











# প্রবাসী

সংস্করণ: ১৯৫০

ক. ক্রিক.

মীরানো

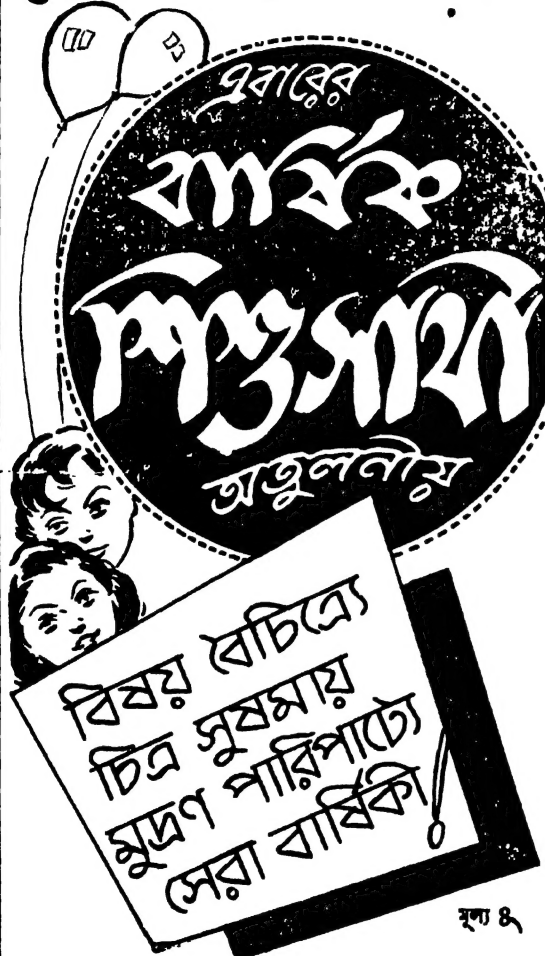
১৩৬০

=পুজার উপহারের ভাল ভাল বই=

শ্রীহর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সিপাহী যুদ্ধের গল্প ৭। মুক্তি-যুদ্ধে বাঙালি

ছোটদের পুজার আনন্দে



Uttara Library

১৯৮৮

২০.৮.৮৮

তোলপাড় ২, কাড়াকাড়ি ২

শ্রীহর্গামোহন মজুমদার অনূদিত ৭ শ্রীধীরেন ধর

দুই সহরের গল্প

দময়ন্তী দেবী সরস্বতী প্রণীত

গল্পে দশ মহাবিদ্যা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু প্রণীত

দেওয়ালাীর আলো

হরিশ্রঙ্গ দাশগুপ্ত প্রণীত

শ্রীঅনির্মল বসু

রঞ্জিতা

হর

চিত্রবহুল হাসির কবিতার বই দুই বই চাপা। মূল্য ১৪০

মজার ছড়া ৬ কবি চোখজুড়ানো ছবি

শ্রীচাক্রজ চক্রবর্তী প্রণীত

যমরাজার বিপদ

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

মন্টুর এক্সপেরিয়েন্স

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনূদিত

টাওয়ার অব লগুন

শ্রীসমর গুহ প্রণীত

নেতাজীর মত ও পত্র

শ্রীধর্গেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

মেরু-অভিযান ১

আলোকের

মহুমতীর বাঁকে ১০

আফ্রিকার জ

ভাকাতের ডুলি ১০

ভোম্বোল সর্দ

বাগদী ভাকাত ২

শয়তানের জ

ছোটদের বেতালের গল্প

আশুতোষ লাইব্রেরী-পি

৫, বহিষ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা :: ১৬, ফরাসিগঞ্জ রোড, ঢাকা :: ২০, হিউয়েট রোড, এ

# প্রবাসী, ৫৩শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬০

সূচীপত্র

কার্তিক-টচত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

করকুমার করাল		শ্রীকানাকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	
-হিমালয় উপত্যকা	... ৩১৮	—জীবন নামে না (কবিতা)	... ১৪৬
করকুমার বহু		শ্রীকালিকারঞ্জন কামুনগো	
-ভারতের বৃহত্তম শিল্প—উঁচ	... ২০৪	—শাহজাদা দারাস্তকো	১৭, ১৪৫, ২৭৫
করকুমার ভট্টাচার্য		শ্রীকালিদাস দত্ত	
পলী অকলে হুয়া	... ৬২২	—শ্রীচৈতন্যদেবের পতিতোরহন	... ৪০১
নাথবন্ধু দত্ত		শ্রীকালিদাস রায়	
—জেলিডজা ছাত্রবৃত্তি বা অভিযানের ছাড়পত্র	... ৬২৪	—একাকী (কবিতা)	... ৪০
নিলকুমার আচার্য		—নিঃশেষের দান (ঐ)	... ২৩০
—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ত্রিপুরার দান (সচিত্র)	... ৫২৬	—বিধাতার হাসি (ঐ)	... ৪৬৮
পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত	... ৩৪৪
—কবির প্রেম (গল্প)	... ৬০১	—আঁধার পূজা (কবিতা)	... ৩০৮
পূর্ণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য		শ্রীকালীচরণ ঘোষ	
—যে লিখন করে ফাঙন এসেছে ঘারে (কবিতা)	... ৫৫৫	—কুটারলিমে যন্ত্রের স্থান	... ৬২২
মরকুমার দত্ত		—পল্লীশিল্প রক্ষার নূতন প্রচেষ্টা	... ৬০৭
—মামার দেশ (নাটক)	... ৪০২	—শহরপত্তনের মূল নীতি	... ৬০৮
মরনাথ চক্রবর্তী		—শিল্প সংরক্ষণ সমস্যা	... ৩৬১
—অভুলপ্রসাদের গান	... ১০৪	শ্রীকালীপদ ঘটক	
মিতাকুমারী বহু		—তাঁজ (কবিতা)	... ৭৩৬
—বিবাহে লোকগীত	... ৪৬২	—অরণ্যে (ঐ)	... ১৮৮
—হোলী	... ৭৩৭	শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত	
মিরকুমার দত্ত		—দীপকথা (সচিত্র নাটক)	... ৪১
—মধ্যযুগীয় যুগের লুপ্ত গ্রন্থিকুল (সচিত্র)	... ৫৭	—সরলাস সাধ (সচিত্র গল্প)	... ৫৪৮
সীমকুমার ঘোষ		শ্রীকুমাররঞ্জন মলিক	
—কেদার-বন্দী বর্ণনে (সচিত্র)	... ৪১২	—কবি-কথা (কবিতা)	... ৭১
ন. ম. বঙ্গবন্ধু রায়		—গ্রামবাসীর কথা (ঐ)	... ৪০৭
—যে আশার প্রিয়তম (কবিতা)	... ৩২৭	—গ্রাম্য পূজারী (ঐ)	... ৬৬৮
পুতৌষ সান্তাল		—বাণীর ব্যাপ্তি (ঐ)	... ২২৭
—উষোধন (কবিতা)	... ৬২৩	শ্রীকৃষ্ণদে	
—চিরন্তনী (ঐ)	... ২০২	—কানীন (কবিতা)	... ৪৬৪
—নিশীথে (ঐ)	... ২৫	—বিরহিনী (ঐ)	... ৩৫
—সনেট (ঐ)	... ৫১৮	শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
পা দেবী		—অপরিসীম (কবিতা)	... ২৪০
—আকাশ-গঙ্গা (কবিতা)	... ১০৩	শ্রীচিঞ্জীহার চক্রবর্তী	
—কণ্ঠস্বর (ঐ)	... ৬০২	—প্রাচ্যবিজ্ঞান সম্মেলন	... ৪২৯
ন পাভলোভিচ শেকত		শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ	
—সাহিত্য-শিক্ষকের কাহিনী (গল্প)	... ৮১	—বাস্তব ও উদ্ভাস (গল্প)	... ৭০৬
কর্ণার বহু		শ্রীজগদীশনাথ নারায়ণ	
—আনুমান (কবিতা)	... ১৮০	—সর্বোদয় : সমাজতন্ত্রবাদের পরিণত রূপ	... ১৮১
—জলের আগুন (গল্প)	... ৪৬৫	শ্রীজীবনময় রায়	
—হেমন্ত-লগ্নী (কবিতা)	... ৮৫	—সাহিত্য-শিক্ষকের কাহিনী (গল্প)	... ৮১
পূর্ণকুমার দাশগুপ্ত		শ্রীজ্যোতির্নাথ রায়	
—টিতোর হুর্গ (সচিত্র)	... ৫৪৩	—সখ্য-ভক্তির মূল	... ৩৩৩

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

ঐদিলীপ দাশগুপ্ত	ঐপ্রভাসচন্দ্র কর
—‘দিবস-দরিতে ভূমি’ (কবিতা)	... ৩১২ —বিক্রম-ভারতের ঐতিহাসিক বোম্বাই—ভোটবাগান
ঐদীনেশচন্দ্র সরকার	ঐপ্রভাসচন্দ্র সেন
—বিষয়গুণসময়ের তাত্রণাপন	... ৭১০ —‘রাজা গণেশের প্রাচীনতম উল্লেখ’ (আলোচনা)
ঐদীনেশ চৌধুরী	ঐবিজয়লতা দেবী
—নীরব বিদায় (গল্প)	... ১৪৪ —অন্ধ প্রদীপ (গল্প)
ঐদীপ্তি পাল	ঐবিজয়মাধব মল্ল
—শাক্যস্ত্রীর বাগান	... ২০৮ —প্রবাহ (কবিতা)
ঐদেবব্রত মুখোপাধ্যায়	ঐবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
—মহাসাগরের শিশু (স্বপ্নবাদ গল্প)	... ৩৩২ —বসন্তে (কবিতা)
—‘শেষ নাট’ (ঐ)	... ৬১৪ —স্বাধীনতার সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ
ঐদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐবিমলেশ্বর ভট্টাচার্য
—পৃথিবী পী বীজ বিনিময়	... ১১১ —সংস্কৃত শিক্ষা
—‘শিক্ষা-সঙ্কট’ সম্পর্কে দু-চারটি কথা	... ৭৩১ ঐবিনয়ভূষণ ঘোষ
ঐদেবেন্দ্রনাথ বসু	—কৃষিবিজ্ঞানে রমায়নের ব্যবহার
—দারজিৎ কালিম্পাংয়ের লামাদের ধর্ম	... ৩১৯ ঐবিনোবা ভাষে
ঐদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়	—আমূল সংশোধন আবশ্যক
—অজানার দেখা (কবিতা)	... ৭২ —ক্রান্তি দেবতা সংস্কৃতি
ঐনরেন্দ্র দেব	—গীতা প্রবচন
—‘সাগর শোলায় কোলে না এ তরী’ (সচিত্র)	২৯, ১৫৩ —সংস্কৃতিক যুগ
ঐনরেন্দ্রনাথ বসু	ঐবিভূতিভূষণ গুপ্ত
—বিজ্ঞানচর্চা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (সচিত্র)	... ৭২০ —দীপ (গল্প)
ঐনরেন্দ্রনাথ বাগল	ঐবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
—সরস্বতী পূজা	... ৪৮৬ —আলোকায় (সচিত্র গল্প)
ঐনিমিত্তকুমার ভট্ট	ঐবিমলাচরণ লাল
—আকস্মিক বাহিনীর উন্নতি (সচিত্র)	... ২৫৩ —সিংল-নরপতি প্রথম পরাক্রমবাহী
—পদ্মপাল (সচিত্র)	... ৯৭ ঐবিমলা চক্রবর্তী
ঐনির্মলকান্তি রত্নমহার	—সঙ্কল্পের জীবনকথা (গল্প)
—অসামান্য (গল্প)	... ১৪৭ ঐবীরেন্দ্রকুমার রায়
ঐনির্মলকুমার বসু	—সুখ (গল্প)
—‘স্বপ্নরোগ কথা’ (সমালোচনা)	... ৭৫১ ঐবীরেন্দ্রনাথ গুহ
ঐনির্মলচন্দ্র বড়াল	—আমূল সংশোধন আবশ্যক
—গান ও স্বরলিপি	... ৩৮ —গীতা-প্রবচন
ঐপারিতোষ দাস	ঐবেণু গঙ্গোপাধ্যায়
—প্রাচীন সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতি	... ৩১১ —জিজ্ঞাসা (কবিতা)
ঐপিনাকীজ্ঞান বর্ধকায়	—পথের শেষে (ঐ)
—চাঁদের বধা (কবিতা)	... ৬৮০ —বাঁহী (ঐ)
—পরিচয় (ঐ)	... ৪৭০ ঐব্রজমাধব ভট্টাচার্য
ঐপূর্ণেন্দ্র গুপ্ত	—বধাতি (সচিত্র গল্প)
—পদ্মবতী সাহিত্যে রায় বসু	... ১২১ —শঙ্কু-কুঞ্জ (গল্প)
ঐপৃথ্বীচন্দ্র ভট্টাচার্য	ঐমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
—‘ড এম. (গল্প)	... ২১১ —‘রবীন্দ্রনাথের চিত্রলিপি’ (সচিত্র সমালোচনা)
ঐপ্রভুল প্র গঙ্গোপাধ্যায়	ঐমণ্ডিলাল দাশ
—রক্তরাশী (উপন্যাস)	১৩১, ২২৭, ৪৪৫ —অপকর্ষবেদ
ঐপ্রকৃষ্ণকুমার দাস	ঐমদন চট্টোপাধ্যায়
—রবীন্দ্রনাথ ও ‘সোহরহু’	... ১৩৮ —গীতা (কবিতা)
—রবীন্দ্রনাথের ‘বর্ণচিত্রা’ ও ‘বর্ণবোধ’	... ৭৫৭ ঐমদন রায়
ঐপ্রভুজ্ঞান বসু	—ঐঐসারস্বতী (নাটক)
—সেবিত্রত শশিধর বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৪৮৯ ঐমহাদেব রায়
ঐপ্রভাকর দাশ	—কাশ্মীরে কোম্পানী (কবিতা)
—পদ্মকান্তি (কবিতা)	... ৫৩৭ —বিদায় (ঐ)

১. পঞ্চলাল বন্দ্যোপাধ্যায়		বেলাটল করীম	
—চিত্র-প্রদর্শনী (সচিত্র)	... ৫৫০	—কথার রাত্‌ডুট্টর জনসন	... ৪৬৭
—শিল্প এবং শিল্পী (ঐ)	... ১৭১	—বেছামের হিতবাদ দর্শন	... ৩৬
২. শ্রীমতী		ক্রিয়েণকা দেবী	
—মেহ নীড় (গল্প)	... ৬০৩	—অমৃতের সন্ধান (সচিত্র গল্প)	... ২৬৭
৩. হিরকুমার মুখোপাধ্যায়		ইন্দ্রলিতকুমার মুখোপাধ্যায়	
—মাতৃস্নেহের বিকাশ	... ৩৫৭	—দুর্গামুক্তির ঐতিহাসিকতা	... ৭৩
৪. মোতাহার হোসেন		ঈশাজ্জীল দাশ	
—নবীন প্রভাত (কবিতা)	... ৪৫৪	—জীবন-অরণ্য (কবিতা)	... ২১৬
৫. হিন্দোমোহন বিশ্বাস		ঈশিনন্দ্রকুমার গায়	
—ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস—হারদ্রাবাদ অধিবেশন	... ১৪৯	—দুই 'জামিন' (কবিতা)	... ১৮৪
—প্রসাদ ভট্টাচার্য		ঈশেন্দ্রকুমার লাহা	
—নারী টেনে তাঁকে তুলেছে উড়ে (কবিতা)	... ২৩৫	—অশান্তি (কবিতা)	... ১৭০
—জীবন চৌধুরী		—পুণ্য ও শ্রীতি (ঐ)	... ৭২
—জৈন কবিতার উপরে মেঘদূতের প্রভাব	... ৭৩০	—ফাগুনে (ঐ)	... ৬০১
—ভাস্কর বাসবদত্তা	... ৭২	ঈশেন্দ্রনাথ সিংহ	
—সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম	... ৪৮৩	—বৈদিক কথার পারিবারিক জীবন	... ৫৭৬
৬. শ্রীমোহন দত্ত		ইশোভদা গুপ্ত	
—গল্পবায়নের গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	... ৭১৪	—ছুটি-টুটু সবা হইতে প্রগতি (সচিত্র)	... ২৫৯
—মনোমোহন ঘোষ		ঈশোরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	
—নবাবী ও দেওয়ানী আমলে মুদ্রা	... ৬২৪	—ঈশ্বর (কবিতা)	... ২৪৬
—নবাবী ও দেওয়ানী আমলে রাজস্ব	... ৪০২	—দাশীর বেলনা (ঐ)	... ১৭৭
৭. গোল্ডকুমার চট্টোপাধ্যায়		ঈশ্বরপ্রভাত চৌধুরী	
—আমাদের নামরহস্য	... ৭৪৩	—নিবে (গল্প)	... ৭৩২
—আমাদের পরিচয়	... ৫৬৭	ঈশ্বরপ্রভাতকুমার ঘোষ	
—আমাদের ভাষা	১০৯, ৩৫৫	—ভূত-কবিতা (গল্প)	... ১৮৯
—সকালের কলীল প্রাক্কণ-সমাজ	... ১০০	ঈশ্বরপ্রভাতী মজুমদার	
—গণচন্দ্র বাগল		—বর্ধন-মন্ত্রিত রাতের বিরহ-বিধুর গজ (কবিতা)	... ২২৫
—রাজা রামমোহন রায় ও ইংরেজী শিক্ষা	... ২৮৫	ঈশ্বরপ্রভাত চৌধুরী	
—শিক্ষা-সঙ্কট	... ৫৭০	—রোমন্থন (কবিতা)	... ১৭৪
—কলকথার্জট		ঈশ্বরপ্রভাত বসু	
—শেষ নাচ (অনুদিত গল্প)	... ৬১২	—কাগজ বিজ্ঞান ও কাগজ-শিল্প (সচিত্র)	... ১৮৫
৮. আলি শাহ		ঈশ্বরপ্রভাতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
—ভাড়াটে ঘর (কবিতা)	... ৪৪৯	—মোমের পুতুল (কবিতা)	... ৯০
—জগৎকুমার সেন		ঈশ্বরপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	
—প্রভাত-স্বপ্ন (গল্প)	... ৭২৫	—বিজয়	... ২৩৬
৯. গুপ্ত		—ভগবান বুদ্ধ ও বুদ্ধি হারীতিকা	... ১০৯
—মুক্তি (কবিতা)	... ২২০	ঈশ্বরপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
১০. মুখোপাধ্যায়		—তিব্বত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র—তোট	
—নবোদয়—সমাজতত্ত্ববিদের পরিণত রূপ	... ১৮১	—বাগান (আলোচনা)	... ৫০০
—জনাথ ঘোষ		ঈশ্বরপ্রভাতকুমার মিত্র	
—কালো মেঘ ও উত্তরে হাওয়া	... ৩৬৩	—ভক্তিগাড়া (স চিত্র)	... ৭০১
—নাথ রায়		ঈশ্বরপ্রভাত গুপ্ত	
—জোয়ার (সচিত্র গল্প)	... ৬৬২	—পদাবলী (কবিতা)	... ৩৪১
—শেষ পাড়া (গল্প)	... ৪২৫	ঈশ্বরপ্রভাত নন্দী	
১১. চৌধুরী		—মৎস্য (সচিত্র)	... ৭১৮
—কাদম্বরী	... ৬১৩	—রবীন্দ্র-দর্শনের ভূমিকা	... ৮৬
—১) রমেশ		ঈশ্বরপ্রভাত বসু	
—ভারতের অন্তর্ভুক্তদের সমস্যা ও উহার সমাধান (সচিত্র)	... ৩৪২	—প্রাণদত্ত	... ২৩৬
—২) মুখোপাধ্যায়		ঈশ্বরপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
—৩) ...	... ৫২	—জ্যোতির্বিদ্যা (গল্প)	... ১৭৬

## শ্রীহরানন্দ বিভাবিনোদ

- করৌলিতে শ্রীমদনমোহন (সচিত্র)  
—কুন্তমেলার সাধু-সম্প্রদায় (ঐ)  
—কুন্তমেলার ইতিবৃত্ত (ঐ)  
—প্রয়াগ ও কুন্তমেলা (ঐ)  
—শ্রীহরিনাথ খানী (ঐ)

## শ্রীহর্যকমল রায়

- ... ৬৫ — নবাবী এমিল কিসার  
... ৬৭৩ শ্রীহর্যোদয় বহু  
... ৪৫৫ — পথিক (গল্প)  
... ৫৭৬ শ্রীহরেশপ্রসাদ নিয়োগী  
... ৩২২ —শ্রীচাঁচন ভারতে বার্ষিক সংগঠন

## বিষয়-সূচী

অজানার দেখা (কবিতা)— শ্রীবীরেন্দ্রনাথরায় রায়

অতুলপ্রদায়ের গান— শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী

অশ্রুর্ধবেদ— শ্রীমতিলাল দাশ

অন্ধ শ্রমীণ (গল্প)— শ্রীবিজনলতা দেবী

অপরিসীমতা (কবিতা)— শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃতের সন্ধান (সচিত্র গল্প) শ্রীশ্বেতকা দেবী

অশীত্ব ধরা (কবিতা)— শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অসামান্য (গল্প)— শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

আকাশ-গঙ্গা (কবিতা)— শ্রীউমা দেবী

আচার্য্য তর্কিনী দাসের স্মৃতিতর্পণ (সচিত্র) —

শ্রীজ্ঞানদীন চক্রবর্তী

আকলিক বাহিনীর উন্নতি (সচিত্র)— শ্রীললিতাকুমার ভট্ট

আলমাসন (কবিতা)— শ্রীকরণামর বহু

আমাদের নামরহস্য— শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের পরিচ্ছদ— ঐ

আমাদের ভাষা— ঐ

আমূল সংশোধন আবশ্যক— শ্রীবিনোবা ভাবে ও

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ও

আলে চনা

আত্মবোধ (সচিত্র গল্প)— শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আঁধার পুত্র (কবিতা)— শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

ঈশ্বর (কবিতা)— শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উষোদয় (কবিতা)— শ্রীঅশ্বত্থোষ সান্যাল

একাকী (কবিতা)— শ্রীকালীকান্ত রায়

কথার রাজা উত্তর জনসন— রেজাউল করীম

কণ্ঠস্বর (কবিতা)— শ্রীউমা দেবী

কবি-কথা (কবিতা)— শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবির প্রেম (গল্প)— শ্রীমহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

করৌলিতে শ্রীমদনমোহন (সচিত্র)—

শ্রীহরানন্দ বিভাবিনোদ

কাগজ-বিজ্ঞান ও কাগজ-শিল্প (সচিত্র)— শ্রীসলিল বহু

কাবখরী— শ্রীরমা চৌধুরী

কানীন (কবিতা)— শ্রীকৃষ্ণধন দে

কালো মেঘ ও উত্তরে হাওয়া (গল্প)— শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কান্দ্রের কোকোঁগরী (কবিতা)— শ্রীমহাদেব রায়

কুটীরশিল্পে বহুরের স্থান— শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কুন্তমেলার ইতিবৃত্ত (সচিত্র)— শ্রীহরানন্দ বিভাবিনোদ

কুন্তমেলার সাধু-সম্প্রদায় (সচিত্র)— ঐ

কৃষিবিজ্ঞানে রসায়নের ব্যবহার— শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ

কৃষিবিদ্যে বাণেশ্বর সিংহ (সচিত্র)

... ৭২

... ১০৪

... ৩৬৩

... ২১০

... ২৪০

... ২৮৭

... ১৭০

... ৭৪৭

... ১০০

... ৬০২

... ২৩০

... ১৮০

... ৫৪০

... ৫৬৭

... ১৫৯, ৫৫১

... ২১৫

... ২৪২, ৫০০

... ২৩

... ৩৬৮

... ২২৬

... ৬২১

... ৪০

... ৪৩৭

... ৬০৯

... ৭১

... ৬৮১

... ৬২

... ১৮৫

... ৬১৩

... ৪৬৪

... ৫৩১

... ১২৪

... ৪২২

... ৪৫৫

... ৬৭০

... ২০০

... ৩৭৪

ক্রান্তি-দেবতা সংস্কৃতি— শ্রীবিনোবা ভাবে

“ক্ষয়রোগ কথা” (সমালোচনা)— শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

কুখা (গল্প)— শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

গান ও স্বরলিপি— শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

গীতা-প্রবচন— শ্রীবিনোবা ভাবে ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ও

গুপ্তপাড়া (সচিত্র)— শ্রীকুমারকুমার মিত্র

গ্রাম্যাদী কথ্য (কবিতা)— শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রাম্য পুজারী (কবিতা)— ঐ

ধুম (কবিতা)— শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত

চাঁদের বাগা (কবিতা)— শ্রীশ্রীনাথকীর্ত্তন কন্দকার

চিত্তার দুর্গ (সচিত্র)— শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

চিত্র-প্রদর্শনী (সচিত্র)— শ্রীমণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবন্ধনী (কবিতা)— শ্রীঅশ্বত্থোষ সান্যাল

চুরি (গল্প)— শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ছুটছুট জগৎ হইতে প্রস্তুত (সচিত্র)— শ্রীশোভনা ও

জলের আল্পনা (গল্প)— শ্রীকরণামর বহু

জিহ্বাসা (কবিতা)— শ্রীশ্বেতকা দেবী

জীবন-অংশ (কবিতা)— শ্রীশ্যামলীদাস

জীবন ধামে না (কবিতা)— শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিষা চাক্ষুশ বা অভিব্যক্তির চাক্ষুশ— শ্রীঅনন্দেরূপ দত্ত

জ্যোতির (সচিত্র গল্প)— শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

জৈন কবিদিগের উপরে দেখদেউর প্রভাব—

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

জ্যোতির্গম (গল্প)— শ্রীহরীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. (গল্প)— শ্রীপুষ্কলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভাঙ্গ (কবিতা)— শ্রীকালীন্দ্র বটক

ভিপত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র— ভোটবাগান—

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

ভিপত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র— ভোটবাগান (আলোচন

শ্রীহরানন্দ বিভাবিনোদ

ভাঙ্গ (গল্প)— শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

ভারতজিৎ-কালিকাভের লামাদের ধর্ম— শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বহু

‘দ্বিষস-দয়িতে ভুলি’ (কবিতা)— শ্রীদীপ দাশগুপ্ত

ছই ‘আমি’ (কবিতা)— শ্রীশিবিরকুমার রায়

দুর্গামুন্ডির ঐতিহাসিকতা— শ্রীললিতাকুমার মুখোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র)— ১২৫, ২৫৩, ৩০৪, ৫০৪, ৬

বীপকথা (সচিত্র নাটক)— শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বনগঠিত অন্তঃরাজ্য (সচিত্র)—

নবাবী ও দেওয়ানী আমলে মুত্— শ্রীশ্যামলীদাস

নবাবী ও দেওয়ানী আমলে রাজত্ব— ঐ

টেনে তাঁরে তুলেছে উর্ধ্বে (কবিতা)— যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	...	২৩৫	ভারতের বৃহত্তম শিল্প— তাঁত—ঐতিহাসিক কুমার বসু	...	২০৪
(কবিতা)—ঐশ্বৰ্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২৫	ভাঙ্গের বাসবদত্তা—ঐশ্বরীন্দ্রবিমল চৌধুরী	...	১৭৯
(গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭৩৯	ভূষণ-কবলিত (গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১৮৯
র দান (কবিতা)—ঐকালিদাস রায়	...	২২০	মংপুতে (সচিত্র)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭১৮
বিদায় (গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৫৫৪	মনোবী এমিল ফিসার—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১৩২
ল (সচিত্র)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২৭	মহাসাগরের শিশু (অনুবাদ গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩৩৯
ক (গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১৫০	মহিলা-সংবাদ (সচিত্র)—	...	৪৬০
র শেষে (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১১২	মাতৃস্নেহের বিকাশ—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩৫৭
লা (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩৪১	মামার দেশ (নাটিকা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪০৯
লী-সাহিত্যে রায় বসন্ত—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২২১	মুক্তি (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২২০
(কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৭৩	মুক্তির মৃগ (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২৩৭
রের গঠন সফল করে কটি কথা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭১৪	মোমের পুতুল (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৯০
কলে জুতা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১২২	মহা-সংবাদ (গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪২৫
ল রক্ষার নতন প্রচেষ্টা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৬০৭	মাতা (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৮৫
(কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৪১	যে লিখন লয়ে ফাটন এসেছে ছায়ে (কবিতা)— ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৫৭৫
ক-পরিচয় ১১৫, ২৫০, ৩৭৮, ৫০৮, ৬১০, ৭৫৬	...	৭২	রক্তাশ্রী (উপক্ৰম)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	১৬২, ২২৭, ৪৪২	
ও প্রীতি (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১১১	রবীন্দ্র দর্শনের কৃমিকা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৮৬
বীণাধী বীণা বিনিময়—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭১৭	রবীন্দ্রনাথ ও "নোভেল"—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২২৮
হ (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭২৫	"রবীন্দ্রনাথের চিত্রলিপি" (সচিত্র সমালোচনা)— ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৬২১
হাত মুখ (গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭৬০	রবীন্দ্রনাথের "ধর্ম্ম-স্বপ্ন" ও "ধর্ম্ম-বোধ"—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৫৭
গ ও কৃষ্ণ-মলা (সচিত্র)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৫৬	"রাজা গণেশের প্রাচীনতন উল্লেখ" (আলোচনা)— ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২৪২
ন ভারতে বণিক সংগঠন—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩১১	রাজা রামমোহন রায় ও ইংরেজী শিক্ষা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২৮০
ন সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতি—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪২৯	গোমথন (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১৭৫
ন বিজ্ঞা সম্মেলন—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২৩৮	শঙ্ক-কৃষ্ণ (গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১১
ও—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৬০১	শহরশতনের মূল নীতি—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩৭৮
ন (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৫০৬	শাকসমার বাগান—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২০৮
বা ও সাহিত্যে ত্রিপুরার দান (সচিত্র)— ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২২৫	শাহজাদা দারাসুকা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	১৭, ১৪৫, ২৭৩	
মঞ্জিত রাতের বিরহ-বিধুর পত্র (কবিতা)— ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭০১	শিক্ষা-সকট—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৫৭০
ম (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭০৬	"শিক্ষা-সকট" সম্পর্কে দু চারটি কথা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭৩১
ও উত্তম (গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১১২	শিল্প এবং শিল্পী (সচিত্র)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১৭১
র বেদনা (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২৩৯	শিল্প সংরক্ষণ সমস্যা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩৬১
মহা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭২২	শেষ নীচ (অনুদিত গল্প)—যোহন ফলকবার্টেট ও ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩১৫
গনাচাণ্ডা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (সচিত্র)— ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩০৭	শেন পাতি (গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪২৫
র (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৬৮	ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪০১
তার হাসি (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৬৯	ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৮৫
হে লোকগণ—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৬৯	ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩৬২
বৈদ্য প্রসঙ্গ ১, ১২৯, ২৫৭, ৩৮৫, ৪১৩, ৪৪১	...	৬৫	সংস্কৃত শিক্ষা—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৫২৯
হিঙ্গী (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭১০	সম্প্রদায়িক যুগ—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩৩৬
বঙ্গ সেনের তাজশাল—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৬০	সবট (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪১৮
বৈদ্য পরিবারিক জীবন—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৭৯	সরলায় সাধ (সচিত্র গল্প)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩০৮
বাণী (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	২২৭	সরলায় পুত্র—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৮৬
ন বৃদ্ধ ও বন্ধু হারানো—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১০৯	সংবাদ: সমাজতন্ত্রবাদের পরিণত রূপ—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১৮১
টে বর (কবিতা)—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৪৯	ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	১৮১
ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৭৪৯	সাহিত্যবিশারদ আবহুল করিম—ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৪৯
ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৩৪২	সাহিত্য-শিক্ষকের কাহিনী (গল্প)—এন্টন পাভেলোভিচ শেফের ও ঐশ্বর্য্যপুত্রের সাক্ষাৎ	...	৪৪২



সিংহল নরপতি প্রথম পরাক্রমবাহু—শ্রীবিমলাচরণ লাহা	...	৬১০	শ্রুণে (কবিতা)—শ্রীকালীদাস ঘটক	...
সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজ—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১০০	জিজ্ঞাসীর উপভাষা—শ্রীঅক্ষয়কুমার কহরল	...
সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বহু রায়	...	১০১	যে আমার প্রিয়তম (কবিতা)—আ. ন. ম. বজলুর রশীদ	...
সেহ-নৌড় (গল্প)—শ্রীমাধবী মিত্র	...	৬০৩	হেমন্ত লক্ষ্মী (কবিতা)—শ্রীকল্পধামর বসু	...
স্বাধীনতা-সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	২১৭	হোলী—শ্রীঅমিতাকুমারী বহু	...

## বিবিধ প্রসঙ্গ

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলার নব ভাগরণ	...	১৩৩	জমিদারী বিলোপ বিল	...
অজমীর চিত্রাবলী সম্পর্কে গ্রন্থ	...	৬৪৬	জাপান ও দূরপ্রাচ্য	...
অমরত সম্প্রদায়ের সমস্ত সমাবানে ভারতের প্রচেষ্টা	...	১৩	ডাক ও তার বিভাগের বাঙালী বৈষম্যানীতি	...
অপরং বা কিং ভবিষ্যতি	...	৬৪১	তটিনী দাস	...
আবর অভিধান	...	২৭৩	তীর্থভ্রম ও তীর্থভ্রম	...
আমেরিকা, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ	...	৬৩৪	ত্রিপুরায় পাঁচ উৎপাদনকারীদের সঙ্কট	...
আলিগড়ে মুসলিম সম্মেলন	...	২৬২	ত্রিপুরায় শক্তিশালী রেডিও স্থাপন	...
আসানসোল হামপাতালে অবাধতা	...	৬২৬	ত্রিয়েশে অশান্তি	...
আসাম সরকারের বৈষম্যানীতি	...	৬৪১	দ্বিগুণলাই গল্পে পোষকতা	...
আসামে কারা-সংস্কার	...	৬৪৪	দিল্লীতে গৃহ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাষ্ট্রসভার আলোচনা-চক্র	...
আসামে বাংলা ভাষার সঙ্কট	...	১২	দেশান্তরে বসতি ও বর্ণবিষেব	...
আসামে শিক্ষকদের দাবি	...	২৭০	নবসিংহদাস বাংলা পুণ্ড্রিক, ১৯৪২	...
আসামের রাজত্বাবস্থা	...	৬৪৪	নারীর সম্মান	...
ইক্স-মিশন সম্পর্ক	...	৬৪১	নিয়ন্ত্রণের ভারত-নিরোধী বিবোধগার	...
এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সামরিকপত্রের তালিকা	...	১৪৪	নিবারণ-ভারত শিক্ষা-সম্মেলন	...
ঐক্যমিত্র সাধারণতন্ত্র	...	১৩২	নিবোধগারী	...
করিমগঞ্জে জমিদার কোম্পানীর খেদ্দাচার	...	৬২৭	নেপালে মার্কিন কারিগরি সাহায্য	...
কল্যাণে পরিকল্পনার দ্বিতীয় বর্ষের কাগ্যবিবরণী	...	৬২০	নৌ-উত্তরীয়াগ্নি: কলেজে পণ্ডিত নেহরু	...
কলিকাতা ময়দানে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা	...	২৪৮	পঞ্চাঙ্গিকী পরিকল্পনা ও কাচাড়	...
কলিকাতার অরাজক	...	৬৪৩	পঞ্চাঙ্গিকী পরিকল্পনার গতি	...
কলিকাতায় পণ্ডিত নেহরু	...	২৭৭	পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ	...
কল্যাণীর পরে	...	৬১৪	পরমাণবিক তপা সংক্রান্ত বিবিনিবেশ	...
কালী মহাকুমার বাধ-সংস্কার	...	৭	পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংগঠন	...
কান্দার, ভারত ও পাকিস্তান	...	৬১৬	পশ্চিমবঙ্গে হৈল ফকানের জন্ম চুক্তি সম্পাদিত	...
কান্দার সমস্তার সমাধান	...	১৩	পশ্চিমবঙ্গে ভূদান আন্দোলন	...
কুটীরশিল্পের অর্থনীতি	...	৬	পশ্চিমবঙ্গে ভূদান যজ্ঞে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ	...
কেনিয়া সম্পর্কে "ম্যাক্‌গেটার রিভিউ"	...	৬৪১	পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলে অপরাধ-নিরোধ ব্যবস্থা	...
কেনিয়ার যেত বর্ধিততা	...	২৭২	পশ্চিমবঙ্গের বাজেট	...
কেজরী বাজেট	...	৬৪৭	পাক মার্কিন চুক্তি সম্পর্কে মহম্মদ আলী	...
কেজরী রাজ্য	...	৬১৮	পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি	...
কেজরী সরকার ও পলাশি	...	৪	পাকিস্তান ও মার্কিন দেশ	...
খাগড়াই বাসন শিল্পের দুর্গতি	...	৬২৩	পাকিস্তানে সরকারী কর্তৃকচাঁরীদের দুর্নীতি	...
খাজ চাঁর নতুন বিপদ	...	১৬২	পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ	...
খাজ-নিয়ন্ত্রণ	...	৬১৮	পাটের ফাটল	...
খাজসঙ্কট	...	৪	পান্ডাঙ্গা সভ্যতার ধ্বংসলীলা	...
ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১৪৪	পূর্ববৃত্ত যোগ ছুটিলা	...
ঐক্যমিত্র আন্দোলন সমগ্র	...	২	পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন	...
চন্দ্রনগর কংগ্রেস কমিটি বাতিল	...	২১৪	পূর্ববঙ্গে নির্বাচন	...
চন্দ্রনগর পরিবরণ	...	৬২৩	পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়	...
চিনির রাজনীতি	...	১০	বঙ্গীর আয়ুর্কেদ চিকিৎসক মহাসম্মেলন	...
জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ	...	১৩৪	বনপাতে নুতন মিউনিসিপ্যালিটি	...
জমাব ভবিষ্যৎবাহিনীর পূর্ববঙ্গ সরকার	...	১৪	বর্ধমান সেটাল কো-অপারেটীভ ব্যাংক	...

## চিত্র-সূচী

আল্‌তাশের সঙ্কট  
ন মেডিক্যাল কলেজ  
ন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি  
নর পৌরপতি সম্পর্কে সরকারী তদন্ত  
পুর কৃকনাথ কলেজের শতবর্ষ  
পুরে সরষা পূজা  
পুর টেট রিলিফ কার্গো ছনৌতি  
পুর পরিকল্পনার এক বৎসরের খতিয়ান  
পুরিহিতিতে ভারতের ভূমিকা  
বৈজ্ঞানিক ইতিহাস শিক্ষা  
ভারতের ভূমিকা  
র বাঙালী দমন  
বাংলা ভাষার প্রতি অধিষ্ঠার  
সমস্ত পঞ্চাশিক পরিচরনা  
সমস্ত ও তদান  
সমস্তার স্থল  
ই রাজ্য পাঠ পুস্তকের অভাব  
ই রাজ্য শিক্ষাব্যবস্থা  
ই রাজ্য পরিবহন বিভাগের ক্রয়নীতি  
এডিনাঙ্গ  
চিহ্ন বাহিনী  
বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান  
কামান ইল্লাত-শিল্প চুক্তি  
বুন্দরাই চুক্তি  
সোভিয়েট বাণিজ্য-চুক্তি  
জন-পরিবর্তিত  
জীবনযাত্রা প্রণালী  
র গৃহ সমস্তার তত্ত্ব  
বৈদেশিক পুষ্টি নিয়োগ  
সোনার চোরাকারবার  
হর কাগ্যরত জনসমষ্টি  
হর জাহীর আর  
আলোচনে প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ  
ইরান আইন ও স্থানীয় কোর্ট  
র ক্রয়বর্তমান ভূমিসংগ্রাম

...	১০১	মানবজীবের "চুই পরব" ও বিহার সরকার	...	৬২৬
...	২১১	মার্কিন সরকারের ঔপনিবেশিক নীতি	...	১০২
...	৭	মার্কিন সহ সভাপতির ভারত সফর	...	২০৭
...	১০২	মিশর ও ব্রিটেন	...	২০৮
...	১০৭	মুর্শিদাবাদে কলেজের শিক্ষার প্রসার	...	৩০৮
...	৩৪৪	মুর্শিদাবাদে বেকার-সমস্যা	...	৬
...	২৭০	মুর্শিদাবাদে রেশন সমবায় সমিতি	...	৬৬০
...	৩১৮	মেদিনীপুরের লগ-ঘাটের অব্যবস্থা	...	৬৬৭
...	১৩	মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	...	১০৮
...	৩৪১	রক্ত বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ	...	৬৬৬
...	৬৩৩	রাজা রামমোহন রায়	...	১০৯
...	৩৮৮	রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি	...	৬৪৬
...	৬৩৪	রাজ্যে সাধারণ পুনর্গঠন কমিশন	...	৬১৬
...	২	রেলপথের ও ইল্লাতের জঙ্গ মার্কিন সাহায্য	...	৩৮২
...	২	লবণ স্তম্ভ	...	৩৯০
...	১	শততম মৌলিক পঞ্চাশ আবিষ্কার	...	৬৬৬
...	৩৪৬	শতাব্দিক বৎসবে ভারতের রেলপথে	...	৩৮২
...	৩৪৬	শিল্পকর্মের কল্পবিচিত্র	...	৬১০
...	৬৬০	শিল্পের উন্নয়ন কলেজের অধ্যক্ষের পদ্যাতি	...	১০৮
...	১০২	সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও পুলিশ	...	১২০
...	১০	সমাজ-উন্নয়ন পরিচরনা কাগজের অগ্রগতি	...	২০৮
...	৮	সমাজ-উন্নয়ন পরিচরনার এক বৎসর	...	৬২০
...	৩২১	সম্পত্তি লক্ষ্য আইন	...	১১
...	৩৮৮	সরকারী ব্যবস্থা বিভাগ	...	২০২
...	২০৪	সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার আর	...	৭
...	২৬৭	সাংবাদিক নিগ্রহ তদন্ত রিপোর্ট	...	১২৬
...	৩২১	সি'বুমে বুনিরাদী শিক্ষা	...	১১
...	৩২১	সি'বুমে লিপির প্রতিযোগের প্রতিবাদ	...	৩২২
...	১০৩	সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বিশ্বশান্তি	...	৩২২
...	২০৩	সোভিয়েট ইউনিয়নে বাল্য মৃত্যু	...	৬২৪
...	৬৬০	সোভিয়েট দেশের প্রাচীনতা পরিবর্তন	...	৬২৩
...	৬৪২	স্থল ফ'টনাল পক্ষাকোষে শুভাশীষ নিক্ষেপ	...	৬৪২
...	৩২৬	স্বাধীনতা পূর্ণতা ও জীবনধারণের মান	...	২০৮
...	২০৩	স্বাধীনতার পথ	...	৩
...	১৪১	হরিনন্দন সাংস্কৃতিকের প্রচারমাধ্যম	...	২৭২

## চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র  
—ঐতিহাসিকাল বসোপাখ্যার  
এ বাচ—ঐতিহাসিকাল সেনসুপ্ত  
ন—  
—ঐতিহাসিকাল বসোপাখ্যার  
ন—ঐতিহাসিকাল চক্রবর্তী  
নংসার—ঐতিহাসিকাল চক্রবর্তী  
একবর্ণ চিত্র  
—সরস্বতী চিত্রাবলী  
—ঐতিহাসিকাল বসোপাখ্যার  
—ঐতিহাসিকাল বসোপাখ্যার  
—ঐতিহাসিকাল বসোপাখ্যার

...	২৪৭	—একটি গোখা পরিবার	...	৬৪০
...	১	—বাড়গামে ব্রহ্মন বিভাগের কল্পিত	...	২০
...	১২২	—বুন্দাবনপুরে সাওতালদের তীর চৌড়া প্রতিযোগিতা	...	২০৩
...	৩৪১	—মহাশী বালকবালিকা	...	২৬৬
...	৩৮৬	অমরনাথ রায়	...	৬৪০
...	৩৮৬	অমরনাথের একটি বৌদ্ধত্ব	...	২০
...	৬১৩	আকস্মিক বাহিনী চিত্রাবলী	...	২০৩
...	৩৪৪-৬	আহমেদাবাদে দুর্গাপূজা	...	২৬৬
...	৩৪৪-৬	ইউ এস-এস-আর-এর রাষ্ট্রদূত এম. কে. মেনশিকভ কর্তৃক	...	১০২
...	৩৪৪-৬	প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রদানকে প্রদর্শন প্রদান	...	১০২
...	৩৪৪-৬	ইতিহাস একাডেমি অব সাইন্স আর্টস-এর প্রদর্শনীতে	...	১০২
...	৩৪৪-৬	ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ	...	১০২

## চিত্র-সূচী

করৌলীতে শ্রীমদনমোহন চিত্রাবলী	...	৬৫-৭০	—শ্রীতলচন্দ্র বিজানিধি	...
—করৌলীয়ায় গোপালসিংহ			—শ্রীশচন্দ্র রায়	...
—গোপীনাথজীর ভগ্নচূড় মন্দির, বৃন্দাবন			বজ্রীনারায়ণ হইতে নীলকণ্ঠ পাহাড়ের দৃশ্য	...
—গোবিন্দজীর ভগ্নচূড় মন্দির			বজ্রীনারায়ণের মন্দির	...
—গোবিন্দজীর মন্দির			বাণী চক্রবর্তী	...
—বর্তমান বৃন্দাবনের দৃশ্য			বাণেশ্বর সিংহ	...
—মদনমোহনের মন্দির, বৃন্দাবন			বি-বি-সির টি. ভি. ষ্টুডিওতে "দি লাইফ এণ্ড ডেথ অব কিং.	...
—জুবলদাস গোবামী			জন"-এর অভিনয়	...
কাগজ-বিজ্ঞান ও কাগজ-শিল্প চিত্রাবলী	...	১৮৫-৭	বি-বি-সির টি-ভিতে চিত্রকলা শিক্ষাদান	...
—আখের ছিবড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত পদ্ধতির মডেল			বিশাখাপত্তমের সমুদ্রতীরে জেলে শ্রীপুরুষ	...
—একটি আধুনিক কাগজের কল			মংগু চিত্রাবলী	...
—কাগজের পাল্প তৈরির কাঠ			মধুর ভাবনা (এন্তরে খোদাই মূর্তি) —	...
—বাংলা ভাষার সাহায্যে পাঁতলা করে কাঠ কাটা			শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	...
কুমোর—শ্রীসমর ঘোষ	...	৫১৩	মধ্যাজীবীর যুগের প্রাণিকুল চিত্রাবলী	...
কুম্ভমেলা চিত্রাবলী	৪৫৫-৬২, ৬৭৩-৭৭, ৬৮৮-৮৯		মহাত্মা গান্ধী—শ্রীমদীর খাত্তর	...
কোয়ার-বজ্রী চিত্রাবলী	২২১ ৫, ৫০৫, ৪১১-২৪		মহেন্দ্রলাল সরকার	...
খেলনা শিল্প চিত্রাবলী	১২২, ২০২-৩০		মা ও মেয়ে—মিসস ও কুনিমোসি	...
অগ্নিপাড়া চিত্রাবলী	...	৭০১-৫	মাটির মানুষ—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	...
গোপেশ্বর মন্দির	...	৪০৪	মাতাজের রাজ্যপাল শ্রী শ্রীকালশঙ্ক ভারতীর কাষ্ট্রিয়ান	...
চিত্তোর-দুর্গ চিত্রাবলী	...	৪৪৩ ৬	ফোসের সৈন্যদল	...
চিত্র-প্রদর্শনী	...	৪৫০-৪	মেরিলাও ভারতের দুই জন মহিলা সমাজকর্মী -	...
—অবসর বিনোদন—শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত			গুপ্তধামী এবং কৃষ্ণাবাস্তি নিম্বকর	...
—ভরজ—শ্রীগোপাল ঘোষ			রাজ্যপালের সঙ্গে মণিকতলা রেশমিং আপিসের কন্সটারিগণ	...
—বাঁহু—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়			লেঃ কমান্ডার ইন্স সিং ও কমান্ডার কোহলি সহ	...
—বীল রঙের পরিচ্ছদ একটি মেয়ে—শ্রীজগদীশ রায়			জেনারেল মচন্দ্রদ নেভার	...
—কেরি-বাট—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী			শহরের দাশনিকের খোলামঠ	...
—লাল সেতু—শ্রীক. সি. এস. পাণিকার			শিল্প এবং শিল্পী	...
—মূরের বর্ণ—মোহন বি. সামন্ত			—করাভী—শ্রী হরেন দাস	...
চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথ	...	৬২১	—কলিকাতার রাস্তা—শ্রীইন্দু রক্ষিত	...
খাঁড়খড়ের একটি কুচিঝীবা সাওতাল পরিবার	...	৩০৪	—গৃহান্তিমুখে—শ্রী হরেন দাস	...
তটিনী দাস	...	৬০২	—দিনান্তে—	...
জিবেশী সঙ্গমের দৃশ্য, প্রয়াগ	...	৪৬৪	—দুর্গামুক্তি গড়ন—অগ্নী নী দত্ত	...
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে 'ডক্টর অব			—নৃত্য—আমণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...
ল'জ ডিগ্রি প্রদান	...	৬৪১	—মুক্তি—শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত	...
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	...	৬৩৯	—মেঘমলার—শ্রীমণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...
মজল হাইডেল কানাডা পরিদর্শনরত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু	৩০৪		—স্টেচ—শ্রীগোপাল ঘোষ	...
মখনীতা গৈব	...	১৫৭	—সুকপত্মী নোকা—শ্রীগোপাল রায়	...
মজপাল চিত্রাবলী	...	২৭-৯	শ্রী শ্রীসারদামণি দেবী	...
পুণা রিসার্চ স্টেশন	...	৭২	সংবাদপত্র পাঠ—চিত্রাং চাও হো	...
প্রয়াগ ও কুম্ভমেলা	...	৫৭৬-৮৪	"সাগর দোলায় দোলে না এ তরী" চিত্রাবলী	২২-৩৪ ১৫
প্রয়াগ দুর্গ	...	৪৬৪	সিপ্রা নদীর তটে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ও স্নানঘাট, উজ্জয়িনী	...
প্রতিকৃতি—শ্রীমাধন দত্তগুপ্ত	...	৩৮৫	হরিদাস দ্বারী চিত্রাবলী	...
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে জিপুরার দান চিত্রাবলী	৫১৬-৬০১		—বাঁকা বিহারীর আবির্ভাব স্থান	...
—কৈলাসচন্দ্র সিংহ			—বাঁকা বিহারীজীর মন্দির	...
—বিজয়দাস দত্ত			—বুদ্ধমূলে ভজনরত হরিদাস দ্বারী	...
—বনলত দেবী			—ভগবানদাসজী	...
—বীরচন্দ্র মণিক্য			—রজনমহল বা রাধাকৃষ্ণ বিশাল স্থান	...
—বীরেন্দ্রকিশোর মণিক্য			—হরিদাস দ্বারী	...
—রাধাকিশোর মণিক্য			—হরিদাস দ্বারীর সমাধি ও প্রাচীন তৈলচিত্র	...
—শশীকৃষ্ণ বিদ্যালকার			হিবালয় পর্বতপ্রাঙ্গণ ও গঙ্গার দৃশ্য, হরীকেশ	...



স্বামী হোস. কলিকাতা

নৌকা-বাচ  
শ্রীমদ্বৈষ্ণব সেনগুপ্ত

‘দ্বিতীয় আত্মজীবন’ শিল্পকলা প্রদর্শনী, কলিকতা



মা ও মেয়ে

[ শিকী—দ্বিতীয় কলিকাতা ]



সংবাদপত্র-পাঠ ( ভল ৮ ) শিকী—চিয়াং চাও-কো  
। শ্রী অর্জুনকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

# অবাস্য

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নারায়ণ! বলহীনেন লভ্যঃ”

১৩শ ভাগ  
২য় পত্র

কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ.

### বেকার-সমস্যার মূল

অধিকাংশ লোকেরই ধারণা বেকার-সমস্যার একটিমাত্র মূল কারণ—চাকরি অভাব। “চাকরি” শব্দের উৎপত্তি “চাকর” হইতে ইহা বোধ হয় আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি—এমনি ভাবেই দাস-মনোবৃত্তি আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃক্ষে আমরা দৈনিক আত্মিকার দিনে যাহারা চাকরি করেন অথচ দাসত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদের অধিকাংশই কার্যিক পরিশ্রমে বা শিল্প-কৌশলে অল্পের সংস্থান করেন। তাহাদের অশন-বসন হয়ত অল্প চাকুরে অপেক্ষা অমার্জিত বা অসংস্কৃত কিন্তু তাহাদের অবস্থা এক হিসাবে ঢের সচ্ছল। যাহারা পরিষ্কার থাওয়া-পরার সঠিক চাকরির মধ্যদ্বারা বুঝেন তাহাদেরই অধিকাংশের আত্ম দুই দিক সাময়িক প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। হয় পূর্ন-পুনঃবের সক্রিয় সম্পত্তির বিক্রয় বা বিনিময় নচেৎ ক্ষণভার স্বঃক লওয়া, ইহা ভিন্ন তাহাদের গতান্তর নাই। কিন্তু তথাপি চাকরি চাই।

বাস্তবক্ষে বাঙালী মধ্যবিত্তের “ভদ্রস্থ বন্ধা”ই তাহার অকৃতম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছেলেকে স্কুল-কলেজে পরিষ্কার কাপড়-জামা পরাইয়া পাঠাইতে হইবে নচেৎ মানহীন হইয়া যায়; সেখানে তাহার যে শিক্ষা বর্তমানে হইতেছে তাহাতে সে—অন্ততঃক্ষে অধিকাংশক্ষে—অবিনয়ী, অশিষ্ট ও উদ্ভ্রম স্বভাবযুক্ত হইয়া বেকার ও নিষ্কর্ম হইতে বাধ্য, যদি না সংসারের আশুনে পুড়িয়া তাহার মতিগতি কিরে। কিন্তু তাহা হইলেও সে যতবার হোচট খাইয়াই পাসের ছাপ আদায় করুক না কেন, তাহার বংশের ভদ্রত্বের খ্যাতি তো রহিল। সে খ্যাতি ধুইয়া খাইলে শরীর বা মনের পুষ্টি হয় কিনা একথা আমরা কয় জনে ভাবি?

তাহার পর আছে সামাজিকতার চাপ। সামাজিক কাজে-বর্থে, ভৃত্যভোজননের পর্কে এবং নানা অবাস্তব ব্যাপারে বাঙালী মধ্যবিত্তের যে অপব্যয় হয় অল্প কোনও প্রদেশের তুল্য অবস্থার লোকের তাহার এক-চতুর্থাংশও হয় না নিশ্চয়। ফলে বাঙালীর ব্যয়ের খাতে অল্প বাড়িয়াই চলে, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চিন্তামাত্র থাকে না।

মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী বা মহারাষ্ট্রীয় চাকুরে তাহার আয়ের বেশ একটা অংশ সঞ্চয় করে। স্বভাব পুত্রের শিক্ষা শেষ হইলে যদি চাকরি না জোটে তবে ব্যবসারে, কৃষিতে বা শিল্পে তাহাকে বসাইয়া দিবার কিছু জোগাড় সে করিতে পারে। বাঙালীর ক্ষেত্রে পুত্র ত

ব্যাপের ধার শোধ করিবারই চেষ্টা আগে করিত—এখন তাহাও করিতে সে অপারগ ও অসম্মত। বাঙালী এমনই সাংস্কৃতিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে বন্ধক রাখিয়াও যে ব্যবসায় করিবে তাহার উপায় নাই, অথচ ভদ্রত্বতা রাপিতেই হইবে।

মুসলমান দরজী পরিবার দিনে পাঁচ সাত টাকা উপার্জন করে, বিহারী বা হিন্দুস্থানী মৃচি দিনে চার হইতে ছয় টাকা উপার্জন করে। হিন্দুস্থানী পানওয়ালা দিনে পনের-কুড়ি টাকা উপার্জন করে। দিন-মজুর যে সেও মাসে ১০০ টাকা উপার্জন করেই। হিন্দুস্থানী দরওয়ান পঞ্চাশ-ষাট টাকার চাকরি করে, তৎসঙ্গে সকাল-বিকাল ও ছুটির দিনে অল্প কাজ করে। শেষজীবনে কয়েক হাজার টাকা ও জমিজমার ব্যবস্থা করিয়া দেশে যায়। বাঙালী মধ্যবিত্তের ছেলে ওসকল কাজে পটুও নয় ইচ্ছুকও নয়—কেননা তাহাতে ভদ্রত্বতা থাকে না, যায়।

বাঙালী মিত্রী এককালে সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল—কার্য-কুশলতার এবং বিশ্বস্ততার। তাহার সে কার্যকৌশল আজও আছে, কিন্তু ফাঁকির চোটে তাহার সুখ্যাতি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বাঙালী এখন কর্মবিমুগ্ন ও ফাঁকিবাজ বলিয়া লোকের বিশ্বাস হারাষ্টিতে বসিয়াছে। উপরন্তু সে নিয়ম মানিতে চাহে না, শৃঙ্খলার বা সময়মত কাজের ধার ধারে না। সুতরাং কলকারখানাতেও তাহার স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতেছে।

বাকি রহিল জমিজমা ও ব্যবসায়। জমার কোটার ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুল্ক, জমিতে হাত দিলে জাত যায় বর্ণহিন্দুর—অবশ্য এটা কোন শাস্ত্রমতে তাহা জানা যায় নাই। উত্তরপ্রদেশে, বিহারে, রাজপুতানায় ও মধ্যপ্রদেশে আক্রমণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত প্রভৃতি উচ্চবর্ণের চাষী অসংখ্য এবং এই কারণে সে সকল দেশে চাষের অবস্থা-ব্যবস্থাও উন্নতির পথেই চলিয়াছে। বাংলায় শুধু পরভোজী (parasite) শ্রেণীরই বংশবৃদ্ধি হইতেছে।

তাহার পর ব্যবসায়। বিনা পুঁজিতে ব্যবসায় কি করিয়া হয়? আমাদের পুঁজির অবস্থা এমনিই দাঁড়াইয়াছে যে, “পুঁজিপতির ধ্বংস হউক” গুলিলে সাধারণ ভাবে আমরা সকলেই আনন্দিত হই। পুঁজিহীনকে অর্থসঞ্চয় যোগাইবে কে? ছিল কতকগুলি বাঙালী ব্যাঙ্ক, তাহারা তবুও কিছু করিত। কিন্তু বাঙালীর অন্তঃকলহ, দলাদলি ও দৌর্য্যবল্যের কারণে সেগুলিরও ধ্বংস হইতেছে।

## বেকার-সমস্যা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ভারত সরকার কি ভাবে এই সমস্যা পূরণ করিবেন তাহার পূর্ণ পরিকল্পনা বোধ হয় এখনও রচিত হয় নাই। এদিকে কিন্তু বড় বড় টাকার অঙ্ক দেশ দিয়াছে এবং তাহার খরচের জন্য পরোক্ষ ব্যবস্থাও বোধ হয় নিভুতে তৈয়ারি হইতেছে। যাহা হউক, সরকার যে এ বিষয়ে চেষ্টা সেটুকু অসংবাদ ও নিম্নস্থ বার্তায় পাওয়া যায় :

“৭ই অক্টোবর—আজ নয়াদিল্লীতে ভারতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিনব্যাপী অধিবেশনের সমাপ্তিতে অধিক-সংখ্যকের কর্ম-সংস্থানের সাহায্যে বেকার-সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রসার বাবদে আরও দেড় শত হইতে পোনে দুই শত কোটি টাকা ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। নূতন নূতন পরিকল্পনার সাহায্যে এই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।”

এই পরিবর্তিত কর্মসূচীতে যে সকল পরিকল্পনা স্থান পাইবার যোগ্য তাহার কথা জানাইয়া একগানি পত্র শীঘ্রই রাজ্য সরকার-সমূহের নিকট প্রেরিত হইবে। এখন পরিকল্পনা বাবদে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইল ২২১৯ হইতে ২২৪৪ কোটি টাকার মত। আজ সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, দুই দিনের আলোচনার ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

আলোচনার এক সময়ে বাধা দিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, “পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কতকগুলি বিষয় বৈকল্পিক সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্থানীয় জনকল্যাণমূলক কার্যে জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়াছে তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইবার কারণ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এতটা সাফল্য অনেকটা আশ্চর্যের বিষয়। গণতন্ত্র শুধু সরকারের কাঁখে ভর করিয়া চলিতে পারে না। অতএব পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কাজে সর্বসাধারণের সঠিত সংযোগের কথা মনে রাখিতে হইবে। পরীবাঙ্গীকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীকার করিয়া তুলিতে হইবে।”

শ্রীনেহরু বিশেষ ভাবে দিয়া জানান, “ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জনগণের পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার সময়ে সকলের মনে এই ভাব জাগ্রত করিতে হইবে যে, দেশের প্রতিটি নবনারী ও শিশু আজ ভারত লিমিটেডের অঙ্গীকার। নূতন ভারত গড়িবার মহান দায়িত্ব নির্মীতে আমরা সকলেই একযোগে প্রতী হইয়াছি।”

সহ-সভাপতি শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী বেকার-সমস্যা নিরসনে এই অতিরিক্ত পরিকল্পনার কথা ঘোষণার সময় অর্থ-মন্ত্রী শ্রী সি. ডি. দেশমুখের প্যারামেন্টের গত অধিবেশনে প্রদত্ত বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে সকল নূতন পরিকল্পনার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল : (১) বাস্তবায়নের পুনর্কাসন পরিকল্পনার সম্প্রসারণ—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তিন বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল। এখন স্থির করা হইয়াছে যে, ইহার পরেও পুনর্কাসনের কাজ

চলিবে। অর্থাৎ, পূর্বাপুরি পাঁচ বৎসরই এই পরিকল্পনা চালু থাকিবে। (২) রাজ্যসরকারবৃন্দ কর্তৃক শিল্প-উন্নয়ন সংস্থা ও শিল্প-অর্থসাহায্য সংস্থা গঠন। (৩) অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য স্থায়ী সাহায্য পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে সাহায্য দান। (৪) বাস্তব নিৰ্মাণ ও স্বল্প শক্তিসম্পন্ন শিল্প-সংস্থাদের সাহায্যদান। (৫) কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা। (৬) কতকগুলি সাধারণ শ্রেণীর কার্যকলাপ।

রাজ্যসরকারসমূহের পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থান সম্পর্কে পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উন্নয়ন “লেভী” ধাৰ্য্য করাই সর্বোত্তম পন্থা। এতৎ সম্পর্কে রাজ্যসরকারবৃন্দকে অনুবোধ জানান হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন সদয় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন। বর্তমান চলকর যেখানেই কম রহিয়াছে, সেখানেই উহাকে বাড়াইয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

সাধারণ শ্রম সংগ্রহের সাহায্যে অর্থ-সংস্থান করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

## বেকার-সমস্যা ও ভূদান

ভূদান যজ্ঞে যে শুধু ভূমিহীনের ভূস্বত্ব লাভ হইবে তাহাই নয়, এরূপ অসংখ্য লোকের কাছের সংস্থান হইবে যাহারা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কর্মহীন ও অন্তঃীন অবস্থায় কাটায়। সুতরাং ভূদানে যজ্ঞের অংশ হোতা দাতা ও ঐশীতা সকলেরই প্রাপ্য, যদি তাঁহারা সকলেই সমান শ্রমবান হন। ২৬শে সেপ্টেম্বরের ‘হরিজন পত্রিকা’ হইতে আচাধ্য বিনোবার বাক্যাংশ আমরা নিম্নে দিলাম। ইহাতে ভূমিতে কায়িক পরিশ্রম সঙ্ঘেও যাহা আছে তাহা প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তানের প্রাণধান যোগ্য :

“১৯৫৭ সন পর্যন্ত পাঁচ কোটি একর জমি চম্ভাস্তব হইয়া যাইবে—এইরূপ আশা আমরা রাখিয়াছি, পরন্তু ভূমিদান যজ্ঞের যে প্রকৃত রূপ আছে, উহা কেবলমাত্র এক ধর্মবিচারের প্রবর্তন দ্বারাই সম্ভব হইবে, ইহাই আমি বাৎসর্য বলিয়াছি। কোনও একজন আমাদের ভূমিদান করিয়াছেন। ধরিয়া লউন যে জমিকর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি উহা দান করেন নাই, শ্রমের শেষে উহা দান করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দান দ্বারা তাঁহার আপন জীবনযাত্রা পরিচালনা করিবার চিন্তার মতো এখন পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় ঐ দানকে ক্ষণিকের পূণ্যদান বলিয়া মানিতে হইবে। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী পূণ্যও মানুষকে সমাধানের পথ প্রদর্শন করে, কিছু সম্ভাবনাও উপস্থাপন করে। কিন্তু এটুকুতেই আমার কার্য সম্পন্ন হইবে না। আমি বাল পালকোটে বলিয়াছিলাম যে, দান করিলে স্বয়ং পরিবর্তন হইবে। তবে উহাকে চিরস্থায়ী পরিবর্তন তখনই বলা যাইবে, যখন সেই আদর্শ অনুযায়ী দাতার জীবনের পরিবর্তন সাধন হইবে। এইভাবে কতিপয় শ্রমিকের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হইতেছে। এইরূপ লোক অল্পসংখ্যকই আছেন। তথাপি তাঁহারা আমাদের যজ্ঞের মুখ্য সংগ্রহ। এইরূপ জীবন পরিবর্তন তখনই হইবে, যখন আমরা সাধনার দ্বারা স্বয়ংের মধ্য হইতে অধিক সংশোধন সঞ্চার করিতে

ধাক্কি এবং আমরা আমাদের কথাবার্তার মধ্যে, দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে, আমাদের মনের ক্ষুদ্র অমুচ্ছৃতিত্বের মধ্যে এই সকল পূর্ণ সংশোধন সঞ্চারিত করিব। তখন আমরা আশা করিতে পারিব যে, দাতার হৃদয় পরিবর্তন চিরস্থায়ী হইবে। পরিবর্তন কণস্থায়ী যেন না হয় এবং এই দানের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন যেন আসিয়া যায়।

এই দৃষ্টিতে আমরা কোদাল চালানোর যে কার্য্য শুরু করিয়াছি, ইহার সফলত্বও আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। ক্ষেতের মধ্যে মাটি গোড়ার কাজ আমি এক প্রকার ভগবৎ উপাসনার মত কয়েক বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছি। এবং সেই নিষ্ঠা এতই গভীর যে উহার দ্বারা এই এক জনশক্তি নিষ্কাশন করা যাইবে, এইরূপ আশা আমার বহিয়াছে। আমরা পদব্রজে দশ-বার মাইল চলিয়া থাকি। ইহার পর আর কোদাল চালাইবার মতন খুব বেশী শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, তবুও কয়েক ঘণ্টার জন্ত কেন আমরা কোদাল না চালাইব? কিন্তু বিলম্ব হইলেও আমরা কোদাল চালাই। প্রত্যন্ত কোদাল চালাইয়া গেলেও কোন যত্নবৎ কার্য্যক্রম থাকা উচিত নহে। শরীরজন্মের মধ্যে নিষ্ঠা রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে ভুদান যজ্ঞের কাজ সফল হইবে না, এবং বর্তমান দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতি হইবে না। দরিদ্র এবং ধনীর মধ্যে ভেদভেদ জ্ঞান ঘুচিবে না ও সংস্কার সমাজের প্রতিষ্ঠাও হইবে না। এই সকল কথা বুঝিয়া আমাদের কোদাল চালাইয়া শ্রমদান যজ্ঞ সার্বক করিতে হইবে। ইহা আমি কেবলমাত্র নিজের কোদাল চালাইবার কার্য্যক্রম সফল হই বলিতেছি না। আরও অনেক কথা আমি চিন্তা করিতে থাকিব। এইরূপ ভাবে আমরা গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিব।

### স্বাধীনতার পথ

পণ্ডিত নেহরু এত দিনে বুঝিতেছেন, আমরা স্বাধীনতার পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি। এতদিন তো একদিকে আনন্দোল্লাস এবং অল্প দিকে আত্মনাশ ও হিংসার চিংকারই দিন কাটিয়াছে। ভারতে দাসত্বের শৃঙ্খলও সর্বত্র দূর হয় নাই। নিম্নের সংবাদে তাহাই জানা যায় :

“কোয়েম্বাটুর, ৪ঠা অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী জিনেত্রু আজ প্রাতে এখান হইতে বক্রিশ মাইল দূরে পালঘাটে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জোরের সহিত বলেন যে, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অজ্ঞাত সমস্ত দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে এদেশে আর বৈদেশিক উপনিবেশ থাকিতে পারে না। তিনি বলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নে মাঠে প্রকৃতি বৈদেশিক উপনিবেশের অবস্থিতি সম্পর্কে জনগণের উত্তেজনার কারণ তিনি বুঝিতে পারেন, তবে এই প্রশ্নটি বৃহৎ দেশগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং শাস্তিপূর্ণ উপায়ে ইহার সমাধান করিতে হইবে।

‘এক কেরালা’র দাবির কথা উল্লেখ করিয়া জিনেত্রু বলেন যে, বর্তমানে তিনি এখন ‘এক ভারত’ ও ‘এক ইণ্ডিয়া’ প্রভৃতি বড় বড় প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন, স্তত্রাং ছোট ছোট বিষয়ে

তিনি আরো মনোনিবেশ করেন না। তবে তিনি বলেন যে, সমগ্র প্রশ্নটি সম্পর্কে বিবেচনার জন্ত নীচের একটি উক্ত, ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিযুক্ত হইবে।

প্রধানমন্ত্রী জিনেত্রু আজ এখানে বলেন যে, স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাঁহারা শুধু তাঁহাদের পথ-পরিচালনার একাংশ সমাপ্ত করিয়াছেন; কিন্তু এখনও দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইবে।

আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় চিদাম্বরম পাকে এক লক্ষ নব-নারীর এক সমাবেশে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জিনেত্রু বলেন, “স্বাধীনতা প্রাপ্তির দ্বারা আমি, তুমি এবং এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু ইতিহাস সৃষ্টি করে নাই; পরন্তু, উহা দ্বারা এশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।”

### তীর্থস্থল ও তীর্থগুরু

বৈদ্যনাথধামে ষাঠা ঘটয়াছে তাহাতে দেশের লোকের চক্ষু কতটা খুলিয়াছে। পুণ্যতীর্থসমূহে যে কিরূপ অনাচার হয় তাহা কাহারও অবদিত নহে। স্তত্রাং নিম্নলিখিত সংবাদটি সমরোপযোগি এবং বিবেচন্যযোগ্য :

“পাটনা, ৭ই অক্টোবর—বিহার বিধানসভার সদস্য জীবৈজ্ঞানিক সিং (কংগ্রেস) বৈদ্যনাথধাম মন্দির বিল (১৯৫৩) বিহার বিধানসভার উপস্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন। বৈদ্যনাথধাম মন্দির ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সুপরিচালনার জন্ত এই বিল বিধান বহিয়াছে।

এই বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সফল বলা হইয়াছে : বহু শতাব্দীর প্রাচীন ও পুণ্যতীর্থসমূহের মধ্যে বৈদ্যনাথধাম অঙ্গতম হইলেও দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানে পাণ্ডাদের রাজত্ব চলিতেছে। এই পাণ্ডাদের পেশা কালক্রমে যাত্রীগীড়নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কুম্ভম্ভার, গোড়ামি ও ধর্ম্মে বক্ষণশীলতা দেওঘরের পাণ্ডাদের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। নানাভাবে তাহাদের অত্যাচার চলিয়া থাকে। কিন্তু সংবাদপত্রে তাহা অল্পই প্রকাশিত হয়। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে ত্রিভুজনের বৈদ্যনাথ মন্দির প্রবেশ সমর্থন করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী পঞ্চাঙ্গ দেওঘরের পাণ্ডাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃহতা সম্পূর্ণ উচ্ছেদের বিধান বহিয়াছে। সংবিধানে অস্পৃহতা কেবল নিষিদ্ধই হয় না, ইহার প্রয়োগও আইন অমুখ্যায়ী দণ্ডনীয়। বিহার হরিজন (সামাজিক অযোগ্যতা নিবারণ) আইন ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবর্তিত হয়। উহার প্রয়োগ আরও জোরালো করার জন্ত ১৯৫১ সালে উক্ত আইন সংশোধিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি দেওঘরে অমুজ্জিত কয়েকটি ব্যাপারে উক্ত আইনের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

এমন কি সন্ত বিনোবা ভাবেও এই কথা বলেন, “আমার মতে এই সকল পূজার স্থান পরিচালনার ভার সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেও অজ্ঞায় হইবে না বরং তাহাতে সুপরিচালনাই হইতে পারে।”



### খাদ্যসঙ্কট

ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি হৈয়ালির ব্যাপার, সভ্যকার অবস্থা জয়জয় করা কিংবা বৃথান কষ্টকর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে খাদ্যসরবরাহে শতকরা ১০ ভাগ ঘাটতি থাকিত এবং ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া ঘাটতি পূরণ করা হইত। বর্তমানেও খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগ। অবশ্য এগুন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। গত তিন বৎসরের খাদ্য-পরিস্থিতির হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

( লক্ষ টনের হিসাবে )

বৎসর	জমা	সংগ্রহ	আমদানী	সরকারী জমা হইতে	প্রচেষ্টা	পরিচেষ্টা	উৎপাদন
					সংগ্রহ	আমদানী	
১৯৫০	১৫.৮১	৪৬.১৭	২৮.৭০	৭৫.৯৪	৬১.১২	৩৭.৯৯	৭.২৯
১৯৫১	৭.২৯	৩৭.৬৬	৪৮.৪৯	৭৮.৬৭	৪৭.৮৮	৬১.৬৪	১৩.০৭
১৯৫২	১৩.০৭	৩৪.১৬	৩৯.৩২	৬৬.২৬	৫১.০২	৫৮.৭২	১৫.০১

চলিত বৎসরে পার্শ্ব শস্যের কৃষিজমি শতকরা ৪.৭ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন-পরিমাণ শতকরা ১২.৪ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ভাল থাকায় মাত্র ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করা হইবে। আন্তর্জাতিক গম চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ বৎসরে ৪৫ লক্ষ টন পর্যন্ত গম আমদানী করিতে পারে। ১৯৫১ সনে ব্রহ্মদেশ সহিত চুক্তি অনুসারে, ভারতবর্ষ আগামী চার বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর সাড়ে তিন লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে পারে। এ বৎসরে চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ অতিরিক্ত আরও দেড় লক্ষ টন চাউল বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী করিবে।

কিছোয়াই সাহেবের হিসাব অনুসারে এবারে বাংলাদেশে গত বৎসর হইতে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ হারে অধিক চাউল উৎপন্ন হইবে। প্রদেশের বাতির চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ হওয়ার, এবারে বাংলাদেশের চাউল এই প্রদেশেই থাকিয়া বাইবে। গত বৎসর উড়িষ্যা কেন্দ্রীয় সরকারকে তিন লক্ষ টন চাউল দিয়াছে এবং মধ্যপ্রদেশ দিয়াছে আড়াই লক্ষ টন। এই বৎসর এই দুইটি প্রদেশ মিলিতভাবে অন্ততঃ নয় লক্ষ টন চাউল ঘাটতি প্রদেশ-গুলিকে দিবে। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারপ্রদেশ হইতে চাউল সরবরাহ কলিকাতা ও বাংলাদেশের রেশনিং ভূক্ত অস্ত্রান্ত জেলাগুলির জন্য পাওয়া যাইবে।

লেভী প্রথা আশাশ্রুত সাংসারিক করে নাই। এই অবস্থায় গবর্ণমেন্ট ১৪ই অক্টোবর হইতে চাউল সংগ্রহ করা বন্ধ করিয়া দিতেছেন। গত বারের তুলনায় যোগানে চাউলের মূল্য অতিরিক্ত-ভাবে হ্রাস পাইবে, সেখানে চারীরা যদি চাউল বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট তাহাদের সমস্ত চাউল ক্রয় করিয়া লইবেন। এ বৎসর বাংলাদেশে নাকি অত্যধিক চাউল উৎপাদন হইতেছে—৪২ লক্ষ টন। গত দশ বৎসরের তুলনায় ইহা রেকর্ড।

লেভী প্রথা লোপ করা যদিও বিলম্বিত হইয়াছে, তথাপি ইহা অবিবেচনায় কাজ হইয়াছে। রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ প্রথা বর্ষ হইয়া বাইতেছে। এত পারা উৎপাদন ও আমদানী সত্ত্বেও খাদ্যসঙ্কট ঘুচিতেছে না। নিয়ন্ত্রণ প্রথা বজায় থাকিতে এ সঙ্কট ঘুচিবার আশাও নাই। যেমন চিনির ব্যাপারে হইয়াছে—চিনি দেশে অতিরিক্ত উৎপাদন হইতেছে, অথচ লোকে চিনি পাইতেছিল না, তেমনি হইতেছে চাউলের ব্যাপারে।

ব্রহ্ম, চীন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি হইতে অবাধে চাউল আমদানী করিবার বন্দোবস্ত করা উচিত—তাহা হইলে দেশের গুণ্ড

চাউল বেকায়দার পড়িবে। গবর্ণমেন্টের ছয় মাসের ভ্রম গম ও চাউলের কিছু ঠিক ব্যয়িয়া, চাউল বিনিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে চাউল আমদানীও যেন চলিতে থাকে।

### কেন্দ্রীয় সরকার ও পল্লীশিল্প

গত ৬ই আগষ্ট লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন : “তৈলশিল্পের ক্ষেত্রে এই কল্পনীতি অবলম্বিত হইতে পারে যে, পত্নীর ঘানির দ্বারা পাড়া তৈল উৎপাদন প্রসারিত করা হইবে এবং তৈল-কলগুলিতে অ-পাড়া তৈলসমৃদ্ধ উৎপাদন করা হইবে।” মন্ত্রীমহোদয় আরও জানান যে, পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত সুপারিশ সরকারের বিবেচনামূলক আছে। আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পরিকল্পনা কমিশন পত্নীর ঘানি-শিল্পের উন্নয়নকল্পে মিলজাত তৈলের উপর কিছু শুদ্ধ ধার্যা করিবার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাও সরকারের বিবেচনামূলক আছে। তবে সরকার কোন বিষয়েই এখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

ঐ দিনই আর এক প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত ও সরবরাহ মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং বলেন, সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র আধাসরকারী চিঠিপত্রের জন্য তুলোট কাগজ ক্রয় করা হইবে। ১৯৫১-৫২ সালে ক্রীত প্রায় ৪। কোটি টাকা মূল্যের কাগজের মধ্যে প্রায় ২০,৫০০ টাকা মূল্যের তুলোট কাগজ ক্রয় করা হইয়াছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের কাগজ ক্রয় করা হইলেও কোন তুলোট কাগজ ক্রয় করা হয় নাই, কারণ পূর্ব বৎসরের ক্রীত তুলোট কাগজ বৎসরান্তে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত ছিল।

১২ই সেপ্টেম্বর “হরিজন” পত্রিকার এক প্রবন্ধে শ্রীমগনভাই দেশাই লিপিতেছেন, এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে “বেশ খোলাখুলি

ভাষ্য প্রকাশ পাইয়াছে, পল্লীশিল্পের প্রসার ও উৎসাহদান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব আছে তাহাকে মন্ত্রীমণ্ডলী কিরূপ লঘু দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। উত্তরে অবহেলার ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল এই যে, টি. টি. কৃষ্ণমাচারী মহাশয় বলিতেছেন যে প্র্যানিং কমিশনের সুপারিশসমূহের বিবেচনা এখনও রাজ্যসরকার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্র্যানিং কমিশনটি কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহৎ কৰ্মনৌতির একটি মুখ্য অঙ্গ। গত কয়েক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার এবং লোক-সাধারণ ভারতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্ত প্র্যানিং কমিশন প্রধান অবলম্বন বলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন—উল্লিখিত প্রস্তোত্র-গুলিতে যে অবহেলা ও দীর্ঘস্থিতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে প্রান থাকিতেও দেশে বেকার সমস্যা বাড়িতেছে কেন তাহার হৃদয় খুঁজিয়া পাওয়া যায়।—”ত্রিযুত দেশাই সরকারকে অবিলম্বে নিজেদের স্বীকৃত কৰ্ম্মশটীকে কৰ্ম্ম রূপায়িত করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন।

### কুটীরশিল্পের অর্থনীতি

“সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ” পত্রিকার লোকসভার সদস্য জিৎমল পারিখ লিখিতেছেন, যেহেতু আমরা বহুযুগে ভয়গ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের জীবনও কাটিতেছে বহুযুগে, সেইজন্য যন্ত্রের উপর আমাদের মোহ ভগ্নিয়াছে। অনেকেই জবোর অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য এবং উন্নততর প্রকৃতির কথা বলিয়া ব্যয়িকতার সমর্থন করেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বহু শিল্পই যন্ত্রের প্রয়োজন আছে এবং সকল শিল্প কুটীর-শিল্পের ভিত্তিতে চলিতে পারে না; আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্পের বৃদ্ধি এখনও আতঙ্কের কারণ হয় নাই। আমাদের দেশের শিল্পায়নের দ্রুত গতিতে আমাদের সংগঠন হওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও গ্রামগুলির ক্রমশঃ কম্ব গতিতেছে; ক্রমশঃই অধিকতর সংখ্যায় গ্রামবাসী শহরবাসী উপার্জনকারীর উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে এবং আমাদের চক্ষের সম্মুখে এক নিরানন্দ ও হতাশাবাজক দৃশ্যের অবতারণা ঘটিতেছে। বিরাট লোকসংখ্যা এবং বেকার সমস্যা আমাদের যে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে তাহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমাদেরকে লক্ষ রাখিতে হইবে যেন আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলে।

যন্ত্রশিল্প বর্তমানে ত্রিশ লক্ষ লোকের কৰ্ম্মসংস্থান করিতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন বৎসর পরে ঐ শিল্পে আরও চার লক্ষ লোকের কৰ্ম্ম জুটিতে পারে। কিন্তু শ্রমণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমানে ২৫ কোটি লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণীর লোকেরা বৎসরে মাত্র দৈনিক তিন ঘণ্টার কাজ পায়। ইহাদের মধ্যে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের অবস্থা আরও দারাব। আমাদের বর্তমান শিল্প ও কৃষি উন্নয়নে এইরূপে

বহুসংখ্যক লোক বেকার বা আংশিক বেকার থাকিয়া বাইবে। প্রতি বৎসর অন্তর ১৫ লক্ষ কৃষিরা নূতন কৰ্ম্মপ্রার্থী দেখা দিবে। আজিকার দিনে বেকার সমস্যাতে শহরের সমস্যা বলা যুগ্ম; শহর ও গ্রাম উভয় স্থানেই আজ এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। লোকেরা শহরে আসিয়া ভিড় কবে কাজের আশায়; ইহাকে প্রতিবোধ করিতে হইবে। শহরের বেকারেরা ক্রমশঃ মুখর হইয়া উঠিতেছে, সেইহেতু তাহাদের প্রভাব অস্বীকার্য হইতেছে। গ্রামের বেকারগণও ক্রমশঃই রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করিতেছে এবং তাহারা একবার মুখর হইলে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব হইবে। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ ত্রিশ বৎসর নাগরিকরা গ্রামবাসীদের শোষণ করিয়া উন্নতি করিয়াছে। বিক্ষোভের পূর্বেই গণতান্ত্রিক সরকারকে এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাবকে দৃষ্টিগত এবং মননশীলতার সহিত সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের জন্ত অনেক দরদ দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক দৃষ্টিভ্রমও এখন যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারযোগ্য করা হইতেছে। বর্তমানে যে-কোন কুটীরশিল্পকেই যন্ত্র স্থানচ্যুত করিতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে অবিলম্বে প্রতিহত করিতে হইবে। কুটীরশিল্প বস্তুতঃ দ্বারা গড়িয়া উঠিতে পারে না। যন্ত্র-শিল্পকে শুদ্ধ সংরক্ষণনীতির দ্বারা যে ভাবে সাহায্য করা হইয়াছিল কুটীরশিল্পকেও তদনুরূপ সাহায্য করিতে হইবে। কুটীরশিল্পকে বেকার সমস্যা দূরীকরণের অন্ততম উপায়রূপে দেখিতে হইবে। কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের বর্ধিত উৎপাদন-ধরত এবং নিয়মানের উপর জোর দিতে থাকিলে কুটীরশিল্প কখনও স্থায়ীস্থান লাভ করিতে পারিবে না। বর্তমান অবস্থায় সর্বাপেক্ষা উত্তম উপায় হইল প্রত্যেক জবোর উৎপাদনক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। বৃহৎ, ক্ষুদ্র এবং কুটীর এই তিনভাবে উৎপাদনক্ষেত্রকে বিভক্ত করিতে হইবে, বাহাতে সৃষ্ট বিকাশের স্বার্থে প্রত্যেক জবোর জন্ত একটি করিয়া স্বতন্ত্র উৎপাদনক্ষেত্র সংরক্ষিত থাকে। এইভাবে বিভাগ করিয়া যন্ত্রশিল্পের আক্রমণকে প্রতিহত করিলে মোটামুটি হিসাবে প্রায় ৮০ লক্ষ বেকারের কৰ্ম্মসংস্থান হইতে পারে। অবস্থা, সময় এবং বিবেচনামত এই সীমানানির্ধারণের পরিবর্তনসাধন সহজেই হইতে পারে।

কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা প্রায় শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ বেশী। যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সম্ভোষণজনক দ্রব্য উৎপন্ন করিতে কুটীরশিল্পের কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। সেইজন্য প্রয়োজন বাহাতে কোন বিশেষ ক্ষেত্রের জন্ত নির্দিষ্ট দ্রব্য উন্নততর ব্যয়িক ক্ষেত্রে উৎপন্ন না হয় সে ব্যবস্থা করা। কিন্তু ক্ষেত্রবিভাগের পূর্বও দেখা যাইবে। বিশেষ বিশেষ দ্রব্য তাহাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাহিরেও উৎপন্ন হইতেছে; সুতরাং তাহাদের জন্ত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। বাহাতে উভয় ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য সমান হয় সেইজন্য হয়ত সুপ্রতিষ্ঠিত

যে সকল শিল্প বাস্তবিকতার সাহায্যে প্রতিযোগিতার অমূল্য অবস্থায় রহিয়াছে তাহাদের উপর কোন কর (cess) আরোপ করা যাইতে পারে। এমনও হয়ত স্থির হইতে পারে—প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানটিকে তাহার বর্তমান উৎপাদন আর বৃদ্ধি করিতে দেওয়া হইবে না। হয়ত বর্তমানের কোন কোন ধরনের উৎপাদন সূচিত করিবার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। এই উপায়ে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ পণ্য রপ্তানী হইলে কর ফেরত দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সম্পদের পর্য্যালোচনা করিয়া সুপারিকল্পিত নির্দেশ দিলে কুটারশিল্পের উন্নয়ন-নীতি খুব সহজেই কাৰ্য্যকরী করা যায়। বিশেষ বিশেষ রাজ্যে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য কুটারশিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে সম্ভোষজনক মানের জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের কোন কোন অংশ কুটারশিল্পের জন্ত সংরক্ষিত করিয়া রাখিলেও উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অন্তর্গত শিল্পজাত দ্রব্যকে যাহাতে অবৈধ উপায়ে কেহ স্থানান্তরিত করিতে না পারে সেইজন্ত বাস্তবিক এবং বৈজ্ঞানিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কয়েম করিতে হইবে। বর্তমানে রাজসরকার কর্তৃক স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের যে নীতি অবলম্বিত হইতেছে তাহা মোটেই সম্ভোষজনক নহে। এই নীতি পরিচালনা করিয়া পূর্ণপরিমাণে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে—এবং সেইজন্ত দ্রব্যের মূল্য ও মান সম্পর্কে বিচারের কড়াকড়ি অনেকাংশে ত্রাস করিতে হইবে।

পল্লীশিল্প বোর্ড, তাঁত বোর্ড এবং হস্তশিল্প বোর্ড (handicrafts board) প্রভৃতি বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলিকে বিধিবদ্ধ (statutory) প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে।

গ্রাম্য কারিগরদের বংশানুক্রমিক দক্ষতা প্রয়োগের অভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং নিরন্তর কষ্টভাবের ফলে তাহাদের মূলধনও ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইতেছে। যাহাতে অল্প প্রতিভাবান ছাত্রেরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে সেইজন্ত দেশের প্রত্যেক তালুক বা তহশিলে একটি করিয়া কৃষি ও কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

কারিগর এবং শ্রমিককে যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য দিতে হইবে। যাহাতে তাহারা মধ্যসম্বত্তোগীদের কবলে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সরকার হইতে কতকগুলি বুচা বিক্রয়ের লোকান খুলিতে হইবে যেখানে নির্দিষ্ট মানের দ্রব্যের বিনিময়ে কারিগর তাহার কাজ চালাইয়া যাইবার জন্ত কিছু টাকা অগ্রিম পাইতে পারে। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা রাজ্য অর্থসংস্থার (finace corporation) মাধ্যমে সহজ উপায়ে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে কোন সং কারিগরকে অর্থাভাবে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে না হয়। সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য

রাখিতে হইবে। প্রায়শ্চৈ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সারকত সরকারকে সাহায্য এবং নির্দেশ দিতে হইবে এবং সমিতিগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিলে সরকার সরিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন। অল্প সময়ে বহুসংখ্যক সমবায় প্রতিষ্ঠান আপনিই গড়িয়া উঠিবে—একথা চিন্তা করা আকাশকুসুম রচনা মাত্র।

দেশের আমদানী-বাণিজ্যের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে হইবে। বর্তমানে বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য এদেশে আমদানী করা হয় তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে। শুষ্ক কমিশন এবং শুষ্ক বোর্ডও কয়েকটি দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সুপারিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে অমূল্য অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব।

সর্বোপরি জীবনধারণের ব্যয় কমাইতে হইবে। জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে বেকার সমস্যার তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। জীবনধারণের ব্যয় হ্রাস বাতীত কোন পরিকল্পনাই সার্থক হইবে না।

লেখকের মতে, বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবায় (National Extension Service) দ্বারা একটি বিধিবদ্ধ স্বতন্ত্র সামাজিক সংস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যবৃন্দ এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের কাৰ্য্যকরী সমিতির নেতৃবৃন্দ সহজেই এই প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে পারিবেন। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিতের কর্মসংস্থান হইবে। প্রত্যেক তালুক এবং তহশিলে এই সংগঠনের নির্দেশে কার্য্য চলিলে দেশের উৎপাদন এবং ভোগ (consumption) দুই-ই নিশ্চিত বৃদ্ধি পাইবে।

### মুর্শিদাবাদে বেকার-সমস্যা

মুর্শিদাবাদের ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক “মুর্শিদাবাদ সন্দেশ” লিখিতেছেন, “সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় মুর্শিদাবাদ জেলায় বেকার-সমস্যা ক্রমশঃ কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা জানা যায়। কিছুদিন পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ও লালবাগ মহকুমায় এন্টি-ম্যালেরিয়া অভিযানের জন্ত শ্রমিক ও ‘মোট’ গ্রহণ করা হয়। বহরমপুর মহকুমায় জন্ত মোট ছত্রিশ জন যুবককে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই সাময়িক চাকুরির জন্ত মোট ২৩০০ জন দরপাশ করেন। তন্মধ্যে কয়েক শত লোককে ইনটারভিউ দেওয়া হয়, এবং প্রায় আঠারো ঘণ্টা ধরিয়া ইনটারভিউ চলে।... আরও শুনিয়াছি জেলা জজকোর্টে চার জন কেরানী লওয়া হইলে দ্বিশতাধিক নবনারী চাকুরীর আবেদন করেন।...”

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে কিছু শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হইবে বটে, কিন্তু শিক্ষকদিগকে সন্তোষে বাচিয়া থাকিবার উপযোগী বেতন দিতে হইবে।

তবে জেলায় শিক্ষিত বেকারের পাশে পাশে অশিক্ষিত চাষী, ক্ষেতমজুর এবং ছোট ছোট কুটীরশিল্পী কারিগরদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। “মুর্শিদাবাদ জেলার সুপ্রসিদ্ধ রেশমশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বসনি সম্প্রদায় হইতে তত্ত্বাবায় পর্যাপ্ত সকলই বর্তমানে বেকার অবস্থায় পড়িয়াছে। জেলাতে বংশ-শিল্পীদের মত অজ্ঞাত কুটীরশিল্পের কারিগরদেরও বর্তমানে যে শোচনীয় অর্থ-নৈতিক দুর্বস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে তাহাতে তাহাদেরও বেকার বলিলে অজ্ঞায় হয় না।”

কুটীরশিল্পের রক্ষার কাজ তো অগ্রসর হইতেছে না। কবে উহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবে?

### বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী

“দামোদর” পত্রিকার এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বর্তমানে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইয়াছে। কলিকাতাস্থিত বর্তমানবাসিগণের প্রতিষ্ঠান বর্তমান সম্মিলনীর কার্যকারী সমিতির অধিবেশনেও অমূরূপ দাবী তোলা হইয়াছে। বর্তমানের অধিবাসীদের সম্মিলিত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সরকার বর্তমানের মেডিক্যাল স্কুলটি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। তাহার পরে সর্বশ্রেণীর বর্তমানবাসী বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার যে দাবী করেন সরকার তাহাতে কর্পাস্ত কথা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই দাবির সমর্থনে আন্দোলনের প্রচণ্ডতা অমুখাবন করিয়া “বর্তমানের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন এবং কিছু টাকা তুলিয়া দিলে সরকার বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া বিক্ষোভকে শাস্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন।” সাধারণ নির্বাচনেও কংগ্রেস মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মৌখিক প্রতিজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচন-পরবর্তী-কালে বিধান সভার মুখমন্ত্রী ডাঃ রায় এই দাবির বিরোধিতা করেন।

ডাঃ রায় উপযুক্ত চিকিৎসক এবং অর্থভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রতিবন্ধক বলিয়া যে যুক্তি দেখান তাহার উত্তরে “দামোদর” লিগিতেছেন যে, বর্তমানে উপযুক্ত চিকিৎসকের কোন অভাব হইবে না। কারণ “এখানকার ডাক্তারগণকেই অজ্ঞাত মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার জন্য গ্রহণ করা হইতেছে।” সরকারের আন্তরিকতা থাকিলেই অর্থ-সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। বর্তমানের বিরাট ও বিখ্যাত রাজবাটী ক্রয় করিয়া সেখানে সরকারী দপ্তরগণা স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। “দামোদর”ের মতে ঐ বাটীতে দপ্তরগণা স্থানান্তরিত না করিয়া উহাকে কলেজ-ভবনে রূপান্তরিত করিলে সকল দিক হইতেই তাহা সূচু হইবে।

বর্তমান বর্ধিষ্ণু জেলা। সেখানকার স্থানীয় লোকেরা যদি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে নিজেরা কিছু দূর অগ্রসর হইতেন তবে ঐরূপ মন্তব্যের পিছনে অনেক জোর আসিত এবং কলেজও হইয়া বাইত। দেশের লোক জড়ভর্য হইয়া বসিয়া থাকিবে এবং সকল ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হইবে ইহা কোনও হিসাবেই বখাষ

নয়। রাজবাটী ক্রয়ের জন্য স্থানীয় লোকে কি সাহায্য করিতে পাবেন তাহা দেখা উচিত।

### সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসায় অবহু

২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের “মুর্শিদাবাদ সমাচার” পত্রিকায় ‘প্রসাদ’ লিগিতেছেন যে, মালদহ সদর হাসপাতালে মালদহের মোক্তার শ্রীশঙ্করপ্রসাদ দাস তাঁহার চার বৎসর বয়স্ক কন্যার ভাঙ্গা হাত সারাইবার জন্য হাসপাতালে বাইলে বালিকার হাত ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহাকে গৃহে লইয়া যাউবার নির্দেশ দেন। প্রসাদের ভাষায়, “মেয়েটি হাতে বস্ত্রধারণ কথা বলিলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহাতে জরূপ করেন না। তৃতীয় দিনে বালিকার যত্না অসঙ্গ হইয়া উঠিলে হাসপাতালে তাহাকে আনা হয় এবং ব্যাণ্ডেজ খুলিলে দেখা যায় যে ক্ষতস্থানে পচন ধরিয়াছে। অনতিবিলম্বে মেয়েটিকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইলে মেয়েটি বাঁচে। কিন্তু শুনা যায় তাহার কয়েকটি আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে হয়। অতঃপর বালিকার পিতা মালদহের তৎকালীন সিভিল সার্জন ডাঃ চিত্তবঞ্জন দত্ত, এসিষ্ট্যান্ট সার্জন ডাঃ মুশাঙ্গী ও ভৈরব কল্যাণীউত্তরের বিরুদ্ধে এক ক্ষতিপূরণের মামলা আনয়ন করেন। গত ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি উক্ত মামলায় বিবাদী পক্ষের উপর মায় প্রচ মোট ৫১০০ টাকার ডিগ্রী পাইয়াছেন।”

‘প্রসাদ’ লিগিতেছেন, “মফঃস্বলের সদর হাসপাতালের ট্রাডি-শন মালদহ বজায় রাখিয়াছে। বহরমপুর হাসপাতাল সশঙ্কেও বহু অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু বহরমপুরে শশঙ্কবাবুর মত জেদী লোক কোথায়?”

দেশের লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকবর্গের এ বিষয়ে অবজিত হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতায়ও হাসপাতালে রোগীর অবহেলা সম্পর্কে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। হইতে পারে তাহার কতকটা অনিবার্য কারণে হয়, যথা—স্থানের অভাবে ও অর্থের অভাবে। কিন্তু বেশীর ভাগই তত্বাবধায়ক ও চিকিৎসকবর্গের এবং নাগদিগের কর্তব্যে অবহেলার কারণে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতার বাহিরের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।

### কান্দী মহাকুমার বাঁধ-সংস্কার

২৯শে ভাদ্রের “মুর্শিদাবাদ-সমাচার” এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিগিতেছেন, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে কান্দী মহাকুমার বয়োপ্রাণা ধানায় ইউনিয়নে অবস্থিত জজানুমাটিয়ারা, কুজুরা প্রভৃতি অঞ্চলের চাষীরা জলাভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে জাতীশালা গ্রামের নিকট হইতে চারি হাত প্রশস্ত একটি খাল ময়ূরাক্ষী নদী হইতে পুনন কুরে। জলাভাবের সময় চাবের জন্য উক্ত অঞ্চলের কৃষক খালপথে ভল লইত এবং প্রয়োজন হুইলে খালের মুখ বন্ধ করিয়া দিত। খালের জল নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন রুইস-গেট ছিল না বা এখনও নাই। “ক্রমে

প্রতি বর্ষার উক্ত খালের পরিসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধটি ভাঙিতে থাকে।" প্রতি বর্ষার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত আবাদী জমিগুলি প্রাবিত হইতেছে, কিন্তু জল নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ব্যবস্থা স্বরূপ একটি স্লুইস-গেট আজও নির্মাণ সম্ভব হয় নাই। "প্রতি বৎসর কিছু আবাদী জমি বজার প্রাবনে ডুবিয়া যায়; বজা অধিক হইলে বেশী পরিমাণ জমি জলপ্রাবিত হয়। আবার বজার জল নামিয়া গেলে নদীর বালুকা জমির উপর নামিয়া যায় এবং জমির উপর হইতে বালুকার স্তর তুলিয়া না কেলা পর্য্যন্ত জমি অনাবাদী থাকে। বালি ভোলায় কাজ ব্যবস্থল বলিয়া কৃষকেরা সে কাজ দ্রুত শেষ করিতে পারে না। এই বৎসরে সরকারের দৃষ্টি বহু বার আকর্ষণ করা হইলেও হাতীশালার বাঁধ বা নসীনালা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হয় নাই।"

উক্ত পত্রিকা আরও লিখিতেছেন, "হাতীশালার বাঁধ ভাঙার ফলে নসীনালাতে ময়ূরাক্ষীর জল প্রাবিত হওয়ার কালক্রমে নদীপাথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষতিকৃতি নালাটি ময়ূরাক্ষীর যে স্থানে হইতে বহির্গত হইয়াছে, সেই স্থানে নালায় খাত হইতে ক্রমশঃ ঢালু হওয়ার এবং নদীগর্ভে বালুস্তর স্ফুট হইয়া উঠায় নসীনালাই প্রবলাকার ধারণ করিতেছে এবং মূল নদীপাথ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সামান্য জলবৃদ্ধি হইলেই মূল নদী অপেক্ষা নসীনালাতে বেশী জল প্রবাহিত হয় এবং সেই প্রাবন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নালায় উভয় তীরস্থ বহু আবাদী জমি জলমগ্ন হইয়া যায়।"

সম্পাদকীয় মন্তব্যে সরকারকে অবিলম্বে এই বিষয়ে তৎপর হইবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে, কিন্তু ঐ অঞ্চলের কৃষক-সাধারণ এ বিষয়ে কতটা কাজ স্বতঃপ্রসূত হইয়া করিতে প্রস্তুত তাহার কোনও ইঙ্গিত উহাতে নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাতারা খাল খনন করিয়াছিল তাহারা সরকারী সাহায্যের মুগ্ধ চাহিয়া বসিয়াছিল কি? তাহাদের বংশধরেরা নিজেহা কিছুকুর অগ্রসর হইলে সরকার বাকিটা করিতে বাধ্য হইবেন।

### ভাঙ্গনবিধ্বস্ত ধুলিয়ান

ধুলিয়ান উত্তর মুর্শিদাবাদের একটি প্রখ্যাত বার্ণজাকেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ জেলায় পাট ব্যবসায়ের অস্তুত প্রধান কেন্দ্র ধুলিয়ান। গত চার বৎসরে পদ্মার ভাঙ্গনের ফলে পুরাতন ধুলিয়ানের চার ভাগের তিন ভাগ গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। অধিবাসীরা পুরাতন শহরের ঘর-বাড়ী নষ্ট হইবার পর নদী হইতে যথাসম্ভব দূরে ঘর বাঁধিয়াছিল, কিন্তু তাহাও এখন ভাঙ্গনের মুখে। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন, "নূতন শহর নব ধুলিয়ান ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়াছে। মাত্র তাহাই নয় ধুলিয়ান রেলস্টেশন ও মালগুদাম বিগ্ন হইয়াছে, ধুলিয়ান স্টেশনে এন্ধিনে জল দেওয়ার জন্য যে পাম্পিং স্টেশন ছিল তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। রেলওয়ের পি. ডব্লু. ইনস্পেক্টরের আপিস সম্প্রতি ধুলিয়ান হইতে আজিমগঞ্জে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং উক্ত আপিস গঙ্গার ভাঙ্গনের সন্নিকটবর্তী হওয়ার আপিস ভাঙ্গিয়া মালপত্র

সরানো হইতেছে। গত বৎসর ধুলিয়ান ও পরবর্তী রেলস্টেশন তিলডাঙ্গার মধ্যে রেল-লাইনের বাঁধ গঙ্গার ভাঙ্গনে স্থানে স্থানে লুপ্ত হওয়ার উক্ত অংশে ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং পরে নূতন রেলপথ নির্মাণের দ্বারা উক্ত দুই স্টেশনের মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই বৎসরে সেই নূতন রেলওয়ে বাঁধও গঙ্গার ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়াছে।"

"গঙ্গা বর্তমানে ধুলিয়ান স্টেশনের মালগুদামের অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। মালগুদাম হইতে গঙ্গা আনুমানিক ৬০ গজ মাত্র দূরে এবং রেলস্টেশন ২০০ গজের মধ্যে পড়িয়াছে, যে-কোন সম্ভাষে ভাঙ্গনের মুখে মালগুদাম পড়িয়া গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হইয়া বাইতে পারে। গত বৎসর মালগুদাম হইতে বাগমারী সাঁকো পর্য্যন্ত যে রেলপথ ছিল, ইতিমধ্যেই তাহা ভাঙ্গনে লোপ পাইয়াছে। গঙ্গা ক্রমশঃ নূতন কলোনির বাসগৃহ ও আড়শগুলির দিকে আগাই-তেছে, অমুপনগর অঞ্চলও আক্রান্ত হইয়াছে। ধুলিয়ানের নূতন বাজারটিও যে কোন সময় ভাঙ্গনের মুখে পড়িতে পারে। ধুলিয়ান পৌরসভার জনৈক কমিশনারের মতে ধুলিয়ান পৌরসভার অধিকের বেশী জমি, আনুমানিক ৬০০ একর, গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। চারটি ওয়ার্ডের মধ্যে তিনটি গঙ্গার ভাঙ্গনে নিঃশেষ হইয়াছে।"

গত আগষ্ট মাসের শেষ দিকে লালপুর গঙ্গার প্রাবনের ফলে শত শত গৃহের অধিবাসীকে বাধ্যতায় অবস্থার রেলওয়ের বাঁধের উপর আশ্রয় লইতে হয়। প্রতি বৎসর বজার উপদ্রবে তাহাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। অবিলম্বে তাহাদের সাহায্য প্রয়োজন।

ধুলিয়ানবাসীর বিশ্বাস যে, ফরাক্কা গঙ্গাবাঁধ নির্মিত হইলে গঙ্গার ভাঙ্গনে শহর বিধ্বস্ত হইত না। সেই কারণে বাঁধ সম্পর্কে তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঁধ নির্মাণের কথা স্থগিত রহিয়া গেল। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন, "পুরাতন ব্যবসাকেন্দ্র ধুলিয়ানকে গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে করিতেই হইবে এবং সম্ভব হইলে ফরাক্কা গঙ্গার বাঁধ নির্মাণের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করিতে হইবে।"

ফরাক্কা বাঁধই শুধু নহে, তাহার পর সমস্ত নদীপথ, নদী সঞ্চালন-ব্যবস্থা (River training) না হইলে উপায় নাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করিবে কে? বাঙালী ত এখন দলদলিতে মত্ত এবং বাংলার সংবাদপত্রগুলি এখন মাদক পরিবেশনে বাস্তব। কেন্দ্রীয় লোকসভায় বাংলার বিষয় মাত্র দুই জন তেজস্বিতার সহিত বাস্তব করিতেন জামায়াবাদ এবং লক্ষ্মীকান্ত। তাঁহাদের মৃত্যুর পর লোকসভায় বাংলার প্রতিনিধিদল প্রায় সকলেই মুকবির।

জনসাধারণের মুখপাত্র যদি সংবাদপত্রগুলিকে চেতনা দান করিতে পারে তবে ইহার একটা কিনারা হয়, নচেৎ এরূপ লেখা অরণ্যে যোদান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতা ক্রমেই সীমাবদ্ধ হইতেছে এবং বাঙালীর স্থান ভারতে অত্যন্ত নীচে নামিয়া বাই-তেছে। ইহার উপায় কি?

## ১২ লক্ষ বিপন্ন মেদিনীপুরবাসী

‘মেদিনীপুর পত্রিকা’ (১লা আধিন) এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে মেদিনীপুরের বর্তমান দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া লিগিতেছেন, “বাংলার গরু, ভারতের গরু মেদিনীপুর জেলা। এই জেলার প্রায় ৩৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে আজ বঙ্গা, বেকারী ও আর্থিক মানের অবনতির জন্ত সরকারী ও বেসরকারী সংগৃহীত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, প্রায় ১২ লক্ষ লোক ভীষণভাবে বিপন্ন। বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী, স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে অবস্থানকারী, জনগণের এক অতি বৃহৎ অংশ আজ মৃত্যুপথ-বাদী। যদি সমগ্র ভারত এই বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করিবার জন্ত অগ্রসর হইয়া না আসেন এবং সুব্যবস্থার অভাবে যদি এই বার লক্ষ অধিবাসীর বিলুপ্ত ঘটে, সেই কলঙ্ক স্বাধীন ভারতের ইতিহাসকে চিরকালের জন্ত মলীলপ্ত করিয়া রাখিবে।”

সংস্কার বার লক্ষ বিপন্ন অধিবাসীর জন্ত খয়রাৎ খণ্ড ও অলগ্ন খাতে ছত্রিশ লক্ষ টাকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার স্বল্পতার উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিগিতেছেন যে, উপরন্তু “সেই অর্থ যদি রাজনৈতিক শক্তিসংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যয়িত হয় এবং প্রকৃত সাহায্যের জন্ত কোন প্রপরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে ইহা ধারাত্মক অর্থের কেবলমাত্র অপচয়ই ঘটিবে।”

দলমতনির্দেশে সকল মহান দেশপ্রেমিক মানুষের সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক ও সর্বভারতীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে মেদিনীপুরবাসীর দুর্দশার অবসানের জন্ত পত্রিকাটি আবেদন করিয়াছেন।

## নারীর সম্মান

নারীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার, অভদ্র ইঙ্গিত, অশ্লীল ঠাট্টা ইত্যাদি বন্ধ করিবার জন্ত পাকিস্তান গণপরিষদের জনৈক সদস্য কৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাকে অভিনন্দন করিয়া সাম্প্রতিক “যুগশক্তি” এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিগিতেছেন, “নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ। বর্তমান সভ্যজগতে নারীর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান যে জাতি দিতে অক্ষম সে জাতি কোনই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারে না। তবে পাকিস্তানেই যে শুধু নারীর অবমাননা ও অমর্যাদা প্রদর্শিত হয় এমন নয়। সেখানে হয়ত বেশী; কিন্তু আমাদের দেশেও এইরূপ ঘটনা একেবারে বিরল নহে। ভারতের বড় বড় শহরগুলির কথা আমরা নাই-বা বলিলাম; কয়মগঞ্জের স্ত্রীর ছোট শহরের যে সমস্ত ব্যাপার আমাদের চোখে পড়িয়া থাকে তাহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া পড়ে।...” সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা এই কুজি ব্যবহার সহ্য করিতে বাধ্য হন; কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদ ও শায়েস্তা না করেন এমন নহে, তবে তাহা বিরল। আমাদের সমাজ এই কলঙ্ক ব্যাপার বন্ধ করিবার কোন সার্বক প্রয়াস করে নাই। এ ব্যাপারে সমাজের নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিদের উদাসীনতা ও অবহেলাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। সেইজন্য আজ সরকারকেই এই অসামাজিক বৃত্তি দমনের জন্ত অগ্রসর হইতে হইবে। “যুগশক্তি” লিগিতেছেন: “পাকিস্তানে এই সম্পর্কিত আইন গৃহীত হউক ইহাই আমরা কামনা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রায়েক বিধান-সভার সদস্যদের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করিয়া যাচাতে অনতিবিলম্বে এতদেশেও অনুরূপ আইন প্রণীত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে অগ্রবোধ করিতেছি।”

কলিকাতার পথে ঘাটে ট্রামে বাসে এক শ্রেণীর জীব দেখা যায় যাহারা মমে করে নারীর অপমান একটা কৌতুকপ্ৰদ বিষয় বা বীরত্বের পরিচয়। মাঝে ইহার খুবই বৃদ্ধি হইয়াছিল, সম্প্রতি কিছু কমিয়াছে। দেশের তরুণ সন্তানদিগের বুঝা উচিত যে, এইরূপ ব্যাপার তাঁহাদের পৌকষের অপমান। তাঁহাদের মা-বোনকে পথে ঘাটে যদি কোনও লোকে বিনা বাধায় অপমান করিতে সাহস পায় তবে তাহা তাঁহাদেরই কাপুখ্যাত কারণে।

## ঐগ্যগার আন্দোলন সপ্তাহ

সাম্প্রতিক “ভারতী” পত্রিকা বিগত ৩১শে আগষ্ট হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে নির্মল ভারত ঐগ্যগার আন্দোলন ও পুস্তক সংগ্রহ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিগিতেছেন, এই অমুঠান প্রমাণ করিতেছে যে, দেশবাসী দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণকর অনুষ্ঠানে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে। এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গ পত্রিকাটি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় ঐগ্যগার সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিগিতেছে যে, ঐগ্যগারের সংগার দিক দিয়া জঙ্গীপুর মহকুমার অবস্থা তেমন আশাপ্রদ না হইলেও একেবারে হতাশ হইবার মত কিছু নহে। অধিকাংশ ঐগ্যগারই অল্পকাল পূর্বে স্থাপিত হইলেও পঁচিশ বা পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন ঐগ্যগারও ৩ই-একটি রহিয়া গিয়াছে। তবে প্রাচীনতার তুলনায় সেই সকল ঐগ্যগারে পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এদিকে পরিচালকবৃন্দের অবহেলায়ই পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালকবৃন্দ পুস্তক সংগ্রহ ব্যাপারে সেটাই হইয়া প্রতি মাসে একখানি করিয়া নতুন পুস্তকও যদি পাঠাগারে সংযোগ করিতেন তাহা হইলেও প্রাচীন ঐগ্যগারগুলিতে কম-বেশি পাঁচ সহস্র পুস্তক সঞ্চিত হইতে পারিত।

আজ যুবক-সমাজ এই সকল ব্যাপারে প্রায় উদাসীন। মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার দিক দিয়া সর্বাঙ্গপক্ষ্য অনগ্রসর জেলা। “ভাবতী” সেই হেতু জেলার তরুণদিগকে ঐগ্যগার আন্দোলনকে সার্বক করিয়া তুলিবার জন্ত ব্রতী হইতে আবেদন করিয়াছেন।

বাঙালীর এককালে বিজ্ঞা-বুদ্ধির বিষয়ে খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতির মূলে ছিল অধ্যয়ন এবং ধুলে হইয়াছিল বাঙালীর কল্পক্ষেত্রে প্রসার, আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতে। তাহার পর আসে আলস্য ও কাঁকির যুগ, যখন ছলে-বলে-কৌশলে “পাস করা” ছাপ যোগাড়ের



ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। শিক্ষার বৃত্তন অর্থ বাহির হয় এবং বিভাজন একটা আয়ের পথ হইয়া দাঁড়ায়। সেই কাকির মূখ এখন চরমে আসিছে। এখন বাংলাদেশে পড়াশুনার সমাদর নাই, আছে শুণ্য পরোক্ষভাবে ভোগ বিলাস, ঝুঁপা ও হিংসার ইচ্ছা সংগ্রহের চেষ্টা।

ভাল প্রমাণগারে তথ্যপূর্ণ সূচিস্থিত ভাবে লিপিত পুস্তক বাতাসকে তাহার চাহিদা এদেশে নাই। ফলে ঐরূপ পুস্তকের বিক্রয় মাত্রাজ ও বোম্বাইয়ে বাহা হয় বাংলায় তাহার এক চতুর্থাংশও হয় না। জাতিগত অবনতি হয় এইরূপে।

### চিনির রাজনীতি

রাজনৈতিক বেড়াভালে বেষ্টিত ভারত সরকারের শরীর নীতি সেক্টরের মাসের শেষ সমুদ্রে ঘোষিত হইয়াছে। প্রায় এক মাস পূর্বে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে বকি আহমেদ কিদোয়াই সাহেব বলিয়াছিলেন যে, আগের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে না। কিন্তু পনের দিন পরেই আগের মূল্য ১২৫০-৫৪ সনের জন্য দুই আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, অর্থাৎ মণ প্রতি এক টাকা পাঁচ আনা হইতে এক টাকা সাত আনার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের চাপে কিদোয়াই সাহেব তাঁহার কথা রাখিতে পারেন নাই।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের প্রধান কৃষি কল হইতেছে আখ এবং এই দুই প্রদেশের চাষীদের সমর্থনের উপর কংগ্রেস দলের ভবিষ্যৎ সাধারণ নির্বাচন নির্ভর করে। ভারতে অজ্ঞাত কোন কৃষিজাত প্রবোধ মূল্য পূর্ব হইতে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু আগের বেলায় তার বাস্তবিক হয় কেন? ইহার কারণ বিহার ও উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি। গত বৎসর আগের মূল্য ১২০ হইতে ১৮০ আনার হ্রাস করার এবং চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কংগ্রেসী সরকার এই দুই প্রদেশে অত্যন্ত বিরত হইয়াছিলেন—বিপক্ষ দল এই দুইটি অবস্থার স্বোচ্চিত সুযোগ লইয়াছিলেন। একথা বলা নিশ্চয়মূলক যে, পর পর দুই বৎসর আগের মূল্যের পূর্ব নির্ধারণ সরকারী নীতিবিরুদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার বিবৃতি দিয়াছেন, ইক্ষুচাষীদের বহুদিনকার দাবি মানিয়া লওয়ার জন্য এবং “পূর্ব-নির্ধারিত মূল্য ইক্ষুচাষের সুবিধা করিবে” বলিয়া আগের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ১২৫০-৫৭ সনের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত আগের মূল্য আর হ্রাস করা সম্ভবপর হইবে না—কারণ নির্বাচনের আগে চাষীদের বিরুদ্ধতাবাপন্ন করিতে এই দুই প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার ভরসা পাইবেন না। ইহার ফল হইবে এই যে আগামী চার বৎসরের মধ্যে জনসাধারণ অধিকতর অল্প মূল্যে চিনি পাইবে না। আগের মূল্য হ্রাস না পাইলে চিনির মূল্যও হ্রাস পাইবে না। বিহার এবং উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী সরকারকে গলীতে কান্দানী রাখার জন্য জনসাধারণকে চিনির জন্য এই অধিক মূল্য দিতে হইবে—চিনি আজ রাজনৈতিক সামগ্রী।

ভারতের সর্বত্র বহন কৃষিজাত প্রবোধ মূল্য হ্রাস পাইতেছে, তখন আগের মূল্য বৃদ্ধি করা এবং পূর্ব-নির্ধারিত করা অতীব অজ্ঞার

হইয়াছে। অজ্ঞ কোন কৃষিজাত প্রবোধ সুবিধা পায় না। আগের মূল্য একেবারে বিনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ ছিল। ইহাতে চাষীরা অধিকতর পরিমাণে উৎকৃষ্টতর আগের চাষ করিবার উৎসাহ পাইত। দেশে চিনির এবং শুড়ের চাহিদা দিন দিন যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আগের মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করিলে ইহার উৎপাদন হ্রাস পাইত না।

মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর না হইলে, তৎপরিবর্তে আগের নিয়ন্ত্রণ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত, যেমন তুলার বেলায় করা হইয়াছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে আগের মূল্য নির্ধারিত হওয়ার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আগের চাষ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আগের নিয়ন্ত্রণ মূল্য নির্ধারণ করিলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আগের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। উৎকৃষ্টতর এবং নিম্নতর আগের জন্য একই মূল্য নির্ধারণ করা সর্বনীতিবিরুদ্ধ—একথা কিদোয়াই সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ক্ষমিকর কাছে তিনি ক্রায়া নীতিকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইলেন। ইদানীং দেশে বাইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের ক্ষিদের নিকট দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জন দিতেও কৃষ্ঠাবোধ করেন না। মাদ্রাজের তাঁতিদের সাহায্য করিবার জন্য মিল বস্ত্রের উপর সেসু বসানো একটি বড় নিদর্শন এবং আগের মূল্য নির্ধারণ দ্বিতীয় নিদর্শন।

মণ প্রতি শতকরা এক টাকা হারে চিনির অতিরিক্ত উৎপাদন-শুদ্ধ রহিত করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। আগের মূল্য বৃদ্ধির জন্য চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদন-শুদ্ধ রহিত হওয়ায় চিনির মূল্য বৃদ্ধির হার প্রায় সমান থাকিবে বাটবে, যদি অবশ্য চিনির মূল্য অধিক পরিমাণে না বৃদ্ধি পায়। আমদানী চিনি সরকার বন্ধ হইতে মণ প্রতি উনত্রিশ বা তিরিশ টাকা হারে বিক্রয় করিয়া দিতেছেন, ইহাতে দেশের অভ্যন্তরে চিনির মূল্য বৃদ্ধি হ্রাস পাইবে না এবং চিনির আমদানী ব্যাহত হইলে মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যপ্রায়ী। অতিরিক্ত উৎপাদন-শুদ্ধ হ্রাস করিয়া দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ চিনির উপর আমদানী শুদ্ধ হিসাবে প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণারপাইবেন—অবশ্য এই লাভের বেশ মোটা অংশ আমদানী চিনির ব্যবসায়-লাভ হিসাবেও আসিবে। সোজা কথা, সম্ভাব্য বিদেশী চিনি আমদানী করিবার সুবিধা পরোক্ষভাবে ইক্ষুচাষীরাই পাইবে—জনসাধারণ নহে।

যদিও চিনির মূল্যের উপর এবং বিতরণের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, তথাপি সরকার বাতায় চিনি ছাড়ার পরিমাণের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিতেছেন এবং প্রত্যেক বৎসরের উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ “করিয়া জমা হিসাবে রাখিবেন। যদি চিনির মূল্য কোন সময়ে বাড়তির দিকে যায়, তাহা হইলে এই জমা চিনি বাজারে ছাড়া হইবে। অতীতে কিন্তু এই জমা চিনি বাজারে ঠিক সময়ে ছাড়িবার ব্যাপার লইয়া বহু গণগোল হইয়াছে এবং মূল্য অবস্থা

বুঝি পাইয়াছে। আমাদের দেশের সরকার অতীতের কুল হইতে কিছু শিক্ষা করেন না এবং ভিন্ন অবস্থাই বজায় রাখেন। ফলে চিনিব শতকরা ২৫ ভাগ জমা রাখা হয় মূল্য কমানোর জন্য নয়—মূল্য বাচাতে অথবা কমিয়া না যায় তাহার জন্য।

### সম্পত্তি-গুণক আইন

গত মাসে ভারতীয় আইন-পরিষদে সম্পত্তি-গুণক বিলটি গৃহীত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে মিতাক্ষরা-সংসারে যদি মৃত ব্যক্তি ৫০ হাজার টাকার উপর মোট সম্পত্তি রাখিয়া যান তাহা হইলে তাহার উপর সম্পত্তি-গুণক আবেদিত হইবে। আর দায়ভাগ-সংসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি এক লক্ষ টাকার উপর থাকে তাহা হইলে তাহার উপর এই গুণক বসিবে। অঙ্গার দেশের তুলনায় এদেশে সম্পত্তি-গুণকের হার অত্যন্ত কম হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে :

সম্পত্তির মূল্য	ভারতবর্ষে	ইংলণ্ডে	অষ্ট্রেলিয়ায়	সিংহলে	পাকিস্তানে
শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার
টাকা ১.৫ লক্ষ	২.৫	৬.০	৩.৯	৫.০	৬.০
টাকা ২.০ লক্ষ	৪.৩৮	৮.০	৫.২	৭.০	৬.০
টাকা ৩.০ লক্ষ	৭.০৮	১৫.০	৭.১	৮.০	৮.০
টাকা ৫.০ লক্ষ	১০.২৫	২৪.০	১০.২	১০.০	১২.০
টাকা ২০.০ লক্ষ	২০.০	৫০.০	২৬.১	১৬.০	৩০.০

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে গুণকের হার বিভিন্ন ধরনের—ইংলণ্ডে সমস্ত সম্পত্তির উপর একই হারে গুণক আদায় করা হয়, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন বরকম গুণকের হার। যেমন, ইংলণ্ডে ২০ লক্ষ টাকার মূল্যের সম্পত্তি হইলে সমস্ত সম্পত্তির উপর শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে সম্পত্তি-গুণক বসিবে। ভারতবর্ষে দায়ভাগ-সংসারে, প্রথম এক লক্ষ টাকা বাদ যাইবে এবং তাবপর প্রত্যেক ধাপে ভিন্ন বরকম গুণকের হার—যেমন, ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইলে প্রথম এক লক্ষ টাকা বাদ দিয়া, পরের এক লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৪.৩৮ হারে গুণক বসিবে; ৩ লক্ষ টাকার মূল্যের সম্পত্তি হইলে, প্রথম এক লক্ষ বাদ, দ্বিতীয় এক লক্ষে শতকরা ৪.৩৮ হারে গুণক বসিবে এবং তৃতীয় এক লক্ষে শতকরা ৭.০৮ হারে গুণক দিতে হইবে। সুতরাং এ দেশের নিয়ম অনুসারে সম্পত্তি-গুণকের সত্যকার হার অনেক কম হইবে।

যে সকল মৃত ব্যক্তির জমিদারী মূল্য দুই লক্ষ টাকার অনধিক, তাহাদের সম্পত্তি নিম্নলিখিতভাবে রিবেট পাইবে : (ক) যদি সমস্ত সম্পত্তি কৃষিজমি হয় তাহা হইলে মোট গুণকের শতকরা এক-চতুর্থাংশ রিবেট; (খ) আর যদি সম্পত্তি আংশিকভাবে কৃষিজমি হয়, তাহা হইলে এই কৃষিজমির উপর যে পরিমাণ গুণক দেয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ।

মেয়েদের বিবাহের জন্য পিতা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দান করিয়া যাইতে পারেন—ইহা সম্পত্তি-গুণকের আওতার পড়িবে না।

ইংলণ্ডে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর হইতে চার বরকম গুণক আদায় করা হয়—সম্পত্তি-গুণক, উত্তরাধিকার গুণক, অস্থাবর সম্পত্তির উপর গুণক এবং শেবকালে বাকী সম্পত্তির উপর। ভারতবর্ষে একবরকম গুণক আবেদিত হইবে, গুণক সম্পত্তি-গুণক।

### সিংভূমে বনিয়াদী শিক্ষা

“নবজাগরণ” পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিহার সরকারের বনিয়াদী শিক্ষানীতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিগিভেছেন, “যদিও প্রায় পাঁচ বৎসর হইল সিংভূমে বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং পায় পিচিগটিরও অধিক বনিয়াদী বিদ্যালয় ঐ জেলায় বহিয়াছে তবুও জেলায় বনিয়াদী শিক্ষা বার্থ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য বিহার সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু সেই ব্যয় নিরর্থক হইয়াছে। কারণ গান্ধীজী-প্রবর্তিত বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিহার সরকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কান্সকে শিক্ষার মাধ্যম করা এবং এইভাবে শিক্ষাদান কার্যকে স্বাভাবিক করিয়া দেশের প্রতিটি ব্যক্তিকে ক্ষেত্র ও বুদ্ধির দিক হইতে সক্ষম করিয়া গড়িয়া তোলাই ছিল গান্ধীজী-প্রবর্তিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।” কিন্তু “নবজাগরণের” কথায় “সিংভূমে বনিয়াদী শিক্ষার নামে বাতা চলিতেছে তাহা গান্ধীজীর আদর্শের সম্পূর্ণ বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নহে।”

পত্রিকাটির মতে সিংভূমে বনিয়াদী শিক্ষা বার্থ হইবার অন্যতম কারণ বিহার সরকারের ভাষা-সম্বন্ধীয় নীতি। “বিহারে বাংলা ও উড়িয়া ভাষার বিস্তারিত ব্যবহার কয়েক বৎসর যাবৎ স্থাপনকল্পিত কাগজের গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত নগ্নভাবে বনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহার ফলে স্থানীয় জনসাধারণ বনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে হিন্দী প্রচারের আপড়া ছাড়া আর কিছু মনে করে না। প্রথমে ধলভূমের উদাহরণই লওয়া যাইক। বড়গোড়া থানার কৈরী, ঘাটশীলা থানার শ্রামশ্রমপুর, পটকা থানার ডরকাসাই এবং জুগশালাই থানার গোবিন্দপুর গ্রামে এ জেলায় প্রথম চোটে বনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ পাঁচ একর জমি এবং বন্যাসাধ্য সহযোগিতা দিলেও বনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার বদলে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া এক হাত্তকর পবিত্রিতার সৃষ্টি হইয়াছে।...” কারণ এখানকার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দী মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। “কৈরীতে উড়িয়া ও বাংলাভাষী ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লইতে না দেওয়ায় এত সরকারী অর্থব্যয় স্বেচ্ছা ছাত্রদের সংখ্যা নগণ্য; এমনকি জেলাবোর্ড কর্তৃক সামান্য সাহায্য প্রাপ্ত পাঠশালা ছাত্রসংখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অধিক।”

সিংভূমের লোকের উচিত এই বিষয়ে হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষর বা টিপসগ্রন্থক আবেদন প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি বাবু ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদপত্রে দেওয়া। বাংলার সংবাদপত্রগুলিরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।



## • আসামে বাংলা ভাষার সঙ্কট

“যুগশক্তি” চই আশ্বিন এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, “আসাম বিধান সভার বিগত অধিবেশনে কংগ্রেসী সম্প্রদায় কুমার বজ্রয়ার এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ করেন যে, ধুবড়ী মহকুমায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ১২৫০টি প্রাথমিক স্কুলে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত; কিন্তু তিন বৎসর পর এই সংখ্যা ১২৪৭টি হ্রাস পাইয়া মাত্র তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে অসমীয়া ভাষায় পরিচালিত প্রাথমিক স্কুল ৩৪৮টির স্থলে বুদ্ধি পাইয়া ৮৩৩টি হইয়াছে। আরও জানা যায় যে, ধুবড়ী প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ডে ১৯৪৭-৪৮ সালে অসমীয়া ভাষা শিক্ষার জন্য ৯৬১৩৫ টাকা প্রাপ্ত দিতেন, ১৯৫০-৫১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৮৯৯০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চাশের বে স্থলে বাংলা প্রাথমিক স্কুলগুলিকে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৬৩০০০ টাকা মঞ্জুরী দিতেন সে স্থলে তাহা কমাইয়া ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ৪৬৭৪ টাকায় পরিণত হইয়াছে।”

উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে ধুবড়ীর কর্তৃপক্ষ তিন বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার উচ্ছেদের জন্য আরও যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা হইয়াছে, এই এলাকার শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অসমীয়া ভাষা বাতীত অন্য ভাষায় প্রচলিত কোন প্রাইমারী বিদ্যালয়কে বোডে হইতে মঞ্জুরী দেওয়া হইবে না বলিয়া লিপিতভাবে শাসাইয়া দিয়াছেন।

“যুগশক্তি” লিখিতেছেন, “ধুবড়ীর এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আসামের বাংলাভাষাভাষী জনগণের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ বঙ্গভাষাভাষী কাছাড় জেলার স্থলসমূহে অসমীয়া ভাষা ঐচ্ছিক বিধিরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে এটি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হইবে না বা ক্রমে ক্রমে কোঁশলে বাংলাভাষার স্থান গ্রহণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে।”

সরকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুস্তিকা অসমীয়া ও ইংরেজী ভাষায় প্রচার করিলেও পুনঃ পুনঃ আবেদন সবে রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর ভাষা বাংলায় তাহা ছাপাইবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। পরিশেষে সম্পাদকীয় মন্তব্যে আসাম সরকারের প্রতি আবেদন করিয়া বলা হইয়াছে যে, “সরকার যদি এখনও বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতি শ্রদ্ধাচর্চা করিয়া অতীতের সমস্ত অজ্ঞান ও অযৌক্তিক ব্যবস্থাদি সংশোধন করেন তবে শুধু আসামের বাঙালী সম্প্রদায়ের নহে—সমগ্র রাজ্যেরই কল্যাণ সাধিত হইবে।”

এখানে উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, উক্ত প্রশ্নোত্তরের সমগ্রই শিক্ষামন্ত্রী জি.অমিয়কুমার দাস জানান যে, ১৯৫০-৫১ সন পর্যন্ত হিন্দী ও গারো ভাষায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল বথাক্রমে দুই এবং এক ( “যুগের আলো”— ৪ঠা আশ্বিন )

বাংলা ভাষার স্থান বাড়া স্থান অপেক্ষা উচ্চে বাইতে পারে না। বাঙালী যদি তাহার সখিঃ হারাইয়া ভিগারী হইয়া দাঁড়ায় বা পরস্পরের অপকারের চেষ্টায় উদ্ভাদের মত কার্যকলাপ চালায়, তবে তাহার মাংসভাষ্য সম্মান করিবে কে? বাংলায় বসিয়াই

বাঙালী তাহার সর্ব্বের খোঁরাইতে বসিয়াছে কেন তাহা কি চিন্তা করারও অবসর আমাদের আছে?

## অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানে

### ভারতের প্রচেষ্টা

ওয়ার্ল্ডওভার প্রেস লিখিতেছেন, ভারতে বর্তমানে জনসাধারণের চিন্তাধারায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনার পৰিবর্তনের কথা উঠিয়াছে। জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনের জীবনধারণের মানের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে লইয়া পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল; বর্তমানে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইতেছে।

যদিও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি খুবই আশঙ্ক্যের কথা তবুও ৭ কোটি অনুন্নতশ্রেণীর লোকের অবস্থার তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং আসামের পার্শ্বতা অঞ্চলের অধিবাসীরা ও অস্পৃশ্য জাতিরা অনুন্নতশ্রেণীর মধ্যে পড়ে। নানারূপ অভাব-অভিযোগের মধ্যেও ধর্ম্মীয় গোড়ামি এবং প্রাচীন প্রথাব প্রভাবে ইহারা এতকাল মুক হইয়া ছিল। কিন্তু বর্তমানে গণতান্ত্রিক উদ্বুদ্ধনা এবং আধুনিক চিন্তাধারা তাহাদের মনকে আলোড়িত করিতেছে। সংগঠিত হিন্দুদের মধ্যে অনেক ধর্ম্মগুরু ও তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রতি এই অসম্য ব্যবহারে লক্ষিত বোধ করেন।

অনুন্নতশ্রেণীর স্তম্ভ গান্ধীজীর কাজের কথা স্মরণ রাখিয়া এবং অধুনা এই সমস্যার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ দেখিয়া সরকার কাকাসাচেব কালেক্টরেবের নেতৃত্বে ১১ জন সদস্য লইয়া অনুন্নত সম্প্রদায় কমিশন গঠন করিয়াছেন। এই কার্যে কাকাসাচেব কালেক্টর গান্ধীজীর অঙ্গতম শ্রেষ্ঠ সহযোগী। কমিশনের কাজ হইতেছে—দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার পর্যবেক্ষণ করা এবং সরকারের নিকট প্রতিকারের উপায় পেশ করা।

সম্প্রতি দেওবরে একজন চরিত্রকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশকালে আচার্য বিনোবা ভাবেব উপর পাণ্ডাগণ আক্রমণ চালায় এবং সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের প্রতিবাদের ফলে ব্রাহ্মণ-পরিচালিত উক্ত মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার চরিত্রদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে “নিউ ইয়র্ক টাইমস” পত্রিকা লিখিতেছেন, “দুইটি কারণে এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অর্থই মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় সংবিধানে দেখা যায়, ভারত-সরকার যে-কোন প্রকার অস্পৃশ্যতা স্বীকার না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতীয় নেতৃবৃন্দও এই বিষয়ে কোন আপোষ-রক্ষা করেন নাই। তবে তাঁহাদের জনগণের সমর্থন লাভ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে যে, একমাত্র আইনের দ্বারা এই প্রকার সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সমাজ-

চেতনা হইতেই তাহা সম্ভব। তাহাদের অক্ষমতার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন ভারতে যে নূতন নয় তাহা ভারতের হস্তভাগদের সম্পর্কে অনেক সংবেদনশীল আমেরিকাবাসী জানেন না।”

সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, গান্ধীজী বলিয়াছিলেন কেবল মাত্র আইনদ্বারা অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যে সমাজ তাহাদের অধিকার হরণ করিয়াছিল সেই সমাজকেই অধিকার পুনরায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং অস্পৃশ্যদের রক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। পত্রিকার মতে “যে ঘটনা ঘটয়া গেল তাহাও মহাত্মাজীরা এই মত সমর্থন করিতেছেন। একমাত্র আইন দ্বারা বাতাস সত্ত্ব হইত না, জনগণ তাহা সত্ত্ব করিয়া তুলিয়াছে। যে শিক্ষা আমরা এই ঘটনা হইতে লাভ করিয়াছি সেই শিক্ষা বিশ্বের এই প্লেটে এবং ভারতেও সকল হুঃখপূর্ণ বৈষম্যমূলক সমস্যার ক্ষেত্রে যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য।”

আমরা এ বিষয়ে একমত, কিন্তু সত্যের প্রতিবে প্রকৃত ঘটনার সকল দিকই দেখা উচিত। এই ব্যাপারে আচায়া বিনোবা প্রস্তুত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারী মহলও অবহিত হন। তাহার ফলে বিহার সরকার সচেষ্ট হইয়া হরিজনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। জনগণের মতামত যদি সত্যি ঐক্য দৃঢ় হইত তাহা হইলে পাণ্ডাগণ আক্রমণ করিতেও সাহস পাইত না। ভারতে জনমত দৃঢ় হইলে, ভারতীয়দিগের হুঃখ-দুঃখনা অতি শীঘ্রই দূর হইয়া যাইত।

### কান্সার সমস্যার সমাধান

২১শে আগস্ট ‘প্রভুদেব’র এক প্রবন্ধে ও. ওয়েল্ডাক গুপ্ত আগস্ট মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত-পাক প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠক সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে লিগিত্তেছেন, “কান্সার সমস্যা সমাধানের পথে এই সাফল্য সম্ভবপর হইয়াছে একমাত্র এই কারণে যে, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের গবর্নেন্ট তাহাদের নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের অসংখ্য দাবিতে কর্পাত করিয়া সরাসরি আলোচনা চালাইবার পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই আলোচনা অহুত হইয়াছে বিদেশী ‘সালিনী’, ‘মধ্যস্থ’ ও ‘পর্যবেক্ষকদের’ অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকেই। কান্সারের সাম্প্রতিক আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রণলিপ্স বৈদেশিক শক্তিগুলি কান্সার প্রবন্ধে একটা শাস্তিপূর্ণ মীমাংসা বানচাল করার জগা এগনও আশা পোষণ করে। এই বিদেশী চক্রান্তকারীরা কান্সারকে এক সামরিক রণনৈতিক কেন্দ্র ঘাটিতে পরিণত করিতে চাহে। ওয়াশিংটনের সামরিক রণনীতি-বিশারদরা বহু আগেই কান্সারের ‘স্বাধীনতা’ ঘোষণা করিয়া কান্সার লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ-বিসংবাদের ‘মীমাংসা’র কথা প্রচার করিয়াছেন। নানা অপকৌশলের আশ্রয় লইয়া আমেরিকান চক্রান্তকারীরা সম্মিলিত জাতিসংঘের পতাকার আড়ালে কান্সার নিজেদের মার্কিন সৈন্তবাহিনী মোতায়েন করার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কতিপয় স্বার্থাঘেযী বৈদেশিক শক্তি কান্সারকে ভূয়া ‘স্বাধীনতা’ দিবার জন্ত বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।”

কান্সারের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং মার্কিন অফিসারদের কতি-কারক কার্যকলাপের উল্লেখ করিবার পর ওয়েল্ডাক লিগিত্তেছেন, “ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রীদের আলোচনা জটিল কান্সার সমস্যা সমাধানের একটা পথ নির্দেশ করিতেছে। এই আলোচনার প্রাথমিক সাফল্য বিদেশী যুদ্ধবাদী শক্তিগুলির চক্রান্ত ও পরিকল্পনার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে।”

### বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা

“বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা” শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ‘দিল্লী-বালটিমোর সান’ পত্রিকা লিগিত্তেছেন, ভারত যে আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রকৃতি এবং সমাধান সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একমত নহে তাহা বহুদিন পূর্বেই জানা গিয়াছে। পত্রিকার মতে ভারতীয় প্রতিনিধি ডি. কে. কৃষ্ণমেনন জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে যে বক্তৃতা দেন তাহার “কোন কোন অংশ সোভিয়েটের বাঁধা যুক্তিরই প্রতিনিধি বলিয়া মনে হইয়াছে।”

কিন্তু ভারত প্রকৃতপক্ষেই নিরপেক্ষ; সে আপন নীতিই অমু-সরণ করে। “বালটিমোর সান”র ভাষায় “ভারতীয় নীতির সহিত আমাদের যতই মতানৈক্য ঘটুক না কেন উগা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। উগা আমাদের সম্পর্কেও নিরপেক্ষ, সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কেও নিরপেক্ষ।”

ভারত আন্তরিকভাবে আপোষ-হফা চাচে বলিয়াই ক্রীমেনন বৃহৎ শক্তিদমুতের টিচ্চ পণ্যায়ের এক সম্মেলনে আসানের ভল্ল আবেদন জানান। আর উইনষ্টন চার্চিল এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্য কুস্থ-তব রাষ্ট্রগুলিও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। পত্রিকার মতে ভারতের এই নীতি অবাস্তব।

ভারত সগা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বহুমানের তাগাবল্লফা একটি স্তৃঢ় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠন করা। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও জনসংখ্যার ভল্ল ভারত এশিয়ার নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নেতৃত্ব ভটিল—শক্তি ও দুর্বলতা লইয়াই ইহার সৃষ্টি।

পত্রিকাটি লিগিত্তেছেন, “আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা সকল সময় ভারতের বলিবার ভঙ্গী পচ্ছন্দ করি না। আমাদের পচ্ছন্দ না করার অনাতম কারণ এই যে, উগা প্রায়ই আমাদের সেই ব্রিটিশ ফেবিয়া-নিজমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, বাগা হইতে বহু ভারতীয় নেতা প্রথম রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি এই বিষয়টি সম্পর্কে ইগা উল্লেখযোগ্য যে, গত ছয় বৎসরে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী ক্রীনেত্ফর সমাধতাগ্নিক মতবাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, যেতত্ত্ব তিনি কতোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়াছেন।”

### পাকিস্তানে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি

শেণ সাদিক হাসান পাকিস্তান গণপরিষদে নিম্নোক্ত মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন, “সরকারী কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান

অযোগ্যতার অবমান ঘটান এবং শাসনবিভাগের বিভিন্নক্ষেত্রে যে গলদ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার জন্য সরকারের পক্ষে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া এই পরিষদ বিবেচনা করেন।”

“সোনার বাংলা”র সংবাদে প্রকাশ, উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে মোসলেম লীগের সভা সর্দার আমীর খান বলেন, “শাসন বিভাগের রক্ষে রক্ষে গলদ ও দুর্নীতি গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। দেশের পক্ষে ইহা লক্ষ্যকর ব্যাপার। এমন এক সময় ছিল যখন অসাধু কৰ্মচারীর সংখ্যা ছিল নগণ্য, কিন্তু আজ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটয়াছে। আজ সাধু প্রকৃতির সরকারী কৰ্মচারীদের সংখ্যা এত কম যে, সহজেই তাহাদের গণনা করা যায়। অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কৰ্মচারীরা আজ তাহাদের দুর্নীতি বেসাতিকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। অবস্থা এইরূপ জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, দুর্নীতি, স্বজনপীতি প্রকৃতির অস্তিত্বকে সরকারী কৰ্মচারীরা অনাচার বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না। বত্ৰফণ পধ্যস্ত দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলিয়া উপলব্ধি করা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উত্থাপক দূর করা সহজ। কিন্তু দুর্নীতি সম্পর্কে যখন মানুষের সচেতনতা লোপ পায়, তখন উত্থাপক দূর করা কঠিন ব্যাপার।”

অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী প্রস্তাবটির সমর্থনে বলেন যে, দুর্নীতি দূরীকরণের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে সরকারী কৰ্মচারী এবং জনসাধারণের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ব্যবস্থা করা দরকার। সমস্ত সরকারী কৰ্মচারীই অবশ্য দুর্নীতিপরায়ণ নহেন, তবে মুশকিল এই যে, জনসাধারণের প্রতি উচ্চপদস্থ সরকারী কৰ্মচারীদের মনোভাব আশাপ্রদ নহে।

‘আলোচনার পর জনাব সাদিক হাঙ্গানের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

ভারতের রাজকৰ্মচারীদের বিষয়ে কিছু বলিলেই উচ্চতম অধিকারীর্গ লম্বা লম্বা কথা বলিয়া তর্ক শেষ করেন। কংগ্রেসের দল ত ঠাঁহাদেরই মুখাপেকী। স্তবরাং শোভন ও বহিষ্কারের পথ দুর্গম। উপরন্তু ভারতীয় সংবিধান এতটী কাঁচা ও ভটিল যে, অপরাধীর জয় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনিবার্য। বিচারকদিগের মনোবৃত্তিও স্তবিশার নহে। সেই সকল দিক বিচার করিয়া আমাদের বলিতেই হইবে যে, পাকিস্তানের মুসলীম লীগ এ বিষয়ে অধিক সজাগ। আমাদের দেশে “দক্ষিণ-বাম” ইত্যাদি নানা নাম ও গালভরা স্লেগান আছে। দেশের কথা বা দেশের সেবার কাহাবও বিশেষ লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

### জনাব তমিজুদ্দীনের পূর্ববঙ্গ সফর

পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি জনাব তমিজুদ্দীন খান পূর্ববঙ্গ সফর করিয়া কবচীতে তাহার সফর সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রাধান্যবোধ্য। তাহার বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ভ্রম-দুর্দশা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভ্রষ্টবিরূপ পূর্ববঙ্গবাসীর মনে এই ধারণাই

অগ্রগাছে যে, কবচীর কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতেছেন না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র আজও পর্য্যন্ত রচিত না হওয়ার পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ত সমাজের মধ্যে গভীর ক্ষোভ বহিয়াছে। জনাব তমিজুদ্দীন স্বীকার করেন, শাসনতন্ত্র রচনার এই বিলম্বের কোন জায়সঙ্গত কারণ নাই।

### ব্রহ্মে চিয়াং-বাহিনী

১৯৫০ সনে পরাভূত কুয়েমিটাং সেনাপতি লি মি'র বাহিনীর অবশিষ্টাংশ উত্তর-পূর্বী ব্রহ্মদেশে পলাইয়া আসিয়া সেখানে এক বাঁটি গাড়িয়া বসে। সেখান হইতে তাহারা চীনা ভূগুণ্ডে আক্রমণ চালায় এবং অবশিষ্ট সময় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবাসীদের জীবন ধন-মান বিপন্ন করিয়া তোলে। ব্রহ্ম-সরকারের সকল অস্ত্রোপকরণে ক্রিয়া গন্ত তিন বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ কুয়েমিটাং-বাহিনী তাহাদের এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাইতে থাকে। ফলে গত ২৫শে মার্চ ব্রহ্ম-সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চিয়াং-বাহিনীর বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। উল্লেখযোগ্য যে জাতিপুঞ্জ অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার পূর্বে ব্রহ্ম-সরকার সকল প্রকার মার্কিন সাহায্য গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেন এটি কারণে যে, ব্রহ্ম-সরকারের মতে মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করিতে থাকিলে জাতিপুঞ্জ ঠাঁহাদের পক্ষে স্বাধীন পন্থা অবলম্বন করা অসম্ভব হইবে।

যাত্রা হটক, ১৯৫০ সনের ২৩শে এপ্রিল জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ব্রহ্মে চিয়াং-বাহিনীর অপরাধ স্বীকার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মদেশের ভূগুণ্ড হইতে ঐ আক্রমণকারী বাহিনীর অপসারণ ও অন্তিহিংস্র নিয়ন্ত্রীকরণ সম্পাদন করাটীয়ার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত চতুঃশক্তি কমিশন গত ২৩শে মে হইতে ব্যাহক্রে এই সম্পর্কে আলোচনা চালাইতেছিলেন। এই কমিশনের সভা হইতেছেন, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিয়াং-সরকার। কিন্তু সকল আলোচনা বার্থতার পর্য্যবসিত হইয়াছে, কারণ চিয়াং-সরকার এবং তাহার সমর্থনপুষ্ট কেন্দ্রবল লি মি কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধানে অস্বীকৃত হয়। ব্রহ্মের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, ব্রহ্মদেশ হইতে কুয়েমিটাং বাহিনীর অপসারণের একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করা হইক, কিন্তু কুয়েমিটাং প্রতিনিধি তাহাতে অসম্মত হয়। প্রতিবাদে ব্রহ্ম প্রতিনিধিদল সভা ত্যাগ করেন এবং চতুঃশক্তি বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে এক মন্তব্যে ইজভেন্ডিয়া লিপিতেছেন, “মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের শক্তি খুঁটি পিছনে আছে বলিয়াই কুয়েমিটাং-পন্থীরা ব্রহ্ম-দেশ ত্যাগ করিতে রাজী হইতেছে না। মার্কিন শাসকচক্র দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া খণ্ডে গোলামাল জিয়াইয়া বাবিতাই চায়, অশান্তি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রহ্ম হইতে সৈন্যসল সরাইয়া লইয়া বাইতে কুয়েমিটাং-চক্রের অসম্মতি এবং এই প্রস্তাবে ব্যাহক্রে আলোচনা বৈঠক বানচাল হইয়া যাওয়া সম্মিলিত জাতিসংঘের মানমর্ষাদ্যের উপর এক মায়াত্মক আঘাতের সাক্ষ্য।”

"হিন্দু" পত্রিকা এই সম্পর্কে এক সম্পাদকের মন্তব্যে লিপিতে-  
ছেন, ব্রহ্ম চিরাৎ-বাহিনীর উপস্থিতি ব্রহ্মদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষয়  
করিতেছে। ব্রহ্ম-সরকার কুয়ামিটাং বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্য-  
কলাপের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের অপমানের জন্য জাতিপুঞ্জ পুনরায়  
যে আবেদন করিয়াছেন পত্রিকার অভিমতে ভারত সে বিষয়ে সহায়-  
ভূতিপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করিবে, কারণ ব্রহ্মের ঘটনার প্রতি  
পার্শ্ববর্তী ভারত উদাসীন থাকিতে পারে না।

### পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসলীলা

"ওয়ার্ল্ড ওভার প্রেস"র ২১শে আগষ্ট সংখ্যার এক প্রবন্ধে  
ভিভিয়ার অ্যালেন লিপিতেছেন যে, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে  
অবস্থিত ইষ্টার দ্বীপে যে সকল বিচিত্র বেপাচিহ্ন (ide-  
graph) এবং অদ্ভুত, বিশালকায় প্রতীমূর্তিগুলি রহিয়াছে কেহই  
সেগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। কেন  
ইতিহাসের এই তাৎপর্যময় দিক সম্পর্কে কোন সকল গবেষণা  
চালান এত শক্ত তাহার কারণ এই যে, ইষ্টার দ্বীপের অধিবাসীরা  
তাহাদের উৎপত্তি, রূপকথা অথবা ঐতিহ্যের সকল জ্ঞান হারািয়া-  
ছেন। শ্বেতকার মানুষের নিবৃত্তি এবং বর্ধিত হই এই প্রচণ্ড  
ক্ষতির জন্য দায়ী।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ নৌসেনাপতি দোগেভীন  
দৈবাত এই দ্বীপে আসিয়া পৌঁছেন। তাহার পরে প্রভাগাক্রমে  
অন্যেরা আসিতে থাকে। আমেরিকান, রাশিয়ান, পেরুভিয়ান  
এবং ব্রিটিশরা এই কোঁড়লোদীপক দেশে আসে এবং দ্বীপের অধি-  
বাসীদের প্রতি তাহাদের অবহেলার চিহ্ন রাপিয়া যায়। প্রায়ই  
তাহারা গুণ্য বোগ রাপিয়া বাইত। কিন্তু তাহাদের অপরাধের  
ক্ষতির তুলনায় এই রোগের ক্ষতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। উদাহরণ  
স্বরূপ লওনের জাহাজ জাহাজী দ্বীপবাসীদের উপর আক্রমণ চালাইয়া  
১২ জন পুরুষ ও ১০ জন রমণীকে লইয়া যায়। কয়েক বৎসর পর  
১৮১৬ সালে একটি রুশ জাহাজ বহু দ্বীপবাসীকে হত্যা করে।

১৮৬২ সালে আটটি পেরুদেশীয় জাহাজ দ্বীপবাসীদেরকে নানা-  
রূপ উপহারের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া প্রায় এক সহস্র লোককে কোণ-  
ঠাসা করিয়া বন্দী করে। ইহাদের মধ্যে রাজা ও তাঁহার পুত্র এবং  
প্রায় সকল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই ছিলেন। এই সকল জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ  
ব্যক্তিই দ্বীপের লিপিত ও মৌখিক ইতিহাসের ধারক ও বাহক  
ছিলেন। তাহাদের সকলকে জাহাজে করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায়  
পাঠান হয় এবং সেখানে তাহাদিগকে সামুদ্রিক পক্ষী বিশেষের  
নিকষিত সার (guano) সংগ্রহের কার্যে নিয়োগ করা হয়।  
তাহাদের প্রতি এরূপ খারাপ ব্যবহার করা হয় যে কিছুকাল পরে  
এক দল পেরুবাসী তাহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তত দিনে মাত্র  
এক শত লোক ব্যতীত প্রায় আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-  
ছেন। যে কয়েকজন তখনও জীবিত ছিলেন তাহাদিগকে দেশে  
পাঠাইয়া দেওয়া হইল—তাহাদের মধ্যে একজন সঙ্গে বসন্ত লইয়া  
গেলেন, কলে দ্বীপবাসীরা উজাড় হইয়া গেলেন।

এদিকে ব্রিটিশ এবং ফরাসী অভিযাত্রীর দল এই দ্বীপের বিবর্ত  
প্রস্তর মূর্তিগুলিকে প্রাচীন পাথরের খোদাইয়ের "নিদর্শন" হিসাবে  
অপসারিত করিতে আরম্ভ করিল। এই কার্যের জন্য কোন প্রতি-  
মূর্তিকে গুরুভার মনে হইলে মূর্তির মাথা কাটিয়া ফেলিতেও তাহারা  
বিধা করিত না। পলিকাণ্টো তোরো নামে চিলিদেশীয় এক যুবক  
এই দ্বীপটিকে চিলির অধীনে আনয়ন করেন। পূর্ববর্তীদের তুলনায়  
তাহাকে সন্মুখ ব্যক্তিই বলা চলে। দ্বীপের উন্নতির জন্য নানারূপ  
পরিকল্পনা করা হইলেও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য তাহা কার্যে  
পরিণত করিতে বিলম্ব দেখা দিল। ১৮০৩ সনে উৎকৃষ্ট মেরিনো  
পশম উৎপাদনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বযোগ সুবিধা দেওয়া  
হয়। কোম্পানীটি একটি বায়ুচালিত যন্ত্র (windmill) এবং স্বাস্থ্য-  
রক্ষার যে সকল ব্যবস্থা করিবার প্রচেষ্টা দিয়াছিল তাহার  
কোনটিই প্রতিপালিত হয় নাই অথবা নিতান্ত উদাসীনতার সন্থিত  
পালিত হইয়াছে। চিলির রাষ্ট্রপতি ইবানেজ ফমতা গ্রহণের পর  
সর্বপ্রথম কতবোঝার মধ্যে কোম্পানীর স্বযোগ-সুবিধা নাকচ করিয়া-  
ছেন এবং শীঘ্রই কোম্পানী সেখানে হইতে উঠিয়া বাইবে।

চিলি সরকার মৃত্তিকা পরীক্ষা এবং সম্ভব হইলে আধুনিক কৃষি-  
পদ্ধতির প্রচলনের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দ্বীপবাসী  
এক ডাক্তারের মতে দ্বীপ হইতে বৃষ্ঠ-বাধি দূর করা সম্ভব। কিন্তু  
দ্বীপবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই।

ভিভিয়ার অ্যালেন লিপিতেছেন যে, অনেক আশ্চর্য্য জিনিষের  
সন্ধান আজ নষ্ট হইয়াছে শ্বেতকার জলপশুদের বর্ধিততার জন্য।  
তাহারা ইষ্টার দ্বীপবাসীগণকে পশুর গায় মনে করিত—তাহাদিগকে  
শোষণ করা বা ধ্বংস করা ছাড়া তাহারা অজ কিছু ভাবিতে পারিত  
না। বর্তমানে সেখানকার অধিবাসীগণ দ্বীপের উৎপত্তির ইতিহাস  
বা নানারূপ মৃতিসৌণ্ডের ইতিবৃত্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু শ্বেত  
বর্ধিততার কথা তাহারা বিস্মৃত হন নাই। এশিয়া এবং  
প্রশান্ত মহাসাগরের সকল স্থানেই কি ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই?

### জাপান ও দূরপ্রাচ্য

১৭ই আগষ্ট সংখ্যার আমেরিকার "নিউজউইক"  
পত্রিকা লিপিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি লইয়া দেখিলে বুঝা  
যায়, শুধু কোরিয়ার জন্য কোরিয়ার লড়াই হয় নাই। বাস্তবে  
কোরিয়া হইতে জাপানের উপর কোন আক্রমণ না হইতে পারে  
সেইজন্যই এই যুদ্ধ। কোরিয়ার যুদ্ধবিবর্তির পর জাপানকে স্বপক্ষে  
আনিবার জন্য এখন নূতন রূপে সংগ্রাম শুরু হইবে। অগ্নির এবং  
বিস্ময়কর হইলেও বাস্তবিকপক্ষে জাপানের গায় অপর কোন দেশেই  
আমেরিকার মর্যাদা এত ক্ষীণ নহে।

আমেরিকাবাসীর চিন্তাধারায় এককালের যুগপরাধী জাপান  
এখন গণতন্ত্রের ঘাটি হিসাবেই গণ্য হয়। যাহারা জাপানের  
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই আজ  
দূরপ্রাচ্যে মার্কিনবাহিনীর কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য একটি শক্ত-  
শালী জাপানী সামরিক ব্যক্তিত্বের কামনা করেন।

নহে। সামরিক শক্তি হিসাবে জাপানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবধারিত। জাপানের দায়িত্বশীল নেতারা—প্রধানমন্ত্রী শিগেকা যোশিদা এবং প্রগতিশীল দলের নেতা শিগোমিতসু আমেরিকার প্রতি বন্ধুত্বাবলম্ব। ইচিরো হাতোয়ামার ভ্রাতৃ বিতর্ক এবং চিন্তাশীল রাজনীতিবিদের মতে জাপান এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিতে উপস্থিত হইয়াছে এবং জাপানের মৌলিক স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে পাশ্চাত্যের সচিত্র সহযোগিতায়—এশিয়ার নতুন। জাপানের সম্রাটও আমেরিকার প্রতি গভীর সহায়ত্বসম্পন্ন।

বর্তমানে জাপানের প্রতিরক্ষাভার প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মার্কিন সামরিক বাহিনীর হস্তে। নিরাপত্তা চুক্তি অনুযায়ী এই সৈন্যদল জাপানে অবস্থান করিতেছে। গত সম্রাট জাপান হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই চুক্তির পরিপূরক হিসাবে আর একটি পারম্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা জাপানে নির্দিষ্টমানের রকেট কামান, মটার এবং ক্ষুদ্র অস্ত্রের অর্ডার দিবে। পরে জাপানে ভারী যুদ্ধযানাদিও প্রেরিত হইতে পারিবে। জাপানের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন শুরু হইয়াছে। জাতীয় রক্ষাবাহিনী (National Safety Force) সেনা-বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয়, এবং উহার মোট সভাসংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার। ইহারাই ফেল মেশিনগান ৬০ এবং ৮০ মিলিমিটার মটার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত। একটি গোন্দাজ-বাহিনীও আছে। বিমান-বাহিনীতে ৪৪টি বিমান আছে এবং আরও ১০০টি নূতন বিমান যুক্ত হইবার কথা আছে। নৌবাহিনীও এইরূপে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

এই সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সাড়ে তিন লক্ষ করিবার জঙ্ক মার্কিন পরিকল্পনাগুলি জোর দিতেছে; কিন্তু জাপানীরা অনুমান করেন যে বর্তমান অবস্থায় ২ লক্ষ লোকের বেশী পাওয়া সম্ভব নহে। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে বর্তমান জাপানে সামরিক বৃদ্ধি জনসাধারণের নিকট কত অপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। তাহা ছাড়া ম্যাক আর্থারের যুগে যে সংবিধান রচিত হইয়াছিল তাহার পরিবর্তন বাতীত বাধাতামূলক সৈন্যতালিকাভুক্তি বে-আইনী।

জাপানী সামরিক বাহিনীর যুদ্ধের ইচ্ছা আছে কি? “নিউজ-উইকে”র টোকিও ব্যুরোর প্রধান কম্পটন প্যাকেনহাম লিখিতেছেন: “ভূতপূর্ব জাপানী অফিসারবৃন্দ নানা কারণে সন্দিহান।” সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিত্বা জাতীয় সংরক্ষণ বাহিনীকে আমেরিকার বেতনভোগী বলিয়া ঘৃণা করে। অপব্যবহারে উর্দ্ধতন বেসামরিক অফিসারগণ মনে করেন যে সংরক্ষণ বাহিনীর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

জাপানের সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণের প্রধান বাধা জনসাধারণের মনোবল। পরাজয় এবং বিদেশীয় অধিকারের মাধ্যমে জাপানীরা বুকিয়াছেন যুদ্ধে লাভ হয় না। মার্কিন দখল তাহা আরও পরিষ্কার করিয়াছে। অনেকে মনে করেন কোন ভারী যুদ্ধে জড়িত হইলে ফলাফল বাহাই হউক না কেন জাপানের বিলোপ অবশ্যজারী।

হিরোসিমা এবং নাগাসাকির অভিজ্ঞতার পর এরূপ চিন্তাধারা অব্যাহত নহে।

জাপানের চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোর ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষতা এবং শাস্তিবাদী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজনীতি-বিদদের প্রতি জনসাধারণের মনে অশ্রদ্ধার ভাব দেখা দিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং হীনতা এই মনোভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে।

গত এপ্রিলের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী যোশিদার উদারনৈতিক দল পার্লামেন্টের ৪৬৬টি আসনের মধ্যে মাত্র ২০২টি আসন লাভ করায় তাহাকে শিগোমিতসুর ৭৬ জন প্রগতিবাদীর উপর বা হাতোয়ামার ৩৫ জন উদারনৈতিক সমর্থকের উপর নির্ভর করিতে হয়। ফলে গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং নানাব্যাপার মানিয়া লইতে হয়। এই অবস্থার ফলে যোশিদা জাপানের পুনরুজ্জীবন দ্বারাচিত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

জাপানে এখন প্রবল মুদ্রাস্ফীতি। বিলাস-বাসনের অন্ত নাই। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ১৯৫২ সালে জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৭২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ১৯৫৩ সালে ঘাটতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এত দিন পর্যন্ত মার্কিন ডলারের সাহায্যে অবস্থাকে আরও রাপা হইয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা কোন স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। চীনের সচিত্র বাণিজ্যের প্রসারের জঙ্ক ব্যবসায়ী মহল একমত। ইহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্য দেশানী এবং সম্ভাব্য কাঁচা মাল পাইবার ব্যবস্থা হইবে (১ টন কয়লার দাম চীনে ৯ ডলার, আমেরিকায় ৩২ ডলার)।

জাপানের অর্থনীতির দুর্বলতার কয়েকটি প্রধান কারণের অঙ্গ-তম মুদ্রাস্ফীতি। জাপানের শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে প্রধানতঃ ব্যাক হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণের সাহায্যে। স্বর্ণ এবং বাটার পরিমাণ আমানতের পরিমাণ অপেক্ষাও বেশী। আমেরিকায় তাহা আমানতের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন-পদ্ধতি অত্যন্ত পশ্চাত্তম। তৃতীয়তঃ চিরাচরিত নিয়োগ ব্যবস্থায় অযোগ্য লোককেও পদচ্যুত করা যায় না এবং চতুর্থতঃ, বেতনের স্বল্পতা। বড় বড় ব্যবসায়ীদেরও ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ কম হইলেও প্রায় সকল উচ্চপদস্থ কামচারী এবং ব্যবসায়ীরা সরকারী বা প্রতিষ্ঠানের বায়ে গাড়ী, বাড়ী এবং বিলাস-বাসনের অঙ্গ-সুযোগ-সুবিধা পান। প্যাকেনহাম লিখিতেছেন যে, কোন পদস্থ লোক সেখানে বাড়ীতে পাওয়া অসম্মানজনক মনে করেন।

### পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্যালয় ২৭শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর) হইতে ১০ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর) পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুলিবার পর করা হইবে।

এই ক্ষেত্রে জনানো বাইতেছে যে, প্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্তন, প্রবাসী-অগ্রাণ্ড এতদ্বিব্যয়ক চিঠিপত্র “ম্যানেজার প্রবাসী” এই নামে প্রেরিতব্য।

কর্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

## শাহজাদা দারাশুকো

### ত্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

#### পিতা-পুত্রের ভাগ্যবিপর্যয়

১

সামুগড়ে সূর্যাস্তের পর মোগল সাম্রাজ্য তথা ভারতবর্ষের বুকে যে কালরাত্রির সূচনা হইয়াছিল, পূর্ণ চই শতাব্দী পরে 'সিপাহী'-যুদ্ধের প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝা লইয়াই উহার অবসান এবং নব-ভারতের প্রথম প্রভাত—ঐতিহাসিকগণ এইরূপ কাল-গণনা করিয়া থাকেন। এই মহানিশার প্রথম প্রহরে দারা-শাহজাহান, দ্বিতীয় প্রহরে আওরঙ্গজেব, তৃতীয়ে সিংহ-বাল্যার্জী বার্কজীরাও এবং শেষ প্রহরে দ্বিতীয় শাহ আলম ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের বিরোগাক্ত জীবন নাট্যের যবনিকাপাত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ চর্যোগময়ী রক্তমীতে ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন শিবার্জী-বার্কজীরাও, আলীবর্দী-হায়দর, নানাকডনবীশ-মাহাদজী এবং রণজিং সিংহের কীতিপুঞ্জ-সমুজ্জল দ্বিতীয় শগুনিসমুদ্র দিশাহারা ভারত-সমুদ্রকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহ উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখে নাই, কালচক্রে ঘুরিয়া মরিয়াছে, আলোর পশ্চাতে ছুটিয়াছে।

২

[ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ২২শে মে রাত্রি আনুমানিক ১০:১১টা ]

আগ্রা শহরে আমীর গরীব কাহারও চোখে ঘুম নাই ; লড়াই হইতে সিপাহী সওয়ার যাহারা পলাইয়া আসিয়াছে তাহারাই কেবল মড়ার মত পড়িয়া আছে। দুর্গে শাহী-মহলে বাহিরে অলিগলিতে কান্নার রোল। যে বাড়ীতে কেহ মরে নাই সেখানেও রাত্রি প্রভাতের আশঙ্কায় স্ত্রী-পুরুষ যাবার হাত দিয়া কাঁদিতেছে, কাঁধের উপর মাথা ও জী কত্তার ইচ্ছত কতকণ থাকিবে নিশ্চয়তা নাই। এই সময়ে আগ্রা-দুর্গ হইতে সম্রাটের বিশ্বস্ত খোজা ফাহিম প্রভুর জরুরি আদেশ বহন করিয়া দারার হাবেলীর দিকে গোপনে চলিয়াছে।

বোড়া হইতে নামিয়াই আধমরা অবস্থায় দারা ফরাশের উপর শয্যা লইয়াছিলেন, সাধ্য থাকিলে যেন মাটির নীচেই মুখ লুকাইতেন। কোমর-ভাঙ্গা অঙ্গগরের মত অপমান ও অনুশোচনার এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে তিনি ক্রমশঃ অসাড় হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময় খোজা ফাহিম আসিয়া অভিবাচনপূর্বক সম্রাটের মৌখিক সংবাদ পুনরাবৃত্তি করিল—“যাহা ঘটিয়াছে উহা তক্ষীরের ফের। আমাদের একবার দেখা দিয়া এবং আমার বক্তব্য শুনিয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, নিরাশ হওয়ার কারণ নাই।” দারা

ইহাতে আরও অভিভূত হইয়া পড়িলেন, অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না ; দুর্গে যাইবার জন্ত ফাহিমের অনুমতি-বিনয় বিকল হইল। অবশেষে তিনি পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “শাহানশাহকে মুখ দেখাইবার সাহস আমার নাই ; আমার সামনে লম্বা সপ্তর, হতভাগ্য মুসাফিরকে দোয়া করিয়া ফাতেকা পাঠ করিবেন।”

আগ্রায় সম্রাট শাহজাহান সারাদিন দারার বিজয় অথচ মোরাদ-আওরঙ্গজেবের অক্ষত শরীরে পলায়নের সংবাদ শুনিবার জন্ত জুয়াড়ীর উৎকর্ষা লইয়া কালক্ষেপ করিতে-ছিলেন ; সন্ধ্যার পূর্বে দারার পরাজয়ের কানায়ুগ্মা শুনিয়াও তিনি উহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই জন্ত চুপসংবাদের প্রথম শঙ্কায় তিনিও মুহম্মান হইয়াছিলেন। দারার চর্যোগ্য এবং আওরঙ্গজেবের জয়লাভ, ভাল মন্দ উভয়ই খোদার মজি কিংবা নিয়তির বিধান বলিয়া স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিবার মত কত্তা জাহানারার অপক্ষপাত জ্ঞান-নির্ভরতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি শাহজাহানের ছিল না। জাহানারার সাম্রাজ্যব্যাধি তিনি কথঞ্চিৎ প্রকটিত হইয়াও দারাকে শুধু আর একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, দারার এই প্রত্যাখ্যান ও শোচনীয় দশা তাঁহার প্রাণে দিগুণ আঘাত হানিল, তাঁহাকে ছাড়িয়া অসহায় দারা কোথায় যাইবে ? এই ভাবনায় ক্রমশঃ কঠোর হইয়া সম্রাটের সুপ্ত পুরুষকার জাগিয়া উঠিল, বুদ্ধি মোহমুক্ত হইল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার কপালে যাহাই থাকুক, দারাকে বাঁচাইতে হইবে, আগ্রায় আর একদণ্ড অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নয়। মনকে শক্ত করিয়া সম্রাট ও জাহানারা হতভাগ্য দারার পথের মঞ্চল যোগাইবার জন্য কক্ষতংপর হইলেন, দুর্গের শুপ্ত শনভাগার উন্মুক্ত হইল, আশরফী ও দার্মী জহরত বোতাই কাতারে কাতারে খচ্চর দারার হাবেলীর দিকে চলিল। নিজ তহবিলে নগদ যাহা কিছু ছিল এবং অলঙ্কারাদির প্রাপ্য অংশ হইতে অন্যান্য ভ্রাতাকে বঞ্চিত না করিয়া দারাকে যাহা দিবার ছিল জাহানারা বেগম উহা দারার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট দারাকে লিখিলেন, “অবিলম্বে তুমি আগ্রা ত্যাগ কর, দিল্লীতে সুলেমানের ফৌজের জন্য অপেক্ষা করিবে, দিল্লীর দুর্গ তোমাকে সমর্পণ করিবার জন্য শাহী ফরমান যাইতেছে।” সেই রাত্রে সম্রাটের কলম বোধ হয় চিঠি লিখিয়াই চলিয়া-ছিল, ভোরের পূর্বেই বিশ্বস্ত খোজাগণ সুবা আগ্রা-দিল্লীর



কৌশল, অমির, আদালতদারগণের নামে শাহী করমান লইয়া শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সিতার নির্দেশ অনুসারে দারা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন; পত্নী নাদিরা বাহু মুক্তিমতী প্রজার ন্যায় তখন তাঁহার বিভ্রান্তচিত্তের একমাত্র আশ্রয়, আশাবের মধ্যে আশার প্রদীপ। পুত্রকন্যা, পুত্রবধু ও পৌত্র-পৌত্রী (সুলতানের পরিবার) লইয়া নাদিরা বাহু হাতীর পিঠে অবগুষ্ঠনায় হাওদার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মাত্র কয়েকজন মুখ্য ক্রীতদাসী চলিল; বাদবাকী পরিচারিকা ও ভৃত্যগণ আশ্রয়ার্থে ঘুরে প্রেরিত হইল। উটের পিঠে নগর ঢাকা আশরফী; বহনযোগ্য দামী কয়েকটি জিনিষ দারার পাশেয় হিসাবে সঙ্গে চলিল। হস্তীপৃষ্ঠে দাগ ও সিপহর শুকো রাত্রি ৩টার সময় গৃহ হইতে চিরবিদায় লইলেন, শাহজাদার বিরাট সংসারের বিলাসোপকরণ যেখানে সাজানো ছিল সেইখানে পড়িয়া রহিল; কিন্তু মালিক অদৃশ্য হইতে না হইতে রাতারাতি হাতী-ঝোড়া সাজ-সজ্জাম সব লুট হইয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে অর্জলক্ষ অম্বারোহী বাহার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল এখন তাঁহার শেষ যাত্রার সাথী হইল মাত্র বার জন সওয়ার।

৩শে মে সূর্যোদয়ের পূর্বে দারা বাদশাহী রাস্তা ধরিয়া আগ্রা হইতে অনেকদূর আসিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে শহরে তাঁহার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র গুলু প্রাণের টানে কয়েক শত অনুচর আগ্রা হইতে দারার সঙ্গ লইবার জন্য ছুটিয়া পড়িল। বেলা ৯টার সময় ম্যামুদী সাহেবও তল্লাতজা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন শত্রুসেনা শহরের বাহিরে দিল্লীর রাস্তায় মোতায়েন হইয়াছে; উহাদের সেনাধ্যক্ষের কুপায় কোনরকমে রক্ষা পাইয়া তিনি ৩য় হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন। যাহা হউক, দুই-একজন করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে পাঁচ শত অম্বারোহী একমঞ্জিল পার হইবার পূর্বেই দারার দলে আসিয়া জুটিল;—অন্ততঃ ডাকাতের হাতে সর্বস্ব লুট হইবার আশঙ্কা রহিল না। দুই দিন পর্যন্ত ছোটখাটো দলে বিভক্ত হইয়া দারার অনুচরবর্গ আগ্রা হইতে কোনক্রমে পলাইতেছিল, বাদশাহী ভৃত্যগণ শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া আরও কিছু অর্থ দারার কাছে পৌঁছাইল; শত্রুসৈন্য তখন পর্যন্ত দারাকে ধরবার জন্য খাবিত হয় নাই। এইভাবে দিল্লী পৌঁছিবার পূর্বে দারার সৈন্তসংখ্যা বার জন হইতে বাড়িয়া পাঁচ হাজার হইল। পাঁচ দিন কুচ করিয়া দারা ৫ই জুন (১৬৫৮ খ্রী:) দিল্লী পৌঁছিয়া শাহজাহানবাদ দিল্লীর বাহিরে পুরাতন দিল্লীতে (বাহার

বর্তমান নির্দর্শন শেরশাহ-নির্মিত অন্তর্দুর্গ, শেরমঞ্জিল ও শেরশাহী মসজিদ) তাঁবু ফেলিলেন। এইখানে নূতন ফৌজ ভর্তি আরম্ভ হইল এবং সাত দিনে সাত হাজার নূতন অম্বারোহী সংগৃহীত হইল। যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি শাহী খাজানানা, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি দখল করিলেন এবং কোন কোন আমীরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরও হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। কুমার সুলেমানকে আগ্রার পথ ছাড়িয়া যমুনার পূর্বতীরের পথে দিল্লী আসিবার জন্য দারা জরুরি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল আওরঙ্গজেব সহজে আগ্রাদুর্গ অধিকার করিতে পারিবেন না এবং ইতিমধ্যে সুলেমানের ফৌজ নিশ্চয়ই আসিয়া পড়িবে।

৪

সামুগড়ে দারার পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পর বিজয়ী আওরঙ্গজেব দুই দুই বার হাতী হইতে নামিয়া পরম ভক্তিভরে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া ধোদাতালাকেই জয়ের কৃতিত্ব নিবেদন করিলেন। উহার পর দারার শিবির অধিকার করিয়া শাহজাদার সাজানো তাঁবুতেই রাত্রিবাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করিলেন না। কোথায়ও মাটির নীচে চোরা সুড়ঙ্গে বরুদ পুরিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া দিবার ভয় হইত কোন ফাঁদ রাখিয়া গিয়াছে সম্ভব করিয়া মাটি খুঁড়িবার হুকুম দিলেন। এত বুদ্ধি মগজে থাকিলে দারার তাজ ও মাথা দুইটাই কি এই ভাবে বিপন্ন হইত?

অতঃপর এখানে নিজ তাঁবুর নীচেই তিনি সেনাধ্যক্ষগণের মোবারকবাদ গ্রহণ করিলেন। মোরাদ বকুশ “হজরত-জাঁউ”-কে বিজয়-সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য উপস্থিত হইলে আওরঙ্গজেব প্রথমেই “বাদশাহজাঁউ! ফতে মোবারক-বাদ!” বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং দরবারে ঘোষণা করিলেন, “অদ্য তারিখ হইতে মোরাদশাহী হুকুমৎ হিন্দুস্থানে কায়েম হইল আপনারা জানিবেন”; মোরাদের বৃকের ছাতি কথাতাই পাঁচ হাত চণ্ডা হইয়া গেল। মোরাদের শরীরের অবস্থা দেখিয়া আওরঙ্গজেব ভাইকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং শল্যচিকিৎসকগণকে তলব করিলেন। মোরাদের মুখে গায়ে বহু আহত স্থান হইতে তখনও রক্ত পড়িতেছিল, তাঁহার মাথা নিজের কোলে রাখিয়া আওরঙ্গজেব হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং নিজের জামার আন্তীন দিয়া রক্ত মুছিতে লাগিলেন; বাহিরে যত যত পড়িয়া গেল, সকলেই ভাবিল শাহজাদা ব্রাহ্মপ্রমে দ্বিতীয় রামচন্দ্র।

যাহা হউক, বিজেতা-শিবিরে সারাবাত্রি আওরঙ্গজেব ব্যতীত বাদবাকী মুসলমান আমীর সিপাহী খিদ্মতগার স্থানে

স্থানে মজলিস জমাইয়া বিজয়লক্ষী নাচওয়ালাগণের নাচগান ও শরাবে মশগুল হইয়া রহিল ; হিন্দুরা কেবল মড়া পোড়াইয়া মরিতেছিল ;—কেননা মুসলমানের মূৰ্দ্ধা বাসি হইলে জাঁক-জমক বেশী হয়, কিন্তু বাসি মড়া হইলে হিন্দুর ঠিক সদগতি হয় না। রাজপুত মারাঠা বুন্দেলা স্বপক্ষ-বিপক্ষ নিষ্কিচরে স্ব স্ব গোত্রের নিহত বোদ্ধাদের মৃতদেহ যথাযোগ্য একত্রে করিয়া শবদাহ করিতে লাগিল, ঘুরে প্রজ্জলিত অসংখ্য চিতার অগ্নিশিখায় যুদ্ধভূমি মহাশ্মশানের উদাস-গম্ভীর মুক্তি ধারণ করিল। রাও ছত্রসাল হাড়ার পুত্র ভগবন্ত সিংহ সারাদিন আওরঙ্গজেবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া রাত্রিতে পিতার মুখাণ্ডি এবং নিহত হাড়াগণের অগ্নি-সংস্কার সমাধা করিলেন— এই ভাবে বিজয়ী পক্ষের দায়িত্ব গৌরব কঙ্কণ ও স্ব স্ব কুলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিয়া জ্ঞাতিস্বজনমুক্ত হইলেন। মৃত শত্রুর শবের উপর জবজ্ঞ প্রতিশোধ লইবার একাধিক বিশদ বিবরণ যথায় যথায় মুসলমান ও খ্রীষ্টানের ইতিহাসে পাওয়া যায় যাহা হিন্দুর পক্ষে কল্পনার অতীত। হিন্দুর জ্ঞাতিবাসল্য, স্বজাতিপ্রেম জীবিত অপেক্ষা মৃতের উপরই বেশী প্রকট ; \* আশানে, পিতৃপক্ষের তপণ-স্থানে উদার আর্থাসন্তানের মনের ছুয়ার আদিকাল হইতেই খোলা ছিল, সম্প্রতি মাত্র বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

৫

অতঃপর আগায় পবিত্র রমজান মাসে পিতাপুত্রের শেষ বুৎপড়া আরম্ভ হইল ; আওরঙ্গজেব রোজা ও কুটনৈতিক মিথ্যার বেসাতি এক সঙ্গেই চালাইলেন। চম্বল নদী পার হওয়ার পূৰ্ব্ণ পর্য্যন্ত চিঠিপত্রে দ্বারার শাঠ্য, তাঁহার একনিষ্ঠ পিতৃভক্তি ও শ্রীচরণচুম্বনের প্রার্থনা বাতীত আওরঙ্গজেবের অস্ত্র কোন মতলব ধুগাঙ্করেও প্রকাশ পায় নাই। শাহজাহান এই সমস্ত সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়া আপোশ-মীমাংসার আশায় পিছন হইতে যথাযোগ্য দারার দান টানিয়া রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর ৩-শে মে ( ১৬৫৮ খ্রীঃ ) তিনি পিতার কাছে স্বকৃত কার্য্যের জ্ঞতা ক্ষমা চাহিয়া এক চিঠি লিখিলেন। ইহার উত্তরে ১লা জুন সম্রাট নিজের হাতে একখানা চিঠি লিখিয়া আওরঙ্গজেবকে দুৰ্গে আসিবার জ্ঞতা সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং সম্রাটের দূত মারফত তিনিও সম্মতি জানাইলেন। উহার পরের দিন ( ২রা জুন ) সম্রাট

অত্যন্ত আশাবিত্ত হইয়া প্রধান কাজী সৈয়দ হিদায়েৎ উল্লা এবং ইচ্ছা ফাজেল খাঁকে-তাঁহার “আলমগীর” ( ভুবনবিজয়ী ) তরবারি এবং অস্ত্রান্ত বহুমূল্য রত্ন-উপহার সহ পুত্রের কাছে পাঠাইলেন। আওরঙ্গজেব উপহার গ্রহণ করিয়া আলমগিরী মেজাজে কড়া জবাব দিলেন, সম্রাট এখনও দ্বারার পক্ষে কারসাজি করিতেছেন ; এই আমন্ত্রণ আমাকে সরাইবার কপট যড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। আওরঙ্গজেবের এইরূপ মতপরিবর্তনের কারণ সম্রাটের দূতবর্ষ বুঝিতে পারিলেন না।

বকশম্বী শায়েস্তা খাঁ ও খলিলুল্লা খাঁ তখন পর্য্যন্ত স্ব স্ব পদে বহল থাকিয়া সম্রাটের নিতান্ত অমুগত শুভচিন্তক ও শান্তির দূত সাজিয়া দু’দিকেই আনাগোনা করিতেছিলেন। ১লা জুন সন্ধ্যাবেলা মাতুল শায়েস্তা খাঁ আসিয়া বলিলেন, “ভাগিনা! সাবধান! ফাঁদে পা দিও না, শাহানশাহর মতলব ভাল নয়।” ভাগিনা মামাকে তিন হাটে বেচিবার বুদ্ধি রাখিতেন, তিনি এই সংবাদে বিস্মিত হইলেন না। পিতার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না, চিঠিপত্র, মৌখিক কথা শুধু ভাঁওতা মাত্র। যাহা হউক, এই বকম সাক্ষী পাইয়া বাহিরে দশ জনের কাছে পিতার ছরভিসন্ধি পাকাপাকি সাব্যস্ত করিবার পক্ষে তাঁহার খুব সুবিধা হইল। পুত্রের এই অভিযোগ শুনিয়া শাহজাহান হতভম্ব হইলেন, কি করিবেন দুই দিন পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলেন না, উভয় পক্ষে মনকষাকষি চলিল। শেষবারের মত পুত্রকে বুৎপাইবার জ্ঞতা তিনি ৫ই জুন ফাজেল খাঁর সহিত তাঁহার পরমপ্রিয় ভায়রাভাই খলিলুল্লা খাঁকে পাঠাইয়া দিলেন ; কারণ খলিলুল্লা দুই পক্ষেই বিশ্বাস-ভাজন, মেসোর কথা হয়ত আওরঙ্গজেব অবিশ্বাস করিবে না। ফাজেল খাঁর ধর্ম্মের কাহিনী শাহজাদা কানেই লইলেন না, কিছুক্ষণ পরে খলিলুল্লাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। কয়েকটি কথার পর তিনি বাহিরে আসিয়া ফাজেল খাঁকে সরাসরি জবাব দিলেন, বকশী-উল-মুল্ক মহামাত্ত খলিলুল্লা খাঁ আপাততঃ এইখানেই বন্দী, আপনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ইহা আগাগোড়া নাটকীয় ব্যাপার ; খলিলুল্লার খেলা শাহীমহলে শেষ হইয়াছিল।

৬

\* সৌদাই ওমবাহগীর ও অহুপগীর নবাব গুজাউদৌলার অধীনে নাগাকোজ লইয়া পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আবদালীর পক্ষে লড়াই করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর আবদালীর নিকট হইতে ওঁহার অস্ত্র অংগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধয়লে নিহত মারাঠাগণের শব অগ্নিসং করিবার অহুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ঐ রাত্রিতে ( ৫ই জুন, ১৬৫৮ খ্রীঃ ) আওরঙ্গজেবের মুখোশ খুলিল ; শত্রুতায় তখন শাহজাহান মুখ্য, দ্বারা গোণ ইহা তাঁহার নিকট অজানা ছিল না। তিনি সৈন্তে আগ্রা



শহরে প্রবেশ করিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন, সম্রাটও উহার জন্ত অপ্রস্তুত ছিলেন না। দুর্গের ফিরিকী গোলন্দাজ, সম্রাটের দেহরক্ষী বন্দুকগারী পদাতিক, এবং ১৫০০ শত হাবশী, কুমী ও জর্জীয় দূতবেহা (কসাক) ক্রীতদাসের পল্টন আসদ খাঁর (?) নেতৃত্বে শত্রুপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল। কোন পক্ষের তোপখানা বিশেষ কার্যকরী হইল না, দুর্গ-প্রাচীর হইতে তোপ দাগিলে আশা শহর উজাড় হইয়া যায়, দুর্গপ্রাচীরের তিন দিকে অতি নিকটে বড় বড় বাড়ী, তোপের গোলা ঐ গুলির আড়ালে লুকায়িত শত্রুর কোন ক্ষতি করিতে পারিল না; অপর পক্ষে দুর্গের উপর গোলা দাগিয়া আওরঙ্গজেবও কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না, কামান বশাইয়া শুধু ভূম্মা মসজিদ (বর্তমান Jahanera Mosque) অপবিত্র করিলেন মাত্র, তবে কামানের পাল্লার ভিত্তর মসজিদ ও পাকাবাড়ী উঠাইবার অতুমতি দেওয়াই বাদশাহী বেকুবী।

যাহা হউক, আওরঙ্গজেবের নৃশংস সামরিক প্রতিভা সম্রাটের আয়োজন ও দুর্গরক্ষিণের বীরত্ব তিন দিনেই পণ্ড করিয়া দিল। যমুনার উপর ভরসা করিয়া আকবর বাদশাহ দুর্গের পূর্বদিক কিঞ্চিৎ কম মজবুত করিয়াছিলেন। এই দিকেই হঠাৎ আক্রমণ করিয়া আওরঙ্গজেবের ফৌজ বিজয়ী দরওয়াজার বহির্ভাগ দখল করিয়া বসিল, দুর্গে প্রবেশ অসাধ্য হইলেও যমুনা হইতে দুর্গের পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হইল। দুর্গের ভিতরে যে সমস্ত কুয়া ছিল ঐগুলির নোনতা জল পানীয় হিসাবে কেহ ব্যবহার করিত না, যমুনা হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা ছিল। নদীর জলের অভাবে দুর্গবাসীদের জীবন একদিনেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। যিনি রাজধানীতে যমুনার জল, সফরে উদ্ভবাহিত মটকা-ভরা গড়মুস্তে-খরের গঙ্গামু, গ্রীষ্মে হিমচল হইতে যমুনার স্রোতে ভেলা-বাহিত বরফে ঠাণ্ডা করা জল ব্যতীত খ্রিশ বৎসর অল্প জল মুখে দেন নাই তাঁহার কাছে অবস্থার ফেরে কুয়ার দুর্গন্ধ ধারা পানি (brackish water) “স্বাদ্ সুগন্ধ স্বদতে ভুবারা” মনে হইল। সম্রাটের দূততা পানীয় জলের কষ্টে দুই দিন পরেই টুটিয়া গেল, তিনি পুত্রের কাছে তিতিক্ষা ও তৃষ্ণায় জল ভিক্ষা করিয়া চিঠিতে লিখিলেন,—“হিন্দু মরা বাপের জন্ত পানি খয়রাত করে। আর মোছলমানের ছাওয়ালা তুমি, বুড়া বাপ জিন্দা থাকিতে সাঁকের বেলা রোজা “এস্তার” (breaking the day's fast) করিবার জন্ত এক চুমুক মিঠা পানি তোমার কাছে পাইবে না?” পুত্র জবাবে লিখিলেন, “যেমন কর্ম তেমনই ফল। যিনি আপনার আশা বড়ভাই খসরুর গলা টিপিয়া মারিয়াছেন, দাওয়ার বখশ (খসরুর পুত্র) প্রভৃতি সাতাশ জন শাহ-

জাদাকে কোরবানী করিয়া খুনরজ (bloody) তক্তে বসিয়াছেন তিনি ধর্মের দোহাই দিয়া পুত্রের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারেন?”

সন্তানের মুখে সাম্রাজ্যলালসা-দৃষ্ট যৌবনের দুর্ভিক্ষ ব্যাখ্যা শুনিয়া শাহজাহানের জল ও জীবনের তৃষ্ণা মিটিয়া গেল, তবুও দুর্গের পণ—প্রাণ থাকিতে পাষণ্ডকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে না। এইদিকে আওরঙ্গজেবও অস্থির হইয়া উঠিলেন; তাই মোরাদ্দের মতিগতি ভাল নয়, দিল্লীতে দারা আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে, সুলেমান যে-কোন যুদ্ধে হেরত পলাইয়া বাপের কাছে পৌঁছবে; এইদিকে দুর্গে খাদ্যের অভাব নাই, নোনতা জল খাইয়া শাহানশাহর কাবু হওয়ার লক্ষণও বিশেষ দেখা যাইতেছে না; সুতরাং কোঁশলে কার্যোদ্ধার ছাড়া উপায় নাই। তিনি সম্রাটকে লিখিলেন, “পূর্বরূপে অপরাধের জন্ত আমি হাজির হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু অসুখে পড়িয়াছি। আপনার হুকুম পাইলে কুমার মহম্মদ সুলতান কদমবাসী করিবার জন্ত দরবারে উপস্থিত হইতে পারে।” পি’পড়ার পেটকামড়ি সম্রাট ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, তবুও মোহ কাটিল না। পুত্রের হেরত স্মৃতি হইয়াছে ভাবিয়া সম্রাট শাস্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, কোনপ্রকার সম্মেহ না করিয়া কুমার মহম্মদ সুলতানকে শাহী-মহলে আসিবার হুকুম দিলেন। আওরঙ্গজেব বিশ্বস্ত ও বেপরোয়া জর্জী ফৌজ বাহিয়া বাহিয়া পুত্রের সঙ্গে দেহরক্ষী হিসাবে প্রেরণ করিলেন এবং গোপনে তাহাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। বিরাট সমাগোহে কুমার দুর্গে অভ্যর্থিত হইলেন, দুর্গরক্ষিণগণ যুদ্ধ শেষ হইয়াছে মনে করিয়া অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিল; কেবল শাহী-মহলে যথার্থীতি বড়া পাহাড়া। দুর্গের শেষ ফটক পার হইয়াই কুমারের দেহরক্ষিণগণ ভিতর হইতে প্রাচীররক্ষী সেনাগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিল, বাহির হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ আরও ফৌজ চুকিয়া পড়িল, শাহী-মহলে সম্রাট শাহজাহান অবরুদ্ধ হইলেন (৮ই জুন, ১৬৫৮)।

দুই দিন পরে জাহানারা বেগম সন্ধিপ্রেমিণী হইয়া আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। আওরঙ্গজেব প্রথমে পরিষ্কার জবাব দিলেন, “ইসলামের পদম শত্রু দ্বারাকে শেষ না করিয়া সম্রাটের সহিত আমি দেখা করিব না।” পরে সুর কিঞ্চিৎ নরম হইল, জাহানারাকে কথা দিলেন পরদিন তিনি শাহ-বুরুজে পিতার পদবন্দনা করিবেন।

জাহানারার সহিত সাক্ষাতের পূর্বে ১০ই জুন আওরঙ্গজেব আগ্রার উপকণ্ঠে মহাপ্রাণে প্রকাশ দরবারে সিংহাসনে

বসিয়া সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরের দিন রাজধানীতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করিয়া তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শহরে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইল, সর্বত্র গভীর্ণ-পতিক লোকারণ্য ও উৎসব। আওরঙ্গজেবের বিরাট সামরিক মিছিল দুর্গ-ভোরণের দিকে চলিল, মোরাদ ও তাঁহার অনুচরবর্গ কেহই আওরঙ্গজেবের অনুগামী হয় নাই। আওরঙ্গজেব প্রায় ফটকে প্রবেশ করিবেন এমন সময়ে ভিড় ঠেলিয়া সেনাধ্যক্ষ শেখমীর ও শায়েস্তা খাঁ জরুরি সংবাদ লইয়া আসিলেন,—ভীষণ বড়বন। শায়েস্তা খাঁ মুখে শুনা গেল শাহবুজ্জ প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ত অতি হিংস্র বলিষ্ঠা তাতার ক্রীতদাসীগণ সম্রাট কর্তৃক গুপ্তস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব আর অগ্রসর হইলেন না; ঐখানেই প্রায় একই সময়ে শাহী অক্ষরমহলের নহর-দিল নামক খোজা সম্রাটের এক গুপ্ত লিপি দ্বারা নিকট পৌছাইবার জন্ত বাহিরে যাইতেছিল, সামনে আওরঙ্গজেবকে দেখিয়া যে-কোন কারণে সে ঐ চিঠি তাঁহার হাতেই দিল, চিঠি পড়িয়াই আওরঙ্গজেবের চক্ষু স্থির। উহাতে নাকি লেখা ছিল—

‘দারাগুকে! তুমি দিল্লীতেই কদম জমাইয়া থাক; ঐখানে টাকা ও সিপাহীর অভাব নাই। সাবগান! ঐ স্থান ছাড়িয়া এক পা-ও দূরে যাইও না; আমি স্বয়ং এই জায়গার মামলা খতম করিব।

সকলেই বুঝিল মতিচ্ছন্ন সম্রাট দ্বারা নিমিত্ত আওরঙ্গজেবকেই খতম করিবার জন্ত বসিয়া আছেন। আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল; তিনি পিতাকে কড়াকড়ি জেলে পুরিবার যে অজুহাত খুঁজিতেছিলেন উহাই নাটকীয়ভাবে প্রকাশ্য সদর বাস্তব তাঁহাকেই খুঁজিয়া লইল, অধিকন্তু ভগ্নী জাহানারার কাছে পূর্বসন্ধ্যায় যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন উহার মর্যাদাও রক্ষা করা হইল।

শাহজাহানের পক্ষে কোন ওকালত-নামা না লইয়াও বলা যাইতে পারে ঐ ধরণের চিঠি এবং রাশি রাশি টাকা আগ্রাহুর্গ হইতে দিল্লী পৌঁছিয়াছিল—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু নহর-দিল বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে চিঠি আওরঙ্গজেবের কাছে সন্দেহজনক পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে উপস্থিত করিয়াছিল, সে চিঠির সঙ্গে শাহজাহানের কোন সন্দেহ ছিল কিনা বলা যায় না। ঐ চিঠি আসল কি জাল উহা একমাত্র আওরঙ্গজেব এবং তাঁহার দরবারী স্তাবকগণই জানিতেন। যে বাজারে আওরঙ্গজেব বড় বড় আমীর রাজা মহারাজকে কিনিয়া লইয়াছিলেন সে বাজারে একটি ক্রীতদাসের সততা ও প্রভুভক্তি অতি সামান্য জিনিষ; তাহার মত একটা

পুলিসী “রাজসাকী” হাজির করার মত আওরঙ্গজেবের হিতৈষী ১০ই জুন তারিখে আগ্রাহুর্গে অনেক ছিল। ইহাও সত্য, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আওরঙ্গজেব সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রচারকাণ্ডের কদর বুঝিয়াছিলেন।

৮

এক ধার্মীকৃত বাঙ্গালী মুসলমানকে “এতেবারু খাঁ” উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিয়া আওরঙ্গজেব আগ্রাহুর্গে বৃদ্ধ শাহজাহানের প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। এতদিন তিনি দারা ও সুলেমান শুরের বিরুদ্ধে কোন সেনা পাঠাইতে পারেন নাই, চিঠিপত্র লিখিয়া রাজা জয়সিংহ ও দেলের খাঁকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৩ই জুন আগ্রায় একদল মৈত্র মোতায়েন রাখিয়া অবশিষ্ট কৌজমহ আওরঙ্গজেব দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন;—ম্যানুসী সাহেবও ছোক্রা; দরবেশ সাকিয়া দারার কাছে পৌছাইবার জন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ৫০।৬০ মাইল দূরে মথুরা পৌঁছিতে আওরঙ্গজেবের দশ দিন লাগিয়া গেল। ইহার কারণ সামনে দারা অপেক্ষা পিছনে মোরাদই তাঁহার পক্ষে তখন অধিক বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সামুগড়ের দা শুকাইবাব সঙ্গে সঙ্গে ভাই মোরাদের উপর আওরঙ্গজেবের দরদ কমিতে কমিতে দারুণ বিষে ও দুশ্চিন্তায় পরিণত হইয়াছিল। মোরাদের উচ্ছৃঙ্খল সেনাদল আগ্রাহুর্গের লুণ্ঠনাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এইজন্য আওরঙ্গজেব রাজধানী রক্ষার ভার কুমার মহম্মদ সুপতানকে দিয়াছিলেন এবং পরে সম্রাটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে মোরাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করেন নাই। মোরাদকে সিংহাসনে বসাইবার জন্ত আগ্রা পর্য্যন্ত আনিয়া ১১ই জুন তিনিই মহাসমারোহে তক্তে বসিয়া পড়িলেন। ভাইদের মধ্যে সর্বপ্রথম মোরাদ আহমদাবাদে সিংহাসনে আরোহণ ও রাজত্ব প্রাপ্ত করিয়াছিলেন, পরে আওরঙ্গজেবের কথা শুনিয়া ঐ ছাতা গুটাইয়া বাক্সবন্দী করিয়াছিলেন এবং শাহী তক্ত উঠের উপর চাপাইয়া ভবিষ্যতের আশায় আগ্রা পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন। মোরাদের মোসাহেবগণ সুযোগ পাইয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উদ্ধানি দিতে লাগিল, কিন্তু দাদার কথা শুনিতেই তিনি গলিয়া যাইতেন। আওরঙ্গজেব বোধ হয় তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি কেবল শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্ত দরবারে ই-আম ডাকিয়াছিলেন, ১১ই জুনের ব্যাপারটা কিছুই নহে; আসল দার-উল-খেলাকত হইল দিল্লী; দারাকে তাড়াইয়া ঐখানেই তান তাহাকে তক্তে বসাইয়া তবে বিদায় লইবেন। দোটা না শ্রোতে পড়িয়া মোরাদ দাদার কাছে যাওয়াই বন্ধ করিলেন,

নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজের সেনাবল বিগুণ করিলেন ;  
আওরঙ্গজেব টের পাইলেন কথায় চিৎকার আর ভিজিবে না।

আওরঙ্গজেব পিতার যে দুর্দশা করিয়াছেন সুযোগ  
পাইলে তাঁহারও ঐ দশা করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না—এই  
আশঙ্কা মোরাদের মনে ক্রমে বদ্ধমূল হইল। তাঁহার বৎস্রদুর্দশ  
বিশ হাজার অস্বারোহী আওরঙ্গজেবের সহিত বলপূর্ব্বকার  
জন্ত উৎসুক, পরামর্শদাতারা বুঝিলেন সিধা আনুলে যি  
উঠিবার নয়। ১৩ই জুন আওরঙ্গজেবের দিল্লীযাত্রার সময়  
মোরাদ অছিল। করিয়া আশ্রিতেই থাকিয়া গেলেন, আওরঙ্গ-  
জেবের দুর্ভাবনা চরমে উঠিল। এক দিন পরে মোরাদের  
ভাবনা হইল দাদা যদি একাই দিল্লী দখল করিয়া ঐখানেও  
তক্তে বসিয়া পড়েন তাহা হইলে উপায় কি ? তিনিও সমস্ত  
কৌশল লইয়া মথুরার দিকে চলিলেন, কিন্তু দুই ভাইয়ের  
কৌশলের মধ্যে বরাবর এক-মঞ্জিল ব্যবধান। আগ্রা হইতে  
দুই-মঞ্জিল দূর করিবার পর আওরঙ্গজেব মোরাদকে মৈত্র-  
গণের ব্যয় নির্বাহের জন্ত নগর বিশ লাখ টাকা পাঠাইলেন  
এবং পরে লুণ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হইবে বলিয়া  
জানাইলেন। ২৩শে জুন আওরঙ্গজেব মথুরা পৌঁছিলেন,  
মোরাদের তাঁবু পড়িল শহরের বাহিরে। মোরাদের আরোগ্য-  
লাভ উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করিয়া আওরঙ্গজেব  
ভাইকে দুই দিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু মোরাদ  
আসিলেন না। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব মোরাদের বিশ্বস্ত  
স্বাস্থ্য (গোলাম) নূরউদ্দীন এবং আরও কয়েকজনকে নানা  
প্রলোভন দেখাইয়া হাত করিয়াছিলেন। ২৫শে তারিখ  
সন্ধ্যাবেলা শিকার হইতে ফিরিবার সময় নূরউদ্দীন কৌশল  
করিয়া আওরঙ্গজেবের শিবিরে মোরাদকে লইয়া আসিল।  
আওরঙ্গজেব আছলামে আটখানা হইয়া এক সার্কজমীন  
ভোজের আয়োজন করিলেন, এবং তাঁহার সেনাধ্যক্ষগণ  
প্রত্যেকেই সমপদস্থ মোরাদের এক এক অফিসারকে নিমন্ত্রণ  
করিয়া পাঠাইলেন। সেই রাত্রিতে আওরঙ্গজেবের শিবির  
নাচ-গান ও শরাবে মশগুল, কেহ ফিরিবার গরজ দেখাইবার  
কাঁকও পাইল না।

এই দিকে নিজ তাঁবুতে দস্তার-খানে বসিয়া আওরঙ্গজেব  
প্রথম স্নেহে মোরাদকে ‘এটা-খাও, সেটা-খাও’ বলিয়া  
আপ্যায়িত করিতেছিলেন। খানার পরে সেবা শিরাজী  
আসিল, মোরাদ তবলুক [গোষ্ঠস্বচক সঙ্কোচ] করিয়া  
মাথা নীচু করিয়া ভাবিলেন, “হজরতজী”-এ দস্তার-খানে  
হারাম ? মোরাদের সঙ্কোচ কাটাইবার জন্ত আওরঙ্গজেব  
বলিলেন, এতে আর দোষ কি ? মেহেনতের পর জঙ্গী  
জোয়ানের এটা না হইলে চলে না। এই বলিয়া তিনি নিজ  
হাতে পেয়ালা তুলিয়া ভাইকে দিলেন ; অগত্যা মোরাদ

সেলাম চুকিয়া পরম কৃতজ্ঞভাবে দাদার দস্ত-মোবারক হইতে  
মহনতের পিয়ালা লইয়া এক চুমুকে নিঃশেষ করিলেন,  
আঙুলে ঘূতাঘৃতি পড়িল। শরাবীর পেটে এক পেয়ালা  
গেলেই ‘আবার খাবো’ অবস্থাটুকু অন্ততঃ আওরঙ্গজেবের  
অজানা ছিল না। তিনি পেয়ালার পর পেয়ালা ভরিয়া দ্বিতে  
লাগিলেন। প্রথম যৌবনে একবার তিনি প্রেমের তুফানে  
নর্তকী হীরাবাদীরের আবদারে এক পেয়ালা মুখের কাছে  
তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চটুলা প্রেমশী হাত চাপিয়া ধরিয়া  
সেই বার তাঁহার ইমান বাঁচাইয়াছিল। এইবার মনে মনে  
মোদাতালার কাছে গুনাহগারী মাফ চাহিয়া তিনি গৌয়ার  
মোরাদের নাচার সাকী সাধিলেন, কি করিবেন ? ছনিয়া-  
দারীর জরুরত বড় পাড়ি !

ভরা পেটে আকণ্ঠপান করিয়া মোরাদের যখন হাই তুলিয়া  
দস্তার-খানের উপর চলিয়া পড়িবার অবস্থা, তখন আওরঙ্গ-  
জেব পাশের কামরায় মোরাদকে একটু ঘুমাইয়া লইতে  
অন্তরোধ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন পরে দাবার বিরুদ্ধে  
যুদ্ধপরিচালনার সঙ্গ-পরামর্শ হইবে। মোরাদের গায়ে তখনও  
শিকারের পোশাক, কোমরে তলোয়ার খঞ্জর (dagger)  
বাঁধা। ঐগুলি বালিশের নীচে রাখিয়া তিনি বিছানার উপর  
লম্বা হইয়া পড়িলেন, প্রহরীস্বরূপ বিশ্বস্ত স্বাস্থ্য বশরত জাগিয়া  
রহিল এবং প্রভুর হাত-পা টিপিতে লাগিল। মোরাদের যখন  
একটু তন্দ্রার ভাব তখন এক সুন্দরী ক্রীতদাসী শাহজাদার  
সেবার জন্ত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, বশরত কায়দামাফিক  
মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। বাহিরে পা  
দেওয়ামাত্র কয়েকজন যগুরুতি লোক চিলেঃমত ছেঁ। মারিয়া  
স্বাক্ষরিত বশরতকে ভৎসনায় লইয়া গেল। ভিতরে সুন্দরীর  
কোমল অঙ্গসংবাহনে মোরাদের ঘুম দারুণ গভীর হইতে  
লাগিল, সময় বুঝিয়া মায়াবিনী স্বরিত-পদক্ষেপে অন্তহিত হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আওরঙ্গজেবের ক্ষিপ্তকর্মা সেনানী শেখমীর  
দশ-বার জন সশস্ত্র ঘাতকসহ ঘরে ঢুকিয়া মোরাদকে ধরিয়া  
ফেলিল, তবুও তাঁহার ঘুম ভাঙিল না, অবশেষে তলোয়ারের  
বন্দুবানি হাতকড়ি-পা-বেড়ীর টুকটাকনি গুলিয়া মোরাদ  
জাগিয়া উঠিলেন, বালিশ হাতড়াইয়া দেখিলেন অস্ত্র নাই।

শত্রুগণের উপর তাঁর ঘুরার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সিংহ-  
বিক্রান্ত মোরাদ স্থিরভাবে বন্ধনদশা স্বীকার করিলেন।  
বাহিরে তাঁহার পানোয়ন্ত সেনাধ্যক্ষগণও অস্বরূপ অতিথি-  
সংস্কার লাভ করিলেন। ভোরের দিকে সুরক্ষিত হাওলা-  
বাহী এক একটা হাতী পাঁচ শত অস্বারোহী পরিবেষ্টিত হইয়া  
শিবিরের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম দিকে অজ্ঞাত স্থান অভি-  
যুখে যাত্রা করিল। নায়কশূন্য মোরাদের বিশ হাজার  
অস্বারোহীর অর্দ্ধাংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, অর্দ্ধেক আওরঙ্গ-  
জেবের চাকরী গ্রহণ করিল।

ক্রমশঃ



১

সেবাসম্ব গড়েছে ছেলেরা। আরও পাঁচটা খুচরা কাজ আছে, হাতে সেরকম এসে পড়ে, তবে আসল কাজ রোগীর সেবা আর দাহ। চমৎকার কাজ করছে, হীরের টুকরো ছেলে সব। বেশী দূর না গিয়ে আর বৎসরের কথাই ধরা যাক, ক'ঘরই বা বাঙালী শহরের মধ্যে, তবু জন ছয়েককে কালের কবলে ভুলে দিতে হ'ল। বলতে নেই, তবে এবারে তো যাচ্ছে সামলে এখন পর্যন্ত ভগবানের দয়ায়।

অবশ্য ভগবানের দয়াই সব, শুণু স্মৃতি না করে পারা যায়? অন্ততঃ এটুকুও তো বলতে হয়, ভগবানের সবচেয়ে বড় দয়া এই সব ছেলে দিয়েছেন। বিপদ-আপদ আছেই মানুষের সংসারে, তবে কতটা ভরসা, যত বড়ই বিপদ হোক বুক দিয়ে পড়বে সবই; মদন আছে, অনিল আছে, যুগোল আছে, বলাই আছে, যজ্ঞেশ্বর আছে, আরও সবাই আছে—সোনার চাঁদ সব, বুকেতে দেবে না যে বিপদটা তোমার।

কিন্তু টিকল না। তার কারণ, যে ভাবের একটু উৎসাহ আশা করেছিল বেচারিরা তার কিছুই পেল না। ছেলেমানুষ সব, নূতন আশা, নূতন উদ্দোষ; কিন্তু আশু আশু মনমরা হয়ে পড়তে লাগল ভেতরে ভেতরে, তারপর যেদিন সবচেয়ে শক্ত কেসটাকে সারিয়ে তুলে প্রায় একরকম অসাধ্যসাধনই করলে বলতে হয়, মুখে মুখে 'বাহবা' রটে গেল চারিদিকে, সেদিন সবাই একেবারে ভেঙে পড়ল।... এই মুখের 'বাহবা'র জন্মই কি এরকম করে প্রাণপণ করেছে বেচারিরা? জীবনে 'বাহবা'টাই কি সবকিছু?

টাকাকড়ি মুগিয়ে উৎসাহ দেওয়ার কথা হচ্ছে না, তারা অকুলান হয়নি, গোড়া থেকেই পেয়ে গেছে, টাকা হিসেবেও, আবার অন্তভাবেও।

ভগবতীবাবু অস্থখে পড়লেন। সেবাসম্বের হৃদ্রপাত

ঐখান থেকেই। একা মানুষ ভগবতীচরণ, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, স্ত্রী নেই, দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় পরিজন নেই। বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধও খুব কম। কালেকটরিতে মোটা মাইনের চাকরি করতেন, অবসর নিয়ে বসে আছেন। মোটা মানুষ, তার এই প্রায় চৌদ্দ-পনের বৎসরের অবসরপ্রাপ্ত অলস জীবনে শুণু মেদ সঞ্চয় হয়েছে, বাইরে বড় একটা বেরোন না, বা পারেনই না বেরুতে।

অস্থখে পড়লেন।

ডিসেম্বর মাস, সবার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। খার্ড মাষ্টারের ছেলে বনোয়ারীলালকে অঙ্কের নম্বর জনতে পাঠিয়ে সবাই বলাইদের খাবারের দোকানে একত্র হয়েছে; অনিল এসে খবরটা দিলে। অনিল খবরটা দিলে অজ্ঞভাবে—তার কাছে সমস্তাটা যেভাবে দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ অত মোটা মানুষ, নিয়ে যাবে কি করে, কত জন লাগবে?

যজ্ঞেশ্বর বললে, “তুই যে একেবারে যাবার ভাবনা ভাবছিস, হয়েছে কি?”

“নিমোনিয়া। হৃদয়াকাকা দেখেছেন, বললেন আশা খুঁই কম। আরও মুশকিল হয়েছে, সেবা করবার কেউ নেই কিনা তেমন—ওরা তো চাকর আর ঠাকুর।”

বলাই বললে, “হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন না কেন?”

অনিল বললে, “নড়াবার উপায় নেই এখন, বড্ড দেরিতে খবর পেয়েছেন কিনা। তা ভিন্ন বড্ড গলিঘুঁজির মধ্যে তো? পঞ্চাশটা বাঁক।”

বনোয়ারীলাল এল। বললে, “সবাই পাস করেছে, শুণু অনিল আর যজ্ঞেশ্বরের এক আর আড়াই নম্বর কম ছিল, চার-পাঁচ জায়গায় আধ আধ করে বসিয়ে এসেছে। বাবা এখনও টোটাল দেয় নি। সবার নম্বরও বলে দিলে।

বলাইয়ের কাছ থেকে কড়ার মত চারখানা ডবল অমৃতী নিয়ে চলে গেল।

যজ্ঞেশ্বর বললে, “অথচ নিমোনিয়া যাদের ধরা দরকার তাদের ধরে না। আড়াইটে নম্বর নিজের হাতে দিয়ে দিতে পারত না? এতে চুরি শেখানো হচ্ছে না বুঝি?”

বোধ হয় এই থেকেই নিরপরাধ যাকে ধরেছে নিমোনিয়া তার প্রতি সহানুভূতিটা ভাল করে উঠল জেগে। যজ্ঞেশ্বরই বললে, “মরুক গে। আমি বলছিলাম, লোকটা বেঘোরে মারা যাবে শেষকালে? কেউ যদি আমার সঙ্গে শোগ দেয় ত চেষ্টা করে দেখি একবার।”

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। অন্ধের কাঁড়াটা কেটে গিয়ে মনটা সবার হালকা হয়েছে, হাতে তেমন কিছু কাজও নেই। আর, কাজটাও তো ভাল; পরসেবা। শুণু যুগোল বললে, “একটা কথা কিন্তু ভাই। ভগবতীবাবু বৈচে উঠুন, আহা!...কিন্তু গীতায় কি যেন লেখা আছে, বাবা সেদিন মাঝে বসছিলেন—যত চেষ্টা করবে ততই তার ফল ভগবানের হাতে। অবশ্য তবু আমরা প্রাণপণেই করব চেষ্টা। শেষকালে কিন্তু...অবিশ্রি বলতে নেই—বৈচেই উঠুন, আহা!...কিন্তু শেষে ভগবান গীতায় যা বলেছেন যদি তাই হয়ে পড়ে তখন বড়রা এসে যে মুকুটধারী করে...”

বলতে হ’ল না, সবাই বু’লে। বলাই বললে, “অবিশ্রি বলতে নেই, কিন্তু আবার ওদিকটাও তো দেখতে হবে ভেবে।...ধরো এল না বড়রা, বললে ওরাই যা করছে করুক; কিন্তু...”

যজ্ঞেশ্বর এগিয়ে এল।

“ভারী বলছিল? নেঃ, অমন ঢের ভারী লাস দেখেছি। আমি আছি, যুগোল আছে, মদন আছে, সত্যেন আছে, মণি নাপিত, বাগদী...”

দলের আরও শক্তসমর্থ কয়েক জনের নাম করলে।

বলাই বললে, “তার চেয়ে এক কাজ করো, আমি যা বুঝি। এরকম এলেমেনে! কাজ আমার পছন্দ নয় দস্তরমত নিয়ম-কানুন করে ফেল, একটা নাম দাও—যেমন বড়দের ক্লাব রয়েছে—ধিয়েটার আর আড্ডা, আরে ছিঃ!...আমরা মশাই, ওসব বুঝি না, এক পাশটিতে পড়ে থেকে সমাজের একটু সেবা করব। কিন্তু এই আমাদের নিয়ম—ডাকতে চান, বাড় পেতে নিচ্ছি, না চান, বহত আছে।”

সবার মনঃপূত হ’ল। বলাইয়ের দোকান থেকে সত্যেনের বাসার দিকে চলল সবাই। সত্যেন থাকে সব তাতেই, তবে একটু মোটা আর আয়েসী বলে বসে বসে যতটা হয়। বন্ধু-মহলে নাম পেয়েছে ‘মোহান্ত’।

মিটিং হ’ল, নিয়ম-কানুন করা হ’ল। নাম-করণও হ’ল।

সুখিাবাবু বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ’ল সবাই, একেবারে দশ-বার জন। ঢোকবার আগে সকলেই একবার আর সবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে নিজের মুখটাও যথাযথ বিবরণ করে নিলে।

বলাই সেক্রেটারী হয়েছে, এগিয়েছিল, বললে, “ভগবতী দাদামশাইয়ের নাকি বড় শক্ত ব্যামো হয়েছে কাকা?”

সুখিাবাবু একবার দলটির উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, বললেন, “হ্যাঁ, নিমোনিয়া।”

“শুনলাম। শুনে পর্য্যন্ত আমাদের সেবা-সজ্জার সবার মন এত ধারাপ হয়ে রয়েছে...কোন উপায় নেই আর?”

যুগোল বললে, “বলাই সেক্রেটারী সজ্জের। গিয়ে বলবে সত্যিই আমাদের মনটা এত ধারাপ হয়ে গেছে।”

সুখিাবাবু আর একবার চোখ ছুটো ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বললেন, “তোমরা সেবা করতে চাও? তা, অনেকগুলি ত রয়েছেও। উপায়—চেষ্টা, আমিও ত দাঁছি ওষুধ...”

যজ্ঞেশ্বর বললে, “আজ্ঞে হ্যাঁ, চেষ্টায় কি না হয়?”

একটু হেসে যুগোলের দিকে চেয়ে বললে, “এই ত আমাদের অন্ধের পেপারটা অত শক্ত ছিল...”

“ও, তোমাদের পরীক্ষাও ত হয়ে গেছে! তা, দেখ না করে চেষ্টা, ভালই ত। সমাজের সেবা এ বয়স থেকে একটু করা ত উচিত, তোমরাই ত করবে। ওঁর আবার শুণু চাকরবাকরের ওপর ভরসা।”

অনিল বললে, “কিন্তু প্রেসিডেন্ট সত্যেন একটা কড়া নিয়ম করে ফেলেছে, কাকা।

মানে, যে কেস্টা আমরা হাতে নোব...”

যুগোল চিমটি কেটে দিতে থেমে গেল।

সুখিাবাবু বললেন, “বেশ, তা হলে তোমরা এগোও। আমায় আবার একবার যেতে হবে এখন, তোমাদের সব ওখানেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে দোব।...তবে, এতগুলি যাচ্ছ, যেন গোলমাল না হয় বাপু ওখানে।”

বলাই বললে, “আজ্ঞে, গোলমাল কি?—শুনে পর্য্যন্ত আমাদের কাকুর মুখে রা বেরুচ্ছে না—এমনি হয়েছে!”

সত্যিই, কি মেহনতটা যে করলে সবাই! রাত্রি নেই, দিন নেই, পালা করে চ’তিন জন রয়েছেই বসে। ওষুধপত্র, শুল্কবা, কিছুতেই এতটুকু খুঁত নেই, যেমন যেমনটি বলে দিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার, অন্ধরে অন্ধরে পালন হয়ে যাচ্ছে।

প্রাণপণ চেষ্টা আর কাকে বলে? গীতায় ভগবানের সেই উক্তিটা নিয়ে সবার যে ভয়টা ছিল সেটা কিন্তু আর ফলল না, ফলাফলটা তিনি আর নিজের হাতে তুলে নিলেন না। ভগবতীবাবু সেবে উঠলেন।

শহরে একটা বেশ সাড়া পড়ে গেল।

কেই-বা চিনত কাকে? স্থলের ছেলে, পাস করছে, কেল করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেলে বেড়াচ্ছে কেই-বা তাদের খোঁজ রাখে—ভগবতীবাবুর ব্যাপারটাতে সবার নাম বেরিয়ে গেল। সবারই মনে একটা উৎসাহ এসেছে—এক দিন আমোদ-আহ্লাদ করে খাওয়া-দাওয়া করবার জন্তে যে টাকাটা পেলে, সজ্জাই চাললে। সত্যোনের বাসায় একটা আলাদা ঘর নিয়ে বেশ কল্যাণ করে সজ্জাটিকে গড়তে লেগে গেল সবাই, কার্ট এড অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ-পত্র, সাজ-সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এল, একটা এম্বুলেন্সের খাট করিয়ে নিলে, একটা সাইন বোর্ডও দিলে টাঙিয়ে; অনিল বললে কিছু বাঁশ খড় দড়িও কিনে রাখা ভাল।—অতটা আর করলে না, আপাততঃ কিছু পরসা হাতে থাকতে দরকার। চাঁদার খতা খোলা হ'ল একটা।

একদিন স্থাবাবুরকে ডেকে নিয়ে এল। দেখে-শুনে খুবই উৎসাহ দিলেন—“বাঃ, তোমরা যদি এই করে দেশের কথা, দেশের কথা না ভাবে! এখন থেকে তো চলবে কি করে?”

ছ'একটা পরামর্শও দিলেন তাঁদের শাস্ত্র অনুযায়ী, বললেন—“আমার দ্বারা যদি কোনও সাহায্য হয় তো জানাবে। বাঃ, দিবা কাজ হচ্ছে!”

উৎসাহে অভিভূত হয়ে পড়েছে সবাই, যজ্ঞস্থর বললে, “আপনি শুণ্ড আমাদের খবরটা দিয়ে দেবেন কাকা, আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাজির হব গিয়ে...”

একেবারেই অত বড় কেসটা সামলে দিয়েছে, সেক্রেটারি বলাইয়ের একটা মর্যাদাজ্ঞান হয়েছে, যজ্ঞস্থরের দিকে চেয়ে বললে, “কাকুর কিছু একটা হলেই কেন দিতে যাবেন খবর? তাতে তাঁরও অসুবিধে, আমাদেরও—কি যে বলে...”

তাঁর দিকে চেয়ে হাত কচলে বললে—“আমাদের অনুরোধ। যখন বুঝবেন খুব সঙ্গীন কেস, আমরা যেন খবরটা নিশ্চয়ই পাই একটু; অবিশিষ্ট আমরাও সতর্ক থাকবই—বাড়ী বাড়ী খোঁজ নোব—আজ সবাইকে বলেও রাখছি...”

হেসে পাঁচটি টাকা দিয়ে একটু চিন্তিতভাবে গাড়িতে গিয়ে বললেন স্থাবাবু।

দুই

সঙ্গীন কেসের জন্য বেশীদিন হা-পিতোশ করে থাকতে হ'ল না। থাকোহরি বাবু অসুস্থ হয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন। ঠিক যে ভগবতীবাবুর মত অবস্থা এমন নয়। বাড়ীতে



“কিছু বাঁশ, খড়, দড়িও কিনে রাখা ভালো”

সেবাশুক্রতা করবার লোক আছে—আঁ, মেয়ে, পুত্রবধূ; ছেলে আপিসে কাজ করে, বাপের অসুস্থ, খাবড়ে গিয়ে সেও ছুটি নিয়ে বসল। অসুখটা নিমোনিয়া। স্থাবাবুরই হাতে রয়েছে। থাকোহরিবাবু তাঁর আবার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

লোক রয়েছে, আশা কম, তবু একটু উৎসাহ কি মারলে দু'তিন জন, তার পর কেউ গা করে না দেখে সবাই মিলে স্থাবাবুর ওখানেই গেল।

কিছু বলতে হ'ল না, তার আগে স্থাবাবুই বললেন, “এই যে তোমরা এসেছ। দেখো! মনেই ছিল না তোমাদের কথা। থাকোটা একেবারে ছ' সাইড নিয়ে পড়ল, আমার মনটাও তেমন বেশ হয়ে নেই। তা বেশ হয়েছে, তোমরা রেডি আছ তো?”

বলাই হাত কচলে বললে, “আমাদের আর কি কাজ কাকা?”

“তা হলে এগোও তোমরা, আমি একটু ঘুরে একটা কেস দেখে সোজা চলে আসছি। থাকোর ছেলে বড় নার্ভাস, বউটাও চিরকাল চিলেচাল—ওদের দ্বারা ঠিক...”

এত দ্রুত সফলতা কেউ আশা করে নি, বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে দলটা, যুগোল একটু হেসে বললে—“যমের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, নার্ভাস হলে চল?—না, চিলেচালা হলে?”

দলের সবার দিকে ঘুরে চাইলে। অনিল বললে—“তার ওপর নিমোনিয়া ক্লগী; এক রকম তো মড়া নিয়ে



টানাটানি যমের সঙ্গে...দেখলাম তো একটা কেস খেঁটে।...  
শোষো একটু রোগা বলে তো ডাম্বেলও ধরেছে...নারে ?”

শমু মাথা দোলালে, বললে, “আর ছোলাও।”

স্থিতিবাবু বললেন, “আচ্ছা, তা হলে তোমরা এসো এখন,  
আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।”

সেবা নয় ত, যেন কলে কাজ হয়ে যাচ্ছে। যে দেখছে  
তার মুখেই ঐ কথা। কোথায় ছিল এই সব ছেলেরা ?  
গত বারে আদিনাথের মেয়েটা সেবার অভাবেই গেল মারা।  
পুরস্কারের নাতিটার বেলা ওষুধেরই গোলমাল হয়ে গেল,  
এই তো সেদিনকার কথা। নিজের বাড়ীতে অসুস্থ, মাথার  
ঠিকও থাকে না লোকের...

বলাই বলে, “আমাদের কি দোষ বলুন ? না ডাকলে  
তো আসতে পারি না। লোকে মনে করবে—কিছু একটা  
মতলব আছে। সজ্বটা গড়েছি আপনাদের সবার জন্যে,  
ডাকুন হাজির হচ্ছি, প্রাণ পণ করে লেগে পড়ছি। দেখতেই  
তো পাচ্ছেন—নিজের মুখে কেন বলতে যাব ?”

সেক্রেটারি, শুণু সেবার দিকটা দেখলেই তো হবে না।  
আবার সজ্বটা যাতে সবার নজরে পড়ে, টেকে, সেটাও তো  
দেখতে হয়। ওদিকটা ওর তদারকের ভার, দেখে শুনে আসে  
ঠিক চলছে কি না, তারপর এদিকটা দেখতে হয়। লোকজন  
আসেই খোঁজখবর নিতে, মেয়ে পুরুষ ; কখনও কম, কখনও  
বেশী ; গিয়ে দাঁড়াতে হয়, শুনতে হয়, গুছিয়ে বলতে হয়।

বেঁচে গেলেন থাকোহরিবাবু। একটু সময় নিলেন  
অবশ্র। ভগবতীবাবু যেমন ছিলেন মোটা ইনি আবার ঠিক  
তেমনি রোগা। অনেকগুলি মাহুলির জোরে সমস্ত জীবনটা  
কাটিয়ে এসেছেন, গায়ে যেদ নেই, ঠাণ্ডা লাগলে অসুস্থ, গোড়া  
থেকেই বেশ ভাল ভাবে পেড়েছিল, কিন্তু সেবার গুণে  
সামলে উঠলেন।

সত্যেনের বাসায় তাঁর কথাই আলোচনা হচ্ছিল। অনিল  
বলছে—“শক্ত ছিল বটে কেসটা ভগবতীবাবুর চেয়ে, কিন্তু  
একদিক থেকে আবার কতবড় একটা সুবিধেও ছিল দেখতে  
হবে তো।...আমার নিজের কথা বলছি ভাই, তোমাদের  
সম্বন্ধে জানি না। মানে কত নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে  
পেরেছি থাকোবাবুর বেলা। ভগবানের দয়া, আমাদের  
হাতবশ—হ’ল না কিছু, কিন্তু একটা তো হয়েছিল—  
ভগবান না করুন, কিছু হয়ে গেলে ভগবতীবাবুর মত তো  
নিয়ে যাবার ভাবনাটা আর ছিল না। হাল্কা লোক—  
আমাদের মনটাও খুব হাল্কা ছিল—অবিশ্রি আমার কথা  
—নছি, তোমাদের কথা কি করে জানব বলো ?”

যজ্ঞেশ্বর একটু অকৃতমনস্ক হয়ে মুখটা একটু কুচকে গুনছিল  
বললে, “আমরাই বা কি করে জানব ?”

অনিল প্রশ্ন করলে, “মানে ?”

যুগোলও একটু অকৃতমনস্কই ছিল, বললে, “যগা বলতে  
চায় আর কি—বাড়ে যখন ভুলতে হ’ল না—ভগবানের  
রূপায় তখন কি করে জানবে—ভারী হ’ত কি হালকা  
হ’ত...”

কিছু দিন খালি গেল। সবাই একটু মনমরা হয়ে ঘুরে  
বেড়াতে লাগল। ডাক নেই, কাজ নেই ; একদিন  
সেক্রেটারি বলাই মুখ ফুটে বললেও, “তা হলে আর কেন  
একটা ঠাট বজায় রাখা, তুলে দিই।”

অনিল বললে, “দেখ, আরও কিছু দিন। শীতটা কেটে  
গেলে বসন্তকালটায় একটু চাগিয়ে ওঠে আবার, স্থিতি-  
কাকাদেরও সিজ্‌ন। ভেঙে দিলে তখন আবার আপসোস  
হবে সেবা করতে পারলাম না বলে।”

অত প্রতীক্ষা করতে হ’ল না ; যেমন দিনকতক খালি  
গিয়েছিল তেমনি এল তো এল এক সঙ্গে দু’ছটা কেস—  
পূর্ণবাবুর স্ত্রীর টাইফয়েড আর জগদীশবাবুর বড় মেয়ে—  
কি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে হয়তো টাইফয়েডই  
দাঁড়াবে। পূর্ণবাবু একরকম বলতে গেলে একা মানুষ,  
তায় ষ্টেশনে কাজ করেন, খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।  
জগদীশবাবুর স্ত্রী আছেন, তবে দু’জনেরই বয়স হয়েছে,  
জামাইকে হয়েছে লেখা, অন্ততঃপক্ষে ততদিন একটু সামলে  
দেওয়া। দু’জায়গা থেকেই ডাক এসেছে, সজ্জের একটা  
জরুরি মিটিং বসল।

—উৎসাহ কিরে এসেছে সবার। যেতে হবে বৈকি,  
বাঃ! না গেলে চলে ? মেহনত একটু বেশী হবে, ভাগা-  
ভাগি হয়ে যাবে তো। তা, মেহনতকে যদি ভয়ই করবে  
তো এ পথে পা বাড়ানো কেন ?

তর্ক একটু হ’ল, সবার খাটবার তো সমান ক্ষমতা নয়।  
অনিল বললে, “খাটুনি অবশ্র আছে, তেমনি বরাবরই যে ছুটো  
ব্যাচকে আলাদা আলাদা খেটেই যেতে হবে এমন তো নাও  
হতে পারে। ভালোই হোক মন্দই হোক, একটা কিছু  
হয়ে গেলে তখন আর আবার তারা অগ্র দিকে চলে এসে  
বিলম্ব করতে পারবে।”

শমু একটু ছর্ব্বল, তত পছন্দ ছিল না, মুখটা একটু ভার  
করেই বসে ছিল, বললে, “মন্দ কেন হতে যাবে ? দুটোর  
মধ্যে কোনটা মন্দ হ’ল ? সেদিক দিয়ে তো ভগবানের  
বেশ দয়াই আছে আমাদের সজ্জের ওপর।”

সবাই ওর মুখের দিকে চাইলে, বেশ যেন বুঝতে পারা  
“যাচ্ছে না মনের ভারটা।

শমু এবার একটু বেশ বিরক্তই হয়ে উঠল, বললে,  
“চাইছিল কি ঘুরে ঘুরে ?—খেটে মরছি, কিন্তু বশ আছে

কি কপালে ? প্রাণান্ত করে বাঁচলাম আমরা, থাকোহরি-বাবুর কথা বলছি, যশ হ'ল হাতে কোমরে কোথায় মাহুলি বেঁধে রেখেছে গণ্ডা গণ্ডা, সেইগুলোর !...তা হলে মাহুলির ভরসাতেই থাকো গে না বাপু, গরীবদের ডাকা কেন ?”

নগেন এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, মোটা, শান্ত প্রকৃতির মানুষ, থাকেই সাধারণতঃ চুপ করে, একটু এগিয়ে এসে বললে, “শোঁষো যখন তুললেই কথা—অপযশ কি শুধু একদিকেই ? খ্যাতি নষ্ট করছি বলে চটেছেও অনেকে ভেতরে ভেতরে। এক এক সময় মনে হয়, কেন তবে এ ভূতের বেগার খাটা ? করবে, অথচ...”

অবশ্য, যাওয়াই ঠিক হ'ল। শুধু যজ্ঞেশ্বর একটা সন্তের কথা তুললে—ভগবান না করুন, কিন্তু তুটো কেসের মধ্যে একটার যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় তো। অন্য ব্যাচ থেকেই লোক ডেকে নিতে হবে নিয়ে যাবার জন্তে, বাইরের লোককে আসতে দেওয়া হবে না।

সন্তোন প্রেসিডেন্ট হিসাবে বললে, এ ত জ্ঞায্য কথা।

ছ'জন ছ'জন করে পড়ল। খাটুনি পড়ল খুবই বেশী। একে মাত্র ছ'জনে চব্বিশটি খণ্টা আগলাহো, তার ওপর ভাগাভাগি হয়ে একটু রেবারেবিও আছে, কেউ কোন দলের বেশী সুখ্যাতি না করতে পারে। খুব খাটুনি গেল।

জগদীশবাবুর বড় মেয়ে পনের দিনে পথ্য নিলে। খুবই ভয় ছিল যে ডাক্তার দেখছিলেন তার ; শুধু অক্লান্ত সেবার শুণে অসুখটা আর ঝারাপের দিকে যেতে পারলে না।

পূর্ণবাবুর স্ত্রীও একুশ দিনে উঠে বসলেন। শহরে যেখানেই পাঁচটা লোক জড়ো হয়েছে, মেয়েদের তাদের আড্ডায়, কি বুড়োদের তামাকের বৈঠকে, সেবা-সজ্জের কথা ছাড়া আর কথা নেই। মেয়েরা বলে, রোগ-ব্যামো আছেই সংসারে, থাকবেই, ছেলেগুলো কিন্তু ওরই মধ্যে অনেকখানি নিশ্চিন্দ করে দিয়েছে বাপু ; যেটের কোলে বঁচে বর্তে থাক।

বুড়োরা বলে, অবশ্য যাবার সময় হয়ে এসেছে, যেতেই হবে এবার, তবু বেঘোরে মারা যেতে হবে না—কত বড় একটা ভরসা !—এইতেই পরমায়ু বেড়ে যায়।

সজ্জের সবাই কিন্তু কেমন যেন একটু হয়ে গেছে। নিশ্চয়, ভাগাভাগি করে অল্প লোকে এত মেহনত করে খানিকটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকবে। বেশ একটু মনমরা হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কেস দুটো সামলে দেবার পর, তারপর প্রশংসার কথাগুলো নুতন করে কানে আসায় আবার আশ্তে আশ্তে চাকা হয়ে উঠল। চাকা তুললে, আরও জিনিষপত্র কিনলে। বেশ শুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে এক দিন আবার স্থিতি-বাবুকোও নিয়ে এল ; তারপর এই নুতন উৎসাহের মুখে

কাজের চাপটা হঠাৎ গেল বেড়ে। একটাকে টেনে তুলছে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা, এই করে করে পাঁচ-পাঁচটা কেস দিলে সামলে। গরমের ছুটি এসে পড়ল তাই সম্ভব হ'ল, ছুটি প্রায় কেটেও গেল এইতেই।

সেজন্ত হুংখ নেই কারুর। যা কাজ হাতে নিয়েছে তাতে নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, আরাম-আমোদের দিকে নজর দিলে ত চলে না। সেজন্ত মোটেই হুংখ নেই ; তবু একটা হুংখ আছে বৈকি। সেই কপাই এক দিন স্থিতিবাবুকো বললে বলাই। তখন রমানাথের কাকার সেবা চলছে, আরও সবাই ছিল।

বলাই বললে, “গরম, ছুটিটাও এইতে কেটে গেল, তাতে হুংখ নেই কাকা, হুংখ বামসহায়বাবু মারা গেলেন, কেউ একবার ডাকলে না সেবা-সজ্জকে ! যেন সেবা-সজ্জ বলে শহরে নেই কিছু।”

“উনি হার্টফেল করে হঠাৎ মারা গেলেন কিনা।”

বলাই চুপ করে রইল। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ল, তবে সেটা যে বামসহায়বাবুর হার্টফেল করে মারা যাবার জন্তেই এমন মনে হয় না। চুপ করেই রইল—কেমন যেন একটা অভিমান লেগে রয়েছে কোথায়। যজ্ঞেশ্বর বললে, “কথাটা হচ্ছে কাকা, সারিয়ে তুলতে পারছি আমরা সে ভগবানের দয়া আর আপনাদের আশীর্বাদ ; কিন্তু শুধু সারিয়ে তোলাটাই ত সেবা নয়। যাদের ভগবান নিজের হাতেই তুলে নিলেন—গীতায় যেমন বলেছেন, তাদেরও শেষ পর্যাস্ত...”

অনিলের দৃষ্টিতে একটু প্রতিশোধেরই ভাব ছিল লেগে, বললে, “তাই আমরা ঠিক করেছি বামসহায়বাবুকোও যদি ভগবান নিজের হাতে...”

যুগোল টিপে দিতে চুপ করে গেল।

৩

রমানাথের কাকা বঁচে যাওয়ার পর আরও কেমন যেন একটা এলাকাড়ি পড়ে গেল। যশ বেড়েছে, টাকাও আপনাই এসে পড়ছে, সজ্জের উন্নতি হয়েছে আরও, তবু কেমন যেন জুঁৎ নেই।

তারপর যুগোল একদিন হস্তদস্ত হয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। উৎসাহে মুখটা রাঙা হয়ে গেছে, শবর দিলে—“হয়েছে রে ! নিবারণবাবুর মাদার ডাউন এবার—তিরিশী বছর বয়েস !...”

তাতে হয়েছে-টা কি সেটা বললে না অবশ্য, তবে সবাই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর সবাই যেন একটু লজ্জিতও হয়ে পড়ল। বলাই সামলে নেবার চেষ্টা করেই বললে, “হ্যাঁ, একে টেনে তুলতে পারি তবে আমাদের সজ্জের





“একটি একটি করে চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেলে”

কেরামতি বটে! ভগবান যেমন মুখ রেখে এসেছেন আমাদের তেমনি রেখে যাবেন কি?...আহ, বড্ড ভাল বুড়ী; দিদিমা-দিদিমা বলি ত...”

অনিল বললে, “ডাকে আমাদের তবে ত...”

যুগোল কতকটা ভয়ে কতকটা বিরক্তিতে বললে, “তারপর হয়তো ডাকার আগেই রামসহায়বাবুর মতন হাটফেল করে বসবে, করো কার সেবা করবে!”

অনিল বললে, “তখন ডাক বড়দের!”

হাটফেলও করলে ন, ডাকও পড়ল সেবা-সজ্জের। লোক আছে সেবা করবার, তবে স্থায়ীবাণুর কেস, কি ভেবে তিনি সেবা-সজ্জের ছেলেদেরও ডেকে পাঠালেন। একবার এসে পড়ার পর ওদের হাতেই সেবা-সুশ্রাব্য ব্যাপারটা আশু

আশু গিয়ে পড়ল, বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছে ত।

সেবাও কাকে বলে দেখিয়ে দিলে। এদিকে শেষের ছটো কেসে একটু যেন অবসাদ এসে গিয়েছিল আবার নূতন উৎসাহ নিয়ে লেগে পড়ল সবাই।

করে তুললে চাক্ষা। এক রকম অসাড়-অচৈতন্যই হয়ে পড়েছিল বুড়ী, দিনদশেকের মধ্যে আবার চনমনে হয়ে উঠে বসল, পথিা করলে, বললে, “কোথায় সব—যারা দেখাশুনো করছিল? ডাক সবাইদের, দেখি একবার ভাল করে। ভরসা কি ছিল যে আবার পাব দেখতে?”

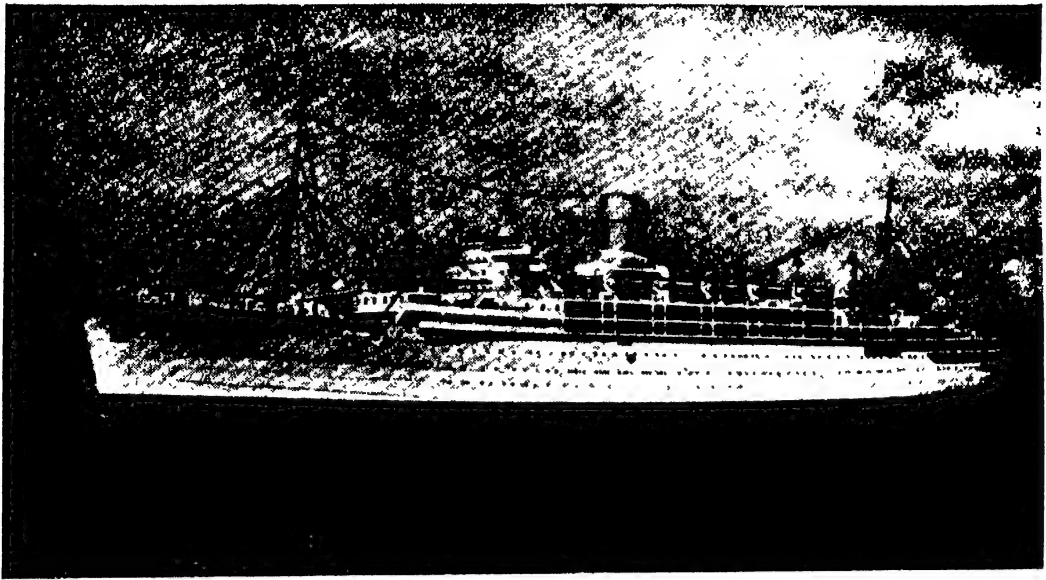
একটি একটি করে সবার চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেলে, কাঁপা-গলায় আশীর্বাদ করলে— “দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক সব, বাড়বাড়ন্ত হোক, মনস্কামনা পূর্ণ করুন ঠাকুর...”

বিড়বিড় করে আরও অনেক কথা।

আশীর্বাদ নিয়ে মনমরা হয়ে বেরিয়ে এল সবাই; ছ’এক জন ফোঁপাচ্ছে। যারা কাছে ছিল বলাবলি করলে—এরকম হয়ই কিনা—এত বুড়ী-মানুষের আশীর্বাদ। মনটা উৎলে-উৎলে উঠছে—আহা, ছেলেমানুষই ত সবাই।

বহুদিন আগেকার কথা, একেবারে ছেলেবেলার। তারপর সবার বাড়বাড়ন্তও হয়েছে, দীর্ঘজীবীও হয়েছে সবাই, তবে মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার কোথায় একটু খুঁত থেকে গিয়েছিল, সজ্বাটি আশীর্বাদ পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে যায়।





‘পি এণ্ড ও’ কোম্পানীর নবতম যাত্রী-জাহাজ ‘চুজান’ (২৪০০০ টন)

## সাগর দোলায় দোলে না এ তরী !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অকূল সমুদ্রে ভাসছি !

জাহাজের নাম ‘চুজান’। চলেছে পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে। সপ্তসাগর পাড়ি দিয়ে বোম্বাই ও কলকাতা ছুঁয়ে, পেনাং ও সিঙ্গাপুরেও নোঙর ফেলে ‘চুজান’ তার যাত্রা শেষ করবে মহাচীনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হংকং বন্দরে পৌঁছে।

আমরা ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে ভারতে ফিরছিলাম। বোম্বাইয়ে নেমে যাব। জাহাজে আমাদের মোরাদ মাত্র চৌদ্দ দিন। ‘চুজান’ ‘পি এণ্ড ও’ কোম্পানীর এক সুবৃহৎ জাহাজ। চব্বিশ হাজার টন। মাত্র ১৯৫০ সনের জুন মাসে প্রথম জলে ভেসেছে। একেবারে বকুবক নতুন। ভাড়া একটু বেশি। তবু এই জাহাজেই আসতে হ’ল। কারণ নবেম্বরের নীতে লগুন আমাদের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

জাহাজ তো নয় একটি যেন ভাসমান বিরাট রাজপ্রাসাদ ! প্রাসাদটি আটতলা। আমরা স্থান পেয়েছিলাম ‘৫’ ডেকের পাশাপাশি ছুটি ডবল বার্ক কেবিনে। সে প্রায় পাতাল বললেই হয়। এ জাহাজখানি পি এণ্ড ও কোম্পানী বিশেষভাবে তৈরি করিয়েছেন যুক্তরাজ্য থেকে কার্ভ-জট্টে যাতায়াত করবার উপযোগী করে। এর দৈর্ঘ্য ৬৭২ ফুট ; প্রস্থ ৮৫ ফুট, উচ্চতা ৭০ ফুটের বেশী হবে। কারণ এই

আটতলা জাহাজের প্রত্যেক তলাটির উচ্চতা গড়ে অন্ততঃ আট ফুট হবেই। এর মধ্যে আবার ‘১’ ডেকের উচ্চতা অত্যন্ত ডেকের চেয়ে একটু বেশী। এর ইঞ্জিনের বিক্রম

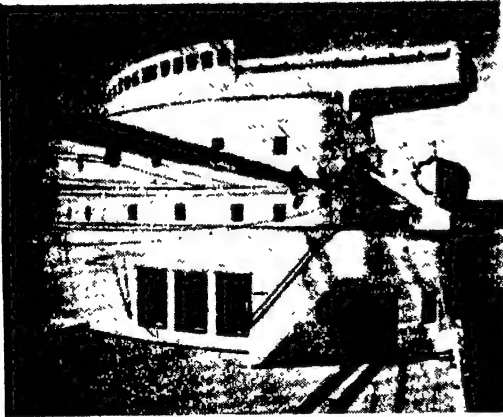


চুজানের ক্যাপ্টেন আর. ই. টি. টানকাজ্

হচ্ছে সাড়ে বিয়াল্লিশ হাজার ‘জাহাজী-অশ্বশক্তি’। বোকা গেল না বোধ হয় কিছু ! চেঁচাও করব না বুঝবার। কারণ

এই টারবাইন সংযুক্ত ডবল ইঞ্জিনের  
ব্যাপার আমরাও বুঝি নি! শক্তি-  
পূজকের জাত হলে কি হবে, শক্তির  
মঞ্চে পরিচয় আমাদের খুবই কম!  
সাধারণ জ্ঞান কতটুকুই বা!

‘চূজান’ জাহাজখানি দুটি শ্রেণীতে  
বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী বা ‘ফার্স্ট ক্লাস’  
আর যাত্রী শ্রেণী বা ‘ট্যুরিস্ট ক্লাস’।  
দুই শ্রেণী জড়িয়ে মোট এক হাজার  
ছাব্বিশ জন যাত্রী এঁরা নিতে পারেন।  
প্রথম শ্রেণীতে ৪৭৫ জন এবং ‘যাত্রী’-  
শ্রেণীতে ৫৫১ জন যেতে পারেন। বলা  
বাহুল্য, আমরা ডিলাম এই ‘ট্যুরিস্ট’  
শ্রেণীর যাত্রী। এ ছাড়া, জাহাজের  
পরিচালক ও কর্মীদের সংখ্যাও হবে  
৫৭০ জন। অর্থাৎ, এই আটতাল্পা  
জাহাজে অট্টালিকাখানির লোকসংখ্যা প্রায় ১৬০০ শত!  
পি এণ্ড ও কোম্পানীর মতে এইখানিই তাঁদের প্রায়দেশ-  
গামী জাহাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সর্বাধিক দ্রুতগামী।  
কারণ এর গতি নাকি ঘণ্টায় ২২ ‘নট’।



চূজান—উপরে ‘বীজ-ডেক’, তলায় ‘বোট-ডেক’, সামনে ‘এ’ ডেক

‘চূজান’ রূপসী তরলী। একেবারে যাকে বলে ‘কুন্ডলু-  
তুমার-ধবলা’ খেতাজিনী। তিতর-বার ধবধবে সাদা!  
হু’পাশে দুটি পাল তুলে দেবার সুদীর্ঘ মাঙ্গল আছে। যদিই  
কোনও কারণে ইঞ্জিন কখনো অচল হয়ে পড়ে, জাহাজ পাল  
তুলে দিয়ে যেতে পারবে। এ সুবিধা বিমানযাত্রীদের নেই!  
ইঞ্জিন বিগড়ে গেলেই বিমানের স্বর্গ থেকে শরীরে ভূতলে  
পতন ও অশরীরে স্বর্গযাত্রা!

ইম ও ইঞ্জিনের ধোঁয়া বেরবার জন্য একটিমাত্র মোটা



‘এ’ ডেকে প্রথম শ্রেণীর বৈঠকখানা

বৈঠক এবং জ্বলন্ত পীতাম্ব চোড়া ফানেল তাঁটা আছে।  
এই চোড়াটির মুখে দু’পাশে অর্থাৎ জাহাজের দু’ধারেই  
‘চূজান’ নামটি ‘নিয়ন লাইট’র বড় বড় হরফে লেখা আছে।  
অন্ধকার রাতে সমুদ্রবক্ষে এই আলোকোজ্জ্বল অক্ষরগুলি  
ভারি স্মরণ দেখায়।

জাহাজের প্রত্যেকটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীই প্রবীণ ও  
অভিজ্ঞ। যিনি কর্ণধার, ক্যাপ্টেন আর. ই. টি. টানব্রীজ  
ডি-এস-সি, আর. ডি. আর-এন-আর, অত্যন্ত অমায়িক  
ভদ্রলোক। একদিন তাঁর সাদর আমন্ত্রণে আমরা ‘ফার্স্ট-  
ক্লাস’ পরিদর্শনে এবং নাবিকদের নিজস্ব আস্তানায়, মায়  
পোত পরিচালকদের ঘর এবং ইঞ্জিন রুম সব কিছুই ঘুরে  
দেখে আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পূর্বেই বলেছি, জাহাজ-  
খানি দুটি অংশে বিভক্ত। মাঝামাঝি ভাগ করে অর্ধেকটা  
‘ফার্স্ট ক্লাস’ করা হয়েছে এবং বাকি অর্ধেকটা ‘ট্যুরিস্ট ক্লাস’!

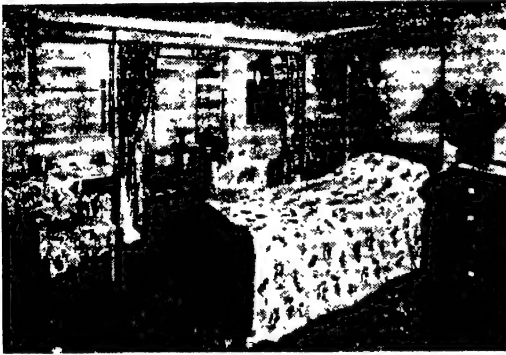
ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা প্রায় সবাই ধনকুবের।  
এঁদের মধ্যে কালোবাজারী বণিক সম্প্রদায় এবং তাঁদের  
প্রতিনিধিরাও কেউ কেউ আছেন। কোম্পানীর ধরচায়  
যাত্রী আপিসের বড়সাহেব, বড় ডাক্তার, ডিপ্লোম্যাটিক  
সার্ভিসের লোক, কোম্পানীর উঁচু অফিসার এঁরাও আছেন।  
আমাদের হু’জন পরিচিত বাঙালী বন্ধুও ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী  
হয়ে আসছিলেন, ডাক্তার সাহিড়ী এবং ত্রীলোকেন গুপ্ত  
মহাশয়। এঁরা বড়বাবুদের ঘরোয়ানা হলেও অধিকাংশ  
সময় আমাদের পাড়ায় এসে কাটিয়ে যেতেন। ফার্স্ট ক্লাসে  
আরও অনেক সৌভাগ্যবান বাঙালী যাত্রী ছিলেন, কিন্তু  
তাঁরা ট্যুরিস্ট ক্লাসে আসা আদৌ পছন্দ করতেন না।

‘ট্যুরিস্ট ক্লাসে’ যত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত ভক্তলোকের সমাবেশ। একই জাহাজকে দুই ভাগে ভাগ করার ফলে দুই সরিকদের জ্ঞাত জাহাজের দু’দিকেই সবকিছু ব্যবস্থা ডবল করে করতে হয়েছে। ‘ট্যুরিস্ট’ ক্লাসের যাত্রীদের ফার্স্ট ক্লাসের দিকে যাওয়া নিষেধ! ঠিক যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘মালান-সরকার’ শাসনের পাড়ায় কালাদের থাকতে দিচ্ছেন না আর কি! তেমনি, ট্যুরিস্ট ক্লাসের যাত্রীদের এঁরা ফার্স্ট-ক্লাসের দিকে বেড়াতে যেতে মানা করে একখানি বিজ্ঞপ্তি-বোর্ড সীমান্ত পথে বুলিয়ে রেখেছেন! কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা ইচ্ছা করলে যখন খুশী ট্যুরিস্ট ক্লাসে পদাধীন করতে পারেন। আমরা এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু যখন শোনা গেল সমুদ্রবক্ষে জাহাজের ক্যাপ্টেনই এই

নিতে পারে এমন ১৪ খানি বোট, ৩৫ জন যাত্রী নিতে পারে এমন ২ খানি বোট, দু’খানি ৭০ জনকে নেবার মত মোটর-বোট এবং দু’খানি ২৮ জনকে নেবার মত ভেলার বন্দোবস্ত



চূড়ানের পানীর মিন: আর. জি. নিউবারি



‘বি’ ডেকে—‘কোবিন-ডি-লুঙ্গ’ (নিজস্ব বারান্দা সংলগ্ন)

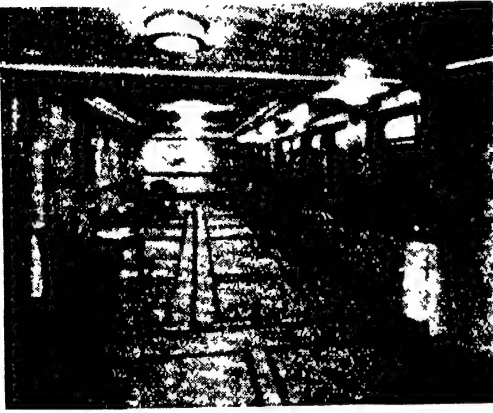
পোত সাম্রাজ্যটির একচ্ছত্র অধীশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছাই এখানে আইন, আর তিনি ইচ্ছা করলে জাহাজের নিয়মভঙ্গকারী বিদ্রোহী যাত্রীদের সত্যাগ্রহ বন্ধ করবার জ্ঞাত তাঁদের পঁজা-কোলা করে তুলে ধরে সাগর-সলিলে নিক্ষেপ করতে পারেন, তখন আমাদের উৎসাহ একেবারে হিম হয়ে গেল! তবে, ই্যা, আমাদের সাহসনা ছিল এই যে, ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া দিলে কালা ও বাদামী আদমিরিও সাদা মান্নবস্ত্রলোর গা-ঘেঁষে ফার্স্ট ক্লাসে যেতে পারবে। জাহাজের খোল এখনও সম্পূর্ণ মালানের দক্ষিণ-আফ্রিকা হয়ে উঠে নি। চাঁদীর জুতো মেরে বাদীও বেগম হতে পারে এখানে।

এই আটতলা জাহাজে আটটি টানা ডেক আছে। তার মধ্যে সাতটি হ’ল যাত্রী ও খালাসীদের জ্ঞাত। আর একটি ক্যাপ্টেন ও তাঁর সহকর্মীদের। এই মহলটি জাহাজের সর্বোচ্চ স্তরে। এটিকে যদি এই ভাসমান অট্টালিকার ছত্র-মঞ্জিল বলে ধরা যায় তবে উপর থেকে নিচের দিকে নামতে দ্বিতীয় তলাটা হয় ‘বোট-ডেক’। এখানে বুলছে সারি সারি সব ‘লাইফবোট’। ৯৯ জন যাত্রী

আছে! অর্থাৎ, জাহাজের প্রায় সব যাত্রীকেই আপন কালে রক্ষা করবার আয়োজন পূরোপুরিই করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্রত্যেক যাত্রীর ঘরে তার মাথার শিয়রেই সর্বক্ষণ রাখা হয়েছে এক-একটি ‘লাইফ-বেন্ট’। মাঝে মাঝে যাত্রীদের ‘বোট ডেকে’ জুড় করে এই ‘লাইফ-বেন্ট’ ব্যবহার করার কৌশল শেখান হয়। এই ‘বোট-ডেকে’ই ভটি কোর্ট করা আছে ‘ডেকটেনিস’ খেলবার। এ ছাড়া বারোটি ‘কোয়েট’ খেলবার ছক কাটা দাগ আছে। এ খেলাটি আর কিছুই নয়, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে দাঁড়িয়ে অদূরস্থ একটি নির্দিষ্ট দাগকাটা গম্বীর মধ্যে একটি চামড়ার বিঁড়ের মত চাকা ছুঁড়ে ফেলা। সেই গম্বীর মধ্য বিন্দুতে বা তার খুব কাছে যার চাকা গিয়ে পড়ে বেশি বার সেই হয় এই খেলায় জয়ী।

তার পরেই জাহাজের ‘A’ ডেক। এর চার পাশে খানিক চাল ঢাকা, আর খানিক খোলা-ফাঁকা। এখানে সারি সারি অসংখ্য ডেকচেয়ার পাতা রয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় জাহাজের মাত্র ছটি পাশ আছে। কিন্তু জাহাজের ভিতরে গিয়ে উঠলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক জাহাজেই চারটি পাশ আছে এবং প্রত্যেক পাশটিই বেশ প্রশস্ত। জাহাজ যে মুখে চলে সেই মুখের দিকটা হ’ল

জাহাজের সমুদ্র ভাগ। এই সামনের দিকের চওড়া ডেকটিকে বলে 'Promenade Deck'। এর মাথা খোলা, কোনও চাল নেই। এই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রত্যেক যাত্রীরই ঠাই হতে পারে। জাহাজের পেছন দিকটিকে বলে জাহাজের পুচ্ছ দেশ! এও বেশ প্রশস্ত। মাথা খোলা, ছাদ নেই। এটিকে বলে 'Rear Deck'। 'প্রমিনেড ডেক' পড়েছে ফাষ্ট ক্লাসের ভাগ্যবান যাত্রীদের ভাগে, কারণ তারা বেশী টাকা দিয়ে মুখপাতে গিয়ে বসেছেন। আমরা টুরিষ্টের দল পেয়েছি পুচ্ছদেশের এই 'রীয়ার ডেক'। আমাদের লেজে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে আর কি!



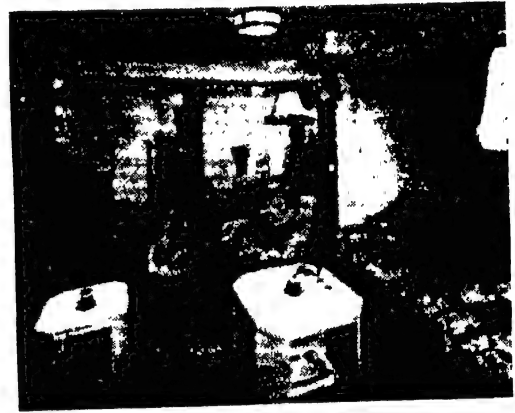
চুজানের "প্যুরো" বা দপ্তরখানা

তারপর হ'ল জাহাজের দুটি পাশ, যাকে বলে Broad side! এই 'ব্রড সাইড' দুটির আবার পৃথক নাম। একটি দিককে বলে Port side বা বন্দরের দিক, অপর দিককে বলে star Board অর্থাৎ, পোতাগ্রভাগের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে যেদিক ডাইনে পড়ে। যখন যে মুখো জাহাজ চলে তখন সেই মুখের বন্দরের দিকটাকেই বলে 'পোর্ট সাইড' বা 'বন্দরবাছ' আর বিপরীত দিকটাকে বলে 'স্টার বোর্ড' বা দক্ষিণ মঞ্চ। কাজেই জাহাজের এ দুটো দিক পর্যায়ক্রমে কখনও পড়ে ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। হৃদিকেই এ চালচল। বারান্দা বা রেলিং-ধেরা আছে জাহাজের চারদিক।

'প্রমিনেড ডেক' প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পদম্পরের সঙ্গে মেলামেশা করবার নানা ব্যবস্থা আছে। এখানে সর্কাগ্রে চোখে পড়বে ধনী যাত্রীদের শিশুগণের জন্ম 'খেলা-ঘর' বা Nursery! এখানে হরেক রকম শিশুতোষ খেলনা ও বাল-মনোবিক্ষীণী বিবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। ছোটোছোটো করে খেলবার একটু খোলা মাঠও আছে এবং জলে নেমে হাত পা ছুঁড়ে খেলার উপযোগী ছোট জলাশয়ও আছে। জাহাজ-কর্তৃপক্ষ শিশুদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান

করবার জন্ত একজন মাসীমা (Hostess) বেছেছেন। মায়েরা তাঁর কাছে নিজেদের ছেলেমেয়ে জিন্মা দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে জাহাজের জীড়া-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন।

প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী ও লিপি-ধরখানি ভারি চমৎকার! এখানে এসে বই পড়, চিঠি লেখ, ভ্রমণ-কাহিনী রচনা কর বা সমুদ্রের তরঙ্গে ডুলে উঠা মন নিয়ে কবিতা লিখতে বস, কেউ বিরক্ত করবে না। এই সুসজ্জিত ও সুচিহ্নিত হলগুলি বেশ প্রকাণ্ড এবং প্রচুর আলো-হাওয়া আছে। বিশেষ করে ভাল লাগে এর সুন্দর গড়নের জন্ত। জাহাজের



পাসার্জের ঘর

চওড়া টানা 'ব্রিজ' অর্থাৎ পোতাগ্রভাগের পোতপরিচালনা-মঞ্চটি (Bridge) এর এক পাশ দিয়ে সুসজ্জিত বঙ্কিম ভঙ্গীতে ঘুরে যাওয়ায় এর আকারে একটা সুখমা কুটে উঠেছে!

এ ঘরের মধ্যে সবচেয়ে যঃ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে এর প্রাচীর চিত্রের অপূর্বসম্পদ! কিছুই না, মাত্র গুটি কয়েক শস্ত্রশ্রেণীর উপর সুদৃশ্য তোরণাকৃতি একটি আচ্ছাদন আঁকা! কলা-শিল্প শিল্পীর তুলির আঁচড়ে এই সামান্য ছবিটুকুই অসামান্য হয়ে উঠেছে। রাত্রে বিজলী আলোকে এ ছবি বেশ একটা দৃষ্টিবিন্দু উৎপাদন করে। মনে হয় এ ধরখানি যেন আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত! এই চিত্রের বর্ণবিত্তাস অতি প্রশান্ত ও পেলব। আশমানী নীলিমাই এর প্রধান রং। এ ঘরের পর্দাগুলি সোনালী ও হরিণ শিশুর মেছর বর্ণে রঞ্জিত হওয়ায় বড় সুন্দর মানিয়েছিল।

রঙের রঙীন মোহ থেকে বেরিয়ে একটু বাস্তবে আসা যাক। 'বন্দর বাছ' থেকে 'দক্ষিণ মঞ্চে' যাতায়াত করবার জন্ত মাঝে মাঝে গলিপথ আছে। এগুলো এ পাশ থেকে ওপাশে যাবার 'শর্টকাট'। সারা জাহাজ প্রদক্ষিণ করতে

হবে না। লাইব্রেরী ও লেখাপড়ার ঘরের পরই এমনিতর একটি গলি আছে, তার পরই প্রথম শ্রেণীর 'লাউঞ্জ' বা বৈঠকখানা। এখানে নরম পুরু গদিওয়ালা আরাম আসনে হেলান দিয়ে বসে অলস বিলাসে খোশগল্প করে সময় কাটান যায়। বল! বাছল্য, এ ঘরের সুপরিচ্ছন্ন প্রত্যেকটি আসবাবপত্র লক্ষপতিদেওই ব্যবহাৰযোগ্য। এখানেও প্রাচীর-গাত্রে বর্ণবিভা ও প্রাচীরচিত্র আমার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। প্রাচীরগাত্রে যে রঙ ছিল তা অনেকটা গোলাপীবেঁধা হওয়ায় দৃষ্টি স্নিগ্ধকর।

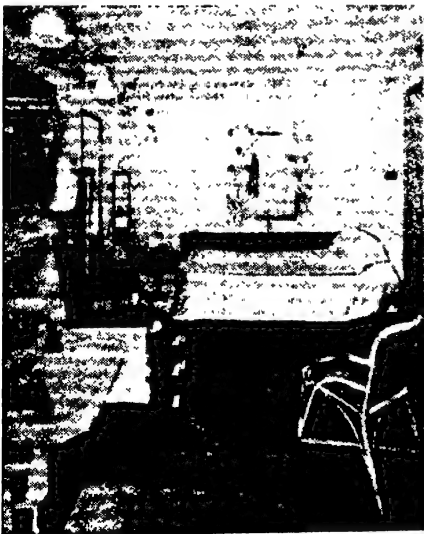
বাতায়নের পর্দাগুলিও গোলাপী রঙের ভেলভেটে তৈরি। এই মঞ্চমলের ঝলমলে চিকণ লেস আর পর্দা-বোলানো রঙীন ধরে বসে উৎকৃষ্ট সুরা ও সবশ সিগারের গুণে যাত্রীদের মন কোন্ বাদশাহী সুখ-স্বপ্নের প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। অবশ্য এ ধরে বসে কোনও যাত্রীর সুরা ও ধূমপানের অধিকার নেই। সুরাপানের জন্য পৃথক 'পানশালা' এবং ধূমপানের জন্য পৃথক "Smoking chamber" আছে। হুতরাং ও পথের যাত্রা পথিক নন তাঁরা এ বৈঠকখানায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। সবচেয়ে ভরসার কথা যে, এখানে কেউ মাতলামি করেন না।



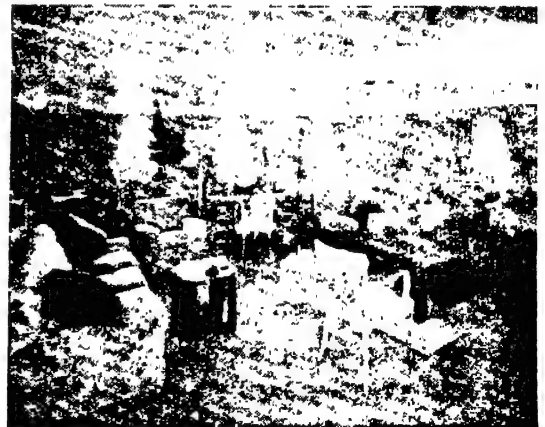
ছকানে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের খানা-ঘর

বেশ উজ্জ্বল অথচ ত্রীতিকর লাগছিল চোখে। ছবি ছুখানির বিষয়বস্তু কিন্তু সেই মার্কোপোলোর ভ্রমণ-কাহিনী থেকে নেওয়া কুবলয় খাঁর জীবনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

লাউঞ্জের পিছনেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট নৃত্যাদান। এখানে নৈশভোজের পর রাজি বারটা পর্যন্ত নৃত্যগীত চলে। এখানেই প্রতি সপ্তাহে চলচ্চিত্রও দেখানো হয়। তখন চারিপাশ পর্দা দিয়ে ঘিরে একে একেবারে সিনেমা-হলে রূপান্তরিত করা হয়। এখান থেকে 'পানশালা'



প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর একলা থাকার কেবিন 'লাউঞ্জের' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্পদ হ'ল ঘরের ভিতরে শোভাবর্ধক বড় বড় ছুখানি দীর্ঘাকৃতি সুরঙীন প্রাচীর-চিত্র। ছবি ছুখানি গাঢ় সবুজ রঙের লাক্স পালিশের গুণে



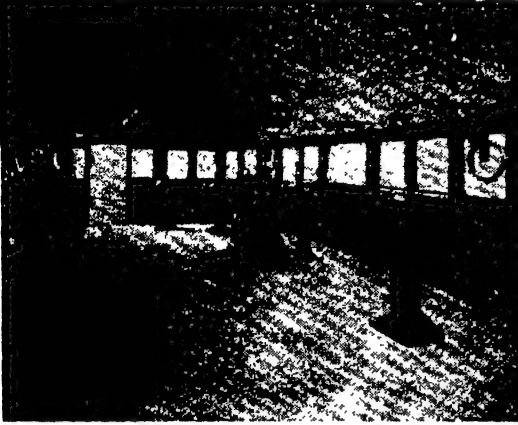
কাপ্তানের ঘর

কাছেই। এটির নাম দিয়েছেন এঁরা "Verandah Cafe" অর্থাৎ 'অলিঙ্গ পানছত্র'। এখানকার প্রাচীর-গাত্রে রঙটিও বেশ; গজদস্তুর মত স্তব্ধ ও ধূসর পলিতের সংমিশ্রণ। প্রশস্ত স্থান এটি। অনেক লোকের এখানে একত্রে বসে বিবিধ পানীয় সেবনের ব্যবস্থা আছে। এর পরেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের স্নান ও সস্তরনের জন্য নাতিবহুৎ জলাশয়।

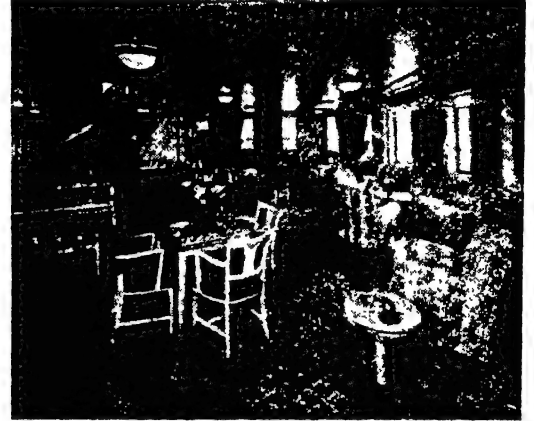


পূর্বোক্ত ‘অলিম্প-পানছত্র’ থেকেই সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে ‘A’ ডেকের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলিতে যাওয়া যায়। ফাষ্ট ক্লাসের যাত্রীদের কাছে জাহাজে ভ্রমণ যেন মনে হয় অর্পব-স্বর্গে জলধি-বিলাস। জাহাজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষরাই যাত্রীদের আনন্দ-বর্দ্ধনের একাধিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যেমন বিবিধ indoor এবং out-door খেলা, সিনেমা, রেডিও, Dog-Race, Howsie প্রভৃতি জুয়াখেলা। এই

বন্দরে গিয়ে লাগবার পূর্বরাত্রি! সেটি যাত্রীদের বিদায়-ভোজ! এ ছাড়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, ক্যান্সী ড্রেস বা সৌখীন সাজের প্রতিযোগিতা, নৃত্যগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, যন্ত্র-সঙ্গীত, হাঙ্গ-কৌতুক, বাহুবিদ্যা, জিমজাজিক, এসব যাত্রীরা নিজেরাই আয়োজন করেন নিজেদের মধ্যে একটি কমিটি করে। এঁরা যাত্রীদের মধ্যে কার কি গুণ আছে সেটা অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেন এবং তার ভিত্তি বিশেষ



পোতা-পরিচালন কক্ষ



“এ” ডেকে টারিষ্টদের বৈঠকখানার একাংশ

জুয়ার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ সব দেশের যাত্রীদের মধ্যেই দেখা যায়। চূড়ানের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজ, আইরিশম্যান, স্কট, ইহুদী, পর্তুগীজ, আমেরিকান, ইরাণী, মিশরী, আরব, পাশী, মাদোয়াবী, আসামী, ভাটিয়া, মরাঠী, বাঙালী, সিংহলী, বর্মী, চীনে, ট্যাশ-ফিরিজী, সিন্ধী, পঞ্জাবী, আর্মেনিয়ান, ইটালিয়ান, তুর্কী ও ভারতীয় মুসলমান, ওড়িয়া, গুজরাটি প্রভৃতি হরেকরকম জাতি ধর্মের নর-নারী। জুয়ার আজডায় এদের বাকী জেতার উৎসাহ কান্নার চেয়ে কম বলে মনে হ’ল না। জাহাজ যেন মনে হয় একটি মহাদেশ বা ছোট্ট পৃথিবী যেখানে সকল বর্ণের, সকল ধর্মের, সকল জাতের ও সকল ভাষার মানুষেরা কিছু দিনের জন্য নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে গিয়েছে! জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়বার পর নতুন যাত্রীদের সংবর্দ্ধনার জন্য ক্যাপ্টেন একদিন রাত্রে সকলকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করেন। সে রাত্রে নৈশভোজের তালিকা একখানি সচিত্র কার্ডে ছাপা হয়। সেদিন বিনামূল্যে যাত্রীদের রকমারি উৎকৃষ্ট সুরা পরিবেশন করা হয়। হরেকরকম বস্ত্রীয় কাগজের চুপী ও রবারের বেগুন বিলি করা হয় প্রত্যেককে। সে রাত্রে তবীবন্ধে যাত্রীদের নৃত্যগীত চলে রজনীর তৃতীয় ঘাম পর্যন্ত। ঠিক এরই পুনরভিনয় হয় জাহাজ বড় বড়

আসরের ব্যবস্থা করেন। আগেই বলেছি, জাহাজে যা-কিছু হবে তা ফাষ্ট-ক্লাস ও ট্যুরিষ্ট-ক্লাস উভয় পাড়াতেই হবে, এবং এ নিয়ে প্রতিযোগিতা ও উত্তেজনার অন্ত থাকে না। কাজেই জাহাজের দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যায় বোঝা যায় না।

‘A’ ডেকে একলা থাকার সুসজ্জিত ঘর আছে ৪২ খানি। যুগলে থাকার ঘর আছে ৩৯ খানি, এর মধ্যে আবার ১৪ খানি ঘরের গৃহ-সংলগ্ন নিজস্ব স্নানাগার আছে। পোতাভাগেই জাহাজের উপর-নীচের উঠা-নামার প্রশস্ত স্কালার সিঁড়ি এবং দুটি বৈদ্যুতিক লিফট আছে। পিছনেও টারিষ্টদের জন্য বৈদ্যুতিক লিফট ও সাধারণ সিঁড়ি আছে। ‘A’ ডেকের ঠিক প্রধান প্রবেশ-দ্বারের কাছেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ‘কোঠাঘর’ এবং ‘সব পেয়েছির দেশ’র মত একখানি দোকান ঘর। জাহাজের এই দোকানে সংসারী মানুষের প্রয়োজনীয় হেন জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না। দামও খুব সস্তা, কারণ জাহাজে কেনা-বেচার ওপর কোনও শুল্ক বা ট্যাক্স দিতে হয় না! এখানে সমস্ত জিনিসই ‘Duty-free’! আশী টাকার ফাউন্টেন পেন এখানে পঞ্চাশ টাকায় কেনা যায়। আড়াইশো টাকার বড়ি



পাওয়া যায় দেড়শো টাকায়। ওশেনিয়া ট্রেডিং কোম্পানীর একচেটে কারবার জাহাজে।

এই ‘A’ ডেকেই অপর প্রান্তে ট্যারিষ্টদের জন্তও ‘কোরবর’ আর তাঁদেরও মনিহারী বিপণি আছে। ট্যারিষ্টদের ‘A’ ডেকেও জাহাজের ডাইনে-ব্যায়ে গালাদী। ইচ্ছামত পদ্ম খিরে ঢাকাবর করে নিয়ে তার মধ্যে নৃত্যগীত ও ‘সিনেমা শো’ চলে। দিনের বেলা ডেক-চেয়ার পেতে জাহাজী আড্ডা, বই-পড়া, সমুদ্র দর্শন বা ঘুম যা খুন্দী কর। আমাদের বেশ একটি উচ্চাঙ্গের আড্ডা জমেছিল। ‘প্রাইস ওয়াটার হাউস, পীট এণ্ড কোম্পানী’র ভারতীয় অংশীদার সদাহাস্ত মুখ, অদম্য উৎসাহী ত্রিযুক্ত রবি সেন এবং তাঁর শাস্ত

নয় সরলস্বভাবা পত্নী শ্রীমতী বুলু সেন, দ্বয়ং আদিবাসনিক হস্তশিল্পিক এবং চটকদার গাল-গল্পবাত্ত পুলিশ কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ত্রিযুক্ত অবনী দত্ত, ইনি শিকার-প্রিয়, কুকুর-প্রিয়, ক্যামেরা-প্রিয় এবং কামিনী-প্রিয়। অবশ্য পর-কামিনী নয়। স্বীর গল্প তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। পত্নীর জন্ত সুবর্ণ বলয়যুক্ত একটি ‘কামিনী-বাড়ি’ কিনেছিলেন—সকলকেই দেখাতেন। বোঝা যেত তিনি বেশ একটু বিবাহ কাতর হয়ে পড়েছেন। জাহাজের উপর আমাদের সকলের চৌচির তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু সে চৌচিরে সচল হয়েছে কিনা খবর পাই নি।

ক্রমশঃ

## বিরাহিণী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

দ্বাদশীর চান্দ-ওঠা আকাশে

একখানি সাদা মেঘ ভাসে কি ?

কোথা থেকে বাঁশী-কাঁপা বাতাসে

ঘুমহারা ভূঁইচাপা ভাসে কি ?

এলোমেলো ঝড় বৃষ্টি এলো যে

ঝড় বন এ কি ভাষা পেলো যে ?

মাঝ রাত্রে চোখে ঘুম আসে কি ?

কুমি আজ এসে মোর কুটীরে

সারা রাত বসে’ বসে পাশে কি ?

রজনীর কালো চুলে বোঁটা

কে বাঁধিল সন্তানার কুঁড়িতে ?

তটিনীর ঢেউ-ভাঙ্গা ধ্বনিটি

কে বাজালো বেণোরারি চুড়িতে ?

জল জলে লাল তা’রা টিপ কি ?

আখণ্ডানি চান্দ হাতে দীপ কি ?

আজিনার এসে ফুল পাড়িতে ?

জোনাকীরা চাকে মুখ ঘোমটার

ঝিকিঝিকি চুমকির সাড়িতে ?

আসে ঝড় ঝঞ্ঝমে গ্রহরে,

রাত বেন চার না’ক কাটিতে !

ক্রবতারা কাঁপে বন-শিররে,

আকাশ কি চলে পড়ে মাটিতে ?

সাত ভাই চম্পা কি নামিল,

পাকলেও কাছে রথ ধামিল,

গুজতারা এল পথে হুটিতে ?

ফালি চান্দ নামে জলে নদীটির,

চেউয়ে চেউয়ে কথা কর হুটিতে ।

উমালোকে সব তারা চলে যায়

নিশাশেষে কেন তুষা বাড়ালে ?

প্রদীপের শেষ লিপি বলে’ যায়—

একটি মধুর নিশা ভাবালে !

শিশিরের আঁখিজলে ভিজানো

ধরার মনের কথা কি জানো ?

—মিছে কেন মনে রঙ ধরালে ?

নিমেষহাবানো চোখে জাগিয়া

ভুল করে’ কারে মালা পরালে ?

যে গান কখনো আমি গাহিনি

সে গান এসেছে ভেসে আকাশে,

এ জীবনে যারে আমি গাহিনি

সে যে এল দক্ষিণা বাতাসে !

যে ফুল গাধিনি আমি মালাতে

সেও এল মিছে মন ভুলাতে,

ভীকু বানী বেণে গেল হবাসে !

যায় লাগি’ পোহায়েছি বামিনী

এল না সে শুধু আজ উবাতে ।

# বেঙ্কামের হিতবাদ দর্শন

রেজাউল করীম

১

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনে নৈতিক আদর্শের প্রকৃত মানদণ্ড কি, এট লাইয়! পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। Ethical Standard ও Nature of Moral Faculty অর্থাৎ নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড এবং নৈতিক মনোবৃত্তির প্রকৃতি কি হইতে পারে, ইত্যাহ ছিল বিবেচ্য বিষয়। শেখ্‌সবেরী প্রমুখ দার্শনিকগণ নৈতিক চেতনার উপর জোর দিয়াছিলেন। তাঁহারা মানুষের বিবেককে অমুভূতির সহিত একীভূত করিয়া দেখিতে চাছিলেন এবং এই কথাই বিশ্বাস করিতেন যে, পরোপকারই হইতেছে মানুষের চরম নৈতিক আদর্শ। আর এক দল দার্শনিক ছিলেন, তাঁহাদিগকে 'Intuitive Moral Philosopher' বলা হয়। বিশপ বাটলার এই মতবাদের পরিপোষক। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষের বিবেক একটি স্বাধীন মনোবৃত্তির অঙ্গীভূত। এই মনোবৃত্তি মূলতঃ বুদ্ধিজাত। কিন্তু এই মনোবৃত্তি বুদ্ধিজাত হইলেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ও অসুত শক্তি-প্রভাবে মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে। অপর এক দল দার্শনিক উপরোক্ত কোন মতই গ্রহণ করেন নাই। স্কটল্যান্ডের দার্শনিক রীড এই মতের প্রচারক। তিনি বলেন যে, সাধারণ জ্ঞানই (common sense) নৈতিক আদর্শের ভিত্তি। এই সাধারণ জ্ঞান—অভ্যাস্ত অভ্যাস্তবীণ আবেদন। মানুষের প্রতিটি কার্যে এই সাধারণ জ্ঞানের সিদ্ধান্তই চরম। কারণ ইহাতে আছে সার্বজনীন সত্য। অর্থাৎ, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই এই সাধারণ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ ভাবে সমগ্র মানব-সমাজ ইহার আবেদন গ্রহণ করে। ইহা বাতীত আর এক দল দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা নীতিবোধকে নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড বলিতেন। রিচার্ড প্রাইস এই মতবাদের অঙ্গতম পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা বলেন যে, এই নৈতিক অববোধ বা জ্ঞান হইতেছে যুক্তি অথবা বোধশক্তির সংসারাতীত উপলব্ধি। 'অল্প এক দল দার্শনিক বলিতেন যে, সত্য অথবা সাক্ষাৎ সত্যের মানসিক অমুভূতি হইতেছে নৈতিক আদর্শের প্রধান মানদণ্ড। তাঁহাদের মতে সত্যানিষ্ঠা বা ধর্মনিষ্ঠা (virtue) একমাত্র উদ্দেশ্য—স্বার্থপরতা। স্বার্থের জন্যই সত্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বিখ্যাত 'অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ "সভামুভূতি"র উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার নীতি-দর্শন প্রচার করেন। নীতির দিক দিয়া তাহাই সমর্থনীয় বাহার ভিত্তি সভামুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নতুবা কোন কার্যই সমর্থনীয় নহে। হিউম প্রমুখ দার্শনিকগণ হিতবাদ (utility) আদর্শের সমর্থক। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণসাধনই তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড। দার্শনিক বেঙ্কাম এই সব পরস্পরবিরোধী মতবাদগুলি পণ্ডিত মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেন। তিনি কতকগুলি

গ্রহণ করিলেন, আর কতকগুলি বিরুদ্ধে লেগনী ধারণ করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। এই প্রবন্ধে বেঙ্কামের মতবাদ লাইয়া আলোচনা করিব। বেঙ্কাম তাঁহার "ইণ্টেলেকশন টু মর্যালস এণ্ড লেজিসলেশন" গ্রন্থের মূগবন্ধে বলিয়াছেন :

"প্রকৃতি মানুষকে দুইটি সার্বভৌম প্রভুর অধীনে রাখিয়াছে, একটি বাধা ও অপরিচি স্তম্ভ বা আনন্দ (pain and pleasure)। এই দুইটি প্রভুই দেগাইয়া দিতে পারে আমাদের কি করা উচিত, আর কি করা অসুচিত। ইত্যাহাই ঠিক করিয়া দিতে পারে, আমরা কি করিব। এক দিকে আছে ক্লার ও অজ্ঞার মানদণ্ড, আর অপর দিকে আছে কার্য-কারণের পারস্পর্য। এট দুটোই সার্বভৌম প্রভুর সিংহাসনের সহিত বাধা আছে। আমরা বাধা বলি, বা বাধা চিন্তা করি ঐ প্রভু সে সবলই শাসন করে। উভার অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবার ভঙ্গ বন্ধ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ইত্যাহই প্রমাণ করে যে, সেই প্রভু পরম শক্তিশালী। হিতবাদ-নীতি উক্ত প্রভুর এই অধীনতা স্বীকার করে। এই হিতবাদ-নীতিই আমার গ্রন্থের ভিত্তি।"

হিতবাদ-নীতি বলিতে বেঙ্কাম সেই নীতির কথাই বলেন, যাহা মানুষের স্তম্ভ ও দুঃগকেই ক্লার-নীতির আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে। যাহা আনন্দ বা স্তম্ভ প্রদান করে, তাহাই ক্লার ও ধর্ম। আর যাহা স্তম্ভসঞ্চিত বাধা দেয় অথবা বেদনা সৃষ্টি করে তাহাই অজ্ঞার ও অধর্ম। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারেই যে এ নীতি প্রযোজ্য তাহা নহে। গবর্ণমেন্টের প্রত্যেক আইন এবং কর্মস্বার্থের ও এই নীতিই নিয়ামক ও পরিচালক। যাহা পরোপকার, স্তম্ভ-সুবিধা, আনন্দ ও প্রীতি বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে, তাহাকেই বেঙ্কাম বলিয়াছেন, "ইউটিলিটি" বা হিতবাদ। এই সংজ্ঞাকে বিপরীত ভাবেও বলা যাউতে পারে—যাহা অনিষ্ট, ক্ষতি, বাধা, অসংকার্য, দুঃখ ও অভাব ঘটাইতে বাধা সৃষ্টি করে তাহাকেও তিনি "ইউটিলিটি" বলিয়াছেন। একজনকে ত বটেই, এমনকি সর্বসাধারণের স্তম্ভ বৃদ্ধি করা এবং দুঃখ লাঘব করাই হইল বেঙ্কামের নীতির প্রাণধর্ম। বেঙ্কাম এই আদর্শকে মাত্র নৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নাই, জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি এই নীতির ক্রিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি, সরকারের আইনকেও তিনি এই হিতবাদ-নীতির মানদণ্ডে ব্যাপ্য করিয়াছেন এবং উভার উচিত্য ও অনৌচিত্যকেও এই নীতির দ্বারা পরীক্ষা করিবার পক্ষপাতী। সেই আইন অজ্ঞার বাহা হিতবাদ-নীতির আদর্শ দ্বারা অমুপ্রাণিত নহে। আর তাহাই ক্লার বাহা হিতবাদ-নীতির আদর্শসম্মত। দেশের সমস্ত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, বিধিব্যবস্থার সংস্কার, রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণ—এই সমস্ত ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের ভালমন্দ বিচার

করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কেবল আদর্শবাদীর মত কঠকগুলি উচ্চ ধরণের চিন্তাধারা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। বাহ্যতে তাঁহার নীতি বাস্তবে পরিণত হয়, সে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। গুটিকয়েক ব্যক্তির হিতসাধন তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল না। তিনি সমগ্র মানব-সমাজের কথাই ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি লইয়াই সমাজ, সেইজন্য ব্যক্তির সুখের ভিত্তিতে তিনি সামগ্রিক ভাবে সমাজের কল্যাণ কামনা করিতেন।

সুখ ও দুঃখই যদি সকল নীতির মূল হয়, সকল ধর্মের সার হয়, তবে এ দুটির উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করা দরকার—তত্ত্বের দিক দিয়া বটে, আদর্শের দিক দিয়াও বটে। মানুষের সুখ কি কি বিষয় লইয়া হইতে পারে—এ সম্বন্ধে বেঙ্গাম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুখ—আনন্দ ও বাধা-বেদনার অভাব অথবা বাধা-বেদনার উপর বাড়তি আনন্দ। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহার উৎপত্তির মূল হইতেছে চারিটি বস্তু—দৈহিক, রাজ-নৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয়। বর্ধন প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সুখ বা দুঃখ আমাদের নিকট আসে তখন তাহার নাম “physical sanction”—দৈহিক আবেদন। মিতাচার স্বাস্থ্য রক্ষা করে; সুতরাং সুখ দেয়। আর অসুখ স্বভাবতঃ মিতাচার হইতে উৎপন্ন, সুতরাং দুঃখ তাহার পরিণতি। বর্ধন সুগঠিত রাষ্ট্র হইতে অথবা রাষ্ট্রকর্তৃক বিশেষ ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিসমূহ হইতে (যেমন, বিচারকগোষ্ঠী) সুখ অথবা দুঃখ আসে, তখন তাহাকে বলা বাইতে পারে রাজনৈতিক অনুমোদন (political sanction)। ইহারই অপর নাম দেশের আইন। জনমত বর্ধন কোন কাজের ক্ষমতা চাপ দেয়, তখন তাহাকে বলা যায় নৈতিক আবেদন (moral sanction)। ইহার বথার্থ নাম গণ-আবেদন (popular sanction)। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং বর্তমান জীবনের সহিত পরলোকের যে সম্পর্ক আর বাহ্যিক জন্ত আমরা বিশেষ ধরণের কঠকগুলি ক্রিয়াকলাপ করি, তাহাকে বলা হইয়াছে ধর্মের আবেদন (religious sanction)। বেঙ্গামের মতে নীতিবিদ ও আইন-প্রণেতাদের প্রধান সমস্যা হইতেছে কি ভাবে এই চতুর্লিখ sanction বা আবেদন মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাধ-সুবিধা বিধান করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা। নীতিবিদ ও আইন-প্রণেতাদের পক্ষা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য যে একই তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখ দুঃখের উৎপত্তিস্থলই যে বিভিন্ন তাহা নহে, তাহাদের মূল্যও বিভিন্ন। তাই বেঙ্গাম দেখাইতে চাহিয়াছেন—অনেকগুলি সুখ-দুঃখের মধ্যে কাহার মূল্য বা যোগ্যতা কতটুকু। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রের আইন-প্রণেতাকেও এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকগুলি স্বাধ-সুবিধাকে এমন ভাবে বর্ধন করিয়া দিতে হইবে যেন সমাজের সকল শ্রেণীর লোক তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। রাষ্ট্রকে

এই নীতি সর্বদাই মানিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটা সত্তা এবং কেহই যেন অপর অপেক্ষা অধিক-তর সুবিধা না পায়, এবং কাহাকেও যেন অপর হইতে অধিকতর অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়। নীতিবিদগণের ক্ষমতা এই আদর্শ অপরিহার্য। সুতরাং প্রশ্ন এই, ব্যক্তির সুখের মূল্য কেমন করিয়া বাচাই করা হইবে? এবং কি ভাবে কতিপয় সমষ্টিগ ও সাধারণ ভাবে সমগ্র সমাজের সমস্ত প্রকার স্বাধ-সুবিধা বর্ধন করা সম্ভব হইবে?

অতঃপর বেঙ্গাম ব্যক্তির স্বাধ-সুবিধার কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তির স্বাধ দুঃখ চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) গভীরতা (intensity), (২) স্থিতিকাল (duration), (৩) নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা (certainty বা uncertainty) এবং (৪) নৈকট্য বা দূরত্ব (propinquity বা remoteness)—এই চারিটি বিষয় বাতীত বেঙ্গাম আরও তিনটি বিষয়ও লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন, যথা—(১) সুখ হইতে দুঃখের এবং দুঃখ হইতে সুখের অন্তর্ভুক্তি জাগে কিনা, (২) সুখের পর দুঃখের এবং দুঃখের পর সুখের সন্ধাননা আছে কিনা, (৩) এই সুখ ও দুঃখ দ্বারা কতজন লোক প্রভাবিত হয়, কতজনদের সুখ বা দুঃখ উৎপাদন হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি দুই প্রকার সুখ বা আনন্দের কথা বলিয়াছেন, যথা—ভটিল সুখ ও সহজ সুখ। ভটিল সুখ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা সুখ ও দুঃখের মিশ্রণে সম্ভব। ইহা বিশ্লেষণ করা কঠিন ব্যাপার। তিনি সহজ সুখ ও সহজ দুঃখ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে চৌদ্দটি বিষয় সহজ সুখের অন্তর্গত, যথা—(১) জ্ঞান, (২) সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা, (৩) কৌশল, (৪) মিত্রতা ও সম্ভাব, (৫) বশ ও শ্রুতি, (৬) শক্তি, (৭) দয়া-প্রবণতা, (৮) পরোপকার-প্রবৃত্তি, (৯) ঈর্ষাপরায়ণতা, (১০) স্মৃতিশক্তি, (১১) বজ্রনা, (১২) প্রত্যাশা, (১৩) সংযোগ বা সহযোগিতা, (১৪) স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধ। সুখের পরেই দুঃখের ফিরিস্তি তিনি দিয়াছেন। তাঁহার মতে নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় সহজ দুঃখের অন্তর্গত, যথা—(১) দৈহিক বা অভাব, (২) ইচ্ছা-সমূহ, (৩) কদর্ঘতা, (৪) শত্রুতা, (৫) অপবশ বা দুর্নাম, (৬) ধার্মিকতা, (৭) পরোপকার, (৮) ঈর্ষাপরায়ণতা, (৯) স্মৃতি, (১০) বজ্রনা, (১১) প্রত্যাশা, (১২) আসঙ্গলিপি। দেখা বাইতেছে, সুখ ও দুঃখের এই শ্রেণীবিভাগ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রচিত হয় নাই। এমন কঠকগুলি বিষয়ের কথা তিনি বলিয়াছেন—যাহা সুখের উৎপাদক, আবার দুঃখেরও উৎপাদক। যেমন স্মৃতি সুখ উৎপাদন করে, তেমনি দুঃখও জাগ্রত করে। এই শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক না হইলেও বেঙ্গাম মোটামুটি ভাবে সুখ ও দুঃখের বিচিত্র হেতুমূল সম্বন্ধে একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তব জীবনে এইগুলির অনেকটা সত্য। যে সব পারিপার্শ্বিক ঘটনা মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে প্রভাবিত করে, সেগুলিকে একেবারে গ্রহণ করিলে চলিবে না। তিনি ত্রিশ

প্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। যে সমস্ত বিষয় এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে প্রভাবিত করে, সেগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা বাইতে পারে, যথা—স্বাস্থ্য, জ্ঞান, মানসিক ক্ষমতা, ইচ্ছা-প্রবণতা, সংস্কার, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পদমর্যাদা, শিক্ষা, গবর্ণমেন্টের প্রভাব ইত্যাদি। বেধ্যাম বলেন, এই সব অনুভূতি মানুষের কার্যকে ও জীবনের স্তর এবং চাপকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ইহাদের প্রভাবে কেহ সুখী হয় আবার ইহাদের অভাবে কেহ দুঃখী হয়।

উপরে এই সব আলোচনা হইতে সাধারণ ভাবে মানুষের কণ্ঠের প্রেরণা সম্বন্ধে একটা ধারণা পরিষ্কার হইয়া গেল। জায় ও অন্তর, সং ও অসং, ভাল ও মন্দ, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা—এই সমস্তই মানুষের নৈতিক কাঙ্ক্ষের মানদণ্ডের সঙ্গিত জড়িত। বেধ্যাম বলেন, এই ভাবে স্তর চাপের আদর্শকে সামনে রাখিয়া যদি আইন-প্রণেতা আইন রচনা করেন, আর সমাজ সংস্কারকগণ সমাজের কর্তৃপক্ষকে নির্ধারণ করেন, তবে তাহাতে মানব-সমাজের বহু কল্যাণ হইবে। এই মতবাদ হইতেই দণ্ডের (punishment) প্রকৃত মানদণ্ড নির্ধারিত হইবে। দণ্ডের প্রকৃতি কি, এবং আইন-প্রণেতা ও নীতিবিদগণ কি ভাবে সমাজে দণ্ডের বন্টন-ব্যবস্থা করিতে চান, তাহাও এই তিতবাদ-নীতি হইতে পাওয়া যাইবে।

২

মানুষের কৃত কার্যের নৈতিক মূল্য বিচার করিতে হইলে, অথবা একটি বিশেষ আইনের প্রকৃত মান আলোচনা করিতে হইলে, সেই কণ্ঠের কর্তার অভিপ্রায় কি তাহা ধর্তব্যের মধ্যে আনিতে হইবে। আরও বিচার করিতে হইবে যে, কর্তা তাহার কণ্ঠের পরিণতি সম্বন্ধে কোন ধারণা পোষণ করিয়াছিল কিনা। নীতিশাস্ত্রের ভাষায় দুইটি শব্দ আছে—“Intention” ও “Motive” (অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য বা প্রবর্তনা)। এই শব্দ দুটি অত্যন্ত জটিল। আমরা সাধারণতঃ “অভিপ্রায়” ও “উদ্দেশ্য”কে মচরাচর একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু নীতিবিদগণের নিকট এই দুই শব্দের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। বেধ্যাম এই পার্থক্যটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, অভিপ্রায় হইতে জ্ঞাত পরিণতির কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না। প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্যকেও (অপর নাম “প্রবর্তনা”) বিচার করিতে হইবে। কেননা অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য এক বস্তু নহে। উদাহরণ : বিশেষ একটা কাজ করিবার সময় একজন লোকের অভিপ্রায় হইতে পারে “প্রতিবেশীর উপকার”। কিন্তু যে মনোভাব তাহাকে সেই কাজ করিতে উৎসাহিত করে, অথবা প্ররোচিত করে, তাহা হইতেছে সেই প্রতিবেশীর প্রতি তাহার একটা অনুবাস (regard)। এই মনোভাব হইতেছে “উদ্দেশ্য”। বাহ্য কর্তাকে কাজ করিতে প্রবর্তনা দেয়, উৎসাহ দেয়, তাহার নাম উদ্দেশ্য। আর সেই কাজের পরিণতিটা হইতেছে “অভিপ্রায়”।

বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা যাক। নীতি-

শাস্ত্রে “conduct” বা আচরণ বলিয়া একটা কথা আছে। মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে যে কাজ করে, অথবা কোন উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে, তাহাকেই বলে আচরণ। কর্তা যদি এই কামনা করে যে তাহার কাজের দ্বারা একটা নির্দিষ্ট কাজ হোক, একটা নির্দিষ্ট ফল হোক, তবে তাহার সেই কাজটা তাহার আচরণ। আর যদি সে কোন কাজ করিতে চাহে নাই, অথবা কোন কাজ হোক এমন কামনা তাহার ছিল না, অথচ সেট কাজটা তাহার অনিচ্ছাক্রমে তাহাই হাত দিয়া হইয়া গেল, তবে সেই কাজটা তাহার আচরণ নহে। পূর্বের কল্পিত উদ্দেশ্যকেই motive বা প্রবর্তনা বলে। ফুট-বল খেলার উদ্দেশ্য এই হইতে পারে—সে খেলা ভালবাসে। সেট সঙ্গে আরও কতগুলি উদ্দেশ্য বা কার্যের পরিণতি উদ্ভূত হইয়া উঠার সঙ্গিত সংযোগিতা করিতে পারে, যথা : অপর খেলার্যাড়-গণের সঙ্গসাথে আসক্তি, ব্যক্তিগত কোন লাভ, কোন একজন নিজের প্রিয় খেলার্যাড়ের দ্বয় দেখিয়া নিজে আনন্দলাভ ইত্যাদি। কিন্তু intention বা অভিপ্রায় ইহা হইতে স্বতন্ত্র। যখন কোন কাজ হইতে কর্তার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে তাহার কার্যের বিবিধ প্রকার পরিণতিলাভ হইতে পারে তখন সেগুলিকে অভিপ্রায় বলা হয়। কাহাকেও হত্যা করার উদ্দেশ্য বা প্রবর্তনা হইতেছে নিহত ব্যক্তির টাকা প্রাপ্তি, অথবা তাহার উপর প্রতিহিংসা-প্রগতি চরিতার্থ করা। কিন্তু এই হত্যার অভিপ্রায় অনেককিছু হইতে পারে। হত্যাকারীর এ জ্ঞান আছে এবং এ জ্ঞান যে আছে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তাহার এই নিধন-কার্যের পরিণতি-স্বরূপ আরও অনেকগুলি কার্য সেট সঙ্গে হইয়া গেল। যথা—মানুষের স্তম্ভনাশ, অপরের বাঁচিবার অধিকারে অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদি। এই পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞানকেই অভিপ্রায় বলে।

বেধ্যাম কার্যের অভিপ্রায় এবং অভিপ্রায়ের পরিণতির মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে চাহিয়াছেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কার্যের দোষগুণ বিচার অনেকটা নিভর করে কর্তা কি করিতে মনস্ত করিয়াছে তাহার উপর। একজন লোকের সঙ্গিত বাক্য বিব্রূপ করিতে গিয়া যদি কেহ বিনা অভিপ্রায়ে তাহার কোন ক্ষতি করে, অথবা তাহাকে আহত করে তবে তাহার এই কার্যের গুরুত্ব এই ভুল লাঘব হয় যে উহা অনিচ্ছাকৃত। অপর পক্ষে কেহ যদি কাহারও ক্ষতি করিবার অভিপ্রায় লইয়া কোন কাজ করে, কিন্তু তাহাতে অন্ততঃকার্য হয়, তাহা হইলেও সে মন্দ অভিপ্রায়ের দায় হইতে মুক্তি পায় না। এমনকি যদি সেই ব্যক্তি অক্ষত দেহে বাঁচিয়া থাকে, তবুও কর্তাকে দোষীই বলা হইবে। নীতিবিদগণের দিক হইতে এখানে কোন গুণগোল বা দ্বিধার স্থান নাই। কিন্তু আইন-প্রণেতা ও বিচারকের দিক হইতে এই আদর্শ সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপালন করার পথে বহু অসুবিধা আছে। তাহাদের নিকট প্রত্যেক কার্যের প্রকাশ্য অভিপ্রায় ও পরিণতিই সর্বাঙ্গগণ্য। আদালতে বিচারক দেখেন, আসামীর উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইয়াছে কিনা। যদি কার্যে পরিণত না হয় তবে তিনি আসামীকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেন :

কিন্তু নীতিবিন্ এত সহজে তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারেন না।

মানুষের উদ্দেশ্যকে বাণী করিয়া বেঙ্গাম ঘোষণা করেন, যে মনোভাব মানুষের চিহ্নাঙ্কিত প্রণোদিত করে, কার্যো নিযুক্ত করে, এবং কার্যো নিবারণ করে, তাহাই হইতেছে মানুষের মোড়িল বা উদ্দেশ্য। এট উদ্দেশ্যকে স্বস্থভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার মূল প্রেরণাদাতা—সুখ ও দুঃখ। সুতরাং উদ্দেশ্য সুখ ও দুঃখের আবেগ বাতীত আর কিছুই নহে। বেঙ্গাম বলেন, উদ্দেশ্য সর্বাঙ্গ ভাঙ্গ নহে, মন্দও নহে। উদ্দেশ্য তখনই ভাল হয়, যখন ইহা হইতে ভ্রাত কল্যাণি ভাঙ্গ হয়। আর যখন উদ্দেশ্য হইতে ভ্রাত কল্যাণি মন্দ হইয়া পড়ে, তখন সেট উদ্দেশ্যকেও মন্দ আখ্যা দিতে হইবে। অভিপ্রায়ের বাস্তব ফলাফল দেখিয়াই বুঝিতে হইবে, তাহা ভাল কি মন্দ। অর্থাৎ, কোন অভিপ্রায়ের বাস্তব পরিণতি যদি মন্দ হয়, তবে সে অভিপ্রায়কেও মন্দ বলিতে হইবে। আর যদি তাহার পরিণতি বা ফলাফল ভাল হয় তবে তাহাকে ভাল বলিতে হইবে।

ইহার পর প্রশ্ন—বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্টাকে ক্রমিক ভাবে সন্ধ্যাধগণ্যতা দেওয়া হইবে? হিতবাদ নীতি অনুসারে উদ্দেশ্য কটা বাস্তব পরোক্ষনীয়তার সত্যক তাহার বিচারের উপর উদ্দেশ্যের সন্ধ্যাধগণ্যতা নির্ভর করে। অর্থাৎ, মানুষের যে উদ্দেশ্য যহা তাহার বাস্তব পরোক্ষনীয়তা মিটাইতে পারিবে, সেট উদ্দেশ্যকেই সকলের অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেট দিক হইতে উদ্দেশ্যকেই প্রথম স্থান দিতে হইবে। ঐষ্টান্দ শতাব্দীর নীতিবিদগণ ইহারই নাম দিয়াছেন পরোপকার বা পরোপকার প্রণোদ। কিন্তু বেঙ্গাম বলেন যে, “পরোপকার”-নীতি সর্বাঙ্গের প্রযোজ্য নহে। ইহাকে উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম স্থান দিলে কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পরোপকার-নীতি এক দিকে অঙ্গ-সংগত ও অপর দিকে অধিকসংগত লোকের মধ্যে সমভাবে প্রয়োগ করা মোটেই সম্ভব নহে। অনেক ক্ষেত্রে বহু লোকের উপকার করিতে হইলে অঙ্গসংগত লোকের ক্ষতি স্থাপনা থাকে, আবার অঙ্গ লোকের উপকার করিতে গেলে বহু লোকের অপকার করার সম্ভাবনাও থাকে। এট নীতির সর্বাঙ্গ প্রসার করিতে গেলে অপরের সুখ-সুবিধার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিতে পারে। সুতরাং পরোপকার-নীতিকে কার্যকরী করিতে হইলে উহা আরও ব্যাপক ও উচ্চাঙ্গের হওয়া দরকার। সন্ধ্যাধ ও সীমাবদ্ধ পরোপকার-নীতি প্রয়োগ করিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ভ্রান্তি-বিস্মৃতি হইতে পারে। ব্যাপারটা আরও সহজ মনে হইবে যখন দেখা যাইবে, বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সময় ব্যক্তিগত পরোপকার-নীতি বৃহত্তর-ক্ষেত্রে সাধারণ পরোপকার-নীতির মধ্যে প্রায় কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ বাহা জনসাধারণের স্বার্থ তাহার সঠিত ব্যক্তিগত স্বার্থের বিশেষ বিরোধিতা নাই। সেইজন্য বেঙ্গাম পরোপকার কথাটির পরিবর্তে শুভেচ্ছা কথাটিকে উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম স্থান দিয়া-

ছেন। শুভেচ্ছার পরে তিনি স্থান দিয়াছেন যশঃপ্রীতিকে। এখানেও তিনি বলেন যে, জনস্বার্থ ও যশঃপ্রীতির মধ্যে একটা সঙ্গতি থাকা চাই। যখন মানুষ নিজের পছন্দ ও অপছন্দকে, নিজের ভাল-মন্দের বিচারকে হিতবাদ-নীতির দ্বারা পরিচালিত করে না, তখনই যশঃপ্রীতি ও লোকচিত্তের সঙ্গতির মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। অনেক সময় মানুষ সচাসুভূতি বিরুদ্ধ অথবা বৈরাগ্য-ভাবকে এত প্রবল করিয়া দেবে যে, সে পরোপকার-নীতিকে পূর্ণ ভাবে কার্যে প্রয়োগ করিতে পারে না। সুতরাং বেঙ্গাম বলেন—যশঃপ্রীতি এরূপ হওয়া চাই যেন তাহার সঠিত পরোপকার-নীতির বিরোধ না বাধে। যশঃপ্রীতি বাতীত আরও দুইটি বিষয়ের কথা তিনি বলিয়াছেন, যথা—(১) সন্তোষ ও মিত্রতার অভিল্য অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্নেহপ্রবণতা ও (২) ধর্মের প্রতি আকর্ষণ। পরোপকার-নীতির সঠিত এট দুইটির সম্পর্ক আছে। এই দুইটির মধ্যে সন্তোষ প্রীতি ও স্নেহ-প্রবণতাকে প্রথমে ও ধর্ম-প্রীতিকে সর্বশেষ স্থান দিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে এত পরস্পর-বিরোধী ধর্ম আছে যে, একজনের ধর্মপ্রীতি অধিকসংগত লোকের অধিকমাত্রায় চিত্তের কারণ হইতে পারে না।

বেঙ্গাম প্রচারিত “হিতবাদ” আদর্শ যে স্বার্থপরতামূলক নহে, বরং ইহার পশ্চাতে একটা মহৎ নীতি আছে, তিনি তাহা প্রমাণ করিবার জগ উদ্দেশ্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। উদ্দেশ্যকে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াও ইহাকে পথ্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠতম হইতে নিম্নতম শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন স্বার্থপরতা নাই। এই পথ্যায়ের ভিতর প্রথম স্থান দিয়াছেন পরোপকারকে। তিনি এট ভাবে “অধিকতর লোকের অধিকতম উপকারের নীতি”তে তাহার মহাবাদের মূল্য নিবারণ করিয়াছেন। তিনি কোন “ব্যক্তি”কেও এই মানদণ্ড হইতে বাদ দেন নাই। “অধিকতম লোকের অধিকতম উপকারের” নীতি যদি সর্বাঙ্গের পালিত হইতে পারে, তবে হিতবাদ-নীতি “স্বার্থপরতা”র অপবাদ হইতে মুক্তি পাইবার যোগ্য। বস্তুতঃ সার্বজনীন সন্তোষের (Hedonism) আর যে-কোন ক্রটি থাকুক, উহা যে স্বার্থপরতামূলক নহে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে, ব্যক্তিগত স্তরে এই নীতির মধ্যগত ধর্ম। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আত্ম-সুখ ও স্বার্থপরতা এক কথা নহে।

বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, সং উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত কার্যো অভিল্যিত সুখ বা আনন্দ উৎপাদন করে না। আবার অসং উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত কার্যো দুঃখ বা আনন্দহীনতা উৎপাদন করে না। আমার এই উদ্দেশ্যটি মন্দ—সব সময় এই ভাবে ভাল-মন্দকে কোন মানুষের উদ্দেশ্যের বিবেচ্য রূপে বিচার করা চলে না। তাহা হইলে স্বতঃই প্রশ্ন এই দাঁড়ায়—তবে “ভাল বা মন্দের” বিবেচকে কি প্রকারে বর্ষ্য ভাবে প্রয়োগ করা চলিবে? বেঙ্গাম ইহার উত্তরে বলেন :—“dispositum”, অর্থাৎ মানুষের

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি। তিনি বলেন—এই ডিসপোজিশন একটি কাল্পনিক সত্তা। কেবল আলোচনার সুবিধার্থ ইহাকে আপাততঃ ধরিয়া লওয়া হয়। তবে একথাও তিনি অস্বীকার করেন নাই যে, মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে ডিসপোজিশন কাল্পনিক হইলেও একটা স্থায়ী সত্তা। তাই মানুষ একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এমন একটা কাজ করিয়া বসে যাহা করিবার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে নিহিত থাকে। তাহার কৃত কণ্ঠের কলাকল দ্বারা বুঝাইবে তাহার এই প্রবৃত্তির কোন্টা ভাল, আর কোন্টা মন্দ। বেদ্যামের মতে এই প্রবৃত্তি যে পরিমাণে সমাজের বা ব্যক্তির সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করিতে অথবা হ্রাস করিতে সহায়তা করিবে, তাহার প্রবৃত্তিটাও সেই পরিমাণ ভাল কিংবা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থাৎ, সেই প্রবৃত্তি ভাল বাহার কল মানুষের সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করে, আর সেই প্রবৃত্তি মন্দ বাহার কল বা পরিণতি মানুষের সুখ নষ্ট করে, অথবা হ্রাস করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রবৃত্তির সহিত অভিপ্রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা অভিজ্ঞতা হইতে দেখি যে, দুইটি বিষয় এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ : ১। সাধারণ অবস্থায় একটা কাজের পরিণতির সঙ্গিত তাহার অভিপ্রায়ের (intention) সম্পর্ক আছে। সুতরাং প্রত্যেক কার্যের ভাল-মন্দ বা গুণাগুণ নির্ভর করে তাহার পরিণতি বা ফলের উপর : ২। যে ব্যক্তি এক সময় অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায় পোষণ করে, অপর সময় সেই একই প্রকার অভিপ্রায় পোষণ করিবার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে খুটিয়া উঠে।

নীতিবিদ বেদ্যাম সুখ এবং আনন্দকেই মানুষের চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহার এই চিন্তাবাদ-দর্শনে দণ্ডের স্থান কোথায়? দণ্ড ত মানুষকে আনন্দ দেয় না। তবে কি নীতির দিক হইতে দণ্ডের কোন স্থান নাই। বেদ্যাম বলেন, তাঁহার নৈতিক দর্শনে দণ্ডেরও স্থান আছে। নীতির প্রশ্ন হইতে স্বতঃই

দণ্ডের প্রশ্ন উদ্ভূত হয়। সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ রাজনীতি ও আইনের দিক হইতে দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অজ্ঞান নীতিবিদের মত বেদ্যামও বিশ্বাস করেন যে, নীতির দিক হইতেও দণ্ডের স্থান আছে। তবে ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। দণ্ড-সংক্রান্ত তাঁহার আদর্শ সুখবাদ নীতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেদ্যাম বলেন যে, দণ্ড কোনক্রমেই প্রতিহিংসা বা বৈবর্নিধাতনের উদ্দেশ্যে দেওয়া চলিবে না। যে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অথবা আহত হইয়াছে, তাকে আনন্দ দিবার জন্ত বা তাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত দোষীকে দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। সত্যাকার সুখবাদী দার্শনিক হিসাবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রতিহিংসাপরায়ণতা হইতেও মানুষ সুখ এবং আনন্দ পায়। এই আনন্দ একটা লাভ বৈকি! প্রতিহিংসার আনন্দ একরূপ বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়। অপরাপার আনন্দের মত এই আনন্দেরও চর্য্য করা বাইতে পারে। আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রতিহিংসার আনন্দ অপরাপার আনন্দদায়ক বস্তুর মতই নিজস্ব গুণেই আনন্দ-উৎপাদক। কিন্তু বতর্জন পর্য্যন্ত আইনের সীমা মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততর্জন পর্য্যন্ত ইহা ভাল জিনিষ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইহা সীমা লঙ্ঘন করে, সেই মুহূর্ত্তে ইহা একটা অপরাধে পরিণত হয়। তাই বেদ্যাম বলেন, দণ্ডের উদ্দেশ্য হইবে অজ্ঞানকারীর সংশোধন, তাহার চরিত্রোন্নতি। সংশোধনকেই যদি দণ্ডের উদ্দেশ্য করা হয়, তবে প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিকে যুক্তির আলয়ে আনয়ন করা সম্ভব হইবে। তখন প্রত্যেক অজ্ঞানকারী বা আইনভঙ্গকারীকে সংশোধন করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে। এই ভাবে দণ্ডের ব্যবস্থা করিলে সমগ্র সমাজের পাপপ্রবণতা হ্রাস পাইবে। কারণ দণ্ডের এই আদর্শের ফল শুভ ব্যতীত অশুভ হইবে না। সংক্ষেপে বেদ্যামের নৈতিক আদর্শের পরিচয় প্রদান করিলাম।

## একাকী

শ্রীকালিদাস রায়

মনে পড়ে বাল্যকালে শিশুদের উৎসবের মেলা,  
গ্রামের প্রান্তরে পথে তাতাদের পেলা।  
রুগ্মশীর্ণ দেহ লয়ে দূর হ'তে মেলি দুই আমি,  
দেখিয়াছি ব'সে ব'সে আমিই একাকী।

শৈশবে কৈশোরে আর প্রথম বোঁবনে  
বিছামটে বসিয়াছি নিত্য বহু সতীর্থের সনে।  
হয় নি কাহারো সাথে কহু মাণমাণি।  
ছাত্রজনতার মাঝে ছিলাম একাকী।

আবদ্ধ হয়েছি আমি সংসার-বন্ধনে  
ভরেছে আমার গৃহ বহু পরিজন,

পাঁকাল মাছের মত সংসারের পাকে আমি থাকি,  
আপন গৃহের মাঝে আমি যে একাকী।

বাণীর দেউলতলে বোঁবনেই লভেছি আশ্রয়  
শত সেবকের সাথে সেবা মোর হ'ল পরিচর।  
সবাই আগারে গেল বেদীপাশে মোরে পিছে রাখি'  
এককোণে কৃতাজলি রই আমি, আমি যে একাকী।

দিন ত কুয়ারে আসে—সন্ধ্যা হ'তে দেরি নাই আর,  
গোধূলির ধূলিভরা রাঙাপথ সম্মুখে আমার।  
পরলোক হ'তে কারা করে ডাকাডাকি  
চিরদিনই একা আমি, ওপারেও চলিবে একাকী।



( নাটক )

## শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্র  
বিজয়—বৈজ্ঞানিক যুবক  
অজিত—শ্রমিকের যুবক  
ভবেশ—ধনী বাবসায়ী যুবক  
গণেশ—মজুর যুবক

পাত্রী  
রমা—বিজয়ের কবি-ভগ্নী  
সবিতা—ভবেশের বিধবী স্ত্রী  
লতি—গণেশের স্ত্রী

১ম অঙ্ক

গভীর বনের মধ্য দিয়ে একটা সুক পায়ে ঢলার পথ  
একে বেকে চলে গেছে, সেই পথ ধরে এগিয়ে চলে  
অজিত, পরিধানে তার শতছিন্ন টাউজার, গা খালি, হাতে  
একগানা বড়ল। পথ ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢালু গা  
বেয়ে নীচে নামতে থাকে, তার পরে আবার উপরে উঠতে  
থাকে। অজিতের পায়ের সাড়া পেয়ে গোটাকয়েক  
প্রগোশ ছুটে পালিয়ে যায়, একটু পরে একজোড়া হরিণ  
পথের এপাশ থেকে এসে ও পানের বনের মধ্যে মিলিয়ে  
যায়। বড় বড় পাখরের আশপাশ দিয়ে অজিত একে-  
বেকে এগিয়ে চলে—এইবার সে ছোট পাহাড়টার মাথায়  
পৌঁছে যায়, দেখতে পায় সামনে তার সীমাহীন নীল  
সমুদ্র, আর সেই দিকে চেয়ে বসে আছে রমা। রমা  
অজিতের উপস্থিতি টের পায় না। কুড়ুলগানা কাঁধে  
ভুলে অজিত নিঃশব্দে রমার পাশে এসে দাঁড়ায়। রমা  
চমকে ওঠে, কিন্তু পদক্ষেপই চিনতে পেরে হাসতে থাকে

—পরনে ঘাসের তৈরি দাগলা আর পাতার তৈরি কাঁচুলি  
সংযত করে।]

অজিত। ( কুড়ুল নামিয়ে বেগে ) এক আধগানা জাহাজ কি  
দেগতে পেলেন রমা দেবী ?

রমা। না, দেগতে পেলাম না

অজিত। জাহাজের মাস্তুল ?

রমা। না, মাস্তুলও নয়।

অজিত। কোন দিন দেগবাব আশা রাখেন কি ?

রমা। আর রাগি না।

অজিত। ( উৎসাহিত হয়ে ) ওা হলে আজ থেকে দুইটা  
হলভাগ থেকে কুন নিয়ে স্থলভাগের উপর স্থাপিত কবন, দেখুন  
আমাদের আশ্রয়দাতা এই ছীপটি সত্যিই কি সন্দর। এখানে  
আমরা কত দিন এসেছি রমা দেবী ?

রমা। ছ'মাসেরও বেশী।

অজিত। অথচ মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন এসেছি।  
পরিষ্কার মনে পড়ছে সেই বিকল, নারকোলগাছের দীর্ঘ ছায়া  
পড়েছে বেলাভূমির উপর, আকাশে সামুদ্রিক পাণীর কাক চক্রাকারে  
ঘুরছে—আমাদের লাইক-বোট এসে ভিড়ল কিনারাখ।

রমা। ( কতকটা বিচলিত ভাবে ) সেই ভয়াবহ অতীত  
ইতিহাসটা ভুলতে নেন অজিত বাবু।

অজিত। বোট ভুলতে চাই সেইটাই মনে পড়ে বেশী।



রমা। সেক্ষা ঠিক। জাহাজডুবির রাতটা যেন স্মৃতির পটে কেটে বসে গেছে—ভাবতে গেলেই সেই ঝড়ের হাহাকার, মেয়ে-পুরুষের আর্শনাদ আবার গুনতে পাই—গা কঁপে ওঠে।

অজিত। তার পরে ছোট লাইক-বোটখানিতে সাতটি প্রাণীর-দিগন্তের দিকে ভেসে ভেসে চলা, দিনের পর দিন, বাতের পর বাত—

রমা। গাবার ফুরিয়ে গেল, ভুল ফুরিয়ে গেল।

অজিত। কুল পেয়ে তবু ত বাচলেন। বিধাতা যেন এই ছোট খীপটি আমাদেরই হস্তে কুলকুলে সাজিয়ে বেগেছিলেন, পাহাড়ের ঐ চূড়োটা এতকাল যেন আমাদেরই পথ চেয়ে ছিল।

রমা। অজিতবাবু, আপনি সব জিনিষই এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন, যেটা আমাদের কাছে ভয়াল সেটা আপনি দেখেন সুন্দর, যেটা আমাদের কাছে অর্থহীন, সেটা আপনি দেখেন অর্থপূর্ণ।

অজিত। ওঁা হচ্ছে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। আপনাকেও আশাবাদী হতে হবে রমা দেবী।

রমা। আশাবাদী হবার মত যথেষ্ট অবকাশ ত দেখছি না অজিত বাবু।

অজিত। অবকাশ নেই, বলেন কি রমা দেবী? আমি বলি বিরাট অবকাশ রয়েছে—না, বিরাট নয়—অনন্ত অবকাশ রয়েছে।

রমা। আপনি কি বলতে চান সভ্য জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন এই খীপে অনন্ত অবকাশ রয়েছে? (হেসে) আমার মনে হয় অনন্ত অবকাশ রয়েছে আপনার কল্পনায়।

অজিত। না, কল্পনায় নেই, রয়েছে এই খীপেই। সভ্য জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন বলেই এখানে অবকাশ আরও বেশী। বুঝতে পারছেন না রমা দেবী, একটা অতি পুরনো জাহাজের সভ্যতাকে গুণ থাইয়ে অথবা অস্ত্রোপচার করে প্রাণবন্ত এবং নবীন করে তোলায় চেয়ে কুমারী মাটিতে নীচ পুঁতে নবীন সভ্যতা অঙ্কুরিত করে তোলা সহজ নয় কি?

রমা। (কিছু আকৃষ্ট হয়ে) কথাটা গুনতে দক্ষ লাগছে না। আপনার মাথায় কি যেন একটা মতলব এসেছে অজিতবাবু।

অজিত। (উৎসাহিত হয়ে) ঠিক ধরেছেন রমা দেবী, একটা বিরাট মতলব এসেছে, যুগ স্বপ্নকে সফল করে তোলবার সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত।

রমা। (অব্যর্থ হয়ে) আপনি কি গুড়িয়ে, স্পষ্ট করে কোন কথা বলতে পারেন না অজিতবাবু?

অজিত। এ অপবাদ আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ দেয় নি, রমা দেবী, একটা বিরাট কথা বিরাটভাবেই বলতে হয় এবং তা বোঝবার জন্যে বিরাট বুদ্ধিরও প্রয়োজন।

রমা। (হেসে) অন্যায় কথা বলেছি, গুটীত্ব ক্ষমা করুন। এখন তা হলে সহজভাবে স্বল্প কথায় স্বল্প বুদ্ধির উপযোগী করে বয়সটা বলুন।

অজিত। (অধিকতর উৎসাহিত হয়ে কুড়ুলখানা কাঁখে তুলে) এ খীপে আমরা সাম্যবাদ-সম্মত আদর্শ সমাজ গড়ে তুলব।

রমা। (হেসে কলে) কিন্তু কাকে নিয়ে সমাজ গড়া হবে? লোক কোথায়?

অজিত। হাসবেন না রমা দেবী, চার জন পুরুষ আর তিন জন নারীই যথেষ্ট।

• রমা। কিন্তু এত কম লোকে কি একটা বিরাট কাজ সম্ভব? অজিত। (গভীর ভাবে) বীজই বৃক্ষে পরিণত হয়, ক্ষুদ্রই বৃহৎ হয়ে উঠে—সাতটি নরনারীর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

(দূর থেকে বাঁশীর স্বর ভেসে আসে)

অজিত। (গুনতে পেয়ে) বাঁশীর আওয়াজ গুনতে পাচ্ছি।

রমা। সহজেবা বাঁশী বাজাচ্ছে, কি মিষ্টি আওয়াজ, কি চমৎকার।

অজিত। (আশ্চর্য হয়ে) সহজেবা আবার কারা?

রমা। খীপের আদিম অধিবাসীদের আমি নাম দিয়েছি ‘সহজ’, ওদের মত সহজ সবল সুন্দর মানুষ আর দেখি নাই। (দূরে দেখিয়ে) ঐ দেখুন, ঐ বড় গাছটার নীচে ওরা নাচগান করছে।

অজিত। সত্যিই ওরা ভারি সবল, শুধু সবল নয়, কোমলও। লক্ষ্য করেছেন রমা দেবী, অসভ্য হলেও ওরা পরহঃপকা ওর, সভ্যবাদী।

রমা। আর যাই বলুন, ওদের অসভ্য বলবেন না অজিতবাবু। যারা সবল, সভ্যবাদী পরহঃপকা ওর তারা যদি অসভ্য হয় তা হলে সভ্য কারা?

অজিত। (চিন্তিত ভাবে) না, অসভ্য বলা চলে না। তবে একটা কথা কি, ওরা লেপাপড়া আনে না এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ওদের সৃষ্ট নয়।

রমা। আমার মতে কেতাবী বিভাব্য বিশেষ কোন মূল্য নেই। আর যে বলে ওদের পোশাক সৃষ্ট নয়, তার মৌনব্যবোধ অত্যন্ত কম। লম্বা ঘাসের ঘাগরা, কচিপাতার কাঁচুলি, ফুলের অলংকার, এর চেয়ে সুন্দর পোশাক যে হতে পারে তা আমি জানি না।

অজিত। দেহের গড়ন ওদের অনবদ্য।

রমা। এর চেয়ে বেশী আর কি চান অজিতবাবু? সমাজ হিসেবে সহজদের সমাজই শ্রেষ্ঠ, কোন বাধা-নিষেধ নাই অথচ কদাচারও নাই। মানুষ হিসেবেও ওরা শ্রেষ্ঠ, কেননা ওরা সভ্যবাদী, সবল, সহজ ও দরদী। ওদের নিঃস্ব স্বম্পত্তি নেই, সম্পত্তি সমাজের। ওদের শাসনভঙ্গ বলে কিছু নেই, আপনাদের মতে সেইটাই ত উন্নতির চরম অবস্থা।

অজিত। কিন্তু—

রমা। (বাধা দিয়ে) কিন্তু-কিছু নেই। (যে দিকে সহজেরা নাচ-গান করছে সে দিকে তাকিয়ে) ওদের আনন্দও প্রচুর, দেখুন, কি সুন্দর নাচ ওদের। (অজিতের দিকে ফিরে) অজিতবাবু, সাতটি মানুষ দিয়ে সাম্যবাদ-সম্মত একটা সমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা না করে আসুন আমরা সহজদের সমাজে মিশে যাই।



অজিত। (হো হো করে হেসে ওঠে)

রমা। কথাটা কি এতই হাস্যকর?

অজিত। (হাসতে হাসতে) সত্যিই আপনার রহস্যবোধ আছে।

রমা। না, আমি মোটেই রহস্য করছি না।

অজিত। (হাসি ধামিয়ে) কালক্রমে শাসনতন্ত্র গড়ে উঠবে, এবং যখন তার প্রয়োজনীয়তার অভাব হবে তখন তা অদৃশ্য হবে। সহস্রাব্দের সমাজে শাসনতন্ত্র এখনও গড়ে ওঠে নি বলে খুব উৎসাহিত হবেন না রমাদেবী—ওদের সমাজে একটা শাসনতন্ত্র গড়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

রমা। আমার সন্দেহ হচ্ছে অজিতবাবু, আপনারা শাসনতন্ত্রের বিলুপ্তি চান বটে, কিন্তু বিলুপ্তি সত্যিকার ঘটলে আপনারদের ঘুম হবে না।

[বহু দূর থেকে ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, টেলিগ্রাফের টরে টকার মত সাস্কেতিক ভাষায় তা বেজে চলে]

অজিত। (শুনতে পেয়ে) রমা দেবীর ডাক পড়েছে, আপনার বৈজ্ঞানিক দাদা শব্দ-সঙ্কেত পাঠাচ্ছেন।

রমা। হ্যাঁ, শুনতে পেরেছি, দাদা আমাকে ডাকছেন।

অজিত। কি আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী-শক্তি আপনার দাদার। শুনে-ছিলাম কাফ্রীরা এভাবে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গরুর পাঠায়। সেট তথ্যটি বৈজ্ঞানিক এট ভুললে কান্দে লাগিয়ে দিয়েছেন, আমাদের বেকার-সমস্যার সমাধান ঘটেছে।

রমা। আমি চললাম অজিতবাবু।

অজিত। আমিও চলি, কার্য সংগ্রহ এখনও হয় নি।

(রমা প্রস্থান করে, অজিত পাথরের উপর কুড়লগানা ঘসে ধারালো করে, তারপরে তা কাঁধে তুলে বনের মধ্যে প্রবেশ করে)

২য় অঙ্ক

জুটি-কয়েক গাছের নীচে লতাপাতা দিয়ে তৈরি তিন-চারগানা কুঁড়েঘর, পাশে বিস্তৃত বালুকাময় বেলাভূমি এবং অদূরে নীল সমুদ্র। কুঁড়েঘরের এক পাশে পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি অকৃত ধরণের লৌহনিক্ষিপনের একটি চুল্লি, তার উপর দিয়ে প্রচুর ঘোঁষা বেরুচ্ছে, আশে-পাশে কাঁচা লোহার গুণ্ড, ছোট-বড় হাতুড়ি। চুল্লির সামনে বসে বৈজ্ঞানিক বিজয় চুল্লিতে জ্বালানি চলেছেন। বেলা মধ্যাহ্ন, কাঁচের বোঝা রাখার করে প্রবেশ করে অজিত, সন্দেহ বোঝা মাটিতে ফেলে দেয়, সে শব্দে বৈজ্ঞানিকের খান ভাজে না। একগানা কুটীর থেকে বেরিয়ে আসে রমা।

রমা। জঙ্গলের সব কাঠ আজ নিয়ে এসেছেন অজিতবাবু।

অজিত। (কপালের ঘাম মুছতে মুছতে) মাত্র গোটা দুই গাছের গুড়ি।

রমা। আর সব কোথায়?

অজিত। আর সবের খবর বলতে পারব না, তারা গেছে উত্তরে, আমি গেছি দক্ষিণে।

রমা। একি হুঃসংবাদ—আপনি দক্ষিণ-পন্থী?

অজিত। আগে কথাটা শুধুন, তারপরে শোক প্রকাশ করবেন। দ্বীপের দক্ষিণ দিকে যে পাহাড়টা আছে তার কাছাকাছি অনেক বিচিত্র ধরণের পাথর দেখতে পাই, আমার মনে হয় সেগুলোর বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে, বিজয়বাবুকে দেখাবার জন্যে আজ একটা সন্ধে করে নিয়ে এসেছি। আমি যা সন্দেহ করেছি সেটা যদি তাই হয় তা হলে আপনাকে আমি অবাক করে দিতে পারব।

রমা। (উৎসাহিত ভাবে) কোথায়, দেখি।

অজিত। এই দেখুন, পাতার মোড়ক খুলে একগানা ভারী পাথর বার করে রমাকে দেয়।

রমা। (পাথর হাতে নিয়ে) খুব যে ভারী। (বিজয়ের কাছে গিয়ে) দাদা।

বিজয়। (চেতনা ফিরে আসে) কি রমা?

রমা। এই দেখ, অজিতবাবু আজ কেমন সন্দর একটা পাথর এনেছেন।

বিজয়। (পাথরগানা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে) পাথরগানা শুকনট বটে—বলতে পারিস রমা এটা কি পাথর?

রমা। না দাদা, বলতে পারব না, তোমার মত পণ্ডিত হলে বলতে পারতাম।

বিজয়। এই পাথরের প্রাস্তুসংবাদটা যদি সভা রূপে পাঠাতে পারতিস তা হলে দেখতিস পৃথিবীর চারদিক থেকে অসংখ্য জাহাজ এই দিকে ছুটে আসছে।

অজিত। (সংশয়) তা হলে আমি যা সন্দেহ করেছি এ পাথর তাই।

বিজয়। তাই, এ সোনা।

রমা। সোনা! (বিজয়ের হাত থেকে পাথরগানা নিয়ে) এ সোনা!

অজিত। দেখুন, আমি যে বলেছিলাম আজ আমি আপনাকে অবাক করে দেব।

রমা। (সোংসাহে) পাহাড়ের নীচে এ পাথর অনেক আছে?

অজিত। অনেক, অনেক আছে।

রমা। আমাকে এক দিন সেখানে নিয়ে যাবেন অজিতবাবু?

অজিত। কেন বলুন ত? উদ্দেশ্য সাধু বলে মনে হচ্ছে না।

রমা। (হাসতে হাসতে) হয়ত আমি আরও মূল্যবান পদার্থ আবিষ্কার করতে পারি।

অজিত। আপনার সাগর্য্য নেবার আগেই আমি আরও মূল্যবান পদার্থ আবিষ্কার করেছি।

রমা। নিশ্চয় হীরক!

অজিত। তার চেয়েও সুসাবান, এই দেখুন (আর একটা পাতার মোড়ক খুলে সুন্দর কয়েকটি ফুল বার করে)

রমা। (এগিয়ে এসে) কি আশ্চর্য, এমন সুন্দর ফুল আমি আর কখনও দেখি নি।

অজিত। (ফুলগুলো রমার হাতে দিয়ে) এই নিন, এ আপনার জন্যে এনেছি।

রমা। (সোনার টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে এবং ফুলগুলো নিয়ে) কি সুন্দর—কি সুন্দর!

অজিত। এ দেশে সোনার চেয়ে ফুলের আদর বেশী।

(দূর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসে)

রমা। ঐ যে ওরাও এসে পড়েছে—সবিতার গান শুনেতে পাচ্ছি।

(গান গাউতে গাউতে সন্ধ্যায় সবিতার প্রবেশ, তার মাথার একটা ফুলের ঝুড়ি, তার পিছনে লতি, আরও পিছনে গোটাছুট বনমুরগী হাতে গণেশ ও ভবেশের প্রবেশ)

রমা। (এগিয়ে গিয়ে সবিতার হাত থেকে ফুলের ঝুড়ি নিয়ে) আজ বুঝি অনেক দূরে গিয়েছিলেন সবিতাদি?

সবিতা। (পাতার পোশাকটা শুছিয়ে নিতে নিতে) গিয়েছিলাম সের্ত করণার কাছে যেটার নাম ডুমি বেপেড 'উচ্চাস'।

লতি। অতঃ কি মিষ্টি তার ওল।

অজিত। আজ দেখছি বিরাট শিকার হয়েছে।

ভবেশ। (মুরগী বেপে) তবে ঐক আশা করেছিলেন সাত শিকার করে নিয়ে আসব?

অজিত। শুনেছি সিংহের মাংস তেমন সরস নয়, একটা হরিণ হলেও হ'ত।

সবিতা। অজিতবাবুর কুকুট-মাংসে অকিচি কবে থেকে হয়েছে?

ভবেশ। হু'এক জনের অকিচি হওয়া মন্দ নয় (একটা পাখরের উপর বসে)

গণেশ। সেকথা আর বলবেন না বাব, একটা হরিণের পিছনে বেজায় ছুটেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কসকে গেল।

ভবেশ। অতঃ, অজিতবাবু উপস্থিত থাকলে সে হরিণ কি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে? সেদিন সমুদ্রের ধারে সেই অপূর্ণ দৃশ্য আপনার মনে পড়ে রমা দেবী?

রমা। (হাসতে হাসতে) পরিষ্কার মনে পড়ে, অজিতবাবু ছুটেছিলেন একটা সামুদ্রিক কচ্ছপের সঙ্গে পালা দিয়ে।

ভবেশ। এবং জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেটা উল্টে দিতে গিয়ে নিজেই উল্টে পড়েছিলেন।

রমা। সেই থেকে উনি শিকার ছেড়ে দিয়ে কাঠ কুড়োতে শুরু করেছেন।

অজিত। কাঠও কুড়ুই আবার কাঞ্চনও কুড়ুই।

রমা। হাঁ, সত্যিই অজিতবাবু স্নান এক খণ্ড সোনা কুড়িয়ে এনেছিলেন।

ভবেশ। (বাগ্গভাবে) দেখি—দেখি।

রমা। ঐ যে ওদিকে ফেলে দিয়েছি।

ভবেশ। ফেলে দিয়েছেন! মাথা খারাপ নাকি আপনার? (উঠে খুঁজতে শুরু করে) কোথায় ফেলেছেন ঠিক করে বলুন তো।

রমা। ঐ দিকেই ফেলেছি বোধ হয়।

[ভবেশ বাগ্গভাবে খুঁজতে থাকে]

অজিত। চলে আসুন ভবেশবাবু, এক টুকরো সোনার স্নেহে অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন? আমাদের এই নতুন দেশে আমরা একটা নতুন মানদণ্ড গড়ে তুলছি, এখানে সোনার চেয়ে ফুলের দাম বেশী।

বিজয়। সভ্যতার আরম্ভে যা ছিল।

অজিত। এবং সভ্যতার শেষে যা হবে।

ভবেশ। (খুঁজে কিছু না পেয়ে ফিরে এসে বসে) অবিশ্রু এখন সোনার মুলাই বা কি?

সবিতা। আর সন্ধ্যা জগতে ফিরে যাবার সন্ধ্যাবনাও নাই।

অজিত। সভ্য জগৎ যাকে বলছেন সেটাকে আর আমরা সভ্য জগৎ বলে স্বীকার করব না।

রমা। (হাসতে হাসতে) আপনারা জানেন না, অজিতবাবু আজ সকালে সঙ্কলন করেছেন আমাদের এই সাত জনকে নিয়ে সামান্যতম এক আদর্শ সমাজ গড়ে তুলবেন।

বিজয়। অজিত বাবুর সমাজে মৌলিকতা আছে।

অজিত। এ মৌলিকতা আমার নয়, বিধাতার। তিনি কেমন বিচিন্তার সমাবেশ করেছেন দেখুন, অসীম সমুদ্রের মাঝখানে অজানা দ্বীপ, তার মধ্যে সাতটি মানুষ—একজন বৈজ্ঞানিক, একজন তাঁর কবি ভগ্নী, (নিজের বৃকের উপর হাত রেখে) একজন শিক্ষক, একজন ধনী ব্যবসায়ী, একজন তাঁর বিদ্যুৎ পত্নী, একজন শ্রমজীবী, একজন তার স্ত্রী।

বিজয়। তা হলে আপনি অবিলম্বে কাজে লেগে যান।

অজিত। (উৎসাহিত ভাবে) চমৎকার প্রস্তাব (চারদিকে তাকিয়ে) আশা করি সকলেরই এ বিষয়ে সম্মতি আছে।

সবিতা। না, আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। আমি প্রস্তাব করছি অজিতবাবু প্রথমে তাঁর আরও কণ্ঠ শেষ করুন, অর্থাৎ কাঠগুলো চোলা করুন।

ভবেশ। আমি এ প্রস্তাব সর্বাঙ্গতঃ করণে সমর্থন করছি।

বিজয়। ঠিক কথা, কাঠ কাটা সভ্যতার প্রথম পাঠ।

অজিত। কেবল আমাব নয়, আজ অনেকেই পাঠ বাকি আছে। (উঠে কুড়ুল নিয়ে কাঠ কাটার আয়োজন করে)

রমা। (হাসতে হাসতে) বেশ ত, এই আমিও বাচ্ছি বরণ থেকে জল আনতে।

[ রমা একটা কলসী নিয়ে বরণা থেকে জল আনতে যায়, সবিতা ও লতি কুটারে প্রবেশ করে, গণেশ একপাশা ছুরি ধাব দিতে বসে, ভবেশ একটা গাছে ঠেস দিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে, অজিত শশকে কাঠ কাটতে থাকে। একটু পরে জল নিয়ে রমা ফিরে আসে, গণেশ ধারালো ছুরি ও মৃগী নিয়ে অস্ত্রবালে যায়, নেপথ্যে সবিতা গান গেয়ে উঠে, ভবেশ চোপ মেলে চায় ]

অজিত। ( ঘাম মুছতে মুছতে ) বৈজ্ঞানিক মহাশয়কে একটা কথা হিজ্জাসা করতে পারি কি ?

বিজয়। ( ফিরে বসে ) নিশ্চয় পারেন।

অজিত। মহাশয় ত পাথর থেকে লৌহনিষ্কাশন করে চমৎকার কুড়ুল তৈরি করে দিয়েছেন, কাঠ কাটা মেশিনটি দয়া করে করে তৈরি করে দেবেন ?

বিজয়। তাও তৈরি হবে।

অজিত। তত দিন বাচব কি ?

ভবেশ। বাচবেন বৈকি—আশায় বুক বাধুন, নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে যে।

[ সবিতা ও লতি কুটারে দরজায় এসে দাঁড়ায় ]

অজিত। গড়ে তুলতে হবে, নিশ্চয় গড়ে তুলতে হবে। তবে আপনার মত নিকট উপাদানকে যথেষ্ট পুড়িয়ে পিটে নিতে হবে।

সবিতা। তা হলে কাজটা অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত।

ভবেশ। ( সবিতাকে লক্ষ্য করে ) তাই নাকি ? দশ বছর বিবাহিত জীবনে তোমার উপাদানটাও অনেকভাবে পরীক্ষা করেবার সুযোগ আমার হয়েছে, কিন্তু কোনদিনই সেটা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়নি।

গণেশ। আজ্ঞে কহা আমি কিন্তু বরাবরই লজ্জিত হ'চার দা দিয়ে এসেছি, ওর উন্নতি বোধ করি শিগগীই হবে।

[ সবাই হেসে ওঠে ]

লতি। ( একবার দিয়ে ) কি বললি ? তা হলে হাটের মন্দির আমি হাড়ি ভেঙ্গে দি ?

অজিত। থাক থাক, আর হাড়ি ভাঙতে হবে না, আমরা সব বুঝতে পেয়েছি। আমি ভাবছিলাম আমাদের এই নতুন সভ্যতার সূত্র হবে কোন পান থেকে, এইবার তার উত্তর মিলেছে—সূত্র হবে মামুলি বিয়ের আমূল পরিবর্তন থেকে।

ভবেশ। ( উদগ্রীব ভাবে ) কি বললেন ! কথাটার যেন যথেষ্ট যুক্তি আছে মনে হচ্ছে।

সবিতা। তুমি এত যুক্তিবাদী কবে থেকে হলো ?

রমা। এ বীণের জলহাওয়ার গুণ আছে।

অজিত। ( উৎসাহিত হয়ে ) এ বীণের জলহাওয়ার গুণ আছে, ভবেশবাবু পর্যাপ্ত যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছেন।

রমা। হয় ত যুক্তিবাদী উনি বহুকাল, তবে সেটা প্রকাশ করার সাহস ছিল না।

ভবেশ। বাগা নতুন সভ্যতা গড়বে তাদের সাহসী হতে হবে, কি বলেন অজিতবাবু ?

অজিত। নিশ্চয়, নিশ্চয়, ভয়টর আর আমাদের নেই, পুরোনো পটা সভ্যতার মাধ্যাকর্ষণের বাইরে আমরা এসে পড়েছি।

রমা। সেই সঙ্গে ভবেশবাবুও সবিতাদির মাধ্যাকর্ষণের বাইরে এসে পড়েছেন বৃষ্টি ?

সবিতা। আর একটা এসেছে সফর হ'ল।

রমা। অজিতবাবু, আপনি হচ্ছেন আমাদের নতুন মন্ত্রী।

অজিত। ( উৎসাহিত ভাবে ) তা হলে আমরা আশ্রয় আমরা এক নতুন সংস্কার রচনা করি।

সবিতা। আমরা কিন্তু দিক্‌টর চাই না।

অজিত। কোনমতেই না।

রমা। শ্রেণীবিভাগ লোপ করতে হবে।

অজিত। অবিলম্বে।

সবিতা। ধনকে সমানভাণ্ডে বণ্টন করতে হবে।

ভবেশ। নতুন পরিষ্কৃতিতে আমার আপত্তি নেই।

রমা। যৌথ কৃষি চালাতে হবে।

অজিত। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ভবেশ। মামুলি বিয়ের আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

রমা। এটা খুব সহজ হবে কি ?

বিজয়। কেন হবে না, প্রথমে পুরোনো প্রতিশ্রুতিগুলো খুলে ফেলা চোক। অর্থাৎ পুণের বিয়েগুলো বাতিল করে দেওয়া চোক।

অজিত। দেখুন ক—তা সহজ !

রমা। আমরা মতে এ বিষয়ে ভোটা নেওয়া উচিত।

ভবেশ। আশা করি অবিবাচিত্তেরা নিরপেক্ষ থাকবেন।

অজিত। খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা ( সবাইকে সম্বোধন করে ) বহুগণ, আমি প্রস্তাব করছি আমাদের এই নতুন সমাজে প্রাচীন সমাজের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক। এই প্রস্তাবের সপক্ষে যারা ভোট দেবেন তাঁরা হাত তুলুন।

গণেশ। আজ্ঞে বাবু, আপনারা কি কওয়া-বোলা করছেন তা বুঝতে পারছি নে।

ভবেশ। বুঝতে পারছ না ? শোনো, কথাটা হচ্ছে এই যে এগানে আমরা এক ভাবি মন্ত্রার দেশ গড়ে তুলব, তাই পুরোনো বিয়েটিয়ে—যেমন তোমার লতির এসব ভেঙ্গে দিতে হবে—এগানে এসব চলবে না। এতে তোমার আপত্তি আছে ?

গণেশ। আজ্ঞে আমি পরে বলব, আগে লতি বলুক।

লতি। ইস, আমি কেন আগে কইতে বাব।

অজিত। আগে-পরের দরকার নাই, একসঙ্গে হাত তুলুন, এক, দুই, তিন—

[ ভবেশ, সবিতা, গণেশ ও লতি হাত তোলে ]

বিজয়। চমৎকার, চমৎকার, একটা বিবাহটুকুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হ'ল।

অজিত। এর পরে আর বিবাহ থাকবে না, যৌথ-পরিবার গঠন করতে হবে।

সবিতা। তার মানে?

ভবেশ। তার মানে বোধ হয় এই যে, কয়েক হাজার বছর আগে অনেক সমাজ যেমন ছিল, অর্থাৎ কেউ কাক আপনার নয়, সবাই-সবাই এই রকম কিছু—তাই না অজিতবাবু?

অজিত। ঠিক তাই, তবে আমরা কয়েক হাজার বছর পেছিয়ে যাব না—কয়েক হাজার বছর এগিয়ে যাব।

সবিতা। (উদ্ভাপের সঙ্গে) যৌথ-পরিবার মানে যদি ঐ হয় তা হলে তাতে আমার ঘোবতর আপত্তি আছে।

ভবেশ। এত ভেত্রে উঠলে কেন? আপত্তি হবার কারণটা কি শুনি?

সবিতা। একটা প্র-শ্নের উত্তর দিন তো অজিতবাবু, যৌথ-পরিবারে শিশুসন্তান পালন করবে কে?

অজিত। মায়েরা পালন করবে।

সবিতা। কেননা, পিতৃত্বের দায়িত্ব যেমন সবার থাকবে তেমনি কাকবই থাকবে না—এই তো?

ভবেশ। সবারই ঘাড় কিছূ কিছু পড়লে দায়িত্ব হালকা হবে।

সবিতা। ধাম, পুস্তকে আমি ভাল করে চিনি। পিতৃত্বের জগ্রে বোল 'আনা দায়ী যারা, অর্থাৎ যারা বিবাহিত স্বামী তারাও সব সময় শিশুপালনটা মায়ের ঘাড় ফেলে দিতে চেষ্টা করে, আর যেখানে দায়িত্ব স্বত্বকে সন্দেহ থাকবে সেখানে যা ঘটবে তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি। না অজিতবাবু, যৌথ-পরিবার চলবে না।

রমা। এ যুক্তি অকালী।

ভবেশ। লতির মতামতটাও তা হলে শোনা যাক।

লতি। একটা বিষয় ভেঙ্গে দিয়েছি বলে আর একটা বিষয় করতে পারব না এ কেমন কথা বাবু!

সবিতা। লতি তার আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণা থেকে ঠিক কথা বলেছে—আমরা আবার বিয়ে করতে চাই।

অজিত। ও বিষয়ে মেয়েদের মধ্যে যখন মতভেদ নেই তখন বিবাহ প্রথা চালু রাখতেই হবে।

ভবেশ। আবার মাঝে মাঝে ভেঙ্গে দিলেই হবে।

সবিতা। তাও যখন খুশী চলবে না, হ'লফের মত হলে তবেই ভেঙ্গে দেওয়া চলবে—তার আগে নয়।

অজিত। ও সব খুটিনাটি বিষয় ক্রমে ক্রমে ভাবা যাবে—এখন—

ভবেশ। ই্যা এখনও পাওয়া হয় নি, পেটের তাগিদটা মিটিয়ে ফেলা যাক।

রমা। সংস্কারের দেয়াল ভেঙ্গে পথ পরিষ্কার করা হ'ল, এখন পেটের তাগিদের কথা ভুলে গিয়ে হৃদয়ের তাগিদ যেটাবার প্রচেষ্টার লাগুন।

ভবেশ। বস্তুতাত্ত্বিক নীমাংসা কিন্তু বগছে পেট আগে, হৃদয় পরে।

রমা। নীচের দিক থেকে দেখলে পেট অবশ্যই আগে, কিন্তু উপরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে হৃদয়ই আগে।

বিজয়। মাহুকের পক্ষে যখন ও হুটোর সমান প্রয়োজন তখন হুটোরই চাহিদা মেটাতে হবে। কয়েক ঘণ্টার আমরা কয়েক বছরের কাজ করে ফেলেছি, এখন সেই অস্থপাতে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা কর রমা।

রমা। বাস্তা হয়ে গেছে—আপনারা আসতে পারেন।

[ উঃসাহের সঙ্গে একে একে সকলে কুঠীবে প্রবেশ করে—সর্বশেষে প্রবেশ করে বিজয় ]

৩য় অঙ্ক

বনের মধ্যে গানিকটা গোলা জায়গা, সময় অপরাহ্ন।  
দূরে গান শোনা যায় এবং একটু পরে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে সবিতা, সঙ্গে তার গণেশ।

সবিতা। (গান) —

জীবন ভরিয়া চেয়েছি যাহারে কাছে

সে প্রিয় আমার কোথায় লুকায়ে আছে।

বন-পথে পথে বাজায় মধুর বীণ,

মনে হয় যেন আসিছে সে নিশিদিন

রাজার মতন সাজিয়া সগৌরবে,

বলো সে অজানা আসিবে আমার কবে!

সবিতা। (গান শেষ করে) কেমন লাগল?

গণেশ। আজ্ঞে খুব ভাল লাগল—আপনার গাঙ্গা গলা।

সবিতা। (স্বর করে) 'বলো সে অজানা আসিবে আমার কবে?'

গণেশ। (মাথা নাড়ে)

সবিতা। (আবার স্বর করে) বলো সে অজানা আসিবে আমার কবে?

গণেশ। আজ্ঞে?

সবিতা। (হেসে) বলতে পারলে না?

গণেশ। (চিন্তিত ভাবে) আজ্ঞে বলতে পারলাম না।

সবিতা। গানের মানেটা বুঝতে পার নি বুঝি?

গণেশ। (মাথা নাড়ে) আজ্ঞে না।

সবিতা। ভাষাটাও কি বুঝতে পার নি?

গণেশ। আজ্ঞে তা একটু একটু বুঝতে পেরেছি—গান শুনে বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠেছে।

সবিতা। তুমিই সত্যিকার বসিক, ভাষা না বুঝেও ভাব বুঝতে পেরেছ। মালয়ে তুমি কি কাজ করতে গণেশ?

গণেশ। আজ্ঞে, কলীর কাজ করতাম।

সবিতা । চমৎকার কাজ করতে, কেমন স্নহ সবল দেহ, ক্ষিপে পায়, বাজে ঘুম হয়—হাটের দোষ নেই, লিভারের দোষ নেই, ব্লাড-প্রেসার নেই,—চমৎকার ।

গণেশ । ( বৃথতে না পেরে ) আজ্ঞে ?

সবিতা । আমার সব কথা তুমি বুঝতে পার না গণেশ ?

গণেশ । আজ্ঞে, আপনি ষথার্থই ধরেছেন ।

সবিতা । আমারও হয়েছে ঐ বিপদ, তোমার সব কথা বুঝতে পারি না ।

গণেশ । আজ্ঞে, আমি মুগ্ধ মানুষ ।

সবিতা । সেজ্ঞে লজ্জিত হয়ে না, বই-পড়া বিড়ের মূল্যই-বা কি ।

গণেশ । ( সোঁসাতে ) আজ্ঞে ঠা, বিড়ের মূল্যই-বা কি ।

সবিতা । ( হাসতে হাসতে ) আমি বলেছি বই-পড়া বিড়ার মূল্য নেই, বিড়ার মূল্য আছে বৈকি । একটু চেষ্টা করলে কাজ চালাবার মত লেখাপড়া তুমিও শিখে নিতে পারবে ।

গণেশ । ( মাথা নেড়ে ) ছোটবেলার বাবার ইচ্ছে হয়েছিল আমাকে পাঠশালায় পড়ায়, তাই পেরথম ভাগ কিনে দিয়েছিল । তাই না দেখে আমি রাতারাতি সাততরে নবগঙ্গা পার হয়ে মামা-বাড়ী পালিয়ে গিছিলাম ।

সবিতা । ( চিন্তিতভাবে ) বল কি গণেশ ! তবে লেখাপড়ার কথা তুলে আর দরকার নেই । ছোটবেলার সাততরে নদী পার হয়ে পালিয়েছিলে, এখন হয় ত সাততরে সমুদ্রই পার হয়ে যাবে ।

গণেশ । আজ্ঞে তা সত্যি, এ বয়সে আর লেখাপড়া হবে না ।

সবিতা । 'আচ্ছা গণেশ, তুমি আমাকে গত 'আজ্ঞে, আজ্ঞে' কর কেন ?

গণেশ । আজ্ঞে আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই ওটা মুগ্ধ দিয়ে বার হয়ে আসে ।

সবিতা । বুঝতে পারছ না, আমি তোমাকে ভালবাসতে চেষ্টা করছি ?

গণেশ । ( হেসে ) আজ্ঞে তা একটু একটু বুঝতে পারছি বৈকি ।

সবিতা । আবার আজ্ঞে ! ও অভ্যাসটা তোমার ছাড়তে হবে । গণেশ ?

গণেশ । আজ্ঞে ( লজ্জিত হয়ে ) ইয়ে—কি বলছেন ?

সবিতা । বলছি কি ভালবাসার চেষ্টা কি এক-ধরফাই হবে ? তোমার দিক থেকে মোটেই সাড়া আসছে না, এটা বেন তেমন স্নহ হচ্ছে না ।

গণেশ । ( লজ্জিতভাবে ) আমরা চাষা মানুষ, আমরা কি আর আপনাদের মত কথা বলতে পারি ।

সবিতা । আমাদের মত নাই-বা বললে, তোমাদের মতই বল, বেশ নতুন হবে ।

গণেশ । আজ্ঞে ভূইতোকারি এসে পড়বে ।

সবিতা । ও আর এমন মাঝামাঝি কি, তার বেশী নয় ত ?

গণেশ । মাঝে মাঝে চড়টা-চাপড়টা ।

সবিতা । ( চিন্তিতভাবে ) সমস্তার ফেললে গণেশ ।

গণেশ । ( অভয় দিয়ে ) প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও শেষে অভ্যাস হয়ে যাবে ।

সবিতা । তার পরে ও না হলে ভয়বেট না --কি বল ?

গণেশ । ( উৎসাহিত ভাবে ) আজ্ঞে ঠিক বলেছেন ।

সবিতা । ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ।

গণেশ । ( খুশি হয়ে ) আজ্ঞে তা ঠিক, ভবেশবাবুই বলেন আর অজিতবাবুই বলেন, কোন বাবুই আমার সঙ্গে পারবে না, দেপবেন আমি গোছ হরিণ মেয়ে নিয়ে আসব ।

সবিতা । কিন্তু নতুন দেশের নতুন আইন অনুসারে ভাগ যে হবে সমান সমান !

গণেশ । ( মাথা চুলকে ) তা ত হবে, কিন্তু একি নেযা কাজ হবে -বলুন ত আপনি ?

সবিতা । ঠিক এট যুক্তিই ত দেখায় ওদেশের সোনার হরিণ-শিকারীরা, কিন্তু সেখানে তোমরা মগুরেরা তা মান কৈ ?

গণেশ । ( বুঝতে না পেরে মাথা চুলকায় ) আজ্ঞে কথাটা ঠিক বুঝতে পরেলাম না ।

সবিতা । ( হেসে ) তা নাইবা বুঝলে ও এমন কিছু কাজের কথা নয়, ভালবাসার কথা ত বুঝতে পার ?

গণেশ । ( উৎসাহিতভাবে ) তা খুব পারি ।

সবিতা : তবে চল সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি, সেখানে গোলা আকাশ দেখলে মনও খুলে যায় ।

গণেশ । আজ্ঞে না বুঝলেও আপনার কথা বড় মিষ্টি লাগে ।

[ হ'ল্লে পছন্দ করে, একটু পরে ছুটতে ছুটতে আসে লতি, একটা গাড়ের আড়ালে লুকায়, পেছনে প্রবেশ করে ভবেশ ]

ভবেশ । ( চার দিকে তাকিয়ে ) এরাও বেশ লুকোচুরি পেলতে পারে দেখছি—লতি, ও লতি [ ডাকে ] ।

লতি । ( কোন সাড়া দেখ না )

ভবেশ । 'আমি চললাম, ঐ যে একটা মস্তবড় অঙ্গুর এদিকে আসছে ।

লতি । ( আড়াল থেকে বেরিয়ে ) কৈ, কোথায় অঙ্গুর ?

ভবেশ । ( হাসতে হাসতে নিকটকে দেগিয়ে ) এই যে সেই মস্তবড় অঙ্গুর ।

লতি । ( কৃত্রিম ভয় প্রকাশ করে ) ও বাবা, এ কেমন অঙ্গুর—এ অঙ্গুর আমাকে পেয়ে ফেলবে না ত ?

ভবেশ । একবার থরা দিয়ে দেখই না ।

লতি । অঙ্গুরের মুখে গিয়ে কি কেউ থরা দেয় বাবু, অঙ্গুরকেই কান্দিকির করে শিকার ধরতে হয় ।

ভবেশ । তাই নাকি ! আমার ধারণা ছিল চাষার মেয়ে

ভারি সরল হয়, এখন দেখছি তা মোটেই না, তাদেরও মাথায় বেশ ছুট বুদ্ধি গেলে !

লতি । ছুট মানুষের সঙ্গে ছুট মি করতে হয় ।

ভবেশ । ছুট মি তোমাকে চমৎকার মানায় । ছুট মিভরা চোখ দুটি তোমার কি সুন্দর লতি ।

লতি । ( হ'তে হ'তে চোখ ঢেকে হাসতে থাকে )

ভবেশ । কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে ।

লতি । ( চোখ খুলে ) আমি আবার সুন্দর !

ভবেশ । সত্যিই তুমি সুন্দর । বিদ্যুতের মত তোমার হাসি, ঘুণালের মত তোমার বাহু, চাপার কলির মত মণ্ডল ।

লতি । ( হেসে ঢলে পড়ে ) চাপার কলির মত আবার অভয়ল হয় !

ভবেশ । কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষেত্রে অচল দেখছি । ওহো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে — খাশা করি এবার ঠিক বৃথতে পারবে— কুঁচবরণ কলা তুমি, মেঘবরণ চুল । লতি তোমাকে আমি ভালবাসি ।

লতি । তা হলে আমাকে কি দেবেন বলুন ।

ভবেশ । সবটা মনই যে তোমাকে দিয়ে ফেলছি ।

লতি । ও সব কথা আমি জানি নে, আমাকে বাজু গড়িয়ে দিতে হবে, তবে জানব ভালবাসা ।

ভবেশ । এখানেও দেখছি ভালবাসা ওজনদার বিক্রী হচ্ছে । বাজু আমি গড়িয়ে দিতে রাজী আছি, কিন্তু এখানে সেকরা কোথায় ?

লতি । ( হুমকিত ভাবে ) তা হলে কি দেবেন ?

ভবেশ । দেব বৈকি, অনেক জিনিষ দেব — কচি পাতার সবুজ শাড়ী দেব, গলার বিনুকের মালা দেব, হাতে ফুলের বালা দেব, খোপায় সোঁজবার নন-মোবগের পালক দেব ।

লতি । আমাকে সুন্দর দেখাবে ?

ভবেশ । খুব, খুব সুন্দর দেখাবে । সেই পোশাকে তুমি যখন নাচবে তখন কি সুন্দর যে তোমাকে দেখা যাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারছি নে ।

লতি । ( লজ্জিত ভাবে ) আমি নাচতে জানি না ।

ভবেশ । কিন্তু আমি যে নাচ ভালবাসি লতি ।

লতি । তা হলে আমি নাচ শিখব ।

ভবেশ । ( উৎসাহিত ভাবে ) তা হলে এখন থেকে শিগতে শুরু কর ।

লতি । শুরু করব কেমন করে, কেউ শিগিয়ে না দিলে কি শেখা যায় ?

ভবেশ । আচ্ছা দাঁড়াও, আমাকে দেখে কতকটা শিগতে পারবে, নাচতে যদিও আমি পারি না, নাচ দেখেছি কিন্তু অনেক । কথাকলি নাচের কয়েকটা ভঙ্গী দেখাচ্ছি, ভাল করে দেখ ( নাচেব হাতকব অঙ্গকব করতে থাকে, এমন সময় প্রবেশ করে অজিত ও রমা । ভবেশের ভঙ্গী দেখে উভয়ে হাসতে শুরু করে )

অজিত । ( হাসতে হাসতে ) এ কি হচ্ছে ভবেশবাবু ?

ভবেশ । ( খেমে গিয়ে ) কিছু না ।

রমা । এ কি অকৃত কিছু না ! ( হাসতে থাকে )

লতি । বাবু আমাকে নাচ শেখাচ্ছেন রমা দিদি ।

অজিত । ওহো বুঝতে পেরেছি, এ সেই জীবজগতের অতি প্রাচীন খাশা—পুং-মানুষ স্ত্রী-মানুষকে নাচ দেখিয়ে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে ।



“এ সেই জীবজগতের অতি প্রাচীন খাশা—পুং-মানুষ স্ত্রী-মানুষকে নাচ দেখিয়ে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে ।”

ভবেশ । তা হলেই বুঝতে পারছেন এতে হাসবার বিশেষ কিছু নাই ।

রমা । ( অনেক কষ্টে হাসি ধামিয়ে ) হাসিটা সত্যিই এতক্ষণে অমুচিত হয়েচে, ক্ষমা করবেন ভবেশবাবু ।

অজিত । এখানে হঠাৎ এসে পড়াটাও অমুচিত হয়েছে ।

ভবেশ । খুবই তথ্য ছিলেন বৃষ্টি, আমাদের অভিজ্ঞ একেবারেই টের পান নি !

অজিত । আমরা একটা অতি গুরুতর বিষয় আলোচনা করছিলাম, তাই না রমা দেবী !

ভবেশ । আচ্ছো হ্যাঁ, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরাও আলোচনা করছিলাম ।

( সবাই হেসে উঠে )

রমা । কতদূর অগ্রেসব হতে পেরেছেন ভবেশবাবু ?

ভবেশ । অগ্রেসব হতে পারছি কৈ, পদে পদে বাধা উপস্থিত হচ্ছে । এই যেমন প্রথম বললে লতি বোকে না—রূপ বললে আমি

বুঝি এক রকম, লতি বোঝে আর এক রকম, রস বললে লতি বোঝে এক রকম, আমি বুঝি আর এক রকম।

রমা। এ দিকেও ঐ ব্যাপার, এগোনো যাচ্ছে না, একটার পর একটা বাধা আসছে, স্বাধীনতা বললে আমি বুঝি এক, অজিত-বাবু বোঝেন আর, সাম্যবাদ বলতে অজিতবাবু বোঝেন এক, আমি বুঝি আর।

অজিত। আমি তবু নিরাশ হচ্ছি নে, গরমিল অনেক আছে আবার মিলও ঢের আছে, যেমন ঝেঁতে হ'জনেই কাঁপ, গায়ে হ'জনেই ঘামি, ক্ষিপে গেলে হ'জনেই পাট, মূপে হ'জনেই হাসি, দুখে উভয়েই কাঁদি।

ভবেশ। (উৎসাহিত হয়ে) যথেষ্ট, যথেষ্ট, ওতেই কাজ চলে যাবে।

অজিত। শুনলেন রমা দেবী, ওতেই কাজ চলে যাবে।

রমা। কাজ চলে গেলেই কি হ'ল? কাজ ত আগেও চলছিল। আমাদের আদর্শসমাজে কাজ-চলাগোছ বিয়ে চলবে না খন্ডিতবাবু, এখানে চাই মনের সম্পূর্ণ মিলের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বস্বাধীনতার বিয়ে।

ভবেশ। এককাল যে সব বিয়ে হয়েছে তা মনের সম্পূর্ণ মিলের উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়, সর্বস্বাধীনতারও নয়, অথচ তার ফলে আপনাদের মত সম্পূর্ণ এবং শুদ্ধ মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

অজিত। এর পরে আর আপনার বলবার কিছু নাই রমা দেবী, 'সম্পূর্ণ' এবং 'সর্বস্বাধীন' কথা দুটোর উপর আপনি একটু বেশী জোর দিচ্ছেন।

রমা। আমার দাবী ছিল অজিতবাবু, আদর্শবাদী, কিন্তু এখন দেখছি সে দাবী ভুল।

ভবেশ। আপনার মত উচ্চ আদর্শের পেছনে যিনি চম্পিলা ঘুরে ঘুরেছেন তিনি যদি আদর্শবাদী না হন তা হলে বলুন আদর্শবাদী কে?

(নেপথ্যে বাঁশীর স্বর ভেসে আসে)

রমা। শুনেছেন সচজন্দের উৎসব শুরু হয়েছে।

অজিত। হরত শুভা বিবাহোৎসব।

রমা। বাঁশীর স্বরে বুঝতে পারছি ওরা নাচছে

লতি। চলুন রমাদি, ওদের নাচ দেখতে যাই।

ভবেশ। শুভা নাচে বন্দ নয়, লতি না হর ওদের নাচট শিখে নিও।

রমা। মন্দ নয় কি বলছেন ভবেশবাবু ওদের নাচ অপূর্ণ।

সচজ ও মাবসীল ভক্তাংশুলা মনের ভাবকে পরিষ্কার হৃদয়ে তোলে।

লতি। (আগ্রহের সঙ্গে) চলুন না রমাদি।

রমা। চল যাচ্ছি—লক্ষ্য করেছেন অজিতবাবু, ওদের বাঁশীর সুর মনকে টানতে থাকে।

(সকলেই প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক

বেলা তখন পূর্ণাহ্ন, কুটীরগুলির সামনে বসে বৈজ্ঞানিক বিজয় একমনে লোহা পিটছে। প্রবেশ করে ভবেশ, গণেশ, সবিতা ও লতি। ভবেশ ও গণেশের হাতে লম্বা ঘাসের বোঝা, লতি ও সবিতার হাতে কচিপাতা আর ফুল। সবিতার মূপে গান। হাতুড়ি কেলে রেখে বৈজ্ঞানিক ঘুরে বসে।

বিজয়। ব্যাপার কি! রোজ মাংস খেয়ে বুঝি অকণ্ঠ হয়েছি তাই মূপ বদলাবার জগে আছ ঘাস আর কচিপাতার ব্যবস্থা! তা মন্দ কি।

ভবেশ। এ সব আয়োজন পেটের তাগিদে নয়—হৃদয়ের তাগিদে।



লতির কলহাংগতার ভিতর ভবেশবাবু একটা কবি-প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন।

সবিতা। আমমা সপিং করে এলাম বিজয়বাবু। (ঘাস দেখিয়ে) এই সব দামী শাক্তি আর (ফুল দেখিয়ে) এই সব গয়না নিয়ে এলাম। আজকে আমাদের উৎসব।

বিজয়। উৎসবটা কি বিবাহ-বিচ্ছেদের ?

ভবেশ। আজ্ঞে না, মিলনের।

বিজয়। ( আশ্চর্য্য হয়ে ) আবার মিলন।

সবিতা। আবার মিলন, তবে এবার কিছু চেরফের আছে।

বিজয়। ( আরো আশ্চর্য্য হয়ে ) এত অল্প সময়ে এত দ্রুত উন্নতি! বলুন তো সবিতা দেবী চেরফেরের কলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াল ?

ভবেশ। গণেশের ব্লাউজের নৈট এবং বাজে ঘুম হয় এত তথ্য জেনে সবিতা দেবী মুগ্ধ হয়েছেন।

গণেশ। ( নিশ্চয়ই হাস্য করে )

সবিতা। লতির কলহপ্রিয়তার ভিতর ভবেশবাবু একটা কবি-প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন।

লতি। ( লজ্জিতভাবে পাশ ফিরে দাড়ায় )

বিজয়। খুবই আনন্দের আর আশার কথা।

ভবেশ। আনন্দের ও আশার এইখানেই শেষ নয়, অজিতবাবু রমা দেবীর মধ্যে তাঁর আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন।

[ শুকনো মুখে কুড়ুল কাখে অজিতের প্রবেশ, সকলে সোংসাতে তাকে অভ্যর্থনা করে ]

সবিতা। আপনি যে একা অজিতবাবু, রমা কোথায় ?

অজিত। ( বিষণ্ণভাবে হাসে )

ভবেশ। বাস্তব হচ্ছেন কেন, ঘোঁরা যখন দেখা দিয়েছে, বক্তা নিকটেই আছেন, সময়মত এসে পড়বেন।

অজিত। ( স্তানভাবে চেঁসে ) এইখানেই প্রমাণ হচ্ছে ঋতু শাস্ত্রেও অসঙ্গতি আছে, বক্তার অবস্থানে ঘোঁরা দেখছেন।

সবিতা। এ আপনার অজ্ঞান অজিতবাবু, রমাকে ছেড়ে আপনি পালিয়ে এলেন ?

অজিত। একেজ্ঞে অজিতবাবুকে ছেড়ে রমা পলায়ন করেছেন।

সবিতা। ( আশ্চর্য্য হয়ে ) বলেন কি অজিতবাবু।

ভবেশ। কি হয়েছে খুলে বলুন তো ?

অজিত। রমা দেবী সহজতমের সমাধি সোপা দিয়েছেন।

[ সবাই হেসে ওঠে ]

সবিতা। আপনি নিশ্চয় তামাশা করছেন অজিতবাবু।

অজিত। ( কুড়ুল নানিয়ে বেগে ) আজ্ঞে না, এটা তামাশার বিষয় মোটেই নয়।

ভবেশ। ওহো প্রসিদ্ধি, রমা দেবী ঐ অসভ্যলোককে সভ্য করার মতলব করেছেন।

অজিত। না উঠেটা বুঝেছেন, সহজতমের সংসর্গে রমা দেবী নিজেই সভ্য হবার মতলব করেছেন। বাদেও আপনি অসভ্য বলছেন রমাদেবী তাদেরই পরম সভ্য মনে করেন।

সবিতা। ওদের কিছু কিছু সঙ্গ আছে একথা স্বীকার করতে হবে।

অজিত। কিছু কিছু নয়, রমা দেবীর মতে ওরা সর্বগুণের আধার। তা ছাড়া ওদের কোন শাসনতন্ত্র নেই।

সবিতা। ( হঃস্বিত ভাবে ) এখন কি উপায়! ওকে ফিরিয়ে আনবার একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।



“উদীয়মান সূর্যের অরণ আলোর আমি তাঁর মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লিপি পাঠ করলাম।”

অজিত। ( বসে পড়ে ) আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সহজ-পল্লীর প্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গিয়েছিলাম, সেইখানে সেই সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে বললেন, “আপনি কিংবা বান অজিতবাবু, আমি আমার জীবন-দেবতার আত্মনা শুনতে পেরেছি, আমার সাধনা ও সিদ্ধি ঐ ওদের মধ্যে।” উদীয়মান সূর্যের অরণ আলোর আমি তাঁর মুখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লিপি পাঠ করলাম।

সবিতা। তা হলে জোর করে ফিরিয়ে আনতে হবে।

অজিত। না—তা অসম্ভব।



ভবেশ। তা হলে তাঁর ব্যক্তিত্বাত্ম্যে হস্তক্ষেপ করা হবে।

বিজয়। (হাতুড়ি রেখে) না, ব্যক্তিত্বাত্ম্যে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। বম্বা ইচ্ছে করে যেখানে গেছে সেইখানেই থাকুক।

সবিতা। কিন্তু—

অজিত। আমিও এ 'কিন্তু'র অবতারণা করেছিলাম। তিনি বললেন, "সমস্ত 'কিন্তু'র অবসান করে দিয়ে আমি এসেছি।"

সবিতা। (চঃপিত ভাবে) আমাদের আজকের উঃসব তা হলে বন্ধ থাক।

বিজয়। কেন বন্ধ থাকবে? এ উঃসব হচ্ছে মিলনের উঃসব, সবিতাদেবী মিলিত হচ্ছেন গণেশের সঙ্গে, ভবেশবাবু মিলিত হচ্ছেন লতিব সঙ্গে, বম্বা মিলিত হয়েছে সহজদেব সঙ্গে, আমার মতে উঃসব বীতিমত জাঁকালো ওয়া উচিত।

ভবেশ। (উঃসাহিত ভাবে) ঠিক কথা, যুক্তিসঙ্গত কথা।

সবিতা। তা হলে এসো লতি, আমরা আয়োজন করতে লেগে বাই।

ভবেশ। নিশ্চয়, নিশ্চয়, পোশাক-আশাক করতেই তোমাদের অনেক সময় লেগে যাবে।

সবিতা। এসো লতি, এস (ঘাস ও ফুলের বোঝা নিয়ে লতি ও সবিতা কুটীরে প্রবেশ করে)।

ভবেশ। (অজিতকে লক্ষ্য করে) অতঃতাহাশ হয়ে পড়বেন না অজিতবাবু, আপনি শু আশাবাদী লোক।

অজিত। (হতাশ ভাবে) আমি মোটেই হতাশ হইনি ভবেশবাবু।

বিজয়। সামান্য বাধাতে বিপ্রবী কখনও হতাশ হই না। আমরা একটা বিরাট কাজে হাত দিয়েছি, এ কাজ সফল করে তুলতেই হবে।

ভবেশ। অজিতবাবুর নেতৃত্বে সফলতার পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি।

বিজয়। (ভেসে) কার নেতৃত্বে বললেন?

ভবেশ। (সগর্বে) অজিতবাবুর নেতৃত্বে।

বিজয়। পৃথিবীতে যারা দেগেও দেগতে চায় না তাদের মধ্যে আপনি একটি।

ভবেশ। পাণ্ডনাঙ্গরকে অবশ্য অনেক সময় দেগেও দেগতে চাই নে, তা ছাড়া আর সব আমি বেশ ভাল করেই দেগতে পাউ মশায়।

বিজয়। কৈ আর দেগতে পেলেন! ব্যক্তিক নেতৃত্ব যে হাত বদলেছে তা দেগতে পেয়েছেন কি?

ভবেশ। তাই নাকি অজিতবাবু? আমরা শু আপনাকেই নেতা জানতাম।

অজিত। ও বিষয়ে এখনও ভোট নেওয়া হয়নি।

বিজয়। আমি কেবল এখানকার নেতৃত্বের কথা বলছি, আমি ব্যাপকভাবে পৃথিবীর নেতৃত্বের কথা বলছি। চেরে দেখুন

তাত্ত্বিক আর রাষ্ট্রনৈতিকের নেতৃত্ব শেষ হয়ে গেছে—স্বক হয়েছ বৈজ্ঞানিকের নেতৃত্ব।

অজিত। তাত্ত্বিক আর রাষ্ট্রনৈতিক চিরকাল নেতা থাকবে।

বিজয়। ভুল, ভুল! মনে পড়ে একদা স্বর্গের রাষ্ট্রনৈতিকের দল দর্বাচির দরজায় ধরণা দিয়েছিলেন? ঠিক তেমনি আজ আবাব রাষ্ট্রনৈতিকের দল বৈজ্ঞানিকের দরজায় ধরণা দিয়েছেন। আজ বৈজ্ঞানিকের সাধনায় তৈরি হচ্ছে এটিম বম, হাইড্রোজেন বম। যে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বড় আজ সে দেশ বড় নয়, যে দেশের বৈজ্ঞানিক বড় আজ সে দেশ বড়।

ভবেশ। মশায় তো পান দুটো কুড়ল তৈরি করেছেন।

বিজয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কুড়ল তৈরি হতে লেগেছিল কয়েক হাজার বছর, আমার লেগেছে মাত্র ছ'মাস।

ভবেশ। এই হিসেব অনুসারে বৈজ্ঞানিক এটিম বম তৈরি করার আশা রাখেন কি?

বিজয়। 'দ্বীপে এটিম বমের কোন দরকার নেই, কুড়লই যথেষ্ট। আপনাদের মত বীরও কুড়লের সাহায্যে একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারবেন।

ভবেশ। ম'ফ করবেন, অত বড় কাজ আমাধারা হবে না।

বিজয়। তা হলে অঃতন, একটা সামান্য কাজ করুন, এই হাতুড়িটা দিয়ে পানিকটা লোতা পিটুন।

(ভবেশ এগিয়ে এসে হাতুড়ি নিয়ে লোতা পিটতে বসে, অজিত গালে হাত দিয়ে চিন্তামগ্ন হয়, গণেশ গোঁফে তা দেয়। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটতে তার পরে লম্বা ঘাসের সাগরা পরা, ফুলের মালা গলায় প্রবেশ করে সবিতা ও লতি।)

ভবেশ। (হাতুড়ি ফেলে দিয়ে) কি সন্দেহ, কি অপূর্ব!

বিজয়। উঃসবের আয়োজন শু বিশেষ ভাবেই হয়েছে।

ভবেশ। (সবিতা ও লতিকে) আপনাদের এইখানে, এই মাঝখানে আসুন, আমরা চারদিকে ঘিরে বসছি।

সবিতা। (মাঝখানে এসে) তার পরে?

ভবেশ। তার পরে নৃত্য আর গীত।

সবিতা। এ শু হ'ল আমাদের তবক্ষ থেকে, আপনাদের তবক্ষ থেকে কি হচ্ছে?

ভবেশ। আমরাও নাচে যোগ দেব।

অজিত। আজ্ঞে না, আপনাকে আর নেচে দরকার নেই, সেদিন আপনার নাচের নমুনা দেগেছি।

ভবেশ। তা হলে আমি হাততালি দেব।

গণেশ। আজ্ঞে, আমি বাণী বাজাব (একটা বাণী ব'র করে)

বিজয়। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, উঃসবের শেষে আমি 'আলীক' করব।

ভবেশ। (বাস্তব ভাবে) তা হলে আর শেরি কেন, নাচগান শুরু হোক!

[সবিতা ও লতি একটা ভঙ্গলী নাচ ও গান শুরু করে,  
কিছুক্ষণ নাচ গান চলে, হঠাৎ ছুটে প্রবেশ করে রমা,  
আলুখালু চুল, অসংযত বেশ, নাচ-গান বন্ধ হয়ে যায়]

অজিত। রমা, রমা, কি হয়েছে, তোমার এ কি অবস্থা?

রমা। (বেশ সংযত করতে করতে) আমি দেখেছি অজিত-  
বাবু, আমি দেখেছি।

সকলে। কি দেখেছ?

রমা। আমি দেখেছি—পরিষ্কার দেখেছি।

ভবেশ। বলুন না খুলে কি দেখেছেন?

রমা। সত্যি বলছি আমি দেখেছি।

সবিতা। (চিঙ্কিত ভাবে) মাথা পারাপ হয়ে গেছে অজিত-  
বাবু।

রমা। না, না, মাথা পারাপ হয়নি, আমি ঠিক দেখেছি।  
উদ্ভয়ের ঐ পাভাড়াটার মাথার দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমি  
দেপলাম আসছে, এই দিকে আসছে।

ভবেশ। নবীন সভ্যতার চেট!

রমা। না—জাহাজ।

সকলে। (উত্তেজিত ভাবে) জাহাজ, জাহাজ আসছে?

রমা। হ্যাঁ, জাহাজ আসছে।

সবিতা। (উত্তেজিত ভাবে) জাহাজ আসছে, সত্যি বলচ  
জাহাজ আসছে? কোথায়, কোন দিকে?

অজিত। আপনারও কি মাথা পারাপ হ'ল সবিতা দেবী?

[সে কথায় বর্ণপাত না করে সবিতা ছুটে বেরিয়ে যায়,  
পিছনে পিছনে যায় ভবেশ]

রমা। চলুন অজিতবাবু, চমক দাদা আর দেরি করো না।

অজিত। এ ছাঁপ ছেড়ে যাওয়া এখন আমাদের উচিত  
হবে না।

রমা। কিন্তু—

অজিত। আপনি ত সমস্ত 'কিন্তু'র অবসান করে দিয়েছেন।

রমা। এখন তর্ক করার সময় নেই অজিতবাবু।

অজিত। ভেবে দেখুন, আপনার সেদিনকার সেই দুট প্রতিজ্ঞা?

রমা। জাহাজ এসেবে সেদিন সেকথা ভাবতেই পারি নি।

অজিত। আশ্চর্য—

বিজয়। কিছুটা আশ্চর্য নয়, পুরনো পৃথিবীটার সঙ্গে যাট  
শাস্ত্র যোগাযোগ হয়েছে 'অমনি মাথাকর্ষণের টানে কাত হয়ে  
পড়েছি। বৃন্দলে ভাট, হর কালস্রোতের কিনারায় গালে হাত  
'য়ে বসে থাক, স্রোতের আপাতে তিলে তিলে পুরাতন ক্ষয়ে যাবে,  
তুন দেখা দেবে; আর তা না হলে নিজের হাতে পুরনোকে নিশ্চয়  
বে ভেঙ্গে ছুঁড়ে করে ফেল, যেন সে আর আকর্ষণ করতে না  
পারে।

[ছুটে সবিতা প্রবেশ করে, পিছনে পিছনে প্রবেশ করে  
ভবেশ]

সবিতা। সত্যি জাহাজ এসেছে—বোট প্রায় কিনারায় এসে  
পড়েছে। চলুন, চলুন, দেরি করবেন না।

রমা। চলুন অজিতবাবু, দাদা চল।

[সবিতা এগিয়ে যায়, ভবেশ কি যেন খুঁজতে থাকে]

সবিতা। (ভবেশকে) ওগো এস, দেখি করছ কেন?

ভবেশ। এট আসছি (খুঁজতে থাকে)

সবিতা। (বিস্ময় হয়ে) পাগলের মত কি করছ?

ভবেশ। অজিতবাবুর পাওড়া সেট সোনার টুকরো খুঁজছি।

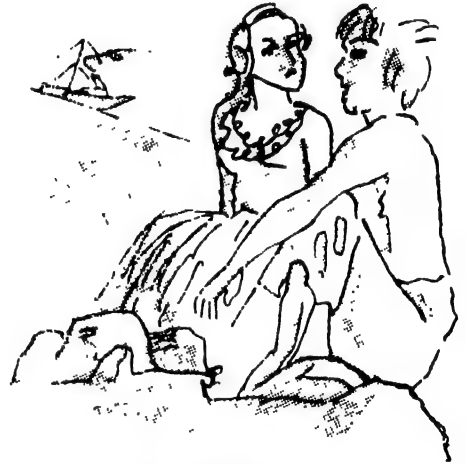
[সবিতা ফিরে এসে ভবেশের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়]

রমা। দাদা চল, আমুন অজিতবাবু (এগিয়ে যায়)

অজিত। আমার তেমন যেতে উচ্ছে করছে না।

রমা। (অহঙ্কী করে) চলে আসুন।

[রমা, অজিত, বিজয় পাকান করে, দাঁড়িয়ে থাকে গণেশ  
আর লতি]



“লতি—তুই যাবিনে?  
গণেশ—না”

লতি। তুই যাবি নে?

গণেশ। না।

লতি। (গণেশের কাছে এসে) তুই এখানে থাকবি?

গণেশ। তুই যাবি ত বা, আমি এখানে থাকব, আমি এখন  
এখানেই মালিক।

লতি। আমিও থাকব।

[হ'জন হ'জনের দিকে তাকায়, লতি গণেশের আরও  
কাছে সরে আসে]

পটক্ষেপ

## প্রাচীন ভারতে বৈদিক-সংগঠন

শ্রীশ্ররেশপ্রসাদ নিয়োগী

প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সেই যুগের ভারতীয়েরা সাধারণতঃ পশুচারণ ও কৃষি-কাণ্ডা করিয়া জীবনধারণ করিতেন। তাই তখনও বাণিজ্যের উদ্ভব হয় নাই। ঋগবেদে অবশ্য আমরা কয়েকটি শিল্পের নাম পাই।

বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন গ্রামে চাষিদের অপেক্ষা কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক বেশী হইতেছে। অনেক কন্যা ও উৎসাহী যুবক এই স্বযোগ গ্রহণ করেন। তাহারা উদ্ভূত পণ্য বহন করিয়া লাভের আশায় দূরত্বিত অঞ্চলে বাইরে আসিয়া থাকেন। এইভাবে বৈদিক যুগে বণিকের উদ্ভব হয়। অথর্ববেদ ও যজুর্বেদ হইতে সে যুগের বণিক সংস্কে আনন্দ অনেক বিষয় জানিত পার যায়।

যে ৩৪৮, সমগ্র বৈদিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে সাধারণতঃ তিন প্রকারের বণিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহারা বৈদ্য, পণি ও ব্রাহ্মণ বণিক। যজুর্বেদের সমাজ-ব্যবস্থা অনেক উন্নত ছিল এবং এই বেদের শৈলীভাষ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদ্যের উপর বাণিজ্যের ভাণ্ডার্য করা হইয়াছে। এই তিন শৈলী বণিকের মধ্যে বৈদ্য পাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ এবং বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থানে তাহাদের গুণ বর্ণিত করা হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যে পণি শব্দের অর্থ বণিক। এত পণিরাকে বা কাহারো তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে বৈদিক সাহিত্যে অল্পখারী ইহারা খুব জবাবদস্ত বণিক ছিল। তাহাদের প্রধান উপকৌশল ছিল ব্যবসা ও অত্যধিক সূদে ঋণদান করা। অনেক পণ্ডিতের মতে তাহারা ভারত ব্যবসায়ের বিদগ্ধ বণিক। ভাস্কর্য্য নিচাণ করিয়া আবার কেহ কেহ বলেন যে, পণির ফিনিস দেশের অধিবাসী।<sup>১</sup> যাহা হউক, তাহারা যে আধা ছিল না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহারা আধাদের দেবদেবী বিবাস

করিত না ও পুরোহিতদের সম্মান করিত না। রাজসেনারী সংহিতায় “আপোতোহমন্ত পণয়োজন্তম দেবপীয়ব” এই পংক্তিটি পাওয়া যায়। ইহার অর্থ “পণির বাহারা দুঃখ দুর্দশা অনিয়ন করে এবং বাহারা দেবদেবী তাহারা এই স্থান হইতে (দেশ হইতে) চলিয়া যাউক। পণির নিশ্চয়ই অসদ্ব্যপারে অর্থোপাজ্জন করিত, তাহা না হইলে সেই যুগের জনমত এইরূপ হইত না। ভাস্কর্য্য মহীশরের মতে পণি অর্থ “পণ্ডিত পরজৈবা ব্যবহবন্তি ইতি অনুরাঃ”। নিরুক্তে (৬.১৬) “উদ্রেঃ বিশ্বকেননাটাং অহদৃশ ঐত কৃত্য পণীরতিঃ” ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পণির ব্যতিক্রম সমগোত্রীয় ছিল। বেকনটান শব্দের অর্থ “বুদ্ধিজীবান” অর্থাৎ সূদখার। ভাস্কর্য্যের মতে পণির দ্রুতবাসী এবং অসদ্ব্যবসায়ী শিল্প ছিল।<sup>২</sup> তাহারা নাস্তিকও ছিল।<sup>৩</sup> পণির যে আধা দেবদেবীদের ভক্তি করিত না তাহা ঋগবেদের আর একটি মন্ত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়।<sup>৪</sup> আচাৰ্য্য মতেন ইহাদের ব্যাণ্ণের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং দ্রুতকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।<sup>৫</sup> পণিদের ব্যবহারে যে আধারো অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার আরও প্রমাণ দেখা যাইতে পারে। ঋগবেদে “চাকুরমাণঃ ইন্দ্রভির বায়ং মা পণিঃ ভু (১৩৩৩) এই পংক্তিটি পাই। ইহার অর্থ “২ ইন্দ্র! আমাদেরকে সম্পদ বিত্তের সময় (পুরুদানের সময়) আমাদের সহিত পণিদের মতে ব্যবহার করিও না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পণির জোড় করিয়া অর্থ আদায় করিত। এইভাবে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে আধা ও পণি-দিগের মধ্যে সংঘর্ষ দেখিতে পাই। পূর্বের অপ্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়িও ঋগবেদে (৮৩৪) এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ “সব পণেঃ সমাবিন্দতঃ ভাজনম” পংক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। একেই আমরা দেখিতে পাই যে, আধারা তাহাদের যুদ্ধের দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া পণিদিগের নিকট হইতে তাহাদের সম্পদ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পণির একবার আধাদের

১। তুল্যায় বাণিজ্য ৩০, ১৭

২। বিশো বিশো বো অতিবিস্মৃতি পুষ্টিকায়ঃ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) ঋগবেদ ১৭৪১ বিশো বৈশ্বাস্ত্রে বাণিজ্যে বতবনমাদিঃ কৰ্মমণি বহুলাঃ পমচ্চাঃ। অতো বিশ্বঃ পুষ্টিমঃ। ভাস্কর্য্য

৩। পণিঃ পণিঃ। পণিঃ পণাঃ। বণিক পণাম্ বেনেতিঃ। (যাক্শের নিরুক্ত)

৪। যেমন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদের অধ্যাপক শ্রীশ্ররেশপ্রসাদ নিয়োগী।

৫। দ্রুতকারীগোষ্ঠিতবতি নহি বিস্ত্রেন কমনা বাচরতি।

৬। অহনি পণ্ডিত

৭। উৎপন্নীতঃ পণিঃ মন্দঃ। (ঋগবেদ ১৪৪২)

৮। পণী বণিজ্যে লুক্কান্ অফ্রো উৎপন্নঃ ইত্যঃ নাশাতঃ।

গরু (ধনসম্পদ) অপহরণ করিয়াছিল। অগ্নি ও সোমের উপাসকেরা এই গরু পুনরুদ্ধার করিয়াছে।<sup>৯</sup>

বৈদিকযুগে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরা বাণিজ্য করিতেন না। পূজা-আর্চা ও কৃষিকার্যাই ছিল তাঁহাদের প্রধান উপ-জীবিকা। তবে বিশেষ কোন দৃষ্টান্তে তাঁহারাও ব্যবসা করিতে বাধ্য হইতেন। এইভাবে ঋগ্বেদের এক স্থানে দেখা যায় যে, অনাবৃষ্টির ফলে দীর্ঘপ্রবস নামে এক ব্রাহ্মণ ধনভাণ্ডের আশায় ব্যবসা করিতেছেন।<sup>১০</sup>

এই ত গেল বণিকদের কথা। ইহাদের কোন সংগঠন ছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে বৈদিক সাহিত্যে “গণ”, “ব্রত” প্রভৃতি সংগঠনবাচক শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংগঠনগুলি যে বণিকদের সংগঠন ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে অগ্নিদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পণিরী সংগঠিত হইয়াছিল। ইহার সভ্যতা প্রমাণ করা শক্ত। তবে পণিদিগের যে সংগঠন ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ সংগঠন ছাড়া ঐ যুগে ঐ ধরনের ব্যবসা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বৈশ্বদেব ও যে সংগঠন ছিল ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশ্বদেব সংগঠনের প্রধান কর্তৃকর্তা ছিলেন “বিশপতি” অর্থাৎ বৈশ্বজ্ঞাতির অধিনায়ক।<sup>১১</sup>

অর্থর্ববেদ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক বণিকেরা মালপত্র বহন করিয়া বিপৎসঙ্কুল অরণ্যের ভিতর দিয়া লাভের আশায় এক স্থান হইতে অত্র স্থানে যাইতেছে। ইহাতে অনেক সময় দম্যুতস্কর ও বস্ত্রকীবজস্কর হাতে তাহাদের জীবন ও মালপত্র হারাইতে হইত, এবং এই বৈদিক বণিকই পরবর্তী রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধ-যুগের সার্ব্বভাষ ও ভ্রাম্যমাণ বণিকদের অগ্রদূত।

পরবর্তী বৈদিক যুগে আমরা শ্রেষ্ঠী (বাংলা শেঠ, দক্ষিণ-ভারতে—chetty) শব্দ পাই। এই শ্রেষ্ঠী শব্দের অর্থ প্রধান বণিক বা বণিকসার্থের প্রধান। ইহা সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ (প্রধান) শব্দ হইতে উৎপন্ন। এই যুগে আর্যেরা এক এক দেবতাকে রাজা, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি কল্পনা করিতেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে “ভগী বা আকাময়ত। ভগ শ্রেষ্ঠী দেবানাং স্যামিতি। স এতং ভগায় কন্তুনীভ্যাং চক্লং নিরবপং।

ততো বৈ স ভগ শ্রেষ্ঠী দেবানাং ভবং। ভগ হবৈ শ্রেষ্ঠী সমানানাং ভবতি”<sup>১২</sup> (তৈ ব্রা. ৩।১।৪।১০) এই ছত্রটি পাওয়া যায়। এখানে আর্যেরা ভগকে দেবতাদের শ্রেষ্ঠী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ভগ আর্যদিগের অতি প্রাচীন দেবতা। তিনি ছিলেন সৌভাগ্যের দেবতা এবং বার আদিত্যের এক আদিত্য। আবিস্তারও ইহার উল্লেখ আছে। (বগ) ভগ ছিলেন সমগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রধান প্রধান গুণ ছিল—সৌভাগ্য, মান, নাম, ষণ ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তখনকার দিনে এক জাতীয় বণিকদের লইয়া সার্ব গঠিত হইত এবং সার্থের প্রধানের ঐ সকল গুণ থাকে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (ক) নূতন শহরের উৎপত্তি, (খ) বণিক ও কারিগরী সার্থের প্রসার ও (গ) দেশী ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার। বণিকসার্থের প্রসারতা লাভের একমাত্র কারণ দেশে বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি।

রামায়ণে আমরা ‘নৈগম’ ও ‘গণবল্লভ’ শব্দ পাই। নৈগম শব্দের অর্থ শহুরে বণিকসার্থ। জয়সোয়ালের মতে এই নৈগম খুবই সংগঠিত ছিল। রাজ্যের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে তাহাই প্রভুত্ব করিতেন। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় যে, অযোধ্যানগরে প্রবেশের সময় এক জন বণিকসার্থের প্রধান রামচন্দ্রকে সন্মুখীন করাইতে-ছেন।<sup>১৩</sup> এই বণিকসার্থের প্রধানই তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হইতেন এবং ইহারা বর্তমান যুগের শেরিকের মত ছিলেন।

মহাভারত হইতে বণিকসার্থের অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা যায়। আরণ্যপর্বে দেখা যায় যে, এক মহাসার্থ ব্যবসার জন্য চেন্দী রাজ্যের দিকে যাইতেছে (দময়ন্তী উপাখ্যান) মহাসার্থের অর্থ বড় বণিকদল। ইহাতে ছিল প্রধান বণিক, সার্থের সদস্তেরা, হস্তি, অশ্ব, রথ এবং সহকারী ভৃত্য প্রভৃতি।<sup>১৪</sup> এই সার্থের প্রধান অধিকর্তাকে বলা

12. Bhaga the God desired—“let me be the Lord of earthly and supernatural powers and be the leader of the gods. Bhaga is the chief among the equals.”—(Author's translation).

১৩। কন্নাৎ প্রকৃতি মুখ্যান্তে জেগীমুখ্যাকরাবন

কিঞ্চি নাচ তিষ্ঠতি বোবরাভাষিযেদে।

অথোধ্য ২৩।১৬

১৪। হস্তাশ্বাশ্ব সংকুলং (৩।৬।১।১০৬)

৯। অগ্নীতমো চেতি তদীধাঃ বাম্। যদযুয়ো তমবস পণিঃ গোঃ। (গোঃ অর্থ এখানে ধনসম্পদ)

10. Yabhih sudana Ausijaya Vanije  
Dirghasyavasa madhu kosa aksarat.  
—(R.V. 1.112.11)

১১। এখানে বিশ শব্দের অর্থ “বৈজ্ঞা”, অনেক লৈজ (বণিক)

হইত সার্থবাহ এবং এই সার্থবাহই ছিলেন সার্ধের প্রধান কর্মকর্তা। ১৫

মহুসংহিতায় আমরা “শ্রেণী” শব্দ পাই। এই শ্রেণী শব্দের অর্থ বণিকসংগঠন (মেণাতিথি ও কুহুকের মতে)। এই শ্রেণীর নিয়মাবলী প্রণয়ন ও রক্ষা করিবার ভার রাজার উপর তুল্য করা হইয়াছে। ১৬ বশিষ্ঠ ও গোতম ধর্ম্মশাস্ত্রে বণিকসার্ধের নিয়মাবলীর উল্লেখ আছে। তবে সেই সকল নিয়মাবলী কি আমরা তাহা জানি না।

বৈদিক যুগের শেষভাগে বণিকসার্ধের উদ্ভব হইলেও মৌর্য্যপূর্ব্বযুগ হইতেই ইহার প্রকৃত সংগঠন আরম্ভ হয়। এই যুগের খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৪০০ খ্রীঃ পূঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস মহামুনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও অশ্বাত্তা সূত্র সাহিত্য হইতে জানিতে পারা যায়। এই যুগে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষুদ্র উন্নতিলাভ করিতে থাকে। পাণিনি পারস্ব তিব্বত প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গৃহ্যসূত্রে দেখা যায় যে, বৈশ্বরাই প্রধান বণিকসম্প্রদায়। পণ্যসিদ্ধি যজ্ঞে তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবসার জন্য ঋণিত করিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছেন। ১৭ এই পণ্যসিদ্ধি যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য অধিক ধনলাভ করা। আরও দেখা যায় যে, লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে প্রায় সকল বণিকই কোন-না-কোন সার্ধের সদস্য। কেবলমাত্র তাহাই নহে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ইহাদের প্রবল প্রভাব ছিল।

মৌর্য্যযুগে এই সকল বণিক প্রতিষ্ঠান এত শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, তাহাদের কার্যকলাপ, লভ্যাংশ প্রভৃতি সম্রাটের নিয়ন্ত্রাধীন ছিল। নৈগমদেব তখন নিজস্ব সভাগৃহ ও দপ্তরখানা পর্য্যন্ত ছিল। ১৮ আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৌর্য্য সম্রাট তাহাদিগকে বৈধ মুদ্রা চাপু করিবার এবং

রাজকীয় টাঁকশাল ব্যবহার করিবার অনুমতি দেন। এই যুগে ভারতের সহিত গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐযম শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বাণিজ্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতীয় বণিকেরা সমুদ্রগামী জাহাজে করিয়া পারস্ব, আরব প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেছেন। এই যুগেই আবান হিন্দুরা জাভা, সুমাত্রা, বলি, বোনিও প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। চাহিদা বৃদ্ধিত হওয়ার ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রসারলাভ করে ও বণিকসংগঠনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য আলোচনা করিলে বণিকসংগঠনের আরও কিছু তথ্য উদ্ঘাটন করা যায়। মহাকবি শূদ্রকের মুচ্ছকটিক নাটকের নায়ক চারুদত্ত এক বণিকসার্ধের কর্মকর্তা বা প্রধান ছিলেন। ১৯ মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে আমরা সার্থবাহ ধনমিত্রের কথা পাই। ২০ চারুদত্তের বিচারের দৃশ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, এক জন বণিক বিচারপতির (অধিকরণ) কাঙ্ক্ষ করিতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, সে যুগের বণিকসার্ধগুলি ছিল প্রতিনিধিমূলক (representative)। পালি সাহিত্যেও শ্রেণী শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুপ্তানের মতে সেট্টিরা রাজ্য কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন এবং অনেক সময় এই পদ বংশপরম্পরায় চলিত। ২১ বণিকসার্ধ বা শ্রেণী-গুলির আইন ও নিয়মাবলী রাজা স্বয়ং প্রণয়ন করিতেন এবং অশ্বাত্তা অর্থনৈতিক বিষয়ে ইহারা রাজাকে সাহায্য করিত।

গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এই যুগে বণিক সার্ধ বা সংগঠন চরম উৎকর্ষলাভ করে। গুপ্তযুগের বণিক-সার্ধ অনেকটা বর্তমান যুগের বণিক সভা বা Chamber of Comm rec-এর মত ছিল। এই যুগে বিশেষ বিশেষ জব্যের ব্যবসায়ীদের সার্ধ গঠিত না হইয়া সকল বণিক, শিল্পের মালিক, কাবিগর ও ব্যাঙ্কের মিলিত সার্ধ গঠিত হইয়াছিল। একটি গুপ্তযুগের মৌল ইহার সাক্ষ্য দেয়। ২২ ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সে যুগে সংগঠনমূলক কার্যকলাপ ভারতীয় জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া-

১৫। সাপ্তম্য নেত্র্য সার্থবাহ সার্থক্য মহতঃ প্রভুঃ সার্থবাহ

৩৬৩। ১২০ ও ১২২

১৬। জাতিজনপদাকর্ম্ম শ্রেণী ধর্ম্মাশ্ব ধর্ম্মবিদ্য—

মহু ৮। ১৫

17. The rite of *panyasidhi* or success in trade (H. 1.48) in which a portion of the particular article of trade is cut off and sacrificed with the verse, “If, O God, we carry on trade to acquire (new) wealth by means of our (old) wealth, let Soma, Agni, Indra, Brihaspati and Indra bestow lusture thereon.”

18. The Naigama was a corporate body with its own Assembly hall and office and was connected with the *gremis* or guilds of the city. These Naigamas were so powerful that they were allowed to use the Royal mint to issue legal tender coins though coinage was a royal prerogative at that time. (Jaysawal's views).

১৯। অবশিষ্ট গুপ্তাঃ বিজ সার্থবাহ চারুদত্ত ২। ১৩

২০। সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহা ধনমিত্র নাম নৌবাসনে বিপন্ন

21. In later times the Setthis were appointed by the king. The post was sometimes hereditary.—Anderson's *Pak Reader*.

২২। শ্রেণী সার্থবাহ কুলীকা নিগম

ছিল। এই সার্ঘ এত শক্তিশালী ছিল যে, সাথের প্রধান, ২০ প্রধান বণিক ২৪ ও প্রধান কারিগর ২৫ প্রকৃতিকে রাজ্য পরিচালনার বিশেষ বিশেষ ভার দেওয়া হইত। কুমারগুপ্ত ও বুদ্ধগুপ্তের মন্ত্রগাসভায় ইহাদের ডাকা হইত। সত্য কথা বলিতে গেলে উহারা দুই জনই ইহাদের হস্তে পুত্তলিকার ভায় ছিলেন। এই যুগে ভারতীয় রেশম শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং রেশম ব্যবসায়ীদের এক শক্তিশালী সার্ঘ গঠিত হয়। কথিত আছে, এই সার্ঘের চাপে পড়িয়া বুদ্ধগুপ্ত বণিকদের উপাসনার জন্য সুর্যদেবের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। ২৬ এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বদেশে ব্যবসারত এবং বিদেশে ব্যবসারত ভারতীয় বণিকদের পৃথক সার্ঘ সংগঠিত হইত।

এই যুগেই আবার স্থানীয় স্থান পরিচালনার ভার বণিকসার্ঘের উপর স্তম্ভ থাকিত। আবার বণিক অপরাধীদের বিচার তাহাদের সার্ঘেই হইত। অপরাধীকে সকল কথা বলিবার সুযোগ দেওয়া হইত এবং বণিকসার্ঘের সদস্যরা একমত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। আবার রাজস্বরবারে কোন বণিকের বিচার হইলে সার্ঘ জামীন থাকিয়া তাহাকে খালাস করিতে পারিত।

এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে ও অশ্বশাসনগুলিতে বিশেষ করিয়া “নগরশ্রেষ্ঠী” শব্দ পাওয়া যায়। ২৭ সম্ভবতঃ এই নগরশ্রেষ্ঠী রাজ্যের সমস্ত সার্ঘের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন।

২৩। নগরশ্রেষ্ঠী (Guild President) আধুনিক গুজরাতি নগরশ্রেষ্ঠী। দক্ষিণ ভারতে “লর্ড মায়র” (Lord Mayor of the town)

২৪। পথমাসার্ঘদাছ (The chief merchant)

২৫। পথমাকুলীক

২৬. The Mandasor Inscription narrates how “by command of the guild and from devotion this temple of the Sun God was caused to be built.”

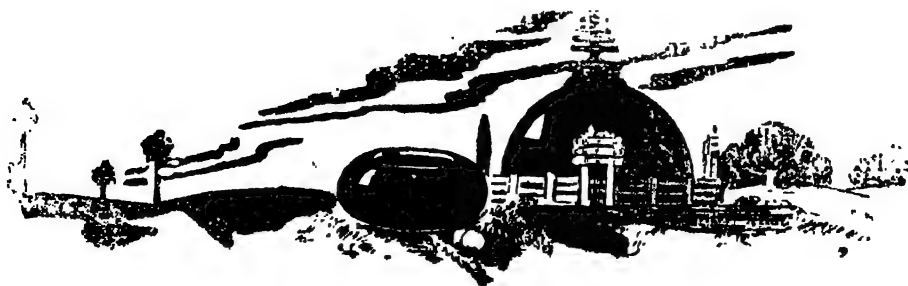
২৭। য এবং শ্রেষ্ঠী চন্দ্রদাসঃ সপ্তবিংশতি নগরশ্রেষ্ঠী - পদমারোপাতাম্  
—মুদ্রারাক্ষস, সপ্তম অঙ্ক।

রাজ্যে তাঁহার স্থান অনেকটা আজকালকার মিলিত বণিক সভার সভাপতির মত ছিল। অবশ্য তাঁহার ক্ষমতা সভাপতি অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। কারণ দেখা যায়, রাজকীয় জায়গায়ে তাঁহাকে বিচারপতির কাজ দেওয়া হইয়াছে। এই নগরশ্রেষ্ঠী পদ তখনকার দিনে খুব লোভনীয় ছিল—তাহার প্রমাণ মুদ্রারাক্ষস নাটকে পাওয়া যায়। দামোদরপুর তাম্রশাসনেও এই নগরশ্রেষ্ঠীর কথা পাওয়া যায়।

বিভিন্ন যুগে বণিক সংগঠনের রূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের ব্যবসায়ী লইয়া এক একটি সার্ঘ গঠিত হইত। এই বণিকসার্ঘের আইন প্রতিপালন ও শৃঙ্খলারক্ষার ভার বণিকপতির উপর স্তম্ভ ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে বণিকপতিই সার্ঘের সর্বময় কর্ত্তা ছিল। যে সকল সদস্য উহা প্রতিপালন করিতেন না তাহাদিগকে সার্ঘ হইতে বহিস্কার করিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। বর্তমান যুগের বণিক সভার মত ইহারা প্রতিদিন কাজকর্ম না করিলেও দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ইহাদের প্রভূত প্রভাব ছিল। রাজকীয় কোন আইন ইহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে ইহারা হরতাল প্রতিপালন করিত ও অনেক সময় প্রবল প্রতাপশালী রাজ্যকেও ইহাদের কথা শুনিতে হইত।

উপসংহারে বলা যাউতে পারে যে, গুপ্তযুগের পর হইতেই আস্তে আস্তে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য অপরের হাতে যাইতে থাকে এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলার ফলে ইহাদের সংগঠনও ক্রমশঃ হীন হইতে থাকে। তাই গুপ্তযুগের পরে ইহাদের কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না।

(This chief merchant Chandandasa should be raised to the dignity of the chief provost of all the cities of the kingdom. This suggests that there was a post like president of all the guilds of all the towns of the empire.—(Cf. Modern Federation of Commercial Associations and Chambers of Commerce).)



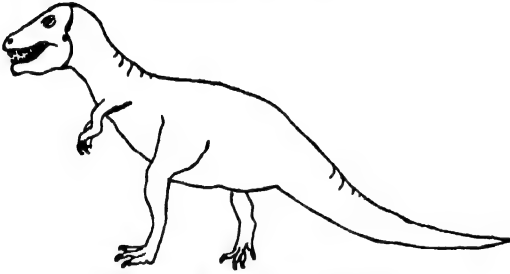
# মধ্যজীবীয় যুগের লুপ্ত প্রাণিকুল

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

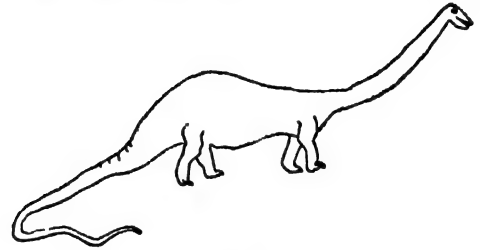
প্রথমতঃ প্রবন্ধের শিরোনামের একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এখানে পৃথিবীর ইতিহাসের যে অধ্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ইতিহাসের মধ্যযুগ নহে—উহা ভূবিজ্ঞান মধ্যজীবীয় যুগ, অর্থাৎ ইংরেজীর Medieval times নয়—Mesozoic times। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এ যুগের আরম্ভ এক কি দেড় হাজার বছর আগে নয়—এর আরম্ভ আঠার কোটি বছর আগে। আর এর সমাপ্তি হয় কোটি বছর আগে। অতএব এ যুগের ব্যাপ্তি বার কোটি বৎসর। ভূবিজ্ঞান মধ্যজীবীয় যুগ বলিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কেই বুঝায়। ইহার ব্যাপ্তিগত অর্থ এই যে, এই যুগে জীব ও উদ্ভিদ বিবর্তনের পথে প্রায় মধ্যবর্তী অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্ত্যন্ত অধ্যায়ের স্তার এই যুগেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জীব ও উদ্ভিদের উদ্ভব ও বিলোপ এবং কতক পরিমাণ

আমাদের মন বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীদের কথাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আকৃতিতে ইহাদের বৈষম্য ছিল অদ্ভুত রকমের। সর্কোশেফা ক্রুস ডাইনোসরের নাম দেওয়া হইয়াছে কম্বোনিথাস—ইহার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র আড়াই ফুট আর শরীরের আয়তন ছিল একটি সাধারণ বিড়ালের মত। ইহা হইল ক্ষুদ্রতমটির মাপ। সর্ববৃহৎদের মধ্যে আছে জাইগ্যান্টোসরাস। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ ফুট আর দৈর্ঘ্যের মধ্যে গলাটা ছিল ৩৬ ফুট লম্বা। ইহাদের ওজন ছিল আরও বিস্ময়কর। জাইগ্যান্টোসরাসের ওজন ছিল ৪০ টন অর্থাৎ প্রায় ১২২০ মণ। ত্র্যটোসরাস বৃহৎ আর একটি ডাইনোসর। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৬৫ ফুট আর লেজ ছিল ৩০ ফুট। ত্র্যটোসরাসের ওজন ছিল ৩৭ টন অর্থাৎ ১০০০ মণের উপর। আরও একটি সুবৃহৎ ডাইনোসরের নাম ডিপ্লোডোকাস,—ইহার শরীরের দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ ফুট। ইহা হইতে ধারণা করা বাইতে পারে, উহাদের দেহ



মাংসাশী ডাইনোসর টাইরানোসরাস



ডাইনোসর শ্রেণীর ডিপ্লোডোকাস

শিলার গঠন হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, ভূবিজ্ঞান জীব এবং উদ্ভিদের সন্নিবেশ ও অননুভবের দ্বারা ই পৃথিবীর ইতিহাসকে মধ্যজীবীয় প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা সম্ভব হইয়াছে।

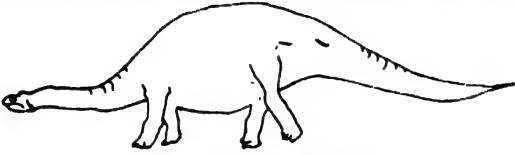
মধ্যজীবীয় যুগে জীবকুলে প্রাচীনাভাব করিয়াছিল—সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীরা। ঐ যুগে সরীসৃপজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে বহু প্রকারভেদ পাওয়া গিয়াছে। এই সময় স্লান, স্লান ও অন্যান্য এই সরীসৃপজাতীয় জীবের ছিল অব্যাহত প্রতিপত্তি। অধুনা সরীসৃপ-কুলের মাত্র পাঁচ প্রকার বংশধর বর্তমান, যথা—সর্প, কচ্ছপ, টিক-টিকি, কুমীর ও নিউক্লিডোব টুরাটোরা। বস্তুতঃ পক্ষে মধ্যজীবীয় যুগকে সরীসৃপের যুগও বলা বাইতে পারে। আবার এই যুগের সরীসৃপকুলে প্রাচীনাভাব করিয়াছিল ডাইনোসর জাতীয় প্রাণী। ইহারা ছিল ভীষণদর্শন—আর ইহাদের প্রতাপ ছিল লোদগিও। জীবাশ্ম (fossil) রূপে প্রাপ্ত ইহাদের কঙ্কালের সাহায্যে আমরা মনশ্চক্ষে ইহাদের যে প্রতিমূর্তি অবলোকন করি তাহাতে

কিরূপ সুবিশাল ছিল। ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রকারভেদ ছিল সুস্পষ্ট। ইহাদের কেহ কেহ ছিল উটপাখীর মত। ইহাদের পিছনের পা দুইটি ছিল বেশ শক্ত, আর নখ ছিল সুতীক্ষ্ণ। ইহারা খুব দৌড়াইতে পারিত। অপর পক্ষে আর কতকগুলি ডাইনোসর এরূপ সুবিপুল ছিল যে, নড়াচড়া করা তাহাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল। কেহ কেহ ছিল পানীয় জায় দ্বিপদবিশিষ্ট, কিন্তু অধিকাংশই ছিল চতুষ্পদ। ডাইনোসরদের এক শাখার প্রাণীদের ছিল গণ্ডারের মত নাকের উপর সুতীক্ষ্ণ গুড়া। বাহ্যিক আকৃতিতে ডাইনোসরদের অনেকটা কুমীরের মত ছিল যদিও তাহাদের কাহারও কাহারও দৈহিক গুণের সঙ্গে পক্ষীর শারীরিক গঠনের সাদৃশ্য ছিল। মূলতঃ সরীসৃপ বলিয়া ইহারা ভিন্ন প্রসব করিত। ইহাদের ডিম মোজোলিয়া হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ জিনেত্র ছিল।

ডাইনোসরদের ভোজন এবং গাছপালাও আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল নিরাধিবাসী। সাধারণতঃ



গাছপালা, লতাপাতা প্রভৃতিই তাহাদের আহার্য ছিল। ইহার প্রাণঃ জলাভূমিতে বাস করিত। এই সকল জলাভূমিতে জাত যুদ্ধাঙ্গির অংশই তাহাদের খাদ্য ছিল। এই সকল নিরামিষাণী ডাইনোসরের মধ্যে কাহারও কাহারও গাঁত তত শক্ত না থাকায় তাহারা খাদ্যরূপে চর্কণ না করিয়া গিলিয়া কেলিত। অপর পক্ষে কাহারও কাহারও এত শক্ত গাঁত ছিল যে, বে-কোন প্রকার যুদ্ধই হউক না কেন তাহারা অনায়াসেই তাহা চর্কণ করিতে পারিত। মধ্যজীবীর যুগের গাছপালাগুলি সাধারণতঃ তত পুষ্টিকর ছিল না। সেইজন্য অতিকার উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরের অতি-মাত্রার ভোজন করার প্রয়োজন হইত। ককালের গঠন হইতে



ডাইনোসর শ্রেণীর ত্রেন্টোসারাস

অল্পমিত হর, উপযুক্ত ত্রেন্টোসারাসের দৈনিক ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে আট মণ গাছপালার প্রয়োজন হইত। আমিষাহারী ডাইনোসরের সাধারণতঃ অপরের ডিম আহার করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহা ছাড়া তাহারা ছোট ছোট প্রাণীদেরও নিশ্চিচায়ে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিত। মাংসাশী ডাইনোসরদেরা ছিল ভয়ঙ্কর। তাহাদের গাঁত ছিল ছুরিকার ভায় তীক্ষ্ণ, নখ ছিল দ্রবং বক্র এবং কজি ছিল ভীষণ শক্তিশালী। এইগুলির সাহায্যে তাহারা অনায়াসেই প্রাণীদের হত্যা করিতে পারিত। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বত মাংসাশী জীব জয়প্রাপ্ত করিয়াছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইতেছে টাইরানোসারাস নামক ডাইনোসর। এই প্রাণীটি ছিল ৪৭ ফুট লম্বা আর প্রায় ২০ ফুট উচ্চ। ইহার ওজন ছিল প্রায় একটি হস্তীর ভায়। ডাইনোসরদের কাহারও কাটারও আদর্শই গাঁত ছিল না। শেবোক্ত শ্রেণীর খাদ্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা চলে না।

ডাইনোসর জীবদেহে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় তাহাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা। অধিকাংশ ডাইনোসরেরই বিশাল দেহ ছিল। কিন্তু তাহাদের দেহের তুলনায় মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত ক্ষয়। মস্তিষ্কক্ষয়ের ক্ষমতা হইতেই এইরূপ অনুমান করা হয়। এত বড় বিরাট বশু যে কি করিয়া এরূপ অল্প মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হইত ইহাই আশ্চর্য। ইহা হইতেই অনুমিত হর যে, প্রাণীগুলি অত্যন্ত নির্কোষ প্রকৃতির ছিল এবং তাহাদের গতিবিধি ও ক্রিয়া-কলাপ ব্যক্তিক ভাবেই নিশ্চয় হইত। ৩৭ টন ওজনের ত্রেন্টোসারাসের মাত্র ১ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্ধ সেব মস্তিষ্ক ছিল।

ডাইনোসর প্রাণীরা সাধারণতঃ স্থলেই বাস করিত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকটা গুহ আবহাওয়াতেই হইয়াছিল। পরে অবশ্য তাহারা আর্দ্র আবহাওয়াতেও বসবাস শুরু করিয়াছিল।

ইহাদের কেহ কেহ উভচরও হইয়া পড়িয়াছিল। ভূপৃষ্ঠে তাহাদের অবার গতি ছিল। পৃথিবীর সর্বত্রই ডাইনোসরের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন শ্রেণীর ডাইনোসরদের অস্তিত্বের একটি দীর্ঘ মধ্যজীবীর যুগের প্রারম্ভিক শিলা হইতে অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রাপ্ত হন। পরবর্তী কালের ডাইনোসরদের দেহাবশেষ ডাঃ ম্যাটলি ওলিভের জব্বলপুর অঞ্চল হইতে ও মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত ওয়ায়োরার নিকটবর্তী পিসডুয়া নামক স্থান হইতেও পাইয়াছেন। মাদ্রাজের অন্তর্গত ত্রিচিনোপল্লীর নিকটবর্তী আর্ধ্যলুর নামক স্থান হইতেও ডাইনোসরদের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। একই প্রকার ডাইনোসরদের জীবাশ্ম মাদাগাস্কার, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের কোন কোন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মধ্য-জীবীর যুগের প্রায় শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, দক্ষিণাভা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থান একীভূত ছিল। এই সংযুক্ত মহাদেশের নাম দেওয়া হইয়াছে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ।

এখানে প্রসঙ্গতঃ ডাইনোসরদের বিলোপের বিষয় একটু আলোচনা করা দরকার। মধ্যজীবীর যুগের শেষ দিকে ভূপৃষ্ঠে একটি বিরাট আলোড়ন চলিতেছিল। ইহার ফলে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া অনেকটা বর্তমানের রূপ পায়। ভারতে দক্ষিণাভা অঞ্চলে বহুল পরিমাণে লাভা উল্গারগের ফলে দক্ষিণাভার মালভূমির সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত হিমালয়, আরস প্রভৃতি পর্বতমালার সৃষ্টিও প্রায় আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং তৎকাল ভূপৃষ্ঠে আলোড়নও চলিতেছিল। ইহার ফলে ডাইনোসরদের আবাসভূমির পরিবর্তনের জন্য উদ্ভিদশ্রেণীর বহুলপরিমাণে বিলোপ সাধিত হয়। সেইজন্য উদ্ভিদভোজী ডাইনোসররা অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া পড়ে। ডাইনোসরদের শেষ অবস্থার শারীরিক গঠনবৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়িয়াছিল। জীবজগতে ইহার অর্থ জাতিগত বার্তিকা। প্রাণিকুলের কোন শ্রেণী এই অবস্থার পৌছিবাব পর কোনরূপ অবস্থান্তরের সহিতই সাধারণতঃ তাহাদের বিলোপ ঘটয়া থাকে। স্থলভূমির উত্থানের ক্ষয় বধন আবাসভূমির পরিবর্তন ঘটিল তখন সেই অবস্থান্তরের সহিত ডাইনোসররা নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারিল না। অপর পক্ষে মাংসাশী ডাইনোসরসমূহ কর্তৃক ডিম ও দুর্বলতর ডাইনোসরদের ভক্ষণ হেতু তাহাদের দ্রুত বিলোপ ঘটে। পরবর্তী যুগের অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন স্তন্যপায়ী জীবদের সহিত সংগ্রামে এই নির্কোষ ডাইনোসরদেরা পরাজিত হয়। জীবন-সংগ্রামে ইহাই তাহাদের চূড়ান্ত বিপর্যয়। ইহারই ফলে তাহারা আজ বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন করিয়া ১২ কোটি বছর ভূপৃষ্ঠে অবাধে রাজত্ব করিয়া ডাইনোসর প্রাণিকুল ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লয়। একদা তাহাদের অপ্ৰতিহত প্রতাপে অস্তিত্বের সাক্ষ্য আজ শুধু ভূগর্ভে প্রোথিত ককালের ধ্বংসাবশেষসমূহ।

# চুবি

## শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দ্বী-আচারের জন্ত বব কনেকে সবে ছাঁদনাতলায় নিয়ে বাওয়া হয়েছে—হে-হে শব্দ উঠল চারদিকে। কি ব্যাপার? বিয়ে বাড়ীতে অবশ্য গোলমাল হয়ই; নানান কণ্ঠে নানা ধরণের আলাপ-আলোচনা, অভ্যর্থনা, উচ্ছ্বাস, হাতকোঁড়ক, গান, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার শব্দ। তবু এই সব মিলিয়ে তার সুরটাও একটু বিশিষ্ট ধরণের, অর্থাৎ অনৈক্যজাত এই শব্দ-স্রোতে আনন্দের বার্তাটি সাগরবেলার তরঙ্গ প্রসারের মতই রূপময় হয়ে ওঠে। উপস্থিত যে শব্দটা উঠল—তার উগ্র ধ্বনিটা কেমন যেন হিংসাত্মক আনন্দ-পরিবেশে প্রতিফলিত।

সকলেই জমা হয়েছে একটি জায়গায়—সকলেই তীব্র কণ্ঠে হুকার আর শাসনে কাঁপিয়ে তুলছে বাড়ীখানা। ধ্বনিটা সর্বত্র থেকে গুটিয়ে একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে অত্যন্ত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। একটিমাত্র ঘরে—বেগানে এইমাত্র পুরোহিতকে সম্মুখে রেখে নবগ্রন্থ-ক্ষৌরিত পটবস্ত্র-পরিহিত স্ত্র-গোল সুগৌরব তম্বু বব বসেছিল আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে, সামনে তার ছিল পঞ্চভুজি দিয়ে তৈরি পদ্মলবের মধ্য-বৃক্ষ স্থাপিত সপল্লব তাম্রঘট, তার পাশে তামার কোশাকুশিতে গন্ধাভল, পুষ্পপাত্রে সুগন্ধি ফুল আর চন্দন—অগুণ্ড, ধূপ ও গব্যায়তন সুগন্ধে ঘর ভিল পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে এগুনও রয়েছে বোঁপা সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা এবং নতুন জলচৌকির উপর সাজানো ঝকঝক কাঁসার বাসন বিজলী আলোর তীব্র প্রভাব দানের পরিমাকে প্রচার করছে একটু উদ্ভত ভাবেই। অস্ত্র পাশে ততোধিক উদ্ভত ভাবে উঁচু পালিশ দেওয়া শো-কেসে বন্দী উপহার-দ্রব্যগুলিও পরস্পরস্বয় সঙ্গ পাল্লা দেওয়ার উত্তেজনায় ঝকঝক করছে। ঘরের আধগালা জুড়ে যে ষাটখানা রয়েছে—তার ছত্রিতে ও অঙ্গে বিচিত্র রঙ্গের বেসাতি বসিয়েছে কে যেন। সেখানে তালা-চাবির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি—আর গোলযোগের সূত্রটা ওরই ছিন্ন থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ব্যাপার কি? শত-কণ্ঠের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

ব্যাপার নতুন কিছু নয়, বা হামেশাই হচ্ছে বিরোভীতে। ঘরে লোকজন কেউ নেই, সবাই হলোড় করে গেছে ছাঁদনা-ভলাতে—আড়ত ঘর পেয়ে মানুষের লোভ কি সামলানো সোজা। তা হলে সবাই ত সন্ধ্যাসী হয়ে বসে। ইনিও তাই...

বক্তাকে অমূল্যরূপ করে এক বেশধুমতী অবগুণ্ঠিতার পানে চাইলে সবাই।

আঁা, বল কি, চুবি করেছে? কি চুবি করলে?

কি আর! সোনাদানা নয়, বাসনকোসন নয়, হীরে মুক্তো পাল্লা জহরং নয়—মাত্র একগানি কাপড়! বক্তা বক্র হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললে।

এই—এইখানি। বলে একখানি ঝকঝক কেঁপে বেনারসী শাড়ী মেলে ধরলে তীব্র আলোর অভিমুখে। কিকে আকাশী রঙের ওপর রূপালি ভরির ফুলগুলো ঝক ঝক করে উঠল—অন্ধকার আকাশে বায়ু-চালিত মেঘের গতি সংঘাতে যেমন ঝক ঝক করে অনেকগুলি নক্ষত্র।

আঁা—বল কি এ-যে সবচেরে দামী বেনারসীখানা! মাসীর সাহস ত কম নয়?

দাও ক'সে গোটা হুঁচাব রন্ধা—আজ্ঞেল হোক চোবের।

কিন্তু মেয়েছেলেব গারে হাত তোলা—

আরে—যেপে দাও তোমার মেয়েছেলে! যে চুবি করে তাকে আবার খাতির কিসের! বক্তার কণ্ঠে হিংস্র উত্তেজনা।

না-না, আগে কবুল করিয়ে পুলিশে দাও। এসেব শাস্তি না হলে সমাজ বে নষ্ট হয়ে যাবে।

কি রে মাসী—কবুল করবি? সমবেত কণ্ঠে হিংস্র গর্জন উঠল। মেয়েটি ভগ্ননও কাঁপছে। এক-ঘর উত্তেজিত মানুষের সামনে কত অসহায় ও। এরা উত্তেজনায় বশে এই মুহূর্তে কি না করতে পারে! মৃত্যু আর এমন বেশী কি? এই অপমান লাঞ্ছনার চেয়ে—সে আর বেশী কি।

মেয়েটি বসে পড়েছে মেঘের উপর। হুঁহাতে মুখ ঢাকে নি—অবসর হুপানি হাত কোলের উপর এলিয়ে পড়েছে। দেহ নিম্পন্দ, মুখখানি ঘোমটার ঢাকা, স্তন্যংগ সে মুখের ভাব ঈষৎ ধূপ-ধূপ-কম্পিত ঘোমটার প্রান্তে প্রকাশিত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন-বাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে—মেয়েটি নির্বিকার নির্দীপক। ওর বলবার আছেই বা কি! অভিযোগ বগুনব কোন উপায়ই ত ও রাখে নি।

ভিড়ের মাঝে রাঙা করে এক ফুলাঙ্গী প্রোচা ওর সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়ির করেক মিনিট ঘরে মেয়েটির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলে। একবার চাইলে জনতার দিকে। তারপর বললে, কেউ চেন একে?

চিনবই যদি ত সওয়াল করব কেন?

তা হলে এক বাড়ী লোকের সামনে কি সাহসে এই ঘরের মধ্যে এল ও? মেয়েটির দিকে কিরে বললে, কি গো, কথা কও না কেন? তোমার পরিচয় কি?

পরিচয়? আপাদমস্তক কেঁপে উঠল মেয়েটির। সব পরিচয় কি এ হেন অপবশ্যের কালিতে ঢেকে যায় নি? মানুষের পরিচয় কোথায়? নিম্ন কর্তৃ-গুণে সমাজে মাকলাভ করার যে সামান্ত সুযোগ জীবনে আসে—তাইতেই ত প্রকাশিত হয় মানুষ, অবশ্য প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যে এমনটি ঘটে না—তারা জন্ম থেকে জীবনান্ত পর্যন্ত অপরিচিতই থেকে যায়। এই প্রকাশ-ক্ষেত্রটি অত্যন্ত সর্পিণ বলেই

কোন কোন মানুষই তা আরম্ভ করতে পারে। এঁরা সমাজে ঢেউ তোলে, কর্তৃক সাড়া জাগান, অল্প মনেব মাঝখানে গুহির-গাছিরে একটু আরগা করে নেন। এমন মানুষ বিধেও বেশী নাই। আর সব জলের ঢেউ; যেমন ওঠে—তেমনি ভাঙে। কতকালের জন্মই বা। সেই ঢেউকে চিনে জেনে হিসেব-নিকশে কি-ইবা প্রয়োজন। ও বুঝছি—বলবে না? কিন্তু বাছা, একটা কেলেকারি হওয়া কি ভাল? আনন্দের দিনে মানুষকে দুঃখ দিতে নাই। সত্যি কথা বল—

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

একজন বললে, ওকে পুলিশের হাতে দিন মা—আপনি কবুল করবে।

পুলিস! চমকে উঠল প্রোঁড়া।

হাঁ মা—বখন চাবুক লাগাবে সপাং সপাং—

মেরেটি কৈদে উঠল শব্দ করে। কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল মেয়ের। সবাই থ হয়ে ওর কান্না দেখতে লাগল। এমন ভরা আনন্দের হাটে—এ কি হলকণ!

প্রোঁড়া অবাক হয়ে বললে, ওমা—একি অলক্ষণ! নিরৈছ-নিরৈছ—একখানা শাড়ী, তা বলে কাঁদ কেন?

তবু কি কান্না ধামে। চাপা কান্নার অমর্য বেগে হুলে হুলে উঠছে ওব সর্কান। একটি অসহায় মানুষের মর্মান্বল থেকে ওঠে বে হাহাকার—তা অগণিত মানুষকে অভিভূত করে দেয়। সকলের মনই বেদনা-বোধে নিগ্ৰেতে কেমন যেন মুহমান হয়ে পড়ল। মাজলিক অঙ্কুঠানে এখনও ঘরগানি উচ্চ রয়েছে—পৃথিবীর ধূলি-জ্ঞালার অনেকখানি উর্কে পবিত্র এক লোক ধীরে ধীরে উন্মাদিত হয়ে উঠছে। সে লোকের দেবতা প্রজাপতি-ধ্বি। গায়ত্রীছন্দেব আবাহনীতে আরও বহু দেবতার অভ্যর্চনা চলছে, হুল দেহ-মাংসের কামনাকে অমর যুগ-প্রবাহের জলে শুদ্ধকৃত করিয়ে সৃষ্টিরহস্তের আদিভূত এই অঙ্কুঠানটিকে পুণ্যময় করে তোলা হয়েছে। অগ্নি, দেবতা, ব্রাহ্মণ আর দেবলোক পিতৃলোককে সাক্ষী রেখে হুটি দেহধারী আত্মার মিলন-ঐচ্ছিক-রচনার সূচনাপর্কে—সহসা এই হৃদয়পতন।

প্রোঁড়া বিব্রত হয়ে পড়ল। হাত ধরে তুলল মেরেটিকে। বললে, এস—এ ঘর থেকে। শোন।

কান্নার বেগ সামলে নিয়ে মেরেটি অধোমুখে ওকে অঙ্গসরণ করল।

২

প্রোঁড়া কক্ষান্তরে এসে দুয়ার বন্ধ করে দিলে। ছোট ঘর, উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ-আলোর দিনের মত স্পষ্ট হয়ে রয়েছে—কোণে-কোণে দেখানে বা আছে সবই নজরে পড়ে। তারের আলনার টাঙানো হুখানা কবলের আসন টেনে নিয়ে মেয়ের পাতলে প্রোঁড়া। ঘরের কোণ থেকে নিয়ে এল গজাজলে ভর্তি তামার বড় বাটিটা—নিরে এল লাল ও সাদা চন্দনের কোঁটার ভর্তি লক্ষ্মী-

নারায়ণের পটখানি। মেরেটির হাত ধরে একখানি আসনে বসিয়ে—নিজে বলল তার সামনে। বললে, এই তারার পাত্তরে গজাজল রয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সামনে, বাস্তিবেলার চুণের ঘরে মিথো বলবি নে ছোটবউ। মিথো বললে নরকেও তোব ঠাই হবে না।

ততক্ষণে মেরেটির অবগুঠন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে। হুটি অঙ্কুঠানা-লিগু বিবর্ণ গুণসমেত শ্রামল মুখখানি বর্ষাকালের সন্ধ্যার মতই বিষন্ন ও ধমধমে দেখাচ্ছে। আধ-বোজা চোখ হুটি কলক-কালিমার প্রলেপে জীবনীমসৃণ পাতুর; কান্নার ঢেউ তখনও কাঁপিয়ে তুলছে সারা দেহ।

একটা কথা সত্যি করে বল—তোব সম্মানের দিবা রইল যদি মিথো বলিস। সত্যি বল ছোটবউ। দেখ, তোব মান বাঁচাতে আমি একঘর লোকের সামনে মিথো বললাম। বললাম, তোকে জানি না। এ কাজে তোব লজ্জা যেমন—আমাদের লজ্জা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

অপরাধিনীর মাথাটা আরও বানিক হেঁট হয়ে পড়ল। যেন স্বীকৃতির ভারে ভুয়ে পড়ল।

প্রোঁড়া বলতে লাগল, কুমারী মেয়েব আইবুড়ো ভাতের কাপড়—ও নিয়ে অনেকে তার যুগসৌভাগ্যের পথ চিরদিনের জন্ম বন্ধ করে দেয়। পোড়াকপাল নিয়ে মেরেকে কাটাতে হর চিরকাল।

না, না, না। আর্ন্তনাদ করে উঠল মেরেটি।

তবে কেন করলি এমন কাজ? একবাড়ী কুটুম, বাইবের অতিথ অভ্যাগত, নতুন বেরাই তাঁর আত্মীয়জন—তোব কি একটুও হুঁস হুঁল না—এ কাজের পরিণাম কি! ও বেনারসী শাড়ী নিয়ে তুই করবি কি? ও পরবার বয়স কি তোব আছে?

আমার মতিছন্ন হয়েছিল দিদি। অক্ষুটে উচ্চারণ করল মেরেটি।

না, এ মতিছন্ন হওয়ার কথা নয়—সত্যি বল।

কি বলব—আমার বা-খুশী সাজা দাও, হুব করে দাও—

তাতে আমাদের মুখটা উজ্জল হয়ে উঠবে? নতুন কুটুম খুশী হবে?

তা হলে আমি কি করব! কান্নার ভেঙ্গে পড়ল মেরেটি।

ওব আর্ন্তনাদে চমকে উঠল প্রোঁড়া। ধমকের সুরে বললে, অমন কতে কাদবি না বলছি—ওতে অকল্যাণ হয়।

বাইবে দুয়োরে বা পড়ল। মা—মা আছেন এ ঘরে?

কে? ভিতর থেকে শুথোলে প্রোঁড়া।

আমি যেনকা। বর-কনে বাসবে বসেচে—আপনি আশীর্বাদ করবেন আস্তন।

সবাইকে বলগে আশীর্বাদ করতে।

সে কি করে হবে—আপনি পেরথম আশীর্বাদ না করলে—সবাই অপিকে করছে আপনার।

চ' ছোট বৌ—আশীর্বাদ করে আসি।

ছোটবউ হুঁপিয়ে উঠল।

আচ্ছা—আচ্ছা—চূপ কর বাপু, নাই করবি আশীর্বাদ। একটু খেমে বললে, তোব কষ্ট বুঝি, কিন্তু এই কান্না বুঝি না। হরোর খুলে শ্রোণা বাইরে এল।

ঘরের মধ্যে কে গো—ছোট খুড়িয়া? তা আপনিও আসুন না—হু'জনে এসসক্রে—

ছোটবউ কাল আশীর্বাদ করবে—ওর মনটা ভাল নেই।

কেনে গো—কোন খারাপ খবর এল বুঝি?

হ্যাঁ—ওর ছেলের বড় অন্তঃ—কাল ভোরেই চলে যাবে। হ্যাঁ দেখ—পারিস তো সন্তকে বলে একখানা গাড়ী ঠিক করে রাখবি। খুব ভোরেব যে ট্রেন সেই ট্রেনেই যাবে ও।

শ্রোণ চলে যেতেই ছোটবউ কাত্যায়নী উঠে আলোটা নিভিয়ে নিয়ে গুয়ে পড়ল মেখেতে। কাজের বাড়ী—কোলাহলের অন্ত নাই—মালোরও বিক্রম কম নয়। অন্ত ঘরেব কোঁতুহলী আলোর বেণা এই নির্দোষদীপ ঘরখানিকে তবল ছায়ায় করে বেখেছে। সেই ভায়াপথ বেয়ে ভেসে এল অসংখ্য ঘটনা। পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি এস্থিৎব হরে পরিণত হ'ল কাহিনীতে। সে কাহিনী গত জন্মব।

৩

মৃত্যু আসন্ন জেনে শাওড়ী দূর নিকট সকল আত্মীরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। খবর পেয়ে যে যেখানে ছিল এসে পড়ল। তিন ছেলে—পুত্রবধু এবং নাতি-নাতিবীর দল—এরা হ'ল আপন পক্ষের : এ ছাড়া খুড়তুতো জ্যাঠতুতোর দলও এলেন। বিরাট এক সমারোহের মধ্যে মৃত্যু আসছেন বোঝা গেল। কিংবা জীবনের কোলাহল দিয়ে মৃত্যুকে পরিচাস করবার আরোজনও বলতে পারা যায়। কেনই বা আসবেন না আত্মীয়স্বজন? স্বপ্নের ভবনস্বর ছিলেন কৃতী পুরুষ। চিরজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছেন, সঞ্চয় করেছেন এবং মৃত্যুকালে সে সমস্তই নিজ পত্নী নিতাময়ীর নামে লেখাপড়া করে দিয়ে গেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, বালো, বোঁবনে ও বার্ককো নারী, পিতা, পতি অথবা পুত্রের বক্ষণাধীনে থাকবে—শাস্ত্রকারদের এ ব্যবস্থা ঠিকই। সে-কালে ঘেহ-মমতার সোনার একালের মত এত বেশী বাদ মেশানো থাকত না—কর্তব্যবোধের দারিদ্ৰ্যটুকু মুছে কেলে কেউ হাফা হবার চেষ্টাও করতেন না, কাজেই পিতা থেকে পুত্র পৌত্র পর্যন্ত নারীর একটি নিশ্চিত আশ্রয় স্থল ঠিক করে দেওয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিল না। সংসারে না থাক তীর্থস্থানে বসতি কর; দেব-দর্শন, পূজাভ্যাস আর পারলৌকিক চিন্তা—এসবের ব্যবস্থা অনারাসে হ'ত। কিন্তু এ কালে ও বিধির খানিকটা সংস্কার প্রয়োজন। পিতা আর স্বামী পর্যন্ত বিধিকে টেনে নেওয়া যেতে পারে কোন ক্রমে, কিন্তু তার পর? পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে আর একটি শব্দ খুঁটি জুড়ে না দিলে নারী বড়-খাওয়া লতাটির মত মাটিতে লুটোবেই। সে খুঁটি আর কিছু নয়—অর্থ অথবা সম্পদ।

সোনাদানা, জমিজমিবেত কিংবা আসবাব-অট্টালিকা। এরাই সম্পদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নারীকে মাননীয় করে তোলে। সেইজন্য মৃত্যুর পূর্বে পুত্র পৌত্র স্বজন সমিতি কাউকে কিছু না দিয়ে পত্নী নিতাময়ীকে এই সম্পদ-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। নিতাময়ীর মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজন সবাই এসে যে শেববাজার পাথের ভবে দিলে—এ তো তাঁরই দূরদৃষ্টির ফলে। নতুবা কাণ্ডব্যাপদেশে কে কোন দূর দেশে ছিটকে পড়েছিল এতকাল? মাত্র স্বয়ংসহীনা খুড়তুতো পুত্রবধু ছাড়া এতকাল তাঁকে দেখেছেই বা কে?

মৃত্যুর আগে নিতাময়ী তাকে ডেকে বললেন, কাছ, সবাইকে খবর দাও, সবাই আসুক। যার বা পাওনা-দেনা মিটিয়ে দিয়ে যাব। কাত্যায়নী বললে, অমন কথা বলছেন কেন মা?

নিতাময়ী বললেন, অনেক বয়স হ'ল—অনেক মৃত্যু দেখেছি মা—আমাকে ভুলিও না।

কাত্যায়নীর চোখে জল দেখে সান্থনা দিলেন, তুমি আমার যে সেবা করেছ—তা পেটের মেয়েতেও করে না। তোমার কথা দিনরাত ভাবি। ভবটা যদি মানুষ হ'ত তা হলে তোমাদেরই বা এত কষ্ট হবে কেন। স্বাক, ভগবান এমন দিন চিরকাল রাখবেন না, যে ক'টি কুচোকাচা পেরেছ ওদের হতেই তুমি সুখী হবে। এদিকে সরে এস, শোন একটা কথা। খবরদার কাউকে বলবে না—বললে তুমিই ক'কে পড়বে। শোন।

সব শুনে শিউরে উঠল কাত্যায়নী। বললে, না মা, ওসব আমার ঘাড়ে চাপাবেন না, যাঁদের পাওনা তাঁদেরই দিন।

ওদের তো বঞ্চিত করে যাচ্ছ না। কিন্তু তোমাকে না দেখলে আমার যে অধঃ হবে—আমি যে মরেও স্বস্তি পাব না।

শুনতে শুনতে কাত্যায়নীর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। এ ভাবে সকলকে লুকিয়ে নিতাময়ীর অলঙ্কার নেওয়ার সাহস সে সঞ্চয় করতে পারলে না। এ যেন চুরি করার ব্যাপার—কাউকে বকনা করার মত লাগছে। কোথায় কুলুঙ্গির গোপনে রয়েছে লোহার সিন্দুকের চাবি—সেই সিন্দুকের মধ্যে আছে গহনার হাতবাক্সটি—তার চাবি আবার আছে অড়হীন পাশ-বালিশটার পেটের মধ্যে। ওরা সব আসবার আগেই কাত্যায়নী যেন গহনা-গুলি সরিয়ে অক্লান্ত রাগে, না রাখলে—

হু'দিন হু'রাত ভাবলে কাত্যায়নী—পাশ-বালিশ কাঁড়তে সাহস হ'ল না ওর।

আঃ বোকা মেয়ে—পারলি নে?

কোথায় লুকুবে মা—আমার যে কোনখানে জায়গা নেই যাবার। চিরকালের আশ্রিত ওরা। এই বাড়ীর হিন্দা কবে অংশীদারকে বেচে দিয়েছে ওর স্বপ্নব। ওর স্বামী কাজ করে জমিদারী সেবেস্তায়—বিদেশে চাকরি নেবার মত বিদ্যা বা ভরসা ওর নেই। মানুষটাও কেমন যেন, নেশা ভাঙ করে—জড়বৃদ্ধিসম্পন্ন। ওরই জ্ঞান কাত্যায়নীর মনে শান্তি নাই।

যাবি কোথায়—এই বাড়ীতেই থাকবি, সে ব্যবস্থাও করে গেলাম। কিন্তু চাবিটা বাছা তোমাকে লুকোতেই হবে, না হলে জানি ত সবাইকে।

তবু গহনার বাস্কাটা সরতে পারলে না কাত্যায়নী। একে একে সবাই এসে পড়ল।

এ ঘরে নিতামরী আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন—অস্ত্র ঘরে বউদের সভা বসল—হিসাব-নিকাশ চলতে লাগল সম্পত্তির, স্বাবর-অস্বাবর ভিনিসের। জমির হিসাব তো দলিল-দস্তাবেজে মিলবে—টাকা গহনা তো সে বস্তু নয়। এতকাল ধরে কত টাকাই তো জমিয়েছেন নিতামরী—গহনাও ঠর সিদ্ধক বোঝাই—প্রবাসবাক্যের মত। কোথায় সেই টাকা আর গহনা?

কাত্যায়নীর দিকে সবাই কটমট করে চাইলে। তুমি নিশ্চয় জান কোথায় টাকা আছে?

কাত্যায়নী শুকনো গলায় বললে, সত্যি বলছি দিদি জানি না।

গহনা? তাও বোধ করি জান না! মেধ বো তিন্ত হাশ্বে ব্যঙ্গের স্বর দেশালে।

নিতামরীর সনির্বন্ধ জল্পারোহ মনে পড়ল, গহনা ওদের হাতে পড়লে মরেও আমার শাস্তি হবে না কাতু। ওগুলো তুই নিস।

কাত্যায়নীর পক্ষে জানি বলাও যেমন শক্ত—জানি না বলাও তেমনি অপরাধ। মাথা হেঁট করে ও ভাবতে লাগল। হাসি টিকিবি কটুবাকা বর্ণ—চোখা চোখা ভীষের মত ওকে বিধতে লাগল—তবু অটল বৈধব্যে দৃঢ় হয়ে বইল কাত্যায়নী।

মেজবো বললে, খজি মেয়ে—সাত সায়েবের নাক কান কেটে আনতে পার। এমন জাঁতাবাজ মেয়ে না হলে কি আর নিবন্ধা পুরীতে বুড়ীকে নিয়ে পড়ে আছ! যেখানে গুড়—সেইখানেই শিঁপড়ে—ও আমবা জানি।

সভা ভঙ্গ হ'ল, বড়বো ওর হাত ধরে বললে, বেশ করেছিস—বলিস নি। কেন বলতে যাবি, ও হচ্ছের খন ত তোয়ই পাওনা। এত করে গেটে-থুটে কল্ল কয়ে—শেষকালে কিনা:

যে এল শেষে—রইতে দিল না দেলে,

নাড়া কাটার ভাত বাড়লে।

রস দেখে আর বাচিলে!

অর অর করে চোখের জল পড়ল কাত্যায়নীর। বলল, সত্যি বলছি বড়দি—তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিবি করছি—

কেন—কিসের জন্তে দিবি দিলে না? বড় বউ সহানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। যে গভীর জল করে সেবাবদ্ধ করলে—সে বানের জলে ভেসে যাবে। আর—আমার ঘরে আর।

ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। বললে, সত্যি বলছি ভাই—শাওড়ী গুরুজন—মায়ের তুল্য, তাঁর সেবা করা কি কম ভাগির কথা। আমাদের যে বিধাতা মেয়েছেন, এমন চাকরি ওঁরার যে এক দণ্ড কামাই করলে আপিস চলা ভার। সায়েববা কিছুতেই যদি ছাড়ো। এই না কত বলে করে মাস্তব ডটি হস্তার

ছুটি। এর মধ্যে যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় ত রক্ষে—না হলে তল্লিহল্লা গুটিয়ে ছোট শতরে। চাকরির খুবে খুবে দণ্ডবৎ বাবা!

ওর আশ্বাসে কাত্যায়নী বিগলিত হয়ে গেল। এমন আপন জনের মত সুগৃহপের কথাই বা কে বলে। অস্ত্র জায়েরা ত ওকে দেখলেই মুগ্ধ ভাব করে—যেন ওদের সবকিছু লুটেপুটে নিয়েছে কাত্যায়নী। ওদের কাছে সেবা করার একটি মাত্রই অর্থ হয়; সেবা মানেই গোঁসামোদ করে অর্থ সম্পত্তি বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। মাহুঘের মনের খবর ওরা বাপে না। কোমল কতকগুলি বৃত্তি যে মাহুঘকে মাহুঘের মত দেখতে শেপায়, কখনও-বা দেবতার আসনে বসায়—এ বিশ্বাস এরা করবে না। দেওয়া আর নেওয়ার দুই তৌলে এদের তুল্যদণ্ড কখনও ডাইনে, কখনও-বা ধায় হেলছে। হায় রে পৃথিবী!

সহানুভূতি পেয়ে অনেকক্ষণ কাদলে কাত্যায়নী। কাদতে কাদতে মনটা বেশ নরম হয়ে উঠল। মনে হ'ল বড়বোয়ের মত এমন চমৎকার মাহুঘ পৃথিবীতে আর নাই—এমন আপনজনও কেউ নাই। সুতরাং সেই নরম মনের যেখানে যা কিছু চাপাখা গোপন কথা ছিল—সবই উজাড় করে ঢেলে দিলে কাত্যায়নী।

বড়বো ওকে আশ্বাস দিলে, তা বেশ ত, কেউ তোকে জ্বরগা না দেয়—আমার চিন্তের থাকবি তুই, আমি মাস মাস টাকা পাঠাব—

না দিদি, এ ভার সব তুমি নাও—আমি চাবি এনে দিচ্ছি তোমায়।

না রে—না। বাপা দিলে বড়বো।

কাত্যায়নী শুনলে না—সিন্দকের চাবি এনে ওর হাতে দিয়ে বললে, যা বোঝ—কর দিদি। তোমাদের পাওনা ভিনিসে আমার এতটুকু লোভ নেই।

বড় বউ চাবিটা বারকতক ঘুরিয়ে দেখলে, তার পর সেই চাবি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, যেখানকার চাবি সেইখানে রাখ গে। মা'র মেজান্তর না হওয়া পর্যন্ত—খবরদার—কাউকে ঘৃণাকরে বলবি নে এ কথা। শ্রাদ্ধশাস্তি চুকেবুকে গেলে ওই সব গহনা নিজে হাতে তোকে দিয়ে যাব আমি। মা সগুণে থেকে আশীর্বাদ করবেন আমাদের।

হা—খুগে থেকে আশীর্বাদই করেছিলেন শাওড়ী। তারই ফলে বড়বো সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরে নতুন-কেনা অট্টালিকার দাস-দাসী আর মোটর নিয়ে সুখে কালযাপন করছেন। কিসে থেকে কি হ'ল—ঈশ্বরই জানেন। বড় ভাস্কর ত কাজ করতেন কোন আপিসে। মাইনে যা পেতেন—তাতে চিরকালই টেনে গুঁজে চলেছে সংসার। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর অবশ্য পদোন্নতি হয়নি, কিন্তু বৃদ্ধর বাড়ায়ে কি সব ভিনিসপত্তর কিনেছেন আর বেচেছেন—তার বিশ-ত্রিশ গুণ দরে। তাই থেকেই কমলার দর।

কিন্তু মেজবো বলে, ভিনিসপত্তর কিনলে কি দিয়ে শুনি? সে-ও ত মোটা টাকার দরকার। ওই যে শ্রাদ্ধের আগের দিন

সিন্দুরের চাবি হাবিরে গেল—ওর মধ্যেই রয়েছে ব্যাপার। আরেও সিন্দুরে কি কম সোনাদানা ছিল? সব হাতিয়েছে—হুই কত-গিল্লিতে। না হলে দোকান হ'ল কোথা থেকে? বাড়ী উঠল—মোটর হ'ল—আকাশ ছোঁা করে ভগবান বুঝি ঢেলে দিয়েছেন টাকা। আর লোক ছিল না—ভূ-ভারতে টাকা দান করবার?

সে দিনের কাণ্ডটাও মনে পড়ল কাত্যায়নীর। বড়বো ওকে আড়ালে ডেকে বললে, খবরদার বলবি নে কোথায় চাবি আছে। আমরা চলে গেলে সব বার করে নিবি, বুঝলি?

কাত্যায়নী কাতর কণ্ঠে বললে, কিন্তু দিদি, চাবি যে খুঁজে পাচ্ছি নে।

পারি—পারি। ভিড় পাতলা হোক আগে, ভাল করে খুঁজলেই পারি। বলে উদ্বিগ্নভাবে কাত্যায়নীর চাবি খুঁজেনা-পাওয়ার রহস্যটিকে উদ্ভ্রমরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এই ভাবটি জানালেন। চুরি না করেও চোর হয়ে বইল কাত্যায়নী।

তার পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। দেশের বাড়ীতে বড়বো বা অল্প কোন সড়িক কেউ আসে না; বাড়ীটা যে মোদামত করা প্রয়োজন সেটিও কারও প্রেরণ হয় না। কালের প্রহারে ইমারতের গা থেকে চুনস্রবিকি প্রলেপ পসেছে। ইট কড়িবরগা স্থানচ্যুত হয়েছে, বট অশ্বখেরা ভিতের বৃক্কে শিকড় ঢালিয়ে বনিসাদ আলগা করে দিচ্ছে। মানুষও সেই তালে চলেছে এগিয়ে। পুরাতন কত চলে গেছে—নতুন কত এসেছে। কাত্যায়নীর সংসারও ভারী হয়েছে। মেয়ে হয়েছে বিবাহযোগ্য, স্বামী সামর্থ্যহারা হয়েছে ও জমিদারী সেরেস্তায় কলম চালনা করছেন। কিন্তু জমিদারীও প্রায় নিশেষ হয়ে এল। ছেলেদ্বিগুণ বা মানুষ হ'ল কৈ। বড়টি বাপের মত ভড়ুড়ফিসম্পন্ন—মাত্রবের আকার নিয়েও মানুষের মধ্যে ঠাই করে নিতে পারলে না। মেজটা স্থূল ছেড়ে দিয়ে বাবুদের সপ্তের খিয়েটারের আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল বেগেছে, স্তব করে বস্তুতা করছে আর রাতদিন বিড়ি সিগারেট ফুঁকছে। ছোটটি স্থূল যার বটে—পড়াশোনার মনোযোগ কম। সময়মত স্থূলের মাইনে দিতে না পারলে—মাষ্টারেরা মিষ্ট মিষ্ট বাক্যবাণে বিঁধবে বৈ কি। মাসের মধ্যে দশ দিন সে স্থূল কামাই করে। এ সবও কাত্যায়নীকে তত ভাবায় না—যত হুচিচ্ছা তার মেরের বিয়ের জন্ত। উনিশ শেখ করে মেয়ে কুড়িতে পা দিয়েছে। সখ্যক যে না আসে তা নয়, কিন্তু দেনা পাওনার হিসাব নিয়ে তারা খবর দেব বলে চলে যায়, আর আসে না। দুর্দশাগ্রস্ত বাড়ীটার মতই ওদের অবস্থা।

মাকে মাকে অনেক কথা মনে হয়—বিশেষ করে মনে পড়ে মেজ জায়ের মন্তব্যগুলি।

বড়বো মিষ্ট কথায় মনের খবর টেনে নিয়ে নিজের আগের জছিরে নিলে—অর সাধু হয়ে সত্যতাকে পোষণ করে কাত্যায়নী কোথায় এসে দাঁড়াল, যেমন মনে ওঠে এ সব কথা অমনি কালবৈশাখী মেঘছায়া-ছড়িয়ে-পড়া নদীজলের মত সেখানটা

ধম ধম করতে থাকে। ঝড় উঠে একটু পরে। তুফানে তুফানে অশান্ত হয়ে ওঠে নদী—কৃষ্ণ তরঙ্গ পলাতক ভবঙ্গের গারে আঘাত হানে—বাতাসের গতি সেই প্রোতবেগকে বয়ে নিয়ে যায় তটের অভিমুখে—এচণ্ড আঘাতে ও শব্দে কঁপে ওঠে তটভূমি। কাত্যায়নী কেমন যেন পাগলের মত হয়ে যায়। কেন এমন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করলে সে? তার বোকাটির স্তবোগ নিয়ে বড়বো ঐশ্বর্যের স্তূপে সাধু সেজে বসে বইল—আর...

তাকাতাড়ি ঠাকুর ঘরে গিয়ে চোপের জলে মনের আশ্রন নিবিয়ে দেবার প্রয়াস করে। আকুল কণ্ঠে বলে, ঠাকুর, আমার রক্ষা কর। চর্নাম দিয়েছ যদি—সহ্য করবার শক্তি দাও।

সত্য, কাত্যায়নী দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছে—কৃত-বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ওর অন্তরাত্ম। এক দণ্ডের প্রলোভনকে ধ্বংস করে ও যেন চিরজীবন তাকে পোষণ করে চলেছে।

আবার প্রার্থনা করে ঠাকুরের কাছে, আমাকে ব্রাহ্মদায় থেকে উদ্ধার কর ঠাকুর—তা হলে এই পাপ চিন্তা আর মনে উঠবে না। আমার রক্ষা কর।

হয় ত তার প্রার্থনাত্তেই ঠাকুর মূগ্ধ তুলে চাইলেন—সুপাত্র জোগাড় হ'ল। সাধারণ গৃহস্থ-ঘর—পাওনা-পরাব কষ্ট নাই। পাত্রটি দোস্তবয়ে হলেও বয়স ত্রিশ পেরয় নি—প্রথম পক্ষের সম্বানাদি নাই। দেনা পাওনার কথাই তারা ভুললে না। শাখা শাড়ী বা হোক কিছু দিলেই দুভাবনা ঘুবে।

স্বামীকে বললে, কিছুই ত দিতে-থুতে পারব না আমরা—এক-জোড়া সোনারাধানো-শাখা—আর একপানি ভাল শাড়ী যদি পার—স্বামী বললেন, আগেকার দিন হলে জমিদারের কাছ থেকে শাড়ী গয়না—আদার করগাম।

তা হলে কিছুই দেওয়া হবে না? শুধু স্বরে বললে কাত্যায়নী।

কোনখানে...কোন আশ্রয়সীমা না পেয়ে—ওঠা কাত্যায়নীর মনে হ'ল—এই বিষয়ে বড়-জাকে জানালে হয় না? ওদের অবস্থা আজকাল ভালই—তা ছাড়া বহুদিন আগে—উনি ত আশ্বাস দিয়ে রেখেছিলেন দায়ে-অদায়ে ঠেকলে কাত্যায়নী যেন ঠেক জানায়। অভাব অনটন—এ সব ত নিত্যদিনের—আপদ-বিপদ এসেছে বহুবাব—তবু কাত্যায়নীর মনে পড়েনি তাঁর আশ্বাসবাক্য। কেন পড়েনি মনে? কে জানে মনের কোথায় এতটুকু অভিমান, বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ—আর অপছন্দের বাষ্প যেন খিত্তিয়ে ছিল। বহুবাব মনে হয়েছে—বড়-জা তাকে ঠিকিয়ে নিয়েছেন—তার স্ত্রী পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছেন—তার সম্পত্তি অপহরণ করেছেন। গুরু বিশ্বাসকে নষ্ট করে উনি কাত্যায়নীর ভালবাসার ক্ষেত্র থেকে কোন দূরাস্তরে সরে গেছেন—ঠেক অভাব অনটনের কথা জানান যায় না।

মেয়ের মূগ্ধ চেয়ে সেই অভিমান আর ঘৃণার বাষ্পকে মুছে কেল-বার প্রয়াস করে কাত্যায়নী। না, কিসের ঘৃণা, কেনই বা অভিমান? তার মত গরীবের এ সব মনে পুবে রাখা মানেই সংসারের

কল্পনা করা। স্বামীকে বলে একখানি পত্র লেখায় সক্ষম করেছে—এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে এল নিমন্ত্রণপত্র। তবু হাসানো—অমর নয়—তার সঙ্গে হাতের লেখা করেক ছত্র। এর পর স্থগিত—অজ্ঞাতের বাতায়নের বাহ্যবস্ত্র এল। এ বুঝি ভগবানেরই ইঙ্গিত—তার চিন্তার জট খুলতে দৈব-প্রেরিত সমাধান। কাত্যায়নী স্বাক্ষর করলে বাড়ী থেকে।

তার পর এখানে এসে বিয়ের আয়োজন-উপচার—মাস্ট্রিক বিধি-বিধান বতাই দেগেছে—ততই মনে উগ্র হয়ে উঠেছে মেয়েকে সুখী করার কামনা। ওকে আশীর্বাদ দেওয়ার কামনা। সুপ্রসাধিতা করার কামনা—বস্ত্রে অলঙ্কারে অঙ্গচর্চায় এমনি চিন্তাশক্তি করে সর্বজন-প্রশংসিতা ও অনঙ্গ করে তোলায় কামনা। এমনি চিন্তায় ছুবে নিজের মনের জগতে হারিয়ে গেল কাত্যায়নী। এই সমারোহে কোলাহল, এই আনন্দ-বঙ্গার প্রাবন, মাছুন্দরের সাধ-আফ্রাদ পূরণের প্রথম আনন্দ—এ তো একান্ত ভাবে কাত্যায়নীরই। এখানে এত প্রাচুর্য কেন? চিরবর্ষায় দেশে মেঘের দাক্ষিণ্য—মরুভূমির দেশকে বঞ্চিত করেই কি অব্যাহত হয় না?

অনেক বার উপর নীচের ওঠানামা করলে কাত্যায়নী। কে যেন মেহের শিরা-উপশিয়ার আশ্রন জালিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যাদের অজ্ঞান রয়েছে—তাদেরই কমলা দিচ্ছেন হুঁতাতে ঢেলে। এত আড়ম্বর, এত প্রসাধনী, এত উপচার—...। কাঁচের শো-কেসে বন্দী হয়েও সোনার গহনাগুলো জ্বলছে, পাটের উপর অসংখ্য শাড়ী স্তূপাকার হয়ে উঠেছে—এর একখানি পেলেই ত কাত্যায়নীর মনের সাধ পূর্ণ হয়। এত শাড়ী এরা করবে কি? লোকের দেখা হয়ে গেলে বাস্তবন্দী হয়ে থাকবে বহুকাল ধরে। সেই বহুদশায় ওদের দেহ জীর্ণ হবে, পাড় জ্বলে যাবে, পোকার শত্রু হুঁদু করবে, আত্মকের ফাটান বদলে গিয়ে—পুরাতন কালের নমুনা হয়ে... নতুন কালের মানুষের হাসিতামাশার বিষয় হবে। অথচ ওর একখানি পেলে...

পুনরায় নেমে এল কাত্যায়নী।

সম্প্রদানের জায়গা থেকে বর গিয়েছে ছাঁদনাতলায়—সঙ্গে গেছে স্ত্রী-আচার-দর্শন লোভী কৌতুহলীর দল। পুরোচিতমশায় এক-খানি আসনে বসে হেঁটমুণ্ড হয়ে পুঁথির পাতাগুলি খুঁজছেন, কেউ হয় ত একবার এসে উকি মেরে যাচ্ছে—ঘরে দাঁড়াচ্ছে না এক মুহূর্তও। যাদের নিয়ে এ ঘরের মর্যাদা—তাদের অবহমান এ ঘর অভাগত বা আত্মীয়-গোষ্ঠী কাউকেই টানতে পারছে না। তবু এই ঘরই প্রবল বেগে টানলে কাত্যায়নীকে। যেমন চুষক টানে লোহাকে—জল টানে ফুৎকে—খাচ্চ টানে ফুৎকে—বাক্স টানে

অভিসাধিকাকে—তেমনি প্রবল আকর্ষণে বহু-উপচিত পালকের কাছে গিরে দাঁড়াল কাত্যায়নী। আশ্চর্য, অকৃতবুদ্ধ এমন সম্মোহনী-শক্তি—দীর্ঘে দীর্ঘে কাত্যায়নীর চৈতন্য অপহরণ করলে ওরা... তার পর আলোঙলি হঠাৎ নপ নপ করে নিতে গেল, কোলাহল হ'ল প্রচণ্ড, বজ্রনির্ধোবে বে বে বিফোদন কর্পণটরে আঘাত করল তারই বেগে ধর ধর করে কাঁপতে কাঁপতে মেয়ের উপর বসে পড়ল কাত্যায়নী।

৪

মেঝেতেই শুয়ে রইল সে অনেকক্ষণ ধরে। ওপারে আলোর দেশের ছায়া এসে এপারের অন্ধকারমাথা কিনারায় পড়েছে—জল-জলাৎ করণ বিলাপে অশ্রাস্ত কঁদে চলেছে তটিনী। অমা-অভিমুখী ভিধির শেষ বাক্সির প্রহরে মরা জ্যোৎস্নার তট-ভাঙ্গা নদীর ধারে গিয়ে বসেছে কি কেউ কখনও? ওপারে বনের মাধায় সেই জ্যোৎস্নার পাণ্ডুর ছায়া দেগেছে কি? আকাশ তখন অসীম সাগরের হাঙ্গাকারে ভরে ওঠে—মনের মাঝে সেই হাঙ্গাকার প্রতিধ্বনি তোলে। একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যায় বাক্সি—তেলফোনো দীপশিখায় মত। এই অসহ্য ক্ষণে মৃত্যুর কথা মনে আসে না, জীবনের কথাও না; রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময়ী ধরিত্রী তখন কোন অতলে বায় ফুরিয়ে।... এই দুস্তরের মাঝখানে মানুষও যদি নিঃশেষিত হয়ে যেত!

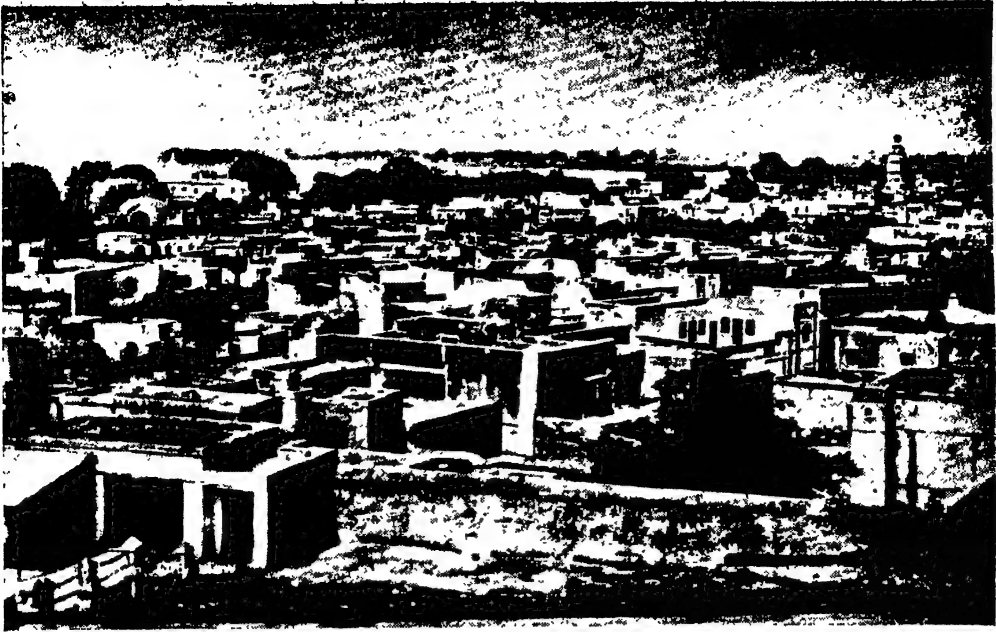
ভোর বেলাতে খুম ভাঙ্গল বড়-জায়ের ডাকে। সে শিরয়ের কাছে মাধায় ভাত দিয়ে ডাকছে, ছোটবউ—ও ছোটবউ—ওঠায়ে।

ওকে চোপ মেলতে দেখে বললে, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নে—পিড়কিতে গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সকাল হলে সবাই জিগ্গেস করবে কালকের কথা—কি লজ্জাতেই যে পড়বে! সত্যের জনের কাছে সাত শো বকমের কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ যাবে। তার চেয়ে তুই বরং...

একটু থেমে বললে, আর এই কাপড়পানা রাখ। বড় আশা করে কাপড় নিয়েছিল—তা বেনারসী পুরবার সময় ত তোর নেই—দিলেও পরতে পারবি নে, এইশানা নে। আশার জিনিস বঞ্চিত করলে—ওদের মজল হবে না। ওদের আশীর্বাদ করে যা ভাই—যেন ওরা সুখী হয়।

শেষ বাক্সির মরা-জ্যোৎস্নার আলোয় পৃথিবী ধুমিয়ে থাকে না—পৃথিবী মরেই যায়। দীর্ঘকাল-লালিত মনের স্তম্ভ কামনার পদতলে আত্ম-বলিদান দিয়ে কাত্যায়নী অনায়াসে হাতে তুলে নিলে সেই কাপড়পানি।





বর্তমান কুন্দাবনের দৃশ্য

## করৌলীতে শ্রীমদনমোহন

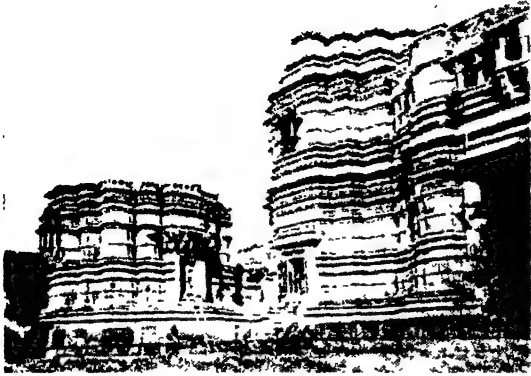
শ্রীসুন্দরানন্দ বিছাবিনোদ

পূর্ব-রাজস্থানে করৌলী নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধান নগর করৌলী, মথুরা হটতে প্রায় ৪৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কথিত হয়, মহারাজ বিজয় পাল বাদব মথুরা হটতে স্বীয় রাজধানী বিশ্বম্ভীর আক্রমণের আশঙ্কায় পার্বত্য প্রদেশ বায়ানায় স্থানান্তরিত করেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, ইনিই করৌলী রাজ্যের মূল পূর্ব। ইনি খ্রিষ্টাব্দ হটতে বংশপারম্পর্যে ৮৮তম অধিস্থান বলিয়া কথিত হন। ঠগার রাজত্বকাল আনুমানিক বিক্রমসংবৎ ১০৯৬-১১৫০ (= ১০৩৯-১০৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)। মথুরা হটতে বায়ানা প্রায় ২৪ ক্রোশ, তথা হইতে করৌলী আরও বিশ ক্রোশ দূরবর্তী। ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদ গোরী ও কৃতব উদ্দীন আইবক কর্তৃক বায়ানা ও তহানগড় অধিকৃত হইবার পর রাজবংশধরগণ বায়ানা পবিত্যাগ করিয়া করৌলীতে আগমন করেন এবং তথা হইতে যমুনা অতিক্রম-পূর্বক সবলগড়ে আশ্রয় লন। অনন্তর তাঁহার পুনরায় করৌলীতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন।

করৌলী নগরের পূর্বদিকে ভদ্রাবতী নদী প্রবাহিত। বিজয়-পালের ৭ম অধিস্থান মহারাজ অর্জুন পালের প্রতিষ্ঠিত কলাগঞ্জীর নামানুসারে এই নগরীর নাম কলাগঞ্জী ছিল। পরে উহারই অপভ্রংশ করৌলী হইয়াছে। ১৪০৫ বিক্রম সংবতে (= ১৩৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) অর্জুন পাল এই নগর স্থাপন করেন। পার্বত্য “মেনা” জাতির উৎপাতে এই নগরের সমৃদ্ধি প্রতিহত হইয়াছিল। ১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দে অর্জুন পালের ৭ম অধিস্থান মহারাজ গোপাল দাস উক্ত

পার্বত্য জাতিকে ধমন করিয়া এই নগরের জিগৃহী এবং তথা স্বব্রমা প্রাসাদ নিৰ্মাণ করেন। গোপালদাসের সময়ের স্তম্ভস্থ রাজপ্রাসাদটি চতুর্দিকে ঋতুচক্র প্রাচীর পরিবেষ্টিত ও দুইটি স্তম্ভের সিংহদ্বারবিশিষ্ট। নগরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ক্রোশ হইবে। গোপালদাসের ৮ম অধিস্থান মহারাজ গোপালসিংহের সময় করৌলী নগরীর অধিকতর সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ইনি এই নগরীর চতুর্দিকে প্রস্তরের প্রাকার, নগরে প্রবেশ করিবার ৬টি সিংহদ্বার এবং ১১টি গুপ্তদ্বার নিৰ্মাণ করান। মহারাজ গোপালসিংহ ১৭৮১ বিক্রম সংবৎ (= ১৭২৪ খ্রিঃ) হটতে ১৮১৪ সংবৎ (= ১৭৫৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত করৌলীতে রাজত্ব করেন। দিল্লীর তদানীন্তন বাদশাহ মহম্মদ শাহ গোপালসিংহকে ১৮১০ সংবৎ (= ১৭৫৪ খ্রিঃ) দিল্লীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক পদবীতে ভূষিত করেন। করৌলীতে গোপালসিংহের সময়ই বুদ্ধাবন হইতে সনাতন গোষামী প্রত্ন-পাদেব প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব গুহ বিজয় করেন এবং করৌলী নগরীতে বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মদনমোহনের মন্দিরই করৌলী নগরীর প্রধান মন্দির। ভয়পূর্বে বেঙ্গল শ্রীলিঙ্গোবিন্দজী তৎস্থানের অধিদেবতা বলিয়া ‘লিঙ্গী’ নামে খ্যাত, করৌলীতেও সেইরূপ শ্রীলিঙ্গমদনমোহনজী ‘লিঙ্গী’ নামে বিখ্যাত। করৌলীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ও দুর্গের অভ্যন্তরে মদনমোহনদেবের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। করৌলী রাজগণ খ্রিষ্টাব্দের বংশধর এবং বহুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

তিনি সেখানে গুরুদেবের সতিত শ্রীমদনমোহনকে আনয়ন করিবার জন্য এতটা ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি ভাবী সেবাপূজার ব্যবস্থার জন্য একটি এক্সারনামা লিখিয়া শ্রবলদাসজী-নিকট প্রেরণ করেন।



গোপালসিংহ মন্দির

গোপালসিংহ স্বয়ং পুনরায় জয়পুরে গিয়া গুরুদেবকে মদনমোহনের সতিত করৌলীতে পদার্পণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে একদিন শ্রবলদাসজী গোপালসিংহের সতিত জয়পুরাদিপতি সয়াঈ জয়সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া গোপালসিংহের প্রার্থনার কথা জানান। সয়াঈ জয়সিংহ অনুরোধে হইয়া মদনমোহনজীকে শ্রবলদাসের সতিত করৌলী গমনের প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করেন।

ভগ্নপতি সয়াঈ জয়সিংহের অনুমোদন পাওয়া গোপালসিংহ পূরম আনন্দিত হইলেন এবং মদনমোহনকে দেবালয় আরোহণ করাইয়া ভাস্কর্য পদতলে করৌলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। করৌলীতে শৌজিয়া রাজত্ববনের দক্ষিণে মন্দিরের মধ্যে মদনমোহনকে মহাসমারোহে স্থাপন করিলেন। এই ঘটনা ১৭৮৫ বিক্রম শংকতে (=১৭৩৯ খ্রীঃ) অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুরাধীশ সয়াঈ জয়সিংহের (২য়) জ্ঞাতক করৌলী-নরেশ ভক্তবর গোপালসিংহজীর আগ্রহাতিশয়েই দ্বিবাধামদনমোহনদেব করৌলীতে শুভবিজয় করেন। তৎপর গোপালসিংহ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় দ্বাধামদনমোহন ও রাধাগোপালকে স্থাপন করেন।

#### গুরুদেবের সেবাপ্রাপ্তি

শ্রবলদাসজী (শ্রবলানন্দ) করৌলীতে আসিবার পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণচরণদাসজী মদনমোহনের সেবাধিকারী হন। ইনিই সর্বপ্রথমে গুরুদেবপ্রণালী স্বীকার করেন। সনাতন গোষ্ঠামিপ্রভুপাদের শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোষ্ঠামী; ঈশ্বর শিষ্য চন্দ্রদাস, তংশিষ্য বংশীদাস, তংশিষ্য কিশোরদাস, তংশিষ্য শ্রবলদাস গোষ্ঠামীজী পর্যন্ত ছয় পুরুষ তান্ত্রগৃহ

ও শিষ্যপারম্পর্যে মদনমোহনের সেবাধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণচরণদাসজী সর্বপ্রথমে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সময় হইতেই মদনমোহনের সেবাধিকারিগণ গুরুদেবের নিধারিত হন। কথিত আছে, সনাতন গোষ্ঠামিপ্রভুপাদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহা হইতে সাত পুরুষ পর্যন্ত শিষ্যপ্রণালীতে মদনমোহনের সেবা চলিবে। ঈশ্বর পর শ্রীমদনমোহনের ঘেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইরূপ প্রণালী প্রবর্তিত হইবে।



মদনমোহনদেবের সেবাধিকারী শ্রবলদাস গোষ্ঠামী, প্রদান-জয়পুর-করৌলী

কৃষ্ণচরণদাসজী অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার কন্যা প্রেমকুমারীকে মহারাজ গোপালসিংহই বঙ্গদেশীয় হুগলী জেলার গজা-গ্রামনিবাসী ভট্টাচার্যবংশীয় রামকিশোরের সতিত মহাসমারোহে বিবাহ দিয়াছিলেন। রামকিশোর বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে বৃন্দাবনে এবং তথা হইতে করৌলীতে আগমন করেন। অপুত্রক কৃষ্ণচরণ জামাতা রামকিশোরকেই মদনমোহনের সেবাধিকারী ও গাদী প্রদান করেন। রামকিশোরের দশটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ কিশোরজী সেবাইতের গাদী প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর সময় তাঁক ধা নামক এক মুসলমান মদনমোহনের ভক্ত হইয়া পড়েন। মদনমোহনের দর্শন না করিয়া তিনি কোন দিন জল গ্রহণ করিতেন না—ইহাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল।

নৃসিংহকিশোরজী নিঃসন্তান ছিলেন। একজন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিকিশোরজী গাদীতে উপবেশন করেন। ইহার সময় 'কারে'-নামক এক ব্রাহ্মণ-ভক্তের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কারে



শ্রীকৃষ্ণদাসগুপ্তার—সনারন গোখামীপাশের শিখা ও  
সমাপিমন্দির-নিম্নাভা, বৃন্দাবন



সদাশু ভগবদ্বিঃ ( দিশা )—ভরপুররাজ

কবি ছিলেন। কারেব একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ার তিনি সেই মৃত পুত্রকে লইয়া মদনমোহনমন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং করুণ-বসন্তক একশত আঁটি কবিতা রচনা করিয়া মদনমোহনকে উচ্চৈঃস্বরে শুনাতে লাগিলেন। তিনি ভগবানের শুভানুবাদ করিতে করিতেই নিজ শরীর পরিত্যাগ করিবেন—এইরূপ স্বপ্ন করিলেন। এষ্ট প্রকারে যখন অষ্ট প্রহর অতীত হইয়া গেল, তখন মদনমোহনের সেবাদিকারী হরিকিশোরদেবজী এক স্বপ্নাদেশ লাভ করিলেন। তদনুসারে তিনি কারেব মৃত পুত্রের মূণে চরণায়ত প্রদান করেন; তাহাতে মৃত বালক প্রথমে অন্ন অন্ন নভিতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে। মৃত পুত্র পুনর্জীবিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কারে পুত্রকে উঠাইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে লইয়া যান এবং সাত্ত্বিক প্রণিপাত করাইয়া পুনরায় কবিতা দ্বারা স্তুতি করিতে থাকেন। এখনও এই সকল কাহিনী এই প্রদেশে গ্রাম-গীতির মধ্যে প্রচারিত আছে।

হরিকিশোরদেবজীর পরে তৎপুত্র প্রাণকিশোরজী গাদী লাভ করেন। প্রাণকিশোরজী কোন কারণে তাঁহার পুত্রের পরিবর্তে শৌর্য দামোদরকিশোরজীকে গাদী প্রদান করিয়া যান (১৯০২ বিক্রমসংবৎ=১৮৪৫ খ্রিঃ)। দামোদরকিশোর অসুস্থ ছিলেন, সুতরাং দেববিধানে তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার পিতা অর্থাৎ

প্রাণকিশোরের পুত্র অটলকিশোরই গাদীতে উপবেশন করেন। ইহার বহু বৎসর পরে তাঁহারই স্ত্রীযোগা উওবাদিকারী শ্রীকিশোরদেবজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে করৌলী মদনমোহনের সেবাদিকার প্রাপ্ত হন।

করৌলীতে মদনমোহনের মন্দির ও সেবাপূজা  
করৌলীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন দক্ষিণভাগে মদনমোহনদেবের বর্তমান মন্দির অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের বা দুর্গের বহির্দ্বার ও প্রাকারের মধ্য দিয়াই মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইতে হয়। উচ্চ বেদীর উপর বিস্তৃত ও দীর্ঘ গর্ভালায়ে মদনমোহনদেব অধিষ্ঠিত আছেন। গর্ভালায়ের উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্বে আরও দুইটি প্রকোষ্ঠ। এই দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী গর্ভালায়ে সিংহাসনোপরি মদনমোহনদেব বিরাজমান। উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠে পৃথক সিংহাসনে মদনমোহনের স্বরূপশক্তিদ্বয় রাধা ও ললিতা অধিষ্ঠিতা থাকেন। এই স্থান হইতে উক্ত শক্তিদ্বয় বিভিন্ন অবসরে মদনমোহনের সিংহাসনে আসিয়া মিলিত হন। মদনমোহনের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে করৌলীর মহারাজ গোপালদাসজীর আবিষ্কৃত করৌলীর আদি বিখ্যাত বাধাগোপালদেব অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারই সংলগ্ন পৃথক সিংহাসনে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া রাধা ও ললিতাদেবী বিধাজিত আছেন। মদনমোহন যে সময় যুগলিত স্বরূপে সবসাধারণকে দর্শন দান করেন, সেই সময় রাধা-গোপালও যুগলিতস্বরূপ একত্রে কবেন। মন্দিরটি পূর্বাভিমুখী।

গভীরের সম্মুখে স্থদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত বেতকৃষ্ণ প্রস্তরমণ্ডিত উচ্চ জগমোহন। জগমোহনের নিয়ে মন্দিরমণ্ডিত সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ হইতেই দর্শকেরা মদনমোহনদেব ও রাধাগোপালদেবের দর্শন লাভ করেন।

করোলের বর্তমান সেবাধিকারী গোস্বামিগণ বঙ্গদেশীয় হুগলী জেলায় গজা গ্রামেব ঘোষাল-বংশীয় ব্রাহ্মণ। মদনমোহনের সেবাধিকার লাভ করিয়া বংশপরম্পরায় ‘গোস্বামী’ উপাধি ধারণ করিয়াছেন। মূলতানে ইহাদের অনেক শিষ্য-সেবক ছিলেন। পাকিস্তান হইবার পর সেই সকল শিষ্য নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বর্তমানে দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, গাজিয়াবাদ, কানপুর, বোম্বাই, পুনা ও কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শিষ্যগণ বাস করিতেছেন।

মদনমোহনের সেবার ভক্ত প্রায় ত্রিশটি দেবোত্তর গ্রাম আছে। তাহা হইতে বৎসরিক প্রায় উনত্রিশ হাজার টাকা আয় হয়। তাহা ছাড়া, ভেট, শিষ্য-সেবকগণের ও বিভিন্ন দেশাগত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত প্রণামী প্রভৃতি হইতেও সেবানুকূল্য পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, করোলাতে ৩৬০টি দেবমন্দির আছে। করোলায় মদনমোহনের মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে করলাদেবী (কালীদেবীর অপভ্রংশ) ও তর্গাদেবী আছেন। এই প্রদেশের সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট এই করলাদেবীর নামই অধিক প্রচারিত। তিল্লী চৈত্রী নুফা ছাদশী তিথি হইতে গুজরা ছাদশী পর্যন্ত এক পক্ষকাল এই করলাদেবীর স্থানে একটি বিবাহ মেলা হয়। সেই সময় সহস্র সহস্র লোক নানা স্থান হইতে তথায় সমবেত হন।

#### করোলা যাইবার পথ

ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের দিল্লী-মথুরা-বরনা-বোম্বাই লাইনের (বড় লাইন) গাড়ীতে দিল্লী বা মথুরা হইতে সরাসরি হিণ্ডোন সিটি স্টেশনে পৌঁছনো যায়। কোন কোন মেল হিণ্ডোন সিটিতে থামে না; এক্ষণ উত্তর দুই স্টেশন পরে গঙ্গাপুর সিটি স্টেশনেও অবতরণ

করা যায়। হিণ্ডোন সিটি স্টেশন হইতে করোলা প্রায় বিশ মাইল। এতোক ট্রেনের সহিত মোটরবাসের সংযোগ আছে। গঙ্গাপুর সিটি



চন্দ্রদাসদেব গোস্বামী—কন্দাবনর মদনমোহনদেবের সেবাধিকারী

স্টেশন হইতে করোলা প্রায় ২৫ মাইল হইবে। তথা হইতেও মোটর ট্যাক্সি ও মোটর-বাস পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথম দিকে কোন পাকা রাস্তা নাই, হিণ্ডোন সিটি দিয়া করোলা যাওয়ার পথই অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বলিয়া মনে হয়। করোলাতে যে স্থানে ব্যক্তিগণ অবতরণ করেন (অর্থাৎ মোটরবাসের বিরতি-স্থান) তাহা হিণ্ডোন-দরজা নামে খ্যাত। হিণ্ডোন-দরজা হইতে মদনমোহনের মন্দির প্রায় তিন কালং।



# কবি-কথা

## শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক

৪

উষাস্তর সংখ্যা বাড়িছে, অন্ন বস্ত্র চাকুরী চাহি,  
হে কবি, তোমার কবিতা পড়ার ইচ্ছা এবং সময় নাহি।  
দুর্ঘটনার নাতিক অবধি, দিন যে কাটিছে চিন্তা ভয়ে,  
সকল দ্রব্য অগ্নিমূলা,—মানুষের প্রাণ এত কি সতে ?  
মান কি অর্থ কিছুই পাবে না, কবিতা তোমাকে দেবে না পেতে,  
কবির কণ্ঠ বল কিসে শুনি ? কি কর বসিয়া দিবস বেতে ?  
হও ব্যবসারী, কর্ম্মী কি নেতা, কিংবা বেড়াও শ্লোগান দিয়ে,  
বহু দিকে পাবে বহু সুবিধা, মাথা ঘামায়োনা কবিতা নিয়ে।  
কালের, কলের ঘণ ঘণ শোন, খামাও তোমার বেণু ও বীণা—  
ও পেশা অচল, বুঝলে কিনা ?

২

সীত ম্যানরী'র দাপট দেখেছ ? 'মালান' 'ম্যালেনকক'কে মানো ?  
'রোজেনবার্গে' মৃত্যুদণ্ড কেন দিল তার কারণ জানো ?  
থাকো ছন্দে স্বমুগ্ধ নিম্নে, স্রবের সোচাগে, কথার ধূমে,  
খপর নাও না কি যে করিছেন, 'হো চিন্ মিন্' আর 'মে সাভুমে'।  
'আইসেনহাওয়ার' ভাষণায় যে বীজ বপন করেন আনন্দে—  
দেখো না হয়ে তা আফিম ফুল যে, কোটে কোরিয়ার ডুবার-ক্ষেতে ?  
'ইরাণ' ধনিত্তে কি তেল উঠিছে ? 'সুয়েজে' 'নার্জীব' কি খেলা খেলে  
জানো কি কেমনে সাগর বাধিছে 'ফরমোসা' দ্বীপে কাঠবিড়ালে ?  
ওই সব নিয়ে নাটক লেখো না, লাগাও উপক্ৰাসের কাজে—  
কবিতা লিখো না—বকো না বাজে।

৩

কবি বলে ক্ষমা কর হে বন্ধু, যা করি করিব ব'দিন বাচি,  
বুহং ব্যাপার তোমাদের থাক, আদার বেপারী ভালই আছি।  
'অভাবের কথা' কহিছ, কিন্তু গ্রাহ্য না করি বৃষ্টি হিম ও,  
সিনেমা গৃহতে নিত্য দেখছি লোকের ভিড় যে অপরিসীম।  
সকলেই সহি সমান হুং, বাখার অংশ সমান আছে,  
কিন্তু তা বলে, দেখিতে ভুলিনে কদম ফুল ফুটেছে গাছে।  
সাময়িক পাঠ বন্ধ করিনে, উৎপাত করে যেতেই হয়,  
বৃষ্টিতে ঘরে জল পড়ে বলে দেখিব না নাকি ইন্দ্রধনু ?  
দেখ স্তম্ভর সত্য ও শিবে নরন-মনের তৃপ্তি বাহা—  
একা তুমি অতো ভেব না আহা !

মাটির হাঁড়ির মূল্য বেড়েছে, তবু কুতূহলী দেখে যে কবি—  
'গোয়ারি'র মুংশিল্লীর গড়া স্তম্ভর দেব-দেবীর চবি।  
'গামছা' 'ফেরানি' মতর্থা হ'ল, ক্রয় করিতেও কষ্ট ভারি  
কিন্তু তবুও 'কহবা' যে দিই দেখিয়া শাস্তিপুত্রের শাড়ী।  
মুংশিল্লীরা গড়িবে কি 'টালি' ? গড়িবে কি শুধু 'গামলা' 'জালা' ?  
'মালসা' 'ভাঁড়ে'র গুদাম হবে কি তাহাদের চাকু শিল্পশালা ?  
রবে কি মোদক 'সরভাঙ্গা' তাজি কেবল 'পাটালি' 'মুড়কি' নিয়া ?  
মণিকার আর স্বর্ণকারেরা কাঠ কাটিবে কাননে গিয়া ?  
দেশটাকে দেখা পরিণত হতে রুগ্ন মনের হাসপাতালে—  
বিধাতা মোদের লেগেনি ভালো।

৫

কবিতা না পড় তাতে কি ভংগ ? এ তো করা নয় অন্তর্গত,  
যেতে মান নেওয়া, আমরা যে ভাবি, অপমান চেয়ে চাৰিষত।  
সকল দৈন্ত চেয়ে, তে বন্ধু মনের দৈন্ত বিষম ব্যাধি,  
আধপেটা খাই তবুও এখনো বীণার গংটি তেমনি সাধি।  
লাভ যাতে নাই, না করাই শেষঃ সাধু উপদেশ, সরল অতি,—  
কিন্তু কোকিল বলিভুক্ত হলে—'বাবুট' হলে যে দেশের ক্ষতি।  
আমাদের আছে শত অনটন, উদরেতে আছে প্রচুর দুখা।  
তবুও তুমি ক্ষুদে পাই মোরা 'বিদ্যে'র সেট ক্ষুদ্রের সুখা।  
ডাকি অনাগত চিত্রাকাক্ষিক-ত, শুল্ক কলস স্তবায় ভরি —  
ভাঙা এ পৃথিবী নূতন গড়ি।

৬

কবির কণ্ঠ বুঝিনে বন্ধু—বতরু ভানি কই তুঁতারে,  
ছপের শিখরে স্পের অলকা সৃষ্টি করিতে নে-ই যে পারে।  
মহাসাগরের সোহাগ-পরশ হেবে কবি পাণিশখ-গায়ে,  
শোনে চন্দন-বনের কাহিনী নিদাঘের পর কঙ্কাবায়ে।  
প্রাসাদ-নগরী মর্দরপুরী কবে যাবে উবে স্থিরতা নাহি  
পৃথিবীর সব বস্তুর চেয়ে স্বপ্ন কবির অধিক স্থায়ী।  
মৃগনাভি মাঝে মৃগেরে জীয়ায়, শুক্লিকে তার মুক্তা মাঝে,—  
সীতা নাই যেথা, কবি অবিরত রত ছায়াসীতা গড়ার কাজে।  
ভাবকে রূপ আর রূপকে ভাব যে দেওয়াই তাহার কন্ড জানে  
তাই করি কবি ধন্য মানে।

# পুজা ও প্রীতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কেনেছি আমি বনের ঘুপে মগ্নবিত ভাষা,  
সুযোদয়ে উঠেছে ফুটে নূতনতর আশা,  
স্বর্ণালোকে জেগেছে ধরা শেফালি বরা প্রাতে,  
দেখেছি জাগে একাকী চান্দ্রোত্তমা বরা রাতে ।  
বিচিত্র কে ? প্রকাশ কার নিত্য নব রূপে ?  
তেরি যে হাসি, তেরি যে তব অক্ষ চূপে চূপে ।  
একান্ত সে নিঃসর নয়, মমতা আছে তারো ।  
প্রকৃতি ? তারে বেসেছি ভালো, মানবে বাসি আরো ।

ক্লদ বাধু কুঁসিরা ওঠে খটকা বহু বেগে,  
বিচলী-জ্বালা বলকি ওঠে আকাশতরা মেঘে ।  
শ্রোতঃস্বনী উদ্যাদিনী—ছোটে সে কলরোলে,  
তরঙ্গিত সিঁদুরকে প্রলয় দোলা দোলে ।  
নয়নে জ্বলি বহি, কাপে চরণতলে ধরা,  
সে রূপ ভীমা প্রকৃতিদেবী ভীষণা মনোহরা ।  
কখনো তারে লাগে যে ভালো, কখনো করি ভয়,  
মাহুখে ভালবাসিয়া গাতি মানবতার জয় ।

নিবিড় শ্রাম অরণ্যানী—চরিত্রা চলে ছুটে,  
সরল ভটি লোচনে তার কি-ভাষা উঠে ফুটে !  
শব্দঙ্গের লোলুপ চোপে জলে সঞ্চার শিখা,  
শাস্ত পরিবেশে সে করে সৃষ্টি বিভাসিকা ।  
প্রকৃতি আছে স্নেহের মাঝে, প্রকৃতি আছে ভয়ে,  
আজও নাহি পড়িল ধরা সে কোন পরিচয়ে ।  
কখনো ভাবি অচেনা চির, কখনো চিনি তবে,  
মানবপ্রেমে ফিরিয়া আসি 'তাই তো বারে বারে ।

আমার গীতি মানবগীতি বেসেছি খারে ভালো,  
হৃদয়ে তার প্রীতির ভার, নয়নে তার আলো ।  
কত-না আছে হর্ষলতা, অপূর্ণতা কত,  
কেহ ত নহে, কিছু ত নহে তবুও তার মত ।  
আলোকে মেই—পেয়েছি খুঁজে অর্থ জীবনের,  
সবার বড় মাহুখ—'তাই পেয়েছি আমি টের ।  
প্রকৃতি ? তারে পুজেছি আমি বিবিধ উপচারে,  
মাহুখ মম নিকটতম, বেসেছি ভালো তবে ।

# অজানার দেখা

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আজি বরষাঘোত ধরা  
কালো মেঘের উত্তরীয়ে  
দোলে স্বপন চন্দ-ভরা  
শ্রাম-শোভন কাস্তি নিয়ে ।  
বুকে দহন-বেদনা ধরি'  
জাগে অনল-দীপ্ত রবি,  
আলো-সাগরে সিনান করি'  
কবি আঁকিলো সে বাঙা ছবি ।

হুনেছে সে যে কাহার বাণী ?  
সে কি চপলা-চকিতে ধামে ?  
তা'র স্বপন-মুদ্রিগান  
আলোর যেন জোয়ারে নামে ।  
মরমে তাই ধরিল আশা  
প্রাণের তা'র সাগর-কূলে,  
কণ্ঠে তা'র তারানো ভাষা  
পলকে আজি উঠিল ছপে ।

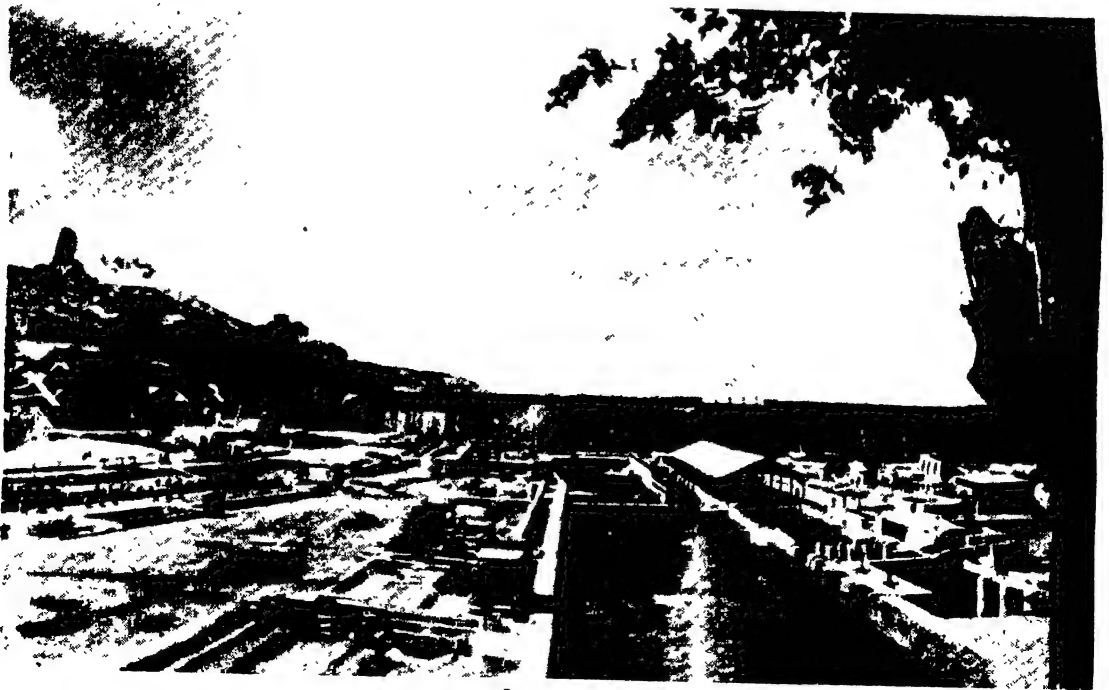
হৃদি-কমল বহু 'পরে  
মন-মধুপ সঞ্চরণে  
প্রেম-পরাগ নীরবে স্বরে  
গোপন তার গুহ্যরণে !  
তাই বিরহ-অশ্রু, কবি  
বেগেছে যত নয়নে ধরি'  
সঁপিয়া আজি দিবে কি সবি  
তার জীবন-পাণ্ড ভরি' ।

দেহ-ধূপের বেদিকা 'পরে  
প্রেম সে তার আগুন জ্বালে,  
হুটি নয়নে আরতি করে  
প্রাণের বৃক্ষি আহুতি ঢালে !

বঁধুয়া হবে দাঁড়ালো একা  
অপরূপ সে রূপের সাজে  
অজানার সে পেলে কি দেখা  
মুখ কবি হিয়ার মাঝে ।



নবগঠিত তনুধৰাজোৰ অশুদৃত্ত বিশাপাণ্ডনের সমুদায়ৰে ভেলে দ্বাপায়। দূৰে বিশাপাণ্ডন শহৰ



মুখা নলীৰ খাডাকোষাসলা বাধেৰ নিকটে পুণা বিসার্চ ষ্টেশন





বি-বি-সি'র টি ভি টি চিত্রে উইলিয়াম সেক্সপীয়রের "দি লাইফ এণ্ড ডেথ অফ কিং জন"-এর অভিনয়



আলেক্সান্ডার আই. এন্. এস-এর লে: কম্যাণ্ডার ইব্র সিং ও কম্যাণ্ডার কোহলি সহ জেনারেল মহম্মদ নেজীব

# দুর্গামূর্তির ঐতিহাসিকতা

ডক্টর শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি

১

শিশুকাল হইতেই আমরা শারদীয়া বোধনকে জাতীয় উৎসব-রূপে দেখিতে অভ্যস্ত। সিংহবাহিনী দশভুজা ও মহিষাসুরের অতিরিক্ত দুর্গার ছই তনয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং দুই পুত্র কাশিক ও গণেশ এই মূর্তির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। দুর্গামূর্তির সহিত এই চারিটি মূর্তি সংস্থাপনের বিশেষ কোন পার্থক্যতা নাই। বৎসরের অল্প সময় বিশেষ পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও, শারদীয়া পূজা উপলক্ষে এই চারিটি দেবদেবীর পূজা হয় না।

কবিগণ এই পূজা-উৎসবকে পূজা-কল্প' সমাভ্যাহারে পার্বতীর পিতৃহৃৎ তিন দিবস যাপন কল্পনা করিয়া অনেক কাব্যের সৃষ্টি করিলেও পুরাণে এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। যে চণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বনে দুর্গাপূজার সৃষ্টি, তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে গৃহীত। উক্ত পুরাণে চণ্ডীর তিনটি লীলার বর্ণনা আছে। প্রথমটির নাম যোগমায়া বা মহাকালী। ইহাতে দেবীর অংশ গৌণমাত্র। ত্রক্ষার স্তবে তুষ্ঠ হইয়া ইনি মাত্র বিষ্ণুকে মায়াযুক্ত করেন; বিষ্ণুই মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে সংহার করেন।<sup>১</sup> দুর্গার দ্বিতীয় আবির্ভাব মহিষাসুর দলনের নিমিত্ত হয় ও দেবতাদের সম্মিলিত তেজে ইহার জন্ম।<sup>২</sup> ইহার নাম জয়া বা মহালক্ষ্মী—ইনি সিংহবাহিনী এবং কখনও বা দশভুজা কখনও বা সহস্রভুজা। মহিষাসুর বধের সমগ্র আখ্যানে ইহার সাহায্যার্থ কোনও দেবীমূর্তির উদ্ভব হয় নাই।<sup>৩</sup>

শুভ ও নিশুভ নামক দৈত্যপতিদ্বয়ের অত্যাচার প্রতিকারার্থ দেবতার পার্বতী অথবা অপরাধিতা দেবীকে স্তবে তুষ্ঠ করিলে দেবীর শরীর হইতে চণ্ডীর তৃতীয় মূর্তির উদ্ভব হয়।<sup>৪</sup> ইনিও সিংহবাহিনী কিন্তু অষ্টভুজা। শুস্তের প্রথম সেনাপতিকে একাকিনী সংহার করিলেও, চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয় নিণনার্থে ইনি আপন শরীর হইতে চামুণ্ডা নাম্নী দেবীর সৃষ্টি করেন।<sup>৫</sup> পরে শুস্ত ও নিশুস্তের সহিত যুদ্ধের প্রাকালে ত্রক্ষা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, বরাহ ও নৃসিংহ নামক বিষ্ণুর অবতারদ্বয় এবং ইন্দ্র আপন আপন শরীর হইতে শক্তি-রূপিনী দেবীর উদ্ভব করিয়া ইহার সাহায্যার্থে প্রদান করেন।<sup>৬</sup> শুস্তকে নিধন করিবার সময়ে আবার এই সকল শক্তি বা দেবী চণ্ডীর শরীরে লীন হইয়া যান—পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।<sup>৭</sup>

লক্ষ্য করিবার বিষয় দুর্গার শেষ মূর্তিতে আমরা একাধিক দেবীর সমাবেশ দেখিতে পাই। পার্বতীর শরীর হইতে

কেবল ইহারই উদ্ভব হয়। ইনি কিন্তু মহেশ্বরের শক্তি-রূপিনী দেবী নহেন। বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী ব্যতীত বরাহ ও নৃসিংহ অবতারদ্বয়ের শক্তি বরাহী ও নারসিংহীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই উল্লেখযোগ্য। এই দেবীর নাম মহাসরস্বতী। পক্ষান্তরে তিন অবতারের মধ্যে ঐহার মূর্তি আমরা পূজা করি তিনি মহিষ-মর্দিনী হইলেও তাঁহার নাম মহালক্ষ্মী ও পার্বতীর সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। তিনি একাকিনীই দৈত্য দমন করেন।

২

পৌরাণিক ভিত্তির অতিরিক্ত ঐতিহাসিক তথ্যালোচনার জন্য আমাদের মূর্তির ধারাবাহিক অভিব্যক্তির অনুসরণ করাও কর্তব্য। ইহার যুক্তি একটু দুর্বল, কারণ যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে কেবল তাহাদের দ্বাণাই অভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ সম্ভব। কাল-প্রবাহ ও ধ্বংসকারীর দ্বারা সম্পূর্ণ নষ্ট ও এখনও ভূকম্পের প্রোথিত মূর্তির হিসাব না থাকায় আমাদের সিদ্ধান্ত একটু দুর্বল। যে সকল একাকিনী দেবী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেগুলির সময় নির্ধারণ সম্ভব তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

- (ক) কাণ্ডদীর পার্বতী মূর্তি, অনুমান প্রথম শতাব্দী।<sup>৮</sup>
- (খ) মহাবলীপুরের চণ্ডীমূর্তি, অনুমান ষষ্ঠ শতাব্দী।<sup>৯</sup>
- (গ) কল্লিওরমে মহিষমর্দিনী মূর্তি, অনুমান সপ্তম শতাব্দী।<sup>১০</sup>

(ঘ) কোদগুপুর ও ইলোরার গঙ্গামূর্তি, অনুমান অষ্টম শতাব্দী।<sup>১১</sup>

(ঙ) ত্রিপতির ভদ্রকালী, মাগের মহাকালী এবং ইলোরার পার্বতী মূর্তি, অনুমান অষ্টম শতাব্দী।<sup>১২</sup>

(চ) মহেন্দ্রপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে নিম্নিত পার্বতী মূর্তি, অষ্টম শতাব্দী।<sup>১৩</sup>

পক্ষান্তরে আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে একাধিক মূর্তি পাই :

(ক) ইলোরার পার্বতী মূর্তি, অনুমান নবম বা দশম শতাব্দী।<sup>১৪</sup>

এই মূর্তির সহিত পার্বতীর নিম্নলিখিত অষ্ট-অবতারের মূর্তি আছে :

ভদ্রকালী, মহাকালী, অম্বিকা, মঙ্গলা, সর্কমঙ্গলা, কাল-রাত্রি, ললিতা ও গৌরী। লক্ষ্য করিবার বিষয় কালী, তারার প্রভৃতি বাংলায় প্রচলিত দশমহাবিভা হইতে ইহা বিভিন্ন

এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কোনও উল্লেখ ইহাতে নাই—মূল মূর্তির অভিযান্ত্রিকরূপ দেবীমূর্তিই ইহাতে দেখা যায়।

(খ) মহাবলীপুরের ত্রীমূর্তি এবং ইলোরার লক্ষ্মীমূর্তি দুইটির সহিত দুইটি করিয়া দেবীমূর্তি আছে, অনুমান সপ্তম শতাব্দী ইহাদের নির্মাণকাল। ১৫

(গ) মাজাজ মিউজিয়মে রক্ষিত ভবানীমূর্তি প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী মূর্তি, ইহার সহিত দুইটি দেবীমূর্তি আছে। অনুমান অষ্টম শতাব্দী। ১৬

(ঘ) কোদগুপুরের সরস্বতী মূর্তি, দুইটি দেবীমূর্তি সহ, উপরি-উক্ত মূর্তির সমসাময়িক। ১৭

(ঙ) দুইটি দেবমূর্তিসহ উদয়গিরির গঙ্গামূর্তি—অনুমান অষ্টম শতাব্দী। ১৮

(চ) খণ্ডের রাজবংশের শর্কালীমূর্তি ( দুই দেবী সহ ) একাদশ শতাব্দী। ১৯

(ছ) লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে নিৰ্ম্মিত দুইটি সজিনীসহ ( বাহার অত্যন্ত মা বাণবাদিনী ) পার্শ্বতীমূর্তি ষাটশ শতাব্দী। ২০

(জ) বর্তমান কাটোয়ার নিকটবর্তী কালিকাপুর গ্রামের মহিষমর্দিনী মূর্তি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ, অনুমান পূর্কোক্তগুলির সমসাময়িক।

উপরি-উক্ত তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয় গ্রীষ্মীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্কের সকল দেবীমূর্তিই একক এবং অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে লক্ষ্মী, সরস্বতী অথবা গঙ্গামূর্তির সহিত দেবীমূর্তি পাওয়া গেলেও দুর্গা বা পার্শ্বতীমূর্তির সহিত অত্র দেবীমূর্তির ( ইলোরার পার্শ্বতীমূর্তির সহিত অত্র মূর্তি মূল মূর্তিই অভিযান্ত্রিক মাত্র ) নিদর্শন একাদশ শতাব্দীর পূর্ক পাওয়া যায় না।

৩

যতগুলি হিন্দুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ( বাহাদের সঠিক কাল নিরূপণ সম্ভব ) তাহাদের মধ্যে কাওদীর পার্শ্বতীমূর্তি ( মতান্তরে ইহা বৌদ্ধদেবী তারার মূর্তি ) ব্যতীত অপরগুলি বৌদ্ধযুগের শেষ দিকে অথবা বৌদ্ধযুগের পরে নিৰ্ম্মিত। মূর্তিনিৰ্ম্মাণের কলা বিশেষ ভাবে বৌদ্ধযুগেরই অবদান। প্রথম যুগে বুদ্ধের যতগুলি মূর্তি পাওয়া যায় তাহাতে তিনি একক হইলেও পরবর্তীকালে কখনও কখনও সজিনী সমভিব্যাহারে বুদ্ধমূর্তি নিৰ্ম্মিত হইত। ত্রীত্যাগী বুদ্ধের পূজার সহিত মহা-যান সম্প্রদায় ভোগী বুদ্ধের উপাসনা করেন ও হীনযান সম্প্রদায় একক যোগীবুদ্ধের মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিতে থাকায় দুই প্রকারের মূর্তি একসঙ্গে দেখা যায়। যে সকল একক

বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির কাল নিরূপণ সম্ভব :

(ক) হস্তিনানগরের মূর্তি, অনুমান ৮১ খ্রীষ্টাব্দ। ২১

(খ) সয়েট উপত্যকার মূর্তি, অনুমান ১০০ খ্রীষ্টাব্দ। ২২

(গ) মথুরায় রক্ষিত মূর্তি, অনুমান ১২৫ খ্রীষ্টাব্দ। ২৩

(ঘ) তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মূর্তি, প্রথম শতাব্দীর। ২৪

(ঙ) হস্তিনানগরের মূর্তি, অনুমান ৭২ খ্রীষ্টাব্দ। ২৫

(চ) খুলনা বাগেরহাটের ( বর্তমান শিবমূর্তিরূপে পূজিত ) মূর্তি, তৃতীয় শতাব্দী। ২৬

(ছ) নালন্দার বৌদ্ধমূর্তি, অনুমান চতুর্থ শতাব্দী। ২৭

ইহাদেরই সমসাময়িক সজিনীসহ বুদ্ধমূর্তির তালিকা প্রদত্ত হইল :

(ক) সয়েট উপত্যকার দুইটি দেবীসহ বুদ্ধমূর্তি, অনুমান খ্রীঃ পূঃ ১০০। ২৮

(খ) দুইটি দেবীসহ বুদ্ধমূর্তি বর্তমানে মিউনিক্ মিউজিয়মে রক্ষিত, অনুমান ৮০-১০০ খ্রীষ্টাব্দ। ২৯

(গ) উপরি-উক্তটির অনুরূপ ও সমসাময়িক মথুরা মিউজিয়মের মূর্তি। ৩০

(ঘ) ছয়টি মূর্তি (চারটি দেবীমূর্তিসহ) তক্ষশীলার মূর্তি, দ্বিতীয় শতাব্দী। ৩১

(ঙ) শাহজীর চেরীতে প্রাপ্ত দুই দেবীসহ বুদ্ধমূর্তি, অনুমান ৮০-১০০ খ্রীষ্টাব্দ। ৩২

(চ) পাঁচটি দেবদেবী সহ পেশোয়ারের মূর্তি, দ্বিতীয় শতাব্দী। ৩৩

(ছ) দুইটি দেবীসহ গুপ্তযুগের ( ৪র্থ শতাব্দী ) বুদ্ধমূর্তি, বজ্রী-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত। ৩৪

(জ) বেলারামের অবলোকিতেশ্বর দুইটি দেবীসহ, পূর্কোক্তটির সমসাময়িক। ৩৫

(ঝ) উদয়গিরির লোকেশ্বর দুইটি দেবীসহ ঋষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর। ৩৬

(ঞ) মুসলমান-আক্রমণ আশঙ্কায় ভূগর্ভে প্রোথিত ও কুরকীহারা ( বিহার ) গ্রামে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র মূর্তি। ৩৭ অপর একটি ৩ ফুট উচ্চ প্রস্তরমূর্তি। ৩৮ অনুমান অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নিৰ্ম্মিত। উভয়েরই সহিত দুইটি দেবীমূর্তি আছে, বাহার অত্যন্ত মা তারাদেবী।

(ট) দুইটি দেবীসহ খাসপাড়ার লোকেশ্বর মূর্তি ( অনুমান সপ্তম শতাব্দী )। ৩৯

(ঠ) তারা ও বিভাদেবী প্রজাপারমিতাসহ দশম শতাব্দীর লোকেশ্বর মূর্তি। ৪০

(ড) তারা নারী দেবী ও হরগ্রীব নামক অর্দ্ধ অশ্ব ও

অর্ধ নবানুত্তি দেবমূর্তিসহ ঢাকা মিউজিয়ামের লোকনাথ মূর্তি,  
১০ম শতাব্দী ১৪১

(৬) দুইটি দেবীমূর্তি (অন্ততমা তারা) সহ চম্পিতা  
লোকনাথ ভট্টরিকা মূর্তি পুর্নোক্তটির সমসাময়িক ১৪২

(৭) অষ্টম শতাব্দীতে নিম্নিত লোকনাথের একটি মূর্তি  
মহাকালী নামক গ্রামে পাওয়া যায়। তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি  
দণ্ডায়মানা দেবীমূর্তি ও সম্মুখে উপবিষ্ট দুইটি দেবীমূর্তি, লক্ষ্মী,  
সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ-সম্বলিত দুর্গামূর্তির সাদৃশ্য প্রদর্শন  
করে ১৪৩

(৮) পুরুলিয়াতে প্রাপ্ত বোমিসঙ্গ মূর্তির বাম পার্শ্বে  
তারা ও দক্ষিণ পার্শ্বে ক্রকুটি তারার মূর্তির সহিত দক্ষিণ  
দিকে হয়গ্রীবের মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহা সম্ভবতঃ  
নবম বা দশম শতাব্দীর ১৪৪

এখানে, তারামূর্তির বহু নিদর্শন একটি উল্লেখযোগ্য  
বিষয়। প্রজ্ঞাপারমিতা বিদ্যাদেবী ও হয়গ্রীব বিদ্যাদেবী একরূপ  
বিশ্বাস মহাযানশ্রেণীতে সুপ্রচলিত ছিল ১৪৫ হয়ত ইহার  
আদর্শেই দুর্গামূর্তির সহিত বাগদেবী সরস্বতীকে দেখা যায়।  
হয়গ্রীব গণেশমূর্তির আদর্শ কিনা তাহাও বিচার্য্য, কারণ  
উভয় মূর্তি অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধনর এবং গণেশকেও লেখনীহস্তে  
দেখা যায়।

৪

পূর্বেই দেখিয়াছি, মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায় বুদ্ধমূর্তির  
সজ্জিতরূপে দেবীমূর্তি গঠন আরম্ভ করেন ও এই সকল দেবী-  
মূর্তির মধ্যে তারার মূর্তি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার  
করে, কারণ শেষের দিকে বুদ্ধমূর্তির অন্ততমা সজ্জিতরূপে  
তারাকে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। বুদ্ধের সজ্জিতরূপের মধ্যে  
অন্ততমা হইবার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় তাহার স্বতন্ত্র  
ভাবেও পূজা হইতে থাকে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারামূর্তির  
সজ্জিতরূপে দুই বা ততোধিক দেবদেবী দেখা যায়। নিম্নে  
কয়েকটি প্রসিদ্ধ তারামূর্তির বিবরণ দেওয়া হইল :

(ক) দুইটি দেবীমূর্তিসহ আফগানিস্থানের তারামূর্তি, চতুর্থ  
বা পঞ্চম শতাব্দী ১৪৬

(খ) মহেন্দ্রপালের রাজত্বের নবম বর্ষ ও রামপালের  
রাজত্বের সময়ে নিম্নিত দুইটি তারামূর্তি নবম শতাব্দী  
(প্রত্যেকটি দুইটি দেবীমূর্তিসহ) ১৪৭

(গ) শ্রামবাগের তারামূর্তি ইহার অল্পরূপ ও সম-  
সাময়িক ১৪৮

(ঘ) ভাগলপুরের নিকট প্রাপ্ত সাড়ে তিন ফুট লম্বা  
ও দুই ফুট উচ্চ প্রস্তরখণ্ডে দুইটি সজ্জিত দেবীমূর্তি তারামূর্তি খোদিত,  
অনুমান নবম শতাব্দী ১৪৯

(ঙ) কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত দুইটি সজ্জিত দেবীমূর্তি  
ষড়িধরগী তারার দণ্ডায়মানা মূর্তি, শ্রামবাগের মূর্তির সম-  
সাময়িক ১৫০

(চ) কলিকাতা মিউজিয়মে দুইটি সজ্জিত দেবীমূর্তি উপবিষ্টা  
তারার মূর্তি। পুর্নোক্তটির কিছু পরের বলিয়া মনে হয় ১৫১

এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য যে, ভাগলপুরের প্রস্তরখণ্ডের  
তারামূর্তির অন্ততমা সজ্জিত পদ্মাসনা উষা বা মারীচি দেবী ও  
ষিষ্ঠীয়া সজ্জিত তরবারিধারিণী একজটা।

ত্রিযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ষষ্ঠ হইতে দশম  
শতাব্দীতে প্রাপ্ত তারামূর্তির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।  
যথা :

(ক) মহাময়ূরী ও মারীচি নামী সজ্জিত দেবীমূর্তি চতুভুজা  
সিতারা ১৫২

(খ) ষড়ভুজা সিতারা, ইনি একাকিনী ১৫৩

(গ) পাঁচটি মূর্তিসহ মহাপ্রজ্ঞিতারা ১৫৪

(ঘ) মারীচি ও মহাময়ূরীর অতিপ্রিয় একজটাদেবী  
ও জাম্বুলী নামক দেবদয়সহ অশোকাতারা ১৫৫

(ঙ) বরদাতারা—ইহার সহিত দুইটি দেবীমূর্তি ও দুইটি  
দেবমূর্তি দেখা যায়, দেবীমূর্তিগুলি নিকটবর্তিনী ১৫৬

(চ) একাকিনী আযাতারা ১৫৭

বৌদ্ধযুগের দেবী তারামূর্তির সহিত বর্তমান দুর্গামূর্তির  
সাদৃশ্য সুপ্রসিদ্ধ। তারার সজ্জিতরূপের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে  
পদ্মাসনা মারীচিমূর্তি দুর্গার তনয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাদৃশ্য  
সুচিত করে। মহাময়ূরী হয়ত পরে সরস্বতীতে রূপান্তরিত  
হইয়াছেন, কারণ সরস্বতী কোথাও-বা হংসবাহিনী, কোথাও  
কোথাও ময়ূরবাহিনী। একজটা পরে শীতলাদেবীতে  
পরিণত হন তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে ১৫৮

৫

হিন্দু দেবমূর্তির সহিত একাধিক দেবদেবীমূর্তি বৌদ্ধ  
রীতির অনুকরণ বলিয়াই মনে হয়।

আমাদের বাংলাদেশে সরস্বতীকে ব্রহ্মার জীর্ণরূপে কল্পনা  
করিলেও ব্রহ্মার যে কয়টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে  
সরস্বতীর অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মার চারিটি মূর্তির মধ্যে তিনটিতে  
যথা : (ক) মাজাজ ১৫৯, (খ) এভারু ১৬০ ও (গ) আহোলের ১৬১  
ব্রহ্মামূর্তি একাকী। আকোলহোসের ব্রহ্মামূর্তির সহিত  
সাতটি সজ্জিত ও সজ্জিত থাকিলেও ১৬২ তাহাতে সরস্বতীর চিহ্ন-  
মাত্র নাই।

গণপতির মূর্তি কখনও-বা একাকী, কখনও তাহার সহিত  
একটি ক্ষুদ্র জীর্ণমূর্তি দেখা যায়। বিহারের একসরাই গ্রামে  
প্রাপ্ত, অনুমান একাদশ শতাব্দীর গণপতি-মূর্তির সহিত  
দুইটি দেবীমূর্তি আছে ১৬৩

শিবলিঙ্গ ভিন্ন শিবমূর্তির পূজা অপেক্ষাকৃত বিরল হইলেও মাঝে মাঝে হরপার্বতীর যুগলমূর্তিও দেখা যায়। নিম্ন-লিখিত তিনটি মূর্তিতে একাধিক দেবীমূর্তি দেখা যায়।

(ক) ইলোরার উমা-মহেশ, দুইটি দেবীমূর্তিসহ, অষ্টম শতাব্দী ৬৪

(খ) ইলোরার রাবণ গ্রহ (উমা-মহেশ) দুইটি দেবী ও দুইটি দেবমূর্তিসহ, পুরোক্তের সমসাময়িক ৬৫

(গ) বাদামীর হরহর (অর্দ্ধ বিষ্ণু অর্দ্ধ শিব) অম্বুমান নবম বা দশম শতাব্দীর। ইহার দুই পার্শ্বে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও হরপ্রিয়া পার্বতীর অতিরিক্ত নন্দী ও গুরুভূমুতিও আছে ৬৬

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ভারতে ব্যাপক স্তম্ভোপ-সনা সিথিয়ান ব্রাহ্মণেরাই প্রচার করেন। বৈদিক যুগের স্তম্ভোপাসনা লোকে ভুলিয়াই গিয়াছিল ৬৭ প্রায়ই স্বর্ধ্য-মূর্তির সহিত অন্য দুই মূর্তি বা তাহার অধিক মূর্তি দেখা যায়। যথা :

(ক) মাজাজ-গোড় মিশ্রিত (বর্ষ বা সপ্তম শতাব্দী) উবা ও প্রভুয়ার সহিত ৬৮

(খ) মাড়োয়ার (অষ্টম শতাব্দী) রজনী, সুবর্ণা, সুবাচা ও ছায়ার সহিত ৬৯

(গ) মাড়োয়ার (অষ্টম শতাব্দী) রজনী ও নিকাছবা দেবীসহ—দণ্ড ও পিঙ্গল সহিত ৭০

(ঘ) হাভেরীর মূর্তি (নবম শতাব্দী) রজনী ও নিকাছবার সহিত ৭১

(ঙ) পাটনা মিউজিয়মের দুইটি দেবীমূর্তিসহ স্বর্ধ্যমূর্তি (৯ম বা ১০ম শতাব্দী) ৭২

(চ) বক্রীর-সাহিত্য-পরিষদের মূর্তি, পুরোক্তটির সম-সাময়িক, ইহাতে দণ্ড ও পিঙ্গল দেবমূর্তি থাকিলেও কোন দেবীমূর্তি নাই ৭৩

(ছ) বুদ্ধগয়ার দুইটি স্বর্ধ্যমূর্তি, ইহাদের সহিত দুইটি করিয়া দেবীমূর্তি আছে, নির্মাণের তারিখ পাওয়া যায় না ৭৪

(জ) পালযুগের স্বর্ধ্যমূর্তি, অম্বুমান ৯ম শতাব্দী. দুই দেবী ও দুই দেবসহ ৭৫

বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার বুদ্ধ। বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দু ধর্মাস্তরিত বৌদ্ধগণকে আপন আপন দলে টানিবার একটা ব্যাপক প্রয়াস হয়। সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব-গণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার স্বীকার করিয়া লইয়া ও ভারতে অধিক প্রচলিত মহাবান পদ্ধতিতে বুদ্ধমূর্তির অম্বরূপ বিষ্ণু-মূর্তি নির্মাণ করিয়া মহাবান বৌদ্ধদের দলে টানিবার চেষ্টা করেন এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

নিম্নে এই মহাবান রীতিতে নিম্নিত বিষ্ণুমূর্তিগুলির (যাহাদের তারিখ প্রদান সম্ভব) একটি তালিকা দিতেছি :

(ক) দুইটি দেবীমূর্তিসহ নালন্দার ত্রিবিক্রম মূর্তি, অম্বুমান বর্ষ শতাব্দী, বৌদ্ধকেন্দ্রেই ইহা প্রথম নির্মাণ হয় দেখা যাইতেছে ৭৬

(খ) দুইটি দেবীমূর্তিসহ বিষ্ণুমূর্তি, তিব্বতে প্রাপ্ত। গঠনভঙ্গী অম্বুসারে পুরোক্তটির এক শতাব্দী বা দুই শতাব্দী পরে ৭৭

(গ) মহাবলীপুরের মার্কণ্ডেয় (দেব) ও ভ্রুকুটি (দেবী)সহ যোগাসন বিষ্ণুমূর্তি, অম্বুমান সপ্তম শতাব্দী ৭৮

(ঘ) মহাবলীপুরের ভূদেবী ও লক্ষ্মীসহ ভোগাসন মূর্তি—পুরোক্তটির সমসাময়িক ৭৯ ভূদেবীর হস্তে শ্বেতপদ্ম থাকায় ইনিই বোধ হয় পরে সরস্বতীতে রূপান্তরিত হন।

(ঙ) ভোগস্থান মূর্তি—পুরোক্তটির অম্বরূপ ও সম-সাময়িক (বিষ্ণু উপবিষ্ট) ৮০

(চ) উচাই বিহারের বাসুদেব মূর্তি লক্ষ্মী ও বীণাবাদিনী দেবী (পববতী যুগের সরস্বতী)সহ মহীপালের সময়ে (৯ম শতাব্দী) নিম্নিত ৮১

(ছ) স্থানক মূর্তি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ, অম্বুমান নবম শতাব্দী ৮২

(জ) মাহেশ্চক্তিস বিষ্ণুমূর্তি, লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ, নবম শতাব্দী ৮৩

(ঝ) কটকের বিষ্ণুমূর্তি, লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ, পুরোক্তটির সমসাময়িক ৮৪

(ঞ) বিক্রমপুরের বিষ্ণুমূর্তি, লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ, দশম শতাব্দী ৮৫

(ট) বর্ধমানে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে (১ ফুট ৫ ইঞ্চি × ১০.৩ ইঞ্চি) চক্রধারিণী লক্ষ্মী ও বীণাবাদিনী সরস্বতীসহ বিষ্ণুমূর্তি খোদিত, দশম শতাব্দী ৮৬

(ঠ) গোরক্ষপুরের লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তিসহ দশম শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তি ৮৭

(ড) উহারই অম্বরূপ ও সমসাময়িক আর একটি মূর্তি ৮৮

(ঢ) একসরাই গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ বিষ্ণুর দণ্ডায়মান মূর্তি, ইহার পশ্চাতে চালচিত্রের অম্বরূপ খোদিত আছে—অম্বুমান একাদশ শতাব্দী ৮৯

বৌদ্ধযুগের শেষ দিকে প্রথমে দাক্ষিণাত্যে ও তাহার পর শঙ্করাচার্যের অভ্যুত্থানের পর উত্তর ভারতে সঙ্গিনীসহ বিষ্ণু-মূর্তি গঠিত হইতে থাকে—তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস উপরে দেওয়া হইল। বিষ্ণুসঙ্গিনীরূপে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়

দেবীই নবম শতাব্দী হইতে পূজিতা হইতে থাকেন তাহার প্রমাণও আমরা পাই।

৬

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে আমরা যে তথ্য পাই তাহার সারাংশ :

(ক) যে পৌরাণিক ভিত্তি অনুসারে আমরা মহিষ-মর্দিনীর পূজা করি সেই মহালক্ষ্মীর সহিত পার্শ্বভৌর কোন সম্প্রদায় নাই।

(খ) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধমূর্তির সহিত দেবীমূর্তির উপাসনা করেন। কতকটা আকার-সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও কতকটা সূক্ষ্মত্বের পূজারী শিল্পী-গণের আকর্ষণ একের স্থানে দুইটি নারীমূর্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে।

(গ) অধুমান ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধমূর্তিতে দুইটি পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমতঃ, বুদ্ধমূর্তির অন্ততমা সঙ্গিনী-রূপে তারামূর্তি একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাদেবী প্রজ্ঞাপারমিতা কখনও কখনও দ্বিতীয়া সঙ্গিনীরূপে দেখা দেন।

(ঘ) তারা এই সময় হইতে কখনও কখনও মূল মূর্তি-রূপেও পূজিতা হইতে থাকেন ও তাঁহার সহিত পদ্মাসনা মার্জীচি বা উষা ও ময়ূরবাতিনী মহাময়ীকে সঙ্গিনীরূপে দেখা যায়।

(ঙ) প্রায় এই সময়েই হিন্দুপ্রধান দক্ষিণ-ভারতে ত্রী (লক্ষ্মী, বা ভবানী (সরস্বতী) দেবী ও সূর্যাদিদেবের সঙ্গিনী-সহ মূর্তি দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধবিরোধী হিন্দু অভ্যুত্থান সূচিত করে।

(চ) নবম শতাব্দী হইতে বিষ্ণুসঙ্গিনীরূপে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজিতা হইতে থাকিলেন। ইহার পূর্বোক্ত বিষ্ণু-মূর্তির সহিত দেবীমূর্তি থাকিলেও তাহা সর্বদা লক্ষ্মী বা সরস্বতী নয়।

(ছ) পার্শ্বভৌরূপে ব্যাপক পূজা নবম শতাব্দীর পরে ও পার্শ্বভৌর সহিত লক্ষ্মী এবং সরস্বতী মূর্তির পূজা প্রধানতঃ উত্তর ভারতে একাদশ শতাব্দীর পরেই হয়।

(জ) বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গণ্য করিয়া ও মহাযান রীতিতে দুই সঙ্গিনীসহ বিষ্ণুমূর্তির নির্মাণ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে অনেক ঋণাত্মকিত বৌদ্ধকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সাক্ষ্যই তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শাক্ত সম্প্রদায়কে তাঁহাদের নীতি অনুসরণে উৎসাহ করে। তাঁহারা প্রথমে “তারা”দেবীকে দুর্গার দশমহাবিভার অন্ততমা

গণ্য করিলেন ও দুই সঙ্গিনীসহ তারার অনুসরণে দুর্গামূর্তি নির্মাণ করিলেন। বিষ্ণুর দুই স্ত্রীকে দুর্গার সঙ্গিনী করিয়া লওয়ায় তাঁহাদের দুর্গার কল্পারূপে গণ্য করিতে হইল। দুই স্ত্রীর মধ্যে একজনকে ব্রহ্মার ও অপর জনকে বিষ্ণুর স্ত্রী মনে করার হয়ত একটা কারণ ইহাও ছিল যে, ইহার দ্বারা দুই দেবাদিদেব দুর্গার জামাতা ও দুর্গা ইহাদের প্রণম্যা হইলেন।

মূল দেব বা দেবীমূর্তির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় দেবীমূর্তির অতিরিক্ত আরও দুইটি দেবমূর্তি যে প্রায় উপবিষ্ট দেখা যায় তাহা হয়ত আকারসাম্যের কারণ। দশম শতাব্দী হইতে কয়েকটি বৌদ্ধ ও বিভিন্ন হিন্দু দেবমূর্তিতে ইহা দেখা যায়। দুর্গার মূর্তিতে এইগুলিই তাঁহার পুত্রদ্বয় কান্তিক ও গণেশ হওয়াও স্বাভাবিক। গণেশের আদর্শ বৌদ্ধ হয়গ্রীব বলিয়া মনে হয়। অর্দ্ধ অশ্ব ও অর্দ্ধ নরাকৃতি হয়গ্রীব বিদ্যার দেবতা, অপরদিকে অর্দ্ধ হস্তী ও অর্দ্ধ নরাকৃতি গণেশের হস্তেও দেখান। বুদ্ধদেব কান্তিক বৌদ্ধ তরবারিধারিণী একজটারই রূপান্তরিত মূর্তি কিনা কে বলিবে?

আদিশূরের সময়ে বাংলায় হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান হইলেও দুর্গার বর্তমান মূর্তি লক্ষণসেবের সময় হইতে প্রচলিত মনে হয়। কবির কল্পনা সকল অভাব পূরণ করিয়াছে। পুত্র-কন্তা সমভিব্যাহারে দেবীর তিন দিন পিতৃগৃহে বাস মানবীয়-ভাবের যে মাধুর্য আনিয়াছে তাহা মহিষমর্দিনীর অস্ত্র মূর্তিতে সম্ভব নহে। পুরাণ ঋষীকে কঠোরা বণচণ্ডী রূপে চিত্রিত করিয়াছে, ইতিহাস ঋষীর পাষাণী মূর্তি বক্ষা করিতেছে, বাংলার শিল্পী তাঁহার মাটির মূর্তি গঠন করিয়া এক কল্পণ ও মধুর ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

### পরিশিষ্ট

- (১) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭৮ অধ্যায় ৪৭-৭৮ শ্লোক
- (২) ই ৮০ " ১-৩৩শ "
- (৩) ই ৮১ " ৩২শ "
- (৪) ই ৮২ " ৪র্থ "

- (৫) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৪ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক
- (৬) ই ৮৫ " ১২শ "
- (৭) ই ৮৭ " ২য় "

8. *Early Hindu Sculpture*—Ludwig Bach Hoffer, Vol. II, Plate 7.

9. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. I, Part II, Plate CV.

10. *Ibid.*, Vol. IX, Part II, Plate CIII.

11. *Ibid.*, Vol. I, Part II, Plate CIV.

12. *Ibid.*, Vol. I, Part II, Plates CVI, CVII.

13. *Eastern School of Medieval Sculptures*—R. D. Banerjee, Plate VI.

14. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. I, Part II, Plate CVIII.
15. *Ibid.*, Vol. I, Part II, Plates IX, X.
16. *Ibid.*, Vol. I, Part II, Plate CXIII.
17. *Ibid.*, Vol. I, Part II, Plate CXIV.
18. Patna Museum—Exhibit No. 6498.
19. *Eastern School of Medieval Arts*—R. D. Banerjee, Plate IC.
20. *Ibid.*, Plate XIC.
21. *Early Indian Sculptures*—Ludwig Bach Hoffer, Vol. II, Pl. 79.
22. *Ibid.*, Vol. II, Pl. 83.
23. *Ibid.*, Vol. II, Pl. 103.
24. *Ibid.*, Vol. II, Pl. 140.
25. *Ibid.*, Vol. II, Pl. 142.
26. ବାଲ୍ୟାବ୍ର ଢଗ୍ଗ E B. Rly 1୯40 Ed ଅବସାନୀ ୩୭ ପୃଷ୍ଠା ୧୭୧
27. Patna Museum—Exhibit No. 8459.
28. *Ibid.*, Exhibit No. 1066.
29. *Early Indian Sculptures*—Ludwig Bach Hoffer, Vol. II, Plate 82.
30. *Ibid.*, Vol. II, Plate 81.
31. *Ibid.*, Vol. II, Plate 152.
32. *Ibid.*, Vol. II, Plate 148.
33. *Hand-Book of Sculptures of Peshwar Museum*, Page 51, Plate 280.
34. *Hand-Book of Sculptures of Bangiya Sahitya Parishat Museum*, Pl. C6/169.
35. Patna Museum—Exhibit 9791.
36. *Ibid.*—Exhibit 6890.
37. *Ibid.*—Exhibit 9771.
38. *Ibid.*—Exhibit 9891.
39. Lucknow Archaeological Museum—Exhibit No. G 219.
40. Nalanda Museum.
41. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures of Dacca Museum*—N. K. Bhattashali, A(11)a/2.
42. *Ibid.*, Plate II, P. 14.
43. *Ibid.*, Plate A(11)a/4.
44. *Hand-Book of the Sculptures of Museum of Bangiya Sahitya Parishat*, Plate cd(1)/20.
45. *Eastern School of Medieval Arts*—R. D. Banerjee, Page 3.
46. *Eastern Indian Sculptures*—Ludwig Bach Hoffer, Vol. II, Plate 160.
47. *Eastern School of Medieval Sculptures*—R. D. Banerjee, Plates IIIC, IVC.
48. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures at the Dacca Museum* by N. K. Bhattashali, IB(V)a/1.
49. *Hand-Book of the Sculptures of Bangiya Sahitya Parishat Museum*, C(c)/269.
50. *Buddhist Iconography Based on Sadhan Mala*—Benoytosh Bhattacharya, Plate XXXIC.
51. *Ibid.*, Plate XXXIIC.
52. *Ibid.*, Page 137.
53. *Ibid.*
54. *Ibid.*
55. *Ibid.*, Page 136.
56. *Ibid.*
57. *Ibid.*
58. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. I, Part I, Page 139.
59. *Ibid.*, Vol. 2, Part II, Plate CXLIII.
60. *Ibid.*, Vol. 2, Part II, Plate CXLII.
61. *Ibid.*, Vol. 2, Part II, Plate CXLIV.
62. *Ibid.*, Vol. 2, Part II, Page 506.
63. Patna Museum (Not classified and numbered).
64. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. 2, Part II, Plate XXVII.
65. *Ibid.*, Vol. 2, Part I, Plate LIII.
66. *Ibid.*, Vol. 2, Part I, Page 335.
67. *Ibid.*, Vol. I, Part I, Page 310.
68. *Ibid.*, Vol. I, Part I, Plate LIII.
69. *Ibid.*, Vol. I, Part I, Plate LXXXVII.
70. *Ibid.*, Vol. I, Part I, Plate LXXIX.
71. *Ibid.*, Vol. I, Part I, Plate LXXXVIII.
72. Patna Museum—Exhibit 32.
73. *Hand-Book of Sculptures of Bangiya Sahitya Parishat Museum*, Pl. XVII.
74. *La Sculptures de Bodhi Gaya*—Ananda Coomaraswamy.
75. Lucknow Archaeological Museum—Exhibit 11 29.
76. Patna Museum—Exhibit No. 10609.
77. *Ibid.*—Exhibit No. 2763.
78. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. I, Part I, Page 81.
79. *Ibid.*, Vol. I, Part I, Page 82, Plate XXII.
80. *Ibid.*, Vol. I, Part I, Pages 87-88.
81. ବାଲ୍ୟାବ୍ର ଢଗ୍ଗ E B. Rly vol. 1, page 136
82. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. I, Part I, Page 84.
83. Patna Museum—Exhibit No. 6563.
84. *Ibid.*—Exhibit No. 1356.
85. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures of Dacca Museum* by N. K. Bhattashali, No. 3A(1)a/2.
86. *Hand-Book of the Sculptures of Bangiya Sahitya Parishat Museum*, F(a)1/352.
87. Lucknow Museum (Archaeological)—Exhibit H-106.
88. *Ibid.*—Exhibit No. H-107.
89. Patna Museum—Exhibit 10629.





# ভাসের বাসবদত্তা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

স্বপ্নবাসবদত্তম্ কবিকুলপতি ভাসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি । রাজশেখর বলেছেন,  
ভাসনাটকচক্রেহি হেঁকেঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্ ।

স্বপ্নবাসবদত্তস্ত দাহকোহুত্ব পাবকঃ ।

অর্থাৎ ভাসের নাটকসমূহ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পরীক্ষার নিমিত্ত  
বখন উপস্থাপিত করা হ'ল, তখন অগ্নি বা পরীক্ষাগ্নি "স্বপ্নবাসবদত্তম্"  
এতদকে দহু করিতে পারলেন না ।

কবিসম্রাট কালিদাসও স্বীয় মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রারম্ভে  
ভাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন । স্বপ্নবাসবদত্তম্ ও মাল-  
বিকাগ্নিমিত্রম্ গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তুর অনেক সামঞ্জস্য পরিস্ফুট এবং  
কালিদাস বহু ক্ষেত্রে ভাসের দ্বারা প্রভাবিত—এ বিষয়ে সন্দেহের  
অবকাশ নাই । এই মহাকবি প্রাচীন নাটকের নায়িকা বাসবদত্তা  
যে কবি-হৃদয়ের অল্পপম স্নেহে, নিপুণ তুলিকার কোমল লেপনে,  
রূপে লাবণ্যে গুণ-গরিমায় অতুলনীয় হবেন, সন্দেহ কি? স্বপ্ন-  
বাসবদত্তার নায়িকা সতী, সার্বভৌম, দয়ালু, মতই চিরপ্রদেয়া,  
চিরবন্ধনীয় ।

উদয়ন-বাসবদত্তার প্রেমকাহিনী ভারতের যুগ-যুগান্তরের সম্পদ ।  
কালিদাস মেঘদূতে বলেছেন গ্রামবৃদ্ধো উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী  
আলোচনার চিত্ত বিনোদন করতেন । গুণাঢ্য তাঁর বৃহৎকথায়  
উদয়ন-বাসবদত্তার ভারতবিখ্যাত প্রেমকাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়ে-  
ছিলেন—তার রসান্বাদন আমরা এখনও করছি, "কথাসরিংসাগর",  
"বৃহৎকথা মঞ্জরী" বা "বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্রহ" প্রভৃতির মাধ্যমে ।  
ধর্মপন গ্রন্থের ২১-২৩ কবিতার টীকাংশেও উদয়নবাসবদত্তার প্রেম-  
বৃত্তান্ত পূর্ণভাবে লিপিত আছে । দিব্যাবদান, মহাবংশ প্রভৃতি  
বৌদ্ধ গ্রন্থ ও কুমারপাল প্রতিবোধ প্রভৃতি জৈন-গ্রন্থেও এই কাহিনী  
সমুদ্রিত হয়েছে । বাসবদত্তা গল্পের ভারতম্যা অনেক । সে ভারতম্যা  
নারকের চরিত্র, বাসবদত্তার প্রতি প্রকৃত হৃদয়ের আকর্ষণ প্রভৃতি  
বিষয়ে । যেমন কথা সরিংসাগরের গল্পাংশ থেকে জানতে পারি যে  
উদয়ন "বিরচিতা" নামী কোনও রাজাস্তঃপুরবা দাসীর প্রতি  
প্রেমাসক্ত ছিলেন এবং বাসবদত্তার কাছে তিনি একজ্ঞ পা খবে ক্ষমা  
ভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু বাসবদত্তা-চরিত্রে—বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন  
ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট লেখকের বর্ণনাকল্পিত কোনও বিসদৃশ ইঙ্গিত  
পর্যাপ্তও দৃষ্ট হয় না । তাঁর পিতা অবন্তীরাজ কুটুম্বী ছিলেন,  
রাজকীয় কৌশল প্রয়োজনবশে গ্রহণ করতেন—উদয়ন বংশরাজের  
প্রতি প্রচোতন ঈর্ষ্যার ভাব পোষণ করতেন, বরগীর অনোভাব পোষণ  
করেন নি সত্যি—কিন্তু বাসবদত্তার জীবনে উদয়ন ব্যতীত আর  
ছিল না কিছুই, শরনে স্বপনে নিশি-জাগরণে উদয়ন-চিন্তাই ছিল  
তাঁর সখল, উদয়ন-অভ্যাস্তিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য ।  
উদয়নের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত—ভিন্ন ভিন্ন যুগের লেখকের  
মতে—নানাপ্রকারের কপটতার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল সত্যি ;  
কিন্তু হৃদয় বখন তিনি দান করলেন, তখন সর্বত্র উজাড় করেই দান

করেছিলেন—নিজের বাসনা-কামনার তিলমাত্র স্থানও নিজের  
হৃদয়ের নিভৃত কোণেও রাখলেন না । ভাসের স্তনিপুণ অঙ্কনে  
উদয়ন চরিত্র সমৃদ্ধ ; উদয়ন নানা অবস্থার বিপর্যয়েও বাসবদত্তার  
এই অকৃত্রিম ভালবাসার অমর্যাদা করেন নি, এবং স্বতঃই  
আজকের যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজার বহু দার পরিগ্রহ প্রথমা পত্নীর  
প্রেমের অমর্যাদাকর ; কিন্তু তখনকার দিনের সামাজিক প্রথাকে  
যেনে নিম্নে উদয়নের চরিত্র ভাসের অঙ্কনে বাসবদত্তাচরিত্রের  
মত চির সমৃদ্ধ না হলেও গীনপ্রভ নয় । রাজহুঁহিতা বাসবদত্তা,  
অবন্তীর পুরজ্ঞানপদবাসীর চোখের মণি বাসবদত্তা, সেই যে স্বামীর  
হাত ধরে একবার রাজাস্তঃপুর থেকে বের হয়ে এলেন—আর ত  
দ্বিতীয় বার অবন্তীতে পদার্পণ করেন নি । তিনি ছিলেন জননীর  
বড় আদরের হুঁহিতা—তাঁর জননীই ত এক দিন কস্তার বিবাহের  
কথায় হৃদয়ের মনোবাখা অশ্রুসিক্ত নয়নে স্রবস্ত করেছিলেন  
(প্রতিজ্ঞা—বৌগন্ধ্যায়ণ, ২৭)—

"অদন্তেভ্যাগতঃ লজ্জা দত্তেতি বাধিতঃ মনঃ ।

ধর্ম্মস্নেহাস্তরে কস্তা হুংখিতাঃ শ্লু মাতরঃ ।"

অর্থাৎ, কস্তার বয়স্বাবস্থার বিষয়ে হয় নি, এতে জননীর হয় লজ্জা ;  
অন্ত দিকে কস্তা বিবাহিতা—এ ভাবতে মন হয় বাধিত । ধর্ম্ম ও  
স্নেহের উভয় রজ্জু-পাশে আবদ্ধ জননীদেব হুংখ অনিবার্য । এই  
আদরের জননীর যুগও ত তার পর দিন থেকে বাসবদত্তা আর দ্বিতীয়  
দিন দেখেন নি । যে উদয়নরাজের জন্ত তিনি মাতাপিতার স্নেহ  
থেকে বঞ্চিতা হলেন, মাতৃভূমিতে দ্বিতীয় বার পদার্পণ করলেন না,  
সেই উদয়নরাজের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের সফলতার জন্ত তিনি হলেন  
গৃহত্যাগিনী, জ্ঞাতভাবে ভবিষ্য সন্তানীর দাসী—গুণু তাই নয়,  
তাদের মিলন-প্রতীক বরণমালা গাঁধে দিতে চল তাঁকেই—কি  
অদৃষ্টের বিড়ম্বনা । এ হুংগে—চরম হুংগের মধ্যেও, তাঁর একমাত্র  
সাম্বনা বংশরাজ উদয়ন তাঁকে ভুলতে পারেন নি । এই স্মৃতির  
ভাবোন্মেষ, এই অল্পপম নারী-চরিত্রের সম্পূর্ণ মাধুর্য্য জনন্যক্ষম করার  
জন্ত ভাসের জগজ্জনমনোবিমোহন বাসবদত্তাচরিত্রের পূর্ণোপলব্ধির  
জন্ত স্বপ্নবাসবদত্তার বাসবদত্তা এবং প্রতিজ্ঞা-বৌগন্ধ্যায়ণের বাসব-  
দত্তার চরিত্র যুগপৎ ভাবে অবলোকন করা অত্যাশ্চর্য্যক ।

প্রতিজ্ঞাবৌগন্ধ্যায়ণের বাসবদত্তা

হলে-বলে-কৌশলে প্রতাপাধিত বংশরাজ উদয়ন আজ অবন্তী-  
রাজ প্রচোতনের বন্ধী । তাঁর বিজ্ঞতকীর্্তি ঘোষবতী বীণা বাসবদত্তার  
উপহারের সামগ্রী । বৌগন্ধ্যায়ণ, বসন্তক এবং ক্রমং—বংশরাজের  
জিত্যাকঙ্কিগণ উদয়নের সঙ্গে বোগাবোগ সংরূপ করে তাঁর  
উদ্ধারের চেষ্টার ব্যাপ্ত । উদয়নের উদ্ধারের নিমিত্ত বৌগন্ধ্যায়ণ  
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিন্তু মদনদেব তাতে বাদ সাধলেন । উদয়নরাজের  
উদ্ধারের পূর্ব পর্য্যকল্পনা ত্যাগ করে এখন বৌগন্ধ্যায়ণ বাসবদত্তা সহ  
উদয়নের উদ্ধারের পুনঃপ্রতিজ্ঞা করলেন । বাসবদত্তা প্রিয়ের হাত

ধরে বেঁধে হয়ে পড়লেন অচেনা জগতে। বাসবদত্তার মেহাত্মা জননী কত্তার হৃৎথে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত করলেন। রাজা বাসবদত্তা ও উদয়নের প্রতিমূর্তির বিবাহ দিতে সম্মত হওয়ার জননী সে সম্মত ভাগ্য করলেন। যে বাসবদত্তাচরিত্র-কুসুম উত্তরকালে বিচিত্র সুবহার জগৎ সুরভিত করেছে, সে অল্পময় লাভাশ্রম কোরকের উদ্দেশ্য ও বিকাশ প্রতিজ্ঞা-বৌগন্ধরায়ণে। ফল ফুলে পরিণতি স্বপ্নবাসবদত্তার।

#### স্বপ্নবাসবদত্তার বাসবদত্তা

স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পরে শোণবতীমোহন উদয়ন সুখের স্রোতে গিলেন পা ভাসিয়ে। রাজকাণ্ড করলেন উপেক্ষা। ফলে স্বীয় রাজ্যের কতক অংশ আক্রমণ হস্তগত হ'ল। বৌগন্ধরায়ণ অতি বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী; তিনি দেখলেন যে আক্রমণকে বংশরাজ্য থেকে বিভাজিত করতে হলে মগধরাজ্যের সহায়তা অত্যাৱশ্যক। মগধ-রাজ্যের ভগিনী পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজা উদয়নের বিবাহসংঘটনই এই সহায়তা লাভের একমাত্র উপায়। রাজা উদয়ন একান্তভাবে বাসবদত্তার প্রেমনিষ্ঠ বলে মন্ত্রী বৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। স্বামীর ইষ্ট-সাধনের জন্ত তিনিও এ বিবাহে সম্মত হলেন এবং বৌগন্ধরায়ণকে পূর্ণ সহযোগিতাপ্রদানে বদ্ধপরিকর হলেন। লাভাশ্রম গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে রাণী বাসবদত্তা এবং বৌগন্ধরায়ণ ভস্মীভূত হয়েছেন এই কথা তাঁর সর্বত্র রটতে গেলেন। অতঃপর মগধরাজ্যে উপনীত হয়ে রাজা দর্শকর ভগ্নী পদ্মাবতীর আশ্রিত্যরূপে বাসবদত্তাকে গচ্ছিত রেখে বৌগন্ধরায়ণ রইলেন আত্মগোপন করে। বিপত্তীক উদয়নরাজ্যের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হয়ে রাজা দর্শক স্বীয় ভগ্নীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহে স্বীকৃত হলেন এবং অচিরকালে এ বিবাহ সংঘটনের পূর্ণ আয়োজন হ'ল। পদ্মাবতীর আশ্রিত্য বাসবদত্তা গাধালেন তাঁদের মিলনমালা। এ সমস্ত হৃৎখের মধ্যে তাঁর একমাত্র সাঙ্গুনা রইল এইটুকু যে রাজা দর্শকই এ বিবাহ রটিয়েছেন, উদয়ন উপবাচক হয়ে এই বিবাহ করেন নি। বৌগন্ধরায়ণের গৃঢ় প্রচেষ্টায় স্বীয় অলৌকিক আত্মদানের ফলে সব সজ্জাতি হচ্ছে বটে; কিন্তু হৃদয় বাধা মানে কোথায়? তাই বাসবদত্তা বলছেন—এ বিবাহ তাড়াতাড়ি সম্পাদন করার জন্ত এরা যতই চেষ্টা করছেন, ততই হচ্ছে হৃদয় আমার হৃৎ-ভারাক্রান্ত—“জহ জহ তুববদি, তহ তহ অক্ষীকরই যে হিঅঅ।” নিরন্তর গভীর ধ্যানের ফলে তিনি এতই আত্মস্থ হয়ে পড়েন যে, তিনি যে বেঁচে আছেন, সেটাই গেছেন ভুলে। তাই রাত্রে প্রথম সময়ে তিনি অবিধবাকরণ গুণ্য গিলেন প্রচুর, কিন্তু “সপত্নী মর্দন” ব্যবহারই করলেন না—তাঁর মতে যার সপত্নী নেই, সেই পদ্মাবতীর বিবাহ-মাল্যে সপত্নী মর্দনের ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক, অবৈতিক।

মগধ রাজ্যে উদয়ন-পদ্মাবতীর দিন কাটছে। বাসবদত্তার মানসিক সহস্র কষ্টের মধ্যেও একমাত্র সাঙ্গুনা—উদয়ন পদ্মাবতীর

নিকট বীণা বাদনে স্বীকৃত নন; বীণা বাজাতে বললেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই হয় রাজা উদয়নের একমাত্র উত্তর। বিদূষকের প্রবেশের উত্তরে নিভৃত রাজা বধন হৃদয়ের বাণী জ্ঞাপন করেন—

“পদ্মাবতী বহুমতা ম বচপি রূপশীল মাধুর্য্যেঃ।

বাসবদত্তাবৎ ন তু তাবদ্যে মনো হবতি।”

অর্থাৎ, যদিও পদ্মাবতী রূপ ও স্বভাব মাধুর্য্যে বহুমানযোগ্যা, তথাপি বাসবদত্তাদত্তপ্রাণ তাঁর প্রাণ নিলীন রয়েছে বাসবদত্তার।

পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে সমুদ্রগৃহে শয়ান। বাসবদত্তা সবল প্রাণে পদ্মাবতীর পরিচর্য্যার জন্ত তত্র উপস্থিত; পদ্মাবতীর ফলে রাজা শয়ান—তিনি জানবেনই বা কি করে? স্বপ্ন ভাষণের ফলে রাজাই শয়ান, তিনি জানতে পেরেই করলেন প্রস্থানের উদ্যোগ। রাজার নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই পিপাসিত নেত্র তৃপ্ত করে রাজাকে তিনি দেখে গিলেন। সুপ্তোপস্থিত রাজা বাসবদত্তার সান্নিধ্য অনুভব করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে হ'ল যেন সবই স্বপ্ন। এ ঘটনা অবলম্বনে বিবচিত্র প্রবন্ধের নামকরণ করেছেন ভাস স্বপ্ন-বাসবদত্তা।

অতঃপর রাজা উদয়নের কাছে রাজা দর্শক গুড সংবাদ গিলেন যে তাঁর শত্রু আক্রমণ ক্ষমধান কর্তৃক পরাজিত হয়েছে। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন রাজা উদয়ন। অবস্থারাজ মহাসেন ও তাঁর মহিষীও এমন সময় তাঁকে গুডাশীর্ষদ জানিয়ে তাঁদের প্রিয় কত্তার বিবাহকালীন একটি প্রতিমূর্তি আরকরূপে করলেন প্রেরণ। পদ্মাবতী ছবি দেখেই বাসবদত্তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারলেন এবং হলেন অমূহুস্তা। অতঃপর বৌগন্ধরায়ণ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত আত্মপূর্ব্বিক বিবৃত করলেন।

#### উপসংহার

সংস্কৃত কাব্য-জ্ঞানীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে যে সকল কবি রসিকজনের চিত্তবিনোদন করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

বস্ত্রাচৌরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপুরো ময়ুরো

ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।

হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণশ্চ বাণঃ

কেবাং নৈবা কথং কবিতাকামিনী কৌতুকার।

(জয়দেবকৃত প্রসঙ্গরাসব, প্রস্তাবনা, শ্লোক ২২)

অর্থাৎ, কবিকুলগুরু কালিদাস কাব্য-জ্ঞানীর চিত্তবিনোদন, মহাকবি ভাস তাঁর সুখের গুড গুটি হাস্যরস—তাঁর আনন্দের মূর্ত্ত প্রতীক।

এই শোভন মধুরিমময় হাস্যবিকাশের মধ্যমণি হচ্ছেন বাসবদত্তা। ভারতীয় নারীহৃদয়ের বত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অনবচ্ছিন্ন কমলীয়তা, মননীয়তা, বরণীয়তা—সমস্ত পূর্ণমাত্রায় চোলে দিয়ে মহাকবি ভাস বাসবদত্তার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয়েরা স্মৃতির সুবর্ণ প্রেক্ষাণ্টে চিরদিন বাসবদত্তাকে উজ্জলতম বিভাৱ দেৱীপ্যমান করে সুসজ্জিত করে রেখেছেন, জানিয়েছেন হৃদয়ের অল্পময় প্রদা।

# সাহিত্য-শিক্ষকের কাহিনী

( ২য় পর্ব )

এনটন পাভলোভিচ শেকভ

অনুবাদক—শ্রীজীবনময় রায়

“গীর্জায় ভীড় হয়েছে খুব, আর তারি গোলামাল হচ্ছে। একবার কে একজন যেন চেঁচিয়ে উঠল। আমার সঙ্গে মাশার বিয়ে দিচ্ছিলেন প্রধান বাজক; তিনি চশমার মধ্যে দিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চটেমটে বললেন, ‘চূপ করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার যোগ দাও সব; গীর্জার মধ্যে গোলামাল ঘোরাধুরি কর না। প্রাণে তোমাদের ধর্মভর থাকা উচিত।’

“আমার হৃৎকন সচক্স্মী আমার মিতবর সেজেছিল; আর মাশার মিতবর সেজেছিল ক্যাপ্টেন পলিয়ানস্কি আর লেফটেন্যান্ট জারনেট। বিশপের গাট্টয়ে দল চমৎকার গান করলে। মোমবাতির চড়বড় শব্দ, চোপ-বলসান আলো, ভ্রমকাল পরিচ্ছন্ন, অক্সিসারের দল, আনন্দে উচ্ছ্বসে ভরা সব মুগ, আর মাশার মুখে বিশেষ এক রকম অপার্থিব ভাব—সমস্ত মিলে—চারদিকের বা কিছু সব—বিবাত-মন্তের কথাগুলি—আমার চোপ অজ্ঞাতে ভরে দিল, আর বুক ভরে দিল বিজয় গর্বে। ভাবলাম কি ভাবে জীবন আমার ফুটে উঠল। কেমন কবিতার ছন্দে ছন্দে সে নিজেকে গড়ে তুলছে। মাত্র হ’বছর আগেও ছিলাম ছাত্র, থাকতাম সম্ভা ঘরে। টাকা নেই, পরসা নেই, আপনায় বলতে কেউ নেই। তখন কল্লনাট করতে পারি নি যে ভবিষ্যতে আশাভরসা করবার মত আমার কিছু থাকতে পারে। আর এখন আমি শ্রেষ্ঠ একটা শহরের হাই স্কুলের শিক্ষক, বাঁধা আমার আর, ভালবাসা পেয়েছি, আদরে প্রেমেরে এখন আমার দিন কাটে। ভাবছি—আমারই জন্মে এত লোক জড়ো হয়েছে; আমারই জন্মে তিন তিনটে বাতি-দান জ্বালান হয়েছে; পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করছেন; গানের দল সাধামত ভাল গাইতে চেষ্টা করছে; আর এই যে নবীনা, একটু পরেই থাকে আমি গৃহিণী বলবার অধিকার পাব, সে ত আমারই জন্মে এমন তরুণ, এমন মনোরম, এমন আনন্দময়ী। মনে পড়ছে, আমাদের দেখাশোনার প্রথম দিনগুলি, শহরের বাইরে ঘোড়ার চড়ে বেড়ানোর কথা; আমার প্রেম-নিবেদনের ঘটনা; আর সারা গরম কালটা, যেন ইচ্ছে করেই, এমন চমৎকার হয়ে উঠেছিল, যে সুখ-সৌভাগ্য আমার আগেকার ঘরে বসে শুধু উপভোগ্য আর রূপ-কথ্যেই থটতে পারে বলে মনে হ’ত, তার কথা। সেই সুখ-সৌভাগ্য আজ আমি দেখে মনে প্রাণে প্রত্যাক করে পাচ্ছি—সেই সৌভাগ্য, ঠিক যেন আশার হাতের মুঠোর পেরে গেছি।

“বিষে শেষ হলে, মাশাকে আর আমাকে ঘিরে, ওরা এসে দাঁড়াল এলোমেলো ভিড় করে। স্বপ্নের অকপট আনন্দ, অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা আমাদের জামাল—‘আমরা যেন হুণী হই।’ সঙ্গ

বছরের বুড়ো ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শুধু মাশাকেই তার শুভেচ্ছা জানাতে লাগলেন। বুড়া বয়সের কাঁকানো গলায় এত চেঁচিয়ে ওকে বলতে লাগলেন যে সারা চার্চের লোক শুনতে পেল :

‘আজ যেমন গোলাপ ফুলটির মত আছ, আশা করি, বিষের পরেও অমনি থাকবে।’

“অক্সিসারেরা, ডিয়েটর, মাষ্টার মশায়রা সকলেই সবিনয়ে হাস-লেন আর বুঝতে পারলাম, আমার মুখেও একটা কৃত্রিম অমায়িক হাসি ফুটে উঠেছে। ইতিহাস ও ভূগোল্যের শিক্ষক, আমাদের ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর—সবাই যা আগে শুনেছে তা ছাড়া কখনও যে আর কিছু বলে না, আশ্চর্যকতার সঙ্গে আমার হাতখানা চেপে ধরে আবেগভরে বললে :

‘এত দিন পঞ্চাশত অবিবাহিত ছিলে আর একলা কাটিয়েছ। আজ তুমি বিবাহিত—আর তুমি একা নও।’

‘গির্জা থেকে আমরা গেলাম একটা দোতলা বাড়ীতে। বাড়ীটা হচ্ছে যৌতুকের একটা অংশ। ঐ বাড়ীটা ছাড়াও মাশা বিশ হাজার রুবল নিয়ে আসছে—তা ছাড়া গানিকটা পোড়ো জমি। তার মধ্যে একটা কুঁড়েঘরে শুনেছি এক পাল মুরগী আর হাস হেপাকতের অভাবে বুনো হয়ে যাচ্ছে। গির্জা থেকে বাড়ী দিয়ে পড়বার ঘরের নীচ সোফাটাতে গা এলিয়ে পড়ে চুপচুপ করে লাগলাম। কি সুখ, কি আশা, কি তৃপ্তি, জীবনে এমনটি আর কখনও পাই নি। ও দিকে বিয়েবাড়ীতে লোকেরা হজা করে হলু-ধনি করছে—বাণ্ডে বাজছে যত বাজে মার্কো লকড় সব গং।

মাশার দিদি ভারি—যেন তার মুখে এক মুগ জল, এমনি অতুত বিকৃত মুগ করে, একটা মদের গেলাস হাতে, দোঁড়ে পড়বার ঘরে চুপ পড়ে; বোকাই যায় যে, ইচ্ছে করে সে থেমে যায় নি; কিন্তু হঠাৎ সে হেসে উঠে কল্লার ভেঙে পড়ে, আর মদের গ্লাসটা মেঝের পড়ে চুরমার হয়ে যায়। আমরা ওকে জড়িয়ে ওখান থেকে বার করে নিয়ে গেলাম।

“‘কেউ বোঝে না গো,’ পিছনদিকের ঘরে বুড়ী নার্সের বিছানায় শুয়ে ও বিড়বিড় করে বকে, ‘কেউ না গো, কেউ না। হা ঠাকুর! কেউ বুঝতে পারে না।’

“বুঝেছিল সকলেই—ভাল করেই বুঝেছিল, বুঝেছিল যে মাশার চেয়ে তার বছরের বড় হয়েও ওর এখনো বিয়ে হ’ল না, তাই। ও কাঁসছে—কোন হিসেবে থেকে নয়—কিন্তু ওর স্বপ্নের যে চলে যাচ্ছে, হয়ত বা চলে গেছেই, এরই চেতনা ওর মনটাকে বিপদে ভরে তুলছে, তাই ওর এই কাহা।

বখন ওরা কোরাঙ্কিল মাচ নাচছে তখন ও কিরে এল—  
চোখের জলে ভিজে, ঘন পাউডারে-মাশা ওর মুখ—দেখলাম ক্যাপ্টেন  
পলিয়ানসকি এক গ্রেট বরফ ওর মুখের সামনে ধরেছেন আর একটা  
চামচ দিয়ে ও তাই পাচ্ছে।

“ভোর পাঁচটা বেজে গেছে। আমার চরম ও পরম স্বপ্নের  
কথা লিখে রাখবার জঙ্গে ডায়েরীপানা তুলে নিলাম—ভাবলাম  
বেশ পাতা ছুরেক লিখব, আর কাল মাশাকে পড়ে শোনাব। কিন্তু  
আশ্চর্য্য এই যে, এক ভারিয়ার ঘটনাটা ছাড়া আর সবই আমার  
মাখার মধ্যে এলোমেলো ছায়াময় স্বপ্নের মত হয়ে গেছে। শুধু  
লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে ‘বেচারি ভারিয়ার’। ঐ একটা কথাই এখানে  
বসে আমি ক্রমাগত লিখে যেতে পারকাম, ‘বেচারি ভারিয়ার’। ও  
দিকে, পাছে পাছে অব্যবহৃত শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখুনি বৃষ্টি আসবে।  
কাকেরা ডাকতে শুরু করেছে, আর আমার মাশা এই সবমাত্র  
ঘুমিয়ে পড়ছে, কেন জানি না, ওর মুখটা কণকণ বিষাদে ভরা  
দেখাচ্ছে।

এর পর অনেকদিন আর নিকিটিন চারেরী লেগে নি। আগের  
গোড়ার ওদের খুলের পরীক্ষা হয়ে যায়—১৫ই তারিখ থেকে  
ক্লাস শুরু হয়। কলিন-মার্কিন নটার সময় ও খুলে যায় আর দশটার  
সময় থেকে মাশার জঙ্গে ওর নতুন বাড়ীর জঙ্গে হেলোতে থাকে।  
নীচের ক্লাসে কোন কোন ছেলেকে ও ডিক্টেশন দিতে বলে।  
ছেলোরা লিখতে থাকে আর ও জানলার উপরে চোপ বুজে বসে খপ  
ঘটনা করে চলে—‘তা সে ভারিয়ারের স্বপ্নই হোক কি অতীতের  
স্মৃতিই হোক—সবই তার কাছে মনে হয় রূপকথার মত মনোবরম।  
উচ্চ ক্লাসে ছেলোরা গোংগোল কিংবা পুশকিনের গল্প রচনা কিছু  
পড়ছে : ওতেই ওর ঘুম পাচ্ছে, গাছপালা মানুষ ঘোড়া তার  
কল্পনার ভেসে উঠছে—নিঃশ্বাস ফেলে ও বলছে, ‘কি চমৎকার!’  
বেন লেপকের রচনার মুগ্ধ হয়ে গেছে।

ধবধবে একটা ঝড়নে বেঁধে টিকিনের ঘন্টার মাশা বোজ ওর  
পাবার পাঠায়। অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে পাবার জঙ্গে  
একটু একটু করে খেমে খেমে ২ পাবারগুলো পায়, আর ইম্পলিট  
ইম্পলিট—শুধু কটি ছাড়া উপরে আর কোনও পাবার বেচারার  
ছোটো না—সমস্তরম ওর দিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে হিংসে হয়,  
সকলেই যা জানে এমন একটা কিছু বলে ওঠে, যেমন :

‘না পেয়ে কেউ বাঁচে না।’

খুলের ছুটি পব তাকে সোজা যেতে হয় ছেলে পড়াতে, আর  
শেষে ছ’টা নাগাদ বখন সে বাড়ী গিয়ে পৌঁছয় তখন ওর মনে সে  
কি উৎসাহ, কি উত্তেজনা—বেন এক বছর ধরে ও বিদেশে পড়ে  
আছে। ছুটে ও উপরে চলে যায়, মাশাকে খুঁজে বার করে, হুট  
হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমু পায়, দিবা করে বলে, ‘ওকে ভালবাসে,  
ওকে না হলে ও বাঁচতে পারে না, বলে, সমস্ত দিন ওর জঙ্গে কি  
ভীষণ হেঁদিয়েছে। তার পর, খুব ভয় পেয়ে স্লিডেস করে—কেমন  
আছে, কেন ওকে এমন মনমরা দেখাচ্ছে। তার পর হুঁজনে মিলে

খেতে বসে। পাওয়ার পর পড়বার ধরে সোকার পড়ে ও তামাক  
কোঁকে, আর পাশে বসে মাশা গুন গুন করে গল্প করে।

ববিবার আর ছুটির দিন ওর সবচেয়ে আনন্দের দিন। সকাল  
থেকে সন্ধ্যা অবধি ও বাড়ী বসে কাটায়। এই সব সবল সুন্দর  
দিনগুলো ওর কাছে গ্রাম্য গাখার মত মনোহর লাগে। কেজো-মেয়ে  
হিসাবী মাশা কি ভাবে যে তার গৃহ-নীড়টিকে সাজিয়ে তুলছে, দেখে  
দেখে ওর চোপ আর ক্লাস্ত হয় না ; ও নিজেও যে একেবারে অকপ্তা  
নয় এইটে দেখাবার আশ্বস্তে, এক একটা অকপ্ত করে বসে—  
চরিত বা আন্তাবল থেকে গাড়ীটা টেনে বার করে এনে, একবার  
এদিক থেকে একবার ওদিক থেকে, চারদিক থেকে সেটাকে দেখতে  
থাকে। মাশা দন্দরমত একপানা ডেরারী খাড়া করে তুলেছে  
তার গোয়ালে, তিনটে গরু, তার ভাঁড়ারে গামলা গামলা দুধ,  
বাটি বাটি পচা ননী—এই ননীকেই সে মাখন তুলবে বলে জমিয়ে  
রেখেছে। সময় সময় একটু রসিকতা করে নিকিটিন এক গ্রাস দুধ  
চায়, আর মাশা পড়ে যায় মহা ফাঁপরে, কেননা ওটা তার নীতি-  
বিরুদ্ধ। শেষে হেসে উঠে নিকিটিন ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, ‘ঠাট্টা  
করছিলাম মণি, ঠাট্টা করছিলাম।’

পাখরের ২৫ একটুকরো শব্দ মাংস কি এক খণ্ড পচা পনীর  
দেখে ওর কড়া গিল্পিপনা নিয়ে হেসে উঠলে ও গভীর হয়ে বলে,  
‘ওরা রান্নাঘরে এসব পেয়ে ফেলবে।’

নিকিটিন টিপ্পনী কাটে, ‘ও বরম সব টুকরো ঠাট্টাফলে ছাড়া  
আব কাউকে দেওয়া চলে না।’ মাশা উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে,  
‘গিল্পিপনার ভারি ত বোঝে পুরুষেরা! রান্নাবাড়ীতে কাঁড়কাঁড়ি  
পোলাও কালিয়াই পাঠাও আর বাই পাঠাও, চাকরবাকরদের কাছে  
ও সবই সমান।’ নিকিটিন বলে, ‘ঠিকই ত, বটেই ত।’ আর  
হুট হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে। মাশার কথার মধ্যে জায়া  
কিছু শুনলেই ও ভাবে অসাধারণ! আশ্চর্য্য! আর ওর মতের  
সঙ্গে বা মেলে না তা ওর কাছে মনে হয়, সরল! বেচারি!

কখনো কখনো নিকিটিন দার্শনিকের মেজাজে থাকে ; একটা  
কোন অবাস্তব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে ; আর মাশা  
অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শোনে।

মাশার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে কিংবা ওর  
বিহুনী নিয়ে জড়াতে জড়াতে আর খুলতে খুলতে ও বলে, বুক-  
জোড়া ধন আমার, তোমাকে পেয়ে আমার স্বপ্নের সীমা নেই।

আমি মনে করি না যে, আমার পক্ষে এ স্তম্ভ, বেরালের  
ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া ; আকাশ থেকে পসে পড়েছে, এ স্তম্ভ একটা  
অতি স্বাভাবিক, সঙ্গত, বধ্যাধ পরিণাম। আমি বিশ্বাস করি যে  
মানুষ নিজেই নিজের স্বপ্নের বিধাতা। আজ আমি বা ভোগ করছি,  
আমি তা নিজের হাতেই গড়েছি। বাজে বিনয় না করেই বলছি ;  
আমিই এ স্বপ্নের বিধাতা—তাই এতে আমার অধিকার রয়েছে।  
আমার অতীতের কথা তোমার অজানা নেই। পিতৃমাতৃহারা সেই  
আমার হৃৎকের শৈশব ; আমার নিয়ানন্দ বৌবন, আমার দারিদ্র্য

—এ সবই ছিল একটা সংগ্রাম; আমার সুখের স্বর্গে আমি যে ঘাব দিয়ে এসে প্রবেশ করেছি, এ ছিল তারই পথ।

অক্টোবর মাসে স্কুলের একটা মঠা দ্বিতীয় হয়ে গেল। মাথার ইরিসিপেলাস হয়ে ইন্সলিট ইন্সলিটিচ মারা গেল। মরার আগে দু'দিন সে অজ্ঞান হয়ে প্রলাপ বকছে। কিন্তু প্রলাপের মধ্যেও সবাই বা ভাল করেই জানে তা ছাড়া আর কিছুই বলে নি।

ভুলগা নদী ক্যাম্পিয়ান ব্রুস গিরে পড়েছে :...ঘোড়া; হুট্টা আর ঘাস পার..."

সংস্কারের দিনে হাইস্কুলের পড়াশুনা বন্ধ ছিল। শব্দার্থ বয়ে নিয়ে গেল ওর সহকর্মীরা আর ছাত্রেরা—স্কুলের গানের দল সারা পথে "হোলি গড" গানটি গাইতে গাইতে গেল। মিছিলে ছিল হাইস্কুলের তিন জন পাত্রী, দু'জন যাত্রক, বয়েজ হাইস্কুলের ইন্সলিটের সব ছাত্র আর শিক্ষকেরা, তা ছাড়া ছিল বিশপের গাইয়ে দল, তাদের সবচেয়ে ভাল পোশাকে সেজে। মিছিলের সঙ্গে লোকের দেখা হলেই তারা বুকের উপর দুই হাতে কুশচিহ্ন করে বলতে থাকে—"ভগবান, এই রকম মরণই যেন আমাদের হয়।"

গোরস্থান থেকে বড় বিচলিত হয়ে বাড়ী ফেরে নিকিটিন—টেবিল থেকে তার ডায়েরীটা নিয়ে লেগে,

"ইন্সলিট ইন্সলিটিচ ব'টলিজকীকে এইমাত্র আমরা কবর দিয়ে এলাম। ওগো বিনয়ী কন্মী! শাস্তি লাভ কর, শাস্তি লাভ কর। মাশা, ভাবিয়া আর যত মেয়েরা সংস্কারে উপস্থিত ছিল, সবাই অকপটে চোখের জল ফেলেছে। তাদের মনে এই কথাটাই জেগেছে যে, এই সামাজ্য নীরস মানুষটি কোনো মেয়ের ভালবাসা পায় নি। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে একটু কিছু মনোমগ্ন কণা এই বন্ধুটির সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে ওরা সাবধান করে দিলে যে ডিবেঙ্কর ওকে বেশী পছন্দ করতেন না, তিনি কিন্তু এতে চটতে পারেন। বিয়ের পর, আমার বিশ্বাস এই প্রথম আমার মনটা ভার হয়ে আছে।"

বঙ্গব' মত কোন ঘটনা বিতালরে সে বছর আর ঘটে নি।

ডুবার পড়ে নি বলে স্যাংসেঁতে বরফে সে নীততা তত তীব্র হয়ে ওঠে নি। যেমন ধরুন, বলা যায় যে শরৎকালের মত, "এপিস্কোপী ইভে" সমস্ত রাত ধরে বাতাস হেঁকে চলেছে—ছাদ বেয়ে টিপ টিপ করে জল ঝরেছে; আর সকালে, 'বারিয়ঙ্গল' উৎসবের সময় পুলিশ কাউকে নদীতে যেতে দিলে না—বললে, নদীর উপর বরফের চেহারাটা সুবিধের দেখাচ্ছে না—ফুলছে। আবহাওয়া মন্দ হলেও নিকিটিনের জীবন সুখেই কাটছিল—গরম কালও যেমন, এখনও তেমনি। অবশ্য, আরও একটা আমাদের রাস্তাও সে পেরে গেছে, সে ভিট খেলতে শিখেছে। সুখের স্বর্গে তার একটা মাত্র কাঁটা ছিল, সে ঐ বেবাল কুকুরের পাল। ওগুলো ওর জী বোতুক পেয়ে-ছিল।

ঘরগুলো (বিশেষ করে সকাল বেলায়) চিড়িয়াখানার মত দুর্গন্ধ ছাড়তে থাকে, কিছুতেই সে গন্ধ নষ্ট করা যায় না।

বেবালেরা কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়াই করে। হিংস্রটে জানোয়ার মুশকটাকে দিনে বিশ বার খাওয়ান হয়। এত দিনেও সে ব্যাটা নিকিটিনের উপর প্রসন্ন হয়নি, ওকে দেখলেই গর্গ-গো-গো-গো করে ওঠে।

রোজার উপোসের সময় একদিন রাত্রে সে ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরছে; সেখানে তাস গেলছিল। অন্ধকার রাত, বৃষ্টি পড়ছে, চারদিকে কাদা পাচপেচে। নিকিটিনের মনের মধ্যে একটা অশান্তি জাগছে—কেন, তা বুঝতে পারছে না। তাসের বাজীতে সে বারো কবল হেরে এসেছে; তাই! না, হিসেব-নিকেশ করার সময় একজন গেলুড়ে ওর জীবর দৌলতের স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেছে, "নিকিটিনের কিনা ঘড়া ঘড়া টাকা--তাঁই।"

টাকা হেরে তার হুপে হয়নি। আর যা বলেছে তাও এমন অপমানের কথা কিছু নয়, কিন্তু তবু কিছুতেই অস্বস্তি ঘোচে না। এমন কি বাড়ী ফিরবে, সে টেছেও না।

স্থির হয়ে একটা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে ও বলে ওঠে, "ওঃ, কি ভীষণ!"

এই কথাটা মনে উদয় হয় যে, টাকা মুক্তে পেয়েছে বলেই ঐ বারোটা কবল ওর গায়ে লাগে নি। যদি গতর পেটে রোজপায় করতে হ'ত তবে প্রত্যেকটি পাই পরমার মূল্য ও বৃদ্ধত; হারজিত সম্বন্ধে এতটা উদাসীন ও হতে পারত না। সব সৌভাগ্যই তার বরাতের জোরে এসে গেছে—কোঁকোটে। সে ভাবে, ওটা তার পক্ষে বাড়তির ভাগ, যেমন সুস্থ মানুষের পক্ষে ওষুধ। যদি দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোকের মত ঠাট্টা হুশিয়ার ওকে বিব্রত হতে হ'ত যদি বেঁচেবহে থাকার জন্তে খসড়াখসড়া করতে হ'ত, যদি পাটতে পাটতে বুকপিঠ বাধার ভেঙে পড়ত, তা হলে রাতের পাওয়া, গৃহ-কোণের আশ্রয়, গৃহস্থ জীবনের সুখ—এ সব তার কাছে সংসারে একান্ত আবশ্যক, সংগ্রামের বিশেষ পুরস্কার, জীবনের সার্থক জয়যুক্ত হয়ে উঠত। এখন বা চলেছে, তার মূল্য বা অর্থ তার কাছে হুকোখা, অনিশ্চিত, পরিণামশূন্য।

এই রকম চিন্তাটাই যে একটা পারাপ লক্ষণ এ কথা ভাল করে জেনেই সে আবার বললে, "উঃ! কি ভীষণ!"

বাড়ী বগন পৌঁছল তখন মাশা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস পড়ছে তার সহজ সমান তালে—মুণে লেগে আছে হাসি—মানে, ভারি আরায়ে ঘুমছে। কাছেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে মাশা বেবালটা আরায়ে গুরুর শব্দ করছে। নিকিটিন আলো জালিয়ে সিগারেট ধরতেই মাশা জেগে ওঠে—উঠে বসে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল পায়।

বলে, 'অনেক মিষ্টি খেয়ে ফেলেছি', আর হাসতে থাকে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে?'

'না।'

ইতিমধ্যেই নিকিটিনের কানে এসেছে যে ক্যাপটেন পলিয়ান্‌স, (ভাবিয়া সম্প্রতি ওর সম্বন্ধে মনে মনে বিরাট আশার সৌধ গড়ে

তুলছিল) পশ্চিমের কোন একটা প্রদেশে বসলি হতে বাচ্ছে : আর এরই মধ্যে সে শহরে সবাইকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেড়াচ্ছে—সুতরাং তার শব্দবাবড়ীর আবহাওয়া এখন মোটেই ঐতিহ্যবাহী নয়।

মাশা উঠে বসে বললে, “ভারিরা এসেছিল সকালে। কিছু বললে না, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যায় যে, কি ভীষণ মনের অবস্থা তার—আচ্ছা বোঝা! হু’চক্ষে দেখতে পারি না পলিয়ান-বিকে। একটা চাপ্পা, হুঁড়োপেটা, চলতে নাচতে গালের মাংস খল খল করে... আমি হল, ও লোকটাকে, কখনই পছন্দ করে নিতাম না। কিন্তু বাই হোক, তবু ভেবেছিলাম লোকটা অস্বস্তি: ভয়লোক।”

নিকিটিন বলে, “এখনও ত আমার ওকে ভয়লোক বলেই মনে হচ্ছে।”

“তবে ভারিয়ার সঙ্গে এমন ছোটলোকমি করল কেন?”

নিকিটিন জিজ্ঞেস করে—“কেন? ছোটলোকের মত কিসে হ’ল?” সন্ধ্যা বেলাটার উপরও মনে মনে চটতে শুরু করেছে—বেলাটা আড়ামোড়া ভাঙছে, আর পিঠটা ধনুকের মত করে তুলছে। বলে, “সত্যই জানি সে কোন বিয়ের প্রস্তাবও করে নি, কোন কথাও দেয় নি।”

“তবে অন্তর করে ও বাড়ী আসার মানে কি? বিয়ে না করার মতলই যদি ছিল, তবে ও বকম করে আসা খুব অস্বাভাবিক।”

বাতি নিবিয়ে দিয়ে নিকিটিন বিড়ানার গিয়ে ওঠে। কিন্তু শুয়ে পড়তে কি ঘুমতে ওর ইচ্ছে করছে না। মাথাটা বোধ হচ্ছে প্রকাণ্ড আর পামাবাবড়ীর মত ফাঁকা, আর লম্বা লম্বা ছায়ার মত নতুন সব অজুত চিন্তা সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ভাবছে, ঐ মুষ্টিওয়ালা বাতিদান থেকে যে কোমল আলো তাদের এই ঘরোয়া নিশ্চিন্ত সুখের উপর উদ্ভাসিত হয়ে পড়ছে, যে নিরাময় ছোট জগৎটির আশ্রয়ে সে আর এই বেলাটা এত আরামে, এত শান্তিতে বাপন করছে, এ ছাড়াও আরও একটা জগৎ আছে—ভাবছে, আর ওর মনে সেই জগতে প্রবেশ করবার জগে একটা তীব্র, সচল, মর্মান্বজনী আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগছে : ইচ্ছে হচ্ছে যে, কোন একটা আড়তে, কিংবা বিরাট একটা কারখানায় গিয়ে কাজে ভর্তি হয় : প্রকাণ্ড জনতাকে আহ্বান করে বক্তৃতা করে; লিখে, ছাপিয়ে চারিদিকে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করে নিজেকে খাটিয়ে, নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে, দুঃখ কষ্ট বহুগণ সহ্য করে... শুধু, নিজেকে ভোলবার মত—একঘেয়ে উত্তেজনার অল্পভূতি ছাড়া বা তাকে আর কিছুই দেয় না নিজের সেই আরাম, আরামের চেষ্ঠা ভোলবার মত—এমন কিছু একটা চায় তার মধ্যে সে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারে। তারপর হঠাৎ তার কল্পনার পটে স্পষ্ট করে শেবালডিনের পরিষ্কার করে কামানো মুখটা জেগে উঠে—আতঙ্কিত হয়ে সে যেন বলছে—“বল কি! লেসিঙের লেংও তুমি পড়ো নি! তুমি যে একেবারে সেকেলে! কি অপদার্থই হয়ে গেছ!”

মাশা জেগে উঠে। খানিকটা জল খায়। নিকিটিন ওর পুঠি ঘাড়, নখর গলার দিকে চেয়ে নেখে, মনে পড়ে চার্চে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল যে কথাটা বলেছিল—“গোলাপ!”

বিড় বিড় করে বলে, “গোলাপ!” বলে হেসে উঠে।

ওর হাসির ভাবাবে মুশকা ঘূমের ঘোরে পাটের তলা থেকে “গরব-গো-গো-গো” করে ওঠে।

একটা রাগ, ঠাণ্ডা ভারী জগদল পাথরের মত ওর বকের মধ্যে গিয়ে যেতে বসে—মাশাকে একটা নিষ্ঠুর কিছু বলে ফেলতে, এমনকি লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে এক বা মারতে মনে মনে একটা দারুণ লোভ জাগছে। বকের মধ্যে ওর তোলপাড় করছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে ও জিজ্ঞেস করে, “মানে, যেহেতু তোমাদের বাড়ীতে আমি যেতাম, অতএব তোমাকে বিয়ে করতে আমি বাধ্য ছিলাম, কেমন?”

“ছিলেই ত? তা তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে।”

“বাঃ বেশ!” তারপর আর এক মিনিট চুপ করে থেকে ও আবার বলে—“বাঃ। এ মন্দ কথা নয়।”

বকের দাবড়ানি ধামাতে, আর পাছে আরও বেশী কিছু একটা বলে ফেল এই ভয়ে, নিকিটিন পড়বার গয়ে গিয়ে বিনা বালিশেই সোফার উপর শুয়ে পড়ে—তারপর নেমে মেজের কাপেটের উপর গিয়ে শোয়।

নিজেকে আশ্বস্ত করবার জগে বলে, “এ সব কি বোকার মত চিন্তা! তুমি একটা শিক্ষক, জগতে তোমার পেশার মত এমন মতং আর কিছু নেই...তোমার আবার আর একটা জগতের দরকার কি পড়ল? যত বাজে সব!”

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃঢ় বিশ্বাসে মনে মনে বলে যে, খাটি শিক্ষক ও নয়, ও শুধু একটা সরকারী চাকর। ঐ যে চেক ভয়লোক, যে গ্রীক পড়ায়, তার মতই নেহাৎ চলনসই নিতান্ত সাধারণ। জীবনে শিক্ষার কাজের জগে তার ভিতরের স্বাভাবিক তাগিদ ছিল না, ও বিবরে আগ্রহও ছিল না—শিক্ষা-বিজ্ঞান সব্বদেও কিছুই সে জানে না; বাচ্চাদের কি বকম করে চালাতে হয় তারও কোন জ্ঞান ওর নেই, বা পড়ায়—তা যে কেন পড়ায় তাও সে জানে না, আর হয়ত বা ঠিক ঠিক বা শেখানো দরকার তাও শেখানো হয় না। বোচারা ইয়লিট ইয়লিটিচের কোন ভান ছিল না, সোজাসজি হালা ছিল, কি ছেলেরা কি ওর সহকর্মীরা সবাই জানত ওকে দিয়ে কতটা কাজ পাওয়া বাবে। কিন্তু নিকিটিন ঐ চেকেরই মত, জানে, চালাকী করে, “ভগবানকে ধন্যবাদ, যে তার শিক্ষার কাজ সফল হচ্ছে”—লোকের কাছে; এই ভান করে, প্রত্যেককে ঠাকিয়ে, নিজের বোকামি কেমন করে ঢাকা দিতে হয়, এই সব নতুন ভাবনা ওর মনে ভর খরিয়ে দেয়। মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সব। বলে, এ সব বোকা চিন্তা; সাবাস্ত কবে যে এগুলো হচ্ছে ওর স্নায়ুবিকার। হেসে উড়িয়ে দিতে হবে ওসব।

সকালে উঠে সত্যিই সে নিজেকে ঠাঠা করে বলে, বুড়ী একটা

মেয়ে-মামুষ হয়ে গেছি। কিন্তু সে স্পষ্টই দেখে যে তার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে; তরত চিরদিনের মতই গেছে। আর, এখন থেকে ঐ ছোট দোতলা বাড়ীটার মধ্যে সুপের সন্ধান মেলা তার পক্ষে অসম্ভব। মনে মনে বুঝতে পারছে যে, তার স্বপ্নের জগৎ মিলিয়ে গেছে, নতুন একটা অতৃপ্তির জগৎ, একটা স্পষ্ট জ্ঞানের জগৎ তার সামনে জেগে উঠেছে, যে জগতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুপ-শান্তির কোন সম্পর্ক নেই।

পরদিন, সে দিন রবিবার। স্কুলের উপাসনা ঘরে গিয়ে তার স্কুলের ডিরেক্টর আর সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হয়। ওর মনে হয় যে, নিজেদের মৃগতা আর জীবনের অসন্তোষ ঢাকবার চেষ্টায় ওরা সবাই প্রাণপণ করছে—আর সে নিজেও, নিজের অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে ভ্রমভার হাসি হাসছে, আর আজে-বাজে বিষয় কথা বলছে। তারপর সে ষ্টেশনে যায়; দেখে, মেল-ট্রেন এল, গেল; একলা একলা থাকতে আর কারো সঙ্গে দায় পড়ে আলাপ করতে হচ্ছে না বলে ওর ভাল লাগে।

বাড়ী ফিরে দেখে ভারিখা আর তার খণ্ডরমণায় এসেছেন; এসেছেন দিনারে। ভারিয়ার চোপ কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে; সে বলছে তার মাথা ধরেছে। শেলেষ্টল খুব এককাড়ি গিলে বলছেন যে, আজকালকার ছেলেদের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না—হাদের মধ্যে ভয় মনোভাবের একবারে অভাব। বলছেন:

“এ হ’ল চাষাড়েপনা; তার মুণের উপর বলব যে, এ তার চাষাড়েপনা। বলবই।”

নিকিটিন অমায়িক হাসি মুখে টেনে এনে মাশার সঙ্গে অভিব্যক্তি-সংকারে লেগে যায়। কিন্তু ডিনারের পরে ও গিয়ে নিজের পড়বার ঘরে চুকে দরজা দেয়।

মার্চ মাস। জানলা গলে তপ্ত রোদ পড়েছে টেবিলের উপর। সব মাসের বিশেষ, কিন্তু এবই মধ্যে গাড়ীওয়ালারা গাড়ীতে চাকা জুড়ে চালাতে শুরু করেছে, আর ষ্টারলিং পাণীরা কিচিৎ-মিচিৎ করে গোলমাল করছে বাগানে। আবহাওয়াটা ঠিক তেমনি, যেমনটি হলে মাশা এসে ঘরে ঢুকবে, এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরবে, বলবে, ঘোড়ায় জীন চড়ানো হয়েছে কিংবা বলবে গাড়ী দরজায় তৈরি, আর ভিজ্ঞাসা করবে কি গরম কাপড় পরলে শীত করবে না। ঠিক গত বছরের মতই চমৎকার রূপ নিয়ে বসন্ত এসেছে, গত বছরের মতই আনন্দের বার্তা ওর আবির্ভাবে...কিন্তু নিকিটিন ভাবছে যে, একটা ছুটি নিয়ে মর্মেতে গিয়ে ওর পূর্বনো আত্মনায় থাকতে পারলে বেশ হয়। পাশের ঘরে ওরা কফি পাচ্ছে আর কাপ টেনে পলিয়ান্স্‌কির কথা আলোচনা করছে। ওদের কথায় কান না দিতে চেষ্টা করে ও ডায়েরীতে লেখে—“ভা ভগবান! এ কোষায় আমি? চারদিকে আমার শুধু ইতরতা, বর্কিততা, শূন্য জীবন। বিরক্তিকর ক্রান্তিকর নগণ্যের দল, বাটি বাটি পচা ননী, ঘড়া ঘড়া চপ, আরসোলার পাল, নিকোশ অজ মেয়ে-মামুষ...ইত্যর বর্কিত পশু-জীবনের চেয়ে ভীষণ, মস্তান্তিক, উদ্বেগজনক আর কি হতে পারে?” এখান থেকে আমায়িক পালাতেই হবে, আজই সরে পড়ব, নইলে পাগল হয়ে যাব।

## হেমন্ত-ল

### শ্রীকরণাময় বস্তু

সজল শিশির-স্নিগ্ধ স্বপ্নঢাকা ছায়া ঝিলমিল  
ধুমায় প্রান্তর-লক্ষ্মী; বনাস্তরে চিত্রসম আঁকা —  
স্বর্ণাভ ধানের ক্ষেত, অভিষাজী হংসের বলাকা  
সুদূর উত্তরমুখে মেলিয়াছে পাখার মিজিল।

এখন প্রাণের বীজে নীলকান্ত মণিমালা রঙ,  
পাহাড়ের স্বর্ণাধারা এনেছে সে আশ্চর্য ধূসর—  
বর্ণাভ জীবন-স্বপ্ন; তাই তো মেঘের এ প্রান্তর  
ছায়াময় অপরাহ্নে, বাজে প্রাণে কি জলতরঙ।

স্তিমিত নদীর স্রোত, বৃষ্টিশায় স্নান ইন্দ্রলোকা,  
স্বপ্নাপাতা এলোমেলো, রূপকণা যেন উদাসিনী—  
গৈরিক বসন পরি’ দূর পথে চলে একাকিনী  
ফুলের বক্ষণ ফেলি, আঁপ-পশ্মে তিম-অন্ধরেণা।

ওগো মেয়ে, কোথা যাও, এঁচলে ত’ এনেছ ফসল,  
এনেছ প্রদীপশিখা, জ্বল দিলে অন্ধকার প্রাণে;  
পৃথিবী-প্রাক্তন তাই মুগ্ধ হ’ল নবায়ের গানে,  
নিতল দীঘির জলে পদ্মকুড়ি কাঁপে ছলোছল।

হিমস্নিগ্ধ বনবায়ু, শূন্য ওড়ে পায়ের আঁক—  
আকাশের নীল গায় ফোঁটা ফোঁটা চন্দনের দাগ।



## রবীন্দ্র-দর্শনের ভূমিকা

ডক্টর শ্রীস্বধীর নন্দী

বহুবিচিত্র সৃষ্টির অন্তরালে কখনো কখনো দার্শনিক দৃষ্টি  
এক মনোময় ঐশী শক্তির অস্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র  
সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের শাবণা।  
যেমন একই মহাচৈতন্ত্বে চৈতন্যময় হ'ল বহুব্যাপ্ত সৃষ্টি, ঠিক  
তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে দীপান্বিত করেছে একটি  
দেউটির আলো। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববোধ' আলোকিত  
করেছে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে। সে আলো ছড়িয়ে পড়েছে  
তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়, তাঁর জীবনে ও তাঁর দর্শনে।  
এই মূল ভাবটিকে অনুসরণ করে আমরা রবীন্দ্রমানসের  
বিবর্তনকে অনুশীলন করতে পারি। সর্বমানবের প্রতি রবীন্দ্র-  
নাথের ঐতি, জীবের প্রতি অসীম মমত্ববোধ, প্রকৃতির সঙ্গে  
তাঁর নিগূঢ় আত্মীয়তা, জাতি ও সমাজের প্রতি তাঁর  
কর্তব্যবোধ, এ সবই তাঁর মূল ভাবনার দ্বারা ভাবিত। এই  
চৈতন্যময় বিশ্ববোধের গারণা তাঁর সমস্ত ভাবনা ও বেদনাকে  
আচ্ছন্ন করেছিল, একথা বললে সত্য কথাই বলা হবে।  
উপনিষদের ঋষিদের মত রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ছিল মহা-  
চৈতন্যকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করার সাধনা, আপনাকে  
ব্যাপ্তচৈতন্যের মধ্যে যুক্ত পাওয়ার তপস্বী। তাঁর নিজের  
কথাতেই বলি :

“এই যে বাণেশ্বর চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে  
উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ পৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে  
স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বাক্য যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের  
চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে উঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ,  
যে লাভ সকলের চেয়ে ব্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ—কাল্পনিকতা নয়।”

[ শাস্ত্রনিকেতন, পৃ: ৪ : ]

ভারতবর্ষে এই বিশ্ববোধের স্মরণ আবেগের দিনে এতই  
সহজ ছিল যে, সেদিনের মানুষকে এই বোধে নতুন করে  
উজ্জ্বল করার জন্ত হয় ত কোন ঋষি-কবির প্রয়োজন হয়  
নি। কালক্রমে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় আমরা এই  
বোধটিকে হারিয়ে ফেলি। জীবনের ঋণ্ডিত আকাশের  
ধ্রুবতারাটি হারিয়ে গেল আমাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টির অন্তরালে।  
লাভ, ক্ষতি, টানাটানির মানিকর আবহাওয়ায় ভারতবাসী  
সেদিন মূহুর্ত মনের সহজ সম্পদকে হারিয়ে ফেলেছিল, তাই  
কবিগুরু আমাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন  
আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদের দিকে—যে সম্পদ প্রাচীন-  
কালে বিশ্বসৃষ্টির মূল তত্ত্বটিকে অত্যন্ত সহজেই আয়ত্ত করতে  
আমাদের সহায়তা করেছিল। এই বিশ্ববোধটিকে একান্ত

ভাবে আপনার করে নেওয়ার ফলে কবির জীবনবেদ বহু-  
বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

কবির ব্যক্তিসত্তা ব্যাপ্ত হয়েছে শুধু বর্তমানে নয়, অনাদি  
অতীতে এবং অনন্ত ভবিষ্যতে। কবি আপনাকে প্রত্যক্ষ-  
ভাবে অনুভব করেন আদিগন্তবিস্তৃত বসুন্ধরার প্রতিটি অণু-  
পরমাণুতে। কবির মনে হয়—ঐ মুক মাটির মুন্ডায় দেউলদ্বার  
খুলে তিনি যেন পৃথিবীর পথে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ঐ মাটি,  
তৃণ, জল সবাই যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। নিখিল  
বিশ্বের যে যেখানে আছে, কবি তাদের সবাই আপনার  
জন। কবি-মানসের আমি, সে আমি স্থান কাল বা ব্যক্তি-  
স্বার্থের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। সে আমি সর্ব আমিতে  
পরিব্যাপ্ত। সে একান্ততা উপলব্ধির মধ্যে কোন ব্যক্তিস্বার্থের  
কীকি নেই। সে অসীম আমি এক দিকে যেমন কালজয়ী,  
অন্য দিকে তেমনি ব্যক্তি-সঙ্কীর্ণতার কুপমণ্ডকতায়ও সে  
অতিক্রম করেছে। সে আমার দ্বারা হয়ে এসেছে অতীত  
থেকে বর্তমানে, বহুমানতার নুপুর-নিষ্কণে ঐতিহ্যকে বহন  
করে। আবার সেই আমার দ্বারা বর্তমান থেকে চলে  
গেছে ভবিষ্যতের দিকে। সেই আদি অন্তহীন ‘আমি’ প্রবাহের  
একটি খণ্ড হ'ল কবিসত্তা। একথা কবি জেনেছিলেন,  
উপলব্ধি করেছিলেন এই মহাসত্যকে সমস্ত অন্তর দিয়ে।  
তাই কবি সে অসীম আমার সুর শুনেছেন, গান শুনেছেন  
নিজের গাওয়া গানে, নিজের রচিত সঙ্গীতে। তাঁর কথা  
উদ্ধৃত করি :

“যে আমি রয়েছে তোমার আমার

সে আমি আমারই আমি,

সে আমি সকল কালে,

সে আমি সকল স্থানে,

প্রেমের পরশে সে অসীম আমি থেকে ওঠে যোর গানে।”

[ সঙ্কীর্ণ, পৃ: ১৪ ]

কবি-মানসের এই যে অহংবোধ, এ বোধ তাঁর বিশ্ববোধ থেকে  
সম্ভাত। তাই দ্বৈধ কবিচিন্তের আমি, সে আমি ছড়িয়ে  
আছে দেশে দেশান্তরে এবং যুগে যুগান্তরে। এ আমার  
অভিসার চলেছে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এবং এ অভি-  
সার চলবে প্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। নানা ঘাটে  
তার আনাগোনা, অসংখ্য ঘাটে ভরা রয়েছে তার প্রসাদ।  
তার আত্মীয়তার শিকড় চলে গিয়েছে অনন্ত সৃষ্টির অণুতে

পরমাণুতে। একালের বোদ্ধা সমালোচক রবীন্দ্র-মানসে এই বিশ্ববোধের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন :

“এই যে দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বজীবনের সহিত অখণ্ড যোগ রবীন্দ্রনাথ সে সত্যটিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এত গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার ব্যক্তিসত্তাকেও তিনি একটা বর্তমানের ‘আমি-সত্তার’ ভিতরে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এই ‘আমি’র জীবনইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্বে—সেই অসূর স্বর্গোত্তের মল্লকারের ভিতরে পৃষ্ঠীভূত চট্টোয় রহিয়াছে তাঁহার অগ্রদূতের কাহিনী।”\*

অহংবোধের এই সর্বব্যাপী বিস্তার রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মূলীভূত গারণা এবং তাঁর কর্মদর্শনের প্রেরণা। যে মানুষ এক মহাচৈতন্যময় বিশ্ববোধের দ্বারা উদ্ভূত তাঁর পক্ষে কোন সর্গীয় ব্যক্তিসত্তার মোহে মুগ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর চৈতন্য বিশ্বের চৈতন্যের সঙ্গে মাল্যবদল করেছে, একান্ত হয়েছ। তাঁর ‘আমি’র পথপরিজ্ঞান ক্ষুদ্র হয়েছে অনাদিকাল থেকে এবং তা চলছে অনন্তকালের দিকে। কোন বিচারই কবির কাছে স্বতন্ত্র, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিমানসের বিচার নয়। কবির অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে—সেখানে কবি সকল মানুষের প্রতিনিধি, সমাপরা পৃথিবীর মানব-সত্তানেরা মহা-কবির আশ্রয় আশ্রয়। দেশকালের সীমায় কবি আপনাকে সীমায়িত করেন নি। তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন যে, দেশকালের বেড়া তাঁর ব্যক্তিস্বত্বকে ক্ষুদ্র করে রাখে নি। কবি-মানসের সে ‘আমি’র ব্যাপ্তি ঘটেছে দেশ এবং কালের সীমানা পেরিয়ে। যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থের কলহ বৃহত্তর স্বার্থকে ধ্বংস করেছে সেখানে কবি ক্ষুদ্র হয়েছেন। এটা সত্য হয়েছে শুধু তাঁর ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর জাতি-স্বার্থের ব্যাপারেও।

সেদিনের মানুষ কবিকে ভাববিলাসী বলেছে, কোন কোন সমালোচক তাঁকে ‘escapist’ বা পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলেছেন, কবি তার প্রতিবাদ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মনের বিস্তৃত প্রান্তরে যে পলিমাটি জমা হয়ে উঠেছিল উপনিষদের পুণ্যতোয়া রসের প্রবাহে, সে খবর অনেকেই হয়ত রাখেন নি। তাঁরা বাইরেটাকে বিচার করেছেন, গভীরে ঘাবার প্রয়াস পান নি। যে মানুষ সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখে, যে মানুষ অতীতে এবং ভবিষ্যতে আপনাকে প্রসারিত করে দেয়, তার পক্ষে নিছক জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে নিজের ভাবকল্পনাকে সীমাবদ্ধ রাখা কতখানি সম্ভব সহজেই বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্র-মানসের ‘আমি-সত্তা’, সে তো কবির ব্যক্তিসীমায় বন্দী নয় :

“সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,  
পুণ্যে বীরের মহিমায়

আপনা হারারে

তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিম্নে পারারে।

এই আমি যুগে যুগান্তরে

কত মুঠি ধরে।

কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার

কত বারবার। [আমি, পরিশেষ।]

রবীন্দ্র-দর্শনের এই ‘আমি-তত্ত্বের সত্যক্ অমুখ্যাবন তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা সংবেদনশীল মন নিয়ে তাঁর বিশ্ব-বোধের গারণাটিকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পাব। যে চৈতন্যময় প্রেরণা আপনাকে প্রকাশিত করেছে তুণে, গুঞ্জে, পুষ্পে, পল্লবে, তারই প্রকাশ হ’ল ব্যক্তি-সত্তায়। তাই ত কবিগুরুর জীবনে ও দর্শনে, দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে বাজছে একটি একতারার সুর।

এই চৈতন্যময় প্রাণপ্রতির স্মরণ হয়েছে পুষ্পে পল্লবে, তুণে শাশলে, একথা এইমাত্র বলেছি। অনন্ত প্রাণদীপ-প্রবাহে একদা প্রাণের উৎসার হয়েছিল বৃক্ষকে আশ্রয় করে—উদ্ভিদজগতে সে প্রাণের নয়নাভিরাম প্রকাশ। কবির প্রাণের ভাষা ও গাছের ইসারায বাণীবিনিময় চলে। কবি তাদের অন্তরের ভাষা বোঝেন। তারা যে একই প্রাণ-প্রতির বিভিন্ন রূপভঙ্গী। তাদের মর্মরঞ্জন কবির কাছে হারিয়ে যাওয়া সুরের আরণিক। ঘুঘু ডাকা গথ্যাছে কবি কান পেতে শোনেন পল্লবদলের কলকাকলি; কবি পল্লব-মর্মরের প্রাণের সুরটি ধরে দেন তাঁর গানের ভাষায়। তাঁর কথাতেই বলি :

“আমার দরর আশেপাশে যেসব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা। তার ইসারা দিয়ে পৌঁছল প্রাণের লবনতন সুরে; তাজার হাজার বৎসরের ভুল-বাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া উঠে সেও উঠে গাছের ভাষায়—তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর হুঁপুনির উঠ।”\*

গাছের ভাষায় কবি শোনেন যুগান্তরের কথা। কোন অরণ্যভীত কালে প্রাণের প্রকাশ একদা হয়েছিল লতা, বৃক্ষে, পুষ্পে, পত্রে এবং সে প্রকাশের মতোও যেন কবি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন মানুষ ছিল না। সেদিনের পত্রমর্মরে কালান্তরের সঙ্গীত যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। গাছের ইঙ্গিতময় ভাষায় আর কবির ছন্দোময় বাণীতে যেন কোথাও একটা প্রাণের যোগ রয়ে গেছে। তাই কবি গাছের ভাষা বোঝেন। প্রকৃতির সঙ্গে কবিপ্রাণের এই মরমী

যোগাযোগটি আমরা ঠিকমত বুঝতে পারব যদি আমরা রবীন্দ্র-দর্শনের গোড়ার কথাটি মনে রাখি যে, মানুষের মনে আর অরণ্যনিকেতনে একই প্রাণের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের মতে মানবসত্তাকে প্রকৃতি-সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা যায় না। একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই নিগূঢ় সম্পর্কটি আরো অনেক কবি-মনীষীই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা শুধু ছন্দগুরুই ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদেরও দেখেছি। শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ কেন ভূরি ভূরি ন্যায়বিদ দার্শনিক রয়েছেন এই দলে। প্রসঙ্গতঃ হেগেলের উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও হেগেল একই দৃষ্টিতে মানব ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধটিকে দেখেছিলেন। তাঁদের চোখে মানুষ ও প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যু এরা পরস্পরের পরিপূরক। কবি মৃত্যুকে দেখেছেন নবীন প্রাণের উৎসরূপে, জীবনের জননীরূপে। কবিদৃষ্টি আবিষ্কার করেছে বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রে আর হেগেল দেখেছেন একটি ‘Concrete moving unity’ বা বাস্তব সঞ্চারমান ঐক্যের অস্তিত্ব। হেগেলের মতে :

“Life is death. And nature is man. Here too, underneath the surface diversity as apprehended by our fragile senses, there is a profound and moving unity. Nothing external to man is really different from man. The world around us is over other self. We see a tree . . . Its existence is part of us. Our existence is not of it.

(*Living Biographies of Great Philosophers*—H. Thomas & D. L. Thomas).

হেগেলীয় দর্শনের এই সর্বব্যাপী ঐক্যের ধারণা রবীন্দ্র-দর্শনের বিশ্ববোধের ধারণার অমূরূপ। হেগেল বলছেন, গাছের অস্তিত্ব এবং মানুষের অস্তিত্ব নিবিড় সম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং এককে পূর্ণভাবে বুঝতে হলে অন্যটির সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ সৃষ্টির কেউই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ও হেগেল সাদৃশ্য আছে।

যে অনন্ত প্রাণের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করেছে প্রকৃতির শম্পসম্পদে, মানবের আশায় ও ভাষায়, সেই প্রাণই আবার প্রকাশ পেয়েছে জীবজগতে, পশুপাখীর মধ্যে। তাই কবি পশুপাখী, জীবজন্তুর সঙ্গে আত্মীয়তার হারিয়ে-মাওয়া যোগসূত্রটি খুঁজে পাবার জন্য ছুঁছুই প্রয়াস পেয়েছেন। এরা যেন তাঁর জন্মজন্মান্তরের পরিচিত। কবি নিজের মধ্যে যে প্রাণোন্মাদনা অনুভব করেন, তাঁর আশেপাশের জীবজগতে সেই একই প্রাণের লীলা প্রত্যক্ষ করেন। তাই তাঁর কাছে পশুপাখীরও একটা বিশেষ মূল্য আছে; তাদের বেঁচে থাকার অর্থ কবির কাছে অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। তারা সবাই একই প্রাণপ্রতির বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। যে অবিচ্ছিন্ন

প্রাণধারা মানুষকে প্রাণময় করেছে, তাই-ই আবার মানুষের ভুবনেও প্রাণের প্রদীপ জ্বলিয়ে দিয়েছে। পশুপক্ষীরও প্রাণের মূল্যে বিক্রয়। তাই কবি তাঁর পোষা ময়ূরটির কথা ছন্দোময় ভাষায় লিখেছেন, লিখেছেন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সুরস কাহিনী। ময়ূর কবিকে ভয় করেনি, অসঙ্কোচে কবির কাছে এসেছে, এটা কবির জীবনে একটা মস্তবড় ঘটনা। এ তাঁর গর্বের কথা, জয়ের ইতিহাস। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সেই আদিম মধুর সম্বন্ধটিকে কিরে পেয়ে কবি পুলকিত হয়েছেন, সে পুলকের মধুটুকু কাব্যের পত্রপুটে ভরে রেখে গেছেন সহৃদয় পাঠকের জন্য। তিনি যে নিত্য পুরস্কার পেয়েছেন এই বিহঙ্গের কাছ থেকে, সে কথা সানন্দে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অনবচ্ছিন্ন ভাষায় :

“সহজ রঙ্গের রঙ্গী

ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী.

বিস্ময়ের নাহি পাঠ পার।

ভূমি যে শঙ্ক না পাও,

নিঃসংশয়ে আস যাও

এই যোর নিত্য পুরস্কার।” [বনবাণী, পৃ: ৩৫]

ময়ূরের মধ্যে কবির নিত্য পুরস্কার পাওয়ায় কবি-মূলভ অতৃপ্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এর সমর্থন তাঁর অনেক প্রবন্ধেও পাঠক খুঁজে পাবেন। কবি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষ এবং পশুপক্ষীর মধ্যে এমন একটা নিবিড় আত্মিক সম্বন্ধ রয়েছে যে, তাকে স্বীকার করলে জীবনের এবং দর্শনের অনেক কিছুকেই হারাতে হয়, কাব্যের মূল্যহানি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ কবি মিল্টনের ‘প্যারাডাইজ লস্ট’ কাব্যের কথা বলেছেন। সেখানে আমরা জীবজন্তুর সঙ্গে আদিম-মানব সম্পর্কের কোন আত্মিক সম্পর্ক খুঁজে পাই না। মহাকাবি মিল্টন এই ধরণের বিশ্ববোধের দ্বারা অন্তপ্রাণিত হন নি। অথচ এই সহজ সম্বন্ধটিকে স্বীকার না করার ফলে রবীন্দ্রনাথের মতে, মিল্টনের কাব্যে রসভাঙ্গ ঘটেছে। তাঁর মতে জীবের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক হ’ল সাত্ত্বিক সম্পর্ক। তাকে স্বীকার করে না নিলে ঠিক তত্ত্বটিকে বোঝা যায় না, কাব্যের আত্মাত্মিক মর্যাদার হানি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

“মিল্টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানব-দম্পতির স্বর্গারণে বাস বিষয়টি এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। জীবজন্তুর সেখানে হিঙ্গা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে, তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোন দৈহিক সম্বন্ধ নেই। এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে ‘ঈশাবাস্তবিক সর্ব বৈকিক জগত্যাং জগৎ’, জগতে যা কিছু আছে সবতকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমারত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে।” [শিলা, পৃ: ১১৮]

এ বাণীটির অভাব মিষ্টনে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচরাচরকে এক মহৎ প্রাণের দ্বারা সমাবৃত করে দেখেছিলেন। সর্বপ্রাণনা ও প্রাণপ্রীতির উৎস যিনি তিনিই এই বিশ্বপ্রাণের অধীশ্বর। কবি তাঁরই প্রকাশ দেখেছেন এই ভুবনে এবং ভুবনান্তরে।

ঋতু পরিবর্তন হয় প্রকৃতিতে। সৃষ্টির প্রেরণা নূতন করে জাগে জীবজগতে এই ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে। বসন্ত-বোধন শুধু পুষ্প-পল্লবেই হয় না, তার আগমনী-গান বেজে উঠে মানুষের মনে। যে সুর বনবাণীকে মধুরতর করে, সেই সুরের মুহূর্তনাই মানবের আশায় ও ভাষায় অনুরণিত হয়ে উঠে। বৈশাখ আসে নবজীবনের উদ্বোধনের বার্তা নিয়ে। সে রুদ্ধ তাপের পদপাত শুধু তো প্রকৃতির দ্ব্যম শব্দধেরা মাটিতেই ঘটে না, তার চরণের ছোঁয়া লাগে মানুষের মনেও। নব অভ্যাসের আগমনী-গান কবির হৃদয়তন্ত্রে বঙ্কিত হয়ে উঠে। কবি বৈশাখকে আবাহন করেন :

“জাগো ফুলে ফুলে নব তৃণদলে,  
তাপস, লোচন মেলে তে,  
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,  
নাচের চরণ কেলে তে।  
জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,  
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,  
আশাসহারা উদাস পরাণে

জাগাও উদার নৃত্য।” [ বনবাণী, পৃ: ৫২ ]

যে সুরটি বাজে প্রকৃতির প্রাঙ্গনে তারই প্রতিধ্বনি শুনি মানবমনের অঙ্গনে। প্রকৃতি ও মানবসত্তা যেন একই সুরে বাঁধা। এ দুয়ে মিলে এক রহস্তর সত্তাকে প্রকাশ করছে। তাই যখন প্রকৃতি ফলে-ফুলে ভরে উঠে, তার আকাশে-বাতাসে নবজীবনের বন্দনগান ধ্বনিত হয়ে উঠে, তখন সৃষ্টির সেই আদিম চাক্ষু্য এসে লাগে মানুষের মনে। মানব-মনের ভাব ও ভাবনা প্রকৃতির রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠে। একই সুরের প্রাণময়তা শ্রাবণের ধারার মত বয়ে পড়ে ভিতরে এবং বাইরে। প্রকৃতির সঙ্গে কবি নিবিড় নিগূঢ় যোগসূত্রটি খুঁজে পান। মৃন্ময়ী ধরণীর প্রেমে তিনি আপনাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর ভুবন ঐ পত্রপুষ্পে ছাওয়া ধরণীর আনন্দনিকেতনে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। কবি গেয়ে ওঠেন :

“আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;  
পাকে পাকে ফেরে ফেরে  
আমার জীবন দিয়ে জড়িয়েছি এরে ;  
প্রভাত সন্ধ্যার  
আলো অন্ধকার  
মোর চেতনার গেছে ভেসে ;  
অবশেষে

এক হ’য়ে গেছে আজ আমার জীবন  
আর আমার ভুবন।  
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,  
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।”

[ বনবাণী, পৃ: ৫২ ]

কবি জীবনকে ভালবেসে জগৎকে ভালবাসেন নি। ধরণীর মোহে মুগ্ধ কবি জীবনকে ভালবেসেছেন। আগে ভালবেসেছেন পৃথিবীকে, পৃথিবীর মাটিকে, তার অনন্ত আকাশে ছড়ানো অন্তহীন আলোকে ; জীবনকে ভালবেসেছেন তার পরে। ছুটির স্বরূপ কবির কাছে অব্যাহত হয়েছে। কবি সবিষয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, ছুটি সন্তা মিশে এক হয়ে গেল এবং এই এককে প্রত্যক্ষ করা, তাকে উপলব্ধি করা মানুষের গ্যান ও ধারণায়, এটাই হ’ল আমাদের ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ সেই ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। ‘মধুবাতা ঋতায়তে’ মন্ত্রের উত্তরাধিকার তাঁর জীবনে ও দর্শনে সত্য হয়ে উঠেছিল একথা আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পড়েছি। পৃথিবী মধুময়, তাই জীবনও মধুময়। জীবনচর্চা অলীক নয়। সূক্ষ্মরী ধরণীর আনন্দনিকেতনেই তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সাধনা। তাঁর প্রতিবেশীর দল তাঁর চিন্তের প্রসাদ পেয়েছে। তারা যে তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন প্রাণ ভরে ; ছুটি হাত দিয়ে তাদের বুকে ঠেনে নিয়েছেন অনন্ত আগ্রহে। দেবতার সন্তান, অমৃতের পুত্র মানুষ—কবি এই দেবতাত্ম্য মানব-সন্তানকে ভালবেসেছেন ; আপনাব করে নিয়েছেন মানুষকে তার শুভবুদ্ধির বিকার ঘটলেও। এদের দৃষ্টকে এবং মূঢ়তাকে সাময়িক বিচ্যুতি বলে তিনি উপেক্ষা করেছেন—ক্ষমা করেছেন এদের দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ত্রুটিতে। তিনি হৃৎপেয়েছেন সত্য, কিন্তু এ হৃৎপেয় তাঁর চিন্তের বলিষ্ঠ আশাবাদকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি। কবির বেদনার্ত হৃদয় অসহায় আত্মের জন্ত কেঁদেছে অথোর দারে। তবু ত ছন্দপতন ঘটে নি কখনও। কে যেন এই বেসুরকে ছাপিয়ে সুর এনে দিয়েছে কবির জীবনে। কবি কান পেতে শুনেছেন ষ্কার উন্নত তানুর্ভাষায় শাস্ত-শিবের বাণী। শাসক ইংরেজের গীমাহীন অত্যাচারের পটভূমিকায় তিনি এগুরুজ সাহেবকে তাহাঙ্গের সত্যিকার প্রতি-নিধি বলে মেনে নিলেন। আর সমস্ত অত্যাচারের পুঞ্জীভূত রক্তময় ইতিহাসকে তিনি খেত জাতির শুভবুদ্ধির সাময়িক বিকার বলে অস্বীকার করলেন, তাকে শাস্ত সত্যের মর্ষাদা দিলেন না। তিনি কখনও এ তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নি যে, ইংরেজ জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত পাশবিকতা রয়েছে। তাঁর চোখে এগুরুজ, পিয়াসন হলেন খেতজাতির প্রতিনিধি। যারা জালিয়ানওয়ালাবাগকে লাগ করে দিয়েছিল মানুষের

বুকের রক্তে তারা কি কখনও মিটন, কীটস বা শেলীর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হতে পারে? সে জাতির ঐতিহ্যের মশাল বহন করেছিলেন এওরুজ সাহের। তিনি এই জাতির প্রতি কবির শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সে কথা কবি আমাদের স্তনিয়েছেন। শ্বেতজাতির এই সম্মানসীকৃত প্রতিনিধির অনুপম চরিত্রের স্বর্গীয় আলোকে তিনি দেখেছেন সমগ্র ইংরেজ জাতির ধ্যান ও ধারণাকে। তাই এদের শক্তিমান রুদ্রদূতদেরও তিনি ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। মানুষের আত্যাত্তিক শুভ প্রচেষ্টাকে তিনি কখনও সন্দেহের চোখে দেখেন নি। মানুষের যা-কিছু ভাল, যা-কিছু শ্রেয়: তাকেই তিনি সত্য বলে স্বীকার করেছেন। মন্দ অগ্রন এবং অসত্য—তাই তিনি বলেন :

“এ ছালোক মধুময়  
মধুময় পৃথিবীর ধূলি,  
অস্তরে নিয়েছি আমি তুলি,  
এই মহামহখানি,  
চরিহাথ জীবনের বাণী। [আরোগ্য, পৃ: ১]

এই মধুময়, ছালোকে, ছুলোকে কবির অশ্রান্ত সঞ্চরণ। একটুকরো সবুজের মায়, অনন্ত আকাশের মোহ, এরা কবিকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। হাঙ্গলির মত প্রকৃতির কুকীর্তিগুলোকেও তিনি বড় করে দেখেন নি। তিনি দেখেছেন প্রকৃতির চিন্ময় রূপটিকে। হাঙ্গলি দেখলেন তার হিংস্র পাশবিকতা আর রবীন্দ্রনাথ সেখানে দেখলেন শাস্ত, শিব ও অদ্বৈতের প্রকাশ। “যাদুশী ভাবনা যন্ত্র”—রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁকে প্রকৃতির মনোময় রূপটিকে দেখিয়েছে আর হাঙ্গলি দেখেছেন হিংস্র উন্মাদনায় মত্ত প্রকৃতির রুদ্র রূপকে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বের এই আনন্দময় রূপটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাতেই তিনি মুক্তির স্বাদ পান। বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে তিনি প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শোনে। চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা সত্য হয়ে দেখা দেয় কবির জীবনে। যা ছিল তত্ত্ব-কথা তাই মূর্ত হয়ে উঠে ব্যক্তিজীবনের বৃহত্তর পরিধিতে। জীবন ও দর্শন সেখানে মিলে গেছে, মনন ও সাধনের আর পৃথক সত্তা নেই।

## মোমের পুতুল

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হৃদিনের পেলা মোরা খেলছি হৃৎকন  
মনের পুতুল দিয়ে সাজান বাসর,  
মোমের পুতুল তাই গলে যায় মনে  
দিবালোকে ভেঙ্গে যায় গানের আসর।

মন সেওয়া নেওয়া তার কোনও মূল্য নাই  
সে মনে শুদ্ধ কাটে কালের পেয়ালী—  
অবাস্তব অবাস্তব প্রভাতী সানাই  
তৈলহীন দীপে দীপে স্তিমিত দেয়ালী।

তুমি আমি যুগোয়ুগি বসেছি কবে  
কবে বা তোমার হাতে রেখেছি হাত।  
বিহ্বল আবেশে ওষ্ঠ চূষন-বৈভবে  
রাঙা হয়ে উঠেছিল উতলা সে রাত।

সে রাতে তোমার সাথে রতসলীলায়  
এক হয়ে গিয়েছি; ভাবি নি তখন  
ইন্দ্রধনু স্নগহাঙ্গী আকাশে মিলায়,  
আশ না মিটিতে ভাঙ্গে আশার স্বপন।

সমস্ত অস্তুর দিয়ে করেছি কামনা  
সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত তার বহ্নি-শিহরণ  
বিফল হয় নি চাওয়া—এ নহে সাস্তুনা  
থিক্ত জীবনে দৈন্ত স্রুতার কারণ।

মৃত্যু সেও ভাল ছিল, জীবনে কি কাজ  
পলে পলে অপমৃত্যু এই ত জীবন,  
পেলাঘর ভেঙ্গে গেছে—এমনি নিলাজ  
মোমের পুতুল নিয়ে কবি আকিঞ্চন।

## শম্ভু-কুঞ্জ

### শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

আসলে কুঞ্জ চক্রবর্তীর দোকানের কাঠের খেলনা আর শম্ভু বটব্যালের দোকানের তামাক, দুই-ই সমানভাবে বিক্রী হ'ত। কিন্তু কুঞ্জ ভাবত শম্ভুর দোকানে ভিড়, কারণ তামাক তিনিখটার চাহিদাই বেশী; তাতে আবার আর ভাল দোকান নেই বললেই হয়। নইলে শম্ভুর আবার তামাক; তার আবার ভিড়।

শম্ভু ভাবত তামাক ধরেই সে করেছে ভুল। কান্ধীর শহরে বাজীর ভিড়ই আসল ভিড়; বাজী পদেরই পদের। তারা চায় টুকিটাকি খেলনাটা আসটা কেনে। তামাক তো দরকার যারা বুড়ো তাদের। তেমন তেমন জুংসই একগানা কাঠের খেলনার দোকান করা যায়। কোথায় উড়ে যায় কুঞ্জের ভিড়! হ্যাঃ! -- ভারি তো কুঞ্জ!

ওদের এ কলহ আজকের নয়। এ বহুকালের কলহ। আমারই হয়ে গেল এই বত্রিশ বছর। জন্মেছি এই বাড়ীতে; অর্থাৎ এ বাড়ীর মুণ্ডামুণ্ডি গলির ওপারের সারিতে ওদের দোকান। জ্ঞান হবার পর থেকেই জানি নিতা ত্রিসন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ওরা লেগে যায় বচসায়। এর বাধা নেই, বিশ্রাম নেই। ওরা যে নিশ্চিন্তে এক দিন বিছানায় শুয়ে জ্বর ভোগ করবে এমন জো-টি নেই। আশঙ্কা—একের অল্পপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অল্প জন পাঁচ কথা বানিয়ে বানিয়ে শোনাতে পুরুষোত্তমকে, ভগেলুকে আর নিবারণ ভালদায়কে, ওরা ত আসল খবর জানে না।

আসল খবর অবশ্য আজ অবধি কেউ জানে না। কেউ যে কোনও দিন জানবে এমন আশঙ্কবী কল্পনা করাও মুঢ়তা। কারণ শোনা যায়, শম্ভু বটব্যাল দোকান ভাড়া করেছে যখন ওর বয়স বোল বা সতের। আর কুঞ্জ তারও বছর দুই আগে, যখন ওর বয়সও ঐ বোল বা সতের হবে। আর এখন শম্ভু হবে বায়ট্টি বা আবও হু—এক বছর বেশী।

সুতরাং কম দিন হ'ল না ওদের এই বাবসারে। এ ভাবে 'তামাক'; আর ও ভাবে 'কাঠের খেলনা'—অর্থাৎ যে ভাবে তামাক তার ব্যবসা খেলনা; আর যে ভাবে খেলনা, তা কেটে তামাক মেখে মেখে তার গারে পোশাকে তামাকের গন্ধ হয়ে গেছে।

হতভাগ্য এমন ওরা, ছুটি পায় না একটি দিন। মাঝে কান্ধীতে নিরন্তর হ'ল একাদশীতে সব দোকান-পাট বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকত, কিন্তু বেলা ন'টার মধ্যেই সেই পুরাতন কণ্ঠে তীব্র বচসা চলত। দেখা যেত দোকানের সামনের রকে বসে একজন, আর একজন কাঠের পাটাতনে বসে চালিয়ে বাচ্ছে বাগুয়ু।

বের্টে শুকনো চেহারা। মাথায় গুটি পাকানো, কাঁচা-পাকা চুল। অল্প গৌক ছোট করে ছাঁটা, বগটা মাঝামাঝি। চোখের চাউনি পিটপিটে, কিন্তু চকচকে, এদিকে সৌখীন। চশমা বেটা

পরে তার ক্রেমটা রোল্ড গোল্ডের। গলায় আঁওয়াড জোবালো আর ধারালো।...এই ছিল কুঞ্জ চক্রবর্তী। অবিবাহিত, তবে ব্রহ্মচারী নয়। বাড়ীতে যিনি বাঁধেন, তিনি বরাবরই বাড়ীতেই থাকেন।

এই জুগুই শম্ভুর ঘেরা অপরিচীত ঐ নছাব কুঞ্জটার উপর। সমাজে থাকার যোগ্য নয় ও। শম্ভু বিবাহিত। শেষবয়সে একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে হয়েছে। মেয়েটার এখন বছর চৌদ্দ বয়স। সতি, গৌর কেন, সুরগৌর বর্ষ শম্ভুর। এই বুড়ো বয়সেও গাল দুটি লাল, হাতের আঙুলগুলো রক্তে টসটস করছে। লম্বা শক্ত চেহারা, পেশীর ভাঁজগুলো স্পষ্ট,—মোটো মোটো শিরাস্থলো নীল হয়ে কুটে বেরছে হলদে আভার চামড়ার মধ্য দিয়ে। গভীর গলায় কথা কয়, চোখের পাতা ভারী, চোখের কোণে যেন জলের কোয়া লুকোনো।

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। বাড়ী থেকে বেরতে পারছি না। ওদের বচসা চলছে বর্ষাধারার সঙ্গে সমান তাল রেখে। বৃষ্টি ধরেছে। ওরাও থেমেছে। পাড়া পানিকটা শান্ত। আমি বেরছি; কাজে নয়,—তার চেয়েও জরুরী তাপিদে,—আজ্ঞায়।

শম্ভুদা ডাকলেন—“বলি, এই বাদলায় বেরলে কোথায়?” দোকানের কাছেই গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায়ই এমনি দাঁড়াই; সুখ-দুঃখের কথা শুনি। সেদিন বিশেষ করে দুঃখ করলেন পশুপতি বাবুর কথা নিয়ে। উনি নিজে যে বাড়ীতে থাকেন তারই উপর তলার পশুপতিবাবু থাকেন। রোলে চেকারের কাজ করেন। তাঁর ছেলেটির বিবাহ দেবার বয়স হয় নি। শম্ভুদার মত যে, বিয়ে করতে গেলে ঐ বয়সটাই সমীচীন।

“আসল মতলব জানলে ভায়, আমার মেয়েকে নেবে না। নেবে কেন? গরীবের মেয়ে, পয়সা-কড়ির মতলব নেই তো, তা সে কথা বললেই হয়।”

সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম, “অগ্রিয় কথাটা যদি ভুললোক এড়িয়ে গিয়ে থাকেন তো—”

কিন্তু কথা বলব কি। অল্পভব করলাম—এবই মধ্যো কুঞ্জদার বাড়িগুদ্ধ মাথাটা বারছুরেক সট সট করে তার দোকানের পাল্লার বাইরে বেরিয়েই আবার চুকে গেল। মনে মনে ভারি অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম।

কি করে না জানি শম্ভুদা তা টের পেয়েছে। বললে, “কুঞ্জ বেয়চারী দেখছে বুঝি?” আমি তৎক্ষণাৎ সেটা সন্ধ্যে অস্বীকার করবার আগেই শম্ভুদা বলতে লাগল, ও শালার ত কন্মেই ওই। ভাবছে ওর কি সর্বনাশ করছি বুঝি। ই্যা ভায়, আমার এই দোকানখানা আলমারি দিয়ে সাজাতে কত লাগবে বলতে পারি?”

হঠাৎ কন্ডালারের ঙ্গ কুঙ্কন থেকে নতুন আলমারী দিয়ে দোকান সাজাবার আড়ম্বর দেখে বিস্মিত বোধ করলাম। “কেন বলুন ত?”

“নাঃ, বড় তেজ হয়েছে ওর। বড় তেজ। ওর তেজ আর নয় না।”

“ব্যাপার কি?” আরও যেন বিস্ময় বোধ হ’ল। বিনয়ী, সদালাপী, অমায়িক সে শব্দটাই যেন নয়। মুণ্ডানা শিখিল, মাংস-পেশীগুলো যেন কিসেব প্রেরণায় সতেজ হয়ে উঠেছে।

“কিছু নয় ব্যাপার। ব্যাপার ওর ব্যাভার। জান ভায়া সব আমি সইতে পারি। পারি না ওর দেমাক! তোমারও বাপু জেদ কম নয়। বলই না। তোমরা আজকালকার ছেলে। ফাসন জানা আছে। এই তো ছোট ঘর আমার। যদি আলমারী করি কত লাগবে?”

ব্যাপার সত্যিই বুঝি না। তাড়াতাড়ি চাপা দেবার আশায় বললাম, “কত আর লাগবে, বড় জোর শ’গানেক টাকা।”

“এই ত? বাস—কালই একটা ছুতোর ডাকবে তুমি। ভায়া উনি কাঠের খেলনার দোকান করেন। এমন ধাঁধানো দোকান করব যে দেখবেন উনি। একটা গন্ধের দাঁড়াক ত দেখি ওর দোকানে। থাকে থাকে রাগব রকম বে-রকমের খেলনা, কাঠের খেলনা। একধারে শুধু কোঁটো। জয়পুরে আমার এক বন্ধু আছে। তাকে চিঠি লিখেছি। জয়পুরের কাঠের কাজ জান ত? সেবা জিনিষ, ছনিয়ায় জুড়ি নেই। প্যারি বিতেরতের বেরাই আছে বর্ষার, শুধু সেই বা কেন, এট ত এ-পাড়ার অমূল্য—বর্ষার ব্যবসা করে। বাশের উপর গালায় কাজের অভিনব জিনিষ সব। আনাব, আনিরে আলমারি সাজাব। কি জানে ও ব্যবসার! তামাক ঘেঁটে ঘেঁটে, চিটেগুড় মেখে মেখে, দা কেটে কেটে হুদ হয়ে গেলাম। কিছু নেই ব্যবসারে। ওর দোকানে বুঝ চরাব আমি তবে—

শেষ হবে কি না ওর কথা জানি না। সুযোগ খুঁজছিলাম সবে পড়ার জন্ত। কেননা কুঞ্জলা আরও বারকতক ঘাড়-বেব-করা-ভেতরে-নেওয়ার ব্যায়াম সেবে এবার একেবারে পথে নেমে এসে ঠাঁড়িয়েছেন। আমি ত প্রমাদ গণলাম।

একটা ছুতোর আমার জানা আছে। তার বাড়ীর দিকেই বাছিলাম।

“বাস বাস। আজই।”

“আচ্ছা” বলেই এক রকম সবে পড়লাম।

কিন্তু শব্দটা পুরোন ঘাগী লড়িয়ে। কোন্ প্যাচে কুঞ্জলা কি করে কাত হবেন, একেবারে নন্দর্পণে। একটু চেঁচিয়ে বললেন, “সবার সেবা কারিগর এনো। করব আলমারি, দশজনায় দেখবে।”

চলে ত গেলাম। পিছনে যে কি রেখে এলাম বেশ বুঝলাম। অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক এগন চলবে।

কিন্তু চলেছিল আরও বেশী। কারণ আমি কিবেরই ছিলাম

হু’ঘণ্টারও পর। যখন গলির মোড়ে তখন শুনিছি সব শাস্ত। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী কিরছি। কুঞ্জলা একেবারে ডেকে বসলেন, “বাড়ি ত বাচ্ছ; একটা কথা শুনে বাও ত।”

বাপের বয়সী ভদ্রলোক। জুয়াবধি দেখছেন, এড়াই সাধা কি। ঠাড়ালাম।

“কি বলছিল শব্দ পাঠাটা!” যদিও কঠিন বাদে। তাতে বাকুদ ছিল অনেকটা। এ তরক থেকে অগ্নিসংযোগ ঘটলেই একে-বারে বাকুদ কাটবে।

“চুপ করে রইলে যে? বলছিল যে আমার তামাকের প্লানটা গাজা? তাই ঠাট্টা করল আমার আলমারি বলে।”

সাহস পেয়ে ভৎসনাৎ বললাম, “আবে রামো রামো। শব্দটা সে খায় দিয়েই যান নি। উনি বলছিলেন পণ্ডপতি বাবুর ছেলেটির কথা। সে ত আমার বন্ধু কি না! তাই আমায় দিয়ে বলাতে চান ওঁর মেয়ের জন্ত। মেয়েটি ত বড় হয়েছে!”

“খাম তে বাপু, আমার আর ভাঁওতা দিতে হবে না। জুয়াতে দেখলাম, আমার চোখে ধূলা দিতে আসা! দেখ, আফিঃ থাই বলে বুড়ির গোড়ায় নেশা ঢোকে নি আজও। মেয়ের বিয়ে! মেয়ের বিয়ে ওর হবে নাকি কখনও। বিয়ে করার ক্ষেত্র ও নিজের জানে না? ওর মেয়ের বিয়ে হবে? ভিক্ষে করবে, ভিক্ষে।” ভাল লাগল না কথাটার। বললাম, “ছিঃ কুঞ্জলা! সে ত আপনারও মেয়ের মত। তার সম্বন্ধে এমন নিষ্ঠুর কথা বলতে আছে?”

“রাগ কে তোমার দয়া। ঢের ঢের দেখা আছে আমার দয়া। নয় হু’দিন ওর নেশাপোবেবা একটু বেশী তামাকই নিচ্ছে। আমি ত তামাকের দোকান করলাম বলে। আমাদের পাহুবাবু আর ললিত চাট্জে—তামাক খায় কোথায় বসে, জান? কি পায় মধু? কেউ জান?...কুঞ্জ চকোস্তির দোকানের তামাক! দেখবে তে দেখবে! ভালট বলতে যেমন ক্ষুব্ধ, গ্রান্সো বলতে যেমন হুখ, সিদ্ধার যেমন সেলাই, পীয়াস যেমন সাবান তেমন কুঞ্জ চকোস্তি বলতে জানবে তামাক, আর তামাক বলতে কুঞ্জ চকোস্তি। মালাখানা, গয়া, বিষ্ণুপুর, মতিহারি সব জারগার লোক পাঠিয়েছি। দেখবে তখন...।”

শব্দটা সস্তা করেন এমন সবেম ছিল না। দোকান থেকে হাঁক পাড়লেন, “তামাকের ব্যবসা করার হুমকি দেখায় সব সুমুন্দি। করনেওলাকে দেখলাম না আজও। বলেছি মরদ কা বাত,—হ্যাঁ, আনিস পুরুষোত্তম, এবার পুজোর আমি খেলনার দোকান করবই।”

কুঞ্জ চক্রবর্তী চীৎকার পাড়লেন—“পুরুষোত্তমকে মধ্যস্থ মানতে হয় মানো পে। কাজ করে বাঁরা মধ্যস্থ তাদের মানতে হয় না; কাজই তাদের মধ্যস্থ। তাই নয়? ভুই-ই বল না ভগেলু।”

ভায়া বিপদে পড়া গেল। আবার সংগ্রাম। এটার জেব চলেবে সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সেদিন সন্ধ্যায় জ্যোঠামশায় ওদের খামিরে দিয়ে বললেন, “তোমাদের পোলমাল ত মিতে বার যদি তুমি এ দোকানে বস আর ও



তোমার দোকানে। তোমার তামাক বেচার সখ, তুমি খেলনা ছেড়ে ও দোকানে যাও; আর তোমার খেলনা বেচার সখ, তুমি তামাক ছেড়ে ও দোকানে যাও।”

শত্ৰু বললেন, “এঁটো জিনিষ বামুনে নেয় না; তাতে আবার কুকুরের এঁটো।”

কুঞ্জলা বললেন, “কুকুরের এঁটো বাছড়ের প্রিয় জিনিষ, ওরা বে মুখে খায় সেই মুখেই ভাগে কিনা। বামুন তলে তবু কথা ছিল।” জোঁঠামশায় সরে পড়লেন।

ক’দিন কেটে গেল। রাতে পড়বার ঘরের বাইরে দরজায় শব্দ তনে সাড়া দিলাম, “কে?”

দেপি শত্ৰুদার স্ত্রী। সুনলাম অভাবের সংসারের গচ্ছিত যা কিছু ছিল নিংড়ে আলমারির প্ৰবেশ জোগান দেওয়া হচ্ছে।

“হু’দিন পরে মেয়ের বিয়ে আমি কি করে দেব দাদা? কার্দের খেলনার ব্যবসা করার কি এই বয়স, মাথার উপর কল্যাণ। একটিবার গিয়ে বোঝাও দাদা।”

কাদতে লাগলেন ভদ্রমহিলা।

বাইরে তখন ঘটাং ঘটাং করে শব্দ হচ্ছে। কুঞ্জলা তালা টানা-টানি করে দেখছেন লেগেছে কিনা। এ তাঁর নিত্য কাজ। দরজায় তালা দিয়ে অন্ততঃ ঘণ্টাপানেক তিনি টানাটানি করেন। নইলে মনের ভুগুটি হয় না।

এই সময়টা শত্ৰুদা দোকানে বসে একটু খান সেবে নেন—তালা টানাটানির শব্দ তার হয় আশ্রয়দাঁড়া। তিনি তাই নিয়ে হলস্থল বাধান।

বিশেষ ঝগড়া করেন না তিনি। সন্ধিক্ষেত্রে কুঞ্জলা ঘণ্টাপানেক পরিশ্রম সেবে, তালা ছেড়ে বখন বাড়ীর দিকে পা বাড়ান তখন শত্ৰুদা শুধু একটি বার হাঁচেন। এর জন্ত নশা, গোলমরিচের গুঁড়ো, কাঠি, পালক ইত্যাদির সংগ্রহ শত্ৰুদার আছে।

আর—সেই একটি হাঁচি মানে কুঞ্জলা আবার ফিরে আসা এবং ঘণ্টাপানেক আবার সেই তালায় সঙ্গে যুদ্ধ করা। যতই অসম্ভব হোক না কেন, কুঞ্জলা মনে করতেন হাঁচির পর দোকানের তালা না টেনে যাওয়া আর খুলে যাওয়া একই কথা। এবং দোকান খুলে রেখে গেলে যদি বা চুরি নাও ঘটে, হাঁচির পরে গেলে চুরি অনিবার্য।

কিন্তু শত্ৰুদার জন্মের সময় যেদিন কুঞ্জলা তালায় শব্দ করবে, সেদিন কুঞ্জলাকে তালা টেনে বাড়ী ফিরতে হয় অন্ততঃ রাত একটায়।

বেচারী কুঞ্জলা বাড়ীর সেই ‘মরাল’—বাঁধনী মহিলাটি এসে শত্ৰুদাকে হাত জোড় করে, “আর হেঁচো না ঠাকুর, দোহাই তোমার। হাঁপানির রুগী, এতো রাতে খেয়ে সারারাত ঘুমতে পারবে না।”

শত্ৰুদা বলে, “সব সইতে পারি; আমার জন্মের সময় ছোট-লোকসী সইব না। আমিও নাক টিপি কি না টিপি, আর ওই ববনটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘটাং ঘটাং, ঘটাং ঘটাং! এ কি ঠাট্টা?”

শত্ৰুদার স্ত্রীর কথা শুনে বাধ্য হয়ে আমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়। অনেক বোঝালাম। কিন্তু পারলাম না। একদিন দেখি ছুতোর এসে আলমারি লাগাচ্ছে।

ছুতোর কাজ করছে। শত্ৰুদা নেই। ছেলে কালীনাথ দাড়িয়ে দাড়িয়ে কাজ দেখছে। জিজ্ঞাসা করলাম, “বাবা কোথায় রে?”

“বাড়ী।”

“দোকানে আসবে না?”—শত্ৰুদার দোকানে না আসা সহজ কথা নয়।

“বাবার” আজ ক’দিন অব।”

চলে যাচ্ছিলাম। কুঞ্জলা হুপানা গোলাপী লম্বা কাগজ হাতে নিয়ে বললেন, “দেখ ত ক’পেটি তামাক আসছে। বিষ্ণুপুর আর বালাপানা দুটোই আসছে ত?”

দেখলাম, প্রচুর মাল আসছে। এমন অভিনব বেথারেরিখ শেষ কোথায় দাঁড়ায় দেখার জন্ত পাড়ার অনেকই উদ্গীব।

কিন্তু যার হস্ত এত উৎসুকতা তিনিই তখন বিছানায়।

আলমারি আর খেলনার দাম মেটাতে শত্ৰুদার স্ত্রীর গায়ের সামান্য সোনাদানাটুকু পঞ্চাঙ্গ বিক্রিয়ে গেল। বাড়ীতে ষাছ-সংস্থান ফুলো।...আর সেই মুখে শত্ৰুদা এ-পারের লোকানদারির পাট চুকিয়ে ও-পারে পাড়ি দিলেন। এ-পারে রয়ে গেল বন্ধ দোকানে আলমারি, খেলনার পেটি আর ঝোলান তালা। আর রয়ে গেল—বিধবা স্ত্রী, তিনিটি ছেলে-মেয়ে, কুখা, অভাব, দৈন্ত, হাফাকার।

কুঞ্জলা যেমন দোকান বোজ গেলেন আর বন্ধ করেন, তেমনিই করে যান। পাড়াটা কেমন যেন শান্ত হয়ে গেছে। কুঞ্জলা যেন সে কুঞ্জলা আর নেই; কেমন ঝিমিয়ে পড়া চোপসানো ভাব।—

পূজা এসে পড়েছে। বিদেশী যাত্রীরা দলে দলে আসছে। কুঞ্জলা খেলনার দোকান গুটিয়ে নিয়ে তামাক নিয়ে জমে বসার কথা। কিন্তু কৈ, কোনই উৎসাহ নেই সে সেবের। তামাক সেই পাকিং বান্স-বন্দী হয়েই রয়ে গেছে।

অনেক রাতে বাড়ী ফিরছি। ক্লাবে একটু বেগী রাত হয়ে গেছে। পাড়া নিস্তব্ধ। বাড়ীর কাছে এসে দেখি সামনের রকে উবু হয়ে বসে কুঞ্জলা। আফিংপোর লোক, কিম্বা বুঝি-বা। ডাক-লাম, “কুঞ্জলা, বাড়ী ফিরবেন না?”

“কৈ আর ফিরছি। ফিরছি, ফিরবো...এই ত সমানে চলেছে। বোজটাই এটা ভাব। কেমন যেন গা-গণ্ডি লাগে না কিছু করতে। উৎসাহই নেই কিছুতে।”

“আমি হেসে বললাম, “আফিং।”

মাথা নেড়ে কুঞ্জলা বললেন, “আরে তা তলে ত তুবীয় আনন্দে থাকতাম। সে আর ত’ল কৈ ভাগো। এ নেশা-পাকার কিম্বা নয়, নেশা-চটার পেউড়ি। এই ত ঘণ্টাপানেক ধরে ভাবছি লোকানটা বন্ধ করি; তা ভাবছি ত ভাবছিই। বন্ধ আর কবে উঠতে পা পাচ্ছি না। যত বার পা বাড়াই মনে হয় যেন শত্ৰু হাঁচছে। আবার ফিরে আসি।...বন্ধ করে দাও না দোকানটা।...শালা ময়েই

গেল হে ! আমার মাতের পেলাটার দফা গয়া করে দিলে !...হাড় বজ্জাত, হাড় বজ্জাত !”

দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি, কুঞ্জলা বলে চললেন—“আমিও তেমনি কেউটার বাচ্চা। শব্দর দোকানখানা কিনে নিলাম।” বলেই ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলেন।

“কিনে নিলেন ? বলেন কি ? হুটো দোকান চালাতে পারবেন কেন ?”

চটে গিয়ে বললেন, “তা বলে শব্দর দোকান কিনে নেবে একটা বিশেষী সন্ধী ? আমি তাই দেখব ? আমার উপর খটকা দিতে গিয়ে পেলনা কেনা হয়েছিল। দিয়েছিলাম ভবব কিস্তী, মাং-ই হয়ে যেত। শালা মরে গিয়ে উঠ-কিস্তী দিলে। দেখি...মনে হচ্ছে সামলে নেব।”

“কি করে সামলাবেন ?” প্রশ্ন করি আমি।

“দেপি। আছে মতলব একটা। শব্দর দফা গয়া না করে আমার কাশীতে মরেও মুক্তি নেই, এ কথা তুমি জানবে।”

না বলে পারলাম না—“এই ভিড়ে শব্দলা সর্বস্ব খুঁয়ে স্ত্রী-পুত্র কঙ্কাকে পথে বসিয়ে গেলেন, আপনি এখনও তা বুঝলেন না !”

হুঁহাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে কুঞ্জলা বললেন, “আমি আর কাকে পথে বসাব ? আছে কে ? আমার ত এই এক হা-পিত্তিশি বাঁধুনী ! সে বুড়ীর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। কিন্তু এ পেল আমি পেলবই ! দান যে-কালে ধরেছি এক নয় সিংহাসন, না হয় অনশন। এর মধ্যে আর ফেরেপবাজী নেই। ছিঃ, পেলতে নেমে দান ধরেছি, ফিরে যাব ? বল কি তে ?”

“কি করবেন ?” জিজ্ঞাসা করতে হ’ল আমার।

“শব্দর দোকান থেকে সব মাল নর্কমার ফেলব, পায়ের তলায় ধ্যাংলাব, রাগব শুধু যে তামাক, সেই তামাক।”

আশ্চর্য হয়ে বললাম, “তবে আপনার ? আপনার দোকানে ?”

ভাবাচাচা কেয়ে গেলেন কুঞ্জলা। তাই ত ! “কি করা যায় ? বল ত হে বল ত ! এঃ, দেখেছ, শালা জাতগচ্চর, বন্মায়েরসীর মোরলা ছিল। মরতে মরতেও শালা প্যাঁচ মেরে গেছে দেখছ ! ...তাই ত !”

বিশেষ ভাবনায় পড়ে গেলেন কুঞ্জলা। বললাম, “বেশ ত ওর দোকানে আপনার আনা তামাক ভুলে দিন। আপনি বদলে ওর পেলনাগুলো নিয়ে নিন। বাপের সঙ্গে লড়াই ছিল বলে ত আর ছেলের সঙ্গে নেই। বেশ যেমন ছিল—তামাক আর পেলনার দোকানই যেমন ছিল তেমন চলবে।”

হঠাৎ পেয়াল হ’ল কুঞ্জলা আমার একটি কথাও শোনেন নি !

বললাম, “কি, শুনলেন না কথা, না মনে ধরল না ?”

কুঞ্জলা বললেন, “শুনলো না শালা হাঁচলো ? হাড়ের ভেতর অবধি বজ্জাতি ওর। না, না, তোমার মত প্যান্পেনে মেরেমাছবের খেল খেললে হবে না আমার !...আমি বা মতলব করছি সেই

তাল !...দেপি লাও তালটা বন্ধ করে। মরুক, আবাগেরা শুদিন সঙ্গে সঙ্গে ভাত কুড়িয়ে।”

ভারি রাগ হ’ল ; বললাম, “হ’লই-বা শব্দলা শব্দ ; তার ছেলে-মেয়েদের উপর এমন কথা বলতে পারবেন, এতটা হীন হতে পারবেন ভাবতে পারি না।”

“খামাও ত তোমার লেকচার বাপু। তাল বন্ধ করতে হয় ত করে দাও ; নয় ত বাও।”

তাল বন্ধ করে দিলাম।

উপরে জ্যোতিষশায়ের কাছে আরও যা শুনলাম—মন একেবারে বিষিয়ে গেল। উনি দোকান কিনেছেন, তার উপর ঠিক করেছেন দোকান খুলে অর্থের যুপকার্থে শব্দদার স্ত্রী-পুত্রকে এনে রাখবেন, ওদের দিয়েই সেই দোকান চালাবেন, কিন্তু নাম মিটিয়ে দেবেন শব্দদার। এতখানি অপমান উনি ভেবে-চিন্তে করবেন।

আরও সঠিক দানার ভক্ত শব্দদার স্ত্রীর কাছে গেলাম।

ওদের বাড়ী গালি। পশুপতিবাবু বললেন, “ওদের ত ষেঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ী ভুলেচে। জান না ? বুড়ীকে লোভ দেখিয়েছে ছেলের চাকরি করে দেবে, মেয়ের বিয়ে দেবে। অথচ নিয়ে গিয়ে, শুনতে পেলাম, সেই বাঁধুনীটার পরিচর্যা করাচ্ছে।”

কিন্তু রাগ হতে লাগল : ওরা গেল কেন !

এতটা নিখুঁত প্রতিশোধস্পৃহা যে নরপশুটার ক্ষমতা, তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করবই। পাড়ার ছেলেদের বলে ওর দোকান লুঠ করাতে হয়; তাও করা। মনে মনে স্থির করে সারাদিন টো টো করে বেড়ালাম।

রাতে ক্লাবে এ সব কথার পরে অনেক ক’জনাই ঠিক করলে কুঞ্জলার দোকানে গিয়ে ওকে যেমন করে ইউক বাধা করবে শব্দর দোকান তার ছেলেকে কিরিয়ে দিতে। দরকার হয় ত দাম দেওয়া বাবে চালা ভুলে। বন্ধদের শুভ-ইচ্ছায় নিজের বুকখানা ফুলে উঠল। রাতে বাড়ী ফিরলাম, কুঞ্জলার দোকান তখন বন্ধ।

পরের দিন কুঞ্জলা দোকান খুললেন না ; তার পরের দিনও না। মনে হ’ল টের পেয়েছে কোন মতে। ভয়ে এখন গা-ঢাকা দিয়েছে।

রাতে বাড়ী ফিরছি, শুনছি ঘটং-ঘটং, ঘটং-ঘটং তালার শব্দ। অনেক রাত তখন, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে গা-টা হুম্ হুম্ করতে লাগল।

কুঞ্জলাই ত তালার টানছেন। জ্যোতিষশায় জানালা খুলে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কেবল ডাকছেন, “কুঞ্জ ও কুঞ্জ”, কোন সাড়া-শব্দই নেই। তালার টানছে ত টানছেই। আকিংখোবের কাণ্ডই আলাদা।

শীতকাল, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, খালি গারে কুঞ্জলা তালার টানছেন, মাথায় ঘাম দেখা দিয়েছে। আমিও ডাকলাম, “ও কুঞ্জলা !”

জ্যোতিষশায় বললেন, “অস্বস্ত : হুঁ ঘণ্টা হয়ে গেলে এই কথা করে চলেছে। কি বে হ’ল ওর।”

গারে হাত দিয়েই হাত দিয়ে আনলাম। হাত বের পুড়ে গেল।

খুব অল্প কুঞ্জদার।

আমি জোর করে টেনে আনতেই চলে পড়লেন। সামনের বকে শুইয়ে দিলাম।

চোখ লাল টুকটেকে। আমার দেখে কটমট করে চেয়ে বললেন, “শালা হেঁচে হেঁচে উজ্জ্বল দিলে আমার। ছেলে বৌকে এয়ারসা নাচান নাচাবো—তখন ইঁচি কপালে উঠবে। মরেও শালা ছাড়ে না। ওঃ হাড়-বজ্জাত, জাত-গচ্চর। মেরে-জামাই হবে, উনি আমার ঐশ্বর্য দেপাবেন। দেখাচ্ছি মেরে-জামাই।”

আমি মাথায় জল দিতে লাগলাম।

উনি কতকটা শাস্ত হয়ে বললেন, “তুমি ত সবই জান ভাই। জীবন্ত লড়েছি, লড়েছি। মরেও শালা ভোগাবে? নতুন বদমায়েসী শুনবে? তোমায় ত বলেছি এই তালা টানার সময় ইঁচত। ক’দিন আগে তালা টেনে টেনে হাতের বগ ছিঁড়ে বাবার জো। শালা ইঁচে না। বত বলি ‘ইঁচ না শালা, ইঁচ’ ওঃ কি হাসি, ইঁচবে না শালা—ও-ই অঙ্ককারে বসে ফিকির ফিকির বিজুর হাসি। ইঁচি

বন্ধ করে দিলে। ঐ একটা জায়গায় মোজ তবু জানান যেত যে ও বৃষ্টি আমি কি করছি। প্রেত কিনা, বৃষ্টি পেয়ে সে ইঁচিও বন্ধ করে দিলে। আচ্ছা, এই কি ধম্ম হ’ল। পাকা পেলা, শেষ কবে এনিছি; এখন চাল দেবে না ত পেলি কি করে? আজ আমি তাই বিছানা ছেড়ে ছুটে এসেছি। সাধা রাত তালা টানব। ছাড় আমার ছাড়, টানব তালা, টানব, দেখি শালা ইঁচে কিনা।”

জোর হেঁচকা মেরে উঠতে গেলেন। পরক্ষণেই পড়ে গেলেন। আমার হাতের মধ্যেই মারা গেলেন। পানিকটা বাদে...নাক দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে কান্দীনাথ আর সেট রাধুনি এসে গেছে।

\* \* \*

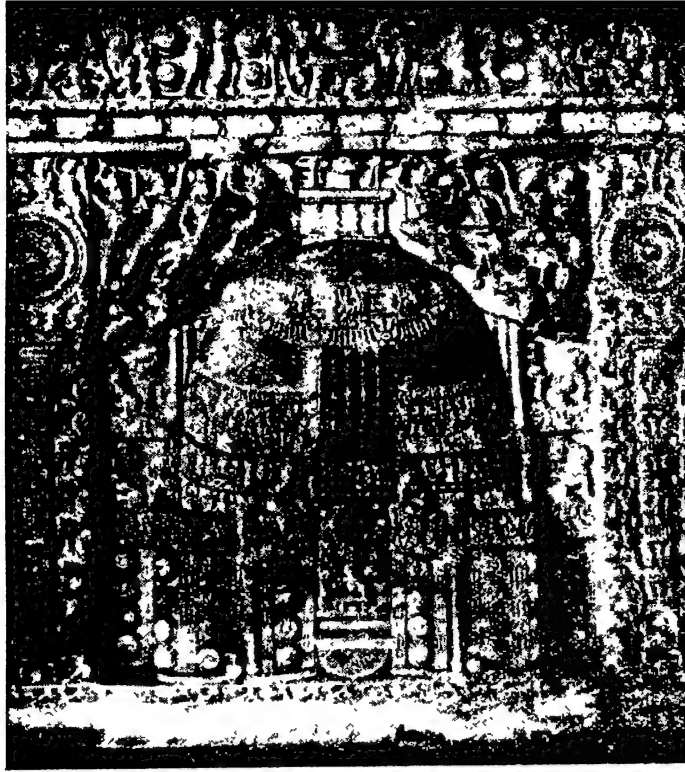
কুঞ্জদার উইলে সব টাকা দোকান কাশনাথকে দিয়ে গেছেন বলে বেদিন প্রকাশ হ’ল, সেদিন আব ক্লাবে যেতে পালাম না। মরবার আগেই নিজের বাড়ীখানায় ওদের বসিয়ে বেগে গিয়েছিলেন।

## নিশীথে

শ্রীআশুতোষ সাগাল

নিম্ভক নিদাঘ নিশি। নিদ্রায় নিলীন  
কল্প শিশুপুত্র মোর পালকের পব।  
কপূরধবল অঙ্গ : নকত্রনিকর  
নির্নিমেঘ আছে নিয়ে চাহিয়া নিয়ত  
শোকতাপহঃখদীর্ণ ধরণীর পানে—  
সন্তানের স্নান মুখে জননীর মত  
সুনিবিড় করুণায়। একটি প্রাণীপ  
নখর জীবনসম যত্নের সম্মুখে  
উন্মত্ত বায়ুর মুখে বেগেছে বাঁচারে  
কোনোমতে নিবু নিবু জীর্ণ শিখাটুকু  
কুস্ত্র গৃহকোণে! ওরে কীর্ণপরমায়  
অসহায় শিশু মোর, যদি এ নিশায়  
ধুক্ ধুক্ প্রাণ তোমর একটি কুংকারে  
নির্কারণ-উন্মুগ ঐ দীপশিখাধার

মিশে যায় অকস্মাৎ অনন্তের সনে—  
কেমনে বাঁচারে তারে তুলিব আবার—  
ভাবি তাই বসি’ তোমর শিয়রে কেবল!  
অজ্ঞসিক্ত স্নেহ মোর—কিবা মূল্য তার  
অন্ধ প্রকৃতির কাছে মমতাবিহীন!  
এ বিশাল ভুবনের পটভূমিকায়  
অণু হতে অণু মোর কতটুকু স্থান!  
বাহা নয় আপনার—সেই প্রধান  
মর্ম্মমল্লভায় ভরি’ রাপিবারে চাই  
ভুল ক’রে কৃপণের ঐশ্বর্যের মত  
চিরকাল! কে কাহার?—কারে ভাবি মোর  
প্রাণের অধিক প্রিয়! অনিত্য ধরায়  
আত্মার আত্মীয় কোথা? জীবন-মনের  
কেহ নাই—কেহ নাই—কেহ নাই সাথী!



অন্ধ রাজ্যের অম্বাবতীতে অলঙ্করণযুক্ত একটি বৌদ্ধ স্তূপ

## নবগঠিত অন্ধ রাজ্য

গত ১লা অক্টোবর নতুন অন্ধ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। পূর্বাংশ মন্ত্রী জীতবাতরলাল নেহরু এই রাজ্যের রাজধানী কুন্ডল আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করিয়াছেন। এগুন ভাংতে ক-শ্রেণীর রাজ্যের সংখ্যা হইল দশটি।

গোদাবরী, কৃষ্ণা ও পেন্নার এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র উপনদী-বিশিষ্ট, ৪০০ মাইল পর্বাংশ প্রসারিত সমুদ্রবেলা-সমর্পিত অন্ধ্রদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের পুনর্গঠন পরিকল্পনার পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়ক হইবে। এই রাজ্যে এসবেষ্টস, বেরাইট, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি, চূণা পাথর ম্যানানীজ, অল্প প্রভৃতি নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বিশাখাপটন ভারতের অগ্রতম প্রধান

বন্দর। সমগ্র অন্ধ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া উৎকৃষ্ট স্থাপত্যশিল্পের ভগ্ন প্রসিদ্ধ যে সকল মন্দির বিজয়মান সেগুলিতে প্রাচীন ইতিহাস এবং সংস্কৃতি-সম্প্রদায়ের নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

অন্ধ্রের আয়তন ৫৩,৫০০০ বর্গ মাইল এবং উহার লোক-সংখ্যা ২,৫৫,০০,০০০। যদিও এই রাজ্যের ভূমির এক বিরাট অংশ কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, তথাপি ভিক্ষাধীন বিস্তীর্ণ অঞ্চল-সমূহ অনাবাদী পড়িয়া আছে।

লোকবসবিশিষ্ট এবং জলে ও স্থলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অন্ধ্রদেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিবে, অন্ধ্রের জন-গণের সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীও এই আশাই পোষণ করিতেছে।

### জন্ম-সংশোধন

সংখ্যা	পুত্র	স্ত্রী	পাতি	হইবে না	হইবে
কার্তিক, ১৩৩০	১৮	১	৬	পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ ও পৌত্র-পৌত্রী	পুত্রকন্যা ও পৌত্র-পৌত্রী



রাজধানীর কোনো এক পদ্মপাল-আক্রান্ত এলাকার বিমান-হুইল আলোড়িত দেখে গণ

## পদ্মপাল

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

মানবজাতির অল্পতম ভয়ঙ্কর শত্রু হচ্ছে পদ্মপাল। ইতিহাসের একেবারে সূর্য থেকে পদ্মপালেরা মানুষকে দুর্ভোগ দিয়ে আসছে। ইদানীং পদ্মপালের উপদ্রব এত দূর ব্যক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে যে, এদের দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশের সমগ্র পাক্ত বিনষ্ট হওয়াও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আধুনিক কালে পদ্মপালের আক্রমণ-জনিত শত্রুত্বের মহামারী সর্বাপেক্ষা শোচনীয়রূপে দেখা দেয় ১৯৫১-৫২ সনে মধ্য-প্রাচ্যে। ইরান, ইরাক, জর্ডন এবং সৌদি আরবের হাজার হাজার মাইল পরিমিত স্থানের সমস্ত সবুজ এবং প্রবর্তমান শত্রুত্ব বিনষ্ট হয়। বর্তমান বৎসরে শত্রুত্বের এই মহামারী আফ্রিকার জঙ্গল থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছে—ভারত ও পাকিস্তানের চল্লিশ কোটি অধিবাসী রয়েছে এই পদ্মপাল-উপক্রান্ত এলাকায়।

আমাদের বাগানে আমরা যে সকল ফল দেখতে পাই তারা অপেক্ষাকৃত চের কম অনিষ্টকারী, কেননা তারা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু উচ্চ অর্ধ মরু-দেশগুলিতে গোমহিষাদির তৃণজাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য হলে পর কোন কোন জাতির পশুপক্ষের বংশবৃদ্ধি সূর্য হয়, তাদের উৎপাদনকার্য্য ক্ষতভ্রম হয় এবং তাদের আহারের পরিমাণ বেড়ে যায়—তারা বত বেশী খায় তত বেশী বংশবৃদ্ধি করে।

এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে অনবরত এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ধারণাভীত অন্ধে গিয়ে দাঁড়ায়। কখনও কখনও পদ্মপাল-উৎপাদন এলাকার এক বর্গপঞ্চ পরিমিত স্থানে ডিমের

সংখ্যা পাঁচ হাজারে পদ্মপাল দাড়ায় এবং উক্ত এলাকা ১,৮৮,০০০ একর স্থান জুড়ে বিস্তৃত হয়।

এই সমস্ত উৎপাদন-এলাকা পরিত্যাগ করে ঝাঁকে ঝাঁকে পদ্মপালেরা স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। একটা বড় ঝাঁকে পদ্মপালের সংখ্যা হয় আনুমানিক ৫০ কোটি এবং তারা ২০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের শত্রুত্ব ধ্বংস করে। একটি ঝাঁক দু'হাজার বর্গমাইলের অধিক স্থান জুড়ে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল এমন দৃষ্টান্তও আছে।

যেখানে ডিম ফুটে বের হয় সেখানে থেকে ৪০০০ মাইল দূরে পর্য্যন্ত একটা পদ্মপালের ঝাঁককে দেখা গিয়েছে। আর একটি ঝাঁক দৃষ্ট হয়েছিল সমুদ্র-নিকটতম স্থলভাগ থেকে ১২০০ মাইল দূরে। একথাও জানা গেছে যে, ১৫০০০ ফুট উচ্চ পর্বত পর্য্যন্ত তারা অতিক্রম করেছে।

পদ্মপাল বিমানের মত উড়তীর্থমান হয়। এর দুই প্রান্ত ডানা আছে। বাইরের দিকের পক্ষধ্বয় দু'ভাবে বসানো এবং সেগুলো থাকে বিমানের পাখা দুটির ধরণে আর কোমল অভ্যন্তরীণ পাখাগুলি দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে এবং প্রপেলারের কাজ করে। পদ্মপালের ক্ষুদ্র কিন্তু শক্ত চোয়াল প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ধ্বংসকারী শক্তিসমূহের অন্ততম। বৌদ্ধ কবোজাল দিনে হয়ত আপনি একটি সবুজ শত্রু-বক্ষেত্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন—দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলে দেখতে পাবেন দিগন্তের কাছে একগুণ ছোট কালো মেঘের আবির্ভাব হয়েছে—দেখতে দেখতে তা সঙ্করমাণ ঝোড়ো মেঘের মত দ্রুত বর্ধিতায়ত্তন হতে লাগল। শীঘ্রই ঐ চলমান মেঘ সূর্য্যকে

ঢেকে ফেলল আর বাতাসে ছড়ানিত হয়ে উঠল গভীর ছজনমান।  
এ হচ্ছে উড়নশীল পঙ্গপালের ঝাঁক।

অকস্মাৎ গোটা ঝাঁকটা ক্ষেত্রের উপর আপতিত হ'ল—সূর্য



পঙ্গপালদের। চমকিত হ'ল গ্রামের লোক—একটি বাণকাময় গাছ

আবার হ'ল দুগ্ধমান, কিন্তু সবুজ ক্ষেত্রটি এখন ধারণ করেছে পিঙ্গল-  
বর্ণ এবং মনে হচ্ছিল সমগ্র সমতলভূমি যেন বৃকে ভেঙে চলেছে।  
পঙ্গপালেরা দীর্ঘে দীর্ঘে কাঁচ করে বটে, কিন্তু তাদের ধ্বংসকারী  
সম্পন্ন হয় নির্দিষ্ট প্রণালীতে। তারা শস্য,  
পাতা এবং গোটা এমন ভাবে ভক্ষণ করে  
যে, শেষ পর্যন্ত শস্যক্ষেত্রে সবুজ শোভা  
অস্তিত্ব হয়ে নগ্ন মাটি বেরিয়ে পড়ে। এই  
ধ্বংসলীলার অবসানে দেখা যায় সবুজ শস্য-  
ক্ষেত্র পরিণত হয়েছে সার মগপ্রান্তরে।

বিরাট সমতল ক্ষেত্র কম খাবার উট-  
রোপই একমাত্র মহাদেশ যা পঙ্গপালের  
আক্রমণে মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।  
কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় পঙ্গপালের আক্রমণ  
অনবরত লেগেই আছে। সম্প্রতি ৬০ মাইল  
প্রস্থবিশিষ্ট এক বিরাট পঙ্গপালবাহিনী কলম্বিয়া  
প্রান্তর আক্রান্ত হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭০ সনে শত শত লোক  
পঙ্গপালের অত্যাচারে নিরপায় হয়ে নিম্ন-  
দব জম্মস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার  
পর থেকে পশ্চিম-আমেরিকায় পঙ্গপাল-সৃষ্ট  
শস্যনির্যাস মহামারী হাসপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু  
যেথানকার সরকার যদি সময়মত উপযুক্ত

ব্যবস্থা অবলম্বন না করতেন তা হলে পঙ্গপালের অত্যাচারে পশ্চিম-  
আমেরিকার অস্তিত্ব ছয়টি রাষ্ট্রে কৃষিকথা প্তম হয়ে যেত। পঙ্গ-  
পালের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সর্বপ্রথম পৃথিবীব্যাপী সঙ্গবদ্ধ  
প্রচেষ্টার সূচনা হয় ইংলণ্ডে পঁচিশ বৎসর পূর্বে। ১৯২৮ সনে

ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকায় শস্যের মহামারী মারাত্মক ভাবে দেখা দেয়।  
অনতিবিলম্বে ডাঃ বোরিস উভারোভ নামক রাশিয়ার জনৈক  
বৈজ্ঞানিকের অধীনে লগুনে একটি গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।  
পঙ্গপাল সমগ্রা নিয়ে যারা প্রথম মাথা ঘামান ইনি তাঁদের এক  
জন।

সমগ্র পৃথিবীতে সবুজত: উভারোভই পঙ্গপাল সম্বন্ধে সর্বাধিক  
প্রাণবীর্ণ লোক। তিনি পঙ্গপালের উৎপত্তি-স্থলগুলি এবং  
বিরাট বিরাট ঝাঁকসমূহের গতিপথের চার্ট তৈরি করেছেন। পঙ্গ-  
পাল-কবলিত যে সকল দেশের কলাণ-সাদনে গ্রেট ব্রিটেনের আগত  
আছে সেগুলির অবিকারশের স্বাউটরা চাক্রে তথ্যাদি সংগ্রহ করে  
নিয়েছেন। স্বাউটসেন দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে  
পর্যালোচনা করে উভারোভ পঙ্গপালের অত্যাচার-পদ্ধতিবোধের  
ব্যবস্থার জন্য তৎপরতার সঙ্গে কার্যে প্রবৃত্ত হন। স্বাউটসেন যদি  
এ ধরনের রিপোর্ট দেয় যে, আবহাওয়া চলে বের হওয়া এক বিরাট  
পঙ্গপালের ঝাঁক প্রবৃত্তি হয়েছিল পাকিস্তানের দিকে, তা হলে সঙ্গে  
সঙ্গে পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং পরে দেখা  
হয় যে, উক্ত গবেষণার নিজে এ সম্বন্ধে বিচলনাবস্থা অবলম্বন  
করবেন।

কখনও কখনও কিছু স্থানীয় সরকারের সঙ্গে বাহিরের সাহায্যের



(বামে) খোলস পরিচাগ করিবার পর একটি পরিণতিপ্রাপ্ত পাখাওয়ালা পঙ্গপাল,  
(দক্ষিণে) খোলস ছাড়িবার অবস্থায় একটি পঙ্গপাল

প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠে। ১৯৫১-৫২ সনে মধ্য-প্রান্তে  
পঙ্গপাল-নিধনকারী প্রধান সাহায্য এসেছিল গ্রেট ব্রিটেন এবং  
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে। পূর্ব-আফ্রিকার উচ্চভূমিতেও একবার  
পঙ্গপালদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে

পক্ষপাল উত্তরাভিমুখে উড়ে চলতে থাকে এবং ইষিওপীয়া ও এমিটিয়ার মধ্যবর্তী এক শত মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শত্রু-সংহাবের নিদর্শন বেগে যায়। অগ্রসরণের পথে তারা লোহিত সাগর



গুন সকালে অথবা সন্ধ্যায় পরিণতিপ্রাপ্ত পক্ষপালসমূহ নিজস্ব হুইয়া পড়ে এবং এঁরা সকল কোণখানেই প্রবেশ করে।

অতিক্রম করে। 'অ'ববের মকড়মি, হাডার হাডার মাইলব্যাপী শত্রু বাণুকারাশি তাদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি—তারা উড়ে চলল পার্শ্ব উপমাগবের উপর দিয়ে, পক্ষ বিস্তার করে পাখি হয়ে গেল উরাক, উরাক ও ছউন।

১৯৫১ সনের ১০ই এপ্রিল গজরাইয়ের কৃষি-বিভাগের নিকট উরাক থেকে সত্যাবার জ্ঞান আবেদন এসে পৌঁছয়। দশ দিন পরে নেতাদার পক্ষপাল নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডারী বিল মারি আটটি পাউপার কাব বিমান-সহ বওনা হলেন তেহেরাণের পথে। তিনি প্রচুর পরিমাণে নব-উদ্ভাবিত আলখিন নামক বিষ সঙ্গে করে নিয়ে যান। আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে পক্ষপাল-সংসে এই বিষের আশ্চর্যজনক কাথাকারিতা প্রমাণিত হয়েছিল। এক গ্যালন জলে দু'আউপ পরিমাণ এই বিষ দ্রবীভূত করে এক একদু ভূমির উপর প্রক্ষেপ করলে, প্রায় প্রত্যেকটি পক্ষপাল মারা যায়।

মারি ঝটপট পক্ষপালের বিকল্পে সংগ্রাম শুরু করে দিলেন। তাঁর নির্দেশে স্থানীয় লোকেরা উটের পিঠে এবং বেড়িও সম্বলিত জিপে চড়ে পক্ষপালের ঝাকের উপর গিয়ে চড়াও হ'ল। যে পতঙ্গের ঝাক সারা বাতীর জন্যে ক্ষেতে অবতরণ করেছে, তারা কিন্তু পর

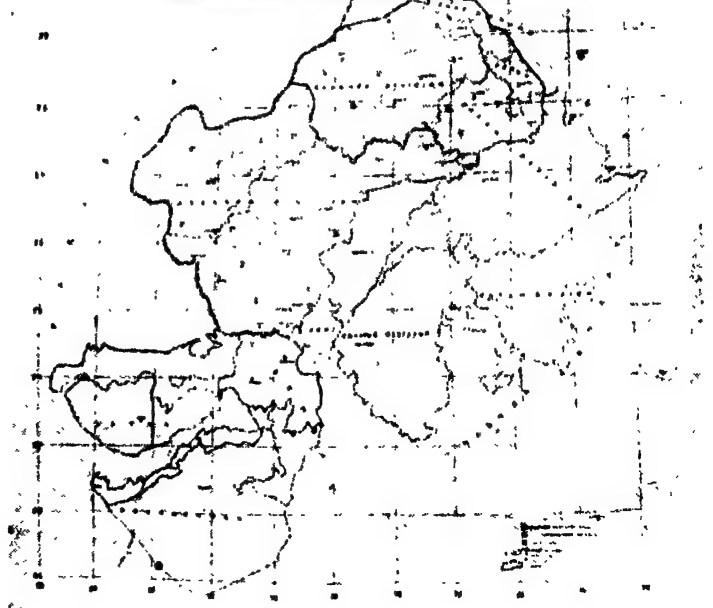
দিন সকালে স্থালালোকে পাখা ওখ না ওখয়া পক্ষপাল শূন্য উড্ডীয়মান হয় না। এমতাবস্থায় পক্ষপাল-সংসকারীদের নানি হ'ল, কোনও স্থানে পক্ষপালের দল অবতরণ কবামান অবিলম্বে মারি নিকট গবর দেওয়া। বিমানসমূহ তাদের নির্দেশিত স্থানের চার পাশে অবস্থান করত, ক্ষেত্রের নিকটতম স্থানের বিমান প্রত্যেকটি মার ক'ন্ত তরল বিষ-প্রক্ষেপণ।

এমনি ভাবে ১৯৫১ সনে উরাণে পক্ষপাল-সংসকারী বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়, কলে সেখানে বেগীর ভাগে শত্রুই বক্ষা পায়।

তারপর এল ১৯৫২ সনের বসন্তকাল। সঙ্গে সঙ্গেই পক্ষপাল-দের প্রাচুর্য হ'ল পূর্বা পূর্বা ব'সন্ত অপেক্ষা দিপুলতর সংখ্যায়। গোটা বসন্তকাল এবং গ্রীষ্মকাল বিল মারি বিমানযোগে সেট সকল স্থানে যেতে লাগলেন যেখানে এই পতঙ্গের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ছউন, উরাক এবং ইরাক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তিনি কাজ করতে লাগলেন। উত্তিমধ্যে ব্রিটিশ পক্ষপাল-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগও এই একট অঞ্চলে কয়ে প্রব'ত হ'ল। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অগণিত পক্ষপাল কামপ্রাপ্ত হ'তে লাগল।

কিন্তু এর শেষ যে কোথায় তা এখনও মানব-বুদ্ধির অগম্য। বহুমান ব'সন্তে পক্ষপালের সংখ্যা বেক্ষণ ক্রমবদ্ধমান হ'তে এদের বিকল্পে তৃতীয় অভিযান অবিলম্বে স্থাপ করা অনিবার্য হয়ে দাড়িয়েছে।

## SET-UP OF THE CENTRAL ANTI-LOCUST ORGANISATION OF INDIA



ভারতের পক্ষপাল-প্রতিরোধ কেন্দ্রাবলী



ভারত এবং পাকিস্থানে মরুভূমির পক্ষপালের বংশবৃদ্ধির হার দ্রুত প্রকৃত পরিমাণে বেড়ে চলেছে এবং তা আরও দু'মাস কাল সমভাবেই চলবে—লণ্ডনের পক্ষপাল-প্রতিবোধ গবেষণা-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাম্প্রতিক সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে এরূপ মত প্রকাশিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণীর মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, জুলাই মাসে পাকিস্থানে পক্ষপালের ঝাঁকের গতি ছিল প্রধানতঃ সিন্ধু, ভাওয়াল-পুর এবং পশ্চিম পঞ্জাবের দিকে। ঐ সময় ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে পক্ষপালের প্রাচুর্য্য ভয়ঃ রাজস্থান, পুঞ্জাব, পেপস্থ, আজমীর, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বিজাপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব ভাগ।

রাজস্থান, পূর্বপঞ্জাব, পেপস্থ, আজমীর, দিল্লী ও উত্তর-প্রদেশের মরু এবং কষিত অঞ্চলে পক্ষপালেরা ব্যাপক ভাবে ডিম পাড়ে এবং জুলাইয়ের মাঝামাঝি ভয়সলমীয়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরনো শুরু হয় আর ক্রমে ক্রমে তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বলা হয়েছে—অগামী দু'মাসে পাকিস্থানে এবং ভারতে

পক্ষপালেরা আরও বিপুল সংখ্যার ডিম পাড়বে এবং অগণিত বাচ্চা বের হবে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মরুভূমির পক্ষপালের ঝাঁক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃই ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের অসম্ভব বকম বংশবৃদ্ধিও হচ্ছে। তুর্কী এবং ইরাকে এবারকার মত পক্ষপাল নিধনকার্য্য সমাপ্ত হয়েছে জুলাই মাসে। ওদিকে আবার কিন্তু ইরানে জুন এবং জুলাই মাসে পক্ষপালের ঝাঁক দেখা গিয়েছে।

লক্ষ কোটি পক্ষপাল ধ্বংস করা সত্ত্বেও বৎসরকাল পূর্বে বা ছিল, আজকের দিনে পৃথিবীতে পক্ষপালের সংখ্যা সম্ভবতঃ তার চেয়ে বেশী। এমন দিন হয় ত আসতে পারে যখন মরুভূমি-সমাজের উৎকর্ষনের জন্য বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সমস্ত পতঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হবে।

\* ১৯৫০, আগস্ট সংখ্যা Readers Digest-এ প্রকাশিত The years of the locust নামক প্রবন্ধ এবং ব্রিটিশ ইনকরমেশন সার্ভিসেস্ প্রদত্ত তথ্যাদি অবলম্বনে।

## সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজ

(কুল-রক্ষা)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

(রাজা রামমোহন ঝারের পর এবং বিজাসাগর মহাশয়ের আমলের পূর্বে একটি প্রস্তুত ঘটনা আমি গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিব। গল্পটি আমি শুনিয়াছিলাম একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে। তিনি আমার পিতার দূরসম্পর্কীয় মাতুল প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলার জনাই গ্রামে তাঁহার বাস। জনাই গ্রামটি ব্রাহ্মণ-প্রধান। শত শত কুলীন ও অকুলীন ব্রাহ্মণ এই গ্রামের অধিবাসী। আমি যে ঘটনার কথা লিপিতেছি তাহা আমার ঐ দাদামহাশয় নিজেকে দেখিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার বয়স এক শত ত্রিংশ বৎসরেরও অধিক হইত। এই প্রাণবল্লভ বাবু তাওড়া আদালতে সর্কিপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন।)

দাদামহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, জনাই গ্রামে রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, এই গল্পে আমি যে সকল নাম ব্যবহার করিব তাহা সমস্তই কাল্পনিক। এই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। পুত্র দুইটি বড়। বোল-সতের বয়সের পূর্বেই ছেলে দুইটির বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু মুশকিল হইল কন্যাদের বিবাহ লইয়া। বঙ্গালসেনের ব্যবস্থা মত কুলীনদিগের কন্যাগত কুল। অর্থাৎ, কোন কুলীনের পুত্র যদি একটু নীচ ঘরে বিবাহ করে তাহা হইলে সেই পুত্রেরই কুলে দোষ হয়। তাহার পিতা বা সত্যোদরদের কুলে কোন দোষ হয় না। তাহাদের কুল ঠিক বজায় থাকে। কিন্তু কোন কুলীনের কন্যার যদি একটু নীচ ঘরে বিবাহ হয় তাহা হইলে সেই কন্যার পিতা এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সেই ন ঘরের দোষবদ্ধ হইয়া থাকেনটী। এমন

কি সেই কন্যার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারাও সেই দোষে লেবী বলিয়া গণ্য হন।

রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রদিগের বিবাহে কুল রক্ষার জন্য এতটা কড়াকড়ি করেন নাই। কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কন্যাদিগকে কিছুতেই “নীচ ঘরে” অর্থাৎ দোষযুক্ত ঘরে বিবাহ দিবেন না। যেমন করিয়াই হউক পৈত্রিক কুলমর্যাদা রক্ষা করিতেই হইবে। সমান ঘর খুজিতে খুজিতে মেয়েদের বয়স বাড়িতে লাগিল। বড়মেয়ে গোদীর বয়স হইল ২০ বৎসর, মধ্যম দুর্গার বয়স হইল ১৭ বৎসর এবং ছোট মেয়ে উষা ১৫ বৎসরে পদার্পণ করিল। কিন্তু তাহাদের কপালে বর আর জুটিল না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। এক শত বিঘার উপর নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল। অনেক ধনবান শিষ্যও ছিল। সেকালে কুলীন সম্ভানগণ কৌলীভ মর্যাদা স্বরূপ “গণ-পণ” হিসাবে মাত্র সতের টাকা পাইবার অধিকারী ছিলেন। ইহার অধিক নগদ টাকা তাঁহারা দাবি করিতে পারিতেন না। তবে কন্যার পিতা নিজের ইচ্ছামুসারে বরভরণ, কন্যার অলঙ্কার ও ভূমি যৌতুক দিতেন। স্ত্রুতরাং সেকালে, এগনকার মত, টাকার জন্য কন্যাদায় বলিয়া কিছু ছিল। মুখোপাধ্যায় কন্যাদের জন্য স্বঘরে পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে বটক প্রেরিত হইল। কিন্তু কোন পাত্রের কুলশীল তাঁহার পছন্দ হইল না। একজন বটক একটি পাত্রের সন্ধান আনিলেন। পাত্রটি সফল বকমেই বাহুল্য, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোপনে অন্বেষণ করিয়া

জানিতে পারিলেন যে, কঙ্কার প্রণিতামহের এক বৈমাত্রেয় ভগিনীর বে বংশে বিবাহ হইয়াছে সে বংশে নাকি “কেশব কুনী” গোর আছে। সুতরাং সেখানে তিনি কঙ্কা দিতে রাজী হইলেন না। আর একটি পাত্রেয়ও খবর পাইলেন। সেটিও সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহারা নাকি “বীরভদ্রি”, অর্থাৎ নিত্যানন্দ বংশের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে। সুতরাং “বীরভদ্রিতে” কঙ্কা দেওয়া চলে না।

অবশেষে মুখুযো মশায় একদিন খবর পাইলেন যে জনাইয়ের নিকটবর্তী বাক্সা গ্রামে বৃদ্ধ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়কে তীব্র কষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা বৃদ্ধকে লইয়া উত্তরপাড়ার গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু নিকতনে আত্র চই দিন চইল গিয়া বাস করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র মুখুযো মশায়ের দৃষ্টির সমুখ চইতে বেন একখানি বনিকা অপস্থত হইল। তিনি কাচাকেও কিছু না বলিয়া কেবল “পাত্রেয় অল্পসন্ধানে বাইতেছি” বাটতে এই সংবাদ দিয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করিলেন। বধাসময়ে তিনি উত্তরপাড়ার গঙ্গাবাত্রী নিবাসে উপস্থিত হইলেন এবং মৃত্যুপঞ্চবাটী গঙ্গোপাধ্যায়কে বলিলেন, “আপনার গাঁড়ার কথা আমি কিছুই জানিতাম না। আজ খবর পাইবামাত্র আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি।” বৃদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মুখুযো মশায়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “রাধাচরণ এসেছে। আমি ত যাচ্ছি। ছেলেপিলেরা হুইল। তুমি মাঝে মাঝে পৌজপবর নিও।”

বলা বাতুল্য, গুণোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা গাঙ্গুলী মহাশয় পঁচিল বংশের বড়।

রাধাচরণ বলিলেন, “খোজপবর নেব বলেই ত আমি এখানে চুটে এসেছি। আপনি ত চললেন। কিন্তু বাবার পূর্বে আমার একটা উপকার করে যান। আমার কুল রক্ষার ব্যবস্থা করে গেলে আপনার অক্ষর স্বর্গ লাভ হবে।”

গাঙ্গুলী মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, “আমি তোমার কুল রক্ষা করব কেমন করে? আজকালকার ছেলেরা কি বাপ-মাকে মানে—না তাদের কথা রাখে? তারা যে এখন সব সাহেব হতে আরম্ভ করেছে। আমার ত দুটি ছেলেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে জান। তারা কি আর আমার কথা শুনে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হবে?”

রাধাচরণ বলিলেন, “আমি আপনার ছেলেদের কথা বলি নি। আমি আপনার কথাই বলছি। আপনি দয়া করে আমার গোঁরীকে আপনার পায়ে স্থান দিন। তার আইবুড়ো নাম ঘুড়ির দিন। এই আমার ভিক্ষে। এতে আপনি আর অমত করবেন না।”

বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিশ্চিন্ত চোখের কোণে একটু হাস্যের আমেজ টানিয়া বলিলেন, “আমি? আমি আর কতক্ষণ আছি? মা গঙ্গার কোলে এসে ত হ’রাত্রির কাটিয়ে দিয়া। বড় জোর আর একটা কি চুটো দাঁড়ি।”

রাধাচরণ বলিলেন, “তা হোক গোঁরীর আইবুড়ো নাম ঘুড়ি। তার পর যা থাকে তার কপালে। সেজন্য আপনারকেও ভাবতে হবে না, আমাকেও ভাবতে হবে না। আপনি শুধু কুলীনের কুলরক্ষা করে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করুন। আপনি বিজ্ঞ লোক, সবই ত জানেন। প্রকৃত সৃষ্টি এই কুলীনের কৌলীন্য মর্যাদা। যে কুলান্নার এ মর্যাদা রক্ষা না করে তাকে যে অনন্ত কাল নরক ভোগ করতে হয়। আমাকে সেই নরক থেকে আপনি রক্ষা করুন। আপনি বেগের গাঙ্গুলী। আমি ফুলের মুখুটি। আমরা পরস্পর সমান। আপনি দয়া করে রাজী হন। আমি আমার মেয়েকে এইখানে এনে আপনার হাতে সমর্পণ করব। আপনি আপনার ছেলেদের ডেকে তাদের একটু বুঝিয়ে বলুন, “কুলীনের কুল রক্ষা করা কাশীতে শিব স্থাপনা করার চেয়েও বড় কাজ। টাকা থাকলে সকলেই কাশীতে গিয়ে শিব স্থাপনা করতে পারে। কিন্তু কুলীনের কুল রক্ষা করা কি আর তার কাজ? আপনি আপনার ছেলেদের বুঝিয়ে বলুন। আমিও তাদের বুঝিয়ে বসব। আপনি বলুন আমি তাদের এই গানে ডেকে আনি।” এই কথা বলিয়া মুখুযো মহাশয় বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয়ের দুইটা হাত চাপিয়া ধরিলেন। বৃদ্ধ তখন অতিকষ্টে বলিলেন, “ভাল, তাই হোক। আমি যাবার সময় কুলীনের ছেলের মনে আর কষ্ট দিয়ে যাব না। আমি তোমার মেয়েকে পত্নী রূপে গ্রহণ করব। তুমি আমার ছেলেদের আর নাতিদের এইখানে ডেকে আন।”

এই কথা শুনিয়া প্রৌঢ় মুখুযো মশায় আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া গাঙ্গুলীর পুত্রগণকে ও আত্মীয়-গণকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা বোঁগীর শয্যার নিকট উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ গাঙ্গুলী পুত্রদিগকে বলিলেন, “আমি রাধাচরণের কাছে একটা বিষয় বাগ্‌দস্ত হয়েছি। আমি মা-গঙ্গার কুলে এসে তাকে কথা দিয়েছি যে আমি তার বড় মেয়ে গোঁরীকে বিবাহ করব। তোমরা তাতে কোন আপত্তি করে না। রামচন্দ্র পিওসত্য পালনে সিংহাসন ছেড়ে বনবাসী হয়েছিলেন, একথা আমাদের শাস্ত্রে আছে। তোমরা যদি এতে বাধা দাও তবে আমাকে সত্যভঙ্গের জন্য অনন্ত নরকে বাস করতে হবে। তোমাদের কিছুই করতে হবে না। যা-কিছু করবার রাধাচরণই সব করবে।”

পিতার কথা শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভু ভাবিল পিতা বৃদ্ধি প্রলাপ বকিতেছেন। সে মধ্যম সঙ্গোদয়কে বলিল, “হরিণ, বাবা প্রলাপ বকছেন। আর বিলম্ব করো না, চল ধরাধরি করে এই বেলা অন্তর্জলির ব্যবস্থা করা বাচ্।”

সেই কথা শুনিয়া রাধাচরণ বলিলেন, “শম্ভু, না প্রলাপ নয়। উনি সজ্ঞানেই আছেন এবং সজ্ঞানেই কথা বলছেন। তোমরা সং পুত্র, বাপকে তাঁর সত্যপালনে আপত্তি করে না। আমি এখনই বাড়ীতে গিয়ে আমার মেয়ে গোঁরীকে আর আমাদের পুত্রমশাইকে নিয়ে শিশুগীর কিয়ে আসছি। বিবাহের বা-কিছু প্রয়োজন এই

উত্তরপাড়ার বাজারেই সব কিনতে পাওয়া যাবে। আমি তোমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাই, তোমরা সব কেনা-কাটা করে। আমি গৌরীকে আর পুরুত মশাইকে নিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ইখানে ফিরে আসব। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। কুলী মহাশয় পুণ্যাস্থা, ঋষিভূলা লোক। তাঁর সংস্কারের ফলে আমাদের গান্ধলী-বংশের মুগ উজ্জ্বল হবে।” এই বলিয়া শম্ভুর তে দশটা টাকা দিয়া দ্রুতপদে মুখুয়ো মহাশয় স্বগ্রাম অভিমুখে যাত্রা যলেন।

বাধাচরণ প্রস্থান করিলে গান্ধলী মহাশয় পুত্রদ্বিগকে বলিলেন, “পা বাবা, কুলীনের কুল রক্ষা করা কুলীনেরই কাজ। কুলিমজুরের কাজ নয়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমি তাব কথায় রাজী হয়েছি। তারপর তার মেয়ের কপালে বিধাতা যা লিখেছেন তাই হবে। তোমার আমার সাধা নেই যে সে সে লেগা পুণ্ডন করি।”

সেকালে লোকের পক্ষে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তিন চারি ক্রোশ। অতিক্রম করা অতি সহজসাধ্য ছিল। তিনি বেলা দুইটা ডাইটার মধ্যে নিজ বাড়িতে উপস্থিত হইয়া উল্লাসেরে পত্নীকে বলেন, “ওগো, গৌরীর বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে এলাম। স্বীকে নিয়ে এখনই উত্তরপাড়ায় গেতে হবে। আজ রাত্রেই বাহ। বর এখানে আসতে পারবে না। আমার অনেক সাধ-ধনার পর বললে, “তবে আপনি আজকেই আপনার মেয়েকে ইপানে আনুন। আমার এখন বাবার সময় নেই। আমাকে বার দুই-এক দিনের মধ্যেই এগান থেকে যেতে হবে।” তুমি ন মেয়েকে নিয়ে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে থাক! আমি যেরা ঢলেকে বসিগে, সে তার গাড়ী নিয়ে এখনই আসবে। ও গাড়ী এলেই তোমরা চার জনেই দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে যাবে। আমি আমাদের পুত্র বিষ্ট ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে সি।”

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাগ্য আজকেই বিয়ে? এতদিন র কি তবে গৌরীর বিয়ের ফল ফুটলো? তারা আমাদের স্বপ্ন? তাদের কুলে ত কোন দোষ নেই?”

বাধাচরণ বলিলেন, “তুমি পাগল হয়েছ? সে আমার খুব মা ঘর। রাগ মুখুয়ো কুল রাখতে না পারলে মেয়েকে গলা প মেরে ফেলবে, তবু কুলে কালি দেবে না।” এই বলিয়াই নি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এবং বিষ্ট ঠাকুরের উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে হান করিলেন।

এদিকে উত্তরপাড়ায় শম্ভু, তরিশ প্রভৃতি সমস্ত কেনা-কাটা য করিয়া বাধাচরণের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় পথের দিকে চাতিয়া সয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাধাচরণ ও বিষ্ট ঠাকুর আসিয়া

সংবাদ দিলেন যে মেয়েরা গাড়ীতে আসছে। দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছবে। বিষ্ট ঠাকুর পশ্চিমধ্যে বাধাচরণের মুখে পাত্রে সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, “এ বেশ হয়েছে! বুড়া যে এত সহজে রাজী হবে তা আমি ভাবতে পারি নি। আজকে পাজীতে বিয়ের লগ্ন না থাকলেও যে কোন দিন গোথুলি লগ্নে বিবাহ হতে পারে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।” গান্ধলী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা ত বসতে পারবেন না। তিনি কি বিছানায় শুয়েই কনের পাণি গ্রহণ করবেন?” বিষ্ট ঠাকুর বলিলেন, “টোপর মাথায় দিয়ে বসা, ছাদনাতলায় বরকে নিয়ে গিয়ে বরণ করা ওসব মেয়েলি শাস্ত্র। ওসব এক এক দেশে এক এক রকম প্রথা। ওসব দেশচার পালন না করলেও বিবাহের কোন কটি হয় না। কনের বাপ বলবেন, “এসা সালঙ্কারা সবস্ত্রা কণ্ঠাং অতঃ সম্প্রদদে। আর বর বলবেন, “হু স্বস্তি, অতঃ গৃহ্যামি। বাস বিয়ে হয়ে গেল। তারপর বাকি হইল আভ্যাদায়ক। সেটা বিবাহের রাত্রেও হতে পারে, কিংবা বিয়ের পর যে কোন দিন হতে পারে। বিয়ের বাদিতে হলে বেশী সময় লাগে না। আমি সংক্ষেপে সেরে নেব! আপনারা তার কণ চিন্তা করবেন না।”

বাধাচরণ মুখুয়ো কণ সম্প্রদানের সময় একটা অস্বস্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বড় মেয়ে গৌরীর কাপড়ের সঙ্গে, সকলের অলঙ্কার, একটা মন স্ত্রী বাদিয়া সেই স্ত্রী অপর প্রান্ত্র মধ্যমা কণা দুর্গার এবং কনিষ্ঠা কণা উমার বস্ত্রাঙ্কলে বাদিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের সময় গৌরীর মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা ভগিনীরাও বিবাহ-কক্ষের এক পাশে বসিয়াছিল। বাধাচরণের উদ্দেশ্যে ছিল বৃদ্ধ গান্ধলীর হস্তে একযোগে তিনটি কণাকেই সম্প্রদান করবেন। তাই তিনি একগাছা স্ত্রীর দ্বারা কণাদের অঙ্কলগুলি বাদিয়া দিয়াছিলেন।

আভ্যাদায়কের সময় গান্ধলী মহাশয় যখন গৌরীর সিঁধিতে সিন্দুর পরাইয়া দেন সেই সময় বাধাচরণের গৃহিণী দুর্গাকে ও উমাকে অস্ত্রালাে লইয়া গিয়া তাহাদের সীমস্ত সিন্দুর-শোভিত করিয়া দিলেন। বাধাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সম্প্রদায়ে ও স্বববে একযোগে তিনটি কণা সম্প্রদান করা হইল।

তাহার পর? আরও কিছু শুনিতে চাটেন? দুই দিন পরে বৃদ্ধ গান্ধলীর গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে বাধাচরণ তিনটি কণার কপালে সিন্দুর মুছিয়া সাদা খান ধুতি পরাইয়া চুইচুটে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন পূর্বক বিজয় গৌরবে ঘোষণা করিলেন যে তিনি ফাঁকি দিয়া এক টলে তিন পাণী মাঝিয়াছেন। তাহার টিলের আঘাতে পাণী তিনটি মবিল, কি বিধবা হইয়া জীবনযত্ন অবস্থায় রহিল সে আলোচনার আর প্রয়োজন নাই।

# আকাশ-গঙ্গা

শ্রীউমা দেবী

উষাল-পাখাল আকাশ-গঙ্গা নামে  
শিব কই এউ শিবহীন নগরীতে ;  
মেঘ-বাহনরা মেঘনা-নদীর বাঁকে  
বিভ্রাৎ রাঙা কলগাটি নিয়ে কাণে

চমৎ চমকে খামে—

উত্তি-উত্তি চায় স্তম্ভিত উজ্জিতে—  
উষাল-পাখাল আকাশ-গঙ্গা নামে  
শিব কই হয় শিবহীন নগরীতে ?  
শিব কই ? খামো, ফণেক চাঁচোপ বঁচে  
দেপ একবার জদয়বিধা পুঁজে ।  
জদয়বিধো গহন গভীর রাত

নেমেছে অকস্মৎ—

চাঁদ মরে গেছে, তারার কলকি ছাউ—  
মরা কোন্সম্মার প্রেতেবা নেমেছে বাউ  
কল পাণ্ডাটীন তকদের নীল-শাণে ।

পাতাহের ফাঁকে ফাঁকে

বাসনা-ফটার তিম শিলাতল  
কাঃ কান্নাস ওয়েছে পিছল -

অনেক অনেক প্রজাপতির

• রঙীন রঙীন পাগা

এখানে কুলের পাপিড়ির মত

নিপুণ তুলিতে আঁকা

বিস্মরণের বুলায় পড়েছে ঢাক ।

শিব নাউ—নাউ, অরণ্য নিষ্কল  
হিমালয়ে বুঝি চলে গেছে তপোঘন ।  
উষাল-পাখাল আকাশ-গঙ্গা নামে  
শিব কই হয়— শিবহীন নগরীতে ?  
বিভ্রাৎঘাতবিদীর্ণ বজ্রের  
মেঘমোহনান নিম্নীলিত চক্ষের  
দৃষ্টিতে ছায়া নামে  
উত্তি-উত্তি চায় স্তম্ভিত উজ্জিতে—  
আকাশ-গঙ্গা চমৎ চমকে খামে—

শিব কই এউ শিবহীন নগরীতে  
শিব নাউ—খামো, ফণেক চাঁচোপ বঁচে  
ভাবি একবার কোনখানে পাবো বুঁকে ?  
এই যে —এউ ত হিমালয় হিমগত  
• স্থিত পৃথিবীর মানদণ্ডের মত ।

দুষ্টিরা মণিমানিক্য গেরিকে  
কত মরকত ভববি যে দিকে দিকে ।

ওউ যে তুঙ্গ কৈলাস গিরি-মালা  
শিবের শিবের বজ্র-অনল ঢালা—  
নাগবালা আর সিদ্ধ-কলকারা  
মেঘময় পথে বিচরণ করে যারা  
ওরি শিখরে কে চন্দ্রশেখর আগে  
অমুরাগবতী ধরা তার বৈরাগে ।

গত জন্মের প্রাণপ্রিয়তমা কে সে  
নব কলেবর নিয়েছে মোহন বেশে --

সিদ্ধ যেমন চন্দ্রের টানে

হয় উদ্বেল গগনের পানে,

শেখনি তরের বিভ্রম আগে

গৌরীর মুগ-ছাঁদে --

হায় ! কই শিব, কই কৈলাস

অতন্তু-আশায়া কাদে ।

নটী-ভরা স্তম্ভ স্তম্ভিত মাদা পাতা,  
কৈলাস নয় —নগরী গ কলিকাতা ।

উষাল-পাখাল আকাশ-গঙ্গা নামে  
শিব কই এউ শিবহীন নগরীতে ;

পুঞ্জিত বাধা সঞ্চিত আশা নিয়ে  
কে বেগেছে সারা আকাশকে মেঘ নিয়ে —  
কে ওয়া—চমকে খামে  
উত্তি-উত্তি চায় স্তম্ভিত উজ্জিতে—  
উষাল-পাখাল আকাশ-গঙ্গা নামে  
শিব কই হয় শিবহীন নগরীতে !

# অতুলপ্রসাদের গান

শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী

অন্তর হইতে আপনার বেগে উৎসারিত হইয়া যে কাবোর বসন্তোত  
শুষ্ক হইয়াছে, কেবলমাত্র অন্তরের অনুভূতি দিয়াই তাহার বর্ষাধ  
রসোপলব্ধি করা বাইতে পারে। কিন্তু উপলব্ধিতেই অনুভূতির চরম  
সার্থকতা নহে। তাই মানুষ তাহার উপলব্ধি ধনকে চিরদিন  
বাহিরে আনিতে চাহিয়াছে—তাহাকে ব্যক্ত করিতে এবং  
তাহার রূপ নির্ণয় করিতে চাহিয়াছে। আমরা জানি যে সব সময়  
এই প্রয়াস সফল হয় না; কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হইতে  
ইহার উত্তর বলিয়া এইরূপ অসম্ভবতা কন্মাই বলিয়াই গণ্য হইবে।  
এই সাহসেই গায়ক-কবি অতুলপ্রসাদের গানের সমালোচনার প্রবৃত্তি  
হইতেছি।

রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রনাথ বাতীত যে কয়টি উজ্জ্বল নক্ষত্র বাংলার  
সাহিত্যাকাশকে দীপ্তিময় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রবাসী কবি  
অতুলপ্রসাদ অঙ্গতম। রবীন্দ্র-স্বর্গকে কেন্দ্র করিয়াই ঈশাদের-  
বালা-সাহিত্য-মণ্ডলে আবর্তন একথা সত্য বটে, কিন্তু বাংলা  
সাহিত্যের পরিব্যাপ্তি ও পরিপুষ্টিতে যে ঈশাদের দান অসামান্য  
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। বাংলা ভাষাকে যাহা  
'মোদের গরব মোদের আশা' করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত অতুল-  
প্রসাদের নামও যুক্ত থাকিবে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবহারাজীবী ছিলেন এবং  
এই ক্ষুদ্রেই তিনি লক্ষ্যের জীবন কাটাইয়াছেন। ঢাকা নগরীতে  
১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বিলাত হইতে তিনি ব্যারিষ্টার  
হইয়া দেশে আসেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। ব্যবহারিক জীবনে তিনি  
ছিলেন উচ্চাঙ্গী, সদালাপী এবং বন্ধুবৎসল। আপনার যোগ্যতা  
দ্বারা তিনি কর্তৃজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। “অবোধা ব্যবহার-  
জীবী সজ্ঞ”র তিনি সভাপতি ছিলেন। একবার ন্যাশনাল লিবারাল  
কন্ফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন ও ১৯৩৩ সনে ইউ. পি.  
লিবারাল কন্ফারেন্সে সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত  
উক্তরা পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনিই।  
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে, “He was  
one of Bengal's foremost cultural ambassador to  
the Ayodhya People's Durbar” অর্থাৎ, অবোধায় জন-  
মাজে বঙ্গ-সংস্কৃতির অঙ্গতম দূত। কিন্তু আমরা জানি যে কবিকে  
বির জীবন-চরিত হইতে পাওয়া বা জানা বাইবে না। তাঁহাকে  
গানিতে হইলে যে রসের উৎসকে তিনি উৎসারিত করিয়াছেন  
গাহারই সন্ধান করিতে হইবে। সেই রসের ধারাতেই তাঁহার  
ভাষার পরিচয় রহিয়াছে। সে রসের স্রোত তিনি তাঁহার সঙ্গীতে,  
গাহার গানের অলকানন্দ্য প্রবাহিত করিয়াছেন। সুবিদ্যুত বাংলা  
গায়ক পরিপ্রেক্ষিত হইতে সাধারণ রসগ্রাহী হিসাবে আমরা তাঁহার

কাব্য-স্রোতধিনীর বেগ, প্রবাহ, গতি, গভীরতা, ব্যাপ্তি ও বিশালতা  
নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বতঃই প্রশ্ন জাগে অতুলপ্রসাদ কোন্ প্রেরণাবশে এই রস-  
প্রবাহকে উৎসারিত করিলেন? অর্থাৎ, কোন প্রেরণা তাঁহাকে  
“আজীবন গান গাহিতে” উদ্বুদ্ধ করিল?

ইহা সত্য যে, গভীর রসানুভূতি হইতেই কবিগণ গান গাহিবার  
প্রেরণা পান। অর্থাৎ, বহিঃপ্রকৃতির রূপ রস শব্দ স্পর্শ বর্ণ গন্ধ কাবর  
অন্তঃপ্রকৃতিকে যে আহ্বান জানায় তাহাতে সাড়া দেওয়াতেই  
কাবোর প্রাণ সৃষ্টি হয়। আর বহিঃপ্রকৃতির সহিত নিবিড়-মিলনের  
এই যে নিরন্তর প্রয়াস ও ব্যগ্র আকৃতি, তাহাতেই কাবোর উৎস  
নিহিত রহিয়াছে। এই আবেগের প্রেরণাই কবিকে গাহিতে উদ্বুদ্ধ  
করে। অতুলপ্রসাদের “প্রকৃতি”তে আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি  
যে বহিঃপ্রকৃতির আকর্ষণ কবির নিকট কত গভীর। “প্রকৃতি”র—

“যাব না, যাব না, যাব না ফর,  
বাহির করেছে পাগল মোরে।  
বনের বিজনে যুহল বার  
ছুলে ছুলে ফুল বলে আমার  
—যাবর বাহিরে ফুটিবি আর  
পুলক-ভরে।”

অথবা

“কে গো তুমি বিরহিণী আমারে সঙ্গাশিলে  
এ পোড়া পরাণ-তরে এত ভালবাসিলে?  
কভু, হরিত-বসনে সাজি  
কুহসে ভরিয়া সাজি,  
মধুমাংস মধু হাসে মম পানে চাহিলে,  
কে আমারে সঙ্গাশিলে?”

এই স্তবকগুলিতে বহিঃপ্রকৃতির আহ্বানকেই মাত্র ব্যক্ত করা  
হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে “প্রকৃতি”র প্রায় প্রতিটি গানই তিনি  
তাঁহার প্রিয় প্রকৃতির প্রেমে পাগল হইয়া গাহিয়াছেন। রহস্ত-  
ময়ী, লীলাময়ী প্রকৃতিকে তিনি উহার নানা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে  
বুঝিয়া লইতে চাহিয়াছেন।—

“বাদল কুমুমম বোলে  
না জানি কি বলে,  
বুঝিতে পারি না কথা  
তবু নয়ন উজ্জলে।”

বহিঃপ্রকৃতিকে না বুঝিবার বেদনাই এই গানটিতে ব্যক্ত  
হইয়াছে।

কিন্তু আমরা ভুলিব না যে তাঁহার গানের উৎসমূখ এত সীমাবদ্ধ  
নহে। কেবলমাত্র এইটুকু হইতেই যে প্রতিভা তাঁহার কাব্য

গাহাকে প্রবাহিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, বর্ধারূপে তাঁহার কাব্যরূপ নিরূপণ করিতে হইলে, আরও যে কয়টি ধারা আসিয়া তাঁহার কাব্যের গতিকে সাবলীলতা দিয়াছে তাহাদেরও সন্ধান লইতে হইবে।

প্রথমই আমাদের চোখে পড়ে অতুলপ্রসাদের ভক্তিরসাস্বক-গানগুলি। এইখানেই আমরা ভক্ত অতুলপ্রসাদকে, সাধক গায়ক-কবিকে আবিষ্কার করি। এই ভক্তি-সাধনাই যে তাঁহার কাব্যের বৃহত্তর অংশে রূপ পাইয়াছে তাহা আমাদের অবদিত নহে। তাঁহার বহুসংখ্যক গান এই ভক্তিরই অভিব্যক্তি। বিশেষ করিয়া “বিবিধ” বিভাগ ও “দেবতা”র বহু গান এ স্থানে উল্লেখ করা যাউতে পারে।

“লভাও যারে নন্দে পাখী  
কেমনে বল চায় ডাকি।  
কৃত্তম লয়ে গন্ধ-বরণ  
নিতি নিতি যারে করিছে বরণ,  
এ কটক বনে কি করি চয়ন—  
কোন ফুলে বল সে পদ ঢাকি।”

“দূরে দিবে এলাম আবার তোমার চরণতলে,  
কুড়িয়ে সবার ভাণবাস।  
ভবের ডালে বীধ্য বাসা,  
ঝড় এসে এক সকলনাশ।

হে নাথ কেবল তুমি তলে  
দণ্ড আমার দণ্ডারী কেলে এলাম জলে।”

‘যবে মানবের বিচারশালায় বিচার পাস দান  
যখন লুকানো নিন্দা আমারে আধাণে জানিবে না’,  
সহিব নীরবে, কহিব তখন  
তুমি জান নাথ তুমি জান।”

আবার

“সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া  
তুমি হো আমার রহিবে,  
বহিবারে যদি না পারি এ ভাব  
তুমি হো বন্ধু বহিবে।  
জানি তুমি মোরে করিবে অমল  
যতই অনলে দহিবে।”

এইরূপ উদাহরণ অল্প দেওয়া যাইতে পারে। কবির ভক্তি-রসাস্বক গানগুলি শুনিয়া মনে হয় যে তিনি যেন তাঁহার অরাধ্য দেবতাকে মূর্ত্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া যেন পরম-নির্ভরতার সঙ্গিত মনের কথা কহিতেছেন। অথচ, এই কথা-গুলি নিচক ব্যক্তিগত কথা নহে—যে কোন ভক্তের মনের কথা।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে আসে। অতুলপ্রসাদ যে দেবতার বন্দনা করিয়াছেন তাহা কি শুধু মন্দিরের পাশা-প্রতিমা? স্পষ্টতাই তাহা নহে। কেননা তাহা হইলে ত তিনি যে কোন পূর্বোহিতের কথাই বলিতেন—তাহাকে কাব্যে বলা যাইত না। আমরা দেখি তাঁহার ভক্তি সেই বিশ্ব-সত্তার প্রতি বহিয়াছে, “জলে

জলে ভলে ভলে, গুণ প্রাণের হব” দিয়া তিনি বাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাকেই তিনি আপন হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ইনিই তাঁহার হৃদয়-দেবতা।

ইহার পর আমরা আর একটি ধারাকে অতুলপ্রসাদের গানে আসিয়া মিশিতে দেখি। মূল স্তবটি যদিও এখানে তাহার ভক্তি, কিন্তু তাহা আরও বেশী আবেদনক্ষম। এইজন্যই কবিরূপে তিনি এখানে অধিকতর সফল। তাঁহার “মানবে” ইহা চোখে পড়ে। ভক্তি ভাব থাকিলেও “মানবে” মানব-মনের প্রতিচ্ছবি আরও অধিক স্পষ্ট। মানুষের হৃদয়ের ইহা আরও কাঁচাকাঁচি বলিয়া মনে হয়। ইহার কথা যেন অধিকতর মানবীয় অর্থাৎ সাধারণের মাঝে তাহার বিস্তার দেখিতে পাই। কয়েকটি গানের উল্লেখ করিতেছি :

“মোরে কাঁড়াল বলিয়া করিও না হেলা,  
পাথর ভিখারী নহি গো,  
দুঃখ তোমারই দ্রাব্যে একের মতো  
অস্তর পাতি বচি গো।

তোমারই লাগিয়া গাঙ্গিয়া গান  
মনের কথা কহি গো।”

কিংবা

‘এগো আমার নবীন শাখী জিলে তুমি কোন বিমানে,  
আমার সকল হিয়া মূগুরিছে তোমার গুণ করুণ গানে।  
জগতের গমন বনে চিন্তা আমি সঙ্গেপনে  
না জানি কি লয়ে মনে এলে উড়ে আমার পানে।

স্বরে গেছে সকল আশা, ফোটে না আর ভালবাসা,  
আজ তুমি বাঁধলে বাগ আমার প্রাণে কোন পরাণে?”

“মানবে”র এবং “বিবিধ” বিভাগের গানে মানুষের অনান্য-বেদনা, আশা-নৈরাশ্য, অবসাদ-উদ্বেগীয় কবিত্বের যে স্পন্দন জাগিয়াছে তাহারই প্রকাশ রহিয়াছে। সাধারণ পাঠক এইজন্যই ইহাদের সঙ্গিত বেশী নৈকট্য অনুভব করে। কেননা তাহার মাঝে তাহার নিজের কথাও যে বলা আছে—নিজের অভিজ্ঞতার সহিত যে তাহার মিল রহিয়াছে। শুধু ভক্তরূপে নহে, সাধারণ মানুষরূপে তাঁহার অনুভূতিশীল মনে এই বিভিন্ন ভাবগুলি তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে, আর এই আঘাতেই তাঁহার কাব্যের আর একটি উৎসস্রুৎ খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা তাঁহার গানকে বহিরা চলিবার নূতন শক্তি যোগাইয়াছে।

কিন্তু এইগুলি ছাড়া বাহার ভগ্ন তিনি এত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, আর যে প্রবাহটি মিলিয়াছিল বলিয়া তাঁহার গান জনগণের অন্তর ভাসাইয়াছে, তাহা তাঁহার গভীর দেশাস্বাধ-আত, তাহার আন্তরিক জাতীয়তা-জনিত।

এই সাক্ষাত্যবোধের টেট অতুলপ্রসাদের সময় পরবর্তী ভাবের সর্বত্র তীব্র ভাবে বহিতেছিল। অতুলপ্রসাদ অন্তর দিয়া এ ভাবকে

এই করিয়াছিলেন। তাঁহার জাতীয়তামূলক গানে আমরা দুইটি ভাবের প্রাধান্য দেখি। প্রথমতঃ তিনি ভারতের বর্তমান শ্রীহীন দৈন্ত দেখিয়া অত্যন্ত বাধিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, ভারতের অতীত ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল এবং সেই অতীত গৌরবের স্মৃতি সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি তাই গাতিয়াছেন—যে জাতির অতীত এত গৌরবময় ছিল অদূর ভবিষ্যতে সে জাতি আবার জাগিয়া উঠিবে।—

“আসিবে শির ধন বাণিজ্য,  
আসিবে বিরা বিনয় বীণা,  
আসিবে আবার আসিবে।”

এই আশার বাণী তিনি বার বার শুনাইয়াছেন। তাঁহার জাতীয়তামূলক গানগুলি তখন যে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে তখনকার গণমানসে অতীত ভারতকে কিরাইয়া আনিবার যে আকাঙ্ক্ষা গুমরাইতেছিল তাহাকে তিনি ভাষা দিয়াছিলেন।—

“এল বল বল মরে  
শত বাণা বেণু রবে  
ভাগ্যত আবার জগৎ-সভায়  
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।  
ধর্ম্মে মহান হবে  
কশ্মে মহান হবে  
নব দিনমণি উদিলে আবার  
পুরাতন এ পুরবে।”

এ আশ্বাস-বাণী তিনি বহু গানের ভিতরে দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বর্ত্ত দিন আমাদের মধ্যে এই বর্ণ-বিদ্বেষ, এই সাম্প্রদায়িক বিবেচনা বর্ত্তমান থাকিবে তত দিন পর্যন্ত ভারতের উন্নতি অসম্ভব। তাই তাঁহার এই জাতীয় গানে যে দ্বিতীয় ভাবটি লক্ষ্য করি তাহা হইল সমস্ত মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যভিমান ও আত্মকল্যে ভাগ্য করিয়া মিলনের আহ্বান।—

“এস হে ব্রহ্মক-কর্ত্তার নিবাসী  
এস অনাগি, গিরিবনবাসী  
এস হে সংসারী এস হে সম্রাসী  
মিল হে মায়ের চরণে।  
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত  
পরিত্র-পথে হইয়া দাঁড়িত  
মিল হে মায়ের চরণে।  
এস হে হিন্দু-এস মুসলমান,  
এস হে পারসী বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ,  
মিল হে মায়ের চরণে।

যুব কম কবিগণ গানেই এরূপ সার্বজনীন মহামিলনের আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে।

সার তাজিয়ে খোসার বড়াই  
মন্ধিরে মসজিদে লড়াই,

প্রবেশ ক’রে দেখে সবাই  
অন্ধরে যে একজনাই।  
চাড় দেখিরে রেশারেশি  
কর প্রাণে প্রাণে মেশারেশি।”

ইহার মধ্যেও ভেদভেদ ভুলিয়া মিলিত হইতে আহ্বান জানান হইয়াছে।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে এই ভাবধারাবলিই তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে ও ইহাদের লইয়াই তাঁহার কাব্য-স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। কিন্তু কেবল এইটুকুর সন্ধান লইলেই কোন কাব্যের বার্থ্য রূপ নিরূপণ করা যায় না বা তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয় না। আমাদের অনুসন্ধিৎসা জাগে ইহাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে।

সর্ব্বপ্রথমে কবির ভক্তিরসাত্মক গানগুলি লওয়া বাউক। এই গানগুলি যে সম্পূর্ণ অন্তরের আবেগ হইতে লিপ্ত তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্ত হইলেই যে কবি হওয়া যায় না, এ কথা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং আমাদের দোঁপতে হইবে যে তিনি এই রসকে কাব্যের গায়ে কতদূর প্রবাহিত করিতে পারিয়াছেন—অর্থাৎ, ভক্তিরস যতই থাক কাব্য হিসাবে তাহা কতদূর সফল?

আমরা দেখিয়াছি যে, তাহা মণিবেব বিগত-বন্দনাৎ রূপ লয় নাই। বিশ্ব-সৃষ্টির সর্বত্র যাহাকে তিনি ভক্ত রূপে দেখিয়াছেন তাহাকেই তিনি ছন্দের বন্ধারে আবৃত করিয়াছেন। ইহার কাব্য-আবেদন নিশ্চয়ই রহিয়াছে।—

“কতু নিম্মল-নীল পাতে  
কনক কিরীট মাথে  
অগ্রভেদী আলোসনে  
রাভিচ অতি মন্দর।  
কতু পুষ্পিত নভ কুঞ্জে  
তব বেশ বন্দী শুভ্র,  
কতু পীত জ্যোৎস্না-বনন  
গাম মুরতি অতি মন্দর।”

ইহার মধ্যে যে ব্যাপক সৌন্দর্য্যবোধ রহিয়াছে তাহাই ইহাকে কাব্য-মূল্য দিয়াছে। সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি সূক্ষ্ম দেখিয়াছেন এবং সেই সৌন্দর্য্যের কথাই বলিয়াছেন। সমস্ত সৌন্দর্য্য এক করিয়া তিনি যদি তাহা দিয়া তাঁহার হৃদয়-দেবতার প্রতিমা রচনা করিতে পারেন তাহা হইলে তাহা ত তাঁহার শিল্প-প্রতিভারই পরিচয় দিবে।

তাঁহার পদ :

“এ জীবন জমীন বড়ই উন্নয়,  
বরষ বরষ বরষে তবু ধূলার ধূসর,  
তাই, নিরাশ হয়ে বসে আছি  
মনের মলিন বাটে।  
পূব গভীর ক’রে দাঁও লাঙলের চির  
চালো তাহে বত পারো নয়ন-কুপের নীর,



লাগে লাগুক হলের খোঁচা

চরণ রেখো বাঁটে।"

ইত্যাদি গানে কবির নির্ভরশীল তদগত চিত্তেরই প্রকাশ রহিয়াছে অথচ কাব্যরসের অভাব তাহাতে হয় নাই। এ প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, দুই-একটি বিশেষ গানের ক্ষেত্র বাতীত আর প্রায় সর্বত্রই তাঁহার গান কাব্যের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। আর একটি উদাহরণ দিতেছি :

"নিশির শিশির সম

পশছে জীবনে মম,

মোরে কুটাও অনুপম

তব সৌরভে।"

তাঁহার সুন্দর কল্পনাশক্তি ও ছন্দ-মাধুর্য্য মিলিয়া এই পংক্তিগুলি এ কথাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

এই গানগুলির উপর বাংলার বৈষ্ণব-গীতি কাব্যের প্রভাব প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু আমরা ভুলিব না যে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্র তখন ইহার প্রভাব অর্থাৎ এই ভক্তিপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। রবীন্দ্র-কাব্যের ধারাও তখন এই দিকেই বহিতেছিল। সুতরাং এই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা তখন নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের সচিত্র তাঁহার অনেক ক্ষেত্রেই ভাব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রজনী কান্তের

"তুমি নিশ্বস কর মঙ্গল-করে মলিন মর্মে মুছায়ে—

তব পূণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়।"

সচিত্র অতুলপ্রসাদের

"কাঁটো হে আমার স্বার্থের পাশ

তব প্রিয় কাজে কর মোরে দাস,

মাগো এ জীবনে তব অভিলাস

হরয়ে কিংবা বেদনে।"

গানটি তুলনীয়।

তাঁহার যে গানগুলি মাতৃরূপিণী বিশ্বপালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া গাওয়া তাহাতে রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অতুল-প্রসাদের :

"তোর কাছে আসবো মাগো শিশুর মত

সব আবরণ ফেলবো দূরে জনর জুড়ে আছে যত।"

গানটির উল্লেখ করিলে রামপ্রসাদের :

"মায়ে চরণতলে স্থান লব

আমি অসময়ে কোথা যাব।"

গানটির কথা মনে হইবে। ইহা ছাড়াও ভাব প্রকাশের ভঙ্গীতে রামপ্রসাদের সচিত্র তাঁহার মিল রহিয়াছে। যেমন :

"শক্তি নাই তোমার ধরি

হার যেনেছি হে শ্রীহরি—

দিয়ে পুলি চোখের ঠিলি

দেখা লাও হে হুঃখর।"

ইহার সচিত্র রামপ্রসাদের

"মা আমার ঘুরাবি কত

কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত?"

গানটি উদাহরণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করা যায়।

অবশ্য এইরূপ সামঞ্জস্য ঘটিবার প্রধান কারণ, এই কবিগণ প্রত্যেকেই ভক্ত ছিলেন ও একই ভাবের ভাবুক ছিলেন। একই ভাব যখন বিভিন্ন কণ্ঠে গীত হইবে তখন ত তাঁহাদের পারস্পরিক মিল থাকাই সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার গানে রবীন্দ্র-প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ তাঁহার গান এত অধিক রবীন্দ্র-প্রভাবিত ছিল যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার গানকে শ্রোতার রবীন্দ্র-রচিত বলিয়া ভুল করিতেন।

"আমার আবার যখন প্রভাঃ হবে

মেঘগুলি সব সরে যাবে

আমায় এমনি করে রাড়িয়ো নাথ

এমনি করে রাড়িয়ো।"

গানগুলির প্রকাশভঙ্গী ও ভাব যে অত্যন্ত গভীর ভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবিত, সুনিবাসিত্রই তাহা বুঝা যাউবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে নিম্নপ্রয়োজন।

তবে তাঁহার প্রতি ও তাঁহার দানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াও এ কথা বলা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না যে, এই গানগুলিতে অতুলপ্রসাদের প্রতিভার কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আমরা দেখি না। ভাবে ও ভঙ্গীতে এইগুলি মধুর সত্য, ইহাতে কাব্যরসের অভাব নাই ইহাও সত্য, কিন্তু বাংলার কাব্য-সাহিত্যে ইহাকে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নহে। যদিও ইহা সর্বথা স্বীকার্য্য যে, রবীন্দ্র-যুগে বৈষ্ণব-কাব্যধারার ভাবটি যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহাতে অতুলপ্রসাদেরও বিশিষ্ট স্থান আছে।

ইহার পর "মানব" ইত্যাদিতে অতুলপ্রসাদের যে পরিচয় পাই তাহাতে কবি-রূপে তিনি আরও সফল ইহাই বুঝিতে পারি। তাহার অগ্রতম কারণ তাহাতে universality বা ব্যাপকতা আরও অধিক। আর গীতি-কবিতার সার্থকতা ত এখানেই নির্ভর করে।

কিন্তু "মানব"র গান কোথাও কোথাও অধিক mystic বা 'ছায়াবাদী' হইয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার বক্তব্য রহস্যবৃত্ত। আমরা বুঝিতে পারি না যে, কোন ক্ষেত্রে তিনি ভগবানকে মানবরূপে কিছু কহিতেছেন অথবা মানবকেই স্বয়ং মানবরূপে কিছু বলিতেছেন। যেমন :

"প্রেম অদীর্ঘ

কণ্ঠ মদিয়া

এ মধু রায়ে পরাণ-পাশে ঢালো গো

নয়নে চরণে বসনে জুগুণে গাহ গো,

মোহন রাগ-রাগিণী,

ওগো নব-অমররাগিণী।

তব চরণ-মধু পরাণ-যন্ত্রে বাজিলে

ব্রহ্মসৃষ্টিগুলি আমারে ঘেরিয়া নাচিলে

রিপিকি রিপিকি রিপি রিপি

ওগো পরাণ-বিলাসিনী।"

আমরা জানি না এ পবাণ-বিলাসিনী, নব-অম্বরগিনি কে ? ইংরেজ কবিদের মত তিনি যে সাধারণ মানবীর স্তুতি করিতেছেন তাহার উল্লেখ কোথাও করেন নাই। ভারতীয় ধার্মিক অনুসরণ করিয়া প্রকৃতিকেই নারীরূপ দিয়া স্তুতি করিতেছেন কি না তাহাও বহুস্বাত্ত রাণিয়াছেন। কিন্তু তাহা উপেক্ষণীয় বিষয় বলিয়াই গণ্য হইবে, কেননা কাবীর রসাস্বাদনেও কোন অস্ববিধা হইতেছে না। কাবীর বসিতে যাহা বুঝায়, তাহা উচ্চৈশ্বর্যের হয় নাই।

প্রকাশভঙ্গী ও ভাবের দিক দিয়া এগুলিও স্পষ্টতঃই রবীন্দ্র-প্রভাবিত। তবে মরস কাবীর সার্থক দৃষ্টান্ত রূপে উত্থানে মূল্য নিশ্চয়ই রাখিয়াছে।

“পাখিলা ননচারে তুট বাথ,  
কেন রে তুট যেথায় সেথায়  
পরিদ্রাণে পদ।”

গানগুলি এইভঙ্গিতে আজও তাহাদের অবদান অক্ষর রাখিয়াছে।

এইরূপ :

“আছে হোর গানের হরী,  
আছে হোর প্রানের হরি,  
ভুলে যা স্বপ্নের সাগর  
খোলসের নৌর খোলা।”

এই দৃষ্টিকোণ হইতে “প্রকৃতি”র গানের আলোচনা পুঙ্কেই হইয়াছে। গীতিকার প্রকৃতির ভালবাসায় এখানে অস্থির। অথচ, এ প্রকৃতি কিন্তু নেতাত ভাল মাটি আকাশ ছাড়াও আরও কিছু। প্রকৃতিকে কবি প্রিয়া এবং অম্বরগণিরূপে আপনার কাছে টানিয়া লইয়াছেন। এইভঙ্গিতে তা গা শুধু নৈগোপিক বর্ণনা না হইয়া কাব্য হইতে পারিয়াছে।

তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলির আলোচনা দ্বারা উত্থানের বিশেষ দিকগুলির উল্লেখ পুঙ্কেই কিছু করা হইয়াছে। একেজ্রে শুধু আর দুই-একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। অতুলপ্রসাদ চারণ-কবি ছিলেন। তিনি নবভারত গড়িতে জনগণকে উত্তেজিত করিয়াছেন—কিন্তু সেই সঙ্গে স্বরণে করাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করিয়া এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এই নিষ্কাশ আরম্ভ করিতে হইবে।

“ভব বরষতে ঘর, হও করষতে বীর  
হও কীর পির নাহি ভয়।  
ভূমি ভৈরবেদে জান, হও মরে আস্থান  
মাগে আছে ভগবান—হবে জয়;  
নানা ভাগ নানা মত নানা পরিধান  
বিশিষ্টের মাঝে দেখ মিলন মান,  
দেখিগা ভারত মতা জাহির উমান  
জগজন মানিনে বিশ্বয়।”

অর্থাৎ, ভারতকে তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত গভীর ঐক্যের কথা শুনাইয়া আত্মসচেতন করিয়া তুলিতে চাতিয়াছিলেন ইহাও সত্যই, সেই সঙ্গে তিনি এই মহাজাতিকে উত্থানের পথে অগ্রসর হইতে

উদ্বোধিত করিতেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই কয়টি পংক্তির মাঝেই তাঁহার সমগ্র জাতীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আবার জাতিগঠনের শত অন্তরায় বর্তমান থাকে সম্বন্ধে যখন মিথ্যা আত্মতৃপ্তির মত হইয়া ভারতবাসী সামোয় বানী ঘোষণা করিত, বড় বড় আদর্শবাদের বুলি আওড়াইত তখনও তিনি উহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই।—

“তোরাই আমার সভায়ে

ঠাকিস নাম উচ্চগোলে,

সমস্ত চাস সকলে

বিশ্বপ্রেমের দিস দেখাই।”

তাঁহার এই চারণ বক্তের উল্লেখ আমাদের ইতিহাসে থাকিবে।

বোধ হয় উল্লেখ করা উচিত যে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত একেজ্রে তাঁহার বহু সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন বোধে কেবলমাত্র একটির উল্লেখ করিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের

“নামিন শরীফ জলিগ হতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,

উঠিল বিশ্ব সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হস,”

গানটির কথা অতুলপ্রসাদের—

“উঠ গো ভারত-বান্ধা, উঠ আদি ভগ্ন-হীনপুত্র।

জগৎ দৈন্ত মন নাশি কর দূরিত ভারত-বাজ।”

তুলিলেই মনে হয়।

এখন তাঁহার গানের সুর সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। কেননা সুর গানের অপরিহার্য ভাগ। অবশ্য একথা সত্য যে, এই আলোচনা কোন সাততা-রাসিকের মন প্রলুব্ধ করিবে না—শুধু সাধারণ অম্বরগণিসা মিটাইবার জগৎ ইহার অত্যাধিক। নতিলে, “কোন বাংলা গানে তিনি গভীর সুর বসাইয়াছেন ও তাহার দ্বারা বাংলা গানকে কতদূর সমৃদ্ধ করিয়াছেন,” এ আলোচনা সঙ্গীত-রাসিকেরই উপভোগ্য।

প্রথমতঃ, “বাংলা গানে শ্রেষ্ঠ ২৪টা চালের প্রবর্তন তিনিই করিয়াছেন” (দিলীপকুমার রায়ের “সংস্কৃতিকো” দ্রষ্টব্য)। এইভঙ্গিতে এই দিক হইতে তিনি এক বিশেষ সম্মানের দাবি রাখেন।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বীপক দিলীপকুমার রায়ের কথায় বলিতে গেলে “তার অনেক গানেই সুর ও কবিত্ব উভয় মিলেই অষ্ট রমণীয় হয়েছে, এ কথা ভুললে চলবে না। অতুলপ্রসাদের গানের একটি অবিসম্বাদিত সম্পদ এই যে, তাতে গানের গানভঙ্গী অত্যন্ত সহজ, সরল; স্বতঃ-স্ফূর্তি—spontaneity শ্রেষ্ঠ শিল্পের একটি নিত্য আনুষঙ্গিক মন্ত এইখান।”

তৃতীয়তঃ, বহু গানে তিনি বহু পুঙ্কে, যখন অল্প কোন ভারতীয় সংস্কৃতি বা কবি বিদেশী বা পাশ্চাত্য সুর-সমন্বয় গানের ক্ষেত্রে গুন বসাই ছিল, তখন তিনি তাহা বাংলায় তাঁহার স্বরচিত (সংসারগতঃ জাতীয়) গানে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা এক নতুন পরীক্ষা ছিল এবং এ বিষয়ে দেখি তিনি অগ্রগণ্যের অঙ্গতম।

সর্বোপরি তাঁহার অধিকতর (সাধারণতঃ ভক্তিমূলক) গানে বাউল, কীর্তন ইত্যাদি শ্রবণকার্য তিনি বাংলার নিজস্ব শ্রবণার প্রচার ও সংরক্ষণে সাতাধা করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহারে সামান্য কিছু বলিয়া প্রবন্ধের ভেদ টানিতেছি। তাহা হইল—বাংলা-সাহিত্যের উত্তীর্ণতাসে অভুলপ্রসাদের গানের সাহিত্যিক মূল্য কতপািন স্বীকৃত হইবে? ভাবীকাল ইত্যাদি তাহার এই সৃষ্টির ভল্ল বিবরণ অর্থাৎ দিবে, তাহাটী স্থিত করিতে ইচ্ছা হয়।

একথা সত্য যে, ইহার সঠিক উত্তর ভবিষ্যৎ দিতে পারে। তথাপি আমাদের মনে হয় যে, হটক না বাড়লো আত্মবিশ্রুত ভাষিত, সে অভুলপ্রসাদকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিবে না। বৃহৎ সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, অভুলপ্রসাদ বাংলা-সাহিত্যকে তাহা দিতে পারেন নাট—যে শব্দের বলে কোন সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া দেওয়া যায় সেইরূপ শব্দের পরিচয় ইহার রচনায় নাট। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা কোনমতেই ভুলিব না যে, তিনি অত্যন্ত গভীর আন্তরিকতা লইয়া বঙ্গ-ভাষার পরম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহার সময়ে বাংলা-সাহিত্যে এত রবীন্দ্র-প্রভাবিত ছিল যে, বিশেষ কোন স্বতন্ত্র সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু স্বতন্ত্রের বেড়া দিয়া ইহার স্থান দেওয়া না থাকক, আত্মবিশ্রুতায়, চকপচ ভাব-প্রকাশে ও নবীন বাংলা সাহিত্যে যে

স্থান তিনি অধিকার করিয়াছেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণশীল ব্যক্তি যাইতে তাহাতে ইহার স্মৃতির উল্লেখ, সঙ্গত অর্থাৎ দিতে কাপণ্য করিবেন না। তাহা ছাড়া—

“দিল্লিরিয়ায় বান ডেকেছে সামাল রে হোর গানের তরী”

এবং

“বুঝি নিদ নাহি আপি পাঃ

তুমিও একাকী আমিও একাকী

আজি এ বাদল রাতে”--

গানগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনার সহিত তুলনীয় এবং এইজন্যই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, ইহার বস্তুমানের আবেদন দীর্ঘকাল অম্লস্বাদ থাকিবে।

সকলক্ষে যে বলিতে পারি যে যত দিন বাংলা ভাষা থাকিবে, তত দিন অভুলপ্রসাদের এই গানটিও অরণ্য হইয়া থাকিবে :

“মোদের গরব, মোদের আশা,

আ মরি বা না ভাবা,

হোমির কোনো, হোমির বোকা

কহে শাপি লালালিমা।

~ ~ ~

এ ভাষার গরব, মোদের আশা,

লালালিমা মরি বা না ভাবা,

এ ভাষার কোনো, এ ভাষার বোকা

কহে শাপি লালালিমা।

## ভগবান বুদ্ধ ও যক্ষিনী হারীতিকা

শ্রীভক্তিকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্ষীতপতি বাঁঘসার যখন ক্ষীতঃ সার বাজগত নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন সচরা তথাবার অধিবাসীদের উপর এক ভয়ঙ্কর উপদ্রব আরম্ভ হইল। একদিন রাজা যখন রাজসভায় বিরাজ করিতেছেন, তখন প্রজাগণ জনকসদৃশ তাহার সমীপে নিজেদের বিপদের বাস্তা নিবেদন করিলেন :

“হে দেব, আপনি দিব, প্রভাবশালী। আপনার শাসন জনগণ কেহও কোনো অজায় আচরণ করে না। দায়করা স্থানবৎ পরদ্রুপে এত রাজ্যে বাস করিতেছি। এগারও আমাদের কোনো হিংস্র ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি এক মহান অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। পতিরাও আমাদের গৃহ হইতে কে আমাদের শিশুসন্তানদের হরণ করিতেছে। আমরা গতাঃগতঃ তাহাকে ধরিতে পারিতেছি না। যদ্যপিও থাক—আজ পর্যন্ত কেহই তাহাকে চক্ষে দেখে নাই। আমাদের বিশ্বাস—ইহা কোনো দৈত্য, গিলাচ অথবা ডাকিনীর কার্য। মহারাজ রক্ষা না করিলে অধিনের মধ্যেই আমরা সকলেই মরান হইয়া হইব।”

প্রজাদের এই করুণ বচন শ্রবণ করিয়া নৃপতির অন্তঃকরণ সমবেদনায় বাধিত হইল। জনগণের এই দুঃখ তাহার সমস্ত মন

বাস্তব হইয়া কিছুকালের জন্য তাহাকে বিদ্রোহ করিয়া ভুলিল। অবশেষে তিনি বলিলেন :

“যাহা ভুলবনের দ্বারা পরিণত হইবার লক্ষ্য, ইহা আমায় কভাবে করিব? জানি না কিরূপে ইহার প্রতিহার হইতে পারি। আপনারা এক দিন আমাকে চিত্ত করিব। তখন দিন : কি ভাবে আপনারা এই মন্তকিন্দর নিবারণ করিয়া, অসুখিত প্রত্যাহার করিয়া ইহা আমায় চিত্ত করিব।”

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌরোহিত্য পরম পণ্ডিত চিত্তে তাহাকে অভিবাদন করিয়া কাটিলেন :

“হে রাজন, আপনার অন্তঃকরণ, উদার হৃদয়, দৃষ্টিঃ জনগণকে যেন নতীকিত করে। আপনার এত প্রাণহারী পায়ঃদ্রুপ মনুষ্য বচনের কথা আর কি বলি। আমরা এখন পরম আশঙ্কিত করি।”

তৎপরে নৃপতিও চিন্তাবলন করিয়া তাহার গুণ কীরন করিতে করিতে পুরবাসিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

নৃপতি তখন শুদ্ধচিত্তে প্রতঃধারণ করিয়া সমস্ত নগরে শান্তি-স্বস্তায়নাদি অমুষ্ঠান করাইলেন। দিব্যক্ষেত্রে দৈববাণী হইল :

“হারীতিকা নারী এক যক্ষিনী পুরবাসিগণের সম্মানগণকে হরণ করিতেছে।”

সেই সময় ভগবান বুদ্ধ বেণুবনে কলকনিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। নৃপতি বিবিসার অমাত্য ও পৌরজনের সহিত তাহার সমীপে গমন করিলেন। দূর হইতে সেই প্রিয়দর্শন শাক্য-কুমারকে দর্শন করিয়া নৃপতি প্রণত হইয়া তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন।

পরম্পর কুশল প্রস্তের পর নৃপতি ভগবান বুদ্ধকে পৌরজনের এই বিপদে কথ্য নিবেদন করিলেন। মহাকাব্যিক স্মৃতি পৌরগণের সম্ভাবিত্বের বিবরণ অবগত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে ধ্যানস্থ রহিলেন।

অতঃপর সহসা নরপতি বিবিসার ও পৌরজনকে পরিত্যাগ-পূর্বক পাত্ৰচীবর গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাত্ বক্ষিণী হারীতিকা নৈবাস অভিমুখে গমন করিলেন। হারীতিকা অবর্তমানে সেখান উপস্থিত হইয়া তিনি বক্ষিণীর প্রিয়কর নামক এক পুত্রকে তপোবলে অধুষ্ট করিলেন।

ভগবান অন্তর্হিত হইলে বক্ষিণী গৃহে আসিয়া তাহার পুত্রগণের মধ্যে প্রিয় পুত্র প্রিয়করকে দেখিতে পাইল না। তখন পুত্রের অহুসন্ধানে হস্তবৎসা গাভীর স্তঃ উদ্ভাস্ত হইয়া সে লোকালয়ে, অরণ্যে নিশাচারা হইয়া ঘূর্ণিতে লাগিল।

“বৎস প্রিয়কর তুমি কোথায়? কোথায় তোমার দেগা পাইব?”—তারতরবে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বক্ষিণী সমস্ত দিশার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত অহুসন্ধান করিল।

সমস্ত আশার (দিকে) পুত্রকে দর্শন না করিয়া নিরাশা বক্ষিণী পর্বত ও দীপসমূহ অহুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিল।

মর্ত্যভূমিতে অহুসন্ধান শেষ হইলে সে ঘোর নরকে প্রবেশ করিল। সেখানে না পাইয়া বিমান ও উত্তানশালী স্বর্গের সর্বত্র অহুসন্ধান করিতে লাগিল।

প্রাণঘাতিনী বক্ষিণী পরিশ্রান্ত হইলেও অবিশ্রামে ইন্দ্র বম বরুণাদি লোকপালগণের সমস্ত পুরী অহুসন্ধান করিল। তথাপি পুত্রের দর্শন পাইল না।

অবশেষে কুবেরের পরামর্শে স্মৃতিভর আশ্রমে গমন করিয়া শোকান্তা বক্ষিণী পরম শরণ্যে শরণ লইল।

দুঃখান্তা হারীতিকা তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিলে ভগবান স্মিতবদনে তাহাকে কহিলেন :

“হারীতি, তোমার তো পঞ্চ শত পুত্র রহিয়াছে। একটি গিয়াছে, তাহাতে এত কাতর হইতেছ কেন?”

ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকান্তা বক্ষিণী বলিল :

“হে ভগবান, এক লক্ষপুত্র থাকিলেও এক পুত্রের ক্ষতি সহ্য করা যায় না। পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু নাই। সেই পুত্রের বিরোধের অপেক্ষা অবিকতর দুঃখ আর কি আছে?”

“হাজার পুত্র আছে, সেই পুত্রহেতু এবং পুত্রশোকের ব্যথা অনুভব করিতে পারে। নিরাস্ত্র অকারণে স্বতই লোকের সম্ভানের প্রতি স্নেহ হয়। সম্ভান কুংসিত হউক, বিকলাঙ্গ হউক, রূগ হউক, ক্ষীণকার হউক, জননীর নিকট সেই পূর্ণশরীর স্থায়।”

বাংসালাবিহ্বলা বক্ষিণী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি অহুসন্ধাপরায়ণ স্মৃতি স্মিতবদনে তাহাকে কহিলেন :

“বহু সম্ভানের জননী হইয়াও একটি সম্ভানের বিরোধে তুমি এইরূপ শোকাত্তা হইয়াছ, তুমি যখন একমাত্র সম্ভানের জননীর ক্রোধ হইতে হাজার সম্ভানকে চরণ কর, তখন হাজার কিরূপ দুঃখ হয় বল দেখি?”

“অলঙ্কে, অপরের গৃহে প্রবেশপূর্বক নারীগণের সম্ভান অপহরণ করিয়া, ব্যাঘ্রী যেমন যুগলাবক ভক্ষণ করে, সেইরূপ সম্ভানের জননী হইয়াও অপরের সম্ভানকে ভক্ষণ করিয়াছ।”

“যে আঘাতে নিজে দুঃখ পাই, সেই আঘাত অপরেরকেও দুঃখ দেয়—ইহা আজ তুমি অন্তরে অনুভব করিলে। অতএব আজ হইতে আর অপরেরকে আঘাত করিও না!”

“তিন্দা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি বুদ্ধদর্শ সঙ্ঘের তিনটি উপদেশ গ্রহণ করো তাহা হইলে তোমার পুত্রকে ফিরাই পাইবে।”

ভগবান ইচ্ছা কহিলে বক্ষিণী তিন্দা পরিত্যাগ করিয়া শীল গ্রহণ করিল। তখন সে তাহার প্রিয়কর নামক প্রিয়পুত্রকে ফিরাই পাইল। ২

১। (ক) চৌর্য পরিত্যাগ, (খ) ব্যভিচার পরিত্যাগ, (গ) মিথ্যাভাবণ পরিত্যাগ।

২। হারীতিকাদমন—অবদান।



# পৃথিবীব্যাপী বীজবিনিময়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

“নিউ ইয়র্ক টাইমস” পত্রিকায় ক্যাথেরিন ই মিকেল আমেরিকার বীজ-বিনিময় প্রতিষ্ঠান ও উহার কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান আমেরিকার কৃষি-বিভাগের অন্তর্গত, এবং ইহার নাম “Division of Plant Exploration and Introduction।” ইহার কার্যাবলী প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত, পৃথিবীর বহু স্থানের বহু ব্যক্তির সহিত ইহার যোগাযোগ আছে। এই প্রতিষ্ঠানে সকলেই নূতন ও স্বল্প জাতীয় উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত আছেন। একটি উদাহরণ দিলেই ইহার ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যাইবে। ১৯৫২ সনে ইউনাইটেড স্টেটসের বাহিরে অবস্থিত ৭৮টি দেশে বহু শত বার ভ্রমণে বীজ প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল দেশের মধ্যে আছে—সামোয়া, টোগো, কুকদ্বীপ ইত্যাদি। ইজরাইল ও ভারতবর্ষ হইতেই অধিক সংখ্যক অনুসন্ধান হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার নামও এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য হইতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রকমের গাছপালা, তরুলতা, অব্যাহত ভাবে আমদানী করা। প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এইরূপ ভাবে আমদানী করা হইয়া থাকে—(১) আমেরিকায় নূতন নূতন শস্য, গাছপালা প্রভৃতির প্রবর্তন করা—যেগুলি ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবে এবং (২) এমন সব গাছপালা প্রবর্তন করা—যে সকল স্থানীয় গাছপালা অপেক্ষা উন্নততর। আমেরিকার প্রধান প্রধান শস্যের মধ্যে দশটিবও কম শস্যকে ‘স্থানীয়’ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা হইতে অতি সহজেই বুঝা যাইবে দেশ-দেশান্তর হইতে বীজ, গাছপালা প্রভৃতি আমদানী করা কত বেশী প্রয়োজনীয়।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং বীজের চাহিদা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধুনা আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিকতর হইতেছে। বিনা মূল্যেই বীজ সরবরাহ করা হইয়া থাকে। তবে ইহা এই আশায় করা হয় যে, ইহার পরিবর্তে কিছু-না-কিছু নূতন জিনিষ পাওয়া যাইবে। একই রকমের গবেষণায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের গবেষক-গণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করাও এই প্রতিষ্ঠানের অপর একটি উদ্দেশ্য, উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যদি কোন

দেশের কোন গবেষক, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ, বা কোন কৃষক পেপের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে তাঁহাকে হাওয়ালি (Hawali) গবেষকদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইবে। এই কৃষিক্ষেত্রে পেপের গবেষণাই প্রধান কাজ।

বিনিময়ের জন্য গাছপালা, তরুলতা অপেক্ষা বীজই অধিকতর উপযোগী, কেননা বীজ শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং সহজে প্রেরণ করা যায়। গাছপালা, বীজ প্রভৃতির সঙ্গে কোন রকমের যোগের বীজাণু বা পোকামাকড়ের বাচ্চা, ডিম প্রভৃতি না যায় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯৮ সনে স্থাপিত হইয়াছিল এবং “থৈর্যা ও আশাই” ইহার মূল মন্ত্র ছিল। প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত গাছপালা, বীজ প্রভৃতির আদান-প্রদানের একটি স্বায়ী তালিকা আছে এবং কোন স্থানে কোন গাছপালা কি রূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

পশু-পালন, তৃণজাতীয় পালন, তুলা, ওষুধি, ফল প্রভৃতি সকল রকম শস্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে, এমনকি উদ্ভানের শোভাবর্দ্ধক গাছপালাও বাদ পড়ে না। বিভিন্ন স্থানে গাছপালা ও বীজ নির্বাচনের ক্ষেত্র আছে; মেরীল্যান্ড, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, আইয়া, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছপালা নির্বাচিত হয়; যেমন চিকো এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে অলিভ, এগ্রিকোট প্রভৃতি নির্বাচন করা হইয়া থাকে। ফ্লোরিডা এভোকেডস এবং আমের নির্বাচন স্থান।

গাছপালা সংগ্রহের জন্য পূর্বের মত এখন আর কোন অভিবান পাঠান হয় না, তবে বিশেষ বিশেষ গাছপালা সংগ্রহের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষজ্ঞ প্রেরিত হয়, বর্তমানে একজন বিশেষজ্ঞ পার্কস অঞ্চলের উপযোগী পশু-পালন সংগ্রহের জন্য আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের কৃষি-বিভাগের অন্তর্গত এইরূপ প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে কত বিশেষজ্ঞ, কত কর্মচারী দেশে-বিদেশে যাইতেছেন। এই কারণে অল্প অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। কিন্তু নূতন গাছপালা, শস্য প্রভৃতির সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে কি? যদিও-বা কিছু হইয়া থাকে সাধারণ লোক তাহা জানে না।

## বাঁশীর বেদনা

### শ্রীশেওরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সকলের মনের কথা যদি না বাজল ওরে  
আমার এই বাঁশীর বাঁধার সুরে,  
সে বাঁশী বাজাই বুধা সে বেণু বোবাই ভালো  
সে বাঁশী থাকুক নীরব-পূবে ।

যদি গো বাজাই বাঁশী তাহাতে উঠবে যে সুর  
তাঁহা তো নিজের পবন নয়,  
তাঁহা যে সকল জনের হৃদয়ের বাঁধার কথা  
সে বাঁশী বাজবে ভগ্নহৃদয় ।

আমার এই বাঁশীর সুরে ফুটিবে যেসব কুসুম  
তাঁহা যে আশ্রন-তারার ফুল,  
সকলের হাতাকারের তাহাতে গাঁথব মালা  
সবারি ভাঙবে পথের ভুল ।

আমার এই নয়তো বাঁশী মিলনের কুণ্ডলনের  
অঙ্গদের গুঞ্জরণের গান,  
এ বাঁশী ঘুমের বনের মিলনের স্বপন ভাঙ্গার  
সকলের হৃৎ-পরিজ্ঞাপন ।

এ বাঁশী গাউবেই গান নারীদের ঘুমলাঙ্গানীর  
যত সব বন্ধ ঘরের তালা—  
ভেঙ্গে সে খুলবে হৃদয় ভীষনের পরিজ্ঞাপন  
পরবে কণ্ঠে সবার মালা ।

বাজাব এমন করে আমার এই আশ্রনবাঁশী  
যা' শুনে সকল বেদন ভুলে',  
দাঁড়াবে সকল মানুস জীবনের সাগর তীরে  
ঘরেই সকল বাঁধন খুলে' ।

সে বাঁশীর সুরটি গা'নে চালাকির চুক্তি ভেঙ্গে  
মাহুয়ের মুক্তি দেবার বাণী,  
জীবনের মুক্তামণি যাচারা ধলায় লুটায়  
তাদের ভুলবে সে সফল'নি' ।

যত সব চণ্ডীকাণ্ডাল হাজারো নিষ্পেষণ  
বেদনায় কাঁদছে অসীম কান্দন,  
আমার এই আশ্রনবাঁশীর চেউয়ের হিল্লোলেতে  
তাদেরি ভাঙুক সকল বাঁধন ।

জলো মোর বাঁশীর আশ্রন জলোই হাজার শিখর  
তাহারি প্রাণের তাগের তলে,  
বাঁধিতের পরিজ্ঞাপন ভগবান উঁচু ভ্রুগে  
আমারি রক্তকমল-মলে ।

## পথের শেষে

### শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পাথের ফুরালো স্বদেশের পানে ফিরিয়া চলেছি তাই ।  
'দেবদূত' গাড়ী ছুটে ছবস্ত, চলাব বিয়াম নাই ।  
ছেলে মেয়ে আর জননী আমার  
ফিরে যেতে যেন ডাকে বাব বাব  
বৃকের বেতাবে আশ্বান-ধনি, যেন যে তনিতে পাই ।

স্মৃতির-স্মৃতি মর্মে বহিয়া ফিরিয়া চলেছি দেশে ।  
পৌছিব সেখা তিনটি দিনের রেলের পাড়ির শেষে ।  
কতনা তীর্থ, নগরী ও গ্রাম  
পার হয়ে মেল ছুটে অবিবাহ  
কয়লার গুঁড়া, ধূম ধুলি উড়ে লাগিছে অঙ্গে কেশে ।

দীঘ পথেতে হেরিলাম কত, পরিচয় হ'ল মেলা ।  
বাধা নাহে গ্রাঙ্ক ভেঙে গেল বঙ্গ গুপ্ত হ'ল দিনের খেলা  
জলুম করেছে পাশুরা কত  
ভেট হয় নাই ভাল মন মত  
পারমাধিক বচন তাদের করিয়াছি অবতলা ।

ভিখারীর দল পিছু ধরিয়াছে, ধমক দিয়াছি কড়া ।  
সে-কথা অরিলে 'দাঁপ-পল্লব' জলে হয়ে উঠে ভরা ।  
দেওয়া হয় নাই কত কিছু দান  
পূজিনি পূজা করি অভিমান  
মথুরে গাধা মর্ষবেদীতে মিছে করিয়াছি স্বরা ।

প্রাণ ভরে গেছে অচেনা জনার চলা-ফেরা মধু ভিড়ে ।  
কত না উপল কুড়ায়ে ফিরেছি মলাকিনীর তীরে ।  
চায়-অঞ্চলে বেধেছে তরুরা  
তীর্থ-সলিলে স্মৃতি-ঘট ভরা  
কস্ময় যের পথের দাবীতে গিয়ে ছিল যে রে ছিঁড়ে ।

তুফানের বেগে ছুটে চলে গাড়ী, ওই দেদা যায় কাশী ।  
শিবালয় ভরা পবিত্র ধাম এবার পড়িল 'আসি' ।  
খামিয়া ক্ষণেক যন্ত্র-দানব  
ছুটে গর্জনে কাঁপায় মানব  
গয়া পার হ'ল, গেল কোডাওয়া, টানেলে ধরিল বাঁশী ।

হাজারীবাগের শ্যাম শোভা হেরি ভরিল হৃদয়-মন  
ঘরের হুরারে মনে পড়ে পুনঃ মধুর বৃন্দাবন ।  
মূর্সারী পায় গিবি হিমালয়  
মানস পটেতে হয় যে উদয়  
স্মৃতির ফলকে শাস্ত হ'ল পথের পথম অণ ।



## সৌন্দর্যের সার্থক প্রতিনিধি...

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের  
সার্থক প্রতিনিধি তার শিল্প-সৃষ্টি।  
শিল্পের ভাষা সর্বজনীন, সহজ ও সুন্দর।  
তার আবেদন তাই স্থান ও কালের সীমা  
অতিক্রম করে নিখিল-মানবের মর্মলোকে।  
তেমনি রূপ-সৃষ্টিতে শতাব্দীর গৌরব-দৃশ্য

# লক্ষ্মীবিলাস

আজো সৌন্দর্যের

সার্থক প্রতিনিধি।

## তৈল

এম. এল. বসু স্ট্র্যাণ্ড কোং লিঃ

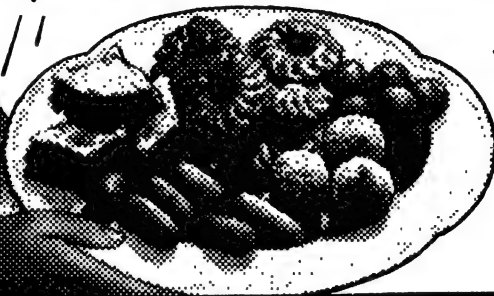
'লক্ষ্মীবিলাস হাউস' :: কলিকাতা-১





# ডাল্‌ডা

পূজার উৎসবকে আরও মধুর করে



পূজার  
ঐতি-সম্ভাষণের  
আরম্ভেই আছে  
ডাল্‌ডার  
তৈরী মিষ্টান্ন।

যা পূজার মিষ্ট কি চমৎকার  
তৈরী করেছেন।

ডাল্‌ডার রান্না হয়েছে বোলে  
পূজার ভোজটা আরও লম্বা হবে।

আর ডাল্‌ডার খরচও কত কম!

এবার পূজার ডাল্‌ডা বনস্পতি দিয়ে আপনাদের সব খাবার ও মিষ্টান্ন তৈরী করে  
উৎসবের আনন্দকে আরও মধুর করুন। ডাল্‌ডা বনস্পতিতে রান্না প্রত্যেকটি খাবার  
খেতে চমৎকার! ডাল্‌ডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো আর এতে খরচও কম। ডাল্‌ডা  
বনস্পতিতে রান্না খাবার নিজেরা খেয়ে ও প্রিয়জনকে খাইয়ে এবার পূজার উৎসবকে  
সর্বোৎসাহিত করুন। আপনারা আমাদের পূজার ঐতিহ্যসম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

এবার পূজার মজার ধরনের মিষ্টান্ন  
কি করে করা যায়?  
জানতে চান জে আজই লিখুন:-  
দি ডাল্‌ডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস  
পোঃ, জাঃ, বর, নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডাল্‌ডা  
বনস্পতি



# পুস্তক পরিচয়

দীপায়ন—ঐঅপূর্বকৃত ভট্টাচার্য। ঐগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। মূল্য চারি টাকা।

তিনখানি কবিতার বই প্রকাশ করিয়া গুরুকার ইহার পূর্বেই কবিতাটি লালত করিয়াছেন। এখানি অপূর্বকৃষ্ণের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। গৃহে ছিন্নানলটুকু কবিতা হানি পাইয়াছে। বইখানির প্রধান দৈনন্দিন বিষয়-বৈচিত্র্য। ইহাতে প্রেম আছে, প্রহর আছে, পল্লী ও প্রকৃতির গান আছে, স্বাধীনতার কথা আছে, দেবতার আরাধনা আছে, বুদ্ধ-বন্দনা আছে, মেঘোৎসবে মেঘবৃষ্টির কবির প্রতি প্রণাম-নিবেদন আছে। “ধানের ভিতর যে দানি রুদবে এনে দেয় আলোড়ন”, সে কি?

“সময়ের মহা শোভা মাঝে কি গো অমৌলের গানগান  
চেতনার চেউ তুলে দেয় দোশ অপনে ও জাগরণে?”

“সত্যতার পরিচাসে”র অবদান হইবে কি?

“জীবন-রঞ্জিত কোন্‌খানে পাবো মোগা দেখা?”

মাঝে মাঝে আশা হয়,

“মনোবুদ্ধির গন্ধ বেড়ার বনে :

প্রাণের অতিথি কাল্পনিক মোর আসিয়াছে নির্জনে।”

আবার মন উদাস হইয়া যায়,

“প্রবাসী পথিক খরে ফিরে চলে অচেনা সিন্দূপারে।”

তবুও বলিতে হয়,

“কোমার নিখিলে মোর যেবনের গানগান

সমাদরে কণ্ঠে তুলে নিও।”

কিন্তু, “যৌবনহারা কোথা পাব আজ?” সবই চলনার খেলা,

“ক্ষণিকের প্রেম বৃষ্টিদসম মন কেড়ে নেয় এসে।”

বিবাস আসে,

“রাত্রির তিমিরপ্রাপ্তে পাওয়া যাবে শাস্তির আভাস।”

উপসর্গক হয়,

“একটি স্বপ্নের স্মৃতি অনন্ত কালের সাথে

অঙ্কিত করিছে তব মতিমার ছবি।”

‘আগ্নেয় রজনী’, ‘নবায় উৎসব’, ‘বুদ্ধের স্বপ্ন’ প্রভৃতি কবিতাগুলি চমৎকার। চন্দ্রনিপুণ কবির শব্দগুলি সুনির্বাচিত। কবিতাগুলি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। অবতরণিকায় তিনি বলিতেছেন, “কবিতার ভিতর দিয়ে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছি নিজের জীবনের যথ।” “দীপায়ন” উহার খ্যাতি অক্ষুর রাখিবে।

জীবন খাতা—ধরলীধর চট্টোপাধ্যায়। দ্বি বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেড, ২২১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। দাম লেখা নাই।



## বঙ্কিম বচনাবলী

বঙ্কিমের জীবনী ও উপন্যাসের  
পরিচয়সহ সমগ্র উপন্যাসগুলি  
এক খণ্ডে সম্পূর্ণ

লাইনো টাইপে, বিশেষভাবে প্রকৃত  
কাগজে সুসম্প্রদিত : মজবুত  
কাপড়ে স্বর্ণাঙ্কিত বঁধাই : সুদৃশ্য  
আবরণী : সহজে বহনীয়।



প্রিয়জনকে উপহার দিবার ও  
গ্রন্থাগারের সৌন্দর্য ও মর্যাদা  
বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী



সাহিত্য সংসদ

০২এ আপার সার্কুলার রোড  
কলিকাতা ৯

দামগুপ্ত এন্ড কোং লি., কলিকাতা ১২  
ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাবেন।



মূল্য ১০, টাকা

# RUSSIAN NOVELS

## CLASSICS

### A NEST OF THE GENTRY

—Ivan Turgeneyev

The well-known novel by an old master in de-luxe edition. Ideal for presentation.

179 Pp.

Rs. 2-13

### THE ARTAMONOUS

—Maxim Gorky

With many illustrations

614 Pp.

Rs. 3-4

## MODERN

### A STORY ABOUT A REAL MAN

—Boris Polevoi

STALIN PRIZE. Strange but true is this story of a real man, Merseyev, a pilot who lost both his legs and yet flew again.

552 Pp.

Rs. 2-10

### PORT ARTHUR

—A. Stepanov

A historical novel depicting the scene of the Russo-Japanese war and the incidents leading to the fall of Port Arthur.

784 Pp.

Rs. 3-12

Catalogues on request.

A centre of Soviet publications :

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS,

3/2, MADAN STREET,

CALCUTTA-18

কবি পরলোকগত। পুর পিরিজানস্কর পিতার কবিতাগুলি একাংশে  
করিয়াছেন। স্মৃতিচর্চা করিয়াছেন শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত এবং শ্রীশৈলজা  
নন্দ মুখোপাধ্যায়। “জীবন-খাতা” একাংশে করিয়া পিরিজানস্কর পুত্রের  
কর্তব্য কাহাই করিয়াছেন। না করিলে হুন্দে এবং প্রকাশভদ্রীতে অনেকগুলি  
হুন্দর কবিতা বিন্দুতি-সাগরে তলাইয়া যাইত।

‘প্রবাসে’ পাই,

অবহরতল মেঘসম্মত গভীর পরকাশ,

ধ্বংস-নাগিনী বলকে বলকি চমকে দাবিনী-হাস।

‘এস’ কবিতায় আছে,

এস নব-বধূটির

অবগুপ্ত কুণ্ডিত অমরাগ-সিকিত লজ্জার প্রায়।

‘অমৃতগুপ্ত’ কবিতায় আছে,

মনে হ’ল যেন ব্যথা দিয়ে মনে কাহারে করেছি কথা,

বিহগের গান তাহারি মনের অক্ষুট ব্যাকুলতা।

‘সমর্পণ’, ‘বিকাশ-ভিখারী’ প্রভৃতি কবিতাগুলি বড় ভাল লাগিল।

‘স্বভা-আবাহনে’ কবি নিজের মনের ইচ্ছা অকুণ্ঠ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

‘জীবন-খাতা’ শেষ কবিতা। ইহাতে তিনি বলিতেছেন,

ঘাটের মায়া কাটিয়ে দিয়ে

অকলপানে লক্ষ্য করি’

নানা ভুলের পণ্য বোঝাই

ভাসিয়ে দি’ এই জীর্ণ-তরী।

পরলোকগত কবির জীবনের আকৃতি এই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে।

“জীবন-খাতা” কাব্যমোদী পাঠকের ভাল লাগিলে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অপলম্প—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি এম, লাইব্রেরী-  
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য উপস্থাস্থানিতে বহু চরিত্রের ভিত্তি, সবগুলিই প্রয়োজনীয় নয়, অনেক ঘটনা—যাহা না ঘটিলেও গল্পাংশ কতিপয় হইত না, এবং অনেক সমস্তা আছে—যাহার উপর একাধিক প্রতিভাশালী কথ্য-সাহিত্যিক ইতিপূর্বে বহুবার আলোকপাত করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলিই গল্প শোনার আসল বাধা নহে—যদি গল্প বলার ধরুটি হয় সরস। একই গল্প তো আমরা বহুজনের মুখে শুনিয়া থাকি, ভালও লাগে শুনিতে, তবু কোন কোন ক্ষেত্রে কৌতুহল জাগ্রত হয় না কেন? শুধু কখন-ভদ্রীর তারতম্যে এমনটি হয়। উপস্থাস্থ লেখার মধ্যেও এই সত্যটি নিহিত। আমরা জানি, নুতন বা পুরাতন যে কাহিনীই হউক বস্তুতঃ জমাইয়া তাহাকে বাস্তব করা যায় না—শুধুমাত্র লেখার ভদ্রীতে ও বস্তু গ্রহণ-বর্জনের সংঘর্ষে তাহা রস-গ্রীষ্ম ও চিত্ত-ব্রাচক হয়। আলোচ্য উপস্থাস্থে যদিও লেখক সমাজ এবং জীবনের কয়েকটি সমস্তা লইয়া বিদগ্ধ-জ্ঞানোচিত আলোচনা করিয়াছেন তথাপি প্রকাশভদ্রীর দৈন্ত্রে এই মূল্যবান ঘটনাবলি কাহিনীটি পাঠকচিতে রেখাপাত করিতে পারে নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অগ্নিযুগের অশ্রুগুরু হেমচন্দ্র :—শ্রীবিনয়জীবন বোব।

ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ বজ্রমল্লার স্ট্রীট, কলিকাতা-১। পৃষ্ঠা ১৫৬, মূল্য ২।০।

যাঙ্গার তথা ভারতের স্বতন্ত্রতম জ্যেষ্ঠ বিদ্বৎ হেমচন্দ্র কামরূপের (১৮৭০-১৯৫১) জীবনী। যাঙ্গার অরিন্দ্রপণ ইতিহাসে যাঙ্গারের

“আমি জানি...  
লাক্স টয়েলেট সাবান আপনার  
স্বক্কে আরও মনোরম করে তুলবে”

সুরাইয়া  
বলেন



“এই বিত্তরু শুভ্র  
সাবানটি আমার গায়ে  
যে সুগন্ধ রেখে যায় তা  
আমি ভালবাসি।” সুরাইয়া  
বলেন। “মনোরম গায়ের রং  
পেতে হোলে আমি বা করি আপনিও  
তাই করুন—লাক্স টয়েলেট সাবান  
মেখে রোজ আপনার স্বক্কে বড় নিন।”



লাক্স  
টয়েলেট সাবান

চিত্র - তারকা দেব  
সৌন্দর্য সাবান

যতো স্নান, ততো বিশুদ্ধ তেমনি সুগন্ধ  
L.S.B. 886-X30 BQ

দায় বর্ণাশ্রমে দ্ব্যধিত হইয়া আছে হেমচন্দ্র তাঁহাদের একজন। তিনি নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা 'বাংলার বিদ্য-প্রচেষ্টা' এবং 'অনাগত দিনের তরে' এই দুইখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র ফরাসীদেশ হইতে বোমা তৈয়ারি শিখিয়া আসিয়াছিলেন একথা অনেকেরই জানা আছে। তিনি পাশ্চাত্যদের বিরোধী ছিলেন এবং অরবিন্দ-বারীন্দ্রের সহিত তাঁহার মতের মিল ছিল না। অথচ হেমচন্দ্র বারীন্দ্রের নেতৃত্বে সংগঠিত বিদ্য-প্রচেষ্টার যোগ দান করার আশ্বাসে পেরিও হইয়াছিলেন। তিনি আশী বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিপরীজীবন ১৯০২-১৯০৬ এই আঠার বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা চলে। লেখক 'অস্ত্র ও ক' হেমচন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়া যে আর একটি ঋণি দরদী মানুষ হেমচন্দ্রের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ব্যক্তি আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্র ক্যান্সেল মেডিক্যাল স্কুলে তিন বৎসর পড়িয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে তিনি ছয় মাস মাত্র চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। আবার এই হেমচন্দ্রই যৌবনে স্বেচ্ছায়ক ও স্ব-স্বস্তর ছিলেন। কিছুকাল তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের চিত্রবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীকালে ফরাসীদেশে চিত্রবিদ্যার অধ্যয়ন করার আরও সুযোগ তাঁহার মিলিয়াছিল। দরজীর কাজে হেমচন্দ্রের পাকা হাত ছিল, কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করিতে পারিতেন, নিজ হাতে ফুলের বাগান করিতেন। স্বদানবিশিষ্ট তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফরাসীদেশে যখন এই বোমা প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষার্থী আর্থিক সম্বল পড়েন তখন পাচক-বস্ত্রের আর দায়া অর্থাভাব দূর করিতে এবং বোমা তৈরি শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এতেন শুধী হেমচন্দ্র পরলোকগত জানেন্দ্রনাথ বসুর সহযোগিতায় ১৯০২ সনে মেদিনীপুর শহরে বিদ্যবী সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। পরে এই দল ও কলিকাতার বিদ্যবীদল একসঙ্গে কার্য করে এবং ১৯০৮ সনের ২রা মে পুলিশ কর্তৃক গুলি হন, তদাধে অনেকে আলিপুরের মামলার শাস্তি প্রাপ্ত হন! আশ্বাসমান হইতে কিরিবার পর (১৯১১) হেমচন্দ্র আর কোন বিদ্যবীদলে ছিলেন না যদিও এই বিদ্যবী নেতা আমরণ বঙ্গেশের ও মানবের হিতের জন্য বিদ্যবাকামী ছিলেন। তিনি মানবতাকে আভিক্যের উপরে স্থান দিতেন এবং নাস্তিক বলিয়া আরম্ভপরিচয় দিতেন। তাঁহার বিদ্যবের আদর্শ ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ—বাহ্য সে যুগে অস্তান্ত বিদ্যবী নায়কেরা অবাতব মনে করিতেন।

হেমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা-পসঙ্গে লেখক তৎকালের বিদ্য-প্রচেষ্টার যে একটি আলোচ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা একাধারে যথার্থ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। লেখকের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর দরুন পুস্তকখানি হৃদযাত্রা হইয়াছে।

বাংলা বর্ষলিপি ১৩৬০—ঈশিনিকুমার আচাৰ্য্য চৌধুরী সম্পাদিত। সংস্কৃতি বৈঠক। ১৭, পতিতিয়া স্টেস, কলিকাতা-২৭। পৃষ্ঠা ৩২২। মূল্য আড়াই টাকা।

ভারতের প্রাকৃতিক পরিচয়, ১৯২১ সনের আদমশুমারী, ভারতের সংবিধান, বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ বিবরণ, কলিকাতা করপোরেশন, শিক্ষা, গ্রন্থাগার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পাক-ভারত বাণিজ্য, পাসপোর্ট, খেলাধুলা, দেশের ও বিদেশের সরকার, রাজনৈতিক দল, কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রকৃতি বহু জাতব্য তথ্য দ্বারা বর্ষলিপিখানি পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাহার ইংরেজী ভাষার অনভিজ্ঞ, এই বর্ষলিপি তাঁহাদের পক্ষে বুঝই উপযোগী সেকথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজী ভাষার অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এই পুস্তকে প্রদত্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করিতে পারেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির পরীক্ষার অকৃতকার্যতার অন্ততম কারণ সাধারণ জ্ঞানের অভাব। উক্ত বর্ষলিপিখানি সঘরে অধ্যয়ন করিলে এই অভাব অনেকটা পূরণ হইবে। বর্তমান দশম সংস্করণে বহু নূতন জাতব্য বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রাশিয়া কি সমাজতন্ত্রী দেশ?—অনুবাদক ঈশবন্দ্যু দাশগুপ্ত। প্রাচী প্রকাশন, ১২, চৌরঙ্গী হোয়ার, কলিকাতা-১। পৃষ্ঠা ৭২। মূল্য চারি আনা।

# সুপ্রা কালি

দামী ফাউন্টেন পেনের জন্য

সুপ্রা কালি আজ এত জনপ্রিয় কেন?

সব বিদেশী দামী কালিকে সে হার মানিয়েছে, সল-এক্সপ্লুজ ও তলানিমুক্ত, ব'লে অব্যাহত তার প্রবাহ, বর্ণের স্থায়ী উজ্জ্বল্য মনে আনে তৃপ্তির নিশ্চিত আশ্বাস। কালির রাসায়নিক গুণে-প্রিয় কলমটি থাকে চিরনূতন।



সুপ্রা কালি এত জনপ্রিয় কেন?—কমিক্যান কোং লিমিটেড

## ব্যাক অফ বাঁকুড়া নিমিটেড

সেন্টাল অফিস—৩৬নং ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা  
আদায়ীকৃত মূলধন—৫০০০০০ লক্ষ টাকার অধিক  
জাঞ্চ :—কলেজ হোয়ার, বাঁকুড়া।

সেভিংস একাউন্টে শতকরা ২১ হারে সুদ দেওয়া হয়।  
১ বৎসরের স্থায়ী আমানতে শতকরা ৩১ হারে হিসাবে এবং  
এক বৎসরের অধিক থাকিলে শতকরা ৪১ হারে  
সুদ দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান—ঈশবন্দ্যু কোলে, এম. সি.



# দিনে দিনে আরও নির্মল, আরও মনোরম স্বক

রেস্নোনার **ক্যাডিল** আপনার জন্যে এই যাদুটি ক'রতে দিন

রেস্নোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে  
বেশ ভাল ক'রে ঘষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন।  
আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার স্বক আরও  
কতো মসৃণ, কতো নির্মল হ'য়ে উঠছে।



## রেস্নোনা ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান

\* স্বপোষক ও কোমলতাপ্রসূ কতকগুলি তৈলের  
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম

এখানি ইংরেজী হইতে অনূদিত। ইটালির রাশিরা সমাজতন্ত্রী দেশ কিনা এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন—“ই” অর্থাৎ ডাক্তার (কম্যুনিষ্ট) এবং “না” মান্ন আউয়ান (কম্যুনিষ্ট বিরোধী)। উত্তর তরফেই যুক্তি দেখানো হইয়াছে এবং পাঠক বাহাতে স্বকীয় মতামত গঠন করিতে পারেন সে বিষয়ে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও পুস্তকখানি কম্যুনিষ্টবিরোধী প্রচারগৃহ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

# বঙ্গভারতী

দৈনিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা ১০ সডাক বার্ষিক ৩/-

কচিবাণ, সংস্কৃতি-সম্পন্ন এবং বিচার-বীল

পাঠকগণের পক্ষে অপরিহার্য।

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাম—ফুলগাছিয়া; পোঃ—মহিষেরখা; জেলা—হাওড়া।

মনের কথা—ঈশ্বরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ১১, কুমার বহু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২ হইতে শ্রীঅপর্ণা ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২০। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্ভোগ্য গ্রন্থ নহে। ঈশ্বর-পরায়ণ, মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞিত চিত্তাশীল লেখক এতে সংসারী মানুষের পক্ষে জ্ঞাতব্য ও পালনীয় কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। কামকোথাপি রিপু মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত চকল করে, সুস্থস্থ আশানিরাশা মনে তোলে আলোড়ন। কিস্তাবে সংসার-তাপে তাপিত মানুষ শান্তিলাভ করতে পারে তা গ্রন্থকার শ্রীমদ্রাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে দ্রষ্টব্য সঙ্কলন করে দেখিয়েছেন। শিশু, কিশোর, যুবা, প্রৌঢ়, প্রকৃ—মানব-জীবনের এই বিভিন্ন অবস্থার মানুষের মনঃপ্রকৃতি ও সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ভাবেই ইঙ্গিত আছে। হাফা লেখার মাঝে দেশের মন ভেঙ্গে গেলে গ্রন্থক ফলবে না। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘সামাজিক প্রবন্ধ’, ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ প্রভৃতি পুস্তকের মত বাঙালীকে আত্মস্বাকারী এ ধরণের বইয়ের সমাদর হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র

ভূখা মিছিল—শ্রীশশীকুমার পাণ্ডা। দেবগ্রাম, নদীয়া।

মূল্য ৮০।

পশ্চিমবঙ্গের চিত্তিক বর্ণনা এবং সরকারী নীতির প্রতিবাদ—প্রচার-ধর্মী কবিতা। ভাষায় জোর আছে, ঠোঁটালি নাহ, চন্দ্র ত্রিহীন।

অভিজ্ঞান :- শ্রীহরবোধরঞ্জন রায়। ইতিহাস, ২১, গোমারচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১১০।

ইতঃপূর্বে ‘ভাষণ’ ও ‘পঞ্চর’ নামে গ্রন্থে বাণীর দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সাহিত্যরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই দুই গ্রন্থের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার সহিত পাঁচটি নূতন কবিতা এই পুস্তকে সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার ঐকবি। নূতনত্বের প্রলোভন অথবা বুদ্ধি-বিলাস তাঁহাকে স্বধর্ম চ্যুত করে নাই। “নতশির মোরা প্রতি দিবসের বেদনা-শোকে, যাপি বিবর্ণ প্রভাত সন্ধ্যাবেলা” এ দুঃখের স্বর তাঁহার কবিতার বাজিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া “সন্ধ্যামালতী ফুটেছে দেহলি পাশে”—তাঁহাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

“ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে তর-বাহ্য প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ—২১০ আন।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১১ বি, গোবিন্দ আজী রোড, কলিকাতা-২৭

কোব—আদিপুর ৪৪২৮

**ডায়াপেপসিন**

পরিপাক ক্ষমতাকে  
দৃঢ়তর  
করে



**ইউনিয়ন ড্রাগ**  
কলিকাতা



# রোজকার ধূলোময়লার

রোগবীজানু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন



লাইফবুয়

যেগার  
আবরণে

কতোই কেন হুঁসিয়ার হোন না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার  
রোগবীজানু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফবুয় সাবান মেখে  
নিভা স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।



L-230-50 BG

লাইফবুয়ের রক্ষাকারী কেনা ধূলোময়লার  
বীজানুকে ধুয়ে সাক্ কোরে দেয় ও সারাদিন  
আপনার শরীরকে স্নিক ও স্বরকরে রাখে।



লাইফবুয় স্নাবান

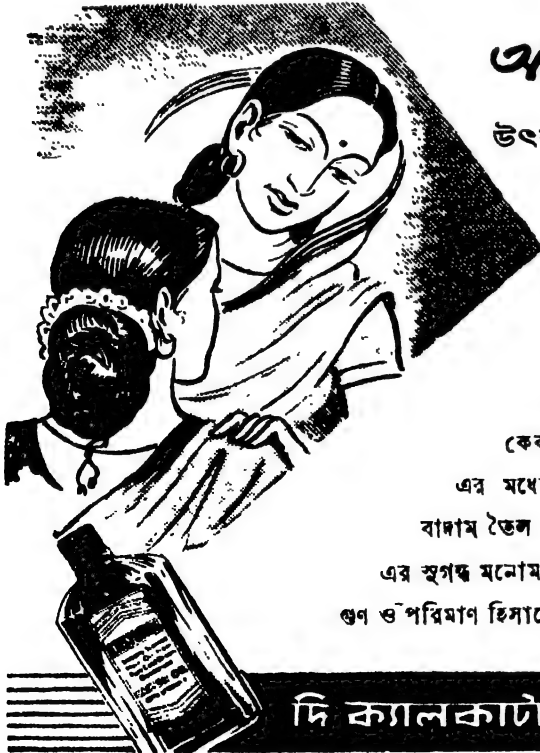
দৈনন্দিনের রোগবীজানু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা

# ফেথার মহাভূজরাজ তৈল

চুল উঠা বন্ধ করে  
মাথা ঠাণ্ডা রাখে



এই মার্কা দেখে কিনুন নকল থেকে সাবধান



## অভিজের উপদেশ

উৎকৃষ্ট কেশটৈল নির্বাচনের সময়  
ক্যালকেমিকোর

## ক্যাষ্টরল

অভিজের বিবেচনায় সবচেয়ে ভাল কেন  
কারণ, এর প্রত্যেকটি উপাদান বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত।  
কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত খাঁটি দামী ক্যাষ্টর অয়েলে তৈরী।  
এর মধ্যে বাজর প্রচলিত ক্যাষ্টর অয়েলের স্ফায় রংকরা পাতলা  
বাদাম তৈল মেশানো নেই।  
এর সুগন্ধ মনোমদ ও অল্পপম। ব্যবহারে চুল বাড়ে, টাকপড়া বন্ধ হয়।  
গুণ ও পরিমাণ হিসাবে দাম সস্তা।

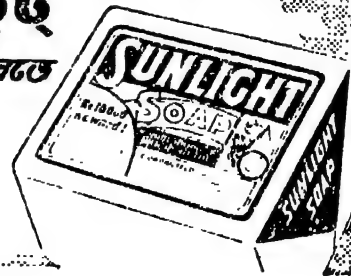
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং.লি. কলিকাতা

ধপধপে  
ক'রে কাচা

ঝকঝকে  
ক'রে কাচা

আন্লাইট  
আবানের মৌলভে

না আছড়ে কাচলেও  
কাপড়চোপড় সাদা ও  
ঝকঝকে ক'রে দায়!



**যুক্তি ও বিশ্বাস—** জীবপদ্ধতক বিধান। ৩৩১বি, গরঢ়া  
রোড, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০।

লেখক চিহ্নশীল। 'যুক্তিহীন মানব কিংবা সাধনহীন অন্ধবিশ্বাস কোন  
কালেই মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে না' ইহাই তাঁহার প্রতি-  
পাঠ। সরস পাণ্ডুল ভাষায় তিনি ইহার বক্তব্য বিষয় গুজাইয়া চলিয়াছেন।

**নির্বাস্ত সঙ্গীত—** পৌষ্পলনীহার ভারতী। ৩১এম্, ভিদায়  
মুদ্রা বেন, কলিকাতা-১৩। মূল্য বার আনা।

কবিতাভিনব সরল গোপচাঁদ্য তাঁর নির্বাস্তের মত পড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু  
ছাপার ভুল দৃষ্টিকে এড়াইয়া দিয়াছে।

**স্মৃতিতত্ত্ব—** জ্ঞানান্ধিনাথ সেন। জ্ঞানপ্রকাশ লাইব্রেরী। ৫, বঙ্কিম  
চৌধুরী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আট আনা।

বিজ্ঞানের কথা সহজ করিয়া বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন আজ অপরিহার্য।  
নিজ গ্রন্থকার এ কাজে তাঁর দিয়াছেন উহা অসম্ভব সুপের বিষয়। জ্ঞান  
করি তাঁহার দান পাঠক-সমাজে সাদরে গৃহীত হইবে।

**মেসমেরিজম বা সম্ভোহন বিজ্ঞান শিক্ষা—** প্রফেসর  
জে চৌধুরী, এম্-এ। প্রকাশক—শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ভট্ট, ১৩৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

গ্রন্থকার সম্ভোহনবিজ্ঞানের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করেন।  
আলোচ্য পুস্তকে তিনি সম্ভোহনের দৃষ্টান্ত সহ এই বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে চেষ্টা  
করিয়াছেন।

### শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

**রক্তস্রবময় চোর—** জ্ঞানপ্রকাশ দপ্তর। প্রকাশক—শ্রী প্রিয়নাথ  
দাস, ৯, পঞ্চানন গোল্ডেন বেন, কলিকাতা-১২। মূল্য—২।০০।

রক্তস্রবময়। জীবন্তগ্রন্থকে শিক্ষা দিয়া শাস্ত্রীদের হারা করে হুঁসখি  
কাজ করানো যায়—এক সচক্ৰে দক্ষ ও তাহার পরিচয় দিয়াছে একটি  
বালককে অপহরণ করাইয়া। নানা ঘটনার সমাবেশে গল্প বেশ জমিয়া উঠি-  
য়াছে। সমালোচ্য পুস্তকখানি এক শৈশবের পাঠকের আনন্দবিধান করিতে  
সক্ষম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

**নূতন পৃথিবী—** জ্ঞানপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স,  
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—১।০০।

উপস্থান। সমুদ্রের খণ্ডে "কলনা" নামে একখানি জাহাজ বহুযাত্রী সহ

চতুর্দিকে পর্যটনভিত্তিক এমন এক স্থানে গিয়া আটক পড়িল যাহার সহিত  
পৃথিবীর সভ্য সমাজের কোন যোগাযোগ নাই। তারপর নানা ঘটনা-  
সংঘাতের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিল এক নূতন উপনিবেশ। মাগবের চেষ্টা  
ও ঐকান্তিকতা থাকিলে জীবনধারণের সকল প্রকার ব্যবস্থাই যে তাহার  
করিতে পারে গল্পের জলে লেখক একথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।  
লেখকের এই প্রয়াস বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে।

**ঝড়—** তলিয়া এরেনগুর্গ। অনুবাদক—শ্রী অশোক গুহ।  
ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৫, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩।০০।

পৃথিবীপাঠ্য প্রাচীন-পুরাণের পাণ্ডু "ধর্ম" উপন্যাসের বহুভাষ্যাদ।  
সমালোচ্য পুস্তকখানি উক্ত পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড। প্রথম দুই খণ্ডের দ্বারা এই  
খণ্ডটিও একখানি গয়সম্পূর্ণ উপস্থাপন। হাজার পরিচিতি নিম্প্রয়োজন।  
যাহারা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠে আগ্রহশীল, পুস্তকখানি ইহাদের নিম্নোক্ত  
আনন্দবিধান করিবে। অল্পমূল্য এবং সাবলীল অনুবাদের জন্যে পুস্তকখানি  
স্বপ্নপাঠ্য হইয়াছে।

### শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

**বেদস্মৃতি** শ্রীবিহারীলাল সরকার সম্পাদিত। প্রথম ভাগে সাহিত্য  
মন্দির ১৩৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। প্রমাণ ১০ + ১১। মূল্য  
আট আনা।

ঈদন্তাধবতে দশম দ্বন্দ্বের সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি মহারাজ পরাক্রম-  
নিষ্ঠাৎ বঙ্গচিহ্নবিহীন গ্রন্থ করায় শ্রদ্ধাভব সম্ভোহনবিজ্ঞানের দ্বারা সংগ্রহরূপ  
জ্ঞানারাম-নারদ সংবাদ প্রকাশিত। বেদের দ্বারা উপনিষদ। সেখ  
উপনিষদের দ্বারা কথা শ্রদ্ধাভব নারায়ণ-নারদ সংবাদ-পত্রের এই পুস্তকে  
এক হওয়ায় উহা গৃহীত ও তাঁর উভয় শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই বিশেষ  
উপযোগী হইয়াছে। শ্রীবিহারীলালের উদ্যোগে মূল্যদিক "নিষ্ঠাৎ বঙ্গ  
কল্পে শ্রীপ্রতিপাদ্য" এই দুইটি বিভাগের ভাষ্যাদি বিবেচন করিয়াছেন।

**শ্রীশ্রীদীপেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ—** জ্ঞানপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক  
১২১২, কালিদাস পতিভূষণ বেন, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।  
প্রমাণ ১০ + ১১।

আলোচ্য পুস্তিকায় কবিগণের কালিদাস রায় হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহী-  
ত পুস্তিকার শেষের গুণমুদ্র বহু ব্যক্তির লিখিত নৃপেন্দ্র-স্মৃতি এবং পশ্চি  
পরিবেশিত হইয়াছে।

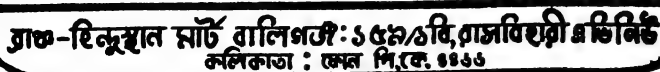
### শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী



**অমৃততাঞ্জন**  
সর্বপ্রকার বেদনায় 'আণবিক বোম্বার' ন্যায় কার্যকরী।

**দাঁদের মলম**  
চর্ম রোগে 'পরমানু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী।  
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭





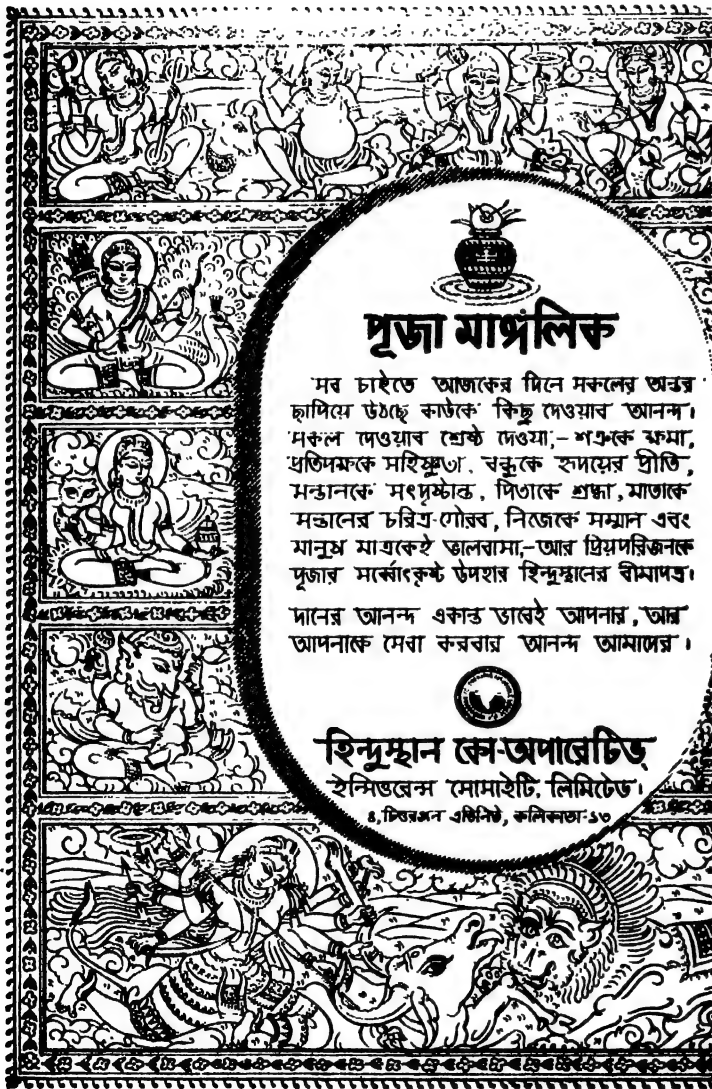
## ‘সঙ্গীতকলাকেন্দ্র’র নৃত্যগীতানুষ্ঠান

গত ৪শে অক্টোবর ৮ নং ভগ্নমাথ শ্রব সেনে সঙ্গীতকলাকেন্দ্র নামক নৃত্যকলা ও সঙ্গীত শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীরতন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ‘গুণাসুন্দর’র সহকারী বার্তা-সম্পাদক শ্রীযুক্তেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়ের দ্বৈপথ্য পরিচালনায় উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীমলিনীকুমার ভট্ট ভারতীয় নৃত্যের গোড়ার কথা, উদয়শঙ্করের নৃত্য-প্রতিভা, সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের ভগ্নমাথ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তারপর সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী,

পাশ্চাত্য উদয়শঙ্করের নৃত্যসঙ্গিনী শ্রীমতী প্রীতি চক্রবর্তী এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলেন। সভাপতি মহাশয়ের সারগর্ভ ভাষণের পর সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের ছোট বালিকাদের নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মঞ্জু নাহার (বয়স ৮) এবং অকণা (৯) রবীন্দ্রনাথের ‘শাওন গগনে’ গানটিকে নৃত্যরূপে চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তোলে। চন্দ্ৰা সাগা কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের ‘হৃদয় মঞ্জিল’ গানটির একক-নৃত্য-রূপায়ণ সকলকে মুগ্ধ করে এবং তাকে একটি কাপ পুরস্কার দেওয়া হয়। “শাহজাহান মমতাজ”, “অসিন্তা”, “রাসলীলা” যুবাই উপভোগ্য হইয়াছিল। সবগুলি নৃত্যেরই পরিকল্পনা এবং কম্পোজিশন শ্রীপ্রীতি চক্রবর্তীর। এই

নৃত্যানুষ্ঠানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার আবহ-সঙ্গীতে কেবলমাত্র মহিলারাই অংশ গ্ৰহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাংশে ছিলেন ঐশ্বর্য, স্মৃতি, হৈমন্তী গুপ্তা। কমলা দাশগুপ্তার সেতার, মোহ চক্রবর্তীর বাঁশী ও শবলাবানন আভি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। নৃত্যের শেষে শ্রীমঞ্জীবচন্দ্র দাস কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ প্রদানের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

সঙ্গীতকলাকেন্দ্র উত্তর কলিকাতার ছোট বালিকাদের গীত, বাদ্য ও নৃত্য শিক্ষাদানের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। লণ্ডন ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রীতি চক্রবর্তীর একক চেষ্টায় ও নিজের অর্থে মাত্র চার জন ছাত্রী লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ ইহার ছাত্রীসংখ্যা ষাট জন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাচাইয়া রাখিতে হইলে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। তাএ, নবকুমার বাহা লেন। শ্রামপুত্র, কলিকাতা — ৪ এই ঠিকানায় সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের সম্পাদিকা প্রীতি চক্রবর্তীর নিকট অর্থসাহায্য প্রেরণ করিলে এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আমরা এই বকম প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের উন্নতি কামনা করি।



**পূজা মাঙ্গলিক**

সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাড়িয়ে উঠছে কার্টেক কিছু দেওয়াব আনন্দ। সকল দেওয়াব শ্রেক দেওয়া-শ্রেক ফমা, প্রতিদমকে মহিমুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, মন্তানকে সংদর্শক, দিগকে শ্রদ্ধা, মাতাকে মন্তানের চরিত্র গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাথকেই ভালবাসা-আর প্রিয়দর্শিনকে দুজার মার্কাংকুর উদহার হিন্দুমানের বিমাদত।

দানের আনন্দ একাত ডাবেই আদান, আর আদানকে মেবা করবার আনন্দ আমাদের।

**হিন্দুমান কেন-অদালত**

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।

৪, চিত্ররঙ্গন এলিন্ট, কলিকাতা-১৩

# = বি জু প্তি =

আমরা অতীৰ সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সৰ্বত্র ৫১০ সাড়ে বারো আনা সের দরে চিনি যাহাতে পাওয়া যায় সেজন্য স্থানে স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের সুব্যবস্থা হইতেছে। চিনি সরবরাহে কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিলে তৎপ্রতিকারার্থে যে কোনরূপ পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হইবে।

## সুগার ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

২নং দয়হাটা স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

টেলি : ঠিকানা—“চিনিবিজ্রি”

ফোন : ৩৩-১০১৯





পূর্ববী সিনেমা হলে রাজপালের সঙ্গে মাণিকতলা রেশনিং আপিসের কক্ষচারিগণ

### সরকারী কর্মচারীরূপে প্রশংসনীয় কার্য

গত মাসে মাণিকতলা সাব-এরিয়া রেশনিং আপিসের কক্ষচারী-বৃন্দের সহযোগিতায় এবং সরকারী রেশনিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে “পূর্ববী” প্রেক্ষাগৃহে যাদবপুর বন্ধা হাসপাতালের সাহায্যার্থে একটি বিচিহ্নাভুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অভুষ্ঠানে রাজপাল মাননীয় লিহরেন্দ্রকুমার যুগোপাধ্যায়, মহা লিপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, উপমহা লিহরেন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচারসচিব জিগোপিকাবিলাস সেন, প্রাক্তন সেরিফ লি. জে. কে. মিত্র, মেজর খিও এইচ. খর্ষ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রেশনিং অফিসার এম. কে. ঝাউবো সকলকে স্বাগত করেন। অভুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনার অভিনবদে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রতিটি টিকিটের সহিত একটি করিয়া স্বল্পা মোড়ক ক্রেতাকে দিয়া কীতার সাম্প্রতিক পান্ডববাদ্য হইতে দুই ছটাক চাল উক্ত মোড়কে করিয়া আনিতে অনুবোধ করা হইয়াছিল। এই অনুবোধ সকলেই সানন্দে বক্ষা

করেন। চাউল সমেত মোড়কগুলি প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশপথে সংগৃহীত হয়। এই অভিনব ব্যবস্থায় অভুষ্ঠান-পরিচালকগণ প্রায় দুই মণ চাউল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। একটি জনস্বার্থী ভাবনের পর জিহ্নপূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (গাদ্যবিভাগীয় উপমহা পতী) কয়েকটি মোড়ক রাজপালের হাতে অর্পণ করেন। ইহা বাতীত ১৩৪৪/১৫ (টিকিট বিক্রয়ের বাবতীয় অর্থ) বন্ধা হাসপাতালের সাহায্যার্থে দেওয়া হয়। অতঃপর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বন্ধা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি. কে. সেন ঐ রোগ সম্বন্ধে একটি শিক্ষাপ্রদ ভাষণ দেন। রাজপাল কীতার সায়গড় ভাষণে বলেন—সরকারের পক্ষে জনগণের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া দরকার, নতুবা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হয় না। পাদ্যমন্ত্রী এই অভিনব উপায়ে চাউল সংগ্রহের ক্ষমতা উজ্জ্বলভাঙ্গকে যত্ববান দেন।

মুখ্যতঃ মাণিকতলা আপিসের এসিষ্টাণ্ট রেশনিং অফিসার লিহরেন্দ্র মিত্রের চেষ্টায় অভুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।



রাহমানন্দ চট্টোপাধ্যায়  
প্রতিষ্ঠা

প্রমা

দ্বিতীয় ভাগ ১৯৬০



মীরাসো

# **PRABASI PRESS**

**is equipped with Modern Machinery, Lino and a  
wide variety of types**

**Can print BENGALI, SANSKRIT, ENGLISH, HINDI  
Books and Job Works.**

**PRABASI—the Bengali Monthly Magazine,  
MODERN REVIEW—the English Monthly Magazine**

**&**

**VISHAL BHARAT—the Hindi Monthly Magazine  
are printed here.**



**ARTISTIC COLOUR PRINTING  
A SPECIALITY**



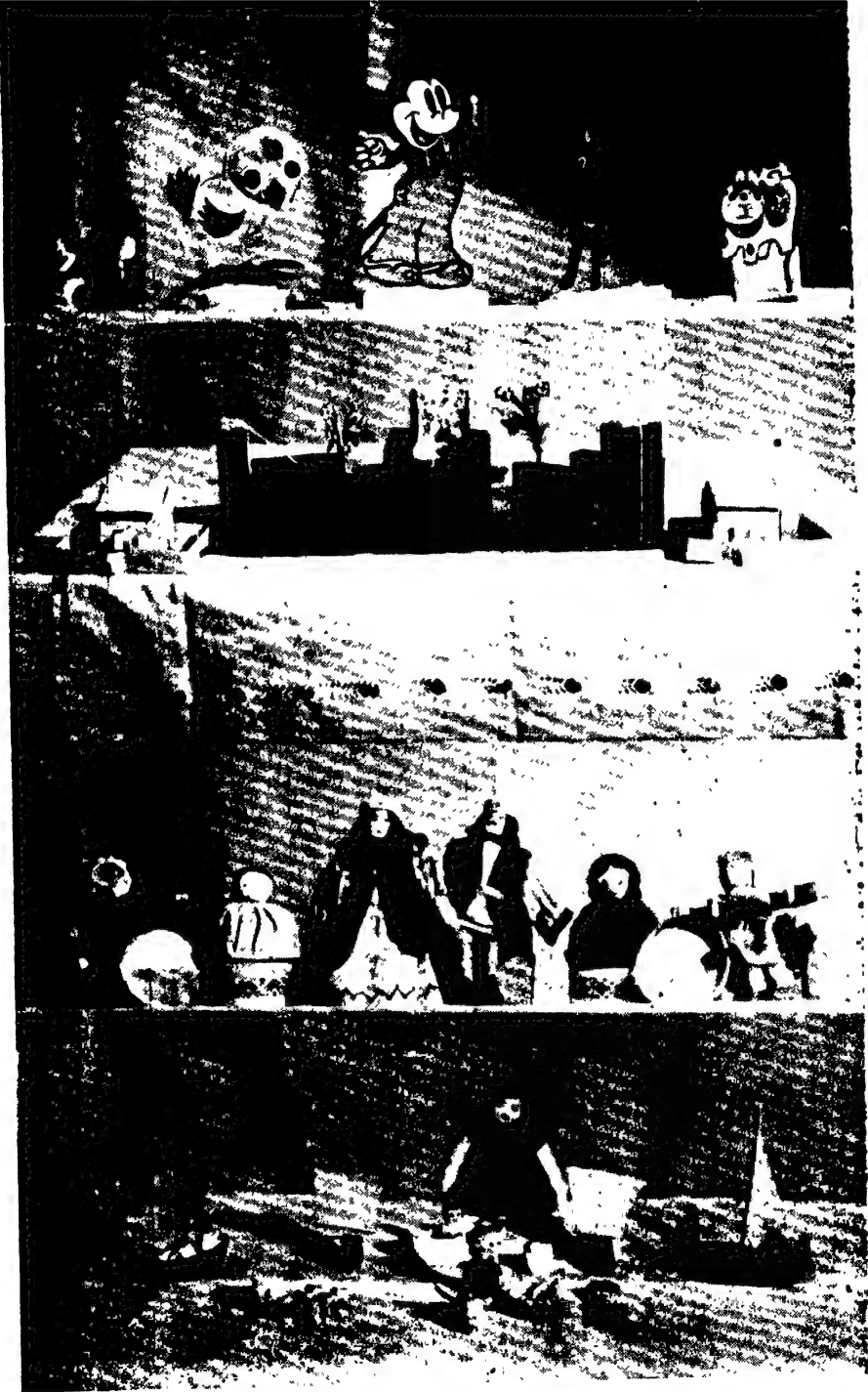
**120-2, Upper Circular Road, Calcutta-9**

**Phone : B. B. 3281**

**THE PRABASI OFFICE & PRESS**

25. 10. 1941 1941. 10. 1941





উপর হইতে নীচে—(১) পিচবোর্ডের কল-জানোয়ার (২) সিগারেটের বাক্স হইতে তৈরি  
পুতুলের ড্রয়িং-ক্রম সেট ও সিগারেটের কাগজের তৈরি পুতুলের বাড়ী (৩) তামাকের টিন  
হইতে প্রস্তুত স্ট্র'চ সূতা রাখার কোটা ও ঐ টিনের ঢাকনায় তৈরি টে (৪) নানা প্রকার পুতুল

# প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নারায়ণ! বলহীনেন লভ্যঃ”

১৩শ ভাগ  
২য় পত্র

অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

২য় সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও পুলিশ

বিগত জুলাই মাসে কলিকাতার যে সংবাদপত্রের পালা অল্পকাল হইয়াছে তাহার মধ্যে এক বিশেষ শোচনীয় ব্যাপার ঘটে ২২শে জুলাই। সেদিনকার সাংবাদিক নিষ্ঠুরের কথা প্রত্যেক সংবাদপত্রেই বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতের সকল প্রান্তেই তাহার উপর মন্তব্য ও আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুৎপত্তি প্রয়োজন নাই।

ঐ ঘটনার পর সাংবাদিকমণ্ডলীতে স্বভাবতঃই বিশেষ আলোচন হই এবং তাহার ফলে কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের দাবি করা হয়। সেই দাবির ফলে কমিশন বসে এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জীবন্ত মুখার্জি কমিশন পরিচালনা করিয়া বিগত ২রা নবেম্বর তাহার রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়াছেন। ঐ রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি আমরা পরে দিতেছি। কিন্তু প্রথমে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কেননা ঐ রিপোর্ট সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবী উভয়ের পক্ষেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিচারপতি মুখার্জি তাহার রিপোর্ট আইনের প্রাক্কারে মতামত দিয়াছেন। ইহা স্মরণীয় এবং যখন সাংবাদিকগণই আইন-সম্মত তদন্ত চাহিয়াছিলেন তখন আমাদের কিছু বলিবার নাই। বিচারপতি মহাশয়ের সম্মুখে যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় এবং ব্যবহার্য্যবীর সওয়ালজবাবে তাহার যে অবস্থা হয় তিনি তাহারই ভিত্তিতে স্মরণীয় নিন্দিত করিয়াছেন ইহাও সত্য। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকের অধিকারের বিষয়ে ঐ পরিপ্রেক্ষিতে বাহা বলিয়াছেন তাহাও অগ্রাহ্য করা চলে না, কেননা দারিদ্র্য ভিন্ন স্বাধীনতা বা কোনও অধিকার বর্জ্য নহে। তাহার এই উক্তি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তিনি বলিয়াছেন, “সাংবাদিকের স্বাধীনতা অর্থ যে কোনও দেশবাসীর সমান এবং উহা সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা অপেক্ষা বেশীও নহে কমও নহে।” ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, এবং যদি কোনও সাংবাদিক এ বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করেন তবে তাহা তাহারই অশান্তির কারণ হইবে ইহাও ঠিক।

কিন্তু ইহা কি প্রমাণিত হয় নাই যে, বহুসংখ্যক সাংবাদিক

পুলিস কর্তৃক প্রহৃত হইয়াছিলেন? এবং এই প্রহার নিরোধ করিবার চেষ্টা উপস্থিত পুলিশ অফিসার কেহ করিয়াছিলেন এক্ষণ কোনও প্রমাণ কি উপস্থিত হয়? উল্লেখ্য যে সেনকে লগায় যে বা বাহারা করিয়াছিল তাহারা ভিন্ন কেহই কি প্রহৃত হয় নাই?

পুলিস কর্তার নিরমাত্তবর্তী ও শিক্ষিত বক্ষত প্রতিষ্ঠান। বিদেশে যদি কেহ আইনভঙ্গ করে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বলপ্রয়োগ নিতান্তই প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রেও পুলিশ বতটা প্রয়োজন ততোধিক বলপ্রয়োগে অধিকারী নহে এইরূপ আমরা অনিয়াছি। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ কি স্বাভাবিক এবং discipline এর মর্যাদা অমুখ্য হইয়াছিল?

এদেশের সাংবাদিক জগতে খেচ্ছাচার বাড়িয়া চলিয়াছে সন্দেহ নাই। সে বিষয়েও সাংবাদিক দেশবাসীর এক অংশ অপেক্ষা অধিকও নহে কমও নহে। কিন্তু পুলিশও তা সাধারণ জনসমষ্টি নহে। তাহাদের ব্যবহার সমীচীন হইয়াছিল কি?

সংবাদপত্র-জগতে “সারকুলেশন” দেবতায় পূজার দরিদ্র সাংবাদিক-গোষ্ঠীর কয়েকজন নিগৃহীত হইলেন ইহাই শুধু চুঃখের কথা নহে। এইরূপ একটি লজ্জাকর ব্যাপার যে আদৌ ঘটিল তাহাও চুঃখের কথা।

### সাংবাদিক নিগ্রহ তদন্ত রিপোর্ট

কলিকাতার বিগত ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় সাংবাদিকদের কার্য্যে বাধাদান ও ২২শে জুলাই ময়দানে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও প্রহারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি জি. বি. মুখার্জি এই তদন্ত কমিশন পরিচালনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ২রা নবেম্বর তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। নিম্নে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রদত্ত হইল :—

১৯৫০ সালের ১লা আগষ্ট কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংস্করণে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৫২ সালের তদন্ত কমিশন আইন অমুখ্যায়ী আমাকে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়। তদন্তের বিচার্য্য বিষয়গুলি ছিল—

(১) ট্রামভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে সাম্প্রতিক আন্দোলনকালে

কার্যরত বার্তাবাহীসহকারী বাধ্যদান ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত।

(২) নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত :

(ক) ১৯৫০ সালের ২২শে জুলাই অপরাহ্নে কলিকাতা মহানগরে সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও কটোগ্রাফারদের উপর পুলিশের প্রহার ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ।

(খ) কোন অবস্থার মধ্যে প্রহার ও গ্রেপ্তার হইয়াছে।

(গ) কে বা কতারা প্রহার ও গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং

(ঘ) ১৯৫০ সালের ২২শে জুলাই অপরাহ্নে সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও কটোগ্রাফারদের উপর প্রহারের কালে অস্ত্র ঘটনা বা ঘটনাসমূহ।

সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও কটোগ্রাফারগণকে এবং অস্ত্রাস্ত্র ব্যক্তিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে মৌখিক ও নথিভুক্ত তথ্যাদিসহ তাঁহাদের বক্তব্যসম্বলিত বিবৃতি কমিশনের নিকট পেশ করিতে বলা হইয়াছিল। পুলিশের পক্ষের সাক্ষীদিগকে কমিশন, সংবাদপত্র ও কমিশনের নিকট উপস্থিত অস্ত্রাস্ত্র ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে জেরা করা হয়।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ, প্রেস ক্লাব, প্রেস কটোগ্রাফার এসোসিয়েশন এবং সংবাদপত্র উপদেষ্টা কমিটির পক্ষ হইতে কমিশনে একটি যুক্ত বিবৃতি পেশ করা হয়। লোকসভার সদস্য শ্রীসত্যপ্রিয় ঝানার্জি কমিশনের নিকট একটি বিবৃতি দাখিল করেন; কিন্তু তিনি উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। তাঁহার পক্ষে তাঁহার এডভোকেট উগাতে স্বাক্ষর করেন। তবে শ্রীঝানার্জি শেখ পর্যন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেন নাই, যদিও কমিশনের স্তানার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন, “একথা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহার (শ্রীঝানার্জি) পক্ষে তাঁহার এডভোকেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে তিনি যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন সেগুলি প্রমাণ করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। অতএব আমি এই মত দিতেছি যে, পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।”

বিচার্য বিষয়ে প্রথম দফা সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

কলিকাতার বহুসংখ্যক সংবাদপত্রের মধ্যে কোনটিরই স্বত্বাধিকারী, মালিক বা সম্পাদক (হিন্দুস্থান ট্যাগোর্ডের অস্থায়ী সম্পাদক ব্যতীত) পুলিশ কর্তৃক সাংবাদিকদের নিকট সংবাদের সূত্র বন্ধ করিয়া দিবার অভিযোগ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে আসেন নাই, যদিও আমি দেখিতেছি, কমিশনের নিকট সাক্ষীদের যে তালিকা পেশ করা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের প্রত্যেক সম্পাদকের নামই সাক্ষীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছিল। অমৃতভাজার পত্রিকা, দোকসেবক, দৈনিক বসুমতী বা স্বাধীনতার এক জন রিপোর্টারও তাঁহাদের সাক্ষ্যে সংবাদ-সরববাহের কোন সূত্র বন্ধ হইয়া বাওরার অভিযোগ করেন নাই। আমার মনে হয় এই সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত অনিবার্য। প্রথমতঃ, পুলিশ কোনভাবে

সংবাদপত্রের নিকট কোন সংবাদের সূত্র বন্ধ করিয়াছিল, এইরূপ কোন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, কায়ার ত্রিগেড বা এম্বুলেন্স ঘটনা সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা প্রমাণ করার মত কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। কায়ার ত্রিগেড বা এম্বুলেন্স পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা সাংবাদিকদের প্রার্থিত সংবাদ দিবার ব্যাপারে পুলিশ কোনভাবে কায়ার ত্রিগেড বা এম্বুলেন্সের কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এইরূপ কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়তঃ, হাসপাতালগুলির প্রসঙ্গে হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ যে কলিকাতা পুলিশের অধীনে কাজ করেন বা তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এইরূপ কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। কলিকাতা পুলিশ কর্তৃক কলিকাতা পুলিশের পক্ষ হইতে কোন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সাংবাদিকদিগকে সংবাদ দিতে নিষেধ করিয়া লিখিত বা মৌখিক কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই অর্থে কড়াকড়ি করিয়াছিলেন যে, সাংবাদিকদিগকে হতাহত সংক্রান্ত সংবাদ সবকারের নিকট হইতে লইতে বলা হইয়াছিল। এই কড়াকড়ির কারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অভিযোগ পাইয়াছিলেন যে, সাংবাদিকগণ বোগীদিগকে বিবক্ষিত করিতেছেন ও তাঁহাদের চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। বোগীদের স্বার্থেই ইহা করা হইয়াছিল, এবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। চতুর্থতঃ, ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই যে, সাংবাদিকদিগকে কিভাবে সংবাদ দেওয়া হইবে সে সম্পর্কে পুলিশ কমিশনারের আদেশ ছিল। ১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৮, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ও ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫২ তারিখে কলিকাতা পুলিশ গেজেটের বিজ্ঞপ্তিতে এই আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে।

সাক্ষ্য হইতে আমি দেখিতে পাইতেছি, এ ক্ষেত্রে বরাবরই নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। সাক্ষ্য হইতে আমি আরও দেখিতে পাইতেছি যে, সাংবাদিকদের রাইটাস বিল্ডিংস, প্রচার-বিভাগের ডিরেক্টর এবং মন্ত্রীদের নিকট অবশ্যে বাইবার পূর্ণ সুযোগ ছিল।

এই সকল আদেশ বেভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সনে এই আদেশ দেওয়া হয়। অতএব একথা বলা যায় না যে, ১৯৫০ সনের জুলাই মাসে কলিকাতার গোলযোগের দরুন সাংবাদিকদের উপর নিয়ন্ত্রণাদেশরূপে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই সকল আদেশের পশ্চাতে যুক্তিসূক্ত ও জাযা নীতি রহিয়াছে। ব্যাপক গোলযোগের সময় যদি যে-কোন ব্যক্তি, যে-কোন স্থানীয় থানা, বাস্তব যে-কোন স্থান হইতে টুকরা টুকরা অসংলগ্ন সংবাদ সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত বাচাই ও পরীক্ষার অভাবে এই সকল সংবাদ প্রকাশের কলে সম্পূর্ণ বিকৃত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল বিবরণ প্রচারিত হইতে পারে। জনসাধারণ যখন উত্তেজিত হইয়া থাকে, তাবাবণ



বখন সত্যেই জাপাইয়া তোলা যায় তখন ইহা ধুবই বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব মনে হইতেছে যে, এই সকল আদেশের অন্তর্নিহিত নীতি হইল, সংবাদপত্রে পূর্ণ ও বাচাই করা সংবাদ দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকিবে প্রয়োজন। এইরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুলিশ বা সরকারী ভাষাই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া যে কথা বলা হইয়াছে তাহার কোন যৌক্তিকতা নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ যদি রাজ্যের একজন সাধারণ পুলিশের লোকও সাংবাদিককে সংবাদ দেয় তাহা হইলে সে কেবল তাহার নিজের বা পুলিশের ভাষারূপেই সেই সংবাদ দিতে পারে এবং এই পদ্ধতিতে সর্বদাই এই বিশদ রহিয়াছে যে, সে নিজে বাচাই করিয়াছে বা দেখিয়াছে এমন সংবাদ না দিয়া কেবল তাহার শোনা সংবাদই দিতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্গ দিক হইতে সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সকল আদেশ পালন না করিয়া বরং অমান্যই করা হইয়াছে। আমি যেভাবে সাক্ষ্য বিজ্ঞেয় করিয়াছি তাহাতে এই সমালোচনার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। বত দিন না আদেশগুলি প্রত্যাহত হইতেছে তত দিন পর্য্যন্ত সাংবাদিকগণ বা পুলিশ কেহই এই সকল আদেশ অমান্য করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে, একথা বলা চলে না। অতএব আমি এই মত দিতেছি যে, সংবাদপত্রের নিকট কোন সংবাদের সূত্র বন্ধ করিয়া পুলিশ বার্তাজীবীদের কার্যে বাধা দানা ব হস্তক্ষেপ করে নাই এবং এই মর্মে পুলিশের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসমূহ যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা প্রমাণ করা যায় না, উহা ভিত্তিহীন ও ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রথম দফা বিচার্য বিষয়ের অধীনে আর একটি বিষয় হইল, বার্তাজীবীদের কার্যে বাধাদান ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ সম্পর্কিত। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের বক্তব্য এই যে, পুলিশ সাত জন বার্তাজীবীর কার্যে বাধাদান ও হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

“সাক্ষ্যদৃষ্ট ও উপরোক্ত কারণে বিচার্য বিষয়ের প্রথম দফার অর্থে এই সকল সাক্ষী ও ঘটনার সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃক বার্তাজীবীদের কাজে বাধাদান বা হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।”

বিচার্য বিষয়ের দ্বিতীয় দফার সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

“সাক্ষ্যদৃষ্ট এবং উপরোক্ত কারণে ও ট্র্যাণ্ডিং কাউন্সিলের সওয়াল ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে আমি রিপোর্ট দিতেছি যে, বিচার্য বিষয়ের ২ (ক), ২ (খ), ও ২ (গ) দফা অনুসারে গত ২২শে জুলাই অপরাহ্নে কলিকাতা ময়দানে সংবাদপত্রের কয়েকজন রিপোর্টার ও কটোগ্রাফারকে বিশেষ করিয়া বাহাদুর সাক্ষ্য আমি মানিয়া লইয়াছি তাহাদের প্রহার ও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আমি এই রিপোর্টও দিতেছি যে, কেবলমাত্র সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশের লোকই এই সকল গ্রেপ্তার ও প্রহার করিয়াছিল। ভাষাঙ্গিক সনাক্ত করা যায় নাই।

কলিকাতার পুলিশের কোন অফিসার এই ধরনের প্রহার বা গ্রেপ্তারে অংশ গ্রহণ করেন নাই। পুলিশ কমিশনার, হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার অথবা অন্য কোন ডেপুটি কমিশনার কিংবা কোন ইনস্পেক্টর অথবা সাব-ইনস্পেক্টর প্রেস রিপোর্টার অথবা প্রেস কটোগ্রাফারদের প্রহার কিংবা গ্রেপ্তারে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিংবা তাহাদের উপস্থিতিতে, উদ্ভাবিত অথবা নির্দেশে এইরূপ করা হইয়াছে, এমন কোন সাক্ষ্য আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমি ইহাও দেখিতে পাইতেছি এবং রিপোর্ট করিতেছি যে, কর্তব্যবাহত পুলিশের লোকদের প্রেস রিপোর্টাররা বাধা দিয়াছিলেন এবং রিপোর্টারদের দলের কয়েকজন সুনীল সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তারের সময় ইনস্পেক্টর নুপেন সেনকে বাধা দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন। আমার মতে ইহাই রিপোর্টার ও কটোগ্রাফারদের প্রহার এবং গ্রেপ্তারের অব্যবহিত কারণ ও প্রধান পরিস্থিতি। ইহাও সত্য যে, যেখানে ঘটনাটি অস্বীকৃত হইয়াছিল সেখানে পুলিশ অপেক্ষা খবরের কাগজের লোকই বেশী ছিল। প্রকৃতপক্ষে খবরের কাগজের লোকদের সংখ্যা পুলিশ অপেক্ষা অনেক বেশীই ছিল। এ বিষয়ে আইন সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব। আইনসম্মত হউক বা নাই হউক, ইনস্পেক্টর সেন সুনীল সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করার সময় রিপোর্টারদেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন এবং প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। এরূপ করার সময় তাঁহারা নিজেদের সাংবাদিক দাবি পালনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না। ময়দানের ঘটনার পরের দিন ২৩শে জুলাই সুনীলের নিজের কাগজেই ৪র্থ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ কলামে বাহা লেখা হইয়াছে তাহা এইরূপ দাঁড়ায় : “এই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সমস্ত খবরের কাগজের লোকেরা সমবেত প্রতিবাদ জানায় এবং বলে, ‘সুনীলকে যদি পুলিশ গ্রেপ্তার করে তবে পুলিশকে সমস্ত খবরের কাগজের লোককে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।’ ‘স্বাধীনতা’ অন্ততঃ সরকার-সমর্থক পত্রিকা হিসাবে পরিচিত নয় এবং উহার রিপোর্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া না গ্রহণ করিলেও দেখা যায় সাংবাদিকেরা নিজেদের গ্রেপ্তার চাহিয়া এমন চূড়ান্ত বেআইনী কাজ করিয়াছেন বাহাদুর ইতিপূর্বে কোন নজীর নাই। স্তব্ধতা পুলিশ কখনও সাংবাদিকদের প্রহার বা গ্রেপ্তার করিয়াছে ইতিহাসে এমন উল্লেখ নাই, এই বৃত্তিকে মিলাইয়া দেগিতে হইবে—প্রেস রিপোর্টারদেরাও কখনও পুলিশকে মারিয়াছে অথবা বাধা দিয়াছে এমন উল্লেখ ইতিহাসে নাই। সাক্ষ্য দেখা বাইতেছে, ‘কোন কোন প্রেস কটোগ্রাফারকে জনতার সহিত মিশিয়া না বাইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।’ বিচারপতি তাহার রায়ে আরও বলিয়াছেন যে, সাংবাদিক পক্ষের বক্তব্যে প্রধানতঃ বলা হইয়াছে যে, জুলাই মাসে সংবাদপত্রে পুলিশের তীব্র সমালোচনা হওয়ায় পুলিশ সাংবাদিকদের আক্রমণ করিবার জন্য পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা করিয়াছিল। কমিশনের সম্মুখে যে সমস্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে তাহাতে পূর্বকল্পিত এবং ইচ্ছাকৃত আক্রমণের অভিযোগ নাকচ

হইয়া যায়। প্রথমতঃ, সাংবাদিকদের সাক্ষ্যও বলা হইয়াছে যে, নিষিদ্ধ সভা ভাঙিয়া বাওয়া এবং সভাকারীদের গ্রেপ্তারের পূর্বে সাংবাদিকদের প্রহার করা হয় নাই। যদি আক্রমণ পূর্বকল্পিতই হইত তবে প্রথমে তাঁহাদের অবাধে ঘোরাকেরা করিতে দেওয়া হইত না। সে ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সভা ভাঙিয়া দেওয়ার ঘটনাবলী সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ করিতেও দেওয়া হইত না। দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষ্য ইহাও দেখা বাইতেছে যে, সাংবাদিকেরা ছবিও লইয়া ছিলেন, রিপোর্টও করিয়াছিলেন এবং কোন কোন রিপোর্টারকে গ্রেপ্তারও করা হয় নাই, প্রহারও করা হয় নাই। ট্রেটসম্যানের লিঅমল দাশগুপ্ত, টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মিঃ ম্যাকমোহন ও অমৃত বাজার পত্রিকার লীগোবিন্দ সেন এবং লিঅসীম সেনকে কোনরূপ বাধাই দেওয়া হয় নাই। মিঃ ম্যাকমোহন কয়েকজন গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিককে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, কটো-গুলিতে দেখা বাইতেছে যে, এগুলি খুব নিকট হইতে ডুলিতে দেওয়া হইয়াছিল। আরও দেখা বাইতেছে, তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদের সকলকেই প্রহার করা হয় নাই। তাঁহাদের ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়াতেও এই আভাস পাওয়া বাইতেছে যে, কলিকাতা পুলিশের তেমন কোন অভিসন্ধি ছিল না। সাদা পোষাকের পুলিশেরা সর্বত্র এবং ঘুরে ঘুরেও ছড়ান ছিল এবং ইনস্পেক্টর নূপেন সেন কেবল রিপোর্টারদের মধ্যে আলাদা করিয়া স্ত্রীলোককে খোঁজ করারও অল্পরূপ আভাস পাওয়া যায়। যদি সেইরূপ কোন অভিসন্ধি থাকিত তবে কেবল একজনের খোঁজ করা হইত না। বিচারপতির মতে এইগুলি অনবীক্ষ্য্য দৃঢ় বৃত্তি বাহার ফলে এমন কোন সন্দেহ করা যায় না যে, পুলিশের আক্রমণ ইচ্ছাকৃত ও পূর্বকল্পিত। ইহাতে প্রমাণিত হয় সাংবাদিকদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন হইতেছে, সাংবাদিকেরা ১৪৪ ধারার আদেশ ভঙ্গ করিতে পারেন কি না। যে স্থানে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকে সেই স্থানে সম্বন্ধিত কোন ঘটনা রিপোর্ট করিতে হইলে প্রেস রিপোর্টার ও কটোগ্রাফারদের যুক্তি লইতে হইবে। তাঁহাদের সেই যুক্তি এড়াইবার ভঙ্গ তাঁহারা পাঁচ জনের অধিক সংখ্যায় একত্র থাকিয়া আইন ভঙ্গ করিতে পারেন না। তাঁহারা যদি তাঁহাদের নিরাপত্তার দিক দেখিতে চাহেন, তাহা হইলেও আইন ভঙ্গ করিয়া তাঁহারা উদ্ধা করিতে পারেন না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রিপোর্টার ও কটোগ্রাফারগণ কর্তৃক ১৪৪ ধারা অথবা দেশের অপর কোন আইন ভঙ্গ করা সমর্থন করে না। সাংবাদিকের স্বাধীনতা অপর যে কোন দেশবাসীর স্বাধীনতার সমান এবং উহা সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা অপেক্ষা বেশীও নহে, কমও নহে। আইন এই ব্যাপারে সাংবাদিকদের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা স্বীকার করে না। (এই প্রশ্নে বিচারপতি আর্পজ বনায় সন্ন্যাস মামলার স্মৃতি কাউন্সিলের লর্ড শ' মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন।)

উক্ত মামলা অপেক্ষা বর্তমান বিষয়টি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ,

কারণ এই ব্যাপারে সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবার অকৃতপূর্ব স্বাধীনতা দাবি করিয়াছেন। ভারতের আইন অথবা বিশেষ যে সমস্ত দেশে স্বাধীন সংবাদপত্র বর্তমান সেই সমস্ত দেশের আইনও সাংবাদিকদের এই দাবি সমর্থন করে না।

সাংবাদিকদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ইউনিকর্ষ পরিহিত পুলিশের লোকই কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, সাদা পোশাকে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে না এবং সেই কারণেই সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশ কর্তৃক সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার বেআইনী হইয়াছে। এই যুক্তি ঠিক নহে। গ্রেপ্তার করার অধিকার ইউনিকর্ষের উপর নির্ভর করে না এবং এমন কি একজন সাধারণ নাগরিকও কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। গ্রেপ্তার করিবার সময়ে পুলিশকে ইউনিকর্ষ পরিহিত থাকিতে হইবে এইরূপ কোন রীতি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অথবা ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে বাণ্যত নাই। আইন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কর্তব্য অথবা দায়িত্ব দিয়াছে, তাহার ইউনিকর্ষের বলে সে অধিকার পায় নাই।

পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার সময়ে, এমন কি অস্ত্রভাবে গ্রেপ্তার করিলেও নাগরিকদের যেমন পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অথবা বাধা দিবার অধিকার নাই সেইরূপ সাংবাদিকদেরও তদপেক্ষা বেশী কোন অধিকার নাই। সুতরাং ক্রিমরাজিঃ দাশগুপ্তের পুলিশ কর্তৃক দ্রুত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা এবং আরও বিশেষ করিয়া সাংবাদিকগণ কর্তৃক তর্কের দ্বারা এবং সাক্ষ্য হইতে বাহা বুঝা যায় সেই বলপ্রয়োগ দ্বারা ময়দানে ক্রিমুনীল সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা সাংবাদিকদের পক্ষে বেআইনী কাজ হইয়াছে। এইগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারায় অন্তর্গত অপরাধ। সাংবাদিকরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের আওতা-বহির্ভূত নহেন।

সুতরাং আমি মনে করি যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সাংবাদিকদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবার অথবা কর্তব্যরত পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করিবার স্বাধীনতা দের না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ দেশের সাধারণ আইন হইতে প্রেস রিপোর্টারদের অবাধ্যতা নহে। উভয় অর্থ হইল যে, সংবাদ ও মন্তব্য সম্পর্কে পূর্ব হইতে সেন্সর করার কোন রীতি থাকিবে না এবং কোন আইনগত শাস্তি অথবা আইনগত পরিণতির সম্মুখীন হইবার ব্যাপারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকিবে। সুতরাং কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবার অথবা কর্তব্যরত পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ বা তাহার কার্যে হস্তক্ষেপ কিংবা তাহাকে প্রতিরোধ করিবার অধিকার দাবি না করিলেই ভাল করিতেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা এরূপ দাবি করিয়াছেন এবং যথেষ্টাচার করিবার ও বিশেষ সুবিধা পাইবার অধিকার চাহিয়াছেন।

ইহা বৃদ্ধা লব্ধকার যে, কোন দারিদ্র্যজন পণ্ডিত কোনও একটি বিশেষ সংস্থা বা, সংবাদপত্রেরও যথেষ্টাচার করিবার অথবা বিশেষ সুবিধা পাইবার চেষ্টা সফল করিবে না। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিষয়ে সংবাদপত্রের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। আমি এই মাত্র আশা করি যে, সেই দায়িত্ব অস্বীকার করা হইবে না, কারণ তাহার কল সাধারণতঃ বাহা মনে করা হইয়া থাকে তদপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর হইতে পারে।

কমিশন ১৯৫০ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, অন্ততঃ কয়েকটি সংবাদপত্র ঘটনার বিবরণ প্রকাশে ও তাঁহাদের মন্তব্যে সংবাদপত্রের মহৎ কর্তব্যবিধি বজায় রাখেন নাই।

একটি বিশিষ্ট বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের ২৪শে জুলাই সংখ্যার পুলিশকে ও সাধারণভাবে সরকারী কর্মচারীদের “জারজ”, “জননীর গর্ভের লজ্জা” এবং “কুষ্ঠব্যাধিরস্ত্র মন” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ক্রোধের বশবর্তী হওয়ার কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, কোনও দারিদ্র্যজ্ঞানসম্পন্ন সাংবাদিকের পক্ষে ইহা শোভা পায় না। কঠোর সমালোচনা করিতে হইলেই যে কুংসিত ভাষার গালাগালি দিতে হইবে এক্ষণে কোনও কথা নাই। একখানা মাত্র সংবাদপত্র যদি এইরূপ একটা কান্ডও করে তাহা হইলে দারিদ্র্যজ্ঞানসম্পন্ন সাংবাদিকতার বংশে পরিমাণে সুনাম হানি হয়। সংবাদপত্র পুলিশের অপেক্ষাও ক্ষমতা এবং শক্তির অধিকারী। তাহাদের উপর সমাজের জীবন, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অনেক বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। যদি পুলিশের দারিদ্র্যজ্ঞান লোপ পায় এবং এক্ষণে সঙ্কট দেখা দেয় বণন অধিকাংশ লোকই উচিতব্যবোধ হারাইয়া কেলে তখন সংবাদপত্রও কি তাহাদের অনুসারী হইবে?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল যুক্তি এই যে, পুস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সংবর্ধের মধ্য হইতে সত্য প্রকাশ পাইবে। কিন্তু পুস্পদের কুংসা করার সূচনা হইলে বিরুদ্ধ মত প্রচারের অবকাশ থাকে না। সি. পি. হেলের প্রেসের (ল অব দি প্রেস, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৩০) এটর্নি জেনারেল বনাম শেকার্ডের মামলার মার্শালের বিণ্যাস উক্তির উল্লেখ করিয়া বলা যায়, “গালাগালির বেধানে সূচনা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সেই পাইনই সমাধি।”

### রাজা রামমোহন রায়

এবারে অরপুয়ে নিপিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে একটু মন্তব্য করা প্রয়োজন। তিনি তাঁহার অভিত্যয়ে বলিয়াছেন : “... তাঁহার (রামমোহনের) মহিমা অথবা বড় করিতে গিয়া আমরা বাঙ্গালী জাতিকে খাটো করিয়াছি। সাধারণের ধারণা এই যে, তিনিই বাংলা গুচ্ছসাহিত্যের জনক—প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচারক এবং প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তক। কিন্তু ইহার কোনটিই সত্য নহে। কোর্ট উইলিয়ার

কলেজের পণ্ডিতেরা রামমোহনের পূর্বে বাংলা গুচ্ছ গ্রন্থ লেখেন এবং তাঁহাদের অনেকের রচনারীতিই রামমোহনের রচনারীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহার প্রতিষ্ঠার রামমোহনের কোন হাত ছিল না বরং বখন এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত তখন তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন....” ইত্যাদি।

এ বেন ধান ভানতে শিবের গীত—ধানিকটা বেন গায়ে পড়িয়া কণ্ঠা করার মত। রামমোহন রায়কে বাংলা গুচ্ছসাহিত্যের জনক বলা হইর ঠিক সেই অর্থে যে অর্থে ডাইডেনকে ইংরেজী গুচ্ছসাহিত্যের জনক বলা হয়। ডাইডেনের পূর্বেও ইংরেজী গুচ্ছসাহিত্য ছিল, কিন্তু ডাইডেন ইংরেজী গদ্যসাহিত্যকে সহজ ও পরিমার্জিত করিয়া দিয়াছিলেন—তিনি নবপথপ্রদর্শক। রামমোহনও অল্পকাল বাংলা-সাহিত্যকে সহজ ও পরিমার্জিত করিয়া দিয়াছিলেন—তাই তাঁহাকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। এ কথাটি স্মরণ থাকিলে রমেশবাবু, রামমোহনের উপর কটাক্ষপাত করিতে পারিতেন না।

রাজা রামমোহন প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তক একথা কে বলিয়াছে এবং তিনি কোথা হইতে পাইলেন তাহা আমরা জানি না। আর বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের স্রষ্টা এবং এক জন প্রধান প্রচারক ছিলেন।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে রামমোহনের বিরোধিতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশবাবু বাহা বলিয়াছেন তাহা অনৈতিহাসিক এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। উইলসন সাহেব এবং রাজা রামমোহন রায় যুক্তভাবে বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর-বর্গের নিকট লিখিয়াছিলেন যে, ভারতে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজন—তাহা না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না। ১৮১৬ সনে সূপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক ছিলেন স্যর হাউড্ ঈষ্ট। তাঁহার নিকট রামমোহন লিখিয়াছিলেন যে, ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করা উচিত। হিন্দু কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব লইয়া যে সভা স্যর হাউড্ আহ্বান করেন তাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বলেন যে, রামমোহন রায় বিধর্মী, তিনি থাকিলে তাঁহারা বোগ দিবেন না। তাহাতে রামমোহন জানাইলেন যে, কলেজ স্থাপনই বখন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং তাঁহাকে বাদ দিয়াই যদি একাধা সন্মত হয় তাহা হইলে তিনি স্বীকৃতি বই অস্বীকৃতি হইবেন না। রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে রমেশবাবুর ঐতিহাসিক ভিত্তি কি জানিতে পারিলে স্বীকৃতি হইবে।

রামমোহন মহান পুরুষ ছিলেন—তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিয়া কাহার গৌরব বাড়িবে—বাঙালী জাতির না যিনি বলিতেছেন তাঁহার? আজকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ, বিশেষতঃ বাংলার। তবে এক্ষণে সত্য বাহা লইবার উৎসাহ রমেশবাবুর মত লোকেরও হয় ইহাই আশ্চর্য।

### জমিদারী বিলোপ বিল

পশ্চিমবঙ্গের জমিদারী বিলোপ বিল সবেই আরম্ভ করা পূর্বে একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। এবারে দুই-একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

প্রথমে ধরা যাক, মাথাপিছু জমি বাধার ব্যবস্থা। বিলের প্রস্তাব অনুসারে মাথাপিছু ২৫ একর জমি পর্য্যন্ত রাখিতে দেওয়া হইবে। বাংলাদেশে জরিপ হয় একর হিসাবে। কিন্তু এক একর কত? কলিকাতা ও সুরমবন অঞ্চলে এক কাঠা ৭২০ বর্গ ফুট, মেদিনীপুর জেলার কাঁধি মহকুমার মাজনামুঠা পরগণার এক কাঠা ১১২ বর্গ ফুট, আর কাঁধি মহকুমার জলামুঠা ও বাহিবিমুঠা পরগণার এক কাঠা ১,১৫৬ বর্গ ফুট। পশ্চিমবাংলার বহু জেলার একরের এই রকম বিভিন্ন মাপ আছে। তাই একর বলিলে সঠিক সংজ্ঞা বুঝায় না। কলিকাতা ও সুরমবন এলাকার একরের মাপ সবচেয়ে বেশী। জমিদারী বিলোপ আইন অনুসারে একরের মাপ কি হইবে? ৪,২০০ বর্গ গজ এক একর, কিন্তু কাঠার বিভিন্ন রকম মাপ হওয়ার, একরের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়।

আর একটি কথা। এদেশে জমির উপর বিভিন্ন রকম স্বত্ব আছে, যেমন নিশী, মালিকানা ইত্যাদি। পশ্চিমবাংলার সর্বত্রই পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট নয়, বহু স্থানে টেন্সোয়ারী সেটলমেন্ট আছে। কাঁধি মহকুমার বাহিবিমুঠা পরগণার পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট, অধিকাংশ অঞ্চলে টেন্সোয়ারী সেটলমেন্ট—জমি বৎসর অন্তর নতুন জমা নির্ধারণ করা হয়। এমন মালিকানার কথা ধরা যাক। মালিকানা হইতেছে জমিদারের পৈতৃক মত—জমিদারদের জমি খাস করিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পৈতৃক দেওয়া হয়। যেমন ১৮৭৪ সনে কাঁধির মাজনামুঠা-রাজ সরকারী খাজনা নিতে অক্ষম হওয়ার, তাঁহার জমি খাস করিয়া লওয়া হয়। জমিতে তাঁহার কোন অধিকার নাই—কিন্তু তবু তিনি মালিকানা পাইতেছেন।

লাখেবাজ, নিশী প্রভৃতির প্রতিকরহার কিভাবে নির্ধারিত হইবে? পাশাপাশি নিশী ও খাসমহলের জমিতে দেখা যায় যে, নিশীর খাজনা নামমাত্র, কিন্তু জমির মূল্য অধিক। আর খাসমহলের জমির মূল্য কম, কিন্তু জমির খাজনা অধিক। এই অবস্থায় পাশাপাশি জমির কি বিভিন্ন রকম প্রতিকর ব্যবস্থা হইবে? বাদশাহী লাখেবাজ, অবাদশাহী লাখেবাজ, জাহগীর, আলতামবা, আইমা এবং মদনমাপ প্রভৃতি স্বত্বের কি হিসাবে প্রতিকর দেওয়া হইবে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা হয় নাই।

### জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন কিনা সেবিষয়ে মতবৈধ আছে। সেজন্য নিম্নস্থ সংবাদটি প্রাধান্যযোগ্য :

নয়াদিল্লী, ১১ই নবেম্বর—১৯৫১ সালের লোকগণনা সম্পর্কে সেল্যাস কমিশনার জি.আর. এস. গোপালস্বামী সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি ভাষ্যে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে, উৎপাদনের

পরিমাণ ভূমিপূরণ বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

লোকগণনার রিপোর্টটি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১৯৫১ সালের লোকগণনার যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে উহাতে তৎসমুদয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং উহার ভিত্তিতে আগামী ৩০ বৎসরের অবস্থাও অনুমান করা হইয়াছে।

বিগত লোকগণনার সংগৃহীত তথ্য-তালিকা পর্যালোচনা এবং গত ৩০ বৎসরের অবস্থার সহিত উহার তুলনাক্রমে জিগোপালস্বামী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিগত ৩০ বৎসরে লোকে যেভাবে খাদ্য পাইয়াছে আগামী ৩০ বৎসরেও যদি সেইভাবে খাদ্য পায় তাহা হইলে ভারতের লোকসংখ্যা ১৯৫১ সনে প্রায় ৩৬ কোটি হইতে ১৯৬১ সনে ৪১ কোটি, ১৯৭১ সনে ৪৬ কোটি ও ১৯৮১ সনে ৫২ কোটি দাঁড়াইবে।

বস্তাদি সাহায্যে দেশে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বপ্রকার সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনার পরও সেল্যাস কমিশনার এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খাদ্যের সরবরাহ ব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে এইরূপ অনুমান নাও টিকিতে পারে। দেশে খাদ্য ঘাটতি এবং উহার পরিপন্থিতে খাদ্য বন্টন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। এইরূপ ঘটিলে ১৯২১ সনের পূর্ববর্তী ৩০ বৎসরে হ্রাসিত, মড়ক প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়া যেভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহারই পথ পুনরায় উন্মুক্ত হইতে পারে।

সরকার সচুঁ পরিকল্পনা অনুসরণে খাদ্যশস্ত্রের ব্যবসার চালাইয়া গেলে এইরূপ ব্যাপার হ্রাস ঘটতে পারিবে না। কসতঃ স্থায়ীভাবে খাদ্য ঘাটতি এড়াইবার উদ্দেশ্যে সচুঁ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা যথোপযুক্তভাবে কার্যকরী করণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া বাইবে। এইজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে, আগামী ১৫ বৎসরে ঐ বিষয়ে আরও বেশী তৎপর হওয়া দরকার।

### পাটের ফাটকা

কেন্দ্রীয় সরকার ২০শে অক্টোবর হইতে কাঁচা পাটের অগ্রিম ব্যবসার (forward trading) বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ১৯৪৮ সনের আগষ্ট মাস হইতে পশ্চিম বাংলা সরকার কাঁচা পাটের ফাটকা বন্ধ করিয়া দেন। সে নিষেধ আজ পর্য্যন্ত বলবৎ আছে—ইহা শুধু পাকানো কাঁচা পাটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমানে এই আইনকে কঁাকি দিবার জন্য আলগা কাঁচা পাটের ফাটকা খেলা হইতেছে। নতুন আদেশ দ্বারা আলগা কাঁচা পাটের অগ্রিম চুক্তি তথা ফাটকা খেলা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল পাটের অগ্রিম চুক্তি হস্তান্তরিত করা বাইবে না, সেগুলি বাতীত অজ্ঞাত সকল প্রকার পাটের অগ্রিম চুক্তি নিষিদ্ধ। এই আদেশ খুবই সাময়িক হইয়াছে।

যে সকল অগ্রিম পাটের চুক্তি হস্তান্তরিত করা বাইবে না, তাহাতে আইনতঃ ব্যবসার করা বাইবে। ইহাতে প্রতীক্ষিত হয়

বে, শুধু বেআইনী কাটকা নিবেদন করা হইয়াছে কিন্তু আইনগত ভাবে পাটের অগ্রিম চুক্তি ব্যবসায় করা বাইতে পারে। ১৯৫২ সনের অগ্রিম চুক্তি আইন অনুসারে যে সকল অগ্রিম চুক্তি হস্তান্তরিত করা বাইবে না, তাহাদের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :

“Specific delivery contract, the rights or liabilities under which or under any delivery order, railway-receipt, bill of lading, warehouse receipt or any other document of title relating thereto are not transferable.”

এই রকম নির্ধারিত অগ্রিম চুক্তিকে বলা হয় “no-specific delivery contract”—বাহ্যি নিবদ্ধ করা হয় নাই।

কিন্তু ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, নূতন আদেশ দ্বারা বেআইনী কাটকা বাজার একেবারে নিমূল হইবে। কাটকা বাজারের উত্তরাধিকারী এখনও জীবিত—তাঁহা হইতেছে কলিকাতার কাটনী বাজার—কাটকার আড্ডা। কাটকা বাজার বন্ধ হইয়াছে, কাঁচা পাটের অগ্রিম ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু কাটনী বাজার এখনও বর্তমান। কাটকা বেন মরিয়াও মরে না।

ভারতের পাট ব্যবসায় বর্তমানে সমৃদ্ধির পথে। আমেরিকার চাঙ্গি বাড়িতেছে। এই অবস্থায় কাটনী বাজারকে নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানের সভা, তাঁহারা ই কাটনী বাজারে কাটকা খেলেন, তাই কাটনীর প্রভাব আইনসম্মত বাজারগুলিকেও প্রভাবান্বিত করে। কাটনীর বিলোপসাধন সেইজন্য প্রয়োজন।

### ব্যাঙ্ক অভিল্যঙ্গ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্ক অভিল্যঙ্গ জারী করিয়াছেন বাহাতে ডেউলিয়া ব্যাঙ্কগুলির সমাপন কার্য (liquidation) লম্বার সমাধা করা হয়। ভারতবর্ষে ১৯৪৭ হইতে ১৯৫১ সনের মধ্যে ১৮০টি ব্যাঙ্ক ডেউলিয়া হইয়াছে এবং অংশীদার ও আমানতদারদের প্রায় ২২ কোটি টাকার মত নষ্ট হইয়াছে। এই ডেউলিয়া ব্যাঙ্কগুলির প্রায় সব কয়টিই ছিল মাকারি ও ছোট আকারের ব্যাঙ্ক—ইহাদের আমানতকারীদের মধ্যে মধ্যবিত্তদের সংখ্যাই ছিল অধিক, তাহাদের কতিপয় আজ সবচেয়ে বেশী। অনেক মধ্যবিত্ত লসারের শেষ সঞ্চল বাহা ব্যাঙ্কে জমা ছিল তাহা চলিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের সমাপন কার্যের নূতন সংজ্ঞা আসিয়া ঝাঁড়াইয়াছে—তাহা হইতেছে এই যে, আমানতদার, অংশীদার ও উত্তরমর্গের সমস্ত দাবিই সমাপন করিয়া দেওয়া হয়, অবশ্য টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয় না—টাকা পরিশোধ করার অক্ষমতার দ্বারা। ১৯৪৭ সনে যে সকল ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই আমানতদাররা আজ পর্যন্ত কিছুই পান নাই এবং বাঁহারা কিছু পাইয়াছেন, তাহা না পাওয়ারই মত।

সম্প্রতি দেখা বাইতেছে, কয়েকটি ডেউলিয়া ব্যাঙ্কের ভিতরেইরকে প্রত্যাহার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইতেছে—ইহা খুবই বখোচিত হইতেছে। কিন্তু আসল ব্যবস্থা—অর্থাৎ, পরীক্ষা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আমানতদারদের জমা টাকা কেবল দেওয়ার কি ব্যবস্থা করা হইতেছে?

ব্যাঙ্কগুলির ডেউলিয়া হওয়ার মূলে শুধু ডিরেক্টরবর্গের শঠতা এবং অকর্মণ্যতাই দায়ী নয়—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অকর্মণ্যতা ও অন্ততঃ এক পবনমেন্টের উদাসীনতাও বহুল পরিমাণে দায়ী।

১৯৪২ সনের ব্যাঙ্ক কোম্পানী আইনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বখোষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ভারতীয় কমিশ্যনাল ব্যাঙ্কগুলিকে বখোপমুক্ত ভাবে চালিত করিবার জন্য।

১৯৪২ সনের ব্যাঙ্ক কোম্পানী আইনের ২২শ ধারা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রত্যেক ব্যাঙ্কে লাইসেন্স দেওয়ার পূর্বে তাহাদের খাতাপত্র ভালভাবে পরীক্ষা করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স ব্যতীত ভারতবর্ষে কোন ব্যাঙ্ক কার্য করিতে পারে না। কোন ব্যাঙ্ক যদি নূতন শাখা খুলিতে চায় কিংবা বর্তমান শাখা স্থানান্তরিত করিতে চায়, তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে যে কোনও সময়ে যে কোন ব্যাঙ্কের খাতাপত্র পরীক্ষা করিতে পারে। অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যাঙ্ক প্রতি সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে তাহাদের বর্তমান পরিস্থিতির হিসাবনিকাশ নিয়মিত ভাবে পাঠায়। তৎসঙ্গেও ইহা অতীত আশুচর্যের বিষয় যে, ১৯৪২ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রায় ১০৫টি ব্যাঙ্ক ডেউলিয়া হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, যে সকল ব্যাঙ্ক ডেউলিয়া হইয়াছে তাহাদের সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশ কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন? এই ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা হঠাৎ রাতারাতি ধারাপ হয় নাই। অনেকদিন ধরিয়াই ভিতরে ভিতরে অবস্থা ধারাপ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু সে অবস্থা ধুঁকিবার দায়িত্ব কার? অবশ্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। একথা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হয় সাপ্তাহিক হিসাব বুঝিতে অক্ষম কিংবা তাঁহারা হিসাব পরীক্ষা ব্যাপারে গাফিলতি করিয়াছেন। যেমন, ক্যালকুলাটর ভ্রাশ্চাল্য ব্যাঙ্কের ব্যাপার। এই ব্যাঙ্কের অবস্থা কয়েক বৎসর ধরিয়াই ধারাপ হইয়া আসিতেছিল—রাতারাতি কিছু হয় নাই। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ইহার ব্যাপারে নিগ্রহিত ছিলেন? প্রশ্নমতই কেন বখোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই? ভিতরে ভিতরে যখন বাঁজরা হইয়া গিয়াছে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শাসন-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে পরিচালন ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা ইনসিওর করিবার প্রথা আছে—আমেরিকায় ব্যাঙ্ক ডেউলিয়া হইলে প্রত্যেক আমানতদারের ২৫,০০০ ডলার পর্যন্ত ইনসিওরেন্স কোম্পানী

(গবর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট) দ্বারা প্রদত্ত হয় আর ইউরোপ এবং আমেরিকায় ব্যাঙ্কগুলিকে সাধারণতঃ লব্ধতা বদ্ধ করিতে দেওয়া হয় না। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা ধারণা হইলেই তাহাকে অল্প কোন ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় কিংবা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। তায়তবর্ষের মত ব্যাঙ্কগুলিকে আমানত গ্রহণকরিতে নিবেদন করিয়া কিংবা শিডিউল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াই ঐ সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিংবা গবর্নমেন্ট নিজেদের দায়িত্ব খালি রাখেন না। আমানতদারদের টাকা বাঁচানোই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিংবা গবর্নমেন্ট সম্পূর্ণ উদাসীন এবং নিশ্চেষ্ট।

যদি বাক, ক্যালকাটা স্ট্রানাল ব্যাঙ্কের ব্যাপার। এই ব্যাঙ্ক বর্তমানে লিকুইডেশনে গিয়াছে—কিন্তু লিকুইডেশনে ব্যাঙ্কের আমানতদাররা কি পাইবে? এই ব্যাঙ্কের নিরঙ্কর চার-পাঁচখানি বাড়ী আছে, বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকার উপর। এই বাড়ীগুলির যেটা ভাড়া খুব কমপক্ষে বৎসরে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার মত হইবে। এই বাড়ীগুলি হইতে যে পরিমাণ টাকা ভাড়া পাওয়া যাইবে তাহা আমানতদার ও অংশীদারদের টাকা শোধ করিবার পক্ষে প্রেষ্ট উপায়।

ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ধারাগুলি এইরূপ :

(১) অল্প টাকার আমানতদারদের টাকা আগে দেওয়া হইবে। সেভিস একাউন্টে জমা টাকার ১০০ টাকা পর্যন্ত শোধ দেওয়া হইবে এবং 'পাঁচ-শ' টাকা পর্যন্ত কারেন্ট একাউন্টে জমা টাকার ১০০ টাকা শোধ দেওয়া হইবে।

(২) ডেউলিয়া ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সম্বন্ধে উদ্ধার করা হইবে। লিকুইডেশনের জন্য আদেশ দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সেনাদারদের নিকট হইতে ঋণ আদার করা হইবে। পাঁচ হাজার টাকার কম হইলে তাহার উপর আপীল করিবার অধিকার সেনাদারদের দেওয়া হইবে না।

(৩) আদালতের আদেশক্রমে লিকুইডেটরের ডিক্রী ডুমি-রাজস্ব আদার করার মত "summary procedure" দ্বারা জারী করা হইবে।

(৪) ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনের জন্য প্রত্যেক হাইকোর্টের একজন করিয়া লিকুইডেটর থাকিবে।

(৫) ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গকে জেরা করা হইবে এবং তাঁহাদের বিবৃতি লওয়া হইবে এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের বিচার করা হইবে।

### পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কাছাড়

"বৃগুশক্তি" লিখিতেছেন, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আসামের তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান নাই। পত্রিকার জ্বার "আসাম বাহা পাইয়াছে তাহা রাজ্য সরকারের সাধারণ বার্ষিক বাজেটের বৃত্তন ভীমের একই বড় সংকরণ মাত্র।

বিষয়ভিত্তিক অথবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, কোন রাজ্যের, কোন শহরের বৈজ্ঞানিক অবস্থার উন্নয়ন অথবা কোন সরকারী বিভাগের পরিপূর্ণতা হইতেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আসামের বরাদ্দ নিঃশেষিত হইয়াছে।" কিন্তু আসামের উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় "আসামের নদী নিয়ন্ত্রণ ও তাহার বিপুল জলসম্ভারকে কাজে লাগাইবার কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই। আসামের অকুদন্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে সার্থক করিয়া তুলিবার কোন প্রচেষ্টাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্থান পায় নাই।"

কাছাড়ের অবস্থা আরও নৈরাশ্রজনক। একমাত্র শিগচর শহরে বরাকর পুল ছাড়া জনগণের আর্থিক ব্যবহার উন্নতির জন্য আর কোন ব্যবস্থাই পরিকল্পনার স্থান পায় নাই। কাছাড়ের চাষী প্রতি বৎসর বস্ত্রের প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লরকারী চাকুরীর বাজার কাছাড়ের যুবক-যুবতীদের নিকট প্রায় বন্ধ; উপার্জনের অল্প আর কোন পথও শোলা নাই; কাছাড়ে ছাত্রদের জন্য সরকারী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবেশদ্বারও সঙ্কুচিত। "বৃগুশক্তি" লিখিতেছেন, তবু যদি কাছাড়ের বনজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক বিভব শিল্পে রূপায়িত করিবার জন্য এই অঞ্চলে কয়েকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিত তবে এখানকার বেকার সমস্যা কতকটা সমাধান হইত।" শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা পাওয়াও খুবই সহজ হইত যদি নদী-নিয়ন্ত্রণের কোন চিন্তা পরিকল্পনা-সচিবরা ত্যাগ করিতেন। একমাত্র বরাকর নদীর নিয়ন্ত্রিত জলের শক্তি হইতে উৎপন্ন বিদ্যাতের সাহায্যে কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাগড় ও জিপুয়ার উত্তরাংশে বৃষ্টি বৈজ্ঞানিক শক্তি সরবরাহ করা যাইত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হইবার সংবাদ শুনা যাইতেছে। বাহাতে দ্বিতীয় বার কাছাড়ের দাবি এইরূপ অবহেলিত না হয় "বৃগুশক্তি" তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

যে দেশে জনমত জাগ্রত নহে, এমন কি উচ্চতম অধিকারীবর্গও দেশের ও দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া নিজস্ব এবং দলগত স্বার্থেরই চর্চার ব্যস্ত, সে দেশের পরিভ্রাণ-পথ সুগম এ তো সহজ নয়। কাছাড়ের তথা আসামের দাবি তখনই গ্রাহ্য হইবে যখন সেখানকার জনমত প্রবলভাবে ব্যক্ত হইবে।

### ভারতে বৈদেশিক পুঁজি নিয়োগ

"আমেরিকান রিপোর্টার"র সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন বাণিজ্য-দপ্তর ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে বিদেশী পুঁজিলিপ্তর্য পরিমাণ বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দিবার জন্য ভারত-সরকার যে সর্ভাঙ্গী দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে ক্রমশঃই বেশ সচেতন হইয়া উঠিতেছেন।

পুস্তিকাটিতে বলা হইয়াছে যে, বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এখন স্বীকৃতি দেওয়া হইতেছে এবং ইহাতে সুবিধে পাওয়া যায় যে,



মার্কিন ও অন্যান্য বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের অধিক সংখ্যার ভারতে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইতেছে এবং উক্ত প্রস্তুত সর্ভাবলী সম্ভাবজনক।

বিদেশী পুঁজি নিয়োগ সম্বন্ধে একটি সর্ব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া উচিত। ভারতীয় উদ্যোগ ও বোজনার পথ বাহাতে সকল ক্ষেত্রেই উন্নত থাকে এবং তাহার প্রসার বাহাতে সূচক হয় সেইরূপ সর্ব সর্বক্ষেত্রেই থাকা আমরা প্রয়োজন মনে করি।

### দিয়াশলাই পল্লীশিল্পে পোষকতা

৩১শে অক্টোবর “হরিজন” পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, “সম্প্রতি অগিলভারত খাদি ও পল্লীশিল্প বোর্ডের সাধারণ উৎপাদন কার্যক্রম সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে ভারতে দিয়াশলাই শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত অধিবেশনে স্ক্রু বা কুটাব-শিল্পরূপে দিয়াশলাই নিষ্কাশন-শিল্পের উচ্চীবনের জন্য পন্থা ও উপায়ের সুপারিশ করা হইয়াছে।

উইমকো পরিচালিত পাঁচটি কারখানা হইতে ভারতের দিয়াশলাই সরবরাহের শতকরা আশী ভাগ পাওয়া যায়। “হরিজন”-এর সংবাদ অনুযায়ী “গত তিন বৎসরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অপর ৭২টি কারখানা উইমকোর শক্তিশালী বিক্রয়-ব্যবস্থায় প্রতি-বোগিতার ফলে বন্ধ করিতে হয়। কমিটি দিয়াশলাই কারখানা-গুলিকে এ, বি, সি, ডি এই চার পর্যায়ের ভাগ করিয়াছেন। বৎসরে পাঁচ লক্ষ গ্রেস দিয়াশলাই বাস্তব নির্মাতাকে ‘এ’ পর্যায়ের রাখা হইয়াছে। পাঁচ লক্ষের নিম্নপরিমাণ নির্মাতাকে ‘বি’ শ্রেণীতে কেলা হইয়াছে। যে কারখানায় দৈনিক এক শত গ্রেস দিয়াশলাই নির্মিত হয় সেগুলি ‘সি’ পর্যায়ভুক্ত এবং যেগুলিতে প্রত্যাহ পঁচিশ গ্রেস হয় সেগুলি ‘ডি’ পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

“এ’ শ্রেণীর নির্মাতাদের নিকট হইতে তাহাদের নির্মিত প্রতি গ্রেস দিয়াশলাইয়ের উপর সাড়ে চার আনা শুদ্ধ আদায় করা হউক এবং গ্রেস প্রতি ‘বি’ শ্রেণীর নির্মাতাকে ছয় পয়সা, ‘সি’ শ্রেণীর নির্মাতাকে সাড়ে চার আনা এবং ‘ডি’ শ্রেণীর নির্মাতাকে ছয় আনা সাবসিডি বা সাহায্য দেওয়া হউক, কমিটি এই সুপারিশ করিয়াছেন।

“কমিটির মতে পল্লীতে দিয়াশলাই নিষ্কাশনের ব্যয় বৃহৎ কারখানায় নিষ্কাশন-ব্যয়ের অধিক হইবে না। ভারতে প্রতি মাসে ছত্রিশ কোটি বাস্তব দিয়াশলাই প্রয়োজন হয়। পল্লীতে দিয়াশলাই নিষ্কাশন-শিল্পের প্রথম বৎসরেই পাঁচ হাজার ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইতে পারে এবং তদ্বারা বেকার সমস্যা তৎপরিমাণ লাঘব হইবে।”

আমরা কেবলমাত্র সাবসিডির উপর নির্ভরশীল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চিন্ত নহি। এরূপ শিল্প স্থায়ী হইতে পারে না।

### বর্ধমানে আলু-চামের সঙ্কট

সাপ্তাহিক “নূতন পত্রিকা” লিখিতেছেন, “বাংলাদেশের মধ্যে অন্ততম প্রধান আলু-উৎপাদনকারী জেলা হইল বর্ধমান। হুগলীর

পরেই ইহার স্থান। প্রায় ৫০,০০০ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। এই চাষ মেমারী, জামালপুর ও কালনা থানাতে সবচেয়ে ব্যাপক।”

কিন্তু গত দুই বৎসর বাবৎ কৃষকেরা আলুর চাষে মার খাইতেছেন, কারণ চাষের সময় কৃষকদের হাতে অর্থ না থাকায় তাঁহারা বীজ, সার ও অর্থের জন্য মহাজনের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন এবং এই ব্যবস্থার আনুযায়িক অসুবিধায় সম্মুখীন হন। এ বৎসর কৃষকদের অবস্থা আরও পারাপ। তাঁহারা সরকারী ঋণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু চাষের মরশুম শুরু হওয়া সত্ত্বেও কৃষি-ঋণ প্রদানের কোন ব্যবস্থা সরকার পক্ষ হইতে করা হয় নাই। ফলে কৃষকগণ মহাজনের কবলে পড়িতে বাধ্য হইতেছেন।

সময়ের মূল্য সর্বক্ষেত্রেই আছে। কিন্তু চাষে সময়ের মূল্য স্বর্ণের মানে হয়। এই সাধারণ তথ্যটি সরকারী কৃষিবিভাগ হৃদয়ঙ্গম করিলে বাংলার কৃষি চের উপকৃত হইবে। সরকার সকল ক্ষেত্রেই ঋণদান করেন, কিন্তু সময়মত পাইলে তাহাতে দ্বিগুণ উপকার হয়।

### বহরমপুর কৃষকনাথ কলেজের শতবর্ষ

নবেম্বর মাসে বহরমপুর কৃষকনাথ কলেজের এবং কলেজিয়েট স্কুলের শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “মুর্শিদাবাদ সমাচার” বহরমপুর কলেজের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদান-প্রসঙ্গে লিপিতেছেন : “১৮৫৩ সনের নবেম্বরে ঠাঁই ইন্ডিয়া কোম্পানী বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্টের ১০ নং ব্যারাক বাহা এখন মনীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী নামে পরিচিত, উক্ত ব্যারাকে একটি কলেজ স্থাপন করেন। পুরাতন গেজেটিয়ারগুলিতে দেখা যায় যে, ১৮২৬ সনে বহরমপুরে একটি ব্রিটিশ কলেজ স্থাপন করা হয়। কিন্তু উক্ত ব্রিটিশ কলেজট যে ২৭ বৎসর চলা পর বহরমপুর কলেজ নাম গ্রহণ করে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরে বিভিন্ন সময়ে উক্ত কলেজ স্থান পরিবর্তন করে এবং বোর্ডাল স্কুলের পার্শ্ববর্তী ভাদোঁন সাহেবের কুঠি হইতে বাবুলঝোনা পর্যন্ত ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত পুরাতন ব্যারাকেই কলেজ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৮৬৯ সনে বহরমপুর কলেজ বর্তমান শুদ্ধ অট্টালিকায় আরম্ভ হয়।”

১৮৬৭ সনে বহরমপুর কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষার প্রথম উত্তীর্ণ হন জ্ঞানকীনাথ পাড়ে। ১৮৬৪ সনে কলেজে আইনের ক্লাস খোলা হয় এবং ১৮৬৯ সনে কলেজটি প্রথম গ্রেডের ‘আর্টস’ কলেজ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু ১৮৭২ সনে কলেজটি দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজে পরিণত হয় এবং ১৮৭৫ সনে কলেজের আইন বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৮৬ সনে সরকার এই কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং কলেজটি বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন স্বগতা মহাবাগী স্বর্গমরী কলেজের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সনের ১৪ই মে তারিখের এক সরকারী প্রজ্ঞাবে কলেজের পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থার ভার এক ট্রাস্টী-বোর্ডের উপর অর্পিত হয়। ১৮৮৮ সনে



বহরমপুর কলেজ পুনরায় আইনবিভাগ সমেত প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়।

মহারাজী ষষ্ঠীর মৃত্যুর পর স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কলেজের অর্থভাণ্ডার পরিপূষ্টির জন্য কিছু জমিদারী দান করেন। তখন বহরমপুর কলেজের নাম পরিবর্তন করিয়া বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ করা হয়। ১৯০৫ সনে মল্লিক দ্বারা কলেজের পরিচালনার ভার এক বোর্ডের উপর তুলত হয়। তদবধি কাশিমবাজার রাজবংশের আর্থিক সাহায্যে বহরমপুর কলেজ চলিতেছে।

কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইলেও মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী পরিচালনাধীন তিনটি কলেজ অপেক্ষা এখনও ঐ কলেজের ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশী। কলেজের বিজ্ঞান-শ্রেণীর ফলাফল প্রতিবৎসরই ভাল হয়। বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসে কৃষ্ণনাথ কলেজের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কলেজের ষোল্লশতাব্দী পূর্ণ হইয়াছে। প্রথমাবধি এই বিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী পাইয়াছে এবং ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহত্তম বিদ্যালয়।

পরিশেষে পত্রিকা লিখিতেছেন : “মকঃম্বলের একটি কলেজ বা একটি স্কুল স্রষ্টা শতাব্দী নিরবচ্ছিন্নভাবে সাক্ষ্যের সহিত চলিতেছে, ইহা শিক্ষার অনগ্রসর দেশের পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং সেই শতাব্দীকী উৎসবকে আরও স্মরণীয় করিয়া তোলা প্রতিটি প্রাক্তন ছাত্রের অবশ্য কঠবা বলিয়া আমরা মনে করি।”

### শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষের পদচ্যুতি

কিছুকাল পূর্বে শিলচর গুরুচরণ কলেজের পরিচালক সমিতি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তকুমার দত্তগুপ্তকে নৈতিক অপরাধ ও অযোগ্যতার অভিযোগে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করেন। “সুরমা”র সংবাদে, প্রকাশ, গত ১লা নবেম্বর তারিখে পরিচালক সমিতি ছয় ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ অধিবেশনে সমগ্র প্রমাণ ও নথিপত্র বিবেচনা করিয়া কলেজের অধ্যক্ষকে অপসারিত করিবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি অধ্যক্ষকে কলেজের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা এবং অসাধুতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পরিচালক সমিতির উক্ত সভার কলেজের ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলা-হীনতার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ছাত্রসংঘ আচরণ এবং কতিপয় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কেও তাঁহারা বিবেচনা করিবেন।

অধ্যক্ষকে অপসারিত করিবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইয়া কতিপয় ছাত্র এক সভা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী তদন্ত সাপেক্ষে অধ্যক্ষের পুনর্নিয়োগ দাবি করে। তাহারা ষষ্ঠমণ্ডলের চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থ হয়।

এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “সুরমা” মন্তব্য করিয়াছেন, “যে সিদ্ধান্ত পরিচালক সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই

চরম সিদ্ধান্ত। তাঁহারা যদি অন্তরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া অধ্যক্ষকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতঃ তাঁহাকে পুনরায় কাজে বহাল করিতেন তবে আমরা সর্বাধিক সুখী হইতাম। পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত শুধু ব্যক্তিগতভাবে অধ্যক্ষের পক্ষেই মর্যাদাসিক নহে, আমরা বিশ্বাস করি, পরিচালক সমিতির সদন্তগণ অন্তরূপ মর্মেবদনাসম্মেও বৃহত্তর কল্যাণ কামনার এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।”

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরূপ ঘটনা বাস্তবিকই অতিশয় দুঃখজনক। দেশের নৈতিক অবনতির একটি কারণও ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

### পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়

“সোবিয়ত দেশ” লিখিতেছেন, মস্কো নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম স্থান লেনিন পাহাড়ে মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভবনের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই সুবিশাল ভবনের মোট আয়তন ২৬,১১,০০০ ঘনমিটারেরও বেশী—প্রায় ৫০,০০০ অধিবাসীর উপযুক্ত একটি শহরের মোট ঘরবাড়ীর আয়তনের সমান।

নোখোজারা সড়কের উপর অবস্থিত মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বাড়ী হইতে ভূতত্ত্ব, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বলবিদ্যা ও গণিত এই পাঁচটি বিভাগ লেনিন পাহাড়ের নবনির্মিত ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে।

ছাত্রদের জন্য যে আবাসভবন নির্মিত হইয়াছে তাহাতে ৫,৭৫৪টি কামরা আছে।

### মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

“মেদিনীপুর পত্রিকা”র শারদীয় সংখ্যার এক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষ মেদিনীপুরের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, “মেদিনীপুরের ইতিহাস হ’ল শতাব্দীর নর, সভ্যতার উদয়দিশস্ত পথান্তরিত। প্রান্তর যুগের নিদর্শন মেদিনীপুরে পাওয়া গেছে, তাম্রযুগেরও। সিংড়ম জেলায় তাম্রখনি ও প্রাচীন তাম্রচূড়ির যেসব নিদর্শন আজও রয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় ভারতে তাম্রযুগের সভ্যতার কেন্দ্র শুধু সিংড় উপত্যকা ছিল না, বাংলাদেশের মেদিনীপুর ঝাড়গড় সিংড়ম অঞ্চলও ছিল। বন সাহেব (V. Ball) সিংড়ম অঞ্চলের এই তাম্রখনি ও খনিমজুরদের বিবরণ প্রায় এক শতাব্দী আগে লিপিবদ্ধ করে গেছেন (Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1869)। তাম্রলিঙ্গ বা তাম্রলুক প্রাচীনতম বন্দর এবং এই বন্দর থেকে ভারতের সর্বত্র ও বাইরে সমস্ত পণ্যপ্রবাহী রপ্তানী হ’ত। তাম্রযুগের তামার তৈরি অস্ত্রাদিতে ও কাঁচা তামার বন্দরটি পরিপূর্ণ থাকত বলেই ‘তাম্রলিঙ্গ’—‘তাম্রলিঙ্গ’ নাম হওয়াই সম্ভবপর। হেমচন্দ্রের ‘দামলিঙ্গ’ বা দামল-জাতির সংলিষ্ট; তা কষ্ট করে অকারণে ভাববার কোন কারণ নেই, বিশেষ করে সিংড়ম অঞ্চলে তাম্রখনি ও তাম্রচূড়ী কারখানার

পরাষ্ট্র নিদর্শন থাকে। এখনও মনে হয়, ঠিক মতন অনুসন্ধান করলে বাড়ুগুণ অঞ্চল থেকে তাম্রলিপ্তের অনেক নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে, শুধু টেকনিক্যাল নয়, সাংস্কৃতিক নিদর্শনও।”

তাম্রলিপ্ত জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। লেখকের অনুমান প্রাচীন ‘বঙ্গ’ হইতেই কলিকতাদেশে জৈনধর্মের প্রসার ঘটে। “এই বঙ্গই হ’ল ঐক্যের বর্ণিত ‘গঙ্গাবিভি’। গঙ্গা-বিশোধিত অঞ্চলে ছিল ‘বঙ্গ’ আর তার পশ্চিমের প্রতিবেশী ছিল ‘উৎকলরা’। কপিসাঁ নদী ( টলেমির ‘ক্যাম্বিসোন’, আধুনিক কাঁসাই নদী ) ছিল বঙ্গ ও উৎকলের সীমারেখা এবং তাম্রলিপ্ত ছিল বঙ্গের প্রধান শহর—‘গঙ্গা’ শহর।” বৌদ্ধধর্মের অবনতির যুগেও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাম্রলিপ্ত ছিল তাহার প্রধান কেন্দ্র। বৌদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রের অঙ্গতম অধ্যয়ন-কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত। কা-হিয়েন তাম্রলিপ্তিতে দুই বংসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চেন্ত-তেঙ ছিলেন বার বংসর এবং তাও-লিন্ তিন বংসর। “এই সব চীনা পরিব্রাজকের অনাগোনা থেকে বোঝা যায় তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল ভারতবর্ষে এবং বৌদ্ধ নিদর্শন তমলুক-মেদিনীপুরে পাওয়া উচিত, বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথিও।”

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত হইতে জলপথে এবং স্থলপথে দেশবিদেশের সঞ্চিত বাণিজ্য চলিত এবং এই বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি ভারতের সর্বত্র এবং বাহিরেও প্রচারিত হয়।

উপসংহারে লেখক লিখিতেছেন যে, মেদিনীপুরের সমুদ্রশালাী সংস্কৃতির উপকরণের সন্ধান গ্রামাঞ্চলে পাওয়া বাইবে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করিতে হইলে সেগুলির সন্ধান করিতে হইবে এবং সেই সন্ধান একেবারে ব্যর্থ হইবে না। “একের কাজ নয়, এক দিনের কাজ নয়। তবু সূক্ষ্ম করতে বাধ্য নই।”

### অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলার নবজাগরণ

‘মেদিনীপুর পত্রিকা’র শারদীয় সংখ্যায় এক প্রবন্ধে অধ্যাপক জীপ্রব্রাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, “উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার যে অভূতপূর্ব ও বিশ্বয়কর নবজাগরণ ঘটিয়াছিল উহাকে সম্যকরূপে প্রাধিকান করিতে হইলে আমাদেরকে জ্ঞানতাপস অক্ষয়-কুমারের বিরাট দানের কথাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে। সত্যই অক্ষয়কুমার ছিলেন একজন যুগমানব বা Representative Man এবং তাঁহার মধ্যে সে যুগের কয়েকটি প্রধান ভাবধারা সংহত হইয়াছিল। আগষ্ট কোমন্টের প্রত্যক্ষবাদ ও মানবতার আদর্শ ( Positivism and Humanism ), জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ বা অধিকতম লোকের প্রভুতম সুখবিধানের আদর্শ ( Utilitarianism বা Universalistic Hedonism ), হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ ( Agnosticism ) এবং সে যুগের বাঙালীর নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেম তাঁহার মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করিয়াছিল।

“তিনি আমাদের মনে কোঁতুলের উদ্রেক করিতে এবং আমা-

দিগকে শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পুষ্টি করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সম্পন্ন করিয়াছেন।”

কিন্তু আধুনিক বাঙালী এই মহান চিন্তানায়কের বিরাট সাধনার সন্ধান রাখে না। তাহার কারণ বাঙালী এখন সকল দিকেই প্রগতির বিপরীত পথই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছে। আজ প্রতিক্রিয়াবাদীরা ও অজ্ঞতাবাদেরই জয়।

### বর্ধমানের পৌরপতি সম্পর্কে সরকারী তদন্ত

২৬শে কার্তিক “আর্য্য” পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, বর্ধমান পৌরসভার বিরোধী দল কর্তৃক পৌরপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ত সরকার এক আদেশ দিয়াছেন। গত ৬ই নবেম্বর তদন্ত আরম্ভ হইবার কথা ছিল; কিন্তু পৌর উপ-নির্বাচন নিকটবর্তী হওয়ার পৌরপতির অনুরোধক্রমে নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে তদন্তকার্য আরম্ভ হইবে।

উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, পৌরসভা-ভবন হইতে উনিশ দফা দলিল বা ফাইল উধাও হইয়াছে। তদন্তকার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে ঐ সকল ফাইলপত্র উধাও হওয়ার পৌরসভার চাকলা দেখা দিয়াছে। এই সংবাদ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যদি ইহা সত্য হয় তবে ইহার সম্পূর্ণ বিচার হওয়া উচিত বাহাতে এইরূপ অনাচারের জন্ত কাহারো দায়ী ও দোষ কাহাদের তাহা নির্ণীত হয়।

### ঐশ্ব্যমিক সাধারণতত্ত্ব

পাকিস্তানের গণপরিষদের এক সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাম হইবে “ইসলামী সাধারণতাত্ত্বিক রাষ্ট্র পাকিস্তান”। মূলনীতি কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে রাষ্ট্রের নাম কেবলমাত্র ‘পাকিস্তান’ রাখার সুপারিশ করা হইয়াছিল। জনাব নূর আহমেদ এক সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছার কথা স্মরণ রাখিয়া রাষ্ট্রের নাম “ইসলামী সাধারণ-তাত্ত্বিক রাষ্ট্র পাকিস্তান” রাখাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। সরকার পক্ষ এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যবৃন্দ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কক্ষ ত্যাগ করেন। স্মরণ থাকিতে পারে, পরিষদ পূর্বেই সিদ্ধান্ত করেন যে, মুসলমান বাতীত অপরাধ কেহই পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তব্য হইতে পারিবেন না।

এই সম্পর্কে ঢাকা হইতে নব-প্রকাশিত দৈনিক “বাংলা ভাষা” এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, “পাকিস্তানের জন্মদাতা কারোদে আজম জিন্না তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে পাকিস্তানে সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ রাখিলে ‘পাকিস্তান’ একটি বিশেষ রাষ্ট্র ও বিশেষ জাতির এই যুক্তি সমর্থন করা যায় না। রাষ্ট্র-প্রধান সম্পর্কে গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ‘সংখ্যালঘুদের পক্ষে শুধু মারাত্মক ক্ষতিকর নহে, অপিচ গণতন্ত্রবিরোধী ও অস্বাভাবিক ও জাতিসত্ত্বের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার বিরোধী।”

উপসংহারে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, “বিষে পাকিস্তানই একমাত্র মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ও মুসলিম-শাসিত অঞ্চল নহে। মুসলমানের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি অমান ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সকল রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা প্রয়োজন হয় নাই। ইসলামের অক্ষুণ্ণ প্রাণবর্তাই এই সকল রাষ্ট্রকে মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ‘ইসলামী সাধারণতন্ত্র’ বোঝা করা অত্যাধিক বাড়াবাড়ি বলিয়াই আমরা গণ্য করি।” এই সিদ্ধান্তের মধ্যে “পাকিস্তানের সংখ্যালঘু তপশিলী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও পার্শীদের প্রতি ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য সর্বোপরি একটা অবিধাের ভাব” পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের অনুরোধ করা হইয়াছে।

তুর্কি সংবাদপত্রে পাকিস্তানের এই সংবিধান ও রাষ্ট্রনামের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের মতে তুর্কি জাতির ইতিহাস এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।

### পাকিস্তান ও মার্কিন দেশ

সম্প্রতি পাকিস্তান ও মার্কিনদেশের মধ্যে সামরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা বিষয়ে কিছু গোপনীয় আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে মার্কিনী সংবাদপত্র মহলে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এরূপ সন্দেহের বিশেষ কারণ রহিয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মতামত নিয়ে প্রশ্নও হইল। এই মত প্রকাশ সম্বন্ধে, এবং ইহা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

নয়া দিল্লী, ১৫ই নবেম্বর—“পাকিস্তান এবং আমেরিকার মধ্যে কোনরূপ সামরিক ব্যবস্থা হইলে দক্ষিণ এশিয়ার সমগ্র কাঠামো এবং ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে তাহার পরিণতি সুদূরপ্রসারী হইবে”—আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলিয়া প্রধানমন্ত্রী জিন্নেহর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় রকমের একটা রাজনৈতিক বোমা নিক্ষেপ করিয়াছেন।

জিন্নেহর বলেন, পাক-মার্কিন আলোচনা বর্তমানে কোন পর্যায়ের পৌছিয়াছে তাহা তিনি সঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু তাহার বিশ্বাস, আলোচনার স্তর পায় হইয়া গিয়াছে এবং ব্যাপার ‘বেশ কিছুদূর’ অগ্রসর হইয়াছে। ‘ঘটনার এই বড় রকমের ক্রম-পরিণতিতে’ তিনি ভারতের পক্ষ হইতে ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেন। পাক গণপরিষদ বর্তমানে পাকিস্তানের জঙ্গ ধর্মীয় ধরণের যে সংবিধান রচনার ব্যাপ্ত আছে তাহার পরিণাম পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ হইবে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া জিন্নেহর বলেন যে, রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী এই মধ্যযুগীয় পরিকল্পনা পরিহারের জন্য ভারত বন্ধুভাবে পাকিস্তানকে অনুরোধ করিবে। পাকিস্তানকে উহার সংবিধান সংক্রান্ত সমস্তা সম্বন্ধ পরামর্শ দেওয়া কঠিন হইলেও জিন্নেহর একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, পাক গণপরিষদের সাম্প্রতিক

সিদ্ধান্তের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদ ঘটিবে—এমন কি কাশ্মীর সমস্তা সমাধানও কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইবে।

কোবীর সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনা-এসঙ্গে জিন্নেহর বলেন যে, তিন মাস ব্যাধা-বিলেপন চলার পরও পরিকল্পিত রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হইলে সমগ্র প্রব্রুতি বৃদ্ধি লিপ্ত পক্ষগুলির নিকট পুনরায় পেশ করা হইবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ এলেন সম্প্রতি বলিয়াছিলেন, ১২০ দিন পরে এবং রাজনৈতিক সম্মেলনে না হইলে বন্দীদের ইচ্ছামত বোঝানে খুন্সী বাইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। মিঃ এলেনের এই অভিমতের সহিত তিনি একমত নহেন।

জিন্নেহর আরও বলেন, যেভাবে প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে, সেইভাবে এইরূপ একটি গুরুতর বিষয় আলোচিত হওয়ার তিনি বিশ্বাস হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারত এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। যুক্ত-রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলিতে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, আলোচনা বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, নয়া দিল্লীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের সহিত ভারত এ বিষয়ে বেসরকারীভাবে আলোচনা করিয়াছে।

প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে অনুরোধ করা হইলে প্রধানমন্ত্রী জিন্নেহর সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পর্কে সঠিক কিছু অবগত হইলে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দান করিবেন। আলোচনা ঠিক কি অবস্থায় আছে তাহা তিনি জানেন না। তবে এইরূপ চুক্তি সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং আলোচনাও বেশ কিছুদূর যে অগ্রসর হইয়াছে সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলি এই চুক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু লিখিয়াছে এবং সংবাদগুলি নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ মহল হইতে প্রাপ্ত। যুক্তরাষ্ট্রের এবং এমনকি পাকিস্তানের দায়িত্বশীল পত্রিকাগুলি এই ধরণের বাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন।

জিন্নেহর বলেন, এই চুক্তির প্রস্তাব আবার এইরূপ যে, পাকিস্তান অথবা যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে কি করিতেছে তাহার সহিত আইনসম্মত ভাবে তাহাদের কোন সংশ্লিষ্ট নাই। কিন্তু বস্তুতঃ এই বিষয়টি তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এইরূপ একটি চুক্তি সম্পাদিত হইলে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় এবং বিশেষ করিয়া ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতি ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিণাম দেখা দিবে। সেইজন্য এইরূপ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেরূপ ভাবে আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে তিনি বিশ্বাস হইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। পাকিস্তান এলাকার মধ্যে ঘাঁটি স্থাপন অথবা বিদেশী সৈন্য বাণা কিংবা এই ধরণের কিছু করা সম্পূর্ণ পাকিস্তানের ইচ্ছাধীন। পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র—ইচ্ছা করিলে পাকিস্তান স্বাধীনতা বিসর্জন অথবা স্বাধীনতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ

করিতে পারে—এ বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু এই সকল কার্যের পরিণামের সহিত তাঁহারা বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট—সেইজন্য তাঁহারা এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন।

গিলগিটে ঘাঁটি স্থাপনে পাকিস্তান সম্মতি দিতে পারে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে জিনেহরু বলেন যে, গিলগিট কাস্মীরের একটি বিরোধমূলক এলাকা। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অমূলক। তবে ঘাঁটি স্থাপনের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও কাস্মীর এলাকায় কোন কিছু করাই পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব নয়।

কোনরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্বে চুক্তি সম্পর্কে ভারতের মনোভাব ওয়াশিংটনে জানাটবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেন্ট কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি না এট প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাঁহার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তরদান কষ্টকর। তাঁহারা এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত এবং বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের সহিত আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা না করিয়া বেসরকারীভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন।

পাকিস্তান গণপরিষদ কব্বুক পাকিস্তানকে ‘ইসলামী সাধারণতন্ত্র’ ঘোষণার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া জিনেহরু বলেন যে, সম্প্রতি পঞ্জাবে ভারত ও পাকিস্তানের পুলিশের কুচকাওয়াজ সময়ে উভয় রাষ্ট্রের সরকারী কন্সটারীদেবের মধ্যে যে সৌহার্দ্য দেখা গিয়াছে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে যখন এইরূপ আন্তরিক বন্ধনের ভাব রহিয়াছে, তখন ভারত কিংবা পাকিস্তানে ভেদ সৃষ্টিকারী কোনরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া অত্যন্ত দুঃস্বপ্নের বিষয়। জিনেহরু বলেন যে, যে-কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের মতই পাকিস্তানের নিজের ইচ্ছামত সংবিধান রচনা করার স্বাধীনতা আছে। তবে দুই দিক হইতে তিনি এই সংবিধান সম্পর্কে আশঙ্কী। প্রথমতঃ মাত্রয় হিসাবে এবং দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের প্রতিবেশী ও দেশ বিভাগের পূর্বে পাকিস্তান এলাকার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার পাকিস্তানের সংবিধান সম্পর্কে আশঙ্কী। জিনেহরু বলেন, গণপরিষদের সিদ্ধান্তগুলিতে পাকিস্তান যে ধরনের রাষ্ট্র হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে পাকিস্তানের এইরূপ মনোভাবে মাত্রয় হিসাবে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত—পাকিস্তানের এইরূপ মনোভাব আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে কোন দিক হইতে উপলব্ধি করা কষ্টকর। ইহা মধ্য-যুগীয় আদর্শ এবং যে কোন গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী—ইহাট সাধারণের ধারণা।

জিনেহরু বলেন যে, পাকিস্তানের এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে এবং ভারতেও যে পরিণাম দেখা দিবে তাহার জুড়ই তিনি বিশেষ চিন্তিত। এইরূপ একটি সংবিধান রচনার ফলে দুই শ্রেণীর অথবা দুই স্তরের নাগরিক সৃষ্টি হইবে এবং এক শ্রেণীর নাগরিক যে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-সুবিধার অধিকারী সংখ্যালঘুদের মনে হীন-মজতার ভাব সৃষ্টি করিবে। রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর মধ্যে স্থায়ী

ভাব সৃষ্টির দিক হইতে ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শ অথবা প্রকৃত বাস্তব আদর্শ নয়। জিনেহরু বলেন যে, সংখ্যালঘুদের বক্ষা-ব্যবস্থা থাকিতে পারে—কিন্তু এই সামগ্রিক নীতির মূলে অধিকতর সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অধীন ব্যক্তিদের বক্ষার ভার রহিয়াছে। বাতাদের বক্ষা করা হইবে, তাহারাও এইরূপ ব্যবস্থা পছন্দ না করিতে পারে। ইহার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি ভিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি উজ্জী অথবা বৌদ্ধ নিজেদের অসহায় বোধ করিবে—তাহাদের ভবিষ্যতের কোন আশাই থাকিবে না।

জিনেহরু বলেন, পাকিস্তান গণপরিষদের এই সিদ্ধান্তে ভারতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে, তাহার জ্ঞান তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত। ১৯৫০ সনে সিয়াকং আলি পান এবং তাঁহার মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, সেই চুক্তি সম্পর্কে তাঁহারা যে যুক্তি বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তাঁহার বক্তব্যের স্বরূপ আছে, তাহাতে সিয়াকং আলি পান বলিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান সংবিধানে পাকিস্তানীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকিবে না। কিন্তু সংবিধানে সেই পার্থক্য করা হইয়াছে। তিন বংসর পূর্বে যে চুক্তি হইয়াছিল, সেই চুক্তি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন অবশ্য বর্তমানে তিনি উপস্থাপন করিবেন না। তবে বাতারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাহারা ভ্রান্ত নীতি প্রচার করিয়া সুযোগ গ্রহণের এবং বিধেয় সৃষ্টির চেষ্টা করিবে।

### দেশান্তরে বসতি ও বর্ণবিষয়

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৭শে আগষ্ট কেনিয়াবাসী বিশ হাজার ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি স্থানীয় ইউরোপীয়ান নিকীচক সমিতি এক প্রস্তাবে আগামী পাঁচ বংসরের মধ্যে কেনিয়াতে অনূন ত্রিশ হাজার ইউরোপীয় বসতিকারীকে প্রবেশ করিবার অনুমতি-দানের সুপারিশ করেন। প্রস্তাবে সন্নিবেশিত ১৮ তন এশিয়ান বসতি কারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার প্রার্থনাও করা হইয়াছে। প্রস্তাবের মর্মার্থ অনুযায়ী “কেনিয়ার ইউরোপীয় সমাজের স্থায়ীত্বের একমাত্র আশা হইতেছে এই স্থানে নূতন কোন ভারতীয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া ইহাকে ইউরোপীয়দিগের বসতি অঞ্চলে পরিণত করা।”

৩রা অক্টোবর “ওরিন্জন” পত্রিকায় এক প্রবন্ধে জীমগনভাই দেশাই এই সংবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন, “কৃষকায়দিগের মহাদেশ আফ্রিকায় ভবিষ্যতে জাতি ও বর্ণবিষয়মূলক যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা এই প্রস্তাবে দেখা বাইতেছে। অস্ত্রাধিকারী দেশের একটি মুষ্টিময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এইরূপে জায়গা ও সদাচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত হুজুম চালাইয়া দিবার সাহস পাইতে-ছেন?” পূর্ব-আফ্রিকায় ১,৮১,০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে এই ক্ষুদ্র শ্রেণিকার সম্প্রদায়ভূক্তের সংখ্যা মাত্র ৪৪,০০০। কেনিয়া প্রদেশে দেখা বাইতেছে উহার অধিবাসীদের মধ্যে ৩০,০০০ ইউরোপীয়; ২০,০০০ ভারতীয়; ২৪,০০০ আরব এবং ৪০,০০,০০০ কাস্মী। এশিয়াবাসীগণ ইউরোপীয়দের অধীনে মধ্য পর্ধ্যায়ের কাজ করেন, কাস্মীগণ সর্বহারা শ্রেণীর লোক। কাস্মীদের ভাল জমি-

জমি খেতকারগণ আইন-বলে নিজস্বের খাসজমিতে পরিণত করিয়াছে। কাকীদিগকে মাথাপিছু জিজিয়া কব (poll tax) দিতে হয় এবং তাহাদের নিজ বাসভূমে তাহাদিগকে সর্বদা একটি রেজিষ্ট্রেশন নাটিকিকেট অর্থাৎ আঙ্গুলের টিপসচিযুক্ত পরিচয় প্রমাণপত্র বহিয়া বেড়াইতে হয়।

ঐশ্যেই লিখিতেছেন, এই পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত সংবাদটিকে আমাদের বিচার করিতে হইবে। “ইউরোপীয়দিগের এই মনোভাব আমাদের আর এক দিক দিয়াও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। পশ্চিমবাসিগণ আমাদের জ্ঞান প্রাচ্যবাসীদিগের কর্ণ এই শব্দ শুধন করিতেছেন যে, আমাদের জনসংখ্যা অত্যধিক, অত্যধিক ক্রোধ ও অনাচারের তাড়নার মুহূর্ত্তে পতিত হইবার সখ যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান-নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রতীচীর নিম্নিত গর্ভনিবোধক সরঞ্জামাদির চাহিদা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ক্ষেত্রে খুলিয়া দিতে হইবে।” অল্পবলে বলীয়ান পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি জনবিরল মহাদেশে বসতির উদ্দেশ্যে এশিয়াবাসীদের তথায় রাজ্য বন্ধ করিতেছেন। কিন্তু তাহারা ক্ষয়ক্ষতি করেন না যে, “পৃথিবীর কোন ঝঞ্জে জনবাহুল্য এবং উপর ঝঞ্জে একান্ত জনবিরলতা—এই যে সমস্তা, মান-ব জাতির পক্ষে তাহার মীমাংসার স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক পথ হইল আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত পন্থায় জনবহুল দেশ হইতে জনবিরল দেশে খাজার সুবাবস্থা করিয়া দিয়া পৃথিবীর সর্ব অঞ্চল মানুষের উপকারে লাগাইয়া দেওয়া।”

বিদেশে মুষ্টিদের খেতকারদের এইরূপ উদ্ভূতপূর্ণ আচরণ বিশ্ব-শান্তি বিপন্ন করিতেছে। খেতকারদের এই সকল আইন জায়-ধর্মের বিপরীত এবং জাতিপুঞ্জের সনদেরও বিরোধী। জাতি ও বর্ণগত বৈষম্য মানবজাতির পক্ষে অবমাননাকর। ঐশ্যেই আশা প্রকাশ করিয়াছেন কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত কেনিয়া-রাজ্য ইউরোপীয়দের এই ভাঙ্গিমূলক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন। আমাদের সে আশা নাই। বিশ্বশান্তির মায়ী কুসুম শুধু আশাবাদীদিগেরই নয়নগোচর হয়। এখনও খেতজাতপুঞ্জ কেবলমাত্র শক্তিরই সম্মান জানে।

### মার্কিন সরকারের ঔপনিবেশিক নীতি

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিকট প্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকা-বিশ্বক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হনরী. এ. বাইরোড বিগত ১১শে অক্টোবর উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়ায় বিশ্ববিশ্বক পরিষদের অধিবেশনে এক বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতামত ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার প্রধান উদ্দেশ্যের বিষয় “সোভিয়েট আক্রমণের আশঙ্কা।” কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি ঝঞ্জের পরাধীন দেশগুলি এ সম্পর্কে তেমন সচেতন নহে। পরবশতঃ অবশ্যনের সংগ্রামেই তত্ত্বা জনগণ ব্যস্ত।

মিঃ বাইরোড বলেন, “বাস্তবিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের এই অভিযানই বিশ শতাব্দীর অগ্রতম সর্বাধিক শক্তিশালী সামাজিক ক্রিয়া”; কিন্তু এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে এক “স্ব-বিরোধিতা” নিহিত আছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা-ভোগের পর “স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের ঘটনাটাকে ক্রমশঃ অলীক” বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং পারস্পরিক সংহতির জন্য স্বেচ্ছায় জাতীয় সার্বভৌম অধিকারের কিছু অংশ বিসর্জন দিতেছেন। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের অভিযান সম্প্রতি “আরও অল্পত এবং সম্ভাব্যতার দিক হইতে আরও বেশী বেদনাদায়ক স্ব-বিরোধিতার” সম্মুখীন হইয়াছে। পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আজ লুপ্তপ্রায়—সেই স্থলে এক নব সাম্রাজ্যবাদ—সোভিয়েৎ সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিয়াছে। কিন্তু পরাধীন জাতিগুলি এই সাম্রাজ্যবাদের বিপদ সম্পর্কে তেমন সচেতন নহেন।

মিঃ বাইরোড স্বীকার করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক নীতি সকলের নিকট স্পষ্ট নহে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সমস্তার বিভিন্নতাই এই অস্পষ্টতার কারণ। এট নীতির ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে মিঃ বাইরোড বলেন, “আমরা সমস্ত জাতি কর্তৃক শেষ পর্যন্ত আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভে বিশ্বাস করি এবং আরও বিশ্বাস করি যে, একমাত্র বিবর্তনের পথ গ্রহণ করিলেই সবচেয়ে কম সময়ে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।”

তিনি বলেন, “আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সর্বদাই যে জাতীয় স্বাধীনতার আকারে ব্যবহৃত হইবে না এই সত্যকেও আমরা স্বীকার করি। কোনও কোনও জাতি হয়ত স্বেচ্ছায় তাহাদের অতীত শাসক জাতির সঙ্গে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বা মিলিত হইতে পারে। জাতিসমূহের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অথবা আরও সাম্প্রতিক ফরাসী ইউনিয়ন এই ধরনের ঐক্য বা মিলনের চমৎকার নিদর্শন।”

কেন যুক্তরাষ্ট্র পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার দাবীকে অবিলম্বে স্বীকার না করিয়া তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য ক্রম-বিবর্তনের পথকে পছন্দ করে তাহার উত্তরে মিঃ বাইরোড বলেন, “অসমযোচিত স্বাধীনতা অত্যন্ত বিপজ্জনক, প্রগতিবিরোধী, ও ধ্বংসাত্মক।” তাহার অভিমতে “অসমযোচিত স্বাধীনতা বলিয়া একটা কিছু আছে, তাহা যদি আমরা স্বীকার না করিতে ইচ্ছুক থাকি তবে পরাধীন জাতিগুলির অবস্থা সম্পর্কে আমরা বৃদ্ধিমন্তার সঙ্গে বা সৃষ্টিমূলক ভাবে কোনও চিন্তাই করিতে পারিব না।”

যে দেশ নিজের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ সে দেশ হইতে বিদেশী শাসন অপসারিত হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বহিরাক্রমণকেই ডাকিয়া আনা হইবে। “প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জনের পূর্বেই যদি কোনও জাতি নামেমাত্র সার্বভৌম অধিকার অর্জন করে তাহা হইলে তাহার একমাত্র পরিণতি হইল দুর্বলতা।” পরাধীন রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহা যেন স্থায়ী হয় তাহাই যুক্তরাষ্ট্রের কামনা। অধিকন্তু “জাতীয় স্বাধীনতা

যে কোনক্রমেই এশিয়া এবং আফ্রিকার অসংখ্য কঠিন ও বিভ্রান্তিকর সমস্তার সর্বস্বযোগ্য সমাধান নয়," একথাও যুক্তরাষ্ট্র সরকার জানেন এবং "বিশ্বের পরাধীন অঞ্চলে যেসব ইউরোপীয় জাতি প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহাদের শক্তি ও স্থায়িত্বে আমাদের [যুক্তরাষ্ট্রের] যে স্বার্থ আছে তাহা আমাদের [যুক্তরাষ্ট্রের] স্বীকার করিতে হইবে।" যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ তাহাদের স্বার্থ হইতে অভিন্ন এবং বিশ্বের শক্তির ভারসাম্যে এই সকল দেশের ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ বাইরোডের ভাষায় ঔপনিবেশিক প্রশ্নের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের বক্তব্য অগ্রাহ্য করিতে পারে না। "বিশেষতঃ কোনও কোনও পরাধীন রাজ্যে ইউরোপীয় জাতিগুলির যে বৈধ বৈষয়িক স্বার্থ রহিয়াছে, আমরা তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। অতীত দিকে যে ইউরোপীয় কাঠামোকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য আমাদের অনেক কিছু করিতে হইয়াছে, সেই বৈষয়িক কাঠামোর সঙ্গে ঐ সকল বৈধ স্বার্থের সংযোগের গুরুত্বও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বস্ত হইতে পারে না। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই যুক্তরাষ্ট্র পরাধীন জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের বিবর্তনের পথকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে।"

মিঃ বাইরোড বলেন, তবে "ইউরোপের বৈষয়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ ভুক্তি থাকিলেও পরাধীন জাতিগুলির অধিকার ইউরোপেরই স্বার্থের অধীনস্থ হইবে আমরা নিশ্চয়ই তাহা বলিতে চাই না। আমাদের বক্তব্য হইল সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই বেশ সতর্কতার সহিত নিজ নিজ স্বার্থের কথা বিবেচনা করুক। ইহা পরাধীন জাতিগুলির বায়ে ইউরোপের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্ন নহে। বরং-ইহা উত্তরের শক্তিবৃদ্ধির উপায় অনুসন্ধানের প্রশ্ন। বিবর্তনের পথে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে বিদেশী রাজ্যগুলিতে ইউরোপের বৈধ স্বার্থ রক্ষারও যেমন ব্যবস্থা হইতে পারে, ঠিক তেমনই সম্পূর্ণ ভাবে সম্প্রদায়ের ফলে আর্থিক স্বযোগ-সুবিধা হইতে ইহারা বঞ্চিত হইবার যে সম্ভাবনা আছে সে সম্ভাবনাও থাকে না।"

### মরক্কোর ক্রমবর্ধমান মুক্তিসংগ্রাম

মরক্কোর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানের জন্য বহুদিন হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি এই দেশটির উপর পড়িয়াছিল। অবশেষে ১৯১২ সনের ৩০শে মার্চ ফরাসীরা মরক্কো অধিকার করে। ফরাসী অধিকারে মরক্কোবাসী ক্রমশঃই সর্বস্বাস্থ্য হইতেছিল—ফরাসী অধিকারের প্রথম বৎসরের মধ্যেই মরক্কোর সাত লক্ষ হেক্টর সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি দেশবাসীর হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনে সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় মরক্কোর কৃষকশ্রেণী নিম্ন শোষণে জর্জরিত, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাও তদ্রূপ। বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ও বিদ্যালয়ে পড়িবার উপযুক্ত বয়সের ছেলেবয়েদের মধ্যে শতকরা মোট সাড়ে-সাত ভাগ বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমেরিকা মরক্কোতে প্রবেশ করে এবং মার্কিন পুঁজি রাং, দস্তা ও দেশের অগ্রগত ঐশ্বর্য কবায়ত্ত করে। আন্তর্জাতিক রক্তক্ষো 'সাপ্তা লড়াই'য়ের সঙ্গে সঙ্গে মরক্কোতে বিরাট সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

গত দুই বৎসর বাবৎ মরক্কোর স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যাপকতা অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পায়। আন্দোলনের এই প্রসারে ভীত হইয়া ফরাসীরা মরক্কোতে সন্ত্রাসবাদী শাসন কায়েম করে এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান উদ্ভিকলালের সমর্থক সুলতানকে গদিচ্যুত করিয়া ফরাসী তাবোলারকে সুলতান নিযুক্ত করে। ইহার বিরুদ্ধে দেশবাসী যে প্রবল বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেখা দেয় তাহাতে সৈন্যদল ও বিক্ষোভ-কারীদের মধ্যে সংঘর্ষের দরুন শত শত লোক হতাহত হয় এবং অনুন ২০,০০০ দেশভক্তকে কারারুদ্ধ করা হয়।

সুলতানের পদচ্যুতির বিরুদ্ধে আরব-এশীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠী জাতি-পুঞ্জের নিবাপত্তা পরিষদে আলোচনার ভক্ত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতার ফলে তাহা অগ্রাহ্য হয়; অবশ্য সাধারণ পরিষদের কার্যসূচীর মধ্যে মরক্কোর প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

### ত্রিয়েস্তে অশান্তি

ইটালী ও যুগোস্লাভ রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে যে বহুদিনব্যাপী প্রচ্ছন্ন শত্রুতা ছিল তাহা বর্তমানে ইংবেজ ও মার্কিন সরকারের অত্যাচার-দর্শিতার ফলে ধূমায়িত হইয়াছে। সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা নিম্নরূপ :

বেলগ্রেড, ১৫ই নবেম্বর—প্রেসিডেন্ট টিটো আত্ম ব্রিটেন ও আমেরিকাকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, ত্রিয়েস্তের 'এ' এলাকা ইটালীকে দেওয়া হইলে যুগোস্লাভিয়া ও ইটালীর মধ্যে বিরোধ বাধিবে।

বর্তমান বৎসরের গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে মার্শাল টিটো যে ভাষণ দেন, তাহার তুলনায় বর্তমান মন্তব্যে তিনি কোন নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই বা যুগোস্লাভিয়ার সর্বশেষ মনোভাবের নূতন কোন ইঙ্গিত দেন নাই। যুগোস্লাভ সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "টিনযুগ" মার্শাল টিটোর ভাষণের কথা উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, 'এ' অঞ্চল ইটালীকে দিলে সংঘাত অবশ্যস্তারী।

বেলগ্রেডের বিপাবলিক স্কোয়ারে এক বিরাট সমাবেশে মার্শাল টিটো বলেন, ইটালীকে ত্রিয়েস্তের 'এ' এলাকা দেওয়ার অর্থ যুগোস্লাভিয়া আক্রমণে ইটালীকে নূতন কতকগুলি সুযোগ দেওয়া।

প্রেসিডেন্ট টিটো ঘোষণা করেন যে, ত্রিয়েস্তের 'এ' এলাকা ইটালীকে দেওয়া সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা শেষ হইয়াছে, ইহা একেবারেই ভুল ধারণা। যুগোস্লাভিয়া এখন মীমাংসার প্রস্তাবে রাজী হইবে, এই ধারণা মারাত্মক। 'এ' এলাকার পণ্ডোত প্রাণের জন্য ইটালীর প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, মার্শাল টিটো পুনরায় তাহা অগ্রাহ্য করেন।



## এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাময়িক পত্রের তালিকা

“মার্কিনবার্ভা”র সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম প্রকাশ্য “লাইব্রেরী অব কংগ্রেস” ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, থাইল্যান্ড, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের প্রচলিত সাময়িক পত্রিকাসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করিতেছেন বলিয়া উক্ত কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ জানাইতেছেন। ইতিমধ্যে ১৭৬০টি সংবাদ-পত্রের নাম তালিকাকৃত করা হইয়াছে এবং আগামী মাসের মধ্যেই এই সমীক্ষা কার্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রত্যেকটি দেশের পৃথকভাবে পত্রিকা প্রকাশের স্থান, প্রথম প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার ভাষা এই তালিকার লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। ইহা ব্যতীত যে যে বিষয়ে পত্রিকাসমূহ প্রকাশিত হইতেছে তাহাও ইহাতে উল্লেখ করা হইতেছে।

লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কমিটি ১৯৪৫ সনের পর উর্দু ভাষার যে সকল উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারত হইতে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম, গুজরাটী, মরাঠী, অসমীয়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং খাসিয়া ভাষার প্রকাশিত এবং পাকিস্তানের বাংলা, উর্দু, আরবী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, পুশতু এবং সিন্ধী ভাষার প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাসমূহ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

### তটিনী দাস

বাংলার বিশিষ্ট মহিলা শিক্ষাব্রতী, বেথুন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক তটিনী দাস গত ৩০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দে বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাংলার নারীসমাজের নানাবিধ উন্নতি, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে স্বর্গতা তটিনী দাসের দান অবিস্মরণীয়। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগে স্ত্রীশিক্ষার উচ্চশিক্ষা তেমন সমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু নিজের চরিত্রবলে, স্বকল্পের দৃঢ়তায় তিনি উচ্চশিক্ষার চরম সোপানে উপনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেরণা ও উৎসাহের ফলে বাংলার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রায় ১৭ বৎসর বেথুন কলেজের অধ্যাপক হিসাবে তিনি কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য এবং ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের অগ্রতম কর্মী হিসাবে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বরিশাল জেলার এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ষণ্মাসী দাসের ছাত্রীজীবন গৌরবোজ্জ্বল। তিনি ১৯১২ সনে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯১৪ সালে আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি “সংস্কৃত” বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এ এবং “দর্শন” শাস্ত্রে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি

তাঁহার স্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রকুমার দাসের সহিত ইউরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং লণ্ডনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের তত্ত্বাবধানে টিচার্স ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। তিনি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবকের আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিক্ষাব্রতী হিসাবে গৌরবময় কর্মজীবনের শেষে ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি বেথুন কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্তি বেথুন কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব। ঐ সময়ে তাঁহার উদ্যোগে “বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ” নামে একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়; ইহা বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থ।

### ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও বিশিষ্ট ম্যালেরিয়া-তত্ত্ববিদ ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-বি, এক-আর-আই (লণ্ডন) বিগত ১৬ই অক্টোবর তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স চুবাশী বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের বহুমুখী প্রতিভা ও কঠোর বাঙালী মাত্রেরই অম্লকরণীয়। তিনি দীর্ঘকাল ধাবৎ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ‘প্যাথলজি’ ও ‘ব্যাকটেরিওলজি’র সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। প্রথম দিকে ডাঃ সরকারের সার্বাঙ্গ এসোসিয়েশনে তিনি অবৈতনিক অধ্যাপকের কার্য করেন। কারমাইকেল, অধুনা আর. জি. কব. মেডিক্যাল কলেজেও তিনি অবৈতনিকভাবে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কালজর্য সম্পর্কে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯১৭ সালে বিশেষভাবে সম্মানিত হন। ম্যালেরিয়া-তত্ত্ববিদ হিসাবেও ডাঃ চট্টোপাধ্যায় সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি কলিকাতা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এন্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি স্থাপন করিয়া সমগ্র বঙ্গে তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সোসাইটির কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সোসাইটির প্রকাশিত “সোনার-বাংলা” পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ দানের জন্য ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে বিলাতের রয় ইন্সটিটিউটের এক জন সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ভারতে সূচিকিংসকরূপে অনেকে সন্মান অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গবেষণাকারীর সংখ্যা এদেশে অতি বিহব। এই স্বল্পসংখ্যক গবেষণাকারীর মধ্যে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অগ্রতম।

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায়ই নিয়োজিত ছিলেন না, তিনি দেশভিত্তিক অগ্রগত চিন্তাও করিতেন। বাংলার মৎস্য-চাষের উন্নতিকল্পে তিনি কয়েকপানি পুস্তিকা রচনা করেন। হাজামজা নদীর সংস্কার উদ্দেশ্যেও তিনি প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। নিজ গ্রাম স্মৃচরে (২৪ পরগণা) তিনি একটি কুটীর-শিল্প সমিতি গঠন করেন। চরিত্রগুণে এবং একনিষ্ঠ দেশসেবার ডাঃ চট্টোপাধ্যায় সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া গিয়াছেন।



## শাহজাদা দারাগুজা

### শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

পিতা-পুত্রের ভাগ্যবিপর্যয়

৯

দিল্লীতে বসিয়া দারা সুলেমান গুজোর সেনাবাহিনী ও আগ্রার খবরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, চার-পাঁচ দিন পরে সম্রাটের বন্দীদশার খবর পাইয়া কোথায় পলাইবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আওরঙ্গজেবের গতিবিধির খবর পাইলে তিনি অন্ততঃ আরও দশ-বার দিন সুলেমানের জন্য নিশ্চিত মনে অপেক্ষা করিতে পারিতেন ; কিন্তু আওরঙ্গজেব আগ্রা হইতে মথুরার দিকে যাত্রা করিবার একদিন পূর্বেই তিনি দিল্লী ত্যাগ করিলেন ( ১২ই জুন ১৬৫৮ খ্রীঃ ) । এই ক্ষেত্রেও তিনি ধীরভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্ররূপে বিবেচনা না করিয়া ভয়ে কৌণিকের মাথায় লাহোরে পলাইয়া যাওয়াই প্রেরণা মনে করিলেন । এই অদৃষ্টদশিতা ও রাজ-নৈতিক সাহসের অভাব তাঁহার এবং সুলেমানের ভাগ্য-বিপর্যয় দুর্গতির শেষ পর্যায়ে টানিয়া আনিল :

তত্ত্বদশী বলিয়া খ্যাতিমান হইলেও দারা প্রাকৃত জনের ব্যাপ্তি ও সমষ্টিগত মনস্তত্ত্ব কোন দিন অনুশীলন করেন নাই—যাহা শাসক ও যোদ্ধার কৃতিত্বের প্রথম সোপান । রাজনীতি কিংবা স্বার্থের সংঘাতে চিরশত্রু অথবা চিরমিত্র বলিয়া কোন জীব ও জাতি নাই ; এই সত্য তখন দারার বুকিবার কথা নয় । শাহজাহানের বন্দীদশা এবং আওরঙ্গজেবের প্রথম রাজ্যাভিষেকের পরে সাম্রাজ্যের রাশিচক্র গুজা মোরাদের শত্রুস্থান হইতে দারার মিত্রস্থানে সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্তু বুদ্ধির দোষে তিনি এই শেষ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেন না । কূটনীতি ও সামরিক ব্যাপারে যুক্তিবৃত্ত সম্ভাব্যতার উপর অদৃষ্টের ফটিকবাধি খেলা ব্যতীত দারার তখন অন্য উপায় ছিল না, অগতঃ বড়রুমের বুকি গ্রহণ করিবার বেপরোয়া নৈতিক সাহস তাঁহার হইল না । আওরঙ্গজেব যে “ইসলাম বিপ্লব” তত্ত্বার ( political platform ) উপর ভর করিয়া শাহীতক্তে পা দিয়াছিলেন, মোরাদকে স্বর্ণ উপায়ে বন্দী করার পর উচ্চা তাঁহার পায়ের নীচ হইতে সরিয়া গিয়াছিল । এই সময়ে মৈত্রীস্থিত্রে আবদ্ধ হইয়া দারা ও গুজা যদি তাঁহার বিরুদ্ধে “সম্রাটের মুক্তি, পিতৃভ্রাতৃহীন শাস্তি” এইরূপ পাণ্টা ধ্বনি তুলিতেন তাহা হইলে তিনি তলোয়ারের জোরে জনমত শাস্ত করিতে পারিতেন না, পঞ্জাব, রাজপুতানা ও যমুনার পূর্বতীর তাঁহার শত্রুগণকে আশ্রয় করিয়া সম্রাটের মুক্তির জন্য আত্মার দিকে

ছুটিয়া আসিত । পূর্বপ্রদেশে দারা-গুজার সম্মিলিত সেনা ও জনপ্রিয়তা, রাজপুতানায় বাঠোর যশোবন্ত, উত্তরে অবস্থিত পঞ্জাব মুলতান কাবুল-সিন্ধু, দক্ষিণে বঙ্গবৈর বিজাপুর গোলকুণ্ডা এবং উদীয়মান শিবাজী, নিজের বগলে সম্মিহান হিন্দু-মুসলমান—এইরূপ অবস্থায় পড়িলে আওরঙ্গজেব উত্তর-দক্ষিণ দুই দিক সহজে সামলাইতে পারিতেন কিনা বলা যায় না ।

যাহা হউক, সময়মত দারার সুবুদ্ধির উদয় হইল না । দিল্লী হইতে তিনি সুলেমানের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন, তাড়াতাড়ি হিমাচলের পাদভূমি বরাবর কুচ করিয়া লাহোরে উপস্থিত হইবে, এবং রাজা জয়সিংহ ও দেলের খাঁকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টা করিবে । সাদুগড়ের সংবাদ পাইয়া সুলেমান ২রা জুন ( ১৬৫৮ খ্রীঃ ) কোরা শহর ( এলাহাবাদ হইতে ১০৫ মাইল পশ্চিম ) হইতে পলাইয়া আবার এলাহাবাদের দিকে চলিয়াছেন ; বর্ষা আসন্ন, কৌজ দ্বারদ্বার, লাহোর বহু দূর ।

১০

১২ই জুন ( ১৬৫৮ খ্রীঃ ) দশ হাজার সৈন্য ও অপরিমিত ধন-ভাণ্ডার লইয়া দিল্লী হইতে দারা লাহোরের দিকে চলিলেন, পথে পূর্ব পঞ্জাবের প্রধান শহর সরহিন্দ ; এইখানে উৎকৃষ্ট বাদশাহী তহবিল জমা থাকিত । শতদ্রব অপর তীর ব্যতীত আওরঙ্গজেবকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই, এই পারে সমস্তই শত্রুর হাতে পড়িবে ; এই জন্য দারা দিশা-শূন্যচিত্তে সরহিন্দের পলাতক রাজস্ব আদায়কারী “কহৌরী”-র (সং—ক্রোরা, লক্ষদাম গ্রন্থ-সংগ্রাহক) ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন এবং সরকারী তহবিলের বার লক্ষ টাকা যাহা মাটির নীচে পোতা ছিল তাহাও খুঁড়িয়া বাহির করিলেন । শতদ্রব নদী পার হইয়া তিনি তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দাযুদ খাঁ কোরেশীকে তলোয়ান গুজার-বাটে [ Jirga ; প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র আলিগড়ালের চার মাইল উত্তরে ], এবং সৈন্যদ্বয়ের খাঁকে (উপাধি ইচ্ছত খাঁ) তলোয়ানের ঘাট মাইল পূর্বে বুপার ঘাটে শতদ্রবীয়া বক্ষার্ধ রাখিয়া গেলেন এবং শতদ্রব বা সতলেজ নদীর দুই পারের সমস্ত নৌকা ধ্বংস করিয়া দিলেন । এই ভাবে আওরঙ্গজেবকে বধাসাধ্য বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ৩রা জুলাই লাহোরে দারা কিঞ্চিৎ স্থতির নিবাস ফেলিলেন ;

তখনও কিন্তু আওরঙ্গজেবের দিল্লী পৌঁছবার দুই দিন বিলম্ব !

লাহোরে পৌঁছিয়াই দারার যেন বুদ্ধি খুলিয়া গেল। আওরঙ্গজেবের মত তিনিও হাতে কলমে প্রতাপকে জয় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, নীতি প্রয়োগে ক্ষমতা-শালী ব্যক্তিগণকে সপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও দারার দৃঢ়তা ও বুদ্ধি-বিকাশের পশ্চাতে কোন রহস্ত ছিল বলিয়া সন্দেহ করা যায় ; হঠাৎ এত বুদ্ধি দার্শনিক দারার মাথায় গজাইবার নহে। লাহোরে প্রতিদিন তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; ভেরা এবং খুশ্‌আব সরকারের কৌজদার প্রসিদ্ধ যোদ্ধা খজুর খাঁ, পাঠানকোট-নূরপুরের পরাক্রান্ত ডোগরা-রাজা রাজরূপ প্রভৃতি দারার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। দারা গোপনে আওরঙ্গজেবের কর্মচারিগণকে বশীভূত করিবার জন্য বিশ্বস্ত হুকুমার মারফত চিঠি লিখিতে লাগিলেন, রাজপুতানার সামন্ত রাজগণকে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য প্ররোচিত করিলেন। লাহোর হইতে দারা অবশেষে শুজার কাছে সাম্রাজ্য ভাগাভাগির প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সশস্ত্রে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মান্তের বৃদ্ধের পর কিংবা অন্ততঃ দিল্লী পৌঁছিয়া শুজার কাছে এই প্রস্তাব করিবার বুদ্ধি হইলে হয়ত পিতা-পুত্র রক্ষা পাইতেন—বিলম্বে কার্য্যনাশ হইল।

দারা কি সত্যই এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন ? না—আওরঙ্গজেব যোকন্দমা সাজাইবার জন্য এই অভিযোগ দারার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন, বাহা তাঁহার দরবারী ইতিহাস আলমগীর-নামার মারফত আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে ? ম্যাহুসী সাহেব ককিরের বেশে আওরঙ্গজেবের ফৌজের সহিত দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়া লাহোরের দিকে পলাইয়াছিলেন এবং সিদ্ধুর সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার ছুঁড়াগ্যের সাক্ষী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য দ্বারাও এই সমস্ত ঘটনা কিছু কিছু সমর্থিত হয় ; সুতরাং দারার বোধোদয়ে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। একটি ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়, দারার এই কর্ম্মতৎপরতার পশ্চাতে নাদির বাহুর\*

প্রেরণা নিশ্চয়ই ছিল। নূরপুর পাঠানকোটের ডোগরা রাজপুত্র রাজা রাজরূপ দারার আমন্ত্রণে তাঁহার সাহায্যার্থ লাহোর আসিয়াছিলেন। দারা তাঁহাকে সেনা সংগ্রহের দশ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়াছিলেন। রাজরূপ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাইবেন, এই সময় নাদির বাহু তাঁহাকে অন্তরমহলে ডাকিয়া পাঠান। স্বামীর সপক্ষে রাষিবার জন্য নাদির তাঁহাকে সেকালের প্রথমতঃ ছুঁ-খোয়া জল পান করাইয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং নিজের গলার বহুমূল্য মুক্তার মালা তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন।\* লাহোরে দারা মোটা বেতনে সৈয়দ মোগল ও পাঠান জাতীয় বিশ হাজার নূতন অশ্বারোহী ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। তিনি ভরসা করিয়া-ছিলেন সেনাপতি দায়ুদ খাঁ শতক্রতীরে বর্ধার দুই তিন মাস আওরঙ্গজেবের ফৌজকে বাধা দিতে পারিবে এবং ইতিমধ্যে পুত্র সুলেমান নিশ্চয়ই লাহোর আসিয়া পৌঁছিবে। দারার সঙ্গে কয়েকজন ফিরকী গোলন্দাজ অফিসার আসিয়াছিল। কয়েকটি বিপদ এড়াইয়া ম্যাহুসীও লাহোরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিমকহালার্দী মনে করিয়া দারার চোখে জল আসিল, এবং বলিয়া উঠিলেন, “সাবাশ, সাবাব ! যাহারা বহুকাল আমার অসীম অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তাহারা এই বিপদে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, আর এই ফিরকী বাচ্চা ?”

১১

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। তখনও ধর্ম্মান্তের বৃদ্ধে মহারাজ যশোবন্তের পরাজয় হয় নাই, কুমার সুলেমান খুল্লতাত শুজার সুরঙ্গগড় রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁকে মুক্তের-দুর্গে কোণঠাসা করিয়াছেন, তৈমুর বংশের দারা ও মৌজ্জাই নাড়ী চতুর শুজা বিলক্ষণ বুদ্ধিতে, শাহজানের পুত্রগণ যদি বাপকে ডিঙাইয়া শাহীতক্তে বসিতে চায়, তাহা হইলে সুলেমান, দারাকে পাশ কাটাইয়া ঐ গদীতে বসিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িবে কেন ? এই জন্য তিনি নাকি সঙ্কল্পদেশপূর্ণ দীর্ঘ পত্র সুলেমানের চোখে পড়িবার জন্য মুক্তের দুর্গের প্রাচীরগাত্রে লাগাইয়া রাষিয়াছিলেন ; সত্যমিথ্যা খোদাতালা জানেন, তবে ঐ শরণের এক চিঠি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে শুজা তাঁহার সুশীলা নন্দিনীসহ শাহজানের গোটা বাদশাহীটা জামাতা সুলেমানকে প্রদান করিয়া স্বয়ং ছনিয়াদারীর বন্ধু হইতে অবসর লইবার সাধ সক্ষম প্রকট করিয়াছিলেন। বাহা হউক ত্রাতুশুভ্রে চোপ গিলিল না, তাহার যুদ্ধোত্তম বিত্ত হইল, মৌজা রাজা তাহাকে বাগ মানাইতে পারিলেন না। ইহার কিছু

\* দারার প্রধান মহিলা ; আসল নাম করিমউরিসা বেগম। ইনি শাহজাদা পরবেজের (জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র) কন্যা। স্বামী যে পরিমাণ অপদার্থ কিংবা দুর্ভাগ্যবান, স্ত্রী ততই বুদ্ধিমত্তা ও সাক্ষী হওয়া সে যুগেও দেখা যায়। পরবেজ অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রী অধিক স্থিরবুদ্ধি ছিলেন। যাহার গুণ করিমউরিসা পাইয়াছিলেন এবং দারার সভ্যদর্শনের (বখা সুলেমান ও জাদী বেগম) মধ্যে পিতা অপেক্ষা দারার চরিত্রই অধিক পবিত্র, দারার চরিত্রে যে সনাতন গুণের অভাব, সেগুলি নাদিরের মধ্যে দেখা যায়, তবে নূরজাহানের মত ‘অবিভীয়া’ হইবার ছরাকাল নাদিরের ছিল না।

দিন পরে ধর্মাত্মের দুঃসংবাদ মুক্তেরে পৌঁছিল। সম্রাট ও দারামীজা রাজা জয়সিংহের কাছে লিখিলেন, তাড়াতাড়ি শুজার সহিত সন্ধি করিয়া যেন অবিলম্বে দ্রুত আগ্রায় চালিয়া আসেন; সুলেমানের কাছেও অমুরূপ আদেশ আসিল। এই খবর পাইয়া সুলেমান মুক্তেরের অবরোধ উঠাইয়া আগ্রায় ফিরিবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন; কিন্তু মীর্জা রাজা তেমন কোন গরজ দেখাইলেন না, ঘোরে মুহুঃ সন্ধির কথা-বার্তা চালাইতে ও শুজার দূত মীর্জা জান বেগকে রাজসিক আতিথ্যেরতায় আপ্যায়িত করিতেই প্রায় আট দশ দিন নষ্ট করিলেন। প্রথম খবরের পর সম্রাট মীর্জা রাজাকে আর এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া অন্ততঃ তিনি যেন নিজ তাবিন ও অস্ত্রাস্ত্র রাজপুত্র মনসবদারগণের ফৌজ লইয়া তৎক্ষণাৎ আগ্রা যাত্রা করেন; অথচ তাঁহাকে ছাড়িয়া সুলেমানও যাত্রা করিতে পারিলেন না। অবশেষে ৭ই মে উভয় পক্ষে স্থিতাবস্থা সন্ধি স্থাপিত হইল, সুলেমান ও জয়সিংহ মুক্তের হইতে আগ্রা রওনা হইলেন। জয়সিংহকে দ্রুত পথ অতিক্রমে বাধ্য করিবার জন্য সুলেমান দুই-এক মঞ্জিল আগেই চলিতে লাগিলেন; এই ভাবে পঁচিশ দিন পরে ২রা জুন বাদশাহী ফৌজ এলাহাবাদ হইতে একশ' পাঁচ মাইল পশ্চিমে কোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের দূত, মীর্জা রাজা এবং দেলের খাঁ রোহিলার কাছে চিঠি লইয়া আসিয়াছিল। দারার পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া মীর্জা রাজা সুলেমানকে সাফ জবাব দিলেন—তিনি বিজয়ী শাহজাদা আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দিবার জন্য আগ্রা যাইবেন; সুলেমান যেখানে ইচ্ছা, হয় দিল্লী না হয় এলাহাবাদে যাইতে পারেন। সুলেমানকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য আওরঙ্গজেব রাজার কাছে লিখিয়াছিলেন। এই অবস্থায় এত দূর নীচে নামিতে বোধ হয় তাঁহার বিবেকে বাধিল। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার এইরূপ চেষ্টায় কচ্ছবাহ ব্যতীত অস্ত্র রাজপুত্র অগ্রসর হইত না, দারার প্রতি বিশ্বস্ত সৈয়দ ও অস্ত্রান্ত মুসলমান মনসবদারগণ প্রবল বাধা দিত, দেলের খাঁও ইহা সহ্য করিতেন না। দেলের খাঁর কিছু মনুষ্য ছিল। তিনি সুলেমানকে এলাহাবাদে গঙ্গা পার হইয়া দোয়াবে পাঠান-উপনিবেশ শাহজাহানপুর জেলায় আশ্রয় লইতে বলিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহার জন্য পাঠানদের এক নতুন ফৌজ সংগ্রহ করিবার ভরসাও দিলেন। ৪ঠা জুন

তারিখে উক্ত পরামর্শমত সুলেমান এলাহাবাদ বাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে কুচক্রী মীর্জা রাজা সব বানচাল করিয়া দিলেন। বাহাদুরপুরের যুদ্ধের পর হইতে মীর্জা রাজা দেলের খাঁকে তাঁহার যশঃস্পর্শী ভারী শত্রু জানে জঁধা করিতেন এবং সুলেমানের উপর দেলের খাঁর প্রভাব তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। এখন তিনি দেলের খাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী মুক্তবী সাজিয়া বসিলেন। তিনি দেলের খাঁকে প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া বলিলেন—নিমকহালালীর জন্য বাজে ভাব-প্রবণতার দোষে সুলেমানের সঙ্গে লইয়া নিজের সর্কনাশ ও পাঠানের দুর্গতি যেন খামকা ডাকিয়া না আনেন; শাহজাহান ও দারার দৌলত শেষ হইয়াছে, আওরঙ্গজেবের কোপ হইতে দুদিন পরে কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। দেলের খাঁ ইহাতে দমিয়া গেলেন, শেষ মুহুর্তে সুলেমানের সঙ্গে এলাহাবাদের দিকে যাইতে রাজী হইলেন না। দেলের খাঁর দেখাদেখি গঙ্গা-যমুনার দোয়াবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাহাদের বাড়ীঘর তাহারও সুলেমানকে বর্জন করিল, বাইশ হাজারের মধ্যে মাত্র ছয় হাজার সৈন্ত তাঁহার সঙ্গে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত চলিল।\*

এলাহাবাদে পৌঁছিয়া কুমার সুলেমান কংকণ্ডবাবিমুদ্র হইয়া পড়িলেন। এইখানে তিনি সংবাদ পাইলেন দারা ১২ই জুন দিল্লী হইতে লাহোরের দিকে পলাইয়া গিয়াছেন। সাত দিন নানা জল্পনা কল্পনায় বুধা নষ্ট হইল, কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন সুবা এলাহাবাদের স্বাধীন শাসক হিসাবে ঐখানে থাকিয়াই সেনাবল বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত; কিন্তু শুজা এবং আওরঙ্গজেবের মাঝখানে পড়িয়া তিনি কত দিন আশ্র-রক্ষা করিতে পারিবেন, ইহাতে পিতার কোন কার্য সিদ্ধ হইবে? অস্ত্র কয়েক জনের মত হইল এলাহাবাদ হইতে পাটনায় শুজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহায্যে আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করাই প্রকৃষ্ট উপায়। শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে সুলেমান রক্ষা পাইতেন, দারার ভবিষ্যৎও কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হইত। দারার বিশ্বস্ত বারুহাবাসী সৈয়দ সৈন্যাধ্যক্ষগণ সুলেমানকে উপদেশ দিলেন গঙ্গার উত্তর কূল খরিয়া মধ্য দোয়াবে তাঁহাদের এলাকায় গেলে ঐখান হইতে গঙ্গা পার হইয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে পঞ্জাব সীমান্ত অতিক্রম করা দুরূহ হইলেও অসম্ভব নয়।

\* ধর্মাত্মের যুদ্ধের (১৫ই এপ্রিল) খবর মুক্তেরে পৌঁছিতে দশ দিনের বেশী সময় লাগে নাই; অথচ শুজার সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল ৭ই মে অর্থাৎ বাইশ দিন পরে।

\* ম্যাহুসী লিখিয়াছেন, সুলেমান, মীর্জা রাজা ও দেলের খাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করিবার জন্য এক বড়বন্দ করিয়াছিলেন। সুলেমানের শলা-চিকিৎসক আশাদানী সেকেন্দর বেগ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজার কাছে সন্তুষ্ট হইয়া দিয়াছিল। এই সেকেন্দর বেগের কাছেই এই গল্প ম্যাহুসী শুনিয়াছিলেন। অন্তের কথা সত্য মিথ্যার জন্য ম্যাহুসী বিশেষ সাধা খামাইতেন বলিয়া তাঁহার *Storia* পড়িলে মনে হয় না। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করিয়া ইতিহাস লেখা যায় না (*Storia*, i 285-6)।

কুমার সুলেমান এলাহাবাদ দুর্গে বারুহাবাসী সৈয়দ কাসিম খাঁর হেফাজতে শাহী লটবহর অধিকাংশ জীলোক ও চাকরবাকরকে রাখিয়া হাল্কা সরঞ্জাম (light kit) লইয়া ১৪ই জুন লক্ষ্মী-মোরাধাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন। মোরাধাবাদ হইতে নগীনা পৌছিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রত্যেক ঘাটে তাঁহার ফৌজ দেখিলেই স্থানীয় মাঝিমাঝা অপর পারে সরিয়া পড়ে। এই ভাবে গঙ্গার উজান চলিতে চলিতে তিনি হরিদ্বারের অপর তীরে চণ্ডী নামক স্থানে তাঁপু ফেলিলেন।

এই জায়গা গাড়োয়াল-তীনগরের\* নাক-কাটি রানীর হিমাচল রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত। সুলতান মহম্মদ তোগলকের সময় হইতে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কোন মুসলমান সেনা এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া নাক লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। দরবারী ঐতিহাসিক লাহোরী লিখিয়া গিয়াছেন, সোনার লোভে শাহজাহানের নামজাদা আমীর শাহাওয়ালপুরের ফৌজদার নেজাবত খাঁ এই “নাক-কাটি রানী”র রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেহাছন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নাক-কাটি রানীর উত্তরাধিকারী রাজা পৃথ্বীচাঁদ জাহানারা ও দারার মারফত আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; পাহাড়ের ভিতরে ঢুকিলে শাহী সন্ত্রের নাকের ডগা কাটা বাইবার আশঙ্কা দেখিয়া সস্ত্রাট কিছু নজর ও নামমাত্র বস্তুতা স্বীকার মঞ্জুর করিয়া যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কুমার সুলেমান বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার কন্ঠচাঁদী ভবানীদাসকে সাহায্যের আবেদন লইয়া রাজা পৃথ্বীচাঁদের কাছে পাঠাইলেন এবং উত্তরের প্রতীক্ষায় ঐ স্থানে কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

১২

ইতিমধ্যে সুলেমানের সেনাবাহিনীকে বেড়াঙ্গালে ফেলিবার জন্য আওরঙ্গজেব দিল্লী হইতে খান-দারান্ নাসিরী খাঁকে এলাহাবাদের দিকে এবং শায়েস্তা খাঁকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব তাল্লাশ করিয়া গঙ্গার তীর বরাবর হরিদ্বারের দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন। কুমার সুলেমান পাছে শায়েস্তা খাঁর দৃষ্টি এড়াইয়া যমুনার পারে আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উজানে যমুনা অতিক্রমণে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শেখ মীর এবং দেলের খাঁর অধীনে আর এক দল সেনা নদীর দক্ষিণ তীরে মোতায়েন রাখিলেন। শায়েস্তা খাঁ গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া হরিদ্বারের দিকে আগাইয়া চলিলেন, তাঁহার সহকারী মনসবদার ফিদাই খাঁ হাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব পুখ

নামক খেয়াঘাটে ৩৭ পাতিয়া রহিল; কারণ লক্ষ্মী হইতে সুলেমানের ফৌজ এইখানে আসিয়াই গঙ্গা পার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সেনার বেড়াঙ্গালের বাহিরে আওরঙ্গজেবের গুপ্তচর ও কূটনৈতিক পত্রের জাল আরও বহুদূরে হিমাচল পর্য্যন্ত ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। কুমার পাহাড়ের রাজা গাড়োয়াল-তীনগরের রাজার প্রতিবেশী, সুতরাং সহজাত শত্রু। তিনি এক চিঠিতে জানাইলেন, রাজা পৃথ্বীচাঁদের সাহায্যে হরিদ্বারে গঙ্গা পার হওয়ার জন্য সুলেমানের ফৌজ ঐ দিকে চলিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়াগাত্র শায়েস্তা খাঁকে পিছনে ফেলিয়া ফিদাই খাঁ বড়ের বেগে হরিদ্বারের দিকে ধাবিত হইলেন এবং চক্ষিণ ঘণ্টার মধ্যে ১৬০ মাইল বোড়া দৌড়াইয়া অপরাহ্নে হরিদ্বার পৌছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ জন সওয়ার; ঠিক ঐ সময়ে অপর পার হইতে সুলেমান নদী পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত। ঐ পারে শত্রুর আকস্মিক আঘাত্বে তাঁহার সেনা দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল, ঐ শত্রুর বলাবলের খবর কে লইবে? গুজবের গরমে ৫০ জন ৫ হাজার হইয়া গেল, উহাও আবার স্বয়ং আওরঙ্গজেবের অগ্রগামী ফৌজ।

এই অবস্থায় পিতার সহিত মিলিত হইবার শেষ আশা বিসর্জন দিয়া সুলেমান তীনগর ব্যতীত নিজের আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন না, তাঁহার ফৌজে ভাঙ্গন ধরিল। বিঘস্ত সৈয়দগণ শত্রুর হাতে তাঁহাদের জীপুত্রের কি দশা হইবে ভাবিয়া সুলেমানকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তীনগরের রাস্তায় সুলেমানের উপদেষ্টা এবং পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধ সেনানী বাকী বেগ যত্নের কবলগ্রস্ত হইলেন। বাকী বেগ এই পর্য্যন্ত নানা বিপর্যায়ের মধ্যেও সুলেমানের ফৌজকে সামলাইয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার যত্নের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্ত-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া ছয় হাজার অস্বারোহীর মধ্যে মাত্র দুই হাজার তীনগরের দিকে চলিল। রাজা পৃথ্বীচাঁদ রাজধানী হইতে চার মঞ্জিল দূরে সুলেমানকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানাইলেন; কিন্তু শাহী লটবহর, হাতী বোড়া ও দুই হাজার সওয়ার তীনগর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে রাজী হইলেন না, যেহেতু তাঁহার গরীব দেশে এতগুলি মানুষ ও জানোয়ারের খোরাক জুটিবে না। দ্বিধাগ্রস্ত সুলেমান সাত দিন পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া কোন কুল-কিনারা পাইলেন না। অবশেষে তিনি রাজার সন্ত মনিয়া লওয়া ব্যতীত গতান্তর দেখিলেন না। যাহারা এত দিন নিমকহালালী করিয়াছে, শত্রুর চক্রান্তে পাহাড়ে বেধোরে মারা যাওয়ার ভয়ে তাহারাও নিমকহারামীর পথ খুঁজিতে লাগিল। সুলেমানকে তীনগর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহার অন্তরবর্ণ এক বড়ঘম্ম করিল এবং এলাহাবাদ-দুর্গাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত সৈয়দ

\* তীনগর বর্তমানে পৌরী জেলার অন্তর্গত অলকানন্দার উপত্যকার বহিষ্ঠ একটি বড় গ্রাম।

কাসিম খাঁর জাল নাম স্বাক্ষরিত এক ভূয়া চিঠি তাঁহার কাছে উপস্থিত করা হইল, যেন কাসিম খাঁ এই মর্মে লিখিয়াছেন—আগ্রা হুগ হইতে বন্দী সম্রাট শাহজাহানকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শাহ শুজা বিরাট সেনাবাহিনী ও নৌবহর লইয়া এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন এবং কুমার সুলেমানের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এই চিঠি আসল মনে করিয়া সুলেমান রাজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক বিদায় লইলেন এবং এলাহাবাদ পৌঁছিবাব জন্য ব্যগ্র হইয়া আবার নগিনা\* পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িলেন। এইখানে বিশ্বাসঘাতকের দল শত্রুর জালের ভিতর সুলেমানকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল, মাত্র সাত শত সওয়ার তাঁহার সঙ্গে রহিল। কপাল চাপড়াইয়া হত-ভাগ্য সুলেমান দারুণ বর্ষার মধ্যে আবার পাহাড়ের দিকে ছুটিলেন। তিনি নগিনা হইতে পলায়ন করিবার আঁঠার ঘণ্টা পরেই মোরাদাবাদের নূতন আলমগীর-শাহী ফৌজদার

এখানে উপস্থিত হইল—এইবার শিকারী কুকুর ও ধরগোশের দৌড়। সঙ্গে অন্তঃপুরের দুই শত পর্দানশীন স্ত্রীলোক লইয়া সুলেমান মহা কাঁপরে পড়িলেন, অবশেষে অধিকাংশকে পথে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া উপায় রহিল না, সাত শতের মধ্যে পাঁচ শত সওয়ার উধাও হইয়া গেল, সুলেমান কোথায়ও বিশ্রাম না করিয়া উর্জ্জ্বাসে পলাইতে লাগিলেন, পাহাড়ে পৌঁছিতে পৌঁছিতে মাত্র সতর জন অশুচর অবশিষ্ট রহিল। আগষ্ট মাসের (১৬৫৮ খ্রীঃ) প্রথম সপ্তাহে ভরা বর্ষায় হুগম পাহাড়ী রাস্তায় কুমার সুলেমান, তাঁহার স্ত্রী ও দুই-চারি জন স্ত্রীলোক, দাই-ভাই (foster brother) মহম্মদ শা ও সতর জন অশুচর সঙ্গে লইয়া সম্ভবতঃ কোটদার ঘুরিয়া গাড়েয়াল-ক্রীনগরের দিকে চলিলেন।

রাজা পৃথ্বীচাঁদ সুলেমানকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং দুই বৎসর পাঁচ মাস পর্য্যন্ত দোঁদগুপ্রতাপ আওরঙ্গজেবের প্রলোভন, কুকুটি ও যুদ্ধোচ্চম উপেক্ষা করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। উপকারের প্রতিদানে বাঁহারা দারার অনিষ্টসাধন করেন নাই এরূপ অতি অল্প কয়েক জনের মধ্যে রাজা পৃথ্বীচাঁদ সর্বাগ্রগণ্য।

\* নগিনা বিজ্ঞানীর জেলায় অবস্থিত একটি শহর ও রেলস্টেশন (O. R. Ry.)। হরিদ্বারের দক্ষিণে মোরাদাবাদের উত্তরে মাঝামাঝি স্থান, এইখান হইতে পূর্বোত্তর দিকে Koldihara গিরিপথ।

### সংশোধন ও সংযোজন

	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঞ্জীকৃত	হইবে না	হইবে
ভাদ্র, ১৩৬০	৫২৫	১	১৯-২০	দাক্ষিণাত্য তরঙ্গিনী এই সেনাপ্রবাহের	দাক্ষিণাত্য সেনাপ্রবাহের
আশ্বিন, ১৩৬০	৬৫৯	২	২০-১	ধূলিরাশির দ্বারা আঘাতের	ধূলিরাশির দ্বারা ধনাত্মক হইয়া আঘাতে
"	"	"	২৫-৬	হরাবল লইয়া স্ব স্ব বাহিনীকে	হরাবল লইয়া রাও ছত্রমাল
৬৬০	২	১৭		যাহা পাইল...লাগিল	যাহা পাইল গাপ্ করিয়া লইল
"	"	"	৩২	ফিরোজজঙ্গের সহিত আহত	ফিরোজজঙ্গের সহিত যুদ্ধে আহত
৬৬৩	১	১৭		ক্রান্ত রাজপুত	ক্রান্ত রাঠোর
"	"	"	২১	আওরঙ্গজেবের	আওরঙ্গজেব
"	"	"	২৪	রক্ষা	রক্ষা এবং
"	"	"	২৮	বিক্রান্তমুক্তি	বিক্রান্তমুক্তি
৬৬৪	১	১৯		হাওদাসহ	রামসিংহের হাওদাসহ
"	২	২		সর সরি	- -
"	"	"	১১	সাঁজোয়ার	সাঁজোয়া
৬৬১	২	২		যোদ্ধা প্রাণের	যোদ্ধাগণ প্রাণের

## পথিক

### শ্রীশ্রবোধ বসু

প্রায় দুই শ' মাইল আসিবার পর এই প্রথম বাধা পাইলাম। বিরক্তিতে সজোরে শ্রেক কষিলাম; ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করিয়া চৌদ্দ মিলিগনের দানব দাঁড়াইয়া পড়িল।

সকাল হইতেই ছুটি তহি। হাওড়ার পুল যখন পার হই তখন কাক-ভোর; ট্র্যাফিক বা ট্র্যাফিক-নিয়ন্ত্রণের কড়া-কড়ি ছিল না। তার পর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পরিয়া সমানে ছুটিয়া আসিয়াছি, কোথাও বাধা পাই নাই। হুগলীর আগে পর্যন্ত জনপদ ও বেপারোয়া পথচারী জন ও যানের বাঙলা; তবুও একবারও থামিতে হয় নাই। এমন কি, ভীরাপুবে রেলওয়ে সেভেল ক্রসিংটিও অবলোকাক্রমে পার হইয়া আসি। এটি যে কত বড় সৌভাগ্য তাহা ভুক্তভোগী মাএই জানেন; ট্রেন পাস করার অপেক্ষায় অন্ততঃ পনেরো মিনিট এইখানে থাড়া না দাঁড়াইয়া কখনও রাস্তা খালি পাই নাই। তারপর হইতে সৌভাগ্যের মরশুম চলিয়াছে; রাস্তায় যেখানেই রেলের ক্রসিং পড়িয়াছে, হয় সেখানে দ্বার অব্যাহত পাইয়াছি, নয় ত আমার ছুটন্ত যানটি হাজির হওয়ামাত্র ফটক খুলিয়া গিয়াছে। যাত্রালগ্নটি আজ নিশ্চয়ই শুভ ছিল; এই সৌভাগ্য চলিতে থাকিলে নন্টপ দোড় না হোক, স্বচ্ছমত চলিবার একটা রেকর্ড স্থাপন করিতে পারিতাম। এমন সময় গন্তব্য হল হাজারিবাগের মাইল পনেরো মাত্র দূরে সৌভাগ্য আমাকে পরিত্যাগ করিল। রেল-ক্রসিংয়ের বন্ধ হওয়া ফটকের সামনে নিরুপায় ভাবে অনিচ্ছিকালের প্রতীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। সারাটা দিন শ্রাবণের আকাশের সঙ্করমাণ মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়াছি; ছুটের প্রতিযোগিতায় উহার যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছে, এমন মনে হয় না। এইবার আমার দুর্দশা দেখিয়া দিগন্তজোড়া আকাশে উহার গড়গড় করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং সকৌতুকে আমার গাড়ীর ছাদে জোর এক পশলা রপ্তি ছিটাইয়া দিয়া সহাস্তে সমুখে আগাইয়া গেল।

রাস্তার দু'দিকে অসমতল ক্ষেত। ডান দিকে দিগন্ত বরাবর উঁচু পাশাড়ের একটা অংশ দেখাল নিরুদ্দেশ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বাঁ দিকে রাস্তার গা ঘেঁষিয়া এক টুকরা জঙ্গল দৃষ্টিকে যথাসাধ্য বাধা দিতেছে, কিন্তু উহার ভিতর দিয়া রেলের বাঁধটা পুরাপুরি ঢাকিতে পারিতেছে না। এই দুর্গম প্রদেশ হইতে লাইন বাহির হইয়া আসিয়া পিচ-ঢালা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ভেদ করিয়া অর্ধ চন্দ্রাকারে ডান দিকের সুদূর পর্যন্তবেরার পাদদেশ দিয়া আগাইয়া গিয়াছে।

অব্যাহত আকাশ, দিগন্তজোড়া পৃথিবী, আশেপাশে কোন গ্রাম বা জনমানবের কোন বসতিই চোখে পড়ে না। রেল-ক্রসিংয়ের কাছাকাছি ইটের গুমটি থরটিকেই সভ্যতার এক-মাত্র নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

পনেরো মিনিট অপেক্ষার পর গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে বহুবার হর্ণ বাজাইয়া ও ইলেকট্রিক হুটারের আওয়াজ করিয়া এই অথবা বিলম্বের প্রতি গুমটি-ওয়ারার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিছুই ফল হয় নাই। এইবার নিজেই হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার ডেরায় হানা দিলাম।

আমার প্রতিবাদের সেও বিরক্তিতে প্রতিবাদ করিল। কহিল, নিকটতম স্টেশন পাঁচ মাইল দূর; সেখান হইতে সঙ্কেত পাইয়াই সে ফটক বন্ধ করিয়াছে। পর পর বিভিন্ন দিকের ছোটো ট্রেন পাস করিবে; অন্ততঃ আশ্বিনটার আগে ফটক খোলা সম্ভব নয়। বলিয়া কোনরূপ আদর-আত্মীয়তা না দেখাইয়া সে আবার আটা সানিতে বসিল।

অগত্যা রেল-লাইনের স্লিপারের উপর দিয়া হাঁটিয়া গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে ফিহিয়া আসিলাম। রপ্তিধৌত রাস্তাটা চক্ চক্ করিতেছে; যত দূর দেখা যায় মাছুর বা যানের চিহ্নমাত্র নাই। যেন বিপুল শত্রুদ্রীর সবুজ বসনের অনন্ত বিস্তৃত কালো পাড়। রাস্তার উভয় পাশে উঁচু গাছের সারি; তার পর জনহীন বন্ধুর প্রকৃতি। অস্তুত মায়া আছে এই রাস্তায়। যেন এক সমাপ্তিহীন চলচ্চিত্রের রীল। এই পথে গাড়ী চাপাইতে চালাইতে কত বার ভাবিয়াছি, রাস্তার ধারের কোন “নিরীক্ষণ বাংলা”র খামকা ছোটো দিন কাটাইয়া রাস্তাটার সঙ্গে ভাব করিয়া লই; পিঠ-উঁচু যে পাহাড়গুলি শারাক্ষণ রাস্তার সঙ্গে দৌড়াইতে থাকে, তাহাদের অনেককণ ধরিয়া লক্ষ্য করি, তোপচাঁচীর ডাক-বাংলাটা দেখিয়া আজও একবার লোভ হইয়াছিল। কিন্তু দেবী করিবার আজ মোটেই উপায় ছিল না। হাজারীবাগে সন্ধ্যার আগেই পৌছানো দরকার; কন্ট্রাক্টের ষড়়া তৈরী করিয়া সেখানে পার্টির লোক সহিব জ্ঞাপেক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যেই সিডিউল হইতে কিছুটা পিছাইয়া পড়িয়াছি। হুগাপুর ফরেস্টের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড যেখানে তরঙ্গায়িত হইয়া একবার তেতলায় উঠিয়া পরের বৃহৎ আবার একতলায় নামিয়া আসিয়াছে, সেখানে নাগরদোলায়



চড়িয়া রীতিমত ক্রান্তিবোধ মা করিলে স্বেচ্ছায় আসানসোল রেল-স্টেশনের দোতলায় রেস্তোরাঁতে দুপুরের খানা খাইতে নামিতাম না। এখন অনুতাপ হইতে লাগিল, কেন আর একটু তাড়াতাড়ি সে পর্ক শেষ করি নাই; আর কয় মিনিট আগে আসিলে হয়ত এখানে এমন আটকা পড়িতে হইত না।

আবার টিপিটিপি বৃষ্টি শুরু হইয়াছে। সারাটা দিনই এমনই চলিয়াছে। গাড়ীর দিকে পা চালাইলাম। এইবার গাড়ীর পনেরো-কুড়ি হাত পিছনে, পথের পাশেই একটা মুদির দোকান নজরে পড়িল। অকূল সমুদ্রে ইহাকে লাইট-হাউসের মত মনে হইল। জায়গাটাকে যতটা নির্জন মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইলে ইহা ততটা নির্জন নয়। গতিহীন গাড়ীর গরমে হজম হইবার চেয়ে ওখানে হাজির হইলে কেমন হয়? সিগারেটের রেশনের খাটতি পড়িয়াছিল; সেই অজুহাতে মুদিখানার দিকে আগাইয়া গেলাম।

মাটির দেয়ালের ছোট ঘর; ছাদটা খোলায়। দোকানের এক দিকে মুদিখানার উপযুক্ত নানা সামগ্রী সাজাইয়া রেলের গুমটিওয়ালার মত নীল বস্ত্রের ফতুয়া গায়ে বুড়া এক মুদি বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল। ঘরের অপর দিকে একটা অয়েল-ক্লথ মোড়া টেবিলকে বেষ্টন করিয়া গোটাকয়েক জীর্ণ চেয়ার চায়ের খন্দের অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু কোনও ক্রেতা নাই।

‘গোল্ড ফ্লেক সিগারেট ছায়?’ বিহারের বাসিন্দার পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্য ‘আছে’র পরিবর্তে ‘ছায়’ লাগাইয়া দিলাম।

লোকটি হিসাব হইতে চোখ একটু তুলিয়া একবার তাকাইয়া দেখিল, তাৎপর্য বিনা বাক্যব্যয়ে কয়েক মুঠো সিগারেটের প্যাকেট ও টিন সামনে আনিয়া উপস্থিত করিল। গোল্ড ফ্লেক এবং তার চেয়ে বহু উৎকৃষ্ট সিগারেটের সংগ্রহ! এতটা আশা করি নাই; একটু বিস্মিত হইয়া একটা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের টিন তুলিয়া লইলাম।

নিঃস্বার্থেই সিগারেটের মূল্য ও ফেরত-চেঞ্জের আদান-প্রদান হইল। বোধ হয় হিসাব লইয়া ব্যস্ত থাকাতেই মুদি আলাপ-আলোচনায় উৎসাহ দেখাইল না। কিন্তু ইতিমধ্যে বৃষ্টি জোর করিয়াছে; সম্পূর্ণ না ভিজিয়া গাড়ীতে ফিরিবার উপায় নাই। অগত্যা নিজের গরজেই কহিলাম, ‘চায় মিল সকে?’

এইবার মুদি হিসাবের খাতা সরাইয়া রাখিয়া ভাল করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইল। কহিল, ‘হ্যাঁ,

পাবেম।...বাবুমশায় বাঙালী তো? আমিও বাঙালী। নাম খুবরি দাস। চেয়ারে এসে বসুন। গরম জল চড়ানোই আছে; আমি নতুন চা দিয়ে চা তৈরি করে দিচ্ছি।’ বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এখন দেখিলাম, বৃদ্ধের একটা পা কাঠের।

যথা আজ্ঞা একটি নড়বড়ে চেয়ারে আসিয়া বসিলাম। কাঠের পা ঠক্ঠকিিয়া দোকানী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে পিছনের পাকশালায় গেলেন। এখান হইতেই জলন্ত তোলা-উনান ও তাহার উপরকার টগবগায়মান কেবলি নজরে পড়িতেছিল। এই কেবলিসহ অবিলম্বেই তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইবার এই কেবলিই পেয়ালার উপর উপুড় করিয়া পাইকিরি ভাবে তৈরি চা পরিবেশন করা হইবে, আশঙ্কা করিতেছিলাম, এমন সময় আমাকে বিস্মিত করিয়া বুড়ো এই দোকানের তুলনায় অত্যন্ত যেমান আশ্চর্য্যারকম সম্ভ্রান্ত একটি টি-পট তাক হইতে পাড়িয়া তাহাতে দামী এক চায়ের প্যাকেট হইতে তিন চামচ চা ঢালিল। আমার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া কহিল, ‘আপনার মত বড় বড় বাবু! এই পথে গাড়ী হাঁকিয়ে যেতে যেতে গরিবের দোকানে পদখল দেন, তাই ভাল চা, ভাল সিগারেটের ব্যবস্থা রাখতে হয়...’ বলিয়া গম্ভীর ভাবে সে ‘পটে’ কেবলির জল ঢালিতে লাগিল।

‘দাস মশায়ের দেশ কোথায়?’

‘আজ্ঞে দেশ চন্দ্রিশ পরগণার বাবাসত মহকুমায়; গাঁয়ের নাম নহবৎপুর।’ দাস মহাশয় আমার আশ্চর্য্যতায় খুসি হইয়া কহিলেন। ‘আমাদের বংশ ওখানকার বহুকালের বোষ্টম বংশ। আমার ঠাকুরদাদা নামকরা পদকর্তা ছিলেন...’

‘আপনি এখানে এলেন কি করে?’ প্রশ্ন করিলাম।

‘লেম্বাপড়া কিছু হ’ল না। ধর্ম্মকর্ণেও মতি নেই। ভাসতে ভাসতে চলে এলাম।...এই গুমটির ঘরের আমি পয়েন্টস্ম্যান ছিলাম সত্ত্বেও বহর। আরও বারো বছর স্বল্পকাজ চালাতে পারতাম। এমন সময় একদিন সার্টিং এজিনে পাটা কাটা গেল। তদন্ত এস; রিপোর্ট দিলে। পয়েন্টস্ম্যান চোখে কম দেখে বলেই দুর্ঘটনা ঘটেছে! কিছু খেয়ারত আর প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা গুণে নিয়ে অবসর দিয়ে দিলে। সেই টাকা থেকেই এই দোকান করে এখানেই বসে গেছি...’ বলিয়া দাস মহাশয় তাক হইতে দামী চায়ের পেয়লা নামাইয়া আনিলেন।

‘এখানে আর কে আছে?’ জিজ্ঞাসা করিলাম।

‘পরিবার অনেক দিন গত হয়েছে। এখানে একাই থাকি।’ বৃদ্ধ চায়ের ‘পটে’ চামচ নাড়িয়া কহিল। ‘দেখ



ছেলেরা আছে ; ছেলের বোয়েরা, নাতিনাতনীরা আছে । এক ছেলে কলকাতায় চাকরি করে—বার্ড কোম্পানীর আপিসের পিওন...অন্তেরা দেশে চাষবাস করে, খেয়ে-দেয়ে ভালই আছে...'

‘এই বুড়ো বয়সে তাদের কাছে গিয়ে থাকলেই ভাল হ’ত না ?’ আমি কহিলাম ।

বুড়ু ইহার কোনও জবাব না দিয়া চায়ের সরঞ্জাম আমার কাছে আনিয়া রাখিল । কহিল, ‘ঐ ইলেনভেন ডাউন আসছে । কিছু তাড়াতাড়ি করবেন না । পরের গাড়ি আসতে আরও ১০।১২ মিনিট । তার আগে ফটক খুলবে না...’

চায়ের ‘পট’কে উপেক্ষা করিয়া প্রথমেই রেলপথের দিকে চাহিলাম । সুদূর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ দিয়া অর্ধরক্তাকার লোহবস্ত্র সম্পূর্ণ ট্রেনটা নজরে পড়িল । একটা প্রকাণ্ড হারকে যেন অলঙ্কৃত্রে বাঁধিয়া দিখধুর কণ্ঠে দোলাইয়া দিয়াছে । ট্রেন লোহার বন্ধনা বাজাইয়া লেভেল ক্রসিং পার হইয়া ওখারের জঙ্গলে অদৃশ্য হইবার আগে আর চায়ের দিকে মন দিতে পারা গেল না ।

চা-টা শতাই ভাল হইয়াছিল । দুধ ও চিনি সংযোগের পর এক চুমুক খাইয়া দেখিলাম, এদিকে দাঁশ মহাশয়ের নৈপুণ্য আছে ।

‘আপনাকে যে প্রশ্ন করছিলাম’, আমি আবার গল্প বালাইয়া লইয়া কহিলাম, ‘বুড়ো বয়সে নিজের দেশে গাঁয়ে গিয়ে নাতিনাতনী নিয়ে কাটালে ভাল হ’ত না ? এখানে একা একা থাকতে কষ্ট হবার কথা । বিদেশে পড়ে থাকবার খুব দরকার আছে কি ? ছেলেরা আগ্রহ করে না ? না বোয়েরা...’

‘না না, বোয়েরা তেমন নয় । আগ্রহ করে বৈকি, সবাই আগ্রহ করে । ছেলেরা মাঝে মাঝে টাকা পাঠায়, নিজেরাও এসে ছ’চারদিন থেকে যায় । আমিই যেতে চাই নে । বেশ আছি । স্বাবলম্বী হয়ে আছি ।...আপনি ঠিকই বলেছেন, বাবুমশায় ; নাতিনাতনীর মধ্যে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে না হয়, এমন নয় । কিন্তু এই প-টা । এই পা-টা যদি আস্ত থাকত, তা হলে হয়ত তাদের কাছে গিয়েই থাকতাম...’

‘কাটা পায়ের জন্ত ওরা আপনাকে ত্যাগিত্য করবে এমন

মনে করছেন কেন ?’ আমি তাহার অদ্বেষা আশ্রয়-স্বপ্নের হইয়া কহিলাম ।

বুড়ু কিছুক্ষণ নীরব রহিল । দেখিলাম, কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের শৈলশ্রেণীর দিকে তাকাইয়া আছে । এই উদার প্রকৃতি, এই পরিতরেখা, ধরিত্রীর এই সুন্দর বিভক্ত বৈষ্ণব-সন্তানকে মুগ্ধ করে নাই তো ? সতেরো বছর এই সুন্দর দৃষ্টির মধ্যে বাস করিয়া গাছপালা, ডোবা-পুকুর ভক্তি অপরিহার্য গ্রামে ভাল না লাগিলে দোষ দিবার উপায় কি ।

‘কি জানেন, বাবুমশায়’, বুড়ু যেন সহসা তন্দ্রা দূর করিয়া কহিল, ‘ভূটো পা-ই ঠিক থাকলে গাঁয়ে ফিরতে ভয় ছিল না । মনে টান পড়লে ইচ্ছেমত পথে বেরিয়ে পড়তে পারতাম । যেখানে খুশী চলে যেতাম । এই গুমটিঘরের কাছেই আবার চলে আসতাম ।...জায়গাটার ওপর বড় মায়া পড়ে গেছে বাবু । ভবেল! হুসু হুসু করে কত ট্রেন পাহাড়ের গায়ে বঁক নিয়ে এসেছে, চলে গেছে । আপনার মত কত বাবু চ’বেলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটর ইঁাকিয়ে এই রাস্তা দিয়ে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলে গেছে । নিত্য সর্কক্ষণ যেন ভূটোভুটির পালা চলেছে । না রেলগাড়ী, না মোটর গাড়ী, কান্দর গন্তব্য জায়গাই আমার নজরে পড়ে নি, কিন্তু সারাক্ষণ তাদের ছুটে চলা দেখছি সতেরো বছর ধরে । এই ভূটো-ভুটিটা আমার মনের মধ্যে বসে গেছে । আমার কাটা পায়ের পঙ্খটা পর্যাস্ত আর টের পাই না । গাড়ীগুলির সঙ্গে মনও ছুটেতে থাকে !...কিন্তু থাক ভগবৎ কথায় ।...ঐ আপনার ও গাড়ীটাও বোম্ব হয় এসে পড়ল । নিজের কথা বলে আর আপনাকে দেখি করাব না । যারা ছুটে যায়, তাদের আমার বড় ভাল লাগে । তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ছুটে চলি কিনা...’

‘খোলা রাস্তা দিয়া অবার অবার গাড়ী ছুটাইতে ছুটাইতে গ্রাণ্ডট্রাক রোডটা যেন অকস্মাৎ আরও অধিক আকর্ষণীয় মনে হইল । গতির প্রতীক এই রাস্তা ! ভাবত উপ-মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যাস্ত প্রসারিত এই রাজপথের উপর দিয়া যান ছুটিয়া চলে, জন ছুটিয়া চলে ; দৈন্ত ও সাম্রাজ্য ছুটিয়া যায়, ইতিহাস ছুটিয়া চলে । আর ইহাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলে বুড়ো মুদি মুরারি দাসের মন !

## “সাগর দোলায় দোলে না এ তরী”

(পূর্বসূরতি)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অবনীবাবুর মুখে শিকারের গল্প শুনে এত ভাল লাগত যে অসম্ভবকণ্ঠে বললে মনে হ’ত। যদিও অবিখ্যাত সব শিকারের গল্প শুনে আমরা তাঁর নাম বেগেছিলাম “গলুবাড়িলাল”! কিন্তু তাঁকে পেলেই আমরা গল্প বলবার জন্ত ধরতাম। তিনি নিজে উকীল হলেও শোভাচাদের কাছ থেকে কোনও প্রতিবাদ বা জেরা বরদাস্ত করতেন না। জমিয়ে বেগেছিলেন জাহাজের আড্ডা অনেকটা তিনি একাই। তারপরেই নাম করতে হয় ডিক্রগড়ের

নির্বিরোধী শ্রীযুক্ত লোকেন গুপ্ত মহাশয়। ইনি কেবল পেতে ও শুতে ফার্ট ক্লাসে যেতেন। নইলে চলিশ ঘণ্টাই প্রায় আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। দস্ত মশাই একে নিয়ে চলিশ ঘণ্টাই ফ্যাপাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু পারতেন না। ডাঃ লাহিড়ী মাঝে মাঝে দেখা দিতেন। খুব সম্ভব লোকেনবাবুই তাঁকে ধরে নিয়ে আসতেন। মিঃ সেনও খুব সদালাপী ও হিসাবে শুভঙ্কর পুরুষ। কিন্তু আমাকে তিনি বড়ই বিপদে কেলোছিলেন। তিনি নিজেই



টুরিষ্টদের খাবারঘর



টুরিষ্টদের ধূমপানের ঘর (‘বি’-ডেক)

গবর্ণমেন্ট কন্ট্রোল্ড শ্রীযুক্ত মণি চক্রবর্তী। তিনিও ক্যামেরা-প্রিয়। ক্যামেরা বগলে না করে ডেকে আসতেন না। আমাদের অসংখ্য ছবি তুলেছেন তিনি। জাওয়ানী থেকে সম্ভ্রায় অনেক মূল্যবান জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দস্তবাবুও অবশ্য তাঁর চেয়ে কিছু কম নিয়ে যাচ্ছিলেন না। হ’জনেই বেশ সৌখীন লোক। পরের জন্ত কিশিং বারকুঠি হলেও নিজের ভক্ত খরচে দস্তবাবু কিছুমাত্র কৃপণতা করতেন না। চক্রবর্তী মশাই ঠিক বিপবীত। মিল দরিয়া মাছ। ডিক্রগড় সেকলকেই বাবার নিমন্ত্রণ করে বেগেছেন। বড় পুত্রবংশস পিতা। জাহাজে ছেলেদের কথা কেবলই বলতেন। কত জিনিস ছেলেদের জন্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পর বহরম-পুরের টেক্‌স্টাইল অভিজ্ঞ নম্র বিনয়ী ও সদালাপী শ্রীযুক্ত আন্তোয়া দাস এম-এসসি এবং নর্থ ব্রিটিশ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর শ্রীযুক্ত বি. বি. ও এস. কে. মুগার্জি। এ চৌকস ছেলে দুটি শিবেয় চেলা নন্দী-ভূজীর মত দস্ত মহাশয়ের একান্ত বশব্দ হয়ে পড়েছিলেন। এ ছাড়া পূর্বেই বলেছি ফার্ট ক্লাস থেকে আসতেন শিবভুল্যা নির্বিকার

নিজের বা-কিছু কাছ করতেন এবং তাঁর স্ত্রীর বা-কিছু করণীয় সমস্তই করে দিতেন, এমন কি কেশ-প্রসাধন পদার্থ! কিন্তু আমি স্ত্রীর কতবা তো দূরে থাক্ নিজের কাছও কিছু করতে পারতাম না। সম্পূর্ণ পত্নী-নিষ্ঠের ছিলাম। কিন্তু অসামান্য কষ্টবীর শ্রীযুক্ত সেনের দৃষ্টান্ত আমাকে যত দূর সম্ভব একটি সাংসারিক অপদার্থ জীব বলে প্রমাণিত করেছিল। তিনিও বেশ আসর জমিয়ে রাখতে পারতেন। ক্যামেরাতেও যে তাঁর হাত বেশ ভাল, তার প্রমাণ এই প্রবন্ধের মধ্যেই পাবেন। আর একটি ছেলে শ্রীমান মতিলাল কব আমাদের সঙ্গে থেকে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করতেন। আমাদের এই আড্ডার রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশ্বসমস্যা, দর্শন, অধ্যাত্তত্ব, তার সঙ্গে আইন-আদালত, ইনসিওরেন্স, দিনেমা, খেলাধুলা এবং ‘স্যাণ্ডাল’—সব রকম আলোচনাই হ’ত। ব্যাঙ্কের হিসাব ও ব্যালাঞ্জ-শীটের কথাও বাদ যেত না। আমরাও ঐ গাওয়া আর শুতে গাওয়া ছাড়া ডেক আর লাউজ বড় কেউ ছাড়তাম না। ঐ একখানা জাহাজ

আগছে—‘বাইনোকুলার’ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এবং চাঁদ ওঠা জাহাজ থেকে দেখতে ভারি ভাল লাগত।



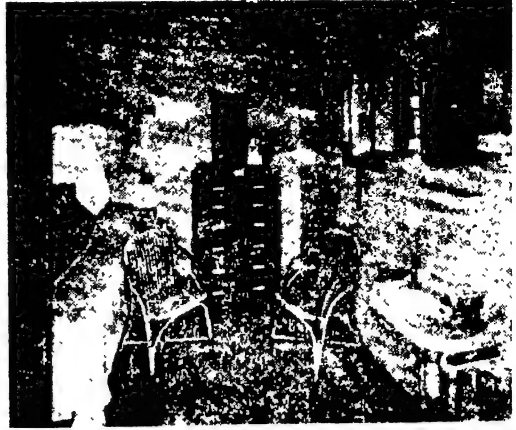
টুরিস্ট ক্লাসের ছেলেমেয়েদের গেলাঘর (‘সি’-ডেক)

‘এ টুইলী’, ‘এ ক্রিস্টালার দেগা বাচ্ছে’, ‘ইটালীর কিনারায় এসে পড়েছি’, ‘পোর্ট সৈয়দ’, ‘সুয়েজ পাল’, ‘এডেন বন্দর’—এসব জাহাজ বাত্মীদের এক একটা উদ্ভেকনাপূর্ণ মুহূর্ত বা মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে স্মৃতির পাতায় অক্ষর আনন্দের স্মরণিকা লিখে রাখে।

ঠিক ফার্স্ট ক্লাসের মতই টুরিস্টদের ক্লাসেও লাইব্রেরী ও লেগা-পড়ার ঘর, ‘লাউজ’ বা বৈঠকখানা, ‘বার’ বা পানশালা এবং ধূমপানাগার আছে। এর পরেই আমাদেরও সাঁতার খেলা ও স্নানের ‘হৌজ’ আছে। ‘বুল রিংবোর্ড’ ও ‘ডেক কয়েট’ খেলারও ছক আছে। পিং-পঙ বা টেবিল টেনিস ও ডেক টেনিসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। আসবাবপত্রগুলিও বেশ ভাল। বড়লোকের বাড়ীর মত। ‘টুরিস্ট’ বলে হুঃখ রাখে নি কিছু। যা ও পাড়াতো আছে তা এ পাড়াতোও আছে।

এইবার “B” ডেকের কথা বলি। “B” ডেকের মাঝামাঝি আছে জাহাজের সকল বাত্মীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি বিভাগ। একে বলে Bureau। এখানে টাকা ভান্ডান, ডাক-টিকিট কিছুন, টেলিগ্রাম করুন, চিঠি দিন, হাবান প্রাপ্তির সংবাদ দিন। এই ‘বুরো’র কর্তা হলেন জাহাজের ‘Purser’ বা ভাঁড়ারী। ইনি বাত্মীদের মালপত্র খাদ্যসামগ্রী এবং টাকাকড়ির হিসাব রাখেন। ‘চুজানে’র পার্সার মিঃ আর. জি. নিউবারি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক। একদিন রাত্রি জাহাজের নাচের মজলিশে আমার হাতের আংটি থেকে হীরেখানি খুলে পড়ে যায়। পার্সার সেখানি খুঁজে বার করবার জন্ত সমস্ত জাহাজখানি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করিয়েছিলেন। পার্সারের কাছেই আমি ‘চুজানে’র বিশদ বিবরণ সব পেয়েছি। বন্ধুবর জীলোকেন গুপ্ত মহাশয় আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লোকেনবাবু তাঁর নিজের সম্পত্তি ‘চুজানে’র নক্সাখানি পর্যন্ত

আমাকে দিয়েছিলেন যাতে এই জাহাজের বিবরণ লেখা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। আমি এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।



আমাদের হ’বার্ষ ক্যুপে কেবিন (‘ই’-ডেক)

এই ব্যুরোর সামনের দিকে প্রথম শ্রেণীর বাত্মীদের থাকবার ‘বি’ ডেকের অনেকগুলি কেবিন আছে। সতরখানি বিরহীদের অর্থাৎ একজনের থাকবার, ৫৭খানি দু’জনের থাকবার এবং ৮খানি একেবারে ‘De-Luxe Cabin’! এই ‘ডি-লুক্স’ কেবিনের মধ্যে দুটি ঘরের সামনে আবার বারান্দা আছে। এই বারান্দাওয়ালা ঘর নিতে চলে টাকার খলিতেও বারান্দা বার করা চাই, কারণ ডি-লুক্স কেবিনের মধ্যেও এই বারান্দাওয়ালা ঘর দুটিতে আবার একটু বিশেষ ধরনের স্বতন্ত্র বিলাস-আরামের ব্যবস্থা আছে।

‘বি’ ডেকে প্রথম শ্রেণীর বাত্মীদের পোশাক ইঞ্জিনিয়ারের একমালি ‘ইঞ্জিনিয়ার’ আছে। এ ছাড়া কেবিন-সংলগ্ন বাত্মীদের নিজস্ব বাথরুমেরও ইঞ্জিনিয়ারের সর্বস্বত্ব আছে। ব্যুরোর পিছনদিকে ‘বি’ ডেকের টুরিস্টদের ঘর। ২৫খানি যুগলে থাকার ঘর আর ১৩খানি চার জনে থাকার ঘর। ‘ব্যুরো’ থেকে দু’ধারেই দুটি করে গ্যারালাল লাইন গুলিপথ বরাবর চলে গেছে সামনের দিকে, প্রথম শ্রেণীর বাত্মীদের পাড়ায় যাওয়ার জন্ত, এবং পিছন দিকে ‘টুরিস্ট’ শ্রেণীর বাত্মীদের পাড়ায় যাওয়ার জন্ত। ঘরগুলি সব এই গুলি পথেই হুঁধারে। ঠিক যেমন শহরের রাস্তার হুঁধারে বাড়ী, এও সেই বকমেরই, শুধু আকারে ছোট এবং মাথা ঢাকা। কারণ ‘বি’ ডেকের মাথার উপর ‘এ’ ডেক। আবার ‘এ’ ডেকের মাথার উপর বোট-ডেক। এইভাবে চলেছে আটতলা পর্যন্ত আগাগোড়া, কাজেই বোসে-জলে জাহাজের গুলিপথে চলতে ছাতি মাথার দেবার প্রয়োজন নেই। অন্ধকারকে দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত বৈদ্যুতিক আলোক কাছে বেসেতে দেয় না। সমস্ত জাহাজখানি ‘শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণ’ (air-conditioned) করা বলে পাণ্যর কারবার নেই। প্রত্যেক ঘরের পৃথক নম্বর লেখা আছে দরজায়। কাজেই একমাত্র অতিবিশিষ্ট নেশায় খেয়াল ছাড়া ভুলে অন্ধ কারুর ঘরে চুকে পড়বার সম্ভাবনা কম।

এইবার ‘সি’ ডেকে আসা থাক। এখানেও সেই বধাপূর্বম। সামনের দিকে ৮৯টি প্রথম শ্রেণীর এবং পিছন দিকে ৫০টি টুরিষ্ট কেবিন। এখানেও কাপড় কেচে শুকিয়ে ইত্থি করে নেবার ঘর আছে। অবশ্য কেবল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য। এই ‘সি’ ডেকের পিছন দিকে টুরিষ্টদের থাকার ঘরের শেষে টুরিষ্টদের বাচ্চাদের জন্যও চমৎকার ‘গেলাঘর’ আছে। এ ঘরের দেওয়ালে আঁকা পশুপক্ষীর বড় বড় রঙীন চিত্র সাহায্যে ছেলেমেয়েদের বর্ণপরিচয় শেখাবার ব্যবস্থা আছে। খেলনা ও গেলাধুলার তো কথাই নেই।

এইবার ‘ডি’ ডেকে নামা থাক। এখানেও সামনের দিকে ২৩টি প্রথম শ্রেণীর কামরা এবং পিছন দিকে ৪৩টি টুরিষ্টদের কামরা। এই ‘ডি’ ডেকের সামনে প্রথম শ্রেণী ও পিছনে টুরিষ্টদের জন্য পৃথক দুটি প্রশস্ত পাবার ঘর আছে। প্রথম শ্রেণীর পাবার ঘরে এবং টুরিষ্টদের পাবার ঘরে একসঙ্গে ২৭৪ জন যাত্রী



প্রথম শ্রেণীর ‘অলিন্দ-পানখালা’ (Verandah Cafe) বসে ভোজন করতে পারেন। তাই প্রত্যেক বার হুঁবাচে ভাগ করে এক ঘণ্টা পর পর যাত্রীদের খাওয়ানো হয়। খাওয়ার মেনু চমৎকার। পানও অতি উৎকৃষ্ট। বেন নিত্যই ভোজের নিমন্ত্রণ খাওয়া। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আলাদা পাবার ঘর আছে এবং হুঁবেলাই তাদের খুব সকাল সকাল খাইয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীরা কেউ যদি সকলের সঙ্গে না বসে আলাদা নিরিবিলাতে বসে খেতে চান তারও বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে।

জাহাজের রন্ধনাগারের বিরাট ব্যবস্থা দেখলে বিশ্বের নির্বাক হয়ে যেতে হয়। বৈজ্ঞানিক তাপে অতি তল্প সময়ের মধ্যে দান্না শেষ করবার জন্য জাহাজে যে ‘ইলেকট্রিক কুকিং বেজ’ আছে সেটি দৈর্ঘ্যে বাইশ ফুট। এর মধ্যে ১৬টি চুল্লী জ্বলে। প্রত্যেকটিতে একসঙ্গে তিনটি জিনিস রান্না হতে পারে। এই চুল্লীর আঁচ ইচ্ছামত কমানো বাড়ানো যায়। রান্না-করা খাবার গরম রাখার

জন্য কয়েকটি ‘hot-press’ আছে। একটি সাড়ে পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা, একটি ত্রিশ ফুট লম্বা এবং দুটি চৌদ্দ ফুট লম্বা। বাষ্পের



প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ছেলেমেয়েদের ‘গেলাঘর’

ভাপে রাখবারও ছয়টি চুল্লী আছে। তিনটি ভাজা ভাজবার আধার সহ বৈজ্ঞানিক উত্তপ্ত, এর সঙ্গে ভাজা গরম রাখবার ব্যবস্থাও সংযুক্ত আছে। ছয়টি আছে কেবল মাছ ভাজবার বৈজ্ঞানিক খোলা। এ ছাড়া শূকর-মাংস রাখার পৃথক ব্যবস্থা, কেক তৈরির তপ্ত চাটু, চা ও কফী তৈরির বিরাট বৈজ্ঞানিক পাত্র, আম্বিষ বা নিরামিষ ‘সুপ’ তৈরি করবার জন্য ইকুমিক্ ককারেং নামের বাম্পাচ্ছাদিত বারোটি বিরাট পাত্র আছে, তার মধ্যে চারিটিতে ৬৫ গ্যালন এবং আটটিতে ১৫ গ্যালন করে সুপ এক এক করে তৈরি হতে পারে। শুঁড়ো দুধ ও শুকনো দিমকে স্বাভাবিক অবস্থার দ্বিগুণে আনবার ব্যবস্থা আছে। একেবারে হাজার হিসাবে ডিমসিদ্ধ ও টোট্ট তৈরির



প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-মুগলের ঘর

আয়োজন করা যেতে পারে এখানে। জাহাজের ‘বেকারি’তে প্রতিবারে ৪৮০ পাউণ্ড পাউরুটি তৈরি হয়। এখানকার আইস-

ক্রীম জমাবার ব্যয়টিও দেখবার মত। প্রতিদিন দেড় হাজার বাত্ৰীকে এঁরা যত বার ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা আইসক্রীম পাওয়াতে পারেন। জাহাজের আইসক্রীম এক বার যারা খেয়েছেন তাঁরা আর ভুলবেন না। এমন সুস্বাদু সুগন্ধি মালাই বরফ কোনও প্রথম শ্রেণীর হোটেলের পাওয়া যায় না।



প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী ও বৈশিষ্ট্যের ময়ের একাংশ

প্রত্যহ চার বেলা দেড় হাজার কোটি দুই পয়সায়ের আট পয়সায় এসে গেয়ে যাচ্ছেন, এতটুকু গোলমাল, বশুতলা বা পরিবেশনে শৈথিল্য নেই! ঘড়ির কাঁটার মত নিঃশব্দে কাজ চলেছে। 'অলু কপি, কড়াইহুঁটি, বাট, গাজর, পেঁয়াজ, শালগম, বিলিতি কুমড়া, স্যালাড, ডিম, মাছ, মাংস, ডাল, ভাত, রুটি, হরকারি, চাটনি, দই, ক্ষীর, পায়েরস, পুডিং, আইসক্রীম, পিউক্কাটি, বিস্কুট, ফলমূল ইত্যাদি দেড় হাজার লোকের রকমারি পানা প্রস্তুত হচ্ছে প্রত্যহই ঠিক ঘড়ি ধরে। এক মিনিট কোনও দিন এদিক-ওদিক হয় না। ভোর ছয়টার মধ্যে কেবিন ষ্টয়ার্ড ঘরে ঘরে 'knock' করে দিয়ে যায় 'এক কাপ গরম চা' (hot-tea) ও তার সঙ্গে লেবু কিংবা আপেল একটি। বেলা আটটা-নয়টার মধ্যে প্রাতরাশ—চা, রুটি, মাখন, ডিম, মাংস, টোষ্ট, বিস্কুট, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি। দুপুরে বারোটা একটার মধ্যে ভূষিভোজ (lunch)। বিকেলে দুইটা হইতে চারটের মধ্যে বৈকালী ভোগ—চা, রুটি, মাখন, কেক, বিস্কুট, জাওউইচ, প্যার্টী ইত্যাদি। রাত্রে আটটা-নয়টার মধ্যে 'নৈশভোজ' (dinner)। শাস-তালিকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক এক দিন এক এক রকম করা হয়। বাতে একঘেয়ে না লাগে। দিনের পর দিন সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে নিত্য এই রাজস্বয় বজ্র চলেছে। অবাক হই আমরা ভেবে এদের সংগঠনশক্তি, কর্মপটুত্ব এবং পরিচালন-ক্ষমতা দেখে।

জাহাজে নিয়ামিষভোজীদের জন্য আহারের পৃথক ব্যবস্থা আছে। আচারনির্ভর স্বপাক রন্ধনও করতে পারেন। জাহাজের ঠাণ্ডা গুদামটিও (cold storage) দেখবার মত। এখানে পৃথক পৃথক হিমকক্ষে মাছ, মাংস, মাখন, শাকসব্জী, ফলমূল এবং

মিঠাপানি থেকে ভাল ভাল উৎকৃষ্ট সুরা ও পানীয় জল রক্ষিত আছে। পুরাকালে প্রয়োজনমত পানীয় জল একটি সুরহং পাত্রে বহন করে নিয়ে যেতে হ'ত। অধুনা বিজ্ঞানের সাহায্যে সমুদ্রের জলই পাম্প করে তুলে নিয়ে জাহাজ চলতে চলতে পরিষ্কৃতকারী যন্ত্রের দ্বারা নিখিল লবণহীন ও সুস্বাদু করে নেওয়া হয়। কাজেই

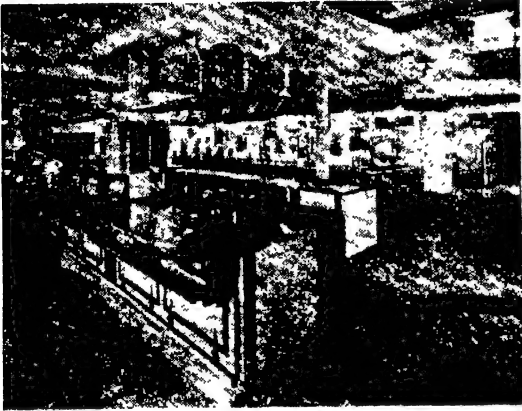


চুজানের ভাঁড়াবথর

সেকালের মত এখন আর জাহাজে বাত্ৰীদের পানীয় জলের ভঁড়াব ঘটে না। এটি 'ডি' ডেকেই এক কোণে সুরহং ঘোবীখানা (Laundry) আছে—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি সম্বিষ্ট।

এইবার আমাদের পাড়ায় আসা বাক, অর্থাৎ 'ই' ডেকে। 'ই' ডেকে আমরা পাশাপাশি দুটি কেবিন পেয়েছিলাম। এক কেবিন-শুলিকে বলে 'কাপ' কেবিন। অর্থাৎ কেবলমাত্র দুটি বার্থ আছে। একটিতে আমার স্ত্রী ও বক্সা আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর পাশেরটিতে আমি একলাই ছিলাম। কিন্তু জাহাজ ছাড়বার মাত্র তল্লাশের আগেই একটি গুজরাটি যুবক সীমান চিমণলালপ্রসাদ শা দ্বিতীয় বার্থটি দপল করলেন। তিনি খুব উৎসাহী যুবক। আমেরিকা থেকে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সববিধ শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে বিলভাউ প্যাটেল হোটে থাকেন। দেশে ফিরে তিনি বোম্বাইয়ে একটি সিনেমা সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কলেজে প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনা একেবারে কাগজ-কলমে ছকে এনে-ছিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে খুশী হয়ে তিনি দিনের পর দিন এই প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করে বহু বিষয় লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। এর আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। এক দিন প্রথমশ্রেণী যাত্রীর ভগ্নী সীমতী নীলিমা বড়ুয়া, বোম্বাইয়ের পানী মহিলা সীমতী নানাতাটি এবং সীমুক্ত পাঠক প্রভৃতি বোম্বাইয়ের আরও কয়েক জন ভ্রাতালোক ও ভ্রাতৃমহিলাকে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন জাহাজে 'দেওয়ালী' উৎসব করবার প্রস্তাব নিয়ে। জাহাজ কর্তৃপক্ষ নাকি এঁদের এই উৎসবে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করবেন। আমরাও ব্যাপারটাতে বেশ উৎসাহিত হয়ে

উঠলাম। নৃত্যগীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা, কবিতা পাঠ ও নাট্যাভিনয় হবে ঠিক হ'ল। সব কিন্তু ইংরেজীতে করতে হবে। কারণ জাহাজের ছাত্রী জাহাজের এটিই ছিল সাধারণ ভাষা (Lingua franca) ! আমাকে দেওয়ালির উপর ইংরেজীতে একটি কবিতা লিপিতে হ'ল এবং “Affairs in Law” বলে একটি হাস্যরসাত্মক দৃশ্যনাট্য রচনা করে দিতে হ'ল, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান “মন মোর মেঘের সঙ্গী” এর ইংরেজী অনুবাদ করে দিতে হ'ল। শ্রীমতী নীলিমা বড়ুয়া এই গানখানি গাইলেন এবং কুমারী নবনীতা তার সঙ্গে নৃত্য করলেন। এ ছাড়া গুজরাটি ও পশ্চিমী মহিলারা গরুনাচা দেখালেন। শ্রীযুক্ত পাঠক দেওয়ালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন ও বাহুবিন্দা দেখালেন। মোটের উপর দেওয়ালী উৎসব খুব প্রশংসা ও সাফল্য অর্জন করলে। ফাষ্ট ক্লাসের বাজীরা এবার টুরিষ্টদের কাছে হার মানলেন।



চুজানের বিরাট ব'ল্লাঘর

‘১’ ডেকে ৮৩টি টুরিষ্ট কেবিন আছে। টুরিষ্টদেরও কাপড়-কাচা ও ইঞ্জিনিয়ার মেরামতের একাধিক পৃথক ঘর আছে। প্রত্যেক ডেকে একাধিক বাথরুম, শাওয়ার ও ল্যাভেটরি আছে। বাথটবে গরম ও ঠাণ্ডা জল প্রচুর পাওয়া যায়। জাহাজে যে কোনও রোগের চিকিৎসার ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা আছে। প্রস্তুতি-আপার আছে। হাসপাতাল আছে। এগুলি সব ‘সি’ ডেকের সামনের দিকে। বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগীদের রাখবার জন্য ‘বি’ ডেকের পিছনে স্বতন্ত্র আরোগ্যশালা এবং প্রথম শ্রেণীর বাজীদের জন্য অভিজাত হাসপাতাল আছে। ডাক্তারের চেম্বার ও ডিসপেনসারী ‘সি’ ডেকের মাঝামাঝি। চিকিৎসা কিন্তু ক্রী নয়। ডাক্তারকে একটা consultation fee দিতে হয়। আবার কেবিনে এসে দেখে যাবার জন্য ডেকে পাঠালে আলাদা ‘ভিজিট’ দিতে হয়। আশ্রয় ৫ শিলিং হবে। চুল ছাঁটাইয়ের জন্য নেয় ২ শিলিং। মেয়েদের বেশ-প্রসাধনের ব্যয় স্বতন্ত্র।

জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা থাকেন যেমন সর্কোচ তলার,

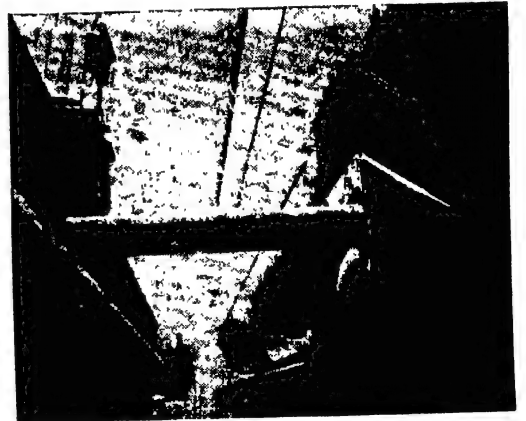
জাহাজের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা অর্থাৎ খালাসীদল থাকেন তেমনি সর্কোচ তলার। সর্কোচ তলার ব্রীজ-ডেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের



গুজরাতিগণের ‘ফান্সী ডেস’ কুমারী নবনীতা দেব

জগৎ সর্কপ্রকার স্ববন্দোবস্ত আছে। তাদেরও পানশালা, প্রমোদাগার, তাহকুট মেবনাগার ইত্যাদি আছে। কিন্তু তাঁদের পেতে আসতে হয় আমাদের পাড়ায় অর্থাৎ এই ‘১’ ডেকে। এখানে তাঁদের ভোজনের পৃথক ব্যবস্থা আছে। কেবল ক্যান্টিন সাহেব এবং তাঁর লেক-নোন্টরা কেউ কেউ প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারে বা কখনো কখনো টুরিষ্ট শ্রেণীর ভোজনাগারেও পেতে এসে বাজীদের ধল করেন।

‘ডাকান’ কেবল যে বাজী বহন করে তাই নয়। প্রচুর মালও বহন করে। তাকনে পুড়বে না এমনতর শুদামে মাল নেবার



চুজানের ‘মোলন-জাণ’ পানশা (এই রকম ঠাণ্ডালাইজার দু'দিকেই আছে)

স্থান আছে এতে ২২,৫০৫ কিউবিক ফুট। আরও ৪৮,৫৬০ কিউবিক ফুট অগ্নি-সিঁরোধক শুদামে মাল নেবার স্থান করা হয়েছে। সাধারণ মালপত্র বেগুলির অগ্নিদহন থেকে নিরাপত্তার প্রয়োজন



বোধ করেন না প্রেরকেরা, সেরূপ মাল নেবার মত স্থান ৪,০৯,৬৯০ কিউবিক ফুট আছে। এই হিসাব থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এ জাহাজের গোলাটি কি বৃহৎ! জাহাজের এই খোল থেকে কপিকলের সাহায্যে মাল তুলে বন্দরে বন্দরে ক্রোশে করে নামিয়ে দেবার জন্য জাহাজের 'A' ডেকে পর পর

অভিনয়-আসর ইত্যাদি অহুষ্ঠানের জন্য জলসামগ্রী আছে সেখানে বাড়ীদের এক সভা ডেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিয়ে বোড়ে ঝড়ি দিয়ে এঁকে বোঝালেন যে এই 'চূজান' তৈরি হবার সময় এ জাহাজে পোত-বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কার সমৃদ্ধ-তরঙ্গে জাহাজের দোলন স্তম্ভনকারী এক অত্যন্ত চর্চ



চূজানের অগ্নি-বায়ণ মালপাশ



‘আমাদের আসর।’ বসে আছেন : ( বা-দিক থেকে ) শ্রীমতী

দুর্লু সেন, শ্রীমতী বামশাহী দেবী, শ্রীযুক্ত লোকেন গুপ্ত ও

এবনী দেবী। পিছনে দাড়িয়ে ( বা-দিক থেকে )

ডাঃ শ্রীধামচন্দ্র বাণ্ডে, নরেন্দ্র দেব, বি. বি.

মুখার্জি, মণি চক্রবর্তী, মতিলাল কর

ও এস. কে. মুখার্জি

চারটি Hatch বা ‘মালকূপ’ আছে। এগুলি সর্বদা সর্বদেয় ঢাকা থাকে। বন্দরে পৌঁছলে মাল তোলা-নামানোর জন্য এগুলি উপযুক্ত প্রহরী বেঁঠেন বাড়ীদের সতর্ক করে গোলা হয়। কেননা দৈবাৎ কেউ অসাবধানতা বশতঃ এর মধ্যে এসে পড়লে একেবারে আটতলা জাহাজের সর্বনিম্ন খোলের গর্ভে চিরসমাধি লাভ করবে। এ ছাড়া বাড়ীদের সঙ্গে বড় বড় ট্রাক বাজ স্টকেস সিঁদুক বেগুলো কেবিনে বাওয়া সম্ভব নয় সেগুলো রাখবার ‘ব্যাগেজ রুম’ আছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ এ ঘর গোলা হয় এবং বাড়ীরা সেই সময় গিয়ে তাঁদের সিঁদুক বাজ খুলে প্রয়োজনীয় জিনিস বাব বয়ে আনতে পারেন এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস রেখেও আসতে পারেন। যে মাল একেবারে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে তবে নেওয়া হবে, সেগুলি জাহাজের ‘হোল্ডে’ রাখা হয়। এই হোল্ডে রাখা মাল পথে প্রয়োজন হলে বার করে নেওয়া যায় না।

এইবার ‘চূজান’ের প্রধান ও অধিতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলে এই জাহাজী প্রবন্ধ শেষ করব। আমরা চূজানের বাড়ী হয়ে-হিসাম এর দ্বিতীয় বার প্রাচ্য দেশাভিমুখে অভিযানের সময়। সেই সবেমাত্র এ জাহাজ তার ‘কুমারী বাড়ী’ শেব করে ফিরেছে। ক্যাপ্টেন একদিন আমাদের ডাকলেন। জাহাজের মাঝবাবার ‘বি’ ডেকে যে বক্তৃতা দান, প্রার্থনা-সভা,

‘ষ্টাবিলাইজার’ ( Stabilizer ) লাগানো হয়েছে। আপাততঃ প্রাচ্যমুদ্রগামী আর কোনও বাড়ী জাহাজেই এ ‘Denny Brown’ যন্ত্র নেই, সুতরাং সেগুলি পূর্ববং উদ্ভাল সাগর-তরঙ্গে মোচার গোলার মত হুলবে, কিন্তু ‘ষ্টাবিলাইজার’ আছে বলে চূজান স্থির হয়ে ভাসে। ‘সাগর দোলার দোলে না এ তরী’!

‘ষ্টাবিলাইজার’ আর কিছু নয়, জাহাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আকার অনুযায়ী মাছের পাপনাব মত জাহাজের হৃদয় থেকে দুটি ডানা বার করে দেওয়া হয়। প্রয়োজন বোধ করলে সর্বোচ্চ তলের কণ্টোল রুম থেকে একটি সুইচ টিপে দিলেই জাহাজের তলার হৃদয় থেকে দুটি পাপনা বেরিয়ে পড়ে এবং অবিলম্বে জাহাজের হুলুনি থেমে যায়। কারণ এই পাপনা দুটো হৃদয় ডেউয়ের মুখেও জাহাজের ভারসাম্য অক্ষুর রাখে। এক একটি পাপনা দৈর্ঘ্যে বায়ো ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে ছ’ফুট। এগুলি একটা সংযোজিত ধাতুতে তৈরি। জলের মধ্যে দেখলে মনে হয় যেন বিপরীত দিক দুই বাহু বিস্তার করে সাঁতরে সাগর পার হবার চেষ্টা করছে। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই জাহাজ থেকে ‘ষ্টাবিলাইজার’ নিজস্ব করা যায়।



## আমাদের ভাষা

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু আমাদের ভাষার নাম পূর্বে বাংলা ভাষা ছিল না। আমি বাল্যকালে প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা যে পুস্তক পাঠ করিয়া স্ববর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণাদি শিখিয়াছিলেন সে পুস্তকের নাম ছিল “গৌড়ীয় ভাষার বর্ণমালা”। সেকালে “ক” ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ অক্ষররূপে ব্যবহৃত হইত। উহা যুক্তাক্ষর হইলেও অযুক্তাক্ষর-সমাজে কি করিয়া স্থান পাইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বর্ণ-পরিচয় রচনা করেন তখন এই “ক” অক্ষরটা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ হইতে নির্দ্বাসিত হইয়া বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষরের সমাজে নিজের আসন প্রাপ্ত হয়।

এইবার আমাদের ভাষার কথা বলি। বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব লুপ্ত হওয়ায় অনেকে এখন বাংলা ভাষাতে যে সকল ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলিকে বর্জন করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা অসম্ভব। বিদেশীয় শব্দের সংযোগে পুষ্টিলাভ না করিলে কোন ভাষাই পরিপুষ্ট হইতে পারে না। পৃথিবীতে যে সকল ভাষা এখন উন্নত ভাষা বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত সেই সকল ভাষায়ও প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়া বর্তমান উন্নত ভাষারূপে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান ইংরেজী ভাষায় ডেনিশ, ফরাসী প্রভৃতি শব্দ এত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত যে উহাদিগকে ইংরেজী ভাষা হইতে পৃথক করিতে গেলে বর্তমান ইংরেজী ভাষার সম্পদ বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। যখন একটা দেশ অপর দেশের সংস্পর্শ লাভ করে তখন সেই অপর দেশের শব্দনিচয়ও সেই দেশের ভাষায় স্থান লাভ করে। এই সংস্পর্শ ধর্ম সন্ধে, বাণিজ্য সন্ধে বা রাজ্যজয় ব্যাপারে ঘটিয়া থাকে। উহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারেন না। একটা সমাজ উদ্ধারণ দিয়া আমার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করি। বাংলার শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর মফস্বলে কোথায় সাবানের ব্যবহার নাই? গায়ে মাখিতে, কাপড় কাচিতে, জব্যাদি পরিষ্কার করিতে সব কাজে সাবানের ব্যবহার অনিবার্য। কিন্তু এই সাবান শব্দ বাংলা ভাষায় আসিল কোথা হইতে? সাবানের ইংরেজী প্রতিশব্দ সাপ। অবশ্য ইংরেজের এদেশে আগমনের পূর্বে বাঙালী সাবান ব্যবহার করিত না। যদি আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সাবান

ব্যবহার করিতে শিখিতাম তাহা হইলে ঐ জব্যকে সাবান না বলিয়া সাপ বলিতাম। সকলেই জানেন যে, মুসলমান নবাব বাদশাহেরা এবং ইউরোপে ফরাসীরা বিলাসিতার চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই নবাবী আমলে ফরাসী বণিকেরা এদেশে সাবান আমদানী করেন। তখন গনবান মুসলমানেরা ফরাসীদের নিকট হইতেই সাবান ব্যবহার করিতে শেখেন। সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে চর্কি লাগে। কিন্তু চর্কি হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে অস্পৃশ্য। বাল্যকালে দেখিয়াছি বর্মীয়শী ব্রাহ্মণ বিধবারা প্রাণাস্তেও সাবান স্পর্শ করিতেন না। এই সাবান শব্দের ফরাসী প্রতিশব্দ “সাবন” (savon)। এই সাবন ইংরেজী বানানে সাভন এবং তাহা হইতে বাংলায় সাবান হইয়াছে। উহা উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে “সাবুন” শব্দে পরিণত হইয়াছে।

আমরা বিদেশে কোথাও যাইতে হইলে পোর্টলা-পুটলি “বোচকা-বুচকি” বাধি। এই বোচকা শব্দ কোথা হইতে আসিল? পশ্চিমী ভাষায় একটা শব্দ আছে “বুশ্কা” (Bouchka)। এই “বুশ্কা” শব্দের মানে কাপড়চোপড়ের পুটুলি। আমি শুনিয়াছি আমার মাতামহ পশ্চিমী ভাষা জানিতেন। তিনিই আমার মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, বোচকা শব্দ পশ্চিমীজদিগের কাছ হইতে আসিয়াছে। ইংরেজ দ্রষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য ব্যপদেশে বাংলায় আসিবার পূর্বে ইউরোপে ডেনমার্ক ডেনস হল্যান্ড ডাচ, ফ্রান্সের ফরাসী এবং পশ্চিমীজের পশ্চিমীজ বণিকেরা বাংলায় আসিয়া কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সকল কুঠীর শেষ নিদর্শন ফরাসী চন্দননগর বা ফরাসডাঙ্গা মাত্র তিন বৎসর পূর্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল বিদেশী জাতির ব্যবহৃত অনেক শব্দ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের সময় আমরা আগ্রহ সহকারে লিচু ও জামরুল খাইয়া থাকি। কিন্তু ঐ দুইটি ফলের জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে—চীন দেশ। ‘লিচু’ শব্দটি চীন ভাষাতেও আছে। কিন্তু জামরুল শব্দটি চীনদেশীয় কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না।

বাঙালীর প্রায় সকল ইষ্টকালয়েই কক্ষমধ্যে প্রাচীর-গাত্রে কুলুঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। এই “কুলুঙ্গী” শব্দটি কোন ভাষা হইতে আসিয়াছে? তিস্ত-পর্যটক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তিস্তভাষা পর্বতকে বলে

“কুল” আর গহ্বরকে বলে “কী”। তিব্বতী ভাষায় কুল্কী মানে পর্বত-গহ্বর। তাহা হইতে আমাদের কক্ষ-প্রাচীর-গহ্বরের নামও কুল্কী হইয়াছে। আমরা যে চা পান করি সেই চা চীন দেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চা শব্দই ব্যবহৃত হয়। এইরূপ জন-প্রবাদ আছে যে, মহর্ষি বশিষ্ঠ চীন দেশ হইতে ভারতে চা আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে উত্তর ভারতের হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে চা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অনেক শব্দ আমাদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অথচ আমরা জানি না যে ঐ সকল শব্দ কোন্ সময় হইতে, কোন্ ভাষা হইতে আসিয়া বাংলা ভাষায় মিশিয়া গিয়াছে।

অনেকের ধারণা যে, সংস্কৃত ভাষায় কোন বৈদেশিক শব্দ নাই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ভূতপূর্ব সংস্কৃত-অধ্যাপক ভাগবত শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সংস্কৃত “উৎপল” শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এরূপ আরও অনেক শব্দ বিদেশী অর্থ বা অনর্থ ভাষা হইতে আসিয়া আমাদের দেবভাষায় মিশিয়া গিয়া থাকিবে— তাহা অসম্ভব নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে আর একটা কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা কথায় কথায় ভাল মন্দ সকল ক্ষেত্রে “যোগদান” শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় “যোগদান” শব্দটি মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইত। চোরে যখন চুরি করিতে যায় তখন কেহ চুরি করিবার উদ্দেশ্যে সেই তস্করদলের সহিত মিলিত হইলে তাহাকেই যোগদান করা বলে।

গোরক্ষপুর কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত-অধ্যাপক ললিত-মোহন কব সংস্কৃত এবং পালিভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করেন। তিনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি বলিতেন, “পাষণ্ড” শব্দটা আমরা নিষ্ঠুর, নির্দম বা অশাস্তিক অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু পালিভাষায় “পাষণ্ডি” শব্দে শাস্ত্রিককে বুঝায়। মহারাজ অশোকের শিলালিপিসমূহে ‘পাষণ্ডি’ শব্দ অশোকের গণবাচক অর্থে বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, দেখা যাইতেছে যে, একই শব্দ কালভেদে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হওয়াও বিচিত্র নহে।

ভারতবর্ষে মুসলমান আমল হইতে আরবী, ফারসী প্রভৃতি বাবনিক ভাষার এত অধিক শব্দ আমাদের ভাষায় মিশিয়া আছে যে তাহার সংখ্যা হয় না। আমরা “আদালতে” “মামলা-মোকদ্দমা” করিতে গিয়া “উকিল” “মোক্তারের” সাহায্য লইয়া থাকি। তাঁহারা “আদালতে”র “নাজীর”, “পেশকার” ও “কারকুন” প্রভৃতিকে ধরিয়া বিচারকের

সম্মুখে আমাদের অভিযোগ “দায়ের” করেন। “আসামী” ও “ফরিয়াদী”র উকিলেরা বিপক্ষ পক্ষের “সওয়াল” “জবাব” গ্রহণ করেন। সাক্ষীদিগকে “জেরা” করিয়া “নাস্তানাবুদ” ও “নাঞ্জেহাল” করিয়া থাকেন। আমার এই বাক্যাংশ আমি কতগুলি আরবী, ফারসী বা উর্দু শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহা দেখাইবার প্রয়োজন আছে কি? লোকে বাদী কিংবা প্রতিবাদী নিম্ন আদালতের বিচারে পরাজিত হইলে হাইকোর্টে “আপীল” করে। আমি জিজ্ঞাসা করি, উচ্চতম বিচারালয়ে পুনর্বিচারের আবেদন করা অপেক্ষা “হাইকোর্টে” “আপীল” করা কি অনেক সহজ নহে?

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য আমরা যদি বিদেশীয় শব্দ বর্জন করি তাহা হইলে সেই বিশুদ্ধ ভাষাটাই কি আমাদের কর্ণে বিদেশীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না?

“শিশি”, “বোতল”, “গেলাস”, “মগ”, “বুরুশ”, “উল” প্রভৃতি শব্দ বিদেশী অথবা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ঐ সকল শব্দকে আমরা স্বচ্ছন্দে বর্জন করিতে পারি কি? আমরা “পেপার” না বলিয়া যদি “কাগজ” বলি তাহা হইলেই কি আমরা বিদেশী শব্দের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব? সুতরাং আমার মনে হয়, যে সকল শব্দ বিদেশী হইয়াও আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে সেগুলিকে বর্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া যেমন আছে তেমনই রাখাই ভাল। অকারণে ভাষাকে সরল করিতে গিয়া উহাকে জটিলতর করা হয় না কি? হিন্দী “করণ” শব্দের অর্থ লেখক। পূর্বে কায়স্থরাই আমাদের দেশে লেখকের কার্য করিতেন। সেই জন্য বিহার বা উত্তর প্রদেশে কায়স্থের প্রতিশব্দ “করণ”। এই করণ হইতে বাংলা কেরানী শব্দ হইয়াছে। এখন যদি এই কেরানী শব্দকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া “কারণিক” করি তাহা হইলে সে বেচারী আমাদের সমাজভুক্ত থাকিবে না সমাজচ্যুত হইবে?

বিদেশীয় শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তরে পর্যন্ত কিরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার একটা প্রমাণ দিতেছি। তিন-চারি মাস পূর্বে আমি একদিন আমাদের প্রতিবেশী একজন ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি এমন সময় দেখি এক বৃদ্ধা একটি রুগ্ন শিশুকে কোলে লইয়া ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। সেই সময় আর একটি বৃদ্ধা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। এই শেষোক্ত বৃদ্ধা রুগ্ন শিশুটিকে দেখিয়া বলিল, “তোমার নাতি না? বড় রোগা হয়ে গেছে। কি হয়েছে?” তাহা শুনিয়া প্রথম বৃদ্ধা বলিল, “কি জানি দিদি। ডাক্তার বললে ওর পেটে যকৃড়ি না কি হয়েছে। আমি ত শুনে ভয়ে

মরি। পেটে পিলে হয়, নেবার হয় তা জানি। কিন্তু যক্‌ড়ি কি তা কখনও জানি না। যক্‌ড়ি শুনে অবধি আমি ভয়ে কাঁঠ হয়ে গেছি।” আমি ঐ কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবুকে গিয়া বলিলাম, “আপনি ঐ ছেলের পেটে যক্‌ড়ি হয়েছে বলাতে বুড়ী ত ভয়ে কাঁঠ হয়ে গেছে। ও পিলে জানে, নেবার জানে। কিন্তু যক্‌ড়ি কাকে বলে বুঝতে পারে নি। ওকে ও রকম বিটকেল শব্দ একটা না বলে বাংলা করে লিভার বললেন না কেন? তা হলে ওর ভয় হ’ত না।” আমার কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

এ তলে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার কল্যাণে আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা “ডাক্তার” বলিলে চিকিৎসককেই বুঝে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিশেষ বিষয়ে সর্বোচ্চ উপাধি-ধারীকে বুঝে না। চিকিৎসক আসিয়া বিবেচকের ব্যবস্থা করিলে তাহারা অবাক হইয়া ভাবে বিবেচক আবার কি? পেট পরিষ্কার করিবার জন্য ডাক্তারেরা “জোলাপ” দিয়া থাকেন। কিন্তু বিবেচক কাহাকে বলে? এইরূপ শত শত বিদেশী শব্দ আমাদের বাংলা ভাষার সর্বস্তরের লোকের মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল শব্দকে আমরা বজ্জন করিব কিরূপে?

আমাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, অত্যাচ্ছ হিমালয় শৃঙ্গে তুষাররূপ গলিয়া নিরাবিনীমুখে যখন নির্গত হয় তখন উহা অতি ক্ষীণপ্রাণ সামান্য জলধারা থাকে। উহার গতি যতক্ষণ নিম্নাভিমুখে থাকে ততক্ষণ আরও শত

শত জলধারা উহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ক্ষীণ স্রোতস্বিনীকে প্রবল নদীর আকারে পরিণত করে। হিমালয়ে গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা যখন পাঁহাড়-পর্বত ও নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হরিদ্বারের সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হয় তখনও তাহার বিস্তার বা গভীরতা একটা সামান্য ঋণের অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু সেই গঙ্গা সাগরাভিমুখে আসিবার সময় সরস্বতী, যমুনা, শোণ, অজয়, কোশী প্রভৃতি নদনদীর সহিত মিলিত হইয়া যে প্রবল ও বিরাট মূর্তি ধারণ করে তাহাকে না জানে। যদি ঐ সকল উপনদী গঙ্গার সহিত মিলিত না হইত তাহা হইলে ভাগলপুর, মুন্সের, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গঙ্গা কি এরূপ দৃশ্য ও বিরাট কলেবর হইতে পারিত! ভাষার বিন্দুত্বতা রক্ষা করিতে হইলে অগ্রে দেখা উচিত যে, ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ কোন শব্দ বা কোন পদ ভাষাকে কলঙ্কিত করিতেছে কি না। আমি অনেক খাতিনামা গ্রন্থকারের পুস্তকে পড়িয়াছি তাহারা “আবশ্যক” এই বিশেষণ শব্দকে “আবশ্যকীয়” লিখিয়াছেন। লিখিবার সময় তাহাদের বোধ হয় মনে থাকে না যে আবশ্যক শব্দ নিজেই বিশেষণ। উহাতে “ীয়” যোগ করিয়া আর বিশেষণ করা চলে না। ইংরেজীতে “use” শব্দটা বিশেষ্য; উহার বিশেষণ “useful”। সেই usefulকে আবার বিশেষণ করিয়া “usefulable” করা চলে কি? রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন ভাষা দেবতা। তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে অগ্রে সাধনা করিতে হয়। বলা সাধনায় কোন দেবতাকে আয়ত্ত করা যায় না।

## জিজ্ঞাসা

ত্রীবৈণু গঙ্গোপাধ্যায়

আজো আসে বাঁশবীর আকুল আহ্বান  
মাটির ধরায় বৃকে। অমৃতের গান  
ভেসে আসে ধবলীর দম্ব বক 'পবে,  
বহিয়া শান্তির বাণী প্রতি ঘবে ঘবে।  
মোরা পাপী-তাপী, মত্ত নৃত্য-স্নাত-গানে।  
মুহুর্তে বিহ্বল হই ঐহিকের টানে,  
কামনা-কণ্টকে ক্ষত হয়ে ওঠে মন;  
অশান্তির দাবদাহে জর্জর জীবন।

মহা-কল্যাণের বাণী, মধু ভক্তিরস,  
আজো করে ধরিজীবীর স্নিগ্ধ ও সরস।  
বাঁশীর বে-মজ্জুধনি আহ্বানিছে সবে  
আনন্দে কল্যাণে তাহা কবে মূর্ত হবে?  
অমৃতের পুত্র কবে খুঁজে পাবে পথ,  
ধাসিবে হৃদয়দ্বারে অনন্তের রথ?

## রক্তরাখী

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অস্ফাটলবাক্তী স্তম্ভের আলো তখন মাটির বুক ছাড়িয়া কানীর মন্দিরচূড়ায় আশ্রয় লইয়াছে। পুণ্যময় মন্দিরের স্পর্শ ছাড়িয়া বাই বাই করিয়াও বাইতে পারিতেছে না। শুধু মা-গঙ্গা আপন বিশাল বক্ষে গোখুলির পাতলা আবরণ ধীরে ধীরে টানিয়া দিতে-ছিলেন।

তড়িংকুমার একা হইতে নামিয়া গোখুলির এই শাস্ত মুক্তি দেপিয়া মুহূর্তের ক্ষণ তন্ময় হইয়া গেল। কিন্তু গঙ্গার উপর পট্টন জীর্ণ না দেখিয়া চিন্তায় কপাল কুণ্ডিত করিল। খবর পাইয়াছিল যে কার্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পুলিশের খুব কড়া নজর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী দেখিলে ত কথাই নাই; কাজেই সে মোগলসরাই হইতে একা করিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র কানী ষ্টেশনের অপর পারে নামিয়াছিল এই মনে করিয়া যে পট্টন ব্রিজের উপর দিয়া গঙ্গা পার হইবে, তা ছাড়া কানীর মত এত ছোট ষ্টেশনে পুলিশের নজর অত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্ষার বেগ একটু তাড়াতাড়ি আসার কলে দিন হই আগের পট্টন ভুলিয়া লইয়াছিল, এ খবর তাহার জানা ছিল না।

অগত্যা তড়িংকে রেল-পুলের উপর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইল। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিল প্রাটেকরমে মাত্র দু-একজন রেলকর্মচারী ভিন্ন আর জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। পুল পার হইয়া রেলসড়ার ধার দিয়া ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া ভাবের বেড়া ডিঙাইয়া বাহিরে আসিল। গেট দিয়া বাহিরে আসার সাহস পায় নাই, পাছে গেটে পুলিশ প্রহরার থাকে; কিন্তু তাহাতেই কি আর নিস্তার আছে! কয়েক পা কেবল অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় দুই জন ডিম্বস্থানী তাহার সামনে আসিয়া বলিল—“আপনি বাঙ্গালী বাবু আছেন, আপনার কোথা হইতে আসা হইল, কোথায় বাওয়া হইবে?”

তড়িংয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল জবাব দেয়—আসিয়াছি তোমার মনিবের ভিড়ায় ঘুষ চরাইয়া, তাহাদের পিতৃপুরুষের পিশুর ব্যবস্থা করিতে; কিন্তু নিজেকে বধাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া কহিল—“আমি কানীতেই থাকি, মোগলসরাই গিয়েছিলাম কাজে”।

“আপনার ঠিকানাটা বলিয়া দিন ত বাবুজী।”

“নাম ঠিকানা নোট বইয়ে টুকে লাভ কি, আমার সঙ্গে এসে দেখে গেলেই ত হয়”—বিরক্তিতরে কহিল তড়িং।

“রাগ করছেন বাবুশাই, পেটের খান্ধায় ঘুরি, যার নিমক খাই তার হয়ে হুঁচরটা নাম ঠিকানাও যোগাড় করতে না পারলে বাল-বাচ্চা লইয়া বাঁচি কি করে!”

তড়িং আর কথা না বাড়াইয়া মিথ্যা নাম ঠিকানা দিয়া অগ্রসর হইল। গোয়েন্দা কর্মচারীরাও কিরিয়া চলিল।

তড়িং কিছুদূর অগ্রসর হইলে এক একাওয়ালা তাহার পাশ দিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া কহিল, “গাড়ী চাই বাবু!”

“চাই, কত নেবে বল!”

“আপনার যোজ্ঞাকার খদ্দের, আপনারদের সঙ্গে আবার দর-কবাকবি কি করব বাবুশাই!”

“সে হয় না, এখন কতছ বাবুশাই, আর বাড়ী পৌঁছলে একেবারে ঘাড়ে চেপে দেড়গুণ দাম না দিলে চোঁচিয়ে পাড়া মাখায় করে নেবে।”

“তা আপনার কাছে আর বেশী চাইব না, ভয় গুণ্ডা পয়সা দেবেন।”

“ওসব ছ’গুণ্ডা টুণ্ডা বুঝি নে, চার আনার যাবে ত চল।”

“ওতে হবে না বাবুজি।”

তড়িং আর দরকবাকবি না করিয়া পা বাড়াইল, হুঁচর পা গিয়াই ফিরিয়া কহিল, “পাঁচ আনা পাবে, যাবে ত চল।”

“আচ্ছা, আস্থান বাবু, আস্থান। আর চারটি পয়সা আপনার কাছ থেকে বকশিশ চেয়ে নেব।”

এতক্ষণ এই দরকবাকবি এই গোয়েন্দা কর্মচারী দুইটি দূর হইতে ঠাড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল। গাড়ী চলিতে সুর করা মাত্রই হাঁক ছাড়িল, “এই গাড়োয়ান গাড়ী রোপ।”

গাড়ী ধামিতেই একটি লোক দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, “এই বাটা নিমকহায়া, বাবু সঙ্গে হাঙ্গামা করবি নে, বাবুকে ঠিকসে পৌঁছে দেবি।” পরে তড়িংয়ের দিকে চাহিয়া কহিল—“আপনার কোন ভয় নাই বাবুশাই; ও অমনি যারা লোক আছে।” কথা শেষ করিয়া কিরিয়া চলিতেই গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল।

লোকটাকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া তড়িং একটু চিন্তিত হইয়াছিল। যাহা হউক, বিপদ ভালয় ভালয় কাটিয়াছে দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—“তোফা গাড়োয়ান সেজেছ ত বনোয়ারী! তোমার চেনে কার সাথি! আমারই প্রথমটা ভুল হয়েছিল।”

“অমনি না হলে কাজ এগোয় কি করে তড়িং দা”—হাসিয়া মন্তব্য করিল বনোয়ারী। তাহার পরই কথার বাঁজ মিশাইয়া কহিল—“দেখলে ত বাটা হারামজানার কাণ্ড; আমার খবরদারী করার অর্থ হ’ল যে কিরে এসে ওকে বলতে হবে তোমার কোথায় যেনে এলাম। গাড়ীর নম্বরটাও দেখে নিলে।”

“ভূমি পাকা লোক, তোমার সঙ্গে ও এটে উঠবে কি করে। থাক্কে, ও ত আমাদের পথের নিত্য সঙ্গী, আসল কথা এখন বল—সব খবর ভাল ত।”

“এখন পর্যন্ত ত খবর সব ভালই, তবে টিকটিকির উপদ্রব

বজ্র বেড়ে গেছে—তার নমুনা ত হাতে হাতেই পেল। রমেশ বাবুর ওখানে তোমার থাকা হবে না ; তোমার জন্ত কোথায় নাকি আলাদা বাসা ঠিক করা হয়েছে, তা রমেশবাবু নিজেই তোমাকে দেখানে নিয়ে যাবেন।”

“আচ্ছা বনোয়ারী, তুমি না আগে মোটরগাড়ী চালাতে, সেটা কি হ'ল।”

“সেটা ত অনেকদিন খুঁয়েছি। তাই ত এখন ষ্ট্রিয়ারিং ছেড়ে লাগাম ধরেছি। সেবার গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম পেশোয়ার। একদিন কি মাথায় চাপল, এক মিলিটারী গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিলাম। শেষে গাড়ীতে গাড়ীতে হ'ল কলিশন! গাড়ী ত চুরমার! নিজে কোনগতিকে ছিটকে পড়ে গিয়ে বেঁচে গেলাম। কিছুদিন যে হাসপাতালে থাকতে হয় নি তা নয়। জানেন ত এমনি দুঃস্বপ্ননার জন্ত কত গালমন্দই না শুনেছি।”

তড়িং বলিল—“এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে ত?”

বনোয়ারী শুধু হাসিতে লাগিল।

“হাসল কথাটা খুলে বল ত! তুমি ত আজকাল আর অমনি খুঁকি নেওয়ার ছেলে নও! কিছু একটা মতলব নিশ্চয় ছিল তোমার।”

বনোয়ারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। “তড়িং-দাকে মিছে কথা বলে সারবার উপায় নেই, ধরা পড়বই পড়ব। অনেক বার চেষ্টা করে দেখেছি, যেহাি আজ পর্যন্তও পেলাম না।”

“আর ভনিতার দরকার নেই, এখন আসল কথাটাই খুলে বল!”

“অবশ্য খুঁকিটা খুবই মারাত্মক ছিল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাধা হলে সবই করতে হয়। তুমি বোধ হয় জান কোহাটের রাস্তায় পাহাড়িয়ারদের একটা রাইকেল তৈরির কারখানা আছে। ওরা হাতেই সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে রাইকেল তৈরি করে—কলে তৈরি যে-কোন রাইকেলের তুলনায় খারাপ নয়। কিছুদিন ধরে ওদের সন্দেহ হয়েছিল যে, বুঝি মিলিটারীর নজর পড়েছে ঐ কারখানার উপর। তাই আমার উপর জরুম ছিল যে, কোন মিলিটারী গাড়ীর আগমন দেখলেই যেন আমি ওদেরকে সম্বন্ধে হুসিয়ার করে দিই। দেখলাম এক গাড়ী যাচ্ছে ঐদিকে। মনে হ'ল কুমতলবেই যাচ্ছে, ওগুলো মিলিটারী গাড়ী দেখেই পাল্লা দিয়ে আগে পৌঁছবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে ওতে স্ত্রিবেশ হবে না, স্পীডে (দ্রুতগতিতে) ওদের সঙ্গে পারব না, তখন দিলাম গাড়ী বাঁকিয়ে, হ'ল কলিশন—তারপর দিন দুই পরে জান হলে দেখি হাসপাতালে পড়ে আছি, হাতে পায়ে মাথায় অল্পস্র ব্যাণ্ডেজ। পরে ভাল হয়ে শুনতে পেলাম মিলিটারী গাড়ীরও বেশ ক্ষতি হয়েছিল তবে আসলে কারখানা বেঁচে গেছে।”

তড়িং এতক্ষণ কল্পনিধাসে তাহার কথা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইতে বনোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা, এমনি করে গাড়ী ঘোরাবার সময় তোমার নিজের কথাটা একবারও মনে হয় নি।”

বনোয়ারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি ধামিলে কহিল, “তুমি হাসালে তড়িং দা, তুমিই বল ত, যখন ঘর ছেড়ে এ পথে পা দিয়েছ, তখনই কি জানটা বকেয়া পাতার লেগাও নি। ঐ গাড়ীটার আগে পৌঁছতে হবে, না হয় ওর যাওয়া বন্ধ করতে হবে, এই ছিল সমস্যা।”

“তা বটে—”

ততক্ষণে গাড়ী জনবহুল রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। বনোয়ারী কহিল, “তড়িং দা, এবার কিন্তু আর কথা নয়। বাবু-গাড়োয়ানে এত হাসিগল্প লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওটা এড়িয়ে চলাই আমাদের কাজ।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া বাঙ্গালীটোলার এক গলির মুখে থামিল। তড়িং তাড়াতাড়ি ভাড়াব পরয়া বনোয়ারীর হাতে দিয়া দ্রুতপদে গলির ভিতর প্রবেশ করিল। অনেকটা আগাইয়া রমেনদের বাড়ী। বাড়ীতে পা দিতেই রমেন কহিল, “এখানে তোমার থাকা হবে না তড়িং-দা। তোমার জন্ত আলাদা বাড়ী ঠিক করে বেখেছি, সেখানেই চল। কাকা এখনও বাড়ী ফেরেন নি। তিনি এসে তোমার চেহারা দেখলে কি যে করবেন তাই ভাবছি। একেই ত আমরা—আমি ও আমার বুড়ো মা ওর গলগল হয়ে আছি। তারপর একদিন এসে পুলিশ বাড়ী তল্লাস করে গেছে। কাকা ত একরকম প্রকাশই করেছেন যে, আমরা এ বাড়ী ছাড়লেই তিনি স্ত্রী হবেন, কেননা আমার এই ছেলেমানুষির জন্ম বাড়ীহীন সব লোকের হাতকড়া পড়বে এ তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবেন না। একথা শুনে মা আমার কাঁদ-ছিলেন। সত্যি বলছি তড়িং-দা, এমনি পারাপ লাগছে তা আর কি বলব। আমার বাইবের কোন কাজে পাঠিয়ে দাও না। এখানে যেন আর ফিরতে না হয়।”

“পাগল হয়েছে নাকি রমেন? ভাবতবর্ষের কোটি কোটি লোকের ওদাসীদ যদি তুমি উপেক্ষা করতে পার, তা হলে কাকার কথাটাই বা উপেক্ষা করতে পারবে না কেন? সত্যিই ত আর তুমি আলস্য করে বাজে বদখেয়ালে সময় কাটাচ্ছ না যে তাঁর কথা গায়ে লাগবে। এখানে থাকলেই তুমি বেশী কাজ করতে পারবে। এ বাড়ীতে থাকা যখন তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে তখন অবশ্য ছাড়তে হবে। থাকগে, এখন আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই—চল তুমি কোথায় আস্তানা ঠিক করেছ।”

২

বাঙ্গালীটোলারই আর একটা ক্ষুদ্র গলির মধ্যে তিনতলা বাড়ীর ভাড়াটে একপানা ছোট ঘর তড়িতের জন্ত ঠিক করা হইয়াছে। এই বাড়ীতে অনেক লোক—একেবারে সাড়ে বত্রিশ ভান্ডা। অধিকাংশ একপানা ঘর লইয়া থাকে। অতি অল্প লোকই দুটো ঘরের বাসিন্দা।

তখন বিকাল গড়াইয়া আসিতেছে। ঐ বাড়ীরই এক ঘরে একটি বৃদ্ধা বিধবা বসিয়া মালা জপিতে জপিতে ভাবিতেছে যে যদি

কাল-পর্যন্ত নাগাদ মনিজ্ঞার আসিয়া না পৌঁছে তবে বিশ্বনাথের প্রসাদ ভিন্ন আর উপায় নাই। অবশ্য তখন মাত্র পাঁচটি টাকা হইলেই একলায় পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

পাশের ঘরের বিধবা ঘরে চুকিয়া প্রথমাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিল, “দিদি কিছু ভেব না, বিশ্বনাথের চরণে আছি, ভয় আর কি। এ বাড়ীর কত লোকই ত ছত্রে গিরে খেয়ে আসে। বিশ্বনাথের রূপায় সতীনপোর টাকা ত আমি কালই পেয়েছি—তুমি কিছু ভেব না। বরাত্তে সতীন জুটলেও ছেলেটা ভালই ছিল দিদি। কিন্তু বিয়ে করবার পর বৌটার মতিগতি ভাল না দেখে ছেলে পাটিয়ে দিলে এই বিশ্বনাথের চরণে”—কথাগুলি শেষ করিয়াই একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। পুনরায় কহিতে লাগিল—“ঐ সাত নম্বর ঘরের দিদির কথা ভাবতে কষ্ট হয়। স্বামী-স্ত্রীতে এলি জোড়ায় বিশ্বনাথের চরণ সেবা করবি বলে। কিন্তু বরাত্ত এমনি স্বামীটা হুঁদিনও টিকল না। ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই হুঁদিন চালিয়ে নেবে! কিন্তু বিশ্বনাথ সবাইকে দেখেন, তাই ত তের নম্বরে ওর রান্নাবান্নার কাজ জুটল—আর বিশ্বনাথের প্রসাদ ত আছেই, কোন গতিকে বাই হোক দিন চলে যাচ্ছে।”

দ্বিতীয়র কথা শেষ হইতেই চার নম্বরের বিধবা আসিয়া কহিল, “এই যে তোমরা এগানেই আছ, ভাস্কর চিঠি লিখেছে তার বড় ছেলের বিয়ে, আমার নিতে আসবে। কিন্তু দিদি, বিশ্বনাথের চরণ ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে নেই।”

“তোমার ভাগা ভাল দিদি, এমন ভাস্কর তপস্বী করলে পাওয়া যায়”—মন্তব্য করিল প্রথম। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিল, “হ্যাঁগা দিদি, পাঁচ নম্বরের দিদির ছেলেটার নাকি চাকুরি হয়েছে?”

“হ্যাঁ হয়েছে, জোয়ান বেটাছেলে ঘরে বসে থাকলে কি রকম দেখায় বল ত?”

এখন যদি কেহ সতের নম্বর ঘরের দরজার কান পাতিয়া শোনে তবে জানিতে পারিবে তাহার তখন সাধুর সন্ধানে বাস্ত, অর্থলাভ কি করিয়া হইতে পারে। আর কোন উপারেই ক্ষুধা মিটিতেছে না। আর একটি ঘরে পলাতক কয়েকটি হুঁত পয়স নিশ্চিন্তে দিন কাটাতেছে ও বিশ্বনাথপ্রাপ্ত লোকগুলির জয়গান করিতেছে।

এ বাড়ীর অধিকাংশ বাসিন্দা অবশ্য বিধবা কিংবা এমনি বাহাদের বিশ্বনাথ ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয়ই নাই। জীবনে কোন একটা ভুলের বা অবিবেচনার জন্য পরিত্যক্তা নারীও আছে।

ইচ্ছা করিয়াই যখন এ বাড়ী পছন্দ করিয়াছে। এরকম বাড়ীর উপর পোয়েলা পুলিশের নজর সহজে পড়ে না। তড়িতের সঙ্গে যখনই বাহার দেখা হইত—সিঁড়ি দিয়া উঠিতে নামিতে তখন তাহাকে নাম ধাম আর বাপের নাম এমন কি কান্নাতে কি কাজ করা হয় তাহা বলিতে হইত! সুবিধা এই ছিল যে, উত্তর একটা কিছু দিলেই হইত। সত্যাসত্য লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না।

তড়িতের আহ্বানের ব্যবস্থা বিচিত্র। নিজে বাঁধাঝাড় একান্ত অপটু—সত্যি কথা বলিতে কি, ও ব্যাপারটার তাহার কোন উৎসাহও ছিল না। কিন্তু তবু পরমা বাঁচাইবার জন্য নিজেই ঠোঁটে ভাত সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে দুই চারিটা আলু বেগুন ফেলিয়া দিয়া আহার পর্ব সমাধা করিত। সাবাদিন পব বাড়ী কিরিবার সময় যে দিন মনে হইত যে বাড়ী কিরিয়া ঠোঁট জ্বালাইবার উৎসাহ থাকিবে না সেদিন রান্ধা হইতে হুঁচাব পরসার বাহা হউক কিছু কিনিয়া আনিয়া খাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়িত। যে দিন তাহাও মনে থাকিত না, সে দিন গ্লাস দুই জল ঢক ঢক করিয়া গিলিয়া শুইয়া পড়িত।

একদিন তড়িৎ দুপুরবেলা বাড়ী কিরিয়া কোনরকমে গায়ের জামা খুলিয়া বাগিয়া বিছানায় দেহ এলাইয়া দিল। ক্লান্তিতে চোপ বুজিয়া আসিতেছে। সামনেই ঠোঁটটা—মনে হইতেছে যদি কোন গতিকে ঠোঁটটা জলিয়া উঠিত আর চালের তেঁকেচি জল আর চালসহ বসিয়া যাইত তবে বোকা যাইত বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য! ঠোঁটটার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়াও উঠিয়া রান্না করিবার উৎসাহ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না।

হঠাৎ দরজার শব্দ পাইয়া চকিতে চাহিয়া দেখিল অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ঘবে প্রবেশ করিতেছেন। কোন ভনিতা না করিয়া তিনি কহিলেন, “তড়িৎ, এ সময় আর শুয়ে থেক না, নাও চট করে স্নান সেয়ে এস, আমি গাবার পাটিয়ে দিচ্ছি।”

তড়িতকে কোনপ্রকার প্রতিবাদ করিবার সুযোগ না দিয়াই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তড়িতের বিশ্ব মাত্রা ভাড়াইয়া গেল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর সহিত তাহার সিঁড়ি দিয়া উঠিতে নামিতে দেখা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোন দিন কোন কথা হয় নাই! হঠাৎ এমনি করিয়া ঘরে চুকিয়া খাবারের কথা বলিয়া গেলেন—যেন আদেশ করিয়া গেলেন ইহার আর বাতিলের হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য তাহার নিকট হুঁকোখা—অপরিচয়ের কোন বিধা কিংবা সঙ্কোচ কিছুই চিরুমাড় নাই! বাহা হউক আপাততঃ স্নান সাধিয়া আসাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া গামছা কাঁধে করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর কথাই মাথার ঘূঁরিতে লাগিল। বতই ভাবিতেছে ততই অবাক হইতেছে। একটা জিনিষ সে অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিল যে, এই বাড়ীর সকল ভাড়াটিয়াই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে!

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর স্বামী একদিন নিরুদ্ভিষ্ট হন। এক ছেলে এক মেয়ে লইয়া তিনি একটু বিপদেই পড়িয়াছিলেন। হয়ত একদিন স্বামী আবার কিরিয়া আসিবেন এই আশার স্বপ্নের ভিত্তি আঁকড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। তাহার একমাত্র পুত্র চিকিৎসার কোনপ্রকার সুযোগ না দিয়াই চিরনিশ্চায় শয়ন করিল। ক্রমে যখন দেখিলেন কত প্রতিক্ষাকে লইয়া স্বপ্নের ভিত্তি আর আশ্রয় পাইবেন না তখন একদিন অল্প-



বিসর্জন করিতে করিতে ইহা পরিভাগ করিয়া বিশ্বনাথের চরণে আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

কানীতে গঙ্গার ঘাটে স্থান করিতে আসিয়া অন্নপূর্ণা অকস্মাৎ অধিকার করিলেন তাহার স্বামীকে ! ঐ ঘাটেই তিনি মৌনী সঃঃ নামে পরিচিত। ঐ ঘাটেই তিনি মৌন হইয়া বসিয়া থাকিতেন, কেহ তাঁহাকে কখনও কথা কহিতে শোনে নাই, অধিকাংশ সময় চক্ষু মুদ্রিয়া থাকিতেন। যদি চক্ষু মেলিতেন তখনও অপলক, বেন ধানময়। গঙ্গার ঘাটে বহু বৎসর উলঙ্গ দেহে মৌনী হইয়া প্রায় সর্বক্ষণ বোগাসনে বসিয়া কাটাইয়া দিতেন।

প্রথম দর্শনে এতদিনকার রক্ত আবেগ অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল তাঁহার পায়ের লুটাইয়া পড়িয়া সমস্ত কথা জানান। কিন্তু তিনি নিজেকে সংবর্ত করিলেন অতি কষ্টে এই ভাবিয়া যে, তাঁহার স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া পরম পিতার ধ্যানে মগ্ন, তাঁহার সঙ্গর পুণ্ডন করাইয়া আর লাভ কি ? বিশ্বনাথের ইচ্ছা যদি তাহা না হইবে তবে তিনি কেন তাঁহাকে ছিনাইয়া আনিলেন ! অন্ততঃ তাঁহাকে দুই বেলা দেখিতে পাইবেন এই সৌভাগ্যের জন্য বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

তাঁহার পর হইতে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আসিয়া সন্ন্যাসীর আশ-পাশ পরিষ্কার করিয়া যাইতেন এবং ঘণ্টে করিয়া পানীয় জল, কিছু ফলমূল এবং মিষ্টি রাখিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসী তাহা গ্রহণ করিতেন কিনা তাহা তিনি জানিতেন না। এই সামান্য সেবা করিবার অধিকার পাইয়াই তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইটুকুও তাঁহার ভাগ্যে বেশীদিন টিকিল না। অল্প কিছুদিন পরই সাধু দেহত্যাগ করিলেন।

এই অঞ্চলের সকলেই এই মৌনী সাধুকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত—সেই সূত্রে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আর প্রতিমাও তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী বৈধবাক্ষিষ্ট বিবাদগষ্ঠীর মুখ তাঁহাকে অন্বেষণ কর্তব্য মত সকলের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিত। প্রতিমা সভাই প্রতিমাপ্রতিম, কিন্তু মাতৃদত্ত গৈরিক বাস রূপের তীক্ষ্ণতাকে একটা পবিত্র আভাষ ঢাকিয়া দিয়াছিল। লোকে তাহার দিকে মাথা ভুলিয়া চাহিতে সহসা সাহস পাইত না।

স্বামীর দেহান্ত হইলেও তিনি নিজে হাতে দুই বেলা তাঁহার বসিবার স্থান পরিষ্কার করিয়া প্রতিমাকে পাশে বসাইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন—স্বামীকে অন্তর দিয়া অনুভব করিবার জন্য।

তড়িতের জীবনে ইহা একটা নাটকীয় ঘটনা। তাহার আহাৰের অব্যবস্থার কথা কি ভাবেই তাহার গোচরীভূত হইল এবং কি করিয়াই বা তাহার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন কিছুতেই সে রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। ঘরে কিরিয়া আসিয়া আরও অন্ধ হইল। পরিচ্ছন্ন একটি আসন পাতা, সামনে খাবারের থালা সাজানো, পাশে এক গ্লাস জল ঢাকা দেওয়া আর ঘরের এক কোণে

প্রতিমা দাঁড়াইয়া থাবার পাহারা দিতেছে। প্রতিমাকে দেখিয়া তাহার বিশ্বাস মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। মনে হইল তড়িতকে দেখিয়া প্রতিমার ক্ষণেকের তরে বেন লক্ষ্য-সঙ্কোচে ভাব আসিল : কিন্তু তাহা কিছুক্ষণের জন্য মাত্র। সে ধীরে ধীরে কহিল, “আর দেবী করবেন না, খেতে বহন, মা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

তড়িত অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর কথায় প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। বিনা প্রতিবাদে এমন সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহার কেমন কেমন লাগিতেছিল। স্মৃতির পাইতে বসিতে বসিতে প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া বসিল, “আমার জন্য এত পরিশ্রম করবার কি প্রয়োজন ছিল বলুন ? আমি একা মাহুখ, ষ্টোভ জ্বালিয়ে এপথুনি খাবার তৈরি করে নিতে পারতাম।”

এই কথার প্রত্যক্ষ কোন জবাব না দিয়া প্রতিমা কহিল, “আমি এপন যাচ্ছি, একটু বাণে আসব, কিছু প্রয়োজন হলে বলবেন।”

তড়িত ভাতের থালা হইতে মুখ ভুলিয়া দেখিল প্রতিমা চলিয়া যাইতেছে। মনে মনে ভাবিল, ‘মা মেয়ে দুই-ই সমান দেখছি।’

এট নীরব শাসন যে তড়িতকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহার মনে হইল ‘এই ত আমার দেশ যাহার জন্য দর ছাড়িয়াছি ; দেশ ত আর এক মুঠো মাটি নয়, এর কোটি কোটি নর-নারী—যাধা সজীব, যাধা মাহুখ, যাধা দুঃখে কাঁদে আবাদ আনন্দে নাচে তাদেরই জন্য, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য এই সপ্তম। এরা ত পর নয়। ভাই, বোন, মাতা, পিতা, এরাই। এদের বাদ দিয়ে কি দেশের স্বাধীনতা ? এই অমৃতুতি আজ বেন তাহার হৃদয়ে নুতন করিয়া এক আনন্দের স্বাদ দিয়া গেল। স্নেহের অঘাচিত স্বরূপ তাহাকে মুগ্ধ করিল। তৃপ্তির এক গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া বাহির হইল।

পরিতোষ করিয়া আহাৰ তড়িত অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছিল। আজিকার প্রতিটি প্রাস তাহার নিকট অপরূপ লাগিল। একটু বাদে প্রতিমা আসিয়া খোজ করিয়া গেল তাহার আর কিছুই প্রয়োজন আছে কিনা। বিপ্লবী গৃহত্যাগীর বৈচিত্র্যময় জীবন—সে হয়ত কোন কোন স্থানে নানা সুখাঞ্চল আহাৰ করিয়াছে, কিন্তু এমন তৃপ্তি সে আর বোধ হয় কোথাও পায় নাই। তৃপ্তির এক মধুর রোমাঞ্চে তাহার ক্ষুধা-ভ্রম বিদূরিত। খাওয়া শেষ করিয়া একটু বিজানায় গড়াইল।

মাত্র আধ ঘণ্টার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহাকে ছেলেবেলাকার দিনগুলির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। যদিও তাহার নামে ঠিক কোন গ্রেপ্তারী পর্বোদ্যান ছিল না, কিন্তু তাহার উপর পুলিশের বড়া নজর থাকার সে ঘর ছাড়িয়াছে বহু দিন। এমনিধারা নীরব শাসন তাহাকে তাহার মা ভিন্ন একমাত্র দেবশের মা করিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে এই অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাহ্যিক ব্যবহারে কিংবা পোশাকে কোন মিল নাই। কিন্তু চেহারার বেন একটা সাদৃশ্য ছিল। তাহার মনে হইল, এরা আসলে মা, আমারই ইউক, কিংবা দেবশের



হউক বা প্রতিমার হউক ! এমনিধারা চিন্তার শ্রোত কখন ঘুমের দেশে মিলাইয়া গিয়াছে তাহা সে খেয়াল করিতে পারে নাই।

তাহার ঘুম ভাঙিল রমেনের ডাকে, “কি তড়িৎ-দা, অস্থগ করল নাকি, ঘুমোচ্ছ যে।”

“না, না, অস্থগ করবে কেন, কাল বড় রাত জাগতে হয়েছে।”

“ও ত তোমার নিত্যকার সাথী, তার জ্ঞান দিনে ঘুম ত তোমার কখনও দেখি নি। কাল রাতে আবার কোথায় ছিলে?”

“কৃষাণদের পাড়ায় মোড়লদের সঙ্গে আলাপ করলাম। তারপর এসে ছাতে শুলাম, কিন্তু ঘুমোর কার সাধি। আবার ভোর হতে না হতেই বিশ্বনাথের নাম করে জেগে উঠেই তুমুল ঝগড়া।”

“সকালবেলাই ঝগড়া।”

“আরে, রাতে শোবার সময় কার নামে কে কি কিস কিস করে বলেছে তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র আর কি।”

“আমার কিন্তু এই ভেবে আশ্চর্য লাগে তড়িৎ-দা যে, ধর্ম-কর্ম করতে এসেও এরা নীচ আচরণ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলতে পারে না।”

তড়িৎ এতক্ষণ শুইয়া ছিল, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “আমলে কি জানিস রমেন, এতগুলি লোক এক ক্ষুদ্র অপরিমিত স্থানে থাকলে পদে পদে ঠোকাঠকি ও ঝগড়া হবেই। এতটুকু ছাদে বাড়ীর অধিকাংশ লোকই এসে ঘুমোর। সকলেরই এখানে আসার ইতিহাস আছে, কাহারও কাহারও খারাপ ইতিহাস আছে—এসেছে অনেক নোংরামি লোকচক্ষুর অন্তরাল করতে, আপনার পরিচিত সমাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে আশ্রয় নেয় নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-নালীতে। ঝগড়ার সময় পেয়াল থাকে না, পরস্পরের বিরুদ্ধে নোংরা ইতিহাসের ঘাটাঘাটি হয়। এদের না আছে শিক্ষা, না আছে ধৈর্য—ধাক্কাতেও পারে না। কাজেই আদম প্রবৃত্তিই এদেরকে চালায়। এদের দোষ দিও না রমেন! এই বাড়ীর অর্ধেক লোকও এ ছাতে শোবার জায়গা পায় না। নিদারুণ গরমে সবাই চায় একটু আরামে ঘুমোতে। স্ততরাং অগ্রাধিকারের প্রস্তুত সহজ।

“ধর্ম-কর্ম এদের অছিলা মাত্র, আসলে এরা...”

রমেনের কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, “এরা মানুষ, এরা বড় হুংসী রমেন। এদের হুংসের তুলনা কোথায়! এদের প্রায় সবাই সব খুইয়ে, সব প্রিয়-পরিজন হারিয়ে একেবারে ছিন্নমূল, একেবারে সর্বস্বহারা! এখানে এসেছে খাদ্য, আশ্রয় ও হয়ত শাস্তি মিলবে—এই আশায়। বাঁচবার তাগিদেই আজও এরা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে নি! আজও আছে এরা বিশ্বনাথের চরণ ভরসা করে।”

কয়েক মুহূর্তের জন্ত উভয়েই নীরব বহিল। রমেন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, “আচ্ছা, থাক এদের কথা, কাল মোড়লদের সঙ্গে কি আলাপ করলে এখন তাই বল।”

“কাল ওদের সঙ্গে আলাপে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেলাম অনেক। ওদের সঙ্গে নিতে হলে আমাদেরকে ঢেলে সাজাতে হবে।”

“ওরা কি তা হলে আমাদের আসল কথাটাই বুঝতে পারে নি।

এদের সঙ্গে নেওয়ার যে মেহনত তার অর্ধেক যদি যুব-সমাজ ও ছাত্র-সমাজের প্রতি করি তবে আমাদের সাক্ষ্য নিশ্চয় বলেই ত মনে হয় তড়িৎ-দা।”

“আমাদের ওরা বিশ্বাস করতে চায় না রমেন। দোষী ওরা নয়। ওরাই দেশের মেরুদণ্ড। আমাদের মুক্কিরানা ডাক ওদের প্রাণে সাড়া জাগায় না।

“আমাদের যুব-সমাজ, আমাদের ছাত্র-সমাজের কথা বলছ, এরা ভাবপ্রবণ। উত্তেজনায় এরা সচল, আর বাস্তবের কণাঘাত এদের করে চিরন্তনে পঙ্গু। কিন্তু ঐ যে বললে, নির্বোধ কৃষাণদের কথা হু’বেলা হু’মুঠো ভাত, মাথা গোঁজবার ঠাই, আর হু’পানা মোটা কাপড় এই হচ্ছে সবকিছু বিচারের মাপকাঠি, এই সিঁথে কথা নিয়ে যদি ওদের কাছে টানতে পার তবেই ওদের বিপ্লবের পুরোভাগে দাঁড় করাতে পারবে। ওদের মনে জাগাতে হবে বিশ্বাস, স্থাপন করতে হবে আত্মপ্রত্যয়।”

রমেন—“সবই বুঝলাম! কিন্তু প্রথম চাই স্বাধীনতা, তারপর আর সব। পরাধীনতার অপমান অসহ্য, আগে ভাকতে হবে এই শৃঙ্খল।”

তড়িৎ—“রাজনৈতিক স্বাধীনতার বুলি ওদের হৃদয় স্পর্শ করে না। এদের কাছে আমরা বাবু—জাত-পা গুটিয়ে টাকা পাটাই আর মুনাফা ব্যাঙ্কে জমা দিই! ইংরেজও তাই করে। আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের sentiment বা ভাবান্তিষো মাতিয়ে তোলা যায়। কিন্তু কৃষাণদের—যারা মাথার ঘাম পায়ে কেলে উৎপাদন করছে তারাই প্রকৃত স্বার্থ বোধে। আমাদের প্রাচীন গৌরব, আমাদের পুণ্যভূমি, আমরা এমন ছিলাম তেমন ছিলাম, ইংরেজ এসে আমাদের পরাধীন করে রেখেছে—শুধু এই বলে মাতানো যায় না। ওদের একজন ত জিজ্ঞাসা করে বললে, “আচ্ছা বুঝলাম না হয় ইংরেজ গেল, কিন্তু তাতে করে আমাদের কয়লা কোথায়? দেবে আমাদের জমি ফিরিয়ে? দেবে আমাদেরকে বেহাই পাঞ্জনা আদায়ের অছিলায় জুলুম থেকে? আমাদের জমি ও উৎপন্ন ফসলের মালিকানা হবে কাদের? এই কথাগুলো একটু বুঝিয়ে দিন।

ইংরেজ গেলেই দেশের দুর্ভিক্ষ চলে যাবে একথা তার নিশ্চিন্ত হয় না। তারা বলে জমির মালিক ও জমিতে উৎপন্ন ফসলের মালিক কৃষকেরা না হলে ইংরেজ গেলেও দুর্ভিক্ষ যাবে না।

রমেন—“কিন্তু এটা কেন এরা বুঝতে পারে না যে, আমাদের দেশ স্বাধীন হলে গণভোটে হবে দেশ-শাসকের গোষ্ঠী নির্ণয়।”

তড়িৎ—“ভোটের রহস্ত এরা ভাল করেই জানে রমেন, কাল ওরা আমায় বললে, ‘বাবু ভোটের কথা বলছ, ও ত নিলামের ডাক, যে বেশী পরসা ছড়াবে সে-ই করবে কাম হাসিল। একবার ক্ষমতা হাতে পেলেই হয় তখন আর ঠেকার কে। তারপর পাঁচ-সাত বৎসর আর আপনাদের উপর হাত দেয় কে? এর মধ্যেই নিজেদেরটা গুছিয়ে নেবেন এবং পরের বৎসরের ভোট ভোগাড়ের ব্যবস্থাও করে

ফেলবেন। এই ত সেবারে কিসের যেন ভোট হ'ল, টাকার ছড়াছড়ি ত দেখলামই, তা ছাড়া তোমায় কি বলব বাবু, এত করে বললাম, আমাদের গ্রামের কথা, তখনও বাবু বলেন উনি জিতলে আমাদের গ্রাম আর গ্রাম থাকবে না; ভোট ত শেষ হ'ল, উনি জিতলেনও, তারপর তার আর পাজা কে পায়! একবার অনেক করে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম; সেবার অনাবিষ্টি—অন্ত কিছু করা ত দুরের কথা, আমাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলে না।' কাজেই বুলে যমেন ও ভোটের তত্ত্ব বই না পড়েও অভিজ্ঞতার আশুনে পুড়ে আপনি জেনে নিয়েছে।"

"ইংরেজকেই তা হলে ওরা বহাল রাখতে চায়।"

"না, তা অবশ্য চায় না, তবে আমাদের মুকদ্দিয়ানাও ওরা চায় না! ওরা বলে, ইংরেজ থাক এটা আমরা নিশ্চয়ই চাই। তবে আপনারা ইংরেজ হয়ে বসবেন না, আপনারা আমাদেরই হয়ে যান এই আমরা চাই। ওদের বান দিয়ে কোন কিছুই সার্থক হতে পারে না যমেন।"

তাঁহ তড়িতের ধুঁও লইয়া প্রতিমা ঘরে প্রবেশ করায় আলোচনার শ্রোতা বাধা পাইল। আজ তড়িতের অবাধ হইবার দিন, কোনকিছু সঠিক মাধ্যম আসিবার আগেই প্রতিমা কহিল, "কাপড়পানা নীচে পড়ে গিয়েছিল, দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম।"

তড়িৎ কিংবা যমেন কাপড় নেওয়ার জন্ত হাত না বাড়ানোতে প্রতিমা সামনের কবল-জড়ানো একটা পুটলির উপর কাপড়পানা রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

যমেনের আশ্চর্য্য দৃষ্টি দেখিয়া তড়িৎ নিজের বিশ্বস্বয়কে অধিক মনে করে নাই। আজিকার হৃৎপূরের ঘটনার পর অবশ্য তড়িৎ আর হতভম্ব হয় নাই! যমেনের কৌতুহল নিবৃত্ত করিবার জন্ত আজিকার সমস্ত ইতিহাস তাহাকে বলিল।

যমেন ইহাদিগকে মোটামুটি যে না চিনিত তা নয়, তবে সে পরিচয় একান্তই লোকমুখে শোনা। তার অভিজ্ঞতার যে নূতন পরিচয় পাইয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিয়া কহিল, "ওরা এমনি অদ্ভুত, লোকে ওদের যেমন করে ভয় আবার শ্রদ্ধাও আছে ওদের উপর। জানেন তড়িৎ-না সেদিন একটা ছেলে পড়েছে অতি অপ্রশস্ত রাস্তায় গড়িয়ে, আর ঠিক সেই সময়ে ওধার দিয়ে আসছিল একটা বাঁড় ছুটে, যে যেখানে ছিল সবাই দৌড়ে নিজের প্রাণ বাঁচাল, আর বাবা ছিল নিরাপদ দূরত্বে তারা হায় হায় করে উঠল, কিন্তু দেখলাম বুকের পাটা এই অন্নপূর্ণা ঠাকুরণের! মুহূর্তের মধ্যে ছেলটাকে আড়াল করে দাঁড়াল। থাকা খেলেন খুব জোরসে, আঘাতও পেলেন খুব। কিন্তু স্নেহ মনের জোরেই বোধ হয় ছেলটাকে দিলেন বাঁচিয়ে। ওর মা বধন কাঁদতে কাঁদতে নিয়ে গেল ছেলটাকে ওর হাত থেকে ওকে ধস্তাবাদ দিয়ে, উনি ত একটা কথাও বললেন না বরং ওদের মূগের পানে কটমট করে দৃষ্টি হেনে গজাব দিকে এগিয়ে গেলেন।

তখন গোখুলির আভা এই ক্ষুদ্র অপরিচয় গৃহে ছায়ার পর্দা

টানিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহাদিগকে বাহির হইতে হইবে তাহা স্বরণ করাইয়া দিয়া যমেন কহিল, "এক কাজ করা যাক তড়িৎ-না, ঠোভটা ছেলে রাস্তাটা সেধে যাওয়াই ভাল।"

"তার আর দরকার নেই, কিরে এসে করলেই হবে।"

"আজকের ক্ষেত্র অনিশ্চিত কাজেই তা হলে আজ আর কলের জল ছাড়া গতি নেই! সুতরাং ও পাট সেধে যাওয়াই মহাজন লাগে।"

ইহার পর আর যুক্তি নাই, সুতরাং উভয়ে মিলিয়া রাস্তা সারিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

"সুবেদার বলবন্ত সিংকে গবর দেওয়া হয়েছে কি"—জিজ্ঞাসা করিল তড়িৎ।

"হ্যাঁ"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। তাহারা এ রাস্তা ও রাস্তা কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটা গলির মধ্য দিয়া আসিয়া বড় রাস্তার মোড়ে পড়িয়া বনোয়ারীর একাধার মুহূর্তে অন্ধকার ঘনবাহনের স্রোতে মিশিয়া গেল।

৩

গভীর রাত্রে তড়িৎ বাড়ী ফিরিল। সমস্ত বাড়ী তখন নিদ্রায় নিম্ম। সিঁড়ি বাহিয়া উঠার নিজের পায়ের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই।

উপরে উঠিতে উঠিতে তড়িৎ লক্ষ্য করিল, প্রতিমা তাহার ঘরের দিক হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। কাছাকাছি আসিতেই প্রতিমা কহিল, "আমাদের ঘরে একটু আসবেন, মায়ের বড় অসুখ।"

তড়িৎ তাহার কথায় জবাব না দিয়া প্রতিমাকে অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরে গিয়া দেখিল অন্নপূর্ণা দেবী বস্ত্রধার কাতরাইতেছেন। জানিয়া লইল বস্ত্রণা পেটের। ডাক্তার ডাকাই শেষে মনে করিয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা করন, আমি এখনি ডাক্তার ডেকে আনিছি।"

অন্নপূর্ণা দেবী তড়িতের গল! গুনিতে পাইয়া ক্রীণ কণ্ঠে প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এত রাতে আবার ওকে ডেকে আনিল কেন বল ত!" পরে তড়িতকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাবা কিছু ভেব না, ও বাধা আমার এমনিতেই হয়, আবার এমনিতেই চলে যায়। ওরু আমি শাই না, ও আমি আর জীবনেও ছোঁব না। মিথ্যে ডাক্তার ডেকে হান্সা করা না।"

তড়িৎ এক মিনিট ভাবিয়া নিজের ঘর হইতে ঠোভটা আনিয়া জালিয়া দিল। প্রতিমাকে জল গরম করিয়া পেটে সেক দিতে বলিল। অন্নপূর্ণা দেবী কাতর কণ্ঠে প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু বৃথা। দুপুরবেলা বাহার শাসন নীরবে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাকে শাসন করিবার সুযোগ পাইয়া তড়িতের মন যেন কিছু পরিহৃত হইল। তড়িৎ ও প্রতিমা উভয়ে অন্নপূর্ণার সেবার ব্যাপ্ত হইল।

অন্নপূর্ণা দেবী বধন একটু সুস্থ বোধ করিয়া ভ্রাতৃজ্বর হইয়া পড়িলেন তখন পূর্বাংশে রূপালী আভাস অতি সুস্পষ্ট। তড়িৎ

নিজের ঘরে কিরিয়া ক্লাস্ত দেহ এলাইয়া দিল নিস্তার কোলে। ঘুম ভাঙিল অনেক বেলায়।

ইহার পর তড়িং নিজেই প্রতিমাদের বোঝাবধি লইত। এই সাধারণ মেলামেশার মধ্যেই তড়িং প্রতিমার লেগাপড়ার প্রতি অমুবাগ লক্ষ্য করিল।

তাহার এই মামুলি মেলামেশা অচিরে ঘনিষ্ঠতার পরিণত হইল। অল্পপূর্ণা দেবীর কঠিন আবরণের অন্তরালে যে স্নেহের ক্ষমতা তাহার জন্ত নিহিত ছিল তাহা তড়িংয়ের বিদ্রবী অনিশ্চিত জীবনে স্তামলিয়া আনিয়া দিল।

প্রতিমার স্বাভাবিক আত্মমধ্যাদাবোধ এবং তাহার ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য অচিরে তড়িংয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তড়িং নিজেও সংযমী ও সদাচারী। সুতরাং তাহাদের অন্তরের এই সহজ বোণসূত্র উভয়ের মধ্যে একটা অকৃত্রিম অমুবাগ সৃষ্টি করিল।

এই অমুবাগের প্রেরণায় তড়িং প্রতিমাকে আনিয়া দিত মহান লোকের জীবনী সম্পর্কে হৃৎ-একখানা বই। ক্রমে স্বদেশী যুগের বই আনিয়া দিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার সহিত এই সমস্ত বই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রতিমার আগ্রহকে আদর্শের প্রতি অমুবাগে পরিণত করিল।

প্রতিমার জীবন চলিয়াছিল এতদিন এক উদ্দেশ্যহীন এক টিমা-তেতাল্য কঠোর পথে। ক্রমশঃ তাহার জীবনাকাশে দেখা দিল এক নূতন আদর্শের আলো। প্রতিমা এক দিন আবিষ্কার করিল যে, সে এই আদর্শকে নিজের একান্ত অন্তরে আকর্ষণ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। মনে মনে কহিল, “ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, আমার উপবৃত্ত কর।”

আজকাল প্রায়ই প্রতিমা ও অল্পপূর্ণা দেবী দুপুরবেলা তড়িংয়ের ঘরে আসিয়া কাটাইয়া যাইত। এমনি এক দুপুরবেলার প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়াই ঘর গুছাইতে আরম্ভ করিয়া মস্তব্য করিল, “সব্বলের মধ্যে হুটো কাপড়, হুটো জামা, একটা কবল আর একটা পুঁটলী, তাই দেখছি ঘরঘর ছড়ানো।”

“ছেলেবেলা থেকে এই বদ-অভ্যাস হয়ে আছে। আর বাচ্ছে না। এ অভ্যাস আমার বালাসহচর। আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কত পেয়েছি, কত হারিয়েছি তার অন্ত নেই। অনেক বন্ধু পেয়েছি, আবার অনেক বন্ধু বিলায় নিয়েছে, কিন্তু ওটি আমার সত্যিকারের বন্ধু—আজ পর্যন্ত ছাড়তে পারে নি।”

অল্পপূর্ণা দেবী বেশ কোঁতুক বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা না গুনিবার ভান করিয়া কহিলেন, “আজ আমার নামে একটা মনি-অর্ডার এসেছে, কিন্তু কি একটা পণ্ডগোল বেখেছে, ভুমি যদি বাবা পোষ্ট-অপিসে গিয়ে কিছু একটা বিহিত করে আসতে পার।”

তড়িং ইহার কোন জবাব না দিয়া পোষ্ট-অপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

“তোমার কিন্তু এসব বালাই নেই তড়িং-দা! ডাকপিয়নও

তোমার বোঝ করে না, পোষ্ট-অপিসে যাতায়াতও তোমার কোন প্রয়োজন হয় না—কোঁতুক করিয়া কহিল প্রতিমা। তড়িংয়ের নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, “আচ্ছা তড়িং-দা, মা, বাপ, ভাইবোন ছেড়ে এই দূরদেশে একা পড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না!”

“তার স্মরণ তোমরা দিচ্ছ কৈ! তোমরাই করে দিয়েছ আমার সে অভাব পূরণ। তোমাদের স্নেহে যত্নে ভালবাসায় আমি মা-বোনের অভাব বোধ করবার ক্রমসতই পাচ্ছি নে। অবস্থা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এখন আমার না খেয়ে থাকবার বা অমুগ হলে গামোশা হুঁপু বিছানায় পড়ে চোঁচাবার উপায় বাপো নি।”

প্রতিমা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অল্পপূর্ণা দেবী বেন হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেলেন। ভারী গলায় বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—“ওসব ভালবাসা-টালবাসা আমি জানি নে বাপু—আমার কেউ নেই, আমি কাউকে চাইও না, দয়া-মায়ার আমার থাকতে নেই বাপু।”

তড়িংয়ের বিস্ত্রিত দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া প্রতিমা কহিল, “কিছু মনে করো না তড়িং-দা। মাঝে মাঝে মার যে কি হয় তার ঠিক নেই। জান, মা জীবনে আঘাত পেয়েছেন অনেক—তাঁই বোধ হয় মাঝে মাঝে...”—প্রতিমা কথাগুলি শেষ করিতে পারে নাই, তাহার গলাও খুব সহজ ছিল না।

“তোমার মায়ের কক্ষণায় আমি অভিভূত প্রতিমা। এ সামান্য কথায় আমি কি মনে করব।”

“কাল রাতে কথার কথার মা বলছিল, ‘জানিস পাপু, এ তড়িং নিশ্চয় তোমার দাদা দেবেশের বাল্যবন্ধু। ওরা ছিল একেবারে রাম-লক্ষণ। তড়িং স্বদেশী দলে লিডবার পূর্ব কর্ত্তা ওর সঙ্গে দেবেশের মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু গোপনে ওদের মেলামেশা কোন দিনই বন্ধ হয় নি। তাৎ পর যেদিন দেবেশ আমার কঁাকি দিয়ে চলে গেল সেদিনকার কথা আজও আমার মনে আছে। ঐ ছোঁড়া বাড়ী ঢুকল না, কিন্তু রাস্তার দাঁড়িয়ে কি কান্না। ওয় কান্না’ দেখে শোক ভুলে গেলাম—মনে হ’ল দেবেশ আমার ওর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। মা এ পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন। একটু পরে হঠাৎ বেন কার উপর চটে গিয়ে বলতে লাগলেন তারপর তুই ছোঁড়াও এক দিন ঘরছাড়া হলি—তোকে আর দেখতে পেলাম না। মনে হ’ল হাড় জুঁবেলো। কিন্তু আবার কেন—কেন-কেন-কেন!’ মাকে এমনি ভাবে উত্তেজিত হতে আমি কোন দিন দেখি নি। ভয় পেয়ে গেলাম। অনেক বুঝিয়ে মাকে আস্তে আস্তে শান্ত করে ঘুম পাড়ালাম। ওর কথার রাগ কহো না তড়িং-দা।”

তড়িং সমস্ত কাহিনী রুদ্ধনিশ্বাসে শুনিয়া এই মনে করিয়া আশ্চর্য হইল যে, এতদিন দেবেশের মাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার স্মৃতির পর্দায় ভাসিয়া উঠিল বহু দিনের বিস্মৃত অনেক চিত্র।

কি ভাবে তাহার সঙ্গে দেবেশের গোপন মেলামেশা হইত তাহার পিতার নিষেধ সত্ত্বেও, কি করিয়া তাহার স্বপ্নের বাক্যকে ও বিশিন গালের মতামত লইয়া তর্ক করিয়া রূপে গোলমাল বাধাইয়া একত্রে বেষ্ণের ওপর দাঁড়াইয়া শাস্তি ভোগ করিত। যেরূপ কোনকিছু ভাল পাবার তৈরি হইলেই দেবেশের মা তাহাকে গোপনে খাওয়াইতেন।

সমিতির কাছে তড়িৎ গৃহত্যাগ করিয়াছে অনেক দিন। পিতার মৃত্যুর পরও শেষকৃত্য করিতে বাড়ী ফিরিতে পারে নাই— পুলিশ তখন তাহাকে খুঁজিতেছে। তাহার নিজের মায়ের সঙ্গে পরে দেখা হইয়াছিল গোপনে কলিকাতায়। তাহার সেই শাকাজ্ঞ মৈথব-খুঁড়ি আজ আবার তাহাকে নুতন করিয়া বাধা দিল। কিছু কাল আর তাহার মায় সঙ্গেও দেখা হয় নাই। বহু কাল পর সমিতির কাছে নিজের জেলা-শহরে গিয়াছিল— সেখানে অনেক বাত্রে গোপনে আবার তাহার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মা তাহার হাত ধরিয়া কান্দ কান্দ স্বপ্নে কথিয়াছিলেন, “এমনি করে আমার সব ভাল লাগে না বাবা, তোর সঙ্গেই আমার নিয়ে চল—হুই যখন যেভাবে থাকবি আমার ভাঙে কোনই কষ্ট হবে না। মনে শান্তিই পাবে।”

তড়িৎ অগমনক হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক মন্তব্যের পর সে নিজে পরিপার্শ্বিক তুলিয়া গিয়াছিল। কিসের শব্দে তাহার মনঃ ফিরিয়া আসিতেই লক্ষ্য করিল প্রতিমা প্রত্যেক দিকে অপসারিত হইতে থাকিয়া যাচ্ছে। আত্মসম্বন্দ্য করিয়া কহিল, “কি বেগু পড়িয়াছে।”

“প্রশস্ত মহাসাগরের ঢেউ।”

“ওটা জলের ধমনী”

“কিন্তু তোমাদের নাকি ওটা অবাস্তব।”

“মাতৃশ্রের বার হতে পাবলে হয়ত হ’বে। কিন্তু তা ত হুই নি, হতে চাইও নে। স্বপ্ন-হুই, কামি-কামা নিয়ে মাতৃশ্রের সঙ্গে তাদের কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারলেই নিজেদের লক্ষ্য মনে করব।”

কথা বলিতে বলিতেই তড়িৎ সিঁড়ি বাঁচিয়া তরতর করিয়া নামিয়া যাঁতে লাগিল। যাঁতে যাঁতে গুলিতে গুলিতে পাইল, “তড়িৎ-না, ও তড়িৎ-না, গুলিতে পাচ্ছি, বাঁচবে আর বাঁচবে না জানা করে না। তোমার পরেই পাবার ঢাকা থাকবে।”

৪

ঘীরে ঘীরে নিশ্চিত গতিতে তড়িৎ প্রাথমিকে বিপ্লবের আদেশে অমুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রতিমা বাংলা ভিঙ্গি যেমন জানিত, তেমন ছোটবেলায় এক পাঙ্গী-পানীর যত্নে ইংরেজী লেখা-পড়া মোটামুটি শিখিয়াছিল—কথাবার্ত্তাও চলনসই শিখিয়াছিল। সুতরাং এদিকে আর তড়িৎকে তত মাথা ঘামাইতে হয় নাই।

কিছুদিনের মধ্যে তড়িৎ মাঝে মাঝে প্রতিমাকে দিয়া তাহার একান্ত অজ্ঞাতেই সমিতির সাধারণ কাজ করাইয়া লইতে আরম্ভ

করিল। প্রতিমা পূর্ব হইতেই বাস্তব একা চলকেরা করিত সুতরাং তাহাও বাস্তবতায় তাহারও সন্দেহের কারণ ঘটায় নাই।

এতকাল প্রতিমা যেখানেই যাঁত মায় সঙ্গেই যাঁত, কিন্তু ইন্দ্রানী মায় মাঝে তাহাকে একা চলিতে দেখিয়া অনেক, বিশেষতঃ প্রহারা শঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু মায়ার মায়ের নিজেরা কেবল কিছু বলিতে সাহস পায় নাই।

এক দিন দুপুরে প্রতিমা ছাত্র হইতে কামড় লইয়া আসিয়াব অল্প উপরে উঠিতে উঠিতে তড়িৎের ঘর গোলা দেওয়া উঁকি মাঝিয়া দেখিল তড়িৎ হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। শেঁড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—“শীগগির স্পিরিট হাত ভেঁকাও।”

কড়াইয়ে বেগুনগুলি পুড়িয়া যাঁতেছে দেখিয়া কড়াইনা নামাইয়া ষ্টোভ নিভাইয়া দিল।

“আজ আর তোমার তরকারি বেঁচে থাকবেই। ভাত তো তোমার হয়েই গেছে।” কথা শেষ করিয়া প্রতিমা নিজের ঘর হইতে কিছু ভাল তরকারী আনিয়া ভাতের পাশে রাখিবার সময় ভাতের দিকে লক্ষ্য পড়িতে কহিল—“ও ত হাত নয় বেন তোমাদের ফেলের লক্ষ্য।” এক দিন কিনা বলেছিলে ফেলপানার লক্ষ্য নাকি এক বস্ত পেতে দেবে, এ বোদ হয় না হইতেছে। বাইরেও সে অভ্যাসটা রপ্ত বুরি। কিছু ভাবব মনে আসি।”

“তার আর দরকার নেই—এখন বেশ ভাল লাগে।”

“তা ও লাগতই হবে। দুব মায় পকেটের না, চাল গোলাই তোমার চেষ্টার দান মনে হবে।”

কথা বলিতে বলিতেই একজন পাবের কপট প্রতিমা পাবার ভাগ্য কামিয়া দিয়া তড়িৎকে পাইতে বসিত অমুপ্রাণিত করিল। তড়িৎ যাঁতে আরম্ভ করিলে প্রতিমা কহিতে লাগিল—“আজ্ঞা, তুমি একটা কোডেলে থাকতে পার, নয়ত একটা বগুনকে বা বামনীকে কিছু পরমা দিলে সেই কোমার বাগা বাজা করবে পারে। হুইনা খাওয়া তোমার প্রাইট হয় না মনে হয়। যে দিন একবেলা জোটে তাও ত দেখছি আবুজোব আর বেগুনপোড়া।”

“বিদেশে বিড়িয়ে এর চেয়ে আরও কি চাই বল তা।” অন্তর, করিল তড়িৎ।

“বিদেশে বিড়িটা এ আপনাদের নিজস্বের মত। ও চলবে আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু তাঁকার অভাব আপনার আছে বলে ত মনে হয় না। তাঁদের তাঁকার টাকা আপনার পকেটে দেবে।”

তড়িৎ প্রাথমিকে বৈপ্লবিক জীবনে জানিয়া লইতেছিল। প্রতিমা জানিত তড়িৎ ‘প্লেদারী’ করে, কিন্তু তাঁকার মতিকাভরের উপ ফি তাহার সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, তড়িৎও পরিচয় করিয়া এতদিন বলে নাই। মনে করিয়াছিল কখনও মন দিয়াই প্রকাশ হইলে কল ভাল হইবে। সুতরাং আজও তাহাকে টাকার আসল রহস্য গোপন করিয়া মন্তব্য করিল—“আমি বড় কুপণ। তুমি কুপণ বড়লোক দেব নি কখনও? তাণা ক্ষুণ্ণ মনে গেলেও

পরমা খরচ করে খায় না, শীতে কষ্ট পেলেও জামা কেনে না ! আমি আসলে তাই...”

“ধাক আর মিথ্যে কথাই খুঁজি বাড়িয়ে লাভ কি তড়িৎ-দা ! কুপণ লোক ঢের দেখেছি। আপনাবা আসলে সেই জাতীয় লোক যারা নিজেকে উজাড় করে পরকে ভরে তোলে ; পরকে নিশ্চিন্ত করতে নিজের ঘাড়ে ঝণ্ডাট তুলে নেয়—অপরের সংসার গড়তে গিয়ে নিজের সংসার ছায়েথারে দেয়—আর পরের মুখে হাসি ফোটাতে আপন জনকে কাদায়।” প্রতিমার চোপ জলে চক্ চক্ করিতেছে।

তড়িতের মনে হইল প্রকাশ করিবার দিন আসিয়াছে। ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল—“কুপণ আমি সত্যি নই বোন। যে টাকা আমার কাছে দেখিস বোন, ও ত আমার সুপের জন্ত খরচ করতে নেই এটা কি তুই আজও বুঝতে পারিস নি ?” কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবহাওয়াকে হালকা করিবার জন্ত পুনরায় কহিতে লাগিল—“তোদের স্নেহের অত্যাচার দিন দিন যে পরিমাণে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে তোদের জন্তই আমাকে এগান থেকে পালাতে হবে।”

“পালাও না কেমন পার।” প্রতিমার এই তুমি সম্বোধন তড়িৎ ও প্রতিমা উভয়কেই মুহূর্তের জন্ত চকিত করিয়াছে। প্রতিমা কখনও আপনি, কখনও তুমি বলিত। কিন্তু এমন দরদভরা তুমি বোন কখনও বলে নাই। কিন্তু প্রতিমা অসঙ্কোচে এই আকস্মিক

পরিবর্তনকে গ্রহণ করিয়া কহিতে লাগিল—“মা কাল রাতে কি বলছিল জান ত, মা বলছিল তড়িৎ ও দেবেশ ত ছেলেবেলার একই পথে চলছিল। বৈচে থাকলে আজ সেও হয়ত ওই মত সব ছেড়ে সেই আদর্শ ধরেই চলত। দেবেশের অস্ত হতে ভেবেছিলাম বিশ্বনাথের চরণতলে জীবনের শেষ ক’টা দিন কাটিয়ে দেব, কিন্তু বিশ্বনাথ যখন তড়িৎকে আমার কাছে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন তখন ওকে আর ছাড়ব না। পারবে তুমি মাকে ছেড়ে যেতে তড়িৎ-দা ?”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কেন আমাকে তোমার কাজের সঙ্গী করে নাও না তড়িৎ-দা।”

তড়িৎকে কোন জবাব না দিতে দেখিয়া কহিতে লাগিল, “তুমি হয়ত ভাবছ পারব কিনা। পারব, নিশ্চয়ই পারব। প্রথম প্রথম হয়ত দোষ-ত্রুটি হবে, তুমি শুধরে দিও। এক দিনেই আর কেউ সব শিক্ষা পায় না।”

এতদিনকার সাধনা সফল হইয়াছে দেখিতে পাইয়া মনে মনে আনন্দিত হইল। যে বিপ্লবের বীজ প্রতিমার অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করিতে তড়িৎ মন স্থির করিল।

নীচ হইতে অল্পপূর্ণা দেবীর ডাক শুনিয়া প্রতিমা গর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ক্রম শ:

## অশান্ত ধরা

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা

শান্ত হয়েছে ক্ষুদ্র পৃথিবী, শান্তি কোথায় প্রভু ?  
জ্ঞান অধিক যুগ্মস্থ দল, ক্রমা নাই—নাই তবু।  
কোথায় করুণা ? কোথায় মমতা ? নিত্য-নিরন্তর  
গুণুই বিবাদ, গুণুই বিভেদ, গুণুই আত্মপর।

গুণু জেগে আছে বস্তু চক্, গুণু ঘৃণা-বিষে,  
আদিম কালের বর্বর যুগ আজো কি হ’ল না শেষ ?  
মানুষ সত্য—ব’লে গেছে যারা, মিথ্যা তাদের বাণী ?  
কমতা এবং প্রভুত্ব তরে সেই চিব-তানাহানি !

মানব কি গুণু কামনা করেছে প্রলয়-আবির্ভাব,  
দানবী সাধনা করি’ আণবিক অস্ত্র করেছে লাভ ?  
বিধাতার কাছে প্রার্থনা তার সৃষ্টির তবে নর ?  
শান্তি চাহে নি, সত্য চাহে নি, চেয়েছে কি গুণু জ্বর ?

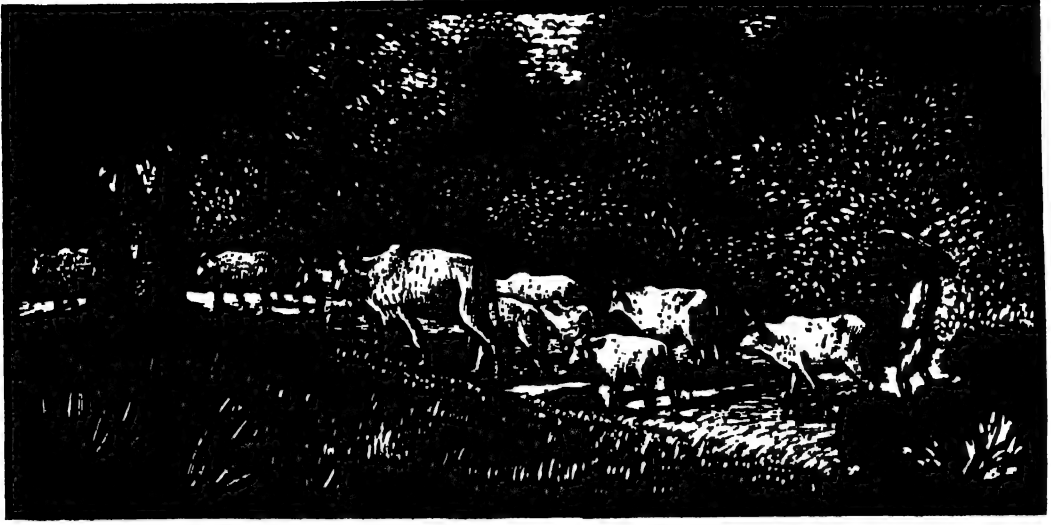
হেথা আদর্শ-সংবাসে বুঝি ওঠে গুণু হলাহল,  
বিবাক্ত ধূমে সমাচ্ছন্ন আকাশ-ধরণীতল।  
অতীতে দেখেছি ধর্মের নামে ক্রুসেডের অভিযান,  
নীতির বুকে উগ্র ক্রুসেড আজো সে বর্তমান।

এ-দেশ ও-দেশ, আমরা ও ওরা, পশ্চিম আর প্রাচী  
কাহারো মধ্যে মিলন হ’ল না, এল নাকো কাছাকাছি।  
ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র ও নারকতন্ত্রগুলি  
রচিয়া আড়াল মানুষের মনে প্রাচীর দিয়াছে তুলি।

মানুষ কি গুণু ‘মতের মূর্তি’ ? গুণু কি ‘বাদের বাদী’ ?  
চিরদিন ধরি’ পরস্পরে কি ক’রে যাবে অপরাধী ?  
প্রকৃতির মাঝে মানুষ করেছে সৃষ্টিবে সন্ধান,  
গুণু আপনাকে পাবে নি করিতে আপনি সে সম্মান।

ধর্ম ও দেশ, বর্ণ, সমাজ, রাষ্ট্রের মাঝে মাঝে  
ওরা নিম্প্রাণ বস্তুর জীব, মানুষ পড়েছে চাপা।  
কে চেনে কাহারে ? কোথায় হৃদয় হাসি ও অশ্রু-ধারা ?  
অপরিচয়ের বেদনা দিয়া যে এই সংসার গড়া।

ক্লান্ত মানব যুদ্ধ-বিহত, শান্তি কোথায় প্রভু ?  
হ’ল না হ’ল না পীড়িত মনের পরিবর্তন কতু।  
বল বল তুমি, অপকল্প সেই জীবন-মন্ত্রে কবে  
গড়িয়া উঠিবে নতুন পৃথিবী, মানুষ মানুষ হবে ?



গৃহাভিমুখে

শিল্পী—শ্রীহরেন দাস

## শিল্প এবং শিল্পী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া যাদের পেশা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যকে তাদের বরণ করে নিতে হয়। কারণ ছবি কিংবা মূর্তি সম্বন্ধে এদেশের লোকের অনুরাগ কম। শিল্পবোধের উন্মেষসাধনে ও রসগ্রহণে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে—আমাদের দেশে সে সুযোগ নেই বলে সর্বসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে উদাসীন। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও সৌন্দর্য্যানুভূতির, উন্নত রুচির কোনও স্থান নেই। ফলে শিল্পকলার যথাযোগ্য সমাদর হয় না। ছবি বা মূর্তি আমাদের দেশে কদাচিত্ বিক্রী হয়। যারা শিল্পকর্মে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের ছবির কিছু চাহিদা আছে—কিন্তু যাদের খ্যাতি কম, সার্বক শিল্পী হলেও তাঁদের শিল্পকর্মের আশানুরূপ চাহিদা নেই। এই সব কারণে শুধুমাত্র ছবি এঁকে বা মূর্তি গড়ে শিল্পীর সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা চলে না। ছাত্রাবস্থার পরই যখন জীবন-সংগ্রামে রত হতে হয়, তখন অধিকাংশ শিল্পীই বিজ্ঞাপন-চিত্রে আঁকা শুরু করেন বা অন্য পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হন। যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে শিল্পশৃঙ্গির প্রয়াস শুরু হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তা লুপ্ত হয়ে যায়—শৃঙ্গির উৎসও ক্রমশঃ শুকিয়ে আসে। কেবলমাত্র অন্নবজ্রের সমস্তাই যেখানে গুরুতর রূপে

দেখা দেয়—সেখানে সার্বক শিল্পশৃঙ্গি কঠিন হয়ে উঠে।



করাতী

শিল্পী—শ্রীহরেন দাস

দারিদ্র্যের সঙ্গে দেশবিদেশের বহু শিল্পীর কঠোর সংগ্রামের কথা নানা বইয়ে পড়ি—জানতে পারি, দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেও অনেকে বড় শিল্পী হয়েছেন—সৃষ্টি করেছেন সার্থক শিল্পসম্পদ। কিন্তু আজকের দারিদ্র্যের রূপ আর আগেকার দিনের দারিদ্র্যের রূপে অনেক প্রভেদ।



মৃষ্টি

ভাস্কর—প্রিয়দর্শন দাশগুপ্ত

দারিদ্র্যের জীবন-সংগ্রাম আজকের যুগে অধিকতর কঠিন এবং জটিল।

অতীত ভারত রাজা, জমিদার এবং ধনী ব্যক্তিরাই শিল্প-কলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিল্পকলার রসগ্রহণে,

গুণাঙ্গণ বিচারে তাঁদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়—অতীতের শিল্পসম্ভারই তার প্রমাণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—অক্সফোর্ড, ইলোরা, কোণারকের শিল্প-কলার কথা। কত সুযোগ্য শিল্পীর দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় এর এক-একটা



নর্তকী

শিল্পী—শ্রীমাণিকলাল বসুপাণিধার

বিরাট শিল্প-পত্রিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল—আজকের দিনে ভাবতেও মনে বিষয় জাগে। যে স্থল শৌন্দর্য্যামুভূতি এবং রসবোধ নিহিত রয়েছে এই সব অপূর্ণ শিল্পসৃষ্টির মূলে, আমাদের দেশে আজকের সমাজ থেকে তা লুপ্ত হয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ মানুষও শৌন্দর্য্য এবং রুচিবোধ বর্জিত ছিল না, তাই তার গার্হস্থ্য



পরিবেশেও শিল্পকলার বিশেষ স্থান ছিল—লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনে তার প্রমাণ মেলে



শিল্পী

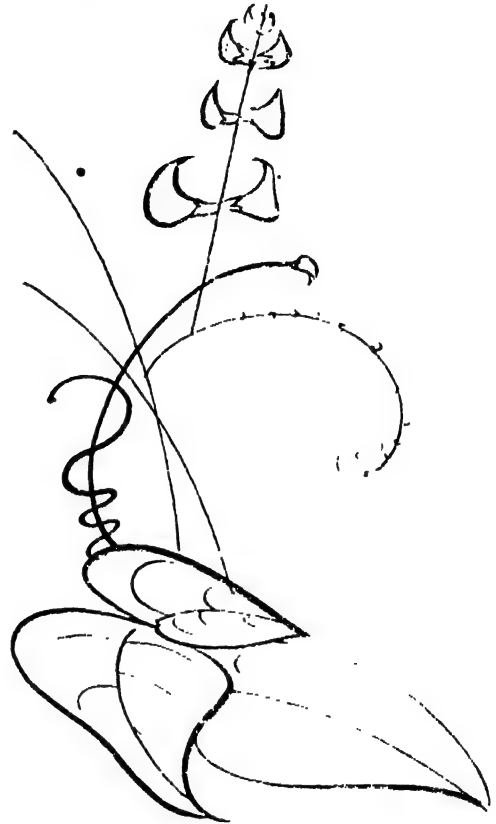
শিল্পী শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যপ্রভাব প্রাধান্যে যুগ বদলাচ্ছে—শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবর্তন হয়েছে। এখন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক জনসমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা এবং সরকার। বিশেষ করে বাসসার-প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রয়োজনে তাগিদে কমাতে শিল্পকলার উৎসাহ পৃষ্ঠপোষক হতে চলেছে।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর থেকে ভারতে বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতিমূলক নানা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং কাজও শুরু হয়েছে। সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মত শিল্পকলাও জাতির কৃষ্টির শারিকে বহন করে চলে। তাই জাতীয় সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে শিল্পকলার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। আজকের দিনে তাই শিল্পকলা এবং শিল্পীর কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।

আজকের বিশ্বে শিল্পকলার অগ্রগতি: ক্ষেত্রে ভারতের স্থান অনেক পিছনে। শিল্পকলার উন্নতিবিধান করতে হলে শিল্পীর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পথকে সুগম করতে হবে। উৎকৃষ্ট শিল্পকলার যাতে সমুচিত সমাদর হয়, আর্থিক অসচ্ছলতা যাতে শিল্পীর সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে না

দাঁড়ায়—শিল্পী যাতে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে তার সৃজনী-শক্তিকে জাতীয় কল্যাণে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতে পারে, রাষ্ট্রের কর্তব্য তাই ব্যবস্থা করা।



শিল্পী

শিল্পী—আগোপান দাস

দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকলার স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পে অনুভূতি জন্মায় না, সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশ হয় না—সুষ্ঠু রুচিবোধও সৃষ্ট হয় না। জাতীয় জীবনের পরিবেশকে সূক্ষ্ম করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও তাই উপলব্ধি হয় না। শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্পকলার বিশেষ স্থান হওয়া উচিত, একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে—কিন্তু কার্যতঃ উন্নতিমূলক কোনও চেষ্টা এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অজ্ঞাত উন্নত দেশে সরকার এবং নানা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন চিত্রশালা দেশের উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করে। জনসাধারণ যাতে আধুনিক চিন্তাধারা এবং শিল্পের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন শহরে উন্নত ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ইউরোপ ও

আমেরিকার কোন কোন শিক্ষায়তনে ছাত্রেরাও দেশের সমকালীন শিল্পীদের ছবি সংগ্রহ করছে। এতে করে শিল্পীরাও উৎসাহিত হচ্ছে—ভাল ছবি আঁকার প্রেরণা পাচ্ছে। আর আমাদের দেশে দেখি কলকাতার এত বড় মিউজিয়মে দেশের সমকালীন শিল্পীদের মাত্র কয়েকখানি ছবি রয়েছে—বহু দিন আগে হ্যাভেল সাহেবের চেষ্টায় সংগৃহীত অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার, ঈশ্বরী-প্রসাদ প্রমুখ শিল্পীদের কয়েকখানি মাত্র ছবি। আমাদের দেশের অতীত শিল্পকলার কত শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাইরে চলে গিয়েছে, সমকালীন শিল্পীদের ভাল সৃষ্টিগুলিও বাইরে চলে

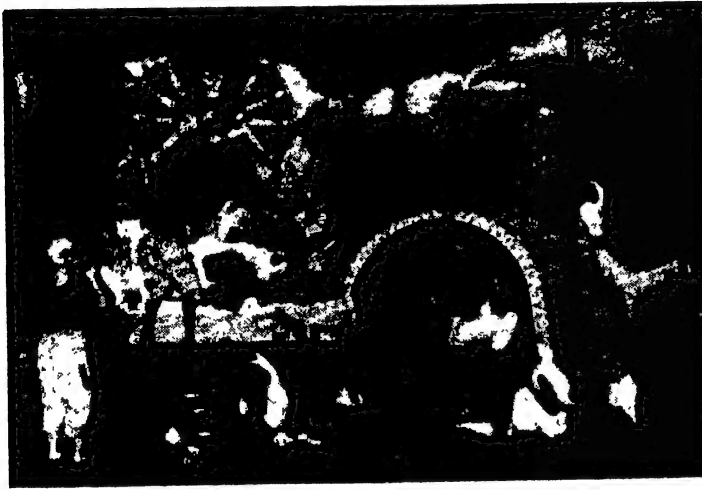


দিনাজে

শিল্পী—ঈশ্বরেন দাস

হচ্ছে—যার দরুন এদেশের পিল্লাহুবাগী-দের সমগ্র পৃথিবীর শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি এবং ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছে। এ বিষয়ে দিল্লীর একাডেমী অফ ফাইনআর্টস্ এণ্ড ক্রাফটস সোসাইটির উদ্যম প্রশংসনীয়। কলকাতার একাডেমী অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগে ভারতের সাম্প্রতিক শিল্পকলার কিছু কিছু নিদর্শন আমেরিকার বিভিন্ন শহরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার দরুন আমাদের দেশের শিল্পীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বড় একটা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ ছবি বিক্রী খুব কমই হয়। অতীত দেশে সরকারী আপিসে ধনী ব্যক্তিদের বাসভবনে বা সাধারণের বিশ্রামাগারে, লাইব্রেরীতে



দুর্গাযুক্তি-গড়ন

শিল্পী—ঈশ্বরী দত্ত

যাচ্ছে—দেশের তরফ থেকে দেশের শিল্পসম্পদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টার অভাবে। সমকালীন ভাস্কর্যের নিদর্শন ভারতের কোন যাদুঘরে রয়েছে বলে জানি না।

বৎসরখানেক হ'ল দিল্লীতে জাতীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং চিত্রও কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে সরকারের প্রযত্নে। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারের তরফ থেকে শিল্পকলার উন্নতিসাধনের চেষ্টা কিছু কিছু হচ্ছে। প্রতিভাবান শিল্পীদের অল্পখরচ বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করাও হয়েছে। ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী ভারতের বাইরেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে—ভারতের প্রধান প্রধান শহরে পৃথিবীর অতীত দেশের শিল্পকলার প্রদর্শনীতে আরোজন

প্রাচীরচিত্র আঁকা হয়—চিত্রে এবং সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ স্থানের পরিবেশকে রূপায়িত করে তোলা হয়, আমাদের দেশে অল্পরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হলে বহু শিল্পীর কর্মসংস্থান হ'ত। আজকাল ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনী চিত্রের প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু শিল্পী বিজ্ঞাপনী চিত্র এঁকে জীবিকার সংস্থান করে থাকেন। ভারতেও বিজ্ঞাপনী চিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে—অতীত দেশে কিছু কিছু হচ্ছেও।

শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করা সব ক্ষেত্রেই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। আমাদের দরিদ্র দেশে চুইল্য ছবি বা সৃষ্টি সংগ্রহ করার মত অর্থসংস্থান সাধারণের নেই। তবে এমন কতক-

গুলি শিল্প আছে বা সহজেই শিল্পানুগামী সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও সংগ্রহ করতে পারেন। বিখ্যাত ছবির ভাল প্রতিলিপি, কাঠখোদাই চিত্র, এটিং, স্কেচ, লিনোকট, প্রতিকৃতি-চিত্র, এগুলি সংগ্রহ করা খুব বেশী ব্যয়সাপেক্ষ নয়। ধনীব্যক্তিরও ‘ম্যুরাল’ এবং ভাল চিত্র, ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন—যদি তাঁদের মধ্যে সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগ্রত হয়। শিল্পকলার প্রদর্শনীতে আজকাল জনসমাগম হয় খুব, কিন্তু এও যেন একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে, আসলে

শিল্পের প্রকৃত রসগ্রহণে সাধারণ লোক অসমর্থ। ছবি ইত্যাদির মর্ম্মকথা তাদের বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন শহরে সম্ভব হলে জনবহুল গ্রামেও শিল্পকলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলে, দেশবাসী আধুনিক শিল্পের ভাবধারা এবং শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। মাসিক পত্রিকাদিতে যেমন-তেমন ছবির পরিবর্তে ভাল ছবির প্রতিলিপি ছাপার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা, বক্তৃতাগুলার ব্যবস্থা



কলিকাতার রাস্তা

শিল্পী—শ্রীকান্ত রক্ষিত

হলে এ বিষয়ে সাধারণের জ্ঞানলাভের সুযোগ মিলবে। বাংলা ভাষায় শিল্পকলা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি খুব কম, আজ পর্যন্তও বাংলা ভাষায় ভারতীয় শিল্পকলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নি! এই সব বিষয়ে রাষ্ট্রের, জনসাধারণের, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন কর্তব্য রয়েছে তেমনি শিল্পীদেরও গুরুদায়িত্ব আছে—পরমুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁদেরও এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

## রোমহর্ষন

শ্রীসবিতা চৌধুরী

কল্পনার রথ

বাতাসের অগ্রে ধায় খুঁজি তার পথ,

উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বল লোকে আরোহিয়া

সহসা স্বেচ্ছায় পুনঃ আসিল নামিয়া

শান্ত, নম্র, মধুর গতিতে—

মুগ্ধ, স্তম্ভ, চাহি দেখে স্রুত অতীতে !

বা কিছু পশ্চাতে

কেলিয়া গিয়াছে চিত্ত, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে,

সবই যেন বহুমূল্য বস্তুবাজি সম

জীবনে দিতেছে দেখা ! অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছতম

অতীতের স্মৃতিকণা অন্তরের প্রশস্ত অঙ্গনে

বেদনার বধ্যবাত্য—আনন্দের উদ্দাম নর্তনে

জাগে আজি। হঃপ, বাধা, হঃসহ বেদনা

অতীতের, সবই যেন সুখপ্রসূ, আনন্দের অপূর্ণ মূর্ত্তনা

জাগারে তুলিছে যোষ অন্তরের নিস্তরক বীণায়

কল্পনার রথ আসি খামিল সেধায়।

পবিত্রাত্মক যে-অতীতে প্রবেশ নিবেধ,

বেধায় নিফল চেষ্টা। বার্ষ লক্ষ্য-ভেদ—

হারপ্রাপ্তে তার

লুপ্ত মস্তকে নামে শক্তি কল্পনার,

পরম তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ মুগ্ধিত নয়ন,

অতীতের স্রুত স্মৃতি করে রোমহর্ষন !

## জ্যোতির্গময়

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পনের বছর পরে গৌতম বাড়ী এল।

চাকরির চাকার ঘুরতে ঘুরতে, ঘর-সংসার টানতে টানতে নানা স্থানে কেটেছে এই সুদীর্ঘ দিন। হয়বানির একশেষ হয়ে উঠেছে জীবনটা। ভাটার টান খরচে শক্তিতে, চুল পেকে চলেছে বয়সকে পেছনে ফেলে। বড় বড় ছেলেমেয়ে, ভাইবোনদের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করবার মেহনত কতখানি, জীবন-সারফে আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে গৌতম। তাই মনে পড়েছে এবার দেশের বাড়ীর এবং পৈতৃক জমিজমার কথা। ইপিয়ে উঠেছে একটানা অম্লদার বিদেশে, বংশরাজ্যে সেগানকার স্নেহপূর্ণ পরিবেশে একটা মাসও কাটিয়ে আসতে পারলে সব দিক দিয়ে শুভাশুভ হয় অনেকখানি।

শোভা বলেছিল, বাওনা বাপু একবার নিজের বাড়ীতে। এমন সুন্দর দেশ, আত্মীয়-স্বজন, জানা-পরিচয়, কেমন মাঝে মাঝে থাকা যায় দিবা।

সেই বিয়ের প্রথম বছরের নীলগঞ্জের মধুময় ছবি ফুটে উঠল শোভার চোপের সামনে।

সুমিত্রাও বৌদির সঙ্গে একমত হয়ে উঠল : সতি, দাদা, তোমার কাছে আর বৌদির কাছে দেশের যা গল্প শুনেছি, মনে হয় আজই চলে যাই।

—আমিও তাই বলি, বাবা।—বড়ছেলে অসিত প্রবীণের মত সায় দিল : আমাদের দেশ তো স্বর্গ!

নাগপুরের মালভূমি বাংলার এই মীমাংস পয়স্তু গড়িয়ে এসেছে। এইখানেই গৌতমের কল্লনার স্ট্রিট হোম—নিজের দেশ।

ছোট গাড়ীর ছোট ষ্টেশনে নেমে একটা বাউরি মেয়ের মাধ্যম স্ট্রটকেস আর বিছানা চাপিয়ে দিল। এই এখানকার কুলি।

ষ্টেশনের পাশ দিয়ে দিগন্তবিস্তৃত শালের জঙ্গল। ভোরেব ঝিরঝিরে বাতাসে লোদফুল আর কুরচি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। লাল কাকর-বিছানো প্লাটফর্মের ধারে সারবন্দী নিমের গাছ, একটা সুন্দর তেঁতোমিঠে পরিবেশ। দূরে শাল-পলাশের পাতা কাপছে সিরসির করে।

আনন্দে গৌতমের মনটা নেচে উঠল। সেই ছেলেবেলার মতই সুন্দর নীলগঞ্জ, সকল দেশের সেরা। এ যে তার জন্মভূমি।

ষ্টেশনের চিনের শেড পার হলই গেকুরা রঙের ভাঙ্গা কাকরের পাকা সড়ক, মিশেছে গিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদর বাস্তার। হানদিকের আম-কাঠালের বাগানের মধ্যে পায়ে চলা পথটা এঁকেবঁকে বাসু-বেখায় চলে গেছে, গৌতম নেমে এল এই আটপোরে গৃহমুখী সোজা পথে।

নানা মানুষের চাতে গড়া প্রায় শতবর্ষ পুরেকার এই কলের বাগানটা। কিন্তু অবশেলা এবং অত্যাচারের ছাপ যেন খুঁচে উঠেছে প্রত্যেকটি গাছে, প্রতিটি ডালপাতায়। বাগানটা যেন বুড়িয়ে গেছে এই কয়েকটা বছরের মধ্যেই, স্থবিরত্বের প্রভাবে যিমোচ্ছে একদা যৌবনচঞ্চল গাছগুলো। গাব-ভেবেণ্ডা আর কালকান্থি ছেয়ে কেলেচে সবত্র, ঘাস-আগাছা ভর্তি।

শাল-পলাশের নির্মল মন্থণতা চোপের উপর স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু গ্রামের পথে ঢুকেই সে আনন্দের স্রোত যেন বাণুচরে পড়ে গেল।

বাগানটার এমন অবস্থা কেন? গৌতম প্রশ্ন করল বাউরি মেয়েকে।

—যেমন গায়ের লগা বাবু, বাগানেরও তাই দশা হইছেন।

—গায়ের কি দশা হ'ল?

—আর বাবু! আপুনি কি লতুন ডন? নীলগঞ্জের আর সি নীলগঞ্জের লাই।

গৌতম সত্যিই আচ্ছন্ন হ'ল লোক, গ্রামের চন্দ্রবার কথাও চমকে উঠল।

—দেখবেন বাবু, পথটার উপর পাতাঢাকা কুয়ো আছে একটা।

বোকনার উপায় নেই, কয়েকটা কুলকাটা, নীচ আম কামালের শুকনো পাতার স্তূপ। ওর মধ্যে বুড়ি কুয়ো। ষ্টেশন পার ব পথে এমনখারো বিপদ করে রাখা—গ্রামের লোকের কি দারিদ্র্য জ্ঞানও নেই।

কতকটা গিয়ে পথটা একটা স্তরভের মত হয়ে গেছে। এক দিকে তালগাছের সারি, অন্য দিকে কামরাড়ার বাগান। তিস্করার লতা ঝুলছে এবার-ওনার গাছগুলো ঘরে ফেলে, মাঝের পথটা অন্ধকার।

এটা পার হয়ে গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়ল গৌতম। মাননেই ফুলের মাঠ, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। ঐ গোটা বাগানটা হাসত এক দিন, সকাল বিকেল পেলা করে বৌড়িয়েছে এর গাছে গায়ে গ্রামের ছেলের দল। আজ ওটা পার হতে ভয়ে যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে এল গৌতমের।

—কুখার বাবে আপুনি?

বুড়ো শিবতলা।

উদিকের পথটা বড় ঝোপঝাড় গো! তা সকাল বেলা বটে... চলে।

পরিষ্কার সুন্দর রাস্তা বলেই তো গৌতম জানত! একটা গরুর গাড়ী বাত হুপুবে হাসতে হাসতে চলে যেত তার ছোট বেলায়—এমনই সুন্দর আর চওড়া ছিল রাস্তাটা।

একটু খেমে মেয়েটা নিজের মনে গজ গজ করতে লাগল :  
ঐ ছাড়া তেলিপাড়ার বাকটোর আকোড়তলার মা-মনসা দিনমানেই  
বড় উৎপাত করছে গো আজকাল ! গাঁয়ে কি মনিষি আছে বাবু,  
সাপের রাজহিঁ শেরালের রাজহিঁ !

আরও কত কি সে চলতে চলতে বলল, গৌতম সব বুঝে  
উঠতে পারে নি। তেলিপাড়ার মোড়টার এসে সত্যিই দেখে,  
কথাটা মিথ্যে নয়। আঁকোড়ের জঙ্গল, ফণিমনসা আর চোর-  
পলতা গাছ ঢেকে রেখেছে সমস্ত জায়গাটা। পথের উপর খুঁকে  
এসেছে চায়া চায়া নাগকণী, সবুজ গাছের উপর স্তম্ভীক্ষ, স্থম্ম  
কাঁটা বর্ষার জল পেয়ে হুলে হুলে নাচছে। এত পাণ্ডলা এর  
কাঁটা, বাতাসে উড়ে এসে গায়ে বেঁধে।

মেয়েটি গলিটা ছুটে পাব হয়ে জানাল, শামুখ-ভাঙ্গা সাপের  
আড্ডা হয়েছে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোপের মধ্যে।

চওড়া বালির পথটা বর্ষার ঢল নেমে নেমে মজে উঠেছে  
একদম। কোনরকমে পাশাপাশি হুটে মানুষ চলতে পারে এখন,  
গরুর গাড়ীর বোধ হয় অল্প পথ হয়েছে।

মনে পড়ল, অজ্ঞান মাসে নবান্ন পেয়ে তারা সব ডাঙুলি  
খেলত এই পথের উপর। পনের-কুড়ি জন একসঙ্গে হই-ছল্লোড়  
করত সন্ধ্যা পর্যন্ত। সেই সোনার মত বকবকে মিহিবালির  
কুলিবাঁজাটা মজে ধ্বসে পড়় হয়ে গেছে এই বছর কুড়ির মধ্যে।  
সাপের ভয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাতে হয় সন্ধ্যার ব্যগাটা।

টাঁড় আর জঙ্গল। ঘাস আর আগাছা বেগানে সেখানে  
চোখে পড়ে। আর ম্যালেরিয়া! দু'থেকে শহরের বাবুয়া  
নীলগঞ্জে চেপে আসত গৌতমের ছেলেবেলাতেও।

পথে, বাড়ীর রোয়াকে বে কয়জনের সাক্ষাৎ মিলল, সবাই  
বেন পানসে চোখ ঝান, জ্যোতিহীন। কঙ্কালের পর্ধ্যায়ে  
এসে গেছে মানুষগুলো, কয়েক মাসের রোগভোগের স্কিষ্টতা  
যুগের উপর চেপে বসেছে। রুক্ষ ঢুল, হলুদ-বসা দাঁত,  
তেলচিটে কাপড়ের আঁচল গায়ে জড়ানো। নীলগঞ্জের অধিবাসীর  
সাদাপেটা চেহারা গেল কোথায়? পাগার এক ঝাপটার অনেক  
কিছু উড়ে গেছে, শুধু রয়ে গেছে জয়চাকের মত উগর একটি।  
ম্যালেরিয়ার দান !

তেমনি ঘরবাড়ীর চেহারা। ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে হাড়পোড়  
বের করা খড়ের ঘর; দালানগুলো নোনাধরা, টালি আর কড়ি-  
ধুঁসি থসা। বাস্তার উপরে মুখ উচিয়ে আছে, বেন বলছে—পড়ি  
পড়ি। শিলেপেটা ছেলেমেয়ে নিঃশব্দে, নির্ভয়ে তারই নীচে দিয়ে  
খানাপোনা করছে।

বাড়ীর কাছটার এসে একটু সংশয়ে পড়ে গেল গৌতম।  
আবর্জনা-আকীর্ণ, যুগলি পথটার মানুষ চলে, একথা ভাবা খুব  
সহজ নয় অবশ্য। কিন্তু বাড়ীর পাশের বাগানভূমির মন্দির চোখে  
পড়তে সন্দেহের নিয়ন হ'ল। ইস, মন্দিরে ঊঠবার সিঁড়িগুলো  
ডেকে গেছে, চাভাল গেছে ধ্বসে। ছোট ছোট জাকরি ইটের

ভেতর হতে স্রবকি বয়ে পড়ছে, শুধু মন্দিরের ওপরের কারুকাব্যগুলি  
তেমনি অটুট। প্রাচীন শিল্পীর হাতের কাজে কেবল এইটুকু  
নোনা ধরতে পারে নি, পচা মাটির দ্বিত বাষ্প পৌঁছুতে পারে নি  
দেবায়তনের চূড়ার।

দরজার কাছে ঝাঁড়াতেই গাভুহাতে মহানন্দর সঙ্গে দেখা। কে  
রে, গৌতম নাকি ?

—কাকা !

প্রণাম করল গৌতম। মহানন্দ আশীর্বাদ করে বললেন, আর।  
ভাল আছিস? বোমা, ছেলেমেয়ে...

—ভাল, কাকা।

একই বাড়ীর পশ্চিম দিকটা পেয়েছে গৌতম, এদিকে থাকেন  
মহানন্দ। মাঝে মাটির দেয়াল।

এদিকে পেরিয়ে এসে উঠানে পা দিতেই গৌতম ঝাঁড়িয়ে  
পড়ল। কালমেঘ, বৃতবোহুল, কালকান্থি—গোটা বাড়ীটা গ্রাস  
করেছে। জায়গায় জায়গায় কাঁটানটে, কণ্টকারির ঝড়।  
দেয়ালের মাঝখানটা ভাঙা, এ পাশটার একটা আন্তাকুঁড় পচা জলে  
নরককুণ্ড সৃষ্টি করেছে। সবকিছু জঞ্জাল কাকা দেওয়াল পার  
করে এখানেই পাচার করেন বোধ হয়। পারবার বিঠা আব  
পালকে বকটা বোঝাই তালটাও মরচে পড়ে খোলা অবস্থায়  
বোঝাব মত বুলছে।

এই গৌতমের নিজের বাড়ী। কন্নার সেই নীলগঞ্জের স্বপ্ন-  
মাথা ছেলেবেলায় বাড়ী। এই একটুখানি বাড়ী, এই নীলগঞ্জের  
কথা কত রকমে সে গল্প করেছে, তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে  
কত আশা, কত রক্ত ছড়িয়ে।

মনের মধ্যে গৌতমের কান্না ঠেলে এল।

পরিষ্কার করাতে লেগে গেল সারা সকালটা।

এদিকে লোকের যুখে যুখে গোটা গ্রামে প্রচার হয়ে গেল,  
গৌতম এসেছে। শিক্ষার, সম্মানে গ্রামের ইতিহাসে ঐর্ষহানীর  
সে; সকলের ধারণা সে খুব বড় একটা সরকারী অফিসার, প্রভাব-  
প্রতিপত্তিও অসাধারণ !

কাকার অন্তরে বাই হোক, বাইরে খুব ঠেঁচে করলেন, এজমালি  
পুকুর থেকে দেয়চাকের কাতলা একটা এনে কেললেন। অন্ততঃ  
আজকের দিনটা আমার ওখানে পেতেই হবে বাবা।

অর্থাৎ, কাল থেকে নিজের ব্যবস্থা নিয়ে ভুমি করে নিও কিন্তু।

তবু পল্লাজলেই গল্পাপুজো করছেন! হু-চার বিঘে যা আছে,  
তিনিই তো ভোগ করেন। এতকণে হাসল একটু গৌতম।

একটি আধাবরসী মেয়ে বেশ চটকদার সজ্জার দাগুয়ার বসে  
ধান ঝাড়ছে আর হাসছে মিটিমিটি এদিকে তাকিয়ে। ঠিক এমনি  
অবস্থায় পাড়ার কয়েকটি ছোকরা একেবারে সামনে এসে পড়ে বেন  
বিবস অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মেয়েটির হাবভাব ভাল নয়, গৌতমও  
লজ্জায় সঙ্কচিত হয়ে উঠল।

মেয়েন-তাদের লীডার, একটু মুচকি হেসে বলল, আমরা 'নবীন

সজ্জা'। আজ ভলিবলের কাইডাল। আপনাকে প্রেসিডেন্ট করতে চাই, যেতে হবে কিন্তু বিকেল চারটার।

তার পর একটু উসখুস করে বলল, একটা কথা গোঁতম-না। তরুণ-সজ্জা আমাদের বিপক্ষে তাদেরও আজ কাইডাল। আমাদের দলে চোদ্দটা টিম, ওদের মাত্র আটটা। আমাদের কাছেই বাবেন কিন্তু।

এই একটা গ্রামে হুটো খেলার দল? বিস্মিত গোঁতম প্রশ্ন করল।

এখন হুটোর ঠেকছে, ভিল চারটে। সমাজসেবী দলের ছেলেকে আটক রেখেছে জেলে, ওদের টিম উঠল। টাউন-ক্লাব তো টাকার হিসেব নিয়ে ঘরে ঘরে বগড়া করেই ভাঙল।

বিদায় নিল তারা। বাবার পথে কে বেন বলছে, এসেই জুটে গেছে রে ভাই।

আর একজন বলল, চুপ।

শুনল গোঁতম। ছেলেমানুষের দল, কিন্তু এই বয়সেই এই ঝটিক! শৃঙ্খল দিকে তাকিয়ে রইল সে।

খুড়িমা তাগাদা দিলেন, চান কর, বাবা।

কাকার ছেলেমেয়ে বোধ হয় ডজনখানেক, প্রায় জনসাতেক ঘুর ঘুর করছে গোঁতমের চারদিকে। কেউ স্ট্রকেশ খুট খুট করছে, কেউ ঠিক পাশে বসেই পকেট আন্ডাজ করছে হাত দিয়ে। যখনই জিজ্ঞাসা করে, কাকা এটি কে?

—ও? আমার ন' ছেলে—ভোতা।

—আর এটি?

—ছোট মেয়ে—নেকা।

ছোট মেয়ে নেকা কিন্তু বড় সরোনা, হাত লাগিয়েছে আসল জয়গায়। কানের কাছে মুণ নিয়ে গিয়ে বলে, একটা টাকা দাও না। এবং অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে ততক্ষণে বের করেছে টাকা-পরস্যা, বা-কিছু ছিল পকেটে। বাকি ভাই-বোনেরা ইশারা করল, নেকা চটপট ছুট দিল দরজা দিয়ে।

অতঃপর একটা চাপা জয়ধ্বনি, পর পর সকলের, অন্তর্ধান। কাকা ও খুড়িমা এতক্ষণ হাত আড়াল দিয়েছিলেন, বললেন, হুটুমি করছে বুঝি ছেলগুলো?

গোঁতম লজ্জায় পড়ে বলে, না—না—

বাইরে কে ডাকল। কাকীমা ঘেঁহু দেখিয়ে ঝাঁকিয়ে ওঠেন, বাছাকে আমার নাওয়া-খাওয়া করতে দেবে না!

এলেন গ্রামের কয়েকটি ভয়লোক। বমাই ভট্টাচার্য্য, বঘুনাথ রায়, ইন্দ্র চৌধুরী, আরও জন দুই। বুদ্ধ বমাই দাওয়ার বসে সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু রহস্যজনক ভাবে হাসলেন, এই ধানের গুঁড়োর মধ্যেই বসে আছে বাবা? অনেক বড়টি হয়েছে, করিভকরীও হয়েছে। এবার গায়ের একটু দেখানো করো। তোষাও তো একটা কর্তব্য আছে!

—আজ্ঞে। কি করতে হবে বলুন? আমার তো আবার চাকরি—

মুখের কথা বন্ধ করে দিয়ে ইন্দ্র চৌধুরী বললেন, তা বলে কি দেশটা পাঁচভূতে লুটে থাকবে? গোঁতম মুখ তুলতেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন : এই ইউনিয়ন বোর্ড—ওটা-হয়েছে একটা মদের আড্ডা, বাবাজী, গাঁজা-গুলির আড্ডা। তুমি সেদিনের ছেলে, তোমাকে বলতে লজ্জা—

বঘুনাথ সম্মতিসূচক স্নান হাসলেন, কোন শব্দ হ'ল না সে হাসিতে। বললেন, দশটা দল হয়েছে বাবা। দেশের ভাল লোক সব কোণঠাসা হয়ে বসে পড়েছে, বাজি কবছে চোরগুলো। তোমাদের মত বিদ্বান লোকেরা যদি এগিয়ে না আসে—বলে তিনি দেশের অবস্রজ্ঞাবী দুর্দশার ইন্ধিত ঘাড় নেড়েই সমাপ্ত করলেন।

—প্রেসিডেন্ট কে জানো? ঐ বহুদলন সবকার। বোশেখ মাসে একটা সারকেন্স পাটি এল, সে ছুজুগে বোর্ডের আপিস ঘরের পেছনে সব মেসাররা মদ আর—

—থাক ওসব কথা—

বঘুনাথ স্তরটা একটু নীচু করে বললেন, বেন ভরে ভরে : পথে-বিপথে চায়ের দোকান, তার ভেতরে আবার একটা করে স্পেশাল ঘর। অনেক গণ্যমান্ত লোককে সেই ঘরের মধ্যে দেখতে পাবে একটু রাত হলেই।

আলোচনা শেষ হ'ল। অনেক আশা-ভরসা দিয়ে এবং অনেক আশা-ভরসা পোষণ করে এঁরা বিদায় নিলেন এক ঘণ্টা পর। কালই একটা সাধারণ মিটিং ডাকা হবে, সভাপতি হতে হবে বাবাজী গোঁতমকে।

তেলের বাটি হাতে বের হলেন খুড়িমা। কাকা সামনে বসে পড়ে হাত ঘুরিয়ে কিস কিস করে বললেন, এ গায়ের কাউকে আর বিশ্বাস করো না বাবা। সেদিন আর নেই।

গোঁতম কথাটি বলতে পারল না; কি আছে, কি নেই, হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে এরই মধ্যে।

পাবার পর নিজের ঘরে শোবার উত্তোপ করল গোঁতম, একটা উই-থরা চৌকির উপর কবল বিছিয়ে।

—পান লাও।

দরজার এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি; হাতে পানের বাটি, মুখে চটুল হাসি।

—গোঁতম আছে?

কয়েকটি লোক একেবারে দরজার কাছে এসে পড়েছে। মেয়েটি পানের বাটি দ্রুতভাবে নীচে নামিয়ে দিয়ে কেমন একটা অচেতনক তৎপরতার সঙ্গে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

গোঁতমের মনে হ'ল, বাইরের লোকগুলি বেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিষুট ভাবটা ঝেঁড়ে ফেলে বাইরে এল, আপনারা ভেতরে আসুন।

—বাস্তব আছেন কি? না হয় বিকেলে আসতাম।

গ্রন্থের অর্থ পরিষ্কার। গ্রামের এই হয়ত আজকের পরিবেশ, কাঁটার ঢেকে ফেলেছে এর প্রতিটি ইঞ্চি মাটি। তবু হাসি টেনে গোঁতম বলল, বাস্তব আর কি? আসুন।

পরিচয় হ'ল এদের সঙ্গে, অনেকেই বন্ধুস্থানীয়। এসেছেন গ্রামের স্কুল সঞ্চকে আলোচনার জন্তে। স্কুল কমিটি বৃষ্টি জোড়োর; অবধা খুচ দেখায়, টাকা বার থেকে আদায় করে জমা করে না পাতায়; ভাল হেডমাষ্টার এলে তাকে পাগল সাজিয়ে, ইংরেজী জানে না ইত্যাদি বলে তাকিয়ে দেয়। এই সব অভিযোগ। প্রেসিডেন্ট তাঁর দল নিয়ে এমন শিকড় পেড়ে বসে আছেন—কমিটি ভাঙতে হবে এবং গোঁতমকে আসতে হবে ছ-এক দিনের মধ্যে মিটিং একটা থেকে ইত্যাদি।

সারাবারজি ট্রেনের ধকলের পর হুপুটা একটু ঘুমবে ভেবেছিল, কিন্তু এই ঘণ্টাকয়েক লোকের সঙ্গে পরিচয় করে যে ত্রিক্ত অভিজ্ঞতা বৃষ্টি জমাট বেঁধেছে, তাতেই ঘুম তার চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে।

তারপর খেলা দেখে গ্রামটা একটু ঘুরে সন্ধ্যার সময় বখন বাড়ী কিরল, তখন গোঁতম প্রায় মুড়ে পড়েছে। তার আশা ছিল, এইখানেই এবার স্থায়ী বাসা বাঁধবার চেষ্টা করবে। এই তাং গ্রাম, এককালের বিখ্যাত নীলগঞ্জ। বেশম এবং লাকাকে কেন্দ্র করে যে শিল্প এখানে গড়ে উঠেছিল, “গেজেটিয়ারে” পর্যন্ত তার উজ্জ্বল ইতিহাস লিপিত আছে। সুদূর জাখানী পর্যন্ত নীলগঞ্জ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল এই সব ব্যবসার দৌলতে। গালা গলাবার ভাটি, নীলকর সাহেবের কুঠি, গ্রামের প্রান্তিক সীমানায় এদের ভগ্নাবশেষ এখনও পথিকের ভ্রমস্থল জাগায়, তারা আঁজ মুক, কিন্তু তবু মুগুর। কোথায় সেই নীলগঞ্জ? সোঁরাগুলের জঙ্গল গ্রাস করেছে ঐতিহাসিক পীঠভূমি, চলদে রঙের কলকে ফুল নীরবে মুহু মুহু হাসে আঁজ নীলকর সাহেবের কাছারিবাড়ীর ভাঙ্গা ইটের স্তূপের উপর। শেরাল আর নেউলের ভুটোছুটি দেখে এসেছে গোঁতম গ্রাম ঘুরতে গিয়ে।

সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়ে গেছে। এতক্ষণে একটু যেন তৃপ্তির নিশ্বাস কেলে ঝাঁড়াল গোঁতম রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সামনে। নষ্ট গ্রাম, ভগ্ন দেউল, শুধু পাথরের দেবতার হাসিটি তেমনি আগেকার মত মিষ্ট। রক্তভরা জগৎমাঝে তিনি বৃষ্টি বা বসে বসে মজা দেখছেন, আর মুখ টিপে হাসছেন।

প্রণাম করে গোঁতম ঘরে ঢুকল। এক ডজন সম্মানের পিতা মহানন্দ খেজুর পাতার তালাই বিছিয়ে আধ ডজনকে ঘুম পাড়িয়েছেন, বাকিগুলোকেও প্রায় কাত করে এনেছেন। বললেন, এস বাবা।

শীতটা পড়ি পড়ি সময়, ঠাণ্ডা বাতাসও দিচ্ছে, তবু হাতে তাঁর একটা তালপাতার পাখা চলছে। গোঁতম সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই তিনি হাসলেন, পাখাটা দেখছে? ঐ—

অর্ধটা পরিষ্কার করবার দরকার হ'ল না। প্রথমে সরোবর শুদ্ধন গোঁতমকে সচকিত করল, তারপর দলে দলে আক্রমণ ও দখল। ধপ ধপ করে গায়ের সর্বত্র বসে অদৃশ্য মশকের দল, মুহূর্তে শরীরের স্থানবিশেষ ফুলে ওঠে। বৃষ্টিতে পাবল গোঁতম—জীর্ণ গ্রাম আর ক্ষয়িষ্ণু মাহুবেব মৃত্যুদণ্ড বিধান করেছে কে?

—গোঁতম বাবা মশারি এনেছ তো? আমরা আবার মশারি ব্যাভার করি না—দম বন্ধ হয়ে যায়!

গোঁতমের মুখ শুকিয়ে গেল, খেয়াল হয় নি এ বিশেষ প্রয়োজনটার। তবু আমতা আমতা করে বলতে হ'ল, সে ঠিক করে নেব'খন।

যাত্রা থেকে বসে কাকা আসল কথাটাই পাড়লেন, নিজের কথা। রেলের মালবানু ছিলেন তিনি, বছরকয়েক বিটার্ড করেছেন। উপযুক্ত ভাইপো যদি কিছু একটা করে দেয়, যেমন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, অন্ততঃ মেম্বার, নয় ত স্কুল কমিটিতে একটা কিছু—সংসারটা যেমন করে হোক চলে।

জমিজমা আর কতক টুকরো বই তো নয়, তাতে চলে কি করে! আগামীকাল এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠে পড়ল গোঁতম। সারাদিন বড় ধকল পেছে শরীরটার উপর। একটু বিশ্রাম দরকার।

নিজের ঘরে শুয়ে হ'হাতে মশা তাড়াচ্ছে আর ছটকট করছে, কাকীমা এলেন—জল খেলে না, বাবা?

—ও ভুলে গেছি। বেগে যাও।

কাকীমা হঠাৎ একটু খেমে একেবারে চৌকির উপর বসে পড়ে গোঁতমের হাতহুটো ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলেন—আমাকে একটু দেগ, বাবা?

সর্বনাশ! আবার কোন্ বিপদ এল।

কিন্তু ন', বিপদ অন্ততঃ তার নয়। ইনিরে বিনিরে কাকীমা বলতে লাগলেন মহানন্দ কাকার কথা। বাটের উপর বসে হ'ল, কিন্তু এখনও স্বভাব পাগটাল না। ঐ মেয়েটি ধান ঝাড়ছিল, কলকাতা ক্লেবত ঝিরেব মেয়ে, নাম নমিতা, তার বাড়ি বাওয়া আসা চলছে। একশ' টাকার বাট সত্তর টাকা স্বদে টাকা ধার দিয়ে একদিকে লোকের সর্বনাশ করছে, আর এদিকে ভোবাচ্ছে। পাড়ার লোক আরও অনেকে।

একটু খেমে কাকীমা বললেন, হাঁবে, তোর সঙ্গে নমির কোন কথা হয়েছে?

—আমার সঙ্গে? গোঁতম শকিত হয়ে উঠল।

—নমি তো বলছে সকলকে, দাদাবাবুর সঙ্গে বাবে, কথাবার্তা সব হয়ে গেছে। তা নিয়ে যা না। ঝিরেব কাজ ও বেশ ভাল পারবে।

ফোভে, বিন্মরে হতবাক হয়ে গেল গোঁতম। আধঘণ্টা পর কাকীমা চোখের জল মুছে বিদায় নিলেন।

ঘুম অবশ্য আসে নি। শেষরাত্রি চোখটা একটু জড়িয়ে এসেছিল, গোঁতম ধড়মড় করে উঠে বসল। স্ট্রোকেশ বিহানা শুছিয়ে নিল। কাকীমার দেওয়া জলটুকু চোখে দিয়ে গেলাসটি বাইরে বেখে মরিচাধরা তালাটা আবার দরজার লটকিয়ে দিল।

আর না। পালাতে হবে এখনই। নীতিক পুঙ্খিয়ে খেয়েছে নীলগঞ্জবাসীরা, স্থল্লরকে সমাধি দিয়েছে, এঁদাপুকুরের বিবাক্ত



মাটি পরম্পরের গারে ছিটিয়ে উৎকট ধূলটে উন্নত হয়েছে। নীলগঞ্জের ক্ষণে একটি দিনে তার ছেলেবেলার কল্পনায় জন্মভূমি ছাই হয়ে যায় বুঝি। বলসে গেছে ছবি, এখনও পালালে হয়ত কল্পনাটুকু অক্ষয় হয়ে থাকে। না হলে বাঁচবে কি নিয়ে গৌতম?

নিজেই স্ট্রটেকশ বিছানা কাঁধে করে বের হয়ে পড়ল সে। ছাদের কার্নিসে একটা আমড়া গাছ ডাল মেলে ঝুঁকে পড়েছে। চমকে দাঁড়াল গৌতম। না, কিছু না, গাছই বটে। পা বাড়াল উঠানে। শিউলি গাছটার আশেপাশে জোনাকির ঘেলা বসেছে, কালকাস্তুরির স্তম্ভল থেকে একটানা ঝিঁঝি ডাকছে। খসখস করে কি একটা চাল গেল তার পারের শব্দ পেয়ে। আকাশের বাঁকা চাদের ক্রীণ আলোর নজর হয় না। বোধ হয়, শেয়াল কি নেউল।

বিড়কির দহক্সা খুলে বাধাক্ষেত্র মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়াল।

মোট নামিয়ে সাষ্টান্নে প্রণাম করল কুলদেবতাকে, স্নানজলের কুণ্ড থেকে হুটো কুল বেলপাতা হাতড়ে তুলে পকেটে রাখল।

তারপর হনুহনু করে ট্রেনের দিকে এগিয়ে চলল।

ট্রেন ভোর পাঁচটার। পূর্ব-দিগন্তে ঈষৎ বজ্রিমাভা হুটে উঠেছে। সূর্যাসারথি দেখা দিবেন ক্রমিক পরেই, নীলগঞ্জের জয়াট অন্ধকার ক্রমশঃ তরল হয়ে মিলিয়ে বাবে দশ দিকে। সামনের ঐ বনবীথির সবুজ পাতায় সোনার কিরণ উপচে পড়বে সেই আগেকার দিনের মত, এখনই শাল-গিরালের বনব উপর আসবে সেই হুয়ানো দিনের উজ্জ্বল নব প্রভাত।

তার কল্পনার নীলগঞ্জ মরবে না।

দূরে রেল লাইনের উপর ট্রেনের ঘর্ষণ শব্দ শোনা গেল। গৌতম পা চালাল জোরে।

## আন্দামান

### শ্রীকরণাময় বসু

সমুদ্রে অনেক বড়,

অনেক প্রোতের শেষে জেগে ওঠে পলিমাটি চর।

নতুন প্রাণের বীজে ছায়া-বোঁজ স্বপ্ন আঁকে,

হাওয়া দেয় বসন্ত-মর্মর ;

অনেক নতুন যুগ, বাঁধে ক্ষের ছোট কুঁড়ে ঘর।

কোথা থেকে এলো এরা এই সব ছন্নছাড়া মাহুবেব দল,  
অবোধ জন্তুর মতো খুঁজেছিল মাঠ ঘাট, জলা ও জঙ্গল ;

ছড়িয়ে পড়েছে ঘুরে যেন এরা সমুদ্রের কেনা,

এরাও মাহুয় ছিল, স্বপ্ন দেখে মালকের আধকাটা হেনা।

অনেক চোখের জলে ভেজা হৃৎকণের বারি হ'ল শেষ ;

ইতিহাসে নতুন অধ্যায়, বাঙালীর আশ্রয় এই উপনিবেশ !

কেলে আসা জীবনের মণি-হার ছিঁড়ে গেছে,

ভেসে গেছে সাগরের জলে,

পদ্মাতীরে বাউরনে যে চাঁদ উঠেছে,

সেই চাঁদ এখানে কি জলে ?

পদ্মাতীর কোথা গেল, সপ্তভিটা নিয়ে এলো অন্ধকার বীণে ;

পাতাল-নাগিনী বতো ঢেউয়ের কণায় জালে

মণিমালা হীরার প্রবীণে ;

নারিকেলকুঞ্জাশে মৌহরী হাওয়া, বহু জলে প্রবাল-সকাল,  
সান্তরঙা প্রজাপতি উড়ে আসে, ভিজে ঘাসে শিশিরের জাল।

হঠাৎ ঘুমের শেষে কানে আসে মেঘনার ডাক,

কর্ণকলী নদীজলে জেগেছে জোয়ার, বেধা চক্রবাক

মেলেছে ধূসর পাখা নিঃসীম আকাশে,

উড়ন্ত ডানার শব্দ সমুদ্রের পাব হতে আসে।

হুই চোখে স্বপ্ন আসে নেমে,

হুই চোখে জল আসে, এখনো কি মুগ্ধ তারা সে পদ্মার প্রেমে ?

কানে আসে মেঘনার ডাক,

এ কোন অচেনা দেশ, অজানা পানীর শব্দ,

ভাবে তারা আশ্চর্য অবাক !

কোথায় সবুজ মাঠ, নীলকণ্ঠী পায়রার বাঁক,

বেতবোঁপ, বাঁশবন, উলুঘাস গাছে গাছে সবুজ মৌচাক ;

পথে ঘাটে ঝরে-পড়া চাপা, হুই, ঘুর মাঠে বাথালের বাঁশী,

মাঝিদের সারি গান, ভাঙা ঘন এখনো উল্লাসী।

ঘুম নেই, চোখে যেন ঘুম নেই, শুকতারা জলে দগদগে,

এখনো বালুর চরে কাশফুল হুটে ওঠে ;

সেই স্মৃতি ভুলে গেছে কবে।

ভোরের, গোখলি বেলা পদ্মাজলে বিলিমিলি আবীরের রঙ ;

আশ্বিনের উত্তলা হাওয়ার কঁপে ওঠে মীড়ে মীড়ে গোঁড় সারঙ,

কত হাসি, কতো গান, ঝরে-পড়া বেলফুলে গাধা ফুলমালা,

কত ভালোবাসাবাসি, কত স্বপ্ন—কেন এলো বিদায়ের পালা,

কোথায় বাংলাদেশ, কোথা এই স্নত আন্দামান ?

পদ্মগন্ধা অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে,

ভেসে আসে সে পদ্মার গান।

# সর্বোদয়—সমাজতত্ত্ববাদের পরিণত রূপ

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

অনুবাদক—শ্রীরবীন মুখোপাধ্যায়

[বর্তমান সমাজের চতুর্দিকে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, শান্তিময় পথে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্তনের উপায় যে কেবলমাত্র “ভূ-দান যজ্ঞ”র মধ্যাই নিহিত আছে, শ্রীজয়-প্রকাশ নারায়ণ এই ধারণার বিশ্বাসী হইয়া সম্প্রতি এই যজ্ঞের কাজে নিজের দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছেন। গত ৮ই মার্চ, ১৯৫৩, চাণ্ডিলে ৫ম সর্বোদয় সম্মেলনের যুবকদের সভার প্রদত্ত তাঁহার ভাষণের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

“হে যুবকবৃন্দ, আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাকে কেন বলা হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। কারণ আমি নিজেই এখন সবে-মাত্র সর্বোদয়ের মূলমন্ত্রগুলি বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। যদিও দেশের যুবকবৃন্দের সহিত আমি বহুদিন হইতেই যুক্ত আছি ও তাহাদের নিকট সময় সময় বলিয়াছি, তথাপি আমার নিজের মধ্যে এখন নূতন বিচারের অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি।

দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা

“আজকাল সাধারণতঃ আমি দেখিতেছি যে, স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা হয় সমাজতত্ত্ববাদ বা সাম্যবাদ, না হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ীয় যুব-সংঘের দ্বারা সাম্প্রদায়িক নীতি দ্বারা চালিত কোন আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ১৯২১-২২ সনে আমার যৌবন অবস্থায় দেখিয়াছি যে, সেই সময়ে দেশবাসী গান্ধী আন্দোলনের যে বড় প্রবল বেগে বহিতেছিল, দেশের যুবকবৃন্দ তাহাতে বঁপ দিয়াছিল। কিন্তু আজকাল তাহারা বলিতেছে যে, গান্ধীজীর রাস্তা প্রাচীনপন্থী, বর্তমানের আণবিক বোমার যুগে এবং রাশিয়া ও চীনদেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দৃষ্টান্তে, গান্ধী পন্থা তাহাদের প্রাণে সাড়া জাগাইতে পারে না। কিন্তু সম্ভবতঃ এখানে যে সমস্ত যুবক সমবেত হইয়াছে তাহারা সর্বোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই আসিয়াছে।

“আমি সাম্যবাদী কিংবা সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া বরং সমাজতত্ত্ববাদ সম্বন্ধে কিছু বলিব। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমি আমার নিজের মনে সর্বোদয় ও সমাজতত্ত্বের ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছি কিনা।

খাটি সমাজতত্ত্বই হইতেছে প্রকৃত সর্বোদয়

“আপনারা যদি আপাততঃ সমাজতত্ত্ববাদের সূত্রগুলি ভুলিয়া গিয়া ইহার উদ্দেশ্যকে বুঝিবার চেষ্টা করেন, তবে আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কি প্রকারে আমরা সর্বোদয় ও সমাজতত্ত্ববাদ উভয়কে একই সূতায় বাঁধিতে পারি, আমরা এমন এক সমাজব্যবস্থা আশা করি যেখানে কোনপ্রকার শোষণ থাকিবে না, পূর্ণ সাম্যাবস্থা থাকিবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশের সমান সুযোগ থাকিবে। সূত্রবাং এখন এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে। আমরা দেখিয়াছি যে, যখনই হিংসাত্মক উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, শোষণ বন্ধ হয় নাই, সাম্যাবস্থা আসে নাই, কিংবা প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-স্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে নাই।

“যেখানেই হিংসাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়া কোন নূতন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেখানেই সম্পূর্ণ অস্ত্র আর এক নয়া অবস্থা আসিয়া গিয়াছে। কেননা স্বভাবতঃই আমরা পুরাতন কায়মী শাসনব্যবস্থাকে কেবল ধ্বংস করিতেই চাই ও কল্পনা করি যে, ইহাতেই বৃষ্টি এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছি। সমাজতত্ত্ববাদীরা চিন্তা করিয়া থাকে যে, ধনতন্ত্রকে ভাঙিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহারা ইহাতে ভুল করে। সমাজতত্ত্ব কেবলমাত্র একটি নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক আদর্শবাদ নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, জাতীয়করণের কথা যাহা সমাজতত্ত্বের একটি মুখ্য আশার। কেবলমাত্র জাতীয়-করণের দ্বারাই যে সমাজতত্ত্ব আসে না, তাহা আমরা আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশেও দেখিয়াছি। রাশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলে, আমাদের দেশে রেলওয়ে এখন একটি কোম্পানীর সম্পত্তি রূপে গণ্য না হইয়া জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু যদি বলা যায় যে, রেলওয়ে শাসনব্যবস্থা শোষণযুক্ত হইয়াছে, তবে আমরা ভুল করিব। সত্য, এখন যেমন পুঁজিবাদও নাই, তেমনি সমাজতত্ত্বও আসে নাই। বর্তমানে বাহা চলিতেছে, তাহা হইতেছে আমলাতন্ত্রী শাসন। সেইরূপ আমরা যদি বলি যে, অন্যান্য শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিলেই সমাজতত্ত্বের সূচনা হইবে, তবে

আমরা কেবল নিজেদেরই বঞ্চিত করিব। তাহা হইলে কেমন করিয়া আমরা প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিব, ইহাই এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়। আমরা যে রাষ্ট্রীয় অগ্রসর হইতেছি বা যে বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, সর্বোদয় এই পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। অতএব যদি আমরা ষাঁটি সমাজতন্ত্রবাদী হই, তবে প্রকৃত সর্বোদয়পন্থীও হইব।

বিনোবা সর্বোদয়ের রাষ্ট্র প্রবর্তন করিয়াছেন

“কেমন করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায় এই প্রশ্নের উত্তর-দান প্রসঙ্গে বিনোবা ঘোষণা করিলেন যে, গ্রাম-রাজ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যিক। আমরা যদি প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদী হই তবে গ্রামীণ স্বরাজে আমাদেরও বিশ্বাসী হইতে হইবে। এখানেই এই চুই আদর্শবাদের মিলন-ক্ষেত্র—সর্বোদয় সম্মেলনে আমার যোগদান করা ও বিনোবাজীর প্রশংসা করা লইয়া কেহ কেহ আমাকে উপহাস করেন, অপর দল বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাকেও শেষ পর্যন্ত আসিতে হইল। আমাদের সকলেরই সত্য পন্থায়, গভীর ভাবে ও সাহসের সহিত চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। যে-কোন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী, যিনি তাঁহার লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট, তিনিও ঠিক আমি আজ যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় নিজেকে দেখিবেন।

“এমন সময় আসিয়াছিল যখন কেহই নির্দেশ দিতে পারেন নাই কোন্ পন্থায় অগ্রসর হইব ও কোথায় যাইব। সাধারণ মানুষ আশা করিয়াছিল যে, গান্ধীজী বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই যেমন সমাজের পরিবর্তনের রাষ্ট্র দেখাইতেন, তেমনি গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গও নূতন রাষ্ট্র বাতলাইবেন। কিন্তু গান্ধীজীর তিরোধানের পর ঘোর অাঁধার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, যদি বিনোবাজী ভূ-দান যজ্ঞ আন্দোলন আরম্ভ না করিতেন, তবে আমরা ভুলিয়া যাইতাম গান্ধীজী ও সর্বোদয়ের কথা। গান্ধীজী বাহা কিছু বলিয়াছিলেন ও করিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বাস হারাইতাম; ফলে সর্বোদয়ের আলো চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইত এবং গঠন-কর্মীরা তাঁহাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে একক ভাবেই কর্মক্ষেত্রে ঘুরাইতেন। ইহাতে দেশের সামাজ্য উপকার হইলেও গান্ধী-শিষ্যরা সমাজ-পরিবর্তনের রাষ্ট্র দেখাইবেন, সাধারণ লোকের এই আশা বিলীন হইয়া যাইত এবং এক সশস্ত্র বিপ্লব সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল লইয়া উপস্থিত হইত।

সমাজতন্ত্রের স্থলে সর্বোদয়

“আমি ইচ্ছাপূর্বক ছাত্রদের সম্মুখে এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিতেছি, কারণ তাহারাও আজ এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, আমরা বুঝি ভিন্ন

পথে চালিত হইতেছি। আমাদের সম্মুখে যে লক্ষ্য আজ আছে, অপর অনেকেই ইহাকে তাহাদের বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু আমাদের পন্থা ভিন্ন। শোষণমুক্ত সমাজ রচনাই যদি কাম্য হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে তাহা যদি হিংসাত্মক উপায়ে অর্জিত হয়, তথাপি ঐ লক্ষ্য অনর্জিত থাকিয়া যাইবে, কারণ হিংসায় আসে নূতন ধরনের শোষণ এবং শোষণ মানে অপরের জাতীয় অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা। এমন কি, আজও যেহেতু আমাদের নিজেদের জীবন-মান সমাজের অবশিষ্ট ভাইদের হইতে অনেক উন্নত, সেইজন্য অস্বীকার করা যায় না যে, আমরা তাহাদের শোষণ করি নাই। এখন তোমাদের ছাত্রাবস্থায় তোমাদের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইতেছে, গরীব ছাত্রদের অভি-ভাবকেরা তাহাদের শিক্ষার জন্য ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না বলিয়া উহার আংশিক দায়িত্ব তোমাদেরও উপর আসিয়াছে। সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত অবস্থার কল্পনা করা অসম্ভব হইলেও আমাদের এই আদর্শকে প্রতিপালন করিয়া যাইতে হইবে। এমন কি, রাশিয়াতেও আজ সর্ব-উচ্চ এবং সর্ব-নিম্ন স্তরের কর্মচারীদের বেতনের পার্থক্য প্রায় ৪০ গুণ। সর্ব-উচ্চ স্তরের কর্মচারীদের জীবন-মান অনেক উচ্চে বলিয়া সেখানেও শোষণমুক্ত আজও বিদায় লয় নাই। তাহারা হিংসাত্মক পন্থায় ক্ষমতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই ঐ একই উপায়ে শ্রমের মজুরী নির্ধারণ করে। প্রকৃত শোষণমুক্ত সমাজরচনা কেবলমাত্র অহিংস উপায়েই সম্ভব। সেই হেতু সমাজতন্ত্রকে সর্বোদয় নামে অভিহিত করায় আমার কোন আপত্তি নাই।

অছি-বাধের বাস্তব রূপায়ণ

“আমাকে অছি-বাদ (trusteeship) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। গান্ধীজী যখন ১৯৩৫ সালে উত্তর প্রদেশে যান, তখন সেখানকার জমিদারবৃন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সঙ্গপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদের শাসনব্যবস্থায় তাঁহাদের অবস্থা কেমন দাঁড়াইবে? গান্ধীজী উত্তর দিলেন, ‘আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি না, সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিলে কি ঘটবে; যতক্ষণ আপনারা নিজেদের জমির অস্থিররূপ থাকিবেন ততদিন আমি আপনাদের বিনাশকারীর দলভুক্ত হইব না।’

“আমি ইহা শুনিয়া আশ্চর্যবোধিত হইয়া বন্ধুদের বলিলাম যে, যে সমস্ত জমিদার দরিদ্র প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী এই কথা বলিতেছেন, তিনি তাহাদের ট্রাস্টি বানাইতে চাহিতেছেন। এই সকল কথাব প্রকৃত অর্থ এইরূপ যে, তাহারাও ট্রাস্টিরূপ হইয়া বলিতেছে না বা গান্ধীজীও তাহাদের

বিনাশ সাধন করিবেন না। আমরা তখন বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, অছিগিরির এই আদর্শ কেবলমাত্র কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু আজ আমি গয়ায় দেখিতেছি যে, যেখানে এক বিধা জমির মূল্য দুই হইতে ছয় হাজার টাকা, সেখানেও লোকেরা জমি দান করিতেছে। প্রায় ৪৮,০০০ একর জমি দানে পাওয়া গিয়াছে। গান্ধীজীর প্রিয় স্ত্রী সখ্বে কিশোরলালভাই\* একবার লিখিয়াছিলেন, ‘আমরা ভুল চিন্তা করিতেছি যে, তিনি যে সব আদর্শবাদ প্রচার করিতেছেন তাহা কোন দিন বাস্তবে রূপ লইবে না। আমাদের নিকট এইরূপ মনে হয় যে, গান্ধীজী অছি বনিয়া বাইবার জন্ত ধনীদেব অসুপ্রাণিত করিলেও, তাহারাও এরূপ কোন কাজ করিবে না (অবশ্য যদি ধনী ব্যক্তিগণ জ্ঞানী না হন), সমাজের কাঠামো ও ইহার দারিদ্র্য যেমন আছে তেমনই থাকিবে। কিন্তু আমরা যদি গান্ধীজীকে এই দৃষ্টিতে বিচার করি তাহা হইলে এক মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিব। যদি আজ তিনি ঠাট্টিয়া থাকিতেন, তবে বিনোবা আজ যে কর্ম-ক্ষেত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন, তিনি নিজে তাহা করিতেন। এমনও হইতে পারিত যে, তিনি ইহা অনেক পূর্বেই শুরু করিতেন এবং তাহার করিবার পদ্ধতি অধিকতর আকর্ষণীয় হইত। গান্ধীজী বলিতেন যে, বাহারা সমাজের অছি হইতে ইচ্ছুক আমরা তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইব; আর যদি তাহারা ইহাতে না আসে, তবে আমরা দরিদ্রদের প্রস্তুত করিয়া বলিব যে, তাহারা যেন তাহাদের আশ্রয়শোষণের স্বত্বের সহিত অসহযোগ করে। এইভাবে আমরা উভয়কেই প্রস্তুত হইতে বলিব। সেইরূপ ভূ-দান যজ্ঞ দাতা ও গ্রহীতা (beneficiary) উভয়েই প্রস্তুত হইতেছে। যে পরিমাণে ভূ-দান যজ্ঞ জনপ্রিয় হইবে, গ্রামের শোষিত জনসাধারণ সেই পরিমাণে জাগ্রত হইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিবে কি ভাবে অহিংস উপায়ে শোষণ-যজ্ঞে বাধা দেওয়া যায়। সুতরাং আমরা যদি কেবলমাত্র এই বলিয়া অছিবাদের ভাবনারাকে দূরে সরাইয়া দিই যে, ইহা লইয়া কেহ কখনও কাজ করিবে না, তবে আমরাও এক মস্ত বড় ভুল করিব। মোটের উপর, সমাজতত্ত্বীরাও কি সংঘর্ষ ও ভ্রেলীসংগ্রামের কথা চিন্তা করে না? প্রমিত সাধারণ পিস্তল বা বোমা লইয়া সজ্জিত নহে। যখন তাহারা সাধারণ ধর্মঘটের দ্বারা ধনতন্ত্রের দুর্গকে ভাঙিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিতে চাহে, তখন ইহাতেও কিছু পরিমাণ হিংসা অবশ্যই আসিয়া পড়ে।

বিপ্লব আসিয়া গিয়াছে

“আজ যখন আমার সম্মুখে যুবকবৃন্দকে দেখিতেছি তখন পাটনা কলেজে আমার ছাত্রজীবনের দৃশ্য মনে পড়িতেছে। সেই সময় মোলানা আবুল কালাম আজাদ পাটনাতে আসিয়া অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিয়াছিলাম। তাহার বক্তৃতাই আমাদের সকলকে কলেজ ত্যাগ করাইল। এই সময় যুবকবৃন্দের মানসপটে যে বিপ্লব-বহ্নি জলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা গান্ধীজীর আন্দোলনের জন্তই সম্ভব হইয়াছিল। ঐরূপ আর এক বিপ্লব-বহ্নি আজ দৃশ্যমান। গতকল্য বিনোবা যে বক্তৃতা\* দিয়াছেন, আজ পর্যন্ত আমি আর এইরূপ বক্তৃতা শুনি নাই। তিনি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে অবস্থা যেমন দেখিয়াছেন, তেমন বর্ণনা করিয়াছেন। যে কেহ ইহার ইঙ্গিত জয়জয় করিয়াছে, তাহার জীবনও নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে। আমি যুবকবৃন্দের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হইয়া বেদনাক্লান্ত হইতেছি। তাহাদের উৎসাহ আছে সত্য, কিন্তু আমার দারিদ্র্য তাহাদের বিশ্বাস, অভিনিবেশ (concentration) ও মানসিক গভীরতার অভাব আছে।

“যদি সর্বোদয়ের বীজ তোমাদের চিন্তে ও বুদ্ধিতে উগ্ঠ হইয়া থাকে, তবে এই অভাবগুলি দূর করিয়া দিয়া তোমাদের কত ব্যকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; এই কর্তব্য-পালনের ফলে তোমরা, ও যে সমাজে বাস কর তাহা সম-ভাবেই উপকৃত হইবে। বিনোবা বলেন যে, ছাত্রেরা ভূ-দান যজ্ঞে যোগদান না করিলেও তাহাদের কলেজ ত্যাগ করা উচিত। তাহার স্মার্য পণ্ডিতের পক্ষে জ্ঞানার্জনের বিরোধিতা করার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। কেন তবে তিনি এই কথা বলিলেন? কারণ এই যে, যে ধরণের শিক্ষা আজ দেওয়া হইতেছে, তাহা ছাত্র, সমাজ বা দেশ কাহারও উপকারে আসিতেছে না। ইহাই বর্তমান অবস্থা। সুতরাং কত ব্যকে সর্বাংশে পালন করার জন্ত সামান্ততম চেষ্টারও অপব্যবহার করা উচিত নয়।

এক বৎসর এই আন্দোলনে দান কর

“১৯২১ সালের মত আমরা এক উত্তেজনাপূর্ণ কালে বাস করিতেছি। বিপ্লব আসিয়া গিয়াছে, আমরা আমাদের অংশ লইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকি। আমি ইহাই আশা করি, আমরা সকলে এইরূপ শিক্ষাগ্রহণ ত্যাগ করিয়া গ্রামে চলিয়া যাও, সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূ-দান আন্দোলনে ঝেঁটুকু

\* সর্বোদয় সম্মেলনে ৭. ৩. ২৩ তারিখে প্রদত্ত বিনোবাজীর ভাষণ।

পার, তাহা দান করিয়া এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোল।

আরও এক বৎসরের শিক্ষা

“এক বৎসরের জ্ঞান কলেজ ছাড়িতে কেন বিধা বোধ করিতেছ। আমি আমেরিকায় থাকাকালীন দেখিয়াছি যে, ছাত্রেরা কিছুকাল অধ্যয়ন করে, তৎপরে পরবর্তী শিক্ষাকালের ব্যয় বহন করিবার জ্ঞান কোন কারখানায় কাজ করিয়া উপার্জন করে। সেই সময় আমি ‘দাম্যবাদে’ বিশ্বাসী হইয়া রাশিয়া যাইবার জ্ঞান সিদ্ধান্ত করি ও কলেজ ছাড়িয়া দিই। ষষ্ঠে অর্থ উপার্জনের জ্ঞান কাজের সম্মানে নানা দিকে ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু তৎকালে “আর্থিক মন্দা”র জ্ঞান বেকার-সমস্ত। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমি ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে-কোন কাজের জ্ঞান প্রস্তুত থাক। সত্ত্বেও কিছু কিছুই যোগাড় করিতে পারিলাম না। তার পরে অসুস্থ হইয়া পড়ায় চিকিৎসার জ্ঞান যে ঋণ হইল, তাহা কোন কারখানায় কাজ করিয়া পরে শোধ করিয়া দিই।

“এত দিন পরে ফেলিয়া-আসা দিনগুলির দিকে দৃষ্টি করাইলে আমি মনে করি না যে, এক বৎসর কলেজ ত্যাগ করার কোন দিকে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। আমি কখনও অনুভব করি নাই যে, মাঠে অথবা কারখানায় কাজ করিয়া

যে শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহা কোন অংশে হয় বা অবহেলার যোগ্য। এখানে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলাম তাহা কখনও কোন কলেজের শিক্ষার পাওয়া সম্ভব নয়। সেইরূপ যে শিক্ষা তোমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লাভ করিবে তাহা স্কুলে বা কলেজে কখনও পাইবে না এবং আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, যদি তোমাদের পিতামাতারা তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বা তোমাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জ্ঞান চিন্তাশীল হন তবে তাঁহারা স্বেচ্ছায় এই কথাই বলিবেন, ‘ভাল কথা, যাও, এক বৎসর এই ভাবে কাজ কর।’ প্রত্যেকের নিকট এইরূপ আশা করা যায় যে, সে নিজেকে ভূ-দান যজ্ঞের জ্ঞান এক বৎসর সমর্পণ করুক। লোকেরা তাহাদের জমি দান করিতেছে, আর আমরা আমাদের সময় ও শক্তি দান করি। বিনোবা বলেন, ইহা এমন এক বিপ্লব হইবে যাহা সমগ্র জগতের ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। অবশ্য আমরা যদি এই ভাবে পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে জমির জ্ঞান বৃহৎ সমস্তার সমাধান করিতে পারি।... সুতরাং আমরা তোমাদের সকলকে বিপ্লবের এই নূতন হোমায়িতে হাত মিলাইতে আহ্বান জানাইতেছি, এবং আশা ও বিশ্বাস করি যে, দেশের যুবকবৃন্দ এই পথে পদক্ষেপ করিতে পশ্চাত্তাপ হইবে না।”\*

\* জুলাই ১৯৫০ সনের ইংরেজী “সর্বোদয়” পত্রিকা হইতে গৃহীত।

## দুই ‘আমি’

শ্রীশিশিরকুমার রায়

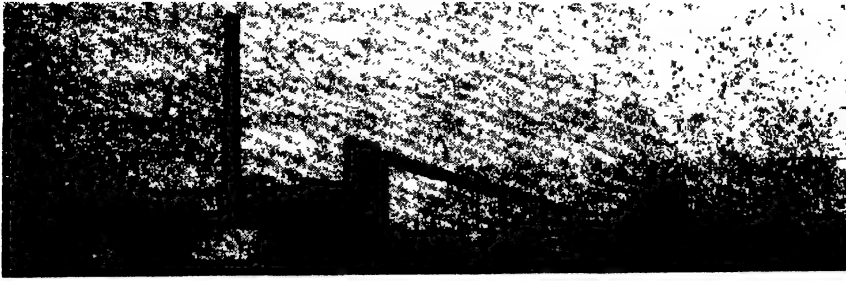
এ দুঃখ আমার নয়—অশ্রু-ভারাক্রান্ত এই দিন  
আনন্দ-পবন-ভরা জীবনের পরিচর্য্যহীন  
কুস্মটিকা আবরণে। গ্লানিমুক্ত দিবসের শেষে,  
এই যে নূতন আমি আঁধারের নয় পরিবেশে  
ভাবের কমল-কলি মুগ্ধ মনে করি বিকশিত—  
সজীব প্রাণের সুরে লভিকার মত হিল্লোলিত  
আনন্দের সমীরণে।

দিবসের প্রচুর আলোক  
আমার দারিদ্র্য লাগি’ সৃষ্টি করে যে সমালোচক—  
লক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সেই লক্ষ্য করে মোর ভিন্ন বেশ  
নয়রূপ বুদ্ধিকার। আলোকের এই ব্যজ ঘেঁষে

যে ‘আমি’-রে সৃষ্টি করে, সে অপর, ভিন্ন প্রকৃতির  
এই ক্ষণে আমা হ’তে। ধূলায় লুপ্তিত তার শির  
হুর্ভাগ্যের পদ-ভারে, বর্ষশেষে স্বপ্নাপাতা মত  
জীবনের ভালোটুকু বয়ে যায় তার অবিহত—  
ব্যথায় হলুদ হয়ে।

অন্ধকার তরা অমানিশা

এনে দেয় চেতনার আকাজিকত স্তব্ধের ভূমি  
পরিবর্তিত এ ‘আমি’র। আলোকের নাহিক আভাস,  
তাই, জীবনের শতদলে জাগে নব যে সুবাস  
তাহে মুগ্ধ এই আমি। এই ঘোর পূজা আপনার  
ছদ্মবেশ মুক্ত হয়ে আনন্দের স্বচ্ছন্দ বিহার।



একটি আধুনিক কাগজের রল

## কাগজ-বিজ্ঞান ও কাগজ-শিল্প

শ্রীসলিল বসু

সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ বেদিন আগুন জ্বালতে শিখেছিল, সেইদিনই হয়েছিল তার বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সূচনা, তার সভ্যতার সত্যি-কারের গোড়াপত্তন। তারপর সভ্যতার পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি—সেই স্বরণাতিত কালের গুহাবাসী মানুষের জীবনধারা থেকে আজকের বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সমাজ-জীবনে। এই যুগ থেকে যুগান্তরে আসার পথের ধারে ধারে রয়ে গেছে অনেক অলিপিভিত কাহিনীর খণ্ড বিচ্ছিন্ন সমাবেশ। এর কিছু কিছু ধরা পড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার, কিছু পাওয়া যায় অমুমানে। এই অলিপিভিত কাহিনীর আভাসে জানা অধ্যায়গুলোকে বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ নিজ গবেষণার সুবিধামত ভাগ করে নিয়েছেন বিভিন্ন ভাবে। গুহামানব প্রথম গুহা ছেড়ে নেমে এসেছিল পণ্ডপালনের ক্ষেত্রে, শুরু হয়েছিল পণ্ডচারণ যুগ। কিন্তু এই সীমার মাঝে তাকে বেশী দিন বেঁচে রাখা যায় নি। নদীপ্রধান অঞ্চলে পলিমাটিতে তারা শুরু করল শস্য উৎপাদন, চাষ-আবাদ; সূচনা হ'ল নতুন যুগের—কৃষিযুগের। এই যুগেই সে প্রথম গড়ে তুলল তার সমাজ, বাঁধতে চাইল নিবিবিলি ছোট্ট বাসা। পানভোজনে, সাজপোশাকে এল তার রূপান্তর, বিরাট পরিবর্তন। মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তারা সৃষ্টি করল সুরের লহরী, আনন্দপ্রকাশের উত্তাল ছন্দে উঠল নেচে। সেই তার রূপসৃষ্টির প্রথম প্রেরণা। কিন্তু তাকে সে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে স্থায়িত্ব দান করতে চাইল। মানুষের সেই যুগের বা-কিছু কীর্তিকলাপ সবই সে রেখে যেতে চাইল অনাগত কালের মানবসন্তানের জন্তে। এমনভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষ বাক্সা করল অপ্রগতির পথে। ক্রমে ক্রমে এই আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠল আরও প্রবল। তাই তার প্রয়োজন হ'ল লেখার সামগ্রী। তার অমুসন্ধিৎসু মন খুঁজতে লাগল নতুন পথের নিশানা। পথ পেতে খুব বেশী দেরি হ'ল না। পাছের ছাল ও পাতাকেই তারা বেছে নিলে তাদের ক্রিয়াকলাপ, জীবনধারা ইত্যাদির স্থায়ী রূপ দেবার উপকরণ

হিসাবে—আগামী কালের কাছে বাণী পৌঁছে দেবার বাসনা মেটাবার পন্থা আবিষ্কৃত হ'ল। নীলনদের কূলে কূলে জন্মায় ধ্বংসে গাছ তারই ছাল থেকে তৈরি হ'ত প্যাপিরাস কাগজ আর মিশরের জনসাধারণের দ্বারা তা ব্যবহৃত হ'ত। এতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর চাহিদা মিটত। প্রাচীন ভারতের এই ঘটনার সাধনা চলত “কুর্জপত্র”। এশিয়া মাইনরে ছাগল বা ভেড়ার চামড়া থেকে লেখার উপযোগী সামগ্রী তৈরি করে নেওয়া হ'ত। এসব হ'ল খ্রীষ্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগেকার কথা। আজকের গাছপালা থেকে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কাগজ তৈরি হচ্ছে তার সূচনা হয়েছিল চীনে, আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু যক্ষণশীল চীন তাদের কাগজ নির্মাণ-পদ্ধতির কথা বাইরের জগৎ থেকে গোপন রেখেছিল প্রায় ৬০০ বছর। তার পর যখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাতারসম্রাট চেঙ্গিস খান আক্রমণে দলিত মগধিত হ'ল সমরখন্দ, সেইদিন থেকেই আরব জ্ঞানীবিজ্ঞানীদের সামনে উল্ঘাটিত হ'ল এই রহস্য। কিছুকাল পরে আরব-ভগতের সঙ্গে ইউরোপের বাণ্যল ‘ধর্মযুদ্ধ’ আর তারই ফলে কাগজ প্রস্তুত-পদ্ধতির কথা গিয়ে পৌঁছল ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে—১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে, ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডে, ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে আর ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে। এইভাবে প্রক্রিয়াটির কথা যেমন ছড়িয়ে পড়ল, তেমনি এর উন্নতিও হতে লাগল বৃষ্টি। আজকের দিনে কাগজ ব্যবহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজকে বাদ দিয়ে আজকের সভ্যতাব্য মূল্য নিকরূপ করা যায় না।

আজকের দিনে কাগজ তৈরি চলছে সেলুলোজ নামে এক জাতীয় জটিল সংগঠনের রাসায়নিক পদার্থ থেকে, এই পদার্থ পাওয়া যায় গাছপালায় ডালপালা, শুঁড়ি পাতা থেকে। প্রথমে কাঠের ছাল-গুলোকে আলাদা করে নেওয়া হয়, আর এই প্রক্রিয়ার জন্তে ‘বার্কিং-ড্রাম’ নামে কতকগুলো বিশেষ বস্ত্র ব্যবহার করা হয়। তারপর এগুলোকে পাঠানো হয় ‘চিপার মেশিনে’। এখানে কাঠগুলোকে



কেটে কেটে ছোট করে নেওয়া হয় যাতে করে পরবর্তী রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ ভালভাবে চলতে পারে। তার পর এই পদার্থগুলোকে কঠিক সোডার সাহায্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে কোটানো চলতে থাকে। এই সময় সাধারণতঃ চাপ থাকে ৬ থেকে ৮ এটমস্ফিয়ার আর উষ্ণতা ১৬০° থেকে ১৮০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি।



যাদবপুর কলেজের বাৎসরিক শিল্পপ্রদর্শনী  
এদর্শিত আখের ছিবড়াই হইতে কাগজ প্রস্তুত-পদ্ধতির মডেল

কাছি। অল্প একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কঠিক সোডা ব্যবহার না করে ক্যালসিয়াম বাই-সালফাইড ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে লিগনিনটো সহজেই পৃথক হয়ে পড়ে আর তার সঙ্গে কিছু হেমিসেলুলোজ নামে পদার্থও চলে যায়। এখন সেলুলোজটা যে অবস্থার পরিণত হয় তাকে বলে পাল্প। এটাকে ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং ব্লিচিং পাউডার বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট প্রভৃতির সাহায্যে বিরঞ্জন করা হয়। এর জন্মে বিরাট বিরাট আখার ব্যবহৃত হয় আর সেগুলোকে বলে ব্লিচিং ট্যাঙ্ক। তার পর ড্রায়ারগুচ্ছ সেলুলোজকে অনেকগুলো তারজালির মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এই সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে জলও দেওয়া হয়, প্রক্রিয়াটি যাতে সঠিকভাবে হয় সেজন্মে। এই জলসম্পৃক্ত সেলুলোজকে ফেট বোলার নামে কতকগুলো বস্তুর মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। এই বস্তুটিকে বাষ্প-সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়, তার ফলে উক্ত সেলুলোজ বখন এর মধ্যে দিয়ে যায় তখন এর মধ্যকার সমস্ত জলই প্রায় উড়ে যায় আর ব্লিচিং পেপারের মত একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। তারপর যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় তাকে বলে 'সাইজিং'। এই প্রক্রিয়ার ফলে কাগজটা কালি দিয়ে লেখার উপযুক্ত হয়—অর্থাৎ কালি কাগজের উপর পড়লে আর 'খেবড়ে' বাবার সন্ধাননা থাকে না। এই পদ্ধতির জন্মে সচরাচর বোজিন,

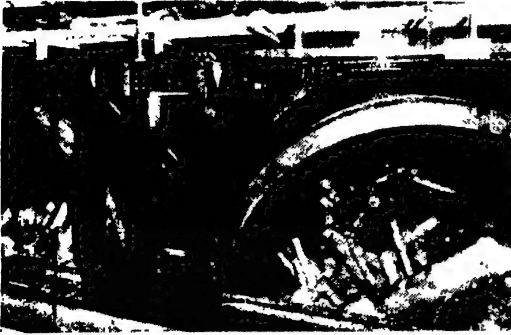
গ্ল্যামা, জিলেটিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। উদ্ভবের 'আর্ট' কাগজের জন্মে সাইজিং-এর সময় কিছু পরিমাণে চীনা মাটিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহু কাগজ বা সেলুলোজ পেপার নামে আখ্যাত কাগজ-গুলো তৈরি করাও এমন কিছু একটা শক্ত ব্যাপার নয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাল্প তৈরি করা হয় আর সেই পাল্পকে কঠিক সোডা এবং কার্বন ডাই-সালফাইডের মধ্যে ভাল করে গুলে নেওয়া হয়, বার দরুন একটা কমলা রঙের জ্বর্ণ তৈরি হয়। তার পর এই জ্বর্ণটিকে একটা সড়ক নলের মধ্যে দিয়ে অম্লপাতের (Acid bath) মধ্যে ঢালানো হয়। নলের স্পন্দন ও দৈর্ঘ্যের উপর কাগজের প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি বেশ কতকটা নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ার পর কাগজটাকে বেশ ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়, তারপর বাই-কার্বনেট জ্বর্ণের সাহায্যে অতিরিক্ত এসিডকে প্রশমিত করে নিয়ে আবার অতিরিক্ত কার্বনেটটাকে অপসারিত করবার জন্মে জল ও লবু এসিড দিয়ে ধোয়া হয়। তারপর এটাকে গ্লিসারিন দিয়ে ধোয়া হয় বার কলে প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ গ্লিসারিন বিশোধিত হয়ে যায়। জল-বিরোধক করবার জন্মে এটাকে তখন ইথাইল এসিটেট বা ঐ জাতীয় উষ্মীয় (volatile) জাবক পদার্থ মিশ্রিত ল্যাকার জ্বর্ণের মধ্যে দিয়ে চালানো হয়। তারপর বাষ্প-সাহায্যে গরম করে শুক করা হয় আর সেই সময় ল্যাকারটা কাগজের গায়ে আবরণী হিসাবে থেকে যায়, যাতে করে নমনীয় গুণটা বজায় থাকে।

আজ থেকে প্রায় ৭০।৮০ বৎসর আগেও কেবলমাত্র ভাল জাতের গাছপালা থেকেই কাগজ প্রস্তুতি চলত। বাঁশ থেকে কাগজ প্রস্তুতি প্রথম শুরু হয় ভারতবর্ষে। বাঁশের গাঁট, তরল-নিরোধকতা ও অস্ত্র কতকগুলো অসুবিধা থাকার দরুন এ থেকে কাগজ তৈরি অনেক দিন সম্ভব হয় নি। ভারতীয় বনবিদ্যা গবেষণাগারে ডক্টর রেইটের গবেষণায় এই অসুবিধা দূর হয় এবং আমাদের কাগজ-শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ধান ও ভুট্টার খোলা, শণ ও পাটের ফেলে দেওয়া অংশ থেকেও কাগজ প্রস্তুতি চলছে। তবে বর্তমান সময়ে কাগজ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে 'ব্যাগাস' অর্থাৎ আখের ছিবড়া উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে এবং এর জন্ম নব নব পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে, বস্ত্রাদিও পেটেন্ট করা হয়েছে। ভারতের রোটাশ ইণ্ডাস্ট্রিজের ডালমিয়া নগরের কারখানার আখের ছিবড়া থেকে কিছু কিছু কাগজ প্রস্তুতি চলছে ও পূণায় ওয়ারালটনের কারখানাতেও এর পরীক্ষা চলছে। কাগজ-শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বাংলার অবস্থা খুবই আশাশ্রয়। সাধারণতঃ বাঁশগাছের গৌলতেই আমাদের দেশে বেশীর ভাগ কাগজের কল চলছে। পশ্চিম বাংলা ছাড়া বোম্বাই, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হয়। বাঁশগাছে পরিপূর্ণ প্রধান অঞ্চল হচ্ছে উড়িষ্যার আঙ্গুল বনভূমি। সাবর বাস নামে একপ্রকার বাসই উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে বাঁশের সঙ্গে



ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখনকার কাগজের কলগুলোতে বছরে প্রায় ২০০,০০০ টন বাঁশ আর ৪০,০০০ টন সাবর বাস ব্যবহৃত হয়। কঠিক সোডা, কার্বনেট, সালফেট ও সালফাইড প্রভৃতি রাসায়নিক সামগ্রীর বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে। তবে কিছু পরিমাণে এই সব এখন আমাদের দেশে তৈরি শুরু হয়েছে এবং আরও বাতে তৈরি করা যায় সেই দিকে সরকার,

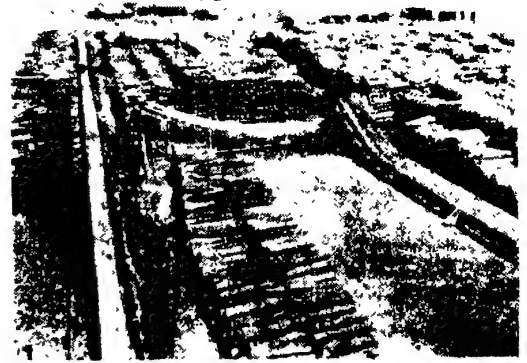
আমদানী করতে হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ২৫টি কাগজের কল রয়েছে যাতে ২০,০০০ লোক কাজ করে। বোম্বাইয়ের স্থানই এ বিষয়ে প্রথম, আর পশ্চিম বাংলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। বর্ষাক্রমে ৮টা ও ৫টা কল রয়েছে এই দুটি প্রদেশে। এই সব মিল থেকে বৎসরে প্রায় ১,১০,০০০ টন করে কাগজ



বার্কিং-ড্রামের সাহায্যে পাতলা করে কাটা কাটা

শিল্পপতি ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়েছে। কলগুলো চালানোর জন্য যে পরিমাণ শক্তি দরকার হয় তার বেশীর ভাগই পাওয়া যায় কয়লার সাহায্যে। অধিকাংশ কলই কয়লার ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ার অনেক সময় খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আত্মকাল কোন কোন জায়গায় জল-বিহীনতার সাহায্যে কল চালানো হচ্ছে, তাতে যে বেশ কিছু চাহিদা মিটছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ কাগজ আমাদের দেশে তৈরি হয়। আর বাকী সব আসে সাগরপারের দেশগুলো থেকে। ১৯৩৬ সালের দু' লক্ষ টন প্রয়োজনীয় কাগজের মধ্যে মাত্র ৪৮,০০০ টন এ দেশে তৈরি হয়েছিল—আর বাকী সবই আনতে হয়েছিল বাইরে থেকে। সাধারণতঃ ইংলণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানী, কানাডা প্রভৃতি দেশ থেকেই বরাবর আমাদের আমদানীটা হ'ত, তবে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও বেশ আমদানী শুরু হয়েছে। যুদ্ধ বাধবার ঠিক আগেই ১৯৩৯ সালে প্রয়োজনীয় ১,০৬,২৫৫ টনের মধ্যেই ৮৭,০৫৮ টনই আমদানী হয়েছিল বাইরে থেকে, আর ১৯৪৯ সালে অর্থাৎ ১০ বছর পরে ১,৮৭,৯২১ টনের মধ্যে আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৮৪,৭২৬ টন। কেন্দ্রীয় সরকারের পেপার প্যানেল বোর্ডের মতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে আমাদের কাগজের চাহিদা প্রায় ৪,৫০,০০০ টনে দাঁড়াবে, কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে তৈরি হচ্ছে মাত্র ১ লক্ষ টনের কিছু বেশী। বৎসরে আমাদের বহু কোটি টাকার কাগজ বিদেশ থেকে



কাগজের কলের প্রাঙ্গণে স্থাপিত কাগজের 'পাল্প' তৈরির কাঠ

পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া এগুলোর উৎপাদন বাড়ানোরও খুবই চেষ্টা চলছে। শীঘ্রই কান্ট্রীর ও আসামে কাগজের কল চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে নিউজ প্রিন্ট সম্বন্ধে আমাদের পুরো-পুরি নির্ভর করতে হয় বিদেশের উপর। মেক্যানিক্যাল উড পাল্পের অভাবে আমাদের দেশে এখনও নিউজ প্রিন্ট কাগজ তৈরি করা সম্ভব হয় নি এবং প্রয়োজনের প্রায় সবটাই আমদানী হয় কানাডা, নরওয়ে ও সুইডেন থেকে। এইজন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন হয় সে সম্বন্ধে ভারতীয় গাছপালা নিয়ে দেয়াতুন বনবিজ্ঞা গবেষণা-গারে কিছু কিছু গবেষণা চলছে। বর্তমান বৎসরে আমাদের নিউজ প্রিন্টের প্রয়োজন প্রায় ৬০,০০০ টন। মধ্যপ্রদেশে একটা বড় কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলছে এবং সেটা খুবই তাড়াতাড়ি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখন থেকে প্রায় ৩০,০০০ টন পাওয়ার সম্ভাবনা। হায়দ্রাবাদেও একটা কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। জাম জাতীয় গাছ থেকে ভাল পাল্প পাওয়া যেতে পারে আর সে বিষয়ে পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ খুবই আশা প্রদ, অবশ্য যদি যথোচিত চেষ্টা করা যায়।

আজকের পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত সামগ্রীর মধ্যে কাগজ একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু বৎসরে কাগজের প্রয়োজন হয় প্রায় ১৭৫ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ১৫০ পাউণ্ড আর ভারতবর্ষে ১ পাউণ্ডের কিছু বেশী। তবুও সারা বৎসর আমাদের দেশে কাগজের দুর্ভিক্ষ চলছে। এ কথা বললে খুব অজান হয় না।

## স্মরণে

### শ্রীকালীপদ যটক

আমার এ গৃহ শূন্য যে আজ, শূন্য এ ধবাতল  
এ মহাশূন্যে ওরে চকস, কোথায় লুকালি বল ।  
তোরে খুঁজে কিরি পথে প্রান্তরে বিজন বিটপীমূলে,  
খুঁজে কিরি মাগো অশানের বৃকে, ভটিনীর কূলে কূলে ।  
আট বছরের বর্ষা শরৎ বসন্ত মালিকার—  
সাক্ষ্যেচ্ছিত তোরে, সে মালা কি আজ অকালে শুকায় বার !  
আকাশের কোলে অষ্টমী চাঁদ আজো হাসে মধুহাসি,  
আমার সোনার অষ্টমী চাঁদে রাছ কি প্রাসিল আসি ।  
কে দিল যে এঁকে স্মৃতিপটে তোরে রূপের মাধুরী হানি',  
রূপ আছে, নাই রূপের আধার কনক পুতলীধানি ।  
রূপ যে মা তোমার অঙ্গ উপচি মাটিতে পড়িত চূঁরে,  
ঘন কেশদাম খেলিত লীলার ঐবামূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ।  
হাসিয় বলকে ঝরিত মাণিক, মুকুতা অঙ্গজলে,  
চরণে বাজিত মুখর নৃপের নৃত্যের হিম্মোলে ।  
এত উজ্জ্বল প্রাণতরঙ্গ এত হাসি এত গান,  
ধেমি গেল কি যে একটি নিমেষে, সবই আজ অবসান !  
জ্যৈষ্ঠের তাপে ঝরে গেল হার কনকচাঁপার কলি,  
ধরায় ধুলায় দিয়ে গেল শেষ বিদায়ের অঞ্জলি ।  
মাটি আর সোনা—সোনা আর মাটি—এক হয়ে গেল মিশে,  
সোনার গরবে গরবিনী মাটি, ও সোনা ধুইলি কিসে !  
যে ছিল হিয়ার হিয়াতে লুকানো, হুটি নয়নের তারা,  
কোন প্রাণে তার বিদায়ের ডালি সাক্ষ্যবি সর্গদারা !  
এত কল দিয়ে সাক্ষ্য মা তোরে, ঢেকে দিমু কূলে কূলে,  
জীবনের ধন দিব বলে' কি রে চিত্তাশয্যায় তুলে ।  
চূর্যচন্দনে চন্দনকাঠে কতটুকু সামান্য,  
আত্মাহুতির উৎসব এ যে আত্মপ্রবঞ্চনা ।  
মানস বাজী বলাকা যে আজ গগনে মিলেছে ডানা,  
শূন্য এ বৃকে সে পাখী ত আর কিরিয়ে না—কিরিয়ে না ।  
ওরে পথতোলা, দিশাহারা হরে পথ বাস যদি তুলে,  
হ'বাহ বাড়ায়ে কঠে জড়ায়ে কে নেবে যে বৃকে তুলে ।  
কে বিছাবে তোমার লম্বা বর্ণন ধূমেতে পড়িবি লুটি,  
চুমার চুমার ভরে দেবে তোমার টুকটুকে ঠোঁট হুটি ।  
'আর ঘুম' বলে কে শোনায়ে তোমার ঘুমপাড়ানিয়া গান,  
পদ্মে পাখায় কথায় কথায় ভরে দেবে কচি প্রাণ ।

তুই নাই বসে' সবকিছু আজ বিবাদকালমা মাথা,  
সবই যেন রূপ-বর্ণবিহীন, গভীর তিমিরে ঢাকা ।  
ওরে বলবুল, বাগিচার তোর কুলকুড়ি কেঁদে সারা,  
পিছু ডাকে তোরে রজনীগন্ধা, দো-পাটি, নয়নতারা ।  
পঞ্চমুখী সে পাঁচটি শীর্ষে হাতছানি দেয় তোরে,  
তুই যে এদের ভালবেসেছিলি, বেঁধেছিলি মেহডোরে ।  
বেলা-মল্লিকা ঝরে' পড়ে তোর বিচ্ছেদ-বেদনার,  
এরা যেন সব কেঁদে বলে—খুঁছু, কিরে আর—কিরে আর ।  
তোমার প্রাণরসে এরা যে সজীব, রূপে রঙে অভিনয়,  
গোপা-কুঞ্জের কূলে কূলে তাই লেখা আজো তোমারি নাম ।  
কূলের বরণী কজা আমার, কুলখেলা করি সায়,  
ঝরে গেলি মাগো বড়ের দোলার অসময়ে অবেলার ।  
কি কাল ঘুম যে ঘুমালি মাণিক, ডেকেও পাইনে সাড়া,  
হেনে গেলি বৃকে একি শেল মাগো, এ যে মরণের ও বাড়া ।  
তুই নাই এ যে স্বপ্নের কথা, মনে জাগে সংশয়,  
তোমারে যেন আজ কে দিল ছড়ায়ে নিখিল বিশ্বময় ।  
জগতে বা-কিছু স্মরণ ছিল অপূরণযোগ্য ছেয়ে,  
স্মরণতর হ'ল বৃষ্টি তোর রূপতরঙ্গে নেয়ে ।  
চাদের হাসিতে হাসি ঝরে তোর স্মৃতির গগনতলে,  
নীলিমায় ভরা তারার মালা সে দোলে যেন তোর গলে ।  
সজল মেঘের কাজল মায়ায় নব শ্রামজলধরে—  
মেঘের বরণ এলোচুল তোর বিছালি কি ধরে ধরে ।  
বাধায় পুলকে তুলোকে তুলোকে এক হয়ে গেল সবি,  
যে দিকে তাকাই হেরি যেন তোর নয়ন-জুড়ানো ছবি ।  
যে ছিল আমার একলার ধন গৃহ-অঙ্গন তলে,  
বিশ্বের হয়ে দেখা দিল আজ শতরূপে শত ছলে ।  
তবে কেন মিছে ভেবে মরি মাগো, কে বলে মা তুই নাই,  
মরণ বিদায়ি স্বপ্ন-বেদীতে নিয়েছিল এসে ঠাই ।  
মনের মুকুরে ভাসে তোর ছবি, এই যে এখানে তুই,  
হিয়ার মাণিক ঠাঁড়া যে বানিক হিয়ার মাঝারে থুই ।  
স্বপ্নের ঘোবে দিয়ে বাস ওরে মাঝে মাঝে হুটো চুমা,  
স্মৃতিমন্দিরে সোনার কোঠায় ঘুমা যে মাণিক ঘুমা ।\*

\* নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, জয়পুর অধিবেশনে পাঠিত

## ভূজঙ্গ-কবলিত

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

ভরা ভাজের শুভোট রাত। কি একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে মানসিক পীড়ন ভোগ করছিল রাসমণি। কাছেই কোথায় সাপে ব্যাঙ ধরেছে। ভূজঙ্গ-কবলিত ভেকের আর্দ্রনাদ শুনেই যুগ ভাঙলো ওর। বুকটা টিপ টিপ করছে এখনো। পাশে ছেলোটো ঘুমুচে অকাতরে। হাত দিয়ে স্পর্শ নিলে তার কোমল অস্তিত্বের। ওপাশে মেয়েটাও ঘুমে অচেতন। ঘেমে নেয়ে গেছে হতভাগী। ভাঙা হাত-পাখাটা হাতড়াতে বাচ্ছিল রাসমণি। আবার সেই মগ্নাস্তিক কাতরানি। সাপের গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার অস্তিম প্রয়াস। রাসমণির বুকটা হঠাৎ কঁপে উঠল। হিমাঙ্কুর হয়ে এল যেন হাত-পা। সাপেরই মত কি একটা বীভৎস জীব ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল যেন তাকে স্বপ্নের মধ্যে। তার সমস্ত চৈতন্যকে অসাড় করে দিয়ে—সমস্ত সত্তাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে কে যেন নির্দ্বন্দ্বভাবে টেনে নিয়ে চলেছিল তাকে ভয়াবহ তিমির-গহবরের মধ্যে। মুগ্ধ চেনবার আলো নেই সেখানে। নিশ্বাস নেবার বাতাস গিয়েছে কুরিয়ে। জীবনের সব আনন্দ, সমস্ত আশাকে নিঃশব্দভাবে নিষ্পিষ্ট করছিল যেন কি এক ধরনের কদম্বা অঙ্ককার। উঃ, ব্যাঙটা ডাকল আবার। আর কতকণ ডাকবে অমনি করে কে জানে। ধীরে ধীরে তিলে তিলে কবলিত করা—ভূজঙ্গের এ কেমন আহ্বাসসন্তোষ।

বস্তির একধারে এই ভাঙা ঘরখানায় আশ্রয় দিয়েছেন তাকে—বস্তিরই মালিক ভোলাবাবু। অল্পকম্পা! হ্যাঁ, হয়ত তাই। না হলে ছেলেমেয়ে দুটির হাত ধরে কোথায় পড়ে থাকতে হ'ত তাকে কে জানে। কিন্তু ও জানে—এ অধুগ্রহের মূলে দেবতার প্রসন্নতা নেই। আছে জৈববাসনার কুৎসিত মনোবৃত্তি। পাশেই এঁদো ভোবা একটা। গাড়ী গাড়ী ঝটলা কেলে ডোবাটার আখ-খানা প্রায় ভরিয়ে এনেছে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। পাড়ে পাড়ে পচাখরা কচুবন। বর্ষার জলে ভেজা বনবাগাড় আর পচা ঝটলাকাড়ির বিক্রি এক ধরনের গন্ধ। মাঝে মাঝে অসহ্য ঠেকে। ওপাশে পচা নর্দমার বীভৎস অস্তিত্ব। সবকিছু মিলে আবহাওয়াটা নরককুণ্ডকেও হার মানিয়েছে যেন। মাছুষ থাকার ঠাই নর এ। এখানে পদচিহ্ন আঁকে বারা তারা ভিন্ন জাতের জীব। তাদের আত্ম থাকে না, সত্ত্ব থাকে না। শিকার-দীক্ষা কিংবা সমাজচেতনারও বালাই নেই তাদের। অপাংক্তের এরা মানববিশেষ। বিধাতাও প্রসন্ন নয় যেন এদের উপর। রাসমণি এখন এই পরিমণ্ডলমধ্য-চাবিণী অসহায় নারী। এখানে আসে অবশ্য আর এক জাতের নিশাচর জীব। এরা মাংসাশী। শিকার খোঁজে এরা। স্থান-অস্থান বিচায় নেই এদের। রক্তমাংসের দেহের লোভে আসে।

বস্তির মালিক ভোলাবাবু প্রচুর বিজ্ঞের মালিক এবং প্রতি-

পত্তিশালী। সভা মাছুষ ইনি। আলো সহ্য হয় না এম্ম লীঅঙ্গে। রাতের অন্ধকারে তাই গা-ঢাকা দিয়ে আসেন তিনি। অভিসারপ্রমত্ত মন নিয়ে আসেন। বয়স হয়েছে অনেক। রাসমণির বাপের বয়সীই হবেন বা। স্ত্রী হোক। নজরে ধরেছে রাসমণিকে। প্রলোভনের খাঁকা খেয়ে গেয়ে রাসমণির মনের ভিত কঁপে উঠছে ক্রমশঃ। লোভ দেগাচ্ছেন ওর ছেলে-মেয়েদের অঙ্গে রঙীন কাপড়-জামা উঠবে। পেটভরে ভাল-মন্দ খেতে পাবে ছুটিতে। মাথার উপর ভাল ছাউনিও ছুটেবে একটা। সর্বোপরি ওর উপোষী দেহমনে আবার ভরা কোটালের জোয়ার আসবে কুল ছাপিয়ে। আজ সন্ধ্যাতোও হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন ভোলাবাবু। ও আর কতদিন লড়বে এমনি করে বিবেকের সঙ্গে। আজন্মের সংস্কার—আর আগলাতে পারবে না ওকে। সব সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়েছে ওর। মনের সকল বাধন এলিয়ে পড়েছে যেন। অঙ্ককার—হ্যাঁ, বীভৎস অঙ্ককারই গ্রাস করছে তাকে ক্রমশঃ। স্বপ্ন নয় এ—বাস্তবের অসহনীয় অঘটন প্রতি লোভনীয় অঙ্ককার। বন্ধ করে চা খাইয়েছে আজ সন্ধ্যায় রাসমণি বস্তির মালিক ভোলাবাবুকে। হেসে পানের খিলি দিয়েছিল হাতে তুলে। কি এক দুর্বীর আকর্ষণ যেন। বিষধরের সম্মোহনই হয়ত বা এ। বা কোনদিন করে না—তাই করবার দ্রুস্ত লোভ জেগেছিল আজ ওর। নিপুণ বন্ধ দিয়ে কবরী রচনা করেছিল আজ সে। অঙ্গবাগ—হ্যাঁ, তারও ছোঁয়াচ লেগে বরছে এখনো ওর দেহ-মনে। পানের রসে ঠোট ছুটিতে রঙ ধরে হয়ে-ছিল ঠিক বিষাদধর। কপালের সিঁদুর টিপটিও হয়েছিল কি নয়ন-লোভন! মাথায় আত্ম আর ও ঘোমটা টানে নি ভোলাবাবু সামনে। ভোলাবাবু বস্তির মালিক, ওর দেহমনেরও মালিক হতে চান। হতভাগা ছেলেমেয়ে দুটো জেগে না থাকলে কি করে বসত ও কে জানে! হাত ধরে কাছেও টেনে ছিলেন ওকে ভোলাবাবু। বিষধরের স্পর্শ অল্প সময় হলে ওর সমস্ত নারীত্ব শিউরে সঙ্কুচিত হয়ে মাটিতে মিশিয়ে বেতে চাইত নিশ্চয়ই। নয়তো আগুন ছিটকে বেকত বিস্ফোহিণীর চোখ দিয়ে। আজ কিন্তু দুর্বীর লজ্জা আর মাতৃদেহের মহিমাই শুধু ওর মনের পাগলামিকে শাবিয়ে রেখেছিল কোনরকমে। ঝি-গিঝি করতে হবে না আর ওকে। পরের সংসারের স্তব্ধ শরীরপাত করতে হবে না আর। ভোলাবাবু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন নাগাড়ে। ভদ্র লোক উনি। কথাই কি খেলাপ হয় তাঁর।

হ্যাঁ, বিয়ের কাজই করে রাসমণি। পাটকাঁটা বাসনমাঝা আরও কত কি। একটি সংসারকে পরিচ্ছন্ন করে রাখার দায়িত্ব তার। বিনিময়ে পার অনেককিছু। হ্যাঁ, অনেক বই কি।

হ'বেলার হুমুচো করে ভাত। ভাগাভাগি করে খায় ছেলে মেয়ে মা। তা ছাড়া পাতে পাতে উচ্ছ্রিও থাকে একটু আধটু। তাতেও কোন কোনদিন পেট ভরে যায় ছেলে মেয়ে দুটির। নগদ তিনটে করে টাকা মাসে মাসে। বছরে দুখানা করে কাপড়। ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড়ও জোটে ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে। প্রত্যাশার তুলনার মধ্যেই বৈকি।

সকালে কসসা হতে না হতেই হাজির হতে হয় ওকে মনিব-বাড়ীতে। স্কুল-কলেজ আপিস-আদালত আছে ছেলেদের বাবুদের। কর্তা-গিন্নীরা ছেলেমেয়েরা হাঁক-ডাক শুরু করে দেয় সকাল থেকেই। পাটকাঁটা সেয়ে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে গিয়ে বসে ও বিড়কী পুকুরের ঘাটে নয়ত কলতলার। একরাশ ছাই, মুঠো হুই খোল, একটু তেঁতুল। মাজবার সব সবজ্যস গুছিয়ে নিয়ে ও কোমর বেঁধে বসে। শুরু হয় ঘামাঝার দৈনন্দিন তৎপরতা। দিনের প্রথম প্রহর শেরিয়ে যায়। প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন অগ্নিবর্ষণ করে মাথার উপর। ছেলেমেয়েদের রাজ্যের জামা-কাপড়ে সাবান দিতে হবে এখনো। তারপর পোড়া কড়া-চাটু নিয়ে ঘামাঝার কসরত আছে। অবেলার হুমুচো মুখে গিয়ে একটু দেহ এলিয়ে দম না নিতেই চারটে বাজবে ঢং ঢং করে। মশলার কাঁড়ি নিয়ে বসতে হবে আবার ওকে। শুরু হবে আবার শিল-নোড়া নিয়ে একটানা কসরত। সত্যি, গতব বেন ওর শুড়িয়ে যায় দৈনন্দিন কর্তব্যপন্থে পড়ে। জাংলা ছেলেমেয়ে দুটো ঘ্যান ঘ্যান করে পিছু পিছু ঘোরে সর্ককণ। মুখপোড়াদের ক্ষুদ্রবৃত্তি হয় না আর কিছুতেই। পেটে রান্স চুকেছে বেন। বাবুদের উচ্ছ্রি এঁটোকাঁটা পরম তৃপ্তিতে দেবতার প্রসাদের মতই চেটে চেটে খায় ছুটিতে ভক্তিবরে। সব দিন পার না অবশ্য। রাসমণি চাইতে পারে না ওদের দিকে। আঁতাকুড়ে এঁটো পাতা-চাটা কুকুরদের মতই ঠিক দেখায় তখন ওদের। বাবুদের ছেলেমেয়েরা ভালমন্দ খায়। পর্কে পর্কে শুভুতে খতুতে ভোজন-উৎসব লেগেই আছে প্রায় এ সংসারে। উপরন্তু আছে প্রত্যেকের জন্মতিথি-উৎসব। ছেলেমেয়েদের সে আনন্দযজ্ঞে ওর কুচোছটি ঠাই পার না। তা ছাড়া ওর নিজের জীবনেও কতই না সাধ-আজ্ঞাদ ছিল এক দিন। কিন্তু আজ! দারী এর জন্ত কে! কে জানে—হয়ত তার অর্ধুই দারী। আর দারী নিশ্চয়ই সনাতন।

সনাতন ওর স্বামী। গায়ে হলুদ, ছাঁদনাতলা, বাসরখর, ফুলশায়া—সব আনন্দ-অমৃত্যুর ভেতর দিয়ে পাওয়া একান্ত আপন জন। একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি। জীবনের পরম দেবতা। জন্মজন্মান্তরেও নাকি সম্পর্ক ঘোচে না এ মানুষের সঙ্গে। তাকে ভালও বাসত প্রাণভরে, কিন্তু কি মতিগতি বে শেষ পর্যন্ত হ'ল তার। আজ স্বামীর মুখখানা মনে করতেও পা কেমন করে ওঠে ওর ঘেল্লার।...তার জন্তে না হোক—ছেলেমেয়ে দুটোর জন্তেও মায়ী হ'ল না একটুও। কি ধাবে পরবে কুচোছটো—ভাবলে না এক বাব। বাঁশবেড়ের চটকলে নাকি কাজ করে এখন ওনতে পার।...মিনসের মদ্যমুখ দেখলেও এখন রাগ বাবে না ওর।

...সাপের মুখের ব্যাঙটা ডেকে উঠল আবার। উঃ, ময়ে নি এখনো! কি মর্মান্তিক গীড়ন!

অন্ধকার—চারদিকে বেন সর্কপ্রাসী অন্ধকার। ঘুম আসছে না আর রাসমণির কিছুতেই। অতীতের কয়েক বছরের ববনিকা তুলে ধরল বেন কে হঠাৎ। ছোট একটি গ্রাম। আম-কাঁঠালের বাগানের ধারে স্রীময় একটি নিকেতন। আলো, বাতাস, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু—প্রকৃতির সে কি অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্য। স্বামী, স্ত্রী আর শাওড়ী তিন জনের সংসার তখন। প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিতেন ভূমি-লক্ষ্মী। মাটি—মাটিই ছিল না শুধু, মাটি ছিল সোন;—মাটি ছিল স্বর্ণগর্ভা। কসল-বেচা পরমায়ু অঙ্গে সোনা উঠতে শুরু করেছে সবে এক-আধখানি করে। শাওড়ী বলতেন—জোতজমি বাড়ী সনাতন। জমিই সোনা। জমিতেই কলবে সোনা। স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সোনার কসলের স্বপ্ন। বৃন্দাবনের বংশাদারাগীর সোনার সংসারের স্বপ্ন। ছোট ছোট নাতি-নাতিনীরা উঠানে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে বেড়াবে নন্দমল্লালের মত। খেই খেই করে নাচবে ননীচোরার দল। আরও কত কি! সে স্বপ্নময়া রাসমণির মনেও রঙ ধরাত অলক্ষ্যে। মনিব-বাড়ীতে তারই সমবয়সী বউ রয়েছে দুটি। রূপে লাভণ্যে বলমল করে ছুটিতে। কত বকমের শাড়ী-গয়না ওদের। বড় আরনার সামনে দাঁড়িয়ে অজরাগ করে ওরা। নিপুণ শিল্পীর হস্ত দিয়ে গড়া ওদের তনুদেহ। আরনার প্রতিবিম্ব পড়ে। লাভণ্যের নদীতে লহরীলীলা শুরু হয় বেন। মনে হয় মনসিজ মূচ্ছিত হয়ে বৃষ্টি-বা লুটির পড়বে পদপ্রান্তে। বাসবের রাগী সাজে ওরা অমনি করে প্রতি অপরাহ্নে। ওর অন্তরের লাভণ্যময়ী হার হার করে। চেয়ে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস কেলে শুধু। অমনি জীবনের স্বপ্ন দেখাও তার পক্ষে বিড়ঘনা এখন। ওদেরই মত চিকণগোঁব রঙ ছিল এক দিন ওর দেহের। স্রীদাম বৈরাগীর মেয়ে ও। অত্যন্ত গরীবঘরের মেয়ে। কিন্তু শাওড়ী সব জেনে শুনেও ঘরে এনেছিলেন ওকে—শুধু ওই গায়ের রঙ দেখে। তের বছরের রাসমণি আধ হুটপ্ত পদ্ম-কুঁড়ির মতই অপরূপ ছিল বেন। স্বপ্নের বেঁচে ছিলেন তখন। বৈকব মানুষ তিনি। হেসে হেসে বলতেন সবাইকে—রাধারাগীর দয়া গো—আমাদের রাধারাগীর দয়া। তিনিই ঘরে এসেছেন আমার মায়ের রূপ ধরে।

কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! প্রদীপ নিভল। উঠানে তুলসীতলায়—ঘরের কোণে পিলমুকে—একসঙ্গেই প্রদীপ নিভল। আকাশ-প্রদীপও আর জ্বলল না। দীপালীর আলোও গেল চির-দিনের মত নিভে। হুঁ এল—হুঁত্বিক এল। জমিজমা অনেক কিছুই খোয়ালে সনাতন একে একে। মাটির দাক্ষিণ্য গেল কুরিয়ে। স্রীময়ী হলেন বিভীষিকাময়ী। অল্পপূর্ণা সাজলেন কালিকা। স্নানবেশ পরিবেশ গেল বদলে। ক্ষান-শব্দা বিছাতে শুরু করলেন পল্লীলক্ষ্মী। মাটির স্বর্ণকান্তি হয়ে এল রান। স্বর্ণ-সম্ভাবনাও হয়ে এল বিলুপ্ত। বোঝাক বিধান বিব-নিশ্বাস ছড়িয়ে গেল আকাশে-বাতাসে আর মানুষের মনে। পণ্টন সেপাই আর

কামান-বাক্সে ভরে গেল দেশ। বুকের চাহিদা নির্ধম এবং সর্বগ্রাসী। উড়ো জাহাজের ঘাটি হবে। সরকার চাইলেন জমি। সাতপুরুষের ভিটে—আজন্দের আবাসভূমি—আলোবাতাস—চিরপরিচিত পরিবেশ সবকিছু ছেড়ে মানুষকে বেরিয়ে পড়তে হ'ল ছন্নছাড়া হয়ে। এমনি ছন্নছাড়াদের দলে ভিড়ে রাসমণিরাও স্রোতের কুটোর মত ভেসে মরেছে বহু দিন ধরে। তাগিয়াস শাওড়ী গত হয়েছিলেন। পুণ্যাত্মা ছিলেন নিশ্চয়ই তিনি। কোলেরটা হয় নি তখনো। মেয়ের হাত ধরে স্বামীর সঙ্গে বিকৃত তরঙ্গ-তাড়নায় নাকানিচোবানি খেতে পেতে এসে পড়েছিল এক দিন এই ভাগাড়ে। একটা অব্যায় শেষ হয়ে নতুন একটা পুরু হু'ল আবার জীবনের। গোম্বলপাড়ার এই চটকলে চাকরী জুটল সনাতনের। দশ টাকা হস্তা। মাসে চল্লিশ টাকা করে। ছুঁধ্যোগের রাজ্যশেষে শুকতারার ওঠার মত আশার প্রসঙ্গ ইঙ্গিত হুটে উঠল বেন। বিনোদভলার বস্তিতে ঘরও জুটল একটা। তিন টাকা করে ভাড়া। আবার মানুষ-পাটী-কঞ্চল-বিছানা, গেলাস-কলসী কড়া-চাটু, কলাইয়ের খালা-বাসন—গৃহস্থালীর সব সামগ্র্য এল একে একে। পাখী পুষলে সনাতন। ছোট একটা ছাগলছানাও আনলে কোথা থেকে। ঘরের চালে লতিয়ে লতিয়ে লাউ পুই উঠল। মায়াবিনী আশা হাতছানি দিতে শুরু করলে সব দিক থেকে। কিন্তু পাপ জুটল ওই মুচি-বউ। পজু স্বামী তার। পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে এক দিকের অঙ্গ জীবনের মত। একটানা সেবা করতে করতে বিরক্তির পাহাড় জমে উঠেছিল এতদিন ধরে বউটার মনের মধ্যে। ভরা ঘোঁষন তার। টলমল করত দেহ। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের মত মনের মধ্যে কি এক ধরণের দুর্বার প্রেরণাও বেন সক্রিয় ছিল। এমনি দিনে সনাতন এসে জুটল। প্রথম দিনেই এমন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালে সনাতনের দিকে—দেখে ওর গা বিঁড়ি করে উঠেছিল। কয়েক মাসের স্বপ্ন-ছবি হঠাৎ মিলিয়ে গেল এক দিন। বজুবাকব জুটল সনাতনের। নেশা ধরল—তাড়ি মল—আরও অনেককিছু। মুচি-বউ হয়ে উঠল মনের মানুষ। রাসমণির রাগ, অভিমান, চোখের জল, সাধাসাধনা কিছুতেই কিছু নয়। কোন আকর্ষণই বাগ মানাতে পারে নি।

তার পরের ইতিহাস—শুধু দুঃখের সঙ্গে একটানা সংগ্রাম। না—লড়াই নয় এ।...উঃ, ব্যাডটা ডাকল বেন আবার। এলিয়ে পড়েছে সব সামগ্র্য। কিমিরে এসেছে আর্ডেকঠ। পরমায়ু আগলে রাখবার এই বোধ হয় শেষতম প্রয়াস। বুকা আবার কঁপে উঠল বেন রাসমণির। ব্যাডটার মত তারও আত্মরক্ষার অভিম প্রয়াস বার্থ

হবে নিশ্চয়ই। মনে হ'ল—সংসারের সব দিক বেন বিবধরে ভরা। নিষ্ঠুর নিয়তি ঠেলে নিয়ে চলেছে তাকে সাপের গ্রাসের দিকে। তাদেরই উপভোগ্য আহাৰ্য্য বেন সে। বস্তির নরপশুদের লোলুপদৃষ্টি পড়েছে তার উপর। বাট বড়রের এক বুড়ো। সেও চেয়েছিল তাকে গ্রাস করতে। এক অমাবস্তার রাতে তারও বিবাক্ত নিশ্বাসের স্পর্শ তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করল সে। বে কেউ ওর পানে তাকায় তারই চোখে ওই বিবধরের দৃষ্টি। তাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করবার কি দুর্নিবার কামনা প্রতিটি চোখে। অভাব-অনটন সম্বন্ধে দেহের যোহীনীয়তা ঘোচে নি কিন্তু আত্মও। হ্যাঁ, পোড়া দেহটাই ত সকল জালায় মূল। কোথায় লুকাবে ও এই দেহকে। এমনভাবে বাঁচতে চায় না আর রাসমণি। অন্ধকারই গ্রাস করুক তাকে। আর্ডেকনি তুলে ভেকের মতই ধীরে ধীরে ভুজঙ্গ-কবলিত হতে থাকবে সে। এই বস্তির অস্ত্রায় মেয়েদের জীবনধারণারই অল্পবর্জন করবে রাসমণি। হ্যাঁ, নিশ্চিত সম্ভাবনাকেই বরণ করবে ও হৃদয় দিয়ে। চুলোয় বাক ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। কাল সন্ধ্যার ঝোলাবাবুকে ও আর বিমুখ করবে না কোনমতেই। শিবার শিবার মর্মে মর্মে দুর্নিবার অগ্নি-জালা সঞ্চারিত হয় বেন।...ব্যাডটা ডাকল বেন আবার। মরে নি এখনো, এখনো গ্রাস করে নি তাকে জীবনাত্মক অন্ধকার। আচ্ছা, তা হলে ভুজঙ্গ-কবল থেকে ভেকটার আর বাঁচবার আশা কি নেই—চরাচরবাগী অন্ধকারের মধ্যে আলোর দিশা কি নেই কোথাও।...

অন্ধকার থাকতেই ছেলেমেয়েকে ঢেকে তুলল রাসমণি। জল জল করছে শুকতারার ভোবের আকাশে। প্রভাতের প্রসঙ্গময় ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠছে পূর্ণাশার প্রোক্ষদেশে। পথ—দিগন্ত-প্রসারী পথ—দূরের দিশারী পথই আছবান জানাল বেন। পদচিহ্ন আঁকে তিনটি প্রাণী। চার বছরের ছেলেটা হাঁটতে পারছে না আর। মেয়েটা বলে—আজ আর কাজে গেলে না মা—এত সকালে কোথায় চলেছি মা আমরা। মা বলে শুধু—জোরে জোরে হাঁট দেখি। পৌছতে অনেক বেলা হবে হয়ত। চণ্ডীভলার চলেছি। মানুষের আত্মনা ছেড়ে দেবতার মন্দিরে আশ্রয় নিতে আজ বহুপরি-কর রাসমণি। ছেলেমেয়ে দুটো ক্লাস্ত পা দুটোকে জোরে জোরে টানতে থাকে বিপুল উৎসাহভরে। মাও মনে বল পেয়েছে আজ। দেবতার চরণতলে কিবে চলেছে সে। কিবে চলেছে অন্ধকারের পারে আলোর দেশে। আপাততঃ ভুজঙ্গ-কবল থেকে নিভুতি লাভ তো করল সে—সমুখে অক্লান্ত পথ—পথের দেবতাই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে বাবেন পবন কল্যাণতীরে।

## মনীষী এমিল ফিসার

অধ্যাপক শ্রীমূবর্কমল রায়

মহাপুরুষদের জীবনী বত আলোচনা করা যায় ততই দেশের ও দেশের কল্যাণ। আমাদের দেশ যেমন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের আবির্ভাবে ধ্বংস হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশ তদ্রূপ বৈজ্ঞানিক সাধকদের দ্বারা অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। আজ যাহাকে স্মরণ করিতেছি তাঁহার নাম এমিল ফিসার। সর্বসাধারণ তাঁহার নাম না জানিতে পারেন, কিন্তু রসায়নীগণ নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিবেন। প্রমিত্যে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফিসার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হওয়ায় ছেলেবও মন ছোটবেলা হইতে ব্যবসায়ের দিকে ধাবিত হয়। ম্যাট্রিক পাস করিয়া সত্তর বৎসর বয়সে তিনি পিতার ব্যবসারে যোগদান করেন। কিন্তু ব্যবসার আকর্ষণ তাঁহাকে বেশী দিন আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। সে সময় তাহাদের দেশের বিখ্যাত জৈব-রসায়নবিদ কেঁকিউলী গবেষণার বিপুল প্রতিভা অর্জন করেন। ফিসার অর্থের লিপ্সা ত্যাগ করিয়া কেঁকিউলীর ছাত্ররূপে তাহার গবেষণাগারে প্রবিষ্ট হন। তাঁহাকে বেশী দিন কেঁকিউলীর অধীনে থাকিতে হয় নাই। কারণ ইনিই ফিসারকে ট্রান্সবর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোজের অধীনে গবেষণা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সে সময় জার্মানীর ছাত্রগণ এক স্থান হইতে অপর স্থানে সদাসর্বদা যাতায়াত করিত। হোজের অধীনে তিনি প্রথমতঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিবিধ পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। এখানেই তাঁহার মন জৈব-রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক বৎসরের মধ্যে তিনি একজন কৃতী জৈব-রসায়নী বলিয়া পরিচিত হইলেন। জার্মানীর অপর একজন প্রথিতযশা জৈব-রসায়নী ব্যায়ারের সঙ্গে এখানে তাঁহার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। এই ব্যায়ারই কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া রসায়নে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্মরণীয় হইয়া আছেন। সেই যুগে ব্যায়ার একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন। তাহার সম্পর্কে আসিয়া প্রবে, বীলবারম্যান, ভিক্টর মায়ার প্রভৃতি মনীষীগণ বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছেন।

ফিসার এই মহান সাধকের আশীর্বাদ ও সঙ্গমুভূতি পাইয়া রসায়নে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিলেন এবং অতি সত্বর (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) দুইটি বর্ণের গঠনভঙ্গী ও তাহাদের অস্তিত্ব ভগাবলী নির্ধারণ করিয়া পিএচ-ডি উপাধি পাইলেন। তিনি ফিসারের শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া অতি সত্বর তাহাকে তাঁহার সহকর্মীরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে ফিসার কিনাইল হাইড্রাজিন নামক একটি অতি মূল্যবান জৈব পদার্থ আবিষ্কার করিয়া জৈব-রসায়নীদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। এই অমূল্য পদার্থটির দ্বারা তিনি পরবর্তীকালে গবেষণাগারে চিনি প্রস্তুত করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। জৈব

রসায়নীগণ আজ একবারে স্বীকার করিবেন যে, ফিসারের ওসাজ্ঞেয় পরীক্ষা কি অপূর্ণ আবিষ্কার। চিকিৎসক ও অস্ত্রান্ত বহু বিজ্ঞানে সম্প্রদায় একত্র তাহার নিকট চিরঞ্জী।

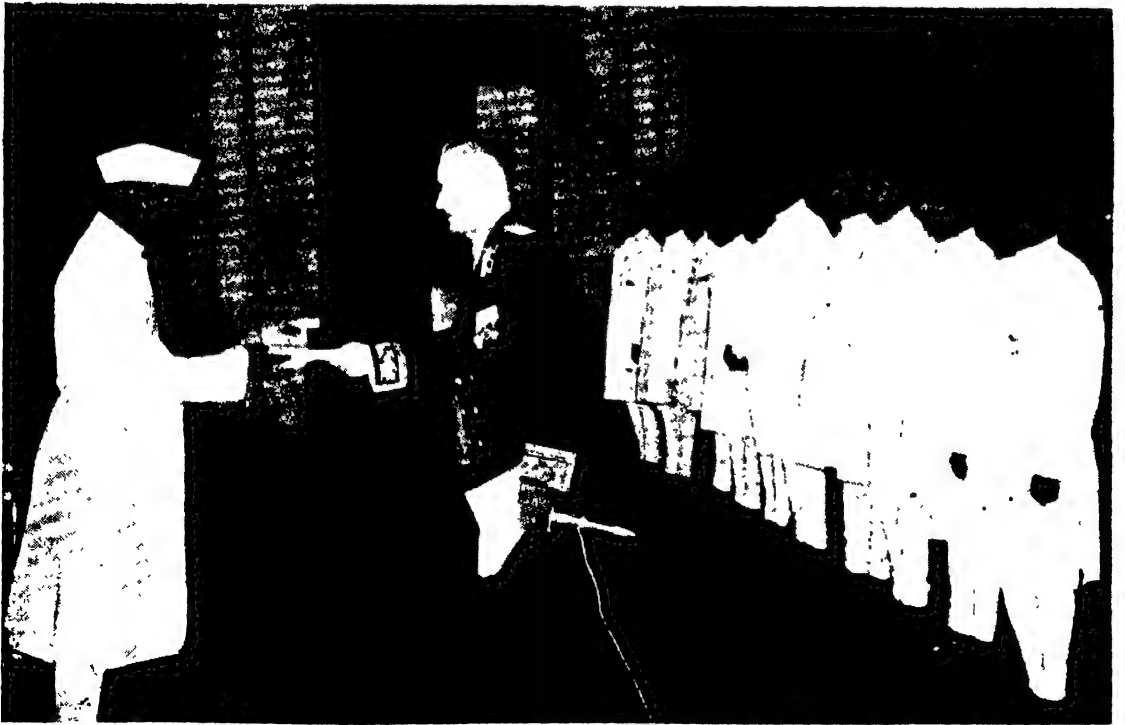
কিছু দিন পর ব্যায়ার মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন এবং প্রিয় ছাত্র ফিসারকে সঙ্গে লইলেন। এরূপ উপযুক্ত রসায়ন-সাধকের সঙ্গে পাইয়া ফিসারও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পর তিন বৎসর গবেষণা ছাড়া তাহার কোন কাজ ছিল না। ফিসার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পাইয়া একেবারে ইহাতে ডুবিয়া পেলেন। তাঁহার এই সময়ের দান জৈব-রসায়নের এক অপূর্ণ সম্পদ। এই কঠোর সাধনার ফলে তিনি বাহ্য আবিষ্কার করেন তাঁহার সঙ্গে ভিক্টর মায়ারের একটা যোগাযোগ থাকায় ইহাদের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মে। কাজেই এ সময় তাঁহার দুইটি লাভ হয়। একটি গভীর গবেষণালব্ধ ফল, অপরটি এক অকৃত্রিম বন্ধু। অগ্নি কখনও চাপা থাকে না—দেখিতে দেখিতে ফিসারের জন্ত একটি উপযুক্ত পদ সৃষ্টি হইল এবং তিনি ব্যায়ার-গবেষণাগারের বিশ্লেষণ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন (১৮৭৮)

মামুষ স্বপ্নেও ভাবে নাই কোন দিন উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থ গবেষণাগারে প্রস্তুত হইবে। যেদিন মনীষী উলার জৈব ও অজৈব পদার্থের সীমারেখা ছেদ করিলেন সেদিন হইতে জৈব রসায়নের যুগ আরম্ভ হয় (১৮২৮)। অজৈবকে ছাড়িয়া বিজ্ঞানী জটিল, অস্পষ্ট, অসম্ভব ব্যাপারে মাতিয়া উঠিলেন। হইল মনীষী উলার ও লিবিগের উদ্ভীপনায় জার্মানীতে তুমুল গবেষণার ডেউ উঠিল। হফম্যান, কেঁকিউলী, পার্কিন, ব্যায়ার, ফিসার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ একে একে আসরে নামিয়া আসিলেন। ফলে কল্পনাতীত আবিষ্কার দেখা দিল। ফিসার কৃষিজাত চিনি, চা ও ককির প্রাণ ক্যাকিন ও থিওব্রোমিনের গঠনভঙ্গি, এমন কি অত্যন্ত জটিল প্রোটিনের রূপরাজি নির্ধারণে মাতিয়া উঠিলেন। তিনি জৈব রসায়নে এমন একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন যে, রাসায়নিক জগতে আবার নব্য-রসায়ন গবেষণার ডেউ উঠিল। প্রাণী-জগৎ ও উদ্ভিদ-জগৎ উভয়ই এখন গবেষণার বিষয়বস্তু হইল।

ফিসার এখন ধাপে ধাপে উঠিতে লাগিলেন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াসবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। এতদিন তিনি নিজেই কাজ করিতেন, এখন হইতে তিনি ছাত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার জন্ত একটি চমৎকার গবেষণাগার তৈয়ারী হইল, সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে দলে দলে ছাত্র ছাত্রী আসিতে লাগিল। ফিসারের ছাত্রগণ আচার্যের পরামর্শে ইউরিক এসিড ও চিনি লইয়া আরও গভীরতর গবেষণার নিমগ্ন হইলেন। অতি সত্বর



অমৃতসরে 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব ফাইন আর্টস'-এর বক্তৃতা-সম্বন্ধী প্রদর্শনীতে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ



নিউ দিল্লী, রাষ্ট্রপতিভবনে ভারতে ইউ. এস. এস. আর-এর রাষ্ট্রদূত এন. কে. মেনশিকভ কর্তৃক প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্রশংসাপত্র প্রদান





মার্কিন কুস্তকাষ্ট্রেয় বেথেন্ডা, ম্যারিল্যাণ্ডে ভারতের দুই জন মহিলা সমাজকর্মী—কুঞ্জ স্বামী এবং কুস্তকাবাসি নিষকর



বি. বি. সি'র টি-ভিতে চিত্রকলা শিক্ষাদান

বিবিধ চিনি সংস্করণ তাঁহাদের হস্তগত হইল এবং উহাদের ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির গূঢ় সম্বন্ধে পাওয়া গেল। কিসার কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুতির প্রাকৃতিক প্রাথমিক সংকটটা অতি দৃষ্টান্তে ব্যাখ্যা করেন, এমন কি যে তাপে প্রাকৃতিক দ্বারা সাধিত হয় তাহাও তিনি অতি স্পষ্টভাবে গবেষণাভাবে প্রয়োগ করেন। কিন্তু এত কাছাকাছি অগ্রসর হইয়াও তিনি চিনি প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা বিধান করিতে পারিলেন না। আজ পর্যন্ত কেউ কিসারের আংশিক সফলতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারেন নাই। গবেষণাভাবে প্রস্তুত হইল সত্য, কিন্তু সাচ্ছন্দ্য ইচ্ছা বা বাসায়িক ক্ষেত্রে স্থান পাইল না।

কিসারের গবেষণা যখন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে, তখন তাঁহার শরীরের উপর এক আকস্মিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তিনি প্রস্তুতির পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে গিয়া তাহাকে এত বেশী ফিনাইল-সাইডাইডিন ঘাটিতে হইয়াছিল যে, ইহা তাঁহার শরীরে বিক্রিয়া করিল। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ফিনাইল-সাইডাইডিনের চাওয়ায় অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাধি তাহাকে তৎকালে পক্ষ করিয়া ফেলিল। ইহাও প্র অনেকটা সস্ত হইল। তাঁহার স্বভাবে একটা কক্ষতা উপস্থিত হইল। তিনি একান্তভাবে ছাত্রদের বন্ধু ও সাহায্য ছিলেন তিনি ক্রমশঃ তাহাদের সঙ্গে পরিচয় করিতে লাগিলেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কিসার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের পদবী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ পদটি সে সময় অত্যন্ত লোভনীয় ছিল, কারণ তদানীন্তন প্রশ্রয় প্রদাতা উচ্চতর পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য ব্যবসায়িক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা এই পদ অলঙ্কৃত হইত। কিসারের জ্ঞান একটি নূতন গবেষণাগার সৃষ্ট হইবে এই সন্তে তিনি ওখানে যাইতে স্বীকৃতি জানাইয়া ছিলেন। বার্লিনে গিয়া তিনি আবার সেই চিনির মধ্যে ডুগিয়া গেলেন—চিনির দ্রবণ কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে যে পচনক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহার গূঢ়াংশ নির্ধারণে এবার তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ফলে এনজাইম ফারমেন্ট প্রভৃতির রাসায়নিক গঠন-ভঙ্গীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ক্রমশঃ দৃষ্টিকোণ অনেক কিছু প্রাকৃতিক গূঢ় রস উদ্ধার করেন। বিবিধ চিনি আবিষ্কার ও তাহাদের অভ্যন্তরীণ কার্যময়ের সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়া তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তিনিই বলিয়াছিলেন “এনজাইম, একটি রাসায়নিক ঘটক, ইহাও প্রাকৃতিক রাসায়নিক বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধন করে, প্রত্যেকটি এনজাইমের রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রতি পছন্দ বা অপছন্দ আছে। সকল এনজাইম সব রকম প্রক্রিয়া সাধন করিতে পারে না। ইহাও যেন এক একটি ভালার জ্ঞান এক একটি চাবি।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে তিনি আবার ইউরিক এসিড ও ক্যাফিন লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। তিন বৎসর অবিরাম সাধনার ফলে তিনি দুইটি বস্তুই গঠনরূপে নির্ধারিত করেন এবং উহারা যে

পিউরিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের বংশধর—সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।

কিসার যে ভ্রমযাত্রার পথ রচনা করিলেন তাহাতে রসায়নী, শারীরবিদ ও চিকিৎসকদের চম্ভ খুলিয়া গেল। ইউরিক এসিড প্রাণীক পদার্থ ও ক্যাফিন বৃক্ষক পদার্থ, কিন্তু উভয়ের মূল এক। এই নূতন সিদ্ধান্তের ফলে সকলেই এক উজ্জল আলোকের সন্ধান পাইলেন। কিসারের শক্তিরূপের এক উদাহরণ কবিরে ১ হুউবক এসিড, ক্যাফিন প্রভৃতি প্রাকৃতিক জটিল পদার্থগুলি প্রস্তুত করিয়া তাহার আশা মিটিল না। তিনি আরও জটিলতর পদার্থ গঠনে প্রবেশ করিলেন। এবার তিনি প্রোটিনের গঠন-রচনা উদ্ঘাটনে এতী হইলেন। প্রোটিন যাহা আমাদের শরীররক্ষার একটি প্রধান অবলম্বন। ইহাকে বাদ দিয়া মানুষ বাচিতে পারে না। কিসার ও তাঁহার সহ-কর্মীগণ প্রোটিন লইয়া যথেষ্ট গাঁঢ়াঘাটি করিয়াছেন এবং জীবদেহে উহাদের শেষ পরিণতি যে এমিনো এসিড তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি, প্রাণীদেহে প্রোটিন যাহা পরিবর্তনে যে ১৯টি এমাইনো এসিড রৈখিক হয় তাহাদের প্রত্যেকটি গবেষণাভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহাদের কয়েকটির যোগাযোগে একটি মবল, সহজ প্রোটিন তৈয়ারি করিয়াছেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিসারের গবেষণা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। তিনি এই সময়ে জগৎ রসায়নের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, কিসারের চিনি গবেষণা নোবেল পুরস্কারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, প্রোটিন গবেষণার জন্য যে পুরস্কার তাহার পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠোরও শক্তিতে কল্যাণ নাই।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতে ফারাসে পদক প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক লম্বা উপস্থিত হইয়া উক্ত সম্মান গ্রহণ করেন। তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যাপিত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম রামসে বলিয়াছিলেন, “আপনার নিকট আমরা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা নত করিতেছি। আপনি আমাদের সমসাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নী এবং পৃথিবীর একজন বিদ্যমান মনীষী।” অজস্র শ্রেষ্ঠ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সার হেনরী বঙ্কো বলিয়াছিলেন, “আমি ডুমাফ, গুয়াফ প্রভৃতি মজা মজা পুস্তিকের বস্তুতা ভনিয়াছি, কিন্তু আপনার বক্তৃতায় যে রস সৃষ্টি করিয়াছে একপ কখনও দেখি নাই।” তিনি, প্রোটিন প্রভৃতির সংগঠন ও বিশ্লেষণ করিয়া তিনি সংগঠন-রসায়নকে প্রাণ বিচার গোড়ায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার চিনি-গবেষণা যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রোটিন-গবেষণা দ্বারা তাহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ যে এমন অচিন্তনীয় দ্রুত ব্যাপারের মধ্যে একপ রস সৃষ্টি করিতে পারে তাহা কেহ কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

কিসারের সময়ই জার্মানীতে বিজ্ঞান গবেষণার শ্রেষ্ঠ আবোজান সৃষ্ট হইয়া উঠে। অসওয়াল, নান্ট প্রভৃতি মনীষীগণ কিসারের সঙ্গে একযোগে রাসায়নিক জাগরণ আনয়ন করিলে তদানীন্তন জার্মান সম্রাট কাইসার দ্বারা সর্বোচ্চকরণে উহাদের উৎসাহিত করেন।

কলে বার্লিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় এবং রাজা ও ব্রাহ্মণ দুই একযোগে বিজ্ঞান-সমৃদ্ধির দিকে পতিত হওয়ার আশ্বাসী পৃথিবীর মধ্যে ঐক্য আসন লাভ করে। কিসার দেখাইরাছেন যে, ভাংকালীন জাতিগত পদব্যাধি কলে বর্ণ-রসায়ন, নৈজ্ঞান উদ্ভাব, কৃত্রিম নীল, কৃত্রিম কর্পূর, ব্যাকোসাইট প্রভৃতি সভ্য জগতে অমূল্য

সম্পদরূপে দেখা দিচ্ছে। ক্লোরোফিল নামক ফসলের সবুজ এতটুকু এই সময়েরই দান।

কিসার অধ্যাপক পদে তৃতীয় হইয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মেধাবী ও শ্রদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের বিবাহিত জীবন খুবই মধুর ছিল।

## কাশ্মীরে কোজাগরী

শ্রীমহাদেব রায়

যত সাধ ছিল, সাধা ছিল না—

ঐনগরে বসি' কবিব বাপনা

দিব্য-কান্তি দ্বিধ-জ্যোত্স্না

কোজাগরী আগবের,

আঁখির পিপাসা মিটে কোথা হেন,

আকাশের চাঁদ হাতে এল বেন,

মিছে তবে কবি পথিতাপ কেন

বার্ষ এ জীবনের ?

ভরলিত সুখা গিরির পাঞ্জে

ভরিয়াছে বেন পাঞ্জে পাঞ্জে

ছত্রে ছত্রে বসের পাঞ্জে

পরিবেষণের আশে।

ঘরিষু লেখনী ককে প্রবেশি,

করে হৈ-চৈ যত প্রতিবেশি

সঙ্গী স্বজন করি যেশামেশি,

হাসিতে কান্না আসে।

ভুয়ার-কিরীট গিরি হুয়ে হা-স,

বজত-ধারার বজার ভাসে,

সমগ্র পুরী বেন পরকাশ

বজের জ্যোত্স্নার,

কোজাগরী বেন সেখা হ'তে আসি

দিল তু স্বর্গে এ সুবসারানি,

ভুলোকে-হালোকে মিশি হাসাহাসি

রচিয়া ছ মহিমায়।

হোথা জ্যোত্স্নার ঝিলমের তীর

মায়াময়ী দেবদারু অটবীর

বজ্রে বজ্রে মুক্তাময়ীর

চিত্রিত রূপে হাসে,

চামিনী পশিছে যক্ষের মূলে,

ঝিলম উঠিছে তাই হলে হলে,

আলোকিতা গৃহ-তরী কূলে কূলে

মায়াপুরী বেন ভাসে।

'ভাল' হুয়ে আর 'শালিমার বাগে'

করিষু বিহার নব অমুবাগে

চলিতে চলিতে যে 'নিশাতবাগে'

বাখার ভরিষু হিয়া,

বীর-প্রসবিনী বাংলা মায়েব

বরগীর সেই বীর তনয়ের

উক্ষেপে দিষু নতি মরন্তের

তায়ই স্মৃতিটুকু দিয়া।

পহলগীরের ছবি ভুলিব না,

গিরি গুল্মাগ অধিক-পোতনা

জাকে পলায়—'শীত' এস না,

শীতল হইলে আমি,

যত কবিষু উঠিবে সিকার,"

এমনি দৃষ্টি উল্বেষ দায়,

কোজাগরে ঐনগরে ঐন পার

লেখনী নমিল খামি।

# তিব্বত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র—ভোটবাগান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

ভারতের চিরন্তন নীতি—প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। সিংহল, বব্বীপ, ব্রহ্মদেশ, শ্রাম, কাশ্মীর, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত এই ভাবেই এক দিন তাহার ঘনিষ্ঠ সখ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভ হইতে বাঙালী আচার্য্য শাস্ত্রব্রহ্ম, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, দীপঙ্কর জিজ্ঞান, অতীশ প্রভৃতি তিব্বতে বৌদ্ধ পতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। সহস্র বর্ষেরও অধিক হইল সেই পতাকা কৈলাস-মানস-চূষিত বায়ু হিল্লোলে আজও সগর্বে হিল্লোলিত হইতেছে। তিব্বত বৃহত্তর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিম তিব্বতেই সারা বিশ্বের প্রাকৃতিক শোভারশির অপরূপ নিদর্শন মানস-সরোবর ও চিরনীহারময় কৈলাস-শিখর বিরাজ করিতেছে—ইহাতেই তিব্বতের প্রসিদ্ধি। অনেকের নিকট নূতন মনে হইলেও একথা সত্য যে, তিব্বতের মঠে মন্দিরে দেববিগ্রহের পার্শ্বে তাঁহাদের মূর্তি বিরাজ করিতেছে। আজও ভারত বিশ্বের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। এই কারণে নানা দেশ হইতে মৈত্রেয় প্রতীকসমূহ আসিতেছে এই প্রাচীন দেশে—সিংহল হইতে বোধিবৃক্ষের চারা, গ্রীস দেশ হইতে জলপাই বৃক্ষের চারা ইহার অল্পকাল আগেই আসিয়াছে। ইহা স্মরণ করাইয়া দেয় তিব্বতের এহেন প্রচেষ্টা, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে, যখন ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল। তাঁহারই সত্যতায় তিব্বতী তাসী লামা ষাট বার ও ষোল্লার কলিকাতার অপর তীরে ঘুরুড়ীতে ভাগীরথীতটে এক মঠ স্থাপন করেন।—১লা আষাঢ়, সন ১১৮৫ সাল, ২২শে জুন, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই মঠে স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস বাতায়ত করিতেন এবং তিব্বত হইতে কোন কোন গণ্যমান্ত দর্শক ইহার অতিথিশালায় অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রথম মোহান্ত পূর্ণগিরি গোসাঁইয়ের হস্তে তিব্বত ও চীন রাজ্যের সহিত সখ্য স্থাপনের তার নহালাশে ভ্রম ছিল। ইহা অভাববি তিব্বত-ভারত মৈত্রেয় জাগ্রত প্রতীক রূপে বিরাজ করিতেছে; কিন্তু পরি-তাপের বিবর কালক্রমে লোকে ইহার কথা ভুলিতে বসিয়াছে এবং বর্তমানে অবহ-সেবিত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' পত্রিকার ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এক সংখ্যায় গৌরদাস বসাক মহাশয় অশেষ অসুস্থতানে এই বিষয়ে যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ\* প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন বর্তমান যুগে তাহার পুনরালোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া এখানে আলোচিত হইল। তাঁহারই অন্তরোধে মোহান্ত উমরাওগিরি গোসাঁই দুই-

খানি হস্তাশ্রয় তিব্বতী পুথি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলকে দান করেন এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জাম্বুরারী অধিবেশনে তাহা আলোচিত হয়।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ যদি তিব্বত-ভারত মৈত্রেয়-বন্ধনের এই পুরাতন স্মৃতিস্মারক সংরক্ষণ করেন তবে বোধ হয় তাঁহার দেশের কৃষ্টির প্রভুত উপকার সাধন করিবেন। আশ্চর্য্যজনক ব্যক্তিত্বের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে একটি স্মৃতিস্মারক স্থাপনও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতার অপর পারে, ভাগীরথীর দক্ষিণ তটে ঘুরুড়ী। এই-খানে এক ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলেই সমুদ্রে পড়ে কতকগুলি মন্দির। ইহার পশ্চাতে দেখা যায় অষ্টালিকা, প্রাচীন ধরণের অথচ পরবর্তী যুগের কিছু কিছু পরিবর্তন ইহাতে রহিয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই অষ্টালিকার কুড়াপি খিলান নাই। ইহাই তিব্বতী স্থপতি-শিল্পের বৈশিষ্ট্য। পি-ডব্লু-ডি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ডব্লু. বি. পাইথর, এ-আর-আই, গৌরদাস বসাকের নিকট মঠের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের উপরের অংশের পুরানো ধরণের গঠনপ্রণালী যে কোন দর্শকের নজরে পড়িবে। তিব্বতীরা ইহার প্রতিষ্ঠার সংশ্লিষ্ট থাকায় এই অষ্টালিকার ঐ দেশীয় ভাব পরিস্ফুট। কিন্তু কতটুকু অংশ প্রথমে নির্মিত হয় এবং কে বা কাহার, কত পরেই বা ইহার পরিবর্তন বা পরিমার্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা বর্তমানে বলা শক্ত। তবে নদীসংলগ্ন অংশেই তিব্বতী ভাব বেশী রহিয়াছে। এখানে ওখানে ক্ষুদ্র গণ্যকল্প প্রাচীর ইহার বহিঃসীমা; মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বার। প্রাচীরেরো দ্বিতল বাড়ী, সাধারণ দৃঢ় ভিত্তি, উচ্চতা প্রায় সাত ফুট। যে অংশে খিলান একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, সেখানেও ইহার ব্যবহার করা হয় নাই; অথচ ছাদের মধ্যভাগ যে ভাবে উঁচু করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে তাহাতে সৌখিন শোভা বর্ধিত হইয়াছে—এ পদ্ধতি প্রশংসনীয় শিল্প। জানালা বা আছে তা দেখিয়া মনে হয় তিব্বতী প্রভাববৃত্ত।"

এই মঠের নাম ভোটবাগান। তিব্বতদেশের আর এক নাম 'ভোট'; তিব্বতীয়দের বাগান এই অর্থে ইহার নামকরণ হইল 'ভোটবাগান'। ইহার অবশিষ্টকে বলা হইত ভোট-গোসাই। বর্তমানে সমগ্র পল্লীটি ভোটবাগান নামে পরিচিত।

মঠমধ্যে হিন্দু ও তিব্বতী পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। হিন্দু দেবমূর্তির মধ্যে বিষ্ণু, দুর্গা, বিষ্ণুবাসিনী, গণেশ, গোপাল, শ্যামপ্রায় শিবলিঙ্গ (ভগ্নাংশে তিন বিভিন্ন বর্ণের গোলাকৃতি বিবল ধরণের করেকাটি), শিবের বাহন ব্রহ্ম। তিব্বতী দেবদেবী বধা : আর্ধ্য-তামা, মহাকাল ভৈরব, সত্ত্বচক্র, সমাজ-গুহ, বজ্র-স্রুটি এবং পদ্মশাপি। কপিল মুনির পদচিহ্ন এবং এক জোড়া বড়মণ্ড রহিয়াছে।

\* উপাধান প্রদানতঃ—

(১) কার্গী ভাষায় লিখিত চারিখানি মূল লিপি, (২) তিব্বতী ভাষায় লিখিত তিব্বতী ছাড়পত্র, (৩) জর্জ বোগল, ক্যাপ্টেন ভাস্করল চার্য্য ও বার্খার প্রণীত প্রাচীর এবং (৪) তৎকালীন মোহান্ত উমরাও-গিরি গোসাঁইয়ের বিবৃতি।

তিন্তত ভ্রমণে ও তিন্তত বিষয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ স্বনামধ্যাত  
রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি-আই-ই, স্বয়ং মন্দিরটি দর্শন করিয়া  
প্রথম পাঁচটি তিন্ততী দেবদেবীর পরিচয় দিয়াছেন। তিন্ততীয়েরা এই-  
রূপ দেবগৃহকে বলে লুগা-গুজ। মঠের পশ্চাতে নীচুমত এক ছোট  
গৃহ : তাহাকে মন্দিরও বলা চলে। ইহার মধ্যে সমাধি রহিয়াছে :  
তিন্ততী ভাষায় ইহার নাম ডউন-তন বা স্মৃতিমন্দির। ইহার উপরে  
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মঠের পূজা হিন্দু ও তিন্ততী বৌদ্ধের সংমিশ্রণে  
সম্পন্ন হয়।

শরচ্চন্দ্র দাসের বর্ণনা : (১) তারা—প্রধান দেবতা আধা-  
তারা। নেপালী বৌদ্ধের বলেন, প্রজ্ঞা পারমিতা বা জ্ঞানের  
অধিদেবতা। তিনি সমুদ্র অতীত তথাগত ও বুদ্ধগণের জননী  
বলিয়া তিন্ততীয়েরা বিশ্বাস করেন। আবার উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধ-  
তন্ত্র মতে তারা হইলেন ভূত ভবিষ্যৎ-বর্তমান বুদ্ধগণের  
অজ্ঞানিনী—এ ভাব হিন্দুতন্ত্রোক্ত শক্তির সহিত তুলনীয়। তারার  
তিন্ততী নাম গ্লেগুমা। প্রতিমা তন্ত্রের উপরে চীনা স্বর্ণের কলাই  
করা। সম্ভবতঃ পূর্ণগিরি যখন তাসী লামার সহিত পিকিং গিয়া-  
ছিলেন, সেট সময়ে তিনিই পিকিং (চীন) হইতে ইহা আনয়ন  
করেন। পিকিং অবস্থানকালে শরচ্চন্দ্র অনলমম গেটের নিকটে  
স্বাক্ষরশের মঠে অল্পকাল তারার প্রতিমা দেখিয়া আসেন। তাহার  
বামহস্তে ত্রিকোণ—মণি-বস্তু পূর্ণ, দক্ষিণে পদ্ম শোভা পাইতেছে।  
তাঁহার শিবোচ্চারণ পঞ্চচূড়া-বিশিষ্ট এবং মণি-বস্তু-গঠিত। বেশভূষা  
তরুণীর বৌদ্ধ বৌদ্ধিতে বাবা—কড়নীর আকারে মস্তকের পার্শ্বদেশে  
সজ্জিত। তরুণীর মণিশোভিত। বেশ তিন্ততী ধরণের নহে।  
পরিধানে চীন-তারা চীনা পেটিকোট, চরণে মাদ্রাস মণির মত চীনা  
কবীর পাংকা। মুদ্রিত উচ্চতা প্রায় দুই ফুট উচ্চ এবং তারার  
চাইছ-এর হস্তের মত তিন্ততরাজের (৬০০ খ্রীষ্টাব্দে) বিবাহ  
অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তারার অবতারণা বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই মূর্তি  
বোধ হয় তাঁহারই আরক।

মূর্তির বেলীমূলে বজ্রাকরে লেগা জীপাস কামিনী—সম্বৎ ১৮৫২,  
১৫ই, গুরুপক্ষ, মার্গশিরা (নবেম্বর), ইহা সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠার  
তারিখ। ইহার পদে রহিয়াছে ভোলাগিরি, লুহাসা, ভোটক্ষেত্র।

(২) মহাকাল ভৈরবের মূর্তির পবিত্রকলা অতি বিস্ময়জনক।  
তিনি বিকটদর্শন, শক্তি তাঁহার বাহুতে আবদ্ধ; নগটি মস্তক  
চারিদিকে—একটি মস্তক অপরগুলি হইতে উচ্চে এবং মধ্যস্থল  
স্থাপিত। চক্রিণ হস্ত, ওষ্ঠাদশ পদ, অস্ত্রাদি সজ্জিত অবস্থায় গল-  
দেশে মুণ্ডমালা ধারণ করায় মূর্তির ভয়ঙ্কর রূপ। তিনি তিন্ততী  
লামাগণের, বিশেষতঃ তাসী লামার বক্ষাকর্তা।

(৩) সম্ভরচ্চন্দ্র তিন্ততীতন্ত্রে প্রধান দেবতা। তাঁহার এক  
মস্তক, দ্বিধ্ব দশবাহু : শক্তি আলিঙ্গনবদ্ধ। বিজিত দানবের  
বক্ষোপরি দণ্ডায়মান, বোধ হয় এই দৈত্যটির নাম 'মাবা'। দেব-  
মূর্তি স্বর্ণের আভরণ দেওয়া তাহার প্রস্তুত—তাই হরিদ্রাবর্ণের। মূর্তি  
উচ্চতার নগ উচ্চ হইবে।

(৪) সমাজহু ও তন্ত্রোক্ত দেবতা—ত্রিমুখ, ছয় বাহু ; তাঁহার  
সহধর্মিনী শক্তিরও অল্পরূপ আকৃতি—দেবদেবী আলিঙ্গনবদ্ধ।

(৫) বহুভুজকুটি—তারার রূপান্তর বিশেষ। সম্ভবতঃ ইহা  
নেপালে গঠিত। রাজা শ্রোউচেন গোংপোর তিনি বিত্তীয়া মহিষী  
এবং নেপালরাজ প্রভাবমায়-রাজত্বকাল ৬৩০-৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে চূড়িত।  
তাঁহার মস্তকের চারিদিকে দেবতার দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত।

সমাধি মন্দিরের দ্বারের উপরে বাংলা ভাষার ও বাংলা অক্ষরে  
লিপি উৎকর্ষ। ভাষা মার্জিত বা ব্যাকরণমতে শুদ্ধ নহে। ইহার  
ভাবার্থ—মসৌধীণ ও প্রণাম চেলা, দলজিৎগিরি মোহান্ত স্বর্গীয় পূর্ণ-  
গিরি মোহান্তের এই সমাধির উপর শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই  
মন্দির ও মহাদেবকে যেন সকলে শ্রদ্ধা করেন। যে ইহা না করিবে  
তাঁহার ব্রহ্মহত্যাতুলা পাপসঞ্চয় হইবে ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার দিবস,  
সম্বৎ ১৮৫২, শকাব্দ ১৭১৭, বঙ্গাব্দ ১২০২, ২৩শে বৈশাখ রবিবার,  
পূর্ণিমার ষাটশরত মধ্যাহ্ন। ইংরেজী ওয়া মে, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

এই প্রতিষ্ঠান দেখিয়া দর্শকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—(১)  
কলিকাতার উপকণ্ঠে এই বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠার মূল কি; (২)  
হিন্দু ও তিন্ততী দেবদেবী কি করিয়া এইখানে স্থান লাভ করিয়া-  
ছেন; (৩) পূর্ণগিরি গোসাই, যাহার সমাধির উপর এই বকম  
স্বলক রহিয়াছে, তাঁহারই বা পরিচয় কি?

প্রথম প্রশ্নটির অমুখাবনে এক রাজনৈতিক পটভূমি দেখা  
যায়। ভূটানরাজ দীপ সীন্দর (বা দিতার-বগ) বলপূর্বক সিকিম  
অধিকার করিয়া কোচবিহার আক্রমণ করেন ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে।  
ওয়ারেন হেস্টিংস তখন বঙ্গের শাসনকর্তা। কোচবিহার রাজ  
সাহাব্যের জন্ত প্রার্থনা জানাইলে দুবন্দরী বহুলাট একদল দেশীয়  
সৈন্য অবিলম্বে ভূটানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। প্রাণপণ বাধা  
দিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ভূটান পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে  
বাধ্য হইল। দীপ সীন্দর তিন্ততের তাসী লামাকে এই উদ্দেশ্যে  
তাঁহার ও ইংরেজের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে অরোধ করেন।\*

তিন্ততের সর্বময়কর্তা দলাই লামা তখন শিশুমাত্র। সে কারণে  
তাসী লামাই তাঁহার অভিভাবক ও প্রতিনিধিরূপে রাজকাব্য পরিচালনা  
করিতেছিলেন। সেই তাসী লামা তখন পরমা নামে এক তিন্ততীয়া

\* "... the Raja (of Bootan) weary of conflict  
and alarmed for the safety of his dominions, applied  
to Teshoo Lama and obtained his mediation for  
peace. Teshoo Lama was at that time the Regent of  
Tibet and the guardian of the Dalai Lama. The  
Lama, moved by the prayers of the Raja and  
interested for the safety of Bootan which was a  
dependency of Tibet, sent a deputation to Calcutta  
with a letter to the Governor."—Captain Samuel  
Turner: *An Account of an Embassy to the Court of  
Teshoo Lama in Tibet.* (London, 1800), p. viii.

১ বঙ্গের সীমান্তে বুদ্ধ চলিতে থাকার এবং ত্রিভুজের সমস্তের  
করাল ভায়া উপস্থিত হওয়ার মাত্র একজন তিন্ততীয় এ দেশে আগিতে  
ভরসা পান এবং সেই সময়ে ঐ দেশে তীর্থভ্রমণে রত পূর্ণগিরির উপর  
এ পত্র লামার ভার তত্ত্ব হয়।

ও পূর্ণগির নামে ভারতীয় তীর্থযাত্রী হস্তে ওয়ায়েন হেষ্টিংসকে এক পত্র দেন; ক্যাপ্টেন আম্বেল টার্নার তাঁহার লিখিত "তাসী লামার দরবারে বাট্টুত" শীর্ষক ইংবেজী পুস্তকে সে পত্রের অঙ্কলিপি দিয়াছেন; ইহার একাংশের অনুবাদ এই: "পত্র আর বিস্তারিত কবিবার প্রয়োজন নাই। কেননা ইহার বাহকগণের মধ্যে একজন ইহাতেছেন গোঁসাই, তিনি স্বয়ং আপনার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবেন। আশা করি, আপনি তাহাতে সম্মতি দিবেন।" এই বাহকদ্বয়ের নিকট ইহঁতে হেষ্টিংস ২০শে মার্চ, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পত্র প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বঙ্গ ও তুটানের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, ২৫শে এপ্রিল, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

তাসী লামার সহিত এই যোগাযোগই ভোটবাগান মত প্রতিষ্ঠার মূলসূত্র। লামার দূতহস্তে প্রেরিত উপঢৌকন-দ্রব্য\* দেখিয়া হুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের বাসনা হেষ্টিংসের মনে উদয় হয়। তিনি চারি দফা দূত পাঠাইয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাঠাইয়াছিলেন:

(১) জর্জ বোগল, কুম্বিদা চিকিৎসক ও আমিলান ও পূর্ণগির গোঁসাই—১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ,

(২) জর্জ বোগল ও পূর্ণগির (অংশতঃ কাসো পরিণত) — ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ,

(৩) ক্যাপ্টেন আম্বেল টার্নার ও পূর্ণগির— ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ,

(৪) শেখ দৌতাকাসো পূর্ণগির স্বয়ং গিয়াছিলেন— ১৮৫

খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথম দফার বিবরণে দেখা যায় যে, বোগল সদলবলে তুটানের রাজধানী তাসী ছোয় জুড়ে উপস্থিত হইয়া দেব রাজ্যে নিকট হিন্দু-যাত্রার বাসনা জানাইলে, যথেষ্ট কষ্টমুক্তিদানে অসম্মত হন। অবশেষে পূর্ণগিরের সম্মুখোচিত ও নিপুণ চেষ্টায় যাত্রার পথ সুগম হয়। তাঁহার ১৩ই অক্টোবর খাজা করিয়া চাই নবেম্বর তাসী লামার প্রাসাদে উপস্থিত হন। পাঁচ মাস সেখানে তাঁহার অবস্থান করেন। এখানেও পূর্ণগিরের দক্ষতার জন্য মিশনের সাফল্য অনেকাংশে লাভ হয়। তাহার ১ই এপ্রিল, ১৭৭৫, তাসী লামার ছাড়িয়া জুনে ভারতে ফিরিলেন। দলটি ফিরিবার পথে তাসী সদনে আসিলে ওয়ায়েন হেষ্টিংস বোগলকে ঐ যে, ফিরিতে এই পত্র লেখেন:

"I am happy to learn that your visit has proved so acceptable to the Lama, and flatter myself it will be productive of good consequences proposed from your journey to him. I have given the necessary

\* "Among the presents sent by the Lama are sheets of gilt leather . . . , talents of gold and silver, bullocks of gold dust, bags of genuine musk, narrow cloths of woollen, the manufacture of Tibet and silks from China—the chests which contained these were of no bad workmanship."—Captain Samuel Turner: *An Account of an Embassy to the Court*, p. xiii.

orders to the Custom masters at Hugli and Murshidabad for passing at those places the boats which you or the Gosain who is accompanying you from the Lama may bring with you . . ."—C. R. Markham, C.B., F.R.S.: *Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet*, etc. etc.—London, 1879, p. 186.

দ্বিতীয় বারের আয়োজন হয় আবার জর্জ বোগলের নেতৃত্বে ও পূর্ণগিরের সাহচর্যে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে যাত্রার প্রাক্কালে কিস্তি সংবাদ আসিল তাসী লামা বৃদ্ধ চীন সম্রাট কুয়াংলুঙ-এর আমন্ত্রণে পিকিং যাত্রা করিতেছেন। বোগল এই সুযোগে তাসী লামার উপস্থিতিতে চীন সম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া হেষ্টিংসের বাণিজ্যনীতির সম্প্রসারণ করিবার সুযোগ পাইলেন। তদন্তসারে উপযুক্ত সহযোগী পূর্ণগিরকে তাসী লামার সহিত মিলিত হইতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বাওয়ায় ফল আশাবাদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বরে পিকিং তাসী লামার আকস্মিক মৃত্যুতে এবং পর বৎসর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় বোগলের পরলোকগমনে বিষয়টি অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

তৃতীয় প্রচেষ্টার সূচনা করিয়া দিলেন পরবর্তী তাসী লামা চেম্জো কুশো, তিনি দূত তাসী লামার ভ্রাতা। তাঁহার লিখিত এক পত্র আদিয়া উপস্থিত হইল ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ায়েন হেষ্টিংসের হাতে।\*

ক্যাপ্টেন আম্বেল টার্নারের নেতৃত্বে তৃতীয় মিশন পদবর্ধে ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা হইতে বসনা হয়। প্রতিবাদেই অপরিহার্য সন্দেহ পূর্ণগিরের বশীত এই দলের উদ্দেশ্যযোগ্য আর দুই জন লোক আম্বেল ডেভিস ও ডাঃ দবার্ট সাগার্স। বোগলের ভ্রমণপথ পরিয়া ইতারা ২২শে সেপ্টেম্বর তাসী লামার প্রাসাদে

\* Translation of a letter from Changoo Cooshoo, Pungun Irtnnee Neimoheim, Regent of Teshoo Loomboo to Warren Hastings, Esqr., Governor-General received on the 12th February, 1782:— " . . . Poorungheer Gosain arrived here in the year 1193, after the departure of the Lama towards China and nine strings of pearls, without blemish and perfect in their form; and among them one string of large pearl of great brightness and purity and two chaplets of coral, which you sent as a gift arrived safe and with satisfactory letters and that which you wrote concerning the village of the Raja, and the remission of all matters relating thereto, to do honour to me, the whole, as there written, was in those days submitted to the inspection of the Maha Gooroo . . . That you will grant a lot of land in the noble city of Calcutta, on the bank of the river. Concerning this offer I have spoken fully and particularly to the Gosain Poorungheer and he will make known to you the whole thereof and you will comply with my request. And I have communicated other matters, and other things to the faithful Poorungheer by whom you will be informed."

Written on the 1st day of the month of Zohijah, in the year of the Majera 1195, corresponding to the 16th November 1781.—Captain Samuel Turner: *An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama*, London 1800, pp. 449-453.

উপনীত হন। ২রা ডিসেম্বর তাসী ল্হাম্পো ছাড়িয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে পাটনার প্রত্যাবর্তন করেন। যে কয় মাস তাঁহার তাসী ল্হাম্পোর অবস্থান করেন পূর্ণগিরি সাত্তিশ্বর কর্তৃ-নিপুণতার সহিত সম্ভবপর সকল বিষয় নিশ্চয় করিতে সৰ্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

শেষ পৰ্য্যয়ে বড়লাট হেষ্টিংস বোগ্য কন্ঠী পূর্ণগিরিকে তিস্তত শাসন পরিষদে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা হইয় গেল। ইহার অব্যবহিত পরে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুবর্তী জন ম্যাকফার্সনের অনুমোদনে মার্চ মাসে পূর্ণগিরি বাক্সা গেলেন।

পূর্ণগিরি পাঁচ মাস মাত্র এই পদে অবস্থানকালে তিস্ততীর উচ্চপদস্থ সকলের সহিত বোগ্যবোগ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। আসিবার সময় তাসী লামা যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার সহিত পূর্ণগিরির নিজ কর্তৃত্বভাষ্য ত্রামুয়েল টার্নার লাটের কাছে নিম্ন-লিখিত পত্রে পেশ করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ণগিরি তাসী লামার সঙ্গে শিক্ত দরবারেও গিয়াছিলেন।

The Hon. John. Macpherson, Esq.,  
Governor-General, etc., etc.

Calcutta, Feb. 6th, 1786.

Honourable Sir,—Having in obedience to the instructions with which you were pleased to honour me, examined Poorungheer, the Gosein, who has at different times been employed in deputation to the late Teshoo Lama, who formerly accompanied him to the Court of Pekin, and who is lately again returned from Tibet, and having collected from him an account of the journey he has just performed, and such other information as he could give me, relative to the countries he has left, I beg leave to submit it to you, in the following narrative.

In the beginning of last year, Poorungheer having received from Mr. Hastings, a short time previous to his departure from Bengal, dispatches for Teshoo Lama and the Regent of Teshoo-Loomboo, immediately set about preparing for the distant journey, he had engaged to undertake . . . He then commenced his journey from Calcutta and early in the month of April had passed, as he relates, the limits of the Coy's provinces and entered the mountains that constitute the Kingdom of Bootan; where, in the prosecution of his journey, he recovered, from the subjects of the Daeb Raja, the most ample and voluntary assistance to the frontier of his territory . . . and on the 8th of May following, reached Teshoo Loomboo, the capital of Tibet.

Immediately upon entering the monastery, he went to the Durbar of the Regent Chanjoo Cooshoo, Punjun Irtinne Nimoheim, to announce his arrival and the purpose of his commission.

Quarters were then allotted for his residence, and an hour appointed for him to wait upon the Lama.

. . . In the course of the morning, at the hour appointed for his admission Poorungheer went down to the Lama's tents . . . Poorungheer found him (young Lama), when summoned to his presence attended by the Regent, his parents, Soopoon Choomboo, the cup-bearer and the Principal Officer of the court. . . . He (Poorungheer) delivered the letters and presents with which he had been charged.

The packages were all immediately opened before the Lama, who had every article brought near to him viewed them separately one by one. The letter he took into his own hand, himself broke the seal, and taking from under the cover a string of pearls, which it enclosed, rub them over between his fingers, as they read their rosaries and then with an arch air, placed them by his side, nor would, while the narrator was in his presence, permit any one to take them up.

Poorungheer says, that the young Lama regarded him with a very kind and significant look and spoke to him in the Tibet language and asked him if he had a fatiguing journey. The interview lasted more than an hour . . . when ordered to receive his dismissal, Poorungheer approached the Lama to receive his blessings, which the Lama gave, by stretching out his hand and laying it upon his head. He then ordered him, as long as he continued at Teshoo Loomboo, to come to him once every day.

The following day Poorungheer waited upon the Regent at his apartments in the palace . . . to whom he delivered his dispatches. After this he visited Soopoon Choomboo, the Lama's parents, etc., etc.

With respect to the lately established commercial intercourse Poorungheer informs me, that though he returned so early he found himself not the first person who had arrived Teshoo Loomboo from Bengal. Many merchants had already brought their commodities to market and others followed before he left his place.

Poorungheer during his residence at Teshoo Loomboo had frequent interviews with the Regent. . . . The Lama and the Regent of Teshoo Loomboo addressed the letters which Poorungheer had the honour to deliver to you. Translations of these letters, having applied for them to your Persian translator, in obedience to your directions, I now subjoin, viz :—

“ . . . At this time, as friendly offerings of union and affection and unanimity, I send one handkerchief, one kitoo of silver of one piece of Cochin. Let them be accepted.”

From the Regent of Teshoo Loomboo:

“ . . . At this time, as friendly offerings of union of affection, and unanimity, I send one handkerchief, three tolas of gold and one piece of cochin. Let them be accepted.”



Poorungheer, having received these dispatches, in the beginning of October, after a residence of 5 months at Teshoo Loomboo, took leave of the Lama and the Regent and set out; upon his return, by the same route he came, to Bengal . . .

Yet another circumstance it may not be improper to point out; that ground alluded to, is a part of the land situated on the western bank of the river, opposite to Calcutta which was formerly granted, under a sunnud of this Government to Teshoo Lama, for the foundation of a place of worship, and as a resort for those pilgrims of his nation, who might occasionally make visits to the consecrated Ganges . . .

I have the honour to be,  
etc., etc.,

Samuel Turner.

ভিক্ট-বঙ্গ তথা ভারতের সহিত বোণসূত্র স্থাপনে এই সন্ন্যাসী অথচ বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ পূর্ণগিরির প্রভাব সহজে অল্পমের। তিনি মশনামী গিরি সম্প্রদায়ভূক্ত সন্ন্যাসী, বদরিকাশ্রমের বিখ্যাত জ্যোতিষ। তিনি দীক্ষিত হন। বহন হেষ্টিংসের সংস্পর্শে আসেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ। তাসী লামার সহিত তাঁহার একরূপ ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে যে, তাঁহার সম্মুখে একদিন লামা চীন সম্রাটের কাছে ভারতের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিব্বত, তুটান, হিমালয়স্থ রাজ্যসমূহ ও মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডের আদান-প্রদান ব্যাপারে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই এই বোণ্য কর্মীর জীবনের উপর ববনিকাপাত হইয়াছিল। একাধারে সন্ন্যাসী, পরিভ্রাজক ও রাজনীতিজ্ঞ পূর্ণগিরির কথা দেশবাসীর স্বপ্ন করা কর্তব্য।

ভোটবাগান প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করেন স্বয়ং তাসী লামা। বোণসূত্রের প্রথম ভ্রমণকালে লামা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আমার ইচ্ছা গঙ্গাতীরে এক ধর্ম-মন্দির স্থাপন করা, বাহাতে আমার স্বদেশবাসী গিয়া প্রার্থনাদি করিতে পান। পূর্বের জেনারেলের নিকট এই ব্যাপারে আমি পত্র দিবার বাসনা করি; আশা করি ইহাতে আপনার সম্মতি থাকিবে।” বলা বাহুল্য, বোণসূত্র সহজেই নিজ ক্ষমতাস্বাসরে এই বিষয়ে ত্রুটি হইবেন এই আশ্বাস দিলেন এবং ৫ই ডিসেম্বর, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংসকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন: “লামা গঙ্গাতটে এক ধর্মগ্রন্থ নির্মাণে উৎসাহী। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সাত-আট শত বৎসর পূর্বে তিব্বতী সন্ন্যাসীদের বঙ্গদেশে বহু মঠাদি ছিল। তখন ভিক্রুনা এখানে আসিতেন, ব্রাহ্মণদের ভাষার অল্পশীলন করিতেন এবং হিন্দুস্থানের ভীষণমুহূর্ত্ত পর্যটন করিতেন। মুসলমান বিজয়কালে তাঁহাদের এই সকল ধর্মপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হয় এবং তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। তদবধি এই ছই রাজ্যের মধ্যে বোণ্যবোণ বহু হইয়া যায়। লামার ধারণা এককাল পরে তিনি যদি বাংলায় একটি ধর্ম-সভ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন তবে তাহা তাঁহার নিজের ও সন্তোষ পৌরব স্মৃতি করিবে। এই কারণেই তাঁহার এত আগ্রহ।

করেক জন ভিক্রুকে তিনি শীতকালে পাঠাইবার ইচ্ছা করেন; তদনন্তর তাঁহারা পর্যাভীর্ষে গমন করিবেন। শুধু ইহাই নহে, লামা চীনসম্রাটের হৃদয় এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছেন বাহাতে সে দেশ হইতেও আপনার সমীপে পণ্যমাত্র বাক্তি প্রেরিত হয় ও বঙ্গদেশের ধর্মমীর মন্দির ধর্ম করেন। চীনের সহিত সন্ধি স্থাপনে লামার এই প্রচেষ্টা কতদূর কলবতী হইবে জানি না, তবে এই সুবোণ গ্রহণ করা চলিতে পারে। ভবিষ্যতে সুবিধামত এক দিন হয়ত আপনার অল্পবোদনক্রমে শিকিটে উপস্থিত হইয়া সম্রাট সমীপে বাতায়ত ব্যক্তি উঠিতে পারে।”

বোণসূত্রের সহিত মধ্যে মধ্যে বহনই সাক্ষাৎলাভ হইয়াছে তখনই তাসী লামা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন। তিনি বলিলেন, গঙ্গাতীরে জমি সংগ্রহীত হইলে তিনি পূর্ণগিরিকে তথায় নিযুক্ত করিবেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন স্থান লইলেই ভাল হয়। গৃহ বড় হওয়ায় আবশ্যকতা নাই, কিন্তু গোড়ার পদ্ধতিতে ইহা গঠিত হইবে। তিনি শুকদেব নামক অপর এক প্রাচীন গোঁসাইয়ের নামও উল্লেখ করেন। পূর্ণগিরির সহিত দেবমূর্ত্তি তথায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিবার অভিলাষ জানান। কেন তিনি বঙ্গদেশ পছন্দ করিয়াছেন তাহার কারণ এই দেখাইয়াছেন যে, পূর্বে পূর্বে জন্মে তিনি নানা ভূখণ্ডে ভ্রমিষ্ট হইয়াছেন, কেবল বঙ্গদেশেই ছই বার তিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, তাই সে দেশের প্রতি লামার আকর্ষণ অধিক।

ওরারেন হেষ্টিংস আদেশ প্রদান করিলেন এবং অনতিকাল পরে জমির ব্যবহার কথা তাসী লামার গোচরীভূত করিলেন। এই জমি সংগ্রহ বিষয়ে মূল কাশী ভাষার লিখিত দলিল (বা সনদ) ভোটবাগান মঠের তদানীন্তন মোহাঙ্ক উমরাওগির গোঁসাইয়ের নিকট গোঁদাস বসাক দেখিয়াছিলেন ও প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাসী লামা এই মন্দিরের জন্য বোণসূত্রের হস্তে বিস্তর অর্থ দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারই কর্তৃত্বাধীনে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সনদ অনুসারে জমি সংগ্রহের তারিখ ১লা আষাঢ়, ১১৮৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজী ১২ই জুন, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। বোণসূত্র লিখিত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাসী লামা প্রেরিত দেবমূর্ত্তিসকল এই মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস দেড় শত বিঘার কিছু বেশী জমি (নিষ্ক) সংগ্রহ করিয়া লেখাপড়া করিয়া প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণগিরি গোঁসাইকে ও পরোক্ষভাবে তাসী লামাকে (পুরা নাম পঞ্জন অর্জনী বকডেও পঞ্জন বা তাসী লামা পঞ্জন দেও পঞ্জন) দান করেন। তাসী লামা—বাঁহাকে তিব্বতে অবতার জ্ঞানে পূজা করা হয়, তাঁহার এই দান-গ্রহণ ব্যাপার এক উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বহিয়াছে, কেমনভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী পাশাপাশি স্থান পাইয়াছেন। বোণসূত্র তাহারও উত্তর দিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে কিছু কিছু সন্ধি বহিয়াছে এবং কতক কতক দেবদেবী ছই ধর্মেই সমান, এমন কি তিব্বতী শাস্ত্রও ভারত হইতে অনুদিত।

একশ্রেণি ভোটবাগানের প্রথম যোগা মঠাধীশ পূর্বণিগির সম্বন্ধে বসাক মহাশয় এবং ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ যাহা বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

পূর্বণিগির ঐতিহাসিক কার্যকলাপ শেষ করিয়া ত্রিকলিত হইতে ফিরিবার পর তইতে ভোটবাগানে সাধুর যোগ্য জীবন যাপন করিতে থাকেন। তিনি সেক্ষেত্রে পুণ্ড্র হটয়া উঠেন; রাজসরকারে তাঁহার সম্মানও অক্ষুণ্ণ রহিল। এমন কি, গবর্ণর হেনারেল সাফাঃ করিতে স্বয়ং মঠে উপস্থিত হইতেন। প্রায় বার বার এই ভাবে ভোটবাগানের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিবার পর একদিন রাতে একদল দস্যু অতর্কিতে মঠে প্রবেশ করিয়া দেবগুহ হটতে অস্ত্রধারিণী আত্মসাৎ করে। একাকী পূর্বণিগির অসীম সাহসে তরবারি হস্তে বাধা প্রদানে রত হটয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের হস্তে সড়কির আঘাতে নিখর ভাবে হত হইলেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর। শিষ্য দলজিৎ যোগাভাবে মঠ মধ্যে সে সম্মান ও সম্মতি মন্দিরের ব্যবস্থা করেন তাহার বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। পূর্বণিগিরের এই শোচনীয় দুর্ভাগ্যবাদ ইংরেজ সরকারের গোচরীভূত হইলে দুহুতদের দণ্ডবিধান হইয়াছিল।

তাঁহার পর দলজিৎ সিং ৪৩ বৎসর যোগাস্ত পূর্বে আসীন থাকিয়া ৬ই মাঘ ১২৪৩ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করিলে, কালীগির তাঁহার স্থানান্তরিত হন। তিনি ১৫ই আশ্বিন, ১২৫৪ বঙ্গাব্দে এক শিবমন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। কালক্রমে এট প্রতীক্ষান নিমিত্ত হইয়া আসিলেও আজ পর্যন্ত তাসী লামা, পূর্বণিগির ও হেস্তিসের অল্পতম কীর্ত্তিক্রমে বিবৃত করিতেছে। বসাক মহাশয়ঃ কথায়—

“A solitary monument of the genius and policy of the first Governor-General of India, of the piety of the Teshi Lama and of the Tibeto-Bengal trade which flourished centuries ago and was restored though in a stilted form, a century ago.”

মঠ নিৰ্ম্মাণ কার্য সমাপ্ত হইলে, হেস্তিসে তাসী লামাকে জানাইয়াছিলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই প্রতিষ্ঠান তইতে আপনার নাম এতদ্রুপে প্রচারিত হইবে এবং আমাদের মধ্যে যথা দৃঢ় হইবে। সেই সঙ্গে আপনি ইহাকে আপনার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিবেন।\* এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থাধারা ভাবত ঐ পুরাতন ক্ষমতা পুনঃস্বীকৃত করিবে।

যে চারিটি মূল দলিল (ফার্সী ভাষার লিপিত) পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের কথা এভাবে বসাক মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন :

\* “By the grace of God it will be the means of making your name known in this country and of strengthening the friendship which is between us and you will consider it as a mark of confidence and regard which I bear to you.”—C. R. Markham, C.B., F.R.S.: *Narratives of the Mission of George Boyle etc. etc.*, p. 108.

১ম সনদ—দলাই লামা ও তাসী লামার পৃথক এক একটি মোহর ইহাতে অঙ্কিত। মূল ফার্সী হইতে সনদের বঙ্গানুবাদ :

“এতদ্বারা, সর্বদেশমধ্যে স্বর্গভূলা সুবা বাংলায়, ভগলি চাকলা সংশ্লিষ্ট, সাওগাঁও সবকারে, বোরো ইত্যাদি পূর্বণিগির দায় বার্বাক-পুস্তক, বৎসমান ও ভবিষ্যৎ সকল বাপারের পরিচালক মুন্সুফদা, চৌধুরী, কাম্বনগো, তালুকদার, প্রজা ও কৃষকদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে এক শত বিঘা এবং আট বিশ\* কৃষিক্ষেত্র, বাহার ১৬ বিঘা অংশ পূর্বণিগির বোরো, মৌজা দার বার্বাকপুর অন্তর্গত এবং চৌগিশ বিঘা আট বিশ অংশ, পূর্বণিগির পাইকান, ঘুপুড়ী মৌজায় মধ্যস্থ এবং যে অংশগুলি সমষ্টিগতভাবে গঙ্গানদী তীরে অবস্থিত এবং নিম্বর, মেই সমস্ত ভূমিগুণ নিম্নলিখিত চারি, সভ্যশ্রমী, সত্যানুসন্ধানীদিগের নাগক, জ্ঞান ও বিচক্ষণতার আকর, পূর্বণিগির গোসাইকে, তদীয় সন্তানাবলী বিচারে, ১১৮৫ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভ হইতে মাপের নিয়ম ও উদ্যান বরোপে প্রদত্ত হইল। অভিল্য প্রকাশ করা যাইতেছে যে, এই মন্দির নিৰ্ম্মাণ ও উদ্যান বরোপ করতঃ তিনি উচ্চ ভোগ দখল করিবেন।

আপনাদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে, এই ভূমি নিম্বর, ইহার অল্প কোন কর আদায় করিতে পারিবেন না, এবং কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এই সম্প্রদে কোন নতুন দাবিদাওয়াও চলবে না।

আপনাদের গোচরীভূত করা যাইতেছে যে, এই বাপারের যথার্থ নিয়মানুবর্তিতা বাঞ্ছনীয়।

ইতি ১২ই জুন, ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ ১লা আশ্বিন সন ১১৮৫ সাল।

২য় সনদ জমির বিবরণে নিম্নপ্রকার পার্থক্য বাতীত অন্তর্গত সব কথায় ইহা ১ম সনদের নকল স্বরূপ :

“৫০ বিঘা চাষের ৫ম পুরের লিপিত বার্বাকপুর মৌজায়—বাহার মধ্যে ১০ বিঘা ৭ বিশ মহারাজ নবকিষের (নবরুপ) জমিদারীভুক্ত, ২০ বিঘা রাজা রায়চান রায়\* ও ১১ বিঘা, ১৩ বিশ রাজা রামলোচনের সম্পত্তিভুক্ত।

তারিখ ১১ই (কেক্রয়ারী) ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ বাহা বঙ্গাব্দের ২৯ ফাল্গুন ১১৮০ সাল।”

[...চিহ্নিত অংশ সম্প্রতি হওয়ায় পড়া বৃষ্টকর]

৩য় সনদ—ইহা অবিকল ১ম সনদ, কেবল প্রণীতার নাম পূর্বণিগির গোসাইয়ের স্থলে তাসী লামা পড়েন অর্দনী বকডেও পড়েন।

তারিখ ১২ই জুন, ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ বাহা বঙ্গাব্দের ১১৮৫ সালের ১লা আশ্বিন।

৪র্থ সনদ—ইহা ১ম সনদের ছব্ব নকল, কেবল পূর্বণিগির গোসাইয়ের স্থলে নাম রহিয়াছে “তাসী লামা পড়েন অর্দনী বকডেও পড়েন।”

তারিখ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ২রা কাশিন ১১৮৯ সাল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সনদে পূর্ণগিরি গোঁসাইকে বখাক্রমে এক শত বিঘা, আট বিঘা এবং পঞ্চাশ বিঘা নিম্নের জমি দানের লেখাপড়া। উক্ত সনদের উপবিভাগে দুইটি করিয়া শীলমোহর—ভদ্রমোহা একটি নাপরী অক্ষরের।

তৃতীয় ও চতুর্থ সনদের তারিখ বখাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সনদের তারিখের সমান। জমির পরিমাণও একই রূপ; কেবল ঐহীতার নাম পূর্ণগিরির স্থলে তাসী লামা। দুই সনদে শাহ আলম বাদশাহের দেওয়ান রূপে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মোহর অঙ্কিত। তৃতীয় দলিলে আরও দুইটি মোহর দেওয়া। ওরিয়েন্ট হোস্টেল এই দুই দলিলেই স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ভিক্তী ভাষার ছাড়পত্র (নমরিগ) মঠে প্রাপ্ত পঞ্চম ও শেষ প্রাচীন দলিল। তাসী লক্ষ্মো হইতে দেওয়া এই ছাড়পত্র। ভাবার্থ—

নার্থেন, গৌরাভূন, নো-সন, হুন-ছোগ-লিন, লহান-ছে, নমরিগ ও নীরিনের লামার প্রতি। অবগত হউন যে, এই সবকারের এক কর্মচারী আচার্য্য পূর্ণগিরি তিন জন অল্পচরসহ মঞ্চত্বে (মানস-সর্বোবর) স্থান ও পরিক্রমার্ধ অগ্রসর হইতেছেন। উল্লিখিত স্থান-সমূহে এই দলের ভক্ত ব্যবস্থা করা হউক, ইচ্ছন, স্মরণপাত্র, রক্তনৈব তৈজস, ঘোটক, পাচক, ভৃত্য ইত্যাদি, অপরাপর বস্তু বাহ্য আবশ্যক হইবে—দিবাভাগে ও রাত্রে বাত্মর বিরামকালে।

চারটি ঘোড়া ও ভারবাহী সাতটি পশু দরকার হইবে। বদলা-বদলি করিয়া ঘোটকের বন্দোবস্ত করা হউক এখান হইতে হুন-ছোগ-লিন; হুন-ছোগ-লিন থেকে লহান-ছে; লহান-ছে হইতে নমরিগ; নমরিগ হইতে সগা-ওয়া পর্যন্ত। ইহার পূর্বে লিখিত পত্রাভ্যুহারী বিভিন্ন জিলা ও মৌজার চারণক্ষেত্রের ভারপ্রাপ্ত এখান অধ্বক্ষকগণকে জ্ঞাত করা হউক যেন আগে বর্ণিত নির্দিষ্টসংখ্যক বলিষ্ঠ অশ্বের ব্যবস্থা করা হয় এবং বদলাইবার অশ্ব লইয়া ঘোড়া-ওয়ালা যেন বখাকালে উপস্থিত থাকে। বাত্মর এই দলকে সকল সম্ভবপর সাহায্য যেন দেওয়া হয়। ভারবাহী পশু বদলের ব্যবস্থা হইবে শিগগী শহর হইতে হুন-ছোগ-লিন; হুন-ছোগ-লিন হইতে নমরিগ; নমরিগ হইতে নীরিন, নীরিন হইতে সগা-ওয়া অবধি করিতে হইবে। প্রতিপদে এই দলকে ভারবাহী পশু বদলাইবার লোক দিতে হইবে। একজন অভিজ্ঞ ও সূক্ষ্ম পথ-প্রদর্শক তাঁহাদের দিতে হইবে। কিরিবার সময় অল্পরূপ বন্দোবস্ত

করিতে হইবে। ইহা খুব জরুরী ব্যাপার।—তারিখ...১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ, দলই লামা, তাসী লামা এবং মস্ত্রীর শীলমোহর অঙ্কিত।

এই ঐতিহাসিক মঠ বর্তমানে যেমনটি রহিয়াছে: দুমুন্ডীর নিকট ভোটবাগান পল্লীতে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বিস্তৃত প্রাক্ষণে মঠ। নদীর ধারেই দুই সাহিতে বখাক্রমে তিন ও পাঁচটি শিব-মন্দির। প্রাক্ষণের পশ্চিম দিকে আরও দুই শিবমন্দির। সবগুলির গঠনপ্রণালী একরূপ নহে। পশ্চিমের একটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমুদ্রে শুভক্লান্ত দালানবিশিষ্ট; মন্দিরঘরের উপরে বড় ব্রোজ কলকে বখাক্রমে লিপি রহিয়াছে। অপর মন্দিরগুলির মধ্যে আরও তিনটিতে বাংলার লেখা প্রস্তরকলক। সবগুলি মোহান্তদের সমাধি, তদুপরি শিবমূর্তি বিদ্যমান। বৃহত্তমটি প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয় এবং উহাই পূর্ণগিরির সমাধি। ইহার বিপরীত বসাক রহস্যের প্রবেশে আলোচিত হইয়াছে। ভাগীরথীতীরের শিব-মন্দিরগুলির মধ্যে একটিতে শিবমূর্তি ব্যতীত খেত প্রস্তরের অপর এক দেবমূর্তি রহিয়াছে। উচ্চতার প্রায় এক হাত, চতুষ্কোণ খেত প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ। চারি হাত, মেঘশাবকের পৃষ্ঠে এক পা স্থানো, বাম পদ ভাঁজ করিয়া দক্ষিণ পদের জালুদেশে স্থাপিত। সামনের দক্ষিণ হস্ত বন্ধে রাখা, বাম হস্তটি ভাঁজ করা অবস্থার জালুর উপর; ধরিয়া আছেন পায়ের মত গোল কিছু। পিছনের দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বামে পুস্তক, এই দুই হাতই উঁচু করিয়া পাখরের গারে সংলগ্ন রহিয়াছে।

মূল মন্দির প্রাক্ষণের মধ্যস্থলে—চতুষ্কোণ ঠাকুরদালান—গর্ভগৃহে তিনটি দ্বার আছে। ঠাকুরদালানের উপরে বাংলার লেখা 'ঈশ্বরহা-কাল জিউ।' প্রত্যেক দরবার সামনে এক একটি মর্মরবেদী। মধ্যের বেদীটি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের। তাহার উপর নেপালী ধরণের প্রায় তিন হাত উচ্চ পিতলের সিংহাসন—উপরে দুই মূর; দুই পার্শ্বে দুই ত্রিশূল। ভিতরে পাঁচটি ছত্র; মধ্যের ছত্র অপেক্ষাকৃত বড়। অতি ছত্রের নীচে দেবতার ভক্ত মাথা গোল করিয়া কাটা পিতলখণ্ড চালচিত্রের মত আঁটা। মধ্যস্থলে বহু হস্তবিশিষ্ট মহাকাল মূর্তি, তাঁহার দক্ষিণে কাল রক্তের কালমূর্তি, আরও দক্ষিণে হুগা। বামে ভৈরব; আরও বামের চালচিত্রের সামনে কোন মূর্তি নাই। এই মূর্তিগুলি খাতব। সিংহাসনের নিম্নে বড় খড়্গ; শুনা যায় হুগোংসবের সময় বলিদানের ব্যবস্থা আছে। সিংহাসনের দক্ষিণে একই মর্মরবেদীতে উপবিষ্ট পিতলের তারামূর্তি, বেশ বড় আকারের, পরিধানে লাল চেলী, মাথার পালকের আকারে পিতলের মুকুটের মত। ইহা ভারতীয় ধরণের দেবীর মুকুট নহে। যে ভিক্তী মূর্তিগুলি শরচ্ছত্র দ্বারা দেখিয়া গিয়াছেন সেইগুলিই রক্ষিত রহিয়াছে, তবে বর্তমানে এইভাবে মূর্তিগুলি সাধারণের মধ্যে পরিচিত।

দক্ষিণের মর্মরবেদীতে অষ্টভূজা দেবী সিংহবাহিনী মূর্তির মত—চতুষ্কোণ প্রস্তর-নির্মিত। ইহার দক্ষিণে মহাদেব (স্বয়ং বলিয়া

\* রামচরণ রায়ের দুই পুত্র—রাঙা রামলোচন ও রাঙা রায়চাঁদ রায়। রামচরণ ভ্যান্সিটাট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান ছিলেন। প্রকৃত বিভ্রাণী হইয়া তিনি কলিকাতার পান্ডুরিবাটার বাস করিতেন। পরে তাঁহার বংশধরেরা আঙ্গুলে বসবাস করিতে থাকেন এবং আঙ্গুলোজ বংশী পরিচিতি হন।

মনে হয়)। বামে পিতলের গণেশ মূর্তি। মূল মন্দিরবেদীর বামের বেদীতে রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি ও পিতলের ছোট ছোট হিন্দু দেবদেবী মূর্তি।

বটের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণে বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী, বোধ হয় ইহাই অতীতের অভিযন্ত্রালার রূপান্তর।

প্রবন্ধী

(১) গৌরদাস বসাক—

*The Journal of the Asiatic Society of Bengal, London. 1800.*  
Vol. LX, Part I, No. 1, 1890.

(২) শরচ্চন্দ্র দাস—

*Indian Pandits in the Land of Snow. Edited by Nobin Chandra Das, M.A. Calcutta, 1893.*

(3) Clements R. Markham, India Office—*Narratives of the Missions George Bogle to Tibet and the Journey of Thomas Manning to Lhasa*. London, 1879.

(4) Capt. Samuel Turner: *An Account of an Embassy to the Court of Teshoo Lama in Tibet.*

## চিরন্তনী

শ্রীআশুতোষ সাহা

ধূসর অতীতের কোন্ এক অখ্যাত জনপদের  
শৈবাল-ঘেরা স্ত্রাম সরোবরের স্বপ্নেরা  
খুমিরে আছে তোমার পটোল-চেরা ভাগবৎ আঁপির  
কাজল-কালো রেশম-কোমল ছায়ার।  
ওরা কি রূপকথার নিদ্রিত রূপসী রাজকন্যা?  
কায় চুখনের সোনার কাঠির স্পর্শে ওরা হঠাৎ উঠবে জেগে?  
অজ্ঞাত-ইলোরা, ধারাবতী-উজ্জয়িনীর  
বহুদিন-তুলে-বাওয়া মেঘের, মধুর, মদির সৌরভ  
ওদের কিংবা পেলব স্পর্শ-কাতর সেকে!  
তুলিরে দেয় ওরা বিংশ শতাব্দীর অভিশ্রব হুঃসহ শ্রানি,  
বাস্তব জীবনের বস্ত-করা কঠোর সংগ্রামের মাঝখানে  
এনে দেয় ওরা কালিদাসের কবিতার মজুল কলগুজন!  
তোমার ঐ নীল হৃকূলের অকলপ্রান্তে  
কোন্ অভ্যাস নীল সাগরের উত্তল উর্মিমালা  
শান্তিহীন শুধু নাচে আর দোলে?  
মৌবনপুশিত ঐ চারুদেহসিকতার  
উজ্জ্বলিত আবেগে ওরা কেন—কেন পড়ে বারিদিন লুটিয়ে?

হৃদয়, হৃদয়, উদয় ওদের কামনা!  
লক্ষকোটি উল্লোল মনো বিস্তার ক'রে  
পান করতে ছুটে চলেছে ওরা তোমার হৃদয়-কুহরের  
অট্টাদশবর্ষ সঞ্চিত অনাচারিত সীধু।  
মেঘবৃত্তের অল্পময় দ্রোণের তিরস্করণী তুলে  
বপন তুমি বেরিয়ে এলে কুহকিনী।  
মন্দাকিনী ছন্দে হিরোলিত ললিত দেহবল্লী নিয়ে  
মহানগরীর পাঁচ-ঢালা প্রান্তর রাজপথের  
কোলাহলমুগ্ধ কুৎসিত পরিবেশে তোমার অতীত  
লোভনীর বটে—তবু বেগনাদারক!  
তুমি আধুনিকা নও পুরাতনী নও—  
নিখিল চিত্তহারিণী চিরন্তনী নারী।  
মালবিকা-শকুন্তলা, নিপুণিকা-মলিনকার তুমি নন্দসখী।  
কোকিল-ডাকা বৃক্ষবাটিকার, দ্বিগুণ জ্যোৎস্নার  
মজীদ-কল্পিত চরণে তোমার গোপন অভিলার।  
উকীরগচিত শির, চন্দনচর্চিত দেহ রাজসভাবিহারী কোন্ কবি  
আজো শার্দূলবিকীর্ণিত আর বসন্ততিলক ছন্দে  
গেরে চলেছে তোমার অজ্ঞত জীবগান!



# কৃষিবিজ্ঞানে রসায়নের ব্যবহার

## ত্রিবিয়ভূষণ ঘোষ

গত কয়েক শতাব্দীতে রসায়নবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। রাসায়নিকদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে রসায়ন-শিল্পের মত কৃষিও আজকাল একটা লাভজনক কারবারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করা একদিকে যেমন ভয়ানক পহিষের কাজ ছিল, তেমনই উহা হইতে লাভও হইত অতি অল্প। একতৃষ্ণকেন্দ্র সর্বদেশে দরিদ্র ছিল। কিন্তু কলিত রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

কৃষিবিজ্ঞানকে যেদিন হইতে বৈজ্ঞানিকেরা রসায়নের অংশরূপে ভাবিতে আরম্ভ করিলেন সেদিন হইতেই এই পরিবর্তনের সূত্রপাত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত জাখান বৈজ্ঞানিক লিবিগ-এর দৃষ্টি প্রথম এদিকে আকৃষ্ট হয়। মাটি এবং বাতাস হইতে গাছ আপন জীবনধারণোপযোগী সকল প্রকার অজৈব পদার্থ এবং কার্বনডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে যৌগিক পদার্থে পরিণত করে—এই তথ্য উপলব্ধি করিয়া লিবিগ গাছের পুষ্টি-সাধনের উপযোগী উপাদানের সমিষ্টে কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁহার সে চেষ্টা বিশেষ কারণে ফলপ্রসূ হয় নাই, তথাপি ইহা কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

গাছের দেহ যেসব রাসায়নিক উপাদানে পুষ্ট সেই সব উপাদানই জমিতে বর্তমান থাকিলে জমিকে উর্বর করে। গাছের দেহ-পুষ্টি এবং গাছ ও মাটির রাসায়নিক উপাদানগত সম্বন্ধ বিষয়ে রাসায়নিকদের জ্ঞান কৃষিবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছে। চাষা গাছ কি ভাবে মাটি হইতে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফস-ফরাস, পটাস প্রভৃতি উপাদান শিকড়ের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে নানা মিশ্রণে রূপান্তরিত করে এবং দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত করে—রাসায়নিকদের তাহা জানা আছে। সুতরাং কি ভাবে উপযুক্ত উপাদানগুলি মাটিতে বর্তমান থাকিলে গাছের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা সহজেই বলা যায়। রাসায়নিক-দের এই আবিষ্কার কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম সার ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বৃক্ষদেহে যে প্রোটিন থাকে তাহার প্রধান উপাদান এমোনিয়া-ঘটিত নাইট্রোজেন। চাষা গাছ জমি হইতে এই এমোনিয়া-ঘটিত নাইট্রোজেন কতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিল তাহার উপর কৃষিকর্মে সার্বভা নির্ভর করে।

রাসায়নিকদের গবেষণা আজকাল কৃষিবিজ্ঞানেও বর্ধিত প্রসার লাভ করিয়াছে এবং তাহা কৃষিকর্মে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জমির রাসায়নিক অবস্থা বিচার না করিয়া জমিতে ফসল লাগান একটা বায়ান্ত্রিক ভুল এবং ভারতের কৃষিকর্মে এই ভুল ক্রমাগত করার ফল আজকাল ভয়ানক ভাবে দেখা

দিয়াছে। প্রত্যেক ফসলই জমি হইতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাস প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ করে। সুতরাং ক্রমাগত ফসল উৎপাদনের পর জমিতে ঐ সব বস্তুর ঘাটতির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য জমির রাসায়নিক পরীক্ষা করা দরকার। অধুনা সরকার এদেশে জমির রাসায়নিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যাপক কাজ শুরু করিয়াছেন। জমির রাসায়নিক গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া এদেশের জমিকে মোটা-মুটি চাষ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। বাংলাদেশের জমি সাধারণ ভাবে পলিমাটি গঠিত। বর্ডমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের এই প্রকার জমিতে সাধারণতঃ ফসফরাস, চূণ ও জৈব পদার্থের অভাব এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে লবণের আধিক্য হেতু জমির উর্বরতা নষ্ট হইয়াছে।

এবারে কৃত্রিম রাসায়নিক সারের কথা। কৃষিকর্মে এই সারের ব্যবহার আজকাল সর্বদেশেই বৃদ্ধি দিকে। হুন্ডের পূর্বে ইউরোপে ১০৮টিরও অধিক রাসায়নিক কারখানা কৃত্রিম সার তৈরি করিত। ভারতে সিন্ধিতেও একটি বৃহদাকার কারখানা বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ টন কৃত্রিম এমন-সালফ প্রস্তুত করিতেছে। এদেশে জমির বর্তমান অবস্থার নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব পূর্ণ করিতে হইলে এমন-সালফ ব্যবহার করা দরকার। সিন্ধির তৈরি এমন-সালফ দেশের মোট চাহিদা অপেক্ষা অনেক কম। দেশে রাসায়নিক সার উৎপাদনের পরিমাণের উপর কৃষির উন্নতি বর্ধিত নির্ভর করে।

পৃথিবীর সর্বত্র কৃষিকর্মে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে—কৃষিবিজ্ঞানে উন্নত জ্ঞান এবং ব্যাপক রাসায়নিক সার প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কারই তাহার কারণ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকর্ম করিতে হইলে উহাকে রাসায়নিক গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জমির রাসায়নিক অবস্থা, জল ধারণ ক্ষমতা, এবং জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা জমিতে ফসল উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য। এ বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞান রসায়নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল।

ভারতের কৃষির অবস্থা বিচার করিলে এদেশে বর্ধিত পরিমাণ কৃত্রিম সার প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া, জীবাণুনাশক এবং আগাছা ধ্বংসকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রয়োজনও বর্ধিত আছে। বীজ হইতে চাষা গাছের উৎপত্তি এবং তাহাতে ফসলের বিকাশ পর্যন্ত গাছের দেহভাষ্যের রাসায়নিক পরিণতি সম্বন্ধে রাসায়নিকের জ্ঞান ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। অল্প দিকে রসায়ন-বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারও কৃষির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইতেছে। সুতরাং রসায়ন এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের সম্মিলিত জ্ঞানের সম্যকভাবে কৃষিকর্ম যে অধুনা জবিষ্যতে আরও উন্নত যাবা অঙ্গসম্বল করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

## ভারতের বৃহত্তম শিল্প— তাঁত

শ্রীঅজিতকুমার বসু

শহর অঞ্চলের চাকুরীপ্রার্থী এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষিকার্যের অন্তর্কর্তী অবসর সময়ে কৃষকদের কাজের অভাব, এই দুয়ের হিসাব ধরলে দেখা যাবে, ভারতের সমস্ত কর্মকর্ম ব্যস্তির আধাআধি সারা বৎসর বেকার থাকে। বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির অল্পপাতে প্রতি বৎসর এই বেকারের সংখ্যা ৮৭ লক্ষাধিক করে বাড়ছে।

দেশের জনসাধারণের ক্রমকমতার বৃদ্ধি তথা আর্থিক সঞ্চিত বৃদ্ধির উপরই যে জাতীয় সমৃদ্ধি নির্ভরশীল, এ কথা সর্ববাদিসম্মত। বেকারদের অর্থকরী কাজে এবং বহুদূর সম্ভব উৎপাদনমূলক কাজে নিযুক্ত করেই তাদের আর্থিক সঞ্চিত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিল্পের সম্প্রসারণ এবং কৃষিকার্যে যন্ত্রের প্রবর্তন ও একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসলের চাষ,—একই সঙ্গে পরস্পরের সামঞ্জস্য রেখে এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তবে বেকার-সমস্যার সমাধান হতে পারে। অবশ্য একাধিক ফসল কলানোর ক্ষমতা যেমন, তেমনই ফসলের হার বৃদ্ধির ক্ষমতাও ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু ভারতে ধনীদেব স্বার্থপরতাজনিত দেশান্ত্রবোধের অভাবও যেমন অত্যধিক প্রকট, পুঁজি বৃদ্ধির ক্ষেত্রও তেমনই অতি সীমিত। সেই ক্ষমতা প্রয়োজনমত ক্রমশঃ সম্প্রসারণ মোটেই সম্ভব নয়, অসম্ভব: বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার তো সম্ভব নয়ই। এমতাবস্থায় কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যাপক প্রবর্তন সমীচীন নয়; তা সম্ভবও নয়। সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাও আর্থিক ও অস্ত্রায় কারণে ব্যর্থই নয়। এই সব কারণে অর্থনীতিবিদরা প্রায় একমত হয়েছেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় বহুদূর সম্ভব শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, কুটীর-শিল্পের ব্যাপক প্রসার এবং কৃষকদের হাতে জমি বিলি করার দ্বারা ই ক্রমকমতার বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। এখানে কুটীর-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হস্ত-চালিত তাঁত সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এ বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা হয়েছে। অর্থকর্ম সমাধান হবে বলেও আশাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায় দু'বৎসর তো কেটেই গেল। কয়েক শ' কোটি টাকা খরচও হয়েছে। আর বাকী বৎসর তিনেক। এই দু'বৎসরে বেকার-সমস্যা সমাধানের দিক থেকে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? কারণানার, আপিসে, কাছাবিতে হুঁটাই এবং বেকারের সংখ্যা তো ক্রমাগত বাড়ছেই; উপরন্তু কুটীর-শিল্পের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক লোকের কর্ম-সংস্থান হচ্ছিল বা হচ্ছে, তাও সমস্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতে চালানো তাঁতশিল্প ভারতে যেমনই পুরাতন, লোকনির্যোগের দিক থেকে তেমনই বৃহত্তম। সরকারী তদন্তের (ফ্যাক্টস্ কাইন্ডি কমিটির রিপোর্ট) হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারতে তাঁত ছিল ২০ লক্ষ। এর মধ্যে শতকরা ১০টা ছিল অকেজো। অর্থাৎ, তখন

কাজের তাঁত ছিল সাড়ে সত্তের লক্ষ। বিভিন্ন ভারতে (ভারতীয় ইউনিয়নে) শতকরা ১০টা তাঁত থাকলেও, তখনকার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ লক্ষের কমই। যুদ্ধের কাঁপাইয়ের দরুন এক দিকে কেনা-বেচা বৃদ্ধি, অপর দিকে কাপড়ের অভাব, এই দুটি কারণে কিছু তাঁত বেড়েছে এবং কিছু অকেজো তাঁতও কাজের হয়েছে। সেই হিসাবে বর্তমানে কাজের তাঁতের সংখ্যা অনধিক ২০ লক্ষ হবে বলেই মনে হয়।

সরকারী স্তরে প্রচার করা হ'ত, তাঁতের সংখ্যা ২৬ লক্ষ; পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার বলা হয়েছে ৩০ লক্ষ। এ হিসাবে ভুল আছে, ভুল থাকার কারণও আছে। তাঁতের লাইসেন্স ও সূতার কন্ট্রোলের সময় বহু মিথ্যা লাইসেন্স বে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। উপরোক্ত সরকারী হিসাবমতে তাঁতপ্রতি এক জন তাঁতি এবং দেড় জন যোগানদার লাগে। এই অল্পপাতে ২০ লক্ষ তাঁতেই সর্বসমেত অসম্ভব: ৫০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। যোগানদারদের মধ্যে অল্পসংখ্যক তাঁতি-পরিবারভুক্ত। এদের বাদ দিলেও সর্বসমেত অসম্ভব: ২ কোটি লোকের জীবিকা তাঁতের উপর নির্ভরশীল! এর উপর আছে খাদির সূতা কাটনী। তাঁতের সংখ্যা আরও বেশী ধরলে তো কথাই নেই। সত্যতঃ তাঁত ভারতের বৃহত্তম শিল্প।

এই বৃহত্তম শিল্প আজ আবার মহা সমস্টের সম্মুখীন হয়েছে। কংগ্রেসের তালিকায় কয়েক লক্ষ "সক্রিয় সদস্য" থাক। সম্বন্ধে খাদি শিল্পেও সমধিক সমস্ট দেখা দিয়েছে। এই সমস্টের প্রধান কারণ হল—(১) সূতার অভাব, (২) সূতার দামও অত্যধিক, বার কলে পড়তায় এত বেশী পড়ে যে, (৩) কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁত পেয়ে ওঠে না, (৪) উপরন্তু কলেই সম্ভার সৌধিন কাপড় বোনা হচ্ছে।

তাঁতিদের মুখপাত্রেরা দাবি করছেন যে, সম্ভার প্রচুর সূতা দেওয়া হউক এবং কলে হুতি, শাড়ী বোনা কমানো হউক। কেউ কেউ এমনও দাবি করেছেন যে, কলে হুতি, শাড়ী বোনা সম্পূর্ণই বন্ধ করা হউক। এই নিয়েই জীরাভাগোপালাচারীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীকুমারচাঁদীর বিরোধ বেধেছিল। কারণ মন্ত্রাজেই হস্ত-চালিত তাঁতের সংখ্যা বেশী—সারা দেশের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। অবশেষে রাজাজীর মতেই কেন্দ্রীয় সরকার কতকটা সার দিয়েছেন। তাঁতশিল্পকে বন্ধ করার ক্ষমতা কলে উপর কাপড়ের উপর সমগ্রপ্রতি এক পরস্পর হারে করা দাবী করা হয়েছে এবং কলে হুতি, শাড়ীর উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ কম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আগাততঃ এই ব্যবস্থাকেই বলবৎ করা হয়েছে। এ ছাড়া একটি কমিটি নির্যোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কমিটির পরামর্শ পেলে পরে কি করা হবে তা এখন ভবিষ্যতের গর্ভে। গত



২য় কেন্দ্রবাহী স্বাধীনতা কমিটির বা বোর্ডের উদ্বোধন করা হয়েছে।

অন্য কাপড়ের উৎপাদন কম করা পক্ষবাহিকী পরিকল্পনার মূলনীতির বিরোধী। পটিকল্পনার বলা হয়েছে কাপড়, চিনি, সাবান ও অন্যান্য কয়েকটি চলতি শিল্পের সম্প্রদায় না করে, তাঁতে নিযুক্ত কল-কন্ডার উৎপাদন-ক্ষমতার (Installed capacity) পূর্ণ সম্ভাব্যতা করা হবে। তা ছাড়া, উৎপাদন দ্রুত সরকারী শিল্পনীতিরও বিরোধী। সরকার বরাবর বলে আসছেন, “উৎপাদন বৃদ্ধি না করলে ধ্বংস হবে” (Produce more, or perish)।

মূল কথাই হ'ল ক্রয়-ক্ষমতা। ক্রয়-ক্ষমতার বৃদ্ধি না করে উৎপাদন বৃদ্ধি করলে যে তা আর্থিক অচল অবস্থা তথা সঙ্কটকেই ডেকে আনবে, বর্তমান বাস্তব তাই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সনে উৎপাদন বৃদ্ধি পেরেছিল। কিন্তু তাও মাথাপ্রতি গড়ে মোট মাত্র ১২-১৩ গজের বেশী নয়, তার মধ্যে খুতি, শাড়ী আত্মমূল্য মাত্র ছয়-সাত গজ। প্রয়োজনের তুলনায় এ যে কত কম তা বর্ণনা করতে হবে না। হাতে পরসা থাকলে এত সামান্য কাপড় অবিক্রীত থাকে তো দুইয়ের কথা, বাজারে অভাবই হবার কথা। কিন্তু এতেই বাজারে কাপড় অবিক্রীত হয়ে জমে উঠেছিল। কলে কলের কাপড়ের দাম কমতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁতের কাপড়ের বাজারে যে মন্দা দেখা দিয়েছিল, তা বেড়ে সঙ্কটে পর্যাবসিত হয়েছে। সুতরাং সব কাপড়ের উপরই কব আদ্যোপকরণের অক্ষম ক্রেতাদের উপরই বোঝা চাপানো হয়েছে। উপরন্তু সব খুতি, শাড়ীরই উৎপাদন ৪০ ভাগ কমানোর কলে বাজারে কাপড়ের অভাব ঘটবে এবং তার কলে দাম বাড়ার সুযোগ নিতে মালিকরা ও ব্যবসায়ীরা কল্পনাকল্পন করে না। অর্থাৎ যেখানে অভাব সেখানে কলের কাপড়ের অভাবে তাঁতের কাপড় কেনা গরীবদের পক্ষে তো সম্ভব নয়! সুতরাং গরীব জনসাধারণ বিপন্ন হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই সে লক্ষণ দেখা দিয়েছে—কাপড়ের দাম এখন উর্দ্ধমুখী। তা ছাড়া, ৪০ ভাগ খুতি-শাড়ীর বদলে অন্য জিনিষ বুনলে ভারতের বাজারে তার ক্রেতা মিলবে বলে ভরসা হয় না। অবশ্য আগের কন্ট্রোলের মত গরীবদের বাধ্য করলে স্বল্প কথা। বিদেশের বাজারেও যে তা চালান করা বাবে এমন ভরসাও নেই। কলে কলের উৎপাদনই কম হবার আশঙ্কা আছে। এতে শ্রমিকদের বেকার দশা বাড়বে তো বটেই, ক্রয়ও কম উঠবে।

এ সব সত্ত্বেও তাঁতীদের কি কোন উল্লেখযোগ্য সুবিধা হবে? কব বাবদ সাড়ে ছয় কোটি টাকা আদায় হতে পারে, যদি না উৎপাদন কম হয়। সে টাকা কি তাতে খরচ করা হবে, তারও বিশেষ কোন নির্দেশ পরিকল্পনার নেই; তা বোর্ডের পরামর্শ-সাপেক্ষ বলেই ধরে নেওয়া যায়। তবে মোটা টাকা বোর্ডের দরুন এবং বোর্ডের পরামর্শ কার্যকরী করতে এক বিপুল কর্তৃত্ব-বাহিনী পিছনে যে খরচ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-

কথা ছেড়েই দেওয়া বাক। সব টাকাই যদি আর্থিক সাহায্য বাবদ খরচ করা হয়, তা হলে খাদির দরুন সাহায্য বাবে, হাতে চালানো তাঁতের সূতার মূল্য বাবদ পাউণ্ড প্রতি হু' আনারও কম তাঁতেরা পেতে পারে (১৯৩৮-৩৯ সালে তাঁতে ৩৫ কোটি পাউণ্ড সূতা লেপেছিল)। অর্থাৎ, তাঁতে উৎপন্ন কাপড়ের গড়প্রতি মাত্র হু' পরসা লাগে এইটুকু পার্থক্যের জন্মই যে তাঁতে দুর্বোধ্য দেখা দিয়েছে, তা কখনই নয়।

হাতে চালানো তাঁতের উৎপাদন-ব্যয় অনেক বেশী। তাঁত ও কলে মিলে সর্বাধিক বা উৎপন্ন হতে পারে, তার শতকরা আত্মমূল্য মাত্র ৩২ ভাগ তাঁতে উৎপন্ন হতে পারে। অন্য উভয়ে মিলিয়ে বত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তার শতকরা ৮৪ ভাগ তাঁতেই লাগে। অর্থাৎ, কলের তুলনায় তাঁতে শ্রমিকপ্রতি মাত্র এক-একাদশাংশ (৩২) উৎপন্ন হতে পারে। তাঁত ও কলের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। এই পার্থক্য দূর করার উপরই তাঁতশিল্পের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

তথাপি জনসংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে এখনও তাঁতের জিনিষ বিক্রী হতে পারে, যদি সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেদিকে উদ্বেগ ধরাই বইতে শুরু করেছে। এক দিকে কুবিজ্ঞাত ব্যবসায়ী দাম ক্রমাগত কমে আসছে, অপর দিকে বাজারের অভাবে কলকারখানার ছাঁটাই চলেছে। উপরন্তু বিদেশের বাজারে সম্ভার জাপানী কাপড়ের সঙ্গে ভারতের কল পেয়ে উঠবে বলে ভরসা নেই। এখানে সে সমস্তা দেখা দিতে পারে বলেই আশঙ্কা হয় বরং। সুতরাং ভারতীয় কাপড়ের কলকে তাঁতের বাজার দখল করতে হবে। কাজেই তাঁতের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্নই হবে। বস্তুতঃ বস্তুজালিত শিল্পজাত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পূর্বাতন পদ্ধতির কুটীর-শিল্পজাত কোন ব্যবসায়ী পালা দিতে পারে না। সুতরাং বংশামাত্র আর্থিক সাহায্য কেবল অর্থের অপচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু অর্থ উপার্জনের পাট্টা কোন ব্যবসায়ী না ভুগ্না পর্যন্ত হাতে চালানো তাঁতশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। বেকার সমস্তা বৃদ্ধির দিনে এত বড় একটা শিল্পের উপর নির্ভরশীল কোটি লোকের আর্থিক সঙ্কট জাতীয় জীবনেও বিপদার আনবে। সুতরাং নিম্নলিখিত বিবরণগুলি বিবেচনা করে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে :

তদন্ত কমিটির মতে শতকরা ৭২ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৫ লক্ষ তাঁতে সূতি কাপড় বোনা হয়। এ ছাড়া ১৬ ভাগ তাঁতে রেশম, ৫ ভাগে পশম, এবং অন্যান্য ও কৃত্রিম রেশম ৭ ভাগে। সূতির মধ্যে শতকরা ১২ ভাগে ৪০ নম্বরের বেশী মিহি বোনা হয়। ১০৮০ নম্বর ও তার বেশী মিহি সূতার তাঁতের সংখ্যা আত্মমূল্য এক লক্ষ।

রেশম ও মিহি তাঁতের কতকটা সুবিধা সহজেই করা যায়। কলে ৪০ থেকে ৭০ নম্বরের কাপড় বোনা করিয়ে ৭০ নম্বরের বেশী মিহি বোনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে ধনীরা ও সৌখিন ব্যক্তিরা



তাঁদের জিনিবের প্রতি হুক্বে। এরা তখন বেশেবের প্রতিও বেশী হুক্বে। সৌধিন জামার কাপড় বোনা কলে কিছু কম করলেও বেশেবের কাটতি বাড়বে। তা ছাড়া প্রচার ও প্রদর্শনী এবং গুণগত ও সৌধিনতার উন্নতি করতে পারলেও চাহিদা বাড়বে। বেশেব কলের তাঁতে কিছু কিছু স্থতির কাপড় বোনার ব্যবস্থা করা যায় কি না, তাও দেখা দরকার।

খাদির ব্যাপারে বড় বড় সরকারী কার্খানারাই অনেকটা সমস্তা মিটিয়ে দিতে পারেন। তাঁরা সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে খাদি ব্যবহার করলে অনেক খাদিই বিক্রী হয়ে যায়। বেশেবও তাঁদের বেশী ব্যবহার করা উচিত। নাগরিক হিসাবেও যেমন সরকারী তথা সাধারণের কার্খানার হিসাবেও তেমন, এ বিষয়ে তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব আছে। তা ছাড়া সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যে পোশাক দেওয়া হয় তার জাঁকজমক ত্যাগ করে খাদির পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করলে, খাদির আর কোন সমস্তাই আপাততঃ থাকে না। গান্ধীজীর নাম নিয়ে খাদির ভেক ধরে প্রতারণা চলছে কি না, তারও তদন্ত হওয়া দরকার। কারণ প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারই খাদিকে মোটা টাকা সাহায্য করে আসছেন, তথাপি খাদির না হয়েছে মূল্যবান, না হয়েছে কোন উন্নতি। কলে মোটা মূল্যে খাদির মত করে বুনেন এবং মোটা মূল্যে তাঁতে বুনেন খাদি বলে বিক্রী হচ্ছে। এ বন্ধ করা দরকার। এর জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান মারকত উৎপাদন ও বিক্রীর ব্যবস্থাও করতে হবে।

বাঁকী ১০ লক্ষাবিক মূল্যে তাঁতে বোনা হয় ১-১০ নম্বরের মূল্যে শতকরা ১২.২৫ ভাগ, ১১-২০ নম্বর ৩৪.৪৩ ভাগ, ২১-৩০ নম্বর ১২.৬২ ভাগ এবং ৩১-৪০ নম্বর ১৪.১৬ ভাগ। গড়ে পাউণ্ড প্রতি ৪ গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং প্রতি তাঁতে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে চার গজ উৎপন্ন হতে পারে। প্রতি তাঁতি বছরে গড়ে ২৭৫ দিন কাজ করলে সর্বসমেত ৪০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের দরকার হবে। তাঁতিরা দরকারমত মূল্য পায় না, আর দামও অত্যধিক, পাউণ্ড প্রতি গড়ে ৪ টাকার বেশী।

টেক্সিক বোর্ড ও উৎপাদন তদন্ত কমিটির মতে সারা বছরে কাপড়ের কলে গড় হাজিরা শতকরা ১০ ভাগ। এদেরই মতে একই কলে বা গড়ে উৎপন্ন হয়, তার বেশী উৎপাদন করলে বাড়তি উৎপন্ন কাপড়ের খরচে সর্বসাকুল্যে শতকরা ৪ ভাগ কম পড়ে। বোম্বাইয়ের মিলমালিক সভাও এ কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং গড় হাজিরার জন্য পরিপূরক শ্রমিক (relieving) নিয়োগ করলে ১৪ কোটি পাউণ্ড বাড়তি মূল্য উৎপাদন করা যাবে। তা ছাড়া, কলে যে ১,১২,৫২,৪৪০টি মূল্য কাটা টেকে আছে, তাতে ১৯৫১ সনে ১৪৬ কোটি পাউণ্ড মূল্য হেরছিল। ১৯৪৮ সনের উৎপাদনের গড় ধরলে এই টেকেতে ১৫৭ কোটি পাউণ্ড মূল্য উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ, সর্বসমেত ২৫ কোটি পাউণ্ড বাড়তি মূল্য উৎপন্ন হতে পারে। এর জন্য কাঁচা মাল আর

মজুরী ব্যতীত আর কোন খরচ বিশেষ নেই। এর দাম দাঁড়াবে পাউণ্ড প্রতি গড়ে ১১০ টাকা। তাঁদের জন্য যে ৪০ কোটি পাউণ্ড মূল্য লাগে কেবলমাত্র তার উপরই এই বাড়তি মূল্যের সমস্তা দরটা চাড়িয়ে দিলে গড়ে প্রতি পাউণ্ডের দাম দাঁড়াবে ২১০ টাকা মাত্র। অর্থাৎ, পাউণ্ড প্রতি গড়ে ১১০ টাকার বেশী বা গজ প্রতি ১৬০ আনারও বেশী সম্ভাব্য হবে। তা হলে কলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাঁতের পক্ষে অসম্ভব হবে না এবং ক্রেতার সংখ্যাও বাড়বে।

কলে দেড়া বা ডবল কাজ করিয়ে মূল্য কাটালেও এই হিসাবে অতিরিক্ত উৎপন্ন মূল্যের পড়তা দরে মোট ১০ থেকে ২০ কোটি টাকা কম পড়বে। সর্বোপরি পরিকল্পনা অনুসারে কলকার উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা করলেও অনেক সম্ভাব্য মূল্য উৎপন্ন করা যায়। ভারতের কাপড়ের কলে গড়ে শতকরা ৬০।৬৫ ভাগ মাত্র উৎপাদন-ক্ষমতার ব্যবহার হয়। একে শতকরা ৮০ ভাগে তুলতে পারলেও ১৫।২০ কোটি পাউণ্ড বাড়তি মূল্য উৎপাদন করা যায়। এইভাবে বাড়তি উৎপন্ন মূল্যের বা কাপড়ের দরুন কলের মালিকদের বাড়তি লাভ না দিয়ে যদি রপ্তানীর মূল্য বা কাপড়ের উপর, তাঁতের মূল্যের উপর এবং সম্ভব হলে মোটা কাপড়ের উপর ছাড় দেওয়া হয়, তা হলে সম্ভাব্য রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করাও যেমন সম্ভব হবে তেমনই তাঁতিদের এবং গরীব ক্রেতাদের সম্ভাব্য দরে বাজারের কেনা-বেচা বাড়ানো যাবে। এ বিষয়ে নজর দিতে হবে, তবে মনে রাখতে হবে মালিক আর পাইকারদের লাভ বাড়ানোর জন্য করলে চলবে না। মোট কথা, কল এবং তাঁতকে পৃথক ও পরস্পরবিরোধী শিল্প হিসাবে না দেখে একই শিল্পের অভিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য করে সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। এর জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ দরকার।

কলে চালানো তাঁত (Power-looms) হাতে চালানো তাঁতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে মাত্র, জাতীয় সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করে না। আর বাতে কোন নতুন এমন কল না বসে তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

কেনা-বেচার ব্যাপারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অধিকাংশ তাঁত এবং তাঁতিই, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে মহাজনদের কবলিত। তাঁতিদের মূল্য কিনতে এবং কাপড় বেচতে অনেক সময় কয়েক হাতে লাভ গুণতে হয়। মূল্য ঝুঁকি এবং পাট করার ব্যাপারে একা করলেও খরচ বেশী পড়ে। তাই সমস্যার ভিত্তিতে কেনা-বেচার ব্যবস্থা করলে খরচের অনেক সুরাহা করে পড়তা কমানো যায়।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রদেশে সমস্যার সমিতি গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সকল হয় নি। তার কারণ উদ্যোক্তাদের অজ্ঞতা এবং অসাহায্যতা, সরকারী উদাসীনতা, আইনের গলম এবং তাঁতিদের মহাজনদের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা। তাঁতিদের অজ্ঞতা এবং উদাসীনতাও অবশ্য কম দায়ী নয়। পশ্চিমবঙ্গে যুদ্ধের সময় অসহ্য তাঁতি

সমবার সমিতি হয়েছিল। তখন সব কেনা-বেচা সমিতি মারকতই হ'ত। প্রত্যেকটি সমিতিতেই প্রচুর লাভ হয়েছে। কিন্তু তার হিসাব নেই। উপরন্তু সমিতিগুলির অধিকাংশই স্থানীয় মহাজনদের করলে ছিল। নিঃশ্রম উঠে যেতেই মহাজনরা সমিতিকে চেপে রেখে নিজের নিজের কারবার শুরু করেছে। কিন্তু সবকিছু কেনে-তেনেও সবকার এবং সরকারী কর্তৃচাৰীরা নীরব আছেন। এর জন্য কর্তৃচাৰীদের অসমুদ্রা এবং উপরওয়ালাদের অবহেলা ও উদাসীনতা দায়ী, তবে সমবার আইনেই এঁরা প্রেরণ পান। এ বিষয়ে প্রকাশ্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে অনেক জখ্যাই প্রকাশ পাবে। মোট কথা, সন্নিষ্ট কর্তৃচাৰীদের সমিতির ও পরিচালকদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে সমবার আইনের সংশোধন করতে হবে এবং তাঁতিদের কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলে সমিতিগুলি আবার সচল হয়ে উঠবে। এ ছাড়া, কোন এলাকার যদি কোন সর্বার্থসাধক বা অপর কোন কৃষক জেলিয়া বা অন্য কোন সমবার সমিতি থেকে থাকে, তা হলে তাঁতি সমিতিতে তার সাহিল করে বা সবগুলিকে মিলিয়ে একটি সমিতি করবার উপবোধী আইন করে সকলকেই সমিতির সভ্য হবার অধিকার দিলে সম্ভবতঃ শুল্ক পাওয়া যেতে পারে।

তাঁতের উন্নতির দিকেও নজর দিতে হবে। 'ফ্লাই' (fly) মাকুর তাঁতে 'থ্রো' (throw) মাকুর তাঁত অপেক্ষা শতকরা ৭৫ ভাগ বেশী উৎপন্ন হয়। আগে থ্রো মাকুর (হাতে ঢেলা) তাঁতেরই প্রচলন ছিল। উৎপাদন-ক্ষমতা বেশী বলে ফ্লাই তাঁত চালু হয়েছে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে শতকরা ৩৫টা ছিল ফ্লাই মাকুর তাঁত। ফ্লাই মাকুরেই সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৮১টা; তার পরই বাংলায়, শতকরা ৬৭টা; বোম্বায়ে শতকরা ৫৫টা। থ্রো মাকুর তাঁত আসামেই সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৯৭টা, তার পরই পঞ্জাবে শতকরা ৯৫টা, উড়িষ্যায় শতকরা ৮৫টা, উত্তর প্রদেশে শতকরা ৮১টা এবং বিহারে শতকরা ৬২টা। তখনকার দিনে অবসরকালীন কাজ হিসাবে তাঁত চালানো হ'ত ভারতে শতকরা ২৯টা, আসামে শতকরা ৯৯টা, উড়িষ্যায় শতকরা ৪০টা। ফ্লাই মাকুর তাঁতের দাম অনেক বেশী এবং এক জারগার বসিয়ে বাগতে হয়। থ্রো মাকুর তাঁতে বয়চ খুবই কম, অধিকাংশই বাড়ীতে তৈরি করা যায় এবং যখন যেখানে খুশী ফুল রাখা যায়। এ সব সম্বন্ধে বাতে সম্ভার ফ্লাই মাকুর তাঁত উৎপন্ন হতে পারে তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং এই তাঁতের প্রচলন বাড়ানো দরকার। এ ছাড়া আরও উন্নত ধরণের

এবং অধিক উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন সভ্য তাঁতের উদ্ভাবন করবার চেষ্টাও দরকার। যুদ্ধেই আন্দোলন ও খাদির প্রচলন এবং বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের সময় বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রয়াস হিসাবে বে-সরকারী ভাবে তাঁতের কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তখন অটোমেটিক তাঁত হয়েছিল। ফ্রাটস'লে তাঁত সবচেয়ে ভাল হয়েছিল। তবে দাম বেশী এবং কলকজার জটিলতা ছিল। দরকার মত তাঁতের অংশ পাওয়া যেত না, সাধাবার জন্য সব সময় মিস্ত্রীও মিলত না। তাই বাও বা চালু হয়েছিল তাম্বু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ত ছিলই।

সর্বোপরি জাপানের মত ছোট ছোট মৃত্যাকাটা ও তুলা পৈজা কল তৈরী করতে হবে এবং সম্ভব হলে জাপান থেকে আনাতে হবে। জাপান এই কলের সাহায্যেই বিশ্বের বাজারে সকল দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছিল; বর্তমানে আবার পাল্লা দিতে শুরু করেছে। এতে তাদের খরচ কম পড়ে। ভারতে তা চালু না হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। গ্রামের মধ্যেই এই কল বসানো যেতে পারে। আর সেজন্য ধনী বা পুঁজিপতিদের দরকার হবে না, কেননা বেশী টাকার দরকার হবে না, সমবার ভিত্তিতেই চলতে পারবে। এমন কল চালু করতে পারলে গ্রামের মেয়ে পুরুষে কাজ করতে পারবে এবং তার কলে বেকার সমস্যার সমাধান ত অনেকটাই হবে, উপরন্তু বস্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে সম্ভার বিশেষণেও চালান দেওয়া যাবে। নমুনা মত ভারতের কারখানায়ই এ কল প্রস্তুত করা যেতে পারে।

মূল কথা, কুটীর-শিল্পকে কোন উচ্চতর আদর্শের ভাবাবেগে দেখলে চলবে না। তাতে তাঁতকে ত বাঁচানো যাবেই না, কোন কুটীর-শিল্পকেই বাঁচানো যাবে না। আধুনিক যন্ত্রের উৎপাদন-ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে তার উপকৃত বস্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে হবে। সেজন্য বস্ত্রপাতি প্রস্তুতির কারখানাকে নির্দেশ দিতে হবে এবং বিশেষতঃ নিয়োগ করে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। তা হলে পথ মিলবেই। এ প্রচেষ্টাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামিল হওয়া দরকার। নচেৎ বোর্ড, কমিশন আর কমিটি দিয়ে কিছু হবে না। ইতিপূর্বে ঢেব ঢেব কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের মণ মণ রায় সরকারী দপ্তরখানায় চাপা পড়ে আছে। নূতন কোন বোর্ড বা কমিশন তাদের চেয়ে বেশী কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন বলে মনে হয় না, কেবল সময় আর অর্থের আরও অপচয় হবে হয়ত।



# শাকসজ্জীর বাগান

শ্রীদীপ্তি পাল

বাগান করতে আমার খুব ভাল লাগে—তাই আমার স্বামী বখন ভারতবর্ষে আসার আগে হলেন তখন আমাদের সরকারী বাগাবাটতে পেলার সাত-আট বিঘা জমি আর ছোটো পুকুর। তখন আল মিটিয়ে বাগান করা বাবে ভেবে খুবই আনন্দ হ'ল। আমরা এখানে এসেছিলাম পৌষ মাসের প্রথমে। আমাদের আগে এখানে কেহ কোন দিন বাগান করে নি। জমিটা একেবারে অনাবাদী পড়ে ছিল। কাজেই আমাকে একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করতে হ'ল। এখানকার মাটি খুবই শক্ত; কিন্তু একবার জলে ভিজলে মাখনের মত নরম হয়। এর জল ধারণ করার শক্তিও ভাল; অর্থাৎ এটেল জাতীয়। আমরা প্রথমে পুকুরের কাছের খানিকটা জমি বেছে নিয়ে জল দিয়ে ভেজাতে লাগলাম। আজ বিকালে বাকি জলে ভেজাতাম কাল তার উপরের ঘাস সাক করা হ'ত। এই ভাবে প্রাথমিক কার্য শেষ হ'ল আর দশ কাঠার। এর মধ্যে অর্ধেক ফলবাগান আর বাকি অর্ধেক তরিতরকারি।

বাগানের অভাবে বাড়ীটা বড় নেড়া নেড়া লাগত বলে প্রথমেই আমরা ফুলের দিকে হাত দিলাম। মার্চ মাসের শেষ থেকে আমার বাগান গাঁগা ও অজান্তে করে ক জাতীয় ফুলে ভরে গেল। একটু দেয়তে আরম্ভ করেছিলাম বলে মরহুমী ফুল আর চৈত্রের শেষ পর্যন্ত ফুটেছিল। বর্তমানে ফুলের মধ্যে আমার বাগানে আছে সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা ও আরও কয়েক বকমের ফুল।

চোখের আর মনের ক্ষুধা মিটিয়ে এর পর স্বভাবতই পেটের ক্ষুধার দিকে লক্ষ্য পড়ল। বাড়ীর বাঁ হাতি পুকুরপাড়ের জমিটাকে তখন ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা হ'ল। তাতে বীজ দিলাম—জঁটা, পালাং, ধনে, কুমড়া, খিলে, উচ্ছে, ফুটি, তরমুজ, চোঁড়স, শশা আর পুঁইয়ের। এ বাদে আর ৫০টা ক্ষেত-মিচের চারা বসালাম আমরা।

এবারে এমিকে বড় বরা গেছে। জলের অভাবে কত ক্ষেত যে নষ্ট হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই! গাছগুলিকে কেবল বাঁচিয়ে

রাখার জন্য আমরা দিনে এক শ' দেড় শ' বালতি করে জল ঢেলেছি বাগানে। সারও এবার কিনেই দিতে হ'ল সব।

সবচেয়ে আগে কল্ল বিজে উচ্ছে আর ফুটি।" জিজে প্রথমে ২।৫টা থেকে আরম্ভ করে শেষে দিনে ২।৩ সের পর্যন্ত তুলেছি। উচ্ছের জমি ছিল ছোট—হ'তও কম। কোনদিনই দেড়পোয়া, আখসেরের বেশী হয় নি। ফুটি ছোটতে বড়তে পেরেছি আর শতখানেক। তরমুজ আমার বাগানে হয়েছে বটে; কিন্তু তার আকার মাঝারি কুমড়োর চেয়ে বড় নয়। বাজারের সাধারণ পাকা তরমুজের মত এগুলো লালও হ'ত না পাকলে; তবে আখাদ ভালই।

পালাং আর ধনে পাতা একেবারেই হয় নি। শশা গাছও বরষা প্রকোপে মরে গিয়েছিল দুই-একটি শশা হবার পর। পোকায় আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে চোঁড়স গাছগুলির খানিকটা করে কেটে দিতে হয়েছিল; এখন সেইসব গাছে আট-নয় ইঞ্চি লম্বা সুন্দর কল ফলছে। পুঁইশাক প্রচুর হয়েছে।

সবশেষে বলি কুমড়া আর লঙ্কার কথা। প্রথমদিকে বৃষ্টির অভাবে গাছগুলি কোন বকমে বেঁচেছিল। আবারের প্রথম বৃষ্টিটা পেরে গাছগুলির আশ্রয় উন্নতি হয়। এর মধ্যে একটা গাছে ৫টি ডাল একসঙ্গে জুড়ে আর চার ইঞ্চি চওড়া একটা ডাল হয়েছিল। তাতে এক সায়ে পাঁচটি পাতা, পাঁচটি ফল, পাঁচটি কড়া দেখেছি। কিছুদিন পরে ডালটিতে পচন ধরে ও সব কুমড়াই নষ্ট হয়ে যায়। কুমড়া সবচেয়ে পেরেছি ৩০টা। লঙ্কা গাছে প্রথমে একপোয়া থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত দিনে পাঁচ পোয়া, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লঙ্কা পাচ্ছি।

আমার বাগানের কলনের হিসাব দিলাম। বাজার দর জানা থাকলে মোট কত টাকার কল পেরেছি তাও জানাতে পারতাম। একটু উৎসাহ আর উত্তম থাকলে পোড়ো অনাবাদী জমির কি রূপান্তর ঘটে এটা তারই একটা সামান্য উদাহরণ।





সিগারেটের বাক্স হইতে তৈরি ড্রিং-কুম-সেট ও ভিতরের কাগজ হইতে তৈরি পুতুলের বাড়ী-ঘর

## ছুটছাঁট দ্রব্য হইতে প্রস্তুত

শ্রীশোভনা গুপ্ত

পূর্বে দেশী খেলনার প্রচলন একরূপ ছিল না বললেই চলে। শিশুদের আনন্দদানের জন্য ছই-চারিটি খেলনা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতাম। বর্তমানে দেশী খেলনার প্রচলন হওয়ায় সে অভাব অনেক দূর হইয়াছে।

কিন্তু ছুটছাঁট দ্রব্য হইতে কি প্রস্তুত করা যায়, ইহা তাহারই চেষ্টা। এই খেলনাগুলি বেশীর ভাগই পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। নূতন ছই-চারিটি দ্রব্যও ক্রয় করিতে হইয়াছে, যথা—কিছু কালো উল, তুতলা, জরি, পেরেক, রং, তুলা ও রঙীন কাপড়। পরিত্যক্ত দ্রব্য—বিঠার বীচি, ছিপি, পাউডারের টিন, তামাকের টিন, সিগারেটের বাক্স, দেশলাইয়ের বাক্স, ঔষধের বাক্স, খালি রিল, কার্পড়ের ছাঁট, নূতন কার্পড়ের টুকরা, শাড়ীর পাড়, ছেঁড়া শাড়ী ও ব্লাউস, পিচবোর্ড ইত্যাদি। অতএব সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের পরিত্যক্ত অংশ দ্বারা এই সকল খেলনা প্রস্তুত হইতে পারে। তবে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল খেলনা শিশুদের চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও পরিভ্রমের প্রয়োজন। সামান্ত সামান্ত বস্তুদ্বারা চেষ্টা করিলে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলনা হইতে পারে নীচের এই ছবিগুলি তাহারই নিদর্শন।

শিশুদের আনন্দদানের জন্য প্রতি পরিবারের মায়েরা তাহাদের লইয়া অবসর সময়ে ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত খেলনা প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাতে অবসর সময়ের সন্ধ্যাবহার

হয়, পরিবারের শিশুদের উৎসাহ, আনন্দ ও শিক্ষার ব্যবস্থাও হইতে পারে।

এ সব খেলনার পরিচয় নীচের ছবির তালিকার প্রায় সবগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

১। পাউডারের টিন ও বিঠার বীচির প্রস্তুত পুতুল।

২। পুতুলের শোবার ঘরের আসবাব।

(সাবানের বাক্স, ঔষধের বাক্স ইত্যাদি দ্বারা শুইবার খাট আর পিচবোর্ডের দ্বারা আলমারী, টেবিল প্রভৃতি করা হইয়াছে।)

৩। ছিপির পুতুল (যুগটি ছিপির উপরে করা)।

৪। দেশলাইয়ের বাক্স হইতে পুতুলের ‘ড্রিং কুম সেট’, ‘ডাইনিং কুম সেট’ আর পুতুলের ‘চেস্ট অব ড্রয়ার’ করা হইয়াছে।

৫। তামাকের টিনটিকে ছুঁচ-সূতা ও Thimble দ্বারা কর্ণাটা করা হইয়াছে। সেই টিনের ঢাকনাটিকে ছোট টেঁ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ছিপির পুতুলও ছবিতে রহিয়াছে।

৬। রিল হইতে পুতুলের মোড়া, ঘুড়ির লাটাই আর ‘আপিস-কুম সেট’ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৭। মেকড়ার পুতুল।

৮। সিগারেটের বাক্স হইতে পুতুলের ক্ষুদ্র ‘ড্রিং-কুম সেট’, ট্রাক আর সিগারেটের বাক্সের (গোল্ড ক্লেক) ভিতরের



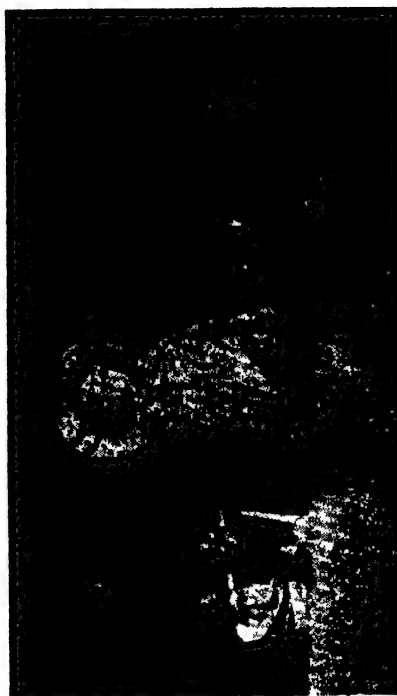
শেখারিয়ার বাস হইতে প্রস্তুত পুতুলের ড্রিং-কম-পোট ইত্যাদি



তুলোর শোবার ঘরের আসবাব



শিববোর্ডের পুতুল আর নৌকা



পাইডামের টিন ও রিটার বিচিত্র প্রস্তুত পুতুল

সুন্দর হলদে রঙের কাপড় দ্বারা পুতুলের বাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৯। নানাপ্রকার পুতুল।

১০। পিচবোর্ডের পুতুল আর নৌকা।

১১। পিচবোর্ডের জন্তু-আনোয়ার।

১২। নূতন কাপড়ের হাঁট পুতুলের মাথায়, পায়ে, হাতে ভরা হইয়া থাকে। নূতন কাপড়ের বড় বড় টুকরা

দ্বারা পুতুলের ক্রক, টুপী ইত্যাদি প্রস্তুত করা থাকে। শাড়ীর সুন্দর সুন্দর পাড় দ্বারা পেনসিল, চিক্রসী ও খুচরা পয়সা রাখার খলে প্রস্তুত করা হয়। ছেঁড়া শাড়ী আর ব্লাউসের শক্ত ভাগ দ্বারা পুতুলের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ড্রয়িং-রুম, ডাইনিং-রুম-সেট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই ভাবে অতি সামান্য সামান্য জব্য হইতে শিশুদের চিত্তাকর্ষক খেলনা প্রস্তুত হইয়াছে।

## ডি. এম.

### শ্রীপৃথ্বীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভারত স্বাধীন হইয়াছে এ কথা অবশ্যই আপনারা অবগত আছেন—

নেহাত ভাগ্যলব্ধ এই স্বাধীনতার ফলে একদা অভিজ্ঞাত বংশ-জাত এই অধম ব্রাহ্মণতন্ত্রের বর্তমানে উদ্বাস্ত আশ্রয়প্রার্থী নামে পরিচিত হইয়া গৃহ-স্বল-আশ্রয়হীন অবস্থার রেল-ষ্টেশন হইতে বহু দূরে জমিদার-শাসিত তথাকথিত ছোটলোক-অধ্যুষিত কোন নামহীন পাড়াগাঁয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কালতিপাত করিতেছি। দিন বার যাত্রি আসে—শিক্ষকতা কার্য্যে বৈচিত্র্যও নাই—অশান্তিও নাই—নিত্য একই এ স্বরায় রাইনাস বি স্বরায়, যোগল বামশাহের নামের তালিকা ও কগনেট অবজেক্ট ও জিবাণ্ড পাটিসিপ্ল লইয়া দিন কাটে। অবসর সময়ে সংবাদ-পত্র চর্কিত চর্কণে ও পরম আনন্দে ভবিষ্যতের বড়ীল স্বপ্ন দেখিয়া দিন বার—ধর্ম্মঘট, প্রতিবাদ সভা, রাজনীতিক বিতণ্ডাহীন প্রামা শাস্ত পরিবেশে কর্ম্মহীন দিনগুলি অতি বীরস্বয় গতিতে চলিয়া যায়।

অকস্মাৎ সেদিন একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল।

তৎকাল। জনৈক ছাত্র আসিয়া একখানি পত্র দিল—বিদ্যালয় সমিতির একজন সভ্য জানাইতেছেন, যবিবার বেলা দশটা হইতে এগারটার মধ্যে ডি. এম. বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন। বিদ্যালয়ের তাল ছাত্রাবাসের যদি একটা কোন গতি করা যায়। অতএব একটু কিছু সহ চারের বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন।

সব্বর স্বপ্নাঙ্কর জীবনে হঠাৎ এক বলক প্রের আলোকপাত হইয়াছে। ডি. এম. আসিবেন। ডি. এম. কে? অনেক ভাবিয়া বুঝিলাম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ জেলাশাসক—শরীরে ও মনে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ বহিয়া গেল। বিদ্যাপর-সম্পাদক নাই, কি করা যায়?

বুদ্ধ কেরানী বাবুকে ডাকিয়া কহিলাম—ডি. এম. আসছেন। একটু চা-র জোগাড় করা দরকার। কি করা যায় বলুন ত?

নিকটতম বাজার তিন মাইল। ষ্টেশন আট মাইল দূরে—কয়েক দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়া পথ কর্ম্মমুক্ত হইয়াছে। কেরানীবাবু কহিলেন, এই অল্প সময়ে কি জোগাড় করা যায়? টাকাও ত নাই, মাসের ২৭শে। সে বাহোক, একটা কর্ম্ম ধরা যাক—

তিনি লিখিলেন :	কলা—	১	ডজন—	১/০
	আপেল	২টা		৫০
	ভাসপাতি	২টা		১০/০
	বসগোলা	/১০		১
	সন্দেশ	৮টি		১
	ভাল চা	সিকি পাঃ		১

চাকর গোপাল কহিল—আজ্ঞে হজরৎগুরুর দোকানে আপেল ত দেখিনি, তবে আঙ্গুর আছে।

কেরানীবাবু কহিলেন—বেশ আপেল না পেলে আঙ্গুর আনবি। সহকারী শিক্ষক একজন কহিলেন—ডি. এম. সাহেবেয়া খিষ্ট-কিষ্ট পছন্দ করেন না, কল, বিস্কুট, কেক—

—বিস্কুট, কেক এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

—সেই ত কথা।

কেরানীবাবু কহিলেন—এতেই হবে। হরত থাকেনই না—যদি একখানা মুখে দেন।

আমি হেডমাস্টার, অতএব বিজ্ঞের মত কহিলাম—দেবতার্য্য ত থান না, কিন্তু অত বস্ত্রে নৈবেদ্য কলমুলাদি শুদ্ধিযে দেন কেন?

সহকারী শিক্ষক কহিলেন—দুটিভোগ, গুতেই দেবতার্য্য দুটি।

তিনি হো হো করিয়া হাসিলেন। আমি কহিলাম—গোপাল, শোন। কাল তোমার উঠে চলে যাবি, হাটে বা পাস আনবি। আর ভনা ময়রাকে সন্দেশ বসগোলার বারনা দিবি—বসগোলা নয়

—রাজভোগ বুঝি। ভাল হয় যেন—ডি. এম. আসছেন বলবি।  
গোপাল সবিনয়ে কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।  
আপাততঃ ঐ রুপই স্থির হইল।

রাজ্যে সঙ্গে সঙ্গে সাইক্লোনের মত ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মনে মনে কি করিতে হইবে ভাবিতে লাগিলাম—বিছালয় গৃহ, আপিস ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে—আপিসে বসিবার স্থান করিতে হইবে। ছাত্রাবাসের বালকগণকে পরিচ্ছন্ন থাকিতে বলিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি—পাছে কোন কিছু ভুল হয় সেজন্য একখানা কাগজে কাজেরও একটা কর্ম করিয়া ফেলিলাম বখা :

সত্যাব্যব বাড়ী হইতে টেবিল রুখ—১

পার্কভীবাড়ী হইতে ফুলদানি—১।২

গাবুলবাড়ী হইতে ছাইদানি—১

ঐ ... ভাল প্লেট—৩

বিরিকিবাড়ী হইতে ভাল কাপ—৪, ঐ প্লেট—৪

ঐ ... চামচে—২

যদি পাওয়া যায়—টিপট, সুগার ও মিষ্টি পট—

রাজি-নিজা বাইবার পূর্বে আর এক বার ভাবিয়া দেখিলাম কি প্রয়োজন? মনে হইল সবই হইয়াছে। গৃহীণীকে কহিলাম, হ্যাঁগা, রবিবার ডি. এম. সাহেব আসছেন সকালে একটু চা করে দিতে হবে। উম্মনে ভাল আগুন রেখে যেন চট করে চা-টা হয়—

—কখন আসবে তার ঠিক কিছু নেই? উম্মনে কয়লা ত দিতে হবে—আধঘণ্টা আগে খবর না পেলে আমি চা করে দিতে পারব না।

—বল কি ডি. এম. আসছেন।

—ডি. এম. কি. এম. তোমাদের, আমার ত গুরুঠাকুর নয় যে শারা সকাল তিনটে উম্মনে জ্বলে বসে থাকব। ছেলেপুলে আছে, রান্না-খাওয়া ত লাগবে।

—কিন্তু আমি ত চাকুরী করি, এসব ত করতেই হবে। তাতে খর 'হেডমাষ্টার' বখন আর এ ডাক্তার থেকে—

গৃহীণী সংবাদটাকে শুভ মনে করেন নাই; তাই বিরক্তির সঙ্গে কহিলেন, আমি ত কারও চাকুরী করি নে—

—তা বটে, তবে আমার চাকুরী বাখাটা ত দরকার—কালকে যেমন করে হোক চালিয়ে দাও—

—দাও বললে ত হয় না, ভূমি চেলে ছুটোকে রাখ, করে দিচ্ছি—

বাক্ ও-সব বাগবিতণ্ডা পরে, এখন সব জোগাড় করতে পারলেই হয়।

শনিবার—

সম্পাদক ও কবিটির সভাপণ আসিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ

জানায়াছিল। তখনও ঝড় ও বৃষ্টি চলিতেছে। বর্ষা প্রবল নহে, কিন্তু হাওয়া প্রবল।

সম্পাদক মহাশয় গভীরভাবে কহিলেন, ভুল করেছেন মাষ্টার শ্যার। বাণীগঞ্জ কি আসানসোল লোক পাঠান উচিত ছিল—হজরৎপুর্বে কি কল পাওয়া যায়—মিষ্ট অখাদ্য—

সভয়ে বলিলাম, এটা প্রায় তা ডি. এম. জানেন, তার পর যেমন চুর্খোণ, টাকাও হাতে নেই।

বাহা হউক সময় নাই। বাহা জোগাড় করা বাইতে পারে তাহাই ভাল, তবে ডি. এম. আসিবেন তাহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা হওয়া চাই ত?

বেলা প্রায় একটার সময় চাকর গোপাল আসিল। আমি কহিলাম, এত বেলা হ'ল কেন গোপাল—

গোপাল কহিল, বাবু হিংকোর বান পড়েছে, বাবার সময় গামছা পরে গেলাম কিন্তু আসবার সময় জল এক গলা হয়ে গেছে তাই সঙ্গী ধরে আসতে হ'ল—

—কি কি পেলে—

—কলা, ভ্রাসপাতি ছাড়া কিছু পাই নি—

কেবানীবাবু কহিলেন, সর্বনাশ, আপেল আনু কিছুই পাওনি। —আজ্ঞে না।

—কি উপায়?

আমি চিন্তিত হইলাম। কহিলাম, মিষ্ট ভাল করে তৈরি করতে বল গিয়ে আর ধর যদি খাটি ঘিরের সিজাড়া নিমকি হয়—

কেবানীবাবু কহিলেন, ও-সব ওয়া খান না—

—যদি কেউ আসানসোল যায় তা হলে—

—এ দুর্ঘোণে কে যাবে? আর ট্রেন ছ'টার, সে গেলেও কাল দশটার কিরতে পাববে না।

অতএব এই পর্যন্তই প্রস্ততি হইল।

শনিবার দুটার ছুটি হইল।

গোপালকে কহিলাম, সমস্ত ভাল করে পরিষ্কার কর। আপিস, রাস সব।

গোপাল কহিল, স্তর আমি শাই নি, দুটো খেয়ে আসি।

অভ্যুৎসাহী সহকর্মী একজন কহিলেন, সকালে ডি. এম. আসছেন আর ভূমি বলছ খাওয়া হয় নি। এক দিন নাই-বা খেলে।

আমি কহিলাম, না খেয়ে বেশি টানবে কি করে। বাও চট করে খেয়ে এসো।

সন্ধ্যা পর্যন্ত গোপাল সব পরিষ্কার করিল, বাঁড়াইয়া থাকিয়া সব দেখাইয়া দিলাম।

রবিবার দুই হইতে উঠিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলাম, আহকার দিনটা কোনমতে পার করে দিও ভগবান।



প্রভাত হইয়া ফুলে বাইব। কনিষ্ঠ-সন্তান দুইটি কি লইয়া চীৎকার করিতেছে, গৃহিণী সম্ভবতঃ কিছু উত্তম-মধ্যম দিরাছেন। আমি কহিলাম, আজ আর যারারাই-ধরাধরি কর না। উম্মেনে আঁচ বেধ গোপালকে দিয়ে থবর দিলেই, ফল, মিষ্টি দিয়ে খাবারটা শুছিয়ে, চা-টা পাঠিয়ে দিও।

গৃহিণী বঙ্কার দিলেন, মারবে না, শতর শতর এসেছে সব। মারবো না কেন শুনি—আজ কি পূজোস্তভার দিন না কি শুনি? আর কেমন বলছে, শুছিয়ে দিয়ে চা-টা পাঠিয়ে দিও, কলে বেন সব তৈরী হচ্ছে—আমি আমার আলার মরে গেলাম।

পুনরায় কথা বলিলে উত্তেজনা বাড়িতে পারে অতএব হুগানাম শরণ করিয়া ফুলে গেলাম। ছাত্র রাম ও মধুর সঙ্গে দেখা। বলিলাম, কি রে, টেবিল-ব্লথ, ভাস্ সব এনেছিস?

—হ্যাঁ স্ত্র, গোপালকে দিলাম।

—টি-পট—

—ও স্ত্র, গ্রামে নেই।

—আচ্ছা থাক।

আগিস ঘরে একপানা টেবিল সাজাইয়া ডি. এম.-এর জন্য বঞ্জন প্রস্তুত হইলাম তখন ন'টা। ইফুলের বারান্দার ঠাঁড়াইলে দূরের ডাকবাংলা দেখা যায়—এখানেই ডি. এম.-এর অবস্থিতি।

ফুলের কর্তৃপক্ষ আসিলেন। একজন কহিলেন, এ কি করছেন মাষ্টার মশায়? এই বিজি ঘরে কি ডি. এম.কে বসান যার? একটা ক্লাসরুম পরিষ্কার করে বড় টেবিলটা দিয়ে, চেয়ার সাজিয়ে দিতে হ'ত।

সকলেই কথাটা অহুমোদন করিলেন। আমি কহিলাম, কিন্তু সময় ত আর নেই।

—খুব আছে, এক ঘণ্টার কত উত্থান-পতন হয়। গোপাল ক্লাস কাইভটার বেকি বেব করে কেল।

গোপাল কহিল, একলা কেমন করে।

—এই, এই রাম, বঙ্কির থব ত বেকি সব, কস করে থবটা তৈরি করে কেল।

ছাত্রগণ ও গোপাল বেকি বাহির করিতে লাগিল। জনৈক-ছাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হুই ডি. এম. এল হুই।' হ্যাঁ, একপানা মোটর ডাকবাংলার চুকিল।

—গোপাল তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, হস করে এসে পড়বে। সাহেব বড্ড পাংচুরেল শুনেছি—জলদি।

মেঘমেঘর দিন। রৌদ্রও নাই, বৃষ্টিও নাই—গোপাল ও ছাত্রগণ বেকি টানিয়া গলদঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। বড় টেবিল টানিয়া আনিতে গোপালের পারে ছেঁচা লাগিয়াছে। বাহা হউক, তথাপি দশটার মধ্যেই বসিবার গৃহ প্রস্তুত হইয়া গেল। ফুলদানিতে করবী-জঙ্ঘ—সমুখে রপায় হাইদানী। আর একজন কহিলেন, চেয়ারের ছিবি কি সব? বা দস্তবাড়ীর থেকে একটা কুশান চেয়ার নিয়ে আর।

হুই জন ছাত্র ছুটি কুশান চেয়ার আনিতে।

সবই প্রস্তুত। এখন ডি. এম. আসিলেই হয়—একবার বাসায় গিয়া বলিয়া আসা দরকার। অতএব বাসায় গিয়া কহিলাম, ডি. এম. এসে গেছেন ডাকবাংলায়। এই এলেন বলে—ভাসপাতিটা কেটে রাখ—কলা, মিষ্টি, আর চা'র জল ফুলে রাখ।

গৃহিণী কটুকটাক্কে চাহিয়া কহিলেন, মাসে মাসে চাদে চাদে সব গুফাফুরিয়া। আসবেন আর মরবি মর এই আপখোবাকী বিনা মাইনের বান্দীটাই মর।

—আহু, রাগ করছ কেন? একদিন ত? ডি. এম. ত যোজ আসছেন না।

—ডি. এম., ডি. এম. আমার রথ উঠেছে না কি? বা পারি করব, না পারলে এসে কবে নিয়ে বেও।

ফুলে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

একদল ছাত্র ছুটিরাছে, তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল—এ এ মোটর বেরিয়েছে—আমরা তত্পর হইয়া বারান্দার আসিলাম। মোটরখানা অস্ত্র রাষ্ট্রায় চলিয়া গেল।

কেহ বলিলেন, ইউনিয়ন বোর্ড দেখে আসবেন, কেহ বলিলেন, ওদিকে নতুন বাস্তা দেখতে গেলেন।

এগারটা, বারটা, সাড়ে-বারেটা বাজিল। মোটরগাড়ী ঘুরিয়া ডাকবাংলার গিরাছে। প্রশ্ন করিলাম, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? থাওয়া-নাওয়া ত করতে হবে?

কর্তৃপক্ষের একজন কহিলেন, বা গোপাল, সাইকেলটা নিয়ে যা, শুনে আর কখন আসবেন।

গোপাল শ্রমক্লাস্ত, সারাদিন অক্লাস্ত পরিশ্রম করিয়াছে, সকাল হইতে না থাইয়া কাজ করিয়াছে, তথাপি চাকুরী ত। সাইকেলে উঠিয়া ছুটিল।

জনৈক ব্যক্তি কহিলেন, গোপাল ঘুবে আসতে দেবী এক ঘণ্টা। একটু চা থাওয়াতে পারেন মাষ্টার মশাই—বেলাও হ'ল।

আমি কহিলাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—গরীবের ঘরে বা আছে। বাসায় আসিতেই গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, কি আমার গুফাফুর এলেন?

—না, আসেন নি। তবে ভয়লোকেরা একটু চা খেতে চাইছেন—পাঁচ কাপ।

গৃহিণী ঠক্ করিয়া কেংলিটাকে উম্মেনে চাপাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, চা কি আমি দিয়ে আসব?

—আমি নিয়ে যাবো'ধন।

চা-পান শেষ হইবার পরে গোপাল কিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যা দিল, এখন সাহেব চান করে খাবেন তার পর ওবেলা আসবেন।

—কখন?

—তিনটা-চারটা।

—কে বললে?

—চাপড়ানী সাহেব বললেন।

খাইরা অবিলম্বে কিরিতে গোপালকে উপদেশ দিয়া এবং মোটরের শব্দ পাইলেই আমাকে সংবাদ দিতে বলিয়া খাইতে গেলাম। আহাবাদি করিতে ছুটা বাজিল। একটু বিজ্ঞান করিতে-ছিলাম।

যেহেটা আসিয়া সংবাদ দিল, দারোগাবাবু ডাকছেন।

দারোগা? তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলাম।

দারোগা নহে, ছোট দারোগাবাবু। তিনি জানাইলেন, এখন তিনটা ইউ. বি. প্রেসিডেন্টের মিটিং হবে খানার তারপর চারটা-সাত্বে চারটা নাগাদ এখানে আসছেন সাহেব—গ্রামের লোকদের মিটিং হবে। আপনি ফুলে একটু ব্যবস্থা করে রাখুন, আমি গ্রামের লোক ডাকবার ব্যবস্থা করি।

—আজ্ঞে রাখছি, আপনি আসুন।

তাড়াতাড়ি ফুলে গেলাম। গোপাল দেয়ালে হেলান দিয়া বসাইতেছি—পায়ের শব্দে উঠিয়া কহিল, কি শব্দ?

—এখানে মিটিং হবে দারোগাবাবু বললেন, নাইনের ঘরটা সাজিয়ে দাও। হোটেল থেকে স্ত্রীমা আর সরোজকে ডেকে আন—বেকি ধরবে।

উচু ক্লাসের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ঘরটা প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং দারোগাবাবুর আহ্বানে দেখিতে দেখিতে গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী বাল্লী তোলা জামা পরিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অর্ধ উল্লস বান্দী-বাউরীও কিছু আসিল, মদীর ছাত্রগণও কেহ তামাশা দেখিতে, কেহ-বা কেবলমাত্র কৌতুহলপরতন্ত্র হইয়া উপস্থিত হইল।

ছোট দারোগাবাবু বাস্তবসম্মত হইয়া তদারক করিতে লাগিলেন।

চারটা-পাঁচটা-সাত্বেপাঁচটা হইল—সন্ধ্যা সমাপ্ত।

ডি. এম. সম্ভবতঃ আসিবেন না অহুমান করিয়া কেহ কেহ চলিয়া বাইতে চাহিলেন।

ছোট দারোগাবাবু কহিলেন, বাবেন না, বাবেন না, নিশ্চয়ই আসছেন সব। ডি. এম. সাহেব না আসুন, এস. পি. আসবেই—আজ্ঞা আমি থবব নিছি।

—এস. পি.? আর কে আছেন?

—এস. পি., ডি. এম. আর সিভিল-সার্জেন আছেন।

—সর্বনাশ!

সম্পাদক মহাশয়ের কাছে ছুটিলাম। প্রশ্ন, সামান্য কল, সামান্য মিটিং এখন কি করা যায়?

—শীগগির গোপালকে পাঠান সাইকেলে—ডনার দোকান থেকে এক সের রাজভোগ এনে রাখুক। তিন জনের ত? তা ছাড়া দারোগা সেপাই—এক সেরই আনতে বলুন।

গোপাল ছুটিল বালতি ও সাইকেল লইয়া।

সংবাদ আসিল—ইউ. বি. প্রেসিডেন্ট মিটিং প্রায় শেষ, এখনুনি আসবেন ওরা।

আমি কহিলাম, সন্ধ্যা আগন্তব্য, মিটিং করতে হলে আলো চাই, একটা ছায়াপা, সকলে কহিলেন, একটা ছায়াপা, ছায়াপা চাই।

গোপালকে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিলাম, রাজভোগ এনেছিস?  
—হ্যাঁ, বাসার দিবে এলাম।

—বেশ।

কর্তৃপক্ষের একজন কহিলেন, গোপাল, শীগগির শীগগির চট করে ক্ষীরোদবাবুর হ্যাঁজাগটা ভেল ভরে ধরিয়ে নিয়ে আসবি বুঝিল—

গোপাল আবার ছুটিল—কেবোসিনের ও মার্কেটের পরস্য লইয়া।

সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, দারোগাবাবু! দুপুর থেকে এসে খাটা-খাটনি করছেন একটু চা দিন—ডি. এম. এলে ত আর হবে না।

আমি কহিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ।

সন্ডরে বাসার আসিলাম, এই সময়েই অবোধ শিশুপুত্রেরা গোলমাল করে এবং গৃহস্থীর মাথাটা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম, ছ' কাপ চা চাই এখনও দারোগাবাবু! সব চা খান নি।

—পারব না, দোকান নাকি?

—ভদ্রতা ত একটা আছে?

—কর গিয়ে ভদ্রতা, আমি কারও চাকুরী করি নে, আমার গুরু-ঠাকুরও কেউ নন। ছেলে দুটো কেঁদে ককিয়ে গেল, সকাল থেকে হুনি জেলে বসে আছি, দুধ দেবার সময় নেই।

—তুমি জরুরী সময়ে কেবল।

—পারব না কি করবে।

ক্লান্তি বশতঃ উত্তেজিত হইয়াছিলাম তাই বলিলাম, এ বাবা, ঘরে ডি. এম. বাইরে ডি. এম.—আমি বাই কোথায়, হার ভগবান! পার ত দিও পাঠিয়ে।

বাহা হউক, চা পান হইল। হ্যাঁজাগ জলিল, কিন্তু গ্রামের লোক এক পারে দুই পারে সরিয়া গেল। ছোটবাবু কহিলেন, এই ক'জন লোক দেখলে যে আমার চাকুরী থাকবে না।

—তাই ত!

বাহা হউক, সংবাদ আসিল—ডি. এম. রাজি হওয়ার আজ আর আসিবেন না।

—অতএব আসুন দারোগাবাবু মিটিংলোর সম্বাবহার করা যাক।

গোপাল বাসা হইতে মিটিং আনিল। চা সহযোগে তাহাদের সম্বাবহার হইল! উঠিতে উঠিতে কহিলেন, ডি. এম. এসেন না, এলে কাজ হ'ত।

বাইবার পূর্বে সম্পাদক-মহাশয় কহিলেন, শেষের এক সের রসগোল্লা ছেলেপুলেকে খেতে দেবেন এবং একটু হাসিয়া কহিলেন, দায়টাও ডনাকে দিয়ে দেবেন।

—আজ্ঞে রসগোল্লা ত কিনে খাই নে কোনদিন, মাসের ২৭শে আজ।

—হেলেনকে বাবে বাবে দিতে হয়।

রসিকতার কঁাকে হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। আমার দুইটি টাকা গেল।

এখন ঘরে তাল দিয়া তিনিবপত্র গোছাইয়া বাইতে হইবে। বাড়ি সাড়ে সাতটা। ডাকিলাম—গোপাল।

সাদা নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি গোপাল বইয়ের আলমারি ঠেস দিয়া ঘুয়াইতেছে। গারে থাকা দিয়া ডাকিলাম, গোপাল।

গোপাল তড়াক করিয়া লাকাইয়া উঠিয়া কহিল, সার ডি. এম ?

—ডি. এম. আসবেন না আজ।

—আসবেন না ! গোপাল হরত জাবিয়াছে তাহার অপরাধেই ডি. এম. আসেন নাই তাই বলিলাম, চল গোপাল, ঘরে তাল দিয়ে চল।

গোপাল ঘরে তাল দিয়া চলিয়া বাইতেছিল। কহিলাম—চল গোপাল স্বাধীন ভারতের আমি হেডমাষ্টার আর তুমি চাকর, হুটো বসগোলা খেয়ে একটু জল খাই চল, তারপর বাড়ী বাবে।

গোপাল বিনয়ে অবনত হইয়া কহিল, থাক স্যর দরকার কি ?

—না গোপাল, আমার পরসার কেনা বসগোলা, চল।

## আমূল সংশোধন আবশ্যক

ত্রিবিনোবা ভাবে

অনুবাদক—ত্রিবিবেকনাথ গুহ

পরিকল্পনা-সমিতি এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈয়ারি করিয়াছেন। ইতিমধ্যে পাঁচ বৎসরের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, বেকার সংখ্যা বাড়িতেছে।

কোন লোক দিল্লী অভিমুখে যাইতেছিল। দিল্লী ছিল তাহার গন্তব্য। কয়েক দিন চলার পরে তাহার মনে হইল সে বোম্বাইয়ের দিকে চলিতেছে। কেন এইরূপ হইল ? দিল্লীর পথে চলিয়াছিল বটে, কিন্তু দিল্লীর দিকে মুখ করিয়া চলার পরিবর্তে দিল্লীর দিকে পিঠ রাখিয়া চলিয়াছিল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বেকার বাড়ানোর জন্ত ত তৈয়ারি করা হয় নাই। তবে বেকার বৃদ্ধি পাইল কি ভাবে ? একবার জবাবে কেহ কেহ বলেন, তার হেতু হইতেছে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি। কিন্তু লোকসংখ্যা যে বাড়িবে তাহা ত মপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে এই উত্তর কি প্রকারে সম্বোধনক হইতে পারে ?

পল্লীশিল্পের হ্রদ্বশ

রাজাজী হাঁকিয়া বলিতেছেন—তাঁতিদের বাঁচাও। হোঁরা বলেন, মিল বাঁচাইয়া আমরা বাহা কিছু করিতে পারি হরিব। স্বাধীনতা লাভের পাঁচ-সাত বৎসরে তৈলখানি শেষ হইতে বসিয়াছে। এক মধ্যপ্রদেশের বরোবা তহশিলেই কোশটি খানি সম্প্রতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এই খবর আমি গাইরাছি। রাখাক্কু পাতিল এই তালুকের অধিবাসী। পাতিল হতাশ ভাবে বলিতেছিলেন, “ইহার প্রতিকার কি ? পল্লীশিল্প ক্ষমতা বিনা কিরূপে বাঁচিবে ?”

মিল কাপড়ের উপর সম্প্রতি টাকাপ্রতি পুঁবা এক পরসার কর ধার্য করা হইয়াছে। এই এক পরসার সহায়তার ঋণিকেরও নিজ পায়ে দাঁড়াইতে হইবে আর মিলের স্ত্রত-বয়নকারী তাঁতিদেরও জীবন নির্বাহ করিতে হইবে। এই এক পরসার মাকড়সা-জালে ঋণিকমীর পর্বন্ত জড়াইয়া গিয়াছেন।

বেকার বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা আর্মো অপ্রত্যাশিত নহে। আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী, গণিতের হিসাব অনুসারেই তাহা বাড়িয়াছে। জনৈক আদিবাসী সেবক আসাম অঞ্চলের আদিবাসীদের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই অঞ্চলের মণিপুর ইত্যাদি আদিবাসী-অধ্যুষিত রাজ্যে হাতে-কাটা স্ত্রতার কাজ খুব চলিত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে এখন তাহা লোপ পাইতেছে। যেদিন হইতে রাজ্য বিলীন হইয়াছে সেদিন হইতে পল্লীশিল্পও যন্ত্রশিল্প বিলীন হইতেছে।

গৃহীত কৃত্য : সবাইকে কাজ

পরিকল্পকদের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, “সকলকে পুঁবা কাজ দেওয়ার দায়িত্ব পরিকল্পনার স্বীকার করা চাই।” তদন্তের তাঁহারা বলেন, “এরূপ দায়িত্ব আমরা যদি স্বীকার করিতে পারিতাম ত ভাল হইত, কিন্তু তাহা সম্ভব মনে হয় না।” তাঁহাদের আমি বলি, “দেশের সকল লোককে কাজ দেওয়া বাইতে পারে, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ইহা ‘গৃহীত কৃত্য’।” ‘গৃহীত কৃত্য’ আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। উহা মানিয়া লইয়া উহার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করিতে হয়।

সকলকে কাজ দিতে হইবে এই ‘গৃহীত কৃত্য’ স্বাকার করিয়া।  
লউন, তখন কিরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা হইবে তাহা আপন।  
হইতেই অবিলম্বে পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

সমতা বনাম ক্ষমতা !

আমরা ‘সমতা’র কথা বলিয়া থাকি। সমতার বিরুদ্ধে  
বিষমতার নাম কেহ করিতে পারে ন। তাই ‘সমতা’র  
প্রতিবন্ধিতা করার জন্য ইহারা নূতন শব্দ খুঁজিয়া বাহির  
করিয়াছেন—‘ক্ষমতা’। গুণের বিরুদ্ধে গুণ টাঁড় করাও  
ইহা হইতেছে পুঁজিবাদের যুক্তি। আমি বলি ‘ক্ষমতা’  
আমরাও চাই। কিন্তু যেভাবেই হোক আগে সকলকে  
খাইতে দিবে ত, না—খাইতে দিবে না ? আগে ত খাইতে  
দিন, পরে ‘ক্ষমতা’ বাড়ান। আগে জোয়ারের কুটিই দিন।  
তারপরে সুযোগ-সুবিধা মত মালপোয়া দিবে। যে হাতিয়ার  
হাতে আছে, তাহা ব্যবহার করিয়া বেকার-সনস্তা দূর করুন,  
আর হাতিয়ারে যে সংশোধন করা দরকার তাহা ধীরে ধীরে  
করুন।

যন্ত্রের ক্ষেত্রে

কেহ কেহ বলেন, যন্ত্রীকরণ ছাড়া উপায় নাই। তার  
মানে, ইহা তাহাদের ‘গৃহীত কৃত্য’। আমি বলি, পল্লীশিল্প  
বিমানের জন্য যন্ত্রীকরণ কেন করিতেছেন ? বিদেশ হইতে  
যেসব মাল শহরে আসিয়া দেশ ভাসাইতেছে তাহা বন্ধ

করার জন্য যন্ত্রীকরণের জোর ব্যবস্থা করুন না ! শহর-  
বাসীর বৃদ্ধি গ্রামের কাঁচামাল পাকামাল করিয়া গ্রামেই  
তাহা সজ্জা দ্বায়ে বিক্রয় করার কাজে ধরচ হইতেছে আর  
ওদিকে বিদেশী মাল অবাধে শহর ছাইয়া ফেলিতেছে। তার  
পরিবর্তে গ্রামের ক্ষেত্রে আলাদা করিয়া রাখুন আর আপন-  
দের যে ক্ষেত্রে বিদেশী মাল দখল করিয়া বসিয়াছে তাহা নিজ  
হাতে আনুন, নচেৎ কাল যদি গ্রামবাসীরা শহরবাসীর  
বিরুদ্ধে বিজোহ করে তবে বিদেশী ব্যাপারী ও পল্লীর মজুদ  
এই উভয়ের মার শহরের উপর পড়িবে ও শহর চূর্ণ হইয়া  
যাইবে।

আমূল পরিবর্তন চাই

আগ্রায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হইয়া  
গিয়াছে। উহাতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তদ্বৃষ্টে আমি  
ইহা লিখিতেছি। কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে,  
বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য পঞ্চ-  
বার্ষিক পরিকল্পনার সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রস্তাব  
ভাল, কিন্তু আংশিক সংস্কারকামী সংশোধন কোন কাজের  
নয়। আমি মনে করি, মূল পরিকল্পনারই সংশোধন করা  
আবশ্যিক।

‘সর্বোদয়’ হইতে

## জীবন-অরণ্য

শ্রীশান্তীল দাশ

জীবন-অরণ্য মাঝে ঘুরি কিরি : গভীর আঁধার :

বার বার একই পথ করি অতিক্রম।

ঘন কুজ্বটিকা খেদা সে পথের বাহিরে আসার  
যেলে না নিশানা কোনো, বার্ষ পহিঙ্গর।

ভবু চলি সেই পথে—যনে আগে ছদ্মস্ত হৃদাশা :

শেষ হবে একদিন অরণ্য-জীবন ,

অন্তরেতে আছে মোর যে আলোর স্ততী পিপাসা,

অরণ্যের প্রান্তে তার হবে নিরসন !

আলোকের স্বপ্ন দেখি : পরিক্রমা আঁধারের মাঝে,

নৈঃশব্দের মাঝে শুনি অক্ষত বিলাপ ;

ঝিল্লির অক্লান্ত স্রব একটানা কানে এসে বাজে,

ভোগ করি জীবনের ক্রুর অভিশাপ।

মন ছুটে চলে বার জীবন-অরণ্য ভেদ করে,

পুঞ্জীভূত অন্ধকার হয়ে আসে জ্ঞান :

স্বপ্ন মোর দেখা দেবে একদিন সত্যরূপ ধরে,

সে দিনের আঝিও তো পাই নি সন্ধান।

# স্বাধীনতার সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে পাড়িয়ে হু' বাহু বাড়িয়ে মানুষকে নর-দেবতা বলে প্রণাম করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। পাক্ষীজীর মতই তিনি বিশ্বাস করতেন, সকলের অধম যে মানুষ, দীনের থেকেও যে দীন তারও জীবনের এমন একটি মূল্য আছে যার কোন পরিমাণ হয় না। পরমপুরুষ প্রতিটি মানুষকে এমন আলাদা আলাদা করে বে তৈরি করলেন—সে তো নেহাৎ খেয়ালের বশে নয়। একজন মানুষকে দিবে তাঁর যে-উদ্দেশ্য সকল হতে পারে আর একজন মানুষকে দিবে কর্ণও তা হবার নয়। প্রতি মানুষের সঙ্গে প্রতি মানুষের যে একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, এই স্বাতন্ত্র্য এসেছে স্রষ্টারই ইচ্ছা থেকে। এর মূল্য অসীম, এর পবিত্রতা অনির্কটনীর। যে মূর্খ বলে, আমি নইলে হুনিয়ার ঢাকা অচল হয়ে বাবে তার দুর্কিনীত উদ্ভতা মার্জ্জনীয়। কিন্তু যে স্ত্রীব বলে, আমি অপদার্থ—আমার জীবনের কোনই সার্থকতা নেই তার আত্ম-অবিশ্বাসের সত্যসত্যই মার্জ্জনা নেই।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের জীবনের অপরিণেয় মূল্যে, অপারিষ্য স্ববহার, অনির্কটনীর মহিমার। আমাকে তাঁর প্রয়োজন আছে বলেই আমার সৃষ্টি, তোমাকে তাঁর প্রয়োজন আছে বলে তোমারও সৃষ্টি, হুনিয়ার যে বেখানে আছে সকলেরই কোন-না-কোন সার্থকতা আছে বলেই তাদের সৃষ্টি। আমাদের সৃষ্টি করে তিনি আমাদের জীবনের মূল্যকেই স্বীকার করেছেন। এই দৃষ্টভঙ্গিমা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' লিখেছেন :

আমারে স্মরন করি' বে মহাসম্মান  
দিরেছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ  
তার অপমান বেন সঙ্ক নাহি করি।

এই দৃষ্টভঙ্গিমা নিয়েই মার্কিন কবি ওয়াট হুইটম্যান লিখলেন :  
I swear I begin to see the meaning of these things,  
It is not the earth, it is not America who is so great,  
It is I who am great or to be great, it is you up  
there, or any one,  
It is to walk rapidly through civilisations, govern-  
ments, theories,  
Through poems, pageants, shows, to form individuals.

হুইটম্যান বোঝা করলেন রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর ক্ষত্রবীণার :

কেথন্তে পাছি এখন এসবের ভাংপড়া.

পৃথিবীর পৌরব কি এতই বেশী ? আমেরিকার পরিচা কি এতই  
বিশ্বল ?

আমি হচ্ছি বড়, বড় আমাকেই হতে হবে, তুমি হচ্ছ বড়,  
বড় নর কে ?

সত্যতা বলি, পবর্ষকেষ্ট বলি, মত্তবার বলি,

সাহিত্য, শোভাবাজা, প্রদর্শনী—সবকিছুই গোণ, মূল্য হ'ল  
মানুষ তৈরী করা।

হুইটম্যান বললেন :

The whole theory of the universe is directed un-  
erringly to one single individual—namely to You.

আমি যে স্রষ্টার কর্তৃক পেরাালের বশে তৈরি হই নি, আমার  
একটা অসীম সার্থকতা আছে বলেই আমি তৈরি হয়েছি—এ  
ভাবটাই অপূরণ মহিমার প্রকাশ পেল যখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

আমার দেখবে বলে তোমার অসীম কোঁড়ুল,

নইলে ত এই সৃষ্টিতারা সকলি নিফল। ( বলাকা )

টিক এই কথাটাই আর এক ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেরেছে 'গীতালি'তে—

ধাক্কা তোমার লক্ষ এই তাম্রা,

তাদের মাঝে আছ আমার-হারা।

সইবে না সে, সইবে না সে,

টানুতে আমার হবে পাশে

একলা তুমি, আমি একলা হ'লে।

তাঁর স্বর্গ যে আমাকেই রচনা করতে হবে। তাই তো মানুষ  
করে তৈরি করলেন আমাকে :

দিরেচ আমার 'পরে তার

তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলকেই তিনি দিয়েছেন। তার বেশী তারা দান করে  
না। আমার কাছ থেকেই কেবল তিনি হাবি করেছেন।

পাখীয়ে দিচ্ছে গান, গায় সেই গান,

তার বেশী করে না সে দান।

আমারে দিচ্ছে স্বব, আমি তার বেশী করি দান,

আমি পাই গান।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'বলাকা'র লেখা হয়েছে :

আর সকলেরে তুমি দাও।

তবু মোর কাছে তুমি চাও।

যেহেতু তাঁর স্বর্গটি রচনা করার তার দিবে তিনি আমাকে  
পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে সেই যে 'কাজনী'র কবিশেখরের ভাষায়  
বাঁচার মত করেই বাঁচতে হবে। বাতে বাঁচতে পারি মুক্ত হয়ে,  
পূর্ণ হয়ে, আত্ম মানুষ হয়ে তারই জন্ত আমি স্রষ্টার কাছ থেকে  
নিরে এসেছি অধিকার—ভয়ভাবের জীবনযাপনের অধিকার, শিকার  
অধিকার, নিজেব মতকে ভাবার বাস্তব করার অধিকার, আরও  
নানা অধিকার। এই অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হতে দিলে জীবন হয়ে  
থাকে অবজ্ঞীত, আত্মপ্রকাশ আর সম্ভব হয় না। বুগ বুগ ধরে

মাহুব স্বাধীনতার জন্ত যে সংগ্রাম করেছে—সে তো যেচ্ছাচারী হবে বলে নয়, জীবনকে সার্থক করবে বলে। এই তো নৈবেদ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

তুমি মোরে অর্পিত হও অধিকার,  
ক্ষুণ্ণ না করিয়া কত কণামাত্র তব  
সম্পূর্ণ সঁপিরা দিব তোমার চরণে  
অকুণ্ঠিত বাণি' তাতে বিপদে মরণে,  
জীবন সার্থক হবে তবে !

কেন স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করব ? অধিকার রক্ষার দৃঢ় পণ হবে ? রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

তুমি বা দিবেছ মোরে অধিকার ভার  
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমাত্র তোমার ।

স্বাধীনতার উপরে কারও হস্তক্ষেপ যদি সঙ্গ করি, অধিকার যদি কাউকে কেড়ে নিতে দিই তবে আত্মপ্রকাশ সম্ভব হবে না, বাঁচার মত বাঁচতে পারব না, আর জীবন যদি পূর্ণ না হয়, শুদ্ধ না হয়, মুক্ত না হয় তবে যে দায়িত্ব দিয়ে তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই স্বর্গ রচনার কাজটি কেমন করে সফল হবে ?

আমাকে প্রয়োজন আছে স্রষ্টার, আমাকে দিয়ে তিনি রচনা করতে চান তাঁর স্বর্গ—এই তথ্যটি স্বীকার করে নিলে একথাও সত্য হয়ে দাঁড়ায় যে, আত্মপ্রকাশই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর বন্ধন মোচনের দ্বারা আত্মপ্রকাশই কি আমাদের মঙ্গলের গভীরতম কামনা নয় ? কেউ যদি আমার ব্যক্তিত্বকে দাবিয়ে বেখে, আমার আত্মপ্রকাশের পথকে বিঘ্নসমূহ করে আমাকে ব্যবহার করতে চায় তার নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য—সে আমার বেঁচে থাকবার অধিকারকে অস্বীকার করে। আর যে আমার বেঁচে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করে সে তো দেবতার বিরুদ্ধেই অপরাধ করে। দেবতার কাজ করার জন্তই বার নুই তাকে স্বার্থ-সিদ্ধির বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার উদ্ভৃতা যে প্রকাশ করে সে আসলে দেবদ্রোহী আর দেবদ্রোহীকে কখনও ক্ষমা করা উচিত নয়। এই বিরাট তথ্যটি ঠিক ঠিক মনঃসম্মত করতে পারলে তবেই বুঝতে পারব কেন রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্যে লিখেছিলেন :

মোর মনুষ্য সে যে তোমারি প্রতিমা,  
আত্মার যজ্ঞে হয় তোমারই মহিমা  
মহেশ্বর ! সেখান যে পদক্ষেপ করে,  
অবমান বহি' আনে অবজ্ঞার ভরে  
হোক না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে  
তাতে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে'  
সর্ব শক্তি লয়ে মোর ! বাক আর সব  
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব ।

মনে পড়ে বার্লড শ'রের কথা :

Now to treat a person as a means instead of  
an end is to deny that person's right to live.

মাহুবেবের অধিকারে যিনি এমন গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন, স্বাধীনতার অধিকারে মাহুবেবের মাহুবেব কখনও তিনি বিপদের ভরে দীর্ঘ থাকেন নি, নিজের থাকেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন Love thy neighbour as thyself—এই মহাজন বাক্যে। প্রতিবেশী যদি মাহুবেবের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে থাকে—কতি কি একা তখু তায়ই ?

যাবে তুমি নীচে কেল সে তোমাতে বাঁধবে যে নীচে ।

পশ্চাতে যেবেছ যাবে সে তোমাতে পশ্চাতে টানিছে ।

আমাদের পরম্পরের জীবন যে একই সূত্রে গাঁথা। প্রতিবেশী যদি শিকার আলো থেকে বঞ্চিত হয় আমাদেরও কল্যাণ তার দ্বারা ব্যাহত হবে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে

আড়ালে ঢাকিছ যাবে

তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান ।

সুতরাং আত্মসম্মান যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই তবে পড়শীর সম্মান যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকেও অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। তখু ভালবাসার ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার সমস্ত সমাধান হতে পারে, বার পরপরকে ভালবাসে হুনিয়ার অপরাধের ধাক্কা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব। মার্কিন কবি ভাষায়—

Be not dishearten'd, affection shall solve the  
problems of freedom yet.

তাই ত দেখতে পাই যেখানে যেখানে মাহুবেব স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছে সেখানে সেখানে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কবির কণ্ঠ জলনদীরোধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ভারত এবং ও'ভারার—মানব-শত্রু এই দুই অশুচিতে মিলে পঙ্কাবে বধন অত্যাচারের তাণ্ডব নৃত্য চালিয়ে ছিল তখন সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে ভারতের যিনি প্রথম উপাধি বর্জন করে অসহযোগের পথ দেখিয়েছিলেন—তিনি রবীন্দ্রনাথ। কার্জনী উদ্ভবের বিরুদ্ধে বাংলা বধন-বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তখনও বিদ্রোহী স্বদেশাত্মার বাণী-মুষ্টি আমরা দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। সেদিনের বড়ের রাতে রবীন্দ্রনাথের ক্রুর বীণায় আঙনতবা সুর বিপ্লবীদের অগ্নিপতির পথে যুগিয়েছিল প্রেরণা, উৎসাহিতদের হৃদয়ে তুলেছিল আশার তরঙ্গ, উৎসাহিতদের চিত্তে আগিরেছিল আসন্ন সর্বনাশের বিভীষিকা।

মহাচীনের উপরে জাপানী আক্রমণের বর্বরতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তকে কি রকম ক্ষুব্ধ করেছিল তার প্রমাণ কবির সেদিনের স্তব-বলীর মধ্যে দৃষ্ট হয় আছে। জাপানী কবি নোজিমি স্তবে এই নিয়ে ভারতীয় কবি যে মতবিরোধ ঘটেছিল তার কথাও আজ ইতিহাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবির সেদিনের ঐতিহাসিক পত্রাবলীর মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি একটা বিরাট প্রাণকে চীনের কান্নার তাঁর প্রাণ উঠতে হলে আর সেই বিদ্রোহ-চিত্ত লেখনীর মুখে আগেরগিরি অগ্নি উল্লাস করছে।

১ : 'মুন্ডাবান' নাটকে রাজা রণজিৎ কুমার প্রজাদের হত্যাকাণ্ডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাদের কাছ থেকে রাজনা আদায় করতে চান। অল্প দিনে তারা তখন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। রাজাকে রাজনা দিতে গেলে তাদের কুমার অল্প দিনে দিতে হয় আর কুমার অল্প দিনে জোবের সঙ্গে বিচার চলবে না। রাজবের বিচার অধিকারের উপরে রাজার এই উচ্চতর পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট করেন নি। নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে খাড়া করে তার মুখ দিয়ে তিনি রাজাকে বলিয়েছেন :

‘আমার উত্তর অল্প তোমার, কুমার অল্প তোমার নয়।’

রণজিৎ জিজ্ঞাসা করলেন :

রাজনা দেবে কিনা বল।

দৃষ্ট কণ্ঠে বৈরাগী উত্তর দিল,

না, মহারাজ, দেব না।

উৎপীড়িতরা ভয়ে উৎপীড়কের হুকুম তামিল করে বললই ত পৃথিবীতে অত্যাচারের আজও অবসান হ'ল না।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন :

তুমিই প্রজাদের বারণ কর রাজনা দিতে ?

বৈরাগী শান্ত স্বরে আবার জবাব দিল :

ওরা ত ভয়ে দিবে কেলেতে চার, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি। ভর মানে মূল্যবান বলে বা মনে করি তাকে হারানোর ভয়, সম্পত্তি এবং শৈশব প্রাণ হারানোর ভয়, বেতের ভয়। বিজ্ঞান করলে রাজশক্তি বেত মারবে, মারলে লাগবে আর লাগার অভিজ্ঞতা দুঃখের। দুঃখকে আমরা সর্বপ্রথম এড়াতে চাই। আর মারকে আমরা ভয় করি বলেই অত্যাচারীকে কুর্নিশ দিই এবং অত্যাচারীকে কুর্নিশ দিই বলেই তার আকাশপাশী লাগে।

কিন্তু লাগছে না বলা যে শক্ত। প্রজারা এই জবাবই দিয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে। জবাবের উত্তরে বৈরাগী বা বলেছে তা মনে রাখবার মত কথা :

আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে অন্তর, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।

বৈরাগীর কণ্ঠে এই যে বাণী—এই বাণীর মধ্যেই রয়েছে ভয়কে জয় করার বহু। আমাদের বা সত্য পরিচর তার পরিমাপ তো মাংসপিণ্ড দিয়ে হবার নয়। শরীর আমার কিন্তু আমি তো শরীর নই। মানুষের ভিতরে আর একটা যে সূক্ষ্ম মানুষ রয়েছে—সেই মানুষটিই হ'ল আসল মানুষ। সে আত্মা, তার লাগে না। ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই আত্মার শক্তিকে ব্যবহার করার অগ্রিম দিয়েছেন প্রজাদের কানে। শরীর থেকে আত্মা পৃথক; শরীর নশ্বর, আত্মা অবিদ্যমান—এই শাস্ত্র সত্যকে স্বীকার করতে পারলে তবেই আত্মার শক্তিকে সাক্ষ্যের সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব। সত্যাত্মের মধ্যে আত্মার এই অপরাধের শক্তির

প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাঁদের নায়ক-নারিকা করে তৈরি করেছেন তারা কেবল ভাল মানুষ নয়, তারা শক্ত মানুষও। তারা শুধু জনস্বজন লোক নয়, তাদের জীবনের হালে রয়েছে জ্ঞান। ধনঞ্জয় বৈরাগী একদিকে যেমন প্রজাদের কান্নার কঁকড়ে আর একদিকে তাদের কানে সত্যাত্মের মন্ত্র দিয়ে মুক্তির পথও তাদের দেখিয়ে দিয়েছে।

নারীজীবনের মধ্যস্থত পুরুষের অহরহ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে বিজ্ঞানতত্ত্বের সুর। যোগাযোগ উপভোগ্যে অযোগ্য মনুষ্যদের হাতে কুমার লাঞ্ছনার অন্ত নেই। স্বামীর সেই লাঞ্ছনাকে শিরোধার্য করে কুমার স্বত্ত্ববাহিনীতে বাস করাই কর্তব্য কিনা—মোতির মা এই প্রশ্নের উত্তরে বিপ্রদাস বা বলেছেন বাংলা-সাহিত্যে তা বহন করে এনেছে লড়াইয়ের হাওয়া। বিপ্রদাস জবাব দিয়েছেন :

“দ্বিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে বলেছি কুমার যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম জ্ঞান করে গড়েছেন। কুমার অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কায়ও নেই, চক্রবর্তী সম্রাটেরও না।”

মোতির মা জবাব শুনে নিরস্তর। স্বামীর আলয়ে বিশ্ব ঘটে মেয়েদের পক্ষের লোকেরাই তো পারে ধরাধরি করে, এ যে উটো কথা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যারা পথিকৃত তারা তো পুঁথির ছেঁলে কথা বলেন নি, তারা উটো কথাই বলেছেন। ‘কান্ডনী’তে নববোবনের দল গান ধরেছে :

দেশে দেশে নিশ্চয় রটে,

পদে পদে বিপদ ঘটে,

পুঁথির কথা কইনে মোরা

উটো কথাই কই।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে উটো কথাই শুনিতেছেন। বতসব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড় নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল গোপন করেছে, তারি বাসা ভাঙবার দিন এল। বিপ্রদাস ‘যোগাযোগে’ কুমার মাথার হাত দিয়ে বলেছে :

ভূই তো ইংরেজী সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছিল, বুঝতে পারিস নে, এই বুকম বত দল-গড়া শাস্ত্র-গড়া নির্মিতকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে।

পাতিভ্রম্য ধর্মের নামে কর্তব্যের দোহাই দিয়ে পতি চেয়েছে পত্নীকে শৈলাঘরের পুতুল করে রাখতে। Doll's House নাটকে ইবসেন পুতুলের এই শৈলাঘর ভেঙে দিয়ে ‘নোরা’কে মুক্তি দিয়েছেন। যে-লড়াইয়ের বড় ইবসেন এবং তাঁর শিষ্য বার্গার্ড শ' এনেছেন পাশ্চাত্য-সাহিত্যে অন্ধ দাসত্বের বাসা ভেঙে নারীকে মুক্তি দেবার জন্তে—সেই বড়েরই স্বাক্ষর রবীন্দ্র-সাহিত্যে। জগৎ জুড়ে নারীর মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলা-সাহিত্যের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। সাহিত্য নারীকে পৌরব দেবার দিক থেকে সাহিত্যের



ভিত্তর দিগে রবীন্দ্রনাথ বা করেছেন তাতে অনারাসে বলা বেতে  
পারে রবীন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যে ইবসেন।

গল্পগুচ্ছে 'দ্বীপ পত্র' গল্পটি বাংলা-সাহিত্যে ঠাঁড়িরে আছে  
নারী-বিরোধের জয়ধ্বজ উড়িয়ে। যেজো বোঁ তীর্থ থেকে স্বামীকে  
লিখেছে :

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নব্বয় মাখন  
বড়ালের গলিতে কিবব না। আমি বিদ্যুকে দেখেছি। সংসারের  
স্বাক্ষণনে মেয়েমানুষের পরিচরটা যে কি তা আমি পেয়েছি।  
আর আমার দরকার নেই।

যে সুভার জাল পাতিব্রত্যাধর্ষের মুখোস পরে নারীর জীবনকে  
দিয়ে বেগেছে নিদারুণ অসম্মানের মধ্যে তাকে ছিন্ন করবার জন্ত  
দরকার ছিল জোয়ের সঙ্গে 'না' বলবার। দ্বীপ পত্রে সুপালের কণ্ঠ  
থেকে উৎসারিত হয়েছে এই 'না'। পতিগৃহে অসম্মানের মধ্যে  
হিতিকে সুপাল স্বীকার করল না।

'পলাতক'র তরুণী মঞ্জুলিকাকেও তিনি তথাকথিত কর্তব্যের  
বলকাঠে বলি হতে দেন নি। পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে তাকে

করাচাঁবাসে পাঠিয়ে দিগে কবি জোয়ের সঙ্গে তার বাঁচার  
অধিকারকেই স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী, রবীন্দ্রনাথ পথিকৃত। রবীন্দ্রনাথ একহাতে  
পুরাতনকে ভেঙেছেন, আর একহাতে নতুনকে গড়েছেন। হুইটম্যান  
লিখেছেন 'By Blue Ontario's Shore' কবিতার :

For the great Idea, the idea of perfect and free  
individuals,  
For that, the bard walks in advance, leader of leaders

কবিরের কণ্ঠে মহৎ আদর্শের জয়ধ্বনি। এই মহৎ আদর্শ হ'ল  
মানুষের মুক্তির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের রক্ত বীণায় তাই ওনতে  
পাই বিকল-ভাঙার প্রচণ্ড আহ্বান। বা-কিছু মানুষের সম্মানে  
আশ্বাস দিয়েছে তাকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও ক্ষমা করেন নি।  
মানুষের লাঞ্ছনাকে কখনও তিনি প্রজ্ঞা দেন নি। তাঁর হাতে  
স্বাধীনতার জয়-কেতন, তাঁর কণ্ঠে মুক্তির বন্দনাগান। মানুষকে  
অসম্মানের মধ্যে টেনে আনবার বড়রক্ত বধন চলেছে দিকে  
দিকে তখন রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বড় দরকার। এই প্রয়োজন  
সম্পর্কে আমরা বত সচেতন হব আমাদের ততই মজল।

## মুক্তি

("Liberation" by Sri Aurobindo)

### শ্রীরবি গুপ্ত

করেছি নিক্ষেপ ঘোর আকর্ষণ-নৃত্য মানসের,  
রহি এবে চিরমুক্ত বিনিস্পন্দ আশ্র-স্বরূপতার ;  
কালজরী সূত্ৰজরী বহু উর্ধ্বে এ-মর্ত্য জগতের,  
এব মর্মে যে বিদ্রুত আমারি শাস্ত প্রধারায়।

লভিয়াছি পরিভ্রমণ, ক্ষুদ্র-আমি হয়েছি নিঃশেষ,  
সুভার অতীত আমি, আমি এক, অনির্কলচরী  
সমুদীর্ণ আমারি রচিত মহাবিশ্ব যেথা শেব,  
উঠেছি জাগিয়া লভি' রূপ অন্যর অধারগীর।

স্বমহান অনন্ত আলোকে হয়েছে নীরব মন,  
জগৎ নিত্যতে শান্তি ও আনন্দ-স্বরূপান বাক্যে,  
অজুড়তি অস্বীকারে স্পর্শ-শব্দ দুষ্টির বন্ধন  
কারা যোর বিদ্যু এক চিরগুরু অসীমের মাঝে।

একক সত্তার আমি অচঞ্চল হবব পরম  
নহি আমি রূপ কোন, আমি সব—স্বাধর-জগৎ।

## নিঃশেষের দাম

শ্রীকালিদাস রায়

বা ছিল ঘোর বিলিরে দিলাম নির্ঝিচারে।  
আপন পথে বইল যবে ভারে ভারে।

বিলিরে দিলাম বাখার মেঘের পাখার আঁখিজল।  
ঘোর স্বপনের কাঙ্ক্ষনী হুল চৈত বোশেখের কল।  
প্রেম-পিপাসার তপ্ত শুভ্র কুলায় কল কল,  
আর—শেষ শব্দের সৃষ্টির সোনা বায়ে ভারে।

এখন আমার শূন্য প্রান্ত বোলাকুলি,  
পোপন আমি করব না কই খোলাকুলি।

হেরন্তে আজ শুধু জরায় অন্ধ টলমল,  
সন্ধ্যাতরীণ কণ্ঠ, এ চোখ নিশ্চল পিল্লল।  
তোমার দিতে দেখে যনে নেই কোন সফল।  
হোক—ঈর্ষ হাতে তোমার মাখে কোলাকুলি।

# পদাবলী-সাহিত্যে রায় বসন্ত

ঐপূর্ণেন্দু গুহরায়

ভারতের অভ্যন্তর প্রদেশের মত বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার সে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঐতিহ্যের প্রেমধর্ম। ঐতিহ্যের অত্যাধিকার বাংলার আত্ম-প্রতিষ্ঠার অঙ্গরোদগম। অগতে কেউ কখনো বা শোনার নি, ঐতিহ্যের মুখে সেই অমিয়-ভাগবত শুনিবে বাংলা বহু দেশের চৈতন্য সম্পাদন করেছে। পরমপ্রেম রূপ পরিগ্রহ করে বাংলার চৈতন্য-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল। আর সে রূপের মহিমা তৎকালীন শিক্ষাদীক্ষা, জাতীয় সভ্যতা-সংস্কার, শাস্ত্রীয় ইতিহাস, তাত্ত্বিক বামাচার, মার্যাবাদের শুদ্ধ বৃত্তিতর্ক ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে শীর্ণা বাংলাভাষা তটিনীর উচ্ছল তরঙ্গতরঙ্গের মত পরিব্রতা ও প্রবলতা পেয়ে বহু হয়েছিল।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে তথা বৈষ্ণব গীতিকাব্যে বৈষ্ণব কবিরের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে অমুশীলিত হয়েছিল এই ষোড়শ শতাব্দীতে। আর ঐ গীতিকাব্যের ভিতর দিয়ে মৈথিল সংমিশ্রণে বঙ্গসাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। পদাবলী-সাহিত্যে বাংলার বৈষ্ণব কবির প্রেমের যে নিকাম মাধুর্য বর্ণনা করেছেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে তাতে ভাস্বর, মধুরোজ্জ্বল। পদাবলী-সাহিত্যে সেই প্রেমের রাজ্য, নয়ন-জলের রাজ্য। বাহ্যিক নয়নে-নয়নে রেখেও ধীরে বাবধান ভেবে কাতর হয়েছেন, দর্শনে বিগ্ন জন্মায় বলে আঁখির পলককে অভিষাপের মধ্যে গণ্য করেছেন, ধীরে প্রেমের গীতি ধর্মবেদী থেকে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শোনার, সেই কবিরের ব্যাকুলতার ইতিহাস, বাহ্যিকের সঙ্গে মিলিত হবার প্রাণাবেগের ইতিহাস এই পদাবলী।

পাঠান রাজত্বের শেষভাগে ঐতিহ্যই প্রধান চরিত্র। পাঠান-কুলভিলক হুসেন শাহের আমলে দেশব্যাপী বৈষ্ণব ধর্মোন্মোলন আগে। ফরাসী-বিপ্লব যেমন সমগ্র ইউরোপের মতিগতি কিরিয়ে দিয়েছে, চৈতন্য-বিপ্লব তেমনি বাংলাকে গড়েছে এক নতুন ছাঁচে। প্রতাপসাহিত্য-বসন্ত রায়ের বশোরও সে ভাববিপ্লব-রক্তে আহুতি দিতে পরাধ্ব্য হয় নি। সেই প্রাচীন বশোরের (অধুনাতন খুলনা জেলা) ববন হরিদাস ও রায় বসন্ত আপন আপন গ্রাম ও রাজ্যের গভী ছাড়িয়ে বৈষ্ণব ধর্মের স্মৃতি স্তম্ভরূপে দেশের অবল্য সম্পাদন হয়ে রয়েছেন।

রায় বসন্তকে বাদ দিয়ে বঙ্গের ইতিহাসের কথা চলে না, খুলনার ইতিহাসও হয় না। হরিদাসের অলৌকিক

প্রেমোন্মাদনা ও রায় বসন্তের অকুণ্ঠিত প্রজ্ঞা ও প্রেম একত্র করলে ঐতিহ্যের অভাস পাওয়া যায়। পূর্বাশার উদয়-দিগন্ত যেমন নব সূর্যোদয়ে রক্তিমাতার রঞ্জিত হয়, ঐতিহ্যের মহাবির্ভাবে তেমনি রায় বসন্ত প্রমুখ তাঁরই মতে তাঁরই ভাব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রভাত-বিহঙ্গের প্রথম কাকলীর মত পদকর্ড। রায় বসন্তের কণ্ঠ-কাকলী ভগবৎ মাধাশ্যে সপ্তগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

রায় বসন্ত বঙ্গ কায়স্থের গুহবংশের সন্তান। বিরাট গুহের এগার পুরুষ অবন্তন রামচন্দ্র গুহের মধ্যমাস্থ জগদানন্দ গুহের পুত্র এই রায় বসন্ত। আদি নাম জানকী-বল্লভ। খ্রীষ্টীয় ১৫০৪ অব্দে সপ্তগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। সে সময় জানকীবল্লভের পিতামহ রামচন্দ্র গুহ এবং জ্যেষ্ঠভাত ভবানন্দ, পিতৃদেব জগদানন্দ ও পিতৃব্য শিবানন্দ সপ্তগ্রাম-রাজসরকারে চাকরি করতেন। ঘটনাক্রমে উপরিতন কর্ম-চারীর সঙ্গে প্রবল মতভেদ হওয়ায় সপ্তগ্রামে রামচন্দ্র চাকরি ত্যাগ করে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গোড়ের নবাব-সরকারে প্রব্রিষ্ট হন। মহম্মদ খাঁ শূরের পুত্র বাহাদুর শাহ তখন বঙ্গাধিপ। পরে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কররাণী গোড়ের মসনদে বসলে ভবানন্দ-প্রমুখ ল্লাত্বজর সুলেমানের সূচুষ্টি লাভ করে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন। সুলেমানের বারজিহ ও দাউদ নামে পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে ভবানন্দ-পুত্র ঐহরি এবং জগদানন্দ-পুত্র জানকীবল্লভের সাতিশয় সৌহৃদ্য জন্মে। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ সিংহাসনারোহণ করে পূর্ব-প্রতিক্রমিত ঐহরিকে “রাজা বিক্রমাদিত্য” এবং জানকীবল্লভকে “রাজা বসন্ত রায়” উপাধি দিয়ে বিক্রমাদিত্যকে প্রধান মন্ত্রী ও বসন্ত রায়কে বাংলার প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বসন্তের ঘোঁট এগারটি পুত্র। তন্মধ্যে ইত্নার কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের কন্যা রাণী বিমলাদেবীর গর্ভজাত দশম পুত্র বশোর-রাজ রাজা চন্দ্রশেখরের কেবলমাত্র নূরনগর ও খোড়গাহিহিত বংশধারাই বর্তমানে রাজা বসন্তের একমাত্র রাজবংশধারা। নবম পুত্র রাজা রাঘবের (কচুরারের) একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত কোন পুত্রসন্তান ছিল না। অবশিষ্ট পুত্রদ্বয়ের মধ্যে অষ্টম পুত্র রমাকান্ত ব্যতীত আর কারো বংশ নেই। পুঁড়াগ্রামস্থিত রমাকান্ত বংশীরেরা রাজা ও রাজোপাধি বঞ্চিত।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদের পরাজয় ও হত্যার পর বখন তোড়মর ভাঙার আসেন, সে সময় রাজা বসন্ত বাংলা রাজ্যের রাজত্ব-হিসাব প্রস্তুত করার পক্ষে প্রধান সহায়ক হন। পরে

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তোড়মন্ড বাংলা-বিহারের শাসনকর্তা নিরুক্ত হয়ে এসে ভবিষ্যতে এদেশে রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন গোলযোগ না ঘটে, তজ্জ্ঞ তিনি সমগ্র বাংলার-রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাব প্রস্তুতকালে রাজা বসন্তের কাছ থেকে পূর্বে যে হিসাব পাওয়া গিয়েছিল, তাই প্রধান সম্বল হয়। এ দেশীয় রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে রাজা বসন্তের হিসাবই এখনো ভিত্তিস্বরূপ হয়ে রয়েছে। "In actuality, the matter of realisation of land revenue is based on the accounts supplied by Raja Basanta Roy."—"Pratapaditya" by Nagendra Nath Roy. সেই ভিত্তিই উপরে হয়েছিল লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অল্পাধিক পরিবর্তনের সঙ্গে তা এখনও চলছে। (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, বঙ্গীয়-সমাজ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) এই কারণে রাজা বসন্তের কাছে গোপল স্মার্ট আকবর তো বটেই, বাংলা বা বাঙালী চিরদিন ঋণী।

খ্রীষ্টীয় ১৫৭৭ থেকে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের সুরু। বিক্রমাদিত্য রাজা মাত্র, বসন্ত রায়ই রাজ্যের সব। বিক্রমাদিত্য-পুত্র রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃবাদেব এই রাজা বসন্তের চরিত্র সত্যই অপূর্ণ। যশোর-রাজ্য অভিনয়ে তিনিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যশোরের যাবতীয় ভার ছিল তাঁর উপর। "সারতত্ত্বতরঙ্গিনী" গ্রন্থে আছে, "যশোরের প্রতিপত্তির যুগে আবির্ভাগত জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলেছিলেন :

"যশোর-পুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।

তক পকানো ব্যাস, বসন্ত কালভৈরবঃ।"

তিনিই মন্ত্রী, তিনিই কোষাধ্যক্ষ, তিনিই সেনানায়ক, তিনিই একনিষ্ঠ প্রজাতন্ত্রের প্রতিপালক। যশোর-সমাজের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই নেতা। রাজা বসন্ত অসম-সাহসী ও অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রের বীরবপুতে কঠোরতার ছায়ামাত্র ছিল না। মূর্তি তাঁর সর্বদা নৌম্য, শাস্ত ও গভীর প্রতিভাব্যঞ্জক। সাম্প্রদায়িক বিষয় পরিশূন্য এই মহাপুরুষ ছিলেন সত্যত দেবদ্বিজে ভক্তিমান। পণ্ডিতের সমাদর তাঁর কাছে ছিল, তিনি গুণের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিতে জানতেন। নিজে যেমন বিদ্বান, তেমনি সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইতিহাসে বা প্রবাদে বা কুলসাহিনীতে তাঁর সম্বন্ধ যাকিছু সঙ্গিত আছে তা থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন তেজস্বী বীর, কর্মকুশল, রাজসি এবং মহাপ্রাজ্ঞ। চন্দ্রবর্ষাপের প্রাচীন কারিকায় আছে :

"কৃতী বসন্ত রামোহসৌ শ্রীমান সত্যগোপনঃ।

প্রায় যাবৎ নবরাজ্যে সর্বশাস্ত্রবিচারকঃ।

যশোহর-রাজ্যে সর্বধর্মভূতাবরঃ।

অদ্যোক্তজানবিশ্ব সৌহৃদ্য প্রাপ্ত প্রিয়ঃ সদা।"

অসপত্র রাজস্ব, নিরুক্ত প্রতাপিত্তি, বিপুল অর্থ, প্রভূত যশ, প্রাচুর্যের পরিপূর্ণতা কোনদিন বসন্তকে প্রেলোভিত বা বিচলিত করতে পারে নি। চিরদিন তিনি ধীরগম্ভীর, অনাসক্ত এবং অকৃত্রিমভাবে তাঁর মহৎ জীবন যাপন করে গেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অকুরন্ত দরদ, অন্তহীন প্রেম। ঈর্ষা, ঘেব, সংকীর্ণচিত্ততা ইত্যাদি যে সব চারিত্রিক দৈত্য মানুষের জীবনকে নিরন্তর ক্লিষ্ট করে তোলে, তাঁর চরিত্রের প্রোচ্ছল দীপ্তির কাছে সে সব স্বর্ঘরশ্মির নিকট কুয়াশার মতন ছিন্নভিন্ন হয়েছে।

রাজা বসন্ত আজন্ম বৈষ্ণব। পিতৃদেব গুণানন্দও পদম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব কুলতিলক ত্রীপাদ সনাতনের বন্দাবনের আদিতাটীলাস্থিত ত্রীত্রীমদনমোহন বিগ্রহই গোড়ায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্থামিগণের প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম বিগ্রহ। ত্রীত্রীমদনমোহনের এই মন্দির ভগ্ন ও বিস্মৃতপ্রায় হয়ে যায়। গুণানন্দ গুহই পরে সুরহং কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির নির্মাণ করে দেন। ত্রীজীব গোস্থামী তখন ব্রজ-মণ্ডলের কর্তা। কৃষ্ণলীলা পদগান বসন্তের অতি প্রিয় ছিল। পদকবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় গোড়ে। প্রাণে-প্রাণে মিলন হয়েছিল কবি গোবিন্দের সঙ্গে রায় বসন্তের। রাজারই অনুরোধে গোবিন্দদাস যশোরে আসতেন এবং প্রতিবারে দীর্ঘকাল রাজসভায় অবস্থান করে যেতেন। ("যশোহর-খুলনার ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।) "বঙ্গীয়-সমাজ" গ্রন্থে আছে, "বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস বসন্ত বীরের সভার সভাসদ ছিলেন।" Pratapaditya পুস্তকে আছে, "The famous Vaishnav Po t Govinda Das decorated the courts of Raja Basanta Roy."

রাজা বসন্ত যে শুধু স্মৃকর্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তা নয়। তাঁর অপর দিকের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তিনি স্বভাবকবি। বাংলা ভাষায় ত্রীত্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক মধুর ও প্রেমভাবের বহু সুসলিল পদ তিনি রচনা করে গেছেন। বসন্ত-পদাবলী অপূর্ণানুগু হলেও কয়েকটি পদ বিক্ষিপ্তভাবে এখনও পাওয়া যায়। বসন্ত-গোবিন্দ বঙ্গুয়ুগল পদ রচনা করে পরম্পরকে শোনাতে। কখনও কখনও গোবিন্দের সঙ্গে বসন্তের তর্জার লড়াই চলত। এমন ভাবে ক্ষিপ্ত উত্তর দিতেন রাজা বসন্ত, যাতে করে গোবিন্দদাস বসন্তের কবিত্ব ও অনুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারেন নি। গোবিন্দদাস তাঁর পদাবলীর রাসলীলা প্রসঙ্গে গেয়েছেন—

"কুহিত কুহ কলতকানন বদিকরনিরমাক ।  
রাস বিলাস-কলা-উৎকণ্ঠিত মনোমোহন নটরাজ ।  
কামিনী-কর-কিশলয়-বলরাষিত রাতুল পদ-প্রবিন্দ ।  
রায় বসন্ত মধুপ অমৃতকিত নিশিত দাস গোবিন্দ ।"

গোবিন্দ-পদাবলীর কোন কোন পদে "দ্বিজরাজ বসন্ত" ভণিতা দেখা যায়। যেমন শ্রীশ্রীগঙ্গেশ্বররূপ-প্রসঙ্গে পাই :

"পদতলে অলকি কমল ঘনরাগ ।  
তাহে কলহসে কি নৃপুংস জাগ ।  
গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমত্ত ।  
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥"

অনেকে এই "দ্বিজরাজ বসন্ত" সম্বন্ধে বিভিন্নতা আরোপ করেন। কিন্তু এই পারণা সত্য কিনা সন্দেহ। রায় বসন্ত কার্য হলেও তাঁকে বৈষ্ণবগণ "প্রাকুর বসন্ত" বলে অভিহিত করতেন। এই কারণে দ্বিজরাজ বসন্ত ভণিতা দেওয়া অসম্ভব নয়।—"Raja Basanta Roy who was known under the name of Thakur Basanta Roy by the great Vaishnabas of the time,"—Pratapaditya by N. N. Roy। নটীর-স্বরূপ প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে"—এমন ভণিতা প্রসাদী পদাবলীর বহু পদে আছে। বৈষ্ণব গীতিকাব্য, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে এমন বহু কবির নামাশ্রে "দ্বিজ" ভণিতা দৃষ্ট হবে, যারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, যশোর-রাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যদেব রাজা বসন্ত এবং দ্বিজরাজ বসন্ত যদি না অভিন্ন ব্যক্তি হবেন, তা হলে কবিরাজ গোবিন্দদাসের মাথুর প্রসঙ্গের—

"এতটি নিরহে আপছি মুরছই শুনহ নাগরকান ।  
প্রতাপ আদিত এ রস ভানিত দাস গোবিন্দ গান ॥"

—এই পদে প্রতাপাদিত্যের নামের ভণিতা কেন ? মনে হয়, সেকালে ভণিতায় "দ্বিজ" উল্লেখ এক প্রচলিত লিপি-রীতি ছিল।

রায় বসন্ত স্বীয় ভক্তিনিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় সুবিখ্যাত শ্রীপাদ নরোত্তম গোস্বামীর চিত্ত জয় করে তাঁর শিষ্যই গ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেশ্বর সেনের "বাক্সালা সাহিত্যের কথা" গ্রন্থে আছে—"নরোত্তমের শিষ্যদিগের মধ্যে বড় পদকর্তা ছিলেন রায় বসন্ত।" নরোত্তম গোস্বামী পদ্মাতীরস্থ ষেতরী গ্রামের কার্য জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের একমাত্র পুত্র। তাঁর মায়ের নাম নারায়ণী। নরোত্তম একজন বিশিষ্ট পদাবলী-রচয়িতা ছিলেন। বৈষ্ণব সাধন-বিষয়ক কয়েকখানি ছোট গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে "প্রেমভক্তিসঙ্গীত" সর্বোৎকৃষ্ট।

পদাবলী-সাহিত্যে রায় বসন্তের অসামান্য নৈপুণ্য আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর পদগুলি অমুরাগ ও ভাবরসে ভরপুর।

সাধক বসন্তও অপরাপর সাধকের মত আরাধ্য দেবতাকে মনেছেন—

"আহে সাধ ! কিছুই না জানি ।  
তোমাতে যগন দিবস-রজনী ।  
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি ।  
পরান-পুতলী তুমি জীবনের সঙ্গি ॥  
অঙ্গ-আতরণ তুমি নয়নে অঙ্গন ।  
বদনে বচনে তুমি শরণ রজন ॥"—বসন্ত-পদাবলী

কি গভীর একান্ততা ! সর্বেশ্বরীভূত্বের ভাব ! মানুষী ভালবাসার উৎসর্গ এ অন্তরাগ। আরাধ্য শনের প্রেমে ভক্ত এমনই তন্ময় হয়ে আছেন যে, আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি বসন্তের পাণ্ডিত্য থাকলেও ভাষার অলঙ্কারের উপর তাঁর তত দৃষ্টি ছিল না। বিজ্ঞাপতির মত উপহার প্রয়োগ করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি মরমী ভাবুক ও দরদী ভক্ত—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উপহার অলঙ্কারে বর্ণনা না করে সংক্ষেপে তিনি তাই জীবনকে কুটিয়ে তুলেছেন। কবি আরও বলেছেন—

"তুমি মোর নিজগতে বিভব-বিহার ।  
পরান-পুতলী মোর হিরে মণিহার ॥  
নরগম ঘন মোর সকল সংসার ।  
রায় বসন্ত পহু পীরিতর সার ॥"—বসন্ত-পদাবলী

এখানেও বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের মত সেই প্রণে-প্রাণে মিলন, এ ধাক্কীভাব। জন্মজন্মান্তরেও যেন বিচ্ছেদ নেই। সাধক কবির এই-ই প্রাণ-প্রেম। ভক্ত-ভগবানের এ প্রেমের খেলায় রসাস্বাদ কবি বসন্তও করেছিলেন, করে সে রসের পরিবেষণ করেছিলেন। কবি বসন্তের পরান-পুতলী তাঁর প্রেমাম্পদাকে বলেন—

"তোমা না তেরিয়া আমি কেমনে রহিব ?"

প্রেমাম্পদা উত্তর দেন—

"বধু, তুঁহ দয়ার সাগর ।

হাম নারি মহিহানে এতক আদর ॥"—বসন্ত-পদাবলী

প্রেমিক বসন্তের এ অনুরাগের নিগূঢ়তা কত সুন্দর, কত মর্মস্পর্শী। বিশ্বাসের কত উৎসাহে তিনি পৌঁছেছেন। তাঁর পরান-পুতলী একটি ধ্যানশাস্ত্র-সমাহিত মূর্তি। আর প্রেমাম্পদা সর্বদা দৃঢ়ই যুক্তিতে নিজের দেহমন দিয়ে লীলার বশোপলিদ্ধি করেছে। তার মধ্যে যে মিলন সে কল্পনা করে এসেছে, সেই মিলনের ভাবতরঙ্গ তাকে উবেল করেছে। তার পরেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্র্য নিজের সঙ্গে দেহা-তীতের ও রূপা-তীতের অপাধিব প্রেমলীলার পর্যবসিত হয়ে উঠল তখন, যখন কবি তাঁর প্রেমাম্পদাকে দিয়ে বললেন—

"বধু ! আমি পরান নিছা কেই পিরিতে তোমার ।"

পরান বেখানে নিছিরে দেওয়া হয়, সেখানে হুই এক  
হয়—বিলু সিন্ধুতে লীন হয়ে যায়। সে কথা কবি বসন্তও  
বলেছেন—

“ধনি! তুয়া কিসের গজনা।

তুমি আমি একই পরান ঢলনা।

হোমার আমার গতি মূর্তি একভাব।

একথরূপ রতি এক অন্তর।”—বসন্ত-পদাবলী

আত্মহারা অনন্ত বিশ্বাসপূর্ণ একান্ত সাক্ষনার মধুর  
অভিব্যক্তি! আত্মসমর্পণে যে প্রেমের পরিণতি, সে  
প্রেমের সার্থকতা এখানে প্রাণবন্ত, শাশ্বত। কবি সাধক  
বলেই এই রমৈশ্বর্যের এত গভীরে ডুবতে পেরেছেন।  
ভাববীর বসন্তের পদসৃষ্টির মধ্যে এমন এক শেফালি-শুভ্র  
পবিত্রতা রয়েছে, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না; অথচ  
সে সকল অমুভূতিকে আপ্তত করে দিয়ে যায়। এখানে  
বাসনার কদম্বতা নেই, কামনা এখানে পবিত্র মহিমার  
বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। ভালবাসার জন্তেই কবি তাঁর  
আরাধ্যনকে ভালবাসেন, তাঁকে ভালবেসেই কবি ভূমানন্দ  
লাভ করেছেন। তাঁর সকল পদে এক পরিমার্জিত শুচি-  
বোধ রয়েছে এবং তার মাধুর্য সকল পদকেই অনির্বচনীয়  
করে তুলেছে। এই রসে ভক্ত ভগবান ভিন্ন আর কিছু  
জানেন না, কিছু দেখেন না। ভগবানের আনন্দের জন্তে তাঁর  
চরণে নিজের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে সে নিজেই পরমানন্দ  
লাভ করে। এই রসে ভক্ত আপনাকে পত্নী ভেবে এবং  
ভগবানকে পতি মনে করে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ  
করে। বৈষ্ণবধর্মে স্ত্রীভাবে ভগবানের সেবা বিধি আছে।  
বৈষ্ণবেরা বলেন, রতি বা ভাবের উন্মেষ না হলে সুন্দরের  
সন্ধান পাওয়া যায় না এবং মাদুসঙ্গ ভিন্ন সে ভাবের বিকাশ

হয় না। দার্শনিক নিউম্যান বলেছেন—“If thy soul  
is to go on into higher spiritual blessedness,  
it must become a woman.”

পদকর্তা বসন্তের পদাবলী সজীতধর্মী। শব্দের সাহায্যে  
তিনি মনোরম মাধুর্যের স্ফোরক সৃষ্টি করেছেন। ভাবের  
গভীরতায়, রসের মাধুর্যে, ছন্দের লালিত্যে তাঁর পদ-সাহিত্য  
চিরবিচিত্র, চিরসুন্দর। যে ভক্তির ধারা তাঁর অন্তস্তলে  
অন্তঃস্রোতে বয়েছিল, পরিপূর্ণতায় তা স্ফুটনশীল হয়ে  
গীতিকাব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাকে রসহৃৎ করেছে।  
সরল অনাড়ম্বর ভাষায় ও ভঙ্গীতে মর্মস্পর্শী আবেগ, মধুর  
বিস্ময়তা, মনের সুষমা প্রকাশ করে পদকবি রায় বসন্ত  
অমর হয়েছেন। বিভাপতির প্রেমে যেমন নবীনতা,  
চণ্ডীদাসের প্রেমে যেমন প্রগাঢ়তা, গোবিন্দদাসের প্রেমে  
যেমন আবেগ রায় বসন্তের প্রেমে তেমনি আমরা মধুরতা  
অনুভব করি। তাঁর পদাবলী সোজামুজি অমুভূতিকে  
সক্রিয় করে তোলে। তাই তাঁর পদাবলী-সাহিত্যের কোন  
বিশ্লেষণ, কোন বিচার চলে না। কেবল অন্তর দিয়ে  
উপলব্ধি করতে হয়। দরদী কবি বসন্তের এক একটি পদ  
যেন এক একটি রত্নখণ্ড, যার দীপ্তি যুগে যুগে বাঙালীকে  
বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করবে।

এই মহাভাগ রাজা বসন্ত, এই বরণ্যে স্বিগ্ন বসন্ত,  
এই প্রাতঃসরগীয় পদকবি রায় বসন্ত ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ  
২৬শে চৈত্র, সোমবার, কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে যশোরের  
আপন ছয় আনা অংশের রাজধানী “রায়গড়ে” মৃত্যুবরণ  
করেন। তৎক্ষণীয়েরা আজও এই মৃত্যু-তিথি প্রতি বৎসর  
উদ্‌যাপন করে আসছেন।



# বর্ষণ-মজ্জিত রাতের বিরহ-বিধুর পত্র

শ্রীসঙ্ক্যারানী মজুমদার

সুচরিতাম্,

...আমাদের এখন যা বয়েস, এ বয়েসের প্রেমকে প্রবীণ মাত্রেই ঐতির চক্ষে দেখেন না! তাঁদের বিশ্বাস, আমরা যে প্রেমিকার কণ্ঠে মালা পরাই বা প্রেমিকার মালা গলায় পরি, এই বিনিময়-মালিকা কণ্ঠকে অতিক্রম করে কোন মতেই হৃদয় পর্যন্ত প্রসঞ্চিত হতে পারে না। ত্রীপাদ রূপ-গোষ্ঠামীর মত বিশেষ বিশেষ সজ্জায়েরা হয়ত নবীন প্রেমের মহিমা প্রচারে বলে থাকবেন—

ধনস্তাং নবঃপ্রমা যন্তোমীনতি চেতসি।

অন্তবান্ভিরপস্ত মুদা হৃৎ হৃৎগমাঃ॥

এ ছাড়া সব শেষালের একই রা। সকলেই Friar Laurence-এর মত বলেন :

"Young men's love then lies  
Not truly in their heart, but in their eyes."

এ প্রেমকে প্রেমই বলেন না, কেননা তা দেহ-কামনার ক্রোড়ে ক্লিন্ন,—যা জৈব-বন্ধনে আবদ্ধ বা biological তা কাম, প্রেম নহে; প্রেম হচ্ছে নিছক anti-biological বা জৈব গতি বিরোধী। এ-কথা তারা স্বীকারই করতে চান না যে—

"Love should be a tree whose roots are deep in the earth but whose branches extend into heaven."

অথবা :

"জৈববন্ধনের মধ্যে মানুষ আবদ্ধ। যদি সে বন্ধনের কোন মুক্তির পথ থাকে তবে সে পথও এই বন্ধনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। তাই কাম প্রেমের বিরোধী হইলেও কামকে অবলম্বন করিয়াই প্রেম উৎপন্ন হয় পক্ষে পক্ষের উৎপত্তি, অথচ পক্ষ থাকে গভীর জলের মধ্যে ক্লিন্নতায় অবসন্ন হইয়া, আর পক্ষজ মৃণাল-দণ্ডের উপর ভর করিয়া পক্ষে নিরুচ্চল হইয়া সূর্যের দিকে, বিধের দিকে, আপন বদন-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আপন-দৌরভে বিশ্বের রস আপনাদের মধ্যে অমুভব করে।"—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তাই আমার হৃদয়ের প্রাত্যহিক প্রেম-স্মৃতি পর্যাবসিত হয়েছে অবিমিশ্র নীরবতায়। কিন্তু ঘনায়মান মেঘপুঞ্জ—অবিরল বর্ষণের মধ্যে কি যে অজ্ঞাত রহস্য আছে—নীরব আমাকে থাকতে দিল না কিছুতেই। বাদল, মেঘ এরা এমনি করে প্রণয়ী-চিন্তকে আকুল করে বলেই বুঝি অমর হয়ে আছে প্রেমের কাব্যে। 'মেঘদূতে' দেখি, মিলন-বিরহের উদ্দীপক রূপে বর্ষা চির-প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে প্রেমের দেউলে। প্রোবিতকান্তের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবার জন্তে

ঘটকপর্বও কালিদাসের মত মেঘকে বরণ করেছেন প্রেমের যোগ্য দূতরূপে। জয়দেবের অমর কাব্যারম্ভও এই চন্দ্রসমাক্ষর প্রদোষের পুঞ্জিত মেঘছায়ে।

মেঘৈশ্চ তুরমধঃ বনভবঃ শ্রামান্তমালদ্রমৈ-

নৃত্যং ভীষণয়ঃ স্বমব তপিমঃ রাধে গৃহং প্রাপয়।

ইংঃ নন্দনিন্দেদেবতঃ নিহত্যাঃ প্রত্যাককুঞ্জদ্রুমঃ,

রাধামাধবয়োঃ স্মৃতি যমুনান্নৈ রজঃকেলয়ঃ॥ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্

এখানে রাধামাধবের নীল যমুনাগুলিনস্থ কেলি-বিলাসের উদ্দীপনময়ী প্রাকৃতিক অবস্থাকে যা অমুপমতায় মণ্ডিত করেছে সে এই তমালবনরাজী শ্রামলিত মেঘমত্তর সঙ্ক্যাব ছায়াচ্ছন্নতা। এমনতর প্রত্যাসন্ন বাদলদিনে প্রণয়ী-হৃদয় যে বিরহ-বিধুরতায় অতীব কাতর হয়ে ওঠে, তার চিত্র অর্ধ্য-কবির রামায়ণেও দেখা যায়। কবির গুরুগম্ভীর নিনাদকারী মেঘমালায় আবৃত অম্বর, মাল্যবানে অবস্থানকালে রামচন্দ্রের সীতা-বিরহ নূতন করে উদ্বোধিত করেছে। নবাবুধারায় নিষিক্ত হয়েও ভ্রমংকুল কদম্বপুষ্পের প্রতি ধাবিত হতে নিরস্ত হয় না। এই ঋতুতেই—

"প্রবাসিনো যান্তি নরঃ স্বদেশান।"

সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বিরহিত বর্ষার মাসগুলি যে শত বৎসরের মত দীর্ঘ বলে অমুমিত হবে, এ আর আশ্চর্য্য কি—

"চতোরো বার্ষিকা মাশা গতা বর্ষণতোপমাঃ।"

বার্ষিকির রামচন্দ্রের মত 'নরঃ প্রমা'ই যদি বাদলদিনে এমন দশাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে আমাদের মত ভোগসুখী জনের যে কি দশা দাঁড়ায় সহজেই অনুমান করতে পার। সুতরাং আজ তোমায় কিছু বলতে গিয়ে বিহ্বলতাবশতঃ কোথাও চাপল্য প্রকাশ করে ফেলি, মাফ করবে নিশ্চয়। সত্যি বলতে কি, জগতে যেখানে যত প্রির-বিরহী রয়েছে, আজকের দিনে তারা তাদের সর্বপ্রকার চাপলোর জন্তে তাদের আপন আপন প্রেমাস্পদার ক্ষমার পাত্র। ডক্টর নীহারবল্লভ রায় একস্থানে রবীন্দ্রনাথকে 'যৌবনে বৈরাগী' অভিধা প্রদান করেছেন, তাই রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন—

হে নিরুপমা,

চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ে ক্ষমা

এলো আদ্যের প্রথম দিবস,

বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবস,

বকুলবীথিকা মুন্ডে মত্ত কানন-পরে।

দবকদম্ব নদীর গর্বে আকুল করে। 'অবির' : কবিতা

এখানে 'এলো আষাঢ়ের প্রথম দিবস' প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা হচ্ছে, 'বর্ষণঘন শীতল আঁশারে জগৎ ঢাকা।' 'মেঘদূতে'ও দেখা যায়—

'মেঘালোকে ভবতি সখিনোঃ পাঙ্কথারতি চেতঃ

কষ্ঠাঞ্জেবপায়িনি জনে কিং পুনর্দৃশমংহ' ॥

স্বর্ষাৎ, সুদূর, প্রাষিতকাস্তর তো কথাই নাই, এমনতর বাহুল্যমানে প্রণয়িনী কণ্ঠস্বর ভাগ্যবানেরও হৃদয়ে বিরহ সন্মুখিত হয়।

'নব মেঘ তেরি', স্বপ্নী সে, তাহাবে

অকারণে করে মন-কমন,

বিরহী কি বাণে নিরুত সে, যাচে

প্রিয়র কণ্ঠ-আলিঙ্গন।

বাস্তবিক, যে কথাটি সমস্ত জীবনভর সজ্জা-সজ্জোতে ব্যক্ত হতে পারল না, মুক হয়ে গুমরে মরতে লাগল হৃদয়ের পরতে পরতে, তার যদি কোনদিন মুখর হয়ে উঠবে? অবসর কোটে ত সে এই মূহুর সন্ধ্যা —

'ব্যাকুল বেগে আজি বাত্না যায়,

বিচুলি থেকে থেকে চনকায়।

মে-কথা এ জীবনে

বহিরে গেল মনে

সে কথা আজি মনে বলা যায়

এমন ঘন ঘোর বসিয়ারে।' 'মানসী : রবীন্দ্রনাথ

'বর্ষার দিনে' কবিতার যে কথাটি বলাবার ইচ্ছিত রয়েছে মাত্র তা রবীন্দ্রনাথের লেখার অন্তরে অভিব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্ট ভাবে। তিনি বলেছেন—

'বৃষ্টির দিনে, বাক্য ভালবাসি তার ঢুটি হাত চেপে বলতে ইচ্ছে করে—'তুমি-জন্মান্তরে আমি তোমার।' আজ এই কথা বলা সহজ আজ সমস্ত আকাশ যে মরীয়া হয়ে উঠল, তু হু করে কি যে ঠোঁক বলাচ্ছ তার ঠিক নেই, তাবই ভাষায় বন-বনান্তর ভাষা পোচ্ছ।

আমার আজকের বাতটিও এমনি—

গমানে আব ঘন

মেঘ ঢাকায়

দমনে দানিনী কলকট।

কুলি পাঠন

শব্দ কনকন

পবন পরতর বদগত ॥

অস্তান্ত দিনের বিরহেরও তাপ আছে স্বীকার করি এবং তাতেও যে সবিবেশ তাপিত না করে তা নয়। কিন্তু আজকের বিরহ-তাপের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না—এ তাপে এক তিলও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আর সব দিনের ক্রম-বিবাহের কাতরতার কথা প্রকাশ করে নিরমজল ঠাকুর বলেছেন—হরি অদর্শনে অধঃ দিনগুলি, তাঁর বিরহের এই দীর্ঘ দিনগুলি কেমন করে যে কাটায়েন ?

অবলম্বনানি দিনাস্তরানি হরে স্বালোকিনমস্তরেণ।

অনাবলোকে কন্থকৈমিকো হা হস্ত হা হস্ত কন্থা নয়ামি।

এ কাতরতার প্রাণের স্পন্দনকে মল্লীভূত করে বটে, কিন্তু বাঁচবার আগ্রহকে একেবারে নিবৃত্ত করে না। পক্ষান্তরে যেখানে বলা হয়েছে—

সজনি অহুঃ শমন-দিন হোয়।

নব নব জলধর

চৌদিক স্বাপল

তেরি' খিট নিকসয়ে মোয় ॥

সেখানে প্রিয়সঙ্গলিপ্যার অচরিতার্থতায় প্রাণের স্পন্দন স্তবীভূত। 'যক্ষ'-প্রিয়র এবশ্রকার প্রাণবিনাশী বিরহের অন্তনিগঢ় বেদনা হৃদয়জগ করেই সত্ত্বশ্চুট কটজ-কুসুমের 'ধূম-জ্যোতিঃসলিলমরুতাং সল্লিপাতঃ' মেঘের অর্থা রচনা করেছিল।

প্রহাসনং নভসি দয়িতাজীবিভালখনঃ

জায়ন্তেন পুরুষলময়াঃ হারয়িগ্নং প্রগহ্মি।

'আসিছে শ্রাবণ,—প্রিয়র জীবন কি লয়ে কাটিবে সে বরষাতে ;

ভাবে তাই,—পীর কুল-বারহা পাঠাবে প্রিয়ারে মেঘের হাতে।'

আচ্ছা, আমার ভাষায় কি মন্দ বল ত ? শরতের অজস্র উদ্‌গাপাতের মতই বর্ষার রাতিতে, 'স্বর্গে মর্ত্তে স্বপনের গুপ্ত আনাগোনা' ত সর্বত্রই চলে থাকে নিরবধি ; আমার মন্দ ভাগ্যের দোষে স্বপ্নেও তোমার সঙ্গে আজকাল দেখা হবার জো নেই। মনের পাঁচ ভেসে উঠছে ত্রীরাধিকার স্বপ্নে কুক দর্শনের চিত্রে। সেও ছিল এমনি এক স্তীমৃত মল্লিত বর্ষণমুখর শাওন ঘন রাতি।

শিগরে শিগরে-রোল

মন্ড দাগরী লোম

কৌকিল গুহরে কুতুহলে।

দি স্বীকিনিকি বাজে

ডাককা সে গরজে

পপনে দেপিল চেনকালে ॥

মনে পড়ছে, বিখ্যাত লেখক 'স্পেনসারে'র ফেরারি কুইনের 'আর্থার-মোরিয়ানা'র কথা। পরীবাণী মোরিয়ানাকে যে রজনীতে রাজা আর্থার স্বপ্নে দেখলেন, সে রাতেও এমনি রুষ্টি—আকাশপ্রান্তে ক্ষীয়মাণ কুকুরের যেউ যেউ রবের প্রতিক্ষণি। আজ যদি স্বপ্নে আমিও তোমার দর্শন পেতাম, কি এমন ক্ষতি ছিল—আগে ত এমন দেখতামও কত রাতে ! সেই স্বপ্ন-মিলন নিয়ে ধোঁটা দিয়ে একদিন হু'কথা বলেছিলাম বলেই বুঝি এই সাজ।

সে যাই কেন হউক না, আমি নিশ্চয় করে বলছি—আমার হৃদয়ে আজ যে সজ্জালাসা জেগেছে, একে কেহ ঠেকাতে পারবে না। এ সাজসার চরিতার্থতার জন্তে প্রিয়-দেহ, স্বপ্নাবেশ এ সবের কিছুই প্রয়োজন নেই—এ মিলন হবে ধ্যানলোকের। আমি জানি, আমার এ বিরহ-বিধুরতার মধ্যে এমনও তাপ আছে এবং সে তাপ ক্রমে আমার এমন ভাবেই তাপিত করবে—তৎকালীন ভাবনার মধ্যে আমি এমন তন্ময় হতে পারব যে, তাবই দ্বারা অবশ্যই চটবে বিরোধ



ব্যথার, সেই আবিষ্টতার মধ্যেই আশ্বাস লাভ করব তোমার মিলন-মাধুরী। জানি না, কথটা তোমার অজুত ঠেকছে কি না। তা যদি ঠেকে ত বাধ্যকির রামায়ণ বুলে দেখো, সম্বন্ধ মিটে যাবে। এই অজুত মিলন-লাভের জন্তেই ত্রীরামচন্দ্র সসৈন্তে লঙ্কাপুবে প্রবিষ্ট হয়ে অশোকবন-নিঃসৃত সীতা-অজস্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শে পুলক-পূরিত অন্তরে শ্যান ময় হয়েছিলেন। ‘মেঘদূতে’ ‘বন্ধ’ যেখানে বলেছে—

‘মৎসঙ্গং বা কনয়নিহিতারত্নমাখ্যায়িত্বা

প্রায়েণেত রমণবিরহঃ কন্যানাং বিনোদা’।

‘কিবা সে মোর সঙ্গ-সোগাঙ্গ সন্তোষ করে কন্যায়,—

প্রিয় বিরচিণী অঙ্গনাগের একরূপে ত্বনি দিবস যায়।’

সেখানে পরিচয় রয়েছে এবস্ত্রকার মিলনেরই। ত্রীরামচন্দ্রগণের এই সত্যোপলব্ধির ফলে গোপীগণ বলতে পেরেছেন—

সিদ্ধাস্ত নখদধরাবৃত্ত-পুরুষণ

হাস্যলোক-কলগৌরব-লজ্জয়াগ্নিঃ।

নোভেষ্মং বিরজ্জায়, পড়ন্তু দেহা

বানেন যাম পদয়োঃ পদবীঃ সপে হে।

হে কৃষ্ণ! তোমার হস্ত-বিজ্ঞাত অবলোকন এখন স্তম্ভুর সঙ্গীতে আমাদের যে কাম্যি উদ্দীপিত হ’ল, তুমি তা অধরাবৃত্ত সিক্তনে নির্দীপিত না করলে, এই অবিদ্য-সঙ্গে তোমার বিরহায়ি সহযোগিতা করে আমাদের বিবিধ অগ্নিদগ্ধ হৃদয়ে যোগীদের মত পানযোগে তোমার চরণ-সান্নিধ্য লাভে সমর্থ করবে।

তুমি হয়ত বলবে, এত বুঝে, এত উদ্দেশ্যে এতখানি কান্না কান্নাতে পেলে কেন তব। আজ সংক্ষেপে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখছি যে, মাতৃসেব কান্নার ৩৩টা বৃক্কেই বলেই বিশ্বের বিজ্ঞপকে উপেক্ষা করে কান্নাবাদ সাহস হয়েছে। ‘সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার (মাতৃসেব) পার আছে—এই জন্তেই সে কান্না, নইলে কান্নাতও না—(ঘরে-বাইরে)।

কিন্তু আর নয়, এবার আমার বিদায় দিতে হচ্ছে—ঐ দেখ, সমস্ত রাত্রির জাগরণে চোখ রাঙিয়ে সূর্য্য বেরিয়ে আসছে উত্তর দক্ষিণ থেকে, সদর দোরে চাই-মেয়ে চুলো জ্বালাতে এসে ডেকে-ডেকে শাবা হ’ল।...

## ব্যথার ব্যাপ্তি

শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক

যুগ যুগ পরি এ পৃথিবী সাথে  
ছিল মোর পরিচয়,  
নতুবা হৃদয় স্তম্ভুর ব্যথায়  
এত কি কাতর হয়?  
যত বেদনাব যত ইতিহাস পড়ি,  
জন্মান্তর জীবন কি মোর অরি?  
বুক নিড়াড়িয়া সেই পুরাতন  
অশ্রুধারা যে বয়।

২

তেমনি ভীষ্ম, ভীষ্ম, কঠোর—  
আঘাত করে যে দান  
উপশম কিছু হয় নাই তার  
হয় নাই অবসান।  
দেশের, জাতির, যুগের বাহিরে জুথ  
দেয় একই ব্যথা—নিপীড়িত করে বুক,  
পৃথিবী কতই ক্ষয়ে গেল—দেখি  
তাঁহার নাহি তো ক্ষয়!

৩

তবে কি আমরা একই বৃক্কে  
যৌথ অশ্রুধারা?  
যে বৃক্কে তে ডোবে ভাসে রবি শশী  
বহে প্রেম-পারাবার?  
অন্ন শু নয়, এ ব্যথা নয় তো কাছে,  
ইহাতে যে দেখি ভূমাব পরশ আছে,  
বহু ব্যবধান, বিবিধ বিভেদ  
তবে কি কিছুই নয়?

৪

একই পাত্রে সুখা খাই মোরা,  
একই পাত্রে বিষ,  
এক সাথে আছে হরিহর হয়ে  
আমাদের জগদীশ।  
জানায় অচেনা লাগি এ যাতনা ভোগ,  
পরস্পরের স্মৃতিবিড় সংযোগ,  
আত্মার এই আত্মীয়তার  
পীড়নই মানুষ নয়।

# রবীন্দ্রনাথ ও “সোহহম্”

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

১৩৫৯ সালের কার্তিক মাসের “প্রবাসী”তে “রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সোহহম্” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। উহাতে ভ্রাম্যস্থক উক্তি ও সোহহম্ তত্ত্ব ব্যাখ্যায় লেখকের (শ্রীমদ্বীরাচন্দ্র কর) যে গুরুতর ত্রুটি ছিল অত্যাধিক তাহার কোনও প্রতিবাদ বাহির হয় নাই; কিন্তু ঋতুন্য রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত বা “ধর্মচিন্তা” ভিত্তি করিয়া সাময়িক পত্রাদিতে তদীয় মতের যে অপপ্রচার বা অপব্যাখ্যা চলিয়াছে তদদর্শনে, অতি বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও, নিয়মিত ১৯২৮ প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

প্রবন্ধটির অবতরণিকাভাগে লিপিত হইয়াছে—

“একদা আদি ব্রাহ্ম-সমাজেও কেবল ব্রাহ্মণেরই উপাসনা-পরিচালনার অধিকার ছিল। কবি তাঁর কালে সে বিধি তুলে দেন। জাতি-বর্ণ-নির্দেশে যোগ্য ব্যক্তি মাত্রকেই তিনি আচার্য্যে বরণ করে নেন।” ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে এই উক্তিটি অসঙ্গত বসিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মতর্বি দেবেন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আদি ব্রাহ্ম-সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ উপাচার্য্য দ্বারা উপাসনা পরিচালনার নিয়ম ভঙ্গ করেন।

স্বর্গীয় অম্বিকতকুমার চক্রবর্তী লিখিত মতর্বির জীবন চরিতে যেখিতে পাই—

“২৭শে চৈত্রের যে সভায় ব্রাহ্ম সমাজের ববস্তার নানা গুরুতর পরিবর্তন হইল, সেই সভার সভাপতি দেবেন্দ্রনাথের এক চিঠি পড়িলেন। তাহাতে তিনি কেশবচন্দ্রকে এলা বৈশাখ হইতে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিবার উচ্ছ্রা প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মদিগর মত জানিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৮১ বৈশাখ (১৭৮৪ শক) সমাজ ঘরে খার লোক ঘরে না। যেমন উপাসনা তট্টাৎ থাকে তাহা তট্টাৎ গলে, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্য পদে কেন নিয়োগ করিতেছেন তাহার কারণ খুলিয়া বলিলেন—(৩৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত বা মতর্বি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী বাহাণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র স্নেহক আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য পদে নিয়োগ করিয়া মতর্বি সাময়িকভাবে তট্টাৎ ব্রাহ্মণ আচার্য্য নিয়োগের প্রথা ভঙ্গ করেন। আচার্য্য সমীপচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মতর্বি “আত্মবীচনী”র ৪১১ পৃষ্ঠার আদভ দোষা যায়, বৃন্দগরের রাজা কীশচন্দ্র ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রদেশের তিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের নিয়মপত্র স্বাক্ষর করান, এবং দেবেন্দ্রনাথকে একজন বেদজ্ঞ উপদেষ্টা পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখেন। দেবেন্দ্রনাথ লাল হাজারীলালকে পাঠাইলেন। হাজারীলাল শূদ্র এবং বেদবিৎ নন, সেইজন্য রাজা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ

হইলেন। বাহাই হউক, হাজারীলালকে তিনি বিদায় করিলেন না।” ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মতর্বি ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল অসুস্থতানে কার্য্য করিতেন সেখানে জাতি-নির্দেশে ভগবন্ত যোগ্য ব্যক্তিকেই আচার্য্য ও উপদেষ্টার কাণ্ডের দাবি দিতেন। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, “সে যুগ অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ব্রাহ্ম-সমাজে উপদেশ দান করিতেন।” কিছুকাল পরে উপবীতধারী ও উপবীত্যাগী উপাচার্য্যদিগের বেদীতে বসিয়া উপাসনা করার অধিকার লইয়া যখন প্রাচীন ও অগ্রসর দলের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা উপস্থিত হইল তখন এই উভয় দলের মধ্যে “মিলন হওয়া নিতান্ত উচিত, এই কথা মনে করিয়া তিনি (মতর্বি) পৈতাধারী ও পৈতাত্যাগী, অগ্রসর ও অনগ্রসর দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মের ভিত্তি উপাসনার বেদী খোলা রাখিয়াছিলেন” (অম্বিকতকুমার চক্রবর্তী, ৩০২ পৃঃ)।

“শাস্তিনিকেতন” আশ্রমে “ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যকে আর সকলের উপরে চাপানো” হয় না—ইহা সপ্রমাণ করিতে গিয়া লেখক সচিবতঃ কোনও অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীর অজ্ঞানতাপ্রসূত, বা কল্পিত একটি অভিযোগ গুণন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু আশ্রমে যে অসাম্প্রদায়িক ভাব বিদ্যমান হয় তাহারও আদিত্তে যে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মতর্বি ছিলেন তাহা আশ্রমের ট্রাস্ট-ডীড হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় (ট্রাস্ট, এই ৬২৪ পৃঃ)। এতপরে “রূপ ও অরূপ” প্রবন্ধ হইতে “মতর্বি কেই বিশেষভাবে অবলম্বন” করিয়া পূজা সঙ্ঘে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধার করিয়া লেখক প্রবন্ধের কলেবর পুষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত দুইটি প্রসঙ্গই পরবর্তী মূল বক্তব্য বিধ্বয়ের সহিত যুক্ত নয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়—“রূপ ও অরূপ” হইতে স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে “সোহহম্” ভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর প্রবন্ধের প্রধান বিষয় “রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনায় সোহহম্”-এর কথা। কোনও সাধকের “ধর্মসাধনা” বলিতে বাহা বুধি তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং অন্তরের বস্তু; এজন্য উহার প্রকৃত রূপ সাধকের সঙ্গে নিয়ত বাস করিয়াও তাঁহার পার্শ্বচর ব্যক্তি সমাক্ জানিতে পাবেন না। রবীন্দ্রনাথ mytic বা মরমী সাধক ছিলেন ইহা সর্ব সাধারণের নিকট সুবিদিত। এই শ্রেণীর সাধকের ধর্মসাধনার গূঢ় কথা সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে সমাক্ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। তবে ধর্ম সাধক তাঁহার চিন্তাধারার নানা দিক তিনি তাঁহার ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি ও উপদেশাবলীতে মধ্য দিয়া পরিষ্কৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে “শাস্তিনিকেতন”, “সঞ্চয়”, “আত্মপরিচয়” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির অন্তর্গত প্রবন্ধাবলীতে তিনি স্বীয় বক্তব্য, অনেক স্থলেই নানা উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের বা বাক্যাংশের সাহায্যে, নিজ

বিশিষ্ট চিন্তাধারার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “নিজ চিন্তাধারার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া”—এই কথাটি বলা প্রয়োজন এই জন্য যে, উপনিষদের “কোন কোন বাক্যের অস্পষ্টতা হইতে একাধিক অর্থ করাও সম্ভব; এবং এই সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়াই বৈদ্যাক্ষরিকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে পারিয়াছেন” (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা—ভারত-দর্শন সার, ২৪৮ পৃ.)।

“সোহমম্মি” এইরূপ একটি উপনিষদ-উক্ত বাক্য; শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্যকার হিসাবে ভীষণ ও ব্রহ্মের ঐক্যমত ব্যাখ্যা করিয়া যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি সঙ্গতি বাক্যের মধ্যে (যথা, “তত্ত্বমসি”, “সোহমম্মি”, “সর্বং ধর্মং ব্রহ্ম” প্রভৃতি) ইহা একটি প্রধান বাক্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে কোনও স্থানেই অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক কোনও কথা বলেন নাই। এতজ্ঞ তিনি স্বয়ং তত্ত্বের আলোকে “সোহমম্মি” এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা স্বয়ং দিয়াছেন (ত্রুট্য)—“সকল”, “আমার ভগবৎ” তাহাতে অদ্বৈতবাদ-মূলক কোনও ভাব নাই। তাঁহার সাধনার যে মূল মন্ত্রটি তিনি ভীষণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সেইটির ভাবই “সোহমম্মি” বাক্যের ব্যাখ্যায় বিবৃতি করিয়াছেন (জঃ “অসীম যেখানে আপনাকে সীমার সংজ্ঞা করেছেন সেখানেই অসঙ্গতি। সোহমম্মি। সেখানেই তিনি শুছেন আমি আছি। অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, ‘অহমম্মি’। আমি আছি।...সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম

বলছেন, ‘অহমম্মি’))। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত প্রবন্ধের কোনও অংশ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে উদ্ধৃত করা দূরে থাকুক, উহার নামোচ্চারণ করেন নাই। ইহার ফলে যে সকল পাঠক রবীন্দ্রনাথের “আমার ভগবৎ” প্রবন্ধ পড়েন নাই তাঁহারা মনে করিবেন লেখক রবীন্দ্রনাথের রচনা-বলীর মধ্যে তাঁহার ‘সাধনায় সোহমম্মি’ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া উক্ত বিষয়ে একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। প্রাক্তল ভাবে ও অতি প্রাক্তল ভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ ব্যাখ্যাটি, ও তাৎপর্য্যক বাণী দিয়া উহার যে ভাষ্য বর্তমান লেখক লিখিয়াছেন এই উভয় প্রবন্ধ পর পর পাঠ করিলে পাঠকবর্গই সম্যক বিচার করিতে পারিবেন রবীন্দ্রনাথকৃত সোহমম্মি-তত্ত্বের ব্যাখ্যাটির ভাব লেখকের ভাষায় পরিষ্কৃত হইয়াছে কিনা। এইখানে মনে পড়ে “গোরা” উপন্যাসের একটি বাক্য—“সে (অবিনাশ) গোরা’র শিষ্য। গোরা’র মুগ্ধ হইতে গেলে শিষ্য শোনে তাহাই সে নিজের দৃষ্টির দ্বারা ছোট এবং নিজের ভাষা দ্বারা বিকৃত কাব্য চারিদিক বহিয়া বেড়ায়।” রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি বিশিষ্ট মতবাদ জ্ঞাপক (“সোহমম্মি”) বাক্যের স্বীয় ভাবানুযায়ী যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা অপরের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিজ বাক্য উদ্ধৃত না করিয়া অথচ তাহার সমগ্র ভাবধারাকে অঙ্গুলি রাখিয়া পাঠকবর্গের নিকট যথাযথ পরিবেশন করা দুর্লভ কাব্য, বিশেষতঃ যখন উক্ত ‘সোহমম্মি’ ভাব’ বিরূপে তাঁহার ধর্মসাধনার বস্তু হইয়াছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

## স্বপ্ন

### শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত

মৃতকল্প স্তব্ধ নীল সমুদ্রসৈকতে বুধা কাটো ক্লান্ত দিনগাত  
জীবনের অর্থ খুঁজে খুঁজে। টুনকা এ ভীষণের রামধনু বধ  
ফণে ফণে জলে নেভে। আসে নিত্য প্রত্যাশিত মিথুর সংঘাত  
একাকার করে সব : তবু বাজে মিঠা রব প্রাণের সাবধ।

কুলি চক্ৰান্ত থেকে সূর্য প্রশান্তি পথে এবার উধাও  
যেখানে শতাব্দী নেই নিস্তর্য্য রাতের তারা ভাগ  
পলাতক ভীত মন : সবুজ শক্তির শীঘ্রাদগন্ত রেখাও  
মুছে যায় মন থেকে, সীতল, পাণ্ডুর ম্পর্শ তড়ায় মহাক।

এখানে জীবন নেই ; বস্তুতন্ত্র প্রত্যাহার হিংস্র বাতাসে  
ভরস্ব প্রহর এখানে অনেকে গোনে। একান্ত নিষ্ঠুরনে  
শৈবালভক্তাচ্ছন্ন স্বপ্নের ছন্দ জাল বুনে বুনে  
বিভিন্ন অলৌকিক স্বপ্ন রচনীর নীলগভ্র আকাশে।

কপট বাহুর প্রেমে পৃথিবীর প্রাণসূত্র যদি নিভে যায়  
রক্তের উদ্ভাস প্রোতে বাতাবার কশাইএর লোভ গুঁটে জলে,  
পুড় পুড় খাটি হওয়া সে মন্দোহ ডাল এই মন বলে  
যেখানে যৌবন মৃত : কীকর হৃৎকোষে ক্লান্ত প্রাণ অঘোরে ঘুমায়ে।

## অন্ধ প্রদীপ

শ্রীবিজয়লতা দেবী

পদভ্যাগ করবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন সুপ্রভা চৌধুরী। পশ্চিমের একটা মেয়ে স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হয়ে এদেশে আসেন যখন, তখন বয়স ছিল কম। আজ পঁচিশ বছর বয়সের কথাই যেন একটা স্বপ্ন। বিয়ে করেন নি তিনি, চিরকুমারী। স্কুলের চাকুরিতে স্তন্যম অর্জন করেছেন। যথার্থীতি পদভ্যাগ করার সময় অবশ্য এখনও হয় নি তাঁর। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ভয়ানক ক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, আর ভাল লাগে না এই নীরস জীবনটাকে। নিজেকে ছুটি দেবেন এইবার। প্রতিভেও ফণ্ডে যে টাকাটা আছে তা তুলে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন স্থির করে রেখেছেন। আজীবন তিনি স্তন্যমের সঙ্গে চাকুরি করেছেন। তাঁর চরিত্র-গৌরবে স্কুলও গৌরবান্বিত। স্কুল-সংলগ্ন একখানি ছোট বাংলো-বাড়ী, আর তার সঙ্গে এক টুকরো স্কুলের বাগান তাঁর নিজেই। একদা যখন ক্ষমির দাম কম ছিল, তখন এই সম্পদটুকু তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। নিতান্ত সাদাসিধা হ'ল একটা আসবাব আর সাধারণ খাওয়া-পরা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। আজ পদভ্যাগ করার পরও এটা তাঁর থাকবে; ধীরে ধীরে নিজেকে তিনি আবিষ্কার করবেন আবার। যে বসন্তের দিনগুলি তাঁর এই মাষ্টার-মিসির করতে করতে করে পড়ে গিয়েছে, সেই বিগত দিনগুলিকে সঞ্চয় করে রাখবেন মনের ভিতর। যে দিন গেছে—তা থাক, কিন্তু যে দিন আছে এখনও বাকি, তাকে কেন আর গ্রামার, কন্সজেশন, ট্রান্সলেশনের বেড়া ঘিরে রাখা? তাঁকে এবার ছুটি নিতে হবে। বোঁবন গত হয়েছে। শুকনো ডালপালা মেলে দেহটা একটা প্রকাণ্ড ব্যস্তের স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। রক্তমেজাজ, কঙ্কশব্দ'স' ক শিক্ষিকা হয়ে উঠেছেন আজ। লাভ্যের জোরায় কি করে নিয়ে যায়, কি অপূর্ণতার ক্রীড়ন হয় বোঁবন, তা তো অজানা নয় তাঁর।

সেদিন আর কি হবে না, তবু ছুটি দিতে হবে জীবনকে। ছক্কাটা, রুটান বাধা জীবনকে দেগলে ভয় করতে থাকে কেমন যেন তাঁর। এরকম জীবন তিনি চান নি। স্কুল থেকে কিবে অবধি একলা চূপ করে জানালায় কাছে বসে আছেন সুপ্রভা। স্কুলের ছুটির পর আজ মহিলাদের একটা মিটিং ছিল। মিটিং থেকে ফিরতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার সপক্ষে সমামত জানাবার জন্য মিটিং হয়েছিল। অনেক মহিলাই নিজের নিজের সুচিন্তিত মন্তব্য লিখে এনেছিলেন, পড়েও ছিলেন অনেকে। সুপ্রভাও কিছু লিখেছিলেন, কিন্তু পড়েন নি। মহিলা-রক্ষক'দিকে তাকিয়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন। বার বার মনে হয়েছিল তাঁর—এরা ত শুকিয়ে উঠে নি? বার্ষিক হয় নি এরা 'আমার মত! বার্ষিক হয় নি বলেই বার্ষিকতার বেননা বুঝতে পারছে না। তাই জোরগলার মন্তব্য জানাতে পারছে? মনে হয়েছে

শুধু এসের ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। মা চব্বার জন্ত ভগবান থাকে সৃষ্টি করেছেন, এরা তাকে বার্ষিক করে তোলে নি। এরা সংসারের নানা খুঁটিনাটির মধ্যে ডুবে গেছে। তবু হারান নি নিজের নারীত্বকে! আর তিনি—? ষিটপিটে অকালবৃষ্টির রূপ নিয়েছেন। নিজের গুচিটা বাচিয়ে চলতে চলতে এমন অভ্যাস করেছেন যে, বাতাসে যেন বহুনায়েব গন্ধ পান।

'আপনি কিছু পড়লেন না?'—প্রশ্ন করেছিলেন একজন মহিলা। প্রশ্ন শুনে তাড়াতাড়ি হাতের লেখা কাগজগুলো হাত-বাগে পুরে নিয়েছিলেন সুপ্রভা। তাঁর কিছু পড়বার নেই। বলবারও নেই। জীবনকে যে ভদ্রপুর করে নিতে পারে নি, কি আবিষ্কার আছে তার জীবনের সম্বন্ধে মন্তব্য করার? সুপ্রভা বলে-ছিলেন, 'না আমার কিছু বলবার নেই।'—'তবে কি এনেছিলেন কাগজগুলোয় লিখে? কবিতা নাকি?' প্রশ্ন করেছিলেন আর একজন মহিলা। একটা ছোট নিখাস ফেলে সুপ্রভা বলেছিলেন, 'না, কবিতা নয়। কবিতা আর লিপি না, লিপিতাম বহুকাল আগে, সে সব শুধু স্বপ্ন।'

সত্যি তিনি কবিতা আর লেখেন না। প্রতিজ্ঞা করে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। যখন তিনি প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখন অস্তুর ভরে সে কি উল্লাস! সে কি রোমাঞ্চবিহীন তৃপ্তম! নিজেকে একটু একটু করে উন্মোচনের মাদকতা। কিন্তু বেশী দিন এ স্পন্দকে সহ্য করে নি তাঁর পরিজন ও গুরুজনরা। কয়েকটা কবিতা মাসিকে প্রকাশিত হবার পরই গুরুজনদের টনক নড়ল। বিধিমতে সতক করে তারা তাকে দমকে দিয়েছিলেন একজ। গৃহিণীরা তাকে ঝিকার দিয়েছিলেন। কস্তারা করেছিলেন শাসন ও নিষেধ। সমবয়স্কারা তাকে বেগারা বলে গাল দিয়েছিলেন। যেরেবা প্রেমের কবিতা লিখবে একথা অবিশ্বাস্ত ও অনভিপ্রেত। যে মেয়ে লেখে, সে নিশ্চয় উচ্ছল বাওয়া মেয়ে। সে কবিতার পাতাপানা আপুনে পুড়িয়ে কেলেছিলেন গুরুজনরা। পাপ একটা, তাকে ধ্বংস করা দরকার।

আজ বার বার নিজের অতীতটাকে মনে পড়ে যায় সুপ্রভার। প্রথম যখন তিনি বিয়ে করতে চাইলেন, তখন গুরুজনরা শুধুই যে অবাধ হয়ে গিয়েছিলেন তা নয়, দারুণ হুম্বিতও হয়েছিলেন। বিয়ে? মেয়েরা নিজে হতে বিয়ে করতে চাইবে, এ কেমন কথা? কামিনীকালেও এমন কথা কেউ শুনেছে আমাদের দেশে? সময় হলে গুরুজনরা তার জন্তে পাত্র মেখে বিয়ে দেন। নিজেই নিজের প্রার্থিত পাত্র বেছে নিয়ে বিয়ে করতে চাইবে এমন কথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাদের? সুপ্রভার মনে আছে, তাঁর সোঠামশায় বলেছিলেন, 'এসব হ'ল মেয়েদের বেশী লেখাপড়া পেখানোর ফল';

তখনই হানা করেছিলাম, বেশী পড়াতে—তা তোমরা ত ওমলে না, এখন বোঝ এর ঠালা।’ সুপ্রভার মা বেঁচে ছিলেন না তখন, কিন্তু বাবা ওনে বিরক্ত হয়েছিলেন। সুপ্রভার উপার্কনের মোটা চাকর তাঁর সংসার চলছে, টাকা বন্ধ হয়, এমন কোন কাজ তিনি অনুমোদন করতে পারেন না। বাধা দিয়ে ছিলেন তাঁর ভাই বীরেন সব থেকে বেশী। কাদ-কাদ হয়ে বলেছিলেন—আমার ম্যাট্রিক একজামিনের পরে ভূমি বিয়ে করলে পারতে দিদি—বাবার চাকরি নেই, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে কে আমার পড়ার খরচ দেবে শুনি—? তখন কি লোকের বাড়ী চাকর-বাকরের কাজ করব?

একবার দারুণ একটা ধাক্কা লেগেছিল তাঁর মনে। তিনি বিয়ে করেন নি তাই। এখনও মনে আছে সেই স্বপ্নের বেশ। আজও মনে পড়ে সেই তরুণ বুঝকে। প্রতাপাত হয়ে সেই যে সে খুঁজে যোগ দিয়েছিল আর ফিরে আসে নি।

বীরেনকে তিনি লেগাপড়া শিখিয়েছেন। তাকে কলেজের পড়া থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং পর্যন্ত পাস করতে সাহায্য করেছেন। বিয়েও দিয়েছেন তার। এই চাকরি করেই তাকে সুযোগ দিয়েছেন মানুষ হবার ক্ষেত্রে। আজ বীরেনের ঘরে স্ত্রী, সন্তান, ছি ও আনন্দ। আর তিনি? মেয়েদের অস্বাভীন ভুলের সংশোধন করতে করতে হারিয়ে ফেলেছেন নিজের নারীত্বকেই। কবে যেন একদিন প্রেমের কবিতা লিখতেন তিনি। নিজের একক শুভ শব্দায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতেন। নিজের তলুদেহকে অপলকে নিরীক্ষণ করতেন। এক দিন এই দেহ ধ্বংস করে জন্ম নেবে তাঁর সন্তান—কোন এক অনাগত মনুষ্য, কোন এক অনাগত আদর্শবাদ মূর্ত হয়ে উঠবে তাঁরই কোলের মধ্যে। শিশুদেহতা রূপে জন্ম নেবে তাঁর মনের গোপাল। সর্কাসের উপর দিয়ে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত তখন। দিবাকরের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রস্ফুটিত কমলের মত প্রতাপার বিকশিত হতে চেয়েছিল তাঁর জীবন।

মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন সুপ্রভা। এমনই হয়। সেদিন আর নেই। পিটপিটে অকালবৃদ্ধার রূপ নিয়েছেন আজ তিনি কি জন্মে? রং রূপ মাথুখাকে হারিয়ে ফেলেছেন এই চাকরির বেড়ালের ভিতর। মেয়েমা মা হতে চায়। তারা মায়েষ জাত। এপানেই তাদের সার্থকতা। তারা আশ্রয় নেয় বস্তুটুকু—তার চেয়ে ঢের বেশী দেখ আশ্রয়। সর্বপ্রথম সে ভননী, তার পথ প্রিয়। প্রিয়ার প্রজ্জদপটে গিয়ে একটি প্রজ্জ ভননীকেই বরণ করে ঘরে তোলে পুরুষ।

বীয়ে বীয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুপ্রভা চৌধুরী, দেওয়ালে টাঙানো ছোট আয়নার প্রতিবিম্ব দেখতে লাগলেন নিজের। গাল বসা, চোখের কোণে কালি। কপালের চামড়ায় রেণার শত কুকনে শত চিহ্ন আঁকা। হাড়সার হুগানা হাড়, দেশলে নিজেরই বুগা হয় নিজের উপর। বারান্দার বেরিয়ে এলেন সুপ্রভা। ছোট এক টুকরা খাটির উঠান জুড়ে নানা বকম ফুলের গাছ। বারান্দার একপাশে তোলা উদ্ভন জেলে দাসী লছমীরা তাঁর জন্মে বাতের কটি তরকারি

ভৈরি করছে। স্থখতা বাগানে বেরিয়ে এলেন। হাসনাহানার ফাডের পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন। বাতাসে ভারি মনোরম গন্ধ। আকাশে চাঁদ উঠেছে, পথের মাঝে গাছের পাতার কঁকে কঁকে চাদের আলো ছিটিয়ে পড়েছে। স্তব্ধ অন্ধকার পথ। সমস্ত নিস্তব্ধ, ভনহীন রাত্রি। ভাব ভাল লাগছিল সুপ্রভার। তিনি অজ্ঞমনে বাগান ছেড়ে বেরিয়ে এলেন পথে। অভিজ্ঞতের মত চলতে লাগলেন পথে।

নিস্তব্ধ রজনীর সীমাহীন অন্ধকারটা বিপুল এক আনন্দের মত প্রতিভাত হতে লাগল তাঁর মনে। ধূল পাগড়, পথের দু’ধাবের তরুশ্রেণী, অগণিত নক্ষত্রের ঝিকিমিকি ভরা আকাশের তলার ইটিতে ইটিতে দু’চোখে জল আসতে লাগল। নিজের একাকিত্বে মনোহর জীবনটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে আজ কাছে। বাতের নির্জনতার নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণের আনন্দে ভরে গেল অন্তর। মনে মনে বলতে লাগলেন—আমি আছি—আছি—নিঃশেষে ঘন নৈকট্যের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করার আনন্দ নিয়ে বেঁচে আছি আমি। কবে এসেছিল বসন্ত তা গিয়েছি ভুলে, ধস্ত হই নি, রিক্ত হয়েছি দিনে দিনে। তবু এই রিক্ত নিঃশ্ব জীবনটাই আজ চেয়ে নিয়েছে পৃথিবী। ধূলি জল গাছ-পাতা ঘেরা, আকাশের তলার নিঃশেষে আমার গ্রহণ করেছে সে। আর আমি ফুলের শিক্ষা সস্তর ঢাকা মাইনে পাওয়া অকালবৃদ্ধা নিঃশ্ব নারী নয়। আমি সার্থক, আমি ধল, আমার উপস্থিতি পৃথিবী সাদরে গ্রহণ করেছে। পথে পথে অনেক এগিয়ে গেলেন সুপ্রভা, বাড়ী ফেরার কথা তাঁর মনে এল না।

—শুনছেন—ধমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুপ্রভা। পথের মাঝখানে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে সত্যবিকাশ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ভয়ানক চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা সুপ্রভা, পরে চিনতে পারলেন, সে সত্যবিকাশ। ছেলেটি সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। কলেজ থেকে বিশেষজ্ঞ হবার জ্ঞান তাকে এবার ইংলেণ্ডে পাঠানোর কথা হয়েছে। তাঁরই ফুলের সেকেন্ড মিসট্রেস, রজনাকে সে বিয়ে করতে চায়। বড় বার শিক্ষিতা মেয়েমজলে সে কথার আলোচনা হয়েছে। রজনীর নিজেরও পরিপূর্ণ সম্মতি ছিল একথাও শুনছেন তিনি। হঠাৎ বাতের অন্ধকারে এমন ভাবে তাঁর গতি-বোধ করে উপস্থিত হওয়ায় ভারি বিরক্ত হয়ে পড়লেন সুপ্রভা।

—কি দরকার তোমার—ভারি ত উঠে দেখছি—

সত্যবিকাশ হাত জোড় করে কমা চাইল। বলল—ভয়ানক বিপদে পড়েছি বড়দি—কোন উপায় নেই, তাই আপনার শাস্তি ভঙ্গ করলাম। শুনছেন রজনীর বাবা আমাদের বিয়েতে সম্মতি দেন নি?—

ভারি বিরক্ত হলেন সুপ্রভা।

—তা কি করতে পারি আমি? রজনীর বাবা নিজের আমার ফুলের ছাত্র নন—

ফিরে চললেন সুপ্রভা এবার বাড়ীর দিকে। জোরে জোরে

হাঁটতে লাগলেন এবার। বাইকটা টেলতে টেলতে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল সত্যবিকাশ।

—আপনি মুণ ফেরালে কে থাকবে আমার। ভেবে দেখুন একটু—প্রথম বর্ষন টাকার অভাবে এগুতামিন দেওয়া বন্ধ হয়েছিল, তখন আপনিই ত সাহায্য করেছিলেন। ভাল চিন্তেনও না, আপনার ভাইয়ের বন্ধু বল শুধু জানা ছিল। আজ কুল এসে ডুব বাব? উপায় হবে না? ভাবী হয়ে উঠল সত্যবিকাশের কষ্টের। একটু উল্লাস নরম গলগলে বললেন সুপ্রভা—‘আমি কি করব বল? আমি ত তার সত্যিকার অভিভাবক নয়। রজনাকেই বল না মীমাংসা করুক।’

‘তবেই হয়েছে।’—সুপ্রভা হয়ে এগিয়ে পড়ল সত্যবিকাশ। বাইকটা গাছে টেন দিয়ে দাঁড়াল পথের ধারে। ‘রজনার ভাই-বোন তায়ই উপার্জনের উপর নির্ভর করে আছে যে। সে চাকরি না করলে চলবে কেন? কোনমতেই তাকে বাজী করান বাবে না।’ ‘তবে আর কি হবে? রজনাই বর্ষন বাজী নয়।’—ইচ্ছা ছেড়ে বাঁচলেন সুপ্রভা, এগিয়ে চললেন দ্রুত পদক্ষেপে। সত্যবিকাশ তবু অস্থির হয়ে লাগল তাঁকে। আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না আপনি। ভাল করে ভেবে দেখুন বড়দি—দোচাই আপনার। বিলাত যাওয়ার সব ঠিকঠাক আমার। কলেজ অবস্থা বাওয়া আসা আর পড়ার খরচ দেবে, কিন্তু খাওয়া থাকা হবে কিসে? তাই বাবা আমার বিয়ে দিয়ে টাকা যোগাড় করতে চাইছেন।—মুঠ একটু হেসে উঠলেন সুপ্রভা। ‘ভালট ত। বাও না বিলেত, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি—এ ত স্ববর্ণস্বযোগ তোমার। রজনাকে বিয়ে করলে ত আর টাকা পাবে না।’

‘টাকা! সামান্য টাকার জ্ঞান আমি বিয়ে করব বড়দি? টাকা কি আমি পরে রোজগার করব না? রজনার জন্মে যদি আমার বিলেত যাওয়া বন্ধ হয় জন্মের মত সেও অনেক ভাল।’

সুপ্রভা কথার উত্তর দিলেন না। এগিয়ে চলতে লাগলেন। সত্যবিকাশ সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল।—‘রজনার মনের কথা আমি জানি। সে যদি বিব্রাহ করে কেউ বাধা দিতে পারে না। আমি পালিয়ে যেতে চাই তাকে নিয়ে, যদি আপনি...’

ধমক দাঁড়িয়ে পড়লেন সুপ্রভা।—‘তোমার স্পর্ধার সীমা নেই দেখছি! জান আমার সুলেব সুনামের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোন দিন এসব আমি অস্বীকার করতে পারি?’ বিশ্বাস স্থির হয়ে গেল তাঁর হুই চোপের দৃষ্টি। ‘তা জানি।’—নরম গলায় বলল সত্যবিকাশ, ‘অপনারা ভরানক ভাল। কেন এত ভাল আপনারা? কেন এত নিরীহ? কেন করতে চান না বিব্রাহ? কেন বিব্রাহীকে সমর্থন করেন না? কি পেয়েছেন জীবনভোর? নিজে শূন্য হয়েছেন, শূন্য করেছেন অপরকেও। আজীবন ঠেকেছেন শুধু।

একটি বাস্তবিক কি করতে পারেন না? ঘটতে পারেন না এম সম্ভাবনা?’

ভাবি বিচলিত দেখাল সুপ্রভা চৌধুরীকে। স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন যেন। কি যেন একটা বলতে গেলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। বাড়ীতে কাছের এসে পড়েছিলেন, দ্রুত পদে ঢুকে পড়লেন ভিতর। যেন পলায়ন করলেন সেখান থেকে।

বাড়ীর ভিতর এসে থপ কর বস পড়লেন একটা চেয়ারে। সমস্ত শরীর কঁপছে তাঁর। কল কল করে ঘাম বরষা দরবাজ দিয়ে। কঁপ উঠছে সমস্ত অস্ত্রের বায় বায়।

মনে পড়ছে তার নিজের জীবনের তরুণ পথিকের কথাগুলো।

—কেন তুমি এত ভাল? কেন চাও না সহজ হতে? তুমি বাজী হও হু—তোমার নিয়ে আমি অল্প দেশে চলে যাই।

সে অল্প দেশে তাঁর যাওয়া হয় নি। অস্থির ভাবে বাড়ীর বাহ্যিক বেড়াতে লাগলেন সুপ্রভা। গুচিটা বাঁচিয়ে চলতে চলতে জীবন তাঁর আজ সূচুত, সংস্কারে বাঁধা হাত-পা। আকাশে বাতাসে বদনামের গন্ধ পেয়ে কাতর হয়ে উঠে সমস্ত অস্ত্রেরাই। মনে মনে বলতে লাগলেন—আমার জীবন আজ শক্ত কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো অকালব্যয়্যার ছবির মত। কিন্তু ওদের? ওদের ত সময় আছে, ব্যয়স আছে, বসন্তের দিন আছে ওদের? ওরাও কি এমনি হয়ে উঠবে? মনে পড়ল রজনার তরুণ স্নান মুখানা, মনে পড়ল সত্যবিকাশকে। না না, এ জীবনের পুনরাবৃত্তি হোক এটা তিনি সত্যিই চান না। কোন দিন কোন শরীর ছাড়ো চান না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। টেলনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছেন সুপ্রভা চৌধুরী। রজনার সঙ্গে সত্যবিকাশের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। তারা দু’জনে এই মাত্র যে ট্রেনটা ছাড়ল তাঁতে করে কলকাতায় বসনা হয়ে গেছে। সুপ্রভা চৌধুরী নিজের প্রভিডেন্স ফণ্ডের সমস্ত টাকাটাই ওদের বিয়েতে যৌতুক দিয়েছেন। সত্যবিকাশ আর রজনাকে ট্রেনে জুড়ে দিতে এসেছেন তিনি। ট্রেন ছেড়ে গেছে, গম গম শব্দ আর শোনা যায় না। দুশানা হাতোজ্জ্বল মুখ মিলিয়ে গেছে দূরে। প্রভিডেন্স ফণ্ডের টাকায় সত্যবিকাশ বিলাত যেতে পারবে। অল্পমন্ড ভাবে সুপ্রভা দু’এক দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ততঃ একটা জীবন এই ধরণের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাবে। তাঁর চাকরি ছাড়লে চলবে না। রজনার ভাই-বোনদের পড়ার খরচ অতঃপর তিনিই যে দেবেন স্থির করেছেন। পদ্যাগ-পত্রখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিতে হবে এবার। আর রজনার গোপনে পলায়ন, গোপনে বিবাহে সাহায্য করার জন্মে যে অপঘণ তার এত দিনের সুনামকে দ্রুত-বিকৃত করতে থাকবে, তাকেও বহন করতে হবে আজীবন তাঁকেই। দীর্ঘবাস ফেলে মরব পদক্ষেপে তিনি কিংবদন্তি চললেন বাড়ীর দিকে।

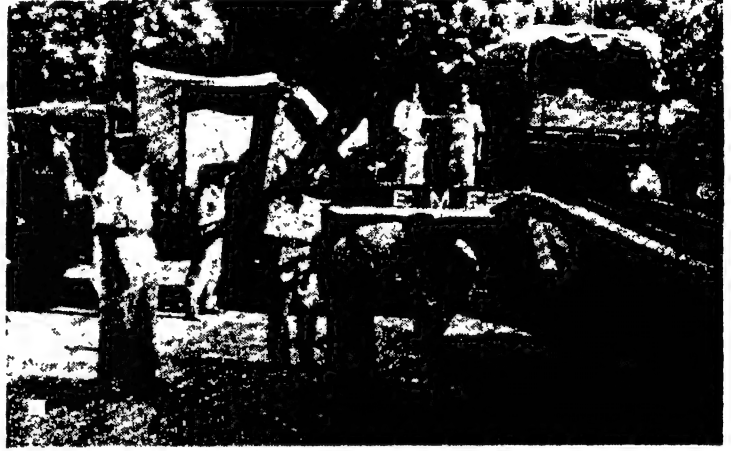
# আঞ্চলিক বাহিনীর উন্নতি

ত্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বৈধা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা কতটুকু সাফল্য লাভ করা যায়, গত চার বৎসরের মধ্যে আঞ্চলিক বাহিনীর উন্নতির কাহিনী হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার গোড়াপত্তনের পর ইহার উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ আশা পোষণ করা গিয়াছিল, শীঘ্রই তাহা কার্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং ইহা সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিল যে, ইহাতে লোক আমদানী চুঃসাধ্য ব্যাপার। স্থায়ী ভাবে সকল সময়ের জন্য কর্মস্রোতের সুযোগ না থাকায় ইহাতে চাকরি প্রার্থীদের স্রবাহা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। চাকরিতে বা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা তখন তখনই আঞ্চলিক বাহিনী দ্বারা সম্ভাব্য উন্নতির বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উহা বর্তমানে বেঙ্গলে আছে, তা ভারতে কতকটা অভিনব ব্যাপার।

ইহা ছাড়া অস্ত্রাস্ত্র অনুবিধাও ছিল। যাহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেও নিজ নিজ মনিবের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। যে সকল সরকারী কর্মচারী আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে ব্যবসায়ী প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। বেসরকারী মনিবেরা কিন্তু নিজেদের কর্মচারীদিগকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইলেন, কেননা তাহাদের নিকট ইহার মানে হইতেছে কাজের সময় নষ্ট হওয়া। যাহারা আঞ্চলিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, কোন ক্যাম্পে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে তাহাদের কর্ম-চ্যুতি হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা দেখা দিল। প্রকৃত-পক্ষে ব্যাপার শুক্লতর হইয়া দাঁড়াইল যখন কতকগুলি আঞ্চলিক বাহিনীর ইউনিটকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্যাম্পে থাকিতে হইত। এই মধ্যে অভিযোগ আসিয়া পৌঁছিল যে, কোন কোন মনিব আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগদানকারী কর্মচারীদিগকে তাহাদের মূল চাকরিতে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। বাই হোক, আইন প্রণয়ন দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় হইল—এই আইনের বলে সকল মনিবকেই আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগদানকারী তাহাদের

কর্মচারীদিগকে কিছুকালের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে বাধ্য করা হইল। এই আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, আঞ্চলিক বাহিনী সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের প্রকৃত সমাধান নিহিত রহিয়াছে মনিবের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতা এবং



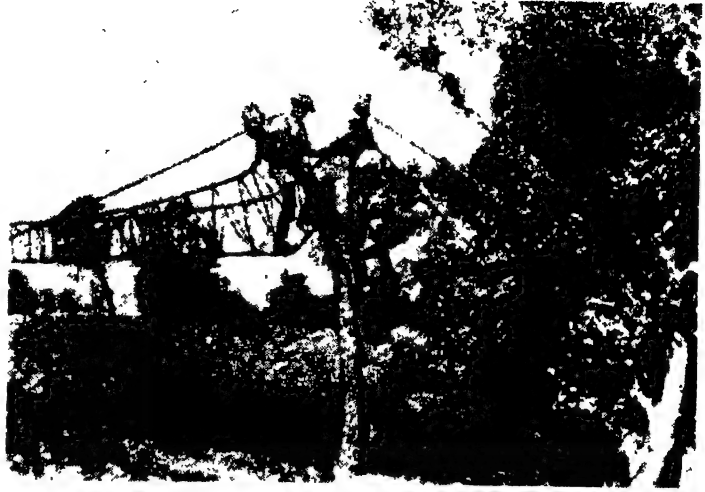
বেরামত কার্খো রত আঞ্চলিক বাহিনীর ইলেক্ট্রিক্যাল এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারগণ

মনিব ও কর্মচারী উভয়ের দেশপ্রেমের মধ্যে। উভয়কেই আঞ্চলিক বাহিনীর আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাসমূহের সমান ভাগীদার হইতে হইবে। আঞ্চলিক বাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী যখন আবার পূর্ণ কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইবেন তখন তিনি হইবেন অধিকতর নিয়মানুবর্তী ও কর্মক্ষম-কর্মীর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে এবং তিনি হইবেন উৎকৃষ্টতর নাগরিক।

সেই জন্যই দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ যোগ্য লোকসংগ্রহ আর সর্বসাধারণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভের জন্য এবং সংগঠিত ইউনিটগুলির অন্তর্ভুক্ত লোকদের আঞ্চলিক বাহিনীর প্রকৃত আদর্শে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে প্রবল চেষ্টা চলিয়াছিল। শ্রােদৈশিক ইউনিটসমূহ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, সেগুলির জন্য গ্রামাঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় যোগ্য লোকসংগ্রহে কখনই খুব বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। এই সমস্ত ইউনিটের লোকদের বৎসরে একনাগাড়ে দুই মাস শিক্ষা-শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় এবং এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, গ্রামের লোকেরা অনায়াসে সেগুলিতে গিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। এই সমস্ত ইউনিট ক্রমশঃ উন্নতির পথে আগাই



চলিল। গ্রামাঞ্চলস্থ ইউনিটগুলিতে  
কিন্তু উন্নতি হইতে লাগিল খুব ধীর  
মহুর গতিতে। এই সমস্ত ইউনিটে  
শিক্ষা দেওয়া হয় সপ্তাহের শেষ দিনে  
অথবা ছুটির দিনে—মোট শিক্ষাদানের  
সময়ের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টা। যদিও ইহা  
বলা হইয়াছিল যে, এই সমস্ত ইউনিটের  
লোকেরা কেবলমাত্র অবসর সময়েই  
শিক্ষালাভ করিতে পারিবে তথাপি  
লোকদের নিকট হইতে আশাহুরূপ  
সাড়া পাওয়া যায় নাই। ক্রমে ক্রমে  
কিন্তু অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল।  
আঞ্চলিক বাহিনীর কথা লোকে যতই  
বেশী জানিতে লাগিল এবং ইহার উদ্দেশ্য  
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইল, ততই ইহার  
প্রতি তাহারা দিন দিন অধিকতর  
সংখ্যায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহা



আঞ্চলিক বাহিনীর সৈন্যদের দড়ির পুলের উপর দিয়া নদী অতিক্রমণ

প্রতিষ্ঠার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বৎসরে আজ লোকসংগ্রহ  
এবং শিক্ষাদান এই উভয় ব্যাপারে সাফল্যের নিদর্শন পরি-  
লক্ষিত হইতেছে। আজকের দিনে, এমন কি গ্রামীণ  
ইউনিটগুলিতে পর্যাপ্ত লোকসংগ্রহের ব্যাপার দুই বৎসর  
পূর্বে যেমন ছিল, তাহার চেয়ে অনেক উন্নত। আঞ্চলিক  
বাহিনীর লোকেরা প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে যোগদান  
করিয়া এবং অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া সকলের  
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আঞ্চলিক বাহিনীর ইউনিট-  
গুলির শিক্ষাদানকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা  
হইয়াছে তন্মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে ‘ক্যাম্প’ টেরিটোরিয়াল  
আর্মি ব্রিগেড’ গঠন, গত বৎসর গড়গাঁওয়ের নিকট ইহার  
শিবির সংস্থাপিত হয়। ইহাই সম্ভবতঃ আঞ্চলিক বাহিনীর  
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ লোকসমাবেশ। যেমন বিভিন্ন রাজ্যের  
মন্ত্রী পার্লামেন্টের সদস্য প্রভৃতি, তেমনি সৈন্যবাহিনীর যে  
সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইহা পরিদর্শন করেন তাহারা

সকলেই আঞ্চলিক বাহিনীর লোকদের উচ্চ মিত প্রশংসা  
করিয়াছিলেন।

কেজে এবং রাজ্যসমূহে উপদেষ্টা সমিতি গঠনও আঞ্চলিক  
বাহিনীর উন্নতি এবং বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।  
এই সমস্ত কমিটি মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া আঞ্চলিক  
বাহিনী প্রশস্তির পক্ষে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা পরীক্ষা  
করেন এবং ইহার উন্নতিবিধানের পন্থা নির্ধারণ করেন।

উপসংহারে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে,  
আঞ্চলিক বাহিনী আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দৃঢ় ভিত্তির  
উপর। দৈর্ঘ্য এবং অগাবসায়ের বলে আজ ভারতের দ্বিতীয়  
প্রতিরক্ষা-বৃহৎ রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রারম্ভিক  
শুভ লক্ষণ আঞ্চলিক বাহিনীর উজ্জল ভবিষ্যতের সূচনা  
করিতেছে—আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা দেশের  
গৌরব বৃদ্ধিকারী একটি শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হইবে  
বলিয়া মনে হইতেছে।



# নারী টেনে তাঁরে তুলেছে উর্কে,

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

প্রয়াগের ঠিক পশ্চিমাংশে চিত্রকূটের পূবে  
রাজাপুর গ্রামে করিতেন বাস শ্রীভানুদত্ত চাণক্য ।  
ছলসী নারী গৃহিণী তাঁহার অতি রূপবতী নারী,  
গর্ভে তাঁহার জন্ম লভিল ছুটি ছেলে বলিহারি ।  
নন্দদাসের কনিষ্ঠ বটে ভক্ত তুলসীদাস,  
কান্তকুজী ব্রাহ্মণ তাঁরা, দুঃখ করেন বাস ।  
আট বছরের তুলসীকে রাখি পিতা তাঁর মারা যান,  
ষাটশ বর্ষ কাশীধামে থাকি পাঠে চলে দেন প্রাণ ।

২

বাড়ীতে আসিয়া বদ্ধ হলেন ভক্ত তুলসীদাস,  
রূপসী নারীর আঁচল ধরিয়া রহিতেন বারো মাস ।  
সহ হ'ত না কখনো বধুর দৈবৎ অদর্শন,  
রূপজ মোহের মোহিনী মায়ায় বিমোহিত ছিল মন ।  
চোখের আড়াল হলেই অমনি ঘটে যেত সঙ্কট,  
জল-ধোঁক তোলা মাছের মতন করিতেন ছটফট ।  
স্নেহ বলিয়া জানিত সবাই, ক্রুরপুং নাই তায় ;  
অশ্রুবাড়ীর লোকেরা আসিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যায় ।

৩

কোনো একদিন তুলসী যখন গেছেন স্থানান্তরে  
অশ্রুবাড়ীর আশ্রয় আসে বধূক নেবার তরে ।  
জননী তাঁহার পুত্রবধূক পাঠান পিত্রালয়,  
তুলসী আসিয়া আলয়ে দেখেন—বাড়ীটা আঁগারময় ।  
প্রাণাধিকা নারী গিয়েছে কোথায় শুধান মায়ের কাছে ;  
জননী বলেন, “যেতে দিছি আমি বাপ-মা যেথায় আছে ।  
তোমার অসম্মতি সত্ত্বেও পাঠানু বাপের বাড়ী,  
বলিয়া দিয়েছি পই-পই করি” আসিবারে তাড়াতাড়ি ।”

৪

মাতার বচন শুনিয়া তুলসী ভীষণ মর্ষাহত ।  
৬টিতি গেলেন অশ্রুবাড়ীতে ঠিক পাগলের মত ।  
স্বামীর হেরিয়া ক্ষুদ্র চিত্তে কহে সুন্দরী প্রিয়া,—  
“লজ্জা তোমার হ'ল না আসিতে ? আমার ফাটিছে হিয়া ।  
অস্থিচর্ম্মময় এই মোর কণ্ঠস্থর দেহ !  
তোমার প্রেমকে শত শিকার ! কামে-ভরা এই স্নেহ !  
রামচন্দ্রের প্রতি তুমি দাও এই স্নেহ প্রেম প্রীতি,  
বিমলানন্দ পাবে তুমি তবে, বহিবে না ভক-ভীতি ।”

৫

জানোদীপক এ-কথা শ্রবণে তুলসীর প্রাণ জাগে,  
একেবারে সোজা কাশী চলে যান গাঢ় ধর্ম্মানুরাগে ।  
এই কুনৌজী ব্রাহ্মণ সেথা অসীমঘাটে করি' বাস  
নিহা পক্ষা-স্বতিবন্দনা করিতেন বারো মাস ।  
রামচন্দ্রের গাভুল চরণ গান করি' দিনরাত  
কাশীর বিজন অর্ঘ্যঘাটে বসি' করেন জীবনপাত ।  
প্রত্যাহ তিনি গাড়, হাতে নিয়ে যেতেন প্রাতঃকালে,  
সন্নিকটেই বসিতেন গিয়ে বোপের অন্তরালে ।

৬

একটি বোপের মাদারে সেথায় পিশাচ করিত বাস,  
শৌচের অবশিষ্ট জলেতে মিটাতো তুষার আশ ।  
তুলসীদাসের শৌচের জলে তপ্ত হইয়া ভূত  
বর-প্রার্থনা করিতে বলিল, কথা বটে অদ্ভুত ।  
তুলসী বলেন, “আমি অক্ষম ; কর্ণঘণ্টা গ্রামে  
সাধু ব্রাহ্মণ আছে একজন, তিনি দেখাবেন রামে !  
তুমি যাও সেথা, তাঁর সাহায্যে পূরিবে মনস্কাম ।”  
তুলসী চলিলা কর্ণঘণ্টা ত্যাগ করি কাশীধাম ।

৭

ছুটিয়া গেলেন তুলসী সেথায় ওই বাঘুনের কাছে,  
সকল বাসনা কাতরে বলেন, মনে যাহা-কিছু আছে ।  
সাধু ব্রাহ্মণ শ্রীরাম-মন্ত্রে দীক্ষা করিয়া দান  
পাঠান চিত্রকূট পর্ব্বতে লুন্ধ করিয়া প্রাণ ।  
গুরুর কৃপায় ছয় মাস পরে সিদ্ধি করিয়া লাভ  
সহসা দেখেন ওই পর্ব্বতে রামের আবির্ভাব !  
তুলসীদাসের উগ্র সাধনা সেদিন হইল শেষ,  
অবনত শিরে আজিও তাঁহারে অরিছে সকল দেশ !

৮

তুলসীদাসের গৃহিণীর মতো কোথা মহীয়সী নারী ?  
পুণ্যের পথে প্রেরণা লভিতে কেবা হবে অভিসারী ?  
ঘুচাইতে মোহ, কাটাইতে মায়া, সহায়তা পেলো তাঁর  
এখনো মানুষ হবে দেবোপম, ঘুচিবে অন্ধকার !  
মানবাত্মার কল্যাণকামী কোথা কল্যাণী বধূ ?  
শান্তি-সুখের ক্ষুধাতুর প্রাণ পিয়বে প্রেমের মধু ।  
কণিকের সেই শুভ মুহূর্ত্তে জাগিল তুলসীদাস !  
নারী টেনে তাঁরে তুলেছে উর্কে, পূর্বায়েছে অভিশাস !

## বিজয়।

### শ্রীমজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিজয়া দশমী। মধ্যাহ্নে আহারের পর কেদারার হেলান দিয়ে একটু আরামের চেষ্টা করছি; হঠাৎ অদূরে রাস্তার ধারে প্রতিবেশী এক বহুদল্লভিত্য বাগ্ৰ আত্মান উপস্থাপি শোনা গেল। কোনরূপ ছুঁচিনা ঘটল নাকি—মনের মধ্যে এরূপ একটা উৎসেগ নিয়ে নগ্নগাত্রেই তাঁদের দিকে ধাবিত হলাম। অর্ধশয্যে দেখি এক গ্রাম্য ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বহুবর আমার দিকেই অগ্রণব হ'চ্ছেন। সামনে এসে বললেন, “ইনি আপনাকে খুঁজছিলেন। চিনতে পারেন কি?”

মোটো শব্দরের মায়াুলি ধুতি-পাঞ্জাবীধারী এক গ্রামবাসী। ধূলিধূসরিত চরণ—জুতার বালাই নাই! পোশাকও খোপ-ছত্র নয়। কে ঠিক চিনতে পারছি না! গ্রামবাসী কোন আত্মীয়স্বজন হবেন কি?

স্মৃতিসমুদ্র আলোড়ন করে ধীরে ধীরে যেন একটি পরিচিত মুখ ভেসে উঠছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে ছাত্রজীবনে ধাঁদের সঙ্গে একই ঘরে বাস করেছি—ইনি যেন তাঁদেরই কেউ! সহসা আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম—“নবকৃষ্ণ!” আমার ভুল হয় নাই। নবকৃষ্ণ আমার জড়িয়ে ধরলেন। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী নবকৃষ্ণ।

তিনি আমাকে ধরে টেনে নিয়ে চললেন তাঁর শিকার স্থান গুরুদেবের শাস্তিনিকেতনে ঘুরে বেড়াবার জন্য। আমার গায়ে জামা ছিল না বলে ইতস্ততঃ করছিলাম। তাই বুকেতে পেরে তিনি বললেন, “না হয় আমার জামাটাই গায়ে দাও। আমিই না হয় খালি গায়ে ঘুরব।”

অগত্যা সমস্ত সজ্জাচ বেড়ে ফেলে কোঁচার খুঁটখানি গায়ে দিয়ে পরমোৎসাহে তাঁর সঙ্গে হেঁটে চললাম। চীন-ভবনের বারান্দায় এনে মালতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। নবকৃষ্ণের সহধর্মিণী মালতী। আমাদের সহ-পাঠিনী। কস্তা নাতি-নাতনী পরিবৃত্তা হয়ে এসেছেন শৈশবের লীলাভূমি শাস্তিনিকেতনে।

মালতী চৌধুরাণী এককালে দেবীচৌধুরাণীর মতই হৃদ্যন্ত ছিলেন। শারীরিক শক্তিতে তাঁর সমকক্ষ ছিল—আমাদের মধ্যে এমন কোন “ভবানী পাঠকের” কথা আমার মনে আসছে না। ছুঁতিনটি ডাকু ছেলেকে একসঙ্গে চড়, চাপড়, ধাপড় দিয়ে নাকাল করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গাছে চড়ে আম বা পেয়ারা পাড়তে পারত, এমন ছেলে খুব কমই ছিল। গাছের মগডালে লোভনীর কলটি তিনি দ্বারা ক'রে না দিলে, কাণ্ড পাখার

উপায় ছিল না। অবশ্য দ্বয়ার তাঁর অন্ত ছিল না। ওই হৃদ্যন্ত মেয়েটির স্বপ্ন ছিল অতি কোমল। আমাদের এমন স্নেহময়ী বন্ধুও আর কেউ ছিল না।

তাঁর ওই হৃদমনীয়তা ও স্নেহশীলতা পরবর্তী জীবনে বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ এবং দেশসেবার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মালতী চীন-ভবনের প্রবেশমুখে প্রাচীর-পাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখছিলেন। সম্মুখে গুরুদেবের “নটীর-পূজা” অপূর্ণ-তুলিকায় চিত্রিত রয়েছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। এক দিন “নটীর-পূজা”র রাণী লোকেস্বরীর পাঠ নিয়েছিলেন মালতী। তাঁর সেদিনের সেই অপূর্ণ অভিনয়ের কথা আজও আমাদের চিন্তপটে অঙ্কিত আছে। ‘লোকেস্বরী’ চরিত্রের অভিনয়ে মালতী আজ সত্যিই লোকেস্বরী।

নবকৃষ্ণের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ছাত্র-জীবনের বাসগৃহটির সম্মুখে এসলাম। এখন তা পাঠভবন-অধ্যক্ষের কার্যালয়। নবকৃষ্ণ পরম আগ্রহের সহিত তাঁর বরখানি দেখতে লাগলেন। এককালে এই দোতলা গৃহের নীচের তলায় নবকৃষ্ণ, রামচন্দ্র<sup>১</sup> এবং আমরা ছ'জন অধ্যাত ব্যক্তি বাস করতাম। আমাদের পাশেই থাকতেন গোপাল রেড্ডি<sup>২</sup> ও সৈয়দ মুজতবা আলি<sup>৩</sup>।

নবকৃষ্ণ এক সময় হাস্যচ্ছলে বললেন—“বিশ্বভারতীতে খুব বেশী দিন থাকার সুযোগ হয় নি। কাজেই বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারি নি। তবে যাবার সময় মালতীকে নিয়ে গেছলাম।”

কথাটা তিনি হাস্যচ্ছলে বললেও আমাদের মনে তা বেশ ছাপ দিয়ে গেল। সংস্কৃতে একটি কথা আছে “জীবনম্”; সত্যিই নবকৃষ্ণ বিশ্বভারতী হতে এই অপূর্ণ রত্নটি লাভ করেছিলেন। যে শুভকক্ষে এই মণিকাকন যোগ হয়েছিল, বিশ্বভারতীর ইতিহাসে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বীরভূমের রাজ্যমাটির ধুলোর পথে নগ্ন পদে পদব্রজে নবকৃষ্ণ, মালতী তাঁদের কস্তাঘর এবং নাতিটি চলেছেন। মাঝে মাঝে ধুলোর মধ্যে নাতিটি বসে পড়ছে এবং তক্ষণাৎ ধুলে

১। জি. রামচন্দ্র—স্বনামধন্য গান্ধীপন্থী শিক্ষাব্রতী।

২। বি. গোপাল রেড্ডি—মাজাজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষী।

৩। বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্র-আচার্য (Pro-Chancellor)

৪। দাদা ভাবাবিধ, পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক।

দিয়ে বেলা আরম্ভ করে দিচ্ছে। সেই অপূর্ণ দম্পতি তার সেই ঘুলোথেলা হাসিমুখে দেখছেন। নিত্যন্ত সময়ভাব, তাই কণেক পরেই সেই ঘুলিধূসরিত বাল গোপালকে কোলে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। সঙ্গে দাসদাসী, বেয়ারা, চাপরাশী কেউ নাই। লাল-পাগড়ীধারী পুলিশ নাই। কেবলমাত্র গোয়েন্দাবিভাগীয় একটি কর্মচারী সাধারণ ভদ্রবেশে বেশ একটু দৃষ্টি রক্ষা করে নিজের কর্তব্যপালন করে চলেছেন।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে দেখা। এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা যেন আমাদের কারও মনে এল না। ছাত্রদীবনের জায় সহজে স্বচ্ছন্দে আমরা পরস্পরে আলাপ করে চললাম।

মালতী ও নবকৃষ্ণ তাঁদের প্রত্যেক পুরাতন বন্ধুর খবর নিলেন, ঘাঁদের খোঁজ পেলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই দেখা করলেন। মাত্র পাঁচ বন্ট ছিলেন। মাঝখানে পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে আহা! সেসে এই পাঁচ বন্টার বাকি সমস্ত সময় আশ্রম ও আশ্রমিক দর্শনে অতিবাহিত করলেন।

গুরুদেব-চুহিতা মীরাদেবী, আচার্য্য নন্দলাল, আচার্য্য ক্ষিত্তিমোহন শাস্ত্রীর পদপ্রান্তে উপবেশন করে তাঁদের সরস মধুর অমূল্য বাক্যলাপ মুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করতে লাগলেন। সময় তাঁদের সীমাবদ্ধ, অপরাহ্ন পাঁচটার সময় যে তাঁদের

কিরতে হবে, সেকথা তাঁরা ভুলে যাচ্ছিলেন। আমাদেরই সে কথা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছিল।

পানাগড়ের কাছে এক গ্রামে এসেছেন মন্ত্রিস্থের ষড়্‌চূড়া ঘুরে কেলে বিশ্রামের জন্ত। সেখান থেকে মোটরে করে বারোটার সময় শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, পাঁচটার সময় কিরে গেলেন। যাবার সময় আমাদের প্রত্যেককে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেলেন তাঁদের গৃহে যাবার জন্ত।

কিছুকাল যাবৎ মনসিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না, কি এক ভয়াবহ নিরাশা ও বিধাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত ছিল। গান্ধীজীর অবর্তমানে তাঁর শিষ্যগণ নূতন গুরু বরণ করেছেন। জনগণের শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে গান্ধী-শিষ্যের রাজকীয় আড়ম্বর দেখে মনে হ'ত, সত্যি গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু না। গান্ধীজীর মৃত্যু হয় নাই। মালতী-নবকৃষ্ণ প্রমুখ শিষ্য-শিষ্যানের মধ্যে এখনও তিনি জীবিত রয়েছেন। মর্তের কোন রাজপদ, কোন ঐশ্বর্য্য ঘাঁদের বাধতে পারে না, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও মন ঘাঁদের পড়ে থাকে দরিদ্র, লাজিত জনগণের পূর্ণ-কুটীরে, তাঁদের মধ্যেই গান্ধীজীকে আজ প্রত্যক্ষ করলাম। সেই সর্বব্যাপী আশানবাসী মহাদেবদ্রুশ মহাত্মার মৃত্যুবিজয়ী আত্মাকে আমার বিজ্ঞার প্রণাম জানালাম।

## মুহুর্তের মূল্য

শ্রীপ্রভাকর মাকি

কালের প্রবাহ সখি, বহিতেছে নিরন্তর হুঁকার,  
ভেসে চলে বর্ষ-মাস, প্রাত্যহিক তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি।  
ধামার সঙ্কেত নাই—দীর্ঘ পথ রয়েছে চলার,

কৃত্র বীজে জন্ম নেয় যুগান্তের বৃক্ষ বনম্পতি।  
শতাব্দী চলিয়া যায়, উড়ে যায় সময়ের রথ,  
আবেক শতাব্দী আসে—নব আশা, নব সম্ভাবনা।  
বনম্পতি মৃত্যু লাভে, ধ্বংসে পড়ে জীর্ণ ইমারত,  
অতীতের চিত্রা-ভ্রমে রয়ে পড়ে অন্ধ এক কথা।

এ মুহুর্ত কতটুকু সীমাহীন সময়ের কাছে?  
ভ্রমাপ মনের কোণে জাগে মোর পরম গৌরব।  
—তোমার আশ্রিত প্রান্তে প্রীতির যে আলোটুকু নাচে  
কালের পথিক সেখা যুগে যুগে মানে পরাভব।

প্রণয়, চুখন আর অর্থহীন তুচ্ছ আলাপন,  
সহসা ভুলারে দেয় অংশ হুগে বিশ্ব চরাচর।  
আকাশের শতভিষা একসত্র করে নিবীক্ষণ,  
তোমার প্রেমের স্পর্শে এ মুহুর্ত শাস্ত সুন্দর।

## প্রাণদণ্ড

### খ্রীষ্টধর্মের ভ্রম

অপরাধ যতই গুরু ও ভীষণ হউক না কেন, মানুষের প্রাণদণ্ড হান কর্তব্য কি না, এ বিষয় লইয়া বহুকাল যাবৎ তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। বিলাতে লর্ড বার্কমাটোর প্রাণদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতি কিন্তু সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রস্তাবটি লইয়া এখনও আলোচনা বন্ধ হয় নাই। প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু কি উপায়ে সম্বাদিত করা যায়, এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ব্রিটেনে যে 'রাজকীয় কমিশন' নিযুক্ত হইয়াছিল, উহার রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ব্রিটিশ পদ্ধতি অর্থাৎ ফাঁসী লটকাইয়া মারাই সর্বোত্তম; আমেরিকার ইলেকট্রো-কিউশন (বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাইয়া) অথবা গ্যাস প্রয়োগে হত্যা ইহাদের কোনটাই ব্রিটিশ রয়্যাল কমিশনের মতে কম স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বাভাবিক সময়সাপ্য নয়। কমিশন আশু মৃত্যুদায়ক ইনজেকশনের কথাও বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ফাঁসীর সঙ্গে কি উহার তুলনা হয়? ফাঁসী হইল সনাতন ব্রিটিশ প্রথা। বনিয়াদী ধরের সম্রাস্ত্র ভক্তলোকের মত ফাঁসীরও তাই একটা কোলিত আছে। তাহা ছাড়া ফাঁসীতে হাত পাকাইতে পাকাইতে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরা উহাকে একটি অব্যর্থ মৃত্যুযন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। মার্কিন ইলেকট্রো-কিউশন গ্যাস, অথবা ইনজেকশন সব কিছুতেই নাকি ভুল হইতে পারে। কিন্তু ফাঁসী নিতুল, একবারে অমোঘ! সুতরাং ব্রিটিশ আদালতের বিচারে যাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে, তাহাদের জন্য আপততঃ ফাঁসীই অবশ্যিস্থ বসিল। ভারতে প্রাণদণ্ড প্রথা প্রবর্তিত আছে। বিনয়টি ভারতবাসীর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ ও ব্যবহার দেখিয়া কোন জাতি সভ্য কি অসভ্য, দানব কি দেবতা, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। সভ্যতা কখনও একটা লোক দেখান ব্যাপার হইতে পারে না। যাহাদের বাহ্য কার্যের সহিত অন্তরের মিল আছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে সভ্যপদবাচ্য। যাহাদের কথায় ও কাজে মিল নাই, তাহারা আত্মপর-ভেদে ব্যবহারের ভেদ করে, তাহারা জড়বিজ্ঞানের দুই চারিটি রহস্য অগিগত করিয়া পাখি ব্যাপারে কতকটা শক্তিশাল্য করিলেই যে সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, সভ্যতার উদ্ভবস্থ ভারতবর্ষ কখনই তাহা মনে করিতে পারে না। অপরাধীকে শাস্তি-দানের ব্যবস্থায় সভ্যতার প্রকৃত লক্ষণ কতকটা প্রকাশ পায়।

অপরাধীদিগের সহিত ব্যবহারে যে জাতির বিধি-বিধানে প্রতিহিংসার ভাব প্রবল থাকে, সে জাতি যে তখনও তাহাদের বর্বরভাব পরিহার করিতে সমর্থ হয় নাই, এই পদচ্যই তাহারা পৃথিবীব্যাপী লোকের সমক্ষে প্রদান করিয়া থাকে। যে সময়ে ইউরোপে খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রবেশলাভ করে নাই, সে সময়ে তথায় শাস্তিদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ছিল। তখন অপরাধী অন্তর্কে যতটা বেদনা দিয়াছে, তাহাকে ততটা বেদনা ভোগ করাইবার জন্যই শাস্তি প্রদান করা হইত। তখন শাস্তিদান প্রতিহিংসামূলক ছিল। 'My eye for an eye, tooth for a tooth'—তখন শাস্তিদানের মূলমন্ত্র বিবেচিত হইত। কিন্তু প্রাচী হইতে খ্রীষ্টধর্ম যখন প্রতীচীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতেই তথায় এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। তখনই খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রভাবে লোক বুঝিতে পারে যে, অশুষ্ঠিত কার্যের জন্য হিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি পরিকল্পিত হওয়া উচিত নহে—ভবিষ্যতে যাহাতে আর ঐক্লপ অপরাধের অনুষ্ঠান না হয়, তাহার জন্যই বিধিপুস্তকে শাস্তির উল্লেখ থাকা আবশ্যক। প্রাণদণ্ডের অহুকুলে প্রধান যুক্তি এই যে, যদি প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে লোকে অকারণে বহুলোকের প্রাণ বিনষ্ট করিবে। মানুষের মৃত্যুভয় স্বাভাবিক। অধিকাংশ লোক মৃত্যুভয়েই নরহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব লোকের প্রাণরক্ষার জন্য, সমাজের স্থিতির জন্য, মানবজীবনের পবিত্রতা স্থাপনের জন্য অতি ভীষণ অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা কর্তব্য। ধর্ম-শাস্ত্রে অতীতের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরাধীকে অতি কঠোর দণ্ড দিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভি-প্রায় নহে। সেইজন্য গুক্রনীতিতে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে :

‘অতি দণ্ডাচ্চ গুণিত্ত্যজ্যতে পাতকী ভবেৎ’

অতিদণ্ড প্রদানের ফলে গুণী ব্যক্তির অতিদণ্ড-প্রদাতা বিচারককে পরিত্যাগ করেন; অধিকন্তু, সেই বিচারপতি পাতকী হইয়া থাকেন। অন্ততঃ বলা হইয়াছে—

‘ক্ষময়া যন্ত, পুণ্যং স্তাভ্যং কিং দণ্ড নিপাতনাং?’

অপরাধীকে ক্ষমা করিলেই যে পুণ্য হয়, দণ্ডদান করিলে কি তাহাই হইয়া থাকে? ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থে বা দণ্ডবিধি পুস্তকে কোন অপরাধের জন্য যদি কঠোর শাস্তিদানের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে বিচার-

পতিকে সেইজন্য দায়ী বলিয়া প্রমাণিত অপরাধীকে সেই কঠোর দণ্ডই দিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। বিচার-পতি স্বীয় ক্ষমতাকে ক্ষমারসে সিক্ত করিয়া তবে আসামীকে দণ্ড দিবেন, ইহাই মহামি শুল্লাচার্যের ব্যবস্থা। তবে ধর্ম-শাস্ত্রে যে অতিদণ্ডের বা কঠোর দণ্ডের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপরাধ অনুষ্ঠানে লোভ লোকদিগের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিবার জন্য, সেই দণ্ড প্রদান করিবার জন্য নহে। justice temper'd with mercy—‘করণ-রস-সিক্ত ন্যায় বিচার’ এই কথাটা প্রাচীর, প্রতীচীর নহে।

প্রাণদণ্ডদানের প্রতিকূলে বহু যুক্তি উপস্থিত করা হইয়া থাকে, যথা:—

(১) মানুষের জীবন অত্যন্ত পুণ্য বস্তু। কারণ যতই গুরুতর হউক না কেন, কোন কারণেই মানুষের প্রাণদণ্ড দান বিধেয় নহে। যে প্রাণ দিবার শক্তি মানুষের নাই সে প্রাণ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা মানুষের দায়িত্ব-বুদ্ধির দারুণ অভাবের পরিচায়ক।

(২) দণ্ডের কঠোরতার দ্বারা অপরাধের নিরস্তির অজুহাত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ত চিরকালই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মানব-সমাজে নরহত্যা অপরাধ রহিত হয় নাই। ড্রেকোর আমলে যখন পাতাকাটা চোরকে ফাঁসী দিবার ব্যবস্থা ছিল, তখন এই অপরাধ-বিড়ম্বিত মানব-সমাজ দিবা সমাজে পরিণত হয় নাই।

(৩) একজনের প্রাণদণ্ড দেখিয়া অন্ত সকলে যে অপরাধের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়, এই হেতুবাদ মিথ্যা, তথ্য দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

(৪) বিচারকের ত্রাস্তির ফলে, মামলা সাক্ষীবার কোর্শলে, কুট সাক্ষ্যের প্রভাবে নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী বিবেচনায়া শাস্তিদান সম্ভবে—এরূপ ব্যাপার প্রায়ই হইয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় যে দণ্ড আর প্রত্যাহার করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না, অপরাধীকে সেরূপ দণ্ড দেওয়া কর্তব্য নহে। বাহার জীবনদানের ক্ষমতা নাই, তাহার জীবন গ্রহণেরও অধিকার নাই।

(৫) অপরাধপ্রবণতা একটা উৎকট ব্যাধি। ব্যাধি-গ্রস্তকে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই বিধিসম্মত এবং সাধুজনসম্মত।

উপরোক্ত অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করাই বিধেয়।

এখন প্রথম কথা এই যে, মানুষ অপরাধ করে কেন? অপরাধপ্রবণতা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্দেশেবে সকল মানব সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কৌলিক-প্রভাব, শিক্ষা-দীক্ষা এবং ধর্মবুদ্ধির প্রভাবে উহার কিছু তারতম্য হইয়া

থাকে সত্য, কিন্তু নিরপরাধ সমাজ নরলোকে নাই। যেখানে সমাজ সেইখানেই অপরাধ এবং সেইখানেই দণ্ডবিধি বিদ্যমান। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অপরাধপ্রবণতা ব্যাপ্তির জায় সমাজে বরাবর স্থানলাভ করিয়া আসিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই অপরাধ করিবার প্রবৃত্তির কারণ কি?

সচরাচর উহার দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কারণ প্রচণ্ড ক্রোধ বা মানসিক উত্তেজনা, দ্বিতীয়টি প্রতিহিংসারক্তির চরিতার্থতা সাধন। এই দুইটি কারণেই শতকরা নব্বইটি বা তাহা অপেক্ষা কিছু অধিকসংখ্যক নর-হত্যা এবং অন্যান্য অপরাধ সম্ভটিত হয়।

যাহারা বলেন যে, মনুষ্য-জীবনের বিপুল রক্ষা করিতে হইলে প্রাণদণ্ড কর্তব্য নহে, তাহাদের প্রতিবাদস্বরূপ অপর পক্ষ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে, প্রাণদণ্ড বহাল রাখা আবশ্যক, কারণ প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া দিলে নরহত্যাজনিত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। উদাহরণ-স্বরূপ তাহারা বলিয়া থাকেন, অনেক ক্ষেত্রে অতি ভীষণ অপরাধে প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দিলে নরহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাহারা বলেন, মার্কিনের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি রাষ্ট্রে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া আবার উহা বহাল করিতে হইয়াছে। এইরূপ অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ইটালী এবং সুইজারল্যান্ডের কতকগুলি ক্যান্টনে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া পুনরায় উহা প্রবর্তিত করিতে হয়। কারণ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রহিত করিবার পর সর্বত্রই নরহত্যা অপরাধীর সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ইটালীতে দশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক শত পাঁচটি হত্যাকাণ্ড সম্ভটিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বিলাতে দশ লক্ষ লোকের মধ্যে গড়ে সাতাশটি মাত্র নরহত্যা ঘটে। ইহা অবশ্য কিছুদিন পূর্বেকার হিসাব। ইটালীতে লোককে সাধ্যপক্ষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় না বলিয়াই তথায় নর-হত্যা এত অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং মনুষ্য-জীবনের পুতঙ্গ রক্ষা করিতে হইলে যুত্যাণ্ড বহাল রাখা কর্তব্য। ফাঁসিকাঠ হইতে অপরাধীর জীবন রক্ষা করিতে গেলে জনসাধারণের আত্মকের পবিত্র জীবন নরঘাতকের হস্তে নষ্ট হইবে। অতএব দণ্ডবিধি পুস্তক হইতে প্রাণদণ্ড একেবারে নির্মাসিত করা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। যাহারা হিসাবপত্র দেখাইয়া এই কথা বলিয়া থাকেন, তাহাদের কথা অর্থোক্তিক মনে করিবার উপায় নাই।

কিন্তু অপর পক্ষের যুক্তিও দুর্বল নহে। প্রাণদণ্ডের প্রতিকূলে যে (৪) এবং (৫) যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যে সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; উহা খণ্ডন করা

যায় না। এই অল্প পরিসর স্থানে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা একপ্রকার অসম্ভব। অবশ্য দণ্ডের ভয় না থাকিলে মানুষ সহজেই লোভের এবং কুপ্ররক্তির প্ররোচনায় অত্যন্ত ভীষণ পাপাত্মকতানে রত হইয়া থাকে। লোক প্রাণদণ্ডকে স্বতঃই অত্যন্ত ভয় করে। সুতরাং উহা দণ্ডবিধি হইতে একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে।

আমাদের মনে হয়, উভয় মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-সাধন অসম্ভব করা যাইতে পারে। লঘু হস্তে মানুষের প্রাণদণ্ড করা অতীব গহিত। বিশেষতঃ যেখানে মানুষ কণিক উত্তেজনার বশে নরহত্যা করিয়া বসে, সেখানে অপরাধীর প্রাণদণ্ড দান সমীচীন নয়; তবে যে ক্ষেত্রে মানুষ বহুদিন চক্রান্ত করিয়া বা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া অত্যন্ত ভীষণভাবে নরহত্যা করিয়া বসে, সেই ক্ষেত্রে সময় সময় প্রাণদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। উপরে যে সকল দেশের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল দেশে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হইয়াছে, সে সে দেশেও প্রায়ই লোককে ঐ দণ্ড দেওয়া হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও তথায় ঐ ব্যবস্থা বিধিপূর্তক স্থান পাইয়াছে বলিয়াই লোক আর উহার ভয়ে নর-

হত্যা করিতে চাহে না। অধিকন্তু একটি নরহত্যার জন্য একাধিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যের নিষ্ঠুরত-হচক, সে বিষয়েও আর সন্দেহ নাই।

তবে যদি কোন পরিণতবয়স্ক ও সাধারণ বুদ্ধিমত্তার ব্যক্তি নিতান্ত কুপ্ররক্তির বশে কোন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া সেই ঘটনার একমাত্র শাস্তীকে লুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে সেই নারীকে বধ করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিলে কখনই বিশেষ দোষের হয় না। যদি কোন দস্যুদল লোকের সর্বস্ব হরণ এবং লোককে হত্যা করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগেরও মৃত্যুদণ্ডে অবিণেয় নহে।

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য ব্রিটেনের রাজকীয় কমিশন পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের পার্থক্য করা উচিত কিনা সে প্রশ্নও বিবেচনা করিয়াছেন। অবশ্য বর্তমানে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত নারীদের শতকরা নব্বই জনকেই নাকি বিকল্প শাস্তি (কারাদণ্ড) দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু কমিশনের ভাষায় “নারী ও পুরুষের মধ্যে এ বিষয়ে আইনগত পার্থক্য করিবার কোন হুজিই আমরা দেখিতে পাই না।”

## অপরিচিতা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিনি না বাহারে সেই রূপহীন অশ্রুপা যেরে  
মোড়িয়াছে মন ;  
আমার সর্বস্ব শুধু নিনিমেব শত চোখে চেরে  
তাহারি কারণ ।  
দুঃসহ ব্যথার মত অব্যক্ত কি আনন্দে অপার  
এই চেরে থাক' ।  
অন্তরের তলে তলে অনর্কক মহাশূন্যতার  
পূর্ণ রূপ আঁকা ।  
বাস্তব জীবন আর বত সত্য হৃৎপ্রচুর স্বপ্ন  
সব ডুবে যায় ;  
কোথাও বে নাই তার বয়সীর স্বপ্ন অহৈতুক  
হাস্য কঁাদায় ।  
বনানী-বীণার কত বাজে বেন ভীক আপমনী  
তজ্জ্বালস বাজে ;  
আকাশের পথে পথে ভালে ওজস্ব রূপের লাবণী  
স্বপ্নালী জ্যোৎস্বাজে ।

বিহগের কল-কণ্ঠে শুনি তার কল্প-সুখ-স্বপ্ন—  
বিপিনে বিপিনে ;  
পুলের অকুট ভাবে উচ্ছসিত হাসির নিরব  
কান্তনের দিনে ।  
বরষার বেবায়ের মনে হয় চাক নীলাধরী  
ওড়ে বেন তার ;  
রোমাক্ষিত তৃণে তৃণে স্পন্দমান প্রাণ গুঠে তরি'  
সেই অবসায় ।  
নিখিলের মধ্যে মধ্যে কাল্পনিক ছবি তার নাচে  
গীত-গন্ধ-রূপে ;  
পলকে পলয় কড়, জ্বলয়ের সব চেরে কাছে  
আসে চূপে চূপে ।  
স্বপ্নতার গানে গানে কেঁদে কর ধ্যানরত মন,  
হে গীলা-গদিনী ।  
বিবর-বহুস্তে তুমি সর্বময় তরি' এ ভুবন  
যদিও না ছিন্নি ।



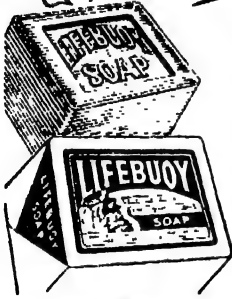
# রোজকার ধূলোময়লার

রোগবীজসমূহ থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন



লাইফবয়

ফেণার  
আবরণে



যতাই কেন ছ'মিটার হোন না—প্রতিদিনই আপনি ধূলোময়লার  
রোগবীজসমূহ থেকে সংকমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফবয় সাবান স্বেচ্ছা  
নিত্য স্নানের অভ্যাস করে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।  
লাইফবয়ের রসকারী ফেনা ধূলোময়লার  
বীজসমূহকে ধুয়ে সাদা করে দেয় ও সার্বাঙ্গীন  
আপনার শরীরকে ত্রিধা ও স্বচ্ছ করে রাখে।

## লাইফবয় সাবান

দৈনন্দিনের রোগবীজসমূহ থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা





# আলোচনা



## “রাজা গণেশের প্রাচীনতম উল্লেখ”

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

১৩৫০ সালের চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে “রাজা গণেশ, দমুজমর্দন-দেব ও মহেন্দ্রদেব” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে আমার প্রতিপাত্ত বিষয় ছিল যে, যখন “বাল্যলীলা সূত্র” ও “অবৈত প্রকাশ” গ্রন্থে গণেশ নামক বৈষ্ণব রাজার এবং “লঘু-তোষণী”তে গণেশের সমসাময়িক দমুজমর্দন নামক ( সম্ভবতঃ চন্দ্রবীপের ) পৃথক এক জন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় তখন ডঃ ভট্টশালী প্রিন্স-ডব্লিউ-সালাতীনের ( ১৭৮৮ খ্রীঃ ) ভ্রমপূর্ণ বিবরণের ভিত্তিতে মুন্সীর “চণ্ডীচরণ পরায়ণ দমুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবকে বখাফ্রমে রাজা গণেশের ও তৎপুত্র বটর ( জিম্মল ) উপনাম বলিয়া যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা অবাস্তব কল্পনা এবং দমুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব রাজা গণেশ ও তৎপুত্র হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বটরতঃ নিজ নাম গোপন করিয়া মুন্সীর কেবলমাত্র উপনাম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

বিগত বৈশাখ সংখ্যার উপরোক্ত নামধের প্রবন্ধে লক্ষপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত জীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় “সঙ্গীত শিরোমণি” ( ১৪২৮-২৯ খ্রীঃ ) নামক একপাণি অমূল্য গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও অজ্ঞাত হেতুতে আমার ঐ মতবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহাই আমার বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়।

গণেশ সম্বন্ধে সঙ্গপ্রাচীন মুসলমান ইতিহাস ‘তবকাৎ-ই-আকবরী’ ( ১৫৯৩ খৃঃ ) বলেন, শামসুদ্দিনের ( সিহাবুদ্দিন বায়াজিজ ) মৃত্যুর পর রাজা গণেশ বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং গণেশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জিম্মল রাজ্যলোভে মুসলমান হইয়া জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। মুন্সীর প্রমাণে পাওয়া যায় ৮১৭ হিঃতে শামসুদ্দিনের মৃত্যু হয় ও ঐ অবধিই তৎপুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ-শাহ মুগলুমাবাদ ও সাতগাঁ হইতে মুন্সী প্রচার করেন। সুতরাং এই আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ ও তাহার সমর্থক মুসলমান প্রধানগণকে বুদ্ধে সংহার করিয়াই গণেশকে বাংলার সিংহাসন অধিকার করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ৮১৮/৮১৯ হিঃ-তে জালালউদ্দিন ফিরোজ-শাহ, সোনার গাঁ ও চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী প্রচার করেন। ‘তবকাৎ-ই-আকবরী’র পূর্বোক্ত বিবরণের সঙ্গিত সামঞ্জস্য রাপিরা বলিতে

হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ৮১৭ হিঃ শেষ অথবা ৮১৮ হিঃ প্রথমে রাজা গণেশের মৃত্যু হইয়াছিল এবং ৮১৮ হিঃতে তৎপুত্র জিম্মল রাজ্যলোভে মুসলমান হইয়া জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করতঃ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা গণেশের এই আকস্মিক মৃত্যু ও জিম্মলের সহসা রাজ্য-লোভে মুসলমান হওয়ার কারণ কি? আমার বোধ হয়, এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দীনেশবাবুর উদ্ধৃত “সঙ্গীত শিরোমণি”র বচনের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে, এবং দীনেশবাবু এই রচনাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শুধু আমার নহে সমগ্র ঐতিহাসিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দীনেশবাবুর উদ্ধৃত শ্লোক-গুলির একাংশ এই :

“শনাটোপঃ গর্জৎগজতুরগসেনাজলধীরেঃ  
শমঃদীপ্তাশঙ্ক শকশলত সপ্তাতিদময়ঃ।  
তুরঙ্গঃ নির্দায় প্রকটিনয়ঃ তস্ত তনয়ঃ  
বাখাদ্ গোড়ান্ প্রোচঃ পুনরপি শকানাং জনপদান্।”  
“আদিক্গৌড়ধেরা চ হিমাদ্রেরা চ গাজানাং।  
আগোড়াহুঙ্কলঃ রাজ্যমিনরাহিমতুঙ্কলঃ।  
অস্তৈব সার্কভৌমস্ত \* \*।”

অর্থাৎ, এই প্রধান ( সম্রাট ইব্রাহিম ) ঘোরদর্পে গর্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও সেনারূপ মেঘবর্ষণ দ্বারা শকপতঙ্গের অগ্নি [ রাজা গণেশকে ] নির্দাপিত অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া তাহার সুনীতিজ্ঞ পুত্রকে তুরঙ্গ নির্মাণ করতঃ গোড়দেশকে পুনরায় শকজনপদ করিয়াছিলেন। এই সার্কভৌম সম্রাট ইব্রাহিমের রাজ্য দক্ষিণ সমুদ্র, হিমালয়, গাজন ( গজনি ? ) ও গোড় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল।

এই শ্লোকে পতঙ্গের নাশক অগ্নি ও অগ্নির নাশক জলধরের উল্লেখ করিয়া বেভাবে উপমাটিকে সাজান হইয়াছে তাহা প্রমাণিত করিয়া দেখিলে সন্দেহ থাকে না যে, গণেশ যেমন বুদ্ধে মুসলমান-গণকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য হইয়াছিলেন সেইরূপ ইব্রাহিমরূপ জলধর গণেশরূপ অগ্নিকে নির্দাপিত অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া গোড়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং রাজ্যলোভে গণেশের পুত্র জিম্মল (বহু) ইব্রাহিমের সঙ্গিত সন্ধিসূত্রে মুসলমান হইয়া ইব্রাহিমের সার্কভৌম স্বীকার করিয়া লইয়া বাংলাদেশের রাজ্য হইয়াছিলেন।

‘সঙ্গীত শিরোমণি’র প্রমাণে গণেশের বিরুদ্ধে ইব্রাহিমের

**ধপধপে**  
ক'রে কাচা

**ঝকঝকে**  
ক'রে কাচা

**আন্লাইট**  
**আবানের মৌলতে**

না আছড়ে কাচলেও  
কাপড়চোপড় সাদা ও  
ঝকঝকে ক'রে দায়!

**SUNLIGHT SOAP**

গোড়াভিষানের বিষয় প্রমাণিত হওয়ায় রিয়াজের বিবরণের এই অংশ স্বাভাবিক সমর্থনযোগ্য। অন্তঃপুর রিয়াজ বলিতেছেন যে, যে বৎসর ইব্রাহিম গোড়দেশ আক্রমণ করে (৮৭৭৮৮ হিঃ) সেই বৎসরেই ইব্রাহিমের যুগ্ম হওয়ায়ও গণেশ সাতসী হইয়া জালালউদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত ও কারাবদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হন ও সাত বৎসর সিংহাসনে থাকিবার পর জালালউদ্দিনের যড়যন্ত্রে নিহত হইলে জালালউদ্দিন পুনরায় রাজা হন।

৩। সুধানন্দ বলেন, আলীউদ্দিন রাজা হুইতাই উৎসাহিতকে আক্রমণ করেন ও টেহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। বল্লাবভিলা, এই সব উক্তি অযথার্থ।

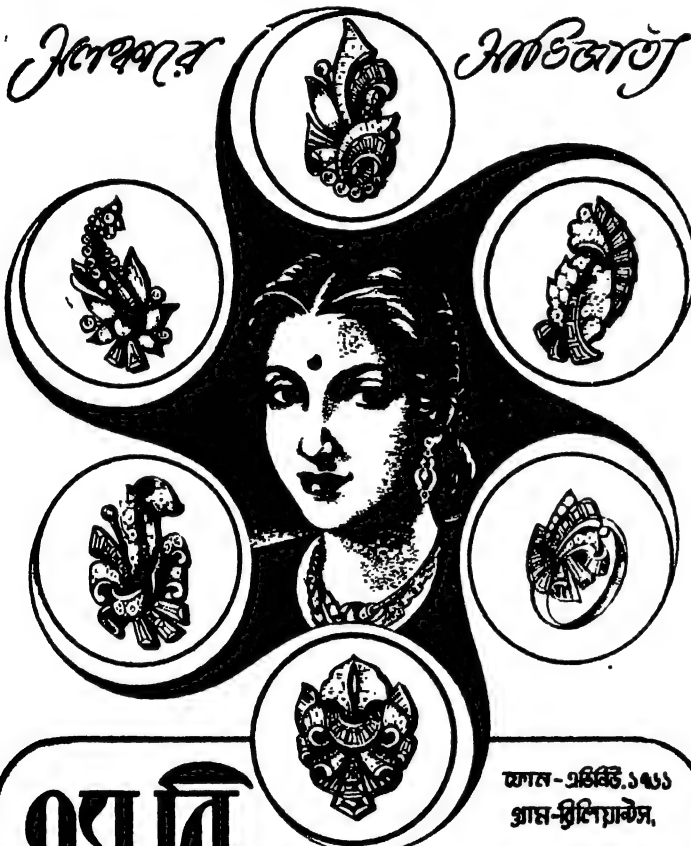
ইতিহাস ও মুদ্রার প্রমাণে জানা যায় যে, ইব্রাহিম ৮৪৫ হিঃ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন। অতএব ৮৭৭/৮৮৮ হিঃ ইব্রাহিমের মৃত্যু হওয়া সম্ভব। রিয়াজ যে উক্তি করিয়াছেন তাহা অস্বার্থ এবং ঐ উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া গণেশ ও জালালউদ্দিনের দ্বিতীয় বাব বাজা হওয়ার যে বিবরণ রিয়াজকার দিয়াছেন তাহারও ভিত্তি নাই। বস্তুতঃ ৮০৪ হিঃ তৈমুরলংগের ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ও ৮৫৫ হিঃতে বহলোল শোদীর দিল্লীস্থর হইবার মধ্যবর্তী কালে দিল্লীস্থবগণের রাজা প্রধানতঃ পুরাতন দিল্লীর প্রাচীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে ৮৪৫ হিঃ ( ১৪৪১ খ্রীঃ ) পর্যন্ত ইব্রাহিমের সার্কুলেমে রাজ্য গোড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমগ্র

উত্তর ভারতে পরিবাস্ত ছিল। “সঙ্গীত শিরোমণি”র বচন হঠাৎও অসম্ভব তাহারই সমর্থন পাইতেছি। স্মৃতদাঃ ১৩৩৯ শকে (৮২০ খ্রিঃ—১৪১৭ খ্রিঃ) রাজা গণেশ যদি জীবিতও থাকিতেন তাহা হইলেও ইতিহাসের দ্বারা সাক্ষ্যভাষ্য ও শক্তিশালী নবপতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করিতে সাহসী হইতেন কিনা সন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে দীনেশবাবু আমার মূল প্রবন্ধের অঙ্কণ বিষয়ের যে সমালোচনা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করি।

দম্ভজদমন কঙ্কর বাংলার সিংহাসন  
অধিকার করার ঘটনাকে দীনেশবাবু আরব্য  
উপক্ৰাসের গল্প বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন :  
কিন্তু রাজ্য গণেশের হাতেও আলাদিনের  
প্রদীপ ছিল না। যাহার বলে উরুবক্সের  
এই সামান্য ভূমাধিকারীঃ বাংলার হিন্দু  
ভৌমিকগণের সাড়াবা-নিরপেক্ষ হইয়া  
একাকী সপ্তগ্রাম হইতে সুদূর সুবর্ণগ্রাম ও  
চট্টগ্রাম পর্যন্ত অধিকার করিতে পারিতেন।  
বাংলার বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের হিন্দু ভৌমিক-  
গণের সক্রিয় সাড়ামালাভ করিয়াই রাজ্য  
গণেশের পক্ষে মুসলমান-কবলিত বাংলা-  
দেশে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব  
হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ এই ভৌমিকগণের  
মধ্যে পূর্ববঙ্গের দম্ভজদমনদেব ও মহেন্দ্রদেব  
অগ্রণী ছিলেন। বহু মুসলমান হইলে  
তাহাদের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভব

3 | Ganesah, a Hindu and Hakim  
of Dinwaj (perhaps a petty Hindu  
chief of Dinaipur) — Buchsencn.



યાત્ર-એડિટિંગ. ૧૯૫૧  
 ગ્રામ-મિલિયનનેસ,

**અસ.વિ.અવકાશ એડ અન્ન**

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ  
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ  
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ৱাশিংটন-ৱিক্টোরিয়া স্ট্রাট ব্যালিগঞ্জ: ১৫৯/১৫, ৱাশিংটন ১৫৯/১৫  
 ফোন : ১৫৯/১৫

# = বি জ প্তি =

আমরা অতীব সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র ৮১০ সাড়ে বারো আনা সের দরে চিনি যাহাতে পাওয়া যায় সেজন্য স্থানে স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের সুব্যবস্থা হইতেছে। চিনি সরবরাহে কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিলে তৎপ্রতিকারার্থে যে কোনরূপ পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হইবে।

## সুগার ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

২নং দয়হাটা স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

টেলি : ঠিকানা—“চিনিবিক্রি”

ফোন : ৩৩-১০১৯

বাহ্যত হওয়ার ঠাঁহারা পরবর্তী নেতা দম্ভজবর্ধন ও মহেন্দ্রসেবের পতাকাতলে সমবেত হইয়া জালালউদ্দিনকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাণালবাবুও ইহা অসম্ভব মনে করেন নাই।

দীনেশবাবু লিপিগাছেন যে, ঈশবিদ্যাস দাস মহাশয় 'বাল্যলীলা সূত্র' ও 'অধৈত প্রকাশ'কে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়াছেন। দীনেশবাবু আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চান যে, এই গ্রন্থ দুইপানি কৃত্রিম। কারণ স্বরূপ বলেন, (১) বাল্যলীলা সূত্রে লিপিত আছে যে, গণেশ "ঐশপক্ষাধিশশস্ত্রমিতে শাকে" রাজা হন। সংস্কৃত সংখ্যাকোষের মতে "অক্ষি" পদে "দুই" বুঝায়, তদনুসারে গণেশের ১৩০৭ খ্রীঃ রাজা হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু গণেশ খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগের লোক। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে সংস্কৃত সংখ্যাকোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। "অক্ষি" পদে "তিন" সংখ্যাও বুঝায়। এ সম্বন্ধে বক্রীর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৭ ভাগ "নামসংখ্যা" নামক প্রবন্ধের ১৭ পৃষ্ঠার ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। অত্যাচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ও "অক্ষি" পদে "তিন" ধরিয়াছেন। (২) বুকাননের অনুসরণে করিয়া দীনেশবাবু বলিতে চান যে, তষ্টদশ শতাব্দীর পূর্বে দিনাজপুরের অতীত হয় নাই। দীনেশবাবু এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শুকদেব যোষ ১৬৭৭ খ্রীঃ পরলোকগমন করিলে তাঁহার তিন পুত্র রামদেব, জয়দেব ও প্রাণনাথ বধাক্রমে রাজা হন। ১৭১৫ : এই প্রাণনাথের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে লিপি সম্বন্ধে I. H. Q vol. 12, page 355-এ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ক্রীসমসীকুমার সংস্কৃতী মহাশয় যে প্রবন্ধ লিপিগাছেন তাহাতে দেখা যায় যে, রাজা প্রাণনাথ ১৬৮২ হইতে ১৭২২ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজা ছিলেন। ওয়েষ্টমেকট সাহেব ১৮৭২ খ্রীঃ *Calcutta Review*, page 132-তে দিনাজপুর রাজবংশ সম্বন্ধে লিপিগাছেন—  
—“The name which Dr. Buchanan writes—  
Dinwaj is undoubtedly the first part of the name of Dinajpur.”  
“ওয়েষ্টমেকট এই প্রবন্ধে দিনাজপুর রাজবংশের প্রাপ্তি প্রবাদ অনুসরণ করিয়া লিপিগাছেন যে, এই রাজবংশের

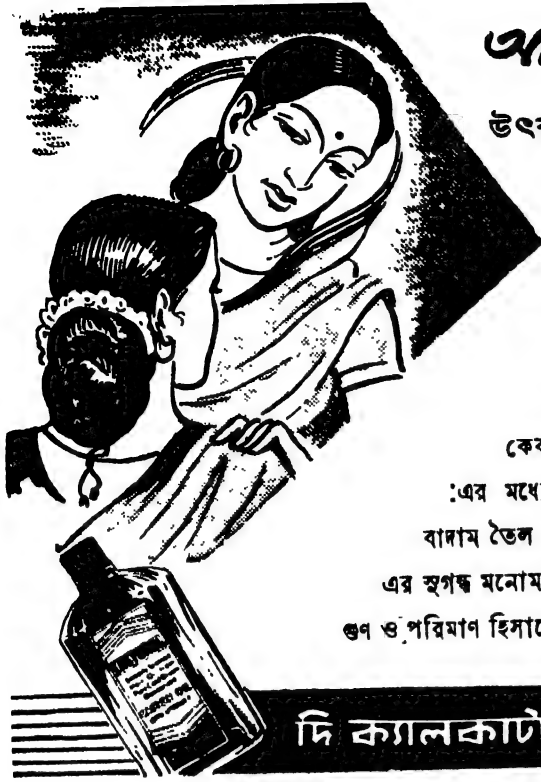
পূর্বাধিকারী শ্রীমন্ত দত্ত রাজা গণেশের কোন অবতান পূর্বের নিকট হইতে দিনাজপুর রাজ্য লাভ করেন—“It is much more probable that the Rstate dated from earlier time possibly from that of Ganesh.”

(৩) দীনেশবাবু বলেন, বখন “বাল্যলীলা সূত্র” রচিত হয় (১৪০৯ শক=১৪৮৭ খ্রীঃ) তখন মহাপ্রভু (১৪৮৫ খ্রীঃ জন্ম) ১ বৎসরের শিশু। অবশ্য অতীবাবুর “বাল্যলীলা সূত্র”র প্রথম সর্গের ২১৩ শ্লোকে ও ষষ্ঠ সর্গের ২৪.২৫ শ্লোকে গোবিন্দ নাম আছে। কিন্তু উহা পরবর্তীকালে কোন গৌরভক্ত কব্বক প্রকিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। “বাল্যলীলা”র যে পুঁথি দৃষ্টে অতীবাবু তাঁহার গ্রন্থ ১৩২২ সালে মুদ্রিত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের অপর একপানি পুঁথি পাবনার অধৈত বংশীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত মুনলীমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিল। অত্যাচরণবাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পূর্বে উক্ত গোস্বামী মহাশয় তাঁহার এই হস্তলিপিত পুঁথি হইতে রাজা গণেশ সম্বন্ধীয় প্রথম সর্গের ৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেন এবং আরি তাতা ১৩২০ সালে আমার বক্তৃতার ইতিহাসের প্রথম সংস্করণে ও পরে দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করি। অনুসরণ যোষ বিজাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই পুঁথির লেখা প্রায় ২০০।২২৫ বৎসরের পুরাতন। মুনলীমোহন গোস্বামীর পুঁথির উক্ত ৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০ শ্লোক বধাক্রমে অত্যাচরণবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থের ৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২ শ্লোক। অত্যাচরণবাবুর পুঁথির প্রথম সর্গের ২১৩ শ্লোক মুনলীমোহন গোস্বামী মহাশয়ের পুঁথিতে না থাকায় এরূপ হওয়া সম্ভব। সুতরাং গৌরবিসয়ক এই দুই শ্লোক অত্যাচরণবাবুর পুঁথিতে প্রকিপ্ত হইয়াছে অনুমান করা বাইতে পারে। যিনি এই দুইটি শ্লোক প্রকিপ্ত করিয়াছেন তিনিই ষষ্ঠ সর্গের ২৪।২৫ শ্লোক প্রকিপ্ত করিয়া থাকিবেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে পারদর্শী ড. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ও এই শ্লোকগুলিকে প্রকিপ্ত মনে করেন ঈশান নাগরের অধৈত প্রকাশ ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খ্রীঃ) রচিত। এই গ্রন্থকে কৃত্রিম বলিবার কোন বিশেষ কারণ দীনেশবাবু দেন নাই। রূপকথার পরিপূর্ণ বলিয়া যদি এই গ্রন্থ কৃত্রিম হয় তবে যোষ



**অমৃততাঞ্জন**  
সর্বপ্রকার বেদনায় 'আণবিক বোম্বার' ন্যায় কার্যকরী!  
**দাদেব মলম**  
চর্ম রোগে 'পারমান্ব শান্তির' ন্যায় কার্যকরী!  
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭





## অভিজ্ঞের উপদেশ

উৎকৃষ্ট কেশটতল নির্বাচনের সময়  
ক্যালকেমিকোর

## ক্যাষ্টরল

অভিজ্ঞের বিবেচনায় সবচেয়ে ভাল কেন  
কারণ, এর প্রত্যেকটি উপাদান বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত।  
কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত খাঁটি দামী ক্যাষ্টর অয়েলে তৈরী।  
এর মধ্যে বাজার প্রচলিত ক্যাষ্টর অয়েলের দ্বায় রংকরা পাতলা  
বাদাম তৈল মেশানো নেই।  
এর স্বগন্ধ মনোমদ ও অম্লপম। ব্যবহারে চুল বাড়ে, টাকপড়া বন্ধ হয়।  
গুণ ও পরিমাণ হিসাবে দাম সস্তা।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং.লিঃ কলিকাতা-২০

## ফেথোডের মহাভূজরাজ তৈল

চুল উঠা বন্ধ করে  
মাথা ঠাণ্ডা রাখে



এই মার্কা দেখে কিরুন-নকল থেকে সাবধান





করি কোন বৈফল্য প্রত্নই বাদ যায় না।<sup>৫</sup> ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের *History of Bengali Language and Literature* (p. 495-96) বাখালবাবুর বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২, ও “বঙ্গীয় মহাকোষে” “অদ্বৈত আচার্য্য” প্রবন্ধে “বালালীলা সূত্র” ও “অদ্বৈত প্রকাশ”কে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। সেখানেও “অক্ষি” পদে “তিন” সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

দীনেশবাবু বুকাননের “Hakim of Dinwaj” কথাটির মধ্যে দম্ভজমর্দনদেবের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং বুকানন “Hakim of Dinwaj” অর্থে “Raja of Dinajpur” বুঝিয়াছেন। ওয়েষ্টমেকট সাহেবও বুকাননের “Dinwaj” অর্থে “Dinajpur” বুঝিয়াছেন।

বিষয়কে জালালউদ্দিনকে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারী বলা হইয়াছে। তাহার প্রতিবাদে আমি “স্মৃতি বক্তার” বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। দীনেশবাবুর ব্যাখ্যা অনুসারেও দেখা যায় জালালউদ্দিন জগদন্তের পুত্র রায় রাজাধরকে সেনাপতি পদ প্রদান ও বহু দান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহাই বুঝা যায়। দীনেশবাবু জগদন্তকে মঙ্গল জাতীয় বলিয়া ভুল করিয়াছেন। “মুদ্রাভিষিক্ত” পদের অর্থ রাজা ও ক্ষত্রিয়। “মুদ্রাভিষিক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ রাজা ইত্যমরঃ” (শব্দকল্পদ্রুম)। দীনেশবাবু মনুজ বর্ষসঙ্কর “মুদ্রাবসিক” (মুদ্রা ১০১৬)কে “মুদ্রাভিষিক্ত” বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। তিনি জালালউদ্দিনের পুত্রের “জ” না থাকায় তাহাকে মৃত মনে করিয়াছেন, কিন্তু ইহাও উদ্ধৃত “সঙ্গীত শিরোমণি”র বচনে “ইব্রাহিম” নামের পুত্রের “জ” দেখিতেছি না, যদিও ইব্রাহিম তখনও জীবিত ছিলেন।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, “প্রভাসবাবু আর একটি হিন্দু সূত্র বাদ দিয়াছেন—উটা নগেন্দ্রনাথ বসুর উত্তর-রাটায় কায়স্থ কাণ্ডের রাজা গণেশের বিবরণ।” আমি উটা উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ করি নাট।

চন্দ্রদীপের রাজা বলিয়া কথিত দম্ভজমর্দন দেবকে দীনেশবাবু “রামনাথ দম্ভজমর্দন” বলিয়াছেন। বোধ হয়, বিভারিক্ত সাহেবের বাগবগঞ্জের ইতিহাস হইতে তিনি এই নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসুন্দর মিত্রের চন্দ্রদীপের রাজবংশ, বংশাবন পুত্রতত্ত্ব ও চন্দ্রদীপের ইতিহাস ও কুলগ্রন্থে তিনি কেবল দম্ভজমর্দনদেব নামেই অভিহিত হইয়াছেন। উপনামের সহিত বংশোপাধি যুক্ত করা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। দম্ভজমর্দনদেবের দম্ভজমর্দন পদকে উপনাম মনে করিবার কোন হেতু দেখা যায় না।

৫। শ্রীপ্রদাস দাস মহাশয়ের গ্রন্থ আমার নিকট না থাকায় তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

৬। “জগদন্ত” পাঠ ভুল বলিয়া মনে হয়। “জগদন্ত” হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত।

“সঙ্গীত শিরোমণি”তে রাজা গণেশকে শব্দরূপ পতনের অগ্নি বলিয়া যে উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দীনেশবাবু রাজা গণেশকে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারী বলিয়া বিবরণকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই উপমা হইতে রাজা গণেশকে তাহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত মুসলমান সুলতান জালাউদ্দিন ফিরোজশাহ ও তাহার সমর্থক মুসলমান প্রধানগণের বিনাশক ভিন্ন আর কিছু বুঝায় বলিয়া মনে হয় না। ফিরিষ্টা (১৬১১ খ্রিষ্টাব্দ) রাজা গণেশকে মুসলমানদের সহায় বন্ধু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগের অন্ধকার যুগের একটি ঐতিহাসিক সমগ্রা সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কারের জন্যই আমি আমার প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সত্য নির্ণীত হউক ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

দীনেশবাবু ১২ নং তথ্যদ্বারা বলিতে চান যে, নরসিংহ নাভিয়াল গণেশের সমসাময়িক নতেন ও দীনাজপুর নামটি আধুনিক। অতএব “বালালীলা সূত্র” ও “অদ্বৈত প্রকাশ” গ্রন্থের কৃত্রিম। অদ্বৈতচাণ্ডীর বংশাবলী সম্বন্ধে আমি “বঙ্গীয় মহাকোষের” অনুসরণ করিয়াছি। কেবলমাত্র পবানমূলক কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কোন ঐতিহাসিক ঘটনার কাল নির্ণয় করা, কিংবা বুকানন ও গ্রান্ট সাহেবের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দিনাজপুর গ্রামটিকে আধুনিক বলা এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া “বালালীলা সূত্র” ও “অদ্বৈত প্রকাশ”কে কৃত্রিম গ্রন্থ বলা নিরাপদ নহে।

বুকানন লিখিয়াছেন, “Then Ganesh, a Hindu Hakim of Dinwaj (perhaps a Hindu Chief of Dinajpur), seized the Government.” এখানে perhaps কথা দ্বারা Hindu chiefকে লক্ষ্য করাই বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। এবং এইজন্যই হয়ত ওয়েষ্টমেকট “undoubted” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

যাহা হউক, “বালালীলা সূত্র” হইতে রাজা গণেশ যে হরিভক্ত ছিলেন তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য ছিল। স্মরণ্য এই গ্রন্থের প্রমাণ বাদ দিলেও আমার প্রতিপাদ্য বিষয় বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না।

দীনেশবাবুর ৩নং তথ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, “বৈফল্য তোষণী (লব্ধতোষণী)-র রাজা দম্ভজমর্দন ও চন্দ্রদীপের রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত রাজা দম্ভজমর্দনদেব যে রাজা গণেশের সমসাময়িক তাহা আমার মূল প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অঙ্কতঃ রাজা দম্ভজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব নামে রাজা গণেশের সমসাময়িক যে দুই জন হিন্দুরাজা বঙ্গদেশের কোথাও বর্তমান ছিলেন তাহা মনে করিলে অসঙ্গত হয় না।

দীনেশবাবুর চতুর্থ তথ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, টীকা-কাষেরা যাহাই বলুন “মুদ্রাভিষিক্তঃ” ও “মুদ্রাবসিকঃ” দুইটি পৃথক জাতি। মনুসংহিতায় ও শব্দকল্পদ্রুমে “মুদ্রাবসিকঃ”কেই জাঞ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত বর্ষসঙ্কর জাতি বলা হইয়াছে।

# শুভ বিবাহ



বিয়ের ভোজটা  
বেশ জমেছে।

কি চমৎকার রেখেছে-  
কি দিয়ে রেখেছে  
জানতে হবে।

মা বলেন:-  
চমৎকার রান্নার জন্তে  
দারী ডালুডা! আর  
এতে খরচও কত  
কম।

ডালুডা বনস্পতি দিয়ে রান্না কোরলে যে কোনো ভোজের আয়োজন সার্থক হয়।  
সব রকম রান্নার পক্ষেই ডালুডা বনস্পতি বিশেষ উপযোগী। বায়ু-রোধক শীল-  
করা টিনে ডালুডা বনস্পতি সর্বদা তাজা বিস্কু ও পুষ্টিকর অবস্থায় পাবেন।  
বিয়ের ভোজের জন্তে ডালুডা বনস্পতি চাইই-চাই। আর এতে খরচও কত কম!

কি কোরে ভালভাবে বিয়ের ভোজের আয়োজন করা যায়?  
বিনামূল্যে উপদেশের জন্তে আজই লিখে দিন:-

দি ডালুডা গ্র্যাডুআইসারি সার্ভিস্ পোঃ, জাঃ, বন্, নং ৩৫৩, নোখাই ১



## ডালুডা বনস্পতি

HVM. 193-X52 BG

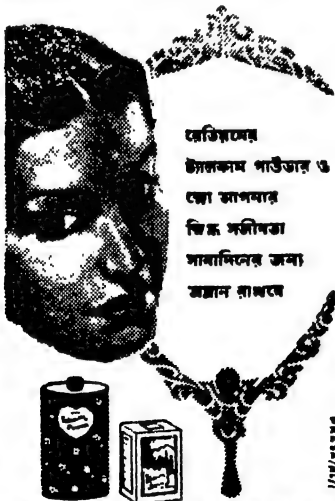
# পুস্তক পরিচয়

বঙ্কিম-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সমগ্র উপজ্ঞান, সাহিত্য-সংসদ, ৩২এ, আপাব সারকুলার রোড, কলিকাতা-২। দাম দশ টাকা।

একত্রে একটিনাশ খণ্ডে নিবদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপজ্ঞানের ৩৪ শোভন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-সংসদ বাঙ্গালী পাঠককে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।—উনবিংশ শতাব্দীর বৃহৎ দর্শক। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই। মিথ্যাকল্পের বন্ধন-বিমুক্ত করিয়া স্রীমদ্রথুসদন বাংলা কাব্যকে নবমহিমামণ্ডিত করিয়াছেন। চরমচরম বিজ্ঞানসাগর বাংলা গল্পকে শ্রী ও শোভন দান করিয়াছেন। সেই যুগসন্ধিকালে বঙ্কিম-চন্দ্রের আবির্ভাব বাংলায় জগদে এক অপূর্ণ সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই অবনত মস্তক ধৌকার করিয়া লটল বাংলার রাজচক্রবর্তীর আবির্ভাব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে; প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের জগৎপথ সেই প্রথম উপলব্ধি হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা ওই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহুর্তে অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই হুঁপ, কোথায় গেল সেই বিন্দুবিন্দু, সেই গোলেব কাঙালি, সেই বাগক-ভুলানো কণা—কাখা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত মেতি নু .....বঙ্গভাষা সঙ্গ, বাংলাকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।”

বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চম উপজ্ঞান “দুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে “কপালকুণ্ডলা” এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে “সুখালিনী” বাহির হইল। মাসিকপত্র “বঙ্গদর্শনে”র প্রকাশকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্মৃতি”তে বলিয়াছেন, “বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর জন্ম একেবারে লুট করিয়া লইল।” বঙ্কিমের প্রত্যেক উপজ্ঞান, প্রত্যেক পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাঠকসমাজে এক আনন্দময় ঢাকলা উপস্থিত হইত। ইহার পূর্বে অথবা পরে একপ খটনা আর ঘটে নাই। এমন অবিসম্বাদ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ধৌকারিতা-শ্রেষ্ঠের দৌত্যগা আর কাহারও হয় নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, “দেখিগা সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের কচি ও প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ পরিবর্তিত করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাগ্রহণ ইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।” বঙ্কিমচন্দ্র শুণু রোমাঞ্চ অথবা ঐতিহাসিক উপজ্ঞান “রাজসিংহ” প্রভৃতি লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। “বিনয়ক” রচনা করিয়া তিনি বাংলা-সাহিত্যে, ‘নভোভার’ পর্বতন করিলেন। “স্বপ্নকান্থের উঠলে” চরম অপূর্ণতা লাভ করিল। “চন্দ্রশেখরের” প্রত্যাপ এক আদর্শ চরিত। “রজনী” এক নূতন ধরণের উপজ্ঞান। “উদ্ভিদা”, “রাধারাণী”, “যুগলাঙ্গুহীর” লিখিয়া তিনি বাংলায় ছোট গল্পের নতুন সূত্রবণ করিয়া ফেলিলেন। পরে অবশ্য “উদ্ভিদা” উপজ্ঞানসাকারে পরিবর্তিত হয়।

শুণু রসস্রষ্টা হিসাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। “বঙ্গদর্শনে”র মধ্য দিয়া ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পরিবেশন করিয়া তিনি বাঙালীর চিন্তাধারাকে নূতন পথে পথিত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপজ্ঞানিক, পাবদিক, দার্শনিক, ইতিহাস-ব্যখাতা, ধর্ম-ব্যখাতা, রসরচয়িতা, কবি—এ সমস্তই সত্য। মাকোপারি তিনি দেশপ্রেমিক। “সুখালিনী” হইতে “কমলাকাণ্ড” পর্যন্ত ভীতার সমস্ত রচনা স্বদেশপ্রেমে ও চরমপ্রোতভাবে বিভূষিত। চরমপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, “বঙ্কিমবাবু যাহা



রেডিয়ামের  
ট্যালকাম পাউডার ও  
জো ডায়মন্ড  
জিহ্ন সলীদতা  
সামান্যদের জন্য  
জ্ঞানোদয়

রেডিয়াম জো ও  
ট্যালকাম পাউডার

রেডিয়াম ল্যাম্পের উত্তরী  
কলিকাতা-৩৬

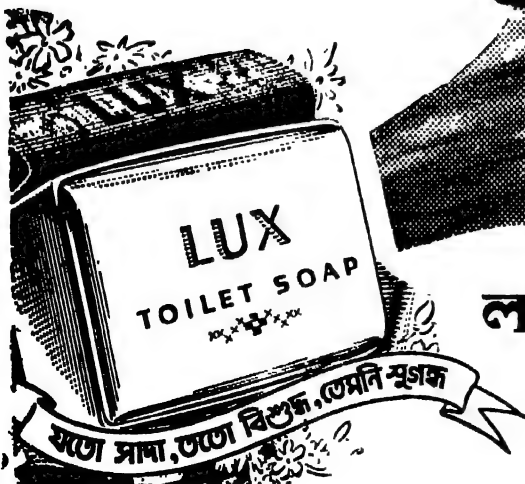
**টোল ও কোম্পানীর**  
**দাদ ওমারের মলম**  
**ক্রিউটা-টোন** (পেয়ে বেদনা ও চর্মরোগের জন্য)  
**নিম্ন মলম** (খোস পায়ে ও চর্মরোগের জন্য)  
ব্রহ্মা নগর  
কলিকাতা-৩৫

# “চেষ্টা করে দেখুন...

লাক্স টয়লেট সাবান যেথে  
...আপনি আরও সুন্দর  
হতে পারেন।”

রেহানা বলেন।

“এ এক সৌন্দর্যচর্চার অপূর্ণ  
সহায়।” রেহানা বলেন, “লাক্স  
টয়লেট সাবানের সরের মত  
ফেনা মুখে ও গায়ে বেশ ভাল করে  
ধ’য়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়-  
মিত ব্যবহার করলে, লাক্স টয়-  
লেট সাবান আপনার হকের  
এক নতুন সৌন্দর্য এনে দেবে।”



## লাক্স টয়লেট সাবান

চি ত্র - তা র কা দে র

সৌ ন্দ র্ঘ্য সা বা ন

কিছু করিয়াছেন সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা, জন্মভূমিকে বা বঙ্গ—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য করিয়াছেন হাতা ভারতবর্ষে আর কেহ করে নাই। হতরা তিনি আমাদের পুত্র। তিনি আমাদের নম্র, তিনি আমাদের আচাৰ্য, তিনি আমাদের কবি, তিনি আমাদের মন্তব্য, তিনি আমাদের মন্তব্য। সে মন্তব্য মন্তব্য। হাতার শেষ করখানি উপজাতি “দেবী চৌধুরাণী”, “সীতারাম” প্রভৃতি এই দেশ ভক্তির দ্বার বহিষ্কার, “আনন্দ-মঠ”র ত কথাই নাই। শুধু রাতে বসে নথ, এই মন্তব্য কবি বহিষ্কার ভারতবর্ষের সমগ্র উপরিচিত।

শ্রীমোগেশচন্দ্র বাগল এই সংস্করণে বহিষ্কারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার উপজাতিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত ইংলেও এই জীবন-চরিত ও পরিচয় বহু মূল্যবান তথ্য পূর্ণ। বহিষ্কারের মূলত সংস্করণ আছে এবং নানা তথ্য ও পাণ্ডুর সমন্বিত মূল্যবান সাহিত্য-পরিচয়-সংস্করণও আছে। কিন্তু একপাশে সম্পূর্ণ বহিষ্কারের সমগ্র উপজাতিসের একপাশে একটি সমন্বিত মন্তব্য অথচ মূলত সংস্করণ পাইয়া বাগলী পাঠক নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন।

### শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

#### সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

(১ম খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১২ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর ‘রাগ ০ রূপ’ গ্রন্থে আভাস দিয়েছিলেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতের আত্মপূর্ণক ইতিহাস প্রকাশে তিনি রতী হয়েছেন। সে ইতিহাসের প্রথম খণ্ড পাঠ করে পঠ্যকে স্বীকার করেন যে কি অসম্ভব পরিচয় ও সাধনায় তিনি এই ইতিহাস রূপায়িত করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের পটভূমিকার প্রথম অধ্যায় রচনা করে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভারতের সঙ্গে ভারতের দেশে সাঙ্গীতিক যোগাযোগ বিষয়ে গভীর আলোচনা তুলেছেন। এ ধরনের আলোচনা একমাত্র ফরাসী ভাষায় সাঙ্গীতিক বিশ্বকোষ (Encyclopedia of Music) প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তিনি সামবেদাদি বৈদিক যুগের সঙ্গীত-শাস্ত্র থেকে শুরু করে আর্য্যক ও উপনিষদ যুগের সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। বৈদিক ভাষা কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় স্থায়ী রূপ পেয়েছিল এবং সে ভাষার একজন আদি গুরু বৈয়াকরণিক পাদিনি। তাঁর শিক্ষায় যেমন সঙ্গীতের বহু তত্ত্ব মেনে তেমনি পরবর্তী যুগের নারদী শিক্ষায়ও

আমাদের সঙ্গীত-ইতিহাসের অমূল্য উপাদান মেনে। এইসব চূড়ান্ত ও চূড়ান্ত গ্রন্থাদি মনন করে প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী যে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন সেটি বহুকাল আমাদের অভ্যর্থনিত করবে। আমরা আশা করি যে সঙ্গীত-কলাবিশ্ব বিশেষজ্ঞেরা তথা সাধারণ পাঠক-পাঠিকারাও প্রথম খণ্ডের প্রচারে সাহায্য করে অপর খণ্ডগুলিরও আশু প্রকাশে সহায়তা করবেন। গ্রন্থখানিতে বিচিত্র বাচ্য, রাগ-রাগিণীর চিত্র ও ছন্দোবদ্ধ মুদ্রা চিত্র সন্নিবেশিত করে গ্রন্থের উপযোগিতা বর্ধিত করেছেন। আমরা তাঁর দ্বিতীয় খণ্ড পঠনের আশায় উদ্বিগ্ন হয়ে আছি এবং আশা করি খাম্বিজী হুহ শরীরে ভারতীয় সঙ্গীতের এই বিরাট বিশ্বকোষ স্রসম্পন্ন করে যাবেন।

বিশাল অর্থ—শ্রীললিতীকুমার ভদ্র। দেশবন্ধু বুক ডিপো, ৮৮-এ দিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

অর্থ জাতি বৈদিক যুগের শেষ পর্বে আর্য্যক ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। জাতিতে দাবি হলেও অর্থের উত্তর-ভারতীয় আয়গণের সঙ্গে সুপাটন কাল থেকে মেলায়েলা করেছে। চ’হাজার বৎসর আগেও আর্থ সাম্রাজ্য ব্রহ্মোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম অর্থ রাজবংশের কীর্তিকলাপ ক্রমশঃ প্রকাশিত হলেও আধুনিক কালের আর্থদের সঙ্গে পটীন আর্থদের যোগাযোগ নিয়ে অনেক মন্তব্য আছে। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প ও সঙ্গীত আর্থদের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় জাতিসত্ত্বের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীজাতির গভীর মিল আছে। দক্ষিণ ভারতে প্রগতিবাদী অনুপ্রেরণা রাজা রামমোহন ও মনীষী বিভাসাগরের প্রেরণায় অগ্রগতি হয়ে সমাজ-সংস্কারের পথ স্থগম করেছেন। হতরা ভাষার ভিত্তিতে প্রথম স্বাধীন ভারতে অর্থ রাষ্ট্র গড়ে উঠার ক্ষমতাকে শ্রীললিতীকুমার ভদ্র ‘বিশাল অর্থ’ গ্রন্থখানি প্রকাশিত করে আমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন। মুক্তিসাধনায় পথে অর্থবিশ্বের দান তিনি গভীর সমবেদনার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পুস্তক হায়দাবাদ থেকে রাজমহেন্দ্রী পরিগ্রহণ করে অনেক মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন অর্থের আদিবাসীদের কথাও তিনি তুলেন নি এবং একালের মূল্য অর্থ নেতাদের সঙ্গে সাহচর্য করে বঙ্গ ও অর্থবাসীদের মধ্যে হারী প্রীতি ও মঙ্গল স্থাপনা করেছেন। সাধারণের ‘বিশাল অর্থ’ পুস্তকটির বহুল পচার কামনা করি।

উপনিষদ—শ্রীচিহ্নিত দেবী। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ নং বহিষ্কার চ্যাংকো ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২২। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীমতী চিহ্নিত দেবী কিছুদিন থেকে মূল উপনিষদ পাঠ করে তার বঙ্গভাষায় প্রতিক্রিয়াতে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে, ঈশ, কেন ও

### ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

#### “ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-খাওয়া প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহাদিনের অহবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২৫০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমঃ

১১১ বি, গোবিন্দ আড়ী রোড, কলিকাতা-২৭

ফোন—জালিপুর ৪৪২৮

## বঙ্গভারতী

### দ্বৈমাসিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা ১০ সড়কি বার্ষিক ৩

রুচিবান, সংস্কৃতি-সম্পন্ন এবং বিচারশীল

পাঠকগণের পক্ষে অপরিহার্য।

### বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাঃ—কুলপাছিয়া; পোঃ—মহিষবেধা; জেলা—হাওড়া



## দিনে দিনে আরও ভাস্কর্য ও রমণীয় ত্বক

রেসোনার **ক্যাডিল্লক** আপনার জন্যে এই যাচুটি ক'রতে দিন

রেসোনার ক্যাডিল্লক ফেনা আপনার গায়ে বেশ ভাল ক'রে ধ'বে  
নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার  
ত্বক আরও কতো মসৃণ, কতো নির্মল হ'য়ে উঠছে।



### রেসোনা

**ক্যাডিল্লক একমাত্র সাবান**


\* ভাস্কর্যক ও কোমলতাপ্রসূ কতকগুলি তৈলের  
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম

কঠোপনিষদ এই তিনটি উপনিষদের সংস্কৃত পাঠ ও সেই সঙ্গে তার বঙ্গানুবাদ পাশাপাশি সরিষেনিত করে প্রকাশ করেছেন। উপনিষদ-শৃঙ্গের সংস্কৃত ভাষা ও অন্যান্য বৃত্তে পারা অনেকের পক্ষেই কঠিন অথচ চিত্রিতা দেবীর বইখানি সেদিক থেকে বহু নরনারীকে উপনিষদ পড়তে ও বৃত্তে উৎসাহিত করবে। অর্থবোধের দিকে সাহায্য করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য এবং সে কর্তব্য তিনি যথাসাধ্য পালন করেছেন এবং তাঁর পুস্তকীয় অধ্যাপক উত্তর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন : “ইহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে প্রয়োগবদ্ধিত তাঁহাদের পক্ষে বঙ্গভাষায় রচিত এই অশ্রুবাদ ও বাখ্য্য কল্যাণ মার্গের অন্তরঙ্গ বিশেষ উপযোগী হইবে। সেইদিনে কল্যাণীয়া অন্ত্রবাদকর্তার অবদানের গৌরব ও মহিমা সমস্ত সমাজে অকুণ্ণ অঙ্গীকার ও সমাদর লাভ করিবে।” আমিও এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত। লেখিকা ম্পু উপনিষদের ভাষে নয় ভাষার মাধুর্ষ্যও প্রেরণা লাভ করে তাঁর অন্ত্রবাদকে প্রাপবস্ত করেছেন। গতো উপনিষদের অন্ত্রবাদ অনেক হয়েছে অথচ উপনিষদের গুণও পূর্ণায়ক। সেট অশ্রুত করে লেখিকা চন্দ্র আভাষে তাঁর অন্ত্রবাদকে মাধুর্ষ্যমণ্ডিত করেছেন। এই হলভ মনুষ্যজন্মই সাধনক্ষেত্র এবং এইখানেই বন্ধোপলক্ষি সম্ভব। উপনিষদের এই মূল ৩৬টি কঠোপনিষদের হৃদিশূণ অশ্রুবাদে লেখিকা পরিশুদ্ধ করেছেন। বিশেষজ্ঞের তথা সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণও চিত্রিতা দেবীর ‘উপনিষদ’ পাঠ করে উপকৃত হবেন। আমি আশা করি অন্যান্য উপনিষদগুলির অন্ত্রবাদও তিনি প্রকাশিত করে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সাধন করবেন। তাঁর বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

**ডায়াপেসিন**

পরিপূর্ণভাবে  
স্বাস্থ্য  
রক্ষা  
করিতে  
সাহায্য  
করে



**ইউনিয়ন ড্রাগ**  
কলিকাতা

**এই মর্ত্তভূমি—**ঈশ্বরীজন মুখোপাধ্যায়। এম্, সি, সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-২। মূল্য—৩০ টাকা।

লণ্ডন শহরের পটভূমিতে গল্পের আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি। গল্পের নায়ক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী এক ভারতবর্ষীয় যুবক। কয়েকটি বৎসরের শিক্ষানবিশীকালে ঐ দেশের বিভিন্ন চরিত্রের নর-নারী এবং তাহাদের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটয়াছে—একটি মেয়েকে সে ভালবাসিয়াছে। ইহাদেরই গুণ-দুগুণ হাসি-বেদনার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয়দের লইয়া ইতিপূর্বে বাংলা-সাহিত্যে কিছু গল্প যে না লেখা হইয়াছে তাহা নহে, সেগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা সে প্রশ্ন না তুলিয়াও আলাচ, উপজ্ঞানসাধনি যে পাঠকচিত্তকে পরিভূত করিতে পারিবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লণ্ডন শহরকে এবং শহরের বাসিন্দাদের দিকমত জানিবার শ্রোগ শতকরা নিরানন্দই জন বাংলা-উপজ্ঞান পাঠকের ভাগ্য খট না, হুতরাং অপরিচিত দেশ ও মানুষগুলিকে জানিবার জ্ঞান মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু কোতুলক জমিয়াই থাকে। অবশ্য অন্ত্রবাদ-সাহিত্যের মাধ্যমে এই কোতুলক বহুলাংশে পরিভূত হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সেই শহর ও মানুষগুলি যথাযথ ধরা পড়ে না বলিয়া পানিকটা অতৃপ্তি রহিয়া যায়। ভারত-শাসক রূপে একদা সে জাতির পরিচয় আমরা ভিন্নরূপে লাভ করিয়াছি। প্রভুত্বের অহমিকা সেখানে মানুষকে দৃষ্টিতে দেয় নাই—শ্রোগত বৈষম্যে সমাজের গুণ কপটিও চোখে পড়ে নাই। চাই পক্ষের ভুল বোঝাবুঝির পানায়, চির ও চরিত্র অধিকাংশ লোককেই ভারতীয় রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পরশামনের বাধা অপসারিত হওয়ার পর এই কাহিনীর দৃশ্যপাট—কাজেই চরিত্রগুলি স্থান কালের পরিকল্পনায় সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জাতি-গণের অহমিকা নাই—কল্লা-স্ট্র নাটকীয় বস্ত্রও নাই, এগুলি জীবন্ত মানুষের ছবি। মধ্যমিত খরের মানুষের কেরানী, কারখানার শ্রমিক, পুথ্যস্রোত জননী, পরীক্ষাক্তর ও কলহনিপুণ পতিবেশিনী, আত্মপ্রোত্তলাগিনী বিলাসিনী, প্রিয়স্বপ্নভাগিনী প্রেমিকা—অসংখ্য চরিত্রের আশা-আনন্দ-বন্ধনার চিত্রপট সমৃদ্ধল একটি অপরিচিত দেশ। হৃদ স্থান ও নামের চিত্রকর্ম মুছিয়া দিলে সেই দেশ ও মানুষগুলিকে অপরিচিত বোধ হয় না; সে যেন নিত্য-দেখা ভূমি অস্তরঙ্গ আত্মীয়জনের স্পর্শ-স্বাদে সমৃদ্ধ। শুধু চোখের দেখা নহে, মনের অঙ্গভূতি মিশাইয়াছেন লেখক এবং কোথাও অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করেন নাই বলিয়া স্থানসমতে চরিত্রগুলি সম্ভব হইয়াছে।

## ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া লিমিটেড

সেন্ট্রাল অফিস—৩৬নং স্ট্রাও রোড, কলিকাতা  
আদারীকৃত মূলধন—৫০০০০০ লক্ষ টাকার অধিক

জ্যাক :—কলেজ ভোয়ার, বাঁকুড়া।

সেভিংস একাউন্টে শতকরা ২% হারে সুদ দেওয়া হয়।

১ বৎসরের স্থায়ী আমানতে শতকরা ৩% হারে হিসাবে এবং

এক বৎসরের অধিক থাকিলে শতকরা ৪% হারে

সুদ দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান—শ্রীকল্যাণ কোলে, এম্. পি.



গল্পের মূল চরিত্র হুজুর ও পামেলা। ইহার পরস্পরের অনুরাগী; ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে দিয়া সেই অনুরাগ গভীর ভালবাসার পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই ভালবাসা সাধক হইতে পারে নাই বলিয়া কোন কোন পাঠক অনুরাগ করিতে পারেন। অর্থকষ্টতা ও পারিবারিক বাধা এই অকৃত্রিম ভালবাসার আকস্মিক ছেদ টানিয়াছে। এইভাবে ব্যক্তিগত বাধা অতিক্রম করিতে না পারায় নায়ক-চরিত্র কিছু চূর্ণল হইয়াছে। তথাপি, প্রতিবেশ, সমস্ত পার্শ্বচরিত্র ও ছোটখাটো ঘটনা মিলিয়া গল্পটিকে শেষ পর্যন্ত সাবলীল গতিতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে এবং ইহারই মধ্যে রসপট্ট হইয়াছে প্রচুর।

নিশ্চতন মন—ঈশোভা হই। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২০ টাকা।

অবসরপ্রাপ্ত রায়বাহাদুরের তিন ছেলে ও একটি মেয়েকে লইয়া গল্পের সূচনা। ছেলেরা খুদেদী করিয়া বেড়ায়—মেয়েটি সমাজসেবকের কাজে আত্মনিয়োগ করে, শুভরাং রায়বাহাদুরের সঙ্গে তাহাদের মতের ঘোরতর অমিল। মেয়েটিকে আত্মমুখী করিবার জন্য রায়বাহাদুর কে. পল অবলম্বন করিয়া প্রবাসী হইলেন। সেবার ভার লইয়া মেয়েটি সঙ্গে গেল। সেখানে এক জমিদার-পরিবারের সঙ্গে পরিচয়, সেই বংশের একটি ধনবান ও রূপবান ছেলের সঙ্গে মেয়েটির আলাপ ও ভালবাসা—গল্পটিকে অবশেষে মিলনান্তক। অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী—খটনাবিদ্ভাস ব'লিপিচাঁদ্র, বিশেষদৃষ্টান্ত।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নববর্ষ (বাংলা বার্ষিকী)—ঈশ্বর গোস্বামী সম্পাদিত। ১৯, নূর মতবন্দ লেন, কলিকাতা-৯, নববর্ষ কাগ্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৫০।

কয়েকটি বিষয়ে এষ্ট বার্ষিকীখানি উল্লেখযোগ্য মনে করি। মৃদু-পরিপাটো, চিত্রগোবিন্দ, বিদ্যুৎ-বৈচিত্র্য, সবদিক দিয়াই ইহার সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ প্রকাশনীয়। খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের লেখা ছাড়া ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, ইহার চিত্রগুলি সুসজ্জিত ও সুন্দর। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সমস্ত নিউজ-পেপারে ছাপা নহে, উৎকৃষ্ট মূল্যবান এস্তিক কাগজে ছাপা। এস্তিক দিয়া ইহার একখানি উৎকৃষ্ট উপহারযোগ্য বই খুঁজিতেছেন, তাহার এইখানি নির্দোষ করিলে সুবিবেচনার কাজ করিবেন। 'তৃতীয়তঃ', ইহাতে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ চলিত বৎসর পর্যন্ত বাংলা নাটক, সাহিত্য, সংবাদপত্র, শিল্পকলা ও চলচ্চিত্রের সালসামানি ও বহুমুখী বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনা পার্থক্যের বিশেষ অনুবাবনযোগ্য। মগাটের পটপঞ্জের আবেশে প্রস্তুত মাতৃমণ্ডর পরিকল্পনা চমৎকার।

মনের পটে অমর ভবি—দারুভাট শ্রীশ্রীনাথ রায়, গ্রন্থাগার, ৭ জে, পণ্ডিতরা রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য ৪০ আনা।  
ছেলেদের বই। লিঙ্গলিংক ছেলে, শুভেন্দ্রনাথ নিজেই করি নিজের কাজ, ছিঙ্কলনাথ, গাড়াইয়ানের ছেলে এই পাঁচটি গল্প উজাতো স্থান পাইয়াছে।

সবগুলিই সচিত্র। কিন্তু গল্পগুলি পড়িয়া মনের কোণে অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, মনে হয় সবগুলি চিত্রিত না করিয়া এইরূপ আরও পাঁচটি গল্প উপহার দিলে গ্রন্থকার ভাল করিতেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

**সামল্য ও সমৃদ্ধির পথে**

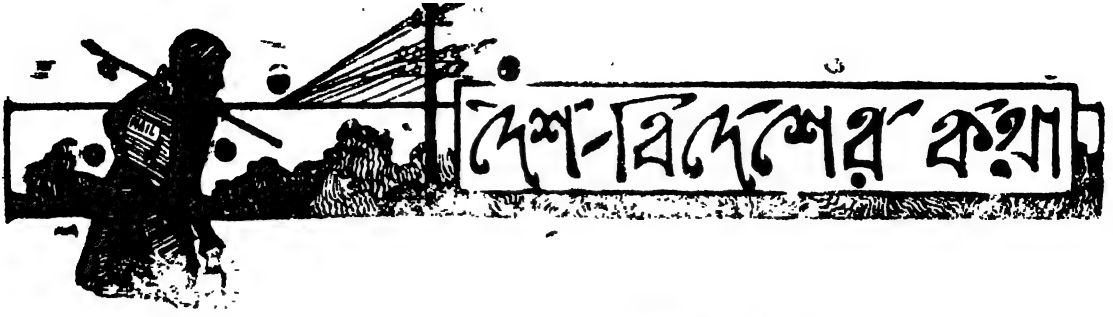
বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অসুষ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সমৃদ্ধি, সমতা ও শ্রুতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহান সম্প্রতি পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে।

**নূতন বীমা**  
১৬, ৩৮, ৭৯, ২৯৮

মোট চলতি বীমা	৮৬, ৭১, ৮৫, ০৪০
মোট সম্পত্তি	২২, ৪৯, ৮৩, ০৪৬
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯, ৭৭, ৭৬, ২৮৭
প্রিমিয়ামের আয়	৩, ৯৪, ২২, ৩৭১
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮, ৮২, ২৭১

হিন্দুস্থানের বীমাণ্ডর বিকাশ  
সম্ভাবন ও প্রাতিফলক।

**হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ**  
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড  
হিন্দুস্থান | ১৯, ৪৮নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩



## আহমেদাবাদে দুর্গাপূজা

আহমেদাবাদে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আনন্দ ও  
সংসারের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। পার্শ্বের  
বিভিন্ন পূজা সমিতির কক্ষীগণ সহ (দক্ষিণ  
ইতে বামে) সভাপতি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখো-  
পাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীসমর ঘোষ ও  
ইরাজেন দত্তকে দেখা যাইতেছে।

## বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও

### মিশনের সংক্ষিপ্ত

### কার্য্যবিবরণী—১৯৫২

আলোচ্য বর্ষে নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-স্থান  
বহারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ৫১টি ধর্ম্মবিষয়ক  
ক্লাস এবং প্রতি একাদশীতে জয়তিধি উৎসব  
বহারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

এই বৎসরে গ্রন্থাগার ও পাঠ্যপুস্তকের  
কার্য্য নিয়মিতভাবে চলিয়াছে। মোট  
পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৮৮৮। ১৯৫২ সালে  
৫০খানি নূতন পুস্তক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত  
হয়। ৩০ খানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা

এবং দুইখানা দৈনিক পত্রিকা পাঠ্যগারে বন্টিত থাকে।

১৯৫২ সালের শেষভাগে গজাজলঘাটি থানার অন্তর্গত  
রামহরিপুর কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে। পরী-  
শ্রমে স্থাপনা হেতু এখনও পুস্তকাগারের আশঙ্করূপ উন্নতিসাধন  
করা সম্ভব হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে তিনটি চিকিৎসা-কেন্দ্রের কার্য্যই শুভভাবে  
সম্পন্ন হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নূতন ও পুরাতন মিলাইয়া মোট চিকিৎসিত  
রোগীর সংখ্যা ৬১৫০১ জন, অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে ৬৪৭ জনের  
উপর। রামহরিপুর শাখা চিকিৎসাকেন্দ্রে ২০৭১৬ জন চিকিৎসিত  
হইয়াছে।

রামহরিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা



## আহমেদাবাদে দুর্গাপূজা

মোট ১১৭ জন। আলোচ্যবর্ষে ১৬ জন প্রাথমিক ফাইনাল  
পরীক্ষা দিয়াছিল, ১৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিবেকানন্দ জোমিও-  
প্যাথিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা মোট ৭ জন।

সাবদানন্দ ছাত্রাবাসে মোট ২০ জন ছাত্র অবস্থান করিয়া  
অধ্যয়ন করিতেছে। একটি ছাত্র স্থল ফাইনাল পরীক্ষায় ২য়  
শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

রামহরিপুর পরিবর্তিত মধ্য উৎসবী বিদ্যালয়ে মোট ১৫০ ছাত্রের  
মধ্যে ১০ জন অবৈতনিক এবং ২০ জন অর্থবৈতনিক দেয়।

বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।  
তত্ত্ব নূতন গৃহনির্মাণকার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে।

বিভিন্ন সূত্রে মিশনের মোট আয় ১৩৩৮০ টাকা ২ পাই,  
ব্যয় হইয়াছে ১৩৭৮০/০ আনা।

ব্রাহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়  
প্রতিষ্ঠা

প্রা

প্ৰৱৰ্ত্তন ১৩৬০



মীরা নো

# **PRABASI PRESS**

is equipped with Modern Machinery, Lino and a  
wide variety of types

Can print BENGALI, SANSKRIT, ENGLISH, HINDI  
Books and Job Works.

●  
PRABASI—the Bengali Monthly Magazine,  
MODERN REVIEW—the English Monthly Magazine

&

VISHAL BHARAT—the Hindi Monthly Magazine  
are printed here.

●  
**ARTISTIC COLOUR PRINTING**  
**A SPECIALITY**

●  
120-2, Upper Circular Road, Calcutta-9

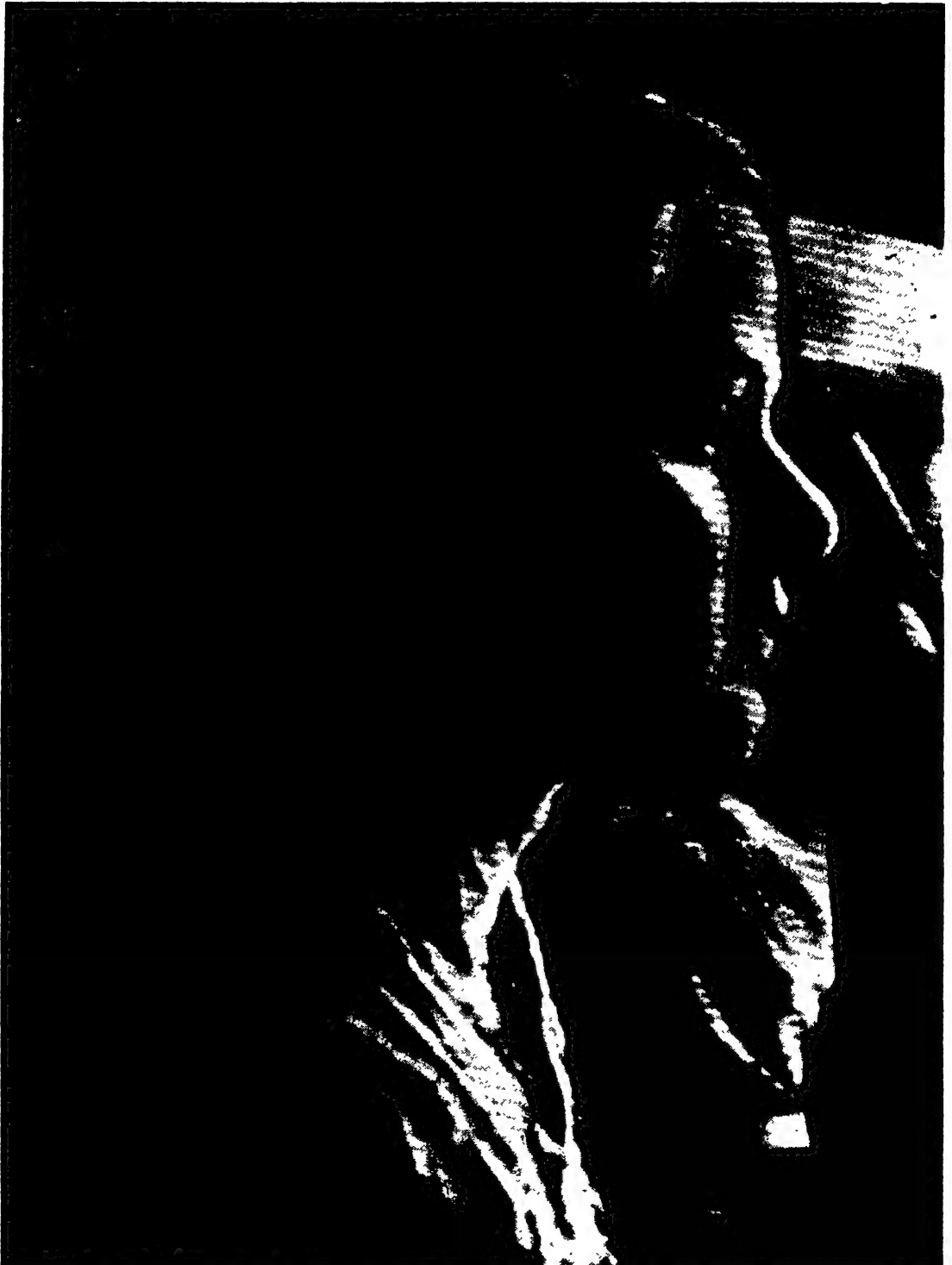
Phone : B. B. 3281

THE PRABASI OFFICE & PRESS



ଅନନ୍ତ ମୋହନ, କଳିକାତା

ନୂତନ  
ଶ୍ରୀମତୀ କଳାଳ ବାଲ୍ୟାପାଠ୍ୟାୟ



মাটির মানুষ

ভাষ্য : শ্রীদেবীপ্রসাদ দাসচৌধুরী

# অবাসা

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

১৩শ ভাগ }  
২য় খণ্ড }

পৌষ, ১৩৬০

{ ৩য় সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### কলিকাতায় পণ্ডিত নেহরু

আমরা সচরাচর প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে দীর্ঘ বক্তৃতা বা সাময়িক সংবাদের স্বদীর্ঘ বিবরণ দিই না। এই মাসে আমরা সেই নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া পণ্ডিত নেহরুর কয়েকটি বক্তৃতার দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি এবং অল্প প্রসঙ্গেও দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে। বিশেষ কারণে আমরা ইহা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং অজ্ঞভাবে পাকিস্তানের যুদ্ধশক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থার আলোচনা চলিতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে ভারতবাসীর বিপদ কি ভাবে এবং কতটা হইতে পারে সে বিষয়ে আমরা বোধ হয় কেহই সম্পূর্ণ সচেতন নহি। পণ্ডিত নেহরুর ভ্রায় শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিও ইহাতে বিধম বিচলিত হইয়াছেন ইহাই এই বিপদের সর্বাঙ্গেক্ষা স্পষ্ট ইঙ্গিত। এইজন্য আমরা তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতার দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি।

ভারতকে অগ্রাহ্য করিয়া পাকিস্তানের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা করিতে আমেরিকা কেন উদ্যত হইল তাহার ইঙ্গিতও এই সকল বক্তৃতায় রহিয়াছে।

যে দেশে মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রবিধ্বংসকারী দল নিজ স্বার্থে বা বিদেশীর ইঙ্গিতে বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বিকল বা অচল করিতে পারে, যে দেশে মুষ্টিমেয় শাপরিণতমস্তিষ্ক এবং অসহিষ্ণু যুবক দেশের শাসন-তন্ত্রকে বিকল করিতে পারে এবং দেশের সংগোপরিষ্ঠ লক্ষ লক্ষ লোক অদ্ভুতরত হইয়া তাহা দেখে, যে দেশের রাজনীতি প্রায় সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বদলে ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং নীচ লালাসায় ছষ্ট, সে দেশ এরূপ অবহেলা ত পাইতেই পারে।

আমাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপ অবস্থার কল কি হয় তাহা রক্তাক্তরে লিখিত আছে। আমরা যদি এতই মোহমগ্ন বা নিজে ক্ষুদ্র স্বার্থে এতই অন্ধ হই যে, এই ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে না তবে আমাদের হৃদয়া ও দাসত্ব নিশ্চিত।

কলিকাতায় বেকার-সমস্যা ভীষণ। কিন্তু স্বার্থান্ধ নীচ লোকের প্রয়োচনার এবং অপরিণতমস্তিষ্ক লোকের উচ্ছৃঙ্খলতার কলে এই নগরীর কুখ্যাতি এরূপ হইয়াছে যে, কেহই এই অঞ্চলে নূতন শিল্পোদ্যম করিতে সাহস পায় না। আমরা দুইটি বিশাল

শিল্পোদ্যোগের কথা জানি বাহার কলিকাতায় স্থাপনা ও চালনা ব্যবস্থা হইতেছিল। এই দুইটিতে অল্পতঃ পনর-বিশ হাজা লোকের সংস্থান হইত। কিন্তু বিগত জুলাইয়ের অবাঞ্ছকতা পর এগুলি অল্পকাল চলিয়া বাইতেছে। বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠা এখানে আছে তাহারাও নূতন কলকারখানা অল্পকাল বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই তো আন্দোলনের ফল।

আমরা চিন্তাশীল লোকমাত্রকেই পণ্ডিত নেহরুর ভাষণগুলি উদ্ধৃত অংশ পাঠ ও বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

### দেরাদুনে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা

“দেরাদুন, ১১ই ডিসেম্বর—অজ্ঞ এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী জ্রিনেহরু ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে সাময়িক চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনার গুরুত্ব বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে পাকিস্তানে সৈন্তবাহিনী বৃদ্ধি পাইলে, শুধু ভারতে নহে, সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং এই অঞ্চলে শক্তিসাম্য নষ্ট হইবে।

দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে তাহাদের সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র বিবাদ বিসম্বাদ ও উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ পরিহার করিয়া দেশবাসীকে একেত্র মূল্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জ্রিনেহরু বলেন, যুবজনই ভবিষ্যৎ ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। তাহারা যদি বিভেদমূলক কার্যকলাপে নিজেদের শক্তি নিঃশেষিত করে তাহা হইলে কিরূপে তাহারা ভবিষ্যৎ ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিবে। বিশেষ জোরে সহিত তিনি বলেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার দয়কা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

জ্রিনেহরু বলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই স্বাধীন। সুতরাং যে-কোন দেশের সহিত তাহারা আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারে। পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে বর্তমানে যে আলোচনা চলিতেছে তাহার উদ্দেশ্য পাকিস্তানের সশস্ত্র শক্তিবৃদ্ধি। ইহা শুধু ভারতের নহে, অস্ত্রাস্ত্র দেশের পক্ষেও ক্ষতির কারণ



হইবে। তিনি বলেন, ভারতকে তাহার প্রতিরক্ষার জন্য শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারত যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি প্রধানমন্ত্রী তাহা পর্যালোচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি হিন্দুস্তান বিমান কোম্পানীর টেষ্ট পাইলট ক্যাপ্টেন নামবোশীর মৃত্যুর কথা আবেগজড়িত কণ্ঠে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ঐরূপ প্রতিভাবান কর্মীর মৃত্যু দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

প্রধানমন্ত্রী অতঃপর পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক নীতির কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, পাকিস্তান স্পষ্টতঃ ভারতের স্বাধীনতাকে হুমকির নীতি পছন্দ করে না।

ব্রিটেনের জনগণকে রাজনীতিতে ধর্মীয় ব্যাপার আমদানীর বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন, রাজনীতিতে ধর্মীয় ব্যাপার আমদানী করিলে তাহা ভারতের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে এবং জনগণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইবে।

ব্রিটেনের বলেন : "ঐরূপ প্রবণতা ই অতীতে ভারতের সর্বনাশের কারণ হইয়াছে। এই প্রবণতা বোধ করা না হইলে তাহা বর্তমানেও ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সম্বনাশকর হইতে পারে। প্রত্যেকেই তাহার ধর্ম আচরণ করিতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাহা আমদানী করিতে দেওয়া হইবে না।"

### কলিকাতা ময়দানে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা

বিগত ১৩ই ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু যে ভাষণ কলিকাতা ময়দানে প্রদান করেন তাহার সারাংশ নিয়ে দেওয়া হইল :

ব্রিটেনের তাহার ভাষণে বলেন, প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি এই মতানুগরীতে আসিয়াছেন। সাত বৎসর হইয়াছে আমাদের দেশ এক স্বাধীন দেশ হইয়াছে, এই দেশে স্বরাজ আসিয়াছে। সাত বৎসর অবশ্য কোন দেশের জীবনে বেশী সময় নহে ; আবার, কখনও কখনও এক বৎসরও জাতির জীবনে খুব বড় সময়। এই কয় বৎসর কি হইয়াছে না হইয়াছে, ভাল কি হইয়াছে, মন্দ কি হইয়াছে, সে সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে, তুলনাক্রমে হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কোন সময়ে অসতর্ক হইলে দেশ হুর্দল হইয়া পড়িবে।

তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতা একটি বড় ঘটনা। বহু শত বৎসর পরে আজ প্রথমবার হিমালয় হইতে কতাকুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ভারতকে আমরা চিনি তাহা এক শাসনের অধীনে আসিয়াছে। ৩৬ কোটি নরনারী শিশু বোপানে বাস করে, পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোকের বাসভূমি সেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ইতিহাসের একটা বড় ঘটনা। উহার সঙ্গে সঙ্গে বড় দায়িত্বও আসিয়াছে। প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে এই দায়িত্ব কেবল দিল্লীতে প্রতীক্ষিত সরকার বা বাংলা-সরকারের নহে, দেশের কোটি কোটি মানুষ সকলেরই উপর সেই দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্বে বাহা ঘটে ভারতের উপর

তাহার প্রভাব পড়েই। পৃথিবীতে কোন যুদ্ধ না হয়, ভাষ্য তাহাই চাহে। প্রধানতম যে বিষয়টি বর্তমানে ভারতকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইল কি করিয়া ভারতবর্ষকে অগ্রগত করা যায়, কি করিয়া দেশবাসীর দায়িত্বা দূর করিয়া দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করা যায়। কেবল সেনাবাহিনীর শক্তি নহে, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সভ্যতার যে শক্তি মানুষকে আগাইয়া লইয়া যায় ৩৬ কোটি মানুষের দেশে কি করিয়া সেই শক্তি আনা যায় তাহা একটি বিরাট প্রশ্ন। আমাদের দেশ দরিদ্র নহে, উহার জমিতে বর্ষে সপ্ত সপ্ত আছে। কিন্তু অধিকাংশ দেশবাসী দরিদ্র। নিজেদের দেশে ধন উৎপাদনের দ্বারা এই দায়িত্বা দূর করা যায়। নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা, জমিতে কাজ করিয়া, কারপানায় খাটিয়াই ইহা করা সম্ভব। পৃথিবীর সকল দেশই এই ভাবে উন্নতি করিয়াছে। রাশিয়া গত ত্রিশ বৎসরে সেপানকার মানুষের নিজেদের শ্রম, নিজেদের সংগঠন, নিজেদের ঐক্যের সাহায্যে অনেক উন্নত হইয়াছে। কোন যুদ্ধের দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। আমরা যে নীতিই অনুসরণ করি না কেন, ভালমন্দ বিচার করিয়া তাহা করিতে হইবে, কোন নীতিই চোপ বৃজিয়া নকল করার প্রয়োজন নাই।

ব্রিটেনের বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে। যে অর্থ মানুষের হিতের জন্য ব্যয়িত হইতে পারিত তাহা তোপ, বন্দুক, এটম বোমা নির্মাণে ব্যয় করা হইতেছে। ভারত কোন দেশের সহিত শত্রুতা করিতে চাহে না, সকলেরই বন্ধুত্ব সে কামনা করে, নিজের জন্য সে যে পথ বাছিয়া লইয়াছে সেই পথে সে স্বাধীনভাবে চলিতে চাহে। ভারতের এই নীতি অনেক দেশের মনঃপূত নহে। কতকগুলি দেশের অভ্যাসই এমন হইয়া গিয়াছে যে, তাহার মনে করে, তাহারা যে ভুক্তম করিবে ছোট দেশগুলিকে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ এইভাবে অন্য দেশের নিকট নতিস্বীকারে অভ্যস্ত নহে। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত স্বাধীনতার সংগ্রাম করিয়াছিল, তখন গান্ধীজী এদেশের মানুষকে অভয় হইতে শিখাইয়াছেন। শক্তিশীল ভারতবাসী তখনই যখন নতি-স্বীকার করিতে রাজী হয় নাই, তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া কেন অন্তের নিকট নতি স্বীকার করিবে ? এক দেশ আর এক দেশের পদানত হইয়া থাকিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা বতদিন পরাধীনতা থাকিবে, ততদিন স্বাধীন-বিবাদের মূল থাকিয়া বাইবে।

গত দুই যুদ্ধে পৃথিবীর যে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আজ পৃথিবীতে রাশিয়া ও আমেরিকা এই দুই শক্তিশালী দেশের মধ্যে মোকাবেলা চলিতেছে। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, পরস্পরের প্রতি তাহার বিদ্বেষ। প্রত্যেকেই চাহে, অন্য দেশগুলি উহার দলভুক্ত হউক। অন্য দেশগুলি তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ এমন কিছু করিতে চাহে না, বাহাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ভারতবর্ষের নিজেরই বর্ষে বড় বড় সমস্যা বহিরাছে।

বিশ্বের সমস্তই জড়িত হইয়া পড়িতে ভারতবর্ষের সময়ও নাই, ইচ্ছাও নাই। কিন্তু কোন দেশের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা সম্ভব নহে, ভারতবর্ষের পক্ষেও নহে। ভারতবর্ষ চাহে বা না চাহে, বিশ্ব রত্নক্ষেত্রে ভারতকেও একটি ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল দেশ এখনও পরাধীন হইয়া আছে, সেগুলি ভারতবর্ষের দিকে তাকাইয়া আছে। একদা ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি অসঙ্গত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সম্মুখে যে নমুনা রাশিয়াছিল বর্তমানে ভারতীয় স্বাধীনতা বিদেশী শাসিত দেশগুলির সম্মুখে তাহার একটা বিপরীত নমুনা রাশিয়াছে। এই সকল পরাধীন দেশের প্রতি ভারতের সত্যাত্মকৃতি আগেরও ছিল, এখনও আছে। ভারতবর্ষ তাহাদের দায়িত্ব লইতে চাহে না; কিন্তু ভারতবর্ষ উহাদিগকে পিছনেও ফেলিয়া দিতে পারে না।

ক্রীনেহর বলেন, প্রায় চার শত সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে ভাস্কো-ডি-গামা যখন প্রথম ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন হইতে ইউরোপ হইতে এশিয়ার অভিমুখে যে প্রবাহ শুরু হইয়াছিল, সেই প্রবাহ আজ রুদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইয়াছে, প্রতিবেশী অনেকগুলি দেশও স্বাধীন হইয়াছে, এশিয়ার অসঙ্গত যে সকল দেশ এখনও স্বাধীন হয় নাই সেগুলিতেও স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিয়াছে।

পাক-মার্কিন চুক্তি প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, হুইটি দেশই স্বাধীন দেশ এবং তাঁহারা যদি এরূপ চুক্তি করেন, তবে ভারত তাহাতে বাধা দিতে পারে না; কিন্তু সকলেই একথা জানেন যে, ইহার প্রতিক্রিয়া ভারত ও দুঃখপ্রাচ্যের সর্বত্র আসিয়া পড়িবে। এই প্রশ্ন ভারত উক্ত হই দেশের নেতৃবৃন্দে নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী কোরিয়াতে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রথমবার স্বাধীন ভারতের পতাকা বহন করিয়া লইয়া সৈন্যদল বিদেশে গিয়া অনেক অসুবিধার মধ্যেও যে শক্তির জন্ত কাজ করিয়াছে, দেশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে এজন্য তিনি আনন্দ অস্থলব করেন।

ক্রীনেহর বলেন, বিশ্ব পরিস্থিতির এই চিত্র সম্মুখে রাশিয়া ভারতের সমস্তাসমুদ্র বিচার করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু যাত্রা শেষ হয় নাই। অস্তঃপর দায়িত্ব, বেকার-সমস্যা দূর করার, সর্বপ্রকার দুর্কলতার অবসান ঘটাইবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইহাই বড় প্রশ্ন। এইজন্য দেশের সকল মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই কলিকাতায় নানা স্থানের নানা লোক আছে। তাহাদের মধ্যে দায়িত্ব আছে, বেকার আছে। শোভাযাত্রা বাহির করিয়া, গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া ত সেগুলি দূর করা হইবে না। এমন অনেকে আছেন, বাহারা মনে করেন, একটা গোলযোগ বাধাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের দাবি আদায় করিতে পারিবেন। এমনকি ছাত্ররাও মনে করিতেছে যে, গোলমাল করিয়া তাহারা বাহা চাহে তাহা পাইবে।

এই বিরাট দেশে বহু মত থাকিতেই পারে, উহা জীবনেরই

লক্ষণ। কিন্তু কতগুলি মৌলিক বিষয় আছে যেগুলি মানিয়া লইতেই হইবে। প্রথমতঃ, ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম যে একাবন্ধ ভারত গঠিত হইয়াছে, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যে কোন নীতিই অঙ্গসরণ করা হউক, এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের ঐক্য যেন নষ্ট না হয়। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কাজের সুবিধার জগতই প্রদেশগুলি গঠিত হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা যদি পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ পথে চলে, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ দুর্বল হইয়া পড়িবে। সমগ্র দেশের একটি অংশও সত্তা রক্ষিয়াছে, উহাকে খণ্ডিত করা চলে না। ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহু ধর্মের লোক আছে, হিন্দুদের মধ্যেও বহু বিভেদ আছে। রাজনীতির মধ্যে যদি ধর্মের এই বিভেদ আনা হয় তাহা হইলে দেশ টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় আর একটি মৌলিক বিষয় হইল, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পুঞ্জিবাদ বা গান্ধীবাদ—যে কোন পথই আমরা গ্রহণ করি না কেন, কলহ-বিবাদের পন্থা অবলম্বন করিলে যে নতুন ভারতবর্ষ গঠিত হইতে বাইতেছে, তাহারই মূল্যাহীন করা হইবে। কলহ-বিবাদে মত হইয়া গেলে ভারতবর্ষের উন্নয়নের সকল কাজ বাতত হইবে।

ক্রীনেহর বলেন, সাম্যবাদের মূল নীতির সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। তাঁহারা সকলেই চাতিবেন যে, উচ্চনীচের মধ্যে বিভেদ কমিয়া যাইবে, প্রত্যেকেই সমান সুযোগ পাইবে। আজ সকলের সমান সুযোগ নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এই দেশের ছোট ছোট শিশুগুলির ঠিকমত বড় লওয়া হইতেছে না। কিন্তু কমুনিষ্টরা বা অন্য কেহ যদি মনে করেন যে, তাঁহারা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। তাঁহাদের পথ ধ্বংসের পথ, গঠনের পথ নহে। ভারতের সমগ্র ইতিহাসে দেখা যায় যে, এ দেশে মহৎ আদর্শের কোন দিন অভাব হয় নাই, আবার এদেশের লোক নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে মত্ত হইবার মুগ্ধতাও বার বার দেখাইয়াছে। সেইজন্যই ভারতবর্ষ পরপদানত হইয়াছে। আবার, তখনই দেশ গিয়াছে যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় যখন ভারতবর্ষ একাবন্ধ হইয়া নিজেকে সংগঠিত করিয়াছে তখন উহা শক্তিশালী হইয়াছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে ক্রীনেহর নাগপুরে বিমান দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, এই দুর্ঘটনার তাঁহার হুই জন পুরাতন সহকর্মী মারা গিয়াছেন। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যাহারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সময় বহিয়া যাইতেছে। পুরাতন দিনের সাধীদের মধ্যে এক এক জন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আজ প্রশ্ন উঠিতেছে তাঁহাদের স্থান কাহার গ্রহণ করিবেন, কাহার দেশের শাসনভার লইবেন। আজ বাহারা স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদিগকে এই দায়িত্ব লইতে হইবে। ইহা একটি বিরাট দায়িত্ব। সেইজন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আজ বাহারা

নও জওয়ান তাহাদের মধ্যেই রহিয়াছে ভবিষ্যৎ ভারত, তাহাদের চোখে, তাহাদের চেহারায়া তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের সন্ধান করেন।

তিনি আরও বলেন যে, এদেশে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, সেইজন্য এখানে জমির প্রশ্নই বৃহত্তম প্রশ্ন। এইজন্য বরাবরই কংগ্রেসের নীতি ছিল জমিদারী, ভায়গীরদারী প্রভৃতি উচ্ছেদ করা। আজ কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই নীতি কার্য্যকরী করিয়াছে বা করিতেছে।

কলিকাতায় সম্প্রতি যে সকল গোলযোগ হইয়াছে, সেগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কলিকাতায় যেখানে ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস সেখানে মাত্র চার-পাঁচ হাজার লোক কি করিয়া এই গোলযোগ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যদি দাবি জানাইতে হয়, তাহা সংগঠিতভাবে, শাস্তিপূর্ণভাবে করিতে হইবে। অপরপক্ষে মালিকদিগের উদ্দেশ্যে তিনি বলিবেন যে, এই শহরের একদিকে বিরাট বিরাট প্রাসাদ, অপর দিকে বস্ত্রী—ইহা অতি লজ্জার বিষয়, এক কদর্যা ব্যাপার। তাঁহার মনে হয় যে, এখন আর কোন প্রাসাদ নির্মাণ করা চলিবে না, এইরূপ একটা আইন করা উচিত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, এই পরিকল্পনার ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু উহা একটি বিরাট পাদক্ষেপ। এই পরিকল্পনায়ই সর্বপ্রথম সমগ্র দেশের প্রয়োজন ও ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া একটি সুচিন্তিত কার্য্যক্রম স্থির করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ভুল-ত্রুটি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি আরও ভাল করিয়া প্রণয়ন করিতে পারিবেন, তাহার এই আশা আছে। বেকার-সমস্যা খুব করার জন্ত ইতিমধ্যে তাঁহার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, গ্রামের তত্ত্ব তাঁহার সমাজ-উন্নয়ন কেন্দ্র খুলিয়াছেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে জাশনাল এম্প্লোয়মেন্ট সার্ভিসের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভারতের সাত হাজার গ্রামে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিতেছে। আর সাত-আট বৎসরে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ইহার সুফল ছড়াইয়া পড়িবে।

এইভাবে চলিতে চলিতে ভারত যদি আর্থিক স্বতন্ত্রতার লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে তাহা হইলে উদ্ভেদ্য সিদ্ধ হইবে। বাক্সা অবশ্য তখনও শেষ হইবে না। কেননা যে জাতির সমুখ বাক্সা বন্ধ হইয়া যায় তাহার পতন ঘটে। কিন্তু এক লক্ষ্য হইতে অস্ত্র লক্ষে পৌঁছিতে হইবে। তদ্রূপ কোটি মানুষের দেশের পক্ষে ইহা এক বিরাট কাজ।

### পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংগঠন

সোমবার ১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে এদেশ কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস-কর্মীগণের এক বৈঠকে বক্তৃতাশ্রমকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জিন্নাবাহরলাল নেহরু কলিকাতায় সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় এবং কয়েক মাস পূর্বে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন কালে অসুস্থিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া বলেন, ঐ উক্ত ঘটনার

মধ্য দিয়া কংগ্রেস সংগঠনের দুর্ব্বলতা—বিশেষ করিয়া কলিকাতায় উহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া উঠিয়াছে।

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের নিন্দা করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সামান্য ব্যাপার বাহার মীমাংসা সহজেই হইতে পারিত তাহা লইয়া কলিকাতা বিপথগামী হইয়াছিল—ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, এই নগরীর জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসকর্মীদের ঘনিষ্ঠতা হ্রাস পাইয়াছে। এই ঘটনা হইতে কংগ্রেসকর্মীদের হুঁসিয়ার হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ছুটি উপনির্ব্বাচনে নদীয়ার কংগ্রেসের জয় কেন হইল এবং কলিকাতায়ই বা পরাজয় হইল কেন তাহা কংগ্রেসকর্মীদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি গুনিয়াছেন যে, কলিকাতায় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে খুব কম কাজ হইয়াছে। যিনি কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন তিনি খুব কম কাজ করিয়াছেন। কংগ্রেসপ্রার্থী খুব সস্তা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হয়ত নির্বাচনের ব্যাপারটি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কংগ্রেসকর্মীগণ কাজ করেন নাই কেন তাহা তিনি (প্রধানমন্ত্রী) বুঝিতে পারিতেছেন না।

### সাম্মিলিত বার্ষিক-সভার সভাপতির উক্তি

এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মিঃ পেকস বিগত ১৪ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সম্মুখে যে বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত অংশ বিচারযোগ্য :

দ্বিতীয়টি হইতেছে বর্তমান শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত পরিস্থিতি। এই সম্পর্কে মিঃ পেকস বলেন যে, বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পের অধিকতর দ্রুত সম্প্রসারণ ও এই সব ক্ষেত্রে মূলধন আসিবার পথে প্রধান বিঘ্নগুলি শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের দুর্গম ক্ষেত্রেই অধিকতর সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। যে সকল অবস্থায় শিল্প উহার বাড়তি শ্রমিককে বাড়িয়া ফেলিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম বোধ করে এবং ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে হৈ চৈ তুলিয়া কারিগরী দিকের উন্নতি ব্যাহত করা হয় এবং যে ক্ষেত্রে বাহির হইতে ক্রমশঃই উচ্চহারে মজুরী ও বোনাসের দায় চাপাইয়া দেওয়া হয়, সেই অবস্থায় পুঁজিপতিগণ আনন্দিত মনে তাঁহাদের মূলধন নিয়োগের জন্ত আগাইয়া আসিবেন, এক্ষণ আশা করা যুথ। সেই হেতু প্রকৃত কাজ ও উৎপাদনের দিক হইতে টাকার কিরূপ মূল্য ধরা হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। শ্রমিকদের জীবনব্যতীর মান উন্নত করা হইবে না, একথা তিনি বলেন না। কিন্তু তিনি একথা বলিবেন যে, দেশের অভাবজন্মে টাকার নিজস্ব মূল্যটা যদি বধাধব বজায় রাখা না হয়, তাহা হইলে ঐ জীবনব্যতীর মান উন্নত হইবে না; বরং উহা হ্রাস পাইবে। ইহার প্রতীকার পন্থা হিসাবে মিঃ পেকস বলেন, শ্রমিককে তাহার দৈনিক মজুরীর বিনিময়ে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। উৎপাদনের পদ্ধতিতে কারিগরী দিক হইতে উন্নতি বিধান করিতে হইবে—উহার ফলে ভারতের শিল্পগুলি তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিতে সমর্থ হইবে এবং খাজনার মূল্য বাহাতে

হাস হইতে পারে, তজ্জন্ত উন্নততর কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে। একমাত্র এই ধরণের পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করিয়াই টাকার ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা এবং দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

### পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ

বণিকসভায় পণ্ডিত নেহরুর ভাষণে বর্তমানে শিল্পাধ্যক্ষের সমস্তা সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য ছিল :

“প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন, তিনি ভারতের অবস্থার পক্ষে উপযোগী আধুনিকতম কারিগরী দক্ষতার পক্ষপাতী। ভারতকে গড়িয়া তুলিবার জন্তই তিনি উহা চাহেন। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহাদিগকে ভিত্তিভূমি রচনা করিতে হইবে। কি ভাবে আধুনিকতম কারিগরী দক্ষতা ভারতের কাঠামোর সহিত বিজ্ঞস্ত করা যায়, তাহাই সমস্যা। কারিগরী দক্ষতা ও শ্রমশিল্পের দিক দিয়া তাঁহাদিগকে ঐ কাঠামোর উন্নতি সাধন করিতে হইবে। তাঁহাদের শ্রমশিল্পগত ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারারও প্রভূত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহাও বিবেচনা করা উচিত। তাঁহাদের অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদিগকে জেট ইঞ্জিন ও অণবিক শক্তির বর্তমান জগতের সজ্জিত সম্পর্ক রাপিতে হইবে। এমনই হইতে পারে যে, ১০ কিংবা ১৫ বৎসরের মধ্যে হয়ত কারখানার প্রধান যন্ত্র পরিচালনার আণবিক শক্তি ব্যবহৃত হইবে। কাজেই বণন দ্রুত পরিবর্তন চলিতেছে, তখন ব্যক্তিগত মনও পিছাইয়া থাকিলে চলিবে না। যদি বাচিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আধুনিক চিন্তাধারা গ্রহণ করিতে হইবে, পুরাতন চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া থাকা চলিবে না।

অতঃপর জিনেহরু বলেন, ভারত শ্রমশিল্পের দিকে অগ্রসর এবং ইহাই হইতেছে ভারতের সমস্যা। কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষমতা লইয়া ভারত অগ্রসর হইয়া বাইতে চাহে। তবে তাঁহাদিগকে কোটি কোটি অধিবাসীকে সঙ্গে লইয়া চলিতে হইবে। ইহা সর্বদাই তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলেন, তাঁহাদিগকে (শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী) ‘প্রস্তুতীভূত’ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করিতে হইবে এবং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অর্থবিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

জিনেহরু আরও বলেন, ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে ভারসাম্য আনয়নের ক্ষেত্রে বিরাট জনসমাজকে বিশ্বাস করিতে হইবে; তাহারা বাহাতে মনে করিতে পারে যে, তাহারা শ্রমশিল্পের অংশীদার তদ্বিষয়ে তাহাদের মনে প্রেরণা জাগাইতে হইবে। বস্তুতঃ বণন রাজনৈতিক গণতন্ত্র আনিসাছে, তখন তাহারা অর্থনৈতিক দাবি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না এবং তিনি তাহা করিতেও চাহেন না। তিনি মন্তব্য করেন যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে পরিণত হয়।”

কুটার-শিল্প ও বৃহৎ বাস্তবিক শিল্পের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর মতামত সুস্পষ্ট

“প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐরূপ শ্রমশিল্পের ভিত্তিভূমি রচনার দ্বারা

ব্যক্তিগত শ্রমশিল্পের সাধারণতঃ ক্ষতি হইবে না। তাঁহাদিগকে যদি দ্রুত অগ্রসর হইতে হয় এবং দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে কিছুকালের জন্ত গবর্ণমেন্টকে অর্থনৈতিক ও শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে নিষ্কণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী ভূমিকাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ভূমিকাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং এতদ্বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কোন কঠোর নিয়ম করা যায় না, কেননা বিবর্তনমূলক অবস্থায় বিষয়বস্তুর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। তিনি নিজে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বিবোধ দেখিতেছেন না এবং তিনি বৃহৎ বাস্তবিক অর্থনীতি ও কুটার-শিল্প অর্থনীতির মধ্যেও কোন মূলগত বিরোধ দেখেন না, যদিও চেম্বার্স অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট শেখোজ্ঞ অর্থনীতিকে “গুরুত্বপূর্ণ গাড়ীর অর্থনীতি” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস এখনও দেশের সংগঠিত সমুদয় শ্রমশিল্প অপেক্ষা অনেক বেশী লোক ভারতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত রাখাছে।”

“দেশে সমস্ত লোকের কক্ষে নিয়োগ-ব্যবস্থার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বাহাতে তাঁহারা একটি নিদ্রাট সময়ের মধ্যে লোকজনকে কাজ দিবার ক্ষমতা উপনীত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে অবশিত হইয়াই তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অবশ্য উহার অর্থ এই নহে যে, যেখানে ছাঁটাই আবশ্যক অথবা যেখানে এমন লোকজন আছে যে উহার অজ্ঞাত লোকের কাঁচের পথে প্রতিবন্ধক হইতেছে, সেখানে শ্রমশিল্পে কোন ছাঁটাই করা উচিত নহে। তিনি মনে করেন যে, বাড়তি কামচারী ছাঁটাই অধিকতর দক্ষতা সূচিত করার সহায়ক হইবে। তিনি বলেন, উহার কারণ এই যে, অপ্রয়োজনীয় ভার বহন করিতে পারা যায় না; তবে তাহাদের তত্ত্ব অজ্ঞাত কি ভাবে কাঁচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহাদিগকে সেই প্রশ্নটির সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সকল বিষয় অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রশ্ন নহে। সন্দেহাত্মক কি উপায়ে বাড়তি কামচারীদিগকে অজ্ঞাত গ্রহণ করা যায়, উহা হইতেছে সেই প্রশ্ন।

### নো-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পণ্ডিত নেহরু

ভারতের সর্বপ্রথম নো-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বারোদ্বাচন কালের বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু প্রাচীনকালে ভাষ্যের ব্যাপারে বিশেষ ভারতের বিশেষ দানের কথা অত্যন্ত আবেগের সহিত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে ভারত নিজের জাহাজ নিজেই নিৰ্ম্মাণ করিত এবং শত সহস্র মাইল ব্যাপী সপ্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়া দেশ-বিদেশের সহিত ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে সংযোগসাধন করিত। সেই যোগসূত্রের প্রমাণ আজিও যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অজ্ঞাত দেশে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। ভারতের কাছে চীন সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে। সমুদ্রপথে শত শত লোক ভারত হইতে চীনে গিয়াছে ও চীন হইতে ভারতে আসিয়াছে। নেপোলিয়নের সময়

ইংরেজ নৌ-বৃহদের জন্ত ভারতে প্রস্তুত জাহাজ ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু আমরা চাই সমুদ্র হইবে এক দেশের সহিত অন্য দেশের যোগ-সূত্র, বিচ্ছেদের সূত্র নহে।

ক্রিনেহর বলেন, আজ ভারত তাহার প্রাচীন ইতিহাস, সমুদ্রের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ভুলিয়াছে, ভারতের অধঃপতনের যুগে ইহা ঘটিয়াছে। ধর্মের নামে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যাহারা সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইহা সত্য যে, ভারতের ধর্ম অতি মহান। কিন্তু অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারত ছিল শক্তিশালী। ধর্ম যখন অস্পৃশ্যতার রূপ ধরিয়া আসে তখন উহা মানুষের প্রগতির পথ বোধ করে। আজ ভারতের সম্মুখে নতন ধার উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস নতন করিয়া আমাদের কাছে শিখিতে হইবে। সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের পুরাতন বন্ধুত্ব আবার নতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে।

ক্রিনেহর বলেন, কিছুকাল আগে বিদেশ হইতে ভারতকে গাঢ়শাস্ত্র আমদানী করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতের জাহাজ নিত্য অপব্যয় ছিল বলিয়া কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে আমাদের বিদেশী জাহাজে গাঢ়শাস্ত্র আনিতে হইয়াছে। কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতের বাহিরে চলিয়া যাউতেছে তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি ও উদ্বেগ বোধ করিতেছি। জাহাজের জঙ্গ বিদেশের উপর নির্ভর করা ভারতের উচিত নহে। সমাগরী জাহাজের সংখ্যা অবিলম্বে বৃদ্ধি করা ভারতের জরুরী প্রয়োজন। নৌ-বিভাগীয় জাহাজের সংখ্যাও ভারতকে বাড়াইতে হইবে। বিশেষভাবে ভারতের যুবকদিগকে সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত হইতে হইবে।

### আলিগড়ে মুসলিম সম্মেলন

“নয়া দিল্লী, ১ই ডিসেম্বর—স্বরাষ্ট্র-সচিব ডঃ কাটজু আজ লোক-সভায় ডাঃ চৈতন্য গিদোয়ানীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সম্প্রতি আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলনে যাহারা জনসাধারণকে হিংসা-চারে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্ত উত্তেজিত করিয়া বক্তৃতা দেয় তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী আরও বলেন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাক্রিকদের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সুবিধার জঙ্গ ব্যক্তিতে সম্মেলন হইয়াছিল এবং পাকিস্থানের কোন কোন দলের সহিত উদ্যোক্তাদের যোগ ছিল বলিয়া উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী যে মন্তব্য করেন তাহা তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু ভারত-সরকার এই বিষয়ে কোন সংবাদ পান নাই।

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে ডঃ কাটজু এই মন্তব্য করিয়া বলেন, আলিগড় সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সহিত পাকিস্থানের কোন কোন দল ও সংবাদপত্রের যোগাযোগের বিষয়ে সরকার কোন সংবাদ পান নাই। তবে একথা সত্য যে, পাকিস্থান এসোসিয়েটেড প্রেসের দিল্লীর সংবাদদাতা পাক সংবাদপত্রের জন্ত এই সম্মেলনের বিবরণ পাইয়াছিলেন এবং সম্মেলনের সংবাদ

সংগ্রহের জন্ত আলিগড়ে গিয়াছিলেন। সম্মেলনের বিবরণ ভারতের কয়েকটি উর্দু সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন—সরকার কি অবগত আছেন যে, হিংসার আলম প্রবর্তিত করিতে এবং ১৮৫৭ সনের ঘটনার (সিপাহী বিদ্রোহ) পুনরাবৃত্তি করিতে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা সম্মেলনে অনেকগুলি রক্তক্ষয়কারী বক্তৃতা প্রদত্ত হয়?

স্বরাষ্ট্র-সচিব উত্তরে বলেন যে, উর্দু কাগজে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন। এই সমস্ত বক্তৃতার স্বরূপ বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হইতেছে।

হিংসা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ-দাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ জোয়াকিম আলভা—সরকার কি অবগত আছেন যে, আলিগড়ে প্রদত্ত শিক্ষা-সচিবের বক্তৃতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা প্রদর্শনের সময় হইতে আজ পর্যন্ত তথ্য (আলিগড়ে) মুসলিম লীগের নীতি আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও চালু রহিয়াছে?

মিঃ আলভার প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র-সচিব ও অজ্ঞাত মন্ত্রীমুন্দ হাসিতে থাকিলে স্পীকার মন্তব্য করেন যে, মিঃ আলভার প্রশ্নটি ফেলনা নয়।

ইহার পর স্বরাষ্ট্র-সচিব উপরোক্ত উত্তর দেন। তিনি আরও বলেন যে, কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এখনও মুসলিম লীগ মনোবৃত্তি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার চেষ্টা করিতেছে এবং অপর একদল উহার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায়—দেশের অভ্যন্তরে পক্ষমবাহিনীর কার্যকলাপ দমনের জন্ত দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের অধীনস্থ নিরাপত্তা বাহিনী সমবেতভাবে চেষ্টা করিতেছে কি না?

স্বরাষ্ট্র-সচিব—দেশে কোন পক্ষমবাহিনী নাই; আমরা শান্তিতে বাস করিতেছি। স্বরাষ্ট্র-সচিবের এই উক্তির প্রতিবাদে সভ্যদের সর্বত্র হইতে ‘না’, ‘না’ ধ্বনি উঠিতে থাকিলে ডঃ কাটজু বলেন, “পক্ষমবাহিনী যদি থাকেও, তাহা হইলেও আপনারা আমাদের উপর নির্ভর করিতে পারেন যে, আমরা উহা দমনে সক্ষম হইব।”

ডঃ কাটজুর উপর নির্ভর করিলে দেশের কি অবস্থা হইবে তাহার ইঙ্গিত এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই পাওয়া যায়। ঐরূপ উত্পাদনী নীতি দেশরক্ষা ব্যাপারে সর্বনাশের পথ।

### নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রলাপ

“লন্ডন, ১০ই ডিসেম্বর—নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী এস. এন. অগ্রবাল প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সাময়িক চুক্তির “বিপজ্জনক সম্ভাবনা”র বিরুদ্ধে ‘জনমত’ গড়িয়া তোলার জন্ত কংগ্রেসের সকল ইউনিটকে আবেদন জানাইয়াছেন। এই চুক্তির ফলে কেবলমাত্র ভারত ও পাকিস্থান নহে, পরন্তু সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার “সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া” দেখা দিবে।

সকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নিকট এক সাকুলার প্রেরণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত চুক্তির ফলে সমগ্র ভারতবাসী বানচাল হইয়া বাইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের চেউ আমাদের সীমান্তে আসিয়া স্পর্শ করিবে। ফলে যদি কখন প্রকৃত যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে উভাতে আমরা জড়াইয়া পড়িব। আমাদের নীতি হইল কোন শক্তিগোষ্ঠীর সহিত জড়াইয়া না পড়া এবং যুদ্ধ যদি বাধে তাহা হইলে এশিয়ার বতপানি সম্ভব এলাকাকে উভা হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করা। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইলে পাকিস্তান যুদ্ধজালে সম্পূর্ণ জড়াইয়া পড়িবে এবং ভারতেও শাস্ত্র-রক্ষার পক্ষে এক নূতন বিপদ দেখা দিবে।

নিপিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী এই বিষয়ে সভাপতির আরোহণ করিতে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, “ঐ সব সভায় পাক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে কোনকণ নিন্দাবাদ করা উচিত হইবে না। বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক ও ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া কেবলমাত্র ঐ নীতির নিন্দা করা হইবে। ওখায় ইহা সম্পৃষ্টভাবে জানাইয়া দিতে হইবে যে, যদি এই ধরনের চুক্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে পাকিস্তানের সহিত ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবে।”

দোষীর নিন্দাবাদ না করিয়া নীতির নিন্দাবাদ করার ব্যবস্থা কংগ্রেসের মস্তিষ্ক-বিকৃতির পূর্ণ লক্ষণ ভিন্ন অন্য কিছু কি ?

### ভূমি উন্নয়ন আইন ও সুপ্রিমকোর্ট

১১ই ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের কনস্টিটিউশন বেঞ্চে যে আপীল করা হইয়াছিল প্রধান বিচারপতি লিপ্তজলি শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত বেঞ্চ আজ তাহা বাতিল করিয়া দিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের দায়ই বহাল রাখিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সনের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-উন্নয়ন ও পরিকল্পনা আইনের ৮ম অধ্যুচ্ছেদের ৭ সংখ্যক ব্যবস্থার শেষাংশ সংবিধানের ৩১(২) অধ্যুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলীর বিরোধী। আলোচ্য ধারার ব্যবস্থা এই ছিল যে, উক্ত আইনবলে গবর্নমেন্ট যে সকল জমি অধিকার করিবেন সেই সকল জমির বাবদ দেয় সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ ১৯৪৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বরে জমির যে মূল্য ছিল তদনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের এই আইন ১৯৪৮ সনের ১লা অক্টোবর পাস হয়। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিণতিতে যে সকল লোক পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসে তাহাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়াই ছিল উক্ত আইনের মূখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীমতী বেলা বন্দোপাধ্যায়ের এবং অপর দুই জন জমির মালিকের জমি এই আইনে অধিকার করা হইলে তাহাদের পক্ষ হইতে এই আইনকে বাতিল ও সংবিধান-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করার চেষ্টা

২৪-পবগণার অন্তর্গত আলিপুরের সাব-জজের এজলাসে এক মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় সংবিধানের বাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত বলিয়া প্রতিবাদীরা অতঃপর সংবিধানের ২২৮ অধ্যুচ্ছেদ অনুসারে কলিকাতা হাইকোর্টের নিকট সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের একটা ডিভিসন বেঞ্চে আবেদনের গুনানী হয়। হাইকোর্ট এই রায় দেন যে, সমগ্র আইনটি সংবিধান-বিরোধী নয়, তবে উহার দুইটি ব্যবস্থা, যথা—(১) জমি অধিকার সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কার্য বলিয়া সরকারী ঘোষণা এবং (২) ১৯৪৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর জমির যে বাজার দর ছিল ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ তাহার বেশী হইতে পারিবে না। এইরূপ ব্যবস্থা বাতিল হইবে।

আইনের এই সকল ব্যবস্থা কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল ও সংবিধান-বিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইলে, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করেন।

শ্রীমতী বেলা বন্দোপাধ্যায়ের জমি যাহারা সরকারী ব্যবস্থায় কৃষিগত করবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহারা উক্তপদস্থ সরকারী কথ্যচারী—অর্থাৎ বাস্তবদুয়। সেটজন্ম সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট।

### আবর অভিযান

“শিলং, ১১ই ডিসেম্বর—চর্চাম পার্কতা প্রদেশে ক্রমাগত ২০ দিন ধরিয়া চলিবার পরে আসাম রাইফেল বাহিনী আচিংমোরী প্রবেশ করিয়াছে। অভিযান আরম্ভ হইবার পরে এই বাহিনী কোথাও বিশেষ বাধা পায় নাই। ডকলাগণ পূর্বেই আচিংমোরী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আটক বাস্তি-দিগকে তাহারা পার্কতা অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগে সরাইয়া লইয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর—নাগা জাতীয় পরিষদের স্বাধীনতার দাবির নিন্দা করিয়া ২৭ জন গণজাতি-নেতা যে বিবৃতি দিয়াছেন, উভাতে সফল ফলিবে বলিয়া আশা করা যাউতেছে। গণজাতি-নেতারা ইহার পূর্বে নাগা-সমগ্র সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া কখনও বিবৃতি দেন নাই। নাগা নেতৃবৃন্দকে তাঁহারা যে পরামর্শ দিয়াছেন, উহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা করা যাউতেছে।

নাগা জনসাধারণের মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নাগা পূর্বতৎকালে গবর্নমেন্ট যে সকল সমাজ-কল্যাণ কার্য করিতেছেন, তাহারা ক্রমেই তাহার সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতা করিতেছে।

আমরা মনে করি, এই সীমান্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ঐ অঞ্চলে শুধু শান্তি-স্থাপন বা শান্তি-বিধানই যথেষ্ট নহে। উহা বখাষধভাবে চালিত ও বক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, কেননা আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যে উহা ছিন্নপথ বিশেষ।

### মিশর ও ব্রিটেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুনর্জাগরণ হইতে



ছয়-সাত বৎসর লাগিয়াছিল। এইবার সময় কিছু বেশী লাগিয়াছে, কিন্তু অবস্থা আবার সেইরূপ বনাইয়া আসিতেছে মনে হয়। নিয়ন্ত্রিত সংবাদ তাহার সাক্ষ্য দেয় :

“ওয়াশিংটন, ১১ই ডিসেম্বর—মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব মি: জন ফটার ডালেস নাকি এখানে মিশরীয় দূতকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সূর্যোজ্জ্বল সম্পর্কে ব্রিটেন তাহার মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করিতেও অস্বীকার করিয়াছেন।

মি: ডালেস আজ হোয়াইট হাউসে মিশরীয় দূত মি: আমেদ হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ৪০ মিনিটকাল আলোচনা চলে।

ওষাকিবহাল কূটনৈতিক মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, মি: ডালেস মিশরীয় দূতকে জানাইয়াছেন যে, বারমুড়া সম্মেলনের সময় তিনি ও পেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: চার্চিলকে পাল এলাকা হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ বিষয়ে মিশরের দাবিগুলি সম্পর্কে কোনপ্রকার সুরিধা দিতে সম্মত করাইতে পারেন নাই। আর উইনষ্টন চার্চিল এইরূপ প্রকাশ করেন যে, সূর্যোজ্জ্বল দলের ২৫ হইতে ৩০ জন সদস্য মিশরকে পূর্বে যে সুরিধা দেওয়া হইয়াছে তাৎসম্পর্কে ইতিপূর্বেই কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। নূতন কোন সুরিধা দিলে তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সক্ষম দলে যোগদান করিবেন।

কারো, ১১ই ডিসেম্বর—বারমুড়া সম্মেলনে সূর্যোজ্জ্বলের বিরোধ-মীমাংসায় আমেরিকার সালিশী বার্ষ হইলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া আজ মিশরী পত্রিকা-গুলিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

মিশরের বৈপ্লবিক পরিষদের সদর দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ বলেন যে, পাল এলাকা সম্পর্কে ব্রিটেনের অনমনীয় মনোভাব এবং একচুলও ত্যাগ না করিবার ব্রিটিশ হুমকীতে মিশরের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ উত্তেজিত হইয়াছেন।

মিশরী দূত টেলিফোন বোগে কর্ণেল নাসেরকে মি: ডালেসের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ এবং বারমুড়ায় সূর্যোজ্জ্বল সমাধানে আমেরিকার বার্ষ চেষ্টার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।”

### চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি বাতল

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাবের দ্বারা চন্দননগরের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির বিরুদ্ধে ‘সমাজবিরোধী’ ও ‘বিভেদশৃঙ্খিকারী’ শক্তিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া এবং সহযোগিতা করিয়া কংগ্রেসের মর্যাদা ও সংহতি ক্ষুণ্ণ এবং শৃঙ্খলাভঙ্গ করিবার জন্ত চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে : “চন্দননগর ঐতিহাসিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ভারত-সরকার চন্দননগরকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির

পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার ঐকান্তিক ইচ্ছা-প্রণোদিত।

“এই রাজ্যের অগুণ্ডতা ও সংহতি ক্ষুণ্ণ করিয়া চন্দননগরের জনগণের স্বার্থের ক্ষতির উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশ ও ইচ্ছার নিন্দনীয়ভাবে বিরুদ্ধাচরণপূর্বক মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন বরকট করিয়া চন্দননগরের এক শ্রেণীর লোক যে ক্রমবর্ধমান বিভেদাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির এই অধিবেশন তাহা উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। এই অধিবেশন হুগের সহিত আরও লক্ষ্য করিতেছে যে, যে সমস্ত সমাজবিরোধী ও বিভেদশৃঙ্খিকারী শক্তি পশ্চিমবঙ্গের অগুণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বিভেদাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে, চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং সহযোগিতা করিতেছে। এই অধিবেশনের আরও অতিমত এই যে, চন্দননগর কংগ্রেস কমিটির কার্যকলাপ শৃঙ্খলা-বিরোধী এবং কংগ্রেসের মর্যাদা ও সংহতি ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এরূপ অবস্থায় কার্যনির্বাহক সমিতি হুগের সহিত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং যথাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির উপর ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।”

চন্দননগর কংগ্রেস কমিটির ব্যাপার একটি ব্যাপক রোগের আংশিক উপশম মাত্র। মূল রোগের উপশম না হইলে চিকিৎসাই বৃথা যাইবে।

### ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্য-চুক্তি

গত ২রা ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে পাঁচ বৎসরের মেয়াদী এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করাই চুক্তিকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের উদ্দেশ্য। উভয় রাষ্ট্রই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্ত সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছে। চুক্তিতে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের জন্ত যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে ভারতের ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং সোভিয়েট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহা ছাড়া অজ্ঞাত দ্রব্য সম্পর্কেও ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতে পারিবেন। স্থির হইয়াছে যে, সকলপ্রকার দেনা-পাওনা ভারতীয় মুদ্রায় (টাকা) মিটান হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সোভিয়েটের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ভারতের এক বা একাধিক ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব রক্ষা করিবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতে একটি সংস্থা খুলিবে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ব্যাপারে সাহায্য এবং সহযোগিতা সম্পর্কেও দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়। বাণিজ্য হইতে যে সকল বস্ত্রপাতি আমদানী করা হইবে সেইগুলি প্রতিষ্ঠা করা এবং চালাইবার জন্ত প্রয়োজনীয় কারিগরি সাহায্য দিতে



সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্মত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন পশিকরনা কার্যকরী করিবার ব্যাপারেও সোভিয়েট ইউনিয়ন কারিগরি সাহায্য দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

প্রথম বৎসরে ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, ককি, তামাক, গালা, গোলমরিচ ও অজ্ঞাত মশলা, পশম, চামড়া, উদ্ভিজ্জ ও অজ্ঞাত আবশ্যক তৈল প্রভৃতি রপ্তানী হইবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন খাদ্যদ্রব্য (গম, বালি), অপরিষ্কৃত খনিজ তৈল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি, কাঠ ও কাগজ, লৌহ এবং ইম্পাতজাত দ্রব্য, বাণায়নিক দ্রব্য, বং, ছায়াচিত্রের কিশ্ম, বই এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় নানারূপ যন্ত্রপাতি ও কৃষিকাঠোর উপযোগী যন্ত্রপাতি ভারতে পাঠাইবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বহির্কর্ণাণ্ড নীতি সম্পর্কে ওয়াই. মিনফ লিখিতেছেন, “অপরূপ দেশসমূহের সঠিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের নীতি সোভিয়েট-সরকার চিরদিনই অত্যন্তভাবে অগ্রসরণ করিয়া চলিয়াছেন। সোভিয়েট-যুক্তরাষ্ট্রের সঠিত যে সমস্ত দেশের বাণিজ্যসম্পর্ক রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা সাম্প্রতিক কালে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। ফ্রান্স, ইটালী, ফিনল্যান্ড, ইরান, ডেনমার্ক, গ্রীস, নরওয়ে, সুইডেন, আর্জেন্টিনা ও আইসল্যান্ডের সহিত সোভিয়েট-সরকারের বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। মিশরের সঙ্গেও লেন-দেন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে; অজ্ঞাত দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য-চুক্তির কথাবার্তা চলিতেছে।”

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে অল্প কথাও আছে। ভারতের সহিত রাশিয়ার বাণিজ্য অতি নগণ্য ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষই অধিক টাকার মাল রপ্তানী করিত। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতবর্ষ রাশিয়াতে ৮৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে, ১৯৫১-৫২ সালে করিয়াছে ৬৬৭ কোটি এবং ১৯৫০-৫১ সালে ১০৩৪ কোটি টাকার মাল। রাশিয়া হইতে ভারত ১৯৫২-৫৩ সালে ২৪.১৭ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিয়াছে, ১৯৫১-৫২ সালে করিয়াছে ১০৮ কোটি টাকার। ১৯৫০-৫১ সালে ২২.৯ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিয়াছে। এই বৎসরের এপ্রিল হইতে জুলাই এই চার মাসে রাশিয়া ভারতবর্ষ হইতে ৮.৬ লক্ষ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে, কিন্তু এই সময়ে ভারতবর্ষ কোনও জিনিষ রাশিয়া হইলে আমদানী করে নাই। রাশিয়া ভারতবর্ষ হইতে সাধারণতঃ চা, পাটজাত দ্রব্য, তামাক এবং গালা ক্রয় করে। রাশিয়া-ভারতবর্ষের ব্যবসা এতদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ জিনিষের পদবর্ত্তে জিনিষ ধারাই হইত।

নূতন চুক্তি অনুসারে রাশিয়া তাহার রপ্তানীর জন্ত ভারতবর্ষের টাকা লইতে রাজী বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি একটু তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। রাশিয়া তাহার রপ্তানী বাবদ ভারতবর্ষ হইতে টাকা লইয়া বাইবে না। এখানে তাহার নামে টাকা জমা পড়িবে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেন-দেনের নিশ্চিতি হইবে টার্লিং

দ্বারা। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের মাধ্যমে টার্লিং মারকত রাশিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা ভারতবর্ষ হইতে লইবে।

বর্তমানে রাশিয়া ব্রিটেন হইতে অধিক মাল আমদানী করিতেছে। ব্রিটেনের সহিত ব্যবসায়ে রাশিয়ার ঘাটতি বাইতেছে, এবং এই ঘাটতি শোধ করিবার জন্ত রাশিয়া তাহার জমা স্বর্ণ পৃথিবীর সাদাবাজারে অপেক্ষাকৃত অল্পদামেও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। রাশিয়ার টার্লিঙের অভাব হইয়াছে, তাই সে বিমানে করিয়া সতর টন সোনা (বাহার মূল্য দেড়কোটি টার্লিং পাউণ্ড) লণ্ডনে চালান দিয়াছে। রাশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি টার্লিঙের সোনা মজুত আছে।

ভারতের সহিত নূতন চুক্তি অনুসারে রাশিয়া টাকার সমপরিমাণ মূল্যের টার্লিং পাইবে এবং তাহার দ্বারা সে ব্রিটেনকে টার্লিঙে তাহার দেয় টাকা শোধ দিতে পারিবে। ইঙ্গ-রাশিয়া বাণিজ্যকে সহজ করিবার জন্তই বোধ হয় রাশিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া ভারতের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। কয়েক বৎসর পূর্বেও রাশিয়া তাহার আন্তর্জাতিক রপ্তানীর বদলে জিনিষ দাবি করিত—টাকা লইতে একেবারেই নারাজ ছিল।

### সরকারী ব্যবস্থা-বিভাগ

কলিকাতায় কিছুদিন যাবৎ সাদাবাজারে চাউল বিক্রি করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—জনসাধারণের অনেকেই এই চাউল ক্রয় করিতেছিলেন। এই চাউলের মূল্য সাত আনা হইতে এক টাকা চার আনা পর্যন্ত এবং সবচেয়ে সস্তা এই যে, উঠাতে কঁকর নাই। বেশনের চাউলে কঁকর থাকার আজ স্পেশাল চাউলের চাউদা দিন দিন বাড়িতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদেশ জারী করিয়াছেন যে, বাংলার জেলা ও গ্রাম হইতে সাদাবাজারের জন্ত চাল ক্রয় করা চলিবে না। সাদাবাজারের বিক্রেতারা যদি চালের বাবসা করিতে চাহে তাহা হইলে তাঁহারা হয় ভারতের বাহির হইতে অথবা উত্তরপ্রদেশ হইতে চাউল ক্রয় করিতে পারেন। এই আদেশের মন্তব্য এই দাঁড়ায় যে, সাদাবাজারী চাউলের দোকানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য এবং জনসাধারণ অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারে, ইহার কারণ কি?

কলিকাতায় বেশনের চাউল সরবরাহ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কলিকাতায় বেশন বাবদ বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টন চাউল দিবেন। এই চাউল পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলার জেলাগুলি হইতে সংগ্রহ করিতেন—এখন আভ্যন্তরিক সংগ্রহ বহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গবর্নমেন্টের এই নূতন আদেশে জনসাধারণের অন্তর্বিধা হইবে। সরকার যখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কন্ট্রোল ও বেশন তুলিয়া দিবেন, তখন বাহাতে বাবসারে স্বাভাবিক অবস্থা কিরিয়া আসে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কি সমীচীন ছিল না? বর্তমানে

ল্যের চাউল কতকটা এ. প্রদেশে ও কতকটা বাহির হইতে আনিয়া বিক্রয় করিতে দিলে ধানের চাষ ভাল চলে এবং কলিকাতার লোকে মাঝে মাঝে একটু ভাল চাউল পাইয়া বাঁচে।

### ভারতে সোনার চোরাকারবার

১৯৪২ সাল হইতে ভারতে সোনার গুপ্ত আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসর হইতে ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে, পশ্চিমীয়া গোয়া ও মাকাওতে, ব্যাঙ্কে এবং ফরাসী পশ্চিমীয়াতে সোনার সাদাবাজারী কারবার শুরু হইয়াছে। ১৯৫১ সালে পৃথিবীতে মোট ২'৫০ কোটি আউন্স সোনা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৭৪ লক্ষ আউন্স কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি ক্রয় করে। বাকি ১'৮০ কোটি আউন্সের মধ্যে ৮০ লক্ষ আউন্স গঠনা ও সৌখীন জিনিষের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এক কোটি আউন্স গুপ্তধন হিসাবে লোকে ক্রয় করে। এই এক কোটি আউন্সের শতকরা প্রায় ত্রিশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৮০ লক্ষ তোলা মধ্যপ্রাচ্য হইতে ভারতবর্ষে গুপ্তভাবে আমদানী করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালে সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১'২০ কোটি আউন্স সোনা গুপ্তধন হিসাবে লোকে জমা রাখিয়াছে।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাস হইতে ভারতে সোনা আমদানী আইনতঃ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের আভ্যন্তরিক উৎপন্ন সোনা কেবলমাত্র শতকরা ৫০ ভাগ চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। বাকি ৫০ ভাগ গুপ্ত আমদানীর দ্বারা মিটানো হয়। বর্তমানে আমদানী সোনার উপর ভবিষ্যৎ সাফে বারো টাকা আমদানী শুল্ক আছে। কিন্তু গুপ্তভাবে আমদানী হওয়ার জন্য সরকার এই আমদানী শুল্ক হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শুধু তাহাই নহে, চোরাকারবারী সোনার জন্য আমেরিকান ডলারে মূল্য দিতে হয়। সাধারণতঃ গোয়া, পশ্চিমীয়া এবং বিভিন্ন মাছ ধরবার বন্দর হইতে চুরি করিয়া ভারতবর্ষে সোনা আমদানী করা হয়। এই বৎসরে ১৫ই সেপ্টেম্বরের পর হইতে প্রায় দুই মাসের মধ্যে দেড় লক্ষ আউন্স সোনা গুপ্তভাবে আমদানী হইয়াছে।

ভারতের দ্বিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বর্ণনিতি বস্তুচন্দনক। তাঁহাদের মতে সোনা কোন প্রয়োজনীয় বস্তু নহে, শুভবাং ইহার আমদানী নিষিদ্ধ থাকিবে। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ ভাবে অজ্ঞবকম। ভারতে বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি টাকার সোনা জমা সম্পত্তি হিসাবে রাখা হয়। গড়পড়তার মাথাপিছু প্রায় এক টাকা হিসাবে পড়ে। এদেশে মাথাপিছু বৎসরে সাত টাকা হিসাবে জমা পড়ে এবং এই টাকার শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ মাত্র সোনাতে নিয়োজিত হয়। অর্থাৎ, গড়পড়তার মাথাপিছু ২৫৫ টাকা বাৎসরিক আয়ের মাত্র এক টাকা সোনা মজুত রাখার জন্য খরচ হয়।

ভারতবাসীর মনে সোনার চাহিদা ব্যাপক এবং আইনসম্মত সরবরাহ বঞ্চিত না হওয়ার চোরাকারবারী দ্বারা সরবরাহ বজায় রাখা হইতেছে। এ তথ্য গবর্ণমেন্ট এবং দ্বিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুবিদিত।

অনেকে বলেন যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার নির্ধারিত মূল্যের (৩৫ ডলারে এক আউন্স) বাহিরে সোনা বিক্রয় করিতে দিবেন না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে ফ্রান্সে সোনার মূল্য অত্যধিক ছিল। এই অবস্থায় ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স সোনা বিক্রয় করিতে 'আবস্ত' করে এবং তাহাতে ফরাসীদেশের মূল্যমান স্থিতিশীল হয়। ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স নিজে সোনা আমদানী করিয়া জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করে। ১৯৫০-৫১ সনে দক্ষিণ আফ্রিকাও জনসাধারণকে নির্ধারিত মূল্যের বাহিরে সোনা বিক্রয় করে।

### পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি

গত নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাক গবর্ণর-জেনারেলের মার্কিন মূলুক সফর উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক আলোচনার কথা প্রথম সাধারণের গোচরীভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থানের সরকারী মহল উচ্চস্থরে এইরূপ কোনপ্রকার কথাবার্তার অস্তিত্বই অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডালেস ১৭ই নবেম্বর ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয় নাই; সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য জানান যে, ভবিষ্যতে এইরূপ আলোচনা হইবার সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু ঠিক তাহার পর দিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাক গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মহম্মদের সহিত সামরিক সাক্ষাৎ এবং ঘাঁটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই—অর্থাৎ, আলোচনা যে হইয়াছিল প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ১৫ই নবেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নেহরু পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং যুদ্ধ-ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে বিবরণ মন্তব্য করিলে তাহার উত্তরে পাক গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, পশ্চিম নেহরু সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই মন্তব্য করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের উক্ত স্বীকৃতির পর গোলাম মহম্মদের বৈদ্যোক্তির অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। ২৯শে নবেম্বর করাচীতে মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি ইমামুল হক সেলারও বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দানের পথে কোন বাধা নাই।

ভারতীয় জনসাধারণ দলমত-নির্বিশেষে এই প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। পাকিস্থানের প্রগতিশীল দলগুলিও এই চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন। এই চুক্তি কার্যকরী হইলে 'ঠাণ্ডা লড়াই' ভারতের দয়াজয় আসিয়া উপস্থিত হইবে, কলে ভারতের স্বাধীনতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি ব্যাহত হইবে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ভারতকে জড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং ভারতবর্ষ আণবিক বোমার অবশ্রাব্যী লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হইবে; কারণ পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি

করার অন্ততম লক্ষ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতি-রক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা; এই সকল ঘাঁটি হইতে সোভিয়েটের বিভিন্ন সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে আক্রমণ চালান খুবই সহজ হইবে। স্বভাবতঃই যুদ্ধ বংশিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বপ্রথম এই ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে এবং সল্লিকটবর্তী ভারতবর্ষকে আরও রাখিবার জন্য কোন পক্ষই চেষ্টা করিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সামরিক সাহায্য দানদ্বারা পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তোলাব মধ্যে আর এক বিপজ্জনক ইঙ্গিত যথিয়াছে। পাকিস্থানী শংসকবর্গের এক অংশ প্রায়ই ভারতের বিরুদ্ধে বেরুপ জেহাদী ভিগীর তোলে। এবং কান্দীয়ে যাত্রার প্রথম আশ্রয় আমরা লাভ করিয়াছি, মার্কিন সাহায্যে পুষ্ট পাকিস্থানী সামরিক মহলের আচরণ তদপেক্ষা অনেক বেশী ভয়ঙ্কর হইয়াছে। ফলে আশ্রয়কার ভয় ভাবতকৈও সৈন্যগণ্যে বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহার ভয় অধিকতর বায় প্রয়োজন হওয়ায় বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করিলে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি স্থগিত রাখিতে হইবে। বিদেশী সাহায্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাতীত পাওয়া সহজ নহে। তাহাদের নিকট সাহায্য চাহিলেই সেই স্বযোগে ভারতের উপরও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অস্বাভাবিকতার ভয় চাপ পড়িবে এবং ভারতের নিরপেক্ষতা ব্যাহত হইবে। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে কান্দীয়ে সম্পর্কে তাহাদের সমাধান ভারতের উপর চাপাটয়া দিবারও চেষ্টা চলিবে।

স্বভাবতঃই ভারত-সরকার দৃঢ়তার সহিত এই চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন, আফগানিস্তান, চীনা গণ-তান্ত্রিক সরকার এবং নেপাল সরকারও এই প্রস্তাবিত চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মার্কিন সরকার পাকিস্থানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন। ১৩ই নবেম্বর নয়া দিল্লীতে অল্পকিছু এক সম্মেলন সভার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ জর্জ এলেন বলেন, তিনি স্বরণ করাইয়া দিতে চান যে, কোন দুই দেশ চুক্তিবদ্ধ হইতে চাহিলে তৃতীয় রাষ্ট্রের তাহা বানচাল করিয়া দিবার অধিকার থাকিতে পারে না। সামরিক সাহায্যপুষ্ট পাকিস্থানী বাহিনী কর্তৃক কান্দীয়ে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনার ভারতের উদ্বেগ তিনি বর্ণিত করেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই বিচারে পাকিস্থানের ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে বলিয়া মিঃ এলেন বলেন।

### মার্কিন সহসভাপতির ভারত সফর

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহ-সভাপতি মিঃ রিচার্ড নিম্মন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরের পর ভারত সফরে আসিয়াছিলেন। এই সফর নানা দিক হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত মে মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডালেসের সফর হইতে আরম্ভ করিয়া ডেমোক্রেটিক

নেতা এডলাই ষ্টিভেনসন, সিনেটর নোলাও প্রভৃতির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরের পর এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম মার্কিন সহ-সভাপতির ভ্রমণের গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহার ভ্রমণের তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়—তদুপরি ফরমোজা, ইন্দোচীন, কোরিয়া এবং জাপানে মিঃ নিম্মন যে সকল বিরূতি দিয়াছেন তাহাতে তাহার মনোভাব এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে, বাহার সর্বশেষ প্রকাশ পাইয়াছে পাকিস্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টায়। কান্দীয়েকৈও কুক্ষিগত করিবার অসুবিধা প্রচেষ্টা সৌভাগ্যক্রমে সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় তাহা বিফল হয়। ভারতে মিঃ নিম্মন সৌভাগ্য দেপাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা যে নিতান্তই বাহ্যিক ভারতের বাহিরে গিয়াই তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পাক-ভারত মনোমালিন্য জীয়াটয়া রাখিবার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে বিগত ৭ই ডিসেম্বর করাচীতে শ্রমিকদের সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, “বিরোধী শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর বিরুদ্ধে” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে রক্ষা করিবে। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই পাকিস্থানের পার্শ্বে থাকিবে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। কোন বিরোধী শক্তির ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী পাকিস্থানের নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। বহু-আলোচিত পাক-মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে দৈর্ঘ্যে এই উক্তির তাৎপর্য্য সম্পর্কে ভুল হইবার অবকাশ খুব কমই আছে।

### ভারতীয় জন-পরিস্থিতি

ভারতবর্ষে পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক বাস করে। এই জনসংখ্যা গণনা করা, তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাপ্তা করা প্রমথসাধ্য ব্যাপার। প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই কার্য সম্পন্ন করা প্রশংসার যোগ্য। স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনার অর্থনৈতিক ব্যাপ্তা সাধাবৎতঃই প্রধান স্থান পাইয়াছে।

১৯৫১ সনের জনগণনার ভারতের জনসংখ্যা মোট ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ হইয়াছে (জম্মু ও কাশ্মীর বাতীত)। ইহার মধ্যে ২৯'৫০ কোটি লোক ৫৫৮,০৮৯ গ্রামে বাস করে এবং বাকি লোক ৩০'৮ শতকে বাস করে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা লইয়া ভারতের জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮'১৩ লক্ষে। গত পঞ্চাশ বৎসরে—১৯০০ সন হইতে ১৯৫০ সন পর্যন্ত ভারতীয় জনসংখ্যা ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩৫.৬৮ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা ১৬০'৮০ কোটি হইতে প্রায় ২৩৯ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিংশ শতকে মাত্র একবার ভারতের জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯১১ সন হইতে ১৯২১ সনে ভারতীয় জনসংখ্যা ৯০ লক্ষ হ্রাস পায় এবং ১৯২১ সনে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪'৮১ কোটিতে। ১৯২১ সন হইতে ক্রমবর্ধিত হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

পাইয়াছে। ১৯৩১ সনে লোকসংখ্যা ছিল ২৭'৫৫ কোটি, অর্থাৎ, ২'৭৪ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছিল; ১৯৩১-৪১ সনে ৩'৭৩ কোটি বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪১ সনে লোকসংখ্যা ছিল ৩১'২৮ কোটি। ১৯৪১-৫১ সনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪'৪১ কোটি। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ক্রমবর্ধিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই বিপুল লোকসংখ্যার পাক্ত-সংস্থান কিরূপে হয়? মোট জন-সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম, অর্থাৎ ১০'৪৪ কোটি কোনরূপে নিজেদের গ্রামাচ্ছাদন করিতে পারে, ইহাদের ধরা হয় স্বাবলম্বী হিসাবে। ৩'৭৯ কোটি লোক আংশিকভাবে নিজেদের গ্রামাচ্ছাদন করে। ২১'৪৩ কোটি লোক নিজেরা কোনও কাজ করে না এবং গ্রামাচ্ছাদনের জন্ত সম্পূর্ণরূপে পরের উপর নির্ভরশীল। যে দেশের প্রায় তিন ভাগ অধিবাসী বেকার এবং পরনির্ভরশীল, ইহা খুবই স্বাভাবিক যে সে দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৪'৯১ কোটি লোক চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে ৭'১০ কোটি লোক চাষী স্বাবলম্বী, ১৪'৬৯ কোটি কৃষক পরনির্ভরশীল এবং ৩'১১ কোটি আংশিকভাবে নিজেদের জীবিকানির্ভর করে।

যে ৭'১০ কোটি লোক চাষবাস দ্বারা জীবিকা-নির্ভর করে, তাহাদের মধ্যে ১৬ লক্ষ লোক জমিদারশ্রেণীভুক্ত। ইহারা নিজ-হাতে চাষ করে না। বাকি কৃষিকারীদের মধ্যে ৪'৫৭ কোটি লোক নিজেদের জমি চাষ করে; ৮৮ লক্ষ লোক অপরের জমি চাষ করে এবং প্রায় ১'৪৯ কোটি লোক কৃষি-মজুর মাত্র। ভূস্বামী কৃষকের সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে ভূমিহীন কৃষক। ভূস্বামী কৃষকের সংখ্যা (৪'৫৭ কোটি) অত্যধিক হওয়ার ভারতবর্ষে সমসার-কৃষি বর্ধিত হয় নাই।

এদেশে ভূমির উপর নির্ভরশীলতা অত্যধিক। ৩৫'৬৯ কোটি লোকের জন্ত মোট ৭,৫৩২ লক্ষ একর জমি আছে, অর্থাৎ মাথাপিছু গড়পড়তার ২'১১ একর জমি পড়ে। মোট ভূমির বৃহৎ অংশ পাহাড়-পর্বত দ্বারা আবৃত এবং মোট ৪,৯৯৭ লক্ষ একর জমি চাষের উপযোগী।

১০'৭৫ কোটি লোক শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ভর করে, ইহাদের মধ্যে ৩'৩৪ কোটি স্বাবলম্বী, ৬'৭৩ কোটি পরের উপর নির্ভরশীল এবং ৬৮ লক্ষ আংশিকভাবে নিজেদের গ্রামাচ্ছাদন করে। ৩'৩৪ কোটি স্বাবলম্বীর মধ্যে ১১ লক্ষ মালিক, ৫৯ লক্ষ ব্যবসায় নিয়োজিত, ৫৫ লক্ষ বিভিন্ন শিল্পে কার্য করে এবং ৩২ লক্ষ শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যে নিয়োজিত।

### স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও জীবনধারণের মান

উইলফ্রেড ওয়েলক্ "হরিজন পত্রিকা"র লিখিতেছেন, "শিল্প-সম্মিলিত কৃষি আশ্রয়ে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে বতব্বর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সহিত সমগ্র সমাজের কল্যাণের ও সুখের সামঞ্জস্য করা করিয়া যদি অর্থনৈতিক

কাঠামো সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে তাহা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি-সম্ভব, স্থিতিমূলক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা হইবে।"

স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্থানীয় অর্থনীতি জীবনধারণের মান অবনমিত করিবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওয়েলক্ লিখিতেছেন, "প্রথমে হয়ত কিছু করিতে পারে, খুব সম্ভব তাহাও করিবে না, কিন্তু পরে সর্বদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে ব্যয়ের মাত্রা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। জাতীয় অর্থনীতির স্থানে স্থানীয় অর্থনীতি কায়ম করিলে দেখা যাইবে এক, দুই, এমনকি, কোথাও কোথাও তিন স্থলে মধ্যবর্তী মুনাফাগোলের পালা শেষ হইয়াছে।"

এইরূপ অর্থনীতিতে বহুদূরে মাল প্রেরণের ব্যয়ও অনেক বাঁচিবে। বর্তমান ব্যবস্থার দ্রব্য বহু দূরে প্রেরিত হইয়া শুদামজাত হয় এবং সেখান হইতে অন্তর্য রপ্তানী হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম স্থানেই পুনরায় ঐ সকল দ্রব্য চালান আসে। ওয়েলক্ সাহেবের কথায় "মুণ্ডাভাপুর্ন এই কর্মপদ্ধতি বন্ধ করিলে দুই বায়ের আনয়ন-প্রেরণের ব্যয় এবং এক অথবা দুই বার মুনাফা প্রদান বন্ধ করা যায়।" বৃহদাকার বস্ত্র-শিল্পের স্থলে কুটার-শিল্প প্রবর্তিত হইলে 'গুভারভেড' খরচও অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

বস্ত্র-শিল্পের পরিমাণগত উৎপাদনের পরিবর্তে হস্ত-শিল্পের গুণগত উৎপাদনের দ্বারা হয়ত সর্বাধিক "পরিশ্রম বাঁচান যায়, ইহা দ্বারা ব্যক্তিগত রুচি ও বিচার-বুদ্ধিকে উদ্ভুদ্ধ করা যায় এবং জনসাধারণের মনের উপর কাশনের যে প্রভাব রচিয়াছে তাহা হ্রাস করা যায়। স্বজনশক্তির সাধনা দ্বারা কুটার-শিল্প ও হস্ত-শিল্পকে প্রভূত পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করা যায়, অতিরিক্ত ব্যয়ের অভাব ও কাঁচা টাকার প্রভাব হইতে জনসাধারণকে সরাইয়া আনা যায়। কাশনের গোলামি ও অন্তত সঙ্গ হইতে রেহাই পাওয়া যায়। স্থানীয় জীবনব্যক্তি-পদ্ধতিতে উন্নতি আনয়নের প্রচেষ্টা দ্বারা এই সকল সম্ভব পুষ্টিলাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিক দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতাকে সীমাবদ্ধ রাখে। কলে কলকারখানা পুরাদমে চালাইবার দরকার হয় না। ইহার ফলে বর্ষে পরিশ্রম ও পরস্যা বাঁচিয়া যাইবে।"

হস্তশিল্পের অর্থনীতিতে উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী হইলেও সেই ব্যয়ের সার্থকতা আছে, কারণ তাহা অপরের মুনাফা-বৃদ্ধির কারণ হয় না। উৎপাদন করা হয় ব্যবহারের জন্ত, ব্যবসায়ের জন্ত নহে। উপরন্তু হস্ত-শিল্পে প্রযুক্ত দ্রব্যাদির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। "সুতরাং শেষ পর্যন্ত দেখা যায়—সমর, পরিশ্রম, সামগ্রী, সঙ্কট ও অর্থ সকল দিক হইতেই এই ব্যবস্থার হিসাবের খাতায় জমার দিকেই বেশী পড়িবে। দেখা যাইতেছে, অল্প কিস্তি উত্তম সামগ্রী ব্যবহার করাই বৃদ্ধিমানের অর্থনীতি।"

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যের অগ্রগতি

"ভিজিল" পত্রিকার এই ডিসেম্বর সংখ্যার 'জৈনিক গ্রামকর্মী' একটি স্বাভাবিক সমাজ-উন্নয়নমূলক দুইটি কেন্দ্র পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা

বিবৃত্ত করিয়া লিপিতেছেন যে, প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টিতে যে ক্রটি ধরা পড়িয়াছে তাগা হইতেছে একটি সুপরিকল্পিত কর্তৃপক্ষত্বের অভাব। তিনি লিপিতেছেন, মোটামুটিভাবে দুইভাবে কার্যে অগ্রসর হওয়া চলে—প্রথমতঃ ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে সাধারণকে স্বমতে আনয়ন করিয়া কর্ত্তে উদ্বুদ্ধ করা চলে। অবশ্য ইহাতে কষ্টের গতি মধুর হইয়া পড়ে; কিন্তু এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে শুদ্বপ্রসারী ফল লাভ করা যায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে যে, সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে তাহার একটি বিশেষ অত্যাৱশ্যক স্থান আছে; ফলে প্রত্যেকের মধ্যেই কষ্টের প্রেৰণা জাগে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কাজের মধুর-গতিতে নরাদিপ্লীর কষ্টাদের চিত্তবিক্ষোভ ঘটে এবং তাহার ফলে স্থানীয় কর্ম্মীদের উৎসাহে ভাটা পড়ে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আদেশ জারী করিয়া কর্ত্তসমাধার চেষ্টা হওয়ার তাহাতে একনায়কত্বের ছাপ আসিয়া পড়ে। উপরওয়াল আদেশ করেন—নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। অবস্তুত কর্ম্মচারী অলস প্রকৃতির হইলে তাহার তাতাদের বিভাগীয় রিপোর্টে কোন কিছু তদন্ত না করিয়াই নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানাইয়া দেয়। লেখক এক স্থানে এইরূপ একটি কাহিনী শুনিয়াছেন যে, নথিপত্রে কর্ত্তসম্পাদনার রিপোর্ট পাইবার পর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অকুস্থল পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখেন যে, কোন কাজই করা হয় নাই। লেখকের অভিমতে যদি সমাজ-উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করাকে বার্ষ্য করিতে না হয় তবে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হুকুম জারীর অভ্যাস তাগ করিয়া জনসাধারণের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করিতে তৎপর হইতে হইবে।

পরিকল্পনা-বাবস্থার যে দ্বিতীয় ক্রটি তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে তাগা হইতেছে এই যে, জনসাধারণকে সমাজ-উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার উপযোগী কোন সংস্থা সরকারী বিভাগে নাই। সমাজ-শিক্ষার ভার যাহাদের উপর লুপ্ত আছে, তাহাদের অধিকাংশই বিভাগায়ের শিক্ষক অথবা অনভিজ্ঞ তরুণ লোক। ইহাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং কল্পনা-শক্তির বর্ষণে অভাব আছে এবং কৃষক জনসাধারণের নাড়ীর স্পন্দন ইহার বৃষ্টিতে অক্ষম। এই ব্যাপারে গান্ধীজীর অমুগামী গঠনমূলক কর্ম্মারা কলপ্রস্থ অনেক সাহায্য করিতে পারেন বলিয়া লেখকের বিশ্বাস।

পরিকল্পনা-বাবস্থার তৃতীয় ক্রটি হইতেছে—ব্যৱাধিক্য। লেখকের মতে উচ্চতর কর্ত্তচারীদের বেতন হ্রাসের মাধ্যমে প্রভূত পরিমাণে ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব।

### ত্রিপুরায় পাট-উৎপাদনকারীদের সঙ্কট

“সেবক” পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরে পাট-উৎপাদনকারীরা এক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন। দেশ

বিভাগের পরে পাকিস্তান হইতে কলিকাতার পাট প্রেরণ বন্ধ হইলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ত্রিপুরার কৃষকদের নানা প্রলোভনে পাট চাষে উৎসাহিত করে এবং কৃষকেবাও লক্ষ লক্ষ টাকা দানন পাইয়া অধিক পরিমাণে পাট চাষ করিতে মনোবোগী হয়। উক্ত সংবাদে প্রকাশ, “চলিত বৎসরে বড় বড় ব্যবসায়ীরা অসঙ্গত বৎসরেব তুলনায় অনেক কম টাকা দানন করিয়াছে। টাকা দানন ও পাট খরিদ সাধারণতঃ মজুতদারেরা তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে করিত, কিন্তু চলিত বৎসরে তাহারা এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজেরাই ব্যবসার কৃষকদের সঙ্গে লেনদেন করিতেছে। কলিকাতার বাজারে ত্রিপুরার পাটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বড় বড় মজুতদারেরা পাট খরিদ করার বিশেষ আশ্রয় দেখাইতেছে না বলিয়া পাট উৎপাদনকারী কৃষক তাগার ঈশ্পিত দর যেমন পাইতেছে না তেমন প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাট বিক্রীও করিতে পারিতেছে না।”

### ধাতু-চাষীর নূতন বিপদ

১৮ই অগ্রহায়ণের “দামোদর” পত্রিকা উক্ত শিরোনামার এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিপিতেছেন যে, এ বৎসর ধাতু কলস ভাল হইলেও চাষীদের সম্মুখে ধাতুর পড়ন্ত-মূল্যের এক বিভীষিকা দেখা দিয়াছে। এ বৎসর পাট-চাষ না করার অধিকাংশ চাষীর হাতেই কোন অর্থ নাই; উপরন্তু তাহাদের দেনার পরিমাণ ক্রমবর্ধমান গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শস্ত-কাটার সময় এই সকল লুপ্ত পরি-শোধ এবং অসঙ্গত অত্যাৱশ্যক জ্রাবাদি ক্রয়ের জন্য ধাতু-চাষীর অর্থের নিত্যন্ত প্রয়োজন হওয়ার চাষীরা এখন ধাতু বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে; কিন্তু ধাতুর পড়ন্ত মূল্যমানেব জন্য তাহারা উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না। সরকার সাম্প্রতিক এক ঘোষণায় ধাতুর দর মণপ্রতি এক টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সরকারী নির্ধারিত মূল্যে ধাতু ক্রয়েরও কোন বাবস্থা সরকারপক্ষ করেন নাই। যদি ধাতুর মূল্যের অমুপাতে অসঙ্গত নিত্য-প্রয়োজনীয় জ্রাবের মূল্যও হ্রাস পাইত তবে অভিযোগের কোন কারণ থাকিত না; কিন্তু তাহার ত কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে না বরং বিপরীত গতিই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই ব্যাপারে সরকারী নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করিয়া “দামোদর” লিপিতেছেন : “লেভী প্রত্যাভারের সময় কেন্দ্রীয় পাণ্ড-মন্ত্রী কিদোয়াই তাঁহার বিবৃতিতে চাষীর উৎপন্ন ফসলের ব্যয়ের সমতা বক্ষা করিবার জন্য খোলা বাজারে ধাতু ক্রয় করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাগা আজও বাস্তবে পরিণত হয় নাই। আমরা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পাণ্ড-মন্ত্রীকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অমুরোধ করি।”

প্রথম দিকে লেভী বন্ধ করিবার আন্দোলন, পরে ধাতু ক্রয় করিতে তৎপর হওয়ার জন্য সরকারকে আহ্বান! এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কি ভাবে হওয়া উচিত, তাগার কোনও নির্দেশ নাই। দেশের ভূমিহীন দরিদ্র গৃহস্থের জীবনবাজায় মান কি ভাবে ধীরে নাশিত্তে পারে সে বিষয়েও কি চিন্তার অবকাশ আমাদের নাই?

## বাঁকুড়ায় টেক্সটাইল কার্ফো ছুন্নীতি

বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগোপাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র শ্রীমতাব-চন্দ্র দাস বাবগারিক শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার বিভাগ্যতনের অধ্যক্ষের অনুমোদন লইয়া ১৮।১০।৫৩ তারিখে বাঁকুড়া জেলার গজাজলঘাট থানার অন্তর্গত উপরাড্ডি-চুকুড়ী রাস্তার টেটে বিলিফকার্য পরিচালনার জন্য সরকারী বিভাগীয় অফিসার নিযুক্ত হন এবং গত ২।১১।৫৩ তারিখে কার্ফো যোগদান করেন। তাঁহার কার্যকালে যে সকল ছুন্নীতি তাঁহার গোচরে আসে, পাক্ষিক “হিন্দুবাণী” পত্রিকার ১৫ই অক্টোবর সংখ্যায় এক বিবৃতিতে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি লিপিতেছেন : “আমি কার্ফো যোগদান করিয়াই দেখিতে পাই যে আমার পূর্বতন বিভাগীয় অফিসার সম্পূর্ণরূপে অমরকাননের কংগ্রেসসেবীদের একটি বেসরকারী ছায়া পরিচালকমণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল। রাস্তায় যথারীতি পরিমাপ করা, গ্রানামাফিক কাজ হইতেছে কি না তাহা জানিবার বা তদারক করিবার কোন অধিকারই তাঁহার নাই। মুহুরীগণ এই বেসরকারী পরিচালক-চক্রের আদেশে কাজ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাও ঐ একই চক্রের অন-প্রভাঙ্গ বিশেষ। ইহাদের এইরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য হইতে আমি জানিতে পারি যে রাস্তায় সংলগ্ন স্থান হইতে ভ্রম পরিমাপ মাটি তুলিয়া ২।০ ফুট মাটি ভরাট করা হইয়াছে বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তাটি নিজেদের সুবিধাজনক স্থানের মধ্য দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া, বখা উচ্চতান দিয়া লইয়া গিয়া আড়াই ফুটের কম মাটি ফেলিয়া কৃত্রিমভাবে কাজের হিসাব দেওয়া হইতেছে।।।।

“আর এক প্রকার ছুন্নীতির বিষয় আমি জানিতে পারি। বহু জন শ্রমিক কাজ করিতেছে তাহা অপেক্ষা বেশী শ্রমিকের জাল ও মিথ্যা সংখ্যা তৈয়ার করিয়া মুহুরী ও তাহাদের বেসরকারী ছায়া পরিচালকবৃন্দ অল্প সরকারী পরয়া আত্মসাৎ করিতেছে।।।।

“১।১০।৫৩ তারিখে লীসতা সিংহ নামক জনৈক কংগ্রেসী বেসরকারী পরিদর্শক আমার নির্দিষ্ট লাইন (Alignment) সত্যায়িত নষ্ট করেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলে তিনি বলেন : “আমি এখানে সর্বেসর্বা। আমি এই রাস্তায় কাজ তদারক করিবার জন্য গোবিন্দবাবু (বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি) কর্তৃক বিশেষ পরিদর্শনকারী অফিসার নিযুক্ত হইয়াছি। আমার হুকুমমত এগানকার সমস্ত কাজ হইবে...ইত্যাদি। আমি এইরূপ অতৈতুক মন্তব্যের প্রতিবাদ করিলে স্থানীয় কংগ্রেসকর্মী শ্রীরামলোচন মুখার্জী বলেন যে, সভাবাবুর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার মত শক্তি তোমার বা তোমার উপবওয়ালারও নাই। সে মনে করিলে তোমাকে এখানে লাঠির আঘাতে শেষ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও আমাকে প্রত্যেকটি চুবি, ছুন্নীতি এবং সরকারী অর্থের অপব্যবহার নিবারণে চূড়ান্তজ্ঞ দেখিয়া স্থানীয় কংগ্রেসী মুহুরী এবং তাহাদের বেসরকারী

পরামর্শদাতারা মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে বড়বন্দ্য করেন। আমি খুব সন্তর্পণে কাজ করিতে লাগিলাম। এইরূপ পরিস্থিতিতে গত ১।১।৫৩ তারিখে বেলা একটার সময় আমি বখন আমার কার্য হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভোলানাথ সরকার নামক মুহুরীর এলেকা পার হইতেছি তখন হঠাৎ গুয়ালডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীহরধর পাল একটা টাক্সি লইয়া আমার সাইকেল আটকায় এবং ভোলানাথ সরকার (কংগ্রেসপন্থী মুহুরী) প্রায় দুই শত লোক সঙ্গে লইয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। আমার হাতে Acquittance Roll-টি দিয়া বাইশটি গ্যাং-এর স্থানে চম্পশিট গ্যাং লিখিতে বলে। অর্থাৎ, ষাট জন শ্রমিক লইয়া দুইটি ভূয়া গ্যাং কাজ করিতেছে লিখিতে বলে। আমি না লিগিলে আমাকে কাটিয়া পুঁতিয়া দিবার ভয় দেখায়। এই অবস্থায় আমি নিতান্ত বাধ্য হইয়া প্রাণভয়ে বাইশের স্থানে আরও দুইটি ভূয়া গ্যাং কাজ করিতেছে বলিয়া লিখিয়া দিই। পরে অবশ্য আমার বাসায় ফিরিয়া পে-মাষ্টারকে লিপিতভাবে উক্ত ভূয়া গ্যাং দুইটির জন্য কোন টাকা দিতে নিবেদন করি। পে-মাষ্টারের নিকট প্রেরিত উক্ত চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার-স্বলিত অহুলিপি আমার কাছে আছে। আমি এই ঘটনার বিষয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও জানাইয়াছি। এই ঘটনার পর আমি লোক-পরম্পরায় জানিতে পারি যে, আমার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। আমার পক্ষে আর কাজ করা নিরাপদ নহে জানিয়া আমি পীড়িত বলিয়া রিপোর্ট দিয়া সাইকেলবোনে ঘুরিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে বাঁকুড়া ফিরিয়া আসি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমি সমস্ত বিষয় লিখিয়া জানাই। তিনি প্রতিকারের আশ্বাস দিয়া আমাকে বিষ্ণুপুর ফুটবল গ্রাউন্ডে টেট বিলিফের কার্ফো (Assistant Sectional Officer) নিযুক্ত করেন। উপরাড্ডি-চুকুড়ী রাস্তায় যে সকল ব্যক্তি বেসরকারী পরিদর্শক ও তদারককারী গাজিয়া মুহুরীদের সহায়তা করেন তাঁহাদের সকলেই এই অফিসের কংগ্রেসকর্মী বলিয়া পরিচিত এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের দক্ষিণ হস্তবরূপ।

“শ্রীঅবনী মুখার্জী, শ্রীপঞ্চানন সর্বেন, শ্রীচন্দ্রমোহন হেমরম, শ্রীকালচাঁদ গোস্বামী, শ্রীরামলোচন মুখার্জী এবং লীসতা সিংহ প্রভৃতিকে আমি প্রত্যহ মুহুরীগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে সলাপরামর্শ করিতে দেখিয়াছি।”

আমরা গোবিন্দবাবুর নিকট হইতে এই অভিযোগের উত্তর চাহিতেছি। তিনি অবহিত হউন।

## আসামে শিক্ষকদের দাবি

গত ২১শে ও ২২শে নবেম্বর আসাম রাজ্য বিধানসভার বিরোধী-দলগণিত শ্রীহরধর গোস্বামীর সভাপতিত্বে শিলচরে নিম্নলিখিত-আসাম সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চবিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-সংস্থানের স্বাধীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতির অভিভাষণ প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীগোস্বামী দেশের ক্রম-বর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যা এবং নানাবিধ দুর্দশার কথা উল্লেখ



করিয়া বলেন যে, বর্ধমান শিক্ষাব্যবস্থার অমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁহার মতে বর্ধমানে কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, দেশের শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষকদের উপযুক্ততার উপর, কিন্তু উপযুক্ত বেতন না পাইলে শিক্ষকগণের পক্ষে বখারীতি শিক্ষাদানকার্য্য চালান অসম্ভব।

উক্ত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটিতে সরকারী হাই স্কুলের শিক্ষকদের সমপর্ধ্যায় সাহায্যপ্রাপ্ত হাই স্কুলের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধানার অঙ্গবোধ জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তিন মাসের মধ্যে সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে আগামী ১লা মার্চ হইতে শিক্ষকগণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিবেন।

সাপ্তাহিক “বৃগশক্তি” এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্মেলনের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, বর্ধমান শাসকগণ শাসনক্ষমতা হস্তগত হইবার পূর্বে সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের পার্থক্য দূরীকরণকল্পে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্তু স্বাধীনতালাভের সাত বৎসর পরেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। শিক্ষকগণ একাধিক বার তাঁহাদের দাবি সরকারের নিকট পেশ করিয়া বিফল হইয়াছেন। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার ঐ সকল বিদ্যালয়ের কিছু উপকার হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষকদের প্রধান দাবি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের তার সরকারী হাই স্কুলের সমপর্ধ্যায়ভূক্ত করা সম্পর্কে সরকার কোন “কিছু না করিয়া বারংবার শুধু “বিবেচনা করা হইতেছে” বলিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।”

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, “শিক্ষক-সম্মেলনের এবারের অঙ্গতম বৈশিষ্ট্য বিরোধী-দলপন্থিক সভাপতি মনোনয়ন। ইতিপূর্বে শুধু কংগ্রেস দলভুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই শিক্ষকসমিতি সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন। এবার তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।” শিক্ষকদের বেতনের অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, “৮০ টাকা বেতন ও ১০ টাকা মাগ্গী ভাতায় শিক্ষকতা আরম্ভ ও শেষ করিয়া এগুন কোন শিক্ষকের পক্ষে বখারীতি শিক্ষাদানকার্য্য চালাইয়া বাওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ ইহা তাঁহাদের পরিবার প্রতিপালনের নূনতম চাহিদার পক্ষেও অপ্রচুর।

“শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য আসাম তৈল কোম্পানী, চাবাগান, বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সেস ধাৰ্য্য করার যে প্রস্তাব সভাপতির ভাষণে করা হইয়াছে তাহা বিবেচনার যোগ্য। দেখা গিয়াছে, সরকারী হাই স্কুলের শিক্ষকদের সমান বেতনের হার নির্ধারণ করিলে আসামের সাহায্যপ্রাপ্ত হাই স্কুলসমূহের জন্য ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। উপরি-উক্ত উপায়ে তাহার অনেকটা সংগ্রহ করা বাইতে পারে।”

### ত্রিপুরায় শক্তিশালী রেডিও স্থাপন

আগরতলা হইতে নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা “সেবক”

সংবাদ দিতেছেন যে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আগরতলায় “ওয়েষ্টার্ন ইলেকট্রিক রেডিও টারমিনাল” নামক শক্তিশালী একটি বেতার-স্টেট বসান হইবে। বিশেষ ভাবে ত্রিপুরার ভক্তই সরকার আমেরিকা হইতে মেশিনটি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সংবাদ অনুযায়ী জানা যায় আসাম সার্কেলের টেলিগ্রাফ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বিলোনীয়া ও উদয়পুরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এবং ধনুসমাস ও কৈলাসমাসে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভনসাধারণ বেতাবে তার প্রেরণ করিতে পারিবেন। সোনামুড়া, সাজম, খোয়াই, কমলপুর ও অমরপুরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বেতার ষ্টেশন বসিবে। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, এই প্রকার রেডিও-যোগে তার প্রেরণ ব্যবস্থা ভারতে এই সর্বপ্রথম করা হইতেছে। তিনি আরও জানান, ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে স্থলপথে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করিয়া ত্রিপুরার সমস্ত বিভাগীয় প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে। তার বিভাগের স্যাসদেব্রাম ত্রিপুরার আমলানী করার অঙ্গবিধার ভক্তই তার বিভাগের সম্প্রদায়ের বিলম্ব হইতেছে।

### বর্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ

“বর্ধমান বাণী”র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনাব আবহুস সাতার লিখিতেছেন, ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়াছেন। ভোর কমিটি স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করিবার যে সুপারিশ করিয়াছেন তদনুযায়ী কলিকাতার মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে কলেজে পরিণত করা হইলেও বাঁকুড়া, বর্ধমান ও জলপাইগুড়িতে অবস্থিত মঞ্চগুলির তিনটি স্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার কোন পদিকল্পনা সরকারে নাই।

জনাব সাতার লিখিতেছেন: “বর্ধমানে একটি মেডিক্যাল কলেজের প্রয়োজন আছে এবং কলিকাতার ভীড় কমাইতে হইলে মঞ্চগুলির ঐ তিনটি মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে পরিণত করা আবশ্যক এবিষয়ে ভিন্ন মত নাই। সরকার পক্ষও ইহা স্বীকার করেন না।” জলপাইগুড়ি এবং বাঁকুড়ার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিজ নিজ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। বর্ধমানেও অনুরূপ দাবি উঠিয়াছে। ইহার উত্তরে সরকার পক্ষ অর্থের অভাবের কথা বলিয়া নিজেদের অক্ষমতা প্রদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বায় এক প্রস্তাব উত্তরে বলেন যে, প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলেই বর্ধমানে কলেজ স্থাপন করা হইবে এবং ইতিমধ্যে বাহাতে মেডিক্যাল স্কুলের সুযোগ-সুবিধা বিফলে না বার সেজন্য বর্ধমানে একটি নার্স-শিক্ষায়তন খোলা হইবে।

জনাব সাতার লিখিতেছেন, শোনা যায় যে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিলে নাকি কলেজের কাজ আরম্ভ হইতে পারে। “বর্ধমান একটি বড় জেলা, অধিবাসীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষের অধিক। বহু শিল্প ও শিল্পপতি এই জেলায় আছেন।



প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী গৃহস্থের সংখ্যাও জেলায় কম নহে। রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিয়া যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে এই দশ লক্ষ টাকা বর্ধমান জেলাবাসীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না বলিয়া মনে করি।”

### “হরিজন” সাপ্তাহিকের প্রচারসংখ্যা

১৪ই নবেম্বরের “হরিজন” পত্রিকায় নবজীবন ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাষ্টি জীববজী দয়্যভাই দেশাই লিখিতেছেন, গান্ধীজীর মহা-প্রয়াণের পর “হরিজন” সাপ্তাহিকগুলি কিছুদিন বন্ধ রাখা হইয়াছিল; ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে পত্রিকাগুলি পুনঃপ্রকাশিত হয়। তদবধি বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যা নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল :

তারিখ	ইংরেজী	গুজরাটি	হিন্দী	বাংলা
	হরিজন	হরিজন বন্ধু	হরিজনসেবক	হরিজন পত্রিকা
৪-৪-৪৮	২,৪৫১	২,১০০	৪,১১৭	১৬০০
১-২-৫২	২,৮৪০	৩,৮২০	২,২৭০	৬০২
১৩-২-৫২	৪,৪৭৫	৭,৪০৮	৬,০২৪	৫৫১
১-৩-৫৩	৩,৩৭৫	৫,৪৪১	৫,৩৮৫	৬০৪
১-২-৫৩	৩,১৫০	৪,১১৭	৩,৬২০	৫৮২

সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে, গত ৬৭৭ মাসে পত্রিকাগুলির গ্রাহকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

ঐশ্বর্যশ্রী লিখিতেছেন, “পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ট্রাষ্টকে ক্রমেই বেশী ক্ষতি সহিতে হইতেছে। গুজরাটি অপেক্ষা হিন্দী ও ইংরেজী সংস্করণের গ্রাহকসংখ্যা কম, ইংরেজীর গ্রাহকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম (বাংলা ব্যতীত)। গ্রাহকসংখ্যা না বাড়িলে সাপ্তাহিকগুলি আর চালাইতে পারা যাইবে কি না ট্রাষ্টকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইংরেজীর গ্রাহকসংখ্যা প্রয়োজনীয় রূপে বাড়িলে অথবা হিন্দী ও গুজরাটীর সংখ্যা উহার পরিপূরকরূপে বর্ধিত বাড়িয়া গেলে সফট কাটাওয়া উঠা যায়।”

বাংলা পত্রিকার পরিচালক শ্রীমধীরচন্দ্র লাহাও অল্পরূপ মন্তব্য করিয়া গ্রাহকসংখ্যাবৃদ্ধির আবেদন করিয়াছেন।

### কেনিয়ায় শ্বেত বর্বরতা

কেনিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার যে নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছে তাহার তুলনা মেলা ভার। এই অমানুষিকতা এতই প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে যে, যেতাব্দেদের ভারতীয় মুখপত্র “ট্রেটসম্যান” পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়াছে। কলিত মাউ মাউ সম্রাসবাদেদের ধূরা তুলিয়া কেনিয়ার খেতাব শাসকগোষ্ঠী নিরস্ত্র কিকিউবাসীকে কুকুয়ের মত গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে, আবালাবুদ্ধবানতা নির্মিশেষে কিকিউরা লিঙ্কন বোমারু-বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত হাজার পাউণ্ডের ওজনের বোমা ও মেশিনগানের গুলিতে মরিতেছে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে কেনিয়া বিধান সভার ইউরোপীয় বসন্তিকারীদের প্রতিনিধি মিঃ ওয়েলউডকে বলিতে শোনা যাইতেছে,

“যদি আমরা অধিকতর সংখ্যার ইউরোপীয় আগমনকারীদের প্রবেশের অস্বস্তি না দিই তবে আফ্রিকাবাসীদের উন্নততর জীবনযাত্রার পৌছাইবার আশা অল্প।”

কিন্তুপভাবে আফ্রিকাবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার জন্য খেতাব-প্রভূরা চেষ্টা করিতেছেন নাইরোবীতে সাময়িক আদালতে ক্যাপ্টেন ডি. এস. এল. গ্রিক্স-এর বিচারের সময় প্রকাশিত তথ্য হইতে তাহার কিছু নমুনা দিলিবে। গ্রিক্সসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, উক্ত কর্মচারী দুই জন রাজভক্ত আফ্রিকাবাসীকে ব্রেণগান দ্বারা পিছন হইতে গুলি করিয়া হত্যা করে। বলা হইয়াছে যে, গ্রিক্সস নাকি সার্জেন্ট মেজর লেওয়েলিনকে বলিয়াছিল যে, সে যাহাকে খুঁজি গুলি করিতে পারে—কালো আদমী হইলেই হইল। বিচারের বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীতে নিহতদের একটি তালিকা রাখা হয় এবং নিরস্ত্র আফ্রিকাবাসীকে হত্যা করিবার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যেক নিহত কিকিউর মাথাপিছু হত্যাকারীকে পাঁচ হইতে দশ শিলিং দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, বিচারে ক্যাপ্টেন গ্রিক্সস বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

এই নগ্ন বীভৎসতার সংবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরকার পক্ষকে প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ হোড বলেন যে, সরকার সাময়িক আদালতে গ্রিক্সসের বিচার সম্পর্কীয় সকল নথিপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই আশ্বাস দেন যে যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে কেনিয়াতে ব্রিটিশবাহিনী কিকিউদের প্রতি ব্যাপকভাবে অত্যাচার করিয়াছে তাহা হইলে সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করা হইবে।

মিঃ হোডের এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ২২৭ ডিসেম্বর কেনিয়া সরকার ঘোষণা করেন যে, কিকিউদের প্রতি নির্ভর আচরণের জন্য দণ্ডিত ১২ বৎসর বয়স্ক ত্রিয়ার ওয়াণ্টার হেওয়ার্ডকে অস্থায়ী জেলাশাসকের পদে পুনরায় বহাল করা হইবে। কেনিয়া বিধানসভার প্রধান নেতিভ কমিশনার মিঃ ডেভিস বলেন যে, হেওয়ার্ড অল্পবয়স্ক হইলেও তাহার কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হেওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে জানা যায়, হেওয়ার্ড যে দলের নেতৃত্ব করিতেছিল তাহার উক্ত টাঙ্গানিকার চরমবঙ্ক দ্বারা কিকিউদের গলা বাঁধিয়া সিগারেটের আগুন দিয়া ঐ সকল নিরীহ আফ্রিকাবাসীর কর্ণপট পোড়াইয়া দিত। প্রধান কমিশনার ডেভিসের মতে টাঙ্গানিকার সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে উপযুক্ত তদন্তবধানের অভাব এই অমানুষিক বর্বরতার জন্য দায়ী। কিন্তু বাহাদেব অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি যদি এইরূপ কোমল ব্যবহার করা হয় তবে যে কল্পে এইপ্রকার বর্বরতা বন্ধ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রী কর্তৃক সরকারী তদন্তের আশ্বাসের মূল্যই বা কি সে বিষয়ে বর্ধিত সন্দেহ থাকিয়া যায়।

## শাহজাদা দারাগু কো

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কামুনগো

পলায়নের পথে কুমার সুলেমান ও দার।

১

পুত্র সুলেমানের আশায় দার। যখন লাহোরে বসিয়া দিন গণিতেছিলেন তখন সংবাদ পৌছিল শতদ্রু নদীর অপার পারে পৌছিয়া আওরঙ্গজেবের সেনাপক্ষ বাহাদুর খাঁ ছাউনী ফেলিয়াছে, দিল্লী হইতে নূতন সম্রাট গাজী আলমগীর বাদশাহের নবনির্মিত নৌবহর গুরু গাড়ীতে বাদশাহী রাস্তা ধরিয়া লুধিয়ানা অতিক্রম করিয়াছে, কোন্ ঘাটে শতদ্রু জলে ভাসিবে ঠিক নাই। দারার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, অগচ সুলেমানের কোন খবর নাই। বাঁহান বুদ্ধি ও পোরসের দাপটে ডাক্তার নৌকা চলে তাঁহার সহিত স্বয়ং খোদাতালা আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, সূতরাং দারার ভরসা কোথায়? যে সমস্ত সেনাপক্ষকে তিনি বাক্সিগত চরিত্রমার্গা, অহুজ ও দান দ্বারা আপন করিয়া লইয়া ছিলেন, গাঁহারা বহুদিন একনিষ্ঠভাবে তাঁহার সেবা করিয়া ছিলেন তাঁহাদের অর্দ্ধাংশ কুমার সুলেমানের সহিত শুজার বিক্রমে প্রেরিত হইয়াছিল, অর্দ্ধাংশ মাদুগড় ও পদ্মাতের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, না হয় বিপাকে কিংবা সোভে পড়িয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, প্রথম শ্রেণীর কোন মনসবদার লাহোর পর্যন্ত অঙ্গুগমন করেন নাই। পুরাতন বিশ্বস্ত মোসাহেবগণের মধ্যে ভোপখানার অধ্যক্ষ জাফর (উপাধি বরকান্দা খাঁ) ব্যতীত কেহ আসে নাই, ফিরঙ্গী গোলন্দাজগণ স্বেচ্ছায় বিপদ মাথায় লইয়া শুধু প্রাণের টানে ছুই একজন করিয়া লাহোরে আসিতেছিল। উল্লেখযোগ্য সেনানায়কগণের মধ্যে ফিরোজ মেবাতী (বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী সুবিখ্যাত মেবাত বা বস্তমান আলোয়ার রাজ্যের অধিপতি হোসেন খাঁ মেবাতীর বংশধর) দারার পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার শেষযাত্রার সার্থী হইয়াছিলেন। সুলেমানের সহিত প্রেরিত মনসবদারগণের মধ্যে একমাত্র দায়ুদ খাঁ কোরেশী কোনক্রমে কৌশল ও দূতত্ব সহিত বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া জঙ্গলী রাস্তায় কোনক্রমে লাহোর পর্যন্ত পৌছিতে পারিয়াছিলেন। এই সঙ্কটে শতদ্রু ও বিপাশার (বিয়াস নদী) তীর বরাবর ঘাটসমূহ পক্ষ করিবার জন্য দার। দায়ুদ খাঁকে প্রধান সেনাপতিরূপে কয়েক হাজার অস্বারোহী ও হাঙ্গা ভোপখানাসহ লাহোর হইতে ঐ দিকে প্রেরণ করিলেন।

দায়ুদ খাঁ দুবর্ষী বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ বোদ্ধা। বিপাশার

উজানে, সুলতানপুর\* পর্যন্ত পারাপারের সমস্ত ঘাটের বলবদ্ধি করিয়া তিনি শতদ্রু দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং অশস্ত্র সেনাযুগ্মপক্ষে বড়ো হুকুম দিলেন তাঁহার হুকুম-নাম' ব্যতীত পরিচিত অপরিচিত কাহাকেও যেন লাহোরে দিকে যাঁহুতে দেওয়া না হয়। এই সময়ে যুবক বোদ্ধা মাহুদী সাহেব কখনও ফকীর, কখনও আমীর সাক্ষিয়া শত্রু চোখে ধুলা দিয়া দিল্লী হইতে বিপাশার তীর পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এই স্থানে দায়ুদ খাঁর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার ষড়ে প্রাণ আসিল। অতঃপর এক ফৌজ লাহোরের ফৌজদার বায়েরত খাঁর (উপাধি ইজ্জত খাঁ) এবং মুসায়েব বেগের অধীনে শতদ্রু পারে রূপার শহরের (আখালা হইতে ৪০ মাইল উত্তরে) দিক হইতে নদী পারের ঘাট রক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। লাহোরের সোজা রাস্তা ছাড়িয়া এই স্থানে দিল্লী হইতে আগুয়ান কোন ফৌজের নদী অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা কম; এই জন্য এইখানে দার। সেনাপতিত্ব সর্বদা কোমরপেটি কষিয়া থাকা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি কিন্তু রূপার উপর নিবদ্ধ ছিল; কেনন। সুলেমান কোন প্রকারে গঙ্গা যমুনার দোয়াব অতিক্রম করিতে পারিলে শতদ্রু নদী পার ওত্তরাং ইহাই নিকটতম ব্যবহারযোগ্য ঘাট। লাহোরদানী সর্বোৎকৃষ্ট কম দূরের রাস্তার মুখে নদীর অপার পারে দার। প্রধান ঘাট তলোয়ান নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, এই পারে দক্ষিণে প্রসিদ্ধ শিবযুদ্ধক্ষেত্র আপিন্ডওয়াল, উত্তরে মধ্যে দূরত্ব ৮০ মাইল; রূপার হইতে তলোয়ান ষাট মাইল ভাটিতে পশ্চিম দিকে; ছই স্থান হইতে প্রায় সমান দূরে মগধান্তী স্থানে লুধিয়ানা ও মাচিওয়ার। চম্বলের পারে আওরঙ্গজেবের হাতে ইকিয়া দার।র বুদ্ধি কিঞ্চিৎ খুলিয়াছিল, তাহা না হইলে শতদ্রুনদীর পারে বাহাদুর খাঁর মত আওরঙ্গজেবের অগ্নিবর্ষী সেনাপক্ষের সাময়িক কাল বিব্রত হইবার কথা নয়।

২

আওরঙ্গজেব মথুরার নিকট হইতে ২১শে জুন (১৬৫৮ খ্রিঃ) বাহাদুর খাঁর অধীনে পাঁচ-ছয় হাজার অস্বারোহী এক অগ্রগামী ফৌজ দার।র পশ্চাদ্ভাবন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে দার।কে ধরিতে না পারিয়া বাহাদুর

\* লুধিয়ানা হইতে তিন ঘণ্টার রাত্তা বিপাশা নদীর পাঁচ মাইল দক্ষিণে বস্তমান গোদী সুলতানপুর গ্রাম।

খ। দ্রুত শতদ্রু নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শতদ্রুপারে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন এই পারে ৫০।৬০ মাইলের মধ্যে একখানা নৌকাও নাই; জলে এবং অপর পারে তলোয়ানে সভাগ শত্রু যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, কোথায়ও পার হওয়ার উপায় নাই এবং নূতন সৈন্য না পৌঁছাইবার পূর্বে পার হওয়াও নিরাপদ নয়। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব মেসেঃ বলিল্লার খাঁকে পঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে দ্বিতীয় সেনাবাহিনী বাহাদুর খাঁর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন; বলিল্লার রূপার গামী রাস্তা ধরিয়া আসিতেছিলেন। দারার সেনাশাফগণ তলোয়ানে শত্রুকে প্রাণপণে বাধা দেওয়ার জন্য তোড়জোড় করিতে লাগিলেন, কাচাকাচি খাতিগুলির উপরও কড়: নজর ছিল। ছলপরাণ বাহাদুর খাঁ তলোয়ানের আশ: ছাড়িয়া স্থানীয় জমিদারগণের সাহায্যে গোপনে অতিক্রম পূর্বদিকে কুচ করিয়া রূপারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং এই স্থানে দিল্লী হইতে আনীত এবং স্থানীয় লোকের দ্বারা সংগৃহীত মোট পঁচিশখানা নৌকার সাহায্যে এই আগষ্ট মাসের অষ্টম তারিখে আট শত অশ্বারোহী ও কয়েকটা হাল্ধা তোপ বিনা বাধায় নদী পার করাইয়া ফেলিলেন। অকুতোভয় শত্রুর অতিক্রম আক্রমণে দারার অসন্তক রক্ষী সেনা ভীতিবিশ্বল হইয়া আশ্রয়ার্থ তলোয়ানের দিকে পলায়ন করিল, এবং তাহাদের উপস্থিতিতে সেখানেও আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। এই দিকে বাহাদুর খাঁর বাহাদুরীর স্বর চক্ষুর ঘণ্টার মধ্যে ৬ই আগষ্ট মাসেতে খুলিল্লার শিবিরে পৌঁছিল। তিনি বাড়ির বেগে দ্বিতীয় বাহিনীসহ ৭ই আগষ্ট রূপারের ঘাটে নদী পার হইলেন।

সেনাপতি দায়ুদ খাঁ এই অবস্থায় বাহাদুর খাঁ ও বলিল্লার সম্মিলিত বাহিনীর সহিত শতদ্রুতীরে যুদ্ধ করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া সমস্ত ঘাট উঠাইয়া লইলেন এবং দ্রুত পিছু হাটিয়া বিপাশা নদীর তীরে সুলতানপুরে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। লাহোরে এই দুঃসংবাদ পাইয়া দারা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিপহর শুকোকে কয়েক হাজার অশ্বারোহী ও হাল্ধা তোপখানাসহ দায়ুদ খাঁর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি দায়ুদ খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন যেন ঐখানে শত্রুকে যথাসাধ্য বাধা দেওয়া হয়, ঐখানে আশ্রয়লাভ সম্ভব না হইলে এই পারে গোবিন্দগঞ্জ (সুলতানপুর হইতে পশ্চিম হেলিয়া ১১ মাইল উত্তরে) সরিয়া আসিয়া শত্রুকে শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে হইবে। এইখানেই দারার আর এক বার ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শতদ্রু অতিক্রম করিবার পূর্বেই আওরঙ্গজেব মিথ্যার জাল বিস্তার করিয়া সেই মঞ্চ বর্ষ করিয়া দিলেন।

৩

২১শে জুলাই (১৬৫৮ খ্রীঃ) দিল্লীতে দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিয়া রাহ-যুক্ত শূর্যের স্থায় আওরঙ্গজেব ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রকট হইলেন। ২৭শে তারিখ তিনি সসৈন্তে শতদ্রু অভিমুখে পাণিপত-আম্বালায় রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন, দিল্লী হইতে যাত্রা করিবার পূর্বেই তাঁহার ছদ্মবেশী চরগণ দারার পাহারা এড়াইয়া কাবুল পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লাহোর হইতে পলাইয়া দারা বাহাতে কাবুলে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য তিনি দারার অধীনস্থ নায়েব-সুবাদার মহাবত খাঁকে (জাহাঙ্গীর-শাহী প্রথম মহাবত খাঁর পুত্র) কাবুল সুবার পাকাপাকি সুবাদার নিযুক্ত করিয়া হাত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে দারা যখন মহাবত খাঁকে তাঁহার জ্ঞাত খাতিবারের রাস্তা খোলা রাখিবার চকুম পাঠাইলেন মহাবত খাঁ জানাইয়া দিলেন ঐ দিকে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়, দিল্লীর স্বর পাইয়া পাঠান মালিকগণ মাথ চাড়া দিয়াছে। কাবুল কিংবা ঐ পথে ইরানে দারার আশ্রয় গ্রহণের পথ এইভাবে অবরুদ্ধ হইল। লাহোরে খজুর খাঁ প্রভৃতি যে সমস্ত বাদশাহী মনসবদার প্রথমে দারার আশ্রয়তা স্বীকার করিয়া অল্পপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ভয় ও প্রলোভনের দ্বারা আওরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে সপক্ষে আনিয়া ফেলিলেন। দায়ুদ খাঁর বিক্রমে শতদ্রু তীরে বাহাদুর খাঁর অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে হাত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আওরঙ্গজেব বিব্রত হইয়াছিলেন। বিপাশা নদীর তীরে হুয়াত দারা তাঁহাকে এবল বাধা দিবে এই আশঙ্কায় তিনি দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইলেন। বাস্তবিকপক্ষে ঐখানেই দারা যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সিপহর শুকোকে দায়ুদ খাঁর সাহায্যার্থ পাঠাইয়া আওরঙ্গজেবের হরাবলকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেন। লাহোর হইতে তিনি বারবার ডোগরা রাজা রাজরূপের কাছে চিঠি লিখিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। তাঁহার টাকায় কোঁজ সংগ্রহ করিয়া রাজরূপ গোপনে আওরঙ্গজেবের সহিত দরকষাকষি করিতেছিল।

রাজনৈতিক মারণ-উচাটন ও বর্ষাকরণ ব্যাপারে হিন্দু-স্থানে চাণক্য পণ্ডিতের পর আওরঙ্গজেবের জুড়ি জয়গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আকবর বাদশাহ এই বিদ্যা কিছু কিছু জানিতেন, তবে তিনি দেবতা-সিদ্ধ ছিলেন; আওরঙ্গজেব কিন্তু বিবেক ও ধর্মবজ্জিত কূট-মিথ্যার সাধনায় একেবারে পিশাচ-সিদ্ধ। চর এবং চিঠিই ছিল তাঁহার মন্ত্রের ধারক ও বাহক, কলমেই তাঁহার ভেলুকী খেলিত।

দায়ুদ খাঁর অসামান্য প্রভুভক্তি দেখিয়া আওরঙ্গজেবের শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি বাড়িয়া গিয়াছিল ; দায়ুদ খাঁ তাঁহার চিঠির উত্তরে সাক্ষ্য জবাব দিয়াছিলেন শাহজাদা দারার জন্য তিনি জান মান-দৌলত কবুল করিয়াছেন, তিনি খালাস না দিলে অস্ত্র সরকারে তিনি চাকরী স্বীকার করিতে পারেন না। বিশ্বস্ততা, সাহস ও রণচাতুর্য্যে দায়ুদ খাঁ একাই দশ হাজার, এ হেন ব্যক্তি সঙ্গে থাকিলে দারাকে বন্দী করা মানুষের সাধ্যাতীত। দারার এই দক্ষিণ হস্তকে পদু করিবার জন্য আওরঙ্গজেব এক যুগিত উপায় অবলম্বন করিলেন।

তিনি দায়ুদ খাঁর কাছে এই মর্মে এক মিথ্যা চিঠি ছাড়িলেন ; উহাতে নাকি লেখা ছিল :

অমুক জায়গায় আপনার আরজ-দস্ত ( চিঠি ) পাইয়া আমি আপনার কাজের হাজার হাজার তারিফ না করিয়া পারি না। আপনার লেখা মতে আমি ঐদিকে তাড়াতাড়ি কুচ করিতেছি। ইন্শাআল্লাহ আপনি শীঘ্রই হুজুরে হাজির হইবার ইচ্ছা হাশিল করিবেন। আপনার মত ইসলামের জন্য দরদী মাতব্বর ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে লিখিত চিঠি মাফিক কাজ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এই উপায়ে কাজ চলিলে কেবল সিপহর শুকো নয়, ইচ্ছাতে রক্তক্ষাতির ইমানের নিন্দুক তামাম উম্মান্ ইসলামী ফৌজের হাতে কয়েক হইবে...

এই চিঠি দায়ুদ খাঁর জন্য নয়, দারার হাতে পড়িবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। পত্রবাহককে গ্রেপ্তার করিয়া দারার প্রহরীগণ এই ভয়ানক চিঠি লাহোরে পাঠাইয়া দিল। চিঠি পড়িয়া শাহজাদা চোখে আঁধার দেখিলেন, চারিদিকে বিশ্বাসবাতকের দল ; স্মৃতরাং একান্ত বিশ্বাসী দায়ুদ খাঁ উহাদের মধ্যে এক জন নহেন তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন ? আওরঙ্গজেবের এক চিঠিতেই বিনারক্তপাতে তিনটি বড় কাজ হইয়া গেল। দায়ুদ খাঁর উপর ভরসা হারাইয়া তিনি আওরঙ্গজেবকে পঞ্জাবে বাধা দেওয়ার আশা ত্যাগ করিলেন। পত্র পাওয়া মাত্র ফৌজ লইয়া দায়ুদ খাঁর শিবির হইতে চলিয়া আসিবার জন্য তিনি সিপহর শুকোকে লিখিয়া পাঠাইলেন ; এবং দায়ুদ খাঁকে নির্দেশ দিলেন শত্রু-সেনা গোবিন্দওয়াল পর্যন্ত আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে তিনি যেন নদীর সমস্ত নৌকা পোড়াইয়া রক্ষা-বাবস্থা ধ্বংস করিয়া পিছু হটিয়া আসেন। এই দিকে তিনি লাহোর হইতে পলায়ন করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।\*

দায়ুদ খাঁ আসল ব্যাপারের বিলুপিসর্গ জানিতে পারিলেন না। আওরঙ্গজেব ১৪ই আগষ্ট রূপারের কাছে নদী পার হইয়াই মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও দেশের খাঁকে বাহাদুর ও খলিলুল্লা খাঁর বলরুদ্ধি করিবার জন্য আগে পাঠাইয়া দিলেন। চারি জন প্রসিদ্ধ সেনানীর মিলিত ফৌজ এবং সুশিক্ষিত খাঁর তোপখানার বিরুদ্ধে গোবিন্দওয়ালে অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া আত্মরক্ষা দায়ুদ খাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবুও দুই-এক দিন তিনি শত্রুকে অসীম বীরবে বাধা দিয়া অগত্যা লাহোরের দিকে পশ্চাদপসরণ করিলেন।

৪

লাহোর হইতে মুলতানের দিকে যাত্রা করিবার পূর্বে পাঁচ শত বড় বড় নৌকায় বিপুল রণসম্পত্তা ও ধনরত্ন বোঝাই করিয়া দারা নদীপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাহজাদার নিজ ধনরত্ন, বাদশাহী কোষাগারে সঞ্চিত নগদ এক কোটি টাকা ও অস্ত্রাস্ত্র দামী জিনিস, দুর্গের বড় বড় তোপ ও শুল্কের সরঞ্জাম নৌকায় বোঝাই করিবার পর যাত্রা স্থলপথে লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না উহা সমস্তই সরকারী বারুদখানা সমেত অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করা হইয়াছিল। দারার সেনাদল এক দিনে শহর খালি করে নাই। আট হাজার অশ্বারোহী, হালকা তোপ ও ষষ্ঠের পিঠে বোঝাই শুল্কের উপকরণ সহ শাহজাদা স্বয়ং ১০ই আগষ্ট ( ১৬৫৮ খ্রীঃ ) মুলতানের দিকে স্থলপথে যাত্রা করিয়াছিলেন। শহরে কিছুসংখ্যক সৈন্য, সামরিক কর্মচারী, নগররক্ষক কোর্টোয়াল প্রভৃতি শাস্তি-রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল। নৌবাহিনীর অধিনায়কস্বরূপ বিশ্বস্ত খোজা বসন্ত স্থলসৈন্যের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া মুলতানের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তোপখানার উপরিস্থ সহকারী অধ্যক্ষ কুমী খাঁর উপর হুকুম ছিল তোপখানার যে সমস্ত কর্মচারী পিছনে পড়িয়া গা ঢাকা দিবে তাহাদিগকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। ম্যাক্সুমী সাহেব নিজের কাজ গুছাইয়া তৃতীয় দিন যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। ম্যাক্সুমীকে জোর করিয়া হাজির করিবার বাহবা লইবার চেষ্টা করিয়া কুমী খাঁ গালে গালে চড় খাইলেন। তৃতীয় দিন যাত্রার প্রাক্কালে কোর্টোয়ালীর এক কর্মচারী ম্যাক্সুমীর তালোশে আসিয়া মাতাল অবস্থায় দারার পক্ষীয় সকলের বাপাস্ত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া সাহেব মাতালের মুখে এক পাথর মারিয়া দুইটি ভাঙা দাঁত দারা-

\* তারিখ সম্বন্ধে কিছু গোলমাল দেখা যায়। যথা ১৮ই তারিখে মীর্জা রাজা ইত্যাদি ( History of Aurangzib ii, p. 448 ) লাহোর হইতে দারার পলায়নের সংবাদ পাইলেন, অথচ

অস্ত্র দেখা যায় "on the 18th August he [Dara] left Lahore..." ( ibid, p. 451 )। লাহোর হইতে যবন পৌছিতে অতি কম পক্ষে দুই দিন দরকার।

নিম্নকের গলার ভিতর ঢুকাইয়া সরিয়া পড়িলেন। যে সমস্ত কিরীকী গোলন্দাজ দাবার প্রতি অত্যাচার ছিল, ম্যানুসীও প্রতি ক্রমী খাঁর আচরণে রুষ্ট হইয়া তাহারা পা ঢাকা দিয়া লাহোরেই রহিয়া গেল। এই সময় সেনাপতি দায়ুদ খাঁর ফৌজ মুলতানের দিকে দাবার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল; ম্যানুসী এই ফৌজের সহিত রাস্তায় মিলিত হইয়া তিন দিন পরে মুলতানে উপস্থিত হইলেন।

লাহোর হইতে মুলতান সে যুগের হিসাবে দশ দিনের রাস্তা। রাবী নদী যেখানে চেনাব নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে উহার ভাটিতে চেনাব নদীর পূর্ব-তীরে মুলতান শহর। দাবার সেনাবাহিনী লাহোর হইতে তাড়াহুড়াভাবে পলায়ন করে নাই, সুস্থভাবে ধীরে সুস্থে কুচ করিয়া উনিশ দিন পরে ৫ই সেপ্টেম্বর (১৬৫৮ খ্রীঃ) মুলতান পৌঁছিয়াছিল; ঐ তারিখে সবেমাত্র আওরঙ্গজেব নিজের সেনা ও রণসম্পত্তি শতদ্রু নদী পার করাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে সুবা পঞ্জাবের নবনিযুক্ত সুবাদার খলিলুল্লা খাঁর অগ্রগামী সেনাদল দাবা লাহোর ত্যাগ করিবার সাত দিন পরে বিনা বাধার শহর অধিকার করিয়াছিল; খলিলুল্লা খাঁ লাহোরে প্রবেশ না করিয়া দাবার পশ্চাতে ছুটিলেন (২৯শে আগষ্ট)। ৬ই-এক মঞ্জিল অগ্রসর হইয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, দাবার সঙ্গে প্রায় ১৪০০০ অশ্বারোহী ও তোপখানা রহিয়াছে এবং মুলতানেই প্রবল যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। এই খবর আওরঙ্গজেবের কাছে পাঠাইয়া তিনি তাহার আগমনের প্রত্যাশা ধীরে ধীরে দাবার সহিত দশ মঞ্জিল ব্যবধান রাখিয়া মুলতানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

৫

মুলতানে পৌঁছিয়া দাবা নূতন সৈন্ত ভর্তি করিতে লাগিলেন, যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদিগকে বেতন অগ্রিম দিয়া সমুদায় করিলেন। শহরের পুরাতন সরকারী হাবেলীসমূহ মেয়ামত করিয়া বাসযোগ্য করিবার চক্রম হইল; শহরবাসীরা মনে করিল শাহজাদা ঐখানে অনেক দিন থাকিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শত্রু তখনও অনেক দূরে; সুতরাং একটু সোয়াস্তি পাইয়াই স্থিতিশীল বাস্তবিক শাহজাদাকে পাইয়া বসিল; ইহা কথঞ্চিৎ স্থানমাহাত্ম্যও বটে। এই শহরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধ শাখ শেখ বাহাউদ্দীন জেকেরিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাহার পিতামহ “মুলতানের শেখ” আখ্যা পাইয়া দেশপূজ্য হইয়াছিলেন। ইহাদের বংশোদ্ভূত প্রতাপত্ত্ব তখনও অক্ষুণ্ণ; লোকে মনে করিত খোদাতালা ও হজরত

রসুলুল্লাহ দরবারে এই ঘরানার পীরগণের গৈবী যাতায়াত আছে, ইহাদের মারফত রসুলুল্লাহ দরবারে আজ্ঞা পেশ হইলেই মঞ্জুর হয়। বলা বাহুল্য, দাবাও ঐ পন্থের পন্থিক ছিলেন, দরবার পর্যাস্ত শরীরে পৌঁছিবাব নসিব না হইলেও ক্ষেত্রেশতাগণের মারফত দৈবী ও গৈবী আওয়াজ তিনি সুস্পষ্ট অবস্থায় শুনিতে পাইতেন। তিনি বাহাউদ্দীনের দরগায় জিয়াবৃত্ত করিয়া কবরের জন্য বহুমূল্য আচ্ছাদন বস্ত্র দান করিলেন, এবং জেকেরিয়া ঘরানার ওয়াশিগণের শরণাপন্ন হইয়া আওরঙ্গজেবের উপর ফতে হাসিল হওয়ার দোয়া ভিক্ষা করিলেন।

শাহজাদার কাকুতি-বিনতি ও দানে দয়াপরবশ হইয়া তাহার কণা দিলেন ঐ রাত্রিতেই রসুলুল্লাহ দরবারে হাজির হইয়া তাহার আজ্ঞা পেশ করিবেন, এবং অধিকন্তু ভরসা দিলেন এমন ত্রায়া আজ্ঞা নিশ্চয়ই মঞ্জুর হইবে। দাবা নিজ শিরির কিরীকী অস্থিরভাবে রাত্রি-প্রভাতে সংবাদে অপেক্ষায় রহিলেন। পরের দিন এই সমস্ত পাকা ঘুমু মুখ ভার এবং মাথা হেঁট করিয়া নিভাস্ত সপ্রতিভ ভাবে শাহজাদার কাছে দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিল—যথা, তাহার সারাদাত রসুলুল্লাহ নিকট হাজির ছিল; কিন্তু পরম দয়াল আল-রহীমের সঙ্গে কোন কথা বলিবার সুসমত পাওয়া গেল না, যেহেতু রসুলুল্লাহ সর্বক্ষণ আওরঙ্গজেবের সহিত কথায় বাস্ত ছিলেন! ইহাতেও দাবার চৈতন্যোদয় হইল না, দক্ষিণবর্তী ঠগদের কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিলেন না, খোদাতালা ও রসুল ভাল রকম মজল চিনেন এদিকে পাইলেন না; তিনি অধিকন্তু উহাদিগকে আর একবার চেষ্টা করিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, এবং খয়রাত স্বরূপ নগদ পাঁচিশ হাজার টাকা দিয়া বিদায় দিলেন। ফকীরেরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া গেল এইবার তাহারা সকলের আগে পৌঁছিয়াই পরগণার দরবারে আজ্ঞা পেশ করিবেন! পরের দিন সকাল বেলাও ঘুমুদের মুখেই এক অজুহাত; কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে দাবা দমিবার পাত্র নহেন। এই ভাবে তিন দিন ফকীরী ধাণা-বাকী চলিল, হয়ত আরও কিছু দিন চলিত; কিন্তু ইতিমধ্যে মুলতানে সংবাদ পৌঁছিল স্বয়ং আওরঙ্গজেব লাহোরের রাস্তা ছাড়িয়া কাসুরের পথে দৈনিক চৌদ্দ মাইল হইতে বাইশ মাইল বোড়া দৌড়াইয়া পোজা মুলতানের দিকে আসিতেছেন।

৬

আসলে মুলতানে যুদ্ধ করিবার মতলব দাবার ছিল না; লোকজনকে শাস্ত রাখিবার জন্য তিনি ঐখানে পাকাপাকি ব্যবস্থার ভান করিয়াছিলেন। তাহার বিরাট নৌবহর শহরের

বার্টেই নক্ষর ফেলিয়াছিল। মুলতান হইতে সরকারী তহবিলের নগদ বাইশ লক্ষ টাকা, আটটা ভারী তোপ, গোলাগুলি ও প্রচুর রসদ নৌকায় বোঝাই করা হইল। এক শত টন ভারবহনক্ষম মোট পাঁচ শত সাতখানা বহরী নৌক। সিপাহী লক্ষর রসদ ও তোপখানা লইয়া খোজা বসন্ত ও শাহসী সেনাপক্ষ ফিরোজ মেবাতীর রক্ষণাধীনে শতদ্রু নদীর ত্রিটি পরিয়া মণ্ডসিঞ্চুমধ্যস্থ ভক্তর জলভূগের দিকে যাত্রা করিল। দারা স্বয়ং ঐ একই দিনে ( ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৬৫৮ খ্রীঃ ) মুলতান হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মুলতান হইতে যাত্রা করিবার সময় মাত্র পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার পদাতিক অবশিষ্ট ছিল। লাহোর ও মুলতানে অগ্রিম বেতন লইয়া যাহারা দারার ফৌজে গতি হইয়াছিল তাহারা সিঞ্চর মরুভূমির নাম শুনিয়া পলাইয়া গেল। তাহার পুরাতন বিশ্বস্ত সেনাপক্ষগণের মধ্যে যাহারা এতদিন দিল্লী লাহোর ঘুরিয়া তাহার অনুগামী হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবলমাত্র মোর আতিশ জাফর ( বাকস্কাজ খাঁ ) তাহার সঙ্গে চলিল। পূৰ্ব্বতন হিতৈষী সেনানায়কগণের প্রতি দারার অবিশ্বাস, ব্যবহারে স্বাভাবিক হৃদয়তার অভাব ইহার জন্ম বহুলাংশে দায়ী। দায়ুদ খাঁ প্রতি লিখিত আওরঙ্গজেবের প্রথম মিথ্যা চিঠি দারার সম্মুখল বিসদ্বন্ধ করিয়াছিল; যিনি আওরঙ্গজেব বাতীত অন্য মাতুলসকল আকোষন সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন মাতুলের প্রতি পাইকারী হিসাবে অবিশ্বাস সাময়িকভাবে তাঁহাকে পাইয়া বসিল। ভাবগোপন করিবার সহজাত রাজসিক শক্তি দারার কোনকালেই ছিল না, কাজেই তাহার কথার ও ব্যবহারে অনুজীবগণের প্রতি অন্তরের ব্যবধান ধরা পড়িতে লাগিল; যাহারা স্বর্ণাঘেষী ছিল না তাহারাও ভাঙ্গা মন লইয়া চলিয়া গেল।

হিন্দুস্থানে চলতি কথা আছে, গরম ছুধে যাহার মুখ একবার পুড়িয়া গিয়াছে সে বোলের সরবতেও ফুঁ না দিয়া চুযুক দেয় না। লোকের মধ্যে আসল মেকী চিনিবার ক্ষমতা না থাকায় শাহজাদারও আনাড়ির দশা হইয়াছিল। মুলতানে সেনাপতি দায়ুদ খাঁর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় দারা তাঁহাকে প্রকৃত হিতৈষী সহায়কের ন্যায় হৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দারার প্রতি তাহার অন্তরের চান থাকাতো তিনি বিরক্ত না হইয়া নতিস্বীকার করিলেন, প্রভুর পায়ের কাছে তরবার রাখিয়া শপথ করিলেন তিনি নির্দোষ, শাহজাদা ও তাহার পরিজনবর্গের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণ দিতে সৰ্ব্বদাই প্রস্তুত। ইহাতে দারার মন গলিয়া গেল, দায়ুদ খাঁর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন

না; কিন্তু আওরঙ্গজেবের ছায়া দায়ুদ খাঁকে অমুসরণ করিতেছিল। পূৰ্ব্ববৎ উপরে দ্বিতীয় এক মিথ্যা চিঠি ঠিক সময়ে দারার হাতে পড়িল।

এই চিঠি আরও ভয়ানক অনর্থকারী—ইহাতে এরূপ কিছু লেখা ছিল [ দায়ুদ খাঁর প্রতি ], যথ—আপনি জানাইয়াছিলেন, ইনশাআল্লাহ কাফের দারার মাথা শীঘ্রই এই দিকে প্রেতিত হইবে। আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় এমন বিলম্ব হওয়ার কারণ কিছুই পুরিয়া উঠিতে পারিতেছি না... ইত্যাদি। এারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি ছুরিকা যাহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে এই চিঠি পড়িয়া তাহার অবস্থা “তুমিও? দায়ুদ?” [ Thou too, Brutus? ] বাতীত অল্প কিছু কল্পনা করা যার না।

বাহা হউক, আওরঙ্গজেবের কারসাজি সার্থক হইল, দারা তাহার নিমজ্জমান ভাগ্যতরনীর বিশ্বস্ত কর্ণধার দায়ুদ খাঁকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়া মুলতান হইতে বিদায় দিলেন। স্বীয় প্রভুর “ক্ষণং ভুঙ্গে ক্ষণং রুঙ্গে” স্বভাব এবং ভাগ্যবিপর্যয়ে শোচনীয় মানসিক অবস্থা গ্রহণ করিয়া দায়ুদ খাঁ এই অপমান সহ্য করিলেন। পশ্চাতে অনুসরণকারী আওরঙ্গজেবের যমদূত বাহাজুর খাঁ, সম্মুখে সিঞ্চর মরুভূমি ও সহায়শূন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা—এই অবস্থার মধ্যে শাহজাদার সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া আওরঙ্গজেবের মনস্কামনা ব্যর্থ করিবার জন্য দায়ুদ খাঁ প্রস্তুত হইলেন এবং দারা যে পথে চলিয়াছেন সে পথে যাত্রা করিলেন। দারার স্তূতদিনে দায়ুদ খাঁ এমন কিছু অনুগ্রহ লাভ করেন নাই যাহার জন্য এইরূপ নিতীক একনিষ্ঠ সেবা ন্যায়তঃ দারা প্রত্যাশা করিতে পারিতেন; যাহারা তাহার বসন্তের কোকিল ছিল তাহারা বর্ষা সমাগমে উড়িয়া গিয়াছে। দারার পলায়মান সেনার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়া অবিচলিত চিত্তে দায়ুদ খাঁ মুলতান হইতে একশত মাইল দক্ষিণে শতদ্রু নদীর নিকটবর্তী অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত উচ্চ ( uch ; বাওরালপুর রাজ্যের অন্তর্গত ) পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর মুলতান ত্যাগ করিয়া দারা ২৩শে সেপ্টেম্বর ( ১৬৫৮ ) ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন; এই সময়ে শত্রুর অগ্রগামী সৈন্য এবং তাহার সেনার মধ্যে মাত্র চারি মঞ্জিল [ চারিদিনের রাস্তা ] ব্যবধান। দায়ুদ খাঁ নিজের কৌতুকে দারার ছাড়নি হইতে পৃথক এবং কিছু দূরে রাখিতেন, দারার নিষেধ অগ্রাহ করেন নাই। প্রভুর অমূলক সন্দেহ দূর করিবার জন্য তিনি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন, শত্রুর মিথ্যা চিঠিতে বিশ্বাস করিয়া শাহজাদা যেন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে হৃদনে সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত না করেন, নামের উপর এই কলঙ্ককালিমা নিজ রক্তে ধুইয়া তিনি স্বামীধ্বংস-মুক্ত হইবেন। লোকে বলে বিনাশকালে



৬

বিপরীত বুদ্ধি; দারা সম্বন্ধ করিলেন আওরঙ্গজেবের ইশারায় তাঁহার মাথা লইবার মতলবেই দায়ুদ খাঁ শুভাকাঙ্ক্ষী সাক্ষিয়া পিছু লইয়াছে। তিনি দায়ুদ খাঁকে সরাসরি জানাইয়া দিলেন আমার প্রতি আপনার ঐতি ও বিশ্বস্ততা যদি অকৃত্রিম হয় তবে আপনি আমাকে আর অনুসরণ করিবেন না। দায়ুদ খাঁ নিতান্ত মর্মান্বিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন লিখিত ভাবে বরখাস্ত হুকুম পাইলেই আমি ফিরিয়া যাইব। দারা এই মর্মে এক হুকুমনামা লিখিয়া দিলেন, ‘আমি দায়ুদ খাঁকে চাকরী হইতে জবাব দিলাম এবং তাঁহার প্রতি আদেশ করিতেছি তিনি যেন আমার ফৌজ হইতে সরিয়া যান; তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইল তিনি অন্যত্র যে কোন ব্যক্তির অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতে পারেন।’

ম্যাহুসী লাহোরের রাষ্ট্র হইতে দায়ুদ খাঁর সঙ্গে মুলতান ও উচ্চ শহর পর্যন্ত সফর করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

এই জবাব পাইয়া [at Uch : Storia i 31.] দায়ুদ খাঁ বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, দুরাগ্য ও অন্তত প্রতি পদক্ষেপে শাহজাহাদর অনুসরণ করিতেছে। ইহার পর প্রভুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় লাহোরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। এই সংবাদ পাইয়া পশ্চিমধ্যে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে সম্মানে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। দারার বিরুদ্ধে কোন অনুসরণ করিতে সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হইবেন না—<sup>১</sup> তিনি আওরঙ্গজেবের চাকরী গ্রহণ করিলেন।<sup>২</sup> দার অনুগ্রহ-পুষ্ট জয়সিংহ যশোবন্ত দেলের খাঁ? এইরূপ সর্ব আওরঙ্গজেবের নিকট উত্থাপন করিবার বুকের পাটা কাহারও হয় নাই, আওরঙ্গজেবের ইজিতে জয়সিংহ দেলের খাঁ শিকারী বাজের মত পলায়মান দারার উপর ছোঁ মারিবার জন্ত প্রস্তুত, যশোবন্ত তখনও এত নীচে নামিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন। বস্তুতঃপক্ষে পরাজিত আর্থ্যবীরের আত্মমর্যাদা রক্ষা করিলেন দায়ুদ খাঁ,—জয়সিংহ-যশোবন্ত নহেন। অমাহুদ ও অতিমাহুদ লইয়াই ইতিহাস, ‘মাহুদ’ ও মাহুদ ইহার পাতায় বিরল। এইজন্য সেকালের মাহুদ শত্রু-মিত্র দায়ুদ খাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছে, লোকমুখে তাঁহার ত্যাগ ও প্রভুভক্তির খ্যাতি সত্যের\* সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

\* সিদ্ধুর ‘সকর’ শহর হইতে দায়ুদ খাঁ বিদায় লইয়াছিলেন [History of Aurangzib ii p. 458] ইহা বোধ হয় ঠিক নহে দায়ুদ-খাঁ সম্বন্ধীয় ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত ম্যাহুসী এবং ওজার আশ্রিত ঐতিহাসিক মাহুদ এবং আলমগীর-নামার প্রয়োগ লিখিয়া

দারা উচ্চ [Uch] শহরে মাত্র চারিদিন অপেক্ষা করিয়া উচ্চস্থানে দক্ষিণদিকে পলায়ন করিলেন (২৭শে সেপ্টেম্বর) এবং অসীম দুর্গতিভোগ করিয়া ষোল দিন পরে (১৩ই অক্টোবর ১৬৫৮) তাঁহার শেষ লক্ষ্যস্থল ভকর দুর্গে উপস্থিত হইলেন। খোজা বসন্ত মুলতান হইতে নৌবহর লইয়া পূর্বেই এইখানে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তখনও তোপ, যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি নামাইতেছিলেন। যেখানে বর্তমানে সিদ্ধ-নদের উপর Sakkar Barrage নির্মিত হইয়াছে এখানে নদগর্ভে চারিটি পাহাড়ের মধ্যে সর্কাপেক্ষা বৃহৎ পাহাড়ী দ্বীপের উপর শত্রুর অভেদ্য ভকর দুর্গ অবস্থিত ছিল। প্রায় সমগ্র দ্বীপ জুড়িয়াই এই দুর্গ, দৈর্ঘ্যে ৮০০ শত গজ এবং প্রস্থে ৩০০ গজ\*। সিদ্ধুতীরে পৌঁছিয়া দারা খবর পাইলেন শত্রুসেনা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। এইজন্য তিনি তাড়াতাড়ি

গিয়াছেন। আচাধ্য যদুনাথ মাস্তমের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন,

“He (Daed Khan) murdered the honourable of his harem, in order to be free from anxiety about them, and then reported to Dara how he had composed his mind about certain objects which men hesitate and shrink from (desperate) exertion and fighting at such times (danger).—History of Aurangzib. I & II, p. 459.

পরিবারের স্ত্রীলোকগণকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত ও বেপরোয়া হওয়া দায়ুদ খাঁর পক্ষে বেশী কিছু নহে, রাজপুত্র, পাঠান ও হিন্দু-স্থানী মুসলমানগণ এইরূপ করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি মাস্তমের উপর নির্ভর করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি, যেহেতু মাস্তম বাহা ‘গুনিয়া’ লিখিয়াছেন, উহা ম্যাহুসীর নিজের চোখে দেখিবার এবং মনে রাখিবার কথা। এই অবস্থায় ম্যাহুসীর অস্বস্তি মাস্তমের উক্তি অপেক্ষা বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয়। ম্যাহুসীর তারিখের ভুল ইত্যাদি স্মরণ যদুনাথ তত্ত্ব করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হইতে দারার জীবনীর উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। আমার মতামত আপিলে টিকিবে কিনা তিনিই জানেন।

\* ম্যাহুসীর মাপে দৈর্ঘ্য ৯৭৫ কদম (pace) এবং প্রস্থ ৫৫৩ কদম। এই স্থান সেকালে ‘সকর-ভকর’ [Sakkur wa Bhakkor] নামে পরিচিত ছিল। বৃদ্ধ বয়সে কাহিনী লিখিবার সময় ম্যাহুসীর দিগ্ভ্রম হইয়াছিল। সকর সিদ্ধ নদের ডান দিকে (অর্থাৎ পশ্চিম তীরে) এবং পূর্বতীরে রোরি শহর, এই উভয়ের মধ্য স্থানে পূর্বতীরে যেখান ভকর দুর্গ। ইহার কাছে (Storia i p. 326 & footnote) প্রাচীন আর্থ্যগণের Father Indus একটি দ্বীপের উপর কেবল তা খোজা বিজয় হইয়া পূজা পাইতেছেন।



নদী পার হইয়া অপর তীরে সন্ধর শহরে শিবির স্থাপন করিলেন এবং শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য দুপারের কাছাকাছি সমস্ত নৌকা পশ্চিম তীরে একত্র করা হইল। দুই হাজার সাহসী পাঠান সৈয়দ মোগল ও রাজপুত যোদ্ধা এবং বাইশ জন নানাদেশীয় ফিরঙ্গী গোলন্দাজ কর্মচারী খোজা বসন্তের অধীনে ভ্রগরক্ষার্থ নিযুক্ত হইল এবং প্রচুর পরিমাণ রসদ, গোলাবারুদ, বড় বড় তোপ ও বহু টাকা আশরফী দুর্গাধ্যক্ষের হেপাজতে দেওয়া হইল। এইখানে দারার অন্তঃপুরের গুরুতর বহুল পরিমাণে হান্না করা হইল। সুলেমানের স্ত্রী এবং আদরের নাতি দুইটিকে অস্ত্রাঘাত স্ত্রী ও পরিচারিকা সমেত দুর্গে রাখিয়া কেবলমাত্র নাদিরা বাহু ও বিশিষ্ট কয়েক জন অন্তঃপুরবাসিনীকে শাহজাদা সঙ্গে লইলেন।

ইতিমধ্যে ভরুর ১১৬ মাইল উত্তরে সফশিকন খাঁর ফৌজ সিদ্ধনদের পূর্বতীর এবং শেখমীর নদী পার হইয়া পশ্চিমতীরে বরাবর সন্ধর-ভরুর দিকে গাথিত হইতেছিল। দারার সওয়াত্রিংশের ভরসা ছিল এইখানে হয়ত তিনি দুর্গের আশ্রয়ে কিছুদিন শত্রুকে বাধা দিবেন। তাঁহার সন্ধর ভাগ করিবার আয়োজন দেখিয়া তাহার নিকটসাহ হইয়া পড়িল এবং চারি হাজার সৈন্য এবং বিখ্যাত সেনা-নাযকগণ তাঁহার শিবির ভাগ করিয়া আড়ম্বন্ধের পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। কেবলমাত্র ফিরোজ মেহতী ও দুই-তিন হাজার সিপাহী তাঁহার সঙ্গে রছিল। ম্যাক্সিম দারার সঙ্গে যাইবার কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। দার তাঁহাকে সিরোপা বকুলিশ করিয়া ফিরঙ্গী গোলন্দাজগণের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং আবার দেখা হইবে আশ্বাস দিয়া সাক্ষরিত বিদায় দিলেন।

দারার মুষ্টিমেয় অমুচর ও ক্রতগামী ক্ষুদ্র নৌবহর লইয়া সন্ধর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন তখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই। সন্ধরের কিছু দক্ষিণে বর্তমান লারখানা শহরের কাছাকাছি পৌছিয়া তিনি ঐ স্থান হইতে কান্দাহারের রাজ্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার অনুযাত্রীরা ইরণে নির্বাসন আশঙ্কায় ফেপিয়া উঠিল, স্বয়ং নাদিরা বাহু ইহাতে বাধা দিলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি সিদ্ধতীরে শিবস্থান (বর্তমান Schwan) দুর্গের দিকে চলিলেন। ঐ স্থানে শেখ মীর এক দারুণ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, একপাশে পিছনে শেখমীর, অত্যাচারে সফশিকন খাঁ, সম্মুখে সেওয়ান দুর্গে শত্রুর ঘাঁটি। দারার সঙ্গে অগ্রগামী দলে এক হাজার সওয়ার ও দশটা হাতী, পিছনে বাদবাকী ফৌজ ও লটবহর, উহারে কাছাকাছি নৌবহরে ধনসম্পত্তি ও বুদ্ধের সরঞ্জাম। দারার নৌবাহিনী পশ্চিম তীরে দুর্গের নিকট দিয়া দুই তীরের গোলাবৃষ্টিতে মধ্য ফাঁদ এড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল, দুইখানা মাত্র নৌকা গোলাব আঘাতে ধোয়া গেল। দারার স্থলবাহিনী লইয়া দুর্গের ঘাঁটি নিরাপদে অতিক্রম করিলেন, দুর্গাধ্যক্ষ হামলা করিতে ভরসা পাইল না (২রা নবেম্বর ১৬৫৮ খ্রঃ)। দশ দিন ক্রমাগত কুচ করিয়া নৌবহরের সাহায্যে দার অবশেষে ১৩ই নবেম্বর সিদ্ধর রাজধানী টাটানগরীতে (করাচীর নিকটবর্তী বর্তমানে শংসপ্রাপ্ত গ্রাম) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানেও তাঁহার বিশ্রাম মিলিল না, টাট্টা হইতে তিনি পূর্বদিকে কোথায় পলাইয়া গেলেন শত্রুপক্ষের করিতে পারিল না।

## ক্রান্তি-দেবতা সরস্বতী

(বিনোব)

আমি সাহিত্যিকদের দেবসিঁতলা মনে করি। একথাও আমি মনে করি যে সরস্বতীই মুখ্য ক্রান্তি-দেবতা। বোদ

২

“সরস্বতি, হং অম্মান্ অবিত্টি।

মরুতী যুযতী জেযি, শক্রনা”

(হে সরস্বতী, আমাদের সত্যত বক্ষা কর। তোমার কৃপায় বিচার-প্রবাহ স্রব্ধ হয়, ভ্রান্ত মূল অভিভূত হয়। শত্রু পরাস্ত হয়)

সরস্বতীর যদি কৃপা না হইত তবে ‘ভূদান শক’ও মনে আসিত না।

# রাজা রামমোহন রায় ও ইংরেজী শিক্ষা

ত্রীমোগেশচন্দ্র বাগল

রাজা রামমোহন রায় যুগপ্রবর্তক ছিলেন এ কথা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। শিক্ষিত ভারতবাসী মাঝেই তাঁহাকে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি—বিভিন্ন বিষয়ে যুগ-স্রষ্টার সম্মান দান করিয়া থাকেন। রামমোহন বাঙালী, বাংলাই তাঁহার কর্মক্ষেত্র। এইজন্য বাঙালী জাতি বিশেষ করিয়া তাঁহার কৃতিত্বে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। আশ্রয় শতাব্দিক বর্ষ পরে রামমোহনের ভাবাদর্শ সমাজ জীবনের প্রতি স্তরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি এই অতি মৃত্যু কথার উপর কতকটা আবেগ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শিক্ষা সাহিত্য, সমাজ-সংস্কার কোন দিকেই নাকি তাঁহার কৃতিত্ব নাই; বরং তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনা মিত্যা চাপে বাঙালী জাতিকে ‘ষাটো’ করা হইয়াছে! স্থানে স্থানে এরূপ উজ্জ্বল প্রতিবাদও যে না হইয়াছে এমন নয়। আমি অন্তত বিষয়ের মধ্যে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা-গবেষণায় লিপ্ত আছি। শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার ফল-স্বরূপ কিছু কিছু পুস্তকও লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে।\* কাজেই আমাকে ঐ সময়কার সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টাগুলির বিষয়ও প্রচুর অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। এই সকলের নিরিখে রাজা রামমোহন রায়ের হিন্দু কলেজ এবং ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে যোগাযোগের বিষয় এখানে কিছু বলিব। স্বর্গত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের কৃতিত্ব বিষয়েও তিনি একটি স্বতন্ত্র সারগর্ভ প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

হিন্দু কলেজের সহিত সংস্রব

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ইহার সঙ্গে রামমোহনের সংস্রব সম্পর্কেই এখানে আগে বলিব। হিন্দু কলেজের দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। সুপ্রিয় কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড জেস্টের ভবনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে

আহূত প্রথম দিনকার সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র ইহাতে পাইয়াছি। ১৮৩০ সনে হিন্দু কলেজের ‘আদি-কল্পক’ (originator) লইয়া যখন সমসাময়িক সংবাদপত্রে বিতর্ক উপস্থিত হয় তখন গবর্ণমেন্ট গেজেটে (২৪ জুন, ১৮৩০) “A Director of the Institution from its very Foundation”-এর পত্রে ইহার মর্ম উদ্ধৃত হয়। উক্ত পাণ্ডুলিপির বিবরণটিতে রাজা রামমোহনের উল্লেখ গাফিলত কণা নয়। তাঁহার বিষয়ে উল্লেখ আমরা প্রথম পাই জেস্ট-ভবনে ১৪ই মে, ১৮১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ-সম্বলিত জন হার্ভার্ট হেরিংটনকে লেখা জেস্টের এক পত্রে। হেরিংটন সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক ছিলেন। এই সময় তিনি বিলাতে ছুটি ভোগ করিতে-ছিলেন। ব্রজেননাথের প্রবন্ধে এই পত্রখানি ছবছ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ইহাতে আবশ্যক অংশ এখানে প্রদত্ত হইল :

“Talking afterwards with several of the company, before I proceeded to open the business of the day, I found that one of them in particular, a Brahmin of good caste, and a man of wealth and influence, was mostly set against Rammohun Roy, ... (who has lately written against the Hindu idolatry, and upbraids his countrymen pretty sharply). He expressed a hope that no subscription would be received from Rammohun Roy. I asked, why not? ‘Because he has chosen to separate himself from us, and to attack our religion.’ ‘I do not know,’ I observed, ‘what Rammohun’s religion is’ (I have heard it is a kind of Unitarianism) -‘not being acquainted or having had any communication with him; but I hope that my being a Christian, and a sincere one, to the best of my ability, will be no reason for your refusing my subscription to your undertaking.’ This I said in a tone of gaiety; and he answered readily in the same style, ‘No, not at all; we shall be glad of your money; but it is a different thing with Rammohun Roy, who is a Hindu, and yet has publicly reviled us, and written against us and our religion; and I hope there is no intention to change our religion.’ I answered, that ‘I knew of no intention of meddling with their religion; that every object of the establishment would be avowed, and a committee appointed by themselves to regulate the details, which would guard against everything they should disapprove of; that their own committee would accept or refuse subscriptions from whom they pleased.’ . . . The Brahmin said he had no objection to this; and some of the others laughed and observed

\* বিভাগীয় কর্তৃক প্রকাশিত বিবিধা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত লেখকের (১) বাংলার জনশিক্ষা, (২) বাংলার জ্ঞানশিক্ষা, এবং (৩) বাংলার উচ্চশিক্ষা (বঙ্গ)।

† “Ram Mohun Roy as an Educational Pioneer” —The Journal of the Bihar and Orissa Research Society, June, 1930

to me, that they saw no reason, if Rammohun Roy should offer to subscribe towards their establishment, for refusing his money, which was as good as other people's."

পত্রখানির এই অংশ হইতে কয়েকটি বিষয় জানা যাইতেছে : (১) রামমোহনের সঙ্গে হাইড ঈষ্টের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, এমন কি উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহারও কখনো হয় নাই। (২) একজন প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্রাহ্মণ প্রস্তাবিত কলেজের সঙ্গে রামমোহনের সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে কথা তুলিয়া উহাতে ষোড়শতর আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে চাঁদাও গ্রহণ করা হইবে না; কারণ রামমোহন হিন্দুসমাজে থাকিয়াই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছেন। (৩) ঈষ্টের নিকট হইতে চাঁদা বা সাহায্য গ্রহণে তাঁহার আপত্তি নাই, কারণ তিনি ত আর হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবেন না, বা খ্রীষ্টধর্মের সপক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইবেন না। (৪) উক্ত ব্রাহ্মণ-প্রবরের আপত্তিতে কেহ কেহ কৌতুক অনুভব করেন এবং ঈষ্টকে বলেন, রামমোহনের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণে তাঁহার কোন আপত্তির কারণ দেখেন না। (৫) এই সকল কথাবার্তা সভারস্তরের পূর্বে হইয়াছিল।

এখানে কথা এই—রামমোহন একেশ্বরবাদী, মূর্তিপূজার বিরোধী; প্রচলিত হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় আচার-আচরণের নিন্দাবাদে অভ্যস্ত। ইহা জানা সত্ত্বেও উক্ত স্থলে যেখানে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং মান্তগণ্য হিন্দুগণ উপস্থিত ছিলেন—রামমোহনের কথা আদৌ উঠিল কেন? তিনি কি তবে হিন্দু কলেজের মত একটি উচ্চাঙ্গের বিত্যালয় প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনার কথা জানিতেন? চাঁদা সংগ্রহের যখন আয়োজন হইতেছিল তখন কি নিজে ঐ উদ্দেশ্যে চাঁদা দিতে চাহিয়াছিলেন? আবার দেখি, রামমোহনপন্থী রাজ-নারায়ণ বসু এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দু কলেজের 'আদিকল্পক' বা 'originator' রূপে খোলাখুলিভাবে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে ডেভিড হেয়ারকেই উল্লেখ করিয়াছেন। রামমোহন-বসু উইলিয়ম এডাম নিজ 'ইন্ডিয়া গেজেটে' (১৪ই জুন ১৮৩০) সম্পাদকীয় মন্তব্যে খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, ডেভিড হেয়ারই হিন্দু কলেজের 'আদিকল্পক'। ১৮৩০ সনে সুপ্রীম কোর্টে হাইড ঈষ্টের যে মূর্তি স্থাপিত হয় তাহাতে ঈষ্টকেই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। 'ইন্ডিয়া গেজেটে' এডাম ইহার প্রতিবাদেই ঐ কথা বলিয়া-

ছিলেন।\* এসব সত্ত্বেও রামমোহন যে গোড়া হইতেই কলেজের পরিকল্পনা বা প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহাই বা কেমন করিয়া খরিয়। লওয়া যায়? নিম্নের উদ্ধৃতিটি এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিতেছে। 'দি ক্রিস্টিয়ান অবজার্ভার', জুলাই ১৮৩২, লেখেন :

"In 1815, a distinguished Native, not now in India, entertained a few friends in his house; in the course of conversation, a discussion arose as to the best means of improving the moral condition of the natives. It will readily occur to most of our readers, that the distinguished individual alluded to was Rammohun Roy, who, by his superior attainments in knowledge, and familiar intercourse with Europeans, became deeply imbued with a spirit of repugnance to the superstitious notions, and idolatrous practices of his countrymen. He was not only convinced of their errors, but animated with a fervent desire to correct them. For this end he proposed the establishment of a Brumha Sabha, for the purpose of teaching the doctrines of religion according to the Vedanta system,—a system, strongly deprecating every thing of an idolatrous nature, and professing to inculcate the worship of one supreme, undivided, and eternal God.

Mr. Hare, who was one of the party, not coinciding in the views of Rammohun Roy, suggested as an amendment, the establishment of a College. He wisely judged that, the education of native youths in European literature and science would be a far better means of enlightening their understandings . . . than such an institution as the Brumha Sabha.

"This proposition seemed to give general satisfaction, and Mr. Hare himself soon after prepared a paper, containing proposals for the establishment of the College. Baboo Buddinath Mookerjee, the father of the present native Secretary (Lakshminarayan Mookerjee, father of Justice Anukul Mookerjee of the Calcutta High Court), was deputed to collect subscriptions. The circular was put into the hands of Sir E. H. East, who was very much pleased with the proposal, after making a few corrections, offered his

\* "Let the Truth be told, and it will appear that Mr. Hare was the originator, and the most active individual in effecting the establishment of the Hindoo College. He it was who first . . . induced the worthy members of the native community to subscribe towards the establishment of a fund for such an institution; he prevailed upon them to do so; . . ." (The India Gazette, June 14, 1830).

আবার অন্তত,

" . . . had there been no such proposal in writing circulated among several native gentlemen? . . . And was not the author and originator of that paper, Mr. David Hare? . . ." (Ibid, June 25, 1830).

most cordial and in the promotion of its objects. He soon after called a meeting at his house, and it was then resolved, 'That an establishment be formed for the education of native youth.'

এই উদ্ধৃতি হইতে কতকগুলি বিষয়, বিশেষতঃ হাইড জেটের গৃহে সাধারণ সভা হইবার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি পরিষ্কার জানা যাইতেছে। ১৮১৫ সনে রামমোহন-গৃহে আহুত কয়েক জন বন্ধুর এই বৈঠকে এইরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। রামমোহন ব্রহ্মসভা স্থাপনের কথা বলিলে ডেভিড হেয়ার তাহার সংশোধনীস্বরূপ একটি উন্নত ধরনের ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের অন্তর্কূলে উপস্থিত সকলেই মত দিলেন। পরবর্তী ঘটনাগুলি এই : হেয়ার পরিকল্পনা রচনা করিলেন, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় চাঁদা সংগ্রহের জন্ত প্রেরিত হইলেন। হাইড জেটের পত্রেই প্রকাশ, তাঁহার নিকটও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ই এই পরিকল্পনার কথা বলেন এবং তাঁহাকে ইহা দেখান। জেট সাহেব ইহার সামান্য সংশোধন করিয়া দেন। তাঁহার গৃহেই তৎকর্তৃক প্রথম ও পরবর্তী সভা আহুত হয় এবং বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়।

কাজেই জানা গেল, হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রচনার পূর্ব্বে প্রথম উল্লেখের সময় হইতেই রামমোহন রায় এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় অবগত ছিলেন। এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না যে, তাঁহারই নির্দেশে এবং উপস্থিত সকলের সমর্থনে এ বিষয়ে চাঁদা সংগ্রহের ভার তাঁহারই আত্মীয় সভার অন্ততম উৎসাহী সভ্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। ডেভিড হেয়ার তখনও হিন্দু-প্রশাসনের নিকট স্বল্পপরিচিত; কাজেই তাঁহার পরিকল্পনা তাঁহাদের দেখাইবার ভারও বৈদ্যনাথের উপরই পড়ে। আর একটি কথা। জেট-ভবনে প্রথম দিনের সভায়ই উপস্থিত মাত্রগণ্য হিন্দুগণ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেন। আরও বহু সহস্র টাকার প্রতিক্রিয়া এই সভাতেই পাওয়া গেল। যাহারা অনুপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অর্থ দিতে সম্মত এইরূপ জানিয়া জেট-গৃহে এক সপ্তাহ পরে ২১শে মে ১৮১৬ দিবসে পুনরায় সাধারণ সভা আহ্বানের বিষয়ও তখন বাধ্য হয়। প্রস্তাবিত কলেজের অধ্যক্ষ-সভায় কে কে থাকিবেন সে বিষয়েও আলোচনা হইয়া থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের অর্থদানে প্রতিক্রিয়া উপরোক্ত ঘটনাপরম্পরায় অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ।

হিন্দু কলেজ পরিকল্পনায় রামমোহনের কতখানি

হাত ছিল দুইটি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা তাহা অনেকটা বুঝ যায়। রামমোহনের নিকট হইতে কলেজের জন্য চাঁদা গ্রহণে যে কোন কোন রক্ষণশীল হিন্দু-প্রধানের আপত্তি—জেটের পত্র হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। যখন চাঁদা গ্রহণেই আপত্তি তখন রামমোহন কমিটিতে থাকেন কি করিয়া? অথচ কলেজ-পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁহার এতই যোগ যে, ডেভিড হেয়ার প্রথম হইতেই ধরিয়া লইয়াছিলেন তিনি ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ বা পরিচালক হইবেন। প্যারী চাঁদ মিত্র হেয়ার-জীবনীতে (১৮৭৭, পৃ. ৬) এই মর্মে লিখিয়াছেন,—হেয়ার যখন রামমোহনকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি অধ্যক্ষপদ লইতে কান্স্ত না হইলে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পণ্ড হইয়া যায়, তখন উদ্বারচেতা স্বদেশকল্যাণ-কামী রামমোহন স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত হন বিদ্যালয় স্থাপনে আর কোন বাধা রহিল না। ৮ অক্টোবর ১৮৩১ দিবসীয় 'সমাচার দর্পণ'-এর একটি মন্তব্য হইতে এই বিষয়ের সমর্থন মিলিতেছে। দর্পণ লেখেন :

“আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন ন তখন তিনি এতদ্রূপ প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ে ভয়াশতাপ্রযুক্ত তাঁহার মন কিছু দুঃখী না হইয় তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদংশীয় শতং বালক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের এতদ্রূপ বিরোধে সর্বসাধারণের উপকার।” (“সংবাদপত্র সেকালের কথা” দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ৪২)

সমসাময়িক দলিল-দস্তাবেজ ও রচনাদির নজরে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে রামমোহন ইহার বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, তিনি ইহার যথেষ্ট সহায়তাই করিয়াছিলেন। রামমোহন বরাবর ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কলেজের ‘আদিকল্পক’ ডেভিড হেয়ার এবং দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় রামমোহনের নিকট হইতে এতদর্থে যে বিশেষ প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি গোড়াই কলেজ প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারের মধ্যে ছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

এংলো-হিন্দু স্কুল, শিমলা

‘সমাচার দর্পণ’ের উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, রামমোহন প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের কমিটিতে গৃহীত না হইলেও ‘ভয়াশতাপ্রযুক্ত তাঁহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।’ এই নজিরে উক্ত বিদ্যালয় ১৮১৬ সনের মাকামাঝি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া

আমরা ধৰি গা লইতে পাৰি। বিদ্যালয়টি শিমলা—জুড়ি-পাড়ায় অবস্থিত ছিল। এটি ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। শিক্ষক-দেৱ বেতন ও অন্যান্য ব্যয় ৰামমোহন স্বয়ং বহন কৰিতেন। ইংৰেজী পঠন-পাঠনাৰ ব্যবস্থা হইল প্রথম হইতেই। তবে নিজ মাণিকতলা বাগানবাড়ীতে বিদ্যালয়ের অঙ্গস্বরূপ ইহাৱ কিছু পৰে স্বতন্ত্ৰ একটী ইংৰেজী শ্ৰেণীও খুলিয়াছিলেন। ৰামমোহন মিঃ মোৱক্ৰফ্ট নামক একজনকে ইংৰেজী শিক্ষক নিযুক্ত করেন এক শত টাকা বেতনে। তাৱাচাঁদ চক্ৰবৰ্ত্তী, নলিনী মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বৰ সরকার প্রভৃতি এখানে পড়িতেন। ৰাজনारायण बन्धू लिখিয়াছেন, তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বন্ধুও ৰামমোহন ৰায়ের স্কুলে ইংৰেজী পড়িয়াছিলেন। নন্দকিশোর ইংৰেজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। তিনি দিনকতক ৰামমোহনের সেক্রেটাৰীৰ কাৰ্য্য করেন। ১৮১৮ সনের একটী বিবরণে প্রকাশ—ৰামমোহন নিজ ব্যয়ে এই স্কুল পরিচালনা কৰিতেছিলেন। এখানকার ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশ। সংস্কৃত, ইংৰেজী ও ভূগোল এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত।†

ৰামমোহন হেজুয়া পুষ্কৰীণীৰ দক্ষিণ-পূৰ্ব কোণে একখণ্ড ভূমি ক্ৰয় কৰিয়া সেখানে এই বিদ্যালয়ের জন্ম একটী গৃহ নিৰ্মাণ করেন। ১৮২২ সনে এখানে বিদ্যালয়টি নূতন পরিবেশে উঠিয়া আসে। তখন হইতে ইহা এংলো-হিন্দু স্কুল বা হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত হইতে থাকে। সাধারণ লোকে ৰামমোহন ৰায়ের স্কুলও বলিত। এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমি অন্তৰ্জ্ঞ\* প্রদান কৰিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে মাত্ৰ কিছু কিছু উল্লেখ কৰিব।

নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিবার পর বিদ্যালয়টি নবোদ্যমে ইংৰেজী শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হয়। ‘ক্যালকাটা জৰ্নালে’র সম্পাদক স্ৰাণ্ডফোর্ট আৰ্নটকে ৰামমোহন এংলো-হিন্দু স্কুলের ইংৰেজী শিক্ষক নিযুক্ত কৰিলেন ১৮২৪ সনের জুন মাসে। কিন্তু তাঁহার উপরেও সরকারের কোপদৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে প্রেস-অভিভাঙ্গ বলে এদেশ হইতে নিৰ্বাসিত করা হইল। ইহাৱ পূৰ্বে ৰামমোহনের ভাগিনের শুক্লাদাস মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কতিপয় বাঙালী ভক্তলোক ১৮২৪ সনের ১৩ই অক্টোবর সরকারের নিকট এই আদেশ রদ কৰিবার জন্ত একখানি আবেদন প্রেরণ করেন। এদেশে ইংৰেজী শিক্ষাৱ প্রসাৱকল্পে যে আৰ্নটের মত লোকের একান্ত আবশ্যক তাহাই ইহাতে প্রতিপাদন করা হয়। কিন্তু এই আবেদনে কোনও ফল ফলে নাই, আৰ্নট নিৰ্বাসিত হইলেন। এই বিদ্যালয়ের ‘ভিভিটর’

বা পরিদৰ্শক পদে কাৰ্য্য করেন ৰামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এডাম। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পরিদৰ্শক ছিলেন একজন বাঙালী। এডাম বিদ্যালয়ের উন্নতিৰ জন্য যে-যে পন্থা অবলম্বন কৰিতে চাহিতেন তাহাতে তিনি বাধা দিতেন। অথচ ৰামমোহন তাঁহাকে কৰ্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাৰণ তিনি বাঙালীদেৱ মধ্যে প্রভাবশালী ও জনপ্ৰিয় বলিয়া প্ৰসিদ্ধ ছিলেন। এডাম বিরক্ত হইয়া ১৮২৮ সনে ভিভিটরের পদ অগত্যা ত্যাগ কৰিলেন।

এডাম ১৮২৭ সনে যে ৰিপোর্ট দেন তাহাতে বিদ্যালয়টির শিক্ষক, ছাত্র ও পাঠ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তখন এখানে দুই জন শিক্ষক ছিলেন—এক জনেৱ মাসিক বেতন দেড় শত টাকা, দ্বিতীয় শিক্ষক পাইতেন সম্ভৱ টাকা। খ্ৰীষ্টতত্ত্ব এখানে শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তবে সম্বন্ধে নীতিশিক্ষা দানেৱ ব্যবস্থা ছিল। খ্ৰীষ্টধৰ্ম্মেৱ ইতিহাসেৱ দিক্‌টা অবশ্য শেষানো হইত। কিছুকাল যাবৎ বিদ্যালয়েৱ প্রশান শিক্ষক ছিলেন প্ৰসিদ্ধ শিক্ষাত্ৰতী জন আলেকজান্ডার টৰ্নগ্ৰু। বিদ্যালয় অবৈতনিক ছিল এবং দ্বিৱ্ৰ গৃহস্থেৱ সম্ভানগণই এখানে পড়িতে আসিত। তথাপি কোন কোন গিৱ্‌শালী ব্যক্তিৱ ছেলেৱাও যে এ বিদ্যালয়ে না পড়িত তাহা নয়। উদাহরণ-স্বরূপ বিদ্যালয়েৱ অন্ততম পূৰ্ণপাঠক দ্বাৱকানাথ ঠাকুৱ তাঁহাৱ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৱকে এই বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে ভৰ্ত্তি কৰিয়া দিয়াছিলেন। ১৮২৮ সনেৱ বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৱ বিবরণ প্রদানকালে ‘বেঙ্গল ক্ৰনিকল’ (১০ জানুৱাৰী ১৮২৮) এই বিষয়টিৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিয়া লিখিলেন :

“To the intelligent observer it must have also been an additional source of gratification to notice among the scholars several of the children of the native gentlemen who contribute to the support of the school, in no respect distinguished from those who receive their education gratuitously.”

ছেলেৱা যে ইংৰেজী পাঠে বিশেষ উন্নতি কৰিতেছিল বাংসৱিক পৰীক্ষাশুলিতে তাহাৱ প্ৰমাণ পাওয়া হাইতে লাগিল। ১৮২৯ সনেৱ ফেব্ৰুৱাৰী মাসে অনুষ্ঠিত বাংসৱিক পৰীক্ষায় অনেকে কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন করেন। ইহাদেৱ মধ্যে তৃতীয় শ্ৰেণীতে দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৱ এবং ৰামমোহন-পুত্ৰ ৰমাপ্ৰসাদ ৰায়েরও নাম পাইতেছি। এই বৎসরেৱ পৰীক্ষাৱ বিবরণ দিতে গিয়া ‘ক্যালকাটা গেজেট’ সংবাদপত্ৰ (২৮শে ফেব্ৰুৱাৰী ১৮২৯) বিদ্যালয়-প্ৰতিষ্ঠাতা ৰামমোহনেৱ ভূয়সী প্রশংসা করেন। ‘গেজেট’ অংশতঃ লেখেন :

“It becomes us to state here that although the Anglo-Indian school is partly assisted by public contributions, yet the greater portion of its expenses

\* ৰাজনारायण बन्धू आच्छरित, পৃ. ৭

† ৰবেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়েৱ পূৰ্বোক্ত প্ৰবন্ধে উক্ত অংশৰ মৰ্ম।

‡ The Modern Review for September, 1951, p. 229-30.

is paid by one of the most liberal and enlightened of native gentlemen—one whose name has been long before the world, whose talents are surpassed by his worth only, and whose efforts to ameliorate the intellectual condition of his countrymen, can never be too highly appreciated. As the founder of the institution, he takes an active interest in its proceedings, and we know that he is not more desirous of anything than of its success, as a means of effecting the moral and intellectual regeneration of the Hindoos. We were sorry to learn that indisposition prevented his witnessing that success yesterday; but whatever may be his state, he must feel the satisfaction that every benevolent mind enjoys for having been useful to mankind,—and it must always be to him a pleasing prospect that when millions yet unborn shall hail the return of knowledge to this country, they will associate that circumstance with the name of Rammohun Roy.”

এই উদ্ধৃতিতে রামমোহনের কৃতিত্বের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিবার পর বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যৎকালের জ্ঞানামূলক পুনঃপ্রবর্তনের নায়করূপে রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য থাকিবে। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর ইহার পরিচালনার ভার প্রধান শিক্ষক পূর্ণ মিত্রের উপর ব্রহ্ম হয়। সাধারণের নিকট ইহা তখন পূর্ণ মিত্রের স্থল বলিয়াও পরিচিত হইতে থাকে। ১৮৩৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার নাম হয় ইণ্ডিয়ান একাডেমি। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ও সাময়িক পুস্তকে এই বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৪১ সন পর্য্যন্ত। ক্রমে এটি অবৈতনিক হইতে বৈতনিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এখানে তিনি প্রথম ইংরেজী পড়িয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ‘ভিক্টর’ পদ ত্যাগ করিলেও উইলিয়ম এডাম বরাবর ইহার সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াছিলেন। এখানকার প্রাক্তন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি ১৮৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে ‘সর্বভূমি লিপিকা সভা’ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানকার কর্মসূচী একমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। রামমোহনের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যে প্রকৃত নীতিমূলক জাতীয় শিক্ষা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের ইংরেজীবাদ হইয়াও বাংলা ভাষার অমূল্যত্বের আশ্রয় তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

#### লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট পত্র

রামমোহন জাতির উন্নতির নিমিত্তই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও অমূল্যত্বের উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে তিনি ইহা হইতে দূরে সরিয়া যান; তাহা একান্ত নহে

যে, তিনি অতঃপর ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী আর ছিলেন না, বরং তিনি যে জনসাধারণের মধ্যে ইহার সম্যক প্রচলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তৎকর্তৃক এংলো-হিন্দু স্কুল নামক অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রামমোহনের উক্ত অভিমত লর্ড আমহার্ষ্টকে ১৮২৩ সনের ১২ই ডিসেম্বর লেখা তাঁহার পত্রখানিতে সুব্যক্ত। তখন সরকার কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রামমোহন উক্ত পত্রে পরিষ্কারই লিখিলেন যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার কোনই আবশ্যিকতা নাই, পরন্তু তখন দেশভাস্তরে যে সকল চতুষ্পাঠী বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের অর্থসাহায্য করিলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সরকার অর্থব্যয় করিয়া এইরূপ একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা মধ্যযুগীয় সংস্কারকে জীয়াইয়া রাখিতেই সহায়তা করিতেছেন। তাহার ফলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া উহা দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকিবে না। বরং এই অর্থ প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যয় না করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের অমূল্য নূতন পদ্ধতি, অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার খাতে ব্যয় করিলে আমরা বিশেষ লাভবান হইব। পত্রখানির একটি প্রধান অংশ এই :

“If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with the necessary books, instruments, and other apparatus.”

এখানে শিক্ষার বাহনের কথা বলা হয় নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে পাশ্চাত্য উদার শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের কথা স্পষ্ট করিয়াই উক্ত হইয়াছে। যোগ্য ইউরোপীয় শিক্ষকের দ্বারা এই পদ্ধতির প্রবর্তন মানে যে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। অকশ্যত্র, পরার্থবিদ্যা, রসায়ন, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা প্রভৃতি এই ভাষার মারকতাই আমা-



দিগকে আয়ত্ত কৰিতে হইবে। তিনি এই পত্ৰে সরকারকে সনিৰ্ভৰ অমুরোধ জানান যে, সরকারী অৰ্থে যোগ্য ইউৰোপীয় অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিদ্যার অনুশীলনোপযোগী পুস্তক এবং যন্তপাতিও আমদানী করা কর্তব্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিলাত হইতে বিজ্ঞানশিক্ষার বকমারি যন্তপাতি লণ্ডনস্থ ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নিজ অৰ্থে ক্ৰয় করিয়া এদেশে এই সময় পাঠাইয়াছিলেন। ৰামমোহন এ বিষয় অবগত ছিলেন কিনা জানা যায় নাই। তবে তিনি সরকারকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া স্বকর্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে অমুরোধ জানাইলেন।

ৰামমোহনের এই পত্ৰখানির উত্তর দেওয়া বড়লাট সমীচীন মনে করেন নাই। তবে তিনি নব-নিযুক্ত শিক্ষা-সভার উপর ইহার উত্তরদান বা যথাবিহিত করিবার নির্দেশ দিয়াই নিরস্ত থাকেন। শিক্ষা-সভাও ৰামমোহনের মতামত গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা সরকারকে জানাইলেন যে, ৰামমোহন সৰ্বকোশলে স্বদেশবাসীর মুখপাত্ৰ সাজিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা নহেন; কাছেই হিন্দুপদ্ধতির বদলে পাশ্চাত্যপদ্ধতির প্রবর্তনে তিনি যে হিন্দুসাধাৰণেরই মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা আদৌ বলা যায় না। কিন্তু ইহার বার বৎসর পরে সরকারই ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন ধৰ্ম্মা করিয়া প্রকৃতিবাহিনী ৰামমোহনের কথাই মানিয়া লইয়াছিলেন। পত্ৰখানির অংশবিশেষের মৰ্ম্ম প্রদান করিয়া ‘প্ৰবন্ধক’ ছদ্মনামে সুপণ্ডিত শ্ৰীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন :

“হিন্দু পণ্ডিতের অধীনে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র পূৰ্বাবধি প্রচলিত ব্যাকরণের ক্কিকা ও দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার মাত্র ছাত্রদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিবে, বাহা ব্যক্তি বা সমাজের কোন কাজেই লাগে না। ১২ বৎসর ধরিয়া ব্যাকরণ পড়া, কিংবা পূৰ্বোক্ত-ব-নীমাংশাশাস্ত্রের আশ্রয়ত্ব, মার্যবাদ ও বৈধহিংসাদি নিরর্থক বিচারশিক্ষা অথবা জ্ঞানশাস্ত্রের পদার্থ-বিভাগ ও সম্বন্ধতত্ত্ব আয়ত্ত করা চিন্তাবৃত্তির কোন প্রকার উৎকর্ষ বিধায়ক ত নহেই, কেবল অজ্ঞানান্ধকারে দেশকে আবৃত্ত করিয়া বাধার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রচৈতন্যের উন্নয়নচক এই বিশেষণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উজ্জ্বল প্রতিভা যে চিরন্তন প্রণালীতে প্রবহমান ছিল তাহা রাষ্ট্রচৈতন্যের অত্যন্ত বিরোধী—আদি রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা ৰামমোহন কঠোর ভাষায় ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার দীৰ্ঘ পত্ৰের এই প্রধান মন্তব্য উইলসন প্রমুখ ইংরেজ প্ৰভুর চিন্তে যে গৃঢ় ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল, ৰামমোহনের প্রতি তাঁহাদের প্রমুখ ভাষাতেই তাহা ধরা পড়ে।”\*

এখানে স্বরণ রাখা আবশ্যক, ৰামমোহন কখনও সংস্কৃত-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, সংস্কৃত বা প্রাচীন পদ্ধতিতে (Sanskrit system) শিক্ষাদানেরই বিরোধিতা করিয়াছেন। দীৰ্ঘকাল পরাবীন থাকিবার পর ভারতবাসীর মনে রাষ্ট্রচৈতন্য তথা স্বাধীনতান্ধুহার উন্মেষের পক্ষে যে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন একান্ত আবশ্যক তাহা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াই এতাদৃশ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

• ডাক সাহেবের স্থল

উক্ত বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়াই ৰামমোহন ড. আলেক-জাণ্ডার ডাককে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮২৪ সনে কলিকাতাস্থ চার্চ অফ স্কটলণ্ডের পাদ্রী ডক্টর ব্রাইস শিক্ষাসম্পর্কে বিলাতস্থ চার্চ-কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত আবেদনে ৰামমোহনের মতামত জ্ঞাপন করেন। এই আবেদনে ৮ই ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখে ৰামমোহন-প্রদত্ত একটি মন্তব্য জুড়িয়া দেওয়া হয়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, লর্ড আমহার্ণ্টকে পত্ৰপ্রেরণের মাত্র তিন দিন পূর্বে ইহা লেখা। মন্তব্যটি এই :

“As I have the honour of being a member of the congregation meeting in St. Andrew's Church (although not fully concurring in every article of the Westminster Confession of Faith), I feel happy to have an opportunity of expressing my opinion that, if the prayer of the memorial is complied with there is a fair and reasonable prospect of this measure proving conducive to the diffusion of religious and moral knowledge in India.”\*

ৰামমোহন বিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষাকে ধৰ্ম্ম ও নীতির উপর ভিত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন। এ কারণ হিন্দু কলেজের শিক্ষাদান রীতির উপর তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। নিজের বিদ্যালয়ে ইহার অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। ধৰ্ম্ম ও নীতির উপর ভিত্তি করিয়া স্কটিশ পাদ্রীগণ যখন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী হইলেন তখন তাঁহাদিগকে তিনি সানন্দে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি একাধিক বার বলিয়াছেন, বাইবেল পাঠ করিলেই আমবা খ্রীষ্টান হইয়া যাইব না। প্রত্যেক ধৰ্ম্মেরই সারতত্ত্ব ও মূল-নীতির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ কারণ আলেকজাণ্ডার ডাক ১৮৩০ সনে কলিকাতায় আগমনান্তর ৰামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাকে সকল প্রকারে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সময় ডাকের জীবনীকার ধৰ্ম্মের

\* “ৰামমোহন ৰায় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ”—শনিবারের চিঠি, পৌৰ ১৩৫৫, পৃ: ২৩৮।

\* ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূৰ্বোক্ত প্রবন্ধের পাদটীকায় উক্তত।



ভিত্তিতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রামমোহন যে মতামত ব্যক্ত করেন তাহা সংক্ষেপে এরূপ বিবৃত করেন :

"All true education, the reformer emphatically declared, ought to be religious, since the object was not merely to give information, but to develop and to regulate all the powers of the mind, the emotions, and the workings of the conscience. Though himself not a Christian by profession he had studied the Bible, and declared that, as a book of religious and moral instruction it was unequalled. As a believer in God he also felt that everything should be begun by imploring His blessing."

ইহার পর ডাক্তার জীবনীকার এই গম্ভীর সিদ্ধিগ্রহণ করেন যে, রামমোহন বলেন, তিনি বেদ, কোরাণ, বৌদ্ধ ত্রিপিটক পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু বাইবেলের "Lord's Prayer"-এর মত সকল দিক দিয়া উৎকৃষ্ট একটি প্রার্থনা কোথাও পান নাই। কাজেই ডাক্তার প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে কার্য্যারম্ভের পূর্বে এই প্রার্থনাটি পঠিত হইলে আপত্তিঃ কারণ থাকিবে না। রামমোহন বাংলা, ফার্সি, আরবি বা সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষাদান না করিয়া ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

ডাক্তার স্কুল বাঙ্গালী পরীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কারণ বঙ্গসন্তানদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়ানো উচিত শুনিয়া অভিভাবকগণ ছেলেরের তো এখানে পাঠাইবেন না। এই অবস্থায় রামমোহনের সাহায্য বিশেষ দরকার। তিনিও স্বতঃপ্রসূত হইয়া স্কুল-স্থাপনে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তখনও ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ (যাহা এখনও বিদ্যমান) প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মেছুয়াবাজার ও চিংপুরের মোড়ে জোড়াসাঁকো পরীতে অবস্থিত রামকমল বসুর (ফিরিঙ্গি কমল বসু-নামে সর্বত্র পরিচিত) গৃহ ভাড়া করিয়া সেখানে ব্রাহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিত। রামমোহন এই গৃহের একটি খর কিছু ভাড়ায় ডাক সাহেবের স্কুলের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তিনি ডাক্তার স্কুলে ছেলেরের পাঠাইতে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ করিলেন। বিদ্যালয় যে অবৈতনিক তাহা বলাই বাহুল্য।

রামমোহনের উপস্থিতিতে ১৮৩০ সনের ১৩ই জুলাই ব্রাহ্মসমাজের ভাড়াটিয়া বাড়ীর এক অংশে ডাক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কার্য্যারম্ভে ডাক যখন বাইবেলের অংশ পাঠ করিতে শুরু করিলেন তখন ছেলেরের মুখপাত্রস্বরূপ

একজন ইহাতে আপত্তি করিল। তখন রামমোহন তাহা-দিগকে এই বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাইবেল পাঠ করিলেই যে আমরা খ্রীষ্টান হইয়া যাইব এমন কোন কথা নাই। ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তো আর হিন্দু হন নাই। তিনি নিজে কোরাণ খুব ভাল করিয়া বার বার পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছেন? তিনি সমগ্র বাইবেল গ্রন্থও পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তো খ্রীষ্টান হইয়া যান নাই। তবে তাহারা কেন বাইবেল পাঠে শঙ্কিত হইবে? তাহারা বাইবেল পাঠ করুক এবং তাহার ভালমন্দ নিজেরা বিচার করিতে শিখুক। ইহাতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হইবে। রামমোহনের কথায় ফল হইল। ছেলেরা বাইবেল পাঠে আন আপত্তি তুলিল না। বস্তুতঃ রামমোহন যেমন সংস্কৃত পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষার নহে; তেমনি তিনি খ্রীষ্টানীর বিরুদ্ধে ছিলেন, খ্রীষ্টানশাস্ত্র অধ্যয়নের বিরোধী ছিলেন না; উভয়েরই তিনি পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর পুরা এক মাস যাবৎ প্রত্যহ তিনি ঠিক দশটার সময় বাইবেল পাঠকালে ডাক্তার স্কুলে আসিয়া হাজির হইতেন। পরেও যত দিন না বিলাত যাত্রা করেন, প্রায়শঃ তিনি বিদ্যালয়ে যাইতেন। তাঁহার বিলাত গমনের পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বাপাপ্রসাদ রায় বিদ্যালয়টির বিশেষ পোষকতা করিতে লাগিলেন। তিনিও প্রায়ই বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতেন। কোন খ্রীষ্টান পাদ্রী তখন ডাক্তার কোনরূপ সাহায্য দান করেন নাই।\* আলেকজান্ডার ডাক রামমোহনের সহায়তার কথা চিরকাল শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন।

কলিকাতা তখন ভারতের সমগ্র ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র। এখান হইতে জাতীয় উন্নতিমূলক ভাব ও কর্ম্মপ্রবাহ চারিদিকে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। রামমোহন এই শাসনকেন্দ্রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে যে আলোড়ন উপস্থিত করেন তাহা শুধু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহা ক্রমে ভারতবর্ষের অন্তর্গত অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হয়। ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষ ও রাষ্ট্রীয় চেতনার পরিপুষ্টিকরে যে ইহার প্রবর্তন আবশ্যক তাহা তিনিই সর্বপ্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মত যুগপ্রবর্তকের আবির্ভাবে বাঙালী সমাজ দ্বন্দ্ব।



বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগে য-কলা পাঠ করবার সময়ে প্যাতি, অপ্যাতি, বিখ্যাত প্রভৃতি শব্দগুলি সকলকে পড়তে হলেও, বিখ্যাত হওয়া আর ক'জনের ভাগ্যে ঘটে থাকে। প্যাতিলাভ ভাগ্যে ঘটে নি, কুখ্যাতিই লাভ করেছিলেন স্বধাসিন্ধুবাবু। তাঁর কাছে চাওয়া আর পাওয়ার দাবি স্বারা করত পারত তাদের রসনা এবং বাসনা দুইটিতেই অতৃপ্ত বেগে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি। নিজের সংসারটি ক্ষুদ্র হলেও সেই ক্ষুদ্র সংসারকে আবার থাকতে হয় এক বৃহৎ সংসারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। দেশগত উন্নয়নধিকারে পারিপার্শ্বিক বৃহৎ সংসারও কিছু দাবি করে, আত্মশীল ক্ষুদ্র সংসারের কাছে। স্বধাসিন্ধুবাবুর কাছে বিমূণ হয়ে সেই বৃহৎ সংসার তাঁকে বিখ্যাত করেছিল। সবকিছুরই শুরু আছে, সেই শুরু যখন সমাপ্তিলাভ করে তখন আরম্ভের কথা কারও মনে পড়ে না, আর সে দিন-তারিখকে স্মরণ করে লাভ কি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর? যুবক ছেলের মাকে বেশ কষ্ট করেই মনে করতে হয় আঁতুড়ে ছেলের ডাবলেশহীন মুখপানকে—হাত-দু'টা করা, কাঁদার তালের মত সেই অতি ক্ষুদ্র মানবকৃতির কথা। তথাপি স্বধাসিন্ধুবাবুর বাতীর লোকেরা ভোলে নি সেই কবেকার কথা, যখন তিনি নাকি এমন ছিলেন না। মায় জঙ্গে, পিসিমার জঙ্গে, ভাই-বোন-জীব জঙ্গে, নানান দহকারী অদরকারী জিনিস কিনে আনতেন নিজের মাইনের নগদ টাকা দিয়ে, চাইবামাত্র হাসিমুখে দিভেন সাধামত অর্থ, সকলের আশা মেটানোই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

সেদিন আর নেই, পরিবর্তন চরয়েছে তাঁদের সংসারের, পরিবর্তন হয়েছে তাঁর নিজের। পিতা-মাতা গত হয়েছেন, ভায়েরা সকলেই ভিন্ন হয়েছেন। বৃদ্ধা পিসিমাকে ভাগাভাগি করে ভাইপোদের

বাড়ী থাকতে হয়। পিসিমার আগমনের দিনটি সঙ্গে সঙ্গেই স্বধাসিন্ধুবাবুর নিজস্ব পাতায় লেখা হয়ে যায়, আর দেখা যায় ঠিক নির্দিষ্ট দিনে প্রাতঃর্মণ সেরে ফেরার পথেই বিস্মা নিয়েই এসেছেন তিনি। ঘরের জানলা থেকেই বিস্মা দেখে পিসিমা বলে উঠেন—‘চামার চামার, এক বেলা বেলা থাকলেই কি এত বেলা পেয়ে ফেলতাম আমি। মুখ নীচু করে থাকেন ননীবালা—স্বধাসিন্ধুবাবুর জ্ঞী সেই আগেকার দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে স্বামীর লজ্জার হাত থেকে নিজেকে বাঁচান।—’সত্যি দিন দিন কি যেন হচ্ছেন উনি, আগে ত এমন ছিলেন না, সবই ত জানেন পিসিমা।’

একটু ঝগড়া হন পিসিমা, নিজের পোটলা-পুঁটলি গুছাতে গুছাতে বলেন, তাই ত এই সুপাট এক সময়ে পিসিমা বলতে অভ্যস্ত ছিল। এত ত এই আশ্রিক করি, এই পঞ্চপাত্রটা ঐ সুপাট ত এনে দিয়েছিল না চাইতেই, ভেবেছিলাম বিকেলের গাড়ীতে যাব—

পিসিমার কথায় বাধা দিয়ে, চোখ বড় বড় করে স্বধাসিন্ধুবাবুর ভোট মেয়ে শোভা বলে, বাবা এনে দিয়েছিলেন! বাবাব কিছু এনে দেওয়া আজ অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।—বিস্মায় চড়ে চলে যান পিসিমা। পিসিমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে থার্ড-ক্লাশের একটা টিকিটও করে দেন তিনি, ভাগের বেলায় ভায়েরদের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তার এক-চুল এদিক-ওদিক করেন না স্বধাসিন্ধু। তবুও তিনি রূপণ, শাক, লোকে বললে আর কি করছেন তিনি। বাইরের লোকের মুখ ত আর চাপা দিতে পারেন না, কিন্তু শুধুই কি বাইরের লোক?—বাড়ী ফিরতেই ‘ছিঃ ছিঃ’ করে উঠে ননীবালা। নিজের মরণ কামনা করে সে। স্বধাসিন্ধুবাবু নীরব। সপ্তাহে

এক দিন দাড়ি কামান, আজ সেই দিন, চার বারের কামানো ব্রেডটা কাঁচের গ্লাসে ঘসে ধার দিতে থাকেন আর মৌন অবলম্বন করে নিজেকে নিরাপন্ন রাখেন।—অনর্গল বকে চলছে ননীবালা।

গালে সাবান লাগালেন সুধাসিন্ধুবাবু।

তার গালের উপরকার পুঞ্জীভূত সাবানের ফেনা দেখে, বহুকাল আগেকার হৃৎকর কথার মনে পড়ে যায় ননীবালার, কারণ হৃৎ এখন এ বাড়ীতে নিবদ্ধ। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সে আরও এগিয়ে এসে স্বামীর মূণের কাছে হাত নেড়ে বলে, বলি সবই ত বাজে খরচ, তা এই বাজে খরচটাই বা করা কেন, একগাল দাড়ি রাখলেই ত হয়, তাও দু'পগা পরসা বাঁচে, শ্রাদ্ধের খরচ জমে আমার।—আশার আলো দেখতে পান সুধাসিন্ধুবাবু। একজন বয়স্ক উকিলের পক্ষে দাড়ি রাখা মোটেই বেমানান হয় না—তারপর থেকে দাড়িই রাখলেন তিনি।

দেশের ও দেশের উন্নতির জন্তে বেদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সদরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করলেন, সকলে ধন ধন করেছিল তাঁকে। তারপর বহু দিন পরীক্ষা অপরের খুশীমতই নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতেন তিনি। প্রথম প্র্যাকটিসের যুগেও স্থানীয় দাতব্য হাসপাতালে একাল টাকা দান করেছিলেন, বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানে মোটা টাকা দানের স্বপ্ন দেখতেন সুধাসিন্ধু, কিন্তু সবকিছুই গুলট-পালট করেছিল এই বুদ্ধ। যুদ্ধের কলে চতুর্দিকে অভাব বাড়ল বখন, তখন টান ধরল চালে, কাপড়ে, খুচরা পরসার, প্রথম প্রথম চালের অভাবে পরসা দিয়েই ভিঁকা দেওয়া চলল, তারপর তারও অভাব, তারপর হ'ল ভিখারীর অভাব। এই ভাবে ত্রবোর অভাবে, কাপড়ের অভাবে কুচ্ছসাধন করে থাকা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল বতই, বাজের টাকা বাজ্রে জমতে লাগল ততই বেশী। এক দিন সুধাসিন্ধুবাবু তাঁর ছোট ক্যানব্রাজটা খুলতেই গুস গুস করে উঠল, নোটের কাগজগুলো। এতগুলো টাকা জমে গিয়েছে—এলোমেলো করে রাখা নোটগুলো কাগজের তারের মত করে শুকিয়ে, দক্ষিণ হস্তের চাপ দিয়ে বাজ্র বদ্ধ করলেন। কাঁচা টাকাগুলো ছোট একটা কাঁচের বাজ্রে রাখলেন, কেমন বেন একটু স্বস্তি বোধ করলেন টাকাগুলোর জন্তে, নিত্য আনা নিত্য পাওয়ার ঘরে কিছু বিস্ত থাকে ভাল, মনে হ'ল তাঁর। এর পর একদিন পাওয়ার সময় কাছে বসে পাখা নাড়তে নাড়তে ননীবালা জানাল যে জামা কাপড় কিছু না হলে আর চলছে না, গোকান-বাজারে ত কিছু নেই, একটু এমিক-ওমিক চেষ্টা কর।

সাবেক কালের সুধাসিন্ধু বাবু বলেন, না-না এ ত ঠিক নয়, বরং কিছু বেশীই সংগ্রহ করে রাখা ভাল, ভুবি লিট্ট কর কার কি চাই, আমি ধোঁজ করছি—ধোঁজখবর করে বখন কেনা হ'ল, দেখা গেল ক্যানব্রাজের নোটের কেতা অনেকখানিই পাতলা হয়ে গিয়েছে। মনে মনে বেদনা বোধ করলেন তিনি, বারে বারেই ক্যানব্রাজটা খুলে পরিপূর্ণ অবস্থার কথাটা মরণ করতে লাগলেন, বাজ্র হতে লাগল ননীবালার উপর, সবই বাড়াবাড়ি, এতগুলো

কাপড় জামা একসঙ্গে না কিনলেই হ'ত, কমেও ত চলার লোকে। ভাগ্যে টাকাগুলো জমেছিল, এর পর যদি আরও দাম বাড়ত—টাকা কিছু জমাই ভাল। গাঁয়ের দৃষ্টিক্রম সমিতির সম্পাদক সাহায্য চাইতে এলেন, বললেন, আপনিই ভরসা।—চিহ্নিত মুখে তাঁদের বসিয়ে ভেতরে আসেন সুধাসিন্ধু বাবু। গোটা পঞ্চাশেক দিতেই হবে। কিন্তু টাকা বার করে দেখেন তা হলে ত সবই ফুরিয়ে যাবে। পঁচিশই দেওয়া বাক, হরত এই শেষ নয়, বারে বারে দিতে হবে, কিন্তু হাতে টাকা নেবার সময় নিলেন কুড়ি টাকা, থাক পাঁচটা টাকা। এসে ভূমিকা করলেন, দিনকাল চালানোর হরবস্থা, হুন্সুলাতা—সম্মত কেনা কাপড়ের দামটা আরও একটু চড়িয়ে বললেন। সম্পাদকের সমবেদনার শাস্তি লাভ করে দেবার সময় মরীয়া হয়ে দশ টাকা দিলেন।

আপনি দশ!—অবাক হয় সম্পাদক ধীরেন দে। উপায়-হীনতার মোহাই শুনে নীরবেই চলে যায়।

বিজয়ীর আনন্দে বাকী দশ টাকা বাস্তবশী করলেন সুধাসিন্ধু বাবু। এই ভাবেই শুরু, এর পরে ছেলের জন্তে হবলিঙ্গ কিনতে গিয়ে ফিরে এলেন, কারণ সে জিনিষের তখন বা দাম হয়েছিল অত টাকা তিনি নিরে বান নি। একটা বেলা হৃৎ-বার্লিতেই চালানো হ'ল, উপায় দেখতে পেলেন তিনি, আট টাকা দিয়ে হবলিঙ্গ কেনার উৎসাহ রইল না তাঁর। তারপর থেকে, চলে যাবার মতন করেই চালাতে থাকেন তিনি; চলেই বার, আটকায় না কিছুতেই, হীয়ার বদলে জীয়ার মতন করেই চালাতে থাকেন সুধাসিন্ধু। যুদ্ধের সময়ে বহু লোকের হাতে প্রচুর অর্থ হ'ল, আর সেই অর্থ বাড়াবার, পাটাবার, রাখবার, ফিকির খুজতে উকিলের বাড়ী আসতে লাগল অনেকেরই, আর ভরে দিয়ে গেল উকিল সুধাসিন্ধু বাবুও সিদ্ধকের কোকরগুলো। তাড়াবন্দী পুরনো নোটের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, পিন-গাঁথা নুতন নোটের গুসগুসে আওয়াজ, টাকার ঝকঝকে রূপ নেশা ধরিয়ে দিল তাঁর মনে। লয়েডস আর ইস্পীরিয়ালের ছাপ মারা ছোট্ট খাতাখানার লাল দাগ দেওয়া খোপগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অঙ্কের অঙ্কগুলো দেখে বতই বুশি হতে থাকেন সুধাসিন্ধু, ততই অসুবিধা ভোগ করে তার ক্ষুদ্র সংসার ও বাইরের বৃহৎ সংসার। কিছু দিন পরে তাঁর আশা ত্যাগ করল বাইরের সংসার, কারণ বহু লোক আছে তার। মুশকিলে পড়ল তাঁর ক্ষুদ্র সংসার। বুদ্ধ মিটে গিয়েছে অনেক কাল, কোন জিনিষের অভাব নেই, বরং প্রাচুর্যের প্রভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে প্রয়োজনের অভাববিস্তার।

ননীবালা বলে, হ্যাগো পাওয়া যায় না বলে এতকাল কাটালে, এবারও কি জামা কাপড় পাবে না পূজোর মেয়ে জামাই, ছেলেরা। এবার পূজোর শাস্তিকে টাকা দেওয়া চলবে না, কাপড় জামা দিতে হবে, না হলে ওরা কি ভাববে বল দেখি।

সুধাসিন্ধু উঠলে উঠেন, কি ভাববে বল দেখি, কেন আমি কি দেওয়া বদ্ধ করেছি না কি। হুঃ, আমার বলে কিপটে। কোন

বাপ বিয়ের পর এত দিন পূজায় তত্ত্ব করেছে  
দেপাও দেখি। যত সব হয়েছে...

স্নেহ পদার্থ বিগলিত করে ননীবালা,  
তত্ত্ব করেছে বলতে লজ্জা করেছে না? বিয়ের  
পর শহরের সেরা উকিলের মেয়ের বাড়ী  
থেকে তত্ত্ব গেল—না কাপড়, না মিষ্টি, খালি  
কয়েকটা টাকা—তা কি হুঁশো চার শো—  
পকাশটা, তার পর থেকে তারও অর্ধেক  
করেছ। ওরা খুব ভদ্রলোক তাই কিছু বলে  
না মেয়েকে। এখন ছোটো নাতি হয়েছে,  
এবার কাপড়চোপড় কিনে দিতেই হবে।

—দিতেই হবে, বলি আমি কি মেয়ের  
বিয়ের সময় রেভেন্সা ষ্টাম্পের উপর সই  
করে দিয়েছিলাম নাকি? তোমাকে আমি  
স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—বতদিন ছোটো মেয়ের  
বিয়ে না হয়, ততদিন বড় মেয়ে কুড়ি টাকা  
করে পাবে, বাস—তাতে কাপড় কেন,  
জুতো কেন, যা তোমার উচ্চা।—আপন  
'মনেই বলে চালান মশুময় বাণী—কে সেট

ইদারাম যে জীকে বলেছিল ঘরের লক্ষী, সব সময়ে ত ওদের  
মাথায় ঘোরে—কি করে ঘরের পরস্যা বার করে পরের কাছে  
নাম কিনবে। শাড়ী, গয়না, তত্ত্বালাস, বার-ব্রত, পান-দোস্তা,  
খাঃ, অলক্ষী—অলক্ষী যত সব।

নিজের ভাগ্যকে দিকার দিতে দিতে চলে আসে ননীবালা...

বড় ছেলে বিকাশ বি-এ পড়বে, ভর্তির হিসাব করে টাকা দেন  
সুধাসিন্দু বাবু।

টাকা দেখে বিকাশ বলে, অনার্স নিয়ে পড়ব আমি।

—অনার্স নিয়ে পড়ব, কেন তাতে আর হুণানা হাত-পা  
গজাবে, কি কাজে আসবে অনার্স, ভারি দাম আছে বি-এ পাশের  
—তার আবার...বাও, বাও গোল করো না আর।

তত্ত্ব হয়ে ওঠে তখন মন, ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাপের দেওয়া  
টাকা, বলে ওঠে, লোকে আপনাকে যা বলে—তার চেয়ে শত গুণ  
কুপণ আপনি, চাইনে আপনার টাকা, টিউশনি করে পড়ব আমি।

ননীবালা বলে, ই্যা লোকের কাছে বলিস, মা ময়েছে, বাপ  
পড়ায় থরচ দেয় না—

অমৃত স্বাম অসুধাসিন্দু বাবু, তার চেয়ে বিধবা মায়ের  
ছেলে বললে, লোকে দয়া একটু বেশী করবে বুঝলে। আমার বলে  
চামার—যত সব হয়েছে শরু, পড়বার ইচ্ছে ত বড়, ঐ যে ছোটো  
টাকা বেশী লাগবে। যত সব হয়েছে...

ছোট ছেলে প্রকাশ, একটু গোয়ার গোছেব। বাপের কাছে  
গিয়ে বলে, পাঁচটা করে টাকা দিতে হবে আমার মাসে মাসে।

—অপরাধ?—প্রশ্ন করেন বাপ।

—পাব্লিক ব্যাডমিণ্টন ক্লাবে খেলব আমি।



—কি জানি বাপ, টাকা দিয়ে খেলা, পয়সা ছাড়া কি খেলা যায় না,  
কৈ আমরা কখনও টাকা-পয়সা দিয়ে খেলেছি বলে মনে হয় না।

স্পষ্ট কথা শুনে নীতিপথ ধরেন সুধাসিন্দু বাবু, জান এটি  
গরীবের দেশে খেলে টাকা নষ্ট করা উচিত নয়।

—কেন সাব-প্রতিষ্ঠানে টাকা দিচ্ছেন আপনি, আর তা ছাড়া  
আপনি ত গরীব নন, আপনার চেয়ে অনেক গরীবের  
ছেলেখা খেলে, আমি কেন খেলব না, আমাদের দিতে বাধ্য  
আপনি।

—বাধ্য আমি। বাঃ খাসা লেখাপড়া শিখত ত! আর দরকার  
নেই ম্যাট্রিক পাসে, লেখাপড়ায় ইন্তফা দাও।

ঘোল বংসর বয়সের সমস্ত শপ অপূর্ণ থাকার ক্রোধ গুরু বেদনার  
ফেটে পড়ে। চীৎকার করে বলে, তার চেয়ে জীবনে ইন্তফা দিলে  
আপনার ব্যাকের অঙ্কটা আর একটু বাড়ি।

ভর পেয়ে যান সুধাসিন্দু বাবু। চড়া স্বর চালালো চলে পালি  
জীর কাছে। স্বর নরম করেন তিনি—টাকা, টাকার কথা কে  
বলেছে, তোমরা খালি ওই দিকটাই দেখছ, বলি যাতে ঐ আলোয়  
খেলেলে চোখ খরাপ হতে পারে, ঠাণ্ডাও লাগতে পারে, সেটাও ত  
ভাবতে পারি আমি।

—বেশ দিনের বেলাই খেলব, ক্রিকেট, ভলিবল, এক টাকা  
টাকা লাগবে।

—কি জানি বাপু টাকা দিয়ে খেলা, পয়সা ছাড়া কি খেলা যায়  
না কৈ আমরা কখনও টাকা-পয়সা দিয়ে খেলেছি বলে মনে  
হয় না।

—খেলতেন ত হাড়ুডুডু।

—কি বললে, ক্রিকেট ভলিবল, এক টাকা—আট আনা  
টাকার কি খেলা যায় তা হল।

—কিছু না।—আরও এগিয়ে আসে  
 বাপের টেবিলের কাছে, বোঝাপড়াই করবে  
 সে আজ।

বলে—আজ্ঞা এই যে টাকা জমিয়েছেন,  
 কি হবে এ দিয়ে, কিছু কি নিয়ে বেতে  
 পারবেন।—ভাবল এইবার ঠাণ্ডা হয়ে  
 যাবেন সুধাসিন্ধুবাবু।

ঠাণ্ডাই হলেন তিনি, ছেলের পিঠের  
 উপর সম্বন্ধে ছোট একটি ধাপড় মেরে  
 বললেন, ওটা বুঝলেই ত পাগলামি সারে  
 বাবা, কিছুই নিয়ে যাব না, সবই তোমাদের  
 জগে।

শীতল হয়ে যায় গৌয়ারগোবিন্দ  
 প্রকাশ।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাংস্কার পুঁটলি  
 খুলে বসে ননীবালা। সুধাসিন্ধুবাবু যত  
 কিছু উপহারের, স্ব-ইচ্ছার বায়ের,  
 উপকারের, দানের কাহিনীর স্বপ্ন-সঞ্চয়,  
 তাই এখন একমাত্র সাংস্কার হয়ে  
 ঠাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতের ক্ষীণ আশাও মাঝে  
 মাঝে উঁকি দেয় ননীবালার মনে, হয়ত কোন দিন ভুল ভেঙে  
 যাবে, আবার ফিরে আসবে সেই সব দিন।

অতীত উকি দিয়ে যায় সুধাসিন্ধুবাবুর মনে—কত অপব্যয়ের,  
 নগদ মাহিনা পাওয়া কবকবে টাকাগুলোর কথা কাঁচা কোড়ার  
 মতই খোঁচা দিয়ে উঠে। হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া সেই অর্থের  
 সঙ্গে বর্তমান অর্থের একটা মোটামুটি হিসাব করে হাত কামড়াতে  
 থাকেন তিনি। ভবিষ্যৎ ভাবেন তিনি, কৃপণ, চামার বলে ত  
 সবাই ভানে তাঁকে। কিন্তু ওই যে মেয়ে মেয়ে করে ননীবালা, ঐ  
 মেয়েই হয়ত ছেলেপিলে নিয়ে চলে আসতে পারে একদিন।



সম্বন্ধে ছোট একটি ধাপড় মেরে বললেন, ওটা বুঝলেই ত  
 পাগলামি সারে বাবা, কিছুই নিয়ে যাব না, সবই তোমাদের জগে।

বেকার অবস্থায় বহুদিন বসে থাকতে পারে ঐ বিকাশ-প্রকাশ।  
 তাঁর অবর্তমানের পর কত দিন পেঁচে থাকতে পারে ননীবালা!  
 চিন্তায় শিউরে উঠেন তিনি। অতীতের অসাবধানতার ভগ্ন  
 অমুশোচনা করেন। নাম সুধাসিন্ধু হলেও সে নাম শ্রবণে  
 লোকের মন বিমমর হয়ে উঠে, তা হোক—তাতে তাঁর কিছুই যায়  
 আসে না, তিনি নির্দিকার, যেমন নির্দিকার হন পরমার্থের  
 সন্ধান যারা পেয়েছেন। সুধাসিন্ধুবাবুও পেয়েছেন অন্তরে  
 অমৃতের সন্ধান—পরম-অর্থে। একেই কি শ্রবীজনেরা বলেন,  
 মোক্ষলাভ।



## কেদার-বজ্রী দর্শনে

শ্রীঅসীমকুমার ঘোষ

কেদার-বজ্রীর দুর্গম তীর্থযাত্রায় আমি যে নিম্নলিখিত আনন্দ লাভ করেছি ভাষায় তার কতকটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয়। এই পথযাত্রা-কাহিনী সঙ্ক্ষে দু'একখানা বই পড়েছি এবং কোন কোন বইয়ে দেখেছি যে, ভ্রমণ-পথকে বড় ভয়াবহ করে তোলা হয়েছে যার ফলে উপরোক্ত ছুটি তীর্থই আমাদের কাছে বড় দুর্গম হয়ে আছে। এমনি একটা বোধ আমারও হয়েছিল। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গিয়েছে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। আমার ইচ্ছা হয়, বাঙালীর ছেলেমেয়েরা এক বার কেদার-বজ্রী ঘুরে আসুন, দেখে আসুন প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, প্রকৃতির মধ্য উপভোগ করুন নিকটকে, প্রেরণা জাগান অপূর্বের মনে।



অলকানন্দা গাঁকো, কীর্তিনগর

আমার গন্তব্যস্থল হ'ল কেদারনাথ ও বজ্রীনারায়ণ। ১৯৫০ সনে আমি যখন দেবাজুন, হরিদ্বার যাই তখনই মনে বাসনা জেগেছিল এ ছুটি তীর্থ দর্শন করে আসবার। দু'বছর কেটে গেল। '৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে আবার আমার মনে এই তীর্থযাত্রার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। জানি না কি এক অজ্ঞাত কারণে কেদারনাথ ও বজ্রীনারায়ণ দর্শনের ইচ্ছা খুব প্রবল হয়ে উঠল। সেই ইচ্ছাই সফল হয়েছে গত মে মাসে।

১৯শে মে রাত ন'টায় হাওড়া থেকে গাড়ী ছাড়ল। আমি যে বগীতে ছিলাম, সে বগীতে আরও দশ জন বৃদ্ধা মহিলা ও চার জন পুরুষ উঠেছিলেন। পরে অল্পসঙ্কানে জানলাম, তাঁরাও আমার যাত্রাপথের সঙ্গী। মনে সাহস বাড়ল; কারণ বাড়ী থেকে আমি একাই বেরিয়েছিলাম।

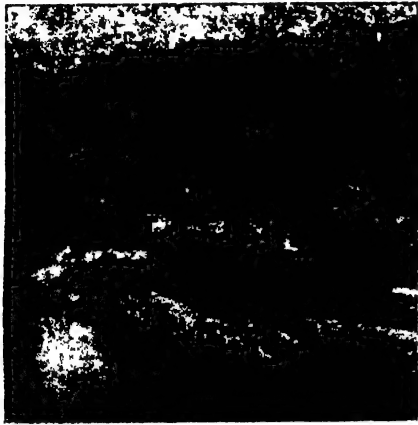
অজানা পথে সঙ্গী পেয়ে বেশ আনন্দ হ'ল। যাই হোক, ২১শে মে ভোর ছ'টার সময় আমরা হরিদ্বারে এসে পৌঁছলাম। আমরা সদলবলে পাণ্ডা পান্নালাল কুস্তকর্ণের ধর্মশালায় উঠলাম। ধর্মশালাটি বড় সুন্দর, একেবারে গঙ্গার উপর। গঙ্গার ধারে বসে স্রোতস্থিনীর দৃশ্য দেখে মনে বড় আনন্দ হয়েছিল। একদিকে গগনম্পর্শী পর্বতমালা উন্নত শিরে দণ্ডায়মান, তাদেরই পাদদেশে ধৌত করে কলকলনাদে বয়ে যাচ্ছে সুরধুনী। সে যে কি নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য, লেখনী দ্বারা তা প্রকাশ করা যায় না। হরিদ্বারে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম যে, তিনিও আমাদের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। আমরা তাঁকে সঙ্গী করে নিলাম।



রত্নপ্রসাদের হৃদয়

২২শে মে, বিকালবেলা, আমি আমার টেনের সঙ্গীদের কাছে আমার চলে যাওয়ার সঙ্কল্পের কথা বললাম। তাঁদের “গোবিন্দ”র চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে তাঁদের চোখে জল এসে গেল; ব্যাধাতুর কণ্ঠে তাঁরা আমায় প্রশ্ন করলেন, “আমাদের কেলে সত্যিই চলে যাবে গোবিন্দ? আমরা কি যেতে পারব তুমি না থাকলে?” তাঁরা এমন সহজ সরল ভাবে আমার উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন যে, তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমি যে কি অব্যক্ত বেদনা অনুভব করেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দু'চোখ-ভরা জল নিয়ে বিদায়ের সময় তাঁদের শুধু এই কথাই বলেছিলাম, “ভয় কি মা! গোবিন্দ ত সঙ্গে রইল। যদি পথে দেরি না করেন গোবিন্দের সঙ্গে আবার দেখা হবে।”

এর আগে কিছু গোড়ার কথা বলা প্রয়োজন। হাওড়ায় যখন টেনে উঠি, আমাদের বগীতে আমরা এই পনর জনই ছিলাম। আর অল্প কেউ ছিল না। কারণ বগীটা পনর জনের নিদিষ্ট করা ছিল। আমি টেনে মালপত্র শুছিয়ে রাখার পর যখন আমার নিদিষ্ট আসনে বসলাম তখন এক জন মহিল আমার জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবা, তুমি কোথায় যাব?” ইত্থান আমি ব্যস্তিলাম, “কেদার-বদ্রী।” তার



কলকাতার নিকট অলকানন্দ মন্দির

পরেই দেখি তাঁদের মধ্যে একটা চাকলাভাব এবং সকলেই বুথে প্রকল্প হাসি। খানিক পরে তাঁদের মধ্যে এক জন আমার বলাচেন, “তুমি বাব আমাদের গোবিন্দ।” তখন হলে ভগবান, তখনই এখানে আমাদের মাংসখান পাঠাবেন কেন? এই দেখ না বাব! আমাদের কত ভয় ক’ছিল, এতখানি দুর্গম পথ! কিন্তু ত্রোময় পথের পর আর ত আমাদের সে ভয় হচ্ছে না! এখন মনে হচ্ছে ঠিক তলে যেতে পারব।”

২৩শে মে, জমীকেশ এসে আমার প্রথমে ২৩ তারিখের বাসের অংশন সংরক্ষিত করে রাখলাম এবং পরে কুলি এতেন্সি আপিসে গিয়ে কুলি ঠিক করলাম। কুলিরা সাধারণতঃ এক ঘণ্টার কম মাস বহন করে না। এক মণ মালের ভাড়া সাধারণতঃ ১০০ টাকা নেয়। চুক্তি থাকে, কেদার-বদ্রী দর্শন করিয়ে বাসে তুলে দেবে। আমাদের মাল খুব বেশীই হয়েছিল, তাই আমরা একটি কুলিই নিয়েছিলাম। এক জন বাত্রীদ পক্ষে দুখানা কবল, দু’জোড়া কেউস জুতো (১ জোড়া নিলেও হয়), হাতিনটে কাপড় বা প্যান্ট, খোটা হাতিন জামা এবং এক স্ট্রট গরম পোশাক, কিছু পেটের অম্ল ও মদিকরের ওষুধ, এক শিশি মালিশ (যা কোন বাধার স্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে) একটা মগ, একটা ওগটার বটল ও একটা লাঠি যথেষ্ট।

২৩শে মে, সকাল সাড়ে ছ’টার সময়ে আমাদের বাস জমীকেশ ছেড়ে দেবপ্রয়াগের দিকে রওনা হ’ল। জমীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ চুয়াশ্লিশ মাইল। বাসে এই রাস্তা অতিক্রম করতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। দেবপ্রয়াগের রাস্তা বড় দুর্গম; পাহাড়ের বৃক অঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু পথে উঠতে প্রথমে বড় ভয় হয়। মনে হয়, বুঝি কল্পস্বপ্নন বন্ধ হয়ে যাবে। রাস্তা এত সরু যে মধ্যে মধ্যে মনে হয় ছয়-সাত ফুটের বেশী চওড়া হবে না। একদিকে আকাশচুম্বী বিরাট পাহাড়, আর এক দিকে ভূপৃষ্ঠে শঙ্ক প্রবাহিত। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে আছে আবার আনন্দের সংমিশ্রণ যা উদ্ভূত করে অকণ্ড এগিয়ে যেতে। আমরা বলা সাড়ে ত্রোয়াটার সময় দেবপ্রয়াগে এসে পৌঁছলাম। দেবপ্রয়াগে আমরা পালেকুনাথ ভাই নামে এক পাণ্ডার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে তিলাম। পাণ্ডার ভূড়িদার আমাদের বেশ হাতিবয়স করেছিল। অলকানন্দ ও ভাগীরথীর মন্দিরস্থলে দেবপ্রয়াগ অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুব উপভোগ্য। মনুভূপৃষ্ঠ থেকে দেবপ্রয়াগ ১০৯৩ ফুট উচ্চ। অলকানন্দ ও ভাগীরথীর পবিত্র সঙ্গমে গমন করে পর দিন ২৪শে মে রাত সাড়ে ত্রোয়াটার সময়ে আমরা কীতিনগরের দিকে রওনা হলাম। কীতিনগর দেবপ্রয়াগ থেকে বাইশ মাইল। আমরা বলা তিনটার সময়ে কীতিনগর পৌঁছলাম। কীতিনগর বাস বদল করে আমরা ত্রীনগর এসাম। ত্রীনগর কীতিনগর থেকে ত্রীন মাইল। ত্রীনগর পাণ্ডায় স রাজ্যের একটা বড় শহর। এখানে ভাল হোটেল ও কালীকমলী ওয়ালার দর্শনাল, এবং দম্মাশ্বলের তেলের পাম্প আছে। আমরা বাসের আপিসে অল্পসন্ধান করে কানসাম, ত্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগের বাস বেসা চারটেইর সময় ছাড়বে। তলয়েগে সেরে নিয়ে আমরা চারটেইর বাসে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে রওনা হলাম।

ত্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ কুড়ি মাইল। রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছতে আমাদের প্রায় আটটা বেজে গেল। কারণ রাস্তায় আমাদের বাস খারাপ হয়ে যায়। এই সময় বড় ভয় পেয়েছিলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল বুঝি এই দুর্গম পার্বত্য পথে প্রাজিবাঁস করতে হবে। একে কঠিন প্রস্তরাবৃত্ত পার্বত্য-প্রকৃতির ভয়াল রূপ, আবার অপর দিকে অজানা-অচেনা পথ! ভয় কিছু হয় বৈ কি! কিন্তু ভয়ের সঙ্গে আনন্দের যোগও কম ছিল না। আনন্দ হচ্ছিল নুতন অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য। রাত আটটার সময় আমরা যখন কালীকমলী ওয়ালার দর্শনালয় এসাম তখন বেধি, এত বাত্রীদ ভিড় যে অনেকে রাস্তায় শুয়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমরা দর্শনালয় সবচেয়ে ভাল ঘরটা পেলাম। এটা দেবার নিমিত্ত যেন দর্শনালয় চৌকিয়ার আমাদের জন্তই



অপেক্ষাকৰিছিল। যাই হোক, সারাদিনেৰে পৰিশ্ৰমে বড় ক্লান্ত হৈছিলোম, তাই ঘৰটি পেয়ে নিশ্চিন্ত হৈয়ে রাত কাটালোম।

কুদ্রপ্ৰয়াগে ছ'বাত্ৰি কাটাৰ পৰা আমৰা ২৬শে মে ভোৰ সাড়ে পাঁচটাৰ সময়তে হাঁটাপথে পৰম তীৰ্থ কেদাৰ-নাথের দিকে বড়না হলোম। এইবাৰ হাঁটাপথেৰে অভিজ্ঞতাৰ জ্ঞান আমৰা তৈৰি হৈয়ে নিলোম। কি ভানি, কি বক, বাস্ত! হঠাত বাপা একটু এদিক-ওদিক তলৈই ঘূৰা, ন'তৰ বাস্ত! হঠাৎ তিমালতৰ বাক দূৰপাক খাওৱা! পাৰ্শ্বতা অক্ষত কোনে তিহা হস্তব কবলৈ পাড় বাওৱা!

তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাতীত অপৰেৰ পক্ষে সম্যক উপলব্ধি কৰা অসম্ভব।

২৬শে মে আমৰা গুপ্তকাশীৰ উদ্দেশ্যে বড়না হলোম। গুপ্তকাশী কুদ্রপ্ৰয়াগ পেকে চক্ৰিশ মাইল। এখানে বিশেষধৰ ও অৰ্দ্ধনাৰীষতৰেৰে দুটি মন্দিৰ আছে। কেদাৰেৰ পথে বদল-পুৰ চটীৰ কাছে জটামাৰী, সোম্যদৰ্শন এক নাগা সন্ন্যাসীৰ দৰ্শন পেলোম—শান্তমুষ্টি, স্থিৰদৃষ্টি। আপন ননে তিনি চলে গেলেন। দেখে বড় ভাল লাগল আমাৰেৰ। প্ৰথম কৰত হোলোম, কিছু ছুঁতে দিচেন ন। ইচ্ছিত বাতৰ



গুপ্তকাশীৰ সাধাৰণ দৃশ্য



বিহাৰ মন্দিৰ, গুপ্তকাশী

দিচিছে নয়। হ'দিন ধৰে হোট গুপ্তকাশী চলে এলো। পাত্ৰ বেশ প্ৰস্তুত পাড় যাবাৰ কোন কাৰণ নেহা। তা একটু পানৰ ছাড় অজ্ঞ হস্ত চাখ পাড় নি। বিপদ যাবাৰও কোন ভয় নাই, কাৰণ পথটো একটাই। কুদ্র প্ৰয়াগ পেকে কেদাৰনাথ মাত্ৰ অষ্টচক্ৰিশ মাইল। ভাৰতও প্ৰাণটা আনন্দ নেচে ওঠে! আৰ মাত্ৰ ৪৮ মাইল! যাৰ দৰ্শনেচ্ছায় দূৰত্বাড়া হৈয়ে মাইলৰ পৰা মাইল কত চড়াই উৎসাহ অতিক্ৰম কৰে অপৰিসীম আনন্দ এগিয়ে যাচ্ছি, এবাৰ তাঁত দৰ্শন পাব। অন্তৰ নেচে উঠল। নিস্তক প্ৰকৃতিৰ অন্তৰাল থেকে কাৰ মন্থৰ আনন্দ যেন বায়ুতৰে ভেসে আস, “ওহে, এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়।” কুদ্রপ্ৰয়াগ থেকে আৰ হুঁজন ভদ্ৰলোক আগাৰেৰ সঙ্গী হলেন। তাৰ মতো এক জন বাহাদুৰী, জীভূপতিবঞ্জন দাশগুপ্ত ও অপৰ জন মাত্ৰাজী জীৰ্মীলকৰ্ণ শাস্ত্ৰী। ভদ্ৰলোক হুঁজন বেশ অমায়িক। এঁরা উভয়েই লাক্কো মিলিটারী বিভাগেৰ উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰী। আমৰা এই চাৰ জন বৰাবৰ এক সজেই ছিলাম। আমৰা কয়েকজন পৰস্পৰ পৰস্পৰকে বন্ধু-ভাবে গ্ৰহণ কৰলাম। এৰ ভেতৰে যে কি মাধুৰ্য আছে

কৰলেন: সৰল্যম তিনি, সৌন্দৰ্য। ওহে সকাল আমৰা ত্ৰিগুণী ন বাগে এলোম। এখানে হৰপাৰ্শ্বতীৰ একটি মন্দিৰ আছে। প্ৰবাস আছে, এখানে ন'বাৰে সাক্ষী বেধে হৰ-পাৰ্শ্বতী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হৈছে ছিন। একটি অগ্নিকুণ্ড আছে; এটো নাকি হৰপাৰ্শ্বতীৰ বিবাহেৰ দিন থেকে জলে আসছে। ঐ দিনই আমৰা গৌৰীকুণ্ড হৈয়ে বিকালবেলায় রামগুয়াড়ীৰ আশ্ৰয় নিলাম।

গৌৰীকুণ্ড দুটি উষ্ণ কুণ্ড আছে—লোকে এখানে স্নান করে। এখানে শিলাজিৎ নামে একপ্ৰকাৰ ঔষধ পাওয়া যায়। পাহাড়ীৰ এই ঔষধটি পাহাড়ের উপৰ থেকে সংগ্ৰহ করে। গুৰ'বাল, এটা একপ্ৰকাৰ পাহাড়ের ঘাম। এ ছাড়া এখানে বাঘ ও হরিণের হাল এবং যুগনাভি পাওয়া যায়। রামগুয়াড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ন'হাজাৰ ফুট উঁচু। এখান থেকে কেদাৰনাথ তিন মাইল। রামগুয়াড়া থেকে কেদাৰ-নাথ পৰ্য্যন্ত বাস্তা বেশ চড়াই। মগুয়া তিন মাইল বাস্তা—প্ৰায় চাৰ হাজাৰ ফুট উঁচুতে উঠতে হয়। কেদাৰেৰ পথে এই বাস্তাটা বড় ক্লেশদায়ক। এ ছাড়াই পথ অতিক্ৰম করতে নিশ্বাস-প্ৰশ্বাসেৰও কষ্ট হয় ষানিকটা। যা হোক,

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে যে তৃপ্তির আনন্দ পাওয়া যায় সে-  
তুলনায় পথের কষ্ট কতটুকুই বা! কেদার পৌছতে আর  
দেরি নেই বেশী। ভারতে মনে এক অভূতপূর্ব শিহরণ  
আগে! তুষারমণ্ডিত ঐ যে হিমগিরি, সূর্য্যাকিরণ প্রতিফলিত  
হয়ে যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, ঐ কি সেই বিরাট,  
সেই অসীমের মাধার কিরীটচ্ছটা! এই কি শ্যানমোনী মহা-  
যোগীর প্রগাঢ় স্তব্ধতা! তাই বুঝি আরাধ্য হিমালয়ের  
বুকে শঙ্করের আবাস খুঁজে পেয়েছিলেন। সব যেন পরিত্যক্ত  
হয়ে যাচ্ছে। কানের কাছে বাজতে লাগল বিশ্বকবির  
সেই মহান সঙ্গীত “সীমার মত অসীম ভূমি বাজাও আপন  
সুর।”



মন্টাকিনি

৩১শে মে বেলা দশটার সময় আমরা কেদারনাথে  
পৌঁছলাম। কেদারনাথের দৃশ্য কি অপূর্ণ! তিন দিকে  
তুষারমণ্ডিত স্তবিশাল গিরিশ্রেণী যেন আকাশ ভেদ করে  
মহাশূন্যে চলে গিয়েছে। সেই তুষারাবৃত গিরিসমূহের উপর  
আলোকচ্ছটা পড়ে মনোরম শ্রীধারণ করেছে। যেন মনে  
হয় রক্ত-পাহাড়ের বেরা কেদারনাথ, আর তার পাশ দিয়ে  
বয়ে যাচ্ছে শ্রোতবিনী মন্টাকিনি দেবতার চরণামৃত নিয়ে।  
আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত কেদারনাথ দর্শন করলাম। ভগবান  
তাঁর স্তম্ভ ভীষকে আকার দান করেছেন। তাই মানুষ ক্ষুদ্র  
প্রস্তরখণ্ডে আবদ্ধ করে রেখেছে পরমপুরুষকে। আমিও  
পরম ভক্তিতরে কেদারনাথ দর্শন করলাম। পূজাদি ও  
দর্শনাদি শেষ করে আমরা পাণ্ডা বিশেষপ্রসাদ বিভাধর-  
প্রসাদ স্তব্ধের বাড়ীতে উঠলাম। আহার ও বিশ্রামের পর  
সন্ধ্যার প্রাকালে আমরা আবার মন্দিরে গেলাম সন্ধ্যারতি  
দেখবার বাসনা নিয়ে।

কিন্তু এ কি! সে দৃশ্য কোথায়? এবার প্রকৃতির

আর এক রূপ দেখতে পেলাম। অন্তগামী সূর্য্যের কনক-  
কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে সমগ্র তুষারশৃঙ্গে এক অপূর্ণ অন্তি-  
বাক্তি ফুটে উঠেছে। মন স্থির করে কিছুক্ষণ আত্মস্থ হবার  
প্রয়াস পেলাম। কি যেন ভাবতে গিয়ে সব স্তলিয়ে যেতে  
লাগল। নিঃশব্দে আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে মন্দির-  
প্রাঙ্গণে চলে এলাম। সেখানে দেখি মন্দিরের পুরোহিত  
মহাভারত পাঠ করছেন, আর অগণিত মানুষ নিঃশব্দে শ্রবণ  
করছে তাঁর পাঠ। আমরাও বসে গেলাম তাঁদের মা-  
খানে।

সন্ধ্যারতি সকলের সামনে হয় না। কত নরনারী  
মহাভারত পাঠান্তে অপেক্ষা করছে মন্দিরের প্রধান তোরণ-  
দ্বারে ভগবানের শূঙ্কর-রূপ দর্শন করবার জন্য, আর আমরা  
মন্দির প্রদক্ষিণ করে চারিদিককার সৌন্দর্য্য উপভোগ করছি,  
এমন সময় মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শুলে প্রধান পুরোহিত প্রবেশ  
করলেন এবং আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম। বেশ ভাল  
করে ভগবানের শূঙ্কর-রূপ দর্শন করে বেরিয়ে আসার  
পর প্রধান-দ্বার খুলে দেওয়া হ'ল। কেদারনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে  
১১,৭৫০ ফুট উঁচু।

আমরা যখন পাণ্ডার বাড়ীতে ফিরে এলাম, তখন বেশ  
রাত্রি হয়ে গিয়েছে। কেদারনাথে থাকার জিনিস তৈরী  
পাওয়া যায় না। আমরা কিছু পুরী, তরকারি খেয়ে সে-  
বাত্রে মত পাণ্ডাপ্রদত্ত রূপে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি কাটিয়ে  
দিলাম। কেদারনাথে তখন বেশী শীত ছিল না। আমাদের  
এখানে পোশ-মাঘ মাসের চেয়ে কিছু বেশী।

১লা জুন সকাল সাতটার আমরা বজ্রীনারায়ণের দিকে  
রওনা হলাম। কেদারনাথ থেকে বজ্রী যেতে হলে ঐ  
রাস্তায় তেইশ মাইল নেমে এসে নালাচটা নামে এক জায়গা  
থেকে বজ্রীর রাস্তায় যেতে হয়। কেদার থেকে বজ্রী এক  
শ' এক মাইল। কেদারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভেতর  
থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে আসতে আমাদের বড় কষ্ট হ'ল।  
যতদূর দেখা যায়, আমরা ফিরে ফিরে কেদারনাথকে দেখতে  
দেখতে নেমে এলাম।

কেদার, বজ্রীর অধিবাসীরা অর্থাৎ গাড়োয়ালরা বড়  
দরিদ্র। যখন যাত্রীরা তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যায়, তখন  
ছোট ছোট গাড়োয়াল ছেলেমেয়েরা, এমন কি বড় বড়  
মেয়েরাও, “শেঠজি, পাই পরসা, শেঠজি, এক পাই পরসা”  
করতে করতে তাদের সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত বাবে; তবে  
“পরসা নেই” বললে আর তারা চায় না। গাড়োয়ালদের  
প্রধান উপভোগ্য চাষ। চাষ এখানে দেখবার মত জিনিস।  
সমস্ত কেদারের রাস্তায় দেখা যায়, পাহাড়ের উপর থেকে  
নীচে পর্য্যন্ত যেন সোপানশ্রেণী। এই সোপানশ্রেণীর সমতল

জায়গায় চাষ করে এরা। এরা খুব পরিশ্রমী। গাড়োয়াল মেয়েরাও বড় বড় বোবা পিঠে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে অক্লেশে ঘোরাফেরা করে।

আমরা যখন নালাচটীর কাছাকাছি এসেছি তখন “এই ত আমাদের গোবিন্দ” বলে একটা আওয়াজ কানে আসতে চেয়ে দেখি, এক চায়ের দোকানে আমার সেই টেনের স্বাক্ষরীরা বসে চা পান করছেন। আমাকে দেখে তাঁদের কি আনন্দ! আমাকে ঘিরে কত প্রশ্ন! একজন বললেন,



কেদারনাথের নিকটে তুঙ্গ-প্রস্থ

“বাব! তুমি ত ঘুরে এলে; আমরা যেতে পারব ত?” আর একজন বললেন, “আর কত দিন লাগবে পৌঁছতে? আবার তেঁমার সঙ্গে দেখা হবে বাবা!” আমি তাঁদের অভয় দিয়ে বললাম, নিশ্চয় পারবেন, এই ত শেষ করে এনেছেন। আর দিন দুই হাটলেই পৌঁছে যাবেন। প্রায় আশ ঘণ্টা কথাবার্তার পর আবার বিদায়ের পালা। বুড়ারা আমার মাতৃস্থানীয়া। তাই তাঁদের বাৎসল্য আমাকেও আকুল করে তুলেছিল। সজল চোখে পরস্পরের দৃবদ্বের ব্যবধান দেখতে দেখতে দৃষ্টির আড়ালে এগিয়ে এলাম।

৩রা জুন আমরা উধীমঠে এলাম। শীতকালে (অর্থাৎ মহালয়ার পর থেকে) যখন কেদারনাথে বরফ পড়ে, তখন এই উধীমঠে কেদারনাথের পূজা হয়। কেদারনাথ ছ’মাস বন্ধ থাকে, আবার অক্ষয়তৃতীয়ার কাছাকাছি খোলা হয়। ৪ঠা জুন, আমরা তুঙ্গনাথ পৌঁছলাম। তুঙ্গনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২,০৭০ ফুট উঁচু। কেদারনাথের মধ্যে তুঙ্গনাথের উচ্চতাই বেশী। এখানে একটি শিবের মন্দির আছে। তুঙ্গনাথকে তৃতীয় কেদার বলা হয়। তুঙ্গনাথ একটা পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত; তাই তুঙ্গনাথ থেকে হিমালয়ের দৃশ্য খুব চমৎকার দেখায়। যেন মনে হয়, হিমালয়ের সমান উচ্চতায় উঠে

গিয়েছি; বহু পাহাড় অনেক নীচে মনে হয়। আমাদের চূর্ভাগ্য, সেদিন এত মেঘ করেছিল যে, তুঙ্গনাথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে পারি নি। আমরা পূজা, দর্শনাদির পর বেলা দেড়টার সময় ভুলোকণা চটীতে এসে পৌঁছলাম। সেদিন আমাদের খুব পরিশ্রম হয়েছিল; তুঙ্গনাথ থেকে নামবার সময়ে খুব উৎরাই পেয়েছিলাম। জায়গায় জায়গায় এত ঢালু যে, মনে হয় গড়িয়ে পড়ে যাব। তুঙ্গনাথ থেকে নামবার পথটা শঙ্কাজনক হলেও একত্রে সবাই মিলে হৈ হৈ করে নামতে বেশ আনন্দ হচ্ছিল। পথটি বেশ উপভোগ্য।



অগস্ত্যমুনির মন্দির

এই জুন আমরা গোপেশ্বর হয়ে লালসান্ধা বা চামোলি এসে পৌঁছলাম। আমরা চামোলিতে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা পাঁচটা কি ছটা হবে। এখানে এক হোটেলের মিঃ এস. এস. কর বলে এক ভক্তলোকের সঙ্গে আলাপ হ’ল। তিনি বর্ম্মাশেলের রিটার্ডেড চীফ ল’ অফিসার; কলকাতায় থাকেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু’জনে বেরিয়েছিলেন তীর্থ-দর্শনেচ্ছায়। নগরের কোলাহল, মানুষের স্বার্থপরতা থেকে দূরে, বহু দূরে এক শান্ত সুন্দর প্রকৃতির কোলে ভক্তলোক ও তাঁর স্ত্রী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের আপন করে নিলেন। সেই সঙ্গে আমাদের দল আরও ভারী হ’ল। রান্না-খাওয়ার ভার তাঁরাই নিলেন। শুধু তাই নয়, দু’বেলা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতেন কর-গৃহিণী। কেদার-বজ্রীর পথে প্রধান ষাটজন্ম হ’ল—চাল, ডাল, আলু, আটা, ঘি, তেল, কয়েক প্রকার মশলা, দুধ ও জিলাপী। বজ্রীর পথে দুধ পাওয়া দুস্কর। যদিও পাওয়া যায়, দুধুলা। সমস্ত চটীতেই এইরকম ষাটজন্ম ও রান্নার সরঞ্জাম পাওয়া যায়।



অগস্ত্যমুনির আর একটি মন্দির

চামোলি বেশ বড় শহর। পাশ দিয়ে অলকানন্দা বয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার মত। চামোলি হ'ল বজ্রী থেকে কেদার যাবার পৃথক পথ। আমার মতে যারা বজ্রী হয়ে কেদার যান, তারা ভুল করেন। কারণ বজ্রী হয়ে কেদার যেতে হলে পথে প্রায় দশ-পনের মাইল দাস্তা; টানা চড়াই ভাঙতে হয়। এতে কষ্ট হয় অত্যধিক। যারা শুধু বজ্রী যেতে চান তারা কোটদ্বার থেকে টানা বায়ে চামোলি যেতে পারেন। চামোলি থেকে বজ্রীনারায়ণ মাত্র আটচল্লিশ মাইল। ৬'এক বৎসর হ'ল চামোলি থেকে আরও দশ মাইল এগিয়ে বাস পিপুলকুঠি পর্যন্ত যাচ্ছে। পিপুলকুঠি থেকে হাঁটাপথে বজ্রীনারায়ণ সাঁই ত্রিশ মাইল মাত্র।

ক্রমঃ

## ঈশ্বর

শ্রীশৌরানন্দনাথ ভট্টাচার্য্য

বাক্মনেরি নও ত গোচর হয় না তোমার বিজ্ঞপণ  
বৈজ্ঞানিকে পায় নি নাগাল বিজ্ঞানে,  
বাণী তোমার করতে গিয়ে চিন্তার ত'ল পক্ষাঘাত  
বস্তবাদের বুদ্ধি?—তাদের থিক্ জ্ঞানে?  
মন্তব্যেরি মধ্যে যারা মনস্বী ও মহাপ্রাণ  
আকাশসম অসীম তাদের মন-গগন,  
মনের গতির স্থল তলায় প্রজ্ঞালোকের দর্পণে  
তোমার তারা নাগাল পেল চিবন্তন!

চর্চায় তোমার স্পর্শ পেয়ে ঈর্ষ কি স্থল তাদের মনে  
জানলো তোমার সত্তা 'তরাই ঠিক করি',  
উর্দ্ধে অধে মধ্যে পাশে সর্ব পদমাধুর মাঝে  
অবস্থিতি তোমার যে সব দিক্ ভরি'।

তখন তাদের তৃষ্ণ আরও জাগলো মনে দেখতে তোমায়  
তোমার কোনও সত্যিই আছে রূপ কিনা?  
মন ভেদিয়া তখন তারা আশ্চর্য হ'ল মগ্ন যে  
ঝঙ্কারিয়া বাজলো তাদের প্রাণ-বাণী।

অনন্ত এই আকাশ-তলে মন-গগনের মিল বেধায়  
সেধায় তারা দেখল তোমার রূপভাতি,  
দেখল তোমার সাকার এবং আকার-বিহীন অঙ্গ যে,  
বিহ্বল হয়ে তোমায় দিল বুক পাতি।

বহু, তোমায় সত্য জেনে তথ্যে তারা জ্ঞান-পুথির  
বিজ্ঞেয়ণে করল প্রমাণ দর্শনে,  
সত্যি করেই অস্তিত্ব তোমার লক্ষ্য হ'ল ও লাবণ্য  
দেখল তোমায় ধন্য হ'ল স্পর্শনে।

দেখল তুমি সত্যিই আছ, ভরল হৃদয় শান্তিতে  
ভাষনাবিহীন ঘুটল সবাব সন্দেহ,  
কেহুবিহীন মানব-নারী কেন্দ্রে পেয়ে স্বস্তিতে  
সুস্থ হয়ে তোমায় দিল মন দেহ।  
বিজ্ঞানীরা দম্ভে আভ্রণ করছে প্রমাণ নেই তুমি  
বন্দনাগান গাচ্ছে তারা বিভ্রান্তের,  
শিবকে তারা দেখল না তো দেখল শুধুই শক্তিকে  
নৃত্য তারা দেখল শুধুই শিবদূতের।

কল্পনাতে মূর্তি রচি' তোমায় তারা পূজলো প্রভু  
ঐ চরণে আশ্বাদেহ মন দানি',  
তাদের মাঝে কইলে কথা বর দিলে গো প্রাণবধু  
ধন্য তারা তোমায় তারা সন্ধানী।

আমায় বেদিন করলে দয়া দেখলু তোমায় চান্দবদন  
মন-বিপিনে জাগল আমার ফুলবাগান,  
বাস্তবেরি মূর্তিতে মোর সদাই থেকো সম্মুখে  
অস্তিমতে দয়াল দিয়ো পরিজ্ঞাপ।

# রক্তরাশী

শ্রী প্রভুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৫

কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় তড়িং বাজায় বাতির হইলে তাহার মনে হইল কে তাহার শিচু লইয়াছে। তড়িং কিছুক্ষণ এগলি সেগলি করিয়া অহুসরণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া এক গলির মধ্য দিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নামিল। দূর হইতেই লক্ষ্য করিল, প্রতিমা ঘাটের জলের কাছে এক সিঁড়িতে বসিয়া কি করিতেছে।

প্রতিমাকে আজ চেনা মুশকিল। গৈরিক বাস পরিভাগ করিয়া খাটি হিন্দুস্থানী মহিলার বেশ আজ তাহার অঙ্গে।

প্রতিমা কৌচড় ভর্তি করিয়া ফুল লটরা আসিয়াছিল। একা একা বসিয়া এক একটা করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিয়া নিজের মনেই হাসিতেছিল।

সন্ধ্যা গড়াইয়া তখন রাত্রির অন্ধকার জমাট বাঁধিবার উপক্রম করিতেছিল। গঙ্গার অপব পাবে গাছগুলির আড়াল ঢেলিয়া পাতলা সাদা মেঘের অন্তরালে থাকিয়া চাঁদ অন্ধকারকে ফাঁকালে করিয়া দিল।

কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ দিন দুই বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু অসন্তব ধুমটে লোক অস্তিত্ব হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই নৌকা কিংবা পানসীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে গঙ্গার স্নেহশীতল আলিঙ্গনে।

দুই-একখানা সোপান লোকের পানসী হইতে কণ্ঠ ও বহু-সঙ্গীতের মুহূর্ত্তা গঙ্গার বুকে আছাড় খাইতেছে।

এদিক সেদিক চাহিয়া তড়িং প্রতিমার পাশে বসিয়া পড়িল। প্রতিমা তড়িংকে লক্ষ্য করিল, কিন্তু কোনও কথা কহিল না। তড়িংও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—“দেখেছ প্রতিমা, এই যে অবিরাম স্রোত, এ চলেছে ত চলছেই। তিমালয়েব শিলা ভেদ করে তার যাত্রা সুরু হ’ল। পথের সকল বাধা কাটিয়ে সে চলেছে তার স্থির লক্ষ্যে ঐ দূর সমুদ্রে—মিলনতীর্থে। তার এই অভিসার বোধ করতে পায়ে এমন শক্তি জন্মায় নি পৃথিবীতে প্রতিমা! তুমি বাংলাদেশের সম্ভান—মনে আছে নিশ্চয় সেই বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে—“একলি চলত রাধা, কিছু নাহি মানয়ে বাধা—পথ বিপথ নাহি মান।”

তড়িং নিজের তথায় নিজেই কৌতুক বোধ করিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “তুমি হয়ত ভাবছ তড়িংদা বিপ্লবী, তার আবার বৈষ্ণব-কবিতা কেন। কিন্তু কি জান, বাংলার আকাশ বাতাস বৈষ্ণব কবিতার ভরণ্য। বাঙালী হয়ে তার রস যে প্রতি নিশ্বাসে গ্রহণ করেছে। এর হাত থেকে কোন বাঙালীই বেহাই নেই প্রতিমা।”

“গান আর কাব্যছন্দ এ নিয়েই বোধ হয় মানুষের জন্ম।

কেউ তাদের প্রকাশ করে দশ জনকে আবাক করে, আবার কাকর জীবনে ওটা বয়ে যায় কল্লখাবায়।”

“কিন্তু তুমি যে বললে নদীর অবিরাম গতির কথা—এর সঙ্গে তোমাদের মিল কোথায়! নদীর গতিপথ শক্তিশালী আর তোমাদের ধ্বংসের তাৎপ্য।”

“নতুন করে গড়তে হলে অনেক সময় পুরোনোকে ভেঙে ফেলতে হয়। নদীও তাই করে। এক পার ভাঙে আর তার পলিমাটি বয়ে নিয়ে যায় অপার পারে দূর দূরান্তে দেশান্তরে। তারই জমাট আলিঙ্গনে মাটি হেসে উঠে বুকভরা আগুন স্নেহে। ভাঙনের কূলে কূলে ধ্রু নেয় নবজীবনের সঙ্গীত।”

“কিন্তু আমাদের এই পুরাতন সমাজের মধ্যে যদি কোন মঙ্গল না-ই থাকবে তবে এতদিন টিকল কি করে?”

“টিকে থাকাই কিছু স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। জীবনের লক্ষণ গতি। আমাদের সমাজ সে গতি হারিয়েছে। আজিকার পারি-পারিকের পরিপ্রেক্ষিতে সে অচল—মৃত। তাই একে কেলে দিয়ে আমাদের পুঁততে হবে নতুন চারা, আবার জন্মাবে বিরাট সমাজ।”

আস্তে আস্তে একখানা ছোট ডিক্সি তাহাদের পাশে আসিয়া ধামিল। তাহারা আলোচনা বন্ধ করিয়া নৌকায় উঠিলে অবিলম্বে নৌকা মাঝ নদীতে গিয়া একখানা পানসীর গায়ে ভিড়িল। তড়িং ও প্রতিমা পানসীতে উঠিলে ডিক্সি চলিয়া গেল। পানসী স্রোত ঢেলিয়া উজ্জানে চলিতে লাগিল।

তড়িং রমেনকে একান্তে ডাকিয়া কহিল—“প্রতিমাকে এনেছি পানসীতে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় স্থপ্তি করতে। তোমরা গান-বাজনার আয়োজন কর, বাইরে যেন এটা সবাই প্রমোদ তরঙ্গী বলেই মনে করে। দেখ বাংলা গান যেন কেউ না গায়, ওতে বিপদ হতে পারে।”

তড়িং রমেনকে নির্দেশ দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

সন্ধ্যার বলবন্ত সিং কহিলেন—“উৎসাহ ভাগিয়ে রাখবার জন্য আমাদের একটা কিছু করতে হবেই। মীরাট, দিল্লী, লাহোর, কিরোজপুর, বাওয়ালপিন্ডি আর আশালা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বা সবার পাছি তা থেকেই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। উৎসাহে ভাটা পড়লে আবার নতুন করে স্রু করতে হবে। দলগতভাবে কিছু না হলে, আমার ভয় হচ্ছে কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হবে, তার ফল হবে সমিতির পক্ষে বিপর্যয়।”

পেশোয়ার হইতে আসিয়াছেন ডাঃ কিষণচাঁদ। তিনিও সন্ধ্যাজীবর মত সমর্থন করিয়া কহিলেন—“কাবুল, হিরাট, বোখারা, তাসখেন্ট এবং আরও সব জায়গার সঙ্গে বোগাযোগ-ব্যবস্থা আর

টিকিয়ে রাখতে পারা বাবে বলে ত মনে হচ্ছে না। কর্মীদের পক্ষে আর কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভব তা অনিশ্চিত। শাসনভাঙে থেকে মিঃ বার, মেশের থেকে মিঃ আইয়ার জানিয়েছেন যে তাঁরা ক্রমেই সন্দেহের আওতার এসে পড়েছেন, তাঁরা আর বেশীদিন ওখানে থাকতে পারবেন না।”

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন সোমেশ-বাবু। এই যুক্তি তিনি সমর্থন করিতে না পারিয়া কহিলেন, “বাংলাদেশে সমিতির অবস্থা যদিও বেশ ভাল এবং আপনারা যে পরিস্থিতির কথা বললেন তার গুরুত্ব যে আমি অস্বীকার করি তা নয়, তবুও চারদিক বিবেচনা না করে বিপদের ঝুঁকি না নেওয়াট ভাল।”

মিঃ ভেলিংকার এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। সর্দার ও কিষণচাঁদ ডাক্তারের মতামত তাঁহার মনোমত হয় নাই। সোমেশবাবুর কথার নিজের যুক্তি খুঁজিয়া পাইয়া উৎসাহভরে কহিলেন, “ঠিক বলেছেন সোমেশবাবু। নয়ম করে পা না বাড়ালে চোরাবালিতে ডুবে মরতে হতে পারে।”

সোমেশবাবু তাহার পূর্বকথার ছেব টানিয়া কহিতে লাগিলেন— “নিশ্চয়, সমিতি ত নষ্ট হবেই, তা ছাড়া শাসকশ্রেণী অত্যাচারের স্রোতে দেশে যে ভীতির বান বইয়ে দেবে, এক যুগে তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন কিনা কে জানে।”

“অতি খাটি কথা”—সায় দিয়া মন্তব্য করিলেন ভেলিংকার।

এতক্ষণ তড়িৎ সকলের মতামত শুনিতেছিল; কোন মন্তব্য করে নাই। সকলেই তাহার মুখের দিকে তাকাইতে তড়িৎ কহিতে লাগিল—“অবশ্য অভ্যুত্থান করা না করা—আপনারা সবাই মিলে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেই সম্ভব, নচেৎ কাকুর ব্যক্তিগত ইচ্ছার নয়। পৃথিবীর ইতিহাস হবে এ বিষয়ে আমাদের বিবেচ্য। তবে আমার মনে হয় আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, স্ববোগ সত্যা সঙ্গী করাও যায় না, বা হাত পাতলেই পাওয়া যায় না। আজ যদি স্ববোগ উপস্থিত হয়ে থাকে তবে আমাদের তাকে কাজে লাগাতে হবেই। আমাদের সমস্ত বাসন্য গোপন, এর ফলাফল আপনারা নিত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন। যা গোপন তা বেরিয়ে পড়বেই—এ অবস্থা ক’দিন টিকবে কে জানে। চেষ্টাবিহীন আত্মপ্রকাশের চেয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শ্রেয় নয় কি?”

“কিন্তু একটা সত্য আপনারা নিশ্চয় জানেন যে আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই মাত্র স্বাধীনতা তথা জনজাগরণ সম্পর্কে সচেতন। জনগণের প্রস্তুতি ভিন্ন আমাদের প্রচেষ্টা যে বার্ষিক্য পর্যাবসিত হবে।”—মন্তব্য করিলেন সোমেশবাবু।

“সম্পূর্ণরূপে তৈরি কোন দিনই হবে না দেশ। কর্তৃক মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে খাটি মানুষ। একেবারে খাটি লোক কোন দেশেই খুব বেশী জন্মায় না।

আজ যে সমিতি গড়ে তুলেছেন তার সভ্যদের পুলিশ যদি

ধরে নাও নেয়, তবুও কিছুদিন পরে আপনিই তারা সমিতি ছেড়ে দেবে। অধিকাংশের বেলায়ই এটা সত্য। এটাই কি অভিজ্ঞতার কথা নয়? আমাদের বেলায়? বারে বারে কি তাই হচ্ছে না? আমাদেরই কি বারে বারে ছত্রভঙ্গ সমিতিকে গড়ে তুলতে হচ্ছে না।”

ইহার পরও আলোচনা কিছুক্ষণ চলিয়াছিল। সিদ্ধান্ত হইল সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াই কার্যে হাত দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তড়িৎকে সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার ভ্রম দিল্লী, মীরট ও রাওয়ালপিণ্ডি বাইতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

একথানা পানসী তখন তাহাদের পানসীকে অভিনয় করিয়া গেল। পানসীখানা নারীকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীতে মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে বাহবা বাহবা করিয়া বিকট চীংকার চলিতে লাগিল।

তড়িৎ বাহিরে আসিয়া দেখিল তাহারা রামনগর ছাড়াইয়া আসিয়াছে। পানসী কিরাইয়া লইতে উপদেশ দিয়া ভিতরে গেল। এতক্ষণ পানসী চলিয়াছিল উজান বাহিয়া দক্ষিণ মুখে, এবার উত্তর দিকে ফিরতিমুখে ভাটির টান পাইয়া পানসী কিছুক্ষণে মধোই আসিয়া গঙ্গাবক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল।

পানসী হইতে সকলেই হুই তিনখানা ছোট ডিঙিতে নামিয়া গেল। সর্দার বলবন্ত সিং প্রতিমার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, “মাদ্রি, তোরা দীর্ঘজীবন কামনা করি। ভগবান তোকে এই কর্তব্যে শক্তি দিন।” কথা কহিতে কহিতে তাহার প্রশস্ত বুক চিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “ভানিস, তোরা বয়সী ছিল আমার মেয়ে, বেঁচে থাকলে সেও হয়ত আজ এমন করে পাশে দাঁড়াত। তার বড় ছিল এক বাটা—কাল ধর এসেছে সেও মেসোপটেমিয়ার লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে। ইংরেজের হয়ে লড়াইয়ের ফলে এ মৃত্যু তাকে বীর পদবী দেবে কি না জানি না, কিন্তু সে তীক্ষ্ণ ছিল না।”

বলবন্ত সিং আর কিছু বলিতে পারিলেন না—উৎখলিত হৃদয় কঠোর করিয়াছে—তিনি বোধ হয় আত্মগোপন করিবার জন্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রতিমাও অভিবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সর্দারের ডান হাত নিজের হুঁট হাতের মধ্যে লইয়া আবেগভরা কণ্ঠে কহিতে লাগিল, “পিতাজী, আশীর্বাদ করো যেন আমি তোমার কন্টার স্থান পূর্ণ করতে পারি। যে আদর্শে ত্রুটি হয়েছি তা উদ্ভাষন করবার শক্তি যেন না হারাই।” কিছুক্ষণ ধামিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, “যদি অসুস্থ হই তবে একদিন বাড়ীতে গিয়ে উপদেশ নিয়ে আসব।”

সর্দার প্রতিমার কথার জবাব দিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখে জল চক্ চক্ করিয়া অলিতেছে।

তড়িৎ ও প্রতিমা যে ডিঙিতে নামিয়াছিল তাহা ঘাটের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। বাটটা সাধারণতঃ নির্জন থাকে—

একে ভাঙা সিঁড়ি, তার উপর কাছের ক্ষণের ধোয়ার এ ঘাট সাধারণের পক্ষে এক বকম বর্জনীয়।

অশ্লীল চাঁদের আলো হইলেও লক্ষ্য করিয়া মনে হইল কয়েকটি লোক ঘাটে চকল ভাবে ঘোরাফেরা করিতেছে। ঘাটের পাশে জনহীন মন্দিরের পাশ দিয়া একটা বাতি বারতিনেক জলিয়া নিভিল। তড়িৎ বিপদের সঙ্কেত পাইয়া মাঝিকে ঘাটের দিকে বাইতে নিবেদন করিল। পানসীর দিকে চাহিয়া দেখিল অনেক ঘর ভাটির টানে চলিয়া গিয়াছে।

ভিড়ি মাঝ নদীতে ভাটির টানে চলিতেছে। তড়িৎ প্রতিমাকে কহিল, “তুমি বাক্সাল দেশের মেয়ে, নদীর দেশের লোক—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদী সাঁতরে যেতে পারবে ত?”

“পারব না বললেও আর এগন চলবে না।”—কাপড় কোমরে বাধিতে বাধিতে জবাব দিল প্রতিমা।

“আমরা আস্তে আস্তে জলে নেবে বাছি, তুমি নৌকো নিয়ে ও ঘাটেই ফিরে যেও, তা হলে আর ওদের সন্দেহ থাকবে না।” মাঝিকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল তড়িৎ।

তড়িৎ ও প্রতিমা জলে নামিয়া কিছুক্ষণ নৌকার ধার ধরিয়া ভাসিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। প্রতিমাকে সাহস দিবার জন্ত কহিল, “তুমি আমার কাছাকাছি থেক, কষ্ট হলে আমার কাঁধে ভর দিও। বেশী ক্লান্ত হলে বলো কিন্তু, আমি তোমাকে নিয়ে অনায়াসে এইটুকু সাঁতরে যেতে পারব। আজ এই তোমার প্রথম, কিন্তু আমাকে এমন অবস্থায় পড়ায় অনেক বার সাঁতরাতে হয়েছে।”

চাঁদের আলো গঙ্গার বুকে তখন জীরার টুকরা ছড়াইয়া চেউয়ের তালে তালে নাচিতেছে। জলের অনিশ্চিত ভীতি তখন প্রতিমার আর নাই। কিসের এক অজানা আনন্দ তাহাকে পাইয় বসিয়াছে। তড়িৎকে আস্তে আস্তে কহিল, “জান তড়িৎ, চাঁদের আলোর তোমার সঙ্গেই চলেছি ভেসে, আমার কেন জ'নিতে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।”

“ও কথা বলতে নেই, আমাদের ব্রত এখনও অসম্পূর্ণ।”—জবাব দিল তড়িৎ।

শ্রোত চেলিয়া ওপারে উঠার চেষ্টা বুধা মনে করিয়া তড়িৎ পুনরায় কহিতে লাগিল, “আজ রাতে আর আমাদের ওপারে বাওয়া হবে না, এ পারেই আশ্রয় নিতে হবে।”

“তা হোক এমন শুভ মুহূর্ত্ত জীবনে কদাচিৎ আসে—মনে হচ্ছে আজ এসেছে আমার জীবনের শুভরাত্রি—মধুরাত্রি। এ ত সলিলশয্যা নয়, ফুলশয্যা।”

“কিসের মধুরাত্রি ফুলশয্যা প্রতিমা?”—প্রশ্ন করিল তড়িৎ।

প্রতিমা কথাটা এত গেরাল করিয়া বলে নাই। তড়িৎকে প্রশ্ন তাহাকে লজ্জিত করিল। ফুলশয্যা, শুভরাত্রি কথা দুইটি বলিয়া ফেলিয়া কেমন একটা অপরিমিত লজ্জা আসিয়া প্রতিমার কণ্ঠরোধ করিল। নববর্ষার এই ক্ষীণ নদীরক্কে দুর্কীর শ্রোতে এই সঙ্কেতের

মধ্যেও লজ্জা আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিল। কিন্তু কোন কিছু না বলা আরও লজ্জাকর মনে করিয়া কহিতে লাগিল, “এতদিন আমার জীবন চলেছিল এক ভাবে—তুমি এনে দিলে আমার জীবনে নূতনের সন্ধান—আজ রাতে হ'ল সেই নবজীবনের সঙ্গে মিলন—তাই ত বলি এল মধুরাত্রি।”

“তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ প্রতিমা। আর একটু কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রাখ—সাঁতরাবার চেষ্টা কব, প্রয়োজন হলে আমাকে জড়িয়ে ধরতে দিখা করো না। ওতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারাজ্যঘাটের অপর দিকে বালুচড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমা আপনার ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল বালুচড়ার উপর। “তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ প্রতিমা”—এই কথা বলিয়া তড়িৎ প্রতিমার মাথা নিজের কোলের উপর উঠাইবার জন্ত হাত বাড়াইলে প্রতিমা কহিল, “দরকার নেই তড়িৎ। আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।”

ওপারে বাওয়ার আর কোন আশাই নাই। স্তব্ধ তাহারাজ্য উভয়েই বালুশয্যা গ্রহণ করিল। যুম বে কখন আসিয়া তাহাদের ক্লান্তির উপর ববনিকা টানিয়া দিয়াছিল তাহা তাহারা কেহই টের পায় নাই।

৬

দিন দুই পরে প্রতিমা শিশু রমণীর বেশে সজ্জিত হইয়া, বা কটিতে কুপাণ খুলাইয়া বলবন্ত সিংহের বাসার উদ্দেশে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওনা হইল।

কান্দী শহর হইতে বরাবর ক্যান্টনমেন্ট বাওয়া নিরাপদ নয় মনে করিয়া মোগলসরায় গিয়া সেখান হইতে ট্রেনবেগে খুব ভোরেই ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে নামিল। সেখান হইতে একখানা টাক্সা করিয়া বলবন্ত সিংহের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সদ্বারজী তখন আপিসে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়ী চুকিয়া এঘর ওঘর ঘুরিয়া চারিদিকের অগোছালো অবস্থা দেখিয়া বাধিত হইল। ঝি, চাকর ডাকাইয়া নিজে কোমর বাধিয়া লাগিয়া গেল পরিচ্ছন্নতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে। এতটা অসকোচ ব্যবহার দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল সদ্বারজীর কজা আসিয়াছে।

আপিসে থবর চলিয়া গিয়াছিল যে, তাহার মেয়ে আসিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন নিশ্চয় প্রতিমাই আসিয়াছে। তিনি অবিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ীতে চুকিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া সদ্বারজী বিম্বিত হইলেন। “এ কি করেছিল মা—এ যে আমার বাড়ী তাই ত মনে হচ্ছে না।”

“পিতাজী, তোমার ভালমাহুরির সুবোগ নিয়ে সবাই তোমার উপর দোরাঙ্গা করে। এতগুলি ঝি চাকর, কিন্তু না ঘর-দোর না বাসন-কোসন কিছুই এরা চোখে দেখে ঠিক করে রাখে না।”

সদ্বারজীর অপলক দৃষ্টি প্রতিমার উপর নিবদ্ধ। প্রতিমা



পুনরায় কহিতে লাগিল, “পিতাজী, আর দেহী নয়, স্নান সেবে এসো, আহাবাদির পর সব কথা হবে।”

বৃদ্ধ শিখের বিশাল বুক চিরিয়া এক গভীর নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কহিলেন, “এমনি মিটে-কড়া শাসন অনেক দিন তুলে গেছি। একটু উপভোগ করতে সময় দে মা।” কথা বলিতে বলিতে প্রতিমাকে কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার উষ্মসিত হৃদয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

স্নানের পর সর্দার তাহার শরনকক্ষে আসিয়া দেখালে বিলম্বিত একখানা তরবারি কুল দিয়া সাজাইতেছিলেন। প্রতিমা কখন আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। তরবারির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পিছন কিরিয়া প্রতিমাকে দেখিয়া কহিলেন, “জানিস মা, এই তলোয়ার নিয়েই আমার পিতামহ শেষ শিখযুদ্ধে মহাবীর শেষ সিংহের পশ্টনে যোগ দিয়ে দেশ রক্ষা করতে প্রাণ দেন। জীবনভোর এর পুজোই কবলাম। কবে যে একে হাতে করে আবার মরণ-বজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব শরতান তাড়াতে, তারই জন্ত প্রতীক্ষা করছি। শুধু লোকদেখানো পুজোর যে আর মন ভরে উঠেছে না।”

“পুজো কথবার কি তবে কোন সার্থকতা নেই পিতাজী”—প্রশ্ন করিল প্রতিমা।

“আছে বৈ কি। রাজ্য ক্ষয়তঃ একবারও পরাধীনতার ভালা হৃদয় দিয়ে চিন্তা করবার অবসর পাই।”

“আর দেহী করে। না পিতাজী, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে”—কথায় কথায় দেহী হইতেছে দেখিয়া প্রতিমা সর্দারকে তাড়া দিল। বলবন্ত সিং আতাবে বসিয়াছেন। তাহার এক পাশে দুইটি বিড়াল, আর এক পাশে একটি কাঠ-বিড়ালী, আর দরজার সামনে একটি কুকুর লেজ নাড়িয়া অপেক্ষা করিতেছে।

প্রতিমা অবাক হইয়া লক্ষ্য করিল ইহাদের সকলের মস্তাই কিছু না কিছু অস্বাভাবিক নির্দিষ্ট আছে। কাঠ-বিড়ালীটা মাঝে মাঝে সর্দারজীব ঘাড়ে উঠিয়া লেজ উঠাইয়া চিক্ চিক্ আওয়াজ করিয়া তাহার ভাগের কথা শ্রবণ করাইয়া দিতেছিল।

“যুদ্ধে মাহুয খুন করা বার পেশ, তাকে এই নিরীহ প্রাণীগুলি বিশ্বাস করে কি করে তাই অবাক হয়ে ভাবছি পিতাজী।”

“মা, আমি চলে জিজ্ঞাসা করতাম, এত ভালমাহুয হয়েও মাহুয মাঝার পেশা নিলে কি করে”—সকৌতুকে জবাব দিলেন বলবন্ত সিং।

“হেবে গেলাম পিতাজী”—

“আসলে কি জানিস মা, শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করতে না পারলে আমি যে বংশের কলঙ্ক হবো মা, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কারুর বিরুদ্ধে সামাজিকতম অস্ত্রপ্রয়োগ করতেও আমার ঘোর আপত্তি আছে। এই নিরীহ প্রাণীগুলি, এরা আমার মান-ইজ্জতের বিরোধী নয়। ওরা আমার ভালবাসে—তাই আমাকেও ওদেরকে

ভালবাসতে হয়। আমার ভালবাসায় আমি বুঝতে পারি ওরা কতখানি বিগলিত হয়।”

“তুমি ওদের তাবা বুঝতে পারো”—কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল প্রতিমা।

“হৃদয় থাকলে বুঝতে কষ্ট হয় না মা।”

সর্দার আতাব করিতে লাগিলেন। প্রতিমা উঠিয়া গিয়া আরও কিছু ভরকারি আনিয়া দিল। পাচক দুধ লইয়া আসিল। প্রতিমা দেখিয়া বলিল, “দুধ যে বড্ড গরম রয়েছে, বাটটা জলের উপর রেখে ঠাণ্ডা করে নিয়ে এস।”

কথায় কথায় আতাব শেষ হইল। সর্দারের মুখে তৃপ্তির প্রশাস্তি। তিনি আপিসে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন বিশেষ কারণে বাইতে পারিবেন না।

পরে প্রতিমা নিজে আতাব শেষ করিয় বলবন্ত সিংহের শরনকক্ষে আসিল, সর্দার তখন বিছানায় অর্ধশায়িত। প্রতিমা তাহার পায়ের নিকট উপবেশন করিলে তাহার দৃষ্ট আকৃষ্ট হইল শুধু নানকের একখানা ছবিব দিকে। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা পিতাজী, শুধু নানক প্রচার করলেন প্রেমের ধর্ম, কিন্তু তাঁর শিষ্যগণ মাহুযকে করল চ্যালেঞ্জ উদ্ভুক্ত রূপাণে, এ দুয়ের সংহরুসা ত খুঁজে পাচ্ছি না।”

“প্রেমই মাহুযের ধর্ম। প্রেম মাহুযকে সন্তুষ্ট, স্তম্ভিত আর সরল করে তোলে। প্রেমের মতিমায় মাহুয মতিমাসিত—সমস্ত দীনতা হীনতার উল্কে। প্রেম যেমন কুন্তলকোমল তেমনি বজ্রও বাজে প্রেমের বাণী। যা ভালবাসি তাকে রক্ষা করতেই না রূপে দাঁড়াতে হয়। তাই ত দেখেছ না, বাদশাহী অত্যাচার যখন সীমা লঙ্ঘন করল তখন শুধু গোবিন্দ সিং নিজে তুলে নিলেন আর সাথী-দেব হাতে তুলে দিলেন এই রূপাণ ধর্ম রক্ষার জন্ত।”

“অপরাধ নিও না পিতাজী, আত্মরক্ষা কি সব”—প্রশ্ন করে প্রতিমা।

“আত্মরক্ষা হ'রকমেই হতে পারে। সক্রিয় হয়ে শত্রু বিনাশ করে কিংবা আক্রান্ত হলে তাকে প্রতিরোধ করে। আত্মরক্ষা আর আত্মসমর্পণ এক নয়। আত্মরক্ষা করতে পারে বীর, আর আত্মসমর্পণ করে ভীকু কাপুরুষ। প্রয়োজনবোধে বীর আত্মদান করে রক্ষা করে নিজের আর বৃন্ত এক গোষ্ঠীর মর্যাদা। এমনি আত্মদানের ইতিহাসই শিখজাতির ইতিহাস মা।”

তিনি বলিতে লাগিলেন, “আত্মরক্ষার প্রয়োজন শুধু শরীর-রক্ষার জন্ত নয় মা, যে আত্মরক্ষা করতে পারে না তার মনও যে ছোট হয়ে যায়। আত্মরক্ষার পরাধীন জাতির মধ্যে দীনতা, হীনতা ও কুন্তীতা এসে পড়ে, পরাধীনতা চিরস্থায়ী হয়! শিখগুরু ও মহাপুরুষগণ ত নিজের শরীর রক্ষার জন্ত কখনও বিক্রমাজ ব্যাকুল হন নি। তাঁরা আত্মদান করে জাতির আত্মার মুক্তির পথ খুলে দিয়ে গেছেন।”

কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—রনে

হইতেছে তাঁহার সারা দেহে যেন বোঁবন ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বর্ণনা করিলেন বহু শিশুবীরের কাহিনী। তিনি বলিয়া চলিলেন—কাহাকে দেখালে গাঁধিয়া মারিয়াছে, কাহার চক্ষু উৎপাটন করা সশেষে শত্রুর অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই, কে আপন মৰ্যাদা বক্ষার ভক্ত বৈবীর সঙ্গে মাথা দিয়াছেন।

বহুদিন পর আত্ম আবার বৃদ্ধের জীবনে জোয়ার আসিয়াছে। অবসাদ, দ্রাব্ধি কখন সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে তাতা তিনি টের পান নাই। কখন যে দুপুর অপরাহ্নে গড়াইয়াছে—আর অপরাহ্নের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিয়া সন্ধ্যা পৃথিবীর বুক নামিয়া আসিয়াছে তাতা কাহারও হৃদয় ছিল না। যি আসিয়া যবের আলো জালিয়া দিয়া গেলে তাঁতাদের চৈতন্য হইল।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিল। বলবন্ত সিং প্রথম কথা কহিলেন, “তোমরা কবে রওনা হচ্ছ মায়ী।”

“আগামী কাল, দিল্লী এক্সপ্রেসে।”

“মা যেমন করেই হোক আমার দিন এক রকম কাটছিল। পুত্র, কণ্ঠা হারা হয়ে অধুনের সঙ্গে এক রকম আপোষ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু ভুট এসে যে আমার সব গুলি-পালট করে দিয়ে গেলি মা! আত্মকীর্তি করি তোমার এত সফল চুক্তি।” সন্ধ্যার আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রতিমাকে চুই বাজবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

প্রতিমা আপনাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বিদায় লইল।

রাত্রি দশটা কয়েক মিনিটে মোগলসরাইয়ের গাড়ী ছাড়বে। ট্রেন ছাড়িবার মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে তড়িৎ ও প্রতিমা বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে উচ্চশ্রেণীর প্রবেশপথ দিয়া হন হন করিয়া চুকিয়া প্রথম শ্রেণীর এক কামরায় উঠিয়া বসিল।

পূর্বে হইতেই বনোয়ারী বিজ্ঞান, প্যাতিয়া, স্তরীকেশ ও ব্যাগ যথাস্থানে বাগিয়া আর্দ্রালীর বেশে অপেক্ষা করিতেছিল। তড়িৎ ও প্রতিমা চুকিতেই “সেলাম বাবুভী, সেলাম মাস্টারী” সম্ভাষণ করিয়া সসন্মানে সরিয়া দাড়াইল।

“বহুত আচ্ছা।”

পরে ইঞ্জিনে কাছে ডাকিয়া তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল সে কেন আসিয়াছে; অপব যে ছেলেটির আসিবার কথা ছিল তাহার কি হইয়াছে।

বনোয়ারী জানাইল, “পাটনা থেকে যে ছেলেটি এসেছে তার সম্পর্কে যমেনের কাছে আজই চিঠি এসেছে যে ছেলেটি নাকি অসাবধানী, ওকে দারিদ্র্য দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। যন্ত্রকরণে নাকি ওকে কি কাজে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে অনেক ক্ষতি করে এসেছে। তাই বনোয়ারীকেই শেষ পর্যন্ত যমেন পাঠিয়েছে।”

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেই বনোয়ারী পাশের ভৃত্যদের সঙ্গে নিকট কামরায় চলিয়া গেল। তড়িৎ ও বনোয়ারী একবার গাড়ী

হইতে যুগ বাড়াইয়া দেখিয়া লইল কোন অনুসরণকারী গোয়েন্দা গাড়ীতে উঠিতেছে কিনা।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে প্রতিমা কহিল, “অনুত লোক এই বনোয়ারী। কখনও একাওয়ালা, কখনও কুলী, আত্ম ত আর্দ্রালীই সেক্ষে এসেছে। এত যে ছোট কাজ করছে—মুগে সেক্ষে কোন অসংজ্ঞাবের চিহ্নও নেই, মনে হয় পরমানন্দেই রয়েছে।”

“মনটা খুব বড় বলেই দেশের কাজে ওর কাছে ছোট বড় কিছুই নেই, বিশেষ করে সমিতির ভক্ত”—মন্তব্য করিল তড়িৎ। একটু ধামিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, “ভান প্রতিমা, সমিতির বিভিন্ন শাখা এবং ব্যক্তির মদ্যে যোগাযোগ রাখার কাজে ও হচ্ছে মধ্যমণি, আর এর ভক্ত যে ওকে কত হুংলাইনা সজা করতে হয় তার ইয়ত্ন নেই। এই ত সেবার মোগলসরাই ষ্টেশনে নিজের চোখেই ওর যে অপমান আর লাঞ্ছনা দেখলাম তা ডাবলে আত্মও আমার মন বাধায় ভরে উঠে, বনোয়ারীর বন্ধ বলে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠে।”

এই পর্যন্ত বলিয়াই তড়িৎ ধামিয়া গেল। তাহাকে ধামিতে দেখিয়া প্রতিমা কহিল, “ধামলে কেন তড়িৎদা, বলো না কি হয়েছিল মোগলসরাই ষ্টেশনে।”

“সমিতিরই কাজে ওকে একবার থাকতে হয় মোগলসরাই ষ্টেশনে প্রায় মাসতিনেক। প্রকাশ্যে ডালপুরী বিক্রী করত। এ কাজটিতে যে এত স্বজাতি বইতে হয় তা আগে ভানতাম না। ষ্টেশনের ছোট-বড় সবাইকে খুশী করে তবু ওকারের কাজের অনুমতিপত্র মেলে। তাকে বহাল রাখতেও হয় প্রতিদিন তাদের খুশী করে। প্রতিদিন লঙ্কনা অপমান সজা করে নিজের বাবসা বদায় রাখতে হয়।

“আমি যাচ্ছিলাম পজাব-মেলে লাহোরের দিকে, কিছু জিনিষ আমার হাতে পৌছে দেবার ভার ছিল ওর ওপর। ডালপুরীর নীচে একটা গোপন খুপুখীর মধ্যে লুকোনো ছিল সেই জিনিষ। একটা কনেটবল ওকে মোটে দেহতে পারত না। কারণে অকারণে ওর উপর অকথা অত্যাচার করত। গাড়ী এসে প্লাটফর্মের চুকতেই বনোয়ারী বত গাড়ীর দিকে এগোতে চায় ঐ কনেটবলটা ততই তাকে বাধা দেয়, কিছুতেই তাকে ফিরি করতে দেবে না। একবার ত কয়েকটা ঠোড়া মাটিতে টান মেরে ফেলে দিলে। তবুও বনোয়ারী নিবৃত্ত হয় না দেখে কনেটবলটা আর তার বেয়াদবি সহ করতে পারল না, বেটনের আগাতে তার কপাল কাটিয়ে দিলে, ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। ব্যক্তীদের কেউ কেউ যে এর মৌখিক প্রতিবাদ করে নি তা নয়, তবে ভিড় থাকায় যে যার উঠা-নামায় আর জায়গা দখলের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। বনোয়ারীও অবশ্য চায় নি যে তাকে যিরে ভিড় জমুক। কপালে হাত চেপে ও বাইরে চলে গেল, কিন্তু এরই মধ্যে পরে এক থাকে জিনিষটি আমার হাতে পৌছে দিয়ে পুনরায় প্লাটফর্মের বাইরে চলে গেল। এ ত একদিনকার কাহিনী মাত্র। ওর জীবনের অনেকগুলি দিনই এমন ইতিহাসে ভরা।”

বনোয়ারীর কাহিনী শেষ হইতেই তাহার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। জীবনে এই প্রথম মাকে ছাড়িয়া সে একরকম নিরুদ্দেশ ব্যতীরা বাহির হইয়াছে। আসিবার সময় অবস্থা মা বলিয়াছেন যে তাহার কোনই অনুবিধা হইবে না, কিন্তু তাহার যদি কিছু হয় তবে মা কি করিবেন তাহা ভাবিতেই তাহার মনের মধ্যে মোচড় দিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তাহার গাড়ী হইতে নামিয়া প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করিতে লাগিল দিল্লী এক্সপ্রেসের জন্ত। গাড়ী আসিল বাত্মি দেড়টার। মিনিট পনের পর একজন হিন্দুস্তানী বৈল-কর্মচারী আসিয়া খবর দিয়া গেল যে তাহাদের জন্ত একখানা প্রথম শ্রেণীর কুপে ঠিক করা হইয়াছে। তাহার যেন অবিলম্বে তাহা দখল করে। আরও বলিয়া গেল তাহার যেন সাবধানে থাকে। আজকাল একরকম সব গাড়ীর উপরই নজর রাখছে, সামান্য সন্দেহে সব জিনিষ ওসটপালট করছে।

তড়িতের কপালে চিন্তার রেখা পড়িল। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, “গতকাল বোধে মেলে ভেলিংকারের যাওয়ার কথা ছিল, সে নিরাপদে গিয়েছে কি?”

“বেশ মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। অনেক কারসাজি করে তবে রেতাই। রাত তিনটে নাগাদ গাড়ী আসে। আমি বর্ণন তার দেখা পেলাম তখন গোয়েন্দারা তাকে প্রত্নবাণে জড়রিত করে তুলেছে। বেগতিক দেখে আমি ওদের পাশুকে খুদ মণি ভানিয়ে ভেলিংকারকে উদ্দেশ করে বললাম কেমন আছেন, গাড়ীতে কোন কষ্ট হয় নি ত?”

ওরা একটু অপ্রতিভ হ'ল—হামার জিজ্ঞেস করল, “টনি আপনার পরিচিত নাকি?”

“বিলক্ষণ, ও আমার বাপা বন্ধু। স্বাচ্ছ আপনারা হত্যার করেন।” তারপর ভেলিংকারকে উদ্দেশ করে বললাম, আজ তুমি এ পথে যাচ্ছ জনতে পেরে তোমার বোদি প্রেক্ষারী পরোয়ানা পাঠিয়েছেন, অপরাধীসহ ক্ষেরত না গেলে অদৃষ্টে কি আছে তা ত বুঝতেই পারছ।’

গোয়েন্দারা সকৌতুক হাসি হেসে এবং মৌগিক ভূষণ প্রকাশ করে নেমে গেল। আমিও ভেলিংকারকে হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে এলাম।

“ভেলিংকার এখন তবে কোথায়”—উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল তড়িত।

“তাকে পরের ট্রেনে তুলে দিয়েছি। স্বযোগ বুঝে গার্ডের গাড়ীতে উঠিয়ে দিলাম। গার্ড এংলো-ইণ্ডিয়ান—মাকে মাকে দু-এক বোতল মদ ওকে দিই তাতেই খুশী থাকে। আমিও ওর সঙ্গে সসারাম পর্যন্ত বাই, সেগান থেকে এক আপ ট্রেনে ফিরে আসি।”

তড়িত স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গাড়ী ছাড়িবার আর পাঁচ মিনিট বাকী। কর্মচারীটি কহিল—“আর সময় নেই, আপনারা গাড়ীতে উঠে বসুন।”

“বাচ্ছি, তুমি আর আমাদের সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত এস না; কোন কারণে তুমি যদি আউট হয়ে পড় তবে সমিতির খুব ক্ষতি হবে।”

“বাচ্ছি, কিন্তু নজর রাখব”—এই কথা বলিয়া কখনচরী বিদায় লইল।

এতক্ষণে বনোয়ারী মালপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া সাজাইয়া শুছাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। মিঃ ও মিসেস মণিলালের জন্ত রিজার্ভ করা একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরা নির্দিষ্ট ছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় প্রতিমা নাম পড়িল—প্রথম তাহার খেয়াল হয় নাই। পরহুহুতেই খেয়াল হইতে তড়িতকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ গাড়ী যে অল্প নামের, আমাদের ত নয়।”

“ও আমাদেরই নাম”—ঈশং হাসিয়া জবাব দিল তড়িত।

মিঃ ও মিসেস কথা দুইটি হঠাৎ প্রতিমাকে অসীম লজ্জার ফেলিল। সে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে জানালায় মুখ বাড়াইয়া লুকাইতে চেষ্টা করিল। নানা কথা চিন্তা করিয়া এ লজ্জার হাত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এটা একবার চাপিয়া বসিলে সহসা যায় না। মনে হইতে লাগিল—ছিঃ ছিঃ তড়িতদা, আমার মুখ দেখে কি মনে করবে! সে নিজের মুখের ভাব স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

বনোয়ারী নিজের কামরায় বাইবার সময় কহিল—“মা, তুমি একবার জিনিষগুলি দেখে নিও।”

বনোয়ারী তাহাকে বরাবরই মা বলিয়া ডাকিত, কিন্তু আজিকার সংবাদন তাহাকে নতুন করিয়া আর এক দফা লজ্জার কথা শ্রবণ করাইল। তাহার মানসিক অবস্থাকে স্বাভাবিক করিবার জন্ত গুহাই গোড়ানো স্ট্রটকেশ পুনরায় শুছাইতে লাগিল। এটা কাজ আর কতক্ষণ করা যায়। পুনরায় জানালায় ধারে গিয়া বসিল।

বিকট চীৎকার করিয়া গাড়ী ছন্দ ছন্দ করিয়া চলিল। প্লাটফর্মের আলোগুলি পিছনে পড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ যেন অন্ধকার গভীর হইতেছে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গাড়ী একেবারে বিরাট অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রতিমার মনে হইল পরিচিত ভগ্ন পিছনে ফেলিয়া সেও যেন আজ অজানা অন্ধকারের দেশে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে হইল যেন গাড়ী ভয় পাইয়াছে আর প্রচণ্ড গতিতে বাধা লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।

মাকে ছাড়িয়া আসায় এমনিতেই তাহার মন কণ্ঠস্থ। তাহার উপর এই দারুণ লজ্জাকর অভিনয় তাহার মনকে ভীষণ চকল করিয়া তুলিল। সে আজীবন সন্মাসীর বেশে ছিল—তাদের মতই নিশ্চিন্ত নির্দিকারভাবে কান্দীর রাস্তায় চলাফেরা করিয়াছে। পরিচিত-অপরিচিত যে-কোন পুরুষের সঙ্গে অকুণ্ঠিতভাবে আলাপ করিয়াছে। অথবা লজ্জার ব্যালাই তাহার কোন দিনই ছিল না। তড়িতের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনেও নিজের মনে কোন লজ্জা অনুভব করে নাই। কিন্তু সে ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেছিল আজ

কেমন করিয়া সামান্য এই দুইটি কথা তাকে এমনি ভাবে বিব্রত করিতেছিল।

তড়িৎও মুহূর্তের জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছিল। বিপ্লবী জীবন শুরু হওয়ার পর হইতে নানা ভাবে নানা বেশে নাম ভাড়াইয়া সে চুনিয়ায় চলাফেরা করিয়াছে; তবে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় এই প্রথম। কিন্তু আদর্শ তাকে দিয়াছে এই সঙ্কোচের হাত হইতে মুক্তি। তড়িৎ প্রতিমার মনের অবস্থাটা আশ্চর্যে অস্বাভাবিক করিয়া তুলেছে। যেচারা! যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কারের বাধন! সে ভাবিল—আমাদের যখন একসঙ্গে এই ভাবে কিছুদিন থাকিতে হইবে তখন উভয়ের এই সঙ্কোচ কিছুতেই ভাল নয়। এই সঙ্কোচ যে কথাটাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই অস্বাভাবিক ভাবে মনের ভিতর বৈষ্ণব স্থান দিতে নাই। একটা ভাবকে মনের ভিতর যে ভাবেই হউক বৈষ্ণব স্থান লালন করিলে মনের উপর তা কতকটা আধিপত্য বিস্তার করিবেই। তাহার ভয় হইল যে সঙ্কোচ বাপারটা জটিল হইয়া পরিণামে ভয়াবহ হইয়া না উঠে। প্রতিমাকে সঙ্কোচের হাত হইতে মুক্তি দিবার জ্ঞান ডাকি দিল—“প্রতিমা...”

গাড়ী তখন এক ছোট স্টেশন হ্রস্ব করিয়া অতিক্রম করিতেছিল, স্তম্ভস্বর তড়িতে ডাক প্রতিমার কাণে বায় নাই। তড়িৎ পুনরায় তাকে ডাকিল। প্রতিমা চমকাইয়া উঠিল। তড়িৎের চোখ ইহা এড়ায় নাই। প্রতিমা এককণে নিজেকে বেপরোয়া করিয়াছে। মুহূর্তের জ্ঞান মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যেন সকল চরলতা পদদলিত করিয়া তড়িৎের মুগের দিকে সহজভাবে তাকাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কি বলবে তড়িৎদা, বল।”

তড়িৎদা শব্দটা সে খুব স্পষ্ট করিয়া জোর দিয়া বলিল। নিজের মনের থিখা-সঙ্কোচগুলিকে সে যেন স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিতে চাহে যে এখানে তাহাদের কোন স্থান নাই, এ তাহার তড়িৎ-দা, এ আর কেউ নয়।

তড়িৎ বলিল, “বনোয়ারী যেমন আত্ম চাকর সেজে বেরিয়েছে, আমরাও তেমন একটা কিছু সেজে বেরিয়েছি। কিন্তু এতে তোমার বড্ড লজ্জা করছে, নয় প্রতিমা?”

প্রতিমা ধীরে ধীরে কহিল, “কখনও আত্মকের মত অবস্থা ত হয় নি! তাই...”

তড়িৎ—“নিতাকার জীবনেও আমরা সময় সময় অভিনয় করে চলি। মুগের কথা আর মনের কথা সর্ব অবস্থায় এক হয় না। তা বাক, অভিনয়টাকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করতে গেলে ভাল করে অভিনয় করতে হয়। তবে সত্যক থাকতে হয় যেন অভিনয়টা মনের মধ্যে আরগা করে না বসে।

প্রতিমা—“মনেও স্থান দিতে পারব না! কেউ যদি পরম প্রিয় হয়ে পড়ে শুধু মনের মধ্যেও তাকে স্থান দিতে পারব না!” তারপর হাসিয়া বলিল, “না তড়িৎদা, কলিতে মনের পাশে দোষ নেই, পাপ কাজ না করলেই হ’ল, সাধু মহাত্মা বলে গেছেন।”

তড়িৎও হাসিয়া বলিল, “এ হ’ল কলির মানুষের চরলতার জ্ঞান কনসেশন, দয়। আমরা যে কলিকালে জন্মালেও কলির মানুষ

নই! এই যে আমাদের সাধনা—এ দেশের মানুষগুলি মানুষকে নবজন্ম লাভ করে নতন দেশের নতন মানুষ হয়ে উঠবে। এ জন্মেই ত সব।”

তড়িৎ কহিতে লাগিল, “দেখ প্রতিমা, আমরা একই পথে একই উদ্দেশ্যে চলেছি, এই হ’ল আমাদের পদস্পর্শের যোগসূত্র। আমাদের ভালমন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য সবই নির্ভর করে এ সমস্ত আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবার সহায়তা করে কি না তার উপর। এই দিয়েই আমাদের কর্তব্য অকর্তব্যের বিচার।”

হঠাৎ গাড়ীর গতিবেগ মন্দীভূত হইল। এমনি সময় গাড়ী হঠাৎ কোথাও থামার কথা নয়। তড়িৎ জানালায় বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিল সিগন্যাল আপ আছে। সময় দেখিয়া অস্বাভাবিক করিল গাড়ী চূনার স্টেশনের নিকটবর্তী। ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখিল অন্ধকারে চুণার চূর্ণের কালো রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ীর মধ্যে একটা কেমন অস্বস্তির ভাব। স্বাভাবিক অবস্থা কিরাইয়া আনার জ্ঞান তড়িৎ কহিল, “জান প্রতিমা, প্রয়োজন হলেই অভিনয় করতে হয়, সেজে বেরুতে হয়। তুমি ত সেদিন সালায়ার কামিজ পরে, কোমরে কুপাণ বুলিয়ে সর্দারজীর ওপানে গেলে। কিন্তু তোমার একটি লোক অস্বস্তির কারণেছিল, তা তুমি টের পেয়েছিলে?”

“কৈ না ত! কি আশ্চর্য!”

“ভয় পেয়ে না, আমিই সেই। তুমি সর্দারজীর বাসায় নিরাপদে পৌঁছলে আমি ফিরে আসি। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে মনে করেছিলাম তোমায় কয়েকটা কথা বলি, কিন্তু ওখানে দুটো গুণ্ডাচার ছিল, ওদের এড়াতে গিয়ে আর পারলাম না। কেননা তুমি শিখ রমণী আর আমি বাঙালী হয়ত সন্দেহের উদ্ভেদ করবে? তোমার সাজটি কিন্তু খুব চমৎকার হয়েছিল। তোমাকে না জানলে বাঙালী বলে চেনা মুশকিল। বঙ্গলসনা বলে চিনলে হয়ত বিপদ হ’ত।”

“কেন, চিনতে পারলে কি হ’ত!”

“হয়ত গুণ্ডার হাত এড়াতে পারতে না।”

“আমি অত চটি কোমল হুইয়ে পড়া লতিকা নই তড়িৎদা। আসলে কিন্তু আমি অত নিরীহ নই। কান্দীর গুণ্ডাদের সঙ্গে হ’একবার মোলাকাৎ যে হয় নি তা নয়। ছোটবেলা এক ওস্তাদের কাছে কিছু কিছু যুয়ুসু শিখেছিলাম! একবার কি হয়েছিল তান। এক দিন রাতিয়ে আরতির পর আমি আর মা বিশ্বনাথের মন্দির থেকে ফিরছি। এক গুণ্ডা আমার গায়ে হাত দিতেই আমি তার হাত মুচড়ে ধরলাম—মা এসে গলা চেপে ধরল—তৎক্ষণে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। তখন ঐ লোকটার যে লাহনা হ’ল তা ত বুঝতেই পারি! সবাই ওকে পুলিশে দিতে বলল—মা শুধু বলল, ওকে আর পুলিশে দিয়ে কাজ নেই—লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এমন কাজ আর কবো না বাচ্ছা।’ অবশ্য এইটাই গুণ্ডা-কাহিনীর শেষ নয়। এর পরও যে ছোটখাটো

চেষ্টা হয় নি তা নয়। একদিন মনে মনে ঠিক করলাম এর একটা বিহিত করতেই হবে। একটা ছোরা নিয়ে একেবারে ওদের আড্ডার গিয়ে হাজির হলাম। যে লোকটাকে সর্দার মনে করলাম, সোজা তার কাছে গিয়ে বললাম, ‘আপনার আমার কাছ থেকে কি চান বলুন ত! সহায়-সম্বলহীন নারীকে পীড়ন করবার জন্তই কি আপনারা ডন কুস্তি করেন নাকি!’ লোকটার কি মনে হয়েছিল জানি নে। মিনিটপানেক কোন কথা বললে না, তার পর আমার দিকে চেয়ে বিনীত স্বরে বললে, ‘মাপ কর মাস্টারজী’; আমার গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতে তোমার কোন খনিষ্ট হবে না।’ তারপর তার নীচের দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে তার চেলা-চামুণ্ডাদের হুকুম দিলে। তারপর আর কোনদিন কিছু হয় নি।”

“ছোরা নিয়েছিলে ওদের খুন করতে নাকি।”

“ওটা নিয়েছিলাম প্রয়োজন হলে ওদের বুক বসাতাম আর ইচ্ছা রাখতে নিজের বুক বসিয়ে দিতাম।”

“যে পথে পা দিয়েছ তার ভুল এমনি আরও প্রয়োজন হতে পারে, সেই মুহুর্তে তোমার ভুল নিশ্চিত হলাম প্রতিমা।”

রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়াছে। গাড়ী মির্জাপুর ষ্টেশনে থামিল।

“তুমি শুয়ে পড় প্রতিমা।”

“খুম আসবে না।”

“বিশ্রাম হবে অন্ততঃ। আমি এখন শোব না। এলাহাবাদে আমার দরকার আছে।”

“তুমি বস” শুয়ে পড়, আমি তোমার এলাহাবাদ এলে ভাগিয়ে দেব।”

তড়িৎ আর বাকবাক না করিয়া শুইয়া পড়িল। প্রতিমা নিজের বেকিতে করিয়া আসিয়া ভানালার বাড়ির মুখ বাড়াইতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাহার মুখমণ্ডলে আত্মার রেশ দিয়া গেল। সমস্ত গ্লানি ধুইয়া-মুছিয়া গেল। দিগন্তের কালো গাছের ছায়া একের পর এক ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও কচিং এক-আধটা আলো দৃষ্টপথে উল্লস কর বটে, কিন্তু নিমেষেই তাহা আবার মিলাইয়া যায়। একমাত্র অন্ধকারের মহাশুলে তাহাগুলি নিশ্চল হইয়া জাগিয়া আছে। এক অনিশ্চয়ের আবেগে তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল। গাড়ী নির্দিষ্ট ষ্টেশনে গিয়া থামিবে, কিন্তু এ যাত্রার শেষ কোথায়। এই অনিশ্চয়তার ও তাহার দময় আত্ম পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে।

কখন যে দুই ঘণ্টার পথ শেষ হইল তাহা প্রতিমা জানিতেও পারে নাই। এলাহাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে তাহার খেয়াল হইল। তড়িৎকে জাগাইয়া দিল। এক ভক্তলোক তড়িতের হাতে একপাশা চিঠি দিয়া গেল। তাহাদের কানপুর যাওয়া নিষাপদ নয়—চিঠির মর্ম ইহাই। তাহারা সোজা আশ্রয় বাড়াই দ্বির করিল।

৮

বেলা দুইটা নাগাদ তড়িৎ, প্রতিমা ও বনোয়ারী আশ্রয় এক প্রসিদ্ধ হোটেলে আসিয়া আশ্রয় লইল। আহাৰাদির পর একপাশা চিঠি লিখিয়া বনোয়ারীকে কার্ণটনমেটে বাইতে নির্দেশ দিল তড়িৎ।

বনোয়ারী চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। ভাত ছড়াইলে কাক গন্ধ পায়। তাহাদের আগমনের গন্ধ পাইয়া অচিরেই জনা পাঁচ-ছয় গাইড আসিয়া আপন আপন বিচার পরিচয় দিতে লাগিল। ইহাদেরই এক জনের পক্ষ সমর্থন করিয়া হোটেলের কেহানীটি কহিল, “বাবু একে আপনি নিন। সাতেরবাও একে পেলে আর কাউকেই চায় না।”

“বিলিতি সাহেবদের আর গুণের সীমা নেই। তাহা মুখ দেখেই গাইড চিনতে পারে দেখছি”—সকৌতুকে মস্তবাক কহিল তড়িৎ। লোকটির আর জবাব জুটিল না।

তড়িৎ তখন একটু বিশ্রামের হস্ত লালায়িত ছিল। স্মরণে গাইডদের বিদায় দিল এই বলিয়া যে যখন তাহার প্রয়োজন হইবে খবর দিবে যাকে তার পছন্দ।

তড়িৎ একটা আরাম কেমারায় হেলান দিয়া বসিয়া খবরের কাগজে চোপ বুলাইতে লাগিল। প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, “কাল রাতে ঘুমাও নি এখন একটু গড়িয়ে নাও, বিছানা তৈরি আছে।”

“অত আরাম সইবে না প্রতিমা, এই যা আছে ঢের।”

তর্ক করিয়া লাভ নাই। একটা বালিশ আনিয়া তড়িৎও মাথা ঘুমাতে শুইয়া দিল। তড়িৎ নিজের অজান্তেই নির্দিষ্ট হইয়া পড়িল।

বিকালের দিকে এক নূতন গাইড আসিয়া বলিল, “এতক্ষণে বোধ হয় আপনারদের গাইড ঠিক হয়ে গিয়েছে, না হলে আমার নিতে পারেন।”

“কি করে জানব তুমি ভাল গাইড?” সন্দ্বিহ চিত্তে প্রশ্ন করিল তড়িৎ।

“আপনি আর একবার এসেছিলেন না সাতের।”

“তখন ভাল গাইডও পেয়েছিলাম।”

“আপনি স্ত্রীস্বরের কথা বলছেন—সে আমার চাচা।”

তড়িৎ আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, “বাক্, আর অভিনয়ের প্রয়োজন নেই। খবর সব ভাল ত?”

“ভেমন সুবিধে নয়। কাল থেকে খুব কড়া নজর পড়েছে চারদিকে, মনে হচ্ছে যেন বড়ের আগেকার ধমধমে ভাব। আজ সকালে এই জরুরী চিঠি পেয়েছি, পড়ে দেখুন।”

“আমাকে অবিলম্বে পেশোয়ার যেতে হবে। দিল্লী গিয়ে বাদেশ সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল তাহাও ওখানে বাচ্ছে।”

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এক টুকরা কাগজে সামান্য কি লিখিয়া গাইডের হাতে দিয়া কহিল, “আগামী পরশ সোমেশ ও ভেলিকার



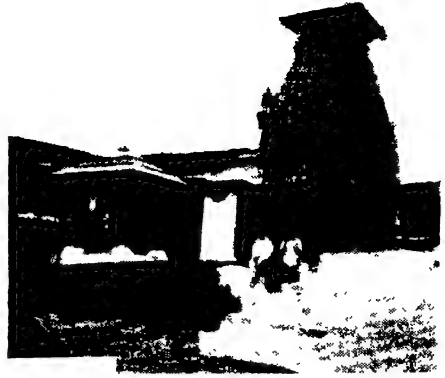
নঙ্গল হাইডেল কানাল পরিদর্শন-রত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু



## কেদার-বজ্রী দর্শনে



দূর হইতে কেদারনাথের দৃশ্য



ওখীমট—কেদারনাথের শীতকালীন আবাস



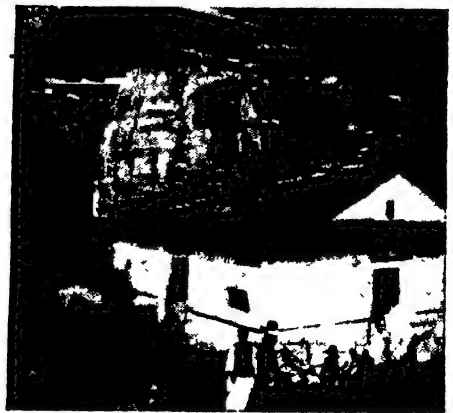
কেদারনাথে শঙ্করাচার্যের সমাধি



পঞ্চকেদারের অন্তিম তুলনাপ



কেদারনাথের মন্দির—প্রভাতে



ত্রিশূলী নারায়ণ



“ওটা হচ্ছে প্রয়োজনের পরফ। মুসলমানেরা এদেশ দখল করে এখানেই বসবাস করেছে, আর তখনকার দিনে দুর্গের মধ্যেই নাদিশাদের বৈঠক ভাগ সময় থাকবার রীতি ছিল, হতে অনেক পরমা পর্যন্ত করে ওরা এ দুর্গের অপরিসীম স্থিতি করেছে। কিন্তু এ যখন

হাচার বধন তান্ময়হলে জাগিয়া পৌছিল তখন তাহের গদুজ

ও মিনারের চূড়াগুলি পৌণ্ড্রির আভার মণ্ডিত হইয়া লজ্জারক্ত-  
তরুণীর মত দেখাইতেছিল।

কটক পায় হইয়া এই দৃশ্য চোখে পড়িতেই প্রতিমা বিশ্বের  
অভিভূত হইল। বিশ্বের আশ্চর্য্য এই তাজমহল। শত শত  
বৎসরের লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ে প্রেমের এক অপূর্ণ স্মৃতি—  
তুই কি স্মৃতি, এই কি প্রেম নয় বা শিলামণ্ডিত হয়ে আছে নীরব  
নিধর।

সামনেই দীর্ঘ জলাধার সবক্কে রক্ষিত, মাঝে মাঝে পদ্ম ফুটিয়া  
আছে, যেন তাজের নিকট আশ্বেত্সর্গের জন্ত জলের বুকে তাজ  
প্রতিবিম্বিত। ভক্তের কাছে ভগবান যেমন সর্বব্যাপ্ত তেমনই  
এখানে সবকিছুর মধ্যেই তাজ আপনি আপন মহিমায় মহিমাযিত  
হইয়া আছে। হুই পাশে সবক্কে রক্ষিত ঝাউয়ের সাদি সমস্ত পারি-  
পার্শ্বিককে এক অপকর্ণ জ্বিমাণিত করিয়া তুলিয়াছে।

আশ্বে আশ্বে হাঁটিয়া তড়িং ও প্রতিমা তাজমহলের উপরের  
চাতালে উঠিল। এতক্ষণ কেহই কথা কহে নাই। এর মাথুরা  
সমস্ত হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া নির্বাক করিয়া দিয়াছিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিল তড়িং। এদিকওদিক চাতিয়া কহিল,  
“তুমি চার দিক ঘুর ফিরে দেখ, আমি ততক্ষণে ঐ মিনারের ওপরে  
উঠে কাজ সেয়ে নিচ্ছি। ভয় পেয়ো না। আমাদের অনেক লোক  
এই আশেপাশে আছে।”

“ভয়, ভয় আমার নেই। আমার বা-কিছু ভয় সে শুধু  
তোমাকে।”—হাসিয়া জবাব দিল প্রতিমা।

তড়িং বাইতে উত্তত হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিমার কথা যেন  
হেঁয়ালী মনে হইল। ইচ্ছা হইয়াছিল এই কথার অর্থ জিজ্ঞাসা  
করিয়া লয়। কিন্তু শ্রুত শুকরি কাজ থাকায় মুহূর্তকাল অপেক্ষা  
করিয়া পুনরায় চলিতে সুরু করিল।

প্রতিমা আশ্বে আশ্বে সমস্ত দেশিয়া সমাধি-গুহে প্রবেশ করিল।  
তখন সমাধি-রক্ষকেরা শ্রদ্ধাভরে ফুল ছড়াইতেছিল। প্রতিমা  
নীরবে তাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া হুই-একটি ফুল তুলিয়া  
লইল।

বাহিরে আসিয়া প্রতিমা যমুনার ধারে উপবেশন করিল।  
সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। আশপাশের ফুল হুইতে গন্ধ ছড়াইয়া  
বাতাস সকলের হৃদয়ে এক মধুর আবেশ সৃষ্টি করিতেছিল। যেন  
সম্রাট-দম্পতির প্রেম যুগে যুগে ফুল হইয়া গন্ধ বিতরণ করিতেছে!

বতই তাজের কথা ভাবিতেছে, এক অনাশ্রয়িত আনন্দের  
চেটে আসিয়া তাহার হৃদয়কে ততই আন্দোলিত করিয়া তুলিতে-  
ছিল। প্রেম কি বস্তু তা তাহার জানা নাই—তাহার জীবনপথে  
এ ছিল নিবিষ্ট বস্তু এত দিন, আজও আছে। কিন্তু এই পাবাণ  
কি তাহাকে নূতন মস্ত্রে দীক্ষিত করিবে নাকি!

সম্রাট পাবাণ-কলকের এই ফুলের মধ্যে যে কাব্য রচনা করিয়া-  
ছেন তা মানুষেরই কাব্য। আবহমানকাল প্রবাহিত জী-পুরুষের  
প্রেম সূত্র হইয়া আছে যেতজীমণ্ডিত এই সোঁথে।

প্রতিমার মনে হইল প্রেম কেবল মিলনেই সার্থক নয়—  
বিরহের মধ্যেও এর মাথুরা লুকিয়ে আছে। তাহার ব্যক্তিগত  
জীবনের সঙ্গে মিলাইতে গিয়া হুই কোঁটা জল তাহার হুই গও  
বাহিয়া মাটিতে পড়িল। মনে মনে সম্রাট-দম্পতিকে প্রশ্ন  
জানাইয়া কহিল, “ওগো সম্রাট দম্পতি, তোমাদের প্রেম, তোমাদের  
মিলন, তোমাদের বিরহ চিরতবে সূত্র করে রেখে গিয়েছে—ভাসিয়ে  
দিয়েছে তোমাদের প্রেম-কাহিনীর তরলী যুগে যুগে মানুষের কাছে  
বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু আমার বাধা কাউকে বলা দূরের  
কথা, নিজের মনেও ভাবতে অধিকারী নই।

তড়িং পাশে আসিয়া বসিতেই প্রতিমার চিন্তাস্রোতে বাধা  
পড়িল।

“কি ভাবছ?” প্রশ্ন করিল তড়িং।

“এ প্রেমের তীর্থ। এক দিন সম্রাট বিরহবাধার বাধিত  
হয়ে এর সৃষ্টি করে গিয়েছেন—কিন্তু এ আজও এমন জীবন্ত হয়ে  
থাকতে পারে তা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। আমি  
সম্রাসিনী—কিন্তু আমার হৃদয়কেও দিয়েছে এক অপূর্ণ দোলা—  
এমনি অল্পভূতি আমার জীবনে কোনদিন আসে নি তড়িং!।”—  
কথার শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল প্রতিমার হৃদয়  
মণ্ডিত করিয়া। প্রতিমার চক্ষু মুদ্রিয়া আসিল।

“আমার কি মনে হয় জান প্রতিমা, এ তাজমহল এক বিলাসী  
সম্রাটের বাধার বিলাসের আশ্রয়প্রকাশ মাত্র। দেশ-বিদেশের অর্থ  
তরবারির মুখে এনে চলেছেন তাঁর পেয়াল চরিতার্থ করবার জন্ত।  
সহস্র সহস্র ক্রীতদাস জীবন দিয়েছে তাঁর এই খামপেয়ালীর  
বেদীতে। তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস লুকিয়ে আছে তাজের প্রতিটি পাথরের  
গাঁধুনিতে। পৃথিবীতে সহস্র সহস্র লোকের জীবনে আসে এমনি  
প্রেম-মিলন-বিরহ। তাদের বাধা, তাদের বিরহ মিলিয়ে যায়  
দীর্ঘনিঃশ্বাসে, তাদের জীবনের সঙ্গে—কে তার ধবর রাখে প্রতিমা!  
কিন্তু প্রবলের খামপেয়ালীর কাগড়গড়ায় বলহীনতা বাড়িয়ে দিতে  
বাধা নিজেরের গলা”...

তড়িংকে বাধা দিয়া প্রতিমা কহিল, “তোমার মুখে এমনি কথা  
শোনবার প্রত্যাশা কবি নি তড়িং। সম্রাটের মহান হৃদয়ের  
অজ্ঞরাশি জমাট বেঁধে আছে এই শুভ্র পাবাণ-ফুলকে। চাদের  
কলক দ্বার কুমুদের কীট বিচাষ করে জীবনটাকে বিবমর করে  
তুলো না তড়িং!”

“পারতাম প্রতিমা, যদি না মনে হ’ত তখনকার রক্ষিত লালিত  
জনগণের তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন প্রাসাদের প্রত্যেক পাথরের ভিতর  
থেকে ফুটে বেরুচ্ছে! সেই সব সত্যচরিতের বিবাক্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস  
আজও আমার গারে লাগছে!”

“সত্যই তোমার জন্ত হৃৎ হর তড়িং। এই প্রেমের তীর্থ  
বসেও তোমার মন এতটুকু সাদা দিচ্ছে না।”—উত্তেজিত কণ্ঠে  
কহিল প্রতিমা।

“দেখছ তুই, ঐ যমুনার অপর পারে, সেখানে নিশ্চয় দেখেছ

গোবুন্দির আলোর একটা ভাঙা অষ্টালিকা ও মিনার। গল্প আছে—কথা হয়েছিল ওখানেও গড়ে উঠবে আর একটা ভাঙ্গমহল কালো পাথরের। সম্রাটের দেহ নাকি ওখানে রাখবারই পবিত্রকল্পনা হয়েছিল। তিনি আরও ভেবেছিলেন যে, এই কালো-সাদার মাঝে যমুনার বুকের উপর দিয়ে তৈরি হবে এক রূপার পুল। হয়ত এটা নিছক গল্প, কিন্তু এমন গল্পও মানুষের কল্পনার আসত! এই ছিল বিলাসিতা ও কল্পনাতীত অপব্যয়ের স্বরূপ!”

প্রতিমা—“ধাক, ধাক তড়িৎদা, এখন এ সব কথা নাই-বা বললে।”

তড়িতের হৃদয় উদ্বেলিত—সে বলিয়া চলিল, “ইতিহাসের পৃষ্ঠা ঘেঁটে লাভ নেই। সমলহৃদয় বিষয়বলেশহীন দরিত্র চারী গৃহস্থের কথা ভাব। তাদের কুটার ভেঙে গৃহহীন করে, তাদেরই অঙ্কিত সম্পদে সেখানে সুরমা অষ্টালিকা তৈরি করে যদি তাদের বা তাদের ভবিষ্যৎবংশীরদের সেই প্রাসাদের স্থাপত্য-শিল্পের সৌন্দর্য অক্ষতব করতে বলা হয় তবে তা কি ঠিক নিম্মম পরিহাসের মত শোনাবে না?”

তাহাদের আলোচনা-শ্রোতে বাধা পড়িল। বনোয়ারী আসিয়া তড়িতের হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল। তাড়াতাড়ি ইহার খাম ভিড়িয়া পাঠ করিল। সমস্ত ওলটপালট হইবার উপক্রম হইয়াছে মনে হইল। ব্যাপক একটা ধরপাকড়ের ছবি আসিয়া তাহার সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমাকে কহিল, “এখন চল।”

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তড়িৎ বায়ে বায়ে পিছন ফিরিয়া ভাকাইতে গিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া বাইবার উপক্রম হইল।

“তোমাদের সন্দেহ দেখছি পদে পদে”—সকৌতুকে কহিল প্রতিমা।

“এই পবিত্র তীর্থ ভেঙে যেতে আমার মন চাইছে না প্রতিমা। সম্রাটকে যখন সিংহাসন থেকে নামিয়ে শুধু মানুষ হিসেবে দেখি, সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিরহে অবহেলিতহৃদয় শুধু মানুষ বলে তাবি তখন তাঁর ও মমতাজ বেগমের এই অকলঙ্ক প্রেমের শুভ নিদর্শনটিকে হৃদয় দিয়েই অক্ষুণ্ণ করি। বিরহে সম্রাটের হৃদয়ে যে দীর্ঘনিশ্বাস জমা হয়েছিল আজও তা এখানকার আকাশে-বাতাসে মিশে আছে। এ ত শুধু শাজাহান-মমতাজের কাহিনী নয়, মানুষের বিরহ-বাধার হৃদয়ের প্রতিমূর্তি। সম্রাটের পাষণ্ড কবিতা ঝুগ ঝুগ ধরে মানুষের বিরহ-বাধাকে রূপায়িত করেছে। কিন্তু পেরে না পাওয়ার দীর্ঘনিশ্বাস যে কত মানুষের বাধার অদৃষ্ট ভাঙ্গমহল গড়ে তুলেছে ঝুগে ঝুগে, তার খবর কেউ পায় না, খবর পাওয়ার উপায়ও নেই।” বলিয়াই তড়িৎ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—“কেমন নিজের কথার নিজেই প্রতিবাদ করছি, নয় প্রতিমা?”

প্রতিমার বিষয়ের মাজা ছাড়াইয়া গেল। এই মাজ যে

লোক ভাঙ্গমহলের মুণ্ডপাত করিয়াছে তাহার এই কি অদৃষ্ট পরিবর্তন। প্রতিমার মনের কোণে যে বিরক্তিকূট জাগিয়াছিল তাহা নিমেষে মিলাইয়া গেল। প্রতিমার চোখ খুঁটিতে উজ্জ্বল হইল, বলিল, “এই ত তোমার দরদী মনের আসল স্নিগ্ধ রূপ তড়িৎদা! বিরহীর বাধাও তোমার হৃদয়ে বাধা জানায়! শুধু পাথরই নয়, পাথর কেটে জলও বের হয়!”

“আমার নিজের কথার প্রতিবাদ নিজেই করেছি। কিন্তু এই প্রতিবাদই সবটুকু নয়—এ হচ্ছে হৃদয়ের সঙ্গে বৃক্তির বিরোধ। অত্যাচারীর হৃদয়ের বাধা সব সময় সহানুভূতি নিয়ে স্মরণ করা যায় না প্রতিমা।”

২

ভাঙ্গ হইতে ফিরিয়া তড়িৎ তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া কয়েকখানা চিঠি লিখিল। তখনই ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিবার জন্ত বনোয়ারীকে পাঠাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গুইয়া পড়িবার আয়োজন করিতে লাগিল।

একই ঘরের দুই দিকে দুইটি নেয়ারের পাটিরার তড়িৎ ও প্রতিমার শোয়ার ব্যবস্থা। তড়িৎ নিজের বিছানায় গা এলাইয়া দিল। প্রতিমা বারান্দায় বেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তড়িৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “আর দেখি করো না প্রতিমা। কাল ঘুমোতে পার নি—আগামী কাল আবার কি অবস্থার পড়বে তারও ঠিক নেই। কাজেই আজকের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নাও প্রতিমা।”

প্রতিমা ঘরে আসিয়া তড়িতের মাথায় পাশে বসিয়া তাহার চুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢালাইতে ঢালাইতে কহিল, “আমার ঘুম হয় নি আর তুমি বৃষ্টি খুব ঘুমিয়েছ তড়িৎদা।”

তড়িৎ আরামে চোখ বৃক্তিয়া কহিল, “মিছে এসব কয়ছ প্রতিমা, আমার অদৃষ্টে এত সুখ সইবে না।”

প্রতিমা যত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তোমাকে হুঃখ দেব কে? হুঃখকে যে সুপের মত ভোগ করে তাকে হুঃখ দেবার সাধ্য কারও নেই।”

“মানুষ হয়ে জন্মে সুখ-দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই প্রতিমা। আদর্শকে জীবনসর্কষ করে সমস্ত সুখ-দুঃখ আজও বলি দিতে পারি নি। এতদিন এ পথে চলবার পরও সুপের প্রতি টান এবং হুঃখ এড়ানোর চেষ্টা যেন এখনও মনের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে আছে টের পাই।”

“কৈ তার কোন চিহ্ন ত আজও দেখতে পেলাম না।”

“অন্তর্ধানী হলে পেতে।”

“যে মহান আদর্শ ধরে চলেছি, সেই একাধ্র সাধনার মধ্যে নিজের সুখ-দুঃখ বাসনা-কামনা সবগুলিকে ডুবিয়ে দিয়ে চলতে চেষ্টা করছি মাজ। এ ত চেষ্টা নয়! এ অন্তর্লোকেব নিলাফণ সংগ্রাম! এ সংগ্রামে কতবিকৃত হয়ে কত নিষ্ঠাবান কর্মী তলিয়ে গেছে!”

প্রতিমা কহিল, “আচ্ছা তড়িৎদা, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বাইরে বস করে এমন চয়ে পাড়িছ যে এই ভালবাসা, প্রেম প্রভৃতির আধিবাসিক মানে বোঝা ছাড়া এসবের আর কোন বাসাই নেই তোমার মধ্যে— নিজে ‘অমৃতভূত’র সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই—নয়?—” অনাসক্ত প্রেম কি হবে নেই? আমার কিন্তু মনে হয় তোমার বোনের ওটা প্রযোজ্য।”

প্রতিমা তাত শব্দ করিয়া ধরিয়া নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিল—প্রত্যেক চোখের প্রতিটি দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া কহিল, “বাইরে ‘অমৃতভূত’কে দেখা যখন না বসে এ জগৎ যে তরঙ্গ উঠে তখন আমার চিত্তের মধ্যে যে মানুষ নুকিয়ে আছে, তা আর কে না পাবে? তুমিও কি ‘আমি’র মত দেখতে পাও নি প্রতিমা!”

তড়িৎদা তথা ফরাইয়া গিয়াছে—সবুজের হুইখানি কানিতোছে—প্রত্যেকটি নুড়ি পতিতের অজ্ঞাত। কিসের এক অজানা ভয়ে তড়িৎদা তড়িৎদা মগ্নিতে লিপ্ত, প্রতিমার মনে হইল তড়িৎদার হুই চাপ বেন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। “তড়িৎদা তড়িৎদা” কহিয়া নিজের মুক্ত করিয়া রাখিল শব্দে অমৃতভূতের পড়িয়া কানিয়া ফেলিল।

যে কানিতে প্রতিমা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল তাহাতেই তড়িৎদার সর্পিং করিয়া আসিল। তড়িৎ নিজের স্নেহের উচ্চারণের মত হুইখানি লজ্জিত হইল। প্রতিমা শব্দিত দৃষ্টি দেখিয়া পথের একটু আশ্রয় হইয়া তাহার অপরিসীম লজ্জাভাবের কথা জানে করিল, মনে হইল বিজলী বতীর আলোক-বিকিরিত আলোকে যেন চাবুক মারিতে লাগিল। “তড়িৎদা তড়িৎদা” কহিয়া তাহার নিবাইয়া গেল। “তড়িৎদার হুই মনে পাড়িল প্রতিমা তাকে বাসনাছিল—“কর আমার শুভ তোমায়।” তবে কি প্রতিমা মনিত তাহাকে এমন সন্দেহ করিয়াছিল—ছিঃ ছিঃ। প্রতিমাকে সে মূর্খ বোকাইবে কি করিয়া! “হাজারই আদর্শে ‘অমৃতপ্রসিত’ হইয়া এবং তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া প্রতিমা মনস্ত ছাড়িয়া গিয়াছে আর সেই কি না হইবে বিশ্বাসযোগ্য! ‘আমৃতভোলা’ বিপ্লবী সে, গণমানবসী ভোলানাথের ‘উন্নতধর্মী’ গুনিয়া সে ‘সংসারের সমস্ত স্বপ্ন-স্বপ্নে বাসনা-কামনার আশ্রম জলাইয়া দগাধরনের ‘আমৃতভোলা’ নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে, আজ পুত্রের পুত্রদুর্ভাগ্য তাহাকে মনে কোথা হইতে এই নারীর প্রতি ভালবাসা আগ্রহ হইয়া উঠিল।

কিন্তু দৃষ্টি কি সে অপরাধী। বিপ্লবীর কি মানুষ হইতে পারে। প্রতিমার প্রতি ভালবাসার তাহার জন্ম এতদিন তাহারই প্রজ্ঞাকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আর যদি তাহা পূর্ণতা পাইয়া থাকে তবে তাহাতে পাপ কোথায়। এটি প্রেম তাহাকে আদর্শিত করবে না। প্রয়োজন হইলে আশ্রিত সে সমিতির স্বার্থে প্রতিমাকে গুন পদাঙ্ক করিতে পারে। ভাবিতে ভাবিতে নিজের বসার ঘরে অমৃতভূত হইয়া পড়িল।

প্রতিমার কান্না আর কিছুতেই ধামিতে চাহিতেছে না। এতদিন যাহাকে প্রাণমন দিয়া ভালবাসিয়াছে তাহাকে আজ একান্ত ভাবে পাইয়াও তাহার আজ কিসের ভয়। কেন সে তড়িৎদার হাত ধরিয়া বলিতে পারিল না—“আমি তোমারই তড়িৎদা। বিপ্লবের সার্থী করে জীবনসঙ্গিনী হওয়ার অধিকার থেকে যে বঞ্চিত করা নি এত বেগী থাকাজ্ঞা আমার আর কিছু নেই।” তড়িৎদাকে কিসের ভয়। এই শব্দাকুল মূর্তি যদি তড়িৎদা দেখিয়া থাকে তবে তাহা হইতে লজ্জার আর কি আছে? তরঙ্গ চলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছে। “আমি তোমারই হইয়া তড়িৎদা আদর্শিত হইয়াছে যে সুখের চয়ে তা হইবে শোকাবহ। সে ‘আজীবন রিক্ত’—কিন্তু তড়িৎদাকে এটি রিক্তের পদতলে লুটাইতে সে কিছুতেই দিতে পারিবে না। তড়িৎদার চয়ে তড়িৎদার ‘আদর্শ’, তাহার মতানুসৃত সে তাহার কাছে অনেক বড়। প্রয়োজন হইলে কানই সে কানী চলিয়া যাইবে। কিন্তু বহুদূরই বাক তাহা ছাড়্য তড়িৎদার জন্মই বহু হইয়া থাকবে। দূরে গেলেও দূরে সে দাঁড়িতে পারিবে না। মনের নাপালেদে বাহিরে এমন স্থান আছে কোথায় যে সে সারিয়া যাইবে।

তড়িৎদাকে সে অদ্যপাতের পথের সার্থী করিয়া চাহে নাই, সে চাহিয়াছে তাহার মতানুসৃতের সঙ্গিনী রূপে। সেই অদ্যপাত যদি আজ তাহার চয়ে আসিয়া থাকে তবে তাহাকে বদমাশ দিতে লজ্জা কিসের। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে তাহার এ অতিস্থিত ভয়ের কোন কারণ নাই। সেও সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তড়িৎদার নিকট সমর্পণ করিয়াছে। তড়িৎ কখনও তাহাকে অদ্যপাতের পথ মানিয়া না যাইবে না। সে ভাবিল যে মতানুসৃতের কণার ভালবাসা পাইয়া আশ্রয় তার জীবন সার্থক, সে কিনা তাহা ভীত হইয়া চলিয়া আসিয়া তাহার তড়িৎদার ভালবাসার অপমান করিয়া বসিল।

মোচল চোখ মুছিয়া প্রতিমা শয্যা ত্যাগ করিল। ঘরে ধীরে তড়িৎদার পদতলে শয্যা রাখিয়া ডাক দিল—“তড়িৎদা।”

তড়িৎ চমকাইয়া উঠিল—“কে?”

“আমি তোমার প্রতিমা।”

“আলোটা জ্বলে দিয়ে তুমি আমার মাথার কাছে এসে বসো প্রতিমা।” তড়িৎদার কথায় কান্দি দৃষ্টি উঠিল।

প্রতিমা মাথার কাছে আসিয়া বসিলে তড়িৎ প্রতিমার ডান হাতপালা নিজের হুই চোখের মধ্যে রাখিয়া উত্তাপপূর্ণভাবে কহিতে লাগিল—“বন্ধিন আমার প্রেম বয়ে চলেছিল কণ্ঠধারায়, আজ যদি সেই বাবা বাইরে বেড়া’ থাকে তবে তাকে কলুষিত মন নিয়ে অনুমানিত করব না প্রতিমা। আজকের এই পবিত্র মুহূর্তকে নতুন করে গ্রহণ করে নবতর উজ্জ্বল এগিয়ে চলব। ‘আজই তাজ-মহলে বসে বসেছিল প্রেম মানুষের মৃত্যুকে লয় করে, সেই মরণের প্রেম আমাদের জীবনকে সার্থক করে তুলুক।”

তড়িৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রতিমাকে নিজের পাশে দাঁড়

করাইয়া কহিল, “প্রতিমা, মনে মনে এই সঙ্কল্প করো যে আমাদের প্রেম আমাদের বিপ্লবের পথের সহায়ক হবে, প্রতিবন্ধক হবে না। যদি হয় তবে এক অপবকে নিখম হস্তে পৃথিবী থেকে অপসারিত করতেও কুণ্ঠিত হব না।

“আর একটা কথা প্রতিমা, যেভাবে নর-নারীর স্বাভাবিক মিলন হয় আমাদের সেই পথ পরিভ্রমণ, সংস্কারের মতোই আমাদের প্রেমের সার্থকতা। ভোগের মধ্যে আমরা সার্থকতা খুঁজব না।”

অচিরেই বিপ্লবের আশ্রম জলে উঠবে, এই পদাশীন ভাবতবাসী মরণ-শৈল্য মেতে উঠবে, সে যজ্ঞে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের মতোই আমাদের প্রেম সার্থক হবে

কথা শেষ করিয়া তড়িৎ সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দাড়িয়েছিল। প্রতিমা কাছে আস্তে তড়িতে বাতবেষ্টন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তড়িকে প্রাণম করিয়া কহিল, “আগন্তব দব তড়িৎনা।”

তড়িৎ কহিল, “আমাদের মতো গোপন বিদ্যুৎ জ্বলবে না। বই আমাদের বাতবেষ্টন নুকাটা থাকবে না।

দরজায় মুক্ত করাবাত হইলে উল্লসে পূর্ণ করিল। “আমাদের পল্লব আত্মত্যাগ করাই নবতা খুলিয়া দিলে বনোয়ারী। মরণ-শৈল্যের ছায়া দেখিয়া তাহার নিকে সপ্ন দৃষ্টিতে হাবাচল।

“চিঠি ভাঙে নিজেই, কিন্তু আদ এই হোটেলের অপর পুলিশের কড়া নজর পড়েছে। প্রয়োজন হইলে পিতৃ নিয়োগিত নব করে তাকে গুড়িয়ে এসেছি।

“তা হলে আমাদের কোনো নত থাকে ভিত্তি না হইলে চলে যেখানে পাই।”

“গাইকে পেল হোটেল যদি বোম্ব নিক্ষেপে হতেন মনে করেন তবে তিনি মোটর নিয়ে হাতির হবেন।

“জিনিষপদ এনি আছেয়ে ফেলা দরকার। আমি আর প্রতিমা এদিককার কাছ করছি, আর তুমি দারাদার এই দেশে যেখানে এটি পালো কম ওখানে দাড়িয়ে লকা বাগ বাস্তার উপর।”

প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “কেমোনিজম পিন্টো বন্ধ থেকে বার করে রেলে লান, পালানোর অবসর না পেলে কণ্ঠস্বর গোড়াতে ওটার দরকার হবে—কড়িটাড়ি ফেলিও ফেলবার ভয়। আর একটা কথা এই প্রকৌশল মতো প্রয়োজনীয় কয়েকটা মাত্র জামাকাপড় নিয়ে নাও। প্রয়োজন হলে বিজ্ঞানগণ্য ফেলই য়েই হবে।”

তড়িৎ প্রাণনার চিত্তক ম্পর্শ করিয়া কহিল, “এই আমাদের জীবন, এই আমাদের সাদনা—সদাঙ্গ্রস্ত হয়ে থাকতে হয় এমন জগৎ।”

তড়িৎের চাক গরম মনে হইল। সন্দেশ দূর করিবার জল কপালে ছাত দিয়েই মনে হইল ছাত পুড়িয়া যাউতেছে। চিন্তাশ্রিত হইয়া কহিল, “তোমার যে ভীষণ জ্বর তড়িৎনা, আজ কি করে যাবে!”

“একমাত্র মুড়া ভিন্ন অজ কোন কিছুই এ ব্যাড়া বোধ করতে পারবে না”—ঈশং হাসিয়া তড়িৎ জ্বাব দিল।

দূরে মোটরের জনের আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বনোয়ারী ঘবে চুকিয়া কহিল, “মোটর নিয়ে এসেছে গাইড। ওকে অনেকেই চেনে, কাজেই হোটেলের খুব কাছে আসবে না।”

তড়িৎ কহিল, “আমি তোমাদের সঙ্গে বেরব না। বাড়ীর পেছনে ছাত থেকে জল নামবার পাইপ বেয়ে পেছন দিয়ে নেমে যাব। নামলেই একটা ছোট বাস্তা আছে সেটা দিয়ে পশ্চিমে কিছুদূর গিয়ে ডানদিকের রাস্তায় মিনি, চারেক ইটলেই একটা মোড়ে গিয়ে পৌছানো যাবে—সেখানে আছে একটা বটগাছ, তার নাচে পুনি জেলে বসে এক সন্ধ্যা। তোমাদের মোটরে ওর কাছাকাছি গিয়ে সংকেত করো। খুব কাছে এস না।”

প্রতিমা ও বনোয়ারী ইতস্ততঃ বারতেছে দেখিয়া কহিল, “আমি মুক্ত বিলম্ব নয়।”

তাছাড়া মিটি মিটি নামিতে আরম্ভ করিল। প্রতিমা পিছন ফিরিয়া ব্যাকুল করে কহিল, “তোমার হত বড় ভয় হচ্ছে। তুমি যদি শেষ পর্যন্ত না থেকে পার—আমি তোমার ছেড়ে যেতে পারব না।”

“আমি নামতে পারব না আমার কিছু হবে এমন চিন্তা করে বত সমস্ত নষ্ট করবে তইই বিপদকে কাছে ডাকবে। এখন ঢকল হওয়ার সময় নয়।” হাসিয়া উত্তর দিল তড়িৎ। প্রতিমা ফিরিয়া নামিতে আরম্ভ করিলে তড়িৎ কহিল, “আল সব ঠিক আছে তুমি।”

নাম টিপ আছে।—হতর কপল একসঙ্গেই প্রতিমা ও বনোয়ারী দোত লুফায়িত দিশল ম্পর্শ করিয়া।

দাঁড়ি বাস্তি নামিতে নামিতে প্রতিমা বনোয়ারীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আমি মনে কর অন্যকে নিয়ে পালানো পারবে না তবে তুমি নিজে গার পাপ, আমি আমার বাস্তা জ্ঞান ভাই, ছাত-খার সংগ্রহ আছে।”

প্রতিমা যে বনোয়ারীকে হোটেলের দরজা দিকে নামিতে দেখিয়া করানী ও লোচন পূর্ণাঙ্গ, দিগো জজ্ঞাসা করিল, “আদনারা—ন বোঝাও দ্বন্দ্ব—এই বনোয়ারী?”

“আদনার, জানে না যাবে।”

“এত কাঁচকে মোটর নেবে বাওরবে নিম্ন নেই—”

“এই ইন্টার মোটর না জেনায়েন পায়ছে।” ব্যাপর প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলি, “গুন মারি।”

বনোয়ারী ভাঙ্গ করিয়া দরজা খা কেইল। বনোয়ারী পকেট হইতে লকা বাস্তা বারিয়া কহিল, “এই লকা মোটার হোটেলের চাক। আর থাকিদি বক্শিদ।”

ভাগের চাকারি এবার লক্ষ্য করিয়া বিনীতভাবে কহিল, “ও পাবার কেন, আমরা ত আপনাদেরই জ্বরের চাবর—তবে কিনা জানেন, আপনাদা না হব কাল সকালেই চলে যাবেন। বাড়িতে বাওয়াও ত কম হাসানো নয়। তা ছাড়া বোধ হয় সাহেবেদ শরীর

তত ভাল নেই—তিনি বাড়িতে থাকেন না বলে পাঠিয়েছেন।”  
দাবোয়ান এবার দরজায় কবিতা দাঁড়াইল।

বনোয়ারী হাসি পাইল, কিন্তু বাগবিতণ্ডার সময় নষ্ট করা একেবারেই সমীচীন নয়—পুলিস আসিয়া পড়িলেও আর উপায় নাই। তা ছাড়া বেশী তর্কাতর্কি হইলে হোটেলের লোকজন জাগিয়া গেলে মুশকিল হইবে।

বনোয়ারী একবার প্রতিমার দিকে চাহিয়া বুক-পকেটে হাত দিল। প্রতিমাও তাহার ব্লাউজের ভিতর হাত চুকাইল। বীরে বীরে বিলম্বকারের নল একটু বাহিরে আসিল।

কেরানী ও দাবোয়ান ভীত হইল।

“ক্যারা দোস্ত, রাড্ডা ছেড়ে দাও ত ভালমাস্তুরের ছেলেরা।  
সাবাদিন খাটুনি গেছে, একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।”

তাহারা বাহির হইলে কেরানী তাহাদের পিছু লইল। পুলিশের নিকট হইতে সে মোটা টাকা পাইয়াছিল—কাজ হাসিল হইলে আরও পাইবার আশা আছে।

বনোয়ারী কেরানীকে পিছু লইতে দেখিয়া সে একটু পিছনে গিয়া দশটি টাকা দিয়া কহিল, “আর এগোবার চেষ্টা করলে ভান নিয়ে টান পড়বে। কাল সকালে সাহেবের কাছ থেকে আরও কিছু পাবে। তার হাত খুব দরাজ।”

নিজের জীবন দিয়া টাকা লইয়া কি হইবে। তাহা ছাড়া সাহেব ত হোটেলই আছে। আর সাহেবই ত আসল ব্যক্তি, পুলিশ থাকে বিশেষ করে চায়। আর অহুসরণ না করিয়া হোটেলের কিরিয়া আসিল। উপরে উঠিয়া দেখিয়া আসিল তড়িতের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ—আলোও অলিতেছে। তড়িতের উপস্থিতি সন্দেহ নিশ্চিত হইয়া নীচে নামিয়া গুইয়া পড়িল—দাবোয়ানকে কড়া পাহারার নির্দেশ দিয়া।

তাড়ং কালো জামা ও কালো প্যাণ্টে সজ্জিত হইল এবং আলো জ্বালা রাখিয়া পিছন অলিন্ধের কার্নিশ ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইল। হাতের কাছে যে জল নিকাশের পাইপ ছিল তাহাই বহিয়া নীচে নামিল।

সন্ধ্যাসীম কাছে পৌঁছিতে তড়িতের খুব বেশী বিলম্ব হইল না।

বাবাজী তখন নেশার মশগুল পাশে জনভিনেক তক্ত কলিকার আশার তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

সন্ধ্যাসীম পারে হুইট টাকা রাখিয়া তড়িং সাটোজে প্রবিণত করিল। আড়চোখে টাকার অঙ্কটি দেখিয়া সন্ধ্যাসী হাত বাড়াইয়া কহিল, “জীতা রসো বাটা।”

হুই টাকা দিয়া বে সেবক কলিকার তক্ত হইতে চার তাহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে আরও পাইবার আশা আছে অনেক, কাজেই তাহার দিকেই কলিকাটা দিল বাড়াইয়া।

তড়িং মনে মনে হাসিয়া, কয়েক হাতে লইয়া গজিকা সেবনের অভিনয় করিতে লাগিল। তাহাকে অবশ্য এ অবস্থার বেশীকণ কাটাইতে হয় নাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনোয়ারী আসিয়া সন্ধ্যাসীকে প্রণাম করিল।

তড়িং পুনরায় সন্ধ্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। তড়িং ও বনোয়ারী গাড়িতে উঠিলে গাড়ী তীব্রবেগে ছুটিল।

মাইল ত্রিশ দূরে হাতবাস জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিল্লীর গাড়ীতে উঠিয়া তাহারা গাজিয়াবাদ পর্যন্ত গেল। সেখান হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ মোটরে গিয়া নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলের পেশোয়ার-গামী একখানা আপ-ট্রেনে চাপিল। একেবারে পেশোয়ার ষ্টেশনে নামা নিরাপদ কিনা জানা নাই, সুতরাং পঁচিশ মাইল আগে নোসেরাতে নামিয়া মোটরে পেশোয়ার গেল।

অনিচ্ছুরতার মধ্যেও যে এত মাথুখা লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহা প্রতিমার অজ্ঞাত। কাশীর সেই নিত্যকার জীবনে বাচিয়া থাকিবার নিশ্চিত আশ্রয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই : কিন্তু এই যে বিপৎসমূহ অভিধান—সামান্য ভুলও বখন মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে, কিন্তু তার মধ্যেও গতি এবং বৈচিত্র্যের এমন মধুর যোয়াক দেহমনকে পুলকিত করিতে সক্ষম—বড়ই আশ্চর্য্য।

তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অবাঙালীর। কথাবার্তার কোন কারণে বাঙালী বলিয়া সন্দেহ করিলে বিপদ হইতে পারে মনে করিয়া তাহারা সমস্ত পথ এক প্রকার নীরবেই অতিক্রম করিল।

ক্রমশঃ



# প্রাচীন সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতি

অধ্যাপক শ্রীপরিতোষ দাস

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরেরও পূর্বে যখন অল্প সমস্ত দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত ও অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন হিন্দু-প্রতিভার বিকাশ নানা দিক দিয়া পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সেদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গুণে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্পে-সাহিত্যে, শোভায়-সম্পদে পর্যায়ান হইয়া ভগতের শীর্ষ আসনে আরুঢ় হইয়া সর্বত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলিতে স্বতঃই আৰ্য্য-সভ্যতার কথাই মনে উদ্ভিত হয়। কিন্তু মোহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে ভারতে আৰ্য্য সভ্যতা বিস্তৃতির পূর্বে সিদ্ধ উপত্যাকায় জাতিভেদ-সভ্যতা নামে এক উন্নততর সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আৰ্য্যদের এই শক্তিশালী জাতিভেদ এবং কোল, ভৌল, মুণ্ডা, মন্ডোলীয় প্রভৃতি অজ্ঞাত অনাৰ্য্য জাতিদের সম্মুখীন হইতে হয়। নানা ধাত-প্রতিঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়া দুই বা ততোধিক সভ্যতার মিলন সাধিত হয় এবং তাহারই ফলে যে এক অশুণ্ড নব-সভ্যতা গড়িয়া উঠে, তাহারই নাম ভারতীয় হিন্দু বা বৈদিক সভ্যতা। শুধু যে একাধিক সভ্যতার মিলন হইয়াছে তাহা নহে, পদস্পর্ষের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনরূপ এক সূত্রে এখিত হইয়া সম্পূর্ণভাবে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার নাম হিন্দুজাতি। পরবর্তী যুগে শক, হুন, গুপ্তের প্রভৃতি অজ্ঞাত জাতি বাহির হইতে ভারতে আগমন করিয়া হিন্দুজাতির অবয়বে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে যুক্ত হইয়া যায়। আজ আর ভারতবর্ষ কে শক, কে হুন ইহার প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। ইহা কলঙ্কের কথা নয়, গৌরবেরই বিষয়। ইহা একটা সচল জাতির জীবনের স্পন্দনেরই পরিচয় প্রদান করে। নূতন নূতন রক্তধারার মিশ্রণ একটা জাতিকে সতেজ রাখিবার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সুপ্রাচীনকালে হিন্দু-জাতি যে সজীব, প্রাণবন্ত ছিল তাহার প্রমাণ—“ঐ যুগে ব্যাস, বাজীকি, কালিদাস, ভবভূতির মত কবি; শূত্রকের মত নাট্যকার; বিষ্ণুশর্মার মত গল্প-রচয়িতা; যাজ্ঞবল্ক্য, গোতম, শঙ্কর প্রভৃতির মত দার্শনিক; পারিণি, কাত্যায়নের মত বৈয়াকরণ; পিঙ্গলের মত ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ; আৰ্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্যের মত জ্যোতিষবিদ ও গণিতজ্ঞ; চরক ও সুশ্রুতের মত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ; কোটিল্যের মত অর্থশাস্ত্রকার ও নাগার্জ্জুনের মত রাসায়নিক জ্ঞানপ্রদান করিয়াছিলেন।”

এক সময়ে ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশ অপেক্ষা বাঙালী

জাতির বুদ্ধিরস্তির বিশেষ খ্যাতি ছিল। নৃতত্ত্ববিৎগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তাহার কারণই হইল জাতিভেদ, আদি-অষ্টেলীয়, নেগ্রিটো ও আৰ্য্যজাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উৎপত্তি। বিভিন্ন রক্তের দ্বারা আসিয়া একত্র মিলিত হইয়া বাঙালী জাতির প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল বলিয়াই আহা-বিহারে, সুমাজ-ব্যবস্থায়, রীতিনীতিতে, তৈজসপত্রে, গৃহ-নির্মাণে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, গুণপ্রাণহিতায়, বীরত্ব-প্রদর্শনে অপূর্ব প্রতিভার ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়াছে। বহুকাল যাবৎ রক্তের স্রোত একই খাতে প্রবাহিত হওয়ায় বাঙালীর বী-শক্তি ও প্রাণবেগ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে।

যাহাই হউক, এখানে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় ভারতীয় সভ্যতা বা কৃষ্টি, তাহার ভিত্তিই হইল ধর্ম্ম। ভারত-বর্ষের ধর্ম্ম হিমালয়ের মত অত্যাচ্ছ ও গভীর। গঙ্গার দ্বারা যেমন হিমালয়ের বক্ষ হইতে উৎসারিত হইয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সারা দেশকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, ভারতবর্ষের ধর্ম্মও তেমনি আহিমাচল-কুমারিকা পর্য্যন্ত গ্রাম-নগর, গিরিশুহা, এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে সঞ্জীবিত ও অমৃতপ্রাণিত করিয়া রাখিত। ভারতবর্ষের সকল বস্তুর মূলেই ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে রাজ্য ধর্ম্ম অর্থ কলের নিমিত্ত। ভারতবর্ষে কবি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। উপনিষদের ঋষি উদাস্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, “বেদ-বিদ্যাশিক্ষা, কল্প, নিকৃষ্ট, ছন্দ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি সবই অপরাধিভা; যাহার দ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, শুধু তাহাই পরা-বিদ্যা।” ভারতবর্ষ শুধু প্রভাত-সূর্য্যাকিরণের মতোই অমৃতের আশ্বাদ পায় নাই, স্বরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ নবোদিত স্নিগ্ধ সূর্য্যের মত প্রখর মধ্যাহ্ন-ভাস্করকেও বন্দনা করিয়াছে। ভারতবর্ষের চরিত্রের গঠনই এইরূপ—একদিকে উছা যেমন কুসুমের মত কোমল, অপরদিকে তেমনি বস্ত্রের মতই কঠোর। ভারতবর্ষ একই দেবতাকে ক্রুদ্ধ ও শিব—ঋগ্বেদ ও কল্যাণের মূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। ভারত-বর্ষেই মহিমামন্দিনী দুর্গা—মা অন্নপূর্ণা; ভারতবর্ষেই শ্রমশান-চাণ্ডী, নৃমুণ্ডমালিনী, করালিনী কালী মাতৃস্বরূপা। ভারত-বর্ষেই কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। ভারতবর্ষেই অর্জুন ভক্তিরসাম্বৃত পান করিয়া বিশ্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে মৃত্যুর ভিতর দিয়াই জন্মের সার্বকতা।

কোন এক বিশ্বত অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে তরুচ্ছায়া-বেষ্টিত পর্নকুটাবে নবোদিত রবি-করজালে পূর্ব্ব-দিকপ্রান্ত



উদ্ভাসিত হইবার পূর্বক্ষেণে ব্রাহ্ম-যুগ্মধ্বজ সমস্ত আকাশ-বাতাস ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, প্রেক্ষিত করিয়া ঋষির কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল ‘ওঁ’। কারণ শব্দই ব্রহ্ম—যে ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম, নিঃশব্দ, নিঃসংশয় ও নিঃসিক্ত, এক ও অবিভীত; যে ব্রহ্ম সমস্ত জীবজগৎও বটেন আবার জীব-জগতের অতীতও বটেন। ইতাই পরে সেই অতীত যুগে রচিত হইল প্রথম ধর্মগ্রন্থ—ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ শুধু ভারতের নয়, সমস্ত জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। তিলকের মতে ঋগ্বেদের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০ বৎসরের কম নয়। ঋগ্বেদ বলিতে ঋক্ সংহিতা বুঝায়। ঋক্-সংহিতা এক জনের রচিত নয়, বহু মন্ত্র বা ঋষিদের স্তব ও প্রার্থনার সমষ্টি। এই সমস্ত ঋষির মধ্যে গৃন্যমদ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বমদেব, অত্রি প্রভৃতি বিখ্যাত। বিশ্বামিত্র গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি। সে যুগে রুচি সম্বন্ধে গণ-স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রুচি অবলম্বন করিতে পারিত। তাই দামোদ্র কবচ ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের ঋষি। ‘বিশ্বাবার নারী একটি অত্রিবংশীয় সীলোক ঋগ্বেদের পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত একটি সম্পূর্ণ মন্ত্র রচনা করেন এইরূপ কথিত আছে।’ এতদ্ব্যতীত নারীদের মধ্যে বোদা, অপলা ও লোপামুদ্রা প্রভৃতি ঋষির নাম পাওয়া যায়। “ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি”—স্ত্রী স্বাধীনতামাত্রের গোপনা নয়—মন্ত্রের এইরূপ উক্তি তখন হিন্দু ঋষিগণ কর্তৃকও করেন নাই, কিংবা স্ত্রীলোক ও শত্রুদের উপর বেদপঠ বা শ্রবণের নিষেধাজ্ঞা জারী হয় নাই।

সেই প্রাচীনকালে ঋক্-মন্ত্রের বিদগ্ধ অগস্ত্যের আদি কারণ সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছেন তাহা তৎকালীন জগতে আর কোথাও সম্ভবপর হয় নাই। তাহাও যত্ন ও গাভী-যত্ন করনার উৎকর্ষে তাহা চিরদিনই জগতের বিষয় এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলে। ঋগ্বেদ ভিন্ন আরও তিনটি বেদ আছে : সাম, যজুঃ ও অথর্ব। সামবেদের পাঁচস্তোত্রী প্রত্যেক ব্যক্তিত সমস্তটাই ঋক্-সংহিতার মন্ত্র : শুধু তফাৎ এই যে, সামবেদে ঐ সমস্ত মন্ত্র পোত হইত। যজুর্বেদের দুইটি শাখা : শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। সংহিতার পাঁচটি ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ একটি বা একটি বেদের অন্তর্ভুক্ত। ‘চৌষো-তিক’ ও ‘ত্রৈতরে’ ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত, ‘শতপথ’ ব্রাহ্মণ শুক্ল যজুর্বেদের ও ‘তৈত্তিরীয়া’ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। বাগব্জাদির বিষয় সংহিতার সংক্ষেপে এবং ব্রাহ্মণে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পর আর্য্যক ও উপনিষদের সৃষ্টি। ছয় হাজার বৎসরের অধিককাল পূর্বে যে রক্ষের অশ্রুত উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই পুষ্ট হইয়া কালক্রমে সুগন্ধ ফুলে ও সুমিষ্ট

ফল সুশোভিত হইয়া উঠে। ঋগ্বেদে যে জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাই, উপনিষদে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ভারতবর্ষের মৌরীশঙ্কর যেমন অভ্রাভদ্রী মহিমায় জগতের সামনে দণ্ডায়মান, উপনিষদের চিন্তাধারাও তেমনই।

উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্কল্পের কথা বলিলেন এবং তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অপর স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, ‘এই বিষয়-সম্পত্তি দিয়া আমি কি অমৃত লাভ করিতে পারিব?’ প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বাক্য বলিলেন, ‘না, ভোগোপকরণসম্পন্ন মানুষ্যের জীবন যে রক্ষম হই, ভোগ্যবস্তু সে রক্ষম হইবে।’ তখন মৈত্রেয়ী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষের প্রাণের অন্তরতম প্রবেশের কথা—“যেনাত্য নাস্মৃত্যশ্চান্দিমহং তেন কুর্ষাম্”—“যদি দিয়া আমি অমৃত লাভ করিতে পারিব না তাহা আমার কি প্রয়োজন!” মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়া ভারতবর্ষের ঋষি, ভারতের ধর্মের ভিত্তি যে তাগ, সেই কথা উদ্ভাসিত কর্তে ঘোষণা করিয়াছেন। “ভাগ্যেনৈব চন অমৃতং মানসং”—একমাত্র ভাগ্যের দ্বারাষ্ট অমৃত লাভ করা যায়—এই মহাবাক্য চিরকাল ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সকল মনীষীই নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। এতদিন ভারতবর্ষ ছিল ভাগ্যপ্রবণ এবং ধর্মপ্রবণ। কিন্তু আজ ভারতবর্ষ হইয়া উঠিয়াছে ধনপ্রবণ। লোভ আজ আমাদের আকাশচুম্বী। কোভের বশবর্তী হইয়া আজ আমরা চরিত্রের বশিষ্ঠতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ভারতবর্ষে যে মহান্ সংস্কৃতির উদ্ভাসিকানী আমরা, আজ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহা নষ্ট করিতে দিয়াছি। আজ ভাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া চূর্ণমার হইয়া পড়িয়াছে। “সমা বিবেচনাম্ বলিয়াছিলেন—what India needs to-day is character”—আজকের দিনে তাহার প্রয়োজনীয়তা আরও মহতর ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। এতৎকর্ম প্রাথমিককে আবার যদি পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই; তাহা হইলে যদি আবার জগতের শিবধামে বসিতে চাই, তবে শুধু বাস্তব স্বাধীনতা লাভে সে ভ্রমশূন্য সিদ্ধ হইবে না, তা অর্থ নৈতিক মর্মেট হইতে মুক্তি-লাভও হইবে না; সর্বপ্রাণ ভারতবাসীকে হইতে হইবে চরিত্রবান ও জ্ঞানবান।

উপনিষদে ভারতীয় ঋষিরা প্রাচীনকালে যে মহান্ প্রশান্ত, গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন—প্রাচীন জগতে অল্প কোথাও সে রূপ দৃষ্ট হয় না। শুধু চিন্তাশক্তি নহে, অস্তুদৃষ্টি উপনিষদের বিশেষত্ব। উপনিষদ শুধু যুক্তির প্রাশস্ত দেয় নাই। “যং তৎ পশ্যসি তদ্বৎ”—আপনি

বাহা দেখিতেছেন, অর্থাৎ উপলব্ধি করিতেছেন তাহাই বলুন, ইহাই উপনিষদের ভিতরকার কথা। উপনিষদ যে পরম জ্ঞানের নির্দেশ দিয়াছেন তাহা শুধু উপনিষদ পাঠেই লাভ করা যায় না। উপনিষদও সেই কথাই বলিয়াছেন—“নায়মাস্মা প্রবচনেন লভ্য, ন মেধয়া ন বহুনা ক্রতেন”—এই আত্মাকে অধ্যাপনা, মেধা বা বহুশাস্ত্র পাঠে লাভ করা যায় না। উপনিষদে ব্রহ্ম এবং আত্মা একাধ্বাচক। উপনিষদের ব্রহ্ম ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ, আর গীতার পুরুষোত্তম সমার্থ-বাচক। ১-৮খানি উপনিষদের নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রঙ্গ, যুগল, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর—এই এগারখানি উপনিষদই প্রসিদ্ধ ও বহুলপ্রচলিত। ব্রাহ্মণে বেদের কর্মকাণ্ড ও উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এইজন্য উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। চারি বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ শিষ্যপরম্পরায় ঋষিদের মুখে হইতে প্রকৃত হইত বলিয়া ইহাদের প্রকৃতি বলা হয়। বৈদিক গ্রন্থ বলিতে এই সমস্তই বুঝায়। এই সমস্ত বৈদিক গ্রন্থই প্রাগ্বৌদ্ধযুগের।

বিভিন্ন উপনিষদে যে পরম জ্ঞান বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত, বাদ্যায়ণ তাহার একমুত্রে বা বেদান্তশাস্ত্রে এক জায়গায় সে সমস্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর সর্বোপনিষদ-রূপ গাভীকে দোহন করিয়া যে দুগ্ধ বা অমৃত লব্ধ হইয়াছে, তাহাই হইল গীতা। উপনিষদ, ব্রাহ্মসূত্র ও গীতা—এই তিন প্রস্থানত্রয়ী বা বেদান্তশাস্ত্রের তিন শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই তিনটির মধ্যে গীতাই সর্বাধিক জনপ্রিয়, কিন্তু গীতা প্রতিপাঠ্যবস্তু নহে।

গীতা হিন্দুসমাজের সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য গীতাত্তা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাষার লালিত্য, ভাবের গভীরতা ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির দিক দিয়া গীতা কাব্যহিসাবেও গৌরবময় স্থান পাইতে পারে। কিন্তু গীতা প্রথমে ধর্মগ্রন্থ, পরে কাব্য। হিন্দুর ধর্মকে বুঝিতে হইলে গীতার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

গীতান্ত্র ধর্ম কি সে বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা মনীষী নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত গীতার নূতন নূতন ভাষা রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা নির্ধারণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে প্রবৃত্ত না হইয়া গীতা পাঠ করিয়া সাধারণ ভাবে বাহা কল্পনাময় হয় তাহাই বিবেচন করা যাক।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাকালে আত্মীয়স্বজনকে বিনাশসাধন-

পূর্বক রাজ্যলাভ করা নিরর্থক ভাবিয়া অর্জুনের মনে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐক্লব্য কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিমূলক নানাপ্রকার যুক্তি দিয়া, এমন কি বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া অর্জুনের মানসিক জড়তা দূর করিয়াছিলেন। অর্জুনের বিষাদে গীতার প্রারম্ভ, আর “নষ্টমোহ ন্তির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোহস্মি গতসম্বেহ করিষ্যে বচনং তব ॥”—‘হে ভগবান, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমি স্থিতিলাভ করিয়াছি, স্থিত ও গতসম্বেহ হইয়াছি, এখন তোমার বাক্যানুযায়ী কাজ করিব’—অর্জুনের এই উক্তির সঙ্গেই গীতার সমাপ্তি। অর্থাৎ, অর্জুনের কর্মে অপ্রবৃত্তিরূপ জড়তায় গীতার আরম্ভ, আব কর্মে প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসার সঙ্গেই গীতার শেষ। কোন একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গীতা রচিত হয় নাই; গীতায় ঐক্লব্যের উদ্দেশ্য ছিল অর্জুনের বিষাদ দূর করিয়া তাঁহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করানো এবং উহাতে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন।

গীতায় ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যাগ্য মায়েকং শরণং ব্রজ’—সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও—ঐক্লব্য এক কথাও যেমন বলিয়াছেন, তেমনি ‘তস্মাক্ষুযুক্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিহ্বা শক্রন ভূভৃঙ্খ রাজ্যং সমুচ্ছম’—সেই হেতু তুমি ওষ্ঠ, যশ লাভ কর, শত্রু ছয় করিয়া সমুচ্ছিন্ন রাজ্য ভোগ কর—এই উক্তিও করিয়াছেন। একদিকে উচ্চাঙ্গের দর্শন—কে কাকে মারে, কেই-বা মারে; আত্মা অমর, মাণুষ্য যেমন জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মাও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর আশ্রয় করে। আবার অপর দিকে লৌকিক যুক্তি—তুমি যদি যুদ্ধ হইতে বিরত হও, তাহা হইলে তুমি ভয়ের বশবর্তী হইয়া যুদ্ধ বিনুশ হইয়াই বলিয়া লোকসমাজে তোমার অকীর্তি প্রচারিত হইবে এবং সম্মানিত বাস্তবিক পক্ষে অকীর্তির চেয়ে মৃত্যুও প্রেয়ঃ, অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানোর জন্য এই উভয় প্রকারের যুক্তিই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত যুক্তিরই একমাত্র লক্ষ্য—মোহ ও ভ্রান্তিবশতঃ অর্জুনের মনে যে ক্লীবত্ব ও জড়ত্ব আদিয়াছিল তাহা হইতে তঁহাকে মুক্ত করা।

অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া, ভীষণ লোককল্লকারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়—গীতায় কর্মের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত অনেক করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা শুধু এই কথাই প্রমাণ করে যে, পরম ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়াও কর্ম করা বাইতে পারে, তাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। গীতায় কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কোনটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই, বরং

তাহাদের সামঞ্জস্যবিধান করা হইয়াছে। পরম জ্ঞানী ও ভক্ত, সমাজ এবং দেশের কল্যাণের জন্ত ধর্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কর্ম করিতে পারেন—ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য ধর্ম। দেশকে অধর্মের শ্রানি হইতে মুক্ত করিবার জন্ত, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশসাধন করিয়া সাব্ব অর্থাৎ সৎ ব্যক্তিদের লাঞ্জন্য হাত হইতে রক্ষার্থ এবং ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত অর্জুনকে ঐ রকম কক্ষে প্রবৃত্ত করানোর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এবং বিধ উপদেশই দিয়াছিলেন। গীতা: এই হিসাবে কর্মমূলক বটে, কিন্তু তাহা ভক্তি ও জ্ঞানের উপর প্রাধান্য স্থাপনের জন্ত নহে। মোহবশে কর্মবিমুখ ব্যক্তির কর্মবিমুখতা দূর করাই ধর্ম। কাজেই কর্মবিমুখতা দূর করিয়া অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্যবার প্রণোদিত করার মধ্যে কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস নাই, আছে জগতের শাস্তর ধর্মকে পরিস্ফুট করার আকাঙ্ক্ষা। যে ভক্তি ও জ্ঞান কর্মবিমুখতাকে সমর্থন করে, তাহা তামসিকতার নামান্তরমাত্র—তাহা ধর্মের নামে অধর্ম। কর্মবিমুখ ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে কর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—গীতার শ্রীকৃষ্ণের ‘তস্মাৎ যুধ্যস্ব’ এই কথাই প্রমাণ করে—ভক্তি ও জ্ঞানের উপর কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ষাটশ শতাব্দী পর্যন্ত নানা দিক দিয়া হিন্দু প্রতিভার বিভিন্নমুখী বিকাশ হইয়াছিল। তখন ভারতের আত্মা কর্মচঞ্চল ছিল, নব নব কর্মের মধ্য দিয়া আত্ম-আবিকারের পথকে উন্মুক্ত করিতেছিল। কিন্তু তুর্কিদের দ্বারা বিজিত হওয়ার পর মধ্যযুগে হিন্দুর প্রতিভা-বিকাশের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। হিন্দু তাহার ধর্মের গতিবেগ ও উদ্যোগের কথা ভুলিয়া নিজের চারিদিকে শুক আচার-বিচার রূপ কুসংস্কারের বেড়াঙ্কাল দিয়া অচলায়তনের সৃষ্টি করিল। পণ্ডিতবর্গ ‘তৈলাঘার পাত্র কি পাত্রাঘার তৈল’ প্রভৃতি অসার তর্ক-বিতর্ক লইয়া দিনের পর দিন ঘরের কোণে বসিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিলে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বাহিরের সমস্ত সংস্পর্শ সম্বন্ধে পরিহারপূর্বক চলমান জগতের পরিবর্তনের দিকে ক্রক্ষেপ না করিয়া কুপমজুক হইয়া বসিয়া রহিলেন। ফলে জাতীয় জীবনে পঙ্গুতা ও জড়তা আসিয়া প্রবেশ করিল, জাতিকে কর্মবিমুখ করিয়া ভুলিল। তাহারই ফলে ভারতের এই অশংপতন, বিদেশীর হাতে লাঞ্জন্যের একশেষ। ভারতবর্ষকে নতুন করিয়া গঠন করিবার ভার আজ আমাদের উপর জম্ভ। আমাদের নৈতিক বলে বলীয়ান ও শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ‘তস্মাৎ যুধ্যস্ব’ এই বিবেকের বাণী শ্রবণে লাগিত হইয়া অন্তর্য অবিচার অত্যাচার প্রলোভনের

বিরুদ্ধে, দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন ভারতের যে প্রাণবেগ এক দিন সমস্ত বিশ্বকে এক জাতি, এক প্রাণ, এক ধর্মমুদ্রে প্রমিত করিবার শক্তি রাখিত, মধ্যযুগের অচলায়তনের প্রাচীরে সেই প্রাণ-স্রোত রুদ্ধ হইয়া পড়ায় নানা ক্রন্দ আসিয়া জন্মিাছে। আমাদের নবীন প্রাণশক্তিরূপ বজ্রার স্রোত বহাইয়া বহু যুগ-সঞ্চিত ক্রন্দ অপসারিত করিতে হইবে, তবেই ভারত আবার জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে।

গীতা আর একটি অমূল্য শিক্ষা প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেবু কদাচন।” ফলের দিকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া অর্থাৎ প্রলুব্ধ মন লইয়া কখনও কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। নির্লোভ এবং নিলিপ্ত মনে কর্মসাধারে বাঁপাইয়া পড়িলে অমৃতের আনন্দান আপনা হইতে পাওয়া যায়।

কোন জাতিকে জানিতে, বুঝিতে বা চিনিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে তাহার স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের দর্পণ-স্বরূপ। জাতীয় জীবনের চিন্তা, ভাবধারা, অন্তর্ভূতি, কল্পনা সবকিছুই উহার সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। যে জাতির নিভস্ব সাহিত্য নাই, সে জাতি ক্রমে নিজের পরিচয়কে হারাইয়া ফেলে। সেই সুপ্রাচীন কাল ভারত-বর্ষে শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, উচ্চতম কাব্য-সাহিত্যও রচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, আরাধ্য ও উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্মগ্রন্থের কোন কোনটিতে যদিও কবিত্বশক্তির প্রকট পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি সেগুলি কাব্য নহে, রামায়ণ ও মহাভারতই ভারতবর্ষের দুইটি সুপ্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্যই ভারতবর্ষের প্রাণের মূর্ত্তবিকাশ। গীতা মহাভারতের অংশ এবং মহাভারতের বহু পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। তবে রামায়ণ ঠিক কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুইয়ের মধ্যে রামায়ণই অধিকতর জনপ্রিয়। তাহার প্রধান কারণ—বাস্তবিক রামায়ণে যে কাহিনী অতি সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের প্রাণকে অমৃতধারায় সিক্ত করিয়া আসিতেছে। তাই রামায়ণ প্রাচীন হইলেও প্রভাত-সূর্যের মত চির-নবীন, চির-সুন্দর। মহাভারতে রামায়ণ অপেক্ষা উন্নততর সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির নিদর্শন পাই। সমস্ত জগতের সাহিত্যে মহাভারতের স্রাব এত বৃহৎ কাব্য আর আছে কিনা সন্দেহ। মহাভারতে মূল আখ্যায়িকার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার সৃষ্টি এত বেশী যে মনে হয় আজকালকার

অনবসর যুগে এত বড় গ্রন্থ পড়িবার যৈধ্য বিরল? কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর প্রাপ্তি অপনোদনের জন্য কথকের মুখ হইতে যখন ভারতবাসী রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান শুনিত, তখন ইহার সার্থকতা ছিল। এই সমস্ত কথকতার ভিতর দিয়াই আমাদের দেশে লোকশিক্ষা প্রচলিত ছিল। তাহার ফলে ভারতের জনসাধারণ যন্ত বড় এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইতে পারিয়াছে এবং সেই কারণেই হাঃভেলের মত বিদ্বান বিংশ শতাব্দীতেও ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে বলিতে পারিয়াছেন, “ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণ— এমন কি, আধুনিক ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষিতদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিতে পারে।” কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ সেই লোকশিক্ষার সহজ পন্থাটি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আগে ভারতবর্ষ ছিল গ্রামপ্রধান। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রামীণ সভ্যতা; সেদিন আনন্দ-উৎসবে মুখরিত থাকিত গ্রামের আকাশ-বাতাস, বাট-হাট-বাট-মাঠ। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভাবতবর্ষ হইয়া উঠিয়াছে শহরমুখী। পূর্বের সেই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও অনাবিল গ্রাম্য জীবনশ্রোত আজ শুকাইয়া মরিতেছে। সে প্রাণ-স্পন্দন আজ আর অনুভূত হয় না। বিজ্ঞানের দৌলতে সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও আজ আমাদের আনন্দ পরিবেশন করে সত্য; কিন্তু প্রাচীনকালে কথকতা যেকল্প জাতির নৈতিক চরিত্রগঠন করিতে সহায়তা করিত, তেমনটি আর হয় না। দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার শান্ত অন্ধকারে পল্লীর সুশীতল স্নেহের আবেষ্টনীর মধ্যে চণ্ডী-মণ্ডপের মধ্যস্থলে কাঠাসনে উপবেশন করিয়া সমুখে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকের সামনে তুলোট কাগজের পুথি খুলিয়া নাকে চশমা দিয়া যখন কথক-ঠাকুর ধ্রুব-প্রজ্ঞাদের, সাবিত্রী-সত্যবানের হৃদয়-গলানো কাহিনীর বর্ণনা করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ভক্তিতে আধ্বুত হইয়া দর-বিগলিত ধারায় যে অক্ষ-বিস্কন্দন করিত তাহা ভারতবর্ষেরই বৈশিষ্ট্য। এইরূপে ভারতবাসীর হৃদয়ে যুগপৎ যে কোমল ও সুদৃঢ় ভাবের রেখাপাত হইত তাহা তাহাকে অধ্যাত্মচারী হইবার হাত হইতে রক্ষা করিত।

সর্বসাধারণের ধর্মশিক্ষালাভের জন্য হিন্দুপ্রতিভা পুরাণ সৃষ্টি করিয়াছে। হৃদয়মন-মুগ্ধকারী ভক্তিবাসনাত্মকে আশ্বাসন করানোই পুরাণের উদ্দেশ্য। অতি সুন্দর ও প্রাজ্ঞ ভাবে পুরাণে উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব ও প্রজ্ঞাদের কাহিনী সারা বাংলায় সুবিদিত। প্রজ্ঞাদ ভক্তের আদর্শস্থানীয়। প্রজ্ঞাদের চরিত্রে ধ্রুবতারার মত সামনে রাখিয়া ভক্ত অশেষ হৃৎস্পর্ক মধ্য ও ভগবানের কল্যাণময় বরাভয় রূপ দেখিতে পায়। পদ্ম-

পুরাণের বেহলা-লক্ষ্মীরের কাহিনী আজও বাঙালীর হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করে। সীতা, সাবিত্রী, হৃদয়স্ত্রী যেমন নারী-জাতির আদর্শ, বেহলাও তেমনই।

“আমি নরকে বাস করিলে যদি আর্জুনের হৃৎস্পর্ক লাভ হয় তবে অনন্তকাল নরকে বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করি।”— মার্কণ্ডেয় পুরাণের রাজা বিপশ্চিতের এই উক্তি জগতের যে-কোন ধার্মিক মহাপুরুষের উপযুক্ত বাক্য। মহাপুণ্যবান রাজা বিপশ্চিতকে সামান্য ক্রটিই জন্য নরকে যাইতে হইয়াছিল। কিছুক্ষণ নরকে থাকিবার পর যদুভূতের আদেশমত যখন তিনি স্বর্গে যাওয়ার জন্য উত্তম হইলেন, তখনই নরক-বাসীরা তাঁহাকে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিবার জন্য চাঁৎকার করিয়া অনুনয় করিল। কারণ তাঁহার শরীর হইতে এমন মধুর গন্ধ নির্গত হইতেছিল যাহাতে নরকযন্ত্রণা লাঘব করে। তাহাদের করুণ আবেদন শুনিয়া তিনি নরক পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “আমার মনে হয়, মানুষ আর্জুনের হৃৎস্পর্ক লাভ করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, স্বর্গে কিংবা ব্রহ্মলোকে সেরূপ আনন্দ কখনও লাভ করিতে পারে না। আমার উপস্থিতিতে যদি সমস্ত আর্জুনের হৃৎস্পর্ক লাভ হয়, তবে আমি এইখানেই স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিব, এখান হইতে এক পাও নড়িব না।” এইরূপ উচ্চ ভাব খুব কম ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়।

বিষ্ণু, পদ্ম, ভাগবত, বায়ু, ব্রহ্মবৈবর্ত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ—পুরাণসমূহের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। পুরাণসমূহ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ যে একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই রচিত তাহা মনে করিবার সম্ভব কারণ আছে। কারণ সুলতান মালুদের ভারত আক্রমণের সময় আলবারুনী নামে একজন পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কুব্জি বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার গ্রামে বায়ুপুরাণ পাঠ শুনিয়াছেন। কাজেই বায়ুপুরাণ যে সপ্তম শতাব্দীর আগে রচিত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণে মৌর্যবংশীয় রাজাদের (যাঁহাদের রাজত্বকাল ৩২১ হইতে ১৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব), মৎস্যপুরাণে অজ্ঞরাজাদের (২২৫ খ্রীষ্টাব্দে যাঁহাদের রাজত্ব শেষ হয়) এবং বায়ুপুরাণে গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (রাজত্বকাল ৩২০ হইতে ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) রাজত্বের বর্ণনা আছে।

বৈদিক যুগ হইতে ভারতবর্ষের ধর্মাত্মতানাদির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাই যে, বৈদিক ধর্ম প্রথম অবস্থায় বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-যুগে যাগযজ্ঞাদি রূপ কর্মপ্রধান, উপনিষদের যুগে জ্ঞানপ্রধান ও পৌরাণিক যুগে

ভক্তিপ্রধান ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য এগারখানি উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাভাষ্য লিখিয়া অষ্টম মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে পর, ধর্মমতসমূহকে শুধু কথ্য, জ্ঞান বা ভক্তির মাপ-কাঠিতে বিচার করিবার পরিবর্তে ইহা অষ্টমতবাদ কি বিশিষ্টাষ্টমতবাদ, ঐতমতবাদ কি ঐত্যাষ্টমতবাদ এইরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিচার করিবার রীতি হইল।

কাব্যসাহিত্যে ছাড়া শ্রেষ্ঠ নাটক রচনাতেও সে যুগে হিন্দুর কল্পনা যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাসের নাটকসমূহ বহু প্রাচীন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গণপতি শাস্ত্রী ‘স্বপ্নবাসবদত্তা’, ‘প্রতিজ্ঞা-বোগন্ধ-রায়ণ’, ‘চাক্রবর্ত্ত’, ‘প্রতিমা’ প্রভৃতি তেরখানি ভাসের নাটক আনিষ্কার করেন। গণপতি শাস্ত্রীর মতে ভাস কোটিলোর পূর্ববর্ত্তী। ভাসের নাটকের ভাষা খুব সহজ ও প্রাঞ্জল। ‘কাঙ্কেই সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হওয়ার বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ভাসের নাটকসমূহের মধ্যে ‘স্বপ্ন-বাসবদত্তা’ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত।

ভাসের পর আমরা একেবারে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে আসিয়া পড়ি। এই যুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি অশ্বঘোষ কবিদের সমসাময়িক। অতএব তিনি প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং এক দল গায়ক ও গায়িকা লইয়া নানা স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তিনি তাঁহার গানের ভিতর দিয়া জনগণের অনিত্যতা প্রচার করিতেন এবং শ্রোতৃগণকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করিত। অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি আর্ধ্যদেব কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি বৌদ্ধদের মধ্যেও খুব সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তবে বৌদ্ধসন্ন্যাসী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এখানে বিবেচ্য নহে, তাঁহার কবিপ্রতিভার কথাই এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়। ফরাসী পণ্ডিত সিলভা লেভি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “খ্রীষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সমস্ত বৃহৎ ভাবপ্রোত ভারতবর্ষকে সজীবিত ও প্রভাবিত করিয়াছে, তিনি তাহার উৎপত্তিস্থলে দণ্ডায়মান। ভাবের সম্পদে ও বৈচিত্র্যে তিনি মিল্টন, গ্যেটে, কাণ্ট ও ভল্টেয়ারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন।” অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত, সৌন্দর্যনন্দ কাব্য, সূত্রালঙ্কার ও বজ্রমূর্ত্তী-প্রণেতা। সম্প্রতি, সারিপুত্রপ্রকরণ নামক অশ্বঘোষের একখানি নাট্যকাব্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্ধচরিতে কাব্যে যেখানে বুদ্ধদেবের জন্মের পর অসিত স্নান আসিয়া নবজাত শিশুর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন সেই অঙ্গাগা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। এই শ্লোকে অশ্বঘোষের উদ্ভবের কবি প্রতিভার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় :

হৃৎখণ্ডবাখ্যায় বিকীর্ণকেনা ভরাতক্কাগরগোত্রবেগাৎ।  
উত্তারগিহত্যয় মুহূনানবাতঃ জগজ্জান মহামবেদ।”

অর্থাৎ, ব্যাবিরূপ বিকীর্ণ কেনা, ভরারূপ তরঙ্গ, মৃত্যু-রূপ উগ্র প্রোতোবেগসম্বিত হৃৎখণ্ডগরে প্রবাহিত আর্ত জীবসকলকে তিনি জ্ঞানরূপ মহানোকা দ্বারা উদ্ধার করিবেন।

অশ্বঘোষের পর পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সুবর্ণযুগ। ইহার অধিকাংশ সময়ই গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল। মহাকবি কালিদাস, বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রক, ভারবি, ভর্তৃহরি, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি এই যুগের বিখ্যাত কবি শুধু এই যুগের নহে, সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যেই শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। কি নাটক, কি কাব্য, সর্বদিকেই কালিদাসের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের ভাষায় “তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট ষণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবিই কালিদাসের ত্রায় সর্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।”

কালিদাসের নাটকের মধ্যে শকুন্তলাই শ্রেষ্ঠ। ইউরোপের কবিকুলগুরু গ্যেটে শকুন্তলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “কেউ যদি তরুণ বৎসরের স্কুল ও পদিক্ত বৎসরের কল, বা আকৃষ্ট করে ও বিমোহিত করে, বা ক্ষমার নিরুত্তি ও পরিপুষ্টি সাধন করে এবং স্বর্গ ও মর্ত্য একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলাই তা পাবে।” এই অল্প কথার মধ্যে গ্যেটে শকুন্তলা নাটক-খানির পরিপূর্ণ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। কথের আশ্রমে ছয়স্ত ও শকুন্তলার মিলনের মধ্যে যে যৌবনচাকল্য রহিয়াছে, সে মিলন পরিপূর্ণ মিলন নহে। ছয়স্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হওয়ার পর মারীচের আশ্রমে তপস্তানলে দগ্ধ হইয়া শকুন্তলা ‘নিকষিত হেম’ হইয়াছিলেন; আর শকুন্তলাকে দেওয়া অনুরীয়ক ফিরিয়া পাওয়ার পর ছয়স্তের হৃদয় অনুতাপের আশুনে পুড়িয়া শ্মশান হইয়াছিল এবং সেই আশুনে তাঁহার চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়াছিল। তাই মারীচের আশ্রমে যখন ছয়স্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন হয়, তখন বৃক্ষান্তরাল হইতে গোপনে দেখিবার চেষ্টা নাই, অতিথিকে ভুলিয়া যাওয়া নাই, সে মিলনে ভাগ্যকাক্ষা বড় নয়, পবিত্র দাম্পত্য প্রেম অপত্যস্নেহের মধ্য দিয়া মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে।

উপরোক্ত নাটকসমূহ ছাড়া ভবভূতির উত্তররাম-চরিত ও মালতীমাধব; হর্ষবর্দ্ধনের রত্নাবলী ও নাগানন্দ; অষ্টম শতাব্দীর বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস; নবম শতাব্দীর

ভট্টনাৰায়ণের বৈষ্ণবসংহার ও একাদশ শতাব্দীর কুরু মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে নাট্যকলা যে প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা শুধু এই সমস্ত নাটকের মারকতে নহে, উড়িষ্যার পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীতে লিখিত সাহিত্য-দৰ্পণ হইতেও একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কি ভাবে নাটক লিখিতে হইবে, নাটকের নায়কের কি কি গুণ থাকা দরকার, কি রকম জিনিস নাটকে স্থান পাইবার যোগ্য নহে—এ সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ সাহিত্য-দৰ্পণে দেওয়া আছে। সাহিত্য-দৰ্পণ নাটককে প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছে : (১) রূপক ও (২) উপরূপক। আবার রূপকের দশ ও উপরূপকের আঠার রকম বিভিন্ন বিভাগ উহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। তখনকার যুগে নাট্যসাহিত্যের ব্যাপকতার ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নাই। “হিন্দুপ্রাণ সে হৃৎকেই বেঁধে, যে হৃৎকে আনন্দকে আরও মধুর করিয়া তোলে। হিন্দু সেই বিরহই সহ্য করিতে পারে, যে বিরহ-মিলনে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। আতাস্তিক হৃৎকে যাহার পরিসমাপ্তি, হিন্দু প্রাণ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাই সাহিত্য-দৰ্পণকার বলেন, রক্তমাংস আতাস্তিক হৃৎকে কোন ঘটনাই দেখানো নিষেধ। শুধু তাই নয়, এমন কথাও বলা হইয়া থাকে, কোনও প্রকারের দৃষ্টিকটু জিনিসও রক্তমাংস দর্শকের সামনে অভিনীত হইতে পারে না।

গল্প ও আখ্যায়িকা রচনাতেও হিন্দু-প্রতিভা কোন অংশে কম প্রকাশ পায় নাই। আচার্য্য উন্নটরনিটসের কথায় ভারতবর্ষ গল্প ও আখ্যায়িকার দেশ। মহাভারত অসংখ্য আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। উপনিষদেও গল্পছলে অনেক মূল্যবান কথা বলা হইয়াছে। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধজাতক গল্পের ভাণ্ডার। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত। গল্প-পুস্তকের মধ্যে বিষ্ণুসংহার পঞ্চতন্ত্র বিখ্যাত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের খ্যাতি দেশ-বিদেশে এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, তৎকালীন পারস্ত-সম্রাট নৌসরবনের আদেশক্রমে পল্লবী ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে লিখিত ‘হিতোপদেশ’ও খুব জন-প্রিয় গল্পের বই। এতদ্ব্যতীত বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গল্পের বইও আছে।

কথা-সরিৎসাগর কাহীনীর কবি সোমদেবের রচনা। তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক।

ইহা ছাড়াও হিন্দুবা অত্যন্তব্য ‘সুত্র’ সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষে ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করা এবং মুখে মুখে শিক্ষালাভ করার প্রথা সুবিদিত। যাহাতে লোকে সহজে মনে রাখিতে পারে এই জন্ত খুব সংক্ষেপে মনোভাব ব্যক্ত করার রীতি প্রবর্তিত হয়। তাহার ফলেই ‘সুত্রের’ সৃষ্টি। ‘সুত্র’গুলি রাসায়নিক সংশ্লেষের মত সংক্ষিপ্ত অথচ যিনি তাহার অর্থ ঠিক ঠিক বুঝেন তাহার কাছে বিভিন্ন ভাব-প্রকাশক এবং মনে রাখিবার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অবশ্য ইহা অর্থশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক বিখ্যাত পুস্তক ‘সুত্রের’ সমষ্টি, যথা—পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ও বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন।

যে সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু-প্রতিভা নানা দিকে বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেই সংস্কৃত ভাষা অমরসিংহ ও পাণিনির নিকট যেকল্প শ্রী, তাহাতে তাঁহাদের কথা কিছু না বলিলে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় ক্রটি থাকিয়া যাইবে। অভিধান বা কোষ প্রত্যেক ভাষার সম্পদ-স্বরূপ। কালিদাসের সমসাময়িক অমরসিংহ প্রণীত ‘নামালিঙ্গানু-শাসন’ই সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান, সাধারণতঃ ইহা ‘অমরকোষ’ নামে বিখ্যাত। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে রচিত এই অভিধান যে এক আশ্চর্য্য কাহিনী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার কৃতিত্ব পাণিনির কম নয়। পাণিনি জগতের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। তাঁহার ব্যাকরণের নাম ‘শকাঙ্কশাসন’। আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ ‘অষ্টাধ্যায়ী’ বলা হয়। পাণিনি খ্রীষ্টের জন্মের সাত শত বৎসর পূর্বে, পঞ্জাবস্থ আটকের নিকটবর্তী শালতুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি তক্ষশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। পাণিনি ব্যাকরণ রচিত হইবার পর সংস্কৃত ভাষা উক্ত গ্রন্থ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

যে জাতির অতীত এত গৌরবময়, বর্তমানে তাহার ভাগ্যাকাশ দুর্ঘ্যোগের ঘনঘটাৎ আচ্ছন্ন থাকিলেও তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আবার মেঘ অপসারিত হইবে, জাতি সচেতন হইয়া উঠিবে—নবোদিত সূর্য্যের আভাষ তাহার ভবিষ্যৎ গগনের দিগন্তল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।



# হিজলীর উপভাষা

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

ইতিপূর্বে হিজলীর উপভাষা সম্পর্কে বংসামাক আলোচনা করিয়াছি।\* এ বংসর আমি পুনরায় হিজলীতে (খেজুরী থানায়) গিয়াছিলাম। স্থানীয় অধিবাসীদের সচিত্র আলোচনা করিয়া আরও কিছু তথ্য ও শব্দাবলী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল। কোন উচ্চমণ্ডল ভাষাতাত্ত্বিক হিজলীর বিভিন্ন অঞ্চলে অল্পসন্ধান করিলে নিঃসন্দেহে ভাষাতত্ত্বের প্রচুর উপাদান পাইবেন। বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী হিজলী অঞ্চলে বাংলা ও উড়িয়া ভাষা-সহোদরভাষ্যের পারস্পরিক যোগ খুবই স্বাভাবিক। আজও যেমন হিজলী বা মেদিনীপুর জেলায় উড়িয়া ভাগবতাদি ধর্মগ্রন্থ পঠিত বা পূজিত হয়, সেইরূপ উড়িষ্যার কটক ও বালেশ্বর জেলায়ও উড়িয়া রূপে লিপিত প্রাচীন বাংলা পদাবলী গীত হইয়া থাকে। খ্রিষ্টাব্দেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পর হইতেই উড়িয়া সাহিত্যের স্বার্থ প্রচলন শুরু হয়। কবি পিণ্ডীক জৈন্দনের ‘বদন্ত রাসর’ কাব্য বাংলা ও উড়িয়া ভাষার চরগোবী মিলনের সুন্দর দৃষ্টান্ত। জৈমতী মাধবী দেবী, রামচন্দ্র পট্টনায়ক, কানাই খুঁটিয়া প্রমুখ উড়িয়া কবিগণ বহু বাংলা-পদ রচনা করিয়াছেন।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলা-সাহিত্যে এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি আক্ষিকার বাংলা ভাষার (ভাগীরথীর উত্তর তীরে) নাই, কিন্তু হিজলী বা উড়িষ্যার ভাষার প্রচলিত আছে। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে ‘বেত’ (মৃণ), ‘ছায়’ (সম্মুণ), ‘মোহর’ (আমর), ‘হস্তে’ (হইতে), ‘করন্তি’ (করে) ইত্যাদি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আক্ষিকার বাংলা ভাষায় এগুলি নাই। ইহাতে হিজলীর উপভাষাকে উড়িয়া বা উড়িষ্যার প্রভাবজাত না বলিয়া ইহাকে উড়িয়া ভাষার মত সংরক্ষণশীল বলাই সমীচীন। উক্তর দীর্ঘশব্দ সেন সত্যই বলিয়াছেন—“প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ শাখা সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল, এইজন্য এই সাদৃশ্য।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র ভাষা পঞ্চদশ শতকের সলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নয়। কিন্তু আজও হিজলী বা মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলের (ধলভূমির পূর্বাঞ্চলেরও) ভাষার ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ ব্যবহৃত বহু প্রাচীন শব্দ ও ইহার ভাষা-রীতির স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

দুই শত বংসর পূর্বে বাংলাদেশের সর্বত্রই ভাষার অপিনিহিত (Apentho-is) ছিল। এমন পূর্ববঙ্গের উপভাষার আছে, পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার নাই বলিলেই চলে, কিন্তু হিজলীর উপভাষায় ইহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—আজি > আইজ, কালি > কাইল, চাপি > হাইল, মাঙ > মাউগ ইত্যাদি।

কোন কোন মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ হয়। যথা, ঢেলা > ডেলা।

‘ও’ বর্ণের ‘উ’-কারের দিকে প্রবণতা আছে। যথা, কুন, তুমার, বুণ (চলিত ভাষায়) ইত্যাদি। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথিতে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হিজলীর উপভাষায় ষ্ট্রুত ক্রিয়ার রূপ বর্তমান। যেমন, আমি খেয়ে যাব—আমি পাইকরি যাবা, তুমি করেছ—তুমি করি পেলছ ইত্যাদি। ধলভূমির উপভাষায়ও একরূপ ক্রিয়া দেখা যায়।

ঘটমান বর্তমানে (Present progressive) ক্রিয়ার সহিত ‘বট’ শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কথার প্রয়োগ অনুসারে ইহার পরিবর্তন ঘটে। আবার দ্রুত উচ্চারণে মধ্যবর্তী ‘ব’ লোপ পাইয়া এক নূতন ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করে। যেমন, আমি করিবিটি > আমি করিটি, তুমি করবট > তুমি করট, সে করে বটে > সে করেটে, তুমি কর বট > তুমি করটু। এই ক্রিয়া-রূপ ধলভূম-মানভূম উপভাষায়ও বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম প্রান্তের ভাষাগোষ্ঠীর সচিত্র সম্প্রদায় বলিয়া উক্তর জি. এ. গ্রীয়ার্সন হিজলী বা মেদিনীপুরের ভাষাকে ‘পশ্চিম-পশ্চিমী বাংলা’ নামে অভিহিত করিয়াছেন। (Linguistic Survey of India, Vol. V.)

শুধু পৃথক মহাকুমার নয়—একই মহাকুমার বিভিন্ন থানাতেই ক্রিয়াপদের রূপে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, তুমি করেছ, খেজুরী থানায় ‘তুমি করি পেলছ’, কাঁধি থানায় ‘তুমি করিপেকিছ’; সে করেছিল খেজুরী থানায় ‘সে করখলা’, কাঁধি থানায় ‘সে করখলন’ ইত্যাদি।

পঁচিশ বংসর পূর্বে ঐতিহাসিক মহেশ্বনাথ করণ খেজুরী থানায় ভাষা সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

“লিখন-পঠনের ভাষা বাংলা। প্রায় ৫০ বংসর পূর্বে ওড়িয়া ভাষায় বহুল চলন ছিল। বর্ধমান সময়ে উহা আদৌ প্রচলিত নাই। কথা কহিবার ভাষা বাংলার সহিত অল্প ওড়িয়া মিশ্রিত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কখনের ভাষার কিছু না কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয় এবং অধিকাংশ স্থলে কখনের ভাষা হইতে জাতি নির্ণয় শক্ত হয় না। কথার ভাষা দ্রুত মার্জিত হইয়া বাংলাতে পরিণত হইতেছে।” (খেজুরী বন্দর, পৃ. ৭০)

\* প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

১ বাগধা—জ: বিজয়বিহারী ভট্টাচার্য

২ ধলভূম ও মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি—হুদীর করণ, বৃণ্ডার ৭ই জুন, ১৯৫০



মগধ হিন্দী জেলা সম্পর্কেও এই কথা খাটে। কেদারনাথ মণ্ডল সম্পাদিত কুড়িবাগী বাসায়ণ পুঁথিৰ লিপিকবের উক্তি হইতে প্ৰায় দেড় শত বৎসর পূর্বকাল হিন্দীৰ ভাষাৰ নমুনা দেওয়া গেল :

“এ পুস্তক সম্পূর্ণ সদায় ইতি সন ১২২০ সাল। মগধ মাসের ১৯ দিনে বুধবারে বেলা ছয় খড়ি সময়ে কৃষ্ণপক্ষে তিথি চতুর্দশী। এ পুস্তক লেখিলে কেওড়া মাল প্রগণা তবক্ষ বিশ্বান গরাণিয়া গায়র শ্রীগদাধর দাসর বালক শ্রীসাগর দাস। হে সাধু স্বজন মান শুদ্ধ অন্তঃক মেলাই গাইব লেখনা দেখ না ধরিব।” (‘বেলা’, ‘বালক’, ‘মেলাই’, ও ‘লেখনা’ শব্দগুলির ‘ল’ ও ‘ব’-এর উচ্চারণে বিশেষত্ব আছে।)

এই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ঐ অঞ্চলের বর্তমান ভাষায়ও সংসামান নমুনা দেওয়া হইল : ‘গত আষাঢ় মাসে আমি হিন্দী বাধলি। সেটি আমার বন্ধু চুনীলাল মণ্ডলের ডয়ারে অতিথি হাইলি। চুনীলাল আর তার স্ত্রী প্রমীলা দেবীর আদর যত্নে কদিন বেশ আনন্দে কাটিল। একদিন সকাল তাল্লাকের গ্রামটা ঘুরিয়া আইলি। গ্রামের মেলা লোকের সাথে দেখা হোলা। তান্নে খুব ভঙ্গ। তান্নে আমাকে মেলা ‘হিন্দী বানাম’ গাথে দিলা।’ (‘সকাল’ ও ‘ঘুরিয়া’ শব্দ দুটির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে।) শব্দ সূচী দিবার পূর্বে একটি কথা জ্ঞানান প্রয়োজন মনে করি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন জাতির (caste) মধ্যে ভাষার পার্থক্য আছে। এমনও দেখা গিয়াছে, এক জাতির ব্যবহৃত কোন শব্দ আর এক জাতির অজ্ঞাত। হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও আবার ভাষার তারতম্য লক্ষিত হয়। আমরা যে শব্দতালিকা দিলাম, তাহা গেজুৰী ধানার কোন না কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অজ্ঞও প্রচলিত।

শব্দসূচী :

অগলি [  $\leftarrow$  অগল ]—যপকাঠ

অঝাড়—অভবা

অস্ত্রাল—হয়রান

অলখুস—অমাজিত

অসাদুরা—আজেরাজে, শৃঙ্খলাবিহীন

আউমান—[  $\leftarrow$  আউমান  $\leftarrow$  উয় ]—পচিয়া উঠা

আকড়া—( ১ ) বেনী ; ( ২ ) তাড়াতাড়ি

আছড়া—অমসৃণ

আজা [  $\leftarrow$  অজ  $\leftarrow$  আর্ষ ]—মাতামহ [ তুলনীয় আজিয়া, আইমা ]

আঠিয়াচণ্ড—নাছোড়বান্দা, আঠার মত লাগিয়া থাকা

আড়ি [  $\leftarrow$  প্রাঃ অড ]—পুকুরের পাড়

আদতা—অস্থির

আফোয়া—বকাটে

উক্লা [  $\leftarrow$  উক  $\leftarrow$  উৎ ; স্বার্থে লা প্রত্যয় ]—তৈলবিহীন [ তুলনীয় উকু—২৪ পরগণা ]

উথি দেওয়া বা খুনা দেওয়া—ছড়ান

উনুন—আবহ

উমড় কাছাড়—ঈর্ষায় জলিয়া বাওয়া

উমড়ি [  $\leftarrow$  হিন্দী উমড়  $\leftarrow$  উয়ড্ড  $\leftarrow$  উয়দ ]—প্রস্তুত ( প্রাচীন বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে শব্দটি পাওয়া যায় )

উয়াল বা আউয়াল—গোলমাল

ওড়পনা—থোঁচা দিয়া একই কথা পান্টাইয়া বলা

কতরে—কাছে

কন্দ [  $\leftarrow$  কন্দ ]—গাছের মেতি

কণ্ডকট্টা—মিশ্রমিশ্র কালো [ তুলনীয় কালকুটি—কপরাম ]

করভাঙ্গা [ সং করমর্দ, মর্দ অর্থে ভঙ্গ ]—কর্মভাঙ্গা

কথ—ভাগা [ তুলনীয় মোহোর করমে তোলা আণি দিল বিদী —ঐক্যকীর্তন ]

কাউচ—গবাদি পশুর কাঁধের ঘা [ তুলনীয় কাউচ—২৪ পরগণা ]

কাউচাম—আমেজ ( যেমন ঘূমের )

কাউর [  $\leftarrow$  কাউর  $\leftarrow$  কামর  $\leftarrow$  কামরূপ ] আসঙ্গলিপা [ তুলনীয় বাতি ভইলে কামর জারে—চণ্ডীগীতি ]

কাঁকড়া ( কাঁকপাণীর ঢাকুর দেওয়া ? )—বোগা

কাখর বা কাইগোর [  $\leftarrow$  কঁকড়ি  $\leftarrow$  কঁকড়িয়া  $\leftarrow$  কঁকড়িয়া  $\leftarrow$  কঁকড়িকা ] —কুমড়া ( কাঁকড়, কুমড়া প্রভৃতি একই শ্রেণীর ফল )

কানপাড়া—গুনিয়াও না শোনার ভাণ করা

কুড়া [  $\leftarrow$  কুড়ু ]—মোরগ [ তুলনীয় করে ধরি গর ছুরি কুড়া

জবাই কর দশ গুণা দান পায় কড়ি—কবিবঙ্কণ মুকুন্দরাম ]

কুংকুতি [  $\leftarrow$  কাড়কুড় ]—খুনসুড়ি

—গাঢ়

কুচন—আনন্দ

কেটকু [ কি+ঠাই+কু ]—কোথায়

কৈদি—পায়ু, মলদ্বার

কেলা [  $\leftarrow$  হিন্দী কবেলা  $\leftarrow$  কববেল ]—উড়ে [ তুলনীয় কইল্যা—সিরাঙ্গগঞ্জ ]

কোলাগা [  $\leftarrow$  কোল+হাপন ]—কুলা

খরকা [  $\leftarrow$  খড়ি ; কাঠ জাতীয় ]—নারিকেল কাঠের খাটা

খাখি [  $\leftarrow$  খাখর ]—লবণাক্ত

খুলি ( মুখ খোলা ) বা তালানি ( বড় ভগ্নাঙ্ক )—বিংত মুখ

অগভীর হাড়ি [ তুলনীয় তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল—ঐক্যকীর্তন ]

ঘেরশানি [  $\leftarrow$  ঘর+শান ] নোনা গন্ধ

গড়া ( শামুক অর্থে ‘জোজড়া’ ) বা স্থপি (  $\leftarrow$  প্রাঃ গিল ; হিন্দী মীপ )—বিশুক

[ নৌকার ] গাছ—মাঙ্গল [ তুলনীয় গুণ বৃক্ষ ]

গাডুরা [  $\leftarrow$  প্রাঃ গড ]—ভূঁড়িওয়ালা

গাদেড়ী ( পা+দেড়ী, অর্থ অনিরম )—অস্থির, ঝড়ুমতী

গ্যাখরানো—বুক ফুলিয়ে চলা

গুজুরী—ছোট

গুগা—বপন করা

পোড়া কাঠি ( পোড়া + কাঠ )—ধানের বিচালী

পোড়ে পোড়ে—ধীরে ধীরে

পোতব ( <পোত )—পোচা—সুতানোচ

পোঁতা ( <উর্দ্ধ গোতা )—যা—কোন বিষয় চাপিয়া বাওয়া

ঘিনি\*—ঘেসিয়া ( উদাহরণ, দৃষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ঘিনি আসে পাশে )

চণ্ডীশাল—বাল্লাঘর ( ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে চণ্ডীর ঘট স্থাপন করিয়া

বাঝা করা হইত বলিয়া এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে )

চহল [ <কার্সী চহল, chahl ]—চাঁকাব

চাটু—বড় চামচ বা হাতা

চিচিলা, ভেড়ু বা ভেড়ী ( চিকী ভেঙী বা ভিঙী—টোঁড়শ ( ২৪

পরগণায় চিচিলা অল্প এক একম লবাকৃতি সজী,

খেজুরীতে ইহাকে বলে 'সম্বলা' )

চিবণ—বিল্লী [ তুলনীয় উচ্চপালী চিবণ্ডীতী—বাংলা প্রবাদ ]

চেন্না ( তেলুগু 'চিন্না' অর্থে ছোট )—তরকারি রূপে ব্যবহৃত ছোট তরমুজ

ছব—কোঁর

ছেনিয়া—ঝাড়

জঁয়া বা জয়া—আবক্ষণ

জুঁই, জিঁয়া—জামাই

ঝোট—ভেতো পাট

টাক্কা—আম আঁটি

টাটি—ছোট ঠাঁড়ির ঢাকনা

টিক্কা—মাথার তেলো

টিকরি [ <টিকর, something high ]—বোমাক [ তুলনীয়

টিকর বুকিয়া ঠাঁড়ি কাটিলেক বন—ঐক্যমঙ্গল, মাথবাচাৰ্য্য ]

ভাষাতত্ত্ববিদ্যের মতে শক্তিগড় ষ্টেশনের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত 'শাণটিকর' ]

টিক্কা—কোণ ( যেমন মশারির টিক্কা )

টুবি—ডোবা

টেক—এঁটুলি, গবাদি পশুর গায়ের পোকা

টেনিয়া—কাপড়ের পাড় ( বহুধানে 'টেনা' অর্থ বস্ত্রখণ্ড,

তুলনীয়—কটিতে কেবল এক টেনা মাত্র হেরি—ভক্তমাল, লালদাস নামান্তরে কৃষ্ণদাস )

ঠাকা—ধামা

ঠানা [ <স্থান ]—সমাবেশ [ তুলনীয় পাপ পুণ্য বর্ণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ ষষাঠানা—চর্যাগীতি ]

ঠিয়া ( উড়িয়া শব্দ, হিতক > ঠিঅ-অ > ঠিয়া )—ঠাঁড়ানো

ঠেঁকি—ছোট ডাড়

ডাবং—ঘটরূপে ব্যবহৃত কলস ( ২৪ পরগণার সাধারণ কলসকেও 'ডাব' বলে )

ডাবুয়া—ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা

ডাংহা [ <ডাং <দাং ] জালা [ তুলনীয় ডাং জোখীঘরে লাগেলি আগি—চর্যাগীতি ]

ডিঙ্গা—মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে জলের মধ্যে মাটির বেটনী দিয়া শুধ

ডেঁউচ ( পু. বাং ডেও )—একজাতীয় মাদার [ তুলনীয় ডেঁকর —২৪ পরগণা ]

তকম—ক্রোধ

তনিক—লক্ষ্য

তপসাপ—কেউটে সাপ

তবং—টং, ভাঙ্গিয়া [ তুলনীয় গল্প নামে সত্য তার তরঙ্গ এমন —তারতচন্দ্র ]

তবি বা তবাই ( হিন্দুস্থানী তবই )—এক জাতীয় বিজা

তামু—আমানি

তুখা [ <তুখ, হিন্দী তুমড়া ]—একতারা ( প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 'সারাদিন ভিক্ষা করে এক মুঠা চাল তুখার ভরে' )

ধুংমা—ভোতা

ধাউড়ি [ <ধাওড়া <ধাওড়া <ধাওড় ] তৃণ নির্মিত লম্বা আসন ( আসনসোলে মজুরদের বাস গৃহকে 'ধাউড়া' বলে। তুলনীয় চোর ধাউড় নাচি জানি কোন কালে—ঐক্যমঙ্গল, মাথবাচাৰ্য্য )

বুঁদি—ভুঁড়ি

বুম্ভী—বুঁঝা

বুলছুচনা ( ধুলা + ছুঁচা ? )—হাভাতে

ধূপ ( পুরাতন বাংলার ছিল, এখন হিন্দীতে আছে )—রোজ [ তুলনীয় ধূপছায়া ]

ধোসা—বাস্তবসংলগ্ন উঁচু ভূমি

পইড় ( উড়িয়া শব্দ )—ডাব ( চৈতন্যচরিতামৃততে শব্দটি পাওয়া যায় )

পন্ধ—সুবিধা

পচরানো [ <পুড় ]—জিজ্ঞাসা করা

পড়ি ( <প্রতি )—ঠাকুর্দা—প্রপিতামহ [ তুলনীয় পড়িনাতি — হীবেজ্ঞানধর্ম দত্ত সম্পাদিত কুন্তিবাসী দামারণ ]

পড়িয়া—পান [ তুলনীয় পড়ে—২৪ পরগণা ]

পলুয়া—তুচ্ছ বাল ব্যজন

পসারিয়া [ <প্রসাথ ] বা চাড়ায়া—ভড়ংদার

পসিন্দা [ <পসেধন <প্রসেধন ; হিন্দী পসীনা ]—ধাম

পাউচ—সিঁড়ি

পানোজানা ( পাদ + আজানা ? )—খোসামোদ

পানা [ <পনহা <প্রসহব ]—গাভী পালান বা হুঙ্কলী

পিঁচ—কাঠি, ( যেমন নারিকেলের )

পিড়া—ঘরের চাল ( কবিকল্প চণ্ডীতে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় )

পীড়ি—[ <পীঠিকা ]—বংশাঙ্কন

\* ইতিপূর্বে 'গ্রহণ করা' অর্থে ঘিনি শব্দের প্রয়োগ দেখান হইয়াছে।

পাঁড়িঘর—পাখি

পুইমিড়ি—পুইবীচি [ তুলনীয় পুইমিটুলি—কলিকাতা ; পুইডেমী  
—২৪ পরগণা : উড়িষ্যার পোইমজী ]

পেকা ( হিন্দী পেকনা )—কেল ( বেমন, লিপি পেকা )

পেটেকলা—মর্তমান কলা ( 'পেটে' অর্থ মোটা )

কাইমা—ফুলবাবু [ তুলনীয় কইমে—২৪ পরগণা ]

ফাটান—প্রহার

ফিরকিটি [ &lt;ফিকিধ &gt; ]—ফন্দীবাড়

বাউকিয়া—উচু পিঁড়ি

বাউড়া [ <বাহুড়া > ]—ধিরাগমন ( প্রাচীন বাংলায় শব্দটির প্রচুর  
প্রয়োগ দেখা যায়। তুলনীয় বাহুড়ী আপণ ঘর করত  
গমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন )বাথার—বড় মরাই ( চিঠিপত্রে সমাজচিত্র—পঞ্চানন মণ্ডল,  
পৃ. ৩২০ দ্রষ্টব্য )বাড়—পার্শ্বদেশ ( যথা—'বসিলা নায়েব বাড়়ে নামাইয়া পদ'—  
ভারতচন্দ্র )

বাড়িয়া [ &lt;বাটি &gt; ]—ঠেল বা ঘৃত রাপিবার মাটির পাত্র

বাড়ু [ &lt;বুড় &gt; ]—মোড়ল, প্রধান

বালুড়া বা বাপকিড়া—বেলে মাছ

বি ( পুরাতন বাংলার পাওয়া যায় ; হিন্দী ভী )—ও, also  
( উদাহরণ, 'আমি বি যাবা )বিবেদন ( ফাসী )—(১) ভাই বন্ধু, (২) তেজাজত ( কবিকঙ্কণ  
চণ্ডীতে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে )

বুলা—ঝোপ

বেনিয়া [ <বিনন > ] বা ভাঁকা—আঙন বাথার থড়ের বিনানী  
( বন্ধমানে—'সাঁজালি' )

বোমুই—মুগভার

ভগারী ( উড়িয়া ) বা ভাড়াবী—নাপিত ( পূর্বে নাপিতরা ক্ষুব্ধ  
আর ভাণ্ড লইয়া ঘূরিত )ভা [ ভাভ <ভাভ <ভাভ > ]—আলগা ( উদাহরণ, অত রাত্তির  
বেলা দুয়ার ভা রাখলু কেনি ? )

ভাবুয়া [ &lt;প্রাঃ ভবুয়, পূ. বাং বা হিন্দী ভৌহ &gt; ]—ক্র

ভুই শুড়কী [ ভুই + শুড়ক ]—ঘন ঘন বাতায়াত

ভোড়া—মোচা

মচক্—মসিক যুবা

মশনা—মাস্তুর

মাই [ &lt;মাই &lt;মাইবই &lt;মামী &gt; ]—মাস্তুরানী

মাই [ &lt;মাইড়া &gt; ]—টকা—মেয়েছেলে

মাইশোর বা মগস্তুর [ <মার্গলীর্ঘ > ]—মগ্রহারণ মাস [ তুলনীয়  
মাস মধ্যে মাইসর আপনি ভগবান—চন্দ্রীমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণরাম ]

মাজা ( মধ্য বা মজ্জা হইতে )—খোড়

মাজা [ &lt;মর্দ &gt; ]—দ্রীক্ষ

মালপা—শৈল

মুগ্মরণ—কিংকর্ডবাবিমুঢ়, হতভম্ব [ তুলনীয় মুড়ামারা - কলিকাতা ]

মুর্দার [ ফার্সী মুর্দা ]—শব [ তুলনীয় মুর্দফরাস ]

মোনুগী—অসংস্কৃত

ম্যাকা—খুঁটি

বা পাতা [ বা-পাই + তা ]—বা'তা'

বণ—ঝোল

বণ—দিব্য, শপথ

বায়া—ডাঁশা, পাকিবার পূর্বাবস্থা

বীষালি [ &lt;বিষ &lt;ঈর্ষা &gt; ]—হিংস্রক

বোরগনী বা বোরোগলী—বিরক্ত [ তুলনীয় বোর &gt; বোরগ ]

লুনিইছে—পাকিয়া তরল হইয়াছে ( ২৪ পরগণায় 'লুনেছে' )

লাপাপাতি—নরম শাঁসবিশিষ্ট ( ২৪ পরগণায় 'নেওয়াপাতি' )

সঁপড়া—সর্দি

সন্লা—চিচিলা

সাকু—জল কচু

লুডাকচা—বনকচুর ডাঁটা

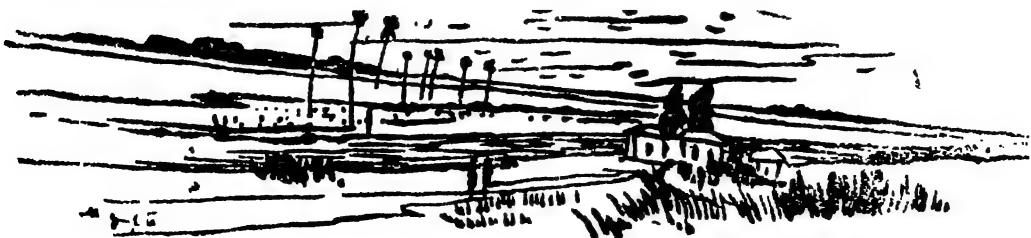
হামার—নৌকার কাছি

হুহর—ফন্দী

হেস—জলজ ঘাসের চাটাই ( ২৪ পরগণায় ইহাকে 'ঝাতলা' বলে )

হোড়—পিচ্ছিল\*

\* এই শব্দ সংগ্রহে শ্রীযুক্ত নীলিমা মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত সাবনা প্রামাণিকের  
বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি এবং কোন কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে উক্ত  
শ্রীযুক্তদের চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তা লাভ করিয়াছি; ইহাদের সকলেরই  
কাছে আমি কৃতজ্ঞ—লেখক।



# শ্রীহরিদাস স্বামী

## শ্রীসুন্দরানন্দ বিজ্ঞাবিনোদ

তানসেন ও বৈজ্ঞ-বাওয়ার সঙ্গীত-শিক্ষাঙ্ক শ্রীহরিদাস স্বামী ১৫৬৯ বিক্রম সংবতে (=১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে) আলিগড় (তৎকালে 'কোল' নামে খ্যাত) জেলার হরিদাসপুর বা হরদাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আলিগড় শহর হইতে এই স্থান প্রায় চারি মাইস দূরবর্তী। ইহা পূর্ববর্তীকালে হরিদাস স্বামীর নামানুসারেই হরিদাসপুর বা হরদাসপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্জাবে 'চরণোদক' গ্রামে কর্ণদেব নামক গর্গ-গোত্রীয় এক সারস্বত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কর্ণদেবের পুত্র বিষ্ণুশ্রী বধন বার বৎসরের বালক, তখন তাঁহার পিতা দেহভ্যাগ করেন। ইনি তখন মাতার সহিত পিতৃদেবের শিষ্য লক্ষ্মীনারায়ণ বশ্মীর নিকট মুসতান



শ্রীহরিদাস স্বামী (প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে), বৃন্দাবন

জেলার উচ্চ গ্রামে গিয়া বাস করেন। কিছুকাল পরে এক সারস্বত ব্রাহ্মণ-কন্ডার পাণিগ্রহণ করিয়া যথাসময়ে তাঁহার গদাধর নামক এক পুত্র লাভ হয়। গদাধরের পুত্র আশুধীর ১৫৪৮ সংবতে (=১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্জাবের তদানীন্তন মুসলমান শাসক-গণের উপদ্রবে আশুধীর পৈত্রিক নিবাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং উত্তর-প্রদেশের আলিগড় জেলার খেড়ে নামক গ্রামে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। এই স্থানে এক শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হয়, তিনি খেড়েধর মহাদেব নামে খ্যাত হন। আশুধীর ও তাঁহার পত্নী গঙ্গাদেবী খেড়েধর শিবের সেবা-পূজার আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের প্রথম পুত্র হরিদাস ১৫৬৯ সংবতের (১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের)

শৌরী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে জগন্নাথ ১৫৭৫ সংবতে (=১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে) ও তৃতীয় পুত্র গোবিন্দ ১৫৮০ সংবতে (=১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিদাসের দ্বিতীয় ভ্রাতা জগন্নাথের বংশধরগণই বৃন্দাবনের বাঁকাবিহারী গোশ্বামী নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইচ্ছাদের মতে হরিদাস বিজয়া সতী নাম্নী এক সারস্বত ব্রাহ্মণ-কন্ডাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পত্নীর মৃত্যুর পর পাঁচিশ বৎসর বয়সে ১৫৯৪ সংবতে (=১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) সংসার পরিত্যাগপূর্বক বৃন্দাবনের নিধুবনে আসিয়া ভজন করিয়াছিলেন। সত্তর বৎসর কাল বৃন্দাবনে বাস করিবার পর ১৬৬৪ সংবতে (=১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে) নিধুবনেই তাঁহার দেহান্ত হয়। অত্থাপি নিধুবনে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে।

কথিত আছে, নিধুবনের একটি স্থানে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী হরিদাস বলিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানে কৃষ্ণের মধো ব্রহ্মবিহারীজী ক্রীড়া করেন। শুনা যায়, হরিদাস স্বামী বিহারীজীর মনস-সেবা করিতেন। হরিদাস স্বামীর সমসাময়িক বিখ্যাত হিত হরিবংশ ও হরিবাস ব্যাস প্রমুখ কয়েকজন বৈষ্ণব হরিদাস স্বামীকে লোক-কল্যাণের নিমিত্ত ব্রহ্মবিহারীজীকে প্রকট করিবার অমুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অমুরোধে হরিদাস ব্রহ্মবিহারীজীর মূর্তি প্রকট করেন এবং নিধুবনেই সেবা করিতে থাকেন। ব্রহ্মবিহারীজী ত্রিভঙ্গবস্ত্রিষ্ণু মূর্তি, তাঁহার বামদেশে জিরাধার কোন মূর্তি নাই, জিরাধার গাদি-সেবা আছে।

এক সময় ত্র্যম্বক কতিপয় সাধু বদরিকাশ্রমে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া হরিদাস স্বামীকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্ত অমুরোধ করেন। কথিত আছে, হরিদাস ব্রহ্মবিহারীজীর নিকট ইহা জানাইলে বাঁকাবিহারী স্বপ্নাদেশ করেন যে, তাঁহার জীচরণ দর্শন করিলেই বদরীনারায়ণ দর্শনের ফল পাওয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া সেই সাধু ভক্তগণও বদরীনারায়ণ দর্শনের ক্লেশ স্বীকার না করিয়া বৃন্দাবনেই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে (বেদিন বদরিনারায়ণের দর্শন ঐশ্ব্যুণ হয়) বাঁকাবিহারীর জীচরণ দর্শন করেন। সেই সময় হইতে অত্থাপি কেবল অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতেই বাঁকাবিহারীর জীচরণ দর্শনের ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া অল্প সময় বাঁকাবিহারীর চরণ আবৃত থাকে এবং তাঁহার ঝাঁকি-দর্শন হয়। গর্ভমন্দিরের দ্বারে একটি পর্দা ঝুলানো থাকে, কয়েক মুহূর্তের জন্ত সেই পর্দাটিকে সরাইয়া ফেলা হয়, আবার পর্দাটি কিছুকণের জন্ত টানিয়া পুনরায় ঝুলিয়া দেওয়া হয়। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব হইতে ঝাঁকি-দর্শনের প্রথাটি প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। বাঁকাবিহারীর

দৰ্শনার্থী জনৈক। কুলবধু এক সময় বিগ্ৰহেৰ মাথুৱী দৰ্শন কৰিতে কৰিতে একেবাৰে তগয় হইয়া পড়েন। এদিকে ঐ ভক্ত-ললনাব পতিপত্নীকে গৃহে আসিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ আহ্বান কৰিতে থাকেন। কুলবধুটি তপন বাঁকাবিহাৰীকে জানান যে, তাঁহাৰ দেহ লৌকিক পত্নিৰ অধীন, কাজেই তাঁহাৰ মন বাঁকাবিহাৰীৰ মুগাৱৰিণ



শুণমূল ভঞ্জনৰত হৰিদাস স্বামী, তাঁহাৰ দক্ষিণে—হিতহৰিবংশ ও বামে—হৰিদাস ব্যাসজী

হইতে অজ্ঞত বাইতে ইচ্ছুক না হইলেও লৌকিক পত্নিৰ তয়ে গৃহে বাইতে হইবে। ইহাতে ক্ৰমবৎসল বাঁকাবিহাৰী অমুৰাগিণী ললনাব গৃহে চলিয়া আসেন। এই ঘটনাৰ পৰ বাঁকাবিহাৰীজীৰ পূজক-সম্প্ৰদায় কাহাকেও বিগ্ৰহদৰ্শনে অধিকক্ষণ অবসৰ প্ৰদান কয়েন না। অমুৰাগী দৰ্শকেৰ আকাঙ্ক্ষা ও আৰ্হিবৰ্দ্ধন কৰাও ঝাকি-দৰ্শনেৰ আৰ একট উদ্দেশ্য।

হৰিদাস স্বামী ৰথন তপানীজন যমুনা-পুলিনস্থ নিধুবনে বসিয়া মানস-সেবা কৰিতেছিলেন, সেই সময় এক ধনাঢ্য ভক্ত এক শিশি অতি উৎকৃষ্ট আতৰ আনিয়া স্বামীজীকে উপহাৰ দেন। হৰিদাস শিশি হইতে আতৰটুকু নিঃশেষে যমুনাৰ বালুকাৰ উপৰে ঢালিয়া দিলেন। দাতা অভ্যস্ত বিবৰ হইয়াছেন বুঝিয়া হৰিদাস উক্ত ভক্তকে বিহাৰীজী দৰ্শন কৰিয়া আসিতে বলিলেন। আতৰ-দাতা তথায় গিয়া দেখিলেন যে, বিগ্ৰহেৰ অঙ্গ হইতে বিন্দু বিন্দু আতৰ পড়াইয়া পড়িতেছে এবং চতুৰ্দ্ধিক আতৰেৰ স্পৰ্শে আয়োগিত হইয়াছে।

তানসেন ও বৈজু-বাওৱা

তানসেন পূৰ্বে ৰামতল্ল মিশ্ৰ নামে এক হিন্দু ব্ৰাহ্মণ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি একজন মুসলমান মৌলবীৰ নিকট সঙ্গীত শিক্ষা কয়েন। মুসলমান ওস্তাদের সংস্পৰ্শে ইসলাম ধৰ্মেৰ প্ৰতি তাঁহাৰ অনুরাগ হয় এবং তিনি একটি ‘সুন্দৰী’ যবনীৰ পাণিগ্ৰহণ কৰিয়া যিঞা তানসেন নামে খ্যাত হন। ইহাৰ পৰ তানসেন বৃন্দল-গণ্ডেৰ ৰাজাৰাম বাঘেলা নামক এক ধনকুৰেবেৰ প্ৰধান গায়ক নিযুক্ত হন। ৰাদশাহ আকবৰ তানসেনেৰ স্নৰুঠেৰ কথা শুনিয়া ৰাজাৰামেৰ নিকট হইতে তানসেনকে চাহিয়া লইয়া নিজেৰ প্ৰধান গায়কৰূপে



বাঁকাবিহাৰীৰ আৰ্হিৰ্ভাব-স্থান নিধুবন, ব্ৰহ্মাবন

নিযুক্ত কয়েন। তানসেনেৰ ইচ্ছামুসাৰে ৰাদশাহেৰ দৰবাৰ হইতে এই মঞ্চে একট যোৰণাপত্ৰ প্ৰচাৰিত হয় যে, তানসেন অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ গায়কই দিল্লীতে গান কৰিতে পাৰিবেন, ইহাৰ অন্তথা আচৰণকাৰীকে প্ৰাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

এক দিন এক ভিখাৰী সাধু বৈজু নামক জনৈক বালককে সঙ্গে লইয়া একতাৰা ৰাজাইয়া দিল্লী নগৰে গান কৰিতেছিলেন। পূৰ্বে যোৰণা অমুৰাগী উক্ত ভিখাৰী সাধু তাঁহাৰ সঙ্গী বালকেৰ সঙ্গিত হৃত হন। সাধুৰ প্ৰাণদণ্ড হয় এবং তাঁহাৰ সঙ্গী বালকটিকে অগ্নবৰষ দেখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই বাপাৰে তানসেনকে সঙ্গীত-প্ৰতি-যোগিতায় পৰাজিত কৰিবাৰ জন্ত বালক বৈজুৰ প্ৰবল ইচ্ছা জাগ্ৰত হয়। বৈজু ব্ৰহ্মাবনে আসিয়া হৰিদাস স্বামীৰ সন্ধান পাইয়া তাঁহাৰ নিকট সঙ্গীত শিক্ষা কয়েন এবং তৎপৰে দিল্লীতে গিয়া তানসেনকে প্ৰতিযোগিতায় আহ্বান কয়েন। দিল্লী হইতে কিছু দূৰে একট বনেৰ মধ্যে আকবৰেৰ মধ্যস্থতাৰ এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয় এবং তানসেন ও বৈজু উভয়েই একট সৰ্বে আবদ্ধ হন যে, তাঁহাদেৰ উভয়েৰ মধ্যে বাঁহাৰ গান শুনিয়া বনেৰ হৰিণ সন্মুখে

উপস্থিত হইবে এবং যিনি তখন হরিণের গলায় মালা পরাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই জয়ী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

বৈজ্ঞ সঙ্গীত আরম্ভ করিলে কিছুক্ষণ পরেই বন হইতে একটি হরিণ সকলের সম্মুখে বৈজ্ঞের পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উৎকর্ষ হইয়া স্থিরভাবে বৈজ্ঞের গান শ্রবণ করিতে লাগিল। তদনন্তর চিত্ত বৈজ্ঞ ও তখন হরিণের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। বৈজ্ঞ গান বন্ধ করিলে হরিণ প্রকৃতিস্থ ও ভীতিবিহীন হইয়া পুনরায় স্বস্থানে চলিয়া গেল। ইহার পর তানসেনের পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু তানসেনের গান শুনিয়া সেই বন হরিণটি পুনর্বার উপস্থিত হইল না। অতএব পূর্ব সঙ্গীতদ্বারা বৈজ্ঞের ভয় ও তানসেনের পরাক্রম ঘোষিত হইল। কথিত আছে, এষ্ট সময় বাদশাহ আকবর নাকি বলিয়াছিলেন, যখন বৈজ্ঞের সঙ্গীত শুনিয়া তানসেন অপেক্ষা নিকট গায়ক বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন তানসেন অপেক্ষা বৈজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় তদন্তরূপ



হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত ও প্রাচীন টেলিচিত্র, নিখুবন

বিচারে তানসেনেরও প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত; কিন্তু বৈজ্ঞ ইহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, তানসেন একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও শুণ্য ব্যক্তি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহাকে প্রাণদণ্ড দিলে পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। বৈজ্ঞের এরূপ উদারতা দর্শন করিয়া তানসেন বৈজ্ঞের চরণে পতিত হইলেন এবং বৈজ্ঞের সঙ্গীত-শিক্ষাগুরু স্বাক্ষান লাভ করিয়া বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর নিকট গিয়া কিছুকাল সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া আসিলেন।

আকবর বৈজ্ঞকে তাঁহার দরবারে প্রধান গায়করূপে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে বৈজ্ঞ বলিলেন, “আমি দিল্লীখবের মনোবন্ধন করিবার জগৎ গান শিক্ষা করি নাই, আমি একমাত্র পরমেশ্বরের

তৃপ্তিবিধানের জন্তই গান শিক্ষা করিয়াছি, জাগতিক সম্মান ও অর্থ পরমেশ্বর-সন্তোষের তুলনায় অতি তুচ্ছ।” দিল্লীখবের কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইলেন না দেখিয়া সেই পরমেশ্বর-প্রেমিক বৈজ্ঞকে সন্তানগণ ‘বাওরা’ উপাধি দিয়াছিলেন। ‘বাওরা’ শব্দের অর্থ পাগল—প্রেম-পাগল; সেই সময় হইতে তিনি বৈজ্ঞ-বাওরা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

#### বাদশাহ আকবর ও হরিদাস স্বামী

১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া হিন্দুর বেশে হরিদাস স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত বৃন্দাবনের নিখুবনে আগমন করেন। আকবরের ইচ্ছা ছিল, তিনি বৈজ্ঞ-বাওরার গুরু হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বাইবেন; কিন্তু দিল্লীখবের তুমুলমত স্বাধীনচেতা হরিদাস স্বামী গান করিবেন না জানিয়া তানসেন একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তানসেন হরিদাস স্বামীর নিকট একটি সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার কালে ইচ্ছা করিয়াই বাগিণীর মধ্যে একটু ভুল করিয়া গেলেন। সেই ভ্রমটি সংশোধন করিবার জন্ত হরিদাস স্বামী যখন গান ধরিলেন, তখন সন্ধ্যাট আকবর অশাস্ত মূগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং অত্যন্ত কাতরভাবে স্বামীজীর কিছু সেবার অধিকার প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস স্বামী বলিলেন, তাঁহার কোন অভাব নাই, তবে বাদশাহ যখন সেবা করিবার জন্ত অত্যন্ত বাগ্ন হইয়াছেন তখন যমুনার নিকটস্থ ঘাটের একটি ভগ্ন সোপানের কিয়দংশ মেরামত করাইয়া দিতে পারেন। বাদশাহ ইহাকে অতি অকিঞ্চির সেবা মনে করিয়াছিলেন; পরে হরিদাস স্বামী ঐখবর প্রকাশ করিয়া আকবরকে দেখাইলেন যে, উক্ত সোপান এরূপ বহুল্পা দীর্ঘক, মুক্কা প্রভৃতি দ্বারা নিশ্চিত যে, বাদশাহ তাঁহার সমগ্র রাজ্য বিক্রয় করিয়াও উহা মেরামত করাইয়া দিতে পারিবেন না।\*

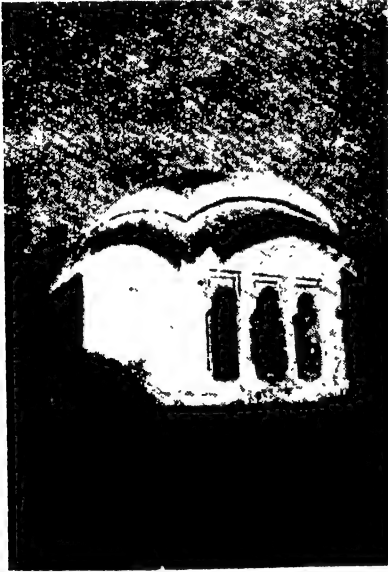
এক বিবরণ অনুসারে রামতল্ল মিশ্র বালক অবস্থায় বৃন্দাবনে কোন ব্রহ্মবাসীর গৃহের গোচারণে নিযুক্ত ছিলেন। এক দিন প্রাতে কালে হরিদাস স্বামী যমুনার স্নান করিতে বাইতেছিলেন, এমন সময় পথে অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের গর্জন শুনিতে পাইলেন এবং কতকগুলি পাতীকে ভীতিবিহীন হইয়া উর্দ্ধগুচ্ছে পলাইয়া বাইতে দেখিলেন। বৃন্দাবনে ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল না; তাহাি কোথা হইতে ঐ গর্জন শুনা বাইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া হরিদাস বিম্বিত-মননে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিলেন, এক বালক একটি বৃক্ষের অন্তরালে ঠাড়াইয়া বাঘের স্রাব ডাক ছাড়িতেছে। বালকের কণ্ঠস্থ এতটা ব্যাঘ্র-গর্জনের অনুরূপ যে, তাহা শুনিয়া গাভীগণও ভয়ে পলাইতেছে। হরিদাস বালককে নিকটে ডাকিলেন এবং ব্রাহ্মণ-পুত্র জানিয়া তাহাকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রামতল্ল সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। এই বিবরণ

\* কেহ কেহ বলেন, গোড়ীর গোবান্দীপাদপত্রের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

অল্পসময়ে আকবর বাদশাহ্ রামতুল্যকে দিল্লীর দরবারে প্রধান গায়ক নিযুক্ত করেন এবং উত্তরকালে তাঁহাকে এক সুন্দরী বনরী সঙ্গিত বিবাহ দেন। তখনই তিনি মিশ্র তানসেন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গোয়ালিয়র শহরে একটি ঠেঁতুল বৃক্ষের নীচে মিশ্র তানসেনের কবর আছে। অত্যাঁপি নানা দেশের গায়কগণ স্বৰ্গ হইবার আশায় তথায় গিয়া ঠেঁতুল গাছের পাতা চিবাইয়া থাকেন :

#### হরিদাসী সম্প্রদায়

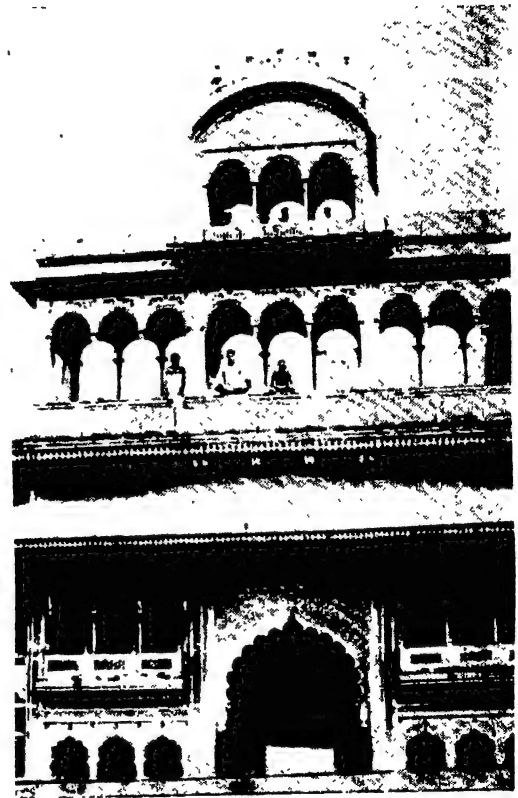
হরিদাস স্বামীর তৃতীয় ভ্রাতা গোবিন্দর পুত্র বিট-ঠল-বিপুলজী। তিনি হরিদাস স্বামীর নিকট চট্টতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া সংসার-ত্যাগী হন। হরিদাসের দ্বিতীয় ভ্রাতা ও শিষ্য জগন্নাথ এবং বিট-ঠল-বিপুল উভয়েই হরিদাসের তিরোধানকালে



রঙ্গমহল বা রাধাকৃষ্ণ বিশাল স্থান

তাঁহার নিকট ছিলেন। কথিত আছে, হরিদাস স্বামী জগন্নাথকে বাঁকাবিহারীর সেবা এবং বিট-ঠল-বিপুলকে নিজ ব্যবহৃত কোপীন ও কবজ দিয়া বান। জগন্নাথদাসের বংশধর গৃহস্থ গোষামিগণ এবং বিট-ঠল-বিপুলের শিষ্য পরম্পরায় ত্যাগী সাধুগণ নিম্নবনে থাকিয়া বাঁকাবিহারীকে স্ব-স্ব আরাধ্য রূপে সেবা করিতেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্যাগী ও গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁকাবিহারীর সেবা-পূজার অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। বাঁকাবিহারীর গোষামিগণের অজ্ঞতম মোহনলাল গোষামী নামক এক ব্যক্তি উক্ত বিবাদের ফলে নিম্নবনের মধ্যে নিহত হন। তখন সিদ্ধিয়ার মহারাজ সুবাদার ছিলেন। তিনি মোহনলালের পুত্রকে বাঁকাবিহারীর মন্দিরের মহাশয়ের পবিত্রে বসাইয়া দোবী ব্যক্তিগণকে বার বৎসর কাল

নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেন।\* এই সময় হইতে বাঁকাবিহারীর সেবা ও নিম্নবন-স্থান সমস্তই জগন্নাথের বংশধর গৃহস্থ গোষামিগণের অধিকারভুক্ত হয়। এই সময় বাঁকাবিহারী নিম্নবন হইতে মদনমোহনের মন্দিরে বাইবার পথে পুরনো সহরে বিহার করেন এবং ঐ পুরী বিহারীপুরা নামে খ্যাত হয়। এই স্থানের বিহারীজীর মন্দিরটিও কালক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িলে হরিদাসী সম্প্রদায়ের ধনী ভক্ত ও গোষামিগণ প্রায় সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি সুন্দর নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে বাঁকাবিহারীর সেবাই বৃন্দাবনের বিশেষ সমৃদ্ধ সেবা!



বাঁকাবিহারীজীর মন্দির

উক্ত বিরক্ত হরিদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌনীদাস বা মোহিনী দাস নামক এক ব্যক্তি সর্কপ্রধান ছিলেন। শুনা যায়, ইনি বার বৎসর পরে পুনরায় বৃন্দাবনে আগমন করিলে ইহার শিষ্য-সম্প্রদায় ইহাকে পাণিঘাটের নিকট বমুনায় তীরে বাঁশের টাটি (বেড়া) দিয়া ঘিরিয়া একটি স্থানে থাকিতে দেন। এই স্থানটি কালে 'মৌনীদাসের টাটি' বা 'টাটি-আস্থান' নামে খ্যাত হয়। অনেকে

\* গোয়ালিয়র-রাজের হাকিম প্রহ্লাদ সেবাজী যে রায় প্রধান করেন, কাসি ভাণ্ডার লিখিত ও সিলমোহরযুক্ত সেই হুকুমনামাটি আমরা বাঁকা-বিহারীর গোষামিগণের নিকট দেখিয়াছি।



ভুলক্রমে টাটি-আস্থানকে হরিদাস স্বামীর ভজন-স্থান এবং এখান হইতেই বাদশাহ আকবর তানসেনকে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ ইহা পূর্ববর্তী কালে নির্মিত হইয়াছে। এখানে মৌনীনীদাসের সমাধি ও তাঁহার গুরু ললিতা কিশোরদাসের নামানুসারে ললিতা-কিশোরজী নামক ঐক্কক্ষমূর্তি জীরাধিকার সতিত স্থাপিত হইয়াছেন। মৌনীনীদাস বিরক্ত-শিষ্য-পারম্পর্য্যে হরিদাস স্বামীর অষ্টম অধস্তন বলিয়া কথিত। হরিদাস স্বামী কোন্ সম্প্রদায়-



ভগবানদাসজী, টাটি-আস্থান

ভুক্ত ছিলেন, তদ্বিবধে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন গ্রন্থেই কোন উল্লেখ নাই। মৌনীনীদাসের সমসাময়িক নিষার্ক-সম্প্রদায়ের কিশোরদাসজী 'নিজ-মত সিদ্ধান্ত' নামক পুস্তকে হরিদাস স্বামীকে নিষার্ক-সম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। ইহার পর শুনা যায়, মৌনীনীদাসের সপ্তম অধস্তন মহান্ত ভগবানদাসজী হরিদাসের পূর্বকৃত মেলার সময় বৃন্দাবনে টাটি-আস্থানেও তাগী হরিদাসী সম্প্রদায়কে নিষার্ক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করেন। উক্ত মহান্তস্বারে নিষার্কচাচারের বোড়শ অধস্তন বলিয়া বিদিত দেবাচারের শিষ্যের অন্ততম ব্রহ্মভূষণ দেবজী হইতে হরিদাস স্বামীর গুরু-পারম্পর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবানদাসের শিষ্য রঞ্জেদাস ও তাঁহার শিষ্য রাধারমণদাস টাটি-আস্থানের মহান্ত হইয়াছিলেন। এখন রাধারমণদাসের গুরুভ্রাতা জীবাচারমণদাস তথাকার মহান্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন। বাক্য-বিহারীর গোষামিগণের মহান্তস্বারে হরিদাস স্বামীর পিতা আন্তবীর আদি বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে (বল্লভ-সম্প্রদায় নহে) দীক্ষিত হইয়া-

ছিলেন। তদনুসারে আন্তবীরের পুত্র ও শিষ্য হরিদাস স্বামীকে আদি বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা গেলোও বস্তুতঃ তিনি সম্প্রদায়-বস্তুত্বই ছিলেন। হরিদাসী সম্প্রদায়ে হরিদাস স্বামীকে ললিতাদেবীর অবতার বলিয়া কল্পনা করা হয়।

#### মতভেদ

টাটি-আস্থানের বিরক্তগণের ও বাক্যবিহারীর গৃহস্থ-গোষামিগণের মতের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

বাক্যবিহারীর সেবায়ত

গৃহস্থ-গোষামিগণের মত

- ১। হরিদাসের পিতা আন্তবীর ও মাতা গঙ্গাদেবী।
- ২। জন্মস্থান—আলিগড় জেলার হরিদাসপুর গ্রাম।
- ৩। কুল—সাদবত ব্রাহ্মণ।
- ৪। ভ্রমকাল—১৫৬৯ সংবৎ, পৌষী শুক্লা ত্রয়োদশী।
- ৫। পত্নী—বিক্রমামতী। পত্নীর মৃত্যুর পর বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবনে আসেন।

টাটি-আস্থানের বিরক্ত

হরিদাসী সম্প্রদায়ের মত

- ১। হরিদাস স্বামীর পিতা গঙ্গাধর ও মাতা চিত্রাদেবী।
- ২। জন্মস্থান—বৃন্দাবন হইতে এক মাইলের মধ্যে রাজপুর গ্রাম।
- ৩। কুল—সনাঢ্য ব্রাহ্মণ।
- ৪। ভ্রমকাল—১৫৩৭ বিক্রমসংবৎ, রাখাষ্টমী তিথি।
- ৫। হরিদাস স্বামী আজন্ম বিরক্ত।

#### সাম্প্রদায়িক সাহিত্য

হরিদাস স্বামী সংস্কৃত ভাষায় কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ব্রজভাষায় রচিত তাঁহার হুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ১। 'অষ্টাদশ সিদ্ধান্তকে পদ'—ইহাতে ১৮টি পদ বা সঙ্কীত আছে। ২। কেনিমালা—ইহাতে ১১০টি গীতি দৃষ্ট হয়। গীতিগুলিতে জীজীবাধাকৃষ্ণের বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। হরিদাস স্বামীর পর তাঁহার বিরক্ত শিষ্য বিটঠল-বিপুলজী ব্রজভাষায় ৪০টি পদ রচনা করেন। তাহা 'বিটঠল-বিপুলজীকী বাণী' নামে খ্যাত। হরিদাস স্বামীর তিরোধানের পর বিটঠল-বিপুলজী চল্লিশ দিন জীবিত ছিলেন। তিনি গুরুদেব ব্যতীত আর কাহাকেও জীবনে দর্শন করিবেন না, এই সঙ্কল্প করিয়া হুই চক্ষু উপর একটি বস্ত্র বাধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং চল্লিশ দিনে চল্লিশটি পদ রচনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। উক্ত পদাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।

বিটঠল-বিপুলের শিষ্য বিহরণদেবজী ব্রজভাষায় কয়েক সহস্র পদাবলী রচনা করিয়াছেন। ইহার রচিত সাহিত্যই তৎসম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা বিপুলাকার; কিন্তু অজ্ঞাপি ঐ সকল মুদ্রিত হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত সরসদেবজীকী বাণী, নরহরিদেবজীকী বাণী, ভগবৎ-  
রসিকজী বাণী (৮০০ পদাবলী), ললিতমোহনদেবজীকী বাণী প্রভৃতি  
পদাবলী-সাহিত্য হরিনাসী সম্প্রদায়ে ব্রজভাষায় রচিত হইয়াছে।

#### সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান

বৃন্দাবনের নিধুবনে হরিনাস স্বামীব আবিষ্কৃত বাঁকাবিহারীজীর  
প্রকট-স্থান, রাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী রঙ্গমহল এবং হরিনাসজী, বিটল-  
বিপুলজী, বিহারদেবজী প্রমুখ আচার্য্যগণের সমাধি দৃষ্ট হয়।  
রাধাকৃষ্ণ ও শ্রামকৃষ্ণের মধ্যবর্তী স্থানে হরিনাস স্বামীর ভজনস্থলী  
ও বিহারীজীর মন্দির আছে।

#### সেবাপুঞ্জার প্রণালী

বাঁকাবিহারীর সেবায়েত সম্প্রদায় বলেন যে, তাঁহারা রাগাঙ্কিকা  
পদ্ধতিতে সেবা করেন। একজ্ঞ তাঁহাদের সেবা পূজাকালে কোনরূপ  
শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ বা আরতির সময় ঘণ্টা-বাদনাদি করা হয় না।  
তাঁহারা তৎসম্প্রদায়ের মহাজ্ঞনগণের দ্রুতি পদাবলী কীর্তন করিয়া  
সেবা ও আরতি প্রভৃতি সম্পাদন করেন। তাঁহারা সন্ধ্যারাত্রিক  
করেন না, কেবল সন্ধ্যাষ্টমীর দিন মঙ্গলারাত্রিক হয়।

#### সাম্প্রদায়িক নৃত্য

হরিনাসী সম্প্রদায় কোন বিশেষ বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত বা মতবাদ  
স্বীকার করেন না। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে বিটল-বিপুলজীর  
শিষ্য-পারম্পর্য্যে মৌনীদাসের শিষ্য ভাগবত-রসিকজী তাঁহাদের এক

বাণীতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং  
তাঁহাদের মতবাদকে ‘ঈশ্বর-ইচ্ছা-দ্বৈত’ নামে উল্লেখ করিয়াছেন :

“আচারজ ললিতা সগী, রসিক হমারী ছাপ।

নিতা কিশোর উপাসনা, যুগল মন্ত্র কো জাপ।

যুগল মন্ত্রকো জাপ, বেদ রসিকন দী বাণী।

ঐবৃন্দাবনধাম, ইষ্টআমা মহাবাণী।

\* \* \* \*

নাহী দ্বৈতাদ্বৈত হরি, নহী বিশিষ্টাদ্বৈত।

বৈদে নহী মতবাদ মে, ঈশ্বর ইচ্ছা দ্বৈত।”

অর্থাৎ, ললিতা সগীই আমাদের আচার্য্য। আমাদের সম্প্রদায়ের  
ছাপ (মুদ্রা) — রসিকতা, নিত্যকিশোর ঐক্যক্ৰেয় সেবাই-উপাসনা,  
যুগলমন্ত্রের জপই — ভজন। রসিকগণের বাণীই আমাদের বেদ  
অর্থাৎ প্রমাণ, বৃন্দাবনই — ধাম। রাধাবাণীই আমাদের ইষ্ট।  
আমরা দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত কোনও মতবাদেই আবদ্ধ নহি।  
ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী যে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ “একোহং বহুস্ম্যম্” —  
আমি এক বহু হইব — পরমেশ্বরের সঙ্কলানুযায়ী এই যে সেবা-  
সবকভাবেযুক্ত দ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তাহাই আমাদের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত।  
তাঁহারা বলেন, শ্রামা ও শ্রাম নিত্য-কিশোর-কিশোরীরূপে নিধুবনে  
সর্লক্ষণ বিচার করিতেছেন। তাঁহাদের নিত্য-সংযোগ বা মিলন,  
কখনও বিয়োগ বা বিরহ নাই।

## যে আমার প্রিয়তম

আ. ন. ম বজ্রলুর রশীদ

যে আমার প্রিয়তম জন্মে জন্মে আপনার জন  
যে আমার জীবনের অবিরাম আবেগ-স্পন্দন,  
পুষ্পের প্রাঙ্গণ গন্ধ, প্রভাত ও সন্ধ্যাবস্ত্রধার —  
যে জন আমার ভাষা, সহস্র সঙ্গীত সপ্তধার,  
চৈতন্য-চৈতন্য-দীপ্ত প্রাণশক্তি বস-রসায়ন,  
আকাশ ও পৃথিবীর অবিলাস সৃষ্টি-রূপায়ণ  
যার করম্পর্শে, সেই নিকট ও দূরতম জনে  
রেখেছি অনেক ঘরে, ভিনদেশী, আপনার মনে  
ভুচ্ছ স্বপ্ন দুঃখ দিয়ে সৃষ্টি করি আমার জগৎ।  
নির্বাক সমুদ্র-মরু, অর্থহীন নীলাভ পর্কণ —  
অসংখ্য তরুর ছবি বিচিত্র রঙের প্রসারণ  
ভূণ থেকে তারালোকে, মর্ম্মমূলে নিবিড় কম্পন

সুগভীর সমাবেশ। বিসর্পিত কামনা আমার,  
সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষার বাসনার নিলক্ষ্য বিস্তার  
আমারে করেছে ক্ষুধ ঋণ গুণ মত স্বার্থপর —  
সঙ্গীর্ণ স্বপথচারী লুপ্তকের লালসা হস্তর  
হুঁচোখে বেগেছে বাসা — সচকিত নিঃশব্দ সকাম  
অভ্যুত্তর, ঘোবনবতী নারীদেহ নয়নাভিরাম,  
সকান্তর আবেদন, দেখি না সে রেণুর বেথার  
কলা-কুতুহল তার ভাব বর্ণ কাঙ্ক্ষি শ্রবণ  
অজানা শিল্পীর সূক্ষ্ম রূপকল্প বস-প্রলেপন  
প্রশান্ত নিমিগ্ন প্রাণ আবেগের অক্লান্ত দূরণ  
অক্লান্ত অম্লরাগ। পরদেশী সে শিল্পী আমার  
ভব অবচ্যুতনার স্পর্শ তার প্রেম ছনিবার।

# সঞ্জয়ের জীবনকথা

ত্রিবিংশনাথ চক্রবর্তী

সঞ্জয় ছিল বেশ চালাকচতুর এবং চটপটে ছেলে—অর্থাৎ, এক কথায় ওকে সার্টিফিকেট দেওয়া যেত স্মার্ট বলে। একটু পাতলা ধরণের গড়ন হলেও চেহারাটা ছিল বেশ মানানসই। চোপ ছোটো ছিল মুখের আরতনের তুলনায় একটু ছোট, দেখলেই মনে হ'ত কি বেন একটা ছোট বুদ্ধির প্লান চলছে সব সময়, সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করবে। ভুরুঝোড়া ছিল বিশাল, ফর্সা কপালে কাল জোড়া ভুরু হঠাৎ দর্শনীয় বলে মনে হ'ত। নাকটা বিশেষ লম্বা ছিল না, তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত অগ্রভাগটা সামান্য একটু উপর-দিকে উঠে রয়েছে। আর সব চাইতে সুন্দর ছিল ওর চুল। এক মাথা সে চুল—অতিমাত্রায় কৃষ্ণিত, মনে হ'ত বড় করুণ বৃষ্টি, কিন্তু হাত দিয়ে দেখেছি বেশমের মত নয়, বাচ্চারা ওর চুলে হাত দেবার জন্ত পাগল হয়ে উঠত। চোপে ওর চশমা ছিল না, যদিচ নাকটা ছিল চশমার ত্রিকের পক্ষে আদর্শ। বোধ হয় সেই কারণেই ও একজোড়া গগলস ব্যবহার করত মাঝে মাঝে।

কিন্তু চেহারার জন্তই আমরা ওর ভক্ত ছিলাম না। ছেলেটার গুণ ছিল অনেক। অনেকক্ষণ ধরে ট্যাপ করে করে বগন আমরা টেলিফোনটাকে ছুঁড়ে ফেলার উপক্রম করতাম তখন ও কি এক অভ্যাসে কোঁশলে টেলিফোনের চোঙের ফুঁ দিয়ে, ছালো ছালো করে চেঁচিয়ে, মধ্যে কখনও স্তম্ভিত কথ্য বলে, কখনও বা ধমকে মিনিট-কয়েকের মধ্যেই এনে দিত বাহ্যিক নথর। সাহেবী দোকানে চুকতে আমরা বগন ইতস্ততঃ করতে থাকতাম, ও তখন দিবি, স্বচ্ছন্দে চুক পড়ে অনর্গল কথা চালিয়ে দিত কিবিরী মেয়েদের সঙ্গে, হুঁ একটা হাড্ডা বসিকতাও করত, ব্যর্থ মর্মে আমরা ব্যস্ত হ'তাম না পেরে ঠাঁড়িয়ে থাকতাম হাঁ করে। আমাদের পশ্চিমী ভারতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা বগন ডাঙার তোলা মাছের মত থাবা খেতে থাকতাম, ও তখন আমাদের জ্ঞান করবার জন্ত দোঁড়ে আসত, ওর লজ্জা-মার্ক চোদ্দ হিন্দুস্থানী ওনে তাদের পর্যন্ত থাঁধা লেগে যেত। সঞ্জয় উড়িয়াও বলতে পারত বেশ। মাদ্রাজী ভাষার হুঁচরটে বৃষ্টি আর পঞ্জাবীদের কয়েকটা গালাগালও ওর কণ্ঠস্থ থাকত সব সময়। বিদেশে চিঠি, পার্সেল, মনিঅর্ডার পাঠাবার জটিল নিয়মসমূহে আমরা বগন হাবুডুবু পেতাম ও তখন অব্যবহিত ভাবে আমাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসত, দরকার হলে গলা সপ্তমে চক্কিরে ঝগড়া করত কাউন্টারবাবুদের সঙ্গে। বালিগঞ্জের মিলন সমিতি থেকে সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত সর্বত্র ছিল ওর অবাধ গতি-বিধি, যে-কোন দুর্ভাগ্য কালও সম্পন্ন করে আসতে পারত হাসিমুখে। আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম সঞ্জয় দি কক্সবার। বাংলার বলতাম অপরাধের সঞ্জয়।

সঞ্জয়ের সঙ্গে রাজ্যের হাটতে ভরও করত, মজাও লাগত। উৎকট

টাই-কলার বাঁধা দিশী সাহেবদের মেথলে পাশ দিয়ে বেতে হঠাৎ ও বলে বসত, 'কি গো বাচ্চারা, কবে এলে হোম থেকে?' বয়ে-হলিউডি শাড়ী পরা দিশী মেয়েদের পাশ দিয়ে বাবার সময় অকস্মাৎ আলগোছে টিল্লনী কাটত, 'গাউনটা বৃষ্টি খোপা এখনও দিয়ে ব্যার নি ললিতে?' আমি প্রায়ই শিউরে উঠে তাকাতে সরে যেতাম—যদি কিছু হয় তবে ওরই উপর দিয়ে যাক সবকিছু। কিন্তু ও নির্লিপ্যকার।

একদিন বাসে করে বালিগঞ্জ থেকে ফিরছি। ভর্তি বাস। আমরা ঠাঁড়িয়ে সামনের দিকে। বিপুলকায় ঘোর কুম্ভবর্ণ এক ভদ্রলোক উঠলেন সাদান' এভিনিউর মোড় থেকে। হুঁঠাতে অনেকগুলো আংটি, গলায় একগাছা হার আর স্তপ্রচুর পাউডার। তিনি উঠেই একবার এ পাশে একবার ওপাশে মেয়েদের দিকে তাকাতো লাগলেন ভিড় ঢেলে। প্রথম প্রথম আমার হাসি পাচ্ছিল পরে বিরক্তি ধরে গেল। কিন্তু সঞ্জয় যেন এসব জাগতিক ব্যাপারের উর্দ্ধে। এক সময় বগন ভদ্রলোক ওর বুকে বেশ একটু জোরেই ঝুঁতো মেয়ে বৃষ্টি লম্বা করে তাকাতো গেলেন ডানধারের মেয়েদের দিকে, ও অকস্মাৎ কাঁচুমাচু হয়ে ঘাড় চুলকে বললে, 'আজ্ঞে? আমরা নেমে যাব? না না আপনি দেখুন—ভাল করে দেখুন।' আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। ওর এই সম্ভা বসিকতায় নয়, ওর নিরীহভাবে বলায় কার্যল্যাটা দেখে। আরোহীদের মধ্যেও অনেকে হেসে ফেলল, মেয়েদের মধ্যে বরীয়ারীরা একটু গভীর হবার চেষ্টা করল, তরুনীরা অনেকেই গিল গিল করে হেসে উঠল ক্রমালে যুগ জুড়ে। আর ভদ্রলোক ঘোঁঃ ঘোঁঃ করতে করতে সবাইকে থাকা দিয়ে পড়ি কি মরি ভাবে নেমে গেলেন পরের ষ্টপেজেই।

ওর সবচেয়ে মজার খেলা ছিল অপরিচিত লোকদের বোকা বানানো। আমি কত দিন ওর হাতে পারে ধরেছি এই সর্বকল্যাণে খেলা ছেড়ে দেবার ভ্রম, কিন্তু ভিত বচন ওর কাছে গ্রাস্তই নয়—(বরসে আমার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ও খোড়াই কেয়ার করত)। কিছু নয়, হয়ত ট্রাম থেকে নামতে এমন সময় হঠাৎ ও পাশের ছেলেটিকে বলে বসত, 'কিরে ভাবলা, হুঁ বৃষ্টি ধরে বইখানা কেলে রেখেছিস, নিবি নে আর? পড়াগুলো বৃষ্টি কচ্ছিস নে? বাবাকে বলে দেব?...আচ্ছা কালকে একবার আসিস, আমি থাকব সকালে।' ছেলেটিকে হতভম্ব করে দিয়ে ও নেমে যেত টক করে। হয়ত মেট্রোর পাশে ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে পরিজ্ঞানভাবে সিগারেট হুকছে, অকস্মাৎ কোন ভদ্রলোককে দেখে সিগারেটটা এমনভাবে লুকিয়ে কেলত বাতে ভদ্রলোক বৃষ্টিতে পারতেন সেটা লুকনো হয়েছে তাঁকে দেখেই। 'আরে হাবুমা

বে। কবে এলে কলকাতার? চোপের নিমিষে পারের খুলো নিয়ে নিত ও। 'কাঙলা বামা কেমন আছে? ভোষল দাচ? তুমি এখানে কি মনে করে? ও: কদিন পর! বছর তিনেক হবে না?' ওর হাবমামা কিছু বোঝার আগেরই ও পকেট থেকে নোটবই বের করে বলত, 'কোথার উঠেছে? চল না আমাদের বাড়ীতে? বাবে? গাড়ী ডাকব?'

তবে ভরসার বিষয় সঞ্জয়ের এই উৎকট সপ পুরুষদের নিয়েই চরিতার্থ হ'ত প্রধানতঃ। যেরেদের ও বোকা বানাতে চাইত না এমন নয়, কিন্তু ও বলত যেরেদের ঠিকিরে নাকি স্থগ পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ তাদের লজ্জা-সঙ্কোচ ভয় কাটতে চায় না কিছুতেই আর দ্বিতীয়তঃ ভিনিষটাকে তারা ডিউমারাসলি নিতে জানে না। অনেক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে—বেন মস্ত কি লোকসান হয়ে গেল। অনেক সময় আরও গভীর কিছু মনে করে বসে। তবুও ওর মেয়ে-ঠাকানোর যে ক'টি উদাহরণ দেখেছি তার প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ, প্রত্যেকটিকে দিয়েই বানানো যেতে পারে এক-একটা পাঁচশ' পাতা উপভাসের প্রথম অধ্যায়। তারই মধ্য থেকে একটির বর্ণনা দিচ্ছি:

জাম্বা বোডের মোড় থেকে আমরা হ'তনে একটা বাসে উঠলাম। আমি উঠতেই বাস ছেড়ে দিয়েছিল, সঞ্জয় লৌড়তে লৌড়তে এসে লাফিয়ে উঠল। ঠিক সামনের লেডিজ সীটটাতে জনকরেক স্ত্রী-জাতীয়া বসে ছিল, ও ভেতরে পা দিয়েই তাদের একজনকে উদ্বেষ্ট করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে তুই! কত বড় হয়ে গেছিস, চিনতেই পারি নি প্রথমে। আবার বিয়েও করেছিস দেখছি।'

চমকে উঠে একটি মেরে তাকাল সঞ্জয়ের দিকে। বিশ্বয়ের ঘোর কাটতেই লাল হয়ে উঠল লজ্জার। মাথা নীচু করে স্থিত মুখে বসে রইল। বাসস্থল লোক কিরে তাকাল এদিকে। আঠার-উনিশ বছর বয়স হবে মেয়েটির। স্থম্বর চেগারা।

'কোথার থাকিস আত্মকাল? কতটি আসেন নি বুঝি?'

মেয়েটি ঈর্ষ্য ও সন্দেহময় এক যুবকের দিকে তাকাল। যুবকটি সঞ্জয়কে নমস্কার করে হেসে বলল, 'আজ্ঞে আমিই সেই ওর্ডাংগা ব্যক্তি।'

নমস্কার অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সঞ্জয় বলল, 'আপনার স্ত্রী ছিলেন আমার প্রতিবেশিনী। কিন্তু ও এত বড় হয়ে গেল কি করে তাই ভাবছি। এই ত সেদিনও ওকে পুলিশে পরিবে দেব বলে ভয় দেগাতাম আর ও কান্দত হাউ হাউ করে। আর এই ত সেদিনও ওকে সিগারেটের বাঁতা দিয়েছি কত-পুতুলের গয়না বানাবে বলে চেয়ে নিত। আজ্ঞা ভেবে দেখি ত ক'দিন আগেকার কথা। তিন? চার? না না, সাত বছর হয়ে গেল এর মধ্যে! কি আশ্চর্য!'

ভারপথ মেরেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেই যে আমার টেবিল থেকে একটা চক্চকে কুচুঁরি করেছিলেন মনে পড়ে তো? খা পড়লে বলেছিলেন—তোমার পুতুল-জামাইয়ের গাড়ী হবে ওটা?'

এবার মেরেটি মুখ খুলল। মিষ্টি হেসে মাথা झুলিয়ে বলল, 'আর সেই যে তুমি আমার পুতুলগুলো ভাঙতে পালি পালি আর খা পড়লে বলতে পুতুলগুলোর ভেতরে কি আছে তা দেখবে? মনে পড়ে তোমার?'

বিফারিত চোপ করে সঞ্জয় তাকাল মেরেটির স্বামীর দিকে। বলল, 'দেপলেন মশাই! আমার নামে এমন অপবাদ। ওকে কোলে পিঠে করে মাহুব করেছি আর আমি কিনা খাব ওর পুতুল ভাঙতে! আপনার স্ত্রীটি ত খুব ভাল লোক নন মশাই। একটু সাবধানে চলবেন।'

তার স্বামী সোংসাচে সঞ্জয়ের পক্ষ সমর্থন করে একটা বক্তৃতা দেবার উপক্রম করেছিল এমন সময় মেরেটির পাশের জায়গাটা পালি হ'ল। সঞ্জয় স্থগ করে সেখানে বসে পড়ল নিঃসঙ্কোচে। যুবকটিকে বলল, 'আপনি মশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় মেলে রাখুন।'

আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ। ও আর আমার দিকে তাকায় না। বোপ হয় ভুলেই গেছে আমার কথা। আমিও কিছু বললাম না, ভাবলাম ব্যালাসজিনীর সাফাং পেয়েছে এত দিন পরে, এর মাঝে আমার স্থান কোথায়।

এক সময় গুনলাম ও বলছে, 'তোমার কস্তাটিকে নিয়ে একদিন আর না আমাদের বাড়ীতে...ভাল কথা, আমরা আর সে বাড়ীতে নেই জানিস বোধ হয়, বীজন স্ত্রীতে থাকি আজকাল।'

নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে সঞ্জয় তার ঠিকানা লিখে দিল মেরেটিকে। 'তোমার ঠিকানাটাও বল। সাত বছর পরে যখন দেখা পেরেছি তখন সাত দিনে অন্ততঃ একবার করে জামলা করব তোমার হস্তব্যাড়ী গিয়ে--সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।'

মেরেটির নক্সারের জায়গাও পালি হ'ল। স্বামীটি বসল সেখানে। তিন জনে মিলে খুব হাসিগল্প চলতে লাগল। ইতিমধ্যে অনেকটা সঙ্কোচ কেটে গেছে মেরেটির। যুবকতঃ গুস্তবিধা হ'ল না বহুদিন পরে বালঃবদ্ধর দর্শনে ছেলেবেলায় স্থিতি বস্তাবেগে উচ্ছসিত হয়ে কিরে আসছে তার মানসপটে, খুশির ভোয়ার বাধ মানছে না।

বাস তখন কলেজ স্ট্রীট পায় হয়েছে। বসবার জায়গা পেয়ে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে দেখি ওর হাসিখুশী ভাবের ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে একটি অধীর মুষ্টি—যেন জাতে আর সময় নেই, এখুনি যা-কয় একটা কিছু করে ফেলতে হবে। হঠাৎ কি একটা কথাখ ও হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম চোপের কোণে অতি স্থম্বর একটা ইশারা আর ঠোঁটের কোণে ভয়ঙ্কর একটা হাসি। সে ইশারা, সে হাসি আমার অতিপরিচিত। ফুৎপিগুটা একবার লাফিয়ে উঠেই যেন স্থির হয়ে যেতে চাইল, হাত-পা অবশ হয়ে এল। কি সর্বনাশ! এতক্ষণ ধরে তা হলে সেই অভিনয়ই হচ্ছে। বড়টুকু সব বাজে! হায় ভগবান, এত দিন ধরে লোক-ঠাকানোর শাস্তি কি তুমি শেষকালে এই বাসের মধ্যেই দেবে? এতগুলো লোকের বায়োরাবি কিল-চড় পেয়েই আমাদের মরতে হবে শেষে?

“আচ্ছা তুই কবে আসছিল বল। পরত ? যোববার আছে ? ভাল কথা, তোরা দাদা এখন কোথায় কাজ করে ?” সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করল।

“বড়লা ব্যাঙ্কে, ছোটলা টাটা কোম্পানীতে।”

“ছোটলাটা আবার কোথেকে এল ?”

“কেন ? ছোটলাকে তোমার মনে নেই ? এত ভুলো মন তোমার ! তোমার প্রাণের বন্ধু মহী !”

“দাঁড়া ভেবে নিই। মহী ? মহী ? না, মনে পড়ছে না ত। বাক গে তোরা মার খবর কি ? বাবা শিলঙেই আছেন ?”

“বাবা শু শিলঙে ছিলেন না কোনদিন। আর তিনি ত মারা গেছেন আজ ছ’ বছর হ’ল।”

“ছ’ বছর !” তড়াক করে প্রায় লাকিয়ে উঠল সঞ্জয়। “আমি ত এই বছরদুয়েক আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি শিলঙে।”

“সে কি !” বিস্মিত হয়ে বলল মেয়েটি। আড়চোখে একবার তাকাল স্বামীর দিকে। চুপ করে রইল সবাই।

“আচ্ছা তোদের সেই কুকুন্টা এখনও বেঁচে আছে ? ও প্রায় চলে এসেছি বাড়ীর কাছে। ভাল কথা, তোদের মহানির্বাণ রোডের বাড়ীর পাশে সেই যে বোবা মেয়েটা থাকত তার খবর শুনেছিস কিছু ?”

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। তার স্বামীও তাকাল সঞ্জয়ের দিকে। কেউ কোন জবাব দিল না।

উদ্ভেজনার আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছি। চকিতে একবার ভাবলাম নেমে বাই সঞ্জয়ের অলঙ্কো। কিন্তু বন্ধুকে একলা এই বিপদে কেলে যেতে মন সরল না, তা ছাড়া শেষ পরিণতিটা দেখবারও লোভ ছিল প্রচুর।

দীয়ে দীয়ে মেয়েটি বলল, “দেখুন আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। আমার বাপের বাড়ী বাগবাজার, আমরা মহানির্বাণ রোডে কখনও থাকি নি। আপনি বোধ হয় অল্প কেউ ভেবে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন।”

“ঐ্যা ! বলেন কি ! আপনার নাম তা হলে খেদী নর ?”

খেদী ! এত চুঃখের হাসি পেল আমার। এ নামটা আবার কোথেকে জোগাড় করল সঞ্জয় ! স্বামী ভদ্রলোকের গভীর মুখেও একটু হাসির রেখা উ কি মেয়ে গেল। মেয়েটির মুখ টকটকে লাল।

“আমার নাম বনলতা, বাড়ীতে ডাকে লতা বলে।” জবাব দিল সে।

“উঃ কি ভয়ঙ্কর ভুল করে ফেলেছি। ছিঃ ছিঃ, চেনা মুখ মনে হতেই আলাপ শুরু করে দিয়েছি, এক বারও মনে হয় নি ঠিক কি না। কি বিল্লী ব্যাপার ! ভারি অজ্ঞার হয়ে গেছে, জানি না আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন কিনা।” অস্থতস্থ হয়ে বলল সঞ্জয়।

“আপনি যখন ভুল কথা বললেন তখনই আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আবার ভাবলাম হয়ত আপনি ঠাট্টা করছেন।

অজ্ঞারটা আসলে আমারই। আমারই তখন বলা উচিত ছিল।” বনলতা বাজা হরে বলল।

“না না, কি অজ্ঞার দেখুন আমার ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! আপনারা হয়ত কত কি ভাবছেন আমার সম্বন্ধে।” জবাব দিল সঞ্জয়।

হঠাৎ হেসে উঠল স্বামীটি। বলল, “বাক আপনার তুলে আর আমার জীব অজ্ঞারে আমাদের শাপে বর হয়ে গেল। একজন বন্ধু পেলাম আজ। আপনি আসবেন পরও দিন, নেমস্তন্ন রইল। না এলে বুঝব লজ্জায় পালিয়েছেন।”

আমিও একটু হাসলাম সকলের আড়ালে।

২

কিন্তু অকস্মাৎ সঞ্জয়ের জীবনে একটা ছেদ পড়ে গেল। সঞ্জয়ের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই আমরা অবশ্য সমর্থন করতাম না, কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমরা মনে মনে অনেক কিছু আশা পোষণ করতাম। কৌনদিক দিয়ে সঞ্জয় বিখ্যাত হয়ে উঠবে তা হয়ত আমরা ঠিক করে বলতে পারতাম না, তবে এটুকু বিশ্বাস করতাম সঞ্জয় নিজে কোন অক্ষয় কীর্তি রেখে বাক না বাক ওকে দেখে প্রেরণা লাভ করবে বহু কীর্তিমান, ওকে তারা অক্ষয় কবে রেখে বাবে নিজেদের বহু কীর্তির ভেতর। কিন্তু আমাদের হতাশ করে শেষ পর্যন্ত ওর জীবনের গতি এক জারগার এসে স্থির হয়ে পড়ল, যেন একটা ভাল নাটক দেখতে দেখতে সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল এমন সময় প্রথম অঙ্কের মাঝখানেই অকস্মাৎ যবনিকা পড়ে গেল, আর সে যবনিকা উঠল না। সে ইতিহাস অতি করুণ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ওদের বারান্দায় তু’জনে পাশাপাশি বসে রয়েছি দুটো বেতের চেয়ারে। সঞ্জয়ের মুখখানা শুকনো, চুলগুলো উজ্জ্বল, তেল নেই। কয়েকদিন ধরে ওর জ্বর চলছিল, সেদিনই ভাত পেয়েছে। বাড়ীতে মালী আর একটা চাকর ছাড়া আর কেউ নেই, কোথায় যেন গিয়েছিল সবাই। সঞ্জয় বলে দিয়েছিল সন্ধ্যার মধ্যেই কিংবে আসতে, কিন্তু তখনও আসছে না দেখে ও ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। আমারও ভাল লাগছিল না বসে থাকতে, কিন্তু সঞ্জয়ের মা-বাবার সঙ্গে দেখা না করে চলে আসতে চক্ষুসজ্জার বাধ্য ছিল বলে বসে ছিলাম। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিদায় নিতে উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় চোখে পড়ল একটি মেয়ে ওদের বাগানের পাশ দিয়ে দীয়ে দীয়ে এগিয়ে আসছে। রোগা লিকলিকে তার চেহারা, লম্বা প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। মুখখানা বেজার লম্বা, গালদুটো ভেতরদিকে বসানো, নাকটা যেন ছোট শিশুর কাছ থেকে ধাব করা। বগলে একটা ব্যাগ। আরো কাছে এলে লক্ষ্য করলাম মুখখানা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, শুকনো ঠোট দুটি টকটকে লাল। কেন জানি না একটু বিরক্তি বোধ করলাম। সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি সেও বিশেষ এসন্ন নয়।

কাছে এসে দাঁড়াল সে বেশ স্টার্টেনেস দেখিয়ে। হুঁজনের দিকেই চেয়ে বলল, “এটা কি মিঠার সুবোধ ঘোষের বাড়ী?”

“হ্যাঁ!” সংক্ষেপে জবাব দিল সঞ্জয়।

“আচ্ছা এখানে সঞ্জয়বাবু থাকেন বোধ হয়। তিনি আছেন কি?”

“সঞ্জয়!” নিজের নামটা উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ বেন চমকে উঠল সঞ্জয়। রুগ্ন মুখপানা দেখতে দেখতে আরও পাণ্ডুর আরও বিবর্ণ হয়ে উঠল। সিগারেটে একটা টান দিতে বাচ্ছিল, মাঝপথেই থেমে গেল হাতটা, কণকাল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। আমি একটু শক্তিত হয়ে পড়লাম।

একটু পরেই বিপরীত দিকের একটা চেয়ারের পানে হাত দেখিয়ে বলল, “বসুন।”

“মেয়েটির চেয়ারে বসার পর সঞ্জয় সিগারেটে একটা টান দিল। ধোঁয়াটাকে আঙুলে আঙুলে ছেড়ে দিতে লাগল। চোখে তখনও সেই শূন্য দৃষ্টি। তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি কোথেকে আসছেন?”

“আমি আসছি শ্রামবাজার থেকে। সঞ্জয়বাবু আমার দাদা রমেশ সেনের বন্ধু।”

“রমেশ সেন? রমেশ সেন?” কক্ষ চলে হাত বুলাতে বুলাতে অনেকটা আপন মনেই সঞ্জয় বাবুজের উচ্চারণ করল নামটা।

“আজ্ঞে হ্যাঁ রমেশ সেন, চাটার্ভ একাউন্টেন্ট।”

“হবে হয়ত,” সঞ্জয় জবাব দিল। তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, “যদি কিছু মনে না করেন...আপনার কোন বিশেষ দরকার ছিল কি?”

মেয়েটি একটু বিব্রত হয়ে উঠল।

“দরকার? দরকার আমার সঙ্গে ঠিক ছিল না। তবে একটু দেখা হলে ভাল হ'ত।”

“আপনি কি সঞ্জয়কে জেনেন? ওর সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ? একটা বিশেষ কারণে আপনাকে এসব জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আপনি কিছু মনে করবেন না।”

তরুণী আরও বিব্রত হয়ে উঠল। একটু হেসে বলল, “আমার সঙ্গে সঞ্জয়বাবুর আলাপ নেই। তবে আমাদের বাড়ীতে উনি প্রায়ই যান। দাদা একটা চিঠি পাঠিয়েছেন একটা বিশেষ দরকারী বইয়ের জন্ত। ক'দিন ধরে উনি একটু অসুস্থ, বাড়ীতেও আর কেউ নেই তাই আমাকেই পাঠিয়েছেন।”

এ পর্যন্ত বলে সে একবার চারদিকে তাকাল। তারপর বলল, “কিন্তু সঞ্জয়বাবু কি বাড়ী নেই?”

সঞ্জয় কোন জবাব দিল না। মাথা নীচু করে এশ-ট্রেতে সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল। তারপর বখন মুখ তুলল, দেখি সে মুখ আরও গভীর, আরও ধমধমে।

“দেখুন প্রথমে কথাটা বলব না ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম,

আপনি বোধ হয় সঞ্জয়ের কোন বান্ধবী বা বিশেষ পরিচিতা হবেন, থবরটা শুনে হয়ত আঘাত পেতে পারেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে বন্ধন ওর পরিচয় নেই তখন আর কথাটা বলতে অত বাধা নেই। তা ছাড়া আপনি ওর বন্ধুর বোন, আপনাদের জানানোও ত কর্তব্যের মধ্যেই।”

সঞ্জয় আবার চুপ করল। মেয়েটি বলে উঠল, “কি, কি হয়েছে?”

“অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি কথাটা জানাতে। কিন্তু...পরশুদিন সকালে সঞ্জয় মারা গেছে।”

মুহুর্তে কাঁকাশ হয়ে গেল মেয়েটির নানা বর্ণরঞ্জিত মুখপানা। ক্যাল ক্যাল করে তাকাত লাগল আমাদের দিকে। আমি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলাম। সঞ্জয়ের অনেক রকম ঠাট্টা দেখেছি, কিন্তু এক জন অপরিচিতা তরুণীর উপর এ রকম অদ্ভুত রসিকতার প্রয়োগ আর দেখি নি। সব কথা কাঁস করে দিতে বাচ্ছিলাম এমন সময় চকিতে মনে পড়ল—সঞ্জয় একবার বলেছিল অপরিচিত বা অল্প-পরিচিত লোকের মতাসংবাদ শুনে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কাছে মাহুস কিভাবে শোকের অভিনয় করে তা সে একবার হাতে-কলমে দেখতে চায়। তবে কি এখন সেই পরীক্ষাই চলছে? সঞ্জয়ের দিকে তাকালাম: ওর দৃষ্টিতে একটু বিষয় মেশানো। তা হলে কি ও নিজেও এতটা আশা করে নি?

আত্মস্থ হয়ে মেয়েটি কাঁপা গলায় বলল, “কিন্তু এ কি হ'ল! ক'দিন আগেও ত উনি আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন শুনেছি। হঠাৎ এ কি হয়ে গেল। আমরা কেউ কিছু জানতেও পারলাম না। আচ্ছা কি...”

গলা ভেঙে গেল মেয়েটির। সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি তার ঠোটচুটে কাঁপছে। তারপর হঠাৎ তার চোপের দৃষ্টি এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেল।

এবার ঘাবড়াবার পালা সঞ্জয়ের। আমার দিকে একবার ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটির উদ্বেগে বলতে গেল, “দেখুন একটা অজ্ঞায় হয়ে গেছে। আমি ঠিক...”

কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটি একটা অকূট শব্দ করে চেয়ার থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আমরা হুঁজনে লাফিয়ে উঠলাম একসঙ্গে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এক মুহুর্ত। তারপর দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখলাম চৈতন্যের কোন লক্ষণ নেই, তবে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে ঠিকমতই। সঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে ভেতরে ছুটল মাকে ডেকে আনার জন্ত, কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে পড়ল বাড়ীতে কেউ নেই। চীংকার করে মালীকে ডাকল।

বুড়ো মালীর পরামর্শে মেয়েটিকে বারান্দায় লম্বা টেবিলের উপর শুইয়ে দিলাম। সঞ্জয় ছুটে গেল টেলিকোনের কাছে। এদিকে আরম্ভ হ'ল মেয়েটির হাত পা ছোঁড়া আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরতে লাগল একটা গৌ গৌ শব্দ। ক্রমশ: সে এত জোরে হাত পা ছুঁড়তে লাগল যে ভয় হ'ল বুবি টেবিলের উপর

থেকে পড়ে বসে। নিরুপায় হয়ে আমরা তিন জনে মিলে চেপে ধরলাম তাকে। সব লিকলিকে তার পা, কিন্তু কি অবিখ্যাত জোর তাকে। বৃক লাগি গেলে সঙ্গর হ'বার ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু নিজের কথা ভাববার সময় তখন ওর নেই, বসে বসে পা সরে বার তত বার জোরে চেপে ধরে।

সে কি ভয়ানক সময়। এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি বছর। ঘামে আমাদের সমস্ত শরীর ভিজে গেল, টপটপ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল মেয়েটির গায়ে। একটা করে সেকেণ্ড বাজে আর আমরা ভাবছি ডাক্তারবাবু কেন আসছেন না, বাড়ীর লোকেরাই বা আসছেন না কেন?

বাইরে মোটরের দরজা খোলার শব্দ।...কে? ডাক্তারবাবু? নাঃ। জনটা পরিচিত। অনেকগুলো পায়ের শব্দ বাগানে। কিছু ভরসা পেয়ে আমরা বাগানের দিকে চেয়েছি এমন সময় মেয়েটির হাত পা ছোঁড়া আবার নতুন করে বেড়ে গেল। আমরা মাথাপানে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে চেপে ধরলাম।

সঙ্গরের বাবা মা ভাই বোন আর বউদিব সেই হতভম্ব ভাব ঘামি সারা জীবনেও ভুলব না। বারান্দার পা দিয়েই সবাই চমকে উঠেছিল ভূত দেখার মত, তারপর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। দৃষ্টান্ত মনে রাখার মতই বটে, ভারতে গেলে এখনও সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। একটা লম্বা টেবিলের উপর শুয়ে একটি অপরিচিতা তরুণী প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়ছে। কাপড়-চোপড় তার অস্বস্ত, শাড়ীর আঁচলটা টেবিলের এক দিক দিয়ে ঝুলছে, ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে গেছে, ছোঁড়া সোনার হারটা মাটিতে গড়াচ্ছে, বাগটা পড়ে রয়েছে আর একটি দূরে। আরও দূরে দূরে তার হ'পাটি জুতো। আর তরুণীটিকে স্থির রাখবার চেষ্টা করছে চটি যুবক আর একটি বৃদ্ধ। তাদের একজন সে বাড়ীর ছেলে, একজন ছেলের বন্ধু, আর একজন বহুদিনের বিশ্বস্ত মালী। পানিক দূবে দাঁড়িয়ে সে বাড়ীর কর্তা-গিন্নী, বড় পুত্র, এক কন্যা এবং পুত্রবধূ।

কিন্তু সত্যি বলতে কি এসব আমার তখনও পেরাল হয় নি, পেরাল হ'ল আরও পরে, সঙ্গরের বাবার মুখে অসুট হবে 'একি' শব্দ শুনে। সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টি অস্থায়ন করে একবার তরুণীর দিকে তাকাতেই চকিতে উপলব্ধি করলাম আমাদের অবস্থাটা আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলাম বলির ছাগশিশুর মত। সে বাড়ীতে আমার স্থান ছিল সঙ্গরের কাছাকাছিই। সঙ্গরের দিকে চেয়ে দেখলাম তারও হাত পা কাঁপছে।

ক' সেকেণ্ড বা ক' মিনিট সবাই স্তম্ভিত হয়ে ছিল মনে নেই। আমরাও কোন কথা বলতে পারলাম না। জিত যেন আটকে গিয়েছিল এভাবে। চমক ভাঙল সঙ্গরের মায়ের তীব্র কঠিন স্বরে, "এ সব কি! কে এই মেয়েটা?"

মায়ের সেই গলা শুনে সঙ্গর একবারে কেঁপে উঠল ধরধর

করে। চোখ চুটে তার বড় বড় হয়ে উঠল ভয়ে। মায়ের রাগ সে ভালভাবেই জানত। কোনমতে জবাব দিল, "ইয়ে...আমি ওকে চিনি না। ফিট হয়ে পড়েছে।"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছি। বলি কোথেকে এল মেয়েটা! বাতাসে উড়ে এল নাকি?"

সঙ্গর কি বলত জানি না এমন সময় মেয়েটির গোষ্ঠানি আরও বেড়ে গেল। সঙ্গর বলল, "সব বলছি মা, কিন্তু এ রকম শব্দ করছে কেন? একটু দেখে যাও না।"

"ওসব পরে হবে। আগে জবাব দে আমার কথার।" মা তীব্র স্বরে বললেন।

বাধা দিয়ে সঙ্গরের বাবা বললেন, "আঃ কর কি! মেয়েটাকে মেয়ে কেলেবে নাকি। আগে দেখ কি ব্যাপার তারপর জেরা করো।"

এগিয়ে গেলেন তিনি। তারপর সঙ্গরের বউদিকে বললেন, "বউমা শ্রদ্ধা সন্দের শিশিলা নিয়ে এস ত শীগগির।"

বউদি এতক্ষণ ভয়ানক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল তরুণীর দিকে নয়, সঙ্গরের দিকে। স্বপ্নের কথা স্মৃতি পেয়ে ভেতরে ছুটে গেল।

এমন সময়ে ডাক্তারও এসে পড়লেন। প্রথমেই তিনি বোগিগীকে পরীক্ষা করলেন। সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ভয় নেই, হঠাৎ 'শক' লেগে ফিট হয়ে গেছে।" তারপর সঙ্গরের মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "কি ভাবে ব্যাপারটা হ'ল বলুন ত?"

সঙ্গর বলে উঠল, "আমি বলছি সব। বিনয় আর আমি বসে গল্প করছিলাম এমন সময় এই মেয়েটি এসে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। আমি বসতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কোথেকে এসেছে, কি দরকার। আমার কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ ও অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি করে ওকে টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়েই আপনাকে ধব দিলাম। তারপর থেকে এই একই অবস্থা।"

বাড়ীর লোকেরা সঙ্গরের কথা বিশ্বাস করল না বোকা গেল, কিন্তু ডাক্তারের সামনে কেউ কিছু বলল না। ডাক্তার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গরের মা হেঁট হয়ে একটা ভাঁজ-করা কাগজ কুড়িয়ে নিলেন। সেটা খুলে পড়ে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "মেয়েটা যে রমেশের বোন সন্ধ্যা তা এতক্ষণ বলিস নি কেন?"

"কি করে জানব ও কার বোন। আমার সঙ্গে ত কথাই হ'ল না"—অসহায়ভাবে সঙ্গর বলতে চেষ্টা করল।

"কি করে জানবে কার বোন! যেক হ'বেলা বাতায়ত আর এদিকে চেনই না কে কার বোন! বেশ বেশ,"—বাক্যের স্তরে জবাব এল।

আমি সঙ্গরের পক্ষ সমর্থন করার লজ্জা বলতে পেলাম, "আজ্ঞে আমিও ত মাঝে মাঝে বাই রমেশদের বাড়ীতে, কিন্তু এ মেয়েটিকে ত কোনদিন দেখি নি।"



মা চৈচিরে উঠলেন, “চুপ কর বিনয়। তোমের কাউকে জানতে আমার বাকি নেই।”

সঞ্জয়ের বউদি এবার একটু কৌতূহলভরে এগিয়ে এল। বলল, “কে? রমেশ ঠাকুরপোর বোন! সেগি কেমন মেশতে।”

সন্ধ্যার হাত পা ছোঁড়া খেমে গেছে। কথা উঠল এবার তাকে নিয়ে কি করা যায়—রমেশদেব বাড়ীতে সমস্ত সংবাদ জানানো, না জান কিয়লে সন্ধ্যাকে একেবারে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া? আমি আর সঞ্জয় বললাম, রমেশদেব এ পথ দিয়ে উৎকর্ষিত করে লাভ নেই। সামান্য কিট বৈ আর ত কিছু নয়, জ্ঞান হওয়া মাত্র পৌঁছে দিয়ে আসব। সঞ্জয়ের বাবা মা তাতে বাজী চলেন না। যা হবার তা ত হয়েই গেছে, কিন্তু নাড়াচাড়া করতে গেলে যদি আবার কিট হয়? তার চেয়ে বরং সেখানেই রাজিটা থাকুক আর ওদিকে রমেশদেব পথ দেওয়া হোক, তারা যদি আসতে চায় আশ্রয়। সেকথা শুনে আমরা দু’জনেই একটু ঘাবড়ে গেলাম। মেয়েটাকে বত তাড়াতাড়ি বিদায় করা যায় ততই ভাল, কখন সব ফাঁস করে দেবে কে জানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদেরই তার হ’ল এবং সঞ্জয়কেই কোন কমে রমেশকে সব কথা জানানো হ’ল।

রমেশ চাণী তাদের বাড়ীর প্রায় সবাই এসে পড়ল। সঞ্জয়দের মধ্যে। এই তাদের এ বাড়ীতে প্রথম আসা। ততক্ষণে বিদ্যানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যাকে। সঞ্জয় যথাসম্ভব স্থির ভাবে একই ইতিহাস শোনায় তাদের। কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম ও ঘাবড়ে গেছে।

সন্ধ্যার জ্ঞান ফিরে এল। একবার ফাল ফাল করে তাকাল চারদিকে। অপরিচিত ভায়রাং বাড়ীর লোকদের পাশে অপরিচিত মুখ দেখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল বিম্বিত হয়ে। আমি আর সঞ্জয় তখন আস্তে আস্তে সন্ধ্যার পেছন দিককার একটা সোকার গিয়ে বসছি, যাতে সে চট করে আমাদের দেখতে না পারে।

হঠাৎ সন্ধ্যা একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস কেল বলে উঠল, “উঃ, আর বে পাবি না ভগবান। সঞ্জয় বাবু, আপনি এখন কোথায়?”

সঞ্জয় বে তখন কেন উঠতে গেল সেকথা ভেবে আমি এখনও আশ্চর্য হয়ে বাই। নিজের নাম শোনা মাত্র ও নত মস্তকে পাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ওকে দেগেই সন্ধ্যার চোখ দুটো যেন ঠিকবে-বেরিয়ে আসতে চাইল, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অল্পক্ষণ হয়ে গেল মুহূর্তমধ্যে। ভয়ানক গলার বলতে লাগল, “একি ভূমি! ভূমি এখানে? তবে কি ভূমি...ওরা বে বললে ভূমি নেই!”

আমি একেবারে বজ্রাহত। বানিকন্দণ আগে এই মেয়েই সঞ্জয়কে চিনতে পারে ন, এখন চিনল কি করে, এ কি রহস্য!

অকস্মাৎ সন্ধ্যা উঠে বলল বিদ্যানায়। চোখদুটো তার ঘুরতে লাগল চরকির মত। সে চোখের দৃষ্টি দেখে বুকলাম সে আর প্রকৃতিস্থ নেই। ভয় পেয়ে সবাই ধরাধরি করে সন্ধ্যাকে শুইয়ে দিতে গেল। সন্ধ্যা হাততালি দিয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। বলল, “না না, অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব।” তার পর একে-

বারে ভেঙে পড়ে কান্নার স্বরে বলল, “কিন্তু ওরা বে বললে! তবে কি সত্যিই...না না, সে হতে পারে না।”

তার পর হঠাৎ সবলে জড়িয়ে ধরল সঞ্জয়কে। প্রাণপণ চেঁচা করেও সঞ্জয় তার হাতেব বাধন খুলতে পারল না। উচ্ছ্বসিত ভাবে সন্ধ্যা বলে উঠল, “না না, আগে ভূমি বল আমাকে ছেড়ে বাবে না কোথাও? বল আগে। কেন ভূমি এতদিন আমার সঙ্গে দেখা কর নি? রাগ করে ছিলে? কিন্তু আমি কি করতে পারতাম ভেবে দেখ।...তা ছাড়া আমি ত বলি নি যে আংটিটা নেব না। তবে অত রাগ করলে কেন? কি বললে? না না, ও সব আর মানব না সঞ্জয়, আজ আমাকে নিতেই হবে। অনেক দিন তোমার সঙ্গে বেরুই নি।”

ঘরগ্রন্থ লোক একেবারে স্তম্ভিত। আড়চোখে সঞ্জয়কে দেখলাম সবাই চোখ নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। এমন কি সঞ্জয় পর্যন্ত ভুলে গেছে সন্ধ্যার আলিঙ্গনমুক্ত হবার কথা। আমার মনে পর্যন্ত একবার দোলা দিয়ে গেল তবে কি সত্যিই সঞ্জয়... কিন্তু সেটা যে অসম্ভব, ওর নাড়ী-নফেরের পথ মাগি আমি। তবে এ সব কি!

হঠাৎ দ্রুত লয়ের কয়েকটা শব্দ চমকে উঠলাম। দেখি সন্ধ্যা কড়ের বেগে সঞ্জয়ের সাং মুখে চুমো পেয়ে চলছে। সঞ্জয় প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটার আকস্মিকতার। তার পর প্রাণপণ শক্তিতে সন্ধ্যাকে প্রায় ঠেলে ঝেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ে পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল। সন্ধ্যা বিদ্যানায় নেতেরে পড়ল।

সঞ্জয়ের বাবাই সর্বপ্রথম নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করলেন। গভীরভাবে ডাকলেন, “সঞ্জয়।”

“আজ্ঞে।”

“বাইরে গিয়ে বসো। না ডাকা পর্যন্ত আর এ ঘরে এসো না।”

সন্ধ্যার বাড়ীর লোকদের দিকে চেয়ে দেখি তারা সন্ধ্যার অপমানে হুখে ফোতে তারা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। এ বাড়ীর লোকেরাও তাদের চোখের দিকে চাইতে পারছে না।

সে রাত্রে আমি বাড়ী কিয়লাম না। সঞ্জয়ের ঘরেও গেলাম না, যদিও সেটাই সবচেয়ে শোভন ছিল আমার পক্ষে। আমাদের বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সন্ধ্যার প্রলাপোক্তিগুলিও আমাদের জানার দরকার ছিল। তাই সকলের স্পষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর সকলের সঙ্গে আমিও সে ঘরের বাদান্দাতেই শুয়ে কাটিয়ে দিলাম সে রাতটা।

পরদিন সকালে সঞ্জয়ের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখি এক রাত্রেই বেচারী একেবারে অর্ধেক হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অল্পুত আচরণ নিয়ে ওর সঙ্গে আশোচনা করছিলাম এমন সময় শোনা গেল সন্ধ্যার ঘুম ভেঙেছে আর পরিষ্কার জ্ঞানও নাকি ফিরে এসেছে।

ইচ্ছা না থাকলেও আমরা হুঁজুনেই গেলাম সে ঘরে, গত রাত্রির ঘটনা সৰ্ব্বদে সন্ধ্যা কি বলে কে জানে। গিয়ে দেখি সবাই সেখানে উপস্থিত, এমন কি সঞ্জয়ের বাবা পর্যন্ত। বাবাকে দেখে সঞ্জয় কিরে আসার উপক্রম করছিল এমন সময় সন্ধ্যা ক্রান্ত হয়ে তাকে উদ্বেষ্ট করে বলল, “না না, আপনি বাবেন না।” সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল আর একটা স্বপ্নের আশঙ্কায়।

সঞ্জয় নিরাপদ দৃষ্টি বক্ষা করে ফিরে দাঁড়াল। জ্ঞান হেসে সন্ধ্যা বলল, “দেখুন আপনাদের কত কষ্ট দিলাম এই দুঃসময়ে। একে আপনারা সঞ্জয়বাবুর শোকে মুহূর্তমতঃ তার উপর আমার হঠাৎ এই ফিট। ডিঃ ডিঃ, এমন হবে জানলে আসতাম না।” আচ্ছা, কি ভাবে মারা গেলেন সঞ্জয়বাবু?”

মাধব উপর ছাদটা ভেঙে পড়লেও বোধ হয় সবাই এত চমকে উঠত না। সন্ধ্যা পাগল হয়ে গেছে, না তারাই পাগল! কিন্তু আমি এবার খুশি হয়ে উঠলাম। সঞ্জয়ের চোখে দেখে মনে হ’ল যেন সে সবেমাত্র শুকনো ডাঙায় পা রেখেছে আসন্ন সলিল-সমাধির কবল থেকে বক্ষা পেয়ে।

অনুতপ্ত সূত্রে সব কথা খুলে বলল সঞ্জয়। আপিসের ‘প্লে’তে ওকে নামতে হবে মৌলিক সভ্যত্বভিত্তি প্রকাশকারী এক প্রোচেরে ডুমিকায়। তাই ও হাতে কলমে দেখতে চেয়েছিল কি ভাবে মাত্রা অল্পপরিচিতের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। সমস্ত বলাব পূর্ব সঞ্জয় সকলের কাছে বার বার কথা চাইল যুগ নীচ করে।

এবার সবাই পদস্পরের দিকে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, অজ্ঞান পরেই সবার মুখে নেমে এল সন্দেহের কালো ছায়া। সন্ধ্যা যদি ওকে নাই চিনত তা হলে কিটের ঘোরে অমন করল কেন? তবে কি তারা আসার আগে ওদের মধ্যে কিছু ঘটেছিল? অথবা সন্ধ্যা বা বলল সেটা শুধু সবাইকার চোখে ধুলো দেবার অভিনয়? বুঝলাম সবার মনেই গুমরে গুমরে কিয়ৎ প্রসঙ্গটা, কিন্তু কেউ প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না। আরও দেখলাম সবাই আমার দিকে কেমন ভাবে বেন তাকাচ্ছে। হয়ত তারা ভেবেছিল রাত্রিবেলা সবার অলক্ষ্যে আমিই সন্ধ্যাকে জাগিয়ে সব কথা বলে দিয়েছি—সে কি করেছে না করেছে সব জানিয়ে দিয়েছি এবং সবার চোখে ধুলো দেবার জন্য সন্ধ্যাকে শিথিয়েও দিয়েছি কি বলতে হবে।

সন্ধ্যা সেদিনই সকালে চলে গেল। একটা জিনিস দেখে আমরা অমন বিপদের মধ্যেও একটু স্বস্তি অনুভব করলাম। মনে মনে যে বাই ভাবুক কিটের ঘোরে সন্ধ্যা কি করেছে সে সৰ্ব্বদে কেউ কিছু তাকে জানাল না, অতি সন্তুর্পণে এড়িয়ে চলল সে প্রসঙ্গ।

আমি আর সঞ্জয় সেদিন বিকেলেই গেলাম এক সাইকোলজিষ্টের কাছে। সব কথা শুনে তিনি বললেন, ‘ব্যাপারটা একটু অসাধারণ তবে খুব বেশী তটিল নয়। সন্ধ্যা অতি-রোমাঞ্চিক ধরনের মেয়ে। রূপগীনা হবার জন্য খুব সন্তব সে কাকুর ভালবাসা পায় নি, আর পায় নি বলেই হয়ত সে রোমাঞ্চিক হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আর

সকলের মত সেও ভালবাসতে চায় ও ভালবাসা পেতে চায় অর্থাৎ সে জনে সে কুপা, তাকে কেউ ভালবাসবে না। তাদের বাড়ীতে সঞ্জয়ের সৰ্ব্বদে নিশ্চয়ই খুব আলোচনা হ’ত আর সেই আলোচনা শুনে শুনেই সন্ধ্যা ওকে ভালবেসে কলেছিল গোপনে। ঠিক গোপনে বললেও ভুল হবে। ভালবেসেছিল অবচেতন মন দিয়ে। অত্যন্ত রোমাঞ্চিক ধরনের মেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সঞ্জয়কে ভালবাসলেও নিজের সৰ্ব্বদে তার ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের সীমা নেই, তাই সে পারতপক্ষে ওর সামনে বেরতে চাইত না লজ্জায়। সে জানত সঞ্জয়ের পক্ষে তাকে ভালবাসা অসম্ভব, তাই নিজের মনে মনে সঞ্জয়কে নিয়ে কল্পনার ভাল বুনেই সে খুশী ছিল, রমেশ তাকে সঞ্জয়ের কাছে না পাঠালে কোন দিন তাদের মুখোমুখি দেখাও হ’ত না হয়ত। অবশ্য সন্ধ্যা এক আধবার দূর থেকে সঞ্জয়কে দেখেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ওকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত অবাস্তব কল্পনা করার কলে সে সঞ্জয়ের আসল চেহারা হুঁলে গিয়েছিল, যদিও তার অবচেতন মন সঞ্জয়কে ভালো নি কখনও। সাধারণ লোকের কাছে হয়ত এ ব্যাপারটা অদ্ভুত এবং অবিদ্বান্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু চরম রোমাঞ্চিক এবং অতি কল্পনাপ্রবণ লোকদের জীবনে এ রকম ঘটনার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। সঞ্জয়ের বাড়ীতে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় সন্ধ্যা ওকে চিনতে পারে নি এই কারণেই। কিন্তু কিটের সময়, যখন তার অবচেতন মন মাথা নাড়া দিয়ে উঠল আর তার কলে মনের সমস্ত অর্গল খুলে গেল শুধু তখনই সে চিনতে পারল সঞ্জয়কে; আর আবার যখন তার স্বাভাবিক চেতনা ফিরে এল, সঞ্জয়কেও আর চিনতে সক্ষম হ’ল না। সর্বশেষে তিনি বললেন, ‘এ রকম চরম রোমাঞ্চিকদের ভাগ্যে সাধারণতঃ দুঃখ ছাড়া আর কিছু জোটে না। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে যখন তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় তখন তাদের জীবনে আসে নিদারুণ বৈরাগ্য আর মাহুতের উপর জাগে তীব্র ঘৃণা আর অবিদ্বাস। এর কলে তারা অনেক সময় উন্মাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বপ্নভঙ্গের কলেই তারা বাস্তব জীবনে ফিরে আসে, আর অনেক সময় বিরে হলে এবং প্রকৃত ভালবাসা পেলে সাধারণের তুলনার একটু বেশীই স্থগী হয়।’

সাইকোলজিষ্টের ব্যাখ্যা শুনে সঞ্জয় বেন কেমন হয়ে গেল। অনেক মেয়ের সঙ্গেই ও ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত, কিন্তু কোনও মেয়ে যে ওকে ভালবাসে এটা ও কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নি। সারাটা পথ ও অভিভূতের মত হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরল।

কিন্তু আরও বিস্ময় ওর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সে ঘটনার পর প্রায় দিন পনের চলে বাওয়া সন্ধ্যা সে সৰ্ব্বদে কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করছে না দেখে আমরা মনে মনে ভাবছি কাঁড়াতা বুঝি নির্মিড়ে উঠে গেলাম এমন সময় এক দিন আকস্মিকভাবে আর এক কল্পনাভীত বিপদ এসে উপস্থিত হ’ল। সঞ্জয়ের বাবা একটু রানভাবি এবং গভীর প্রকৃতির লোক, এক কথা হ’বার বলেন না। এক দিন তিনি সিধে সঞ্জয়ের ঘরে ঢুকে বিনা ডুমিকায় বললেন,

“আমি সন্ধ্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ নিতে রাজী আছি। এ মাসেই হয়ে থাক শুভকর্ষণটা।”

হতভব সঞ্জয় কিছু বলার আগেই আবার তিনি বললেন,  
“আপিসে ক’দিন ছুটি পাওনা আছে?”

এবার সঞ্জয় বলল, “কিন্তু...”

বাবা বললেন, “কিন্তু কি?”

“কিন্তু...মানে আমি বলছিলাম কি...ইয়ে কি বলে...” আর কিছু বেরুল না মুখ দিয়ে।

বাবা জ্ব কঁচকে কিছু না বলেই চলে গেলেন।

মার কাছে আপীল করতে গেল সঞ্জয়। মা তেলে-বেগুনে জলে উঠে বললেন, “হতভাগা লজ্জা করে না আমার কাছে আসতে? বংশের মান-মর্যাদা খুইয়ে সকলের মুখে জুতো মেরে আবার আমার কাছে এসেছিস ঢঙ দেপাতে! যেখানে এদিন পড়ে বয়েছিলি সেখানেই বা না এখন, আমার কাছে কেন?”

তারপর কপালে করাঘাত করে বললেন, “আমারই কপাল! নইলে সেদিনই কাহ্ন মিত্তিরের ছোট মেয়েটার সঙ্গে তোর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক করে আসি! আতা কি মিষ্টি স্বভাব মেয়েটার। ভাগো নেই কি আর হবে। কোথায় মা-দুর্গার মত মেয়ে সরমা আর কোথায় ঐ শাকচুরি! কথা দিয়ে আবার আমাকেই নিজের মুখে কথা ফিরিয়ে নিতে হ’ল হাতে পাবে ধরে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।”

সঞ্জয় বলল, “বিশ্বাস কর মা, আমি এসবের কিছুই জানতাম না, মেয়েটাকে আমি এর আগে কোনদিন দেখি নি পর্যাপ্ত।”

মা দ্বিপ্তপ্রায় হয়ে বলে উঠলেন, “এখনও সেই কথা! আমরা কি সব ঘাস গেয়ে থাকি? এতখুঁর এগিয়ে আবার মেয়েটাকে অকুলে ভাসিয়ে দিবি? ঐ মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে তোর, নইলে আমি গলার দড়ি দেব।”

নিরুপায় হয়ে সঞ্জয় বউদির শরণাপন্ন হ’ল। বউদি ছোট্ট একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলল, “আর জাকামো কেন ঠাকুরপো? সবই ত জেনে গেছি।”

অবশেষে সঞ্জয় আমার কাছে এসে কঁদে পড়ল। সব কথা শুনে আমি আংকে উঠলাম। কোথায় অমন সুন্দর চেহারার সঞ্জয় আর কোথায় সন্ধ্যা! অনেক ভেবে-চিন্তে পরামর্শ দিলাম—বাড়ী ছেড়ে কয়েক মাস কোথাও অজ্ঞাতবাসে কাটাতে। প্রজ্ঞাবটা সঞ্জয়ের মনে লাগল আর সত্যি সত্যিই ও তার আয়োজন করতে লাগল এমন সময় আর একটা সংবাদ শুনে আমরা মাথায় হাত দিয়ে পড়লাম।

সেই ঘটনার পর থেকেই সঞ্জয়ের বউদি নিজে থেকে থেকে সন্ধ্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল এবং মাঝে মাঝে রমেশের বাড়ীতে বাওয়া আসাও আরম্ভ করেছিল, আমরা তখন তাতে

সন্দেহের কিছু দেখি নি। একদিন সে রমেশের বাড়ীতেই সন্ধ্যাকে কথায় কথায় সমস্ত জামিয়ে দেয় কিটের ঘোরে সে কি কি করেছিল। পাখরের মত স্তব্ধ হয়ে সন্ধ্যা সব শোনে আর সেই দিনই রাত্রে আকিং পেয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে সময়মত ধরা পড়ায় তার জীবন রক্ষা পায়।

তার পর আরম্ভ হ’ল এ বাড়ী ও বাড়ী ছোটাছুটি। এদিকে সঞ্জয়ের মার হুমকি—সন্ধ্যাকে বিয়ে না করলে তিনি গলার দড়ি দেবেন আর ওদিকে সন্ধ্যার এক কথা—এ ঘৃণিত কলঙ্কময় জীবন আর সে রাখবে না। অবশেষে সঞ্জয়ের বউদি অনেক কষ্টে সন্ধ্যাকে বোঝাল যে জীবন বখান সে রাখবে না বলেই ঠিক করেছে তখন সেটা একজনকে দান করে কেললেই সমস্তা চুকে যাবে। তা ছাড়া যার জন্ত সে নিজেকে কলঙ্কবতী মনে করছে তার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনটা যোগ করে দিলেই আর কোন কলঙ্কের প্রশ্ন থাকবে না। বলা বাহুল্য, শুধু এটুকু বলাতেই সন্ধ্যা বিয়েতে রাজী হ’ল না, তাকে বিশ্বাস করাতে হ’ল যে সে ঘটনার পর থেকে সন্ধ্যার জন্ত সঞ্জয় একেবারে উদ্ভাদপ্রায় হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যাকে না পেলে হয়ত ও আত্মহত্যা করে বসবে। সন্ধ্যার সশব্দেও ঠিক এই কথা—শুনেই সঞ্জয়ের বউদি বোঝাল সঞ্জয়কে। একটি মেয়ের জীবন-মরণ নির্ভর করছে ওই উপর একথা শুনেই সঞ্জয় একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। আর কোন বাক্যব্যয় না করে হুড় হুড় করে হাজির হ’ল ছাঁদনাতলায়।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। কুরূপা সন্ধ্যার মধুর ব্যবহার সবাইকে ভুলিয়ে দিয়েছে তার রূপহীনতার কথা। ওদের দাম্পত্য জীবন দেখে অনেকে ঈর্ষা করে, অনেকে বিস্মিত হয়! অনেকে সুখী হয়। আর সবচেয়ে সুখী হয়েছেন বোধ হয় সঞ্জয়ের মা আর বাবা, বউমা বলতে তাঁরা একেবারে অজ্ঞান।

কিন্তু এ রকম সুখময় পরিণতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে এটা ট্রাজেডিই রয়ে গেল। বিয়ের পর থেকেই সঞ্জয় অতিরিক্ত রকমের সুরোষ বালক হয়ে পড়ল, ওর সেই স্মার্টনেস, লোক ঠকাবার উৎকট আনন্দ, সেই চটপট সদ্যসপ্রতিভ ভাব কোথায় যেন অদৃষ্ট হয়ে গেল। এখন ও মেপে কথা কয়, মেপে হাসে, ভিড় দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, রাষ্ট্রায় বগড়া দেখলে টিল্লনী কেটে বগড় দেখার বদলে তাড়াতাড়ি গিয়ে মধ্যস্থতা করে, এ ছুট দিয়ে কোন স্বল্পপরিচিতা মেয়েকে যেতে দেখলে ওকুটে গিয়ে ওঠে, দশ বার না তাকিয়ে, একেবারে নিঃসন্দেহ না হয়ে কাক গলে কথা আদম্ভ করে না। চেহারাতেও ওর পরিবর্তন এসে গেছে। শরীরটা একটু মোটা হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন স্থূল হয়ে উঠেছে। আগেকার জীবনের রোমাঞ্চ আর রোমাঙ্কের কথা যদি কখনো ওঠে ত ও শুধু সলজ্জ হেসে ঘাড় নেড়ে বলে, “খোঃ।”

# সখ্য-ভক্তির যুগ

ত্রিবিনোবা ভাবে

অনুবাদক—শ্রীজ্যোতির্ষ্য রায়

কালের আত্মন

আজ সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ। গত বৎসর এই দিনে আমি বিহারে প্রবেশ করি। এক বছর পূর্ণ হ'ল। এর মধ্যে বিহারের ভাইদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। পরিচরও হয়েছে বটে। আমি দেখেছি বিহারে প্রচুর শক্তি পড়ে রয়েছে, এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা দরকার।

রাজাদের দিন আজ চলে গেছে, এ কথা আপনারা জানেন। বড় জমিদারদের দিনও আর নাই। ভবিষ্যতের পৃথিবী হবে জন-পণের পৃথিবী। সেখানে সাধারণ জনগণের দাবিই মর্যাদা পাবে। আজ সারা দুনিয়ার কথা জেগে উঠেছে। আজকার যুগ সমান সম্পর্কের দাবি করছে। এ যুগ সখ্য-ভক্তির যুগ।

সখ্য-ভক্তির উদাত্তরূপ

অর্জুন আর ভগবানের মধ্যে সখ্য-প্রীতির সম্পর্ক ছিল। হু'-জনে সমান মর্যাদার সঙ্গে কাক করতেন। ভগবান জ্ঞানের ভাণ্ডার। অর্জুনের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর শক্তিরও সীমা ছিল। ভগবানের শক্তির সীমা ছিল না। তবুও হু'-জনের মধ্যে সখ্য ছিল, সম্পর্কে উচু-নীচের ভেদ ছিল না। ভগবানের প্রতি অর্জুনের মনে শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সম্পর্কে ছোট-বড়র ভাব ছিল না।

অতীতের দাস্ত-ভক্তি

এর আগে এক যুগ ছিল, দাস্ত-ভক্তির যুগ। সে যুগও খুব ভাল ছিল। ঐ যুগে প্রভু আর সেবকের ভাব চলিত ছিল। প্রভু আর সেবক পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ছিল। তবে প্রভু সেবককে পালন ও পোষণ করত, আর সেবক প্রভুকে ভক্তি করত। সে ছিল হুম্মানের যুগ। হুম্মান রামকে যে ভক্তি করত তার নাম দাস্ত-ভক্তি।

বিকাশের প্রণালী

আজ দুনিয়াতে সখ্য-ভক্তির আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী। তার মানে এ নয় যে বান্দা শ্রদ্ধার পাত্র তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে না, কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে এখন সমমর্যাদার সম্পর্ক থাকবে। যখন যুদ্ধের সময় এল অর্জুন কৃষ্ণকে ভিজাদা করলেন, আনন্স সাচাব্য করবেন? তা হলে আমার সারথি হন ও ঘোড়া সাময়ান। এইরূপে তিনি নিজের পরম পুত্র্য ব্যক্তিকে ঘোড়ার পরিচর্যা করার কাক দিয়ে-ছিলেন। এইরূপ তাঁদের মিত্রের সম্পর্ক ছিল।

হুম্মানের আমলে সমাজের গড়ন ছিল এইরূপ যে, কিছু শক্তিশালী লোক প্রভু ছিল, আর কিছু সেবাপরায়ণ লোক সেবক ছিল।

সেবক আর প্রভুর মধ্যে ভালবাসা ছিল। বগড়া ছিল না কিন্তু ঐ সময়ে এই সম্পর্কের এক সীমা ছিল।

রামচন্দ্র ছিলেন রাজা রাম। কৃষ্ণ কিন্তু রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ। বহুই ছিলেন তিনি। আজকের দিনে প্রভু-সেবকের সম্পর্কে, তা যদি ভালবাসার সম্পর্কও হয়, বখেট বলে মনে করা হয় না। এর মধ্যে এমন সময়ও এসেছিল যখন প্রভু হয়ে উঠেছিল অত্যাচারী, আর সেবকের মনে প্রভুর প্রতি সম্মানের ভাব ছিল না। আজও প্রভু-সেবকের সখ্য মধুর হতে পারে, কিন্তু এ যুগের দাবি হ'ল সখ্য-ভক্তির। প্রভু-সেবকের সখ্য এ যুগের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

সেইজন্য আমি যখন দান চাই তখন এ কথা বলি না, "আপনি বড়লোক, প্রভু, আপনি আমাকে দান করুন, আমি আপনার সেবা করব। আমার খুব উপকার হবে।" আমি শুধু এই বলি যে সকলে ভাই-ভাই। আপনার নিজের সমান ভাগ দিন। দানের অর্থই সমান বিভাগ, সমবন্টন। শতরাচা এই-রূপ অর্থ করেছেন। এইজন্য একশ' একর থেকে যখন কেউ আমাকে দুই একর দেয় তখন আমি সে দান গ্রহণ করি না। যদি আমি সেবক ভাব থেকে দান চাইতাম ত হুই একরও নিয়ে নিতাম এবং দাতাকে নমস্কার করতাম ও দাতার অহুগ্রহ মেনে নিতাম, কিন্তু আজ আমি সগায় সম্পর্ক দাবি করছি। আজকের সমাজ-বচনা এখন সখ্যভাবকেই স্বীকার করে নেবে। গুরু-শিষ্যও আজ একে অপরের মিত্র হবেন। হু'জনে একে অঙ্কে ভালবাসবেন। গুরু শিষ্যকে শেগাবেন আর শিষ্যও গুরুকে শেগাবে। যার নিকটে যা আছে তা পরস্পর পরস্পরকে দেবেন এবং একে অঙ্কের উপকার স্বীকার করবেন। এইরূপে সমান সম্পর্ক মেনে নিয়ে গুরুশিষ্য থাকবেন, মালিক-মজুর থাকবেন, প্রভু-সেবক থাকবেন।

এক সময় ছিল, যখন শ্রী স্বামীকে পতিদেবতা বলে মনে করত আর নিজেকে দাসী বলে পরিচর দিত। সে কাল খারাপ ছিল না, কিন্তু আজ আমরা এক এক পা এগিয়ে গিয়েছি। আজকের পত্নী পতিপ্রভা হলে, পতিও হবে পত্নীপ্রভ। হু'জনে একে অঙ্কে দেবতা বলে মনে করবে। যার যোগ্যতা বেশী হবে তার পতির হবে বেশী। স্বামীর যোগ্যতা বেশী হলে শ্রী তার সমাদর করবে, আর শ্রীর যোগ্যতা বেশী হলে স্বামী করবে শ্রীর সমাদর। এই হু'জনের সম্পর্কের দান কিন্তু সমান থাকবে। একেই আমি নাম দিয়েছি "সখ্য-ভক্তির যুগ।"

সমাজ-বচনার বুনিসাদ

কালের দাবি হুম্মানে আমাদের সমাজ তৈরি করতে হবে। তার পথে কি করব সে বিচার আজ করছি না। আজ শুধু এই কথা

বুঝে নেওয়া দরকার যে পুরানো আমলের মূল্য, পূর্বের অল্পকপই, আজ আর টিকবে না। তুলসী-রামায়ণের সময়ে যে মূল্য ছিল আজকের দিনে সে মূল্য আর নাই। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু আজকের দিনের রামায়ণে কেবল ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হবে না। যেখানে গুণ থাকবে সেখানে—এই সখ্য-ভক্তির যুগে—তার সমাদর হবে, কিন্তু সম্পর্ক সমান থাকবে।

এ যুগে কারখানাওয়াল ও মজুর থাকবে। একের বুদ্ধি বেশী থাকবে, অপরের শক্তি বেশী থাকবে। তবে মজুর এ কথা বলবে না যে আপনি মালিক আর আমি আপনাব চাকর। এ সম্পর্ক এগন চলবে না। এগন ত হুঁজনে শরিক হয়ে যাবে। কারখানা-ওয়ালারও নিজের বুদ্ধির পারিশ্রমিক মিলবে, আর মজুরেরও নিজের শক্তির ঐ পরিমাণই পারিশ্রমিক মিলবে। পারিশ্রমিক সকলের সমান হবে। যেখানে যোগ্যতা হবে সেখানে সমাদর করা হবে, কিন্তু সকলে একে অস্ত্রের মিত্র থাকবে, একে অস্ত্রের সার্থী হবে।

আজকের দিনে ভাই-ভাই, গুরু-শিষ্য ও পতি-পত্নীর সম্পর্ক মান অমুসারে তৈরী হবে। এতে করে এক নতুন মাধুর্য আসবে। পুরানো কালেও মাধুর্য ছিল, কিন্তু সে মাধুর্য আজ নষ্ট হয়ে গেছে। পতি মহারাজ খরাপ হয়েছেন, তবুও তাঁকে দেবতাই মনে করা হয়, আর স্ত্রী সাধী হলেও তার দাম নাই। যেখানে সম্পর্কে গলদ ঢুকেছে সেখানে নব যুগের দাবি সামনে এসে পড়েছে।

আজ যদি রামচন্দ্র নিজে পৃথিবীতে এসে রাজা রাম হতে চান ত আমি তাতে রাজি হব না। মহাত্মা গান্ধীও যদি আসেন তবে আমি তাঁকে রাজা গান্ধী করে নেব না, মহাত্মা গান্ধীই রাখব। পুরানো আমলে ভাল রাজাও হয়েছে, কিন্তু তার চাইতে বেশী হয়েছে পারাপ রাজা। ঐ সময়ে প্রজার বিকাশ এক সীমা পর্যন্ত হ'ত, কিন্তু কাল আজ এগিয়ে গেছে।

যে লোক কালের পরিবর্তন অমুসারে কাজ করতে জানে না, সে হেরেও যায়, মারও পায়। লোক যদি শ্রোতের অমুসারে যায়, নাও সাঁতরায়ে ত সে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যদি শ্রোতের প্রতিকুলে সে যেতে চায় তা হলে তার কিছু ব্যায়াম হ'ত হবেই, কিন্তু সে এগিয়ে যেতে পারবে না।

তাই লোক যতই বড় হউক না কেন, তার পুরানো মান-মর্যাদা, চালচলন, প্রভাব-প্রতিপত্তি এগন চলবে না। আমার কাছে এর দুটো আছে। পরশুবার কি মহান পুরুষই না ছিলেন! তাঁর শৌর্ধ্যবীৰ্য্য ছিল। একুশ বার তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তিনি অবতারই ছিলেন, কিন্তু বখন রামচন্দ্রের নতুন অবতার হ'ল, তখন পরশুরামের বৃক্ষে নেওয়া উচিত ছিল যে, নতুন অবতার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তিনি তা বুঝলেন না, আর রামের সঙ্গে বিরোধ করলেন। তাতে তিনি হেরে গেলেন। পরশুরামের হত বলশালী লোকেরও কালের বিরোধিতা যেখানে টিকল না সেখানে দ্বিতীয় কে আর টিকবে? প্রাচীন রীতি ভাল হলেও, নতুন যুগে তাকে ভাল বলে মনে নেওয়া হয় না।

#### সকলের সমান অধিকার

আজ কর্মীদের সঙ্গে বখন কথা হয় তখন আমি বলি যে, বর্ষ-ভাগ আমাদের চাই—এ বেন ট্যান্স আদার করা হচ্ছে। আমি ত এই কথা বোঝাই যে, জমি সম্পত্তি আর উৎপাদনের উপকরণের উপর সকলেরই আজ সমান অধিকার। কালের দাবির কথা যে বলে তাকে লোকে উদ্ধত বলে থাকে। যদি তাকে উদ্ধত বলে মনে কর তবে সে উদ্ধত হয়ে উঠবে। কিন্তু কালের ক্ষমাকে যদি স্বীকার করে নাও ত সকল দাবিদার নম্র থাকবে, বড়র আদর ছোট করবে।

লোকে বলে আজকাল ছেলেপিলেরা মা বাপের সমাদর করে না। ছেলেমেয়েরা ত ছেলেবেলা থেকেই মায়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে কাজ করে। মা যদি বলে যে গুটা চাদ, শিত্ত তা মেনে নেয়। এ কথা সে বলে না যে, দাঁড়াও জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি গুটা সত্য-সত্যই চাদ কি না। এত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও লোকে বলে সম্মান মা-বাপকে মানে না। আমি ত এই বলব যে মাতা-পিতা এ যুগকে চিনে নাই। মাতাপিতা শিশুর সঙ্গে সমান সম্পর্ক রেখে চলবে, সমান সম্পর্ক রেখে তাদের ভালবাসবে। তাদের হুকুম করবে না, পরামর্শ দেবে। আজ্ঞা করবে না, পিটাবে না। আগে ত মা-বাপ ছেলেমেয়েরদের মারত, কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে মারত। এ যুগে ও কথা চলবে না। এ কাল ম' বলবে, তোমাকে সাজা দেব না, আমি নিজে নিজেই দণ্ড দেব। আমি না খেয়ে থাকব।

লোকে জিজ্ঞাসা করে, ছেলেপিলেদেরও মারা চলবে না? আমি বলি যে, সম্মানেরা শিশুকাল থেকে আপনাদের উপর শ্রদ্ধা বেধে এসেছে, তাদের মারার কোন কথাই উঠতে পারে না। ভালবাসা ত আজ চাই-ই, তাহাই পর্যাপ্ত নচে, সমানে সমান ভালবাসা চাই।

#### ভূদান আর বিচার-বিপ্লব

সকলেরই নিজের নিজের বিশেষত্ব থাকে। মজুরের বুদ্ধি কম হলেও হৃদয় বড় হতে পারে। কারও জন্য সে জীবন দিয়ে পরিশ্রম করতে পারে। আমাদের বুদ্ধি বেশী, কিন্তু কিছু দুর্বলতাও থাকতে পারে। সকলের মধ্যেই কিছু দুর্বলতা আর কিছু বিশেষত্ব থাকে। এই জন্য সমানে-সমান ভালবাসা হওয়া দরকার। নিছক প্রেম বঞ্চিত নয়। এই দৃষ্টিতে যদি আপনারা ভূদান-রজকে দেখেন তবে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা আজকের দিনের দাবি। ভূদান-রজ যদি কালের দাবির অমুসারে না হ'ত তবে গরীব লোক আমাদের জমি দিত না, আর বড়লোকদের মধ্যেও কিছু লোক আমাদের বাধা দিত। আর যে লোক জমি দিত তার অমুসারে আমাদের স্বীকার করতে হ'ত। আজ ত আমি প্রত্যেক লোকের নিকট জমি চাইছি, কারণ সবাইকে আমি বলতে চাইছি যে তোমরা জমির মালিক নও। গরীবের ঘরে যদি বর্ষ সম্মান আসে ত সে কি থাকে না? আমাদের ঘরে যদি বর্ষ সম্মান আসে সে কি তাকে ভাগ দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে। এই ভাবে আমি সকলের কাছে চাই, আর আমি পাইও অনেক। আমি ত এখন বলি যে বত কৃষক আছে তত দানপত্র

আমায় পাওয়া চাই। বখন কোন লোক কালের দাবিকে বুঝতে পারে, বর্ষভাবনাকে জাগিয়ে তোলে, তখন প্রত্যেকেই এই কথা মেনে নেওয়া কর্তব্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এটি এক নূতন বিচারধারা। নিজের খলি থেকে এটা আমি বার করি নাই। কালেরই দাবি পেশ করছি। এই বিচারধারাকে প্রসারিত করার দৃষ্টি নিয়ে আপনারা কাজ করবেন, কেবল আমি পাওয়ার দৃষ্টি নিয়ে নয়।

কোটা—নির্দিষ্ট পরিমাণ—পূর্ণ করে কাজ হবে না। বখন আপনারা লোকেদের বুঝিয়ে দেবেন যে সখ্য-ভক্তির যুগ এসে গিয়েছে তখন আপনাদের কাজ সফল হবে।\*

\* যুদ্ধের জেলার কিয়াজোরীতে ভাষণ

## ঔষধির পূজা

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

বুধি আর রাত পোহাতে  
প্রভাত হতে নাইকো দেবি,  
আকাশের শুকতারিণী  
মলিন সেটি তোমায় হেরি।  
তবুও মন মানো না  
কেউ জানে না মনের কথা  
বদিও বক্ষে রাপি  
ভরাই আঁপি  
বক্ষে তবু ঘনায় ব্যথা।  
এবে মোর বক্ষে আছ  
চক্ষে আছ  
তাইতে বাঁচি;  
তবু এই ঔষধির পূজায়  
ঐ প্রতিমার  
প্রসাদ যাচি।  
এ যে মোর ঔষধিকের  
আর্ত চোখের বৃত্তকৃত্য  
ভ'রে চোখ উপচে পড়ে  
তাই সে ঝরে  
মালা গাখি সেই মুকুতা।  
অধরের তীব্র সুধার—  
এই বসুধার পাত্র ভরি  
ধরা নয়—মাটির সরা—  
সেই পসরা মাখার করি।

সীমা নাই সামান্য নাই  
চাই শুভু চাই  
হায় যে চাওয়া!  
ঘটে বার ধরবে বত  
মিলবে তত  
তাহার অধিক বায় কি পাওয়া?  
তোমার ঐ রূপের শিখায়  
নির্নিমিখা  
আঁখির তারা,  
বাসনার বস্তুরাগে  
বাক্সি লাগে  
তজ্জাহারা।  
তোমার ঐ চোখের লীলায়—  
নিকুন্তিলার  
দহন-দাহ  
তোমার ঐ ক্র-ভঙ্গিমায়  
অপান্নিমায়  
বখন চাত।  
সে-চোখের দৃষ্টি পিয়ে  
ধিক্ধিকিয়ে  
তুচ্ছ জ্বল—  
সরে বাই এলোকেশের  
মেঘাবেশের  
ছায়ার তলে।

হতাশায় বুকভাঙা সে  
দীর্ঘশ্বাসের

লঙ্ঘন যুগে,  
করে তাই এই আশ্রয়  
তোমার প্রতি  
চোখের মতি

ঐ প্রতিমার বক্ষে চুমে।

# মহাসাগরের শিশু

## শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কি করে তৈরি হ'ল এই ভাসন্ত রাস্তা? কোন নাবিক কোন কারিগরকে দিয়ে এই অতলান্তিক সমুদ্রের বুকে গড়ল একে? লম্বা রাস্তার দু'ধারে লাল ইটের এক সার বাড়ী—ক'উঠে খুস হয়ে গিয়েছে—টালির ছাদ, ছোট্ট দোকানঘর? আর এই নস্রাকাটা পাথরের মিনার? এই এখানে শুধু খানিকটা সমুদ্রের জল, যদিও কারও বাগান কববার বাসনা ছিল মনে হয়, তাড়া বোতলের টুকরো বসানো পাঁচিলে ঘেরা—কখনও কখনও হ'একটা মাছ তার উপরে লাফিয়ে ওঠে।

কি করে এরা পাড়া হয়ে রইল চেউয়ের আঘাতে অটল হয়ে? আর সঙ্গীবিহীন বার বছরের শিশুটি এই জলপথ বেয়ে অনারাসে চলে কি করে—বেন কঠিন মাটির ওপর দিয়েই চলেছে? কি করে এসব সম্ভব হ'ল?

সবই বধাসময়ে বলব, যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি। যদি তার পরেও রহস্ত রয়ে যায়, আমি নিরুপায়।

যখনই কোনও জাহাজ এদিকে আসত, দিগন্তে তার আভাস পাওয়ার আগেই শিশুর বড় ঘুম পেত, আর সমস্ত গ্রামখানা তলিয়ে যেত চেউয়ের নীচে। তাই কোনও নাবিক দূরবীন দিয়েও আজ অবধি সে গ্রাম দেখতে পায় নি, তার অস্তিত্বের কথা ভাবতেও পারে নি।

শিশু ভাবত সে-ই বুঝি জগতে একমাত্র ছোট্ট মেয়ে। কিন্তু সে কি জানত যে, সে একটি মেয়ে?

খুব স্নন্দর দেখতে ছিল না সে, দাঁতগুলো একটু অসমান, নাকটাও একটু বেশী উঁচু, কিন্তু হাট ধবধবে সাদা, ছোট্ট হ'একটি তিল তার উপর। কুদে শরীরে খুস, একটু সলজ্জ কিন্তু খুব উজ্জল চোখ দুটি তোমার মধ্যে এক বিষয় জাগিয়ে তুলত—কালের মতই প্রাচীন এবং নিবিড় সে বিষয়।

সেই গ্রামের একমাত্র পথ বেয়ে যেতে যেতে শিশু ভাইনে-বোয়ে তাকিয়ে চলত, যেন কারও হালকা হাতছানির প্রত্যাশা করছে; তেমনিই একটা আভাস, শুধু আভাসই, কারণ আসলে কেউ কোনদিন ঐ হারানো গ্রামে আসতে পারবে না—এলেই চেউয়ের তলার মিলিয়ে যাবে সে গ্রাম।

কি খেয়ে বাঁচত সে? মাছ ধরে ভাবছ বোধ হয়? না, আমার তা মনে হয় না। রাস্তাঘরের দেয়ালে থাকত তার খাবার, মাংসও থাকত হু'তিন দিন অন্তর। আলুও থাকত, অল্প আনাছ আর মাঝে মাঝে একটা ডিম। বোজ নতুন নতুন খাবার। যদিও একটা পাত্র থেকে সে বোজ আচার নিয়ে খেত, তবু তা ফুরিয়ে যেত না কখনও, পরিমাণে ঠিক একই থাকত, যেন চির-কালই ঐ একটি দিনের মতই চলবে।

বোজ ভোরে কুটিওয়ালার দোকানে তার জন্তে এক পোয়া পাঁউরুটি কাগজে মোড়া থাকত মার্কেল পাথরের টেবিলের উপর—তার শিহনে কাউকে সে কোনওদিন দেখে নি—কারও হাত নয়, আঙুলও নয় এমন কি।

ভোরবেলা উঠে সে দোকানের সাদিগুলো খুলে দিত। সমস্ত বাড়ীর পাল্লাগুলো তুলে ভাল করে সেগুলো আটকে দিত জোবালো জোলা হাওয়ায় ভরে। তার পর কোন কোন রাস্তাঘরে গিয়ে উমুন খরাত, হু'তিনখানা বাড়ীর ছাদের ওপর ধোঁয়া উঠত কুণ্ডলী পাকিয়ে।

শুভে যাবার ঘণ্টাশানেক আগে আবার সে পাল্লাগুলো বন্ধ করে দিত, যেন তা-ই স্বাভাবিক, আর দোকানের কবগেট লোহার খড়খড়িগুলো দিত নামিয়ে।

শিশু এ কাজগুলো করত যেন কোন সহজাত প্রবৃত্তির বলে, যেন কোন এক সুস্থ প্রেরণা তাকে বলত বোজ এই সব দেখাশুনো করতে। ভাল আবহাওয়া থাকলে সে শোলা জানলা দিয়ে একটুকরা কার্পেট বা কাপড় ফুলিয়ে দিত শুকোতে, যেন গ্রামে যে লোকজন থাকে, সেটা দেখানো নিতান্তই প্রয়োজন, যত দূর সম্ভব জীবন্ত করে তোলা দরকার।

রাত হলে সে মোমবাতি জালিয়ে বসে সেলাই করত। কয়েকটা বাড়ীতে বিজলী আলোর ব্যবস্থা ছিল, সেগুলো সে বেশ অনারাসে, সুন্দর ভাবে জালাতে পারত। একবার একটা বাড়ীর সামনে সে এক টুকরো কালো কাপড় ফুলিয়ে দিয়েছিল। দেখাছিল বেশ। হু'তিন দিন বাদে তার পর সেটা সে লুকিয়ে ফেলেছিল।

আবার কখনও সে গায়েব জরচাকটা বাজাত, যেন মস্ত কিছু খবর রটনা করতে চায়। তার দারুণ ইচ্ছে হ'ত চীৎকার করে কিছু বলে, বা সমুদ্রের প্রতি কোণায় শোনা যাবে; কিন্তু গলা যেন তার আটকে আসত, স্বর ফুটত না। প্রাণপণ চেষ্টার তার মুখ আর গলা কালো হয়ে উঠত ডুবে-মরা মানুষের মত। তখন সে চাকটা ঠিক জারগার রেখে দিত—মগুপের বাঁদিকের কোণে।

বোবানো সিঁড়ি বেয়ে শিশু গীর্জার চূড়ার উঠত, হাজার পায়ের তলায় তার ধাপগুলো গিয়েছে করে। মনে হ'ত যেন সিঁড়ির সংখ্যা পাঁচ হাজার হবে (আসলে ছিল বিদ্যানকুইটা)। চূড়ার হলদে ইটের কাটল দিয়ে আকাশের কয়েক চিলুতে আসত ভিতরে। উপরে উঠে বড় ঘড়িটা দয় দিয়ে ঠিক করে দিত সে, বাতে ঘণ্টাগুলো ঠিক সময়ে বাজে।

গীর্জার দালানঘর, উপাসনা-বেদী, নীরব আদেশদান-বত সাধু-সন্তদের প্রস্তর-মূর্তিগুলি, কিতকটি সিঁচে চেয়ারের সাধি—সকল বয়সের সকল মানুষের জন্তে প্রতীকী করে রইত—দেয়ালের গায়ে মিনের



কালগুলি মলিন হয়ে এসেছে—মলিন হয়েই চলবে—এ সমস্ত শিশুকে ওদিকে টানত, আবার তার ভরও জাগত। কখনও সে চুপ্ত না এঁ উঁচু বাড়ীটার, অবসর সময়ে আখখোলা দরজার ফাঁক উঁকি দিয়ে দিয়ে এক বলক দেখে নিত ভরে ভরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে।

তার ঘরে একটা তোরঙ্গের মধ্যে সংসারের কাগজপত্র থাকত। 'ডাকার' থেকে, 'রিয়োডে জ্যানীরো' থেকে আর 'হংকং' থেকে পাঠানো ছবির পোষ্টকার্ড। তলায় সই করা থাকত 'চার্লস' কিংবা 'সী. লীডেন্স'—ঠিকানায় লেগা থাকত 'ষ্টান্‌ভুর্ড (নর্ড)'। সমুদ্রের শিশু কিছুই জানত না এই চার্লস বা এই ষ্টান্‌ভুর্ডের।

দেবাজের ভিতর একখানা কোটোর এলবামও থাকত। একটা ছবি ছিল একটি ছোট্ট মেয়ের—ঠিক সমুদ্রের শিশুরই মত—অনেকক্ষণ ধরে সে দেখানা দেখত আর ভাবত। তার মনে হ'ত যেন এঁ ছবির শিশুটিই সত্যি। হাতে তার একটা লোহার ঢাকা। শিশু সারা গ্রাম খুঁজে কিরেছিল অমনি একটা ঢাকা, পেয়েছিল ও এক দিন। কিন্তু বেই সেটা গড়তে গেল, অমনি সেটা সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গেল।

একখানা ছবিতে শিশু নাবিকের বেশে একজন লোক আর সাজগোজ করা শক্ত চেহারা একজন মহিলার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। সমুদ্রের শিশু কখনও কোনও পুরুষ বা মেয়েকে দেখে নি, তাই অনেকক্ষণ নিজেকে প্রশ্ন করেছিল এই সব মানুষের মানে কি - ভেবেছিল অনেক রাজে, বগন মাঝে মাঝে বিহ্বালের মত হঠাৎ এক নিমেষে কোন কোন জিনিষ পরিষ্কার বোঝা যায়।

রোজ সকালে সে গায়ের পাঠশালার বেত এক মস্ত কার্ডবোর্ডের খাম বগলে নিয়ে। তার মধ্যে থাকত তার খাতাপত্র, একখানা ব্যাকরণ, একখানা গণিতের বই, একখানা কবাসী দেশের ইতিহাস আর একখানা ভূগোল। আরও তার কাছে থাকত একখানা দেবজ-বিজ্ঞানের বই—'সম্পাদক : গাঠন বনিরে, ভেবজ সমিতির সদস্য, 'সর্ব'-র অধ্যাপক এবং জর্জ জালায়েস, বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি।' বইখানিতে সব বকম গাছগাছড়ার নাম ছিল—উপকারী এবং অপকারী, আর ছিল 'আটশ' আটানকইখানা ছবি।

মুখবন্ধে সে পড়ত : "ঐশ্বকালে মাঠ ও বনের ওবধিসমূহ সংগ্রহ করা অত্যন্ত সহজ।..."

আর এই ইতিহাস, ভূগোল, দেশবিদেশ, বড় বড় লোক, পাড়া, নদী—কেমন করে এসব তাকে বোঝানো যায়—যে জানে না মহাসমুদ্রের জনহীন কোণে ছোট্ট একটি গায়ের নিরালা একটি রাত্তা ছাড়া আর কিছুই? সমুদ্রই কি সে চিনত, সমস্ত মানচিত্রের গায়ে যে সমুদ্র আঁকা দেখত দিনরাত, জানত কি যে সেই সমুদ্রেরই বৃকে তার বাস? একবার, একদিন, এক মুহূর্তের জন্তে এটা সম্ভব বলে তার মনে চরেছিল। তারপরই মন থেকে এ ভাবনা সে সরিয়ে কেলে অজ্ঞার, বিপজ্জনক বলে।

কখনও কখনও সে হ'একখানা চিঠি লিখত নিজের ববর, গায়ের

ববর দিয়ে। কারও উদ্দেশ্যেই লিখত না সেগুলো, শেষে ভালবাসাও জানাত না কাউকে, খামের উপর লেখা থাকত না কারও নাম। চিঠি শেষ হয়ে গেলে সে সমুদ্রের জলে কেলে দিত—দূর করে দেবার জন্তে নয়, সে শুধু জানত যে এঁ তার কথা উচিত—অনেকটা ভূবো-জাহাজের নাবিকদের মত, মরিয়া হয়ে বারা বোতলের ভিতর তাদের অস্তিম বার্তা পুরে রেখে দিয়ে বার চেউয়ের বৃকে।

ভাসন্ত সেই গ্রামে সময় বলে কিছু ছিল না। শিশুর বয়স চিরকালই বার বছর। বৃথাই সে আয়নার সামনে তার ক্ষুদে শরীরটিকে টান করে ধরবার চেষ্টা করত। শেষে একদিন নিজের ফটোর এঁ চওড়া কপাল আর বেড়াবিহুনির উপর বিরক্ত হয়ে সে সব চুল এলিয়ে দিল পিঠের উপরে—মনে সাধ যদি অজুত কিছু ঘটে যায়—যদি হঠাৎ সে মস্ত বড় হয়ে যায়! কিংবা যদি সমুদ্রের তলা থেকে ইয়া দাড়িওলা বড় বড় ছাগল তার সামনে এসে দাঁড়ায়! কিন্তু সমুদ্র চিরকালের মতই জনহীন হয়ে রইল, তাকে দেখা দিয়ে গেল শুধু আকাশের গসে-পড়া তারা।

শেষে একদিন ঘটল অজ্ঞ ব্যাপার। যেন ভাগের হঠাৎ মত বদলাল। একটা সত্যিকারের মালের জাহাজ, বুনো কুকুরের মত একঝোখা, সমুদ্রের উপর দিয়ে অনায়াসে গেসে এল—বৃকে আঁকা তার শৃঙ্খর একটি রাডা দাগ শৃঙ্খর আলোয় জল জল করছিল—সত্যি সত্যি, জাজ্ঞ একটা মালের জাহাজ ভেসে এল গায়ের সেই সাগরপথ বেয়ে, তবু গ্রামখানা মিলিয়ে গেল না, শিশুরও ঘুম এল না।

তখন ঠিক মধ্যদিন। মালের জাহাজ তার বাঁধি বাজাল, এবার গীঞ্জার ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল না তার স্বর।

এই প্রথম লোকালয়ের স্তব্ব শুনল শিশু। জানালার ধারে ছুটে এসে সে প্রাণপণে ডাকল, 'ওগো! বাচাও!'

কিন্তু নাবিকেরা কিরেও তাকাল না। একজন খালসী চুপ্ত মুখে দিয়ে ওদিকে চেরে রইল, যেন কোথাও কিছু নেই। আর সবাই যে বার খোয়ামোহা করতে লাগল—জাহাজের হৃদিকে সিঁদুগুতকেরা পথ করে দিল জজ্ঞবাজ হয়ে।

শিশু ত্যাড়াতাড়ি পথে নেমে এল, জাহাজের পিছু পিছু কিছু দূর গেল, জলের উপরকার ঢাকার দাগগুলি হ'হাত মেলে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু উঠল বগন, তখন চারদিকে শুধু ধূ-ধূ করতে চিরন্তন সমুদ্র, কুমারী সিঁদু।

বাড়ী কিরে এসে শিশু সবিস্ময়ে ভেবেছিল কেমন করে সে 'বাচাও' বলে ডাকতে পারল! সে ত ওকথা জানত না, শুধু ওর নিগূততর অর্থই বৃকত। আর এই নিগূত অর্থ তাকে শক্তিত করে তুলল। ওরা কি তার ডাক শুনতে পার নি? তবে কি ওরা কানে শুনতে পার না? বোবা? না কি ওরা গভীর সমুদ্রের চেরেও নিষ্ঠুর?

তখন একটি চেউ তাকে খুঁজতে এল। এই চেউটি ছিল খুব স্বাধীন, এতকাল সে গ্রামের থেকে দূরে দূরেই থাকত। একাধ

টেউ, অল্প সবার চেয়ে বেশী দূরে ছড়িয়ে পড়ল দু'ধারে। মাথার উপরে যেন কেনার ছুটি চোপ—যেন অনেক কিছুই ও দেখতে আর বুঝতে পারে, যদিও সবকিছুতে তার মন সায় দেয় না। যদিও দিনের মধ্যে একশ' বার সে নিজেকে গড়ত আর ভাঙত, তবু ঐ চোপ ছুটি ঠিক একই জায়গায় প্রতিবার পরে নিতে ভুলত না। তারি জীবন্ত দেখাত তাকে। মধ্যে মধ্যে যখন কোন কোঁড়ুলের জিনিষ চোখে পড়ত, টেউটি পুরো এক মিনিট স্থির হয়ে থাকত বাতাসে মাথা তুলে—প্রতি সাত সেকেন্ড অল্পর যে নিজেকে ভেঙে ফের গড়তে হবে, সেখানা যেন সে ভুলেই যেত।

বহুকাল ধরে এই টেউয়ের সাথ ছিল শিশুর জন্মে কিছু করে—কি যে করবে তা ঠিক ভেবে পেত না। এইবার সে মালের জাহাজকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখল, যাকে ফেলে গেল, তার বেদনা সে মর্মে মর্মে বুঝল। এবার সে আর দূরে রইল না, কোন কথা না বলে শিশুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, যেন হাত ধরে নিয়ে চলেতে।

শিশুর সামনে এসে নতজানু হয়ে সে বসল—টেউয়েরা যেমন করে। তারপর পরম শ্রদ্ধাভরে তাকে কোলে করে নিল, একমুহুর্তে চোপ খদল, যেন মরণের সাড়াবা নিয়ে শিশুর হৃৎপিণ্ড সে দূর করে দিতে চায়। শিশুও তার বাসনা বুকে নিয়ে নিখাস বন্ধ করে রইল।

কিন্তু সমাপ্তি ঘটল না, তখন সেই টেউ শিশুকে আকাশে ছুঁড়ে দিল, যেন সে সাগরপাগীর চেয়ে একটুও বড় নয়, আবার গুকে লুফে নিল, শেষটায় উটপাগীর ডিমের মত বড় বড় কেনার মধ্যে তাকে নিয়ে ফেলল।

‘গরশেষে কিছুতেই কিছু হ’ল না দেখে, শিশুকে কোনমতেই মরণের হাতে সঁপে দিতে পারল না দেখে টেউ অজস্র অশ্রু আর

কমা-প্রাণনার বিনীত মর্শ্বধ্বনির মধ্যে শিশুকে তার নিজের বাড়ীতে রেখে এল।

আর ছোট শিশু, একবিন্দু আঁচড়ও লাগেনি তার বেহে, হতাশ মনে আবার জানালায় পাজা খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল দিনের পর দিন—দিগন্তে জাহাজের মান্দল দেখা দিলেই মিলিয়ে যেতে লাগল বুকের অন্তরে।

মহাসাগরের নাবিক, যারা জাহাজের হেলিডে কল্লই রেখে স্বপ্ন দেখে, হাতের অঙ্ককারে কারও সুন্দর মূর্খের ছবি বেশীকণ ধরে যেন তোমরা ভেব না! হয়ত তা হলে তোমরা এই জনহীন জায়গায় গুহ দেবে কোন নিঃসঙ্গ আত্মার—যে অতুল্য করতে পারে মানুষেরই মত, কিন্তু বাঁচতে পারে না, মরতে পারে না, ভালবাসতে পারে না—গুহ বেদনা বইতে পারে বাঁচার মত, মরার মত, মরণ-মুহুর্তের মত। সে আত্মা চিরকালের মত অনাধ হয়ে থাকবে এই জলময় নির্জনতার মধ্যে, যেখানে ছিল আমাদের মহাসাগরের শিশু—একদা সে জন্ম নিয়েছিল টীনডুর্ডের নাবিক চার্লস লৌভেনসের মনে, ‘লে হার্ডি’ জাহাজের বুকে, এক সমুদ্রবাজার সময়ে হারিয়ে যাওয়া তার বার বছরের মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে, এক গভীর রাতে, পঞ্চাশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা আর পঁয়ত্রিশ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার সংযোগস্থলে। স্বদীর্ঘ সময়ের সেই ভাবনা, অতি নিবিড় সেই ভাবনা চিরকাল শিশুর গভীর বেদনার কারণ হয়ে রইল।\*

\* জন্ম স্মৃতিপত্রেরইয়ের ‘এ চাইল্ড অব দি হাই সীজ’ গল্পের অনুবাদ।

## পদাবলী

### ত্রিশুধীর গুপ্ত

চির-বহমানা দূর যমুনার তীরে,  
‘পদাবলী’-পথে ঘন-বর্ষণ-দিনে  
গাগরী ভরিতে ‘রাধা’-মন রস-নীরে  
করে অভিসারী বাঁশী-সুরে পথ চিনে।  
বাজিয়া চলেছে সে বাঁশরী চিরদিন  
হৃদয়-যমুনা সিকতার—সিকতার;  
সীমায়ে চাহিয়া ফিরে যেন সীমাহীন;  
গৃহ-বেটনী আলুলিয়া শুধু বার।

নিশীথ-নিভল বাবল-বরিষা-ধারে,  
‘সুরধুনী’-তীরে নদীর পথে পঃথ  
‘পদাবলী’-পান শুষ্কি বারে বারে  
চলি অভিসারী। ‘গোরা’র মাধুরী হ’তে

যে ‘রাধা’-ভাবের প্রাণ বহিল দেশে,  
‘পদাবলী’-পথে তারই স্রবা-স্রাব লভি  
মিশাই নিজেরে সেই অসীমেই শেষে।—  
নদীরায় হেরি যমুনারই জলছবি।

চির-সুরধুনী চির-যমুনার তীরে  
নিখিল মনের হাসি আর আঁখ-ধার  
রূপ ধরে শুধু যুগে যুগে ফিরে ফিরে :—  
‘পদাবলী’ তারই অভিনব সম্ভার।

শ্রাবণ-ভুবন একাকার-করা ধারা  
‘পদাবলী’-পথে তাই শুধু টানে মন;  
ছোট বড় পথ এ পথে হয়েছে হারা,  
অশেষে গড়েছে স্রবার বৃক্ষাবন।

# ভারতের অম্লমতদের সমস্যা ও উহার সমাধান

## ত্রাণচরী রমেশ

আমাদের সমাজের বুকে এক শ্রেণীর মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া অবহেলিত জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে। ইহারা ভারতের আদিবাসী ও তপশীলীভূক্ত হিন্দু। ১৯৫১ সনের আদমশুমারি অনুসারে সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৭ লক্ষ। তন্মধ্যে আদিবাসী ১ কোটি ৯২ লক্ষ এবং তপশীলীভূক্ত বা অনগ্রসর সম্প্রদায় ৫ কোটি ১৩ লক্ষ। অর্থাৎ, প্রতি সহস্র মানুষের মধ্যে ৫৪ জন আদিবাসী এবং ১৪৪ জন তপশীলীভূক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়। ভারতের বিরাট জনবলের এই অংশটি উপেক্ষণীয় নহে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে জীবনযাত্রার মান অনুসারে সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যায় সহিত ইহাদের তুলনামূলক পরি-সংখ্যান পর্যালোচনা করিলে বিষয়টির গুরুত্ব সহজে অনুমান করা যায় :

	সমগ্র জনসংখ্যা
গ্রামাঞ্চলের আদিবাসী	২৯ কোটি ৭৮ লক্ষ
শহর অঞ্চলের "	৬ " ১৮ "
কৃষিকারী	২৪ " ৯২ "
অকৃষিকারী	১০ " ৭৪ "
জমির মালিক কৃষিকারী	১৬ " ৭৪ "
পোষাসহ ক্ষেত মজুর	৮ " ৪৮ "
কৃষি-খাজনা গ্রহণকারী অকৃষিকারী	
পোষাসহ জমির মালিক	৫৩ "
কৃষি ছাড়া অনগ্রসর উৎপাদনকারী	৩ " ৭৭ "
বাণিজ্যকারী	২ " ১৩ "
অগ্রসর	৪ " ৩০ "

ইহা হইতে সমাজের চিন্তাশীল সমাজসেবকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের অতি নিকট-প্রতিবেশী এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষগুলি জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; ইহারা আমাদের জাতীয় জীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতের স্বাধীনতা-সংরক্ষণ-ক্ষেত্রে এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের দান অতুলনীয়। মহারাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামের অমর বীরগণ এই অনগ্রসর সমাজের বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের সমরারণে এই অম্লমত সমাজের বেসাতিবাহিনীর কাহিনী

আমরা পাঠ করি তাহাতে ইহাদের স্বাধীনতা-প্রীতির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। বর্তমান যুগেও আমরা দেখি শোষণ ও অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়া রাঁচির মুণ্ডাবীর বীরস ভগবান মুণ্ডাদের মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগ্রত রাখিয়াছেন। ভীলনেতা মোতীলাল তেজবতের জীবন-কাহিনী স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়।

১৯২২ সনে শ্রীরামরাজার নেতৃত্বে কোণ্ডাডোরাগণ ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শ্রীরামরাজা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অমর শহীদ। ইহা ছাড়া তীরত সিং, রানী গুইদালো, নেতা নিখিল কাছাড়ী, নেতা মধুবন, কমলা গিরি প্রভৃতির ত্যাগ, তিতিকা এবং স্বাধীনতালাভের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা

আদিবাসী বা উপজাতি	তপশীলীভূক্ত অনগ্রসর হিন্দু
১ কোটি ৮৬ লক্ষ	৪ কোটি ৬২ লক্ষ
৫ " "	৩১ " "
১ " ৭৩ " "	৩ " ৮১ " "
১৮ " "	১ " ৩২ " "
১ " ২৫ " "	১ " ৭৪ " "
২৮ " "	৫৬ " "
১ " "	৩ " "
৭ " "	৫৩ " "
১ " "	৯ " "
৯ " "	৬৪ " "

আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কিন্তু এই সাত কোটি নরনারীর জীবনের মান এতই অম্লমত যে, তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের অগ্র-গতিকে ব্যাহত করিতেছে। ভারত সরকারের তপশীলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার শ্রীএল. এম. শ্রীকান্ত কর্তৃক সংগৃহীত ১৯৫১-৫২ সনের তথ্যগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা ও এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার এখনও নানা স্থানে প্রকট রহিয়াছে। বহু স্থানের বর্ণহিন্দুগণ 'তথাকথিত নিম্নবর্ণের স্পর্শ ও সান্নিধ্য দুবর্ণীয়'—এই সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন

নাই। বহু স্থানে ধৰ্ম্মস্থান, উৎসবক্ষেত্র, বিদ্যালয়তন, প্রভৃতিতে এবং কুপোদক ব্যবহার করতে গিয়ে তপশীলী নরনারী নানা ভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া থাকেন। ইহাও জানা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থানে বর্ণহিন্দুগণের দোঁরাশ্যে নিম্নবর্ণের নারীরা অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইবার সাহস করে না। খ্রীষ্টীয়কালের রিপোর্টের এক স্থানে বলা হইয়াছে :

"In the villages, however, it can not be said that the social disabilities have completely faded out as the social customs are deep-rooted and cannot be done away within a short space of time. So far as access to shops, public restaurants, and places of public entertainment and the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, etc., are concerned, except for a few advanced and enlightened Harijans, the majority of the Harijans are still afraid of making free use of public institutions. They fear that any claim of right on their part would wound the feelings of the Caste Hindus on whom they are depending for their livelihood. Religious institutions in villages continue to be used by the Caste Hindus only."

প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে এইরূপ বৈষম্যমূলক প্রথা অশোভন ও লঙ্ঘ্যকর। ঐ সকল সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের জন্তই আমাদের জাতীয় জীবনের অভ্যাদয় ও সাংস্কৃতিক গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতেছে। ফলে আমরা ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িতেছি। যুগ-যুগব্যাপী এই সামাজিক দুর্বলতার ফলে আমাদের সমাজের একটি নিরাট অংশ বিভিন্ন ধৰ্ম্ম ও সমাজের কুক্ষিগত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে হীনবল করিয়া দিতেছে। যে সকল আদিবাসী ও তপশীলী হিন্দু ধৰ্ম্মাস্তর গ্রহণ করিতে উৎসাহ হয় তাহারা বহুলপ্রচারিত নবধৰ্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ উহা গ্রহণ করে না; বস্তুতঃ আর্থিক সুস্থ-সুবিধা ও জীবনযাত্রাক সহজ ও সুখকর করিবার জন্ত প্রলুব্ধ হইয়া তাহারা ভিন্নধৰ্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

আবার কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়িয়া অনুন্নত-গণ আমাদের সমাজ হইতে যে দূরে সরিয়া যাইতেছে তাহা নহে, সামাজিক অবিচার ও উচ্চবর্ণের ধৰ্ম্মাঙ্কতা এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দিতেছি : বরিশাল জেলার কোনও বৈদ্যপ্রধান গ্রামের মধ্য দিয়া এক দিন এক গ্রাজুয়েট নমঃশূদ্র যুবক জুতা পায়ে ও ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেছে দেখিয়া ছোট লোকের স্পর্ধায় ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাতের গাড়ু ছুড়িয়া মাঝিয়াছিলেন। গাড়ু লক্ষ্যক্রষ্ট হইলেও রসনার কটবাক্য স্ববকের মস্তম্বল বিদ্ধ করিয়াছিল। পর-

দিবসই উক্ত শিক্ষিত যুবকটি স্থানীয় খ্রীষ্টান মিশনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ ত্যাগ করেন এবং এক শত শিক্ষিত হিন্দু যুবককে খ্রীষ্টধৰ্ম্মে দীক্ষাদানের সম্বন্ধ গ্রহণ করেন।



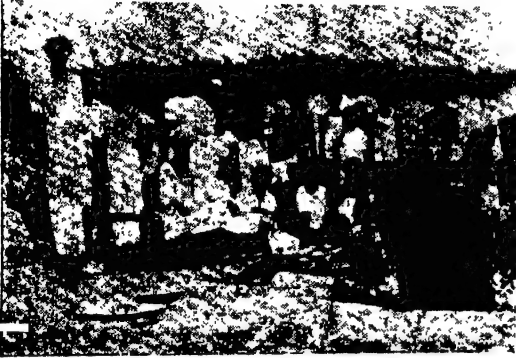
ঝাড়খ্ণে সরকারী উন্নয়ন বিভাগের কর্মিগণসহ খামী আবাদশিল্পী

মাজাজ প্রদেশে হিন্দুধৰ্ম্মের আদর্শ প্রচার করিবার সময় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—বর্ণহিন্দুগণের বাড়ী পরিষ্কার করিতে আসিবার সময় মেধঃ ঘণ্টা বাজাইয়া তাহার আগমনবার্তা প্রচার করিয়া আসে; তখন বর্ণহিন্দুগণ তথাকথিত অস্পৃশ্য-গণের যুগ্মবলোকন রূপ মহাপাতক হইতে অব্যাহতিলাভের জন্ত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। গুজরাট প্রদেশের দৃষ্টিকে ভারত সেবাশ্রম সমাজের সেবাকার্য্য পরিচালনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি—উচ্চবর্ণের হিন্দু জলাশয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুর গৃহপালিত পশুরও জলপান করিবার অধিকার নাই!

আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কিরূপ অর্থ-নৈতিক অস্বচ্ছন্দ্য ও সামাজিক অবিচারের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাহা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। বাঁকুড়ায় রাণীবীধ একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়-অধ্যুষিত অঞ্চল। উক্ত অঞ্চলে ভারত সেবাশ্রম সমাজের সেবাকার্য্যরত জনৈক প্রচারক সম্প্রতি একখানি পত্রে তথাকার উপজাতি সম্প্রদায়ের যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা হইতে সহজে অনুমান করা যাইবে যে, ঐ সকল অবহেলিত নরনারী কিরূপ দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছে। পত্রখানি এই :

"...আমরা জুলাই মাস (১৯৫০) হইতে এখানে সাঁওতালদের ভিতর কাজ আরম্ভ করিয়াছি। এই অনুন্নত সম্প্রদায়টি সাধারণতঃ অশিক্ষিত। ইহাদের ভিতর একা সখ্য স্থাপন করিয়া সলাচার, নিষ্ঠা ও ভাৰতীয় ভাবধারাসমগ্র প্রচার করিবার পর উভাবা জিহ

আলোকের সন্ধান পাইবে বলিয়া আশা করি। সম্মুখের প্রদর্শিত পথে ইহাদিগের ভিতর নৈতিক জীবন গঠনের শিক্ষা, চরিত্র গঠনের প্রেরণা, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির প্রচেষ্টা, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি ব্যাপক ভাবে প্রচার করিতে হইবে। আর একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, ইহাদের অর্থনৈতিক জীবন নিতান্ত অনগ্রসর। হুঃখদারিত্ব, অর্থকষ্টের ভিতর ইহারা অশেষ ক্লেশ সহ করে। আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া মায়েলিয়া ও অন্যান্য পীড়ার



আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে বৈদিক বজ্রাদি ধর্মগ্রন্থের প্রবর্তন

ভেষ্য বিতরণ করিতেছি। আমাদের স্বৈচ্ছাসেবকগণ ইহাদের বাড়ী বাড়ী বাইরা ইহাদের অভাব অভিযোগের কথা ওনিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় সাহায্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। অধিকাংশ বাড়ীতে শীত নিবারণের বস্ত্রাদি নাই। পোষ মাঘ মাসের শীতে তাহারা খেজুর পাতার চাটাই মোড়া দিয়া কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া দেয়। মশারি ইহাদের কলনার বস্ত্র। মশার কাষড় এড়াইবার জন্য ইহারা সমস্ত শরীরে নিম বা ঐ জাতীয় তৈল মাখিয়া ঘুসায়। আমরা সাঁওতাল বালকদের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছি। বর্তমানে ৬০টি ছেলে পড়া-শুনা করে। ইহাদের অনেকের পরনে কাপড় নাই। অধিকাংশ ছেলেই কোপীন পরিয়া পড়িতে আসে। এই প্রকৃতির কোলে বর্ধিত মানবশিশুগুলি আরও কতকাল ঘুরে সরিয়া থাকিবে তাহা বলা কষ্টকর। আমাদের প্রগতিশীল সমাজের বৃক্কে ইহারা কিরূপ হুমখের জীবন বাপন করে আজ আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি।”

অম্লমুগতগণের প্রতি আমাদের সামাজিক অবিচার ও তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্দশতার সুযোগে বৈদেশিকগণ কিভাবে প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে জাতীয় কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যিক। এখানে খ্রীষ্টান প্রচারকগণের প্রচারকোশলে তাহাদের সমাজ কিরূপ পরিপুষ্টিলাভ করিতেছে তাহা আমরা উল্লেখ করিতেছি। বর্তমানে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সাত হাজার খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠান

বিদ্যমান। অন্যান্য ৭ হাজার খ্রীষ্টীয় পাত্রী ও ১৮ হাজার খ্রীষ্টান পাত্রী প্রচারকার্যে নিয়োজিত আছেন! উহাতে বাৎসরিক ৮ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হয়। তাহা ছাড়া ৭১৭টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ১৪১টি অনাথালয়, ১৭০টি শিল্প-বিদ্যাপীঠ, ২৪টি প্রচারক শিক্ষাগার, ১৫ হাজারেরও অধিক রবিবারের স্কুল, ১৮টি কৃষি-বিদ্যালয়, ৫০টি কলেজ, ৪০টি ছাপাখানা, ২২টি সাময়িক পত্রিকা, ৪০০টি দাতব্য চিকিৎসালয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ২৩ কোটি হিন্দুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনের মান উন্নয়ন-মূলক সেরূপ সুপরিচালিত ব্যাপক আয়োজন কোথায়?

যদি কোন সমাজের নর-নারী কর্মক্ষম, সুস্থ এবং সুরক্ষিত ও সম্বলবদ্ধ না হয় তবে তাহার বিরাট জনবল লইয়া গর্ব করা বৃথা! একটি জাতির শক্তি শুধু বিপুল জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল নহে। সমাজের কত সংখ্যক মানুষ স্বাবলম্বী, শিক্ষিত এবং জাতি তথা মানব-সমাজের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্ম করিতে সচেষ্ট তাহাই একটি সমাজের প্রকৃত শক্তি নির্দেশ করে। সমাজ ও ধর্মের বাহ্যিক আচরণে দিশাহারা হইয়া আমরা আমাদের সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গকে যুগ যুগ ধরিয়া অবজ্ঞাত হইতে দিয়াছি। এই অবহেলিত জনসমষ্টি আমাদের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে।

আজ যান্ত্রিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যুগে বৈবয়িক উন্নতি ও রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়া ভারত আশানুরূপ অগ্রসর নহে। কাজেই আমাদের সমাজের সর্বাধিক অনগ্রসর শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অযোগ্যতার কথা আজ বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়। এই সংখ্যালঘিষ্ট অবজ্ঞাতদের উন্নতির প্রচেষ্টা যথোচিতভাবে করা হইলে উচ্চবর্গের মানুষের অগ্রগতির পথ সুগম হইবে। এইভাবে একটি সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্ভব। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, “আজ আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে সামাজিক ক্রায়-বিচার, সমাজ-কল্যাণ, ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে অম্লমুগত শ্রেণীসমস্তার উদার ও ক্রায়সম্মত সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে।”

রাজনৈতিক সংগঠনে ও সমাজ-ব্যবস্থায় অবজ্ঞাত বা অবহেলিত কোন বর্ণ বা জাতি থাকিবে না-বলিয়া ভারতের নব-রচিত সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। তাই সকলকে সমান অধিকার, সমান সুযোগ দিয়া এক সার্বভৌম ভারতবাসী গঠনের জন্য আজ আমাদের সচেষ্ট হইতে

হইবে। নূতন সংবিধান অনুসারে আদিবাসী ও তপশ্বী সস্ত্রাণ্যের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পন্থা আলোচিত হইতেছে। অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তাকে আইনতঃ দণ্ডনীয় বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে; কিন্তু আইনের দ্বারা কোন সার্বজনীন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় যদি বলিষ্ঠ জনমত গঠিত না হয়। প্রকৃত জনমত সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হইলে রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী পাণ্ডাগণ সন্ত বিনোবাজীকে অপমানিত করিতে পারিত না। আশার কথা, বর্তমানে ভারত-সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আদিবাসী ও অমূল্যত সস্ত্রাণ্যের উন্নয়নকল্পে বিশেষভাবে সচেতন হইয়াছেন। এগার জন সদস্য লইয়া কাকা কালেলকরের সভাপতিত্বে অমূল্যত উন্নয়ন কমিশন গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা ভারতের অনগ্রসর সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ-কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন, বিশেষভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় অমূল্যত-উন্নয়ন কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ তাঁহার ধ্যানলব্ধ সত্যদৃষ্টির ফলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে এই সকল অমূল্যত জনগণের সার্বজনীন উন্নতি না হইলে জাতি বলিষ্ঠ হইয়া গড়িয়া উঠিবে না। তিনি তাঁহার প্রজ্ঞালোকিত প্রতিভার দ্বারা জাতির প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, “উচ্চবর্ণের বালক-বালিকাদের সহিত নিম্নবর্ণের বালক-বালিকাদেরও শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে দেওয়া উচিত। একই ছাত্রাবাসে উভয় সস্ত্রাণ্যের স্থান দান করিতে হইবে। তাহা হইলে উচ্চবর্ণের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আচরণের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিবে এবং তাহাদের সঞ্চার গভীর হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ মিলিবে।” তাই তিনি সঙ্ঘের পরিচালিত ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয়সমূহে সকল সস্ত্রাণ্যের শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দান করিয়া গিয়াছেন। কেবল-মাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নহে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অমূল্যত শ্রেণীর সর্বাধিক কল্যাণের বিষয় তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। হিন্দু ধর্মের মহান আদর্শ ও উদারতা সত্ত্বে তাহাদের সম্যক পরিচয়সাধনের জন্য তিনি সঙ্ঘের প্রচারক-মণ্ডলী প্রেরণ করিয়া তাহাদের ভিতর ধর্মীয় জাগরণ আনিয়াছেন এবং সামাজিক অযোগ্যতার অজুহাতে তাহারা যে অস্পৃশ্য নয় তাহা ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তীকালে স্বামীজী তাঁহার হাতে গড়া ত্যাগ-ব্রতী সঙ্ঘকর্মী ও সন্ন্যাসিগণকে কর্মনির্দেশ দান করিবার সময় যে সমস্ত পত্রাদি লিখিতেন তাহাতে দেখা যায় যে এই সকল অমূল্যত শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য তাঁহার চিন্তাধারা ছিল স্পষ্ট। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বামীজী মাধারীপুর

হইতে জনৈক সঙ্ঘ-সন্তানকে লিখিয়াছিলেন : “তোমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে হীন অন্ত্যজ ও পতিত



বৃন্দাবনপুর [ ঝাড়গ্রাম ] আদিবাসী সম্মেলনে শ্রীমতালদের তাঁর ছোঁড়া প্রতিযোগিতা

জাতির ভিতরে যদি কোনরূপ ধর্মের উদ্ভীপনা আনয়ন করিতে পার তবে তোমাদের যত্নের সফলতা হইবে। এই নিঃস্বার্থ কর্মের ভিতর দিয়া প্রসুপ্ত শক্তির উদ্বোধন, অবিকশিত অপ্রকাশিত শক্তির বিকাশ প্রকাশ হইয়া তোমাদিগকে ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যের পথে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আজ তোমরা হীন অন্ত্যজকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, পতিতকে উদ্ধারের জন্য মহাব্রত ব্রতী হইয়াছ।”

অমূল্যতদের উন্নয়নকল্পে স্বামীজীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী, অনন্তসাধারণ কর্মপ্রবাহ, ব্যাপক ও সুপরিচালিত প্রচার-কৌশল জাতিকে ভেদভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া মহা-মিলনের পথে ব্রতী করিবে। উচ্চ-নীচের মধ্যে একটি যুগো-পযোগী সাংস্কৃতিক সমতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে সর্বশ্রেণীর হিন্দু—বিশেষতঃ তথাকথিত অমূল্যতবর্গের মধ্যে হিন্দু-মিলন-মন্দিররূপ বিশাল মিলন-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গঠনমূলক কর্মপ্রবাহের মাধ্যমে জাতির জাগরণ সম্ভব। জনগণের মানসিক পরিবর্তন ব্যতীত সমাজদেহ হইতে সর্বনাশা ভেদনীতি বিদূরণ ও বৈষম্যরূপ দূষিত ক্ষত নিরাময় হওয়া সম্ভব নহে। সেজন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রচার। একটি ক্ষয়গ্রাসী ও সর্ববাদি-সন্ত্রস্ত উচ্চ আদর্শ নিয়মিতভাবে দিনের পর দিন আলোচনা করিয়া শুনাইলে জনগণের অন্তরে উহা গভীরভাবে রেখাপাত করে। এই প্রচারিত আদর্শকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মধারার ভিতর বাস্তবরূপ দান করা যায় তবে স্থায়ীভাবে উহা মানসিক পরিবর্তনসাধন করিতে সমর্থ হয়। সার্ব চারি শত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অভিনব পন্থার আভি ক্রম ও



স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ-নীচের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমতা আনয়নপূর্বক আপামর সাধারণকে অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তা পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের প্রয়োজনে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মিলন-মন্দির আন্দোলনের ভিতর দিয়া জাতির জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। উক্ত মিলন-মন্দিরসমূহের



মহালী বালক-বালিকা

শাস্তাহিক ও পার্শ্বাহিক অধিবেশনে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর সমান অধিকার আছে। সমবেত ভজন-কীর্তন, প্রার্থনা, সন্ধ্যা-উপাসনা, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে সমবেত অঞ্জলিপ্রদান, প্রসাদ-গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্বামীজী সর্বশ্রেণীর হিন্দুকে সমন্বীভূত দেখিয়াছেন এবং সকলকে সমভাবে আচরণের সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মিলন-মন্দিরের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তার কুফলসমূহ, আলোচনা, মাদক বর্জনের উপদেশদান, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ প্রভৃতি পঠন-পাঠন, ছায়া-চিত্র যোগে নৈতিক শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যাবলী পরিচালিত হইতেছে। এই সকল অনুষ্ঠান উদ্‌ঘাপনের দ্বারা হিন্দুদের উদ্ধার মহান্ ভাবধারা এবং হিন্দু সমাজের সনাতন আদর্শ জনগণের হৃদয়ে গভীরভাবে বুদ্ধিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। মিলন-মন্দিরের কার্যাবলীর মধ্যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষবিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ভিতর শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্য-উন্নয়ন ও আর্থিক মান উন্নততর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মধারা আরোপিত হইয়া থাকে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণীর সর্বপ্রকার উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করিয়াছে। ইতিমধ্যে সঙ্ঘের পরিচালনায় আদিবাসী ও অল্পশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে নয়াটি কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আদর্শ ছাত্রাবাস, অবৈতনিক পাঠাগার, নৈশ-বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হইয়াছে।

অল্পশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে গঠনমূলক কর্মধারার একটি মাত্র দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। অনগ্রসর সমাজের সমস্ত সমাধানে যেমন চরিত্রগঠনের উপযোগী আদর্শ শিক্ষা, স্বাস্থ্য-উন্নয়ন, অল্পকূল মনোবৃত্তি গঠনের জন্য সাংস্কৃতিক ভাবধারার উৎকর্ষবিধান আবশ্যিক তেমনি তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনের মানকে উন্নত এবং তাহাদিগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য অধিকার দান করার জন্য উপযুক্ত সংস্কারসাধন আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-পরিচালিত বিভিন্ন ‘অল্পশিক্ষিত উন্নয়ন কেন্দ্রে’ কার্য্য করিবার সময় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ভূমিহীন। জীবিকার জন্য তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। আগর বহু ক্ষেত্রে জমির মালিকগণ এই সকল সরলহৃদয় অল্পশিক্ষিতগণকে নানাভাবে প্রতারণিত করিয়া থাকেন। জনৈক প্রাচীন আদিবাসী মোড়লের নিকট শুনিয়াছি—জমির মালিকগণ অভাবের সময় চুক্তিতে তাহাদিগকে ধাত্তাদি ফসল কর্ত্ত্ব দিত। দেওয়ার সময় তাঁহারা যে ওজন দিতেন গ্রহণের সময় তদপেক্ষা বেশী ওজনের বাটখারা ব্যবহার করিতেন। বৈষয়িক নীতিতে অনভিজ্ঞ আদিবাসিগণ এই কারসাজির কিছু বুঝিতে পারিত না। ফলে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িত।

কাড়গ্রামে সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র আছে। সেই অঞ্চলে লোশা নামে একটি অল্পশিক্ষিত শ্রেণীর বাস। সমগ্র বাংলায় লোশার সংখ্যা আট হাজার; তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার কাড়শুও অঞ্চলেই ছয় হাজার। ইহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহারা মেদিনীপুরের আদিবাসী। জীবিকার জন্য ইহারা নবহত্যা করিত। ব্রিটিশ সরকার ইহাদিগকে স্বভাবচরিত্র আখ্যা (Criminal Tribes) দিয়া-ছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে এই লোশা নামক আদিবাসীদের ভিতর উন্নয়নমূলক কর্মপন্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহাদের পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য কূপ খনন, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ভারের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

ভূমিসম্পত্তা সমাধানই অনগ্রসর শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপায়। ভূমিহীন অল্পশিক্ষিত সমাজ বাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের জীবিকাক্ষমতার পথ সুগম করিতে পারে, সেইজন্য চাই কুটীর-শিল্পের ব্যাপক প্রসার। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ঔদ্যোগিক শিক্ষার (Basic Training) প্রসারের জন্য সরকার বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এই শিক্ষা কেবলমাত্র হাতেকলমে কাজ শিখাইবার ভিতর সীমাবদ্ধ



থাকে তবে উহাতে জনগণের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হয়। জীবিকান্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে মানসিক উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা থাকে তাহারও কার্যপদ্ধতি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ভারত সরকারের অনগ্রসর শ্রেণীর কমিশনার তাঁহার প্রকাশিত রিপোর্টে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য কুটার-শিল্প প্রসারের সুপারিশ করিয়াছেন। সুখের বিষয়, সরকার এই কার্যে বিশেষভাবে আগ্রহশীল।



একটি লোখা পরিবার

বাংলাদেশে আদিবাসী ও অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর হিন্দু ব্যতীত আর একটি সম্প্রদায় অবহেলিত জীবনযাপন করে। তাহারা বাংলার পটুয়া। বাংলার পটশিল্প একদা ছিল জগদ্বিখ্যাত। এই বিখ্যাত শিল্পটির সংরক্ষণ করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। পটুয়াদের এক অদ্ভুত সামাজিক জীবন যাপন করিতে হয়। ইহারা বেশভূষা আচার-আচরণ প্রভৃতিতে হিন্দু রীতিনীতি-সমূহ অনুসরণ করে; ইহারা হিন্দু-দেবদেবীর পূজা করে, হিন্দু-দেবদেবীর চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া জীবিকা অর্জন করে। হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্বণ ইহারা পালন করে; কিন্তু হিন্দুর ও পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সময় মুসলমান মৌলবীর বিবাহ ও পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সময় মুসলমান মৌলবীর আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দু পুরোহিতগণ ইহাদের এই দুইটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন না। সামাজিক অযোগ্যতার অঙ্কুরে ইহারা দুইটি বিষয়ে অপাংক্তেয়। ভারত সেবাশ্রম সম্বলিত এই শ্রেণীটির উন্নয়নমূলক কার্য আরম্ভ হইয়াছে। চিত্রকবগণকে শুদ্ধি করিয়া অস্ত্রান্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সমপর্যায়ে আনয়নের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। উহারা যে আমাদের সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তাহা বর্ণহিন্দুর সমাজপতিগণকে বুঝাইয়া দিয়া বাহাতে তাঁহারা উহাদিগকে সমপর্যায় দান করেন] এবং শিক্ষায় সমৃদ্ধিতে তাহাদিগকে

অস্ত্রান্ত স্তরের নাগরিকগণের সমপর্যায়ের উন্নীত করিবার জন্য সহযোগিতা করেন সেই বিষয়ে সম্বল হইতে প্রচারণা চালানো হইতেছে। এই চিত্রকব সম্প্রদায়টির



একটি বর্ষীয়সী লোখা জীলোক

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাহাদের জাতীয় বৃত্তিটিকে উজ্জীবিত করিয়া রাখা দরকার। এই বিষয়ে আমরা জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সরকার অনগ্রসর সমাজের কল্যাণের জন্য অর্থব্যয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কোন কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ইহাতে সহযোগিতা করিতেছেন। কিন্তু এই বিরাট সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু এই প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। এই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করা দেশের যুবশক্তির আজ বিশেষ প্রয়োজন। দেশের যুবক ও ছাত্র-সংগঠনই জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রতীক; আজ স্বাধীন ভারতকে জগতের বুকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের কর্তব্য—সরকার তথা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করা।

## গান

সিদ্ধ—কাণ্ডালী

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল

হুঃখ রূপে হৃদয়-হৃদয়ে

ডাক দিল কে—ডাক দিল কে

ভাঁহারে ও তোর সকল পরাণ

সঁপিয়া দে—সঁপিয়া দে !

হুঃখ রূপে তিনি দাঁড়িয়ে ঘারে

প্রাণের ঠাকুর তোর কিরাসু না রে —

ভকতি-প্রেমের কণিকা দিয়ে

অক্ষয়-সম্পদে ঝুলি ভরি'নে ।

সংসার-পথে চলিতে চলিতে

কখন যে নেমে আসে বড়—

অস্তরে জানি ইচ্ছা বিনা

কাঁপে না তো তৃণ-পত্বর !

কল্যাণময় তিনি মরমে জেনে

আনন্দে চলি' যাও ফুলমনে—

সকলি সমপিয়া ঐ চরণে

চিরশান্তিতে বসে শ্রব-শরণে ॥

II  $\overset{1'}{\text{রা}} - \overset{0}{\text{গা}} \text{ গা ধা } | \overset{0}{\text{পা}} - \overset{1'}{\text{না}} - \overset{0}{\text{না}} - \overset{1'}{\text{না}} I \overset{1'}{\text{গা}} \text{ গা গা ধা } | \overset{0}{\text{পা}} - \overset{1'}{\text{না}} \text{ পা } - \overset{0}{\text{না}} I$   
 হুঃ ০ খ র পে ০ ০ ০ হ হ য হ রা ০ রে ০

$\overset{1'}{\text{সা}} - \overset{0}{\text{রা}} \text{ রা রা } | \overset{0}{\text{গা}} - \overset{1'}{\text{না}} - \overset{0}{\text{না}} - \overset{1'}{\text{না}} I \overset{1'}{\text{পা}} - \overset{0}{\text{মা}} \text{ জা } | \overset{0}{\text{রা}} - \overset{1'}{\text{না}} - \overset{0}{\text{না}} - \overset{1'}{\text{না}} I$   
 ডা ক দি ল কে ০ ০ ০ ডা ক দি ল কে ০ ০ ০

$\overset{1'}{\text{সা}} \text{ সা সা সা } | \overset{0}{\text{গা}} - \overset{1'}{\text{না}} - \overset{0}{\text{না}} - \overset{1'}{\text{না}} I \overset{1'}{\text{ধা}} \text{ ধা গা জা } | \overset{0}{\text{রা}} - \overset{1'}{\text{না}} - \overset{0}{\text{না}} - \overset{1'}{\text{না}} I$   
 ভাঁ হা রে ও তো ০ ০ হ ল ক ল গ রা ০ গ ০

১' মা পা পা -া | ০ মা -া -গা -া I পা মা জ্ঞা -া | ০ রা -া -া -া II  
স পি রা ০ দে ০ ০ ০ স পি রা ০ দে ০ ০ ০

II { ১' মা -পা পা পা | ০ পা -া পা ধা I না সা রা না | ০ সা -া -া -গা I  
০: ০ খ র পে ০ তি নি দা ড়া রে দা রে ০ ০ ০ ০

১' ধা ধা -া ধা | ০ ধা -া ধা -সা I সা সা না -া ধা | ০ পা -া -া -া I  
প্রা গে ব্ ঠা কু ব্ তো ব্ ফি রা স্ না রে ০ ০ ০ }

১' মা ধা ধা ধা | ০ ধা -া -া -সা I সা সা গা ধা | ০ পা -া -া -া I  
ভ ক তি প্রে মে ০ ০ ব্ ক গি কা দি রে ০ ০ ০ .

১' মা -া মা মা | ০ গা -া পা পা I মা মা মজ্ঞা জ্ঞা | ০ রা -া -া -া II  
অ ০ ক র স ম্ প দে বুলি ভ রি নে ০ ০ ০

II { ১' সা -া সা সা | ০ সা -া -গা সগা I ধা ধা -ধা জ্ঞা | ০ রা -া রা -া I  
{ স ২ সা র প ০ বে ০ চ লি তে চ লি ০ তে ০

১' মা মা -া গা | ০ রা রা জ্ঞা রা I সা -া -া -া | ০ -া -া -া -া I  
ক খ ন্ বে নে মে আ সে ষ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১' মা -পা পা পা | ০ পা -া পা -া I মা -গা গা গা | ০ গা -া -া -জ্ঞা I  
অ ন্ ত রে জা ০ নি ০ ই ০ জা বি না ০ ০ ০

୧' ଛା ଛା ରା ସା | ୦ ମା ବଜ୍ରଛା - । ୧' ରା - - - - । ୦ - - - - ।  
କା ପେ ନା ତୋ [ହ ୩ ୩ ୦ ୦ ଡ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦]

II ୧' ମା -ପା ପା ପା | ୦ ପା ପା ପା ଧା I ୧' ନା ନା ରା ନା | ୦ ନା - - - - -ଗଧା I  
କ ୦ ଲା ୩ ମ ସ୍ଵ ତି ନି ମ ସ୍ଵ ମେ ଝେ ନେ ୦ ୦ ୦ ୦

୧' ଧା ଧା - ଧା | ୦ ଧା ଧା ଧା -ନା I ୧' ଗା - ଧା ଧା | ୦ - - - - - ।  
ଆ ନ ନ୍ ଦେ ଚ ଲି ଧା ଓ ହ୦ ୦ ଗ୍ଠ ମ ନେ ୦ ୦ ୦ ୦

୧' ମା ଧା ଧା ଧା | ୦ ଧା - ଧା ନା I ୧' ଗା - ଧା ଧା | ୦ - - - - - ।  
ମ କ ଲି ମ ମ ସ୍ଵ ପି ଗ୍ଠ ଓ ଇ ଚ ର ଧେ ୦ ୦ ୦

୧' ମା ମା ମା - । ୦ ମା ଗା ପା - । ୧' ମା ମା ବଜ୍ର ଛା | ୦ - - - - - ।  
ଚି ଚ୍ଚା ନ୍ ତି ତେ ସ୍ଵ ଓ ଶ୍ଵ ବ ଶ୍ଵ ସ୍ଵ ୦ ୦ ୦



সখ ! সখ বলতে ও বাদর বোঝে কি । আশ্চর্য্য এর পরেও গুর ।  
গলা দিয়ে ভাতগুলো ত বেশ চলে গেল ।

শ্রীতকালের সকালবেলা, চাটুজো-বাড়ীর বশোদা বুড়ী আপন মনে বকতে বকতে ঘাট ঘেঁরে নেমে জলরেপার সল্লিকটে এসে পড়েছিল । ‘সখের কথাটি হচ্ছে গত রাত্রির, তাইপো প্রহ্লাদের’ বিষয়ে ও তার মেয়ে বশোদার নাতনী কনকলতাকে কেন্দ্র করে । ওই কচি মেয়েটার পুরো এক বছর হ’ল বিয়ে হয়েছে, সেই থেকেই সে শশুরবাড়ী । তাকে আনবার কথা বললে প্রহ্লাদ বলে কিনা ও পিসির সখ ।

উভেজনার বশোদার পা দুপানা জড়িয়ে আসতে চায় । তেলের বাটি, গামছা ও ছোট্ট কলসীটি জলের একটু তক্তাতে রেখে সে অন্ন জলে নামতে নামতে উপর দিকে একবার চেয়ে দেখল ক্রমবর্ধমান সূর্যের জলন্ত চাহনি । তারপরে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটু ন্যষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল—সুখে আশ্বিন, সুখে আশ্বিন সব ।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে চঠাং সে সামনে চেয়েই দেখে অতূরে কোমর পর্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায় প্রৌঢ় বাহু ভটচাষ স্নানশেষে পৈতে চাতে সূর্য্যপ্রণাম করছে । বশোদা অপ্রতিভ হ’ল এবং একটু ধেমে তার উদ্দেশ্যে বলল, ছিমর এখন কেনন আছে বাহু ?

বাহু চমকে উঠল, তারপরে একটু সামলে নিয়ে চিন্তিত সুরে বলল, ভাল নাই দিদি ।

বড় ডাক্তার কখন এসেছিল ?

সেই সন্ধ্যার পরে । বলে গেল নিমোনিয়া, কতক্ষণ বাঁচে বলা মুশকিল । আর গুণপুস্তরও এমন দামের যে কিনে আনব সে উপায় দেখি না ।

বশোদা বোঝে । শ্রীময় বাহুদেবের বড় ছেলে, কি স্নন্দর স্বাস্থ্য তার । বশোদার বহু দিনের ইচ্ছে ছিল তার নাতনী কনকলতার সঙ্গে বিয়ে দেয় । পাশাপাশি ঘর, কি স্নন্দরই না হ’ত । আর আজ ? কনকের সেই যে দুবে কোথায় বিয়ে হ’ল, আজ বছরখানেক দেখা নাই, আর এদিকে শ্রীময় মৃত্যুশয্যায় । লোকের এখন যে বাই বলুক তার নিজের স্থির বিশ্বাস কনক পরমন্ত মেরে, তার সঙ্গে বিয়ে হলে শ্রীময় এমনভাবে মরত না ।

সে সুখে শুধু বলল, আচ্ছা বাহু বাও আর ঝাঁড়িও না । দেখা-শোনা করগে, আমি টাকা নিয়ে যাচ্ছি । কথার বলে বতকণ খাস ততক্ষণ আশ । বাও ।

বাহুদেব কথা না বাড়িয়ে চলে যায়, বশোদাও হাত-পা ধোয়া শেষ করে জলের কিনারায় উঠে আসে এবং ধানিকটা উচু শুকনো জায়গায় পা ছড়িয়ে আদাম করে বসে যায় তেল মাখতে ।

কিন্তু না । ওদিকে ছেলে মরছে, আর এদিকে বুড়ো মিলের চানের ঘট দেখে না । বশোদার হাত-পায়ের গতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ।

পেছনের ভিজে মাটিতে কার পায়ের শব্দ শোনা যায় এবং গলায় শব্দও ।

কি দেখবে বশোদাদিদি ? একটু দেরি হ’ল আজ তোমার, না ?  
মিষ্টিরদের মেজবোঁ সুনীতি । বশোদার অতূরে এসে জলের ধারে দাঁড়িয়ে কলসীটা নামিয়ে রাখে ।

বশোদা কাল রাত্রির পর থেকে এই প্রথম হাঁপ ছেড়ে বাঁচল একজন সঙ্গিনী পেয়ে । সঙ্গে সঙ্গে তেলের বাটিটা একটু তক্তাতে সরিয়ে বেগে বাঁধ স্বরে বলল, আর সুনী, ক’দিন তোর খোজখবর নেই । নে, সব বল দেখি ।

সুনীতি গামছাটা কলসীর উপর বেগে দিয়ে দুপানা ময়লা কাপড় হাতে শুছিয়ে নিতে নিতে হঠাৎ বিষন্ন সুরে বলল, হ্যাঁ । আমাদের আবার খবর ।

অর্থাৎ, খবর নয়, সবগুলোই সমস্তা । তার মধ্যে প্রধান হ’ল আপাততঃ অরক্ষণীয় মেয়ে টুনির বিয়ের ব্যবস্থা । ক’দিন ধরে তারই একটা হেঁচনেনস্ত চলছে ।

বশোদা উৎসুক সুরে জিজ্ঞাসা করল, নতুন গাঁয়ের ওরা কি বলে ?

বলছে আমার সাতপুরুষের মাথা, বুঝলে দিদি ? এত চাই, অত চাই, কেন কুবেরের ভাগুরটি কি ভগবান আমাকেই লিখে দিয়েছেন ? হবে না, হবে না, ও যে আমার সৃষ্টিছাড়া মেয়ে । ওর কপালে ছাই ছাড়া কিছু নেই বলে দিলাম দেখো । সুনীতি বেন আক্রোশে ফেটে পড়ে ।

অমন করে বলতে নেই রে । মেয়ের কি দোষ বল ?

না, বত দোষ আমার । বেশ তাই হ’ল ।

এমন ছেলেমাহুড়ি কান্নার সুরে সে কথাটা বলল যে, বশোদা অন্ন হেসে ফেলে বলল, কারও যে দোষ হয়েছেই এ কথা তোকে কে বলছে ? এ শোষণের কথা নয় রে, এ হ’ল সংসারের কথা ।

সুনীতি ততক্ষণ জলে নেমে পড়ে কাপড় কাচতে লেগেছে । এই সহায়ত্বের ইচ্ছিতে তার মনটা নরম হয়ে ওঠে, সে বলে, তা ত বুঝলাম, কিন্তু করি কি বল ত দিদি ? এখন শুধু বাকি আছে [মেয়েকে গলায় বেঁধে জলে ডুব দেওয়াটা । তাও হয়ত এক দিন করব ।

বশোদা গামছাটা উঠিয়ে নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করতে করতে বলল, এবার ঐ বোসেদের ছেলেটাকেই ধর বাপু । মেয়েমাহুড়ের অত বাছাবাছি করলে চলে না ।

সুনীতি কাপড় দুপানাকে হাত সমেত পটাপট ঝেড়ে পাড়ে এনে একটু তক্তাতে বাসের উপর রাখল, তারপর একটু শ্রান্তভাবে বলল, তুমিও তাই বুঝলে দিদি ? কথার বলে ডুবতে বসলে মাহুড় ঘাসও ধরে । ওই ভামলটাকে তাত চাইতে কিছু কম ধরাধরি করা হয় নি । বশোদা একটু বিম্বিত হয় । মিষ্টিররা ভাল বনেদী ঘর, অবস্থা

বদিও আর আগের মত নয়। বিশেষ করে পর পর তিনটি মেয়ের  
বিয়ে দিয়ে মেজ তরফ (মেজ তরফই এখন গায়ে থাকে, বড় ও  
ছোট কোথায় কোথায় চাকরি করে, মাঝে মাঝে আসে এই মাত্র)  
প্রায় পতন-দশায় উপস্থিত। কিন্তু অবস্থা যাঁট চোক মিহিররা  
পাত্র খুঁজেছে বরাবর নিজেদের সম্মান বনেদী ঘরে। তিনটির এক  
রকম ভালই বিয়ে হয়েছে এমন শেষের এটিকে নিশ্চয়ই হয়েছে যত  
টানটানি। ওপরের বোসেরা লোক ভাল, কিন্তু তেমন  
বনেদী বংশ নয় এবং অবস্থাও নিতরুন্দ। ওরা এপারের  
মিহিরদের ঘরে সম্বন্ধ করতে বরাবরই রঙী, মিহিররাই বাড়ী  
হয় না।

যশোদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তবে যে শুনি এত রকম। সে  
যাক, ওরা কি বলে?

সুনীতি চটপট স্বামি সেবে নিছিল, কিন্তু তেঁর হস্তেই ছিল এটি  
ভক্তিতে সংক্ষেপে তবাবে ছিল—বলল এখন ছেলের বিয়ে দিতে  
পারবে না, বজ্র বড় তান।

সে কি?

কেন, থাকে কি? চালের দর জানে, নিজের টা পেতে পায়  
না। বলতে বলতে সুনীতির দারা মুগ্ধানা প্রচণ্ড বিরূপতায়  
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

যশোদা কিছু বাধা পায়। কথারা সে বোসে, কিন্তু ঠিক এমন  
ভাবে আগে তার নজরে পড়ে নি যে, বাজারে চালের দর বাড়ার  
সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মেয়ের দাম কমে যায়। কিন্তু এটি নিয়ে মতুয়  
ঠাটা করে। কেন সে মেয়ে ও সুনীতিরই।

সুনীতি ক্ষণকাল যশোদার এই বিরূত মুগ্ধতার পানে চেয়ে  
নিতে বলে, তাই কবে এবার, একটা ছেলে-চাকী বর তুনির বিয়ে  
দিয়ে দেব। ওরা আর যাঁট চোক বো পুষতে পারে। আমাদের  
আর সে দুঃখানও নাই।

যশোদা তাবার বলে, সে কি?

সুনীতি ভরা কলমাটা কাপে উঠে নিয়ে বললে, তুমি ভাবছ  
সবটাই সঠিক, তা নয়। এ ছাড়া উপায় কি, বিয়ে ত দিতে হবে।  
আজ্ঞা চলি দিদি, আবার দেখা হবে।

সুনীতি চলে যায়, যশোদা অস্বস্তি হয়ে চেয়ে থাকে। এর  
কতখানি সত্য; আর কতখানি সত্য সে খুঁজে পায় না, তার মনে তার  
ও-ভ্রমো তা হলে একটু জিনিস।

ওপরেরেলা একসঙ্গে একটু ছাড়াছাড়ি ভাত পেতে বসে যশোদা  
অন্নদাকে জিজ্ঞাসা করে, আজ্ঞা বোঁমা, কনককে একবার দেখতেও  
ইচ্ছে করে না তোমাদের?

অন্নদার বয়স বছর পঁচাত্তর হবে, দেখতে সুস্থ কিন্তু কিছু ক্লয়  
ও নিস্কিয়ার। কাল রাতে পাওয়ায় সময় কনক সম্বন্ধে স্বামী ও  
পিসির বাসন্ত্যবাসে সে মোটেই যোগদান করে নি। এ কথার সে  
ভাত পেতে পেতে সংক্ষেপে বলল, সে উপায় কে?

যশোদা একটু আতত হয়ে বলে, উপায়ের কথা ত বলি নি বৌ,  
বলছি ইচ্ছের কথা।

অন্নদা চকিত হয়ে ভাত খাওয়া থামিয়ে এবার পিসশাউড়ীর  
গানে তাকায়, ভাবখানা যেন ও চেনে জিনিস তাগাদা নাকি?

যশোদা নিজের কথার ওর মনে ঢলে—আর দেখো তাঁর  
চোক তোমারই, আঁধার করে নয়।

অন্নদার সঙ্গে সঙ্গে মনে পাড় যত হয়, কনককে কথা নয়, সে  
মেয়ে বিনির কথাও। সে অস্বস্তি করে বলে, সুনীতি তাহা  
পিসি, না পারা ফেলতে, না পারা হওয়ায়, তান বর ছাড়া  
কি?

একটা না পায়তো মেয়েও দুগুণ বেশি উপায় থাকে না,  
আমি দেবত দুগুণ বেশি না।

—তাই না? বাপু কিন্তু কনককে, একবারে একমুখ করে

অন্নদা একটু ইন জেস বলে, দেব, কিন্তু তুমি না। তুমি  
মেয়ে পাড়ে পিসি। তুমি না পায়তো ও-চলতে পায়, পায় না  
দিলে চলবে না। আজ্ঞা চলো, কনককে।

কিন্তু অন্নদার একটু পায়েই ওর মনের লগা তান বর যশোদা  
বলল, পুণ্যেই বাত ভাব্যের বাড়ীর দিকে। নাকি বাতের দর  
এসেই নিয়ে বোসছিল, এখন এসেই যত্নে না পায়তো নাকি  
এল কিনা। ওর মনে ওর মনের কনককে, ওর মনে বসে।

আমি দেব! আর দুগুণ উপায় এমন কনককে বসেই ওর যত  
সহজ হলে। যশোদা চকিত ও প্রসন্ন হয়ে বসে ভাতের দোর-  
গোড়ায় দাঁড়ায়।

বাস্তবের স্বাভাবিক থাকে বলে, সুনীতি কনককে, পথকতা,  
পকায়গিরি, পকায়গিরি, পকায়গিরি, পকায়গিরি, এমন কনককে  
তুমি কেন নিতে পার কনককে না, কনককে পুণ্যেই আছে। তার  
উপর এখন যা নিবান পড়েছে, লোকের পুণ্যেই পায় না আর দেখ-  
কল্প করবে কে?

বাস্তবের এত উদার দুটিভঙ্গ নেই, সে রগ করে বলে, কেবল  
কাকে কতক উপায় এত হয়েছে এমন কথা। এতে কারও ভাল  
হবে নাকি!

আর তার যাঁট চোক, তার যে ভাল হচ্ছে না দেখা আঁত  
সত্য। সম্বন্ধের অভাবে পুরনো বাড়ীঘানা পড়েপড়ে অবস্থায়।  
যশোদা অক্ষর করে তার করণে কবতে ভাব সিঁড়ি বেয়ে বাউয়ের  
একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এ কি, সব অবকার নিকুম,  
কে বলবে এখানে কখনো দেখা মরছে! কে, বাত, মিত্র কোথায়  
হবে রা! শুইছাড়া বাড়ী যা চোক বাপু!—বলল। বলতে ওদিকের  
কোণে একটি কুপির খাঁপ আলো লক্ষ্য করে দ্রুত কম্পিত পদে  
যশোদা সেট দিকে অগ্রসর হয়।

বেণী ছুঁতে গেল না, দোরগোড়ার অনেকটা এদিক তক্তেই  
সে স্পষ্ট দেখতে পেল—বাস্তবের বিভিন্ন বয়সের গুটি তিন-চার ছেলে  
মেয়ে নিয়ে রান্নাঘরের মেঝেয় যেমন তেমন করে বসে ভাত খাচ্ছে

এক সন্ধ্যাতি বশোদায় কঠোর ভনে একবার ভাতের হাঁড়ির দিকে, একবার মৃণালিনীর দিকে ও একবার ছেলেমেয়েগুলোর পানে তাকাচ্ছে।

বশোদা এত সব দেখল না, দোরগোড়ার দাঁড়িয়ে তিরস্কারের সুরে বলল, তোদের কাণ্ড একি বাপু! ছেলেটার ঘর এমন অন্ধকার আর এদিকে একসঙ্গে সব খাওয়ার এমন যোচ্ছব!

মোচ্ছবট বটে! আচ্ছ তিন দিন পরে এই প্রথম সন্ধ্যাবেলা তাদের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে। এ তিন দিন যে তারা কি গেয়ে কাটিয়েছে তারাই জানে। বাস্তবের খালাস মাথা ভাতের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। ছেলেগুলো বুকল তাদের বাবা কিছু একটা অন্টার করেছে, স্তব্ধতা তাদের অবস্থাও তেমনি। মৃণালিনী অন্ধুরে বসে শুধু ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে ওই ভাতগুলোকে ঘন লেহন করছে।

কি যে তাদের মূগে কথা নাই কেন, বোবা হয়ে গেলি নাকি সব?

বাচ্ছি দিদি, এট যে হয়ে গেল। বলতে বলতে অকস্মাত বাস্তবের খালা ছেড়ে উঠে পড়ে প্রায় দৌড়ে বশোদার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। বশোদা হতবাক, কি বলবে ভেবেই পেল না।

মৃণালিনী বুঝতে পারল। উঠে গিয়ে একটা ছোট পিঁড়ি এনে চৌকালের অন্ধুরে পেতে দিয়ে প্রথমে ছেলেমেয়েগুলোর উদ্দেশ্যে বলে, তোরা গেলনা কেন বাপু, তাদের কি হ'ল। তারপরে বশোদার উদ্দেশ্যে বলে, বোস দিদি এইখানটায়। আমাদের কাণ্ডই হ'ল এই, তুমিই বা কি বলবে আর আমরাই কি করব।

বাস্তবের অমন করে উঠে যাওয়াতে বশোদা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, এ কথায় সে কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বলল, সে কি শ্রমের ঘরে কেউ নাট, অন্ধকার, তাই বললাম।

গরীবের সংসারে অলসতার সঙ্গে লড়াই লেগেই আছে, সেটা বরং অপরিহার্য বিজ্ঞান বলে মনে নেওয়া যায় কিছু যমের সঙ্গে লড়াই করাটা তাদের পোষায় না। কারণ সংসারে নানাবিধ গলা-ধাক্কা পেয়ে তাদের প্রাণের মূল্যবোধটাই অতি ক্ষীণ, দ্বিতীয়তঃ যমের সঙ্গে লড়াই করাটাও অত্যন্ত বায়সাধ্য।

যদি পড়ে বহুদিনের দাগী চোর যেমন রূখে ঠাড়ায় সেই ভঙ্গিতে মৃণালিনী বলল, নাই কেন, আছে। বস ঠিকই আছে দেখ।

বশোদা আতকে উঠে বলে, সে কি যে মূণী, তুই কি মা!

মৃণালিনী তৎক্ষণাৎ বলে, না ভাই। মার দশা এমন হবে কেন!

বশোদা সম্মোহিতের মত তার মুখের পানে চেয়ে বলে, নিজের দশার ওপর ত হাত নাই মানুষের, নইলে তার এমন দশা হবে কেন। সে বাক, ওখুপত্তরগুলো ঠিকমত এসেছিল ত?

একটা এটো পাতার উপর পড়ে তিন-চারটা কুকুর যেমন করে, ঠিক সেই ভাবে একাণ্ড ভাতের খালাটা ছেলেগুলোর মাথখানে পড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। বশোদা তাদের একটা আড়ালে পিছন করে বসেছিল তাই সে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। মৃণালিনী কিন্তু একেবারে সামনে বসে প্রতিটি ভাতের গতিতকি লক্ষ্য করছিল,

এ কথায় সে এক রকম অকৃত ক্ষুধিত চাহনির সঙ্গে সেই দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে ধরা-গলায় বলল, হ্যাঁ এসেছে, ওই দেখ না।

ভাগ্যভাগির ভাত শেষ হয়ে আসার মুখেই চরম অবস্থার সৃষ্টি করে বিশেষ যদি পেট না ভরে থাকে। ছেলেমেয়েগুলো খালায় এ কোণ ও কোণ হাতড়াতে হাতড়াতে প্রায় হাতহাতি আরম্ভ করে দিয়েছিল, বশোদা ঠিক সেই সময় একটু ঘুরে সেদিকে চাইল। চোখে পড়ল তার সেই হাতহাতির দৃশ্য এবং মনে পড়ল বাস্তবের সেই পলায়নের ভঙ্গিটি। সে বুকল। তাদের যে রোগ তার ওষুধ ত এই।

ছেলেরা সমস্তই আব্বার তোলে—মা আরও খাব।

মৃণালিনীর চোখে সঙ্গেসঙ্গে আগুন জ্বল গুচে, সে প্রায় চিংকার করে বলে, খাও এবার আমাদেরই খাও সবাই মিলে। যা বেরিয়ে যা সব হতভাগারা বলছি। লক্ষ্মীছাড়া বাফসের গুটি বত জুটেছে আমারই কপালে।

ক্ষণপূর্বের মমতা কোথায় উবে যায়, পরিবর্তে ঘন সচকিত হয়ে ওঠে কুকুরত্যাগানি এক দলজাল মেয়ে। আর ওরা পালিয়েও গেল কুকুরের মতই, এতক্ষণ ঘন কার-না-কার ঘরে ঢুকে পাত চাটছিল। বশোদা এবারও নির্বাক, কিছুক্ষণ পরে শুধু বলল, তোর রইল ত?

মৃণালিনী হঠাৎ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে, অসহায় কণ্ঠে বলে, ঠিক আমাদের, তুমি কি তাই ভাবলে দিদি?

অবেগের আধিক্য সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তার পর সামলে নিয়ে থানিকটা বেপরোয়া ভাবেই বলে ওঠে—তোমার ভাবনা নাই দিদি। ভাত ত আর চোখের সামনে নাই বলতে পারি না, তাই হাঁড়িতে চড়াবার আগেই কিছুটা চিবিয়ে রাগি।

চিবিয়ে রাগি কথাটা সে এমন চিবিয়ে বলল যে, বশোদা আর একবার আতকে উঠে ভাবল—ভাইনই বটে।

মৃণালিনীকে ঘন ভূতে পেয়েছে, সে বলে চলে—আর দিদি, তোমার টাকা শুধু গেয়ে উড়িয়ে দিলে ত চলবে না, কিছু ধার শোধ করতেই হবে, আর মরলেও ত থরট আছে—

বশোদা মিনতির সুরে বাধা দিয়ে বলে—থাক রে আর হিসেব দিতে হবে না, সবই বুঝছি।

আরও দিন ছয়-সাত পরে। শ্রীময় এখনও মরে নি, কেবলই ধুঁকে চলেছে। বশোদার সে একান্ত স্নেহের পাত্র, কিন্তু বশোদা তাকে বিশেষ আর দেখতে যায় না। বোধ হয় অমন স্নেহের পাত্র বলেই যায় না, কারণ ও দৃষ্ট শত্রুরও দেখা যায় না। কবারও তার আর কিছু নাই। বহু দিন হতে হুঁচকার পরগা করে তার হাতে বা জমে ছিল এ কদিনে তার প্রায় সবই খরচ হয়ে গেছে, থানিকটা শ্রীময়ের চিকিৎসার ব্যাপারে, আর-কিছুটা কনকের বাড়ী তথ্য পাঠানোর ব্যাপারে। তাতেও যে কি রকম তথ্য বাবে তার আজ কেমন ঘন সন্দেহ হচ্ছে। আরও অবশ্য কিছু সঞ্চিত আছে তার পালেশ গায়ের এক জনের কাছে। কিন্তু তার নিজের মরলেও ত খরচ আছে।





শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

“লইয়া” শব্দকে গ্রামা ভাষায় “নিয়া” মনে করিয়া উল্লিখিত ছাত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শুল্কনাৎক বেঠান করিদ, লইয়া আকাশে উঠিল। কিন্তু কে উঠিল তাহান উল্লেক করেন নাই। যদি তাঁকাকারের জানিতেন যে, করিবর অগ্নির পবিত্রত্বে উড়িয়া শব্দ “নিয়া” ব্যবহার করিয়াছেন তাহ হইলে নিশ্চয়ই তাহান এরূপ ভুল করিতেন না।

[illegible]

এদেশে একটা প্রচলিত কথা আছে যে, যোজন-ভেদে ভাস ভেদ। যোজন অগ্রে চারি-ক্রোশ। এক স্থান হইতে চারি-ক্রোশ দূরবর্তী স্থান-গোলে প্রায় শতক্ৰে ইংসং পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই পরিবর্তন শুধু যে বাংলাদেশেই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তবে শিক্ষিত সমাজে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহা সেই দেশের সকলেই বুঝিতে পারে। তাহাই সাহিত্যের ভাষা। সাধারণতঃ রাজধানীর ভাষাই সাহিত্যে

ব্যবহৃত হয়। গোড় নগর যখন বাংলার রাজধানী ছিল তখন সেই গোড়ের ভাষাকেই সমগ্র বাংলার লোক আদর্শ ভাষা বলিয়া মনে করিত। তখন লোকে বাংলা বা বঙ্গ-ভাষাকে গোড়ীয় ভাষা বলিত। তাহার পর নবাবী যখন বাংলার রাজধানী হইল তখন নবাবীপের প্রচলিত ভাষাই বাঙালীর আদর্শ ভাষা হইল। আমি বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা বাল্যকালে যে বর্ণমালা শিক্ষার জন্য পুস্তক পড়িতেন সেই পুস্তকের নাম ছিল “গোড়ীয় ভাষার বর্ণমালা”। তাহার স্বরবর্ণের তালিকায় দীর্ঘ ‘ঋ’ ও দীর্ঘ ‘৯’ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় শেষ অক্ষর ছিল ‘ক্ষ’। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক শত বৎসর পূর্বে যখন “বর্ণ পরিচয়” প্রথম ভাগ রচনা করেন তখন তিনি দীর্ঘ ‘ঋ’ ও দীর্ঘ ‘৯’ পরিভাষা করেন এবং ‘ক্ষ’ অক্ষরকে প্রথম ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগে প্রমোশন দেন।

লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সকল ভাষাই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মাজ্জিত ও অমাজ্জিত অথবা শহুরে ও গ্রাম্য। মাজ্জিত বা শহুরে ভাষা একই প্রদেশের মধ্যে সকলেই বুঝিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অমাজ্জিত ও গ্রাম্য ভাষায় প্রত্যেক জেলায় এমনকি প্রত্যেক মহকুমায় পার্থক্য আছে। আবার, ব্যবসায় বিশেষ গ্রাম্য ভাষাতেও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত রামগতি জ্ঞানরত্ন মহাশয়-রচিত “গোষ্ঠীকথা” নামক পুস্তকের এই অমাজ্জিত ভাষার একটি সুন্দর উদাহরণ এখন আমার মনে পড়িতেছে। বহুকাল পূর্বে বাংলার একজন ছোট-লাট একবার ছগলীতে গিয়া একটা দরবার করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে ছোটলাট বাহাদুরকে দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র পল্লীগানবাসীর ছগলীতে সমাগম হইয়াছিল। একজন গ্রাম্য জেলে দরবারের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার প্রতিবেশীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল লাটসাহেবের দরবার কি রকম হইয়াছিল। উত্তরে সে বলিল, “ভাই, গিয়ে দেখলুম যেন পোনার বাক ভেসেছে। আমি কৈকানায় কৈকানায় (কৈমাছ কানকোর সাহায্যে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে যেমন অগ্রসর হয়) গিয়ে যেমন ঘরসোলা হুলুপ দিইচি (ঘরসোলা: মাছ যেমন সহসা জলের উপর ভাসিয়া উঠে) অমনি চিতল পটকে দিলে (চিতল মাছ ক্ষুদ্র মাছকে যেরূপ ভাড়া করে), আমিও অমনি গুঁতো সটকলুম (গুঁতো মাছ ভয় পাইয়া সহসা যেরূপ অদৃশ্য হয়)।” সম্ভবতঃ সেই ধীরে ধীরে হইতে লাটসাহেবকে দেখিতেই পায় নাই বলিয়া ভিড়ের মধ্যে একটা লাফাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পার্শ্বস্থিত একজন পুলিশ কর্মচারী শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে সে পুলিশের হাত ছাড়াইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়াছিল।

ঐ ধীরে যে ভাষায় তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিল সে ভাষার শব্দ কোন অভিধানে নাই। “অন্তর্গ নেই বন্তর্গ আছে”, “রুরো লুসে কুপোকাতে” এই সকল বাক্যাংশ অমাজ্জিত ভাষাতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মাজ্জিত ভাষায় ইহার অর্থ ভাত খাইয়া নিত্রা যাওয়া, গুণ নাই দোষ আছে। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণ মাজ্জিত ভাষায় কথা কহে না বলিয়াই এই প্রকার কথা বঙ্গভাষাভাষী অপর জেলার লোক সহসা বুঝিতে পারে না। মেদিনীপুর, রংপুর, ঢাকা বা ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের লোক যখন পরস্পরের মধ্যে এরূপ অমাজ্জিত ভাষায় কথাবার্তা কহে তখন আমরা তাহার অর্থবোধ করিতে পারি না। অথচ তাহারা বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা কহিয়া থাকে।

সকল দেশের ভাষা সম্বন্ধেই এই একই কথা বলিতে পারা যায়। আমরা ইংরেজী বই পড়িয়া যে ইংরেজী ভাষা শিখিয়াছি তাহা ইংলণ্ডের মাজ্জিত ভাষা। ইংলণ্ডের এক এক কাউন্টি বা জেলার লোকে যে অমাজ্জিত ভাষায় কথাবার্তা বলে তাহা আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। এরূপ অমাজ্জিত ভাষাকে ইংরেজীতে slang বলে। আমি দেখিয়াছি দুই জন ইংরেজ পরস্পরের সহিত কথা কহিবার সময় কোন দেশীয় শিক্ষিত লোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে, যদি কোন গোপনীয় বিষয় উল্লেখ করিবার সময় slang ব্যবহার করেন তাহা হইলে ইংরেজী শিক্ষিত দেশীয় ভক্তলোক সহজে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। ইংলণ্ডের উত্তর প্রান্তস্থিত নর্দামবারল্যাণ্ড বা ইয়র্কের অমাজ্জিত ভাষা ঐ দেশের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কেন্ট বা কর্ণওয়াল জেলার লোক সহসা বুঝিতে পারে না। আমরা ফরাসী ভাষা বলিতে যাহা বুঝি তাহা ফ্রান্সের মাজ্জিত বা সাহিত্যের ভাষা। প্যারিসের অমাজ্জিত ভাষা এবং মাসাঁই বা লিয়ঁর অমাজ্জিত ভাষা একরূপ নহে। সকল দেশেরই ভাষা সম্বন্ধে এই একই ব্যবস্থা।

মাজ্জিত ভাষাও কাল সহকারে পরিবর্তিত হয়। রাম-মোহন রায় তাঁহার পুস্তকে যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা করেন নাই। আবার, বিদ্যাসাগরের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্কিমী যুগের সাহিত্যিকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাসবহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ‘সীতার বনবাসে’ “এই গিরির শিখরদেশ সতত সঙ্করমান নবজলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে।” এই ভাষা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে একেবারে অচল। বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁহার প্রথম রচিত উপভাস বা রচনাসমূহে কতকটা

এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী-কালে রচিত কোন গ্রন্থে এইরূপ ভাষা গ্রহণ করেন নাই। তিনি একবার তাঁহার বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে বলিয়াছিলেন, “অনেক সাধনার ফলে সরলতা দেবীর কৃপালাভ করিয়াছি। আর আমি নিজেকে সে কৃপা হইতে বঞ্চিত করিব না।”

আজকাল অনেক উপাশাস লেখক তাঁহাদের নিজের জেলার বা মহকুমার গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ

করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বরণ রাখা উচিত যে, এই প্রকার ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সুবোধ্য নহে। বাহা সমগ্র বাংলার লোক সহজে বুঝিতে পারে এরূপ সরল ও মাঝিত ভাষা ব্যবহার করা উচিত। নতুবা স্থানীয় গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক রচনা করিলে তাহা সমস্ত বাঙালীর পক্ষে সুবোধ্য বা সুখপাঠ্য হইবে না। উপাশাসে ও নাটকে নায়ক-নায়িকার মুখেই গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা উচিত।

## মাতৃস্নেহের বিকাশ

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

জৈব-বিস্তারনের প্রথম দিকে মাতৃস্নেহের উদ্ভব।

বিশ্ব-প্রকৃতির পরীক্ষাগারে জীব-জীবন নিয়ে যখন নিত্য নব পরিকল্পনা চলছিল, বড়বৃদ্ধা, ভূকম্প, অগ্ন্যংপাত, প্রাচীন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রমতাণ্ডেবের কদল কবল থেকে তরুণ জীবনের রক্ষা করবার জন্য প্রকৃতির ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না, তখন ধর্মেতে স্থায়ীভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস হয়েছিল জন্মসংসার হার রক্ষি করে। উষ্মাযুগের প্রাণী যারা আজও বেঁচে আছে তারা মুহূর্ত্তস্বয়ী, আকস্মিক দুর্গটনা ছাড়া তাদের মুহূর্ত্ত নেই (এমিষ: ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি)। তবে এ সমারোহ অন্তঃসারশূন্য নীরস গুণ-লেশহীন প্রাণী। উদ্ভেদসাধনের উপায় না হয়ে তাদের অগণিত সংখ্যা বৃদ্ধিই হয়ে দাঁড়াল চরম লক্ষ্য। অর্থাৎ, অভিব্যক্তির পরম রূপ গেল হারিয়ে, বেঁচে রইল শুধু জীব-জীবন। কিন্তু এ সার্বভৌম আয়োজন পারিবারিক স্বার্থ অপেক্ষা বৃহত্তর কল্যাণই আদর্শ বলে বিবেচিত। সেজন্য কেবল অগণিত সংখ্যার জোরে বেঁচে থাকার মোহ পরিত্যাগ করে গুণ বিকাশের দিকে মনোযোগ পড়েছিল, তার ফলে ‘মাতৃস্নেহ’ের উদ্ভব। মন-অভিব্যক্তির ইতিহাসে এ এক পদম স্তম্ভ মুহূর্ত্ত। আহা-বিহার-সংসারের বাধাহীন অনায়াসলব্ধ জীবন দৃঢ়চিত্তে পরিত্যাগ করে স্বইচ্ছায় বন্ধন ও নিয়ন্ত্রিত কষ্ট স্বীকার করা সহজ নয়, জীব-বিস্তারনের সমস্ত ইতিহাসে তা অমূল্য। এর দরুন রেহ, ঐতি, আনন্দ, মুরাগের তোরণধার খুলে গেছে, কোমল ও সুকুমার মানবীয় বৃত্তির স্তম্ভ উদ্বোধন হয়েছে; এক দিকে উন্মেষ হয়েছে বেদনা, অমূল্যকম্পা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সামাজিক গুণ, অপর দিকে হয়েছে শোষণাভ্যাস, ধর্মনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সমাবেশ। এক-মাত্র মাতৃস্নেহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তি, আবার নীতিজ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যানুষ্ঠান ও এসেছে এই পথে।

এ কি উপায়ে সম্ভব? একটি মাত্র প্রতিগর্ভে কি এই বিপুল উদ্ভাবনশক্তি মুগ্ধ?

এ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে মাতৃস্নেহের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। পশুজগতের আদিম জৈব-ক্ষুধা নিরসনকল্পে যৌন আকর্ষণের জন্ম। প্রাণী-জীবনের নিত্য প্রবাহমাণ আলোড়ন-বিলোড়নের পশ্চাতে বিশ্ব-প্রকৃতির শুভ্রোজ্জ্বল নবজীবন সৃষ্টির যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা যৌনজনন তার একটি প্রধান ধারা, জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই ধারায়। যৌন-প্রেমের রূপ দুটি: একদিকে প্রভূত্ববাজক দম্ভ, ক্রম-কঠিন শক্তি; অন্যদিকে কান্তিকোমল মনোভাব, মধুময় জগতের মোহন আবেশ। জীব-সৃষ্টিতে উভয়েই প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রথমোক্ত ভাবটি থেকে আক্রমণ, পলায়ন, আক্রোশ, বিদ্বেষ, অহমিকার আবির্ভাব—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বুদ্ধি, খেলাধুলা হতে আরম্ভ করে রাজ্যশাসন, বাবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত এর দ্বারা প্রভাবান্বিত; মাতৃস্নেহের উন্মেষ হয়েছে দ্বিতীয়োক্ত ধারায়। নারী-পুরুষের প্রেম যে কেবল আদিম যৌন-ক্ষুধা নিবারণের জৈব-প্রেরণা নয়, স্বরণাভীত কাল থেকে এ-ভাবে যে প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ সার্বকতা অনুসন্ধান করছে, অসংখ্য বস্তুর ভিতর দিয়ে বিচিত্র আত্মপ্রকাশে তার প্রমাণ। প্রেমের একটা রহস্য অংশ সূচিসিদ্ধ সূক্ষমামণ্ডিত, যত বর্ধক, যত নিয়ন্ত্রণের হোক না কেন ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা না থাকলে তার কমনীয়তা অমূল্য। শৃঙ্খলের এ দিকটা রসপ্রধান, জনিত্ব-যন্ত্রের সূত্রপাত এখান থেকে।

কিন্তু প্রাণীর মানসিক অবস্থার তারতম্য আছে, স্বভাব ও আচরণ থেকে পশু-জগতের উচ্চ-নীচের যাচাই। কীট-পতঙ্গের ভিতর বুদ্ধির অমূল্যলীন প্রায় নেই, এদের জীবন প্রবৃত্তির নিয়মাহুগ বন্ধন নিয়ন্ত্রিত। অভিনব কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করবার অবসর তাদের অল্প। স্ত্রী-পুরুষের

মিলনে সাহচর্য্য যতটা তার মধ্যে ললিতকোমল ভাবটি ঠিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না ; শুধু পিতামাতার স্নেহ কেন, কোন রকমের মমত্ববোধ এদের মধ্যে বিরল । ফেবর, লুবক প্রমুখ কীটতত্ত্ববিদরা চেষ্টা করেও কীটপতঙ্গের মধ্যে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার নিদর্শন বিশেষ দেখেন নি, বিবাদ-কলহের স্পৃহাই অধিক বলে তাঁদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে । মাতৃস্নেহের ক্ষীণ আভাস দেখা যায় একক বোলতার ভিতর । লার্ভার ষাট সংস্থান করে ডিম পাড়ে—কিহ আর আসে না ; নবুদ্ভিত। এত অধিক যে মাতৃস্নেহের পরিমাপ করা দুঃসাধ্য । মদুপ ও পিপীলিকা এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভীষ, শৈশবে কিছু যত্ন পরে বটে, তবে সে পিতামাতার লালন পালন নয় কম্বু ভগিনীদের পরিচর্যা । দারুণ ঝোত ঝাড়াভাবে এরাই আবার সাব্যস্ত করে ফেলে শিশুদের । বড়-বাক্সব আত্মীয়-পরিজনদের বিপদ-আপদে সংহায্য করে এদের ধাতো নেই, নিমজ্জমান মদুপ পিপীলিকাকে সাহায্য করতে কেউ দেখে নি । হয়ত পার্শ্ববর্তী একটি সঙ্গী মার পড়ল, কিন্তু তাতে কি ? অত্যাচারী তিলমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত না হয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে কর্ম করে যেতে থাকে । ক্রী অক্টোপাসকে ডিমের পাশে মতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত দেখা গেছে, গুবরে-পোক, জল-ছাটপোক ( waterbug ) আশ্রয় ও খাদ্য জোগাড় করে রাখে ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য, কিন্তু তবু অমেরুদণ্ডী ভগ্নাত মাতৃস্নেহের প্রকাশ কোথাও সূত্র নয় । ডিম দুটি বার হবার পর কীটশিশু যত্ন আশ্রয় পেয়েছে এমন শোনা যায় না, সেজ্ঞা এদের শৈশবাবধি তুলনায় অতি অল্পকালের, কেউ কেউ শৈশব-বিরহিত । আত্মরক্ষা ভীষনমারণ ইত্যাদির শিক্ষা, অভিভাবকহ লালনের সুযোগ নেই বলে বোধ হয় অমেরুদণ্ডী ভগ্নাত প্রবৃত্তির দাস, পূর্বপুরুষের কর্মক্ষেত্র এদের কার্যেব নৃসংস্থিত সীমাবোধ, তার বাইরে যাবার কৌশল জানে নেই

মেরুদণ্ডী ভগ্নাতের সর্বনিম্ন স্তরে আছে মসাকুল ও উভচরের—যাদের মানসিক অবস্থা অমেরুদণ্ডীর চেয়ে কিছু উন্নত হলেও তাদের মধ্যে মাতৃস্নেহের বিকাশ অল্প । এই পর্য্যায়ের ডিম থেকে বার হয়ে আসবার পরও চলতে থাকে মতর্ক অথবা পিঃ-সঙ্গ । অনেক মাতৃ জলতলে গৃহ নির্মাণ করে এবং সন্তান জাত হলে সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করে । ষ্টিকলব্যাক ও বেলি পুরুষদের অগ্রদ প্রহরায় প্রসিক্ত, ক্রীড়ারত শিশুদের গিরে পড়লেই পিতা বাড় ধরে কিলিরে আনে, কারণ এতদ্বারা শত্রুদের মধ্যে বাকসীনাও উদ্রসাদ করে ফেলে নিজ সন্তানকে । কোন কোন জাতের ডেক মাটির সেওয়াল ঘিরে কৃত্রিম চোবাচ্চার মত তৈরি করে শিশুদের নিরাপদে রাখে ; বেগার্ডীদের মাতাপিতার সঙ্গে

সঙ্গ সম্ভরণ করতে দেখা যায় । সর্প বা কুমোরের সন্তানের জন্য সবিশেষ উৎকর্ষার কথা শোনা যায় নি ; বিরাট মেহী পাইথন-জননী অবগু কুণ্ডলী মধ্যে শতাব্দিক ডিম রেখে চারি মাসাব্দিকাল নিঃশব্দে অবস্থান করে, কুমীর নাকি দু'ব হতে আপন ডিমের প্রতি লক্ষ্য রাখে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, বাচ্চা বের হলে আর তার সঙ্গে সখ্য নেই । সন্তান পালনের দায়িত্ব সুকঠিন । দেখা গেছে সাধারণতঃ যে পর্য্যন্ত না স্বামী-স্ত্রীর মধুর সখ্যপূর্ণ বিকাশলাভ করেছে, অর্থাৎ যৌনমিলনেই সে সখ্যকে পূর্ণচ্ছন্দ পাড় নি—পর গৃহস্থালী ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে, সে পর্য্যন্ত মাতৃস্নেহের সম্যক রূপ অল্পপলক থেকে গেছে । বচ্চাদের সতীত্বপদে পড়ায় কলক একটি বৎসর ধরে অবাধে চলছিল, অ কারণ পালন-শিক্ষা-মতার দিকে এদের প্রভূত উল্লসিত হলেও শিক্ষা হয় নি কিছুই, বুদ্ধিবিকাশ হয়েছে যথাসামান্য, সেজ্ঞা প্রথম চারটেই এরা বিলম্বিত হয়ে গিয়েছিল নীচের অথচ বুদ্ধিমান স্তম্ভপাখীদের কাছে যাদের শিক্ষার কিছু ভাষা

যতক্ষণ না সুব্যবস্থিত আত্মরক্ষা পাড়ে ওঠে ততক্ষণ সন্তান-শিক্ষার প্রশ্ন নির্বন্ধক । এতে উভয়েরই সহনশীলতা প্রয়োজন, সে কারণে শিক্ষা ও লালন-পালন-ব্যবস্থা স্তম্ভপাখীদের পূর্বস্রকার যুগে বিকশিত হয় নি । সতীত্বপদে পড়তেই নয়, ওদের উৎকর্ষন বন্ধীয়া বিক্রমকে আশ্রয় করে ঘনু বিদ্যার মতো, ছাত্র আচরণ কোপন স্বভাব ও তদুপায়ী সংস্কার ও আদর্শনে তাহা বিকশিত হয়েছিল । দাম্পত্য ভীষনে স্নিগ্ধ মধুর ভাব নেই, জনিত যত্ন ত তাহা পালন কথা ।

ইতর প্রাণিজগতে মাতৃস্নেহের প্রকৃত উৎস বিহঙ্গকুল । পতঙ্গাদির জার অনাগত সন্তানকে অভ্যর্থনা জানাবার নিমিত্ত নীড় রচনায় উদ্যোগপরী, ডিমের তা সেওয়া কতকটা সতীত্বপদের অন্তর্করণ ; অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের একাঙ্গে বেশ সাহায্য করে ; এম্বিকিউই পাখীদের মধ্যে পুরুষেরাই কেবল একাজ করে, বহুপত্নীক উঁপাখী পর্য্যায়ক্রমে সকল ক্রীকেই সাহায্য করে ; পুরুষ পেঙ্গুইন স্নেহশীল পিতা পূর্বাপর সন্তানদের যত্ন করে ; ত্রাশটাকি শুষ্ক বাসপতা আগাছা দিয়ে দশ-বর বর্ষকুটির বিরাট স্থপ তৈরি করে ডিম পাড়ে, পুরুষেরা প্রায়ই উত্তাপ পরীক্ষা করে দেখে যে, ডিম ফাটনার উপযোগী উষ্ণতা আছে কিনা ; শনেশ তার গৃহীণীকে রক্ষককাঁচের বন্দী রেখে দ্বাব রুদ্ধ করে দেয়, কাছা-মাটি দিয়ে তার পর বর্গিত হয় খাদ্যানুসন্ধানে । লালন-পালনের সঙ্গে নীড় বাসাব সখ্য গভীর, যে-সব পাখীর শৈশব মাতাপিতার কর্তৃত্বাধীনে খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয় না তাদের নীড় সাধারণ, অল্পাংশে রচিত, যেমন তিত্তির-কালিঙ পেঙ্গুইন উঁপাখী বনমোরগ সামুদ্রিক হাঁস ইত্যাদি ।

জন্মের অল্প দিন পরে হয় স্বাবলম্বী, কিন্তু প্রায়ে পলয়নতৎপর, এদের বাসা ভূমিতলে। শিক্ষার কাল সকলের সমান নয়, চড়ুই-পায়রা মাতা-কর্তৃক সন্তানকে উড়তে শেখানো অনেকেরই দেখেছেন, বাবুট, ঈগল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পক্ষীকেই সন্তানদের অনুরূপ শিক্ষা দিতে হয়, এদের বাসাও সাধারণের অনধিগম্য। ক্রী-পক্ষীর বধূজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন মাতৃদের আশ্রয়ে গুরু হয় নীড় রচনার ব্যস্ততা; আনাগোনা—তারপর সন্তান পালনের সবটুকু দায়িত্ব এসে বহায়। এই বিশেষ করে যে মাতার দিক থেকে আসে তা নয়, এর উদ্ভব নারীস্বভাব কামল প্রতি অবলম্বনে। যে পুরুষের প্রেম একনিষ্ঠ নয়, সে কথুচিস্ত ব্যক্তি সন্তানকেও ভালবাসতে পারে না, সহজেই এড়িয়ে যায় লালন-পালনের দায়িত্ব।

ক্রীড়া-কৌতুক-আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে যে চিত্ত বিকাশ হয়, কৈশোর কাল তার উপযুক্ত সময়, এই কৈশোরই পিতামাতার জেহ শ্রমের পরমণ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবার কাল। খেলাধুলি অভিজ্ঞতা, মজার বিশেষ ক্ষেত্র এবং পিতামাতার আশ্রয় ও আশ্রয় বৃত্তি দৈনন্দিন সহজলভ্য হয়, পরীক্ষামূলক কাজকর্মের স্তরিত তত্ত্ব অধিক হয় থাকে। বহুদিন বিচিত্র পদক্ষেপে সমৃদ্ধ করে তোলে অভিজ্ঞতাকে, নিঃস্রাতি অবকাশ তত্ত্ব মূল্যবান। বিভিন্ন পরিবেশের দৈনন্দিন সহিত প্রাথমিক পরিচয় একটিকে যখন মনকে সমৃদ্ধ করে, তখন অতীতকে আবার কুপমজুততার অবস্থান ঘটিয়ে তাকে প্রশস্ত করে তোলে, গ্রহণক্ষমতা বোড় দিয়ে নিজেকে চিকিত্তে থাকা থাকায় নেওয়া সহজ হয়ে যায়। এইখানে বুদ্ধির আবির্ভাব, প্রবৃত্তির সঞ্চারিত ভাবের মীমাংসা করে দিতে যুক্তিযুক্তি মনের বিকাশ। কীট পতঙ্গ-জগতে শৈশবকালের বালাই একরূপ নেই, ওরা পূর্ণমাত্রায় প্রবৃত্তির দাস, কুলস্বত্তি ওদের সকল কাজের উৎস। পার্থক্যের জীবনে আনুগমিক কয়েকটি বিষয়ের সূত্রপাত দেখা যায় : শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও স্বাধীন জনকজননী খাদ্যাধেষণে বের হয়ে সন্তানের কথা ভুলে যায় না, আর অনেক পাখীর ব্যক্তিগত জীবনের একনিষ্ঠ প্রেমের এরূপ দৃষ্টান্ত আছে যা স্তম্ভপায়ী ছাড়া অপর কিছুতে পরিচালিত হয় না। মাতৃস্নেহের উন্মেষ পক্ষী বিবস্ত্রনের পূর্বেই হয়েছে, হয়ত কীট পতঙ্গের সমাজের মধ্যেই এর অল্প, কিন্তু তা বিকাশপ্রাপ্ত হয় নি, এদের মধ্যে এ বস্তুর আশ্রয়ের কথা বিশদভাবে জানা যায় না। প্রবৃত্তি-চক্রের আশ্রয় হতে পরিণতি পথান্ত যথোচিত উদ্দীপনা দিয়ে প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়, তার পরের সমস্ত কার্যকলাপ একের পর এক যেন পূর্ণনির্ভরিত নিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়, এর মধ্যে বিরাম নেই, ছন্দ ব্যাহত

হয় না। কাক রবিন কোকিল-ড্রিম বা কোকিল-ছানা অগ্নি বহনে পালন করে যায়, বায়ুসঙ্গাতাব একবারে ছেগে উঠলে আশ্রয় জ্ঞান থাকে না, সন্তান সন্তানই; নিজের ছানা হয়ত বাসাত্যুত হয় নীচ পড়ে গিয়েছে (অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কোকিল-শাবক থাকে মরে ফেলেও দেয়), সবকণ আর্ন্তর মাতার কানে পৌঁছাবে অথচ খাবার এনে খাওয়াচ্ছে সেই ক্ষুদ্রে বাসককে, কিন্তু কীংকর্ত হয়ে আসে নিজ সন্তানের কণ্ঠস্বর, শেষে চিরতরে শুক হয়ে যায়, জননীর কোন ভ্রমকপ নেই, পালিত সন্তানের পরিচোয় সে ব্যস্ত! এ সময় প্রবৃত্তির অধিকারভুক্ত, স্তম্ভপায়ী বুদ্ধি-ভগ্নেত এরূপ সময় নেই। সঞ্চারমানোবৃত্তি, সন্তান নিজের ব পরের সে গোন্ধমোলে প্রশ্ন বিচারে নিজেকে বিব্রত করবার ইচ্ছা মোটেই নেই।

আম্বল সম্বন্ধে স্তম্ভপায়ী শাবক, স্তম্ভপট, চুস্ত শিশুর প্রতি করুণাবোধ আছে তবে আপন শাবককে বঞ্চিত করে নয়। বুদ্ধির স্পর্শে পশুস্তম্ভ জনিত-যন্ত্র রূপান্তরিত হয় প্রকৃত মাতৃস্নেহে, আর সেইটাই হাল আদম যৌন প্রেমের সুকুমার ভাব-দ্যোতনা। মাতৃস্নেহ-যন্ত্রে বুদ্ধি-অনুভবের শিশুর জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, শিশুর অসহায় অবস্থা নাথাকে অধিকতর মানসযোগী করেছে সন্তানের প্রতি; অধিকতর তত্ত্বোজ্ঞিত স্তম্ভপায়ী মাতার সঙ্গে খাদ্যাধেষণে বের হয়; মাতৃস্নেহ মাতা শাবককে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে শিকারের যত্ন, শিকার এনে শাবকদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। অনেক সময় বঙ্গবান পিতা, শিকার পরে কী পুত্র-কন্যাকে নিয়ে একত্রে ভাগ ভাগায়; পরিবার তথা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার ভিত্তির সূত্রটি পাওয়া যায় এর মধ্যে। স্তম্ভপায়ী শাবক ও মাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী নিবিড় করে তুলেছে প্রাকৃতিক জীবের এই প্রবৃত্তি। স্তম্ভপায়ী বুদ্ধি দক্ষতা গড়ে উঠে শিক্ষার মাধ্যমে, মাতাপিতার অভ্যাসকৃত থাকবার সুযোগ যে জাতের যত অধিক তাদের তত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও কৌশলী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। কাঠবিড়াল শত্রুর চুঁচোর মত অনুরক্ত স্তম্ভপায়ী সন্তানকে অল্প কিছুদিন আশ্রয় এবং দুধ, পোকামাকড়, মাংস প্রভৃতি খাদ্য সরবরাহ করে থালাস। তাদের শুধু মাতৃস্নেহ নয়, কোন প্রবৃত্তিই বুদ্ধিরতি অথবা অভিজ্ঞতালভের সুযোগ সুবিধা পায় না; ফলে প্রবৃত্তি কেবলমাত্র প্রবৃত্তিই থেকে যায়, বুদ্ধি বিবেচনার সহযোগিতা বিরহিত হয়ে বহুবৎ কাজ করে। অন্য পক্ষে বৈড়াল গোষ্ঠী, মীল শিকারটক জাতীয় উচ্চাঙ্গীর মাংসাদিদের মাতৃস্নেহ খাদ্য যোগানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সুদীর্ঘকাল ধরে কাছে রেখে শিকার ধরা শিক্ষা দিতে, আত্মমগ্ন পলয়ন থেকে আরম্ভ করে নিজের সকল অভিজ্ঞতা সন্তানের মনে অল্পপ্রবৃত্তি

করে দিতে এরা ক্রটি করে না। শিকারী পণ্ডের মাতৃস্নেহ ঔদার্য্যে, নমনীয়তার আদর্শস্থানীয়। কুকুর-বিড়ালমাতা প্রায়ই অপরের শাবক প্রতিপালন করে, কিন্তু অশ্ব ছাগল-ছানা পালন করেছে বা গাভী মেঘশাবককে খাওয়াচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত কয়টা আছে? কার্শগ্রুজ এক স্নেহশীল কুকুরের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, সে অসহায় কুকুট শাবককে ঠিক মানুষের মত অসীম ধৈর্য্য সহকারে পালন করেছিল; আবার, এক বিড়াল মুরগী-হাঁস-ছানাকে অত্যন্ত স্নেহ করত। একসঙ্গে চারটি সন্তান প্রসব করবার পর তার কাছে সন্তান-জাত ছয়টি কুকুটছানা এসে, তার পক্ষে এগুলোকে উপেক্ষা করাই স্বাভাবিক, কিন্তু আশ্চর্য্য, সে দিনের পর দিন ঐ পালিত সন্তানদের নিজ সন্তানদের সঙ্গে পরম স্নেহে লালনপালন করতে লাগল, কুকুট ছানাগুলো ঠুকঠুক গলা লোমশূন্য করে দিলেও সে নির্ভীকার। বানর বনমাতৃস্নেহের মাতৃস্নেহের পরিধি আরও ব্যাপক ও উদার। সমস্ত উচ্চশ্রেণীর স্তম্ভপায়ীর মধ্যে মাতৃস্নেহের প্রভাব বিস্তৃত ও তীব্র। রোমানিজ একটি তিমিমাছের অপূর্ণ মাতৃস্নেহের কথা উল্লেখ করেছেন: গত শতাব্দীতে উত্তরসাগরে একটি বাচ্চা তিমিকে হার্পূনবিদ্ধ করে জাহাজে তোলা হয়, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল এক হৃদয়তনু মাদী তিমি জাহাজটির পাশে ভেসে উঠে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে চলতে শুরু করেছে—একবার ডোবে আবার ভেসে ওঠে, জাহাজের সঙ্গ ছাড়ে না, নিরতিশয় বেদনায় ছটফট করতে থাকে, নিস্তেজ বিপদ অগ্রাহ্য করে সন্তানকে রক্ষার স্থির ও অদম্য সঙ্কল্প তার মনে। নাবিকরা অবশেষে হার্পূনের পর হার্পূন মেরে ফায়ের করেছে, তবু সে একদারও পালাবার চেষ্টা করে নি। অবশেষে নাবিকদের হার্পূনের আঘাতেই তার সকল ব্যথার অবসান হয়েছে। মাতৃস্নেহের এই যে অপূর্ণ রূপ, শাবকরা বিপন্ন হলে লেলর সন্তান সন্ধ্যা ও নিক্তিশালী প্রাণী দুটে আসে সাহায্যার্থে; য ছুঁছে-ছুঁড়িবেব একটি কাতর আহ্বান পক্ষীমাতাকে সন্তানের পাশে টেনে আসে, সেই আর্তবর স্তম্ভপায়ী-জগতে কল সবল সক্ষম পুরুষকে উত্তেজিত করবার পক্ষে পর্যাপ্ত। শিকারে সহযোগিতা: যুধ-বিকাশের ভিত্তি এ কথা সত্য, তবে যুধের ঐক্য ও সংহতি বিধানের মূলে স্নেহ-কল্পনার প্রভাব অপরিমিত। কেবল আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের গরু যুধজীবন স্থায়ী হতে পারে না, সেখানে দাম্পত্য প্রেম: মাতৃস্নেহের মধুর দিকটি মুগ্ধ। এইজন্য স্তম্ভপায়ী নীবেব আবির্ভাবের পূর্বে সংহতি বা ঐক্যের কোন সম্ভাবনা ছিল না, পরস্পরের প্রতি সহজ ও স্বাভাবিক সহানুভূতি থেকে সহযোগিতা এবং সর্বক্ষেত্রে একরূপ সাহায্য পদস্পর্শের লক্ষ্য ঘনিষ্ঠতর করে তুলেছে। যুধের প্রয়োজনীয় বিকাশ

ঘটেছে এইদিক থেকে। মানুষের সমাজগোষ্ঠী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে স্নেহ-ঐতির প্রভাব যথেষ্ট। পরিবার প্রতিষ্ঠার মূল জনন-বৃত্তি ও স্নাতুমার বৃত্তির সমন্বয়, অমুদার আত্মসম্মত-প্রবণতা অবদানিত হয়েছে শ্রমসাধ্য সন্তান-পরিচর্যায়। গোষ্ঠী তথা সামাজিক সমুদ্বির পক্ষে বিবাহ যেমন অপরিহার্য্য, পিতামাতার কর্তব্য ঠিক অমুরূপ—তাই প্রত্যেক ধর্মে সামাজিক অমুশাসনে সজ্ঞারে এই দুইটির সবিশেষ প্রাধান্য লোকাচার থেকে আরম্ভ করে দেশজ আইন কানুন প্রভৃতি এদের বৈধ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, পবিত্র ভাববাক্সনা দিয়ে উচ্চ আদর্শজাত করা হয়েছে।

স্তম্ভপায়ী জীবের অভ্যাসের কিছু পূর্বে হতে সন্তানরক্ষার দায়িত্ব স্থল অপরিণত অবস্থা পরিত্যাগ করে ক্রমশঃ মানসিক বোধের পর্যায়ভুক্ত হচ্ছিল। প্রথমতঃ, সন্তান জন্মসংখ্যা প্রভূত পরিমাণে কমে আসায় লালন-পালনের দায়িত্ব সহজ হয়ে এল। শত শত আত্মজকে রক্ষা করা অসম্ভব, সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হ্রাসটিতে এসে দাঁড়াতে স্তম্ভরূপে দেখাশোনার অবসর মিলল, সেই সঙ্গে বাড়ল ঘনিষ্ঠতা ও স্বজনবোধ। দ্বিতীয়তঃ, পক্ষী ও উচ্চশ্রেণীর জীবের শৈশব-অসহায়তা অমূল্য পরিবর্তন করে দিল পিতামাতার স্বভাব। ক্ষীণ দুর্বল আত্মজকে উপেক্ষা করা কঠিন, মনের স্নাতুমার ভাব দান: বোধে আসাতে মাতৃস্নেহের মাধ্যমে আনন্দের স্বাদ অমুদৃত হতে লাগল, দূততর হয়ে উঠল আত্মজ ও পিতামাতার সম্পর্ক। সন্তান পালনের দায়িত্ববোধ উচ্চ-জীবকুলে নিবিড়ভাবে অমুদৃত। জাতি রক্ষায় প্রযুক্ত বলে অপর সমস্ত প্ররতি: ছাপিয়ে উঠেছে এই প্রবৃত্তি, মাতৃশক্তির নীরব সমাবেশ এখানে, ব্যক্তিগত হৃৎস্পন্দে ক্রমশঃ এমনকি যুধ্য পর্যাপ্ত এর কাছে তুচ্ছ।

স্তম্ভপায়ীদের মধ্যে ক্যাডাক্স ওপসম ওলাদী সর্বাপেক্ষা আদিম, এরাও সন্তানকে দেহসংলগ্ন থলিতে নিয়ে বেড়ায়। প্রসবাস্তে থলিতে রাখবার বুদ্ধি নেই, সন্তান অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে নিজেই থলিতে প্রবেশ করে। প্রবেশ-পথও অনিশ্চিত; শিশু প্রায়ই ভুল করে বিপদে চলে যায়, মাতার ক্রক্ষেপ থাকে না। মায়ের কোলে পিঠে থেকে জাতীয় বিশেষত্ব শিখা করে অনেকেই। জলহস্তী-বীবর সিঙ্ক-ঘোটকের শাবক সন্তরণের পাঠ গ্রহণ করে স্বচ্ছ চড়ে; চামড়িকে অসহায় অবস্থায় জয়গ্রহণ করে, তখন মাতার পক্ষপুটই তার আশ্রয়, প্রথমে মাতৃদুগ্ধ, পরে চর্কিত ফলপাতা তার আহার। বানর, বনমাতৃ ও মানুষের সন্তানপালনে বিশেষ পার্থক্য নেই, মাতাপিতা ও সন্তানের কর্তব্যবৃত্তি পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে সংস্থাপিত ও সংহত। মানবী তার শিশু-সন্তানকে খাওয়ানো, পরিচ্ছন্ন রাখা এবং



তার সেবা-পরিচরায় সময় অতিবাহিত করে : বানরী  
মাতাকে সম্বন্ধে বক্ষণীয় সম্ভানের পরিচর্যারই দেখা যায়,  
সম্ভানের বিপদ অস্বস্থতার তার উৎকর্ষণ অন্তর্নেই, মৃত-  
সম্ভানকে বানরীর ক্রোড়যুক্ত করা বিষয় বাপার। অবিকল  
মানুষের মত নীরপ গৈরী সকল ক্রোশ সহ করে তার হৃদয়।  
মাতামহের অভিব্যক্তিযুক্ত কাব্যকলাপ কেবল যে সম্ভানই  
শিক্ষালাভ করে ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট হয়ে ওঠে তাই নয়, পিতা  
মাতার অন্তরেও এই সময় অনেক গুণের সমাবেশ হয়  
আনন্দ-বিসাদেব, সুখ-দুঃখেব, যে মানসিক অস্থিত্তি পশু-জনা  
জন্মে প্রকৃত, মানব-জনা সেই পুণ্যকাজেই যে বিভা—  
সেই অন্তর্গত সুত্র রূপে অক্ষয়নীর বিকাশ মানব সভ্যতার  
অন্তঃস্থল বিদ্যায়িত পশুজগতে এ প্রকৃতি পূর্বনিষ্টি ও  
সুদূর, মৌলিক সমবন্ধের ক্ষুদ্র পরিচয় করছে—বিক্রি ও  
বিলেপন ক্ষমতা। তার কল্যাণে পশুজগৎ ও মানুষের  
জগতের সমাবেশ এইখানেই জন্মলাভের অভ্যন্তরীণ স্তর  
পার্বত্যের আবির্ভাব ঘটবে হয়েছে, দুটি বিদ্যমান প্রকার  
এক স্তরে এদের মিলন, মানব-অভিব্যক্তি তার কাছাকাছি  
নয়, ক্রমাগত চলছে অগ্রগতিতে ও, পশু-বিশ্বের হয়েছে বিদ্যমান

যুক্তি-প্রজ্ঞার—মানুষ উন্নত এই পক্ষে। শিশুর চেষ্টাচর্চাইবে  
জননী অস্থির হয়ে উঠবে এ পক্ষে, নিম্ন স্তরের স্তরপারীর  
সহায়ত্ব নিক্ত সম্ভানকে নিক্ত জগতের সম্ভানকে অতিক্রম  
করবে এটা আশা করা যায় না। উচ্চ স্তরপারী বোধ হয়  
সমবেদনা কতকটা অনুভব করে, দশ পাড়, সিঁচ বা  
নেকড়ে অনেক সময় নির্মিত তৃপ্ত পশুজগৎকে পালন করে,  
বানর ও বনমাতৃসদেব জেহা-কাজে একদা প্রথম পাকার  
শরণ করে, সে নিঃসন্তান জননী পোষাপুত্র হতে যথেষ্ট  
আনন্দ পায়, আলোকচ্ছবিগণ এক মালগাউ, দোকান একটি  
দোকান লাফিয়ে পাড় ফুটল কয়েকটি শাপক-পরিহৃত এক  
কুকুরের কাছে, কিছু বলেই দেখা গেল তাকে তাড় করে  
আমছে কুকুরটি, বনমাতৃ হস্তে একটি কুকুর  
অপসংস্থ আক্রমণ প্রতিপাদ্য করছে : ততক্ষণে পশু  
ছাড় দরোহ, কিছু বোঝাটি কুকুরছান ছাড়াই, পশুজগৎ  
পায় ভাব দিত, পশুজগৎ তার নিজেকে বক্ষণ করে  
অবশ্য বনমাতৃটি সংস্থান আদর্শের বাস হাল, যখন  
দেখা গেল সে বনমাতৃ কনিষ্ঠ পশুটি বক্ষণ করতে  
না পার

## শিল্প-সংরক্ষণ সমস্যা

শ্রী কালীচরণ পান

বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল, এমন কেবল  
নানা শিল্প দ্বিগুণ হওয়ায় যথেষ্ট প্রয়োজন পড়ে নাই। এটা নতুন  
বস্তু পুরাতন সৃষ্টি করার উপর প্রাচীন শিল্প কতিপয় হইয়াছে,  
লোপ প্রাপ্তির উপক্রম হইয়াছে।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর হইতেই বনমাতৃর চাপে সংরক্ষণ-বস্থা  
এবং নবায়ন শিল্পের বিদেশী শিল্পের সাহিত্য অসম প্রতিযোগিতা বক্ষণ  
করিবার পন্থা অবলম্বন করা হইতে থাকে, কিন্তু প্রাচীন শিল্পশিল্প  
পুনরুজ্জীবনের জন্য অর্থাৎ উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। আর  
মিলিট বা চীনা থাকে, তাহাতে অধ্যয়নকর ফল পাওয়া যায় নাই।  
মাত্র স্বাধীন ভারত নামা ভাবে শিল্প-সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছে এবং  
যে নীতি অবলম্বন করা হইতেছে, পরীক্ষাকালে সকল হইলে  
এটা বাপক ফেলে চূড়ান্ত মতামত বলিয়া গণ্য হইবে।

বহুতর শিল্প নতুন ও পুরাতন গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধায় কোনও  
প্রকারে গঠিয়া আছে, আবার উত্তর মধ্যে বাতারা কল্যাণ ও শক্তি-  
শালী, তাহার নতুন অবস্থার সঠিত নিজেদের পক্ষে পাওয়াইয়া  
প্রতিদ্বন্দীর সমকক্ষতা করিতে সক্ষম হইতেছে। শেখোজ শ্রেণীর

শিল্প বিষয়ে চিন্তার এই করা নাই - যে প্রাচীন বা প্রাচীন হই  
যত্নের বক্ষণ পাইবে একমাত্র দাবি নয়, বক্ষণের বাধ্য হইবে  
বস্তু শিল্পের জীবনকাল সম্পন্ন হইলেও নতুন জগৎ - সমস্যা  
হইলেই লইয়া

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কতিপয়শিল্পই এক পন্থার অস্তিত্ব  
এবং উচ্চ বস্তু বক্ষণের শিল্পের স্তিত্ব বক্ষণ করা এক প্রকার  
অসম্ভব, যদি আমরা ওঁদের প্রাচীন প্রথাগত জীবনযাত্রানীতিতে  
কণ প্রস্থই না হই। কিন্তু কখন হইতেছে, হইতে পারে সত্তর নাহে  
কালের গতিতে কাঁচের পরিবর্তন হইয়াছে, নানা দেশের সাহিত্য  
মেলমেশার ফলে নতুন ভাব আদিয়া পড়িয়াছে এবং নানা প্রকার  
দেশী বিদেশী দ্রব্য ঘরে পক্ষেবর হইলে মিডাইবার ব্যবস্থা  
হইয়াছে। অতঃপর নানা চেষ্টা ও আর্থিক কতিপয় সত্তর কতকগুলি  
শিল্প যে আর উদ্ধার করা যাইবে না, তাহা মানিয়া লইতেই  
হইবে।

সমস্যা সেই শ্রেণীর শিল্প লইয়া যেগুলি কেবল প্রাচীন নয়,  
কেবল যে শিল্পনৈপুণ্যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া

ছিল তাহাও নহে, উপরন্তু যে সকল শিল্পের সচিব বহু পরীবারীর স্বার্থ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। আবহাওয়া অনুকূল, এক কালে যেমন ছিল তেমনই আছে। ব্যবহারের স্বাভাবিক পরিবর্তন হয় নাই। উপরন্তু নতুন দেশে নতুন ধরণের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় চাচিল বন্ধি পাইয়াছে, অথচ ক্রমেই সেই শিল্প বিক্রয় হইয়া পড়িয়া। অপর দেশকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

মুশলিম, কাস্ত, পিকল, শকরা, শঙ্খ, বয়ন, কৃষি-যন্ত্রপাতি, ঘানি প্রভৃতি সকল শিল্পই এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করা বাটতে পারে। কিন্তু দেশ-বিদেশের চাহিদা ও ব্যবহারের কথা ধরিলে বয়ন-শিল্প, বিশেষতঃ রেশম-শিল্পকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া বাটতে পারে।

রেশম শিল্পের দুইটি প্রধান ও স্বতন্ত্র দিক আছে। প্রথম, ণ্ডী-পালন হইতে রেশম "লাইট" বা ছড়ি করা। অর্থাৎ, চিহ্নীয়, ছড়ি রেশমকে বয়ন করিয়া বস্ত্র রূপে পরিণত করা। দুঃপের বিষয়, অপব্যবহার ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের মত রেশম-শিল্পের বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য দেশ, বিশেষতঃ জাপান, যে সকল উন্নতিসাধন করিয়াছে, আমাদের দেশে তাহা হয় নাই। ক্রমে সদগ রেশম-শিল্প যে পর্যায়ের অসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সরকারী সাহায্যসাহায্যে, বৈদেশিক বাসকটে যেমন অস্বাভাবিক দিব্য ব্যবস্থা আছে, সেট ভাবে উচ্চতর বাটাইবার চেষ্টা হইতেছে।

অক্সিজেন দিয়া মাতৃসকে চিরকাল বাটাইয়া রাপা যায় না। ভিতর হইতে জীবনীশক্তি প্রবল হইয়া বায়ুমণ্ডল হইতে বায়ুগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় অসিয়া উপনীত হওয়া যায়। আমাদের দেশের রেশম প্রভৃতি শিল্পকে সেই অবস্থার সচিব তুলনা করিতে হয়, অর্থাৎ সরকারী সাহায্য-ব্যবস্থার সাহায্যে উচ্চতর বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করা হইতেছে। কিন্তু যাহা কিছুই করা যাক, তাহাতে পণ্যের দর নিতান্ত বেগা পড়িয়া গেলে লোকে হ্রস্ব করিয়া অসমর্থ হইয়া পড়ে। মিতাক্ষ প্রাথমিকভাবে জল্ল অল্প ও লক্ষ্যনিম্নবর্ণের বস্ত্র হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু রেশম সে পথে বড়লক নহে। স্বতরাং সর্বদা সতর্ক হইতে হয় যে, ক্রমে লোকে রেশম ব্যবহারে অনন্তস্থ হইলে, চাহিদা হ্রাস পাইবে। পূর্বে নৈতিক ক্রিয়াক্ষেত্রের বা রেশম-বস্ত্র পরিধানের একটা রীতি ছিল, আজ তাহা বিলুপ্তপ্রায়। স্বতরাং বিলাতিনী মার্কিন নারী আজ নতুন প্রধান কেন্দ্র। তাহা নবিত ভারতবাসীর গৃহে অচল হইয়া পড়িলে

বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেশম-বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস, দেশ-ছড়ি প্রস্তুতে অবতরণ, দেশের প্রসাধন বিচারের বিধিব্যবস্থার অভাব, বিক্রয়-কলের উপলব্ধ প্রভৃতি কারণে রেশম আজ বিপন্ন। কেবল রক্ষণ-শুদ্ধ প্রভৃতির সাহায্যে উচ্চতর ওচ্চতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসমর্থ। বহুপ্রতি উৎকর্ষসাধন ও পুণঃস্থাপন করিতে না পারিলে রেশম-শিল্পের উচ্চতর পাইবার সম্ভাবনা নাই।

আজ রেশম-শিল্প সম্বন্ধে যে দোষ-কুটি প্রযোজ্য, ভারতীয়

অন্যান্য বস্ত্রের শিল্পের মধ্যেও তাহা প্রবেশ করিয়াছে। রক্ষণের একটা সাহায্য-কাল নির্ধারিত করিয়া শিল্পের মূল উন্নতিসাধনই সকলের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে এক কালে এই সকল শিল্পের আত্মরক্ষা করা সহজ হইতে পারিবে।

কার্যক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছে, তাহা প্রয়োজনের বিপরীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ পর্যন্ত যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে রেশম-শিল্পের উন্নতির সহায়ক বিশেষ কিছু হয় নাই, স্বতরাং তাহা বাটিয়া উঠিবার বা তাহার পক্ষে বাটিয়া থাকিবারও যথেষ্ট শক্তি-সক্ষম হইতেছে না। এদিকে বিদেশী কৃত্রিম রেশম ত ছিলট, দেশেও তাহা উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে। একপ রেশমের দাম কম। দরিদ্র দেশের লোকের রেশমের সপ্ন মিটিয়াবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইবার কথা।

এ দেশের শিল্পের দুর্বলতার এইখানেই শেষ নহে। বিদেশের শিল্প আমাদের কাজে লাগে না, উপরন্তু তাহা আমাদের বিরুদ্ধে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাটী ক্ষতির পর্যায়ে পড়ে। জাপানে বস্ত্র শিল্পের গতিত্ব, কিন্তু তাহা আমাদের কাজে লাগে না। মাতৃগের দাব্যে যেমন গতিত্বগতিক দাব্য অসিয়া বাসা বসিয়াছে, বস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রেও সেই এক অবস্থা বর্তমান। কোনও এক দেশের দান অপর দেশে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হইতে সমর্থ হইয়া না। দেশের ভাব-চিন্তা, লোকের সংস্কার, পট প্রভৃতি, পুরাতন প্রথা-প্রথা মতাদেশ অধ্যয়ন, কক্ষে প্রেরণা ও কৃশলতা অজ্ঞান দেশভেদে বিচার হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু পুরাতনের সাহায্য করিয়া নতুন পদ্ধতির সচিব তাহা রাখিয়া চিনিতে শিখা করা সকল জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতে যে জাতি অধম তাহা উচ্চতর হইয়া, অর্থাৎ সেই জাতির উচ্চ-শক্তি লোপ পাইবার পথে চলিয়াছে।

রেশম যেন বিদেশী আমদানীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া হটিতেছে, কিন্তু এমন ত সম্ভব নয়। যাহা পাইবার নিমিত্ত, যাহা অবতরণকাল দেশের লোকের ক্ষমতা অল্প যোগাতিয়া অসিয়া-গাড়ে যাব এমনও বস্ত্র লোক যাহার উপর নির্ভর করিয়া আছে, কিন্তু আজ তাহা উচ্চতর তাহার স্বাসকট উপলব্ধ হইয়াছে। দেশে উৎপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য দরাকে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মাটির পাতের বিপক্ষে চীনা-মাটি, এনামেল, কাচ, লৌহ, মিনিয়াম, প্রাক্সিস, —এতগুলি শত্রু জুটিয়াছে। উচ্চতর অধিকাংশই দেশে প্রস্তুত হইতেছে। পিতল কাঁসা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে, তাহা সফল মাপাঙ্গ সম্বন্ধেই সফল করিয়াছে। তাহা ছাড়া আবার পিতল, কাঁসাও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু উচ্চতর বস্ত্র হওয়া হইয়া বা বড় একটা শিল্প গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল। এখন তাহারও বিক্রয়, মুশলিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চলিয়াছে।

দেশীয় পরীশিল্প রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় বস্ত্র শিল্পজাত পণ্যের উপর বিবিধ বর সাধা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাও রক্ষণশীল। কলের কাপড়, তেল, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর দাব্য করা বহুবিধ ট্যাক্স সাহায্যে উৎপাদন-প্রসার-চেষ্টা বাহ্যত

হইতেছে; আশা—কুটাব-শিল্প বন্ধা পাইবে এবং তাহার আত্মবঙ্গিক সফল লোকে ভোগ করিবে।

এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন—প্রকৃতপক্ষে ইহা সফল প্রসবে সমর্থ হইবে, অথবা স্বল্পপ্রস্থ হুসী প্রাঃ বিসর্জন দিয়া লোভী অপরিণামদর্শী কড়পক্ষকে বিপন্ন করিয়া ফেলিবে। জাপানী শিকা গিয়াছে, এখন ভারতের কুটাব-শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য সপ্ত-সমুদ্র পার হইতে সপ্ত-বিজ্ঞানী আসিয়া ভারতের মতাক্ষেপে সমবেত হইয়াছেন, স্তূতিভেনের তুটী মতাজ্ঞানী এই সপ্ত-বি-মণ্ডলের পুরোভাগে

স্থাপিত হইয়াছেন। দেশের অর্থ পর্যাণ্ড মনে হইতেছে না, কোর্ড স্থাপিত অর্থভাগুর এই কাসের মতাস্তা করিতে ৯২,০০০ ডলার সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ইহার কলাফল জানিবার জন্য দেশের লোক উৎস্রীব হইয়া থাকিলে। কুটাব-শিল্প বন্ধাক্ষে দেশীয় শিল্পের উপর ট্যাক্সের চাপের কুফল চারিদিকে প্রকাশ পাইতেছে, স্তূতবাঃ যে-কোনও উপায়ে লাটী না ভাঙ্গিয়া যদি সাপ মারা যায় তাহাই লোকে একান্ত মনে বামনা করিতেছে।

## অর্থবর্ষবেদ

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

যজ্ঞের উচ্চ বেদ : সে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় তিন বনে, অর্থবর্ষ বর্ষের প্রয়োজন নাই, একথা মনে হইতে পারে।

ইহা সত্য নহে : যজ্ঞের চারি জন পুরোহিত, হোতা, উদগাতা, অধ্বর্যু, এবং ব্রহ্মা : হোতার উচ্চ অর্থবর্ষ, উদগাতার উচ্চ সামবেদ ব্রহ্মবেদ অধ্বর্যুর প্রয়োজন সাধন করে এবং মনুস্মৃতি, যজ্ঞের জ্যোতিষ অধ্যয়ন।

গোপথ প্রাঞ্চল বলেন

"অর্থ : পঞ্চাপতি সোমেন অক্ষমাণো বেদানু উবাচ : কা বেদাচারম নীধ্যাত কা অধ্বর্যু মধ্য কা উদগাতারম্ কা ব্রহ্মাণম ইতি । ত উচ্যত : অগ্নিদেব হোতারম্ ব্রহ্মদেব যজুর্বিদমধ্বর্যু ম সামাবিদম উদগাতারম্ । অধ্বর্যুঃ সোমো বিনা ব্রহ্মাণম্ । তথা হোতা যজ্ঞ চতুষ্পাদ পুত্রিহিতঃ ।" (গোপথ ২, ২৮)

সোম যজ্ঞ করিবেন, ব্রহ্মা এই বেদ বলিলেন। প্রথমে জাগল কাহাকে হোতা করিব, কাহাকে অধ্বর্যু, কাহাকে উদগাতা, কাহাকে ব্রহ্মা করিব। তাহারা বলিল অগ্নিকে হোতা, যজুর্বিদকে অধ্বর্যু, সামবিনকে উদগাতা এবং অধ্বাঙ্গিরোবিনকে ব্রহ্মা কর। এই ভাবে হোতার যজ্ঞ চারি পায়ের দাঁড়াইতে পারিল।

ব্রহ্মকর্তব্য-সম্পাদক এই বেদবে গোপথ প্রাঞ্চল প্রেষ্ঠে বলিয়াছেন।

প্রেষ্ঠো তি বেদম্পসোবিভ্রাতো ব্রহ্মজ্ঞানাঃ হৃদয়ে সংবভূব।

—তপস্যায় অধিজাত, ব্রহ্মাবিদ অগ্নিগণের হৃদয়ে ইহার প্রকাশ :

গোপথ ইহার প্রশংসায় বলিতেছেন :

"এতদ্ বৈ ভূয়িষ্ঠং ব্রহ্ম যচ্ চন্দ্রবিসমঃ । যে অগ্নিবিসমঃ স বসঃ

যে ধবানন্তচ্ ভেষজম্ । যচ্ ভেষজম্ তদমৃতং । যচ্ অমৃতং তচ্ একং ।

অর্থবর্ষবেদ দুই অধ্বির তপোবিভ্রার কল—একজন অর্থবর্ষ বা চন্দ্র, অপরজন অগ্নিবিসম। অগ্নিবিসমের অবদান রসময়, অর্থবর্ষের দান ভেষজ-স্বরূপ। এই ভেষজ অমৃততুল্য। বাহাই অমৃত তাহাই এক।

অর্থবর্ষ-পরিণিষ্ট বলেন

ন যিনির্ন চ নক্ষত্রাঃ ন গ্রহে, ন চ চন্দ্রমাঃ ।

অর্থবর্ষ সাংসার্য্য। সর্বসিদ্ধিবিধিহিতঃ ।

অর্থবর্ষ মতোঃ জ্ঞান ত্রিপি বিচার নাই, নক্ষত্র দেখিবার দরকার নাই, কোন্ গ্রহ, যে চন্দ্র তাহার সন্ধান করিতে হয় না—এই মন্ত্র অসিগত হইলেই সর্বসিদ্ধি ঘটে।

পরিণিষ্ট অর্থবর্ষ বলে, যে পঞ্চাঙ্গের মধ্যে পাণ্ডিগ্ৰহণ অর্থবর্ষ পুরোহিত থাকেন সেই হোতা ঐকি পার, নিকপত্ব হয়। এই জ্ঞান ব্রহ্মা স্নিহিতক্রিয় অর্থবর্ষগণকে দান ও সম্মান দিয়া প্রত্যাহ সাংবর্ধনা করিবেন।

অর্থবর্ষকে অনেক কেবল উচ্চতিন, বর্ষীকরণ প্রভৃতি অর্থবর্ষ মনে করেন ইহারা ভুল করেন। অর্থবর্ষবেদে মধ্যওলি ভাবে মধ্যমে জ্ঞান-পরিমায় পড়েছে সত্যিকাই তুলনীয়। প্রথম পণ্ডের একটি যজ্ঞ হোতা ইহার সাহায্য প্রমাণ করিব। এই যজ্ঞ যেখানে জননের প্রার্থনার উচ্চতম প্রথম—কোনিক ইহার নাম পূর্ব দিয়াছেন।

৮ যে ত্রিযজ্ঞাঃ পরিযুক্ত বিধা কপাদি বিদিতঃ ।

বাচস্পতিবলা তেষাং তথো বহু মধ্যম্ মে ১১

পুনরেষি বাচস্পতে দেবেন হনসা সতঃ ।

বসোপ্ততে নিঃস্রয় যথোবাগ্ন মরি শ্রমঃ ১২

ইহেবাতি বিতনুভে আশ্বী ইব ভায়া ।

বাচস্পতির্নি যজ্ঞতু যথোবাগ্ন মরি শ্রমঃ ১৩

উপহৃতো বাচস্পতিক্রপামানু বাচস্পতির্হুগ্রমঃ ।

যঃ ক্রতেন গমেমহি মা ক্রতেন বিরাধি ১৪

যে ত্রিসপ্ত দেবগণ নানাক্রমে জগতে পাইব্রহ্মণ করেন, বাকাধিপতি বৃহস্পতি তাহাদের সামশক্তি আমার মাঝে প্রেরণ করুন, তাহাদের তত্ত্ব তনিমায় আমি যেন উদ্ধৃত হইয়া উঠি। যে দেবতা ব্রহ্মপতি, তুমি পুনরায় এস, তুমি আমনয়ন কর দিবা মন ও দিবা বারণা, তুমি কল্যাণের বিধাতা, আমার হৃদয়ে বসন কর, বাহা কিছু



ত্রিধাবর্ণা স্তব্যঃ পাবক। য'স' জাতঃ সবিভা যাবস্থিঃ ।  
 যা অগ্নিঃ পদে নদিয়ে স্তব্য'স্তান ন' আপঃ শ' স্তো'না ভবন্ত ।  
 য'হা বাতা বগণো য'ন্তি যদো সত্য'নতে অবপশ্বন জনানাম্ ।  
 যা ক্রি' গন্তে নদিয়ে স্তব্য'স্তান ৩ প' ৭' স্তো'না ভবন্ত ২২  
 যাসাং দেবা নিবি কৃষ্ণ'স্ত ভব' য' অস্তবিয়ে বহুনা ভবন্তি ।  
 যা পৃথ' গন্তে নদিয়ে স্তব্য'স্তান ন' আপঃ শ' স্তো'না ভবন্ত ৩৩  
 শিবেন যা তপসা পশ'তাপঃ শিবয়া তপোপ'শ্রুত' যদঃ মে ।  
 ততশ্চ'তঃ স্তব্যঃ য'স' পাবক'স্তান ন' আপঃ শ' স্তো'না ভবন্ত ২৬

[illegible]

द्वैततन्त्रनाथ श्रवण

[illegible]

১৭: কলকাতা ও অষ্টাট ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে 'প্রশান্ত' প্রকৃতির গলা-  
খোলা পথ - চারদিকে হালকা হুড়ুর টোকা - নন্দা দিল্লি ছাড়া বিভেদ  
বাড়িয়ে তুলেছে। আমদের গভীর ও অন্তর্নিহিত 'অ' কাময়ে দিচ্ছে  
আমাদের মাংস এবং শক্তি। সর্বনিম্ন না আমরা 'কমি' হাতিয়ে  
পারব। শুধু পারছি, ততদিন সফল আত্মসম্মতিতে শুধু সংগ্রাম  
হবে নিঃশব্দ। সফলগ্রে প্রদেহন আমদের আত্মপ্রত্যয়ের উপর  
নতুন করে ভাঙিয়ে পড়া হলে এসে সমস্ত হওয়া। অতিসার  
পাতক ত্রিবার-রঞ্জিত পাতক। - হেচ পাত্র পাতকাত্মক নির্ভর  
সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে মৃত 'ন' হলে অত্যন্ত গুরুত্ব হবে : গলা-

রাজী ক্রাণের সমুদ্রেরও এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের ভাবা দরকার যে, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে ও অন্ধ সংস্কারবোধে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনের সু-উচ্চ আশা-আকাংক্ষা নিশ্চিষ্ট হতে চলছে। দেশের ইস্কুলে অর্থকরী বিদ্যা না শিগিয়ে প্রচলন করতে হবে সাময়িক শিক্ষা। একদা ভারতের সম্ভাবনাব্যাপ্তি শৌখিন ও বীথো দেশ-দেশান্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। অতীতের সেই মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অজ মেয়েদের সঙ্গে পৃথক ইস্কুলের কোন আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না। যারা পুরুষের পাশে দাঁড়াতে ভয় পান, তাঁরা কোনদিনই আত্মবিশ্বাস সঞ্জন করেন না। যুব-শক্তিরও অভাব জানা দরকার যে, কেবলমাত্র বাংলা প্রাচীন, শিবাজী বা টিপু স্বল্পতায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে দেশে বীরের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারবেন না। নওল অভিনয় করে যে অর্থবয় হয়—তা দিয়ে দেশের সত্যিকারের অনেক কাজ হয়। অমিতব্যয়ী ব্যক্তি দেশের শত্রু। তাদের পরিপোষক যারা তাঁর সমান অপরাধী। এই চরিত্রেরও যদি প্রত্যেকে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং আনন্দ নিয়ে মত্ত থাকি, তা হলে আমাদের সাধনা কি নিফল হবে না? অপরিণীত অর্থ নৈতিক চরিত্রের অবস্থান কি কোনদিনই সম্ভব হবে?

উত্তোক্তারা খুব হাততালি মিলেন। কিন্তু গ্রামের মধ্যে চি-চি পড়ে গেল সকলের মুখে একটু কথা, 'কোকো' ম্যুটিংর মেয়ে, কলকাতার কলেজে পড়ে—ছোট্ট মুখে বড় কথা শোভা পায় না। ছিঃ ছিঃ।

বৃদ্ধদের আড্ডাতেও অজ এটা কথা। জায়গীর্ষ মশায় চুকতেই বাচস্পতি মশায় বললেন, শুনেছ ভায়া, আমাদের সন্ধ্যাপের মেয়ের বড়ো—

পাশ থেকে ঘোষাল মশায় অবজার হাসি হেসে টিপ্তেনী কানলেন, আমাদের বলে কিনা গজাবতী। ওরে বাবা, এটা গজাবতীর বৈচে আছে বলে এখনো সমাজ-বাহ্যে বজায় রয়েছে।

জায়গীর্ষ মশায়কে গ্রামের 'পোপ' বললেও অজ্ঞান হয় না। তিনি সনৎ গাঙ্গুলীর পাশে বসে নাকে নখি গুঁজে বললেন, অর্কাটোনের কথা ধরবার মধ্যে না আনাই শেষ।

বাচস্পতি মশায়ের মনোপূত হ'ল না কথাটি—বেশ বোকা গেল। তিনি উৎসাহিতভাবে বললেন, ঘোর কলি ভায়া, নটলে এ এক-রতি মেয়ে বলে কিনা গড়তে হবে নতুন সমাজ—যে সমাজে শাস্ত্র শিষ্ট নারীকেও প্রয়োজনবোধে জাতিয়ার নিয়ে অঙ্গসর ভেঙে হবে। ভেঙে চুরুর করে দিতে হবে আমাদের সনাতন সমাজ—যে সমাজের আদর্শ সীতা, সবিত্রী, দময়ন্তী।

বৈচে থাকলে আরও কত কি শুনেতে পাবে। এখন আমাদের প্রতিবাদ করার মত গলার ডোংও নেই, ক্ষমতাও নেই।—জের টেনে গেলেন ঘোষাল মশায়।

আমরা এখনও মরি নি যে সমাজের বৃক বসে বার যা পুলিশ হাই করবে—কো-পারিস্ত হয়ে জানালেন বাচস্পতি মশায়।

সনৎ গাঙ্গুলী হুঁতাতের চেটোয় ক্রমাগত ঘুঁটি ঘসছিলেন

মনোমত দান কেলবার আশায়। কানের কাছে নিয়তই টেকখাই-টেকখাই করাতে বিষম হয়ে তিনি বললেন, এটা ধুতি-চাদরের দেশ, গলার দেশ—এখানে বিলিভী বুদ্ধবাকি খাটবে না। এখনো চক্র-সুখা উঠছে, এখনো বেদ-পুরাণ লোপ পায় নি। যদি মুণ্ডের কথাতাই সামাজিক প্রথা উর্দে দেওয়া যেত, তা হলে এদেশে সংস্কৃতি, সভ্যতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

বাচস্পতি মশায় বাধা দিয়ে বললেন, তুমি ভায়া কোন গবরই রাখো না। দেশের সবাই এখন হুজুগে মেতেছে। কালই মেপেবে খবরের কাগজে এ নিয়ে আন্দোলন স্রব্ধ হয়েছে। তখন ঘর সামলানো দায় হয়ে উঠবে।

এই কথায় সনৎ গাঙ্গুলীর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল। মাথা নেড়ে তিনি জ্ঞানালেন, ঠিকই বলছ দম্যপতি, প্রতিবাদ প্রয়োজন।

তখন ঠিক হ'ল কাল সকালে সকলে মিলে সন্ধ্যাপের কাছে গিয়ে মেয়ের উদ্ধৃতের ও হঠকারিতার প্রদঙ্গ উত্থাপন করবেন। সন্ধ্যাপ তেমন ছেলে নয়। দেব-ছিড়ে তার ভক্তি অগাধ। একথা শুনে সে মেয়েকে শাসন করতে বাধ্য হবে।

আবার হাড়ের ঘুঁটির খটাখটা শব্দ হ'ল। বারো প'জা সতেহো—উঠু হয়ে বসে টেকে উঠলেন সনৎ গাঙ্গুলী।

অপরূহের স্তমিত স্বাভাসক পাঁচ মন্দিরের অগাধ নিকম্বিক করছে। বেলা পড়ে আসছে। তার উপর কাল থেকে বেজায় দীপ্ত পড়েছে। তবু পালেরদেব খিড়িকির পুকুরের শান-দাঁধানো ঘাট জনশূন্য নয়। কায়ত-পিসি ঢাল ধুতে ধুতে মুখুজোদের ছোট-বোঁ অতসীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তুমি বোঁমা হাই বল, মেয়েমহাবীরের মুখে ওসব কথা মানায় না। হ'লট বা সে ব'জব মেয়ে। বল, স'স'র তো তাকেও করতে হবে। অউদুড়ো মেয়ে চিরকাল তো আর লম্বা লম্বা দুধি তাড়ুড়লে চলবে না? পরেশ পালের বোঁও ত কলেজে পড়া মেয়ে। কোনদিন তার মুখে একটা রা' শুনেছ? কলেজে পড়লে সবাই অমন খিজির হয় না।

বানুন-খুঁড়ীমা ঘড়ায় তল ভরতে এসেছিলেন। মনের মত কথা শুনে না বলে থাকতে পারলেন না, ডটো পাস করে ও যেন সাপের পাঁচ পা দেপেছে। সংসারে একবার চুকলে সব তুরকুটি ভেঙে যাবে। শুনেত পাই ত বিয়ের কথাবাত্তা হচ্ছে—হলে আমরা বাচি। নিত্য নতুন হুজুগের গোলায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। বলতে বাও নিক কোন কথা, অমন মা-মেয়ে তেড়ে আসবে। নিজেদের বেলায় দোষ নেই—যত দোষ নন্দ ঘোষ।

শুনলে ত বোঁমা—খুঁড়ী ত আর মিছে কথা বলবে না। রমান দিলে কায়ত-পিসি।

গহ্বরে মেয়ে এবং আধুনিকী হয়েও অতসী কিছু না বলে মাজা বাসনের গোছা নিয়ে উঠে গেল।

ময়রা-গিল্লী উঠে যাচ্ছিলেন ভিত্তে-কাপড়ে। এই কথা শুনে ফোঁস করে শুড়ে এলেন, বড়লোকদের কথায় আর যদি কণনও বিশ্বাস করি! বল, সেবারের কথা মনে আছে ত ঠাকুরবি? দেশ-

হুঙ্ক লোক মোটা চট পরে পরে মরল আর ওনারা দিবা মিহি কাপড় পরে ঘুরে বেড়ালেন। ভাঁওভায় আর ভুলছি নে। আগে দেখব ওরা এগিয়েছে—তবে এগোব।

কথাটা কয়েত-পিসিব খুব মনে ধরল। বললেন, নেড়া এক বারই বেলতলায় যায়।

বাসুন-গুড়ীমা বললেন, ঢাক-ঢাক ঝড়-ধড় করবে যত, বদ' ততই পেয়ে বসবে। ডেপুটি-গিল্লীর কানে একথা তোলা দরকার। তবে যদি ওদের চোতনা হয়।

কয়েত পিসি চিরদিনই স্পষ্টতায়িণী ও নিতীক। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে যদি কেউ যায়, ডেপুটি-পরিবারের জারিত্বের ভেত্রে দিয়ে আসতে পারি।

সবাই যাবার উজ্জা প্রকাশ করলেন। কাল সকালে যাওয়াই স্থির হ'ল।

তব সন্ধ্যা পলিয়ে গেল। বাস্তব অলো জ্বল উঠল। মডেল গার্লস ইন্সুলের চেম্বারেরে নামে এখনও শিক্ষিত্রীরা ভিড় করে লাড়িয়ে বয়েছেন। সকলের দুপেট উজ্জ্বল চিত্র। ইন্সুল টাউ গেলে বিপন্ন হয়ে তবে সবাইকেই। কয়েকটি টুটির পর বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যত সবাই সমান উদ্যমান।

ডেডমিট্রিস এম-এ, বি.টি। বুদ্ধিমত্তা, বড় ইন্সুল-ফেরত এগুনের অভিজ্ঞতায় ৬ বিভিন্ন লোকের সম্পর্কে গুটিক জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন যে, বিদ্যাদায়িত্বের অবস্থান দৃশ্যে গেলে প্রতিবাদ চালিয়ে কোন লাভ হবে না। সিপ্রাকে দুয়ের মধ্যে আমার চেষ্টা করাটী গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় অধিবাসিনী হিসাবেও বাউ, এবং সিপ্রার সত্যিকার বন্ধুত্বের খ্যাতিরেও বাউ, শিক্ষিত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে অমিয়ার সাহায্য প্রকৃত্ত আবশ্যক। এ কে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, মিটিং করে কেনই ফল হবে না। তার চেয়ে সিপ্রাকে এক দিন ইন্সুল দেখাবার নাম করে এইখানে নিয়ে এলেই কাজ বেশী হবে।

জবাবে অমিয়া জানালে, সিপ্রাকে আপনি চেনেন না চৈমদি। ৭৭ পেছনে আছে সবুজ-সঙ্গ। তাদের উত্থানিত্যেই ত সে এই সব করে বেড়াচ্ছে।

এই কথা শুনে ডেডমিট্রিসের আরও নামে যাবার কথা। কিন্তু তিনি স্বকীয় গাফীয়া বজায় রেখে বললেন, অমন যে জাঁদবেল ইন্সপেকট্রিস মিস দত্ত তাঁকেও যখন ডিট করতে পেরেছি, সিপ্রাকে না পারবার কোন কারণ নেই। ত'এক দিনের মধ্যেই যাতে তাকে ইন্সুলে নিয়ে আসতে পার, সেই চেষ্টাই এখন কর। আদর-আপায়নের পর সাধারণতঃ তার মন একটু না একটু ঘুরে পড়বেই। তখন তাকে বুঝিয়ে দেওয়া খুব শক্ত হবে না যে স্বাধীনতা, প্রত্যেক নরনারীই কামা। কিন্তু মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষসাধন বাতীত অন্তরে প্রকৃত স্বাধীনতাবোধ জাগতে পারে না। শিক্ষা সেই উৎকর্ষসাধনের বাহক। সুতরাং একমাত্র শিক্ষার ভেতর দিয়েই সামা, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-ভাব অন্তরে জাগিয়ে দেওয়া সম্ভব।

অমিয়া সঙ্গী বলে উঠল, সিপ্রা অত সহজে ভোলবার মেয়ে নয়

চৈমদি। সেগবেন তখন সে হাজার নজির দেখাতে শুরু করে দেবে।

ডেডমিট্রিস বললেন, আগে আমার কথা শেষ করতে দাও। এতেও যদি দেখি সে বাগ মানছে না, তখন যেমন করে যেমন-সিংতের হিসেস, স্তম্ভপা মুখাঙ্কিকে তাত করেছিল'ম সেই ব্যবস্থা করব। সবাই গিয়ে হাজির হব তার বাড়ীতে। প্রথমতঃ আমাদের সবাইকে দেপে সে নিজেকে খুব বড় বলে মনে করবে, তা'পর যখন জনবে যে আমরা তাকে অহুন্নয় জানাতেই এসেছি, দেখি তখন সে কেমন করে জ্ব'র বিদ্যাদায়িত্ব করবে?

এই কথা শুনে সকলের হেঁড়ে যেন প্রাণ এস।

অমিয়া সংসারে জানলে, নামের দিকে সিপ্রার বিষয় চকলতা আছে। ঠিক হয়েছে, কাল আমরা সবাই এখানে আসব। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে চৈমদি।

ডেডমিট্রিস সানন্দে সম্মতি জানালেন। সবাই ধুপীমুনে বিদায় নিলে

সাতটা বাজল।

নবাবদণ নামসমাজে সাতটা থেকে ফুল রিচার্সাল হবার কথা। সবাই এসে জমেছে। কিন্তু সে উৎসাহ নেই—প্রত্যেককে দেপে মনে হয় যেন ভেঙে পড়েছে। সিপ্রার এই নিতীকতার পিছনে অনেকের সহযোগিতা আছে, সে বিষয়ে সবাই যেমন একমত, তেমনি আবার অনেকে বিকলচরণ করতে ভয় পাবে এটাও অনিশ্চিত। হালদার মশায়ের প্রাক্ষণে অভিনয় হবার সব ঠিকাকা। তিনি আবার যেক্রপ ভীক প্রকৃতির তাতে এত কাণ্ডের পর রাজী হবেন বলে ত মনে হয় না। তা ছাড়া রাবের সেকেন্ডারী অরিন্দমের উপর সিপ্রার যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই নাটকে রামের ভূমিকায় অভিনয় করবে সে। সে যদি দৈর্ঘ্যে বসে তো এ বঙ্গবের মত নাটকের দফা গয়া। তার অনুপস্থিতি তাই সকলের মনকে জ্ব'রও নিকংসাতে ভরিয়ে ফুলেছে।

আটটাও যখন বেজে গেল, কেউ আর তপ করে থাকতে পারলে না, বললে, অরিন্দম যে শেষ পর্যন্ত ডেবাবে, এ আমি আগেই জানতাম। তখন পট পট করে বলেছিল'ম যে, অষ্টমী পূজার দিন নামিয়ে দাও। তখন দিলে এই হাজারাব মধ্যে ত আর পড়তে হ'ত না!

হাবু একমনে বিড়ি চানছিল। সপের থিয়েটারে বিভিন্ন গ্রামে অভিনয় করে যশ ও প্রতিষ্ঠা সে অর্জন করেছে। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গে তার সম্ভাবও আছে। বিভ্রিতে জোরে টান দিয়ে বললে, হালদার বাগড়া দিলেও কেউ আমাদের প্লে বন্ধ করতে পারবে না। পঁচিশে আমরা করবই। হালদার মশায় রাজী না হন, গুডেনের বখতলায় হবে। অরিন্দম না করতে চায় নৈজাটি থেকে রাম 'বয়ো' করে নিয়ে আসব।

চন্দ্রশেখর বলে উঠল, জোর করে প্লে করতে গেলে আরও কেলেঙ্কারী হবে। সবুজ-সঙ্গ মনে করলে সব পারে।

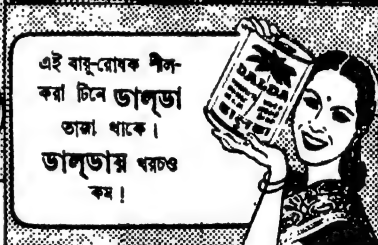


অধিকমূল্যে, এর দ্বারা সমুদ্র অস্ত-নো এ. রিলক কণ্ডের  
 ক্ষয় একটা চিহ্নিত শোনের ব্যবস্থা করছিল। উপরে গিয়ে কঁকে  
 দেখা যায় বরলায়, ঠিক হলে যে আমাদের 'প্রাচীন' হবে। মনে

বাচস্পতি মণায় জানলে গদগদ হয়ে বললেন, ধামের মধ্যে তোমার মত গুরুব জোড়া নেই বাবা। হুমি ছিলে বলেই তক-

# দেখুন, কেন ডাল্‌ডা বনস্বস্তি সব রকম রান্না-বারান্নার পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

“এখন ডাল্‌ডা দিয়ে রান্না করি বলে  
আমাদের পরিবারের সকলেই কেমন  
আনন্দ করে খায়।”



ডাল্‌ডার এই পাকপ্রণালীটি পরীক্ষা

ক'রে দেখুন—চমৎকার রান্না — মুগী - মশালা !

বেশ বড় বড় টুকরো কোরে মুগীটা কেটে নিন। পায়ে কোরে কাটা ছুটি টোমাটো, ছ চা-চামচ ঘন শুঁড়ো, তিন বড় চামচ ডাল্‌ডা নিয়ে তাতে মুগীর টুকরোগুলো, এক চা-চামচ হলুদ শুঁড়ো ও ছকাপ জল দিন। নরম হেঁতো করা রসুন, আদা আর পিঁয়াজ, চার কালি হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।

বাংলায় ডাল্‌ডা রন্ধন পুস্তক বেরুলো! ডাল্‌ডা রন্ধন পুস্তক এখন বাংলা, হিন্দী, তামিল ও ইংরেজিতে পাঠ্য। ৩০০ পাকপ্রণালী, তা ছাড়া বাহা, রান্নাঘর ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়। মাত্র মাত্র ১ টাকায় আর ডাকমাণ্ডল ব্যবদ ১০ আনা। আজই লিখে আনিতে নিম্ন-দি ডাল্‌ডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস, পোঃ, জাঃ, বর, নং ৩৫৩, বোম্বাই ১



## ডাল্‌ডা

সকল রকম রান্নার পক্ষে অতুলনীয়

১০, ৫, ২ ও ১ পাউন্ড টিনে পাওয়া যায়

HVM. 191-X58 BQ

বহুতর প্রণিভামহের প্রতিষ্ঠিত মল্লিকটির সংস্কার হ'ল। তোমাকে আর কি বলে আশীর্বাদ করব, তুমি রাজ্যেশ্বর হও।

বাচস্পতি মশারের দেখাদেখি সবাই উঠে দাঁড়ালেন।

কুণ্ড সাহেব উপরে গিয়ে দেখলেন, সবাই খুশ্মনে চলেছেন। পাইপ বেকিরে ধরে সেই দিকে তিনি তাকিয়ে বসলেন।

বেলা বাড়ল।

কারেত-পিসি জোট বেঁধে ডেপুটি-পরিবারকে নালিশ জানাতে বেরলেন। গেট খোলা। কিন্তু ঢুকেও ভয়ে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। কালো কাঁকড়া কুকুরটা এমন ভাবে হেড়ে এল যে, কামড়ে দেয় আর কি? ছুঁয়ে ফেললে হাঁদের নাটতে হয়, কামড়ে দিলে বেঁধে হয় স্বর্গের পথও হাঁদের বন্ধ। সেই ভেবে কেউই অ'র এগোতে সাহস করলেন না।

কারেত-পিসি আহগাছেব আড়ালে এসে বসলেন, অভ্যাকালকার বড়লোকদের সবাই কি অনাস্থ্য!

বামুন-খুড়ীমা ভের টেনে বসলেন, কুকুর পোষা মানে আর কিছুই নয়, গরীব ভিখারীদের ঢুকতে না দেওয়া—

কুকুরটা চণ্ডাং আবার হেড়ে এল সম্মুখে। পশ্চাত্তপসরণ সাকল্যমণ্ডিত হ'ল, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কিন্তু মুখোজ্জ্বল-গিরী আর একটু তলে মিলিটারী লাই' চণ্ডাং পড়লেন।

এমন দিনকাল পড়েছে যে এপোলেও বিপদ, পিছলেও বিপদ। কারেত-পিসির মস্তক: শুনে ভরবত-গুড়িনী ডা'ললেন, চম্ভমানদের জ্বালায় কি বাস্তব হেঁটে শুপ আছে দিদি!

ডেপুটি-পরিবার জঙ্কেট শাউ' পরে মে'বিরে বেরুজিলেন। কনভয়ের জন্তে গেট থেকে বেরিয়েই আতকে পড়লেন। তাকে দেখে সবাই গিয়ে ছেকে ধরলেন।

ডেপুটি-পরিবার কারেত-পিসিকে টিফেশ করে বসলেন, আপনার নাতির চাকরির কথা বলে রেগেছি। পালি না তলে ত আর ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না।

কারেত-পিসি উত্তরে ডা'ললেন, সে ত ঠিক কথাই মা—

ভরবত-গুড়িনী এগিয়ে গিয়ে বসলেন, আমায় ভাটপোড়াকে যদি কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পার মা, ভাড় ছাড়োয়। দিনরাত টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে আর বাড়ীতে এলেই বত ত'ধি।

আচ্ছা, বলব'খন—

বামুন-খুড়ীমা মুখ বাড়িয়ে বসলেন, নরেকেকে স্নোজ বলি একবার দেখা করে যেতে। এমন মুখচোরা ছেলে কখনো দেখি নি— একলা কিছুতেই আসতে চা'য় না।

একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। এখন আমার বড় ভাড়াভাড়ি। ন'টা আটাশের ট্রেন ধরতে হবে।

মুখোজ্জ্বল-গিরী এগিয়ে আসবার আগেই মোটির ছেড়ে দিল। তিনি নিজের ভাগের জন্তে আচ্ছি পেশ করতে না পারার নিতান্ত সন্মমলা হয়ে পড়লেন।

বেলা আরো বাড়ল।

মডেল গার্লস স্কুলের সাত জন শিক্ষয়িত্রীকেই জন ডিঙিরে হলঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখা গেল। সিপ্রা তখন ফোনে কার সঙ্গে কথা কইছিল। নিজের ক'র বাড়ার এত বড় একটা স্মরণ পেয়ে সে বেন মরীয়া হয়ে উঠল। কিন্তু দূরবর্তিনীর তথ্য তাড়া ছিল। কাভেই সে বিনায় নিলে। বাধা হয়ে শিপ্রাকে রিসিডার নামাতে হ'ল। টেলিফোন সামনে এসে সকলকে চিত্রাচিত্রের তার দাড়িয়ে থাকতে লেগে সে বললে, বসুন আপনারা।

সেফা ও চেয়ারের অভাব ছিল না ঘরে। সবাই বসল।

সিপ্রা বললে, যদিও বেলা হয়ে গেছে, তবুও সাতা কিছুতেই কাঁছে না। চায়ে কথা বলে আ'য়।

হেডমিষ্ট্রেস আপ'রি ডা'লবার আগেই সিপ্রা শুদ্ধ হয়ে গেল।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিয় কোন ফল হ'ল না। অল্পকণের মধ্যেই সিপ্রা নিজে চা', বিস্কু' মনে চা'ভির করলে।

আধুনিক সভ্যত'র হুতা রক্ষা করা প্রদ'ন অ'হ। কাভেই চায়ে পেরালা সবাইকে তুলে নিতে হ'ল।

প্রথম চুমুক দিয়ে ত'মিষ্ট্রেস বসলেন, আপন'র কাছ আমাদের যে জন্তে আসা, সেই কথাটাই অ'গ পাড়া যাক।

সিপ্রা শুধু মুখপনা ক্ষুভাবে তুলে ধরল।

হেডমিষ্ট্রেস বসলেন, আমাদের ঈশ্বর সঘঞ্জে আপ'নি যা'ই বলুন না কেন —

সে জাহের মেয়ে সে নয়—যার মুখ দেখলে আতঙ্ক ধরতে পারে না। একটুখানি ঘুঁকে পড়ে দূর তথচ শব্দ ধরে বললে, নিজেনের সঙ্গীর্ণতা ও দীনতা ঢেকে রাখবার দিন চলে গেছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অভাবের তাড়নায় আমাদের দেশের মেয়েরা বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেও উতস্কৃত: করছে না। তথচ দেশের ছেলেদের সঙ্গে পড়বার বেলাতেও আসে যত নীতিজ্ঞান। আপনাদের মধ্যে এ'ই সংস্কার না থাক'ই ব'হুনা'য়। আজ দরকার, পুরুষ ও নারীর সমান আত্মবিক'তা: সেই আত্মবিক'তা আসবে কোথা থেকে যদি আপনারা পরস্পরকে পাশাপাশি দাঁড়াতে না দেন।

হেডমিষ্ট্রেসও বোবা হয়ে যাবার মেয়ে নন। তিনি বললেন, আমরা সেজ্জো আসি নি। সমান অধিকার সঘঞ্জে আমরা সবাই একমত।—জগৎ'ল স্তর থেকে তিনি পুনরায় বলতে শুরু করলেন, তেসরা জাম্ভারী ঈশ্বরের প্রা'ইক। মিসেস দত্ত, ঈজপেক্ট্রেস অ'ফ স্কুলস, আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।—সিপ্রা বললে, আমার চেয়ে বোগা লোক খুঁজলে চের পাবেন। ঠাঁদের কাউকে এ অস্থায়ী কানালে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবে।

হেডমিষ্ট্রেস তৈরি হয়েই এসেছেন। প্রত্যুত্তরে হাসলেন,

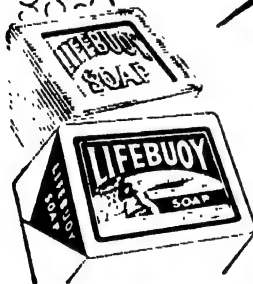
# রোজকার ধূলোময়লার

রোগবীজসমূহ থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন



লাইফবয়

যোগ্য  
আবরণে



যতটা কেন হ'লিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনই আপনি ধূলোময়লার  
রোগবীজসমূহ থেকে সংরক্ষণের কৃকি নিচ্ছেন। লাইফবয় সাবান মেখে  
নিতা: স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।  
লাইফবয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার  
বীজসমূহকে ধুয়ে সাত্ কোরে দেয় ও সাবান  
আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ রাখে।



## লাইফবয় সাবান

দৈনিকের রোগবীজসমূহ থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা

L. 227A-50 BG

এখানকার মেয়েরা আপনাকে পেলে বতখানি উৎসাহিত হবে, কেম্রিক্সের গ্রাজুয়েট এলেও কি তারা ততখানি খুশী হতে পারবে ভেবেছেন।

অমিয়া বললে, উঠুন চৈতন্য, বেলা হয়ে গেছে অনেক। পরক্ষণেই সিঁথার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আমি হলে ভাই তোমার মত না নিয়েই কাণ্ডে নাম ছাপিয়ে দিতাম। দেশেতাম দেশের স্কুলে না, গিয়ে থাকতে কেমন করে? চলি ভাই, আর এক দিন আসব।

এত সত্যক্কে অমিয়া বাপারটাকে মিটিয়ে দিতে পারবে, হেড-মিষ্ট্রস তা ভাবতে পারেন নি। সিঁথার পক্ষেও বাস্তবিক এই কথার পর আর ওতর আপত্তি তোলা সম্ভবপর হ'ল না।

বেলা আড়াইটা।

অরিন্দম লম্বা লম্বা পা ফেলে বড় রাস্তা ধরে চলেছে। সমীরকে এখন ধরতে না পারলে যেন বাজাই চলে যাবে এইবকম ভাব। সে বেচারা সব একটু শুয়েছে। অস্থান শুনে উঠে পড়ল। রেলিভে ফুঁকে পড়ে অরিন্দমকে দেখে নীচে নেমে এল।

পোষ্টাং ছাপিয়ে নিয়ে এসেছি। এই বার যা-যা কংবার সব তোমাকেই করতে হবে সমীরল। অরিন্দম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একগাঁনি ভাঁড়-কড়া কংগজ পকেট থেকে বের করে সম্মুখে প্রসারিত করে ধরলে।

টিক চড়েছে। চোখ বুলিয়ে নিয়ে সমীর বললে, এখুনি এগুলো মারবার ব্যবস্থা করতে হবে। সময় নেই আর। কাল থেকেই টিকিট বিক্রি শুরু করে দিতে হবে।

অরিন্দমের চোখ তুঁটা সিঁপাকে গুঁজছিল। কুমীরের সঙ্গে কংগড়া করেও জলে বাস করা চলে—এই কথা প্রমাণ করবার ভক্ত সে অভিমতায় চকল হয়ে উঠল। কিন্তু সমীরের এ সম্বন্ধে ঔনসীজ কেঁপে সে নিবৃত্ত হ'ল।

সমীর বললে, আমি এখন বাচ্ছি ছুটলালের সন্ধান। দেখি, কোথায় তাকে ধরতে পারি। তুমি যত তাড়াহাড়ি পার, পোষ্টাং-গুলো যথাস্থানে পেঁছে দেবার চেষ্টা করে। এবেলা বতগুলো পায়ে, মারুক ত!

ছুটলালকে পাওয়া যাবে ত? উত্তরেব অপেক্ষা না করে অরিন্দম সোঁড় বেরিয়ে গেল।

কয়েক দিন পরে একটি বিখ্যাত দৈনিকের মঞ্চল সংবাদে নিজস্ব সংবাদমাতা প্রেরিত নীচেকার সংবাদগুলো প্রকাশিত হ'ল :

২৩শে ডিসেম্বর তারিখে—

স্ববিপ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুত জয়চন্দ্র তর্করত্নের অপিতামহ-প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটির সংস্কারকার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্থাপত্যশিল্পের অজ্ঞাতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে এটি মন্দিরটি রক্ষা করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। সরকার এই নিমিত্ত এক জাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। দেশের স্তম্ভান্তর শ্রীযুত সন্দীপ সেনগুপ্ত মহোদয় অবশিষ্ট ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

২৫শে ডিসেম্বর তারিখে—

গত ২১শে ডিসেম্বর বলরাম সরকারের ঠাকুরবাড়ী-প্রাঙ্গণে স্থানীয় মহিলা-গ্রন্থ একটি মহতী সভার আয়োজন করিয়া হেপুটি মার্জিষ্ট্রেট শ্রীযুত সন্দীপ সেনগুপ্ত মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুরভিত সেনগুপ্তকে একগাঁনি মানপত্র প্রদান করেন। সভায় স্থির হয় যে, মহিলা-পাক এই নামের পরিবর্তে সুরভিত-পাক নামে অভিহিত করিবার উক্ত স্থানীয় মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষকে একটি আবেদন জানানো হইবে।

২৭শে ডিসেম্বর তারিখে—

গত শনিবার স্থানীয় মন্দির শ্রীযুক্ত চন্দ্রপ্রসাদ জালদার মহাশয়ের ভবনে আট. এন. এ. ফণ্ডের সভাপতি নবাবগ নাট্য-সমাজের সভাপতি সীতা অভিনয় করেন। বামের বো শযুকের ভূমিকায় সন্দীপসেন অভিনয় করিবার উক্ত যথাক্রমে শ্রীমন্দির দায় চৌধুরী ও শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সনুজ-সনুজ একটি করিয়া হোঁপা পদক উপহার দেন। টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই আট. এন. এ. ফণ্ডের সেক্রেটারীর নিকট পাঠানো হইয়াছে।

৪ঠা জানুয়ারী তারিখে—

মডেল গার্লস স্কুলের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব গত ববিবার মহাসমারোহে সন্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বারাকপুর মহকুমার এস-ডি-ও শ্রীমুদ্র গুপ্ত। সবুজ-সজ্জার সম্পাদিকা সিঁথার সেনগুপ্তা বি-এ. পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।



**অমৃততাঞ্জন**  
সর্বপ্রকার বেদনায় 'আণবিক বোম্বার' ন্যায় কার্যকরী।

**দাদের মলম**  
চর্ম রোগে 'পরমাণু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী।  
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭

স্থাপিত ১৮৯৩



“আমি জানি  
লাক্স টয়লেট সাবান আপনার  
স্বক্কে আরও মনোরম করে তুলবে’

মীনা  
কুমারী  
বলেন



“এই বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবানটি আমার গায়ে যে  
অগন্ধ রেখে যায় তা আমি ভালবাসি” মীনা  
কুমারী বলেন। “মনোরম গায়ের রং পেতে  
হোলে আমি যা করি আপনিও তাই করুন—  
লাক্স টয়লেট সাবান মেখে রোজ আপনার  
স্বকের যত্ন নিন।”

লাক্স টয়লেট  
সাবান

চিত্র - তারকা দেবী সৌন্দর্য সাবান

## কৃষিবিদ, বাণেশ্বর সিংহ

ব্রিটিশ জেলার স্বনামধন্য কৃষিবিদ বাণেশ্বর সিংহ বিগত ১৫ই নবেম্বর রবিবার অষ্টাশি বঙ্গের বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙালি গ্রামের সম্ভ্রান্ত সিংহবংশে তাঁহার জন্ম। বাণেশ্বরবাবু ব্রিটিশের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীমন্তেন্দ্র সিংহ ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা আইনজ্ঞ হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের ভ্রাতা ছিলেন। অতীত কাল-পরীক্ষিত কেরিয়াট তিনি দীর্ঘজীবন লোকসেবার ও গবেষণামূলক কৃষিক্ষেত্রে বাণ্যক চর্চায় ঐকান্তিক নিষ্ঠার সচিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কৃষি, গো-পালন,



বাণেশ্বর সিংহ

পল্লীর স্বস্ত্যবিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধাদি বহু সংবাদপত্রে গত ব্রিটিশ-চলিত বঙ্গবঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত-বিভাগের পূর্বে পর্যন্ত বহু বঙ্গের তিনি অসংখ্য কৃষি-বিভাগের অবৈতনিক উপদেষ্টার কাজ করিয়াছিলেন। বাংলা কৃষি-সংগঠিত; তাঁহার মৌলিক দান যথেষ্ট। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—“কৃষি প্রবন্ধ”, “গো-পালনশিক্ষা” ও “আয়কর ফলের চাষ”। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র পুস্তকগুলির সংখ্যাও অনেক। গঠনমূলক সমাজ-

সেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার পরলোকগমনে একটি অমূল্য জীবনের অবসান ঘটিল।

কৃষির অবনতি যে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ বোঝেনই তাহা তিনি মধ্যে মধ্যে অল্পভব করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য হাতেকলমে গো-পালন ও কৃষিচাকাকে তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রত তিনি শেষবয়স পর্যন্ত উদ্ব্যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ-সমূহ স্বকীয় পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। সেইজন্য সেগুলি বাংলা কৃষি-সংগঠিতো স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিবে।

বিজ্ঞান-সম্মত বাৎসরিক কৃষিকার্যে তাঁহার অমূল্যগুণ কত গভীর ছিল, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাদিই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—“পঞ্চাশ বঙ্গবঙ্গেরও উচ্চকাল যাবৎ কৃষিকার্যের ল'ভজনক ও ফলপ্রসূ উপায়গুলি লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশের মানুষের প্রয়োজনে উপস্থাপিত পত্রাদির পরিমাণ কিভাবে বাড়েনা যায়, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিবার জন্য একনিকে যেমন আমাকে নানা প্রকারের পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, তেমনই অল্পদিক সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেও হইয়াছে। আশীশবৎ পর্যন্ত গ্রামে বাস করিয়া প্রতিবেশী কৃষিকার্যে অবস্থার তারতম্য সবক্ষে আমার দৈনন্দিন জীবনের পাতক অভিজ্ঞতাও আমার এই কাজে প্রবৃত্ত হইবার অন্যতম প্রধান কারণ হইয়াছিল।” (প্রতি-প্রবন্ধের ভূমিকা)।

গ্রন্থকারের “আয়কর ফলের চাষ” নামক পুস্তকে আছে—“ছেলেবেলায় (৭৪ বঙ্গের পূর্বের ঘটনা) আমার এক পিসিমার বাড়ীতে এতরূপ একটা আমগাছ দেখিয়াছিলাম, বাহার আম প্রতি বঙ্গের পাটকাওয়া এক শত টাকা দিয়া কিনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত—ছেলেবেলায় সেই আমগাছের দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারি নাই, বরং সেই গাছের অবস্থা ক্রমশঃ গভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে আমাকে এই পথের পথিক হইতে হইয়াছে।”

বাণেশ্বরবাবুর জীবনে অমূল্য ঘটনার সমাবেশ নহুৎক্রেই ঘটিয়াছে। মূলতঃ তিনি দেশের বাৎসরিক কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষক-কুলের স্বখ-ভোগের সচিত্র নিষ্ঠের জীবনকে একীভূত করিয়াছিলেন। আত্ম দেশে পাকশস্যের প্রায় জাতির জীবন-মরণের সমস্তরূপে প্রকট। সেজন্য বাণেশ্বরবাবুর কর্মজীবনের হুঁ একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ব্রিটিশের যে অল্পকালে বাণেশ্বরবাবুর জন্ম সেখানকার কৃষকেরা অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে একমাত্র ধানের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর



.....

# দিনে দিনে আরও নির্মল, আরও লাবন্যময় ত্বক্

রেসোনার **ক্যাডিলেক** আপনার  
জন্মে এই যাত্রাটি কোরতে দিন।

রোজ রেসোনা সাবান  
ব্যবহার করুন। এর  
ক্যাডিলেক ফেনা আপ-  
নার গায়ের চামড়াকে দিনে  
দিনে আরও কোমল,  
আরও নির্মল করে  
তুলবে।



## রেসোনা

ক্যাডিলেক একমাত্র সাবান

• স্বপ্নোৎসাহ ও কোমলতাপ্রসূ কঠকগুলি তেলের  
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।

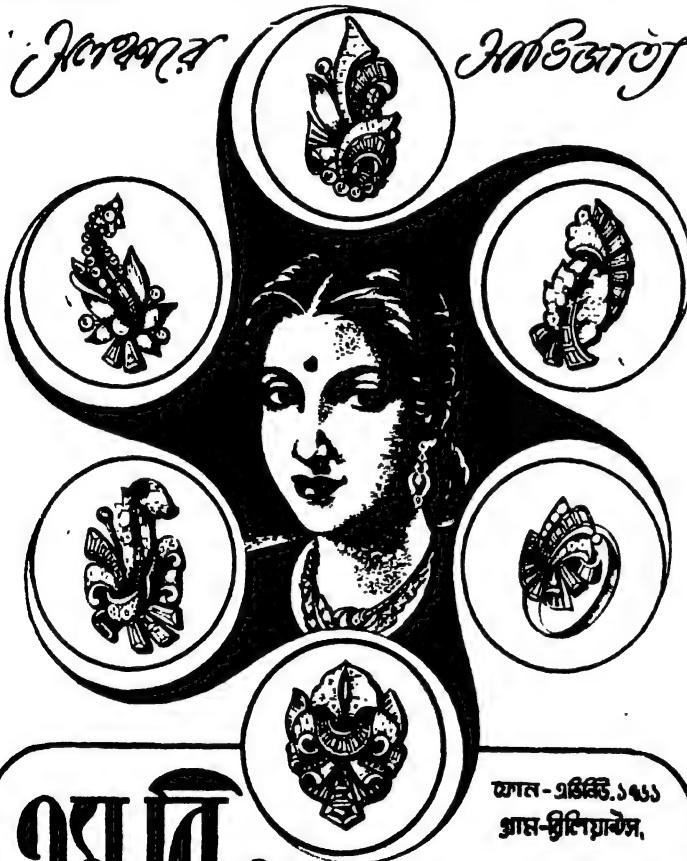
RP. 109-50 BG

রেসোনা প্রোপাইটারি লিঃ এর তরফ থেকে ভারত প্রভৃতি।

কবিত, রবিশস্ত্রের চাব-আবাদ বড় কবিত না, কলে অজগা হইলেই  
 দৃষ্টিক দেখা দিত। অস্বাভাবিক চল্লিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা : সেই  
 অকলে পর পব কয়েকটি বৎসর তল্লাশবনে ধান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার  
 দারুণ দৃষ্টিক দেখা দেয়। এই অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের চিন্তায়  
 বাণেশ্বরবাবু রবিশস্ত্রের চাব-আবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। রবিশস্ত্রের কল্প  
 প্রসিক স্থান ও প্রদেশসমূহ বৎসব্যতিকাল ঘুরিয়া দেখিলেন। এই  
 কাণ্ডে তাঁহার সফলতা চারিদিকের কৃষককুলের উপর প্রভাব বিস্তার  
 করিল। দৃষ্টিক নিবারণের উপায় পুস্তকাবলীতে—(১) রবিশস্ত্রের  
 প্রচুর আবাদ, ২) গোধান রক্ষা ও (৩) ভাবিব্যয় কথা), তিনি  
 নিজেব কৃষকদ্বী অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাপাইয়া বহু সমস্ত প্রতিষ্ঠাপি

কৃষকদের মধ্যে স্থানে স্থানে বিতরণ করিলেন। বলা বাহুল্য,  
 ইহাতে প্রচুর সফল হইয়াছিল।

বাণেশ্বরবাবুর বহুমুখী প্রতিভা শুধু কৃষি ও গো-পালনে নিবদ্ধ  
 ছিল না; বাস্তব সমাজসেবার অর্থও একটি আদর্শক তিনি জীবনে  
 গ্রহণ করিয়াছিলেন। পল্লীর স্বাভাবিক উপায় উদ্ভাবনে তিনি  
 আজীবন কাজ করিয়াছেন। দরিদ্র পল্লীবাসীর চিকিৎসার ক্ষমতা তিনি  
 হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।  
 অর্থাভাবে যে সকল রোগী চিকিৎসার সন্ধান পাইত না, তিনি নিজ  
 ব্যয়ে তাহাদের চিকিৎসা করিতেন। এই কাজে তাঁহার দক্ষতার ফল  
 এই হইয়াছিল যে, তাহার বাড়ীতে হেঁগীর ভিড় সন্ধানট লাগিয়া



এশানী, স্বর্গজাত এও সন্ম

স্বর্গজাত ঈশ্বরদেবের (এশানী) দেবীমূর্তি ও হিরণ্যকুবজার  
 ১৩৭সি, ১৩৭সি/১ বহুবাক্যের ফ্রিট কলিকতা (আমহার্ট ফ্রিট ও  
 বহুবাক্যের ফ্রিটের সংযোগস্থল) আমাদেব পুরাতন শোভনসর বিবর্তিত দিক

প্রাচ-হিন্দুস্থান মার্চ বালিগড়: ১৩৬০/১৬, গ্রামবিহরি ঈকিনিউ  
 কলিকতা : জন্ম শি.ক. ১৩১৩

ধািকিত। লক্ষ্যধিক হেঁগীকে তিনি চিকিৎসা  
 ও পরিচর্যা দ্বারা নীরোগ বহিয়াছেন। গ্রামে  
 কলেরা বা কোন মড়ক দেখা নিলে রোগ-  
 বিজ্ঞান প্রতিরোধকল্পে অগ্রসৃত্বাবে তিনি  
 অচোবাত্ত শ্রম করিতেন। “কলেরা ও পল্লী-  
 গ্রামের স্বাস্থ্যবিধি” তাঁহার প্রমাণ।

তত্ত্ব বয়সে তিনি বাণেশ্বর প্রভাবে  
 অসিত্যছিলেন। তখন তিনি শিবনাথ  
 শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসেন। আপন জীবন-পথের  
 আদর্শ হস্ত তিনি সেউগানেট লাভ করিয়া-  
 ছিলেন। তখনকার দিনের কলিকতার  
 বিপাক্ত নারদীসমূহ কৃষি-বিজ্ঞানের  
 ব্যবহারিক চর্চা তাঁহাকে বিশেষভাবে আকর্ষিত  
 করিয়াছিল এবং বিভ্রান্তস্বাধ কৃষিকে তিনি  
 জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে  
 কৃষিবিষয়ক জ্ঞানের প্রচারে তাঁহার যত্নসন্না-  
 চিত উৎসাহ জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত  
 বর্তমান ছিল।

শৈশবচর্য্য তাঁহার বিশেষ অগ্রদাগ ছিল ;  
 চাক-শিল্পে তাঁহার দক্ষতাও ছিল। বাণেশ্বর-  
 বাবু গভীর শাস্ত্রাত্মবাসী ছিলেন। কান্টের  
 পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে বিদ্যাবিনোদ উপাধি  
 দান করিয়াছিলেন, কিন্তু উপাধি তিনি কোন  
 দিনই ব্যবহার করিতেন না। তিনি সূক্ষ্ম  
 কীর্তনগাছক ছিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন ও  
 কীর্তন তাঁহার নিত্য কথের তত্ত্ব ছিল।  
 তিনি অসাধারণ অতিথিবৎসল ছিলেন।  
 তাঁহার পরলোকগমনে ইচ্ছাভক্তের সন্তিত,  
 আত্মগোপনবীল একটি প্রতিভাবান সমাজ-  
 সেবীর সম্পদ ছিল হইল।

মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বেও তিনি “গুরু  
 মূল্য বৃত্তি ও কৃষির সর্বনাশ” নামক পুস্তিকা  
 লিখিয়া গিয়াছেন।



# দ্রুত-ফেনিল সানলাইট না আছড়ে কাচলেও সাদা ও বাতলাকে করে দেয়



“শুষ্কহীন বলেন আমি বেশ ক্রিটফাট থাকি। তার কাণ মা সানলাইট সাবান দিয়ে আমার ঝক ধপধপে সাদা করে কেটে দেন। সানলাইটের লুপাকার সরের মত ফেনা শীঘ্র ও সহজেই কাপড়-চোপড় থেকে ময়লা বার করে দেয় — আচ্ছাতেও হয় না।”



“আমার বাতলা মতো আনাকেই সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট দিয়ে কাচাব উল্ল আনার বহিন একে কেমন ঝকঝক থাকে দেখুন। মা বলেন সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় না। আর তা টেকেও বেশী দিন। এতে পুঁপুঁ হবার কথা — নয় কি?”



# পুস্তক পরিচয়

**আধুনিক আলোকচিত্রণ—**পরিমল গোস্বামী। ফটোগ্রাফী  
টোর্স এণ্ড এক্সেসি লিঃ। ১০৪ ধনুতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১৩। মূল্য সাড়ে  
সাত টাকা।

বিশ্ব শতাব্দীর প্রারম্ভেও বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ কেশলী ভিন্ন অন্তর  
নিকট আলোকচিত্র প্রায় বৈজ্ঞানিক রহস্যবস্তু ছিল। নিপুণ আলোকচিত্রকার  
তখনকার দিনে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। আলোকচিত্রের  
সম্বন্ধে তখন ছিল দামী এবং জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

অন্ধ-শতাব্দীবাঙ্গী অবিগ্রাম চর্চার পর আজ আলোকচিত্র শিক্ষিত  
মানুষের জীবনের লৈনিক বাণ্যের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু হইয়াছে।  
এখন ইহার ব্যবহার ও চর্চা সাধারণ লোকের আয়ত্তে আসিয়াছে, আলোক-  
চিত্র হৌলা বা হৌলানো হো অতি সাধারণ বাণ্য। ছেলে-বুড় স্ত্রী-পুরুষ  
সকলেরই এ বিষয়ে সখ আছে।

কিন্তু বস্তুটির সহটা প্রচলিত হইয়াছে বা সাধারণ লোকের কাছে  
আলোকচিত্রের পরিচয় যতদূর বাপক হইয়াছে এদেশে ইহার সম্বন্ধে জ্ঞান  
ততটা গভীর হয় নাই। এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ বোধ হয় সহজ  
বাংলায় এই জটিল বিকট সম্বন্ধ কোনও সুনির্দিষ্ট বই এতদিন ছিল না।

ঐযুক্ত পরিমল গোস্বামী একবারের লেখক ও আলোকচিত্র-কলাবিদ।  
তিনি আধুনিক আলোকচিত্র লিপিয়া এতদিনে সেট অভ্যাস মোচন করিয়া-  
ছেন। এই পুস্তকে আলোকচিত্রের বৈজ্ঞানিক সমস্তার প্রতি লোকের পূর্ণ  
চর্চা এবং নিপুণ অভ্যাস নির্দেশ দান করা হইয়াছে। পরিমল বাবুর দীর্ঘ-  
কালের অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রয়োগ উচ্চায়ে রহিয়াছে।

বইটিতে এক কোন জায়গায় ভাণ্ডা হয় নাই। সহজরূপে আলোকচিত্রের  
সাধারণ জ্ঞান ইহার আছে, যিনি ইহার সাঁচায় তাঁ বিদ্যার অসংখ্য  
ব্যবহারিক সমস্যা পূরণ করিতে পারিবেন। ভাষা সহজ, তথ্য পরিপূর্ণ।

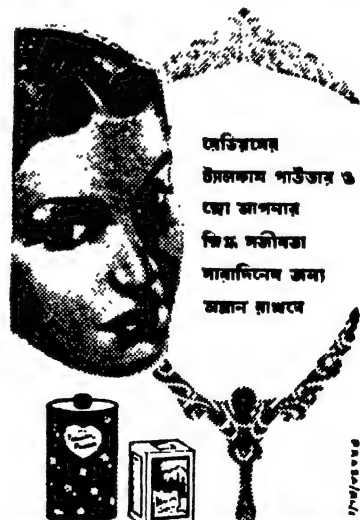
তবে একটা বিষয় বলা প্রয়োজন। আলোকচিত্র চর্চা সম্বন্ধে কলার পরও  
আর এক নতুন কলার আশা রাখিয়াছে। পরিমল বাবু কলাবিদ এবং

আলোকচিত্রণ শিল্পের রসজ্ঞ। পরের সংস্করণে ইহার নিকট আমরা  
তাহাও প্রত্যাশা করিব।

ক. চ.

**কাল্পনা-হাসির দোলা—**ঈশ্বরানী মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান  
এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩ আরিগন রোড, কলিকাতা।  
মূল্য তিন টাকা।

উপরতলার একটি মেয়ে—নাট্য গাঢ় আর পাট-কালচারে তাহার  
জীবন নিয়ন্ত্রিত। পিতা আত্মসম্মান বিলাসপুত্র সে জীবন; ইহার চারিপাশে  
বিপুল চঞ্চলতার-আবৃত্তি জলরাশিতে সমস্তা-কুটিল ঢেউগুলি ঘেন উঠিয়া;  
ভাঙ্গিয়া যায়, সেই শব্দের কি মঙ্গলিক ভাষা—সে সব জ্ঞানবান কোঁচুল  
কোনদিনই জাগে না মেয়ের মনে। অথচ মনের গভীরে, তাহার অপোচরে  
সেই ঢেউ ভাসার তিনা-নিকাশ সে রাখে—শব্দ-প্রতিচ্ছিন্ন জলতরঙ্গী তাহার  
স্তরের মধুকণা উপলব্ধি করিতে উৎসুক হয়। ফলে স্বান-কালের অকল  
পতিলে মনের এক হ্রদে গুলিয়া গিয়ে মেয়েটি নামিয়া আসে মাটির  
পৃথিবীতে। পৃথিবী ঘেন পুরুষসহৃদে আশ্রয় লাভ করিয়া ছাপন বোনা-  
প্রসারে সৃষ্টির সৌন্দর্যলোকে নিজেকে নতুন করিয়া অতব করবে—জীবনের  
নতুন অর্থ, নতুন খাদ ইত্যাদি পুনর্নবীকরণ করিয়া তুলে। প্রথমত পতি  
লিনের লেখা জড়নকরজগৎ চৈতন্যময় হইয়া উঠে, আকাশ, মাট, মাটি,  
লোহা আর পাছ সকলের সম্মুখে অস্ত্রের যোগ্যতা রাখিত হয়। এইভাবে এক



রেডিয়াম  
ট্যালকাম পাউডার ও  
স্নো জাপনার  
ফিল্ম সজীবতা  
সার্বাধিনেয় জন্ম  
অজান রাখবে

রেডিয়াম স্নো ও  
ট্যালকাম পাউডার

রেডিয়াম ল্যাবরেটরী  
কলিকাতা-৩৬

**টোলএণ্ডকোম্পানীর**  
**দাদ ওকডরের মলম**  
**ক্রিউটা-টোন** স্নো বৈদনা ও  
চর্মরোগের জন্য  
**নিম্ন মলম** স্নো পাউডার ও  
চুলকামীর জন্য  
**ব্রহ্ম নগর**  
কলিকাতা-৩৫

# = বি জ ণ্টি =

আমরা অতীব সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র ৮১০ সাড়ে বারো আনা সের দরে চিনি যাহাতে পাওয়া যায় সেজন্য স্থানে স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের সুব্যবস্থা হইতেছে। চিনি সরবরাহে কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিলে তৎপ্রতিকারার্থে যে কোনরূপ পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হইবে।

## সুগার ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

২নং দয়হাট্টা স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

টেলি : ঠিকানা—“চিনিবিক্রি”

ফোন : ৩৩-১০১৯





## অভিজের উপদেশ

উৎকৃষ্ট কেশটেল নির্বাচনের সময়  
ক্যালকেমিকোর

## ক্যাষ্টরল

অভিজের বিবেচনায় সবচেয়ে ভাল কেন

কারণ, এর প্রত্যেকটি উপাদান বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত।

কেবলমাত্র ঔষধগর্মে ব্যবহৃত খাঁটি দামী ক্যাষ্টর অয়েলে তৈরী।

এর মধ্যে বাজর প্রচলিত ক্যাষ্টর অয়েলের তায় রংকরা পাতল

বাদাম তৈল মেশানো নেই।

এর সুগন্ধ মনোমদ ও অমৃণম। ব্যবহারে চুল বাড়ে, টাকপড়া বন্ধ হয়।

গুণ ও পরিমাণ হিসাবে দাম সস্তা।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং.লিঃ কলিকাতা-২১

## ফে.থোডেজ মহাভূজরাজ তৈল

চুল উঠা বন্ধ করে

মাথা ঠাণ্ডা রাখে



এই মার্কা দেখে কিনুন•নকল থেকে সাবধান



জীবন পথাবসিষ্ট হয় নাই; তিনি যে জ্ঞানসম্পন্ন অহরণ করিয়াছেন তাহা চূর্ণ। বিতরণও তিনি কাপণ্য করেন নাই। পনেরখানি ইংরেজী এবং সত্তেরখানি বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থে তাহা বিস্তৃত। সেই জ্ঞানের বৈচিত্র্য এবং বিস্তৃতিতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বঙ্গভারতী শ্রীপ্রাণেশকুমার চব্বিশ বৎসরেরও অধিককাল মহিমাবাবুর সঙ্গে লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাহার সহিত ঠারতবর্ষের বহু তীর্থে গমন করিয়াছেন। বইখানি সেই তীর্থভ্রমণের কাহিনী। মহিমাবাবুর জীবনের অনেক কথা জানিতে কেতুহল হয়। বর্তমানে এই তীর্থভ্রমণের কাহিনী পাহেই সঙ্কট থাকিতে হইতেছে। মহিমাবাবুর বয়স এখন চুরাশি বৎসর। আশা করি, পরবর্তী গ্রন্থে মহিমাবাবুর দীর্ঘদিনের সঙ্গী গ্রন্থকার তাহার একখানি পুঙ্খ জীবনচরিত লিখিয়া আমাদের কেতুহল পূর্ণ করিবেন। পুস্তকে মহেন্দ্রনাথের স্মৃতি এবং চুরাশি বৎসর বয়সের দুইখানি ছবি আছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মহাভারতসার—ড. সি. এল. চ. মহেন্দ্রনাথ রায়,

কলিকাতা-২২; মূল, ১২।

গঙ্গা পরিচয় হইতে জ্ঞানবলে, লেখক সরকারী রাসায়নিকের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার অবকাশ-জীবন যদি শাস্ত্র-পুস্তকের আলোচনার একান্তভাবে নিমগ্ন হয় তবে তাহার কথা। গুপ্তপানিত্র মন্ত্রের অস্তিন্যেশের এবং দীর্ঘ অবসারের পরিচয় নাই, বিভিন্ন চিত্রের নিদর্শন আছে। 'দর্শন', 'সমাজতত্ত্ব', 'পুস্তক', 'দর্শনতত্ত্ব' এবং 'পূর্ণ ও নরক'—এই পাঁচটি পর্বে তিনি তাহার মহাভারত-পাঠ্যমন্ত্র কবচগুলি ধারণা বা

চিত্তকে হৃদয়কারে প্রথিত করিয়াছেন। শেষ দিকের কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজীতে লিখিত। সে বিষয়ে লেখকের কৈফিয়ত : ইহা 'সর্বধর্মসম্মত ভাব হইতে লিখিত হইয়াছে।' বাক্য; মানুষের দ্বিতীয় শৈশব, কৈফিয়ত পড়িয়া এই কথাই মনে হইল। নামে ইংরেজীজানা এবং প্রারম্ভে ইংরেজী প্রশংসাপত্র—ইহাও দৃষ্টিকট।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অ-আ ক থ—শ্রীনিয়রঞ্জন

সেনগুপ্ত, এম্-এ। শ্রীমদ্বিনীকুমার পাল কড়ক যাদবপুর কলেজ, কলিকাতা-২২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

## স্বাধীন্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসংখ্যার যে গৌরব ও জনগণের যে অস্পষ্ট আশ্রয় উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সমৃদ্ধি, সম্ভব ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্বাঙ্গের বৈশিষ্ট্য, তাহার সম্প্রতি পরিচয় পাওয়া যায় ইতার ১২৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

### নূতন বীমা

১৬, ৩৮, ৭৯, ১৯৮।

মোট চলতি বীমা..... ৮৬,৭১,৮৫,০৪০,  
মোট সম্পত্তি..... ২২,৪৯,৮৩,০৫৬,  
বীমা ও বিবিধ তহবিল..... ১৯,৭৭,৭৬,১৮৭,  
প্রিমিয়ামের আয়..... ৩,৯৪,২১,৩৭১,  
দাবী শোধ (১৯৫২)..... ৮৮,৮২,২৭১,

হিন্দুস্থানের বীমাধর্ম নিরাপত্তা  
সার্বভৌম ও গাওড়াক।



হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিং, ৪নং চিত্রকলন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩



## ডায়াপেসমিন

পরিপাক ক্ষমতিকে  
বৃদ্ধি  
তেজস্বর্ণ করে



ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা

জ্যোতিষশাস্ত্র-চর্চার দিকে আজকাল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু চতুর্থের বিষয় এই বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় লিপিত বই বাজারে খুব কম। বর্তমান পুস্তকখানি এই অভাব কটকটী পূরণ করিবে। ষাঁহারা অল্প পরিচয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিতে চান বইখানি তাঁহাদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে আঠারটি অধ্যায়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের বহু জটিল বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। লেখকের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাষার প্রসাদগুণ পুস্তকখানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থের 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক অধ্যায়ে জাতক কোন্ কোন্ গ্রন্থের কারকভায়ে কবি দার্শনিক লেখক চিকিৎসক শিল্পিদি ইত্যাদি হইয়া থাকেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের সেই গুরুত্বম ও মনোপোষণ জটিল বিষয়টি চর্চার কথায় বড় চমৎকারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমানলীকুমার ভদ্র

পলাশীর যুদ্ধ—ঈশপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র এডিনিউ, কলিকাতা-১৩। প. ১৯৩১। মূল টারি টাকা।

পলাশীর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—৬ষ্ঠ শত বৎসর পূর্ব হইতে মাত্র চার বৎসর বাকী। এই দিনেও কিয় উত্তর নবীনরা পুণ্য হয় নাই। এখনও পলাশীর যুদ্ধ বলিতে আমাদের মনে কতকটা কোমল জাগে! পলাশীকে কেন্দ্র করিয়া কং গির্জা, কাঠিনী, কাব্য রচিত হইয়াছে ইতিহাস-পুস্তকও কত! তা হইলেও বাবা কখন ভাবিতবোধে মত একটা বিলাতি দেশের ভাষা, নিম্নলিখিত ভাষা পলাশীর মতো, ইংরেজ গুরু অল্প লেখা ছিল, আগ্রহ হইতেছিল। কিন্তু পলাশীর মতো যে জগন্মাল ভাষাভাষী হাজার গলায় পলাশীর মতো হাজার ভাষাভাষী হাজারে কিকিনবিক পলাশীর বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারত-বিশ্বেরই মাথা হইয়া উঠে। এখন পলাশীর যুদ্ধ যে আমাদের চক্ষুসম্মুখে প্রতিমা হইয়াছে এবং আরও অনেককাল তুলিয়া থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার যখন ঐতিহাসিকভাবে পলাশীর যুদ্ধের 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশ করিতেছিলেন তখন ষাঁহ আমান বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল। পুস্তক প্রকাশের পক্ষাংশের পর তৎকালীন অনেক প্রশাসনের উপর যে গভীর মহিমিত পদার্পণ করিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিয়া। বঙ্গবীর গুণগণিত একবার পরখ করিয়া দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই সুযোগ ঘটিয়াছে। তাই উক্ত পুস্তকটি।

বইখানি কাঠিনী বা গজেন্দ্র শঙ্করীতে লিপিত হইলেও উত্তরে ইতিহাস ঠাস। গল্প—কিন্তু এত, এত অতিরঞ্জন নাই। পলাশীর যুদ্ধ লইয়া কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার গজাধারের লিপিত গির্জাও কাব্যোপদেশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন; ভাষা হইয়াছিল যেকোন গজাধারিয়াছেন, ইতিহাস বুঝিয়া বাবুচাল হইয়া যায়। কিন্তু হাঁহা ভাষা নাই। সমসাময়িক দলিল-সম্ভাবনা, পুণিপাত্রে যে সমস্ত গুরুত্ব আছে, গল্প বলিতে গিয়া হাজার বাক্যে এতটুকু যান নাই। গ্রন্থকারকে এজ্ঞা অভিনন্দন জানাই।

পলাশীর যুদ্ধ নাম দিলেও উত্তরে পলাশীর যুদ্ধের কথাই কলিকাতার লোচন ইতিহাস আজ কাঠিনীর মত লাগে। কিন্তু একটি মাত্র বা জাতির মত বড় উমান-পতনের মধ্য দিয়া কলিকাতা মহানগরীর এত বিস্তৃতি, এত সমৃদ্ধি, এত প্রাণ। পলাশীর যুদ্ধ সেই কাঠিনীও বদ হৃদয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমাজতন্ত্রি কলিকাতার বাবুলী-সমাজ লইয়া আলোচনা-প্রবেশা করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু তিনি ষাঁহর পুত্র পোত্রাক, স্পষ্ট নিদেশ এই বইখানিতে পাঠবেন। এই কলিকাতার বাবুলী-সমাজ পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিজে আস্ত হইয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষে তাহা বিলাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার উপসংহারে অতি চমৎকারভাবে এটি

'নাভানা'র বই

কাব্য-সাহিত্যে সার্থক সংযোজন

## প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ থেকে বিশিষ্ট কবিতা-সমূহ, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি নতুন রচনা এবং বিচিত্র স্বাদের কিছু অনুবাদ এই সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। পাঁচ টাকা।

'নাভানা'র আরও কয়েকখানি বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প। অনিবার্চিত গল্প-সমূহের মনোজ্ঞ সংকলন। পাঁচ টাকা। পলাশীর যুদ্ধ। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। সরস ও সার্থক সাহিত্যের আশ্বাদে জাতীয় ইতিহাস রচনায় নতুন দিকনির্দেশ। উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক। চার টাকা। বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা। বুদ্ধদেব বসুর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ থেকে বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কবিতাসমূহের সংকলন। পাঁচ টাকা। সব-পেয়েছির দেশে। বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আনন্দ-বেদনা-মেধা অতুণ্য রচনা। আড়াই টাকা। মনের ময়ূর। প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস (দ্বিতীয় সংস্করণ)। তিন টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দার নতুন উপন্যাস

## মীরার দুপুর

'মীরার দুপুর' বৈদিক যুগের উজ্জ্বল নারী সাহিত্যের কাহিনী নয়। এ-যুগের নারিক। মীরার দুপুরের স্মৃতি। অনিবার্ধভাবেই উঠে। মীরার দুপুরের রাজির বিভীষিকার মতো। বিলাদ ও কবোদ নাভনায় একখানি বিশিষ্ট আধুনিক উপন্যাস। তিন টাকা।

নাভানা

। নাভানা—৬ষ্ঠ ও ৭ষ্ঠ নিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ।

৪৭ গণেশচন্দ্র এডিনিউ, কলিকাতা ১৩

পুস্তকগানিতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি—যেমন কাপুরুষ ড্রেক, অসমসাহসী ক্লাইভ, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, ইংরেজ-ভক্ত উমিচাঁদ, কটালী নন্দকুমার, অকৃতজ্ঞ সিরাজউদ্দৌল্লাহতক, গতিপাখা লুৎফরিসা এমনভাবে পদ্যে আঁড়ান হইতে প্রকাশ্যে আসিয়া পড়িতেছেন যেন নাটক দেখিতেছি; অথচ কোনটাই এইরূপ নাটকীয়তা নাই। কি সংযমের সহিত চরিত্রগুলি চিত্রিত! সন্দেহপরি বইখানির ভাষা সখ্যক কিংবদন্তি। পাঠি বাংলা ভাষা, মায়ের ভাষা, পিতামহ মাদারীর ভাষা; আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। পাঠি বাংলা উচ্চৈষম বা বাকারীতে, বাকারী পুস্তকগানিতে বিশেষ-ভাষা ধরিয়া রাখা হইয়াছে। এরূপমতী কতিপয় দৃষ্ট হয়। লেখক এই দিক দিয়া একটি মন্ত উপকার করিয়াছেন।

ত্রিগোগেশচন্দ্র বাগল

## ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৯০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অস্ববিধা দূর করিয়াছে :

মূল্য—৪ আ: শিশি ডা: মা: সহ—২৪০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১১ বি, গোবিন্দ আজড়ী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—আলিপুর ৪৪২৮

# বঙ্গভারতী

## দৈনিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা ১০ সড়াক বার্ষিক ৩-

রুচিবান, সংস্কৃতি-সম্পন্ন এবং বিচারশীল

পাঠকগণের পক্ষে অপরিহার্য।

## বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাম—কুলগাতিয়া; পোঃ—মহিষেরখা; জেলা—হাওড়া

## ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া লিমিটেড

সেন্টাল অফিস—৩৬নং ষ্ট্রাও রোড, কলিকাতা

আদায়ীকৃত মূলধন—৫০০০০০ লক্ষ টাকার অধিক

ব্রাঞ্চ :—কলেজ স্কোয়ার, বাঁকুড়া।

সেভিংস একাউন্টে শতকরা ২% হারে সুদ দেওয়া হয়।

১ বৎসরের স্থায়ী আমানতে শতকরা ৩% হারে হিসাবে এবং

এক বৎসরের অধিক থাকিলে শতকরা ৪% হারে

সুদ দেওয়া হয়।

ফো:ম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে, এম. পি.,

## দেশ-বিদেশের কথা

### উত্তমাশ্রমে স্মৃতিতর্পণ

সম্প্রতি স্বামী প্রবানন্দ গিরি মহারাজজীবন নবম বার্ষিক ত্রিযোভাব মহোৎসব যথোচিতভাবে সমাপ্ত হয়। এতদুপলক্ষে ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন্ধ্যায় আনতি ও সমবেত শিব বর্গের “গীতাপাঠ” এবং সঙ্গীত ও সঙ্গীতন হয়। ১০জ্ঞ ও তবঙ্গা-সঙ্গত দ্বারা কলিকাতার শ্রীবলউচ্চক গোঁস্বামী স্কুলের অনন্য বন্দন করেন। উহার পর শিবপুরের পাগলের দলের স্তম্ভর নরমর্দ্যবনে রাত্রি অতিবাহিত হয়।

১০ই অগ্রহায়ণ বুধসম্প্রতিবার ত্রিযুপা উৎসাহিত হয়। স্বামী বিশ্বানন্দজীব উপনিষদ, ব্রহ্মসংবাদ দেবদেবের শ্রীচরণে, প্রবানন্দ হইতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইতে স্তম্ভর উপাচার্যের শ্রীচরণে পড়ে ও চরিত্রকেশবের সঙ্গিতের মধ্যস্থতায়ের মতিঃ স্তোত্র পাঠে এক স্বগীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উপাচার্যের তবঙ্গ-সঙ্গের গুলনিত কলীকীর্তন সকলকে মুগ্ধ করে।

অপরূপে বহুমানের শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব ব্রহ্মসংবাদ ও মাতিক পদধন ও স্কুলের প্রশাসনিক নকর। সন্ধ্যায় আনতি ও সমবেত গীতাপাঠের পর স্বামী প্রবানন্দ মহারাজজীব উপনিষদ অংশেচিত হয়।

### অনুন্নতদের উচ্চশিক্ষা

কৌন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনিক্যাল পাব্লিক স্কুলের শিক্ষালীলাস নংগের এক প্রকল্পে উত্তরে উপশিক্ষারূপী শ্রী কৌন্সিল, মালবীর বলেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে, ভারত ব্রিটিশ শাসনের আমলে) অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালিশ ওন ছাত্রকে এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রকে বেলশিক টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট। কিন্তু ১৯৪৯ সালে হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের কোন ছাত্রকে একটি মাত্র বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় নাই।

উহার প্রকল্পে ২৪৪ নং উপশিক্ষারূপী দৃষ্টি নিয়োক্ত বিষয়-গুলির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন : “আমাদের দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা প্রায় গুণ্টেনের লোকসংখ্যার সমান। এদিকে পাঁচ কোটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যদি এক কোটি আশী লক্ষ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা যোগ করা যায় তাহা হইলে তাহা তুর্কীর সমগ্র জনসংখ্যার সমান হয়। এই বিপুল জনসংখ্যিক যদি আমরা নেতৃত্বের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারি করিতে না পারি, তাহা হইলে উনিয়ার সামনে বিচারে আমরা কি জবাব দিব? আমরা যদি উহাদের ভিতর হইতে নেতা তৈয়ারি করিতে না পারি তাহা হইলে সাম্প্রতিক কালে আসাম এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জায় ভাঙেগ সঙ্গীতই আমাদের অদৃষ্ট ঘটিতে পারে।



মাঘ

# প্রবাসী

মীরাসো

শ্রীমদভগবদ্গীতা

# **PRABASI PRESS**

is equipped with Modern Machinery, Lino and a  
wide variety of types

Can print BENGALI, SANSKRIT, ENGLISH, HINDI  
Books and Job Works.

PRABASI—the Bengali Monthly Magazine,  
MODERN REVIEW—the English Monthly Magazine

&

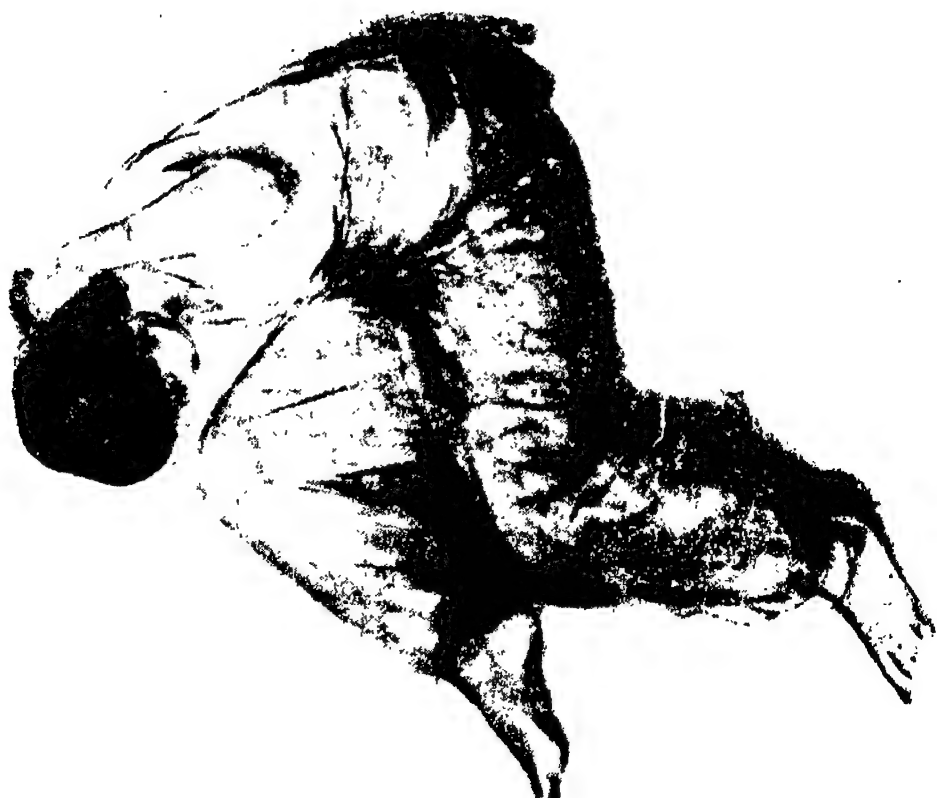
VISHAL BHARAT—the Hindi Monthly Magazine  
are printed here.



**ARTISTIC COLOUR PRINTING  
A SPECIALITY**

120-2, Upper Circular Road, Calcutta-9







অনুসংগে সম্পর্কে এদেশের কয়েকটি শৈলিক ও সাময়িকগণ্ডে  
যাহা বাতির উটয়াছে তাহা বঙ্গদেশ অবস্থায় গজিকধর্মপ্রসূত  
বলিয়াই মনে কর। বুড়িটি "জেলি কুজার" দাঁড়াইবার মত স্থান  
পাকস্থানের সব কয়টি বন্দেও নাষ্ট, এমনকি কড়াচি বন্দেও  
"জেলি কুজার" প্রবেশ কায়েত হাফ পায়ে কিনা সম্ভব। তাহার  
পূর্ব একপ বৃহৎ সাময়িক নৌবাহুরে সর্ববিধ তত্ত্বাবধান ও তদারক

করিবার ব্যস্তিক ব্যবস্থা সিংহলের ট্রিকোমালি, মালয়ের সিঙ্গাপুর এবং জাপান ভিন্ন সমগ্র এশিয়ায় কোথায়ও নাই। শিক্ষিত লোক-লব্ধের কথাও আছে, তাহাও ঠিকমত করিতে হইলে তিন-চার বৎসর লাগিবে। তিন হাজার এরোপ্লেনের সংবাদ আরও অপরূপ।

বাহা হউক, এবিষয়ে বিশেষ কিছু মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। সময় ও অর্থ এই দুই বখেট থাকিলে কিছুই অসম্ভব নহে এবং সেইজন্যই আমাদের নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে জাতি নিপসক নৈরো দিবারাত্র সচেতন না থাকে তাহার বিপদ অবশ্যজ্ঞাবহী। আমাদের ইতিহাস এ বিষয়ে সারা বিশ্বের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে।

কুপমণ্ডক বৃত্তির ফলে আমরা শত শত বৎসর দাসত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং আজও আমাদের শিক্ষিত সমাজ সারা জগতের অন্তর্গত শিক্ষিত সমাজের তুলনায় কুপমণ্ডক বৃত্তিতে পরিপূর্ণ। আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকের দৃষ্টিই তাহাদের দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রের বাহিরে যায় এবং তাহা অপেক্ষা আরও অল্প লোকের দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের তিতাহিত সম্পর্কে চেতনা আছে। নিজস্ব স্বার্থ, নিজস্ব ঘেষ-বিষেই আমাদের প্রায় সকলের নিকট চরম। ফলে রাষ্ট্রের শক্তি ও মর্যাদা দুইয়েরই হানি হইতেছে এবং সেই কারণেই আমরা ক্রমে বিদেশীর নিকট গুরুত্ব হারাইতেছি। পাক-মার্কিন তুষ্টি ব্যাপারের ইতাই প্রধান কারণ, অবশ্য অন্ত কারণও আছে।

সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এখন ক্রমেই একটু শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। মিশর, চীন, ইরান, ইটালী, রুশিয়া, এ সকল দেশের শিক্ষিত জনসমাজ ক্রমে বুঝিতেছে যে, তাহাদের ভবিষ্যতের বাগড়ের সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের হস্তে নাট, তাহাদের ভাগ্যের পেশার সহিত আভিকার মার্কিন দেশের ইতিহাসের শ্রোতের টেবিলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিত আছে। এমনকি মার্কিনের জার অসীম ঐশ্বর্যশালী ও প্রবলপরাক্রান্ত জাতির মধ্যেও অল্প চেতনা আসিয়াছে যে তাহাদের ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করে পেইপিং, মস্কো ও দিল্লীর নির্ধারিত কার্যক্রমের উপর। সকল দেশের স্বাধীন জ্ঞানেন যে, ইতিহাসের সকল ধারা ক্রমেই একীভূত হইতে চলিয়াছে, তাহার বাহিরে কোন দেশ, কোন জাতি, বাইতে পারে না। শুধু আমরাই বৃথি অন্তরূপ। শত শত বৎসরের দাসত্ব-কুপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার ফলে আজ উদ্বুদ্ধ আকাশের নীচে স্বাধীনতার শ্রোতে জাসিয়াও আমাদের কুপমণ্ডকত্বের সর্দীর্ণ ও ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমরা শ্রোতের গতি দেখিতে পাইতেছি না। আমরা কেবল চোটা করিতেছি সেই অকুল শ্রোতের মধ্যে নিজস্ব এক গণ্ডী গড়িবার জন্য, যেন সাগর-উর্মামালার মধ্যে নিজস্ব কুপননের জন্য।

বাস্তবিক পক্ষে জগতে বাস করিয়া পৃথিবীর সকল জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন ও প্রভেদযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে থাকিবার দাবী এক আমাদের দেশেই আছে, আর কোথায়ও নাই। যে মার্কিন দেশ এককালে সম্পূর্ণ পৃথক গণ্ডিতে থাকার (isolationism)

বৃহত্তম উদাহরণ ছিল সেও আজ নিজ হাতে সেই গণ্ডী ভাঙিতেছে, সোভিয়েট রুশিয়া যে গণ্ডী এতদিন তাহার চতুর্দিকে রাখিয়া ছিল আজ তাহার উন্মোচনের পথ খুলিতেছে। শুধু আমরাই নিজেকে “ন মাতা, ন পিতা, ন চ ভ্রাতা বহু” বলিয়া নিজের উপর দেবত্ব আরোপ করিবার বুঝা চোটা করিতেছি এবং সেই কারণেই জাতীয়তাবাদের সহিত নানারূপ নূতন সংজ্ঞা যোগ করিয়া এক অভিনব ছুঁংমার্গের সৃষ্টি করিয়াছি।

এরূপ অবস্থায় আমাদের সহিত অন্ত দেশের বা অন্ত জাতির ঘনিষ্ঠতা অসম্ভব, বন্ধুত্ব অসম্ভব এবং এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তিগতের সহিত আমাদের সংযোগও অতি সর্দীর্ণ হইতে বাধ্য।

পাকিস্তান এ বিষয়ে অজ্ঞভাবে ভগতে চলে। সম্প্রতি আমেরিকার “ওয়ার্ল্ড” নামক মাসিকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শিরোনাম “Why We Flirt with Pakistan” অর্থাৎ, “আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে প্রেমবিনিময়ে লিপ্ত কেন?”

এই সম্পর্কে লেখা হইয়াছে, “ইতার অংশিক উত্তর পাওয়া যাইবে পাকিস্তানের মার্কিন দেশস্থ প্রতিনিধিবর্গের ব্যক্তিগত ও আদান প্রদানে এবং তাহার বহিনীতি-অধিকারবর্গের কার্যক্রমে। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ ও প্রতিনিধি দল বুঝিয়াছেন যে, ভারতের মর্যাদা এদেশে (আমেরিকায়) ক্রমশঃ কনিতেছে এবং ভারতীয়েরা সে বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া আছে, অন্ত কিছু করিতেছে না। সুতরাং পাকিস্তান সেই সুযোগে ফসল কাটিয়া গোলা বোঝাই করিতেছে। এদেশ (আমেরিকায়) প্রেরিত প্রতি পাকিস্তানীর যেন সকলসাধারণের সহিত অদান-প্রদান করার বিষয়ে একটা জ্ঞান অস্তিমজ্জাগত হইয়া আছে। তাহারা যেখানেই যায় সেখানেই নিজদেশের দেশের বিষয় একটা সুসমাচারের প্রচার করে এবং সকলকে বুঝিতে দেয় যে, তাহারা পশ্চিমের গণতন্ত্রের সমর্থক এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ পশ্চিমের সহিত জড়িত।”

“পাকিস্তানের বৈদেশিক বিভাগের লোকেরা শুধুমাত্র রাষ্ট্রনীতিতে দক্ষ নহেন, তাহারা লোকের সঙ্গে মিশিতে জানেন, অজ্ঞের মতামতের মর্যাদা বুঝেন।”

আর আমরা? সে বিষয়ে কি বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন আছে? আমরা কাহারও সঙ্গে পাছে শত্রুতা করা হয় সেই ভয়েই আড়ষ্ট। এতই আড়ষ্ট যে, কাহারও সঙ্গে সখ্য বা মিতালি করারও অবসর নাই। ঘবে-বাইরে আমরা সদাই শঙ্কিত পাছে অহিংসার ছুঁংমার্গে কলঙ্ক আসে। কাজেই পাকিস্তানের মরওম ভাল।

আমাদের এখন স্থির ভাবে ঠিক করা দরকার আমরা কি চাই। অসহায়, নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ দেশের পরিজ্ঞান নাই এ কথা ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে লেখা আছে। আমরা সেই ভাবে বাঁচিতে পারি একমাত্র দাসত্ব বরণ করিয়া। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সবল হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্ষমতা বর্ত্তমান জগতে কাহারও নাই ইহা আমাদের বুঝা প্রয়োজন।

এ কথাই অর্থ ইহা নচে যে বর্তমানে যে দুইটি শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতেছেন, তাঁহাদের যে-কোন একটির দলে সেবকরূপে আমাদের নাম লিখাইতে হইবে। তবে আমাদের স্পষ্ট বলিতে হইবে আমাদের রাষ্ট্র কোন মতে চলিতে চাহে, কোন আদর্শকে মানিতে প্রস্তুত এবং সেই আদর্শ রক্ষার জন্ত কি করিতে প্রস্তুত। সেই সঙ্গে ইহাও স্পষ্টভাবে জগৎকে জানান প্রয়োজন যে, আমরা নিজে ও প্রতিবেশীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত কি ভাবে এবং কি পরিমাণে ক্ষমতা ও ইচ্ছা রাখি।

ক্ষমতার কথাই চরম। বর্তমান জগতে অতিসন্ন্যাসিত গুপ্ত শক্তিমানের পক্ষেই মধ্যাদাযুক্ত। ঢাকালের অতিসন্ন্যাসিত এই মহাশয়কে গ্লীবদেরই পরিচায়ক এটী স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি আমাদের বুঝিবার সমস্ত আশিত্যে। ইহা কোনও নতুন তথ্য নহে, ইহা চিরন্তন সত্য। আমাদের দেশে ক্ষত্রধর্ম বর্ণন জাগ্রত ছিল তখন হইতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত।

### পাক-মার্কিন চুক্তি সম্পর্কে মহম্মদ আলী

“ওয়ারশিংটন, ১:১৫ জাহুয়ারী—পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলীর মতে জব্বরী অবস্থায় দেশবন্ধুর জঙ্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যে-কোন মিত্ররাষ্ট্রকে পাকিস্তানের ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না।

মিঃ মহম্মদ আলীর সঠিত সাক্ষাৎকারে যে বিবরণ এখানে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি একথা বিশেষ জোরের সঠিত বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান যদিও মার্কিন সামরিক সাহায্য সানন্দে গ্রহণ করিবে তথাপি দুই দেশের মধ্যে অমুদ্রিত ঘরোয়া বৈঠকে ঘাঁটি দিবার প্রশ্ন গণনও উঠে নাই। মহম্মদ আলী আরও বলেন, স্বতন্ত্র পথান্ত সামরিক সাহায্যের সঙ্গে কোন বৈদেশিক শক্তিকে ঘাঁটি দেওয়ার কথা না থাকিবে, ততক্ষণ পথান্ত ইহা সকলের সমর্থনলাভ করিবে।

মিঃ মহম্মদ আলী ‘উই. এস. নিউজ গ্রুপ ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট’র প্রতিনিধির নিকট এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ উক্ত পত্রিকায় ‘সর্বস্ব সংরক্ষিত’ সংবাদরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

জব্বরী অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ঘাঁটি ব্যবহার করিতে পারে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মহম্মদ আলী বলেন, আমরা দেশবন্ধুর জঙ্গ পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থাই ঘাঁটি নিষ্কাশন করিব এবং জব্বরী অবস্থায় এই এলাকা রক্ষার জঙ্গ আমেরিকাসহ যে-কোন মিত্ররাষ্ট্রকে এই সমস্ত ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিবার পক্ষে কোন বাধাই থাকিতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, মার্কিন সাহায্য দ্বারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৃথিবীর মধ্যে একটি অসমতম শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হইতে পারে। প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ আলী বলেন,—পাক বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা শ্রীনেহরুর নাই। ভারতের ৩৬ কোটি লোক

সাড়ে সাত কোটি লোকের দেশ পাকিস্তানের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িবে—ইহা কল্পনা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। শ্রীনেহরু কোন নীতি অগ্রসরণ করিয়া চলিতেছেন, তাহা আপনাদের মনে রাখা দরকার। পৃথিবীতে বর্তমানে দুইটি রাষ্ট্রজোট রহিয়াছে। এই দুইটির শক্তিই প্রায় সমান সমান। শ্রীনেহরু রহিয়াছেন ঠিক মাঝখানে। নিরপেক্ষতার নীতি অগ্রসরণ করিয়া তিনি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে তাঁহার দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তি-সাম্যের অবস্থা এরূপ জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারত রাশিয়ার দিকে ভিড়িয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ শ্রীনেহরুকে চটাইতে চাহিতেছেন না। দুইটি সমান শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত একটি দুর্বল রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত কাজে লাগান হইতে পারে। শ্রীনেহরুও ইহাই চাহিতেছেন। দুইটি ভারসাম্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিয়া তিনি দুইটি রাষ্ট্রজোটের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে চান। এজন্য কোন রাষ্ট্র যদি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে দলে টানিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে শ্রীনেহরুর অবস্থা অনেকটা দুশাল হইয়া পড়িবে। এই কারণেই শ্রীনেহরু পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধী।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী ঢাকার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে বহু বার প্রয়োজন তত বার তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঠিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু প্রস্তাবিত সামরিক সাহায্য সম্পর্কে এইরূপ সাক্ষাৎকার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না—ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যের ব্যাপারে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রবল আন্দোলন চলার জঙ্গ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঠিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি উপরি-উক্ত মন্তব্য করিয়া বলেন যে, ভারত যদি তাঁহাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহাদের উদ্বেগের কারণ আছে। সেইজন্য তিনি পুনরায় ভারতকে এ সম্পর্কে সংযম অবলম্বনের অহুরোধ করিতেছেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে ওকালতীর কুটকট অনেক কিছুই আছে। আমাদের প্রশ্ন এইমাত্র, “কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি অন্তঃসজ্জা করিতে চাহিতেছেন।” ইহার স্পষ্ট উত্তর কি তিনি সারা পৃথিবীকে জানাইবেন?

পশ্চিম নেহরুর মনের অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তাঁহাকে প্রশ্ন এইমাত্র যে, ভারতের মান-মর্যাদার কোনও মূল্য জগতে আছে কি? যদি তাহা না থাকে তবে সে বিষয়ে তিনি কি করিতে চাহেন?

### নিক্সনের ভারত-বিরোধী বিবোধগার

গত ৬ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহঃ-সভাপতি মিঃ রিচার্ড নিক্সন এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি সফরে বাহির হন এবং

সম্প্রতি সফর শেষ করিয়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সফরের এক গুরু রিপোর্ট জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করেন। এই নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার স্বয়ং; অন্ত্যস্ত সভারাই হইতেছেন প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রসচিবস্বরূপ, বৈদেশিক কার্যাবলি সংস্থার প্রধান এবং জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্ক বোর্ডের সভাপতি। মার্কিন সাপ্তাহিক “নিউজ উইক” পত্রিকার ৩১শে ডিসেম্বর সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, পরিষদে দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতাশ্রমক্ষে মিঃ নিক্সন বলেন যে, সফরান্তে তিনি এই বিশ্বাস লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন যে, “ভারতের নিরপেক্ষতার কারণ এই, নেহরু এই কথা বিশ্বাস করেন যে অ-কমিউনিষ্ট এশিয়ার দেশগুলি দুর্বল এবং অন্ত্যস্তীন থাকিলেই কেবলমাত্র ভারত প্রভূতশালী শক্তি হিসাবে অবস্থান করিতে পারিবে।”

পত্রিকাটি আরও লিখিতেছেন, “মিঃ নিক্সন নাকি মনে করেন যে নেহরু স্বাতিবাদ ঘৃণা করেন কিন্তু শক্তিকে সম্মান করেন।” তিনি রিপোর্টে বলেন—তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, “আমেরিকার পক্ষে বাতা ভাল তাতার উপর ভিত্তি করিয়াই মার্কিন নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত, নেহরুর কৃষ্ণ চাইবার ভয়ের উপর নহে।” এই নীতির ভিত্তিতে তিনি পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যদানের সুপারিশ করেন।

পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী মিঃ নিক্সন মনে করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বোভেন্সিয়ার পরিস্থিতি “স্পর্শকাতর” এবং তথায় ও “সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অসুস্থরূপে ভারতীয় বৈদেশিক সংস্থা পশ্চিমের বিরোধিতা করিতেছে।”

মার্কিন সহঃ-সভাপতি নাকি আরও বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সম্পদ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার স্থান বিশেষ গুরুত্বলাভ করিবে।

মিঃ নিক্সন ইন্সোচীনের সম্পর্কে লঘু মনোভাবের বিকল্পে সতর্ক করিয়া বলেন যে, যদি কমিউনিষ্ট জয়লাভের ফলে অথবা ক্রান্তির সহিত কোন চুক্তির ফলে ইন্সোচীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তচ্যুত হয় তবে মালয়, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্ত্যস্ত দেশগুলিও সেই পথ অনুসরণ করিবে। পরিশেষে জাপানও কমিউনিষ্টদের কবলে পড়িতে বাধ্য হইবে, কারণ এই সকল দেশের সহিতই ভারত বাণিজ্যের অধিকাংশ নির্ভর করে।

সীমায়ান দ্বীর ব্যক্তিত্ব নিক্সনকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং মিঃ নিক্সনের অভিমতে একমাত্র দ্বীর পিছনেই কোরীয় জনগণের সমর্থন আছে।

### বিহারে বাঙ্গালী দমন

অল্প কিছুদিন পূর্বে বিহারের প্রধানমন্ত্রীর সর্বাধীন উপলক্ষে বিহারের নেতৃবর্গ বাংলায় ও উড়িষ্যায় বিহার সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ হইতেছে তাতাকে অপপ্রচার বলিয়া নিন্দা করেন এবং মান-চুস ইত্যাদি বাঙালী অকল ও সরাইকলা ইত্যাদি উড়িষ্যাদেশজ অকল বিহারের কবল হইতে উদ্ধারের চেষ্টাকেও নিন্দাবাদ করেন।

তাহার কিছুদিন পূর্বে জামতাড়ার বিহারের মন্ত্রী জৈনকবল্লভ সহায় বিহারের কর্তৃপক্ষের বাঙালীর ও বাংলাভাষার প্রতি প্রীতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, বাংলাভাষা বা বাঙালীর প্রতি তাঁহাদের কোনও বিদ্বেষ আছে এমন অপপ্রচারের কোনও মূল্য নাই।

নিম্নলিখিত সংবাদে এই সকল বিবয়ের উপর তীব্র আলোকপাত হইয়াছে :

“পুন্ডলিয়া, ১৩ই জানুয়ারী—পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মানদুয়ের গণ-উৎসবের অঙ্গ-স্বরূপ ‘টুন্ডুর’ সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। স্থানীয় শহরে লোকসেবক সঙ্ঘের ১২ জন লোককে পুলিশ এই গান গাতিবার অপরাধে বেলা সাড়ে বায়োটায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। এইদিন অপরাহ্নে ছয়টার পুন্ডলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক মানদুয় লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক জৈনকবল্লভ ঘোষ ও তাঁহার দলের ১১ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইতিমধ্যে পুলিশ জৈনকবল্লভ মাতাশেখর নেতৃত্বে ১৬ জন লোকের আর একটি দলকেও আজ বাঙ্গালীর গ্রেপ্তার করিয়াছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ঘোষ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ নির্বিকারে যে ভাবে দমন-নীতির আশ্রয় লইয়াছে, তাগাতে এখনকার বর্তমান পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুন্ডলিয়া কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, ‘টুন্ডুর’ গান এবং বেআইনী শোভা-বাজা পরিচালনার ভগ্ন ভন-নিরাপত্তা আইনে এই সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে পৌষ সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে ঐ-পুন্ডুর, যুবা-বৃদ্ধ নিঃশেষে মানদুয় লক্ষ লক্ষ লোক ‘টুন্ডুর’ গান গাতিয়া আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির কণ্ঠবোধে চেষ্টা সত্যই বিস্ময়কর!”

### ভারত-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি

১৯৫৩-৫৪ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ৭৭১ কোটি ডলার সাহায্য দিবে। ইহার মধ্যে সদ্যসম্পন্ন চুক্তি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষকে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দিবে। এই অর্থ দিয়া ভারতবর্ষ চারি প্রকার ইম্পাত দ্রব্য ক্রয় করিবে, যথা—শীট, প্লেট, রেল এবং রেলপথের জন্য লোহার স্লাপার। ১৯৫৩-৫৪ সনে ভারতবর্ষের প্রায় ৭২৫ লক্ষ টনের মত এই জিনিষগুলির প্রয়োজন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই জাতীয় দ্রব্যগুলির উৎপাদন কেবলমাত্র ৩৪০ লক্ষ টনের মত হইবে। আমেরিকার ডলার দ্বারা ভারত-বর্ষ প্রায় ২ লক্ষ টন এইরূপ ইম্পাতদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিবে। এই জিনিষগুলি আমদানী করিবার এবং বন্ডের জাহাজে উঠানো-নামানোর জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ হইবে। এই টাকা ভারত-সরকার দিবে।

চলতি বৎসরের জন্য যে ৭৭১ কোটি ডলার ভারতবর্ষ সাহায্য পাইবে, তাহার মধ্যে মোট সে ৪৫৫ কোটি ডলার পাইয়াছে। পূর্বে ২ কোটি ডলার লইয়াছে। গত দুই বৎসরে ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে মোট ১৬৫৪ কোটি ডলার সাহায্য পাইয়াছে।

বর্তমান চুক্তি অনুসারে, ভারতবর্ষে ভারত প্রয়োজনীয় ইম্পাত এবং পৃথিবীর যে-কোন দেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিবে।

### রেলপথের ও ইম্পাতের জন্য মার্কিন সাহায্য

ভারতীয় রেলপথগুলির উন্নতি বিধানের জন্য বিদেশ হইতে ইঞ্জিন ও ওয়াগন ক্রয় করিতে ১৯৫৪ সালে বৈষয়িক সাহায্যের অল্প হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত-সরকারকে ত্রুটি কোটি ডলার দিবে। এই প্রসঙ্গ অর্থের বিনিময়ে এক শতটি নতুন ইঞ্জিন এবং পাঁচ হাজার ওয়াগন ক্রয় করা যাইবে। জাহাজ ভাড়া, মাল উঠানো ও বিভিন্ন অংশ সংযোজন করার জন্য ভারত-সরকার ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত-সরকার ইতিমধ্যেই ৭৬০টি ইঞ্জিনের ক্রয়াদেশ দিয়াছেন এবং আগামী ত্রুটি বৎসরে আরও ৫০০টির ক্রয়াদেশ দিবে।

আগামী ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতীয় রেলপথে চলচলকারী প্রায় ২৬ শত ইঞ্জিনের বয়স ৪০ বৎসরের বেশি হইবে, এবং ভারতের ৭৩ হাজার ওয়াগনের অর্ধ ইতিমধ্যেই নিঃশব্দিত হইয়াছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির সন্নিহিত শেষ হইবে।

গত ৫টি জাহাজী নয়াদিল্লীতে স্বাক্ষরিত ভারত-সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে আর এক চুক্তির বলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত-সরকারকে বিদেশ হইতে ত্রুটি লক্ষ টন ইম্পাত কিনিবার জন্য ১২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা সাহায্য হিসাবে প্রদান করিবেন। বন্দরে মাল নামান, বিভিন্ন কার্যকেন্দ্রে মাল পাঠান এবং অস্থায়িক ব্যয় হিসাবে ভারত সরকার ব্যয় করিবেন ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতবর্ষকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য ১ কোটি ৭১ লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র স্থির করিয়াছে, ইহা ভারতের দ্বিতীয় চুক্তি। ভারতকে যে কেবল আমেরিকা হইতেই ইম্পাত কিনিতে হইবে চুক্তিতে সেক্ষেপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ১৯৫৩ সনের জুন হইতে ১৯৫৪ সনের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার নিমিত্ত ভারতের আনুমানিক ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টন ইম্পাতের প্রয়োজন, অর্থাৎ এই সময়ে ভারতে আনুমানিক ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন ইম্পাত উৎপন্ন হইবে। স্থির হইয়াছে চার প্রকারের ইম্পাত আমদানী করা হইবে, শীট ৮০ হাজার টন, শ্লেট ৫০ হাজার টন, বেল ৫০ হাজার টন এবং স্লীপার বার ২০ হাজার টন।

### শতবার্ষিকী বৎসরে ভারতের রেলওয়ে

ভারতের রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতি শ্রী এফ. সি. বাখোয়ায় লিখিতেছেন যে, ১৯৫৩ সাল ভারতীয় রেলপথের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—এ বৎসরে রেলপথ স্থাপনের শতবার্ষিকী পালন করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, আকস্মিক ভিত্তিতে রেলপথগুলির পুনর্বিভাগের পর পূর্ণ এক বৎসর অতীত হয়; তৃতীয়তঃ, গত ১লা

অক্টোবর হইতে প্রথম শ্রেণী তুলিয়া দেওয়ার কালে বহুকাল হইতে প্রচলিত চারটি শ্রেণীর স্থলে ভারতীয় রেলপথগুলিতে বর্তমানে কেবল তিনটি শ্রেণী চালু থাকিবে। অজ্ঞাত উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটি হইতেছে রেলপথগুলির স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি এবং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ তুলিয়া দিয়া ভারতের স্থলে রেলপথ-ব্যবহারকারী পরামর্শদাতা-সংস্থা গঠন এবং রেলকর্মচারীদের বিভিন্ন সম্মুখ একত্রিত হইয়া একটি প্রতিষ্ঠান—রেলওয়ে কর্মী জাতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্তি।

রেলপথগুলির ইঞ্জিন, ওয়াগন এবং অজ্ঞাত সাজসরঞ্জাম অত্যন্ত পুরাতন হইয়া পড়ায় বর্তমানে রেলপথগুলির সম্মুখে পুনর্গঠনের কার্য হইতে দেখা দিয়াছে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য স্বভাবতই নতুন রেলপথ স্থাপন এবং নতুন উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রভৃতিক দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ মোট ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে রেলপথের জন্য ৪০০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এই টাকার মধ্যে রেলবিভাগই ৩২০ কোটি টাকা দিতে সক্ষম হইবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। বর্তমান এবং আগামী ত্রুটি বৎসরে অবশিষ্ট ২৫০ কোটি টাকা নিম্নোক্তরূপে ব্যয় করা হইবে :

১ পুনর্গঠন এবং কতকগুলি সাজসরঞ্জাম তৈরি	১৮৩ কোটি টাকা
২ পরিচালনা ও কারিগরি উন্নয়ন এবং যাত্রী ও কর্মীদের সুশিক্ষা	৮৩ কোটি "
৩ গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নতুন লাইন স্থাপন	৫০ " "
৪ বিবিধ	৪ " "

ক্রীবাখোয়ায় লিখিতেছেন, “১৯৫১ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত নতুন নতুন সাজসরঞ্জাম ও ইঞ্জিন ক্রয় করা সত্ত্বেও এই তারিখে মোট ৮২০৯টি রেল-ইঞ্জিন, ১৯,১২৩টি বগি গাড়ী ও ১,৯৯,৪৮৮টি ওয়াগনের মধ্যে ২৬৫৮টি রেল-ইঞ্জিন, ৬,৮৯৮টি বগি গাড়ী ও ৪৭,২৫৬টি ওয়াগনই ছিল কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত পুরাতন। অর্থাৎ, ১৯৫১ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে ভারতীয় রেলওয়ের শতকরা ৩২টি ইঞ্জিন, ৩৬টি বগি এবং ২৪টি ওয়াগনই প্রথম মহা-যুদ্ধেরও পূর্বে। ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে আরও শতকরা ১৩টি ইঞ্জিন, ১৬টি বগি ও ১৩টি ওয়াগন পুরাতন হইয়া যাইবে।”

১৯৫১-৫৬ সালে ভারতের রেল-ইঞ্জিন কারখানাগুলিতে বরাদ্দ এবং অজ্ঞাত সাজসরঞ্জাম ছাড়াও ৪৪০টি পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিন নির্মিত হইবে। প্রয়োজনের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের স্বল্পতা হেতু পরিকল্পনা কালে বিদেশ হইতে মোট ৮৫০ হইতে ৯০০টি নতুন ইঞ্জিন আমদানীর পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই সময়ে ভারতে ৪৫০টি বগি গাড়ী নির্মিত হইবে এবং বর্তমান চাহিদা ইহাতেই পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয়। স্থির হইয়াছে যে, ভারতীয় উৎপাদকের নিকট হইতে ৪০ হাজার ওয়াগন এবং বিদেশ হইতে ১৮

হাজার ওয়াগন ক্রয় করা হইবে। বগি গাড়ী নির্মাণের জন্য মাস্তোজের নিকট পেরামবুরে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আশা করা যায়, এই কারখানার উৎপাদন আরম্ভ হইলে অন্ততঃ বাজীবাড়ী গাড়ীর জন্য বিশেষের যুগাপেক্ষী হইতে হইবে না।

১৯৫৪ সালে পাঁচটি নতুন লাইনের কাজ চলিবে—“তাজদের মোট দৈর্ঘ্য ২৬৭ মাইল। অপর ৭টি প্রস্তাবিত লাইন জরীপের কাজে ১৯৫৩-৫৪ সালের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটির উদ্দেশ্য হইল পশ্চিমবঙ্গে তিলডাঙ্গা-খাজুরিয়া মালমত লাইনে সম্ভাব্য সংযোগ স্থাপন।”

ক্রিষাখোয়ার লিপিতেছেন : “বর্তমানে মাল ও বাজীবহনের ট্রান্সপোর্ট প্রায় স্বাভাবিক পৰ্যায়ের নামিয়া আসিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে বাজীবহনের পরিমাণ সর্বোচ্চে উঠিয়াছিল। কিন্তু ইতার পরে ভাড়া বৃদ্ধি করায় বাজীর সংখ্যা হ্রাস পাইলেও আর হ্রাস পায় নাই। বর্তমানে যাজীব ও বাজী মাইলের সংখ্যা হ্রাস পাইলেও যুদ্ধ-পূর্বের অবস্থার তুলনায় এখন শতকরা ১৭০.১৩ ভাগ বেশী বাজী বাহিত হইতেছে এবং বাজী মাইলও এখন শতকরা ১২৫ ভাগ বেশী।” বাজী ও মালের দ্রুত আরের হার এখন প্রায় প্রাক-যুদ্ধকালীন তারের নিকটবর্তী হইয়াছে। অবিসম্ভে বাজীসংখ্যা বৃদ্ধির তেমন আশা না থাকিলেও উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে মালবহনের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোচ্য বংসরের অপর নতুন প্রচেষ্টার কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে—তাগা হইতেছে, প্রত্যেক রেলওয়েতে এবং কেন্দ্রে রেলওয়ে ব্যবসায়কারীদের পরামর্শদাতা সংস্থা স্থাপন। জনসাধারণের সুপ্তসুবিধা বিধান এবং রেলপথের সাধারণ পরিচালনা বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেপার্টে ইতারের উদ্দেশ্য। পূর্বেরকার স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটির স্থান ইতারা গ্রহণ করিয়াছে।”

পরিষেবে ক্রিষাখোয়ার বলেন, “রেলওয়ে শ্রমিকদের দিক বিবেচনা করিয়া বলা যায়, ১৯৫৩ সাল ছিল সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার বংসর, বস্তুতঃ ইতারের অকৃত্রিম সহযোগিতা বাতীত ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতি সম্ভব হইত না। রেলওয়ে শতবার্ষিকী বংসরে লক্ষ লক্ষ রেলওয়ে কর্মী সত্যই উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন।”

### কলম্বো পরিকল্পনার দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণী

কলম্বো পরিকল্পনা সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে, “কলম্বো পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যসূচী কঠিন অবস্থার পৌছিতেছে।” রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনার সাক্ষ্য তিনটি অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। “প্রথমতঃ, পরিকল্পনাত্ত্বক এলাকার দেশসমূহকে তাজদের প্রধান প্রধান কার্যসূচীর উপর মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং ‘তাজদের সর্বপ্রকার সম্পদের পূর্ণ সম্ভাব্যতার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পণ্যাদির মূল্য-বৃদ্ধিবোধ এবং বধ্যাসম্ভব অধিক পরিমাণ অর্থসঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিবার জন্য ঐ দেশগুলিকে দৃঢ় আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করিতে

হইবে। তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক মূলধন আমদানী বদ করা হইবে না। উহা বধ্যাসম্ভব বাড়াইতে হইবে।”

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ দেশেরই প্রধান রপ্তানী দ্রব্য কাঁচামাল। গত দুই বংসরে এই সকল রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য অনেক কমিয়া যাওয়ার এবং বিশেষতঃ মূলধনী মাল কিম্বা অত্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় আমদানী দ্রব্যের মূল্য অল্পরূপ ভাবে না কমিবার ফলে রপ্তানী বাবদ দেশের আর কমিয়া যাওয়ার দেশে বেকারসমষ্টি বৃদ্ধি হয় এবং রাজস্বও কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া জনসাধারণের সঞ্চয় ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যসূচী রূপায়িত করিবার সম্পদও হ্রাস পায়।

“তাগা সম্বন্ধে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ সালে উন্নয়নের কাজে অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। একজন তাগাদিগকে সঞ্চিত উদ্ধৃত টাকা ব্যয় করিতে হয় এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তাজদের আভ্যন্তরীণ সম্পদের উপরেও খুব বেশি চাপ পড়ে।”

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতে ৩৫ লক্ষ একর ভূমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় পাঁচোৎপাদন ৫০ লক্ষ টন বাড়িয়াছে। ভারতে বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ৩১৫০০০ কিলোওয়াট বাড়িয়াছে।

ঐ বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলের ভল্ল ১৯৫২-৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সর্বাধিক বোম্বী সাহায্য পাওয়া যায়—পরিমাণ ২৬ কোটি ৯১ লক্ষ ডলার, তন্মধ্যে ভারত প্রায় ৯ কোটি ৭১ লক্ষ ডলার, নেপাল ৭ লক্ষ ডলার, পাকিস্তান ২ কোটি ২৭ লক্ষ ডলার, কাম্বোদিয়া, লাওস ও ভিয়েতনাম ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ডলার এবং ৫ কোটি ১৪ লক্ষ ডলার পায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। তাগা ছাড়া ঐ দুই বংসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানকে গম কিনিবার তত্ত্ব ধার দিয়াছে ৩০ কোটি ডলার। স্বর্ণ-করা গম বিক্রয়ের টাকায় যে তত্ত্ববিল সঞ্চিত হইবে তাগা আর্থিক উন্নয়ন পরি-কল্পনার গচ্চ করা হইবে। গত তিন বংসরে ফিলিপাইন ও ইন্দো-নেশিয়া স্বর্ণ পাইয়াছে ৮ কোটি ৯২ লক্ষ ডলার।

ভারত, পাকিস্তান, সিংগল প্রভৃতি দেশের পাওনা ঠালিঃ ব্রিটেন শোধ করিয়া দিতেছে; প্রতি বংসরে ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে পরিকল্পনার ছয় বংসর কাল দিতে থাকিবে। কমন্ওয়েলথ উন্নয়নের জন্য মূলধন সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লওনে একটি ফিন্যান্স কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে। মালয়, সিঙ্গাপুর, সাবওয়াক এবং উত্তর বোর্নো পুনর্গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্রিটেন সাড়ে ছয় কোটি পাউণ্ড দিবে। উত্তার মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ১৯৫২-৫৩ সালে ব্যয় হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনে সাক-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য পাকিস্তানকে এক কোটি পাউণ্ড ধার দিয়াছে।

কানাডা এ পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ডলার ধার দিয়াছে। উত্তার মধ্যে পণ্য ও সরঞ্জামও বহিরাছে।

অষ্ট্রেলিয়া সরকার কলম্বো পথিকল্পনার জন্য প্রতিশ্রুত তিন কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে।

ভারত নেপালকে ২ কোটি টাকা দিয়াছে। তন্মধ্যে এক কোটি টাকা সড়ক উন্নয়নে এবং ভারত ও নেপালের মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপনে, ৫০ লক্ষ টাকা সেচব্যাপারে এবং ৫০ লক্ষ টাকা সমগ্র নেপালে বিমান হইতে তদন্ত কার্যে ব্যয় হইয়াছে। তাছাড়া ভারত বিভিন্ন দেশকে ৫ জন বিশেষজ্ঞ সমবরাদ্ধ করিয়াছে এবং বিদেশের ২৮ জন শিক্ষার্থীকে এদেশে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দিয়াছে।

### ভারত-জার্মান ইম্পাত শিল্প-চুক্তি

গত ২১শে ডিসেম্বর ভারত গবর্নমেন্ট জার্মানীর শিল্প সংস্থানদ্বয়, —ক্লপ ও ড্রেমাগের সহিত ভারতে ইম্পাত কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। প্রস্তাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি সরকারী শিল্পক্ষেত্রে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হইবে। এটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি “হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড” নামে একটি যৌথ সংস্থান হইবে—ইহার মোট মূলধন হইবে ১০০ কোটি টাকা।

প্রথম দফায় ৭০ কোটি টাকা গৃহীত হইবে এবং ইহার মধ্যে আপাততঃ ৩৫ হইতে ৫০ কোটি টাকার মত মূলধন প্রদত্ত হইবে। বাকী টাকা সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। এই কারখানাটি প্রথমে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টন করিয়া ইম্পাত উৎপন্ন করিবে, পরে ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা ১০ দশ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে।

এই যৌথ সম্পদ দশ বৎসরের জন্য স্থায়ী থাকিবে, পরে যে-কোনও পক্ষ আরও দশ বৎসরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। ক্লপ ও ড্রেমাগ চার বৎসরের মধ্যে কারখানাটিকে চালু করিবে। চালু হইবার পর তিন বৎসর পর্যন্ত তাহারা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ব্যতীত উপদেষ্টা হিসাবে কার্য করিবে। ভারত গবর্নমেন্ট শতকরা ৮০ ভাগ মূলধনের স্বত্বাধিকারী থাকিবেন, বাকী কুড়ি ভাগ জার্মান কার্পগুলির অধীনে থাকিবে।

নয় বৎসর পরে ভারত-সরকার ইচ্ছা করিলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। কিংবা নয় বৎসর পরে যদি জার্মান কার্য ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদের অংশ গবর্নমেন্টের কাছে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। জার্মান কার্য তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে ২.১০ কোটি টাকা লইবে। যদি চুক্তিমত তাহারা কারখানাটিকে কার্যকরী করিতে না পারে তাহা হইলে শাস্তি হিসাবে তাহাদের ঐ পারিশ্রমিক মুদ্রা পাইবে না। জার্মান কার্য কোন বোনাস কিংবা বয়ালটি পাইবে না এবং তাহাদের আর ভারতীয় আয়করের আওতায় পড়িবে।

এই প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভারত-সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। সুতরাং দেখা বাইতেছে যে,

এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে প্রায় ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ভারত ও জার্মান অংশের অনুপাত হইবে ৪ : ১। প্রথমে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা লইয়া এই শিল্পটির স্থচনা হইবে—ভারত-সরকার দিবেন ৪ লক্ষ টাকা, জার্মান কার্য দিবে ১ লক্ষ টাকা।

প্রথমে অনেকে এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখা বাইতেছে যে, প্রায় সব কয়টি সর্বোচ্চ ভারতের অনুকূলে। অধিকন্তু টাটা আয়রণ, ইস্তিরান আয়রণ এবং হিন্দুস্থান স্টীল এই তিনটি প্রতিষ্ঠান পরস্পর সাভায়মূলক ভাবে কার্য করিবে।

আমাদের দেশ এখনও ইম্পাতের বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল নহে। একদিকে যে পরিমাণ ইম্পাতের চাহিদা দেশে বরাবর থাকে তাহার অর্ধেকও দেশে উৎপন্ন হয় না, অল্প দিকে বিশেষ বিশেষ প্রকারের ইম্পাত—যেমন জাহাজ তৈরির জন্য প্রয়োজন—এদেশে আদৌ হয় না। সুতরাং এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা জরুরী।

### ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী

ভারতের মোট জনসংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৬ লক্ষের মধ্যে ২১ কোটি ৪৩ লক্ষ লোক (অর্থাৎ, মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০.১ ভাগ) পরনির্ভরশীল, তাহারা নিজেরা কোন জীবিকা অর্জন করে না। ১৯৫১ সনের জনগণনার এই তথ্য জানা গিয়াছে। প্রধানতঃ ইহারা জীলোক এবং শিশু—পিতা বা সংসারের অজ্ঞান স্বাবলম্বী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সংসারের চাববাসে যে সকল জীলোক সাভায়া করে তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত তালিকায় পরনির্ভরশীল পুরুষ ও জীৱ সংখ্যা দেওয়া হইল :

পরনির্ভরশীল পোষা		
সংখ্যা (লক্ষ হিঃ)		শতকরা
গ্রাম্য পুরুষ	৬৭৪	৪৫.০
শহুরে পুরুষ	১৫২	৪৫.৬
গ্রাম্য জীৱ	১,০৬৫	৭৩.৫
শহুরে জীৱ	২৫২	৮৬.১
	২,১৪৩	৬০.১

পরনির্ভরশীল জীলোকের সংখ্যা পরনির্ভরশীল পুরুষের সংখ্যার চেয়ে অধিক। আবার গ্রামের চেয়ে শহরের মেয়েরা বেশী পরনির্ভরশীল, কারণ গ্রামের মেয়েরা সাধারণতঃ চাববাসে সাহায্য করে।

স্বাবলম্বী লোকের সংখ্যা মোট ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ। তাহার মধ্যে ৭ কোটি ১০ লক্ষ (অর্থাৎ, শতকরা ৬৮.১) লোক হইতেছে চাষী এবং ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ (অর্থাৎ, শতকরা ৩১.৯) জন কৃষিজীবী নয়। কৃষিজীবীদের মধ্যে শতকরা ৬৪.৪ জমির অল্পবিস্তর মালিক। শতকরা ২১ জন হইতেছে কৃষিকর্মী। কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই জমির মালিক।

স্বাবলম্বী অকৃষকদের মধ্যে (non-agriculturists)



মালিকের অল্পপাত অভাব—বিশ্ব জন্মের মধ্যে একজন মালিক কিংবা তাহারও কম। স্বাধীন ব্যবসায় লিপ্ত বাহারা আছেন (মালিক বাতীত) তাঁহাদের সংখ্যা মালিক এবং শ্রমিক ও কর্মচারীর বৃদ্ধ সংখ্যা হইতে অধিক। ইহারা সাধারণতঃ উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি।

আয়কর্মীদের (income-earners) মধ্যে বাহারা লন্যান্স পার তাহাদের সংখ্যা শ্রমিক এবং অসঙ্গ কর্মচারীদের বৃদ্ধ সংখ্যা হইতে অধিক। অর্থাৎ, কৃষিজীবীদের মধ্যে মালিকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু অকৃষকদের মধ্যে (স্বাধীন উপজীবিকা বাতীত) বাহারা ব্যবসারে এবং শিল্পে লিপ্ত আছে, তাহাদের মধ্যে মূল্যাকারীদের (earners of profit) সংখ্যা অধিক।

৩ কোটি ২৪ লক্ষ লোক শিল্পে এবং চাকুরীতে নিয়োজিত আছে। প্রাচীন শিল্প, যথা—চা, রবার, কফি ইত্যাদিতে ১০'৬ লক্ষ লোক কাজ করে; কয়লার খনিতে ৩'১ লক্ষ লোক; উৎপাদন শিল্পে ৯২ লক্ষ; বস্ত্রশিল্পে ২১ লক্ষ; কেমিক্যাল এবং খাদ্য শিল্পে ১২'৪ লক্ষ; এবং অসঙ্গ উৎপাদন শিল্পে ২৪'৩ লক্ষ। ব্যবসারে লিপ্ত আছে ৫৯ লক্ষ;—ইহার মধ্যে খুচরা ব্যবসারে আছে ৫১ লক্ষ লোক আর পাইকারী ব্যবসারে আছে ৪'৬ লক্ষ লোক। নির্মাণকারী প্রভৃতিতে আছে ১৬ লক্ষ লোক এবং যানবাহন ও পরিবহন ব্যবহার ১৯ লক্ষ লোক কাজ করে।

৩৩ লক্ষ লোক চাকুরীজীবী, ইহাদের মধ্যে সরকারী শাসনকার্যে আছে ২১ লক্ষ লোক। ইহাদের মধ্যে ৫ লক্ষ ৩ হাজার কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীজীবী (সৈন্তলকে লইয়া)। যথোক্ত আছে ১৪ লক্ষ লোক নিয়োজিত আছে।

একজন স্বাবলম্বী ব্যক্তি দুই জনকে পোষণ করে এবং প্রতি তিন জন স্বাবলম্বী ব্যক্তি একজন উপায়জীবী পরনির্ভরশীল ব্যক্তিকে (earning dependent) আংশিক ভাবে পোষণ করে। ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ লোক, অর্থাৎ, মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০'৬ ভাগ, "উপায়জীবী-পরনির্ভরশীল"—তাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের ভরণপোষণ করিতে পারে না। নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল :

#### উপায়জীবী পরনির্ভরশীল

	সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা
গ্রাম্য পুরুষ	১১৯ ...	৭'২
শহরে পুরুষ	১৫ ...	৪'৬
গ্রাম্য স্ত্রীলোক	২৩২ ...	১৬'০
শহরে স্ত্রীলোক	১৩ ...	৪'৫
	৩৭৯	১০'৬

ইহাদের সংখ্যা গ্রামেই অধিক, প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে। ইহারা সংসারের চাববাসে এবং কাপড় বোনার সাহায্য করে ও কোন মাহিনা লয় না।

মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ লোক স্বাবলম্বী, তাহাদের অল্পপাত শতকরা ২২'৩ ভাগ। নিম্নে ইহাদের তালিকা দেওয়া হইল :

#### স্বাবলম্বী ব্যক্তি

	সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা
গ্রাম্য পুরুষ	৭০৬	৪৭'১
শহরে পুরুষ	১৬৬	৪২'৮
গ্রাম্য স্ত্রীলোক	১৫১	১০'৪
শহরে স্ত্রীলোক	২১	৭'৪
	১,০৪৪	২২'৩

স্বাবলম্বী ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেক চর ভূমির তিস্র একজন করিয়া স্ত্রীলোক। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক পাঁচ জনে একজন, শহরে প্রত্যেক আট জনে একজন। স্বাবলম্বী কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবীদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

#### স্বাবলম্বী ব্যক্তি

	কৃষিজীবী		অকৃষিজীবী	
	সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা	সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা
গ্রাম্য পুরুষ	৫৬৬	৮০'২	১৫০	১২'৮
শহরে পুরুষ	১৯	১১'৪	১৪৭	৮৮'৬
গ্রাম্য স্ত্রীলোক	১২১	৮০'২	৩০	১২'৮
শহরে স্ত্রীলোক	৪	১২'৭	১৭	৮০'৩
	৭১০	৬৮'১	৩৩৪	৩১'৯

কৃষি, শিল্প, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি বাতীত অর্থাৎ ৭৫'৪ লক্ষ লোক অসঙ্গ বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত আছে। আট লক্ষ চাকুরীজীবী এবং ১৪'৫ লক্ষ স্বাধীন-স্বাবলম্বী (self-employed) ব্যক্তিরা কি কার্যে নিয়োজিত আছে সে সম্বন্ধে আদমশুমারী রিপোর্ট সঠিক কিছুই বলিতে পারে না। ইহারা সবাই গ্রামে বাস করে।

এই অবশিষ্ট ৭৫'৪ লক্ষ লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৮'১ লক্ষ লোকের উপজীবিকা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়, যথা—

#### সংখ্যা (হাজারে)

গৃহকার্য	১,৪২৪
ধোপাখানা ও ধোপাখানার কাজ	৫৬৫
নাপিত ও ক্ষৌরকার্য	৫১১
ধর্ম, শাস্ত্র ও মাদ্রাসিক কার্য	৩৬৯
আইনসংক্রান্ত এবং ব্যবসায় কার্য	২৩০
পেলায়লা, গানবাঁজন ইত্যাদি	২১৪
চোটেল, রেস্তোরাঁ	৪৫৮
আট, সংবাদপত্র ইত্যাদি	৩৯

### চা-রপ্তানীর পরিমাণ

সম্প্রতি ভারত-সরকার ভারতের চা-রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। গত এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক চা-চুক্তি অনুসারে ভারতের চা-রপ্তানীর পরিমাণ রপ্তানী মালের শতকরা ১১৫ ভাগে নির্ধারিত হয় (অর্থাৎ, প্রায় ৪০ কোটি পাঃ)। গত আগষ্ট মাসে শতকরা পরিমাণ ১২২শে বৃদ্ধি করা হয় (অর্থাৎ, প্রায় ৪২ কোটি ৪৮ লক্ষ পাঃ)। দ্বিতীয় বারে, ১৯৫৩-৫৪ সনের রপ্তানীর পরিমাণ ৪৩৭০ কোটি পাউণ্ডে বৃদ্ধি করা হইয়াছে, অর্থাৎ, রপ্তানী মালের শতকরা ১২৫.৫ ভাগ। আন্তর্জাতিক চা-চুক্তি অনুসারে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ৪৭ কোটি পাউণ্ডে নির্ধারিত করা আছে, অর্থাৎ, রপ্তানী মালের শতকরা ১৩৫ ভাগ।

ইদানীং বিদেশে ভারতীয় চায়ে চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে চা রপ্তানী করিবার অধিকারের মূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চা রপ্তানী করিবার জন্য লাইসেন্স পাইতে হইলে রপ্তানী কোটার অধিকারী হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। কোটার ভুলনায় চাহিদা বেশী হওয়ার দালাল ও মাধ্যমিক ব্যবসাদারেরা লাভ করিতেছে, ফলে রপ্তানী চায়ে মূল্য পাউণ্ড প্রতি পায়ে ৪০ পাই হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমে, রপ্তানীর লাইসেন্স পাওয়ার জন্য পাউণ্ড প্রতি দেড় পাই হিসাবে মূল্য দেওয়া হইত; এখন রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ১১৫ ভাগে নির্ধারিত হয় তখন ১৩ পাই পাউণ্ড হিসাবে রপ্তানী কোটা কেনা-বেচা হইতে থাকে। জুলাই মাসে পাউণ্ড প্রতি ২২ পাই হিসাবে বৃদ্ধি পায়। যদিও মাঝে ইহা অল্প হ্রাস পায়, কিন্তু পরে ইহা পাউণ্ড প্রতি ৪০ পাইয়ে বাড়ে। চলতি বৎসরে এটেনে প্রায় ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড উত্তর-ভারতীয় চা অতিরিক্ত পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে। বাণিজ্য সচিব সভা ব্যবসা-চুক্তি অনুসারে বাণিজ্য ক্ষমতা: ৩ কোটি পাউণ্ড ভারতীয় চা লইবে। ইদানীং চায়ে ফটকা-বাজার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রপ্তানী চায়ে মূল্য অথবা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতীয় চা অসুবিধায় পড়িয়াছিল। চায়ে রপ্তানী বৃদ্ধিতে ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারে চায়ে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ গত বৎসরের ভুলনায় উত্তর-ভারতের চায়ে পরিমাণ মোট এক কোটি পাউণ্ড কম হইবে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতীয় চা এবারে ৪০।৫০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত হইবে।

### থাগড়াই বাসন-শিল্পের দুর্গতি

৭ই পৌষের 'মুর্শিদাবাদ-সমাচার' পত্রিকা মুর্শিদাবাদে কুটীর-শিল্পী, বিশেষতঃ কাস্তে-শিল্পীদের হ্রাসের উল্লেখ করিয়া লিগিতেছেন : ১৯৫১ সনের লোকগণনার হিসাব হইতে জানা যায় মুর্শিদাবাদের শতকরা ৯৭.৭ জন অবিবাসী শিল্পকর্মী। মুর্শিদাবাদের প্রধান শিল্প বেশম; তাহা এখন ধ্বংসের পথে। ১৯১১ সনে মুর্শিদাবাদ জেলার বেগানে অনুমান ১৪০০০ লোক বেশমী হুতা

কাটিয়া বা বেশম বস্ত্র বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন ১৯৫১ সনে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া মাত্র ২২০ জনে দাঁড়াইয়াছে। বেশম শিল্পের পথই শিল্পীর সংখ্যার দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় শিল্প হইতেছে বাসন-শিল্প। কাসার বাসনের জন্য থাগড়ার কাংশ-শিল্পীরা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। থাগড়া এবং বহরমপুর ছাড়াও কান্দী, জলপুত্র, পাচগ্রাম ও বড়নগরেও কাংশ-শিল্পের বেশ প্রসার ছিল। কাংশ-শিল্প এখনও যথেষ্ট সাহায্য; বাস্তবিকই চলিতেছে। মাত্র কিছুকাল হইতে কলের সাহায্যে কাসার বাসনগুলি পাণ্ডিত্য করা হইতেছে। পিতল-শিল্পেও কেবলমাত্র পিতলের ধান- (পীট) গুলি কঁস হইতে আসে—অগাধ সকল কাজই কারিগরেরা হাতে করে।

এই শিল্পে মজুরী এবং কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যার জন্য বহু পরিবার জাত-ব্যবসা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ফলে বেশম-শিল্পের মত থাগড়াই বাসন-শিল্পেও শিল্পীর সংখ্যা দীর্ঘমত হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৪৭ সনে বঙ্গ-বিভাগের পূর্ব নবাবগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক পিতল ও কাংশ-শিল্পী সপরিবারে আসিয়া থাগড়া প্রভৃতি স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়া কারখানা চালাইবার কারণে শিল্পীসংখ্যা হ্রাস তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। তবে "শিল্পীর সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন হয় নাই।"

পরিশেবে "মুর্শিদাবাদ-সমাচার" লিগিতেছেন : "মুর্শিদাবাদের বেশম-শিল্পের উন্নতি-সাধন সম্পর্কে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সমবায় পদ্ধতির সাহায্যে বেশম-শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। এ সম্পর্কে একটি বেশম সমবায়-সমিতি গঠিত হইয়াছে। যদি এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলে থাগড়াই বাসন-শিল্পের উন্নতিকল্পে সমবায় প্রথার সাহায্যে অগ্রসর হইলে এই প্রখ্যাত কুটীরশিল্পটিও বিলোপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। থাগড়াই বাসন-শিল্প সম্পর্কে সরকারী শিল্প-বিভাগের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।"

### লবণ শুদ্ধ

ভারত স্বাধীন হইবার পর লবণ-কর রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি লবণ শুদ্ধ প্রবর্তিত করা হইয়াছে। বেসরকারী কারখানার প্রস্তুত লবণের উপর মণ প্রতি দুই আনা হিসাবে এবং সরকারী কারখানার প্রস্তুত লবণের উপর মণ প্রতি চৌদ্দ পয়সা হিসাবে শুদ্ধ দিতে হইবে। উৎপাদনের উপর লবণ শুদ্ধ পূর্ব হইতে ছিল, নতুন আইনমারা লবণ শুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করা হইল। লবণ শুদ্ধ হইতে বৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মত গবর্ণমেন্টের আয় হইবে। এই অর্থ সরকারী লবণ বিভাগের ব্যয়ে নিয়োজিত করা হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এবং পরিকল্পিতভাবে লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য এই শুদ্ধ সাহায্য করিবে।

সরকারী কৈফিয়ত হইতেছে এই যে, এই উৎপাদন ওজের পরিমাণ এত অল্প যে ইহা রহিত করিয়া দিলেও জনসাধারণের কোন সুবিধা হইবে না। ইহাতে কেবলমাত্র বড় বড় কারখানাগুলি ও মাধ্যমিক ব্যবসাদাররা উপকৃত হইত। ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে লবণ-কর রহিত করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হয় বৎসরে ৮'২৫ কোটি টাকা।

### পশ্চিমবঙ্গে তৈল সন্ধানের জন্ম চুক্তি সম্পাদিত

পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা সকলে পেট্রোলিয়ম সন্ধান করিবার জন্ম হিসেবের মাসে ভারত-সরকার ও মার্কিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। উক্তের মধ্যে সম্পাদিত পূর্ববর্তী এক চুক্তি অমুসন্ধানের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়, এই পর্বায়ে মাগনেটোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বিমান হইতে পেট্রোল অমুসন্ধান করা হইয়াছিল। গত মাসের চুক্তিতে এই অমুসন্ধানের কাজ অব্যাহত রাখিবার ও প্রসারিত করিবার কথা বলা হইয়াছে। তৈল অমুসন্ধানের কাণ্ড পরিচালনার ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ বহন করিবেন ভারত-সরকার এবং অবশিষ্ট অংশ বহন করিবেন উক্ত তৈল কোম্পানী ও অমুসন্ধানের ভার থাকিবে তৈল কোম্পানীর উপর।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম তৈল কোম্পানী ভারত-সরকারকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, অমুসন্ধান ও পরীক্ষাদি ফলে ভবিষ্যতে যদি বাণিজ্য এবং শিল্পের ভিত্তিতে পনিক তৈল উত্তোলন করা সম্ভবপর হয়, তবে তৈল কোম্পানী একটি তৈল শোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে। এই শোধনাগারে দৈনিক ১০ হাজার ব্যারেল (পিপা) পেট্রোল নূনপক্ষে শোধন করা সম্ভব হইবে।

### ধানের দরের নিম্নগতি

৩১শে ডিসেম্বরের "নূতন প্রজিকা" ক্রমভাসমান ধানের দর লক্ষ্য করিয়া এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিপিতেছেন যে, বর্ধমান জেলার অনেক স্থানেই ধানের দর মণপ্রতি ৭৮ টাকার নীচে নামিয়াছে। সরকারী খানাবিভাগ আশ্বাস দিয়াছিল যে ধানের দর পড়িতে দেওয়া হইবে না, কিন্তু শ' ওয়ালেস কোম্পানীকে ধান ক্রয়ের একচেটিয়া সুবিধা দেওয়ার পর সরকারের আর সে কথা; শ্রবণ নাই। কোম্পানী জেলার ধান-চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির অর্ধেকও পরিদ ডিপো খোলে নাই। উপরন্তু তাহার চাবীকে ভাষা দরও দেয় না। এই ভাবে অল্প পরিদ্যাবের পরিসের পথ বন্ধ করিয়া শ' ওয়ালেসকে একচেটিয়া পরিসের সুযোগ দেওয়ার চাবীর সর্বনাশ হইতেছে।

প্রজিকাটি লিপিতেছেন : "যদি অবিলম্বে ছোট বড় সব মোকামে পরিদ ডিপো খোলান যায় ও কোম্পানীকে ভাষা মূল্য দিতে বাধ্য করা যায় তবেই কৃষক কতকটা রক্ষা পাইতে পারে।"

এখানে প্রশ্ন—ভাষা মূল্য কি? বাহারা চাল কিনিয়া পায় এবং তাহাদের সংখ্যা কোন অংশেই নগণ্য নহে—তাহারা চাহে চাউলের দর পড়ুক। চাবী চাহে থাকেব উচ্চ মূল্য। দুইয়েব মাঝামাঝি কিছু স্থির হওয়া প্রয়োজন, বাহাতে চাবীরও কিছু লাভ থাকে এবং 'কুলাক'বর্গও রক্ত শোষণ করিতে না পারেন। সরকারের লেভী ও প্রোকুরামেন্টের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া সে বিভাগ ত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন পরিদ ডিপোর খুবচ দিবে কে?

### পশ্চিমবঙ্গে ভূদান আন্দোলন

"ভূদান যন্ত্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল ভূমিহীন দরিদ্র ভূমি চাষ করিতে জানে ও ভূমি চাষ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে চায় তাহাদের দারিদ্র্য মোচনের জন্ম ভূমিদানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জীবিকার সংস্থান করা। উহার চরম লক্ষ্য এই যে, ভূমিহীন দরিদ্রের জন্ম ভূমির সংস্থানকে ভিত্তি করিয়া দেশে সর্বোদারের প্রতিষ্ঠা।"

পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযন্ত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভূদান আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপবাস্তব মন্তব্য করিয়া জীবুত চাকচন্দ্র ভাণ্ডারী লিপিতেছেন যে, বিভিন্ন সরকারী হিসাব হইতে দেখা যায়, অবিত্তক বঙ্গে ভূমিহীন চাবীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। "চুক্তির সময় ৯ লক্ষেরও অধিক পরিবার তাহাদের ধানী ভূমি বিক্রয় করিয়া কেলেতে বাধ্য হয়। আড়াই লক্ষ পরিবার তাহাদের বাসভিটা পর্যন্ত হারাইয়া সর্বভাগ হইয়া যায়। চুক্তির পূর্বে কৃষিক্ষেত্র পরিবাদের মধ্যে শতকরা ১৬টি পরিবারের কিছু কিছু ধানী ভূমি ছিল। চুক্তির সময় তাহাদের মধ্যে শতকরা ১০টি পরিবার তাহাদের বাসা কিছু ভূমি ছিল তাহা সবটাই হারাইয়া বসে। অজ্ঞাত কৃষিজীবী পরিবারও অসংখ্য চক্রান্ত পতিত হইয়াছিল।"

এই সকল কথা শ্রবণে রাখিলে ভূদানযন্ত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অস্বীকৃত হইবে।

তিনি লিপিতেছেন : "ভারতের মোট কর্ণযোগ্য ৩০ কোটি একর ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ পাঁচ কোটি একর ভূমি ভূদানযন্ত্রে দানস্বরূপ গ্রহণ করিবার সম্ভব করা হইয়াছে। তবে প্রথম পাদক্ষেপস্বরূপ দুই বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৪ সনের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ভারতে পঁচিশ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিতে হইবে। ঐ ২৫ লক্ষ একরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ একর ভূমিদান করিবার কথা। এই দুই বৎসর পূর্ণ হইতে আর চার মাস বাকি। কিন্তু আজ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার যে ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার পরিমাণ মাত্র ৩৭৫ একর। এই অবস্থা নিতান্ত বেদনাদায়ক।"

ভূদানযন্ত্র আন্দোলনের প্রসার পশ্চিমবঙ্গে কেন আশাপ্রসূত হয় নাই সে সম্পর্কে জীবুত ভাণ্ডারী চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :

(১) অনভিকর্মা ও একনিষ্ঠ হইয়া ভূদানযন্ত্রের কাজে প্রভাব-শালী কর্মীর সংখ্যা নিতান্ত কম।

(২) কর্মী ও নেতৃবৃন্দ তাহাদের নিজ নিজ ভূমি, সম্পত্তি ও আর উপযুক্ত পরিমাণে ভূদানযজ্ঞ বা সম্পত্তিদান যজ্ঞে আহতি না দেওয়ার অজ্ঞকে দান দিবার প্রেরণা দিতে সক্ষম হন নাই।

(৩) পশ্চিম বাংলার বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রগুলি এই আন্দোলনকে অকুণ্ঠভাবে উৎসাহদান করিতে পারে নাই।

(৪) বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ভূদানযজ্ঞকে তাম্রিলা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

ক্রীত ভাগ্যারীর বিরুদ্ধে অমুখ্যারী পশ্চিমবঙ্গ ভূদানযজ্ঞ সমিতি চারখানি ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কীয় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সভা-সম্মেলনে ও গ্রামে এ বাবৎ উত্থানের ৮,৫০০খানি বর্চি বিক্রয় করা হইয়াছে। ভারতবাসীর প্রতি বিনোবাজীর আবেদন এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি বাণীর ৩৫,০০০খানি বাংলা অমুখ্যবাদ গ্রামে গ্রামে ছড়ানো হইয়াছে।

### ভূদান আন্দোলনে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ

অশিল-ভারত সর্বসেবা সংস্থার অশিল সেক্রেটারী ঐক্যব্রজ মেহতা ভানাইতেছেন যে, ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত ভূদান আন্দোলনে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ নিম্নরূপ :

রাজ্যের নাম	মোট প্রাপ্ত জমি (একর)	দাতার সংখ্যা
বিহার	১১,৪২,৫৬৫	৮২,৩৭২
উত্তরপ্রদেশ	৫,০০,৩৩১	১২,৩৪৩
রাজস্থান	২,২২,৭৭০	২২৬
হায়দরাবাদ	৬৮,৭৬৮	
মধ্যপ্রদেশ	৫৬,৫৩৫	
মহারাষ্ট্র	৫১,৪৬৮	
উড়িষ্যা	৪৫,০২১	
গুজরাট	১৮,৩২৬	
তামিলনাড়ু	১৪,২৫২	১,৮৭৭
অন্ধ্র	১০,২২২	
কেরালা	১০,০০০	
মহারাষ্ট্র	২,২৭০	৬২৮
সৌরাষ্ট্র	৮,০০০	
দিল্লী	৭,৬৫২	
বিজাপুর	৫,৭০০	
পঞ্জাব	২,৪৩৫	
মহীশূর	২,০০৭	৮৫০
কর্ণাটক	১,৬৩৪	
হিমাচলপ্রদেশ	১,৬৫০	
আসাম	১,৩৪২	
বাংলা	৩৭৪	৩১০
মোট	২১,২২,১৫৩	২২,৩৬৩

মোট ৩৮,১৭৪ একর জমি ৬,৬৩৬টি পরিবারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

### নিলোথেরী

গত ১লা জাম্বুয়ারী নিলোথেরী ভারত-সরকারের শাসন হইতে পঞ্জাব সরকারের শাসনে চলিয়া গিয়াছে। একটি সরকারী বিরুদ্ধিতে নিলোথেরীর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, ১২৪৮ সনে কুরুক্ষেত্রে উদ্বাস্ত শিবিরের এক দল কর্মী শ্রী এস. কে. দে-র নেতৃত্বে কর্ণাল হইতে ১২ মাইল দূরে দিল্লী-অমৃতসর সড়কের উপর অবস্থিত একটি বিজন প্রান্তর বাছিয়া লইয়া একটি নতুন শহর পত্তন আরম্ভ করেন। ১২৪৮ সালের জুলাই মাসেই জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ শুরু হইয়া যায়। দুই বৎসরের মধ্যে সেই জনহীন প্রান্তর একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ শহরে রূপান্তরিত হয়। শহরটি সমবায়ের ভিত্তিতে নির্মিত হইয়াছে এবং সকল ক্ষেত্রেই সমবায়ের ভিত্তিতে ইহা পরিচালিত হয়।

অবশ্য সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করিয়া সাকলা লাভ করিতে হইলে কর্মীদের আর্থিক ও সামাজিক সংগতির এবং পরস্পরের মননশক্তির বিশেষ ব্যবধান থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ সফলপ্রসূ হয় না। এই পার্থক্য দূরীভূত হইলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। এই জঙ্গলই কুটারশিল্পগুলিতে সমবায়পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ, কিন্তু মধ্যম ও বৃহৎ শিল্প পরিচালনায় ইহার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ।

প্রথমে ঠিক হইয়াছিল নিলোথেরীকে একটি শহর ও গ্রামের সমন্বয়ে গড়িয়া তোলা হইবে, কিন্তু বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া পরে শুধু শহরটিকেই গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

নিলোথেরীতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালক অফিসার মহাকেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে—পার্শ্ববর্তী এঞ্চলগুলির এবং সমগ্র পঞ্জাবের কর্মী ও কারিগরদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এই স্থানে। নিলোথেরীর পলিটেকনিকে এখন ৩০০ জন ছাত্র আছে। তাহা ছাড়া সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার গ্রামস্তরের কর্মীদের শিক্ষাকেন্দ্র এবং সমাজসেবালক্ষ্য কর্মীদের আর একটি শিক্ষাকেন্দ্রও এখানে সংস্থাপন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে শীঘ্রই নিলোথেরীতে ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসারদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র এবং একটি বুনিনাদী কৃষি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এই কেন্দ্রে সকল শ্রেণীর কর্মীই শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। সেখানে পঞ্জাব সরকারের পক্ষ হইতেও একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে—বুনিনাদী শিক্ষক শিক্ষক-কেন্দ্র। দেশ-বিভাগের পূর্বে পঞ্জাবের বাসুল নামক স্থানে যে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলটি চালু ছিল, তাহাও দুই বৎসর পূর্বে নিলোথেরীতে স্থাপিত হইয়াছে।

নিলোথেরীতে যে একটি ছাপাখানা আছে শীঘ্রই ভারত-সরকার ইহা নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া গিয়া ইহার সম্প্রসাধন করিবেন। নিলোথেরীর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা হইতে ভারতীয় রেলওয়েসমূহের জঙ্গল ক্লিয়ারিং যন্ত্রাংশ তৈরার হয়।

নিলোথেরীর লোকসংখ্যা ৬,৪০০, তাহাদের মধ্যে ছাত্র ১৩০০। তাহা ছাড়া সেখানকার পলিটেকনিক ও অগ্রান্ত শিক্ষাকেন্দ্রে যোগ দিবার জন্য বাহির হইতে আরও ৬০০ জন ছাত্র সেখানে যায়।

শহরে ১০০০টি বাড়ী আছে। একটি হাই স্কুল, কয়েকটি বুনরানী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাসপাতাল, একটি পত চিকিৎসালয়, একটি হুয়াগার, একটি পণ্ডপালনকেন্দ্র, অনেকগুলি কুটারশিল্প ও কতকগুলি ক্ষুদ্র শিল্প আছে।

শহরের নিখাদকাণ্ড শেষ হইয়া বাওয়ায় এবং অস্বাস্থ্য কারণে ১৯৫২ সালে নিলোথেরীতে কনসংস্থানের অভাব ঘটে। বর্তমানে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে।

নিলোথেরী শহর বারদ ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৬২,৫০,৮৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই তারিখ পর্যন্ত ১২,১৭,৮৩৬ টাকা শোধ করা হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলার ঐক্যে নতুন শহর গঠন ও স্থাপনের চেষ্টা বহুদিন ধাব্য চলিতেছে। কিন্তু বিশেষ কোনও ফল দেখা যায় নাই। ইহার কারণ নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ পঞ্জাবী ও বাঙালী উভয় মধ্য মনোপ্রবৃত্তির প্রভেদ। ইহার প্রতিকার না হইলে উদ্বাস্তু-দিগের শোচনীয় হুগতি অনিবার্য।

### আসানসোল হাসপাতালে অব্যবস্থা

“বঙ্গবাণী” আসানসোল হাসপাতালের নানাবিধ অব্যবস্থা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, হাসপাতালের উন্নতির প্রতি কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। দুই বৎসর ধাব্য হাসপাতালের এক্সরে যন্ত্রটি বিকল হইয়া রহিয়াছে, বহুবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও মেরামত হয় নাই। পোটেল এক্সরে যন্ত্রটির অবস্থাও তদ্রূপ। রেক্সিফায়ারটিও অচল। অথচ গড়ে প্রত্যহ এই হাসপাতালে ২৫০৩ জন আঘাতপ্রাপ্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। হাসপাতালের অস্ত্রোপচারকক্ষে উপযুক্ত আলো নাই; অস্ত্রোপচারে সাহায্যকর কোন শিক্ষিত সহকারীও নাই যদিও প্রতি বৎসর নুনপক্ষে দুই-তিন হাজার অস্ত্রোপচার এই হাসপাতালেই হয়। যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত করিবার জন্য লোকের অভাবে বহুমূল্য সরকারী যন্ত্রপাতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে হাসপাতালের বসন্ত ওয়ার্ডটি খুলিয়া হইয়াছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহার পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয় নাই। হাসপাতালে সরকার যে পরিমাণ ঔষধপত্র সরবরাহ করেন তাহা ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তিন মাসের জন্য যে পরিমাণ প্রাণীর দেওয়া হয় তাহাতে তিন সপ্তাহের বেশী চলে না। হাসপাতালে পরিষ্কৃত (distilled) জল থাকে না, কলে কলেরা রোগীর স্যালাইন পর্যন্ত সাধারণ কলের জল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। চক্ষু ঔষধও ঐ কলের জল অথবা ইদারার জল ব্যবহার করা হয়।

‘বঙ্গবাণী’ লিখিতেছেন : “অবভাব দেখিয়া মনে হয় গবর্ণমেন্ট নতুন নতুন হেলথ সেন্টার খুলিয়া এবং কলিকাতার বড় বড় হাসপাতালের ব্যবস্থা করিয়া প্রশংসা লইতেই বাস্তু। মফস্বলের হাসপাতালগুলির কোনরকম উন্নতিসাধন করিবার দিকে তাঁহাদের আঁকো দৃষ্টি নাই এবং বোধ হয় প্রয়োজনও মনে করেন না।”

### নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের ২৮শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা-সম্পর্কীয় সমিতিগুলির নিখিল-ভারত ফেডারেশনের (All-India Federation of Educational Associations) উদ্যোগে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক যুগ্ম পরামর্শদাতা শ্রী কে. জি. সৈয়দায়েন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উক্ত নিখিল-ভারত ফেডারেশনের সভাপতি ডঃ অমরনাথ ঝা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ শ্রী মনোমোহন বসু এই সম্মেলনে অভিভাষণ প্রদান করেন।

প্রায় তিন হাজার শিক্ষাপ্রতী প্রতিনিধি এবং দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে শিক্ষার বিভিন্ন পথায়, দিক এবং সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে : “এই সম্মেলন চূড়ান্ত সচিহ্ন লক্ষ্য করিতেছেন যে, দেশের রাজনৈতিক মুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির পথ প্রশস্ততর করে নাই। বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি বসিয়াছে এবং তাহাদের রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষাকে অগাইয়া লইবার জন্য সরকার কোন মূল্যবান প্রচেষ্টাই করেন নাই। ফলে সর্বত্রই ইতস্ততঃভাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যেকটিতেই সাক্ষ-সরঞ্জামের অভাব, শিক্ষকগণ বাঁচিবার উপযুক্ত মজুরী পান না এবং ছাত্রদের ব্যক্তিগত বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ নাই।”

সভাপতি শ্রী কে. জি. সৈয়দায়েনের ভাষণের মধ্যেও এই একই সুরের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাহাতে শিক্ষকদিগকে কিছুপ হতাশাময় পরিবেশে কাব্য করিতে হইত তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তবুও সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, এমন সুদিন আসিবেই যেদিন শিক্ষা জাতীয় জীবনের জায্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি বলেন, “আজ সেদিন আসিয়াছে। একটু ধৈর্যভরেই এই কথা বলিতেছি। কারণ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকই এখনও কি অবস্থার মধ্যে কাজ করিতেছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি।” দেশের পরাধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন হইবার পর দেশ-গঠনের বিভিন্ন কাজ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে; কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন এক প্রকার অসাধ্যসাধন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। একমাত্র শিক্ষাই এই অসাধ্যসাধনে সহায়তা করিতে পারে যদিও আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

শ্রী সৈয়দায়েন বলেন, “বর্তমানে বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতার যে অবস্থা তাহাতে উন্নত শ্রেণীর কর্মিগণ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না, তাহারা নিকৃষ্ট হইয়াই এই কাজ গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই শিক্ষাদানের মহান কার্যে তাহাদের আগ্রহ থাকে না। শিক্ষাদানের কার্যের ভার বাহাতে কেবলমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিগণের উপরেই চাপ থাকে তজ্জন্ত শিক্ষক নির্বাচনের উন্নত মান প্রবর্তন

করিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে, যে যুগের লোক কৃষিকা লাভ করিবে সমাজের নিকট তাহার। জ্ঞাত বলিয়া গণ্য হইবে। আজ যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষক বিদ্যায়তনগুলিতে শিক্ষাদানের কার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্ত আমাদের অবজ্ঞাই কিছু করিতে হইবে। ...কৃটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্ত আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছি। কিন্তু শিক্ষকদের সামান্য আয়-প্রমোদের নিমিত্ত অতি সামান্য পরিমাণ অর্থব্যয় করিতেও আমরা রাজী নহি। আমার মনে হয়, শিক্ষকদের আয়-প্রমোদের জন্ত সামান্য কিছু ব্যয় করিলে তাহার উপযুক্ত প্রতিদান পাওয়া যাইবেই।”

প্রায় বিশ বংসর ধাবৎ বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতামত পেশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড হইতে কার্যকর কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট অনুসারে এই কমিটি হইতে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজ করিবেন। ক্রীসৈয়িদায়েন বলেন : “তবে সরকার, দপ্তর বা কমিটি যে পরিকল্পনাই করুন না কেন, সভ্যকারের কাজ করিবেন শিক্ষকগণ। তাই শিক্ষক নিরীচনে এবং তাঁহাদের চাকুরীর সমাবলী নিদ্বন্দ্বিতা কর্তৃপক্ষ যেন মনে না করেন যে, তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে পণ্যস্বরূপ ক্রয় করিতেছেন। বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি বারংবার এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবের জন্ত সেই সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নাই। সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই যুক্তিকে লবু করিয়া দেখিতে পারি না। তবে একথাও বলি যে, মানুষকে বস্ত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া গণ্য না করিলে এবং অর্থ অপেক্ষা সমাজকল্যাণকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে না করিলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হইতে পারে না। শিল্প এবং কারিগরি উন্নয়নের জন্ত যদি অর্থ পাওয়া যায় তবে শিক্ষার জন্তই বা পাওয়া যাইবে না কেন, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষাকেই বা অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে না কেন?”

সাম্প্রতিক ছাত্রবিক্ষোভের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, “পরিদর্শক, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই শিক্ষাব্যবস্থা সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আমলা-তান্ত্রিক মনোভাব লইয়া একেত্রে কাজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শিক্ষকগণ ছাত্রদের আস্থা অক্ষত করিতে পারিলে ছাত্রগণ নিশ্চয়ই ঈর্ষপুলভাবে সাড়া দিবে। তিনি সাম্প্রতিককালে ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বখ্যাত গুরুত্ব লাঘব করিতে চাছেন না। “কিন্তু বহুক্ষেত্রে আমরাও কি সমান দারিদ্র্যজননীয়তার পরিচর দিই নাই? ছাত্রদের বিশ্বখ্যাত কি সামগ্রিক জাতীয় বিশ্বখ্যাতই একটা অঙ্গ নহে? আমাদের প্রবীণ ব্যক্তিব্যক্তি কি বুকে হাত রাখিয়া এ কথা বলিতে পারেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক জীবনে, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার তাহার অধিকতর শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার নিদর্শন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ছাত্রগণ যখন বিদ্যালয় এবং পরে কলেজে প্রবেশ করে তখন তাহার সেখানে কি সামাজিক সম্পর্ক, শৃঙ্খলা ও চরিত্র গঠনের অগ্রকূল পরিবেশ

দেখিতে পার? আমার মনে হয়, পার না। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, কলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে না। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক আব-হাওয়া, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যতের বেকারশা স্রবণ করিয়া ছাত্ররা হতাশ হইয়া পড়ে। “সর্বোপরি বড়দের মধ্যে আদর্শবাদ, চারিত্রিক অগুণতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার নিদর্শন খুব কমই দেখা যায়। প্রায় সকলেই যে-কোন পন্থায় অর্থ, বিত্ত ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্ত লালারিত।”

এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের উন্নতিসাধনের মারকতাই কেবলমাত্র এই চূড়ান্ত ভেদ করা সম্ভব বলিয়া ক্রীসৈয়িদায়েন মনে করেন।

পরিশেষে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে নিহিত “যুগপৎ বৈপ্লবিক ও স্বতন্ত্রী শক্তি”র প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলেন, “ইহা সংকীর্ণ ব্যাখ্যা না করিলে বা যত্নের মত ইহা কার্যকরী করিবার চেষ্টা না হইলে ইহা শিক্ষকে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের শক্তি রূপে সৃষ্টি করিতে পারে।”

সম্মেলনে গৃহীত অস্ত্র প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে আগামী মাসে মাধ্যমিক শিক্ষাপদ্ধতের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম বেতন ও মহাখ্যাতার দাবিতে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গবাসী যে শিক্ষক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রস্তাবে সম্মেলন আবেদন জানান যেন প্রত্যেক কলেজের কার্যকরী সমিতির শতকরা ৫০ জন সদস্য শিক্ষকদের মধ্য হইতে গৃহীত হয়। সম্মেলন আরও দাবি করেন যে, বেসরকারী কলেজগুলিকে সরকার যেন যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন বাহাতে শিক্ষকদের বেতন ৫৫০ হইতে ৮০০ টাকা ধরে নিদ্ধারিত হইতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্মেলন অবিলম্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করিবার দাবি করেন।

অপর এক প্রস্তাবে সরকার, অভিভাবক এবং শিক্ষা ও সামাজিক কর্মীদের প্রতি আবেদন করা হইয়াছে যেন তাহারা সবর যে-কোন উপায়ে যুবক-যুবতীদের নৈতিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর আপত্তিজনক সাহিত্য, ছায়াছবি বিজ্ঞাপন, ছায়াছবি প্রকাশ, বিক্রয় এবং প্রদর্শন রহিত করেন।

সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শিক্ষা, সামাজিক প্রগতি এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্বার্থে বিশ্বশান্তির প্রতি সমর্থন জানান হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জরী মনোভাবের শিক্ষা করিয়া শান্তির জন্ত ভারত-সরকারের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান হয়।

সম্মেলন সরকারের নিকট “শিক্ষকদের সনদ” মানিয়া লইবার দাবি জানান এবং স্থির করেন যে, আগামী ৭ই আগষ্ট তারিখের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকদের সনদ দিবস পালন করা হইবে।



## মুর্শিদাবাদে কলেজীয় শিক্ষার প্রসার

২২শে ডিসেম্বর তারিখের মুর্শিদাবাদ-সমাচার পত্রিকায় “প্রসার” লিখিত এক বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ-কলেজ ব্যতীত অন্য কোন কলেজ ছিল না। তাহার পর হইতে চারিটি কলেজ বৃদ্ধি পাইয়াছে যথা : জিয়াগঞ্জ লীপংসিং, কান্দীরাজ, জলীপুর ও বহরমপুর গার্লস কলেজ। ছাত্রসংখ্যার দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে, যে স্থলে ১৯২২ সনে একমাত্র কৃষ্ণনাথ-কলেজে ১০৪০ জন, ১৯২৬ সনে ১০৩৭, ১৯২৪ সনে ১০৩০ জন, ১৯২৫ সনে ১০৬৬ জন ছাত্র ছিল, ১৯৪৬-৪৭ সনে সেখানে ছিল মাত্র ৭৬৬ জন। সরকারী Dispersal Scheme অনুযায়ী কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার পর হইতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ :

বৎসর	কলেজের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
১৯৪৭-৪৮	২	১৩২৭
১৯৪৮-৪৯	২	১৫৩২
১৯৪৯-৫০	৩	১৫৯৮
১৯৫০-৫১	৫	১২৭৪

১৯২২ সনের ১০৪০ জন ছাত্রের তুলনায় ১৯৫০-৫১ সনে ১২৭৪ জন ছাত্র! জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মরণ রাখিলে বলিতে হইবে যে, কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধি সশেষে মুর্শিদাবাদে শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরূপে হইয়াছে। কিন্তু দেশের অবনীতি এতই চমৎকার যে, এই ‘মুর্শিদাবাদ’ শব্দটি শুধু কথ্য-সংস্থান সম্বন্ধে হইতেছে না। ২৪শে ডিসেম্বরের “ভারতী” ‘কথা-প্রসঙ্গে’ শীর্ষক মন্তব্যে লিপিতেছেন : “সংবাদে প্রকাশ, নূতন প্রাথমিক শিক্ষক-নিয়োগ পরিকল্পনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ৫৮৭ জনকে সওয়া হইবে এবং উক্ত পদের জন্য চার সহস্রাধিক প্রার্থী আবেদন করিয়াছে। মোটামুটিভাবে ধরা যাইতে পারে আবেদনকারীগণ সকলেই এই জেলার অধিবাসী এবং ইহাদের ছাড়া আরও বহু সংখ্যক শিক্ষিত বেকার এই জেলায় আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত অনগ্রসর। আজ এই জেলাতেই শিক্ষিত বেকারের যদি এই অবস্থা হয়, তবে অপেক্ষাকৃত উন্নত অঙ্গান্ত জেলায় যে কি অবস্থা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় জাতীয় প্রাণ-শক্তির এই বিপুল অপচয় বন্ধ পূঁজি প্রতিরোধ হয় ততই মঙ্গল।”

## আসামে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি

ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “বাতায়ন” সমগ্র আসামে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটিগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেলার উপায়ুক্ত সভাপতি থাকিবার পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিপিতেছেন :

“জেলার উপায়ুক্ত জেলার বহু উচ্চ-বিভাগের ম্যানেজিং কমিটিতেই সভাপতি। তিনি যেন দশভুজা, তাঁর ‘দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত’। এইরূপে একই ব্যক্তি দক্ষিণ শালমায়া হাই স্কুলের

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, হামিদাবাদের পরিচালক, বিলাসী-পাড়ার নায়ক, ধুবড়ী গবর্ণমেন্ট হাই স্কুলের, শিওপাঠশালা হাই স্কুলের ও ধুবড়ী বালিকা উচ্চ-বিভাগের কণ্ঠধার। জেলার গুরু শাসনভার যে উপায়ুক্তের উপর জুট, তিনি কি করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কণ্ঠের বাহিরেও এতগুলি বিভাগের মঙ্গল চিন্তা করিবার অবকাশ পান? পাইবারই বা দরকার কি? নিয়োগ, বরখাস্ত ও শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত প্রশ্ন ব্যতীত অঙ্গান্ত সব ক্ষেত্রে সব স্কুলের, বিশেষতঃ মঞ্চস্কুল স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভায় অমুপস্থিত থাকিলেও ত চলিতে পারে।”

উপায়ুক্ত সকল সময় যে বিভাগের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাহাও সত্য নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ “বাতায়ন” লিপিতেছেন, “উপায়ুক্ত সভাপতি থাকিতেই হামিদাবাদ হাই স্কুলের সাহায্য বন্ধ হইয়াছিল—স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তনকল্পে চাপ আনিবার জন্য। বিলাসী-পাড়া ইন্সন্যায়গণ একাডেমীর সভাপতি জেলার উপায়ুক্ত মহাশয়। আগুনে বধন স্কুল-গৃহটি ভয়সং হইয়া গেল তখনও উপায়ুক্ত ঐ স্কুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই।”

আসাম শিক্ষাবিভাগের অর্ডার বা কলে বলা হইয়াছে যে, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইবেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সকল সময়েই দেখা যায় যে সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন। ধুবড়ী গার্লস স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির গঠন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, চৌক জন সদস্যের মধ্যে তিন জন অভি-ভাবকদিগের প্রতিনিধি, দুই জন শিক্ষকদের প্রতিনিধি, চার জন পদাধিকার বলে গৃহীত সভ্য এবং পাঁচ জন নিম্নক মনোনীত সভ্য—অর্থী, মনোনীত ও পদাধিকার বলে গৃহীত সভ্যসংখ্যা নয় এবং নির্বাচিত সভ্যসংখ্যা পাঁচ। “বাতায়ন” লিপিতেছেন :

“যে-কোন কমিটির কথাই বিবেচনা করা যাউক না কেন, মনোনীত সভাগণ বস্তুতঃ উপায়ুক্তেরই গ্রামোফোন ছাড়া আর কিছু নহেন। যাহারা একলা আমানীয়া সভা অলঙ্কৃত করিতেন, যুদ্ধের যুগে ‘লাশনাল ব্রুগে’ সময় পরিচালনা করিতেন বা বর্তমানেও সরকারী অগ্রগতিবী, তাহারা এই আজ মনোনয়নের গবাক্ষপথে জনপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতেছেন।”

## বিনিময় পরিকল্পনার এক বৎসরের খতিয়ান

“মার্কিনবাণী” লিপিতেছেন যে, বিনিময় পরিকল্পনাসমূহ অনুসারে এ বৎসর “স্বাধীন” বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ হইতে প্রায় ৪৪ হাজার লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা সর্বাধিক। পৃথিবীর ১২টি বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ৩৪ হাজার ছাত্র আমেরিকায় ১৫০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সরকারী অথবা বেসরকারী বৃত্তি লইয়া আসিয়াছে।

পূর্বে অধিকাংশ ছাত্রই আসিত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে, কিন্তু গত জুন মাসে যে শিক্ষাবৎসর সমাপ্ত হইয়াছে,



তাহার হিসাবে দেখা বাইতেছে যে, ঐ সময়ের মধ্যে যে সকল ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছিল তাহাদের অধিকাংশই ভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ, দর্শন বা শিল্পকলা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে।

ছাত্রদের এক-তৃতীয়াংশ আসিয়াছে নিকট-প্রাচ্য ও দূর-প্রাচ্যের দেশগুলি হইতে। শতকরা ২৩ জন আসিয়াছে ইউরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে। সর্বমুহুৎ জাতীয় দল আসিয়াছে কানাডা হইতে। এই দলে ৪৫০০ জন আছে। একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ৩৬০০ জন চীনা ছাত্র চীনে কমানিষ্ট অধিকারের পর যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৫৫০ জন শিক্ষাবিদ, ৫৫০ জন গবেষণাকারী এবং ১৪০০ জন জাতীয় নেতা ও অজ্ঞাত বিশেষজ্ঞ এই পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করিয়াছেন।

### সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বিশ্বশান্তি

আমেরিকান ইন্টারকন্টিনেন্টাল নিউজ সার্ভিসের ইউরোপীয় বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কিংসবেরী শিখ ১৯৫৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী জর্জি মালেনকফকে নববর্ষ উপলক্ষে কয়েকটি প্রশ্ন লিপিয়া পাঠান। তন্মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর এইরূপ :

প্রশ্ন—“১৯৫৪ সনে বিশ্বশান্তি বক্ষা করিবার এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের সম্ভাবনা কতটা আছে বলিয়া আপনার ধারণা?”

উত্তর—“সকল মানুষই স্বাধীন শান্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে এবং ১৯৫৪ সনে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা আরও প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা বহিরাছে। সরকারসমূহ, বিশেষ করিয়া প্রধান প্রধান দেশের সরকারসমূহ জনগণের এই প্রার্থনায় কান না দিয়া এবং তাহাদের স্বাধীন শান্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় ইচ্ছাকে সম্মান না দিয়া পারিবেন না।

“সোভিয়েট সরকারের কথা ধরা যাউক। তাহার দেশের জনগণ বাহ্যতে শান্তিতে বাস করিতে পারে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং দেশগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহার ক্ষমতা সে সকলকিছুই করিয়াছে, বর্তমানে করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।”

প্রশ্ন : বিশ্বশান্তির স্বার্থে ১৯৫৪ সালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি পদা অবলম্বন করা বাইতে পারে বলিয়া আপনি মনে করেন?”

উত্তর : “পদা হইল জাতিগুলির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন : যে চুক্তিবলে দেশগুলি পরস্পরের প্রতি বিনাসর্ব্বভেদে এই পবিত্র অকীকারে আবদ্ধ থাকিবে যে কেহ আগবিক বোমা, উদ্বান বোমা, এবং ব্যাপক ধ্বংস-ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র অস্ত্রগুলি বৃদ্ধে ব্যবহার করিবে না। এই চুক্তি সম্পাদনের পর মাঝপন্থা হিসাবে আগবিক অস্ত্রের প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে এক বোঝাপড়ার উপনীত হওয়া সহজ হইবে এবং বৃদ্ধে আগবিক শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার উপর কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

“সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদা তাহার সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট সরকার

অস্ত্র সকল প্রকারের মাঝপন্থা এবং সৈন্যবাহিনী বহুলাংশে হ্রাস করা সম্পর্কেও একটি চুক্তি সম্পাদন জরুরী মনে করিবে।

“ইহা অনুষ্ঠিত হইলে সাময়িক প্রয়োজনে রাষ্ট্রের খরচ নিঃসন্দেহে কমিয়া বাইবে এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিবে।”

বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিশালী জাতিসকল পরস্পরকে সন্দেহ ও হিংসার চক্ষে দেখিবে ততদিন ঐরূপ চুক্তির মূল্য কিছুই নাই।

### ঐশ্বর্য্য দাসের আভ্যোগের প্রতিবাদ

আমরা গীত পৌষ সংখ্যায় “বাকুড়া ষ্টেট বিল্ডিং কার্খো হ্রনীতি” শীর্ষক একটি প্রসঙ্গে ঐশ্বর্য্য দাসের কতকগুলি অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গের শেষে বাকুড়ার প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী ঐশ্বর্য্য গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নিকট এই মধ্যে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন উক্ত হ্রনীতির অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের বক্তব্য আমাদিগকে জানান। আমরা নিম্নোক্ত উত্তর পাইয়াছি। ইহা হইতে ঐশ্বর্য্য দাসের অভিযোগের অসারতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্তরটির মূল অংশ এখানে প্রদত্ত হইল :

“...আমাদের জ্ঞাত তথ্যগুলি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

বাস্তাব্য গ্লান বা লাইন সম্বন্ধে (alignment) কংগ্রেস-কর্মীগণ কোনদিন তাঁহাকে বাধা দান করেন নাই। নতুন বাস্তাব্য পূর্বাংগে অধিকতর বিস্তৃত করিবার কথা স্থির হয়, কিন্তু তাহা সংশ্লিষ্ট মালিকগণের ষেচ্ছাকৃত দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঐশ্বর্য্য দাসের অবিবেচনার ফলে কোন কোন স্থানে ধাতুক্ষেত্রের এবং পলাশ বনের মধ্য দিয়া বাস্তাব্যকে লইয়া বাইবার চেষ্টা হয়। ফলে ভূমাধিকারিগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। কংগ্রেস-কর্মীগণ ভূমাধিকারিগণকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া এই সকল সমস্যার সম্মীমাঙ্গা করিয়া দেন। ইহাই কংগ্রেস-কর্মীগণের অপরাধ। ঐশ্বর্য্য সিংহ কিংবা ঐরামলোচন মুখার্জী তাঁহাকে কোন স্পষ্টাংক কথ্য বলেন নাই। বরং রামলোচন মুখার্জী এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে গ্রাম-বাসিগণের সহযোগিতা লইবার সুপারামর্শ প্রদান করায় তিনিই রামলোচন মুখার্জীর প্রতি ঋণ কথ্য ব্যবহার করেন। রামলোচন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়বশতঃ আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। পরে ঐশ্বর্য্য দাস অনুতপ্ত হইয়া রামলোচনের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

হ্রনীতির উদাহরণ-স্বরূপ ঐশ্বর্য্য দাস তাঁহার বিবৃতিতে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু এই সকল উদাহরণের সহিত কংগ্রেস-কর্মীগণের নাম সংযুক্ত করিবার কারণ কি? মুহুরী মহদেব সেন কিংবা ভোলানাথ সরকার কেহ কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। বরং আমি অবগত হইয়াছি যে, ঐশ্বর্য্য দাস সেন হিন্দু মহাসভাপন্থী এবং তিনি কম্বু-আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে দিল্লীতে সভাপ্রার্থী স্বরূপে গিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্য দাস সেন ও ভোলানাথ সরকার সম্পর্কিত যে ঘটনা

হুইট ঐশ্বরভাষ দাস বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের অপরাধ লোকচক্ষের অন্তরালে রাখিয়াছেন এবং একটু বং ধরাইয়াছেন। ৫৫নং ভূয়া গ্যাং-এর জালিয়াতি পে-মাষ্টার আবিষ্কার করেন এবং তিনি ঐ গ্যাং-এর টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এইরূপ প্রকাশ যে, এই ভূয়া গ্যাং-এর allotment slip-এ ঐশ্বরভাষ দাস নিজ স্বাক্ষর দিয়া মঞ্জুর করিয়াছিলেন, পরন্তু পে-মাষ্টার টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এইরূপ হইবার পর ঐশ্বরভাষ দাস নিজের অপরাধ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এই ভূয়া গ্যাং-এর জঙ্গ মুহুরী সহদেব সেনই দায়ী এইরূপ অভিযোগ করিয়া আমাকে একটি লিপিত বিবৃতি দেন। ঐ জালিয়াতি পে-মাষ্টার ধরিয়াছিলেন এবং তাহাও বিবৃতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমি সেই লিপিত বিবৃতি কর্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দিই। তাহার পর সহদেব সেন বরণান্ত হন।

ঐশ্বরভাষ দাস ১১/১০/৫৩ তারিখে acquittance roll-এ ২২টি গ্যাং-এর পরিবর্তে ২৪টি গ্যাং-এর উল্লেখ করেন। এইরূপ হইবার পর মুহুরী ভোলানাথ সরকার তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য না হইয়া সকলকে এই বিষয় জানাইয়া দেন। এমনকি ঐ সংবাদ অমরকাননে ঐগোবিন্দপ্রসাদ সিং মহাশয়ের নিকটও প্রেরিত হয়। এইরূপভাবে লোক জানাজানি হইবার পর ঐশ্বরভাষ দাস পে-মাষ্টারকে নিম্ন-লিখিত পত্রটি প্রেরণ করেন :

"I do hereby inform you that I checked the acquittance roll of the works clerk Shri Bholanath Sarkar today and found 22 gangs of coolies but due to my own mistake I wrote there 24 gangs. Hence, in conclusion, I request you to stop the payment of the last two groups, i.e., 23rd and 24th as they might be false."

ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বভাষ দাস নিজেই ভূয়া গ্যাং চালাইবার চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িয়া পে-মাষ্টারকে লিপিত পত্রে সাক্ষ্য গাহিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ভীভোলানাথ সরকারের বা স্বভাষ দাসের কি দোষ আছে তৎসম্বন্ধে আমি বিচারকের আসন গ্রহণ করিতেছি না, কিন্তু এই ঘটনা হইতে কি সিদ্ধান্ত সমীচীন তাহাই জনসাধারণকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে কংগ্রেসের কি অপরাধ হইয়াছে তাহাও বুঝা গেল না। নিজের দোষ ঢাকিয়া তিনি এক্ষণে নিজ বিবৃতিতে ভোলানাথ সরকারের নামে এক রোমকর্ষণকর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ঘটনার পর ১২/১০/৫৩ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্য পরিদর্শনে গেলে Supervising officer ঐশ্বরভাষ দাসের উপরোক্ত কার্য সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি লিপিত অভিযোগ প্রদান করেন। তাহার পর ১২/১০/৫৩ তারিখেই ঐশ্বরভাষ দাস পে-মাষ্টারকে পত্র লিখিয়া জানান যে, 'তাঁহার বক্তৃ-আমাশয় হইয়াছে তজ্জন্ত তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বাইতেছেন, পূজার পর পুনরায় কার্যে যোগদান করিবেন।' এই ভাবে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যান, আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। এট

প্রসঙ্গে ইহাও জানান আবশ্যক যে, তথ্যর সকল সময় চার জন সশস্ত্র পুলিশ থাকিত এবং ১২/১০/৫৩ তারিখে স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তথ্যর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার লুকাইয়া স্থান ত্যাগ করিবার কারণ কি? কারণ এই যে, ঐ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সচিব বিষ্ণুপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষও তথ্যর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে স্বভাষ দাস স্থান ত্যাগ করেন এবং স্বভাষ দাস ইন্সটিটিউটের ছাত্র থাকার তাঁহার বিরুদ্ধে অল্প কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। আমরা এই বিষয়ে তদন্তের দাবি করি। তদন্ত হইলে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইবে।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, ঐ রাস্তার টেব্ট রিলিফের কাখা আরম্ভের প্রারম্ভেই বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হওয়ায় ঐগোবিন্দপ্রসাদ সিংহের পরামর্শে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিছুকাল কাখা স্থগিত করিয়া দেন এবং পরিদর্শনের সুব্যবস্থা করিয়া পুনরায় কাখা আরম্ভ করেন। ঐ রাস্তায় দ্রব্যার্থের জঙ্গ তিনটি কেবাবী বরণান্ত হন। কংগ্রেস-কর্মীগণ Watchdog বা সতর্ক প্রহরীর কাখা করিয়াছিলেন মাত্র এবং অনুরোধ করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বার বার পরিদর্শনের কাখা প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। উভয়ই তাঁহাদের অপরাধ। কংগ্রেসের এট প্রচেষ্টাকে 'বেসরকারী ছায়া পরিচালকমণ্ডলী' নাম দিয়া কদর্থ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐশ্বরভাষ দাস বিমুত হইয়া গিয়াছেন যে, তিনি এক দিন কতকগুলি সাদা শ্লিপে নিজ নাম সচি করিয়া শ্রমিকদলকে টাকা দিবার আদেশ দিয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন, কেননা মুহুরীর নাম সচি-করা ছাপা শ্লিপ না হইলে ঐরূপ সাদা শ্লিপ ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকায় তাহা গ্রাহ্য হয় না। ঐশ্বরভাষ দাস বিপর হইয়া ঐগোবিন্দপ্রসাদ সিংহের দ্বারস্থ হন। ঐগোবিন্দ-প্রসাদ সিং মহাশয় কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া অমূল্যস্থানমতে প্রকৃত কাখা-কারী শ্রমিকগণকে টাকা দিবার জঙ্গ অনুরোধ করেন এবং এই তরুণমতি বালক অজ্ঞানতাবশতঃ এতরূপ করিয়াছেন বলিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট স্তপাশিষ করেন। আরও বহু কথা প্রকাশ করা বাইতে পারে কিন্তু এই বিবৃতির কলেবর বৃদ্ধি করিবার আমার ইচ্ছা নাই।...

ঐশিওরাম মণ্ডল, এম-এল-এ

অমরকানন, বাঁকুড়া।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

লেখকগণের লেখা কেবল লইতে হইলে লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকা আবশ্যক। কোন-কিছুর উত্তর পাইতে হইলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক বিল্লাই-কার্ডে চিঠি লিখিবেন। কবিতা বাহারা পাঠান তাঁহাদের প্রতিও এই অনুরোধ। তবে তাঁহারা দয়া করিয়া কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। বুক-পোটে প্রেরিত লেখা সব সময় আপিসে নাও পৌছাইতে পারে।

পত্রিকার প্রাক্ক, বিজ্ঞাপন, কাগজ-অগ্রাণ্টি, ঠিকানা পরিবর্তন, টাকাকড়ি প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠিপত্র 'ম্যানেজার, প্রবাসী'র নিকট প্রেরিতব্য।

# শ্রীচৈতন্যদেবের পতিতোল্লসন

শ্রীকালিদাস দত্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল মহাপুরুষের নাম মহামানব প্রেমিক রূপে অমর হইয়া আছে শ্রীচৈতন্যদেব তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে মুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন।

ঐ সময় তাঁহার জীবনের আদর্শ ও আচরণে ভগবৎপ্রেম অভিনব ভাবে বিকশিত হইয়া বিরাট শক্তিরূপে জনচিত্তে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার ফলে বঙ্গদেশে ও উড়িস্যায় তৎকালীন অসংখ্য শিক্ষিত এবং নিরক্ষর নরনারীর মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। অতি অল্পকালের ভিতর তাঁহাদের মধ্যে এক গণতান্ত্রিক ও উদার সমাজ গড়িয়া উঠে, যেখানে সর্ব শ্রেণীর জাতিবহির্ভূত ও সমাজচ্যুতরা আশ্রয় পাইয়া মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হয়।

উহা ভিন্ন তখন তাঁহার ঐ প্রকার শক্তি প্রভাবেই ঐ প্রদেশে দুইটির জনসাধারণের ভাষা এবং শিল্প ও নৃতন আকারে তাঁহাদের জ্ঞানবর্ধনে সহায়ক হয়। হিন্দু জাতির বহু বিভক্ত বর্ণ ও শ্রেণীগুলিও ঐ প্রকার জাতিবহির্ভূত ও সমাজচ্যুতদের সহিত একত্রে শ্রীভগবানের নামকীর্তনের মাধ্যমে সমভাবে ধর্মসাধনে মিলিত হইয়া ভগবৎপ্রেমরস অস্বাদনে সমর্থ হয়।

তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে ভারতের অত্যাচারপ্রদেশের স্তায় উপরোক্ত দুইটি প্রদেশেও ঐ সকল জাতিবহির্ভূতরা পতিতরূপে হিন্দুদের অস্পৃশ্য ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্মপালনে অধিকারী ছিলেন না। সে কারণ দেশের আদ্রিম ও পরবর্তীকালীন বিকৃত বৌদ্ধ মতবাদজাত নানা প্রকার লৌকিক ধর্মই পালন করিতেন। ঐ সমস্ত লৌকিক ধর্মে ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ, বাঙালী, বিবহরি, যদু প্রভৃতি

১ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণায় ঐ সময় বঙ্গভাষা জনসাধারণের জ্ঞানবর্ধনে কি প্রকারে সহায়ক হয় সে সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার “বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম” নামক পুস্তকে এইরূপ সত্য প্রকাশ করিয়াছেন :

“Bengalee in our province received a new inspiration becoming the vehicle of a new thought, creating a new body of religious and spiritual literature that had previously been practically confined to Sanskrit. . . . The creation of the religious scripture in the vernacular of the people gave at once a very powerful impetus to mass education in Bengal. The result of it was seen even in the early years of the present century, when the Vaisnavas of Bengal were found to be only literates as a class among our Hindu population. Not only the males of this denomination but even their females became thus more or less educated in their own vernacular.”—Bengal Vaishnavism, pages 116-118.

দেবতা ও বিভিন্ন রকমের ভূতপ্রেতাঙ্গি তাঁহাদের উপাস্ত ছিল। মহিষ, মেঘ, ছাগ, শূকর, হাঁস প্রভৃতি পশুপক্ষীর মাংসে ও মদ্যে তাঁহারা ঐ সমস্ত দেবতা ও উপদেবতার পূজার্তনা করিতেন। উহা ব্যতীত ঐ সকল দেবতার জাত ও চরিত্রাদি পার্শ্ব উপলক্ষে ভাং, গাঁজা ও মদ্যপান, সং সাক্ষিয়া কুৎসিত নৃত্যগীত, জিহ্বাচ্ছেদ, পৃষ্ঠে বাগফোঁড়া প্রভৃতি বহু রক্ত ও তমঃ গুণ বর্ধক নিকৃষ্ট অর্থষ্ঠানও তাঁহাদের ধর্মসাধনের প্রধান অঙ্গ ছিল।

তৎকালীন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি রূপাবনন্দাশও ঐ সকল নরনারীর ঐ প্রকার পূজার্তনা ও আচার-অর্থষ্ঠানের এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :

“ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাস জানে।  
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥  
দেবতা জানেন সবে যদু বিবহরি।  
তাও যে পূজেন সে মহাদম্ব করি ॥  
ধনবংশ বাড়ুক বলিয়া কাম্য নবন।  
নরমাংসে দানব পুজয়ে কোন জনে ॥”<sup>১</sup>

ঐ সময় উক্তরূপ ধর্মসাধনের ফলে ঐ সকল পতিতের মধ্যে অনেকের নৈতিক অবস্থা কত শোচনীয় ছিল তাহা জানা যায় নরহরি চক্রবর্তীর বিখ্যাত গ্রন্থ নরোত্তমচরিতের এই বর্ণনা হইতে :

“করয়ে কুক্রিয়া কত কে কহিতে পারে।  
ছাগ, মেঘ, মহিষ শোণিত ঘরে ঘরে ॥  
... ..  
সন্তোষী লম্পট সর্ব বিচার রহিত।  
মদ্য মাংস বিনে না ভুজয়ে কদাচিত ॥”<sup>২</sup>

অস্পৃশ্যতার সংস্কারেই তখন সমাজে পতিতরূপে পরিগণিত হইয়া ঐ সমস্ত নরনারী ঐ রকম দুর্বাস্থায় কালাতিপাত করিতেন এবং ধর্মেকর্মে কোথাও হিন্দুদের সহিত সমভাবে একত্রে মিলিত হইতে পারিতেন না। তদুপরি তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় উক্তরূপ সংস্কারের নিমিত্ত দারুণ বৈষম্য থাকায়, সময় সময় তাঁহাদের নানারকম পীড়ন ও অবিচারও সহ্য করিতে হইত। তন্মত উচ্চশ্রেণীদের প্রতি তাঁহাদের অনেকের আন্তরিক ক্রীতি ও সহানুভূতিও ছিল না।

দমাই পতিতের ধর্মপুণ্যের “নিরঞ্জনর উদ্যা” নামক

১ শ্রীচৈতন্যভাবত, অধ্যায় ৩, ৪র্থ অধ্যায়।

২ নরোত্তম চরিত।

রচনাটি পাঠ করিলে জানা যায় যে, উক্ত কারণেই মুসলমানেরা ঐ সময় জাজপুর আক্রমণ করিয়া হিন্দু মন্দিরাদি ধ্বংস করিলে ধর্মঠাকুরের উপাসকেরা তাহাতে হতবিস্ত্র হন নাই ; বরং উহা তাঁহাদের দেবতাদেরই কাজ বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহাদের ধারণা হয় যে, তাঁহাদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের জন্তই নিরঞ্জন (ধর্মঠাকুর) জুহু হইয়া ঐরূপ ঘটাইয়াছেন। ঐ রচনাটির কিয়দংশ এই :

“এইরূপ দ্বিগুণ, করে দ্বিগুণ সংহারণ,  
এবড় হইলা অবিচার।  
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম, মনেতে পাইয়া ধর্ম,  
মায়াতে হইল অন্ধকার।  
নিরঞ্জন নিরাকার, হইলা ভেষ্ট অবতার,  
মুখেতে বলেন দামোদার।  
যতেক দেবতাপণ, সব হয়ে একমন,  
আনন্ডেতে গরিল ইজার।  
ধর্ম হইল বনরঙ্গী, মাথায়তে কালচুপী,  
হাতে শোভে তিরুচ কামান।  
চাপরে উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,  
খোদার বলিয়া একনাম।  
দেউল দেহার ভাঙ্গে, কাড়াকিড়া খায় রঙ্গে,  
পাখড় পাখড় বলে বোল।  
ধরিয়া ধর্মের পায়, রমাই পণ্ডিত পায়,  
ইবড় বিবন গণগোল।”

প্রাচীন বিবরণাদি হইতে জানা যায় যে, উল্লিখিতরূপ ধর্ম ও সমাজ ব্যবহার জন্তই তখন ঐ সকল পণ্ডিত, তৎকালীন রাষ্ট্রপোষিত, মুসলমান ধর্মে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ প্রকারে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের উপর জুলুম ও পীড়নের মাত্রাও অধিকতর হইতে থাকে। ঐ সময় মুসলমানদের হস্তে হিন্দুদের কি রকম নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত তাহার কিছু কিছু বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে পুরাতন বাংলা-সাহিত্যের নানা স্থলে উল্লিখিত আছে। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে উহা এইরূপ :

“ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কোড়কে।  
কারো পৈতা ছিঁড়ি ফেলি গুপ্ত দেয় মুখে।  
... ..

পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যথা।  
চড় চাপড় মারে আর খাড়ে মারে পৌতা।  
ব্রাহ্মণ সজ্জন থাকে ভয়ে অতিশয়।  
গোময় না দেয় করে সব দুর্জনের ভয়।”

অন্যান্যের চৈতন্যমঙ্গলেও উহার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এই :

“নবদীপে শতধনসি গুনে খার করে।  
ধনপ্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে।

কপালে ভিলক দেখে বজ্রহস্ত ধীরে।  
ঘরবার লোটে তারে সেইখানে ধীরে।  
দেউল দেহার ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।  
প্রাণভয়ে ছির নহে নবদীপবাসী।”

এই রকম অত্যাচারের ভয়ে তৎকালে অনেককে দেশ-ত্যাগ করিতে হয়। তন্মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যও একজন। তিনি চিরদিনের মত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সপরিবারে নীলাচলে গিয়া বসবাস করেন। ঐতিহ্য-ভাগবতে গঙ্গাদাস নামে অল্প একজন ব্যক্তিরও ঐ সময় সপরিবারে ব্রাহ্মিকালে নবদীপ হইতে নৌকাযোগে পালাইবার উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায়, ঐ ঘটনার বছরদিন পবে এক সময় ভাবাবস্থায় ঐতিহ্যভাগবতই গঙ্গাদাসকে উহা এই ভাবে অরণ করাইয়া দিতেছেন :

“তব মনে জাগে,  
রাজভয়ে পালাইলে হবে নিশাভাগে।  
সর্বপরিষেক সনে আসি খেদা বাটে।  
কোথাও না দেখি নৌকা পড়িলে শব্দট।  
রাশি শেষ হইলে তবে নৌকা না পাইয়া।  
কাঁদিতে লাগিলে তুমি হতবিস্ত্র হইয়া।  
মোর অগ্রে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।  
গঙ্গা প্রবেশিতে চিত্ত হইল তোমার।  
তবে আমি নৌকা লয়ে খেদারির রূপে।  
গঙ্গার বাহিরা বাই তোমার সনৌপে।  
সেই নৌকা দেখি তুমি সজোব হইলে।  
অতিশয় শ্রীতি করি বলিতে লাগিলে।  
আরে ভাই আমারে রাখ এইবার।  
এক জোড় এক তকা বকসিস তোমার।”<sup>১</sup>

প্রাচীন বিবরণাদি হইতে আরও জানা যায় যে, ঐ সময় বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতবাদের খুব বেশী প্রাধান্য থাকায় বহু আড়ম্বরপূর্ণ নানারূপ কাম্য অনুষ্ঠান হিন্দু উচ্চশ্রেণীদেরও ধর্ম-সাধনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহারা ঐ সকল বাহ্যিক অনুষ্ঠানে ও নানাপ্রকার জড়বিলাসেই কালহরণ করিতেন। পণ্ডিতমহলেও স্ত্রায়শাস্ত্রের চর্চা তখন প্রবল হওয়ায় উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও অধিকাংশ তর্কবুদ্ধে প্রশংসা অর্জনের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতেন। সেজন্য দেশবাসীদের ঐরূপ হ্রবস্থায় কেহ বিশেষ হুঃখবোধ করিতেন না। বুদ্ধাবনদাস তজ্জন হুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :

“কুতর্ক দুখিয়া সব অধ্যাপক হয়ে।  
ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সঙ্গারে।  
হরিতক্তি শূন্য হইল সকল সংসার।  
অসংসঙ্গ অসংগত বহি নহি আর।  
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।  
যেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি ক্ষুরে।”<sup>২</sup>

১ ঐতিহ্যভাগবত, অধ্যায় ৩, ১ অধ্যায়।

২ ঐতিহ্যভাগবত, আদিপর্বে, ৩১০ অধ্যায়।

ঐ সকল কারণে ঐ সময় শ্রীঅষ্টম আচার্য্য প্রভৃতি মানবশ্রেণিক মহাশ্চার্য্য খুবই কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহারা তখন দেশবাসীদের ঐ রকম মতিগতি দেখিয়া শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইয়া ক্রন্দন করিতেন। যথা :

“অষ্টম আচার্য্যাদি বত ভক্তপণ।  
জীবের কুহতি দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥”<sup>১</sup>

দেশের ঐ প্রকার হৃদিনেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে ও তাঁহার প্রেমধর্মের প্রচার হয়। তিনি জানিতেন যে, ঐ সময় হিন্দুদের রক্ষার নিমিত্ত ঐ সকল পতিতকে উন্নত করা ও তাঁহাদের উচ্চবর্ণদের সহিত ধর্মসাধনে সমান অধিকার দিয়া একই রূপ একটি সহজ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। তজ্জন্তই তিনি তাঁহাদের অন্তরে ভক্তি-ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া সন্তুগুণ বর্দ্ধনদ্বারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্হ সর্ববর্ণের একত্রে সংকীর্তন প্রবর্তন করেন ও শ্রীভগবানকে ভজনা করিবার সমান অধিকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই আছে ইহাও ঘোষণা করেন।

তৎপূর্বে ভারতবর্ষে কোথাও জনসাধারণের ঐ ধরণের একত্রে সংকীর্তন ছিল না। সে কারণ তাঁহার পূর্বগমনের পর সেখানেও ঐরূপ সংকীর্তন দেখিয়া উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেব বিস্মিত হন ও তাঁহার সভাপতিত্বে “উহা কি রকম সঙ্গীত ?” জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বলেন উহা সংকীর্তন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সৃষ্টি। বৃন্দাবন-দাস তজ্জন্তই তাঁহাকে “সংকীর্তনৈকপিতরো”—সংকীর্তনের একমাত্র জনক বলিয়া বক্ষনা করিয়াছেন।

ঐ সময় তিনি সর্বপ্রায়ে তাঁহার জন্মভূমি নবদ্বীপেই সমাজের উচ্চনীচ সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সহিত একত্রে ঐরূপ সংকীর্তন প্রচারের সূত্রপাত করেন এবং তদ্বারা জাতিধর্মনির্কিংশে সকলকে একরকম ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলেন। প্রথমে কি প্রকারে উহাতে জনসাধারণ আকৃষ্ট হয় তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায়।

তৎকালে যখন নবদ্বীপে তাঁহার সংকীর্তনে উষিত ভাব-প্রবাহের বাতপ্রতিবাত্তে যুগযুগান্তরের অস্পৃহতার সংস্কার-জনিত বৈষম্যবোধ জনচিত্তে শিথিল হইয়া ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমভাবসূচক ঐতি জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ হয় তখন ব্রাহ্মণ-দের কিয়ৎংশ উহার বিরুদ্ধবাদী হন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের নিন্দা প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার এইরূপে উল্লেখ আছে :

“চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগাথে।  
তটু নিত চক্রবর্তী নিন্দা সবে জানে ॥”<sup>২</sup>

তুলিলেই কীর্জন করয়ে পরিহাস।  
কেহ বলে বত পেট ভরিবার আশ।  
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।  
পরম উচ্চতাপনা হেন ব্যবহার।  
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত।  
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ।  
ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নয়।  
নাচিলে গাছিলে ডাক ছাড়িলে কি হয় ॥”<sup>৩</sup>

ঐ সকল ব্যক্তি তখন এই প্রকারে নিন্দা প্রচার ব্যতীত সংকীর্তন বন্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে রাজহওর ভয় দেখাইয়াও চারিদিকে কতকগুলি মিথ্যা জনববের সৃষ্টি করেন। উহা এইরূপ :

“কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রহাদ।  
শ্রীবাসের তরে হৈল দেশের উল্লাস।  
আজি মুক্তি দেওয়ানে গুনিল সব কথা।  
রাজার আজ্ঞার হুই নাও আইসে হেথা।  
গুনিলেন নদীয়ার কীর্জন বিশেষ।  
ধরি আনিবারে হইল রাজার আদেশ।  
... ..  
এই মত কথা হৈল নগরে নগরে।  
রাজনৌকা আসে বৈকুণ্ঠ ধরিবারে ॥”<sup>৪</sup>

এই ধরণের প্রতিবন্ধকতাচরণে কোন ফল না হইলে অবশেষে কয়েকজন নবদ্বীপের তৎকালীন শাসক চাঁদ কাকির নিকট গিয়া সংকীর্তনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলেন :

“হিন্দুধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই।  
যে কীর্জন প্রবর্তাইল কহু গুনি নাই।  
... ..  
কৃষ্ণকীর্জন করে নীচ বার বার।  
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥”<sup>৫</sup>

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উক্ত কাকিরও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি কীর্জনের বিরুদ্ধতা পরিহার করেন। তখন ঐ সকল বিরোধীর অনেকেও তাঁহার সংকীর্তনে যোগ দেন। ঐরূপে ক্রমশঃ তাঁহার সংকীর্তন স্থান সর্ববর্ণের সাধনক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠে এবং উহাতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বনী, নির্ধন, পণ্ডিত, বৃহৎ ও পণ্ডিত সকলে আসিয়া সমভাবে মিলিত হন।

ভারতবর্ষে জাতিধর্মনির্কিংশে হিন্দুদের ঐভাবে একত্রে ধর্মসাধনের করনা তৎপূর্বে বাহা কোনদিন কেহ ধারণায়ও আনিতে পারিতেন না, তখন আমাদের এই বঙ্গদেশের পুণ্যময় সুরধুনীতীরে বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠে।

- ১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, ১।
- ২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অধ্যায় ৩, ২১ অঃ।
- ৩ শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ।

- ১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিলীলা, ৫ অধ্যায়
- ২ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অধ্যায় ৩, ৬ অধ্যায়

এই প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম সংকীৰ্তনে উখিত প্রেমপ্রবাহে সৰ্ব্বাঙ্গে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর ডুবিয়া যায় ও তৎসহ উচ্চনীচে যুগযুগান্তের বিষেষও ক্রমশঃ অন্তহিত হইতে থাকে। তজ্জন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন তখন :

“উছলিল প্রেমবস্তা চৌদিকে বেড়ায়।

শ্রী বালক বুকু বুঝা সকলে ডুবায়।”<sup>১</sup>

সে কারণ জনসাধারণের সংকীৰ্তনে অমুরাগও দিন দিন বাড়িয়া যায় এবং কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী হইতে দলে দলে লোক উহাতে যোগ দিতে থাকেন। উহার জন্তও দৈবকব-দের তখন সংকীৰ্তন-বিরোধীদের নানা বকম বিক্রম সহ্য করিতে হয়। তাঁহাদের ঐ প্রকার বিক্রম-বাক্যের একটি আঙ্গিও লোকমুখে প্রবচন রূপে প্রচলিত আছে। উহা এই :

“মত ছিল নাড়াবুনে সবাই হ'ল কীৰ্তনে।

কান্তে কুড়ল ভেঙ্গে সব গড়ালে কর্ণাল।”

ঐ সময় নবদ্বীপে জনসাধারণ শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত একত্রে সংকীৰ্তন করিবার আশায় উদ্গীব হইয়া থাকিতেন এবং তিনি গৃহের বাহির হইলেই আনন্দে দিশাহারা হই-তেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন তখন :

“প্রভু মাত্র বাহির হইলে নৃত্যরসে।

হরি বলি সৰ্বলোকে মহানন্দে ভাসে।

সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।

সৰ্বলোকে হরি বলে অলগ হইয়া।”<sup>২</sup>

টোলের ছাত্তেরাও তৎকালে তাঁহার সহিত সংকীৰ্তন করিবার নিমিত্ত খুবই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন ও তাঁহাকে বলিতেন, “প্রভু! আমরাও আপনার সহিত সংকীৰ্তন করিব। উহা কিরূপ আমাদের শিখাইয়া দিন।” তিনি তখন হাতে তালি দিয়া উহা শিখাইতেন ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া সংকীৰ্তন করিতেন :

“শিখাগণ বলেন কেমন সংকীৰ্তন।

আপনি শিখায় প্রভু শচীর নন্দন।

... ...

দিশা শিখায়ন প্রভু হাতে তালি দিয়া।

আপনি কীৰ্তন করে শিখাগণ লইয়া।”<sup>৩</sup>

তাঁহার অনুরক্ত সঙ্গীরাও তখন তাঁহার সংকীৰ্তনে মিলিত হইলে আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। শ্রীবাস অঙ্কনে সারারাত্রি কীৰ্তন করিয়াও তাঁহাদের আশ মিটিত না। রাত্রি কিরূপে শেষ হইত তাহা জানিতে পারিতেন না। প্রভাত হইলে

সকলে দুঃখে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহাদেরও তৎকালীন অবস্থা বৃন্দাবনদাস এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

“চমকিত হইয়া সবে চারিদিকে চায়।

নিশি পোহাইল বলি কাশে উভরায়।

কোটি পুয়লোকেও এত দুঃখ নহে।

যে দুঃখে বৈকুণ্ঠ সব অরণ্যের চাহে।”<sup>৪</sup>

এই ভাবে ঐ সময় হইতে দিন দিন সংকীৰ্তনের প্রভাব দেশের সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জনসাধারণও সংকীৰ্তনকে তাঁহাদের ধর্মসাধনের প্রধান অঙ্গে পরিণত করিয়া তুলেন। উহাতে প্রচারিত শ্রীভগবানের নাম-গান তৎকালে জনচিত্তকে কত বেশী আকৃষ্ট করে তাহা বুঝিতে পারা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশিত এই দুইটি পঙ্ক্তি হইতে :

“কলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।

শুক্ল চরায় ডোম সেও বুকু গায়।”<sup>৫</sup>

এইরূপে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইতে সংকীৰ্তনে উখিত প্রেমপ্রবাহ চতুর্দিকে ছড়াইয়া প্রথমে বঙ্গদেশে ও তৎপরে উড়িষ্যায় প্লাবনের সৃষ্টি করে। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীৰ্তনের প্রতি জনসাধারণের ঐ বকম প্রবল আকর্ষণের এই প্রকার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন :

“The unsophisticated non-Brahmin classes could not study the Vedas. They could not recite the *mantras*. They neither understood nor were taught, nor indeed allowed to read and understand the sacred texts and laws. Religious ritual was to them practically mere magic and incantation. But Sree Chaitanya Mahaprabhu gave to each man the right and the power to directly worship the Supreme Lord by chanting and singing His name. The old Pujas and Yajnas were nothing really to the people at large. The Harinam that they received from the Mahaprabhu became something personal and intimate to them, became, indeed, every-thing in their religious and spiritual life.”<sup>৬</sup>

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপে ঐরূপ নাম সংকীৰ্তনের প্রারম্ভকালে অষ্টমত আচার্য্যও চৈতন্যদেবকে ঐ সকল অবহেলিত ও নিরক্ষর জনগণের মধ্যেই উহা প্রচারের জন্ত অনুরোধ করেন। যথা :

“অষ্টমত বলেন যদি ভক্তি বিলাইবে।

শ্রী শূদ্র আদি যত মূর্খের সে দিবে।”<sup>৭</sup>

মহামানবপ্রেমিক নিত্যানন্দও ঐ উদ্দেশ্যেই চৈতন্যদেবের

১. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

২. শ্রীচৈতন্যভাগবত, দ্ব্যখণ্ড, ২৩ অঃ

৩. শ্রীচৈতন্যভাগবত, দ্ব্যখণ্ড, ১ অধ্যায়

১. শ্রীচৈতন্যভাগবত, দ্ব্যখণ্ড, ১ অঃ

২. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১০ পঃ

3. *Bengal Vaishnavism*, page 156.

৪. শ্রীচৈতন্যভাগবত, দ্ব্যখণ্ড, ৬ অঃ

সহিত সন্নিহিত হন। তৎকালীন নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্তদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালেই তিনি বলেন :

“পতিতের জ্ঞান বড় শুনি নদীয়ার  
শুনিয়া আইলু মুক্তি পাতকি এখার।”<sup>১</sup>

উক্ত কারণেই তিনি তৎকালে সর্বপ্রকার বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া কি প্রকারে পতিতদের ঘরে ঘরে গিয়া তাঁহা-দিগকে ভগবানের নাম দান করেন তাহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠে জানিতে পারা যায়। কবি লোচনদাস তাঁহার গানেও উহার এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন :

“অকোথ পরমানন্দ নিহানন্দ রায়।  
অস্তিমানশূণ্য নিতাই নগরে বেড়ায়।  
১৬ল পতিতজনের ঘরে ঘরে গিয়া।  
হরিনাম মহাময় দেন বিলাইয়া।”<sup>২</sup>

শূদ্রদের উন্নয়নের নিমিত্ত তিনি প্রায়ই তখন তাঁহাদের মধ্যেই থাকিতেন। তৎকালীন নীলাচল চৈতন্তদেবের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগও করেন :

“দণ্ড ছাড়ি লেহ দণ্ড খরেন বা কেনে।  
শূদ্রের আশ্রমে কেন থাকেন সর্বদা।”<sup>৩</sup>

ঐচ্ছিকচরিতামৃত দেখা যায় যে, চৈতন্তদেবই তাঁহাকে ঐ প্রকার পতিভোগন কার্যভার দিয়া নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। শুধু তাঁহাকে কেন তাঁহার অত্যাশ্রিত সকল অশ্রুগামীকেই জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রেমধর্ম প্রচার ও জনসেবার জন্য তিনি যে নির্দেশ দেন তাহা এই :

“অতএব আমি আজ দিগ্ধ সংস্কারে।  
যাহা তাহা পেমদল পেহ যারে তারে।  
... ..  
ভারতভূমিতে হৈল মহাপ্রভু যার।  
জনম সার্থক করি কর পর-উপকার।”<sup>৪</sup>

এই প্রকারে বাহ্যতঃ ভগবানের নাম সংকীর্তন প্রবর্তিত করিয়া চৈতন্তদেব শুধু যে দেশের জনসাধারণকে একত্রে একভাবে ধর্মসাধনের জন্য একটি উচ্চাঙ্গের অধঃ সহজ ও গণতান্ত্রিক ঐশ্বর্য আরাধনা-পদ্ধতি দিয়া বান তাহা নহে, তখন উহার দ্বারা অসংখ্য পতিতকেও উন্নত করেন, যাহার ফলে সমাজে অস্পৃশ্যতার সংস্কার শিথিল হইয়া যায় এবং পতিতদের উপর উক্ত সংস্কারের প্রভাবে যে সমস্ত কঠোর সামাজিক আচরণ প্রচলিত ছিল তাহারও অনেক উচ্ছেদ হয়। ভারতবর্ষের অত্যাশ্রিত প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে

হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার সংস্কারের কঠোরতা যে অনেক কম তাহার কারণই তাঁহার তৎকালীন ঐরূপ প্রচেষ্টা। উহার জন্য তাঁহার যে সমস্ত উপদেশ ও বাণী প্রচারিত হয় তন্মধ্যে একটি এই :

“সহজ জীবনে যে অর্থ পীড়া করে।  
বিকৃ পুঞ্জিগণ সে প্রজাঘোষ করে।  
পূজা তার নিফল হয় আর তুখে মরে।  
সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।  
বিকৃপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া।  
একহস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে।  
• আর হস্তে ঢিলা যারে মাখায় কপালে।  
এসব লোকের কুশল কোন ক্ষণে।  
হইয়াছে? হইবেক? বৃক ভাবি মনে।”<sup>৫</sup>

ঐচ্ছিকদেবের মুখনিঃসৃত এই প্রকার বহু বাণী ও ভগবানের নামগান ঐ সময় দেশের চারিদিকে প্রচারিত হইবার ফলে জনমতের পরিবর্তন হইয়া শুধু যে পতিতরা তৎকালীন নানারূপ সামাজিক উপদ্রব হইতে মুক্তি পান তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাইয়া মাতৃঘরের মহিমময় মহত্বলাভেও সক্ষম হন এবং বৃকিতে পারেন যে মাতৃঘরের অধিকার ও মধ্যাহ্ন শ্রমীবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। এ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। উহা এইরূপ :

“The Vaishnava movement in Bengal, initiated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, not only gave a new theology of the Absolute or a new philosophy of art or created new forms of beauty through its lyrics,—the richest in the whole body of Bengalee literature—but it delivered a new social message, the message of the presence of the Lord in every human individually and collectively in the human society, and applied itself to secure both individual and social uplift. . . . It repudiated the mediæval Hindu dogma of Adhikaree-veda or the classification of worships according to the qualification of the worshipper, which had been organised in the mediæval institution of caste. And thus granted the highest religious franchise to all men and women, irrespective of all considerations of birth, parentage and social status and proclaimed the great gospel of universal worship.”<sup>৬</sup>

এই সকল কারণে তৎকালে ঐচ্ছিকদেবের প্রতি লোকান্তরাগ এরূপ প্রবল হয় যে :

“বাঁহা বাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।  
সে হৃদিকা নয় লোকে গন্ত হয় পথে।”<sup>৭</sup>

ঐ সময় তিনি একবার নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া

১ ঐচ্ছিকভাগবত, অধ্যায় ৪, ৪ :  
২ পৌরন্দরভাগবত, পৃষ্ঠা ২৭৮  
৩ ঐচ্ছিকভাগবত, অধ্যায় ৪, ১ অধ্যায়  
৪ ঐচ্ছিকচরিতামৃত, আদিলীলা, ১ পরিচ্ছেদ

১ ঐচ্ছিকভাগবত, অধ্যায় ৪, ৪ অধ্যায়  
(২) Bengal Vaishnavism, pp. 115, 129.  
৩ ঐচ্ছিকচরিতামৃত, অদিলীলা, ১ পরিচ্ছেদ



গঙ্গাতীরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেন। বৃন্দাবনধাম বলিয়াছেন যে, সেখানে তাঁহার পৌছিবাব সংবাদ লোকমুখে প্রচারিত হইবামাত্র :

“তখন অসংখ্য লোক বলি হরি হরি ।  
চলিলেন দেখিবারে গৌরাদ্র শ্রীহরি ।  
পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহলে ।  
বন ডাল ভাজি লোক চারিদিকে চলে ।  
... ..

ক্ষণেক আইল সব লোক খেরাঘাটে ।  
গেরায়ি করিতে পার পড়িল শব্দেটে ।  
শত শত লোক একো নারে চড়ে ।  
বড় বড় নৌকা সেই ক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে ॥  
নানা দিকে লোক খেরারিরে বজ্র বিয়া ।  
পায় হইয়া যায় সব আনন্দিত হইয়া ॥  
নৌকা যে না পায় সেও নানা বুদ্ধি করে ।  
ঘট বুক দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে ॥  
কেহ বা কলার গাছ বাঁধি করে ভেলা ।  
কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি খেলা ।”<sup>১</sup>

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্তে ঐ ঘটনার সংক্ষেপে যে উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ :

“আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিয়া ।  
প্রভুর দেখিতে লোক সংঘট হইলা ।  
পকদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ।  
লোকভয়ে রাতে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম ।  
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন ।  
কোট কোটি লোক আসি কৈল দর্শন ॥”<sup>২</sup>

তৎপরে তিনি কুলিয়া হইতে তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজধানী গোঁড়ের সান্নিধ্যে অবস্থিত রামকৈলি গ্রামে আসেন। সেখানেও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত এত অত্যধিক জন-সমাগম ঘটে যে উহার বিবরণ পাইয়া গোড়ের সুলতান বিস্মিত হন ও তাঁহার অমাত্যগণ সকাশে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :

“বিনাশনে ধার পাছে এত লোক হয় ।  
সেই ভো সৌসাই ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥”<sup>৩</sup>  
“এই মুক্তি বলি সুভারে ।  
কেহো বেন উপহব না করয়ে তারে ।  
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে ।  
আপনার শাস্তমত করুন বিধান ।  
সর্বলোক লয়ে সুখে করুন কীর্তন ।  
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন ।  
কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে ।  
কিছু বলিলেই তার লইবু জীবনে ॥”<sup>৪</sup>

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্তে উল্লিখিত আছে যে, তিনি চক্কিশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন ও ছয় বৎসর দ্বাক্ষিণাত্য, কান্ধী, বৃন্দাবন প্রভৃতি দেশে গমনাগমনে অতিবাহিত করেন। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, আঘাটের গুরুপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে রবিবাসরে তাঁহার অপূর্ণ লীলার অবসান হয়। এই অল্প-কালের মধ্যেই, সেই যুগে যখন বানবাহন বা সংবাদ আদান-প্রদানের বর্তমান সময়ের মত কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাঁহার শক্তি পূর্ণোক্তরূপে জনচিন্তা অধিকার করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর ধর্মে কর্মে ঐ প্রকার পরিবর্তন সাধন করে।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্য পাঠে বুঝা যায় যে, ঐ অসামান্য শক্তির মূলে ছিল তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহিত দেবদুর্গভ ভগবৎপ্রেম, অপরিণীত মানবপ্রীতি, অসাধারণ শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অমায়িক চরিত্রমাধুর্য, আদর্শ ত্যাগ, মধুর আচরণ ও অপূর্ণ সুধামাস্তিত বৃত্তি।

ঐ সময় জনসমুদ্রের মধ্যে সংকীর্ণনানন্দে বিভোর তাঁহার ঐক্লপ রমণীয় মূর্তিতে প্রেমের অপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া কত লোক যে তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সংযত করিয়াছে, কত দম্ভা তন্দ্র ও পামণ্ড মাহুয়ের মহত্ত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে, কত পাণ্ডিত্য ও ধনদর্পীর গর্বোন্নত মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া গিয়াছে, কত পতিত যে তাহাদের জীবন বৃথা সৃষ্টি হয় নাই তাহা বৃত্তিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না।

সংকীর্ণনকালে তাঁহার প্রেমমাধুরীমস্তিত মূর্তি মানব-হৃদয়ে কত গভীর রেখাপাত করিত তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় তৎকালীন সপ্তগ্রামের রাজকুমার, পরে সর্বস্বত্যাগী মহাশ্চা রঘুনাথদাসের এই রচনাটি হইতে :

“রসের অবধি মোর পোরা ।  
রসের উলাসভরে, অপক্লপ নৃত্য করে,  
ছ’নয়নে বহে প্রেমধারা ॥  
অভিনব সে মাধুরী, স্মরণ করিয়া হরি,  
বাঁহি বহে রাজা ছই নেত্র ।  
বসন্ত-উৎসব কালে সেচন করয়ে জলে,  
যেন পিচকারি জলধরে ॥  
সকল আনন্দাবেশে, দর্শনে অধর দংশে,  
হেন প্রেম আছিল কোথায় ?  
একবার হারে হেরে, তার আঁখি মন হয়ে,  
মোর মন সতত সাতার ॥”<sup>১</sup>

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অঙ্ক, ৩ অঃ

২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্ত, মধ্য, ১ পঃ

৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্ত, মধ্য, ১ পঃ

৪ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অঙ্ক ৪৩, ৪ অধ্যায়

১ শ্রীসৌরভজন কল্পকরঃ । নবদ্বীপ পৌরাণীর অনুবাদ

## গ্রামবাসীর কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নহি জানী, গুণী, ভক্ত ভাগ্যবান—  
বিশ্বাসী মোরা, এই শুধু অভিমান।  
'বনের-বুড়া'কে অর্চনা করি,  
'জল-কুমারী'কে পূজি।  
'ঘণ্টা' 'শীতলা' 'মনসা' 'লক্ষী'  
সবার মহিমা বুঝি।  
আকাশে বাতাসে দেবতা ফেরেন,  
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপাল,  
পদ্ম-হস্তে সরাইয়া দেন  
সব জালা জঞ্জাল।  
দেবতারে ডাকি, দেবতার কথা কহি  
দেবে ও মানুষে প্রতিবেশী হয়ে রহি।

২

পৃথিবীর রজে দিই মোরা গড়াগড়ি,  
অপাধিবেব সাধে কারবার করি।  
গান গায় পাখী, গান গায় বায়ু  
কি মুগ্ধ নীরবতা!  
ভাবের মাঝারে অভাব হারায়,  
সুরের মাঝারে কথা।  
কখন কিরূপে দেখা দেন হরি  
পথ চাই বারবার,  
ঠাহারি লাগিয়া সাজাইয়া রাধি  
এই ধর-সংসার।  
রজনীর দেবদ্বন্দ্বি দিবাভাগে,—  
জীবনের চেয়ে অধিক সত্য লাগে।

৩

বিপদেও দেখি অকরুণ ন'ন বিধি,  
মিলে 'শ্রীবৎস' 'চিন্তার' সন্নিধি।  
অতিথি বিমুখ করিনে—গোঁড়াই  
বহু আশ্রয় লয়ে,  
প্রছায় করি ধর্মকর্ম—  
শুচি দারিদ্র্য সয়ে।  
পূজা হোম ষাগ প্রাচীন প্রথার  
ধায়া বহে অনিবার,

শত বিপ্লবে অক্ষত আছে  
বৈদিক সনাতন।  
ত্যাগে ও গ্রহণে হেথা বিলম্ব ঘটে,  
সুদূর অতীত রয়েছে সন্নিকটে।

৪

প্রকৃতির প্রিয় গুণ এই ভবন—  
শুচিতায় এরে গড়েছে ভক্ত মন।  
কত অভাগিনী সাবিত্রী হায়  
বাঁচাতে না পারি স্বামী,  
হেথায় কঠোর 'পঞ্চতপে'তে  
কাটায় দিবস যামী।  
কত অর্জুন রহে অজ্ঞাত  
বৃহন্নলার বেশে,  
কত 'নলরাজ' আশ্রয় লয়,  
যোর ছদ্ম্বিনে এসে।  
সমগ্র ধরা একদা পূজিবে থাকে,  
গ্রামা-দেবতা হইয়া এখানে থাকে।

৫

পঙ্কেতে রই, ছখী নই তায় মোটে,  
পুণ্য আলোকে বুকে পঙ্কজ ফোটে।  
'ধরা ও জ্ঞোণের' নিকট পড়শী,  
বিহ্বলের জ্ঞাতি মোরা  
আমরা চাহি না 'মায়া কাপেট'  
ইন্দ্রজালের ঘোড়া।  
পরশ-মণির আকাঙ্ক্ষা নহি,  
তার চেয়ে মানি দামী—  
স্বপ্নেও যদি পদমূলি দেন  
সনাতন গোস্বামী।  
অর্থই আনে অনর্থ অবনীর,  
'কুবেরের' কাছে নোয়াই না মোরা শির

৬

গুনি আমেরিকা যত গুণী তত ধনী  
বিজ্ঞানে তারা অগতের শিরোমণি।

আমরা চাহি না ওয়াশিংটন,  
ব্রিটেন, মস্কো, রোম—  
মোরা মরীচির তপোবন খুঁজি,  
‘সুত্রভীর’ আশ্রম।  
ধ্বংস-কদার বিবাত সৃষ্টি  
‘অণুবোমা’ নাম তার,  
লোকক্ষয়কুণ্ড আমেরিকা নাকি  
করেছে আবিস্কার ?  
আমরা অণুর বেশী জানি গুণপনা,  
তাই মাগি সাধুপদরজ-অণুকণা।

৭

অমিত প্রতাপ, বিপুল শক্তিধর,  
কাল খারা ছিল—কোথায় অতপের ?  
দুঃস্বপ্নে দুঃকৃতি দল  
কোথা গেল হরা উপ ?  
গেল দপের বিপুল বহর  
কোন সাগরেতে ডুবে ?  
উদ্ধার মত কোথায় মিলাল।  
উদগ্র বেগে ছুটি  
প্রচণ্ড রথী, রাষ্ট্রনায়ক,—  
আগুনের কিন্নরুটি ?  
দুর্কালীর্ষে শিশিরবিন্দু হায়—  
সমাগর: এই ধরণী গ্রাসিতে চায় ?

৮

যে বিশ্বরূপ কুরু যোগেশ্বর—  
দেখান—দেখেন পার্শ্ব গজুর্জর,  
ক্ষীণ পুণ্যেতে কেমনে হবো তা  
দেখিবার অধিকারী ?  
আমরা অবোধ এই বিশ্বই  
রূপ বলে জানি তাঁরি।  
ভূবন এবং ভুবনেশ্বরে.

পৃথক দেখে না আঁখি,  
শরীর শিহরে প্রেমে বুক ভরে  
বিস্মিত হয়ে থাকি।  
দয়াল ভয়াল তাঁর রূপ দেখি নিতি  
অনুভব করি তাঁহার উপস্থিতি।

৯

কাল-মাগরের কালিদেহে করি বাস,  
নিম্বরজ, প্রশান্ত চারি পাশ।  
অস্ত্রবিহীন এ কমলবনে  
লাগে না আন্দোলন,  
‘কমলে কামিনী’ বিরাজেন সদা  
পেতে পারি দর্শন।  
স্থির শৈবাল-শযায় হেথা  
শুভ্র মুক্তা রাগে,  
যুগের যুগের মণিকর্ণিকাও  
অক্ষয় হয়ে থাকে।  
প্রলয়-পয়োপি তরঙ্গ আসি ছুটে—  
জননীর পাদপদ্মেতে পড়ে লুটে।

১০

পল্লী—বিবর নহে চঞ্চ-দৈন্যের,  
বহে বাহু হেথা নৈমিসারণ্যের।  
মহাভারতের মহিমার মাঝে  
আজও মোরা বাস করি,  
ক্ষুদ্র মধুপ ভাবের স্নিগ্ধ  
চক্রতীর্থ গড়ি।  
অজাতবাসে আলেখ্য আঁকি  
রাজহুয় যজ্ঞের,  
প্রতীক্ষা করি অনাগত দিন  
শুভ সৌভাগ্যের।  
আঁখিজলে ধুয়ে পল্লীর পথধূলি,  
বৈতরণীর ব-দ্বীপ গড়িয়া তুলি

## মামার দেশ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

চরিত্র

বিশ্বস্তর বাগ—	মানোজার	( বুনো ব্যবসায়ী )
সুলোচন নাগ—	প্রফ-রীডার	( কানা )
সাতকড়ি সিংহ—	জেড কম্পোজিটার	( তাতলা )
গোপাল গোয়েল—	কম্পোজিটার	( ছিটখেন্ড প্রেমিক ও টারা )
রমেশ শর্মা—	ঐ	( নেশাপোর )
রাধাচরণ হাতি—	মেসিনমান	( উগ্র স্বভাবের )
কাঞ্চন নীল—	আংশিক অধ্যাপক ও আংশিক সাংবাদিক	( সূচত্বর ও রসিক )
প্রেমতোষ ব'য়—	শ্রম-সংস্থের কর্মচারী ও সরকারী শ্রমিক	সজ্জব পাণ্ডা
হাবু—	বেয়ারা	( বোকা শয়তান )
ডেটলাল—	বেহারী দারোগদান	

স্থান—“গেয়ালী ছাপাখানা”র আশিসঘর।

সময়—বেলা তিন ঘটিকা।

( মানোজার বিশ্বস্তর ও প্রফ-রীডার সুলোচন হ'প'না

টেবিলে বসে কাজে বাস্তব )

সুলোচন। ( একটা নীল চশমা পরে এক চোপ দিয়ে প্রফ দেখছিলেন, দেখতে দেখতে মানোজারকে উদ্দেশ্য করে হঠাৎ বল উঠলেন ) না মশাই, এদের সঙ্গে প্রফরীডারের চাকরি রাখা দেখছি দায় হয়ে উঠল। ( তার পর হাসতে হাসতে বললেন ) একবার শুধুন আপনার কম্পোজিটার কি রকম কম্পোজ করেছে। ঐ যে ডি. এল. রায়ের সেই “বঙ্গ আমার, জননী আমার” গানটা, যা আজকেই বিকেলে দিতে হবে, তার শেষের ছত্র দুটি কি রকম কম্পোজ হয়েছে, তা একবার পড়ে শোনাই, শুধুন—

“আমরা মুক্তাব মা তোর লাসিমা, ফাহুস, ভোমরা, নহেত মেঘ,

দেবীকে মার, সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার মামার দেশ।”

কোন মূর্তিমান্ এটা কম্পোজ করেছে মশাই? পশ্চিমাটিকে একবার ডেকে পাঠান তো।

বিশ্বস্তর। বাপার শুনে মনে হচ্ছে আমাদের গোপাল কম্পোজ করেছে। শেষের ছত্র দুটা কি বললেন? দেখি, প্রফটা আমার একবার দিন। ( প্রফটা ভাল করে দেখে তারপর নিজে নিজেই পড়লেন ) “ফাহুস, ভোমরা, নহে ত মেঘ, দেবীকে মার, সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার মামার দেশ।” এ ত সর্বনাশের বাপার দেশ, হঠাৎ মামার দেশ? ( এমন সময় হাবু বেয়ারা গানকরক চিঠি এনে মানোজারকে দিল, মানোজার দেখতে দেখতে গোপালের একটা পাখের চিঠি দেখে বললেন ) গোপালের যে আবার একগানা

পাখের চিঠি দেখছি, মেরেলি হাতের লেখা, বর্ধমানের ছাপ, বর্ধমানেই তো ওর মামার বাড়ী, মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে, পাড়ান, একবার ডেকে পাঠাই। হাবু—

( হাবু প্রবেশ )

হাবু। আজ্ঞে এই, কি বলছেন?

বিশ্বস্তর। একবার গোপাল কম্পোজিটারকে ডেকে দাও।

হাবু। আজ্ঞে এই, ডেকে দিচ্ছি। ( প্রস্থান )

বিশ্বস্তর। দেখুন বিপদ, ভাবি কাজ, ছ'টার সময় দিতে হবে, আর এই রকম কাজ করলেই তো দিচ্ছে। যত সব আপদ এখানে এসে জুটেছে। জালিয়ে মারলে। ( গোপাল কম্পোজিটারের প্রবেশ ও নমস্কার ) এই যে, গোপাল, ( প্রফটা দেখাইয়া ) এই গানটা তুমি কম্পোজ করেছ?

গোপাল। ( প্রফ দেখে ) আজ্ঞে হাঁ।

সুলোচন। একটা গান কম্পোজ করতে তো ভুল করেছে অসংখ্য, তার ওপর শেষের দু'ছত্র তুমি কোথা থেকে পেল?

গোপাল। কেন আর, ঐ গানেতেই তো সব আছে।

বিশ্বস্তর। ( ধমক দিয়ে ) ঐ গানেতেই সব আছে?

গোপাল। ( বিনীত ভাবে ) তবে আজ্ঞে, বড় জড়ানো লেখা

কিনা, একটু আধটু ভুল যে না হতে পারে, তেমন নয়।

বিশ্বস্তর। ( ধমক দিয়ে ) একটু আধটু ভুল? চোপ মেলে একবার দেখ তো কি কাণ্ড করেছে? আচ্ছা, বুচাব না হয় ভুল করে মুছাব হতে পারে, কালিমাও না হয় লাসিমা হ'ল কিন্তু তারপর এ রকম অপক্লপ পদ বানালে কোথা থেকে? “ফাহুস, ভোমরা, নহে তো মেঘ,

দেবীকে মার, সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার মামার দেশ?”

গোপাল। আজ্ঞে, ও সব তো ওতেই আছে।

বিশ্বস্তর। ( রাগত ভাবে ) ও সব ওতেই আছে? কোথায় আছে দেখাও তো? ( লেপটা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন )

গোপাল। ( লেপটা দেখে বিনীত ভাবে ) আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না, লেখা তো ওই রকমই লাগছে।

বিশ্বস্তর। ( রাগতভাবে ) ওই রকমই লাগছে? গোপাল আমার! ( লেপটা নিয়ে দেখিয়ে ) চোপ মেলে দেখ তো ভাল করে—এই কথাটা ফাহুস না ফাহুস, এটা ভোমরা না আমার, এটা নহেত না নহি ত?

গোপাল। আজ্ঞে, তা হলে তাই হবে।

বিশ্বস্তর। ( ধমক দিয়ে ) তা হলে তাই হবে? কেন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? তারপর দেবী আমারকে কবে বসলে একেবারে দেবীকে মার? স্বর্গকে করলে স্বর্ণ। ( উপহাস করে )

আর গোপাল গোবিন্দ, আমার দেশকে একেবারে আমার দেশ  
বানিয়ে ছাড়লে ? বাহাদুর বটে !

গোপাল । আজ্ঞে তা হলে—

সুলোচন । সব ভুল প্রক্ষেপিক করে দেওয়া হয়েছে । আবার  
ভুল বেন না হয়, হুঁসিয়ার হয়ে কাজ কর—বাও । ( প্রক্ষ নিয়ে  
গোপাল প্রস্থানোচ্চত ) ।

বিশ্বম্ভর । ( গোপালকে ডেকে ) আজ্ঞা, শোন ?

গোপাল । আজ্ঞে, বলুন ।

বিশ্বম্ভর । তোমার আমার বাড়ী কোথায় ?

গোপাল । আজ্ঞে বহুদূর ।

বিশ্বম্ভর । তুমি সেখানে বাও ?

গোপাল । আজ্ঞে হ্যাঁ, বাই বৈ কি, প্রত্যেক ছুটিতেই বাট ।

বিশ্বম্ভর । তোমার মা সেখানেই থাকেন ?

গোপাল । আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে কিনা, ঠিক মাকে দেখতেই  
বাই না ।

বিশ্বম্ভর । ঠিক মাকে দেখতে বাও না, অথচ প্রত্যেক ছুটিতেই  
বাও, তা হলে কাকে দেখতে থরত করে বাও ?

গোপাল । আজ্ঞে, ( মাথা চুলকাতে চুলকাতে ) বলব ?

সুলোচন । হ্যাঁ, বল না ? জিজ্ঞাসা করছেন তো ?

গোপাল । আজ্ঞে, এই আজ্ঞে, ( আমতা আমতা করে ) তা  
হলে বলব ?

বিশ্বম্ভর । ( বিরক্তির স্বরে ) আঃ, সময় নষ্ট করো না,  
তাড়াতাড়ি বল ।

গোপাল । আজ্ঞে তা হলে এই বসছি—( মাথা চুলকাতে  
লাগল ) ।

সুলোচন । কৈ মাথা চুলকাচ্ছ কেন, বল না ?

গোপাল । ( আমতা আমতা করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে )  
আজ্ঞে, এই আজ্ঞে, আমি বাই ওই সাধীকে—তার মানে সাধনাকে  
দেখতে ।

বিশ্বম্ভর । সাধন ? সে কে ? তুমি তো বিয়ে কর নি এখনও ?

গোপাল । আজ্ঞে না, বিয়ে করি নি, তবে আজ্ঞে করব  
ভাবছি ।

বিশ্বম্ভর । বিয়ে করবে ? কাকে ?

গোপাল । আজ্ঞে ওগানকার ওই সাধীকে যাকে বলে  
সাধনাকে, যদি পাট তা হলে ।

বিশ্বম্ভর । দেবী বলেও ওগানে কেট থাকে নাকি ?

গোপাল । দেবী ( বাগত ভাবে ) আজ্ঞে হ্যাঁ, বলবেন না ওর  
কথা, ওটা, ওটা একটা বদমায়েস, পাণী, নছার, পাই যদি একবার  
তো ওর মুণ্ডপাত করে ছাড়ব ।

সুলোচন । কেন, দেবী কি কয়ল তোমার ?

গোপাল । কি কয়ল ? কি করে নি মশাই ? বলছেন কি,  
ওটা একটা পরলা নখরের বদমায়েস । সাবাদিন ছিপ হায়ে করে

পুকুরপাড়ের মাছ ধরবার অছিলে করে বসে থাকে ওই সাধীকে  
দেখবার জন্য । বেচারী ওর জন্তে আলাতন, পুকুরে আসতে  
বেতে পারে না আর আপনি বলছেন, কি কয়ল ও ? পাণী, নছার  
বেটা ! ( বাগে ফুলতে লাগল )

সুলোচন । তোমার বুঝি সাধন' এ সব কথা বলেছে ?

গোপাল । না, সাধনা বলবে কেন ? ( হতাশার স্বরে ) তার  
সঙ্গে তো আমার আলাপই নেই ।

সুলোচন । আলাপ নেই ? তা হলে তুমি জানলে কি করে ?

গোপাল । জানব না ? কেন জানব না মশাই ? আমি  
জানলা দিয়ে নজর করে দেখি না ? সাধীদের বাড়ী তো আমার  
মামার বাড়ীর পুকুরের ঠিক ওপারেই ।

বিশ্বম্ভর । ( হাসি চেপে গভীর হয়ে ) বাও এখন ঠিক করে  
গানটা কয়েকশন করে নিয়ে এস । এবার ভুল হলে ভাল হবে না  
—তাড়াতাড়ি করে নিয়ে এস । বাও ।

( গোপালের প্রস্থান )

( প্রফরিডারকে টক্কেল করে হাসতে হাসতে বললেন ) এবার  
বুঝছেন মশাই কেন ও ছত্র কম্পোজ হয়েছে ? দেবীকে মার,  
সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার মামার দেশ ? ( হুঁতনের ভাঙ্গা )

সুলোচন । কি করে জানব বলুন যে কম্পোজ করতে করতে  
আবার কম্পোজিটারের মনের ভাব বেরিয়ে পড়ে ?

বিশ্বম্ভর । এই ত্রিশ বছর ধরে অনেক ভূত নিয়ে কাঁদবার  
করে আসছি, তবে তো ওদের মনস্তত্ত্ব কিছু বুঝতে পারি । দেখলেন  
না, একটু পরণ করতেই সব ফাঁস হয়ে গেল । ওর চিঠিটা ওকে  
এখন দেওয়া হবে না, থাক এখানে । ( চিঠি দেখে ) হুঁ, কিছু বেন  
বহুশ আছে এর মধ্যে ।

সুলোচন । কি জানি মশাই, আমারও ত এই দশ বছর হতে  
চলেছে প্রফরিডারের কাজ, কিন্তু এরকম অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের পরিচয়  
আর কখনও পাই নি, আজ এই প্রথম ।

বিশ্বম্ভর । আরে নাগ মশাই এর চেয়ে আরও অদ্ভুত  
কম্পোজের ব্যাপার তা হলে বলি শুধুন—( বাইরের দিকে চেয়ে )  
এই মাটি কবেছে, প্রোফেসার শীল এসে পড়লেন যে—

( প্রোফেসার শীলের প্রবেশ )

প্রোঃ শীল । Hello, Mr. Bag, আমার গানটার ফাইন্সাল  
প্রফটা দিন দেখে দিয়ে যাউ ।

বিশ্বম্ভর । আর প্রোঃ শীল—ওই গানটার কম্পোজের ব্যাপার  
নিশ্চয় চমকিত এতক্ষণ, সে অনেক কথা, তবে ফাইন্সাল প্রফটা  
এখনও তুমি নি, একটু না' হয় অপেক্ষা করে দেখে দিয়ে যান । এই  
এখনই হয়ে যাবে :

প্রোঃ শীল । সে কি মশাই ! সর্কানশ করবেন দেখছি, চারটে  
বাঞ্চে এখনও proof ready হ'ল না ? ছ'টার সময় আমার ছাপা  
গান চাই-ই চাই । Be sure of that Mr. Bag.

সুলোচন। তা হয়ে বাবে, কবেকখন এখনই হয়ে বাবে। আপনি একটু দয়া করে বসে দেখে বান না?

শ্রোঃ মিল। By jove! I have no breathing time. কালেক থেকে এই ছুটে এলাম, আবার এখনই “সত্যবাদী” পত্রিকার কাজে যেতে হবে। অনেক কষ্টে একটু সময় করে এসেছি। সকলের জানা একটা গান কম্পোজ করতে কত সময় লাগে মশাই? আমি তা হলে এখন চললাম, ঠিক ছ’টার সময় আসব নিতে। আপনারা ভাল করে প্রফটা দেখে দেবেন, ভুল-টুল যেন না থাকে। Mind you Mr. Bag.

(বিরক্তির সহিত প্রস্থান)

বিশ্বম্ভর। হায় রে! জানা গান, কার জানা, আর কে জানে? কম্পোজিটারদের বাপাব ত আর জানা নেই? জানতেন যদি কি ঠেঙিয়ে কি করতে হয়? আর কালেক্সে পড়িয়ে জানবেনই বা কি করে? ছাপাখানার মানোজ্ঞার হবার সৌভাগ্য হলে জানতে পারতেন, বুঝতে পারতেন যে তাদের অতি জানা নিজের নিজের নাম কম্পোজ করতে দিলেও সে হয়ে যায় তাদের কাছে অজানা। বাক, (সুলোচনকে সম্বোধন করে বললেন) দেখুন, আমার তো আবার এই মুহুর্তে সেট “লিবিলাসে”র টাকাটাও ভক্ত তাগাদায় যেতে হবে। অনেক দিন পরে ঘোরাচ্ছে। আজ সময় দিয়েছে সওয়া চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। দুজনের ছেলের অভাব নেই, একটু দেরি হলেই বলবেন, কৈ আপনি ত সময়ে এলেন না, আজ আর হ’ল না, সব থরচ হয়ে গেছে। টাকাটা দেখছি মরাই বাবে। আমি চললাম, আপনি প্রফটা ভাল করে দেখে দেবেন। (বিল হাতে দাবোয়ানের প্রবেশ) এত্না দেবী কাতো, কপেরা মিলা?

জেটলাল। কাঁহা কুপাইয়া হুজুর?

বিশ্বম্ভর। কেয়া বোগা?

জেটলাল। বাবুকা পাণ্ডা নেতি মিলতা, বোলেনগা কোন হুজুর?

সুলোচন। আপনি কিন্তু পাঁচটার মধ্যেই আসবেন। আমি ঠিক পাঁচটার উঠব। জানেন ত আমার আজ বিশেষ দরকার আছে।

বিশ্বম্ভর। আচ্ছা ভাই হবে, তা হলে আসি। ই্যা, নাগ মশাই কাইজাল প্রফটা হু’চোখ দিয়ে ভাল করে দেখে তারপর ছাপতে দেবেন।

(বিশ্বম্ভর ও জেটলালের প্রস্থান)

সুলোচন। (রেগে চোব থেকে কালো চশমাটা খুলে, সামনে তাকিয়ে) আমার এক চোপ কানা বলে ঠাট্টা করে বলা হল, হু’চোখ দিয়ে দেখে দিতে—(রাগত স্বরে) স্বাউন্ডেল।

(সবেগে প্রস্থান)

(নিজেদের প্রফ নিয়ে গোপাল ও রমেশের প্রবেশ)

এবং কাহাকেও না দেখে)

রমেশ। কেউ নেই রে গোপাল এইবার তোর ভালবাসার কথাটা শেষ কর, বলছিস তো তাকে খুব ভালবাসিস। হারে সতি নাকি?

গোপাল। মাইরি বলছি ভাই, খুব ভালবাসি। পাগল হয়ে গেছি।

রমেশ। তাই তো থামকা পাগল হলি? কিন্তু সে তোকে ভালবাসে কি না সেটা একবার খোঁজ নে, না হলে তাকে বিয়ে করবি কি করে?

গোপাল। কেন? বিয়ে করব বিয়ে করে। আবার কি? হারে সব মেয়েই কি ভালবেসে বিয়ে করে?

রমেশ। দুহ, মেয়েরা বাকে হোক একটা বিয়ে করলেই তাকে ভালবাসে। আহা—কে বলে পিরিতি নাই? (স্বর করে)

“পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে?

ও পাড়ার সাধী বধূরে আমার, ধরিয়া আনিয়া দে।”

গোপাল। না ভাই না, ঠাট্টা রাগ, এ বিয়ে যদি না হয় তা হলে আমি তো প্রাণে বাঁচবো না? মাইরি বলছি—

রমেশ। কি করে বুকেল বাবা যে এ বিয়ে না হলে প্রাণে বাঁচবে না?

গোপাল। এই দেখনা ভাই কি রকম শুকিয়ে বাড়ি, আগে বারখানা কুটি না হলে পেট ভরত না আর এখন তোকে বলব কি দুখানা, শুধু দুখানা খেতে না খেতেই পাওয়া হয়ে যায়। এই খাওয়া পেরে ক’দিন আর বাঁচব বল? আমি মামীকেও এবার সেকথা বলে এসেছি, যে যদি এ বিয়ে না দিতে পার তো আর তোমার গোপালের প্রাণের আশা যেপো না।

রমেশ। হা—ঠিক, বারখানা থেকে বগন হু’খানার নেবেছে তখন রোগ ঠিকই ধরেছে। মরেছ ঠিকই, (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) বাবা ও রোগ আমার একবার ধরেছিল—(হেসে) মাই আর কি—অটগানা থেকে একেবারে ওই হু’খানার তারপর (শিশি দেখাইয়া) বেঁচে থাক এই ধাক্কেধরী, এখন বাবা চড় চড় করে বেড়ে একেবারে ঝোলখানা। ই্যা, তা তোর মামী সব শুনে তোকে কি বললে?

গোপাল। বলবে আর কি আমার মাথা আর মুতু—বললে আমার মামার মত নেই, সাধীরা নাকি ছোট ঘরের—

(সুলোচনের প্রবেশ)

সুলোচন। কৈ গোপাল তোমার প্রফ এনেছ?

(সুলোচনের উপবেশন ও প্রফ রেখে রমেশের প্রস্থান)

গোপাল। এই নিন স্যার।

সুলোচন। (প্রফ দেখিতে দেখিতে) এ আবার কি করেছ? এত করে কেরেকশন করে বলে দেওয়া সত্ত্বেও ঠিক হ’ল না? কি করেছ দেখ দেখি—(গোপালের টাারা চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে) কোন দিকে তাকিয়ে আছ? এই, এই দিকে দেখ কি করেছ—

মাছুষ নহত তোমরা মেঘ,

দেবী কামার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার মামার দেশ!

এত করেও ভুল? জালালে দেখছি, নহত নয়, ওটা নহি ত, আর

তোমরা নয় ওটা আমরা। দেবীকে আবার কামার বানালে কেন?

গোপাল। আজ্ঞে, দেবীরা জাতে কামার তো।

সুলোচন। তোমার মুণ্ড, এগুনকার দেবী জাতে কামার নয়, ওটা হবে দেবী আমার, বুকেছ? আবার আমার দেশ? উঃ জ্বালাতন করে মারলে। ওরে বাবা আমার দেশ নয়, ওটা আমার দেশ—আ-মাং দেশ বুকেছ? কবেকশন করে দিলুম, আর যেন ভুল না হয়। যাও তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিয়ে এস।

গোপাল। যে আজ্ঞে স্ত্রীর, এগুনি ঠিক করে আসছি।

(গোপালের প্রস্থান)

সুলোচন। হাবু, ও হাবু।

হাবু। (নেপথ্যে) আজ্ঞে এই, বাই। (আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে প্রবেশ করে) আজ্ঞে এই, কি অল্পমতি করেন?

সুলোচন। অ'রে হাবু, তুমি যে আবার শুক ভাষায় কথা কইছ?

হাবু। আজ্ঞে এই, তা কইব বৈকি (বাড়ী লুকে) কইব বৈকি আপনাদের সঙ্গে। শুক ভাষায় কথা তো কইতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু ওই বাগ মশায়ের হালুম, হলুম সব কি রকম গুলিয়ে যায়।

সুলোচন। একবার হেঃ কম্পজিটার সিং মশাইকে ডেকে দাও তো!

হাবু। আজ্ঞে এই, দাঁট। (জনাস্থিকে) ব'বারে বাবা—বাগ, নাগ, সিং একেবারে যেন সোঁন্দরবন। (প্রস্থান)

সুলোচন। ওট গোপালটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, না হলে এরকম—

(হেঃ কম্পজিটার সাতকড়ির প্রবেশ)

সাতকড়ি। আ—আ—আমার ডাকছেন?

সুলোচন। হ্যা—আচ্ছা দেখুন, ওট গোপালের মাথাটার কি কিছু গোলমাল আছে?

সাতকড়ি। তা—তা—তা—একটু—আজ্ঞে বোধ হয়। প্রা—প্রা—প্রায়ই ও—অল্পমতি থাকে, আর মা—মা—মাঝে মাঝে—আপন মনে বি—বি—বিড় বিড় করে, সময় সময় আবার গা—গা—গানের সুরও ভাঙে। মা—মা—মামার আদরে আদর একটু পা—পা—পামথেষ্ট্রালী হয়ে উ—উ—উঠেছে আর কি।

সুলোচন। মশাই আপনি একবার গিয়ে দেখুন তো ও কি করছে? প্রফটা তাড়াতাড়ি কর পাটিয়ে দিন। সাড়ে চারটা তো দেখছি বেড়ে গেল, আমার পাঁচটার উঠেই হবে।

সাতকড়ি। আ—আ—আচ্ছা, আমি এখনই গি—গিয়ে বেশ করে তা—তা—তাড়া দিয়ে পা—পা—পাটিয়ে দিচ্ছি।

(সাতকড়ির প্রস্থান)

সুলোচন। উঃ সোতলাকে সঙ্গে কথা কওয়া কি জ্বালা যে বাবা—শেষ হয় না।

(তৃতীয় প্রক্ষ নিয়ে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। এই নিন স্ত্রীর, এবার একেবারে ঠিক করে এনেছি, হ্যা, আর ভুল পাবেন না।

সুলোচন। (প্রক্ষ দেখতে দেখতে) ভুল পাব না, তোমার মাথা পাব। ভুল নয়তো এটা কি হয়েছে?

মামুষ নহেত আমার মেঘ,

স্বর্গ আমার মামার দেশ।

শেই আবার মামার দেশ? পাগল করে তুলবে যে দেখছি? শোন ভাল করে শোন—ওপরে “মামুষের” পরে আসবে “আমরা” আর তার পরে হবে “নিহিত”, নহেত নয়, বুকেছ? আর নীচের লাইনের শেষ কথা “আমার দেশ”, মামার দেশ নয়। বুকেলে এবার? কেব যদি ভুল হয়, মুণ্ড ভেঙ্গে ফেলব, বুকেছ?

গোপাল। আজ্ঞে হ্যা।

সুলোচন। আচ্ছা যাও, শীঘ্রির নিয়ে এস। (ঘড়ি দেখে) আঃ পাঁচটা যে বাজে। আচ্ছা এক কাজ বরো, সিং মশাইকে একবার পাটিয়ে দাও, আর সোজা চোপ চেয়ে কাজ করো, বুকেলে?

গোপাল। যে আজ্ঞে। (জনাস্থিকে) “কানা খোড়া একগুণ বাড়ি”—আমার টারা চোপ নিয়ে ঠাট্টা, (বাগত স্বরে) আচ্ছা—(গোপালের প্রস্থান)

সুলোচন। আবার সেই সোতলাকে বোঝাতে হবে—ভাল জ্বালা।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাতকড়ি। আ—আ—আমার ডা—ডা—ডাকছেন?

সুলোচন। মশাই, পাঁচটা বাজে, মানেজার মশাইতো এখনো এলেন না, আমাকে এখন যেতে হবে। উনি বোধ হয় এখন এসে পড়বেন। যদি তাঁর আসতে দেরি হয়, তা হলে আপনি দয়া করে গোপালের ফাইন্সাল প্রফটা একবার দেখে ছাপতে দিয়ে দেবেন। ওরা ঠিক ছ'টার সময় নিতে আসবে। একটু দেখবেন যেন আবার “মামার দেশ” না থেকে যায়। আচ্ছা, আমি তা হলে এখন আসি। (ক্রমালে মুখ মুছে, চশমা পরে প্রস্থান)

(চতুর্থ প্রক্ষ নিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে)

গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। নিন স্ত্রীর, এবার একেবারে ঠিক না হয়ে যায় না। (সাতকড়ির প্রতি) কৈ, নাগ মশাই কোথায় গেলেন?

সাতকড়ি। ও—ও—ওঁর বিশেষ—জরুরি কাজ থাকার দরুন উ—উ—উনি চলে গেছেন। আ—আমায় দে—দে—দেখে দিতে—বলেছেন, দা—দা—দাও দেখি। (প্রক্ষ দেখে) এ কি? মা—মা—মামার দেশ কবেই কেন? ওটা হবে আ—আ—আমার দেশ। যাও—ওটা ঠিক করে দিয়ে জ—জ—জমাদারকে ছাপতে দিয়ে দাও, আ—আ—আমার হাতে—অনেক কাজ রয়েছে,—আমি বাই। চো—চো—চোপ দিয়ে দেখে—কাজ করো। (প্রস্থান)

গোপাল। (সরোবে মুখভঙ্গী করে) আরে সোতলা আজ



হতে পারে না, সেও আমার চোখ নিয়ে ইজিত করে—ওঃ, মামার শকে আমার দেশ করতে হবে, কেন—আমার দেশ কি মামার শ হতে পারে না? একটা গানের মধ্যে সাতশ গুণ্ডা আমার, আমার, আর আমার। কেন, বাবা একটা আমার হলে কি হয়? আমি বলাব না। আমার দেবী, আমার সাধনা, আছে আমার দেশ, আর আমি করব তাকে আমার দেশ?

(বাখচরণের প্রবেশ)

বাখচরণ। কৈ গোপাল, এখনো কাণ্ড দিচ্ছ না যে—তান নাও আমার শালীর বিয়ে—

গোপাল। (চমকে উঠে) কি বললে, আজ সার্বীর বিয়ে?

বাখচরণ। আরে না না, (গোকে মোচড় দিয়ে) আজ আমার শালীর বিয়ে।

গোপাল। (অশ্রুত হয়ে) তাই বল, গোমার শালীর বিয়ে নাও বিয়ে—(প্রফ দিয়ে) এট নাও ভাই এট নাও—আতা ব—য়ে। (বলিতে বলিতে উত্তরের প্রস্থান ও বিশ্বস্তরের প্রবেশ)।

বিশ্বস্তর। হাবু, এই হাবু?

হাবু—(নেপথ্যে) আজ্ঞে এট বাই। (প্রবেশ করে) আজ্ঞে এই, কি আজ্ঞা করেন?

বিশ্বস্তর। তাহে—প্রফ রিটার বাবু, মানে নাগ মশাই কি বলে গেছেন?

হাবু। আজ্ঞে এট, বোখ হয় গিয়েছেন।

বিশ্বস্তর। (বিশ্বস্তর স্বরে) বোখ হয় গিয়েছেন? কেন হুমি ছিল কোথায়?

হাবু। আজ্ঞে এট—এটগানেই তো ছিলাম।

বিশ্বস্তর। এটগানেই ছিলে তো সবচেয়ে বলতে পারছ না কেন, এনি চলে গেছেন কি না?

হাবু। আজ্ঞে এট, তাঁকে তো চ—লে যেতে দেখি নি।

বিশ্বস্তর। (রাগত ভায়ে) আজ্ঞে তাঁকে চ—লে যেতে দেখি নি, —তবে কি উড়ে যেতে দেখেছ?

হাবু। আজ্ঞে এই, উ—ড়েও তো যেতে দেখি নি।

বিশ্বস্তর। তা হলে তিনি গেলেন কোথায়? তাঁকে চলেও যেতে দেখি নি, উড়েও যেতে দেখি নি, তারু তিনি এখানেও নেই, তা হলে তিনি কি কপূরের মত উবে গেলেন?

হাবু। আজ্ঞে এট, তাই তো ভাবছি। (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) তাই তো, তাই —

বিশ্বস্তর। (খমক দিয়ে) আর অত ভেবে কাজ নেই। যত সব ভুত এসে জুটেছে এখানে — ওদিকে পক্ষের কাছে হেঁটে হেঁটে ঢাকা পাবার জো নেই, আর এদিকে সবচেয়ে গোপালগোবিন্দ জালাতন করে মারলে। ঘুমুড়িলি বুঝি?

হাবু। (হাত কচলাতে কচলাতে) আজ্ঞে তা মিথ্যে বলব কেন, একটুগানি নিদ্রে এসেছিল কি না? তাই, তাই একটু বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বিশ্বস্তর। বিকেল পাটটার সময় একটু বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলে? উদ্ধার করলে, মর্ত্তমান কুন্তকর্ণ কোথাকার—

(প্রোফেসার শীলের প্রবেশ)

প্রোঃ শীল। Hullo Mr. Bag, গানের কাগজগুলো কি ছাপা হয়েছে? (হাতবড়ি দেখে) I am a bit early—একটু আগেই এসে পড়েছি।

বিশ্বস্তর। আমি একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম, এই আসছি, বোখ হয় হয়ে এসেছে। হাবু — (হাবুর প্রবেশ)

হাবু। আজ্ঞে এট, কি বলছেন?

বিশ্বস্তর। যা, সিংহ মশাইকে গানের কাগজগুলো নিয়ে আসতে বল। (বেবিলের উপর গোপালের চিঠিটা দেখে) হাঁ—এই দেখ, গোপালের এই চিঠিটা—আচ্ছা থাক এখন। তুই যা।

হাবু। আজ্ঞে এট, বাই।

(প্রস্থান)

প্রোঃ শীল। আরে বাগব, এখনে দেখছি সবাই রয়েছে—বাবু, নাগ, সিংহ সকলেই বিরক্তমান।

বিশ্বস্তর। আমার যা অবস্থা হয়েছে মশাই তা আর আপনাকে কি বলব। সারাদিন ধরে কতকগুলো ভুত তাড়িয়ে বেড়াছি। এদের সঙ্গে বকতে বকতে আমার মাথার কিছুটা নড়ে গেল, ব্লাউথ্রস্টর হয়ে গেল।

(কয়েকগণা গানের কাগজ নিয়ে সাতকড়ির প্রবেশ)

সাতকড়ি। স—স—সব এখনও ছাপা হয়নি।

প্রোঃ শীল। দিন আমায় দিন, একবার পড়ে দেখি (পড়তে পড়তে) আরে সর্বনাশ, What's the matter এ কি ছাপা হয়েছে? দেখুন তো—

মামুখ নহিত আমরা মেব,

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার, মামার দেশ!

(মানেজারের দিকে সজোরে গানের কাগজগুলি ছুড়ে ফেলে) দেখুন একবার পড়ে দেখুন। এখন উপায়? What's the way out?

বিশ্বস্তর। (প্রফ দেখে) তাই তো—সর্বনাশ! সিংহ মশায়—?

সুলোচন। আমি গোপালকে পা—পা—পাঁচ বার বলেছি মা—মা—মামার দেশ নয় ওটা আমার দেশ, ক—ক—কয়েকশন করে দিলাম, সবও সে ও—ও—ওই ভুল করলে? আ—আ—আশ্চর্য।

বিশ্বস্তর। হাবু, এট হাবু। জমাদারকে এখন মেসিন খামাতে বল।

হাবু। (নেপথ্যে) আজ্ঞে এই যা—ই।

প্রোঃ শীল। শুধু মামার দেশ? আর তার ওপরের লাইনে কি হয়েছে? মামুখ নহিত আমরা মেব?

সাতকড়ি। কেন, ওপানটা তো ঠি—ঠি—ঠিকই আছে?

বিশ্বস্তর। ওপানটা ঠিকই আছে?

প্রোঃ শীল। তা ঠিকই আছে বৈ কি।

সাতকড়ি। কেন মশাই, ও গা—গা—গান তো আমরা স্বদেশী আমলে ক—ক—কত গেয়েছি। আমাদের বিপাত কে—কে—কেই না, তো বরাবরই আমাদের দিগে গাইয়েছেন—মা—মা—মামুখ নহিত আমরা মে—মে—মৈষ ?

বিশ্বস্তর। আপনাব বিপাত কেই না বোধ হয় এই জাতীয় একটি ভীষ ছিলেন, তাই আপনাকে দিয়েও গাইয়েছেন। এখন আর সময় নষ্ট না করে কাজে বান। ওখনটা হবে “মামুখ আমরা, নহিত মৈষ।” তাড়াতাড়ি করে কেরেকশন করে দিন আর গোপালকে এখানে পাঠিয়ে দিন। (সাতকড়ির প্রস্থান)

দেপ্লেন ত মশাই ? কি বলছিলাম আপনাকে, ভূত নিয়ে কাজ করছি, এক একটি ভাংত ভূত। (গোপালের প্রবেশ) কি এসেছ, গোপালগোবিন্দ, কতগুলো ছাপা হয়েছে ?

গোপাল। আজ্ঞে, শগুনেক হবে।

বিশ্বস্তর। (রাগত সুরে) শগুনেক—ক’না! প্রাক কেরেকশন হয়েছিল ?

গোপাল। আজ্ঞে চারখানা।

বিশ্বস্তর। শুনলেন তো মশাই, চার চার বার প্রাক কেরেকশন হয়েও হয়েছে—মামুখ নহিত আমরা মৈষ, স্বর্গ আমার আমার দেশ মৈষ কোথাকার, স্বর্গ আমার দেশ চরে পাও গে, কাল থেকে আর এখানে এসো না, আজ থেকেই তোমার চাকরি খতম, যাও।

গোপাল। আজ্ঞে—

বিশ্বস্তর। আর আজ্ঞে টাজ্ঞে নয়, যাও এখন থেকে, বেরোও।

(গোপালের প্রস্থান ও জমাদার বাধাচরণের প্রবেশ)

বাধাচরণ। মানত’র মশাই, যেদিন বন্ধ করে দিতে ভুলুম দিলেন নাকি ?

বিশ্বস্তর। হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে, আবার কেরেকশন করে দিতে হবে।

বাধাচরণ। এখন আবার কেরেকশন করে ছাপা শেষ করতে হলে সাতটা বেজে যাবে। আমি আজ ওভারটাইম থাকতে পারব না—আপনাকে আগেই বলে রেখেছি। আমি ছ’টাতেই যাব। আমার শালীর বিয়ে।

বিশ্বস্তর। যাব বললেই যাওয়া হয় নাকি ? শালীর বিয়ে তো মাথা কিনেছ আর কি—ভুললোকের গানগুলো বস্তকণ না ছাপা হয়, ততক্ষণ ওভারটাইম থাকতে হবে। তা’র ভুলে তো ষিগুণ মাইনে পাবে, অমন থাকবে নাকি ?

বাধাচরণ। (হেগে) আপনাব মাইনের ব্যাপার আমার জানা আছে। ষিগুণ মাইনে আমি চাই না, আমি ওভারটাইম থাকতে পারব না। আমি আপনাকে আগেই বলে রেখেছি, আজ আমি থাকতে পারব না, কোন মতেই নয়, আজ আমার শালীর বিয়ে। আমার জ্বী—

প্রোঃ শীল। (ব্যাপার সন্ধীন দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠলেন)

ওয়েল ড্রাগার, আপনাব তো ভাই শালীর বিয়ে, আমার যে বাপের শ্রাদ্ধ আজ সাড়ে ছ’টার সময়।

বিশ্বস্তর। আপনাব বাবার শ্রাদ্ধ ?

প্রোঃ শীল। আজ—বাপ মানে স্বত্তর। Father-in-law, আমার বৃদ্ধাসিনীর বাপ। নিজের বাবা হলে তবুও বন্ধা ছিল, এ যাব বাবা সে তো কোন কথাই শুনবে না। তার ওপর আমাদের আজকের অমুঠানে বিপাত “সত্যবাদী পত্রিকার” সম্পাদক আসবেন প্রধান অতিথি হয়ে। আর এই গানটিই হচ্ছে তার উদ্বোধন-সঙ্গীত। এর ভুলে নাচগানের ছেলেমেয়েরা সব সেজে গুজে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

বিশ্বস্তর। (আশ্চর্য হয়ে) শ্রাদ্ধে নাচগান ?

প্রোঃ শীল। নাঃ, আপনি নেহাত সেকলে লোক দেখছি। একেবারে ওল্ড ফসিল, কেন জানেন না যে আজকাল সব মহাপুরুষের শ্রাদ্ধ হয় নাচে আর গানে ? যিনি যত বড় মহাপুরুষ হবেন তাঁর শ্রাদ্ধে চলবে তত বেশী নাচ। নাচের মধ্যে দিয়েই তো মুটে ওঠে তাঁদের জীবনের মাহাত্ম্য, তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের স্তম্ভ বিকাশ। এ তো মহাপুরুষদের ব্যাপার, আর আমার স্বত্তর ছিলেন একজন অবতারকল্প মহাপুরুষ। তাঁর নাম ছিল কি জানেন ? ব্রহ্মচারী ঐল্লীজগদ্বৃন্দ ভগবান ঐল্লীমহরি কৃষ্ণানন্দ অবতৃত মহারাজ। মেয়েদের নাচের মধ্যে দিয়ে না চলে এহেন ভগবানের ভগবদ্বাদীর আধ্যাত্মিক ফলবেই না একেবারে। এ সকল নাচের নাম হ’ল mataphysical dance।

বাধাচরণ। মানেজার মশাই ! আমার জ্বী বিবাবাসিনী—

প্রোঃ শীল। (সকৌতুকে) আবে, আবে, আমার জ্বী বিবাবাসিনী, তা হলে তোমার জ্বী বিবাবাসিনীর সাক্ষাৎ বোন। দেখ মিলিয়ে দেখ—বিবাবাসিনী, বাসিনী-নাশিনী। বাস Brother, তা হলে আমার জ্বীও তোমার শালী—

বাধাচরণ। (হতভব হয়ে) আজ্ঞে—সে কি ?

প্রোঃ শীল। আবে ভাই ভাই তো বলছি—এ সব ওই আধ্যাত্ম নাচের মহিমা।

বিশ্বস্তর। নাচ আবার আধ্যাত্মিক হয় নাকি ?

প্রোঃ শীল। কেন হবে না ? জানেন না সেকালে স্বয়ং দেবদেবের মহাদেব ছিলেন নটরাজ ? আর একালে, এই প্রগতির যুগে, in this modern age ভ্রম্যবের ছেলেমেয়েদের আধ্যাত্মিক নাচ শুনেই একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন ? ওয়েল দেখবেন কাল সকালের “সত্যবাদী পত্রিকা”তে আমার স্বত্তরের আধ্যাত্মিক চৈতন্যের সত্তার অপরূপ নৃত্যের প্রকাশের মহাসত্য কি রকম প্রকাশিত হয় ?

বাধাচরণ। (হতভব হয়ে অনাভিক্রমে) কি রকম হ’ল, ওর জ্বীও আমার শালী—?

বিশ্বস্তর। তা এ কি তাঁর উপদেশবাণী পড়ে—পাওয়া যাব না ?

প্রোঃ শীল। পড়? ও তার মানে আবার আপনাদের খবরে পড়ি ছাপাতে এসে? Bravo, Brother Bravo, একটা গান ছাপাতে এসে তো নাজেহাল হচ্ছি, এবার তাঁর বাণী ছাপাতে এলে একেবারে উদ্ভাস হবে ছেড়ে দিন আর কি?

বিশ্বম্ভর। তা হলে লেখাপড়ার আর প্রয়োজন নেই না কি?

প্রোঃ শীল। পড়বে? কেন পড়বে মশাই? লেখাপড়াটা কি ভগবানের অভিপ্রেত? তা যদি হ'ত তা হলে তিনি তাঁর ব্যবস্থা করে দিতেন। ছেলেরা কি বলে জানেন? বলে যে কতকগুলো লোক নিছক তাদের কারেমী স্বার্থ, মানে vested interest বজায় রাখবার জন্য এই লেখাপড়ার প্রচলন করেছে। ভগবান দিয়েছেন নাক, কান, চোখ—ধূপ ধূনা পোড়াও গন্ধ শুকব, গান গাও কান দিয়ে শুনব, নাচ চোখ ভরে দেখব। তা নয় read and learn—পড়, পড়ো জান। পড়ার যদি এতই প্রয়োজন থাকত তা হলে ভগবান নিশ্চয়ই তার জন্তে স্বতন্ত্র একটা organ মানে ঈশ্বর দিয়ে দিতেন। তা যখন তিনি দেন নি তখন আপনাদের পড়ার ভাঙতা দেওয়া ওই তুলুমবাজী আর চলবে না। বুদ্ধিমান বাঙালীর ছেলেরা সেটা ভাল করেই ধরতে পেরেছে, তাই তারা আর ও পথ মাড়ানো না। ভগবান যা দিয়েছেন তার সংরক্ষণের জন্তে তারা করে চলেছে অসুস্থ নাচ, গান, স্মৃতি আর হুজা, আর তাঁর মানসগান দিয়ে ফুটে উঠছে তাদের জীবনে পবন আনন্দময় অশ্রাব্য-কৃত্যম। আর আমরাও তাদের নগচেতে দিয়ে সেটা অবসরে এক উপায়ে দুটো পরমা রোজগার করতে পারছি।

বাধাচরণ। মানোজ্ঞার মশাই, ছ'টা বাজল, আমার এখনই যেতে হবে। আমি তা হলে চললাম—আর থাকতে পারব না হ'জ আমার শালী বিয়ে। জীর নিজের ছোট বোন—

প্রোঃ শীল। (হঠাৎ লাকিয়ে উঠে জমানারের হাত ধরে) ও দাদা, Oh brother, এবারকার মতন আমার বন্ধা কর। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার বাধা। আজ দেখি হওয়া মানে অনেক মুগনাড়া তোমার ভাগ্যে আছে। কিন্তু ভাই, আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখ।

বাধাচরণ। আপনার কথা আবার কি ভেবে দেখব? আপনার জী আমায়—

প্রোঃ শীল। শালী, সে যে আবার সাক্ষাৎ ভগবানের দৈবাৎ কোটা দেবকাজ—হঠাৎ হঠাৎ কৃপাবশে আমার গিলেই ফেলবেন। মোটাই দাদা, এ বাজা বন্ধা ক'বো। I know you are my saviour. (মানোজ্ঞার প্রতি) কৈ মশাই, উঠন আবার কি হ'ল দেখবেন চলুন। এখন দয়া করে আমাকে মেঘন থেকে উদ্ধার করে, আমার দেশ থেকে মুক্তি দিয়ে আমার দেশে প্রতিষ্ঠিত করুন। (জমানারের প্রতি) চল ভাই চল। Thank God.

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাতকড়ি। আ—আরে ব—বাধাচরণ আমি তোমার গো—গোক খোজা করছি। চ—চ—চলো সব ঠিক।

বাধাচরণ। কিন্তু, আমার শালী—

প্রোঃ শীল। নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার জী নিশ্চয়ই তোমার শালী।

(সকলের প্রস্থান এবং গোপাল ও রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। ভারতের কথা বলছিলি—তোরা ও সাধনারা কি জাত? তোরা তো বাবা গয়লা। না?

গোপাল। আরে সাধীরাও তাই।

রমেশ। তবে, (গোপালের চিবুক ধরে) আটকাচ্ছে কোথায় গোপাল?

গোপাল। (হতভাষার সুরে) বলিস নে ভাই আমার কপালের কথা, মায়া বলেন আমরা নাকি ভাগ্যগুলা আর ওরা নাকি পাত-গয়লা।

রমেশ। এ—সে আবার কি? জাতগয়লা আর পাত-গয়লা কি বাবা?

গোপাল। তার মানে আমরা জাতিতে গয়লা, ঘোষ—বড় বংশ আর তারা নাকি একেবারে পাত গয়লা—তারা গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া পালে আর তথের ব্যবসা করে, এই তাদের কাজ। এখন কি করি বল দেখি? একটু বুদ্ধি জুগিয়ে দে ভাই! সাধীকে না পেলে আমি মাইরি বাঁচব না, বাঁচব না, হঠাৎ আত্মহত্যা করব। কি করব ভাই? (তার হাত ধরল)

রমেশ। একেবারে আত্মহত্যা? মরেছে, আত্মা যাব জন্ত বাঁচবি না সেই তোর সাধীকে কি রকম দেখতে, তাই এক বার বল দিকিনি শুনি?

গোপাল। কি রকম? সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। পুকুরের ওপারে ও, আর এপারে আমি, যখন চোখোচোখি হয়—

রমেশ। আরে ম'ল যা, সুন্দর, সুন্দর, কি রকম সুন্দর, কার মতন সুন্দর তাই বল। (বাগের সুরে)

বাঁকা চোখে চোখোচোখি,

মোহা হুটি চকাচকী।

গোপাল। কার মতন? তা'লে বললে পেতায় যাবিনি ভাই, সে যেন ওই আটের সরস্বতীর মত সুন্দর।

রমেশ। কার মতন?

গোপাল। ওই যে বললাম—আজকাল ওই যে কি বলে আটের বাঁকা (বাঁকা হয়ে দেখিয়ে) সরস্বতী, ঠিক ওই রকম বাঁকা হয়ে দাড়ায় পুকুরঘাটে কাঁপে কলসী নিয়ে, ডকাৎ শুধু ওই কলসীর বলে বাঁধা। ওই সরস্বতী যখন দেখি, তখন কি যেন মনে হয়, প্রাণটা সাধীর জন্তে হ'ল করতে থাকে। ওঃ কি সে রূপ—একেবারে বাঁশঝাড় আলো করা রূপ।

রমেশ। বাঁশঝাড় আলো করা? তা'র মানে? তার রং কি খুব কর্গা।

গোপাল। কর্গা টর্গা জানি না ভাই, কিন্তু ভোবের বেলা যখন সে তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে, বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে

পুকুরঘাটে আসে তখন সমস্ত বাঁশঝাড় একেবারে আলো হয়ে ওঠে।

রমেশ। ও—বুঝছি, তার পর বাঁশঝাড় আলো করে এসে কি করে?

গোপাল। সে আর বলিসনে ভাই, আমি জানলাম বসে বসে সব দেখি, পুকুরে নেমে স্থান করে, উঠে গা মোছে, চুল কাড়ে, আর তার পরে যখন নীল শাড়ীখানা নিঙড়োতে নিঙড়োতে ঘাটের পথ দিয়ে চলে যায় তখন, ওঃ আমার বকের মধ্যে যে কি তোলাপাড় করতে থাকে তা আর তাকে কি বলব—তখন ইচ্ছে করে কবিতা লিখি, কিন্তু কবিতা লিখতে জানি না—ইচ্ছে করে গান গাই, হার তাও জানি না। ভাই, তুই গো ছড়া লিখতে, গান গাইতে জানিস, দেনা ভাই আমার ততো ছত্র শিখিয়ে—যার মধ্যে থাকবে ওই পুকুরঘাটে আসা—আর ঘাট থেকে ভিক্ত কাপড়ে যাওয়ার কথাগুলো।

রমেশ। দাঁড়া, দাঁড়া তোর বর্ণনা শুনে মনে আমার কেমন ঢেঁল মেয়ে উঠছে, শোন ভাল করে—(একটু চিন্তা করে)

(আজ) আসে গো সে ধনী, ছড়ায় লাংগী, বাঁশঝাড় আলো করে, সিনান করিয়া, অলক কাড়িয়া, আমার চিয়াটি হবে।

গোপাল। তারপর, তারপর—

রমেশ। বধু গো আমার, কভি কি আর, বজনী হইলে ভোর, “চলে নীল শাড়ী, নিঙড়ি নিঙড়ি, পরণ সতিত মোর”

গোপাল। ঠিক, ঠিক, একেবারে আমার মনের কথাটা ঠিক বলেছিস ভাই। একটু স্বর করে গা না? শিখে নি সুরটা।

রমেশ। আর মানেভারবাবু এসে পড়লে—তখন? ভূমি সামলাবে?

গোপাল। হ্যাঁ আসবেন? (বাউরের দরজা দিয়ে দেখে এসে) তিনি এখন যে পাঠ্য পড়েছেন—তার আর এখনি নিস্তার নেই। সে ভাই সে একটু শিখিয়ে—সে ভাই সে—আজ! কি কথা—যেন আমারই প্রাণের কথা—(রমেশ গান ধরল ও গোপাল তার সঙ্গে গাউতে লাগিল)

(আজ) আসে গো সে ধনী, ছড়ায় লাংগী, বাঁশঝাড় আলো করে, সিনান করিয়া, অলক কাড়িয়া, আমার চিয়াটি হবে।

বধু গো আমার, কভি কি আর, বজনী হইলে ভোর, চলে নীল শাড়ী, নিঙড়ি নিঙড়ি পরণ সতিত মোর।

(৬’জনে গাউতে লাগল, ওদিকে গানের স্বর শুনেতে পেয়ে মানেভার আপিসবরের দিকে কি হ’ল দেখতে আসছেন, রমেশ তাকে দূর থেকে আসতে দেখে পাশিয়ে গেল, কিন্তু গোপাল তখনই হয়ে চোপ বৃক্ষে গেয়েই যেতে লাগল। মানেভার আস্তে আস্তে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, সে ভাবাবেগে প্রথমটা ঠেরই পেল না, তারপরে চোপ খুলে তষ্ঠাৎ সামনে মানেভারকে দেখে বলে উঠল)

গোপাল। এ্যা—ম্যা—নে—তার মশাই?

মানেভার। আজ্ঞে হ্যাঁ—সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

এটাকি নাচগান করবার তালিমখানা হয়ে উঠল নাকি? (ধমক দিয়ে) তোমার না বেতে বলেছি? এখনও বাও নি যে বড়?

তোমায়—তোমায়—দাঁড়াও, জেটলাল?

(জেটলালের প্রবেশ)

জেটলাল। জী হুজুর।

মানেভার। (গোপালকে দেখিয়ে বাগত স্বরে) গদর্দানা পাকাড়কে ইসকো চিয়াসে নিকাল দেও।

(এমন সময় প্রেমতোষ দায় এসে একরাশ ছাপানো কাগজ মানেভারের টেবিলের উপর কেলে খুব বেগে বললেন)

প্রেমতোষ। মেনেজর মশয়, এই সব কি যা নয় তা ছাপছেন? কাইল আমার কংসন, মাননীয় মন্ত্রী আসবা। আর তাঁর সন্তাষণে এই সর্বনাশ কইরা বইসা আছেন?

(মানেভার তাড়াতাড়ি এসে বসলেন, জেটলাল ও গোপালের প্রস্থান)

বিশ্বম্ভর। কি, কি হয়েছে?

প্রেমতোষ। আর কি হ’লছে, হইছে আমার মস্তক (কাগজ দেখিয়ে) আপনাদের প্রেসেসে কি “R” কথাটার মস্তক হইছিল নাকি? Friend-এ “R” উঠাইয়া দিয়া যেকোবারে কইরা বসছেন Fiend?

বিশ্বম্ভর। তাই ত এরকম হ’ল কেন?

প্রেমতোষ। আর এরকম হইল কান? বাংলা সন্তাষণটার নামের নীচে—

বিশ্বম্ভর। (স্বগত) এতইে আবার গোপাল?

প্রেমতোষ। একি কবছেন জাচেন ত প্রমমন্ত্রীকে যেকোবারে প্রেমমন্ত্রী কইরা বসছেন?

বিশ্বম্ভর। তাইতো এ কেন হ’ল? আপনি নিজেই তো ফাউজাল প্রফ দেখে দিয়ে গিয়েছিলেন? তার, রমেশকে একবার আসতে বল।

হাবু। (নেপথ্য) আজ্ঞে এট য ট।

প্রেমতোষ। এ কি রকম কন্ড মশয়, আপনরা কি সব অজ্ঞ? যেকবার পটরাও জাচেন নাট, কি ছাপটলেন? সাপ না বাঙ—(কতকগুলি প্রফ-সাঁচ নিয়ে এসে চিবেতে চিবাতে রমেশের প্রবেশ)

বিশ্বম্ভর। রমেশ, এর ফাংসনের উৎক্রেজী সন্তাষণটা তোমার কম্পাঙ্ক করতে দিলাম আর ভূমি এই করলে?

রমেশ। আজ্ঞে উনি যা ফাউজাল প্রফ করে দিয়েছেন তাই তো ঠিক করেছি—এই তো রয়েছে ঠর নিজের চাতের কারেকশন, দেখুন।

বিশ্বম্ভর। (প্রফগুলো নিয়ে) ও মশায় আপনার কাটা কাইজাল প্রফ মত তো ঠিকই ছাপা হয়েছে?

প্রেমতোষ। কি কন্ড মশয়?

বিশ্বম্ভর। এই দেখুন ইংরেজী address-এ “x” টা

আপনিই delete করে দিয়েছেন—আর বাংলাটাও প্রেমমন্ত্রী কেটে তো প্রেমমন্ত্রী করে দেন নি।

প্রেমতোষ। কই ছানু দেখি। ( প্রফ দেখে ) এখানে “R” টা ভাঙা আছিল, সেইটারে বদলাইতে কইছিলাম, উঠাইতে কইল কাডা ?

বিশ্বম্ভর। কিন্তু আপনি যা sign দিয়েছেন তা তো delete করবার, আর বাংলাটাও কবের্শন করতে ভুলে গেছেন। আমাদের তো ছাপার গলদ কিছু হয় নি।

প্রেমতোষ। বাংলাটাতে তো ছাপতেছি ভুল রইয়া গ্যাছে। আর ( প্রফ দেখিয়ে ) এটিই কি delete করবার চিহ্ন ?

বিশ্বম্ভর। ( গম্ভীর হয়ে ) আজে চাঁ।

প্রেমতোষ। এখন উপায় কি কন ?

বিশ্বম্ভর। address হলো হাতে কবের্শন করে নিবু।

প্রেমতোষ। কন কি ? মন্ত্রী হাতে বাটব কানেন।

বিশ্বম্ভর। হাতে আর কি হয়েছে—মন্ত্রী যদি আপনাদের friend না বলে fiend বলে সচরণ করেন তা হলেও সকলে খুশী হবেন। আর মন্ত্রী মশায়ের নামের সঙ্গে—তার মানে অবল্যকান্ত মহাপাত্রের সঙ্গে প্রেমমন্ত্রী ঠিক থাপ থেয়েই তো গিয়েছে, বরফ শ্রমমন্ত্রী হলে থাপছাড়া শোনাত। হাঁকে একটি প্রেমের portfolio খুলতে বলুন না ? যে একম প্রেমের বাপার আজকাল চলছে হাতে ওটা তো একটা necessity হয়ে দাড়িয়েছে।

প্রেমতোষ। মশুড়া বংচেন, এটিই মশুড়ার সময় না। এখন কন পরিত্রাণের উপায় কি কগনু।

বিশ্বম্ভর। বললাম তো হাতে লিখে দিন, আর তা—না হলে ফের ছাপতে হবে, সে অনেক ভাঙ্গাম।

প্রেমতোষ। ভাঙ্গাম বাই হোক, আবার ছাপাইতে হইবই।

বিশ্বম্ভর। বেশ তা যদি হয়, তা হলে বাজার থেকে কাগজ এনে দিন। আর যেতেই, এটা আমাদের ভুল নয়, সেটিক্ত দ্বিতীয় বার ছাপার খরচ দিতে হবে।

প্রেমতোষ। উঃ আটছা বিপদেই পরলাম—বাটক। কাগজ লইয়া আসতে আছি। ( প্রস্থান )।

বিশ্বম্ভর। বাক্ রমেশ, এ যাত্রা রক্ষা পেলাম, খুব বাঁচিয়েছ। আর গোপালটা আমার কি ভোগানই ভোগাচ্ছে। আবার এখানে আপিসে ঢুকে নেচে নেচে গান গাইছিল। ওটাকে পাঠিয়ে দাও তো একবারে দূর করে দেব এখান থেকে।

রমেশ। তা হলে আমার মাইনেটা এবার বাড়িয়ে দিন সার—

বিশ্বম্ভর। ( গম্ভীর হয়ে ) হ্যা, তোমার মুণ দিয়ে কিসের গন্ধ বেব হছিল যেন ?

রমেশ। কৈ না তো, ( নিজের হাতের চেঁচোতে হাই ভুলে শুকে ) কৈ না, ও এলাচের গন্ধ এলাচের—( বলিতে বলিতে প্রস্থান ও ঘরোয়ান জেটলালের প্রবেশ )।

জেটলাল। আপকো উ বাবু সেলাম দিয়া।

ম্যানেজার। গোপালবাবুকো ভেজ দেও।

( জেটলালের প্রস্থান )

( গোপালের প্রবেশ ও ম্যানেজার কিছু বলবার আগেই দৌড়ে তার পা জড়িয়ে ধরে কান্দকান্দ স্বরে বলতে লাগল )

গোপাল। আমার এবারকার মত মাক ককন। এ রকম ভুল আমার আর কখনো হবে না। আমি বড় গদীব, আপনিই আমার না বাপ। আমার ক্ষমা ককন। আপনার পারে ধরে মাক চাইছি।

বিশ্বম্ভর। ( খুব দাগত ভাবে ) পা ছাড়, নীপ্গিব পা ছাড়। কেন ? মামীর আচরে গোপাল মামার দেশে গিয়ে সাধনাকে নিয়ে করে ঘুপ ভাত খাওগে। যাও এখান থেকে। এখনি যাও।

গোপাল। ( কান্দকান্দ স্বরে ) কিছুই কানে পাঁচ বার ফেল করবার পর থেকে নানা আনার মুণ দেখেন না, কথ' কন না, মামীমা আমার একটা ভালবাস বলে বাড়ী ঢুকতে পাট। দেহাট আপনাদের, চাকরি গেলে আমি না পেতে পেয়ে মরে যাব। দয়া করে আমার এবারকার মত ক্ষমা ককন।

বিশ্বম্ভর। না, না, না,—আমি কোন কথা শুনতে চাই না, যাও আর কাল থেকে এসো না, পবরদার।

( জেটলালের প্রবেশ )

জেটলাল। উ বাবু কিন সেলাম দিয়া।

বিশ্বম্ভর। আচ্ছা, চলো।

( উঠরের প্রস্থান )

গোপাল। ( মুণ্ডকী করে বলল ) ওঃ, আসবে না কাল থেকে। পাঁচশো বার আসব, হাজার বার আসব। তাড়াও না দেখি—হাজার এণ্ট্রটিক করব না ? লাগ লাগা নিয়ে আসব না ? “নচি কখাটা” আমার পরে না হয়ে আগে হয়েছে তো হয়েছে কি ? সব কথা হেঃ আছে, না নেই ? আর আমার দেশ না হয়ে আমার দেশ হয়েছে বলে ভুলকালাম লাগিয়ে নিয়েছেন। চাকরিতে জবাব। আমার দেশটা যেন বাংলাদেশই নয়। ওদের “মা-রা” যেন সব বিলেত থেকে এসেছেন। যেন ওদের আমার বাড়ী সব বিলেত, বাংলাদেশ নয়। আমার দেশও যা আমার দেশও তা, হুটোই বাংলাদেশে। তবে এত অনর্থ কেন ? ( ছাপা প্রফ দেখতে দেখতে ) আঃ কি সুন্দর লাইনই না হয়েছে—দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার আমার দেশ। স্বর্গ, স্বর্গ, স্বর্গ, সেখানে আছে আমার দেবী, আমার সাধনা। ( ছাপানো কাগজ দেখে ) বাঃ কি সুন্দর ! আমি এই লাইনটা কেটে আমার সাধীকে পাঠিয়ে দেব। নিশ্চয়ই দেব। আর ওই পাজী দেবীটা পাঠিয়েছে, একথা বাতে না ভাবতে পারে, তার জন্ত ছোট্ট করে তলার লিখে দেব আমার নাম—শ্রীগোপালগোবিন্দ গোয়েল। ভাগ্যিগ ঠাকুরদা আমাদের পদবীটা বদলে গোয়েল করে গিয়েছিল। গোয়েল যেন কোয়েল-পাখীর ভায়রাভাই। ইচ্ছে করছে আবার গান গাই।

( একথানা চিঠি নিয়ে রমেশের প্রবেশ )

রমেশ । এই নে তোর একথানা চিঠি, ম্যানেজারের টেবিলে ছিল ।

গোপাল । ( চিঠি খুলে পড়তে পড়তে ) ওরে রমেশ !

রমেশ । কি রে কি খবর ।

গোপাল । ওরে, আমার মামা হঠাৎ মারা গেছে ।

রমেশ । তাই তো রে, বড় দুঃখের কথা জানালাম দেখছি !

গোপাল । ( পড়তে পড়তে ) দুঃখ কিরে, দুঃখের কথা, মামাটা একেবারে কাঠগয়লা ছিল । তার পরে শোন, মামী আমাকে এখনি ডেকেছে তাঁর সম্পত্তি দেখতে । ওঃ কি আনন্দ !

রমেশ । যাক, তা হলে মাইরি আপনপটা গেয়ে, এই ঘানিপেশা চাকরির হাত থেকে বেঁচে গেলি বল ?

গোপাল । ( চিঠি পড়তে পড়তে ) ওরে আরো সুখের আছে, সাধীর সঙ্গে তার বাবা আমার বিষের সম্বন্ধ করে পাঠিয়েছিল, মামী তাতে রাজী হয়েছেন । সাধীর বাপও খুব অল্পের পড়েছে, তার গরু মোষ দেখবার কেউ নেই । তার সাতটা মোষ, পাঁচটা গরু, কিছু ছাগল আর ভেড়া দেয়াশুনো করে দুপের ব্যবসা আমার করতে হবে এই কড়ার করেছে । ওরে রমেশ, কি আনন্দ কি আনন্দ—আমি নাচব, না গাইব, না পাগল হয়ে যাব ? সাধীকে পেলে সাতটা মোষ কি ছার, সাতশো মোষ চরতে পারি ! বল, বল ভাই । ক কটি এখন ?

রমেশ । কি আবার করবি, এখন ম্যানেজার মশাইকে কলা দেখিয়ে গড়গড় করে বন্ধন গিয়ে সাধীকে বগলদাবা করে, ঘরঘর করে ঘর করগে য' ।

গোপাল । রমেশ ! আনন্দের চোটে আমারও কবিতার লাইন গজ গজ করে এসে গিয়েছে রে, ছাপার লাইনের সঙ্গে একে-

বাবে মিল করে, সেইটে এখানে দাঁড়িয়ে গাইব, নাচব, তার পরে যাব । ওঃ কি আনন্দ, সাধী গয়লানী, বাধাও ছিল গয়লানী, সাধী হবে বাধা, আর, আর আমি তব তার কেউ—নাচব আর গাইব—ভুইও আমার সঙ্গে হর ধর ভাই ।

ধনু আমার বিধবা মামীমা, চরাব মতিষ, ছাগল, মেঘ,

পেয়েছি গায়ের সাধীবে আমার, স্বর্গ আমার আমার দেশ ।

( হুঁজনের গান চলছে এমন সময় প্রোঃ শীল, বাগচরণ ও

সাতকড়ির ছাপানো কাগজ নিয়ে বিশ্বভারতের প্রবেশ )

বিশ্বভারত । ( সরোষে ) আবার গান, গোপাল ভূমি এখনো যাও নি ? কেটলাল—

গোপাল । যাব ম্যানেজার মশাই, নিশ্চয়ই যাব, আপনাব পায়ে ধরা কিরিয়ে নিয়ে যাব । আমার মামা মরে গেছে, এখন তার সম্পত্তি আমার । আর আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে সাধী—ওই সাধনার সঙ্গে । এটো দেখুন মামীমার চিঠি । ( চিঠি দিয়ে ) আমার বিয়েতে আপনাদের সকলের নেমন্তন্ন রইল । চিঠি দেব । কিন্তু যাবার আগে আমার আমার দেশের গানটা গাইতে হবে ( প্রোঃ শীলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ) ভাগিনা মশাই, আপনি গানটা ছাপাতে এনেছিলেন হাত তো আমার বরাতে থুলল, আপনাকে ছাড়ব না, আপনারও আমার সঙ্গে গান গেয়ে যেতে হবে । গাইবেন না ?

প্রোঃ শীল । ( সর্কাভুত্ব : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই গাভব । বল কি গান ।

( উচ্চৈশ্বরে গোপাল গাইতে লাগল ও সকলে হাহবাক হয়ে শুনে লাগল )

ধনু আমার বিধবা মামীমা, চরাব মতিষ, ছাগল, মেঘ,

## সনেট

### শ্রী আশুতোষ সাত্তাল

বলেছি তুলিব না, তবু গেছি তুলে !

আজি মধ্যাহ্নেব এট' অলস বেলায়

জীর্ণ স্মৃতিবনিকা সেপিলাম তুলে

তোমার আলোখ্য মের মধু-মধুসুদ

কীট-দষ্ট পুরাতন পট্টবস্ত্রসম

প'ড়ে আছে একপ্রান্তে দীর্ঘ নিশিদিন !

কেমনে করিব দৌত এই মচা পাপ,

এই ক্ষোভ, লাজ, দাও, তির্যক সন্তাপ !

হু হু করে কাদে প্রাণ ! বৃথা দর্প মম,

পারি নাট শুধিবারে তব প্রেমমগ্ন !

ভেবেছি তুল ক'রে—জীবন-আকাশে

ভূমি একা ববে জাগি' স্থির শুকতারি ।—

এ যে আত্ম-প্রবঞ্চনা ! আজি তব পাশে

কেমনে মাগিব ক্ষমা ? দিয়ে অশ্রুধারা

## কেদার-বন্দী দর্শনে

শ্রীঅঙ্গীমকুমার ঘোষ

২

এই মুন, বেলা বারটার সময়ে আমরা বাসে করে রওনা হলাম। বেলা দেড়টার সময় আমরা পিপুলকুঠি পৌঁছলাম। বাস থেকে যে দুগ্ধ চোখে পড়ল তাতে ত চক্ষুস্থির! কাতারে কাতারে লোক রাস্তায় শুয়ে বসে আছে। অল্প-সন্ধানে জানতে পারলাম, তারা তিন-চার দিন ধরে এই ভাবে অপেক্ষা করছে ফিরে যাবার বাসের টিকিটের জন্য। এখানে বাসের নিয়ম-কানুন সুবিশালজনক নয়। কর্তৃপক্ষের ও বিবরণ

মনের অবস্থা তখন সঙ্গীদ একে সারাদিনের পরিশ্রম, তাতে আবার দিনের আলোও নিভে গেছে! এই রাজ্যে বিনা আলোয় এগিয়ে যাব কি করে? সেই সময় সেই বিহারী দলটিই পরামর্শ দিলেন—তাদের সঙ্গে হারিকেন ও চর্চ আছে, যদি আমরা এগিয়ে যাই তবে তাঁরাও আমাদের সঙ্গে নেবেন। প্রাণে যেন বল এল। সেই রাজ্যে নবোদ্যমে পাহাড়ী পথ চলার অভিজ্ঞতায় আমরা পাঁচ জন মনের আনন্দে, গানের তালে তালে পা ফেলে নিবিড় অন্ধকারে এগিয়ে যেতে লাগলাম।



শেখগাও



গাড়েয়াল বর্মণী

যাত্রীদের প্রতি একটি নতুন রাধা উচিত। যাই হোক, আমি বুকিং আপিসে অল্পসঙ্কোচে জানলাম যে, অগ্রিম টিকিট দেওয়া হয়। ১১ তারিখে ফিরে যাব বলে আমি ও ভূপতিবাবু অগ্রিম টিকিট সংগ্রহের জন্য থেকে গেলাম; আর আমার সঙ্গীদের আগের চর্চাতে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলাম। এখানে আমাদের সঙ্গে আর দুই দল যাত্রীর আলাপ হয়—এক দল বাঙালী, তাঁরা রামপুর, উদয়পুরে থাকেন; আর এক দল বিহারী শিকারিজীয়ে। আমরা যখন টিকিট পেলাম তখন বেলা ছয়টা। তারপর নির্দিষ্ট চর্চার দিকে আমরা রওনা হলাম। সন্ধ্যা আটটায় (এখানে আটটায় সন্ধ্যা হয়) আমরা গরুড়গঙ্গায় পৌঁছলাম। গরুড়গঙ্গায় এসে যখন আমরা আমাদের সঙ্গীদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন সেই বিহারী শিকারিজীদের সঙ্গে দেখা—তাঁরা কোথাও স্থান না পেয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছেন। তাঁরাই আমাদের সংবাদ দিলেন যে, আমাদের দলের লোকেরা এখানে জায়গা না পাওয়ায় পরের চর্চাতে এগিয়ে গেছেন।

রাত প্রায় দশটার, আমরা টাঙ্গনী চর্চাতে এসে পৌঁছলাম। এখানেও অবস্থা তথৈবচ। তিলধারের স্থান নেই। কব মশাই রাস্তার ধারে বিছানা পেতে বসে তামাক খাচ্ছেন আর বিচুড়িব তদারক করছেন। আমাদের দেখেই নির্ভাবনায় সুরে বলে উঠলেন, “যাক, আপনারা এসে পৌঁছেছেন তা হলে! এবার তা হলে আসুন, জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন। কলকাতায় ফুটপাথে অনেককে রাত কাটাতে দেখেন, আজ আমরা রাস্তায় কাটাই আসুন।” ঋষাব আমাদের প্রস্তুত ছিল। আহাৰাদির পর আমরা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, সুবিস্তৃত পাহাড়ের কোলে সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ পরমাস্বীয়ের মত আমরা পাশাপাশি শুয়ে রইলাম; মনে কারও কোন বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। কখন যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম জানি না।

৮ই জুন, আমরা সদলবলে বোশীমঠ পৌঁছলাম। বোশী-



মঠ বজ্রীনারায়ণের শীতকালীন পূজাহান। শীতকালে বজ্রীনাথে যখন বরফ পড়ে, তখন বজ্রীনারায়ণের প্রতিকৃতি নিয়ে আসা হয় এই যোশীমঠে; ছাঁমাস এখানে পূজা হয়। এ ছাড়া যোশীমঠ শঙ্করাচার্যের সাধনগীঠের জন্মও বিখ্যাত। শঙ্করাচার্য এখানে একটি গাছের তলায় শিবের আরাধনা



সাধনগ দৃশ্য, চামোলী

করতেন। সাধক এই সুদূর হিমালয়ের বৃক উঁচু সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই বিরাট প্রশান্ত প্রকৃতির মাঝে তিনি পেয়েছিলেন শিবকে। এই স্থানটি বড় মনোহর, চাঁদও বিশ্রাম করলে মনের প্রসার বেড়ে যায়। যোশীমঠ থেকে ছাঁমাইল উৎসর্গ পাত হয়ে আমরা বেলা দশটা নাগাদ বিষ্ণু-প্রয়াগে পৌঁছলাম। বিষ্ণু-প্রয়াগ বিষ্ণুজ্ঞ ও অলকানন্দার মঙ্গমহল। কেদার-বজ্রীর পথে বড় প্রয়াগ পেয়েছি, বিষ্ণু-প্রয়াগের মত এত উচ্চম উত্তাল তরঙ্গময় প্রয়াগ আর চোখে পড়ে নি। কি ভয়ঙ্কর গর্জনে এই চুই নদীর জলস্রোত মিলিত হচ্ছে পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গনে। এই প্রয়াগে খুব কম লোকেই স্নান করে। সকলেই এর পবিত্র জল স্পর্শ করে চলে যায়। বিষ্ণু-প্রয়াগের প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ নয়নমুগ্ধকর। বিষ্ণুজ্ঞার উপর একটি বোলানো সেতু আছে। এই সেতুটি স্থানীয় পুন্ডিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত করা হয়, কারণ সেতুটি মাত্র দুটি তারের দড়ির উপর ভর করে আছে। আর তারই নীচে প্রচণ্ড ধরস্রোত বিষ্ণুজ্ঞ। কর্তৃপক্ষের এই সেতুটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। হাজার হাজার যাত্রীর জীবনের দায়িত্ব নির্ভর করে তাঁদের উপর।

আমরা ৯ই জুন পাণ্ডুকেশ্বর হয়ে বজ্রীনারায়ণ এসে পৌঁছলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটে নি। পাণ্ডুকেশ্বরে ভগবান বিষ্ণুর ছুটি মন্দির আছে। বজ্রীর পথে বিস্তর ভিখারী চোখে পড়ে। খজ, কাণা, কুড়ী ইত্যাদি

নানা রকমের ভিখারী দেখা যায়। এই রকম এক অতি বৃদ্ধ—সমস্ত শরীরের চর্ম লোল, শ্রবণশক্তি রহিতপ্রায়—অন্ধ ভিখারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। জানি না সে সাক্ষাতের ফল ভাল কি মন্দ, তবে তার স্ববর্ণিত কাহিনী শুনে এইটুকু মনে হয়েছিল যে, যাঁর মাহাত্ম্যে এত লোক সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে সুদূর হিমালয়ে এসে উপস্থিত হয়, সেখানেও ব্যবসাদারি! এই বৃদ্ধীর এককালে সবই ছিল—স্বামী, পুত্র, কন্যা; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে আজ তার কেউ নেই, সে একা। তারই কাছে শুনলাম যে এখানে একটি দল আছে, তারা লোক যোগাড় করে রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে যায় এবং সমস্ত দিনের গোজগারের বিনিময়ে এক বেলা খেতে দেয়।

বজ্রীনাথে আমরা ধীরেন্দ্রনাথ ভট্ট নামে এক পাণ্ডার বাড়ীতে উঠেছিলাম। বাড়ীটি বেশ ভাল জায়গায়। ভদ্রলোক আমাদের খুব আদরস্বস্ত করেছিলেন। নিজ-হাতে আমাদের খাবার এনে খাওয়াতেন এবং আমাদের কিছু কষ্ট হচ্ছে কি না খবর রাখতেন। বজ্রীনাথে একটি তপ্ত কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে স্নানের পর সাধারণতঃ লোকে ঠাণ্ডকর্ষণ যায়। আমার দীপ্তিত্রী বজ্রীনারায়ণ দর্শন করব ভেবে মন আনন্দে ভরে উঠল। যাত্রা এবার আমার পূর্ণ হবে। বড় ভূপ্তিতে বজ্রীনাথের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। মন্দিরের ভিতর ভগবান জীনাথায়ণের মূর্তি দর্শন করলাম। পবন শ্রবায় মাথা নত হয়ে এস। এই প্রস্তর-প্রতিকৃতির অন্তরালের কোন শক্তির পূজা করে আসছে মানুষ যুগ যুগ ধরে। সেই শক্তি, যাব অভিযুক্তি আছে কিন্তু রূপ নেই—ভূদেব, সাগর, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য্য সর্বত্রই ত সেই শক্তির বিকাশ। আমি ত সেই শক্তিরই সৃষ্ট জীব। আমার আত্মা সেই পরমাত্মারই ত অংশ। আমার চেতনা—এ ত তাঁরই দান। জ্ঞানের দ্বার খুলে গেল। আমি যেন আলো দেখতে পেলাম। কেদার-নাথে যা গুলিয়ে ফেলেছিলাম, বজ্রীনারায়ণে তা আমি খুঁজে পেলাম। মনে হতে লাগল, আমি যেন ধনী হলাম। মনে হ'ল আমি যেন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারছি—তিনি আছেন; সারা বিশ্ব জুড়ে যে মহাশক্তি, সেই মহাশক্তিতে তিনি বিরাজমান। বজ্রীনাথে আমরা তিন দিন ছিলাম। বজ্রী অলকানন্দার ধারেরই অবস্থিত এবং বেশ শহরের মত। এখানে মন্দিরে ও বাজারের রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো আছে। এখানকার বাজারে বাঘ, হরিণ, মৃগনাভি ও আরও হ'এক প্রকার পাহাড়ী জন্তর চামড়া, স্তন্য, শিলাজিত ইত্যাদি পাওয়া যায়।

১০ই জুন, বেলা ন'টার সময় আমরা কিছু লুচি, তরকারি

ও হালুয়া সঙ্গে নিয়ে বনুধারার দিকে রওনা হলাম। বনুধারা বজীনাথ থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে, এই স্থান থেকেই পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হন এবং উহারই অনতিদূরে দেহত্যাগ করেন। এখানে দুটি



বিকুপ্রয়াগ

জলের খার আছে, প্রায় ৪০০ ফুট উঁচু থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে অলকানন্দায় গিয়েছে। এখানকার দৃশ্য অতীব সুন্দর। এখান থেকেই বরফের পাহাড়ের আরম্ভ। আমরা যখন বরফ অতিক্রম করে বনুধারা প্রপাতের কাছে এলাম, তখন বেশ প্রার চুটো হ'বে। প্রপাতের বিপরীতে বারিগারা ও অক্ষুদন্ত শৌল্যের স্পর্শ আমাদের সমস্ত পথশ্রম যেন এক মুহূর্তে কে হরণ করে নিল। আমরা আবার যেন নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা ফিরে পেলাম। অস্তমিত সূর্যের স্নিগ্ধ আভাষ প্রপাতের জলের দারা দুটি বৌপানিস্থিত রজ্জুর মত মনে হচ্ছিল। যেখানে সমতল ভূমি, সেখানে পীত ও বসুন্ধরী রঙের সুন্দর এমন সুন্দর ভাবে সাধোনা যে মনে হয়, কে যেন স্থানোপযোগী মানানসই রং বেছে হানটিতে মনোদম গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। অনিমেষ দৃষ্টিতে আমরা কিছুক্ষণ সেদিনে তাকিয়ে রইলাম। এখানে আমরা এক মৌন সাধুর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি কৈলাস, মানসসরোবর দর্শনাকাজ্জল্য বজীনাথে অপেক্ষা করছেন। কারণ প্রতি বৎসর নৈলাসের রাস্তায় জুন মাসের শেষের দিকে যাত্রীদের যাওয়ার অল্পমতি দেওয়া হয়। আহাব ও বিশ্রামের পর আমরা বেলা তিনটার সময়ে ওখান থেকে রওনা হয়ে পাঁচটার সময় বজীনারায়ণে ফিরে এলাম। বনুধারার পথে ব্যাসগুহা নামে একটি গুহা আছে। প্রবাদ, ব্যাসদেব এই গুহার বসে বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন।

১১ই জুন সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর ১২ই জুন ভোরে আমরা

বজীনারায়ণ ত্যাগ করে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। পথের জীবনযাত্রায় কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল, বজী ছাড়তে গিয়ে একজন নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে যে ধরনের মনোবেদনা হয়, ঠিক তেমনই হয়েছিল। কিন্তু হৃদয় তৃপ্ত—আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর দর্শন মিলেছে; ক্রমে



পাণ্ডুকেশ্বর মন্দির

ক্রমে মনে হ'তে লাগল বাড়ীর কথা। একে একে পরিচিত মুখগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যত দিন আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়েছে, তত দিন আমরা কৰ্ম্মজগতের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তখন চলাই ছিল আমাদের প্রগণন কাজ। সাল, মাস, তারিখ সবই যেন বিস্মৃত হয়েছিলাম। নিজের বাড়ী, আপন প্রিয়জন, যারা আমার পথের পানে চেয়ে বসে আছে, এবার সব স্মৃতিপথে উদ্ভিত হতে লাগল। পথের কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সেদিন প্রায় কুড়ি মাইল হেঁটে বজীনাথ থেকে সিংহদ্বার পৌঁছে-ছিলাম। ঘোশীমঠ পার হয়ে সিংহদ্বার।

বিকুপ্রয়াগ পথান্ত আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নি। কিন্তু তারপর সিংহদ্বার পথান্ত দু'মাইল খাড়া চড়াই। এই রাস্তায় সেদিন আমাদের খুব কষ্ট হয়েছিল। দু'চার মিনিট হাঁটি, আবার বসে পড়ি রাস্তায়, পা যেন আর চলতে চায় না। হাতের মুক লাঠিটি যেন ইঞ্জিতে জানায়, “ভয় কি? আমি ত আছি বন্ধু।” এমনি করে যাত্রীরা “জয় বজী বিশাল কী জয়” বলে ভগবানের জয়গান করতে করতে কেউ-বা দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে উপরে উঠে, কেউ-বা কৰ্ম্ম-সমাপনান্তে নেমে আসে। সিংহদ্বার অভিমুখে নেমে আসছি, এক দল যাত্রী উঠছে “জয় বজী বিশাল কী জয়” বলে। তাকাবার অবকাশ ছিল না। নিশ্বাস নিতে বেশ

কষ্ট হচ্ছিল। তবুও কষ্ট করে প্রত্যুত্তরে জানালাম “জয় বজ্রী!” এগিয়ে আসছি, “ওমা এ কি? এ যে গোবিন্দ! কি চেহারা হয়েছে বাবা তোমার? আমরা ত চিনতেই পারি নি।” কাদের কণ্ঠস্বরে আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ



দলক'নন্দা, বিষ্ণুপ্রয়াগ

চড়ি'নি। বাসে উঠবার জন্ত মন অধীর হয়ে উঠল। যাই হোক, সেদিনকার মত আমরা একটি ঘর ভাড়া করে সেখানেই রাত্রিবারে ব্যবস্থা করলাম। পিপুলকুঠী বেশ বড় জায়গা, এখানেও বজ্রীনাথের মত সব জিনিস পাওয়া যায়। বিকাল-



‘দলক'নন্দা’ তাঁরে দেখক, বজ্রীনাথদর্শন

যে আমার সেই ট্রেনযাত্রীর দল। তাঁর আমার প্রশ্ন করেন, “ত বাবা, এ পথে কি খুব কষ্ট?” তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বললাম, “কিছু না। এই ত আপনারাও ত প্রায় এসে গেছেন, খুব কি কষ্ট হচ্ছে?” উত্তরে তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, “না বাবা! কষ্ট হয় নি, শুধু দু'জন আর পারে নি, তাই কাণ্ডি করেছে।” সামনে কাণ্ডি সোহারীকে উদ্দেশ্য করে বললাম, “কি কাণ্ডি করেছেন?” তিনি একটু ক্লান্তির হাসি টেনে বললেন, “ঠা' বাবা! এই দেখ ন', পা তটো ফুলে গোদ হয়ে গেছে। যা-ও একটু-আধটু হাঁটতে পারছিলাম, কাণ্ডিতে চড়ে সে শক্তিও গেছে। কোমরে এত ব্যথা হয়েছে যে আর যেন দাঁড়াতেই পারি না। বড় কষ্ট হয় এই কাণ্ডিতে...” কিছুক্ষণ নানা রকম গল্প চলতে থাকে। তার পর আবার বিদায়ের পালা শেষ করি। প্রথম দর্শনে আমি সত্যি এঁদের চিনতে পারি নি। বজ্রীর পথে এঁদের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। অনেকে মুণ্ডিতমস্তক, পরনে গেরুয়া বসন, কেউ-বা গেরুয়া বসনধারী—হাতে হরিনামের বোলা। এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি, আর কখনও দেখা হবে কিনা তাও জানি না। এঁরা সকলেই কোল্লগর উত্তর-পাড়ার বাসিন্দা।

১৪ই জুন, বেলা দশটার সময় সেই পরিচিত পিপুলকুঠীতে আবার এসে পৌঁছলাম। সে কি আনন্দ সেদিন হয়েছিল। আমাদের ঠাঁটাপথ শেষ হ'ল। বহুদিন পর আবার হিমালয়ের বৃকে ‘বাস’ দেখে যেন মনে হচ্ছিল, কতকাল বাসে

বেলা, আমরা সাজগোজ করে সব সজ্জা করতে বার হলাম। ঠিক যেন আমরা পার্বত্য অঞ্চলের একটি বড় শহরে হাওয়া বদল করতে এসেছি। কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের যে কি পরিশ্রম গেছে ত' আমরা যেন ভুলেই গেলাম। এখানে হ'ল একজন যাত্রীর সংস্পর্শে এসে জানতে পারলাম যে, তাঁদের যথাসর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। সাবুবেশী চোরের উপদ্রব আছে এখানে, অবশ্য তারা অসাবধানী যাত্রীদের কেবল টাকা-পয়সাই চুরি করে, মালপত্রের নজর কম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, বাসে যাত্রীদের সুবিধার জন্তই এত চুরি হয়। চোরেরা যাত্রীর পাথের হরণ করে বাসের সাহায্যে পালাবার সুযোগ নেয়। কেদার-বজ্রীর পথে আর কোথাও চুরির সংবাদ আমরা পাই নি। ১৫ই জুন নতুন উৎসাহ নিয়ে আমাদের যখন যুগ ভাঙল তখনও ভোরের আলো ফোটে নি।

আজ আমাদের ফিরে যাবার দিন! বাসের আসন আগেই সংরক্ষিত করা আছে। কতদিন পরে বাড়ী ফিরে যাব! বিছানাপত্র বাগা-ছানায় মন দিলাম এবং স্নান সেবে খিচুড়ি ভক্ত্যের পর বেলা আটটার সময়ে আমরা সদলবলে বাস ষ্ট্যান্ডের নিকট উপস্থিত হলাম। আমাদের বাস ন'টায় পিপুলকুঠী ছেড়ে যাবে। এখানে এক কক্কণ দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। আমরা যেন এক রহৎ পরিবার খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলাম। বঁারা রুমীকেশ হয়ে ফিরবেন তাঁদের বাস স্বতন্ত্র। আমি এবং কর-পরিবার কোটদ্বারযাত্রী আর

ভূপতিবাবু, শাক্তীজী, ভয়পুর পরিবার ও বিহারী শিক্ষয়িত্রীর দল স্বীকেশযাত্রী। এখানেই কুলিদের বিদায় দিওয়া হয়। আমার কুলি করবীর বয়সে খুব অল্প; এই বছরেই সে প্রথম কুলি হয়ে কেদার-বজী ঘুরে গেল। তার প্রাপ্য টাকা ও আহার দিওয়া বাকশিশ নিয়ে সে সজল চোখে বিদায় নিয়ে গেল।

তারপর “ভয় বজী বিশাল কি ভয়!” “ভয় কেদারনাথ-স্বামী কি ভয়!” বলে ন’টার সময় আমরা বাসে পিপুলকুঠী ত্যাগ করলাম। পিপুলকুঠী থেকে কোটদ্বার এক শ’ আটাল মাইল। বাসে ছ’দিন সময় লাগে। আমাদের বাস পাহাড়ের কোল বেয়ে চড়াই ও উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে বেলা একটার সময় কর্ণপ্রয়াগে এসে পৌঁছল। কিছুক্ষণ পর জানা গেল যে, আমাদের বাস বদল করতে হবে। অলসানন্দার উপর যে একটি অস্থায়ী কাঠের সেতু আছে, সেটি বর্ষায় প্রতি বছর ১৫ই জুন বেলা একটার সময়ে জলক্ষীতি-আশঙ্কায় খুলে দেওয়া হয়। আমরা



সাধারণ দৃশ্য, বজীনারায়ণ

বড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে। এই পাঁচ মিনিটের ভিত্তি অনেক দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হ’ল। যাহোক, আমরা কর্ণপ্রয়াগের ছকুম তামিল করে, গালপত্র সমেত হাঁটাপথের স্থায়ী সেতু পার হয়ে নিশ্চিষ্ট বাসে এসে বসলাম। বেলা প্রায় ছ’টার সময়ে আমাদের বাস কর্ণপ্রয়াগ ত্যাগ করল।

রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে আমরা যখন আবার সেই পরিচিত শ্রীনগরে বেলা ছ’টার সময়ে এসে পৌঁছলাম, তখন বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল। জয়ীকেশ অথবা কোটদ্বার যেতে হলে পিপুলকুঠী থেকে সবগুলো বাসকে শ্রীনগর আসতে হয়। এখানেই বাস ও যাত্রীদের বিশ্রামকেন্দ্র। পরদিন সকালে আবার বাস ছুটে চলে কোটদ্বার অভিমুখে। বেলা

দশটার সময় আমরা পৌড়ী এসে পৌঁছলাম। পৌড়ী স্থানটি বেশ সুন্দর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫,৫০০ ফুট উচ্চ। এখানকার



তৎসংবাদ, বজীনারায়ণ

মনোহর দৃশ্য দেখে মনের ক্রান্তি জুড়িয়ে দেয়। জায়গাটা অনেকটা যুসোবির মত। রাজপথ পীচের তৈরি এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানেও বেশ ঠাণ্ডা আছে। এই দেখছি স্বর্ঘ্যলোক-নিবর্তনাত শহর, আবার কোথা হতে একখণ্ড মেঘ এসে মারা শহরকে করে দিল তমসচ্ছন্ন। কখনও কখনও বা ছ’এক পশলা বাদিপাত হয়ে যায়; আবার, পরমুহূর্তেই সব পরিষ্কার। আজ মনে হয় যেন



ভাণ্ডিতে বিশ্রাম

কোন এক কুহেলিকাচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্যের ভিতর দিয়ে বিচরণ করে এসেছি। দেড় দিন বাসে আবদ্ধ থাকার পর পৌড়ী শহরে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভাল লাগছিল। এখানে অনেক হোটেল ও রেইনুয়েন্ট আছে। আমরা একটি হোটেলে কিছু জলযোগ সেয়ে নিয়ে আবার বাসে এসে বসলাম।

বাস ছুটল কোটবার অভিমুখে। কখনও ৫,০০০ ফুট, কখনও ১,০০০ ফুট চড়াই-উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে বাস যখন কোটবার পৌঁছল, তখন বেলা সাড়ে তিনটে। দু'দিন ধরে বাস ভ্রমণে শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; তার উপর সমস্ত শরীরে বাসের বাকুনিতে এত ব্যথা হয়েছিল যে, বাসের উপর বিরক্তি ধরে গেল। এমন সময় আমাদের বাস কোটবার রেলস্টেশনের সামনে এসে থামল। বিপুল গিরি হিমালয়ের দিকে তাকালাম। আনন্দে, বিস্ময়ে বিরাট পর্বতকে শেষ প্রণাম জানিয়ে আমরা কোটবার ত্যাগ



তীর্থস্থানী হল

করলাম। কোটবার থেকে নাজিবাবাদ পনর মাইল। কোটবার-নাজিবাবাদ একটি ব্রাঞ্চ লাইন। আমাদের ট্রেন যখন নাজিবাবাদে পৌঁছল, তখন বেলা ছ'টা। আমরা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিলাম, কারণ আমাদের ট্রেন ছিল রাত এগারটায়। বিশ্রামাগারে আমরা ভাল করে ধারাবাহিক সেত্রে নেবার পর মিঃ কর আমাকে নিয়ে একটা হোটেলে গেলেন। সেখানে আহারাতির পর যখন স্টেশনে ফিরে এলাম, সে এক নির্মল আনন্দ এবং সন্তোষ অনুভূতির স্পর্শ পেলাম।

ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে এস। পরম তৃপ্তিতে একটি আরাম-কেন্দ্রারায় দেহ এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে কাটাবার পর রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমরা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। দু'রে, বহু দু'রে একটি ছোট টিমটিমে আলো দৃষ্টিগোচর হ'ল। ক্রমে সেই আলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে ডুন এক্সপ্রেস রাত এগারটার সময়ে স্টেশনে প্রবেশ করল। আমি কর-পরিবার সমভিব্যাহারে ট্রেনে একটি কামরায় আসন গ্রহণ করলাম। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর ট্রেন ছাড়বার সঙ্কেত পেলাম। গাড়ী ছুলে উঠল। ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলাম।

আত্মীয়-পরিজন এখানে কে আর আছে? তবু কেমন একটা ব্যথা অনুভব করলাম। যে কঠিন মাটির উপর আমার পায়ে ছাপ পড়ে ধুলির সঙ্গে মিশে গেছে, সে মাটিও আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। সুরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলাম।

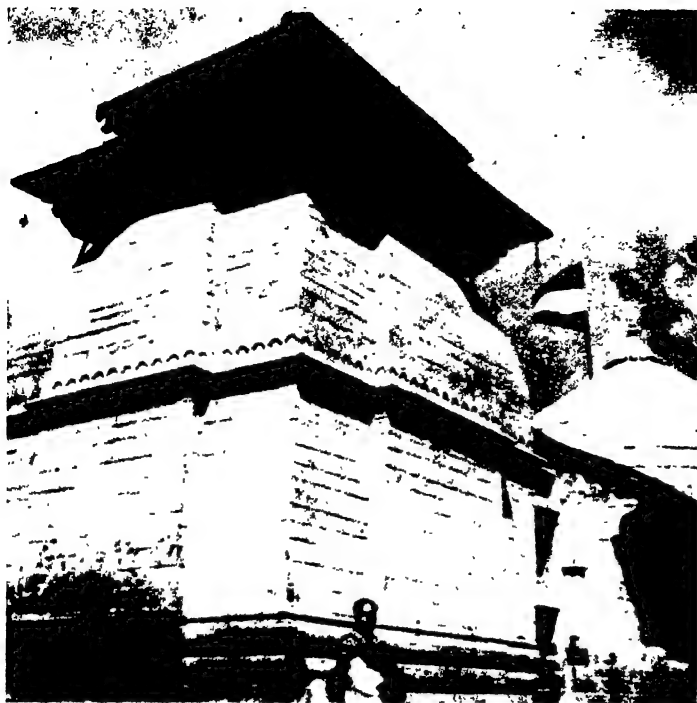
গাড়ী ছুটে লাগল, আর হৃদয়ে জাগল বিপুল আলোড়ন ...ঐ নগাদিরাজ হিমালয়! হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গের তুষারবাশি বিগলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, যার



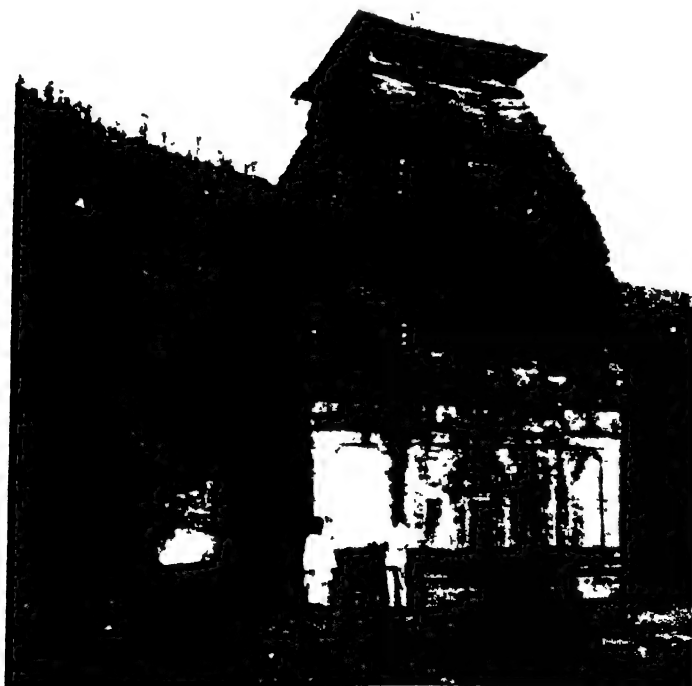
সেতু, কোটবার

বারিধারা ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমার দেশকে করেছে সুজলা, সুফলা। ঐ যে শ্যানময় শৃঙ্গটির আবির্ভাব পার্বত্য প্রকৃতির আকাশে বাতাসে—যার সুবিশাল বাক্স আশ্রয় নিলে হৃদয় হয় পবিত্র, মন হয় প্রশান্ত ও উন্নত! বিশ্বপতির অগ্রমের মহিমার ছায়া যেন হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠে। ঐ যে সৌরকরোজ্জ্বল কনক কিরণে উদ্ভাসিত হিমাদ্রি-শিখর, ঐ যে নীল চন্দ্রাতপের জ্বায় আকাশের নীচে আলো-ধৌত বনানী অপেক্ষা শ্রী ধারণ করে, কোন্ মহাশক্তির প্রভাবে? কোন্ মহাশক্তি সৃষ্টি করে মানুষ? বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরালে ঐ বিরাট মহান শক্তি তিনি কে? মনস্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠে কেন্দ্রাবিন্দুর শিলাখণ্ড, যার উপর ভগবান-জ্ঞানে, যুগ-যুগান্তরের নরনারীর শ্রদ্ধাজলি অপিত হচ্ছে, তারই আড়ালে ঐ যে জ্যোতি! ঐ যে আলো! বঙ্গোপসাগরের প্রতিকৃতির আড়ালে ঐ যে দীপ-বক্তিকার স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা! এ কি দর্শন করলাম? অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে উত্তর আসে, জ্ঞানালোক, ঐ দিব্যালোকের আলোকচ্ছটায় তোমার অজ্ঞানকে, অন্ধ-কারকে দূর কর। আমার দু'চোখ জলে ভরে আসে। অবনত মস্তকে, শল্লভচিত্তে আমি বিশ্বপিতার উদ্দেশ্যে আমার পরিতৃপ্ত হৃদয়ের প্রণতি জানাই।

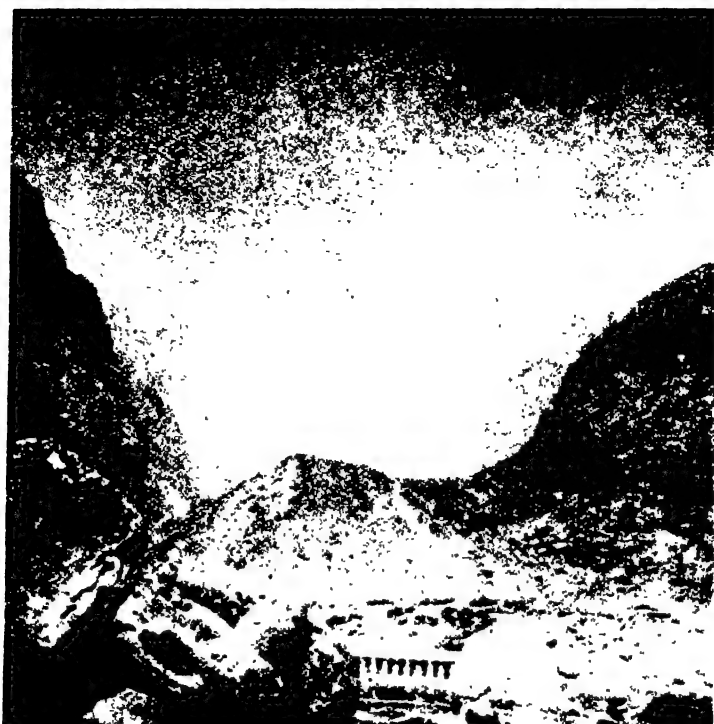
কৈদার-বজ্রী দৰ্শনে



বজ্রীনাতায়ণেৰ মন্দিৰ



গোপেশ্বৰ মন্দিৰ



বঙ্গীয় রাজ্যে এইতে নীলকণ্ঠ পাখী.ডল দৃশ্য



শঙ্করের সাধনক্ষেত্র যোগেশ্বর



# যযাতি

শ্রী ব্রজদ্বারধর ডট্টাচার্য



কথা হচ্ছিল 'সেই' নিয়ে ; অস্ত্র কারুর সঙ্গে নয়। আমার  
খীর সঙ্গে।...কিছুতেই মানবে না। অবশেষে আগাকে  
জিজ্ঞাসা করতে হ'ল, “আচ্ছা পর বিপাকে পড়েছ। একটি  
মাএ ওষুধের গুলি। পুত্র ও স্বামী উভয়েই পীড়িত। এক  
জনকে দিতে পার।...কাকে দেবে ? মনে থাকে যেন  
একজনকে বড়ি দেওয়ার মানে অস্ত্রকে গুলি করে মারা।...”

খানিকটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে,  
“ভেলেকে দেব। মা হবার আগে স্বামী বড় ; স্বামী হবার  
আগে পুরুষ বড়। কিন্তু মা হবার পর না পুরুষ, না স্বামী।  
অপু সন্তান !”

“বেশ ! আর বাপের বেলার। খী আর পুত্রের মধ্যে  
বাপ কাকে দেবে ওষুধ ?”

হাসতে লাগলেন শ্রীমতী। বললেন, “পুরুষ আবার কি  
চায় ? খী মরবে, পুত্র বাঁচবে।”

আমি বললাম, “খোলস !”

শ্রীমতী গাইলেন, “এনেক হৈয়ালিই বুঝি না তোমার।  
কিন্তু এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হ'ল। খোলসটা কি ? মানে ?”

“তোমার জবাবটার ব্যঙ্গনা মনোহর। সন্তানের বিপুল  
স্নেহের কাছে সবই পিছিয়ে যায়। সেক্ষেত্রের ক্ষুধা হার  
মানে মনের মাঝে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসার তপস্কার কাড়ে।”

চোখ বড় বড় করে গদগদ হয়ে বললেন শ্রীমতী, “হী  
গো হী...হাসছ কেন ? বিশ্বাস হয় না ?”

“না হয় না। যযাতির গল্প শোন নি ?”

শ্রীমতী বললেন, “রাখ গল্প কথা।”

“তবে শোন গত্য ঘটনা। জান সবই, মনে পড়বে সব।  
কিন্তু বাকী নাগণ্য জিজ্ঞাসা করা না।”

শ্রীমতী লেপটা টেনে নিয়ে বললেন, “একটু জায়গা ছেড়ে  
শোও। গল্প শুনতে বেশ লাগে।”

“গল্পই বলবে একে ? ‘সাহিত্যচার্য মশায়’ গল্প ? আচ্ছা  
শোন।...”

“সাহিত্যচার্য মশায়ের ছেলে বরেন্দ্রের ওস্তাদ সাহিত্যচার্য  
মশায় অনেক মেয়ে দেখছিলেন। ওদের ঘর ভাল ; তা  
ছাড়া মাছল্য আছে সংসারে। বরেন্দ্র অঙ্ক মে-এ পাস  
করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করত। সাহিত্যচার্য ত  
নিজেই প্রাচীন ও বিশিষ্ট অধ্যাপক। সুতরাং পাত্রী  
আকৃষ্টারই দেখা হচ্ছে। ওদের রং ত কাঁচা সোনার রং।  
খী আর ফল খেয়ে খেয়ে যেমন রংটি হওয়া উচিত, সেই  
তাপোবনিক রংটি ওদের সুবিখ্যাত।...মেয়ের গৌচাকে ঢিল  
পড়ল যেন।

“ঢিল পড়ল, মাছিও উড়ল ; ছল আর বৈধে না।  
সাহিত্যচার্য ত নাকাল হবার ধোঁ। নিজের বয়স হয়েছে  
পঞ্চাশ। খী মারা গেছেন বছর দুই। বাড়ীতে বরেন্দ্র  
বড় ছেলে। তার পর একটি মেয়ে শ্রামা এবং তার পর  
দুটি ছেলে। মেয়েটি বি-এ পড়ছে এবং বউ নইলে সংসার  
চালানো দায়। অথচ বরেন্দ্র বিয়ে করছে না।

“আমরা জানতাম বরেন্দ্র বিয়ে করছে না, এই পর্যন্ত।  
করছে না ত করছে না। কেন করছে না, কি বৃত্তান্ত,  
অতশত খোঁজ করি নি। শ্রামা এক দিন এসেছিল বড়-

বৌদির সঙ্গে দেখা করতে। বড়বৌদির এক বোন বিবাহ-যোগ্য...”

“তোমার আবার বড়বৌদি কে?” বিস্মিত। শ্রীমতী মিছে কথা বলে ফেললেন।

হেসে বললাম, “গল্পের গল্প শুধু গাছেই চড়ে না। তার বড়বৌদিও থাকে। সবার নাম করব না বলেই ত এসব আয়োজন। শুনে যাও।...তার কাছে কথা পাড়তেই শ্রামা বলেছিল, ‘দাদার বিয়ে হবে না বৌদি, ও হবার নয়। যথা চেষ্টা করবেন না।...বৌদির কাছে থেকে কথটা শুনে অবশি আমার ইচ্ছে হ’ল শ্রামাকে জিজ্ঞাসা করব। বরেনের মত সংস্কার নিষ্ঠুর ছেলের জীবনে আবার ‘কমপ্লেক্স’ এল কোথেকে, জানতে ইচ্ছা হ’ল; যদি পারি সাহায্য করব। আমার ত ওরা ভাইবোন সবাই মানে।

“সুযোগও হয় গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ভাল বক্তৃতা ছিল। শেষ হবার পর মিসেস দত্ত শ্রামাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। শ্রামা আমার ডেকে বলল, ‘দাদা, আপনি ত আপাততঃ হোস্টেলের দিকে যাবেন। শহরে ফিরবেন যখন আমার ডেকে মেনবেন। আমিও যাব।’

“কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহর অনেকট। পথ। মেয়েদের পক্ষে তখনকার দিনে একা একা ফেরা কেউ কল্পনাও করত না।

“আমি বললাম, ‘আচ্ছা; কিন্তু সুবিধে করতে পারলে চলই যাক। আমি ফিরলেও আমার রাত হতে পারে।’

“বোধ কবি আমার ভয়ভীতিও রাত করেছিল। মোটের উপর গাড়ির আশার পেটের দাব অবশি এসেও গাড়ী পেলাম না।

“হেসে বললাম, ‘পারবি তাটোতে?’

“জুড়নাই তাটে চললাম।

“সুতরাং সুযোগ হয় গেল।

“কথার কথাই যা প্রকাশ পেল তা অতি-সাদারণ কথা। ছনিয়ার হালচাল পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে তুচ্ছ ব্যাপার—আকৃষ্টার স্ফূর্তি।

“গল্পের বক্তা বরেন গিয়েছিল তার এক বন্ধুর দেশ, মেদিনীপুরে। সেখানে গিয়ে বন্ধুর গ্রামে এক পরিবারে তার ভাব-সাব ওয়। ভাব-সাব শেষ অবশি চরমে উঠে। পরিবারের অনিন্দ্যপ্রস্তুতি এক কিশোরীর সঙ্গে চারি চক্ষের মিলন। মেয়ের বাপ গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মেয়েটি তাই বেশ লেখাপড়া শিখেছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে। বাপের কষ্ট ও সমস্যার অনটন দুটোই বোঝে। বরেনের সঙ্গে যে ওর বিয়ে হতে পারে না, তা বিলক্ষণ জানে এবং

তবে ওর কথা ছাড়া আর সবকিছুতে বরেনের মনে মনে জানাজানি রটে গিয়েছিল যে, বরেনের সঙ্গে বিবাহকে ও বরণ করে নিতে চায়।

“পালটি ঘর; ভাল মেয়ে; সুন্দরী কেন অপূর্ব সুন্দরী। বয়সও বিবাহযোগ্য, এ বিয়ে তবে হ’ল না কেন?

“সাহিত্যচার্য ঘোরতর আপত্তি তুলেছেন—রাঢ় দেশ, পাণ্ডববর্জিত দেশ—ওখানে করণ-কারণ করবেন না। বরেন আজকালকার ছেলে। পাণ্ডববর্জিত আর করণ-কারণ ওর মনকে স্পর্শ করে নি। বাপ টাকা চায়। ছেলের মইয়ে পা দিয়ে বেয়াই ফলপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাব নিস্ত্রভ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতীর মর্যাদা থেকে একবার সামাজিক প্রতিষ্ঠার রৌপ্য-শিখরে সমামান হতে।

“বরেন একথা যতই ভাবে ততই তার মন ধরাপ হয়ে যায়। তার সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে রাজকৃত্যের মত সেই মেদিনীপুরের মেয়ে। হাসতে হাসতে ও নাকি শ্রামাকে বলেছিল, ‘মেয়েটা যে পাণ্ডববর্জিত দেশের তাতে আর সম্বন্ধ নেই, জানিস শ্রামা।’ পাণ্ডববর্জিত বলেই ওরা আজও আছে। শ্রীমান পাণ্ডববর্জিত কানি ঐ দেশের রূপলাবণ্যে। বরেন গেলেন পল আর ও দেশটাও বর্জিত থাকত না।

“পরে আমি বরেনের সঙ্গে এ আলাচন করেছিলাম। বাইরেটা ওর বরাবরই চাপা। তা ছাড়া আমার একটু সমীহও করত। অনেক প্রশ্ন করে, অনেক খোঁজখবর নিয়ে আমি কিছু কিছু জানতে পেরেছিলাম।

“চন্দন একাদশীর দিন মাঁতারকাটা, নৌকাচড়া কাশীর একটা রেওয়াজ। নৌকা নিয়ে অশীর আশ্রয় দক্ষিণে চল গেছি উজানে। ছেলেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। রামনগরের ফেরি চলাচল করছে।

“বরেনকে বললাম, ‘যা হবার হয়ে গেছে যখন তখন আর কর এবার, গোল মিটে যাক।’

“বরেন বললে, ‘যা হবার হয়েই গেছে যখন তখন আর হবার কিছু নেই। জানেনই ত আমি রোম্যান্টিক টাইপ নই। আমাদের সব ম্যাথামেটিকস—একটা প্রশ্নের একটাই উত্তর—বলি সেটা ঠাটি প্রশ্ন হয়।’

“আমি বললাম, ‘দেখ বরেন, জীবন আর ম্যাথামেটিকস যে কেন এক নয়, সে কথা তুলে আমি আমার আসল বক্তব্যটাকে বানচাল করে দিতে চাই না। ও সব ছেঁছো দার্শনিকতার মাঁধায় ভোলাবার মত প্রশস্তি আমার যত কম, ভোলাবার মত বুদ্ধিও তোমার নয়। সুতরাং আমি একেবারে চরম কথায় এসে পড়ি।’

“হেসে বরেন বললে, ‘বলুন’—  
একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া হাসি।

“আমি ভাল এবং সুন্দরী মেয়ে  
জানি। আমার জানা মেয়ে; ভাল  
মেয়ে। তোমায় তাঁরা চেনেন। মেয়েটিরও  
মত আছে। আমি নিশ্চিত জানি  
বিবাহ করলে তুমি সুখী হবে।”

“বরেন গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে,  
‘বিবাহিত সুখ যদি অল্প গোত্রে হয়  
জানি না। তবে সুখ যদি একটু  
নিরবয়ব স্বরংসম্পূর্ণ চরিতার্থতা হয়,  
আমার দ্রব বিশ্বাস বিবাহ না করেও  
আমার সুখ কিছু কম নয়।’

“বিশ্রিত হয়ে বললাম, ‘দেখি  
তোমার মন এতটা বসে গেছে আমার  
উপর?’

“মন-বসার মত বস তাকে ছিল”—বলল বরেন হাল  
হাসি হেসে, ‘কিন্তু পাণ্ডুর বক্তিত যা তা নিয়ে আমাদের মত  
আর্যগণের কি করব?’

“এতই একনিষ্ঠ যখন তোমার নিবেদন তখন বাবার  
কথা শোনার দরকার কি?”—আমি সম্বোধে বললাম। তার  
পর জোর দিয়ে বললাম, ‘বিবাহ তুমি কর; তারপর আমরা  
সব সামল দেব।’

“মান হাসি ফুটে উঠল গর মুখে। ও বলল, ‘এ হ’ল  
আদর্শের কথা। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। আমার প্রেম,  
সেও আমার। কিন্তু প্রশ্ন—আমার বাবা যতটা ‘আমার’,  
তার চেয়ে অনেক বেশী ‘আমি’ তাঁর। অর্থাৎ বিবাহ আমার  
ভবিষ্যৎ সম্ভাবিত সার্থকতা; আর আমি বাবার অতীতের  
সার্থকতা; ভবিষ্যতের অবলম্বন। এ অবলম্বন টাকাকড়ির  
অবলম্বন নয়, মনের অবলম্বন, শাস্তির অবলম্বন। আমার  
বিবাহ হবে আমার অনাস্বাদিত সুখলাভের আকাঙ্ক্ষায়;  
অথচ সে হবে আমার বাবার আস্বাদিত ও প্রতিষ্ঠিত সুখ-  
লাভে বিশ্ব। আমি ভেবে দেখলাম যে একটু সংযত আচরণ  
দিয়েই সমস্ত অশান্তি মেটানো যায়।’

“কথা শুনে গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন কবলাম,  
‘আর তোমার শাস্তি?’

“ঠাট্টার সুরে বললে, ‘শাস্তি ত মায়া!’ মায়া ত সেই  
মেয়েটির নাম।’ রহস্যচ্ছলে বললেও বেদনা ছিল এই ঠাট্টায়।  
সামলে নিয়ে বলল, ‘বাবাকে দুঃখ দিয়েও যে আমি শাস্তিতে  
থাকব এ ভরসা আমার নেই।’

“আমি কথাটা আর বাড়িতে চাই নি। মন আমার ভরে



বরেন বললে, ‘যা হবার হয়েই গেছে যখন তখন আর হবার কিছু নেই’

গিয়েছিল। আমাদের দেশটা মূলতঃ পিতৃ-ভক্ত-রামচন্দ্রের দেশ  
সেই কথাটাই মনে হ’ল।

“কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কথাটা এক দিন সাহিত্যাচার্য  
মশায়কে বলে ফেললাম। তিনি ত তলিয়ে বুঝতেই চান  
না। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে আমি বরাবর একটা অভাব  
লক্ষ্য করি, সেটা কোনও ব্যাপারকে হৃদয়ঙ্গপ ধারণা করার  
ধৈর্যের অভাব। যেসব তত্ত্বকথা দার্শনিকতার সংজ্ঞায় পড়ে,  
আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক সেই সব চুলচেরা সংজ্ঞার নির্ণয়  
করায় তাঁদের প্রশ্রয়তা খুব বেশী। মতের অনৈক্যে তাঁরা  
ভারি খুশী; কারণ অনৈক্য হলেই দ্বন্দ্ব, আর দ্বন্দ্ব হলেই  
সূত্র ও রুতি যোগে বহুক্ষণ ধরে বিদ্বৎ মুখমণ্ডলের কণ্ঠস্বর  
চলতে থাকবে। এত যে পাণ্ডিত্য, এত যে পাত্রাপাত্র,  
সংজ্ঞালিঙ্গের বিচার, সবটাই মাথায়। অন্তরের কোঠা একে-  
বারে জানের হীরায় ভরি। তাঁদের ধারণায় আর আসে না যে  
আসলে হীরাও পাথর।

“ক্লেপে গিয়ে সাহিত্যাচার্য বললেন, ‘কোনকালে ছিল  
না, কেউ কখনও করে নি বলেই আজও হবে না, আজও  
কেউ করবে না এটাকে যেমন তোমরা পূর্বপক্ষ মানতে চাও  
না, তেমনই আমিও স্বীকার করি না যে, মনের চাওয়াটাই  
জ্ঞানের বা বুদ্ধির সর-বাওয়ার পক্ষে একমাত্র যুক্তি। আমি  
উত্তরপক্ষ করব না; বলব মন যদি চায় কর; তবে মন  
চাইতেই যারা করে তাদের মনের জোর তোমার আমার  
মনের মত নয়। তেমন মনের জোর যাদের আছে তাদের  
পিতামাতা, সংসারবন্ধন কিছু নেই। তাদের থাকে শুধু  
মন। বরেনের যে তেমন জোরালো মন আমার তা বোধ হয়  
না।”

এতক্ষণে শ্রীমতী কথা কইলেন। লেপের মাঝ থেকে



সাহিত্যচর্চায় থাকা চোখে একটু হাসলেন। টিকি থেকে ফুলটা খুলে সামনের  
পুঁথিখানার উপর রাখলেন

বলে উঠলেন, “সাহিত্যিক লোক বাব! কিছু বললে না তুমি?”

“সাহিত্যিক বলছ; কিন্তু কোন গভীর যুক্তি বল ত? আমি নেহাত নাছোড়বান্দা; বিশেষতঃ পানের কথায় থাকতে আমার ভাবি কুচি। কোনমতে চোখ কান বুঁজে বলে ফেললাম, ‘যে বরেনকে আপনি এতটা উপহাসনায় বলে বোপ করছেন তার মন জোরালো বলেই সে তার পিতাকে পতন করে আত্মসম্বন্ধ হতে চাইল না।’

“এম করে বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে, ‘কি বলব? যদি বলি তার মনের জোর, তোমাদের বহুপ্রচারিত প্রথম প্রণয়ের জোরকে শিথিল করা হয়; যদি বলি প্রণয়ই জ্বরী, বললে ননের জোর যায় ভেসে, বলতে হয় আমার হাতযশ।’

“না বলে পারি নি, ‘সীতাকে রাম বনে দিয়েছিলেন প্রেমের জোর শিথিল হয়ে গিয়েছিল বলে বুঝি?’

“সাহিত্যচর্চায় থাকা চোখে একটু হাসলেন। টিকি থেকে ফুলটা খুলে সামনের পুঁথিখানার উপর রাখলেন। বললেন চাপাগলায় বাজেন ব্যাঙের ভরে, ‘আর কিছু বক্তব্য আছে তোমার? রামায়ণের ব্যাঙা শোনার মত ধৈর্য আমার নেই।’

“এর পরেও সেখানে থাকার চেয়ে একটা অজগরের মুখে ঢুকে যাওয়া বোধ হয় সহজ।

“আমি বাচ্ছিলাম। ডেকে বললেন, ‘আমার ঔরসজাত সন্তান হলে আমাকে বা আমার বাক্যকে অতিক্রম করে যাওয়া ওর সাধ্যের বাইরে।’

“দরকার ছিল না এই দস্তোক্তির। তবু বললেন তিনি, যুক্তিসঙ্গত বোধ করলেন, যতই অসঙ্গত হোক তার প্রয়োগ বা প্রকৃতি।

“এরই কিছুদিন পরে সুনলাম বরেন বিবাহী হয়ে চলে গেছে।

“জানতাম এ রকম একটা কিছু হবে। তবে প্রায় ছ’বছর কেটে গিয়েছিল; ভেবেছিলাম এতদিনে ওরা মোটামুটি একটা নিশ্চিন্তি করে নিতে পেরেছিল।

“শ্রামা আমার বারান্দা থেকে দেখতে পেয়েই চুপি চুপি নেমে এসেছিল। এসে সদর দরজা খুলে অঙ্ককারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। আমি তখন ক্লাব-ফেরতা বাড়ীমুখ। ফিরতে

ফিরতে হঠাৎ শ্রামার কথ, বরেনের কথ মনে পড়েছিল।

“ছ’মাস সাহিত্যচর্চায় বাইরে ছিলাম। এর মধ্যে দেখা করারও একটা ইচ্ছা ছিল। বরেনকে খুবই মনে করতেন। সেই বরেন গৃহত্যাগী। কোনও খোঁজবের পেলেন কিনা।

“কিন্তু শ্রামা বাদ সাধল।

“যেতেই সেই অন্ধকার দরজার একপাশে টেনে গিয়ে দুই হাতের মধ্যে আমার জড়িয়ে কান কানে বললে, ‘ভতরে ঢুকবেন না; এইখানেই দাঁড়ান। পায়ে পড়ছি আপনার। একটু দাঁড়ান। আসছি। শব্দ করবেন না।’

“নিঃশব্দে সেই অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুৎলাম শ্রামা খুব কাঁদছে।

“একটু পরে ও ফিরে এল। ওর হাতে একটা স্টকেস।

“বাড়ীর বাইরে এসে চুপি চুপি দরজা বন্ধ করে দিল ও।

“লক্ষ্য করি নি বাইরেই একখানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল।

“গাড়ীর ভেতরে অনিল রায় বসে। অনিল রায় কাশীর কায়স্থ জমিদার বিপিন রায়ের ভাইপো। বমায় কাঠের ব্যবসা করে। ও যে সেদিনই বমায় যাচ্ছে সে খবর আমি জানতাম।

“আমি যেন কি বুৎলাম। হঠাৎ শ্রামার হাত ধরে বললাম, ‘তোকে এমন করে আমি যেতে দেব না শ্রামা।’

“গাড়ীর ভেতর স্টকেসটা রেখে শ্রামা বলল, ‘আপনি

বারণ করলে আমি যাব না, কথা দিলাম; তবে আমার কথাগুলো শুধুন।

“গভীর হয়ে বললাম, ‘বল কথা, শুনি।’

“শ্যামা বলল, ‘গাড়ীতে উঠুন, বলতি।’

“যা বলবার শ্যামা বলল। আমি পাথরের মত চুপ করে শুনছিলাম। গাড়ী তখন রাজপুটের পুল পার হাচ্ছে। গভীর বাতাস মনকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে। আমার চুল ধোলা নয়, তবু ভেঁড়-পড়া অবাধাপনার জাঁকগাড়া উড়ে মুখে লাগছে।

“আমি বললাম, ‘বিশ্বাস করতে যে পারছি না শ্যামা।’

“কাঁদাত কাঁদাতে শ্যামা বলল, ‘আমি চকলাম।’ দু দ ত গেলেন। আপনাতঃ বহুদিন বহুদিন বার, সমাজ, হিন্দু ধর্ম আর নীতিতত্ত্ব। বাড়া যাবেন; গিয়ে এসে দেখবেন। যদি মিথ্যা হয় বলা বলা ক্ষমা করেন না; করেন শ্যামা কুলটা, শ্যামা নষ্ট মেয়ে।’

“মাপসত্যের গাড়ী ছইসুখ দিল। শ্যামা বলল, ‘আশীর্বাদ করলেন না আমায়?’

“কলেজিাম আশীর্বাদ ভাণী খুশী হয়েছিল। হৃদে এত প্রতিবাদ চান না। ‘ওর সুখী ও বই।’

আর সব করতে পারতিন না শ্রীমতী, শুধু কি কথা-বল।

তোমার? কি খাবার গল্প তোমার? শ্যামা কি বলল তোমায় যে তোমার এত খুশী?”

আমি বললাম, “পারবে বিশ্বাস করতে ভূমি?”

“কি কথা এমন?” শ্রীমতী শুধালেন।

“বড় সঙ্কোচ হয়। সমস্ত মনুষ্যত্বের অপমান, পৌরুষের অপমান। সাহিত্যচর্চা শিব্যবাড়ী গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন। সঙ্গে নবপরিণীতা স্ত্রী। স্ত্রী আর কেউ নয়—সেই মায়া—বরেনের মায়া।”

এবার শ্রীমতী উঠে বসলেন, “বল কি? সত্যি? কিছু বল নি তোমরা? সমাজ কিছু বলে নি? সে কি?” বিস্ময়ের, ক্ষোভের অবশিষ্ট ছিল না সেই কণ্ঠস্বরে।

এক দিন আমি গিয়ে জিজ্ঞাস করেছিলাম, “এ কাজ আপনি করে কি করে?”

“সাহিত্যচর্চা উদ্যোগ কণ্ঠ উত্তর করেছিলেন, ‘ওপরের আকাশকে জিজ্ঞাসা কর, অনেক দেবতাকে জিজ্ঞাসা কর, আর পার ত জিজ্ঞাসা কর রাজ্য’ ব্যাপ্তিক। কিন্তু বিবাহ থাকে কেবলি সে নারী নয়, স্ত্রী নয়, হিমশিরিশিখরে সঞ্চিত সুখান্তপ্রায়ী ভূমারূপ।’

শ্রীমতী লেপট টেন নিয়ে আমায় একবারে দারুণ জড়িয়ে ধরলেন।

## প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন

### অদ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাচীন সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসের সম্যক আলোচনা প্রাচ্যবিদ্যাশোচনা নামে পরিচিত। ব্যাপকভাবে এই বিজ্ঞান অল্পশীলনের ব্যবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন শিক্ষাকেন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও শতাব্দিক বৎসর যাবৎ এই বিজ্ঞান আংশিক আলোচনার প্রবর্তন হইয়াছে। আমরা মুখ্যতঃ ভারতীয় ও ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বিদেশেই আলোচনা করিতেছি—সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত সাহিত্য ছাড়া আরবী ফারসী চীনা তিব্বতী সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের যে যে অংশে গভীর যোগ বিদ্যাজে বিশেষ করিয়া সেই সেই অংশের আলোচনা আমাদের কাছে আদৃত। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই আলোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন—বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে তাঁহাদের আলোচনার ফল প্রকাশিত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন সম্মেলনের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা অভাব-

অভিযোগের কথা কিছু কিছু প্রচারিত হইতেছে। এই সব সম্মেলনের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন প্রাচীনতম। ১৯১৯ সনে পুণা শহরে ইহার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তদবধি প্রতি দুই বৎসর অন্তর প্রায় নিয়মিত ভাবেই বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দের অধিনায়কতায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে এইরূপ অধিবেশনের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। বেদ, দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্য, পালি, প্রাকৃত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখার অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় বিস্তৃত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকগণ এই সমস্ত শাখায় তাঁহাদের গবেষণার ফল প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত করেন। মূল ও শাখা-সভাপতিগণ তাঁহাদের অভিভাষণে দেশে-বিদেশে পরিচালিত গবেষণা এবং প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকার পরিচয় ও বিবরণ প্রদান করেন—নূতন নূতন আলোচ্য বিষয়ের দিকে পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছুঃখের বিষয়, এই সম্মেলনের কথা সাধারণের

নিকট তেমন পরিচিত নয়—ইহার কার্যকলাপ প্রচারের তেমন সুব্যবস্থা নাই।

সম্প্রতি আমেদাবাদে সম্মেলনের সম্ভবদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীমূর্তী-কুমার চট্টোপাধ্যায়। দেশবিদেশের বহু পণ্ডিত এই উপলক্ষ্যে এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে ভাল মন্দ প্রায় সাড়ে তিন শত প্রবন্ধ আমদানী হইয়াছিল—ইহাদের সংক্ষিপ্তসার-সংবলিত একখানি সুযুক্ত পুস্তক সভার প্রারম্ভেই সভাদের দেওয়া হইয়াছিল। তিন দিন বাপী অধিবেশনের নানা কাজের মধ্যে এতগুলি প্রবন্ধ পড়িবার ও আলোচন করিবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তাই এ জাতীয় অধিবেশনে এই মুখ্য কাজটিকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া লওয়া হয়। সাধারণতঃ প্রবন্ধ পাঠে ইচ্ছুক কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় না মতঃ তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ ও বখাষণা আলোচনা সম্ভবপর হয় না। তাহা ছাড়া, শ্রোতাদেরও অনেক সময় বিশেষ কোন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না—অনেক ক্ষেত্রে শ্রোতার অভাব ও উদাসীন্য অতিবড় উৎসাহী পাঠকও হতাশ করিয়া থাকে। সমস্ত বাপার মিলিয়া কোন একমুখে একটা নিয়ম রক্ষামাত্র হয়। অধিবেশনের মুখ্য অঙ্গ এই ছরবছার প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করা খুবই দরকার।

আসলে এই জাতীয় সম্মেলনের মার্ককতা প্রবন্ধ পাঠের উপর নির্ভর করে না। ইহার সামাজিক দিকটাই ইহার প্রধান দিক ও স্বার্থ লক্ষ্য বলিয়া মান হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান সাধনায় যাহারা একই পথেব পথিক—জীবনে যাহারা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয়ের ও আলাপ-ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্মেলনের একটা মস্ত বড় কাজ। শুধু ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গ হয়, এই দূরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কার্যের সহিতও পরিচয় ঘটিয়া থাকে।

আলোচ্য সম্মেলনের আহ্বানকর্তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী বর্ষের প্রাচীন গবেষণাকেন্দ্র গুজরাট বিদ্যাসভা সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে সাহিত্য প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিল তাহাতে প্রদর্শিত গুজরাটের প্রাচীন পুথি-সম্পদের বিচিত্র নিদর্শনসমূহ নুনি ত্রীপুণ্যবিজয়জীর অভিভাষণের সহযোগিতায় দর্শকদের নিকট গুজরাটের জ্ঞানভাণ্ডারের আংশিক পরিচয় উদ্ঘাটিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সম্মেলনে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গেল গুজরাট বিদ্যাসভা এমন একটি কার্যে ইন্তক্কেপ করিয়াছে যাহা সংস্কৃতভাষা ব্যক্তিমাঝেরই সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পুণ্ডরীকভাণ্ডার ইনষ্টিটিউট বেক্সপ মহাভারতের সংস্করণ প্রকাশ করিতেছে—বরোদার গুরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট বেক্সপ

রামায়ণের সংস্করণ প্রকাশের কাজ আরম্ভ করিয়াছে গুজরাট বিদ্যাসভাও সেইরূপ ভাগবতের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছে।

গুজরাট বিদ্যাসভার মত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমেদাবাদের কয়েকটি স্বল্পপরিচিত সংস্কৃতিকেন্দ্রের পরিচয় লাভের সৌভাগ্যও এই অবসরে পাওয়া গেল। ইহাদের মধ্যে সন্ন্যাসপ্রণে আমাদের কয়েকজনের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সবমতী তাঁরে এই আশ্রম অবস্থিত। আশ্রমের মন্দিরে নিষমিত পূজাপাঠের অনুষ্ঠান হয়। মন্দির-সংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণ প্রতিদিন অপরাহ্ন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামীজী শাস্ত্র বাখা করেন—এই বাখা শুনিবার জন্য বহু লোক-সমাগম হইয় থাকে। মন্দিরপাশ্বর্ষ স্থিতল গৃহে আশ্রম-পরিচালিত কনিষ্ঠ বিদ্যালয় সংযুক্ত মহাবিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের অন্তর্বাসীদের তাহার বাসস্থানের ব্যবস্থা আশ্রম হইতেই করা হয়। ছাত্রগণকে কতকগুলি বিনিময় মনিয়া চলিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক—প্রতিদিন ভোর পাঁচটার উঠিয়া সমবেত ভাবে মহিমাঃ স্তোত্র পাঠের ব্যবস্থা। বোম্বাইয়া উপকণ্ঠে ভিলে পলেতে অবস্থিত সন্ন্যাসপ্রণে পরিচালিত কাশী বিশ্বেশ্বর আশ্রমিক সংযুক্ত মহাবিদ্যালয়টিও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। এখানকার মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত বিবিধ মূল্যবান শাস্ত্রবচন দর্শকমণ্ডলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মথুরার বিদ্যালয় মন্দিরে এইরূপ শাস্ত্রবচন ছাড়া সমস্ত গীতা গ্রন্থ উৎকর্ষণ দিরাছে। আমেদাবাদের গীতামন্দিরেও দেওয়ালে অঙ্কিত গীতা ও ত্রীকৃষ্ণের জীবনালেক্ষা বিশিষ্ট দর্শনীয় দৃশ্য। গীতামন্দির কর্তৃক গীতা বহুল প্রচারের চেষ্টা প্রলম্বযোগ্য। মন্দিরের অঙ্গণ স্বামীজী নানা দেশ ঘুরিয়াছেন। গ্রীসানগণ কর্তৃক বাইবেল সংরক্ষণের অনুরোধে তিনি সোনারূপার পত্নী তৈয়ার করিয়া তাহার উপর গীতা উৎকর্ষণ করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন।

দর্ম ব. শাস্ত্র প্রচার প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের উদ্দেশ্য না হইলেও প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচারে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান ইহার অত্যন্ত লক্ষ্য মন্দির নাই। সেই হিসাবে এই সব প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজনও উল্লেখযোগ্য। গীতা-মন্দির হইতে গীতা ব্যতীত মাসুলবাদ বৃদ্ধারণ্যক উপনিষদ ও মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই সন্ন্যাসপ্রণের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ বেদের অংশ বিশেষের অষ্টমতপরাখ্যা ও নৈতিক এবং ব্যবহারিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া ঋগ্বেদোপনিষদতক, শুক্লযজুর্বেদোপনিষদতক ও অথর্ববেদোপনিষদতক নামে তিনখানি

উপায়ে এষ প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে, শাস্ত্রাঙ্গীচনার প্রাচীন পদ্ধতিকে সম্মেলন হইতে তেমন আমল দেওয়া হয় না। সত্য বটে, প্রাচীন দরবের কোন কোন পণ্ডিত সম্মেলনে মাঝে মাঝে সংস্কৃত লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন। তবে সম্মেলনে তাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন না। বারভাঙ্গার অধিবেশনে যেরূপ পণ্ডিত-সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল তদনুরূপ ব্যবস্থা সর্বত্র এখন। পণ্ডিত সমাজে একজ্ঞ একটা ক্ষোভের ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমোদবাদের উহা লক্ষ্য করিয়াছিল। এইজন্যই আমোদবাদের পণ্ডিতমণ্ডলী সম্মেলনের সময়েই সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চা প্রয়োজনীয়ত প্রতাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। রক্ত ও ভূতপাতি সংস্কৃত পদ্যদ্বয় প্রয়োজনীয়তা সঙ্গীতসম্মেলন প্রদর্শন এই সভার অনুষ্ঠান হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ছাত্রজগৎ মণিলাল সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর জীউমেশ মিশ্র। সম্মেলনের অনেক সদস্যও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার কাগাবলী মুখ্যতঃ সংস্কৃত ভাষায়ই পরিচালিত হইয়াছিল। দুই এক জন বৈয়াক্যিক লোকের সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃত এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতঃ বাংলায় বাহিরে সংস্কৃত ভাষায় আলাপ আলোচনার চলন কিছু বেশি বলিয়াই মনে হয়। সংস্কৃত পণ্ডিত ছাড়া সাধারণ শিক্ষিত লোকও কেহ কেহ মোটামুটি ভাবে সংস্কৃত হইবার কথা বলিতে পারেন—এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় বাহিরে চলত নয়। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অবাঙালীদের কাহাকে কাহাকেও সভায় সংস্কৃত বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। বাংলাদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

তবে অনভ্যাসই মুখ্যতঃ এই দ্রব্যের জন্ত দায়ী—বাঙালী সংস্কৃতে একেবারে অজ্ঞ নয়। একটু চেষ্টা করিলেই সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীও সংস্কৃত বলিতে ও বুঝিতে পারে। পঞ্চদশশতাব্দী এই বিষয়ে কিছু কিছু অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকিলে তাহা আনন্দজনক ও মঙ্গলকর হইতে পারে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেও বাঙালীর এ বিষয়ে কিছু অভ্যাস ছিল—পূর্ববঙ্গে পণ্ডিত-সমাজে বিবাহসভায় অনেক স্থলে বর ও কস্তাপক্ষে সংস্কৃত আলাপ হইত—যুবকরা এই উদ্দেশ্যেও আগ্রহ করিয়া সংস্কৃত বলিতে শিখিত। অবশ্য, বাঙালীর উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতভাষা বাঙালীকে অবাঙালীর নিকট দুর্বোধ্য করিয়া তুলে। সুপের বিষয়, আধুনিক প্রথাধা শিক্ষিত

বাঙালী ক্রমশঃ এই বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিতেছে। এখনও বিভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত উচ্চারণের যে বৈচিত্র্য আছে তাহা যথাসম্ভব রহিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এ বিষয়ে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

শুধু উচ্চারণ নয়, সংস্কৃত ভাষার লিপি ও পঠন-পাঠন-পদ্ধতির মধ্যেও যথাসম্ভব সাম্য স্থাপনের ব্যবস্থা অতি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। একই সংস্কৃতভাষার গ্রন্থ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপিতে লিখিত ও মুদ্রিত হওয়ার সর্বত্র প্রচারের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পঠন-পাঠন-পদ্ধতি ও পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থার মধ্যেও এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের যোগাযোগ না থাকায় নানা জটিলতার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রতিকার করা দরকার। এ বিষয়ে প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ভারতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার মূল ভিত্তি সংস্কৃত ভাষা—ইহার অনুশীলন বাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত হইতে পারে সেজন্য প্রাচ্যবিদ্যানুদগী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই যত্ববান হওয়া উচিত। বর্তমান ব্যবস্থার ব্যাপক পর্যালোচনা ও তাহার ক্রটিবিচুতি দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ সম্মেলনের পক্ষ হইতে করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ সাড়ধরে সাময়িক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াই সম্মেলন কর্তৃপক্ষের কৃতকৃত্য হইল চলিবে না—প্রাচ্যবিদ্যাব্যাপক ইতিকর বিবিধ কাম সম্মেলনের পক্ষ হইতে বাহাতে সম্পাদিত হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেশে বিদেশে এ জাতীয় নানা সম্মেলন নানারূপ কাজের ভাব লইয়া থাকে। সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপার ছাড়া করিবার মত আরও অনেক কাজ আছে। প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কাছের পূর্ণ পরিচরাস্রক বিবরণ সঙ্গত—নানা স্থানে প্রচারিত বিক্ষিপ্ত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকার সংবিবরণ-সূচী প্রকাশ, প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনরতী জ্ঞানসাধকগণের পরিচয় ও কৃত কার্যের বিবরণ প্রচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সম্মেলনকে উদ্যোগী হইতে হইবে। দেশীয় বাহ, সম্মেলন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। আশা করি, দুই বৎসর পরে অন্নমল্লাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ও বিশিষ্ট মনীষী ত্রীপুর্ণপল্লী প্রাধিকার মহোদয়ের অধিনায়কতায় চিদম্বরমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আগামী অধিবেশনে তাঁহাদের আলোচনার ফলাফল প্রকাশিত হইবে এবং এক্ষণে কোন বিষয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হইবে।



# নবাবী ও দেওয়ানী আমলে রাজস্ব

শ্রীমামিনীমোহন ঘোষ

অশেষ সমৃদ্ধিশালী এই বাংলাদেশে সেকালে কোন পণ্যক্রবোর আমদানী করা দরকার হইত না। এগুনকার মত পণ্যাবিনিময় প্রথাও (barter) ছিল না। কৃষিজাত ও শিল্পজাত বস্তুসমূহের বিনিময়ে প্রভূত অর্থ বাংলায় আসিত। বাংলাই ছিল মুঘল বাদশাহদের সাম্রাজ্যের স্বর্গ। রাজস্বই তাঁহাদের আয়ের একটা প্রধান অংশ ছিল। বহুকাল পূর্বে উৎপন্ন শস্যের অংশ রাজস্ব বাবদ দেওয়ার প্রচলন থাকিলেও অনেককাল হইতেই তাহার বিনিময়ে মুদ্রা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য জমিদারদের পাওনা বাবদ শস্য দেওয়ার প্রথা এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে, যেমন—উত্তর ময়মনসিংহের 'টঙ্ক' খাজনা। এখানে এক ষ্ট্রিন শব্দ বা 'তুনপা' শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহার আলোচনা আবাস্তব, তবে টাকার পরিবর্তে যে শস্য দেওয়া হয় তাহাই এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। বাকুড়া জেলার সাজা পাওনাও অনুরূপ। এই প্রথা জমিদারসমূহের মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত। তাহারা এখনও বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করে। বাংলার রাজস্ব-প্রথা বিবৃত করিতে গেলে বহু অবাস্তব কথা আসিয়া পড়ে। তোতরমল যে খাজনা ধরি কবেন তাহা 'দামে' ধার্য্য হয়। ৪০ দামে এক টাকা।

পাঠান আমলে অক্ষপান জায়গীরদারগণ দেশব্যপ্ত ভায় লইয়া সাধারণতঃ সীমান্ত অঞ্চলে কেলা তুলিয়া অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। স্থলতানের ক্ষমতা ও প্রতাপের উপর অনুপাতের এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্ভর করিত। মুঘল আমলে বাংলার ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—নিজামত ও জুজুরী। সুবেদারের নজর, শাসন ও শাস্তিরক্ষার জন্য যেসব কক্ষচারী নিযুক্ত ছিল তাহাদের যেতন নির্দিষ্টে নিজামত ভূমির প্রকৃষ্ণ নিয়োজিত ছিল। ইহার অধিকাংশ জায়গীর স্বরূপ কক্ষচারীরা দখল করিতেন, ইহার রাজস্বের সঙ্গে দেওয়ানের বা ইহার পালসা বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না। কক্ষচারীদেরও কোন স্বায়ী স্বত্ব ছিল না, পদাধিকার বলে ইংারা দখল করিতেন। জুজুরী শব্দের অর্থ কতকটা তিক্ত মাছোড়ী। জুজুরী শব্দের এখন যত্রতত্র ব্যবহার। জুজুরী ভূমির রাজস্বের কতক অংশ পালসা ও কতক অংশ মনসবদারদের জায়গীর ছিল। পালসা ভূমির রাজস্ব দেওয়ানকে আদায় করিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট পাঠাতে হইত। দেওয়ান যেমন রাজস্ব আদায়ের জন্য তাগিদ দিতেন, তেমনি জায়গীরদারও ইহার প্রাপ্যের জন্য তাগিদ দিতেন। ঢাকার রাজধানী থাকতে নিকটবর্তী অঞ্চলে নিজামতের কক্ষচারীদের জায়গীর দেওয়া হইত। কোন কোন স্থলে জায়গীরদারগণ নিজেরাই ইংাদের জায়গীরের পাওনা আদায় করিতেন, আবার অনেক ক্ষেত্রেই জায়গীরের বাবদ নির্দিষ্ট টাকা পরগণার রাজস্ব হইতে বরাদ্দ দেওয়া ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাতিলান্দ পরগণার কথা উল্লেখ করা যায়।

আবার, নিজামত ভূমির আর হইতে সুবেদারের বায়, নিজামের বায় শাসন-সংরক্ষণ ও দেশরক্ষার বায় অকুলান হওয়াতে জুজুরী বা দেওয়ানী ভূমির আর হইতে কতক অংশ জায়গীর বাবদ দেওয়া হইত। দেওয়ানী ভূমির আয়ের কিয়দংশ জায়গীর বাবদ দিয়া যে অংশ অবশিষ্ট থাকিত তাহাই পালসার নিট আয়রূপে ধরা হইত। এইরূপ জায়গীর পূর্ববাংলার সীমান্ত অঞ্চলেই বেশী ছিল, কারণ সেখানে মগদের অত্যাচারের ভয় নাওয়াবা বাতিনী রাখিতে হইত। সাধারণতঃ নাওয়ারা বাতিনী ঢাকায় বেশীর ভাগ থাকিত মগ ও পর্তুগীশদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। মুর্শিদকুলী, জাফর খান আমলে ৭০৮খানা রণতরী ও নৌকা ছিল। ইংাতে দেওয়ান নৌসেনা বাতীশ কামান দাগিবার জন্য গোলন্দাজ ৯২৩ জন ফিল্ডে ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে ৪০০ চটগ্রাম কোম্পানীর হস্তগত হয়, তখনও এই সব গোলন্দাজ (ইন্ট্যান নামে অভিহিত) ছিল। জাফর খান সময়ে ইংার জগু আট লক্ষ তের হাজার টাকা ব্যয় হইত। জাফর খান পূর্বে এইরূপ ব্যয় সরকার হইতে না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জমিদারদের উপর নাওয়ারা বাতিনী লইয়া মগদের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ছিল। ইংারার বাতিনীর মাঝি-মাঠ, সৈকত রাখিতেন। এই জগু পূর্ববাংলার দশ কোশা, নয় কোশা (ময়মনসিংহ জেলা), সাতর কোশা, চৌদ্দ কোশা, আট কোশা (ত্রিপুরা জেলা) ইত্যাদি জমিদারীর নাম এখনও পুরাতন কাগজপত্রে দেখা যায়। কোশা এক প্রকার রণতরী। বহু প্রকার রণতরীর প্রচলন ছিল, যথা—মহালগিবি, কোশা, বজরা, মদুরপখী, পালোয়ার ইত্যাদি। ইংারা এ বিষয়ে জানিতে চান, ইংারা বাতাবিস্থান-ই-বারবা গ্রন্থ প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য যে নৌবাতিনী লইয়া মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেট সন্ধে বাতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা দেখিলেন। পরে জমিদারগণ নৌবাতিনী না রেখাইয়া রাজস্ব দিতেন। রাজস্বের কতক অংশ জায়গীর বলিয়া নিজামত প্রকৃষ্ণ হইত। মগদের আক্রমণ কেবল পূর্ববাংলার সীমান্ত ছিল না, দক্ষিণ বাংলার যে অংশ সুরক্ষাবনে পরিণত হইয়াছে, তাহাও মগদের অত্যাচারের ফলে। ইংারের পালের মাংগে উল্লিখিত আছে।

মগদের অত্যাচারের একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। সম্রাটের ভূখণ্ডের রাজকুমারকে তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং পর্তুগীজ পার্সীর নিকট বিক্রয় করে। পরে পার্সী এই রাজকুমারকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন এবং ডন আন্তোনিয় ডি বোজারিও নামকরণ করেন। এই আন্তোনিয় বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লেখেন। মগদের অত্যাচার নিবারণের জন্য স্বাধীন স্থলতান হোসেন শাহ এখন যেখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন সেখানে এক কেলা নির্মাণ করিয়া

একটি থানা স্থাপন করেন। ইহাও পরবর্তীকালে মগকেন্দ্র বা থানা-কেন্দ্র নামে পরিচিত হয়। ইহার গোলন্দাজগণ সৈন্য। তাহারায়শা পরগণায় বহু জমি ভোগ করিত। বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্ত এই সব ভূমি গৃহীত হইলে তাহাদিগকে জামপুর থানায় অধীনে জমি দেওয়া হয়। এই মগকেন্দ্রের অপর পায়ে ছিল মাটির কেন্দ্র বা মেটিয়াবুরুজ। ইংরেজেরা মগদের নৌকা চৌকাইবার জন্ত এই পারের কেন্দ্রের মধ্যে লোহার শিকল বাঁধিয়া দেয়।

এইরূপে দেখা যায়, শাসন, দেশরক্ষা, নাজিমের ব্যয় ইত্যাদি বাবদ বহু রাজস্ব ব্যয় হইত। সীমান্তবর্তী পরগণা-সমূহের, যথা—আসামের বিজনী, বিদগাঁও, রাজমাটি, করইবাড়ী ইত্যাদির জমিদারদের নিকট হইতে রাজস্ব বাবদ হাতী আদায় হইত। এই সব পরগণায় জমিদারগণ এবং সুসঙ্গের মহারাজা অনেকটা অর্ধ-স্বাধীন ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে করইবাড়ীর জমিদার গারোদের কয়েকটি গ্রাম পোড়াইয়া দিলে ময়মনসিংহ সেবপুরের জমিদার গারোদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া করইবাড়ীর জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; এই লড়াইয়ে উভয় জমিদার অশ্রুশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। জমিদারদের ব্যবহৃত অস্ত্রাদি এখনও তাঁহাদের বাড়ীতে দেখা যায়। করইবাড়ীর জমিদার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গারো পাঠাড়ে আশ্রয় নেন। এই সংঘর্ষের মূলও রাজস্ব। যেসব গারো পাঠাড়ের পাদদেশের চাটে আসিয়া তুলা, কস্তুরী ও অন্তরু-চন্দন-কাঠের বিনিময়ে লবণ ও কুকুর লইত তাহাদের নিকট হইতে জমিদারগণ কর আদায় করিতেন। করইবাড়ীর জমিদার গারোদের চাটে আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজা হাতী ধরিয়া নবাবের নিকট উপচৌকন-স্বরূপ পাঠাইতেন, তবে তাঁহার জমিদারী চাকসা রোসনাবাদের রাজস্ব হইতে বার্ষিক তের হাজার টাকা হাতী ধরায় শেদা-পরচ বাবদ বাদ পাইতেন। সুসঙ্গের দাভায়া রাজস্ব বাতীত অন্তরু, চন্দন, কস্তুরী ইত্যাদি দিতেন। বর্তমান মহারাজা গারো পাঠাড় হইতে চায়া আনিয়া সুসঙ্গে অন্তরু চন্দনের চাষ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম ও জিহটে শস্তরক্ষার সরকার হইতেই খেলা করিয়া হাতী ধরিবার ব্যবস্থা করিতে হইত, তাহা না হইলে পাঠাড় হইতে বঙ্গ হাতী আসিয়া শস্ত ও গৃহাদি নষ্ট করিত। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী খেলা খরচ তুলিয়া দিতে চাহিলে ঢাকার চীফ, আপত্তি করিয়া লিখিলেন, যদি হাতী ধরা বন্ধ করা হয় তবে হাতীর সংখ্যা মন্থা-সংখ্যা হইতে বেশী হইবে। তবে নবাবী আমলে সাধারণতঃ সর্ব-প্রকার করই মুন্সীর আদায় হইত। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা করিতেন ঘাটোয়ালরা। ইংরেজ আমলে এই সব ঘাটোয়ালের জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া খাজনা ধার্য হইয়াছে। বীরভূমের বিহোহী জমিদার রাজা আসাদজুমানের বিরুদ্ধে নবাব দীর কাশিম বার্থ অভিযান করিয়াছিলেন। আনন্দমঠের মুসলমান জমিদার এই রাজা আসাদজুমান খাঁর বাসভূমি ছিল অজর-তীরে। ইংরেজ আমলেও বর্ধমানের মহারাজার বার শত নদী সৈন্ত ছিল। এই সৈন্তবাহিনী

ভাঙিয়া দিবার জন্ত ইংরেজ বহু যত্নবস্ত্র করে। পশ্চিমবঙ্গে সাহসী দুর্ধর্ষ সৈন্ত ছিল—বারবেইগণ, সতুব নোয়াখালী জেলায় মগদের দমনের জন্ত ইহারা নীত হইয়াছিল এবং জায়গীরদার রূপে ভূমি ভোগ করিত, যাহার শেষ নিদর্শন নবাব মীরজাফরের আমলেও সন্দেহে দেখা যায়।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন জায়গীরদার জমিদার, চতুর্দ্বী ও নিজামতের তহশীলদার এবং ইজারাদার ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ভূমি-খাজনা আদায়কারী ছিলেন। ইংরেজের বিচিত্র বিধানের জগলিচূড়ি তৈয়ার হইয়া ইহারা সকলে দশসাল বন্দোবস্ত-কালে ভূমাধিকারী আগা পাইলেন। রাজস্ব ধার্য ছিল তুমার জমার উপর, অর্থাৎ টোডরমল যে কর বিধাপ্রতি পরগণা নিবিধ ধার্য করিয়া গিয়াছিলেন, সেই হার অনুসারে আবাদী জমির উপর যে কর ধার্য হইত তাহাকে আসল তুমারী জমা বলে। তার উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে অবোদার ধার্য হইয়াছিল।

যুদ্ধের সঙ্গে কর-ধার্য-প্রথা অজ্ঞানি ভাবে জড়িত। নবাবী আমলে দেশের সকল প্রকার করই জমিদার মারফত রাজস্বের সঙ্গে আদায় হইত। কৃষি-আয়কর না থাকিলেও নবাবের প্রয়োজনমত রাজস্বের উপর আবোদার ধার্য হইত। এই আবোদারের কতকগুলি সাগা বাংলায় প্রযোজ্য হইত। যথা 'কসুর' বা দেশ খরচ অর্থাৎ মদন্থলে আদারী রাজস্বের বিভিন্ন টাকার সমতা দক্ষার জন্তও খরচ—জমিদারী টাকা প্রতি আড়াই আনা হিসাবে আদায় হইত। ইহাও এক প্রকার বাট্টা অর্থাৎ টাকায় আড়াই পরস, সদকাফি বা সিবাফি খরচ টাকায় দেড় আনা। তার পর আবোদার আলি সাহি বা সরকার আলি প্রায় সাড়ে পাঁচ আনা—মোট ১০০ আনা। ইহার পর মন্থরগঞ্জ অর্থাৎ নবাব আলীবর্দি খাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লাহ মন্থরগঞ্জে প্রাসাদ তৈয়ার করার খরচ—ইহা অবশ্য সব পরগণায় বসানো হয় নাই। তার পর চৌধ বগীদেহ দেওয়ার বাবদ। এই সব তুমার জমার উপর ধার্য হইত। চট্টগ্রাম অঞ্চল মগদের নিকট হইতে সায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজরগ উমেদ খা ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দখল করেন। সেখানে প্রথমতঃ কোন খাজনাই লওয়া হইত না, পরে আবাদের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য জমা ধার্য হয়। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে জমার উপর টাকা প্রতি বৃদ্ধি চাপাইয়া দেওয়া হইতে থাকে। এইরূপে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের জমার উপর ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের জমা টাকা প্রতি প্রায় চারি টাকা বৃদ্ধি পায়। সফরাজ খাঁর আমলের শাসনকর্তা জুলকাদের খা নূতন রাজধানী বা দৌলত বাবদ টাকায় ৮৮ গুণা আবোদার ধার্য করেন। আবার দশাশা টাকার টাকায় আট আনা ও সুরাট টাকার উপর ১৮ গুণা বাট্টা ধার্য করেন। এই জুলকাদের খা সরকার খাঁর দলভুক্ত ছিলেন। মীরকাশিমের নিকট হইতে ইংরেজরা চট্টগ্রামের জমিদারী স্বধ পাইলে চট্টগ্রামের শেষ শাসনকর্তা বেখা খা ভেরেলটকে হিসাবপত্র বুঝাইয়া দেন।

এইরূপে আসল ভূমারী জমা অর্থাৎ আবাদী জমির উপর পরগণার প্রচলিত জমির মাপের উপর টোডরমল কর্তৃক ধার্য্য নিদিষ্ট অমুসারে জমা ধার্য্য হইত। তাহার সহিত সর্ব-প্রকার আবোয়াব, বাট্টা ইত্যাদি যোগ হইত। জমিদারের আদায় করিবার ব্যয় নির্বাহার্থ ঐ টাকা হইতে এগার ভাগেব এক অংশ বাদ দিয়া নিট রাজস্ব ধার্য্য হইত। জমিদারের নিজ পদ-গৌরব ও সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থ তাহাদিগকে বিনা খাজনায় নিজ জোত, খাস, হানাবাড়ী ইত্যাদি ভোগ করিতে দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত ইত্যাদের রাজকর্ম করার জন্য নানাবিধ চাকরান ছিল, যথা : ধোপা, নাপিত, মালি, পাকীর বেহারার, নৌকার মাঝি ইত্যাদি। এমন কি ততশীলদার আমলা গোমস্তা ইত্যাদিও চাকরান ভূমি ভোগ করিতেন। নবাবের গৃহস্থালির যে আটত্রিশ কারখানা ছিল তাহার কঞ্চচারিগণও নিজামত হইতে চাকরান ভূমি ভোগ করিতেন। এইসব কারখানা হইল, পিলগানা হটতে আরম্ভ করিয়া চিরায়ীপানা ইত্যাদি। গৃহস্থালির সর্বপ্রকার কার্যের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ছিল।

লাঞ্চে রাজ ভূমি দুই প্রকার ছিল : বাদশাহী ও অ-বাদশাহী। দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে করমান-প্রাপ্ত যে লাঞ্চে রাজ তাহাকে বাদশাহী লাঞ্চে রাজ বলিত। নূতন বাদশাহের নিকট হইতে সনদ নূতন করিয়া লইতে হইত। কোন রাজকর্মচারীর লাঞ্চে রাজ সনদ দিবার ক্ষমতা ছিল না। জমিদারগণ তাহাদের এলাকার ভিতর যে লাঞ্চে রাজ দিতেন তাহাকে অ-বাদশাহী লাঞ্চে রাজ বলিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পরেই ঠংরেজ গবর্ণমেন্ট উভয় প্রকার লাঞ্চে রাজের সনদ পরীক্ষা করিয়া যেগুলি অগ্রাহ্য করেন সেগুলির মালিকদের উপর চিরস্থায়ী হাডস্ব ধার্য্য হয়। থাকবন্ত ভরিপের পর যেসব জমিদারীভুক্ত লাঞ্চে রাজ পকাশ বিঘার অতিরিক্ত পাওয়া যায় তাহাও বাজেয়াপ্ত করিয়া কর দাখীল করা হয়। এই প্রকারে নশসাল বন্দোবস্তকালে যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল তাহা হইতে অধিকতর রাজস্ব এই সকল বাজেয়াপ্ত লাঞ্চে রাজ ও নদীমগাঙ্গ বৃহৎ বৃহৎ চর হইতে দিয়া বন্দোবস্ত করিয়া প্রাপ্ত হয়।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে রাজস্বের হার অত্যন্ত অঞ্চল হইতে উচ্চতর। উহার কারণ এই যে, ঠংরেজরা প্রথমেই কলিকাতা, সূতংগুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী স্বত্ব পান। তখন ইঁহারা বিধাপ্রতি তিন টাকা যে প্রচলিত আসল ভূমারী জমা ছিল তাহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু নবাব নির্দোষ বেন যে, এই খাজনার হার বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা বাদশাহেরও নাই। বাতা হটক, পরবর্তীকালে মীরজাকবের নিকট হইতে চলিশ পরগণা পাওয়ার পর ঠংরেজের কড়া জমিদারী শাসনে কর ধার্য্য হয়। মীরকাশিমের নিকট হইতে বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার জমিদারী স্বত্ব পাওয়া ইংরেজ কালেক্টারগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অমুসন্ধান করিয়া কর ধার্য্য করেন। এখনও দেখা যায় যে, প্রজাদের নিকট হইতে আদায়ী খাজনার পরিমাণ রাজস্ব হইতে খুব বেশী নচে। নদীরা জেলার

কৃষ্ণনগরের মহারাজার উপর দশসাল বন্দোবস্তের পূর্বে বৎসরের পর বৎসর রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হয়। ফলে তাঁহার জমিদারীর অনেক অংশ হস্তান্তর হয়। এইসব আলোচনা করিলে দেখা বাইবে যে, দশসাল বন্দোবস্তের সময়েও পশ্চিমবঙ্গে রাজস্ব নিতান্ত কম ছিল না। তৎকালে পশ্চিমবঙ্গে জেলাগুলিতে পতিত, অনাবাদী, বিল ও খাল ইত্যাদি কম ছিল। সেইজন্য জমিদারী হইতে লাভও কম হইত। পরবর্তীকালে পথকর, পুতকর, শিলাকর, আয়কর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কর ধার্য্য করিয়া রাজস্ব বাবদ বহু পরিমাণ টাকা আদায় হইতেছে। জমিদারী প্রথা ডুলিয়া দিলে এই পরিমাণ অর্থ আদায় হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বিশেষতঃ, অশ্বোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, ভুক্ততালুক ইত্যাদি যে সকল নিষ্কর বহিরাছে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার।

ঢাকাই ছিল রাজবন্দীদের নির্বাসন-স্থান। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় পেন্সনপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের তালিকায় সূতা খা, সবুজরাখা খা, জুলকাদের খা, হোসেনকুলী খা, এক্রামখোজা উত্খানির বংশধরগণের সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়তমা বেগম লুৎফুন্নেসা ও ইঁহার অসামান্য সন্দরী কন্যা উম্মতজ্জহার নামও দেখা যায়। কালের কি বিচিত্র গতি! বাংলার বিভিন্ন নবাবদের, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দীদের ও সমর্থনকারীদের বংশধরগণ ঢাকায় আনীত হইয়া রাওভোগী ছিলেন। সবচেয়ে বেশী বৃত্তি পাইতেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পট্টা ও কন্যা— তাহাও মাত্র ছয় শত টাকা ছিল। একালে ইঁহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই সব বৃত্তিভোগী ব্যতীত লুপ্ত নাওগারর দেওয়ান ইত্যাদির বংশধরগণ, নিজামতের কবিরাজ ও ঠেকিম এবং দারোগাদের বংশধরগণও বৃত্তি পাইতেন। হোসেনী-দালানে পক্ষ উপলক্ষে আলো দেওয়ার জন্য ২৫০০ টাকা ধার্য্য ছিল। প্রধান প্রধান বাণিজ্য-ক্ষেত্রে (শাহবন্দরে)—যথা, ঢাকা, হুগলী ইত্যাদি স্থানে নবাবের কঞ্চচারীরা (কৌজদারের অধীন দারোগারা) গুরু আদায় করিতেন। কিন্তু হাট-বাজারেব কর (সায়রজমা) বা চলিত নৌকার মালের উপর কর (সায়র চলজ) জমিদারগণ আদায় করিয়া পরগণার রাজস্বের সঙ্গে সরকারে দাখিল করিতেন। মীরজাকব ইংরেজের প্রাপ্য দেনার জন্য বর্দ্ধমান ও নদীয়ার মহারাজারদের এবং হুগলী ও হিজলীর কৌজদারদের উপর “ববাত” দিয়াছিলেন। মহারাজাদের ভয়ে মুঘল সম্রাট বাংলার রাজস্বের চৌধ আলীবর্দিকে দিবার ববাত দিয়াছিলেন। মহারাজগণ তাহা জোর করিয়া আদায় করিতে বাংলায় আসিয়াছিল। ইঁহাই বগীর হাঙ্গামা। রাজস্ব হইতে পরিশোধ করিবার জন্য এইরূপ ববাত দেওয়ার প্রথা কয়েক বৎসর পূর্বেও জমিদারদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাঁহারা তাহাদের দেয় কোন দিন নিজেরা না দিয়া তাঁহাদের কোন কাছারি নায়ের গোমস্তাকে দিবার জন্য ববাত চিঠি দিয়া দিতেন। প্রাপক কাছারিতে বসিয়া চাপ দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতেন। আয়কর, স্থপারটাক্স বা সায়রজমা বলিয়া

আইনতঃ কোন কয় আদায়ের ব্যবস্থা না থাকিলেও ধনী, বণিক মহাজনদের নিকট হইতে নজরানা বাবদে নবাব টাকা আদায় করিয়া লইতেন। কোন পদে নিযুক্ত হইয়া সনদ তালিল করিতে নজরানা দিতে হইত। প্রত্যেক জমিদারকে সনদ তালিলের সময়ও নজরানা দিতে হইত। এইরূপে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ হইতে নজরানা আদায় হইত। দর্পনারায়ণ কানুনগো পদপ্রাপ্তির সময় মুর্শিদকুলী খাকে চুই লক্ষ টাকা নজরানা দেন। মোবারকউদ্দৌল্লাহ অভিজিৎবিদ্যাপন প্রাপ্তির জন্ত মণিবেগম ক্রাইভকে দেড় লক্ষ টাকা নজরানা দেন। মণিবেগম টংরেজদের নিকট "Mother of the Company" (কোম্পানীর মাতা) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ওলন্দাজের মৌরজাকরকে সিরাজউদ্দৌল্লাহর বিরুদ্ধে প্রলুব্ধ করার জন্তই কি তিনি এট আশা পাইয়াছিলেন! নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসের দেওয়ানী পদপ্রাপ্তি বাবদ নজরানা দেওয়ার কথা অবিস্মৃত নহে। হুলভরাম বা রাজা হুলভের (পূর্বে নাম মহারাজা মহীন্দ্রনারায়ণ হুলভরায়) জীবন এইরূপ গভিন্ন আকারে নজরানা দেওয়ার প্রৱণ দৃষ্টান্ত। তাঁহার পুত্র দায়রায়ণ রাজবল্লভের এক আবিষ্কৃত ক্রিকেটে তাঁহার পিতা সন্তোষিত হইয়াছিলেন তাহা বিবৃত আছে। এট হুলভরাম সিরাজউদ্দৌল্লাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে একজন প্রধান নায়ক ছিলেন। প্রথমতঃ, মৌরজাকরের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর সন্ধিসূত্রে দেখা হইল কোটি টাকার মধ্যে তিনি দুই লক্ষ টাকা দেন, তৎপর মৌরজাকরের অধীন সৈন্যপনর হাজার সৈন্যের বাকি বেতন বাবদ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা দেন, তাহা চাহিতে গিয়াই মৌরজাকরের সন্তোষ বণ্ণা হওয়াতে কলিকাতায় বিতাড়িত হন। তারপর ওলন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় (১৭৫০ খ্রীঃ) লর্ড ক্লাইভের অস্বাভাবিক ও পদাতিক সৈন্য গঠনে তাহার ১,৭০,০০০ টাকা খরচ হয়। তারপর মৌরজাকরের সঙ্গে ইংরেজদের গোলযোগের সময় তিনি গবর্ণর ড্যানসিটারের আদেশমত সৈন্যগঠনে ১,৭০,০০০ টাকা খরচ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র ৫৫,০০০ টাকা পাইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া বা তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়াই নজর আদায়ের চিরন্তনমোদিত প্রথা ছিল। আলীবর্দি খাঁর সময়ে ইংরেজের কালিমবাজারের কুঠি হইতে বায় লক্ষ টাকা নজরানা আদায় করা হইয়াছিল। জগৎশেঠের নিকট স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া এই টাকা দেওয়া হয়। আবার ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে টাকার কুঠিয়ারের নিকট নজরানা দাবি করা হইলে, কুঠিয়ার তাহা দিতে রাজী না হওয়ায় ভনসাধারণের উপর পরোয়ানা জারী হইল যে, ইংরেজের সঙ্গে কেহ ব্যবসা করিতে পারিবে না। ইহার পর হুকুম হইল, ইংরেজের কুঠিতে কেহ পাণ্ডর্য্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই বয়কটে বাধা হইয়া চতুর্থ ইংরেজ আলীবর্দি খাকে একটা আয়বী তাজী ঘোড়া নগর দিয়া বেরাই পাইল। সোনার ব্যবসারে একটেরিয়া অধিকারলাভের জন্ত দীপচাঁদ নবাব আলীবর্দকে ২৫ হাজার টাকা নজরানা দিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত টাকার নোয়াজিস মহম্মদের নায়েব হইয়া গিয়া ইংরেজ

কুঠিয়ারকে নজরানা লইয়া দোণা করিতে বলিলেন। কিন্তু প্রথমে কুঠিয়ার রাজী হইলেন না। পরে তিনি ৪,৩০০ টাকা নজরানা বাবদ দিলেন। পর বৎসর রাজবল্লভের পুত্র 'নবাব' কৃষ্ণদাসের গোমস্তা ওলন্দাজদের নিকট নজরানা দাবি করিয়া তাহাদের একজন কুঠিয়ারকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নজরানা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, এই রাজা রাজবল্লভ হুলভরামের পুত্র, রাজা রাধাকান্ত নতুন। ইনি টাকার রাজনগর প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাজবল্লভ। ইনি প্রথমে সরফরাজ খাঁর আমলে টাকার নাওয়ালা দপ্তরে কায্য করেন। আলীবর্দি খাঁর আমলে নোয়াজিস মহম্মদের অধীনে টাকার তাঁহার নায়েব হিসাবে কায্য করেন। নোয়াজিস-পত্নী আলীবর্দির কন্যা যেসেটি বেগম সিরাজউদ্দৌল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজবল্লভ যেসেটি বেগমের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেইজন্য সিরাজউদ্দৌল্লাহ নবাব হইলে তাঁহার ভয়ে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সাগর-স্থান করিবার ভান করিয়া কলিকাতায় ইংরেজের দুর্গ কোর্ট উইলিয়মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরাজউদ্দৌল্লাহর কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে রাজবল্লভ সিরাজউদ্দৌল্লাহর সঙ্গে দেশ করিয়া তাঁহার গৃহপ্রার্থী হন। সেইজন্য কলিকাতা বিজয়ের পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহ খেলাত দিয়া সম্মানিত করেন। ইহার পর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংরেজদের সাহিত সন্ধি স্থাপন করাইয়া ইনি সিরাজউদ্দৌল্লাহর প্রিয়পাত্র হন। সেইজন্য নবাব তাঁহাকে খেলাত, স্বর্ণগচিত কাবেরওয়াল পাখী ও নহবৎ পুস্তক দেন। ইহার সাহায্যে ওলন্দাজগণ নবাবের সঙ্গে দরবার করিতেন। সিরাজউদ্দৌল্লাহ পতনের পর মৌরজাকরের পুত্র মৌরজার ইনি বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং মৌরজা বা ছোট নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হন। নবাব আলীবর্দি খাঁ মরাঠা আক্রমণে বিস্ত্রহস্ত হইলে বহু লক্ষ টাকা দিয়া জগৎশেঠ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সোনার তৎকালীন একচেটিয়া ব্যবসায়ী আহমাদি বণিক সাক্ষিয়া ওয়াজিদ বহু অর্থ দিয়া সিরাজউদ্দৌল্লাহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লাহ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেন, বণিকশ্রেষ্ঠ (ফকর-উল-জুজার) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লাহ কলিকাতা জয় করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহাকে সাহায্য করা হয় নাই বলিয়া ওলন্দাজদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং তাহাদের হুগলীর কুঠী আক্রমণ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। তখন তাঁহার ক্রোধ শাস্ত করিবার জন্ত হুগলী কুঠীর কুঠিয়ার অনন্তোপায় হইয়া পাঁকে ওয়াজিদের শরণাপন্ন হইলেন। সিরাজউদ্দৌল্লাহ প্রথমতঃ ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করিলেন, পরে খাজে ওয়াজিদ, হুলভরাম ও নবাবের জ্ঞাত্ত বিষয় পাবিষদের মধ্যস্থতার চার লক্ষ টাকার রাজী হইলেন। ওলন্দাজ কুঠিয়ার চার লক্ষ টাকা নগদ দিতে সমর্থ না হওয়াতে নবাব বরাবর এক বৎস লিখিয়া দিলেন। খাজে ওয়াজিদের গোমস্তা পরের দিন তাহা কেবল আনিয়া বলিলেন, নবাবের নগদ টাকার দরকার, সৈন্যদের মাহিনা দিতে হইবে; খত লইবেন না। তাঁহার

সঙ্গে ভগংশেঠের কুঠীর দেওয়ান বৈষ্ণবনাথকে আনিয়াছিলেন। অগত্যা ওলন্দাজ কুঠিয়ার ভগংশেঠ কতেচাদজী ও শেঠ আনন্দচাঁদজী বরাবর চার লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিলেন—মাসিক সুদ শতকরা বার আনা। ভগংশেঠের কুঠী হইতে নবাবকে টাকা দেওয়া হইল। ইহার পর বঙ্গের ( ১৭৫৭ খ্রীঃ ) ইংরেজের সন্ধিত সন্ধির পর সিরাজউদ্দৌল্লাহ আবার ওলন্দাজদের উপর দাবি করিলেন। যদিও সিরাজ উহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন তথাপি তিনি নিরুপায়। উহার তখন প্রিন্সপাল ছিল মোহনলাল ও বণজিৎ রায়। ভগংশেঠের উপর বিরাগ, সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে বণজিৎ রায় কথাবাত্তা চালাইতেন। যাহা হউক, এবার ওলন্দাজেরা টালবাতানা করিতে লাগিল, দেখা যাক বড়যন্ত্রের ফল কি হয়। কলে আর কিছু দিতে হইল না। মীরজাফরের সন্ধি অনুসারে ইংরেজের প্রাপ্য তিন কোটি টাকার মধ্যে হুন্ডভাম দুই লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরকে ওলন্দাজদের চুঁচুড়ার কুঠী আক্রমণে কাশিম থাকে ৫০,০০০ স্কোরিন দিয়া ওলন্দাজগণ বেতাই পান। ঐ সনেই নবাব কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠীর কুঠিওয়ালকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমরা সৈন্য সংগ্রহ করিতেছ। এটি অজুতান্তে তাহাদের নিকট সাড়ে বাটশ টন সোনা বা ৫০ লক্ষ টাকা নজর দাবি করিবে। ওলন্দাজ কুঠিওয়াল প্রমাদ গণিলেন। তখন বারদায়াণ ও উমেদরদের মধ্যস্থতর সাড়ে সাত টন সোনা দিয়া বেতাই পাইলেন। সোনার দাম কি তখন এত সস্তা ছিল বা দিকের মন কি এত বেণী ছিল? মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় এক তোলা সোনার দাম ২০ টাকা মাত্র। ইহা হইল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। চৈতন্যসিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে জেষ্ঠ্যসক্রে নাগপুরের রাজা ভোঁসলার প্রতিনিধি বেণারাম পণ্ডিত এক লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপে খেজুর বা জোর করিয়া তৎকালে ধনীদেব নিকট হইতে নজর বা কর আদায় হইত। যদিও সেকালে রাষ্ট্রের মজুত ধন বলিয়া কিছু ছিল না তথাপি নবাব বা উহার পরিবারভুক্ত সকলের মণি-মুক্তা মোহের ভরসায় রাষ্ট্রের অনটনকালে ব্যবহৃত হইত। বঙ্গদেশের যুদ্ধে অযোগ্য নবাব পরাজিত হইয়া বিজয়পুর হইলে উহার প্রিয় বাহু বেগম তাঁতাকে ধন-রত্নাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন মজুত

স্বর্ণ ( gold reserve ) বলিয়া কিছু না থাকিলেও এইরূপ ধন-রত্নাদি অসময়ের সহায় হইত, বরং কোম্পানীই কোন মজুত স্বর্ণ রাখিত না বলা বাইতে পারে। যাহা মজুত হইত তাহা বাইত সাগরের অপব পায়ে। ইহার পর "Sterling Balance" হইল। এইরূপে ধনীদেব নিকট তাঁহাদের সঞ্চিত ধন হইতে নজর আদায় হইত। অনন্তোপায় হইলে মহাজনদের নিকট হইতে বাংলার রাজস্বের মাতব্বিতে নবাব টাকা কর্ত্ত লইতেন। আবার, কোন স্থলে প্রবল পক্ষের দাবি মিটাইতে না পারিলে রাজস্বের কোন অংশ প্রতিপক্ষের নিকট ছাড়িয়া দিতেন। আলীবর্দি খাঁ মরাঠাদের বাকি চৌধুর দাবি মিটাইতে না পারিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ মরাঠাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, যদিও ঠাঁট বজায় রাপিবার জন্য দেওয়ান হুন্ডভাম মরাঠা শাসনকর্ত্তাকে উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের জন্য এক সনদ দিয়াছিলেন। বাংলা ও বিহারের চৌধুর জামিনস্বরূপ মেদিনীপুরের অজুগত পটালপুর পরগণাও মরাঠা-অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সেইরূপ ইংরেজের দাবি মিটাইবার জন্য মীরকাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী স্বত্ব দিয়াছিলেন। ইহাও কি একরূপ 'লীচ-লণ্ড' নহে? তাই বলিতেছি যে, মজুত স্বর্ণ না থাকিলেও নবাবী আমলে 'অর্থসংগ্রহের' বহুবিধ উপায় ছিল। তখন নগদ অর্থের কারাবার—বাংলাদেশের সমস্ত রক্ষা করিতেই হইবে। বর্ধমান জমিদারী প্রথা ভুলিয়া দেওয়া হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব-প্রথাও আমূল পরিবর্তন অবশ্যহাবী। পঞ্চকর, পূর্বকর, শিকারকর এবং কৃষি-অন্যকর উঠাইয়া দিয়া দেশেলে একটা একত্রীকৃত কর ডমির চাষীর উপর দাওয়া হইবে। যেসব স্থলে সেটকর আছে তাহাও পণ্ডনের সঙ্গে ভুক্ত হইবে। বঙ্গ শতাব্দী প্রচলিত কর-প্রথা—প্রথা এবং সেট শত বৎসরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়া যাইবে। ইহার আদি উত্তীর্ণ হইয়া পাটকগরের আনিয়া যাবা দরকার \*

\* হিশ বঙ্গের পূর্বে আমার লেখা *Select Chapters on Mymensingh* পুস্তিকায় এবং *Bengal Past and Present*-এ প্রকাশিত 'Revenue History of a Bengal Pargana' গ্রন্থ অবলম্বনে এত প্রবন্ধের কতক অংশ লিখিত হইয়াছে।—লেখক



## কথার রাজা ডক্টর জনসন

রেজাটল করীম

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে সেন্সপীয়ার, মিল্টন, গ্যাডওয়ার্থ, শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং, টেনিসন এবং আরও অনেক প্রতিভাশালী কবি ও শিল্পী অমর স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কোন দিক দিয়াই ডক্টর জনসন ইংরেজদের পার্শ্বে স্থান পাটবার যোগ্য নহেন। তবুও আশ্চর্যের কথা এট যে, তিনিও ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাটয়াছেন, আর সে আসনে তিনি সম্মানের সতিত প্রতিষ্ঠিত। ডক্টর জনসন নিজেই যেন একটা প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ ভাষা নতুন করে সমগ্র ব্রিটিশ-মহাদেশের প্রতীক বলিয়া মনে করে সেন্সপীয়ার, শেলী, কীটস্ কেহই ইংরেজ ভাষার প্রতীক বা প্রতিনিধি নহেন। যদি একজনমাত্র লোককে সমগ্র ইংরেজ ভাষার প্রতিনিধি বলি, যাঁহাতে পারে, তবে তিনি হইতেছেন ডক্টর জনসন। সাহিত্যিক প্রতিভা অথবা কাব্যভাষার উচ্চ নৈপুণ্য, বরং তাঁহার ব্যক্তিগত ও চরিত্রগুণেই তিনি অমর্যদ্ব লভ করিয়াছেন।

ডক্টর জনসন লিখিয়াছেন অনেক—নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, সমালোচনা। সাহিত্যের এই সব দিকে তিনি নিজস্ব প্রতিভার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালের বিচারে আজ তাঁহার রচনার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ খুব কম লোকেই পাঠ করে। সেন্সপীয়ার, মিল্টনের কথা না হয় বাল্য দিল্লীম : ডাউডেন, পোপ, গ্রে, শেলী, কীটসের কবিতা যত লোক পড়ে জনসনের রচনা তত লোক পড়ে না। তবুও সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি যেন স্থায়ী আসন জুড়িয়া বসিয়া আছেন। এক যুগে তিনি ছিলেন সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্যের ডিক্টেটর। সে যুগে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির সম্মুখে কেহই টিকিতে পারিত না। তাঁহার শ্রমজন্মে পড়িবার জন্ম, তাঁহার একটি পটভূমিত লাভের ভগ্ন কত লড়, মন্ত্রী, বিশপ, কবি ও সাহিত্যিক ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি পাইলে মনে করিতেন যে জীবন ধন হইল। আর যে তাঁহার রূপাধারা পাইত না সে মনে করিত তাঁহার জীবন বার্থ। বাস্তবিকই জনসনের কোপদৃষ্টিতে পড়িল মনে হইত যে তাঁহার মত হতভাগা জীব বোধ হয় আর কেহ নাই। দোষেপ্ণে, ভালমন্দে গঠিত এই বিশালবর্ণ মাছুষটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের নিকট কতকটা অতি মানব বলিয়া সম্মান পাইয়াছেন।

যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির বহু পরিবর্তন হইয়াছে। সাহিত্যের আদর্শ ও সীমার পরিবর্তন হইয়াছে। জনসনের যুগে শিল্পীগণ ঐক্য ও যোমান আদর্শের অনুসরণ করিতেন। কিন্তু রোমান্টিক প্রভাবের ফলে তাঁহাদের অতীতের মোহ কাটিয়া গেল—তাঁহারা এখন অতীত অপেক্ষা অগ্রগামী যুগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। সেইজন্য রোমান্টিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যুগে ডক্টর জনসন অচল হইয়া পড়িলেন।

পরবর্তী যুগে পুরুষের অনেক অচল কবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু কবি ও শিল্পী হিসাবে জনসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার কোন আশা নাই।

কিন্তু মানুষ হিসাবে ডক্টর জনসন এত বড় এবং সাহিত্যের উপর তাঁহার প্রভাব ও নীরব প্রভাব এত বেশী যে যদিও আজ তাঁহার রচনা কেহ বড় একটা পড়ে না, তবুও তাঁহার কথা কেহই বিস্মৃত হয় নাই। সাহিত্য-ভগ্ন হইতে নিঃশব্দে নেপথ্যে বিদায় লটলেও সর্বত্র তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার জীবনের ছোটখাটো ঘটনা, নানাএসঙ্গে তাঁহার কথা ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর ইংলণ্ডের জনসাধারণ অজান্তে-সাহেব ইঁহার মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করিতে বিস্মৃত হয় না। যখনই কোন নীতি ও বাস্তব জীবনের কঠোর প্রশঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখনই ডক্টর জনসনের ছবি ত্যাপনা হইতে লোকের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। নৈতিক আদর্শ ও বাস্তব জীবনে সেই নীতির প্রয়োগ এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তিনি জীবনের ব্যাপ্তিতে অগ্রসর হইতেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী নীতিবিন। জীবনের উপর তাঁহার গভীর প্রভা ছিল। বাস্তব জীবনের সাধারণ কথাকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না।

হোজনে তিনি ছিলেন খুবই পটু : সে যুগে মতপান একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল, কিন্তু জনসন প্রায় মত স্পর্শ করিতেন না। মতের পরিবর্তে পেয়ালার পর পেয়ালো চা পান করিয়া তিনি পান-প্রবৃত্তি নিবারণ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে এত অধিক বই লেখা হইয়াছে যে, সেন্সপীয়ারের পর বোধ হয় আর কোন সাহিত্যিক এ সম্মান পান নাই। বর্তমান যুগেও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বই লিখিত হইয়াছে। বিগত দুই শত বৎসরে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যেসব বই লেখা হইয়াছে সেগুলিতে একটা ছোট লাইব্রেরি পূর্ণ হইতে পারে।

জনসনকে অমর করার আছে জেমস বসওয়ারেলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডক্টর জনসনের জীবনী'। যাহাকে বলে "হিথো-ওয়ারশিপ" বা বীরপূজা, বসওয়ারেল-লিখিত জনসনের জীবনী হইতেছে সেই বীরপূজার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বসওয়ারেলের সহিত জনসনের আলাপ-পরিচয় হয় বহু পরে। একবার আলাপ-পরিচয় হইয়া গেলে বসওয়ারেল এত বিনীতভাবে জনসনের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার জীবনের ছোটবড় কোন ঘটনা বিস্মৃত করিতে বিস্মৃত হন নাই। একজন গুরু পদপ্রাপ্তে শিবা যেমন ভক্তিভরে গুরুর বচনানুসৃত পান করে বসওয়ারেলও সেইরূপ জনসনের কথাগুলি শুনিতেন। জনসনের কথাবার্তা, চালাচলন, স্বভাবচরিত্র, 'অদভুত'।



ও জীবনের প্রতিটি ঘটনা তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন—কি তিনি ভালবাসিতেন, কি তিনি ঘৃণা করিতেন, কখন তাঁহার মজ্জা উষ্ণ ছিল, আর কখনই বা শীতল ছিল, কাতাকে কি ভাষণ ভঙ্গনা করিয়াছেন, আর কাতাকেই বা খান্দ করিয়া কাছে বসাইয়াছেন, কি খাইতেন, কিরূপ পোশাক পরিতেন, কতদূর ঘুমাইতেন, কখন গিন্নায় ঘাইতেন, কখন উপবাস করিতেন, তাঁহার পায়ের জুতাটা, হাতের চড়িটা কিরূপ ছিল, এমন কি তাঁহার বাড়ীর বাড়িলাটা কি খাইত আর তাঁহার স্ত্রী জনসন কিভাবে পাছা সংগ্রহ করিতেন—এইসব খুঁটি টি খাঁটাও বসওয়ারের পুস্তকে অতি মিশ্রণ ভাবে লিপিত হইয়াছে। সেইসঙ্গে বসওয়ারের আরও দেখাইয়াছেন, কোথায় ছিল জনসন-চরিত্রের স্বেচ্ছা, আর কোথায় ছিল ক্রটি-বিচ্যুতি। বসওয়ারের “জীবনী সাংগীত” বসওয়ারের গ্রন্থ অতুলময়ী। বসওয়ারের তুলিকার সাংগীত দেখেই সম্পন্ন এই বিদ্যার মাহাত্ম্যটি বাস্তব রূপ ধরিয়া প্রত্যেক পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন বসওয়ারের নিজের কৃতিত্ব বেশী ছিল না। কিন্তু জনসনের মত বিরাট পুণ্যের জীবনী লিখিয়া তিনি জনসনকে যেমন অমর করিয়াছেন সেইরূপ সেই অমর মাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে নিজের অমর হইয়া গিয়াছেন। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আজ জনসন ও বসওয়ারের পরস্পরে সত্যি ভেদিত হইয়া যেন একীভূত হইয়া গিয়াছেন। বসওয়ার না থাকিলে যেই হয় জনসন এখনভাবে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত হইতেন না।

অনুত মাহাত্ম্য ছিলেন উত্তর জনসন। পরম্পরবিরোধী বহু গুণের সমাবেশ হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে। একদিকে তিনি ছিলেন চরম যুক্তিবাদী, ও বার মাপের নিকট যের বস্তুবোধীতা; তাঁহার প্রতি কাব্যে ধূমিমা উঠিয়াছিল। এক দিকে তিনি ছিলেন কুসংস্কারপূর্ণ-আবার অল্প দিকে সহজে যে-কোন কথা বিনা যুক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন গোড়া চোর, আর ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ট্যাংলি চাফের অন্ধ সমর্থক। পিউরিটান ও ডিসেন্টার মতবাদকে তিনি ঘৃণা করিতেন, কিন্তু মাহাত্ম্য হিসাবে সব মতাবলম্বী লোককেই শ্রদ্ধা করিতেন। কখনও কখনও কথাবাতায় তিনি অত্যন্ত রূঢ় হইয়া উঠিতেন অথচ মূলতঃ তিনি ছিলেন বিনয়ী ও ভদ্র। সেইজন্য গোলাঘরি বলিয়াছেন, তাঁহার মেতে ছিল ভদ্রকের চামড়া, কিন্তু অন্তরে ভদ্রকের কোন অংশই ছিল না। তিনি ছিলেন খাটি ইংরেজ, আর সেইজন্য তিনি বিশেষভাবে গর্দিত ছিলেন—এখান অল্প বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার ও মানববদ্ধ। রুশো ও ভল্টেরায়ের মত বিপ্লবীদিগকে তিনি ভালবাসিতেন না। তাঁহাদের মতবাদ সফল করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, আবার তন উইলকিন্সের মত উগ্রপন্থী রাজত্বপ্রার্থী লোকের সত্যিও তাঁহার বখেই সংগৃহীত হইয়াছিল, অবশ্য ইহা বসওয়ারের মধ্যবর্তিতায় সম্ভব হইয়াছিল। এত সব বিচিত্র গুণের সমাবেশে উত্তর জনসন একজন গোটা মাহাত্ম্য ছিলেন।

জনসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার অদ্ভুত কথাবাতা। তিনি

ছিলেন কথার রাজা। তাঁহার মত মাহাত্ম্য কথা কেহই বলিতে পারিতেন না। কথা বলা যে সোজা ব্যাপার নয়, কথা বলার মধ্যে যে একটা আট আছে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন উত্তর জনসন। তাঁহার কথাগুলি ইংরেজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যথাসময়ে যথাস্থানে যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি যেসব কথা বলিতেন তাহার তুলনা হয় না। জনসন বাবের মত বাগ্মী ছিলেন না। বাগ্মীর থাকে অপূর্ণ বক্তৃতায় পার্লামেন্ট-ভবন কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহার পার্শ্বে জনসন স্বাম পাটবার যোগ্য একজন। কিন্তু ক্লাবে বসিয়া নিশিচয় মনে বহুবাক্যবের সম্মুখে জনসন যখন কথা বলিবার ভক্ত মুগ্ধ হুঁলিতেন, তখন বাক, ক্ষম, শ্রেয়সন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বক্তারা হতবাক হইয়া নীরবে তাঁহার কথাসুত পান করিয়া দগ্ধ হইতেন। ক্লাবে বাক ক্ষম শ্রেয়সন তাঁহার কাছে অতি নগণ্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধারিয়া জনসন কথা বলিয়া ঘাইতেন, আর উপস্থিত বহুবাক্যবগণ মস্তমস্তবৎ তাঁহার কথা শুনিতে। কথার আর শেষ নাহ, এক কথার পর আর এক কথা—এইভাবে বিস্তার নানা বিষয় লইয়া জনসন কথা বলিতেন, তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল অসীম। তাঁহার জ্ঞানগভ কথা শুনিয়া মাহাত্ম্য মুগ্ধ হইয়া যাইত। এমন কথার রাজা ইংলণ্ডে ত ছিলই না, অন্য দেশেও বিরল কথা আছে অনেক বলিতেন এবং অপূর্ণ কথা বলিয়া মজলিস গুলকার করিতেন কিন্তু কথাবলার আর্টিষ্ট হিসাবে জনসন অদ্বিতীয়।

কথা বলিবার ইতিহাসে সফেকীস, মার্সিন গুথার, কোলরিড বিশেষ পণ্ডিতসম্পন্ন। কিন্তু জনসনের পার্শ্বে তাঁহারা কেহই টান্ডুইতে পারেন না। ইংলণ্ডের প্রতিটি কথার মধ্যে নিহিত ছিল একটা উদ্দেশ্য, একটা আদর্শের ইঙ্গিত। তাঁহারা কথার শিল্পী ছিলেন না। তাঁহারা আদর্শ প্রচারের ভক্ত নানা স্থানে নানা লোকের সঙ্গে নানা কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের কথার প্রভাবে ধর্ম, রাষ্ট্র ও সাহিত্যে; বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কথা শিল্পের বস্তু নহে, স্তম্ভরূপে তাঁহাদের কথার মধ্যে আনন্দের সামগ্রী ছিল না। তাঁহাদের কথা অন্তরে দোলা দেয়, যতটা কানে প্রবেশ করে ততটা তার আরও গভীর, আরও ব্যাপক। তাঁহাদের কথার প্রভাবে অনায়াসে মনুষ্য হয়, সাধারণ লোক দেবতার পরিণত হয়। কোন মূল্য দিয়া তাঁহাদের কথার বিচার করা সম্ভব নহে। কিন্তু তবুও তাঁহারা কেহ কথার শিল্পী ছিলেন না। উপদেশ ও নীতিবচনই তাঁহাদের সর্বশেষ কথা। তাঁহারা জনসাধারণকে গুনাইতেন ভাল ভাল কথা, চরিত্রের উন্নতিসাধনই ছিল ইহাদের কথার উদ্দেশ্য। তাই ইহাদের কথার মধ্যে ছিল না শিল্পের আনন্দ। শুধু কথার ভক্ত কথা এ আদর্শ তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। “ওন ওন দেশবাসী, আমার এ অমৃতময়ী বাণী—স্বর্গ হতে আগত এ বাণী, ইহাতে তোমাদের আছে কল্যাণ”—মহাযানবদের কথার মধ্যে এই ধর্মের উপদেশ-বাণী কুটরা উঠিয়াছে।

কিন্তু উত্তর জনসন ছিলেন কথার সত্যকার শিল্পী। তাঁহার



কথাবাহী এক বিষয়ের বস্তু। তাঁহার সব কথা আজ পাইবার উপায় নাই। তবে বসণ্ডয়েল এবং আরও কয়েকজন সমসাময়িক লেখকের চেষ্টায় যেসব কথা আজও পাওয়া যায় তাহা পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার কথা বলার কি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কথা যাহারা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন তাহারাই সেসব কথার প্রকৃত মাহুর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত, অপরে যাহারা শুনিয়াছে 'আমরা কেবল তাহাই পড়িয়া জনসনের কথার মাহুর্থ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি।' মাহুর্থ বর্ণন কথ্য কথ্যে, বিশেষতঃ জনসনের মত মাহুর্থ বর্ণন কথ্য বলেন 'তখন কেবল কণ্ঠস্বর একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে যাহা সেই কথা উপলব্ধি করে। প্রথমে শুনিয়া পরে সেসব কথা লিপিবদ্ধ করিবার কালে সে কথার অনেক গোপন্য কপূর্বের মত উন্মোচিত হয়।' খাচাখা কেশবচন্দ্র, কবিগুণ রবীন্দ্রনাথ অথবা মহাত্মা গান্ধীর কথা যাহারা উপস্থিত থাকিয়া মুগ্ধমুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছেন তাহারা যতই উচ্চাঙ্গের শিল্পী হউন না কেন, নিখুঁতভাবে সেসব শুনা কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন না। কেননা কথ্যটি একমাত্র বিষয় নহে। কথা বলার ভঙ্গীটাকেও প্রকাশ করা চাই। সে ভঙ্গী বা 'ভীত' কথ্যগুলির বিশেষ আকর্ষণ নাই। কারণ তাঁহাদের সব কথাই তাহাদের স্রলিপিত পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

কথা বলিবার সময় উত্তর জনসনের চোখে ছুটি আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিত—ক্রোড়ে অথবা বিড়কায় তাঁহার গণ্ডথ্য ফুসিয়া উঠিত, তাঁহার দৃশ্য ললাট সজ্জিত হইত—চোখে ছুটি দ্রব মড়িয়া উঠিত—আর তাঁহার বিরাট মুগ্ধস্বর হইতে কি কথাই না বাতির হইবে এই চিন্তায় অপেক্ষমাণ শ্রোতৃমণ্ডলী অধীর আগ্রহে নীরবে অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাতিয়া আছে—টিক এই সময় বহুগুণী স্বরে জনসনের মুখ হইতে কথা বাতির হইল—আর এমন শ্রোতৃমণ্ডলীর কেহ কেহ হো হো করিয়া হাসিয়া চতুর্দিকে ফাটিয়া পড়িল, একে অপরের অঙ্গে চলিয়া পড়িল, আবার আতঙ্কিত বাক্তি লক্ষ্যায় মরিয়া বাইতে লাগিল। এত যে কথার মধ্যে একটা দৃশ্য সৃষ্টি করার আট—ইহা সহজসাধ্য বিষয় নহে। ইহা ভাষায় বাক্ত করা যায় না। তাঁহার যেসব কথা ভাষায় বাক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে যে তাহার মাহুর্থ ছিল আরও ঢের। যাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছে কেবল তাহারাই সে মাহুর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন। তবে বসণ্ডয়েলের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি সাধমত জনসনের কথ্যগুলি দৃশ্যসম প্রকাশ করিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছেন।

জনসনের কথার মধ্যে যে খুব গভীর তথ্যকথা ছিল তাহা নহে। এ বিষয়ে আরও অনেক পণ্ডিত ও সুধী বাক্তি জনসনকে পরাস্ত করিতে পারেন। তবে এই সব সুধী ও সাধকদের কথা কতকটা একঘেয়ে নীতি-উপদেশ বাতীত আর কিছুই নহে। সক্রিটস, লুথার অথবা কোলরিঞ্জের প্রধান কাজ হইল আদর্শপ্রচার। হই-চান্নি বার তাঁহাদের কথা শুনিলে আর ভাল লাগিত না। কারণ বিভিন্ন স্থানে বার বার তাহার একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতেন।

এ যুগের রাজনৈতিক নেতাদের মত তাঁহাদের কথার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া তাঁহাদের কথা সীমাবদ্ধ। কিন্তু জনসনের কথার কোন সীমা ছিল না, তাঁহার কথার বিষয় ছিল পৃথিবীর সবকিছুই। তিনি ছিলেন কথার শিল্পী। কথার রাজ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী সম্রাট। বৈচিত্র্য, কৌতুক, আনন্দ, হালকা ভাব সবই তাঁহার কথার মধ্যে ছিল। কথার মধ্যে তিনি এত আনন্দ দিতে পারিতেন যে, একবার তাঁহার নিকট বসিলে কেহ উঠিতে চািত না।

তাঁহার কথার আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—অল্পমাত্র ভাষা বা ষ্টাইল। তিনি যে-কোন বিষয় লইয়া কথা বলিতে পারিতেন। যে-কোন বিষয় লইয়াই আলোচনা হোক না কেন, তিনি তাহার উপর নূতন আলোকপাত করিতে পারিতেন। শ্রোতৃ-মণ্ডলী ভাবিত যে এত বিষয় তাহার জ্ঞান আছে। দর্শন, সাহিত্য, কবিতা, সাংসারিক বিষয়, রাষ্ট্রের বিষয়, রাজনীতি, প্রেততত্ত্ব, দেশের শিক্ষাসমস্যা, এমনকি চামড়া, দোকানপাট, নব-নাগরীর সম্পর্ক—বিভিন্ন দেশের দরজা—এমন বিষয় ছিল না যাহার উপর তিনি আলোকপাত করেন নাই।

এ কথা সত্য যে কোন কোন বিষয়ে জনসন গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন—সাহিত্যের সমালোচনা করিবার সময় অনেক ভুল করিয়াছেন। বহু ভূতীয় শ্রেণীর কবিগণে তিনি উচ্চ আসন দিয়াছেন, আবার উচ্চ শ্রেণীর বহু কবির কাবোর গুণ স্বীকার করেন নাই। রাজনৈতিক বিষয়েও তিনি বহু ভুল বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এসব বড় কথা নহে। তাঁহাকে কেহই দূরদর্শী মহামানব বলে না। সে গুণও তাঁহার ছিল না। তাঁহার কথাবাহীর সবচেয়ে অপূর্ণ ধর্ম এই যে, তিনি যাহাই বলিতেন তাহাই এত মনোহর হইত যে শ্রোতৃমণ্ডলী বিষমবিমুগ্ধ চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত। মনঃমুগ্ধবৎ আর কাহারও কথা এমন ভাবে কেহ শোনে নাই। কোন কথার উত্তর দিতে তিনি কখনও বিলম্ব করিতেন না। উত্তর যেন তাঁহার ঠোটে লাগিয়াই আছে—প্রশ্ন শুনিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ ভাষায় উত্তর বাতির হইত। কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, উত্তর একটা দিতে হইবে—অল্প কেহ হইলে ভাবিয়া চিন্তিয়া শব্দ-ভাণ্ডার আভরণ করিয়া তবেই উত্তর দিত। কিন্তু জনসন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন—এত দ্রুত তাঁহার মুখ হইতে উত্তর বাতির হইত যেন মনে হইত যে নিশ্চয় পূর্বে হইতে তৈয়ার করিয়াই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি কখনও পূর্বে হইতে তৈয়ার করিয়া কেন কথার উত্তর দিতেন না। মুখে বাহা আসিত তাহাই বলিতেন। আর প্রশ্নত না হইয়াই বাহা বলিতেন তাহা একেবারেই উপযুক্ত উত্তর হইত। তাঁহার কথা দ্রুত ভাবে মুখ হইতে বাতির হইত। বসণ্ডয়েল বলিয়াছেন—

"He flew upon an argument. He has no formal preparation, no flooring with the sword; he is through your body in an instant."

তিনি তরবারি লইয়া পার্যতারা করিতেন না, মুহূর্তমধ্যে

তাঁহার কথার তদ্বারি তোমার বন্ধু বিনীত করিয়া দিত। উক্ত জনসন অনেক সময় রূঢ় ব্যবহার করিতেন। ককশ কথা বলিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার স্বভাব রূঢ় ছিল না। আর রূঢ় ব্যবহারের অল্প তাঁহার বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নাই। তাঁহার কথার মধ্যে এমন একটা হাস্যরস মিশ্রিত ছিল যে তিনি রূঢ় কথা বলিয়া বাহ্যিক আক্রমণ করিতেন সেও যুদ্ধ না হইয়া পারিত না। তাঁহার বাক্য-বাণে লক্ষ্যবিত হইয়া অনেকে প্রীতমনেই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। একবার এক যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিল। তিনি প্রথমে এ বিষয়ে তাহাকে কোন উপদেশ দিতে সম্মত হন নাই। বৎন যুবকটি তাঁহাকে পাড়াপীড়ি করিতে লাগিল তখন জনসন বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন—

"I would advise no young man to marry who is not likely to propagate understanding."

ইহার ভাবার্থ :—“যে যুবক বুদ্ধিমান সজ্ঞানের ভ্রম্য দিতে পারিবে না তাহাকে আমি বিবাহের পরামর্শ দিব না।” অর্থাৎ প্রকারান্তরে জনসন সেই যুবকটিকে বলিলেন যে তুমি মূঢ়। কিন্তু এই কথাটি তিনি এমন ভাবে বলিলেন যে আক্রান্ত যুবকটিও না হাসিয়া পারিল না। এই যুবকটির প্রতি উপর লোকের সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জনসনের কথার মধ্যে এমন একটা হিউমার প্রচ্ছন্ন ছিল যে তাহার উৎপ্রেত কথা ভুলিয়া লোকে হাসিয়া কুটিকুট হইয়া গেল। বস্তুবিকই জনসন মূঢ় ব্যক্তিকে এইভাবেই উত্তর দিতেন। তুহার পর পণ্ডদের ভবিষ্যৎ কি হইতে পারে এসম্পর্কে এক দিন বসওয়ারেল তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। জনসন একটা উত্তর দিলেন। কিন্তু তাহাতে বসওয়ারেল সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন,

"But really, sir, when we see a very sensible dog, we don't know what to think of him."

এইবার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া জনসন উত্তর দিলেন :

"True sir, and when we see a very foolish fellow, we don't know what to think of him."

ইহার দ্বারা তিনি প্রকারান্তরে বসওয়ারেলকেই যুগ্ম বলিয়া অভিহিত করিলেন। সেই সময় বলিং ক্রক নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কিছুদিন উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে একখানা পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। গোড়া রক্ষণশীল জনসন তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। এক ব্যক্তি জনসনের সম্মুখে এই বলিং ক্রকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন আর অমনি উক্ত জনসন গভীর হইয়া বলিলেন—

"Sir, he was a scoundrel, and a coward;—a scoundrel, for charging a blunderbuss against religion and morality; a coward, because he had not resolution to fire it off himself, but left half a crown to a beggarly Scotchman, to draw the trigger after his death."

জনসনের এই আক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু শব্দগুলি

এত উপযোগী ও উপমাটি এত নির্ভুল যে, যে শুনিয়াছে সেই যুদ্ধ হইয়াছে। অল্প এক সময় ডাক্তার আডামস তাঁহার নিকট ব্রিটলের বিশপ নিউটনের লিপিত একটি পুস্তকের প্রশংসা করিতেছিলেন। তখন ডঃ জনসন বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"Why, sir, it is Tom's great work; but how far it is great, or how much of it is Tom's, are other questions."

এই উত্তর দ্বারা তিনি একই সঙ্গে দুইটি কথাই বলিলেন। প্রথমতঃ, টমাস নিউটনের পুস্তকটা কিছুই হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ উহার মধ্যে নিউটনের নিজস্ব কথা খুব কম আছে। একবার এক জন লোক অসাবধানে তাঁহাকে বলিল, “মহাপান চুশিচ্চা ধূর করিতে সাহায্য করে, আর অপ্রীতিকর বিষয় তুলাইয়া দেয়।” সেইভঙ্গ সেই লোকটি জনসনকে বলিল, “তাঁহা হইলে কাহাকেও আপনি মহাপান করিতে অনুমতি দিবেন কিনা।” তত্বৎবে জনসন বলিলেন, “yes if he sat next you”। এই সামান্য কথার মধ্যে তিনি সেই লোকটির উপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। প্রকারান্তরে তিনি তাহাকেই মূঢ় ও অববেচক বলিয়াই ভৎসনা করিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কতকগুলি মেধাভিষ্ট ছাত্রের গ্রাজুয়েটকে তাহাদের ধন্যমতের ভগ্ন বিতাড়িত করা হইয়াছিল। তাহাতে চুঃখিত হইয়া বসওয়ারেল এক দিন জনসনকে বলিলেন, “ইহা খুবই অকায়।” কিন্তু রক্ষণশীল জনসন একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, ঠিকই করা হইয়াছে। তখন বসওয়ারেল বলিলেন, মহাশয় আমি জানি খাতাদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে তাহারা খুবই ভাল লোক। সঙ্গে সঙ্গে জনসন উত্তর করিলেন—

"I believe they might be good fellows; but they were not fit to be in the University of Oxford. A cow is a very good animal in the field; but we turn her out from a garden."

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই উপমাটি কত উপযোগী হইয়াছে।

চর্চা এমন কালাপযোগী উপমা প্রয়োগ করার মধ্যেই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সিডনস সে-যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী। জনসনের পাড়ার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সে গৃহে আরও কয়েক জন চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। অতিরিক্ত চেয়ার একটিও ছিল না। সিডনস গৃহে প্রবেশ করিবারাত্র সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অভিনেত্রীকে চেয়ারও ছাড়িতে পারেন না, অথচ তাঁহারা চেয়ারে বসিয়া থাকিবেন আর এক জন মহিলা পাড়াইয়া থাকিবেন, ইহাও বিসম্বল্য সেকিল। কিন্তু অল্প জনসন তাঁহাদের সকলকে চমৎকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"Madam, you who so often occasion a want of seats to other people, will the more readily excuse the want of one yourself."

অর্থাৎ, আপনি কতবার কত লোকের বসিবার আসনের অভাব

ঘটাইয়াছেন। আজ যদি আপনার আসনের অভাব হয় তবে কিছু মনে করিবেন না।

বসওয়েল তাঁহার পুস্তকে জনসনের কথাবার্তার বহু বিবরণ দিয়াছেন। সেগুলি পড়িতে পড়িতে আমরা মুগ্ধ হইয়া বাই। বসওয়েল ব্যতীত আরও অনেকেই জনসনের বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। জনসন মহাপুরুষ নহেন। আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। কিন্তু তবুও তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষার বহু বিষয় আছে। তাঁহার সমগ্র জীবনই শিক্ষার বিষয়। অবশ্য কেত কেত তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে, তিনি নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। সাধারণ চলিত কথাই তিনি বলিয়াছেন। আর তিনি যে-সব নীতি ও উপদেশ দিয়াছেন তাহাও সচরাচর ব্যবহৃত তুচ্ছ কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। নূতন কথা তিনি বলেন নাই সত্য; কিন্তু পুরাতন কথা তাঁহার মূণ হইতে যখন অনবচ্ছিন্ন ভাষায় বাহির হয় তখন তাহা নূতন ভাবেই দেখা দেয়। তাহা ছাড়া তিনি পুস্তক হইতে অপরের কথা ধার করিয়া বলেন নাই। তিনি প্রত্যেকটি কথা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন। শোক দুঃখ আশা আনন্দ সাফল্য বার্থতা—এসবের অভিজ্ঞতা তিনি পাইয়াছেন। এসকল অভিজ্ঞতা হইতে তিনি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাহাই তিনি তাঁহার অপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ চলিত নীতি উপদেশকে অগ্রে নিজের জীবনে পালন করিয়াছেন, সেগুলিকে বাস্তব সত্য হিসাবে নিজে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা পর তিনি তাহা লোকশিক্ষার জন্য প্রচার করিয়াছেন। সেইজন্য জনসনের কথা ও উপদেশাবলী সাধারণ হইলেও তাহার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। আমরা বলি মানুষ ভ্রমশীল। জনসন এই কথাটা কি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন : “A fallible being will fail somewhere.”

তাঁহার প্রচারিত কতকগুলি সাধারণ কথা তাঁহার নিজস্ব ভাষায়

পড়িলে মনে হয় যে, পুরাতন কথা নূতনভাবে গুণিতেছি। কয়েকটি উদাহরণ দিব :

“(1) It is better to live rich than to die rich, (2) No man is a hypocrite in his pleasures, (3) It is the business of a wise man to be happy, (4) A man should keep his friendship always in repair, (5) A man talks to unburden his mind is the man to delight you, (6) No sir, let fanciful men do as they will, depend upon it, it is difficult to disturb the system of life.”

ডক্টর জনসনের বিষয় যতই আলোচনা করি ততই মনে হয়, নৈতিক চরিত্রে বলবান ও জীবনের প্রেমিক এমন বাস্তববাদী মানুষ সংসায়ে বিরল। তাঁহার চরিত্র ছিল উন্নত। তিনি ছিলেন ক্ষমশীল, বন্ধুপ্রিয়। তিনি দুঃখের মধ্যেও জীবন উপভোগ করিয়াছেন। common sense বা সাধারণ ও সহজজ্ঞানের তিনি বাস্তব নিদর্শন। তত্ত্বকথা অপেক্ষা বাস্তব জীবনই তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। তিনি বাস্তব জীবনের প্রধানমন্ত্রী। একজন লেখক বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর জন্ত যে গুণটা সবচেয়ে প্রধান তাহা হইতেছে বাস্তব জ্ঞান। ডক্টর জনসন সাহিত্য ও মানবজীবনের প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার বাস্তব জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে তিনি কোন খিওরী বা তত্ত্বাবাদী বিভ্রান্ত হইয়া এই বাস্তব জ্ঞান হারান নাই। তিনি ছিলেন আজন্ম বিপ্লববিরোধী। বিপ্লবের সময় তিনি মানুষকে পথের নির্দেশ দিতে পারিবেন না। অস্ত্র সময়ে দৈনন্দিন জীবনে তিনি সত্যই জীবনের প্রধানমন্ত্রী। সাধারণ অবস্থায় বাস্তব জীবনে বাহা বাহা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তিনি নির্ভরযোগ্য নেতা। আজ প্রায় দুই শত বৎসর হইল জনসন গত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রভাব সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া আছে। জনসনকে জানিলে সমগ্র ইংরেজ জাতিকে জানা হইবে। এক জন লোকের মধ্যে একটা গোটা জাতির সমগ্র চিত্র এমনভাবে অঙ্ক কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।

## পাতা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

( জার্মান কবি Ludwig uhland হইতে )

বর্ষায় ভেজা রোদে পোড়া এক

পত্র এসে

আমারই চরণে পড়িল শেষে !

এক নিমেষে—

বৃষ্টি তখন—তাজা ও তরুণ ছিল ও এ সে।

আমায়ও তখন ছিল যে স্বপ্ন কি ভালোবেসে

পাতার হার

ওকালো বার,

কত না শীত ওকারে বার।

কত বসন্ত কত যে শরৎ

কি গেল কয়ে,—

তবুও বাঁচিয়া ছিল এ দীর্ঘজীবীই হয়ে।

আমার কি প্রেম তত দিন ধরে ছিল এ লয়ে ?

# রক্তরাখী

ত্ৰিপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১০

তাহাদের আশ্রয় মিলিয়াছিল এক পাঠানের গৃহে। যদিও সকালেই তাহার পেশোয়ার পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনের জন্ত আর সারাদিন বাহির হয় নাই।

সন্ধ্যার পর এই বাড়ীর এক গৃহকোণে স্তিমিত আলোকে একে একে জমায়েত হইলেন বীর রাঘব আইয়ার—তিনি আসিয়াছেন যেসদ্য হইতে। পূর্বের পরিচয় না থাকিলে চেনা যায় না। ডাঃ ক্রিষণচাঁদ পূর্বেই আসিয়াছেন। পেশোয়াবে সূচিক্রিমসক হিসাবে তাঁর বখেষ্ট সুনাম আছে। তিনি সাধারণ ডাক্তারের বেশেই আছেন। পকেট হইতে ট্রেসিং-কাপের নলটা বাহির হইয়া আছে।

তত্ত্বিতের পোশাকও পেশোয়ারী পোশাকের অনুরূপ। ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ, একজন পাঠান দরজার বাহিরে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত। বনোয়ারীও দরজার ধারেই বসিয়াছিল; অদূরে মোটর প্রস্তুত বিপদ বুঝিলে পালাইবার জন্ত।

তড়িং মিঃ আইয়ারকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, “আপনি যে নির্দিষ্টে এতগুলি ব্রিটিশ ঘাঁটি পার হয়ে আসতে পারবেন তা আপনি না পৌঁছানো পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি নি।”

“বিপদ পদে পদে, তবে একটা সুযোগও মিলেছিল। আপনি জানেন বংসবের এমনি সময় মেসেদে লক্ষ লক্ষ সিয়া তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হয়। সিরাদের নিকট মেসেদ হ’ল গিয়ে মন্ডার মত। সেই যাত্রীদের মধ্যে অনেকে ছিল ভারতীয়। তাদের সঙ্গে জুটে কোনগতিকে চলে এসেছি।”

“তা হলে বলুন মুসলমান সেজেই আসতে হয়েছে।”

“ওধু কি বেশত্বা, তা করে রেগাই পেলে ত বাঁচোয়া ছিল। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ হয়ে ওদের সঙ্গে ওদের মত করেই মাংস খেতে হ’ত আর রোজ নমাজ পড়তে হ’ত। এখানে কোনপ্রকারে এসেই এক গাছা পৈণ্ডের খোজ করেছিলাম।” কথা শেষ করিয়াই আইয়ার হাসিয়া উঠিলেন এবং সকলেই হাসিতে যোগ দিয়া ঘরের আবতাওয়া প্রদর্শন করিয়া তুলিলেন।

তড়িং কহিল, “মানসান সিরাদের সঙ্গে এসেছেন, কিন্তু বাইরায়েতে কড়াকড়ি খুব বেশী, ওপানটা পার হলে কি করে।”

“চারদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাঝে মাঝে সত্য হয় তড়িং-বাবু। ল্যাণ্ডিকোটাল পর্যন্ত আসতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু এখানে এসেই একেবারে ন বরো ন তন্তো। ব্যবসারী লোকেরা যে পাখা কিংবা গজরের কায়াভান নিয়ে আসে মাল বোঝাই করে, তার সঙ্গে আসে সাধারণ লোকও। তাই ঐ কায়াভানের সঙ্গে এসে সাধারণ লোকের মতই উঠতে হ’ল সরাইখানার—

সেখানকার পরিচ্ছন্নতার বর্ণনা করব না, কেননা ও কথাটা ওদের অভিধানে নেই।

সরাইখানায় সন্ধ্যা হ’ল চোয়, জুয়াচোর, চোয়াইমাল কায়বাবী আরও কত কি। গোয়েন্দাদের ওটা হচ্ছে আইডিয়াল থাকবার জায়গা। দু’একটি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাও যে নেই তা বলা যায় না।

ওখানে থাকতে গেলেই নাম, খাম, কোথায় যাব এবং কেন—এর সব খুঁটিনাটি জবাব দিতে হয়। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেও গ্রেপ্তার করে নেবে। বিপদ বুঝলে পালাবার উপায় নেই, একটি মাত্র দরজা, আর কড়া পাহারা। বেরিয়েই বা যাবেন কোথায়, সামনেই কেদা—সেখানে থাকতে হয় ঠাণ্ডা গারদে।

শেষের কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। হাসি ধামিলে তিনি পুনরায় কহিতে লাগিলেন, বাইবার পাস হচ্ছে এখান থেকে প্রায় পয়ত্রিশ মাইল। বেলা সাড়ে চারটার মধ্যে না বেরুতে পারলে কয়েদখানায় থাকতেই হবে। কিন্তু সরাইখানায় থাকতে গেলে গোয়েন্দারা আমার চিনবেই চিনবে।

কিন্তু এক অপূর্ণ সুযোগ মিলে গেল। পেশোয়ার থেকে ল্যাণ্ডিকোটাল পর্যন্ত দুধ নিয়ে আসে যোজাই একটা মিলিটারী ভ্যান। তার চালকের সঙ্গে কয়েক টাকায় রফা করলাম সে আমার পেশোয়ার পৌঁছে দেবে। পথে দু’তিন জায়গার সাত্তীরা জিজ্ঞেস করলে গাড়ী ঠিক আছে কিনা। কিন্তু জামরুদ কেদার সামনে একেবারে গাড়ী স্বচক্ষেই দেখতে এল। একে ত বসবার জায়গা নেই—বড় বড় দুধের ক্যানের পেছনে কোনরকমে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা, তার উপর ভীষণ কাঁকুনি, হাড় বার হবার উপক্রম, বার দুই বমিও করেছি। কিন্তু চালকটি, ‘কই নেই হায়’ বলে ওর সঙ্গে কি ফিস ফিস করলে পরে পরসা গোনার আওরাজ পেলাম। গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমি পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্টের প্রায় মাইল-খানেক দূরে নেমে পড়লাম।”

সকলেই বেন নিশ্চিন্ত হইল। তড়িং কহিল, “পৈণ্ডের কথা বলছিলেন না? এই নির্দিষ্ট পোলসটি কিন্তু আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বেশ কাজে লেগে যায়। শব্দের ভেদ নিয়ে এখনও লোক ঠকানো যায়। একবার আমার সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করে। পৈণ্ডে গলায় ছিল বলে এক গৃহস্থবাড়ীর মেরেয়া আমার রফা করে। সেই থেকে একগোছা পৈণ্ডে আমার সঙ্গে থাকে। আচ্ছা থাক এ সব কথা—পাসগড়ের মিঃ বাহের পবর কি!”

“তিনি ল্যাণ্ডিকোটাল আগে আকগান সীমান্ত পর্যন্ত এসেছেন দেখে এসেছি। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ সীমান্তে পা দিতে সাহস পাচ্ছেন না।”

"তঁার পক্ষে সম্ভব হবে বলে ত আমার মনে হয় না"—মন্তব্য করিলেন ডাঃ কিরণচাঁদ। "সব জায়গার আছে তঁার কটো আর হ'সিয়ারী। চিরালের পথ এমনিতেই হুগুং, তার উপর ওপানে এমন ভূবারশাত হচ্ছে, ওপথ দিয়ে আসবার চেষ্টাও তঁার বার্থ হয়েছে।"

"মিঃ রায়েব সঙ্গে ল্যান্ডিংগার অনেক আলাপ হয়েছে।

"তঁার মতে বাইরে থেকে বেশী কিছু সাহায্য পাওয়া বাবে না—আমাদের ভেতর থেকেই সব করতে হবে।" উত্তর দিলেন মিঃ আইয়ার।

"টিকট বলেছেন, একটা কিছু করা একান্ত প্রয়োজন। দিল্লী

ও মীরাট থেকে লোক দেগা হবে গিয়েছে। পথে আরও নানা জায়গা থেকে যে খবর পেলাম তা সবই উৎসাহজনক। অবশ্য রাওলপিণ্ডি ট্রেনে কান্ডের সঙ্গে দেগা হ'ল না। তবে সরকারপক্ষ যে নিষ্ক্রিয় আছে তাও নয়।"—মন্তব্য করিল তড়িৎ।

"আমিই নিষেধ করেছিলাম তড়িৎবাবু। রাওলপিণ্ডি ট্রেনের উপর কড়া নজর"—উত্তর দিলেন ডাঃ কিরণচাঁদ।

"আচ্ছা, সীমান্তবাসী আফ্রিনী, মোমান্দ, জাকাসেল প্রভৃতি পার্শ্বতা জাতিগুলির মনোভাব সম্পর্কে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি? এরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ করিয়া কিরণচাঁদ কহিলেন, "এরা স্বাধীন-চেতা, আমাদের সংগ্রামে এরা সহানুভূতিশীল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু ওদের ভেতর আমরা আজ পর্যন্ত কোন কাজ করি নি, সুতরাং ওরা আমাদের হয়ে প্রত্যাক সংগ্রামে যোগ দেবে এ আশা আমরা করতে পারি নে।

আপনি বোধ হয় জানেন কোহাটের পথে ওদের একটা অস্ত্র-নির্ধাণের কারখানা আছে। ওদের মাতঙ্গরদের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। অস্ত্র-নির্ধাণের কারখানা শুনেছি ওদের আরও আছে, ওরা বলে ইংরেজ তোমাদের রাজা, ওদেরকে আমরা কোন দিনই মেনে নিই নি, এবও না—আমরা চিরকাল লড়াই করে এসেছি—রসদেব অভাব হলে কেবল মাঝে মাঝে চূপ করে থাকি। হিন্দুস্থান চিরকাল বিজিত হয়েছে উত্তর দিক থেকে। ভয় করি শুধু উত্তর দিককে। দক্ষিণ থেকে সাধ্য নেই আমাদের জিনীমানার আসে। ইংরেজরা আমাদের ভয় করে চলে। ওরা সোজা বাস্তা ভিন্ন চলে না। নোটশি খুলিয়ে রেখেছে—  
"Beware, Independent tribal area।"

একটু ধামিয়া ডাঃ পুনরায় কহিলেন, "আর একটা কথা, ওরা জানতে চায় আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, আমরা কি ঠিক মোকামল আত্মাণী (পূর্ণ স্বাধীনতা) চাই, না ইংরেজকে ভয় দেখিয়ে কিছু স্ববোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে চাই। বাতে তাদের দেশে হুদে টালা খাটাবার ব্যবসাতা ভাল চলে, তাদের পাঞ্জা সম্ভার কিনে নিয়ে হিন্দুস্থানে বেশী দরে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা করতে পারি। লড়াইয়ে ইংরেজ কিছু কাবু হলই পার্শ্বতা জাতিদের ও 'সাতানার' অধিকার কিছু পাই, আর বেশী কিছু চাকরি-বাকরিও পাই।

তড়িৎ—"টিকট বলেছেন আপনি, ওদের ভেতর আমরা কোন কাজই করি নি। ওদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে। ওদেরকে বোকাতে হবে আমরা স্বাধীন হলে ওরাও নিরাপদে পারবে নিজের দেশকে ইচ্ছামত উন্নত করতে। আমরা তাতে বাধা জন্মাব না।

আর একটা কথা সৈন্তদের অধিকাংশই আসছে কৃষক-পরিবার থেকে, সুতরাং এই দেশের কৃষকশ্রেণীর মধ্যে কাজ না করলে সৈন্তদের উপর আমাদের কাজও কঠিন হবে। গতকালের ভূগ আজকের পথ নির্দেশ করবে।" এই পর্যন্ত বলিয়া তড়িৎ ধামিলে ডাঃ কিরণচাঁদ কহিতে লাগিলেন, "চলুন না তড়িৎবাবু, একদিন গিয়ে ওদের অস্ত্র তৈরির কারখানা দেখে আসবেন। কুটীব-শিল্পের মারকতে যে অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি হতে পারে তা চোখে না দেগলে বিশ্বাস করা যায় না। বিদ্রোহের নামগন্ধ নেই, অথচ হাতে চালিয়ে প্রথম শ্রেণীর রাইফেল তৈরি করছে। ওতে ইংরেজী নাম আর নম্বর গোড়াই করে দেয়। এমন একটা রাইফেলখারী জাত পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। ছেলে, বুড়ো সবাই হাতেই রাইফেল।"

তড়িৎ কহিল, "একথা বনোয়ারীর মুখেও শুনেছি। আমাদের এর থেকে শেগবার আছে অনেক। আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে হচ্ছে আমাদের সমিতি-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ দাসের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের গড়ে তুলতে হবে অস্ত্র তৈরির কারখানা।' অনেকে অবশ্য ঠাঁকে একজ্ঞ গোপনে ঠাঠা করত। তারা বলত জুপস্ আর স্কোভার মত কারখানা তৈরি হবে তবে হবে বিপ্লব, তবেই হয়েছে আর কি! এই হুগুং জায়গার যেভাবে এরা লোহা যোগাড় করে অস্ত্র তৈরি করছে তার তুলনা সত্যিই বিরল।"

তখন একখানা এরোপ্লেন আকাশে-বাতাসে কম্পন জাগাইয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন বোড়সওয়ার সামনের বাস্তা দিয়া তীরবেগে ছুটিয়া গেল।

তড়িৎ ও আইয়ার সচকিত হইয়া তাকাইতে ডাঃ কিরণচাঁদ কহিলেন, "এখন লড়াইয়ের সময়, দিনবাত এই চলেছে। এই লড়াইয়ের স্ববোগ আমাদের পুরোমাজার গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া মনে হচ্ছে ওরা আমাদেরকে যা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওদের আঘাত আসবার আগেই আমাদের যা দিতে হবে। নইলে আমরা পিছিয়ে পড়ব।"

দরজায় মুহূর্ণ করাবাত হইলে ডাক্তার দরজা খুলিয়া দিলেন। বনোয়ারী থানকরেক টেলিগ্রাম ডাঃ কিরণচাঁদের হাতে দিয়া কহিল, "এগুলি এইমাত্র এক আগন্তুক দিয়ে গেল।"

টেলিগ্রামগুলি সবই সাক্ষেতিক ভাষায়। ডাক্তার কিরণচাঁদ উহাদের পাঠোচ্চাবে ব্যাপৃত হইলেন। তাহার কপাল কুঞ্চিত হইতে দেখিয়া তড়িৎ প্রশ্ন করিল, "কি খবর ডাক্তার..."

"সব বোধ হয় শেষ হ'ল—সোমেশ ও ভেলিংকার প্রেষায় হয়েছে টাওয়ার। মীরাট, আখালা, লাহোর, কিবোজপুর, অন্ততসর,

কানপুর এবং আরও অনেক ক্যান্টনমেন্টে অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে। কবেকটা রেজিমেন্ট নিবৃত্ত করা হয়েছে।”

“বাংলা ও কান্টন বব কি?”

“এখনও দুটো টেলিগ্রাম পড়া হয় নি—দেখি আরও কি আছে আমাদের জন্ত।” কিছুক্ষণ পরেই কহিল, “কান্টনে বলবস্ত সিংকে গ্রেপ্তার করবার জন্ত গিয়েছিল—তিনি বাধা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। আর একটা টেলিগ্রাম ঠিক বৃত্তে পারছি না—এটাও কান্টন থেকে আসছে—কে একজন মহিলা...”

তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া তড়িৎ প্রসন্ন করিল, “অল্পপূর্ণ নয় ত?”

“আপনি ঠিকই বলেছেন, অল্পপূর্ণই বটে, তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু অত্যধিক উত্তেজনার বশে তাহার মাথা খারাপের মত হয়, অচিরেই হাটকেল করে মারা যান। আপনাকে ধরবার জন্তও অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আপনার আশ্রয় পৰ্যন্ত আসার কথা পুলিশ জানে।”

“নিশ্চয় আমাদের মধ্যেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নইলে এতটা দ্রুত তাদের জানার কথা নয়”—উত্তেজিত ভাবে কহিল তড়িৎ।

এক আগন্তুক আসিয়া গবর দিল শহরে অনেক বাড়ী পানাতলাসী হইয়াছে এবং অনেক বাড়ী পুলিশ ও মিলিটারী ঘেরাও করিয়াছে। ডাক্তারের বাড়ীও তলাসী হইয়াছে। তড়িতের পেশোয়ারে উপস্থিতিও পুলিশের জানা আছে।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল। ঘরের মধ্যে উত্তেজনা ও নৈরান্ত্র্য যেন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তড়িৎই প্রথম কথা কহিল, “এবারকার মত সব শেন—তবে আমাদের শেষ নেই—আবার শুরু করব গোড়া থেকে। বার বার বার্ষিকার ভিত্তর দিয়েই আমাদের নিশ্চিত সাফল্যের পথ সৈর্য্যি হচ্ছে।”

আইয়ার বলিলেন, “কিন্তু এখানে তো আর থাকা চলে না।”

তড়িৎ—“নিশ্চয়ই, এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।”

প্রতিমার কথা মনে হইতে তড়িৎ পুনরায় কহিল, “প্রতিমাকে কোথাও বেগে যেতে পারলে হ’ত।”

স্বিন্ন হইল, প্রথমে নিরাপদে শহরের বাইরে বাওয়া। বাইরে থেকে পালাবার চেষ্টা করা সম্ভব। ডাঃ কিষণচাঁদ কহিলেন, “আপনারা একটু বসুন, আমি শহরের অবস্থা দেখে আসছি, আর সেই সঙ্গে প্রতিমা দেবীর থাকবার ব্যবস্থাও করে আসব।”

“আপনি একা বাবেন? একা—অবশ্য না গিয়েই উপায় কি!”—উদ্বিগ্ন কর্তে প্রশ্ন করিল তড়িৎ। পরে তড়িতের অসুযোগে ডাক্তার বনোয়ারীকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত অবস্থার সুরক্ষা প্রতিমাকে জানাইয়া বাওয়া উচিত মনে করিয়া প্রতিমা যে ঘরে ছিল সেই দিকে তড়িৎ অগ্রসর হইল। সিং আইয়ার তখন হাত্তিয়ার গুছাইতে ব্যস্ত।

বাইরের ঘরে সমিতির ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস লেখা হইলেও অন্দরে ইহার বিন্দুমাত্র ছাপ নাই। প্রতিমা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠান-বৌয়ের সঙ্গে জমাইয়া তুলিয়াছে।

অভিষিপরায়ণ সরল প্রকৃতির এই মহিলা তাহার এই নূতন সাথীকে কি করিয়া যত্ন করিবে, কোথায় বসাইবে, কি খাইতে দিবে তাহার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিমা অনেক কষ্টে অনেক অসুযোগে করিয়া তাহার জন্ত ভাবিতে নিবেদন করিয়া তাহাকে তাহার পাশে বসাইয়া আলাপ শুরু করিল।

পাঠান-বৌ কথায় কথায় ঈশ্বর হাসিয়া কহিল, “বহিন তুমি বড় সুখী, তোমার শৌচর্য তোমাকে খুব পিয়ার করে। তোমার উপর তার খুব মোহান্ত।

“তুমি বুঝলে কি করে?” হুটুমির হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল প্রতিমা।

“বৃত্তে পারি বহিন, বৃত্তে পারি।” ঐ মধুতে আমার কর্তৃ পৰ্য্যন্ত ভরা। বাবুজী যখন তোমাকে এখানে বেগে গেলেন তখন তিনি তোমাকে যে চোখে কণিকের জন্ত বিদায় দিলেন তেমনি চোখের চাচনি আমি নিজেই দেখেছি অনেক। চোপ দিয়ে যেন তার ভালবাসা পাহাড়ী ঝরণা-ধারায় ঝরে পড়ে তোমাকে নাইয়ে দিচ্ছিল। বাবুজী তোমার জন্ত জান দিতে পাবেন। প্রতিমা বলিল, “পিয়ার যেমন করেন তেমনি দরকার হলে তিনি আমার জানও নিতে ছাড়বেন না, বড় নিষ্ঠুর!”

“তা ত পারতেই হবে, আজাদীর জন্ত, ঈশ্বর দরকার জন্ত যদি তোমার খুন করতে হয় তবে তা তিনি করবেন তোমার পিয়ার করেন বলেই! দিলকী পিয়ারকে, ভালবাসার বস্তুকে যদি না দিতে পারলাম আজাদীর লড়াইয়ে তবে আর নিছাবর করলাম কি? জান বহিন, আমার ধসমও দরকার হলে আমার খুন করতে পারবে, আমিও পারি তার জান নিতে। অঞ্চ ও আমার জানের জান, আমার কলিজা, তবে এ ত খুন নয়! এ হ’ল আমার নিজেকেই কোরবানী!

তড়িৎ গৃহে প্রবেশ করিতেই পাঠান-বৌ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। তড়িৎ দৌরঙ্গ প্রতিমার মুখ ধুশীতে বলমল করিতেছে। আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রতিমা গোপন করিতে পারে নাই—তড়িৎ তাহাকে ভালবাসে পাঠান-বৌও একথা বুঝিতে পারিয়াছে! প্রতিমা পাঠান-বৌয়ের সঙ্গে তাহার কথোপকথনের বিবর বলিয়া চলিল। যদিও ভাব-বিলাসের সময় এ নয়। কিন্তু তড়িৎ প্রতিমাকে হঠাৎ দারুণ হৃৎসংবাদ শুনাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। ভাবাবেগের প্রথম জোয়ার কাটিলে প্রতিমা লক্ষ্য করিল তড়িৎ যেন অল্পমনস্ক, মনে হইতেছে প্রতিমার কথা যেন সে ভাল করিয়া শুনিতেছে না—ধামিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বি-... হয়েছে তড়িৎনা, তুমি অল্পমনস্ক কেন?”

“না, এমন কিছু নয়”—এই পৰ্য্যন্ত বলিয়া মনে হইল বাহা

বলিতেই হইবে তাহাকে আর ঢাকাচুকি দিয়া লাভ কি। আন্তে আন্তে প্রতিমাকে সমস্ত কথা শুনাইল।

প্রতিমার পায়ের নীচ হইতে মটি বেন সরিয়া যাইতেছে, আর বুঝি সে ঠাড়াইয়া থাকিতে পারিবে না—হাত বাড়াইয়া বেন কোন-কিছু একটা আশ্রয় খুঁজিতেছে। তড়িৎ তাহার হাত খপ করিয়া ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া দিল।

তাহার চিরহুঃশী মা—প্রতিমা তাহাকে এতদিন ছায়ায় মত অমুসরণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক তাহার শেষমুহূর্তে কাছে থাকিতে পারিল না। কেমন করিয়া না জানি মা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন—নিশ্চয়ই একবার প্রতিমাকে দেখিতে চাহিয়া-ছিলেন—চীৎকার করিয়া প্রতিমার কানিতে ইচ্ছা হইতেছিল। পরমুহূর্তেই তাহার মনে হইল তাহার মা ভীষন দিয়াছেন এক মহান আদর্শের গণকান্ত—‘‘তাঁহার রক্ত কানিয়া, শোক করিয়া মৃতের আত্মার অবমাননা করিবে না। এত কথা ভাবিতেই শোকের বোঝা যেন অনেকটা হালকা মনে হইল।

বলবন্ত নিঃশব্দে ভক্ত ও তাহার কষ্ট কম হয় নাট—কিন্তু তিনিও বীরধ্বজ বক্ষা করিতে ভীষন দিয়াছেন—ইঁতার মতান—ইঁতারের জ্ঞান শোক সার্থক হইবে ইঁতারের আদর্শ বক্ষা করিতে পারিলেই।

প্রাণ দেওয়ার ভক্ত তড়িৎ ঘরে ঘরে কহিতে লাগিল, ‘‘সারা প্রাণ দিয়েছেন, দাড়া ধরা পড়ছেন তাঁদের সম্মানবক্ষার্থে তাঁদের আদর্শকে সিন্ধির পাথ নিঃতই আমাদের অন্তরের শক্তিকে আরও বড় করতে হবে। বিপ্লবীর জীবনে শোকের প্রকাশ সাধারণ মানুষের মত তা-ছড়াশ করে নয়। আমাদের শোক আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে পেরণা যোগাবে—বীরধ্বজ এমনি করেই শোক প্রকাশ করে আসছে যুগ যুগে...’’

সহসা মিঃ আইয়ারের আহ্বানে তড়িৎকে ঘরের বাহিরে যাইতে হইল। মিঃ আইয়ারের নিকট শুনিতে পাইল যে, ডাঃ কিরণচাঁদ পথে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বনোয়ারী গ্রেপ্তার এড়াইয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু পুলিশের নজর এড়াইতে পারিয়াছে কিনা তাহা সন্দেহ—তাহার বিশ্বাস পারে নাই। স্মরণ্য এ গৃহও আর এক মুহূর্তের জ্ঞানও নিরাপদ নয়। অবিলম্বে তাহার গৃহত্যাগ না করিলে শুধু যে তাহারাই গ্রেপ্তার হইবে তাহা নয়। এ বাড়ীটিকেও পুলিশের আক্রোশের আগুতার কেলিয়া যাউতে হইবে—ভবিষ্যতের আশ্রয় নষ্ট হইবে। স্থির হইল পাইবারের পথেই এক বার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

‘‘বেরিয়ে পড়েই এক বার শেষ চেষ্টা করতে হবে। নৈরাশ্রে ভেঙে পড়লে চলবে না, দমে আমরা কিছুতেই যাব না—এগিয়ে যাবই’’—দৃঢ় কণ্ঠে কহিল তড়িৎ :

প্রশান্ত হাসিতে আইয়ারের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, ‘‘আজ আমার মনে পড়ছে কনষ্টান্টিনোপলের একদিনকার একটি ঘটনা—কে এক জন সিগারেট ধেরে শেষ টুকরোটুকু কেলে দিয়েছিল, তারই আগুনে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হুটি

করেছিল। আমরা প্রত্যেকেই একটা অগ্নি-কুলঙ্গ, একটা বিরাট দেশেও আগুন জ্বালাতে একটু অগ্নি-কুলঙ্গই যথেষ্ট। আমরা মবলেও আমাদের হৃদয়ের আগুন ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে—সারা দেশে জ্বলে উঠবে বিপ্লবের আগুন, আমাদের ভয় হবেই।’’ মিঃ আইয়ারের চক্ষু দুইটি আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল।

তড়িৎ তাড়াতাড়ি অজ্ঞ কোন উপায় না দেখিয়া গৃহকর্তা পান্টানকে ডাকিয়া প্রতিমাকে এই বাড়ীতে রাখিবার প্রস্তাব করিতে সে আশ্বাস দিল যে, প্রতিমার জ্ঞান তাহাদের কোন চিন্তা নাই। যদি তাহার নিজের বাড়ীতে প্রতিমাকে রাখিলে প্রতিমার কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে সে ব্রিটিশ সীমানার বাহিরে তাহার যে-কোন আফ্রিদী বন্ধুর বাড়ীতে প্রতিমাকে রাখিয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। মোট কথা জ্ঞান করুল। বাবুভী যেন নিশ্চিন্ত থাকেন।

তড়িৎ ভিতরে গিয়া প্রতিমার নিকট তাহার এখানে থাকিয়া যাটবার প্রস্তাব করিলে সে কহিল, ‘‘দেখ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের পথে অন্নসংস্কারী পথের কুকুরটাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে স্বর্গে যেতে চান নি। আর তুমি কি বলে আমার কেলে যেতে চাচ্ছ? আমার আর কে আছে তুমি ছাড়া আর তোমার আদর্শ ছাড়া? স্মরণ্যে সকল অবস্থার মধ্যে আমাদের ভীষন এক হয়ে গেছে। আজ এই বিপদের মুখে তোমায় ছেড়ে দিয়ে আমি একান্ত নিশ্চিন্ত আবারে কি করে বসে থাকি বল ত?’’

‘‘বুকে দেখ প্রতিমা, আমি ত কোন স্মরণ্যে স্বর্গে বাচ্ছি নে।’’ বাখিত কণ্ঠে তড়িৎ কহিল।

‘‘তুমি যে কোন মরণসাগরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ তা কি আমি বুঝি নে? যে বিপদের তলোয়ার তোমার কাঁধের ওপর ঝুলছে সে যদি খুলে পড়েই তবে তোমার আমার দুজনার ঘাড়ে একসঙ্গে পড়তে স্মরণ্যে দাও তড়িৎলা—চিরসার্থী বলে যে প্রতিজ্ঞা আমরা করেছি তার থেকে বঞ্চিত হবার কিংবা বঞ্চিত করবার অধিকার আজ আর আমাদের কান্ধরই নেই!’’ প্রতিমার কণ্ঠস্বর দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

তড়িৎ বুকিল তর্ক করিয়া আর লাভ নাই, বাধাভরা কণ্ঠে বলিল, ‘‘তবে চল, আমাদের মিলন বোধ হয় এ যাত্রায়ই সার্থক হবে। প্রতিমার দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া সে গর্গাববোধ করিল।

১১

অনিশ্চয়তার শতবাহু প্রসারিত রাত্রির ব্যাপক অন্ধকার। ইহারই মধ্যে মোটর লহর ছাড়াইয়া খাইবার গিরিবন্ধের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্বয়ং বনোয়ারী গাড়ীর চালক।

রাস্তার দুই দিকেই এবং সামনের দিকেও দূরে দূরে অবস্থিত পর্বতমালা বেন কালো পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া ভারত-প্রবেশের পথে জৈবীক হইয়া পাহারা দিতেছে।

শেষায় ছাড়াইয়া আধ মাইল আগে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর পাশ দিয়া মোটর হস্ করিয়া চলিয়া গেল। তড়িৎ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আইয়ারের দিকে তাকাইলে তিনি বলিলেন, ‘‘এটা হচ্ছে



প্রসিদ্ধ ইসলামিয়া কলেজ, এরই সঙ্গে আছে হোটেল; এখানকার প্রিন্সিপাল হচ্ছে এক জন ইংরেজ—চার জন প্রোফেসরই ইংরেজ, তা ছাড়া এক জন বাঙালী মুসলমান প্রোফেসরও আছেন। পূর্ব-বঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় বাড়ী। আপনাকে খুব চেনেন। তিনি আমাদের পরিচিত এবং সমিতি সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন। খুব সহানুভূতিশীল—প্রয়োজন হলে আমাদের সাহায্য করবেন বলে প্রতিজ্ঞাতি দিয়েছেন। এখানে শিকার নামে ইংরেজপ্রীতি ও ইংরেজ রাজতন্ত্র বৈদ্য ভাগ প্রচার করা হয়। ইংরেজী আদব-কায়দাও খুব শেখানো হয়। তবে তারা কতদূর সার্থক হবে তার বিচারকতা ভবিষ্যৎ। ব্রিটিশের উপর অসন্তোষও আমাদের মধ্যে খুব।”

“একটা কাজ করলে হয় না মিঃ আইয়ার! সংগঠনশক্তি-সম্পন্ন দুই-একটি বঙালী ছেলেকে যদি এখানে ছাত্র করে পাঠানো হয়, এদের মধ্যে আমাদের সমিতির কাজ করবার জ্ঞান। মুসলমান হলেই ভাল হয়—নিদেনপক্ষে হিন্দুকেই মুসলমান করে পাঠাতে হবে।”

“তা ঠিক, হিন্দু-মুসলমান, জৈন, খ্রিষ্টান প্রয়োজন হলে আমাদের সবই হতে হয়। টার্কিতে থাকবার সময় ভারতীয় মুসলমান বলে কত যে নিষিদ্ধ পান! পেরেছি তার আর ইয়ত্তা নেই। আপনাদের সঙ্গে মিশে জাতধর্ম আর কিছুই হইল না।”—আইয়ার হাসিতে লাগিলেন।

“ধরে মুছে যাবে সব বিপ্লবের পবিত্র রক্তগন্ধ! ম্লান করে”—হাসিয়া মন্তব্য করিল তড়িৎ।

তাহার এই ভাবাবে আইয়ার অভিভূত হইল। হাত বাড়াইয়া তড়িৎের সঙ্গিত করমর্দন করিয়া খানপের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার মনোভাব গোপনে আদান-প্রদান করিয়া লইল।

তড়িৎের দৃষ্ট অঙ্ককার ভেদ করিয়া বাহিরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছু দূরেই মনে হইল বেন বেল-লাইন পাতা! আইয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল, “এখানে কি কোন রেলপথ আছে নাকি?”

“আছে, কাছাকাছি একটা ছোট ষ্টেশনও আছে। এই লাইনই খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে ল্যাণ্ডোকাটাল পর্যন্ত গিয়েছে। এ লাইনের ওপর দিলিটারী গোয়েন্দার নজর সচাড়াগ্রন্থ স্তব্ধ! এ পথে বাতায়াত আমাদের মত লোকের জন্ম নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে”—কথার শেষের দিকে কোঁড়কের আভাষ স্পষ্ট।

“আমরা কি জামরদের কাছে এসে পড়েছি?”

“তিন-চার মাইলের মধ্যেই জামরদ। খাইবার গিরিবন্ধের মুখেই হচ্ছে জামরদ কেল্লা, এটা পার হওয়াই হচ্ছে সমস্যা। খাইবার পলিটিক্যাল এজেন্টের অমুমতি ছাড়া জামরদ পার হওয়া নিষিদ্ধ। টোল আপিসে অমুমতিপত্র দেখে, গাড়ী ভাল করে তল্লাসী করে তবে ছেড়ে দেয়। বেলা সাড়ে এগারোটার পর অবশ্য কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দেয় না—আর গুলান থেকে বেড়িয়ে আসবার শেষ

সময় হচ্ছে বিকেল সাড়ে চারটে। জামরদ বেশ ভাল করে শক্ত কাঁটা তারের বেড়ার ঘেরা। কেননা তার চার পাশেই হচ্ছে আফ্রিনীখানদের ছোট ছোট রাজ্য। ব্রিটিশের একটা মাটির তৈরি ছোট কেল্লাও আছে।”

“বেলা সাড়ে এগারোটার পর বগন ঢোকা নিষেধ এখন এই বাহিরেবার আমাদের বাধাপ্রাপ্তি ত নিশ্চিত!”

“তা ত বটেই, তবে গাড়ী এগোতে দেগলে প্রথমটার হয় ত মনে করবে সরকারী গাড়ী—এমন অসময়ে আর কার ঘাড়ে দুটো মাথা থাকতে পারে। তবে নিয়মমত ওরা ধামাতে চেষ্টা করবেই।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী টোল অপিসের সামনে উপস্থিত হইল। গাড়ী অগ্রসর হইতে দেখিয়া যে সাত্তী মোটর ধামাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল তড়িৎ তাহাকে গুলি করিয়া তুলশায়ী করিল। সঙ্গে সঙ্গেই বিপদসূচক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—অজ্ঞান সাহীরা মোটর লক্ষ্য করিয়া রাইফেলের গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। মোটর ততক্ষণে একটা বাক ঘুরিয়া গুলির আওতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

গাড়ীর মধ্যে একটা নীরব উত্তেজনা জন্মিত বাধিয়া রহিয়াছে। গাড়ী ক্রমশঃ চড়াই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। দূরের শ্রেণীবদ্ধ কালো পাহাড়গুলি একবার অগাওয়া আসিতেছে, আবার গাড়ী মোড় ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেবাও ঘুরিয়া যাইতেছে। এইটু পর পরই সাইনবোর্ডের মত কি দেখা যাইতেছে।

“এগুলি মোটর চালকদের সাবধান করার সঙ্কেত। সাবধান গাড়ী চালিও বানোয়ারী।” বানোয়ারীর প্রায় কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন আইয়ার। একটু পরে পুনরায় বলিলেন, “ইংরেজদের হতৎ থেকে আমাদের এখন পিছু নেওয়ার ভয়, আর আশপাশ থেকে ভয় আছে আফ্রিনীদের কাছ থেকে। কেননা ওরা হয়ত ভাবছে এ গাড়ী ইংরেজদের।

খাইবার গিরিসঙ্কটের মধ্যে গাড়ী চুকিতে তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। কিন্তু পাহাড়ের চড়াই উৎরাই স্রু হইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ মনে হইল এক বিরাট পাহাড় তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইতেছিল পথ এগানেই শেষ। একটু অগাওয়া আসিলেই অবশ্য পথ দেখা যায়। এখান হইতেই পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া আঁকিয়া-বাকিয়া পথ উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে। এক দিকে বিরাট গাদ, আর অপর দিকে পাহাড়ের উচ্চ গাত্র। গাদের দিকটার মাঝে মাঝে লোহার বেড়া আছে—কিন্তু চলন্ত গাড়ীর থাকা সামলাইবার মত মজবুত নয়। কাজেই হাত কসকাইলে ঐ পাহাড়ের পাদদেশে বন জঙ্গলের মধ্যে কয়েক শত ফুট নীচে চিবসমাধি লাভ করা ছাড়া গতাস্তব নাই। বাস্তব অগণিত বাক, মাঝে মাঝে পুলও আছে।

গাড়ী এদিক ওদিক হেলিয়া আস্তে আস্তে গো গো করিয়া উপরের দিকে উঠিয়া চলিয়াছে। বারে বারে গিরার বদলাইবার প্রয়োজন হইতে লাগিল। দিনের বেলাতেই যে পথে মোটর

চালানোর বীতিমত ওস্তাদির প্রয়োজন, সেই পথে এই নিবিড় অন্ধকারে মোটর চালানো যত্নকেই চ্যালেঞ্জ করার মত।

বানোয়াড়ী একবার মাত্র এ পথে আসিরাছে। কিন্তু তাহার প্রাণের স্বর্ণশক্তি এবং চর্তুত্ব সাহস বজ্রকটিন হাত তাহাকে লইয়া চলিরাছে উপরের দিকে ভূতে পাওয়ার মত। কোনও দিন পিছু হটে নাই—আজও পিছু হটিয়া আদর্শের অমর্যাদা করিবে না।

আইয়ার বলিলেন, “ওর বাচাছুবি আছে বটে! এখানে দিনের বেলাই গাড়ী চালানো কঠিন, তা বানোয়াড়ী গাড়ী চালাচ্ছে যোব অন্ধকারের ভিতর দিয়েই। তাও একবার মাত্র এই রাস্তায় এসেছিল, সেই দেবার যখন আপনি ওকে জেলালাবাদে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।”

উত্তেজনার আবহাওয়ায়কে হাফা করিবার জন্য তড়িৎ প্রতিমার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, “জানো প্রতিমা বানোয়াড়ীর হাত কসকালে, একটু ঈশ্বরবিরুদ্ধের গোলমাল হলে আমাদের কি গতি হবে।”

“ছোটবেলায় শুনেছিলাম, পুণ্যবানেরা সশরীরে স্বর্গে যায়—সুতরাং পুণ্যের ছোর ততটা না থাকলেও আমাদের সম্মান স্বর্গ-প্রাপ্তি নিশ্চয়—সাধ্য কি ইংরেজ আমাদের পারবে পাবে!” প্রতিমার জবাব দেওয়ার আগেই সর্কোতুকে মস্তকা করিল আইয়ার।

প্রতিমা তড়িৎের কাছে আরও সরিষা ঘন হইয়া বসিল, কানের কাছে মুখ লটুয়া কহিল, “এমনি কবে একসঙ্গে তেমন সৌভাগ্য কি আমার হবে!”

“সেদিন গঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে বলেছিলে তোমার ফুল-শস্যার কথা, ময়ুরাজির কথা। সেদিন বোধ হয় কথাটা অমনিতেন্তে বলেছিলে। কিন্তু আজ বোধ হয় এসেছে আমাদের বজ্রকটোর মধুরাজি, কঠিন পাষণ-শস্য।”—তড়িৎ প্রতিমার কানে কানে চুপি চুপি কহিল। প্রতিমাকে আরও একটু নিবিড় হইবার জন্য বা হাত দিয়া আকর্ষণ করিল। ভান হাতে তখনও পিঙ্কল থরা আছে। আজ আর প্রতিমা ফুলশস্যার কথায় লক্ষা পাইল না।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের মাথায় আলোর দিকে তড়িৎ ও প্রতিমাণ দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া আইয়ার কহিল, “ওগুলি হচ্ছে গিয়ে সাহীদদের পিকট বস্ত্র। মাটি থেকে মই বেয়ে ওগুলিতে চড়তে হয়। ওপরে উঠেই ওরা মইগুলি তুলে নের—নয়ত পাড়াড়িয়ারা গোপনে উঠে ওদের অসতর্ক মুহুর্তে ওদেরকে খুন করে অজ্ঞপ্ত নিয়ে যেতে পারে। এমনি ঘটনা অনেক ঘটেছে—তাই এই সতর্কতা।”

তড়িৎ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই তাহার মনে হইল, এই পিকট বস্ত্রগুলি হইতে আলোর সাহায্যে কি বেন সঙ্কেত করা হইতেছে। মিঃ আইয়ার দৃষ্টি সে ব্যাপারে আকর্ষণ করাইয়া দিল, “এতক্ষণ নিশ্চয়ই জামকন টোল আপিস থেকে টেলিফোনে খবর এসে গিয়েছে। এদেরকে বোধ হয় আমাদের পিছু নিতে কিবা পথরোধ করতে নির্দেশ দিয়েছে।”

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আইয়ার কহিল, “আজ প্রকৃতিও বোধ হয় আমাদের বিরুদ্ধে—মনে হচ্ছে, শীঘ্রই আকাশ ঝড়ে ফেটে পড়বে। তখন কি আর গাড়ী চালানো সম্ভব হবে।”

“আমরা এখন সমস্ত সম্ভব অসম্ভবের বাইরে চলে গিয়েছি—একটা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের খামলে চলবে না দোস্ত! আমারও মনে হচ্ছে এই ঝড়ই আমাদের বাঁচিয়ে দেবে পেছু নেওয়ার হাঙ্গামা থেকে।”—অভয়বাণী উচ্চারণ করিল বানোয়াড়ী।

দিনের বেলা হইলে দেখা যাইত, কয়েকটা রাস্তা সমান্তরাল ভাবে সিঁড়ির মত পর পর উপর হইতে নীচে পর্যন্ত স্তরে স্তরে সাজানো। ইঠাং দেখিলে মনে হইবে ইহার পদশব্দবিচ্ছিন্ন। এগুলি একই রাস্তা, পাহাড়ের গা বাঁচিয়া কখনও উপর দিয়া কখনও নীচে দিয়া চলিয়াছে।

মিঃ আইয়ার বসিয়াছিলেন গাড়ীর বাঁ দিকে। আলোর বলকানিতে পথ হঠাৎ অগ্নিকের তন্ত্র উদ্ভাসিত হইয়া পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। এ আলো বিদ্রোহের নয়। তীব্র সাদা লাইট ফেলিয়া অগ্নির হইতেছিল তাহাদের পিছু ধাওয়া করিয়া সরকারী গাড়ী! কলকাতা এখন সকলের নিকট অতি স্পষ্ট আকারে আবার দেখা দিল!

“আলি-মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারলে আজকের মত রক্ষা পাওয়া যেত। ওখানে এক আফ্রিকী পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আশ্রয় চাইলে কাউকেই ফেরায় না—আর আশ্রয় দিলে জান দিমেও রক্ষা করতে চায় আশ্রিতকে।”—ডাইভারের সীটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠ কহিলেন মিঃ আইয়ার।

“আলি-মসজিদ কত দূর?” প্রশ্ন করিল তড়িৎ।

“খুব বেশী নয়। তবে চড়াই-উঁচুই করে, আর আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে একটু সময় লাগবে বৈ কি।”

“ওখানে সেনানিবাস নেই?”

“আছে। তবে খুব বেশী লোক নেই। হুঁ একটা দোকান আর আছে একটা মসজিদ। আলি নামক এক মুসলমান ফকিরের নামেই এ জায়গা ও মসজিদ। ওখানে মালচলাচলের একটা রোপ ট্রান্সপোর্ট স্টেশনও আছে।”

“পেছন থেকে ওরা আমাদের কত দূরে আছে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা খুব বেশী দূরে থাকলে হয় ত শেষ পর্যন্ত ধরতে নাও পারে।” সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করিল তড়িৎ।

“পেছন থেকে ওরা আমাদের নাগাল পাবে না। ওরা আসছে সাবধানে নিজেদের জান বাঁচিয়ে—ওদের গতি আমাদের চেয়ে নিশ্চয় কম—সামনে থেকে কেউ আক্রমণ না করলে...”

কথা কহিতেছিল বানোয়াড়ী। তাহার বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়াই প্রতিমা সকলের দৃষ্টি উপরের দিকে আকর্ষণ করাইয়া কহিল, “দেখুন, দেখুন ওপর দিক থেকেও বেন একটা আলো এগিয়ে আসছে।”

এতক্ষণ সকলেই নীচের দিকে তাকাইয়াছিল, নীচেব আলোর

পতিপথ লক্ষ্য করিয়া, এবার উপরের আলো দেখিয়া উভয় দিক হইতেই আক্রান্ত হইতেছে দেখিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিল।

“মিঃ আইয়ার। প্রতিমা, এস সবাই আমরা পিস্তল নিয়ে তৈরি থাকি একবার শেষ লড়াইয়ের জন্য।”—নির্দেশ দিল হুডিং।

“গাড়ীতে গাড়ীতে কলিশন করিয়ে দিয়েই একবারে ওদের সঙ্গেই সহমরণে গেল হুডিং না।” তখনও আইয়ার তার সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা হারায়ে নাই।

“তা মন্দ নয়—কিন্তু আমি বলি আপনারা এখানে নেমে যান।—আমি একা চলে কবর।”—মন্তব্য করিল বনোয়ারী।

আইয়ার—“এখানে নয়। তা হলে ধরা পড়ে যাব। এখানে-কার পাণ্ডাদের ইংরেজরা অনেক টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে। আর একটু এগিয়ে—তার পর এক চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তোমাদের ছেড়ে ত আমরা যেতে পারব না।”

বনোয়ারী একটি অদ্ভুত হট্টয়া বলিল, “এখন ভাব-নিজাসের সময় নয় আইয়ার বাপু। এখন আমাদের একজন বাকলেও আমাদের অনেক লাভ।”

প্রতিমা—“সামনের গাড়ীটা যে বড় নিকট। এসে পড়ল।”

আইয়ার—“না, এখনও একটু দূরে আছে। তবে ওদের ঘাইকালের পালা বেশী। সঙ্গ মেশিনগান এমন থাকলে ত কবরটা নেই।”

আইয়ার আরও কি বলিতে বাটতেছিল, কিন্তু তখন প্রলির আওরাত সকলেই সচকিত হট্টয়া উঠিল। তুলি বিদ্য হট্টয়াছে আইয়ারের বকে। তিনি বাতীর বুক শক্ত করিয়া চাপিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, “বিনা হুডিং বাবু, বিনা প্রতিমা দেবী, বনোয়ারী তোমাকেও ভাবনাট অমর জিরদগার সঙ্গল—যদি পুনর্জন্ম থাকে তবে যেন আমরা আবার স্বাধীন ভারতের পরাক্রমে মিলিত হতে পারি। চেষ্টাছিলম ওদের সঙ্গে আলিসন করে মরতে। কিন্তু...” তাঁহার কথা শেষ হইল না। সন্ধ্যার ভাঙা দিশালী বীর বাবু আইয়ারের পাবার মতামতে বিগীন হট্টয়া গেল। হুডিং অস্ত্র হুডিং অস্ত্র দেও মেরের মীর পিচনে এলাটয়া দিল। প্রতিমা তার তার করিয়া টাকার করিয়া টটিল।

হুডিং প্রতিমাকে সাধুনা দিয়া কহিল, “এখন চল ওদের সময় নয় প্রতিমা। দেখ নি মিঃ আইয়ার চরম সঙ্কটমুহুর্তে ওদের প্রাণের কথা বান নি, তিনি ত আমাদের আদর্শ হয়ে রইলেন। এখন তো কানবার সময় নয়, আমরা সঙ্গে নেমে এসে।

তার পর বনোয়ারীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “নিখল আর আমাদের গাড়ী চালানো। গাড়ী থামিয়ে দাও। আমি আর প্রতিমা প্রথম নেমে পড়ছি, তুমিও নেমে এস, তার পর এক পাশে গড়িয়ে এমন ভাবে চালিয়ে দাও যে গাড়ীটা পাদে পড়ে যায়। গাড়ী পাদে পেললে ওরা মনে করবে বিপদ হয়ে গাড়ী উল্টে গেছে আর আমরাও তলিয়ে গেছি তার সঙ্গে। ওরাও নিশ্চিন্ত হবে।

আর এক মুহূর্ত দেখী নয় বনোয়ারী। বড়ও বোধ হয় এসে পড়ল, এতে আমাদের সুবিধেই হবে।”

বনোয়ারী গাড়ী থামাইয়া কহিল, “আপনারা নেমে যান, আমি ঠিক নেমে পড়তে পারব।”

হুডিং ও প্রতিমা গাড়ী হট্টতে নামিলে বনোয়ারীও নামিল। ভবিষ্যৎ নীচে হুডিং হুডিং তার বাড়াটয়া গাড়ীতে টাট দিতে পারিলে। কিন্তু নীচে নামিয়া দুই-একবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া পেল একা ‘গীয়ার’ ঠিক নাই। এই ‘গীয়ার’ ঠিক করিয়া মনে হলে গাড়ীতে বসিয়া টাট দিয়া ফেলিল। গাড়ী এক নাক দিয়া পাদে মদে কপোতয়া পড়িল। বনোয়ারী তখন নামিবার শেষ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারেন নাই।

প্রতিমা শক্ত করিয়া হুডিংকে হুডিংটা পাদে কহিল, “বনোয়ারীও আমাদের ছেড়ে গেছে হুডিংনা।”

হুডিং কিছুক্ষণ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেকে প্রতিমার বক্তব্যকন হট্টতে দৃষ্টি করিল। “আপনার সব শেষ হ’ল। কিন্তু আমাদেরও শেষ হয় নি, শেষ হয় না কখনও। তুমি আমিও এখনও বেঁচে আছি। আগে আছে আমাদের অনিশ্চিত প্রতিমা মদে। আমাদের পথ হতে নেই, কিন্তু তুমি নিরশ হতে নেই। আমাদের চেপে ধর সামান্য আশার আলো কখনও নিভে যায় না। এগিয়ে আমাদের যেতে হবে—পায়ের তলে একটু। চল, আর দেরি নয়। ওদের গাড়ীটা প্রায় এসে পড়ল।”

অধিকারে দাঁড়াইয়া বনোয়ারী আইয়ারকে এক বার মনে মনে শেষ ভবিষ্যৎ জ্ঞানটয়া হুডিং প্রতিমার তা শক্ত করিয়া বলিল। তারপর দাস্তা পরিচালনা করিয়া পাদে মদে টুকিয়া পড়িল।

নিবিড় অন্ধকার, মাকে মাকে সামনে আর অগম্য কন্যা যায় না। এদিক-ওদিক করিয়া, চলিতে হট্টতেছে—প্রায় অন্ধের মত।

ততকালে বাড়ের প্রায় তত্ত্ব পাদে মদে এক মাশটয়া তুলিয়াছে। দুলি-কাঃ অধিকার নিবিড়তার হট্টয়া উঠিল। দুলিকা আসিয়া তারবেগে দুল অস্বস্ত করিতেছে, মনে হয় অসংখ্য সূচ ফুটাইয়া নিতেছে। কিন্তু তুমি হুডিংয়ের গতি লক্ষ্য হট্টল না। হুডিং সামনের দিকে ককিয়া পড়িয়া প্রতিমাকে একদকম টানিতে চানিতেই লটয়া চলিল।

“দলোয় যে চোখ বন্ধ হয়ে এল হুডিংনা।”

ও তুমি চোখ বন্ধ করেই চল প্রতিমা, কেননা চোখ খোলা রেখেও এখন কিছু লাভ নেই।”

শিলাময় বন্ধ পথে বারে বারে চোঁচ পাটতে লাগিল। পেশোয়ার হট্টতে তাড়াকড়া করিয়া আসিবার সময় প্রতিমা জুঙ্গ হুলে ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহার পা স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়াছে। বস্ত্রা বোধ করিতে লাগিল।

“এখানে কি পথ নেই তড়িৎলা—আর যে হাঁটতে পারছি না, পায়ের লাগছে !”

তড়িৎ—“এ ত পথ নয় প্রতিমা ! মানুষের পায়ের চলায় পথ নয়। অতানা পাতাড়ের উপর দিয়ে আমরা চলেছি। আর এই অন্ধকারেই চলতে হবে, এখানে কেউ আলো দরবে না। আমাদের অস্ত্রের আলোতেই, আমাদের বিশ্বাসের আলোতেই এই নীরব অন্ধকারে পথ নেপে চলতে হবে। এ দুঃখোগ খামবে—তুমিও রাজিও অবসান হবেই, অন্ধকারের বুকে যে আলো লুকিয়ে আছে তাই অন্ধ আলোয় ফুটে উঠে পূর্ণকাশে আত্মপ্রকাশ করবে। চল, একটু পেরেই ঐ মেঘের কোলে রূপালী রেখা দেখতে পাব। দেখতে পাব না মাঝে মাঝে মেঘের কোলে বিহীন চমকোচ্চ—তারই সত্যে আজ আমি পথের নিশানা করে নিছি। আর এই ফণিকের রূপালী রেখাট একদিন অনন্ত আলোর বাজো আমাদের পৌঁছে দেবে।” সন্তানের সরে প্রতিমাকে কঠিল তড়িৎ, “চল, আমরা আলোক-পথযাত্রী। ওখানে আমাদের পৌঁছতে হবে।”

• তড়িৎর মনে ওঠল প্রতিমা আর কিছুতেই পায়ের ভর দিয়া চলিতে পারেনোহে না। পা তাতার যেন ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। প্রতিমা আর মাথা খড়্খড়িতে পারিতেছে না। চলিতে চলিতে • তড়িৎর কাঁধে মাথা রাখিল। তড়িৎ তাড়াতাড়ি ভাড়াটায় দরদার কোলে তুলিয়া লইয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল।

“আমরা দু’জনেই কি একসঙ্গে ঐ আলোর দেশে পৌঁছতে পারব ?” ফণি কণ্ঠে প্রশ্ন করিল প্রতিমা।

তড়িৎ—“কি জানি ! দু’জনেই পারব কিনা জানি নে। তুমি যদি পড়ে যাও, তোমাকে বেগে আমি এগিয়ে যাব, পিছন ফিরেও চাইব না। আমি যদি অক্ষম হয়ে পড়েই থেমে যাই, তুমি কি আমার ফেলে রেখে, পেছনে না তাকিয়ে, একলা এগিয়ে যেতে পারবে না। সাধা না জোটে একলাই যে আমাদের চলতে হবে। এই ভরসাটুকু লাও প্রতিমা।

“গতিই আমাদের সাথনা—গতিই আমাদের আশ্রয়।”

“আমি পারব, তড়িৎলা, আমি সব পারব, আমি যে তোমারই পিয় শিষ্য। তোমার চেয়ে তোমার আদর্শকে যে আমি বেশী ভালবাসি। নিবিড়ভাবে ভড়াটয়া ধরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল প্রতিমা।

“আজ আমার বড় আশঙ্কের দিন প্রতিমা ! এটি যে কণ্টকাকীর্ণ শিলাময় বক্ষর পথ—এটি যে গভীর অন্ধকারে অন্ধার মাতামাতি একে ভেদ করে চলতে হবে আমাদের ঐ কেটি কেটি নয়নারীর জনয়ে বিপ্লবের আশ্রন জালিয়ে তুলতে—এই মুহুর্তে তোমার আশ্রয় পেয়ে আমার মনে হচ্ছে আজই আমাদের জীবনের স্রেষ্ঠ শুভ মুহুর্ত—এই মুহুর্তেই এসেছে আমাদের মধুরজি !

সমাপ্ত

## ভাড়াটে ঘর

রওশান আলি শাহ্

ছোট একখানি ভাড়াটে টালির ঘর  
রূপনারায়ণের বাকটার কোল ঘেসে,  
নেপায়ার ঘাসে ঢাকা পূর্বদিকে চর  
শুপারি-ভাসের নিরিবিলা পরিবেশে।

ভরা কোটালের ফাপা জোয়ারের ভল  
ভাড়াটে ঘরের ভিত্তি চুয়ে চুয়ে যায়,  
মড়া পোড়ার কণা, কচুরীদল  
ভেসে এসে ঢেকে জেলে ডিক্টিয়ার গায়।

হিজল বনের নিষ্কুম মরফিয়া  
নিয়ে আসে কোন স্বপনের নিবিড়তা,  
দীর্ঘে নেমে আসে দূরের না-পওয়া প্রিয়া  
স্মৃতি-পদ্মাস্তে পুরণো দিনের কথা।

ওপারে বিরাট গ্রাসাদের ছায়া বত  
ভাড়াটে ঘরের কাছে কবে মাথা নত।

## চিত্র-প্রদর্শনী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার রাজ্যপাল ডক্টর ব্রীহৎসেনকুমার যুগোপাধ্যায় গত ১৮ই ডিসেম্বর ষাটঘরে একাডেমী অব ফাইন আর্টসের অষ্টাদশ বাৎসরিক সম্মেলন-প্রদর্শনীর স্বাগতবাচন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে অঙ্কিত প্রায় পাঁচ শত চিত্র এবং চক্ৰশিলা ভাস্কর্য্য নিদর্শন

এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। দেশীয় শিল্পীদের চিত্র ছাড়া রুশিয়া, জাপান, ইটালী, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া এবং আমেরিকার কয়েকজন শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রশিল্পও এখানে প্রদর্শিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পীর মান সম্মেলন কাজের এই সমাবেশের মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের দেশে চিত্রকলায় ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি উপলব্ধির সুযোগ হয়েছে। এই সাম্প্রতিক প্রদর্শনী এদিক থেকে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

আজিকের ক্ষেত্রে ভারতের শিল্পের প্রধানতঃ দুই বকম ধারায় শিল্পচক্র করেছেন। একটাকে বলা হয় ভারতীয় পদ্ধতি, অপরটি হ'ল পাশ্চাত্য পদ্ধতি। ধারা ভারতীয় ধারা অবলম্ব করে শিল্পকর্ম করেন তাঁদের দারও দারও চিত্রে দেখা যায় লোকশিল্পের আজিকের প্রভাব, কারও-ব শিল্পকলার অবনীন্দ্র-নন্দলাল-প্রবর্তিত ধারার প্রভাব। কেউ আঁকেন প্রকৃতিগত রূপ (realistic form), কেউ আঁকেন বস্তুর আলংকারিক রূপ (decorative form)। অর্থাৎ,

কারও ছবিতে দেখা যায় বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণে আজিকের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নব রূপায়ণের প্রয়াস। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন "ism"-এর প্রভাবও বহু চিত্রে দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ধারা চিত্রকর্ম

করেন, তাঁদের কাজের মধ্যেও রয়েছে নানা ধরনের আঙ্গিক—ক্লাসিক্যাল, ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেসিভিজম। অতি আধুনিক 'ism'-এর প্রভাবও দেশের শিল্পকলায় প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পীর কাজে এসবের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা



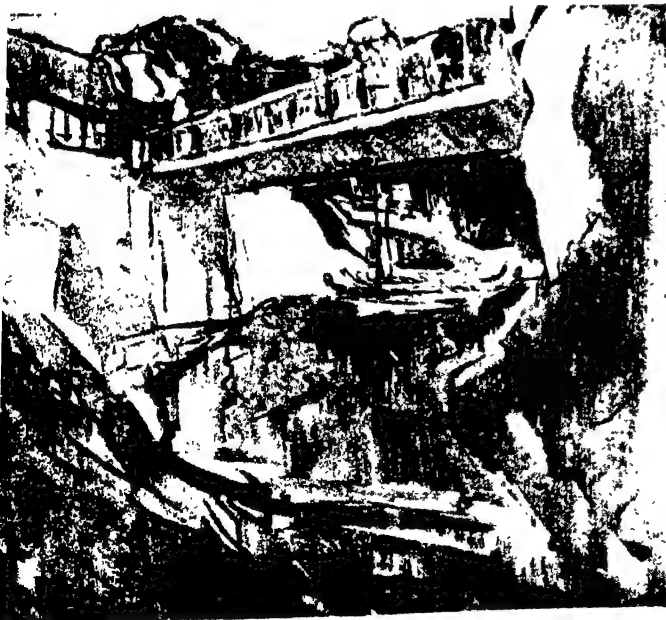
নীল বড়ের পরিচ্ছদে একটি মেয়ে শিল্পী—ঈদগমণী রায়

যায়। ইউরোপীয় শিল্পের এবনুটাক্টি আর্টের রূপ ও আজিক —অবচেতন মন, কল্পনা এবং গুঞ্জির যথেষ্ট বিকাশ। আলো-ছায়া ও বস্তুর স্থূলরূপে অবলম্বন করে বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত ভাবধারা, কল্পনা ও গতিবেগ এবনুটাক্টি আর্টে রূপায়িত



রংগের স্বর্ণ

শিল্পী—ক্রিমোতন বি. সামন্ত



লাল সেতু

শিল্পী—শ্রী কে. সি. এস. পাণিকার

হয়েছেন ব্যক্তিবাদী শিল্পীরা। আমাদের দেশের কোন কোন শিল্পীও সেই পথে শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা খুঁজছেন। বর্তমানে

এই বিকৃতি চিত্রের ভাবপ্রকাশ বা অলঙ্করণের ক্ষেত্রে আদৌ সহায়ক নয়। ডেসমণ্ড ডয়েগের “বড়ের পুর্বে” ছবিটির

দব দেশের চিত্রকলায়ও দেখা যায়—  
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সমস্তাসমূহ  
জীবনের রূপায়ণে নানা আদিক ও  
ভাবধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আদিকের  
ক্ষেত্রে এই বিবর্তন আমাদের দেশের  
অনেক শিল্পীর বসচৈতন্যকে আকৃষ্ট  
করেছে—যার সাহায্যে তাঁরা ভারত-  
শিল্পের নব-রূপায়ণের চেষ্টা করছেন।

শিল্পকলা অবশ্য স্থির ভাবে এক  
জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, প্রচলিত  
সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি শিল্পকলার  
অগ্রগতির পথে বন্ধনস্বরূপ। সংস্কারযুক্ত  
হলেই শিল্পকলা গতিশীল হয়—নতুবা  
হয়ে ওঠে গতানুগতিক। তাই নব-  
ভাবধারার সংশ্লিষ্ট, বিভিন্ন আদিকের  
অনুশীলন, নূতন পথসন্ধানের প্রয়াস  
শিল্পকলার নূতন প্রাণসঞ্চারের লক্ষণ।  
তবে এ কথাও বিশেষভাবে উপলব্ধি  
করা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র আদিকের  
অনুকরণে ‘ফ্যাশন’ সৃষ্টি হতে পারে,  
সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয় না। অনুকরণে  
এবং অনুসরণে প্রভেদ আছে।

এবারকার চিত্রপ্রদর্শনীতেও অনেক  
শিল্পীর চিত্রে লক্ষ্য করা যায় নূতনত্বের  
প্রয়াস। মোহন বি. সামন্তের রচনারীতি  
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তাঁর  
চিত্রগুলিতে ভ্রমিং, রূপ এবং বর্ণযোজনায়  
প্রাচীরীতিমূলভ—বিশেষভাবে রাজ-  
পুত, পারস্য ও মিশরের আদিম  
চিত্রকলার ধরনের প্রভাব রয়েছে।  
সর্বোপরি স্বকীয়তায় এবং অভিনবত্বে  
এঁর চিত্রগুলির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব  
হয়েছে। কোন কোন চিত্রে মানুষের পা

আঁকা হয়েছে খানিকটা দুটুকটু ভাবে।

বিষয়বস্তু এবং রচনারীতি প্রতিভার পরিচায়ক। বড়ের আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত বিভালের পিঠ-বাকানো ভঙ্গীটি মনোহরম ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এঁর আঁকা “রাতের পথ”, “গৃহভাস্তর” সার্থক রচনা। স্মৃদর্শন বেনেগালের “দূর্গায়মান”, “রোপণ” চিত্রেও দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব রূপের মাধুর্য এবং পরিচলনার কুশলতা আছে। রামকিঙ্কর বেইজের “কুমক” এবং রামকুমারের চিত্রে এবস্ট্রাক্ট আর্টের ক্ষেত্রে সার্থক প্রয়াস। ত্রিযুক্তা দময়ন্তী গাওলার রচনার ক্রাফট এবং উজ্জল রঙের ব্যবহার, সংযত সংক্ষিপ্ত রেখার গঠনের এবং ভাববিস্তারের প্রয়াসে নূতনত্ব আছে। শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের



ফেরি-ঘাট

শিল্পী—জি.রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



দাঘ

শিল্পী—জি.সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়





হরেন বিনে দল - হরেন - প্রিয়দেবী দল

১৯৪২ খ্রিঃ প্রথম : কলকাতা সেনেট দৃষ্টিকটু। সাদা কালার কাজের ভেতর মাখন দত্তগুপ্তের  
বচনকে অধিকার অর্জন করে সফল হয়েছে। ডবলিউ. কাজগুলি সজীব এবং সরস। হরেন দলের কাজগুলির

এইচ. ব্রাকবার্ণের “সাদা বিড়াল”  
পরিচালনা এবং আফ্রিকের শরণ  
মনোরম। ভবষণ সাত্তালের রচনা-  
রীতিতেও বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া  
যায়।

জলবন্ত বিভাগে গোপাল ঘোষের  
“ভরঙ্গ” এবং “মাছ ধরা” নিপুণ কাজ।  
এঁর ঐক্য চিত্রগুলি বর্ণ ও তুলিকা-  
সম্পন্ন তের মাধ্যমে ভরপুর এবং শিল্পীর  
নিজস্ব আঙ্গিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কানাই  
কম্বাকারের ছবিগুলি গতানুগতিক  
পদ্ধতিতে ঐক্য চিত্রের মধ্যে ভাল  
কাজ। বোমেন দ্বৈ-অঙ্কিত কতকগুলি  
চিত্র খেলা শরণের বর্ণসমাবেশে



ভরঙ্গ

শিল্পী—প্রিয়দেবী ঘোষ

মধ্যে দক্ষতার পরিচয় আছে, তবে চিত্রে বসসমাবেশের পরিধি কম বলে মনে হয়। সুশীল সেনের “এটিং” এবং মুহাম্মদ চক্রবর্তীর “তালগাছ” ডাইপয়েন্ট মনোজ্ঞ কাজ।

তেলরঙের কাজের বিভাগে পানিকারের “লাল সেতু”র পরিকল্পনা, বর্ণযোজনার অভিনব স্বাতন্ত্র্য ছবিটিকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করেছে। লাল রঙের ব্যবহারেও ছবিটি সরস হয়েছে। “ভোরবেলা মাঠের পাশে” ছবিখানাও একই রীতিতে আঁকা। এখিল সি. সিয়ার “তই বোন” চিত্রের রঙের ব্যবহারে শিল্পীর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। জগদীশ রায়ের “দিপু”, “নীল পলিচ্ছাদে একটি মেয়ে” চিত্র দুখানি প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের সার্থক প্রয়াস। এঁর আঁকা ছবিগুলিতে দক্ষতা এবং প্রতিভার ছাপ আছে। সুশীল সেনের “গৃহস্থালি”, অনিল ভট্টাচার্য্যের “নিওলা রান্নাঘর”, “অন্তর্গামী কন্যা” ছবিগুলি নূহ এবং বর্ণযোজনার পরিপাট্যে মার্যামণ্ডিত। দ্বিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নেপল্‌সু” এবং “একটি প্রতিকৃতি”, ডি. পিওরিফিকাটো অঙ্কিত “ব্রোমের গ্রাম্য মেয়ে” দক্ষিণ রচনা। চিত্রকলাক্ষেত্রে অতি আধুনিক পাশ্চাত্য-প্রভাবযুক্ত কাজগুলিতে নৃতনত্বের চমক আছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, রূপ, ছন্দ বা ভাবের যথাযথ বিকাশ, আঙ্গিকের কুশলতা, স্বেচ্ছা বা সারল্য এসব কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রদোশ দশগুপ্তের “অবসর বিনোদন”

রচনার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সুশীল পালের “ভূমিকম্প” পরিকল্পনা-নৈপুণ্যে সার্থক হয়েছে। ত্রীদাম সাহার “তুতু” সুন্দর প্রতিকৃতি।

ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগে সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “দাছ” চিত্রটির বিষয়বস্তু এবং রচনানৈপুণ্য সর্বোপরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলবোলার নল হাতে উপবিষ্ট দাছ নববধূর মুখখানি দেখছেন! নববধূ নাতনীর হাতে বরমালা। দেয়ালের আড়ালে দণ্ডায়মানা মায়ের মুখে কৌতুকের মুছ হাসি। এঁর কাজগুলির মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য আছে যা সহজেই মস্তিষ্কের মনে সাড়া জাগায়। সমর বোসের এবারের কাজগুলিতে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু চক্চকে খেলা রঙের ব্যবহারে ছবির মাধুর্য্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ ব্রজ, সুশীল মজুমদার ও শান্তি মুখোপাধ্যায়ের কোন কোন কাজের ভিতরে শিল্পীস্বত্ব বসে সন্ধান আমরা পাই। দীপেন ব্রজের “নাড়ুগোপাল” সার্থক রচনা। ইলজ ছপারের চিত্রগুলিতেও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদায়ের প্রাক্কালে ক্রীমতী ও মালতী” উল্লেখযোগ্য কাজ। গোপেন রায়ের “ব্রাহ্মপুত্র ও অজগর”, “শুষ্কপত্রী নৌকা” চিত্র দুখানির আলঙ্কারিক দরগটি মনোরম হয়েছে। রূপকথা অবলম্বনে আঁকা এঁর ছবিগুলিতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে।

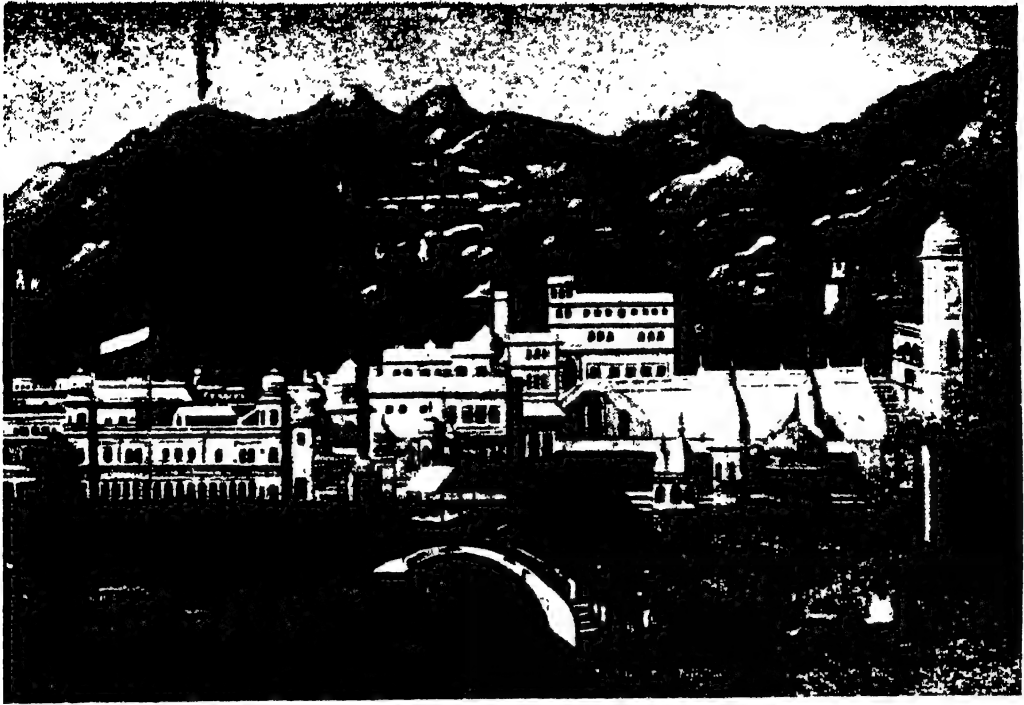
## নবীন প্রভাত

সুফী মোতাহার হোসেন

যে জন সৌন্দর্য-স্বপ্ন স্বপ্নোপম যে শিল্পসাধনা  
ভাঙে নতুন নামে দেবতার পরম বিকাশ  
তাহার পূর্বের দিগা আপনাতঃ কলক প্রকাশ  
মনন-মননীর সং বুদ্ধি-স্বপ্নে লভিয়া চেতনা।  
সে সন্দের বুদ্ধি মনে হবে শুধু দেবতা-বন্দনা  
মুগ্ধ ভগবান দিবে আপনার লীলার অভাস,  
দেবতার মত দেখা নমনীয় করিবে সম্ভাষ  
লীলা-সুন্দরের স্বপ্নে মজলের করিবে বোধনা।

সুপ্ত ভগবানসম শিল্প রচে মাধুর্যের মাঝে  
বাণীর স্বপ্নে আর স্ফোতিত্বের আলোর স্বপ্নে  
বহিরা স্বপ্নের তুয়া সৌন্দর্যের স্তব্ধ দেখানে।  
তাগারি আনন্দ-মুগ্ধ বিকাশের সর্ব কথ্যে জানে—

নবীন প্রভাত হোক বিবর্ত মানব-জীবনে  
আলোকে স্তম্ভিত নাত উষাসম কলোমলো সাধে।



হরি কী পৈড়ী ও ব্রহ্মবুড়, হরিদ্বার

## কুম্ভমেলার ইতিবৃত্ত

শ্রীমন্দেরানন্দ বিজ্ঞাবিনোদ

এ বৎসর নাথানাসে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হইতেছে। এই মেলায় সমগ্র ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু, সন্ন্যাসী, পুণ্যাখী, ধর্ম ও বিভিন্ন মতপ্রচারক সকল শ্রমীর ব্যক্তিগণই সমবেত হন। কেহ কেহ কুম্ভমেলাকে সাধুসন্ন্যাসিগণের কংগ্রেস, কেহ কেহ বা পৃথিবীর বৃহত্তম সম্মেলন বলিয়া মনে করেন। পূর্বে কুম্ভমেলায় সাধু-সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীগণই সমবেত হইতেন। কিন্তু ক্রমে এই মেলা সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবমায় প্রভাবিত জনতাশ্রয় হইয়া পড়িতেছে। অনেকে মনে করেন বর্তমান বৎসরে প্রয়াগে যে কুম্ভযোগ উপস্থিত হইয়াছে, গত শত বৎসরের মধ্যেও এইরূপ যোগ হয় নাই।

### প্রয়াগে মাঘস্নান

শ্রবণাভীত কাল হইতে প্রয়াগে মাঘ-স্নানার্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের সম্মেলন হইয়া আসিতেছে। প্রয়াগে মাঘ স্নান করিলে শ্রীহরির সন্তোষ উৎপাদন ও তৎফলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হইবে। শ্রীসনাতনগোষামিপ্রভূপাদ শ্রীহরিভক্তিবিশ্বাসে শাস্ত্রব্যাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেরূপ হরি-দেতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, আশ্রম নিকলিশেষে জীবমাত্রেরই

অধিকার, সেইরূপ মাঘস্নানেও সকলেরই অধিকার আছে— শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ থাকায় মাঘস্নানে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়—ইহাই তাৎপর্য। ১। স্বল্পপুরাণে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,

একার সর্ববৈদ্যানাং যথাদৌ পরিচরিতঃ।

তথা নিকুবহানান্ত মাঘস্নানং মহামুনে ২।

অর্থাৎ হে মহামুনে! যেরূপ সর্ববৈদ্যের মধ্যে ‘প্রণব’ সকলের আদিতে পরিগীত হন, সেইরূপ যাবতীয় বিষ্ণু-ব্রতের মধ্যে মাঘস্নানই সকলের অগ্রণী।

### প্রয়াগে মাঘস্নান

সনাতনগোষামিপাদেব শ্রীব্রহ্মভাগবতামৃত-গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, প্রয়াগ ভগবদ্ভক্তির প্রকাশভূমি বলিয়া ‘তীর্থরাজ’ নামেও অভিহিত হইয়াছে। ছত্র ও চামর রাজার দুইটি চিহ্ন। তীর্থরাজ প্রয়াগেও যেত ও কৃষ্ণ তরঙ্গময় গঙ্গা-যমুনাক্রমে দুইটি চামর এবং নীলছত্ররূপ

১। শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস : ৪। ৮—৪৪ মূল ও টীকা দ্রষ্টব্য ;

২। এ, ১৩।৭৪ সংবাদিত বঙ্গবাক : ৩। শ্রীকৃষ্ণভাগবতামৃত টীকা ২।১।৪৪



গঙ্গার তটে সাধুগণের ছাউনি, কলকাতা

অক্ষরট বিরাটমান। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গিত যে স্থানে  
অন্তঃসলিল স্রবণভীর্ণ মিলন হইয়াছে, তাহ 'ত্রিবেণী সঙ্গম'  
নামে কথিত। এই ত্রিবেণীর অশ্বখর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি  
'ত্রিবেণীমাসব' বা 'বেণীমাসব' নামে প্রসিদ্ধ। প্রয়াগে বাটটি  
মাসব-মূর্তির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। (১) 'আদি-বেণী-  
মাসব'—ইনি ত্রিবেণী-সঙ্গমের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন, এখন  
হারাগঞ্জ অবস্থান করিতেছেন (মতান্তরে আদি-বেণীমাসব  
জলত্রয়রূপে সম্মেই অধিষ্ঠিত); (২) 'বিন্দুমাসব'—  
জৌপদী-ঘাটের নিকট অবস্থিত; (৩) 'আদিমাসব'—প্রয়াগের  
অপর পারে শ্রীবল্লভাচার্য্যের অধ্যুষিত শ্রীগোবিন্দপালঙ্কিত  
আড়াইল-প্রাণে অধিষ্ঠিত আছেন; (৪) 'চক্রমাসব'—ইনিও  
আড়াইল বা অলকপুত্রে অধিষ্ঠিত; (৫) 'শঙ্খমাসব'—হুতনগার  
নিকট মুন্সীবাদ পল্লীতে অবস্থিত; (৬) 'গঙ্গামাসব' নৈনীতে  
অবস্থিত; (৭) 'পরমেশ্বর' নীকর 'কেশবের' নামক স্থানে  
অবস্থিত; (৮) 'অনন্তমাসব' অক্ষরটের নিকট অবস্থিত;  
(৯) 'মনোহর মাসব' প্রয়াগের চক্ৰবাক্যে জ্যোত্বর্ণনাথের  
মন্দিরে অবস্থিত; (১০) 'অসিমাসব' নাগ-বাসুকির নিকট  
অবস্থিত; (১১) 'শকটীহর-মাসব' সঙ্খাবটের নীচে অধিষ্ঠিত  
এবং (১২) 'বটমাসব' বৃদ্ধ বটবৃক্ষের মূলে অধিষ্ঠিত।

১৮৮৩ সালের ১২/১২/৮৩

সনাতনগোষ্ঠাস্থাপন (শ্রীজীবন) অতি প্রাচীনকাল  
হইতে স্বল্প বিগ্রহ শ্রীমৎস্বদেশের দমন ও মঙ্গলান করিয়া  
কথ প্রয়াগে মৃত শ্রীমৎস্বদেশের মরণের হইতে ভগবানের  
ভগবান, আত্মপুত্র, স্বদেশ, চিত্তবল ও মনোবল ইত্যাদি  
সকল ও অতিশয় পুণ্ড্র মৃত্যু বিগ্রহ বিষ্ণুমূর্তির  
আরাধনা করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চন্দ্রাবদন হইতে মাদ্যম্যে প্রয়াগগারে  
পদাধিপ করিয়াছিলেন। তদায় শ্রীমৎস্বদেশ উপর বাস  
স্থাপন করিয়া দশ দিন মনোরঞ্জন করেন।

এইমত চিত্র পাণ্ডা মায়া

১৮৮৩ সালের ১২/১২/৮৩

শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠাস্থাপন ও চন্দ্রাবদন (শ্রীজীবন  
গোষ্ঠাস্থাপনের পিতামহ) ত্রিবেণীতে শ্রীমৎস্বদেশপ্রভুর বাসের  
সম্মিলনেই বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু লোকের  
ভিড়ের ভয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমের অনতিদূরে দশাশ্বমেধ ঘাটে

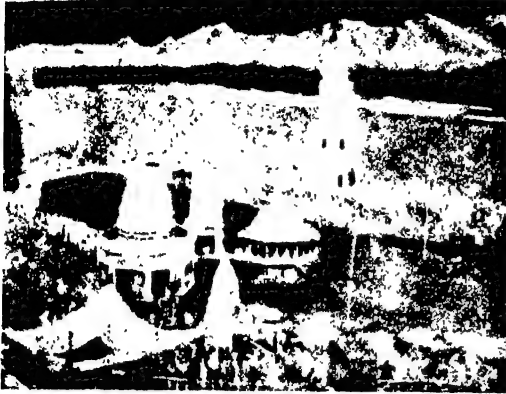
১. শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠাস্থাপন ১৮, ১৯-২০ মূল ও টীকা প্রকৃত।

২. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ৮। ২২।

রীকপকে লইয়া গিয়া ভাগবত-সিদ্ধান্তসমূহ শিখা  
য়াছিলেন।<sup>৬</sup>

কবি তুলসীদাস তাঁহার 'শ্রীরামচরিতমানসে' বলিয়াছেন,  
রামচন্দ্র বনগমনকালে প্রয়াগে মহসি ভরদ্বাজের আতিথা

রচনা আরম্ভ করেন। তুলসীদাসের তিরোভাবের (১৬২৩  
খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় এক শতাব্দী পরে বাসানন্দ-শাখায় শ্রীরামানন্দের  
পর দশম-অংশস্তন 'গোবর্দ্ধনবার্মা' শ্রীরামানন্দজীর অভ্যাস  
ইহার শিষ্য বাসানন্দজী প্রবল প্রভাবশালী সাধু ছিলেন।



হরি কী পৈড়ার দশ—৩২২৪৪

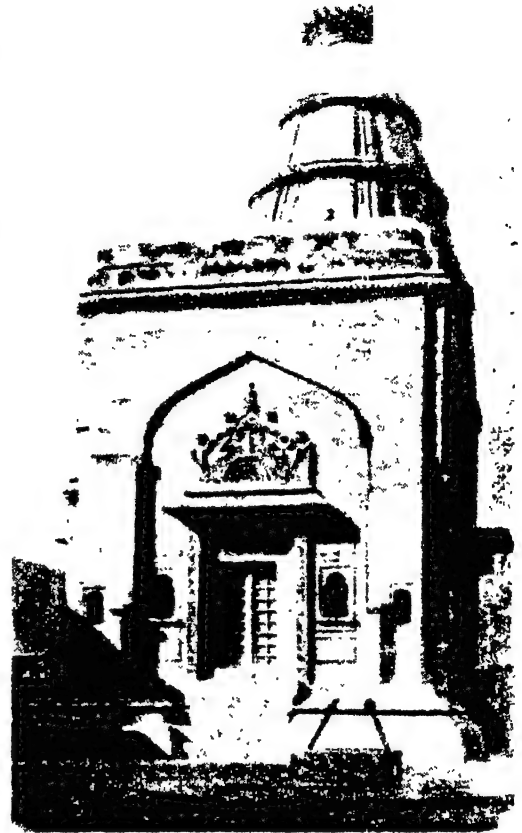
স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রপুত্র সেই পরম মনোহর  
ভরদ্বাজপ্রম প্রতিবৎসর মাঘমাসে মুনিমণ্ডিগণ সমবেত হইয়া  
ত্রিবেণীস্নান, শ্রীমাদবেদ দর্শন ও অক্ষয়বট স্পর্শন এবং হরি-  
স্তবগান, ধর্মবিধি প্রণয়ন, ব্রহ্মচন্দ্র-নিরূপণ ও জ্ঞানদেবরাগায়ুক্ত  
ভগবদ্ভক্তির আলোচনা করিতেন।<sup>৭</sup>



হরি কী পৈড়ার গ্রানথার্ট ও বাজারের দৃশ্য

### কুন্তমেলার ইতিহাস

তুলসীদাসের উক্ত বারীতে প্রয়াগে কুন্তমেলার কোন  
কথা পাওয়া যায় না। তুলসীদাস প্রয়াগের নিকটবর্তী  
স্রোত্রেই জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীরামচরিতমানস'



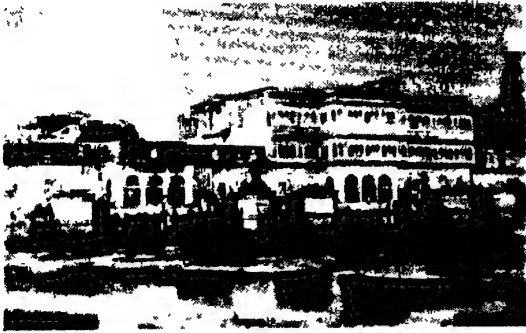
কেলীঘাটের উপর শ্রীকেশবদেবের পাতাল ভা. মন্দির প্রদর্শন

কথিত আছে, ইনি তদানীন্তন এক শেখীর সন্তানসিগগের  
প্রবল দোহাশ্বাদমনান চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুগণকে  
একত্রিত করিয়া 'সাধু-সংস্করণ-সনাতানী' গঠন করেন।  
সেই সাধু সৈন্তগণ 'লক্ষকর' নামে খ্যাত হয় 'লক্ষকর' শব্দের  
অর্থ পদাতি সৈন্ত। বাসানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় 'লক্ষকরী-বংশ'  
নামে বিখ্যাত হয়। বাসানন্দ লক্ষকরগণকে লইয়া হরিদ্বার,  
প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী—এই চারি স্থানে ধর্মপ্রচার ও  
বিপক্ষ-দমন করিয়া বেড়াইতেন। অনেকে মনে করেন,  
বাসানন্দজী চারি সম্প্রদায়ের লক্ষকরগণকে লইয়া উক্ত চারিটি  
স্থানে যে যে ক্রমে নুনান্দিক তিন বৎসর অন্তর ভ্রমণ  
করিতেন, সেই ক্রমানুযায়ীই হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও

৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ১২।৩০, ১১৪-১৫,

৭। শ্রীতুলসীদাসচরিত শ্রীরামচরিতমানস বালকাণ্ড ৫৮-৫৯

উজ্জয়িনীতে সাধুগণের মেলা প্রবর্তিত হইয়াছে। যে বৎসর হরিদ্বারে 'পূর্ণকুম্ভ' হয়, সেই বৎসরই তৎপূর্বে বন্দাবনে বৈষ্ণবগণের একটি প্রারম্ভিক কুম্ভমেলা বসিয়া থাকে। ইহার কারণ বালানন্দী বন্দাবনেই চারি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সৈন্তবাহিনী সংগঠন করিয়া তথা হইতে হরিদ্বারে অভিযান করিতেন।



কেশবাচি, বন্দাবন

মতান্তরে শঙ্করাচার্য ভারতের চারি স্থানে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া কুম্ভযোগ উপলক্ষে সন্ন্যাসিগণ বাহাতে প্রতি তিন বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে সম্মিলিত হইয়া সম্ভ্রান্তত্ব স্বাক্ষর পরস্পর আলোচনা করিবার সুযোগ পান, তাহার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় হইতে উক্ত চারিটি স্থানে কুম্ভযোগে সন্ন্যাসিগণের সম্মেলন হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য পুরী, দ্বারকা, বদরিকা ও গুজেরী—এই চারিটি স্থানেই মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রপ্রমাণ ও আধ্যাত্মিক।

কুম্ভমেলায় উৎপত্তি স্বাক্ষর নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ কুম্ভযোগের সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদনকল্পে বৈদিক ও পৌরাণিক প্রমাণ এবং পৌরাণিক আধ্যাত্মিকাসমূহের উল্লেখ করেন। কোন পণ্ডিত বেদ হইতে নিম্নলিখিত প্রমাণটি উদ্ধার করিয়াছেন,

“বৃহো বনিঃ জ্ঞানতঃ শতাব্দিম্মিরাগ্রে গোষ্ঠাঃ গভোঃ স্বস্তঃ”

[ শ্রুতযজুঃ ৯।৮৭ ]

পৌরাণিক আধ্যাত্মিক এই যে, সমুদ্র-মগ্ননকালে যখন ধবস্তুরী অমৃতকুম্ভ লইয়া উৎখিত হইলেন, তখন অম্বরগণ বলপূর্বক ঐ কুম্ভ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবতাগণ ঈহরিদ শরণাপন্ন হন। ঈহরি মোহিনী-রূপ পারদপূর্বক অম্বরগণকে বন্ধন করিয়া শরণাগত দেবতাগণকে স্বহস্তে অমৃত পান করান এবং ঐ কুম্ভটি দেবতাগণকে প্রদান করেন। অম্বরগণ অমৃত পান করিতে না পাইয়া

দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ করেন।৮ পুরাণান্তরের মতে সমুদ্র-মগ্ননে সমুদ্রত সুধাকুম্ভ লইয়া দেবতা ও অম্বরগণের মধ্যে দ্বাদশ দিনব্যাপী যুদ্ধ হয়। ঐ দ্বাদশ দিনের মধ্যে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত পৃথিবীর যে চারি স্থানে যে যে ক্ষণে সুধাকুম্ভ বন্ধা করিয়াছিলেন, সেই চারিটি স্থানেই সেই সেই ক্ষণ উপস্থিত হইলে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। দেবতাগণের একদিনে



শ্রীকৃষ্ণ, বন্দাবন

সমুদ্রের এক বৎসর, এইজন্ত দ্বাদশ বৎসর অন্তর প্রতি স্থানে কুম্ভযোগ হয়।

হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী—এই চারিটি স্থানে ‘অমৃতকুম্ভ’ স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে উক্ত কুম্ভ হইতে বাহাতে অমৃত ক্ষরিত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্ত চন্দ্র ঐ কুম্ভের মুখে আবরণ এবং সূর্য্য ঐ কুম্ভের নিম্নে আধারস্বরূপ হইয়াছিলেন। আর অম্বরগণ বাহাতে অমৃত পান করিতে না পারে, তজ্জন্ত বৃহস্পতি অম্বরগণের হৃদয়ে বুদ্ধি রূপে স্থিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাগাইয়া দিরাছিলেন।

চারিটি স্থানে কুম্ভযোগের নিয়ম

হরিদ্বারে—বৃহস্পতি কুম্ভে ও সূর্য্য মেঘে (বৈশাখ মাসে) থাকিলে ‘কুম্ভযোগ’ হয়।

প্রয়াগে—বৃহস্পতি রসে বা মেঘে ও সূর্য্য মকরে (মাঘ মাসে) থাকিলে ‘কুম্ভযোগ’ হয়।

নাসিকে (গোদাবরীতে)—বৃহস্পতি সিংহে ও সূর্য্য কর্কটে (শ্রাবণ মাসে), অথবা বৃহস্পতি ও সূর্য্য কর্কটে (শ্রাবণ মাসে), অথবা বৃহস্পতি ও সূর্য্য সিংহে (ভাদ্র মাসে) থাকিলে ‘কুম্ভযোগ’ হয়।

উজ্জয়িনীতে (পারানগরীতে)—বৃহস্পতি বৃশ্চিকে ও সূর্য্য জ্যৈষ্ঠ (কার্তিক মাসে), অথবা বৃহস্পতি ও সূর্য্য জ্যৈষ্ঠ

( কার্তিক মাসে ), অথবা বৃহস্পতি সিংহ ও মৃগা মেসে ( বৈশাখ মাসে ) থাকিলে ‘কুস্তযোগ’ হয় ।\*

বৃহস্পতির এক এক রাশি অতিক্রম করিতে প্রায় এক বর্ষ লাগে ; সুতরাং প্রতি দ্বাদশ-বর্ষান্তে পুনরায় পূর্ব-রাশিতে ফিরিয়া আসে । তবে কয়েক দিনের ইতর-বিশেষ থাকায় বছরিনাস্তে কিছু অমিল হয় । একজ্ঞ কখনও কোন স্থানে এগার-বৎসরান্তে পূর্ণ-কুস্তযোগ হয় । কিন্তু সাধারণতঃ স্থল-ভাবে বার বৎসর অন্তর এক এক স্থানে পূর্ণ কুস্তযোগ ঘণা হয় ।



গোদাবরীর একটি দৃশ্য, নাসিক

বিক্রমঃ ১৭৮৪-৪৫ কুস্তমেলা

হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী—এই চারটি বিষ্ণু-ভার্গই পুত্র মলিন, নদীর তটে অবস্থিত । বিষ্ণুপাদোক্তবা গঙ্গা হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার-ভীর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন । ‘হরি কি পৈত্ৰী’ কথাটি উহারই সূচক । পৈত্ৰী শব্দের অর্থ সোপান ; উক্ত ঘাটের উত্তর পার্শ্বে হরিদ ( বিষ্ণুর ) চরণচিহ্ন প্রদর্শিত হয় । হরিদ্বার



গোদাবরীতে বিভিন্ন ঘাট ও মন্দির, নাসিক

২৩ জন যাত্রীর মলিন-সমাধি ঘটে । এই ভগটনার পর উক্ত ঘাট এক শত ফুট প্রশস্ত ও ঘাটটি সোপানযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় ।

গোদাবরীর তীরে বামায়ণ-প্রসিদ্ধ বামলীলাক্ষেত্র নাসিক নগরী এবং সিপ্রা নদীর তীরে পুরাণ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অবন্তী বা উজ্জয়িনী নগরী অবস্থিত । গোদাবরী নদী ব্রহ্মগিরি হইতে প্রবাহিত । নাসিক শহরটি গোদাবরীর দক্ষিণতটে এবং পঞ্চবটী বামতটে অবস্থিত । নাসিক শহর হইতে কুশাবর্ত ও ত্র্যম্বকেশ্বর আঠার মাইল । কুশাবর্ত হইতে ব্রহ্মগিরি পর্বত চার মাইল উচ্চে । ব্রহ্মগিরিস্থ গোদাবরীর উৎপত্তি-স্থানকে গঙ্গাদ্বার বলে । অবন্তী-নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ সান্দোপনি নুনির গৃহে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ইহাও যোক্ষদায়িকা-পুরীর অন্ততম । মহাকবি কালিদাস-প্রমুখ নবরত্ন উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভা উজ্জল করিয়া-ছিলেন । ‘বৈরাগ্যশতক’-রচয়িতা ভট্টহরি সংসার ত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীর একটি গুহায় তপস্তা করেন ।

- \* ১। কুস্তে গুরো হরিদ্বারে, দ্বারবাজে গুপে গুরো ।  
ধারায়ঃ বশিষ্ঠে জীবৈ, গোদাবরায়ঃ গুরো গুরো ॥
- ২। স্বজ্ঞে নক্রে তথা যক্রে কপে পৃথো যথাকমাং ।  
কৃষ্ণাথো তলভো যোগশ্চতুর্গঙ্গলপ্রদঃ ॥
- ৩। মক্রে চ দিব্যনাথে রাজগে চ বৃহস্পতৌ ।  
কুস্তযোগো ভবেৎ তত্র প্রয়াগে চতিত্বলভঃ ॥
- ৪। কপে গুরুস্তথা ভানুশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রদয়ে তথা ।  
গোদাবরায়ঃ তদা কৃষ্ণো জায়তে২বনিমণ্ডলে ॥
- ৫। সিংহরাশিগতে মৃগ্যে সিংহরাশৌ বৃহস্পতৌ ।  
গোদাবরায়ঃ ভবেৎ কৃষ্ণো জায়তে বল মৃত্তিকঃ ॥
- ৬। গটে গুরঃ শর্শা মৃগ্যঃ কৃষ্ণাঃ দামোদরে যদা ।  
উজ্জয়িন্তাঃ তদা কৃষ্ণো জায়তে২বনিমণ্ডলে ॥
- ৭। মেঘরাশিগতে মৃগ্যে সিংহরাশৌ বৃহস্পতৌ ।  
উজ্জয়িন্তাঃ ভবেৎ কৃষ্ণঃ সদা মৃত্তিপ্ৰদায়কঃ ॥

১। মহাভারত আদিপর্ব ১০০, ১০১ অধ্যায়, কুস্তকোণম্ সংস্করণ ;

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যঃ ২০।১১৭



### প্রয়াগে কল্লাবাস ও কুস্তমেলা

প্রয়াগে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা ও পূর্ববাহিনী যমুনা যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই সমকোণক্ষেত্রে প্রয়াগ-দুর্গ শোভা পাইতেছে। দুর্গের অভ্যন্তরে পৌরাণিক স্মৃতি-বিজড়িত শিবস্বরূপ 'অক্ষয়বট' কয়েক বৎসর পূর্বেও প্রকাশিত ছিলেন। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে 'প্রয়াগ' ও পূর্ব পাড়ে 'ঝুপি',

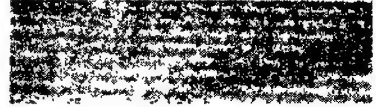


গোদানরী-দুর্গে প্রকাশিত কল্লাবাস ও কুস্তমেলা

মধ্যস্থলে সঙ্গম প্রকাশিত চুড়। প্রয়াগের গঙ্গাতটে, ত্রিবেণী-তটে, বিস্তৃত চড়ার মাথা ও ঝুপিতে 'কল্লাবাস' উপলক্ষে প্রতি মাঘ মাস সাধু সন্ন্যাসিগণের ছাউনী পড়ে। শাস্ত্রানুযায়ী এই স্থানে মন্দর সংক্রান্তি (পৌষ-সংক্রান্তি) হইতে এক মাসকাল নিরাহারে সৈকতশায়ী হইয়া পূর্ণকৃষ্ণের বাস এবং প্রত্যহ ব্রাহ্ম-মুহুর্তে অনারত দেহে ত্রিবেণীতে স্নান-পূর্বক ত্রীমাধব-দেবের সেবারূপ ত্রৈলোক্যকে 'কল্লাবাস' ও 'মাগ-ব্রত' বলে। কুস্তমেলার সময় তথায় সহস্র সহস্র কল্লাবাসী সাধু সন্ন্যাসীর ছাউনী, চাতা ও অস্থায়ী আশ্রমাদি স্থাপিত হয়। এই সকল সাধুর মধ্যে গন্যাতা মহন্ত অথবা সম্পত্তিশালী শ্রেষ্ঠ ও রাজস্ববর্গ যাহাদের কল্ল-তলপ—এইরূপ অনেক ব্যক্তি থাকেন; আবার, অনেক নিঃসঙ্গ, অযাচক, সঙ্কয়হীন, অনিকেত সাধুও দৃষ্ট হয়।

অনেক সাধু এক একটি ছাতার নীচে এক একঘানি চাটাই বা কমলাসনে, কেহ বা সৈকতাসনেও অবস্থান করেন কোথাও কোথাও এক একজন মহন্তের

অধীনে এক এক দল সাধু এবং এইরূপ এক এক দলে শত শত সাধু অবস্থান করেন। বৈষ্ণব-সাধুগণের মধ্যে অধিকাংশই রামানন্দী বৈষ্ণব—নিষার্ক-সম্প্রদায়ের এবং মধ্য ও বিষুখামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী সাধুগণও দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে দশনামী-এক-দণ্ডী-সন্ন্যাসীর বিভিন্ন শাখা এবং শাক্ত-সন্ন্যাসিগণের অন্তর্গত

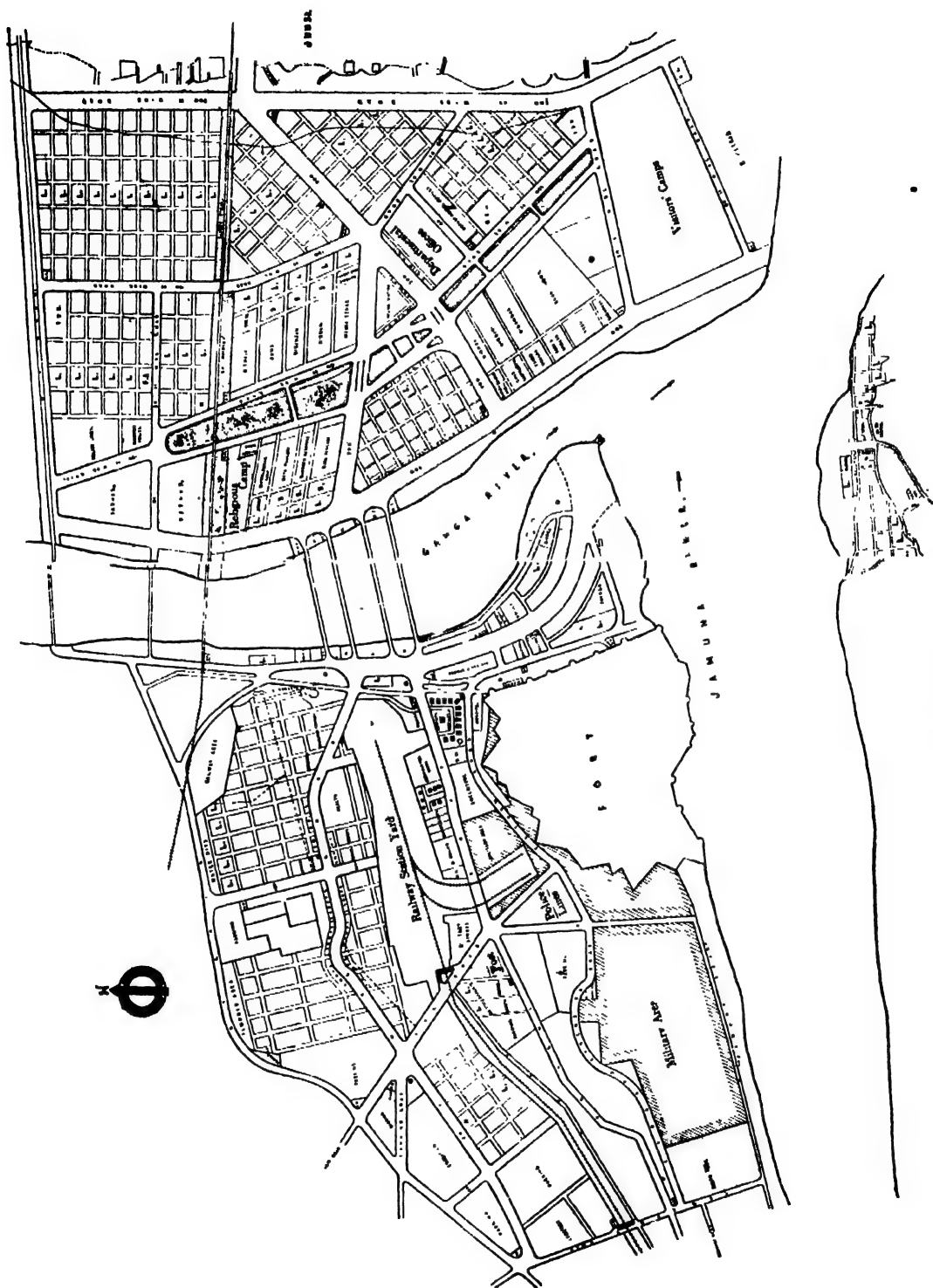


গোদানরী-দুর্গে প্রকাশিত কল্লাবাস ও কুস্তমেলার সময়, নানিক

ভৈরবী ও আলেক প্রভৃতি উপশাখার সাধুগণও দৃষ্ট হয়। গুরু নানকের পুত্র ত্রীটামের প্রবর্তিত উদাসী-সম্প্রদায়ের অনেক সাধু এবং দশম গুরু গোবিন্দসিংহের প্রবর্তিত শিখ-সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি কুস্তমেলায় যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত দাছ-পছী, কবীর-পছী, গরীব-দাসী, গোরক্ষনাথী, নিরঞ্জনী; নিখলী, নিখোহী, নিরুণী, জুনা প্রভৃতি অসংখ্য মতাবলম্বী ব্যক্তি এই মেলায় সমবেত হন। আবার, অনেক ব্যবসাদার নকল-তপস্বী সাধু-সন্ন্যাসীরও যথেষ্ট সমাগম হয়।

### কুস্তমেলার স্নানযোগ

কুস্তমেলার স্নানযোগের সময় এক এক দল সাধুর এক একটি বিরাট শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। জ্বরির বুল দ্বারা সুসজ্জিত হস্তিপুষ্ঠে আরুঢ় সাধুগণের হস্তস্থিত সূর্যহং রৌপ্যদণ্ডের সহিত সংযুক্ত বিচিত্র বর্ণের জরোয়া কাঙ্ক-করা মূল্যবান পতাকাসমূহ বহুদূর হইতে বিপুল জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন পতাকায় হুম্মান, কোন পতাকায় ধর্ম্মরূপ, কোন পতাকায় ত্রীরামচন্দ্র, কোন পতাকায় ত্রীকৃষ্ণ, কোন



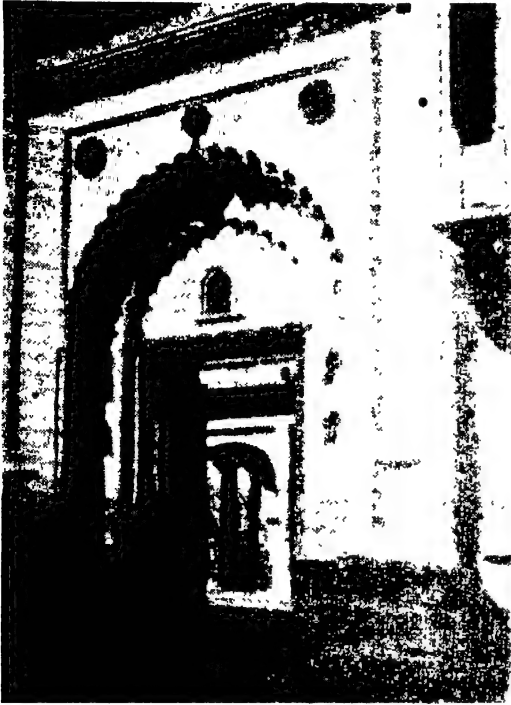
বর্তমান কলকাতার মানচিত্র, প্রায়শ

পতাকায় শেষনাগ, কোন পতাকায় ঐরাবত প্রভৃতি বহুবিধ মূর্তি বিচিত্র কারুকাযের দ্বারা খচিত থাকে। রৌপ্যভূষণে ভূষিত অশ্ব, সুসজ্জিত রৌপ্য-মণ্ডিত শিবিকায় আকৃষ্ট মহন্ত গণ, কোথাও বা সুসজ্জিত উদ্বৃপ্তে বিভূতিমাখা জটাধারী সন্ন্যাসীর দল, কোথাও লাঠি তলোয়ার খেলোয়াড় নাগা সাধুর দল, রৌপ্যমণ্ডিত আস-সোটাধারী সাধুগণ, কোথাও বা “জয়

হয়। অনেক মঠাধীশই সদাশ্রিত খুলিয়া থাকেন। কোথা বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনী, সভাসমিতিও উদ্ভূক্ত হয়।

১৩৬০ বঙ্গাব্দের প্রয়াগ কুম্ভমেলায় প্রধান প্রধান জ্ঞানের তালিকা নিম্নরূপ :

- |            |                   |                               |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| ( ১ )      | মকর সংক্রান্তি    | ১০শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫৪ |
| ( ২ )      | পৌষী-পূর্ণিমা     | ১৫ মাঘ, ১৯শে “ “              |
| ( ৩ )      | মৌন-অমাবস্যা      | ১৬শে “ “                      |
| ( প্রধান ) | প্রয়াগ কুম্ভমেলা | ১০শে “ “ ৩রা ফেব্রুয়ারী “    |



গঙ্গা

মৌতারাম” ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কোথাও বা মৃদঙ্গ কবতাল সহযোগে হরিমন্দিরকালী সম্প্রদায়—একটির পাছ দ্বার একটি শোভাযাত্রা পূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক জানকীতেও ঐরূপ বিচিত্র বর্ণের পতাকাসমূহ উড্ডীয়মান দেখা যায়। এক দিকে যেকোন পুস্তকসমিষ্ট গল্প সমুদায় তাহলে বিচিত্র সমজ্ঞাশ্রমী শোভা পায়, অত্যাধিক সেইরূপ যমুনাদেবীমন্দির চিকণ সলিলোপরি এবং তৈলিকবর্ণা গজদ্বার বাঁচি বিজুক বাজাপরি অজস্র তবলা শেলী মালাকারে শোভিত থাকিয়া মেসার আর একটি বিচিত্র শোভা হস্তি করে। প্রত্যেক ঘাটে স্নানার্থীর ভিড়। বিস্তৃত চড়ায়ে জনসমষ্টির তরঙ্গ শু শ্রোতস্থানীর মধ্যেও মনঃ জনতার সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ বৈষ্ণব সাধুগণ তাঁহাদের উপাখ্য বিভিন্ন বিষ্ণুবিগ্রহের অসংখ্য মূর্তি, ছাতা ও পর্বকটীরের দ্বারা একটি পৃথক বৈষ্ণবপন্থা চেনা করিয়া থাকেন। এই সকল মূর্তির সম্মুখে পুরাণপাঠ, বাজনা, মহোৎসব ও সঙ্কীর্তনাদি



গঙ্গা ও চৈতন্যমন্দিরের শিবতলা, প্রয়াগ

হরিদ্বার কুম্ভযোগ উপলক্ষে শঙ্কর-সন্ন্যাসিগণের রীতি-অনুসারে জ্ঞানের দিন—১ শিবচতুর্দশী, ২ ফাল্গুনী-অমাবস্যা, ৩ চৈত্রী-শুভদশমী, ৪ মহাবিশুব সংক্রান্তি। হরিদ্বারের পূর্বকুম্ভযোগের পূর্বে আরদ্রাবনামাঘোষ কেশীঘাট হইতে পাবনাঘাটের পুলিনে বসন্তপঞ্চমী হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত বৈষ্ণব সাধুগণের সম্মেলন, শ্রীকৃষ্ণাভ্যাস মহোৎসব, শ্রীমদ্ভাগ-বতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা, হরিসঙ্কীর্তন, শোভাযাত্রা ও যমুনাস্নান হইয়া থাকে। যমুনাস্নানের তিথি যথা—১ বসন্ত-পঞ্চমী, ২ মাদীপূর্ণিমা, ৩ মাদী-সংক্রান্তি, ৪ ফাল্গুনী-শুক্রা-একাদশী (বিশেষ জ্ঞান), ৫ দোলপূর্ণিমা বা শ্রীগৌরজন্মোৎসব।

নিম্নে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে গত এক শত আট বৎসরে পূণকৃৎস্নার সময়-নিরূপক বঙ্গাক ও ঐষ্টাকের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল :

[illegible][illegible][illegible]

# কামীন

শ্রীকৃষ্ণধন দে

মোর বেদনা-সাগর-মধন-ধন

হে অমুপম,

মোর কামনা-জাগর নিরালা-স্বপন

হে প্রিয়তম !

তুমি গোপন ভবার অলখ স্ততার মালা বে,  
কত-অগ্নি-জলে-রচা প্রিয় বরণের ডালা বে !

তুমি চিরপথ-চাওয়া কাণ্ডনের হাওয়া

মকতে মম !

মোর দিশাহারা পথে মৌন কাহিনী

বাধার কাঁদে,

হায়, অন্ধ চকোরী খু জিয়া মরিছে

হারানো চাদে !

এলে কোন্ মারাত্মক কণিকের তরে চলিতে,

তব শেষ ছায়াটুকু পেয়েছিস পথ চলিতে ।

এল কার অভিশাপ বিধাতার চির

আশীর্বাদে !

আজো যে-নাম আমার ফুটে নাই মুখে,

হিয়ার জাগে,

আগি গোপনে সে-নামে মিটাব তৃষ্ণা

সবার আগে !

তব অদেখা পায়ের বে ধ্বনিটি মনে শুনেছি,

তারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কত স্নেহজাল বুনৈছি,

নিতি অমৃত-তিলক দিয়েছি উদয়-

অস্তরাগে !

বল, ঝড়ের আকাশে উড়ে-বাওয়া-পাখী

ধরা কি যায় ?

মোর পিপাসার বারি না ছু তে অথব

শুকালো হায় !

কোন্ নন্দন-তরু-বীষিকার ছায়া-আড়ালে

কেন কোমল নখর ছোট হাত ছুটি বাড়ালে ?

কেন ধরা দিতে এসে লুকালে চকিতে

মরীচিকার ?

মোর হারানো-গানের গুরটুকু আছে,

বাণী যে নাই,

হায়, যে ছিল সাগর, আজ বুকে তার

মক-তুঘাই !

শুধু মনে জাগে কত স্মৃতিভরা রূপ-ছায়াটি,

কতু দেগিবে না ধরা চাদের অপর কায়াটি !

কোথা শুক্লির ব্যাধা মুক্তা যে আজো

জানে না তাই !

কবে শেষ বরাপাতা রেগে গেল দাগ

লতার প্রাণে,

তারে উত্তর বায়ু কোথায় উড়াল

লতা না জানে !

কত পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে পথ-ধূলাতে

কেন তারি মাঝে হুটি ছোট ছাপ চাও ভূলাতে ?

আজ মেঘহারা নভে কাঁদে যে চাতকী

মরণ-গানে !

এলে হারানো এ পথে অচেনার মত

পরম ধন,

যদি না পারি চিনিতে, তবু যে কাঁদিয়ে

মায়ের মন !

কতু বরা ফুলে ডেকে বলে কি বনানী—"জাগবে !"

হায়, যে-নদী শুকাল, কি হবে তাহার সাগরে ?

চির বাদল-আকাশে কেন গোখুলির

এল স্বপন ?

শত উৎসব-দিনে স্নেহবিস্মল

এ ছুটি চোখ

পথে জনতার মাঝে, তোমারে খু জিয়া

অন্ধ হোক !

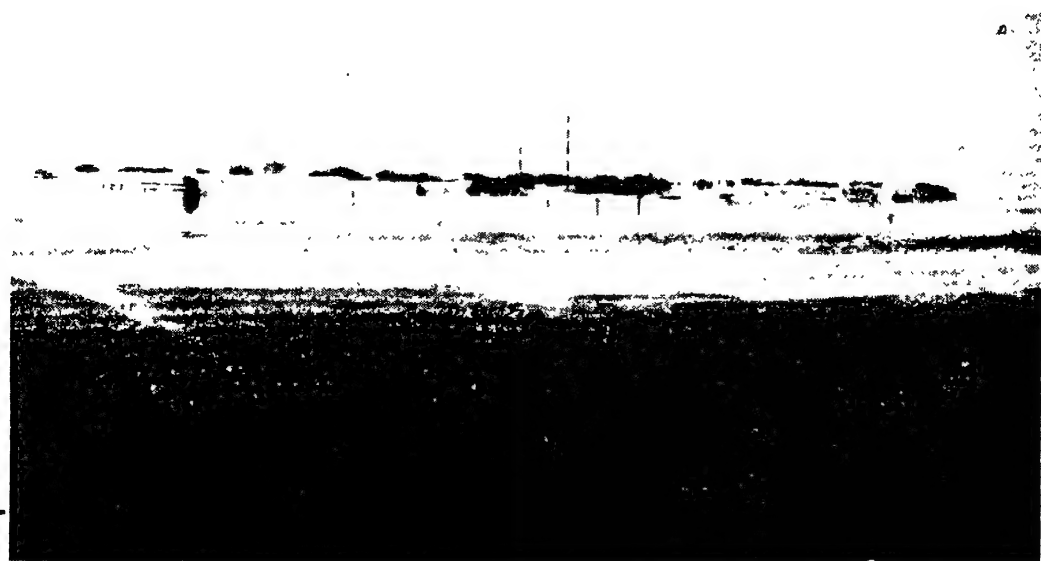
তবু তোমারি উজল অদেখা-লগাট ভরিয়া

নিতি মায়ের আশিস-অঙ্ক পড়িবে বরিয়া,

সেখা তুমি আর আমি তুলিব গড়িয়া

কল্লোলক !

কুড়মেলা



প্রয়াগ-তীর্থ



সিপ্রা নদীর তটে মন্দিরশ্রেণী ও স্নানঘাট, উজ্জয়িনী



হিমালয় পর্বতশ্রেণী ও গঙ্গার দৃশ্য, জম্বোকেশ



## জলের আলপনা

### শ্রীকরুণাময় বসু

চিঠি পড়ে অবাক হয়ে গেলাম।

দাদা পজ লিখেছে, কাকা এবার পুজোর ছুটিতে ঢাকীতে এসে পুর্নদিককার ঘর সংস্কার করেছেন আর সামনের বারান্দায় একটা পাঁচিল খাড়া করেছেন। সদর রাস্তা থেকে সে পাঁচিল দেখা যায়। লোকে অবগত আমার কাকা চাকিবাবুকে ছি-ছি করেছে, কিন্তু তিনি হাসিমুখে ঘুরে বেড়িয়েছেন, লোকের কথা গায়ে মাখেন নি ইত্যাদি।

তিনপানা গর, তার মধ্যে মাঝের ঘর আধাআধি ভাগ করে নিয়েছেন। বোঝা গেল দেড়পানা ঘরে দাদার সংসার পাতানো আছে। আমার সংসার পাতবার আর জায়গা হবে না ঢাকীর বাড়ীতে। হাওড়ার বাসা উঠে গেলে কোথাও বাড়ী করতে হবে—তা সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তসীমায় হোক না কেন?

ঠিক এতপানি হবে প্রত্যাশা করি নি কোনকালে। কাকা ছিলেন সাব-মেপুটি। যুদ্ধের আগে রিটারার করে কলকাতার বাড়ী করেছেন। ছেলে নেই; ছই মেয়ে, ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। বাবা যত দিন বেঁচেছিলেন, তত দিন কিছু করেন নি। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে লেগেছেন বাড়ী আর জমাজমি ভাগ করে নিতে। দাদা মধ্যে বলেছিল, এত দূর পাড়াগায়েব জমাজমি, বাড়ী আপনাব কি দরকার?—একটু চূপ করে থেকে কাকা ভাবাব দিয়েছিলেন, বাড়ী আর জমাজমি ভাগ করে নেওয়া আমার জায়া অধিকার। আজ পর্যন্ত কেউ সেই দাবি ছেড়েছে বলতে পারি কিরণ?

দাদা হেসে বলেছিল, তা বটে, এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি।—আমার কাকীমা অভিনয় করতে ওস্তাদ। আমাদের আত্মীয়-স্বজন যখনই কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় তিনি কাঁদতে বসেন আর নাকী সুরে বলেন, আমরা কি বাড়ী ঘরদোর লাগ করতাম। হিংস্রদের ব্যবহারে এইসব করতে হ'ল।—আত্মীয়েরা কাকীমাকে চেনে, তারা হেসে চূপ করে যায়, কথা বাড়িয়ে লাভ কি? কাকীমা কখনও ঢাকী এসে শ্বশুরঘর করেন নি। আসবার কথা হলে তিনি নাকি কাল্লাকাটি করতেন। চিরকাল বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন।

বাবা বলতেন, ওরা হ'ল উড়োপাণীর জাত। ওরা হ'ল তাহিরপুরের মিত্তিরদের মেয়ে, ওরা শ্বশুরঘর করে না।

বতহর মনে পড়ে কাকীমার জিভ ফুটবে চেষ্টাও খালাস। আমার বাবা-মা গরীব ছিলেন বলে কি রুঢ় ভাষার গালিগালাজ দরজেনি, অর্থাৎ করতে সাহস পেতেন, তা কানে না ওনলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। ছেলেবেলায় দেখেছি কাকীমা ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ গালিবর্ষণ করতেন, আমার মা বিষয়মুখে চূপ করে বসে চোখের জল কেলতেন। সেইসব ছবি এখনও আমার মনে আছে। তখন

ছোট ছিলাম, কি করে এর প্রতিকার হয় কিছু ভেবে পেতাম না। তার পর বিশ-পঁচিশ বছর কেটে গেল। কাকীমা, খুড়তুতো বোনদের চেহারা ছাঁচ পর্যন্ত ভুলে গিয়েছি।

এখন একটা করুণা আসে মনের মধ্যে। একটা দুর্বল অনুকম্পা। \*একটা অতি সাধারণ মানুষের প্রগলভ দাষ্টিকতা করুণার বস্তু বৈ কি? যাদের কেউ চেনে না, যাদের নাম পর্যন্ত কেউ জানে না, যারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অত্যন্ত তুচ্ছ, তারা এক দিন ছেলেবেলায় আমাদের গালমন্দ কবেছিল, একথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ চকমকির আলো জ্বলে উঠল, জ্বলে দিলে স্মৃতির প্রদীপ। এটি চিঠি পড়ে হাবানো দিনের কাহিনী ছবির মত জেগে ওঠে মনের মধ্যে।

মুঠোয় ধরা ছিল চিঠি। মন ভেসে যায় ময়ূরপঙ্খী নৌকার উজানি শ্রোত চলে পিছনদিকে।

সেই সব ছেলেবেলাকার তুচ্ছ ঘটনা হঠাৎ নবীনরূপে, মাধুর্য্য-রসে বিচিত্র হয়ে ওঠে। কৈশোর-দিনের রঙ্গস্থল এই ঢাকী গ্রাম। কত আনন্দ, গেলাধুলা, মান-অভিমানভরা পুরনো ভীষন হাতছানি দেয়।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে সত্যি এবার হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়ায়। বুঝলি বরণ, এবার পুজোর আর নৌকো চড়ব না। ভূই আমি স্বদেশ সোদপুরের খেলায় যাব। উঃ সে কি ভিড়? ভিড় চলেতে ভারি মজা লাগবে।

স্বদেশ দর করে মেলায় বাতাবি লেবুর। ও কল্যা, জোড়া কত, পাকা নেবু তো?

হ্যাঁ বাবু, পাকা বৈ কি?

তা হলে তো হবে না কর্তা, আমরা একটু কাঁচাই চাইছি।

ঠিক করে বল?

না সেবকম পাকা না, একটু কাঁচাই আছে।

আমরা হাসতে হাসতে এগিয়ে বাই।

সন্ধ্যাবেলা কতদিন ক্ষণের ধারে সবুজ চরের ঘাসের উপর বসেছি আমরা। নীচেই উচ্ছ্রামতী নদী। বেকর দল সারি বেঁধে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে উড়ে যায়। দিগন্তজোড়া চাপার রঙের মেঘ, লাল চেলি রঙের মেঘ হঠাৎ ধূসর তার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে কালোয়তে মিলিয়ে গেল। হুঁ-একটা নক্ষত্র জ্বলে ওঠে আকাশের এক কোণে। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা—তবু মনে হয় এই তো সেদিন। অক্ষুব্ধ শ্রোত চলে যায় বচরের পর বছরের সিঁড়িতে জলের আলপনা টেনে। জলের আলপনা বৈ কি? কত এল, কত গেল। কত মুখ ভেসে আসে সেই শ্রোতে, এবার হারিয়ে যায় স্রাওলার মত ভাঁটির টানে। তবু এক-একটা ঘটনা অবিস্মরণীয়

হয়ে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। এক-একটা মুহূর্ত, এক-একটা ছবি মৃত্যুকে এড়িয়ে ঝিলিমিলি রক্ত-প্রবালের বিচিত্র রঙে রঙীন হয়ে থাকে মনের মণিকোঠায়।

আমার মা আমাকে কি যে ভালবাসতেন, সে কথা বুঝিয়ে বলতে পারি নে। এক দিন সন্ধ্যার সময় বামনদাস কুণ্ডুর বাড়ী আস গেলছি। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি হচ্ছে, এলোমেলো হাওয়া বইছে।

মা আমার ভাগ্নেকে ঢেঁকি বললেন, যা তো অরুণ, দেখে আয় বামনদাসের বাড়ী। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখবি শুধু, কিছু বলবি নে। শুধু আছে কিনা দেখে আয়।—এই কয়টি কথাই মাতৃহৃদয়ের কতখানি দরদ প্রকাশ পেয়েছিল, তা কি ভাষায় বোঝাবার?

সেই ছেলেবেলায় ফুলের লাইথেরী খেঁক একগুনা পাতা ছেঁড়া গল্প শুধু সংগ্রহ করি। তার আগে রবীন্দ্রনাথের বই সম্ভবতঃ পড়ি নি। মনে আছে, তাতে ছুটি, পোষ্টমাষ্টার, একরাতি এসকল গল্প ছিল। গানের বন্ধাবের মত গল্পের স্তরের অনুবণন ধ্রুয়েব মীড়ে মীড়ে আশ্চর্য্য মোহ বিস্তার করেছিল। সেই অল্পভূতি, সেই শিরিত ছলভ মুহূর্তগুলি আজও হারায় নি, আজও ভেগে আছে মনের মধ্যে। তার পর কত গল্প পড়লাম কত লেখকের, কিন্তু সে অল্পভূতি আর পাই নি। কিছু পেয়েছি শরৎ চন্দ্রের গল্পে আর বিভূতি ঐক্যের গল্পে।

আজ যেন বেশী করে ছেলেবেলাকার কথা মনে হচ্ছে।

উঃ কতকাল ঢাকী ষাই নি, বেশ হয় সাত-আট বছর হবে। এখনও কি সব সেইরকম আছে আগেকার মত। গায়ে ঢুকবার মুখেই লীকাস্তুর খাবারের দোকান, তার পর ফুল, বোঁটিং, পদ্ম-ঢাকা কালস-দীদি। তার পর পশ্চিম বাড়ী, নুসারি ডাক্তারের ডিশপেন্সারি। কি জানি হয় তো কত বদলে গিয়েছে এই ক'বছরে। গেল বছর ঢাকী মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন হয়ে গেল। দুই প্রতিযোগী দল থেকে চিটি দিয়েছিল ভোট দেবার জন্ত। আমি ষাই নি। একটা ছোট পাড়াগাঁ, তার মিউনিসিপ্যালিটি, তার আবার ইলেকশন। তবু সুনলাম খুব ধুমধাম, উত্তেজনা, ঢাকার শ্রদ্ধা হয়েছিল এই নির্বাচনে। একটা ছোট পাড়াগাঁয়ের মোড়লি করে এরা কি যে স্পণ পায়, তা আমার ধারণায় আসে না। সঙ্গীর্ষ গণ্ডীবদ্ধ এদের জীবন। সত্যি তুংগ হয় এদের জন্ত। এরা কি দেখল, কি অনুভব করল বৃহৎ জীবন-সমুদ্রের অনন্ত কল্লোলের অস্বস্ত সৌন্দর্য্য-বিস্তার! শুধু বগড়া কেন্দ্র করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে। তবু ভালবাসি এটী প্রেমকে। এর লোকজনের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রান্তে চলে গেলেও সে স্মৃতি ছিল হবে না। তবু আমি জানি এই প্রেমের কেই-বা আমাকে চেনে, ক'জনাই বা আমাকে ভালবাসে। তা হোক, তবু এর মাটিতে নিয়েছিলাম আমার প্রথম নিশ্বাস। এর চারিদিককার গাছপালা, বনের ফুল, আকাশের রঙ, ঝিলিমিলি সন্ধ্যার মেঘ সাত-সমুদ্রের কথা মনে করিয়ে দিত ছেলেবেলায়।

বড় হয়েও সেই সব অল্পভূতি হারায় নি। শনিবারে বখন

ট্রেন থেকে নেমে প্রথম পা দিতাম মাটিতে সন্ধ্যাবেলা, চারিদিককার বনকান্ডে, ভাঁটি ফুলের ঝোপ থেকে একটা ঘনগন্ধ উঠে আসত, কাঁচামাটির গন্ধ থাকত তার সঙ্গে মিশে। ঝিঁঝিঁ-ডাকা ঝিমঝিম রাত। জোনাকির ফুল ফুলছে লতায়পাতায়, ঘাসের ডগায়। মন আচমকা আনন্দে ভরে উঠত। যেন কতকাল যাকে খুঁজে পাই নি আজ হঠাৎ তাকে ফিরে পেলাম।

পাড়ায় ঢুকবার মুখে আমতলায় গুরুপদ বোষ্ট্রমের তেলেভাজার শোকান। গুরুপদ আমার দিকে চেয়ে বললে, এই ট্রেনে বৃষ্টি আলেন দাদাবাবু?

এই একটি মাত্র কথায় মনে হ'ত এরা আমার কত আপনজন। ঢাকী যে কতকাল ষাই নি! কেমন সব আছে সেপানকার লোক-জন ছোট ছোট হৃৎকথ নিয়ে, ছোট ছোট ভালবাসার প্রদীপ জ্বলে। আশা, স্নেহ থাক তারা, ভাল থাক তারা।

হঠাৎ এক আশ্চর্য্য অল্পভূতি আসে মনের মধ্যে। ছোট বেলাকার আমি ফিরে যেন গিয়েছি তারানো ভগতে। সেই সিঁড়ি-মাথানো মেদের রঙ ফুটে উঠত পিছনের স্মৃতি, চাঁলতে বনের মাথার উপরে। ভ ভ করে পূবালি-হাওয়া আসছে গাড়ের উপর দিয়ে। একটা মাড়োয়া পানী সোঁ করে নেমে ভলে ছোঁ মেঝে আবার উপরে উঠে যায়। একটা ভামগাছের দালে বসে পাখনা ঝাড়ে। আবার কখনও টিয়ে পাখীর পালকের মত সবুজ রঙের মেঘ অল্প অল্প ফুটে উঠত আকাশে—যেন চিত্রবিচিত্র রঙের সাড়ীর পানিকটা ছড়িয়ে দিয়েছে কে আকাশের এক কোণে। আমি একটা ছোট ছিপ নিয়ে পুঁটিনাছ ধরতাম। পড়কির পুকুরে।

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার গর্জন ভ ভ করে ঢুটে আসে দূরদূরান্তর থেকে—কত নদী, বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে। চাপারঙের মেঘ, সবুজরঙের মেঘ আকাশের স্লেট থেকে হঠাৎ নুছে যায়। ফুল ফুলে শুটে মিশকালো মেঘের দল ঝোড়ো হাওয়ায়। বাড়ী থেকে ঠাকুর্দা চেচান শুনেতে পাই : ও দাদু, বাড়ী আয়। মাছ ধরে আমাদেব কি আর রাজা করবি? কি রকম মেঘ করে আসছে দেখ?... .

কি জানি কেন মনে হ'ল ষাই এক বার ঢাকী ঘুরে আসি। আর হয় তো কখনও যাওয়া হবে না। রাণ্ডির ট্রেনে যাব, ভোরবেলায় ফিরে আসব, সন্ধ্যার অলক্ষ্যে, অগোচরে। আমার ছোটবেলাকার পেলাগর সেই বাড়ী আমবনের, লিঙ্গুগাছের ছায়ায় এগুনও লাড়িয়ে আছে আগেকার মত। সেই সব ছবির মত শাস্ত উদাস অপরাহ্ন, পাখীর কুঞ্জে মূরিত বনভূমি। উলুয়াস, ভাঁটবনে গাভশালিগ, চঞ্চল চুড়ুইয়ের আসা-যাওয়া, সে সব কি ভুলবার?

কতদিন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে নদীর পাড়ে রাত কাটিয়েছি একা একা। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে-পড়া অস্বস্ত উর্ষ্মমালায় চাদের আলোর বিলিক। মনে হয় চোঁড়ের ডগায় ডগায় যেন হাজার হাজার রূপালি মাছের দল থেলা করে বেড়ায়। কখনও মনে হয় যেন পাতাল-নাগিনীরা লক্ষ প্রদীপ জালিয়েছে আলোয়

মাঘর পেলায় ঘুমন্ত পৃথিবীর নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়; দর্শক শুধু আমি একা। সত্যি অপূর্ণ সেই জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। দিগন্তে ছেলে-পড়া চাদের ভগ্নাবশেষ। মাথার উপরে জল জল করছে কালপুন্ডর, সমুদ্রিমগুল। নিস্তব্ধ নিঃশব্দ প্রকৃতি যেন সম্মোহিত করত আমার সেই ছেলেবেলায়, কৈশোর-দিনে।

কোথায় যাচ্ছ এ সময়? গিল্লীর কক্ষ কণ্ঠস্বর।

জানি নে, তবে আজ আর ঋষি না। কাল আসব।

কোন বন্ধুর বাড়ী আড্ডা মারতে যাচ্ছ বুঝি। সমস্ত রাত আড্ডা চলবে না কি?

উত্তর না দিয়ে হাসলাম একটু। তার পর বেরিয়ে পড়লাম। বেলগাছিয়া টাম হিপার কাছেই ছোট্ট হেলষ্টেশন।

টিকিট দেখি একপানা। টাকীর টিকিট।

ষ্টেশনে যখন নামলাম বারোটা বেজে গেছে। নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ রাত। অত দারুণ কোন যাত্রী নাহে, নি এক আমি ছাড়া। ফুট-ফুটে চাঁদনী রাত। চোখের যেন আকাশ-অপসরার হাসির অমেঘে রেশানো। উদ্ভুল আঁচলের প্রান্ত থেকে ঢুকণা ঢুকণা স্বপ্নের মত উড়ে পড়া ভোলাকি ভাঙার নিকিমিকি। সব মোঠো পথ, উঁথল ঘন বনজঙ্গল। গাণী কেমন ছম ছম করে ওঠে।

কোথায় নদীর ধারে বাড়ী। ইচ্ছামতী নদী, ওপারে অস্পষ্ট দিগন্ত রেখার উপরে একটা নক্ষত্র জল জল করছে, বোধ হয় চিত্রা কি উরুধ্ব নদী গোষ্ঠীর কোন একটি। ছল ছল নদীর গোত্রে যেন গানের শব্দ। এটু ত মাঠ, পাশেই আমবন, শিউল ফুলের গন্ধ ভেসে আসে কে তা থেকে আঁচলকা হাওয়ায়। মদর দরচা ভেজানো ছিল, বাড়ীতে ঢুকলাম। সমস্ত বাড়ীটা নিখর ঘুম নিগুম। আমার পায়ের শব্দে একটা কুকুর কেঁট কেঁট শব্দ করে আবার চুপ করে গেল। দেপলাম বারান্দার উপর একটা পাঁচিল খাড়া হয়ে আছে। বাড়ীর দান নিকটা চুককাম করা, বারান্দার সিমেণ্টের পোঁচ দেওয়া হয়েছে। নতুন সম্মোহনের চিহ্ন এখনও মোটে নি। বুকপানা কে যেন সজোরে মুচড়ে ধরল। চোপ হুচো আঁলা করে ওঠে।

একবার ভাবি বৌদিকে ডাকি। না, না থাক, আর কতকণ বা আছি। রাত খুবাবার আগেই ট্রেনের সময় হয়ে বাবে। হয় ত টাকীতে এই আমার শেষ ভোরবেলা। আর হাসা হবে না, আর জায়গা নেই এখানে। আবার কোথায় নতুন দেশে নতুন নীড় বাঁধব।

ছেলেবেলাকার, কৈশোর-দিনের পেলায় এই বাড়ী, এই মাঠ, বনজঙ্গল সব হারিয়ে বাবে ক'দণ্ডের পরে। চোখে যেন কি পড়ল, অকারণে জল আসে কেন? অন্ধকার বন-বনাঙ্ক থেকে একটা পাখী পাখার ঝাপট দিয়ে ওঠে।

কাড়ীর সিঁড়ির উপর বসলাম।

ছেলেবেলাকার কথা কেবলই মনে পড়ে য'থ। খালেয়ার আলো হাতছানি দেয় যেন। ওই ত নীচু জমি, ধানের শীষে শীষে ধূসর সমুদ্রের মত দেখায়।

সেই ছোটবেলাকার কথা। ঠাকুরাণী গিটে করে নিয়ে গেলেন ধানক্ষেতের মধ্যে।—দাড় বেড়াবে এটি ধানক্ষেতে? দূরে যেও না যেন।

আমি প্রায় লাফিয়ে পড়ি কাঁধ থেকে। ছুটে ধানবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে বাই।

পিচনে ডাক শুনি : ও দাড়, কোথায় গেলি? কিরে আর সোনা আমার, মানিক আমার। বেশী দূর যাস-ন দাদাভাই।

সেনিনের মত আজও সবুজ ধানের সমুদ্র থেকে কাঁচা শীষের গন্ধ আসে পুঁথ-ভাওয়ায়। এঁত একটু দূরেই শীক সবকারের ডামলগাছ। ছেলেবেলায় আমি, সবুজ আর স্বদেশ কোঁচড়া ভর্তি জামল পেড়েছি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোপের মত।

কে, কে, কে রে? লাঠি হাতে শীক সরকার তাড়া করে আসে।

হি, হি, হি শব্দে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়ি গাছ থেকে। তার পর কাঁচা কোঁপ, পাল, বিল ছিড়িয়ে ছুঁ, ছুঁ।

চারি দিকে ঘুম ঘুম আবছায়া। ফুলের গন্ধে মন-কেমন-করা রাত নিগুম; চোখে যেন স্বপ্ন নেমে আসে। কত কাল আগেকার স্বপ্ন; হয় ত পঞ্চাশ, একশ বছর কি তারও আগেকার একটা থণ্ড দৃশ্য ছায়াছবির মত ভেসে আসে।

বকুলতলার পথ দিয়ে পাছো এসে নামল বাড়ীর দোরগোড়ায়। আমার প্রপিতামহী নববধুর বেশে এসে দাড়িয়েছেন পথ-আলপনা দেখা পিড়িতে। পরনে রেশমী চেলি। হাতে মাথায় কঞ্চণ, কেয়ুর, রতনসিঁথি। চোখে সগ কাকুলপ্রণী। কি সুন্দর দেখাচ্ছে নববধূকে! কে যেন চোচাচ্ছে : ওরে ও ছোটবউ, লক্ষ্মীর ঝাঁপি দেও বৌর মাথায়। হোরা সব কোথায় গেলি ঋষিরাবালা, তবঙ্গিনী দেখ না একটু। ছবির মত মিলিয়ে যায় অতীত ঘটনাগুলো। হারানো দিনের নিখাসে ভেসে আসে অতীত কালের মালুঘের দল। হাবা হাসে, ক'দে, ভালোবাসে, মান-অভিমান করে ঠিক আজকেরই মত। আবার বকুলতলার পথে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল চিরদিনের চেনা পথের দিকে। আমি সে পথ দিয়ে কিরে এস না তারা। কিরে এল নতুন মৃৎ, নতুন ফসলের ডালা, নতুন কালের সুপহুং নিয়ে। এঁত ত অনাদি, অনন্ত কালের জীবন। তুমি আমি কে? ফসলের শীষের মত জেগে উঠি হঠাৎ অনন্ত কালের পরমাত্মর একটুকু ক্ষণকালের বুকের ডগার উপর। চকল হাওয়ায় হাসি-কান্নায় আন্দোলিত হই ছ'দণ্ডের জীবন-দোলায়। তার পর—তার পর পারাপারহীন সমুদ্রের টেডিয়ে মিলিয়ে বাই বৃদ্ধদের মত।

নতুন নীড়ের স্বপ্ন হাতছানি দেয় আমাকে। বনবনাঙ্ক পার হয়ে শ্রামল মাঠের এক কোণে দিগন্তের শেখসীমায় পড়কুটো দিয়ে বাধা ছোট কুঁড়ঘরের স্বপ্ন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় উপনিবেশ রচনা করার কত রোমাঞ্চকর হুঁসাহসিক গল্প আছে ছড়ানো। হয়ত আমারই পূর্বপুন্ডর হাজার হাজার বছর আগে মধ্য-এশিয়ার বালুপ্রান্তর পার হয়ে সিদ্ধু নদ অতিক্রম করেছিল

এক দিন এই উপনিবেশ রচনা করার ছুটির মোহে। পিছনে কেলে এসেছিল খেলাধবের মত পিছনের জীবন।

কে, কে, কে ওখানে?

নিযুগ গা-ছমছম-করা অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে ওখানে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ভয় নেই দাছ, আমি। আমি তোমার ঠাকুর্দা।

ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি চাও তুমি, এত দিন পরে কেন দেখা দিলে?

তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছ, তাই তোমাকে বারণ করতে এলাম। তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না। আমাদের ভিটেন্স তুমি পশীপ জ্বালাবে এই আমাদের অহুর্দোষ।

তা হয় না দাছ, আমাদের যেতেই হবে। এখানে গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে থাকতে পারব না। আমাদের ছেড়ে দাও দাছ।

তুমি ভয় পেয়ে চলে যাবে। নতুন করে ঘর বাঁধ এই সামনের উঠানে, ঐ পোড়ো জমির উপরে। এ তোমার সাতপুরুষের ভিটে, তুমি পালিয়ে যেও না বরুণ।

তুমি যদি সুখী হও তবে তাই হোক দাছ। আমি কোথাও যাব না তোমাদের ছেড়ে। আমাদের ক্ষমা কর দাছ।

নীচের জলাভূমি, ধানক্ষেত থেকে কুয়াশার একটা ধূসর পর্দা উঠে আসছে দিগন্ত আচ্ছন্ন করে, আমার চৈতন্যকে সম্মোহিত করে। চোপের পরবে জড়িয়ে আসছে ঘুম ঘুম স্বপ্নের আবছায়া। স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে— নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গুপ্তপ্রান্তে তর্জনী বেধে বহুশয় সঙ্কেত করছে, এতখান যা দেখেছি সব হুল, সব মিথ্যা, সব কল্পনা। তা হলে কি আমি নিস্তব্ধ মনে কথা কয়েছি মনের প্রতিচ্ছায়ায় অল্পসরণ করে। কেউ কোথাও নেই, নিস্তব্ধ রাত ঝাঁঝ করছে। শুধু ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, শুক-তারাজল জল করে উঠল আকাশের এক কোণে।

খুঁট করে শব্দ হতেই দেখি দরজা খুলে বাইরে কে এসে দাঁড়িয়েছে।

কে ওখানে বসে?

রাস্তিরের ট্রেনে আমি এসেছি বৌদি।

ট্রেন লেট করেছে বুঝি।

হ্যাঁ, শীগগির বিছানা করে দাও। ঘুমে চোপ জড়িয়ে আসছে।

## বিধাতার হাসি

শ্রীকালিদাস রায়

ভবনে বর্ণন উৎসব করি তর্কে মতি  
নিপিল ভুলিয়া উল্লাসনার সাব্বাটি রাতি।  
মাঝে মাঝে বুক হুক হুক করে আচর্ষিতে  
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে অলক্ষিতে।

ফাল্গুনবাতে জ্বল বুলি কত কল্পনাতে,  
আকাশকুসুম তুলি আনমনে আশার সাথে।  
মাঝে মাঝে কোন্ অজানা শব্দা উদাস করে।  
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে মাধার 'পরে।

সংসার-মোহে মুগ্ধ বর্ণন সকল ভুলি',  
শিশু পোলে কোলে চারি পাশে হাসে স্বপ্নগুলি।  
স্বপ্নের মাঝে কে বকের পাঁজরে আঘাত জানে।  
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে কোথা কে জানে।

রোষভরে হবে অপরাধীজনে শাসন করি।  
বিচারক হয়ে অস্ত্র সবার দূষণ ধরি',  
ক্ষম ভাষণ সহসা কণ্ঠে মিলায়ে যার।  
কেন? মনে হয় হাসিছে বিধাতা যেন কোথায়।

অস্ত্রের হবে গণ্য করি না দর্পভরে,  
আমার ভুলা ভাবি কেবা আছে এ চরাচরে,  
চমকায় বুক, মাথাটা কে যেন নামায় টানি'।  
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে দণ্ডপাণি।

এই বিধাতার নগে বিবিস্ত ভবিষ্যৎ।  
যুগে যুগে সে যে সাজায় বাথার মাথুর বথ।  
শুনি লোকে তারে অতুর বলে, সে-ই ত কুব।  
হুচ্ছ কোড়ে হুচ্ছ কাদায় তাহার হাসি নিষ্ঠুর ॥

# বিবাহে লোকগীত

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

সঙ্গীত একটি অপূর্ণ ভিনিষ। সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে মানুষ যুগে যুগে তার গুণ-তুণে ব্যক্ত করছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র, সভা-অসভা পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই সঙ্গীত অতি প্রিয় এবং সকলজি সঙ্গীতের বহুল প্রচলন আছে। আমাদের দেশে নানা ধর্মাত্মকভাবে, বিশেষতঃ বিবাহ-উৎসবে সঙ্গীতের প্রাচুর্য দেখা যায়।

বাংলাদেশেও এককালে বিবাহের সময় মেয়েদের গীত গাইবার বড় চল ছিল। সাধারণতঃ রানসীতার সাজসজ্জা বিবাহ উত্থাদিরই গীত গাওয়া হত। আত্মকাল অবশ্য নবা সভাসমাজে সে সমস্ত সেকলে লোকগীত গাওয়া উঠে গেছে, তবে বাংলার বাউরে, বিশেষতঃ উত্তর ও মধ্যভারতে এবং রাজস্থানে সমস্ত উৎসবে এখনও মেয়েদের গীতবাহ্য, এমনকি নাচেরও প্রচলন আছে।

এবার মধ্যভারতে থাকাকালে সে দৈন্য প্রবাসী উত্তর-ভারতীয় ঐশ্য নারীদের লোকগীত সংগ্রহের সুবিধা পেলাম। সেদিন আমাদের প্রতিবেশী এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারে খুব ধুমধামে বিয়ে চলছিল। আমি সে বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। পাত্রের সাগাতি বাগদান থেকে শুরু করে বৌভাত পর্যন্ত সমস্ত অমুষ্ঠানের খুঁটিনাটি কৌতুহলের সচিত্র লক্ষ্য করে দেখলাম, এদের অমুষ্ঠানগুলি বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সাগাতির দিন থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত রোজ ত'বেলা বর ও কনকে হলুদ মাগান হয়। নাস্তেনী এসে অঙ্গন পরিষ্কার করে প্রথমে লাল মাটি দিয়ে লেপবে, তারপর 'চৌক পুরবে'। চৌক পুরা হ'ল শ্রবীর, আটা ও একরকম সাদা পাথরের গুঁড়ো দিয়ে স্তম্বর করে রেখা টেনে ছোট ছোট নজ্জা আঁকা, অনেকটা আমাদের দেশের পিঠালি দিয়ে খালপনা দেবার মত। তারপর নাস্তেনী বরকে পিঁড়ি পেতে বসায়। সব সধবা একত্র হয়ে বরের গায়ে হলুদ মাগায় আর বরকনের মাকে গালি দিয়ে গান গায়।

এদের গানের মধ্যে গালি দেওয়া একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। গান গাইবার সময় প্রথমে ঠাকুরদার নাম নিয়ে তারপর বাপকাকার নাম নিয়ে গান শুরু করে :

“বোলাও আজ ভগবান দীন

সুখ দেখো আজ, কুছ খরছ আজ।

কাইয়া নাতি বৈঠে হায়া উবটনা,

শাহাজাদা বাচে হায়া উবটনা।”

“ঠাকুরদা ভগবানদীনকে গবর পাঠাও, তার নাতি কি সুন্দর হলুদ লাগাতে বসেছে। তাকে বল কিছু খরচ করতে, আজ কত আনন্দের দিন।”

যেদিন শুভ বিবাহ হবে, সেদিন সব এয়োতিরা মিলে পেয়ারা-

পাতা পেড়ে আনবে। সব শুভ কাজেই অন্ততঃ সাত জন এয়োতি থাকবে। ব্রাহ্মণ এসে বরন পাঁজি দেখে শুভ মুহূর্ত বলবে, তখন একজন পুণ্য বংশের একটা খুঁটি বিয়ের মণ্ডপের জন্ত গাড়বে, তারপর চারদিকে সাতটা খুঁটি গেড়ে বিয়ের মণ্ডপ বাঁধবে, আর এয়োদের আনা সেই পেয়ারাপাতা আমপাতা দিয়ে মণ্ডপ সাজাবে। এদিকে এয়োরা একটা খালাতে খুব করে হলুদ গুলে রাপে, আর বরন ব্রাহ্মণ মন্ত্র বলতে থাকে ও পুণ্যেরা খুঁটি গাড়তে থাকে, তখন এয়োস্ত্রীরা ভীততে হলুদ গুলে জলে ছাত চুবিয়ে এদের পিঠে জামাতে ছাপ মেয়ে দেয় ও গান গাইতে থাকে :

“মণ্ডপ ত ভারি সুন্দর, ন জানে কেতে গুণ

ন জানে বাটায় গুণ, ন জানে কাঁঠ গুণ।

কলস ত ভারি সুন্দর, ন জানে কোঁনে গুণ

না জানে কুন্তরকা গড়ায়ে, ন জানে মাটি গুণ

হলুতা ত ভারি সুন্দর, ন জানে কোঁনে গুণ

ন জানে মাখি কি কোপি, ন জানে বাপা গুণ।”

“মণ্ডপ ত ভারি সুন্দর, তা কার গুণে হয়েছে, কে জানে কারো গুণ, না কারিগরের হাতের গুণ? কলসী অতি সুন্দর, তা কি মাটির গুণ, না কুমারের হাতের গুণ। বর এত সুন্দর, সে কি মায়ে গুণ, না বাপের গুণ।”

এসব বিয়ের কাজে নাস্তেনীর খুব দরকার, আর বিয়ের সময় নাস্তেনীদের রোজগারও খুব হয়। নাস্তেনী এসে মণ্ডপের ভিতর গোবর দিয়ে খুব ভাল করে লেপবে, আবার আটা দিয়ে স্তম্বর করে চৌক পুরবে। সাত সধবা একটা নূতন মাটির কলসী এনে গোবর দিয়ে লেপে তাতে গেহিমাটি দিয়ে রাং দেয়, তারপর সব দিয়ে সেই গোবরের উপর গেথে গেথে নানারকম নজ্জা আঁকে। মণ্ডপের মধ্যভাগে নাস্তেনী মাটি দিয়ে বেলী বাঁধে, তাতে সব বিছিয়ে দেয়, তারপর সধবারা সেই অঙ্কিত মঙ্গলকলসী জলে পূর্ণ করে বেদীর উপর রাখে ও তার উপর একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়।

সাতটি কুমারী কজা এসে একে একে সাত বার দুর্কা হাতে নিয়ে তেল-হলুদে চুবিয়ে বরের পায়ে, হাঁটুতে, বাহুতে ছুঁইয়ে মস্তকে রাপে ও নিজের হাতে চুমো পায়। এদের পর সাত সোহাগিন পূর্বের মতই বরের শরীরে তেল হলুদ মাগায় ও অল্প সোহাগিনরা গান গাইতে থাকে :

“ছাটিকা চাওল, ঝালারি ছব,

তেল চড়াওয়ে, মোহন কী বহিন।

তেল চড়াওয়ে খেবিয়া, দেও আশীষ,

বাচে হলুতা হলহিন দাপ বরিষ।”

“মিহি চাল, সুন্দর সতেজ দুর্কা। মোহনের বোন তেল লাগাচ্ছে।

বরের শরীরে কল্লারা তেল লাগাচ্ছে, তোমরা সবে আশীর্বাদ কর  
বর-কনে লক্ষ বধ দেঁচে থাক ।”

উঠানে বরকে স্নানের জল এনে পিঁড়ির উপর বসান হয় ।  
বরের স্নানের জল ভারী বালতী (কাঁহার) ভরে ভল আনে ।  
সোহাগিনরা মণ্ডপের মঙ্গলকলসী থেকে কিছু জল এনে সেই  
বালতীর জলে মিশিয়ে দেয় । বাকী কলসীর জলটা হলহিনের  
জল একটা ঘটিতে ভরে নেয় । সাত সোহাগিন জল ঢেলে  
হলহাকে স্নান করায় দেয়, সখীরা গান গাতিতে থাকে :

“কে সগরা পনারে, কেনে ঘাট বন্ধাওয়া ?

কে কর ভরায় কাঁহার ?

—হলহা নৌওয়ায়ে ।

বাধা মোরে সগরা পনারে, ভাটকা ভরায় কাঁহার

—হলহা নৌওয়ায়ে ।”

“বয় জিজ্ঞেস করছে, কে কুয়া খুঁড়েছে, কে ঘাট বাধিয়েছে, কে  
ভারী এনেছে ?

সখীরা বলছে, বর নাটতে এস, বাপ কুয়া পানন করে দিয়েছে,  
ভাই জল দেবার জল ভারী এনেছে, ও বর তুমি নাটতে এস ।”

নাশিত এল নখ কাটতে—

“গর ঘর ফিরিতি নউনিরা, গোতিন বলায়াই

আজ মেরে রামকা নখুব, সব সখী আয়োই ।

কই ছুঁড়ে চুনকি মুন্দারিয়া, কই ছুঁড়ে রূপ

কই ছুঁড়ে রতন পদার, ভরি গয়া স্রণ ।

মায়া ছুঁড়ে চুটকি মুন্দারিয়া, বাপা ছুঁড়ে রূপ

বুধা ছুঁড়ে রতন পদার, ভরি গয়া স্রণ ।”

“ঘরে ঘরে নাশিত করে, সখীরা তাকে ডেকে নিয়ে আসে,  
আজ আমার রামের নখ কাটবে, সব সখী এস, কেউ দেয় আংটি,  
কেউ দেয় তাঁরামোতি, চার দিকে স্রণ উপচে পড়বে । না দিচ্ছে  
হাতের রক্তমাংস আংটি, বাপ দেয় ঢাকা, পিসী দেয় তাঁরা ওহরত,  
চার দিকে কত স্রণ ।”

নখ কাটা হয়ে গেলে বরের শরীরে, মানে সাহসজ্ঞা হবে । নখ  
কাটা হলে পর নাগুনি বরের পায়ে একে একম লাল রং,  
আলতার মত পরিবে দেয় । হলুদে নতুন জামা কাপড় বড়িয়ে  
রাখা হয় । হলহা সেই হলুদ-ছোপান নব বস্ত্র পবে পিঁড়িতে  
বসে । বোন এসে চোখে কাজল পরিবে দেয় । সমস্ত কপালে  
চন্দনের ছোট ছোট দোঁটা দিয়ে চিত্রিত করে তোলে । কেউ  
কেউ মাকে মাকে অজের কুঁচি দিয়ে দেয়, তাতে আলো পড়লে সব  
কপাল চকমক করে ওঠে । মালী মৌর নিয়ে আসে, বোঝাই (ভগ্নী-  
পতি) বরের মাথায় মুকুট পরিবে দেয় ।

সখীরা গাটতে গাটতে জিজ্ঞেস করে—

“মায়া ভূসে পুছা, ও বানা, মৌর কাঁহা পায় ?”

জ্ঞান সখী গানে উত্তর দেয়—

“তোমার বতিনকা ইয়ার মালী লে অয়া ।”

“মায়া ভূসে পুছা, ও বানা জামা কাঁহা পায় ?”

তোমারা ভাবীকি ইয়ার দজি লে অয়া ।” ইত্যাদি

এ ভাবে মাসী-পিসী সবার নাম নিয়েই গায়িকা গানের  
ভিতর দিয়ে বসিকতা করে, উত্তর-প্রত্যুত্তর চালাতে থাকে । বয়  
নিশ্চুপে বসে থাকে ।

মুকুট পধান হলে চার জন সোহাগিন ছটা নতুন কাপড় এনে  
বরের হৃদিকে বরকে আড় করে ঢাকে । সাত জন সোহাগিন  
বরের চারদিকে সাত বার স্তোত্র ঘুরিয়ে আনে, একজন সোহাগিন  
হাতে খানিকটা চাল নিয়ে কাপড়ের নীচে বরকে দেখায়, জিজ্ঞেস  
করে -

“বলত হলহা চাল ভাল কি নন্দ ?”

হলহা বলে—“ভাল না চাল ।” এ রকম ছয় বার জিজ্ঞেস  
করার পর হলহা সাত বরের সময় বলে “ভাল চাল ।” তখন  
কাপড় তুলে নেয়, সাত দিকে ঘূরান স্তোত্রা ভাঁজ করে হলুদে  
চুবিয়ে নেয় । লোহাঘের কাছ থেকে নতুন লোহার কাঁকন তৈরি  
করে আনে । সেই হলুদ-রঙানো স্তোত্রা কাঁকনে বেধে বরের ডান  
হাতে পরিয়ে দেয়, বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ হলে তবে হাত থেকে  
লোহার কাঁকন খুলে ফেলে ।

এখন ববাত (শোভাযাত্রা) বেরবে, বাইরে ঘোড়া ফলের  
হার দিয়ে খুব সজ্জা করে সাজিয়ে আনে । হলহাকে তার বোঝাই  
(ভগ্নীপতি) অভাব পক্ষে নাশিত ঘোড়াত্তে বসিয়ে দেয় । বাগু  
বেঞ্চে উঠে—স্ত্রী পুরুষ সব শোভাযাত্রা করে চলে কুয়ো পূজা  
করতে । বাঁধান কুয়ের পাড়ে মা বসেন এক পা কুয়ের ভিতরে  
দিয়ে । সাত জন সখী বাঁধান পাড়ে সাত ভাথগায় পান, স্রপারি,  
সিন্দুর, হলুদ, গি, হুড় ও ছ' পয়সা রাখে । তার পর জলভরা ঘটি  
হাতে নিয়ে কুয়াকে হাত বার প্রদক্ষিণ করে, ও সেই পান স্রপারি  
উপর অল্প অল্প জল ছিটিয়ে দেয় । তখন ছেলে বলে—“মা ঘরে  
চল ।” মা কুয়োতে এক পা বাড়িয়ে বলেন—“আমি ঘরে যাব না ।  
তুই ত বিয়ে করতে যাবি, আমাকে পাওয়ারে পরাবে কে ?” ছেলে  
বলে—“মা তুমি ঘরে চল, আমি রোজগার করব তুমি পাবে, বৌ  
জানব সেবা করবে । তুমি শুধু বসে থাকবে ।” তখন মা অভিমান  
ছেড়ে উঠে আসেন ।

এই মা এব' ছেলের প্রথ ও উত্তরে মনে হয়, মা ছেলের বিয়ে  
দিতে গিয়েও সম্পূর্ণ প্রসন্ন হতে পারছেন না, তার মনে সব সময়ই  
এব' ভয় ভাগছে, বিয়ে হলেই আমার এতদিনের কষ্টে মাল্লব করা  
আদরের ছেলে সম্পূর্ণ পর হয়ে যাবে । বুড়ো বয়সে আমার অল্প-  
বস্ত্রের সংস্থান করবে না, তার চেয়ে আমি কুয়োতে কাঁপ দিলেই  
সব আপদ মুকে য'ত ।

ছেলে আখ'স দিয়ে মাকে ঘরে ফিরিয়ে আনছে । শোভাযাত্রা  
আদও খানিক দূর এগিয়ে যায়, মা কলো হাতে নিয়ে ছেলেদে চার-  
দিক ঘুরিয়ে কপাল ছুঁতয়ে সোহাগিনদের হাতে দেন । এ ভাবে  
মশলা পিষবার নোড়া, ঘোল ঘুঁটার খুঁটনি, চাল কুঁটার মুগ্ধ, এ  
সব দিয়ে একে একে ছেলের কপালে ছুঁয়ে সখীদের হাতে দেন ।

তার পর পিতলের খালায় মঙ্গল দীপ নিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করে বিয়ে করতে বিদায় দেন। বর বেচারা এসব স্ত্রী-আচার করণ-কারণের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে বুঝতে পারে বিয়ে করাটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।

কুয়া পূজাতে গাথিকারা গাউছে—

“ভুম ত পুত চলে বিয়াচন,  
মোরে তুধকা মোল কিতৈ যাও।”

অঙ্ক সঙ্গী উত্তর দিচ্ছে—

“গাউয়া ভটমকা মোল হোয়  
মাতা, তোরে তুধকা মোল নেতি হোয়  
তোরে তুধ উবিন নেতি হোয়।”

“আ ছেলেকে বলছেন, ছেলে ভুমি ত বিয়ে করতে যাচ্ছ, আমার তুপের মূল্য দিয়ে যাও।

ছেলে উত্তর দিচ্ছে, গাউ নহিযের তুপের মূল্য দেওয়া যায় কিন্তু তোমার তুপের মূল্য নেই, তোমার স্বর্ণ গাউবনে শোধ হবে না।”

গাথিকারা গুয়ে চলেছে—

“সাজ সাজ ঠা রহা মোরে সঙ্গ-সাখী ন কৈ,

অঙ্ক সঙ্গী বলছে—

“সঙ্গ সাখী যো হুই হায়— মোতনরাম,

যে কে বিয়াচন যায়।

সঙ্গ সাখী যো হুই হায়—উনকা বাপ রাম

উনকা পুত বিয়াচন যায়।”

বর বলছে—“আমার সাক্ষসকা ত হ'ল, কিন্তু সঙ্গী-সাখী কেউ নেই, কি করে বিয়ে করতে যাউ। সখীগ বলছে—সঙ্গী-সাখী ত মোতনরাম আছে, যার ভাই বিয়ে করতে যায়।

“ঘোড়ে চড় পরজৈ হলচে রাম,

বাবা, হাম না বরতে যাবে

হাম মোরে লাগে।”

পিতা বলেন—

“হরা হরা বাঁশ কচৌবে, ছাতা ছওবে

পুত ওছি ছারে ছারে যাও, ঘাম কাইসা লাগে।

ঘোড়া ত বাক পুত, ঐ ঘোড়া সড়িয়া,

হাতী লও কি ডাল, তোত ভোব পুত,

তুমকা বিচৌবে।”

বর ঘোড়ায় চড়ে বলে, “বাবা আমি বিয়ে করতে যাব না, আমার বোদ লাগে।”

বাপ বলছে—“সবুজ বাঁশ কেটে ছাতা বানাব, তারই ছায়ায় ছায়ায় বাছা যাও, বোদ কি করে লাগবে। ঐ দেপ ঘোড়াশাল আছে ঘোড়া বাঁধ, হাতী লগাচ্ছে ডালে বাঁধ। ভোর হয়ে আসছে ছেলে, তোমার বিয়ের সময় হয়ে এল।”

বর ত বিয়ে করতে চলে গেল, এবার বৌ নিয়ে কিবে আসবার পালা। বাজতাত শোভাবাজা করে বর বিয়ে করে কনে নিয়ে

এল। বচ্ছাই এসে বরকে ঘোড়া থেকে নামাল। নাগেনী এসে কনেকে পাখী থেকে নামিয়ে নিল। অঙ্কনে বর-কনেকে দাঁড় করিয়ে বাপ মা ধোড়ে বান ছেলেরোঁকে বরণ করতে। হাতে একপানা কুলা, তাতে এক এক মুঠা করে সব বরকমের ডাল, গুঁড়া হলদি, ধানদুর্কা, তেলসিন্দুর, আর মধ্যভাগে একটা প্রদীপ জ্বলতে থাকে। মা ছেলেরোঁকে সেই কুলা দিয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরিয়ে আরতি করেন। ছেলেরোঁদের কপালে হলুদ সিন্দুরের ফোঁটা দেন, এক ঘটি জল নিয়ে ছেলেরোঁদের চারদিকে জলের ধারা দেন। অঙ্কন থেকে যে ঘুরে বধু বরণ হবে সে রাস্তা পথ স্তম্ভ এক চুককা নতুন চুনরি (চাপ দেওয়া ফুলতোলা নতুন স্তম্ভের কাপড়) বিছানো হয়। ওদিকে এয়োরা এক তাত চওড়া বড় বড় লুচি ভেজে রাপে, লুচিগুলি একের পর এক বিছিয়ে রাখে সেই ফুল তোলা বিছানো কাপড়ে। বরকনে তখন লুচির উপর ঘোঁরে ঘোঁরে পা রেখে ঘরে প্রবেশ করে। নাগেনী এসে সেই লুচিগুলো আর নতুন চুনরি-পানা উঠিয়ে নেয়, এগুলি তারই প্রাপ্য। বরকনে গৃহদেবতাকে প্রণাম করে ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু সেখানে এক মহা বিপদ, বরের বোন লোর আগলে বসে থাকে, বলে—তোমাদের ঘরে ঢুকতে দেব না। ভাই তখন মিনতি করে বলে—“বোন রাস্তা ছেড়ে দে, যা চাস তাই দেব।”

বোন তখন তার ইচ্ছানুযায়ী কোন গয়না, সাড়ী বা পাঁচ দল ঢাকা চেয়ে বসে। ভাই তাই দিবে এটি প্রতিশ্রুতি দিলে বোন শেষ ছেড়ে দেয়, বর বৌ নিয়ে ঘরে ঢোকে, এই সামাজ্য নিয়ম-টুকুতেই নন্দন-ভাঙের অর্থের সম্পদ ফুটে উঠে।

বরের হাতে বিয়ের দিনে যে লোহার কঁকন পরিয়ে হলুদ-রঙের সূতো বেধে দেওয়া হয়েছিল, এবার কনেকে তা খুলতে হবে। বরের তরফে এক দল এয়ো বসে সেই সূতোর খুব কষে গিট লাগায়। বরের পক্ষে এয়োরা সেই হলুদ সূতোতে তেল ও মাষকলাই-দাল বাটা মেখে সূতোটাকে পিছল করে রাখে যাতে কনে খুলতে না পারে। কনেকে এক হাতে ঐ গিট খুলতে হবে। কনের তরফের এয়োরা কনেকে উৎসাহ দিতে থাকে। বেচারী কনে গলদবদ্ধ হয়ে উঠে ঐ পিছল সূতোর গিট খুলতে। না খুলতে পারলে বরপক্ষের এয়োরা উল্লসিত হয়ে উঠে কনের পক্ষের এয়াদের গালি দিয়ে গান গুলু করে। “আমার ছেলে রাজা, তুই অমুকের মেয়ে, তুই তেরে গেলি” ইত্যাদি।

তার পর একজন এয়ো সেই কঁকন, সূতো, আঙটি এসব নিয়ে উপর থেকে ফেলবে। বরকনে ওং পেতে থাকবে, কে আগলে এগুলো নিতে পারে। যে দল তারবে সেই দলই গালি খায়। এ ভাবে সবধা স্ত্রীরা বরকনেকে নিয়ে খুব হাসিমুখা করে।

এবার পাকস্পর্শের পালা। কনেরোঁ হিসেলে গিয়ে একটু ফীর (পায়েস) রান্না করে। স্বস্তর, ভাস্তর, জাতি-গোষ্ঠী নিতান্ত ঘরোয়া যারা তাঁরা পেতে বসেন, সামনে পাতা বিছানো। বৌ এক হাত ঘোমটা টেনে সকলের পাতায় পিছুড়ী আর কীর পরি-



বেশন করে, আর পাতা ছুঁয়ে বসে থাকে, বতরুণ পঞ্চম স্তম্ভ, ভাস্কর এঁরা কেউ শাড়ী, কেউ গয়না এসব দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি না দেন।

বরাত চলে গেলে এক সপ্তা গাটিলে—

“কে বানাকো বিয়াচন যায়, মোতি ঝালর লাগি”

“কে বরের বিয়েতে যাচ্ছে, মোতির সাজগোজ পরে?”

সপি বলছে—

“আগে ঘোড় উনকে আজাকা,

পিছে আজীকা মেথানা

বীচ ডোলা শাহজাদাকা

চোপিওয়ালেকা মোতি ঝালর লাগি।”

“ঘোড়ায় চড়ে যে যাচ্ছে, সে হ'ল বরের ঠাকুরদাদা, পিছনে ঠাকুরমার পাখী, মধ্যখানে শাহজাদা বরের ডুলি, বর জরি মোতিতে সেজে বসেছে।”

বরাত এসেছে, সপি বলছে—

“ইতনি দেব কঁহা লগায় ডলারী পুতা,

মোরি থিয়া গরি কুস্থলায়।”

অল্প সখি উত্তর দিলে—

“বাপ হামারে পতুরিয়া নচাওয়ে

এঁচি ভই ইতনি দেব।”

“ও আমার বাছা, তুমি এত দেবী করলে কেন, আমার মেয়ের মুখ শুকিয়ে উঠছে।”

বর বলছে, “আমার বাপ পুতুল নাচাচ্ছে, তারই ভঞ্জে এত দেবী হ'ল।”

বর দ্বৈতে বসেছে, এয়েঁরা তপন গান শুধু করলে—

“জৌনে দিন রাম জনকপুর আয়ে

দেবন আরী সারি তনিয়া।

কিছা চাওল যতিন সে বিছো,

মুংকি দাল বগারি

বরা, বরোঁলী, আওর কুলোঁহী

লৈ দহিয়ামে চ ভোরি

ময়লাকি রোটি যতিনসে সেকো

লৈ ঘিওন যে চ ভোরি।

রাম সীতাসে ভজ।

চন্দনকাঠ পিটই বগী আঁদ্র

পাতিন পাত বিছাই,

পাননকি পতরি বন আঁদ্র

লওন ডোভ ভোভাই।

জৈওন বৈঠে লছমন রাম,

পরশন লাগি হায় জনক দুলারি,

বিছিয়ান কি ছনকারি।”

“যেদিন রাম জনকপুয়ে এলেন, পৃথিবীর সব লোক দেখতে এল।

নইয়ে ভিজিয়ে বগাফুলোঁরি নিয়ে এস, ময়দার কুটি বস্ত্র করে সোঁকে ঘিরে ভিজিয়ে আন। মুগডাল ঘিরে ফোড়ন দিও, আর সজ চালের ভাত রান্না কর। রামসীতায় বন্দনা কর। চন্দনকাঠের পিঁড়ি তৈরি হয়ে এসেছে, পাতাওয়ালী সারি সারি পাতা বিছিয়েছে, লং জুড়ে জুড়ে পাতার চোঁড়া বানিয়েছে। খাবার জুতা রাম-লক্ষণ বসেছেন, জনকনন্দিনী পায়ের আংটির স্বকার তুলে খাদ্য পরিবেশন করছেন।—

“জোওন বার্টে কুঙ্কানাইয়া, দেতি সপিসব গারি।”

কুঙ্কানাইয়া বর বলছেন,

“হাম ত আছি, তিনলোককে ঠাকুর,

হাম তি তুম তি ক্যাইসা গারি।”

“আমি ত তিনলোকের ঠাকুর, আমাকে কি করে গালি দিচ্ছ?”  
সপীরা উত্তর দিলে,

“যো তুম আচো, তিনলোককে ঠাকুর

কাঁচে ত আয়ে স্বস্তরাঙ্গী।”

“তুমি যদি তিনলোকের ঠাকুরই হবে, তবে কেন স্বস্তরবাড়ী এসেছ?”

স্বস্তরবাড়ীতে ছেলে যে গিয়েছে, আর ফিরবার নাম নেই,

“মাতা বশোলা চিঠি লিখ ভেজে

ছায় ললন স্বস্তরাঙ্গী

চিঠিয়া বাচত, পুত ঘোড়া সাভাও হঁচি

বায় কি পৌঁছে দয়ারী

হাসি হাসি পুছে মাত বশোলা

ক্যাইসি ললন স্বস্তরাঙ্গী?”

“মা বশোলা চিঠি লিখে পাঠালেন, বাছা স্বস্তরবাড়ীতে গিয়ে আমাকে ভুলে গেছে? চিঠি পড়ে ছেলে ঘোড়া সাজিয়ে ঘরের দ্বায়ে গিয়ে পৌঁছল। হাসিমুখে মা জিজ্ঞেস করলেন কেমন স্বস্তরবাড়ী?”

ছেলে উত্তর করলে,

“স্বস্তর হামারে গজপতিয়াকে ঠাকুর

শাস গজাজল পাপি

আজীয়া শাস মেরি অধিক পিয়াদী

আঁচল ঝালাইন বয়ারী

শালা সে শরহাত, অধিক পিয়াদী

শারে বড় অভিমানী।”

“স্বস্তর তিনলোকের পূজা, শান্ত্রী গজাজলের মত পবিত্র, দিদি-শান্ত্রী আমাকে খুব ভালবাসেন, আঁচল দিয়ে তাওয়া করেন।

শালায় চেয়ে শালাবোঁ বেলী প্রিয়, শালা বোঁ বড় অভিমানী।”

“নওরে মাহ উদরী মে বাধি

পুত কবছ না কিয়ো বড়াঈ।

চারদিন পুত গয়োও স্বস্তরাঙ্গী শাসকী কিয় বড়াঈ।”

“নয় মাস জুড়ে খাওয়া করলাম, তার ভঞ্জে ত কোন অহঙ্কার কর নাই, আর চারদিন স্বস্তরবাড়ীতে গিয়েই শান্ত্রীর প্রশংসা স্বক করেছে।”

ছেলে—“যো তুম মাতা, ইতনা দুঃখগয়া

কভিতি ন যাবে খুশ্বালী।

বহিনকে যাবে, খুশ্বারী ন যাবে (সীতারাম ভদ্র)

মাতাবহিন পায়ো গালি।”

“মা তুমি যদি এতটু চুপে পাক, তবে কখনো খুশ্বরবাড়ী যাবে না, বোনের বাড়ীতেই যাবে।”

মাতা—“হামারে কতকো পুত মাগ না মানো

নিতরে ভোজন, নিতমে গালি,

যুগ যুগ বাটে পুত, তোমারি খুশ্বালী

নিত ভোকনরে নিত গালি।”

মা বলছেন, “আমার কথায় তুমি পেয়ো না, বাড়া তোমার খুশ্বরবাড়ী যুগযুগ ধরে অগ্নি থাক।”

এই গানগুলির ভিতর দিয়ে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে চিরন্তন স্বপ্নচুপ-বন্ধা-অভিমানেরা মাহুদয়। এই অযোধ্যাবাসিনীদের বিবাহের গানগুলিতে সপ্নের পক্ষ ও উত্তরে মায়ের অন্তরের মূর্তি অতি সুন্দর পরিকল্পিত হয়ে উঠেছে। মায় কাছে ছেলে প্রাণাদিক প্রিয়, তাইই দিয়ে দিয়ে বোঁ বরে আনবেন, কিন্তু মা তো মুক্কাংকরণে আনন্দিত হয়ে উঠতে পারছেন না। বোঁ এলে ছেলে পর হয়ে যাবে, এই ভাবনাটাই মূহুত হয়ে উঠেছে মায়ের মনে। তারই বন্ধুমাংসে গড়া, তার প্রাণের পুত্রলীকে কে আগের কল্যা এনে তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে এমন একটা আশঙ্কা মায় মনকে চিন্তায় অভিমানে ভরে তুলল। মা তাই ক্রোড়ে পা দিয়ে বসে রইলেন, গড়ে ধাবেন না। ছেলে এসে মাকে অচনয়-বিনয় করলে, প্রতিশ্রুতি দিলে বোঁ এসে মায় সেবা করবে, ছেলে দোষপার করে মাকে পাওয়াবে। ছেলের কথা শুনে মায় মন পসন্ন হ'ল, মা ছেলেকে আশীর্বাদ করে বিয়ে করতে পাঠালেন। কিন্তু ছেলে বিয়ে করতে গিয়ে ফিরে আসতে দেবী বওছে, মায়ের মনের যে

মেঘ কেটে গিয়েছিল তা আবার একটু একটু করে জমা হতে লাগল। মা ছেলেকে অনুযোগ করে চিঠি দিলেন, খুশ্বরবাড়ীর মায়ায় ছাঁদিনেই ভুলে গেলে বাছা? ছেলে মায়ের চিঠি পেয়ে কোঁড়া টুটিয়ে চলে এস। মা-শী তখন ছেলেকে খুশ্বরবাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে খুশ্বরবাড়ীর প্রশংসা করতে লাগল।

মায় মন অভিমানে ভরে উঠল, বললেন, “হা রে, তোকে যে ন'মাস জুঁবে পরলাম, তার জগে ত কোন বড়াই কর'ত দেগলাম না, আর এক দিনেই তোর স্বপ্ন-শাস্ত্রী আপনার বন হয়ে উঠল? মায় এত দুখা আর অভিমানের কথায় ছেলের মনেও অভিমান হ'ল। বললে থাক মা, খুশ্বরবাড়ীর কথায় যদি তোমার এতটু চুপে হয় তবে কখনও খুশ্বরবাড়ীতে যাব না।

ছেলের এই অভিমান মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি গল্পেতে বললেন, “না বাবা, তুই খুশ্বরবাড়ী যা, তোর খুশ্বরবাড়ী যুগযুগ ধরে অগ্নি থাক, তোরা সুখী হ'।”

মায়ের মনের এই বিচित्र সংঘাত গানগুলির ভিতর দিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে। অযোধ্যাবাসিনীরা তাদের সহজ সরল কথা আর গানের মিষ্ট স্বরে আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা মাহুদয়ের এই বিচিত্র অস্থিতি অন্তরে সঞ্চিত করে দিল।

গ্রামা নারীদের গান শেষ হ'ল। গানগুলির বিশেষত্ব এই, এগুলো কোন পুস্তকে ছাপা হয় নি, এগুলো বহু প্রাচীন সঙ্গীত। অযোধ্যাবাসিনীরা বংসরের পর বংসর বিবাহ ও অগ্নি দম্মাহুতানে দুগে দুগে রচিত এই গানগুলি গেয়ে উৎসবকে আনন্দপ্রদ করে তুলেছে। এদের গানে নবরসের কোন রসই বাদ যায় নি—গানের গালিগুলো যদিও স্নেহচর্চিত নয়, তবুও গানগুলোর ভিতর দিয়ে তাদের সামাজিক জীবনের বহু বৈচিত্র্য ও মাধুর্য ফুটে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## পরিচয়

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার

আকাশের চাঁদ মাটির পৃথিবী

চোখে চোখে চেয়ে রয়

এত দিন পরে দুটি তিয়া যেন

মনের কথাটি কয়।

চাপা ফুল স্তম্ভ-শাপে

মেলে ধ'রে আপনাকে

সুখভি তাহার উতল পবনে

মিলনের বাণী বয়।

সকল আগল দূরে সরে যায়

স্নানবিড় অহুঁরাগে,

প্রেম-অলকার মণু পরশন

যদি প্রিয় মনে জাগে।

সে মণু-মাধবী রাতে

ছিন্ন দোহে এক সাধে

হবে কি আবার জীবনে সেদিন

নব রূপে পরিচয়।

## দাগ

### শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গভীর রাত। পূর্ণিমা—সাদা আলোর বগা নেমেছে। উষা আর অনিরুদ্ধ তাঁত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের শয়নঘরের সংলগ্ন ছাদে। চোখে মুখে ওদের স্বপ্নের আবেশ। কথা ওদের হারিয়ে গেছে যেন। হাওয়ায় ভেসে এল এক গুণ্ড কালো মেঘ। ক্ষণকালের জগা ওদের আশপাশের চেহারা গেল বদলে। অনিরুদ্ধ জুঁকুটি করে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কথা কয়ে উঠল, অসহ্য—

উষার হৃদয় ভাব ধাক্কা পেয়ে কেটে গেল। চমক চমকে উঠে মুচ কণ্ঠে বললে, কেন!

অনিরুদ্ধ কণ্ঠে অনিরুদ্ধ জবাব দিলে, একটুও কি মাত্রাজেন আছে। দিলে ত সব অন্ধকার করে।

উষা শাস্ত গলায় বললে, উড়ো মেঘ—এখনি সরে যাবে।

অনিরুদ্ধ জবাব দিলে, সে আমি জানি, কিন্তু মুহূর্তের জন্য ওলেও ঐ কালো মেঘকে আমি সহ্য করতে পারি না। সত্যিই আমি বরদাস্ত করতে পারি না উষা।

অনিরুদ্ধ আবেগে উচ্চসিত হয়ে উঠল। উষার হাতে মুচ টাপ দিয়ে পুনশ্চ বললে, কেনই বা বরদাস্ত করতে যাব আমি।

উষা গিল গিল করে ভেসে উঠল, তুমি পাগল...

অনিরুদ্ধ এ হাসিতে যোগ দিলে না বরং আরও গভীর কণ্ঠে বললে, পাগল বলতে আমার মতের পথ, আমার অনিরুদ্ধের পথ কোন অস্তরায়কে মন খেনে নিতে চায় না। পাগল না হলে পেট বিভোর হতে পারে না উষা।

এ কথার কোন দাবি উষা দেখে না। স্পর্শের ভিতর দিয়ে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আকাশের মেঘ তীব্রমতো সরে গিয়েছে। অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে, উষার চোখের কোলে জল। কিন্তু কোন প্রকার পদ্য আর সে উদানী করেন না। পূসক করেছে। অনিরুদ্ধের উচ্চাস বশবশত মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে, উষার চোখে দেখা দিয়েছে জল। অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করেছে, উষা জবাব দিয়েছে, ও কিছু নয়—প্রকাশের বকমফের মাত্র।

কথাটা তার বোঝা উচিত ছিল—অনিরুদ্ধের হাসি আর উষার চোখের জল একই ভাবাবেগের ভিন্ন রূপ।...ওরা ভালই আছে। ওদের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ ভিত্তি বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। ওদের চলায় বলায় কথাটা সব সময়েই মনে করিয়ে দেয়। উদ্ধত উদ্দাম ভালবাসার বেগ। আশেপাশে চোখ ফিরিয়ে দেখতে চায় না। অনিরুদ্ধের মতে দেখবে তারা—ওরা নয়। বস্তুতঃ এত বড় দক্ষ করবার একটা যুক্তি তার আছে এবং তার মতে এটা অকাটা যুক্তি। অনিরুদ্ধের টাকা আছে, আর সেই সঙ্গে আছে রূপ এবং সে রূপকে প্রাণদান করেছে উষা। ওদের একটিকে বান্দ দিলে আর একটি অসম্পূর্ণ।

বন্ধুবান্ধবকে অনিরুদ্ধ ছেড়েছে, কিন্তু তারা এখনও ছাড়তে পারে নি। মাঝে মাঝে পৌছগবর করে। বন্ধুদের পরিত্যাগ করার জগা অল্পযোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত উষার হাতের তৈরি চা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে ফিরে যায়।

অনিরুদ্ধ মনে মনে হাসে। উষাকে কাছে থেকে ঠাটার ছলে বলে, ওরা তোমার সান্নিধ্যলাভের জগাই এখানে আসা-যাওয়া করে উষা...

উষা ক্রটিম বিমর্ষিত দেখিয়ে যেন, এ তোমার অগ্রস্ত অজ্ঞার কথা...

অনিরুদ্ধ জবাব দেয়, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন হাসি লুকোবার চেষ্টা করছে...

উষা হেসে ফেলে, বলে, ওরা কিন্তু তোমারই বন্ধ-বান্ধব। এক দিন তোমার অনিরুদ্ধের সঙ্গী ছিল—ভাগীদার ছিল।

অনিরুদ্ধ বললে, অস্বীকার করছে কে সে কথা?

উষা সহসা গভীর হয়ে উঠল। বললে, অস্বীকার না করলেও অন্তদার হয়েছ এ কথাও ঠিক। আমার বিচ্ছিন্ন সত্যিই মাঝে মাঝে লজ্জা করে। নিজেই অপরাধী বসে মনে হয়।

কিন্তু আমার করে না উষা, অনিরুদ্ধ উচ্চসিত হয়ে ওঠে, বল, তা ছাড়া কেনই বা অপরাধী মনে করতে হবে? বরং আমার মত লাগে—প্রাণ ভরে উপভোগ করি।

উষা যেন কতকটা আপন মনে বললে, কিন্তু এট উপভোগ করে আর ভাল লাগানি কত দিন অব্যাহত থাকবে সেইটেই বড় কথা।

উষার কথা বলার ধরণে অনিরুদ্ধের উচ্চাস গতিপথে ছোটো গেল। ভাল মানলে নিয়ে থাকিক সে উষার মুগের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একটু হেসে বললে, তোমার বক্তবান কি উষা?

উষা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। সহসা অনিরুদ্ধের কাঁধের উপর মাথা রেখে ফিস ফিস করে বললে, দেখছ আকাশের রঙটা আবার বদলে যাচ্ছে, কিন্তু এটা নিয়ে রাগ করলে চলবে কেন? যে নিয়মে চাদের আলোর সাক্ষাৎ মেলে সেই একই নিয়মে কালো মেঘেরও আবির্ভাব ঘটে। এর ভুলোটা সত্য!

অনিরুদ্ধ রাগ করে জবাব দিলে, তুমি অবাস্তব কথা বলছ। সত্য হলেই সব সময় তা অস্মর হয় না এবং সব সত্যকেই মাথুষ মেনে নিতে পারে না।

অনিরুদ্ধের কাঁধের উপর থেকে তার মাথাটা সরিয়ে নিয়ে মুহূর্ত গলায় উষা বললে, সেইখানেই ত আমার সবচেয়ে বেশী ভয়।

উষা ধামলে। অনিরুদ্ধের চোখে একরকম বিস্ময়। উষা পুনশ্চ বললে, তুমি যখন ভালবাসার কথা বল আমাকে তখন অন্ধ করতে হয়। কখনো আমি বাধ্য হই।

অনিরুদ্ধ উত্থান কর্ণে জবাব দিলে, দুই আর দুইয়ে চার হয় এও কি তোমাকে অঙ্ক কষে বার করতে হয় নাকি ?

হয় বৈ কি—উষা একটুগানি হেসে জবাব দিলে, ছোট বললই কি অবহেলা করতে হবে। তা ছাড়া ছোটর সমস্যা নিয়েই—

তাকে খামিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধ বললে, জীবনটা ত অদৃশ্য নয়—

উষা একটু হাসল, আমি বলি ঠিক তাই—বোগবিয়োগ নিয়েই ত জীবন।

অনিরুদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, তুমি দেখছি হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠেছ।

উষা একটু হাসল, কোন জবাব দিলে না। অনিরুদ্ধ কিন্তু খামতে পারল না, হেমনি বলে চলল, কিন্তু আমার খামতে ও-সব নয় না। আমি সোজা মানুষ, সোজা করেই সবকিছু ভেবে থাকি। আমার মধ্যে ঈশা, জেথ, ভালবাসা সবই সমানভাবে বিদ্যমান। প্রয়োজনে এর আবিষ্কার—প্রয়োজনে হয় অস্তিত্ব।—বলেই ত' হাত বাড়িয়ে উষাকে বুকের মধ্যে ঢেঁচেন নিলে অনিরুদ্ধ। বললে মুত চাপা কণ্ঠে, তাই ত এত বড় মতাকে আমি অবহেলা করতে পারি না।

দ্বায়ে ধীরে সে উষার মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ওর চুলের স্নিক স্তব্ধ অনিরুদ্ধর বুকে ঢেঁচি তোলে। রাগের কথা ওর কইনালাতে এসে ঠেলে ঠেলে করে, কিন্তু কথা সে বলে না। এত দলভ মৃদুতিকে সে পরিপূর্ণভাবে শব্দভর বরণে চায়। শব্দের মাধ্যমে এই পূর্ণ অংশটিকে হারিয়ে চায় না অনিরুদ্ধ।

এমনি নিঃশব্দে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে অনিরুদ্ধই প্রথমে কথা কইলে, আমাদের এই বর্তমান জীবনের কিছুমাত্র বাস্তবিক আমি কল্পনাও করতে পারি না।

উষা মুত হাসল, বললে, অথচ কল্পনার বাইরেও বহু ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে থাকে। মানুষ তাকে মেনেও নেয়।

অনিরুদ্ধ জবাব দেয় বাবা হয়ে।

উষা তেমনি হাসিমুখে বললে, বাবা হয়েই বটে! একটু খেমে পুনশ্চ সে বললে, আজ যদি আশুব মূহূ হয়—

অনিরুদ্ধ রাগ করে উষাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

উষা মুত কর্ণে বললে, একটা কথার আদাতও সহিতে পারলে না—তবুও এখন আমি বৈতে আছি। তুমি রাগ কর কেন। জীবজগতের ধর্মই হ'ল এইটে। আমার বক্তমানে যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, অব্যক্তমানে—

অনিরুদ্ধ মাঝপথে তাকে খামিয়ে দিলে, বললে, কামচা তোমাদের মন। যে কথা ভাবতেও আমাদের ভয় লাগে, কত অনাস্থ্যে তা তোমরা বলে ফেল—একটু দ্বিধাও কি তোমাদের মনে আসে না!

উষা হাসতে থাকে—জবাব দেয় না।

অনিরুদ্ধ বলে চলে, এখনও তুমি হাসতে পারছ!

উষা বলে, তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি? কি জান... সে মুহূর্তের জ্ঞান খেমে পুনরায় বলতে থাকে, দুঃখের যে সত্য রূপ সেটা আমাদের জানা, তাই সামান্যে আমরা বিচলিত হই না। কিন্তু তোমার মতলবটা কি শুনি, আজও সারাবাস্তা এখানেই বাচাবে নাকি?

অনিরুদ্ধ একটু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। উষার শেষ কথায় সহসা সে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বললে, না তেমন আর উদ্বেগ পাচ্ছি না।

উষা বলে, তুমি ব্যক্তি রাগ করলে?

অনিরুদ্ধ জবাব দিলে, তাতে কোন লাভ হলে বলতে পার?

উষা সহসা গুলোবালির মতো শুয়ে পড়ল অনিরুদ্ধর কোলে মাথা রেখে। বললে ফিস ফিস করে, মাঝে মাঝে হয় বৈ কি। হয় না? তুমিই বল না গো।

অনিরুদ্ধর মাথাটা সহসা ঘুঁকে পড়ে। কিছুক্ষণের জ্ঞান বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে ওদের অস্তিত্বটাও একাকার হয়ে যায়। হৃদয়ের বেগ প্রাণের আবেগে গলে যায়। তাদের আলোর যৌতধারার সঙ্গে ঘটে পরিপূর্ণ মিলন। কিন্তু ওহুড়তির এই পরম লগ্নি বৈশিষ্ট্য স্থায়ী হয় না। উষা হঠাৎ অনিরুদ্ধর মুখখানাকে একটু তুলে ধরে মুত হাসে প্রশ্ন করে, আজ্ঞা আমাদের বিষয়ে হয়েছে আজ ক'বছর হ'ল?

অনিরুদ্ধর একটি নিশ্বাস পড়ল। সে বললে, তুমি বড় হিসেবী। জীবনটাকে সব সময় তুমি গণ্ডের ছকে ফেলতে চাও।

উষা হাসতে থাকে, বলে, তা ফেলি বৈ কি। কিন্তু সব সময় বিয়োগ করি না একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।

কিন্তু কোন সময়টাই বা কবে কেন? অনিরুদ্ধ আশ্বাসের সুরে বললে।

উষা নির্বিকার ভাবে জবাব দিলে, যে কারণে তুমি শুধু যোগ করতে চাও ঠিক সেট কারণেই বিয়োগ এবং অংশ ভাগেরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

অনিরুদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, তোমার এই হিসেবের আর এক নাম অপচয়—

অপচয়? উষা যেন গানিকটা বিস্মিত হ'ল।

নয় কেন? অনিরুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, আজ হিসেব করতে গিয়ে যা হারান, আগামী কাল পিছন ফিরে তারই জ্ঞান হা-হাশ কবাকে তুমি কি বলতে চাও শুনি?

উষা বিস্মিত কর্ণে প্রশ্ন করলে, তুমি বলতে চাইছ কি?

অনিরুদ্ধ জবাব দিলে, মুঠি আমার সবসময়ই ভরে রাখতে চাই।

উষা গিল গিল করে হেসে উঠল, তা যাই কেন থাক না সে মুঠিতে। সোনা কিংবা ছাই। কিন্তু ঠাট্টা থাক—উষা বেশ গানিকটা গম্ভীর হয়ে বললে, বড় বেশী স্বার্থপরের মত কথাটা বললে। তাছাড়া এর পরে জীবনটা বড় বেশী একঘেয়ে ঠেকবে না কি। উষা ধামল। অনিরুদ্ধর একগানি হাত নিজের দুই

হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে গভীর কর্ণে পুনরায় বলতে লাগল, কথাটা যখন এই পথে এসে গেছে তখন শোন—তোমার ভালবাসার এই প্রচণ্ড বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চলতে আমার বড় ভয় হয়। ভাল লাগে তাই গা ভাসিয়ে দিয়ে আছি, কিন্তু সব সময়ই আমার মনে হয় এই বুঝি কোন স্তম্ভ পাগড়ের সঙ্গে ধাক্কা পেয়ে চূর্ণ হয়ে যাব।

অনিরুদ্ধ বিম্মিত হলেও কথা বলে না। শুধু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে উষা তা অনায়াসে পড়ে ফেলল এবং হাসিমুখে বললে, আমি তোমাকে অকশাঙ্কের কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাইছিলাম।

অনিরুদ্ধর মুখে হাসি ফুটে উঠে, বলে, তাই বল এ তোমার যুক্তিতর্ক। যে মেঘ ওর মনের কোণে জমে উঠেছিল, সামান্য একটা হাওয়া দেখা দিতেই তা উড়ে গেল, কিন্তু উষার অন্তর্ভোগের হিসাবের পাতায় আর একবার বিয়োগচিহ্ন পড়ল। অত্যন্ত সজোপনে একটি নিশ্বাস চেপে গেল উষা। আর অনিরুদ্ধ যেন নতুন করে ভেগে উঠল, বললে—এমনি করেই অন্তরকাল আত্মসাৎসাপথে চলব উষা। কোথাও কোন দিন এক বিন্দু নিরানন্দের ছায়াপাত ঘটতে দেব না।... অনিরুদ্ধ আর একবার উচ্ছসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু ভাড়াগড়া নিয়েই জীবন। তাই ত যে মনোরম প্রাসাদ অনিরুদ্ধ বহু জ্যোৎস্না-রতনীর স্তম্ভস্থতির উপর গড়ে তুলেছিল, তা হঠাৎ এক দিন গাঢ় গন্ধকরে ঢাকা পড়ে গেল। অথচ এর পিছনে যে কোন বড় রকমের কারণ আছে তা নয়। অতি তুচ্ছ কারণেই অনিরুদ্ধ সরে গেল তার অভ্যস্ত চলার পথ থেকে। মূগ্ধ কুটে কোন ক্ষম্মযোগ দিতে সে পারলে না। কোন ছিদ্রপথ ধরে যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে তার সন্ধানও সে উদ্যাক দিলে না। অস্তিত্ব আকস্মিক ভাবে অনিরুদ্ধ সরে গেল তাদের প্রতিদিনের পরিচিত মুখের দিন-গুলি থেকে। উষা বিম্মিত হ'ল, বাধিত হ'ল কিন্তু মূগ্ধ কুটে কোন প্রশ্ন করলে না। মন তার গুহরে উঠে, কিন্তু তার কোন প্রকাশ নেই। চোপে মুখে তার জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠেই অভিমানের অধি জলে তা তলিয়ে যায়।

চাদের আলো আজও তাদের ঘরের সম্মুখে নির্দিষ্ট দিনে ছড়িয়ে পড়ে। উষার ফুলগাছগুলিতে অজস্র ফুল ফোটে—সৌরভ ছড়ায়...সে সৌরভ বাতাসে ভর করে ভেসে ভেসে বেড়ায়, কিন্তু এ চাদের আলো আর ফুলের সৌরভ আজ শুণ্ড নিরর্থক নয়—পাঁড়াদায়ক।

উষা তার ঘরে নিঃশব্দে বসে আছে। আশপাশের কোন-কিছুই আজ আর তার মনে কোন কোঁতুললের সৃষ্টি করে না। ভাল-মন্দ কোন চিন্তাকেই সে মনের মধ্যে আমল দিতে চায় না। কিন্তু মন না চাইলেও সহস্র রকমের এলোমেলো চিন্তা এসে তাকে ঘিরে ধরে। শুরু হয় নিজেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করা। তাদের বিবাহিত জীবনে হঠাৎ কি এমন ঘটল যার জন্য এমন রহস্যময় ভাবে স্বামী ঘূরে সরে গেল। কি সে কারণটা যা জানবারও অধিকার

তার নেই। তার বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তার নীরব সেবা, গভীর ভালবাসা—এর কোনকিছুই কি এই সামান্য অধিকারটুকু অর্জন করতে সক্ষম হ'ল না। অথচ ভালবাসার কত বড় বড় কথাই না তাকে প্রতিদিন স্নেহেতে রয়েছে—আর উষা কত অনায়াসে তা বিশ্বাস করেছে।

বহুদিন পরে আয়নার সম্মুখে এসে উষা দাঁড়াল। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সে চমকে উঠল। বয়সটা তার এই ক'টা দিনের মধ্যে কতক বড়র এগিয়ে গেছে। মাথায় চিকণী চালাতে গিয়ে সে বিবস্ত্র হয়ে উঠল চুলগুলির দৃশ্য দেখে। চিকণী চলতে চাইছে না।... শেষ পর্যন্ত যদিট-বা সচল হয় হাত আর চলতে চায় না। দূর ছাউ, কি হবে কেশবিজ্ঞাস করে। পূর্বেই অভ্যাসবশেই হয়ত অকারণে দেরি করে, কিন্তু অনিরুদ্ধ নিঃশব্দে এসে তার পশ্চাতে দাড়ায় না...নানা চলে উষা নিজেকে নিজে শামন করে। কিন্তু অবশ্য মন তবুও বারের বারের পিছন ফিরে তাকায়।...

ইদানীং গভীর রাত ছাড়া অনিরুদ্ধর সাক্ষাৎ মেলে না। সাক্ষাৎ মানে তার উপস্থিতি কপট নিদ্রার মাঝে অন্তর্ভব করা। নিঃশব্দে সে উষার পাশে এসে স্পর্শ বাঁচিয়ে শুয়ে পড়ে। উষা চোপ বুন্ধে কাট হয়ে থাকে। দেওয়ালঘড়িটা একের পর এক বেজে চলে। সে কান পেতে শোনে। ঘুম আজ তার সাধনার বস্তু। নিশ্বাসের শব্দে উষা বুদ্ধত পাবে অনিরুদ্ধ ঘুমিয়েছে কিনা? এক সময় আবাস চোপ ঘড়িটা অনিরুদ্ধর ঘুমন্ত মুখের পানে গিয়ে স্থির হয়ে ধমকে দাঁড়ায়। কানালার ফাঁকে ফাঁকে চাদের আলো এসে তার মুখময় ছাড়িয়ে পড়েছে। শাশ্বত! কেমন নিকটেগে ও ঘুমুচ্ছে। ওর কি মন বলে কোন পদার্থ নেই! নইলে এমন অকরণ হয়ে উঠতে পারল সে কেমন করে। কিন্তু ঠিক তাই কি? উষা নিজেকে পাণ্টা প্রশ্ন করলে, অনিরুদ্ধর এমন সদাপ্রকৃত মুখের হাসি, দেহের লালিতা, ভীষণ পাগলামি কোথায় গেল...চোপের কোলেই বা এমন স্তম্ভষ্ট কালো দাগ ফুটে উঠেছে কেন...এ কি নিতান্তই অকারণে? কিন্তু উষাকে কে বলে দেবে কোথায় রয়েছে বস্তু। লাগ গেলো সে অনিরুদ্ধকে একটাও প্রশ্ন করবে না।

আর অনিরুদ্ধ?...সে নিজেই কি উষার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে স্বপ্নী হতে পারছে? না এমনি এক জটিল পরিস্থিতির জন্ম প্রস্তুত ছিল। অথচ ঘটনাক্রম এমন এক পঙ্কিল অবস্থার মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে এল যে, অসঙ্কোচে সে না পারছে এগুতে না পারছে পিছিয়ে যেতে। আজ উষার চোপে চোপ রেখে তাকাতোও সে ভয় পায়। যেন সে নিজেই একটা অপরাধ করে বসেছে। অথচ...

উষাই-বা কেন এমন করে চূপ করে আছে। জিজ্ঞেস করতোও কি পারে না যে, কেন তার মধ্যে এ পরিবর্তন...কিসের জন্ম করছে এমন দরব্যবহার! মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে সে লুকিয়ে উষার মুখের পানে চেয়ে থাকে। যে প্রশ্ন অষ্টপ্রহর তার মনের মধ্যে ভোলাপাড় করছে তারই উত্তর খোজে। চেয়ে চেয়ে তার মনের মাঝের ফাঁপা

মানুষটা জেগে উঠে। ইচ্ছে করে উষাকে ঠিক তেমনি করে বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুষনে চুষনে পাগল করে দিতে। কিন্তু পারে না। উষা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শোয়। অনিরুদ্ধ আবার নুতন করে নিজের মনকে বিলম্বণ করতে থাকে। কি আশ্চর্য! এই সেদিনে সে বড় গলায় তার বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজের নিখুঁত ভালবাসার গভীরতার কথা প্রকাশ করেছে—যে অতলস্পর্শ ভালবাসার কথা ওরা কল্পনা করতেও অক্ষম বলে বর্ণোক্তি করেছে। আজ সেদিনের সেসব কথা ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই সে লক্ষিত হয়ে পড়ল। আসলে মানুষ সব সময়ই মানুষ। তার বন্ধুরা হয়ত নিভাস্ত মিথ্যা বলত না। ভালবাসার নান করে সে শুধু মিথ্যা অহঙ্কারই এত দিন করেছে, নইলে কেন সে ভুলতে পারছে না সামান্য কয়েকটা কথা যা উষার অলীক জীবনের একটি অধ্যায়ের উপর। অনিরুদ্ধ আর ভাবতে পারে না। তার মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। বিলম্বণ করতে বসে তারও দেখী করে জড় পাকিয়ে যায় তার বিক্ষিপ্ত চিন্তাপারায়।

বিচিত্র মানুষের মন—নিজেকে কি সঠিক পোষবার উপায় আছে। উষার ফুলগাছে ফুল ফুটেছে। চমৎকার গন্ধ বাতাসে ভর করে স্থানটিকে স্বামিত্ব করে তুলেছে, কিন্তু অনিরুদ্ধের মনে আজ আর সাড়া জাগে না। বরং একটা অপরিণীত ক্রান্তিতে সে মগ্ন ফিরয়ে নেয়।

উষা ঘুমিয়ে আছে। ওর মনের কথা গোন্ধবার উপায় নেই, শুধু একটি দিনের জগা অনিরুদ্ধ ওর চোখে মুখে একটা আশ্চর্য্য রকম বেদনার ছায়াপাত ঘাটতে দেখেছিল, কিন্তু মগ্ন সে আর পূর্ণাঙ্গ একটি প্রশ্ন করলে না বরং অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিজেকে বিচলিত করে নিয়েছে। একবারও এগিয়ে এল না তার অগ্নয় বাবতারের প্রতিবাদ জানাতে। অবস্থা প্রতিবাদ জানানোর মত অজায় যদি সে করে থাকে।

অনিরুদ্ধ ঘর ছেড়ে বাইরে হাদে এসে উপস্থিত হ'ল। আজ কি পূর্ণিমা! গোটা ছাদটা জ্যোৎস্নায় মাণমাণি হয়ে আছে। সে কি এখনও বেঁচে আছে! আজ তার পাশে উষা নেই। এই মোহময় অংশটিকে জীবনরসে পূর্ণ করে তুলতে কেউ তার চোখে চোপ রেখে মুগ্ধ টিপে টিপে হাসছে না।...উষা নিশ্চয় ঘুমছে।...ভাবতে ভাবতে অনিরুদ্ধ পাগল হয়ে উঠে।

নানা অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক চিন্তা তার মাথায় আসে। শেষে নিজের মনেই প্রশ্ন করে—উষার অপরাধ কতখানি তার কোন খোজ করেছে কি সে...কথাটা এই সাত দিনের মধ্যে একবারও তার মনে আসে নি। অনিরুদ্ধের বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। একটা অজানা আতঙ্কে সে বার বার শিউরে উঠছিল। কথাটা তার বহু পূর্বেই চিন্তা করা উচিত ছিল। কৃষ্ণিত পদে সে পুনরায় ঘবে ফিরে এল। একবার উষার স্তম্ভ যুগের পানে চেয়ে দেখে নিশ্চয় কৃষ্ণিত পদে পাশের কক্ষে চলে গেল।

একটি আবারেকদারায় গা এলিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধ নিশ্চয়

পড়ে আছে। গত সাত দিনের বহু চিন্তার মধ্যে যে কথাটা তার সর্দপ্ৰথম ভেবে দেখা উচিত ছিল সেই কথাটিই এক মুহূর্তের জগা তার মনে উদয় হয় নি, অথচ কেনন করে যে এই সাতটা দিন তার কেটেছে তা অন্তর্যামীই জানেন। যে বন্ধুমতলকে সে বিবাহের পরে একপ্রকার ত্যাগ করেছিল তাদেরই সঙ্গে ওর হৃদয় গীমা ছাড়িয়ে গেছে। গত কয়েক বছরের অসহযোগ এই ক'টা দিনে মধ্যে একরকম পুণিয়ে নিয়েছে। সিনেমা, থিয়েটার, পিকনিক একের পর এক চলেছে—মনের অপরিণীত ক্রান্তিকে সে এই ভাবেই ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছে। বন্ধুরা অলক্ষ্যে মুগ্ধ টিপে টিপে হেসেছে। আর প্রকাশ্যে দিয়েছে উৎসাহ। কিন্তু উৎসাহ অনিরুদ্ধের বৈশিষ্ট্য স্বায়ী হয় নি। প্রাণতীন হাসি হেসে সে বলেছে, বড় বড় বাড়ি বাড়ি হয়ে যাচ্ছে একথা আমি বুঝি, কিন্তু এরও সময় সময় প্রশ্রয়ন হয়—নইলে ভাবনাটা নিতান্তই অংশান্ত হয়ে পড়ে। মুগ্ধ অনিরুদ্ধ এমনি আরও বহু কথাই বলছে অথচ সব সময়ই সামান্য কোলাহলের স্পর্শ পাঁচিয়ে চলতে সে বাস্তব।

বন্ধুদের মধ্যে একটা গোপন পরামর্শ চলে। অনিরুদ্ধকে নিয়ে ওরা যেন একটা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এমন কি নাটের শুরু অনিলকে পূর্ণাঙ্গ বলতে হ'ল, না হে দাওয়াইটা বড় কড়া হয়ে গেছে—শেষ পর্যন্ত না মহাপাতকী হতে হয়। গেরাধারী মাধুরী বললে, কথাটা তোমাদের আগেই ভাবা উচিত ছিল।

অনিল রঠ কণ্ঠে জবাব দিলে, কিন্তু মতলবটা কে দিয়েছিল শুনি বাবাকী। ভূমি নিয়ে-খা কর নি, স্বামী-স্ত্রীর...সহসা অনিল স্তম্ভ প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, কিন্তু আর একমুহূর্ত এখানে নয়। অনিরুদ্ধ আসছে...হ্যাঁ হ্যাঁ এ পাশের দরজা দিয়ে সোজা অন্দর-মহলে সরে পড়।

অনিরুদ্ধ এসে ঘরে প্রবেশ করতই উপস্থিত সকলে তাকে স্বাগত জানাল।

অনিল বললে, কিন্তু তোমার চোখরাটা ত তেমন ভাল মনে হচ্ছে না অনিরুদ্ধ। রক্তে ঘুম হয়েছিল ত?

এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে অঙ্গমনকভাবে সে ফরাসের এক পাশে বসল।

অনিল পুনশ্চ একই প্রশ্ন করলে, বলি কথা বলছ না যে? অসহযোগ চলছে নাকি? আরে কি ছেলেমানুষ ভূমি...দাম্পত্য-জীবন এ নইলে যে বড় একঘেয়ে হয়ে যায় হে।

অনিরুদ্ধ এসব কথা ধার দিয়েও গেল না। সে প্রশ্ন করলে, আজ্ঞা অনিল, উষা সন্ধ্যা সেসব কথা ভূমি বিশ্বাস কর?

অনিল ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি বোধ করলেও প্রকাশ্যে হো হো করে হেসে উঠল।

অনিরুদ্ধ গভীর কণ্ঠে বললে, আমার কাছে এটা হাসির কথা নয় অনিল।

তার কথা ধরনে অনিল মুহূর্তে সামলে নিলে। যুৎ শাস্ত কণ্ঠে বললে, এর জবাব আমার কাছে আশা করা তোমার উচিত হচ্ছে না অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, জবাব তোমার কাছে আমিও চাইছি না অনিল, শুধু তোমার মতামতের কথাটাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

অনিল সহসা মাত্রাতিরিক্ত গর্জীর হয়ে উঠল, বলল, বাপারটা অনেকদূর গড়িয়েচে দেখছি...কিন্তু আমার ধারণা ছিল তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস অর্থাৎ শ্রদ্ধা কর অথচ সাধারণ একটা লোকের দুটো কথায় তুমি এমন বেসামাল হয়ে পড়েছ অনি—

অনিরুদ্ধ কতকটা বোকার মত অনিলের কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে, সাধারণ দুটো কথা—

তাকে ধামিয়ে দিয়ে অনিল বললে, তা ছাড়া আবার কি। যাকে চেন না, জান না সে কখন কি উদ্বেগ নিয়ে দুটো মন্দ কথা বললে সেইটাই এত বড় হ'ল ব'র কাছে তোমার এত দিনের জানা এতদিনের চেনা সব মিথ্যা হয়ে...

তাকে ধামিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধ বললে, তোমাদের এই জানা-না-জানার গোলকব্যাধায় পড়ে আমি পথ ভুল করেছিলাম এবং তার মাগল এই সাতটি দিনে আমাকে যা দিতে হয়েছে তা বোধ হয় সারাজীবনও আর আমার পাতায় লেখা হবে না, কিন্তু তোমাকে এসব কথা বলা বুঝা, তার চেয়ে তোমাদের সেই মহাপুরুষটির সঙ্গেই আমাকে আর একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। তাকে আমার গোচাক্ষেপ প্রসন্ন করবার চাছে।

অনিল বলল, প্রায় যদি কিছু করতে হয় তা নিজেকেই কর। মহাপুরুষের দেখা আর কোন দিন পাবে না। তা ছাড়া...অনিলকে সহসা ধামতে হ'ল অনিরুদ্ধর ভূতের আকস্মিক আগমন। মনিবের হাতে একপাখি চিঠি দিয়ে সে একপাশে সরে দাঁড়াল।

অনিরুদ্ধ এক নিখাসে চিঠিপাখি পাড়ে ফেলে অনিলের মূগের পানে চোখ তুলে যেন আত্মনাদ করে উঠল, উষা চলে গেল—ও অসহায়ভাবে একটু হাসলে। সে হাসি অনিলকে চাবুক মারলে, সে ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, চলে গেল! কোথায় গেল...কেন গেল অনিরুদ্ধ?

অনিরুদ্ধ যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় বলে চলল, উষাকে আমি সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম—

বেশ করেছিলে...তাকে ধামিয়ে দিয়ে সে ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি কোথায় গেলেন তা জানিস তুই?

ভৃত্য জানালে, সে তা জানে না তবে হাওড়া ষ্টেশনের জগৎ একটা কিটন এনে দিয়ে নিজে সে ট্যাক্সি করে সোজা চলে এসেছে। বাবু এখানে আসবেন বলে এসেছিলেন কিনা—

ভৃত্যর পিঠ চাপড়ে দিয়ে অনিরুদ্ধর হাত ধরে একটা হ্যাচকা টান দিয়ে অনিল বললে, কথা পরে হবে অনি...ছিঃ ছিঃ কত বড় অজ্ঞায় হয়ে গেল...কত বড় একটা...কিন্তু এই তো বড় বড় কথা...

তার দ্রুত ঘর ছেড়ে বাস্তায় এল। ট্যাক্সি তখনও অপেক্ষা করছিল।

উষা হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছবার পূর্বেই অনিল অনিরুদ্ধকে নিয়ে পৌঁছে গেছে। ব্রিজের উপর উষার গাড়ীর সাক্ষাৎ মিলেছে।

উষা গাড়ী থেকে নামতেই অনিল এগিয়ে গেল। দুই করতল একত্র করে নমস্কার জানিয়ে মুহূর্তে কণ্ঠে বললে, মালপত্র কিছুই আনেন নি দেখছি—ভালই হয়েছে, আপনার বাওয়া হবে না। আশা করি, বৈশী কথা আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই বোধি। একটা মস্তবড় ভুল হয়ে গেছে। অনিরুদ্ধ আপনার জ্ঞান এ ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছে।

একটা জবাব দেবার জ্ঞান মুগ্ধ তুলেই উষা নিজেকে সামলে নিলে। ইতিমধ্যে দুই-একটি করে কোঁতুললী লোক জমা হচ্ছিল। অবস্থাটা এক মুহূর্তে উপলব্ধি করে আর কালবিলম্ব না করে উষা অনিলের সঙ্গে এসে গাড়ীতে উঠল।

সারাটা পথ তিন জনের কান্নার মুখে একটি কথাও ফুটল না। একটা অশ্রু স্তব্ধতা থম থম করছিল গাড়ীর মধ্যে।

বাড়ী পৌঁছে অনিল এবং অনিরুদ্ধ বাইরের ঘরে প্রবেশ করল। উষা শব্দর-পথে পা বাড়তেই অনিল দ্রুত তার সম্মুখে এসে বললে, আমার একটা আবেদন ছিল বোধি—

উষা ধামলে, শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলে, বলুন—

অনিল একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, অতটা রুচ হলে যে বলতে ভয়না পাচ্ছি না।

উষা বললে, তা হলে না হয় আড্ডা থাক অনিলবাবু। বিশ্বাস করেন আমি বড় হাস্য।

অনিল লালিত কণ্ঠে বললে, তার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে আমি জানি, কিন্তু আপনিও বিশ্বাস করেন যে বাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আর একটা মিনিটও অপচয় করি নি। আমরা দু'বে ছিলাম আবার দু'বেই সরে যাব। মাসের এই ক'টা দিনকে আপনার ভ্রমে যেতে হবে। আমাদের অপরিণামদর্শিতার যথেষ্ট সাক্ষ্য হয়েছে। অনিল ধামলে, উষা কতকটা বিম্বিত কতকটা কোঁতুলনপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

অনিল পুনরায় বলতে লাগল, তবে একটা শিক্ষা আমাদের হয়েছে যে মানুষের জীবনের সকল দিক নিয়ে কোঁতুক করা চলে না। তার পরিণাম সব সময় স্তব্ধ হয় না।

উষা ভেতনি পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

অনিল বলে চলল, আপনি বিশ্বাস করেন আমাদের উদ্বেগ যোটেই খাদ্য ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যাতে ভবিষ্যতে অতিবড় প্রয়োজনও হয়ত আর আপনাদের সম্মুখে আসতে পারব না।

উষা তথাপি নীরব। কিন্তু অনিল ধামতে পারল না। বলে চলল, আমার সখী গেক্সাধারী তার উপর একমুগ দাড়ি। তার প্রকাণ্ড দেহ, দাড়ি এবং ভুড়ি মিলিয়ে তাকে বাবাজীর পর্যায়ে ফেলা চলে—

অনিরুদ্ধ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে লাক্ষিয়ে উঠে পুনরায় হতাশ-ভাবে বসে পড়ল। অনিল মুহূর্তের জ্ঞান দেই দিকে দৃষ্টি কিরিয়ে পুনরায় বলতে লাগল, তাকে কাছে পেয়ে আমাদের মাথায় একটা দৃষ্টবুদ্ধি উদয় হ'ল। আমরা ক'দ পাতলাম আর অনিরুদ্ধ সে ক'দে



ধরা দিল। টেরও পেলো না যে কত বড় ভুল সে করল। কিন্তু আমার সম্বন্ধী সকলের অজ্ঞাতে মাত্রাটা একটু বেশী দিয়ে ফেলোছে। অনিল মাথা নীচু করলে। আর উষার মুণের চেহারা যুটে উঠল— ঘুণা, বিতৃষ্ণা এবং অসুস্থতার এক বিচিত্র ছবি। অনিলের মাথাটা নীচু হতে হতে প্রায় তার হাঁটুর কাছে নেমে গেছে। সেই দিকে আর এক বার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উষা পুনরায় পা বাড়াতোই অনিল তার পথ বোধ করে দাঁড়াল, ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, আপনাকে অন্তর-পর্যন্ত অনুসরণ করবার স্পৃহা আমার নেই কিন্তু আপনার ক্ষমা না পেলে ত পথ ছাড়তে পারি না বৌদি—

ক্ষমা! উষার চোখ দুটো একবার জলে উঠেই নিভে গেল। মনের ক্ষতস্থান থেকে একবিন্দু রক্তও তার মুগ্ধ পর্যন্ত ঠেলে উঠতে পারল না। উষা প্রাণপণে নিজের কঠিনালি চেপে ধরেছে। ঠোঁট দুটি তার গানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। উষার মুগ্ধ হাসি দেখা দিয়েছে না? অনিলের তাই ত মনে হ'ল। এ ত সে কথা কইছে, এগনও বোধ হয় আপনাদের চা পাওয়া হয় নি— পথ ছাড়ুন আমি বরং সেই ব্যবস্থা করিগে—

অনিল নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল।

## বৈদিক ঋষির পারিবারিক জীবন

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

ঋগ্বেদের মন্ত্রমালা মুখ্যতঃ দেবস্তুতি হইলেও ঐ সকল মন্ত্র স্থানে স্থানে যে সকল উক্তি বহিরাছে, তাহা হইতে বৈদিক ঋষিদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা জানিতে পারা যায়। পারিবারিক জীবনে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক কান্ড কি ছিল, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ইহারা পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের পারিবারিক পরিবেশ কি প্রকার ছিল তাহা কোনও কোনও মন্ত্ৰে অল্প কথায় এগন সজীব চিত্রে অঙ্কিত হইয়া আছে যে মনে হয় যেন অতীত যুগের সেই ঋষি পরিবারের গৃহস্থা জীবন সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ঋষিরা মদল জীবন বাপন করিতেন। তাঁহাদের জীবন-যাত্রা ছিল পল্লীবাশী গৃহস্থের জায়। বর্তমান সময়ের গ্রামে একদিকে যেমন শহরের প্রভাব বাড়িতেছে, আর এক দিকে তেমনি ইহার উপর ক্রমশঃমান দারিদ্র্যের তমসা ধনীভূত হইতেছে। এ কারণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও পল্লী-গৃহস্থের রূপ কি ছিল তাহা এখন অসুমান ও কল্পনার বিষয়। আমাদের বাল্যকালে দেখা এই গ্রাম ও গৃহস্থ এবং পুরা-কালের সেই ঋষি-পরিবারের যে চিত্র ঋগ্বেদের মধ্যে পাওয়া যায়—এই উভয়ের মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। অর্থাৎ, বৈদিক ঋষিদিগের কেহ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও আমাদের গ্রামাঞ্চলে উপস্থিত হইলে এই গ্রামকে তাঁহাদেরই বাস-করা গ্রামের উত্তরাধিকারী বলিয়া চিনিতে পারিতেন। গ্রামের সেই মৃষ্টি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে।

বেদের ঋষিরা গৃহস্থ ছিলেন। কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদিগকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত। মঙ্গল

দিনের কর্মস্বাক্ষতি রাত্রির বিশ্রামে অপনোদন করিয়া প্রত্যয়ে তাঁহারা জাগরিত হইতেন। উমাগমে তাঁহারা গাহিলেন—

উদাৱাঃ জীবো অগন অগা-

দপ প্রগাৎ-ম আ জোটি-রেকি। ১। ১৩। ১৬

তে মন্ত্রগণ (শতা হাশ করিয়া) কটো। আমাদের দেহের পরিচালক (এরা) আসিয়াছেন।

রাত্রিশেষে গ্লান্বেদেই কেহ কেহ বক্র হইয়া শুইয়াছিলেন তাহাও ঋক্ মণ্ড্যে পাইতেছি—

জিহ্মশ্চ চরিত্তব মণো-

জাঃভাগ্য ইয়য়ে রায় উত্ম। ১। ১১। ৭৮

যেদকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল (এরা) তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য বাহ্যকেও যত্নের জন্য কাহা কও ঘনের অস্ত্র-সকলকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য জাগাইয়া দিলেন।

গৃহিণী সর্বাঙ্গো জাগরিত হইতেন। তাহার পর তিনি পরিবারস্থ অস্ত্র সকলকে জাগাইয়া দিতেন। উষার স্বতিতে একস্থানে আছে—

গৃহিণী জাগরিত ইয়া যেমন সকলকে জাগরিত করেন উদাও মেইরূপ পৃথিবীর সকলকে জাগাইলেন। ১। ২৯। ৭

অশ্বিনয়ের স্তবে পাই—

পূত্র যেকপ পিতাকে জাগরিত করে (সুমন পিতরা বিবস্মি), সেইরূপ এই রথ তোমাদের দুহের নায় লোককে জাগরিত করে। ৭। ৩৭। ১

এই উক্তি হইতে অনুমিত হয়, পুত্রও পিতার পূর্বে জাগরিত হইতেন। পরে তিনি পিতাকে জাগাইয়া দিতেন।

পারিবারিক জীবনে, সংসার পরিচালনা কার্যে, গৃহস্থ-পত্নীই ছিলেন প্রধান—তিনি গৃহকর্ত্রী গৃহিণী। সকলকে তিনি সন্তোষে লালনপালন করেন। উষার স্তবে আছে—

উষা গৃহকার্যের নেত্রী গৃহিণীর নায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন। ১। ৮৮। ৫

অপর কয়েকটি ঋকে গৃহিণীকে পত্নীরূপে পাইতেছি—

পত্নী যেমন স্বামীর প্রথম আহ্বানে দ্বারদ্বিত হইয়া আগমন করেন, সেইরূপ দিন ও রাত্রি নানা প্রকার স্তোত্রদ্বারা প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের নিকট দ্বারদ্বিত হইয়া আগমন করেন। ১১২২২

জায়েব পত্নী উশরী প্রবাসা

উশা হস্তেব নি রিগোত অৱ। ১১২৪৭

জায়া যেরূপ পতি অভিনাশিণী হইয়া শব্দ পরিধান করিয়া হাস্যদ্বারা দত্ত প্রকাশ করে, উশাও সেইরূপ করেন।

পতি-পত্নীর মধ্যে প্রীতির উল্লেখ যেমন পাওয়া যাইতেছে, তেমনি পাওয়া যায় তাঁহাদিগের মধ্যে সাময়িকভাবে অবনি-বনাও হইবার কথা। সেরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের বন্ধুপার্শ্বের মধ্যস্থতায় পুনরায় তাঁহাদের মিলন ঘটিত। একটি ঋকে আছে—

জী-পুংগের বন্ধুপার্শ্ব যেমন পতিপত্নীর মিলন করাইয়া দেয় (জনে মিলে) ন দম্পতি অন্তি। ১০৭৮৭) বৃহস্পতি দেবতা সেইরূপ পাত্নীদিগকে লোকদিগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন।

গৃহিণীকে যেমন স্বামীর প্রণয়নীরূপে পাই তেমনি তাঁহাকে স্নেহশীল। মাতারূপেও পাইতেছি। তিনি সমস্তে কত্রার দেহ মার্জনা করিয়া দিতেছেন।

সংস্কাশা মাতৃবৃত্তেব যোগ

বিস্তম্বঃ কৃষ্ণে দৃশো কৃম্। ১২৩১১

মাতা দেহ মার্জনা করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেমন উজ্জ্বল হয়, (হে মাতা) তুমিও সেইরূপ হইয়া দশনাথ আপন শরীর প্রকাশ কর।

মক্ৰং দেবতাগণ সম্বন্ধে একটি উক্তি আছে—

তাহারা বৎসল মাতার শিশুদিগের ন্যায় ক্রীড়াশীল। ১০৭৮৭

মাতা স্নেহশালিনী হইলে তাঁহার সন্তানেরা নিকরূপ হস্ত-কোলাহলে খেলাধুলা করিয়া বেড়ায় তাহার চিত্ত উক্ত ঋকটিতে দ্রুত হইয়া বহিরাগে। অগ্নির স্তুতিতে আছে—

হে অগ্নি, তুমি জননীর ন্যায় সকলকে পালন কর (মাতার জনন্যঃ ধায়সে। ৪১৫৪৪)।

ঋষিদিগের কাহারও কাহারও একাঙ্গিক পত্নী থাকিত। মহাকবি কালিদাস তাহার শকুন্তলা চিত্রণে, শকুন্তলাকে সপত্নীদিগের প্রতি প্রিয়স্বর্গীয় ন্যায় ব্যবহার করিতে (প্রিয়স্বর্গীয়-বৃত্তিঃ সপত্নীজনে) উপদেশ দিয়াছেন। ঋগ্বেদে সপত্নীদিগের মধ্যে প্রবল ঈর্ষার কথাই পাওয়া যায়। ঋষিদিগের পক্ষেও বহু পত্নী অশান্তির হেতু হইত।

ত্রিত ঋষি কুপমধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার ক্রোশের বর্ণনায় বাসন্তেছেন—

সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পা-কিয়া (সপত্নীর পাখ্যঃ) যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, এই পাখ্য-এর ভিত্তিসকল আমাকে সেইরূপ সন্তাপ দিতেছে। ১১০৫৭

১০ম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তটি সপত্নীদিগের উপর প্রভূত লাভ করিবার ও স্বামীর প্রণয় লাভ করিবার মন্ত। বিশেষ-ভাবে পত্নী জড়ল হইতে বিশেষ এক প্রকার লতা মূলসমেত ছুলিয়া আনিয়া তাহা স্বামীর বালিশের নীচে রাখিয়া দিলেন।

অনেকের মতে সূক্তটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা। তাহা হইলেও উহা সুপ্রাচীন। উহা হইতে সপত্নী-দিগের মধ্যে স্বন্দেহের কথা পাওয়া যায়। সূক্তটি এইরূপ—

এই যে তাঁর শক্তিশালী লতা, ইহা ওদধি। আমি ইহা খনন করিয়া উঠাইতেছি। ইহা দ্বারা সপত্নীকে কষ্ট দেওয়া যায় ও স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়। ১২

হে ওদধি, তোমার পাতা উপর-মুখো (উত্তানপাতা)। তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়। দেবতারা তোমাকে স্তুতি করিয়াছেন। তোমার তেজ অতি তীব্র। তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও। স্বামীকে কেবল আমারই বর্শভূত করিয়া দাও (পতিঃ মে কেবলঃ কর)। ১২

(হে ওদধি, তুমি প্রধান, আমি যেন প্রধান হই—প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচের নীচে হইয়া থাকে। ৩)

সেই সপত্নীর নাম পরিত্র আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপরি। আমি সেই সপত্নীকে দূর অপেক্ষা আরও দূর পাঠাইয়া দিই (পরামেব পরাবতঃ সপত্নীঃ গময়ামি)। ৩

(হে ওদধি, তোমার পঙ্কত শক্তি, আমারও শক্তি আছে। এস, আমরা উভয়ের শক্তিদ্বারা সপত্নীকে হীনবল করি। ৪)

(৩ পতি), এই শক্তিশালী ওদধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। এই শক্তিশালী বাণিশ তোমার মাথায় দিত দিলাম। তোমার মন যেন আমার দিকে ধাবিত হয়, পাভা যেমন বৎসের দিকে ধাবিত হয়, জন যেমন নিরপথে ধাবিত হয় (মামন্ত প তে মনো বৎসঃ গৌরীম ধাবতু পথা বারিন ধাবতু)। ১২

সূক্তটির বিষয় যাহাই হউক, ইহার রচনা যেমন সজীব ও সবল তেমনি উপভোগ্য।

পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক নিকরূপ ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঋকগুলিতে পাওয়া যাইতেছে :

পিতা যেরূপ পুত্রের কথা শ্রবণ করে, সেইরূপ (৩ ইন্দ্র) আমাদিগের দ্বারা আহৃত হইয়া আমাদের কথা শ্রবণ কর পিতার না শৃণুতি ক্রয়মানঃ)।

১১০৪১২

পিতা যেরূপ অপথগামী পুত্রকে উপদেশ দান করেন (পিতব কিতবঃ শশাং), সেইরূপ (হে বিশ্বদেবগণ), তোমরা আমাকে উপদেশ প্রদান কর।

২২২১৫

পিতা আশীর্বাদ করিবার সময় পুত্র যেমন তাঁহাকে নমস্কার করে (কুমারশিঃ পিতরঃ বন্দমানঃ প্রতি ননাম), হে ইন্দ্র, তুমি আশিবার সময় আমরা তোমাকে সেইরূপ নমস্কার করিতেছি। ২৩৩০-২

পুত্র যেমন মধুর বাক্যে পিতার বস্ত্রপাশ গ্রহণ করে, হে ইন্দ্র, আমি সেইরূপ হস্তের স্তুতিদ্বারা তোমার বস্ত্রপাশ গ্রহণ করিতেছি (পিতৃপুঃ সিচমা রন্তে ত ইন্দ্র দ্বাদিষ্টয়া গির শচীবাঃ। ৩৫৩২

মধুক স্তুতিতে পিতার সহিত পুত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি উপমা আছে—

অকপলীকৃত্য পিতরঃ ন পুত্রো

অন্যো অন্যমপ বদন্তমতি। ৭১০৭১৩

পুত্র যেমন অকপল শব্দ করিয়া পিতার নিকট গমন করে, (বর্ষাকাল আসিলে) সেইরূপ এক মধুক অন্য মধুকের নিকট গমন করে।

বাস্তোম্পুতির (গৃহের পালয়িতা দেবতার) স্তুতিতে আছে—

পিতা যেমন পুত্রদিগকে পালন করেন তুমি আমাদিগকে সেইরূপ পালন কর ( পিতের পুত্রান্ প্রতি নো ভূবন্ ) । ৭।৫৪।২

পিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার বিধান পুত্রগণ পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকুক । ( পিতৃবিস্তৃত রাসো বি শ্রয়ঃ শত হিমা নো অন্তঃ ) । ১।৭৭।২০

পিতা পুত্রকে সেরূপ দান করেন, সেইরূপ তুমি ( ইন্দ্র ) ধন দান কর ।

৭।৫৭।২০

অগ্নির উদ্দেশ্যে একটি উক্তি আছে—

পিতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পালন করেন ( পিতের পুত্রম-বিস্তরুপন্তে ) ১।১৬৯।১০

পরিবার মধ্যে অতিথি ও বন্ধুব্যক্তির বিশেষ স্থান ছিল । এ সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি এইরূপ—

অগ্নি পৈতৃক ধনের নায় অন্নদাতা ; শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির শাসনের নায় ত্রিনি নেতা ; উপবিষ্ট অতিথির নায় ক্রীতিভাজন । ১।৭৩।১

অতিথি যেমন ক্রীতিভাজন তেমন তিনি পূজ্য । ৭।৩।৫ শিষ্য ও শিক্ষকের মধ্যে কি প্রকার সম্পর্ক ছিল তাহা এই উক্তিটি হইতে পাইতেছি—

শিষ্য যেমন শিক্ষকের কথা শোনে ( হে অশ্বিনয় ) তেমনরা সেইরূপ বগ্রিমতীর আশান শ্রনয়ছিলে । ১।১১৩।১০

কোন রাজ্যের বগ্রিমতী নামে একটি কন্যা ছিল । বগ্রিমতীর পুত্র না হওয়ায় তিনি অশ্বিনয়কে আহ্বান করেন । অশ্বিনয় তাঁহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র প্রদান করেন ( শ্রুতং তচ্ছাস্ত্রিণি বগ্রিমত্যা হিরণ্যহস্তমগ্নিনাবদন্তম্ ) ।

গৃহস্থ পরিবারে জীলোকদিগের গৃহকার্য্যসমূহের মধ্যে সোমরস প্রস্তুত করিয়া উহা গো-চর্শ্বের কলসে সঞ্চিত করিয়া রাখা একটি প্রধান কাজ ছিল । সমগ্র ১ম মণ্ডল সোমদেবতার স্তুতি । এই স্তুতির উক্তি হইতে সোমরস প্রস্তুত করিবার সমগ্র পদ্ধতি পাওয়া যায় । একটি ঋকে সোমরস প্রস্তুত সময়ের পরিবেশ এইরূপ—

চারদিকে স্তোর পাঠ হইতেছে । সোমরস প্রস্তুত হইতেছে । চারি দিকে গাভীগণ চক্ষু দিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে । সোমরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া চক্ষের মধুরতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে । সোম প্রস্তুত হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন । সেই সঙ্গে কবিতা পাঠ হইতেছে । সোম বৃদ্ধিমান কবি, তাঁহার পড়াইতেই কবিতার সৃষ্টি হয় । ৯।৮৪।১

ঋষিরা দিনে চারি বার আহার করিতেন । পুরোডাশ এবং ভাজা যব ছিল তাঁহাদের প্রধান খাদ্য । ৩য় মণ্ডলের ২৮ স্তোত্রে অগ্নিকে প্রাতঃ সবনে পুরোডাশ মধ্যাহ্নে সবনে পুরোডাশ তৃতীয় সবনে পুরোডাশ ও দিনের শেষে পুরোডাশ আহুতি দিবার কথা আছে । পুরোডাশ আশ্বনে সঁকিয়া প্রস্তুত করা হইত । ইহা ভিন্ন তাঁহারা ভাজা যবের ছাতু, কখনও কখনও ঐ ছাতু দধি মিশ্রিত করিয়া ও তাহা দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইতেন ( ৩ মঃ, ৫২ স্তঃ ) ।

যবভাজা জীলোকদিগের অপর একটি প্রধান কাজ ছিল ।

কোন কোন জীলোক অস্ত্রের বাড়ীতে যব ভাজিয়া দিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন ।

কৃষিজাত যব এবং গো-পালন হইতে উৎকৃষ্ট সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাঁহাদের জীবিকার সমস্তা গোটায়াই ভ'বেই মিটিয়া যাইত ।

গোভিক্ষারমামতিঃ দুঃপাঃ

যাবেন কৃণঃ পুত্রহৃত সিংহা ১।১।৪।১১

আমরা যেন গাভীর সাহায্যে কষ্টকর দারিদ্র্য চূর্ণ উত্তীর্ণ হই । তে পুত্রহৃত ( ইন্দ্র ), আমরা যেন যবের দ্বারা কৃণার নিবৃত্তি করিতে পারি ।

জীলোকদিগের আর একটি কাজ ছিল বগ্ন বয়ন করা । এ সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি এইরূপ—

...উসামানস্তা বযোব রথিতে ।

তস্থং ততঃ সংবয়ন্তী সমাচী ... ২।৪।১৫

উষা ও রাত্রি বয়নকাল রমণীয়ের নায় । পরম্পরের সাহায্যার্থ গমন করেন ।

সম্ভবতঃ দুই জন জীলোক পরম্পরের সহায়তায় কাপড় বুনিতেন ।

বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর নায় রাত্রি পুনরার আলোককে সমাকরণে বেঁধেন করিতেছেন । ২।৪।১৬

উপজীবিকা হিসাবে বস্ত্রবয়নকারী তত্ত্ববায়ও তৎকালে ছিল । ১০।১০৬।১

গৃহস্থের বাড়ীতে সূচের দ্বারা বস্ত্রের ছিন্ন মেয়ামত করা হইত । বাক্য ( পূর্ণিমা ) দেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে । তিনি যেন নিজেই আমাদের অভিপ্রায় জানিয়া অচ্ছিন্নমান সূচির দ্বারা আমাদের কস্ম বয়ন করেন (সীব্যত্বপঃ সূচ্যচ্ছিন্নমানয়া ) । ২।৩২।৪

ঋষিরা গো, অশ্ব, গর্দভ ও মেঘ পালন করিতেন ( ৮।৫২।৪ ) । গৃহপালিত ষোটককে আহার ও পানীয় দেওয়ার কথা আছে । তাহার গাত্র মার্জনা করিয়া দিবার কথাও পাইতেছি । ৯।৮৬।৪

১০।১১।৫ মস্ত্রে গৃহপালিত পশুকে ঘাস দেওয়ার কথা আছে ।

গাভী ঋষিদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রিয় পশু ছিল । বহু মস্ত্রে গাভী সম্বন্ধে নানা প্রকার উক্তি আছে ।

১০ম মণ্ডলে ১২ স্তোত্রে গাভী এবং গো চারণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় । দোহনদক্ষ লোকেরা অস্ত্রের বাড়ীতে গো-দোহন করিয়া দিত । মনে হয় ইহাও অনেকের উপজীবিকা ছিল ।

আমি দুগ্ধবতী এই শ্রেণীকে আহ্বান করি দোহন-কুশল গো-ধূক্ ( হস্তো গোধূক্ ) উহাকে দোহন করে । ১।১৬৪।২৬

বৎসের সহিত গো-মাতার ব্যবহার তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বহু মস্ত্রে মধ্যে উহা প্রকাশ করিয়াছেন ।

বৎসের জন্য খেদ ব্যগ্র হইয়া হাধারন করিতে করিতে ( হিহুতী বৎস-

বিচ্ছত) আগমন করিতেছে। যেহু নির্বীজিতাক বৎসের জন্য হাথারব করিতেছে। উহার মন্তক অবলোকন করিবার জন্য হাথারব করিতেছে। বৎসের ওষ্ঠপ্রান্তে কেন অবলোকন করিয়া হাথারব করিতেছে এবং প্রভুত হৃদয়ানো উহাকে পুষ্ট করিতেছে।

বৎস খেতর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া অব্যক্ত শব্দ করে এবং গো-চারণ হানে অবস্থিত গাভী হাথারব করে। ১১৩০।১৭-১২

অস্থিঘরের স্তবে আছে—

তোমরা রাহিসে, গো-দোহন সময়ে প্রত্যয়ে স্তবোধনে, মধ্যাহ্ন সময়ে কিবা দিবসে ও রাত্রিকালে, যখনই আমাদের নিকট আসিবে, হৃৎকর রঙ্গ-সমভিবাহারে আগমন করিও। ৫.৭৫।৩

মস্তক হইতে মনে হয় শেখরাজি ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়েই সাধারণতঃ হৃৎকর দোহন করা হইত।

গো-জননী যেরূপ বৎসের দিকে বারবার গমন করে, সেইরূপ আমাদের এই স্ত্রী বার বার তোমার (ইন্ডের) দিকে গমন করিতেছে। ৬.৮৫।২৫

হৃৎকর গাভীগণ যেমন বৎসের নিকট ধাবিত হয় সেইরূপ আমাদের এই স্ত্রীসকল দ্রুতগেগে তোমার দিকে গমন করে। ৭।১৪।২৮

গো-মাতা সত্যোজ্ঞাত বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে। ৯।১০০।৭

গো-দোহক যেমন হৃৎকর গাভীকে আহ্বান করে, তে ইন্ড, আমরাও সেইরূপ তোমাকে আহ্বান করিতেছি। ৮।৫২।৭

নবপ্রসূত গাভীগণকে সোমরস পান করান হইত। ৯।১৭।৫০

গৃহপ্রাক্ণে যবের মরাই পাকিত। ঐ যব তাঁহার ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতেন। ১০।৬৮।৩  
ঋষিরা কেহ কেহ কামার ছুতার চিকিৎসক প্রভৃতি নানা রুত্তি অবলম্বী হইলেও কুশিই তাঁহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। মাহুশ বলিতে ‘কুষ্ঠঃ’ (অর্থাৎ কর্ণকরী) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (১।৪।৬)। ১১।১৭।২১ ঋকে আছে—

হে অধিষ্ঠ, তোমরা অধিদিগের জন্য লাক্ষন দ্বারা চাষ করাইয়া, যব পণন করাইয়া ও অন্নের জন্য পুষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বজ্রদ্বারা দহাদিগকে বাধা দিয়া তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছিল।

ঋগ্বেদে শান্তের উল্লেখ নাই। কয়েক স্থানে ‘শানাঃ’ শব্দটি পাওয়া যায়। ভাষ্যকার সাধারণতঃ উহার অর্থ দিয়াছেন ‘ভূষ্টযবান্’ (ভাজা যব)। ‘শানা ভূষ্ট যবে’ (অমর সিংহ)।

ঋষিরা পরশুধারা বৃক্ষ ছেদন করিয়া (৩।৫৩।২২) ধর্ম্মাক্ত কলেবরে অগ্নির জন্ত ইন্ধন বহন করিয়া আনিতেন (৪।২।৬)। অগ্নি নিরুপদ্রব স্থানে থাকিত এবং তাহাতে ক্রমাগত ইন্ধন প্রদান করিয়া প্রজ্জ্বলিত রাখা হইত।

৩ং হা নরোদম আ নিত্যমিন্-

মগ্নে সচস্ম গিত্বিঃ ধ্রুবাত। ১।৭।১০

লোকে নিরুপদ্রব স্থানে স্থায়ী গৃহ অনবরত কাঠদ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোমার (অগ্নির) সেবা করে।

ঋষিরা পরিপক ফলপূর্ণ বৃক্ষকে প্রাক্ষিপিত করিয়া ফল পাড়িয়া আনিতেন। ২।৯।৭।৫৩

জীবিকা অর্জনের জন্য ঋষিদিগকে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। এ কারণ রাত্রিকালে শান্তিতে নিদ্রা যাইবার জন্য আগ্রহাধিত হইতেন। রাত্রি-দেবতা

তাঁহাদিগের নিকট পরম স্নিগ্ধ সৃষ্টি লইয়া সমাগত হইতেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্রমণ্ড্যে উবার মন্ত্রগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা কবিশূর্ণ। রাত্রির মন্ত্র সংখ্যা উবার মন্ত্রের ত্রায় প্রচুর না হইলেও কবিশূর্ণ-মাধুর্য্যে সমধিক সমৃদ্ধ। পূর্ণিমা (রাকী) ও অমাবস্তা (সিনীবালী) উভয় প্রকার রাত্রির বর্ণনা তাঁহারা করিয়াছেন।

সন্ধ্যা সমাগম ও রাত্রিকালের পরিণতি যে ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঋষিমনের শৌন্দর্য্য-বোধের অপূর্ণ নিদর্শন। [১০ম মণ্ডল, ১২৭ সূক্ত]

‘রাকী বাখ্যদায়তী পুস্তক’ দেবাকৃতঃ। বিধা অধিষ্ঠানোপধিতা—রাত্রি দেবী আসিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছেন। তিনি নন্দ্যসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। ‘ওৎপ্রা অমত্যা নিবতো দেবাকৃতঃ। জ্যোতিষা বাথতে তমঃ। তিনি আরও নিস্তারলাভ করিলেন, নীচে ধারার থাকেন, উৎপ্রা ধারার থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি (গৃহ নন্দ্যাদির রূপ) আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল; মাহুশ, পশুপক্ষী সকলেই শয়ন করিল।

নি গ্রামাসো অধিকৃত নি পদবস্তো নি পক্ষিণঃ।

নি স্তেনাসমিচদিনঃ।

গ্রামসমূহ নিশ্চল হইয়াছে, যাচার পায়ে চলে তাঁগার, পক্ষীর, শয়নকারী স্তেনগণ সকলেই নিশ্চল হইয়া শয়ন করিয়াছে।

রাত্রিতে সকলে নিরুপদ্রবে শিথিলভাবে ঘুমাইতে চাহেন। বাস্তোম্পতির নিকট প্রার্থনা (৭ মণ্ড ৫৫ সূ) :

হে সারসের, তুমি যে স্থান হইতে গমন কর, পুনরায় সেই স্থানে আগমন কর। তুমি চোর ও ডাকাতির প্রতি গমন কর। ইন্ডের স্তোত্রগণের নিকট কেন যাও? আমাদের দিকে কেন বাধা দাও? তুমি নিদ্রা যাও।

তোমার মাতা নিদ্রা যাউন। তোমার পিতা নিদ্রা যাউন। কুকুর নিদ্রা যাক। গৃহস্বামী নিদ্রা যাক। বন্ধগণ নিদ্রা যাক। চারিদিকে এই জনগণও নিদ্রা যাক।

যে জীগণ প্রাক্ষেপে শয়ন করিয়া আছে, যাঁহারা বাহনে শয়ন করিয়া আছে, যাঁহারা তরু (বিচানাপত্র) শয়ন করিয়া আছে, যাঁহারা পুণ্যগন্ধা তাঁহাদের সকলকে নিদ্রিত করিব।

এগুলি ঘুমপাড়ানী মন্ত্র।

রাত্রি-দেবতার নিকট শেষ প্রার্থনা:—

মা নো অগ্ন্য যস্তাবয়ং

নি তে যামন্নবিস্মহি।

যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি সেই রাত্রি আমাদের শুভকরী হউন।

যাবগা বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ধ্যো।

অথানঃ সূক্তরা ভব। ১০।১২।৭৬

হে রাত্রি, বৃকী ও বৃককে আমাদের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও। চোরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্ট রূপে শুভকরী হও।

\* বাস্তোম্পতি, গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরস্বা কুলোদ্ভব, এ কারণ ‘সারসের’।

## সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম

(জন্ম : ১৮৬৯ ; মৃত্যু : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩)

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

অবিভক্ত বাংলার অক্লান্ত পুষ্টি-সংগ্রাহক, সাহিত্যিক, 'সাহিত্যবিশারদ' আবদুল করিম আর ইহজগতে নাই। বঙ্গ-জননীর এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের তিরোভাবে বাংলা-সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। বঙ্গদেশের দুই প্রান্তে বীরভূমে ও চট্টগ্রামে একদা দুই দিকপাল গবেষণার মূল খাঁটি আগলে ছিলেন; শিবরতন মিত্র মশায় বহুকাল আগেই শেখনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিছু দিন পূর্বে ৮৪ বৎসর বয়সে সাহিত্যবিশারদও আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের, সাহিত্যিক ভ্রাতাদের মায়ামমতা কাটিয়ে পরম জননীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পরিপক্ব বয়সে তিনি মর্ত্যধাম ত্যাগ করেছেন; দুঃখ তাঁর জন্ত নয়—দুঃখ আমাদের জন্ত, যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনন্ত মানবপ্রেম, অপরিণীত পাণ্ডিত্য, অকাতর দেশসেবার পূর্ণ মূল্য দেওয়ার কথা দূরে থাকুক, তাঁর কাছে আমাদের অপরিণীত ঋণের কিছুমাত্র শোধ করতে পারলাম না।

সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতির লীলানিকেতন শৈলকিরীটিনী সাগর-কুন্তলা নদীমেখলা চট্টলজননীর এ স্থান এককালে মহাপ্রভুর পার্শ্বদৃষ্টির জন্ম পরিগ্রহে ধস্ত হয়েছিল; এ গ্রামের মুকুন্দ দত্তের মৃদঙ্গের বোল ব্যতীত মহাপ্রভুর নৃত্যসুষ্ঠি হ'ত না; তাঁর অগ্রণ্ড বাসুদেব দত্তও মহাপ্রভুর বড়ই অন্তরঙ্গ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ গ্রাম মেখল গ্রামের সঙ্গে ধর্ম্মের বন্ধনে ছিল সুসংপৃক্ত; স্বনামধন্য মহাপুরুষ পুণ্ডরীক বিত্তানিধি—যাঁকে খ্রীষ্টচৈতন্য মহাপ্রভু নিজ পিতা বলে সন্ধান করতেন—মেখল গ্রাম থেকে নিরন্তর সুচক্রদণ্ডী গ্রামে রূপাদৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, মুকুন্দ বাসুদেব পুণ্ডরীক অতুলনীয় ধর্ম্মান্বিত ছিলেন—ধর্ম্ম-সুহৃৎ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মগরাজ জয়চন্দ্র এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন—চক্রালা থেকে রামু পর্যন্ত অঞ্চল চক্রালা সম্রাট অচল রূপাদৃষ্টি লাভে ছিল তখন বরণীয়। এ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রামে পুত্রোদ্ভূত পুণ্ডরীক অতুলনীয় গুণাবলীর আধার সাহিত্যবিশারদ জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন—এ অতি সুখাবহ ঘটনা।

কিন্তু জন্ম পরিগ্রহ থেকে নানা দুর্ভোগের, বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে তাঁকে কর্ম্মপথে অগ্রসর হতে হয়েছিল। তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতৃদেব ধর্ম্মাধার পরিত্যাগ করেন। তাঁর অষ্টাদশবর্ষ বয়সে পরমারাধ্যা জননীও তাঁর লালন-

পালনের সমস্ত ভার তাঁর পিতামহ মহম্মদ নবী চৌধুরী ও পিতৃব্য মুন্সী আইমুদ্দীনের উপর ঋণ্ড করে ইহলীলা সংবরণ করেন।

১৮৯০ সালে তিনি সংস্কৃত সহ এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। এটি জানা কথা যে চট্টগ্রামের সদর বি ও কল্লবাজার ষাহকুমার তিনিই প্রথম এন্ট্রান্স পাস মুসলমান। অতঃপর এক-এ পড়ার জন্ত তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্ত্তি হন; কিন্তু সন্নিপাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। পর পর নানা পারিবারিক দুর্ভোগে তাঁকে পড়াশুনা ত্যাগ করে চাকরির সন্ধানে বের হতে হ'ল।

চাকুরি-জীবনে প্রথম তিনি দীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর ধুলতাত আইমুদ্দীনের চেষ্টায় চট্টগ্রাম জজকোর্টে অস্থায়ী কেরানীর পদ লাভ করেন। এ সময়ে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামে বিভাগীয় কমিশনারের পাস্তাল এসিস্ট্যান্টরূপে কাজ করছিলেন; তাঁর আনুকূল্যে সাহিত্যবিশারদ কমিশনারের আপিসে স্থায়ী কেরানীপদ লাভ করেন। এ সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা থেকে সাহিত্যবিশারদের ভাগ্য ভিন্ন পথে নিয়ন্ত্রিত হয় বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যবিশারদের পিতামহ মহম্মদ নবী চৌধুরী মহাশয়ও সাহিত্যরসপিপাসু মহদয় শিক্ষিত লোক ছিলেন; নিত্য তাঁর বাড়ীতে সন্ধ্যায় পুষ্টিপাঠ ও সাহিত্যালোচনা হ'ত—বাল্য-বয়সে সাহিত্যবিশারদের সাহিত্য-প্রেমের মূল স্রষ্টাপাত এখানেই। একথা তিনি তাঁর ঢাকায় প্রদত্ত ২৬/৬/৫২ তারিখের বক্তৃতায় স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। এই সাহিত্যপ্রেম —কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ধরগতিতে বদ্ধিত হতে থাকে। তখনকার দিনে ব্রিটিশ সরকারের প্রচণ্ড প্রতাপ; স্বদেশীভাবাপন্ন লোকের সংস্পর্শে আসাও রাজকীয় শক্তির কাছে এক অমাজ্জনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হত। চট্টগ্রামের জ্যোতিঃ পত্রিকা ছিল স্বদেশী কাগজ এবং তার সম্পাদক কালীশঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন সর্বতোভাবে বিদেশী শাসন-কর্তৃপক্ষের একেবারে চক্ষুশূল। প্রাণের আকুল আবেগে এবং সাহিত্যসেবার অধিকতর সুযোগলাভের উদ্গ্রীব আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যবিশারদ সেই কালীশঙ্করের প্রকাশিত জ্যোতিঃ পত্রিকাতেই স্বনামে

বিজ্ঞাপন দিলেন—“ধারা আমাদের প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি সংগ্রহ করে দেবেন, তাঁদের এক বছর বিনা মূল্যে জ্যোতিঃ দেখা হবে।” এ বিজ্ঞাপন থেকে শাসন-কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করে নিলেন যে, আবদুল করিম জ্যোতিঃ পত্রিকার পক্ষীয় অন্তরঙ্গ লোক ; এবং ফলে তাঁকে সরকারী চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে যা ক্ষতি, ভগবানের বিধানে তা অনেক সময়ে পরম আনন্দের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যবিশারদ এবার আলোয়ারা মশা ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করলেন। বিধির বিধানে তিনি ভগবদ্ব্যাক্তিত কার্যে যোগ দিলেন ; অচিরকালের মধ্যেই তাঁর অপরিদ্রাঘ আগ্রহ উদ্যোগ এবং অগায়িক বাবতারের ফলে বহু মূল্যবান পুঁথি সংগৃহীত হতে লাগল। তাঁর জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল দীপ্তিতে সমগ্র বঙ্গদেশ ভাস্বর হয়ে উঠতে লাগল। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষারও পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি স্বভাবতঃই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ’ল। বিভাগীয় স্কুল ইনসপেক্টর আবদুল করিমকে পরম সন্তোষসহকারে স্বীয় আপিসের কেরানীর পদে নিযুক্ত করেন। পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আবদুল আজিজও তাঁর প্রতি বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিলেন। নবীনচন্দ্র সেন, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতির সাহচর্য্যে ও অনুরোধে এবং স্বীয় শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের হিতৈষণায় সাহিত্য-বিশারদ উত্তরোত্তর জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিস্নাত করেছিলেন। ১৯৩৩ সনে তিনি সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যবিশারদের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আলো-পত্রিকায়, তাঁর ২২ বৎসর বয়সে। ১৮৯১ সনে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ অক্ষয় সরকার-সম্পাদিত হুগলী থেকে প্রকাশিত পুণিমা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র এ প্রবন্ধের জন্য তাঁকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করেন। সে সময় থেকে জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত নবীনচন্দ্র সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিমের পরম অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্যবিশারদ বিগত বৎসরে ঢাকায় প্রদত্ত রেডিও বক্তৃতায় বলে গেছেন—নবীনচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনে উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস-স্বরূপ ছিলেন। অনন্তর তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরন্তর প্রবন্ধরচনা ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশিত করে গেছেন ; বঙ্গদর্শন, ভারতী, যমুনা, নারায়ণ, সাহিত্য মানসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কোহিনূর, নবনন্দ, মুসলিম ভারত, আলাই সলাম, সগুণাত, মোহনদী প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় হয় আমাদের স্বগ্রামে চট্টগ্রাম

সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে—১৯৩৮ সনে ; বদন-মণ্ডল তাঁর মিলিত হাতে বিমণ্ডিত ; লস্যাটমেশ প্রতিভার জ্যোতিতে ভাস্বর ; পরম আশীর্বাদ সহকারে তিনি দেশ-হিতৈষণার শ্রেষ্ঠ বাণী হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতির উল্লেখপূর্ব্বক প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে তখনি তাঁর পাঁচ শতের অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে গেছে। অতঃপর এ সুদীর্ঘ পনের বৎসরে তাঁর আরও শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নূনকল্পে তিনি ছয় শত প্রবন্ধ জীবদ্দশায় প্রকাশিত করে গেছেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধই গবেষণামূলক ; অপূর্ব্ব, পণ্ডিত-দের অপরিচিত পুঁথির মালমসলার সাহায্যে বিরচিত। এক-জীবনে এতগুলি প্রবন্ধ বিরচন অত্র কোনও গবেষণাকারের ভাগ্যে ঘটেছে কি না সম্ভবহীন।

শুধু প্রবন্ধ বিরচন নয়, তিনি অনেক পুঁথি সংশোধিত এবং প্রকাশিত করে গেছেন। লালগোলা স্বনামধন্য মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণের অর্ধাঙ্গুল্যো ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষণায় তিনি ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয়, রবিদেবের মুগলঙ্গ, ...সারদামঙ্গল, ...জ্ঞানসাগর, ...গৌরঙ্গসন্ন্যাস প্রভৃতি বহু মূল্যবান পুঁথি সম্পাদন করে গেছেন পরম পাণ্ডিত্য সহকারে। তাঁর পুঁথির বিবরণীরও ক্রিয়দংশ সাহিত্য-পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এসব কাজে রামেন্দ্রশূর্য্য ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট সহায়ক ছিলেন। ১৩২৪ থেকে ১৩২৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম থেকে সাধনা নামক এক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করতেন।

এতদ্ব্যতীত সাহিত্যবিশারদ আলোলের পদ্মাবর্তী সম্পাদন করে গেছেন। অর্থাভাবে হেতু এ গ্রন্থ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। এটি দেশের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আনন্দের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সাহিত্যবিশারদের জন্য অমূল্য শোকসভায় তাঁর এ গ্রন্থপ্রকাশের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আশা করি, তাঁর নিপুণ হাতের এই বরিষ্ঠ কাজ অচিরেই সুধী-সমাজে প্রভুত আনন্দপ্রদানে সমর্থ হবে—প্রকাশনের কাজে কোনও বাধা হবে না। সাহিত্যবিশারদ হিন্দু ও মুসলমান কবিদের প্রায় পনের শ’ পুঁথির বিবরণী লিখে রেখে গেছেন ; অর্থাভাবে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। এ পুঁথির বিবরণী অচিরে প্রকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। অমিলে এ দুর্মূল্য সম্পদ চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সারা জীবন কঠোর জীবিকা-নের শ্রম স্বীকার করেও সাহিত্যবিশারদ শুধু যে সাহিত্য-সাধনায় চির সঙ্গাণ্ড ও কর্ম্মকুশল ছিলেন, তা নয়—বহু জন-

হিতকর কাজ, সভাসমিতির সঙ্গে তিনি স্বেচ্ছাশ্রিত ছিলেন। চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনীর তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের “আজীবন সদস্য” ছিলেন এবং একবার পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির সহ-সম্পাদকের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি জীবনে বহু সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদে বৃত হয়েছেন। ১৯৩৯ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-মুসলিম সাহিত্য-সম্মেলনে এবং ১৯৫২ সনে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বঙ্গ-ভঙ্গের পরে ১৯৫২ সনে কুমিল্লায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছেন, “আমার দেশের যুঁহা নাই, আমার দেশের আত্মার—জনগণের যুঁহা নাই, তেমনি অমর আমার এই বাংলা-ভাষা।...মানুষে মানুষে বিভেদ আছে সত্য। এই বিভেদকে জয় করাই সংস্কৃতির কাজ। সংস্কৃতি ত্র্যেকের বাহন, বিভেদের চামুণ্ডা নহে।” বঙ্গীয়-সংস্কৃতির এ যুঁহা প্রতীকের দেশপ্রেম ছিল অপরিসীম; স্বয়ং অসাধারণ সাহিত্যিক হয়েও স্বীয় গ্রামের ঋণমালিনী বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির সভাপতির কাজ তিনি পরম নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করে গেছেন। বিগত বঙ্গ-ভঙ্গের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে তাঁর উপদেশের বলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাঁর অঞ্চলে প্রকট রূপ ধারণ করতে পারে নি।

তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানবপ্রেমের উপাসনায় চরম সিদ্ধি লাভ করে গেছেন। তাঁর “সাহিত্যবিশারদ” উপাধি চট্টগ্রামের সুধীসমাজ-প্রদত্ত। নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে “সাহিত্য-সাগর” উপাধিতে বিভূষিত করেন। অল্পপম পাণ্ডিত্যে ও স্বকীয় অমায়িক ব্যবহারে, দেশহিতৈষণায় অতুলনীয় মাহাত্ম্যে তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই হৃদয় সমানভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর উপাধি দুটিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সাহিত্য-সাধকের আজীবন সহধর্মিণী ও মরজগতের লীলা-সঙ্গিনী বিগত ২৫শে মাচ্চ মানবলীলা সংবরণ করেন। তারপর তিনি জীবনের প্রতি স্বভাবতঃই বিতুষ্ট হন। স্বল্প-কাল মধ্যেই তিনি বিধাতার আশ্রানে সহধর্মিণীর সহগামী হলেন। দেশের এক উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক সাহিত্যাকাশ থেকে চিরতরে ভ্রষ্ট হ’ল।

সাহিত্যিকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের, তাঁর পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়—তাঁর বিরচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করা। সাহিত্যবিশারদের অমূল্য প্রবন্ধরাজি ইতস্ততঃ বিক্ৰিষ্ট অবস্থায় আছে। আজ তাঁর দেশবাসীর অবশ্যকর্তব্য—ঐগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা; অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি সঙ্কলনপূর্বক অচিরে প্রচারিত করা। বঙ্গীয় সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন—এই প্রার্থনা।

## যাত্রী

### শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পথ করিয়াছে সন্তোহ আশ্রান,  
দিয়াছে খুলিয়া রহস্য-ববনিকা।  
কত শিলালিপি, সৌধ, জুপের গান  
পথযাত্রীর অন্তরে হ’ল লিখা।

পূন্নাবনেতে ঐশ্বরী প্রেমলীলা,  
মানবী-প্রেমের অমরা আগ্রা তেরি।  
গোবর্ধনেতে হেরিহু প্রোথিত শিলা  
‘লাল-কেল্লা’র ধ্বনে স্বাধীনতা-ভেরী।

চিম্বাত ভেদি তরিতে পণ্ডিত জনে,  
সুরধনী নামে ‘হর কি পেয়ারি’ বাটে  
অলকানন্দা মন্দাকিনীর সনে  
রক্ত প্রয়াগে মিশিলেন গিরিবাটে।

পথ নিয়ে যায় পথিকে টানিয়া নিতি,  
জীবন ভরিয়া জেগে থাকে সেই স্মৃতি।



মস্তাধারলেখনীক"। পঞ্চমীতে লক্ষ্মী এবং দোয়াত-কলমের পূজা করিবে। এইখানে কোন প্রতিমার উল্লেখ নাই। বরাহের বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতিষ-সংহিতায় প্রতিমার লক্ষণের মধ্যে সরস্বতীর উল্লেখ নাই।

চণ্ডীকাব্যে সরস্বতী—বাংলার চণ্ডী-কাব্যের কবি মুকুন্দ-রাম চক্রবর্তী সরস্বতীর বন্দনায় বলিয়াছেন যে, দেবীর খেত কমলে অধিষ্ঠান, খেত বন্ধ পরিধান, মস্তকে শোভে চন্দ্রকলা, করে শোভে জপমালা; শুকশিশু শোভে বাম করে। তাঁর এক হস্তে পুস্তক, মণীপত্র তাঁর সার্থী, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিনী, বীণা, বেণু, বাতায়ন সকল সময় তাঁর সেবা করে। তিনি চন্দ্রমুখে বেদধ্বনি করেন।

বীণাপাণি বর্ণময়ী, তিনি বিষ্ণুমায়ী চতুর্ভূজা। বিষ্ণু-মায়ীই প্রকৃতির আত্মশক্তি। মহামায়ীই দুর্গাশক্তির একাংশ সরস্বতী। তিনি ছয় ঋতু ছয়টি দেবশিশু লইয়া সঘনাসরের লীলা দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতিকে রক্ষা করিতেছেন। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সরস্বতীর সাধারণ পরিচয় পাইলাম। বুঝি-লাম যে, শক্তি একই, বিভিন্ন যুগে মানব ভিন্ন ভিন্ন প্রতি-রূপকে শক্তির কর্তব্য করিয়া, নিরাকার শক্তির ভাবপ্রতীক সাকার মূর্তিকার প্রতিমায় অর্চনা করিয়াছিলেন। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী একই চিন্ময়ী নিরাকার শক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ভাব প্রতিমায় অর্চনা হইয়া থাকে।

চিন্ময়ীভাব প্রতীকের, মূর্ত্তি ভাব প্রতিমা জাতীয় কৃষ্টি-কলার বিকাশ : চিন্ময়ীভাবপ্রতীক নিরাকার সরস্বতীর সাধনার ক্ষেত্রে মানব-হৃদয়। মানব-চিত্তে এই নিরাকার শক্তি আবির্ভূত হইয়া মূর্ত্তি ভাব প্রতিমায় তার বিকাশ করা হয়। মানব-হৃদয়ের 'অঞ্জন' দুগ্ধগুণ্ডা, হৃদয়ের সরসে ধৌত করিয়া নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রজ্ঞা বারিপূর্ণ সুখাকলস পূর্ণ করিয়া থাকেন। সাধারণ মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধিতে এই চিন্ময়ী নিরাকার জ্ঞানের দ্যুতি প্রবেশ করিতে পারে না; কল্মষকালিমাপূর্ণ মানব-হৃদয়ে আত্মার স্নিগ্ধ ছায়া আশ্রয় লইতে পারে না। তাই তাঁহার হৃদয়ের জালা চিরশরণের কাছে নিবেদন করিয়া আত্মার শাস্তিস্নান করিতে কখনও পারে না। সেইজন্তই নিরাকার জ্ঞানশক্তির চিন্ময়ী ভাব প্রতীকের মূর্ত্তি ভাব প্রতিমায় রূপ ও গুণ বিকাশ করিয়া সহজে সাধারণ মানব-চক্ষে শক্তির গুণ, গুণের ধর্ম প্রকাশ করিতে হয়। তারপর জাতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের মধ্যে বিকাশ করিয়া জাতীয় প্রাণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় উদ্বোধন করিতে হইলে নিরাকার চিন্ময়ীশক্তির ভাবময় চাক্ষুষ প্রতীক, মূর্ত্তি ভাব প্রতিমা গড়িয়া পূজার ভক্তির মধ্য হইতে জাতীয় কৃষ্টিকলার উন্নতি আবশ্যক হয়। কামনা-কলুষপূর্ণ ভোগময় অশাস্ত মানব-হৃদয়ে চিরশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে চিন্ময়ীভাব

মূর্ত্তি হইতে মূর্ত্তি প্রতিমার অর্চনা অধিক আবশ্যক। নিরাকার দেবশক্তির ভাব প্রতিমার সাধনার মধ্য হইতে ধীরে ধীরে মানব-হৃদয়ে চিন্ময়ী নিরাকার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া চিরশরণের কাছে তাঁহার অশাস্ত হৃদয়ের জালা নিবেদন করিয়া দ্রুত মোচন করিতে পারে। মানবজাতি হৃদয়ের ঐক্য প্রেম জীতির বন্ধনে বিশ্বমানবের সহিত একাত্মবোধ এবং দেবতার সহিত মানবের সম্পর্ক মধুর করিতে হইলে অষ্টমহাভূজ জ্ঞান-বিজ্ঞান শক্তি সরস্বতীর চিন্ময়ী ভাব মূর্ত্তির সাধনার চাক্ষুষ ব্যবহারিক শিল্প ও কাব্যকলায় বিকাশ করিয়া তারপরে প্রাণের আবেগে যজ্ঞ ও নিষাদের সুরধ্বনিতে ঐক্যতান করিয়া শক্তির মূর্ত্তি প্রতিমায় চিন্ময়ীভাবের অম্ল-প্রবেশ করাইতে হয়।

প্রতীক সাধনায় ভারতীয় জাতীয় গুণের বিকাশে পাষণ দেবতা—যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের দেবী-শক্তির চিন্ময়ী ভাব মূর্ত্তি মূর্ত্তিকার প্রতিমায় গড়িয়া সজ্জন (সৃষ্টি), বিসজ্জনে জাতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া দেবতার সহিত মানবের মধুর সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছেন। সরস্বতীর অষ্টমহাভূজ শক্তিই বিশ্বকর্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর যুৎপিণ্ডে, নিম্নচল পাষাণে, দারুকাষ্ঠে নানাপ্রকার বিচিত্র শিল্প গড়িয়া শিল্পকল ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া-ছেন। মানব এই মহাশক্তির চিন্ময়ী ভাব মূর্ত্তির সাধনার ফলে বিভিন্ন কারুশিল্পে জড়দেহে পাষাণে চৈতন্য ভাবদীপ্তি সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছেন। নিরাকার অদৃশ্যদ্যুতি শক্তির সাকার জড় পদার্থের মধ্যে জ্যোতির্ময় করিয়া পাষাণেও দৈবশক্তির আবির্ভাব করিয়াছেন। এই ভাবেই তাঁহার দেবশক্তির সহিত মানবীয় সম্পর্ক নিবিড় করিয়া লইয়াছেন।

সরস্বতী শক্তিবাচ্যে বাম্ময়ী। কাজেই তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির আত্মা। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার দেহ। তিনি প্রত্যেক দেহে বিদ্যমান আছেন। বিশ্বদেহই তাঁহার প্রতীক। আমরা দেবীর মূর্ত্তি বলি না, প্রতিমা বলি। মূর্ত্তি হৃদয়ের অম্লভূতি নিরাকার; প্রতীক প্রতিমা সাকার। মূর্ত্তিকে অন্তরে সজ্জন করা হয়, তাহারই প্রতীক প্রতিমাকে বিসজ্জন করা হয়। প্রতিমাই দেবীর বাম্ময়ী ও চিন্ময়ীশক্তির গুণ। গুণের ধর্ম ও কর্মের প্রতীকই তাঁহার মানবদেহরূপী জড় প্রতিমা। আমাদের সাধনা হইল অন্তরে বাম্ময়ী ভরনের বৃত্তি ভারতীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি, বাহিরে তাঁহার জড়দেহ প্রতিমায় সজ্জন, পূজাস্তে তাঁহার বিসজ্জনই আমাদের জাতীয় সাধনা। এই ভাব প্রতিমার সাধনায় ভারতবর্ষের সাধকগণ দুর্বলকে সবল করিয়াছেন, অত্যাচারীকে দমন করিয়া চিরশরণের আশ্রয়-পথ দেখাইয়াছেন। পতিত মানব-হৃদয়ে জ্ঞানের দ্যুতি অম্লপ্রবেশ করাইয়া তাহার ভিতরে সত্য-শিব-সুন্দর করিয়াছেন।

জাতীয় ভাববর্জনে বর্তমান কুটির বিকল্প : বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আমরা এই মহান জাতীয় আদর্শ বর্জন করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার বর্জনীয় অংশ গ্রহণে ধ্বংসের পথে চলিতেছি। ভরতের বৃষ্টি 'জ্ঞানভারতী'র সঞ্জন না করিয়াই বিসর্জন কবিতোঁছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সাধনার আমাদের মস্তিস্কের অতিবৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু সেই মস্তিস্কের আশ্রয়, হৃদয় দুর্বল হইয়া দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া আর সবল মস্তিস্ককে বহন করিতে পারিতেছে না। বিজ্ঞানময় জড় মস্তিস্ক যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঠিক সেই অনুপাতে ইহার জ্ঞানময় অন্তরের আশ্রয় প্রাণময় জীবনীকোষ অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয় শুকাইয়া মস্তিস্ক বৃদ্ধি করিলে সেই মস্তিস্কের ভার কোনরকমেই কৃশ দেহ বহন করিতে সক্ষম হইবে না—সাধারণ বড়েই মস্তক ভুলুঙিত হইবে। আমাদের জাতীয় শক্তিসাধনা এবং শিল্পকলায় মনো পাশ্চাত্য

ভাবধারা মিশ্রিত করিয়া শিল্পকলার নূতন বঙ্গালী কোলাহলের গর্বে জাতীয় জ্ঞান শক্তির সাধনাকে হারাইয়া ফেলিতেছি। জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের শিল্পকলায় মনো এখন আর শাস্ত্রীয় চিম্বা ভাবে প্রতীক প্রতীমাঃ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সবস্বতী অর্চনার দেখিতেই দেবীমূর্তিতে এক অদ্ভুত নিরাশার কল্পনার আচ্ছাদন। এই প্রাণ হৃদয় শুকাইয়া মস্তিস্ক বৃদ্ধি করিলে আমাদের জাতীয় কুটির ক্ষাণ দেহ আর কত দিন অতিবিক্ত মস্তিস্ককে বহন করিতে সক্ষম হইবে! হৃদয় বৃদ্ধি পাইলে মস্তিস্ক আপনি বৃদ্ধি পাইবে—সেই মস্তিস্কই জাতীয় শিল্পকলা, জ্ঞান বিজ্ঞানকে বহন করিতে সক্ষম হইবে। দেবী সবস্বতী তানু বিজ্ঞান অতি নাজুল শক্তিই হৃদয় কান্তি কর পুষ্টি আদ্যে। তেজস্বিনাবর্ণিতমস্ত, তেজস্বিন-জ্ঞানম্ অতিম্ বুদ্ধিম্ অস্ত, এই আমাদের জ্ঞানের সাধনা হইবে।

## সেবাস্ত্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসুরায়

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একদা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, বাঙালী যুবক রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু সমাজসংস্কার-কাৰ্য্যে বিধব-বিবাহ করিতে লোক পাওয়া যায় না কেন? তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি—হুজুরের শ্রোতে পাতা ভাঙ্গিয়া দিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও ভীত হয় না, কিন্তু আজীবন সামাজিক নিষেধাতন সহ্য করিতে অপরিচয় আত্মত্যাগ ও অবিচলিত সাহসের প্রয়োজন। মৃত্যুভূমির শঙ্কলমুক্তির জন্য যাহারা অগ্নির বদনে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিয়াছেন তাঁহারা জাতিব্রতমাগ্ন। কিন্তু যাহারা সমাজকে টানিয়া তুলিবার জন্য বিবেকবুদ্ধিপ্রাণাদিত হইয়া সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া জীবনভোর সমাজের অত্যাচার-অবিচাৰ ও লাঞ্ছনা সহিয়াছেন, তাঁহাদের ত্যাগ নিষ্ঠা ও বীরত্ব অধিকতর প্রশংসনীয়। এই কাৰ্য্যে দীর্ঘকাল একটি সত্য ও আদর্শকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত বহন করিতে, চতুর্পার্শ্বস্থ প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে নিজের মত, বিশ্বাস ও সঙ্কল্প অটল থাকিতে যে নৈতিক সাহস ও দৃঢ়তা আবশ্যক বাঙালীর চরিত্রে ক্রমশঃই যেন তাহা দুর্বল হইয়া উঠিতেছে।

অথচ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এই বাংলাদেশই শিক্ষা এবং সমাজ-

সংস্কারে অগ্রণী হয়। রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিজ্ঞানসাগর এদেশে শিক্ষা ধর্ম্ম সমাজ-সংস্কারের পথিকৃৎ। সেবাস্ত্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্কারক-প্রধানদেরই ঐতিহ্যবাহী প্রতিভাশালী সংস্কারকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। পরবর্তী-কালে পুঙ্খানুপুঙ্খের প্রদর্শিত পথে কেহ কেহ পদচারণা করিয়া থাকিলেও শশীপদবাবুর পথে আর কেহ সংস্কারকাৰ্য্যে তাঁহার চায় অন্তঃসংকল্প ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে এক কুশলী বাক্তরপে নবীন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকাল-প্রসিদ্ধ একজন দেশহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া অর্ধাভাবে যদিও শশীপদকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় তথাপি আত্মচেষ্টার দ্বারা স্বগৃহে শিক্ষালাভ করিয়া অচিরে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সামান্য বেতনে শিক্ষকতার কর্ম্ম করিয়া প্রথম-জীবনে তাঁহাকে নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করিতে হয়। উত্তরকালে সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত

থাকিয়া তিনি প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। সেকালের কুশীলব ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের পক্ষে অধিক বয়সে স্বয়ং কত্যানির্বাচনপূর্বক বিনাপণে বিবাহ করিয়া শশীপদ যৌবনারম্ভেই প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সেই যে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাহা দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া ছিলেন—কোথাও অবনমিত হইতে দেন নাই। তাহার নিকাম জনসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ভট্টপল্লীর পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার “সবাব্রত” উপাধিতে ভূষিত করেন। স্বদেশ ও বিদেশে সম্মানিত হইয়া এই অক্লান্তকন্মা জনহিতৈষী মহাপুরুষ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

জনসেবার উদ্বুদ্ধ হইয়া শশীপদ যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তাহার অনেকগুলিই ভারতবর্ষে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রথম। প্রাতঃসংকীর্তন পুণ্য শ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিধবা আইনসিদ্ধি বিষয়ে গেলেন, তৎসঙ্গেই সমাজ উন্নয়ন সাধিত হইল না। বালবিধবার ভরণে দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগরকে অন্তঃকরণে বিগলিত হইয়া করুণায় যে নিদ্রাবাণ প্রবর্তিত হইল, হিন্দুসমাজের সংস্কারবদ্ধ গৌড়ামির বাণুভায় রুদ্ধ হইত তাহার প্রবাহ একরূপ ক্ষয় হইবারই উপক্রম হইল। এ সময়ের শশীপদ হিন্দু-বিধবার ভরণ ও চন্দ্রশামাচরণের সমন্বিত বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন আজ পর্যন্ত তাহাই বিধবার স্থায়ী কল্যাণের পথনির্দেশক হইয়া আছে। বিধবাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া ও ভাগ্যদিককে নানাবিধ শিক্ষাকর্মে শিক্ষা দিয়া আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি “বিধবাপ্রশম” স্থাপন করেন এবং প্রথমেই হিন্দুসমাজের আচারনিষ্ঠা ও তথাকথিত সমবোধ আদর্শ প্রচারিয়া প্রাচীন হিন্দুপ্রথাগত উৎপত্তিগত ক্রিয়াকলাপের ভারতবর্ষে হিন্দু-বিধবাদের উন্নতিসাধনে উচ্চতম সর্বপ্রথম সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টা এবং পরবর্তীকালে শশীপদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াই পশ্চিম-ভারতে পণ্ডিতা রমাবাসীর বিখ্যাত “সারদাসদন” প্রতিষ্ঠিত হয়। শশীপদকে তাঁহার সেবাকার্য্যে বিলাতের আশ্রয়লাভ হইতান এসোসিয়েশনের পক্ষে কুমারী কাপেন্টার এবং তাহার মৃত্যুর পর কুমারী ম্যানিং প্রভৃতি বিশেষ সাহায্য করেন।

ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইবার বহু পূর্বেই শশীপদ শ্রমিক-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তিনি উপন্যাস করিয়াছিলেন, বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকেরা কেবল যে শোষিত হইতেছে তাহাই নহে, তাহাদের মধ্যে পানদোষ বিস্তারলাভ করিয়া ক্রমশঃ নৈতিক অবনতি ঘটাইতেছে। তাই তিনি

শ্রমিকগণের অর্থনৈতিক, চারিত্রিক, স্বাস্থ্যগত ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিলেন। শ্রমিক-কল্যাণে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ছিল এবং বর্তমানের আশ্রম শ্রমিক আন্দোলনকে ব্যক্তি ও দলবিশেষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার না করিয়া তিনি যথার্থ মানবসেবার উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাঁহার বিপুল কর্মক্ষমতা শ্রম-জীবীদের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। সেকালে একজন বাঙালী যুবক যে এইরূপ সুপরিকল্পিত উপায়ে শ্রমিক-গণকে সংগঠিত করিয়াছিলেন ইহা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিলে।

এ.দ.শ সরকারী ডাকবিভাগীয় সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্বেই শশীপদ শ্রমজীবীদের সঞ্চয়প্ররম্ভ ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিবার জন্য “আনান ব্যাঙ্ক” স্থাপন করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইংলণ্ড গিয়া তিনি ভারতবর্ষে “ফ্যাক্টরী আইন” প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “ভারত শ্রমজীবী” নামে চপুষ্ঠার একখানি সচিব শিক্ষামূলক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সংগ্রহ সচিব করিতে সাধ্যবদ্ধ ভাবে দাপি উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইত। “ভারত শ্রমজীবী” প্রতি মাসে পনের সহস্র কপি মুদ্রিত হইয়া প্রতি সংখ্যা এক গয়দা মুক্ত্যে বিক্রয় হইত। তখনকার দেশব্যাপী বিশেষতঃ অন্তঃপ্রবীর ব্যাপক নিরক্ষরতার মধ্যে, বাংলাভাষায় মাসিকপত্র প্রচলনের সেই প্রথম যুগে “ভারত শ্রমজীবী”র প্রচা-সংস্থা হইতেই শ্রমিকগণের মধ্যে উহার জনপ্রিয়তা অন্তর্মান করা যায়। “ভারত শ্রমজীবী” মাসিকপত্রে প্রকাশিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি কবিতা হইত দুইটি শব্দকনিষ্ঠ উদ্ধৃত করিতেছিঃ

“৩২, জাপো, শ্রমজীবী ভাঙ

উপস্থিত কথায়

৮০০০ নারীস্বর

সেবার বেলার আর নাহ

৩২, জাপো, ডাকিবেছি গো

সমাজের ন্যায়ভোগ ভাঙ

এ দেশের দর হইবে

মূল্যবান সব চলে

নাথ্য চলে গায়ে লাভ নাহ

বৈশ্য ভিল রথের দেখাই।”

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল তিনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেন। “আপনি আচরি গর্হ জীবেরে শিখায়”—এই মহাজন-

বাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। শশীপদ দয়ঃ বিধবা-বিবাহ করিলেন ও স্বীয় বিধবা ভ্রাতৃপুত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া স্বর্গতে উহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। বনস্ক কুলসম্প্রদায় বিধবাবিবাহ জন্ত যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন তাহার প্রথম ছাত্রীই হইলেন শশীপদের স্ত্রী ও তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃ-জায়া। সমগ্র দেশের বিজ্ঞান ও শৈশব-কথায়িত জরুটি উপেক্ষা করিয়া শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশে সর্ব্বপ্রথম সস্ত্রীক বিবাহিত যাত্রা করেন। মদকতা নিবারণী আন্দোলন করিতে হইলে ত নিজে সমস্ত মাদকদ্রব্যের সহিত সংগ্রহ এইরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিলেন যে, শেষজীবনে একবার মদ্যপানান্ত হইলে চিকিৎসক বলেন তাঁহাকে ঔষধ হিসাবে কিঞ্চিৎ অহিফেন সেবনের পরামর্শ দিলেন। তখনও তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, “No, doctor, I cannot die on a pain-killer.” গ্রামিক-কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন ত বহুনাড় পীড়িত শ্রমিকের শোগলস্যায় বাসনা অহঙ্ক বরুণী যাপন করিতেছেন, তাহার কখনও-বা কাবখানায় কক্ষানন্দ গ্রামিক-সেবনী পুনর্পিত্তক্রমবর্ত্তে, শস্ত্রপুত্রটিক ক্রোড়-বুকিয়া বসিয়া আছেন—যাহাদে সেব করিতে হইবে প্রথমই তাহাদে প্রদত্ত বস করিতে হইবে।

জনসম্মত শশীপদ সেবনপ্রতি হৃদয়-সমগ্র জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ও নিরন্তর কণ্ঠশীলতায় এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আঞ্জিকার কাম্বোজলার দিনেও সুলভ নহে। হিন্দু বিধবার কল্যাণসাধনে তিনি যে অদয়বন্ত ও দুঃদশিতা, মাদকতা নিবারণে যে পৌরুষ ও তজ্জ্বিতা, শমজীবীদেব সেবায় যে অপরিমেয় ত্যাগ ও শ্রমশীলতার পরিচয় দেন তাহার যে কোন একটির দ্বারা শশীপদ সেবাবত নাম সার্থক হইত, কিন্তু

বহুমুখী কর্ম-প্রযত্নের দ্বারা তিনি অনন্তসাধারণ কর্মবীরের গৌরবমণ্ডিত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অনেক প্রতিষ্ঠানই পাশ্চাত্যের উন্নততর সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার আদর্শে প্রভাবিত হইলেও তাহার কর্মপ্রণালী পাশ্চাত্য-পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণে নোথাও গ্রিষ্ট হয় নাই, কৃত্রিমতায় কুজিত হইয়া পড়ে নাই।

শশীপদের স্বার্থলেশশূন্য নিরাসক্ত কর্মসাধনার উৎস ছিল বঙ্গনিষ্ঠ সাধকের ভক্তিরসে সিক্ত নিগূঢ় অধ্যাত্মজীবন। তাঁহার চরিত্রে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত পাশ্চাত্যের বলিষ্ঠ কর্ম-বুদ্ধির অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শশীপদ সমুদয় সচলুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সর্ব্বজনীন প্রেম ও মানবতাবৈতন্যে যে সার্বভৌম আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বৈষ বিজিজ্ঞাসিত বিদ্বৈষ মানবের আত্মিক কল্যাণে তাহা সমভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল। যেকালে বরাহনন্দেন অনতিদূরে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির স্বপ্নাদিষ্ট ভগ্নবিধীর মন্দিরে পুনঃসে শ্রীশয়কুমার লোকশিক্ষার জন্ত সাধকভাবে “বত মত তত পণ” এর পরীক্ষা চাপাইতেছিলেন তৎকালে শশীপদও মানবপ্রেমের উদার ভিত্তির উপর “সাধারণ ধর্ম্মমত” স্থাপন করিয়া ধর্ম্মসমগ্রের ক্ষেত্র গম্ভীত করিতে-ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ধর্ম্মসাধায় যে মহতী সম্ভাবনা রাজ উত্ত হইয়াছিল তাহাই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে “দেবালয়ে” অঙ্কুরিত হইয়া বিরোধবিস্কৃদ্ধ মানবকে মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের এক মহাতীর্থে আহ্বান করিয়া লইল। সেদিন শশীপদ সমস্ত প্রেমায়িত হৃদয় দেবালয়ের উদার প্রশস্ত অঙ্গনে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে বিশ্ব মানবের জন্ত আসন পাতিয়া দিয়া—

### ভ্রম-সংশোধন

পরাগী, পৃষ্ঠা ১৩৬০ :	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছবিদ নাম— হইবে না	ছবিদ নাম— হইবে
১৩৬০	১	১	গুপ্তকালীর সাধারণ দৃশ্য	গুপ্তকালীর দৃশ্য, গুপ্তকালী
১৩৬০	২	২	বিশ্বেশ্বর মন্দির, গুপ্তকালী	সাধারণ দৃশ্য, গুপ্তকালী
১৩৬০	২	২	গুপ্তকালীর মন্দির	বিশ্বেশ্বরের মন্দির, গুপ্তকালী

## কুটীরশিল্পে যন্ত্রের স্থান

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যন্ত্র ও কার্যিক প্রসঙ্গ বন্ধ লইয়া আলোচনা যন্ত্রের অবিভ্যর্থনের কাল হইতে তথিমা আসিতেছে; ইহার আভ্যন্তরীণ মীমাংসা হয় নাই, কোনও কালে ইহার কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। যেভাবে যন্ত্রের প্রয়োগ বাড়িয়া বাইতেছে, দিনে দিনে বিজ্ঞানীয় উদ্ভিতির সহিত মানুষের সৃষ্টিপ্রতিভা অপরূপ আকারে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ইহার শেষ একাধার তাহার সীমা নিকটবর্তী হইতে পারে না।

যদিও ইহা, কারণ বহুশ্রমসাধ্য ক্রিয়াকে মনুষ্যশক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইতে সক্ষম নয়, অথচ আধুনিক সভ্যযুগে ইহার অসিদ্ধিশিই না হইলে জীবনযাত্রা অচল। এতদব্যতীত যন্ত্র বর্জন করিয়া আদিমমানব পথচারে ফিরিয়া বাইবার কথা চিন্তা করা যায় না।

আবার এক কতকগুলি কাজ আছে, যন্ত্রের সাহায্য অপেক্ষা মানুষের হাত-পা যন্ত্রে সম্পাদন অধিক যোগ্যত- সম্পন্ন। যন্ত্র তখন কেবল ব্যবহার্য নয়, অচল বলিষ্ঠ অস্ত্রাস্ত্র হয় না, সেখানে কার্যিক শ্রম বৃদ্ধি দিয়া যন্ত্রের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু যে দেশে লোকসংখ্যা কম, অথচ উৎপাদনের ক্ষেত্র অনেক, গৃহস্থালী কলসে লোকের অভাব, সেখানে ক্রমেই যন্ত্র অবিভ্যর্থন হইতেছে এবং মানুষের জীবন উপর নিম্নের দ্বন্দ্ব পাইতেছে।

সমস্ত সেইখানে যেখানে কার্যিক শ্রমে বহু লোক জীবিকা অর্জন করে, যথেষ্ট বজ্রাঘাতের উৎপাদন তৎপরতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া থাকে। সেই উৎপাদিত পণ্য আবার যদি দ্রুতজের মধ্যে বেশী ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে মূল্য হ্রাস পাওয়ার বহু লোকের উপকার হয়। এখন একটা বড় প্রশ্ন, লোকের আয়ের পথ নষ্ট করা ও তাহা দ্রুত ক্ষয় সন্তায় মূল বিক্রয় স্থান ব্যয় হ্রাস করা, এই দুইটির মধ্যে কোনটি অধিক বাঞ্ছনীয়? অবশ্য একটা সহজেই অনুমান করা যায়, যন্ত্র লোক সৃষ্টিপ্রস্তুত হইলে তাহা অপেক্ষা উপকারী হইবে সংখ্যায় বেশী লোকের। তবে এক শ্রেণীর মুখের অল্প নষ্ট হইতেছে, অপরদের পক্ষে ঠিক তাহা নহে, সমগ্রজাতীর ব্যয় কিছু বাড়িতেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বর্ধিত ব্যয়ের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হিলে পরিমাণ বেশ মোটা হইয়া দাঁড়ায়।

এবং বর্ধিত এই স্বল্পের নিম্নসংখ্যার বিরাট পরীক্ষা হইতেছে। কোনও দেশে এই নীতি অবলম্বন করে নাই বল যায় না। তবে আদিমপ্রাচীন দেশেই বড় বড় ছোট শিল্প স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়; আর না হয় ছোট শিল্প বহুদাকার শিল্পের

কতকগুলি উপাদান উৎপাদন করিয়া পরিপূরক হিসাবে কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষে যেখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পের দ্বন্দ্ব-সম্মানে বড় শিল্পের নিকট অর্থ আদায় করিয়া উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কাপড় ও তেলের কল, তাঁত ও ঘানি বাঁচাইবার জল মতন কল, সেদু দিতেছে। কি ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে ছোট বড় দুই শিল্পই ধাঁচিতে পারে, ইহা তাহাবই পরীক্ষা।

সম্প্রতি আবার এক নতুন বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হইতে সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে। কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য-পরিষদ বালিয়াড়েন, তিনি বিড়ি তৈয়ারি করিবার জল কলসে বিপণিত করিবেন। এদিকে বিড়ি তৈয়ারি করিবার নিম্নসংখ্যার কারখানা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কল তৈয়ারি ওয়া পাওয়া

আবার পাওবে।

বিড়ি তৈয়ারি মাত্র কয়েকটি বড় কারখানা আছে, ছোট আছে অনেকগুলি। বালি সবই হাতে তৈয়ারী করা হয় এবং এই কারখানার মধ্যে কয়েকটির একটি বড় অংশ আছে। অন্ততঃ দুই লক্ষ লোক মাত্র ব্যবহার এবং তিন লক্ষ সাময়িকভাবে বিড়ি সাহায্যে উপভোগ্যিক নিষ্কৃত করে এবং মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশগুলিতে লক্ষাধিক, পশ্চিম বাংলায় ৭২,০০০, বিহারে ৪৮,০০০ ও ভারতের অপরাপর অঞ্চলে ১২,০০,০০০ : সমস্ত মিলিয়া চার লক্ষ কারিগর আছে। সঠিক সংবাদ জানা নাই, বৎসরে আন্দাজ ১২,৭০০ কোটি বিড়ি প্রস্তুত হয়, এবং ইহার মূল্য ৬০ কোটি টাকা।

বোম্বাই ও বাম্বাণসীতে একটি করিয়া বিড়ির কল তৈয়ারি হইয়াছে। ইহা বর্তমান অবস্থায় প্রতি ঘণ্টায় ১৫ হইতে ২০ হাজার বিড়ি প্রস্তুত করিতে পারিবে। যন্ত্রের উদ্ভিতির আরও সম্ভাবনা আছে; তাহা হইলে উৎপাদন পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারিবে।

এরূপ যন্ত্রের প্রসার হইতে দেওয়া উচিত কিনা, তাহাই বিবেচনা বিষয়। যদি যন্ত্র চালু হয়, বিশেষতঃ মানুষের কার্যিক শ্রমে চলে, তাহা হইলে ৭৫,০০০ হইতে ১,০০,০০০ লোক কাজ পাইতে পারে। যদি সকলে অন্ততঃ নতুন পণ্য না পাওয়ার পর্যন্ত অত্যন্ত কষ্টে পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ শ্রেণীর যন্ত্র নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় কিনা

তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। লোকের ক্রেশ কমে, কার্য্য ক্ষত উদ্ধার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়, ইহাই যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবার পক্ষে বড় যুক্তি। বিড়ি তৈয়ারিতে প্রত্যক্ষভাবে কারিগরের ক্রেশ খুব বেশী না হইলেও দিনের পর দিন একই অবস্থায় শ্রমের একটা ক্লান্তি আছে, বিবর্তিত আছে। বিড়ির কল হাতে পায়ে অর্থাৎ কায়িক শ্রমে চালাইতেও ক্রেশ আছে, কিন্তু উপাধীন বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। কলে তৈয়ারি বিড়িতে যট্ট, দাম কমিবে, তাহাতে ক্রেতার মাট লাভ যদি উপেক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে যন্ত্রের খুব বেশী সমর্থন পাওয়া যায় না। হাতে তৈয়ারি বিড়ি যদি সকল সময়েই বাজারে পাওয়া যায়, বাজারে কখনও অভাব না থাকে, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় বিশেষ লাভ নাই।

কাপাস বা তেল কলের সহিত বিড়ির কলের তুলনা করা যায় না। বিড়ি বা এন শেলীর শিল্প স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত হইবার দাবি করিতে পারে। তবে ডেটিশাট যন্ত্র চাই, জীবনে তাহাতে একটু স্বস্তি ও সময় লাভের সুযোগ ঘটিত পারে, তাহা ছাড়া যেখানে চাহিদা আছে, সেখানে যন্ত্র-সাহায্য উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উপভোক্তাদের সংস্থান হইবে। তবে এ কথাও ঠিক, যন্ত্র বড় হইলে অভাব ও অশান্তি সৃষ্টির বাধা পোষণ করে।

বস্ত্রাণ আ' সেলাইকলের বিপক্ষে কোনও মত আছে বলিয়া শোনা যায় না। বাহালাই অঙ্গ সঞ্চার করিতে পারে, তাহার একটা কল সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ইহা বিলাসের বস্তু; কিন্তু যে কল বিভিন্নক্ষেত্রে সেলাইকল ব্যবহৃত হয়, তাহাতে মনে হয় যে, ইহা সাধারণের নিকট বিজ্ঞানের একটা বিশেষ দান।

এখন যদি নারিকেল-ড্রোবড়া হইতে দড়ি তৈয়ারির উপযোগী তন্তু উদ্ধার করিবার যন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা যাদরে গ্রহণ করা উচিত। কারণ ইহাতে মাস্তুরের অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম হয় এবং যন্ত্রের সাহায্য পাইলে আগ বেশী হইবার সম্ভাবনা। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রথম কয়েক-শত শ্রমিকের উপাধীনতায় পথ ক্লান্ত হইবে।

প্রতিটি যন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিবার নানা দিক আছে। যে সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে শিল্প বন্ধ পায় না, এবং প্রতিবর্ষিতায় দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অথবা কায়িক শ্রম, যন্ত্রের অপটুতার ফলে ব্যবহৃত কাঁচ মাল হইতে সমস্ত “শাস্তি” উদ্ধার করা যায় না, অর্থাৎ, অনেকটা মূল্যবান বস্তু পরিত্যক্ত মালের সহিত থাকিয়া যায়, তদ্রূপ ক্ষেত্রে যারে শীঘ্র উন্নততর যন্ত্রের প্রচার বৃদ্ধি না পাইলে কেবল যে উৎপাদন-ব্যয় বেশী পড়ে তাহা নহে, প্রতিনিয়ত বহুসংখ্যক

জাতীয় সম্পদের অপচয় হইয়া থাকে। বীজ হইতে তৈল নিকাশন ব্যাপারে প্রগ্রেস বড় করিয়া মনে পড়ে। ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় স্নেহপদার্থের অভাব আছে এবং সেই কারণেই তৈলবীজ রপ্তানি বন্ধ ছিল; এখন সামান্য পরিমাণ রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। যদি ঘানিতে তৈল নিষ্কাশিত হয়, তাহা হইলে খইলে শতকরা তিন হইতে পাঁচ ভাগ তৈল থাকিয়া যায়। অর্থাৎ, ভারতে উৎপাদনের মোট পরিমাণ অনেকখানি নষ্ট হয়। অবশ্য ইহা খইলে থাকিলে গবাদি পশুর অধিকতর পুষ্টিসাপনের কথা এমনকি মান হিসাবেও অধিকতর মূল্যবান। কিন্তু যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশী এবং পশুখাদ্য ও ভূমির সাবের অভাব অথবা পরিবর্তন জবাবদির দ্বারা মিটাইতে পারে বাইতে পারে, সেখানে একটা বিশেষ পরিমাণ তৈল খইলে রাখিয়া দেওয়া হয়ত যুক্তি-যুক্ত নয়। তবে ইহার পিছনে ঘানিজালক কলুর উপজাবিকার কথা আছে, এবং তাহাই কলের ঘানির বিকল্প প্রথম সর্গ বলিয়া আলোচন শুরু করা হইয়াছে। এখানে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিরন্তর কথ্য উঠিয়াছে তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কোন পস্থা গ্রহণ করা সমাধান তাহা বিচার করা বাইতে পারে।

কোনও না-কোনও প্রকার যন্ত্র নিশ্চয়ই প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। যে যুগ হাতের তুলি এবং পুরো চরক আবিষ্কৃত হয়, এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে তাহা সে যুগের অত্যন্ত কামুকশল যন্ত্র; কেবল সে যুগের নয়, তাহা আজও বিশ্বয় সৃষ্টি করে, এবং আবিষ্কারের কৃতিত্ব স্বপ্নে করিলে স্বপ্নই মস্তক নত হইয়া আসে। কায়িক শ্রম, সামান্য যন্ত্র ও আধুনিক যন্ত্র-পাতি, পদস্পর্শের মীমাংসার কোণায় নির্দিষ্ট হইবে, তাহার মীমাংসা সহজ নহে, এবং সেই কারণেই ভারতবর্ষ হাতড়াইয়া পথ পাইতেছে না। হয়ত এখানকার শিক্ষাস্তর উপর জগতের কল্যাণ-অকল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করিবে।

যাহা লইয়া বিচার, তাহার মূল উদ্দেশ্য জনকল্যাণ স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, বিশ্রাম, আনন্দ লইয়া প্রত্যেকটি মানুষ যাহাতে অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পায়, তাহাই এই যন্ত্রচর্চিত বিচারের মীমাংসার পথ বলিয়া দিতে পারে। যে সকল কার্য্যে মানুষের কায়িক শ্রমই পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় অথবা যন্ত্র যেখানে অচল, সেখানে মানুষই খাটিয়া জীবনযাত্রা নিষ্কাহ করিবে, কাকুশিল্পকলা সৃষ্টির আনন্দে তৃপ্তিলাভ করিবে, জগতে মানুষের অদ্বিতীয় স্বজনী-শক্তির পরিচয় রাখিবে। আর যেখানে মানুষের শক্তিদ্বারা কার্যোদ্ধার সম্ভব নহে, সেখানে দানবই হউক আর দেবতাই হউক, যন্ত্র ব্যবহার চলিতে থাকিবে।

যাহা মানুষের শ্রমে চলে, অথচ কেবল সেই কারণেই উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে না, সেখানে যন্ত্রের প্রসার হইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। সেই হিঁসাবে বলিতে হয়, কেবল কার্যিক শ্রমের সমর্থনে যদি উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সর্বকালে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে কার্যিক শ্রমের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়া ক্রেতা-সাধারণের ক্ষতিসাধন করা হয় এবং তাহা সমাজের আর্থিক কল্যাণের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যেখানে দ্রবের পার্থক্য সামান্য সেখানে যন্ত্র বোম্বা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিলে অন্তত অপেক্ষা শুভই হইবে সন্দেহ নাই।

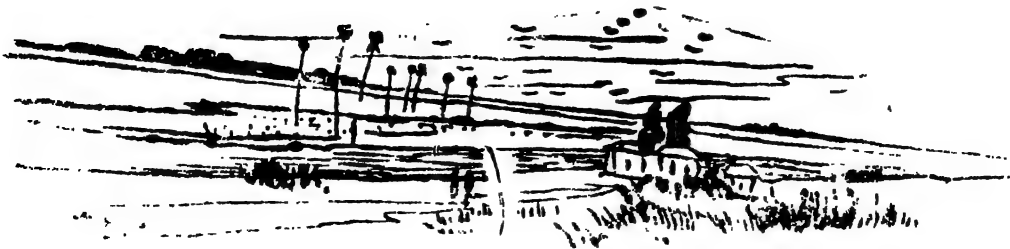
এ ব্যবস্থার নজির কেবল আমাদের দেশে নহে, স্বত্বেকার সভ্যজাতির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে নারিকেল পেটাই ছোবড়া, নারিকেল দড়ি ও দড়িজাত পাপোম, ম্যাটিং প্রভৃতি নানা দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। ইউরোপের নানা দেশই এই সকল বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রেতা; অথবা, প্রয়োজন ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিবিধ পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। হল্যাণ্ড দড়ি বা ম্যাটিং পয়ন। শুক চড়: বাধিয়া আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কিন্তু তাহার প্রচুর পেটাই ছোবড়া ব. তুল্য ক্রয় করে। তাহাও বলে, বন্ধা অথবা যুদ্ধ আতত সৈনিক দ্বারা দেশের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈয়াবি করািয়া লওয়া যায়। একেবারে প্রস্তুত মাল ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করিলে দর কিছু সস্তা পড়ে, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করা হয়।

অনুরূপ মান নির্ণয় করিয়া বাস্তব ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কর বাঞ্ছনীয়। যন্ত্র কার্যিক শ্রমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলিয়াই উহার ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে অথবা চিরকাল উহার উপর কর পাৰ্য্য করিয়া কুটীরশিল্প বা মানুষের শ্রমের সহায়তা করিতে হইবে, এরূপ বিচার অত্যন্ত ভ্রাম্যস্বক এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহা দেশের অর্থনৈতিক সংস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত দেওয়ার সম্ভাবনা। সর্বদাই যদি বোম্বা দ্রবে

নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণ দরিদ্র দেশে কুফল দেখা দেয়। বড় যন্ত্রের যখন প্রশ্ন নাই, তখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রের উপর সেসু প্রভৃতি বসাইবার সময় সকল দিক বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। রূহতের কল্যাণ বা স্বার্থ উপেক্ষা করিলে মোটের উপর দেশের ক্ষতি হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

যেখানে সো কসংখ্যা কম, শ্রমিকের প্রতি ব্যয় অত্যধিক এবং প্রয়োজনের সময় তাহা ছুপ্রাপ্য সে সকল দেশে যন্ত্রের যত প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়, জনবহুল ও কর্মহীন শ্রমিকের দেশে তাহা প্রযোজ্য নহে।

এ সকলের সহিত যাহাতে কুটীরশিল্পে পণ্য উৎপাদনে অধুন প্রচলিত বীতি পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করা যায়, তাহা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এখন যে চরকা চলে, তাহার অন্ততঃ দ্বিগুণ বা তিনগুণ স্রুত উৎপাদনকারী চরকা আবিষ্কৃত না হইলে কলের স্রুতার উপর দেশী তাঁতকে নির্ভর করিয়া চলিতেই হইবে। হাতে চালিত মাকু অপেক্ষা কৃষ্টিক তাঁত অনেক বেশী কার্যকরী। কিন্তু ইহা অপেক্ষা স্বয়ংক্রিয় তাঁতের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অবস্থায় যে কয়জন তাঁতি বেকার হইবে, তাহাদের অপর কক্ষক্ষেত্রে দৈখিয়া লইতে হইবে, অথবা নূতনতর তাঁত চালনার জীবিকাক্ষণ করিতে পারিবে। দেশে তৈল ও ত্রহপদার্থের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে তৈলকলের উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা সমীচীন হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে বর্তমান ঘানির উন্নতিসাধন করিতে না পারিলে তাহাকে অস্বাভাবিকভাবে বাচাইবার চেষ্টা কিছুদিন সফল হইতে পারে, চিরকালের জন্ত নহে। যন্ত্রমাজেই দেশের শক্তি মনে না করিয়া যেমন করিয়া রক্ষণশীল প্রয়োগ করিবার সময় ট্যারিফ কমিশন কাজ করে, সেইভাবে প্রত্যেকটি শিল্প সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সমাপনান্তে নূতন করিয়া সেসু প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করা বিধেয়।





## শেষ পাতা

ও' হেনরী

অনুবাদক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ দায়

ওয়ারশিংটন স্কোয়ারের পশ্চিমে এক জায়গায় এসে রাস্তাগুলো এলোমেলো ভাবে কতগুলো পাড়ায় ঢুকে গেছে। পল্লী-  
গুলোতেও অনেক বিচিত্র বাঁক, অনেক মোড়—একটি রাস্তাই  
হয়ত বারকয়েক করে পাক খেয়ে গেছে। এই রাস্তাতেই  
একজন চিত্রকর এক দিন অনেক লাভের সম্ভাবনা আবিষ্কার  
করেছিল। সে পের্ট, কাগজ আর ক্যাষিসের দাম আদায়  
করতে গিয়ে পয়সা না পেয়ে এই রাস্তা দিয়েই ফিরে  
আসছিল।

তার পরেই প্রাচীন গ্রীনউইচ গ্রামস্থানিতে দলে দলে  
চিত্রকর এসে ভিড় করল—কেউ উস্তম্ভে খোঁজা জানলা, কেউ  
বা অষ্টাদশ শতাব্দীর এড্‌ভান্স চূড়াবিশিষ্ট বাড়ী কিংবা ওলন্দাজ  
চালের দালান আর সম্ভা ভাড়ার লোভে। এর পর, তারা  
ষষ্ঠ এভিনিউ থেকে ছ'একটা করে চুল্লী আর কলাইয়ের বাসন  
আমদানী করে স্থানটিকে একটি উপনিবেশে পরিণত করল।

নীচু তেতলা একটি ইটের বাড়ীর উপরতলায় সু আর  
জন্মীর চিত্রাগার ছিল। জন্মী আবার জোয়ান্না নামেই  
বেশী পরিচিত। একজন এসেছিল 'মেইন' থেকে, অল্প জনের  
বাড়ী ক্যাফে-ফেরিয়ার। অষ্টম রাজপথের 'ডেলমোসিকো'  
হোটেলের ঠ'জনে দেখা হয়, আহা রে, বসনে এবং চিত্রকলার  
রুচিতে দুজনেই পরস্পরের মধ্যে এতটা সাদৃশ্য দেখল যে তার  
ফলেই ওদের এই বৌধ চিত্রকেন্দ্রের স্থপ্তি হয়েছে।

এ গেল মে মাসের ঘটনা। নভেম্বর মাসে একটি অদৃশ্য  
শীতল আগন্তুক, ডাক্তারেরা যাকে নিউমোনিয়া বলে, এই  
উপনিবেশের অনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং  
এখানে সেখানে ছ'এক জনকে তার আঙুলের হিমম্পর্শ  
বুলিয়ে দিয়ে গেল। পূর্বদিকে ত এই সর্বনাশা শত্রু বিপুল  
বিক্রমে এক সঙ্গে দশ-বিশ জনকে ধায়ের করতে লাগল, কিন্তু  
পল্লীর দামতরা সৰু অলিগলিতে তার গতি মন্থর হয়ে গেল।

নিউমোনিয়া মশায় বুড়ো হলেও তাকে বীরপুরুষ বলা  
যায় না। ক্যালিফোর্নিয়ার পশ্চিম; হাওয়ার্ড যার রক্ত পাতলা  
হয়ে গেছে এমন একটি সামান্য নারীর প্রতি এই রক্তমুষ্টি  
হেঁপো বুড়োর আঘাত মোটেই বদোচিত নয়। কিন্তু তার  
সে জন্মীকে আক্রমণ করল। বেচারি কি আর করে!  
র-করা লোহার খাটে স্থির হয়ে শুয়ে থাকে আর ওলন্দাজ  
চালের ছোট জানলার ভেতর দিয়ে চেয়ে থাকে সামনের  
বাড়ীর ছাড়া দেয়ালের দিকে।

এক দিন সকালে ব্যস্ত ডাক্তারটি লোমবহুল পাকা ক্র  
কুঁচকে সু-কে হলের দরজার কাছে ডাকলেন। তারপর  
থ্যাট্রোমিটারের পারা নামাতে নামাতে বললেন, দলের মধ্যে  
যর ওর একভাগ আশা আছে আর তাও নির্ভর করে ওর  
বাঁচবার ইচ্ছার উপর। লোকে যদি এভাবে আগে থেকেই  
গোরের দিকে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়, ভেদধ্বজাত্তের তা হলে  
আর কোন উপায়ই থাকে না। তোমার বন্ধুটি মনে মনে  
স্থির করে ফেলেছে সে আর ভাল হচ্ছে না। ওর মনের  
ভেতর আর কিছু নেই ত?

ও, ও একবার নেপলসের বাঁকা সমুদ্রতীর আঁকবার  
ইচ্ছা জানিয়েছিল—সু বললে।

ছবি? বাজে কথা। সত্যি চিন্তা করার মত আর  
কিছু আছে, যর কোন পুরুষ?

পুরুষ!—কণ্ঠে তারের বন্ধার তুলে সু বললে, কোন  
পুরুষ কি সত্যি চিন্তার যোগ্য,—না ডাক্তারবাবু, তেমন  
কিছু নেই ওর মনে।

'ভাল কথা, তা হলে দুর্বলতাই হবে' ডাক্তার বললেন,  
'আমার চেষ্টায় বিজ্ঞানের দ্বারা যতটা সম্ভব সবই করব। তবে  
যখনই আমার রোগী তার শব্দযাত্রায় গাড়ীর শব্দ শুনত  
সুরু করে দেয়, তখনই আমি ওষুধের আরোগ্যকারিতার  
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাদ দিয়ে রাখি। তুমি যদি ওকে  
ওভারকোটের শীতকালীন ষ্টাইলের একটি প্রশ্রু জিজ্ঞেস  
করতে পার, আমি তোমাকে দশের জায়গায় পাঁচের মধ্যে  
এক ভাগ আশার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।'

ডাক্তার চলে গেলে, সু ভেতর ঘরে গিয়ে কৈদে কৈদে  
একটি জাপানী রুমাল ভিজিয়ে কাঁদা করে ফেলল। তার  
পর হাত ছবির সরঞ্জাম নিয়ে এলোমেলো সুরে শিস্ দিতে  
দিতে সে জন্মীর ঘরে এসে ঢুকল।

জন্মী শুয়ে আছে—চাদরের তলায় তার দেহ স্পন্দনহীন,  
মুখ জানলার দিকে। সে ঘুমিয়ে আছে ভেবে শিস্ ধামিয়ে  
দেবল কালি-কলমের সাহায্যে সু একটি পত্রিকার গল্পের  
জন্ত ছবি আঁকতে লাগল। সাহিত্যের প্রবেশপথ সুগম  
করতে তরুণ লেখকেরা যেমন পত্রিকার মারফত হাতে-খড়ি  
করে; অঙ্কনের ব্যাপারে নবীন চিত্রকরদেরও তেমনি  
পত্রিকার গল্পের জন্ত ছবি আঁকতেই হবে।

সু ইডাহো-দেশীয় একটি খুবককে বোডুসওয়ার্ডের স্মৃতির

পোশাকে সাজিয়ে তার এক চোখে একটি চশমা এঁকেছে, এমন সময় সে একটা চাপা শব্দ শুনল—শব্দটি উপযুপরি ক'বার শোনা গেল। সে তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে সরে এল।

জননী বিস্ফারিত চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে গুনছে—গুনছে উণ্টো দিক থেকে।

বারো—সে বললে, একটু পরেই এগারো; তার পরে দশ এবং নয়; আট এবং সাত, সে প্রায় একসঙ্গে গুনল।

উৎসুক হয়ে সু জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল, গোনবার মত কিছুই দেখা গেল না। দেখা যায় কেবল একটি শুল্ল, নিরানন্দ আঙিনা আর প্রায় বিশ ফুট দূরে একটি ইটের বাড়ীর বন্ধ দিকটা। খুব পুরনো একটি আইভি-লতা সেই ইটের দেয়াল বেয়ে প্রায় মাথাপথ পর্য্যন্ত উঠে গেছে—লতার গোড়ার দিকটা জীর্ণ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

হেমসেতর শীতল নিঃশ্বাসে লতার পাতা বরে গেছে, কেবল কঙ্কাসদৃশ ডালপালাগুলো; ভাঙা ইটগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছে প্রাণপণে।

কি গুনছ ভাই? সু জিজ্ঞেস করল।

ছয়—জননী প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললে, এবার শুন্তলো খুব তাড়াতাড়ি পড়ছে। তিন দিন আগেও প্রায় একশ' ছিল, গুনতে গুনতে আমার মাথা ধরে উঠত। এখন কিন্তু অনেক সহজ হয়ে এসেছে। ঐ—আর একটা গেল; আর মাত্র পাঁচটা রইল।

পাঁচটা কি ভাই—বল তোমার সুডিকে?

পাতা—ঐ আইভি লতার ওপর। শেষ পাতাটি বরে গেলে আমিও যাব। আমি তিন দিন থেকেই তা বুতে পারছি। ডাক্তারবাবু তোমায় বলেন নি?

‘এমন কথাও শুনি নি কখনো’—ব্যক্তরে সু অভ্যুযোগ করলে—‘তোমার ভাল হবার সঙ্গে শুকনো আইভি-পাতার কি যোগ আছে? তা ছাড়া আইভি-লতাকে তুমিও তো ভালবাসতে, দুই ময়ে! কেন, ডাক্তার তো আজ সকালেই বললেন—তার কথাতেই বলি—তোমার ভাল হবার আশা দশের মধ্যে এক ভাগ। তা এমন কিছু মন্দ নয়। নিউ-ইয়র্কে যখন কোন গাড়ীতে চাপি কিংবা নতুন বাড়ীর পাশ দিয়ে হাঁটি, আমাদের জীবনের আশাও বোধ হয় ওর চেয়ে বেশী থাকে না। নাও এখন একটু মাংসের ‘ব্রথ’ খেয়ে, তোমার সুডিকে ছবি আঁকতে ছাড়ো। ছবি হলে তবে তো সেটা সম্পাদককে বেচে সে তার পীড়িত সন্তানের জন্য ‘পোর্ট’ (বলকারক সুরা) আর নিজের লোভ মেটাতে শূকরমাংসের ‘চপ’ কিনবে?’

‘তোমার আর মদ কিনতে হবে না’—জানলার ওপর চোখ

রেখেই জননী বললে—‘আর একটা গেল। না, আমি ‘ব্রথ’ খাবো না,...ঠিক আর চারটে রইল। সন্ধ্যার আগেই আমি শেষ পাতাটার পড়া দেখতে চাই, তার পর আমিও চলে যাব।’

জননী ভাই—সু তার ওপর ঝুঁকে বললে, আমার যতক্ষণ আঁকা শেষ না হয়, তুমি চোখ বুজে রাখ; জানলার দিকেও তাকিও না, কেমন? আমার আলোর দরকার, নইলে পর্দা নামিয়ে দিতাম।

পাশের ঘরে গিয়ে আঁকতে পার না?—রুদ্ধভাবে জননী বললে।

‘আমি তোমার পাশেই থাকতে চাই’, সু বললে—‘তা ছাড়া আমি তোমাকে ঐ বাজে আইভি-পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেব না।’

তোমার হলেই আমার বলবে কিন্তু। বলে জননী চোখ বুজে শাদা, নিশ্চল পাষণ্ডমূর্তির মত শুয়ে রইল। কারণ আমি শেষ পাতাটার পড়া দেখতে চাই। অপেক্ষা করতে আর ভাল লাগে না, ভাবতেও না। সবকিছুর ওপর থেকে আমার বন্ধন শিথিল করে দিয়ে আমিও ধীরে ধীরে ভেসে যাব ঐ শুকনো ক্রান্ত পাতাগুলোর মত, দূরে—অনেক দূরে।

‘একটু ঘুমোও বরং’—সু বললে, ‘বুড়ো সাধু মাইনারের (যারা কয়লার খনিতে কাজ করে) ছবির মডেলের জন্য বাহারম্যানকে ডাকতে যাচ্ছি। এক মিনিটও লাগবে না; না ফেরা পর্য্যন্ত নড়বে না কিন্তু। বুড়ো বাহারম্যানও চিত্রকর; থাকত ওদেরই নীচের তলায়। বয়স ষাটের উর্দ্ধে, এবং মাইকেল এঞ্জেলোর ‘মোজেস’-এর ছবির মত একখুক কোঁকড়ানো দাড়ি। গ্রীক উপাখ্যান-বর্ণিত বনদৈত্য ‘স্যাটির’র মত মাথাটা যেন একটি ক্ষুদ্র শয়তানের দোহে বসানো—এমনি তার চেহারা। চিত্রকর হিসাবে বাহারম্যান ব্যর্থ হয়েছে। চল্লিশ বছর ধরে তুলির কসরত করে আজও সে তার মানসসুন্দরীর বস্ত্রগুলোর প্রান্তটুকুও স্পর্শ করতে পারল না। সে বরাবরই একটি ‘মাষ্টারপিস’ আঁকবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু আজও তা আরম্ভ করতে পারে নি। ক’বছর ধরে একটু-আগটু বিজ্ঞাপন চিত্র বা ব্যবসায়ী ছবি ছাড়া সে আদৌ কিছু আঁকে নি। কাছেই উপনিবেশের যেসব তরুণ চিত্রকর পেশাদার ‘মডেল’ ভাড়া করতে পারে না, বাহারম্যান তাদেরই প্রতিরূপের কাজ করে যৎসামান্য উপার্জন করে। সে কিছু বেশীমাত্রায় সুরাপান করে এবং এখনও তার ভবিষ্যৎ ‘মাষ্টারপিসের’ কথা বলে।

বাদবাকি মানুষটির স্বভাব বড় উগ্র এবং কোন লোকের তেতর দুর্বলতা দেখলেই তীব্র রেষ করে। সে একরকম

বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মেঘবন্ধক ম্যাট্রিক্ কুতুবের মত উপর-তলার তরুণী চিত্রকর ছুটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে।

সু বাহারম্যানের স্বপ্নাকার কুঠরির মধ্যে ঢুকেই তার গায়ে স্রবার গন্ধ পেল। ঘরের এক কোণে পঁচিশ বছর হ'ল ইঞ্জেলের ওপর এক খণ্ড সাদা ক্যাশিস আঁটা আছে—এক দিন তাতে তার মাষ্টারপিসের প্রথম তুলির রেখা পড়বে এই আশায়।

সু তাকে জনসীর খেয়ালের কথা জানিয়ে বললে—সত্যি, ও বেরকম পাতার মত হাল্কা ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে, পৃথিবীর ওপর থেকে এই ক্রীণ বন্ধনটুকু কেটে গেলে ভয় হয়, সেও হয়ত ভেসে যাবে।

বুদ্ধ বাহারম্যানের লাল চোখ দুটো এতক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিল, এমন আকণ্ঠবি খেয়ালের কথা শুনে সে এবার স্নেহের সুরে চোঁচিয়ে উঠল—ছ্যাঃ, হুনিয়ায় এমন বেকুবও আছে যে একটা মরা গাছের পাতা বঁরে যাচ্ছে বলে ভাবে সেও মরে যাবে? এমন কথা শুনি নি বাপু! নাঃ, যাও আমি সাধুর বেশে তোমার গাধার মডেল সাজতে পারব না। ওর মাথায় এসব মুখের খেয়াল ঢুকতে দাও কেন? কে ছেলেমানুষ গেয়েটা!

তার বড্ড অসুস্থ, দুর্বলও হয়েছে খুব—সু বললে, জরের তাড়মে মাথায় দোষ হয়েছে, তাই রাজ্যের খেয়াল এসে জোটে মাথায়। বেশ, আমার মডেল না হতে চান হবেন না, কিন্তু আমি বলব আপনার শরীরে দয়ামায়া বলে কিছু নেই।

‘তুমিও দেখছি নিতান্তই মেরেমানুষ’—বাহারম্যান চোঁচিয়ে উঠল—‘কে বললে তোমার ছবিত্তে পোজ দেব না? চল যাচ্ছি। আধ ঘণ্টা ধরেই তো বোবাতে চেষ্টা করছি পোজ দিতে রাজী আছি আমি।...তা তো বটেই, জনসীর মত এমন ভাল মেয়ের অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার এ জায়গা নয়। আমার মাষ্টারপিসটা একবার হলেই হয়, তার পর—সবাই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব, সত্যি বলছি।

হু'জনে উপরে এসে দেখল জনসী ঘুমুচ্ছে। সু জানলার পর্দা নামিয়ে বাহারম্যানকে পাশের ঘরে যেতে ইশারা করল। সেখানে গিয়ে হু'জনেই ভয়ে ভয়ে জানলা দিয়ে আইভি-লতাটির দিকে তাকাল, মুহূর্তের জন্ত চোখাচোখি হ'ল, কিন্তু কেউ কারু সঙ্গে কথা বললে না। অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাত হচ্ছে—বাহারম্যান নীল কামিজ পরে একটি উটানো কেতলীকে নকল পাহাড় বানিয়ে তার উপর সাধু ‘মাইনার’ সেজে বসল।

পরদিন সকালে বণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে সু দেখলে জনসী নিশ্চিন্ত বড় ছুটি চোখ মেলে জানলার সবুজ পর্দার দিকে চেয়ে আছে।

ওটা ভুলে দাও, আমি দেখব—সে ক্রীণ কঠে আবেশ করল।

সু ক্লান্তভাবে আঁজা পালন করল। কিন্তু কি আশ্চর্য! সারা রাত্রিব্যাপী অবিশ্রান্ত বর্ষণ এবং দ্রবস্ত বায়ুর আঘাত সয়েও একটি আইভি-পাতা তখনো দেয়ালের গায়ে জেপে আছে, সেটাই লতার শেষ পাতা। বোটার কাছটা ঘন-সবুজ, খাঁজকাটা ধারগুলোতে ক্ষয় ও বিনাশের পীত আভা—পাতাটি তবু মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট উপরে একটি শাখা আশ্রয় করে নির্ভয়ে ঝুলছে।

‘ওটাই শুষ’—জনসী বললে—‘আমি ভেবেছিলাম রাত্রে ওটা নিশ্চয় পড়ে গেছে; সে কি বড়, শুনেছি তো! কিন্তু আজ ওটা পড়বেই এবং সেই সঙ্গে আমারও মৃত্যু ঘটবে।’

‘ছিঃ অমন কথা বলো না ভাই’—সু তার চিন্তাক্রিষ্ট মুখ-খানা প্রায় বালিশের কাছে নামিয়ে বললে, ‘নিজের কথা না ভাব, আমার কথা চিন্তা কর ত, আমার কি হবে?’

জনসী কোন উত্তর দিলে না।

যে আত্মা সুদূর রহস্তপথে যাত্রার আয়োজন করছে তার চেয়ে নিঃসঙ্গ বোধ হয় জগতে আর কেউ নেই। একটি একটি করে সখা ও পৃথিবীর বন্ধন যেমন যেমন শিথিল হয়ে পড়ছে, জনসীর মনের খেয়ালও তেমনি বহুঝুল হচ্ছে।

দিন শেষ হয়ে গেল, প্রদোষের ক্রীণ আলোতেও ওরা সেই একটি আইভি-পাতাকে দেয়ালের গায়ে ডালের সঙ্গে ঝুলতে দেখলে।

রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বায়ু আবার প্রবল হ'ল, জানলার উপর পটপট শব্দে আঘাত করে বৃষ্টির জল নেমে যেতে লাগল ছাতের ওলন্দাজ কায়দার নীচু আলসে বেয়ে।

দিনের আলো ফুটলে নির্দম জনসী জানলার পর্দা সরাবার জন্ত আবার হুকুম করলে।

আইভি-পাতাটি তখনো একই জায়গায় আছে।

জনসী অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে শুয়ে রইল; তারপর সূকে ডাকল—সু তখন গ্যাসের উত্তনে চাপানো মুরগীর ‘ব্রথ’ নাড়াচ্ছে।

‘আমি সত্যি এতদূর করেছি সুড়ি’, জনসী বললে—‘আমার অপরাধ দেখানোর জন্তই যেন কোন অদৃশ্য শক্তি পাতাটাকে একই জায়গায় ধরে রেখেছে। মৃত্যু-কামনা সত্যি পাপ। তুমি এবার আমাকে একটু সুক্কয়া দাও আর পোট্ট মিশিরে ছণ্ড আন একটু, আর—না; আমার বরং আপে একটা হাত-আয়না দাও, তারপর আমার চারদিকে উঁচু করে বালিশ রাখ—আমি বসে বসে তোমার রান্না করা দেখব।

বণ্টাখানেক পরে সে বললে, সুড়ি এবার আমার আঁখা

হচ্ছে, এক দিন আমি নেপলস্-এর সমুদ্রতীরের ছবি আঁকতে পারব।

বিকেলের দিকে ডাক্তার এলেন। তিনি চলে যাবার পরেই এক ছুতোয় সু-ও হলঘরের দরজায় এল।

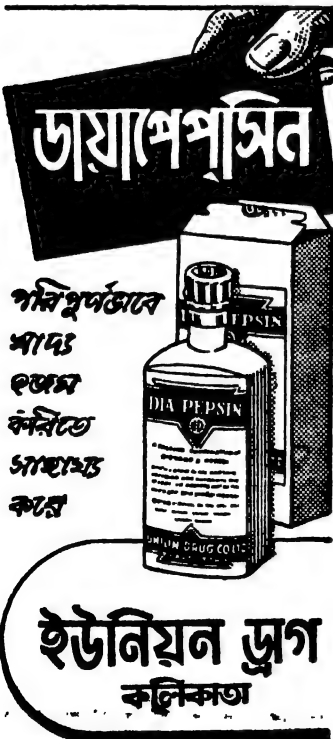
আর ভয় নেই, ডাক্তার সু-এর শীর্ণ করমর্দনরত হাত ধরে বললেন, ভাল সেবা করলে তোমারই জিত হবে। আচ্ছা, আসি এবার—নীচের তলায় আর একটি রোগী দেখতে হবে। লোকটার নাম বাহারম্যান, মনে হয় ও চিত্রকর। তারও নিউমোনিয়া। লোকটা একেই বুড়ো, তার দুর্বল—রোগে ধরেছেও শক্ত করে। কোন আশা নেই, তবে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে তবু একটু আরাম পাবে।

পরদিন ডাক্তার সুকে বললেন, 'এবার ওর ভয় পার হয়ে গেছে, তোমারই জয় হ'ল। এখন কেবল যত্ন আর পুষ্টি, ব্যস্‌।'

সেদিন বিকেলে সু ভন্দার বিছানার পাশে এল, সে তখন হঠমনে অতি নীল এবং একান্ত অকেজো একটি কাঁধে-

রাখা উলের জাক্ বুনছিল। এবার এক হাতে সে বালিশ-সুস্থ ভন্দারীকে জড়িয়ে ধরল।

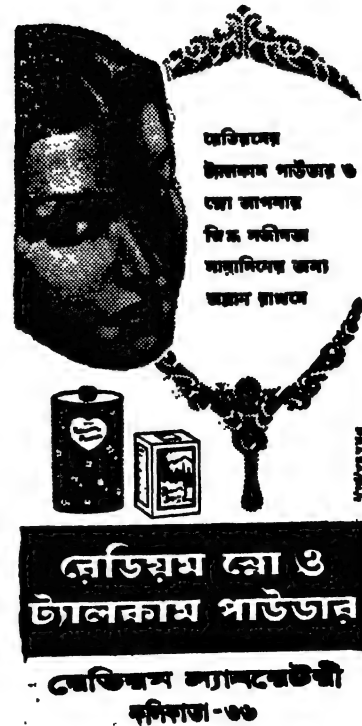
'দাদা ইঁদুর, তোমায় একটা খবর দেব আমি', সে বললে, 'মিষ্টার বাহারম্যান আজ হাসপাতালে নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন, মাত্র দু'দিনের অসুস্থে। প্রথম দিন যখন তিনি নীচের ঘরে শুয়ে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিলেন, দরওয়ান দেখেছিল তাঁকে—জামাজুতো ভিজে একেবারে বরফের মত হিম হয়ে গিয়েছিল। ঐ দুর্ভোগের রাতে তিনি যে কোথায় গিয়েছিলেন ভেবেই পেল না কেউ। পরে দেখা গেল একখানা মই টেনে সরিয়ে আনা হয়েছে, একটি লণ্ঠন তখনও জ্বলছে, আশেপাশে কতকগুলো বুরুশ পড়ে আছে আর বং-গোলা একটি তক্তায় সবুজ আর হলুদে বং মাখানো। জানলা দিয়ে এবার ঐ আইভি-পাতাটা দেখ তো? পাতাটা হাওয়ায় একটুও কেন নড়ে না, সে কথা কি একবারও তোমার মনে খেয়াল হয় নি? বন্ধু, ওটাই বাহারম্যানের মাষ্টারপিস্—যেদিন শেষ পাতাটি ধরে গেল, সেই রাতেই ওটা একেঁছিলেন তিনি।



**ডায়াপেপসিন**

পরিপূর্ণভাবে  
শাদ্য  
হজম  
করিতে  
সাহায্য  
করে

**ইউনিয়ন ড্রাগ  
কলিকতা**



রেডিয়াম  
ট্যালকাম পাউডার ও  
ফ্রো ফ্যানস  
বিহীন সজীবতা  
ম্যাক্সিমাম জল  
জরুরে চাহিদা

**রেডিয়াম ফ্রো ও  
ট্যালকাম পাউডার**

রেডিয়াম ল্যাবরেটরী  
কলিকতা-৩৩

“সত্যিই  
সহজ...

লাক্স টয়লেট  
সাবান হোখে  
আরও সুন্দর হওয়া”  
আখতার  
জাহান  
বলেন



আখতার জাহান বলেন যে “কোনও কিছুই বললে আমি লাক্স  
টয়লেট সাবান হোখে আমার স্বকের নিয়মিত বস্ত্র নেওয়া  
ছাড়তে রাজি নই। আমি যে দেখতে পাই লাক্স টয়লেট  
সাবানের স্বক্-শোধন কাজ আমার চামড়ায় আনে এক অপূর্ব  
পরিবর্তন...আনে নবীনতর উজ্জ্বলতা, আনন্দদায়ী নতুন মন্থতা।”

**লাক্স  
টয়লেট সাবান**

চিত্র-তারকা দের

লৌ অধ্য সা বা ন



# আলোচনা



তিব্বত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র—

ভোটবাগান

শ্রীমুখাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসীতে (অগ্রহায়ণ, ১৩৬০) প্রকাশিত শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর  
লিপিত উক্ত শীর্ষক মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। কয়েক বংসর

## সামান্য ও অসাধারণ পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে পৌরষ ও জনগণের  
যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান  
উজ্জ্বলতার সন্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং  
যে সমৃদ্ধি, সত্যতা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্বাগত  
বৈশিষ্ট্য, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় ইহার  
১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা

১৬, ৩৮, ৭৯, ২৯৮

মোট চলতি বীমা..... ৮৬,৭১,৮৫,০৮০  
মোট সম্পত্তি..... ২২,৪৯,৮৩,০৫৬  
বীমা ও বিবিধ তহবিল..... ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭  
প্রিমিয়ামের আয়..... ৩,৯৪,২৬,৩৭১  
মার্বী শোধ (১৯৫২)..... ৮৮,৮২,২৭১

হিন্দুস্থানের বীমা পত্র বিবরণ  
মার্বার ও প্রাপ্তবৎক।



হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিং, ৪নং চিত্তরঞ্জন এডেনিট, কলিকাতা-১৩



ধরিয়া ভারত-তিব্বত ইতিহাসের এই দুপ্ত অধ্যায় সম্পর্কে ক্যালকাটা  
বিভিন্নস্থে, আনন্দবাজার পত্রিকায়, এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় এবং  
সরকারী মহাক্ষেত্রখানার (National Archives) সহিত কিছু  
কিছু আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে বলিয়া উক্ত  
প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে সামান্য কিছু বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

তাঁহার প্রবন্ধের উপকরণ-স্বরূপ গ্রন্থপঞ্জীতে তিনি এসিয়াটিক  
সোসাইটির ১৮২০ সালের জুলাই প্রকাশিত গৌরদাস বসাকের  
প্রবন্ধ, শবং চন্দ্র দাসের *Indian Pandits in the Land of Snow*  
এবং মার্কহাম ও টার্নারের বিবরণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা  
ছাড়াও ড্যালরিম্পলের (Dalrymple) ওরিয়েন্টাল রিপোর্টারীতে  
(১৭২১) ও (১৮০৮) এবং ঐ সময়কার কাউন্সিলের রেকর্ড-  
দলিলদস্তাবেজেও তিব্বতে ওয়ায়েন হেষ্টিংসের “মিশন” প্রেরণের  
কথা এবং আচার্য্য পুরাণগির বা পূর্ণগিরির নাম পাওয়া যায়।  
(*Calendar of Persian Correspondence 1781-85, Vol. vi*),—এও পুরাণগিরির কথা আছে। সম্প্রতি  
*Tirage A Part Du Tuong Pao Vol. XXXIX, LIVR, 4-5*  
E. J. Brill—Leiden—“*The Missions of Bogle and Turner*  
according to Tibetan texts,” by L. Petech প্রকাশিত হই-

যাকে। তাহাতে তৃতীয় ও চতুর্থ তাসী লামার আত্মজীবনী কিছু  
কিছু অংশ অনূদিত হইয়াছে। প্রভাসবাবু তাসী লামা কর্তৃক পরমা  
ও পূর্ণগিরিকে ওয়ায়েন হেষ্টিংসের দরবারে প্রেরণ করিবার কথা  
লিপিবদ্ধাছেন, কিন্তু তৎসহ তাঁর বিখ্যাত চিঠিটির সম্পূর্ণ বিবরণ দিলে  
তাসী লামার চরিত্রমার্ধব্য আরও কুটিরা উঠিত। লামা ওয়ায়েন  
হেষ্টিংসকে লিখিতেছেন, “কাতাকেও আঘাত করা বা কাতারও  
বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের সমাজের রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ। কোন  
সামান্য লোকেরও অনিষ্ট করার কল্পনাতে আমাদের সুনিত্যার ব্যাঘাত  
হয়...আমি নিজে একজন সন্ন্যাসী এবং আমাদের সন্ন্যাসের নিয়ম  
এই যে, জগৎমালা হাতে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামনাই আমাদের  
মন্ত্র, শান্তিই আমাদের কাম্য—এই রাজ্যে সর্বশক্তিমানের উপা-  
সনাই সকলের পেশা...”

পত্রের এই সারাংশ থেকেই অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন  
তাসী লামা সাধারণ সন্ন্যাসী বা রাজা ছিলেন না। তিব্বতীয়  
বিবরণীতে জানা যায়, তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শবী  
লোক ছিলেন। চীন-সম্রাট তাঁকে গুরু মত শ্রদ্ধা করিতেন।

“As the first and most holy living (being) of all  
those on earth who devoted their time to the service  
to the Almighty.”

১৭৭২-৮০ খ্রীঃ অব্দে ওয়ায়েন হেষ্টিংস স্থির করেন যে, আচার্য্য  
পুরাণগিরি তিব্বতে গিয়া তাসী লামার সঙ্গে দিলিত হইবেন এবং



# শুভ বিবাহ



বিয়ের ভোজটা  
বেশ কমেছে।

কি চমৎকার বেঁধেছে-  
কি দিয়ে বেঁধেছে  
জানতে হবে।

যা বলেন-  
চমৎকার রান্নার জন্তে  
ডাল্ডা! আর  
এতে খরচও কত  
কম।



ডাল্ডা বনস্পতি দিয়ে রান্না কোরলে যে কোনো ভোজের আয়োজন সার্থক হয়।  
সব রকম রান্নার পক্ষেই ডাল্ডা বনস্পতি বিশেষ উপযোগী। বায়ু-রোধক শীল-  
করা টিনে ডাল্ডা বনস্পতি সর্বদা তাজা বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর অবস্থায় পাবেন।  
বিয়ের ভোজের জগ্রে ডাল্ডা বনস্পতি চাইই-চাই। আর এতে খরচও কত কম!

কি কোরে ভালভাবে বিয়ের ভোজের আয়োজন করা যায়?  
বিনামূল্যে উপদেশের জন্তে আজই লিখে দিন:-

দি ডাল্ডা গ্র্যাডুভাইসারি সার্ভিস্ পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, পোষ্টাট ১



## ডাল্ডা বনস্পতি



তাহার সঙ্গে মহাত্মানে বাইবেল, আর জলপথে বঙ্গোল সাহেব তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন। পূর্ণগিরি লামার সঙ্গে চীনবাজার যে চমৎকার বিবরণী দিয়াছিলেন তাহাই কিরকংশ ড্যালম্পলের ওয়িয়েটাল রিপোর্ট দ্বারা অনূদিত হইয়া ১৭২১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল :

"It contains a 'Narrative of the Teshoo Lama's journey to Peking in 1779 and 1780 and of his death there : by Poorun Geer Gossain. From Dalrymple's introduction to this number it appears that this nar-

ative (this very curious paper as he says) was received by Dalrymple from his friend Mr. Bradshaw of Portland Place through his very old and intimate friend Mr. Fitzhugh. We are further told that Mr. Bradshaw had received it from Mr. Auriol (Secretary to the Supreme Council at Fort William under Warren Hastings) who in his turn had received it from Warren Hastings while in India. Mr. Dalrymple secured Hastings' permission to get it printed through the good offices of Calliand."

## ব্যাক অফ বাঁকুড়া নিমিটেড

সেন্টাল অফিস—৩৬নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা  
আদায়াকৃত মূলধন—৫০০০০০ লক্ষ টাকার অধিক

জ্যাক :—কলেজ স্কোয়ার, বাঁকুড়া।

সেভিংস একাউন্টে শতকরা ২ হারে সুদ দেওয়া হয়।

১ বৎসরের স্থায়ী আমানতে শতকরা ৩ হারে হিসাবে এবং

এক বৎসরের অধিক থাকিলে শতকরা ৪ হারে

সুদ দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে, এম. পি.

## বঙ্গভারতী

দ্বৈমাসিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা ১০ সভাক বার্ষিক ৩

কচিবান, সংস্কৃতি-সম্পন্ন এবং বিচারশীল

পাঠকগণের পক্ষে অপরিহার্য।

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাম—কুলগাছিয়া; পোঃ—মহিবরেশ্বর; জেলা—হাওড়া

ছোট ক্রিমিটোপের অধ্যর্থ ঐষধ

“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া”

শৈশবে আত্মদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-ভাঙ্ক প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুখবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশু-ভাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওব্লিউইটাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১ বি, পোবিল আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

কোম—আলিপুর ৪০২৮

তাসী লামার এই অপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী আনন্দবাজার পত্রিকার এক বার্ষিক সংখ্যার আমি সামান্য উল্লেখ করিয়াছি।

প্রভাসবাবু প্রবন্ধে আর একটি বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ নাই বাহা আমরা তাসী লামার তিব্বতীয় আত্মজীবনী হইতে পাই, তাহা এই যে, ঐ সময়ে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলিত উদাসী পরিব্রাজকদের মাধ্যমে। কাশ্মীরে চৈতন্য ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী এবং তিনি লালা কাম্বারীমল, গোঁসাই কিষণপুরী, শোভারাম প্রভৃতিকে তিব্বতে পাঠাইয়াছিলেন। তাসী লামাও তিব্বতী ভ্রমণদের নানা উপহার সমেত প্রয়াগ, বারাণসী, নৈরজনা প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধগয়া হইতে আনীত কুরুপ্রস্তুদের শাকামুনি ও মৈত্রেয়ের দুটি মূর্তি তিব্বতের মঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ঐ মূর্তিদের প্রতিষ্ঠার সময় তাসী লামা স্বয়ং দুটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন।

প্রভাসবাবু যে বঙ্গোলের ‘মিশন্’ সঙ্কে লিখিয়াছেন তৎসম্পর্কে তিব্বতীয় আত্মজীবনীতে এই মধ্যে উল্লেখ আছে যে দশম মাসের দ্বিতীয় দিবসে—

“Acarya Bho-gol (Bogle ?) with his attendants offered presents of glass, bottles, etc., and took their appointed places for the distribution of ceremonial tea; they made conversation in the ‘Nagara’ language.”

তাহাদের বিদায়ের কথা এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

“On the 7th day of the 3rd month during an interview after dinner with Bhogol Sahob, the Bengalis and their attendants; (the Tashi Lama) held a conversation in the language of the Magadha (Yul-dbus) and gave to the two men leave to depart with pleasing presents of garments, etc., and his reply (to the Governor-General) along with accompanying gifts.”

এই সম্পর্কে *The Calcutta Review*তে প্রকাশিত (April 1952) আমার প্রবন্ধ “A Forgotten Chapter of Indo-Tibetan Contact” স্মৃত্য। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মিশনে তিব্বতীরা পূর্ণগিরির বললে ‘সুর্বাগিরি’র উল্লেখ করে।

এই পূর্ণগিরি কোন দেশের সন্ন্যাসী তাহা জানা নাই, তবে তিব্বতীয় আত্মজীবনীতে তাঁহাকে বাঙালীই বলা হইয়াছে। তাহা হইতে তিনি ওরায়েন হেষ্টিংসের দূত হইয়া বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া। তবু এই পুণ্যপ্রস্তুক সাধুর কীর্তি, বাংলায় বর্ণনামে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।



# **দ্রুত-ফেনিল সানলাইট** **না জাচ্ছে কাচলও সাদাও স্বচ্ছভাবে করে দেয়**



আমি হিসেবে সত্যিই আমি ভাগ্যবান কারণ  
 আমার স্ত্রী আমার কাপড়-চোপড়ের বিশেষ  
 বসনেন—সানলাইট সাবানের সাহায্যে।  
 সানলাইট সাবানের দ্রুত-উৎপাদিত কেনা  
 কাপড়ের সব ময়লা বার করে দেয়, কাপড়  
 আছড়াবার মরকার হয় না। তার মানে  
 আমার পরমা ধীচে, কারণ আমার কাপড়-  
 চোপড় টেকে বেশী দিন।

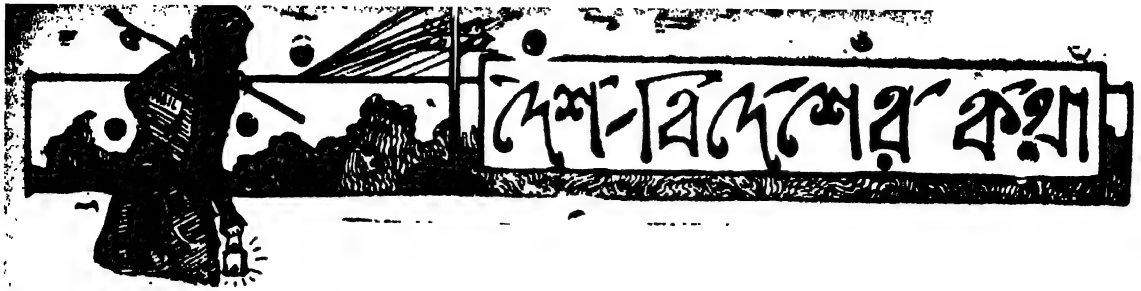


সানলাইট সাবান দিয়ে সহজে  
 ও তাড়াতাড়ি কাপড় কেটে আপ-  
 নার আমোদ প্রমোদের অবসর  
 বাড়ান। সানলাইট সাবানের কার্যকরী  
 কেনা কাপড়ের ময়লাকে ঝেঁটের  
 বার করে দেয়, আর মদীন কাপড়কে  
 উজ্জল ও স্বচ্ছ করে তোলে।



**সানলাইট সাবান**

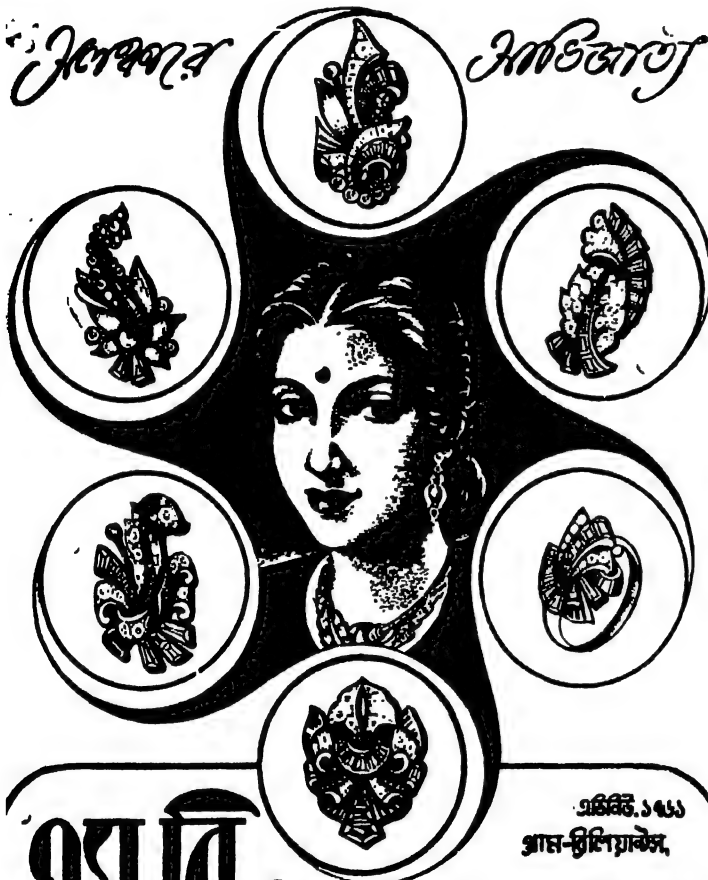
বাপড় বাটার • পরিষ্কার কাচার • মরচ কাচার  
 ১৯০-১১৪ ৩৬



বিশাখাপত্তনে নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন

অন্য শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার সংস্কৃতি সংযোগ পরিষদ নামক  
সংস্থার উদ্যোগে গত ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনে টাউন-

হলে এক নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়।  
বাংলাদেশ হইতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রবাসীরা সভাকারী-সম্পাদক  
শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভট্ট এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সম্মেলনের



এম.বি.সরকার এও সন্ন

১৩৭সি.১৩৭সি/১ বহুবাজার ফ্রিট কমলিনতা (আমরা  
বহুবাজার ফ্রিটের সংযোগস্থলে) আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরী

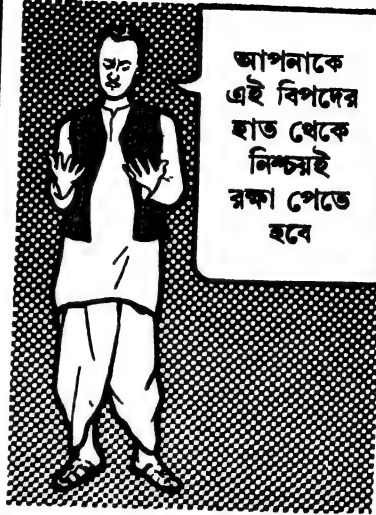
ফ্রাঙ্ক-টিকুহাল ফ্রিট বালিগঞ্জ: ১৫৯/১ বি. রাসবিহারী এভিনিউ  
কলিকতা: ফোন পি.কে. ৪৪৬৬

উদ্বোধন-প্রসঙ্গে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর  
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, আধুনিক  
বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে যে সকল সমস্যা  
উপস্থাপিত করিয়াছে সেগুলির সমাধান  
করিতে হইলে আমাদেরকে আধ্যাত্মিক  
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।  
নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের প্রতি অনুবাদের  
অভাবই আক্ষিকার দিনে আমাদের পক্ষে  
সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হইয়া  
পড়াইয়াছে।

শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার সভাকার পণ্ডের  
তাত্পর্য ব্যাখ্যা করিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন,  
ভারতীয় সংস্কৃতিতে পণ্ডের একটি বিশেষ  
গুরুত্ব আছে। পক্ষ হইতে জন্ম হয় পক্ষের,  
তেমনি আমাদের সাংস্কৃতিক আদর্শ বলে  
যে, তৎকালীন নিম্নতম শ্রেণীর মানুষও  
সাধনা দ্বারা নিজের অধ্যাত্ম-জীবনের চরম  
বিকাশ সাধন করিতে পারে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের উদ্বোধনী বক্তৃতায়  
পর অন্তঃ শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার সম্পাদক  
শ্রী আর. মণ্ডেশ্বর শর্মা শ্রমিক ধর্মরাজ্য  
সভার আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া এক সংক্ষিপ্ত  
বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর গুয়াটিং  
সেক্রেটারী শ্রীসর্বেশ্বর শর্মা কর্তৃক ডক্টর  
কালিন্দাস নাগ, অধ্যাপক বি. এল. আজের,  
ভারতন কুমারামা, অন্তঃের প্রধান বিচার-  
পতি সি. রাজমল্লার প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন  
প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রেরিত বাণী  
পঠিত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর বেলা আড়াইটার  
সময় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন  
আরম্ভ হয়। ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক পত্রিকার  
ভূতপূর্ব সম্পাদক সি. ডি. এইচ. রায় কর্তৃক  
আবৃত্তিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইবার পর



# লাইফবয় সাবান

প্রতিদিনের ময়লার বীজাণুর  
হাত থেকে আপনাকে বাঁচায়





দিনে দিনে  
আরও মসৃণ,  
আরও লাভণ্যময় ত্বক



রেসোনার **ক্যাডিল** আপনার  
জন্মে এই বাতুটি কোরতে দিন।

রোজ ক্যাডিলযুক্ত রেসোনা সাবান ব্যবহার করুন। তা হোলে  
দিনে দিনে আপনার গায়ের চামড়া নতুন স্নাত্তো ও  
লাবণ্যে ভাবে উঠবে।

**রেসোনা**

ক্যাডিল যুক্ত একমাত্র সাবান

\* দুর্গন্ধপাতক ও কোমলতাপ্রদ কঠকপ্তি তেলেণ  
বিশেষ সংমিশ্রণের এক সাদিকারী নায়।

RP. 110-50 BQ

রেসোনা শোআইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।





ব্রহ্মাণি বইয়েরই প্রচ্ছদপট চমৎকার; সুধেণে বহু ও পারিপাট্যের পরিচয় আছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

চোরকাঁটা—চাঁচল বন্দোপাধ্যায়। দীপনী। ২৩৫ বি. টি. রোড, কলিকাতা-৩৬। মূল্য দুই টাকা।

‘চোরকাঁটা’ লোকান্তরিত চাঁচল বন্দোপাধ্যায়ের একটি অপরিচিত উপন্যাস। সাধু নামে এক যুগল আত্মার ক্ষেত্রে পটভূমিতে অলঙ্ঘন কর্তে বাঁধন; তারপর তার মন আর জনম পরিভ্রমণের মতো চলতে থাকে দন্দ এবং পরিণামে মন-প্রগতিই জয়ী হয়ে ওঠে। এটি প্রতিপাতা-কৃত লোক নানা ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রচলিত বোঝায়ে, হবে পাকা হাতের মুখায়ানার দরুন কোনওখানেই জট পাকিয়ে যায় নি, যার জন্য পাঠকের মনে মোটেই কানি অনুভব করান, বরং বরং একটি নীতিবোধের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে।

উপন্যাসের একটি সুখ, চরিত্র মনো, মানব জীবন। এর ভেতরিতা, অপরিমিত মন, আর অনুভবের ক্ষেত্রেই মন আবার কণাশের পথে ফিরে আসতে সমর্থ হলে—এইজন্যে মন হয় সমগ্র উপন্যাসটির মূল কেন্দ্র এবং মনোময়ী নারী, এর আত্মবিশ্বাস এক এক সময়ে শব্দ চশ্মের কোন কোন বিশেষ নারীচরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চাঁচল বন্দোপাধ্যায়ের জীবন-কালে বাঁচা-মারা; এর প্রত্যেক শব্দই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে বোঝা যায় রসপিপাস্য পাঠকের কাছে এর সমাদর এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—জীবন নিয়তি। পপনবুড়ো। সাহিত্য চয়নিকা, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৩৬। মূল্য দুই টাকা।

ভেলেমেয়ের আত্মীয় এক ভেলেমেয়ের আর একবার বয়স পেরিয়ে যাওয়া বুড়ো। ‘পপনবুড়ো’ জীবনবাহু এই নবিকারে ভেদের একবারে মাঝখানটি দিয়ে বসেছেন। গল্প বলতে হবে। ছোটরা আমাদের আশ-পাশে রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা বাস্তব; বাস্তবক্ষেত্রে ভেদের জগৎটা পূর্বের একটা স্বপ্নের কল্পনার জগৎ। আরও পূর্ব করে বলতে গেলে বলা চলে যে, ওরা এই জগৎটাকেই ভেদের মনের রঙে রঙিয়ে আলাদা করে, আর খানিকটা পূর্ব করেই দেখা। সেখান থেকেই দৃষ্টি না থাকলে ভেদের মনের নাপাল পাওয়া যায় না, অন্তরা ভেদের আসরে সায়গা করে নিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

‘পপনবুড়ো’ এর প্রচলিত জানেন, তাই তার গল্পের আসর জম উঠেছে। শুধু ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পরীদর কথাই নয়, এই জগতের নিত্যকার প্রচণ্ডের কথাও তিনি যা বলেছেন, এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে বলেছেন যাতে ভেলেদের মনে দিয়ে পৌঁছাতে একবারেই দেহি না হয়। কল্পনার জগৎ থেকে এই পরিবেশে যাওয়ার এক সময় এসে পৌঁছাতে হবে, এই মুহুর্তের বাস্তবের সামনে এসে হলে পাড়াতে তাদের উপদেশও দিতে হয়েছে মাঝে মাঝে; কিন্তু তা এমনভাবে ময় যাতে গজের আসরটিও প্রচ্ছন্ন সূর্যের বলে তাদের মনে আতঙ্ক জন্মে উঠতে না পারে।

বইয়ের ভাষা সাধারণতঃ বেশ হালকা আর অল্প বয়স্কদের উপযোগী। বইখানি ছেলেদের হাতে তুলে দিলে তারাও আনন্দ পাবে, অভিভাবকও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সা হি তি কে র লে খ নী তে

## কাঁজল কালি

১৯০৫এ বাঙালী স্বাধৈশিকতার উদ্ভূত হয়ে শিখে বাণিজ্যে ব্যবসায়ের কৃৎসিল। উৎসাহ-উত্তেজনার স্বদেশী শিল্প জয়গাঠ করেছিল অনেকগুলি, কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালী বস্ত্রের জগতের মত সেগুলিকে ভেঙ্গে যেতে দিয়েছিল। সেই ভাববস্ত্র কাটিয়ে বাঙালীর কীতি স্বামী হয়ে রয়েছে সামান্য ৫-চারটিতে।

১৯২১এ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বদেশী শিল্পের নতুন উদ্বোধন করেছিল। তারও অধিকাংশ কালের প্রবাহে ভেঙ্গে গেছে। অসহযোগ-আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল “কাঁজল কালি” বাংলাদেশে আজও সগৌরবে টিকে আছে। এর কারণ ভাবগেগের সত্য এবং আবিষ্কারক-পরিচালকদের চিন্তে নিষ্ঠা ও সততা ছিল। “কাঁজল কালি” এক জায়গাতেই থেমে থাকেনি, সময়ের এবং বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল বেখে নতুন নতুন পরীকার মধ্য দিয়ে এই কালি কলমের মর্যাদা বেগে এগিয়ে চলেছে। নামে এবং ক্ষেপে হার মেনেছে বাবতীয় বিলিভী কালি।

বাংলাদেশের একজন সামান্য বাণীসেবক আমি, বিগত শতাব্দীপাদের অধিক কাল এই “কাঁজল কালি”র সাহায্যেই বাণী সাধনা করে আসছি। কখনও অস্ববিধের পড়িনি, স্নান হয়নি কলমের গতি, বহু হয়নি লেখনীর মুখ। এরই ভগ্নে আমি কৃতজ্ঞ। সেই আত্মরিক কৃতজ্ঞতাবশে “কাঁজল কালি”র অক্ষর জীবন কামনা করছি।

শ্রীসত্যজিৎ রায়

# = বি জ ণ্টি =

আমরা অতীব সন্তোষের সহিত জানাইতোছ  
যে, পাশ্চাত্যবর্জ রাজ্যের সর্বত্র ৫১০ সাড়ে বারো  
আনা সের দরে চিনি যাহাতে পাওয়া যায় সেজন্য  
স্থানে স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র এবং পাইকারী ও খুচরা  
বিক্রেতা নিয়োগের সুব্যবস্থা হইতেছে। চিনি  
সরবরাহে কোন বাধা বিষয় ঘটিলে তৎপ্রতিকারার্থে  
যে কোনরূপ পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হইবে।

## সুগার ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

২নং দয়হাট্টা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

টেলি : ঠিকানা—“চিনিবিক্রি”

ফোন : ৩৩-১০১৯

## যেখানেই তাঁরা মিলিত হন ...

কেশ প্রসঙ্গে তাঁরা ক্যালকেনিকোন মধুর সুগন্ধি ক্যাষ্টল তৈল  
কেশ তৈলের কথা আলোচনা করেন।



নারী সৌন্দর্যের যে দুনিবান আলো, তাই  
একখানি সুপনারোপ নতুন করে  
খানেক তাঁদের চোখ চিকুনে ক্যাষ্টল  
বাবুদের কেশ। একদা উৎকর্ষ লাভ  
নবো, কানন ইত্যাদি বিজ্ঞান পরিশীলিত  
চোখের ময়েল হইতে প্রস্তুত। ইজার  
স্বাস্থ্য চিকুকে প্রসঙ্গ নাপ।

এই আশুদয় প্রাধিকার পাওয়া যায়।



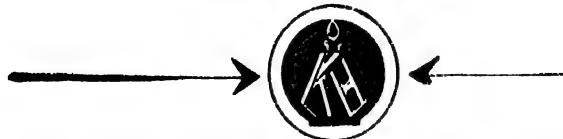
জামলাটা কামিকা

১৯৩৭

কলিকাতা

## ফে, থে, ডে, জে মহাভূজ রাজ তৈল

চুল উঠা বন্ধ করে  
মাথা ঠাণ্ডা রাখে



এই মার্কি দেখে কিনুন নকল থেকে সাবধান



সব-হারাদের গান—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নব-জীবন  
সম্ম, লোকসেবা-শিবির, পোঃ বড় আশুলিয়া, নদীয়া ও এএ, অরুণা নিয়োগ  
সেন, কলিকাতা-৩। মূল্য আড়াই টাকা।

বইখানি আটশট কবিতার সমষ্টি। চারপ-কবি বিজয়লালের এই  
কবিতাগুলি একদা বাংলার অনেক তরুণের পাণে প্রেরণা যোগাইয়াছিল।  
আটশট কবিতার মধ্যে অবিকালই যে লিখিত কবিতা, কয়েকট অনূদিত  
পদ্য-কবিতাও আছে। পঞ্চম কবিতা 'ভূমি চলে'। এটি ঐতর্যের প্রাঙ্গণ  
হইতে অনুবাদ। ভূমিকায় লেপক বলিতেছেন, এটাই কালের মূল শব্দ।  
দ্বিতীয় কবিতায় কবি বলিতেছেন,

গাতি জীবনের গান,

রাতির ধাঁধারে জাগিতেছে ধীরে মহামানবের পাণ।

বলিতেছেন,

সব-হারা যারা ভবিষ্যৎ হারা; সবার মালিক হ'লে,  
যুগের লক্ষে এই মহাগান বাজে ঝুরব রবে।

আসিতেছে ভগবান

মহামানবের হৃদয়পক্ষে— গাতি কবি তার গান।

'বড়ী-নালালের তীরে' আছে,

বিজয়ী বীরের দল!

মরিয়্য হোমিয়্য শিপায়্যা পেলে পাঁচিয়ার কেশল।

ভালোলে যে হোমানল—

শত শিপা মেলে পরশিয়ে হাতা মস্ত-অম্বর হল:

'পলভাতে' পাঠ,

ওই ডাকে পলভাতের গম্ভীর গদ্য,

আলোয় মিলালো কালো অম্বোতের রা, ক,

মজাবীর, জাগো জাগো, রণিতেছে তুগা,

ভূমি যে বাধনহারি আলোকের দায়ী।

'ব্রজ-ভাণ্ডা' কবিতা চমৎকার,

হোমার চারপ-বেশে পথে পথে আমি গান গান,

আমার সঙ্গীত তব কুকুরিয়ে পলম-বিদগ্ধ।

'বিজিতের গানে' আছে,

দাঁস আর নত দাঁস, মানে মস পাবোন-প্রসঙ্গ,

কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

দেশ কি দেবে না দাঁবারের পাং

দন-চাঁমোর নতন তপন ?

হবে না মস্ত কবির অপন ?

'শতাব্দীর আঙ্গানে' আছে,

কবিতা কি পাও পাতালপুরীর অন্ধকারের ভাণ,

মাটির গর্ভে ভূকম্পনের ডমক সঙ্গীনা ?

'কবির পতি' কবি গায় পাঠ

আজি নচে, আজি নচে মুকুটে মিলনের গীত;

আজি চাচি কণ্ঠে তব স্তনিবারে ভৈরব সঙ্গীত;

আজি চাচি স্তনিবারে সেই ব্রজ সন্দের আঙ্গান

কুণ্ঠেমে পার্শ্ব-বৃক জাগিলো যা উড়াল তুলসি।

শেষ কবিতার পদ্য,

যুগের রাজ্যে কে গাতিবে বল ধূম-ভাণের গান ?

কাবের মধ্য দিয়া সাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপাসক কবি বিজয়লাল  
যুগের বাস্তব খোঁসনা করিয়াছেন। এই চতুর্থ সংস্করণ গ্রন্থে কয়েকটি নূতন

কবিতাও সংযোজিত হইয়াছে। অনুবাদগুলিও সুন্দর। দৃষ্ট চক্ষে বহুত  
পৌরুষপূর্ণ "সব-হারাদের গান" আজও দেশবাসীর মনে সাজা জাগাইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাথী

ভূতের পাঁচালি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী-রচিত, শ্রীমধুরী দেবী  
এম-এ-চিহ্নিত। দাঁশপ্তক এণ্ড কোং, ৫০৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।  
মূল্য ৮০।

"পঙ্কিতের পুঁথিঝড়া বড় বড় কথা

ভেবে ভেবে সাগরিন কঁ। কঁ করে মাথা।"

তাই বালক, শিশু ও কিশোরদের ডাকিয়া লেখক ভূতের গল্প দুইটি  
বিস্তারিত এবং কম নয়—এক ডজন ভূতের গল্প বলিয়া গিয়াছেন। সেখানে  
বিলাতি গল্পের ছায়া আছে, সেখানে লেখক তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন  
'ভূতের নাচে' 'I am ()' 'Shan()'—এর। সচজ মনোময় পক্ষে মজাদার  
গল্প বলার কৌশল তাঁহার বেশ আয়ত্ত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(১) জমজম কামকাম, (২) আলোর কুঁড়ি—

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দাঁশপ্তক এণ্ড কোং লি., ৫০৩ কলেজ ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা-১২। মূল্য ৮০ ও ২০।

পঞ্চমটি গল্প, কবিতা ও ছড়ার বই। বড় বড় অক্ষরে অক্ষরে ছাপা ও  
রঙীন ছবিতে ভরা বইটি উপকার পাইয়া ছোটরা পুণী হইবে। দ্বিতীয়টি  
কিশোর-কিশোরীদের জন্য নানা-ভাবোদ্দীপক সচিত্র কবিতার বই।  
কবিতাগুলি রচনানৈপুণ্য ও পদ্যলিপিতে উপভোগ্য। তৎপ-তৎপাণ বইটি  
পড়িয়া আনন্দিত হইবে।

ছবি ও পড়া (১ম ও ২য় ভাগ) - শ্রীঅনিমল বসু ও শ্রীধীরেন্দ্র-  
লাল ধর। ২ গ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৮০ ও ১০।

অধুনিক পদ্ধতিতে রচিত অম্বা ক-প শিশুগণের বই। বিবরণভিত্ত  
ছবিতে ভরা এবং পাকাতার রচিত ছড়া ও পড়াগুলি শিশুরা দশবার করিয়া  
পড়িতে চাহিলে। বইছটির ছবির বাজার নয়নরঞ্জন।

ছড়ার বই (১ম ও ২য় ভাগ) - শ্রীঅনিমল বসু। শিশুসাহিত্য সংসদ লি.,  
২এ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা-২। মূল্য ৮০।

ছন্দী ছড়া অবলম্বনে রচিত ছড়াগুলি যেমন মজাদার, শিল্পী সমর দে  
অঙ্কিত চিত্রাবলী চিত্রগুলি তেমনি মনোহর। ছবিগুলি দেখিলে যেমন চোপ  
ছড়াওয়া যায়, মিঠা হাতের রচিত গম্ভীর ছড়াগুলি তেমনি মন মুগ্ধ করে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

শ্রীশ্রীনপেন্দ্রনাথের আত্মচরিত (২য় পঞ্চ) - ২১,

কাবিদাস পত্রিকার বেন, কলিকাতা-২২ হইতে ডাঃ শ্রীমন্তকুমার দে ও  
শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ৪০ + ১৪০। মূল্য দুই  
টাকা।

বিগতি ব্যক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিম্পন্ন এই সাধু পুঙ্কদের আত্মচরিতের প্রথম  
পত্রের আলোচনা ইতিপূর্বে 'প্রবাসী'তে করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ড  
চারটি অধ্যায়ে প্রায় চৌষটি মাসের নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে  
গুণেন্দ্রনাথের শৈশবজীবনের বহু ঘটনা অতীত জগৎগ্রাহীভাবে পরিবেশিত  
হইয়াছে ও নানা বিষয়ের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের জগৎস্ব-  
বৃত্তান্ত যেমন বিস্তারিত তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এই গ্রন্থপাঠে জীবনকে সার্থকতার  
দিকে অগ্রসর করার প্রেরণা পাওয়া যাইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০১২ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা



রামানন্দ চন্দ্রোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

ফাল্গুন

# প্রবাসী

মীরা নো

সম্পাদক: - শ্রীকেশ

# **PRABASI PRESS**

**is equipped with Modern Machinery, Lino and a  
wide variety of types**

**Can print BENGALI, SANSKRIT, ENGLISH, HINDI  
Books and Job Works.**

**PRABASI—the Bengali Monthly Magazine,  
MODERN REVIEW—the English Monthly Magazine**

**&**

**VISHAL BHARAT—the Hindi Monthly Magazine  
are printed here.**



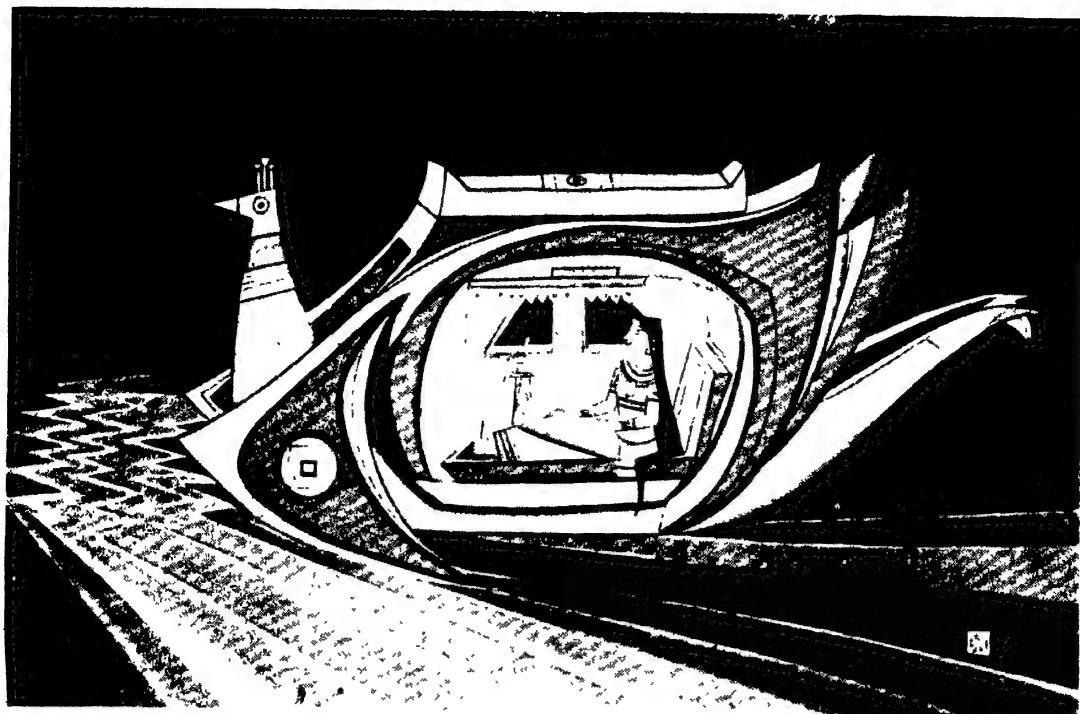
**ARTISTIC COLOUR PRINTING  
A SPECIALITY**



**120-2, Upper Circular Road, Calcutta-9**







শুকপাখী নৌক

শিল্পী—অমলেন্দু নাথ



কুমোর

শিল্পী—অমলেন্দু নাথ

# এবাস্য

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

নাথমায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

১৩শ ভাগ }  
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৬০

{ ১ম সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### শিক্ষকদিগের কর্মবিবর্তি

বিগত ২৭শে মার্চ ( ১০ই ফেব্রুয়ারি ) হইতে পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকবৃন্দের কর্মবিবর্তি আরম্ভ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন।

আমরা এই পত্রিকায় দীর্ঘদিন হইতে বাংলার শিক্ষকবৃন্দের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অভাব সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি এবং সাধামত তাঁহাদের সাহায্যকল্পে তাঁহাদের সকল যুক্তি ও প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, জাতির জীবনে ও ভবিষ্যতে বালক-বালিকা এবং কিশোর-কিশোরীর শিক্ষকগণের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আঞ্চিকার পরিস্থিতিতে আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ মনে করি।

একদিকে ইহা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য যে, শিক্ষক যতই স্বার্থহীন ও শিক্ষাব্রতে অনন্তমনাই হউন, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সমস্যা তাঁহার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করিবেই। দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষক পরিবার-পরিজনদের দুঃখকষ্টকে নিলিঙ্গভাবে দেখিতে সমর্থ হইতেই পারেন না এবং ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার শিক্ষাব্রত পিন্ন ও অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষকের শিক্ষাকার্য্যে যোগ্যতা যেমন অত্যাবশ্যক তেমনিই তাঁহার সাংসারিক ব্যাপারে অন্ততঃ পক্ষে নূনতম সাচ্ছল্য থাকা প্রয়োজন! শিক্ষকের সংসার অচল হইবে, তাঁহার পরিবারের ভরস্ব থাকিবে না অথচ তাঁহার শিক্ষাকার্য্য অক্ষুণ্ণভাবে সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে ইহা অসম্ভব।

শিক্ষকের কার্য্য শুধু বিদ্যালয়ের কক্ষে আবদ্ধ নহে। সংসারে ও সমাজে তাঁহার স্থান গুরুত্বনোচিত। জাতির শিক্ষা-দীক্ষা তাহার প্রগতির প্রধান সোপান এবং সেইজন্যই জগতের সকল সভ্য জাতিই শিক্ষক ও অধ্যাপককে সমাজে উচ্চ স্থান দিয়া থাকে। সুতরাং অভাব-প্রাপ্তিত ও দৈত্যক্লিষ্ট শিক্ষকের সমাজে ও সংসারে অধঃপতন জাতির লজ্জার কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ। শিক্ষকের

সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সেইজন্য শুধু কামা নহে, উহা জাতি ও সমাজের উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক।

অল্প দিকে এই কর্মবিবর্তির পথ শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদার বিষয়ে শঙ্কাপূর্ণ। এই পথে যাঁহারা আজ শুরু ও নেতা, তাঁহাদের কার্য্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই কুটিল ও কলুষপূর্ণ। এ কথা আজ কে না জানে যে এই কর্মবিবর্তির পথ রাষ্ট্র-স্বংসকারীদিগের প্রধান অস্ত্র এবং সেই কারণে এই পিচ্ছিল রাজনৈতিক মার্গে চলিলে অধঃপতনের ভয় সর্বদাই থাকে। এই পথে শিক্ষকের পক্ষে আরও এক ভয়ের কারণ তাঁহাদের সংসারীবর্গ। বাংলায় শিক্ষকগণ অপেক্ষা তাঁহাদের ছাত্রগণ এই ক্ষেত্রে অধিকতর পটু। এ পথে চলার এই ভয়ও আছে যে শুরু ও শিষ্যের পদের পরিবর্তন অসম্ভব নয় এবং ইহাও চিন্তার বিষয় যে, যে ছাত্র শিক্ষককে হাত ধরিয়া এই কুটনীতির গিরিসঙ্কটে একবার লইয়া গিয়াছে সে কি আর কোনও দিন সেই শিক্ষককে শুরুর পদমর্যাদা দিবে? এমনই ত বাংলায় ছাত্রগণ ক্রমেই অবিনয়ী ও উদ্ধাম হইয়া শিক্ষাদীক্ষা লাভকে গোঁণ ব্যাপারে দাঁড় করাইয়াছে।

সর্বশেষ সমস্যা আর্থিক। রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারেই ত অর্থের অভাব। এক্ষেত্রে কতটা সরকারের কর্তব্য এবং কতটা সাধারণের, তাহারও নির্ণয় প্রয়োজন। যদি শিক্ষার যথাযথ প্রসার হয় তবে যেখানে আজ ২২০০০ শিক্ষকের অভাব মোচনের প্রশ্ন বহিয়াছে সেখানে কাল ৮৮০০০ শিক্ষকের প্রশ্ন আসিবে। অবশ্য সে সকল সমস্যাই আমাদের সমাধান করিতে হইবে, কেননা শিক্ষকের সমস্যা ও শিক্ষার সমস্যা একই, এবং আমাদের মতে জাতির জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্বয়িত অপেক্ষা কোন অংশে গৌণ নহে।

সুতরাং সকল দিক হইতে শিক্ষকের এই কর্মবিবর্তির ব্যাপারে উৎকর্ষার কারণ রহিয়াছে। বর্তমান “ঘোলাটে” অবস্থায় এই বিষয়ে অধিক কিছু বলা কঠিন। কেননা আমরা কোন পক্ষের নিকটেই কোনও প্রশ্নের উত্তর পাইতেছি না। আর এই ব্যাপারে মধ্যস্থ হইবার জন্য কাহাকেও দেখিতেছি না।

সেই কারণে আমরা কোনও পক্ষের কোনও বিরূতি ছাশিলাম না। এ ব্যাপার এতই সাংঘাতিক ও এতই জটিল যে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় “সারকুলেশন”-দেবতার নৈবেদ্য রূপে যে রূপকথা এইমত পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয় তাহার অমূল্যবোধ ও এখন উচিত নহে। আমরা আশা করি সম্মুখই এই সমস্যা সমাধানের পথ দেখা যাইবে এবং তত দিন এই পরিস্থিতি শিক্ষকদিগের আয়তনের মধ্যে থাকিবে।

### কল্যাণীর পরে ?

বিপুল জনসমাবেশ এবং অশেষ জাঁকজমকের মধ্যে কল্যাণীতে কংগ্রেসের ঊনবিংশতম অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। তবে এত যে লক্ষ লক্ষ টাকা ও হাজার হাজার লোকের পরিশ্রম উহাতে ঢালা হইল তাহার ফল কি হইল সে প্রশ্নের উত্তর এখন আসে নাই।

প্রথম দিনের প্রকাশ্য মহাধিবেশনে জিনেহর সভাপতির ভাষণে পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক সাহায্যদান সম্পর্কে বলেন :

“পাকিস্থানকে যে সামরিক সাহায্যদান সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে গুরুতর অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার প্রতি আমাদের ঐকান্তিক মনোযোগ দান করা কর্তব্য। ইহার ফলে আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু ইহাতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, বাহার সঞ্চক্ষে আমরা চিন্তা না করিয়া পারি না। সর্বোপরি যে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইল জাতীয় সংহতি। আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসে বহু বার বাতির হইতে আমাদের দেশের উপর আক্রমণের আশঙ্কা ঘটিয়াছে এবং আমরা আক্রান্তও হইয়াছি। যে ক্ষেত্রে আমরা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছি এবং আমাদের দেশ ধুও ধুও বিভক্ত অথবা পরাজিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে তাহা অল্পশক্তি বা সাহসের অভাবের জন্য ঘটে নাই, পরন্তু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণেই ঘটিয়াছে।”

ইহাই ত ভারতের ইতিহাসের সাক্ষ্য !

ষষ্ঠীয় দিনের মহাধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণে পণ্ডিত নেহরু বাহা বলিয়াছিলেন তাহার চুপক “যুগান্তর” এইরূপে দিয়াছেন :

“কৃতি ও বিপদ আছে জানিয়াই এই জীবনের আনন্দ। যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা সম্মুখে না থাকিত, জীবন যদি নিতান্তই নরম, সুখের জীবন হইত, তবে তাহার কি মূল্য ছিল ? আজ তাঁহাদের এবং ভারতবাসীর সকলের সম্মুখে বিপদ এবং কৃতি এক গৌরবময় ঐতিহাসিক ও মহান কর্তব্য পালনের আহ্বানরূপে দেখা দিয়াছে। সুশাসিত নর জীবন নয়, দুর্গম, কঠিন, দুঃস্বাদোহ পূর্ণ বিজয়ের মত ভারতবর্ষের উন্নতিবিধানের এই আহ্বান বাঁহারা ক্ষুদ্র লইবেন, ইতিহাস তাঁহাদের ভাগ্যবান করিয়াছে।”

‘ভাতির প্রতি আহ্বান’ এই প্রস্তাবটি উত্থাপনে তিনি বলেন, ৩৬ কোটি লোকের সমগ্র জীবনের উন্নতিবিধানের দায়িত্ব,

এই দেশের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কর্তব্য, হউক দুর্বল, হউক দুঃখকর, কিন্তু উহা কত বড় মহান গৌরব তাহা আজিকার দিনের ভারতবাসীকে উপলব্ধি করিতে হইবে। উহা একটা মহাপুরুষের কাজ। অবশ্য তাঁহারা কেহই মহাপুরুষ নহেন। যিনি ছিলেন, তিনি কিছুকাল পূর্বে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র এবং দীন হইতে দীন লোকদের উপরও এই মহাপুরুষের একটা আলো আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই আলোর জোরে তাঁহারা পথ চলিতেছেন। সমস্ত দুর্ভাগ্যের মধ্যে তাঁহারা যে মশাল ভুলিয়া ধরিয়াছেন, আজ সেই মশাল হাতে তাঁহারা জীবন-সারাক্ষে উপনীত, বিকালের আলো জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মশাল আরও উজ্জ্বল, আরও উজ্জ্বলতায় প্রদীপ্ত করিয়া তোলায় জন্য তিনি যুবকদের নিকট—বাঁহারা আগামী দিনের মশালবাহক, তাঁহাদের নিকট আবেদন জানান। জিনেহর ভাষায় একা, আত্ম-নির্ভরশীলতা ও কৃচ্ছসাধনের আহ্বান জানাইয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা গৃহীত হওয়ার পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঊনবিংশতম অধিবেশন পরিসমাপ্ত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং ভারতকে যে নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে উহার উল্লেখ প্রসঙ্গে জিনেহর জনগণকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র সমস্যা ও অসুবিধা ভুলিয়া গিয়া নবভারত গঠনের বিরাট কর্তব্যপ্রসঙ্গে ত্রুটি হইবার ক্ষমতা উদাত্ত আহ্বান জানান। জিনেহর বলেন, আমাদের সম্মুখে বিরাট কর্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। “শরণ রাখিতে হইবে, ক্ষুদ্র বাদ-বিসম্বাদে দিশূন্য থাকি সমীচীন নহে। কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকি আবশ্যক তাহা শরণ রাখিতে হইবে। অল্প দেশ ভারতকে দুর্বল মনে করিতে পারে ; কেননা শক্তির অর্থে তাহার অল্পশক্তি, অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বৃক্কে। কিন্তু ভারত শক্তির অর্থে অল্প জিনিষ বৃক্কে এবং তাহাই ছিল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালনা করিয়াছে যেমন পূর্বে কংগ্রেস, তেমনি আজ ভারতের পূর্ণ সংহতি লাভের জন্তও সংগ্রাম করিবে কংগ্রেস। তিনি বলেন, “আমি, আপনারা ও অজ্ঞাত বহু লোক আসিবে আবার চলিয়া যাইবে, কিন্তু ভারত ও ভারতের জনগণ অমর হইয়া থাকিবে। বর্তমান ভারত এবং আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই হইবে বর্তমান বংশধরদের প্রধান কর্তব্য।”

মহাত্মাজী অতাব আজ সমস্ত দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমায়েই নির্দাক্ষণভাবে অম্লভব করিতেছেন। তাঁহার স্মৃতি-দিবস ত এই সেদিন গেল। আমরা কয়জন নিজের স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া তাঁহার আদর্শের কথা সেদিন ভাবিয়াছি ?

জিনেহর ভাষণে একেবারে জন্ত আহ্বান, এই জাতির জীবনে আজ যে সন্ধিক্ষণ আগন্তপ্রায় তাহার জন্ত প্রস্তুতির আবশ্যক এবং এই অবস্থার কংগ্রেসের ও সকল জাতীয়তাবাদী দলের কর্তব্য সম্পর্কে

যে স্পষ্ট আহ্বান ও ইচ্ছিত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে অন্তর্যমত হওয়ার অবকাশ নাই। বিগত ১৭ই মাঘ ঐ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্ত বর্তমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্মিলিত অধিবেশনে সভাপতি জনাব আবহুস সন্তোষ বলেন :

“গণতন্ত্রের যুগে সকল সময়ই যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। অতএব কংগ্রেসকর্মীদের প্রায়ে প্রায়ে ও জেলায় জেলায় গিয়া গঠনমূলক কার্যের মধ্যে জনসংযোগ বৃদ্ধি করিয়া সংগঠনের অন্তিমত্বে ভবিষ্যতের জন্ত রক্ষা করিতে হইবে।”

তিনি এই সম্পর্কে আরও বলেন, “প্রদেশ কংগ্রেসের শক্তিবল ও অর্থবল জেলা কংগ্রেসের অপেক্ষা অধিক। তাঁহারা যদি কেবলমাত্র ‘চোপকলসান’ আসবাবপত্রাদির দ্বারা আপিস সজ্জিত করেন, তবে জনসংযোগ রক্ষা হইবে না। আজ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির জেলা কংগ্রেস কমিটিকে নানাদিক হইতে সাহায্য করিতে হইবে। নচেৎ কংগ্রেসের জনসংযোগ কমিয়া বাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।”

ঐ অধিবেশনে জেলার লোকের অবস্থা বিচারের সম্পর্কে নানা কথায় ডাঃ কানাইলাল দাস, এম-এল-এ, একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, উদ্বাস্তুদের জন্ত সরকার বর্তমান জেলার গুজরা অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে যে ভাবে জমি দগল করিয়াছেন, তাহাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ডাঃ দাস কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে জমি-জায়গা দগল লওয়া হইতেছে। বর্তমান জেলা কমিটির এই সাধারণ সভা উদ্দেশ্যের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন-কল্পে জমি দগল এমন ভাবে করা হইতেছে যাহার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ অনুরোধ ও কষ্ট হইতেছে। গুজরা অঞ্চলের আলুটিয়া, কাটাটিকুরী, মৌয়ারা প্রভৃতি গ্রামের জমি দগলের নোটিশ জারি হইলে গ্রামবাসিগণের মধ্যে চাকলা ও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। এই সভা আশা করে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া জমিগুলি ছাড়িয়া দিবেন।

### পূর্ণকুম্ভ যোগে দুর্ঘটনা

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ যোগ উপলক্ষে স্থানীয় লোকের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষেরও অধিক হয়। বুধবার, ২০শে মাঘ, সর্বাপেক্ষা পুণ্যময় যোগে বর্ষান্ত স্থান চলিতে থাকে সেই সময় মেলার এক অংশে এক তীর্থ দুর্ঘটনার তিন শতাধিক লোক হত এবং প্রায় দুই হাজার লোক আহত হয়। সেইদিন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জীনেহর প্রমুখ বহু উচ্চ অধিকারী প্রয়াগে উপস্থিত ছিলেন।

ঐ শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী জীনেহর তীর্থ-বাজীরা কেনই-বা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল এবং তাহাদের সাহায্যের জন্তই বা আর কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা মেলা-কর্তৃপক্ষের নিকট জানিতে চাহেন।

দুর্ঘটনার সময় যেসব সাংবাদিক ঘটনাস্থলে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তিনি তাঁহাদের নিকট ঘটনা-সম্পর্কিত তথ্য অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সরকারী হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক সাড়ে তিন শত লোক পিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এক হাজারের বেশী লোক আহত হইয়াছে।

সেই রাত্রে মেলা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে নিহতের সংখ্যা তিন শত হইতে সাড়ে তিন শত বলিয়া হিসাব দেওয়া হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল, “সন্মতার হুড়াহুড়ির কোন সঠিক কারণ জানা যায় নাই। কিন্তু সঠিক তথ্য এই যে, নাগা সন্ন্যাসী ও তীর্থবাজীরা একসঙ্গে অষ্টমের হইবার কালে শোভাযাত্রা বাইবার নির্দিষ্ট পথে উপবিষ্ট একদল ভিক্ষুকের সহিত তীর্থবাজীরা ভীড়ের চাপে পিষ্ট হইয়া নিহত হয়; একজন নাগা সন্ন্যাসীও এই সময় মারা যায়। ইহা স্পষ্ট যে, নাগা সন্ন্যাসীরা সভাই মারমুখী হইয়াছিল কিনা, তাহা বড় কথা নয়। তবে যেসব তীর্থবাজী তাহাদের খুব কাছাকাছি গিয়াছিল—তাহারা শত্রুভয়ে বা অস্ত্র বে কোন মনোভাবের বশবর্তী হইয়াই ষাউক—তাহাদের এই মর্মে ধারণা জন্মে যে, নাগা সন্ন্যাসীরা মারমুখী হইয়া উঠিয়াছে। এই হেতু জনতা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়—যাহারা জরাজীর্ণ ও বৃদ্ধ তাহারা অস্ত্রের পদতলে পিষ্ট হয়। ভীড়ের বেগে এত প্রচণ্ড হৃদয় যে, যেসব তীর্থবাজী ও ভিক্ষুক শোভাযাত্রা দেখিবার জন্ত মাটিতে বসিয়া ছিল, তাহারা পদতলে পিষ্ট হইয়া নিহত হয়।

এতাবধি ঐ শোচনীয় ঘটনার সঠিক বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। তবে উহার পূর্ণ তথ্য নিরূপণের জন্ত একটি সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করা যায়, উহাতে ঐ বিষয়ের সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইবে এবং সরকারী ভুল-ত্রুটি কি ছিল তাহাও নির্দ্ধারিত হইবে। ইতিমধ্যে নানা গুজব ও নানাপ্রকার অভিযোগ-অনুযোগ চলিতেছে।

সরকারী ভুল-ত্রুটি বাহাই হউক, এই মঞ্চস্থল ঘটনার প্রধান কারণ আমাদের সকলের নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে দারুণ শৈথিল্য। যত দিন না দেশের লোক এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অবহিত হইবে তত দিন এইরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবেই।

বাঁধ এলাকা দিয়া নাগা সন্ন্যাসীদের এক শোভাযাত্রা অতিক্রম করিবার সময় অধিকতর বিভ্রান্তিকর অবস্থার উদ্ভব হয়। হাজার হাজার তীর্থবাজী শোভাযাত্রাপথের দুই পার্শ্বে স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে। পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ শোভাযাত্রার জন্ত পথ করিতে গিয়া বিফলকাম হয়।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, বহু তীর্থবাজী শোভাযাত্রা-পথে ভীড় জমায় এবং কিছু সংখ্যক সাধু তাহাদের ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বিশূল চালায়। ইহাতে বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায় এবং হাজার হাজার তীর্থবাজী কর্মমাক্ত

ময়দানে পড়িয়া যায় এবং তাহাদের পার্শ্ববর্তী জনতার পদতলে পিষ্ট হয়।

মেলা কর্তৃপক্ষ তীর্থযাত্রীদিগকে সন্ধ্যা এলাকার দিকে অগ্রসর না হইতে অমুখোজ্ঞ জানান; কিন্তু স্নানার্থীদের ভীড়ের চাপ অব্যাহত থাকে।

আত্মমানিক দুই হাজার বর্গ গজ পরিমিত স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।”

ঘটনাটি ঘটে নিমেষের মধ্যে। সওয়া-বিঘা প্রমাণ জমিতে হাজর হাজার লোক উদ্ভয়ের গায় চুটাছুটি করায় এতগুলি নিরীহ নয়নারী ও শিশুর প্রাণ গেল।

### রাজ্যের সীমানা পুনর্গঠন কমিশন

কল্যাণী কংগ্রেসে এই কমিশন গঠন ও তাহার কার্যাবস্থার আভাস দেওয়া হয়। সম্প্রতি ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতেছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে :

“নয়াদিল্লী, ১০ই ফেব্রুয়ারী—আগামী কলা নয়াদিল্লীতে রাজ্যের সীমানা পুনর্গঠন কমিশনের প্রথম আনুষ্ঠানিক অধিবেশন হইবে, এই অধিবেশনে নিম্নকর্ণাধিবাসি ও প্রাথমিক বিষয়সমূহ আলোচনা হইবে বলিয়া মনে হয়। কমিশনের সভাপতি জনাব ফজল আলি গতকলা দিল্লী পৌঁছিয়াছেন এবং কমিশনের অপর দুই সদস্য জি কে. এম পানিকর এবং পণ্ডিত হুদয়নাথ কুঞ্জর পূর্ব হইতেই দিল্লীতে আছেন। তথা ও বেতার দপ্তরের সেক্রেটারী জি পি. সি. চৌধুরীকে সেক্রেটারী নিয়োগ করা হইয়াছে।

কমিশনের সদর কার্যালয় দিল্লীতেই থাকিবে। তবে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং হায়দরাবাদে কয়েকটি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া মনে হয়।”

পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল না কেন জানি না। তবে কল্যাণী কংগ্রেসের অধিবেশনে বিহার ও বাংলার মধ্যে বৈরুপ মনোমালিঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের দাবি সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

মানভূমে যাহা চলিতেছে তাহার বিষয়ে অজ্ঞ লেখা হইয়াছে। কিন্তু বিহারী “সাম্রাজ্যবাদ” অঙ্গস্থলেও কিভাবে চলিতেছে তাহা কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া সমীচীন মনে করার আশ্রয় নিম্নের সংবাদটিও এই সঙ্গে দিলাম :

“কটক, ৯ই ফেব্রুয়ারী—রবিবার সেবাইকেল্লায় উৎকল সন্মিলনীর জনসভা গুণ্যমি করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং উৎকলের অন্তর্ভুক্তিকামী কম্মী ও নেতাদের উপর শত্যাচারের সংবাদে বিহারের সরকারী কর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র নিন্দা করা হইতেছে। সেবাইকেল্লা ও শারসোয়ানের উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্তির দাবির বিরুদ্ধতা সর্বত্র নিদ্রিত হইতেছে। রাভেনশ’ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সভার এই উচ্ছলতার তীব্র নিন্দা করা হইতেছে। সেবাইকেল্লায় উড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অপমানে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। বাক-স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা হরণের এই সংবাদে উষ্ম

প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ভারত-সরকারকে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তে জ্ঞ বিচার-বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করিতে অমুখোজ্ঞ করা হয়। অধ্যাপক জি বি. সি. দাস এই সভার সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক জে. কে. মিশ্র, আর. কে. বি. এন. মিশ্র ও এ. কে. সেন উড়িষ্যার নেতৃবৃন্দের এই নির্ধাতনের নিন্দা প্রসঙ্গে মানভূমে বাঙালী নেতৃবৃন্দের নির্ধাতনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, একটি প্রতিবেশী রাজ্য অপর দুইটি প্রতিবেশী রাজ্যের নেতৃবর্গের অপমান ও নির্ধাতন করিয়া প্রতিবেশীমূলত মনোবৃত্তির হানি করিয়া যে অজ্ঞ তিক্ততার সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা কেবল পাকিস্থানের কাঞ্চকলাপের সহিতই তুলনীয়। উৎকল সন্মিলনীর সম্পাদক জীনবক্ক দাস অপর একটি জনসভায় বিহার-সরকারের কাঞ্চকলাপের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন।”

### কাশ্মীর, ভারত ও পাকিস্থান

সম্প্রতি কাশ্মীরের গণপরিষদ কাশ্মীরের সহিত ভারতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভারতে যোগদান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কলে পাকিস্থানে কিছু আন্দোলন হইয়াছে মনে হয়।

“করাচী, ১০ই ফেব্রুয়ারী—কাশ্মীর গণপরিষদ ভারতে যোগদানের অন্তকলে সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহা নাকচ করিবার জ্ঞ জ্ঞেনহককে অমুখোজ্ঞ জানাইয়া পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী তাহার নিকট একপানি পত্র প্রেণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।”

পাকিস্থানের পররাষ্ট্র-সচিব জাকবউল্লা খানও জানাইয়াছেন যে, কাশ্মীর গণপরিষদ অতি গঠিত কাজ করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে পণ্ডিত নেতৃগণ কন্তব্য কি তাহাও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। তবে দু’জনের কেহই মার্কিন রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধান্ত সম্পর্কিত চুক্তি বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতেছেন না। চুক্তি মত অস্ত্র সরবরাহ ও তাহার ব্যবহারের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পরে আবার জেহাদের দামামা বাজিবে কিনা সে বিষয়ে দুই জনই “নিশ্চয়”!

### পূর্ববঙ্গে নির্বাচন

পূর্ববঙ্গে নির্বাচনের পর্ব আরম্ভ হইয়াছে। মুসলিম লীগ এবার শহীদ সুরাবর্দি সাহেব এবং ফজলুল হক সাহেবের দলের প্রতিশ্রুতিভার সন্মূলীন হইয়াছে! বিরোধী পক্ষগুলি পরম্পরের বিরুদ্ধে জোর প্রচার করিতেছেন। তাহার কিছু পরিচয় নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যায় :

“ঢাকা, ২রা ফেব্রুয়ারী—কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা জনাব এ. কে. ফজলুল হক করিমপুরের এক নির্বাচনী সভার বলেন যে, পাকিস্থানের স্বার্থরক্ষার জ্ঞ হিন্দুমত্ৰী নিয়োগ প্রয়োজন হইলে তিনি তাহার মন্ত্রিসভায় হিন্দুমত্ৰী নিয়োগ করিতে বিধা করিবেন না।

সম্প্রতি মুসলিম লীগ মিঃ হকের বিরুদ্ধে এই প্রচারকার্য আরম্ভ করে যে, নির্বাচনে জয়ী হইলে তিনি হিন্দু মত্ৰী নিয়োগ করিবেন।

তিনি জানিতে চাহেন যে, কায়েদে আজম কি তাঁহার মন্ত্রিসভায় শ্রীবোগেন মণ্ডলকে গ্রহণ করেন নাই এবং পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভায়ও কি শ্রীধারিকানাথ বাড়ারী স্থান পান নাই ?

ভাষা সমস্কার উল্লেখ করিয়া মিঃ হক বলেন যে, মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয়ী হইলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাইবে না। তিনি বলেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলিমী এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তাঁহারা গদী পাইলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহারা এই সম্পর্কে কি করিয়াছেন ?

মিঃ হক পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে দারিদ্র্য ও অনশনের কবল হইতে দেশ-বাদীকে রক্ষা করিবেন।”

নির্বাচনে পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুর বিরুদ্ধে অবস্থা ও প্রতিষ্ঠা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। এ পর্যন্ত খবর বাগা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ত ভরসা বিশেষ নাই। হিন্দু নেতারা দলাদলি পুরামাত্রায় করিতেছেন। ফলে নির্বাচনের পরে তাঁহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়াবন্ধুকে পরিণত হইবেন।

### বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক মহাসম্মেলন

গত ১৬ই মাঘ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—আওতোয হলে বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক মহাসম্মেলনের দশম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে আয়ুর্বেদ-শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীহিন্দুভূষণ সেন নিজ অভিভাষণে আয়ুর্বেদ শিক্ষাসম্বন্ধে এই তথ্যগুলি পরিবেশন করিয়াছেন :

“ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই আয়ুর্বেদ চর্চা এখনও অব্যাহত আছে এবং প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যে এখন পাওয়া যাইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, আসামে দুইটি আয়ুর্বেদ শিক্ষালয় আছে। ইহার জঙ্গ ১৯৫১-৫২ সনে ৭৬,৫০০ টাকা সরকারের ব্যয়বরাদ্ধ ছিল।

বিহারে চারিটি আয়ুর্বেদ কলেজ এবং দুই শত আয়ুর্বেদ চতুষ্পাঠী আছে। ইহার জঙ্গ ১৯৫১-৫২ সনে ৫২,১৬৩ টাকা সরকারের ব্যয়বরাদ্ধ ছিল।

বোম্বাইয়ে আটটি আয়ুর্বেদ কলেজ আছে এবং ইহার জঙ্গ ১৯৫১-৫২ সনে ৯৯,৬৫০ টাকা সরকারের ব্যয়বরাদ্ধ ছিল।

মধ্যপ্রদেশ ও বেবোরে ৫৮টি আয়ুর্বেদ শিক্ষালয় আছে। রায়পুর আয়ুর্বেদ স্কুলের জঙ্গ ১৯৫১-৫২ সনে ৫১,৮০০ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ ছিল। ইহা ভিন্ন পূর্বে সরকার ৮৩টি আয়ুর্বেদ ও ইউনানী দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রের জঙ্গ ৭৮ হাজার ২০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে ৬টি আয়ুর্বেদ কলেজ আছে, ইহার মধ্যে একটি সরকারী আয়ুর্বেদ কলেজ। ইহার জঙ্গ ১৯৫১-৫২ সনে ১০,৪২,৮০০ শত টাকা সরকারের ব্যয়বরাদ্ধ ছিল।

উড়িষ্যার দুইটি আয়ুর্বেদ শিক্ষালয় আছে, ইহার মধ্যে একটি সরকারী আয়ুর্বেদ কলেজ। ১৯৫১-৫২ সনে ২,৪৩,৯১৭ টাকা সরকারের ব্যয় বরাদ্ধ ছিল।

উত্তর প্রদেশে নয়টি আয়ুর্বেদ কলেজ আছে। তন্মধ্যে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আয়ুর্বেদ কলেজ ও বাঁসী আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গতম। ইহার মধ্যে পাঁচটি গবর্ণমেন্ট আয়ুর্বেদ কলেজ। ১৯৫১-৫২ সনে ইহার জঙ্গ সরকারের ২১,৮৯,৯৮০ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি আয়ুর্বেদ কলেজ ও দুইটি আয়ুর্বেদ চতুষ্পাঠী আছে। ১৯৫১-৫২ সনে কলিকাতাও তিনটি আয়ুর্বেদ কলেজ-সংলগ্ন হাসপাতালে ৩৫০০০ টাকা সরকার ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আজমীর, দিল্লী, কোচিন, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, জয়পুর, পাতিয়ালা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবাঙ্কুর, বাঙ্গালোর, দক্ষিণ মালাবার প্রভৃতিতে কোন স্থানে একটি, কোন কোন স্থানে একাধিক আয়ুর্বেদ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে জয়পুর, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ-ডেকান ও পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানগুলি গবর্ণমেন্টের।

স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাতীত অঙ্গান্ত প্রদেশে আয়ুর্বেদ প্রসারের জঙ্গ যে চেষ্টা হইতেছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজে বর্তমানে ৮৪১টি দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র আছে, তন্মধ্যে ৫২২টি দেশীয় চিকিৎসাকেন্দ্র। উত্তর প্রদেশের রাজ্য সরকারের গ্রাম্যকলে ৫২০টি দেশীয় চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। হায়দ্রাবাদে ৫২টি আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকেন্দ্র আছে।”

### নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার, ১৯৫২

সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলা পুস্তক ও থিসিসের লেখকদের উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ‘গ্লানাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস-এর ডিরেক্টর কলিকাতা নিবাসী নরসিংদাস আগরওয়ালার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ হইতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে একটি পুরস্কার প্রবর্তন করিয়াছেন। এক হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কার পথায়ক্রমে সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের জঙ্গ প্রদত্ত হইবে। ১৯৫২ সালের পুরস্কার সাহিত্যের জঙ্গ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন বৎসরে নির্ধারিত বিষয়ের জঙ্গ যোগ্য প্রার্থীর অভাব হইলে উক্ত পুরস্কার সাহিত্যের বদলে বিজ্ঞান, অথবা বিজ্ঞানের পরিবর্তে সাহিত্যের জঙ্গ প্রদত্ত হইতে পারে।

যে বৎসরের জঙ্গ পুরস্কার ঘোষণা করা হইবে, সেই বৎসরে প্রকাশিত পুস্তক এবং থিসিসসমূহের মধ্যে নির্বাচনী সমিতি যেটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত করিবেন তাহার রচয়িতাকেই পুরস্কার দেওয়া হইবে। ১৯৫২ সনের ৩০শে জুনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকের লেখক, প্রকাশক এবং লেখকদের অনুরাগী ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেক পুস্তকের আটপানি কপি, বিষয়-নির্বাচনী সমিতির বিবেচনার্থে ১৯৫৪ সনের ২৭শে



কেজরায়ীরা আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার টি. টি. এস আয়ারের নিকট (পোঃ দিল্লী) পাঠাইয়া দিবার জন্য আয়তন জানান হইয়াছে।

### খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ

মহাত্মা গান্ধীর মত ছিল যে, নিয়ন্ত্রণ প্রথাই দেশের বহু অনাচারের আকর। ইহা সত্য যে কালোবাজার ও নিয়ন্ত্রণ প্রথা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। তবে দেশের লোক এখনও সমাজ বা দেশের মঙ্গল অপেক্ষা নিজের স্বার্থকেই অধিক বুঝে, সেজন্য নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে দরিদ্রের সর্বনাশ আরও দ্রুত ও নিশ্চিত হইত। তবে এখন দেবতা কিছু প্রসন্ন হওয়ায় খাদ্যের অভাব ততটা প্রবল নয়। সেইজন্য নিয়ন্ত্রণ সংবাদটি আশা প্রদ:

“বল্লভবিজ্ঞানগর, ৩১শে জানুয়ারী। আজ এখানে এক সাক্ষাৎকারে ভারত-সরকারের খাদ্য-সচিব জৈরুজ্জামিন আহমেদ কিদোয়াই বলেন, ‘সরকারের হাতে দশ লক্ষ টন চাউল মজুত হইবামাত্র চাউলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ আদেশ তুলিয়া লওয়া হইবে।’ তিনি ঘোষণা করেন যে, এক্ষণে দেশে খাদ্যশস্যের আর কিছুমাত্র ঘাটতি নাই।

চাউল বিনিয়ন্ত্রণের জন্য এক্ষণে বিদেশ হইতে সাত লক্ষ টন চাউল আমদানী করা প্রয়োজন। আর বঙ্গবন্ধুরাণের মধ্যেই ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

দেশবাসীর মনে আশা সঞ্চার ও উহা বজায় রাখার জন্যই এক্ষণে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা হইতেছে। বর্তমানে বিশ্বে ৪০ লক্ষ টন চাউল বাড়তি আছে। ভারত এক্ষণে তাহার নিজের দরেই কেবল চাউল আমদানী করিবে।

ভারতে গমের অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক। এক লক্ষ টন গম লওয়া হইবে বলিয়া আন্তর্জাতিক গম বোর্ডকে কথা দেওয়া সত্ত্বেও ভারত এপর্যন্ত এক জাহাজের বেশী গম আমদানী করে নাই।”

জৈরুজ্জামিন বলেন যে, শুধু চাউল বিনিয়ন্ত্রণই নয়, কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যশস্যের তুলিয়া দেওয়াই ভারত-সরকারের লক্ষ্য।

খাদ্য-সচিব বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্য-সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার খাদ্যশস্যের দর চড়া রহিয়াছে; স্বাধীনসময়ে এই সংগ্রহ বন্ধ হইবে এবং তখন হইতেই দর নামিয়া যাইবে। তবে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, খাদ্যশস্যের দর বাহাতে এমন নামিয়া না যায় যে, উহার ফলে চাষীদের ক্ষতি হইতে পারে। চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকার-গুলির উচিত মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করা কর্তব্য।

জৈরুজ্জামিন ঘোষণা করেন যে, এক্ষণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অবিভক্ত ভারতের উৎপাদন ছাড়াইয়া গিয়াছে। শুধু খাদ্যশস্যই নয়, অন্যান্য বহু পণ্যের—বেমন বস্ত্র-উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবিভক্ত ভারতে বার্ষিক প্রায় ৭০ কোটি গজ বস্ত্র আমদানী করিতে হইত, কিন্তু আজ ভারত বঙ্গসরে ঐ পরিমাণ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করিতেছে।

সবই নির্ভর করিতেছে আপাদী বর্ষা-ঋতুর উপর। দেশের

যেকোন অবস্থা, তাহাতে অল্পবজ্রের মূল্য হ্রাস না হইলে রক্ষা নাই। চাউল সম্পর্কে ত সরকারী অধিকারীবর্গ খুব ভরসা দিতেছেন। শুধু বা পশ্চিমবঙ্গের কপালে উড়িয়া ও মধ্যপ্রদেশের ভোজলা ভরা জখন্য কময়! চাউল নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শেষ কথা এইরূপ:

“বোম্বাই, ১লা কেজরায়ী—আজ এখানে এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় খাদ্য-সচিব জৈরুজ্জামিন আহমেদ কিদোয়াই বলেন যে, ভারতে এখন এত চাউল আছে যে, তাহার বর্তমান চাহিদা মিটিয়াও কিছু উত্তর থাকিবে। ‘৫৩-’৫৪ সালে ভারতে ‘৫২-’৫৩ সালের অপেক্ষা অধিক এবং ৫১-৫২ সালের অপেক্ষা ৪০ লক্ষ টন অধিক চাউল উৎপন্ন হইবে। দেশে যে চাউল আছে তাহাতেই দেশের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যাইবে। বস্তুতঃ দেশে এখন এত চাউল আছে যে, ভারত-সরকার চাউলের বেশন বৃদ্ধি করিবার জন্য কয়েকটি রাজ্যকে অধিকতর পরিমাণে চাউল সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাউল মজুত হওয়া মাত্র তিনি চাউলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবেন।”

### কেন্দ্রীয় রাজস্ব

ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রাজস্ব সম্পর্কে নিম্নে উক্ত সংবাদটি বিশেষ প্রাণধানযোগ্য:

“৩রা কেজরায়ী—১৯৫৩-৫৪ সালের প্রথম নয় মাসে সংগৃহীত শুদ্ধের হিসাব হইতে মনে হয় যে, চলতি আর্থিক বৎসরে ভারতের স্থল ও সমুদ্র শুদ্ধের পরিমাণ অনেক কম হইবে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা স্থল ও সমুদ্র শুদ্ধ সংগৃহীত হইয়াছে; অথচ গত বৎসরে (১৯৫২-৫৩) ঐ সময়ে ১২২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। গত বৎসরে সংগৃহীত শুদ্ধের মোট পরিমাণ ছিল ১৬৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা।

সারা বৎসর স্থল ও সমুদ্র শুদ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ অনেকটা একই রকম আছে। তাই মনে হয়, এই বৎসর বর্ষাসাকুল্যে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। বাজেটে স্থল ও সমুদ্র শুদ্ধ সংগ্রহ বাবদ ১৭০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। স্তত্রাং ঘাটতির পরিমাণ অনেক হইবে।

কেন্দ্রীয় রাজস্বের তিনটি প্রধান উৎস হইতেছে—স্থল ও সমুদ্র শুদ্ধ, কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুদ্ধ ও আয়কর। চলতি বৎসরের ৯ মাসে এই তিনটি খাতে আয় হইয়াছে ২৭৭ কোটি টাকা; গত বৎসরে ঐ সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ৩০১ কোটি টাকা।

১৯৫২-৫৩ সালে উক্ত তিনটি খাতে মোট আয় হইয়াছিল ৪৩৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। বর্তমান বৎসরের বাজেটে আয়ের পরিমাণ কম করিয়া ৪২১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে; কিন্তু এ টাকাও সংগৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ।”

যেভাবে আয় কমিতেছে তাহাতে ধরনের সঙ্কট বিশেষ প্রয়োজন এ কথা বলা বাহুল্য। অপব্যয় ও এখনও বহু দিকে হইতেছে তাহারও প্রতিকার আত প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ ভাবে



যে সকল কথাবার্তা—আর ব্যয় সম্পর্কে শুনা যায় তাহাতে এক বিভ্রান্তির পাতের ঢাকা অর্ধেক করিয়া অল্প বিভাগে চতুর্দশ ব্যয়ের দাবিই শুনা যায়। আরও শুনা যায় যে, সর্বোপরি আছে বিশলাকরণী “ডেকিসিট কাইনালি।”

### পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গতি

প্লানিং কমিশন সম্প্রতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালের অর্থনৈতিক বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তিন বৎসর পূর্ণ হইবে। এই তিন বৎসরে মোট খরচ হইয়াছে ৯৯৮ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪১৩ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, ১৯৫২-৫৩ সালে খরচ হইয়াছে ৩২৩.৫ কোটি টাকা এবং ১৯৫১-৫২ সালে হইয়াছে ২৬১.৫ কোটি টাকা। পূর্বে নির্ধারিত হিসাব অনুসারে আগামী বাকি দুই বৎসরে আরও ১০৬৯ কোটি টাকা খরচ হইবে। সম্প্রতি অতিরিক্ত ১৭৫ কোটি টাকা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ধার্য করা হইয়াছে—এই অতিরিক্ত ব্যয়ও আগামী দুই বৎসরে হইবে।

রিপোর্টে পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে আশার কথা বলা হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অতিরিক্ত ৪৪ লক্ষ টন হইয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালে শিল্পজাত দ্রব্যের স্থচীসংখ্যা ছিল ১১৭; ১৯৫২ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১২২-এ এবং ১৯৫৩ সালের প্রথম ষাট মাসে ইহা ছিল ১৩৪-এ। ১৯৫১ সালের শেষে পাইকারী মূল্যমান ছিল ৪৩৩, ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে ইহা নামিয়া আসিয়া ৩৯৩-তে দাঁড়ায়। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ১৩৪ কোটি টাকার ঘাটতি ছিল। গত বৎসরের সমস্ত মাসের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত বহির্বাণিজ্যে ভারতের ৬৪ কোটি টাকার মত উৎপাদ ছিল। সুতরাং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গত তিন বৎসরের তিনটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হইতেছে: (১) উৎপাদন বৃদ্ধি—কৃষি এবং শিল্প; (২) মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও স্থিতি, এবং (৩) আর্থিক স্থিতি-শীলতার সূচনা।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক অসুবিধা সত্ত্বেও প্রতি বৎসরই খরচের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম বৎসর খরচ হইতে রাজস্বের পরিমাণ কিছু উৎকৃষ্ট ছিল। দ্বিতীয় বৎসর ১২০ কোটি টাকার মত বাজেট ঘাটতি পড়ে। যদিও ঐ বৎসর বিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকট ভারত-সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি টাকার মত হ্রাস পায়। প্রথম দুই বৎসরে প্রায় ৪০।৪৫ কোটি টাকার মত ঘাটতি খরচ হয়।

প্রথম তিন বৎসরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি প্রায় ৩০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত কর বাবদ আদায় করিয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে পরিকল্পনার গতি দ্রুত করা হইয়াছে, সেইজন্য রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রদেশগুলিকে অধিকতর পরিমাণে নতুন নতুন

রাজস্বের সংস্থান করিতে হইবে। টাকার বাজারের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে প্রদেশগুলি প্রায় ১২ কোটি টাকা ঋণ তুলিয়াছেন; ১৯৫২-৫৩ সালে ১৭ কোটি টাকা ঋণ তুলিয়াছেন এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৩৯ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বল্প সময়ের ক্ষেত্রে প্রথম দুই বৎসরে ১০৩ কোটি টাকা জমা পড়িয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মতে পাঁচ বৎসরের শেষে স্বল্প সময় পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকা হওয়া চাই। গত তিন বৎসরে প্রদেশগুলি ১৮৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য পাইয়াছে; ইহার মধ্যে ১৬৩ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে এবং ২০ কোটি টাকা অমুদান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

এই তিন বৎসরে ১৩৩ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য হিসাবে ভারতবর্ষ পাইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কোর্ড প্রভিষ্ঠান এবং নবওয়ে হইতে ভারতবর্ষ সাহায্য পাইয়াছে। এখানে বলা নিম্নপ্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতেও অনেক টাকা ঋণ লইয়াছে। নিম্নে পরিকল্পনার কিছু কিছু হিসাব দেওয়া হইল।

#### কৃষি এবং লোকসমাজ পরিকল্পনা

১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ সালে ৪৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাঁচ লক্ষ একর পতিত জমি চাষ-আবাদী করা হইয়াছে। প্রায় ৪৭,০০০ গ্রাম (অধিবাসীর সংখ্যা ৩.৭০ কোটি) জাতীয় বিস্তার-কাঁধাবলী পরিকল্পনার আওতার মধ্যে আনা হইয়াছে। ছোট ছোট সেচ কার্খের সাহায্যে প্রায় ২৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সেচ এবং শক্তি—নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করিয়াছে। নদী পরিকল্পনার দ্বারা প্রায় ৪.২৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

শিল্প—১৯৫০-৫১ সালে স্থতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১৭ কোটি পাউণ্ড; ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপন্ন স্থতার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৫ কোটি পাউণ্ড। গত বৎসর প্রায় ৪,৭০ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। সিমেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে সিমেন্টের উৎপাদন ছিল ২৬ লক্ষ টন, আর ১৯৫২-৫৩ সালে হইয়াছে ৩৫ লক্ষ টন। গত বৎসর সিল্কী সার কারখানার ২.৫২ লক্ষ টন এমোনিয়া সালফেট উৎপন্ন হইয়াছে। চিত্তবর্জন-ইঞ্জিন কারখানার আজ পর্যন্ত মোট এক শতটি ইঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে। টেলিকোন কারখানার ৪০,০০০ টেলিকোন গত বৎসর প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি নতুন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত-সরকার জার্মানীর বিখ্যাত ক্রাৎস্‌কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। ২৪০ মাইল রাষ্ট্রীয় রাজপথ তৈয়ার করা হইয়াছে এবং আরও ৪৫০ মাইল রাজপথ তৈয়ারি করা হইতেছে। প্রদেশ-প্রতিতে প্রায় ৭,২০০ মাইল রাজপথ তৈয়ারি করা হইয়াছে। উপকূল বহন ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে ভারতীয়দের প্রায় ৭৭,০০০ হাজার

টন জাহাজ নিয়োজিত আছে। বর্তমানে উপকূল ব্যবসায় সমস্তটাই ভারতীয়দের কর্তৃত্বাধীন। বিশাখাপত্তনমের হিন্দুস্থান জাহাজ নির্মাণ কারখানায় পরিকল্পনার দুই বৎসরে ৮০০০ টনের ছয়টি জাহাজ নির্মিত হইয়াছে।

সমাজসেবা—পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তুহারাদের ক্যাম্প প্রায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের প্রায় সকলকেই বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ৩৬,০০০ জন এগনও ক্যাম্পে আছে। ইহারা প্রধানতঃ স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধ। পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে আগত প্রায় ২৫ লক্ষ লোককে এখানে চাষবাসে বসতি করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রায় ২৫ লক্ষ লোককে শগবে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের জঙ্গ ভারত-সরকার প্রায় ১,৩৯,০০০ নতুন বাড়ী নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা বাতীত তাহারা ভারতবর্ষ তাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের প্রায় ১,৭২,০০০ বাড়ী পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তুহারাদের দেওয়া হইয়াছে। ১৪'৭ লক্ষ লোককে পুরানো বাড়ী দেওয়া হইয়াছে এবং ৯'১৭ লক্ষ লোককে নতুন বাড়ী দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের জীবিকানির্ভার কার্যে নিয়োজিত হওয়ার জঙ্গ ভারত-সরকার ১১ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন।

পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত প্রায় আড়াই লক্ষ পরিবারকে সরকার চাষবাসে পুনর্বসতি করাইয়া দিয়াছেন। ইহাদের গৃহ-নির্মাণের জঙ্গ নয় কোটি টাকা খণ দেওয়া হইয়াছে। চাষের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জঙ্গও ৮ কোটি টাকা খণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের পুনর্বসতির জঙ্গ প্রায় ১২টি নতুন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

বেকার-সমস্যা—প্লানিং কমিশন বেকার-সমস্যা সমাধানকল্পে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং ইহার জঙ্গ পরিকল্পনার খরচ ১৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নদী-পরিকল্পনা, লোকসমাজ-পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ-কার্যাবলীতে বহু লোক নিয়োজিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বেকার-সমস্যা সমাধানকল্পে পুনর্বসতির জঙ্গ ৪৫ কোটি টাকা খরচ করিবেন, রাস্তা নির্মাণের জঙ্গ দশ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন, অফিস-ঘর ও বাড়ী নির্মাণের জঙ্গ ২'৫ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় ২ কোটি টাকা, কৃষি-উন্নয়ন খাতে ২'১৬ কোটি এবং অন্যান্য বিবিধ পরিকল্পনায় ৮'৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। পুনর্বসতির জঙ্গ পাঁচ বৎসরে মোট ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

### সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার এক বৎসর

একটি সরকারী বিবৃতিতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার এক বৎসরের কার্যের হিসাবনিকাশে বলা হইয়াছে যে, ২৩,৬৫০টি গ্রামের ২ কোটি ১৫ লক্ষ লোক সম্বলিত ২২০টি উন্নয়ন অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। ১৯৫২ সনে ভারত-সরকার সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবার

সিদ্ধান্ত করেন এবং ঐ বৎসরই ২রা অক্টোবর ভারতের ৫৫টি উন্নয়ন-অঞ্চলে পরিকল্পনার উদ্বোধন করা হয়। ১৯৫৩ সনে ভারত-সরকার জাতীয় সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা আরম্ভের যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহাতে পরিকল্পনাকালে ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাম এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে জাতীয় সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা একত্র করিয়া কাজ চলে।

উক্ত বিবৃতি অনুযায়ী প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৩-৫৪ সালে জাতীয় সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার হস্ত ২৩৭টি ব্লক বরাদ্দ করেন। এই দুইটি পরিকল্পনার দ্বারা নিম্নোক্ত সংখ্যক গ্রাম উপকৃত হইবে :

সমাজ-উন্নয়ন ব্লক	পর্লী	লোকসংখ্যা
২২০	২৩,৬৫০	২ কোটি ১৫ লক্ষ
জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক		
২৩৭	২৩,৭০০	১ কোটি ৫৬ লক্ষ

মোট ৪৫৭ ৪৭,৩৫০ ৩ কোটি ৭১ লক্ষ  
সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ এই উভয় পরিকল্পনারই অন্যতম লক্ষ্য কৃষির উন্নয়ন—তবে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কণ্ঠস্বচী আরও ব্যাপক।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জঙ্গ বরাদ্দ ১০১ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম বৎসরের কাজের জঙ্গ সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, “জাতীয় পরিকল্পনা-কালে গড়ে যে টাকা ব্যয় হওয়ার কথা তাহার তুলনায় ইহা কমই।” প্রথম বৎসরে জনসাধারণ যে পরিমাণ কাজ দিয়াছে তাহার দাম অনুমান ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মত। ইহা ছাড়া, নগদে বা অন্যান্যভাবে তাহারা ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছে। তাহাদের মোট দানের পরিমাণ ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। প্রথম বৎসরে অগ্রান্ত অনুবিধার মধ্যে উপযুক্ত কর্মীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

প্রথম বৎসরের কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

২রা অক্টোবর, ১৯৫২	৭৭টি ব্লক
জুন, ১৯৫৩	৬৭টি ব্লক
২রা অক্টোবর, ১৯৫৩	২৩টি ব্লক
৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৩	৫৩টি ব্লক

মোট ২২০টি ব্লক

প্রথম বৎসর কৃষির উন্নতির জঙ্গ পতিত জমি আবাদ, সেচের ব্যবস্থা করা, সার সরবরাহ করা, গবাদি পশুর উন্নয়ন প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আলোচ্য সময়ে পচাই সুর উৎপাদনের জঙ্গ দেড় লক্ষ গর্ভ খনন করা হয়, সাড়ে ছয় লক্ষ মণ সার সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া ২ লক্ষ ১৫ হাজার মণ উন্নত বীজ

বিতরণ করা হইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন অঞ্চলে ৫৪,২৬৮ একর পতিত জমিতে আবাদ করা হইয়াছে। ১,৩০,৩২২ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ৩৭ হাজার একর জমিতে ফল ও তরিতরকারীর আবাদ করা হইয়াছে। ১২টি মূল কেন্দ্র ও ১৫৫টি পশ্চিম চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ১১ লক্ষ গবাদি পশুকে বিভিন্ন রোগের টীকা দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ৯ হাজার কুপ সংস্কার এবং ১৩ শত নতুন কুপ এবং ১২টি নলকূপও স্থাপন করা হইয়াছে। এই সময়ে মোট ৩২১ মাইল কাঁচা রাস্তা ও ১৪৬ মাইল পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে ১৩৬৮টি নতুন বিদ্যালয় খোলা হয় এবং চলতি ২২৫টি বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়, প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য ৩৫৫৬টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় এবং সেগুলিতে ৫২,১৪২ জন শিক্ষালাভ করিতেছে। চিটবিনোদনের জন্য ২৮৬৮টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

জনসাধারণের মধ্যে গৃহযোগিতামূলক মনোভাব জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-উন্নয়ন অঞ্চলে ১০৪৬টি সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ১৫ হাজার গৃহ সংস্কার করা হইয়াছে এবং ১৬৬২টি নতুন গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

প্রথম বৎসরে চার হাজার জন উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী ও অজ্ঞাত শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিলে অনুমান ৮০ হাজার দক্ষ কর্মী ও ৩ লক্ষ অক্ষ সাধারণ কর্মীর প্রয়োজন পড়িবে। গ্রামসেবকদের শিক্ষাদানের জন্য কোর্ড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় খাজ ও কৃষিদপ্তর ৩৪টি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। সেগুলিতে ২৫২২ জন গ্রামসেবক শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং ১৬৫৪ জন শিক্ষারত রহিয়াছে। ৩০৬ জন পরিদর্শন কর্মীর শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে এবং আরও ২৬০ জন শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। ১৯৫৩ সনে সমাজসেবা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নীলোপেরী, হায়দাবাদ, গঞ্জীগ্রাম, শান্তিনিকেতন ও এলাহাবাদে পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এ পর্যন্ত এইসকল কেন্দ্রে ৬৪ জন প্রধান সমাজসেবা-সংগঠক ও ২৫২ জন সমাজসেবা-সংগঠককে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

## দিল্লীতে গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কে রাষ্ট্রসংস্থের

### আলোচনা-চক্র

জানুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভারত-সরকারের আয়তনক্রমে এবং এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের সহযোগিতায় রাষ্ট্র-সংস্থের কারিগরি সহযোগিতা সংস্থা নয়াদিল্লীতে গৃহ-নির্মাণ ও সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। এই সঙ্গে দিল্লীতে একটি স্বল্পমূল্যের গৃহ-প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়াছে। আলোচনা-চক্রে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক দেশগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের গৃহ ও সমাজ-উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা

সম্পর্কে আলোচনা হইবে। নিম্নোক্ত প্রধান তিনটি বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে—(১) গৃহ-নির্মাণের জন্য স্থানীয় মালমশলা ব্যবহার ও তাহার উৎপাদন, (২) গৃহ-নির্মাণ ও সমাজ-উন্নয়ন কল্পসূচী প্রণয়ন-পদ্ধতি এবং (৩) ভূমি-উন্নয়ন-নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেকটি বিষয় লইয়া অনুমান এক সপ্তাহকাল আলোচনা চলিবে এবং আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাথমিক সিদ্ধান্ত-গুলি প্রকাশ করা হইবে।

এই আলোচনা-চক্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় প্রতিনিধি-দল প্রেরণ করিতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসরকার, সমাজ-উন্নয়ন সংস্থা এবং গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কিত অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গও যোগদান করিবেন। হংকং, ইরান, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও মিশর পরিদর্শক প্রেরণ করিবে। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতিনিধি-দল আসিবেন। রাষ্ট্রসংস্থের এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশন, বিশ্বব্যাংক-সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ও শিক্ষাবিজ্ঞান সংস্থাও হইতেও প্রতিনিধি-দল এই আলোচনা চক্রে যোগদান করিবেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য জাপান, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, পুয়েটোরিকো, ইজরাইল ও ভারত হইতে পঞ্চাশটিরও অধিক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংস্থের এই আলোচনা-চক্র স্বতন্ত্র ঘটনা নহে। ১৯৫০-৫১ সালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গৃহসমস্যা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রসংস্থা হইতে একদল বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা হইয়াছিল। ১৯৫২ সালে শিক্ষা-সংস্কৃতিসংস্থা ও ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান মন্ত্রকের উদ্যোগে ঐশ্বর্যপ্রধান দেশের উপযোগী গৃহের নক্সা ও গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কে এক আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৩ সালে টোকিওতে আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তরের যে আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এশিয়ার দেশগুলির গৃহনির্মাণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার কালে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই সকল প্রস্তাবই বর্তমান আলোচনা-চক্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

### ভারতে গৃহ-সমস্যার তীব্রতা

কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠ, গৃহ-নির্মাণ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এস. পি. শঙ্কসেনা ভারতের গৃহ-নির্মাণশিল্প সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন : “১৯৫১ সালের জনগণনা সংক্রান্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া প্ল্যানিং কমিশন যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা হইতে এদেশে গৃহভাবের তীব্রতা বুঝা বাইবে। এদেশে এখন ৪৩ লক্ষ গৃহের প্রয়োজন। যে সকল গৃহের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন দরকার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যে সকল গৃহের দরকার সেগুলি ধরিলে প্রয়োজনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া বাইবে। প্রতি গৃহের জন্য গড়ে তিন হাজার টাকা ব্যয় ধরিলে গৃহ-সমস্যা ব্যাপারটা যে কি বিশাল তাহা ভালভাবে বুঝা বাইবে। মোট ব্যয় হইবে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা।”

এই বিরাট সমস্য়ার সমাধান করা সরকারের পক্ষে একক সম্ভব নহে। সরকার, মালিক, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকলের সহযোগিতায় ঘাড়াই ইহার সমাধান সম্ভব।

বর্তমান গৃহ-নির্মাণ শিল্পের সংগঠনের অভাব এবং ক্রটির উল্লেখ করিয়া শ্রীশকসেনা লিখিতেছেন, এদেশে খুব কম সংগঠিত পাবলিক কোম্পানী আছে, বাহারা প্রচুর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া ল্যাবা মূল্যে মধ্যবিত্তদিগকে বিক্রয় করিবে বলিয়া ভরসা করা বাইতে পারে। বর্তমানে ছোটখাট কনট্রাক্টরের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্রটি অমুযায়ী গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় কনট্রাক্টরেরা সাব-কনট্রাক্টর নিয়োগ করিয়া কাজ করায়। “সেজ্ঞা আজকালকার গৃহ-নির্মাণে শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না।”

“গৃহ নির্মাণের বেশীর ভাগ কাজ একক ভাবেই সম্পন্ন হয়। ফলে উহার উপাদান, নক্সা প্রভৃতির একটা মান নির্ধারণ প্রায়ই সম্ভব হয় না। উপাদানের আকার-প্রকারে খুব বেশী পার্থক্য থাকায়, সেগুলির ব্যাপক প্রস্তুতি হয় না। বিভিন্ন কনট্রাক্টরদের সম্পদ বেশী না থাকায় গৃহ-নির্মাণ প্রণালীর উন্নয়নের গবেষণা চলিবার আশা করা বাইতে পারে না।”

ভারতের গৃহ-নির্মাণ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্ত প্রয়োজন গৃহ-নির্মাণোপযোগী মৌলিক উপাদান, যথা ইট, বালুকা, পাথর ও চুন প্রভৃতির অল্প ব্যয়ে উৎপাদনের উন্নত উপায় নির্ধারণ। কতকগুলি দ্রব্যের মান নির্ণয় করাও একান্ত দরকার। ভারতে যে ধরণের সবজায় ব্যবহার করা হয় তাহা সাবেকী—সেগুলির পরিবর্তে উন্নত এবং আধুনিক সবজায় প্রবর্তন করিতে হইবে। সেজ্ঞা আরও প্রয়োজন হইবে বতমানের অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত নিপুণ শ্রমিক। বাড়ীর মালিকগণ সমবায় সমিতি গঠন করিয়া সহজে অর্থ পাইতে পারেন এবং তাহাতে নূতন গৃহ-নির্মাণের অনেক সুবিধা হইতে পারে। তৎসম্পর্কিত গৃহ-নির্মাণ বিষয়ে গবেষণার ফলাফল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

### পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক কমিশন এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে বহির্কাণিজ্য সম্বন্ধে যে একটি তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট লিপিয়াছেন তাহাতে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক সূচিস্থিত মন্তব্য করা হইয়াছে। রিপোর্টে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কাগজ এবং অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ব্যাগ পাটের চাহিদা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে পাটের এবং পাটজাত দ্রব্যের স্বল্প সরবরাহ এবং বর্ধিত মূল্য পাটের নিয়ন্ত্রণ চাহিদার জন্ত দায়ী। এই সময়ে পাটের মূল্য ক্রমশঃ উচ্চতর হারে বর্ধিত হইতে থাকে এবং ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে যুদ্ধপূর্ব-যুগের তুলনায় ১২ হইতে ১৫ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

এই সময়ে ভারতে পাটের মূল্য বিনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এমনকি ১৯৪৮-৪৯ সনে যখন পাটের মূল্য নিয়মানে ছিল, তখনও গড়পড়তার পাটের মূল্য যুদ্ধপূর্ব-যুগের তুলনায় চার হইতে পাঁচ গুণ পরিমাণে অধিক ছিল। সাধারণ মূল্যমান হইতে পাটের মূল্য অধিক ছিল।

যুদ্ধোত্তর যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্পসংস্থার সর্বোচ্চ উন্নতি সাধিত হওয়ায় শিল্পদ্রব্য বহন করিবার উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং তাহাতে পাটের ধলিয়ার প্রয়োজন হ্রাস পায়। ইহা বাতীত কাগজের ধলিয়ার বর্ধিত ব্যবহার পাটের চাহিদা হ্রাস করিয়া দেয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সনে ধলিয়া প্রস্তুতের জন্ত শতকরা ৩৩ ভাগ পাট ব্যবহার করা হইত, আর ১৯৫০ সনে এইজন্ত মোটে ১৭ ভাগ পাট ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৯ সনে ধলিয়া প্রস্তুতের জন্ত মোটে শতকরা ২৯ ভাগ কাগজ ব্যবহার করা হইত, কিন্তু ১৯৫০ সনে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৬৭ ভাগে।

শুধু কাগজ-ব্যাগই পাটের বড় প্রতিদ্বন্দী নয়, কেনাকা এবং “কলো জুট” ইদানীং পাটের পরিবর্তে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বেলজিয়ান কলোতে, ফরাসী অধিকৃত মধ্য-আফ্রিকায় এবং ব্রিটিশ গায়ানাপ্রদেশে “কলো জুট” বহুত হাড়ে উৎপন্ন করা হইতেছে। বর্তমানে ব্রেন্ডিলে বথেষ্ট পরিমাণে পাটের উৎপাদন হইতেছে এবং ইহা পাট সরবরাহ ব্যাপারে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইয়াছে।

রিপোর্টে তাই সাবধান-বাণী করা হইয়াছে—অর্থাৎ, পাটের বাজারের যুদ্ধে জয় ভারত কিংবা পাকিস্থানের খুব বড় কামা হওয়া উচিত নয়। পাকিস্থানকে রিপোর্ট সাবধান করিয়া দিয়াছে যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পাট পরিস্থিতিতে পাকিস্থানের পক্ষে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ যেন তাহার কাঁচা পাট উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিয়া পাকিস্থান হইতে আমদানী করে। ইহা কিন্তু অত্যন্ত অর্থোক্তিক কথা। ভারতবর্ষ যদি তাহার কাঁচা পাট সরবরাহের জন্ত পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল থাকে তবে পাকিস্থান সর্বদাই যথোপযুক্ত সরবরাহ না করিয়া ভারতবর্ষকে বিব্রত করিতে থাকিবে—যেমন সে এত দিন পর্যন্ত করিয়া আসিতেছে।

পাটের আন্তর্জাতিক বাজার ক্রমশঃ প্রতিযোগিতামূলক হইয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে ভারতের সজাগ থাকা উচিত। পাটের উপর উচ্চহারে রপ্তানী কর আরোপ করিয়া ভারত-সরকার নির্ভরিতায় পরিচয় দিয়াছেন—ইহাতে পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় পাটের মূল্য অত্যধিক হওয়ার ভারতের পাট-রপ্তানী হ্রাস পায়। বর্তমানে পাটের রপ্তানী-কর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহা একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতের উৎপাদন-ব্যয় কম হওয়ার আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, যদি অবশ্য তাহার রপ্তানী-কর বথেষ্ট পরিমাণে কম থাকে।

### বিশ্বসভায় ভারতের ভূমিকা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমস্ত এবং ফ্রেন্সারি অর্থনৈতিক সেক্রেটারী আর. মডলিং গত শবৎকালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কলম্বো পরিকল্পনা পরামর্শ কমিটির অধিবেশনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি-দলের নেতা হিসাবে ভারতে আগমন করেন। প্রজাতন্ত্র-দিবস উপলক্ষে এক বিশেষ প্রবন্ধে মিঃ মডলিং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, জাতিপুঞ্জের তাহার কাজের জগৎ ভারত আজ বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। ভারতের মতামত “সকলের সাধারণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতার জগৎ সে আজ সকলের প্রদ্বার পাত্র হইয়া আছে।”

মিঃ মডলিং লিখিতেছেন : “আজকার এই দিনে যখন ভদ্রতা হিসাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন একটি রীতিমাত্র তখন উল্লেখ করা অবাস্তব হইবে না যে জাতি হিসাবে ভারত কি বিরাট কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন করিয়াছে। আজ বিশ্বের নানা দিক হইতে ভারত যে আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করিবে সেই অভিনন্দনের আন্তরিকতার মূল কারণও হইল ইহাই।”

তিনি বিশেষ করিয়া কোমিয়াতে ভারতীয় বাহিনীর কাজ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সভানেত্রী হিসাবে বিরুদ্ধলক্ষী পণ্ডিতের কার্যের উল্লেখ করেন। কোরিয়ার যুদ্ধবন্দী প্রায় মীমাংসার জগৎ এবং তৎসাবধায়ক বাহিনীর পরিচালকরূপে ভারতের কার্য সম্পর্কে মিঃ মডলিং লিখিতেছেন : “এই ধরণের কৃতিবিগর্হিত এবং অবাস্তিত কাজে জেনারেল থিমায়া এবং জেনারেল থোরাটের পরিচালনাধীন ভারতীয় সৈন্যদল যে অননুকারণীয় বৈদ্য এবং মানবতাবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।”

ভারতবর্ষক প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য দানের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন : “কলম্বো পরিকল্পনাক্ষু কায়গিরি সাহায্য ব্যবস্থাদীনে আমরা দেখিতে পাইয়াছি ভারত কি ভাবে সিংহলকে সাহায্য করিয়াছে শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শ্রমশিল্প এবং বাণিজ্য-বিশেষজ্ঞ দ্বারা এবং কি ভাবে সে গ্রহণ করিয়াছে নিজের তালিমি ব্যবহার অস্ত্র সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যথা পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থী। এই সাহায্য পরিকল্পনাধীনে ভারত এই ভাবে তাহার কর্তব্য পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।”

### সোভিয়েট দেশের প্রাচ্যবিজ্ঞা পরিষদ

মস্কোতে অবস্থিত সোভিয়েট বিজ্ঞান মন্দির ( একাডেমি অব সায়েন্সেস )-এর প্রাচ্যবিজ্ঞা পরিষদ সম্পর্কে এক প্রবন্ধে ডাঃ কে. আন্তোনোভা লিখিতেছেন যে, এই পরিষদে প্রাচ্যভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য লইয়া গবেষণা এবং পর্যালোচনা করা হয়।

পরিষদ হইতে মহাভারতের রুশ ভাষার অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কে চারিটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে : এ. এম্. দিয়াকভ-লিখিত ‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের অর্থনীতি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি’ : কে. এ. আন্তোনোভা-লিখিত ‘আকবরের আমলের যোগল-শাসিত ভারতের সামাজিক সম্পর্কবর্ষী ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কিত প্রবন্ধবাজি’ : এবং এল. আর. গডন-লিখিত ‘ভারতের ১৯১৪-১৯৪৭ সালের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলির কৃষি-বাবস্থা’। প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত তিন খণ্ডে সমাপ্ত ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস প্রকাশেরও উদ্যোগ চলিতেছে।

ডাঃ আন্তোনোভা লিখিতেছেন : পরিষদের প্রাচীন প্রাচ্যগু বিভাগ নিযুক্ত রহিয়াছে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন চীনের ইতিহাস অনুশীলনের কাজে। প্রাচ্যভূখণ্ডের ইতিহাস লইয়া লিখিত অধ্যাপক ভি. আভাদিয়েফের পাঠ্য পুস্তকের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের ইতিহাস।

পরিষদ হইতে একটি উদ্-রুশ অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগেই প্রথম হিন্দী-রুশ অভিধান প্রকাশিত হইবে। বহুদিন ধাবৎ সেপানে হিন্দী, উর্দু ও বাংলাভাষার চর্চা চলিতেছে। বর্তমানে সোভিয়েট ভাষাতত্ত্ববিদগণ তেলুগু, মরাঠি ও তামিল ভাষা লইয়াও গবেষণার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, “প্রাচ্যবিজ্ঞা পরিষদ তিনপানি বৃহৎ সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশের কাজে হাত দিয়াছেন। প্রথম সঙ্কলনের বিষয় হইতেছে প্রাচ্যদেশগুলির কৃষি-সমস্যার আলোচনা ; দ্বিতীয় সঙ্কলন ঐসব দেশেরই শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস সম্পর্কে এবং তৃতীয় সঙ্কলনখানির বিষয়বস্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এতাবৎ ঐসব দেশের ইতিহাস। এই তিনপানি সঙ্কলনই ১৯৫৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। এই তিন খণ্ডেই ভারতবর্ষকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইবে।” বর্তমান বৎসরের প্রথমভাগে বিখ্যাত রুশ ভারতবিদ্যাবিদ আই. মিনায়েফের দুই বারের ভারত সফরের রোজ-নামচা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। উক্ত ডাইরী বা রোজ-নামচার উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের ভারতীয় সমাজের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাচ্যবিজ্ঞা পরিষদের একটি বৃহৎ পুস্তকাগার আছে। তত্ত্বিন্ন পরিষদের হাতে আছে প্রাচীন প্রাচ্যপাণ্ডুলিপির এক বিরাট ভাণ্ডার। হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির এই ভাণ্ডারটি লেনিনগ্রাডে অবস্থিত। ডাঃ আন্তোনোভার প্রবন্ধ অনুযায়ী “এই সুরক্ষিত সম্পদের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান হইতেছে সংস্কৃতভাষায় লিখিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন মঙ্গোলিয়ান পাণ্ডুলিপির অপূর্ণ সংগ্রহ। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে আছে মধ্যযুগের ভারতের পাণ্ডুলিপি, ঔরঙ্গজেবের আমলের কবিতা, বোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের সাধুসন্তদের হুল্লভ চরিত-কথা, দিবানী-বেদিল ও অন্ত্যস্ত গ্রন্থ।”

## সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যালে নৃত্য

সম্প্রতি কলিকাতায় এক সোভিয়েট সংস্কৃতি-সংযোগ স্থাপক প্রতিনিধিদল আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নৃত্যগীতবিদ অনেকই আছেন। অবশ্য ইহারা প্রায় সকলেই সাধারণ শ্রেণীর নৃত্যগীতে পটু। উচ্চাঙ্গের নৃত্যের পরিচয় নিম্নরূপ—

এ. এনিসিমফ লিপিতেছেন : “সোভিয়েট নৃত্যকলার মধ্যে দুইটি বিভিন্ন নৃত্যরীতির মিলন লক্ষিত হয়, একটি লোকনৃত্য, অপরটি উচ্চশ্রেণীর ব্যালে নৃত্য। ইহারা একটি অপরটিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর রুশ ব্যালে নৃত্যের সূক্ষ্মতম কৌশল লোক-নৃত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে এবং অল্পদিকে সোভিয়েট জনগণের লোকনৃত্যের সম্পদ ও প্রকাশভঙ্গীকে আপনার মধ্যে মিশাইয়া লইয়া সোভিয়েট ব্যালে নৃত্য নিজেই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।”

প্রাক-বিপ্লবযুগে ব্যালে নৃত্য শুধু অভিজাতশ্রেণীর মনোরঞ্জন করিত। সাধারণের পক্ষে তাহার কোন বসাম্বাদ গ্রহণ খুবই কঠিন ছিল। তখন সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মাত্র দুইটি অপেরা হাউসে ব্যালে নৃত্য প্রদর্শিত হইত। বিপ্লবের পর এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়নের ত্রিশটিরও অধিক অপেরা হাউসের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া ব্যালে নৃত্য সম্প্রদায় আছে।

ব্যালে নৃত্য রূপ ও যৌবনের কলা। ব্যালে নৃত্য কবিতার সমপোক্তীয়। ব্যালে নৃত্যের মধ্যে দর্শক দেখে সং ও অসন্তের, আলো ও ঙ্গাধারের ধন্দ। ব্যালে নৃত্য মাহুষের মত ভাব ও আবেগকে এবং মনস্তত্ত্ব আদর্শকে প্রচলিত সাধারণ আঙ্গিকের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। নৃত্যের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যালে নৃত্যের চরিত্রগুলি দর্শকের মনের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে নাটক ও সাহিত্যের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রভাব অপেক্ষাও বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। উচ্চশ্রেণীর ৭শ ব্যালে নৃত্যের মধ্যে সোয়ান লেক, গ্লিপিং বিউটি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এনিসিমফ লিপিতেছেন : “ব্যালে নৃত্য এমনই একটি বিশেষ জাতের কলা যে ইহার মধ্যে নৃত্যন আঙ্গিকের প্রবর্তন ও ভাব প্রকাশের মাধ্যম আবিষ্কার খুবই কঠিন কাজ এবং দীর্ঘকালব্যাপী চর্চা ও অভিজ্ঞতার ফলেই তাহা সম্ভব।” তবে সোভিয়েট ব্যালে থিয়েটার উচ্চাঙ্গের ব্যালে নৃত্যের সূক্ষ্মতম পারদর্শিতাকে নৃত্যন বিষয়বস্তুর সহিত মিশাইয়া নৃত্যন ব্যালে নৃত্য পরিকল্পনায় অনেকটা সফল হইয়াছে। এইরূপ আধুনিক সোভিয়েট ব্যালে নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্লিয়ার রেডপপি এবং ব্রোনজ অথারোভী, প্রেকোফিয়েভের সিনড্রেলা এবং রোমিও ও জুলিয়েট প্রভৃতি। পূর্বে ব্যালে নৃত্যের বিষয়বস্তু ভিল রূপকথার কাহিনী। বর্তমানে বলশ্বর থিয়েটার ব্যালে নৃত্যগুরু ডি. লাক্সারভিচ নির্দেশে “পাথরের হুল” নামক এক রূপকথার উপর ভিত্তি করিয়া একটি ব্যালে নৃত্য পরিকল্পনার কাজে রত আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে নৃত্যশিল্পীদের শিক্ষাদানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকার-পরিচালিত মঞ্চো বলশ্বর থিয়েটার সংলগ্ন বিশেষ নাট্যকলা বিদ্যালয়, লেনিনগ্রাদ কিরক অপেরা, ব্যালে থিয়েটার ও অজ্ঞাত কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। আট বৎসরের উচ্চে বালক-বালিকারা এই সকল বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে—শিক্ষাকাল দশ বৎসর। এই সময় নৃত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকা সাধারণ দশসালী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাও পাইয়া থাকে। শিক্ষালাভের সময় তাহারা সাধারণের সম্মুখে তাহাদের নৃত্যপটুতা পরিদর্শনের সুযোগ পায়। প্রতিবৎসর এক বার অথবা দুই বার কনসার্টের আয়োজন করিলে সমগ্র ব্যালেটিকেই মঞ্চস্থ করা হয়।

এনিসিমফ লিপিতেছেন যে, সম্প্রতি ভারতীয় যুব প্রতিনিধিদল যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণে গমন করে তখনই সর্বপ্রথম ভারতীয় নৃত্যকলার সহিত সোভিয়েট দর্শকদের পরিচয় ঘটে। তিনি লিপিতেছেন : “এই পরিচয়ে আমাদের বহু লাভ হইয়াছে এবং আমাদের অতিথিবাণ্ড সোভিয়েট লোকনৃত্য ও উচ্চ-শ্রেণীর ব্যালে নৃত্য দেখিয়া লাভবান হইয়াছেন।

“সোভিয়েট কলা ও সাহিত্যের প্রতিনিধিরা কয়েকবার ভারতে গিয়াছেন এবং সকল সময়েই ভারত হইতে বিবিধ এবং জীবন্ত ধারণা লইয়া ফিরিয়াছেন। এই সব ধারণা শিল্পীর সৃজনশীল কল্পনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি, সোভিয়েট ও ভারতীয় শিল্পীদের সৃজনশীল অভিজ্ঞতার বিনিময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।”

## নেপালে মার্কিন কারিগরি সাহায্য

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক পরিচালনা দপ্তরের এক বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নেপালের মধ্যে কারিগরি চুক্তি অনুসারে নেপালে কীটপতঙ্গাদি নিয়ন্ত্রণ, গবাদিপশুর উন্নয়ন, চাষ-আবাদে বস্ত্রপাতির উন্নয়ন, সেচ ও বরষদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গৃহীত পরিকল্পনায় জরুরী উক্ত দপ্তর ছয় লক্ষ ডলার বরাদ্দ করিয়াছে। বর্তমান বৎসরে উক্ত দপ্তর নয় জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দ্বারা নেপালকে সাহায্য করিয়াছে। গত বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪,২৭,০০০ ডলার সাহায্য করিয়াছে এবং নেপাল পাঁচ লক্ষ টাকা এই সকল পরিকল্পনায় নিয়োগ করিয়াছে।

## বিহারে বাংলা ভাষার প্রতি অবিচার

সম্প্রতি পাণ্ডতাল পূর্বগণা পরিভ্রমণ কালে বিহারের রাজস্বমন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় বলেন যে, বাংলা ভাষার প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন অথবা বিদ্বেষ পোষণ বিহার-সরকারের অভিপ্রায় বা নীতি নহে। তিনি বলিয়াছিলেন, “রাজ্য গবর্নমেন্ট বাংলা ভাষা—বন্ধিত্বের ববীন্দ্রনাথের ভাষা দমন করিতে চাহিতেছেন একথা চিন্তা করা পাগলামি মাত্র।”

এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ‘নবজাগরণ’ লিখিতেছেন,



“শুধুই বোঝা যাইতেছে যে বাউগারী কমিশন গঠিত হইবার পর বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের জনসাধারণের বঙ্গভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া বিচলিত রাজস্ব-সচিব মহাশয় বিহারের বঙ্গভাষাভাষীদের প্রবোধ দিবার অভিযানে নিগত হইয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞার শত ধোঁতেন মলিনত্ব ন মুক্তে। এই সময়েও কৃষ্ণবল্লভ বাবু তাঁহার ও তাঁহার সরকারের অতীত চক্রান্তের কথা গোলাগুলি স্বীকার করিয়া যদি বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া তাহাদের দাবি পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে বিহার-সরকারের সদিচ্ছায় কথঞ্চিৎ আস্থা জন্মিবার সন্যোগ হইত। কিন্তু এখনও তাহারা নির্ভীক মিথ্যা বলিয়া চলিতেছেন।”

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, সিংভূমে বাংলা ও উড়িয়া-ভাষীদের উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছে তাহা কৃষ্ণবল্লভ বাবুর অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। “এমনকি ইহাও আমরা জানি যে প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে ধলভূমের ভূমৈক নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীর কাছে তিনি এই কথা স্বীকার করেন যে দলীয় রাজনীতির জন্য তিনি ধলভূমের ভাষা স্বাধীন অভিযোগ দূর করিতে ও নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে অসমর্থ। জনসাধারণের স্মৃতি ক্ষীণ, কিন্তু কৃষ্ণবল্লভ বাবু বত সহজে তাহাদের বিভ্রান্ত করিবেন ভাবিতেছেন, ব্যাপার তত সহজ নহে।

“আসলে সমস্যা কি? বিহারে বাংলা বা উড়িয়া-ভাষীরা কোন নূতন অধিকার বা বিশেষ দাবি জানায় নাই। ইংরেজ আমল হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষার ও পরীক্ষার মাধ্যম ছাত্রদের মাতৃভাষা ছিল। ভামসেনপুর ও পুরুলিয়া ইত্যাদির আদালতেও সরকারী কাছকক্ষে বাংলা ভাষা চলিত। স্বরাজী বিহার-সরকার সেই অধিকার হইতে বাংলা ও উড়িয়া-ভাষীদের বঞ্চিত করিতে এই আন্দোলন দানা বাধিয়াছে। সরকারের নিমাত্মলভ আচরণে বাংলা ও উড়িয়ার দাবি প্রবল হইয়া স্থানীয় জনসাধারণের মনে অস্ত্র প্রদর্শনে যুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা সঞ্চিত করিয়াছে।” উপরন্তু কৃষ্ণবল্লভ বাবুর এই জাতীয় মিথ্যাভাষণ এবং প্রাদেশিকতার বিবে অর্জিত কার্যকলাপে বাংলা ও উড়িয়া-ভাষাভাষী জনসাধারণ বৃষিতেন যে, কৃষ্ণবল্লভবাবু-প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে-সরকারের কর্ণধার, তাহার নিকট জায় বিচার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

### মানভূমের “টুঙ্গপর্ব” ও বিহার-সরকার

“মুক্তি” পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীঅশোক চৌধুরী লিখিতেছেন :

“টুঙ্গ বা ‘তুঙ্গ’ পর্ব মানভূমের একটি বিশিষ্ট পর্ব। গুণবান স্বামী ও ধন-ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে কুমারীরা টুঙ্গদেবীর পূজা করে এই ব্রত পালন করে। অজ্ঞহারণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালনের কাল। কিন্তু ‘টুঙ্গ’ পর্বের জের সাধারণতঃ বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ সিংহান পর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত ‘তুঁব-তুঁব’ বা ‘তোষলা’ ব্রতই মানভূমে ‘টুঙ্গপর্ব’ নামে পরিচিতি।”

“মানভূমের জনজীবনে ‘টুঙ্গপর্ব’ একটি সামাজিক অমুহুর্তের রূপ ধারণ করেছে। তাই এই লৌকিক ব্রতের ছড়া ও গান

অন্ততঃ লোকসঙ্গীত রুম্বের মতই লোকপ্রাণী হয়ে উঠেছে। এর ভাবসম্পাদ এবং রচনাসম্ভার নির্দিষ্ট কোন গম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। চলমান জীবনের নিতানূতন ঘাত-প্রতিঘাত ও বৈচিত্র্যময় ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে নূতন রূপ ও রস সংগ্রহ করে আত্মপ্রকাশ করে।”

বর্তমান বৎসরে ‘টুঙ্গপর্ব’ উপলক্ষে রচিত কতকগুলি গানে বিহার-সরকারের ভাষাবৈষম্য-নীতির নিন্দা করা হয়। এই সকল গান ‘টুঙ্গ’ গানে মানভূম শীর্ষক একটি পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া লোকসেবক সজ্জ্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন এবং বিহার-সরকারের বাংলাভাষা উচ্ছেদনীতির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রামে টুঙ্গ গানের দল প্রেরণ করেন। গত ৯ই জানুয়ারী বধুনাথপুরে টুঙ্গ গান করিবার সময় একদল কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই গ্রেপ্তারের নিন্দা করিয়া ১২ই জানুয়ারী এক বিবৃতিতে লোকসেবক সজ্জ্বের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, এই গ্রেপ্তারের ফলে জনসাধারণের সামাজিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। বিহার-সরকার “টুঙ্গ গানে মানভূম” পুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করেন নাই। সুতরাং গানের বিষয়বস্তুর জন্য নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এই গ্রেপ্তারের ফলে বিহার-সরকারের সাম্রাজ্যবাদমূলক মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পরদিন ১৩ই জানুয়ারী পুরুলিয়া শহরে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের পরিচালনায় একদল কর্মী যখন টুঙ্গ গান গাহিয়া যাইতেছিলেন তখন তাহাদিগকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। সজ্জ্ব-সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ এই সম্পর্কে থানা অফিসারের সঙ্গিত এক সাক্ষাৎকারে নিরাপত্তা আইন অনুসারে সরকারের নিকট বিনা নোটিশে যে কোন গোডায়াত্রা নিষিদ্ধ এই সরকারী যুক্তি পণ্ডন করিয়া বলেন, “চিরাচরিত প্রথায় সমগ্র জেলার লক্ষ লক্ষ লোক শত শত ব্যক্তির দলে একত্রিত হইয়া গান গাহিয়া শোভাযাত্রা করিয়া টুঙ্গ-পর্বের সমবেত হইয়া পর্ব উদ্‌যাপন করেন। এই বিরাট জনসমষ্টির চিরপ্রচলিত প্রথার উপরে ত নিরাপত্তা আইন প্রযুক্ত করা যাইবে না। তাহা হইলে লোকসেবক সজ্জ্বের কর্মীদের টুঙ্গ গানে আপত্তি কি জন্য—উহা কি গানের বিষয়বস্তুর জন্য? উত্তরে থানা অফিসার বলেন—না তজ্জ্ব নহে, সরকারে না জানাইয়া যে-কোনও ভাবে হউক দলবদ্ধভাবে যাতায়াত নিরাপত্তা আইনে নিষিদ্ধ। সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে বিনা সংবাদে যে কেহ গান গাহিয়া দলবদ্ধ ভাবে চলিবে তাহাদের ধরা হইবে।” (“মুক্তি” ৪ঠা মাঘ, পৃ: ৬।) উত্তরে অরুণবাবু বলেন যে, ১৬ই জানুয়ারী যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী সহস্র সহস্র মেলায় ও স্নানঘাটে দলবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিবে—সরকার কোনক্রমেই তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না—করিবেনও না। কেবলমাত্র সর্দারী রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকসেবক সজ্জ্বের কর্মীদের উপর হামলা চালান হইতেছে।

এ তারিখেই (১৫ই জানুয়ারী) পুরুলিয়া আদালত-প্রাঙ্গণে



চৌকিদারী আপিসের সম্মুখস্থ বাস্তার উপর জনৈক কোর্ট ইনস্পেক্টর একটি টুসুর গানের দলের কয়েকজন কর্মীর ও লোকসেবক সজ্জের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষকে প্রহার করে এবং পরে অরুণ বাবু ও বাল্লোয়ানের ঋষি নিবারণচন্দ্র বিজাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীমুখী বসু সহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে—এই মধ্যে “মুক্তি”তে প্রকাশিত সংবাদে আরও জানা যায় যে, “অরুণ বাবু যখন ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছেন তখন তাঁহার সাইকেলটি বৃচন মাহাত নামে একটি কর্মীর নিকট রাখিয়া তিনি কোর্ট ইনস্পেক্টরের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন, কোর্ট ইনস্পেক্টর সাইকেলটি বৃচন মাহাতের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। বৃচন মাহাত ছাড় না, তখন কোর্ট ইনস্পেক্টর বৃচন মাহাতকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া চড়াপড়, ছুতাপারে ঢেঁকর ও লাথি মারিতে থাকে এবং সাইকেলটি ছিনাইয়া লইয়া যায়। এই সাইকেলটিতে অরুণবাবুর একটি ঝোলা বাঁধা ছিল, তাহাতে টাকা এবং বহু দরকারী ও মূল্যবান কাগজপত্র ছিল। ঝোলাসহ সাইকেলটি আপিসে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে পুলিশ স্বেচ্ছামত কাগজপত্র বাহির করিয়া তাহা রাখে। পরে ঐ সমস্ত কাগজের একটি অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত লিষ্ট তৈরি করিয়া কেবল লিষ্টটি, টাকা ও সাইকেলটি ফিরাইয়া দেওয়া হয়।” (“মুক্তি” ৪ঠা মার্চ, পৃ: ১১।) ঐ দিনই বৃচন মাহাত কোর্ট ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে এস. ডি. ও’র নিকট প্রহার, লাঞ্ছনা প্রভৃতির অভিযোগ করিয়া এক দরখাস্ত দাখিল করে।

পুলিস অরুণ বাবুদের বিরুদ্ধে আদেশ জ্ঞাপন করা, আসামী ছিনাইয়া লওয়া, সরকারী কার্যে বাধা দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগ আনিয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, “অরুণ বাবু প্রভৃতিকে পুলিশ হাজত হইতে জেল, জেল হইতে পুলিশ হাজত ও কোর্ট সর্বত্রই হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়। হীরু সিং প্রভৃতির দলটিকে বিচারের সময় এজলাসেও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রাখা হয়। তাহাদের পক্ষের উকীল প্রতিবাদ করিলে দড়ি খুলিয়া দেওয়া হয়।

“লোকসেবক কর্মী বাহাদুরই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া-আসা করা হইতেছে।

“১৭ই জাম্বুয়ারী হইতে একটি নূতন সরকারী ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। মানভূম জেলায় ও পুর্নালিয়া শহরে সহস্র সহস্র লোক দল বাঁধিয়া টুসুর গান গাহিয়া শোভাযাত্রা করিলেও বাছিয়া বাছিয়া লোকসেবক সজ্জের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নামে জন-নিরাপত্তা আইন (বিহার মেটেনেন্স অব পাবলিক অর্ডার) অমুখ্যারী সমন জারী করা হইতেছে।”

সরকারী হামলা সত্ত্বেও টুসুর গান গাওয়া বন্ধ হয় নাই। ২ই হইতে ১৩ই জাম্বুয়ারী পর্যন্ত তিনটি দলকে ধরিয়াই সরকারকে ক্ষান্ত হইতে হয়। এক বিবৃতিতে শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন যে, সরকার সোভাপথে সত্যপ্রতীদগকে কিছু করিতে না পারায় তাহারা

বাছিয়া বাছিয়া লোকসেবক সজ্জের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা আইনে মামলা রুজু করিয়াছেন। সেইজন্য “টুসুর পক্ষের কার্যধারা উদ্ভাষিত হইয়া আসিলেও শৈবাচাচারের অন্ত্র এই নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম স্থায়ীভাবে জাগ্রত ও অব্যাহত থাকিবে এবং গণশক্তি ও সত্যপ্রতীকের বলে আমরা আমাদের কাজ নিয়ত উদ্ভাষান করিয়া চলিব ইহাই আমাদের সঙ্কল্প।” (“মুক্তি” ১৮ই মার্চ)

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষের গ্রেপ্তারের নিন্দা করিয়া এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে “মুক্তি” লিখিতেছেন, “অতুল বাবু বর্তমান বয়স ৭৪ বৎসর। সংবাদপত্রে পি-টি-আই কর্তৃক রিপোর্টে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর বলা হইয়াছে—ইহা ভুল। পি-টি-আই কর্তৃক পরিবেশিত উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, ‘অননুমোদিত শোভাযাত্রা পরিচালনা কালে তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।’ একটি দল টুসুর গান গাহিয়া শহর পরিভ্রমণ করে—তিনি তাহার নেতৃত্ব করেন। ইহা বাস্তবিকই আইন বিরুদ্ধ কিনা এবং তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কোন প্রশ্ন আসে কিনা তাহা বিচারের বিষয়। এ সম্বন্ধে পি-টি-আই পূর্বাভাসে সঠিক একটা মতামত দেওয়াতে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।”

কল্যাণী কংগ্রেসে সীমানা কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিচারের প্রতিনিধিরা যে আচরণ ও মনোভাব প্রকাশ করেন তাহা এরূপ নিন্দাহ ও গ্লানিজনক রূপ ধারণ করে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত প্রতিনিধিরা সমন্বয়ে তাহার দিকার দিতে থাকে। প্রকৃত অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র স্তরায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বাংলাতে বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতাতে মানভূমের টুসুর সত্যপ্রতীকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বাংলাতে লক্ষ লক্ষ বিহারী বহিয়াছেন কিন্তু বাংলা গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের ভাষা বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনদিনই চিন্তা করিয়া ত করেন নাই বরং তাহাদের বিকাশের জল্পই সমস্ত সুযোগ দিয়াছেন। বিহারের প্রতিনিধি বারংবার বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা বাংলায় বক্তৃতা শুনিবেন না, হিন্দীতে বলিতে হইবে। তাহাদের অভ্রান্ত আচরণে সভাপতি নেহরু বলিতে বাধ্য হন যে বাংলাতে যাহারা বক্তৃতা শুনিতে চান না তাঁহারা যেন সভাকক্ষে হইতে বাহির হইয়া যান এবং বাংলা শিখিয়া যেন কংগ্রেসে আসিয়া যোগ দেন।

এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়া “মুক্তি” লিখিতেছেন :

“আমরা বিহারের কতিপয় প্রতিনিধির আচরণের সামান্য নমুনা উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। ইহাদের মুখপাত্ররূপে শাহ মহম্মদ ওমরের গরম বক্তৃতা ও শ্রীজগৎনারায়ণলাল প্রভৃতির অতি নিয়ন্তরের ভাষণ ও তাহাদের অনুচরদের আশ্রয় বিহারের সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ খানিকটা সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

“এবারকার কল্যাণী কংগ্রেসের ইহাই অজ্ঞতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।”

৪ঠা মার্চের সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরও বলা হইয়াছে, “বিহার সরকারের দমননীতির দ্বারা মানভূমের জনসাধারণকে চ্যালেঞ্জ করা

হইয়াছে—ইহা ইহার একটি দিক। ইহার আরও দিকগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, গান্ধীজীর আদর্শ, গান্ধীজীর কল্পনা বা তাঁহারই অভীষ্টিত স্বরাজ—জীবনের অধিকার, কর্তব্য ও লক্ষ্যকে সংগ্রামে আহ্বান করা হইয়াছে। সর্বোপরি ভারতীয় সংবিধানানুযায়ী স্বাধীন ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারকেও এই মানভূমে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। মানভূম এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছে।

“গভসে একটা অন্ধ সাম্প্রদায়িক উন্নয়নতায় স্বাধীন ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধীকে স্বাধীন ভারতেই হত্যা করিয়াছিল। কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট তাহাকে বিচারে ফাঁসী দিয়াছেন। এই স্বাধীন ভারতবর্ষেই অন্ধ সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়নতায় স্বাধীনতা ও গান্ধীজীর আদর্শের ধাবক ও বাহক কর্মীদের দমন করিবার জন্য যে বিহার কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট ‘জননিরাপত্তা’ আইন ও অস্ত্রাস্ত্র উপায় প্রয়োগ করিয়া গান্ধীবাদকে ও ভারতের স্বাধীনতাকে হত্যা করিতেছে তাহার বিচার হইবে না বলিয়া যদি কেহ আশ্বস্ত থাকেন তবে তাহা ভুল। গণ-নারায়ণের সুদর্শন চক্র অবিশ্রান্তই ঘুরিতেছে। ইহা কাহাকেও বাদ দেয় না, শুধু সময় পূর্ণ হইবার অপেক্ষা রাখে মাত্র।”

### করিমগঞ্জের ষ্টীমার কোম্পানীর স্বেচ্ছাচার

কলিকাতা হইতে কাছাড় অধিকাংশ মাল আমদানী হয় ষ্টীমার মাধ্যমে; কারণ আসাম লিঙ্ক লাইনে মাল পাঠাইবার নানারূপ অসুবিধা। এলা মাঘের “যুগশক্তি”র এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৩ই জানুয়ারী ষ্টীমার কোম্পানী করিমগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতিতে জানাইয়া দিয়াছে যে নগরী জল কমিয়া চড়া পড়ার দরুন কোম্পানী অতঃপর আর কোন মাল বহন করতি সক্ষম হইবে না।

“যুগশক্তি” এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ষ্টীমার কোম্পানীর এই স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা করিয়া লিখিতেছেন, বহুদিন হইতে জলপথে ষ্টীমারে মালপত্র আমদানী রপ্তানী ব্যাপারে নানারূপ অসুবিধা জনসাধারণকে ভোগ করিতে হইতেছে এবং বারংবার আবেদন সত্ত্বেও তাহার কোন প্রতিকার করা ষ্টীমার কোম্পানী প্রয়োজন মনে করে নাই। আসাম লিঙ্ক লাইনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় নিরুপায় জনসাধারণকে এই সকল অবিচার বাধা হইয়া সহ্য করিতে হইতেছে। সমগ্র কাছাড় ও লুসাই পাছাড় জেলা, জিপুরার অধিকাংশ স্থান, মণিপুর ও আসামের কিয়দংশ বেশী ভাগ নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবোর জন্য করিমগঞ্জ বাজারের উপর নির্ভরশীল এবং করিমগঞ্জ বাজারের মালের একটি বিরাট অংশ পাকিস্থানের মধ্য দিয়া ষ্টীমার-যোগে কলিকাতা হইতে আসে। ষ্টীমার কোম্পানীর অব্যবহার জন্য বখারীতি মালপত্রাদি না আসায় গত কয়েক সপ্তাহ হইতে করিমগঞ্জ বাজারে তৈল, চিনি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ দুল্লভ ও দুর্লভ হইয়া উঠে। তৈলের মূল্য ৮০ টাকা হইতে ১০০ টাকার দায়, কিন্তু তাহাও দুস্তাপ্য হয়। চিনির দাম ৩৭০৮ টাকা এবং খুচরা ১ টাকার উঠে। সংক্রান্তির বাজারে মকমলের পাইকাররা মাল না পাইয়া কিরিয়া বান।

“যুগশক্তি” লিখিতেছেন, “অসুস্থান” করিয়া জানা গেল যে

সংক্রান্তি উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের প্রায় দ্বাস্থানেক আগেকার অর্ডারী বহু তৈল ষ্টীমার কোম্পানীর অব্যবহার দরুন আসে নাই।”

ষ্টীমার কোম্পানী নদীতে জল কমিয়া বাওয়ার যে সূক্তি দেখাইয়াছে সেই সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে নদীকে চালু রাখিবার জন্য ষ্টীমার কোম্পানীর পরিপূর্ণ নিশ্চেষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়া “যুগশক্তি” লিখিতেছেন, “দেশ বিভাগের পূর্বকালে ষ্টীমার কোম্পানী প্রতি বৎসর হেমন্তে জু-ইলার আনিয়া নদী খোদাই করিতেন, ফলে জাহাজ বার দ্বাস এই নদীতে চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার পর ষ্টীমার কোং এই খাতে পাই পয়সাটা পর্যন্ত খরচ করেন নাই। স্থানে স্থানে নদীতে বেগুনি দ্বারা নদীর স্রোত অব্যাহত রাখা হইত। কিন্তু তাহাও গত ৫৬ বৎসর ধাবৎ বন্ধ।” ষ্টীমার কোম্পানী এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি পুনঃপুনঃ এই দিকে আকৃষ্ট করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অবস্থার উন্নতি বিধানের কোন চেষ্টা হয় নাই।”

ষ্টীমার কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবোর অভাব এবং দুর্লভতার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যগুলি রপ্তানী করা সম্ভব হইতেছে না—ফলে জনসাধারণ যে ব্যাপক অর্থ নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন পত্রিকাটি সরকারকে অবিলম্বে সে সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

### বনগাঁতে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি

১৯৩২ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল এক্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের এক সাম্প্রতিক নির্দেশে বনগাঁতে ১৫ জন কমিশনার লইয়া একটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইয়াছে। পূর্বেই সরকার বনগাঁ শহরে একটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বর্তমানে তাহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল।

### মেদিনীপুরের পথ-ঘাটের অব্যবস্থা

মেদিনীপুরের রাস্তাঘাটের বিভিন্ন অসুবিধা এবং বর্তমান ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে “মেদিনীপুর পত্রিকা” লিখিতেছেন :

“মেদিনীপুর জেলার রাস্তাঘাট সঙ্কটে বলতে গেলে কোন্টিকে বাদ দিলে কোন্টিকে বলব সেইটাই সমস্যা। ময়নার রাস্তাঘাট সম্পর্কে বহু দিন সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কাঁধি এবং তমলুক মহকুমায় যদিও-বা কিছু সংস্কার বা নূতন রাস্তা হয়েছে, সদর মহকুমা ও ঘাটাল মহকুমা যেন অভিতাবকহীন। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম অঞ্চলের রাস্তাঘাট সঙ্কটে যেখানে সর্বোপরি নজর পড়া উচিত ছিল সেখানেই নজর পড়ছে না, ফলে প্রদেশ পুনর্সংস্কারের ক্ষেত্রে এই অংশের একটা জনমত যদি বিরূপভাবে পোষণ করে আমরা বলব তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী জেলার সরকারী দল এবং সরকারী ব্যবস্থা।”

পাঁশকুড়া-ঘাটাল রাস্তা নির্মাণ অনেক উত্তোপ-আয়োজনের পর ধামাচাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বহু লোকের জমি দখল করিবার পর এখন সরকারী উত্তোপে ভাঁটা পড়িয়াছে।

“যেখানে আমরা আশা করিয়াছিলাম খড়সপুর থেকে কলিকাতা

পর্যাপ্ত ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হওয়া উচিত, মেচাদা থেকে দীঘা পর্যাপ্ত রেল-লাইন পাঠ্যের ব্যবস্থা হওয়া উচিত, কলিকাতা হইতে দীঘা পর্যাপ্ত সরাসরি মোটর চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা ও যোগাযোগ অবিলম্বে স্থাপন এবং ট্রেট বাস রুট প্রবর্তন করা উচিত সেখানে জেলাভাষ্যে সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা দূবে থাকুক, ব্যাহত বা বিলম্বিত করার পক্ষে নিশ্চয়ই কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।”

### পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলে অপরাধ-নিরোধ ব্যবস্থা

২৮শে জানুয়ারী “সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ” পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে গ্রামাঞ্চলে অপরাধ-নিরোধের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মহা-আরক্ষা পরিদর্শক শ্রীতীরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন যে, উপযুক্ত সংবাদ না পাইলে পুলিশ ফলপ্রসূ কর্মতৎপরতা দেখাইতে পারে না। বর্তমান পর্যাপ্ত চৌকিদার এবং দফাদাররা প্রত্যক্ষভাবে পুলিশের অধীন ছিল ততদিন পর্যাপ্ত পুলিশ বখারীতি গ্রামাঞ্চলের সমুদ্র সংবাদাদি পাইত। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে চৌকিদাররা মাসে মাত্র একবার থানায় হাজিরা দেয়। ফলে পুলিশের সংবাদ সংগ্রহে বাধাঘাত সৃষ্টি হয় এবং গ্রামাঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রাম্য প্রতিরোধ বাহিনী গড়িয়া তুলিবার পর হইতে অপরাধের সংখ্যা অবশ্য হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৫০ সনে যেখানে ১৬৭৬টি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছিল ১৯৫১ সনে কমিয়া তাহার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪২৮ এবং ১৯৫২ সনে ১০৮৭। ১৯৫৩ সনের ১৪ই নবেম্বর পর্যাপ্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ডাকাতির সংখ্যা আরও হ্রাস পাইয়া ৬৯৩টিতে দাঁড়ায়। আজ প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটি বকী দল আছে।

নতুন ব্যবস্থার প্রতিরোধী দলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং গ্রাম্য জনসাধারণ যত্নে আরও বেশী উপকৃত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রাম্য প্রতিরোধী দলে একজন করিয়া সংবাদ-সংগ্রহকারী অফিসার নিযুক্ত হইবেন। প্রতিরোধী দলের নেতা দলের মধ্য হইতে বাংলা লিখিতে ও পড়িতে জানেন এইরূপ একজন বিশ্বাসযোগ্য সভাকে সংবাদ-সংগ্রহক নিযুক্ত করিবেন এবং এই নিয়োগের সংবাদ সকল গ্রামবাসীকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। সংবাদ-সংগ্রহক ডাকযোগে এবং চৌকিদার ও দফাদারদের থানায় হাজিয়ার দিন তাহাদের মারকত সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি, নামজাদা হুট লোকদের সহিত অন্তরঙ্গ আগন্তকের উপস্থিতি, নামজাদা হুট লোকদের অস্থপস্থিতি বা অস্বাভাবিক আচরণ, ছোটগাট মারামারি, অস্থিতি বা অস্থিরতা সভা—সভার আলোচ্য বিষয়, সন্দেহজনক মৃত্যু, ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্ধান, অস্থিতি অপরাধের সংক্ষিপ্ত সংবাদ ইত্যাদি থানায় পাঠাইবেন। প্রয়োজন-বোধে টেলিগ্রাম বা বিশেষ দ্রুত মারকতও সংবাদ প্রেরণ করা হইতে

পারে—এই সকল ব্যয় বহন করিবেন রাজ্য সরকার। কালক্রমে এই সংবাদ-সংগ্রহকপণ গ্রামে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীতীরেন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্বের দিনে, ইংরেজের শাসনে বাড়ালী নিরস্ত্র নির্বীণ হইবার পূর্বে, এই জাতীয় ব্যবস্থাই অনেক স্থলে ছিল। ইহাতে গ্রামবাসী শুধু যে অত্যাচার নিরোধ করিতে পারে তাহাই নহে, ইহার ফলে সে ক্রমে স্বাবলম্বী হইতে শিখে।

### পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ভূদান যজ্ঞের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে ২৯ লক্ষ একরেরও বেশী জমি সংগৃহীত হইয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বর পর্যাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে মোট ৪৫২ একর জমি সংগৃহীত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে ১৫২৬ একর জমি। ৩রা মাঘ নতুন বাংলা সাপ্তাহিক “ভূদানযজ্ঞ” এই সংবাদ পরিবেশন করিয়া লিপিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত জমির পরিমাণ নিম্নরূপ :

জেলা	৩১ ডিসেম্বর পর্যাপ্ত মোট প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ( একর )	দানপত্রের সংখ্যা
মেদিনীপুর	১৭৯'৬০	৫০১
নদীয়া	৭৩'৮১	—
মালদহ	৬৩'৫৬	২০
২৪ পরগণা	৪৩'৪৭	৬১
বীরভূম	৬৯'৪২	২২
পশ্চিম দিনাজপুর	১৫'৬৩	৪
হুগলী	১৫'৫০	১৩
বর্ধমান	১২'২৫	১
হাওড়া	৩৮'১	১৩
বাঁকুড়া	৩'১৫	৪
মুর্শিদাবাদ	১'৬৫	—

আমরা পূর্ববর্তী এক সংখ্যার সমগ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে কি পরিমাণ জমি পাওয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব প্রকাশ করিয়াছি।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

লেখকগণের লেখা কেবল হইতে হইলে লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকা আবশ্যিক। কোন-কিছুর উত্তর পাইতে হইলে তাঁহারা অস্থগৃহপূর্বক রিগ্রাই-কার্ডে চিঠি লিখিবেন। কবিতা বাঁহারা পাঠান তাঁহাদের প্রতিও এই অনুরোধ। তবে তাঁহারা দয়া করিয়া কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। বৃক্ষপোটে প্রেরিত লেখা সব সময় আপিসে নাও পৌঁছাইতে পারে।

পত্রিকার গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, কাগজ-প্রাপ্তি, ঠিকানা পরিবর্তন, টাকাকড়ি প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠিপত্র ‘ম্যানেজার, প্রবাসী’র নিকট প্রেরিতব্য।

# সংস্কৃত শিক্ষা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

উপক্রমণিকা।

আজকাল সংস্কৃতজ্ঞগণকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ফেলিতে পারা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। প্রাচ্যগণ জ্যেষ্ঠ, আর পাশ্চাত্যগণ কনিষ্ঠ। কিন্তু ইহাতেই কোন দলকে উৎকৃষ্ট বা অপর দলকে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। জ্যেষ্ঠরাও কখনো নিকৃষ্ট এবং কনিষ্ঠরাও কখনো উৎকৃষ্ট হইতে পারেন। যাহা চোখে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অপলাপ করা সম্ভব নহে। ঘেষ করিয়া লাভ হয়ই না, বরং অনর্থই হয় বেশী। ইহাদের উভয়েরই যোগ আবশ্যক। ইহাতেই সংস্কৃতের অভূদয়ের সম্ভাবনা।

তত্ত্বনিষ্ঠ:

এখানে একটা কথা অবশ্য বক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। আপনারা অনুগ্রহপূর্বক অনুধাবন করিবেন। দৈশ্বর্যও আদেশ করেন নাই বা ধর্মশাস্ত্রকারগণও পাঠ করেন নাই যে, প্রত্যেকই একই পথে চলিবে। পূর্ব এইরূপ বিমান ছিল না বলিয়া এখানে কেহ তাহাতে চলিবে না, ইহা হয় না। যদি কেহ এইরূপই করেন, তবে তিনি অর্ধপ্রজ্ঞ হইয়া অনর্থ পতিত হইবেন।

আরো একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। মনে হয়, আমাদের এমন কিছু অনেক আছে যাহা না করিলে হইত, অথবা যাহা অজ্ঞপ্রকারে করিলে হইত, কিংবা একেবারেই বর্জন করিতে হইত। দৃশ্-ধাতু হইতে আমরা পশ্যতি, পশ্যতঃ ইত্যাদি পদ বাল্যকাল হইতে শিখিয়া আসিতেছি। আমাদের গকে বলা হইয়া থাকে, দৃশ্-ধাতু স্থানে পশ্য আদেশ হয়। কিন্তু ইহাতে তত্ত্বকথা বলা হয় না। আদেশ করিয়া দৈশ্বর্য ঘটকে পট করিতে পারেন না। এখানে আসল কথাটা এই যে, দর্শন-অর্থে প্রচলিত স্পশ্-ধাতু হইতে পশ্যতি ইত্যাদি পদ হইয়া গায়ে। লৌকিক সংস্কৃতে স্পষ্ট, আর 'চর' অর্থে স্পশ্ (ভুলনীয় spy) শব্দ আমাদের সকলেরই জানা; আর পতঞ্জলির মহাভাষ্যের প স্পশা শব্দ বিশেষজ্ঞগণ জানেন। স্পশ্-ধাতু হইতে এই কয়টি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অজ্ঞ একটা কথা ভাবিবার আছে। গত্যর্থক ই ধাতুর

লুঙ লকারে অ গা ৭ পদ হয়, ইহাই আমরা সকলে সাধারণত পড়িয়া থাকি। কিন্তু কিরূপে ইহা হয়? কোন ঐচ্ছ-জালিকের কথায় এইরূপ কিছু হইতে পারে, কিন্তু শব্দতত্ত্ব ইচ্ছাজাল নহে।

কেহ মনে করিবেন না ইহার বস্তুতই গা হইয়াছে। ব্যাকরণের স্মারচার্য এখানে কেবল একটা সূক্ষ্ম উপায় মাত্র ("উপায়কৌশল্য") অবলম্বন করিয়াছেন। উপায়টা এই যে, ইহা এরূপ হইবে যাহাতে সহজে কিছু একটা বুঝা যায়। ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই উপকার হয়। ভাষান্তরেও এইরূপ হইয়া থাকে।<sup>২</sup>

দৃশ্-ধাতুর স্থানে পশ্য আদেশ করিবার এই অভিপ্রায় নহে যে, দৃশ্-ধাতু সত্য-মতাই পশ্য আকার গারণ করে। ইহার তাৎপর্য এই যে, দৃশের স্থানে পশ্য পাঠ করিতে হইবে। সাধারণ পাঠকেরা ইহা বিচার না করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকেন।

যদিও আচার্যের পক্ষের দোষ এইরূপে ফালন করা যায়, তথাপি ইহাকে একেবারে দোষমুক্ত বলা যায় না। যেমন, আমাদের পা, ভ্রা ও স্থা ধাতুর স্থানে যথাক্রমে পি ব, ভ্রি ব্র ও তি ঠ আদেশ হয় বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত এ স্থলে ধাতু অভ্যন্ত হয় ইহাই বলিলে ঠিক বলা হয়। এইরূপ জঙ্, জা গৃ প্রভৃতি ধাতু বস্তুত অভ্যন্ত, আর কিছু নহে। এখানে ঘস্ ধাতুটি বস্তুত এস্ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কঠোর স্বাসের অনুপ্রদানে রকারের যোগে অল্পপ্রাণ গকার মহাপ্রাণ বকার হইয়া গিয়াছে, আর কিছু নহে। এ বিষয়ে অনিৱিক্ত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

আদেশের সম্বন্ধে পূর্বে আমরা একটু আলোচনা করি-

২। যেমন ইংরেজিতে he goes, he went বধাক্রমে বর্তমান ও অতীতকালে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু এই দুই ক্রিয়াপদ একই ক্রিয়া to go হইতে হয় নাই; একই to go হইতে goes ও went হয় না; went হইয়াছে গমনার্থক স্বতন্ত্র ক্রিয়া to wend হইতে। এইরূপ করাদীতে etre (to be) হইতে je suis (I am), আর অতীত কালে je fus (I went) এই উভয় ক্রিয়া পদ এক ধাতু হইতে নহে। এইরূপ জাখান ভাষার বর্তমানে Ich bin (I am) আর অতীত কালে Ich war (I was) এই উভয় ক্রিয়া পদ একই ক্রিয়া হইতে হয় নাই। কিন্তু সুবিধা হইবে ভাবিয়া এইরূপ করা হইয়াছে।

১। ইহাইই সঠিত লাতিন spec শব্দ সংস্কৃত। ইংরেজী spectator প্রভৃতি শব্দ প্রসিদ্ধ।

যাছি। আরও একটু করিতে হইবে। বলা হইয়া থাকে অ স্থি শব্দের তৃতীয়া প্রভৃতি স্থানে অ স্থ না, দ গা ইত্যাদি হয় (পাণিনি, ৭. ১. ৭৫)। কিন্তু এই সমস্ত পদে নকারের যোগ কোথা হইতে হইল? বহু অনুসন্ধান করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। আসল কথা হইতেছে, এখানে একই অর্থে দুইটি পৃথক শব্দ, একটি ইকারান্ত অ স্থি শব্দ, আর অপরটি নকারান্ত অ স্থ ন শব্দ; অর্থ উভয়েরই ‘হাড়’। বেদে ইহার বহু প্রয়োগ আছে। যথা “অস্থিস্তম্ কর্ণবস্তম্” (ঋগ্বেদ ১. ১৬৪. ৪)। “ভজং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবা ভজং পশোমাক্ষভির্ষজ্ঞাঃ”, এখানে এই প্রসিদ্ধ (১-৮৯-৮) ঋগ্বেদে অ ক্ষ ভিঃ শব্দটি অ ক্ষি হইতে নহে, অ ক্ষ ন হইতে। এইরূপ দ গা পদটি দ বি হইতে নহে, দ ধ ন হইতে। এইরূপ স ক্ বি শব্দের রূপেও বুঝিতে হইবে।

অনেক কিছু বলিবার আছে, অতএব বাহুল্য বর্জনীয়। এখানে ইহাই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, কবে আমাদের সেই সময়টা উপস্থিত হইবে যখন আমরা কাল্পনিক সমাধান বর্জন করিয়া বাহ্য সত্য তাহাই গ্রহণ করিতে পারি।

আদেশবিধির কথা আমরা পূর্বে একটু আলোচনা করিয়াছি, আরো একটু করিতে হইবে। দ ম্প তি ও জ ম্প তি এই শব্দ দুইটি আমাদের সকলেরই জানা। ইহার মধ্যে প্রথমটিকে সর্বত্র প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে একমাত্র ব্যাকরণের গ্রন্থগুলির মধ্যে ঐ উদাহরণটিরই জন্য উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। হয় ত পূর্বে কোথাও প্রয়োগ ছিল, পরে তাহার লোপ হইয়া গিয়াছে। বাহাই হউক, এখন প্রশ্ন হইতেছে, ঐ শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তি কি? আসল অর্থ কি? আমরা শুনিয়া আসিতেছি, জা য়া প তি শব্দের জা য়া স্থানে নিপাতনে জন্ ও দন্ হয়, আর তাহার সহিত প তি শব্দ যুক্ত হইলে যথাক্রমে ঐ পদ দুইটি হইয়া থাকে। কেহ ইহা বলিতে গেলে লজ্জিত হওয়া উচিত। আর কিছু নহে, কেহ ঋগ্বেদের (২.১২৭.৮) সায়ণাচার্য্য-কৃত এই ভাষ্যপঙ্ক্তির একটু পড়িয়া দেখিবেন—“দম্পতিং গাহপত্যাধিক্রমেণ গৃহস্থ পালকং। দম ইতি গৃহ নাম।...“অকারলোপশ্চান্দ্রঃ” ইতি। বেদে ‘গৃহ’ অর্থে দ ম শব্দের বহু প্রয়োগ আছে, যেমন “মোদমানো স্বে গৃহে”। ঋগ্বেদে দ ম্প তি শব্দ অগ্নি, ইন্দ্র ও অশ্বিনের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়। দ ম শব্দের মূল অর্থ ‘গৃহ’, অতএব যিনি গৃহপতি তিনিই দমপতি বা দম্পতি (দ্বিবচনে দম্পতী)। বেদে দ ম শব্দ আভ্যাদান্ত। এই জ্ঞাত ঐ স্বরটি প্রবল ও তাহার পরবর্তী মকারস্থ অকার দুর্বল হয় আর লুপ্ত হইয়া

থাকে (অর্থাৎ এখানে বর্ণলোপ, Syncope)। অতএব এই শব্দ সমাধানে কোন দোষ পাওয়া যায় না। অর্ধের দিক দিয়াও কোন দোষ হয় না। দম্পতি শব্দের আক্ষরিক বা মুখ্য অর্থ গৃহপতি, আর যখন দ্বিবচনে প্রয়োগ করা হয় তখন গৌণ অর্থে একত্র জায়া ও পতিকে বুঝাইয়া থাকে। এখানে একশেষ শব্দ প্রভৃতি কল্পনা পরের যোজনা।

জম্পতি শব্দেরও ব্যুৎপত্তিতে কোন কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। নিম্নকৃতে পৃথিবীর একুশটি নাম ধরা হইয়াছে। যাক্ষ ইহাদের কতকগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদের অজ্ঞাতম নামটি হইতেছে জু।। এই জু শব্দটি বিপ্রকর্ষে (Anaplytaxis) জন্ম হয়; ঠিক যেমন গা গাতু হইতে গ ম, আর গা গাতু হইতে গ ন হইয়া থাকে (পাণিনি, ৭. ৩. ৭৮)। তাহার পর দ ম প তি শব্দের অকারলোপের দ্বারা এখানেও অকারলোপে জ ম্প তি। ইহার মুখ্য অর্থ ‘ভূপতি,’ গৌণ অর্থ দ্বিবচনে ‘জায়াপতী’।

প্রসঙ্গবশত এখানে আর একটা কথা বলা আবশ্যিক। ব্যাকরণ আমরা পড়িয়া থাকি, কিন্তু সাধারণ নিরুক্তের (philology) জ্ঞান না থাকিলে ব্যাকরণের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। আচার্য্য যাক্ষ নিজের নিরুক্ত এই কথাই বলিয়াছেন (১. ১৫)—“ইহা (অর্থাৎ নিরুক্ত) ছাড়া মন্ত্রের অর্থ বুঝা যায় না। অর্থ না জানিলে ভাল করিয়া শব্দ জানা হয় না, বিষয়ও পরিষ্কার হয় না। ইহাই বিদ্যাহান, এবং ইহাই ব্যাকরণের সম্পূর্ণ হ্রাসকরন।”

### প্রাকৃত

এখানে কাহারও কাহারও অপ্রিয় হইলেও অনেকেরই ভাল হইবে ভাবিয়া একটা কথা বলিতে বাইতেছি। আজ-কাল এরূপ অনেক সংস্কৃতজ্ঞ আছেন, যাহারা প্রাকৃতকে যে কেবল ভালবাসেন না, তাহা নহে, বরং অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন। ইহাতে পরের তেমন অপকার হয় না, যেমন নিজেরই প্রভূত অপকার হইয়া থাকে। অজ্ঞানবশত ইহা তাহারাই বুঝিতে পারেন না। কেহ কেহ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, প্রাকৃত স্পর্শও না করিয়া কোন ব্যক্তি মীমাংসা বা বেদান্তে পুরস্কার হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি প্রাকৃত না জানেন তবে তিনি সংস্কৃতবিদ বলিয়া স্বপ্নেও গণ্য হইতে পারেন না।

স্পষ্টই দেখা যায়, প্রাচীনেরা সংস্কৃত ও প্রাকৃতকে সহপঠনীয় বলিয়া মনে করিতেন। সংস্কৃত দৃষ্ট কাব্যগুলি সাধারণত সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই রচিত হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণকার, “সাহিত্যার্থবর্ধকধার” বিশ্বনাথ কবিদ্বিজ অষ্টাদশ ভাষা জানিতেন। ইহার মধ্যে

একটি সংস্কৃত, আর মতেরটি প্রাকৃত। এই কবি কবিত্ব-জনোচিত ভাষায় এই বিষয়টি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—  
“অষ্টাদশ ভাষাবাবিলাসিনীভূজক” ইতি। তাঁহার পিতাও ছিলেন সমস্ত ভাষায় নিপুণ ( “সকভাষাচউরো” ), এবং ভাষার্থবি নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্বে এমন সব প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন, যাহারা সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই ব্যাকরণ রচনা করেন। এসব এখন পাওয়া যায়, অনেক ছাপাও হইয়াছে। যেমন হেমচন্দ্র, ক্রমদীপ্তর ও পুরুষোত্তমের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণ। আলঙ্কারিকেরা জানেন যে, অলঙ্কার আলোচনার জন্য প্রাকৃত জ্ঞান প্রচুর থাকা আবশ্যক। পাঠকেরা এখানে ভোজবাজের সরস্বতী-কণ্ঠভরণের কথা মনে করিতে পারেন।

একটুও প্রাকৃতজ্ঞান না থাকিলে সংস্কৃত জানিলেও কেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, শত-শতের মধ্যে তাহার দুই একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিত পঞ্জিকটি কবি কুলগুরু কালিদাসের রথুবংশে (২. ৩৯) আছে

“সম্ভাস্তুলিঃ সায়কপুংখ এষ  
চিত্রাপিতাবস্ত ইবাব তস্তে।”

আম.ভা.গণ.ভে.৬ ( ৬. ১০. ১৪ ) পাওয়া যায়—

“পুংখানুপুংখ পতিভৈর্যোত্তোষীষ নভো ঘনৈঃ।”

এখানে পুংখ শব্দের অর্থ কি? পাখীর পাখনা। সংস্কৃতে যাহা পক্ষ, প্রাকৃতে তাহাই পুংখ এই আকার ধারণ করিয়াছে। শব্দের প্রয়োগকর্তা সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও ভেদ অবধারণ করিতে না পারিয়া অনবধানে পক্ষ না লিখিয়া পুংখ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এখানে প্রয়োগকর্তা স্বয়ং কালিদাস। সেই সময়ে প্রাকৃতেও কি প্রভাব ছিল তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে। ইহা মোটেই বিচিত্র নহে, কারণ যখন বৈদিক ভাষাতেও বিকৃত স্থানে বিকট পদ পাওয়া যায়। ইহাতে দ্রুশ পদ অনেক অনেক আছে এবং পণ্ডিতগণেব ইহা সুবিদিত।

প্রাকৃত স্থলে পক্ষ স্থানে পুংখ হওয়ার কিঞ্চিৎ আলোচনা

৪। কালিদাস মেঘদূতে একটি নদীর নাম দিয়াছেন শিপ্রা। ইহা বস্তুত হইয়াছে শিপ্রা হইতে। এ কাব্যেই অগ্নত্র আছে তাপা। ইহা একটি দেশী প্রাকৃত শব্দ। ইহা এক রকম মদকে বুঝায়। পাল বুঝাইতে ভবভূতি মালতী মাথবে লিখিয়াছেন গল্প। ইহা একটি প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত পণ্ড হইতে হইয়াছে। ইহার উত্তর চরিতে আছে পুচ্ছ। ইহাও সংস্কৃত পক্ষ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত শব্দ। ইহার বৈদিক সাহিত্যেও প্রচুর প্রয়োগ আছে। মাঘ শিশুপাল বধে লিখিয়াছেন লাহন ( “সুগ লাহন” অর্থাৎ চন্দ্র ), ইহা সংস্কৃত নহে, লক্ষণ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত। এইরূপ অনেক, অনেক।

করিতে পারা যায়। প্রাকৃতে ইহা সাধারণ নিয়ম যে, সংস্কৃত শব্দে স্বরের পরে ক্ষকার স্থানে বিকল্পে কঞ্চকার বা ছ্কার হইয়া থাকে। তদনুসারে প্রথমে ক্ষ-স্থানে কঞ্চ হওয়ার পর, পকার শুষ্ঠ্য বর্ণ হওয়ার তাহার প্রভাবে অকারটি উকার হইয়া যায়। ইহার পর স্বয়ংজাত অনুনাসিক ভাবের ( Spontaneous nasalization ) জন্য পু কঞ্চ হইয়াছে পুচ্ছ।

শব্দের নির্বাচন করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে যুক্তি থাকা আবশ্যক। যাস্ত বলিয়াছেন, ব্যুৎপত্তি দেখাইতে হইলে অর্থের প্রতি নিষ্ঠা থাকা দরকার ( “অর্থনিষ্ঠঃ পরীক্ষিতঃ” )। যা তা একটি ব্যুৎপত্তি দিলেই হয় না। কোন কোন স্থলে এমনও ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয় যাহা শুনিতে লজ্জা বোধ হয়। আপটের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে আছে—“পুংখাংস্ব খনতি। খন্ ড” ইতি। এখানে কি বলিতে হইবে?

পাখীর পাখা বুঝাইতে সংস্কৃতে পিচ্ছ ও পিচ্ছ শব্দও আছে। কিন্তু বস্তুত ইহাদের কোনটিই সংস্কৃত নহে, কিন্তু পরবর্তী সংস্কৃতে অনেক পাওয়া যায়। আসল কথা হইতেছে এই দুইটি শব্দই প্রাকৃত এবং সংস্কৃত পক্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে সংস্কৃত শব্দে স্বরের পরবর্তী ক্ষকার প্রাকৃতে কঞ্চ অথবা ছ্ হইয়া থাকে। যখন ছ্ হয় তখন ছ্ তালব্য বলিয়া তাহার প্রভাবে পকারস্থ অকারের স্থানে ইকার হইয়া যায়। আর পচ্ছ হইয়া যায় পিচ্ছ। পরে ইহাই স্বয়ংজাত অনুনাসিকভাবে পিচ্ছ আকার ধারণ করে। ইহার একটি নির্বাচন এইরূপ পাওয়া যায়; ক্ষীরস্বামী অমরকোশে লিখিয়াছেন—“পিচ্ছতি পিচ্ছম্”। ভানুজিদ্ধিক্তি ঐ স্থানেই লিখিয়াছেন “পিচ্ছয়তি পিচ্ছয়তে বা। কুট্টনে। অচ্ ধণ্ বা।” এখানে কিছু বলিবার নাই। পণ্ডিতগণ জানিবেন যে, বহু বহু অসংস্কৃত পদ সংস্কৃত বলিয়া নিবিচারে সংস্কৃতেও পালি-প্রাকৃতেও মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃতে প্রাকৃতেও প্রভাব এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্বে অনেক স্থানে এই প্রাকৃতভাবকে আর্থ প্রয়োগ বা ছান্দস প্রয়োগ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে পদটির যথার্থ স্বরূপটি আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে অপর দিকে একটি বিষয় দেখিবার আছে। আমাদের মধ্যে বহু অল্পপুঙ্ক্ত, অধাপক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য-গুলি পড়াইতে গিয়া বড় অনর্থ করেন। আমাদের এই বন্ধুগণ মূলের প্রাকৃত অংশগুলি নিজেও প্রাকৃতে পড়েন না বা ছাত্রগণকেও প্রাকৃতে পড়ান না, কিন্তু সংস্কৃতে ছায়া মাত্র পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা কাব্যের সমগ্র মাধুর্য সংহার করিয়া থাকেন। ইহার একটিও অনুভব করিতে পারেন না যে, ছয় যদি দৃষ্টরূপে পরিণত হয় তবে দৃষ্টি থাকিলে ছয়ের গুণ আবাদন করা হয় না। পাঠকগণ



নিজে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিজে বিদ্যাপতির একটা পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

“সাজু রজনী হাম ভাগে পোহায়ু পুপু পির যুগ চন্দা।  
জীবন যৌবন সকল মানহু দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।  
আজু ময়ু গেহ গেহ করি মানহু আজু ময়ু দেহ ভেল দেহ।  
আজু বিহি মোরে অন্তকুল হোয়ল টটল সব সন্দেহ।”  
ইহার সংস্কৃত ছাড়াটি এই :

অত রজনীমহং ভাগেন প্রভাতামকাবয়ঃ প্রৈক্ষে প্রিয়মুখচন্দ্রম।  
জীবনং যৌবনং সকলমমানহং দশ দিশো ভূতা নিরদন্দাঃ।  
অত মম গেহং গেহমমানযমাতা মম দেহো ভূতো দেহঃ।  
অত বিধিযেঃকুলোত্তমভূতুটিতঃ সবঃ সন্দেহঃ।

এই উভয়ের মধ্যে কি মতং ব্যবধান, এবং কোনটি উৎকৃষ্টতর তাহা আর আমাকে বলিতে হইবে না, পাঠকগণ অন্তর্ভব করুন।

এই প্রসঙ্গ আন একটা কথা আঙ্গোচর্য্য করিয়া দেখুন। সংস্কৃতের দুর্ভাগ্যবশত নিবিশেষে টোল ও কলেজসমূহ এইরূপে একটি শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর উৎপন্ন হইয়াছে যাহা না নিজের না আত্মের কল্যাণের জন্ত হইল। অতএব সাবধান, এ বিষয়ে কেহ যেন স্বপ্নেও ভ্রান্ত না হন। এইরূপে আনন্দে প্রাকৃতজ্ঞান ক্রমশ হীন হইতে হইতে সংস্কৃত-জ্ঞানকেও হীন করিতেছে, কিছুতেই উন্নত করিতেছে না।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপাঠ্যে এমন প্রাকৃতের নামকেও অগ্রাহ্য মনে করেন। ইহাতে তাহার সুবিচারের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

এখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা অংশ বক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

ভারতের প্রাচীন ভূগোল

ছাঙ্গোয়া উপনিষদে ( ৫. ১১. ৫ ) আছে কেকয় দেশের রাজা অশ্বপতি বলিতেছেন :

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্শো ন মজ্জপঃ।

নানাহিতাগ্নিনা বিদ্বান্ ন শৈবী শৈবিরী কৃতঃ।”

অর্থাৎ আমার জনপদের মধ্যে চোর নাই, কদর্শ ( অর্থাৎ কৃপণ, অপার কপায়, যে থাকিতে দান করে না, এমন ব্যক্তি ) নাই, মাতাল নাই, অগ্নি আগান করে না এমন সোক নাই। বিদ্বান্ নহে এমন কেহ নাই, ব্যভিচার করে এমন কেহ নাই, আর ব্যভিচারী কেহ না থাকিলে ব্যভিচারিণী কোথায় থাকিবে ?

এই কেকয় দেশ কোথায় ? অথবা উপনিষদের অগ্যান-বিদ্যা নিবিশিষ্ট ছাত্র ইহা নাই-ই জানিলেন। কিন্তু যাক্ষ নিকঞ্জে ( ২. ২. ) বলিতেছেন “শবতির্গতিকর্ম্য কথোজ্জেষব

ভাষ্যতে” ইতি, অর্থাৎ শব্দাত্ম ‘গতি’ অর্থে কথোজ্জ দেখে পাঠ করা হয় ; আর পতঞ্জলি নিজের ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে এখানে যোগ করিয়াছেন ( ১. ১. ১. ) “বিকার এনমর্থে ভাষন্তে শব ইতি” অর্থাৎ আধেরা এই শব্দটিকে কোন কদম্ব পদের আকারে প্রয়োগ করেন, যেমন শব। মহাভাষ্যে এই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—“হ্মতিঃ সুরাষ্ট্রেশু। রংহতিঃ প্রাচ্য মধ্যেশু। গগিমেষ বার্যাঃ প্রযুক্তঃ,” অর্থাৎ গতি অর্থে হ্মৎ শব্দ সুরাষ্ট্র দেশে প্রযুক্ত হয়, প্রাচ্য মধ্যদেশে ঐ স্থলে রং শব্দ প্রযুক্ত হয়। আর আর্থগণ এখানে গম্ শব্দ প্রয়োগ করেন। ভাষ, কোথায় এই কথোজ্জ ও সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ? কোথাকার লোককে আর্থ বলা হয় ?

বসুবংশে ( ২. ৬৭ ) ধ্রুব দ্বিঘঞ্জে তাঁহার অশ্বগুলি সিদ্ধনদের তীরে গা নাড়িয়া স্বচ্ছ নাড়িয়াছিল। কিন্তু কাম্বীরে সিদ্ধন কোথা হইতে আসিল ? যদিও মল্লানথ লিখিয়াছেন, “সিদ্ধনাম কাম্বীরদেশেষু কশ্চিদ্যদীবেশ্য” ইতি। বস্তুত এখানে সিদ্ধ শব্দজানে বক্ষু বা বক্ষুড় পাঠ ঠিক হইবে। এই নদ আজকাল Oxus নামে প্রসিদ্ধ। অতএব বক্ষুগণ এই বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।

কিছুকাল পূর্বে প্রাচীনত সংস্কৃতজ্ঞগণের কোন এক দৃষ্টান্ত, যাহাতে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, কোন এক সংস্কৃত পণ্ডিত এই নর্মে এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যে কোন তর্কপরীক্ষার্থীকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অবগত হই পাঠ করিতে হইবে এই নিয়ম করা হউক। এক জন সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত এই সম্বন্ধে ঐ সভায় নিজের এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, “ওহে বিদ্যারত্ন, কালিদাস নিজের বাড়ীর কোন ঘাটে স্নান করিতেন ইহা জানিলে একটা কৌতুক নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কালিদাসের কাব্য বুঝিবার কোন সুবিধা হয় কি ?” সমস্ত সভা মৌন অবলম্বন করিলেন। সবই অরণ্যে গোদন হইল।

যাহাই হউক, ইহা ঠাট্টা-উপহাসের কথা নহে, আর উপেক্ষারও বিষয় নহে। নিশ্চয়ই সেই সভার ঐ সকল সদস্য উপযুক্ত ছিলেন না, তাহার নিজের ও অন্তের কল্যাণ বুঝিতে পারেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বলিতে কি বুঝায়, নিশ্চয়ই তাহার জানিতেন না। অতএব যাহা কর্তব্য তাহা করিতেই হইবে।

৫। আমাদের বাড়লায় ছোট-ছোট ছেলেদের ‘হামা’ দেওয়ার সহিত ইহার যোগ মনে হয়।

৬। দ্বিতীয় পাঠ পর্বতী মনে হয়।



## বৈদিক সাহিত্য

ঐ সভারই অধিবেশনে ঐ ব্যক্তি এইরূপ আর একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তীর্থপরীক্ষার্থী ছাত্রকে বিবিধ বৈদিক সাহিত্যের একটি সংগ্রহকে অবগত পাঠ করিতে হইবে। ইহাতে ঐ পূর্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, আর তাঁহার গজন শুনা গেল আমাদের ধর্ম নষ্ট হইবে! ধর্ম নষ্ট হইবে! তীর্থপরীক্ষায় অধিজ্ঞদেরও অধিকার আছে, তাহারও পরীক্ষা দেয়। কিন্তু তাহার বেদ পড়িবে কিরূপে?

এখানে কি করিতে হইবে? দুইটি মাত্র পথ আছে। হয় যাগ পাঠ্য পড়িতেই হইবে, অথবা পরীক্ষা একবারেই ছাড়িতে হইবে।

## বিষয়ের ইতিহাস

এখানে একটি কথা আলোচনার আছে। ইহা বিবেচনায় কিছু নূতন নহে, পূর্বে বাহা বলা হইয়াছে তাহারই একটু বিবরণ। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জানেন, এমন সব দুর্গম গ্রন্থ আছে যাহা অবগত অধ্যয়ন করা উচিত, এ সময়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপন লুপ্ত হইলে দীর্ঘ দিনে ধীরে শাস্ত্র নষ্ট হইবে। অতএব অব্যাহত ভাবে ইহা চর্চিতে থাকুক। এখানে একটু বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। কত্র দুর্গম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেও সেই সেই বিষয়ের জ্ঞানকে প্রশস্ত বলা যায় না যদি আলোচ্য বিষয়ের ইতিহাস না জানা যায়, অর্থাৎ, বিষয়টির উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও প্রসার প্রভৃতি ঠিক না জানা যায়। যদি কেহ আজকাল আমাদের এখানে গ্রাম অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে বলা হইবে যে, গ্রাম-বৈশেষিক শাস্ত্র পড়। সে তাহা করিলে এবং তাহার পরিশ্রম মার্শক হইলে, তাহাকে প্রশংসা করা হয়, বেশ, তুমি গ্রামে প্রশংসনীয় হইয়াছ। কিন্তু তাহাকে যদি অতি সামান্তও কিছু জৈন বা বৌদ্ধ গ্রাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায় তবে সে কিঞ্চিৎমাত্রও বলিতে পারিবে না, যদিও জৈন ও বৌদ্ধগণ গ্রামবিদ্যা প্রভূত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা ভারতেরই প্রচুর গোত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ছাত্র ভারতেরই গ্রামবিদ্যা অধ্যয়ন করে, অথচ তাহার এক অংশের সংবাদ রাখে না। ইহা নিশ্চয়ই ঠিক নহে। অতএব আমাদের গ্রামের ছাত্রগণের তাহার ইতিবৃত্তকে কিছুতেই অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

যেমন গ্রামের তেমনি বহু ভেদ-ভিন্ন বেদান্ত, নীমাংস প্রভৃতি অস্ত্রান্ত শাস্ত্রেরও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

## বৃহত্তর ভারতের বিবরণ

ভারতের বহির্ভাগে নিকটে বা দূরে সংস্কৃত বহু দেশ আছে। ইহাদিগকে আজকাল বৃহত্তর ভারত বলা হইয়া থাকে। ইহাদের সম্বন্ধে ভারতের পূর্বে নানাপ্রকারে বহু বর্ণিত সম্বন্ধ ছিল, ইহা কিছুতেই অপলাপ করা যায় না। আমাদের বিদ্যার উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে, দুর্গমগ্রন্থের প্রসারের জন্য ও এইরূপ অস্ত্রান্ত উপকারের জন্য আমরা ভারত-সংস্কৃত এই ইতিবৃত্তকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। সংস্কৃতের ছাত্রেরা ইহা নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই অনায়াসে অধ্যয়ন করিতে পারেন।

## অবেস্তা

আমি যেন এখানে একটু বাড়ি বাড়ি করিতে যাইতেছি, যেন একটু নূতন বা অদ্বিত কিছু বলিতে যাইতেছি। আমাদের যেন কেহ অস্বাভাবিক মনে না করেন, আমি পণ্ডিতী করিতে যাইতেছি না। সংস্কৃত ছাত্রগণের ইহাতে বহু উপকার হইবে মনে হওয়ার কিছু বলিতে যাইতেছি। তথাপি আমার চিন্তা শঙ্কিত হইতেছে। অথবা যখন ইহা অবগত বক্তব্য মনে হইতেছে তখন আর ইতিবৃত্ত করিয়া লাভ নাই। আপনারা ক্ষমা করিবেন।

আমাদের বেদভাষা আর পারস্যের ধর্মভাষা অবেষ্টা সম্বন্ধে পরস্পর সংযোগ্য। ইহার মধ্যে প্রথমটি জোষ্ঠা আর দ্বিতীয়টি কনিষ্ঠা। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ সংস্কৃত ও অবেষ্টার মধ্যে বহুস্থানে তাহা অপেক্ষা — সম্বন্ধ। নূতন পাঠ্যক ইহা দেখিয়া বিম্বিত হইবেন।

সংস্কৃত	অবেস্তা
সোম	হুম
অস্তব	অহব (প্রাণপ্রদ)
দেব	দেব (দৈত্য অর্থে)
বজ্র (=ষড়্জন)	যজ
গাথা	গাথা
সেনা	তএনা
হস্ত	অস্ত
মৃত	তমত
সুস্ত	ইংথ
পুত্র	পুথ
মিত্র	মিথ
মৃগ	মেবেগ (পাদী)
গিরি	গইরি
মহা	মইহা
তনু	তনু

ভূমি	বুইরি
পতি	পইতি
বিশ্ব	বীশ্ব

কয়েকটি ক্রিয়াপদ উদ্ধৃত হইতেছে—ভবতি (ভূ বাতু), বইতি; ভবতে (ভূ বাতু), ববতি; হন্তি (হন্ বাতু), জইন্তি; অস্মি (অস্ বাতু), অস্মি; গৃণামি (= গৃহ্ণামি, গ্রহ বাতু, বৈদিকে গ্রহ্ বাতু), গেরহনামি; ঐণামি (ঐ বাতু), ফ্রনামি, দদাতি (দা বাতু), দদাতি ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংস্কৃতের গ্রন্থ অবস্থা ৩৩ লিঙ্গ, বচন ও পুরুষ ত্রিবিধ; স্বাস্ত ও বাজনাস্ত এক প্রকরণ, কারক প্রকরণ, সমাস প্রকরণ, দশ লকার বিশিষ্ট ক্রিয়াপ্রকরণ, ক্রুৎপ্রকরণ, তদ্ধিত প্রকরণ, ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাকরণের বিষয় সংস্কৃতেরই মত ইহাতে রহিয়াছে। পাঠকগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবেন।

অবেস্তার সম্বন্ধে এখানে একটি মনোজ্ঞ কথা আছে। এ ঐ ও ঔ এই চারটি স্বর সন্ধাক্ষর নাম সংস্কৃত ব্যাকরণে সুপ্রসিদ্ধ; কারণ ইহারা প্রত্যেকেই দুই দুইটি স্বরের সন্ধিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ঐকার ও ঔকারের সন্ধিতে উৎপন্ন তাহা স্পষ্টতই সকলে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু অপর দুইটি সন্ধাক্ষর, অর্থাৎ একা ও ওকার, তাহা পূর্বে যায় না; ইহারা আকার উকার প্রভৃতির জায় এক-একটি অসংহিত স্বরের জায় প্রতীক্ষমান হয়। ঋগবেদ প্রাতিশাখ্যে ভাষায়, ঠিক যেমন দুগ ও জলে মিশাইলে দুই এক হইয়া যায়, তেমনি অকারের সহিত ঐকার, আর অকারের সহিত ওকার মিশিয়া এক হইয়া যায়; ঠিক যেমন দুগ ও জল একত্র মিশাইলে হইয়া থাকে। ব্যাকরণের ভাষায় আজকাল একা ও ওকারের সন্ধাক্ষর ধর্ম প্রক্রিয়ায় প্রচলিত থাকিলেও প্রয়োণে একবারেই তিরোভূত হইয়াছে। অবেষ্টায় কিন্তু এই দুই-ই এখনো প্রচলিত আছে। সম্প্রতি অবেষ্টায় সংস্কৃত হইতে এই একটি বিশেষত্ব।

অবেস্তা প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। সংস্কৃতে এমন কয়েকটি শব্দ আছে সাহারা দুই দুইটি অর্থ বুঝায়। যেমন শরৎ শব্দ, ইহা প্রসিদ্ধ ঋতু, আর বৎসর উভয়কেই বুঝায় “জীবেম শরৎঃ শতম্”। এইরূপ হিম শব্দ, ঋতু ও বৎসর (“শতং হিমাঃ”)। বর্ষ ও বর্ষ শব্দের কেবল আকারত ভেদ, ইহাদের প্রকৃতি অভিন্ন।

এক দিন কোন সময়ে আমার মনে একটা কথা উঠিয়াছিল। ভাল, গ্রীষ্মবাচক এমন কি কোন শব্দ নাই যাহা

শরদাদি শব্দের জায় ঋতু ও বৎসর উভয়কেই বুঝায়? যদি থাকে, তবে তাহা কি? দীর্ঘকালও আমি ইহার উত্তরের সন্ধান পাই নাই। কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল যে, নিশ্চয়ই এইরূপ কোন শব্দ থাকিবে, কারণ ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম ঋতু এমন নহে যে, সর্বত্র অবজ্ঞেয়।

যাহাই হউক, এক দিন আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম, আর অবেষ্টাকোশের পাতাগুলি যথেষ্টভাবে উল্টাইতেছিলাম। হঠাৎ আমার চোখ অবেষ্টাকোশের একটি শব্দের উপর পড়িত হইল, আর আমি অত্যন্ত হুটু হইয়া উঠিলাম। আমি তৎদিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও যে শব্দটিকে পাই ন, তাহা পাইলাম। ইহা, হইতেছে হম। অবেষ্টায় হম আর সংস্কৃতের সম একই। আমরা পূর্বেও দেখিয়া আসিয়াছি সংস্কৃতের স্মৃত, স্মৃত ও সোম প্রভৃতি শব্দ আর অবেষ্টাবাধাক্রমে হুমত, হুম্ব ও হুম প্রভৃতি শব্দ বস্তুত একই। ধনিতত্ত্বের নিয়মে কেবল সংস্কৃতের সকার স্থানে হকার হইয়া গিয়াছে। সম ও হম শব্দ একসঙ্গে পড়িয়াই ভগবান বাম্বাকির সেই কবিতাটি মনে পড়িয়া গেল:

“মা নিষাদ প্রতিহংমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

যং কৌকম্বিনাদেকমবদ্যঃ কামমোহিতম্॥”

অবেস্তায় সংস্কৃতের সম অথবা সমান শব্দেরও অর্থে হম শব্দের প্রয়োগ আছে।

ভাল, সংস্কৃতে সমা শব্দের ব্যবহার কি? কেহ কেহ বলেন সমিবৈকল্য ইতি। কেহ কেহ বলেন “অবৈকল্যো।” এখন বিকলতা কাকার, যেমন গরমে হয়, তেমনি শীত প্রভৃতিতেও হইতে পারে। অবেষ্টার অথ এখানে বেশ স্পষ্ট। এই শব্দটি জৈব পরিবর্তিত আকারে ভাষান্তরেও পাওয়া যায়, (যেমন Germ. Sommer, Eng. Summer)। এ বিষয়ে আমরা এ স্থানে আর কিছু বলি না।

অপর আবশ্যক ভাষা

এখানে আর একটা কথা অবশ্য আলোচ্য মনে হয়। তক করিয়া লাভ নাই। সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতির সহিত যোগ রক্ষার জন্ত ইংরেজী তো জানিতেই হইবে। ফরাসী ও জার্মান জানাও উপকারের জন্ত হইবে।

নিষিগোপ

আচার্য যাক্স বলেন যিনি আমাদের বিদ্যা রক্ষা করেন তিনি আমাদের নিষিগোপ। বিষয়গণের আঞ্জ দেশের বিদ্যাকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবার সময় আসিয়াছে। বহু পূর্বেই ইহাতে হাত দেওয়া উচিত ছিল, আর কিছুতেই বিলম্ব করা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও

অতি সংক্ষেপে অল্পকিঞ্চিৎ বলা হইতেছে। পূর্বকালে চীনে (১ম শতক) তিব্বতে (৭ম শতকে) বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। তাহার পর ঐ উভয় দেশে সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ও তিব্বতের ভাষায় অনূদিত হয়, এবং অদ্যাবধি এই সমস্তে অধ্যয়ন অধ্যাপন হইয়া আসিতেছে। মঙ্গোলীয় ভাষাতেও অনুবাদ আছে। ঐ সমস্ত দেশে, বিশেষত তিব্বতে সেখানকার অধিবাসীরা সংস্কৃত শিখিবার উদ্দেশ্যে পালিনি, চন্দ্রগোমী, শর্ববর্মী (কলাপকার), রামচন্দ্র (প্রক্রিয়া: কৌমুদী কার) প্রভৃতির ব্যাকরণ অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ইত্যাদি নানা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় একটি মঙ্গোলীয় ভিক্ষুকে অল্পভূতিসঙ্গপাচাযের কৃত সারবত্ত ব্যাকরণ (তিব্বতী) অধ্যয়ন করিতে স্তনিয়াছিল। শাগ্রগ্রন্থের তে কথাই নাই বিশেষত বৌদ্ধ শাস্ত্রের।

বহু মূলগ্রন্থের লোপ হইয়াছে। তথাপি যেভাবে এমনও অবশিষ্ট আছে তাহাতে তাহার পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সংস্কৃত হইতে যে পদ্ধতিতে তিব্বতী ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা চমৎকার। বোধ হয় এমন প্রণালী আর কোথাও অনুসরণ করা হয় নাই। ইহা এত আক্ষরিক যে, যেন আমাদেরই উদ্দেশ্যে ইহা হইয়াছিল। যদি কেহ মনে করেন, এই সব অনুবাদ হইতে আবার মূল উদ্ধার করা সম্ভব নহে, তবে তাঁহার নিতান্তই ভুল করা হইবে। প্রত্যক্ষ দেখিলে বিশ্বাস না করিবার কিছু নাই। যাহারা নিজে ও অন্তরে হিতকর এই সব কার্যে এখনো উদাসীন, তাহারা মনে করিয়া ইহা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। তাহাদেরই ইহা ক্ষেত্র। তাহাদের আর অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তি এ কার্যের গুণ্য নাই। একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বিদেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এই কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যেভাবে আরম্ভ হওয়া উচিত তাহা হয় নাই।

#### নূতন বৌদ্ধ গ্রন্থ

তিব্বতের প্রসঙ্গে আমরা একটু অন্যত্র আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের শাস্ত্রের, বিশেষত বৌদ্ধশাস্ত্রের সংখ্যা এখানে অনেক। ইহাদের মধ্যে অনেক লুপ্ত অথবা অত্যন্ত দুর্গম। আজ আমরা মহাপণ্ডিত ত্রীরাহুল সাস্কত্যায়ন মহাশয়ের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তাঁহারই অনুগ্রহে ও চেষ্টায় বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তিনি দুর্গম তিব্বতে নানা মঠে ভ্রমণ করিয়া ও তাহাতে নিজ জীবনকেও বিপন্ন করিয়া কতক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছায়াচিত্র (কটোগ্রাফ)। মোট

অন্তত ৭৩খানা ছায়াচিত্র আছে। এগুলি এখন পাটনায় জয়শাল-গবেষণাভবনে আছে। সেখানকার অধ্যক্ষ মহাশয়কে নিবেদন করিলে তিনি ইহা দিতে পারেন। এই সমস্ত সংগ্রহীত ছায়াচিত্রের যদি সত্বরে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা না যায় তবে তাহাদের লেখা ধীরে ধীরে মুছিয়া উঠিয়া যাইবে, আর মোটেই পড়া যাইবে না। অতএব লুপ্ত গ্রন্থ যদিও পাওয়া গেল, তথাপি রক্ষা করা হইল না বলিতে হইবে। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব হয়, যেকোন প্রকারে উৎকৃষ্টভাবে এইগুলির সংস্করণ করিয়া প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে তিলমাত্র বিলম্ব করা ঠিক নয়। কয়েক-খানি পুঁথি সংস্করণ করা হইয়াছে বা হইতেছে, কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে, প্রভূত প্রয়াস আবশ্যক। ইহার কি উপায় নাই? আমার মত লোকে কিরূপে বলিবে নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আছে। দেখিতেছি, আমরা করিতেছি না। কিন্তু ইহা করিতেই হইবে, তা যেক্রমেই হউক।

#### সংস্কৃত পণ্ডিতেরা কী করিবেন?

আমার কথা শেষ হইয়া আসিয়াছে, অল্পই বাকী। কিন্তু অতিগুরুতর বলিয়া অবশ্য বক্তব্য ও চিন্তনীয়, অন্যথা বিপদ অনিবার্য। সংস্কৃতকে ভারতের 'জীবাত্ম' অর্থাৎ জীবন-উদ্দেশ্য বলা হইয়া থাকে। ইহাকে যেকোন অবস্থায় যাহারা একান্তভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহারা প্রতিদিন মপরিবারে চারিটি চাউলের জন্য আজ্ঞাকাল কি কষ্ট পান তাহা কয় জন খবর রাখেন? এখানে কী কর্তব্য? তাহারা কী করিবেন? তাহারা ভিক্ষু নহেন। তাহাদের ভিক্ষু-ভাবে কিছুতেই মগ্ন করিতে পারা যায় না। যেকোনরূপে হউক ইহা অপনয়ন করিতেই হইবে। কেহ যেন তাহা-দিগকে কুকুরের মত গুটিকতক উচ্ছিষ্ট পিণ্ড দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা না করেন। না, ইহা কিছুতেই মগ্ন করা উচিতও নহে, পারাও যায় না। যাত্রামাত্র-নির্বাহ ধর্ম, অধিক আবশ্যক নাই। ইহাই ছিল তাহাদের জীবনের আদর্শ। এই সেদিন পর্যন্ত এরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখা যাইত। আজ তাহারা যৎসামান্য মাত্রাও পান না। ইহা তাঁহাদের অবশ্যই পাইতে হইবে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? বঙ্গদেশে মুখ্য-মন্ডির, শিক্ষা-মন্ডির, অথবা শিক্ষার অধিষ্ঠাতা পুরুষ আছেন। সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি ইহাদের অনুরাগ আছে ইহা বাহিরে প্রকাশ পাইলেও বস্তুত তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না। একজন অধিষ্ঠাতার এক বা একাধিক দরওয়ান থাকে। ইহাদের এক-একজনের মাসিক বেতন কত দিতে হয়? এক একটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে প্রতি মাসে দিয়া করিয়া যে রকম দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ

দরোয়ানের বেতনের সমান হয় তো ? এক-একটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে যে রুত্তি দেওয়া হয়, তাহা দ্বারা তাঁহাকে কয়টি ছাত্রকে আজকালকার দিনে ভোজন দিতে হয় ? এ সব কী কাণ্ড ! শিক্ষার অধিষ্ঠাতা মহাশয় নিজের জানিয়া-গুনিয়া কল্পে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লজ্জা অনুভব করেন না, ইহা নিতান্তই বিখ্যের বিষয়। সংস্কৃত শিক্ষাকে একবারে তুলিয়া দিসেই হয়, সরকারী ভাণ্ডারের কিছু আয় বেশী দেখাইতে পারা যাইবে।

বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রত্যেক জীবেরই স্বাভাবিক। যেমন করিয়া হউক সে বাঁচিবার চেষ্টা করিবেই। ভিক্ষায় যে না বাঁচা যায় তাহা নহে। কিন্তু সে জীবন নিতান্তই কদম্ব। অনেক সময় তাহাতে আবার নির্বাহও হয় না। তবে কি করিতে হইবে ?

শ্রী বালিয়াছেন, নির্বিশেষে তিনি সকলকে এই উপদেশ দিয়াছেন—“কাজ করিয়াই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে।”

শ্রদ্ধার সহিত ইহা গ্রহণ করিয়া এই কর্মেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্মের অসাধ্য কিছু নাই। এমন কোন তপস্যা নাই, বাহা দ্বারা মানবের কল্যাণের সিদ্ধি না হয়।

আর একটা কথা আমাদের মনে করিতে হইবে, যদিও ইহা আমাদের সকলেরই অতিপরিচিত। কথাটা এই যে, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু যদি একত্র মিলিত হয় তবে কার্যসিদ্ধি হয়—“অল্পানামপি বহুনা সহিতঃ কার্যসাদিকা।”

বেদের মধ্যে অনেক কর্ম আছে যাহাকে ‘সাংমনস্ত’ বলা হয়, অর্থাৎ যাহাতে সকলে একত্র একমনে মিলিয়া কাজ করিতে পারে। আমরা যেন ইহাই করিতে পারি। “সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বা মনাসি জানতাং”—এই মন্ত্রটি আমাদের কে না জানে ? আমরা চারিদিকে অনেক আছি। ইহাদের মধ্যে একটি লোকও অযোগ্য নাই। নীতিবিদেরা বলেন, “অযোগ্যো নাস্তি বৈ কশিচ্ছ যোজকস্ত সুদূর্লভঃ”, অর্থাৎ, অযোগ্য কেহই নাই, যে কাজে লাগাইয়া দিতে পারে সেই লোকটি তুল্য। আমাদের মহামহোপাধ্যায়ের প্রয়োজন আছে, কাব্যতীর্থেও প্রয়োজন আছে, অকাব্যতীর্থেও প্রয়োজন আছে। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সকলে মিলিত হইয়া কোন কার্যে নিযুক্ত হইলেই হয়। কিন্তু কাজ কোথায় ? কি কাজ ? এক জনেরই ত কাজ নাই ? এত লোকের কাজ কোথায় পাওয়া যাইবে ? না হয় কাজ হইল, কিন্তু টাকা কোথায় যাহা এতগুলি লোকের মধ্যে উপযুক্ত ভাবে ভাগ করিয়া দিতে পারা যায় ? ইহাতে ত কোন সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সত্য কথা, সম্প্রতি কোন কাজ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু

অচিরেই নূতন নূতন কাজ উদ্ভাবন করিতে হইবে এবং ইহা এমন নহে যে, উদ্ভাবন করিতে পারা যায় না। সমাজের অন্তান্ত বিভাগেও ত এইরূপ হইতেছে। এখানেই বা কেন তাহা না হইবে। বর্তমানকালই ইহার অল্পকাল ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে।

ভাল, আমি কি কাজের প্রস্তাব করিতেছি ? অনেক, অনেক ; গুটিকয়েক মাত্র উল্লেখ করিতেছি, প্রকাণ্ড তালিকা করিয়া লাভ নাই। প্রথমত একখানি সংস্কৃত কোষ বা অভিধান রচনার কথা ধরা যাক। আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন নির্বাহ হইতে পারে এইরূপ একখানি অভিধানের দরকার। আদর্শ হিসাবে ইহা মনিয়ার মনিয়ার-উইলিয়মের সংস্কৃত-ইংরেজী কোষের (A Sanskrit-English Dictionary by Sir Monier Monier-Williams) সমূল্য হইবে। আর আকারে এক ষষ্ঠে অনধিক ১৩৫০ পৃষ্ঠার হইবে। উৎসাহী পাঠকেরা একবার ইহা দেখিলে ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন, বর্ণনা করা যায় না। এই নূতন অভিধান রচনার কথায় শ ক ক ল-দ্র ম অথবা বা চ স্প ত্যের মহত্ত্ব বা পৌরব অপনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে না। শেখোক্ত অভিধান দুইখানির বিষয় স্বতন্ত্র, আর বহু নূতন কথা তাহাতে যোগ করা আবশ্যিক।

দ্বিতীয়ত অপর একখানি কোষ। ইহার নাম দেওয়া হইতে পারে ভারতীয় দর্শন মহাকোষ। প্রথমে ত্রায়কোষের ত্রায় এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের পৃথক পৃথক কোষ রচনা করিয়া এবং তাহাদের পৃথক পৃথক প্রচার করিয়া, ঐ সমস্ত কোষের উপকরণসমূহের দ্বারা স্বতন্ত্র একখানি সুবহু কোষ রচনা করিতে হইবে। ইহার নাম দেওয়া যায় ভারতীয় দর্শন মহাকোষ। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শনাধ্যাপক ভীষ্মাচার্য্যসহ সেই সময়ে স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন, ‘যদি ইহা সম্পূর্ণ হয় ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অমর করিবে’ (‘If complete, it will immortalize the University’)

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা সম্পূর্ণও হয় নাই, আর কর্তৃপক্ষ তাহার সম্বন্ধও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ইহাকে নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং পণ্ডিতগণ যতশীঘ্র ইহা করিতে পারেন ততই ভাল।

কালিদাস কোষ নামে আর একখানি অভিধান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সঞ্চলন করা হইতেছিল, বিশেষত ছাত্রেরা ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতেও হাত দিতে পারা যায়।

এইরূপ কত কত রচনার উপযুক্ত পুস্তকের নাম করিতে পারা যায়, ইহার ইয়ত্তা নাই। যেমন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত

ইত্যাদি হইতে ভাষায় অনুবাদ এবং ঐ ঐ বিষয় উপযোগী গ্রন্থের রচনা ইত্যাদি।

#### প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণ

এখানে একটি অতি আবশ্যিক কার্যের নাম করিতে পারা যায়। ইহা হইতেছে বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে প্রাচীন গ্রন্থগুলির নবনব সংস্করণ। পুস্তকের প্রত্যেকটি পাঠকে বিচার করিয়া বাহ্য যুক্তিমণ্ডিত তাহাঃকই গ্রহণ এবং আর সকলকে বজন হইল ইহাব বিশেষত্ব।

ইহার মধ্যে নিম্নোপ প্রসঙ্গে চীনা ও তিব্বতী হইতে সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধারের যে কথা বলিয়াছি তাহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে।

#### উপায়

এ কথা অনেকেই বলিতে পারেন যে, এ পরিকল্পনা অথবা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনা আরও বহু লোকে

করিতে পারে। সব বুদ্ধিলাম। কাজ করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু টাকা কোথায়? আমরা ত যাত্রামাত্র নির্বাহ চাই, তাহাই ত নাই।

এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু বলিয়াছি, ইহার প্রতীকার আছে। তা ছাড়া সেই গৌরী সেন এখনও আছেন। নিশ্চয়ই তিনি টাকা দিবেন। যদি তিনি না দিতে চান? যে-কোন রকমে হউক, দেওয়াইতেই হইবে। যে আদ না দেয়, সে কাল দেয়, বা দিতে বাধ্য হয়। সত্য কথা; আজ রাষ্ট্রকোষের মুখ আমাদের জন্য বন্ধ। কালও ইহা এইরূপ থাকিবে বলা যায় না। অতীত মনে হয় যদি আমরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করি তবে আমাদের কল্পনারও অত্যন্ত অর্থচুল্লভ হইবে না। ---\*

\* সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবের সভাপতির অভিভাষণ। ১৩৬৬ (সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ)

## বিদায়

শ্রীমহাদেব রায়

ক্ষীণ পুণ্য সেই মর্ত্যলোকে পুনরায়  
মাগিতে হইল স্বর্গ হইতে বিদায়  
শঙ্করে জানায়ে নতি। আটশে প্রভাতে  
স্বর্ণ চিনারের বন রাখিয়া পশ্চাতে  
চলি ক্রান্ত রাঙপথে। দীর্ঘ গিরি-পথ  
শত ক্রোশ রূপে-রসে ভরি' মনোরথ  
নব রক্তরাগে রাঙাইয়া ভাবে-ভারে  
বিলা'ল ঐশ্বর্য-রাশি; ইরাবতী-পারে  
সমাপ্তি রচিল আসি। পুনঃ গৃহ-পথে  
সাজিতেছে জনে-জনে সেই বাস্পপথে  
স্বর্গ বাস করি' শেষ। এখনও নিমেষ  
পড়িতে চাহে না যেন অরি' সেই দেশ,

দশ দিন সমারোহ উপভোগে যাব,  
হয় নাই অবসান কৌতুক হিয়ার  
একটি দিনের তরে। গৃহগত প্রাণ  
তবু যে ছুটিতে চায় যেথায় অন্নান  
স্বর্গের অধিক শোভা; হ'ল তাই ক্ষীণ  
পুণ্য স্বর্ণকালে, যেন অতি ঋণদীন  
প্রবেশিল মহীলোকে স্বর্গবাস ছাড়ি,  
ভুলোকে চলিল তীর্থে তীর্থে তাড়াতাড়ি  
—আত্মা, দিল্লী, মথুরা ও বৃন্দাবনধাম,  
প্রয়াগ, কাশীর পুণ্য পূর্ণমন্ডাম  
স্বর্গাধিক গরীয়সী ভূমিরে যখন  
হেরিলু, স্থগিত হ'ল এ ছুটি নয়ন।



শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

ভোরবেলা কুলীদের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙে যায়, বেহিরে দেখি মোট মাথায় জনতিনেক কুলীর সঙ্গে রাম দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—“ব্যাপার কি, হঠাৎ যে শ্রীরামচন্দ্র বনে আগমন করলেন?” এগিরে এসে মামাতো ভাই রাম প্রশ্নাম করে বলে ‘খবর সব ভালই, তবে খবর না দিয়ে হঠাৎ এসে পড়লাম।’ খুলী হয়ে বলি, ‘বেশ করেছ ভাই, এইবার কুলীদের মাথা থেকে মোটগুলো নামিয়ে নিয়ে ওদেয়ে বিদেয় কর।’ মালপত্র নামিয়ে রেখে মজুরি ও বকশিশ আদায় করে কুলীরা চলে যায়, রাম মাথা চুলকে বলে, ‘সঙ্গে সরলাদি এসেছেন।’ সঙ্গে সরলাদি এসেছেন! আবার অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, ‘সরলাদি কে রে? কোথায় তিনি?’

রাম একটু ইতস্ততঃ করে বলে, ‘চেন না সরলাদিকে? আমার মাসভৃত বোন—রমামা-গীর মেয়ে।’ সরলাকে না চিনতে পারলেও রামের রমামাসীকে চিনি—বলি, ‘কিন্তু কোথায় সে, ট্রেনে রেখে এলি নাকি!’ রাম পেছন দিকে তাকিয়ে ডাকে—‘সরলাদি, ও সরলাদি এদিকে এস।’ চামেলির ঝোপটার আড়াল থেকে একটি মেয়ে এগিরে আসে, সাদা চাদরে সাবা গা ঢাকা, পরনে সাদা ধান, হেঁট হয়ে প্রশ্নাম করে সে দাঁড়ায়। চেয়ে দেখি রক্তহীন শীর্ণ এক-খানিমুখ। বলি, ‘তোমাকে না দেখলেও তোমার মাকে দেখেছি—শরীরটা বুঝি ভাল নয়।’ কথা না বলে মাথা নেড়ে জবাব দেয়—‘শরীর ভাল না।’ রামকে বলি, ‘চল এইবার ভেতরে, জিনিষ-গুলো আমি চাকর দিয়ে ঘরে নিচ্ছি—এস সরলা।’

রামের পিছনে পিছনে সরলা নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়।

সন্ধ্যার গাড়ীতে রাম কলকাতা ফিরে যায় সরলাকে রেখে। ব্যাপারটা খুবই সবল, বালবিধবা সরলা তার ভাইয়ের সংসারে বাস করত। গত বৎসর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিছুতেই ভাল হয়ে

উঠে না, শেষ পর্যন্ত বড় ডাক্তার দায় দেন—রোগটা পারাপ। ভাই আতঙ্কিত হয়ে উঠে, ছেলেপুলের সংসার, এমন রোগীকে আর



“চামেলির ঝোপটার আড়াল থেকে এগিরে আসে—”

এক দণ্ডও রাখা চলে না। পরামর্শদাতার অভাব হয় না— বলে, মৃত্যুর অবিবাচিত লোক, সংসার বলতে আপনি আর কপনি, ছোটনাগপুরের স্বাস্থ্যকর ভায়গার বাস করে, সরলাকে দাও ওর ওখানে পাঠিয়ে। সম্মতি নেবার প্রয়োজনও কেউ বোধ করে না, রামের সঙ্গে সরলাকে আমার এখানে পাঠিয়ে দেয়।

এই ভাবে সরলা আমার সংসারে এসে জোটে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি, আমার চেয়ে অনেক ছোট। দুর্বল শীর্ণ শরীরটাকে কোনমতে টেনেটেনে নিয়ে নিজের রান্নাটুকু করে আর শুয়ে থাকে। রক্তহীন শীর্ণ মুগ্পানার দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হয় মরে যাবে না ত! কিন্তু সরলা মরে না, ভায়গার ভলভার ওয়ে ওর শরীর একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠে। হাড়গুলোর উপর মাংস দেখা দেয়, বল কিছু আসে। দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

বহু মানুষের সংস্পর্শে আমি কোনদিনই আসি নি, তাই এই মানুষটির সংসর্গ প্রথম প্রথম প্রীতিকর না মনে হলেও শেষে ভালই লাগে। ক্রমে ক্রমে সে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে বসে। ক্রি পাব, কি পরব, কি করব সব বিষয়েই তার মতামত গ্রহণ হতে থাকে। আমার কখনোই অবসর সময়ের একটা কাজও জুটে যায়—এই রূপ বিধবা মেয়েটির রক্তময় মনোভগতের পরিচয় পাবার চেষ্টা করি। আমি দেখতে পাই সরলার দসবর্ণ হাতে বঙ্কিত অস্তুর এতদিনের নিগাড়নেও মরে যায় নি, আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারি আর দশ জনের মত সেও কামনা করে, কল্পনা করে, অনাগত ভবিষ্যৎ তার কাছেও রঙীন। একদিন সে আমাকে বলে, ‘দাদা, ওরা আমাকে বলেছিল আমি বাচব না, আমার নাকি পারাপ অস্ত্র, সারে না—কিন্তু সেদে ত উঠলাম।’ বলে সে খুশীর আবেগে হাসতে থাকে, তারপরে মাথা নেড়ে বলে, ‘আমি কিন্তু জানতাম আমি সেদে উঠব!’ হঠাৎ সে আমাকে প্রশ্ন করে, ‘আচ্ছা দাদা, আমি একেবারে সেদে গেছি ত, আর ত কোন ভয় নেই।’ বলি, ‘না, আর ভয় নেই, সত্যিই তুমি একেবারে সেদে উঠেছ।’ শুনে সরলার মুগ্পানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। মনে মনে ভাবি এ মিথ্যা সত্য বলার চেয়ে বড়।

প্রায়ই চোখে পড়ে সরলা আরনার সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়ায়। ওর ঘরে গেলে একটা সুগন্ধ পাই, হয়ত সেটা কেশেঁতলের, অথবা আর কিছুই। বিষয়টা কিছুই নয়, তবু চিন্তা কোঁতুলী হয়ে উঠে। সেদিন বিকেলের দিকে ঘরে বসে লিপছি এমন সময় আন্তে আন্তে সরলা এসে অদূরে বসে। কিছুক্ষণ উসখুস করে, হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, ‘আচ্ছা দাদা, মানুষ মনে প্রাণে বা হবে বলে বিশ্বাস করে তা কি হয়?’ কঠিন প্রশ্ন, বুঝি লেগা আর হবে না, কলম বেখে ভাবতে শুরু করি, উত্তরের প্রতীক্ষায় সরলা উঃসুক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে বলি, ‘অনেক কিছু হবে বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু সব সময় তা হবার ত বৃত্তি দেখি না।’ শুনে সরলা মুগ্পানা নীচু করে বসে, কিছুক্ষণ কি ভাবে জানি না, তার পরে হঠাৎ মুগ্ধ ভুলে বলে, ‘আপনি বাই বলুন

দাদা, আমি বলব আমার বা হবে বলে বিশ্বাস করি তা হয়।’ সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে বুঝি সে কি শুনতে চায়, কি শুনলে খুশী হয়, বিচারবুদ্ধিকে বিলায় দিয়ে হেসে বলি, ‘হয়ত তোমার কথাই ঠিক, যা বিশ্বাস করি তা সত্যিই হয়।’ শুনে সরলার মুগ্ধ খুশীর আলোতে ভরে যায়, আবেগের সঙ্গে বলে, ‘দাদা, আমি ছোটবেলা থেকে বিশ্বাস করি আমার জীবন এমন অর্থহীন ভাবে কাটবে না, কাটলও না, দেশগ্রামের সঙ্গীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।’ বুঝলেন দাদা, যোগটা নিমিত্তমাত্র।’

আবার সরলা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, আমি বুঝি একটা ঢেঁট আসছে, সরলার অন্তরে কুল ছাপিয়ে সে ঢেঁট বাইরে এসে প্রকাশ পাবে, আমি প্রস্তুত হয়ে বসি। হ’লও তাই, সরলা আমার দিকে তাকিয়ে বলে—‘দাদা, আমি বাতদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম আমার জীবনকে বার্থ করো না, আমার জীবনকে সার্থক করে তোলা। ভগবান এত দিনে আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করতে চলেছেন, আমি ভাল হয়ে উঠেছি, আমি গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়েছি এখন থেকে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হবে।’ সরলা ধেমে যায়, ভাবাবেগে তার মুগ্পানা রাজ্য হয়ে উঠে। আমি ওর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারি, কিছু বলি না, চুপ করে বসে থাকি। একটু পরে সরলাই কথা কয়, বলে, ‘আমি আর দেশে ফিরে যাব না।’ প্রশ্ন করি, ‘তা হলে কোথায় যাবে?’ সরলা বলে, ‘কান্দি যাব, আমার এক দিদি আছেন সেখানে, তাঁরই কাছে আমি যাব।’ আমি বলি, ‘বেশ, বেশ তাই যেয়ো—কান্দি ভাল জায়গা, ধর্ম অর্থ ইত্যাদি সবই সেখানে পাওয়া যায়।’

ছোটনাগপুরের ভীষণ শীতের শেষে প্রথম গরম হাওয়া বইতে শুরু করে—কাঞ্চন মাস। আমার বাগানের হুটো পলাশগাছে গোছাগোছা লাল ফুল ফুটে উঠে। সরলার শরীর আজকাল ভালই আছে, অনেকটা চলাফেরা করতে পারে। বিকেলবেলা বাগানের করবী ফুলের দীর্ঘ পথ ধরে সে ঘোরে ফেরে, দমকা বাতাসে তার মাথার কাপড় খসে পড়ে, সেটা আবার তুলে দেবার চেষ্টা সে করে না, নিজের মনে ধীরে ধীরে চলে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে আমি তাকে দেখতে পাই, এলো চুলের গোছা কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, আঁচল অস্বস্ত, পায়ে একজোড়া হালকা শ্রান্ডাল। স্বীকার করি সে সন্দর্ভী, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের উপর রোগের ছায়া গাঢ়ভাবেই পড়েছে।

বসন্তের আমেজ বোধ হয় আমার শুকনো মনেও লেগেছিল, তাই সেদিন অনেক রাত্রে বেড়িওতে একটা মিঠে স্বপ্নের গান শুনে লেগা বন্ধ করে বসেছিলাম। পূর্ণিমার কাছাকাছি, বাইরে প্রচুর জ্যোৎস্না, মন আবিষ্ট হয়ে আসছিল এমন সময় পেছনে একটু আওয়াজ পেয়ে চেয়ে দেখি দরজার পাশে সরলা দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ‘কখন এলে, টেরও পাই নি।’ হেসে সরলা বলে, ‘অনেকক্ষণ।’ আমি বলি, ‘ভেতরে এসে বস।’ সরলা এসে একখানা চেয়ার টেনে বসে। বুঝি এই মিঠে স্বপ্নটাই ওকে



বিছানা থেকে টেনে এনেছে। গান ধেমে যায়, সরলা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, তার পরে আন্তে আন্তে বলে, 'কি সুন্দর গান।' আমি বলি, 'গানের স্তরে তোমার ঘুম ভেঙে যায়, তুমিই গানের সত্যিকার সম্বাদার।' সরলা মুচ কণ্ঠে বলে, 'এক সময়ে আমিও গান গাইতে পারতাম।' উৎসাহিত হয়ে বলি, 'তাই নাকি, এ খবরটা এতদিন আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে।' সরলা বলে, 'সে অনেকদিনের কথা, এখন গান গাইতে গেলে গলা দিয়ে কি বেরবে তা জানি নে।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে সরলা, বুঝতে আমার দেরি হয় না—সে ততীহের মধ্যে ডুবে গেছে।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায়—উঠে বাইরে যাই। হলঘর দিয়ে যাবার সময় দেখি সরলায় ঘরের দরজা গোলা। হুঁপা এগিয়ে যেতেই এবাক হয়ে দাড়াই, বাইরে জ্যোৎস্নার বলা বইছে,



“সরলাকে দেখি না, দেখি তার ছায়া”

সরলার ঘরের গোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে, সরলাকে দেখতে পাই না, দেখতে পাই দরজা পর্যন্ত এসে পড়েছে তার ছায়া—জানালার ধারে চুপ করে সে বসে আছে।

দিন যায়, একটু একটু করে গরম বাড়তে থাকে, শামল প্রাস্তরে পেকুরার ছোপ লাগে। প্রায়ই দেখতে পাই—তুপুরের দিকে সরলা কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিপতে বসে। ভাবি এত চিঠি সরলা লেখে কাকে? বলি একদিন রহস্য করে, 'কি লিপছ, চিঠি—না কবিতা?' অপ্রস্তুত ভাবে কাগজপত্র সরিয়ে রেখে সরলা বলে, 'না দাদা, কবিতা নয়, আমি মুগ্ধ মাত্রয় কবিতা-টবিতা লিপতে জানি নে, লিপছিলাম চিঠি।' বলি, 'তা বেশ, তা বেশ, লেখ।' আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি এমন সময় সে ঢেকে বলে, 'দাদা, একটা কথা বলব?' 'কি কথা?' ফিরে আসি আবার। সরলা উত্তম্বতঃ করে বলে, 'কয়েক দিন থেকে একপানা চিঠি লিপবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই গুছিয়ে লিপতে পারছি নে।' পাশের চৌকিতে বসে প্রশ্ন করি, 'এ তেন জগুবি চিঠি কাকে লিপছ?'

সরলা বলে, 'কাশীর দিককে।'

—কি লিপছ?

—আমি কাশী গিয়ে দিদির কাছে থাকতে চাই।

—বেশ ত, তাই লিখে দাও।

—শুধু এটুকু লিপলে কেমন করে হবে দাদা? অনেক কথা লিপতে হবে।

—তা হলে আমাকে দিয়ে হবে না—উকিল চাই।

সরলা হেসে বলে, 'আপনার সব বিষয়েই তামাশা। আপনি সাহিত্যিক কত কথা লেখেন, আমি দুটো কথাও গুছিয়ে লিপতে পারি নে, একটা লিপ্তি ত আর একটা ভুলে যাই।' আমি বলি, 'কি কথা লিপতে হবে বল?' সরলা পানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে, 'লিপতে হবে আমি আর দেশে ফিরে যাব না, আমি কাশী যাব, কাশীতেই থাকব। সেখানে একটা কাগজপত্র জুটিয়ে নেব—এই সব।' বলি, 'আচ্ছা, দাও কাগজ, তোমার চিঠি আমিই লিপে দিচ্ছি।' চিঠি লেপা শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় সরলা বাস্তব হয়ে বলে, 'লেপা শেষ হয়ে গেছে নাকি দাদা?'

—হ্যাঁ হয়ে গেছে।

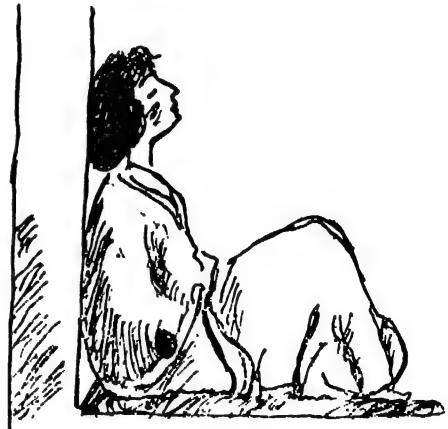
—এই দেখুন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

—কি কথা বল।

—লিখুন আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি।

পুনশ্চ দিয়ে লিপি—সরলা একেবারে ভাল হয়ে গেছে।

বৈশাখ এসে পড়ে, সারাদিন ধুলো উড়িয়ে ছুঁতে গরম তাওয়া বর। বাইরে বেরুনো চক্ষু, ঘরে বসেও স্বস্তি নেই। সরলার শরীরটা ভাল নেই। কিছুই আশ্চর্য নয়, চায়ালীভল বাংলা-



“সেদিন শরীরটা তার খুব খারাপ”

দেশের মেয়ে, ছোটনাগপুরের নিখুঁত গ্রীষ্ম সহ্য করে উঠতে পারবে কেন? আমি সাবধান করে বলি, 'সকাল সকাল বাত্মা বাত্মা করে ঘরে চলে যাবে সরলা—তোমার শরীরটা ভাল দেখছি না।' শুনে সরলা চমকে উঠে, তাড়াতাড়ি বলে, 'শরীর ত আমার ভালই আছে দাদা।' বলি, 'এপানকার গরম তুমি সহ্য করতে পারছ না, তাই

তোমাকে কিছু কাব্য দেখাচ্ছে।' এইবার তেঁসে সরলা বলে, 'হ্যাঁ দাদা, গরমে শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে।'

সেদিন সকালবেলা ঝি ককিয়ায় সঙ্গে সরলার একটা পরামর্শ চলে। পরামর্শটা কি বুঝতে পারি না, তবে দেখি ককিয়া একবার ছুটে বাঙারে যায়, আবার আসে, আবার যায়। রীতিমত কোঁতকনী হয়ে উঠি, সবাসরি একেবারে সরলার রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হই, প্রশ্ন করি, 'বাগারটা কি বল ত সরলা?' সরলা বলে, 'বাগার ত কিছু নয় দাদা।' আমি বলি, 'গোপন করবার চেষ্টা করো না, ধরা পড়ে গেছে—বল ত ককিয়া সকাল থেকে অত ছুটো-ছুটি করছে কেন?' এইবার সরলা তেঁসে উঠে বলে, 'হয়েছে কি জানেন ককিয়া বলেছে—গরমের দিনে 'দতি' পাও দিদি, তবে শরীর ভাল হবে।' বলি, 'তাই বুঝি ককিয়া 'দতি'র সন্ধানে ঘোড়াদোড়ি করেছে?' নাথ্য নেড়ে সরলা বলে, 'হ্যাঁ, গরমে সত্যিই আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ককিয়া যখন বলেছে তখন গেয়ে দেখি দই! উৎসাহ দিয়ে বলি, 'বেশ, বেশ, খুব ভাল পরামর্শ, দই গেলে উপকারট হবে, দই ভাল জিনিষ।''

কিন্তু 'দতি' গেয়েও সরলার শরীর ভাল হ'ল না। পাশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আমার ঘরে ঢুকে সরলা ডাকে—'দাদা।' চেয়ে দেখি সরলার চোখমুখ খুশীও ভালোয় ভরা, প্রশ্ন করি, 'ভারি খুশী যে, বাগার কি?' তেঁসে সরলা বলে, 'এবার পেয়েছি।' বলি, 'কি পেয়েছ?' মনে হচ্ছে খুব দম্ভী জিনিষ, আমাকেও ভাগ দিতে হবে কিছু।' সরলা বলে, 'নিশ্চয় দেব, কত নেবেন বলুন।' আশ্চর্য হয়ে বলি, 'বড়ো কি বল ত?' সরলা তেঁসে ফেটে পড়ে, বলে, 'হল।' জল। জল পেয়ে এত খুশী, বলি, 'তামাশা হচ্ছে আমার সঙ্গে।' হাসি থামিয়ে সরলা বলে, 'তামাশা নয় দাদা, সত্যিই এবার পেয়েছি। ও বাড়ীর বৌদি বললেন এদেশে গরমের সময় জল খেতে হয়, ঘড়া ঘড়া জল খেতে হয়, জলই নাকি শরীর ভাল করে। বললেন, আর কিছু পাও না পাও বাছা ঘড়ি ঘড়ি জল পাবে, দেখবে চ'দিনে মুটিয়ে যাবে।' শুনে আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠি, বলি, 'এস দুজনে পান্না দিয়ে জল খাই—দেখি, কে আগে মুটিয়ে যায়।' আমি না গেলেও সরলা যখন তখন জল খেতে শুরু করে, ককিয়াকে দিনে দশবার কুঁজো ভর্তি করতে হয়।

কিন্তু জল গেয়েও সরলার বিশেষ উপকার হ'ল না।

গরমে ঘরে শোয়া অসম্ভব, তাই বাহিরের বাবান্দার খাটিয়া ফেলে মশারি ঢানিয়ে শুয়েছি। স্বপ্ন দেখছি—ডাকপিয়নটা বাগানের কাঁকর দেওয়া পথ ধরে জুতোয় গস গস আওয়াজ করে চলে আসছে, কিন্তু সে চলে আসার যেন শেষ হয় না, আসছেই, আসছেই—পথটুকুর যেন অন্ত নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়—না—এ ত স্বপ্ন নয়, সত্যিই ত জুতোয় আওয়াজ শুনেতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি মশাকটা তুলে দেখি ভোর তখনও হয় নি, আবছায়া অন্ধকার, সেই অন্ধকারে জুতোয় আওয়াজ বাগানের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। এমন সময় পিয়ন

আসবে কেন? তবে এ কি পিয়নের প্রেতাত্মা! ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছি, এমন সময় সাদা কাপড়ে গা ঢাকা একটা মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আবার ফিরে যায়। সাহস সঞ্চয় করে শুকনো গলায় প্রশ্ন করি—'কে?' মূর্তি ধেমে গিয়ে ভাবব দেখ, 'আমি সরলা।' সরলা! অবাক হয়ে উঠে বসি, বলি 'এত রাজে তুমি করছ কি?' সরলা উতস্কৃত করে বলে, 'ভোরবেলা উঠে বেড়াচ্ছি।' ভোর! বলি, 'ভোর হতে এখনও অনেক দেরি, মতলব কি বল ত আমাকে ভয় দেখানো!' সরলা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'ভয় পেয়েছিলেন নাকি?' বলি, 'নিশ্চয়, আমি বলে মুচ্ছা বাই নি।' সরলা তেঁসে বলে, 'ও পাক্কার রমার মা বেড়াতে এসেছিলেন। আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না শুনে বললেন—খুব ভোরে উঠে বেড়াবে, দেখবে শরীর ভাল হয়ে যাবে।' বলি, 'সকালে বেড়ানো ভাল, কিন্তু রাজে নয়।' সরলা বলে, 'আজ একটু বেশী আগে উঠে পড়েছি দাদা।' সরলা বাগানের পথ ধরে চলে যায়, আমি শুয়ে শুয়ে কাঁকরের উপর ওর হালকা ফ্রান্ডেলের আওয়াজ শুনি।

কয়েক দিন পরে ভোরবেলা শুয়ে শুয়ে ভ্রমণরতা সরলার পারের আওয়াজ শুনি—সে ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মনে হয় ওর চলায় মধ্যে যেন প্রাণ নেই, উৎসাহ নেই, একটা অপরিদ্রা ক্লান্তি যেন ওর পদক্ষেপকে ভারী করে তুলেছে। শুয়ে থাকতে পারি না, উঠে পড়ি, এগিয়ে বাই ওর দিকে। আমাকে দেখে সরলা দাঁড়ায়। পূর্বের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে, একটা স্বচ্ছ আলো করবী-তলার অন্ধকারকে তরল করে দিয়েছে—সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে আচমকা মনের মধ্যে একটা ব্যাথা বোধ করি, গত রাজের শুকনো ফুলের মতই মুখ ওর শুষ্ক। বেড়াতে বেড়াতে জিজ্ঞাসা করি, 'ভোরে উঠে বেড়িয়ে তোমার কেমন লাগছে?' ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সরলা বলে, 'কৈ আর ভাল লাগছে দাদা, বয়ঃ—' কথাটা শেষ করে না সরলা, মনে মনে কথাটা সামিট শেষ করি। চলতে চলতে সরলা বলে, 'হ'সপ্তাহ হয়ে গেল—শরীর ত ভাল হ'ল না দাদা।' কথাটার মধ্যে হতাশার সুর বেঁচে উঠে—ভয় পাই আমি। ওর মনটাকে হালকা করবার জঙ্গে সহজভাবে বলি, 'শরীরের দোষ দিও না সরলা—ঘুম নষ্ট করে অত ভোরে বেড়ালে ভাল শরীরও খারাপ হয়।' শুনে সরলা আশ্বস্ত হয়, বলে, 'ঠিক বলেছেন দাদা, ঘুম নষ্ট করেই আমার শরীর আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে—আপনাকে বলছি, ভোরে আর আমি বেড়াব না।'

বর্ষা আসে—শুকনো মাঠে আর তৃষ্ণিত শালের বনে বর বর করে বৃষ্টি পড়ে। গরম আর নেই, সজল পূবালি বাতাসে গারে কাপড় জড়াতে ইচ্ছা করে। সরলাকে বলি, 'গরমটা যখন কাটিয়ে দিতে পেরেছ তখন আর ভয় নেই—এইবার শরীর দেখতে দেখতে ভাল হয়ে যাবে।' সরলা ভারি খুশী—তার শরীরের শানিকটা পরিবর্তনও দেখা যায়। চলাফেরার মধ্যে আবার সজীবতা ফিরে আসে। ইতিমধ্যে একদিন ওর কাণীষ দিদির চিঠি আসে, লিখেছেন, 'তুমি আসবে এখানে জেনে স্ত্রী হুলাম, আমি তোমাকে যতটুকু

সাগাঃ কবচে পারি তা করব।' বাবার জন্তে প্রস্তুত হতে থাকে সরলা।

কিন্তু ক'টা দিন পরেই আমি বুঝতে পারি—সরলায় পরিবর্তনটা সাময়িক। আমি ও বিষয়ে কিছু বলতে গেলে সরলা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। শরীর যে তার একটু একটু করে ক্রমেই ধারাপ হচ্ছে একথাটা আত্মকাল সে অস্বীকার করে। আমি সাবধান হয়ে বাই—কিছুই বলি না—মনে মনে ঐশ্বস্তি বোধ করি।

বিকেলের দিকে সেদিন একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—আকাশ মেঘ ঢাকা, ক-ক করে ভিজে বাতাস বইছে। সরলার ঘরে ঢুকে দেখি সে ঘরের সবকয়টা জানালা খুলে দিয়ে শুয়ে আছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠি, বলি—‘একি করেছ সরলা, বন্ধ কর, বন্ধ কর জানালা, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে মতা মুশকিল হবে।’ আমাকে দেখে সরলা উঠে বসে, বলে ‘বড় গরম লাগছে দাদা, তাই জানালা খুলে রেখেছি, তাওয়া ভালই লাগছে আমার।’ অথচ বলে, ‘গরম লাগছে! বল কি সরলা, আমার ত রীতিমত শীত করছে।’ সরলা বলে, ‘আমার কিন্তু গরম লাগছে, আত্মকাল বিকেলের দিকে এই রকম গরম বোধ করি।’ হঠাৎ এগিয়ে এসে আমি তার কপালে হাত দিই, বা ভেবেছি তাই, সরলার গা বেশ গরম—জ্বর হয়েছে। কথাটা বলতে গিয়ে থেমে যাই। সরলা উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করে, ‘কি দেখলেন দাদা?’ তাড়াতাড়ি বলি, ‘কিছু না—দেপলাম তোমার গাটা আমার চেয়ে গরম কিনা।’ আশস্ত হয়ে সরলা বলে, ‘বসুন দাদা।’ ওর বিছানার প্রান্তটিতে বসি। সরলা বলে, ‘আপনি কান্না গেছেন দাদা?’ বলি, ‘হ্যাঁ, গেছি বৈকি—বেশ ভায়গা।’ সরলা উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, ‘নিদিকে লিখেছি, আমি শিশুগীতই যাব—সেখানে গিয়ে ভীষনটাকে নতুন করে গড়ব।’ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করে, ‘আচ্ছা দাদা, আমার এই বয়সে কি আর লেখাপড়া শেখা সম্ভব নয়?’ ‘নিশ্চয় সম্ভব।’ কথাটার ব্যর্থষ্ট জোর দিয়ে বলি, ‘নিশ্চয় সম্ভব, বয়সের সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সম্বন্ধ নেই সরলা, তা ছাড়া তোমার বয়সই বা কি?’ শুনে সরলা খুশী হয়ে হাসতে থাকে।

শ্রাবণের মাঝামাঝি, সারাদিন বোধ আর বৃষ্টির পেলা চলে। সরলা স্বভাবতই নীরব প্রকৃতির, আত্মকাল সে আরও নীরব হয়ে পড়েছে, তাই আমার দীর্ঘ দিনগুলি দীর্ঘতর বলে মনে হয়। আমি শান্ত দেখতে পাই দিন দিন তার শরীর ধারাপ হচ্ছে। আত্মকাল

বিকেলবেলা বন্ধকরবার পথটা সে সবখানি ঘুরতে পারে না, কিছুদূর গিয়েই ফিরে আসে, বারান্দার একটি কোণে চুপ করে বসে। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করে না যে, সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমাকে কাছে পেলেই কান্নার কথা তোলে। বলে, ‘এইবার চলে গেলেই হয় দাদা।’ আমি বলি, ‘যাবে বৈ কি, তবে আর ক’টা দিন থেকে যাও—ব্যাটা পার হয়ে যাক।’

সেদিন বিকেলবেলা সরলার শরীর বিশেষ ধারাপ হয়েছে, বারান্দার কোণটিতে বসে আছে। আকাশে মেঘ নেই, পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে আমি ওকে দেখতে পাই, চোখ দুটি নিম্প্রভ, মুখখানা পাণ্ডুর, শীর্ণ দুটি হাত কোলের উপর রাখা। ভিতরটা বাধিত হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে বারান্দার বোরিয়ে আসি। আমাকে দেখে ও বেন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে, ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ‘আমার শরীর এত ধারাপ হয়ে পড়ল কেন দাদা, আমি কি সত্যিই বাঁচব না?’ এমন প্রশ্নের জন্তে প্রস্তুত ছিলাম না, চমকে উঠি, তার পরে সামলে গিয়ে হেসে বলি, ‘অসুখ করলেই মরার কথা মনে হয় কেন? কার অসুখ হয় না বলতে পার? শরীর থাকলেই মাঝে মাঝে অসুখ করবে।’ আমার কথা শুনে সরলার গুকনো মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখ দুটি আলোয় ভরে যায়, বলে, ‘দেখেছেন দাদা, কত ভীর্ণ আমি। সত্যিই ত মাঝে মাঝে কার না অসুখ করে? হ’চার দিন পরে অসুখটা সেরে যাবে তার জন্তে এত ভাবছি কেন?’ আমি সাহস দিয়ে বলি, ‘সেই বাবে বৈ কি—এটা তোমার সাময়িক।’ আশ্বস্ত হয়ে সরলা বলে, ‘দাদা, কান্নার দিকদিকে চিঠি লিখেছি আমার জন্তে একপাশা খবর ঠিক করতে, ঘর ঠিক হয়েছে খবর পেলেই আমি কান্না যাব।’ আমি বলি, ‘খুব ভাল প্রস্তাব।’

এরই কয়েকদিন পরে সরলা বিছানা নেয়। রোজই আমাকে প্রশ্ন করে ‘দাদা, কান্নার কোন চিঠি এল?’ আমি বলি, ‘আজও আসে নি—এলেই তোমাকে বলব।’

বে প্রশ্নটা এই ক’দিন সে সজ্ঞানে করেছে, আজ অজ্ঞান অবস্থায় সেই প্রশ্নটা বাবে বাবে করতে থাকে, আজ আমার উত্তরের প্রতীক্ষা নেই।...

শুপন সবে ভোর হয়েছে, দরজার সামনে চামেলী ঝোপটার উপর কাঁচা রোদ এসে পড়েছে, মনে পড়ে এমনি আর এক প্রভাতে সরলা এখানে এসেছিল।



চিত্তোরের বসতির দৃশ্য

## চিত্তোর দুর্গ

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে মেবারের প্রাক্তন রাজধানী চিত্তোর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজপুতানার বর্তমান নাম রাজস্থান।

আগ্রা থেকে একটি মিটার গেজ রেললাইন সোজা পশ্চিম দিকে রাজস্থানের বর্তমান রাজধানী জয়পুরের ভিতর দিয়ে আজমীরে এসে পড়েছে এবং সেখান থেকে অপর একটি রেললাইন বরাবর দক্ষিণদিকে নেমে রাটলামে এসে মিশেছে। আজমীর ও রাটলাম লাইনের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে চিত্তোরের অবস্থিতি। স্টেশনটির নাম চিত্তোরগড়। সমগ্র রাজস্থান আরাবল্লী পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত।

ডিসেম্বরের শেষে এক দিন ভোর পাঁচটায় আবহাওয়া আলোয় চিত্তোরগড় স্টেশনে নামতে হ'ল। অন্ধকার তখনো দূরীভূত হয় নি। স্টেশনের ছ'একটি কেরোসিনের বাতি নিশ্চয় হয়ে এসেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওয়েটিং-রুমে অশ্রিয় নিলাম। পথে নিরাপত্তার জন্ত আমরা তিন বন্ধু স্থানীয় লোকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে নিলাম। প্রাতরাশের পর স্টেশনেই সমাপ্ত করে বেলা আটটায় একটি টাক্সি উঠলাম। এখান থেকে স্বতঃই দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয় প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত, আনুমানিক পাঁচ মাইল দীর্ঘ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীতে, এই পর্বতমালার উচ্চতাই প্রায় ছ'হাজার ফুট। এই পর্বতেই ইতিহাসবিখ্যাত বিরাট চিত্তোর দুর্গ অবস্থিত। ঐ পর্বতের পানে তাকিয়ে

আমরা তিন জনেই আশ্চর্যবিশ্বত হয়ে পড়েছিলাম। ঋনিক বাদে আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল চিত্তোর দুর্গাভিমুখে। দুর্গের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখে আবার এই স্টেশনেই ফিরে আসব— এই সর্বোচ্চ ভাড়া ঠিক হ'ল সাত টাকা। চিত্তোর দুর্গ লক্ষ্য করে ধূলিময়-বিশাল শূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম।

রাজপুত রাজাদের মধ্যে কেবলমাত্র রাজা সংগ্রাম-সিংহের পুত্র মেবারের রাণা উদয় সিংহই সম্রাট আকবরের সাক্ষীভৌমত্ব স্বেচ্ছায় স্বীকার করে মেবারের পূর্ণ স্বাধীনতার গৌরবকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। স্থায়ী মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্দেশ্যে বাদশাহ আকবর ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তোর আক্রমণ করেন। এক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি চিত্তোর দুর্গ অধিকার করেন। চিত্তোর দুর্গ পুনরুদ্ধারের বাসনায় উদয় সিংহ আরাবল্লী পর্বতমালার মধ্যে আশ্রয়গোপন করে বইলেন। মৃত্যুর পর তাঁর সুরোগ্য বীর পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চিত্তোর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই আশা পূরণ হবার পূর্বেই তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মেবারের স্বাধীনতা অন্তিমত হ'ল।

দু-একটি কুঁড়েঘর ছাড়িয়ে আমরা চিত্তোর দুর্গের পাদদেশে লোকালয়ে উপস্থিত হলাম। চিত্তোর থেকে মেবারের রাজধানী উদয়পুরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর চিত্তোরের জন-

সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাজার থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে নিয়ে চড়াই অভিমুখে অগ্রসর হলাম। পর্বত-আরোহণের

করা হয় “কতেপ্রকাশ”। কতেপ্রকাশে প্রবেশের অল্পমতির প্রয়োজন হয় না। নবনির্মিত, শুভ্র এই বিরাট প্রাসাদটির

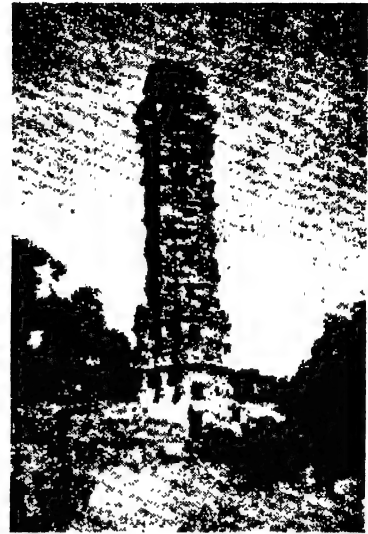


চিতোর দুর্গের একাংশ

মুখে প্রথমেই বিরাট তোরণদ্বারটি অতিক্রম করা গেল। তার পর প্রায় ২০ ফুট চওড়া ও সুরক্ষিত সপিলাকার পথটি ধরে অশ্বযুগল অনায়াসেই আমাদের টাঙ্কাকে উপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। এক পাশে খাড়াই পর্বতগাত্র, অপর পাশে ঝাদের দিকে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ দুর্ভেদ্য পাথরের গাঁথুনি দ্বারা দুর্গটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সাতটি তোরণ অতিক্রম করে পর্বতের সান্নিধ্যদেশে উপনীত হলাম। প্রত্যেকটি তোরণের আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন : দ্বিতীয়টির নাম গিরিপোল, চতুর্থটির নাম লছমন-পোল এবং পঞ্চমটির নাম জোড়াপোল। সমগ্র পর্বতটির মধ্যে কেবলমাত্র এই স্থানটির বিশ ফুট উঁচুতে গাঁথুনির পরিবর্তে লোহার রেলিঙের ব্যবস্থা আছে। সম্মুখে দু-একটি জাঁপ মন্দির ও গৃহের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। একটি গৃহে প্রাচীন আমলের অনেকগুলি তোপ। ভগ্ন গৃহটি বুল ও জঙ্গলে পূর্ণ।

মাঝে মাঝে পথ ঋনিকটা বন্ধ হলেও চড়াই-উৎরাই নেই। মাঝে মাঝে টাঙ্ক থেকে নেমে ও পুনরায় টাঙ্কায় আরোহণ করতে করতে অনেকটা পথ অগ্রসর হলাম। পথের দু'পাশে অধিকাংশই ভগ্ন অট্টালিকা। অরক্ষিত ও অবহেলিত নির্জন দুর্গের ভগ্ন অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে গড়ে-উঠা লোকের নূতন বাসস্থান নজরে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক পেয়ে গেলাম।

বহুক্ষণ পরে আমরা এক বিরাট প্রাসাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম। প্রাচীন কালের পরিবেশের মধ্যে এই নূতন প্রাসাদটির অসামঞ্জস্য স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। মেবাবের রাণা কতেসিংহের নামানুসারে তাঁর এই প্রাসাদটির নামকরণ



জয়স্তম্ভ

নিম্নের কয়েকটি কক্ষে জনকয়েক পুলিশ কাম্ভচারীর বাসস্থান — আর একটি কক্ষকে ডাকঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অভ্যন্তরস্থ বিরাট অঙ্গনে যেত প্রস্তরে নির্মিত রাণা কতেসিংহের আবক্ষ প্রতিমূর্তি। কতেপ্রকাশের সম্মুখে প্রশস্ত সমতল প্রাঙ্গণ এবং পিছনে নবনির্মিত মন্দিরশ্রেণী। পিছনের দ্বিতল বারান্দা থেকে নিম্নের মন্দিরশ্রেণীর নয়নাভিরাম দৃশ্য সত্যই অপূর্ণ।

কতেপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করে আবার সূর্য হ'ল আমাদের পথচলা। এবার এসে উপস্থিত হলাম মৌর্যাব্দয়ের আরাধ্য দেবতা গিরিধারীলালজীর মন্দিরে। মন্দিরে প্রবেশান্তে ঘণ্টাধ্বনির পর সম্মুখেই বংশীধারী বিগ্রহের দর্শনলাভ করলাম।

নবপরিণীতা পত্নীকে খুশী করার নিমিত্ত রাণা কুস্ত গিরিধারীলালজীর এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন। রাণা কুস্ত প্রথম প্রথম মৌর্যকে অষ্টপ্রহর হরিভজনে বিভোর হয়ে থাকবার সুযোগ দিয়েছিলেন। মৌর্য সে ভজনের সুর আজও আকাশে-বাতাসে শ্রবিত হয়ে ভারতবাসীর মনে জাগিয়ে তোলে তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম ও ভক্তির কথা। অষ্ট-প্রহর হরিভজনে গন্ত থেকে শৈব ঋগুরকুলের বিরাগভাজন হয়ে স্বীয় অশান্তি তিনি নিজেই ডেকে এনেছিলেন। ঋগুরালয়ে লাঞ্ছনা সহ করতে না পেয়ে তাঁকে চিতোর ছেড়ে

\* চলে বেতে হয়েছিল। সকল লাহনা অপমান সহ করেছিলেন তিনি গিরিধারীলালজীকে শরণ করে।

পরিপার্শ্বে আবরণহীন প্রাচীর-কোটরে নানা জাতীয় যুদ্ধের চারা উর্দ্ধ মাথা ভুলে দাঁড়িয়েছে। কোঁচুলবশে



মৌর্য মন্দির



এর পরেই আমরা উপনাত হলাম আকাশস্পর্শী সুদৃঢ় ও সু-উচ্চ মিনারের পদমূলে। মিনারের কারুকারণ্যে শিল্পীর সূক্ষ্মচির পরিচয় পাওয়া যায়। এইটিই রাণা কুন্ত-নির্মিত বিখ্যাত জয়স্তম্ভ। ক্ষতেপ্রকাশের অনতিদূরে এই স্থানটিতে দু'একজন লোকের মুখ দেখা যায়। নয় তলাবিশিষ্ট চতুষ্কোণ মিনারটির প্রত্যেক তলার শেষেই দুই পাশে বারান্দা ও অপর দুইটি পাশে গবাক্ষ। নবম স্তরের উপস্থিত হওয়ার পর সেখানে থেকে চিতোর দুর্গের যে নয়নাভিরাম দৃশ্য নজরে পড়ল তা বিস্মিত হবার নয়। এক দিকে দূরের বনরাজিতে ও অসমতল পর্ণশায় দৃষ্টি ব্যাহত হয় এবং অপর দিকে দুর্গপ্রাকার অতিক্রম করে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বহু নিম্নে চিতোর-প্রান্তরে।

তার পরেই আমরা দর্শন করলাম অনতিদূরে পবিত্র গোমুখী জলপ্রপাত। বিরাট গহ্বরের প্রায় ত্রিশ ফুট নিম্নে ক্ষুদ্র একটি স্নানাগারের অভ্যন্তরে পর্বতগাত্রে বাঁধানো গোমুখ থেকে প্রস্রবণের বারিধারা নিঃসৃত হচ্ছিল। সেই বারিধারা স্নানাগারের বাইরে প্রবাহিত হয়ে সেখানে ক্ষুদ্র একটি কুণ্ডে পরিণত হয়েছে। সেই কুণ্ডের চারদিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধানো। নিম্নে চলাচলের সোপানশ্রেণীও প্রস্তর-নির্মিত। তথাকার শৈব মন্দিরটি ভূতপূর্ব রাজকুলের শৈব ধর্মাবলম্বির পরিচায়ক। অবগুষ্ঠনবতী চার জন রাজপুত-মহিলা মন্ত্রোপরি কলসী নিয়ে গোমুখ জলাশয়ে স্নান করতে চলেছে।

ক্ষতেপ্রকাশ ছাড়িয়ে আমরা বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গেলাম। পথের উভয় পার্শ্বের বন্ধুর ভূমিতে কোন দূরান্ত থেকে প্রতিহত অশ্বযুগলের একবেয়ে ক্ষুরধ্বনি কানে আসছে জানি না, কিন্তু বেশ তন্দ্রা হয়েই গিয়েছিলাম।

ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভয় ভূপ ও আগছায় অট্টালিকার ক্ষেত্রভূমি পরিপূর্ণ, উদ্ধপানে বিরাট আকাশের অসীম শূন্যতা। অতীতের এই প্রাসাদটির রাষ্ট্রদায়ক কথা স্বরণে পড়ল। সেযুগে ভয়দশা থেকে রাজপ্রাসাদটিকে রক্ষা করেছিলেন রাণা কুন্ত, বিস্ত্র এ যুগের কুন্তকর্ণেরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকায় এর শেষ চিহ্নটিও বিলুপ্ত হতে চলেছে। অতীতের কত দুঃস্বপ্ন রহস্য বিধ্বজিত রয়েছে এই অট্টালিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে। সে অতীত কাহিনীর অব্যক্ত বেদনায় হয়ত বাতাস হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত।

সত্যিই রক্ষায় জহরকুণ্ডে যিনি অনলদহনে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, এবার আমরা উপস্থিত হলাম রাণা রতনসিংহের সেই অসামান্য ক্রবলাব্যবতী মহিষী পদ্মিনীর স্মৃতিবর্ণ প্রাসাদের সম্মুখে।

প্রাসাদটি দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় চার গুণ। পথের উপরেই প্রাসাদটি চওড়ার প্রায় চল্লিশ ফুট এবং এই মধ্যবর্তী স্থানে মহলটির প্রবেশপথ। প্রবেশপথের পাশেই প্রাচীরগাত্রে একটি প্রস্তরে উৎকীর্ণ রয়েছে “Padmini Mahal”। অবশিষ্ট লেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে কালের প্রভাবে। বহুদিনের পরিত্যক্ত নির্জন প্রাসাদে প্রবেশকালে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। প্রবেশপথ থেকে মহলটির শেষপ্রান্তস্থিত প্রাচীর পর্যন্ত প্রায় পনের ফুট চওড়া, সড়কের স্তায় একটি আজিনা বিদ্যমান। বামে উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট, এর সমান্তরাল প্রায় চার ফুট উচ্চ একটি রোয়াক কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েছে। তৎকালে পসাদিনীদের স্থান ছিল এরই উপরে। ডাইনে পাশাপাশি অনেকগুলি বন্ধনশালায় তখনকার বিরাট চুল্লীগুলি চোখে পড়ে। বামে রোয়াক ও ডাইনে প্রকোষ্ঠের

শেষে ছ'দিকে ছুটি প্রাচীর বিদ্যমান। কিন্তু সড়কের মধ্যপথ উন্মুক্ত, তবে অপেক্ষাকৃত সর্ধীর্ণ। এ পর্যন্ত আমরা যে



কতেশ্বর

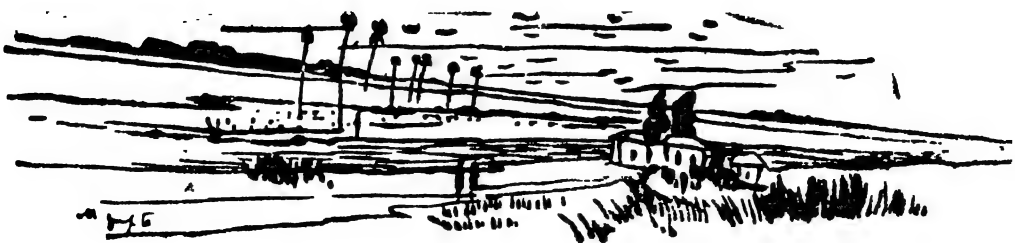
বাহির-মহল অতিক্রম করেছি পূর্বে সেখানে মেলা বসত। সড়ক ধরে আরও ষাণিকটা পথ অগ্রসর হলাম। ডানদিকে উপরে রাণী পদ্মিনীর গম্বুজাকৃতি ক্ষুদ্র মনোরম প্রকোষ্ঠ—সম্মুখের সম্পূর্ণ অংশটি সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা। বামে আঙ্গিনা-প্রান্তে বহির্গমনের রুদ্ধ দ্বার। দ্বারটির অপর প্রান্তেই সুবিখ্যাত জ্বরকুণ্ড। ভূগর্ভ মহলটির নিম্নের অংশ বিদ্যমান। ডাইনে নিম্নাবরোহণের সোপানশ্রেণীর মুখে দ্বারপাশায় তালা দোহুলায়মান, সুতরাং সেখানে যাওয়ার আশা ত্যাগ করে বহুদিনের ভগ্নপ্রায় কাষ্ঠনির্মিত দি'ড়ি অবলম্বন করে সন্তর্পণে উপরে উঠলাম। পদ্মিনীর প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করলাম। এ প্রান্তের গাঁথুনি একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের ভিতর থেকে উঠেছে। মহলটির সম্মুখেই জলাশয়ের অপর প্রান্তে সুদৃশ্য ক্ষুদ্র গৃহটি আমাদের কৌতূহল অতিমাত্রায় বদ্ধিত করল। এটি দেখবার উদ্দেশ্যে পদ্মিনীমহল হতে নিষ্ক্রান্ত হলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জলাশয়বেষ্টিত গৃহটির উপর-তলায় উপস্থিত হলাম। দেয়াল হতে শুরু করে গম্বুজের অভ্যন্তরের প্রতিটি স্তম্ভ কারুকার্যেই স্থাপত্যশিল্পের প্রকৃষ্ট

নিদর্শন। পদ্মিনী-মহলের সম্মুখস্থিত এই ভগ্নপ্রায় গৃহটির উপরকার কারুকার্যচিহ্নিত ক্ষুদ্র অলিঙ্গ থেকে পদ্মিনীমহলকে বিরাট ও সৌন্দর্যের আকর বলে প্রতীয়মান হয়, এর অভ্যন্তরভাগ কিন্তু একেবারে ফাঁকা। উপরকার জলাশয়ের শাস্ত জলে পদ্মিনী-মহলের প্রতিবিম্ব, মহলের সৌন্দর্যকে শতগুণে বদ্ধিত করেছে। এই পরিবেশের সঙ্গে যেন ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে পদ্মিনীকে কেন্দ্র করে সেই কিংবদন্তী।

এখান থেকে আরও প্রায় আশ মাইল অগ্রসর হয়ে ষা'দিকে একটি বিরাট পুষ্করিণীর তীরে অবতরণ করলাম। নিরামিষভোজী রাজপুত্রের দেশে এই নির্জন আবেষ্টনীতে মৎস্যকূল অতি নিরাপদেই পুষ্করিণীতে বংশবিস্তার করে চলেছে। মৎস্যশিকারীদের লোভনীয় স্থান বটে! মৎস্য-শিকারে চিতোরবাসীর বাধা দিবার সঙ্গত কারণ থাকলেও এমন নির্জন স্থানে সে ভয়ের কোন হেতু নাই। এর পর আরও অগ্রসর হবার উপায় থাকিলেও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার সন্দেহ আছে; কারণ সম্মুখেই হিংস্র স্থাপদসম্মূল বনভূমি।

ফিরতি-পথে গাড়ী থেকেই পরিচিত স্থানগুলির উপর পুনরায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে স্বরণের গাঁথুনিকে দৃঢ় করলাম। প্রায় আশ ঘণ্টা পর উৎরাই শুরু হ'ল। দুর্গের সাতটি তোরণ পেরিয়ে নিম্নের লোকালয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। যখন লোকালয় পিছনে ফেলে শূন্য প্রান্তরের পথ ধরেছি, তখন দ্রুত অনতিদূরে একটি নদীর শীর্ণ ধারাগুলি উপলব্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এইখানে জলাধারার উপরে প্রস্তরনির্মিত সুদৃঢ় সেতু বিদ্যমান। চিতোর দুর্গ আক্রমণের সুবিধার্থে এই সেতুটি সম্রাট আলাউদ্দীন ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করান।

সেদিন বৈকাল তিনটা চল্লিশ মিনিটের ট্রেনে মেবারের বর্তমান রাজধানী উদয়পুরের পথে রওনা হলাম। চলন্ত ট্রেন থেকে চিতোর দুর্গকে শেষ বারের মত দেখে নিলাম।





# গীতা-প্রবচন

ত্রিবিম্বা ভাবে

অম্ববাদক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

[ গীতা-ব্যাখ্যানের সূচনা হয় বঙ্গভং: ১৯১৭ সালে। তখন বিনোবা পদ্মভং মহাশয় পৰ্যটন করিতেছিলেন। বোম্বাই বাইতেন গীতার উপর ব্যাখ্যান দিতেন। ১৯৩২ সালে ধুলিয়া জেলে বন্ধুদের অম্ববোধে তিনি মাতৃভাষার আঠার রবিবারে গীতার আঠারটি অধ্যায়ের মৌখিক ব্যাখ্যান দেন। তাহার অম্বলিখন “গীতা-প্রবচন” গুস্তকে মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে হিন্দী, গুজরাটী, তামিল, কন্নড় ইত্যাদিতে তাহা অনূদিত হইয়াছে। হিন্দী শেখ সংস্করণের মুদ্রণসংখ্যা ১,০১,০০০।

বিনোবা বলেন, “আমার জীবনের উপলক্ষি আমি ‘গীতা-প্রবচন’ সচজবোধী ভাষায় লোকের কাছে ধরিয়াছি। ইহা নিতা পঠনীয়।”

গীতার প্রথম অধ্যায় বিবাদ-যোগের বর্ণনা। অর্জুন বিবাদ-প্রস্ত। কত বানির্ঘ্য করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে হৃদয়ের ছল-চাতুরী দূর করিয়া হরিশরণ লইতেছেন। তিনি বলিতেছেন, ‘ভগবান, আমি তোমার শরণ লইতেছি। তুমি আমার অনন্তগুরু। তুমি আমার পথ দেখাও। যে পথ তুমি দেখাইবে সে পথেই আমি চলিব।’ পরবর্তী সপ্তদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে ক্রিয়াক্ষেপেই পথের নির্দেশ দিয়াছেন। বস্তা কৃষ্ণ। শ্রোতা ‘কৃষ্ণ’ আর ভগবান ও ভক্তের হৃদয়ত ভাব প্রকট করিতে গিয়া ব্যাসদেব এমনই এক রস চাইলেন যে, লোকের তাঁতাকেও ‘কৃষ্ণ’ সংজ্ঞা দিয়াছে। বর্ণনাকারী কৃষ্ণ, শ্রোতা কৃষ্ণ, রচয়িতা কৃষ্ণ—তিনে যেন অধৈতের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনই যেন সমাধিস্থ। গীতার পাঠে একপ্রকার একাগ্রতা চাই। শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে অর্জুনের মত ধুজুতা ও হরিশরণতা চাই। ইহাই প্রথম অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অম্ববাদ নীচে দেওয়া হইতেছে।

১

প্রিয় বন্ধুগণ,

প্রথম অধ্যায়ে আমরা অর্জুনের বিবাদ-যোগ দেখিয়াছি। যখন অর্জুনের মত ধুজুতা ও হরিশরণতা আসে তখন তাহাতে বিবাদেবও যোগ হয়। ইহাকে হৃদয়-মন্ডন বলে। সঙ্কল্পকারেরা গীতার ভূমিকাকে অর্জুন-বিবাদ-যোগ রূপ বিশেষ নাম দিয়াছেন। আমি তাহাকে বিবাদ-যোগ রূপ সাধারণ নাম দিতেছি। কারণ গীতার পক্ষে অর্জুন এক নিমিত্ত মাত্র। পনচরণুরের পাণ্ডুরক্ষ কেবল পুণ্ডরীকের জন্ত অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। জড়জীব আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আঙ্গ হাঙ্গার বৎসর ধরিয়া তিনি বিদ্যমান। তজ্জগৎ গীতার রূপ। অর্জুনের নিমিত্ত হইলেও আমাদের সঙ্কল্পের জন্তই তাহা হইয়াছে। তাই গীতার প্রথম অধ্যায়কে

বিবাদ-যোগ এই সাধারণ নাম দেওয়াই শোভন হইবে। গীতারূপ এখন হইতে বাড়িতে বাড়িতে শেষ অধ্যায়ে প্রসাদযোগ রূপ ফলধারণ করিবে। দৈবের অভিপ্রায় হইলে এই কাগ্যবাসকালে আমরাও সে পর্যন্ত পৌছিয়া যাইব।

গীতার শিক্ষার সুরু দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে। আর আরম্ভেই ভগবান জীবনের মহাসিদ্ধান্ত বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে সব মুখ্য তত্ত্বের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুরুতেই তাহা যদি অস্তুরে গাঁথিয়া যায় তবে পরবর্তী পথ সুগম হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্যবুদ্ধি শব্দের অর্থ আমার মতে জীবনের মূলীভূত সিদ্ধান্ত। এই সকল মূল সিদ্ধান্ত এখন আমাদের বিচার করিতে হইবে। তার আগে এই সাংখ্য শব্দের প্রসঙ্গে গীতার পারিভাষিক শব্দের অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া ভাল।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় শব্দসমূহকে গীতা হামেশা নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। পুণাতন শব্দসমূহ নূতন অর্থের কলম বসানো বিচার বিপ্লবের অহিংস প্রক্রিয়া। ব্যাসদেব এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত। তাই গীতার শব্দসমূহ ব্যাপক সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে অথচ মরল ও চির সতেজ রহিয়া গিয়াছে। আর তাই জিজ্ঞাস্ত ব্যাকরণ নিজ নিজ প্রয়োজন ও উপলক্ষি অনুসারে তাহাদের বিভিন্ন অর্থ করিতে পারিয়াছেন। নিজ নিজ দৃষ্টি হইতে ঐ সব অর্থই ঠিক হইতে পারে। আর আমি মনে করি, উহাদের বিরোধ না করিয়া স্বতন্ত্র অর্থও আমরা করিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে উপনিষদে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে দেব, দানব ও মানব এই তিনে উপদেশের জন্ত প্রজাপতির কাছে গিয়াছিল। প্রজাপতি সকলকে ‘দ’ অক্ষরটি দেন, দেবেরা বলিল, ‘দেবতা আমরা কামী, বিষয়-ভোগে আমাদের আসক্তি জন্মেছে। তাই ব্রহ্মা ‘দ’ অক্ষর দ্বারা দমন করার শিক্ষা আমাদের দি়েছেন।’ দানবেরা বলিল, ‘আমরা দানবেরা ক্রোধী, দয়হীন হয়ে গিয়েছি। ‘দ’ অক্ষর দ্বারা ‘দয়া কর’ এই শিক্ষা প্রজাপতি আমাদের দি়েছেন।’ মানবেরা বলিল, ‘মানব আমরা লোভী, সঙ্কল্পের জন্ত পাগল হয়েছি। ‘দ’ অক্ষর দ্বারা ‘দান কর’ এই শিক্ষা প্রজাপতি আমাদের দি়েছেন।’ প্রজাপতি বলিলেন, সকলের অর্থই ঠিক। কারণ সকলেই আত্মমুভূতি হইতে নিজের নিজের অর্থ পাইয়াছে। গীতার পরিভাষার অর্থ করার সময় উপনিষদের এই কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

২

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবনের তিন মহা-সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে—(১) আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতা, (২) দেহের ক্ষুদ্রতা, এবং (৩) স্বর্গের অবস্থাতা। উহার মধ্যে স্বর্গের সিদ্ধান্ত কর্তব্যরূপ এবং অপব দুইটি জ্ঞাতব্য। পূর্ব অধ্যায়ে স্বর্গ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। প্রকৃতি-ধমে এই স্বর্গ আমরা পাইয়া থাকি। স্বর্গম খুঁজিয়া লইতে হয় না। আকাশ হইতে পড়িয়া আমরা চলিতে-ফিরিতে থাকি, তাহা নয়। আমাদের জন্ম হইবার পূর্বেই এই সমাজ ছিল, মা-বাপ ছিলেন, পাতাপ্রতিবেশী ছিলেন। এই প্রবাহে আমরা জন্ম গ্রহণ করি। যে মা-বাপের ঘরে আমাদের জন্ম, তাহাদের সেবা করার ধর্ম জন্ম হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। আর যে সমাজে জন্মিয়াছি তাহার সেবা করার ধর্মও ঐভাবেই আমাদের কাছে আসিয়া যায়। আমাদের জন্মের সঙ্গেই আমাদের স্বর্গের জন্ম হইয়া থাকে। একথাও বলা যাইতে পারে যে, আমাদের জন্মের পূর্ব হইতেই তাহা আমাদের জ্ঞাত হইত। কারণ তাহা আমাদের জন্মের হেতু। তাহা সম্পন্ন করার জন্যই আমাদের জন্ম। পত্নীর সহিত স্বর্গের তুলনা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, পত্নীর সম্বন্ধ যেমন অচ্ছদা স্বর্গও তদ্রূপ অচ্ছদ্য। কিন্তু এই উপমাও আমরা কাঁচ গোঁ মনে হয়। আমি স্বর্গের তুলনা করি মায়ের সহিত। আমার মা কে হইবেন সে নির্বাচন আমার অপেক্ষায় ছিল না। আগে হইতেই তাহা নির্দিষ্ট ছিল। যেকোন হউক তাহা এখন আমার ফেলিবার উপায় নাই। স্বর্গ সম্বন্ধে সেই কথা, স্বর্গ হ'ল এ জগতে অপর কোন অবলম্বন আমাদের নাই। স্বর্গকে অস্বীকার করা স্বর্গকে অস্বীকার করার মতই আত্মঘাতী। অগ্রসর হইতে চাই তো স্বর্গের সন্ধানতাই অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব এই স্বর্গের আশ্রয় কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে—জীবনের ইহা অকৃতম মূল সিদ্ধান্ত।

স্বর্গ একরূপ সহজপ্রাপ্ত যে তার আচরণ অনায়াসসাধ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নান্য মোহের দরুন তাহা হয় না। অবশ্য অতি কষ্ট হয়। আর হইলেও তাহাতে নানা বিষ মিশ্রি যায়। স্বর্গের পথে বিঘ্নরূপী মোহের বাহুরূপ অনেক। সীমাসংখ্যা তাহা নাই। বিচার-বিশ্লেষণ করিলে ঐ সকলের মূলে একটি মূল্য বস দেখা যায়—সে হইতেছে সঞ্চর্ষ ও হান্ধা দেহবুদ্ধি। আমি ও আমার শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তু ও বস্তু, বাসু এই পর্যন্তই আমার ব্যাপ্তি-প্রসারের সীমা। যাহারা এই গতির বাহিরে তাহারা সকলে পর, শত্রু—ভেদের এই প্রাচীর দেহ-বুদ্ধি খাড়া করিয়া দেয়। আর 'আমি' ও 'আমাদের' বলিয়া বাহ্যের গণনা করি

তাহাদের শরীরটাই মাত্র তাহা দেখে। দেহ-বুদ্ধির এই দ্বিবিধ পক্ষে পড়িয়া আমরা নানাধি ডোবা—বেটনী সৃষ্টি করিতে থাকি। প্রায় সকলের পক্ষেই একথা খাটে। কাহারও ডোবা ছোট, কাহারও বা বড়, এই মাত্র। কিন্তু আসলে তাহা ডোবাই—গতি। উহার গভীরতা এই শরীরের চক্ষের গভীরতারই সমান। কেহ সৃষ্টি করে আত্মীয়-স্বজনের গতি, কেহ বা দেশাভিমানের। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণেতার নামক এক ডোবা বা গতি, মুসলমান-অমুসলমান নামক আর এক ডোবা বা গতি, এরূপ দুই-একটি নহে অসংখ্য ডোবা-গতি রহিয়াছে। যেদিকে তাকান ডোবা আর ডোবা। আমাদের এই জেসেও রাজনৈতিক কয়েদী ও অস্ত্রবিধ কয়েদী—এইরূপ ডোবা-গতি রহিয়াছে, তাহা ছাড়া আমাদের জীবন যেন চলে না। কিন্তু পরিণাম ইহার কি? পরিণাম একই। হীন বিকারের জোবাঘর প্রসার আর স্বধর্মরূপী স্বাস্থ্যের নাশ।

৩

এই অবস্থায় কেবল স্বধর্ম নিষ্ঠা পর্যাপ্ত নহে। তার জন্য অপর দুইটি সিদ্ধান্ত জাগ্রত রাখা চাই। এক—আমি মরণশীল দেহ নহি, দেহ উপরের ক্ষুদ্র পাপড়ি মাত্র। দুই—আমি মুহূর্ত্তন অখণ্ড ব্যাপক অস্ত্র। এই দুই মিলিয়া এক পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হয়।

এই তত্ত্বজ্ঞান গীতার দৃষ্টিতে এত আবশ্যক মনে হইয়াছে যে, গীতা তাহার আবাহন প্রথমে করিয়াছে, আর স্বধর্মের অবতারণা করিয়াছে পরে। কেহ কেহ বলেন, “প্রান্তেই এই সব তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক শ্লোকের অবতারণা কেন?” কিন্তু আমি মনে করি, গীতার যদি এমন কোন শ্লোক থাকে যাহা মোটেই স্থানান্তরিত করা যায় না তবে তাহা হইতেছে এই সব শ্লোক।

এইটুকু তত্ত্বজ্ঞান মনে অঙ্কিত হইয়া গেলে স্বধর্ম আদৌ কঠিন মনে হইবে না। তাহাই নহে, স্বধর্মের বাহিরে অস্ত্র কিছু করাই কঠিন মনে হইবে। আত্মতত্ত্বের অখণ্ডতা ও দেহের ক্ষুদ্রতার কথা বুঝা কঠিন নহে। কারণ এই দুইই সত্য বস্তু। কিন্তু তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। মনে তাহা বার বার মগ্ন করিতে হইবে। এই চর্মের গুরুত্ব কমাইয়া আত্মাকে গুরুত্ব দেওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

পলে পলে এই দেহ বদলাইতেছে। বাস্যকাল, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা এই চক্রের অভিজ্ঞতা কাহার না আছে? আধুনিক বিজ্ঞানবিদদের মতে সাত বৎসরে শরীর একেবারে বদলাইয়া যায়, পুরাতন রক্তের একবিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের পূর্বজগণ মনে করিতেন যে, বার বৎসরে পুরাতন

শরীর মরিয়া যায়। তাই প্রায়শ্চিত্তের, তপস্চার্য, অধ্যয়ন আদির অবধি বার বার বৎসরের ছিল। বহু বৎসর ছাড়া-ছাড়ির পর ছেলের সহিত মায়ের মিলন হইয়াছে; মা ছেলেকে চিনিতে পারেন নাই এরূপ গল্প আমরা শুনিতে পাই। যে দেহ এইভাবে প্রতিক্রিয় বদলাইতেছে, প্রতিক্রিয় মরিতেছে তাহাই কি তোমার রূপ? দিন-রাত যেখানে মলমূত্রের প্রবাহ বহিতেছে, আর তোমার মত উত্তম সেবক তাহা শৌথ করিতে সঙ্গী প্রস্তুত থাকে সত্ত্বেও যাহার অপরিচ্ছন্নতার ত্রুটি ভঙ্গ হয় না, তুমিই কি সে? সে অপরিচ্ছন্ন, তুমি তাহার পরিচ্ছন্নতা-বিধানকারী; সে রোগী, তুমি তাহার ঔষধাধিকারী, সে সাড়ে তিন হাত পরিমিত, তুমি ত্রিভুবনবিহারী, সে নিতাপরিবর্তনশীল, তুমি তাহার পরিবর্তনের সাক্ষী, সে মরণশীল, আর তুমি তাহার মৃত্যুর ব্যবস্থাকারী। তোমার ও উহার পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তুমি এমন সঙ্কুচিত হইয়া থাক কেন? এই দেহের সহিত যত সঙ্কল্প তাহা আমরাই একথা কেন মনে কর? আর এই দেহের মৃত্যুতে এত শোকই বা কেন? ভগবান বলেন—“আরে, দেহের বিনাশ কি শোক করার মত ব্যাপার?”

দেহ তো কাপড়ের মত। পুরাতন ছিঁড়িয়া যায়, তাই নূতন ধারণ করা হয়। একই শরীর যদি আত্মাকে সঙ্গী আঁকড়াইয়া থাকে তবে আত্মার নিকৃষ্ট গতি হয়। সমস্ত বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আনন্দ অদৃশ্য হয়, আর জ্ঞানপ্রভা য়ান হয়। অতএব দেহের বিনাশ পরিতাপের হইতে পারে না। হাঁ, আত্মার বিনাশ যদি সম্ভব হইত তবে তাহা অবশ্যই শোচনীয় হইত, কিন্তু আত্মা অবিনাশী—যেন অখণ্ড বহমানা ধারণা। অনেক কলেবর তাহাতে আসে যায়, অতএব দেহ-সম্বন্ধের পক্ষে পড়িয়া শোক করা এবং ইহা আমার, উহা অপরের, এই ভেদবিভেদ করা একান্তই অসুচিত। মনে কর, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন সুন্দর বোনা একখানি চাদর। ছোট শিশু হাতে কাঁচি লইয়া যেমন চাদর টুকরা করিয়া ফেলে, তেমনি এই দেহরূপ কাঁচি ঘারা যদি এই বিশ্বাত্মাকে টুকরা করা হয় ত তাহা কতই না ছেলো-মাছুষি হইবে—হিংসা হইবে!

যে ভাগতত্ত্বের ব্রহ্মবিদ্যার জন্ম হইয়াছে, সেখানে এরূপ অগণিত ছোট বড় দল, সম্প্রদায় ও জাতি দেখা যায় ইহা সত্য সত্যই নেহাত দুঃখের কথা। আর আমাদের মনে মৃত্যুভয় এরূপ বাসা বাঁধিয়াছে যে, তেমনটা আর কোথাও বড় দেখা যায় না। ইহা দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার ইহাই যে পরাধীনতার অন্ততম কারণ একথা ভুলিলেও চলিবে না।

মৃত্যু শব্দটাই আমাদের কাছে অসহ্য। মৃত্যু এই নামটাই অমঙ্গলের মনে হয়। বড় দুঃখে জ্ঞানদেব বলিয়াছেন :

“মৃত্যু শব্দ নাহি সহ্যে, মরে গেলে কাঁদে।” লোক মরিলে কান্নার মহা রোল পড়িয়া যায়। তাহা যেন এক কর্তব্য! ব্যাপার এতটা গড়াইয়াছে যে কান্নার জন্য লোক ভাড়া করা হয়। মৃত্যু আসন্ন। তবু রোগীকে সেকথা বলা হয় না। রোগী বাঁচিবে না, একথা ডাক্তার বলিলেও মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়। ডাক্তার নিজেও স্পষ্ট করিয়া বলেন না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুখে ঔষধ চালিতে থাকে। তার পরিবর্তে সত্য বলিয়া সাস্থ্যনা দিয়া ঔষধ-স্বরণের দিকে যদি তাহার মন ঘুরানো যায় তবে কতই না ভাল হয়। কিন্তু লোকের ভয় ঐ গভীর ভাণ্ড যদি আগেই ভাঙিয়া যায়। কিন্তু নিদিষ্ট সময়ের আগে কি এই ভাণ্ড ভাঙিবার? আর যে ভাণ্ড দুই ঘণ্টা পরে ভাঙিবেই তাহা যদি দুই ঘণ্টা আগে ভাঙে ত কি আসে যায়। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা কঠোর ও প্রেমহীন হইয়া গেলাম। দেহাসক্তি প্রেম নহে বরং দেহাসক্তি দূর না হইলে যথার্থ প্রেমের উদয়ই হয় না।

দেহাসক্তি চলিয়া গেলে বুঝা যাইবে যে দেহ সেবার সাধন হইয়াছে। আর তখন দেহ তার যোগ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কিন্তু আজ দেহপূজাকে আমরা সাধ্য মনে করিতেছি। স্বধর্মাচরণ যে সাধ্য সেকথা ভুলিয়াই গিয়াছি। দেহ ধারণ করা, তাকে পান-আহার দেওয়া সে ত স্বধর্ম-আচরণের নিমিত্তে। কেবল বাসনাতৃপ্তির জন্য তার দরকার নাই। চামচ দিয়া হালুয়া অথবা ভাত-ডাল পরিবেশন কর তাহাতে চামচের কোন সুখ-দুঃখ নাই। জিল্লার অবস্থাও অনুরূপ হওয়া চাই—রসবোধ থাকিবে, সুখ-দুঃখ নহে। শরীরের খাজানা শরীরকে মিটাইয়া দিয়াছি; ভাল, আর কি চাই। সূতাকাটার জন্য চরকায় তৈল দিতে হয়। তেমনি শরীর হইতে কাজ আদায় করিতে হয় বলিয়া তাহাতে কয়লা দিতে হয়। এইভাবে যদি আমরা দেহের ব্যবহার করি তবে মূলতঃ ক্ষুদ্র হইলেও উহার মূল্য বাড়িয়া যাইতে পারে, আর তাহা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে।

কিন্তু সাধনরূপে ব্যবহার না করিয়া আমরা দেহে ডুবিয়া যাই, আত্ম-সংকোচ করিয়া ফেলি। তার ফলে মূলেই যে দেহ ক্ষুদ্র তাহা আরও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। তাই সাধুপুরুষেরা দৃঢ়ভাবে বলেন, “দেহ ও দেহ-সম্বন্ধ নিন্দ্য। কুকুর শূকর আদির বন্দ্য।” ওরে, দেহের ও দেহের সহিত যার সঙ্কল্প, দিনরাত তার পূজা তুই করিস নে। অপরকে চিনতে শেখ।” এইভাবে সাধুপুরুষেরা আমাদের আত্মপ্রসারের শিক্ষা দিয়া থাকেন। আপন আত্ম-ইষ্ট-মিত্র ব্যতীত অপরের কাছে নিজ আত্মা এতটুকুও আমরা লইয়া যাই কি? জীবে জীবে

সমাবেশ, আত্মায় আত্মায় মিলন, এইরূপ আমরা করি কি ? নিজ আত্ম-হৃৎসকে এই পিঞ্জরের বাহিরের হাওয়া খাওয়াই কি ? যাকে নিজ গতি বলিয়া জানি সেই গতি ভেদ করিয়া আগামী কাল নূতন দশ জন বন্ধু বানাইব একথা কখনও মনে হয় কি ? আজ পনর, কাল পঁচিশ হইবে। আর পরিধি এরূপ বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত বিশ্বই আমার ও আমি সমস্ত বিশ্বের এই অন্তর্ভব করিতে থাকিব। জেল হইতে আমরা আত্মীয়-স্বজনকে পত্র দিই, ইহাতে বিশেষতঃ কোথায় ? জেল হইতে বাহির হইয়া কোন নূতন বন্ধুকে—রাজনৈতিক কয়েদী নহে, চোর কয়েদী-বন্ধুকে পত্র লিখিবেন কি ?

আমাদের আত্মা ব্যাপক হওয়ার জন্য ছটফট করে। সমস্ত জগৎকে সে নিজ করিয়া লইতে চাহে, কিন্তু আমরা দিই তাহাকে কামরায় বন্ধ করিয়া। আত্মাকে আমরা কয়েদী বানাইয়া ছাড়িয়াছি। আত্মার কথা মনেও হয় না। সকাল হইতে সন্ধ্যা দেহের সেবাতেই আমরা মত্ত—এই দেহ হুট-পুট হইল কি দুর্বল হইল ইহাই অনুকূলের চিন্তা। যেন সংসারে অপর কোন আনন্দ নাই। ভোগের ও স্বাদের আনন্দ পণ্ডরাও উপভোগ করিয়া থাকে। এখন ত্যাগ ও স্বাদ-ভজের আনন্দের খোঁজ করিবে কি করিবে না ? নিজে ক্ষুধাপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি ভাত আর কোন ক্ষুধাতুরকে দেওয়ার আনন্দ যে কি তাহা অনুভব কর। সেই স্বাদ চাখ। মা যখন ছেলের জন্য কষ্টভোগ করেন তখন তিনি এই স্রব্ধের কিছু আনন্দ পান। মানুষ নিজের বলিয়া যে সর্কারী গতি সৃষ্টি করে, অগোচরে সেখানেও আত্মবিকাশের মাধুর্য আত্মাদের বাসনা তাহার পাকে ; কারণ দেহবদ্ধ আত্মা স্বল্পমাত্রায় আর ঋণিকের জন্য হইলেও উহার বাহিরে আসে, কিন্তু এই বাহিরে আসা কীদূশ ? কারা-প্রাচীরের মধ্যে কয়েদী যেমন ওয়ার্ডের বা কামরার বাহিরে আসে তাদূশ। কিন্তু আত্মার কাজ ততটুকুতে চলে না। আত্মার চাই মুক্তানন্দ।

সারাবংশ—(১) অধর্ম ও পরধর্মের ঝাঁক রাস্তা ছাড়িয়া মাধকের স্বধর্মরূপ সহজ সরল রাস্তা ধরা চাই। স্বধর্মের আঁচল কখনও ছাড়িতে নাই। (২) দেহ ক্ষণভঙ্গুর একথা উপলব্ধি করিয়া স্বধর্মের নিমিত্ত উহার ব্যবহার করা চাই, আর দরকার হইলে স্বধর্মের নিমিত্ত উহার শেষ করা চাই, (৩) আত্মার অখণ্ডতা ও ব্যাপকতার বোধ সদা জাগ্রত রাখিয়া মন হইতে আত্মপর ভেদভাব দূর করা চাই। জীবনের এই সরল সিদ্ধান্ত ভগবান সামনে ধরিয়াছেন। যে মানুষ তজ্রপ আচরণ করিবে, সে একদিন-না-একদিন নিঃসন্দেহে এই নরদেহ দ্বারা 'সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা' অনুভব করিবে।

ভগবান জীবনের সিদ্ধান্তসমূহের নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কেবল সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিলে কাজ পূর্ণ হয় না। গীতায় বাণত এই সব সিদ্ধান্ত উপনিষদ ও স্মৃতিসমূহে পূর্ণ হইতেই ছিল। গীতা এই সব পুনরায় উপস্থিত করিয়াছে,—এখানে গীতার অপূর্ণতা নহে, এই সকল সিদ্ধান্ত কি ভাবে আচরণ করা যায় সেই পথ গীতা দেখাইয়াছেন, আর এই-খানেই গীতার অপূর্ণতা। এই মহাপ্রশ্নের সমাধানেই গীতার নৈপুণ্য।

জীবনের সিদ্ধান্তসমূহকে আচরণ করার কলা বা উপায়কে যোগ কহে। সাংখ্যের অর্থ সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্র। আর যোগ মানে কলা। তাই ত জ্ঞানদেব সাক্ষ্য দিতেছেন, “যোগীদের জীবনে রূপ পেয়েছে জীবনকলা।” সাংখ্য ও যোগ, শাস্ত্র ও কলা এই দুইয়ের গীতা পরিপূর্ণ। শাস্ত্র ও কলার মিলনে জীবন-সৌন্দর্য বিকশিত হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত ব্যক্ত করার কলা যদি না রাখিয়া থাক ত নাটকশিল্পের ব্যঞ্জনা হইবে না। তাই ভগবান সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিনিয়োগ করার কলাও দেখাইয়াছেন। ভাল, সে কলা কিরূপ ? দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতার উপর নজর রাখিয়া স্বধর্মাচরণের ঐ কলা কি প্রকার ?

লোকের দ্বিবিধ ভাবনা হইতে কর্ম করে। এক—নিজ কর্মের ফল অবশ্য ভোগ করিব। তাহাতে আমার অধিকার, আর ইহার বিপরীত আর এক ভাব এই, ফল ভোগ করিতেই যদি না পাইলাম তবে কর্ম করিতে যাই কেন ? এই দুইটি ছাড়া গীতা তৃতীয় এক ভাব বা বৃত্তির কথা বলিয়াছেন। গীতা বলেন—“কর্ম অবশ্যই করবে, কিন্তু ফলে তোমার অধিকার এক কথা মনে করো না। কর্ম যে করে ফলে অবশ্যই তার অধিকার আছে। কিন্তু যেহেতু সেই অধিকার তুমি ছেড়ে দাও।” রজোগুণ বলে “নিত্যে হয় ত ফলসহিত নেব।” আর তমোগুণ বলে, “ছাড়তে হয় ত কর্মসহিত ছাড়ব।” এই দুই একে অন্তের সোদর। অতএব এই দুইয়ের উর্ধ্বে উঠিয়া তুমি শুদ্ধ সজ্জগী হও—অর্থাৎ কর্ম কর, কিন্তু ফল ছাড়। আর ফল ছাড়িয়া কর্ম কর। আগে বা পাছে ফলের আশা রাখিও না।

ফলের আশা করিও না—একবার সঙ্গে সঙ্গে গীতা একথাও বলে যে, কর্ম উত্তমরূপে ও দক্ষতা সহকারে করিতে হইবে। সকাম পুরুষের কর্ম অপেক্ষা নিকাম পুরুষের কর্ম অধিকতর ভাল হওয়া চাই। আর এই প্রত্যাশা উচিতও বটে ; কারণ সকাম পুরুষ ফলাসক্ত। তাই ফলের স্বপ্ন-চিন্তায় তাহার সময় ও শক্তি অনাধিক্রম্য হইয়া

যায়। পক্ষান্তরে ফলেচ্ছারহিত লোকের প্রতি মুহূর্ত আর সমগ্র শক্তি কাজে নিয়োজিত হয়। নদীর ছুটি নাই, বাওয়া বিশ্রাম জানে না, সূর্য অক্ষুণ্ণ জলিতেছে। তরুণ নিকাম কর্মী নিরন্তর সেবাকর্ম ছাড়া আর কিছু জানে না। অতএব এরূপ নিরন্তর কর্মরত পুরুষের কর্ম যদি উৎকৃষ্ট না হয় তবে হইবে কাহার? তা ছাড়া চিন্তের সমতা এক বড় নিপুণ গুণ। নিকাম পুরুষের তাহা পৈতৃক সম্পত্তি। যে-কোন বাহ্য হস্তশিল্প লক্ষ্য করুন। হস্তশিল্পের সহিত চিন্তের সমত্বের সংযোগ যদি হইয়া থাকে তবে পরিষ্কার দেখা যাইবে যে সে কর্ম আরও অধিক সুন্দর হইয়াছে। তাহা ছাড়া সকাম ও নিকাম পুরুষের কর্ম-দৃষ্টিতে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাও নিকাম পুরুষের কর্মের পক্ষে অধিকতর অন্তুকুল। সকাম পুরুষ কর্মের দিকে স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখে। “আমার কাজ, আর ফল আমারই প্রাপ্য”—এই দৃষ্টির দরুন কর্ম হইতে তাহার মনঃসংযোগ কতকটা সরিয়া যায়। আর উহাতে সে কোন নৈতিক দোষও দেখিতে পায় না। খুব দেখে ত দেখে ব্যবহারদোষ মাত্র। কিন্তু নিকাম পুরুষের নিজ কর্ম সম্বন্ধে নৈতিক কর্তব্যবুদ্ধি থাকে। তাই নিজ কার্যে ক্রটির লেশমাত্র যাহাতে না থাকে সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই কারণেও তাহার কার্য অধিকতর নির্দোষ হইবে। যে দিক হইতেই দেখুন, ফলত্যাগ যে একান্ত নিপুণ ও ফলপ্রদ তত্ত্ব তাহা সপ্রমাণ হইবে। অতএব ফলত্যাগকে যোগ বা জীবনের কলা বলা উচিত হইবে।

নিকাম কর্মের কথা লাড়িয়া দিলেও, কাজের নিজেরই যে আনন্দ রহিয়াছে সে আনন্দ উহার ফলে নাই। নিজ কর্ম করিতে করিতে এক প্রকারের তন্ময়তা জন্মে। তাহা আনন্দেরই এক ধারা। চিত্রকরকে বলুন, “ছবি আঁকতে হবে না, কত পরয়া চাই নাও।” সে কথায় সে কান দিবে না। কৃষককে বলুন, “ক্ষেতে যেয়ো না, গাই চরাতে হবে না, সেচ দিয়ো না, ধান-চাল যতটা চাও দিব।” সত্যিকার চাষীর সে কথা ভাল লাগিবে না। ভোরে উঠিয়া চাষী ক্ষেতে যায়। সূর্যনারায়ণ তাহার অভ্যর্থনা করে, পক্ষী তাহার জন্ত তান ধরে। গরু বলদ তাহার আশেপাশে চলাফেরা করে। প্রেমভরে সে তাহাদের পিঠে হাত বুলায়। যে ফসল বুনিয়াছে, অপলক নেত্রে সে তাহা দেখে। এই সকল কাজে এক প্রকারের সাত্ত্বিক আনন্দ রহিয়াছে। এই আনন্দই ঐ কার্যের মুখ্য ও ঐচ্ছিক ফল। সে ভুলনায় উহার বাহ্য ফল নেহাতই তুচ্ছ।

কর্মফল হইতে গীতা যখন মানুষের দৃষ্টি সরাইয়া দেয় তখন গীতা ঐ উপায়ে তাহার কর্মতন্ময়তা শতগুণ বাড়াইয়া দেয়। ফল-নিরপেক্ষ লোকের কর্মবিষয়ক তন্ময়তা পমাধির

তুল্য। এই হেতু তার আনন্দ অল্প আনন্দ হইতে শতগুণ অধিক। এ দিক হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নিকাম কর্ম নিজেই এক মহান ফল। জানদেব ঠিকই বলিয়াছেন, “বৃক্ষে ধরেছে ফল, ফলে আর ধরবে কি ফল?” এই দেহরূপ বৃক্ষে নিকাম স্বর্গমাচরণ-রূপ সুন্দর ফল ধরার পরে এখন আর কোন ফল চাই? কৃষক ক্ষেতে গম বোনে, গম বেচিয়া জোয়ারের রুটি কেন খায়? সুস্বাদু ফল সে কলায়, তাহা বেচিয়া সে লক্ষা খায় কেন? ওরে ভাই, কলাই খাও না? কিন্তু লোকের সেকথা রুচে না, কলা খাওয়ার ভাগ্য থাকিতেও লক্ষার জন্ত পাগল হয়। গীতা বলে, “এরূপ তুমি করো না, কর্মই খাও, কর্মই পান করো, আর কর্মই পরিপাক করো।” বাসু, সবকিছু কর্ম করাতে আসিয়া যায়। খেলার আনন্দে শিশু খেলে, তাহা হইতে আপনা-আপনি সে ব্যায়ামের ফল পাইয়া থাকে। কিন্তু সেই ফলের দিকে তার নজর থাকে না। তার সকল আনন্দ ঐ খেলাতে।

৫

মাধু লোকেরা নিজ নিজ জীবনদ্বারা একথা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তুকারামের ভক্তিভাব দেখিয়া শিবাজী মহারাজের মনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। একবার তিনি তুকারামের বাড়ী পাল্কী পাঠাইলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। তুকারাম অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, “এই কি আমার ভক্তির ফল? এই জন্তাই কি আমার ভক্তি?” তাঁহার মনে হইল মান সম্মানের এই ফল তাঁহার হাতে দিয়া ভগবান তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন :

“জানিস অন্তর, তবু সৃষ্টি করিস বন্ধট।

এই ত তোমর দোষ, পাণ্ডুরঙ্গ মহা খোট।”

“ভগবান তোমার এই অভ্যাস ভাল নহে। এই ঘৃণুর-দানা দিয়া তুমি আমায় ভুলাইতে চাও। ভাবিতেছ এই আপদকে দূর করিয়া দিই। কিন্তু আমিও কাঁচা গুরুব চেলা নহি। তোমার পাশক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়া যাইব। ভক্তি ভক্তের স্বর্গ, আর ভক্তিতে ফলরূপ অবাস্তব কণ্টক সৃষ্টি হইতে না দেওয়াই তাহার জীবনকলা।” ফলত্যাগের ইহা অপেক্ষা গভীর আদর্শ, পুণ্ডলীকের চরিত্র আমাদের সামনে ধরিতেছে। পুণ্ডলীক নিজ মা-বাপের সেবা করিতে-ছিলেন। তাঁহার সেবার তুষ্ট হইয়া পাণ্ডুরঙ্গ তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিলেন, কিন্তু পুণ্ডলীক পাণ্ডুরঙ্গের কাঁদে পড়িলেন না। সেবাকর্ম হইতে বিরত হইলেন না। নিজ মা-বাপের এই সেবা তাঁহার কাছে হৃদগত ঈশ্বরভক্তি ছিল। অপরকে লুপটাট করিয়া কোন ছেলে যদি মা-বাপের সুখবিধান করে

বা অপর দেশকে জোহ করিয়া কোন দেশসেবক যদি নিজ দেশের উৎকর্ষ চাহে ত এই ছুই জনের এই চুই বস্তুকে ভক্তি বলা বাইবে না, তাহা আসক্তি মাত্র। পুণ্ডলীক এই আসক্তির কাঁদে পা দিলেন না। তিনি বলিলেন, পরমাত্মা আমার সামনে যে বৃত্তিতে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি কি তাহাই মাত্র? এই রূপে দেখা দেওয়ার আগে কি সৃষ্টি প্রেতবৎ ছিল? ভগবানকে তিনি বলিলেন, “হে ভগবান, তুমি স্বয়ং আমাকে দর্শন দিতে এসেছ তা দেখছি। কিন্তু আমি ‘ও-সিদ্ধান্ত’ মাত্রকারী—একলা তুমিই ভগবান একথা আমি মানি না। আমার কাছে তুমিও ভগবান, মা-বাপও ভগবান। তাঁহাদের সেবার নিযুক্ত আছি বলে তোমার দিকে মন দিতে পারছি না। তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো।” এই বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকার জন্য ভগবানকে একথানা ইট বাড়াইয়া দিলেন এবং স্বীয় সেবাকার্যে নিমগ্ন হইলেন। এই প্রসঙ্গে তুকারাম বড়ই কৌতুক পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন :

“কেমন রে তুই পাগল প্রেমী। রেখেছিস্ দাঁড় করিয়ে বিঠলকে। সাবাস্ তোর সাহসে, পেতে দিলি ইট বিঠলকে।”

পুণ্ডলীক-আচরিত এই ‘ও-সিদ্ধান্ত’ ফলত্যাগ-যুক্তির (পথের) এক অঙ্গ। ফলত্যাগী পুরুষের কর্মসমাপ্তি যেমন গভীর, তাহার বৃত্তিও তেমন ব্যাপক, উদার ও সমভাবাপন্ন। তাই সে দ্বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানের কামেলায় পড়ে না, আর নিজ সিদ্ধান্তও ছাড়ে না। ‘নাত্তদন্তীতি বাদিনঃ’—ইহাই, অপর কিছু নাই, এরূপ তর্ক সে তুলে না। ইহাও ঠিক আর উহাও ঠিক, কিন্তু আমার পক্ষে ত ইহাই ঠিক—এইরূপই তাহার বিনম্র দৃঢ় বৃত্তি। এক গৃহস্থ কোন এক সময়ে এক সাধুর কাছে গেল ও জিজ্ঞাসা করিল, “মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ঘর-সংসার ছাড়া দরকার কি?” সাধু বলিলেন, “নয় ত, দেখ, জনকের মত ব্যক্তি রাজমহলে থেকেও মোক্ষলাভ করে গেলেন। তখন তোমার ঘর ছাড়ার আবশ্যকতা কোথায়?” পরে অপর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “স্বামীজী, গৃহত্যাগ না করলেও মোক্ষলাভ হতে পারে কি?” সাধু বলিলেন, “কি বলেছে? ঘরদোর না ছেড়ে অমনি যদি মোক্ষ মিলত, তা হলে শুকের স্তায় ধীরে ঘর ছেড়েছিলেন তাঁরা কি বুর্খ ছিলেন?” পরে সেই ছুই জনে দেখা হইলে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। একজন বলিল, “সাধু ঘর-সংসার ছাড়তে বলেছেন।” অপর বলিল, “না, সাধু বলেছেন, ঘরদোর ছাড়ার দরকার নেই।” তাহারা তখন সাধুর কাছে গেল। সাধু বলিলেন—“ছুইয়ের কথাই ঠিক। যার যেমন ভাব তার তেমন পথ। যার যেমন প্রব্র,

উত্তরও তার তেমন। ঘর ছাড়া দরকার ইহা যেমন সত্য, আর ঘর ছাড়া নিশ্চয়োজন, ইহাও তেমন সত্য।” ইহাকেই বলে ‘ও-সিদ্ধান্ত’।

পুণ্ডলীকের ফলত্যাগের উদাহরণ হইতে দেখা যায়, ফলত্যাগ কোন পর্যন্ত বাইতে পারে। ভগবান তুকারামকে যে প্রলোভনে ভুলাইতে চাহিয়াছিলেন, পুণ্ডলীকের কাছে উপস্থিত সোভ তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি মোহিত হইলেন না। হইতেন তো যাইতেন। অতএব সাধন একবার নিশ্চিত হইয়া গেলে শেষ পর্যন্ত তাহার আচরণ করা চাই। মাঝপথে ভগবৎ-দর্শনরূপ বাধা উপস্থিত হইলেও সাধন ছাড়িতে নাই। ভগবানের দর্শন আর যাইতেছে কোথায়? তাহা তো হাতের মুঠিতেই।

“সর্বস্বাভাব মোর, আর কে নেবে কেড়ে!

তোমার ভক্তিরসে মন বান্ধিয়ে গেছে যবে।”

এই ভক্তিলাভের নিমিত্তই আমাদের জন্ম। ‘মা তে সংগোৎসবকর্মণি’ এই গীতাবল্লভের অর্থ নিক্রম কর্ম করিতে করিতে অকর্মের অর্থাৎ অন্তিম কর্মযুক্তির তথা মোক্ষের বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ করা। এতদূরই ইহার অর্থ প্রসারিত। মোক্ষ মানে বাসনা হইতে মুক্তি। বাসনার কাছ হইতে মোক্ষের কি পাওয়ার আছে? ফলত্যাগ যখন এই স্তরে পৌঁছিয়া যায়, তখন জীবনকলা যোল কলায় পূর্ণ হয়।

৬

শাস্ত্র পথ দেখাইয়াছে, কলা দিক নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই গোটা চিত্র চোখের সামনে ঝাড়া হয় না। শাস্ত্র নিগূর্ণ। কলা সগুণ। কিন্তু সগুণও আকার ছাড়া ব্যক্ত হয় না। নিহক নিগূর্ণ যেমন শূন্য থাকে, নিরাকার সগুণের অবস্থাও তরুণ হইতে পারে। উপায় হইতেছে, যে গুণীতে গুণ মুর্তিমান হইয়াছে তাহার দর্শন। তাই তো অর্জুন বলিতেছেন, “হে ভগবান, আপনি মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। সে সকল সিদ্ধান্ত কিরূপে আচরণ করতে হয় সেই কলার সন্ধানও দিয়েছেন, তাহা পি এর স্পষ্ট চিত্র আমার কাছে ধরা পড়ছে না। অতএব এখন আমাকে এর উদাহরণ দিন। ধীর বৃত্তিতে সাংখ্যানিষ্ঠা স্থির হয়েছে এবং ফলত্যাগরূপ যোগ ধীর প্রতি রোমকূপে পরিব্যাপ্ত, এরূপ পুরুষের লক্ষণ বলুন। ধীরের স্থিতপ্রজ্ঞ বলে, ফলত্যাগের পূর্ণতা ধীরের মধ্যে দৃষ্ট হয়, কর্ম-সমাপ্তিতে ধীর মগ্ন এবং মহামেক্সদৃষ্ট দৃঢ়নিশ্চয়, তাঁরা কি ভাবে বলেন, কি ভাবে বলেন, কি ভাবে চলেন সে সব আমাকে বলুন। তাঁর আকৃতি কিরূপ? তাঁকে



চেনার উপায় কি? ভগবান, সে সব বলুন।” তাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তিম অষ্টাদশ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের গম্ভীর ও উদাত্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। মনে হয় এই আঠার শ্লোকে গীতার আঠার অধ্যায়ের সারসংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ গীতার আদর্শ মূর্তি। এই ষড়টিও গীতার নিজস্ব। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে জীবমুক্তের, দ্বাদশে ভক্তের, চতুর্দশে গুণাতীতের এবং অষ্টাদশে জ্ঞান-নিষ্ঠার এরূপ বর্ণনাই রহিয়াছে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা এসকল হইতে অধিক বিস্তৃত ও খোলাখুলিভাবে করা হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধ-লক্ষণের মণ্ডিত সাগর লক্ষণও বলা হইয়াছে। সহস্র সহস্র সত্যাত্মী, দীপকুম্ভ সাক্ষা প্রার্থনায় এই সব শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে, ঐ সব যদি পৌছাইয়া দিতে পারা যায় তাহা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবে। নিতাপঠনায় যত্নবৎ হইলে তাহা চিত্তে রেখাপাত হওয়া কঠোর না, উণ্টা লয় পায়। কিন্তু এই দোষ নিত্যা পাঠের নহে, মনন না করার। নিত্যা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যা-মনন ও নিত্যা-আত্মনিরীক্ষণ দরকার।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলিতে স্থিরবুদ্ধি লোক বুঝায়। নামেই তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু সংযম ব্যতীত বুদ্ধি স্থির হইবে কিরূপে? তাহা স্থিতপ্রজ্ঞকে সংযমমূর্তি বলা হইয়াছে। বুদ্ধির তো আত্মনিষ্ঠ হইতেই হইবে, আর অন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বুদ্ধির অধীন হইতেই হইবে। ইহাই সংযমের অর্থ। ইন্দ্রিয়-সকলকে লাগাম দ্বারা বদ্ধ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগে জুড়িয়া দেন। ইন্দ্রিয়রূপী বলদ দ্বারা তিনি নিকাম স্বপ্নচরণের ক্ষেত সন্দেহরূপে আবাদ করিয়া লন। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তিনি পরমার্ধে বায় করেন।

এই ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ নহে। ইন্দ্রিয় হইতে একেবারে কাজ না লওয়া সহজ হইতে পারে। মৌন, নিরাহারা দি ব্যাপার কঠিন নহে। ইহার বিপরীত, ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরস্ত্র ছাড়িয়া দেওয়া, সে তো যে কেহই পারে। কিন্তু কক্ষপ যেমন ভয়েব ক্ষেত্রে নিজের সমস্ত অঙ্গ ভিতরে গুটাইয়া লয় এবং নিরাপদ স্থানে উহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করে, তজ্জপ বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে গুটাইয়া লওয়াও পরমার্ধের কাজে উহাদের সমুচিত ব্যবহার করা—এই সংযম কঠিন। এই জ্ঞান মহান্ প্রযত্ন আবশ্যক। জ্ঞানও চাই। তাহা হইলেও সব সময় যে উহা উদ্ভাসরূপে নিম্পন্ন হইবে— তাহা নয়। তবে কি আশা ছাড়িব? ভাল ছাড়িব? না, সাগরের কখনও নিরাশ হইতে নাই। সাগর নিজের সকল কর্মমৈপুণ্য কর্মে নিয়োগ করিবে। তাহা সত্ত্বেও যদি ক্রটি থাকে তো ভক্তি জুড়িয়া দিবে। এই মহামূল্যবান নির্দেশ ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে দিয়াছেন, দিয়াছেন তাহা অসংখ্য গুটিকয়েক শব্দে। কিন্তু গাড়ীবোঝাই বক্তৃতা অপেক্ষা তাহা অধিক মূল্যবান। কারণ যেখানে ভক্তির অভ্রান্ত প্রয়োজন সেখানেই তাহা উপস্থিত করা হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আজ এখানে দেওয়া নহে। কিন্তু আমাদের এই সাধনায় ভক্তির নিজস্ব স্থানের কথা পাছে আমরা ভুলিয়া যাই তাই তাহার প্রতি দৃষ্টি আকষণ করা গেল। পূর্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ এ জগতে কে হইয়া-ছিলেন তাহা এক ভগবানই জানেন। কিন্তু সেবাপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞের দৃষ্টান্ত পুণ্ডলীকের মূর্তি সদা আমার চক্ষুর সামনে ভাসে, আর সে কথা আমি আপনাদের বলিয়াছিও। এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ পূর্ণ হইয়াছে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ও শেষ হইয়াছে।

রবিবার, ২০/২/৫২





# নীলব বিদায়

শ্রীদীনেশ চৌধুরী

বস্ত্রশালাতর এক গোড়ানিতে চাঁৎ আমার তন্ত্রার বেশ কেটে গেল। রোগীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে সবে আয়েস করে হেলানো চেয়ারখানায় একটু গা এলিয়ে বসেছিলাম। মেজাজটাও তেমন ভাল ছিল না। সফটপল্ল অবস্থায় রোগীকে এটেণ্ড করার কর্তব্য অস্বীকার কববার নয় কিছুতেই। কিন্তু ডিসেম্বরের সেই ছাড়-কাঁপানো শীতে, আর যে সে শীতে নয়, একেবারে খোদ আসামের পাঙ্গাড়িয়া চা-বাগান অঞ্চলের শীতের রাতে খাড়া হুঁমাইল বাইক করে আসতে চলে কর্তব্যবোধটা একটু দোহলামান হলে কর্তব্যবাহই বা অপরাধ কোথায়!

কিন্তু দূত-বেটা কিছুতেই ছাড়বে না—পণ্ডিতবাবুর ব্যামায়; দেবতার মত মানুস, তাঁকে দেখতে যাবেন না—একি হতে পারে?

রাত তিনটের ঘুম-ভাঙনে! মেজাজে, একটু তিক্ত গলায়ই বলে-ছিলাম—তোদের দেবতাকে নিয়ে তোরা থাকগে, দেবতা দেখবার আমার অত সপ নেই। রোগীর এমন কি বাড়াবাড়ি যে রাত হুপরে এসে বাড়ী চড়াও করেছিস?

লোকটি হাত চপানা ছোড় করে মিনতিমাথা গলায় এবার বলে—দোহাই! ডাক্তারসাব, বেণী বাড়াবাড়ি না! হলে মাজি নিশ্চয় এ রাত-বেরাতে আমাকে পাঠাতেন না।

‘মাজি’—কথাটার উল্লেখে মেজাজখানা কেমন যেন একটু নরম হয়ে এল। তবুও যথাসম্ভব বিরস গলায় বললাম—মাজি আমাকেই বা ডাকতে পাঠালেন কেন, সন্যাস’ব’ ত আছেন, আর তিনি ত তোদের কাছেই থাকেন।

—কিন্তু, মাজি নিজে বললেন—ডাক্তারসাবকে নিয়ে আসবি।

মাজি নিজে বললেন—কথা ক’টি একটু স্বগতোক্তি’র মত উচ্চারণ করতে গিয়ে কি ভেবে যেন থেমে গেলাম।

লোকটি কাতর চোখে তপনও দাঁড়িয়ে। তাই অগত্যা বেরুতেই হ’ল :—

মাসপানেক হ’ল এ চা-বাগানে ডাক্তারি নিয়ে এসেছি। বছর দু’তিন কলকাতার হাসপাতালে স্বল্প মাহিনায় ‘চাউস সার্জেনের’ শিকানবিশী করে হতাঃ সৌভাগ্যলক্ষীর এক বিলিক মুখের হাসি দেখে সতিঃ ধনকে ভরে উঠেছিল মন। আর যাই হোক, মাইনে ত মোটের উপর কম নয়! কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই ঐ পবরটা বন্ধুহলে ঘোষিত হতে না হতেই ব্যাপারটাকে একেবারে ভয়ঙ্কর করে তুলল তারা।

দ্বিধাভীন ভাবে তারা সবাই একমত হয়ে বলে—বাবা, কাছাড়ের জঙ্গল; যে-সে জয়গা নয়। ডাক্তারি আর তোমাকে করতে হবে না ওখানে। একবার ম্যালেরিয়ার ধরলে তোমার

নিজেব ডাক্তারি বিজে নিজের উপরই চালাতে হবে পুরোপুরি। তার পর যখন প্রাণটা গলা অবধি এসে...

আমি একটু বিবক্তির ভাব দেখিয়ে বাধা দিয়ে বলেছিলাম—

—যা যা, তোরা শুধু বাজে বকিস। নিজেবা ত হাসপাতালে বসে ভেবেগু ভাজছিস, তাই আমার একটু ভাল দেখে তোদের বত মাথাবাধা আর কি।

বুঝতে পেরে, কথা ক’টি বলে নিজের মনকেই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছিলাম। তাই কলকাতা ছেড়ে আসার সময় নিজের মনটাকে শঙ্কামুক্ত করে আসতে পারি নি।

তার পর দিনকয়েক কার্টল চা-বাগানে নিরুপদ্রবেই। লোক-জনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম জায়গাটাতে ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু এই মাসপানেকের মধ্যেই প্রাণ প্রায় কঠাগত হয়ে উঠেছিল আর এক কারণে।

কলকাতার ট্রাম-বাস-কুর্পাতে জনারণ্য। আর এখানে শুধু সবুজ আর সবুজ—সবুজের প্রশাস্ত। দৃষ্টি প্রসারিত করলেই চোখে পড়ে টিলার পর টিলা—মাঝারি উচ্চতার চা-গাছে স্তরে স্তরে সজ্জিত। তার মধ্যে অবিস্মৃত শ্রামল আভা, যেন সবুজের প্লাবন। প্রথম দেখায় প্রাণ মাতিয়ে তোলে। কলকাতার অভ্যস্ত জীবনে মনে হয় এ যেন সুসবুজের সাগরে ঝাঁপ দেওয়া।

কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই সে উচ্ছাস হয়ে আসে মন্দীভূত। এখানে সবুজের শোভার গভীরতা যৎ বেণী, সামাজিকতার অভাবটা ততোধিক। চা-বাগানের কুলী-মজুরদের দেহের কুচকুচে কালো রঙেও যেন দেখতে পাই সেই সবুজ—দীর্ঘ দিনের জীবন-বাত্জার মিশে এক হয়ে গেছে তারা প্রকৃতির সঙ্গে।

তাই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল বিরট একাকিত্বে—পাশাপাশি আকুলভাবে খুঁজছিল একটু সামাজিক শীতলতা, একটু মাধুর্য।

আঁকাবাঁকা অসমতল পথ দিয়ে বাইকে আসতে আসতে তাই ভাবছিলাম সেই অদেখা ‘মাজি’র সন্ধ্যা। কি জানি দেখতে কেমন, বয়সই বা কত। চা-বাগানের অভ্যস্ত জীবনের একটু ব্যতিক্রমও হয়ত হতে পারে এক্ষেত্রে। ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে না থেকে সহজ ভাষায়, নিঃসঙ্কোচ ভঙ্গীতে হয়ত রোগীর সন্ধ্যা প্রয়োজনীয় কথা বলবেন আমার সঙ্গে, মিনতিমাথা চোখে চাইবেন আমার সাধারন সজায়তা।...

রোগী অসুস্থ গলায় গোঙিয়ে উঠল। এবার মাথাটা তুলে একটু সোজা হয়ে বসলাম চেয়ারে, তার পর চোখ ঘুরিয়ে তাকালাম রোগীর মুখের পানে। লষ্ঠনের অশুদ্ধ আলো সেই কোর্টরগত চোখে খানিকটা অন্ধকার জমাট করে তুলেছে। তার

পাশেই ছোট বেতের চেয়ারখানার উপর চোখ পড়ল। মুহূর্তকয়েক যেন আমি বিশ্বয় শুরু হয়ে বইলাম। এ কি পটের চিত্রিত রূপ, না জীবিত মানবীয় সত্তা! একটু যেন সন্দেহ দোলা দিতে চায় মনকে।

ফুটন্ত পদ্ম-কোরকের মত উদ্ভুক্ত বাহুল্যতার উপর মাথা ঝুঁক চলে পড়েছে। শুভোল প্রীত্যয় সপ্ন সোনার চেন সেই স্বপ্নালোকেও ঢক্ ঢক্ করছে। গুটি কয়েক চূর্ণকুন্তল এসে লীলায়িত ভঙ্গিমায় ভেঙে পড়েছে কপালে, চোখে, কানের উপর। বুকের বসন ঝুঁক অবিলম্বে। ফুটন্ত যৌবন-আভা সর্বত্র, যেন রূপের তরঙ্গায়িত সত্তা। আমার দৃষ্টি চোখও বিশ্বয়ে বিমোহিত হয়ে বইল মুহূর্তকয়েক।

পরক্ষণেই সচকিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু কি করব ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলাম না। রোগীর পাশেও যাবার কোন উপায় নেই, যদি হঠাৎ জেগে উঠেন মহিলাটি, লজ্জায় হয়ত আড়ষ্ট হয়ে উঠবেন সঙ্গে সঙ্গে। অথচ জাগিয়ে দেওয়াটাও ঠিক উচিত হবে না। সাবাস্ত্রের গুচ্ছধার শ্রান্তিতে হতত আপনাতাই চোখ চলে পড়েছে। সেই অবস্থায়...

আমার চেয়ারের অনতিদূরেই মেঝের উপর দেয়ালের প্রায় গা-সোঁসে অঘোরে ঘুমুচ্ছে রঘুয়া। ভাবলাম তাকে ডাকি, কিন্তু সে সাড়াও ত উনি জেগে উঠতে পারেন। মুহূর্তপানেক ভেবে উঠে দাঁড়লাম। তার পর ধীর পদে এগিয়ে গিয়ে সম্বর দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় পা দিলাম।

শোর হয়ে এসেছে। কিন্তু চার দিক কেমন যেন প্রায়শ্চক্য হয়ে আছে কুয়াসাং নিবিড় স্তরে। একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করলাম বারকয়েক বারান্দার উপর।

'কনট্রাস্ট' যে এত হৃদয়-বন্দনক হতে পারে এর আগে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। পৃথিবীর সকল রূপবানকে নিঃস্ব এক বিজ্রপের কণাঘাত দেবার জন্তেই যেন এ অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছে কোন এক অদৃশ্য হাত। রঘুয়ার 'দেবতা'কে দেখে এক বলক বাঁকা হাসি আপনা থেকেই ফুটে উঠতে চেয়েছিল ঠোঁটের কোণে। কিন্তু অবস্থাবিশেষ করে দিয়েছিল সচেতন। দীর্ঘ দিন বোগে ভুগছে এমন অনেক রোগী দেখেছি এর আগে। কোটরগত চোখ, চোয়াল দুটি বেরিয়ে আছে অতি প্রাধান্য নিয়ে; দেহে মাংসের লেশমাত্র নেই, শুধু চামড়াখানা হাড়ের উপর আবরণ তৈরি করে আছে কোনও উপায়ে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। দীর্ঘ দিনের রোগাক্রান্ত রোগী এ নয়। তা ছাড়া দেহাবয়বও তেমন বিশেষ কোন পরিবর্তন আসে নি। চোখ দুটো শুধু খানিকটা কোটরে প্রুবিষ্ট। দেখে ম্পষ্ট বোঝা যায়, স্বাভাবিক অবস্থার একটু ব্যতিক্রম হয়েছে মাত্র, রোগ আক্রমণের হেতুস্বরূপ। কিন্তু এ মুণ-ছবি স্বপ্নকের জন্তে আমার কল্পনার চোখ দুটোকে ছুটিয়ে নিয়ে বেতে চেয়েছিল অস্ত্র এক জগতে—জনপদ, নদী-পর্বত-উপত্যকার 'পরে বিচিত্র রূপে তার স্থিতি। সেখানে চলেছে ভাঙাপড়ার মহা-

বজ্র। গড়ে উঠছে নূতন মানুষ, নূতন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে— পাশাপাশি তেমনি চলেছে ভাঙনের তীব্র স্রোত; পুরনো, জীর্ণ বা-সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে দুর্বলোরা, হয় বিধাতাকে নয় ভাগ্যকে করণ অভিযোগ জানিয়ে। সেই কলকাতা! বছর-আটেক আগেকার ট্রামের সেই বিশেষ ঘর্ষন ধ্বনি আজ আবার কেন নূতন করে শুনতে পাচ্ছি?

—ডাক্তারসাব, মাজি আপনাকে একটু ভেতরে যেতে বলছেন --রঘুয়া চোখে হাত ঘষতে ঘষতে আমার অনিঃস্থবে এসে দাঁড়াল। সচেতন হয়ে উঠলাম। লক্ষ্য করি নি, ততক্ষণে কুয়াসা সম্পূর্ণ-রূপে কেটে গিয়ে কয়েক ফালি অন্তঃকরোধ দেগা দিয়েছে বারান্দার —পূর্বদিকের শিরিব গাছটার নীচে, সবুজ ঘাসের উপর।

ধীর পদক্ষেপে ঘরে গিয়ে চুকলাম।

এরই মধ্যে ঘরের সবক'টি জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে। গত রাতের ঝুঁক আলোকিত বর যেন প্রাণবন্ত রূপে চোখে পড়ল আমার। রোগীর পাটের পাশে চেয়ারখানা তখনও আছে সে অবস্থায়, তবে একটু সরিয়ে নিয়ে শিয়রের কাছ ঘেঁষে বসেছেন এবার মহিলাটি। মাথার ঘোমটা কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। এক পলক তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা হ'ল—মুখে কোন সলজ্জ রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে কিনা। তাপ দেখার জন্তে খামোমিটার এরই মধ্যে দিয়ে বেগে ছিলেন তিনি। তুলে ভাল করে দেখে নিয়ে রঘুয়ার হাতে দিয়ে ইঙ্গিতে আমাকে দেখাতে বলে চেয়ার চেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তার পর আস্তে আস্তে অনতিদূরে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। খামোমিটার হাতে নিয়ে দেখলাম জ্বর কমেছে অনেকটা। তার পর কাছে গিয়ে যথার্থীতি রোগীকে পরীক্ষা করে ব্যাধ্যপত্র আবার লিখে দিয়ে রঘুয়াকে জানালাম ভয়ের কোন কারণ নেই, জ্বর কমেছে। বিকেলে আবার আমি আসব। তবে এরই মধ্যে তাপ তেমন বাড়লে আমাকে পুনর পাঠালেই আমি আসব।

পা বাড়াবার আগে তাকিয়ে দেখি মহিলাটি তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন জানালার পাশে। তবে তার স্থির চোপের দৃষ্টি আমার পানে নয়, রোগীর মুখের উপর।

শীতের বিকাশ। বেলা প্রায় পাঁচটা হবে। দিনের উজ্জ্বল্য কমে আসছে ক্রমে। আর দেরি করা উচিত নয় মনে করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রোগী দেখতে বাওয়ায় যে একটা আনন্দ-বোধ থাকতে পারে, আমার অবস্থায় পড়লে যে কেউ তা স্বীকার করবেন। পণ্ডিতবাবুর মত দেবতুল্য লোককে দেখতে যেতে আনন্দ হবে সে ত নিশ্চিতই!

সোনাছড়ার উপরকার ব্রীজটার কাছে এসে নামতে হ'ল বাইক থেকে। কল কল ছল ছল ধ্বনি করে বয়ে যাচ্ছে সোনাছড়ার স্বচ্ছ জলধারা। ডান পাশে একবার তাকিয়ে দেখলাম, জলধারার হৃদয়ের গুল্ল বালির উপর সূর্য্যের বিদারী আভা সত্তা চকচকে সোনালী রঙ ছড়িয়েছে। কেন জানি মনে হ'ল, সোনাছড়ার এ

সময়কার রূপ দেখেই হয়ত ধোঁগ্য নামে বিভূষিত করা হয়েছে তাকে। আর এ নামের মধ্যাদা দেবার জগেই বাগানের নামও দেওয়া হয়েছে 'সোনাছড়া'। সোনাছড়ার পণ্ডিতবাবু, মাজি; সৌন্দর্য্য সত্যর বহুশ্রুত মহনীর হয়ে উঠেছে আমার কাছে এ ছোট্ট কাঁড়ি বাগান। বাগানের বাবুদা বলেন, 'আউটগার্ডেন'; মাহুলীছড়ার কাঁড়ি বাগান। কথার সুরে হয়ত বা থাকে কিছু অবহেলার আশ্রয়। কারণ এতে কলঘর নেই, নেই কলের খবর ধ্বনি, কন্যরত শ্রমিকদের বাস্তবতা, কোলাহল। কিন্তু তবুও সোনাছড়ার একটা বিশিষ্ট সত্তা আছে। চার-পাঁচটি বাগানের মধ্যে একমাত্র সোনাছড়ায়ই আছে বিদ্যালয়িকার স্রোত—'সোনাছড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়', আর আছেন তার অতীতম শিক্ষক পণ্ডিতবাবু।

প্রীতী পেয়েই এবার একটু দ্রুতগতিতে বাটক চালানাম।

আমাদের সদানন্দ আজ পাণ্ডিত্যবান। একটু বিষয় ঠেকাবে কি, কিন্তু সদানন্দ আজ ভাগ্যবান। শ্রদ্ধায় ভানবাসায় তার জীবন আজ সার্থক। সা বাগানের শ্রমিকদের কাছেও সে দেবতুল্য।

প্রথম দেখায়ই তার সে চেতরাখানা চকিতে উঁকি দিয়েছিল দীর্ঘদিনের সঞ্চিত স্মৃতির কুহেলী ভেদ করে। কিন্তু তখনও স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি, খুঁজে বের করতে পারি নি তার প্রকৃত পরিচয়। তার অবকাশও হয় নি তখন, তা ছাড়া দীর্ঘ আট-নয় বছরের বাবধানের প্রাচীর। তারপর আজ পথের নিয়ে বুঝতে পারলাম আমার স্মৃতি-মহন বর্ধিত হয় নি, আমাদের সন্ধানপট।

দৃষ্টি আবার প্রসারিত হয়ে ছুঁতে চলে 'অদম্য গতিতে'। হাঁ, কলকাতার, যেন স্পষ্ট চোখে পাড় সাক্ষ্যের রেখা থেকে একটা সর গলি গিয়ে শেষ হয়েছে অপ্রশস্ত এক সন্তক দায়ে, এরই পশ্চিম 'অংশে মাথা উঁচিয়ে আছে একখানা তেতলা বাড়ী। আমাদের তোলেই, দীর্ঘ কলোড ভীষনের আবাসস্থল। দক্ষিণ কোণের সেই চার নম্বর ঘর থাকত সদানন্দ। কিন্তু সদানন্দ বেশী দিন থাকে নি, বছর খুবতে না বুঝতেই সে চলে যায় তোলেই ছেড়ে, শুধু তোলেই নয়, সেইসঙ্গে কলকাতাও। কিন্তু পিছনে রেখে যায় একটা কণক স্মৃতি। আজ যেন আবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার অশ্রুভারা কণ্ঠ সে মুগ্ধানা।

দাস্তার হোড় ঘুরেই এক ফালি প্রশস্ত টেবু জায়গা, তার উপর পণ্ডিতবাবুর বাড়ী। বাটক নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি রঘুয়া বারান্দার উপর দেয়ালে তেলান দিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে সমস্তই উঠে দাড়ায়।

বাটকখানা আমার হাত থেকে নিয়ে বারান্দায় ডুগতে গিয়ে সে বলল, আপনার জগেই বসে আছি ডাক্তারসাব সেই বিকেলতক। মাজি আমাকে ঠায় বসিয়ে রেখেছেন।

আমি মুহূর্তে বসে বললাম, তাই নাকি।

উৎসাহ পেয়ে রঘুয়া এবার যেন খুব একটা 'অনন্দ'ের খবর

জানাচ্ছে তেমন ভাব দেখিয়ে বলে, জানেন ডাক্তারসাব, মাজি আমাকে কি বলেছেন আজ সকালবেলা। আপনি চা-টা কিছু না খেয়ে চলে গেলেন সেই সকালে। কিন্তু আমার ত খেয়াল ছিল না কিনা মাজিকে মনে করিয়ে দিতে...

—রঘুয়া, রঘুয়া—নারীকণ্ঠের আত্মবান এল, একটু যেন তীব্র গলার। মুহূর্তে রঘুয়ার মুখের হাসিখুশী ঈষৎ স্তান হয়ে এল।

—মাজি ডাকছেন ডাক্তারসাব, বলেই আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবার কথা বেমানাম চলে গিয়ে সে ছুট দিল।

মিনিট দুয়েক পরেই আবার সে এল একেবারে হস্তদস্ত হয়ে—কি সর্বনাশ, আপনি দাড়িয়ে আছেন ডাক্তারসাব; আসুন, ভেতরে আসুন।

ভিতরে গেলাম। বসবার ঘরখানা পেরিয়ে একফালি সর বারান্দা, বা-পাশে শোবার ঘর। আলো জ্বালা হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। দেয়ালোড়ার যেতেই বিষয়ের সঙ্গে স্তন্যময় নারীকণ্ঠের আত্মবান—আসুন ডাক্তারসাব, ভেতরে আসুন।

উল্লেখ নিশ্চয়োচন সে মহিলাটি রঘুয়ার মাজি। আমার কানে যেন মধুর বহুর গিয়ে প্রবেশ করল।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি দেবের এক পাশে দাড়িয়ে। মাথার ঘোমটা আর তেমন বিলম্বিত নয়, চোখে মুখেও নেই সে শ্রান্তির ছাপ। লগ্ননের তরুজ্বল আলোতেও কুচে উঠেছিল সে স্তম্ভর মুখের এক পরম দীপ্তি।

চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন উনি?

মুচক গলায় তিনি বললেন, তাপ তার নেই এখন। আপনি 'ইনজেকশন' দেবার পর থেকেই তার নৈম গিয়েছে।

আমি ততক্ষণে দেয়াল পাশে গিয়ে দাড়িয়েছি। রোগী তখন অঘোরে ঘুমচ্ছে। তাই আলগোছে কপালে হাত দিয়ে তাপটা দেখলাম, তেমনি ভাবে 'পালস'টাও একটু দেখে নিলাম। সত্তা ডাক্তারবাবু, আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব—আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি এতটা কষ্ট স্বীকার না করলে কি যে হ'ত কে জানে।

তাকিয়ে দেখলাম, হা কৃতজ্ঞতা বৈ কি, মুখে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতার ছাপ।

আমিও ডাক্তারি কার্যদায় বললাম, এ আপনি শুধু শুধু বলছেন। আমাদের কতবাই হো হচ্ছে রোগীর যত্ননা লাঘব করে দেওয়া। বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে একটু হাসিও পেল। রঘুয়া প্রথম আমাকে শাকতে যাবার সময়ে আমার কতবাবোখটা যদি একবার পরখ করে দেবার সুযোগ পেতেন মহিলাটি!

সদানন্দের শক্ত মুগ্ধমুগি পরিচয় এবারও হয়ে উঠল না। গত রাতে জ্বরের ঘোরে বারকয়েকই তাকিয়েছে আমার মুখের পানে। কিন্তু সে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে মোটেই সম্ভব ছিল না দীর্ঘদিনের বিস্মৃতি ভেদ করা।

ভেবেছিলাম, আজ অন্তর্কিতে উন্মোচিত হয়ে উঠবে আমাদের

পূর্বনো দিনগুলি; একটা গোটা অধ্যায় এসে নিবিড়ভাবে দাঁড়াবে সন্ধানন্দের স্মৃতিপ্রসারিত দৃষ্টির সামনে, রক্তপ্রবণ হয়ে উঠবে তার ছোট চোখ দুটি। আর রঘুর মাজি—

—ওগুদ কি বললে দেবেন ডাক্তারবাবু?

সহজভাবে জানালাম, না আগের মতই চলবে।

অগত্যা কি ভেবে নিয়ে এবার বললেন তিনি আপনি একটু বসন চেয়ারটার, বলেই ছবিপর্দা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিনিটকয়েক পর রঘু একটা বেকাবীতে করে কিছু খাবার আর এক কাপ চা নিয়ে এসে ছোট টিপসের উপর রেখে আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বিনীত হাসি নিয়ে বলল আপনি পান ডাক্তারসাব, মাজি বলে দিলেন।

মিনিটকয়েকের মধ্যেই চা-চা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। কিং এবং বিম্মিত না হয়ে পারলাম না, উনি সেই বে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তারপর আর তাঁর দেখা নেই। একবার ভাবলাম রঘুকে ডিসেস করি। কিন্তু পরমুহুর্তেই মনে হ'ল, তখন যুক্তযুক্ত হবে না। তাই রঘুকে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি এ খবরটা যেন তার মাঠকে জানায়।

সেদিন রবিবার।

চতুর্দশের পর আবার সোনাছড়ায় আসতে হ'ল। তখন পণ্ডিতবাবুর বাড়ী নয়, বাগানের তেঁতুলতরুর খবর পেয়ে তার ছোট ছেলের চাকি-সো-বাগারে। সবাল প্রায় মাড়ি অঁচন হবে। বড়বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছিলাম।

আমমতল অংগা। ওখানকার ব'বলদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীই এক একটা টিলার উপর। প্রশস্ত চিত্র চাপ, ওখানকার লোকেরা বলে টিলা। বাংলা পাঠ্যের ছোট আকারের গড়ের চাল দেওয়া বাড়ী। এক বাড়ী থেকে অল্প বাড়ী স্পষ্ট চোখে পড়লেও দূরত্ব একেবারে কম নয়, নিচেন গায়ে দেখ'শ'ত'শ গজ। টিলা-গুলির নীচ দিয়ে সপিল গতিতে রাস্তা চলে গেছে মাছলীছড়ার দিকে। আর প্রত্যেক টিলা থেকেই এক একটা অপ্রশস্ত রাস্তা চালু পথে একটু পাক গেলে গিয়ে মিশেছে সেই রাস্তায়।

বাইকপানা হাতে নেমে আসছিলাম। একটা প্রবল ইচ্ছা হজিল পণ্ডিতবাবুর বাড়ী থেকে একটু ঘূর খাই। চাইফয়েড বোণী, অস্ত্র হয়ে উঠলেও ডাক্তার হিসাব আমার কণ্ঠে একবার দেবে যাওয়া। তা ছাড়া সন্ধানন্দের সঙ্গে প্রত্যাশিত ভাবে পরিচিত হবার আশ্বাস, সেও কম ছিল না। পরমুহুর্তেই মনে হ'ল—কিণ্ড সেদিনের পর একবারও ত খবর পানো হ'ল নি আমাকে। ওষট আমি প্রতিদিনই প্রত্যাশা করেছি, রঘু হ'ল হ'ল গিয়ে দাঁড়াবে বিনীতভাবে—মাজি পাঠ্যলেন ডাক্তার-সাব। ঝকুণ্ড সে সুবের কথা, কোন খবরই এর পর থেকে পাই নি। হ'একদিন ভেবেছি, নিজে থেকেই বাই একবার; আবার তপনি মনে হয়েছে, অস্বাচিতভাবে গেলে তেমন কিছু যদি ভাবেন রঘুর

মাজি! একটু অগমনভাবে রাখা ঘুরিয়ে তাকলাম একবার। পণ্ডিতবাবুর বাড়ীর পূর্বদিকের দেয়ালটা রোদের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, জানালার মীল বড়ের পক্ষগুলো ক্ষণে ক্ষণে জলে উঠেছে হাওয়ায় পরশ পেয়ে। একটু অস্থসন্ধিঃস্থ দৃষ্টি এবার জেগে উঠল, পক্ষাব ফাঁকে কোন ক'ভল-কালো চোপের এক বলক চাহনি যদি থেকে থাকে।

হঠাৎ 'চাপে' পড়ল, একটা লোক পায়ে চলা পথটি ছেড়ে পণ্ডিতবাবুর বাড়ীর দিক থেকে টিলার ঢালু গা বেয়ে সোজা আমার দিকে ছুটে আসছে, আর হাত নেড়ে কি ইঙ্গিত করছে। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, লোকটি আর কেউ নয়, সন্ধান রঘু, তাতে একপানা সাদা কাগজের টুকরো, তখন চিঠি।

রঘু হাঁপাতে হাঁপাতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

চিঠি আছে ডাক্তারসাব, মাজি দিলেন। বলেই হাতের মুঠোতে কুচকে যাওয়া এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিলে।

চিঠিপানার উপর চোপ পড়তেই বিষর ও আনন্দ দুইই অল্পভব কখনো একসঙ্গে। রঘুর মাজি লিখেছেন মা'এ হ'তিনটি কথা; বাবীশ্রিক ছাঁদের একটু নেয়েলি খাঁচের স্তম্ভের হস্তাক্ষর:

ডাক্তারবাবু,

দয়' করে একবার 'ম'লের বাড়ী গিয়ে যাবেন। ইতি

'মীরা'

নামের নীচে 'ব্রজক' লিখে দেওয়া আছে মিসেস সন্ধানন্দ দেবী। কাগজপানার পানে 'ব'কিয়ে রয়েছিলাম মুহুর্তকয়েক। রঘুর কথায় সচকিত হতে উঠলাম।

গাড়ীখানা দিন ডাক্তারসাব, আমি নিজে যাচ্ছি।

সংক্ষেপে বললাম, অজি চল।

বাটীদের বাদান্দুক পেঁরিয়ে আমি বহব'র ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। রঘু বাটকখানা দেয়ালে তেলান দিয়ে বেগে এসে বললে—মাজি ভেতর আছেন, চলুন।

ভেতরের বারান্দায় পা দিয়ে দেখলাম, মীরা দেবী অধুবে একপানা চেয়ারের দিছন দিকে হাত ছ'খানা রক্ত রেখে দেবের পানে চোপ বেগে দাড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই স্মিত হেসে আপায়ন করলেন, অংজন ডাক্তারবাবু, বসন এসে চেয়ারটায়।—তারপর একটু সরে দাড়িয়ে গিয়ে বললেন, ডাক্তারদের না ডাকলে ভুলেও একবার এসে পা দেন না গরীবের বাড়ী।

আমি এ কথা'র কোন ভাব না নিয়ে তুড় হেসে বললাম, তারপর, উনি কোথায়?

—যাবেন আর কোথায়, নিশ্চয়ই কোন শিখা-শিখার বাড়ী। সানেন ত পণ্ডিতবাবু দেবতুল্য লোক। ঢের শিখা আছে তাঁর এ অঞ্চলে। শিখাও আছেন হ'একজন।

আমি হেসে বললাম, বড় স্তম্ভবাদ তো। আপনাম তো তা

হলে মহা গৌরবের ব্যাপার!—আমার চেয়ারের অধুয়েই একটা বেতের মোড়া নিয়ে ততক্ষণে বসেছেন মীরা দেবী।

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে কি একটু ভেবে এবার আমার মুণের উপর চোখ বেগে বললেন, আপনি এখানে একা থাকেন, না ডাক্তারবাবু?

সংক্ষেপে জানালাম, হাঁ।

তারপর কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন বারান্দার নীচেকার প্রশস্ত উঠানটার উপর।

—আজ্ঞা ডাক্তারবাবু, বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন?

মুণ তুলে তাকালাম সে সপ্রশ্ন চোখের পানে; ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না এ প্রশ্ন কেন। হয়ত নারীর স্বাভাবিক কৌতূহল, জানার একটু আগ্রহ, আমার এ একাকিত্বের হেতু কি। চোখ নামিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললাম, দেশের বাড়ীতে ঠিক কেউ আছেন বলা যায় না। বাবা থাকেন কানীতে; পেন্সন নেবার পর থেকেই আছেন ওখানে। মাকে হারিয়েছি ছোটবেলায়। আর বোনটিরও বিয়ে হয়ে গেছে বছরতিনেক আগে। তাই থাকার মধ্যে আছেন শুধু বাবাই।

বাথ হয়ে ওনছিলেন মীরা দেবী। আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বলে উঠলেন, আর কেউ...

পরমুহূর্তেই কথাটা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেলেন। তারপর ভ্রমভাবে কথার মোড় ঘোরাতে গিয়ে বললেন, আপনি কলকাতার পড়াশুনো করেছেন, না?

আমি শ্রিত হেসে জানালাম, হাঁ।

তারপর চকিত হঠাৎ তিনি মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বহুদূর আপনি, পালাবেন না যেন—বলেই স্বরিতপদে বারান্দা পেরিয়ে বাগানঘরে গিয়ে চুকলেন।

মিনিটকয়েক বসে রইলাম নীরবে। উঠানের উত্তর কোণের নিমগাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে শীতের মিষ্টি বোধ এসে ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ ঘাসের উপর। সে জায়গা থেকে বারান্দার দক্ষিণ-কোণ অবধি কয়েক সারি ফুলের গাছ। বৈশীরা ভাগই 'সিজনড্ ক্রাওয়ার'। তার শিশির-ভেজা পাপড়ি থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে বিভিন্ন রঙের ছটা।

শোরগোড়ায় হঠাৎ চোখ পড়ল। আনন্দের সঙ্গে দেখলাম, হাঁ সদানন্দ। নিজের অজান্তেই একটু নড়ে-চড়ে বসলাম। সদানন্দ এগিয়ে এসে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুণের পানে তাকাল মুহূর্তকয়েক, তারপর চকিতে তার ছোট চোখ দুটিতে ঘনিয়ে এল অপার বিষয়, যেন বিশ্বাস করছে পারছে না তার চোখ দুটিকে। অক্ষুটে ছুটি কথা বেরিয়ে গেল তার মুণ থেকে।

—আমাদের তাপস না?

আমি শ্রিত হেসে মাথা নাড়লাম।

একটা আনন্দের ধারা খেলে গেল তার সারা মুণে-চোখে। আমার পাশেই চেয়ারখানা একটু এগিয়ে এনে বসে বলল,

তারপর খবর কি বল ত? আমি ত চিনতেই পারি নি। কতদিন পর দেখা; বছর সাত-আট হয়ে বাবে হয়ত। একটা যুগ প্রায় শেষ হতে চলেছে।

আমি হেসে বললাম, খবর আর কি, মাসদুয়েক হ'ল ডাক্তার হয়ে এসেছি এ অঞ্চলে।

—তাই নাকি, মাহুলীছড়ার তা হলে? বিষয়-বিস্ফারিত চোখে তাকাল সদানন্দ;—অথচ আমিই জানি না!

—জানবে কি করে, তুমি ত আছ তোমার বইপত্র আর ছাত্রদের নিয়ে। তোমার চিকিৎসার কে কবল সে খবরটা একবার জেনেছ?

আমরা দু'জনেই মুণ ঘুরিয়ে তাকালাম। মীরা দেবী এক হাতে খোঁদাটে চায়ের কাপ, অঙ্গ হাতে পাবারের প্লেট নিয়ে এসে দাড়িয়েছেন। সদানন্দ উঠে গিয়ে টি-পয়টা আমার সামনে এনে রাখল। তারপর নিজের আসনে বসে এবার স্বীয় মুণের পানে তাকিয়ে বলল, কিন্তু ডাক্তারটি কে সে খবরটা তুমি কিছু রাখ? আমার অনেক দিনকার বন্ধু তা: তাপস রায়।

তারপর হাসিমুখে আমার পানে তাকিয়ে সে বলল, পরের উপাধিগুলো আর লাগালাম না ভাই। জানি না ত ঠিক, বি-এসসির পর আর কি কি লাগিয়েচিস!

মীরা দেবী বললেন এবার, তোমার এ খবরটা কিন্তু অনেকটা আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।

—আন্দাজ, সে কি? জলজ্যান্ত একটা অচেনা লোককে তুমি আন্দাজে ধরে নিলে?

—বা: রে, তুমিই ত একদিন বলেছিলে, তোমার এক বন্ধু ডাক্তারি পড়তেন কলকাতায়, এদিনে নিশ্চয় ডাক্তার হয়ে গেছেন। তারপর তাঁর চেহারার যে বর্ণনা দিলে তাতে সেদিন তাঁকে দেখে আন্দাজ করাটা কি আর অসম্ভব কাজ হয়েছে! তা ছাড়া আমি আগেই শুনেছিলাম কলকাতা থেকে একজন নতুন ডাক্তার এসেছেন মাহুলীছড়ায়।

এবার সম্ভ্রান্তর-মুগ্ধ আমার পানে তাকিয়ে তিনি বললেন, আজ্ঞা, আপনিই বলুন ডাক্তারবাবু, আন্দাজ করাটা কি অস্বাভাবিক হয়েছে?

আমি কৌতুকবোধ করছিলাম উভয়ের এ বাগ্‌বিতণ্ডায়। এবার মুহূর্তেই হেসে বললাম, না, অস্বাভাবিক মোটেই হয় নি। তবে, এতে আপনার কৃতিত্ব আছে যথেষ্ট, এটা সদানন্দ কেন যে কেউ স্বীকার করবে।

হঠাৎ চায়ের কাপের পানে নজর পড়ল মীরা দেবীর—এই বা, চা-টা ঠাণ্ডা হতে চলেছে। আর কথা নয়, এবার চূপ করে হাত লাগান দিকি নি। আমি আর এক কাপ নিয়ে আসছি আপনার বন্ধুর জন্তে। স্বরিতপদে এগিয়ে গেলেন মীরা দেবী।

দীর্ঘদিন পর অপ্রত্যাশিত দেখা। এতদিনকার সজ্জিত কথার ধারায় হয়ত বান ডেকে উঠেছে। সদানন্দের মুণের ভাব

দেখে মনে হ'ল, অনেকগুলো কথা এসে জড়ো হয়ে উঠেছে তার ওষ্ঠাধ্রে। কিন্তু কাকে মুক্তি দেবে আগে ঠিক করে উঠতে পারছে না। তাই কথার গেই হারিয়ে শুধু যামুলি প্রশ্ন করে গেল গুটিকয়েক—কলকাতা ছেড়েছি কবে, ডাক্তারি পাস করলাম কোন্ সালে, হোষ্টেলটা কেমন চলছে কি জানি; তারপর এখানকার জায়গাটা লাগছে কেমন, বাবার শরীর কেমন আছে; বিয়ে-খাই বা করছি না কেন এ বয়সেও... ইত্যাদি।

একে একে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে গেলাম। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই তটস্থ হয়ে ছিলাম একটি প্রশ্নের আশঙ্কায়। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে করে বসবে, সঙ্গে সঙ্গে এ স্বর্গাক্ষরোজ্জ্বল সকালটাও হয়ে উঠবে বিবাদঘন। সতসা ভিড় করে দাঁড়াবে এসে একটা গোটা অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ ক'টি দিনের ছবি, বেদনার তত্ত্বীতে ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে সদানন্দের। এ পরিবেশের পক্ষে তা বাহ্যনীর হবে না মোটেই।

বাক, মীরা দেবী এসে পরিজ্ঞাপ করলেন, আমার এ তটস্থ ভাব থেকে। হাতের কাপটা রাখতে গিয়ে তিনি বললেন, আপনার বন্ধুর চেয়ে আমি কিন্তু কম আপনার নই ডাক্তারবাবু। এবার থেকে সোনাছড়ায় এলে একবারটি যেন দেখা দিয়ে যাবেন।

সদানন্দ উঃস্মৃতিভাবে বলল, একশ' বার, আসবে না মানে। সোনাছড়ায় না এলেও তাকে আসতে হবে। আর না এসে যাবেই বা কোথায়—বলেই সদানন্দ আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে তাকাল আমার পানে।

এবার বিদায় নেবার পালা। উঠে দাঁড়ালাম। সদানন্দ বলল, আজ ত রববার, সন্ধ্যার দিকে একবার আসিস, আমি অপেক্ষা করব।

তাকিয়ে দেপলাম মীরা দেবীর মুগ্ধানাও স্মিতহাস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যা হতে-না-হতেই বাইক নিয়ে এসে দাঁড়ালাম পণ্ডিতবাবুর বাড়ীর সামনে। সদানন্দ বারান্দায়ই বসেছিল একথানা চেয়ার নিয়ে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

—এসেছিস তুই; বাক, দেরি করিস নি মোটেই।

আমি বারান্দায় পা দিতেই সদানন্দ এবার বলল, আজ এখানে আর বসব না, চল একটু ঘুরে আসি এদিক ওদিক। হু'জনেই নামতে বাছিলাম। রঘুয়া এসে পেছন থেকে আমাকে ডাকল—ডাক্তারসাব, মাছি ডাকছেন আপনাকে।

সদানন্দ আমার পানে তাকিয়ে বলল—যা, শুনে আর মহারাণীর কি হুকুম, হুমিনিটের বেই কিছু দেরি করিস না।

ভেতরে গেলাম। বারান্দা পেরিয়ে একেবারে রাজাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড় করাল আমাকে রঘুয়া। কি একটা কাজ করছিলেন, আমি দাঁড়াতেই মুখ তুলে চাইলেন মীরা দেবী, তার পর যুহু হেসে বললেন—শুনলাম, খুব খুবে বেড়ানোর মতলব করেছেন আপনারা।

আমি স্মিত হেসে মাথা নাড়লাম—অনেকটা তাই।

ততক্ষণে আঁচলে হাত দু'গানা মুছে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে—ছেন মীরা দেবী। তার পর স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন এবার—আমার একটা অমরোথ আছে কিন্তু, রাখবেন নিশ্চয়ই। মুহূর্তপূর্বই আবার বললেন—বিকল্পিত করলে অমরোথ না বলে বলব আদেশ।

আমি হেসে ফেললাম—ভূমিকাই এত লম্বা, আদেশের বহরের কথা ভেবে ত আমি আঁতকে উঠছি। এবার বলুন, কি আদেশ!

সহস্র ভাবে বললেন মীরা দেবী—কি করে এসে খেয়ে দেয়ে ভবে যাবেন, বুঝলেন?

আমি বলতে বাছিলাম—রাজাবাদা ত ঠাকুর করে রেখেছে ওখানে। কিন্তু বলার আগেই শুনলাম—এর ওপর কোন কথাই আমি শুনব না।

অবস্থা দেখে বাধা হয়ে নীরবেই কি করে যেতে হ'ল।

সদানন্দ বলল—চল এগোই।

টিলার চালু রাস্তা দিয়ে নেমে চললাম হু'জনে। তার পর মাহুলীছড়ার অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তা। সে রাস্তার পা দিতেই সদানন্দ বলল—চল, তোকে আজ একটা নতুন জায়গা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

তার পর উভয়েই নীরব। পাশাপাশি চলছি হু'জনে। রাস্তাটা ঈষৎ আঁকাবাঁকা গতিতে এগিয়েছে। হু'পাশে কাঁটাতারের বেড়া, তার ভেতর উঁচুনিচু টিলা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। নবমীর চাঁদ উকি দিয়েছে পূর্বদিকের একটা উঁচু টিলার গা বেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার রূপালী ধারা এসে বর্ধিত হচ্ছে সবুজ কচি চা-পাতার উপর। সবুজে রূপায় মিশে এক অপকল্প আলো বিকীর্ণ হচ্ছে সেট পাতা থেকে।

—সত্যি, চমৎকার! না বলে পারলাম না।

সদানন্দ তাকাল আমার মুখের পানে, একটু যেন সচকিত ভাব নিয়ে। তার পর মুত হেসে বলল—আরও চমৎকার দেখতে পাবি, চল।

আরও মিনিট চার-পাঁচ এগিয়ে বাবার পর দেখতে পেলাম আর একটা ব্রীজ। তারও নীচে পাহাড়ী জলধারা।

সদানন্দ বলল—এটা সোনাছড়ার দ্বিতীয় ব্রীজ, প্রায় সমস্ত বাগানটা বেঠন করে সোনাছড়ার জলধারা এ পাশ দিয়ে গিয়েছে, তার পর এ ঝঞ্ঝা দিয়ে বহু ঘুরে গিয়ে মিলেছে একটা পাহাড়িয়া নদীর সঙ্গে।

ব্রীজে আর পা দিলাম না আমরা। তার গা দিয়ে সোনাছড়ার ধারা বরাবর একটু সড় পায়-চলা পথ এগিয়ে গিয়েছে বড় রাস্তা থেকে। সে পথে এগোলাম হু'জনে। কয়েক পা এগোতেই চকিতে সদানন্দের কথাটা যেন বহুত হয়ে উঠল—হুবে, ছন্দে।

—সত্যি আরও চমৎকার।

অদূরে একটা ঈষৎ উঁচু টিহির নিম্নাঙ্গ ত্রিভুজাকার ধারণ করে

ছুঁয়েছে গিয়ে জলধারাকে। তার সবুজ গায়ে, নীচের সমতল অংশে ফুটে আছে অসংখ্য বনফুল। জ্যোৎস্নালোকে সবগুলোই বড় ধরেছে তুষার-গুজ। জলের উপর চুয়ে আছে কয়েক গুচ্ছ কাশবন, তারও শীর্ষে ফুলের বিকাশ।

একটা ঝির-ঝির ধ্বনি শুনে তাকিয়ে দেখলাম বাঁ-পাশে। কাছেই একটা সরল গাছ দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছুঁয়ে। এই সবুজের বাজো সে যেন প্রৌঢ়ের মর্দাদার মতীয়ান।

সেই চিবিব ওপর গিয়ে বসলাম আমরা। চাঁদ কঁপে কঁপে উঠছে জলধারার উপর, হেসে লুটোপুটি পাচ্ছে বনফুলের শাপাঙ্গলো, ছন্দ রেখে মাথা দোলাচ্ছে কাশগুচ্ছ।

অধিকের দমকা হাওয়া। ঝির-ঝির-ঝির ধ্বনিতে মুগ্ধিত করে তুলছে দীঘল সবল পাতাগুলি।

তাকলাম সদানন্দের মুখের পানে। চিস্তাময় সে চোখ দুটি। একবারও হয়ত সে আজ তেমন ভাবে তাকিয়ে দেখে নি, এত যে সৌন্দর্যের প্লাবন।

পা-দুখানা একটু ছড়িয়ে বসে সামনের দিকে চোখ রেখে সদানন্দই এবার নীরবতা ভাঙে—একটা কথা তোকে ফিজেস করব ভাবছিলাম তাপস, সকালবেলাই বলতাম তোকে, কিন্তু স্থান-কাল বিবেচনা করে বলতে পারি নি।

জলধারার পানে আমি নীরবে তাকিয়ে ছিলাম, তেমনি ভাবেই তাকিয়ে বইলাম। কিন্তু সে সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতার উপর হঠাৎ যেন একটা কুয়াসার স্তর আবরণ রচনা করতে আরম্ভ করেছে বলে মনে হ'ল।

সদানন্দই আবার বলল—আজও তাকে তুলতে পারি নি তাপস, দীর্ঘ আট বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু...

‘আমি একটু ভাংসনার সুরে বাধা দিয়ে বললাম—এ তোদের ‘সেটিমেণ্টে’র কথা সদানন্দ। আজ তুই কোন্‌ ডুপে মন পাবাপ করতে বাচ্চিস বল ত? মীরার মত মেরেকে তোর জীবনে পেরে-ছিস। এব বোনী কামা আর কি থাকতে পারে বল? আমার ত মনে হয় তুই আজ পরম ভাগ্যবান।

নিজের কানেই বক্তৃতার মত শোনাও কথাগুলো। কিন্তু সদানন্দ নীরব, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বুকের ঐ টিলায় পানে।

কথার আবেগ গিয়েছে যেমে! ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ, চন্দ্রালোকিত জলধারা, গুজ বনফুল আড়ালে পড়ে গিয়েছে একে একে।

হাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্বল্পপরিসর মাত্র, তার উপর তেতলা বাড়ী। বাতাসে ভেসে আসছে ট্রায়ের ঘর্গর ধ্বনি, ফুটপাথের কোলাহল। এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট অধ্যায়, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার দিনগুলো।

চোখেলের নতুন ‘সেগুন’। ভাঁড়ি হ'ল এসে সদানন্দ দস্ত, ‘কিঞ্চ ইয়ার’, অর্থনীতির ছাত্র। আমি তখন সব বি-এসি পাস করে ডাক্তারিতে ‘এডমিশন’ নিয়েছি। রুম-মেট সদানন্দ।

দিনকয়েক কাটল। ভাবত বুকের কথা, কথাই তেমন জমে উঠে না তার সঙ্গে। ভোরবেলা আমি বিছানার থাকতেই সে বেরিয়ে যায় কোথায়, আসে একবার কলেজের আগে খেয়ে যেতে, মিনিটকয়েকের মধ্যেই স্নান-আহার শেষ করে আবার ছোট্ট কলেজে। তার পর কিং আসে রাত নটা সাড়ে নটার। কথা বলার ফুরসতই আর হয়ে ওঠে না। নিশ্চিন্ত রুটিনের মধ্যে যে বায়-হুঁতিন দেখা হয় তাতে মামুলি দু'চারটি কথাও বেশী এগোয় না। তা ছাড়া গোষ্ঠেলের অন্তর্ভুক্তদের মত আমিও তেমন আত্মিক বোধ করি নি তাই সঙ্গে ভাব জমাবার। কারণ তার মুখের উপর প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণের বিপরীতটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এমনকি দু'একটি ছেলে নীচু স্তরের বসিকতায় আনন্দ কলাতে গিয়ে আড়ালে আঁবড়ালে বলত—আহা, কি নাক, কি চোখ। একেবারে কলিযুগের স্ক্রিক, বাঁশী হাতে দিলেই হয় আর কি!

সত্যি, বাঁশীর মত নাক, পাতলা ঠোঁট, রেখাচিত্রিত জুঁ-ছোট চোখ দুটো ছাড়া অতি রূপবানদের সমস্ত উপাদানই তার মুখাবরণে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু একটু তাকালেই চোখে পড়ে, মনে হয় যেন শ্রুতি সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলো গুড়ে করে এনে সমন্বিতভাবে অতিমাত্রায় ত্রুস্ত হাতে শেষ করেছেন তাঁর তপনকার সৃষ্টির কাজটি। তাই নাক আর মুখ-গহ্বরবের দুবছর যেরূপে গেছে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী, ভ্রুগল নিয়েছে কৌণিক অবস্থান।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন সাড়া পড়ল চোখেলের তেতলা অবিধ। সকলে এসে খোজ করতে লাগল—কে ছেলেটি সদানন্দ দস্ত?

‘দেয়াল’ পত্রিকার গল্প বেরিয়েছে সদানন্দের। চমৎকার, অপূর্ব গল্প—সকলের মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। হুঁ এক জন পুরনো আবাসিক বললেন—চোখেলের ‘দেয়াল’ পত্রিকার জীবনে এমন গল্প আর বেরোয় নি।

আমার মুগ্ধ স্নান হয়ে এল। তবুও সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হ'ল—চমৎকার। কারণ এর আগে অল্পতম গল্পলেখক ছিলাম আমি। কিন্তু...

কিন্তু কল হ'ল অল্প রকমের। সূচনা হ'ল সদানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্বের। অল্পদিনের মধ্যেই সে হয়ে উঠল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুগ্ধ করেছিল আমাকে তার সরলতা। তখন প্রশংসার বান বইছে তোটেলে। আমি তাকে হেঁদে বললাম, আপনি যে খুব প্রশংসা লুটছেন মশায়।

সে হাসিমুখে তাকায় আমার পানে—ও কিন্তু আমার প্রাপ্য নয়; ফাঁকি দিয়ে বাজি মাং করেছি জানি, কিন্তু ঠায়া ত তা বুঝবেন না। গুচ্ছিয়ে-গাচ্ছিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ঢালাই করেছি, এই ত মাত্র।

শেষ জানতে পেরেছিলাম, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তার সত্যি বিচিত্র সম্ভারে পূর্ণ। বালক-বয়স থেকেই আরম্ভ হয়েছে তাঁর জীবন-সংগ্রাম, জীবন-সংগ্রাম ঠিক না হলেও শিক্ষা-সংগ্রাম। বখা-সম্ভব স্বাবলম্বী হয়ে চালাচ্ছে হয়েছে তার স্কুল-জীবন। তার পর



কলেজ-জীবনে তাকে হতে হয়েছে পূর্ণ স্বাবলম্বী। তাই বিচিত্রতর ঘটনাপরিবেশের ভেতর দিয়ে কাটাতে হয়েছে তাকে দীর্ঘ কাল।

গরমের ছুটির পর পুজোর ছুটি ঘুরে এল : দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েক মাস। এবই মধ্যে সদানন্দ হয়ে উঠেছে আমার প্রধান বন্ধু। অল্প দিনের মধ্যেই সে 'ভূমি'র স্তর ছাড়িয়ে 'ভূই'-এর স্তরে এসে পৌঁছেছিল। আমার চেষ্টায় এবং উৎসাহে তার শুটিকের গল্প আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন সাময়িকীতে। কিন্তু সদানন্দের ভাবান্তর নেই কিছুই ; স্মিত হেসে শুধু বলত—ও আর কি, এবার সম্পাদক মশায়দের ঠেকাচ্ছে। আমাকে কিন্তু অল্পপ্রেরণা দিত সেই ঠেকানো বিদ্যায়। আমার যে-কোন লেখা দেখেই সে করে উঠত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, বলত, তোর ভাল হাত আছে যে লেখায়, লিখে যা, দেখবি সম্পাদক ঠেকানো কত সহজ।

পুজোর ছুটি প্রায় শেষ হতে চলেছে, নবম্বরের গোড়ার দিক। বালিগঞ্জে গিয়েছি এক বান্ধবীর বাড়ী তার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে। বান্ধব-বান্ধবী মিলে সমাবেশ হয়েছিল মোটের উপর একেবারে কম নয়। অল্পকণের মধ্যে একটা জিনিস নজরে পড়ল, পানকয়েক একই জাতের মাসিক কাগজ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায় কাড়াকাড়ি লেগে গিয়েছে। ঘূষপাক পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ পর আমার হাতেও এল একগানা। কাগজখানা খুলে বুঝতে পারলাম এই কাড়াকাড়ির হেতু। একটা গল্প লিখেছেন বান্ধবী সুনেন্দ্রা বার। নামের নীচে লেখা 'প্রথম পুরস্কার' এই কথাটি। বুঝতে বাকি রইল না ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন সুনেন্দ্রা বার। তাই একটু নিবিষ্ট মনে পড়ে বাচ্ছিলাম গল্পটি। পৃষ্ঠা তিন পড়ার পর চকিতে আমার মনে পড়ে গেল আর একটি গল্পের কথা। হাঁ, সদানন্দের টেবিলেই ত কাগজ হাতড়াতে গিয়ে পেয়েছিলাম সেদিন একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি। তাতে নাম-ধাম কিছু লেখা নেই, কিন্তু হৃদয়ঙ্গব তারই এবং লেখাও তার নিজের। একটু বেন রহস্যময় ঠেকল ব্যাপারখানা। ক্রান্তভাবে এবার পড়ে গেলাম বাকি পৃষ্ঠা-গুলো। রহস্য বেন আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। গল্প শেষ করলাম, ঠিক সেই গল্পটি। তা ছাড়া, এ ব্যাপারে কোন দক্ষতার পরিচয় সুনেন্দ্রার মধ্যে কোন দিনই পাই নি এর আগে। তাই বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। বুঝে উঠতে পারলাম না, কি করে এ সম্ভব হ'ল !

জন্মদিনের আনন্দ-আসর। কথায়, হাসিতে, গানে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে প্রশান্ত ভ্রমির রুমখানা। তার দাপটে অল্পকণের মধ্যেই তলিয়ে গেল সে রহস্য। কিন্তু ভুলতে পারি নি ব্যাপারটা। কিরে আসার সময় কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম সুনেন্দ্রাকে, সদানন্দের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিনা।

চকিতে লক্ষ্য করলাম, সুনেন্দ্রার হাতোজল মুগ্ধ একটু স্নান হয়ে গেল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্তেই, তারপরই বখাস্তব সপ্রতিভভাবে সে বলল, ও, সদানন্দবাবু। তাই

বলুন, চেনা আছে বৈকি কিছুটা, আমাদের খণ্টকে পড়ান কিনা।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সদানন্দকে বললাম না কিছুই।

ছুটির দিন ; কিন্তু সদানন্দের সেই ঐতিহ্যবাহী রুটিন। বাতিক্রম শুধু, দুপুরবেলাটা এখন অবকাশ। সে এটা ওটা বই পড়ে, আর আমি কাটাই সারা দুপুর নিম্নাঙ্গবীর সঙ্গে পরাম সগো। সেদিন দুপুরে আর তাকে দেখলাম না টেবিলে। খেয়ে দেয়ে আবার বেরিয়ে গেছে কোথায়, সকালবেলা থেকে একবারও তার দেখা পাই নি। বিকেলে একটু এদিক-ওদিক বেড়িয়ে সন্ধ্যায় কিরলাম হোটেলে। করে চুকতে যাব, সদানন্দের তত্ত্বপোশের উপর চোখ পড়তেই আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেলাম। বিছানাপত্র বাধা-ছান্দা অবস্থায় পড়ে আছে, তার পাশে তার টিনের 'স্টটকেস'টা। টেবিলখানাও পালি, বইয়ের বিশাল স্তূপ সরানো হয়ে গেছে ইতি-মধ্যে, পড়ে আছে শুধু পানকয়েক ছেঁড়া কাগজ, আর লেখা পোষ্ট-কার্ড। কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না : মনে হ'ল, কোন খারাপ খবর এসেছে হয়ত।

আমি ঘণ্টার মধ্যে এল সদানন্দ। তার মুখের পানে তাকিয়ে ত আমার চক্ষু স্থির ! একি হয়েছে তার চেহারা। উষ্ণ খুন্স চুল, মুখে ফুটে উঠেছে একটা দক্ষতার স্পষ্ট ছাপ।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে বল ত ? কোন খারাপ খবর নাকি ? এগিয়ে এসে তত্ত্বপোশের উপর সে বসল ; তারপর স্নান হেসে বলল, খবর খারাপই, তবে আর কারো কিছু হয় নি। হয়েছে আমার নিজেরই।

আমি একটু উদ্ভ্রিতভাবে বললাম, বল না কি হয়েছে ?

সদানন্দ তেমনিভাবে বলে, এখন নয় ভাই, বলব, তোকে সবই, তবে বাবার সময়, রাত ন'টা দশে আমার ট্রেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আসছিঁস কবে ?

উদাসীন গলায় এবার সে বলে, ঠিক নেই, হয়ত নাও আসতে পারি।

আমার বিষয় তখন পূর্ণমাত্রায়—সে কি, তুই বলছিঁস কি ?

সদানন্দ এবার একটু করুণ চোখে তাকাল আমার মুখের পানে—এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করিম না ভাই আমাকে, পরে সবই তুই বুঝতে পারবি।

কথা আর এগোয় নি।...

শিয়ালদা প্রাটিক্স। মালপত্র সব রাণা হয়ে গিয়েছে কামরায়। মিনিট কুড়ি বাকি ট্রেনের। প্রাটিক্সের একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন অয়গায় গিয়ে দাঁড়লাম খামরা হুঁজন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সদানন্দ এবার বলে, তুই জিজ্ঞেস করেছিলি কেন কলকাতা ছাড়ছি ; বলছি তোকে সবই।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে ট্রেনের পানে উদ্বেগবিহীন দৃষ্টি রেখে সদানন্দ বলে, একটা মজা ভুল মাসকয়েক ধরে করে আসছিলাম তাপস। আজ অতর্কিতে ভেঙে গেল সে ভুল ; আর

সেই ভাঙাটা এত তীব্র, এত নির্ধ্বংস যে আমি সহ্য করতে পারছি না কিছুতেই ; তাই ছুটে পালাচ্ছি ।

বৃষতে পারলাম না কিছুই, তবুও নির্নিমেধ চোখে তাকিয়ে রইলাম সদানন্দের মুখের পানে ।

আবার সে বলে, স্নেনেত্রাঃ রায়কে তুই নিশ্চয়ই জানিস। শুনেছি তোরা একসঙ্গে বি-এসসি পড়েছিলি ।

আমি মাথা নাড়লাম ।

—হোষ্টেলে আসার মাসখানেক পরই আমি ওদের বাড়ী টিউশনি নিই, পড়াতাম ওর ছোট ভাই মিতুকে । আধুনিক ভাব-ধারার পরিবার, তাই অবধি মেলামেশার ছিল সুযোগ । এর আগে আমি কোন তরুণীর সঙ্গেই সহজভাবে মেলামেশার সুযোগ পাই নি ; পেলেও হয়ত তা গ্রহণ করতে পারতাম না । কিন্তু এক্ষেত্রে স্নেনেত্রার তৎক্ষণেই এল বন্ধুত্বের নীরব আহ্বান । এখানেও বন্ধুত্বের মাধ্যম আমি নিজেকে নই, আমার লেখা । বন্ধুত্ব গড়ে উঠল ! কিন্তু তরুণ-তরুণীর বন্ধুত্বের স্বাভাবিক নিয়মে আমার অজ্ঞাতেই ত্রয় দিনের মধ্যে কুটে উঠল তাকে গোলাপা অভা । একটা অননুভূত সাড়া জেগে উঠল মনে ; এতেও অগ্রণী স্নেনেত্রা নিজেকে । কোন এক ইংরেজ লেখক বলেছেন, 'ভালবাসা মানুষকে পাগল করে তোলে ।' সত্যি আমাদেরও করে তুলেছিল উদ্ভাস । তা না হলে একবারও কি সচেতন হয়ে ভাবতাম না আমার মুগ্ধতার কথা । স্নেনেত্রার চোখে লেগেছিল রঙের ঘোর । সে চোখকে মুগ্ধ করেছিল আমার কল্পনার জগৎ, আমার লেখক-সত্তা । কিন্তু সে ঘোর স্বপ্ন কাটল, নির্ধ্বংসভাবে দেশা দিল তার সামনে বাস্তব, স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল আমার বাস্তব জীবন । তাই তার মন হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী । আমার সান্নিধ্য তাকে করে তুলেছে অতিষ্ঠ ।

সদানন্দ খামল একটু । আমার সপ্রশ্ন চোখের পানে তাকিয়ে আবার সে বলে, এ আমার ধারণা নয় তাপস । আজ নিজের কানেই শুনে পেলাম স্নেনেত্রার মুখে । পড়াতে গিয়েছিলাম আজ একটু দেরিতে । এত বেলা অবধি আমার থাকার কথা নয় । পাশের ঘরে স্নেনেত্রা কথা বলছিল এক বান্ধবীর সঙ্গে ; জানত না আমি তার পাশের ঘরেই বসে কাগজ পড়ছিলাম । হঠাৎ আমার নাম শুনে একটু সচকিতভাবে উৎকর্ষ হয়ে রইলাম । স্নেনেত্রা বলছে—আর বলিস না ভাই, আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলছে । সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে, নিজের সম্বন্ধে একটুও সচেতন নয় লোকটি । তাই বৃষতে পারে না গল্পের জগৎকে গায়ের জোরে করা যায় না সত্যিকারের ।

তার বেশী আমি শুনে চাই নি । অতর্কিতে যেন আমার পারের নীচের মাটি নড়ে উঠল সেই সঙ্গে । আর বসে থাকতে পারলাম না । বস্ত্রচালিতের মত বেরিয়ে এলাম নীরব পদক্ষেপে, হয়ত শেষবারের জন্য ।

সদানন্দ খামল এবার । আমার গলা দিয়ে আর কথা বেরুল না । শুনেছিলাম নীরবে, এবার মুহূর্তকয়েক তাকিয়ে রইলাম

প্লাটফর্মের ব্যস্ত লোকদের দ্রুত গতিবিধির পানে । শুধু বারেকের জন্তে মনে পড়ল সেদিনকার জন্মদিনের আসবরের কথা ।

ট্রেনের সময় হয়ে এল । সদানন্দ কামরার উঠে জানালায় পাশে গিয়ে বসল । আমি জানালায় কাছাকাছি প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম নীরবে ।

ট্রেনের ঘণ্টা বেজে উঠল, নড়ে উঠল ট্রেন । এতক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে মুগ্ধের পানে তাকাতে পারি নি সদানন্দের । এবার তাকাতে গিয়ে মনটা অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল । সদানন্দের চোখের কোণ প্লাটফর্মের অন্ধুচ্ছল আলোকেও চক্ চক্ করে উঠেছে । যা কোনদিন কল্পনাও করি নি তাই, সদানন্দের চোখে অশ্রু ।

হোষ্টেলে ফিরলাম এক বিরাট শূন্যতা নিয়ে ।...

ঝির-ঝির-ঝির...শৌ-শৌ গুল্লিত হয়ে উঠল সরলের সর-পাতা । সে ধ্বনির ছন্দে তাল মিলিয়ে ডেকে উঠল একটি বাত-জাগা পাখী । সচকিত হয়ে উঠলাম । মিলিয়ে গেল উচ্ছল কলকাতা জ্যোৎস্নার প্লাবনে, শ্রামলিমার বিজুরণে । অতর্কিতে ফিরে এলাম সোনালিডার স্বচ্ছ জলধারার পাশে ।

সদানন্দ তাকিয়ে আছে তেমনি দৃষ্টি প্রসারিত করে । তার শিল্পী-হৃদয়ে আজ জেগেছে স্মৃতির তরঙ্গ, তাই ভাষা হয়ে গেছে মুক ।

আমিই ভাঙলাম সে নিস্তব্ধতা—তুই কি বৃষতে পেরেছিলি স্নেনেত্রাও ভালবাসত তোকে ?

সদানন্দ মুখ না ঘুরিয়ে তেমনিভাবে থেকে বলল, বৃষতে আমি চেষ্টা করি নি, আর বৃষতে আমি চাইনিও । কিন্তু আমি তাকে দিয়েছিলাম হৃদয় উজাড় করে । তাতেই হয়ে রইয়েছিল বিমোহিত ।

আবার নীরবতা । মুহূর্তকয়েক পর সদানন্দ উঠে দাঁড়ায়—চল বাই এবার রাত হয়ে গেছে বেশ ।

ফিরে এলাম হৃৎজনে । মীরা দেবী হয়ত জানালায় দাঁড়িয়ে-ছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়ে একেবারে সদর দরজায় এসে হাজির—বাক বাবা, বেড়ানো হ'ল তা হলে । এবার আর কোন কথা নয়, সোজা রান্নাঘরে চলুন ; বলেই এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরে ।

গেতে বসেছি পাশাপাশি দুপানা পিঁড়িতে । মীরা দেবী খালায় চারপাশে বাটিতে বাটিতে তরকারী সাজিয়ে বেগেছেন । আরোজনের বহর আর পারিপাট্য দেখে ত আমার চক্ স্থির । বায়ুন-ঠাকুর গজারামের গল্লোদকহুলভ বোল তরকারি ধেরে আমি অভ্যস্ত । মীরা দেবী কাছেই একপানা পিঁড়ি নিয়ে বসলেন । খাণ্ডবস্ত্রগুলির উপযুক্ত সজ্জাবহার হয় কি না তার করলেন তদারক । আমাকে গোড়াতেই শাসিয়ে রাখলেন—এর একটুও যদি যেখে ওঠেন ত আমি দোর আগলে দাঁড়াব ।

দোর আগলাতে আর হয় নি । মোটামুটি নিঃশেষেই শেষ করলাম সবকিছু । অবশ্য জিভের তাগিদটাই ছিল প্রবান । কথা

আর তেমন হ'ল না। সদানন্দ প্রায় নীরবেই থাওয়া শেষ করল।

চলে আসছিলাম, মীরা দেবী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে ঠাকুর বাস্না করে না ডাক্তারবাবু?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হা।

কি একটু ভেবে অনেকটা যেন স্বগতোক্তি মত তিনি বললেন, এই পেয়ে কি শরীর টেকে?

আমি হেসে বললাম, টিকে ত আছে দিবি।

কথা বলতে বলতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা।

সদানন্দ বলল, আসছে রববার তুই নিশ্চয়ই আসছিস।

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মীরা দেবী বলে উঠলেন, তা ছাড়া এমনিতে সময় পেলে তো! আসবেনই, কেমন ডাক্তারবাবু?

আমি উত্তর কথার জবাবেই মাথা নাড়লাম। তারপর আবার বাইকে আয়োজন।

মাসপানেক কেটে গেল দেখতে দেখতে। শয্যা ছেড়ে জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে দূরের ঐ 'পাগলা টিলা'র কোল ঘেঁষে উঁকি মারছে প্রভাতী সূর্য, আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চূড়া। সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতিতে জেগে উঠে একপালা কমলীর দীপ্তিময় মুখছবি। এক স্তম্ভুর অতুপ্প্রেরণা নিয়ে শুরু করি দিনের কাজ। দিনও সমাপ্ত জানায়, পূর্বের সূর্য চলে পড়ে পশ্চিমের আকাশে। তারই হয় দ্রুত পুনরাবুত্তি। দিনগুলো হয়ে উঠে চন্দ্রময়। সপ্তাহশেষে রবিবার আসে; শত বীণার স্বরবে যেন মুগ্ধিত হয় সে দিনটি, সদানন্দ-মীরা দেবীর সান্নিধ্যে। বারেকের জন্তেও মনে হয় না, সমাজবিবাক্তিত এক জায়গায় বাস করছি শূন্য একাকিত্ব নিয়ে।

রবিবার দেরি করে যাবার উপায় নেই, অভিযোগ-অনুযোগ গুনতে হয়। তাই বধ্যাসময়ে হাজিরা দিই। হু'একদিন গিয়ে দেখেছি সদানন্দ বাড়ী নেই। মীরা দেবী স্মিত হেসে বলেছেন—কোন ভয় নেই, ও আসছে এখনুনি। তত্তক্ষণ না হয় আমার সঙ্গে একটু গল্প করুন।

জামি চেয়ার নিতেই তিনি বাস্নাঘরে পা বাড়ান। হাতে নিয়ে আসেন ধুমারিত চায়ের কাপ। কাপটা আমাকে এগিয়ে দিয়ে মোড়া টেনে বসেন অদূরেই, এটা ওটা নিয়ে কথা বলেন। কণিক নীরব থেকে কখনও বা জিজ্ঞেস করেন—আপনার একা লাগে না ডাক্তারবাবু?

উত্তরে আমি বলি, না, এখন আর তেমন লাগে না।

সত্যি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাঁর মুখমণ্ডল।

দিন-তিন চার ধরে ইনফুরেক্সার মত হয়েছে। তাই গত রবিবার আর যেতে পারি নি সোনাছড়ায়। বাইরের বারান্দায়

হেলানো চেয়ারখানা নিয়ে বসেছিলাম, আর ভাবছিলাম আমার চলমান দিনগুলির কথা।

হঠাৎ দেখি রঘুয়া এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। আমার সামনে এসে একগাল হেসে বলল, ডাক্তারসাব, মাজি এসেছেন।

আমি বেন চমকে উঠলাম। ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না, মনে হ'ল ভুল শুনছি। তাই জিজ্ঞেস করলাম—কি বললি, মাজি এসেছেন...

কথা শেষ হবার আগেই তাকিয়ে দেখি মীরা দেবী উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে। আমি সহস্রভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়লাম। মীরা দেবী এগিয়ে আসতে আসতে একটু কৃত্রিম শাসনের স্বরে বললেন, সে কি, উঠছেন কেন, বসুন দিকি নি আগের মত।

বসতেই হ'ল। বলতে গেলাম—আপনি এই দুপুর-বোদে... বাধা দিয়ে তিনি বললেন, সে ভাবনা আপনাকে করতে হবে না আপাততঃ।

—এই হু' মাইল পথ?

এবার হেসে ফেললেন মীরা দেবী আমার সহস্রভাবে দেখে, কোন ভয় নেই, আমি টুলী করে এসেছি।

রঘুয়া একটা পুটলী হাতে বারান্দায়ই দাঁড়িয়েছিল। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এবার বললেন, আর দিকি রঘুয়া, ভিতরে দেখি গন্ধারাম ওখানে কি করছেন; বলেই আমাকে বসতে বলে এগিয়ে গেলেন। হু'এক পা এগিয়েই আবার কি একটু ভেবে ক্ষিরে এলেন। তারপর আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে কপালে হাত দিয়ে দেখলেন তাপ আছে কি না। স্পর্শের সে শীতলতায় আমার চোখ ছুটি যেন বুজে আসছিল। কোন কথা আর তখন আমার মূণ দিয়ে বেরুতে চাইল না!

—না তাপ আর নেই এখন—বলেই তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

বিশ্রয়ের ধাক্কা তখনও আমি সামলে উঠি নি পুরোপুরি। মিনিট কুড়ি পর মীরা দেবী এবার এলেন, ডান হাতে একপালা বড় ডিসে করে কয়েক টুকরো নাসপাতি, আপেল, খোসাছাড়ানো একটা গোটা কমলালেবু, আধপালা বেদানা আর বাঁ হাতে গ্রাসে করে এক গ্রাস দুধ নিয়ে। রঘুয়া ছোট টুলখানা এনে আমার সামনে রেখে এক গ্রাস জল নিয়ে এল। মীরা দেবী টুলের উপর সেগুলো রেখে শাস্ত কণ্ঠে বললেন, খেয়ে নিন দিকি নি এটুকু।

আমি চোখ ভুলে তাকাতো পারলাম না। নীরবে ডিসে হাত দিতে হ'ল। মিনিট হু'তিন দাঁড়িয়ে থেকে মীরা দেবী আবার ভিতরে চলে গেলেন। বৃকতে বাকী রইল না, আমার বরণনা এবার ভঙ্গ হতে চলেছে।

ঘড়ীখানেক পর যাবার জন্তে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মীরা দেবী। এ সময়টুকুর মধ্যে কথা বলায় একটুও সুযোগ পাই নি আমি; আর পেলেও তেমন সহজভাবে বলতে

পারতাম না হয়ত। প্রায় সারাক্ষণই তিনি ছিলেন ভিতরে এটা ওটা কান্ডে, ঘর গোছানোয়। কেন জানি আমি নিজেও চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে পারলাম না। আমার মুণের পানে তাকিয়ে তিনি এবার বললেন, সেয়ে উঠেছেন এবার, কোন ভয় নেই। আসছে বববার কিন্তু যাওয়া চাই-ই।

সেই কপালে হাত দিয়ে তাপ দেখার পর থেকে আমি আর চোপ তুলে তাকাতো পারছিলাম না মীর দেবীর পানে। কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই স্নিগ্ধ পবন। এবার অনেক কষ্টে মুখ তুলে তাকালাম। চোপে চোপ পড়তেই সবে এল আমার দৃষ্টি : মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ, বাব।

দিনকয়েক পর হবে, সেদিন শনিবার। হৃপস গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে : একটা দরকানী কাজে হাসপাতালে যাব, সবে চেয়ার ছেড়ে উঠছি, হঠাৎ দেখি রঘুবা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, মুখে সেই হাসি। আমাকে দেপেই বলল, চিঠি আছে ডাক্তারসাব।

তার কথা শুনেই আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম—মাজি পাঠিয়েছেন না রে ?

উত্তরে বলল, না, ডাক্তারসাব, পণ্ডিতবাবু দিলেন।

পণ্ডিতবাবু ? একটু বিষয় ঠেকল আমার, বৃত্তনন্দ মনে হ'ল ব্যাপারটায়। এতদিন রঘুবা যতবারই দৌঁড়া করতে এসেছে, সবকিছুতেই পাঠিয়েছেন মাজি। আজ এই প্রথম বাতিক্রম। হাত বাড়িয়ে নিলাম চিঠিপানা।

রঘুবা বলল, আমি যাট ডাক্তারসাব, একটা তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি অঙ্গমনস্ত ভাবে মাথা নাড়লাম—আচ্ছা যা।

পামের মুখ এঁটে দেওয়া চিঠিপানা। ওজন দেখে মনে হ'ল ভিতরে কাগজ আছে একাধিক। স্পষ্টভাবে আমার নাম ঠিকানা লেখা। ত্রস্ত হাতে খুললাম চিঠিপানা। দীর্ঘ এক চিঠি। চেয়ার-পানা এগিয়ে নিয়ে বসলাম আবার। সদানন্দ লিখেছে—চিঠিপানা আব শেষ করতে পারছিলাম না, হঠাৎ মনে হ'ল আমার চারিদিক যেন এক অন্তঃ আধারে ছেয়ে ফেলছে, অক্ষরগুলো ক্রমে হয়ে আসছে অস্পষ্ট। অনেক কষ্টে তবুও শেষ করলাম সে দীর্ঘ চিঠি। তারপর নিশ্চল নিস্তব্ধের মত বসে রইলাম চেয়ারে। ধূবে ঐ পাগলা টিলার চূড়া বাজা হয়ে উঠেছে অন্তরবির বিদায়ী আভাষ। কিন্তু মনে হ'ল সে রঙও হয়ে উঠেছে বিষণ্ণতায় করুণ।

সদানন্দ লিখেছে :

ভাই ভাপস,

মনে গভীর এক দুঃখ নিয়ে তোকে আশ্রয় এ চিঠি লিখছি। তুই ত জানিস মীরার পরই তুই আমার একান্ত আপনার জন, বাকি বিনা দ্বিধায় সবকিছু খুলে বলতে পারি। তাই আজ তোকে লিখছি এই দীর্ঘ কাহিনী। কেন লিখছি তুই নিজেই বুঝতে পারবি সহজে।

সেদিন তুই বলেছিলি আমি 'পরম ভাগ্যবান,' মীরার মত মেয়েকে পেয়েছি আমার জীবনে। আমি নীরব ছিলাম, প্রত্যুত্তরে বলি নি তোকে কিছুই। আজ প্রয়োজন পড়েছে বলেই বলছি বাধ্য হয়ে।

মীরার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সে স্বাভাবিক পথে নয়। এর পেছনে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এত দিন ভেবেছিলাম তা অমূল্যটিতই থাকবে। কিন্তু আজ তার তাগিদ এসেছে উদ্ঘাটিত হবার।

কলকাতা ছাড়ার পর দীর্ঘ কয়েক মাস কোথায় ছিলাম, কি করেছি তা বলা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, তাই বলছি না। মাস ছয়েক পর আমি 'আপার আসামে' তেজপুরে গিয়ে পৌঁছি আমার বাবার এক উকিল-বন্ধুর বাড়ি। আগেই লিগেছিলাম তাকে, সে অমুখ্যায়ী গৃহ-শিক্ষক হিসেবে থাকতে পাই হাঁদের বাড়ী। তাঁরই মেয়ে মীরা। আমাকে তিনি জানতেন অনেক দিন থেকেই। তাই নিঃসঙ্কোচে মীরার লেখাপড়ার ভার ছেড়ে দেন আমার হাতে। কলকাতা ছেড়ে আসার কারণটা তখনও আমার মনে সম্পূর্ণ ভাগবৎক। তাই সচেতন ছিলাম পুরোপুরি, আগুনে হাত দিয়ে যাতে হাত না পোড়াতো হয় আবার। নির্ভর সঙ্গে শিক্ষকের পূর্ণ স্বাভাবিক বজায় রেখে পড়াতে লাগলাম মীরাকে। মীরা বুদ্ধিমতী, তাই অল্পদিনেই আশাতীত উন্নতিও হ'ল তার লেখাপড়ায়। তার বাবা অনাধবাবুও খুশী হলেন আমার উপর। ভাবলাম, ভাগা এবার আমার উপর স্তপ্রসন্ন। তারপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমার তপস্বী-স্তলভ নির্ভর প্রয়োজনও নেই তেমন। কারণ মীরার মন সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে আর একজন। সে অশোক, মীরার বাবারই এক বন্ধুপুত্র। অশোক বি-এ ক্লাসের ছাত্র ; সুক্লি, স্তম্ভবান ছেলে, তার বাবারও টাকা-পয়সা মোটের উপর কম নয়। তাই ভাবী জামাতা হিসেবে তাকে আগেই নির্বাচন করে রেখেছিলেন মীরার মা-বাবাই। সানন্দে আরও ভাবছিলাম, সৌভাগ্যটা তা হলে একেবারে অশ্বস্থায়ীও নয়। অশোকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও একেবারে সম্প্রীতিভীন ছিল না। তার একটা কারণ হয়ত আমার সংরম—নিষ্ঠা, আর অল্পটা আমার মুণের ক্রীড়নতা।

কাটছিল মন্দ নয়। এরই মধ্যে অশোক বি-এ পাস করল। মীরা পাস করল ম্যাট্রিক, কুতিষের সঙ্গেই। বাড়ীতে আনন্দ-উৎসব চলল দিনকয়েক ধরে, লোকজনের আসা-যাওয়া ; মিষ্টিমুখ, তারপর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা-বর্ষণ।

মীরা কলেজে ভর্তি হ'ল। অশোক গেল এম-এ পড়তে কলকাতায়। এক দিকে মীরার কলেজে পড়ার আনন্দ, অন্য দিকে অশোকের অদর্শন ; ক'দিন কাটল তার একটু আনন্দ-বিবাদের পরিবেশে। তখনও আমি গৃহশিক্ষক।

দিনকয়েক পরই কিরে এল স্বাভাবিক আবহাওয়া, সেই সঙ্গে আমার শিক্ষকতাও চলল ক্রটিবিহীন ভাবে।

তারপর গরমের ছুটি এল। অশোক আর এল না সে ছুটিতে। ক'দিন লক্ষ্য করলাম আবার মীরার ভাবান্তর : এলোমেলো ভাব, রাত জেগে দীর্ঘ চিঠি লেখা... ইত্যাদি। তারপর আবার সবই ঠিক। মাসকয়েক কেটে গেল, এল পূজার ছুটি। অশোক এল এবার। তাকে দেখে সন্তোষ আমার চিনতে কষ্ট হচ্ছিল, এবার সে পুরো সাতবে। মীরার সে কি আনন্দ! সারা ছুটিই কাটল তাদের চৈ চৈ করে। প্রায় মোজাই খাচ্ছে তাদের এখানে-ওখানে-সেখানে বেড়াতে যাবার 'প্রোগ্রাম।' কোন কোন দিন ফিরতে রাতও হ'ত একটু। বাড়ীর কেউই তা গায়ে মাখতেন না। এত দিন পর হু'জনেদ দেখা হয়েছে, একটু বাড়াবাড়ি হবেই ত। ছুটিও এল ফুরিয়ে। তাৎ দিন পনের পর অশোক গেল কলকাতায়।

এ ক'দিন মীরার পড়াশুনা প্রায় কিছুই হয় নি। তাই পরদিন সন্ধ্যায় একটু তড়াতাড়ি গেলাম পড়াতে। ঘরে গিয়ে ঢুকে ত আমি একেবারে হতভম্ব। মীরা টেবিলে মাথা রেখে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না ব্যাপারগানা কি। পরমুহূর্তেই মনে চল অশোক চলে গেছে বলে হয়ত।

কাছে এগিয়ে গেলাম। টেবিলে ওর মাথার কাছে হুণানো গোলা চিঠি পড়ে আছে। আমার উপস্থিতিতে তার কান্না বেন আরও বেড়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি টেবিলের এক কোণ সিন্ধু হয়ে উঠেছে অশ্রুর হ্রদ্বার ধারায়।

আমি শাস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে বল ত মীরা?

মীরা নিরুত্তর। এবার আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। তারপর তার মাথায় আমার হাতগানা বেপে হেমনিভাবে বললাম, লক্ষ্মীটি, বল তোমার কি হয়েছে?

মীরা এবারও নিরুত্তর। বুঝতে বাকি রইল না, আমি বা ভেবেছিলাম, কারণ তা নয়! অগ্নি কিছু হবে, তার চেয়ে গুরুতর। তাই এবার বললাম, বাই হয়ে থাক, এমনিভাবে কাঁদলে কি কোন ফল হবে? তোমার এত বুদ্ধি অথচ...

আমার কথা শেষ হবার আগেই মীরা মাথা তুলে তাকালে। বিস্মিত না হয়ে পারলাম না তার সে চেহারা দেখে। চোখ দুটো জ্বাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে; মাথার চুল ছড়িয়ে পড়েছে বাধা-বন্ধহীনভাবে, চোপের কোণে পড়েছে কালি। আমার পানে সে ভাল করে তাকাতে পারল না। শুধু চিঠি হুণানো হাত দিয়ে দেখিয়ে অকুণ্টে বলল, পড়ে দেখুন।

কম্পিত হস্তে তুলে নিলাম একপানা। অশোকের চিঠি, অনাথ-বাবুকে লেখা। ছোট্ট চিঠি, কয়েক লাইন পড়েই আমার হাত হুণানো বেন কঁপে উঠল, মাথা ঘুরে যেতে লাগল, তবুও পড়লাম। যতদূর মনে পড়ে এই ক'টি কথা ছিল চিঠিতে :

শ্রদ্ধাঙ্গদেবু

বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে আজ লিখছি। আপনি জানেন আপনাকে আমি কত বেশী শ্রদ্ধা করি; তাই আপনাকে সবকিছু গোলাধূলিভাবে বলা উচিত মনে করলাম। আপনি একটা দৃষ্টান্ত

ভণ্ড লোককে বাড়ীতে পুবে রেখেছেন। আমি এ ক'দিনে বুঝতে পারলাম তার কৃত কণ্ঠের কল ভোগ করতে চলেছে নিরীহ মীরা। জানতে পারলে আরও আগেই আপনাকে সাবধান করতাম।

এখন আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। আপনিই বিবেচনা করলে বুঝতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে সরে দাঁড়ানো ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। গভীর দুঃখ হচ্ছে মীরার জন্তে। কিন্তু আমি নিরুপায়। আশা করি, আপনার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হব না। ইতি

অশোক

যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম অশোকের দ্বিতীয় চিঠিগানা, মীরাকে লেখা :

প্রিয় মীরা,

তুমি ত জান কত গভীরভাবে তোমাকে আমি ভালবাসি। আজ একটা কথা তোমাকে লিখতে গিয়ে কত যে দুঃখ হচ্ছে আর কি বলব। আমাদের ভালবাসা অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরদিন। কিন্তু আমাদের মিলন হয়ত সম্ভব হবে না। কলকাতা গিয়ে আমি বুঝলাম, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াও একটা বৃহত্তর স্বার্থ আছে। সেই বৃহত্তর কাজে আমি আমার নিজের জীবন বলিয়ে দিতে চাই। কিন্তু অসম্ভব হবে আমাদের মিলন। একটা মহৎ আদর্শের জন্য এতটুকু আত্মত্যাগ কি আমরা করতে পারব না? আমার স্থির বিশ্বাস, সে মনের জোরে তোমার আছে। কামনা করি, তোমার জীবন স্রগী হয়ে উঠুক। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জেনে।

ইতি

তোমারই অশোকনা

চিঠিগানা নামিয়ে রাখলাম। মীরা সেই একবার মাথা তুলে আবার টেবিলে মাথা এলিয়ে দিয়ে কাঁদছে তেমনধারা। ভাবলেশ-হীনভাবে তাকালাম তার পানে। মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, হঠাৎ মীরা তীরের বেগে চেয়ার থেকে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। সেই সঙ্গে অকুণ্টে শুধু হ'তিনটি কথা বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে—মাষ্টারমশায়, বাঁচান আমাকে।

আমি একটু আগে অনেকটা ধারণা করেছিলাম তেমনকিছু। তবুও বেন চমকে উঠলাম। মীরা তখন উপুড় হয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কান্নায় উচ্ছাসে তার তনুদেহ তুলে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে আহত কপোতের মত। আকাশের চাঁদ লুটিয়ে পড়েছে ধরায় ধুলায়। সে যে কি করণ দৃশ্য না দেখলে তা ভাষায় বোঝানো যায় না তাপস। আমি নিজেকে আর বেন সামলাতে পারছিলাম না। কিন্তু স্থির থাকতে হবে আমাকে। অনেক কষ্টে সে আবেগ রোধ করলাম। তারপর ধীর পদে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। মীরা সেই একই অবস্থায়, বেন কান্নায় তরঙ্গায়িত রূপ তার সর্ক দেখে। তার কাছে গেলাম এবার; তারপর তার মাথার কাছে মেঝের উপর উবু হয়ে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম মুহূর্তকয়েক নীরবে। ঘরের আবহাওয়া বেন

নিম্ন কঠিন হয়ে উঠেছে; কোন কথা বেরতে চাইছিল না গলা দিয়ে। তবুও বলতে হ'ল অনেক কষ্টে—জিঃ, এমন ভেঙে পড়লে চলবে কেন মীরা, কোথায় স্থির হয়ে বসে এর উপায় একটা কিছু ভাববে, তা না করে এমনি ভাবে কেঁদে চললে কোন সমাধান ত হবে না। লক্ষ্মীটি, উঠে বস।

দেখলাম আমার কথা অগ্রহণ করল না মীরা, চোখে আঁচল চেপে উঠে বসল। আমি বললাম—না, এখানে নয়, ওখানে চেয়ারের ওপর।—বস্ত্রচালিতের মত মীরা তাই করল।

—এবার চোখ হুটো মুছে নাও দিকিনি।

চোখ মুছে একটু স্থির হয়ে বসতেই আমিও অদূরে একখানা চেয়ার টেনে নিলাম। তার পর বললাম—এবার ঠাণ্ডা মাথায় বল ত কি করা যেতে পারে?

মীরা মাথা ঈষৎ নত রেখে তেমনি ভাবে মুখে আঁচল দিয়ে কালাকন্ড গলার বলল—আমি যে আর বাবাকে মুখ দেখাতে পারব না মাষ্টার মশায়। আর একদুগুণ আমি থাকতে পারছি না এ বাড়ীতে।

জানতাম ভাল করে, অনাথবাবু কিছুতেই ক্ষমা করবেন না মীরাকে। তাই একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম—কিন্তু বাবে কোথায়? তেমনি রুদ্ধ কণ্ঠে মীরা বলল—বেগানেই হোক...

তার পর আবার সেই নিরুদ্ধ কান্না।

যেতেই হ'ল অনির্দিষ্ট ভাবে। রাত্রের অন্ধকারে গৃহশিক্ষক সদানন্দ বায় প্রভৃ-কন্যা মীরাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে, মাথা পেতে নিল চরিত্রহীনতার দুঃপন্থে কলঙ্ক-কালিমা।

মীরা চিঠি রেখে এসেছিল। তা ছাড়া জানতাম, অনাথবাবু নির্ধম আঘাত পেয়েও কোন খোজ করবেন না মীরার। তাই হ'ল। গেলাম কলকাতার, বেতস্ত্রী করে বিয়ে হ'ল আমাদের। কিন্তু এবার সমস্তা দাঁড়াল; কাজ জুটে না কিছুতেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সারা কলকাতার ঘুরেও। মাসদুয়েক পর, হঠাৎ দেখতে পেলাম সোভাগ্যের মুখ, তখনও মীরার সমস্ত অলঙ্কার আঁকরার দোকানে গিয়ে পৌঁছয় নি। এলাম এই সোনাছড়ায়। তার পর...

এই সেই মীরা। দীর্ঘ কয়েক বছর কেটেছে আমাদের দাম্পত্য জীবন। সত্য কথা বলতে কি তাপস, একটি দিনের স্তম্ভেও ভাল-বাসতে পারে নি আমাকে মীরা। শিক্ষক হিসেবে আমাকে শ্রদ্ধা করত সে খুব। সেই শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার বোঝাই শুধু পেলাম দিনের পর দিন, বছর ধরে। তার পর আজ যখন দেখছি তার ভাবান্তর তখন কি করে মন স্থির থাকে বল, আমিও ত বস্ত্রমাংসের মাহুয! স্নেহের প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে সে তা করছে না। তবুও আমি বঞ্চিত, তার ভালবাসা দানা বেঁধে উঠবে না আমার উপর। আবার সেই বড় উঠেছে তাপস, সারা মনকে আলোড়িত করে। কি করে যে এর গতিরোধ করব আমি ভেবে উঠতে পারছি না।

মীরা আমাকে ভালবাসে না, জানি। কিন্তু সেই আজ আমার একমাত্র অবলম্বন। তা না হলে আমি বাঁচব কি নিয়ে। তুই মনে হুগুণ পারি, কিন্তু উপায় যে কিছুই নেই তাপস। আমাকে তুই ক্ষমা করিস। আমার শুভেচ্ছা তোমার উপর থাকবে চিরদিন। ভালবাসা জানিস। ইতি তোমার সদানন্দ

নিজর্জীর মত এলিয়ে পড়েছিলাম চেয়ারে। হঠাৎ কে বেন আমাকে চাবুকের তীব্র আঘাতে জর্জরিত করে তুলল—কে বেন কানে কানে বলল—না, কিছুতেই হতে পারে না এ অজ্ঞায়, সদানন্দকে বঞ্চিত করা তোমার মতাপাপ হবে তাপস।

বিদ্যাসুন্দর মত চকিতে উঠে দাঁড়লাম। টলতে টলতে গিয়ে বসলাম টেবিলে। তার পর অনেক কষ্টে নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করে একখানা 'নোট' লিপলাম ম্যানেজারকে: বিশেষ তার পেয়ে আমি দেশে যাচ্ছি।

অন্ধকার, কৃষ্ণপঙ্কজের রাত। বাইকের আলো জ্বলে বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়। রাত এগারটার ট্রেন। মাইল ছয়ের দূরে আঞ্চ লাইনের স্টেশন। গঙ্গারাম টুলীতে করে আমার ট্রাক বিছানা নিয়ে চলে গেছে ঘণ্টাখানেক আগে।

সোনাছড়া ব্রীজের পাশে এসে নামলাম এবার। বাইকের উজ্জ্বল আলো পড়েছে সোনাছড়ার জল-ধারার উপর। সেই কল কল, ছল ছল ছন্দে নিজের আনন্দ নিয়ে বয়ে চলেছে সোনাছড়া। পা যেন চলতে চাইল না কয়েক মুহূর্ত।

তার পর মিনিটকয়েক পরই এলাম রাস্তার সেই মোড়টার, যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় পণ্ডিতবাবুর গোটা বাড়ীখানা। কিন্তু রাতের গভীর অন্ধকার ঢেকে দিয়েছে সমস্ত সোনাছড়াকে। শুধু চোখে পড়ল গোলা জানালাগুলো, ভেতরের অজ্বল আলো জান হয়ে বেরিয়ে এসেছে গবাক্ষ-পথে।

একটা অবাক্ত বেদনার বৃকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। বাইক থেকে নেমে মুহূর্তকয়েক নির্নিমেধ চোখে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

তার পর, বাইকে আরোহণ করলাম ঠিক যেন বস্ত্র-চালিতের মত। কলকাতা ছাড়ার সময় সদানন্দের চোখে জল দেখেছিলাম। চোখ কেটে জল বেরলে আমি হয়ত বেঁচে যেতাম। কিন্তু চোখ হুটি তখন হয়ে উঠেছে শুষ্ক কঠিন মরুভূমি। এগিয়ে চললাম অন্ধকার পথ অভিক্রম করে। পিছনে পড়ে রইল সদানন্দ, মীরা, আর তার কালকালো চোখের দৃষ্টি।

পা হুখানা চলেছে অদম্য গতিতে। আর অন্ধ দিকে গোটা স্থাপিণ্ডটা কে বেন সমূলে উপড়ে কেলে নির্ধম ভাবে পিবে কেলেছে জাঁতাকলের কঠিন পাষাণে।

## আমাদের পার্শ্বদ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্মার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের সংসারে যত প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়াছে, ভোজন-বিলাসিতা তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। আমার এক এক সময় মনে হয় যে শুধু ভোজন-বিলাসিতা কেন, পরিচ্ছদ-বিলাসিতাও—বিশেষতঃ মহিলাসমাজে—বড় সামান্য পাপ নহে। আমি আমার এই সুদীর্ঘ জীবনকালে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ-বিলাসিতার কথা চিন্তা করিয়া থাকি। আমাদের বাল্যকালে, সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলারা যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্তমান কালের পরিচ্ছদে ভূষিত সেকালের সেই বাঙ্গালীকে অবাকালী বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য, আমি কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের অগ্রান্ত শহরের অধিবাসী বাঙ্গালীর কথাই বলিতেছি। সুদূর মফস্বলে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, দেখিলে মনে হয় তাঁহারা সেকালের সেই বাঙ্গালীই আছেন। পরিচ্ছদে তাঁহাদের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেরা দশ-এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত বাটীতে নয় অবস্থায় থাকিত। তখন বালক-বালিকাদের জন্ম প্যাণ্ট অথবা হাফ প্যাণ্ট এবং ইজার প্রচলিত ছিল না। হাফ প্যাণ্টের প্রচলন হয় এখন ইহতে পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর পূর্বে। লর্ড কিচেনার যখন ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন তখন তিনি সৈনিক-দিগের জন্ম এই হাফ প্যাণ্টের প্রচলন করেন। তিনি বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে সুদীর্ঘ আঙুলফলম্বিত প্যাণ্টের পরিবর্তে হাফ প্যাণ্ট ব্যবহার করিলে সৈনিক বিভাগে হাজার হাজার টাকার অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে। তৎপূর্বে সকল ঋতুতেই কি ভারতীয় আর কি খেতাজ উভয়বিধ সৈনিকেরাই ফুল প্যাণ্ট ব্যবহার করিত। সামগ্রিক বিভাগ হইতে এই হাফ প্যাণ্টের ব্যবহার ক্রমশঃ শহরবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরদের মধ্যেও প্রবেশিত হয়। সেকালে বাঙ্গালী ঘনবানেরা বিলাসিতা-প্রকাশের জন্ম অতি সূক্ষ্ম—স্বচ্ছ বলিলেই হয়—বস্ত্র পরিধান করিতেন। প্রধানতঃ ঢাকা, শান্তিপুর ও চন্দননগর এবং তৎসন্নিহিত স্থানে তত্ত্বাবধায়েরা ঐ সকল বস্ত্র বয়ন করিত। আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি, চন্দননগরে প্রায় দুই হাজার তাঁত ছিল। এখন সেস্থলে দুই শত তাঁত আছে কিনা সন্দেহ। আমার বিশ্বাস ঢাকা এবং শান্তিপুরেও

ঐরূপ তাঁতের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। আজকাল কলিকাতায় বড় বড় বস্ত্রালয়ে ফরাসডাক্সার ধুতি বা শাড়ী নামে যে সকল ধুতি বা শাড়ী বিক্রয় হয় তাহার শতকরা আশী বা পঁচাত্তি-খানা চন্দননগরের তাঁতিদের দ্বারা বয়ন করানো হয় না। চন্দননগরের সন্নিহিত ধরসরাই, বেগমপুর ও ধনেখালি প্রভৃতি স্থানের তাঁতিরা তাহা বয়ন করে। চন্দননগরের ব্যাপারীরা ঐ সকল তাঁতিকে অগ্রিম দান দিয়া বস্ত্র বয়ন করান। কোরা বস্ত্র চন্দননগরে আনিয়া স্থানীয় রজকদিগের দ্বারা ধোত করাইয়া কলিকাতার বস্ত্রবিক্রেতার বিক্রয় করিয়া থাকেন।

নগরের বিলাসী “বাবু”রা সেকালে যেরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাতে তাঁহাদের স্ফীলতা সম্যক রক্ষিত হইত বলিয়া মনে হয় না। তাই বোধ হয় সেকালের সুরুচিসম্পন্ন ‘বাবু’রা হাফ প্যাণ্ট বা জাকিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভবপূর্বক হাফ প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রমহিলারাও ‘সেমিজ’ এবং ‘সায়’ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। আমার মনে পড়ে ১৮৯১ বা ৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় আসিয়া প্রথম সেমিজ-পরিহিতা বাঙ্গালী মেয়েদিগকে দেখিতে পাই। তাহা দেখিয়া আমিও আমার জ্যৈষ্ঠ এক ছোড়া সেমিজ কিনিয়া বাড়ীতে লইয়া যাই। তখন আমার জ্যৈষ্ঠ কিশোরী মাত্র। যৌবনে পদার্পণ করেন নাই। আমার জননী সেই সেমিজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “এ ত বেশ জামা। এতে মেয়েদের আঁক রঞ্জে হয়।” তদবধি আমাদের বাটীতে সেমিজের ব্যবহার চলিতে লাগিল।

সেই সময় আমার জননী আমার পত্নীকে লইয়া কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যান। আমি সঙ্গে ছিলাম। সেখানে আমার ঠাকুরমা সম্পর্কীয়া এক প্রৌঢ়া সেমিজ-পরিহিতা আমার জ্যৈষ্ঠ দেখিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “যোগীন, বোকে বাগরা কিনে দিইছিল, এইবারে এক ছোড়া জুতো কিনে দে, তা হলে পুরো মেম-সাহেব হবে।” হায় রে, সেকালের প্রৌঢ়া ও স্বাক্ষর দল! আজ যদি তাঁহারা জীবিত থাকিতেন তবে তাঁহারা স্থল-কলেজের ছাত্রীদিগকে দেখিয়া কি ভাবিতেন?

বাঙ্গালী পুরুষের হাফ প্যাণ্ট এবং স্ত্রীলোকদিগের সেমিজ, সায় যে তাঁহাদের রুচির উন্নতির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। শিশু ও বালক-বালিকাদিগের হাফ প্যাণ্ট



অথবা ফ্রক ব্যবহারও সূত্রটির পরিচায়ক। আমার জননীও মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের বাল্যকালে অল্পবয়স্কা বালিকাদের জন্য এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র গামছার স্ফায় বস্ত্র পাওয়া যাইত। তাহাকে “ঠেটী” বলিত। তাহা দ্বারা কোমর একফের জড়ানো হইত এবং তাহা হাঁটুর নীচে নামিত না। এই ঠেটী বালিকারা ব্যবহার করিত, বালকেরা নহে। দশ-এগার বৎসর বয়সের বালকেরা কেবল স্কুলে যাইবার সময় পাঁচ হাত দীর্ঘ এবং সেই অল্পপাতে প্রস্থ ধুতি ব্যবহার করিত। এখনকার বালকদিগের মধ্যে সেইরূপ ক্ষুদ্র ধুতির ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। এখন শতকরা নিরানব্বই জন ছাত্র হাফ প্যান্ট পরিয়া বিদ্যালয়ে গমন করে। আজকাল কলিকাতায় ও মুম্বইতে কলেজের ছাত্ররাও অনেকে হাফ প্যান্ট ও পুরা প্যান্ট পরিয়া কলেজে যায়।

আমরা বাল্যকালে যে স্কুলে পড়িতাম, সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষক (হেড মাস্টার) ব্যতীত অত্র কোন শিক্ষক প্যান্ট ও চোগা চাপকান ব্যবহার করিতেন না। হেড মাস্টার মহাশয় প্যান্ট এবং চাপকান পড়িয়া স্কুলে আসিতেন। সেকালে চাপকান ব্যবহারকারীরা প্রায় সকলেই ধুতি পরিধান করিয়া তাহার উপর চাপকান পরিতেন এবং চাপকানের সঙ্গে উড়ানিও ব্যবহার করিতেন। সেই উড়ানি লম্বালম্বি পাক দিয়া দড়ির মত হইলে তাহাই বগলের নীচে দিয়া বুকের উপর ঢাবার মত করিয়া দুই কাঁধে কেলিতেন। আমরা অনেককে ধুতি ও চাপকানের সঙ্গে চোগা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। আজকাল যেসকল প্যাটুলানের বহুল প্রচলন হইয়াছে, সেকালে সেসকল ছিল না। যাত্রার দলে জুড়িরাই প্যাটুলানের সঙ্গে চোগা চাপকান ব্যবহার করিত এবং মাথায় টুপি পরিত। বালক ও কিশোর গায়কেরা প্যান্ট পরিয়া আসরে নামিত। তাহাদের পোশাক গুরুতর লক্ষ্য করিত।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আমি আমাদের শহরের স্কুল ছাড়িয়া যখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হই তখন দেখিলাম যে, কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকেরা কেহ-বা প্যাটুলানের সহিত আবার কেহ-বা ধুতির সহিত চাপকান পরিয়া স্কুলে আসিতেন। ইহারা সকলেই চাপকানের উপর ঢাবার আকারে চাদর ব্যবহার করিতেন, কেবল প্রধান শিক্ষক মহাশয় চোগার উপর চাপকান গায়ে দিয়া আসিতেন। আজকাল বোধ হয়, শহর অঞ্চলে কোন শিক্ষকই ধুতি পরিয়া স্কুলে যান না, হয়ত অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষকই ধুতি ব্যবহার করেন। আমার মনে হয় দেশ স্বাধীন হইবার পর ধুতি-পরিহিত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভা-সমিতি ও দরবারে বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ ধুতি, জামা

ও চাদর পরিধান করিয়া গমন করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরাও দেখিতে পাই, খাঁটি বাঙালী পরিচ্ছদই ব্যবহার করেন। সেকালে বাঙালী চিকিৎসকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কোট-প্যান্ট ব্যবহার করিতেন। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের মধ্যে একমাত্র সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ধুতি পরিয়া সর্বত্র গমন করিতেন। তিনি ধুতির সহিত চটি জুতাও ব্যবহার করিতেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন প্রথম জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে যাই তখন দেখিলাম যে, ঠাকুর-পরিবারে বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধনির্মিশেষে সকলেই বাড়ীতে প্যান্ট বা পায়জামা পরিধান করিয়া থাকেন। আজকাল কলিকাতায় বোধ হয়, এইরূপ প্যান্ট বা পায়জামা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আমি এক এক সময়ে ভাবি, ইংরেজ আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও ইংরেজী পরিচ্ছদ এদেশে বাঙালী-পরিবারে পুরুষদের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। বাংলার মহিলাসমাজে গাউনের প্রচলন হয় নাই বটে, তবে ১৮৭৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্রীদের মধ্যে অনেককে আজ্ঞাভুলস্বিত ফ্রক পরিধান করিয়া স্কুলে-কলেজে যাইতে দেখিতে পাই।

আমাদের সমাজে এই পরিচ্ছদ পরিবর্তনের দুইটি কারণ প্রধান বলিয়া মনে করি। প্রথম কারণ—আমাদের কাছাকাছাচাচা ধুতি পরিধান কিপ্রকার অন্তর্কুল নহে। ইহাও দোড়াইতে হইলে বা দ্রুত পথে যাইতে হইলে আমরা শিথিল কাছাকাছাচা সামলাইবার জন্য মল্লকচ্ছ হই বা মালকোঁচা মারিয়া কাপড় আঁটিয়া পড়ি। প্যান্ট, হাফ-প্যান্ট বা ইজের-পায়জামা পরা থাকিলে আমাদের আর মালকোঁচা মারিবার হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। প্যান্ট ব্যবহারের দ্বিতীয় কারণ ব্যয়সঞ্চোচ। আমরা বাঙালী ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতে ভালবাসি। কিন্তু সূক্ষ্মবস্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অপেক্ষাকৃত স্কুল বস্ত্রে প্যান্ট তৈয়ারি হয়। একবার প্যান্ট তৈয়ারি হইলে তাহা অনেকদিন ধরিয়া ব্যবহার করা চলে। সুতরাং উহার জন্য অল্প অর্থ ব্যয় হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আমাদের পরিচ্ছদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন :

“আমাদের Dress টা হবে English কিংবা Greek

তাহা আজও করতে পারিনে ঠিক।”

আমার তাই সময় সময় মনে হয় আমাদের সমাজে সকল বিষয়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে পরিচ্ছদ-বিপ্লবও অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু এজন্য আমাদের জাতীয়তাকে কোন-রূপেই ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। আমাদের পরিচ্ছদ এইরূপ

হওয়া উচিত বাহাতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা কেবল আমাদের পরিচ্ছদ দেখিয়াই বিব্রিত পাবে যে আমরা বাঙ্গালী, পঞ্জাবীবা পাগড়ি পরিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। পারসীকদিগেরও মস্তকাবরণ বা টুপি তাহাদের জাতীয়তার পরিচায়ক, কিন্তু আমাদের এমন কোন পোশাক নাই যাহা অন্য সমাজে পরিয়া গেলে লোকে আমাদেরকে বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারে। আমাদের সমাজে কোনরূপ মস্তকাবরণ প্রচলিত নাই। বহুকাল পূর্বে কোনরূপ ছিল কিনা তাহা বলা কঠিন। এখন হইতে দেড় শত বৎসর হইতে বৎসর পূর্বে ভদ্র বাঙ্গালী হিন্দুরা ধুতি এবং উড়ানি বা চাদর মাত্র ব্যবহার করিতেন। কোনরূপ জামা ব্যবহার করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। ইহার অন্ততম প্রধান দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শীতকাল বাতীত অল্প কোন ঋতুতে জামা গায়ে দিতেন না। আমি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “আপনি কি কখনও ধুতি চাদর ছাড়া অল্প পোশাক পরেন না?” হাসিয়া তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “ওরে সেকথা বলিস কেন? একবার যে বিপদে পড়েছিলাম সে বলবার কথা নয়। একবার ছোটলাটের দরবারে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমাকে সকলে পরামর্শ দিলেন দরবারে যেতে গেলে দরবারী পোশাক পরে যাওয়া উচিত, অর্থাৎ—ইজের চাপকান ও চোগা কিংবা মাহেবি পোশাক কোট-প্যান্ট পরে যেতে হয়। আমি ত মুশকিলে পড়লাম। সেই চোগা-চাপকান আর ইজের পরে দরবারে গেলাম, কিন্তু যতক্ষণ সেখানে ছিলাম ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। দরবারের শেষে আমি ছোটলাটকে বললাম, ‘আমাকে আর কখনও দরবারে ডাকবেন না। দরবারী পোশাক আমার সহ্য হয় না।’ শুনে ছোটলাট বাহাদুর বললেন, ‘তুমি তোমার ইচ্ছামত পোশাক পরেই এসো, তবে শরীরটা যেন আবৃত থাকে।’ বাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তিনি ধুতি ও চাদরে বার মাস কিরূপ শরীর আবৃত করিয়া রাখিতেন। তিনি বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে চাদরে গা

ঢাকিয়া যাইতেন, কিন্তু বাতীত সর্বদা (শীতকাল বাতাত কেবল ধুতি মাত্র পরিয়া থাকিতেন। চাদর গায়ে দিতেন না।

ইজের, চোগা, চাপকান আমর মুসলমানেরা নকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তারপর ইংরেজরা নকট হইতে কোট-প্যান্ট, নেকটাই, কলার প্রভৃতি ব্যবহার শিখিয়াছি আর ভুলিয়া গিয়াছি যে, এই বিদেশীয় পরিচ্ছদ আমাদের পরামর্শকরণের উৎকটমোহ বাতীত আর কিছুই নহে।

আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে অনেক ভদ্র বাঙ্গালী হিন্দু বাতীতে ‘লুঙ্গি’ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং উদ্যোগ অনেক লুঙ্গি পরিয়া পণে-ঘাটে, হাটে-বাজারে বাহির হইয়া থাকেন। এই লুঙ্গি ব্রহ্মদেশীয় পরিচ্ছদ। উত্তর বঙ্গীয়দের জাতীয় পরিচ্ছদ। ব্রহ্মদেশ ইংরেজের অধীন হইবার পূর্বে রাজা-মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া পথের মুটে-মজুর পর্যন্ত দী-পুরুষনিকিশেষে সকলেই উহা একমাত্র পরিধেয় ছিল। লর্ড ডাকবিন ব্রহ্মদেশকে ইংরেজের রাজ্যভুক্ত করিলে তদানীন্তন রাজকুমার মেহন জুইন ও বহু উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সুপরিবারে দরাসী চন্দননগরে আসিয়া কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমরা তখন দেখিয়াছি রাজকুমার স্বয়ং এবং তাঁহার অন্তঃকরেরা বহুমূল্য রেশমী লুঙ্গি পরিধান-পূর্বক পণে বাহির হইতেন। এখনও কলিকাতায় যে সকল বঙ্গী বাস করেন তাঁহারা পরিধানে লুঙ্গি এবং মাথায় রুমাল বাঁধিয়া থাকেন। এই লুঙ্গি ব্রহ্মদেশ হইতে আলাকানের ভিতর দিয়া পূর্ববঙ্গে মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ইউরোপীয়, চীনা, আফগান প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ এবং ভারতের মধ্যে পঞ্জাবী, পারসীক, নেপালী, ভূটানী প্রভৃতি জাতিকে তাহাদের পোশাক দেখিলেই আমরা চিনিতে পারি, কিন্তু বাঙ্গালীর এমন কোন জাতীয় পরিচ্ছদ এখন নাই যাহা দেখিলে সকলে তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারে। ইহা কি আমাদের লজ্জাব কথা, না গৌরবের কথা?



# শিক্ষা-সঙ্কট

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

সেদিন গোবরডাঙ্গায় গিয়াছিলাম। নেতাজীর জন্মদিন-উৎসব। এই সুযোগে নানা লোকে নানা রকম প্রচারকার্য চালান। ঐশ্ব্যনকার সভায়ও কেহ কেহ এই সুযোগ লইতে ছাড়েন নাই। এক বক্তা তাঁহার সাম্প্রতিক চীন-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছিলেন। সেখানকার সবই ভাল। অল্প সময়ে এত কাজ করিয়া ফেলিয়াছে সেখানকার রাষ্ট্র যে, তিনি এবং তাঁহার মত আরও অনেকে, মায় তাঁহার সঙ্গীরা অবাক্ বনিয়া গিয়াছেন! তবে উক্ত বক্তা নূতন চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বাহা বলিলেন তাহা বাস্তবিকই মনে লাগিল। চীনে যে শাসনতন্ত্র চালু হইয়াছে তাহা ভাল কি মন্দ, কি মন্দের ভাল কিছুই বলিতেছি না, তাহা বলিবার অধিকারও হয়ত আমার নাই। কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ স্বল্পকালের ভিতর ছেলেমেয়েদের মধ্যেও নূতন যুগের নূতন বাণী ছদ্মগত করাইতে সক্ষম হইয়াছেন শুনিয়া খানিকটা ভূয়োদর্শন হইল। আমরা এখানে কি করিতেছি? আজ সাত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল—জাতির ভবিষ্যৎ কিশোর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা তথা জাতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এবং জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষাদানের কি ব্যবস্থা করা হইতেছে? প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে আজ এই প্রশ্ন। পিতা-মাতা, অভিভাবক-অভিভাবিকা আর কি করিবেন, তাঁহারা গডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি মারকত ছেলেমেয়েদের কি ভাস্ত পথেই না চালনা করিতে বাধ্য হইতেছেন।

আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ আলোচনা-গবেষণায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। এই চুঁচুড়াতেই নূতন শিক্ষার প্রবর্তন, কলিকাতায় নয়। পাক্তী রবার্ট যে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপ্রচার ছাড়িয়া নূতন ধরনের পাঠশালা স্থাপনে মন দিলেন—চুঁচুড়ায় ও তার আশেপাশে। এ সব পাঠশালা ছিল বাংলা শিক্ষার পাঠশালা। পরে কিছু কিছু ইংরেজী শিখাইবারও ব্যবস্থা হয় এখানে। স্মৃষ্ট ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে কিন্তু কলিকাতাই অগ্রণী, এমন কি সমগ্র ভারত-বর্ষের মধ্যেই ইহার প্রথম স্থান। আজকাল এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাংবাদিকও আছেন, —বলিয়া থাকেন বাঙালী কোন বিষয়েই অগ্রণীত্বের দাবি করিতে পারে না—কি শিক্ষায়, কি সভাসমিতি প্রতিষ্ঠায়, কি রাজনৈতিক প্রচেষ্টায়। তাঁহারা একরূপ দাবির মধ্যে নাকি

প্রাদেশিকতার গন্ধও পান! আমরা প্রাদেশিক-ভাবাপন্ন, প্রাদেশিকতা-দোষে ছুট—কয়েক বৎসর যাবৎ এই কথা শুনিতে শুনিতে নিজেদের যেন এইরূপ ভাবিতেই ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইতেছি। অনবরত মিথ্যা প্রচারের এগনই মাহাত্ম্য!

২

যাহা হউক, শিক্ষা-ব্যাপারে আমরা কখনই পশ্চাৎপদ ছিলাম না। শত শত বৎসর ধরিয়া বিদেশীর আক্রমণ, স্বার্থ ও স্বার্থান্বেষের অত্যাচার—নানা বিপদ-আপদের মধ্যেও ভারতবাসী শিক্ষার ধুনি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের প্রতি ভারতবাসীর স্বাভাবিক প্রীতির কথা শত্রু-মিত্র অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা কখনও নূতনকে ভয় করি নাই। নূতনের আশ্বাস সাগ্রহে শুনিয়াছি, দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী যাচাই করিয়া যতটুকু লইবার লইয়াছি, যতটুকু বর্জন করিবার, চাড়িয়াছি। ভারতবর্ষের মাটিরই এই গুণ।

ইংরেজ আমলের প্রথম যুগেও এইরূপই ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। তখন শিক্ষার—বিশেষতঃ পাস্চাত্য শিক্ষার দায় রাষ্ট্র গ্রহণ না করিলেও আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ নিজ নিজ সম্ভানকে ইংরেজী শিক্ষাদানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যবস্থাও করিতেছিলেন। ইংরেজী শিখিলে রাজ-সরকারে চাকুরি পাইব—এ বোধ আমাদের মধ্যে জন্মে মোটামুটি ১৮৩৫ সনের পর হইতে। ১৮৪৪ সনে বড়লাট হাড়িঞ্জের ঘোষণায় এই বোধ সম্পূর্ণ পাকা হয়। ইহার পূর্বে নহে। হাড়িঞ্জের ঘোষণার ত্রিশ বৎসর আগেই যে এখানে বাঙালীদের মধ্যে নব্যশিক্ষার আয়োজন হয় তাহার তাগিদ ছিল দুইটি—এক : ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সহ-যোগিতা করা; দুই : পাস্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়লাভ। তখনকার সমাজ আমাদের নিকট যে রকম চিত্রিত, তাহাতে দেখোক্তটি সম্বন্ধে স্বতঃই মনে সম্বন্ধেই উদয় হইতে পারে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে—সে যুগের নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের বর্ণনা পাঠ করিলে একথা বুঝা আদৌ ক্লেশকর নয় যে, তখনও নব নব বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন-স্পৃহা আমাদের মন হইতে লোপ পায় নাই। হিন্দু কলেজ স্থাপনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনকার সভার (১৪ মে, ১৮১৬) কথা স্মরণ করা যাক্। সভার প্রাক্কালে এক জন বিখ্যাত

পণ্ডিত সভা-আম্বানকারী সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি জব্বার আল-হুসাইন হাইড জেটের হাতে একটি ফুল দিয়া বলিলেন—প্রাচ্য-বিদ্যার নিদর্শনস্বরূপ এটি গ্রহণ করুন। প্রাচ্য ও পশ্চাৎ-বিদ্যার সার্বিক অনুশীলন ও বিনিময়ের জন্যই এই ফুলটি উপহার দেওয়া হইয়াছিল। সামান্য ঘটনা। কিন্তু ইহার মধ্যেই ভারতবাসীর নতুন নতুন বিদ্যা বা জ্ঞান আহরণ-স্পৃহার পরিচয় মিলে।

সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য শুধু প্রসারিত নয়, ক্রমে একেবারে দৃঢ়মূল হইল। একরূপ বিরাট রাজ্য শাসনে বিশ্বের লোক দরকার। আবার ইংরেজী-জানা লোক বেশী প্রয়োজন। কারণ ইংরেজের ভাষা না বুঝিলে তাহাদের মতানুসৃত হইয়া কাজ চালাইবে কিরূপে? ১৮৩৫ সনে ধর্ম্য হইল শিক্ষার বাহন ইংরেজী, ১৮৪৪ সনে প্রচারিত হইল ইংরেজী-জানা লোকই সরকারে বেশী গৃহীত হইবে। সরকার বা রাষ্ট্র নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদে শিক্ষা-নয়ন্ত্রণে অভিনিবিষ্ট হইলেন। এখানে বাংলাদেশের কথাই বিশেষ করিয়া জানা যাইবে। কারণ সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল এই কলিকাতা নগরী। এখানে হইতেই সকল বিধি-বিধান প্রচারিত হইতেছিল। শিক্ষা-বিষয়েও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রধান জেলা-শহরগুলিতে কোন কোন স্থলে কলেজ,—যেমন হুগলী, ঢাকা, কুষ্মনগর, পাটনা প্রভৃতি, আবার বহু স্থলে ইংরেজী স্কুল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যিক। ১৮৪২ সনের পূর্বে পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের, মায় দিল্লীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইত এই কলিকাতা নগরী হইতে। ইহার পর ১৮৫৭ সনে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও—(আধুনিক পরিভাষায়) সরকারী শিক্ষা-অধিকর্তা নিয়োগ দ্বারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতম শিক্ষা সাক্ষাৎ ভাবে নিয়ন্ত্রণে সরকার মনোযোগী হইলেন। কখনও প্রাথমিক শিক্ষা, কখনও মাধ্যমিক শিক্ষা, আবার কখনও উচ্চতম শিক্ষার উপর খোঁক দেওয়া হইল। কখনও বা একটির প্রসারকল্পে অন্যটি সম্বলিত করিতে সরকার প্রয়াস পান। কমিটি কমিশন কতই না বসানো হয়। শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে মধ্যে পরিবর্তনও সাধিত হয় পাঠ্য বিষয় বদলাইয়া—প্রসারিত বা সম্বলিত করিয়া। এইরূপে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বহুতর বাক ঘুরিয়া আমরা যা-হোক একটা মানে উপস্থিত হইলাম। ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা লক্ষ হইল ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট।

৩

আমরা এখন সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ, নতুন দায়িত্ব এবং

নব নব কর্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছি। পরাধীন অবস্থায় বিদেশী রাষ্ট্র দ্বারা যে-যে উদ্দেশ্যে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা মূলতঃ নিরাকৃত হইয়াছে। এখন আমাদের নতুন করিয়া যাত্রা শুরু করিতে হইবে। এই যাত্রাপথে সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতিই আমাদের জীবনে রস ও রসদ পরিবেশন করিবে। কিন্তু সেই সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতি—যাহা হইবে নতুন পরিবেশে নবজাতীয়তা তথা সত্যকার মনুষ্যত্ববোধ উন্মেষের সহায়ক তাহা কি বস্তু? এই বিষয়ে পথ-নির্দেশের পক্ষে আবার একটু পুরনো ইতিহাসের পাতা উটানো আবশ্যিক। ব্রিটিশ আমলে, আধুনিক যুগে ‘জাতিভেদ’ বা ইংরেজী ‘caste system’ কথাটির বড় চল। এই কথাটির দ্বারা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার সত্যকার রূপ আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে না, ইহা দ্বারা আমরা বুঝি—সমাজের শ্রেণী বা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য, বিভিন্নতা, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু ভারতীয়—যাহাকে আমরা হিন্দুও বলিতে পারি, সমাজ-ব্যবস্থা বড়ই মৌলিক। এই ব্যবস্থায় যখন খুণ ধরিয়াছে তখন বিবর্তনবাদী বা বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বেদাদির আবির্ভাব কালেও যে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সূত্র-শ্লোকাদিতে ধৃত বিষয়াদিসমূহ হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐতিহাসিক যুগে—বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্যন্ত অনেকে সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি বা সংস্কারসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু মূল সমাজ-ব্যবস্থা যুগে যুগে সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হইয়া বরাবরই অটুট ছিল, আর এইজন্যই বহু সহস্র বৎসরেও—যখন অস্ত্রান্ত্র দেশের বিভিন্ন সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া কতকগুলি নিদর্শন বা স্মৃতিতে মাত্র পর্যাবসিত হইয়াছে তখনও—টিকিয়া রহিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের মূল ধারক ও বাহক এই সমাজ-ব্যবস্থা। এমন একটি ব্যবস্থাকে ‘জাতিভেদ’ বলিয়া অসম্মান করিবেন না, অমর্যাদা দেখাইবেন না।

কিন্তু ইংরেজ আমলে আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থার মূলে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। ইংরেজ ইচ্ছা করিয়াই যে একাধারে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে পশ্চাত্যে যে শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয়, প্রথম যুগে তাহার দ্বারা প্রভূত লাভবান হইয়াছে ব্রিটিশ জাতি। বিজ্ঞানের সহায়ে তাহারা পররাজ্য জয় করিয়াছে, অধীন রাজ্য হইতে কাঁচা মাল আমদানী করিয়া স্বল্প-সাহায্যে পণ্য উৎপন্ন করিয়াছে, এই পণ্য পুনরায় অধীন রাজ্যসমূহে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ শাসন ও শোষণের কলেই যে তাহাদের এত সমৃদ্ধি

ও শ্রীরদ্ধি সে কথা সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে বহু বার বহু যোগ্য ব্যক্তি দর্শাইয়াছেন। ইংরেজ শিক্ষাব্যবস্থাকে তাহাদের এই শাসন ও শোষণকার্যের উপযোগী করিয়াই তৈরি করিয়া লয়। এদেশে যে শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন হয় তাহাতে শাখত সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

তবে একটি কথা এখানে অবশ্যই বলিতে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত-শিক্ষা এযাবৎ শুধু ব্রাহ্মণ এবং অংশবিশেষ শুধু বৈশ্য-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। নূতন ব্যবস্থায়, বিশেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মারফত সংস্কৃত অগ্রতম অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধাৰ্য্য হওয়ায় তাহার দ্বার আপামরসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়। সংস্কৃত-শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিল। নূতন ব্যবস্থায় এইটিই পরম লাভ। কিন্তু ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা জাতির অন্তর্দেশে বিষম আঘাত হানিয়াছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতম শিক্ষা একই ছাঁচে ঢালায় সমাজে একই রকম জীবের আবির্ভাব হইয়াছে—যাহাকে সোজা সাদা কথায় বলিতে পারি—ইংরেজের শাসন এবং শোষণযন্ত্রের সহায়ক ‘চাকর’ বা আধুনিক ভজভাষায় ‘কম্পী’। শিক্ষা আদৌ রক্তিমুখী হয় নাই। যে বিজ্ঞান ইংরেজকে অত্যন্ত শক্তিমান ও বিস্তারিত করিয়াছে তাহা আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে মাত্র এই সেদিন। শিক্ষা রক্ত-অঙ্গুর না হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই সরকারি বা মণ্ডলাগতী আপিসের দ্বারে ঘণ্টা দিতে হইয়াছে। শিক্ষা যখন অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন চাকুরি জুটাইতে বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল।

গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই বিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা—বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মস্তজীবী, তত্ত্ববায়, সূত্রধর, ধার্মিক, মিত্র, কুন্তকার, কৰ্ম্মকার, কাঁসারি, শাঁখারি, রকমারি কারুশিল্পী, বণিক, কৃষক, বাকুজীবী, গোয়াল, মোদ্দক নিজ নিজ রক্তি তাগ করে এবং মূলভ ও সহজ অর্থাগমের উপায়স্বরূপ চাকুরির অবশেষে ছুটিতে থাকে। ফলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সমাজ কেন্দ্রীভূত হইবার উপক্রম হয়। আমরা স্ব স্ব রক্তি তুলিয়াছি; কত শিল্প বিলুপ্ত, শিল্পীশ্রেণী মৃত, শিল্পকৌশলও সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিত। প্রাচীন সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি অনাদর এবং জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধহীন ইংরেজীয়ানার প্রসার আধুনিক শিক্ষার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কুফল। এই দুইটি কুফলের হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে জাতির কল্যাণ নাই, স্বাধীনতাও ভুয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

8

জগতের সকল জিনিষই ভালয় মন্দয় মিশ্রিত, নিছক ভাল, নিছক মন্দ কিছুই নাই। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় যে ভাল কিছুই হয় নাই, তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষের দূরদূরান্তের লোকের ভিতরে একটা শাখত যোগ বরাবরই বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে এই যোগকে একটি জাতীয় রূপ দিতে বিশেষ সহায়তা করে ইংরেজী শিক্ষা। - দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনও আমাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষে কম বসদ জোগায় নাই। এক আইন, একই সুবিধা, একই অসুবিধা, একই রকম অনাচার অত্যাচার শোষণ আমাদিগকে এক-জাতীয়তা মস্ত্রে উদ্ভুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু যাহাতে এই একত্ববোধ বা এক-জাতীয়তা দেশের জনমাটিতে শিকড় গাড়িয়া একটি বিপুল শক্তিরূপ মহামহীকুহে পরিণত হইতে পারে সেই উপায়সমূহ নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা ষটে নাই। এই সকল উপায়ের প্রধানতম—শিক্ষা। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন যুগের নূতন শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ সেখানকার কঙারা শিক্ষার মাধ্যমে মাগুন গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছিলেন। চীন পরিক্রমার পর কেহ কেহ যে সেখানকার নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় মুগ্ধ হইয়াছেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু আমাদের দেশে—স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে এই মাগুন-গড়ার কাজ কি সুরু হইয়াছে? ইংরেজীতে একটি কথা আছে—‘Putting new wine into old bottle’, অর্থাৎ, পুরাতন বোতলে নূতন সুরা ভর্তি করা। আর যে বিষয়েই ইহা সত্য হোক, শিক্ষা-ব্যাপারে যে এটি একেবারেই সত্য নয় তাহা নিশ্চিত। তাই স্বাধীনতা-লাভের সাত বৎসর পরেও আমরা আজ বিভ্রান্ত। অনেকের মুখে অনেক কথা শুনি। কেহ বলেন—তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মন্ত্রীকেও একাধিক বার বলিতে শুনিয়াছি, আমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়া স্বাধীনতা লাভ করি নাই। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—যুক্তরাষ্ট্রে যখন স্বাধীন হইয়াছিল তখন সেখানকার দশ লক্ষ লোক সকলেই কি অল্প ধরিয়াছিল? এরকমটি কোন দেশে কখন কি সম্ভব হইয়াছে? অল্পসংখ্যক লোক লড়ে, সমগ্র জাতি বা জাতির অধিকাংশ লোক তাহাদের পিছনে থাকিয়া সাহায্য করে। ইহাকে ইংরেজীতে বলা যায়—‘moral support’ বা নৈতিক সমর্থন। শতাধিক বর্ষে দুভিক্ষে মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে, বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে হাজারে হাজারে লোক শতবিধ অনাচার-অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, কাঁসি-কাটেও অনেকে আত্মহত্যা দিয়াছেন। শত সহস্র

ভারতবাসী ছিন্নমূল হইয়া সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। শেষে যুগশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধীকেও প্রাণ হারাইতে হয়। ইহার পরও কি বলিব—আমরা স্বাধীনতার মূল্য দিই নাই, সাধারণ লোককে ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা কি কর্তব্য?

৫

আসল কথা, নতুন পরিবেশে নতুন লোক চাই, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী চাই। বাঁহারা রাষ্ট্রের কর্তব্যানুষ্ঠানদের নতুনকে গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। শিক্ষাকে নতুন ধাঁচে গড়িতে হইবে। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিতেছি পুরানো বোতল। যে বোতল আমাদের মাথা ভাঙিয়াছে, কারাগারে পাঠাইয়াছে, কাঁসিকাঠে বুলাইয়াছে, আমাদের উপর অশেষ অভ্যাস-উৎপীড়ন চালাইয়াছে, বিদেশী শাসকের দক্ষিণহস্তরূপ শাসন ও শোষণে সহায়তা করিয়াছে, সেই বোতলেরই প্রতাপ এখনও দেখিতেছি রাষ্ট্রের রক্তে রক্তে। বোতলের চেতনার পরিবর্তন হয়ত কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে, কিন্তু আদতে সেই পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল সামগ্রিক উন্নতির পরিপন্থী মনোভাবই লক্ষ্য করিতেছি। মনের পরিবর্তন দরকার—মহাত্মা গান্ধী যাহাকে বলিতেন—‘change of heart’, হৃদয়ের পরিবর্তন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সবচেয়ে বেশী আবশ্যিক। কারণ এখানেই তো মানুষ গড়া হইবে। স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধিবাসী সৃষ্টি হইবে। আজ আপনাদের ভিতরে আসিয়াছি। ‘দশবন্ধু’ নাম-পুত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস। সাতাশ বৎসর বিজ্ঞানগতির বয়স। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে যেরকমটি ছিল, আপনাদের শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষাদান প্রণালীর এখনও কি তাহার কোন পরিবর্তন আপনাদের চোখে পড়িতেছে? এক-একটি বিদ্যালয় কি ভখনকার মত এখনও বেকার এবং ফেরালী সৃষ্টির এক-একটি কল রূপে বিরাজ করিতেছে না? আমরা তো এখনও যেন পরহস্ত-চালিত বস্তুর বহিরাছি। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টির আয়োজন কৈ? বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু কারু সৃষ্টি হইতেছে কৈ? প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার কঙ্কাল দেখিতেছি, ইহার সমপৃষ্ঠ হইয়া সংহত ও শক্তিমান হইবে কিরূপে?

ইহার একমাত্র উত্তর—সন্তান সন্ততিদের, ভবিষ্যৎবংশীয়দের নিমিত্ত সুশিক্ষার আয়োজন ও প্রসার। এখন সুশিক্ষা কাহাকে বলিব? গণতন্ত্রের একটি প্রধান কথা—সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা। যাহার যেমন ক্ষমতা বা শক্তি তদনুযায়ী যাহাতে স্বাভাবিকভাবে উন্নতি বা উৎকর্ষ লাভ

করিতে পারে তাহার সৃষ্ট আয়োজন। এ কথার তাৎপর্য, মন্ত্রজীবী, মন্ত্রধর বা তত্ত্বাবহ-পুত্রও স্বীয় শক্তিবিকাশের সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্রের কর্তব্যের হইতে পারিবেন, বিশ্ববিদ্যুত বৈজ্ঞানিক বা কবি অথবা সাহিত্যিক হইতে সক্ষম হইবেন। গনসম্পদেও এক-একটা কার্গেগী বা রথচাইল্ড-রককেলার হইবার সুযোগ পাইবেন। সবই ঠিক, সকলই মানিয়া লই। কিন্তু সমাজের স্থিতি চাই, অর্থাৎ সমাজের জনসাধারণেরও কল্যাণ চাই। আমার কল্যাণকে তখনই সার্থক জ্ঞান করিব যখন ইহা অপর দশ জনের কল্যাণের পরিপন্থী না হইয়া সহায়ক হইবে। কি উপায়ে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি? গণতন্ত্রের মূলনীতি সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া, সমাজের—জাতির—দেশের সর্বজনীন উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এখানে আবার একটু পুরানো কথাই যাই। তত্ত্বাবহ কাপড় বুনিতেন, কুস্তকার হাঁড়ি কলসী-মুঠি গড়িতেন, স্বর্ণকার, কণ্ঠকার-শিল্পীকুল কত রকমারি অলঙ্করণ করিতেন। এসব কি তাঁহারা করিতেন শুধু নিজদের জন্য? নিজ নিজ দৃষ্টি—জীবিকা ছিল এই সব, কিন্তু তাঁহারা এ সকলে লিপ্ত হইতেন সমগ্র সমাজের জন্য, তাহার কল্যাণের নিমিত্ত। এই যে একই সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত কল্যাণবোধ ইহাই তাঁহাদিগকে—তাঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। যুগে যুগে নানা বাস্তব-প্রতি-ঘাতের মধ্যেও সমাজ-সৌখ চিকিয়া গিয়াছিল। সমাজের এই প্রতিস্থাপকতার প্রতি বহু মনোমীরা দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—গত যুগেও, এযুগেও। সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে হইবে, আধুনিক উদ্ভাস্ত মানব-সমাজকে স্থিতিশীল হইতে হইবে। বেকার সংখ্যা আমরা আর বাড়াইব না, দায়িত্ব কর্তব্যজ্ঞানহীন ‘শিক্ষিতের’ দল আমরা আর যেন সৃষ্টি হইতে না দিই।

৬

আজ ইহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। এ বিষয়ে পূর্বে-স্মরণ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। গত শতাব্দীতেই জাতীয় শিক্ষার আয়োজন হয়। শিক্ষার বাহন ইংরেজী হইবার পর তাহার প্রতিবাদেই যেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) ভক্ত-বোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন (১৮৪০)। এখানে বাংলার মাধ্যমে বাংলা ও সংস্কৃত এবং পরে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে নবগোপাল মিত্র হিন্দু-মেলায় আহুকুল্যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিজ্ঞানশিক্ষা ও শারীরচর্চা এ বিদ্যালয়টির বিশেষত্ব হইল। অখিনীকুমার দত্ত বরিশালে ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন (স্কুল ও কলেজ) প্রতিষ্ঠা করিলেন শুধু কায়িক মানসিক নয়, নৈতিক



শিক্ষারও উদ্দেশ্যে। সত্য-প্রেম-পবিত্রতা বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত উচ্চতম শিক্ষার সংশোধনকল্পে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, নানা পত্র-পত্রিকা'র আলোচনাও হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হের ফের' এইরূপ একটি যুগান্তকারী আলোচনা। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্রে।

রবীন্দ্রনাথ বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যা-আশ্রম খুলেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সারস্বত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া। স্বদেশী আন্দোলন-কালে গ্রামশিক্ষা কলেজ ও গ্রামশিক্ষা স্কুল স্থাপিত হয়, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটও স্থাপিত হয়—একদিকে জাতীয় সাহিত্য-ইতিহাস ও জাতীয় ভাবধারা যুবমনে অল্পপ্রবীষ্ট করাইবার জন্য এবং অন্যদিকে যুবকগণের কারিগরি বিদ্যা শিক্ষালাভের পর স্বাধীন ভাবে, কিয়দংশে নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জীবিকা-জ্ঞানের নিমিত্ত। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এত সব আয়োজনেও মূল সমস্যার সমাধান হইল না। আবার রাষ্ট্র ছিল বিকল্প, ব্যক্তিগত বা সমবেত প্রচেষ্টায় আশামুরূপ সাক্ষাৎলাভ সম্ভব নয় যতক্ষণ না রাষ্ট্র ইহার সহায় হয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি একটি নূতন উপায় লইয়া আমাদের সম্মুখে উপনীত হইলেন।

৭

উপায়টি বুনিয়াদী শিক্ষা। আমাদের নিকট নূতন ঠেকিলেও মোটের উপর এটি নূতন নয়। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ইয়ংকি জন ডিউয়ি এই উপায়টি—অর্থাৎ বৃত্তিমুখী শিক্ষা কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন অর্ধ শতাব্দী পূর্বে। বাংলায় আসানসোলের নিকটে উষাগ্রামে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্রে আগেই স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীও চিন্তাধারায় এ সকলের প্রভাব কতখানি জানি না। তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষাও মূলতঃ এইরূপ। তবে ইহার টেকনিক বা কৌশলে কতকটা তফাৎও রহিয়াছে। বৃত্তিমুখী শিক্ষা, আধুনিক বাঙালী বা ভারতবাসীর নিকট এটি নূতন ঠেকিলেও, আমাদের সমাজ-জীবনে ইহা মোটেই নূতন নয়। মহাত্মাজী এক একটি শিল্পের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিলেন। কোন গ্রাম তত্ত্বাবধায়-প্রধান, কোন পল্লী স্বত্বধর-প্রধান, কোন পল্লী কৃষকার-প্রধান। এই এই বৃত্তির মাধ্যমেই তিনি

ছেলেদের অক্ষর-জ্ঞান হইতে সাধারণ-জ্ঞান পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন। তবে তিনি চরকায় সূতাকাটা এবং তাঁতবোনার উপরই বেশী বেশী দিয়াছিলেন। কারণ আমাদের কাপড়ের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে এই শিল্পে বহুতর ব্যক্তির নিয়োগ আবশ্যক। এক-একটি শিল্প বা বৃত্তির মাধ্যমে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষাবিদরা ভাল বলিতে পারিবেন। কিন্তু ঠিক প্রয়োজন-কালে মহাত্মাজী এই যে উদ্ভাবন—ইহাকে আবিষ্কারও বলা যায়—যন তমসার ভিতরে আলোকবস্তুর সঞ্চার। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ইহা দ্বারা দৃঢ় হইবে। সমষ্টির জন্য যে ব্যক্তি (তাহা অবশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়া নয়)—এই জ্ঞান পুনরায় মানুষের মনে বহুমূল হইবে। বেকার-সমস্যা এবং তদ্ব্যবস্থিত নানা নিরর্থক আন্দোলন-আলোড়নও আর মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে না।

১৯৩৭ সন হইতে এ বিষয়ে পরীক্ষা শুরু হয়। মধ্যে কিছুকাল বন্ধ থাকিলেও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে আবার ইহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ঘটে। বিভিন্ন রাজ্যে এদিকে কাজও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ইহার প্রচার বা প্রসারের সার্থক আয়োজন কোথায়? বাইগাছি (বর্তমানে, বাণীপুর) কেন্দ্রে যাহা কাজ হইতেছে তাহা ত পরীক্ষার স্তর পার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এখানে সরকার টাকাও ঢালিতেছেন প্রচুর। বলরামপুরে বেসরকারী প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষাদানের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু তাহার কার্য সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান অতি সামান্য। আজ জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়—সরকারী বা বেসরকারী প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষা কতটা প্রসারলাভ করিতেছে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। কেহ যেন মনে না করেন আমি পৈতৃক বৃত্তিকেই সর্বদা আঁকড়াইয়া ধরিতে বলিতেছি। বুনিয়াদীর বৃত্তি-অনুগ শিক্ষা পাইয়া তত্ত্বাবধায় কৃষিকারের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, স্বর্ণকার হস্তধর হইতে পারেন। তথাকথিত ভক্তশ্রমীর লোকেরাও এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, যেমন এখনই কেহ কেহ করিতেছেন। এত সাধারণ ব্যবস্থা। আবার বুনিয়াদী শিক্ষার এরূপ সুযোগও থাকা চাই যাহাতে যে-কোন শিল্পী-সন্তান স্বশক্তি বলে রাষ্ট্রে উচ্চতম পদাধিকারীও হইতে পারিবেন।

৮

বর্তমান সমস্তা সমাধানে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রকল্পে ও প্রধান উপায় বলিয়া মনে হয়। অল্প উপায়ও থাকিতে পারে। কেহ



কেহ হয়ত বলিবেন এই আণবিক বোমার যুগে বুদ্ধিমানী শিক্ষা কি আমাদের সমস্তাগুলির সমাধান করিতে পারিবে? শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া সমগ্র দেশকে শিল্প-কারখানায় পরিণত না করিতে পারিলে আমরা বনৈশ্বৰ্য্যে পরীয়াই হইব কিরূপে? আবার উচ্চতম বিজ্ঞান আয়ত্ত না করিতে পারিলে নবতম সমরোপকরণই বা আমরা প্রস্তুত করিব কেমন করিয়া? জগৎ পূৰ্ব্ব-পশ্চিম ব্লকে আবদ্ধ। যবের দোর-গোড়ায় পাক-মার্কিন চুক্তি, পাক-তুর্কি চুক্তি কতই-না গুণিতেছি? এ সকলের প্রতিবেদক তবে কি? এই প্রশ্নকে জামসেদপুরের লৌহখনির আবিষ্কর্তা প্রমথনাথ বসু প্রণীত *Illusions of New India* বা 'নব্য ভারতের আলোয়' শীর্ষক পুস্তকখানির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি বিশেষভাবে। তিনি আরও অনেকগুলি পুস্তকে বর্তমান ভারতের সমস্তাসমূহের বিশদ আলোচনা করিয়া সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়াছেন। উক্ত পুস্তকখানিতে প্রমথনাথ প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান বা কারিগরি শিক্ষা, জ্ঞানশিক্ষা, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে দেখাইয়াছেন, আমরা ইংরেজ-সংস্পর্শে আসিয়া নিজের কতকগুলি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। এ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হইয়া তিনি পাঠকগণকে ঐসকল সংস্কার মন হইতে দূর করিতে বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের শিল্পায়নের পক্ষে যে মূলধন আবশ্যক তাহা নাই। বিদেশ হইতে আজিকার দিনে অর্থ ধার করা মানে প্রকারান্তরে বিদেশীর অধীনতা-শৃঙ্খল গলায় জড়ানো। আমাদের নিজ শক্তি অপরিণীত। দীর্ঘ দুই শত বৎসরের শাসন ও শোষণের পরেও ভারতবর্ষে এমন সম্পদ রহিয়াছে বাহার আরহণও যথোচিত বিনিয়োগ করিলে আমরা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারি। প্রমথনাথ ভারতবাসীকে মিথ্যা আলোয়ার পিছনে না ছুটিয়া আশ্বস্ত হইতে সেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে যে ভাবধারা পরিপূর্তি লাভ করে তাহার পূর্বাভাস পাই প্রমথনাথের এই চিন্তাধারায়। বিদেশী মূলধন, বিদেশী পণ্য, বিদেশী যন্ত্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বদেশী কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করিতে পারিলে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে আমরা একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হইতে পারিব। প্রয়োজনমত বিজ্ঞানের সাহায্যও যে লইতে হইবে তাহা বলাই নিম্নপ্রয়োজন। আমরা শক্তিশালী বাহাতে না হইতে পারি তাহার জন্তই ত পশ্চিমের বন্ধুবর্গের এত তোড়-জোড়। আজ শিক্ষার মোড় এমন ভাবে ঘুরাইতে হইবে বাহাতে ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ একই সঙ্গে সাধিত হয়।\*

\* চুঁচুড়া দেশবন্ধু হাই স্কুলের অষ্টাবিশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে সভাপতির বক্তৃতার সারমর্ম।

## যে লিখন লয়ে ফাণ্ডন এসেছে হারে

### শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কুটেছে যে ফুল  
ভোরের আলোক মেখে  
সৌভতে অতুল,  
সেও বাবে অশ্রু রেখে  
তুপে তুপে চিরু একে।  
মৌন স্তবহার  
'বেধা পত্র-অস্ত্রবালে  
পাণীয়া ঘুমায়,  
জ্যোৎস্নার ইন্দ্রজালে  
ওঠে চাঁদ চক্রেবালে,  
নামিবে আঁধার :  
সেঁধাও বটিকা এসে  
দস্যুসম তার  
দেখাবে স্বরূপ শেষে  
মরণের কব্জবেশে ?

কেহ কি জানে না  
স্রিয়মাণ সীমাহীন  
এ বিশ্ব মানে না  
কোনো বাধা? প্রতিদিন  
কালপ্রোতে হয় লীন!  
হেথা পরবাসে  
জেগে ওঠে কত বাণী  
প্রাণ পরকাশে  
সংশয়-বিরোধ আনি :  
বাধার বিধুর প্রাণী।  
আর্জমন কাঁদে  
বিশ্ববন্ধ সম্বাসনে  
মায়াজ্ঞান রাতে  
জীবনের বিসর্জনে  
অরুণেয় প্রোমার্জনে।

মৃতের সভাতে  
অমৃতের মহোৎসব।  
বসন্তের সাথে  
কোকিলের কুহু রব  
শীত বেধা হ'ল শব।  
যে লিখন লয়ে  
ফাণ্ডন এসেছে হারে,  
সে কি স্মৃতি হয়ে  
রবে সজল আবারে  
অনন্তের পায়বারে ?  
হুংগে মৃত্যু সব  
আনন্দ-সম্পদসম  
সৃষ্টির বৈভব :  
শাশ্বত সম্বারে ময়  
কবে কি স্মরণতর ?



ত্রিবেণী-সঙ্গম

## প্রয়াগ ও কুম্ভমেলা

শ্রীমুন্দরানন্দ বিছাবিনোদ

প্রকৃষ্ট যজ্ঞস্থলী—প্রয়াগ

প্রয়াগ শব্দের অর্থ—প্র ( = প্রকৃষ্ট ) ; যাগ ( = যজ্ঞ ) ; যে স্থানে বিশেষরূপে যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানট 'প্রয়াগ'-নামে গ্যাত। বিভিন্ন পুৰাণ-শাস্ত্রে প্রয়াগকে 'প্রজাপতি-ব্রহ্মার ক্ষেত্র' ও 'যজ্ঞবেদী' বলা হইয়াছে। বামন-পুরাণে ( ২২ অধ্যায়ে ) উক্ত



নগীর মূর্তি

ইয়াছে, ব্রহ্মার যে-সকল যজ্ঞবেদী ভূতলে বিরাজমান, তন্মধ্যে যাগক্ষেত্রেই 'মধ্য-বেদী'। মহাভারতেও প্রতিষ্ঠানপূর্বের ( তুংসীর ) তত প্রয়াগতীর্থে প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদী বলা হইয়াছে।

মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত—'প্রজাপতেয্যৈঃ আসীঃ প্রয়াগে' অর্থাৎ, প্রয়াগে ব্রহ্মার যজ্ঞ হইয়াছিল ইত্যাদি-বাক্য পাওয়া যায়।

কর্মার্পণরূপ ভাগবতধর্ম

গীতার ঈশ্বর অর্জুনকে বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থং কর্মণোক্তজ্ঞ লোকোঃ কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্মভোক্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৩

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—'যজ্ঞঃ কুঃ 'যজ্ঞো নৈ বিকুঃ' ইতি শ্রুতেঃ ; তদাশ্রয়নার্থং কর্মণোক্তজ্ঞ দেবং বিনা, লোকোঃ কর্মবন্ধনঃ কর্মভির্বিধাতে, ন স্বীকৃত্যার্থ-গর্হণে কর্মণা ; অতস্তুদর্থং বিকুপ্তীভার্থং মুক্তসঙ্গো নিধামঃ সন্ কর্ম-বাগাচর ॥' অর্থাৎ, যজ্ঞই বিকু, ইহা শ্রুতি ( শতপথ-ব্রাহ্মণ )-মাণে জানা যায়। একমাত্র সেই বিকুর আরাধনার নিমিত্ত কর্ম-তীত অঙ্গ কর্মধারা এই মহুয়ালোক আবদ্ধ হয় ; কিন্তু ঈশ্বরার-বামূলক কর্মধারা কাহারও বন্ধন হয় না। অতএব বিকুর প্রীতির ক্ষেপে মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ নিধাম হইয়া স্তম্ভভাবে কর্ম আচরণ কর। যাগক্ষেত্রে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা লীলিকুর প্রীতির উদ্দেশে প্রকৃষ্ট-পে যজ্ঞ অর্থাৎ বিকুর আরাধনা-রূপ কর্মের অহুষ্ঠান করিয়া জীব-জগৎকে বিকুর সন্তোষার্থ কর্মার্পণ-রূপ ভাগবতধর্মের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এজন্য প্রয়াগক্ষেত্রে বিকুসন্তোষমূলক-জ্ঞান-দানাদি কর্মের বহু ফলশ্রুতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সঙ্গমতীর্থে জ্ঞান-ফলে স্বর্গ-প্রাপ্তি ও দেহত্যাগে মোক্ষপ্রাপ্তির কথা ঐতিহ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

১। মহাভারত, বনপর্দ ( তীর্থযাত্রা-পর্ব ), ৮৩ অধ্যায়, ৯২ শ্লোক ;  
lited by V. S. Sukhtankar, Poona - Bhandarkar  
iental Research Institute,



কুম্ভমেলার একাংশ, প্রয়াগ

সিহাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে  
তত্রাপন তাসো দিবমুৎপত্তি।  
যে বৈ তত্রঃ বিশুদ্ধিঃ ধীরাঃ  
তে বৈ জনাসোঃসুতঃ ভজন্তে ॥

মনে তর, উপরি-উক্ত শ্রুতি শ্রবণ করিয়াই মহাকবি কালিদাস তাঁহার  
রঘুবংশে প্রয়াগ-সঙ্গমের মাতা-জ্ঞাপক নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা  
করিয়াছেন—

সমুদ্রপ্ৰোঙ্কলসনিপাতে পুত্ৰান্নানামত্র কিলান্তিগেকাং ।  
তদ্বাপনোদেন বিনাপি ভূয়ঃ তদ্রজ্যজ্ঞাং নাপি শরীরবন্ধঃ ॥১

যাঁহারা এই সমুদ্রপ্ৰতী গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবগতনপূর্বক  
দেহত্যাগ করেন, সেই পুত্ৰাদিগের তত্ত্বজ্ঞান-বাতীতই পুনর্জন্মের  
নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

প্রয়াগে বিষ্ণুর সন্তোষমূলক কর্মার্পণের বিধান সর্বশাস্ত্রেই  
কীর্তিত হইয়াছে । ভগবানের সন্তোষের জন্ত ধন, জন, এমন কি  
প্রাণ-পূর্বক অর্পণ করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে । মহাভারত  
( ৩৮৫৮৩ ), পদ্মপুরাণ ( ১৪৪৪-১২ ), মৎস্রপুরাণ ( ১০৮২-৫ ),  
কুম্ভপুরাণ ( ৩৬২০ ; ৩৭৮, ১৫ ; ৩৮৩-১৩ ), বরাহপুরাণ  
( ১৪৪৮২ ), অগ্নিপুরাণ ( ১১১১৩ ) প্রভৃতি শাস্ত্রে, প্রাচীন  
শিলালেখ ও তাম্রশাসনে এবং বিভিন্ন প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিবরণে  
প্রয়াগে আত্মবলি প্রমাণ পাওয়া যায় । বৈদিক-ধর্মে আত্মত্যাগ  
সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইলেও প্রয়াগে ঐরূপ আত্মত্যাগের বিশেষ বিধি  
ছিল । এইজন্য কর্মধীমাসকাচার্য কুমারিলভট্ট প্রয়াগে তুযানলে

দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় । দেহসংবৎ কলি-  
মানবের পক্ষে এইরূপ বাধাতামূলক দেহত্যাগ অবৈধ । বিশেষতঃ  
ঐকৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিযুগে নাম-সংকীর্তনপর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বসাধ্য  
ভাগবতধর্ম আবিষ্কার করিবার পর ঐ সকল উৎকট বিধির অবসান  
হইয়াছে । তথাপি যাঁহারা কর্মকাণ্ডে কৃচিযুক্ত তীর্থাঙ্গিগের মধ্যে  
সমগ্র-দেহত্যাগের পরিবর্তে অন্ততঃ দেহের সামান্য-অংশ ত্যাগ—  
অম্বকল্প-বিধিরূপে স্বীকৃত হওয়ার প্রয়াগে মস্তক-মুণ্ডনের প্রথা  
অতাপি দৃষ্ট হয় । এখনো বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত  
আছে—

প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা ।

মরণে পার্পী যথা তথা ॥

স্মার্ত-ব্রহ্মবুনন্দন ভট্টাচার্যও প্রারম্ভিকতত্ত্বে প্রয়াগে মুণ্ডন-  
বিধি-মূলক প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন ।

প্রকৃষ্ট বা সর্বশ্রেষ্ঠ বজ্র

ক্রীমত্যাগবতে কলিকালে ঐকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বজ্র  
( প্রকৃষ্ট বজ্র ) বলা হইয়াছে ।—

কৃষ্ণবর্ণঃ শিখাঙ্কুরঃ সান্নোপান্নান্ন-পার্বকম ।

যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্জজ্ঞি হি স্মমেশঃ ॥২

ঐকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণীতে পাওয়া যায়—

সংকীর্তন বজ্জৈ কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন ।

সেই ত স্মমো পায় কৃষ্ণের চরণ ॥৩

শ্রীল কবিবাজ-গোষামিপাদলিখিত—

সেই ত সন্ধ্যা, আর কুবুজি সন্ধ্যার।

সর্ব বজ্র হৈতে কখনামবজ্র সার ॥১

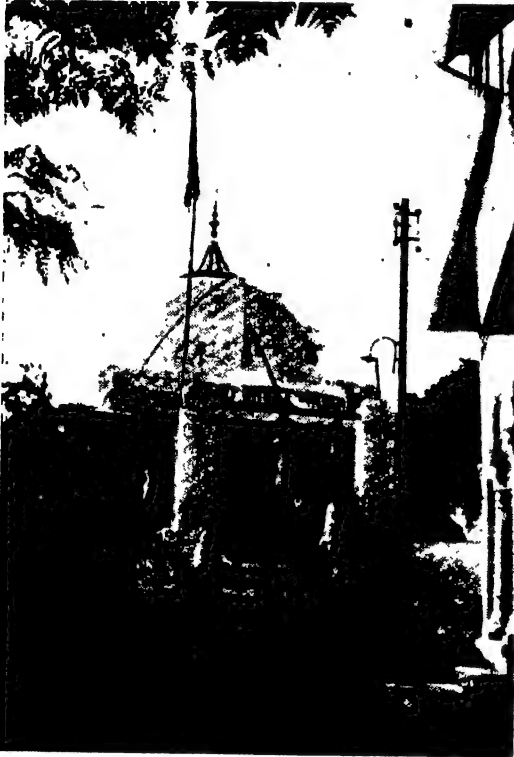
নাম-সংকীর্ণ নরুপ শ্রীমত্তাগবতধর্ম ই প্রকৃষ্ট বজ্র অর্থাৎ বজ্রের পরাকাষ্ঠা। ইহা ঐতি-মুতি-পুবাণাদি-শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

গোকোটিদানঃ গ্রহণে খগন্ত

প্রয়াগ গঙ্গোদক কল্পবাসঃ।

যক্ষাসুতঃ মেরুঃ স্তবর্ণদানঃ

গোবিন্দকীর্তনে হংস শতাব্দীঃ ॥২



ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম, প্রয়াগ

অর্থাৎ, স্তবর্ণগ্রহণ সময়ে কোটি গোদান, প্রয়াগগঙ্গার জলে কল্পবাস, অমৃত বজ্র, স্তবর্ণসদৃশ স্তবর্ণদান, কিছুই গোবিন্দনামকীর্তনের শতাব্দীর একাংশতুল্যও নহে।

প্রয়াগে ত্রিবেণীর তটে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বীয় অন্তরঙ্গ-পার্বদ লীলাগর্ভ-নামবসাকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমত্তাগবত-সিদ্ধ হইতে যে অন্তরের ত্রিধারা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাই গোড়ীয়-দর্শন, গোড়ীয়-অলঙ্কার, গোড়ীয়-বসনসিদ্ধান্তের ত্রিবেণী সঙ্গমরূপে শ্রীভাগ-বতাসুত, ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি ও উজ্জলনীলরণির মধ্যে সম্প্রসারিত

রহিয়াছে। ভক্তিরসামৃতের আবিষ্কারের পর প্রয়াগ সার্বকনামা অর্থাৎ, বজ্রের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসদ সঙ্গীত-ন-বজ্রের বখার্ব কেন্দ্র হইয়াছে।

#### প্রয়াগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাস্তবিক-রামায়ণে<sup>১</sup> লিখিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, “ঐ দেখ, প্রয়াগ। এই স্থান হইতে বজ্রের ধূম উৎপন্ন হইতেছে; মনে হয়, নিকটে কোন মূনির আশ্রম আছে। আমরা এখন নিশ্চয় গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গমের নিকট আসিয়া গিয়াছি। জাহ্নবী ও যমুনা-মিশ্রনের কলকল নাদ শুনা যাইতেছে এবং ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমস্থ বৃকসকল



দারাগঞ্জে গঙ্গা ও গঙ্গাওটের দৃশ্য

দেখা যাইতেছে।” ইহার পর সঙ্গমের নিকটবর্তী ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জানকী ও লক্ষ্মণ-সহ রামচন্দ্র তথায় বিশ্রাম করেন। ইহার পরে ভরতও চিত্রকূট বাইবার পথে বশিষ্ঠের সহিত প্রয়াগে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে আসিয়াছিলেন<sup>২</sup>। বনবাসান্তে রামচন্দ্র পুষ্পক-বিমানে অবোহণ করিয়া পুনঃ প্রয়াগ হইয়া অবোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, ইহা যুদ্ধকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

মহাভারতেও প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠানপুর (খুঁসি), বাসুকী, হংস-প্রপতন ও দশাশ্বমেধের বর্ণনা পাওয়া যায়। মন্ত্রপুবাণ, কুর্ম-পুবাণ, বামনপুবাণ, বরাহপুবাণ, পদ্মপুবাণাদি-শাস্ত্রে প্রয়াগের প্রচুর মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ আছে। মহাসংহিতায় (২।১১ স্কন্ধ) প্রয়াগের নাম পাওয়া যায়। শ্রীমত্তাগবতে শ্রীহরির অর্চালিত বিষ্ণুবল্লা-নদী-সেবিত পুণ্যতমক্ষেত্রের অঙ্গতমরূপে প্রয়াগতীর্থের নাম পাওয়া যায়। এই সকল তীর্থে অনার্যাসে ব্রাহ্মণাদি সংপাদ্যের দর্শন পাওয়া যায়। এই তীর্থে মাঘী ত্তরা সপ্তমী, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি পুণ্য তিথিতে দান, জপ, ব্রত, স্বেদ-ধির্জার্ন, শ্রাদ্ধ ও প্রাণি-গণকে যে দানাদি করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়।<sup>৩</sup> বলদেব তীর্থ-

১। ট: চ: আ: ৩।৭৭ ২। শ্রীহরিকৃতবিলাস ১১ম বিলাস, ৩৮৫ স্লোক (লক্ষ্মণবত-বাক্য)

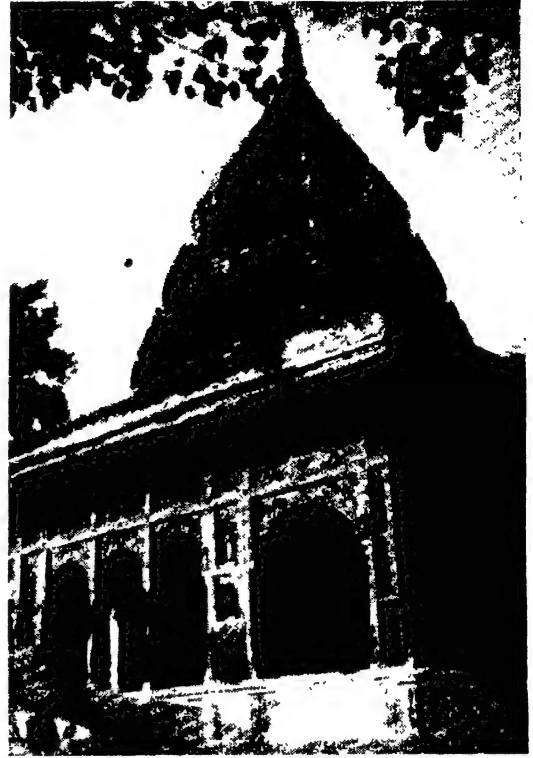
১। অবোধ্যাকাণ্ড, ৩৮-৮ ২। ঐ ৯০ সর্গ ৩। বনপর্ব, ৮৩ অধ্যায়, ৩৫-৮২ স্লোক ৪। ভা: ৭।১৪২৭-৩০

পটিনকলে প্রয়াগে পদার্পণ করিয়া এই স্থানে দ্বানাদির অস্থান করিয়াছিলেন, ইহাও ক্রীমঙ্গলবতী হইতে জানা যায়। প্রয়াগ ও প্রতিষ্ঠানপুর পুরাকালে বৈবস্বতমহর্ষ পুত্র সুহ্যদ্রের ও তৎপুত্র পুরবরার রাজধানী ছিল। ২

গবেষকগণ প্রয়াগের নিকটবর্তী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে প্রাচীন 'বংসদেশ' বলিয়া মনে করেন। এই বংসদেশের রাজধানী 'কৌশাধী' নগরী। এই স্থান প্রয়াগ হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে, বর্তমান 'কোশামে'র নিকট যমুনার তীরে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকালে প্রয়াগ কৌশাধী-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

গৌতম বুদ্ধ প্রায় ৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রয়াগে আসিয়া তথায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ৩১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নাগাদ প্রয়াগে মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। প্রয়াগের নিকটবর্তী স্থানসমূহে গুপ্তযুগের অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময় (৩০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিস গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোক কৌশাধীতে উপ-রাজধানী নির্মাণ এবং স্বীয় অনুশাসনান্বিত শিলাস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত স্তম্ভটি বর্তমানে প্রয়াগের দুর্গাভ্যন্তরে রহিয়াছে। ৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের সময় প্রয়াগ তদীয় রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। প্রয়াগের নিকটবর্তী প্রাচীন বৃসি নামক স্থানে উচ্চ টিলার উপর 'সমুদ্রকূপ' নামে, সমুদ্রগুপ্তের সময়ের একটি স্তম্ভকূপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়ান ভারতে আসেন। তাঁহার বিবরণে প্রয়াগের নাম 'স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হইলেও তাঁহার বর্ণন-সম্বন্ধে হইতে গবেষকগণ তাঁহার প্রয়াগে আগমনের বিষয় অনুমান করিয়াছেন। ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে কান্তকূজের অধিপতি বশোবর্ধনের হস্তগত হয়। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হর্ষবর্ধন কান্তকূজে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সেই সময় প্রয়াগ কান্তকূজ রাজ্যের অন্তর্গত হয়। হর্ষবর্ধন কান্তকূজের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পর 'শিলাদিত্য' নাম গ্রহণ করেন। তিনি 'জিহ্ব' নামেও গ্যাত। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সহিত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ কান্তকূজ হইতে প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগের সঙ্গম, অক্ষয়বট প্রভৃতির বর্ণনা এবং 'জিহ্ব'র অস্থিষ্ঠ দানসত্বেব বিবরণ লিপিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট 'তর্ষচরিত' নামক গ্রন্থে সম্রাটের বিবিধ কীর্তিকলাপও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রায় ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ গোড়ের পাল-নবোদগণের হস্তগত হয়। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে শঙ্করাচার্য প্রয়াগে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কান্তকূজের 'প্রতিহার-রাজগণ' প্রয়াগ অধিকার করেন। ১০৯০

খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ রাঠোররাজ চন্দ্রদেবের হস্তগত হয়। ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী চন্দ্রদেবের পৌত্র জয়চন্দ্রকে নিহত করিয়া



নাগ-বাণরীকর মন্দির, এলাহাবাদ

প্রয়াগকে ভূকরাজের অন্তর্ভুক্ত করেন। সিকন্দর-লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ) হুমায়ুনকে প্রয়াগ প্রদেশ জায়গীররূপে প্রদান করেন। মোগল সম্রাট আকবর ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর (আবুল ফজলের আকবর-নামার মতে) প্রয়াগের নাম 'ইলাহাবাস' রাখেন এবং গঙ্গা যমুনা-সঙ্গম প্রয়াগ-দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। আকবরের জীবদ্দশায় তৎপুত্র সেলিম (জাহাঙ্গীর) প্রয়াগে নিজের বাসস্থান মনোনীত করেন। জাহাঙ্গীর ইলাহাবাসে 'গঙ্গাবাগ' নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে শাজাহান 'ইলাহাবাস' নামের স্থানে 'ইলাহাবাদ' নাম রাখেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। বৃন্দোলা ও মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণের সময় এই স্থান কখনও মুসলমানগণের কখনও-বা মহারাষ্ট্রীয়দের অধিকারে আসে। সম্রাট শাহ আলমের সময় এই স্থানে কিছুদিন রাজধানী ছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর অবাধার নবাব সাদাত-আলী খা তাঁহার দেয় অর্থের পরিবর্তে দাঁট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এলাহাবাদ ছাড়িয়া দেন।

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ

প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত প্রয়াগ মোগলরাজত্বের সময় 'ইলাহাবাস'

ও 'ইলাহাবাদ' নাম ধারণ করে, আর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ প্রয়াগের নাম তাঁহার নিজ ভাষায় 'পো-লো-য়ে-ক' বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।<sup>১</sup> হিউয়েন-সাঙ-লিখিত প্রয়াগ-বিবরণের ইংরেজী তর্জমার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল :

"On the east side of the capital and at the confluence of the rivers, was a sunny down about ten li wide covered with a white sand. This down was called in the popular language "The Grand Arena of Largesse." It was the place to which from ancient times princes, and other liberal benefactors had come to make their offerings and gift. The king went in state from Kanauj to this place for his customary quinquennial great distribution of gifts, and alms, and offerings. He had come prepared, he gave away all the public money, and all his own valuables. Beginning with offerings to the Buddhist images on the first day, the king went on to bestow gifts on the resident Buddhist Brethren, next on the assembled congregation, next on those who were conspicuous for great abilities and extensive learning, next on retired scholars and recluses of other religions, and lastly on the kinless poor. This lavish distribution in a few (according to the Life in 75) days exhausted all the public and private wealth of the country, but in ten days after the Treasury was emptied it was again filled. At the junction of the river and to the east of the Arena of Largesse, every day numbers of people arrived to die in the sacred water, hoping to be thereby reborn in Heaven."

প্রয়াগে হর্ষবর্ধনের দানসত্রের উক্ত বিবরণ প্রাথমিক বিজ্ঞান্যের শিক্ষার্থিগণও ভারতের ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকে। এই বিবরণ হইতে কেত কেত অনুমান করেন যে, হর্ষবর্ধন প্রতি অর্ধ-কুস্ত বা পূর্ণ-কুস্ত-পূর্ণের সময় প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া এরূপ দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। হিউয়েন-সাঙ উক্ত বিবরণের কথিং পূর্বে কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের গুণগ্রামের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

"He erected thousands of topes on the banks of the Ganges, established Travellers Resto through all his dominions, and erected Buddhist monasteries at sacred places of the Buddhists. He regularly held the Quinquennial Convocation; and gave away in religious alms everything except the material of war."

হর্ষের পঞ্চবার্ষিক মহাসভা ও কুস্তমেলা

হর্ষবর্ধন নিয়মিতভাবে 'পঞ্চবার্ষিক-মহাসভা' আহ্বান করিতেন এবং সমরোপকরণ বাতীত সমস্তই ধর্মার্থে বিতরণ করিয়া দিতেন, ইহা উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়। হর্ষের দ্বাবতী পূর্বপুরুষ

শৈব, তাঁহার পিতা সৌর, তাঁহার স্ত্রোষ্ঠ জাতা ও ভগ্নী বৌদ্ধ, আর হর্ষ স্বয়ং উক্ত ত্রিবিধ ধর্মের প্রতি সমভাবে আস্থাযুক্ত হইয়াও শেষ বয়সে বৌদ্ধধর্মের প্রতিই বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।<sup>২</sup> স্তবরাং বুদ্ধের পদাঙ্কিত ধর্মপ্রচার-পীঠ ও প্রসিদ্ধ দানক্ষেত্র প্রয়াগে প্রতি পঞ্চম বৎসরে মহামোক্ষ-পরিষৎ ও দানসত্রের উন্মোচন বৌদ্ধসম্রাটের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। হর্ষবর্ধনের উক্ত পদবিদ বা দানসত্রের সহিত কুস্তমেলার কতটা সম্বন্ধ আছে তাহা বিচার্য। হিউয়েন-সাঙ ভারতের যে-যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে—ডঃ ফ্রিট প্রমুখ গবেষক-গণের মতে তিনি প্রয়াগ বাতীত হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকেরও কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন। এই স্থানগুলিরও কুস্তপর্বের জন্ত প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে ধেরূপ প্রয়াগে কুস্তপর্বের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, সেইরূপ হরিদ্বার উজ্জয়িনী এবং নাসিকের বিবরণের মধ্যেও উক্ত পর্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; অথচ প্রয়াগের বিবরণের মধ্যে অক্ষয়-বটের, সক্রমের এবং তথায় দেহ-বিসর্জনের জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।<sup>৩</sup> চৈনিক পরিব্রাজকের উক্ত বর্ণনা প্রাচীন শাস্ত্রপ্রমাণের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে আলবেরুণী ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী উদ্দান প্রমুখ লেখকগণও প্রয়াগের এই সকল দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনার মধ্যেও কুস্তপর্বের কোন উল্লেখ আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। সম্রাট আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক আব্দুল-কাদীর-বলয়ানী 'মুস্তব্দ-ল-তবারীক'-এ লিখিয়াছেন যে, সন ৯৮২ হিজরী (- ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ ) শফর-মাসের ২৩শে তারিখে ( কাহিক মাসের মধ্যভাগে ) আকবর প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, বিধর্মী ব্যক্তিগণ বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া গজায় ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করিতেছেন। ইহার বিবরণেও ভাবী কুস্তমেলার কোন উল্লেখ নাই।

মিঃ বিল *Life of Hiuen Tsang* নামক পুস্তকেও লিখিয়াছেন :

"The quinquennial assembly in the spring of A.D. 644 was the sixth held in the reign."

ভি. এ. স্মিথ তাঁহার *Early History of India* পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"Harsha explained that it had been his practice for thirty years past, in accordance with the custom of his ancestors, to hold a great quinquennial assembly on the sands where the rivers meet, and there to distribute his accumulated treasures to the poor and needy, as well as to the religions of all denominations. The present occasion (A.D. 643) was the sixth of the series . . .

1. On Yuan Chwang's Travels in India—Vol. I, p. 364, by Thomas Watters, London Royal Asiatic Society, 1904.

২। এ বিষয়ে মহভের আছে, কেহ কেহ ৪০ দিনস বলিয়াছেন।

3. On Yuan Chwang's Travels in India—Vol. I, p. 344.

1. V. A. Smith's *Early History of India*, p. 345, Oxford. 1914; 2. On Yuan Chwang's Travels in India—Vol. I, pp. 319, 329; 3. *Ibid*—Vol. II, p. 250; 4. *Ibid*—Vol. II, p. 336; 5. *Ibid*—Vol. I, pp. 362, 364; 6. *Ibid*, page 184; 7. Smith's *Early History of India*, p. 350.

The proceedings lasted for seventy-five days, terminating apparently about the end of April."

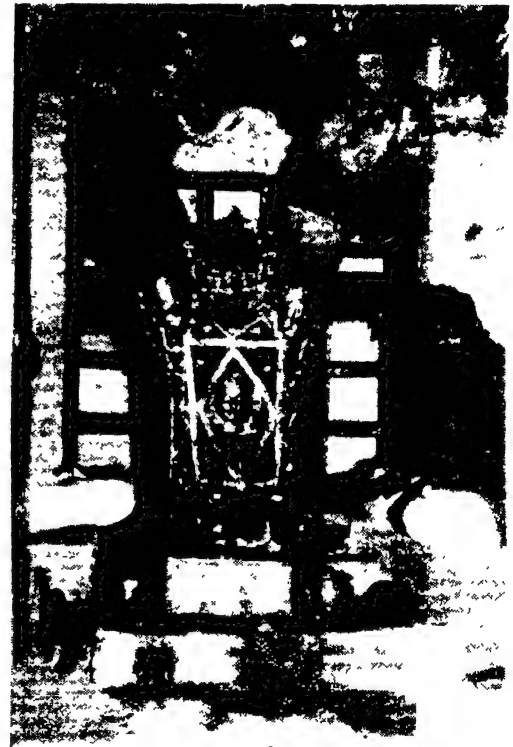
বিল সাচেবের মতে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে ও ভি. এ. শ্বিথের মতে ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত আড়াই মাসব্যাপী মহামোক্ষপরিষদের অধিবেশন প্রয়াগে হইয়াছিল। কোন কোন গবেষকের মতে উক্ত পরিষদ ঊনপঞ্চাশ দিন, কাহন মাস হইতে চৈত্র মাসের প্রায় অধেক পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। ১১ খ্র্ষবর্ধনের পূর্ব হইতেই প্রয়াগে কুন্তমেলার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতে থাকিলে ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে (= ৭০২ সংবতে) প্রয়াগে পূর্বকুন্ত এবং ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে (= ৬৯৬ সংবতে) অর্ধকুন্তযোগ হইবার কথা কোন কোন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া লিখিয়াছেন। ১২ খ্র্ষবর্ধন ৬৪৩ বা ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা প্রয়াগের পূর্বকুন্ত বা অর্ধকুন্তপর্বের যোগের মধ্যে পড়ে না। তিনি উহার ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রয়াগে যে প্রথম দানোস্বর করিয়াছিলেন, সেই সময়েও প্রয়াগে অর্ধ বা পূর্বকুন্তযোগের সমাবেশ দেণা যায় না। বিশেষতঃ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত খ্র্ষবর্ধনের দানোস্বর প্রতি পঞ্চম বর্ষে অনুষ্ঠেয় পঞ্চবার্ষিক মহোৎসব বা মহাপরিষদ (Quinquennial Convocation) বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

এইসকল কারণে কোন কোন গবেষক খ্র্ষবর্ধনের মহামোক্ষপরিষদের সঠিত প্রয়াগে কুন্তমেলার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ৩

আচাৰ্য্যদের চরিত্রগণ্ডে কুন্তপর্বের উল্লেখ

প্রয়াগ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রসিদ্ধ তীর্থরাজ। এই স্থানে কোন বিশেষ পর্ব, সভা বা সুপ্রাচীন প্রথা ও অনুষ্ঠানের কথা নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ আচাৰ্য্যগণের চরিত্র-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিবার কথা। 'শঙ্কর-বিজয়'-গ্রন্থে প্রয়াগে তুহানলে প্রাণত্যাগোন্মুখ কুমারিলভট্টের সঠিত শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ থাকিলেও কুন্তপর্বের বা কুন্তমেলার কোন উল্লেখ নাই। ৪ 'প্রপন্নামৃত' লীলামাহুজ-আচার্যের তীর্থ-ভ্রমণাদি-প্রসঙ্গে তাঁহার প্রয়াগ-বিজয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'শ্রীমধ্ব-দ্বিখিকর'-গ্রন্থেও শ্রীমধ্বাচার্য প্রয়াগে কুন্তমেলার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের স্বনামখ্যাত দ্বিখিকরী আচার্য শ্রীবাতিরাজ-তীর্থ (১৪৮০-

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতের তীর্থস্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া 'তীর্থ-প্রবন্ধ'-নামক একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেও প্রয়াগের বা হরিদ্বারাদি স্থানের কুন্তমেলার কোন কথাই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে বলদেবের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দপ্রভুর ৬ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সঠিত হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ ও স্নানাদি-কৃত্যের উল্লেখ থাকিলেও এইসকল স্থানে কুন্তপর্বের কোনই উল্লেখ নাই। শ্রীবল্লভাচার্য দ্বিখিকর করিবার ভ্রম সমগ্র ভারতবর্ষ তিন বার পর্যটন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার পর্যটন করিবার পর তিনি গার্হস্থ্যালমী হইয়া প্রয়াগের অপর পারে আড়াইল-গ্রামে গিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি প্রয়াগ-সঙ্গমের সন্নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেন;



পাতালপুরীর আধুনিক অক্ষয়বট, এলাহাবাদ

অথচ তাঁহার সুবোধিনীটাকায় তীর্থরাজ প্রয়াগের কথা থাকিলেও কুন্তমেলার উল্লেখ নাই, পরবর্তী কালের বল্লভদ্বিখিকর গ্রন্থেও নাই। শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ 'শ্রীচরিত্তিলাস' ও 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' প্রয়াগে মাঘস্নান, দান, কল্পবাস ও সম্পত্তিশালী ভক্তিমান ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধুসেবা ও মহোৎসবাদির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কুন্তযোগ ও কুন্তমেলার কোন উল্লেখ করেন নাই। ৭ শ্রীকৃষ্ণ-

১। 'ভারত'-পত্রে রজতজয়ন্তী মহাকুন্ত বিশেষাঙ্কে প্রকাশিত 'কুন্তমেলা কা মনোবৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ইতিহাসিক আধার' শৈবক প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৫২ দ্রষ্টব্য।

২। [ক] দৈবজ্ঞভূষণ পণ্ডিত মাতৃগঙ্গাসদ পাণ্ডের (কাশীবাসী)—'কুন্তপর্ব-বাস্তবতা' ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ।

[খ] 'ভারত'-পত্রে মহাকুন্তবিশেষাঙ্কে প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর ঈশ্বরীগঙ্গাসদ রচিত 'ইলাহাবাদ কা কিল্লা' প্রবন্ধ, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। 'ভারত'-পত্রে (মহাকুন্তবিশেষাঙ্ক) শ্রীকল্পনারায়ণ-শাস্ত্রীকৃত 'কুন্তমেলা কা ইতিহাসিক আধার'-প্রবন্ধ ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। মাদ্বাচার্য-কৃত 'শঙ্কর-বিজয়' ৭৮৯, শ্রীনাথ মিশ্র কর্তৃক প্রকাশিত, বঙ্গাব্দ, ১২২০ কলিকাতা।

৫। তারিখ ১০/৭/২০ শ্রীলোক

৬। তারিখ: তারিখ ২/১০/২০

৭। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১/১২/৩-৩৬;



চৈতন্যমহাপ্রভু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঘমাসে প্রয়াগে ত্রিবেণীর উপরই আবাস স্থাপন করিয়া দশ দিন 'মকর-স্নান' করিয়াছিলেন।<sup>১</sup> কৃষ্ণদাস করিয়ারোগাধামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের মকর-স্নান লীলার কথা, দশাশ্বমেধবাটে শ্রীকৃষ্ণ-শিকার কথা, আড়াইল গ্রামে বনভাচাচের ভবনে পদার্পণের কথা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্তে কৃষ্ণমেলায় কোন উল্লেখ করেন নাই। তুলসীদাস 'বামচরিতমানসে' প্রয়াগে সুপ্রাচীনকাল হইতে প্রতি বৎসর মাঘ-মকর-সংক্রান্তিতে যুনি-ঋষিগণ ভয়ঙ্কর-যুনির আশ্রমে সমবেত হইয়া ত্রিবেণী-স্নান, অক্ষয়বট-স্পর্শ, শ্রীমাঘবের পাদপদ্মপূজা, হরিগুণগান, ধর্মবিধি-প্রদর্শন এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যাসুহৃৎ ভগবতাক্তির আলোচনা করিতেন বলিয়া লিখিয়াছেন ; কিন্তু কৃষ্ণপর্বের কোন উল্লেখ করেন নাই।

#### পুষ্কর-যোগ

এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন, প্রয়াগে স্নান, দান, দেহোৎসর্গ, কল্পাস, সাধুসমাগম, শ্রীমাঘবের আরাধনা, হরিগুণ-কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি ভক্তিমূলক অহুস্তানসমূহ আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল ; হরত পরবর্তী কালে স্থলপুরাণ প্রকাশ করিয়া 'পুষ্পদ্রব্যাগে'২ মাতাঙ্গা মাঘস্থানের সঠিত সমাবিষ্ট করা হইয়াছে। জ্যোতিষসম্বন্ধীয় পারিভাষিক কোষসমূহে পুষ্করযোগকে 'কৃষ্ণ'ও বলা হইয়াছে। এইরূপ স্থল-পুরাণের দ্বারা পুণ্যস্থানসমূহের মাতাঙ্গা ও বিশেষ পর্বাদির প্রচার ভারতের বহু তীর্থস্থানে দৃষ্ট হয়।

#### কৃষ্ণকোণমে মহামাঘম-মেলা

দক্ষিণ-ভারতের তাম্রাঙ্গের জেলার কৃষ্ণকোণম-নগরে 'মহামাঘম' নামক একটি স্থানোৎসব প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৃহৎসপ্তি দ্বিত্বাশিষ্ট হইলে তৎকালে মাসী পূর্ণিমা তিথিতে ঐ স্থানবোণ উপস্থিত হয়। উত্তর-ভারতের 'কৃষ্ণমেলা' এবং অন্তর্দেশের 'পুষ্কর উৎসব'—স্নান উপলক্ষ করিয়া পুণ্যতোয়া নদীতেই হইয়া থাকে ; কিন্তু কৃষ্ণকোণমে কুণ্ড ( বিশাল সরোবর ) মধ্যে স্নানোৎসব হয়—সেই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ সাধুসন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীর সমাগম এবং মেলা হইয়া থাকে। উক্ত 'মহামাঘম' উৎসবটি স্থল-পুরাণের ( স্থানমাতাঙ্গা প্রতিপাদক পুরাণ ) দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে এবং উজাতোও কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে। উক্ত স্থলপুরাণের মতে প্রলয়ের প্রাকালে বেদ ও সৃষ্টিবীজ সংরক্ষার্থ ত্রিকা অত্যন্ত চিত্তাশ্রম হইয়া মহাবিকুর নিকট উপস্থিত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত পুণ্যার্থী হইতে মুক্তিকা সংগ্রহ করিয়া ত্রিকাকে একটি কৃষ্ণ নির্মাণ এবং উহার মধ্যে অমৃতের সঠিত বেদ ও সৃষ্টিবীজ বক্ষা করিয়া কৃষ্ণীকৈ মহামেঘের দক্ষিণভাগে স্থাপন করিবার উপদেশ দেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই দিবা কৃষ্ণটি প্রলয়পরোধিজলে ভাসিতে ভাসিতে কোন একটি স্থানে সংলগ্ন হইয়া পড়ে। শিব

তথায় আবির্ভূত হইয়া উক্ত কৃষ্ণের উপর বাণ নিক্ষেপ করেন। তাহাতে কৃষ্ণের 'যোগ' অর্থাৎ কানা ভাঙ্গিয়া অমৃত ক্ষরিত হইতে থাকে। শিব সেই অমৃত পান করিয়া তথায় 'অমৃত লিঙ্গ কৃষ্ণেশ্বর' নাম ধারণপূর্বক লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হন। ঐ স্থানে কৃষ্ণের যোগ বা কানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানের নাম হয়—'কৃষ্ণযোগম' বা 'কৃষ্ণকোণম'। পরে ত্রিকার প্রার্থনায় মহাদেব কৃষ্ণকোণমে 'মহামাঘকুলম' নামক কুণ্ড গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, মহানদী, পরশ্বিনী ( পালার ) ও সরস্ব—এই নয়টি পুণ্য নদীর আবির্ভাব করাইয়াছিলেন। এই কুণ্ডের তটেই শ্রীকৃষ্ণেশ্বর শিব অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উক্ত 'অমৃতলিঙ্গ' শিব দর্শনমানসে তথায় পূজার্পণ করিয়াছিলেন।<sup>১</sup>

'মহামাঘম' উৎসবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাচীনত্বের প্রমাণ-মূলক অনেকগুলি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিংগলপুট জেলায় 'নাগলপুরম' নামক স্থানের একটি দেবালয়ের গোপুরের উত্তমভাগে গম্বুজের মধ্যে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, বিজয়নগরের স্বনাম-ধন্য রাজা কৃষ্ণদেব রায় কৃষ্ণকোণমের 'মহামাঘম' উৎসবে বোগদানার্থ গমনের পথে উক্ত গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং একটি মন্দিরে বহু দান করিয়াছিলেন। গত ১৯৪৫ সনে মার্চ মাসে কৃষ্ণকোণমের দ্বাদশ বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

#### কৃষ্ণপর্বের প্রমাণ

কৃষ্ণপর্বের সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশে শাঙ্ক্রে বিভিন্ন অর্থে বা ভাষ্যপথে ব্যবহৃত 'কৃষ্ণ' শব্দটি হইতে অনেক কালান্বিত অর্থ ও ভাষ্যপথ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক স্থলে কৃষ্ণবোগের প্রমাণরূপে প্রচারিত বহু শ্লোক যে সকল শাঙ্ক্রে নামোল্লেখপূর্বক নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতেও কোন পুথির, কোন সংস্করণের বা কোন পুথিশালায় রক্ষিত, কত সংখ্যক পুথিতে কোন অধ্যায়ে ঐ সকল শ্লোক আছে, তৎসমুদয়ের সঠিক নির্দেশ নাই। অনেক সময় অপরের প্রমাণসমূহ পরীক্ষা না করিয়াই গতানুগতিক ও আনুসঙ্গিক পদ্ধতিতে প্রচার করা হইয়াছে। ইহাতে বর্তমান লেখকের কায় সাধারণ ব্যক্তিগণ অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত সত্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া পড়েন। পণ্ডিত শ্রীমদপ্রতাপ ত্রিপাঠী শাস্ত্রীজী তাঁহার রচিত 'কৃষ্ণপর্ব—এক পৌরাণিক বিবেচন' স্বীকৃত প্রবন্ধে প্রকৃত সত্য স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—'উপযুক্ত মন্ত্বে। মে 'কৃষ্ণ' শব্দ কা কৃষ্ণপর্ব অর্থ সম্প্রদায়কে অমুরোধ সে কিয়া গয়া হৈ।'<sup>২</sup> অর্থাৎ উক্ত বৈদিক মন্ত্রসমূহের মধ্যে 'কৃষ্ণ' শব্দ হইতে যে কৃষ্ণপর্ব অর্থ করা হইয়াছে, তাহা সম্প্রদায়ের অমুরোধেই করা হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীউমেশ মিশ্র, এম-এ, ডি-লিট 'তীর্থবাজ প্রয়াগ ওর কৃষ্ণপর্ব' নামক এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'পুরাণে। যে কৃষ্ণবোগ কী কঠী ভী চর্চা নহী হৈ। মাঘ-মাহাত্ম্য

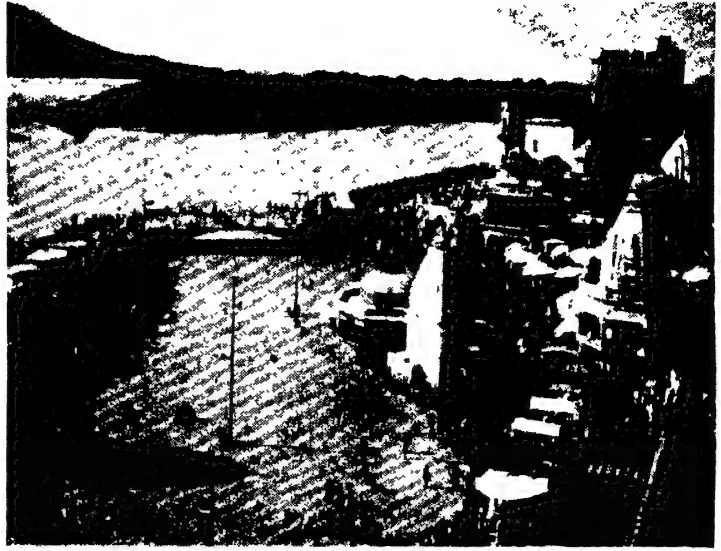
১। জে: চ: ম: ১৮২২২; ২। স্বলপুরাণ, পুষ্করও—মকররশ্মিতে বৃহৎসপ্তি ও পূর্বের মিলন এবং তৎকালে রবিবারে পূর্ণিমা-তিথির সংঘটন হইলে প্রয়াগে ও হরিদ্বারে গঙ্গা পুষ্কর-ভুল্য হয়। ইহা কোটি-স্বর্গপ্রাপ্তের সমান।

১। জে: চ: মধ্য ১৭০

২। হিন্দী 'ভারত' পত্রিকার রজতজয়ন্তী—মহাকৃষ্ণ-বিশেষাঙ্ক, ৪৫ পৃষ্ঠা:

মে রা প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে যে ভী কুস্ত কা  
কহী ভী উল্লেখ দেখেনে মে ভী তক  
নহী আরা হৈ। নিবন্ধে মে ভী চর্চা নহী  
দেখ পড়তী হৈ।<sup>১</sup> অর্থাৎ, পুরাণে কোথাও  
কুস্তযোগের আলোচনা নাই। মাঘ-মাহাত্ম্য  
ও প্রয়াগ-মাহাত্ম্যেও কোথাও এখন পর্যন্ত  
কুস্তযোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়  
নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-নিবন্ধসমূহও কোনও  
আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্যোতিষাচার্য পণ্ডিত শ্রীবলরাম-শাস্ত্রী,  
এম-এ, সাহিত্যরত্নও লিখিয়াছেন—“ইসসে  
সিদ্ধ হোতা হৈ কি গ্রহো কী স্থিতি মে  
পরিবর্তন হোতে গয়ে ওর পুরাণ বনতে গয়ে  
হৈ। অতঃ সে প্রমাণ পরস্পরবিরোধী  
সিদ্ধ হো রতে হৈ।”<sup>২</sup> অর্থাৎ, এতদ্বারা  
ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গ্রহ-মূর্তির স্থিতির  
পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণও রচিত  
হইতেছিল। এইজন্যই প্রমাণ পরস্পর-  
বিরোধী হইয়াছে।



হরিদ্বার

কুস্তপর্ব প্রকৃত কোন সময় হইতে শুরু হইল এবং কেই-বা  
ইহার প্রথম প্রবর্তন করিলেন, তাৎসব্দিক নানাপ্রকার বিবদমান  
অমুমানমূলক মত প্রচারিত আছে। (১) কেহ কেহ বলেন, আদি-  
শ্রীশঙ্করাচার্য কুস্তপর্বের প্রবর্তন করিয়াছেন; (২) কোন মতে  
চতুঃসন প্রত্যেক বার বৎসর অস্তর হরিদ্বার ও প্রয়াগাদি তীর্থে  
পণ্টন করিতেন, সেই স্মৃতি সংরক্ষণকল্পে কুস্তপর্বের প্রবর্তন  
হইয়াছে; (৩) মতান্তরে—যোগিগণ এক যুগ অর্থাৎ বার বৎসর  
অস্তর তাঁহাদের যোগসাধনার একটি একটি পর্ব সমাপ্ত করিয়া  
প্রয়াগাদি তীর্থে মিলিত হইতেন, তাহা হইতে প্রতি বার বৎসর  
অস্তর কুস্তপর্বের প্রচার হইয়াছে; (৪) কেহ কেহ মনে করেন,  
সম্রাট-মহেন্দ্রের সময়ে উক্ত অমৃত-কুস্ত হইতে অমৃতবট্টন প্রয়াগ-  
তীর্থেই হইয়াছিল, উহারই স্মারক-উৎসবরূপে প্রয়াগে কুস্তমেলার  
প্রচার হইয়াছে; (৫) কেহ কেহ মনে করেন, যখন গরুড় অমৃতকুস্ত  
লইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি যে চারিটি  
বিষ্ণুতীর্থে অমৃতকুস্তসহ বিশ্রাম করেন, সেই চারিটি স্থানেই কুস্তমেলা  
অদ্বিতীয় হইয়া আসিতেছে; (৬) কেহ-বা কুস্তমেলাকে বৈদিক-  
যুগের সমন-মেলারও রূপান্তর বলিয়া অমুমান করেন; (৭) কেহ  
কেহ-বা ইহাকে বৌদ্ধধর্ম-পরিষদ বা মহামোক্ষপরিষদ প্রভৃতির  
রূপান্তর বলিয়া কল্পনা করেন; (৮) কেহ কেহ কুস্তমেলাকে  
দশনামী-শঙ্কর-সন্ন্যাসিগণের, যোগিগণের এবং তদনুসরণে অন্যান্য  
সন্ন্যাসীলক্ষ্যদায়ের গণতান্ত্রিক-সম্মেলন-বিশেষ মনে করেন; (৯)  
আবার কেহ কেহ বলেন, হরিদ্বার ও প্রয়াগের পুষ্করযোগ কালক্রমে

কুস্তপর্বে রূপান্তরিত হইয়া চারিটি তীর্থস্থানে বিরক্ত সাধুগণের মধ্যে  
প্রচারিত হয় এবং এই সাধুগুণের মধ্যে পরস্পর নানাপ্রকার  
উপদ্রবের সৃষ্টি হইলে শ্রীরামানন্দ স্বামী শিষ্য সুরস্বরানন্দের শাখার  
বালানন্দজী ( ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত ) হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক  
ও উজ্জয়িনীতে বর্তমান আকারের কুস্তমেলার প্রবর্তন করেন;  
(১০) সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী এবং আচার্যগণ ইহাও বলেন যে, কুস্তপর্ব  
ছল-পুরাণের দ্বারা প্রচারিত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে কুস্তমেলায় নাম  
ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

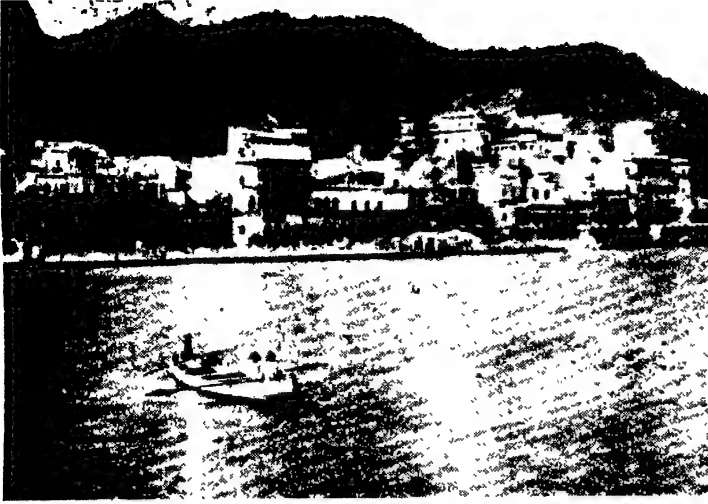
#### অক্ষয়বট

প্রয়াগের অক্ষয়বট সম্বন্ধেও দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যিক।  
পদ্মপুরাণে অক্ষয়বটকে তীর্থরাজ প্রয়াগের ছত্র-স্বরূপ ‘আদিবট’  
বলা হইয়াছে। কুম্ভপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে উক্ত বটবৃক্ষের নিয়ে  
প্রাণত্যাগ করিলে রক্তলোকপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে। প্রলয়-  
কালেও এই বটের অস্তিত্ব থাকিবে এবং চন্দ্র সূর্য লুপ্ত হইলেও এই  
বট ভূতলে প্রকাশিত থাকিবে, বলা হইয়াছে।

৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন্-সাঙ প্রয়াগে এক প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের  
সম্মুখে স্তম্ভরূপকারী বিস্তৃতশাখা এক বিশাল বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন  
এবং প্রাচীন প্রবাদানুসারে সেই বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া পুণ্য-  
কামী লোক প্রাণ বিসর্জন করিতেছিলেন—এইরূপ বিবরণ দিয়া-  
ছেন। কেহ কেহ ঐ বিখ্যাত মন্দিরটিকে শূলটঙ্করবরের মন্দির  
বলিয়া অমুমান করেন। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে আলবের্ণী যে প্রস্ত  
বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমের উপর  
এক বিশাল বটবৃক্ষের বর্ণনা আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এই বৃক্ষে  
আরোহণ করিয়া গঙ্গার কাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতেন। ১৩১০

১। ঐ, ১০৩ পৃষ্ঠা ২। ঐ, ৫০ পৃষ্ঠা

৩। কুস্তম ২।: ৩৭, ১১২৪।: অর্থবোধ ২।: ৩১



প্রাচীন মায়াপুর (হরিশার)

খ্রীষ্টাব্দে 'জামুত তবারীণ' লেখক মুসলমান ঐতিহাসিক রশীদ উদ্দীন প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের উপর বিশাল বটবৃক্ষের দুইটি মুগা শাখার কথা এবং উহার উপর উঠিয়া হিন্দুগণ গঙ্গাতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন ইত্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন। তুলসীদাসও স্বচক্ষে অক্ষয়বট দর্শন করিয়া তাঁহার 'শ্রীরামচরিতমানসে' এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

সম্রম সিংহাসনু স্তম্ভি সোঃ।

ভঃ অক্ষয়বট মূনি মন মোঃ॥

পূজ্যর্থে মাধবদ জলজ্ঞাঃ।

পরদি অক্ষয়বট হরপাতি গাঃ॥১

সম্রাট আকবরের সনকালীন আবহুল কাদির বলায়ুনীও অক্ষয়বট হইতে গঙ্গার ঝাঁপ দিয়া হিন্দুগণের প্রাণত্যাগের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আকবর প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে দুর্গনির্মাণ কালে (১৫৮৩ খ্রি:) প্রাচীন অক্ষয়বটের একটিমাত্র শাখা রাখিয়া সমগ্র বৃক্ষটি ছেদন করিয়া দেন। তৎপর ঠিক কোন সময় হইতে দুর্গের মধ্যে পাতালপুরী ও কৃত্রিম অক্ষয়বটের প্রদর্শনী গোলা হয়। তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৭৬৫ সালে ওলন্দাজ মিশনারী টিফেন থালর প্রয়াগ-দুর্গের মধ্যে পাতালপুরী ও তথায় বিভিন্ন দেবমূর্তি, পজাদিবিহীন শাখাশ্যবৃক্ষ বৃক্ষের এক অংশ দেখিতে পান। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম কর্তৃক প্রদত্ত এক সনদ হইতে জানা যায়, তৎকালে পাতালপুরীতে অক্ষয়বটের পুরোহিত অরোধ্যানাথ বোপী ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় তাঁহার

ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত) লিখিয়াছেন, ১৫ বৎসর পূর্বে তাঁহার কোন আত্মীয়কে পাণ্ডাগণ শুষ্ক শাখাশ্যবৃক্ষ এক বৃক্ষকে অক্ষয়বট বলিয়া প্রদর্শন করেন। কিন্তু চন্দ্র মহাশয় স্বয়ং অক্ষয়বট দর্শন করিতে পারেন নাই; কারণ তখন ঐ পাতালপুরী বন্ধ ছিল।

বর্তমান দুর্গের মধ্যে পাতালপুরীতে ব্যক্তিগণকে যে অক্ষয়বট প্রদর্শিত হয়, উহা বাস্তবিকপক্ষে বহির্দেশ হইতে আনীত, সাময়িক ভাবে স্থাপিত কোন বটবৃক্ষের শাখা। চারি-পাঁচ বৎসর অন্তর এক একবার পরিবর্তন করা হয়। এই কাণ্ড ব্যবসায়ী পাণ্ডাগণের দ্বারা সাধারণের অজ্ঞাতসারে রাক্তিতে অতি গোপনে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যে পরিবর্তন-কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা সাধারণের মধ্যে কেহ কেহ জানিতে পারেন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পুনরায় উক্ত শাখার পরিবর্তন-কালে পাতালপুরীর প্রধান পুরোহিত দুর্গের অধ্যক্ষের আদেশ লইয়া চত্বিশ জন পাণ্ডা ও প্রায় কুড়ি জন মজুরদ্বারা রাক্তি আটটার সময় দুর্গের বহির্দেশ হইতে এক বৃক্ষের শাখা লইয়া পুরাতন শাখার স্থানে স্থাপন করেন। এই সংবাদ ২৪-৬-৫১ তারিখে এলাহাবাদের ইংরেজী দৈনিক 'লীডার' পত্রে প্রকাশিত হয়।

শ্রীশিবনাথ কাটজ্জ এম-এল-এ মহাশয় গবেষণাধারা নির্ণয় করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রয়াগ-দুর্গ নির্মাণকালে আকবর প্রকৃত প্রাচীন অক্ষয়বটের যে একটি শাখা বাতীত সমগ্র বৃক্ষটিকে কাটিয়া দিয়াছিলেন সেই অকর্ষিত শাখা অদ্যাপি দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যমুনার নিকট বর্তমান রহিয়াছে। উহার অগ্রভাগ যমুনার তীর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বাতির হইতে দেখিয়া উহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না। ঐ স্থানের বহির্দেশে দুর্গের প্রাচীর-গায়ে পদ্মচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রয়াগে প্রচারিত প্রাচীন কিংবদন্তীও ইহার সমর্থন করে।

কাটজ্জ মহাশয়ের নির্দেশানুযায়ী প্রয়াগ-দুর্গের সেনাধ্যক্ষ প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বনম্পতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীরঞ্জনকে উক্ত অক্ষয়বট পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত করেন। ডক্টর রঞ্জন পরীক্ষা করিয়া বলেন, উক্ত বটবৃক্ষ পাঁচ-ষট্টি বৎসরের অধিক পুরাতন। উহার মুগা বৃহৎ শাখাটিকে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে ভূমি হইতে ছয় ফুট উচ্চে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

# শ্রীশ্রীসারদামণি

মন্মথ রায়

প্রথম দৃশ্য

১২৬৬ সালের বৈশাখ মাস

[ জয়রামবাটী । রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহ । বিবাহ-বাসর । পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন । অদূরে সানাই বাজিতেছে । ]

রামচন্দ্র । ওহে ত্রৈলোক্য ! এদিকে শোন ত ।

ত্রৈলোক্য । কি দাদা ?

রামচন্দ্র । আর দাদা ! দাদার তোমরা যা মর্যাদা রাখছ । সারদামণি—নামেই আমার মেয়ে । কিন্তু কাকাদের কোলে-পিঠেই ও মানুষ । আজ তার বিয়ে—তা তোমার মূণে হাসি নেই, আর ছোট কাকা নীলমাতবের ত দেখাই নেই । একটা কথা জেনে রাখ ত্রৈলোক্য । আমি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—আমি লোক চিনি । মেয়েকে আমি জলে ফেলে দিই নি—জলে ফেলে দিই নি—দেখো তোমরা ।

ত্রৈলোক্য । কি জানি দাদা, আপনি মেয়ের বাপ—সংসারের কর্তা । বগন যা বলবেন করব । কিন্তু নীলমাতব অবুঝ । দেখে এলুম ঠাকুরঘরে বসে সে কাঁদছে ।

রামচন্দ্র । দেখ দেখি—কি সব কাণ্ড । তুমি এখানে বসে সব দেখাশোনা করো । আমি ওকে দেখছি ।

( নীলমাতবের প্রবেশ )

হ্যাঁয়ে নীলমাতব, তুই পাগল না ক্যাপা ? তোর আদরের সাক্ষ—আমাদের সকলের বুকের ধন সারদামণির বিয়ে হচ্ছে, আর তুই এই ঠাকুরঘরে একলাটি গোমড়া মূণে বসে রহেছিস ? চল—

নীল । না দাদা, আমি যাব না । আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল । তারপর বব্বাজীরা নিজ্জমুখেই সব বলছে ।

রাম । কি—কি বলছে ?

নীল । তিনশো টাকা পণের লোভে আমরা কচি মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলাম ।

রাম । বটে !

নীল । কি দরকার ছিল এত তাড়াহুড়া করে এই বিয়ে দেবার ? স্পষ্ট মনে আছে বারোশ' বাট সালের আটই পৌষ ওর জন্ম । আর এই ছেড়টি সালের বোশেখে ছ'বছরে পড়তে না পড়তেই হয়ে গেল ওর বিয়ে । আর সেই বিয়ে কিনা একটা ক্যাপা পাগলার সঙ্গে ।

রাম । মুখ সামলে কথা বলবি নীলমাতব । ঐ ত বব্বা ভিঁড়িতে বসে আছে । এসে দেখ ওর পাগলামিটা কোথায় । বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করছে—কি স্পষ্ট, কি অর্থবোধ ! তোরা কেউ এমনটি পারবি নে । কলকাতার সেরা ধনী রাণী রাসমণি—তিনি কি আর

না দেশে শুনে চক্ষিণ বছরের ছেলে ঐ গদাধর চাটুজ্যকে তাঁর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পূজারী করেছেন ?

নীল । জানি দাদা জানি । কিন্তু সেই ত হয়েছে কাল । বারো বছর ধরে কালীপূজা করতে করতে মাথাটি ওর একেবারে বিগড়ে গেছে । ও নাকি মা-কালীকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা কয় । রাণী রাসমণিও বব্বা রাসমণি তাঁকেও নাকি চড় মেয়েছে । টাকাকে মাটি, মাটিকে টাকা, এই রকম হ'ল ওর ধারণা । এসব পাগলামি নয় ?

রাম । এ সব জাতি-শত্রুর ঘটনা । আমি ত কথাবার্তা করে দেখলুম । এ সব লক্ষ্য ত কিছুই পেলুম না ।

নীল । এখন ত কিছু পাবেন না । আমি যে সব শুনলুম । ছেলের এই পাগলামির খবর পেয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে ধরে এনে মা চন্দ্রমণি দেবী আর মেত্র ভাই রামেশ্বর চাটুজ্য অনেক শাস্তিস্বভাৱন, ঝাড়ুকু করে তবে কিছুটা সুস্থ করেছেন । অন্ত-দিকে মন ফিরিয়ে সংসারে বাঁধবার জন্তে তাড়াহুড়া এই বিয়ের ব্যবস্থা । কিন্তু জেনে রাখুন দাদা, এ পাত্র মেয়েকে বলি দিতে কেউ রাজী হয় নি । রাজী হয়েছেন শুধু আপনি ।

রাম । হ্যাঁ আমি । তবে তুইও জেনে রাখ নীলমাতব, এ বিয়ে আমরা কেউ ঠিক করি নি । এ বিয়ে ছেলে-মেয়ে নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে । জানিস ত নীলমাতব, দেব-ইচ্ছার সারদার জন্ম । তোর বৌঠান শ্রীমাতুলদেবী একদিন স্বপ্ন দেখেন, লাল চেলিপরা একটি পাঁচ-ছ' বছরের দেবীমূর্তি ওর ঠাঠে প্রবেশ করেন । তার পরই হয় সারদার জন্ম ।

নীল । জানি দাদা । আর তা জানি বলেই আজ আমাদের হঃখ । এই মেয়ের ত্রিভুবনে তুমি আর বর পেলে না ?

রাম । কিন্তু দেবী যে নিজেই তার বর নির্বাচন করে বসে আছে । আমি তার কি করব ? একদিন শিহড়ে স্বদয় মুখোজ্যের ঘরে ওকে কোলে নিয়ে আমি গান শুনেতে বাই । গান ভাঙল । অত লোক দোঁপয়ে রহন্তু করে আমি বললুম—বল মা সাক্ষ, এদের মধ্যে তুই কাকে বিয়ে করবি ? হ'হাত তুলে মা আমার হাকে দেখাল, সে হ'ল গিয়ে এই ছেলে—এই গদাধর । পরিচয় নিয়ে জানলুম স্বদয় মুখোজ্যেরই মামা ।

নীল । কাছে ছিল দেখিয়েছে । গদাধর না থেকে হলধর থাকলে তাকেও দেপাত । কচি মেয়ের এই অর্থহীন খেলাটাই আজ আপনার কাছে এত বড় হয়ে দাঁড়াল দাদা ?

রাম । অর্থহীন নয় ভাই, অর্থহীন নয় । সেদিনকার এই কথা আমাদের কারুরই মনে ছিল না নীলমাতব । কিন্তু ছেলেটি তা ভোলে নি । পাত্রী বগন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না,

ঐ গদাধরই তখন বাড়ীর সবাইকে বলে দিলে—জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখগে যাও।

(চঠাং ত্রৈলোক্যের প্রবেশ)

ত্রৈলোক্য। দাদা—সর্বনাশ! শীগগির এস।

রাম। কি হয়েছে ত্রৈলোক্য—কি হয়েছে?

ত্রৈলোক্য। ভীষণ অমঙ্গল। বিয়ের জী-আচারে মেয়েরা সাতাশ কাটি ছেলে বধন বরের চারপাশে ঘুরছিল, তখন জালা কাঠির আগুনে বরের হাতে বাঁধা, গায়ে-হলুদের মাল্লিক স্ততো পুড়ে গেল।

নীলমাধব। আমি জানতুম—আমি জানতুম তিনশো টাকা পণ পেয়ে দুখের মেয়েটাকে আমরা বলি দিলুম—বলি দিলুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

১২৭৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস

[জয়রামবাটী। সারদামণির পিজালয়। সারদামণির মা'গা শ্রীমাস্তন্দরী পূজা সারিয়া উঠিলেন।]

শ্রীমা। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

[এমন সময় গ্রামের সঙ্গোপ-কন্ডা ভানু দাসী আসিয়া দাঁড়াইল]

ভানু। আমার সারদামণি কোথায় বোঁঠান?

শ্রীমা। কে—ভানু? শব্দবাবড়ী থেকে কবে এলি তুই?

ভানু। এই ত আজ সকালে।

শ্রীমা। জামাইও এসেছে নাকি রে?

ভানু। না বোঁঠান, জান ত সঙ্গোপের পো। আর এটা হ'ল গিয়ে বিয়ের মাস—দইয়ের বায়না পেয়ে মেতে আছেন। তা, সাক্ষ কোথায়?

শ্রীমা। ধবলী গরুর নতুন বাছুর হয়েছে। খড়ের অভাব—নিজেই গেছে পুকুর থেকে দল-ঘাস কেটে আনতে। সংসারের কাজ নিয়েই মেতে আছে।

ভানু। এমন মেয়ে—বিয়ে হ'ল—তাও স্বামী নিয়ে ঘরকন্ডা করতে পারল না। বিয়ের পর শব্দবাবড়ী কি আর গিয়েছিল?

শ্রীমা। তা তিন বার গেছে। কিন্তু জামাই ছিল না। বিয়ের পর কলকাতা গিয়ে সেই যে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাই নিয়েছে, আর বাড়ীঘুণে হবার নামটি নেই। মাকেও নিয়ে গেছে কিন্তু বোঁকে নিল না। এদিন না হয় ছোটই ছিল, কিন্তু—বাট—এখন ত সাক্ষ আমার তেরো পেরিয়ে চৌদ্দর পা দিয়েছে। মেয়েটার দিকে আর আমি তাকাতে পারি না—ভানু। আমার গল্পনাই কি কম? আমরা নাকি জেনে শুনে একটা পাগলের গলায় যুক্তোহার ঝুলিয়ে দিয়েছি।

ভানু। লোকে যা বলে বলুক। কিন্তু আমি বলছি, আমা-সের ঐ ক্যাপা ঠাকুরটি হচ্ছেন সাক্ষাং ভোলানাথ শিব। লোক

দেখেই বোঝা যায় বোঁঠান। বাক্—চলি। সাক্ষ এলে আমার কথা বলো।

ভানুর প্রস্থান

শ্রীমা। তুমি কে বাবা—ওখানে দাঁড়িয়ে?

ছিদাম। মা ঠাকুরণ, আমি ছিদাম—তোমাদের ক্ষেতের কাজ সেবে জলপানি নিতে এসেছি। তা সাক্ষ দিকিকে ত দেখছি না।

শ্রীমা। ধবলীর জন্তে দল-ঘাস কেটে আনতে গেছে রে ছিদাম।

ছিদাম। তাখ দেখি। অবলা গরুর জন্তেই কত দয়া—মামুষের ত কথাই নেই। তিন বছর আগে সেই যে দুর্ভিক্ষ হ'ল, হাঁড়ি হাঁড়ি পিচুড়ি বেঁধে কত লোককেই না তোমরা পাইয়েছ। পেট ফিফের জলে বাচ্ছে, অথচ পিচুড়ি এত গরম—মুখে দিতে পারছি না দেখে দিদি ছুটে এসে পিচুড়ি শীগগির জুড়োবে বলে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে বসে গেল। সে কথা আরও সবাই বলে থাকে মা।

শ্রীমা। তুমি এখন একটু ঘুরে এস ত বাপু। এ সব কথা শুনেতে আর আমার ভাল লাগে না। দয়ার শরীর—দয়ার শরীর—কিন্তু ওকে আর কে দয়া করছে?

ছিদাম। তা যা বলছ মা ঠাকুরণ। এমন সোনার পিতিমে! আচ্ছা আমি আসছি।

ছিদামের প্রস্থান

শ্রীমা। এট কাহ, শুনে যা।

দ্বিতীয় কন্ডা কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। তুমি মা আর আমাকে 'কাহ' 'কাহ' কর না। দিকিকে 'সারদা' বল, আমার ছোটটা—তাকেও 'প্রসন্ন' বল, আর আমার কাদম্বিনী বলতে পার না?

শ্রীমা। বেশ, না হয় কাদম্বিনীই বলছি। তা এত বেলা হ'ল—তোরা সব পাবি আর।

কাদম্বিনী। দিদি ফিরে না এলে কি করে পাব?

শ্রীমা। কেন? আমি খেতে দিচ্ছি।

কাদম্বিনী। 'দিদি' ভাত পাইয়ে না দিলে পেটই ভরবে না কারুর। দিদি আসুক, পাব।

কাদম্বিনীর প্রস্থান।

শ্রীমা। পালি দিদি আর দিদি। এই দিদি শব্দবাবড়ী গেলে তখন কি হয় দেখব।

(শ্রীমাস্তন্দরীও চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় রামচন্দ্র ও নীল-মাধবের প্রবেশ)

রাম। না, না গিন্নী বেও না—দাঁড়াও। শোন নীলমাধব কি বলছে। এই যে সাক্ষ তুইও এসে পড়েছিল। ভালই হ'ল। তুইও শোন।

সারদার প্রবেশ

সারদা। দল-ঘাসগুলো গোয়ালে বেধে আমি আসছি বাবা।

রাম। না, না, তোরও বে শোনা দরকার। ঘাগগুলো নামিয়ে রাখ।...কামারপুকুরে আমার ফাপা বাবা এদিন পর হাজির হয়েছেন। এসেই জোর তলব—তোকে আজই বেতে হবে। লোক পাঠিয়েছেন। কিন্তু নীলমাধব বেকে বসেছে। তোকে যেতে দেবে না।

নীল। কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? লোকটা কে? শুনেছিস ত সব। দক্ষিণেশ্বর ত এমন কিছু দূর নয়—খবর সবই আসে। ঝশানে-ঝশানে জাটা হয়ে বাঁশ কাঁধে করে বেড়ায়। কাঙালীদের এঁটো গায়। কখনও বসে থাকে স্বাবর-হির অসাড় হয়ে। কখনও সন্ন্যাসী—রামনাম জপছে। আবার কখনও ককির—আল্লা আল্লা করছে। এখানেও বে এসেছে—সঙ্গে নাকি একটা ভৈরবী বামনী। এই লোকের কাছে মেয়ে পাঠাতে হবে? মেয়ে কি জলে পড়ে আছে?

শ্যাম। তবু ত স্বামীর ঘর। স্বামী যখন যেতে বলেছে—হ্যাঁ গা, তুমি কি বলো?

রাম। আমি আর কি বলব। এ সব ত শুধু আজই শুনেছি না। শুনে শুনে আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। তুই চুপ করে আছিস কেন সারু? বাপের সংসারে বসে বসে সারা জীবন কি শুধু ঘাসই কাটবি?

সারদা। আমি বাব বাবা। আমার নিয়ে চল কাকামণি। পাগল হোক, আর যাই হোক—মা তুমিই বলেছ, তিনিই আমার দেবতা। তোমার কথা সিঁধো হবে না মা। আমাকে যেতে দাও।

### তৃতীয় দৃশ্য

কামারপুকুর। গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের গৃহ। কাল—সন্ধ্যা। গদাধর ও প্রাণের অনেক নরনারী উপস্থিত রহিয়াছেন। কালীকীর্তন হইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। জনতার মধ্যে ঢাকলা দেখা গেল। কোলাহল উঠিল।

—দেখ, দেখ, গদাধরের কি হ'ল?

—মূর্ছা গেছে—মূর্ছা গেছে।

—মূর্ছা নয়—ভাবাবেশ হয়েছে।

—গদাধর, গদাধর, নাঃ কোন সাড়া নেই।

—ওনেছি, দক্ষিণেশ্বরে গুঁর এ রকম প্রায়ই হ'ত। ভয় কিছু নেই।

—কিন্তু কামারপুকুরে এসব এই প্রথম।

—ওহে বাড়ীর ভিতর খবর দাও—ওরা সব আসুক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরপকে আর হৃদয় ভায়েকে ডেকে আন।

—ভৈরবী ব্রাহ্মণী! সে আবার কে?

—দেখ নি, দক্ষিণেশ্বর থেকে সঙ্গে এসেছে। গুঁর নাকি শিক্ষাগুরু।

—কি জানি বাপু, আমার ত ভীষণ ভয় করছে।

—বেঁচে আছে ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বেঁচে আছে—শুধু জ্ঞানই নেই।

—এই যে হৃদয় ভায়ে এসে গেছে।

—সর, সর, বাড়ীর মেয়েরাও সব এসে গেছে।

হৃদয়। মামা ও মামা।

১ম লোক। কই সাড়া দিচ্ছে না ত। কব্বরেজ ডাকবো?

হৃদয়। না, দরকার নেই। ও ভৈরবী ঠাকুরপ, আপনি আসুন।

ভৈরবী। সর ত বাবা, আমি ডাকছি।...ঠাকুর—ঠাকুর জাগ। তারা ব্রহ্মময়ী, তারা ব্রহ্মময়ী, তারা ব্রহ্মময়ী। এই ত বাবা আমার জেগেছে।

হৃদয়। মামা, আমার চিনতে পারছ? আমি—আমি তোমার হৃদয়...হ্যাঁ চিনেছে।

গয়াবিষ্ণু। আমাকে চিনতে পারছ ভাই? আমি গয়াবিষ্ণু। চিনছ না! আরে, আমি গয়াবিষ্ণু লাহা—তোমার ছোটবেলার খেলার সাথী।...চিনেছে। হ্যাঁ ঐ হাসছে। বল ত ইনি কে? চিনলে না? ঐনিবাস শাখারী। তোমাকে কত ভালবাসেন।... এই ত চিনেছেন।

ধনী। আমাকে চিনছ বাবা? আমি ধনী কামারণী।

গদাধর। তুমি ভিক্ষা-মা।

হৃদয়। আর বল ত ইনি কে?

গদাধর। তোদের সারদামণি, আমার চোপের মণি [সকলের হাসা]

হৃদয়। হ্যাঁ এই ত মামা আমার মামা হয়েছে। মামা এখন একটু একলা থাক।

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ভাল।

—চল হে চল।

—কাল আসব।

—হ্যাঁ কাল আবার আসব।

সকলের প্রস্থান।

ভৈরবী। আমি পূজায় চললুম হৃদয়।

ভৈরবীর প্রস্থান

হৃদয়। আমিও গেতে বসে উঠে এসেছি। চল ত মামা, যবে চল। ওঠ। মেজ মামী, ছোট মামী, তোমরাও ধর। ওরে লক্ষ্মী, তুই ছুটে গিয়ে মামার বিছানাটা ঠিক করে রাখ।—বুঝলে মেজ মামী, বুঝলে ছোট মামী, দক্ষিণেশ্বরে এসব আমাদের হামেশাই ভুগতে হয়। ভয়ের কিছু নেই।

## চতুর্থ দৃষ্ট

গদাধরের শরনকক্ষ। কাল—রাত্রি। গদাধর ও সারদামণি কথোপকথনে বস।

গদাধর। কি গো? আমার অমন দশা দেখে তুমি বুঝি খুব ভর পেয়েছিলে?

সারদা। প্রথমটায় ভর পেয়েছিলাম বৈকি, তারপর সবাই বণন বললে—দক্ষিণেশ্বরে তোমার এমন হয়ে থাকে, তখন ভর গেল। ভৈরবী ঠাকরণ কাছে আছে দেখে মনে সাহস হ'ল।

গদাধর। হ্যাঁ আমার এমন হয়। জ্ঞান থাকে না—বুঝলে? আমি যে কোথায় চলে বাই—মনে থাকে না। তখন শুধু দেখি, আমি আর মা, মা আর আমি।

সারদা। কোন মা? আমার শাওড়ীর কথা বলছ? তাঁকে ত দক্ষিণেশ্বরে বেঁধে এসেছ।

গদাধর। (চাসিরা) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সে মা, আমার সে মায়ের মা—তার মায়ের মা—জগতের মা। শুধু দক্ষিণেশ্বরে কেন, তিনি আছেন সর্বত্র। হ্যাঁ গো, ঐ যে জানলা দিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে দেখছ। ঐ চান্দামা সবায় মামা ত? অগজ্জননীও তেমনি। সবাইই আপনার জন। সবাইকেই তিনি ভালবাসেন। তুমি ডাক, তুমিও দেগবে—সাড়া পাবে। আমাকে কিছু খেতে দিলে না যে?

সারদা। ওমা, সে কি গো! তুমি যে এই খেলে।

গদাধর। কৈ খেলুম? আমি ত এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি, কৈ পাওয়ালে?

সারদা। বা রে!

গদাধর। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুড়ি আর মেঠাই পেয়েছি। এই দেখ আমি সব ভুলে বাই।

সারদা। তা তুমি বাও। বিয়ে করে আমাকে দেশে বেঁধে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে আমাকে ভুলে গেলে। একদিন নয়, দু'দিন নয়—বছরের পর বছর—আটটি বছর আমি একলা আছি।

গদাধর। একলা কি গো? আমি যদি এ ঘর থেকে ও ঘরে বাই, তার মানে কি—আমি নাই?

সারদা। তা কেন হবে?

গদাধর। এ-ও ত তাই। আর আমি ও ঘরে গেলেই কি তুমি আমার ভুলে যাবে?

সারদা। ভুলে যাব কিগো? ছাড়াছাড়ি হলে আরও বেশী মনে হয়, আরও বেশী মনে পড়ে।

গদাধর। তবে? সারদামণি—তবে? এই—এই দেখ, তোমার পিদিমটা বুঝি নিভে যাচ্ছে।

সারদা। না নিভবে না। আমি উসকে দিচ্ছি।

গদাধর। এ সলতে কে পারিয়েছে? তুমি?

সারদা। হ্যাঁ গো। কেন?

গদাধর। হয় নি। এই দেখ—আমি পাকাছি। সলতে পাকাতো হয় এমনি করে। শিখে রাখ।

সারদা। হ্যাঁপো, তুমি এত জান! শুধু জান না বৌ নিয়ে ঘরকন্না করতে।

গদাধর। (হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি কিনা দেখবে এখন।

সারদা। তবে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ এবার?

গদাধর। না গো না, এবার নয়। সময় হলই নেব।

সারদা। বেশ, তাই হবে। কিন্তু গিয়ে খবর-টবর দিও। কোন খবর না পেলে আমি টিকতে পারি না।

গদাধর। টিকতে পারবে না কি গো? তেমন ব্যাকুলতা এলে তোমাকে ধরে রাখবে কে? যেও। তবে হ্যাঁ, পথ চলতে সাবধান—খুব সাবধান। গাড়ীতে বা নৌকোর বাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিসটা নিতে ভুল হলেই কিনা দেখে-শুনে সকলের শেষে নামবে। তা ছাড়া কলকাতা শহর—ওরে বাপরে। পেঙ্গায় ব্যাপার। সেখানে কিভাবে চলতে হয়—লোকজনের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়—সেসব শেখাতে গেলে গোটা রাতই কেটে যাবে সারদামণি।

সারদা। যাক—তুমি বল।

## পঞ্চম দৃষ্ট

১২৭৮ সালের চৈত্র মাস।

[জয়রামবাটি। সারদামণির পিত্রালয়। শ্রীমাস্তন্দরী পৈতা কাটিতেছিলেন, ভানুপিসী আসিরা প্রবেশ করিল।]

ভানু। আচ্ছা বৌদি, বখনই আসি, তখনই দেখি—তুমি পৈতে কাটছ, হাত বাধা করে না?

শ্রীমা। আর, আর ভানু—বোস্। একপাল ছেলেমেয়ে হয়েছে—আর বোকার উপর শাকের আঁটি হয়েছে ঐ সারদা—উপরি যোজগার না হলে কি করে চলে বল?

ভানু। কিন্তু বৌদি, তাই বলে আমার সার বোকা বলতে পার না। তিনটে মানুষের কাজ ঐ একটা মেয়ে করছে।

শ্রীমা। দশটা লোকের কাজ করলেও বোকাই বলব। কেন বলব না? স্বামীর সংসারে আজ বাব হেসে খেলে বেড়াবার কথা, কেন সে আজ খেটে মরবে আমার ঘরে? আমার ঘাড়ে কেলে দিয়ে লোকটা আজ চার বছর হ'ল কলকাতা চলে গেছে। জিজ্ঞেস নেই, পত্নর নেই—লোকনিষেধ কান কালাপালা হয়ে গেল। মেয়েটা মরলে আমি এখন বাঁচি।

(শ্রীমাস্তন্দরীর প্রস্থান, সারদার প্রবেশ)

সারদা। ব্যাপার কি পিসী, মা অমন চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল কেন?

ভানু। আর কেন? তোর জ্বালা বর তোকে কেপিয়ে তুলতে পারুক আর না পারুক, তোর মাকে কেপিয়ে তুলেছে।



গোটা জয়রামবাটি গাঁটাকে ফেপিরে ভুলেছে। হ্যাঁ, তোর হুংগে পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।

সারদা। কিন্তু জান তো পিসী, হুংগে আর আমি কবি না। হুংগে সে দিয়েছে সন্তি, কিন্তু হুংগে সইবার শক্তিও সে-ই দিয়ে গেছে। তোমায় বলেছি তো পিসী, যে আনন্দের পূর্ণঘট তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন, এই চার বছরেও তার এতটুকু ক্ষয় হয় নি।

ভাসু। দেখ দেখি, আর এই লোকটাকেই কিনা সবাই বলছে—ক্যাপা দিগম্বর। তা আমি তো বলি সাক, জামাই আমার দিগম্বর, শঙ্করও তো। তুই ত নিজের চোখেই দেখেছিস সেই শিবের চোখমুখ। দেখিস নি?

সারদা। দেখে আশ মেটে না—আশ মেটে না ভাসুপিসী। (কোঁপাইয়া কাদিয়া উঠিল)।

ভাসু। “লাখ লাখ যুগ হিরে হিয়া বাগমু।

তবু হিয়া জুড়ন না গেল।”

তা কঁাদছিস কেন সাক? সামনের এই কান্দন পূর্ণিমায় ঈশৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে এখান থেকে কত লোক বাবে গঙ্গান্নান করতে কলকাতায়। তুইও তোর বাবাকে নিয়ে যা না। বখ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে। তুই ভাবিস নে। দাদাকে বলে আমি সব ব্যবস্থা করছি।

বৃষ্টি দৃশ্য

[ দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের (ঠাকুর রামকৃষ্ণের) বাস-কক্ষ।

ঠাকুরের ভাগিনের হৃদয় ছুটিয়া আসিল ]।

হৃদয়। ও মামা, আছ কোথায়? এদিকে যে জয়রামবাটি থেকে ছোটমামী এসে উপস্থিত।

রামকৃষ্ণ। কোথায় যে হৃদয়?

হৃদয়। কোথায় আবার—এই দক্ষিণেশ্বরে। ঐ তো ঘাটে নৌকো ভিড়েছে। বাপের সঙ্গে এসেছে কান্দন পূর্ণিমায় গঙ্গা-নাইতে। ঘাটে আমি মুখ ধুতে গিয়েছি। গিয়ে দেখি অবা কাকু।

রামকৃষ্ণ। তা বেশ, তা বেশ। কিন্তু ও হৃদয়, বারবেলা নেই তো? প্রথম বার আসছে।

হৃদয়। সেকথা আমার সঙ্গে হয়ে গেছে। তা দেখলাম ছোটমামীর জ্ঞান টনটনে। বলে কিনা—আমি গঙ্গার উপরেই নৌকোর বারবেলা কাটিয়ে এসেছি। বুঝলে মামা, না-ছোড়-বাপা।

রামকৃষ্ণ। আরে মলো! লোকটা কোথায় না বলে বক্তিতে শুরু করে দিয়েছে।

হৃদয়। আরে, লোকটা তো তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে। চোখের মাথা না খেতে তো এতক্ষণ দেখতে। এসো মামী—এসো। আমি বাই মুখোজো মশারের আদর-আপায়ন করে আসি।

হৃদয়ের প্রস্থান

রামকৃষ্ণ। কি গো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসেছ বেশ

করেছ। হৃদয় আগে এলে না কেন? আর কি আমার সজ-বাবু আছে, যে তোমার বড় হবে? আরে, সেই যে মধুর বাবুগো—বাণী বাসমণির জামাই। কি ভালই না আমার বাসত। তা এই পরলা শ্রাবণ সন্ধ্যানে দিব্যধামে চলে গেল।

সারদা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

রামকৃষ্ণ। আমার তো প্রণাম করছ। মন্দিরে গিয়ে ভবতারিণী মাকে প্রণাম করেছ? নহবতখানার গিরে আমার চন্দ্রমণি মাকে প্রণাম করেছ?

সারদা। এইবার বাব।

রামকৃষ্ণ। আরে, তোমার কপালটা আঙনের মত গরম। জ্বর হয়েছে নাকি?

সারদা। পথে জ্বরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম। আর দেখা হবে ভাবি নি। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম একটি কালো মেয়ে—কি তার রূপ—আমার মাথার হাত বুলিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দিল। আমার বললে—“ভয় কি? দক্ষিণেশ্বরে বাবে বৈকি। সেখানে বাবে, তাকে দেখবে। তোমার জন্মই তো তাকে সেখানে আটকে রেখেছি।” বুঝলে গো, তাই আসতে পেরেছি। নইলে পথেই আমার শেষ হ’ত।

রামকৃষ্ণ। বটে! তা ঐ বেটিই তোমাকে টেনে এনেছে। কিন্তু এখন ঠালা সামলায় কে?

হৃদয়ের পুনঃ প্রবেশ।

হৃদয়। কি আবার ঠালা?

রামকৃষ্ণ। ও হৃদয়! জ্ঞান দেখি—গায়ের জ্বর। ঠাণ্ডা লেগে এখনি হ হ করে বেড়ে বাবে। আমার এই ঘরেই আর একটা বিছানা করে দে। কোবরেজকেও ডাকতে হবে। আর জ্ঞান একটু সাঙ-বাগি—তাও ভুলিস নি।

সারদা। না, না, আমার জন্ম ভূমি এত উত্তলা হচ্ছ কেন?

রামকৃষ্ণ। কেন গো? ভূমি কি আমার পর, ভূমি কি আমার ফেলনা? না, না—বা’ হৃদয়, বা—

হৃদয়। ওরে বাবা। যাচ্ছি—

সপ্তম দৃশ্য

[ দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানা। চন্দ্রমণি দেবী গঙ্গান্নানে বাইতেছিলেন ]।

চন্দ্রমণি। বোমা—বোমা—ও বোমা—

সারদা। (নেপথ্য হইতে) ভাতের হাঁড়টা চাপিয়ে আসছি মা।

চন্দ্রমণি। এই যে গদাধর, আর বাবা—আর।

রামকৃষ্ণের প্রবেশ

চন্দ্রমণি। জ্ঞান এসে—নহবতখানার উপরের এইটুকু ঘরে এক দিনের ভিতর বোমা আমার কেমন সোনার সঙ্গার সাজিয়েছে।

বত বলি, জ্বর থেকে উঠেছ—ও শরীরে সইবে না। তা শুনছে কে ?

রামকৃষ্ণ। কিন্তু তার আগে বল দেখি মা নহবতথানার এই ঘরে ঢুকতে চোঁকাঠে ওর ক'বার মাথা ঠুকেছে ?

চন্দ্রমণি। (হাসিয়া) সে ঠুকবে তোয়। বোঁমা আমার হিসেবী আছে। চাপ না একদিনেই কেমন গোছগাছ করেছে। আমাকে বাঁধতেও দিলে না।

রামকৃষ্ণ। ইং, বোঁর হাতে দেবাবত পেয়ে তোমার মুণ্ণানি চিক্‌মিক্‌ করছে যে ! আনন্দ আর ধরে না দেখছি।

চন্দ্রমণি। মন তো এসব চায়ই। কিন্তু হবে কি ? তুই বোস।

সারদার প্রবেশ।

চন্দ্রমণি। এই যে বোঁমা। ওকে কিছু পেতে দাও। আমি গন্ধায় ডুব দিয়ে আসছি।

চন্দ্রমণির প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ। কি গো ! এ যে একেবারে জাঁকিয়ে বসেছ দেখছি।

সারদা। জান তো, বসতে পেলেই শুতে চায়।

রামকৃষ্ণ। (চমকিয়া উঠিয়া) বাঁ ! বল কি গো ! তুমি কি আমার সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ ?

সারদা। না। আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টানতে বাব ? আমি বশন তোমার সহধর্মিণী, তোমার ইষ্টপথেই সাগাষা করতে এসেছি। থাকবো আমি ?

রামকৃষ্ণ। (উৎফুল্ল হইয়া) সহধর্মিণী ! বাঃ, বেশ কথা বলছে। সহধর্মিণী বশন, কেন থাকবে না ? একশো বাব থাকবে—লাগেবাব থাকবে। আমি গিয়ে এখনি স্বত্তরমশায়কে বলে দিচ্ছি—আপনি মশায় আসুন, উনি বাবেন না।

অষ্টম দৃশ্য

[ দক্ষিণেশ্বরে জীৱামকৃষ্ণের শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি।

ভাব-সমাধিতে মগ্ন জীৱামকৃষ্ণ। ভীতা সারদামণি কাদিতে কাদিতে তাঁহার চৈতন্তসম্পাদনে নিযুক্ত। ]

সারদা। ওগো—শুনহ, শুনহ—কথা বল—কথা বল। নাঃ, কই জ্ঞান তো কিরে এল না। এত রাতে একা আমি এখন কি করি—(কোঁপাইয়া কাদিতে কাদিতে) মা ভবতারণী—দয়া কর মা—দয়া কর—কালী কৃপাহি কেবলম্—কালী কৃপাহি কেবলম্—কালী কৃপাহি কেবলম্।

জীৱামকৃষ্ণের চেতনা কিরিয়া আসিল।

রামকৃষ্ণ। মা—মাগো ! তুই কোথায় মা ?...একি তুমি !

সারদা। আমি সারদা—আমি তোমার সারদা।

রামকৃষ্ণ। ই্যা সারদা—আমার সারদামণি। এই শেব রাতেও তুমি বসে আছ ? শোও নি ?...একি ! তোমার চোখে জল কেন ? কাদছিলে বুঝি ?

সারদা। বোজ রাতে শুতে এসে তোমার ভাব-সমাধি হয়। এক এক দিন অন্তেই জ্ঞান কিরে আসে, কিন্তু এক এক দিন এমন হয় যে, আমি ভাবি ভাব পাই। ভয়ে রাতে আমার ঘুম হয় না।

রামকৃষ্ণ। বটে, তাই তো ; এই ক'মাস তুমি সারা রাত বেগে কাটিয়েছ ? চাপ সারদামণি, তুমি যদি এইভাবে সারা রাত বেগে বসে থাক, তবে নহবতথানায় মার কাছ তোমার শোবার ব্যবস্থা করব কি বল ?

সারদা। আমি কি বলব, তোমার যা ইচ্ছা।

রামকৃষ্ণ। আমার ইচ্ছা তো সারদামণি, এখন তুমি আমার গায়ে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও।

সারদা। দিচ্ছি।... (ক্ষণপরে) ওগো, একটা কথা বলব ?

রামকৃষ্ণ। আরে, ঘুমের দফা তো গয়া ! কেন বলবে না ?

সারদা। কেউ কেউ বলছে—তাই তো ! ছেলেপুলে একটা হবে নি ? সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে ?

রামকৃষ্ণ। একটা ছেলে কি খুঁজছ গো ? তোমার এত ছেলে হবে যে, তুমি 'মা' ডাকে তিষ্ঠাতে পারবে নি।

সারদা। (দুঃস্থ হইয়া) বটে ! আমাকে তোমার কি মনে হয় ?

রামকৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ ! কি মনে হয় ? যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরে জন্ম নিয়েছেন—সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন—আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। হাঃ হাঃ হাঃ—

নবম দৃশ্য

১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

[ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বাস-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

জীৱামকৃষ্ণ ও হৃদয় কথোপকথনে রত।

রামকৃষ্ণ। আর এক দিনের কথা শোন হৃদয়। তোর মাসী আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে। আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। সারদাকে একমনে দেখতে লাগলাম। বিচার করে মনকে বললাম, মন, এইই নাম স্ত্রী-শরীর। লোকে একেই পরম উপাদেয় ভোগ্য-বস্তু বলে জানে এবং ভোগ করবার জন্য সর্বক্ষণ লালারিত হয়। কিন্তু এটা গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়। সন্নিধানন্দন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মন, তাবের ঘরে চূরি করো না। পেটে একপানা, মুখে একখানা রেণ না। সত্য বল, তুমি একে চাও, না ঈশ্বরকে চাও—যদি এ চাও, তবে এই তো তোমার সম্মুখে রয়েছে—নাও, বলেই সারদার দেহ স্পর্শ করতে গেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন চলে গেল সমাধি-পথে। সে রাতে আর চেতনা হ'ল না হৃদয়। বহু কষ্টে তোরা পরের দিন আমার চেতনা আনলি।

হৃদয়। জানি মাসী, জানি। ধন্ত মাসী তুমি।

রামকৃষ্ণ । আমি আর কি শ্রুত যে—শ্রুত তোমার ছোটমামী । ও যদি এত ভাল না হ'ত—আম্বাহার্য হয়ে তখন আমাকে যদি আক্রমণ করত তা' হলে সংসারের বাঁধ ভেঙে দেহবৃদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পাবে হুহু ? তাই আজ এই অমাবস্তায়—ফলাহাবিণী কালিকাপূজার এই পুণ্য রাতে আমি ঐ সারদাকল্পিণী ভগবদ্বার অংশকে পূজা করব যে হুহু, পূজা করব ।

হৃদয় । তোমার সব কথাই মানছি মামা—বিশ্বাসও করছি । কিন্তু তাই বলে নিজের স্ত্রীকে মায়ের আসনে পূজা করা—পৃথিবীতে এ কেউ কখনও করেছে, না করে ? না না মামা, এসব পাগলামি করো না ।

রামকৃষ্ণ । যে আমার স্ত্রী, সে যদি মা হয়ে আমার এই পূজা নিতে রাজী হয়—তবে তোমার আপত্তি কিরে হুহু ? রাত ন'টা বাজে—পূজার সময় হয়েছে—

হৃদয় । তোমার পেটে এত ! তাই আমার দিয়ে এবরে পূজার আয়োজন করিয়েছ । কিন্তু মামা এখনও ভেবে ছাণ ।

রামকৃষ্ণ । ভাবা আমার শেষ । আমার দেবী এসে গেছেন । এসো সারদামণি ।

সারদার প্রবেশ ।

রামকৃষ্ণ । হুহু করবে মন্দিরে আজ ফলাহাবিণী কালিকা-পূজা—আমি করব এখানে বোড়শোপচারে বোড়শীপূজা । যা হুহু, যা—

হৃদয় । যাচ্ছি ।

হৃদয়ের প্রস্থান ।

রামকৃষ্ণ । ঐ আলপনা-কাটা পিঁড়িতে বস সারদা । হ্যা, হ্যা ।...এই অ-সার সংসারে সারদান করতে এসেছ তুমি, তাই তোমার নাম সারদা দেবী । হে কালি, হে সর্বকলার অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিধার উগ্ৰাক্ষ কব, ইহার শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর ।

হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকল্মষনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণার্থিনি জিনয়নি, শিবগেহিনি গৌরী, হে নারায়ণি । তোমাকে প্রণাম—তোমাকে প্রণাম করি ।

দশম দৃশ্য

১২৮৩ সালের মাঘ মাস

[ জররামবাটা । ভানুপিসীও বাড়ী । ভানুপিসী ও সারদা দেবী কথোপকথনে বস । ]

সারদা । আজ কেমন আছ ভানুপিসী ?

ভানু । এসেছ আমার সারদা মা । বস—বস । সেই যে সেদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আমার মুখে চরণাবৃত্তের মত কিছু দিয়ে বললে—“পিসী পাও—পাও ।” সেই খেয়েই ত অস্থখ গেল—ভাল হয়ে উঠলুম । আজ কেবলই

আকশোণ, আমার কর্তার অস্থখের সময় তোমার পাই নি কেন ? তবে ত সে আর অকালে মরত না । তাকে ত আমি ধরে রাখতে পারি নি :—তুমি আমার কেন বাঁচালে মা ?

সারদা । আমি কি আর তোমাকে বাঁচিয়েছি ? ওসব ঠাকুরের ইচ্ছা ।

ভানু । ও ঠাকুরকেও চিনি—তোমাকেও চিনি । এই অস্থখে শুয়ে সত্যি বলছি মা, একদিন সাদা চোপে তোমাকে চতুর্ভুজা দেখেছি । যখন সমুখ দিকে মুখ করে, তখন দেখছিলুম ঠিক এমনি মা—খিভুজা । আর যখন আমার দিকে পিছন ফিরলে, তখন চতুর্ভুজা । সুখে কি আর ঠাকুর তোমাকে বোড়শী পূজা করেছিল মা ? আচ্ছা মা তোমার ত এত লজ্জা—তা সেই বোড়শী পূজার সময় ঠাকুর তোমার কাপড় পরিয়ে দিলে এতেও তোমার হ'স হ'ল না ।

সারদা । কি জানি পিসী ! কোন হ'সই তখন আমার ছিল না । সেদিন নাকি প্রসাদী মাংস পর্য্যন্ত খাইয়েছেন, অথচ কখনো ত মাংস খাই না আমি ।

ভানু । তখন যে তুমি সাক্ষাৎ ভগবদ্বা । তখনও—এখনও ।

সারদা । দেখ পিসী, ওসব কথা বলতে নেই । আমি সংসারের দশ জনের মতই এক জন । দেখলে না, আমায় যোগে কি ভোগটাই না ভুগলাম । আমাদের গায়ের সিংহবাহিনী মায়ের দম্বায় তবেই না বেঁচে উঠেছি । সব ভোগই আছে পিসী । এই ত ঠাকুরের বোড়শী পূজার পরই কামারপুকুরে মেজ ভানুর দেহ রাখলেন । এই সালেই আমার অমন বাপ তিনিও দেহ রাখলেন । চ'বছর যেতে না যেতেই দক্ষিণেশ্বরে শাড়ী ঠাকরণ গঙ্গা পেলেন । সেই থেকে ঠাকুরেরও আর কোন খবর পাচ্ছি না । আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে পিসী । আমি দক্ষিণেশ্বরে আবার বাব ।

ভানু । কেবল বাচ্ছ আর আসছ ! এখন ত ওখানেই থাকতে পার মা ।

সারদা । বুড়ী মা'টা যে এখনও এখানে বেঁচে আছে পিসী । তোমরাও ত রয়েছ । মায়ার বাঁধন কে কাটবে বল ? খবর পেরেছি, ভূষণ মণ্ডল দলবল নিয়ে কামারপুকুর থেকে কলকাতা বাবে গঙ্গা-স্নানে । ভাবছি, আমিও সেই সঙ্গে যাই । না, না, পিসী আবার আসব ।

একাদশ দৃশ্য

[ আশ্রমবাগ হইতে তারকেশ্বর হইয়া কলিকাতা আসিবার পথ ।

লক্ষী, শিবরাম, ভূষণ মণ্ডল ও তাহার মাতা পথে দাঁড়াইয়া সারদামণির ক্রম অপেক্ষা করিতেছে । ]

ভূষণ । আচ্ছা শিবরাম ঠাকুর, বলি তোমাদের আকলিটা কি ? শিবরাম । থুড়ীমা পথে একলা কোথায় পড়ে রইলেন, তাঁকে সঙ্গে না নিয়ে আমরা এগুও না ভূষণ ভাঠা ।

ভূষণ। আরে কি বিপদ! কতবার বলব যে, সামনের এই তেলোভেলো—কৈকলার মাঠ খুব কম করেও চার কোশ। এই চার কোশ পথ আজ সন্ধ্যার আগে যেমন করেই হোক পার হতে হবে। নৈলে ডাকাতের হাতে আমাদের একটি প্রাণীরও মাথা থাকবে না। বলতেই বলে এ হ'ল ডাকাত-মাঠ।

লক্ষী। তা আমরা জানি। আর সেই জন্যই খুড়ীমাকে ফেলে যাব না।

ভূষণের মা। দেখ বাবা ভূষণ, ও লক্ষী ঠাকরুণ ঠিক কথাই বলছে। সারদা মাকে পিছে একা ফেলে কি করে আমরা বাই?

ভূষণ। না, দেখছি তোমাদের সবারই মরণ ঘনিষে এসেছে।

নেপথ্য কণ্ঠ। এ—ভূষণ—আমরা আর দাঁড়াতে পারব না—আসবে ত শীগগির আসবে—

ভূষণ। ঐ দেখ, অত বড় দলটা চলে যায়। কি করি এখন! আরে বাপু, সারদা মা তো বলেই দিলে, তোমরা এগোও—আমি পিছে পিছে বাছি। তা যখন এল না, নুহতে হবে, শরীরটা খুবই খারাপ হয়েছে। নয়ত আর কোন বড় দলের সাথ খবেছে। আজ রাতে আরামবাগে আরাম করে কাল প্রাতে বগুনা হবে।

শিবরাম। এটা কিন্তু হতে পারে লক্ষী।

লক্ষী। বেশ, তবে তারকেশ্বর পৌঁছে খুড়ীমার জন্তে আমরা চটিতে বসে থাকব; তিনি এলে তবেই আমরা কলকাতা যাব।

ভূষণ। আরে তা নয়ত কি! সারদা মা'ই আমাদের দক্ষিণেশ্বরে নেবে, গঙ্গাস্নান করাবে বলেছে। সেই ভরসাতেই যাওয়া। তা সে যদি না আসে আমরা যেতে পারি? চল—চল—

সকলের প্রস্থান।

[ মুহূর্ত্ত পর সেগানে বান্ধী ডাকাত-দম্পতীর আত্মপ্রকাশ ]

পুরুষ। না এ শিকারও দেখছি ফসকালো বো। তুই আমার সঙ্গে বেরলেই অযাত্রা।

স্ত্রী। দেখ মুশপোড়া, অযাত্রা-অযাত্রা করিস নি। কানের মাথা খেয়েছিস? ওনলি না? ঝোপের আড়ালে বসে তবে কি ঘুরোচ্ছিলি?

পুরুষ। কি আবার তুই ওনলি?

স্ত্রী। কেন? ঐ যে বললে খুড়ী আছে পিছনে একা।

পুরুষ। সাধে কি আর মেরেলোকের দশ হাত কাপড়েও কাছা হয় না? এই বৃদ্ধি নিয়ে তুই ডাকাতের বোঁ হয়েছিস? একা আসছে মানে? ওনলি না? ব্যারামে পড়েছে, না হয় দলবল নিয়ে কাল ভোরে আসছে।

[ নেপথ্য হইতে সারদার শ্রান্ত কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল। ]

সারদা। (নেপথ্য হইতে শ্রান্ত কণ্ঠে) কালী কুপাহি কেবলম্—কালী কুপাহি কেবলম্—কালী কুপাহি কেবলম্।

পুরুষ। নারে বোঁ, তোমার কথাই ঠিক। আসছে—ঐ দেখ একাই আসছে।

স্ত্রী। ওরে, তা হলে আমি একটু সরেই দাঁড়াই। আমি রক্ত-টক্কর দেখতে পামি না।

স্ত্রীর আত্মবলে গমন। সারদার প্রবেশ।

সারদা। কালী কুপাহি কেবলম্—

পুরুষ। (বজ্রনির্ঘোষে) এই—কে যায়? দাঁড়াও।

সারদা। এই যে বাবা, তুমি এখানে আছ। বাঁচলুম।

পুরুষ। (কর্কশ কণ্ঠে) বাঁচলুম মানে?

সারদা। হ্যাঁ বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে। আমিও পথ বোধ হয় ভুলেছি। সামনেই নাকি ডাকাত-মাঠ। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে এলো। তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি আমার সঙ্গীদের কাছে তারকেশ্বরে পৌঁছে দাও—

পুরুষ। তাই তো! আমি পৌঁছে দোব? আরে—ও বোঁ, বেরিয়ে আর। দেখ দেখি, মেরেলোকটা কি বলছে।

স্ত্রীর আত্মপ্রকাশ

স্ত্রী। কে যে?

সারদা। এই যে মা, আমি তোমার মেয়ে—সারদা। সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ার একা আমি বিবম বিপদে পড়েছিলাম। ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে এই ডাকাত-মাঠে কি করতুম—বলতে পামি না। (পুরুষকে) আমার এই পায়ের মল-জোড়া খুলে দিচ্ছি। তোমার কাছে রাখো বাবা। নইলে ডাকাতের দেখলে আমাকে কেটে ফেলবে।

পুরুষ। (স্ত্রীকে) ওরে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

সারদা। না বাবা, তোমাদের বগুন পেয়েছি, আর ভয় কি? তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁর কাছে বাছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও; তা হলে তিনি তোমার খুব আদরবদ্ধ করবেন।

পুরুষ। নে, হ'ল তো! ছেলেমেয়ে নেই বলে হুখু করতিস। বাঁজা বলে তুই ছিলি অযাত্রা। নে এবার মেয়ে পেলি—নিশরচায় জামাই পেলি। জয় বাবা তারকেশ্বর। চল মা—আমরা থাকতে তোমার কোন ভয় নেই।

সারদা। (ক্লান্তভাবে) আমি জানি—আমি জানি। চল বাবা—চল—

পুরুষ। কিন্তু তোমার মুখে যে আর কথা সরছে না মা। ও বোঁ, মেয়েকে নিয়ে চল ঐ তেলোভেলো গাঁয়ে।

স্ত্রী। হ্যাঁ, মুদীর দোকানে নিয়ে চল। কিছু মুড়ি-মুড়কি কিনে না খাওয়ালে ও আর দাঁড়াতে পারবে না। এস মা চটিতে আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে তোমাকে তারকেশ্বরে পৌঁছে দিয়ে আসব। ওঠ মা, আমার কোলে ওঠ। না, না এটুকু পথ তোমাকে আমি খুব নিয়ে যেতে পারব—আমরা বান্ধীর মেয়ে। জয় বাবা তারকেশ্বর।

সকলে। জয় বাবা তারকেশ্বর।

বাণেশ দৃশ্য

১২০১ সালের কাহিনী মাস

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের বাস-কক্ষ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বোগীন-মা আলোচনাবত।

রামকৃষ্ণ। বুঝলে বোগীন-মা, এইবার নিয়ে দক্ষিণেশ্বর সাধনামণির সাত বার আসা হল। শরীরটা ওর ভাল নয়। তার উপর এই বাতায়াত। এক সময়ে হঠক্বে বলেছিলুম, 'তাই ত হুদে, ও কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না'। তা এখন দেখছি, ও অনেক এগিয়ে গেছে। যায় নি বোগীন-মা ?

বোগীন-মা। সে বাপু তুমি জান। আমি তবে একদিন নতুনবে এসে দেপি, মা খুব হাসছেন, এই হাসছেন, এই কাঁদছেন। ক্রমে স্থির, একেবারে সমাধি।

রামকৃষ্ণ। সে আর কি বলছ ? একদিন রাত্তিরে কে বাঁপী বাজাছিল। বাঁপীর স্বরেই ওর ভাব হয়ে গেল।

বোগীন-মা। তা হলে আর একদিনের কথা শোন বাবা। সেদিন ভাবসমাধি হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে হুঁস এলে মা বলতে লাগল; 'ও বোগেন আমার জাত কই, পা কই?' আমরা মার জাত-পা টিপে দেখাতে লাগলুম। তবে জ্ঞান কিবে এল।

রামকৃষ্ণ। জানি না বোগীনের মা, ও কে? রূপ থাকলে পাছে অন্তর মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয় তাই এবার রূপ ঢেকে আসা। ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী। জ্ঞান দিতে এসেছে।

(সারদার প্রবেশ)

সারদা। এই যে বোগীন-মা—তুমি এখানে। আরও কিছু পান সাজতে হবে। এলাচ-মশলা ফুরিয়ে গেছে। এনে দাও না। বোগীন-মা। এতক্ষণ ত চুপ-সুপুри দিয়ে কতগুলো সাজলে গো! এলাচ-মশলা আবার কার জন্তে?

সারদা। এলাচ-মশলা দেওয়া গুলো হবে ভক্তদের জন্তে।

রামকৃষ্ণ। (হাসিয়া) আর পালি চুপ-সুপুри দেওয়া স্নানো বৃষ্টি আমার জন্তে।

সারদা। তা হোক। তুমি ত আপনজন। বাও গো বোগীন-মা—

বোগীন-মা। হ্যাঁ বাচ্ছি।

বোগীন-মার প্রস্থান

সারদা। এই নাও গো তোমার পান।

রামকৃষ্ণ। আপনজন হাতে করে দিলে বা দেয়, তাই মিষ্টি। কিন্তু শোন গো, পেনেটি-মুছবে আমাকে জোর করে ওরা ধরে নিয়ে গেল। গিরে আমার গলার বেদনা বেড়ে গেল। একমাস ধরে ঘটা করে খুব চিকিৎসা ত করলে গো, কিন্তু কমল না ত। পেতেও এখন কষ্ট হয়।

সারদা। তোমার জন্ত দুধ-ভাত আর সুজির পায়ের কবচি। এখন থেকে এই কিছুদিন খেয়ে দেখ।...সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

হেলেনের আসবার সময় হ'ল ৮ কটি হবে। তিন সের সাড়ে তিন সের আটা এখনি করে বাপি গিরে।

রামকৃষ্ণ। কি গো, আরও সন্ধান চাই নাকি?

সারদা। কেন চাইব না? এমনি সব সন্ধান মায়ের সংসার ভরে উঠুক।

রামকৃষ্ণ। কিন্তু সবাইকে তুমি চিনতে পার?

সারদা। কেন পারব না? তোমার কাছে ওরা বণন বসে সব আনন্দ করে, আমি যে ওদের দেখি। কান গাড়া যেতে তোমাদের কথাবার্তাও কিছু কিছু শুনে পাই।

রামকৃষ্ণ। বটে! কি করে বল ত? তুমি ত ওদের সামনে বড় একটা বের হও না।

সারদা। হ্যাঁ, ঠ্যা, আমার বারান্দার বেড়াতে একটা ফুটো করে রেখেছি। সেই পথে দোপ, তুমি রক্তবসের ডুফান তোল, নাচ, গাও—আর তোমার চার পাশে চাদের ছাট। কপনও রাগাল, শরৎ, লাটু—কপনও রাম, বলরাম, গিরিশ, কেশব—আবার কপনও বা মাষ্টার, বোগীন, পূর্ণ—আর নরেন ত আছেই।

রামকৃষ্ণ। হুঁ, সবাইকেই চেন দেখছি। তুমি বড়গর্ভা গো বড়াগর্ভা! আর ঐ নরেন—ও বেন সহস্রদল কমল। ওর তুলনা নাই।

সারদা। নাই-ই ত। নইলে বণন টাকার এত ঠেকা—তুমি বলে দিলে, বা ভবতারিণীর কাছে চাইলেই পাবি—তা কি না তিন বারের একবারও টাকা চাইতে পারল না। চাইল শুদ্ধা ভক্তি।

রামকৃষ্ণ। তা আমি ত বলে দিয়েছি, ও না চাইলেও ওর মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। তা সংসারে টাকার দরকারও হয় বৈকি। হ্যাঁ গা শোন, মারোয়াড়ী ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দশ হাজার টাকা দিতে চাইছে। আমি নিতে পারবু নি বলার তোমার নামে দিতে চাইছে। তুমি নাও না কেন—কি বল?

সারদা। তা কেমন করে হবে? আমি নিলে ও টাকা তোমারই নেওয়া হবে। না, ও টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।

রামকৃষ্ণ। বাচালে—আমার বাচালে...দেখেছ, কি সুন্দর জোছনা উঠেছে—জ্ঞানলাগ গিয়ে দেখ। আমি মন্দিরে চললুম।

রামকৃষ্ণের প্রস্থান

সারদা। ঠাকুর! তোমার ঐ জোছনার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও। চাদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে বেন কোন দাগ না থাকে।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

১২০২ সালের ত্রয়োদশ মাস

দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর রামকৃষ্ণের শয়নকক্ষ। কাল—সন্ধ্যারাজি। ঠাকুর চোখ বৃষ্টি ওইরা রহিয়াছেন, বোধ করি ঘুমাইতেছেন। সারদামণি পা টিপিয়া ধরে

আসিয়া তাঁহাকে তরুণ অবস্থায় দেখিয়া হৃৎকের বাটিটি  
জলচৌকির উপর নামাইয়া রাখিতেই শব্দ হইল।

রামকৃষ্ণ। কে, লক্ষ্মী? তুই দরজাটা ভেঙিয়ে দিয়ে যা।

সারদা। হ্যাঁ, বাব। হৃৎক এনেছিলাম। তুমি এখন স্নেহে  
উঠেছ, হৃৎকটা গেয়ে নাও।

রামকৃষ্ণ। আহা তুমি! তোমাকে 'তুই' বলে কৈলেছি—  
তোমাকে তুই বলে কৈলেছি। আমি মনে কবেছিলুম—লক্ষ্মী।  
ভাণ গো, কিছু মনে করো নি।

সারদা। সে কি! তুমি ত আর দেখে বল নি। নাও ওঠ,  
এই হৃৎকটুকু গেয়ে কেল।

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, এখন ত হৃৎকই ভরসা। কোবরেজ গঙ্গাপ্রসাদ  
সেন এসে জল খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে গেল। বলে গেল, জল  
না বন্ধ করলে সারবে না অসুখ। ঠাণ্ডা, জল না খেয়ে কি পারব?  
সবাই ত বলছে পারব। ঠাণ্ডা, তুমি বল—পারব জল না খেয়ে?

সারদা। পারবে বৈকি।

রামকৃষ্ণ। বেদানা পথান্ত জল পুঁছে দিতে হবে। দেখ  
বদি পার।

সারদা। তা মা কালী যেমন করবেন, বধাসাধা তাঁর ইচ্ছায়  
হবে। নাও হৃৎকের বাটিটা ধর।

রামকৃষ্ণ। এতটা হৃৎক?

সারদা। কত আর। একসের পাঁচ পো হবে।

রামকৃষ্ণ। উহু, এ অনেক বেশী। এই যে পুরু সর দেখা  
বাচ্ছে।

গোলাপ-মার প্রবেশ

গোলাপ-মা। আচ্ছ কেনন আচ্ছ গো ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। এই যে গোলাপ-মা, এস এস। ঠাণ্ডা, ভাণ ত  
আমার হাতে কত হৃৎক হবে বলত।

গোলাপ। তা পাঁচ-ছ'সের হবে বৈকি। জান না, গয়লা  
যে সেধে তোমার জল বেশী করে হৃৎক দিয়ে যায়। আগে দিত  
তিন-চার সের, এখন দেয় পাঁচ-ছ' সের। বলে, মন্দিরে দিলে  
কালীর ভোগ বলে ব্যাটারী বাড়ী নিয়ে যাবে—পাঁচ-ছ' লুটেপুটে  
খাবে। এখানে দিলে ঠাকুর খাবেন। সেই হৃৎক জাল দিয়ে  
কমিয়ে এইটুকু করে দিয়েছে সারদা-মা।

রামকৃষ্ণ। কি গো, সারদামণি?

সারদা। গোলাপ জানে না। এখানকার মাপ গোলাপ  
জানবে কি! এখানকার বাটিতে কত হৃৎক ধরে সে জানবে কি  
করে?

গোলাপ-মা। তা বটে! তা বটে!

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ গো, এ বাটিতে কত ধরে? ক' ছটাক, ক'পো।

সারদা। ক' ছটাক, ক'পো অত জানি নে। হৃৎক খাবে,  
তা ক' ছটাকের বাটি—ক'পো অত কেন? অত হিসেবে দরকার  
কি?

রামকৃষ্ণ। মতলবটা বুঝি বেশী হৃৎক খাইয়ে টেনে তোলা।  
তা হজম করতে পারব কি? দিয়েছ—খাচ্ছি। (হৃৎক পান  
করিয়া) নাও গো, হ'ল ত?

সারদা। আচ্ছা, আমি আসি। নহেনরা আসবে। ওদের  
খাবারটা করে রাখি।

সারদার প্রস্থান।

গোলাপ-মা। তোমার হজম হয় না, আমি কি অত জানি,  
তবে কি আর পাঁচ-ছ' সের বলি আমি। ভাবল্যাম, সত্তা কথাই  
বলাটা হয়ত ঠিক হবে।

রামকৃষ্ণ। শরীরটা সেবে উঠবে বলে ও ভুলিয়ে-টুলিয়ে  
খাওয়ায়—বুঝলে গোলাপ-মা? তা আমার ভালই লাগে। তবে  
আজ জানতে পারলুম কিনা। এ হৃৎকটা আমার হজম হবে নি।  
নৈলে ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে বেশ চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে।  
জান গোলাপ-মা, ভাত বেশী দেলে আমি আঁতকে উঠি। (গুপ্ত-  
কথা বলার ভঙ্গীতে) তাই ভাত টিপে টিপে সরা করে দেয় সারদা।  
ও ভাবে, আমি বুঝি না। কিন্তু বুঝি আমি সবই। কিন্তু তবু  
পাই—ওর অস্ত্রের গুপাটা মেটাতে।

সারদার পুনঃ প্রবেশ

সারদা। হ্যাঁ গো, দেখ—আমার কি ভুল। হৃৎক পাটয়ে চলে  
গেলুম। কিন্তু গুপাটা পাটয়ে যেতে ভুলে গেলুম।

গোলাপ-মা। সে মা ভুলে গেলে আমার ওপর বাগ ক'রে।  
আমি চলি, তা না হলে গুপুথের মাক্রার আবার ভুল হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ। তাঃ হাঃ হাঃ।

গোলাপ-মার প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ। কই গো, দাও গুপুথ।

সারদা। দাঁড়াও। মধু দিয়ে গুপুথটা গলে মেড়ে দি।

সারদা গলে গুপুথ মাড়িতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ গো, তুমি ত রোজ দুপুরে ভাতের খালা নিজে  
নিরে এসে আমাকে পাটয়ে বাও। আজ সেই মেয়েটাকে দিয়ে  
পাঠালে কেন? তুমি কি ও মেয়েটাকে জান না?

সারদা। জানি—মেয়েটি ভাল নয়। কিন্তু কি করব বল?  
খালা হাতে আমি আসছি। কোথেকে সেই মেয়েটি এসে বললে  
—“আমায় দাও না মা, আমি নিয়ে যাচ্ছি।” ওর মিনতি দেখে  
আমি 'না' বলতে পারলুম না।

রামকৃষ্ণ। সারা দিনের ভিতর ঐ একটি বার তুমি আস।  
ঘরোয়া ছটো কথা কইবার ঐটুকু সময়।

সারদা। সে কি আমি জানি না?

রামকৃষ্ণ। তবে আমার খাবার আর কোন দিন কারও হাতে  
গেবে না বল?

সারদা। আমি কি তা চাই না? এত বোঝ, এটুকু বোঝ  
না। তবে এও তোমাকে বলে রাখছি, কেউ আমার কাছে যা

বলে চাইবে আর আমি তা দেব না—এমনটি হবে নি কখনও।  
তুমি ত খালি আমার একলাই ঠাকুর নও, তুমি সকলের।

রামকৃষ্ণ। তা ঠিক, তা ঠিক। মা কিনা—আকুল হয়ে কেউ কিছু চাইলে, 'না' বলতে পার না।

সারদা। ই্যা গা, কি অস্থির হ'ল—এ কি আর তোমার সারবে না? কি কষ্ট পাচ্ছ বল ত? মা ভবতারিণীর কাছে একবারটি বল—“আমায় ভাল করে দাও।” তুমি চাইলে মা কি আর 'না' বলতে পারবে?

রামকৃষ্ণ। ঐ দেখ। এত বুকে এটুকু বোঝ না—যে মন সচ্ছিদানন্দকে দিয়েছি, তা কি আবার কিরিয়ে ছাড়-মাসের খাচার দেওয়া যায়? মাকে বলতে হয়, তুমি বল।

সারদা। না গো, আমিও তা পারব না। তুমি যা ভাল মনে কর না আমি তা করব না—করব না।

#### চতুর্দশ দৃশ্য

১২৯৩ সালের ১লা ভাদ্র।

[ কালীপুর উজানবাটিকার সদর। বাবুরাম,  
বাগাল ও নরেন। ]

নরেন। তোমরা দু'জনে দাড়িয়ে যে?...ও বুকেছি। মা গেছেন তারকেশ্বরে হত্যা দিতে—পথ চেয়ে আছি?

বাবুরাম। মিথ্যা বল নি নরেন। মা যদি তারকেশ্বরে গিয়ে এগুনীকৃত্য করতে পারেন, নইলে আমি ত আর কোন ভরসা দেখছি না।

বাগাল। আমাদের যতদূর সাধা, তা ত করে দেখলাম বাবুরাম। চিকিৎসার সুবিধার জন্তে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল শ্যামপুকুর। সে বাড়ীতে আলো-ভাওয়া নেই। নিয়ে আসা হ'ল গঙ্গাতীরে কালীপুরে এই বাগানবাড়ীতে। মহেন্দ্রলাল সরকারের মত সেবা প্রাপ্তির কত যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করলেন। কিন্তু কি হ'ল? উন্নতি ত দুবের কথা, আজ বা দেখছি তাতে ত আর আশাই হয় না। তুমি কি বুঝছ নরেন?

নরেন। ঠাকুর ত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বসে আছেন বাগাল। গেল ১লা জামুয়ারী এই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গৃহী ভক্তদের কাছে কল্লতরু হয়ে সকলকে চৈতন্য দিয়েছেন। তখনই মনে হয়েছিল সময় হয়ে গেছে। সেটা আরও স্পষ্ট বুঝলাম সেদিন—বধন আমাদের একলা ডেকে পাঠালেন

নিজের ঘরে। অনেক কিছু হ'ল। শেষে কান্ডিতে কান্ডিতে বললেন—‘তোকে আমার সর্বস্ব দিয়ে আজ আমি কবির হলাম। জগতের কল্যাণে এই শক্তি দেলে দে।’ আমি জানি, বিদায় তিনি সেই দিনই নিয়েছেন।...ঐ যে মা এসে গেছেন। আমি জানি উনিও পালিহাতেই ফিরেছেন।

[ শূণ্যক নিমন্তৃত্য। সারদামণির প্রবেশ।

বাগাল। মা, ঠাকুর আমাকে তাঁর মানসপুত্র বলেন। তুমি কথা বল মা।

সারদা। তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলুম। এক দিন যায়, দু'দিন যায়, পড়েই আছি। রাস্তার একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম। যেন অনেকগুলি হাড়ি সাজান থাকলে তার উপর যা মেয়ে যদি কেউ একটা হাড়ি ভেঙে দেয়, সেই রকম শব্দ। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল—এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্তে আমি এখানে প্রাণ হত্যা করতে এসেছি। একেবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে। আমি চলে এলাম।

বাবুরাম। মা!

বাগাল। কি হবে মা।

[ হ'জনেই কোঁপাটয়া কান্দিয়া উঠিল। ]

সারদা। তোমরা কান্দছ কেন? ঠাকুরের মুখ শোন নি? কেউ কি কখনও মরে? শুধু যায়—এ ঘর থেকে ও ঘরে।

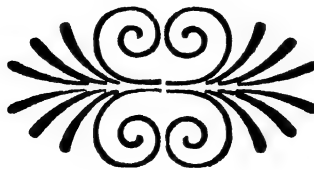
#### পঞ্চদশ দৃশ্য

[ কালীপুর উজানবাটিকা। সারদামণি সকাশে  
ভক্তবৃন্দ ]

নরেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস গেলেন—আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ। মা, তুমি আমাদের চেড়ে বেও না মা।

সারদা। আমার তিনি বলে গেছেন বাবা নরেন—আমার শরীরটা চলে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে চলে বেও না। আমার বাকী কাজ তুমি পূর্ণ করো। বাবা, জান ত—ঠাকুর সকলের ভিতরই মাকে দেখতেন। সেই মা'ভাব জগৎকে শেখাবার জন্তে এবার আমাকে বেধে গেছেন।

ববনিকা





# বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ত্রিপুরার দান

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য

১

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট গবেষণা এবং সংগ্রহের অবকাশ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে এবং বঙ্গের বাহিরে মফস্বলের বিভিন্ন শহরে ও পল্লীগ্রামে নীরবে বাঁহারা সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে, তাঁহাদের দানের পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর নহে। বস্তুতঃ এই সকল সাহিত্য-সাধকের দানে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমুদয় জেলার সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রণালীবদ্ধ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহরূপ দ্রুত কার্য অনেকটা অগ্রসর হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। ত্রিপুরা বলিতে আমরা ত্রিপুরা রাজ্য বা বর্তমানে পাকিস্তানভূক্ত ত্রিপুরা জেলাকেই বুঝি না—এই দুইয়ের সংযোগে যে “বৃহত্তর ত্রিপুরা” তাহাকেই বুঝি। কারণ ত্রিপুরার এই দুই অংশ স্বাধীনকাল পরস্পর এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল যে, একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে বুঝা কষ্টসাধ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান পাকিস্তানভূক্ত ত্রিপুরা ত্রিপুর-রাজ্যগণের অধিকাংশেই ছিল—ত্রিপুরারাজ্যের স্ববৃত্ত অধিদারী “নৃ-নগর পরগণা” ব্রিটিশ ও বর্তমানে পাকিস্তানভূক্ত ত্রিপুরা জেলার এক বৃহৎ অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত।

সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রিপুরার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য দান ত্রিপুরার ইতিহাস “রাজাবলী”। শুক্রেস্বর-বাণেশ্বর রচিত ত্রিপুরার দ্বিতীয় ইতিহাস-গ্রন্থ “রাজমালা” বহু শতাব্দী পূর্বে রচিত হয়। এই পুস্তক সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, তদানীন্তন “বঙ্গদেশের ইহা সর্বাঙ্গোপাঙ্গী উল্লেখযোগ্য ও উপাদেয় ইতিহাস। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই এই পুস্তকের মুখ্য বিষয়, তথাপি ইহাতে প্রাসঙ্গিক ভাবে আখ্যায়িকার বহুদেশের, বিশেষ বঙ্গদেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা ঐতিহাসিক তথ্যের গনিবিশেষ।” অনেকের অভিমত এই দুই পুস্তক বাংলা ভাষার ইতিহাসমূলক আদি গ্রন্থসমূহের পর্যায়ভুক্ত।

এই দুই গ্রন্থ ব্যতীত সেখ সত্দি রচিত ‘চম্পকবিজয়কাহিনী’ [ ১৬৮৫-১৭১০ খৃঃ ] বনমালা সিদ্ধান্ত রচিত ‘কুরুমালা’ [ ১৭৬০-১৭৮৩ ], শ্ৰেণীমালা, ষিদ্ধ বঙ্গচন্দ্র কৃত ‘ত্রিপুর বংশাবলী’, ‘সমশের গাঙ্গীনামা’ প্রভৃতি বহু মূল্যবান ইতিহাস-গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য দান। তন্মধ্যে ‘চম্পকবিজয় কাহিনী’ বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ত্রিপুরারই অন্তর্গত ( ত্রিপুরা-ময়মনসিংহ জেলাখণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত ) যোয়ানশায়ী গ্রামের কবি নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে “পদ্মাপুরাণ” রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত পদ্মাপুরাণ ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলার এখনও বিশেষ ভাবে প্রচলিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ ধর্মমাণিক্য মহাভারতের বাংলা পট্যমুদ্রণ করাইয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার আর একটি শ্রেষ্ঠ দান—আবু ও প্রাচীন কালে, একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত ভবানী দাসের ‘ময়নামতীর গান’। বৌদ্ধ রাজা মাণিকচন্দ্রের রাণী ও শিবযোগী গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। কথিত আছে, এই রাণীর নামানুসারেই কুমিল্লার দক্ষিণ-পশ্চিমে “ময়নামতী পাড়াডে”র নামকরণ হইয়াছিল। যদিও ময়নামতী এবং গোপীচাঁদের গানের নানা সংস্করণ নানা গ্রন্থকারের নামে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের—বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, তথাপি অনেকের অভিমত, এই ভবানী দাসও ‘ময়নামতীর গানের’ অঙ্গতম রচয়িতা। উক্ত মতের সমর্থনে স্থানীয় ময়নামতী পাড়াড ও তৎপার্বর্তী প্রাচীন ধ্বংসস্তুপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। ‘লক্ষণ-দিগ্বিজয় বা রামাভিষেক’ ও ‘সরথ’ নামক দুটি কাব্যগ্রন্থও এই ভবানী দাসের লিপিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

নানা কারণে ‘ময়নামতীর গান’ পুস্তকটি বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ আলোচনা করিয়াছেন। ময়নামতীর গান বঙ্গসাহিত্যের হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে লেখা। এই কাব্যের নায়ক রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার মাতা রাণী ময়নামতী কর্তৃক জন্ম বরসে সন্ন্যাস গ্রহণ কবিত্তে বাধ্য হন। রাজার সন্ন্যাসগ্রহণ উপলক্ষ্যে গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী রাণী “অহুনার” বিলাপকাহিনী বড়ই কল্পন। “প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার কর্কশ উপলব্ধির মধ্য দিয়া যে মর্যাদাসিক কষ্টের স্বরণ বহিয়া” গিয়াছে, সেই বিলাপকাহিনী বড়ই মর্মস্পর্শী।

পরবর্তীকালে রচিত বরদা শাতের ( ত্রিপুরার পরগণাবিশেষ ) মির্জা হোসেন আলীর ‘শ্রামাসঙ্গীত’ বৃদ্ধিচন্ডের কবি রামরতন পালের ‘শ্রীরামচন্দ্রজীর দিগ্বিজয়’ ( ১৮০২ ) ‘মুনিতরণ’, ‘লক্ষণের দিগ্বিজয় ও চন্দ্রকলার বিবাহ’ প্রভৃতি কাব্য, যোরাচালা গ্রামনিবাসী নন্দ-কিশোর দেবশম্ভার ঐতিহাসিক গ্রন্থ বরদামঙ্গল ( ১৮১২ ), দেওয়ান রামহুলাল রায়েব “ভক্তি সঙ্গীত” প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মির্জা হোসেন আলী ও দেওয়ান রামহুলাল রায়েব কতিপয় সঙ্গীত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

২

সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে কালীসাপেক ভূবন রায় (‘সঙ্গীত’ নামক গ্রন্থ প্রণেতা) এবং মনোমোহন দত্ত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মনোমোহন দত্তের ‘মলয়া’র গানগুলি ত্রিপুরা ও তৎপার্বত্য জেলাসমূহে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। তাঁহার রচিত সঙ্গীতসমূহ শব্দসম্ভারে এবং ভাবসম্পদে এতই সমৃদ্ধ ও মনোহারী যে রামপ্রসাদী সঙ্গীতের সচিৎ এগুলি তুলনীয়। অবশ্য রামপ্রসাদের সঙ্গীতের মত মনোমোহনের সঙ্গীতসমূহ সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচারলাভ করে নাই।

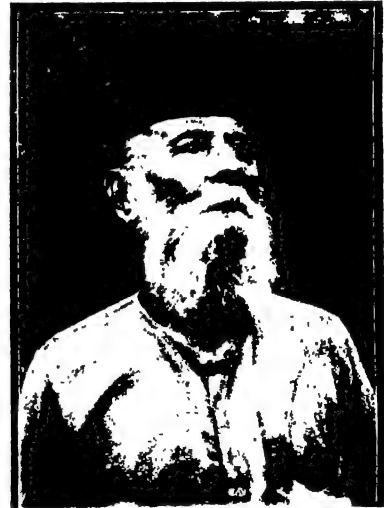
উপরে আলোচিত এই সব সঙ্গীতপুস্তক বাতীত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছেঁড়াগ্রামনিবাসী রক্ষাকর ভট্টাচার্য্য [সঙ্গীত-সার ৩ খণ্ড : ১৮৮০-৯০ খ্রিঃ], তদীয় কন্যা স্বর্ণময়ী দেবী [সঙ্গীত-মালা—১৮৯৯], চুটানিবাসী ভারতচন্দ্র চক্রবর্তী [ভারত সঙ্গীত

রামকানাই দত্তের কিছু পূর্বে, চুটীর হরিচন্দ্র সেন ‘মুখের প্রয়াস’ কাব্য (১৮৭০-৭৫ খ্রিঃ), রচনা করিয়া এবং পণ্ডিত রাম-নারায়ণ বিজয়রত্ন ও ত্রিপুরার দেওয়ান রাখারমণ ঘোষ জীমন্তাগবতের পঞ্চানুবাদ করিয়া সুনাম অর্জন করেন। ববীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে তাঁহার ‘ভগ্নহৃদয়’ কাব্য প্রকাশিত হইলে উক্ত রাখারমণ ঘোষ ত্রিপুরার মহারাজের বিশেষ দূত হিসাবে ববীন্দ্রনাথকে মহারাজের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিপুরার এক বিখ্যাত লেখক ছিলেন ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়। যদিও নূতন নূতন গবেষণার আলোকে তাঁহার অনেক মতবাদ অধুনা পণ্ডিত হইয়াছে, তথাপি অমুসন্ধিৎসা, পাণ্ডিত্য এবং ঐতিহাসিক সচিত্রতার জন্য অঙ্গতম পুরোধা হিসাবে তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবে। তিনি ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, বাংলা রাজমালা, বাংলার ইতিহাসের উপক্রমণিকা, সেনরাজগণ—বাংলা



কৈলাসচন্দ্র সিংহ



বিজ্ঞানদাস দত্ত

১৮৯৭-৯৮], রামকানাই দত্ত [‘বিশেষ সঙ্গীত’, ‘সেবক সঙ্গীত’] প্রভৃতি লোকের সঙ্গীতসমূহ বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিল।

রামকানাই দত্ত পূর্বোক্ত সঙ্গীতপুস্তক বাতীত “দানব-নন্দিনী”, “বিব্যাটে পাণ্ডব”, “চৈতন্যলীলা”, “মণিপুর-বিভাট”, “বিধ-মঙ্গল” প্রভৃতি নাটিকা (১৮৯১-১৯০০) এবং “কবিতা-বিশিষ্ট”, “কবিতাশতক”, “জীবনগীতা”, “লিপি মর্পণ”, “মাতৃপূজা”, “নব ব্রহ্মোপাসনা”, “সিদ্ধার্থ”, “বিহ্বল”, “হাসানহোসেন,” প্রভৃতি কাব্য এবং “সম্ভান-শিক্ষা”, “বড়লোক” প্রভৃতি পুস্তিকার রচয়িতা। ইহা ছাড়া তিনি ১৮৯০ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে “উষা” মাসিক পত্র ও “সম্ভান” পাক্ষিক পত্র বাতীর করিয়া বহুদিন সুনামের সচিৎ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ইতিহাসের একটি অধ্যায়, ষোড়শের জীবনচরিত। [বাংলা ভাষায় ষোড়শ অব আকের সর্বপ্রথম জীবনচরিত] সাধক-সঙ্গীত, মোহমুদগর, চন্দ্রামলক, দারুপ্রহ্ম, ভারত পুরাতত্ত্বকলাপ-প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং পরদর্শনসংগীতা ও জীমন্তাগবতীতা প্রভৃতি সম্পাদনা করেন।

এই প্রসঙ্গে শীতলচন্দ্র বিজ্ঞানিধি, বিজ্ঞানদাস দত্ত ও মহিমচন্দ্র দেববর্মা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানিধি মহাশয় “আদি আর্ষভূমি,” “হিন্দু ভূগোলবিজ্ঞান,” “আর্যোত্তর ও অনার্য জাতির ইতিহাসের রহস্য,” “ঐতিহাসিক কৌতুকপ্রসঙ্গ,” “ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস,” ও “ঋগ্বেদোড়ন” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বিজ্ঞানদাস দত্ত বৈদিক প্রবন্ধাবলী এবং মহিমচন্দ্র দেববর্মা দেশীয় রাজা-

বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। প্রায় ইঁহাদেরই সমসাময়িক কতিপয় লেখকের নামও এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়কুমার বর্দন “ঋতুচক্র” ও “একেই কি বলে মাহুৰ?” নামক দুপানি নাটক এবং বেগম ফরজুল্লাহা “রূপ জালাল” নামক নাটক লিখিয়াছিলেন।

৩

বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুর রাজবংশের দান—তা প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, নিতান্ত সামান্য নহে। তাহা ছাড়া সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েক জন নৃপতির নাম যে কারণে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, সেই বিভাগে সাহিত্যের ঘরান ত্রিপুর-রাজবংশের নামও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।



শীতলচন্দ্র বিধানিধি

“ইংরেজি শিক্ষার প্রথম উচ্চাঙ্গে নব্যবঙ্গের শিক্ষিত-সমাজের আনন্দ ও উপেক্ষার বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা বখন বাংলা দেশে অচলপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বিপদকালে উপেক্ষিতা বঙ্গ-ভাষাকে রাজভাষার সম্মানদানে” ত্রিপুররাজগণ মাতৃভাষার প্রতি যে প্রগাঢ় অহুসারাগ দেখাউয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। এই ত্রিপুরাই বোধ হয় একমাত্র দেশীয় রাজ্য যেখানে মাতৃভাষা রাজভাষার সম্মান লাভ করিয়াছিল।

বিগত শতাব্দীর শেষপাদে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর কবিশুফ রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার “অনতিবাক্য খ্যাতির মুহূর্ত্তে” স্বেচ্ছায় বন্ধুত্বের সম্মানদানে বঙ্গবাণীর মহা উপকারসাধন করিয়াছিলেন। সেদিনের বন্ধুত্ব যে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছিল, একথা তিনি স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। রাজর্ষি, মুকুট, বিসর্জন

প্রভৃতি সেই বন্ধুত্বেরই ফল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “তখন এক-পানিমাত্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছে (ভগ্নহৃদয়)....সেই সময়ে আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্পলোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়স্বজন ও নিকটতম বন্ধুত্বের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম।...মহারাজ তাঁকে শুধু ত্রিপুরা হতে বিশেষ ভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে আমাকে তিনি কবিরূপে অভিনন্দিত করতে উচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিশ্বাসের সীমা বইল না। এর পর থেকে নানা সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশেষ করে রাজর্ষি লিখবার সময়ে “রাজমালা” থেকে সংস্কৃত বিষয়গুলি ছাপিয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন। তার থেকে আমি গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পেরেছিলাম।...”



মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য

“জীবনে যে যশ আজ আমি পাছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন তাঁর অভিনবকনের দ্বারা।”

সঙ্গীতশাস্ত্রে মহারাজ বীরচন্দ্রের অসামান্য অধিকার ছিল। তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন অমরদ্বীপী ও পৃষ্ঠপোষক মাত্রই ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর ভক্তকবি। “তাঁহার স্বরচিত বৈষ্ণব কবিতা ও গানের দাস্তভাব ও আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা অতিমাত্রায় প্রাণম্পর্শী।”

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরও পিতার জায় বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও সেবক ছিলেন। শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রেই তাঁহার বদান্যতা সীমাবদ্ধ ছিল না; যেখানেই প্রতিভা দারিদ্র্যের কবলে নিপীড়িত, সেখানেই তিনি অকাতরে হস্ত কবিত্তে

কুঠিত হইতেন না। আচার্য্য ভগদীশচন্দ্র নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাধাকিশোরের বিদ্যোৎসাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মহারাজ বাধাকিশোরের সাহিত্যাহরণ এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার চেষ্টায় ও একান্ত আগ্রহে আগরতলায় একটি সাহিত্য-সমাজ গঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্রভাবনো'তে তাঁহার বিশদ বর্ণনা আছে। তাহা ছাড়া মহারাজ বাধাকিশোরের চেষ্টায় আগরতলা হইতে পর পর 'বার্ষিক', 'বঙ্গভাষা' ও 'অগ্রণ' নামক তিনখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বার্ষিক' পত্রিকায় মহারাজ বাধাকিশোরের কিশোর-বয়সের রচনা প্রকাশিত হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সব রচনা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'বঙ্গভাষা' রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষিগণের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ "চিত্তবাদী" সম্পাদক চন্দ্রদাস বিদ্যা-

সময়েন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার 'ভারতীয় নৃত্তি' (১৩৩৩), 'আশ্রয় চিঠি' ১৩৩৫, 'জ্যেষ্টিসা' (১৩০৬), 'ত্রিপুরার স্মৃতি' প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখ-



মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর নারিক্য

যোগ্য। রাজ-পরিবারের মহিলাগণের মধ্যে মহারাজকুমারী অনঙ্গ-মোহিনী দেবী সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতাবলীর ('কণিকা'

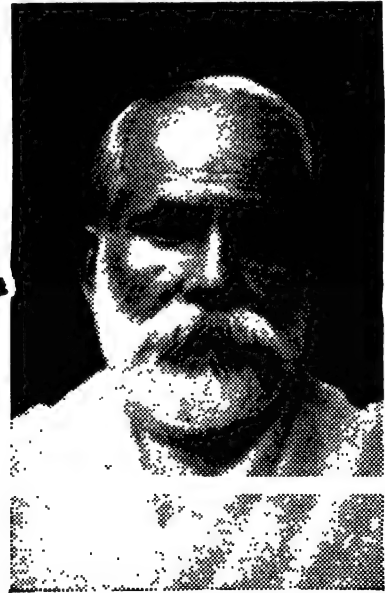


মহারাজ বাধাকিশোর নারিক্য

বিনোদের সম্পাদনায় 'অগ্রণ' পত্রিকা বেশ কিছুকাল সর্বোত্তমবে চলিয়াছিল।

মহারাজ বাধাকিশোরের সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরও পিতার স্তায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ অহুবাগী ছিলেন। তাহা ছাড়া নিপুণ চিত্রকর হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার চেষ্টায় ত্রিপুরারাজ্যে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই সমাজের উদ্যোগে 'রবি' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা দীর্ঘকাল স্তম্ভ ভাবে চলিয়াছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের অর্থাহতুলাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

স্বয়ং মহারাজ ছাড়া বহু রাজকুমার-রাজকুমারীও সাহিত্যচর্চা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বহু পুস্তক, প্রবন্ধ ও কবিতা সাহিত্য-সেবার নিদর্শন-রূপে বিদ্যমান আছে। রাজকুমারগণের মধ্যে



শ্রীশচন্দ্র রায়

—১৩০৮, 'শোকপাথা'—১৩১০, 'ঐতিহ্য'—১৩১৪) একটা বহু-স্বয়ং প্রাণে বেদনার স্বাক্ষর জাপাইয়া তোলে।

বলা বাহুল্য, বঙ্গভারতীয় প্রতি এই একান্ত অচ্যুত ও নিষ্ঠা ত্রিপুরা-রাজবংশকে এক বিপুল গৌরবের অধিকারী করিয়াছে। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের পুত্র মহারাজ বীরবিক্রমের শাস্ত্র-নিকেতনে অভ্যর্থনা উপলক্ষে বীরেন্দ্রনাথ তাঁতার অননুগ্রহণীয় ভাবায় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।



৩ বনলতা দেবী

৪

স্বদেশী যুগে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কবি কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত জাতীয় সঙ্গীত ঘবে ঘরে গীত হইয়া সকলকে দেশাত্মবোধে অত্যন্ত প্রেরিত করিত। তাঁহার সঙ্গীতসমূহ “সুপলা” নামে সংকলিত হইয়া তৎকালে বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ারই অন্তর্গত বিষ্ণুকুট গ্রামের স্বর্গত শশিভূষণ বিজালঙ্কার মহাশয় দীর্ঘকাল কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ‘জীবনীকোষ’ নামে এক সুবৃহৎ কোষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত। ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালেরও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই বিরাট কার্য্য যে একবার পক্ষে কিরণ দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত বাংলার বোধ হয় আর কেহ একক প্রয়াসে এতদূর বিপুলকার মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হন নাই। বাস্তবিক বসু মহাশয়ের বিশ্বকোষের জায় এই গ্রন্থও আমাদের জাতীয় সম্পদ। ত্রিপুরার গবেষকদের মধ্যে প্রাচ্যবিজ্ঞান সুপণ্ডিত এলা-

হাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহো-  
পাধ্যায় ডঃ ক্রীশসরস্বতীর আচার্য্য মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত অধিকাংশ পুস্তক ইংরেজীতে রচিত হইলেও কতিপয় পুস্তক বঙ্গভাষায়ও রচিত হই-  
য়াছে। তিনি একবার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া-  
ছিলেন।

এই স্থলে ক্রীশচন্দ্র রায় বেদান্তভূষণের নামও স্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর চরিত্রসাধনার যে মহান রূপ আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর ভিতর দেখিতে পাই, আচার্য্য ক্রীশচন্দ্র তাহারই উত্তরসাধক। তিনি একাধারে ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, কবি ও দার্শনিক। তাঁহার কবিতাসমূহের সহজ অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য মনকে সহজেই করণ করে। কাব্যগ্রন্থ “প্রগতি” ব্যতীত তিনি “বাসন্তীগীতা”, “খানযোগ”, “বৈষ্ণব দর্শনে জীববাদ”, “উদীয়মানদের প্রতি” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ক্রীমৎভগবদ্গীতা সটাক ভাষ্য ও ইংরেজী অনুবাদসহ সম্পাদনা করেন। আচার্য্য ক্রীশচন্দ্রের স্বগ্রাম কালী-  
কচ্ছনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী উল্লাসকর

দত্তের ‘বীপাস্তরের কথা’, ‘কারাকাহিনী’ (১৯২২-২৩) প্রভৃতি পুস্তক এক সময়ে আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। এই প্রসঙ্গে উক্ত ক্রীশবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ‘বঙ্গসম্রাজ্ঞ জায়েনী’ পুস্তকটির (১৯২২) নামও উল্লেখ করিতে হয়। উক্ত পুস্তক ব্যতীত তিনি ‘স্বরাজ-সাধনা’ (১৯০৭), ‘মুক্তি-সাধনা’ (১৯০৮) এবং ‘জায়েনী প্রবাসীর পত্র’ প্রভৃতি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। তাহা ছাড়া ১৯২৭ সন হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ‘চুটা প্রকাশ’ পত্রিকা তিনি বোয়ালতার সহিত সম্পাদনা করেন।

ত্রিপুরার চই জন লেখিকার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐশ্বর্য্যমান শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বর্গতা বনলতা দেবী ‘অন্তঃপুর’ নামক সাময়িক পত্র পরিচালনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার প্রায়

সরসাময়িক ছিলেন কুমিল্লার উদ্ভিদা সিংহ। তিনি 'ত্রিপুরা-হিতৈষী' পত্রিকা দীর্ঘকাল স্বেচ্ছাভাবে পরিচালনা করিয়া সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তী কালে কুমিল্লার শ্রীমতী সরোজিনী দেবী 'সুদের বীণ' নামক কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই কবিতা-পুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই গীতিপ্রধান এবং ইহাদের সরল মাধুর্য ও সুদের বক্ষার অতীব চিত্তাকর্ষী। বর্তমান কালে অল্পাঙ্ক সাহিত্য-সাধনা ও গবেষণা দ্বারা যাহারা গীতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দীনেশ-বাবু 'গুণাইগড়ের পাটা'র আবিষ্কারক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের গবেষণার ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। সম্প্রতি "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান" নামক পুস্তক লিখিয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র স্মৃতি পুর্নস্বাধ লাভ করিয়াছেন।

উপরে যেসব লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, তাঁহারা ছাড়াও বহু প্রেরণার এবং সাংবাদিক বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে বঙ্গভাবার সেবা করিয়া গিয়াছেন। এখনও অনেকে এতাদৃশ সেবাকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন।



শশীকুমার বিদ্যালঙ্কার

## ফাণ্ডনে

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১

বহু দিন খুঁজিয়াছি, তবু আমি পাই নি সন্ধান।  
শীতের রাত্রির মত দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর পথ,  
অতীত হারারে গেছে, কে-জ্ঞানে আছে কি ভবিষ্যৎ ?  
দিগন্তে কুহেলি, আর আকাশের আলো হ'ল স্নান।  
শীতের শিশিরে বৃষ্টি প্রভাতের সাধা হ'ল স্নান,  
অক্ষর আভাস পাই দিবসের নয়নে ঐষৎ ;  
• একলা কি হেসেছিল স্বর্ণালোকে সন্দের শরৎ ?  
তরুণলি বিজ্ঞপত্র, খেমে গেছে মধুরিত তান।

অকস্মাৎ বয়ে গেল উজ্জ্বল সিঁতা দক্ষিণের হাওয়া,  
নৃত্যের কোঁড়কে মাতি মুকুলের মুখ গেল চুমি'।  
শিহরিয়া ওঠে শাখা, সুর হ'ল কোন্ গান পাওয়া ?  
স্বরা পাতা উড়ে যায়, মধুরিয়া ওঠে বনভূমি।  
•  
•  
সুন্দর ফুলেরা আগে, মনে হ'ল গেল বৃষ্টি পাওয়া,  
কান্তন এসেছে ফিরে, এলে বৃষ্টি, এলে বৃষ্টি ভূমি ?

২

দণ্ডে পরে মুহূর্তে কি বিচকল সময়ের মাপ ?  
ক্রান্ত তালে কতু চলে, কখনো সে নিত্যান্ত মন্থর,  
কখনো তাহার সঙ্গে তরঙ্গিয়া ওঠে যে অস্তর,  
কখনো তাহার ছন্দে স্পন্দমান সুদের আলাপ।  
বসন্তে ওনেছি আমি কলধ্বনি কালের প্রলাপ,  
কালের আবেগ লাগে শীতশ্রান্ত জীবনের 'পর',  
সে আবেগে জেগে ওঠে হৃদয়ের নিরুচ্ছ নিব্বর,  
সে আবেগে লেগে থাকে অকুরন্ত প্রাণের উত্তাপ।

কোকিল কুহরি ওঠে, কণ্ঠে আনে কুহক কান্ডন,  
কুহেলি কাটিয়া বার, আগে আলো অগ্নান উজ্জ্বল,  
অন্তবে সক্ষর করে বহুদূর সুধীর আগুন,  
সব্বলের সমাবেশে পরিপূর্ণ তাই ধরাতল।  
পুষ্পে পুষ্পে ভরা ওই অতহর অপরূপ তৃণ।  
ভূমি এলে ? জীবনের বগ্ন আজ হবে-কি সকল ?

‘নামডাকে এখন থেকেই লোভ?’ নিত্য স্তব্ধ করে বলে।

‘বত চাড়-জালানো কথা! দশ জন সমবয়সীর মাঝখানে মাইনের কথাটা বললে বেচারীর মনটা কেমন হয়?’

‘তাও ত ঠিক।’ বলে ঠাণ্ডা হয়ে আসা গেলাসের তলানিটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে একটা বিড়ি ধরাল নিত্য।

‘তোমার বাখাটা কেমন আজ?’ নিত্য হঠাৎ বলল।

‘এক কথা বার বার জিজ্ঞেস করা কেন? বাখা নিজের মনে নিজেকে আছে—আজ আর কাল কি?’

কথা বাড়তে সাহস হয় না। নিজের ঘরের স্টুইচ নিবিয়ে নিত্য সোঝা গুরে পড়ে। মাথবী চায়ের গেলাস খাটের নীচে রেখে, বারান্দার দোর দিয়ে নিজের মশারিতে গিয়ে ঢোকে।

‘হাট—হাট—হাট’ ভোরের আবছা আলো কাঁপিয়ে পাড়ম্বর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল ভূতুর কমাগুয়ারি হাঁক। পাঁচটা সাধারণ কালোর কিলবিলে কুকুরছানা সার বেঁধে বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। ভূতুর পেছনে সব চলল সময় রাস্তার দিকে। একটা চোঙার পাউরুটির গুঁড়ো আর ছাতু এক সঙ্গে মেশানো—তার মধ্যে হাত পুরে একবার এক মুঠো বার করে আর তা বার বার ছড়ার হুঁধারে। আর বাচ্চাগুলো মাথা নেড়ে নেড়ে চেটে পুটে সব খেয়ে কেলে। রাস্তার জল দেওয়ার আগে একবার ‘ভূতুর’ সঙ্গে টেল দিয়ে আসা চাই এই ক্ষুদ্রে পটনের।

বেড়িয়ে এসে, বাশির ক্যাম্পখাটে বই পাতা ছড়িয়ে ফুলের পড়া তৈরি করতে বসে ভূতুর। পাশে এনামেলের টোলখাওয়া বাটিতে মুড়ি মাথা। ফুলে ফুলে পড়া মুগ্ধ করে। পেট্টাটা কোন কাকে পাটে উঠবার চেষ্টার দাগের খাতার মাঝে এক টান। আর হয় ত বা ‘কর্তব্য’-র বেকে আগের লাইনের সব লেগা খোঁচা খেয়ে কাটা পড়ে গেল। ভূতুর টেটিকে ওঠে, ‘ধর না মা একে, সব নষ্ট কয়েছে, বান্ধুনী।’ মাথবী বঁটি ভেঙে উঠে এল। নাক মুছিয়ে পেট্টাকে কোলে নিয়ে বারান্দার চলে এল।

‘দাদা বকেছে, না, না, খাতার হাত দেয় না, মাতার মারবে’—পেট্টা শুধু অবাক হয়ে কথাগুলো শুনে বার মার মুগ্ধের দিকে তাকিয়ে। তার পর একটা শুকনা কুমড়া শাকের ডাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলতে থাকে।

রোগে ভুগে বড় জ্বর হয়ে গেছে এই পেট্টাটা। এখনও যুখে ভাল করে কথা ফুটল না, পারের দিকে কম জোর। নইলে তিন বছরের মধ্যে, এত দিনে কি তার দস্তিপনার অস্ত থাকত? টলতে টলতে গিরেই তাকের উপরকার শিশিতে টান মাঝে, ধবরের কাগজের ছবি ভিঁড়ে দেয়। মাথবী জানালার ঠাঁড় করিয়ে দেয়, আর কার্চের পরদা ধরে ‘ও মা’, ‘ও মা’ ‘এঁ বে’ ‘হু’ নানা স্তব্ধ করে ডাকে পেট্টা। বছর দুই আগে কত কষ্ট করে চোখ সারানো হ’ল—আবার ক’দিন থেকে সেই পিঁচুটি জ্বরে বাওয়া আরম্ভ হয়েছে, মাঝে মাঝে একেবারে চোখ জুড়ে বার।

অন্ত সব ছেলেমেয়েরা চার ধারে খেলে বেড়ায়, ছুটোছুটি করে।

আর পেট্টাও তার মনের মতন একটা খেলা বেছে নিয়েছে। সেটা হ’ল কুকুরছানাদের ভোজ। খা খা হুপু। পাড়া নিষুয়। শুধু বাড়ীর সামনেকার সড় কাঁচা রাস্তাটার আগুন-তাতা ফুলের উপর পা ছড়িয়ে বসে পেট্টা। পাঁচটা কুকুরছানা ওকে গোল করে ঘিরে ধরে। একটা পোড়া রুটি নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাখছে ফুলের, আর বাচ্চারা কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নিচ্ছে। বসে বসেই ঘুবেছে পেট্টা ফুলের উপর, কোন বাচ্চা যেন বাদ না পড়ে। দরজার চৌকাঠে ঠাঁড়িয়ে মাথবী, হলুদের ছোপলাগা কাপড়গানাই পরনে। দেখে আর হাসে। খাওয়ানো শেষ হলে এক ছুটে গিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নেয়, বলে—‘নেমন্ত খেয়েছে আউ-বাচ্চা?’

‘হা-হা’ করে ভাঙা ভাঙা খুশির আগুয়াজ তুলে হেসে ওঠে পেট্টা। মার কোলে চড়ে ঘরে ফিরে আসে। আউ-বাচ্চা পাটের তলার চুকে পড়ে। আর মশারিটা কেলতেই অয়েল-রুখের উপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটা।

তার বিকেলবেলার আন্ডারটাও মাথবীর মাথা চাই। সেটা হ’ল, গোলাপী ব্রুক্ পয়ে, কাক্সল চোখে দিয়ে মাঠের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া। দুটো বাড়ী পরে মাঠের বাড়ীটা নতুন উঠেছে। ওভারসিয়ারের বউ মনোরমা ভারি ভালমাসুখ। আর বড় মায়ী পড়ে গেছে তার ক’দিনে এই বাচ্চা দুটোর ওপর। মনোরমা বেডিও ফুলতেই পেট্টা খিল খিল করে হাসে মার গলা জড়িয়ে ধরে। ‘গানের নামে পাগল’—মাথবী বলে।

‘মায়ের ধারা পেয়েছে। আমি শুনেছি দিদি আপনি খুব ভাল গাইতে পাবেন,’—মনোরমা জবাব দেয়।

‘মায়ের গান সব চাপা পড়ে গেছে। এই পেট্টাটা ছাড়ে না, যখন তখন কাঁদে, আর শুন্ শুন্ করে স্তব্ধ ধরতেই খেমে যায়।’

‘এমন স্তব্ধ কচি কচি মুখ হু’ ভাই বোনেষ—অমন বা-তা বলে ডাকেন কেন দিদি?’

‘পকাশ সালের দুর্ভিক্ষে মরে এসে জুটেছে কিনা,’—মাথবী জোরে হেসে ওঠে।

‘অমন কথা বলবেন না ভাই,’—বাখা দেওয়ার ভাবে মনোরমা বলে, ‘ভারি চটপটে ছেলোট আপনার। আমাদের সজ্বর বলছিল এবার ওদের ফুলের রবীন্দ্র-উৎসবে কি স্তব্ধ আবিষ্টি করেছে ব্রূপাল।’

‘ঐ ত কাঠি চেহারা, ওব বলা কেউ শুনল?’

‘বড় হলে দেখবেন, সোনালেলে হবে।’

‘তার আগেই যে রেশন-ব্যাপ ধরতেই বাবু কাং’—আবার সেই জোয়ালো হাসিতে ওদের আলাপ শেষ হয়।

ভূতুর খেলা সবই সর্দারি চালের। সন্ধ্যাবেলা পা কেটে বাড়ী এল।

‘পা কাটলি কি করে?’

‘বাঃ বলে গেলাম না, ম্যাচ আজ। আমাদের ক্লাস খি, ওরান্ মিলে হারিয়ে দিল কোরকে।’



“বঁধে দিলে কে?”

“খেলা ওভার হলে চিম্মিরে বাবার ডাক্তারখানার নিরে গেল। টিচার বেন্জিন দিয়ে বঁধে দিলে।” মুখের দিকে চেয়ে থাকে মাধবী। একত্র খেমেই ভূত বলে চলে : “পেট্টীটা বড় হলে মা ওকে বা খেলা খেঁচাব না, আমার শটে কি জোর। দেখবে?”

“আজ থাক বাবা—বড় ব্যাটা বেড়েছে, গোলমাল বাড়ান না এর উপর।”

“কেন সেই পাঁচ কোঁটা ওষুধ?”

“ও কোঁটার কমে না রে। তার চেয়ে শুয়ে থাকি। ভুই বরং পেট্টীটাকে ঘুম পাড়া একটু।”

পেট্টী দাদার হাত ধরে বারান্দার পাতা মাতুরের উপর গিয়ে বসে। তারপর একটা বালিশ পেতে বোনটিকে শুইয়ে চড়া কাটতে থাকে ভূত—

“বাবের মুখে উঠত যদি রামছাগলের দাড়ি”

এ পাড়ায় ভূতের সবচেয়ে বড় বড় সঙ্গর। স্ততরাং তার জন্মদিনে ভূতের ডাক পড়ল প্রথম। ইঞ্চুল থেকে কিংবদন্তি খবরটা মাকে জানানো হ’ল জন্মদিনের খাওয়া আছে সঙ্গরের বাড়ী।

“কি দিবি ওকে?”

“কি আবার? নেমস্তন্ন ত।”

“বাবের, বড় জন্মদিন, তাকে কিছু দিবি না?”

“তবে তুমি বলে দাও।”

“আজ্ঞা, বা ভুই খেলে আর। এসেই দেখবি কি মজার জিনিস পাবি।”

মাথার কাছে ভুঁড়ো করা একগালা গালি সিগারেটের বাস। কাত হরে শুয়ে একটা একটা করে বাস নিরে বরফি কেটে কেটে জোড়া দিয়ে সুন্দর আসন বানায় মাধবী। মনের সব বাধা যেন মিলিয়ে যায়। জোরে হাত চালিয়ে সজ্জার মুখে আসন শেষ করল।

ভূত কিংবে এসে সেই আসন দেখে লাফিয়ে উঠল।

“মা তুমি শুভ বর হয়েছ”—এক টানে আসনটা নিরে এক বার ভাল করে দেখে।

“আমায় একটা দিয়ো কিছু।” চটপট হাত-পা ধুয়ে তৈরি হ’ল ভূত।

“উ-উ” হাত বাড়াল পেট্টী।

“ধর মা।”

“নিরে বা না বাবা, একটু পড়ে থাকি।”...

ওদের হুঁ ভাইবোনকে পেয়ে সঙ্গর মহাখুশি। চারদিকে প্রচুর ফুল, আলো, লোকজন, ঘরের মাঝখানে ফুলতোলা আসনের সামনে প্রদীপ জ্বলতে। বোন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনোবল্লা ওকে কোলে তুলে নিল। আদর করে কত কি খাওয়া। খুব সুস্থি আনন্দে স্নেহের কাটাল ওরা। একটা চকচকে পাজারী আর কোঁচানো মুক্তি পুরে সঙ্গর ভূতকে নিরে সব দেখাচ্ছিল। একটা সবুজ রিবনে

বাঁধা অয়েলপেপার মোড়া মলাটের কত মোটা মোটা গজের বই পোল টেবিলে সাজানো। “এ সব কাকার দিরেছে”,—সঙ্গর সব বুঝিয়ে দেয়, “আর ঐ তাকে যে এয়ার-পান আর হাউথ-অর্গ্যান দেখছিল ও দুটো বাবার কাছ থেকে নিয়েছি।” ভূতের মায়ের তৈরি, সিগারেটের বাসের আসন সঙ্গর সবাইকে সগর্বে দেখাতে লাগল। “এটাই সবচেয়ে চমৎকার বে, মাসীমা করেছেন নিশ্চয়ই।” “হ্যাঁ”—ভূত আনন্দে ও বিশ্বরে হতবাক। মাকে আজ তার সবচেয়ে বেশী ভাল-বাসতে ইচ্ছে হ’ল। বোনটার লক্ষ্য রয়েছে কাঁচের আলমারির মাথার কাপড়ের গাদার উপর বসানো একটা মস্ত লাল রবাবের বলের উপর। বার বার সেমিলক “ঐ বে” বলে সে হাত বাড়তে লাগল। ভূত কিছুতেই শাস্ত করতে পারে না। কেবল ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে চুপি চুপি বলল, “বাপি দেবে তোকে, বাড়ী চল।” ভূতের কথার তার মনে আশার সঞ্চার হ’ল। সঙ্গর ভাবান্তরের হেতু কিছুই বুঝতে পারল না, ভূতও তাকে কিছু খুশবাসল না।

জন্মদিনের উৎসব শেষ হলে ভাইবোনে বাড়ী ফিরল একটু রাতে। শুয়ে ছিল মাধবী। বোনকে ছেড়ে দিতেই মার বুক গিরে ধপ করে শুয়ে পড়ল।

“ওকে আদর করো না আজ মা, বড্ড অসভ্যতা করেছে।”

“কেন বে, বোনটির উপর রাগ কেন বাবা?”

“ওদের বাড়ী গিয়ে বা দেখে নিতে চায়।”

মায়ের এসব কথার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কেবল মার গলা জড়িয়ে “মা, বঃ” “মা, বঃ” করতে থাকে। সেটার খেই ধরিয়ে দিয়ে ভূত বলে উঠে রাগের মাথায় :

“ঐ শোন না, একটা লাল বল দেখে এসেছে, তাই কেবল ‘ব’, ‘ব’ করে তোমার শোনাচ্ছে।”

“ওর বোধ হয় একটু জন্মদিনের সখ হয়েছে রে”—মাধবীর শুকনো মুখে হাসি দেখা দিল। মায়ের বুক থেকে নাড়িয়ে পাশে পাতা বিছানার শুইয়ে দিল। ততক্ষণে তার ঘুম এসে গেছে। পাশ বালিশে একটা পা তুলে দিয়ে দিবি ঘুমতে লাগল। আলোটা মুখে পড়ে কেমন যেন করুণ দেখাচ্ছে।

নিমেষ মধ্যে চিন্তিত হয়ে ভূত বলল :

“বোনের জন্মদিন কবে মা?”

“জীবন মাসে, দেবি আছে।”

“কত দেবি তাই বল?”

“এটা যে সবে বৈশাখ মাস। আরও ছ’ মাস বাবে তবে...”

“না, না, বড্ড দেবি হয়ে বাবে মা। তুমি এই যোষবারেই একটু ওর জন্মদিন কর না।” ভূত ঘুমন্ত বোনটির মুখের দিকে চেয়ে ঝড়ের মত বলে গেল।

“বেশ”—মাধবী হেসে উঠল, তার মনে পড়ল রবিবারই মায়ের জন্মবার।

“ঠেক, তুমি ত এদিন বল নি”, ভূত রাগের তান করে মাথা নীচু করে বাহুর কাঠি খুঁতে লাগল।

স্ববিবাহ এল। কাল রাত থেকে তুহুর ঘুম নেই। খুব সকালে উঠে প্রথমেই ক্যালেন্ডারের পাতা ছিঁড়ে উন্টোনিক বড় বড় অক্ষরে লাল কালিতে লিখল :

“আজ ললিতার জন্মদিন”

লেখাটা টাঙিয়ে দিল শোবার ঘরে চুকবার দরজার পায়ে। সন্ধ্যকে বলে এল তার পরেই। বোনটি উঠলে তাকে কোলে করে লেখাটার কাছে গিয়ে দেখাতে লাগল। ওদিকে নাওয়া খাওয়ার বেলা পড়িয়ে বার! তুহু কেবল মাকে বলে চলেছে কেমন করে বোনটিকে সাজাবে, বল কিনে দেবে, মোটেই বকবে না। ছেলের করমারেসে মাথবী বসে বসে ঘাড় বাধা কছে মুড়ির মোয়া তৈরি করল, পূর্বনো স্নাকড়া পাড় সব জড়ো করে পুতুল সেলাই করল সারাদিন। তারপর কালি দিয়ে চোপ নাক ঠোট আঁকা হ’ল। সেই পুতুলটাকে একটা পূর্বনো জুতার বাক্সের মধ্যে রেখে উপরে কালি দিয়ে লিখে দিল : পেত্নীকে জন্মদিনের উপহার।” তুহু আনন্দে লাফাতে লাগল। বোনের কোলে পুতুলটাকে শুইয়ে মিল। চড়া কাটতে লাগল। ‘হা-হা’ করে করে পেত্নী হেসে গড়াগড়ি।

সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্য এল। একটা কাঠের বেলপাড়ী এনেছে। প্রথমেই তুহু তাকে মার হাতে তৈরি সেই পুতুলটা দেখাল। বেলপাড়ীটা গড়িয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাসতে লাগল পেত্নী। আলো-আলানো ঘরে পিঁড়ি পাতা হ’ল। মাথবী একটা লবঙ্গ নিয়ে একটা একটা করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কপালে মুখে চন্দনের টিপ পরিবে সাজিয়ে দিল পেত্নীকে। সন্ধ্য সেই সাজানো দেখে অবাক হয়ে একবার মাসীমার দিকে চায় আর একবার ঘাড় কিরিয়ে বন্ধুকে দেখে।

মুড়ির মোয়া আর বাগামভাজা খুব হৈ হৈ করে খেল ওরা।

পাশের ঘরে নিত্য ক্যাম্পখাটে শুয়ে। বিড়ি টানছিল। তার জ্বরির চিঠির জবাব, টিউশনির টাকা সবই কেন দেহিতে পৌঁছয়

এই ভাবনার কেমন বেন বিষনা হয়ে ছিল। তুহু এসে আচমকা ঠেলা দিয়ে তুলল :

“চল বাপি, বোনটির জন্মদিন দেখবে না?”

“ও, চল চল”—বটপট উঠে পাশের ঘরে চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল নিত্য। তারপর আন্তে আন্তে পিঁড়ির কাছে গিয়ে মেয়ের কোলে মাথাটা রেখে জোয় জোয়ে মাথা ছলিয়ে তার লম্বা লম্বা চুলগুলোকে দোলাতে লাগল। বাপির এই আমরটা ভালই বোঝে সে। “তা, তা” করে মাথা চাপড়াত্তে লাগল বাপির। তুহুর কি বেন মনে হ’ল। বাপিকে হাত ধরে পাশের ঘরে টেনে আনল। তারপর আলনার ঝোলানো জামাটা ধরে নাড়া দিল। একগোছা চাবির মিঃ কনকন করে উঠল।

বাও না বাপি কিছু মিটি আনবে না!” তুহু আবদার করে বলল।

“আচ্ছা, তুই জামাটা টানিস না বাবা, ছিঁড়ে বাবে”—নিত্য সম্ভরণে শাটটা গলিয়ে নেয়। খাটের তলা থেকে চটি বার করে পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেরবার আগে একবার ক্রীণ আলোতে চন্দনপরা মেয়ে মুখখানা ভালো করে দেখে নিল। বাইরে কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মেঘ জমেছে একটু একটু। হয়ত বা জল নামবে। তুহুকে ছলনা করে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু পক্ষট বে একেবারে গড়ের মাঠ! কোথায় বা বাবে সময় কাটাতে। বাচ্চা-ছোটোয় যুমতে ত আজ ঢের দেখি। নিত্য সোজা ঠেশনের পথ ধরল।

স্বয়ংবাবুদের দালানের পাশে উচু জমিটার দাঁড়িয়ে সেই জাড়া পাছটা। ঝড়কুটো দিয়ে বাসা বেঁধেছে একটা কাক। বাজারের পথে কতদিন চোখে পড়েছে নিতার—লাল লাল ঠোটওয়ালা বাচ্চারা হাঁ করে বড় কাকটার মুখ থেকে খাবার নিচ্ছে।

নিত্য কি ভেবে সেই জায়গাটার একটু দাঁড়াল। বাসাটা বোড়ো হাওয়ার দোল খাচ্ছে।



# পল্লীশিল্প রক্ষার মূলতঃ প্রচেষ্টা

## ত্রিকালীচরণ ঘোষ

স্বাধীনতার জীবনযাত্রা ক্রমশঃই কঠোরতর হইয়া পড়িতেছে এবং ইহার পরিণতি কোথায় তাহা লইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকেই বিব্রত করিয়া ফেলিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া পথ খুঁজিয়া বাড়ির কবিরার চেষ্টায় গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতেছে। রোগের পরিচর সংগ্রহ করিবার আর বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এখন উপযুক্ত চিকিৎসক সাহায্যে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এখানেও নিরুত্তি নাই। “নার্সো মুনির্গন্ত মন্তম্ ন ভিন্নম্,” বহু ব্যবস্থাপত্র আসিয়া জমা হইতেছে। কতককে অবলম্বন করিলে নিরুত্তি, রোগ হইতে নিরুত্তি—ভববল্লভা হইতে নয়—লাভ করা যায় তাহাই বিচার্য বিষয়। এখানেও বিচারের কাল এত দীর্ঘ যে নীমাংসার পৌঁছিবাব মধ্যে রোগীর অবস্থা হীনতর হইয়া পড়িবে এমনকি রোগমুক্তির সম্ভাবনা ভিন্নোভিত হইয়া বাইতে পারে।

মাকারি ও কুটীরশিল্প লোকের আয়ের পথ অধিকমাত্রায় উন্মুক্ত করিবার সুযোগ দান করিতে সমর্থ; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কতককে অবলম্বন করা যায় এবং কোথায় ও কিভাবে কার্যাবলম্ব হয়, তাহা লইয়া সমগ্রা বাড়িয়া চলিতেছে। কুটীরশিল্প রক্ষাকল্পে যে সকল ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাহার কতগুলি পালন করা বাইতে পারে তাহা লইয়া সর্বল মতবিষোধ বহিরাছে। সাধারণ লোকে মনে করেন, কেবলমাত্র প্রচার দ্বারা ইহাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়; এমনকি আইন সাহায্যেও যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহাতেও বশেষে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বিচারপূর্বক আইন প্রয়োগ এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি সজীবিত করা প্রয়োজন। প্রচলিত কুটীরশিল্পের সহিত যন্ত্রচালিত শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিচার করিবার সময় কুটীরশিল্পের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে নূতনতর বিপদ সঙ্কটের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে কল শুভ হইবার সম্ভাবনা।

কয়েকটি শিল্প সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা বাইতে পারে। প্রথমই মুংশিল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা চলিতে পারে। ইহা-সারা ভারতের অত্যন্ত ব্যাপক কুটীরশিল্প এবং উৎপাদনকারী কৃষকরা হইতে বিক্রয়কারী দোকানদার, মালবহনকারী গোলকট এবং পল্লীর নৌকার চালক মাঝিগণ সকলের অঙ্গসংস্থানে সহায়তা করিয়া থাকে। মুংশিল্পের ব্যাপক ক্রেতা প্রত্যেক বাড়ী এবং ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে নানাপ্রকার হাড়ি, সরা, মালসা, কুঁজো, কলসী, গামলা, গেলাস, ডিস বা বেকাব প্রভৃতি বিশেষ প্রচলিত। বিশ মুংসের পূর্বে এই সকল পাত্র নিত্য ব্যবহারেও বহুদিন খুঁট অবহার থাকিয়া বাইত, সুতরাং বহুদৈনিক তৈজসাদি ওভাউত অশোচ, অরুচন, প্রহ, শার্শদেব, উচ্ছিন্ন প্রভৃতি এক-একটা উপলক্ষ

করিয়া পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। যদি চীনামাটির বাসন উদ্ভূত হইলে পরিভাগ করিবার প্রয়োজন না থাকে দ্রুত মুক্তিকার পাত্র সামান্ত উচ্ছিন্ন হইলে ফেলিয়া দিবার বশেষে কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আকাশে সূর্য-চন্দ্র প্রভৃতি বহুদৈনিক মুংপাত্র কোনও দোষস্পর্শ করে না, তাহা সতর্কই অল্পমান করা বাইতে পারে। কার্ঠেয় জালে বা উত্তাপে এক একটি পাত্র বহুকাল চলিয়া বাইত। কিন্তু ইহাতে কৃষকদের মাল বিক্রয় হয় না; তাহার অন্ত্যস্তাব ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং সমান্তপতি ব্রাহ্মণ মুংশিল্পের অর্থনীতিজ্ঞের মত যে ব্যবস্থা দান করেন তাহাতে নানা অল্পহাতে এই সকল তৈজসের পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এক পরসার ছটা মালসা, চারপানা সরা, চার-ছয়পানা বেকাব, দশ হইতে বিশটা গেলাস, দুই পরসা হইতে ছয় পরসার বড় বড় হাড়ি, তিনেল বিক্রীত হইত আর তাহাই যদি মাসের পর মাস ব্যবহার করা হয়, তাহাতে সাধারণ মুংশিল্প বিপন্ন হইবার কথা। তাহাকে রক্ষা করিবার যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেকে আনন্দে মানিয়া লইয়াছে এবং তাহাই শিল্পের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করিয়াছে। কোনও শাসন, শুদ্ধ প্রভৃতি লোকের আশঙ্কিত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই।

আজ সে ব্যবস্থা অস্তিত্ব হইয়াছে; তাহার নানা কারণও বর্তমান। কার্ঠের পরিবর্তে “পাথুরে” কয়লা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মুং-তৈজস ব্যবহার বিষয়ে বিচিত্র পরিবর্তন সংস্কারিত হইয়া গেল। সাধারণ মাটির হাড়ি এ তাপের সম্পূর্ণ অল্পপযোগী, সুতরাং শীঘ্র কাটিয়া ভাঙিয়া অব্যবহার্য হইয়া পড়িতে লাগিল। নানাতরপ অর্থ-নৈতিক কারণে দ্রব্যাদির দর বাড়িয়াছে এবং লোকের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। সুতরাং দুইটি প্রধান কারণে মাটির তৈজস আঘাত পাইয়াছে। সেই হিসাবে কুঁজা ও কলসীর প্রচলন তত হ্রাস পায় নাই, কারণ তাহাদের প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে এবং এই একই কারণে দুই শ্রেণীর মুংপাত্রের চাহিদার যে ভারতম্য ঘটিয়াছে, তাহা স্বল্প বিচারেই ধরা পড়ে। আবার এই মান প্রয়োগ করিয়া কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যের পুনঃ প্রচলনের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

বিশদ অপর দিক হইতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ইহা অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী, সুদর্শন, ব্যবহারে সুবিধাজনক এবং প্রথম বিচারে অধিক-তর মূল্যবান হইলেও মোট ব্যবহারের কাল বিচারে স্বল্পমূল্য দ্রব্যাদি আসিয়া পড়িয়াছে। সর্বপ্রকার গৃহস্থালীর কাজে মুংপাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। বেশী পরিমাণ জল ও চাউল প্রভৃতির আধার হিসাবে জালা, গামলা; চাটনি, কানুনি, পুরাতন তৈল প্রভৃতির জল হাড়ি; ঘেহ পদার্থ, অর্থাৎ তৈল-দ্রুতজাতীয় দ্রব্যাদির আধার

হিসাবে মানা আকৃতি ও রূপের বিশিষ্ট পাত্রাদির প্রচলন ছিল। বীয়ে বীয়ে সে স্থান অপর্যে গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন, কালির দোয়াত, সবই মাটির ছিল। দীপাবলীর ব্যবহার প্রচুর প্রাচীন বিক্রয় হইত। চীনা মাটির পাত্র, কাচ, এনামেল আসিয়া অধিকাংশ স্থান দখল করিয়া বসিল। বখন ইহার রাঙ্গা ভাড়ার ঘর দখল করিতে আরম্ভ করিল, তখন মৃৎপাত্র সকল স্থান বিনা বাধায় পরিভ্রমণ করিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। কিন্তু কাচ, এনামেল বা কলাই ও চীনা মাটির পাত্র অগ্নিসংস্পর্শে বিশেষ সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাট, সেখানে খান, ভাত, কাপড় প্রভৃতি সিদ্ধ করিবার জন্য মাটির পাত্রের একটা স্থান ছিল। কিন্তু বখন সম্ভার এ্যালুমিনিয়ম আসিয়া আবির্ভূত হইল, তখন সহর ও সহরতলী ত বটেই, দূর পল্লীর মধ্যেও প্রবেশ করিয়া সে অনর্থের সৃষ্টি করিল।

এলুমিনিয়ম ও অপরাপর উপকরণে প্রস্তুত দ্রব্যাদি কেবল মৃৎপাত্রের নহ, ভারতের বিশেষতঃ বাংলার এক প্রধান শিল্প পিতল ও কাঁসার পাত্র নিখাদ শিল্পেরও সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল। ইহার মৃতপ্রায়, এখনও যে কর ঘর শিল্পী এখানে-ওখানে ছড়াইয়া আছে, তাহাদের স্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, বাঁচিবার সম্ভাবনা হ্রাস পাইতেছে এবং একবার অদৃশ্য হইয়া গেলে তাহাদের আর খুঁজিয়া পাওয়া বাইবে না।

মৃৎ ও কাঁস-পিতল শিল্পের একটু বিশদ আলোচনা করিলাম কারণ ইহাদের সৃষ্টিত বহু লোকের অন্নসংস্থান জড়িত রহিয়াছে এবং সাধারণ লোকের নিকট সমস্তার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি হইবে। ঘরের ব্যবহারী আসবাবপত্রের মধ্যেও এই ভাব ও অভাব প্রবেশ করিতেছে। পল্লীশিল্প সাভায়ে তাহা পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এই টানে পড়িয়া বাহা বাঁচাইয়া রাখার নিত্যন্ত প্রয়োজন, জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে বাহা বহু সাশ্রয় দান করিতে পারে তাহাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ঢেঁকি ও গরুর গাড়ীর কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে। ইহা ভিন্ন প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, কারণ নিত্যন্ত সংক্ষেপে তাহা শেষ করা সম্ভব নয়।

“কুটীরশিল্প এমন কি মধ্যমাকার শিল্প না বাঁচিলে বা তাহার উন্নতিসাধন না করিলে দেশের সমুদ্র বিপদ” এই কথাই এখন সকলের মুখে শোনা বাইতেছে। কিন্তু কি করিলে তাহা বাঁচিতে পারে সে সম্বন্ধে মাত্র সম্প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেহ জানিতেন না তাহা বলা যায় না, কারণ “প্রবাসী” ও “মহার্ণ বিভিদ্” পত্রিকাখণ্ডের নিরমিত পাঠকবর্গ কয়েক বৎসর ধরিয়া এ বিষয় অবগত আছেন। যে সকল বিষয়ের অবতারণা এককাল করা হইয়াছে, মাত্র কয়েক মাস হইতে তাহা কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

দেশী-শিল্পের আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী ত বটেই দেশী শিল্পের উপর নানাবিধ সেস,

ট্যাক্স প্রকৃতি ধার্য হইতেছে। সে কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

কুটীরশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির উৎকর্ষের বিষয় এতাবৎ বখাবোগ্য মনোবোণ আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী যখন উন্নত চরকা আবিষ্কৃতাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন হইতেই সামান্য যন্ত্রপাতিতে উন্নতিসাধনের কথা বড় করিয়া দেখা দেয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা সদিচ্ছামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কোথাও কোনও উন্নত যন্ত্র এ শ্রেণীর শিল্পে প্রয়োগের বাকী পাওয়া যায় না। সম্প্রতি অংগিল-ভারত খাদি ও পল্লীশিল্পোন্নতি সংস্থা (অন্-ইণ্ডিয়া খাদি এ্যাণ্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড) এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। ইহা ছাড়া “নাস্তোব গতিবনখা” বুদ্ধিমা পল্লীশিল্পপণ্য উৎপাদনে বড় কারখানার উন্নত প্রণালীর পরিবর্তিত সংস্করণে প্রয়োগ (for utilising and adopting current technology to village industries) করিবার জন্য এক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে। এই প্রথায় পল্লীশিল্পপণ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং তাহার নিষ্ক্রেয় গুণে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস।

বিদেশী প্রথা লক্ষ্য করিবার জন্য এবং সম্ভব হইলে তাহা দেশে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে বহু অর্থব্যয়ে অনেকে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই, তাহা এখন আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। দেশের প্রয়োজন দেশীয় কারিগরের বুদ্ধি, কৃতি ও সাধা বুদ্ধিমা যদি যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সফল পাওয়া বাইবে। অপর দেশ হইতে অকস্মাৎ একটা ভাল গাছ আনিয়া দিলে যেমন এ দেশের মাটিতে শিকড় বিস্তার নাও করিতে পারে শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া নিত্যন্ত স্বাভাবিক।

এই সম্পর্কে অপর যে নীতি গৃহীত হইতেছে তাহা বড় শিল্পের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া ক্ষুদ্র শিল্প রক্ষা প্রচেষ্টার পরবর্তী অবশ্যস্তাবী পরিণতি বলিয়া মনে করা বাইতে পারে। মাজাজ রাজ্য-সরকার তাঁত রক্ষা করিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড অঞ্চলে মিলবস্ত্রের “আমদানী” বন্ধ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। ইহার “সু” ও “কু” দুই দিকই আছে এবং ইহা বাঞ্ছনীয় কি না তাহা এখানে বিচার করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। যদি পল্লীশিল্প নিজের শক্তিতে ধাঁড়াইতে না পারে বা সেরূপ ব্যবস্থা কৃত সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে রক্ষিত অঞ্চল সৃষ্টি করিয়া ওভ-দিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। একই অঞ্চলে মিল ও কুটীরশিল্পজাত পণ্য বিক্রীত হইলে নানা কারণে মিলজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। যদি অনবরত কৃত্রিম ভাবে মিল-দ্রব্যের দর বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে মিল ক্রমে দর সম্ভা করিতে চেষ্টা করিবে আর ক্রেতা ক্রমে উচ্চতর মূল্যে মাল ক্রয়ে অভ্যস্ত হইলে কুটীরশিল্পের দুর্দশা ঘুচিবার সম্ভাবনা ঘটিবে না। তাহা ছাড়া, “বদেশী” এবং অধিক মূল্যে

সদাসর্বল্য ক্রম করিতে গেলে প্রতিনিয়ত যে কতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে কুটারশিল্পজাত পণ্যের উপর একটা বিবেচ্য ভাব জন্মিতে পারে। তদপেক্ষা একই রকম মাল পাওয়া যায় এবং অপর কাহারও সহিত গুণ ও দর তুলনা করিবার সুযোগ থাকে না, এইরূপ একটা অবস্থা লইয়া পরীক্ষা করা নিতান্ত অর্থোক্তিক বলিয়া মনে হয় না। তবে এই প্রসঙ্গে বল্য বাইতে পারে, কেবল তাঁত-বস্ত্র নয়, বা কেবল মাজাজ রাজ্য নয়, অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে কারখানাজাত মাল বর্জন করিয়া যদি চলা সম্ভব হয়,

তাহার পরীক্ষা করাই সমীচীন। গান্ধীজীর উক্তসংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন; তাহারাই এখন অধিকাংশ রাজ্যের কর্তব্য। এখন যদি দুই তিনটি প্রতিলেখী রাজ্য মিলিয়া এ পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হন, রাজ্য-সরকারের আয়, নাগরিক সাধারণের অসুবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া কুটারশিল্প ও সহজ সরল জীবনযাপনের পরীক্ষার উদ্যোগ হন, তবে কেবল ভারতবর্ষের নয়, সারা জগতের একটা মহত্বপূর্ণ সাধন করা হইবে। আমরা আশাবিত্ত চিত্তে এই সুদিনের অপেক্ষা করিয়া জীবনাতিপাত করিব, তাহাতে সংশয় নাই।

## কণ্ঠস্বর

শ্রীউমা দেবী

এমন সন্ধ্যা হয়ে চাঁদ কোনোদিন আগে ওঠে নি আকাশে,  
এমন সৌরভ-ঢালা ছিল না-তো কোনোদিন দক্ষিণ বাতাসে,  
জন্মের লাবণ্য এত কোথা থেকে এসে এক নিটোল আশ্বাসে—

ভালোবাসে—সে আমার কত ভালোবাসে!

এখন তো ধরে ধরে সন্ধ্যামণি ফুলগুলি ফুটে উঠে সুগভরে হাসে,

চাঁপার সোনালি শাখা—

চাঁদ সোনালি মাখা—

মেঘে মেঘে কাঁচা সোনা ভাসে

—বাসনার তরঙ্গ-উচ্চাসে,

জন্মের উঠেছে জেগে এই অবকাশে।

বদিও—বদিও আছে হ'জনার মাঝখানে বেদনার তরঙ্গ হৃদয়  
তবু—তবু যদি বায়ুপ্রোতে একবার ভেসে আসে তার কণ্ঠস্বর!

সে কণ্ঠে কি বাহু আছে জানি না সে কথা

সে সূত্রে স্বতি শুধু স্বপ্নময় বাখা।

আহা, মনোহর তার নবনীত-সুকুমার মোহময় তরু,  
কচিং জন্মের তবু ভেঙে হ'ত পানু পানু ময়মের ধরু।

আহা—সুধামর তার পরশের পাবারাব শীতল গভীর—

সে শীতল আলিঙ্গনে প্রাণ হ'ত মরণের বহুস্তে অধীর।

আহা—দেহগন্ধে তার

মুক্ত সৌভাগ্যের ধার—

উদ্গাদনা বহু নিশীথের—

তুলনা—তুলনা শুধু কল্পনায় যুগের।

মধুর মধুর তার সব

দেহ মন প্রাণের বিস্তার,

বদিও—বদিও আজ হ'জনার মাঝখানে বেদনার তরঙ্গ হৃদয়

তবু—তবু যদি বায়ুপ্রোতে একবার ভেসে আসে তার কণ্ঠস্বর!

সে কণ্ঠে কি বাহু আছে জানি না সে কথা

সে সূত্রে স্বতি শুধু স্বপ্নময় বাখা।

কবে সে-বলেছে কথা শুন্ শুন্ ভুলে বাওয়া আঁধ আঁধ স্বতির মতন  
সে অসুস্থান আজো শেষ তো হয় নি তাই বহুস্তের এত আলাপন

—পৃথিবীর ফুল আর আকাশের তাহার তাহার,

সে কথা শোনার আগে—

সে কথা বলার আগে—

সে কথা বোকার আগে—অকস্মাৎ শেষ হয়ে যায়।

কবে সে গেয়েছে গান সুরের আশ্রয় তার জলে প্রাণে প্রাণে—

নভ থেকে স্খালোক তাই বায়ে বায়ে আসে ধরিত্রীর টানে

কে জানে কি গুণ আছে, কি আশ্রয় আছে তার গানে।

ভুলে যেতে পারি না সে কথা—

সে সূত্রে স্বতি শুধু স্বপ্নময় বাখা।

আজো তো প্রত্যেক রাত্রে

কুসুমের পাতে পাতে—শিশির বগন

ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে অজস্র মতন,

বনে বনে বায়ু বয়ে যায়—

যেন এক দীর্ঘশ্বাস গাড় ততশায়,

ভাঙা ভাঙা ওঠে রাজ্য চাঁদ,

মুজ্জিত আকাশে যেন স্বপ্নের প্রমাণ;

ধরণী ঘুমায় এক গর্ভভার-অবসন্ন। নারীর মতন

ঘুমায় তবুও দেখে স্পন্দমান সৃষ্টির স্বপন

জন্মের সমুদ্রের পার থেকে আসবে সে কবে বল কবে—

ধরণীর সোনাভাঙা হিম বালুতটে,

একান্তই আমার নিকটে—

আহা—নবনীত তার তরুতটে থাকবে কি রাতের শিশির—

আঁপিপটে জাগবে কি ভোরের মিহির?

এই তো—এই তো রাত—অন্ধ রাত উজ্জ্বল কেমন

বাতাসেও সৌরভ তেমনি!

লেগি নি তো এর আগে কোনো রাত সূর্যের এমন!

এমন সূর্যের হয়ে চাঁদ কোনোদিন আগে ওঠে নি আকাশে,

এমন সৌরভঢালা ছিল না তো কোনোদিন দক্ষিণ বাতাসে!

আনন্দের এমন উচ্চাসে—

আর এতটুকু পেলে এ আকাশ এ বাতাস হ'ত জানি সুনিশ্চিত

অমৃত-মধুর

সে শুধু—সে শুধু আহা তার কণ্ঠস্বর।

# সিংহল-নরপতি প্রথম পরাক্রমবাহু

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

রাজ্য কীর্ত্তিপ্রদায়ক যুগের পর প্রথম পরাক্রমবাহু খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে সিংহলের রাজা হন। কথিত আছে, তিনি সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন হার জন্মভূমি ছিল পুত্ত্রগ্রামে। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের তিনটি তারিখ পাওয়া যায়—যথা : খ্রীঃ ১১৫৩ ; খ্রীঃ ১১৫৯ এবং খ্রীঃ ১১৬১। তিনি রাজ্যশাসনে বিশেষ পরদর্শী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার চেষ্টায় লঙ্কাদ্বীপে শান্তি আনয়ন করেন। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, মঠ, মন্দির, ভূপ, উদ্যান, পুষ্করিণী, খাল, রাজপথ, বিপণি, স্নানাগার প্রভৃতি নিৰ্মাণ করিয়া তিনি লঙ্কাদ্বীপের শোভাবৰ্দ্ধন করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজ্য ও শরীর উন্নতি বিষয়ে পরাক্রমবাহু সচেষ্ট ছিলেন। সিংহলের নৃপতিগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা ধ্যাতিমান ছিলেন। মন্ত্রাতি অশোকের দৃষ্টান্ত অঙ্কুরণ করিয়া তিনি ধর্ম, কৃষিকর্ম ও অন্যান্য কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পুলস্তিপুর নগরে বাস করিতেন। বহু প্রাসাদ ও উদ্যান নির্মাণ করিয়া এই নগরটি সুরক্ষিত ও শ্রীমণ্ডিত করেন। তিনি পোলনারুবা নগরটি পুনর্নির্মাণ করেন। এখানে বিহারগুলির সংস্কার ও নূতন ধর্মমন্দির স্থাপনা করেন। ইহাদের সঙ্গসাধারণে অজাপি পোলনারুবাতে দৃষ্ট হয়। রোহণ প্রদেশের গ্রামে ও নগরে তিনি অনেকগুলি গৃহ নির্মাণ করেন। সুবিস্তৃত ও সুন্দর পুলস্তি নগরটি তাঁহার সময়ে পুনর্নির্মিত হয়। ইহার চৌদ্দটি দরজা ছিল। সেগুলি এই : (১) বিশেষ রাজদ্বার, (২) সুন্দর সিংহদ্বার, (৩) সুবিস্তৃত হস্তীদ্বার, (৪) ইন্দ্রদ্বার, (৫) হরুমানদ্বার, (৬) সুউচ্চ কুবের দ্বার (৭) সুসজ্জিত চণ্ডীদ্বার, (৮) রাক্ষসদ্বার, (৯) উচ্চ সর্পদ্বার, (১০) সুন্দর জলদ্বার, (১১) উদ্যান দ্বার, (১২) বুদ্ধের মাতার নামানুসারে) মায়াদ্বার, (১৩) মহাতীর্থদ্বার এবং (১৪) সুন্দর গন্ধর্ব্বদ্বার। এই নগরটির মধ্যভাগে ভগবান বুদ্ধের দন্তধাতুর রক্ষার জন্য মন্দির নির্মিত হয়। এই উপলক্ষে তিনি উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। পুলস্তি নগরীর চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্মিত হওয়াতে নগরটি সুরক্ষিত হয়। তিনি বহু পথঘাট নির্মাণ করেন। বহু স্তম্ভশোভিত নামাবর্ণে চিত্রিত অনেকগুলি কক্ষযুক্ত একটি সমুদ্রতল প্রাসাদ নিৰ্মাণ করেন। এই নগর বহুশত কূটাগার দ্বারা শোভিত ছিল। ইহার সুবর্ণমণ্ডিত দরজা, জানালা, উত্তম দেওয়াল ও সোপান ছিল। নৃপতির শয়নকক্ষটি সুবর্ণমণ্ডিত দীপাবলীর মালা দ্বারা

করিয়া সৌন্দর্য্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই রমণীয় প্রাসাদটির নাম পরাক্রম রাখিয়াছিলেন—বৈজয়ন্ত অর্থাৎ দেবপুত্রী। পরাক্রমপুর নগরটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ ছিল। ইহা দ্বার, চূড়া, প্রাচীর, উদ্যান, প্রাসাদ ও বিপণি দ্বারা সুশোভিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জেতবন বিহারে স্থবিরগণের নিমিত্ত তিনি আটটি ত্রিতল মহামূল্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। স্থবির সারিপুস্তের জন্য বহু কক্ষ ও বহু প্রাক্ষণযুক্ত একটি সুবৃহৎ সুরমা প্রাসাদ নির্মিত হয়। ভিক্ষুগণের ৭৫টি বাসগৃহের জন্য সুবৃহৎ, সুচিত্রিত প্রাসাদ, ১৭৮টি ক্ষুদ্র প্রাসাদ এবং ৩৪টি দ্বার-তোরণ নির্মাণ করেন। শিকার-বিমান নামে একটি চারিতল প্রাসাদ নির্মিত হয়।

রাজবেশভূষণ, রাজকুলসুতক, ও বিজিত নামে তিনটি উপনগরের ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন। এইগুলিতে সুরমা ত্রিতল প্রাসাদ ছিল এবং বেদবন, ইসিপতন ও কুশীনগর নামে যথাক্রমে তিনটি বিহার ছিল। পরাক্রমবাহু নগরের মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ শালা নির্মাণ করেন। ইহাতে চারিটি দ্বার ও অনেকগুলি ঘর ছিল। মনোহর উদ্যান-শোভিত চারিটি ভিক্ষুগৃহ নির্মিত হয়। যাহারা শীল রক্ষা করিত তাহাদের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করা হইত। তিনি অনেকগুলি ভাণ্ডার নির্মাণ করেন। ইহাতে নিত্যব্যবহার্য্য সকল বস্তু পাওয়া যাইত। শত শত ক্লর ব্যক্তিদের জন্য একটি বৃহৎ গৃহ নির্মিত হয়। এখানে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরা দিবারাত্র রোগীদিগকে সেবা করিত। অনেকগুলি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে বহুপ্রকার ঔষধ সংগৃহীত হয়। পরাক্রমের সুব্যবস্থায় সুদক্ষ, সুপণ্ডিত চিকিৎসকগণ উত্তমরূপে চিকিৎসাকার্য্য চালাইতেন। রাজা চিকিৎসকগণের দক্ষতার পরীক্ষা লইতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন এবং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত কবিবার জন্য হেমমন্দির (সুবর্ণ গৃহ) নির্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত মন্ত্র উচ্চারণের জন্য ধারণীঘর, বুদ্ধের জন্মকথা শুনিবার জন্য মণ্ডল মন্দির এবং পীতবস্ত্রধারী ভিক্ষু-প্রদত্ত যাচবিদ্যাপূত জল ও স্ত্রীগ্রহণের জন্য পঞ্চসত্ত্বী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পরিণত উৎসবসমূহ পালিত হইত। এই উৎসবসমূহে জল ও স্ত্রীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা ও প্রচারকার্য্যের জন্য তিনি বহুবর্ণশোভিত উত্তম চন্দ্রোতপমণ্ডিত, আলোকমালায় উজ্জল, গন্ধদ্রব্যে সুবভিত একটি ধর্ম্মাগার নির্মাণ করেন।



গায়কগণের সুমধুর সঙ্গীত ও নৃত্য উপভোগ করিবার জন্য প্রাসাদের অনতিদূরে সর্বস্বতী মণ্ডপ নির্মিত হয়। ইহার স্তম্ভগুলি সুবর্ণমণ্ডিত ছিল। এখানে রাজার কার্য্যাবলী বহু চিত্রে অঙ্কিত ছিল। রাজবেশিতুজ্ঞ নামে একটি সুন্দর মণ্ডপ নির্মিত হয়। ইহা মণ্ডপসদৃশ ছিল বলিয়া ইহাকে মণ্ডপ বলা হইত। ইহা ঠিক দেবসভার আয় ছিল। নানা চিত্রশোভিত এই ত্রিতল প্রাসাদটি সুন্দর বেদিকায় বেষ্টিত ছিল। পরাক্রম একস্তুস্ত প্রাসাদ নির্মাণ করেন, ইহাতে একটি সুবর্ণমণ্ডিত কক্ষ ছিল। ত্রিবন্ধমূর্তির জন্য তিনি ত্রিবন্ধগৃহ নির্মাণ করেন। রাজা পরাক্রমবাহু তিনটি ধর্ম্মাগার, একটি চৈত্যা, আটটি সুরহং বিহার, এবং ইষ্টকনির্মিত অনেকগুলি অগ্নিগৃহ নির্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত পাঁচটি নাট্যশালা নির্মিত হইয়াছিল। শহরবাসীরা যাহাতে সহজে ষাণ্ডক্রয় পাইতে পারে সেইহেতু রাজা পরাক্রম সিংহলের বিভিন্ন স্থানে উদ্যান স্থাপন করেন। প্রাসাদের সন্নিকটে রাজার একটি নিজস্ব উদ্যান ছিল। এখানে বহু প্রকার ফুল-ফলের গাছ ছিল। এগুলি দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। অশোক, চম্পক, তিলক, নাগ, পুরাগ, কেতক, পাটলি, নীপ, জম্বু, কদম্ব, বকুল, কুটজ, বিষ্ণুজালক ও তমালবৃক্ষ এবং নবমল্লিকা লতা এখানে দৃষ্ট হইত। মধুকরদিগের গুঞ্জন ও ময়ূরের কেকারবে উদ্যানটি মুগ্ধরিত হইত। এই উদ্যানে অনেকগুলি পুষ্করিণী ও স্নানাগার ছিল। শিলাপুষ্করিণী ও মঙ্গলপুষ্করিণী নামে দুইটি সুন্দর পুষ্করিণী এই উদ্যানে ছিল। এই উদ্যানে চন্দনকাষ্ঠ-নির্মিত স্তুপশোভিত একটি সুরহং প্রাসাদ ছিল। স্নানাগারযুক্ত দীপ-উদ্যান নামে আর একটি বাগান রাজা পরাক্রমবাহু স্থাপন করেন। তাল, হিঙ্গাল, নাগ, পুরাগ, কণিকার প্রভৃতি বৃক্ষ দীপ উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিত। দীপ-উদ্যানে শনিমণ্ডপ ( শনিগ্রহের আবাস ), মোরামণ্ডপ ( ময়ূর-মণ্ডপ ), আদাম মণ্ডপ ( আয়নাগৃহ ) অবস্থিত ছিল। অনন্ত পুষ্করিণী নামে একটি স্নানের পুষ্করিণী ছিল। ধবলাগার নামে একটি খেতগৃহ এখানে ছিল। এই উদ্যানে বিদ্যা-মণ্ডপ নামে একটি দিব্যভবনে নানা বিদ্যার চর্চা চলিত। এখানে সুবিভূত দোলামণ্ডপ ( দোলনাগৃহ ) ছিল। এখানে কিরামণ্ডপে ( ক্রীড়াগৃহে ) অবস্থিত হইয়া রাজা আনন্দ উপভোগ করিতেন। নন্দন উদ্যানে বহুপ্রকার পুষ্পফল-শোভিত বৃক্ষ দেখা যাইত। লক্ষ-উদ্যান নামে একটি বড় বাগানে রাজা আত্র ও নানা বৃক্ষ রোপণ করেন। ইহা ব্যতীত চিত্তলভাবন ও মহাশেষ-বন উদ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বস্ত্রা ও হুড়িঙ্কের কবল হইতে বাহাতে প্রজাগণ রক্ষা

পায় তক্ষক তিনি বিভিন্ন স্থানে ঝাল ও পুষ্কারন খনন করেন। ভারতীয় নদীর নামের অনুকরণে তিনি কতকগুলি ঝালের নাম দেন। কথিত আছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের জন্য তিনি ২১৬টি পুষ্করিণী খনন করেন, তন্মধ্যে উল্লেখ্য নামক সুরহং পুষ্করিণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরাক্রমসমুজ্ঞ নামক বৃহৎ জলাশয়টি সর্বদা জলে পূর্ণ থাকিত। পরাক্রম-তড়াগ নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। গম্ভীরা, নীল-বাহিনী, বেত্রবতী, তুঙ্গভদ্রা, মঙ্গলগঙ্গা, চম্পা নামক ঝাল-গুলিও খনন করা হয়। সর্বস্বতী ঝাল ভোয়বাণী হইতে বহির্গত হইয়া পুণ্যবর্দ্ধন বাপীর দিকে প্রবাহিত। যমুনা ঝাল পুণ্যবর্দ্ধন হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং সরভু ঝাল উত্তর দিকে প্রবাহিত। লোক-উদ্যানের মধ্য দিয়া চন্দ্রভাগা এবং জেতবন বিহারের মধ্য দিয়া নর্মদা ঝাল প্রবাহিত হইয়াছে। নৈবগ্ননা ঝাল উত্তরবাহিনী এবং অনবতপ্ত জলাশয় হইতে ভার্গৱধীর উৎপত্তি ঘটে। কালিন্দী প্রোতধারা দক্ষিণমুখী হইল এবং কাবেরী জলধারা গিরিতড়াগ হইতে বহির্গত হইল। রাজা গোদাবরী ঝাল খনন করেন এবং ইহার জলধারা পরাক্রমসাগরে পতিত হয়। তাঁহার চেষ্টায় উল্লেখ্য, পাণ্ডুকলধ প্রভৃতি পুষ্করিণীর সংস্কার হয়।

পরনবিতান ঠিকই বলিয়াছেন যে, ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পরাক্রমের সিংহাসনে আরোহণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহার ৩৩ বৎসর কাল রাজা সিংহলের ইতিহাসে স্থাপত্য-শিল্পের দিক দিয়া একটি গৌরবময় যুগ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি পোলনারুবাতে দৃষ্ট হয়। পরাক্রমের সিংহাসনের আরোহণের পূর্বে অনেকগুলি স্তূপ নষ্ট হইয়াছিল। রাজা হইয়া পরাক্রম সেগুলির সংস্কার করেন। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধগণ বৃহৎ স্তূপ নির্মাণরীতি বহু যুগ ধরিয়া ত্যাগ করিয়া-ছিল—রাজা পরাক্রম ঐ রীতির পুনঃপ্রবর্তন করেন। পরাক্রমের পত্নী ভদ্রবতী পোলনারুবাতে কিরিবিহার নামে একটি চৈত্যা নির্মাণ করেন। সিংহলে ইহা একটি পুরাতন সুরক্ষিত স্তূপ। রাজা পরাক্রমের রূপবতী নার্মী অপর মহিষী একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। বর্তমানে ইহা পবলু-বিহার নামে পরিচিত একটি ধ্বংসস্তূপ। পরাক্রমের জন্ম-ভূমিতে ও যেখানে তাঁহার মাতার সংস্কার হয় সেই স্থানের স্তূপগুলি আজও অজানা রহিয়াছে। পরাক্রম একটি সুরহং স্তূপ অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান। এই অসম্পূর্ণ স্তূপটি পোলনারুবার উনগলবিহার নামে পরিচিত।

রাজা পরাক্রম ভিক্ষুদিগের বাসোপযোগী সুরহং বিহার নির্মাণে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি সুরহং জেতবন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে ৫২০টি অট্টালিকা ছিল, আটটি প্রস্তরময় স্নানাগার নির্মিত হয়—এ গুলিতে স্তম্ভ, সোপান



ও বেদিকা ছিল। রাজা সুল্লের আড়াহণপরিবেশ নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ নগরের বহির্ভাগে কতকগুলি অট্টালিকা ছিল। বর্তমানে এই অট্টালিকাশ্রেণী সাধারণের নিকট জেতবনারাম নামে পরিচিত। এখানে সুভদ্রা চৈত্যা ও রূপবতী চৈত্যা নির্মিত হয়। রাজার জন্মভূমি পুন্ড্রগ্রামে স্মৃতির চৈত্যা স্থাপিত হয়। এই চৈত্যা ১৮ ফুট উচ্চ ছিল। রাজা পরাক্রম খীরগ্রামে নিজ মাতার সমাধিস্থানে ১৮ ফুট উচ্চ স্তম্ভাকার চৈত্যা নির্মাণ করেন। ১৬টি চৈত্যা, বোধিবৃক্ষ, বোধিমন্দির, বোধিতোরণ, নির্মিত হয়। বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত চিহ্নস্বরূপ বিশাল অশ্বখবৃক্ষ সিংহলে অবস্থিত।

রাজা পরাক্রম বুদ্ধশীমা প্রাসাদ নামে একখানি দ্বাদশতল গৃহ নির্মাণ করেন। এই গৃহ দৈর্ঘ্যে ৩ প্রস্থে ২৬২ ১/২ ফুট ছিল। তিনি পশ্চিমারামের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বিহারে ভিক্ষুদের বাসের জন্য ২২টি কক্ষ ছিল। অনেকগুলি দ্বিতল স্তূপীয়া প্রাসাদ, কুড়িটি অগ্নিগৃহ, একটি ভজনাগার, দশটি তোরণ এবং ৪১টি স্নানাগারসমেত দ্বিতল কুন্ড প্রাসাদ এখানে নির্মিত হয়। এই পশ্চিমারাম ভিক্ষুদিগের ইন্দ্রেশে উৎসর্গ কর; হইয়াছিল। রাজা উত্তরারাম এবং মহাস্তূপ নির্মাণ করেন। মহাস্তূপ ও দমিত্তস্তূপ অভিন্ন। ইহা সর্বাঙ্গাৎ ২২২ ফুট। ইহার পরিধি ছিল ১৩০০ হাত। রাজবেশিভূজ্ঞ এবং সিংহপুর উপনগরে যথাক্রমে ইপিপতন বিহার এবং কুশীনার; বিহার নির্মিত হয়। প্রথমটি

ভিক্ষুদিগের নিকট-অতি মনোরম স্থান ছিল। বিজিত উপনগরে গ্রামের উপকণ্ঠে বেলুবন বিহার স্থাপিত হয়। কপিল মূনির সন্মানার্থে কপিল বিহারে একটি মূল্যবান দ্বিতল প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। চোড়গণ লৌহপ্রাসাদ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজা পরাক্রম পুনরায় ইহাতে ১৬০০ স্তম্ভ বসাইয়া ইহার সংস্কার সাধন করেন। হমিট (তামিল) কর্তৃক বিনষ্ট তিনটি স্তূপ পুনরায় নির্মিত হয়। ইহা ব্যতীত রত্নবালুকাস্তূপ, জেতবনস্তূপ, অভয়গিরিস্তূপ এবং মরিচবট্টস্তূপের সংস্কার সাধিত হয়। চেতিয়গিরিতে (অর্থাৎ মিহিস্থাল পর্বতে) ৬৪টি স্তূপ পুনর্নির্মিত হয়। কাহারও কাহারও মতে এগুলির কেবল সংস্কার হইয়াছিল।

১। এই প্রবন্ধ রচনাকালে আমরা যে যে পুস্তক হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

*Epigraphia Zeylanica*, I, II; *Archaeological Survey of Ceylon*, 1901, 1905, 1906; A. M. Hocart—*The Topography of Palommaruva* (*Archaeological Survey of Ceylon Memoir*, II, 1926); *J.R.A.S.C.B.*, Vol. XXX; Bode—*Pali Literature of Burma*; *Culavamsa* (Pt. I); *Culavamsa*, Tr. II (P.T.S.); Law—*History of Pali Literature*; Law—*Rivers of India*; *Mahavamsa Commentary* (P.T.S.); Paranavitana—*The Stupa in Ceylon*; Barua—*Ceylon Lectures*; Law—*Geographical Essays*; Smither—*Architectural Remains of Anuradhapura*; P. M. Burrows—*The Buried Cities of Ceylon*.

## দিবস-দয়িতে ভুলি'

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

ধূসর সন্ধ্যার কোলে অঘোরে ঘুমতে লাগে, রৌদ্রদীপ্ত দিবসের সাথ  
প্রশ্ন-প্রাচুর্য্য তাতে শতাব্দীর গর্ভ নিয়ে মুছে নিক্ সকল আচ্ছাদ,  
নিয়ে থাক মধুমাস, অকুরন্ত কুণ্ডল, আর নিতে সর্বনাশা আশা—  
কালের কামনা-মনে দাগ কেটে রেখে যেতে ঘুরে থাক প্রেম ভালবাসা।

দিবস দয়িত স্বর্গা অল্পলি ভরিয়া যদি অশ্রুসনে করিতে তর্পণ—

আবার আমার সেই ঘুমন্ত আত্মারে ডেকে নিজেবেই ক'রে সমর্পণ,  
তখনো বেন গো সেই অনাদি কালের আমি ফেলে বাই এই উপহার  
আমার স্ব পুরে 'অরি' নরম সন্ধ্যার কোলে মুছে ফেলি স্বপ্নের ভার।

প্রবল-পাবক-প্রমে আমারে জড়ারে ধরে' তেজোদীপ্ত দিবসের চোখ

আমারে প্রত্যক্ষ করি' আমার পৌরুষ সনে ঢেলে দিল উজ্জ্বল আলোক,  
সে আলোকে ভুলে গেছি—তিমির-তপস্যা-ভলে হচা কত শান্তি-অনিবিত্ত  
সেখানে একাকী রব, আমার আমিবে লয়ে, সে নির্জনে রহিবে না ভিত্ত।

দিবসে পেয়েছি জালা—অভিশাপ মর্মে বহি, পদে পদে মিথ্যা অকীকার

এখন সন্ধ্যার কোলে গাঁধিব একটি মালা—বাস্তে নাই কারো অধিকার।

# কাদম্বরী

(কাব্য-সমালোচনা)

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম ত্রিংশদশী-রচিত “দশকুমারচরিত”, সুবহু-রচিত “বাসবদত্তা” এবং বাণ-রচিত “কাদম্বরী”। পুনরায়, এই তিনটির মধ্যে, “কাদম্বরীই” সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও চরম উৎকর্ষরূপে প্রসিদ্ধতম। মহাকবি বাণ তাঁর অপর সুবিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ “হর্ষচরিতের” প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমার্ধে নিজের যে জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি চিত্রভাঙ্গ ও রাজ্যদেবীর পুত্র, এবং রাজা ক্রীর্ধের বিশেষ প্রিয় সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং বাণ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে ভাষ্যভূমি অলঙ্কৃত করেন।

“কাদম্বরী” একটি সুবৃহৎ গদ্যগ্রন্থ, এবং আলঙ্কারিকদের মতে, বাণ-রচিত “হর্ষ-চরিত” ও “কাদম্বরী” যথাক্রমে “আখ্যায়িকা” ও “কথা” শ্রেণীর গদ্যরচনার আদর্শ বা প্রতীকস্বরূপ। দূর্ভাগ্যবশতঃ বাণ “কাদম্বরীর” অর্ধাংশ মাত্র রচনা করে মহাপ্রয়াণ করেন, এবং অবশিষ্ট অংশ তাঁর স্ত্রীযোগা পুত্র ভূষণভট্ট বা ভট্টপুলিন সমাপ্ত করেন। যে অর্ধাংশ বাণভট্টের স্ব-রচিত, তাও আর্যতনে অতি বিপুল। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের আখ্যানাংশও অতীব চক্কর ও জটিল। তার কারণ এই যে, এতে নায়ক-নায়িকা ও উপনায়ক-উপনায়িকার দুই বা তিন ভিন্নরূপে বৃত্তান্ত বাণত হয়েছে, এবং বর্ণনা-প্রণালীও জটিল। এক জনের দ্বারা কথিত গল্পের মধ্যেই দ্বিতীয় এক জন কর্তৃক অপর একটি বৃত্তান্ত, পুনরায় তার মধ্যেই তৃতীয় এক জন কর্তৃক তৃতীয় একটি বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে বলে গ্রন্থটির মূল কথাবস্তু কিরূপে কঠিন হয়ে উঠেছে। কথা—গ্রন্থের প্রারম্ভে, মূল গল্পটির শুক রাজা শূন্যককে বলছে, পুনরায় সেই গল্পটি মহামুনি জাবালি শুককে বলছেন, পুনরায় জাবালি শ্ববির গল্পের মধ্যে উপনায়িকা মহাশেতা নায়ক চন্দ্রাপীড়কে স্বীয় করুণ বৃত্তান্ত বলছেন, পুনরায় মহাশেতার আখ্যানের মধ্যে কপিঞ্জল তাঁকে উপনায়ক পুণ্ডরীকের বৃত্তান্ত বলছেন—এই ভাবে আখ্যান, উপ-আখ্যান, তার মধ্যে পুনরায় আখ্যান—এই প্রণালীতে সমগ্র গ্রন্থটি রচিত।

পিতা-কর্তৃক প্রারম্ভ এবং পুত্রকর্তৃক সমাপ্ত সুবিশাল “কাদম্বরী” গ্রন্থের গদ্যাংশ অতি সংক্ষেপে এইরূপ :

বেত্রবতী নগীকুলস্থিত বিদিশা নগরীর রাজা শূন্যক জনৈক। চণ্ডালকণ্ঠ কর্তৃক আনীত একটি শুকের মুখে সমগ্র আখ্যান শ্রবণ করেন, এবং শুক সেটি জাবালি মুনির মুখে শ্রবণ করে। আখ্যানটি নিম্নলিখিতরূপ—

উজ্জয়িনী নগরীর রাজা তাবাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় এবং কুন্তী শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়ন নিবিড় বন্যস্থানে আবদ্ধ ছিলেন। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে নিবিড় বনে অপরাকুমারী, তপস্বিনী

মহাশেতার পরিচয় হয় এবং মৃত স্বপুত্র পুণ্ডরীকের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় যে তিনি এইরূপে তপস্বীত্ব আছেন, সে কথা চন্দ্রাপীড় জানতে পারেন। এই সূত্রে, মহাশেতার প্রিয়তম বন্ধু গন্ধর্বরাজকুমারী কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের মধ্যে প্রণয়সংস্কার হয়। কিন্তু পিতার আদেশে চন্দ্রাপীড়কে সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয় ; এবং স্থির হয় যে, বৈশম্পায়ন সৈন্তদল সহ বীরে বীরে তাঁকে অনুসরণ করবেন। বৈশম্পায়ন নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাবর্তন না করাতে উবিগ্ন চন্দ্রাপীড় বনে গমন করে বোদ্ধদামান্য মহাশেতার মুখে সংবাদ পান যে, বৈশম্পায়ন মহাশেতার নিকট প্রেম নিবেদন করাতে, তিনি বৈশম্পায়ন যে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু তা না জেনে, তাঁকে অভিশাপ দিয়ে একটি শুকে পরিণত করেছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে চন্দ্রাপীড় প্রাণত্যাগ করেন। পরে দৈববাণী দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটি শুকলের নিকট সুপরিষ্কৃত হয়। অর্থাৎ, মহাশেতার প্রেমপাত্র পুণ্ডরীক শ্ববির মৃত্যুর পরে মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়নরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং মহাশেতার শাপে শুকরূপ ধারণ করে তিনিই এখন রাজা শূন্যককে সব গল্পটি বলছেন। অপর পক্ষে, চন্দ্রাপীড়ই মৃত্যুর পরে রাজা শূন্যকরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। পুনরায় পুণ্ডরীকের বন্ধু কপিঞ্জল চন্দ্রাপীড়ের প্রিয় অশ্ব ইন্দ্রায়ুধ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রাপীড় চন্দ্রের অংশ, এবং তাঁর সহচরী পত্রলেখা চন্দ্রপত্নী বোধিণী। এক্ষণে জন্মজন্মান্তরের লীলাধেলার নায়ক-নায়িকা চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী এবং উপনায়ক-নায়িকা পুণ্ডরীক ও মহাশেতার মিলন হয়।

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই “কাদম্বরী” কথাগ্রন্থের বিবরণস্ত বিকাশ প্রণালীর অসংখ্য জটিলতা ও অস্পষ্টতার আভাস পাওয়া যাবে। “কাদম্বরী” কাব্য সমালোচনা কালে এই দোষটিই আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। আখ্যানের মধ্যে উপ-আখ্যান প্রথার সমগ্র গল্পটিকে একরূপ সুদীর্ঘ ও জটিল করে তোলা হয়েছে যে, পাঠকের বৈধবুদ্ধি হওয়া আবশ্যক নয়। আখ্যায়িকা ও উপ-আখ্যায়িকার সাহায্যে মূল বিবরণস্তর সম্প্রসারণ অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় রীতি, এবং “কাদম্বরী” যে এই রীতির উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত তা নিঃসন্দেহ। কারণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থের অসংখ্য আখ্যায়িকা, উপ-আখ্যায়িকাকে পরিশেষে নিপুণভাবে একই সূত্রে আবদ্ধ করে মূল গল্পের সঙ্গে ঐকিত্য করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, গল্পটি পাঠ-কালে যে এই প্রণালী স্থলে স্থলে বিবক্ষিত ও বিভ্রমকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, কেবল বিবরণস্ত-বিকাশ-প্রণালীই নয়, মূল বিবরণস্ত বা গল্পটিও সেসব সার্বজনীন সমাদরের দাবি করতে পারে না। অলৌকিক ঘটনাবলী অবশ্য একপ্রকারের বিষয় ও উত্তেজনাদায়িত্ব

আনন্দের সঞ্চার করে। কিন্তু যা রূপকথার শোভন ও সঙ্গত, তা কাব্যে সর্বত্র নয়। বিশেষ করে জগজ্ঞানান্তরনের গল্প সবকালে ও সর্বদেশে সমান চিত্তাকর্ষক হতে পারে না। সেজ্ঞান নবীনকালের পাঠক এবং অভ্যন্তরীণ রসপিপাসুগণ গ্রন্থের মূল আধার বা ভাবের সম্পূর্ণ রসান্বাদনে সেরূপ সমর্থ হন না।

তৃতীয়তঃ, “কাদম্বরী” যে অপর একটি ক্রটির কথাও সমালোচকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তা হলে এর ভাষার কাঠিক, অত্যধিক সমাস ও অলঙ্কারবাহুলা, এবং স্থলবিশেষে তজ্জনিত অস্পষ্টতা ও ছবোধাতা। একটি মাত্র শব্দের সঙ্গে অসংখ্য বিশেষণ যোগ করার ফলে স্থলে স্থলে দু’তিন পংক্তি ব্যাপী এক একটি সমাস, এবং পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী এক একটি বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের বন্ধারের খাতিরে অর্থকে বাদ দেওয়া হয়েছে, শব্দের সাধারণ সুপরিচিত অর্থকে পরিবর্তনপূর্বক জটিল অজ্ঞাত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, অকারণে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং অজ্ঞাত পৌরাণিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় ভাষার মাধুর্য ও স্বাক্ষর বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে বাণ এরূপ অত্যধিকভাবে অলঙ্কারাদি প্রয়োগ করেছেন যে, স্থলে স্থলে বাক্যিক ভ্রম-বাহুল্যে আন্তর সৌন্দর্য হয়ে গেছে অবলুপ্ত, ভাষার অকারণ উচ্চ সৌখ্যতলে ভাবের ঘটেছে অপমৃতা। সেজ্ঞান বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যাত্ত্ববিৎ Weber বাণের রচনাকে নিবিড় ভারতীয় বনানীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে স্থলে আগাছা ও শুষ্কাদির প্রকোপে গতিবেগ বাধাপ্রাপ্ত হয় পদে পদে। স্বীকার করবার উপায় নেই যে, ভাষা সম্বন্ধে স্থলে স্থলে বাণের কৃত্রিমতা ও মাত্রাজ্ঞানহীনতা কাব্যরস বাহত করেছে।

চতুর্থতঃ, বাণের মাত্রাজ্ঞানহীনতার অপর একটি প্রমাণ অকারণ দীর্ঘ বর্ণনার প্রতি তাঁর অত্যধিক আসক্তি। মূল গল্পটি বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বা কিছু হাতের কাছে পেয়েছেন, তাই নির্বিচারে পাতার পর পাতা ধরে বর্ণনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, মূল বিষয়বস্তু বিকাশের জন্য তার প্রয়োজন থাকুক, আর নাই থাকুক। যথা, গল্পের প্রারম্ভেই শুককর্তৃক বিদ্যাটবী, অগস্ত্যাশ্রম, পঞ্চটবীন, পশ্চাৎসোবন, শাস্ত্রলীলক, শবরসুগরা, শবরসৈন্য, হারীত মুনী, জাবালি-আশ্রম, জাবালি মুনী প্রভৃতি বিষয়ক সূক্ষ্ম বর্ণনার পর প্রকৃত গল্পটি আরম্ভ হয়েছে। মহাশেতার রূপ ও চণ্ডিকামন্দিরের সৌন্দর্যবর্ণন প্রভৃতিও অকারণ দীর্ঘ, এবং বস্তুক্ষেত্রেই এরূপ বর্ণনা-বাহুল্য দৃষ্ট হয়। স্তবরাং, বর্ণনা প্রসঙ্গেও যে “কাদম্বরী” স্থলে স্থলে মাত্রাধিক্যদোষে ভুট, তা স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু সমালোচকবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উপরি-উক্ত দোষক্রটি দূরীকৃত হলেও, সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্নরূপেই “কাদম্বরী” জগতের সাহিত্যে সমাদৃত হয়েছে। তার কারণ এই যে, এই সকল দোষক্রটি মহাকবি বাণের অজ্ঞতা বা অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত নয়—উপরন্তু তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দেরই দ্বারা প্রকাশ মাত্র। তৎকালীন শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান তাঁর নিগূঢ় উপলব্ধির

দূরমনীর উচ্ছ্বাস ও গতি প্রতিকলিত হয়েছে তাঁর অকারণ দীর্ঘ বর্ণনায়, তাঁর অত্যধিক অলঙ্কারবাহুল্য ভাষায়। কাব্যানন্দে বিভোর আমাদের মহাকবি হুঁততে, অকরণ ভাবে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন সেই অমৃত, কিন্তু পরিবেশন-প্রণালীর সঙ্গত উপায় চিন্তা করে দেখবার তাঁর অবকাশ হয় নি। এরূপে “কাদম্বরী”র ভাব ও ভাষার মাত্রাধিক্য কবির প্রাণের অদম্য প্রাচুর্য, পরিপূর্ণতা, বাপকতা ও গভীরতাই অভিযুক্তি বলে, সমগ্র গ্রন্থটিতে আমরা একটি অকরণ সজীবত্ব ও সতেজত্বের আভাস পাই, স্বতঃই আমাদের আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ করে। একটি বিপুল জ্ঞানপ্রপাতের বা সৌন্দর্য, “কাদম্বরী” সৌন্দর্যও ঠিক তাই। সেজ্ঞান সত্যই বলা হয়েছে : “বাণোচ্ছিষ্টঃ ভগং সবম্”—সমগ্র ভগংই বাণ-কর্তৃক স্পৃষ্ট—অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোনও বিষয় নেই যা বাণ বর্ণনা করেন নি।

“কাদম্বরী” পাঠ্যকালে, ভাবের দিক থেকে যা প্রথমেই আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে তা হ’ল এর অতি-বাস্তব, অলঙ্কার, প্রাণবন্ত বিবিধবিষয়ক চিত্র বা বর্ণনা। সমগ্র গ্রন্থের দিক থেকে এই সকল অসংখ্য সুদৃশ্য বর্ণনা মাত্রাধিক্য ও নিপ্ৰয়োজনীয়তা দোষে ভুট হলেও, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি স্ব-মতিমায় উদ্ভাসিত। সত্যই, পৃথিবীর সকল বিষয়ই যেন কবির মরমী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, নারীর সৌন্দর্য, বিবিধ প্রকারের মনুষ্য, নগর, প্রাসাদ, আশ্রম, মন্দির, হ্রদ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় তাঁর নিপুণ তুলিকার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবি নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর জ্ঞান ও অতুলনীয় কল্পনা-শক্তির যে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা এই সব বর্ণনার মাধ্যমে পাই, তা নিঃসন্দেহে তাঁকে কাব্য-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী করেছে।

চরিত্র-চিত্রাঙ্কনেও বাণের অপূর্ণ নেপুণ্য আমাদের চমৎকৃত করে। বহু চরিত্র-সম্বলিত এই বিপুল মহাগ্রন্থের চরিত্রগুলি সবই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। সংস্কৃত-কাব্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই সাধারণতঃ প্রধান বিষয়বস্তু হয়। অবশ্য “কাদম্বরী”তেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রেমের পার্শ্বে বন্ধুত্বের মধুর মহিমাও সমান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—বা অজ্ঞাত গ্রন্থে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। এরূপে পুরুষে পুরুষে (চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন, এবং পুণ্ডরীক ও কপিঞ্জল), নারীতে নারীতে (কাদম্বরী ও মহাশেতা), এবং পুরুষে নারীতে (চন্দ্রাপীড় ও পত্র-লেখা) সুপরিচিত বন্ধুত্বের যে স্নমহং চিত্র কবি অঙ্কিত করেছেন, তা সত্যই অনবদ্য। বিশেষ করে, পুরুষ ও নারীর এরূপ পবিত্র, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের চিত্রাঙ্কনেও বাণ যে শুচি, স্নিগ্ধ প্রেমের আলোকে আমাদের সমুগ্ধ করেছেন, তার অমূল্য মাধুর্য ও মাহাত্ম্য আমাদের মুগ্ধ করে। ভারতীয় কবিগণ যুগে যুগে যে বিশ্বজরী, কাল-ক্রীড়া, দেহজরী, জগজ্ঞানান্তরব্যাপী প্রেমের মহিমা কীর্তন করে গেছেন, কবিচূড়ামণি বাণের “কাদম্বরী”তে তারই প্রকৃষ্টতম প্রকাশ দৃষ্ট হয়।

ভাবার দিক থেকেও “কাদম্বরী” একটি অপূর্ব সৃষ্টি, কারণ এই দিক থেকে বাণের দোষত্রুটি থাকলেও নিছক গল্পের মাধ্যমেও কিরণে কবিতার শব্দমাধুর্য ও ছন্দোবদ্ধতার প্রকাশ করা সম্ভব, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এই “কাদম্বরী” গল্প কাব্য। নিপুণ শিল্পী বাণের হাতে সাধারণ গল্পও হয়ে উঠেছে অপূর্ব সৌন্দর্য-মাধুর্য-মণ্ডিত, চিত্তোন্মাদী কবিতা-বিশেষ। বাণের অত্যাস্পর্ষ ভাষা ও অলঙ্কার-জ্ঞান আমাদের বিশ্বাসঘিট করে। এই সুবিপুল গ্রন্থের সর্বত্র এরূপ শব্দের পর শব্দ, অলঙ্কারের পর অলঙ্কার সজ্জিত করে অমুপম কাব্য-রস সৃষ্টি করা অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। বাণ “পাঞ্চালী” রীতিতে গ্রন্থ রচনা করেন—অর্থাৎ, যে রীতিতে শব্দ ও অর্থের সমপরিমাণ মাধুর্যরক্ষার চেষ্টা করা হয়। স্থলে স্থলে, শব্দের প্রতি অত্যধিক মনোযোগদানে অর্থকে কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করলেও, বাণ যে এই রীতিতে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছেন, তা নিঃসন্দেহ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, “কাদম্বরী”র অসংখ্য স্তম্ভের স্তম্ভের অংশ থেকে এখানে একটি মাত্র উদ্ধৃত করছি—

“অস্তি পূর্বাণয়-স্তলনিধি-বেলাবলয়া মধ্যদেশালংকারভূতা  
মেগলেব ভুবঃ, বনকরি-কুল-মদন্তল-সেক-সংবর্ধিতঃ, অতিবিকচ-খবল-  
কুম্মনিকরমভূচ্চতয়া তায়াগণমিব শিগরদেশলগ্নমুদভিঃ পাদটপকপ-  
শোভিতা, মদকলকুরব-কুল-দস্ত্রমান-মরিচপল্লবঃ, কবিকলভকরমুদিত-  
তমাল-কিসলয়ামোদিনী, মধুমদোপরক্ত-কেরলী-কপোল-কোমল-  
ছবিনা সচরধনদেবতা চরণলঙ্কর-রসরঞ্জিতেনৈব পল্লব-প্রায়ণ  
সংচ্ছাদিতঃ...বিষ্ণাটবী নাম।”

এটি “কাদম্বরী”র প্রারম্ভে বিষ্ণাটবীর সুবিখ্যাত বর্ণনা। চ’তিন

পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বাক্য দ্বারা বিজ্ঞানবনের যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে, তা সত্যিই অপূর্ব।

মহাকবি বাণ যুগে যুগে কবিশ্রেষ্ঠ রূপে পূজিত হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে বহু স্তুতিবাদ বিভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা—

“হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্ত বাণঃ।”

“পঞ্চবাণধারী ময়ূষের স্নায়ই বাণ হৃদয়ে বাস করেন।”

“যুক্তঃ কাদম্বরীঃ শ্রদ্ধা কবয়ো মৌনমালিনিতাঃ।

বাণধনাবনধ্যায়ো ভবতীতি স্মৃতিযতঃ।”

“কাদম্বরী শ্রবণ করে কবিগণের মৌনভাব অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। বাণ বা শব্দের ধনি শ্রবণে যে রূপ ছাত্রদের পাঠে বিরতি স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত, সে রূপ বাণের ধনি শ্রবণে বা কাব্য পাঠের পরেও অন্ত কোনও কিছু পাস নিশ্চয়োন্মত্ত।”

“শ্লেষে কেচন শব্দগুচ্ছবিষয়ে কেবিরসে চাপবেহ-

লংকারে কতিচিৎ সদর্থবিষয়ে চাত্তে কথাবর্ণনে।

আ-সর্বত্র গজদ্বীপকবিতাবিষ্ণাটবীচাত্তুরী

সঞ্চারী কবিকুন্ডলকুন্তভিরো বাণস্ত পঞ্চাননঃ।”

“কেহ কেহ শ্লেষ অথবা ভিন্নার্থক পদ প্রয়োগে, কেহ কেহ বহু শব্দের একত্র বিজ্ঞাসে, কেহ কেহ রসসৃষ্টিতে, কেহ কেহ অলঙ্কার-সমাবেশে, এবং কেহ কেহ সদর্থ-বিষয়ক কথাবর্ণনে পটু। কিন্তু কবিশ্রেষ্ঠ পঞ্চানন-সদৃশ বাণ এই পঞ্চ-বিষয়েই সমান নিপুণ।”

সংস্কৃত সাহিত্যের সবশ্রেষ্ঠ গজকাব্য-রচয়িতা, বহুমুখী প্রতিভা-বান্ মহাকবি বাণের সম্বন্ধে সত্যিই এই প্রশংসাবর্ণি বিন্দুমাত্র অত্যধিক নয়।

## শেষ নাট

য়োহন ফল্‌বার্জেট

অনুবাদক—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

[নরওয়েবাসী যোহন ফল্‌বার্জেট (১৮৭২) তাঁর জন্মস্থান রোস শহরে সাহিত্যসৃষ্টির বহু নতুন উপাদান পেয়েছেন। গনির মজুতের ঘরে তাঁর জন্ম, ন’ বছর বয়স থেকে তাঁকে গনির কাছে চুকতে হয়, শ্বেদসিদ্ধ সেই কঠিন জীবনের আভাস তিনি কোন কোন বুটনায় দিয়েছেন। তথাকথিত শিক্ষা তিনি অল্পই পেয়েছেন, নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছে নিজের-জীবন। তাঁর রচনায় হয় ত লাগিতোয় অতাব আঁচ, কিন্তু তেমনই আছে শক্তিমান লেখকের বিধাহীন প্রবলতা। ‘লিথ-বেট ক্রয় রান কিরেক’ তাঁর প্রসিদ্ধতম উপন্যাস।]

বড়দিনের পর ছ’ দিন কেটে গেছে। সন্ধ্যাবেলা। বড়-দিনের ভোর থেকে শুরু করে যখন ‘আলেন’য়ের কাঠের গীজ্জার ঘণ্টাগুলো দিনরাত ঘরে বেজে চলেছিল উত্তরের পাহাড়ের মাথায় বাতাসকে মন্ত্রিত করে তুলে আবার ‘হেসেডেলয়ের’ ঘন বর্চনের ওপারে মিলিয়ে যেতে যেতে, শারা পাহাড়তলীর মধ্যে কেবল একটি জায়গায় কামান গর্জে উঠেছিল তাঁর উত্তর রূপে। ‘আস্‌বেলহে’ শুরু হয়েছিল উৎসব—প্রাচীন গাথার সুগ থেকে যেখানে পাহাড়তলীর

পালোয়ানেরা সম্পন্ন করে আসছে তাদের শীতোৎসব—  
প্রাচীন প্রথা অনুসারে যাত্রা করেছে দক্ষিণের দিকে। বড়  
দিনের ছ' দিন পরে 'গ্রন্থাসেন'য়ের পাহাড়গুলির পিছনে  
বিশাল প্রান্তরে সে যাত্রার শেষ।

দেয়ালের ধারে ছোট্ট বাড়িগুলি নিবুনিবু হয়ে এসেছিল,  
খোলা উত্তনে পাইনকাঠের রাঙা আগুন উঠছিল দপদপ  
করে।

অগ্নিশিখায় উজ্জ্বল জায়গাটিতে বসে বৃড়ো 'হেগেলি',  
তন্দ্রাতুর। ছুঁচোল টুপি একপাশে কাত করে পরা একটি  
কান ঢেকে, কঠিন চিবুক ভরে সাদার ছোপধরা ঝাড়ি।  
নীরবে সে তামাক চিবোচ্ছিল।

তারই পাশে খালিমাথার দাঁড়িয়েছিল জোয়ান একটি  
ছেলে, ঘামে ভিজে তার চুল, পায়জামার পকেট হাতছাটি  
বেশ করে ঢোকানো। শ্রান্ত, নত দৃষ্টি তার। সে বোর  
আসবেল।

বৃড়ো হেগেলি একটু ঝাড়া হয়ে বসে তার দিকে স্তিমিত  
তাকিয়ে প্রশ্ন করল তন্দ্রালু, ককশ কণ্ঠে—“তুমি নাচবে না  
হে ছোকরা?” পুরানো অভ্যাসবশেই ছোরাগোজা কোমর-  
বন্ধটায় লাগল টান।

বোর আসবেল নিরুত্তর।

হেগেলি আবার কাঠের উপর উবু হয়ে রাঙা শিখার  
দিকে কুঁকে বিমোহিত লাগল।

চিংকার আর বরফের মেঝের উপর জুতোর খটাখট  
শব্দ ছাপিয়ে উঠল। ‘পোলকা’ নাচের উদ্‌যাদনায় সুর।  
দেয়াল বয়ে গলে পড়তে লাগল বরফে জমানো মাংসের  
টুকরো, কড়িবরগায় পুরু হয়ে জমেছিল বুল। জোয়ারাতে  
অন্ধকার জানালা দিয়ে, তুহিন-প্রান্তরের উপর দিয়ে ভিতরে  
এসে পড়েছিল কয়েক ফালি চাঁদের আলো। কনকনে  
শীত। ঘরের কাঠগুলো গচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে লাগল, বাইরে  
শুনা যেতে লাগল ঘন কোপবাড়ের গম্ব দিয়ে বুনো জন্তুদের  
পায়ের স্রুস্রু আওয়াজ।

হেনিং হেগেলি অতীত দিনের স্রু দেখছিল বসে বসে।  
মনেও পড়ে না, কতদিন ধরে সে এই পাহাড়তলীর উৎসবে  
যোগ দিয়ে আসছে প্রতি বড়দিনে। আর তখন কি আনন্দই  
না ছিল! এখনকার চেয়ে চের বেশী। আজকালকার  
ছোকরারা সব বড়িয়ে গেছে, পায়ে সে রকম জোরও কারও  
নেই। ‘পোলকা’ নাচ—তাতেও সব যেন পা টেনে টেনে  
চলে; আর পা তুলে ছাত ছোঁয়া—সেকথা না বললেই  
ভাল। আর লড়াই-ই কি এরা করতে পারে সেকালের  
ছেলেদের মত।

হেনিং হেগেলির ভাবনাগুলো জড়িয়ে বেতে লাগল।  
গত দুইপুরুষ ধরে বহু নাচে সে যোগ দিয়েছে, তবে একটিই  
কেবল তার বিশেষভাবে মনে আছে। অতীতের স্মৃতিতে  
ফিরে আসে বৃড়ো হেগেলি।

যৌবনের জোয়ার তখন তার প্রাণে। ঠিক এমনি এক  
বর্ষ সন্ধ্যায় ‘গ্রন্থাসেন’র অভিযাত্রা শেষ হয়েছিল পুরানো  
নিয়মে। রাজির দুই প্রহর অতীত। বৃড়ো ‘নেকস’ বসে বসে  
‘য়োতুন পোলকা’র সুর বাজাচ্ছিল। হঠাৎ নাচের মাঝখানে  
যুবা হেগেলি দরজা দিয়ে তীব্রবেগে বেরিয়ে পড়েছিল  
‘রান্‌হিল্ড বোরেন’য়ের হাত ধরে, গায়ে তার কেবল কামিজ।

বাইরে পাথরের মেঝের উপর বোরেন’য়ের কোমর জড়িয়ে  
ধরে তাকে টেনে নিল উঁচু দরজাটার দিকে। ভয়ে ভয়ে  
সে বাধা দিল অন্ন।

“মাথা ধরাপ হ’ল না কি তোমার?” বোরেন নিজেকে  
মুক্ত করবার চেষ্টা করল।

“মাথা ত ধরাপ হয়েছেই,” হেগেলি উত্তর দিল।

“তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে ফিরে যাবে রান্‌হিল্ড!”

মেয়েটি ঈষৎ ইতস্ততঃ করল। “কিন্তু এ নিয়ে কথা  
উঠবে হেনিং!”

সে তাকে কাছে টেনে আনল, প্রচণ্ড জোরে বলল,  
“তাই ত আমি চাই।”

মেয়েটি অন্ধকারে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।  
তার পক্ষে এ ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত।

অতিকষ্টে কান্না চেপে সে বলল, “তুমি সবকিছুকেই  
ভুল করে দেখ।”

আবার তাকে টেনে নিয়ে গম্ভীরভাবে হেগেলি বলল,  
“কেবল তোমার নয়। আমি তোমায় ভালবাসি রান্‌হিল্ড।”

মেয়েটি চাপা গলায় বলল, “না, না।” নিজেকে মুক্ত  
করে নিল, “না, না।”

ছুটে পালাল সে, কিন্তু এক বোঝা কাঠের সামনে ধমকে  
দাঁড়াতে হ’ল। হেগেলি দাঁড়িয়েছিল সেই হিমেল শীতের  
রাত্রে, যৌবনের তেজে তপ্ত তার দেহের প্রতিটি পেশী  
কাঁপছিল। সারা পাহাড়তলীতে হুঙ্কার সে, রক্ত তার এখন  
গরম। এ মেয়েটিকে সে নেবেই, যে বাধা দেবে  
তার কপালে নির্ধাত দুঃখ। ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে সে  
জড়িয়ে ধরল, কাঠের বোঝার গায়ে গড়িয়ে পড়ল হুঁজনে,  
গাছের শাখার তুষার ধরে পড়ল তাদের দেহে।

“আমার সঙ্গে আসবে না রান্‌হিল্ড?”

আবার সে ইতস্ততঃ করতে লাগল, কাঠের বোঝা আর  
হেগেলির বিশাল বুকের ধোঁ যেন ছোট্ট একটি পাখী।

তার ভয় হচ্ছিল, পাছে কেউ এসে পড়ে। শেষে হঠাৎ দুই হাতে হেগেলির গলা জড়িয়ে ধরে স্নেহভরা কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ হেনিং, আমি বাব।'

আনন্দে উদ্ভস্ত হয়ে হেগেলি তার কোমর জড়িয়ে ধরে 'পোল্কা' নাচের ঘূর্ণিপাক লাগিয়ে দিলে চারদিকে বরফ উড়িয়ে।

"পাগল!" রান্হিল্ড হেসে কাঁধের থেকে শালটা নামিয়ে নিল। আবার সেটা বাঁধবার আগেই আর এক মন্ত ঘূর্ণিপাক শুরু হ'ল। নিজের টুপিটা খুলে ফেলে বরফের চিবির উপর হেগেলি উঠে দাঁড়াল, এক লাথিতে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে বরফের গুঁড়ো।

"তুমি বোধ হয় সত্যিই পাগল হয়েছ, হেনিং" আবার হেসে শালে হাত দিল মেয়েটি।

হেনিংও মাথায় টুপিটা পরল, তারপর হৃৎকনেই গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল। মেয়েটি তার পর ধরে চুপি চুপি ঢুকে গায়ে জামাকাপড় জড়িয়ে নিল, হেনিং গেল বুড়ো ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুততে।

একটু পরে সেই তারায় ভরা রাতে পাহাড়ের গা ঘেঁষে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিল। পায়ের তলায় বরফ ঝচম্চ করতে লাগল, লোহার ডাওয়ায় বাজতে লাগল ঘটং ঘটং আওয়াজ, পথের উপর ধূবের শব্দের প্রতিধ্বনি ভাসতে লাগল হাওয়ায়। হেনিংয়ের কোলে নিবিড়ভাবে বসেছিল রান্হিল্ড, হৃৎকনকে ধিরে ভেড়ার চামড়াখানা। উষর গিরিমালার ওপার থেকে শিসু দিয়ে আসতে লাগল কনকনে হাওয়া।

বুড়ো ঘোড়া ডবিন্ বীর মন্দ গতিতে বিশাল প্রান্তর পার হয়ে উপত্যকা দিয়ে নেমে চলেছিল। সে রাতে তাড়াহুড়ো করার ত কোন কারণ ছিল না। মোটেই না! গাঁ তাদের এর চেয়ে দু'গুণ দূরে হলেও, রাত অন্ধকার—সীমাহীন হলেও কিছুই ক্ষতি নেই তাদের। কি মধুর ছিল সে রাত্রিটি! এখন থেকে চিরকালের মত তারা একে অস্ত্রের।

রান্হিল্ড আরও কাছ ঘেঁষে চোখ দুটি বুঁজল।...এ যাত্রার যদি শেষ না থাকত। ঘোড়ার ধূবের আওয়াজ, তার মনে হতে লাগল—যেন 'পোল্কা' নাচের লঘুপদক্ষেপ। পথের ধারের ধামগুলি সব পার হয়ে আসতে আসতে সেগুলিকে তার মনে হতে লাগল যেন প্রেতের দল চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে। তার জীবনে এ রকম অদ্ভুত রাত আর কখনও আসে নি। এ নীত যেন অনন্ত হয়। আকাশের তারারা টিপটিপ করে জ্বলতে লাগল, হিমের হাওয়া তরুণপ্রবীণ পাহাড়ের ওপার থেকে গেরে গেল গান।

হেন্সেডেলয়ের মোড়, যেখানে খুঁটখুঁটে অন্ধকার, পথের দু'ধারে পাথরের প্রাচীর আর বরফের তলায় গর্জন করে চলেছে দু'রস্ত্র জলপ্রপাত, সেইখানে হেগেলি ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। বড় বেশী জোরে ছুটছিল তার ঘোড়া।

আনন্দে আত্মহারা হেগেলি। কি সুন্দর মেয়েকে পেয়েছে! সারা দেশে এমন ভাগ্য আর কারও হয় নি... তাকে নিজের কাছে টেনে নিল সে। হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল তার উদ্বেল করে তুলেছিল একটানা হাসির বান। সারা উপত্যকায় সেই হবে সব চেয়ে জোয়ান। আর রান্হিল্ডেরও গর্জ হবে এমন স্বামী পেয়ে। আর হৃৎকনে মিলে তারা কত কি?...

"সামলে, ডাবিন, সামলে!"...

এত ছুটবার দরকার নেই। তাড়াহুড়ির ত নেই কিছু। বুড়ো ডাবিন্ থমকে দাঁড়িয়ে মাথাটা একবার এদিকে একবার ওদিকে দোলাল, পিছনে গাড়ীর মধ্যে কি হচ্ছে, তাই ভেবে বিশ্বয় বোধ করতে লাগল।

বেহালার তার ছিঁড়ে গেল বন্ধ করে। বুড়ো হেগেলি ফিরে এল বর্তমানে। ব্যার আসবেল তখনও পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তার সামনে।

"যুমিয়ে পড়েছিলাম" বুড়ো হেগেলি বলল। আসবেল তার দিকে তাকাল।

"তোমাকে 'পোল্কা' নাচতে হবে।" ভিজ়ে চুলের উপর জামার হাতাটা বুলিয়ে সে বলল।

হেগেলি ইতস্ততঃ করে বলল, "বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি। জানই ত আশী বছর বয়েস হয়ে গেলে কারও—

আস্তনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আসবেল বলল, "ও সব বাজে। তা হলে 'পোল্কা' শুরু হোক। এই মেয়েরা, বুড়ো হেগেলি এবার আমাদের সঙ্গে নাচবে।"

দেয়ালের ধারে মেয়েদের মধ্যে আনন্দের গুঞ্জন উঠল। তার সঙ্গে নাচতে সবাই রাজী। সারা তল্লাটে এমন নাচিয়ে আর হয় নি।

"বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছি যে ব্যার!" ভালমানুষের মত হেগেলি মুখ তুলে বলল।

ব্যার তার কাঁধ ধরে তাকে তুলে দিয়ে বলল, "ও তুমি ঠিক করে নিতে পারবে দাদা।"

—"বড্ড বুড়ো যে!" বাধা দিল হেগেলি। কিন্তু কেউ শুনল না, 'পোল্কা'র সুর বেজে উঠল বেহালার, টুপিটা মাথায় দিয়ে বুড় হেগেলি তামাকপাতা ফেলে দিলে মুখ থেকে। একটু দ্বিধা করল সে, তার পর ভালবর্গ বোরেনের কাছে গেল। তার বোয়ের সম্পর্কে সে তাঁর ভাইঝি।

—‘ভালবর্গ, আমাদের একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে দেখছি। তোমার মত ধৈর্যের সঙ্গেই আমার নাচা অভ্যাস।’

ভালবর্গ হেসে তার হাত ধরল, মাটির দিকে নম্রভাবে তাকাল, তার পর সুরু হ’ল নাচ। তাকে ঘুরিয়ে দিলে হেগেলি, চীৎকার করে কাঁপিয়ে তুলল দেয়াল, আবার সুরু হ’ল ঘূর্ণিপাক। ঝাপেভরা ছুরিখানা তালে তালে উঠতে পড়তে লাগল।

‘মোটোও খারাপ হচ্ছে না, দাদা।’ আসবেল্ হাঁকল।

হেনিং গেয়ে চলেছে ‘ফাডেব্লেন—ও-হো!’ লাফিয়ে চেষ্টা করল কড়িকাঠ ছোবার, প্রথমবারে ঠিক পারল না, দ্বিতীয়বার তার জুতোর ডগা লাগল কড়িকাঠে... ‘হো-হো...!’ উদ্দাম হয়ে উঠল তার পদক্ষেপ, নাচটা হয়ে উঠল মস্ত বড়ের মত, স্রোতগর্জনের মত, উত্তাল তরুণাধার মত।

তার মনে হতে লাগল, বাইরে অন্ধকার হেমন্ত-রাতে পাহাড়ডুড়ায় বুনো গাছগুলোকে যেন ধ্বংস করবে এই অবিরাম তুধারধারা।

‘ও-হো! ডিরব্লামটি ডুডলি ডু! ডিরব্লামটি ডুডলি ডু!...’

পাহাড়ের শাণিত শিখরে রক্তমাখা হাতিয়ার হাতে তার সেই মস্ত যৌবনের দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে আবার। ‘হো-হো!’ ভগবান্ ক্ষমা করুন তাকে। হেগেলির নাচের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বিবাদে ভরে উঠল তার মন।

পঞ্চম সুরে একটি কম্পন দিয়ে শেষ হ’ল নাচ। দুর্বল ভাবে আসনে বসে পড়ল বুড়ো হেগেলি। কিসের একটা বোতল তার সামনে ধরে দাঁড়িয়েছিল বোয় আসবেল্।

‘সত্যি, এবারে এই পানীয়টুকু তোমার প্রাপ্য,’ সে বলল।

হেগেলি হাত বাড়িয়ে মুখের উপর থেকে দাড়ি সরিয়ে

নিতে নিতে বলল, বলেছিলাম ত আমি একবারে একেবে। হয়ে পড়েছি।

—‘না দাদা, তুমি এখনও তেমনি মজাই আছ।’

—‘হ্যাঁ, বুড়ো মজা।’ হেগেলি চুপক দিল, কঠিন মুখে তার দেখা দিল কোমলতার আভাস।

সেই রাতেই বুড়ো হেগেলি উপত্যকা দিয়ে চলল হেসে-ডেলের উদ্দেশ্যে। সুরু গলিটার মধ্যে বোড়ার লাগাম টেনে ধরল সে।

‘সামলে ডাবিন্, সামলে!’

কষ্টেস্থে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে থাকে। লোমের কোটে ঢাকা হাঁটুটু তার হয়ে পড়েছে।

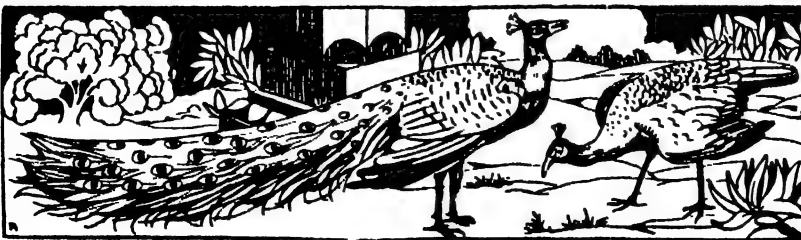
হ্যাঁ—এই ত, এখানেই। এই পাংড়ার দেয়ালের নীচে পক্ষাশ বহর আগে সেই রাতে তারা দুটিতে ঘুরে বেড়িয়েছিল। আজ বান্হিল্ড মাটির তলায় অনন্ত সুস্থিতে মগ্ন, আর সে এ পথে চলেছে একলা। বান্হিল্ড চলে যাবার পরে তার জীবনে আর সুখ নেই। কিন্তু আবার ত তার কাছে ফিবে যাবার দিন বনিয়ে এসেছে। তাকে বড়ই উতলা করেছে আজকের রাত।

আবার গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসল হেগেলি, লোমের কোট তার অশাস্ত শীতের হাওয়ায় উড়তে লাগল, বোড়ার কেশরে হাত বুলিয়ে দিল সে।

হ্যাঁ—এখানেই...সে রাত্রিও ছিল আজকেরই মত। সেই কনকনে শীত, সেই তারায় ভরা আকাশ। আজও সব ঠিক সেদিনেরই মত। কেবল বান্হিল্ড চলে গেছে, আর সে আজ জরাজীর্ণ।

বহুক্ষণ ধরে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে, লাগামে হাত দিয়ে, আঁধার রাত এগিয়ে চলল ছ-ছ করে। অন্ধকারে মনে হতে লাগল মানুষ আর বোড়া যেন নিকষ পাথরে ঘোড়াই করা।\*

\* ওন্ড হেগেলি ‘লাপট্’ ‘গোল্কা’ হইতে।





# দারজিলিং কালিম্পাঙের লামাদের ধর্ম

শ্রীহিজেন্দ্রনাথ বসু

দারজিলিং হ'ল “দোরজিলিং” বা “দোরজিস্থান” “দোরজি” তিব্বতী কথা, মানে—বস্ত্র, আর “লিং”—বীপ বা স্থান—যেমন জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষ ওদের ভাষায় “জম্বোলিং”। দারজিলিঙে মহাকালের মন্দিরের কাছে দোরজিলামার সমাধিস্থান। তাঁরই নামে বুঁি এই দোরজিস্থান বা বস্ত্রস্থান। লামার নামের সঙ্গে “দোরজি” বা বস্ত্র বুজু কেন, সে বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক এবং সে জিজ্ঞাসা মিটতে পারে দারজিলিং কালিম্পাঙের লামাদর্শ সন্মুখে একটু সন্ধান নিলে।

দারজিলিঙের যা যা জট্টবা, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এখানকার বৌদ্ধমন্দিরগুলিও। কিন্তু শুধুমাত্র নিসর্গ-শৌন্দর্য-রসিকের চোখ দিয়ে এই সব জট্টবা দেখা বার্ষ্য হবে। নৈসর্গিক শৌন্দর্য-ভাগের সে চোখ, সে চিত্ত না থাকলে যেমন টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়-দর্শন সার্থক হয় না, তেমনই এই সব বৌদ্ধমন্দির দেখতে হলে লামাদের দেবদেবী এবং তাদের বিশ্বাস—পূজা-অর্চনা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা না থাকলে চলে না।

দারজিলিঙের কাছে “ঘুম” আছে একটা তিব্বতী গুপ্তা, ভুটিয়া বস্তুতে আছে ভুটিয়াদের একটা, দারজিলিঙের মাঝখানেই নেপালী বৌদ্ধদের তামং মন্দির একটা আর আলুবাড়ী বলে একটা জায়গায় আর এক গুপ্তা। কালিম্পাঙ একটাই বড় গুপ্তা, সেটি তিব্বতীদের।

গুপ্তার বাইরে খোলা চত্বরে উড়ছে খুব লম্বা ফালির নিশান—তা দূর থেকেই অনেক সময়ে গুপ্তা চিনিয়ে দেয়। একটা ফটক থাকে প্রায়ই। মন্দিরের বাইরে আর ভিতরে নানা রকম ছবি আঁকা। সে চিত্রাণ আমাদের ভারতীয় কলার সঙ্গে চৈনিক কলার যেন মিশ্রণ দেখা যায়। ভিতরে সারি সারি বসবার জায়গা, বৌদ্ধ লামা ও ভক্তদের মধ্যদা অহুসারে তাদের আসনের উচ্চতা ঠিক করা আছে। পাশে ষোপে ষোপে “তেজুর” আর “কেজুর” ধর্মগ্রন্থ হলদে বেশমী কাপড়ে সম্বন্ধে মোড়া। আর সামনে সারি সারি মূর্তি, সে গুণ্ড বুদ্ধের মূর্তিই নয়; ওদের দেবদেবীর ধারণা অত্যন্ত বিস্তৃত, এমনকি বড় বড় লামারাও ঐ দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

হিন্দু দর্শনে ব্রহ্ম যেমন, তেমনই এক আদি বুদ্ধকে ওরা মেনে থাকে—তাঁর দেহ নেই, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্। ওখানকার লামারা তাঁর নাম বলেছে “সমস্ত ভজ্র।” এঁর চার দিকে চার লোকে চার দিকপাল, আমাদের বায়ু কুবের ইজ্র বরুণের মত। বীণা হস্তে শুভ্রকায় “বস্ত্র-বুজু” (তি-দোরজি স্লেপ্পা) পূর্ব-দিকপাল। “অমিতাভ” বা

“পদ্মা” নামে একটি ভক্ত ও একটি ভাঙ হাতে লাল রঙের নাগরাজ পশ্চিম দিকপাল। তরোয়াল হাতে সবুজ রঙের “রত্ন” হলেন দক্ষিণ দিকের দিকপাল। আর উত্তর দিকের হলেন পীতকায় যক্ষরাজ “কর্ম্য”। “সমস্ত ভজ্রে”র সঙ্গে এই চার জন হলেন, “গ্যালোয়াস্টিঙ” বা পঞ্চ-দেবতা। চার দিকপালের ছবি আঁকা থাকে সাধারণতঃ মন্দিরের বাইরের দেয়ালে।

এদের দেবগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব দেবতা গুরু সবাই স্থান পেয়েছেন। ভুটিয়ারা বস্ত্রবস্ত্র বা “দোরজি স্লেপ্পাকে” ঠিক সমস্ত ভজ্রের পরেই স্থান দেয়। তারপর “আর্থবস্ত্র” বা “গরব দোরজি”, তার পর পদ্মসম্বত বা “গুরুবিন্ পোচে”, তার পরে “অবলোকিতসরি” বা অবলোকিতেশ্বর—যাঁর এগারোটি মাথা, আর এক হাজার হাত এবং প্রত্যেক হাতে একটি করে চোখ। নেপালী বৌদ্ধমন্দিরের দোতলায় দেখা যাবে দীপঙ্কর বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ আর মৈত্রেয় বুদ্ধ এই তিন বুদ্ধমূর্তি পাশাপাশি। এঁরা হলেন অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎকালের বুদ্ধ। নীচের তলায় পদ্ম-সম্বতের মূর্তি মাঝখানে, দুই দিকে দুই তারামূর্তি, এক তারা মূর্তির পাশে অবলোকিতেশ্বর, আর একটির পাশে অমিতাভ বুদ্ধ। অমিতাভকে এরা বোধিসত্ত্ব বলে মানে। আর মঞ্জুশ্রীকে খুব প্রাণান্ত দেওয়া হয়। প্রণামমন্ত্র তাই “নমো বুদ্ধায় নমো মন্যায় নমো সংঘায় নমো মঞ্জুসূসিবি বোধিসত্ত্বায়”। এই লামাদর্শের বিশেষত্বই হ'ল এদের দেবগোষ্ঠীর সর্বগ্রাসিতা। তাই বোধিসত্ত্বের সঙ্গে শিব গণেশ কালীর পূজা করতেও এদের আপত্তি নেই, ভুটিয়া বস্ত্রের পাশে পাহাড়ের গায়ে সব-রকম মূর্তিই পাশাপাশি আঁকা দেখা গেল। মহাকালের মন্দিরে শিবের পূজা করতেন হিন্দু নেপালী, সঙ্গে তিব্বতী বৌদ্ধেরও অর্চনা চলছে। শিবের সঙ্গে গৌরী গণেশের মূর্তি আঁকা, আর এক জায়গায় কালী মূর্তিও আছে একটি। লাম-ধর্মে এঁরা সকলেই স্বীকৃত। কালিম্পাঙে এক ভুটিয়া দোকানদারের বাড়ীতে আবার দেখা গেল নানক থেকে আরম্ভ করে যত সব শিখগুরুর মূর্তি ও ছবি।

তিব্বতীদের আগে যে ধর্ম ছিল তার নাম “বোন্পা” তাতে এই রকম বিশ্বাস করা হ'ত যে, সব প্রাণীরই মধ্যে, সব জিনিসেরই মধ্যে এমন আত্মা আছে যার দ্বারা ভাল বা মন্দ হওয়া সম্ভব। অষ্টম শতকে রাজা “তিশ্রোনচেচান” ভারতবর্ষ থেকে ছাত্রজন বড় ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে আনেন, —এক জন শাস্ত্ররক্ষিত, আর অন্য জন হলেন পদ্মসম্বত। পদ্মসম্বত “বোন্পা” ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের একটা চমৎকার

সময় ক'রে দিলেন এবং তাঁর যোগাচায়ে সবাইকে চমৎকৃত করে তিনি খুবই জনপ্রিয় গুরু হয়েছিলেন। তিনি ওখানকার লোকদের হুটি ভাগে বিভক্ত করলেন—যাঁরা বৌদ্ধ তাঁরা “নানুপা” বা ভিতরের লোক, আর যাঁরা বৌদ্ধ নন তাঁরা “চিপা” বা বাইরের লোক। তাঁর প্রবর্তিত এই সমন্বিত মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম “নিং মা পা” বলে পরিচিত—এরই নানা শাখাধর্ম আজও তিব্বতে, নেপালে ভোটানে বিস্তৃত ভাবে চলছে এবং পয়সম্ভব “গুরু রিন্ পোচে” নামে আরাধ্যতম-দের একজন বলে খুব বড় স্থান লাভ করেছেন। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে অতীশ দীপঙ্কর এসেছিলেন তিব্বতে; তিনি এই ধর্মের একটা সংস্কার করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও তার শাখার নাম “কদ্দম্ পা”, “করম্ পা”, “হুগপা”, “দিবুং পা”—এই সব। দারজিলিং, কালিম্পাঙে এই সব ধর্মসম্প্রদায় না থাকলেও গুরু বলে অতীশ দীপঙ্কর আরাধ্যের স্থান পেয়ে আছেন—অনেক মন্দিরে তাঁর মূর্তি আছে। সর্বশেষ সংস্কার করেছিলেন “চোং ষা পা”। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম “গোলুগপা” বা হুগ্গে টুপি সম্প্রদায় তিব্বতেই প্রধান, নেপাল ভোটান বা দারজিলিঙে বেশী নেই। কালিম্পাঙে এই সম্প্রদায় বিদ্যমান। এরা দালাই লামাকে এত উচ্চ স্থান দেয় যে, তাঁর ক্ষমতা নির্দিষ্ট যে অতি উচ্চ আসনে তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ রাখা আছে, তা বুদ্ধমূর্তিকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ আড়াল করে আছে। দালাই লামা, পান্চেন লামা প্রভৃতি অনেক লামারও মূর্তি দেখা যায় এই সব বৌদ্ধ-মন্দিরে।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের নানা সম্প্রদায় ভারতেই ছিল—মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি। তিব্বতী লামাধর্মও তাই বজ্রের স্থান। বজ্রের প্রতীক একটি উপকরণ মন্ত্রতন্ত্র পাঠের সময়ে অপরিহার্য। এক হাতে এই “দোরজি”, অত্র হাতে “বিরপো” বা ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে লামা বা পাঠ করেন তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ। “ডা” বা ঢাকের উপর “নার্জাপ” নামে একটা ঝাঁকানো কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাত্মহনি পূজা-অর্চনার একটি বিশেষ অঙ্গ। আর একটি উপকরণ লামাদের ধর্মাহুতানের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। সেটি একটি ধর্মচক্র—হৃদয় মোড়া একটি চোড়া, মধ্যে আছে একটি কাগজে লেখা পবিত্র মন্ত্র—একটি হাতল ধরে চোড়াটি ঘোরানো হয়। ছোট ছোট এই ধর্মচক্র প্রত্যেক লামার সঙ্গে থাকে, বাড়ীতে থাকে, ধর্মমন্দিরে বসানো থাকে—সাধারণতঃ তলায় আঙুন জালানো থাকে এমন ভাবে যাতে করে চক্র আপনা হতে ঘীরে গীরে ঘুরতে থাকে। ভূটিয়া বস্তির গুস্তায় আছে প্রকাণ্ড পিপের মত একটি চক্র। একটি ঘণ্টা তার সঙ্গে এমন জায়গায় লাগানো আছে যে

একবার পূর্ণ আবর্তনে ঘণ্টা বেজে উঠে। চক্র ঘোরে, আর বলতে হয় “ওঁ মণিপদমে হুং”। এই মন্ত্রের দার্শনিক অর্থ অনেক লামারই জানা নেই। কিন্তু এর একটা চমৎকার ব্যাখ্যা শোনা যায় অশিক্ষিত লামাদের কাছে।

লামাদের দেবলোক হ'ল “খাম্মু” বা তিনটি লোকের সমষ্টি—“দোখাম্”, “জুখাম্” ও “জুমেখাম্”। তার নীচে আছে অমুরলোক, নরলোক, পশুলোক, প্রেতলোক, নরক। এই সব লোকেই আছে দুঃখ। যেমন, দেবলোকের দুঃখ হ'ল অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ। অমুরলোকের দুঃখ যে, দেবতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তাদের চিরন্তন। আর নরলোকের দুঃখ—জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু। পশুলোকের দুঃখ—তারা কথা বলতে পারে না। প্রেতলোকের দুঃখ তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা অনিবার্য। আর নরকের ত দুঃখের অন্ত নেই। “ওঁ” কথাটি ঐ ত্রিলোক বুঝায়—অ, উ, ম, হ'ল “দোখাম্”, “জুখাম্” ও “জুমেখাম্”। তার পরে ম, গি, পদ্, মে এবং হুং এই পাঁচটি অক্ষর দাঁড়াল যথাক্রমে—অমুরলোক, নরলোক, পশুলোক, প্রেতলোক ও নরকের পরিবর্তে। ধর্মচক্র ঘুরিয়ে “ওঁ মণিপদমে হুং” বলার উদ্দেশ্য হ'ল এই ছয় লোকের দুঃখ দূর হোক। এ যেন অনেকটা আমাদের শাস্তিঘটনের মত।

মহাকালের মন্দিরে আছে অসংখ্য ত্রিশূল। শুধু ওখানেই নয়, অত্রত্রও এই ত্রিশূল বা “খড়্গ” দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তামং মন্দিরে একটি ত্রিশূল গাঁথা তিনটি মাটির মুণ্ড। এর তাৎপৰ্য—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালের দৃষ্টতকারীদের এই দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। লম্বা সরু কাপড়ের যে নিশানের কথা বলা হয়েছে তার উপরে ছাপানো আছে অনেক মন্ত্র আর মাকো মাকো এক একটা ছবির ছাপ, সে ছবিতে একটা ঘোড়া আর তার পিঠে রক্ত এবং পশু রয়েছে। আর এক রকম ধ্বজা দেখা যায় মহাকালের মন্দিরে—গোল-গোল কৌঁচ দেওয়া কাপড় ঝুলিয়ে যেন অশোকস্তম্ভের অশুকরণ হয়েছে। এই সব নিশান বা স্তম্ভ-ধ্বজা লোকে উঠিয়ে দিয়ে যায় কোন রোগ বা বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মানত করে, আবার অনেক সময়ে নিজেদের বাড়ীতেও এগুলি উঠানো হয়।

দারজিলিং কালিম্পাঙের এই সব গুস্তায় নানা পার্শ্বকোয় নগ্নোও যে লামা-ধর্মের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় তার ঠিকানাে বিস্তৃত হতে হয়।\*

\* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকমণ্ডলীর তরফ থেকে গত মে মাসে যে পাঁচ জন গবেষক দারজিলিং কালিম্পাঙে শিক্ষাসকরে গিয়েছিলেন বর্তমান লেখক তাঁদেরই একজন। ওখানকার বৌদ্ধ ধর্মমন্দিরের লামাদের কাছ থেকে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে—তিকতী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে “গুয়াডেলের” গ্রামাণ্য বইয়ের সঙ্গে সেগুলির মিল আছে।

# “রবীন্দ্রনাথের চিত্রলিপি”

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

কবির চিত্রশিল্প লইয়া আমাদের দেশে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ ইহাতে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পান, কেহ ইহাতে কোন আরোপিত অর্থ বুঝিতে যাওয়া নিরাশ হন। মনে হয়, দুই পক্ষই ভুল করেন; কারণ তাঁহার চিত্রে কোন আধ্যাত্মিকতা বা কোন আরোপিত অর্থ তিনি প্রয়োগ করিতে চান না। তাঁহার চবির সৌন্দর্য্য বুঝিতে চাইবে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ভিতর, তাঁহার চিত্রের আঙ্গিকের ভিতর। আমার মনে হয়, তাঁহার চিত্রের আঙ্গিক বিশেষভাবে অনুধাবন তাঁহার চিত্র বুঝবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কবির যুগী সকল প্রকার সাম্প্রতিক জীবনকে প্রতিকলিত করিয়াছে এবং এই শিল্পশক্তি কবি-পতিভার আর এক বিকাশ—উঠা তিনি জীবনের শেষ দিকে স্থগণ করিয়াছেন। তাঁহার এই শিল্প-পতিভার মূলে একটি শিশু-মুগ্ধতা প্রসূতি হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি সংশোধন করার সময়ে, শূণ্য একটি লাইন টানিয়া তাহা কাটিয়া দেন না, কটাটুকি অংশ সংযোজিত করিয়া তাহা ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন [চিত্র. নং ১]; তাঁহার অলঙ্কারণ কোন সময় গোলকর্ষা বা সৃষ্টি করিয়াছে, কোন সময় উহা কাল্পনিক কিস্তি ক্রিমাকার পাখী ও জন্তু সৃষ্টি করিয়াছে—এই সব পাখী ও জন্তু শিশু শিল্প এবং আদিম মানবের কল্পজগৎ-নিহাত। তাঁহার স্বেচ্ছাজনিত সাহিত্যচর্চা রাখিয়া যখন তিনি শূণ্য চিত্রবিন্যাসের জন্য এসব কাজ করিয়াছেন, তখন ভাবেন না—এক দিন তিনি তাঁটি চিত্র অঙ্কন করিবেন এবং চিত্রের বর্ণিত পরিচিত হইবেন। উহা হইল তাঁহার চিত্রকৃত প্রথম ধাপ। উহা হইতে দ্বিতীয় ধাপের উৎপত্তি হইল, এখন আর পাণ্ডুলিপি কাটা-কটা নহে—যাঁটি ছবি আঁকার চেষ্টা—উহা কাল্পনিক পাখী, জন্তু এবং মৃগশাশুর অলঙ্কারণ; তৃতীয় পর্যায়ে আঁকিলেন “কিগার”—মুগ্ধমূর্তি, পুষ্পাঙ্ক, মানচিত্র ইত্যাদি। কিন্তু বাহাই আঁকুন না কেন, সব কাজেই তাঁহার মূলতত্ত্ব রহিয়া গিয়াছে,—রেখার সময়ে ছন্দের সৃষ্টি; কাজেই তাঁহার চিত্রে কোন বস্তুর বাস্তব প্রকাশ নহে, ইহা শুণ্ড্রকন্দের এক অদ্ভুতি, উহা রেখার গতি অনুসরণ করিয়া স্ফুটতি হইয়াছে। রেখা বস্তুর ‘কন্ডর’ বা বহিরেখা অনুসরণ না করিয়া শুণ্ড গতি-শীল রেখারই মিল বুঝিয়াছে; কাজেই তাঁহার চিত্রকে বলা যায় গতিশীল ছন্দ। শিশুমুগ্ধতা খেলা চেষ্টাতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার চিত্রের পরিণতি ‘আবষ্ট্রাক্ট আর্ট’ অথবা ‘এক্সপ্রেসনিজম’ নামধের অতি আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পরীতিতে।

কবির নিজের কথাই উল্লেখ করা যাক (পুস্তকের ভূমিকা), উহা তাঁহার চিত্রকৃতির উদ্দেশ্য এবং অঙ্কনরীতির উপর আলোকপাত করিলে :

“ছন্দের নীতি সকল শিল্পেরই মূল ভিত্তি, ইহা অচেতন পদার্থকে সজীব সৃষ্টিতে পরিণত করে। আমার স্বাভাবিক প্রগতি এবং ইহার ব্যবহারের জন্য শিক্ষা আমাকে এই তথ্যই প্রণোদিত করিয়াছে যে, রেখা ও বর্ণ কোন তথ্য পরিবেশন করে না; তাহারা ছবিতে ছন্দোবদ্ধ মূর্তি পরিগ্রহ করে। বাহিরের কোন সমাচার অথবা অন্তর্জগতের কোন দৃষ্টির চিত্রাঙ্কন বা অঙ্কন করা তাহার চরম উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু তাহার চরম উদ্দেশ্য হইল একটি সামস্তপূর্ণ সম্পূর্ণতা উদ্ঘাটন করা, ইহা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া কল্পনাতে পুথ বুজিয়া পায়। ইহা অর্থের জন্য আমাদের মনকে প্রর করে না, অথবা ইহা অনর্থকভাবে ভারাক্রান্ত হয় না, কারণ সর্বোপরি ইহাই অর্থ।”

কবি যখন এই সকল ছবি আঁকিয়াছিলেন এবং নিজের চিত্রের অর্থ ব্রহ্মীকৃত করিয়াছিলেন, তখন হয়ত ইউরোপের বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিক শিল্পের কোন জ্ঞান তাঁহার ছিল না; কিন্তু সম্ভবতঃ অজান্তসারেই তিনি

ইউরোপে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছিল, তখন তথাকার—বিশেষভাবে আর্থাগীর্ষ, শিল্পরসিকেরা—তাঁহার কাজ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার কাজের মধ্যে এমন কিছু তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যাঁহার জন্য তাঁহার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার কাজের মধ্যে, নব, ইউরোপের কোন “ইজম” যদি বুঝিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইল “এক্সপ্রেসনিজম”—ইহাই তাঁহার কাজের মূল তত্ত্ব। এই কারণে তাঁহার কাজকে ওয়ালিস ক্যান্ডিনস্কি, পল গৌ এবং এমিল নোভোর চবির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—এই চিত্রকরণ সকলেই এক্সপ্রেসনিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পী।



চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথ

ইহা আশংগ যে, সমসাময়িক নবাবঙ্গীয় বা নব্যভারতীয় শিল্পের জনক অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপর বহান্বয় নাই। আমরা জানি, প্রাচ্যপুত্র অবনীন্দ্রনাথকে কবি তাঁহার শিল্পশক্তিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে যখন চিত্র আঁকিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতে প্রবাহিত হইল। কবি অবনীন্দ্রনাথের মত চিত্রবিদ্যায়—অর্থাৎ অঙ্কন, আলোচ্যায়, পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতিতে শিক্ষা পান নাই, কিন্তু অঙ্কনবিদ্যা অথবা টেকনিকের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার অসামান্য সৃষ্টি প্রতিভা এক কাল্পনিক জগৎকে প্রকাশ করিল। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র প্রকটিত করিল নিও-রোমান্টিজম, কবির চিত্র প্রকাশ করিল একটা ক্যাণ্ডিস বা থাম্বিকালী জগৎ। তিনি

চোটা করিয়াছেন হুম্মাবদ্ধ “নিগনিকিকার্ট ক’রুর” রূপ প্রদান করিতে। তিনি বাস্তববাদী নহেন—পাখী, জন্তু, মুখোশ তাহার চিত্রনীতিতে রূপারিত হইয়াছে ( চিত্র নং ৪, ৮, ১১ ) ; অথবা তাহার রেখাচিত্রের পরিণতি হইয়াছে নিম্নক আঁবট্টাষ্ট অলঙ্কারে ( চিত্র নং ২, ৩ )।

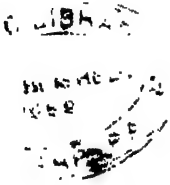
উৎকলীর রচয়িতা অর্দ্ধ অবস্থানান্তর একটি নারীর মুখ আঁকিয়াছেন [ চিত্র নং ৭ ], তাহা লিওনার্দো’র “মোনালিসা” চিত্র স্মরণ না করাইলেও তাহার অর্ধেক বোঝা চক্ষু একটা রহস্তের আভাস দেয়। এক চিত্রাঙ্কিতা নারীর চিত্র [ চিত্র নং ৫ ] শান্ত-কালোতে আঁকা, এক হাত গালের উপর স্তম্ভ, শাড়ীর বহু ভাঁজ বহু রেখায় পায়ের নীচে পড়িয়া আছে। মুখে চক্ষু নাসিকাদির কোন চিত্র নাই, শূন্য মুখমণ্ডল চিত্রাঙ্কিতের ভাব প্রকাশ করে। আলিঙ্গনবন্ধা দুইটি নারীর চিত্র আছে ( চিত্র নং ৬ ), সম্ভবতঃ শোকদম্ভপ্র, একজন অপরাধকে সাপ্তনা দিতেছে ;

যদিও কবির চিত্র চন্দ্র এবং গর্ভন প্রধান উপজীব্য, তবু তিনি যে কম বর্ণবর্ণনাদী ন’তন, চারিটি চিত্র তাহার প্রমাণ দিবে ( চিত্র নং ১০, ১২, ১৪, ১৫ )। একটি নারী কলস কাঁধে এক বিরাট বাকড়া গাছের সামনে দাঁড়াইয়া আছে ( চিত্র নং ১১ ), তাহার দীর্ঘ বাত একটা সম্মুখের

ভাব প্রকাশ করে। ইহা স্বাভাবিক, আকাশের আটটা মেঘের চিত্রের উল্লেখ হৃদয় এবং বাদ্যমির সম্মিলনে একটা বর্ণকূলিক সৃষ্টি করে। বহুবর্ণরঞ্জিত পুষ্পগুচ্ছের এক চিত্র ( চিত্র নং ১২ ) বিখ্যাত গুলশাজ শিল্পী ভ্যানগগকে স্মরণ করাইয়া দিবে। ভ্যানগগের টেকনিকের চোরালো রেখাপাত এবং বিন্দু-প্রয়োগ এই চিত্রে লক্ষ্যীয়। একটি দীর্ঘাকৃতি সম্ভ্রান্ত মুখমণ্ডল—ইহা সম্ভবতঃ কবির নিজেরই প্রতিকৃতি ( চিত্র নং ১৪ )—যেহে হই যেন সুনিবিড় পঙ্কজগাঠ হইতে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে ; মুখমণ্ডলের হলুদবর্ণ বেন সবুজ ও বাদ্যমির রঙের পাথরের ফাটল দিয়া সম্মুখের গলিত লাতার মত ছুটিয়া চহিয়াছে।

শেষ চিত্র ( চিত্র নং ১৫ ) একেবারে ভিন্ন স্বীতির ; ইহার সঙ্গে কবির অন্ধদর্শনের বা শিল্পত্বের কোন সামঞ্জস্য নাই, কেননা ইহা পুরাপুরি বাস্তববাদী ; ইহা একটি নিরুপচিত্র—সম্ভার দৃষ্টি। বৃক্ষগাছ, প্রান্তর, বর্ণাশ্লেষণ শাস্ত্রাঙ্গিকতার ব্যস্তনা দেয়।\*

\* *Chitralepi* রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পনেরখানি রঙিন চিত্র সংলিষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা-সহ। বিখ্যাতরতী, ৩৩ দারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা, বোড বাধাই আঠার টাকা।



## পল্লী-অঞ্চলে জুয়া

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য

গ্রাম-জীবনে যে-সব ছনীতি আজ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে জুয়া একটি। পূর্বে পল্লী-অঞ্চলে জুয়ার সহিত লোকের অতি অল্প পরিচয়ই ছিল। শহর-কেন্দ্রিক সভ্যতা শহরেই ইহার জন্ম দিয়াছিল। পরে এই সর্বনাশা নেশা শহরের সীমারেখা পার হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং এমনি করিয়া বাংলার সমগ্র পল্লী-অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ এমনই ইহার প্রভাব যে, গ্রামাঞ্চলে যে-কোন মেলা, যাত্রাগান ও সামাজিক উৎসবে জুয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা গ্রাম-জীবনের নৈতিক অগণপতন সূচিত করিতেছে।

পূর্বে গ্রামের নৈতিক মান ও সভ্যতা এতটা কলুষিত ছিল না। গ্রামের যে সমস্ত প্রাচীন ব্যক্তি আজও বাঁচিয়া আছেন, তাহাদের মুখে শোনা যায়—পূর্বে গ্রামে গ্রামে আজিকার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাত্রা, কবির লড়াই, তরঙ্গা, রামায়ণগান পল্লীর মানুষ প্রাণ ভরিয়া শুনিয়াছে ; কিন্তু ইহার ব্যয় মিটাইতে তাহারা জুয়াড়ীর শরণাপন্ন হয় নাই। এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল সমগ্র গ্রাম্য সমাজ, এই আনন্দ উপভোগ করিত সমাজেরই সকল মানুষ ; তাই অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিঃসন্দেহে তাহারাই পালন করিবে, এ

নীতিবোধ প্রত্যেকের ছিল। পৃথক করিয়া কাহাদও ভাবিবার মনোবাস্তব কিংবা অবকাশ ছিল না—সবাইকার ভাবনা গোটা সমাজের সহিত একান্ত হইয়া অগ্রসর হইত। কিন্তু এই গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা কালের আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই প্রাপত্তলাভ করিয়াছে ব্যক্তির প্রগ্ন ; যত-কিছু গ্রাম্য অনুষ্ঠান সবই আজ মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী লোকের হাতে চলিয়া গিয়াছে। তাহারাই আজ সমাজ ও গ্রামের ‘কর্তা’ হইয়া বসিয়াছেন। যে সমাজ-ব্যবস্থার নৈতিক বাধনে গ্রামের ছোটবড় সকল মানুষ আবদ্ধ ছিল, সেই বন্ধন শিথিল হইয়া যাওয়ার ফলে সার্বজনীন অনুষ্ঠানের কোনরূপ অংশ লইবার দায়িত্ববোধ অথবা আগ্রহের মনোবাস্তব প্রায় সবাই মাঝে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই নীতিবোধকে জাগাইবার জন্য এতদিন ধরিয়া মানুষের শুভ-বুদ্ধির নিকট আবেদন লইয়া আগাইয়া আসা হয় নাই ; সবাই ফাঁকির পথ বাছিয়া লইয়াছে। তাই গ্রামের উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, মেলা, অভিনয়, কবিগান—যাহা কিছুই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সেখানেই সমাজ-জীবনে ফাঁকির পথ বাহিয়া জুয়ার আকারে এই ছনীতির অঙ্গ প্রবেশ ঘটিতেছে। প্রত্যেক বা পরোক্ষভাবে গ্রামের প্রতিটি মানুষ ইহার জন্য দায়ী।—গ্রামের যে-কোন সামাজিক উৎসব

অথবা আনন্দ-অনুষ্ঠানের সমাধা প্রভিটি মানুষ পরিপূর্ণ-ভাব উপভোগ করিবে, অথচ তাহার উত্তোগ ও ব্যয়ভারের ন্যূনতম দায়িত্ব গ্রহণের বেলার পিছাইয়া যাইবে, ইহা সমাজ-জীবনের নীতিবিরোধী। কিন্তু তাহাই ঘটয়া চলিয়াছে। তাই বর্তমান সমাজের তথাকথিত 'কর্তা'দের একতরফা দোষ দিয়া লাভ নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ ইহারই জন্ত গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ও বার্ষিক্য হইয়াছেন, একরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সামাজ্য অর্থ অথবা কার্যিক শাসনাদানের ভয়ে মানুষ এই উৎসব-অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। উদ্যোক্তার অবশেষে জুয়াড়ীর শরণাপন্ন হইয়া আপনাদের কর্তব্য করিবার পথ খুঁজিয়াছে। এই-ভাবেই গ্রামে গ্রামে জুয়ার প্রচলন বাড়িয়া চলিতেছে। যে-কোন অনুষ্ঠানের জন্ত উদ্যোক্তারা জুয়াড়ীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সে প্রতি রাত্রেব জন্য একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়; এই টাকাতেই অনুষ্ঠানের অধিকাংশ ব্যয় কুলাইয়া যায়। উৎসব-আসরের বহিঃপ্রান্তে জুয়ার ছকের চারিপাশে পেশাদার 'খেলায়ড়' ও কোঁতুলী জনতার ভিড় জমিয়া উঠে; উৎসব হয়, আনন্দ হয়—কাহারও নিকট হইতে বিলম্বিত সাহায্য না লইয়াও এই বিরাট যাত্রা-মেলা-তরঙ্গ-কবিগানের সাফল্য উদ্যোক্তারা স্বীকৃত হইয়া উঠে; দর্শক এবং শ্রোতারও ফাঁকির পয়সায় আনন্দ উপভোগ করিয়া গৃহে ফেরে। কিন্তু এই ফাঁকির রক্তপথ বাহিয়া যে জঘন্য নীতিহীনতা ও মর্যাদাসিক অভিশাপ জীবনের স্তরে স্তরে বাসা বাধিতেছে, তাহা যে-কোন চিন্তা-শীল ব্যক্তির নিকট ভয়াবহ বলিয়া গণ্য হইবে। সমাজের আজ ও যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া নূতন সাধনায় নবভারতের গ্রামীণ সমাজ-রচনার চেষ্টা চলিতেছে, এই সর্বনাশা নেশার প্রচণ্ড ব্যাপ্তিতে তাহাও ধ্বংসের গলবে ধসিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নহে। গ্রামে গ্রামে জুয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় ইহার নেশা সংক্রামক ব্যাধির মত সব স্তরের মানুষের মধ্যে একটু একটু করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাহারা নিবিবোধী ভালমানুষ, তাহারাও এই অপরিমিত অথচ অনিশ্চিত লাভের লোভে ধীরে ধীরে এই পথে চলিয়া আসে এবং একদিন যখন তাহার মোহ ভাঙিয়া যায় তখন সে চাহিয়া দেখে—অর্থ, সম্পত্তি ও সম্মান হারাইয়া তাহার জীবন, রক্তভার ভরিয়া গিয়াছে। দেশের তরুণ-সমাজ, এমন কি ছাত্রসমাজেরও একটা বিরাট অংশ এই দুর্নীতির

কবলে পড়িয়াছে। গ্রামের কিশোর-বালকেরাও জুয়ার ছকের আশেপাশে ভিড় বাড়াইয়া তোলে এবং শুধু ইহারই নেশায় তাহারা নিজেদের ঘরের গোপন তহবিল শূন্য করিতে শিখে। জানিয়া-গুনিয়াও আজিকার মানুষ মানসিক আলস্য-ভরে ইহাকে প্রস্রাব দিয়া চলিয়াছে; ইহার সর্বনাশা পরিণতি কোথায় গিয়া ঠেকিতে পারে, তাহার চিন্তাও একান্ত অবহেলায় মন হইতে সরাইয়া দিয়াছে। থাকুক সামাজিক দলাদলি, থাকুক ঈর্ষা ও পরজ্ঞাকারিতা; কিন্তু গ্রামীণ সভ্যতা এমনিধারা দুর্নীতির স্বপ্ন কোন দিন দেখে নাই, এমনি করিয়া আপনাদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিবার জন্ত কোন দিন কাহাকেও আমন্ত্রণ করে নাই। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা যে পাপকে আপন পক্ষপুটে রাখিয়া পুষ্ট করিয়া-ছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে!

ইহার উপর দুর্নীতিনিবোধ কার্যে নিযুক্ত সরকারী কর্ম-চারীদের ফাইল-দ্রষ্টব্য কার্যকলাপের যে পরিচয় অহরহ মিলিতেছে, তাহাও প্রহসন ছাড়া আর কিছু নহে। দিনের পর দিন পুলিশ কর্মচারীদের চোখের উপর এই যে জুয়ার অবাধ প্রসার ঘটিতেছে ইহাও এক মর্মান্বজ অভিশাপ। তাহাদের নিকট আত্মারা পাইয়া জুয়াড়ীরা বেপরোয়া হইয়া উঠে। ইহা আজ হস্ত কাহারও নিকট গোপন নাই যে, জুয়াড়ীদের লাভের টাকার একটা মোটা অংশ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার উপঢৌকন যথাস্থানে নিয়মিতভাবে পৌছাইয়া দেওয়া হয় এবং বিনিময়ে জুয়াড়ীরা তাহাদের বাবসা নির্ভয়ে পূর্ণমাত্রায় চালাইতে থাকে। জুয়া বন্ধ করিবার আবেদন লইয়া ধানায় আসিলে সময়ভাবের অজুহাত দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ প্রায়ই অক্ষমতাপ্রকাশ করেন এবং গ্রামের শিক্ষিত সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিবার সংপরামর্শ দান করিয়া আপনাদের কর্তব্য শেষ করেন। ইহার পরও মহাকুমা অথবা জেল পুলিশ কর্তৃ-পক্ষের কাছে বার বার আবেদন করিলে তাহারা একান্ত বিরক্তির সহিত রীতিমত নোটিশ দিয়া সংশ্লিষ্ট ধানায় তদন্ত করিতে আসেন। কিন্তু—যথাপূর্বং তথাপরং! জুয়াড়ীর দল ইতিমধ্যেই সংবাদ পাইয়া সাবধান হইয়া যায়। উপরিতন কর্মচারীরাও তদন্ত শেষ করিয়া কর্মস্থলে ফিরিয়া যান। মহা-ভাড়ি-জুয়া-বাহিত উৎসবের আসরে অপাংক্তয় শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হতাশ হইয়া পড়ে; নূতন সমাজ-গঠনের উজ্জল স্বপ্ন ম্লান হইয়া আসে।

# জেল্লিডজা ছাত্রবৃত্তি বা অভিযানের ছাত্রপত্র

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জিরা। ওয়ালটার নামে একজন তরুণ ফরাসী স্থপতি ১৯২৫ সনে মরক্কো দেশে সীসা, দস্তা এবং রৌপ্যের এক গনি আবিষ্কার করেন। এই গনি বর্তমানে জেল্লিডজা গনি নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের দ্বারা মরক্কো দেশের যেরূপ সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, তেমনি ওয়ালটার নিজের বিপুল বিস্তার মালিক হইয়াছেন। কিন্তু তরুণ বয়সের এই আবিষ্কারের দুঃখকষ্ট ওয়ালটার ভোলেন নাই। এই ক্ষণেই তিনি স্থির করিলেন যে, একরূপ দুঃখকষ্টের ভিত্তর দিয়াই যুবকগণকে জীবনের যাত্রারস্ত্রের শুভ স্তযোগ করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত আবিষ্কারের চৌদ্দ বৎসর পরে ( এখন হইতে চৌদ্দ বৎসর আগে ) ওয়ালটার জেল্লিডজা ছাত্রবৃত্তি নামে একটি তত্ত্ববিল প্রতিষ্ঠা করেন। এই তত্ত্ববিলের সাহায্যে ২৫০ জন তরুণ ফরাসী প্রতি বৎসর নানাদেশে অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের জন্ত বাহির হইয়া পড়ে। এই সকল যুবক এক হিসাবে 'গৃহ হইতে পলাতক', তবে এই পলায়ন পিতামাতা এবং কটুপক্ষের সম্মতিক্রমে ও জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে।

যে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ খুবই কম এবং ইচ্ছা করিয়াই বৃত্তির পরিমাণ কম করা হইয়াছে। ১৯৫০ সনে প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ছিল ২০,০০০ ফরাসী ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ ২০ পাউণ্ড বা ৫৮ ডলারেরও কম। ভ্রমণের পরিকল্পনা যত বড়ই হউক না, ছেলেদের এই অর্থেই বায়স্কুলান করিতে হয়, আর সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছেলেকেই যে উক্ত ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয় তাহাও নহে—সহপাঠীগণ অভিযানের জন্ত বাহ্যকে সর্বাপেক্ষা যোগ্য মনে করে, সেই বৃত্তি পাইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফরাসী দেশ ও উত্তর আফ্রিকার ১০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৫,০০০ শিক্ষার্থী গোপন ব্যালট দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণী ( form ) হইতে দুই জন হিসাবে, মোট ১০০০ প্রার্থী বাছাই করে। দুই মাসের মধ্যে এই বাছাই-করা ১০০০ ছাত্রকে তাহাদের নিজ নিজ ভ্রমণ-পরিকল্পনা—শিক্ষার বিষয়, পথঘাট এবং একপাশি পসড়া মানচিত্রের সহিত দাখিল করিতে হয়। বিদ্যালয় পরিচালন পরিষদ ও জেল্লিডজা পরিচালন বোর্ড ( এই বোর্ডে শিক্ষাবিভাগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ থাকেন ) কর্তৃক এই সকল পারিকল্পনা বিবেচিত হয়। মোট ১০০০ প্রার্থীর মধ্যে হইতে শেষ পর্যন্ত ২৪৫ জনকে বাছাই করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়।

এইরূপে প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষা শেষ হইলে ২৪৫ জন স্কুলের ছেলেই অভিযান আরম্ভ হয়। মাত্র ২০,০০০ ফ্রাঙ্ক পকেটে লইয়া ছেলেরা "ফরাসী গায়েরা কদলী উৎপাদন", "পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ক্রোয়েলের কলাবিভা", "ব্রজিলের কফি উৎপাদন", "গেয়নের তিরি

শিকার" অথবা "আধুনিক ল্যাপলাণ্ড এবং তথাকার লৌহপ্রস্তর-গনি", "কানাডার অরণ্য" প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান বাহির হইয়া যায়।

প্রত্যেক ছেলেকে চারটি ভাষার অনূদিত একপাশি ডিপ্লোমা দেওয়া হয় এবং ইহাই পরিচয়-পত্র বা স্থপারিশ-পত্রের কাজ করে। ইহাতে লেখা থাকে—

"বুদ্ধি এবং উৎসাহ প্রভৃতি গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া এই পত্র-বাহককে তাহার সহপাঠীগণ নির্বাচন করিয়াছে এবং শিক্ষকগণ উহা অনুমোদন করিয়াছেন। এই ছাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে একাই দূরদেশ পরিভ্রমণ করিবে, একজ্ঞ খুব অল্প অর্থই বায় করিবে এবং অভিযানের জন্ত সকল প্রকার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক কৃচ্ছ তা সহ্য করিবে। এই তরুণ মনুষ্যত্বের দায়িত্বগ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে।"

এই বৃত্তি তত্ত্ববিলের সহকারী সভাপতি মর্শিয়ে লুই ফ্রাঙ্কয়েরের ভাষায়—পৃথিবী এবং ফরাসীদেশের রাজপথে কয়েকজন তরুণকে ছাড়িয়া দেওয়াই কেবল জেল্লিডজা বৃত্তির উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষার পরিকল্পনা বাহাতে বাস্তব ভ্রমণ ও সহযাত্রী মানুষের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত ও সার্থক হয় বুদ্ধিদানের মুণ্ডা উদ্দেশ্য তাহাই।

বালকেরা পারে ইটিগা, সাইকেলে, ডোন্ডার, রেল, বিমানে বা নৌকায় যে-কোন উপায়ে ফরাসীদেশের বাহিরে ভ্রমণ করিতে পারে এবং তাহারা সেই ভাবে নিজেদের পছন্দমত চলার কার্যসূচী তৈরি করে—তবে ভ্রমণকাল এক মাসের কম হইলে চলিবে না। পড়া-শুনায় পরিকল্পনা সবক্ষে তাহাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অনেকটা এইরূপ : আধুনিক কৃষিপদ্ধতি, শিল্প-সংগঠন, স্থানীয় আচরণব্যবহার এবং জীবনযাত্রা, শিল্প ও মানসিক উৎকর্ষ, শিক্ষা-ব্যবস্থা, খেলা-ধুলা ইত্যাদি।

এই ভ্রমণের সময়ে বালকেরা যোজ্ঞগার করিতে পারে—অনেককে করিতেও হয় এবং এ বিষয়ে উৎসাহও দেওয়া হয়। ইতি-মধ্যেই দুই হাজারের অধিক বৃত্তিভোগী শত্সংগঠনের সময় ক্ষেত্রের এবং মাছ ধরিবার ঋতুতে জেলে স্ত্রীমায়ে কেবিন বয়েব, জাহাজের যং করার, জানালা পরিষ্কারের, এমন কি বাসন ধোয়ার কাজ করিয়াছে। অনেকে পর্বতের কাগজ ও ছবি বেচিয়াছে, কাগজে লিখিয়া এবং যেডিওতে বক্তৃতা করিয়া যোজ্ঞগার করিয়াছে। বৃত্তির সাহায্যে এবং কঠোর পরিশ্রম ও নিজেদের চেষ্টায় অনেকে ইউরোপের প্রায় সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছে—অনেকে উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা এবং উত্তর মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত অভিযান চালাইয়াছে।



ময়লার বীজাণু থেকে  
প্রতিদিনই আপনার  
অসুখের সম্ভাবনা  
আছে



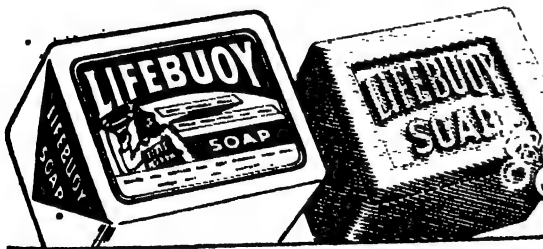
লাইফবয় মোথে এই  
সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে  
প্রতিদিন নিজেকে  
রক্ষা করুন



# লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু  
থেকে আপনাকে রক্ষা করে

লাইফবয়ের  
“রক্ষাকারী ফেনা”  
আপনার স্বাস্থ্যকে  
নিরাপদে রাখে



ভারতে প্রস্তুত

B, 244-XB2 BO



নির্দিষ্ট কর্ণব্য সম্পাদন এবং জীবনধারণের জন্য উপার্জন ছাড়াও গ্রামের বড়ার সর্বস্বলি প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে অবশ্যপ্রতিপাল্য। প্রত্যেককেই একপানি দিনিলিপি বাগিতে এবং যথাযথ আর বয়েরব হিসাব ও রিপোর্ট দাখিল করিতে হয়—ইতা ব্যবস্থানচিত্র, চিত্র, চিত্র এবং কণা দারা পরিষদ রূপে বুঝিয়া দিতে হইবে। আর এই সমস্তই নিজ হাতে করিতে হইবে—বাক্যের কেনা পোষ্টকার্ড বা ফটো দাখিল করিলে চলিবে না।

২৪৫ জন গ্রন্থিপাণ্ডু ছাত্রের মধ্যে হইতে তাহাদের রিপোর্ট বিচার করিয়া ১৫ জনকে দ্বিতীয় বাৎসরিকের সুবিধার জন্য আর একবার যদি ১৭৭ কণা হয়। দ্বিতীয় বাৎসরিকের পর উভ্যদের মধ্যে হইতে ১৫ জনকে পঁচটি পুরস্কার দেওয়া হয়—ইতার একটি পুরস্কার ফরাসী গণবায়ের সভাপতি নিমিত্ত দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় দফার পুরস্কারপ্রাপ্ত তিন জন তরুণের বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল—দ্বিতীয় রিপোর্টের বিচারে ইতার এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছিল।

প্রথম দৃষ্ট—ডায়ী বুজন নামক একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত যুবক, সে কলাবিদ্যায় খুবটী উৎসাহী। প্রথম বাৎসরিক যুবকটি সিসিলিতে গ্রীক ভাষায় পদবেশন করিতে যায়, তখন সে শুলের ছাত্র। গত বৎসর স্পেনে যুরোপের ভাষায় সম্বন্ধে সে গবেষণা করে। এই যাত্রায় তাহার বিপদ উপস্থিত হয়। মাদ্রিদের এক কোলেজে তাহার সমস্ত

স্বর্থ এবং দুইটি ফটোর ক্যামেরা ধোয়া যায়। এই লোকসানের চোট সামলাইবার জন্য সে আলহাম্ব্রার ভ্রমণকারীদের নিকট তাহার হাতে থাকা ছবি বিক্রয় এবং গাউন্ডের কাজ করিয়া স্বর্থ সংগ্রহ করে। এই সময়ের কঠিন পরিশ্রমে তাহার শরীরের ওজন ত্রিশ পাউন্ড কমিয়া যায়, কিন্তু সে কতবাক্তই হয় নাই এবং এককন্ট দ্বিতীয় বৎসর পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হয়। সে এ বৎসর মোটর সাইকেল ও সিনেমার ক্যামেরা লইয়া গ্রীসদেশে গঠীন ছবি তুলিতে গিয়াছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—উনিশ বৎসর বয়সের স্মিথ দেভেজ। সে রসায়ন-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য পড়িতেছিল। এ ছেলেটি বিভিন্ন ধরণের জোয়ান ছেলে, এলোমেলো চুল, কিন্তু সে যেন ভেজ ও উৎসাহের প্রতীক। প্রথম বাৎসরিক সে উটালীতে যায়—কিন্তু সেবারকার সম্বন্ধে কিছু বলিতে রাঙী হয় নাই, বলে সে ত ছেলেপেলা। কিন্তু ফরাসী স্থানের নিগার জলসেচের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় সে যুগ্ম হইয়া উঠে। তার বিবরণীর সচিত্র সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে দেখা যায়, দাকার বামাকো রেলপথে সে ১৭৫ মাইল ভ্রমণ করে, পরে বামাকো সেগুই এয়ার-ফ্রান্সেব এভোয়েনে যায়—ইতার মধ্যে অবস্থা ১৫৫ মাইল তাহার ভাড়া লাগে নাই। তার পর এক ফরাসী-আফ্রিকান কোম্পানীর প্যান্ডল ষ্টীমারে সেগুই-মোবাইল যায়। ২০,০০০ ব্রাঙ্ক পকেটে করিয়া তাহাকে এই দীর্ঘ ভ্রমণ সম্পন্ন করিতে হয়।

## — সদ্যপ্রকাশিত নূতন ধরণের দুইটি বই —

বিশ্ববিখ্যাত কথাসিদ্ধি আর্থার কোয়েষ্টলারের

‘ডার্কনেস্ অ্যাট নুন’

নামক অল্পপন উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ

“মধ্যাহ্নে আঁধার”

ডিমাই টে সাইকে ২৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

শ্রীনীলিমা চক্রবর্তী কর্তৃক

অতীব সদয়গ্রাহী ভাষায় ভাষান্তরিত

দ্বিতীয় আড়াই টাকা।

প্রসিদ্ধ কথাসিদ্ধি, চিত্রশিল্পী ও শিকারী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

লিখিত ও চিত্রিত

“জঙ্গল”

সবল সুবিন্যস্ত ও প্রাণবন্ত ভাষায়

ডবল ক্রাউন টে সাইকে ১৮৪ পৃষ্ঠায়

চৌদ্দটি অধ্যায়ে সুসম্পূর্ণ

দ্বিতীয় আড়াই টাকা।

প্রান্তিস্থান: প্রবাসী প্রেস—১২০২, আশার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৩

এবং এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ—১৪, বহিম চাটাজি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



# দেখুন, ডালুডা বনম্রতি কিনলে কত দিক দিখে আপনার লাভ হবে

সর্বত্রই গৃহিনীরা বলেনঃ

“ডালুডা কিনুন- তাহোলে পয়সাও  
বাঁচবে ও আরও সুস্বাদু খাবারও  
রাঁধা হবে।”



হিসেবী গৃহিনীরা প্রতিবারই ডালুডা কিনে থাকেন। আমাদের দৈনিক খাবারে যে রকম স্নেহপদার্থ দরকার হয় বলে ডাক্তাররা বলেন ডালুডায় ঠিক সেই জিনিসই আছে, আর ডালুডার দামও কম। ব্যবহার কোরে দেখুন একটি ডালুডা কতদিন চলে আর কি চমৎকার খাবার এতে রান্না হয়! আজই একটি ডালুডা কিনুন।

রান্নার ব্যাপারে কি কোরে খরচ বাঁচানো যায়?

বিনামূল্যে উপদেশের ক্ষেত্রে আজই বা যে কোনো দিন লিখুন:-

দি ডালুডা গ্র্যাডুইসারি সার্ভিস পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

## ডালুডা

১০, ৫, ২, ও ১ পাউন্ড টিনে পাওয়া যায়



আফ্রিকায় যাওয়া-আসা, অদান ভ্রমণ, পাওয়া-থাকার প্রচেষ্টা সবই ইহার মধ্যে কল্যাণ লটতে হয়।

দেশজের অভিজ্ঞতার বিবরণ বেশ চিত্রাক্ষক : হস্ত ম'ন'চিহ্ন, চাঁদ, ফল, ঐতিহাসিক ছিটো-চাঁচা ইত্যে সস্ত্র সস্ত্র একর জমির বাপক ফলসেট-বাবুয়ার পিচয় পাওয়া যায়--এই বিরাট দেশট বিবাহতে দান ও তুলা উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

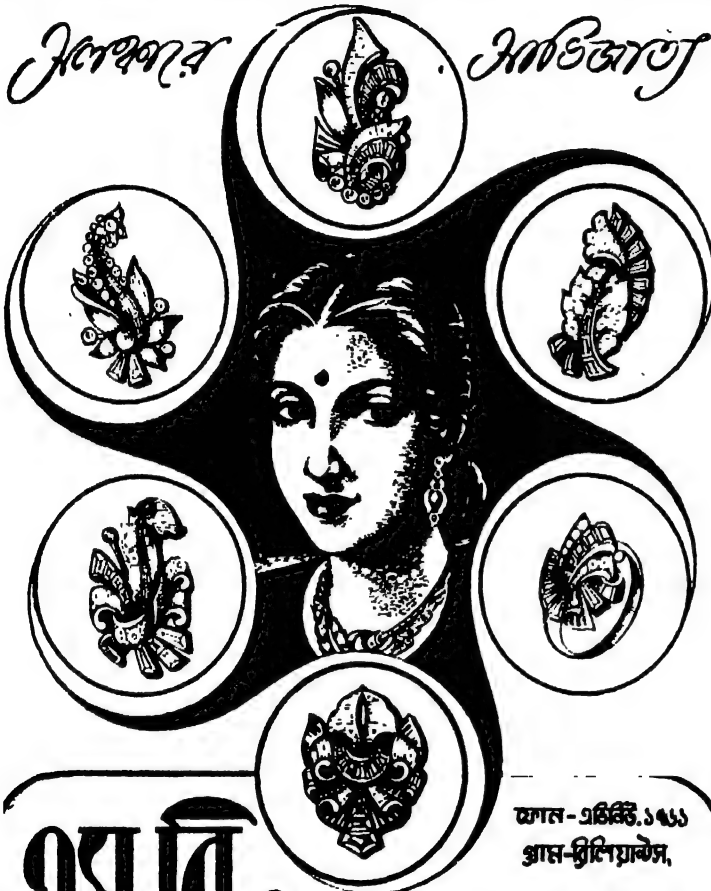
তৃতীয় দৃষ্টান্ত—দানিয়েল ভার্ণি। ইনি ইস্রাইলে কিবুজিম, অর্থাৎ—সমবায় কৃষি-সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়াছিলেন। ইহার আসা-যাওয়ার টিকিট কিনিতেই বৃত্তির টাকা শেষ হয়। কিন্তু একেবারে গালি হাতে বিদেশে নামা ঠিক নহে মনে করিয়া নিজের অর্থ হইতে ৫,০০০ ফ্রাঙ্ক সঙ্গে লন। কিন্তু বৃত্তির সন্তু অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার চেষ্টা এই অর্থ ভ্রমণকালে ব্যক্তিগত ব্যয়নির্বাহার্থে তিনি খরচ করেন নাই। তবে প্রত্যাবর্তনের দিন পিতা মাতা ও

বন্ধুদের জ্ঞাত বিদেশ ভ্রমণের স্মারক চিহ্নস্বরূপ স্রবাদি কিনিবার জ্ঞান ক্রমে এই টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

পেট চালাইবার জ্ঞান ইনি কিবুজিমে মজুর গাটিয়াছিলেন। ইহার বর্ণনা হইতে এই ইলদী সমাজের পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় এবং ইহাদের আর্থিক ও সামাজিক সমাজ বিষয়ে ভার্ণি যে গভীর গবেষণা করিয়াছেন তাহার আভাস মেলে।

পূর্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জেল্লাভা পরিকল্পনা দ্বারা তরুণ ফরাসীরা সাধারণ ভ্রমণকারীর মত ভাষা ভাষা দেশভ্রমণ করে না, সঙ্গীতাত্মক উৎসাহ ও আশ্রয়ের সহিত পনিষ্ঠভাবে দেশ এবং দেশের মানুষের সঙ্গে মিশিবারও ভাবিবার সুযোগ লাভ করে। তরুণদের মানুষ করিবার, পরবর্তী জীবনে দায়িত্ব প্রতিপালনের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে তৈরি করিবার পক্ষে ইহা যে প্রবৃত্তি পুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই

—( ইউনেস্কো )



**এম.বি.সরকার এও সঙ্গ**  
 প্রখ্যাত চীনিয়নের (অনেকের দীর্ঘায়ু ও হিরণ্যকুমারী)  
 ১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকতা (আমহার্ট স্ট্রীট ও  
 বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল) আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপণীত হিঁক

গ্রাহক-হিন্দুস্থান মার্চ বালিগঞ্জ : ১৫৯/৮৬, গঙ্গাধরী এভিনিউ  
 কলিকতা : ফোন পি.কে. ৪৪১৩

# = বি জু ণ্ডি =

আমরা অতীব সন্তোষের সহিত 'জানাইতেছি  
যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র ৬১০ সাড়ে বারো  
আনা সের দরে চিনি যাহাতে পাওয়া যায় সেজন্য  
স্থানে স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র এবং পাইকারী ও খুচরা  
বিক্রেতা নিয়োগের সুব্যবস্থা হইতেছে। চিনি  
সরবরাহে কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিলে তৎপ্রতিকারার্থে  
যে কোনরূপ পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হইবে।

## সুগার ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

২নং দয়হাট্টা স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

টেলি : ঠিকানা—'চিনিবিক্রি'

ফোন : ৩৩-১০১৯

# খুস্তক পরিচয়

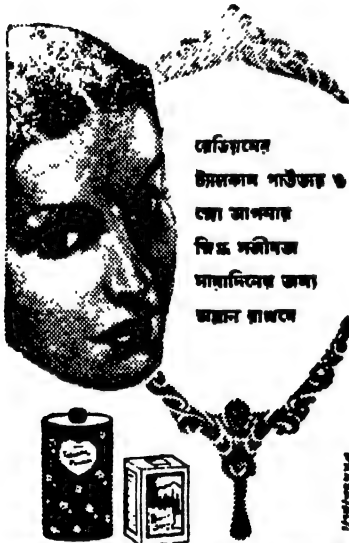
**পদাবলী পরিচয়**—ঐতিহাসিক মণিপুরিয়ার, ঐতিহাসিক মণিপুরিয়ার চট্টোপাধ্যায়-সিদ্ধি কৃষিক-সম্বন্ধিত। প্রকৃতদাস চট্টোপাধ্যায় "এও মন, ২০৩১১ কণ্ঠাশিস দ্বীপ, কলিকাতা", মূল্য হিন টাকা।

ঐতিহাসিক মণিপুরিয়ার মণিপুর পদাবলীর একজন গুরু বিচারক এবং প্রবীণ সমালোচক বলায় তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি বহু বৎসর পূর্বে জয়দেব গোস্বামীর ঐতিহাসিকের একটি সম্পদ বাংলায় প্রকাশ করেন। তাঁহার দেয়ালি তাঁহার অসামান্য বিচারবুদ্ধি ও অনস্বাদ্যারণ গবেষণা। পরলোকগত মহাশয় তাঁহার ঐতিহাসিকের একটি বাংলা পত্র অর্থাৎ ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা আর পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে ডঃ ঐতিহাসিক মণিপুরিয়ার চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান মহা-সম্পাদকতায় তিনি যে "চট্টোপাধ্যায়ের পদাবলী" প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার বিশুদ্ধ অসামান্য পরিচয় রহিয়াছে। চট্টোপাধ্যায়ের পদাবলীর পাঠ্যে নির্ণয় এবং গুরু বিচার দ্বারা তাঁহার ক্রম নির্ধারণ সাহিত্যে। তাহাকে স্মরণ করিয়া রাখিবে।

পদাবলী পরিচয় গ্রন্থে পদাবলী যাচিতের প্রতি গুরুত্বের যে অঙ্গীকার আছে, তাহা তাঁহারই পরিচয় পাবনা যায় না, বাংলার কীটনগারের

প্রতি তাঁহার একান্ত অস্বাভাবিক গ্রন্থের প্রতি ছত্রে কুরি উঠিয়াছে। পদাবলী পরিচয় তিনি বৈষ্ণবদিগের অস্বাভাবিক হইতে অনেক প্রমাণ-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পদাবলী বুঝিবার পক্ষে প্রস্তুত হইয়া দিয়াছেন। আশা করি এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া পদাবলীর রসধারা পাঠকগণ আস্থান করিতে পারিবেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন—"বিশ্বসাহিত্যে পদাবলী বাঙ্গালীর অগ্রতম অবদান।" আজ কয়েক শতাব্দী হইতে পদাবলীর দ্বারা বাংলাদেশ হইতে গুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর পদাবলী রচিত হইবার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। বাঙ্গালী তবুও পদাবলীর মোহ কাটিতে পারে নাই। সময়ে সময়ে তাই পদাবলীর আভাস লইয়া কোন কোন কবি কিছু উল্লেখ দেখাইয়াছেন। পদাবলী আর রচিত না হইলেও তাঁহার মধ্যে যে বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠা বিকশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'ভক্তিরসামৃত সিদ্ধি', 'উজ্জ্বল চন্দ্রিকা' ইত্যাদি হইতে পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন যে উপাধায় গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, তাঁহার সজ্ঞা তাঁহাকে অশেষ সাধনাদ প্রদান করিতেছি।

ঐতিহাসিক মণিপুরিয়ার

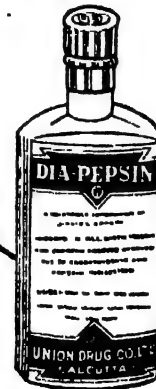


**রেডিয়ম স্নো ও ট্যালকাম পাউডার**

রেডিয়ম ল্যাবরেটরী  
কলিকাতা-৩৬

**ডায়াপেপসিন**

পরিপাক ক্ষমতাকে  
দৃঢ়তন  
ভেজদ্রব করে



**ইউনিয়ন ড্রাগ**  
কলিকাতা



# দ্রুত-ফেনিল সানলাইট না আছড়ে কাচলেও সাদাও স্বাক্ষরকে করে দেয়



“শিক্ষিকারী বলেন আমি বেশ কটকট থাকি। তার কারণ মা সানলাইট সাবান দিয়ে আমার ক্রক ধলধলে সাধা করে কেটে দেন। সানলাইটের তুপাকার সরের মত কোনো দীঘ ও সহজেই কাপড়-চোপড় থেকে ময়লা বার করে দেন—আছড়াক্তেও হয় না।”



“আমার ক্রাসের মধ্যে আমাকেই সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট দিয়ে কাচার তুল্য আমার রঙিন ক্রক কেমন স্বকণ্ঠকে থাকে দেখুন। মা বলেন সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড় নয় হয় না আর তা টেকেও বেশী দিন। এতে পুং পুসী হবার কথা—নয় কি?”

ভারতে প্রস্তুত



সানলাইট সাবান

কাপড় বাচার, পরিশ্রম বাচার, সরচ বাচার

২২০-২২২ ৫০

কৃষি-বিজ্ঞান ( দ্বিতীয় পর্ব )—রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিবর্দ্ধিত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩০৫। মূল্য দশ টাকা।

এই পুস্তকে ডাল জাতীয়, খাদ্যাদি জাতীয়, তৈল ভেদজ ও মাদক এবং মশলা জাতীয় ফসল, তন্তুপ্রদ ফসল, কন্দ ফসল, পশুপাতি ফসল, শকরা ফসল প্ৰভৃতির চাষাবাসের বর্ণনা আছে। উতা ছাড়া প্রাচীন-বৰ্ণাকালের ও শীতকালের মাসিক শাকসব্জীর এবং নানাবিধ ফলের চাষের বিবরণ বৰ্তমান পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রেশমের চাষ, তসর, কীটপালন, এঁড়ির চাষ এবং লাঙ্গার চাষের কথাও এই পুস্তকে আছে। পুস্তকের চিত্রদশ অধ্যায়ে কতকগুলি কৃষি-বচন ও দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্ট ফসল, মজা ও ফলচাষের আয়-ব্যয়ের তালিকাও সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয় কৃষিবিভাগের একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কর্মচারী ছিলেন এবং কৃষিবিভাগের প্রথম অবস্থায় বহু কাণ্ডকারী পরিকল্পনার ভিত্তি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা পুণ্য ছিল এবং কর্মপ্রদক্ষতার জন্ত তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এক কণায় বলা যায়, কৃষিবিভাগের গোড়া যাত্রার পটন করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

বাংলা ভাষায় কৃষি-বিষয়ের পুস্তকের এখনও পঞ্চাশ খুন্ট অভাব। বর্তমান পুস্তকপানি সেই অভাব কতকটা পূরণ করিলে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে স্থানীয় মাটি, আবহাওয়া এবং অজ্ঞান। বিষয়ের উপর কৃষির সফলতা নির্ভর করে। শুধুরা কৃষিবিষয়ক পুস্তকে সন্নিবেশিত উপদেশাবলী সকল স্থানে সমানভাবে কাণ্ডকারী হয় না। সেই কারণে বর্তমান পুস্তকে বিভিন্ন জাতীয় ফসলের চাষাবাস সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা

পুস্তকে সাধারণ বাংলায় সন্নিবেশিত থাকে। [স্থানীয় আবহাওয়া, মাটি প্ৰভৃতির তারতম্য। সকল পানালীর তারতম্য হইতে।] যাত্রার কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকিলে কিংবা যাত্রার কৃষিকার্যে লিপ্ত হইতে উচ্চা করেন প্রচাদের মনে রাখা উচিত যে, নিজেদের অভিজ্ঞতার মূল্যে সন্দেহপূর্ণ অবিক। কেবলমাত্র কোন কৃষি-পুস্তকের উপদেশাবলী অবহেলা করিয়া তাহার কৃষিকার্যে সম্পূর্ণ লোভান হইতে পারিবেন না। আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে বহু প্রাক্ত কৃষিকার্যে আইনিয়োগ বরিয়াছেন, কিংবা এক বাণেশ্বর মিহ্র চাড়া অনেকেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতাপত্র কোন কৃষি-পুস্তক রচনা করেন নাই। আরও ভ্রমের বিষয় এই যে, যাত্রার কৃষিবিভাগে দীর্ঘকাল কাণ্ড করিয়া কৃষি সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিকে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা কোন পুস্তকের মাধ্যমে দেশকে প্রদান

## স্বাধীন্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে পৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে শক্তি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্বাঙ্গের বৈশিষ্ট্য, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে।

**বৃহত্তর বীমা**  
 ১৬, ৩৮, ৭৯, ২৯৮

চলতি বীমা	৮৬, ৭১, ৮৫, ০৪০
সম্পত্তি	২২, ৪৯, ৮৩, ০৫৬
ও বিবিধ তহবিল	১৯, ৭৭, ৭৬, ২৮৭
প্রিমিয়ামের আয়	৩, ৯৪, ২২, ৩৭১
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮, ৮২, ২৭১

হিন্দুস্থানের বীমাগ্রন্থ বিরাপত্র  
সারস্বত ও পাঠ্যক্রমক।

# সুপ্রা কালি

পেনের জন্য

সুপ্রা কালি আজ এত জনপ্রিয় কেন ?

সব বিদেশী দামী-কালিকে সে হার মানিয়েছে, সল-এক্সক্লুসিভ ও তলানিমুক্ত বলে অব্যাহত তার প্রবাহ, বর্ণের স্থায়ী ওজ্জ্বল্য মনে আনে তপ্তির নিশ্চিত আশ্বাস। কালির রাসায়নিক গুণে প্রিয় কলমটি থাকে চিরনূতন



**হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ**

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিং, ৪নং ডিস্ট্রিকশন এজেন্সি, কলিকাতা-১৩

সুপ্রা কালি পেনটিং এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি



“যেমন সাদা তেমন বিশুদ্ধ  
এই লাক্স টয়লেট সাবান—  
সুগন্ধি সরের মতো ফেনা এর...”  
নিরুপা রায়

বলেন



“বিশুদ্ধ, সাদা লাক্স টয়লেট সাবানই আমার ত্বকে  
খুব পরিষ্কার রাখে” নিরুপা রায় বলেন। “তার  
কারণ এই সাবানের প্রচুর সরের মতো ফেনা  
লোমকূপের ভেতর পর্যন্ত যায়। আর, তাতে মূথের  
স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে ও ত্বক পরিষ্কার ঝর-  
ঝরে হয়ে যায়। এই সাবান মাথলে গায়ের ওপর  
যে একটা সুগন্ধ থেকে যায় তা আমার বড়  
ভালো লাগে।”

“... তাই তো আমি ত্বকের লাবণ্যের জন্য লাক্স  
টয়লেট সাবান এত পছন্দ করি।”

ঠিক গল্প নয়, একটি নারীর জীবনের রেখাচিত্র। সামাজিক আবেষ্টন'

দিনে দিনে আরও  
নির্মল, আরও  
লাবন্যময় ত্বক্

রেমোনার **ক্যাডিল্যাক** আপনার  
অন্তে এই যাদুটি কোরতে দিন।

রোজ রেমোনা সাবান  
বাবহার করুন। এর  
ক্যাডিল্যাক ফেনা আপ-  
নার গায়ের চানড়াকে দিনে  
দিনে আরও কোমল,  
আরও নির্মল কোরে  
তুলবে।



**রেমোনা**

ক্যাডিল্যাক একমাত্র সাবান

\* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রসূ কঠকগুলি তেলের  
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।

BP. 109-50 BG

রেমোনা প্রোপাইটারি লিঃ এর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

এই গ্রন্থের উপর ভাষার প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। যেন এর অভিজ্ঞতা  
ইহঁতে দেখা যায়। এই বিশিষ্ট 'সাহিত্যিক গুণ' বা শক্তিতেও পণ্ডিত জ্ঞান লাগে  
এক পক্ষের ভাববোধ বিদ্যে পাওয়া যায়।

## শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছোটদের কবিকল্প চণ্ডী—শ্রীগোবিন্দোপাল বিদ্যাবিনোদ।

চাঁটাজি পাবলিশার্স, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য  
বোর্ড পঁচাত্তর ১৫০, প্রথম সংস্করণ।

মঙ্গল-কাল পোড়ানো বাংলা-মাহিষের বিশিষ্ট সম্পদ, তরবারে রায়চাঁপার  
ভারতচন্দ্রের অংশমঙ্গল ও কবিরঞ্জন মনুন্দরাম চট্টোপাধ্যায়ের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য  
সম্বন্ধে পুস্তিকা। বাংলাকল্প চণ্ডী নামে খ্যাত এই কালো চণ্ডীদেবীর  
মাহাত্ম্য-বিস্তারিত চিত্রিত মনোহর কবিত্বের স্থান পাওয়াছে, প্রথমটি কালকেতু  
ও সুমরান, দ্বিতীয়টি ধনপতি ও কুমুদেব উপাখ্যান। গ্রন্থকার কিশোরদেব  
উপাখ্যান কবিত্ব এই গল্পটিকে বর্ণনা করিয়েছেন। গ্রন্থকারের ভাষা মার্জিত  
ও বর্ণনামূলক। একে বংশানুগত। এইটি সচিহ্ন, মলাটের পবিত্রতা  
অভিন্ন।

## ব্যাক অফ বাঁকুড়া লিমিটেড

সেন্টাল অফিস—৩৬নং স্ট্রাও রোড, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন—৫০০০০০. লক্ষ টাকার অধিক

ব্রাঞ্চ :—কলকাতা, কোয়ার, বাঁকুড়া।

সেভিংস একাউন্টে শতকরা ২২ হারে সুদ দেওয়া হয়।

১ বৎসরের স্থায়ী আমানতে শতকরা ৩২ হারে হিসাবে এবং

এক বৎসরের অধিক থাকিলে শতকরা ৪২ হারে

সুদ দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে, এম. পি.

**টোল প্রজেক্ট কোম্পানীর**

**দাদ ও কন্ট্রোল মলম**

**ক্রিউটা-টোন** পোরে বেদনা ও  
চর্মরোগের জন্য

**নিম মলম** পোরে পায়ে ও  
চর্মরোগের জন্য

ব্রজনাথ গর  
কলিকাতা ৩৫

## পুরাণের আলো—শ্রীগোবিন্দোপাল বিদ্যাবিনোদ।

গোবিন্দোপাল লিমিটেড, ৫৫ ভবানী দত্ত স্ট্রিট, কলিকাতা-৭। মূল্য—১০।

আমাদের পুরাণগুলি রচয়িতার বিশেষ, কত মণিমাণিক্য ও রত্নমাণিক্য যে  
এই আশেব জ্ঞানভাণ্ডার সম্বন্ধে আছে তাই বলা যায় না। বিবিধ পুরাণ  
ইহঁতে গ্রন্থকার কয়েকটি গল্প নিকটাত্মক বর্ণনা কিশোরদেব উপাখ্যান ভাষায়  
বর্ণনা করিয়েছেন। প্রত্যেকটি গল্পই পুস্তিকার একটি অধ্যায়। এই  
মুদ্রিত বইখানির প্রাচীর বাঁধাচ্ছে।

কলিকাতা—শ্রীগোবিন্দোপাল বিদ্যাবিনোদ। এম. কে. পালিত

এও কো., ৮ আমাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫০।

কবি রঘুচন্দ্র মজুমদারের সম্ভাষণতরকার আদর্শ রচিত, সম্ভাষণ ও কল্পনার  
উদ্ভাপক এবং নৌদৃশ্যের সম্ভাষণ এই কাব্যকল্পিকাগুলি মনস ও  
স্বপ্নপাঠ।

(১) হিতোপদেশের গল্প—শ্রীরাধাকৃষ্ণদেব বসু। (২)

বেড়াল ঠাকুরকি—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম ১২ ও ১২। মূল্য বোর্ড পঁচাত্তর  
১৫০ ও ২৫০, সাধারণ সংস্করণ ১৫০ ও ২৫০।

পঞ্চকল্প হইতে পৃথকীকৃত হিতোপদেশ নামে আর একখানি গ্রন্থ বিংশমুদ্রা  
পেঁচা ও পলিমা প্রস্তুত আছে। পঞ্চকল্পের মূল গল্পগুলি শাখা-প্রশাখায়  
বিস্তারিত, শেষেরটি হইতে কয়েকটি গল্প বাছিয়া কল্পনা স্বনামধন্য গ্রন্থকার  
শ্রীমদেব জ্ঞান সম্ভাষণ মলম ভাষায় 'হিতোপদেশের গল্প' লিখিয়েছেন।  
গ্রন্থকার গ্রন্থটির জন্য ব্যঙ্গরচনা সিন্ধু, ছোটদের জন্যও তিনি কেমন  
সরল নিপুণ হাতে লিখিতে পারেন, বইখানি তাহার পরিচয় দিচ্ছে।

'বেড়াল ঠাকুরকি' গল্পখানি বই। প্রবীণতম ভূমিকায় লিখিয়েছেন,  
'গল্পকথা' মেয়েদের মূল যেমন শোনা যায় ঠিক যেমনি লিখিয়েও  
চেষ্টা করি যাচ্ছে। এগুলি পড়িলে বন্ধু বাঁধবে, এ সমস্ত অপরোক্ষ  
মেয়েদের বচনা, তাহাদেরই প্রতিদিনের ধরনেরই আঁকুড়ির অস্তরের কথা।  
তাঁহাদেরই মতো মানবমনের স্নেহভক্তি-পরিচয় পাওয়া যায় তাহারও  
আধার এই বাঁধাধরের অস্তরে। অবশ্য মানবস্বকৃতি সকল জায়গারই  
সমান। কিন্তু তাহার বাহিরের চেহারাটি অবসরভেদে ভিন্ন। ছেলেমেয়েরা  
চিরকালই মাদুরমা ও দিদিমাদের মুখে গল্পকথা শুনতে ভালবাসে, লেখক  
ঠিক তাহাদেরই ভাষায় ও ভঙ্গীতে গল্পগুলি বলিয়েছেন।

বই চুখানি বহু চিত্রে অলঙ্কৃত, ছবিতেও কথা কয়, প্রবাসে নিঃসন্দেহে  
বলা যায়, বই চুখানি ছোটদের মনোরঞ্জন করিলে।

আমার ছড়া—শ্রীপ্রদীপ বসু। শিল্পী—শ্রীপ্রভুল বন্দ্যো-  
পাধ্যায়। শিশু সাহিত্য সংসদ লি., ২২এ আপার সার্কেলার রোড,  
কলিকাতা। মূল্য ১৫০।

অপকণ অঙ্গসজ্জায় বইখানি স্বলম্ব করিতেছে। যেমন ছড়া তেমনি  
ছবি। একদিকে শিল্পীর কোমল তুলিকা-স্পর্শে আঁকা জলরঙা ছবিগুলি  
যেমন একটি মৌগন ইন্দ্রজালের হস্ত করিচ্ছে, অন্যদিকে লেখকের স্নেহমুখ  
ছড়াগুলি যেন চন্দ্র ও সূর্যের গুমুসু বাজাইতেছে। পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী ছবি, বড়  
বড় টাইপে ছাপা বইখানি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে।

ছুটির দিনে মেয়ের গল্প—শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত। শিল্পী—  
শ্রীসুখেন্দ্র সেন। শিশু সাহিত্য সংসদ লি., ২২এ আপার সার্কেলার রোড,  
কলিকাতা। মূল্য ১৫০।

যেমন পৃথিবী তাপে পৃথিবী জ্বলিয়া গেল, মাঠঘাট গাছপালা শুকাইয়া গেল। পরিত্রী আকাশের দিকে তাকিয়া অচিহ্নিত জানাইল—জল দাও, তৃষ্ণার জ্বালা কাটিয়া মরি। করুণায় বিগলিত হইয়া আকাশ মেঘের দলকে পাঠাইল জল আনিতে, মেঘেরা দল বাঁিয়া সমুদ্র জল তুলিতে গেল। সমুদ্রের দেবতা বলিল, জল দিব না। মেঘেরা সূর্য্যটাকুরকে নাগিল জানাইল, সূর্য্যটাকুর রোমে হস্তার দিয়া সমুদ্রের জল শুষ্কিত থাকিলেন, তখন সমুদ্রের দেবতা ভয়ে জল দিতে রাজ্য হইল। গমনি মেঘেরা লাফালাফি দাপাদাপি করিয়া সমুদ্র হইতে আকাশে জল তুলিতে লাগিল, জলভরা মেঘ মেঘে আকাশ ছাটয়া গেল, অবশেষে অবিরলভাবে পৃথিবীর উপর জল ঢালিতে লাগিল। জল পাইয়া তৃপ্তি বরণী হইল হইল, স্বপ্নান্তে, পত্রপুষ্প নীচগাছি হাসিতে লাগিল, চানীর মনের আনন্দে গান বরিষল। পিতৃপুত্র মিথিয়া প্রভুকার এত সন্দেহ গাঢ়ি ছোঁদের জনা পত্র-কবিতায় লিপিয়াছেন। গল্পটি পড়িতে যেমন কে ভুলগোনাপক, চরিত্রলিপি কল্পনাকবিতাটিকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। গল্পগানির বহিঃসংলগ্ন আনন্দ।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকুমার শীল

লেখক লবপ্রতিষ্ঠ জ্যোতিষিন্দ। করুণেরা বিষয়ক তাহার এই গ্রন্থখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহা যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রন্থকারের বহু বিস্তৃত অধ্যয়নের ফল, তেমনি ইহাতে তাহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিও পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বহুদলনের দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শুক্রেখা-বিচারে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়বিধ পদ্ধতিতে সমানভাবে সত্যতা করে। সেইজন্য এই পুস্তকে দুইটি ব্যাখ্যাশব্দই প্রদত্ত হইয়াছে। তবে লেখক নিজের প্রাচ্য পদ্ধতিতেই অধিকার লিখিয়াছেন এমন করেন বলিয়া প্রাচ্য পদ্ধতির ব্যাখ্যা বিস্তৃততরভাবে করিয়াছেন “যজ্ঞো অদ্য” প্রভৃতিতে প্রাচ্য এমন সব বৈখ্য ও চিত্তের বসন প্রাপ্যবন য করুণাবিষয়ক পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। গ্রন্থপাঠ্যনে লেখক গভীরপাঠিক পণ্ডা অনুসরণ করেন নাই। এই পুস্তক এমন কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তে প্রদত্ত হইতে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত। প্রত্যেক কারকত-বিচার, মহাপ্রাণ লক্ষণ, বিবিধ লক্ষণীয় মন্দিরযোগ, রাজস্বযোগ, গণনাযোগ, বিশালযোগ, বেতারযোগ

## একাধারে চারিটি গুণ একত্র সমাবেশ করেছে ক্যালকেমিকোর

## নিম টুথপেস্ট

- ১) নিম দাঁতের সংক্রমণ-নিবারক, বিসাপহারক, জীবাণুনাশক নানা গুণের সঙ্গে দাঁতের ও দাঁটার গায়ে উপকারী কয়েকটি আবর্জনীয় জৈব এবং আর্বিদিক দস্তবিজ্ঞানসম্মত দাঁতের চিকিৎসক উপাদানও কিছু আছে।
- ২) দস্তগদ্য (Caries) ও পাথোরিয়া প্রতিরোধক আমাদের নবাবিস্কৃত একটি বিশেষ রসায়ন এর মধ্যে আছে।
- ৩) প্রেসিপিটেটেড চক, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি বিশুদ্ধ উপাদান অবলম্বনে প্রস্তুত বলে, অল্পসংখ্যক জীবাণু সংদ হয় ও দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে।
- ৪) এর মধ্যে মুগের গুণক নাশক ‘ফ্লোরোফিল’ আছে।

এই টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজার সময় যে পত্র ফেনা হয়, তা দাঁতের থাকে প্রবেশ করে এবং সমস্ত ময়লা ও খালকণা পরিষ্কার করে।

একাধারে এতগুলি গুণ আর কোনও টুথপেস্টে নেই।  
বড়, সাধারণ এবং ছোট টিউবও পাওয়া যায়।



বৃত্তি। লেখকের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, মৌলিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচিত এই পুস্তকপানি সাময়িক শাস্ত্রালোচকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীমলিনীকুমার ভদ্র

**সাধনাগীতি (২য় খণ্ড)**—ড. নরেন্দ্রনাথ বসুচৌধুরী। 'দামোদর অগ্রম' পোঃ রত্নদেবপুর, জেলাঃ চাঁদা ২৩২৩ খ্রীঃাব্দে প্রজ্ঞাপিত। প্রজ্ঞাপাদায়কত্ব প্ৰকাশিত। ১১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬৫ টাকা।

আলৌচ্য গ্রন্থের এই দ্বিতীয় খণ্ড মোট এক শত সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থকারের প্রাণের ভক্তিরসবাহারী অর্ভুজিত হইয়া পরিবেশিত হইয়াছে। গানের মূল ও তাল উল্লিখিত থাকিলে তৎ ২৩২। গানের ভাব এবং চন্দ্রের মাধুর্য প্রাণমণীয়। গ্রন্থের মূল্য আপেক্ষিক ন্যূনত্ব হইয়া গঠিত হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

**অঁথিতে রহ গো—**শ্রীঅমিত্য ভদ্র। বঙ্গদেশ প্রকাশন, ২৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য—৩৫ টাকা।

গল্পসঙ্কলন। নন্দমুদ্রালয়, সহধর্মিণী, আমাদের যুগের স্নান এবং হে ঈশ্বর—এই চারটি গল্প পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। গল্পের বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আলোপাশে এমনি ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটে পড়ে, আমরা চাহিয়া দেখি—পাশ কাটাঁইয়া চলিয়া যাই। কিন্তু, লেখক স্বল্প ঘটনা-প্রবাহের নির্দোষ দর্শক নন। তিনি জন্ম দিয়াই চরিত্রসমূহের চরিত্রবেদনা অনুভব করিয়াছেন এবং তার আনুভূতিক সঠিকভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। পড়ে কটি গল্প স্মরণিত। শেষ করিবার পরেও সেন মনের মতো বেশ থাকিয়া যায়।

**হে অর্জুন—**শ্রীঅমিত্য ভদ্র। ২৮এ বনমালা ষ্ট্রীট, ঢাকা, কলিকাতা। মূল্য—১২।

এই অংশে এবং সমগ্র গল্প এই চরিত্র গল্প পুস্তকখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম গল্পটি 'উৎসবোৎসব'—পারিতোষিকের বৈশাখ এবং সন্দের বর্ণনা প্রদানের জন্য লেখা। তিনি গল্পে অতি সাধারণ দর্শক।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দ্রষ্টব্য শ্রীযুত অনিলকুমার আচাৰ্য্যের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ত্রিপুরার দান' প্রবন্ধের আত্মকাশ ছবি পূর্ণ প্রকাশের সৌজ্ঞেয় প্রাপ্ত।

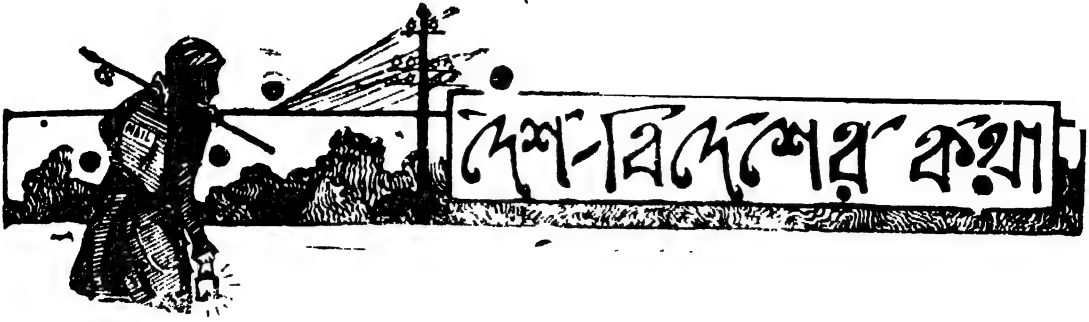
**ফেংছেজের  
মহাভূগবাজ তৈল**

চুল উঠা বন্ধ করে  
মাথা ঠাণ্ডা রাখে



এই মার্কা দেখে কিনুন নকল থেকে সাবধান





শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সম্মান



শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ইউনেস্কোর চেপটি ভাটরেট্টর মিঃ পি কুপালের ঘোষণা শুনেই জানা গিয়াছে যে, ইউনেস্কোর উদ্যোগে সাধারণ শিক্ষা এবং সমাজ-উন্নয়ন ক্ষেত্রে চার ৬ কার্যশিল্পের স্থান সম্পর্কে বংগীয় বংশের

লোকগণকে একটি 'এশীয় আঞ্চলিক সেমিনার' (Asian Regional Seminar) অনুষ্ঠিত হইবে।

মিঃ রূপাল পি-টি-আইয়ের নিকট বলেন যে, মাজাজ আর্ট কলেজের "শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পী এবং 'শিল্পশিক্ষক' ডি. পি. রায় চৌধুরীর পরিচালনামণীনে উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হইবে।

এই সেমিনার সমগ্র জাপানে বিশেষ কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সেমিনারের শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষার্থী সাধারণ লোকেরা আশা করেন যে, এই অনুষ্ঠান হ.জাংগকে প্রশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষকের সঙ্গে পরিচিতি হইবার সুযোগ দান করিবে। এই উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক শিল্প-শিল্প-প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯৮০-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় সেক্রেটারিয়েট অভিযান-কারী সাক ভন শ্রীদেবী শ্রীদেবীরে বিচার গবর্ণমেন্ট পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে একটি শতীর্দ-স্মরণী ( Martyrs' Memorial) প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধ করিয়াছেন। উহার উচ্চতা হইবে সাড়ে সাত ফুট, নিম্নাংশের পড়িবে দুই লক্ষ টকা এবং উহা শেষ হইতে দুই বাসন্ত লাগিবে। উহার পরিবর্তন ও নিম্নাংশের ভগ্না বিচার রাজ-সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠিত হইয়া উক্ত শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী পাটনায় গেলে পর "পাটনা শিল্পকলা পরিষদের" উদ্যোগে সিংহ লাইব্রেরী হলে ১০টি চিত্রকারী তাকাকে সংবর্দ্ধিত করা হয়।

জাতীয় শিল্পীদের সচিব আলোচনা-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলেন যে, "আর্ট ফর আউস সেক" এই নীতিতে তাঁর অল্পই আস্থা আছে। শিল্পী যদি শুধু নিজের শিল্পের রূপায়ণ লইয়া অতিমাত্রায় ব্যাপৃত থাকেন তাহা হইলে সমাজের সেবা করিবার পক্ষে তিনি অন্তর্পন্থক হইয়া পড়েন।



# অমৃততাঞ্জন

সর্বপ্রকার বেদনায় 'আণবিক বোম্বার' ন্যায় কার্যকরী!

## দাদের মলম

চর্ম রোগে 'পরম্পর শক্তির' ন্যায় কার্যকরী!

অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকতা ৭

স্থাপিত ১৮৯৩





১৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইব্রেরীতে এক আলোচনা-সভার আয়োজন হয়। বিচারপতি এস. কে. দাস আই-সি-এস-এর অল্পরোধে পাতনামা কথাসাহিত্যিক জীবিতভূষণ মুগোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদের বহুগুণী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর দেবীপ্রসাদ শিল্পকলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

‘ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরে’ও দেবীপ্রসাদকে সম্বন্ধিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাঙ্গণ কর্তৃক ‘কথাকলি’ এবং মণি-পুরী নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

### কবিশেখর শ্রীকার্লদাস রায়ের সম্মান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এন্ট বাংলায় কংগ্রেসের স্বর্ণপদক কবিশেখর শ্রীকার্লদাস রায়কে পদান করিয়াছেন। প্রবীণ সাহিত্য-সেবীর এই সম্মানলাভে সাহিত্যভ্রমণী মাওদেই আনন্দিত হইবেন।

### অমরনাথ রায়

শ্রীশ্রী সুনামগঞ্জে পাতনামা কবিশেখর ও প্রতাপচন্দ্র অমরনাথ রায় গত ২৪ মাঘ পঁচাত্তর বাঙ্গালী বৎসরে পরলোক-গমন করিয়াছেন। অমরনাথ চেনা জেলার মণিকগড় মহকুমার অন্তর্গত জীবাতীর প্রসিদ্ধ লেখক বাঙ্গালী ভাষায় লিখিত। ইংরেজ

প্রতিভামহতরগোবিন্দ রায় নানা স্থানে ভ্রমণসঙ্গী সংগ্রহ করিয়া প্রচুর বৈভব ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। তবে লক্ষ্মীর কৃপা তাঁহাকে সম্বন্ধীয় আরাধনায় পরাভূত করে নাই। তিনি নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং নিজে গ্রন্থরচনার তত্ত্বী হইয়া ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় হরগোবিন্দেব বিশাল গ্রন্থ পঞ্চম বেদসার নির্ণয়ের বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। হরগোবিন্দেব স্বযোগ্য বাঙ্গালীর অমরনাথ প্রপিতামহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। প্রথম জীবনে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী হিসাবে নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি আসাম বাবস্থাপক সভার সভ্য, সুনামগঞ্জ মিউনিসিপালিটি ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ছিলেন। বাণিজ্য, সততা ও তীক্ষ্ণ দীক্ষার জন্য তিনি মহাক্ষমতের ও পরিচিত সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও ঐশ্বর্য্য পাতি ছিলেন। রাজনীতি হইতে অবসর গ্ৰহণ করিয়া তিনি বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা



অমরনাথ রায়

## কাডল

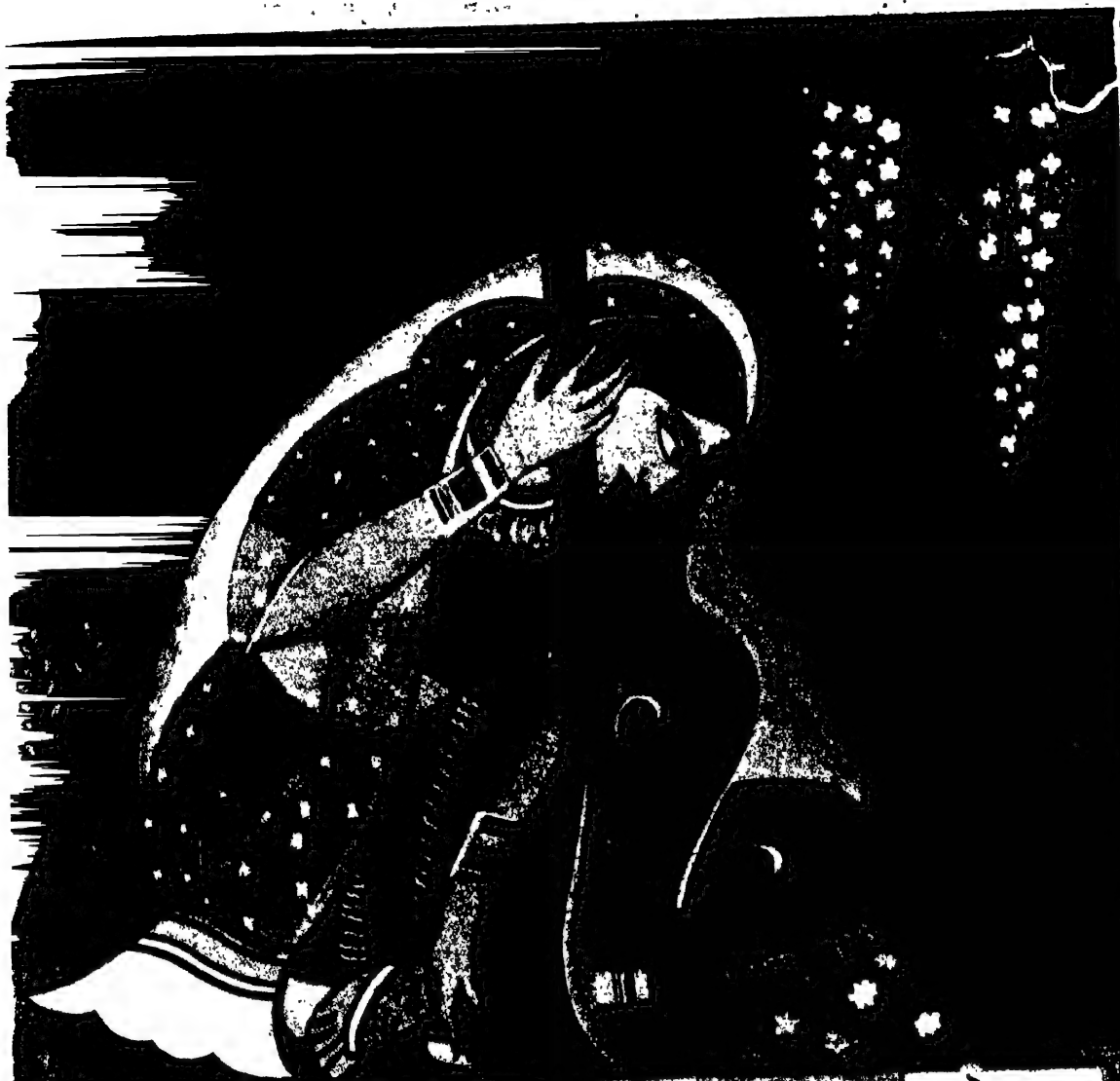
### —নেতাজীর অভিজ্ঞতা—

“এমন ক্যানিং স্ট্রীটে অবস্থিত কেমিক্যাল এসোসিয়েশন-এর তৈরী “কাডল কালি” আমি ব্যবহার করেছি। বড়ই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই কালি কাউন্টেন পেনের সম্পূর্ণ উপযোগী। যতদিন ইহা ব্যবহার করেছি, কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি। “কাডল কালির” প্রস্তুত-কারকদের তাঁদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। আশা করি, ভারতবর্ষের জনগণ এই কালি ব্যবহার করে এই জাতীয় শিল্পটির শ্রীবর্ধন করবেন।”

বঙ্গভাবাদ :—শ্রীঃ সুভাষচন্দ্র বসু

Sukha Chandra Bose

অর্জন করেন। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁহার লেখা অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। একাধিক প্রবন্ধ পণ্ডিতসম্প্রদায়ের সম্মানস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ফলে তদানীন্তন ভারত-সরকার এক দিকে যেমন তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন—অন্য দিকে তেমনি ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশন নামক পণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য নিযুক্ত করেন।



স্বামিনন্দন চক্রবর্তীর প্রসিদ্ধি

চৈত্র

# প্রবাসী

মীরাসো

# Chowringhee

A WEEKLY NEWSPAPER DEFENDING CIVILIZATION AND PROGRESS

12 Neraji Subhas Road (2nd floor), Calcutta-1

Civilization means communities living in peace and harmony with no interference with the individuals forming the communities in their free expression of personal ideas and developing along lines freely chosen by them. Civilized communities work freely for better living conditions and are not hampered in their activities so long as these do not hamper others to follow their own vocations. Civilized men are free and their lives are full and devoid of shackles. True democracy is the political expression of the morality inherent in civilization.

Progress is advancement towards greater benefits in the way of the material and cultural equipment of life. All movements towards a less complete life are contrary to progress. Better and more food, clothing, housing, education, medical aid, recreation and the intellectual and cultural supports of human life constitute progress. Those useless fads and fancies which are often paraded as ideals may have no connection whatsoever with true progress.

Economy of a civilized community means that proper and effective setting of a complicated pattern of production, distribution and consumption, which enables all members of the community to live freely, honourably and fully.

This weekly is no apparatus for mud-slinging or idle and malicious criticism. Whatever is published in it will have a purpose which is in keeping with Freedom, Honour and Progress. We may have to open a few malignant tumours here and there in what may appear to be a surgical manner, but that will be only for the good of the body politic.

Politics, Economics, Science, Art, the Trades and Industries, Cultural Institutions and even the Bazar will have a place in these pages.

*Price : Annas Six*

TO BE PUBLISHED EVERY MONDAY

WATCH FOR THE DATE !

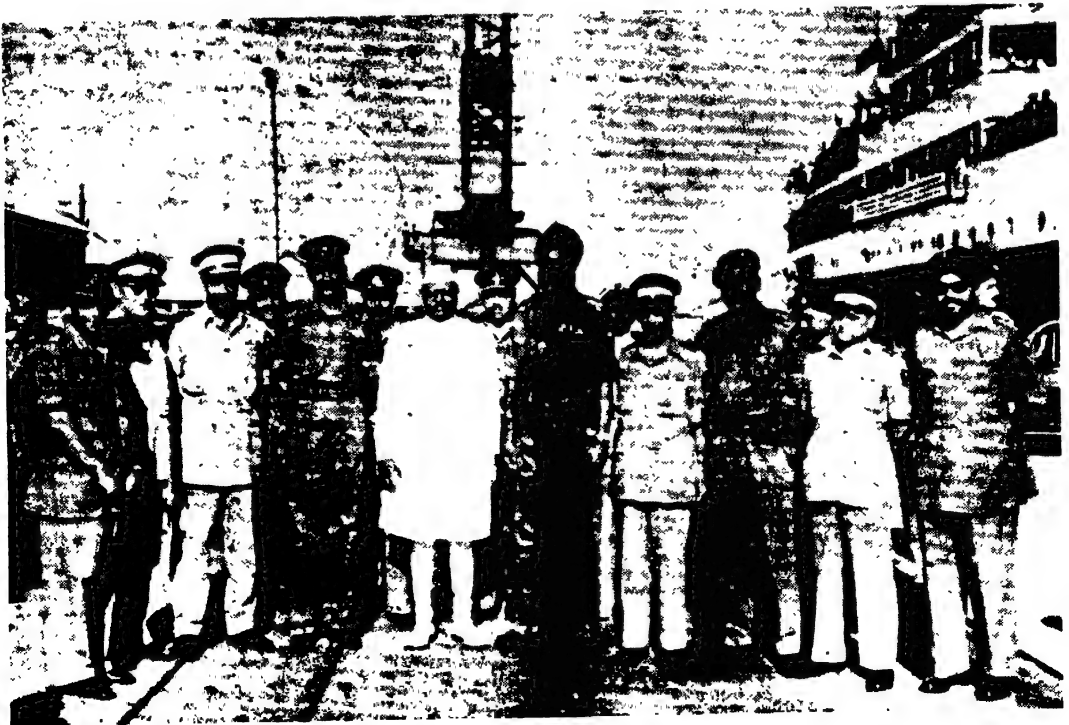


পবাসী পেম, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত পদ্মেশ্বর প্রসাদ



দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কানাডার প্রধান মন্ত্রী লুই স্ট্রোকান সেন্ট লাবেন্টকে  
‘ডক্টর অব লজ’ ডিগ্রি প্রদান। উৎসব-ক্ষেত্রে গমনশীল পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, কানাডার  
প্রধান মন্ত্রী এবং ডক্টর সবপল্লী রাণাকৃষ্ণনকে দেখা যাইতেছে



মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ সহ ভারতীয় ‘কাষ্টাডিয়ান কোর্স’র প্রথম সৈন্যদল

# অবাস্য

"সত্য শিবম্ সুন্দরম্"  
নারায়ণা বলহীনেন লভ্যঃ"

১৩শ ভাগ  
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬০

৬৬ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ .

### অপরূপ বা কিং ভবিষ্যতি

এই বৎসর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগের (Administration) পরীক্ষার বাংলা দেশের পরীক্ষার্থী একজনমত সফলকাম হয় মাই। বাংলার বাহিরের দুই জন বাঙালী—তাহার মধ্যে একজন মহিলা—সাকল্যাভ্যস্ত করিয়াছেন, একজন দিল্লী হইতে, অপরজন এলাহাবাদ হইতে। বাংলার ছাত্রদের এই শোচনীয় বিফলতার ইঙ্গিত কি তাহা আমাদের বুঝা প্রয়োজন।

লক্ষ্মীলাভের যে তিনটি পথ প্রাচীন প্রবাদে উক্ত আছে তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহা অর্থাৎ বাণিজ্য, তাহার দ্বার বাঙালীর সমুখে বন্ধ। ইতার মূলে আছে বাঙালীর বিলাসপ্রবণতা, অসহিষ্ণুতা এবং অকৃতদর্শিতা। দীর্ঘকালের প্রয়াস ও কুজসাধন ভিন্ন বাণিজ্যে সফলকাম হওয়া যায় না। ফাঁকির পথে অর্থাগম ফলিত হয়, আবার ক্ষণকালেই চলিয়া যায়। সুতরাং বাঙালী সে কষ্টসাধ্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ভিন্ন প্রদেশীয় ও ভিন্ন জাতীর ব্যবসায়িগণ তাহা অধিকার করিয়াছেন। সেখানে এখন আমাদেরই দোষে আমাদের সম্ভাবনের প্রবেশ নিষেধ! নিজের সাধনা দ্বিবার ভ্রম আরম্ভ এই দুঃস্থের নানা কারণ দর্শাই, কিন্তু সকল কারণের মূল ঐ এক, শ্রমকাতরতা এবং ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি।

"তদর্থে" লক্ষ্মীলাভের পথ কুবি—বাঙালী অভিজ্ঞানোচিত বলিয়া শশিক্ষিত, দরিদ্র ও গুণভারস্বিত চারীরা শুধু চাপাইয়াছে। চারীর গুণান যদি ঐ অশিক্ষিত সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত হয়, তবে সেও ঐ পথ হইতে বিরূপ হইয়া পড়ে। কলে বাঙালী এতদিন অল্পের লাভান হইয়া বিদেশীয় দ্বারে ঘুরিয়াছে। এখনও সেই পথে বাঙালীর সম্ভাবনের প্রবেশের অধিকার আছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে দারুণ কঠোর পরিচর্যের প্রয়োজন এবং ফাঁকির অবকাশ নাই। ইতরাং সেখানেও বাঙালী অগ্রসর হইতে চাহে না।

বাকী ছিল চাকুরীর পথ, বুদ্ধিকীর পথ। প্রবাদে বলে, রাজকার্যে লক্ষ্মীলাভের পথ বাণিজ্যের তুলনার এক-চতুর্থাংশ মাত্র মশস্ত। কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিমান, ফাঁকিতে এবং "উপরি"তে চোর প্রসার এককালে বর্ধিত করিয়াছিল এবং সেই কারণে প্রায় এক শতাব্দীকাল ঐ পথেই বাঙালী লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

ঐ বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙালীর অধিকার এবং বাঙালীর প্রভাব দেশবাসী হয় এবং কালে ঐ পথে সজ্জন ও মহাজনগণ শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার করার বাঙালী বশেষও অধিকারী হয়। এইভাবে যে বাঙালী ধন, প্রতিপত্তি ও বশের অধিকারী হয় সে শুধু বুদ্ধিমান ছিল না, সে ছিল সুশিক্ষিত ও সংযমী, বিনয়-গুণপ্রাপ্ত (disciplined)।

আজ সংস্বের অভাবে, সুশিক্ষার অভাবে, উদ্যমভাবে জীবন-বাহ্যে আরম্ভ করার কলে, বাঙালী সেপথেও বার্ষিক্য হইতে চলিয়াছে। বাকী বহিল ভিকার পথ।

কোষ কাহার? দৈনিক সংবাদপত্র পড়িলে বা ত্র্যাকাকলসুত জীববিশেষের মত নেতৃবর্গের চটল ভাষণ শুনিতে লোকে বুদ্ধিবে সকল দোষের আকর শাসনতন্ত্রের অধিকারী "সরকার"।

কিন্তু এই অবনতির চূড়ান্ত পরিণাম যে দুর্দশা, তাহার কল ভোগ করিবে কে? সে কথা কেহই বলে না বা ভাবে না, কেননা সে বিচার করিতে গেলে অপ্রিয় ও কঠোর সত্য প্রকাশ পায় এবং তাহাতে "সারকুলেশন" দেওয়া অসম্ভব হইতে পারেন।

কল ভোগ করিবে আমাদের ভবিষ্যতের অধিকারী ঐ অপরিণত-মস্তিষ্ক, অবাধ, দুর্ভিক্ষিত সম্ভাবনা। আজ বাহার উদ্যম পতিতে রাজপথে লক্ষ দিয়া "আমাদের দাবী মানতে হবে" বলিয়া চলিতেছে, কল্য তাহাদেরই ভিকার বুলি শুধু লইয়া ভিখারীর স্থানত জীবন বাপন করিতে হইবে এবং আরও দুঃখের কথা, ঐ অল্পসংখ্যক চাকরাদিগের দোষে, এখনও যে শত সহস্র সুবৃদ্ধি বালক-বালিকা সংপথে চলিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদেরও ভবিষ্যতের পথে কাঁটা পড়িবে।

ইহা এখন সর্বজনবিস্তৃত যে বাংলার সম্ভাবনগণের এই শনিগ্রস্ত বিপরীত বুদ্ধির কলে দেশে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার স্রোত বহিতেছে তাহাতে ভ্রম হইয়া অনেক সুবৃহৎ কাক-কারবার ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান অল্প বাইবার চেষ্টা করিতেছে। সম্ভ্রতি একটি অতি বৃহৎ বস্ত্রনির্মাণ (Machine Tool) প্রতিষ্ঠান বাংলার জমি পর্যন্ত লইয়া পথে বর্তমান অবস্থার বিচার করিয়া দক্ষিণদেশে চলিয়া গিয়াছে। অল্প একটি সুবৃহৎ বল-বিয়ারিং নির্মাণ প্রতিষ্ঠানও

স্থানান্তরে গিয়াছে। এমনকি জাতীয় সরকারের নূতন বিরাট লোহ ইন্সটিটিউট কারখানা যে শত সুবিধা সম্বন্ধে বাংলা ছাড়িয়া উড়িয়ায় গেল, তাহারও একটি প্রধান কারণ বাঙালী সম্ভানের এই বুদ্ধিহীন ও অসংযত বিশ্বাসপ্রবণতা। উহা ভিন্ন একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক কারখানা ও কয়েকটি সাধারণের উপভোগ্য বস্তু সম্পর্কিত শিল্পায়তন বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মসীপুরে চলিয়া বাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যবস্তুর বস্তুসম্ভানের জীবিকানির্বাহে সহায়ক হইত। সে পথ রুদ্ধ হইল কাচার দোষে এবং দোষ বাহারই হউক ফলভোগ করিবে কে?

তবে দোষ কাচার এ প্রশ্নেরও উত্তর প্রয়োজন। দোষ সর্বত্রই আমাদের—অর্থাৎ পিতামাতার। পিতামাতার বুদ্ধি বিবেচনার অভাব না হইলে সম্ভান এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না। তৎপরে দোষ শিক্ষকের। শিক্ষক কাকিবাঙ্গ ও অযোগ্য না হইলে ছাত্র এরূপ অবাধ্য হয় না। তৎপরে দোষ সরকারের। সকল দিকের অনাচার অত্যাচার ও দুর্নীতির সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহস এবং যোগ্যতা বাহাদের নাই শাসনতন্ত্র তাহাদের অধিকারে থাকা উচিত নয়, এবং দোষের বিশেষ অংশ বাংলার সংবাদপত্রের। স্বার্থপরতা ও কাপুক্ষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া দেশের লোককে পথনির্দেশনে দায়িত্ব তাহাদের।

### স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাকেন্দ্রে গুপ্তমীর নিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ঐশ্বর্যী-মোহন মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ২২ মার্চ উত্তর ও মধ্য কলিকাতার কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে যে কদর্য ঘটনা ঘটে তাহার কতিপয় বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, এদিন বেলা ২টার পর এক দল কুকু ছাত্র চীংপুয়ের দিগ্ মহেশ্বরী বিদ্যালয় কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া আসে। তাহাদের মধ্যে অনেক প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল। ক্রমে অস্ত্রাস্ত্র ছাত্র এবং বহিরাগতদের সম্মিশ্রণে তাহাদের দল ভারী হইতে থাকে। তাহারা উত্তর এবং মধ্য কলিকাতার তিন মাইল ব্যাপী স্থানে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ হামলা চালায়।

ঐশ্বর্যমুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহা বৃথা শব্দ যে শহরে ১৪৪ ঘণ্টা জারী থাকা সম্বন্ধে পুলিশ প্রায় চার শতাধিক লোকের এই জনতাকে কেন বাধা দেয় নাই। তাহারা সজ্জেই লালবাকার-স্থিত সদয় দপ্তরে সংবাদ পাঠাইতে পারিত বাহাতে এই উন্নত শোভাব্যাজকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায়। তাহার পরেই যে ব্যাপারের গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন তাহা হইতেছে ছাত্র-দিগের প্রতি আপত্তিজনক ব্যবহার। ছাত্রদের জন্ত নির্দিষ্ট বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের হলে গুপ্তমী প্রবেশ কবে, প্রস্ন এবং উত্তরের খাতা ছিনাইয়া লয়। কোন কোন কেন্দ্রে বালিকাদিগের শরীরে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তাহাদের হাত মোচড়াইয়া কাউন্টেন পেন প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবং অস্ত্রাস্ত্র শিক্ষয়িত্রীগণ বাধা দিতে বাইলে তাহারাও প্রহৃত হন।

কয়েকটি কেন্দ্রে ঐ সময় প্রকৃতপক্ষে ত্রাসের বাজঘ চলিতে থাকে এবং কয়েকটি বালিকা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আশ্চর্য্য বিষয় যে, সুবিখ্যাত জননেতা অথবা প্রতিষ্ঠান কেহই এখনও পর্যন্ত এই গুপ্তমীর নিন্দা করিতে অগ্রসর হন নাই। স্কুলগুলির সম্পত্তির যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা নিশ্চয়োক্তন। যে সকল শিক্ষক এবং ছাত্র সাহসের সহিত এই দাঙ্গাকারীদের বাধা দিয়াছেন তাহাদের প্রকৃত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। দাঙ্গাকারীদের কয়েকজনের নিকট ছুরিকাও ছিল।

ঐশ্বর্যমুখোপাধ্যায় বলিতেছেন, “এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করি যে বোর্ড সিলেবাসের বহির্ভূত এবং অত্যধিক কঠিন প্রশ্নপত্র রচনা করার জন্যই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ইতিহাসের প্রশ্নপত্র পাওয়া ছেলেরা বাহির হইয়া আসে। এই প্রশ্নপত্রের ধরণ অসঙ্গত বংসরের প্রশ্নপত্রের ধরণ অপেক্ষা বহুলাংশে পৃথক। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরের জন্য ইতিহাসের পাঠ্য বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা স্বপ্ন করাইয়া দিতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রচলিত নিয়ম আছে যে কোন বংসরের প্রশ্নপত্রের ধরণ পূর্ববর্তী বংসরের প্রশ্নপত্রের ধরণ অপেক্ষা বহুলাংশে পৃথক হইতে পারিবে না। কোন শিক্ষককে প্রশ্নকর্তা অথবা মডারেটর নিযুক্ত না করার জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে। আমরা আশা করি, এষ্ট ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না। আমরা আরও মনে করি যে, ছাত্রদের স্বার্থে নীচুই বোর্ডের উচিত বখানীয়া পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা।” (“হিন্দুস্থান ট্র্যাগার্ড,” ১৩ই মার্চ, ১৯৫৪)

মুখোপাধ্যায় মতামতের বিরুদ্ধি সমরোপযোগী হইয়াছে। পরি-  
ক্ষিত উদ্ভবের কারণ বাহা তিনি দর্শাইয়াছেন তাহা বিচারযোগ্য।

গুপ্ত কলিকাতার একাংশে দুই তিনটি কেন্দ্রের কয়েক শত ছাত্র এই প্রশ্নগুলিতে বিচলিত হয়। বাকী ৫৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী উভয় উত্তর দিতেছিল। এরূপ কেন্দ্রে ঐ কারণ সম্পূর্ণ সমীচীন মনে হয় না।

সংবাদপত্রে এই ঘটনার প্রথম সংবাদ এইরূপে প্রকাশিত হয় :

“মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত ১৯৫৪ সনের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইতিহাস প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন, দুর্বোধ্য এবং কয়েকটি প্রশ্ন পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত, এই কারণ দেখাইয়া মঙ্গল-বার এক ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার ফলে কলিকাতা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে ইতিহাস পরীক্ষা অস্থগিত হইতে পারে নাই। এই হাল্লামার ফলে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কথা বিবেচনা করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ আজ (বুধবার) ১০ই মার্চ হইতে পুনরায় পর্বোক্ত সমস্ত কেন্দ্রে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়াছেন।

পরীক্ষা চলিতে থাকার কালে পরীক্ষা স্থগিত রাখার নির্দেশ বাংলাদেশে পরীক্ষা গ্রহণের ইতিহাসে ইহাই প্রথম।

উত্তর ও মধ্য কলিকাতার বহু কেন্দ্রে ক্রুদ্ধ বিক্ষোভকারীর দল পরীক্ষার গার্ডদের আক্রমণ করে; যে কয়েকগনি উদ্ভবের খাতা



পরীক্ষার্থীরা পেশ করিয়াছিল, সেগুলি তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়; পরীক্ষার্থীদের অনেককে জোর করিয়া পরীক্ষা চল হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনা হয়; পরীক্ষা হলের দরজা-জানালা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই হাঙ্গামাকালে কয়েকজন পরীক্ষার্থীনি জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।

কয়েকটি উপজ্ঞত কেন্দ্র হইতে পুলিশকে হাঙ্গামার কথা জানান হইলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় গণের জন বিক্ষোভকারীকে শ্রেণ্ডার করে বলিয়া আনা গিয়াছে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হইতে হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে : আপার চিংপুর রোডের দিহু মহেশ্বরী পাঠশালা, সায়দা-চরণ এরিয়ান ইনষ্টিটিউট, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, আদি মহাকালী পাঠশালা, শ্রামবাজার এ-ভি-স্কুল, বেধুন কলেজিয়েট স্কুল, টাউন স্কুল, শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়, স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল, কমলা এইচ-ই স্কুল, আধ্যাত্ম মহাবিদ্যালয়, মেট্রোপোলিটান মেন, বালিকা শিক্ষাসদন, ভারতী বিদ্যালয়, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল, পার্চিচরণ গার্লস এইচ-ই স্কুল, সদ্বস্তী বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি।

ইহা ব্রহ্ম যে আক্রান্ত : ৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ২টিতে বালিকারা পরীক্ষা দিতেছিল। ইহাতে হাঙ্গামাকারীদিগের মনোবৃত্তির পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের সেক্রেটারী মঙ্গলবার দায়ে নিয়ন্ত্রক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :

“কয়েকজন পরীক্ষার্থী সমেত একদল লোক উত্তর কলিকাতায় পরীক্ষা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটির পর একটিতে জোর করিয়া ঢুকিয়া গাওঁ, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও পরীক্ষার্থীদের মারধর করিয়াছে। এই মারধর হইতে পরীক্ষার্থীনি দল, প্রধানা শিক্ষক(ত্রী) এবং অধ্যক্ষ শিক্ষক(ত্রী)রাও বেহাই পান নাই। উত্তরের পাতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও পরীক্ষার্থীকে ছোয়া লইয়া ভীতি প্রদর্শনও করা হইয়াছে। এই সমস্ত কেন্দ্রে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অধিকাংশ কেন্দ্রেই ডেঙ্ক, বেঞ্চ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। অতএব আর পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নহে এবং বুধবার হইতে কোনও কেন্দ্রেই আর পরীক্ষা হইবে না। ইংরেজী ও ইতিহাস সমেত সমস্ত বিষয়েরই পরীক্ষা পবে পুনর্ব্যার প্রচণ্ড করা হইবে এবং তাহার দিনও পরে ঘোষণা করা হইবে।”

### কলিকাতায় অরাজক

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ২১শে ফাল্গুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত জীবাঙ্কশেখর বসুর প্রবন্ধ বিশেষ প্রাধান্যবোধ্য। আমরা তাহার এক অংশ নীচে দিলাম।

“হুজুমে যেতে বা দেশজোহীর প্ররোচনার গুণামি করা আর দেশবন্ধার জন্ত বুদ্ধ করা এক নয়। যত্নভূমি স্বাক্ষর জন্ত গুণ সাহস নয়, শিক্ষাও আবশ্যক। দেশবন্ধার জন্ত যে সৈন্তবাহিনী গঠিত হচ্ছে তাতে যদি, দলে দলে বাঙালীর ছেলে সাধারণে বোপ দেয়,

তবেই তাদের এবং তাদের পিতামাতার সাহস আর দেশপ্রেম প্রমাণিত হবে। এককালে ইংরেজ আমাদের রক্ষা করত এখন অবাঙালী ভারতবাসী রক্ষা করবে—একথা ভাবতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

“দেশের উপর একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের ঝাঁল ছড়িয়ে আছে, প্রজা বা শাসক কেউ তা থেকে মুক্ত নয়। শিক্ষকরা ছাত্রদের ভয় করেন, পরীক্ষার সময় বারা নকল করে তাদের বাধা দিলে প্রাণ-হানির সম্ভাবনা আছে। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করতে সাহস করেন না, পাছে সে অসুস্থতা করে অথবা তার সঙ্গীরা সদলে এসে শোধ নেয়। ব্রিটিশ আমলে পুলিশ বেপরোয়া ছিল, তার এই ভরসা ছিল যে প্রবলপ্রতাপ মনিব পিছনে আছেন। কিন্তু এখন পুলিশ বিধায় পড়েছে, কোন ক্ষেত্রে কতটা বলপ্রয়োগ চলবে তা তার বর্তমান মনিবরা স্থির করতে পারেন না। চোব ডাকাত প্রভৃতি মামুলী অপরাধীদের বেলায় ঝড়াত নেই, কিন্তু আজকাল যে সব নুতন নুতন বেআইনী ব্যাপার হচ্ছে তার বেলায় নির্ভয়ে কর্তব্য পালন অসম্ভব। লোকে দলে দলে বিনা অধিকারে জমি দখল করে, আপিস আর কারখানার কর্মীরা মনিবদের আটকে রাখে, ধর্মঘটীরা রাজপথে লোকের যাতায়াত বাধা দেয়, স্কুল-কলেজ বা আপিস প্রভৃতি কক্ষস্থান অবরোধ করে, গুণ্ডারা ট্রাম-বাস পোড়ায়। এ সব ক্ষেত্রে পুলিশ উল্লর সন্দেশে পড়ে। নিজের থাকলে তাকে অকস্মণ্য বলা হবে, কর্তব্য পালন করলে নির্ভর অত্যাচারী বলা হবে। অধিকাংশ গবর্নর কাগজ অপেক্ষাতে কিছু লিখতে সাহস করে না, পাছে কোনও দল চটে। তারা দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে, পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়। দশ-বারো বছরের ছেলে বগন বলে, নেমে বান মশাইরা, এ গাড়ী পোড়ান হবে, তখন যাত্রীরা সুবোধ শিশুও মতন আজ্ঞা পালন করে। নাগরিক কতব্যবুদ্ধি এবং অজ্ঞান কথ্যে বাধা দেবার বিন্দুমাত্র সাহস কারও নেই। ঝগাটে দরকার কি বাপু—এই হচ্ছে জনসাধারণের নীতি। পাশ্চাত্য পানদোষ আর ইন্দ্রিয়দোষের তুলনার এই ক্রীকতা আর কল্যাণবিমুগতা অনেক বড় অপরাধ।

“লোকে শাস্তি চায়, অধিকাংশ লোকের এ বুদ্ধিও আছে যে ব্রহ্মদমনের জন্ত বলপ্রয়োগ আবশ্যক এবং মাঝে মাঝে তা মাজা ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার ফলে নির্দোষেরও অপযাত হতে পারে, যেমন যুদ্ধকালে অনেক অসোচ্ছন্দ্য মারা যায়। আমাদের শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণও তা বোঝেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্য পালনে ভয় পান। বোধ হয় ভবিষ্যৎ নির্বাচনের কথা ভেবেই তাঁরা মতি স্থির করতে পারেন না। জনসাধারণের যদি ধারণা হয় যে কংগ্রেসী সরকার অত্যাচারী, তবে তাঁদের ভোট দেবে কে? যে ছোকরার দল আজ হই হই করে উপদ্রব করছে, নির্বাচনের সময় তাদেরই তো সাহায্য নিতে হবে, তারাই তো ‘ভোট দব অধিক’ বলে চেঁচাবে।

অতএব তাদের চটানো ঠিক নহে। পবনের কাগজকেও উপেক্ষা করা চলবে না, তারা জনসাধারণকে পেপিরে দিতে পারে। শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণ যদি নিজ দলের লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করে নির্ভয়ে কুর্ভা পালন করেন, তবেই বর্তমান অবস্থার প্রতিকার হবে। জনকতক নেতা না হয় নির্কাচনে পরাজিত হবেন, কিন্তু জনসাধারণ যদি সন্ত্রাসনের কল উপলব্ধি করে, তবে ভবিষ্যতে তারা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্কাচনে ভুল করবে না।”

এই সকল “গণবিক্ষোভ” নগরীয় শাস্তিপ্রস্থলকে কিরূপ অবস্থায় আনিয়াছে তাহা ২৮শে ফাল্গুনের যুগান্তের প্রকাশিত নিম্নস্থ সংবাদে বুঝা যায় :

“উত্তর এবং মধ্য কলিকাতার কয়েকটি এলাকার গুপ্তা ও দুই প্রকৃতির লোকজনের উৎপাতে স্থানীয় জনসাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি জোড়াসাঁকো, চিংপুর, শ্রামপুকুর প্রভৃতি থানা এলাকার হুর্বৃত্তদের সশস্ত্র আক্রমণ, বোমা-সোডার বোতল নিক্ষেপ, রাস্তার উপর মাতলামি, জুয়াখেলা, মহিলা-দের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিত, চুরি ও রাহাজানির ঘটনা সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত দুষ্কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হুর্বৃত্তদের দমনে এবং শাস্তিপ্রিয় নাগরিকদের হুর্বৃত্তদের কবল হইতে রক্ষার ব্যাপারে কলিকাতা পুলিশের নিক্রিয়তা সম্পর্কেও স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে জোড়াসাঁকো থানার অন্তর্গত বলরাম দে খ্রীটে হুর্বৃত্তদল কর্তৃক সশস্ত্র আক্রমণের তিনটি ঘটনা ঘটে। কেরান্দারী মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রামপুকুর থানার কাঁটাপুকুর লেনে হুর্বৃত্ত দল কর্তৃক আক্রমণ ও ছুরিকাঘাতে জনৈক বুকের মৃত্যু ঘটে। ইহা ছাড়া, উত্তর ও মধ্য কলিকাতার বিভিন্নস্থানে বিশেষতঃ বলরাম দে খ্রীটে, শেঁবাগান, রমেশ দত্ত খ্রীট, ঘোষবাগান, গ্রে খ্রীট, কাবলা চাঁক লেন প্রভৃতি অঞ্চলে বোমানিক্ষেপ, সোডার বোতল ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার, রাহাজানি, জুহারী ও মাতালদের হৈ-হুলা ও মারামারি প্রভৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

জোড়াসাঁকো থানার অন্তর্গত বলরাম দে খ্রীটের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের নিকট এক আবেদনে কঠোরভাবে গুপ্তা-বহুমায়েস ধর্মীর লোকের উৎপাত বন্ধে তত্ত্ব আবেদন জানান হইয়াছে। এই আবেদনপত্রে বলা হইয়াছে : গত এক বৎসর বাবৎ ‘রামবাগানের’ কুখ্যাত হুর্বৃত্ত দল বলরাম দে খ্রীটে আড্ডা পাড়িয়াছে। এই সমস্ত হুর্বৃত্ত লোকজন বিভিন্ন ধরণের উচ্ছৃঙ্খল ঘটনা বহা মূল্যবান জিনিষ কাড়িয়া লওয়া, বোমা নিক্ষেপ, লুণ্ঠপাট, বলরাম দে খ্রীটের বিভিন্ন স্থানে জুয়াখেলা এবং মহিলাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া চলিয়াছে। এই লোকজন সর্বদা মাঝামাঝি অস্ত্রশস্ত্রের থাকায় বাহবায চেষ্টা করিয়াও হাতেনাতে হুর্বৃত্তদের ধরা সম্ভব হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকজন আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আহত হইয়াছেন।

এই সমস্ত ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় থানার বাহবায অভিযোগ

পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু অভিযোগ পেশের পর পুলিশের লোক-জনের কয়েকবার আসা-যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অব-লম্বিত হয় নাই। মার্চ মাসে মাত্র দুই দিনের মধ্যে এই এলাকার তিনটি সশস্ত্র আক্রমণ ঘটে। গত এই মার্চ তারিখে হুপুয় রাত্রে এবং ৬ই ও ৭ই মার্চ প্রকাশ্য দিবালোকে মোট তিনটি সশস্ত্র আক্রমণ হয়।

গত এই মার্চ গভীর রাত্রে রামবাগানের হুর্বৃত্তগণ ১৪৪ থানা আদেশ থাকা সত্ত্বেও বলরাম দে খ্রীট দিয়া কি করিয়া তাহা শোভা-যাত্রা বাহির করা সম্ভব হইল তাহাতে আবেদনে বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে। এদিন শোভাযাত্রীরা বোমা নিক্ষেপ করিয়া নিরপরাধ বালকদের আহত করে।

বর্তমানে দিনে কি রাত্রে গুপ্তা মহিলা ও শিশুদের পক্ষেই নহে, সমস্ত নরনারীর পক্ষেই ঘরের বাহিরে আসা প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে।

### বহরমপুরে সরস্বতীপূজা

১৮ই ফাল্গুন সংখ্যা “মুর্শিদাবাদ সমাচার” পত্রিকায় উহার বিশেষ প্রতিনিধি এই বৎসর বহরমপুর শহরে সরস্বতী পূজা সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির তাৎপর্য অল্পবিস্তর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেই প্রযোজ্য।

সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট দিক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বাণীবন্দনার প্রধান পূজারী বাংলার তরুণ-সম্প্রদায়। বহরমপুর শহরেও অজ্ঞাত স্থানের জায় এ বৎসব বিরাট ধুমধামের সহিত বাণী-অর্চনা হয়। শহরের সর্বত্রই পূজার বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছে এবং পূজার সংখ্যাও অজ্ঞাত বৎসরের তুলনার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও যে শুভবুদ্ধির প্রেরণায় পূর্বে এই পূজা হইত তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে সে কথা বলা চলে না। “উপরন্তু আমরা এই কথা বলিতে কখনই ইতস্ততঃ করিব না যে, অধুনা সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল আনন্দমুগ্ধান হইয়া থাকে তাহা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদৌ পরিপোষক নহে, পরন্তু তাহা কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ভিলে ভিলে হত্যা করিতেছে। ইহা অনাচার ও কল্যাণের নামান্তর মাত্র।”

এই অভিযোগের কারণ বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধকার লিখিতেছেন, পূজাতে অজ্ঞাত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর জাঁকজমকের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে সুরুচির বধেই অভাব ছিল। লেখকের কথায় “হুগুণের বিষয় অধিকাংশ পূজাপ্রাঙ্গণেই বা প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে স্রষ্ট, স্রষ্টব্য ও শালীনতাপূর্ণ অমুষ্ঠানের প্রমাণ, না পাইরা আমরা মর্মান্বিত হইলাম। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতীক বাগদেবীর আরাধনার পূজারী ও উদ্যোক্তাদের এই শোচনীয় বার্ষিক্য আমরা অত্যন্ত হতাশ হইরাছি। নির্দল আনন্দের নামে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নামে তাঁহারা যে সকল অমুষ্ঠান আরোজন করিয়াছিলেন তাহা অতি নিম্নস্তরের ইয়ার্কি ছাড়া অন্য কিছু ভাবে আখ্যাত হইতে পারে না। সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলের প্রযোজ্যে বোতল হস্তে মত্তলোকের অভিনয় করিতে বাতরা যে কি কুরুচির পরিচয় দান করে, তাহা আমরা বৃক্সম্প্রদায়কে স্রষ্ট এবং স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অমুযোগ্য করিতেছি।”

অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরের ভ্রমহোদয়গণই এই সকল কুচিৎপূর্ণ সঙ্কট ও মিছিলের প্রধান উল্লেখ্য ছিলেন, ইহা নিতান্তই পরিচায়ক বিবরণ। উজ্জ্বলতার মধ্যে প্রায় সকলেই হয় কলেজ বা বিদ্যালয়ের ছাত্র। তৎপরি পাড়ায় পাড়ায় মিছিল লইয়া যে কুচিৎপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলে তাহা আরও উৎকট। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন, “এই বৎসর এই প্রতিযোগিতার ফলে একটি পাড়ায় প্রতিমা নিবন্ধন উৎসব সমাধা হইয়া বাইলেও নিছক প্রতিযোগিতা ও ভেদে বশবর্তী হইয়া সেই পাড়ায় লোকেরা সম্বন্ধী পূজার বহুদিন পরে পুনরায় প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া নিবন্ধন উৎসব সমাধা করেন। উদ্দেশ্য হইল নিবন্ধন উৎসবকে অপরাপর প্রতিবেদী পাড়ার নিবন্ধন উৎসব অপেক্ষা অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ করিয়া তোলা।”

লোক এই কুৎসিত অবস্থার আশু প্রতিকারের দাবী করিয়াছেন। তাহার মতে ইহা সহজসাধ্য। পূজার উজ্জ্বল যুবকদের ইহার কুল বুঝিতে হইবে। সহজে তাহারা না বুঝিলে চান্দাদাতারা চান্দাদান বন্ধ করিয়া দিবেন। বাহারা চান্দা দেন তাহারা সহজেই দাবী করিতে পারেন যে, চান্দালক অর্থের দ্বারা কোন কুচিৎপূর্ণ প্রদ্রষ্টানের আয়োজন করা চলিবে না। পুলিশও এই ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। প্রতিমা নিবন্ধনের মিছিলের অল্পমতি দিবার সময় তাহারা উজ্জ্বলদের নিকট হইতে এই অস্বীকার আদায় করিয়া লইতে পারেন যে মিছিলে কোন প্রকারের কুৎসিত আচরণ করা হইবে না।

আমরা কয়েক ক্ষেত্রে বলিয়াছিলাম যে, সম্বন্ধী পূজার চান্দার অন্ততঃ ছয় আনা অংশ খাওয়া হুঃ ছাত্রদিগের সাহায্যে কোনও ক্ষেত্রে দিতে প্রতিশ্রুত হইবেন, শুণু তাহাদেরই চান্দা দেওয়া উচিত। বর্তমানে যেভাবে এই চান্দার পরচ হয়, তাহাতে উহার দশ আনা অপরায় হয় বলিয়া মনে হয়। কোন কোনও ক্ষেত্রে আরও অধিক।

### বোম্বাই রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা

৬ই মার্চ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে “বোম্বে ক্রনিকল” বোম্বাই রাজ্যের শিক্ষাসমগ্র সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রাজ্যের শিক্ষায়ন্ত্রী জীর্জনকররও দেশাই সম্ভ্রান্তি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বোম্বাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই বৎসর অধিকতর পরিমাণে সাহায্য দেওয়া হইবে। যদিও এই সাহায্য সর্বাধীন তবুও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারের এই ঘোষণার আনন্দিত হইবেন বলিয়া “বোম্বে ক্রনিকল” মনে করেন। ইহার দ্বারা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির দীর্ঘকালস্বামী অর্থাভাবে প্রতিকার হইবার আশা দেখা দিয়াছে। অন্যান্য উপায়েও সরকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সবই আশ্বাসের কথা, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে পৃথিবীর অপরাপর অংশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে পরিমাণ সরকারী সুহায্য পায় ভারতে শিক্ষায়তনগুলিতে সরকারী সাহায্য এখনও সে পর্যায়ে পৌঁছায় নাই। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারের

নিকট হইতে তাহাদের আয়ের শতকরা ষাট ভাগ পায়। এই সরকারী সাহায্যের পরিমাণও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেনের সহিত ভারতের ঠিক তুলনা চলে না, কারণ হুই দেশের পটভূমিকা বিভিন্ন।

সরকারী সাহায্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে অবিশিষ্ট হিতকারী কিনা তাহা নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যোগ্যতার উপর। পত্রিকাটির অভিমতে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যদাতার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলা হয় তাহার পিছনে অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উন্নতিসাধনের আসন্ন প্রয়োজনীয়তার কথাও অস্বীকার করা যায় না। চতুর্দিক চাইতেই আজ বারংবার অভিযোগ উঠিতেছে যে, ভারতের উচ্চশিক্ষার মান অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। সরকার আগামী বৎসর হইতে সরকারী কলেজসমূহের প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা বিচার করিতে হইবে।

পত্রিকাটি স্বীকার করেন যে, ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া কামা। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হইলে পাঠ্য পুস্তক এবং শিক্ষকদের কথা ভাবিতে হইবে। হয়ত সেই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই সরকার কেবলমাত্র সরকারী কলেজসমূহে এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও পরিস্থিতির অধোগতি হইতে পারে যদি সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ এই ব্যবস্থার মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। কারণ তাহারা হয়ত প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিবেন না। হয়ত এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত জ্ঞানিবার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্ত বিচারপতি গজেন্দ্রগদকার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা মানিয়া লইয়াছেন। পত্রিকাটির মতে এই ব্যাপারে শিক্ষকদের মতামতের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা কহব্য; এবং কেবলমাত্র এই উপায়েই এই ভটিল সমগ্র সম্পর্কে সরকার সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন।

শিক্ষকদের মতামতের ব্যাখ্যাতুল্য দেওয়া যে অবশ্যপ্রয়োজন—আমরা “বোম্বে ক্রনিকল”—এর এই অভিমত পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই কথা না বলিয়া পারি না যে এই ব্যাপারে সরকার অগ্রণী না হইলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আশা কবে বাস্তবে রূপায়িত হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্বাধীনতালাভের পর সাত বৎসর কাটিতে চলিল, অথচ মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্ত পাঠ্য পুস্তক অথবা শিক্ষক-শিক্ষণ কোন কিছুই করা হইল না। এই অবস্থা নিরসনের জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রসরকারের উচিত এই সম্পর্কে মনোবোপী হওয়া।

অন্যদিকে যে সকল রাষ্ট্রের মাতৃভাষা হিন্দী নহে তাহাদের

অবস্থাও বিবেচনার প্রয়োজন। 'শিক্ষক অভিজ্ঞ কিন্তু রাষ্ট্রভাবার অভাব' এইরূপ অবস্থা বহুক্ষেত্রেই আছে। ইহার প্রতিকার কি?

### বোম্বাই রাজ্যে পাঠ্য পুস্তকের অভাব

পাঠ্য পুস্তকের অভাবে বোম্বাই রাজ্যের ছাত্রদের বিশেষ অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়া এই মাসের "বোম্বই ক্রনিকল" পত্রিকায় "টুইনটার" একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ছাত্ররা যে সকল পাঠ্য পুস্তক পায় নাই তাহাদের মধ্যে কয়েকটি হইল : ভারত সরকারের তথা এবং বেতার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিধিবদ্ধ আইনের বই, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কিত একটি পুস্তক এবং বি. কন্স. ছাত্রদের ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক।

প্রবন্ধকার লিখিতেছেন যে, যদিও সম্প্রতি এই পুস্তকগুলি বাজারে আসিয়াছে তথাপি এই বংসরের ছাত্রদের তাহাতে খুব বেশী সুবিধা হইবে না।

সরকারী আইনের বই সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দপ্তর বাতীত অপর কেহ প্রকাশের অধিকারী নহে। লেপক এই ব্যাপারে সরকারের অবহেলার নিন্দা করিয়াছেন।

নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক বাজারে না পাইয়া স্বভাবতঃই ছাত্রগণ অপ্ৰামাণ্য এবং অপেক্ষাকৃত হীনমানের পুস্তক ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং পুস্তক-বিক্রেতারগণ স্ববোগে বুকিয়া ঐ সকল বইয়ের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছে।

কেবলমাত্র যে কলেজের বই-ই ছলিত তাহা নহে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পুস্তকগুলিও বাজারে সহজপ্রাপ্য নয়। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন, কেন যে কষ্টপূর্ণ কোন পুস্তক মনোনয়নের পূর্বে উহা বাজারে পাওয়া যায় কিনা তাহা বিচার করেন না, তাহা বুদ্ধির অঙ্গ নয়। যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব-জ্ঞানের পরিচয় না দেন তবে পাঠ্য পুস্তকের দ্রুতিক্ষের কোন সমাধান হওয়া শক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও অনুরূপ। প্রতি বংসরই ফুল ফাইন্ডাল হইতে শুরু করিয়া এম-এ পর্যন্ত যে সকল পাঠ্য পুস্তক মনোনীত হয় তাহাদের অধিকাংশই কলিকাতার বাজারে সহজপ্রাপ্য থাকে না। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রায়ই এ সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠকের চিঠি দেখা যায়, কিন্তু ব্যবস্থার কোন উৎকর্ষ আজিও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

### বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষা

মাত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে অধ্যাপক হুমায়ুন করীরের সভাপতিত্বে ইতিহাসের অধ্যাপকবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষা অথবা রাষ্ট্রভাবার প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। বনকারেলে বলা হইয়াছে যে, সাহায্য এবং বিভিন্ন পুস্তকাদির দ্বারা ইতিহাস শিক্ষকদিগকে ঐ সকল ভাষার পুস্তক রচনার উৎসাহ দিতে হইবে।

সম্মেলনে অন্যান্য কয়েকটি সুপারিশও করা হয়। তন্মধ্যে একটিতে ইতিহাস শিক্ষার আদর্শ পরিবর্তনের সুপারিশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেষ্ঠ মনীষীদিগের জীবনচরিতের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় সাংস্কৃতিকদিগের উপর জোর দেওয়া হইবে এবং সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে রাজনৈতিকদিগের উপর জোর দেওয়া হইবে। কারিগরি বিদ্যালয়গুলিতে ভারতসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলিতে অর্থনৈতিক এবং শিল্পবিকাশের ইতিহাসের উপর জোর দেওয়া হইবে। ভবিষ্যৎ কূটনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রশাসকগণকে যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে তথায় ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক ইতিহাস বিশদরূপে পড়ান হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অপরাপর প্রধান দেশগুলির শাসন-তান্ত্রিক এবং সাংগঠনিক ইতিহাস শেখান হইবে।

কলেজে বাহাতে অজ্ঞা বিষয়ের ছাত্ররাও ইতিহাস পড়ে এবং ইতিহাসের ছাত্ররাও বাহাতে অন্যান্য বিষয় পড়ে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কনফারেন্স সুপারিশ করিয়াছেন। সকল সরকারী পরীক্ষাতেই ভারতের ইতিহাস অবশ্য পঠিতব্য বিষয় হিসাবে রাখিতে হইবে।

ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর জোর দিতে হইবে। ভারত-সরকার বাহাতে ইউরোপীয়, এশীয়-আফ্রিকান এবং আমেরিকান ইতিহাস পঠনপাঠনের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন তজ্জন্য অমুদ্রোহ জানান হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষকের আদান-প্রদান এবং ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে শিক্ষক বিনিময়ের জন্যও সম্মেলনে সুপারিশ করা হইয়াছে।

### রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি

২৩শে ফেব্রুয়ারী রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কমিশনের উপর জ্ঞাত কার্য ক্রম সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কমিশন প্রসারবলী প্রচার করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার জনসাধারণ এবং রাজ্য-পুনর্গঠন সম্পর্কে আগ্রহান্বিত সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁহাদের মতামত ও পরামর্শ লিখিতভাবে পেশ করিবার আবেদন জানাইয়াছেন। সকল সূত্রির্দিষ্ট প্রস্তাবই ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যান তথ্যের দ্বারা সমর্থন করিয়া পাঠান উচিত। কোন নূতন রাজ্য গঠনের প্রস্তাব করা হইলে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এক বা একাধিক মানচিত্র পেশ করিতে হইবে। ১৯৫৪ সনের ২৪শে এপ্রিলের পূর্বে নয়াদিল্লীতে কমিশনের নিকট প্রত্যেক স্বায়কলিপির ছয় কপি করিয়া পাঠাইতে হইবে।

রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে পুর্কলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকার ২৪শে ফাল্গুনের সম্পাদকীরে যে অংশ আমরা নিয়ে দিলাম তাহা প্রাধান্য দিগো। আশ্চর্যের বিষয়, এ সম্পর্কে বাঙালী সাধারণ কিরূপ অস্বাভাবিক উদাসীন প্রকাশ করিতেছে!

"সম্প্রতি পাটনার (উজ্জ্বার) বহারাজা দিল্লীতে লোক সভার

অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “আমি এই অভিযোগ করিতেছি যে—মানভূম, সিংভূম ও সেবাইকেলার কোনরূপ সভা সরকারের অস্তিত্ব নাই।” সেবাইকেলার তিনি একদিন মাত্র বাতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তাহাকে এইরূপ তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহা উপেক্ষার নহে।

অথচ এইসব অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোককে এইরূপ একটি শাসনের অধীনে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দৈনন্দিন জীবন কাটাইতে হইতেছে। ইহা যে কিরূপ মর্মান্বজ তাহা একমাত্র ভূক্ত-ভোগীদেরই উপলব্ধির বিষয়, অল্প কাহারও নহে। মানভূম জিলার কয়েক বৎসর ধরিয়াই যে সমস্ত ঘটনা বিহার সরকার কর্তৃক ‘অল্পান্ত্রিত হইয়া চলিয়াছে তাহাতে মানভূমবাসী বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছে যে এখানে কোন সভা গবর্নমেন্টের অস্তিত্ব নাই। সেই জুই জীবনের জীবনের জ্ঞান নিঃশাস বায়ু যেমন প্রয়োজন, মানভূমবাসীদের মাতৃশব্দের জীবনের জ্ঞান বিহার কংগ্রেস গবর্নমেন্টের শাসনাধীন হইতে মুক্তি হেমনাই অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমানে যে ঘটনাবলী অল্পান্ত্রিত হইয়া চলিয়াছে তাহা পার্লামেন্ট সমস্ত ঘটনাকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়াছে, কিন্তু বিহার গবর্নমেন্ট মানভূমকে অধিবেশনে বিহারে রাখিতে উন্নত ও নৃশংস হইয়া উঠিয়াছে। কমিশনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং এই রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের কার্য যতই অগ্রগত হইতেছে ততই তাহাদের উন্নততা ও নৃশংসতা বাড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের প্রত্যয়ে রাজ্য-কর্মচারীরাও সর্বক্ষেত্রেই আরও উন্নত ও নৃশংস হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জ্ঞান বিশেষ করিয়া ঘটনাবলী উদ্ভূত করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা একরূপ অবিদ্যম গতিতে চলিয়াছে যে ইহা সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এই জুই বলিতে হইতেছে যে, বিহার গবর্নমেন্টের এইরূপ আচরণ তাহাদের চরিত্রের সাময়িক প্রকাশ নয় ইহা তাহাদের মূলগত বলিয়া ইহাদের নিকট হইতে কোনক্রমেই, কোন সময়ের জুই কোন প্রকার আশা করিবার সামান্যতম সুযোগও ইহারায় বাধে নাই। দেশবাসীর স্বাধীন জীবনে ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার হইলেও ইহা এমন নিষ্ঠুর বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে যে ইহাদের হাত হইতে মুক্ত না হইলে আর বাচোয়া নাই।

স্বাধীন ভারতবর্ষে যদি কোন স্থান বা ভারতবর্ষের কোন অংশ সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, সেখানে কোন সভা গবর্নমেন্টের অস্তিত্ব নাই তবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় ভারতবর্ষের—বিশেষ করিয়া কংগ্রেস গবর্নমেন্টের—পক্ষে আর কিছু হইতে পারে কিনা জানি না। ভারতবাসীর স্বাধীন-জীবনের প্রাথমিক ব্যবস্থার জ্ঞান অপরিহার্য ভাবার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির পুনর্বিভাগের জ্ঞান ভারত গবর্নমেন্ট কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন—কমিশনের নিকট সকলেরই এ বিষয়ে নিজেদের অভিমত পেশ করিবার স্বাধীন উন্মুক্ত; তোমাদের যদি কিছু বলিবার

ধাকে তোমরা বল, কিন্তু এ কি? সরকারী শক্তির আড়ম্বর দেখাইয়া অমায়িক সম্ভাসবাদের বিভীষিকা দ্বারা তোমরা জনগণকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিতে চাহিতেছ; জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, তাহাদের সম্মান, তাহাদের মর্যাদা তাহাদের নারীর মর্যাদা, গৃহস্থ জীবনের পবিত্রতা, নিরাপত্তা আজ উচ্চ অল ও উন্নত কর্মচারীদের শ্রমতলে দলিত ও মথিত।”

## কেন্দ্রীয় বাজেট

১৯৫৪-৫৫ সনের কেন্দ্রীয় বাজেট বৈচিত্র্যবিশীল—জনসাধারণের মনে আশার বাণী কিছু বহন করিয়া আনে নাই, উপরন্তু তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের পরচ কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৪৭-৪৮ সনে কেন্দ্রীয় কর-রাজস্বের মোট আয় ছিল ১৭৭.৫০ কোটি টাকা, ১৯৫১-৫২ সনে কর-রাজস্বের আয় ছিল ৪৫২.৯৯ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সনে কর-রাজস্বের আয় হইয়াছে ৩৬৩.৫১ কোটি টাকা আর আগামী বৎসরের নূতন বাজেটে কর-রাজস্বের আয় ধরা হইয়াছে ৩৭৯ কোটি টাকা। নূতন বাজেট অনুসারে মোট রাজস্ব আয় হইবে ৪৪১ কোটি টাকা এবং আরও অতিরিক্ত আয় হইবে ১১.৮৫ কোটি টাকা।

ইদানীং প্রত্যক্ষ কর হইতে অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবহার-শুল্ক হার ক্রমবর্ধমান, এবং নূতন বাজেট অনুসারে ব্যবহার-শুল্ক আরও বৃদ্ধি পাইবে, যেমন গুপারী, সাবান ইত্যাদির উপর। ব্যবহার-শুল্কভার গ্রামের চেয়ে শহরের লোকের উপর বেশী। শহরে মোট জনসাধারণ শতকরা মাত্র ২০ ভাগ বাস করে এবং ইহারাই প্রধানতঃ ব্যবহার-শুল্কের শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ অংশ প্রদান করে। তাই অনেকে মনে করেন যে, গ্রামেও বাতে এই শুল্কের ভার প্রাধান্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার জ্ঞান কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

১৯৫১ সনে মাসিক গড়পড়তার শিল্পোৎপাদনের মূল্য ছিল ১১৭, ১৯৫২ সনে ছিল ১২৯ এবং ১৯৫৩ সনে ছিল ১৩৪। অধিকন্তু, অনেক নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান কার্য আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং সেই অনুপাতে আয়কর বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৫২-৫৩ সনে নিগদ কর (Corporation tax) এবং আরকরের মোট পরিমাণ ছিল ১৮৫ কোটি টাকা, ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে প্রায় ১০৮ কোটি টাকা।

কর অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট দাখিল না করা পর্য্যন্ত নূতন কোন প্রধান কর আরোপ করা হয় নাই। এই কারণে প্রদেশগুলিও প্ৰত্যাহুগতিক ভাবে বাজেট তৈয়ারি করিয়াছে, ফলে কেন্দ্রের নিকট তাহাদের অধিকতর পরিমাণে ঋণ লইতে হইয়াছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। কংগ্রেসের নীতির চৌকিদারী করার দমন, প্রতিবেশ ব্যাপারে (prohibition) বৎসরে বহু কোটি টাকার আয় হইতে দ্বাষ্ট বঞ্চিত হইতেছে। প্রতিবেশ মাত্র কয়েকটি

প্রদেশে আছে, তাহাতেই ক্ষতিব পরিমাণ এইরূপ। প্রতিবেশের দরুন ঐ সকল প্রদেশের নৈতিক চরিত্র যে খুব উন্নত হইয়াছে তাহার প্রমাণ হয় না। সুরাপান নিবৃত্ত হয় নাই—কেবলমাত্র বাস্তবিক তাহার আয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। প্রতিবেশের দরুন ঘাটতি মিটানোর জন্য ঘাটতি পরচায় পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের আয়ের হিসাবে বেশ দু'একটি গোজামিল আছে। যেমন, পাকিস্তানের শুল্ক শোধ বাবদ ১৮ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত যে, পাকিস্তান তাহার ভারতীয় শুল্ক শোধ করিবে না, তবু যে কেন ইহা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় তাহা বলা কঠিন। গত বৎসরের বাজেটে পাকিস্তানের দেয় শুল্ক আয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছিল। পাকিস্তান এক পরসাদে শুল্ক শোধ করে নাই, ফলে ১৮ কোটি টাকার ঘাটতি হইয়াছে।

নূতন বাজেটে রাজস্ব আয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, শুদ্ধ আয় হইবে ১৭৫ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় ব্যবহার শুদ্ধ পাওয়া বাটবে ২২ কোটি টাকা, আরকর ও নিগমকর মিলিয়া আয় হইবে ১০৯ কোটি টাকা, সম্পদা শুদ্ধ আয় হবে ২৫ লক্ষ টাকা, আকিং হইতে আব-গারী কর উঠিবে ১৮৫ কোটি টাকা, ইত্যাদি। পরচের মধ্যে দেশ-রক্ষা কার্যের জন্য পরচা হইবে ২০৫ কোটি টাকা, প্রশাসনের (Civil Administration) জন্য ৮৬ কোটি টাকা, শুল্ক শোধ বাবদ ৪০ কোটি টাকা, প্রদেশগুলিকে অনুপূরক সাহায্য বাবদ ৩২ কোটি টাকা, ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় বাজেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে ২৫০ কোটি টাকার ঘাটতি পরচ—সোজা কথা, এই টাকাটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার লওয়া হইবে। রাষ্ট্রের পরচ সাধারণতঃ কর-রাজস্ব দ্বারা কিংবা জনসাধারণের কাছ হইতে শুল্ক প্রদান করিয়া মিটান হয়। কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনীতি অতিরিক্ত পরচের চাহিদা করে—হাঙ্গা সাধারণ আয় দ্বারা কুলান যায় না। তাই পরিকল্পনার সাক্ষ্যের জন্য কিছু পরিমাণ ঘাটতি পরচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহার পূর্বে কর-রাজস্ব সবরকম ভাবে আদায় করার চেষ্টা করা উচিত। অতিরিক্ত ঘাটতি পরচের টাকার মূল্য হ্রাস পাইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আয় ঘাটতি পরচের পরিমাণ যদি বাবজারী দ্রব্য (consumer goods) বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই, শিল্পপতির চীংকার করিয়া করিয়া তাহাদের দাবী আদায় করিয়া লইয়াছেন মনে হয়।

আর অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধি এমন এলোমেলোভাবে করা হইয়াছে যে, তাহাতে সৃষ্টিকৃত পরিকল্পনার অভাব প্রতীয়মান হয়। শুপারী, কাপড়কাটা সাবান, গারোমাখা সাবান, জুতা ইত্যাদির উপর ব্যবহার শুদ্ধ বসান হইয়াছে। কাঁচা তুলার আমদানীর উপর যে শুদ্ধ ছিল তাহা বহিত করিয়া দিয়া মিহি হুতার কাপড়ের উপর কর বসান হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সকল প্রকার কাপড়েরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুলার উপর হইতে আমদানী শুদ্ধ বহিত

করিয়া দেওয়ার ফলে কাপড়ের মূল্য কিছু পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার উচিত ছিল।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কমিশন তাহাদের রিপোর্টে ভারতের ঘাটতি পরচ সমর্থন করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকে সাক্ষ্যমণ্ডিত করিতে হইলে কিছু পরিমাণ ঘাটতি পরচ প্রয়োজন, কিন্তু ঘাটতি পরচের মুদ্রামূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা সন্দেহেও তাহারা সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বেকার-সমস্যা সমাধানের দারিদ্র্য বর্জন্যে প্রধানতঃ রাষ্ট্রের এবং ব্যাপকভাবে কাব্যস্থিতির জন্য ঘাটতি পরচের প্রয়োজন। কিন্তু ঘাটতি পরচ যেন উৎপাদনশীল হয়।

### পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

১৯৫৪-৫৫ সালের নূতন বাজেটে ১৩৩৮ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িবে। গত ১৯৫২ হইতে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে ৩২ লক্ষ টাকা উদ্ভূত ছিল, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬ কোটি টাকা ঘাটতি পড়ে। শুধু রাজস্ব পরচের ব্যাপারে এই ঘাটতি হইতেছে, উন্নয়নপাতে কাপিটাল একাউন্টে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। ১৯৫২-৫৩ সালে রাজস্ব আয় ছিল ৩৭৭ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে রাজস্ব আয় ছিল ৩৮৮ কোটি টাকা, এবং আগামী বৎসরে নূতন বাজেটে হইবে ৩৯৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত তিন বৎসরে মোট আড়াই কোটি টাকার রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং পরচ বৃদ্ধির তুলনায় ইহা কিছুই নয়। ১৯৫২-৫৩ সালে পরচের পরিমাণ ছিল ৩৮৯ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে ছিল ৫০৫৭ কোটি টাকা, এবং নূতন বাজেটে পরচের হিসাব ধরা হইয়াছে ৫০৩১ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ২৭৪ কোটি টাকা বেশী।

দেখা বাইতেছে, ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বাড়তির পথে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, কিন্তু ক্রমাগত ঘাটতি অবাছনীয়। শাসনব্যয় অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, নূতন পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধিত পুলিশবাচিনীর প্রয়োজন আছে, তথাপি পূর্বেরকার বাংলায় এক-ভৃতীরাংশের জন্য এত বড় মন্ত্রীপরিষদের প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না এবং ইহাতে সুরশাসনও বে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কার্যতঃ সমস্ত ভার দুই জন মন্ত্রীর ক্ষেত্রে আছে।

উন্নয়ন খাতের পরচ নির্দিষ্ট দ্বারা অনুসারেই চলিতেছে। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় জন্য পশ্চিমবঙ্গের মোট ৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করিবার কথা, এবং ইহার মধ্যে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, ১৫ কোটি টাকা বাকী আছে। দামোদর পরিকল্পনার খাতে পশ্চিম-বঙ্গ ৩৬ কোটি টাকা দিয়াছে। অধিকন্তু ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ও সমাজসেবা পরিকল্পনার জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি বাবসারিক সংস্থার মধ্যে ১১টি ঘাটতি দিতেছে। এই ক্ষতির পরিমাণের প্রধান কারণ হইতেছে, খাজনা



অল্পমূল্যে বিক্রয়, অবশ্য সাধারণের সুবিধার্থে। সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার বাণিজ্যটি প্রথম হইতেই প্রহসন ছিল, সেইজন্য ইহাতে ঘটিত হওয়ার আশংকা হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের বাণিজ্যটি অল্পভাবে দেখিতে হইবে। বর্তমানের রাষ্ট্র কলাণকামী, তাহাকে নতুন নতুন কাঁচা সৃষ্টি করিয়া বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কলাণকামী রাষ্ট্রের অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য মুনাফা লাভ ইহার উদ্দেশ্য নহে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফার স্থান নাই—এই কথাটি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিকরা ভুলিয়া যান। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট যদি কয়েক হাজার লোকের চাকরীর সংস্থান করিয়া দিয়া থাকে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের যাতায়াত সুগম করিয়া থাকে তবে তাহাই যথেষ্ট। মুনাফা লাভ হয় অপরের প্রেমের শোষণ দ্বারা, রাষ্ট্র কাহাকেও শোষণ করে না। সেইজন্য রাষ্ট্রের ব্যবসায়ে মুনাফার স্থান না থাকাই উচিত। তবে লোকসান হওয়া উচিত নহে।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ঠিকভাবে বিক্রয়কর আদায় করা হয় বলিয়া মনে হয় না, যদিও ত্রেতাড়া যথোচিতভাবে কর দিয়া থাকে। বোম্বাই ও অগ্গাল প্রদেশে বিক্রয়করের মোট পরিমাণ অনেক বেশী, কিন্তু বাংলায় এত অল্প পরিমাণে কেন বিক্রয়কর আদায় হয়? মাত্রাজে সবচেয়ে বেশী বিক্রয়কর, কারণ সেখানে বহুমুখী বিক্রয়কর (multipoint sales tax)। বাংলার বিক্রয়কর আদায়ের ব্যবস্থা আরও কড়াকড়ি হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের বাজারে পণ্য আছে ৭২৫ কোটি টাকা। এ বৎসর আরও চার কোটি টাকার পণ্য তোলা হইবে। কেন্দ্রের নিকট পশ্চিমবঙ্গের ৭৬ কোটি টাকার মত পণ্য আছে, নতুন বাজেটে ইহার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইবে।

বাজেটের আলোচনা এখনও চলিতেছে। কি ভাবে চলিতেছে তাহার নমুনা নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যায় :

গুজুবায়, ১২ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের পুলিশ বাজেটের আলোচনাকালে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং পুলিশের ক্ষয় অর্থ বরাদ্দের যৌক্তিকতার প্রশ্নে সরকার ও সরকার-বিরোধী—উভয়পক্ষে উত্তেজনাপূর্ণ অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগে প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল সভাকক্ষ সর্বগম্য হইয়া উঠে। দর্শক গ্যালারীগুলি এই দিন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বিরোধীপক্ষ হইতে সদস্যের পর সদস্য বক্তৃতা করিতে উঠিয়া পুলিশের বিশেষ করিয়া কলিকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্নপ্রকার অপরাধ ও গুণ্ডামি দমনে নিক্রিয়তা, অকর্মণ্যতা এবং হীনীতির নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাহারা আরও অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস গবর্নমেন্ট পুলিশকে অপরাধসমূহের আধারা ও হস্ত-ও দমন অপেক্ষা বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলির এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের ও স্বাধীনতা থকা করার কাজেই অধিকতর নিয়োজিত করিতেছেন। তাহারা পুলিশ খাতে বার-বৃদ্ধি বিবোধিতা করেন।

পক্ষান্তরে সরকার-সমর্থক কংগ্রেস দলের সদস্যগণ বক্তৃতাকালে সমান তীব্রতার সজ্জিত বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রত্যাভিযোগ করিয়া বলেন যে, বাতারা বিপ্লবের নামে নানারূপ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করিতে উদ্যনি দেয়, রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষয় তাহাদের কাব্যকলাপ দমনের নিমিত্ত পুলিশের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

বিতর্কের উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় কংগ্রেস পক্ষের প্রবল চর্যামূর্খির মধ্যে বলেন, “যে গবর্নমেন্ট আইনের বিধান প্রয়োগ করিবার পক্ষিত জানে না, সে গবর্নমেন্ট গবর্নমেন্ট নামেই যোগ্য নহে। আমাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা থকা করার অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়? সেট স্বাধীনতা কি ট্রাম-বাস পোড়াইবার স্বাধীনতা? সেই স্বাধীনতা কি নরহত্যা, লুণ্ঠাট ও জনসাধারণকে সম্বল করিবার স্বাধীনতা? এই গবর্নমেন্ট যদি কাহাকেও বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে বাতারা ঐ পন্থার কাব্যকলাপ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধেই সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।”

### ভারতের জাতীয় আয়

১৯৪০ সনের আগষ্ট মাসে জাতীয় আয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫১ সনের ১৫ই এপ্রিল কমিটি তাহাদের প্রথম রিপোর্ট দাখিল করেন। কমিটি সরকারের নিকট সম্প্রতি তাহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সনে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ২,৫৩০ কোটি টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সনে এবং ১৯৪৯-৫০ সনে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮,৬৫০ কোটি টাকা এবং ৯,০১০ কোটি টাকা। ঐ তিন বৎসরে ভারতে মাথাপিছু বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৪৮-৪৯ সনে ২৪৬.৯ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সনে ২৫৩.৯ টাকা এবং ১৯৫০-৫১ সনে ২৪৮.৯ টাকা। রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৯৪৮-৪৯, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ সনে সরকারী কাব্যে অথবা গবর্নমেন্ট-নিয়ন্ত্রিত কলকারখানায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে; অন্যদিকে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমিয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে একটি মোটামুটি তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যাইবে।

বিষয়	১৯৫০-৫১	১৯৪৯-৫০	১৯৪৮-৪৯
জনসংখ্যা (কোটিতে)	৩৫.৯৫০	৩৫.৪৮২	৩৫.০৩৮
জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	২৫৩০	৯০১০	৮৬৫০
জনপ্রতি বাৎসরিক আয় (টাকায়)	২৫৫.২	২৫৩.৯	২৪৬.৯
গৃহে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য (কোটি টাকায়)	২৫৫০	৯০৩০	৮৬৭০
জাতীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্য (কোটি টাকায়)	১০০৩০	২৪৬০	২০৬০
সরকারী কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য (কোটি টাকায়)	২৯০	২৭০	২৪০



## সরকারী পরিচালনার আর (কেমিটি টাকার)

	৪০০	৪১০	৪০০
বেসরকারী আর (কেমিটি টাকার)	৮৮০০	৮০৫০	৮০০০
জাতীয় ব্যয়ে সরকারী অংশ (,, ,,)	৮২০	৮১০	৮৫০
বেসরকারী ব্যয়ে সরকারী অংশ (,, ,,)	৭৭০	৭১০	৬২০

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাব অনুসারে ১৯৫৬ সালে ভারতের জাতীয় আর ১০,০০০ কোটি টাকা হইবে, অর্থাৎ পরিকল্পনার এই পাঁচ বৎসরে (১৯৫০-৫১—১৯৫৫-৫৬) জাতীয় আর শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় আর বৃদ্ধির গতি নির্দিষ্ট হিসাব মতই চলিয়াছে, বৎসর কিছু পরিমাণ আগাইয়া আছে।

কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৮৭১০ কোটি টাকা, এখন সংশোধন করিয়া ধরা হইয়াছে ৮৬৫০ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সালের মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে কৃষি কার্য হইতে আসে ৪৮২০ কোটি টাকা, শিল্প ও পনিজ উৎপাদন হইতে আসে ১৫৩০ কোটি টাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বানবাহন হইতে আসে ১৬২০ কোটি টাকা, অজ্ঞাত কার্যাবলী হইতে আসে ১৪৪০ কোটি টাকা। মোট ৯৫০০ কোটি টাকা।

চূড়ান্ত রিপোর্টের একটি পরিচ্ছেদে জাতীয় আর কমিটি সংগৃহীত তথ্যাদির বিবরণ করিয়া তথ্যাদির সংগ্রহের উন্নততর ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করেন। কৃষি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশন দেশের প্রত্যেক গ্রামে প্রতি বৎসর পাঁচ বার তথ্য সংগ্রাহক প্রেরণের পরামর্শ দিয়াছেন। বেতন ও নিয়োগ বিষয়ে ব্যবহার্য তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের সুপারিশ করিয়াছেন। বিক্রয় কর সম্পর্কে তথ্যাবলী প্রকাশে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কমিশন কৃষি, পশুপালন-ব্যবস্থা, পরিবহন, কুটিরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাগার ও শিক্ষায়তনগুলিতে গবেষণা চালাইবার সুপারিশ করিয়াছেন। কুটিরশিল্প সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার তার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট ও রাজ্যগবর্ণমেন্টসমূহকে লইতে হইবে।

সংগঠনী সুপারিশে কমিশন ভারত সরকারের জাতীয় আর শাখাকে বিলাতের জাতীয় আর সম্পর্কিত বৈতপত্রের মত ভারতের জাতীয় আর সম্পর্কে বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশের অনুরোধ জানাইয়াছেন। কমিটি এই উদ্দেশ্যে উক্ত শাখাকে দায়ী করার প্রস্তাব করিয়াছেন। জাতীয় আর সম্পর্কে গবেষণার জন্য কমিটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারকে সরকারী সাহায্য প্রদানের সুপারিশ করিয়াছেন।

কমিটির মতে জাতীয় আর সম্পর্কে একটি অন্তর্ভুক্তিকালীন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা আবশ্যিক। প্রস্তাবিত উপদেষ্টা কমিটি জাতীয় আর সম্পর্কিত চলতি কার্যাদির পর্যালোচনা করিয়া সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। পরে সরকারী ও বেসর-

কারী জাতীয় আর সম্মেলন গঠিত হইলে অন্তর্ভুক্তিকালীন উপদেষ্টা কমিটি উহার হস্তে সকল দায়িত্ব অর্পণ করিবেন। জাতীয় আর সম্মেলনের সকল ব্যয় সরকারকে বহন করিতে হইবে।

চূড়ান্ত রিপোর্টের হিসাবে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ বা ক্রিষ্টাব্দিক তুলনামূলক ক্ষমতিতে পারে বলিয়া জাতীয় আর কমিটি স্বীকার করিয়াছেন।

## ভারতের কার্যরত জনসমষ্টি

জাতীয় আর কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে ভারতে ১৯৪৮-৪৯, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ এই তিন বৎসরে কার্যরত ব্যক্তিদের একটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সনে মোট কার্যরত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৮৮ লক্ষ, ১৯৫০-৫১ সনে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ষাড়ার ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ। তিন বৎসরের হিসাব হইতেই দেখা যায়, মোট কার্যরত ব্যক্তিদের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী নিযুক্ত ছিল কৃষি ও পশুপালনে। নিম্নের তালিকা হইতে তাহা স্পষ্ট হইবে :

কার্যরতদের সংখ্যা (হাজারে)

কার্যের নাম	১৯৫০-৫১	১৯৪৯-৫০	১৯৪৮-৪৯
কৃষি ও পশুপালন	১০,২৭,১১	১০,১১,৩৫	৯,৯৫,২১
বন	৩,৫০	৩,৪২	৩,৪৮
মৎস্য	৫৭২	৫৭৮	৫৭৭
খনি	৭৮০	৭৭৮	৭৭৭
কলকারখানা	২২৬২	৩০৭০	৩০৬৫
ক্ষুদ্র শিল্প	১১৫২১	১১৩২০	১১২৩০
যোগাযোগ	১২৫	১৭৫	১৬২
রেলওয়ে	১১৭৮	১১৮১	১১২২
বাণ্য ও বীমা	১৪৭	১৪৭	১৪৭
অজ্ঞাত বাণিজ্য ও পরিবহন	২৫০০	২৪৩৭	২৩৪৩
শেখা ও কলাবিদ্যা	৬৪২৫	৬১২১	৬০১৬
সরকারী শাসন	৩৮৮৬	৩৭৬৫	৩৫২৭
বাসগৃহের কাজ	২২৪৭	২৮৪৭	২৭৫১
মোট কার্যরত ব্যক্তি	১৪৩২২১ (১০০)	১৪০২৭৬ (১০০)	১৩৮৮০ (১০০)

## বোম্বাই রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগের ক্রয়নীতি

"বোম্বাই ক্রয়নীতি" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাইয়ের রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন অতীতে যে ক্রয়নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখায় যে বোম্বাই বিধান-সভা কর্তৃক নিযুক্ত প্রাক্কলন (estimate) কমিটি এক সুপারিশ করিয়াছেন। বস্তাদির অতিবিক্রয় অংশ এবং অজ্ঞাত করেকপ্রকার সমস্যা ক্রয়ের মধ্যে চাষিভারের জন্য দায়ী যে অনুসন্ধান তাহা স্থির করিতে হইবে।

৯ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য বিধান-সভার রাজ্য মন্ত্রী ডাঃ শ্রীমদ

মেহটা সভার প্রাক্কলন কমিটির একাদশ রিপোর্ট উপস্থিত করেন। রিপোর্টে অত্যন্ত কথার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের গুণ্যে কয়েকটি বস্ত্রাশ এবং বিভিন্ন প্রকারের সরঞ্জাম প্রভূত পরিমাণে উদ্ধৃত্ত হইয়াছে। মোট প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের মালের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের মাল আগামী দুই বৎসরের মধ্যে কর্পোরেশনের কোন কাজেই আসিবে না।

কমিটির নিকট সাক্ষ্য কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে, বস্ত্রাদি অতিরিক্ত অংশ ক্রয়ের কোন শতকরা হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। কর্পোরেশনের নীতি ছিল ছয় মাসের প্রয়োজনীয় মাল ক্রয় করা এবং ঐ পরিমাণ মাল মজুত রাখা। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় অক্সিজেন সকলের মত কর্পোরেশনও মাল গুদামজাত করা আরম্ভ করে। ডিজেলের অতিরিক্ত বস্ত্রাশগুলি দুই বৎসরের মত এবং পেট্রলের দ্বারা চালিত বস্ত্রের অতিরিক্ত অংশ এক বৎসরের মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ মজুত করা হয়। জেনারেল ম্যানেজার আরও জানান যে, এই উদ্ধৃত্ত মালের পরিমাণ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন সৈন্য-বাহিনী এবং অপরাপর রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থানগুলির সহিত আলোচনা চালাইতেছে।

প্রাক্কলন কমিটি পরামর্শ দিয়াছেন যেন অতিরিক্ত বস্ত্রাশ ক্রয়ের নীতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করা হয়। ক্রীত মালের বখাবহ হিসাবরক্ষা এবং প্রতি ছয়মাস অন্তর কেন্দ্রীয় অপিসে গুদামজাত মালের ব্যালান্স সীট বাহাতে পাঠান হয় কমিটি তৎক্ষণাৎ সুপারিশ করিয়াছেন।

পরিবহন সংস্থা কর্তৃক বার্ষিক কাঁচাধিবিবরণী এবং অডিট রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্বের প্রতি কমিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর বিধান-সভার এই সকল রিপোর্ট বাহাতে উপস্থিত করা হয় কমিটি সেই মধ্যে পরামর্শ দিয়াছেন। অপর এক সুপারিশে কমিটি কর্পোরেশনের ক্ষতির হ্রাসের উপায় অনুসন্ধান করিয়া দেখার কথা বলিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাহাতে আয়ের পথ স্ফূর্ত হয় তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন হইলে আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক সংস্থাগুলির সাহায্য লইবার অন্তর কমিটি পরামর্শ দিয়াছেন। কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, রাজ্যের যে সকল অংশে যানবাহনের বিশেষ বন্দোবস্ত নাই সেই সকল ক্ষেত্রে নূতন হুট থলিতে হইবে। তাহাতে লাভ-লাভের বিচার করা চলিবে না, কারণ জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখাই রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রাথমিক কর্তব্য।

ডাঃ জীবরাজ মেহটার নেতৃত্বে পনের জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রাক্কলন কমিটিতে বিরোধী পক্ষের তিন জন সদস্য আছেন।

### কেনিয়া সম্পর্কে “ন্যাশ্যোন্টার গার্ডিয়ান”

“ন্যাশ্যোন্টার গার্ডিয়ান” এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিপিতেছেন যে, কেনিয়া-প্রত্যাপ্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। “ইহাতে

যে সকল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেরই মোটামুটি জানা থাকিলেও ইহাতে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রধান সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে এবং ছয় জন প্রতিনিধি বেতাবে আলোচনা প্রসঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না—সমগ্র রিপোর্টটির গুরুত্ব এইখানেই।”

পত্রিকা বলেন, রিপোর্টের সহিত কাহারও কাহারও মতানৈক্য থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের “রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বিরাট জনসাধারণ যে রিপোর্টটিকে সমর্থন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রিপোর্টটি মাউ মাউ আন্দোলন এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত কিছুই বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব দেখাইয়াছে। ইহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে যে, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়াছে এবং এই বিশদ সংক্রামিত হইতে পারে কিঞ্চিৎ এলাকার বাহিরেও। ইহা আরও বলিয়াছে যে পুলিশবাহিনীর কাজকর্মে যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় এবং পুলিশবাহিনীকে নূতন করিয়া সংগঠিত করার প্রয়োজন হইবে।”

রিপোর্টের যে অংশে মাউ মাউ দলের উচ্চতর কমান্ডারীদের শপথ গ্রহণের এবং তৎসংক্রান্ত পদ্ধতির বর্ণনা রহিয়াছে তাহা প্রকাশ না করার যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে পত্রিকাটি সেই সিদ্ধান্তে সমালোচনা করিয়া লিপিতেছেন যে, এইভাবে এই অংশটি বাদ দেওয়া ভুল, কারণ জনসাধারণকে সমগ্র চিত্রটি জানিতে দেওয়া কর্তব্য “বাহাতে মাউ মাউ চরিত্রের ভীষণতা সম্পর্কে কাহারও আর কোন ভুল ধারণা না থাকে।”

“আমরা জানিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে পুলিশের বিরুদ্ধে অমাত্রব্যবহৃত অত্যাচারের ক্ষুদ্র ১৩০ জনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ৭০ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়, বাকী ৪০ জনের বিচারকার্য এখনও শেষ হয় নাই। রিপোর্টে বলা হয়—ইহাতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার শক্তি সন্দেহ জনসাধারণের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে এবং এমন কি মাউ মাউ-এর বিরুদ্ধে যাহারা দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইতে পারিতেন তাঁহারাও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু অপরপক্ষে এই অত্যাচারের অপবাদ নিরাপত্তাবাহিনী সম্পর্কে যাহারা দিয়াছেন তাঁহারা ভুল করিয়াছেন সন্দেহ নাই।”

“ন্যাশ্যোন্টার গার্ডিয়ান” এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিরাপত্তাবাহিনীর শৃঙ্খলা এবং চরিত্রগত সংশয়ের সত্যতা জনসাধারণ কি পর্যাপ্ত উপলব্ধি করিতে পারে তাহারই উপর নির্ভর করিবে তাহাদের সাফল্য।

### ইঙ্গ-মিশর সম্পর্ক

মিশরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে “অবজার্ভার” পত্রিকা ৭ই মার্চ লিপিতেছেন : মিশরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মুখ্যতঃ নির্ভর করে ব্রিটেনের সহিত একটি আপোষরকার উপর। কারণেতে যে সরকারই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন সকলের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য। বর্তমান শাসকগণ তাহাদের পূর্ববর্তীগণ অপেক্ষা এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের পরবর্তীগণ যেরূপ কঠিনে পারিতেন, তাহা

অপেকাও সুরেন্দ্রপাল সম্পকে একটি বাস্তবমুখী চুক্তি করিতে এবং চরম জাতীয়তাবাদীলিঙ্গকে দমন করিতে অধিকতর তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন।

সুদান সম্পকে “অবজ্ঞাভীর” মন্তব্য করেন যে, মিশর সরকারের বুঝা উচিত, সুদানে স্থায়ী এবং সুশাসক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রিটেন এবং মিশর উভয়েরই স্বার্থ বৃদ্ধি পাইবে। সুদানের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থার পরিণতি বাগাতে রাজনৈতিক গণ্ডগোল এবং শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতার পথাবসিত না হয়, বাগাতে ব্রিটেন অপেকা মিশরের অধিকতর ক্ষতির সম্ভাবনা তাহাই যদি কামা হয় তবে কার্যের সরকারের বুঝা উচিত যে সুদানের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিম্বাদ বাড়াইলে তাহাদের স্বার্থ প্ররক্ষিত হইবে না, সেই বিবাদের নিরসনেই তাহাদের প্রকৃত স্বার্থ। মিশর সরকারের কতবা ব্রিটেনের সহযোগিতায় সুদানবাসিগণ তাহাদের নূতন দায়িত্ব বহন করিতে পাবেন সেইভাবে তাহাদিগকে প্ররক্ষিত করা।

### পূর্ব-পাকিস্থানে নির্বাচন

“ঢাকা, ১২ই মার্চ—প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্থানের ৩০২টি আসনবৃদ্ধ নূতন আইনসভার প্রথম পাঁচদিবস-ব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচন আন্তর্জাতিক শেখ হুসেইন। শেষ দিনের ভোট গ্রহণ দ্বিতীয় বৌদ্ধ নির্বাচন কেন্দ্র ও কতিপয় বর্ধিতবয়স্ক নির্বাচন কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর কেন্দ্রে কতিপয় দ্বিতীয়বয়স্ক ঘটনার দরুন আগামী ২৭শে মার্চ পুনরায় নির্বাচন হইবে।

পূর্ববঙ্গের এই সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল দুই কোটি নয়নাথী। নির্বাচনকাণ্ড শাস্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুমান করা হইতেছে যে, নির্বাচনে শতকরা ৫০ জন ভোটদাতাই অংশগ্রহণ করেন ( তাহাদের মধ্যে অর্ধেকের কিছু কমসংখ্যক ছিল মহিলা ভোটদাতা )। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার। এই সব কেন্দ্রের অনেকগুলিই ছিল দূরত্বক্রমা স্থানে অবস্থিত। উত্তর অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা এবং দক্ষিণ অঞ্চলের নদীপ্রধান এলাকার যোগাযোগ রক্ষা করিয়া ভোট গ্রহণের কাজ সম্পাদন কঠিন হইলেও, নির্বাচনী অফিসারদের মতে সেই সব অঞ্চলে নির্বাচনের কাজ খুব ভালভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

আগামী ১৪ই মার্চ ভোট গণনার কাজ আরম্ভ হইবে এবং ৩০শে মার্চ পর্যন্ত গণনার কাজ চলিবে। ১৫ই মার্চ কিছু ফলাফল জানা হইতে পারে এবং ১৮ই মার্চ হইতে ২০শে মার্চের মধ্যে অধিকাংশ ফলাফল জানা হইবে।”

লিখিত সময় পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে মুসলীম লীগের জয় অনিশ্চিত। উভয়মধ্যেই সর্দার ইব্রাহিম কবীতীতে ফিরিয়া পরাজয়ের লক্ষ্যে ধর্ম্মের ঢাকিবাব জগৎ “ভারতের চক্রান্তে এবং বিপুল ঋণ সাহায্যে এতদ্রূপে মুসলীম লীগের অবস্থার বিপর্যয়

ঘটিয়াছে” ইত্যাদি বুলি ছাড়িতেছেন। অবশ্য উহার কঠোর প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গেই সুবাবদীর দল করিয়াছেন।

### বর্তমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

শশিমবঙ্গের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতেছে বর্তমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনা-ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বর্তমানের সাপ্তাহিক পত্রিকা “বর্তমান বাণী” পর পর দুই সপ্তাহে দুইটি সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন। “বর্তমান বাণী” লিখিতেছেন যে, ব্যাঙ্কের ১৮জন ডিরেক্টর—ছয় জন সরকার-মনোনীত, ছয় জন গ্রাম্যসমিতিগুলি কর্তৃক নির্বাচিত এবং ছয় জন বিশিষ্ট অংশীদারদের প্রতিনিধি। গ্রাম্যসমিতিগুলির সংখ্যা ছয় শতের বেশী এবং তাহারা লক্ষাধিক টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। বিশিষ্ট অংশীদারেরা সংখ্যায় দুই শতেরও কম এবং তাহারা মাত্র তের হাজার টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। পত্রিকার মতে “যে ভাবে এবং যে কোন দিক হইতেই বিচার করা হোক না কেন বিশিষ্ট অংশীদারগণ সাধারণ অংশীদারদের সঙ্গিত সমপ্রতি-নিষিদ্ধের দাবী করিতে পাবেন না, কিন্তু না পারিলেও এই সম-প্রতিনিধিত্ব তাহারা পাইয়া আসিতেছে।” প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী তিনটি পরিবারের মধ্যেই এই বিশিষ্ট শেয়ারগুলি সীমাবদ্ধ।

সমপ্রতি ব্যাঙ্কটির পক্ষ হইতে ৫০ হাজার টাকার বিশিষ্ট অংশ বিক্রয় ঘোষণার পর প্রায় নয় হাজার টাকার শেয়ার ক্রয়ের আবেদন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাঙ্কের কল্পপক্ষ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার ক্রয়ের আবেদন পাওয়া যায় নাট এই অজুহাতে কোন শেয়ার বিক্রয় করা হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণ পরিচালকসভায় বিশেষ গোষ্ঠী বিশিষ্ট অংশীদারদের সংখ্যা বাড়াইবার পক্ষপাতী নহেন। পত্রিকার ভাষায় “পরিচালকসভায় নিজ গোষ্ঠীর সংখ্যাধিকার বজায় রাখিতে হইলে বিশিষ্ট অংশীদারদের সংখ্যা বাড়ানো চলিবে না এবং এই কারণেই প্রস্তাবের অপব্যবহার করিয়া অংশ বরাদ্দ করেন নাই।”

“বর্তমান বাণী” লিখিতেছেন, “এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় সমবায় ব্যাঙ্কটি একটি কোটারীতে পরিণত হইয়াছে।

“সমবায় ব্যাঙ্কের এই কোটারীর কথা সমবায় বিভাগের অজ্ঞাত নহে। ব্যাঙ্কের উপবিধির দোহাই দিয়া বিভাগ চলিবে, তাহারা নিরুপায়। সমবায় বিভাগ নিরুপায় বলিয়া আমরা মনে করি না। তাহারা ব্যাঙ্ককে নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, যে টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছে সেই পরিমাণই বিশিষ্ট অংশ বিক্রয় করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক সমবায় বিভাগের উপলক্ষে অমান্ত করিলে কম প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে পারেন।”

### মুর্শিদাবাদে রেশম সমবায় সমিতি

“মুর্শিদাবাদ সমাচার” ১৮ই ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুর্শিদাবাদে রেশম শিল্প সম্পকে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, গত বৎসর মুর্শিদাবাদে একটি জেলা রেশম শিল্প সমবায় সমিতি

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার পিছনে সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে সরকার সম্বায় সমিতিতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইয়াছেন, কলে বিশর বেশম শিল্প পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা ব্যতীত হইতে বসিয়াছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন :

"পশ্চিমবঙ্গ সিদ্ধ কমিটির গত বংসর জুন মাসে বহরমপুরে যে সভা হয়, তাহাতে ব্রিস্টলীকুমার মিশ্র, ডাঃ নবপোপাল দাস, শিল্প বিভাগের অধিকর্তা, সমবায় বিভাগের বেক্টিং প্রভৃতির উপস্থিতিতেই বেশম সমবায় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। সরকারী সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তাহার ফলে সমিতি বেক্টিং করা হয় এবং শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হয়। বেশম শিল্পীরা নিজেদের সম্পত্তি বন্ধক দিয়াও বেশম সমবায় সমিতির শেয়ার রূপে ক্রয় করিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। এই ভাবে দশ হাজার টাকা শেয়ারের প্রথম 'কল' সিকি টাকা উঠিয়াছে। বেশম শিল্পীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে পূর্বে পূর্ব বেশম সমবায় সমিতির কাৰ্য্য আরম্ভ হইবে। কিন্তু সে আশ্বাস বাণ্য হইতে বসিয়াছে। বেশম সমবায় সমিতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট যে ঋণ চাহিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আজ পাঁচ মাস পরে জানা গিয়াছে যে, বেশম সমবায় সমিতিতে সরকার কোন ঋণ এখন দিবেন না। সুতরাং নবজাত মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ সিদ্ধ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি যে পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, আপাততঃ তাহা থামাচাপা পড়িল বলিয়াই মনে হইতেছে।"

কিন্তু মুর্শিদাবাদে বেশম শিল্প সমবায় সমিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ বেশম শিল্প আজ তুর্গতির সম্মুখীন হইলেও এখনও বহু পরিবার বেশমের কাছে প্রসারিত করে। তাহার কারণ বেশম সমবায় সমিতি গঠনে বিশেষ আগ্রহাধিত। উপরন্তু বেশম শিল্পীদের তিনটি পৃথক সম্প্রদায় বসনি, কাটনি ও তন্তুবারের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে আত্ম পরিত্রাণ কোন কাজ হয় নাই। সমবায় সমিতি এই দিকে সবিশেষ সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে। বসনি সম্প্রদায়কে ভাল বীজ সরবরাহ করা, তুঁতের জমিতে জলসেচের জন্য পাওয়ার পাম্পের ব্যবস্থা করা এবং উপযুক্ত সার সরবরাহ করা নিত্যান্ত দরকার এবং সমবায় সমিতি সহজেই তাহা করিতে পারে। অনুরূপ ভাবে কাটনি সম্প্রদায়ের জন্য ক্রীলচায়ের ব্যবস্থা করিলে চরকার কাটা নৃত্য অপেক্ষা উন্নততর নৃত্য পাওয়া বাইতে পারে। বুদ্ধের সময় কাঁচা বেশমের দর থাকায় পশ্চিমবঙ্গে মোট ১১৫টি ক্রীলচার সংকারী অর্থসাহায্য চলিত। বর্তমানে সে স্থলে ২০টিও আছে কি না সন্দেহ। তাহার পর আসে তন্তুবার সম্প্রদায়ের কথা। ১৯৫০ সালে প্রায় ৩০০০ সংকারী হিসাব অনুযায়ী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বেশমের বরন সংস্থা ছিল ৩২০০; বেশমের তাঁত—৫৮০৫, এবং পাওয়ার লুম ৭৭৫। তদুপরে মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ—বেশম বরন সংস্থা—১৬৭২; বেশমের তাঁত—২৬৮২ এবং পাওয়ার লুম ৩৫।

উপসংহারে পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "কাজেই মুর্শিদাবাদের বেশম শিল্প পুনরুদ্ধারিত করার জন্য বেশম সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্বন্ধে এ বাবৎ কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। নানা ব্যাপারে টাকা মিলিতেছে, মুর্শিদাবাদের মৃতপ্রায় বেশম শিল্পের কথা বলিলেই টাকার অভাবের কথা বলা হইয়া থাকে।"

### ডাক ও তার বিভাগের বাঙালী বৈষম্যনীতি

কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগ আসাম সার্কুলে কেবলী গ্রন্থ ব্যাপারে যে ভাষাগত নীতি গ্রহণ করেন তাহার ফলে তিন্দী অথবা অসমীয়া-ভাষী ভিন্ন আর কাহারও ক্ষেত্রে তথ্য চাকুরী গ্রহণ সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই বিভিন্ন স্থান হইতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে নির্দিকার থাকেন এবং জানাইয়া দেন যে, যদিও আসাম রাজ্য-সরকার কোনও ভাষাকে রাজভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা দেন নাই তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের নীতি পরিবর্তন করিবেন না।

কিছুদিন পরে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম আসাম পরিভ্রমণে গেলে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট অভিযোগ করেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের আদেশ সংশোধন করিয়াছেন, তবে তাহাতে বাঙালীদের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। সংশোধিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাক ও তার বিভাগের আসাম সার্কুলে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন বিভাগের আঞ্চলিক ভাষা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা :

(১) কামরূপ, গোয়ালপাড়া, গারোপাড়া এবং পাসিয়া ও ভরগুয়া পাড়া জেলাগুলি লইয়া গঠিত নিম্ন আসাম বিভাগ। এই বিভাগের আঞ্চলিক ভাষা রূপে স্বীকৃত হইয়াছে অসমীয়া, পাসী, গারো এবং তিন্দী।

(২) দাবাং এবং নগা জেলা লইয়া গঠিত মধ্য-আসাম বিভাগ—তথ্য আঞ্চলিক ভাষা অসমীয়া এবং তিন্দী।

(৩) লক্ষ্মীমপুর, শিবসাগর এবং নাগা পাড়া জেলা লইয়া গঠিত উচ্চ-আসাম বিভাগ—আঞ্চলিক ভাষা অসমীয়া এবং তিন্দী।

(৪) কাছাড়, লুসাই পাড়া, উত্তর-কাছাড় ও মিকির পাড়া এবং মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য লইয়া গঠিত কাছাড় বিভাগ—তথ্য আঞ্চলিক ভাষা অসমীয়া, মণিপুরী, লুসাই, তিন্দী এবং বাংলা।

(৫) ডাক-তার বিভাগের আসাম সার্কুলের গোঁহাটি আপিস—স্বীকৃত ভাষা অসমীয়া ও তিন্দী।

এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "বৃগ্গজি" লিখিতেছেন : "উচ্চ-আসাম, নিম্ন-আসাম ও মধ্য-আসামে বহুসংখ্যক বাঙালী বহিয়াছেন; তবুও বাংলা ভাষাকে সেখানে বাদ দেওয়া হইয়াছে। আসামে বাঙালীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার নূনাত্মক এক তৃতীয়াংশ। তবু দেখা যায়, ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বাঙালীদের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুঠাবোধ করিতেছেন। উপরি-উক্ত

এলাকার আসাম সরকার ও গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ডাক ও তার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এখানে বাঙালীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করায় কোন বৃত্তিসঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।”

“যুগশক্তি” আরও লিখিতেছেন, “ডাক ও তার বিভাগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান পদসমূহে বিভাগীয় কক্ষচারীদের প্রোমোশন ব্যাপারে ডি-পি-টির সাক্ষ্যে বাংলা ভাষাকে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আসামের অল্পতম ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাহা স্বীকার করা হইতেছে না—ইহা অকৃত ঠেকিতেছে না কি?”

সরকারী নির্দেশের কঠোর সমালোচনা করিয়া ২৭শে মার্চ “সুরমা” সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন, “আমরা এতদিন আসাম সরকারের সঙ্গীর্ণ নীতির সমালোচনা করিয়াছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিভাগ সম্পর্কে আমাদের তীব্র সমালোচনার আবশ্যক হয় নাই। একদা রেল কর্তৃপক্ষ সত্ত্বত: পাতুর চাপে পড়িয়া কাছাড় জেলার রেলের সাইনবোর্ডগুলিতে অসমীয়া লিপি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রতিবাদ জানাইবা মাত্র রেল কর্তৃপক্ষ তাহাদের ত্রুটি সংশোধন করেন। কিন্তু ডাকবিভাগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দপ্তরের এই ব্যবস্থা কেন?”

“এই ‘কেন’র জবাব খুঁজিতে গিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে মানফুনের চিত্র ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে। আসামের চেয়ে চীন এবং সঙ্গীর্ণতর নীতির পোষক বিহার সরকার তথায় তুসুং গান গাহিবার অপরাধে অতুল ঘোষ ও তাঁতার সহকর্মীগণকে দীর্ঘমেয়াদ কারাবাসে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁতাদের অপরাধ মাতৃভাষার প্রতি তাঁতাদের মমত্ব। যে ভাষার শিশু প্রথম মাকে ডাকে সে ভাষা রক্ষা করার জন্য অতুল ঘোষের নেতৃত্বে যে আন্দোলন দানা বাধিয়া উঠিয়াছে পশুপক্ষি প্রয়োগে বিহার সরকার তাহা ক্রটিতে উদ্ভত। যে রক্ত এই সঙ্গীর্ণতা শিক্ষা দিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান যোগাযোগ মন্ত্রী বিহারবাসী ঐকগর্ভীবন নামের ধমনীতে কি একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে—তাহা আমরা আকুল বিশ্বাসে ভাবিতেছি।”

প্রকাশ যে, প্রায় পনের হাজারেরও বেশি বাঙালী প্রার্থী চাকুরীর আবেদন করিয়াছে; কিন্তু সরকারী নির্দেশমত কেবলমাত্র কাছাড় বিভাগের ২০ হইতে ২২টি পর্য্যন্ত শূন্যপদের জন্য ইতাদের দরপত্র বিবেচিত হইবে। কলে বাঙালী যুবকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারীর ইংরেজী সাপ্তাহিক “ক্রনিকল্”—এর সংবাদে জানা যায়, যদিও কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগ হিন্দীর বিকল্প হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষারূপে গণনা করিবেন তথাপি বাংলাভাষার প্রায়সঙ্গত দাবী তাঁতারা মানিতে সম্মত নছেন।

আসামের বাঙালীদের উচিত এ বিষয়ে সংযুক্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁতাদের দাবী প্রেরণ করা। তাহাতেও যদি না হয় তবে

স্বাধীন কোর্টে মৌলিক অধিকার লইয়া আসাম সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা। বাঙালী সর্বত্রই মরিচতে সম্মত না হওয়ার কারণে।

## আসাম সরকারের বৈষম্যনীতি

বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসাম সরকারের বহুবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের সংবাদ আসে। সাপ্তাহিক “যুগশক্তি” এবং “ক্রনিকল্”—এর সংবাদ হইতে দেখা যায় এই আচরণ শিক্ষাক্ষেত্রে কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ১৫ই মার্চের “যুগশক্তি”র এক সংবাদে প্রকাশ ঐরজনপ্রসাদ সেনগুপ্ত নামক একটি বাঙালী ছাত্র গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার দশম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধে তাহাকে সরকারী বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ছাত্রটির পিতা আসামের এক জন রেলকর্মচারী। নগাঁ জেলার উত্তর লামজিতে তাঁতাদ পৈতৃক আবাস ও জিশ বিধা পরিমিত ভূমি রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

উক্ত পত্রিকার ৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যার প্রকাশিত আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, শিলচরে সরকারী সাতাষাঐশ্বর উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বাস্ত ছাত্রী ঐমতী সবিতা সিংহ, চিত্রা ঘোষ ও বেলা চৌধুরী গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার সমগ্র আসামের মধ্যে বর্ষাক্রমে ৭ম, ১১শ ও ১৪শ স্থান এবং কাছাড় জেলার বর্ষাক্রমে ২য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করে। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী—“কিন্তু দেখা যায় আসাম সরকার তাহাদিগকে বৃত্তি না দিয়া তাহাদের চেয়ে বাহায়া নীচে স্থান পাইয়াছে তাহাদিগকে বৃত্তি দিয়াছেন।

“ইতিপূর্বে মধ্যস্থল পরীক্ষার ঐমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য আসামে প্রথম স্থান ও শিলচরে চুনীলাল রায় প্রবেশিকা পরীক্ষার আসামে সপ্তম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে আসাম সরকারের বৃত্তিপ্রদান করা হয় নাই।”

২৬শে ফেব্রুয়ারীর “ক্রনিকল্” পত্রিকার প্রকাশিত আর এক সংবাদে দেখা যায় যে, “সিলেট ক্রনিকল্”—এর ভূতপূর্ব সম্পাদক ঐকালীকৃষ্ণ দেব ক্রোয়ারী পুত্র ঐবিমলেন্দু দেব ক্রোয়ারী গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এসসি পরীক্ষার চতুর্থ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আসামে ডোমিসাইল্ড নহে এই “অপরাধে” তাহাকে গৌহাটী কটন কলেজে ভর্তি হইবার অমু্যতি দেওয়া হয় নাই। অনেক বড় ঋণ্য পাব হইয়া এই বংসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চতুর্থ স্থান লাভ করিয়া এম-এসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

## ভোলানাথ কলেজ লটারী ও আসাম সরকার

কিন্তু আসাম সরকারের এই বৈষম্যনীতি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—শিক্ষারতনগুলির বিরুদ্ধে তাহা সমান উচ্চের সহিত প্রযুক্ত হইতেছে। ২য় ফাল্গুন

এক সম্পাদকীয় সম্বোধ্যে “বাতায়ন” পত্রিকা খুবড়ী ভোলানাথ কলেজের বিরুদ্ধে এই বৈষম্যমূলক আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে খুবড়ীর একমাত্র কলেজ ভোলানাথ কলেজে এতদিন কেবলমাত্র কলা বিভাগই ছিল, সম্প্রতি বিজ্ঞান বিভাগ খুলিবার পর প্রথম বার্ষিক প্রেষীতে বিজ্ঞান বিভাগে ৬০টি ছাত্রছাত্রী প্রবেশলাভ করিয়াছে।

কলেজের পক্ষে বিজ্ঞান বিভাগের জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলান অসম্ভব। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষ জেলাশাসকের নিকট কলেজ লটারীর প্রস্তাব করেন। কিন্তু জেলাশাসক সেই প্রস্তাবে অসম্মত হন।

“বাতায়ন” লিখিতেছেন, “আসাম উপত্যকার অধিকাংশ বেসরকারী কলেজ গড়িয়া উঠিয়াছে লটারীলব্ধ আয়ের উপর। আসাম উপত্যকার যে-সব বেসরকারী কলেজে বতবাব লটারী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

- (১) হুম্মান বক্স কানৈ কলেজ, ডিব্রুগড়—২ বার।
- (২) শিবসাগর কলেজ—৪ বার।
- (৩) জগন্নাথ বড়ুয়া কলেজ, জোড়হাট—অজ্ঞাত : ২ বার।
- (৪) দয়ঃ কলেজ—২ বার
- (৫) নওগাঁ কলেজ—২ বার
- (৬) রাধাকান্ত মন্ডিকৈ মহিলা কলেজ, গোঁড়াটি—২ বার।”

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, “গোয়ালপাড়া জেলার উপায়ুক্তের বিরুদ্ধে আমরা প্রকাশ্য অভিযোগ আনিতেছি, তিনি জেলার উপায়ুক্ত হইয়াও দলের উদ্দেশ্যে উঠিতে পাবেন নাই। খুবড়ী কলেজের ছাত্র সংখ্যা বেশি নচেৎ জেলার একটি কলেজই চলা যায়। এমতাবস্থায় খুবড়ীর মাত্র ছয় মাইল মধ্যে গোঁড়াপুরে তিনি একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অল্প পূর্বেই একটা বার্ষ প্রয়াস করিয়াছিলেন। ভোলানাথ কলেজ সম্পকে তাঁহার মনোভাব ইহাতেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।।...”

“আমাদেরই জেলার আগমনীতে, বালাজানে, রোকাখাতার ও বোকাই গাঁওতে প্রকাশ্য ভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া লটারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তখন উপায়ুক্তকে আমরা সক্রিয় দেখি নাই।।...”

### আসামের রাজ্যভাষা

• এই বার্ষিক “বৃগশক্তি”র সংবাদে প্রকাশ যে আসাম সমতল হইতে নির্মুক্তি আসাম ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীধরবীধর বসু-মাতারি অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করার সুপারিশ করিয়া পরিষদের বাজেট অধিবেশনে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। ১২শে ফেব্রুয়ারী শিলচরের প্রবীণ আইনজীবী শ্রীকৃষ্ণবীকুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিলচর বার এসোসিয়েশনের এক বিশেষ সাধারণ সভায় আসাম সরকারের ভাবানীতির তীব্র প্রতিবাদ জানান হয় এবং উক্ত সভার প্রস্তাবের নোটিশের সংবাদে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে সভা স্বেচ্ছায় পাইল, নোটিশ ইত্যাদি ব্যবহার সরকারী কাগজপত্রে ক্রমবর্ধমান অসমীয়া ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া ইহার প্রতিবিধানার্থ কাছাড়ের পরিষদ-সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মিজো ইউনিয়নের ( লুসাই জনগণের একটি সংগঠন ) কাৰ্য্য-করী সমিতি উপজাতীয়দের উপর বলপূর্ব্বক অসমীয়া ভাষা চাপাইবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ( “ক্রনিকল”, ১২শে ফেব্রুয়ারী )।

এই প্রসঙ্গে আসামের একমাত্র ইংরেজী দৈনিক “আসাম ট্রিবিউন” কলিকাতার বাতালী পরিচালিত পত্রিকাসমূহ এবং শিলচর বার এসোসিয়েশন প্রভৃতিকে যে অসম্মত ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন “বৃগশক্তি” তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

### আসামে কারা-সংস্কার

আসাম সরকার দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদিগকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। “বৃগশক্তি” এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সরকারের এই উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়া এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, “আসাম গবর্নমেন্টের এটি পরিকল্পনা শুধু কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ না থাকিয়া বাস্তবে পরিণত হইবে।”

কারা-সংস্কারের আসন্ন প্রয়োজনীয়তার উপর ভেদ দিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন : “আমাদের দেশের কারাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে-সব অপরাধী এক বার কোন দুঃখের জন্য কারাকক্ষে প্রবেশ করে সারা জীবনের জন্য তাহাদের ললাটে অপরাধের পঙ্ক-তিলক চিহ্নিত হইয়া থাকে। কারাগারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবেষ্টনী ও অজ্ঞান দুর্বৃত্তদের সাহায্যে তাহাকে অপরাধপ্রবণতার আরও প্ররোচিত ও দক্ষ করিয়া তোলে।” কারামুক্তির পর ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশও অপরাধীকে সংপর্বে চলিতে বিশেষ সাহায্য করে না। “সজ্জন সমাজ তাহাকে বর্জন করে—নানা কারণে তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।” এই সকল বিভিন্ন অবস্থায় সম্বন্ধে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ভাষা হইয়া পুনরায় সেই পঙ্কিল আবর্তে নামিয়া পড়ে।

মনস্তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যপ্রকৃতি লইয়া যদি অপরাধীদের বিচার করা হয় তবে অধিকাংশক্ষেত্রেই অপরাধের উৎস প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নানাবিধ ক্রটিব মধ্যে নিহিত দেখিতে পাওয়া বাইবে। এই কথা স্বরণ রাগিলে কারাগারগুলিকে শুধু শাস্তিপ্রদানের কেন্দ্ররূপে না ভাবিয়া সংশোধনাগাররূপে পরিচালিত করা প্রয়োজন। এবং এই উপায়েই অপরাধীদিগকে পুনরায় সং সামাজিক রূপে কিরিয়া পাওয়া সম্ভব।

অপরাধের অন্ততম প্রধান কারণ দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। তাই “বৃগশক্তি” লিখিতেছেন : “কারাগারে চবিত্ত সংশোধনের মত উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাার্জনের জন্য কতকগুলি



অর্থকরী বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইচ্ছাতে বন্দীরা আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে। যেমন—ভাতের কাজ, সূতা বঁ ও খোলাই, কাপড় ছাপাইবার কাজ, সেলাই, সূতা তৈরী, চামড়ার স্টকেশন তৈরী, স্বত্বধরের কাজ, ছাপাপানার কাজ, বই বাধার কাজ, কাপড় কাচার কাজ, সাবান তৈরী, শ্রাষ্টিকের জিনিষপত্র তৈরী ইত্যাদি।” বন্দীদিগকে রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত করা হইবে যাচাতে কারাগারের বাহিরে জীবিকা-জ্ঞানের সচল পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইতে পারে।

### অজ্ঞানতার চিত্রাবলী সম্পর্কে গ্রন্থ

“মার্কিনবার্তা”র সংবাদে প্রকাশ রাষ্ট্রসম্ম শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা বিষয়ে বিশিষ্ট হুস্তাপা শিক্ষকলার সচিত্র জনগণের পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে নতুন বিশ্বশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ হইবে ভারতের অজ্ঞানগুস্তার চিত্রাবলীর একটি সংগ্রহ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জিনেচকর ভূমিকা-সম্বলিত এই পুস্তকে ৩২টি বঙ্গীয় চিত্র থাকিবে। গ্রন্থটির নাম “ভারত অজ্ঞানগুস্তার চিত্রাবলী।” ইংরেজী, কন্নড়ী, ইটালীয়, স্পেনীয় ও জাফান ভাষার গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবে।

রাষ্ট্রসম্ম শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার মাসিক মুখপত্র “কুরিয়ার” পত্রিকায় এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া আরও বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞানগুস্তার ক্রোডোগুলি চারুকলার ইতিহাসে অবিদ্যার। উক্ত পত্রিকায় অভিযন্তে এশিয়ার শিক্ষকলার ইতিহাসে অজ্ঞানতার চিত্রাবলীর স্থান সর্বোচ্চে। ইউরোপীয় শিক্ষকলার ইতিহাসে ইটালীর ক্রোডা যেমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, এশিয়ার চিত্রকলার ইতিহাসে অজ্ঞানতার স্থানও সেইরূপ।

অজ্ঞান গুস্তা চিত্রাবলী সম্পর্কে অম্বাধের সরকারী বিভাগের কর্তব্য অনেক আছে। এগুলি বধ্যবন্যভাবে বক্ষিত হইতেছে না। এই সময়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডাকটরা উচ্চর বক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত।

### পরমাণবিক তথ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

“মার্কিনবার্তা”র সংবাদে আরও প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার “যুক্তরাষ্ট্র ও স্বাধীন বিশ্বের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে” যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণবিক সংক্রান্ত আইনসমূহ সম্পাদন করিবার জরুরী কংগ্রেসের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বনের জরুরী সুপারিশ করেন, যথা :

“প্রথমতঃ পরমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ে দ্বিধা-বর্গের সঙ্গে আরও ব্যাপক সহযোগিতা।

“দ্বিতীয়তঃ পরমাণবিক তথ্য পরিবেশন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আরও উন্নততর ব্যবস্থা।

“তৃতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণবিক শক্তির শান্তিকামী ব্যবহার বৃদ্ধির কার্যে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির যোগদানে উৎসাহদান।”

এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মন্তব্য করেন যে পরমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসম্মের সাধারণ পরিষদের বক্তৃতায় যে প্রস্তাব তিনি গত ডিসেম্বর মাসে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার সহিত উল্লিখিত সুপারিশসমূহের কোন সম্পর্ক নাই।

### শততম মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার

“মার্কিনবার্তা”র অপর এক সংবাদে প্রকাশ, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকগণ শততম মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ইউরেনিয়াম আবিষ্কারের পর এই অষ্টম মৌল আবিষ্কৃত হইল। যাত্র দুই মাস পূর্বে ৯৯তম মৌলটির আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হয়। দুইটি মৌলের কোনটিরই এখন পর্যন্ত নামকরণ হয় নাই। শততম মৌলটির গুণন অসঙ্গত মৌলের তুলনার সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহা অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় এবং অতি দ্রুত ক্ষয় পাইয়া যায়। এই পদার্থটির অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

ইউরেনিয়ামের পর বর্তমান মৌল আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সবগুলিই কৃত্রিমভাবে সাইকোট্রন যন্ত্র অথবা অণুবিভাজনের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে। শততম মৌলিক পদার্থটিও অম্লরূপ ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

### রক্ত বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ

১০ই মার্চের “হিন্দুবাদ” পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, জলপুরে আগত কতিপয় মাদ্রাজী এবং অন্যান্য স্থানীয় হাসপাতাল-গুলিতে রক্ত বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ভর করিতেছে। “হিন্দুস্থান সমাচার” পত্রিকার সংবাদমাতার নিকট তথ্যেরা বলে যে, অল্প কোন-রূপ কর্মের সংস্থান না হওয়াতেই তাহারা এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের প্রতিবার তিন আউল করিয়া রক্ত দিতে হয় এবং পরিবর্তে তাহারা ২৫ টাকা করিয়া পায়। এই সকল বেকার ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও আছে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য যন্ত্র পরিচালনেও সক্ষম। কিন্তু তাহারা কোন কাজ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

লেখকগণের লেখা কেবল লটতে হইলে লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকা আবশ্যিক। কোন-কিছুর উত্তর পাইতে হইলে তাহারা অগ্রপূর্ণক যিলাই-কার্ডে চিঠি লিখিবেন। কবিতা বাহারা পাঠান তাহাদের প্রতিও এই অনুরোধ। তবে তাহারা দয়া করিয়া কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। বুকপোটে প্রেরিত লেখা সব সময় আগিসে নাও পৌঁছাইতে পারে।

পত্রিকার গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, কাগজ-অগ্রাণ্ডি, ঠিকানা পরিবর্তন, টাকাকড়ি প্রার্থনা সংক্রান্ত চিঠিপত্র ‘ম্যানেজার, প্রকাশী’র নিকট প্রেরিতব্য।



# রবীন্দ্রনাথের ‘ধর্মচিন্তা’ ও ‘ধর্মবোধ’

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

আমাদের দেশে বঙ্গভাষায় সমালোচনা-সাহিত্য আঞ্চলিকতার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই বলা যায়। তথাপি ইহা অবশ্যস্বীকার্য যে রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এবং তাঁহার পরও কোনও কোনও লেখক প্রবন্ধাদিতে যথার্থ সমালোচনাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত সমালোচনাজ্ঞানের অভাবেই ইউক বা সমালোচনা প্রবন্ধ-প্রদর্শিত ত্রুটি উপেক্ষা করিয়াই ইউক, অথবা অনেক লেখক কোনও কবি, কথাসিদ্ধী কিংবা নাট্যকার সম্পর্কে তাঁহাদের রচনাবলী ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত মত শিল্পীগণেরই ব্যক্তিগত মত বলিয়া প্রচার করেন ও তাহা পাঠ করিয়া অনবহিত সাধারণ পাঠকবর্গ ভ্রান্ত পথে চালিত হন। সাহিত্যশিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিষয় জ্ঞানবিহীন কোতুলক সকল দেশেই সাধারণ পাঠকবর্গের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যবাসিক সমালোচকগণ এই প্রকার কোতুলকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই; কারণ এই প্রকার কোতুলক শুধু যে অর্থহীন তাহাই নহে, অনেক স্থলেই উহা পাঠকের পক্ষে শিল্পী-প্রদর্শিত উন্নততর জীবনদর্শনের পথে আকৃষ্ট হওয়ার পরিপন্থী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজী ভাষায় ব্যঙ্গ পদ্যরচনার জন্মদাতা, এডিসন (Steele-এর সহযোগিতায়) যে সুপ্রসিদ্ধ স্পেক্টেটর পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাহার প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভিক বাক্যই সমসাময়িক সাহিত্যজগতে প্রচলিত এই প্রকার কোতুলকেই ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন:

“I have observed, that reader seldom peruses a book with pleasure, till he knows whether the writer of it be a black or a fair man, of a mild or choleric disposition, married or a bachelor, with other particulars of the like nature, that conduce very much to the right understanding of an author.”

তৎকালে এডিসন যাহাকে সাহিত্যরস-সম্ভোগ শিক্ষার ক, খ বা গোড়ার কথা মনে করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত বাক্যটির শেষাংশেই বক্তৃতবে বলিয়াছেন—“that... author”, অর্থাৎ (সোজা কথায়) ‘যাহা গ্রন্থকারের রচনার যন্ত্রোপলব্ধির পক্ষে একেবারেই আবশ্যক নহে’। ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সেক্সপীয়রের নাট্যকাবলী ও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন। এই মহাশিল্পীর ভক্তগণ দুই শতাব্দীরও অধিককাল পরিশ্রম এবং গবেষণা করা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কিত অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু এই জ্ঞানের অভাবে উক্ত বিষয়বিশিষ্ট মূল্য-

ীয় নাট্যকাবলী হইতে তদীয় অসাধারণ স্বজনী প্রতিভা,

মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণক্ষমতা প্রভৃতি নানা গুণাবলীর সম্যক পরিচয়-লাভের পক্ষে কোনও অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। তদীয় অধ্যাত্ম ব্যক্তিজীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ সম্বন্ধে পরবর্ত্তীকালের গবেষণা ও অনুসন্ধান লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য মনীষী এমার্সন লিখিয়াছেন:

“But whatever scraps of information concerning his condition these researches may have rescued, they can shed no light upon that infinite invention which is the concealed magnet of his attraction for us. Shakespeare is the only biographer of Shakespeare. Yet with Shakespeare for biographer we have really the information which is material, that which would most import us to know.”

সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের জায় মহাশিল্পীর নাট্যকাবলী অথবা উপন্যাসাদি পাঠ্যে, উহাদের কোনও কোনও চরিত্র অবলম্বনে শিল্পী তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভাব, জীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ব্যক্ত করিয়াছেন—এইরূপ ধারণা সাধারণ পাঠকের মনে জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়; কারণ যে শিল্পী শতাব্দিক বিভিন্ন চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তন্মধ্যে কোন কোনটির রচনাকালে তাঁহার তৎকালীন কোন কোন মনোভাব, ইচ্ছাপূর্বকই ইউক বা অজ্ঞাতমারেই ইউক, ব্যক্ত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু ইহা ধারণা মাত্র থাকিতে হইবে। এই অনুমান সত্য কিনা তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে শিল্পীর জীবনের প্রমাণিত রচনাবলী হইতে অথবা তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে সুবাস্তু মত সাহায্য (যাহাকে External evidence বলা যায়) পাঠকের ধারণাকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর বিষ্ময় ইংরেজ সমালোচক এ. সি. ব্রাডলি বলিতেছেন:

“...For we may lay down at once the canon that impressions derived from the works must supplement and not contradict this evidence, so far as it appears trustworthy.”

ইহার কারণ এই যে, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন বা মতামত সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণার উদয় হয় তাহা অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাব বা ইচ্ছাপ্রসূত—ইহা অনেক প্রমাণ সাহিত্যক্ষেত্রে অতীতে পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও বাহ্য পাওয়া যায় তাহার নিদর্শন ভিত্তি করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। আমাদের অপেক্ষা বহুপরিমাণে সমালোচনা-শাস্ত্রে অগ্রসর ইংরেজী সাহিত্যের অধুনাতম শ্রেষ্ঠ সমালোচকদিগের প্রদর্শিত পথ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলা সমালোচনায় অনুসৃত হইতে দেখি না। এমনকি সাহিত্য-

সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজের মত যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও অনেক প্রবন্ধ লেখক মানিয়া চলেন বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত যে বিদ্যাপীঠ আমরা সাহিত্যচর্চা-ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় রূপে দেখিয়া আসিয়াছি ও এখনও দেখিতে চাই; অতি ৬০ খণ্ড সহিত বলিতে হইতেছে তাহা হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত “রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা” নামক প্রাবোধচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিত একটি প্রবন্ধে ও তৎপ্রকাশিত মতাদির সমর্থনকার উক্ত লেখক কতক উদ্ধৃত জীপ্ৰভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক “রবীন্দ্র জীবনী”র অনেক স্থানে প্রকৃত সমালোচনারীতির দ্বারা ত্রুটি দোষ দোষিত পাই।

রবীন্দ্রনাথ উচ্চস্তরের ধর্মসাধক ছিলেন ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখকদ্বয় বাক্য করিয়াছেন। আমরাও এই মত পোষণ করি। কিন্তু কোন্ নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি “মতঙ্গ্য মতঙ্গ্য”কে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্মের সাধনপ্রণালীর সহিত তাহার কতটা মিল ছিল, কতটা ছিল নাক তাহাও তত্ত্ব “নিহিতং গুহ্যং”ঃ উহা রবীন্দ্রনাথের সহিত অতি খনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অনেক ব্যোমক্লান্ত ব্যক্তিও তাহার জীবিতকালের মধ্যে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে ধর্মের আদর্শ, ধর্মরাজ্যে প্রবেশলাভের উপায়, ধর্মের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য, ব্রাহ্মসমাজের সাধকতা প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাহার লিখিত মত ও উপদেশ বর্তমান এবং অনাগত কালের জন্য তাহার অমূল্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন; ইহা ছাড়া তাহার ধর্মসম্বন্ধমাল্যও আছে। এইগুলি হইতেই কবির “ধর্মচিন্তা”র পরাঙমুখী আমাদিগকে জানিতে হইবে। কারণ গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সমন্বিত প্রবন্ধেই শিল্পী তাহার ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তব্য বা মতাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন, স্বরচিত উপন্যাসে কিংবা নাটকে নয়; একথা কবি নিজেই বলিয়াছেন, “তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ”ঃ কিন্তু জীবনচরিত-লেখক প্রভাতবাবু “গোরা” উপন্যাসের শিল্পী কর্তৃক গোরা'র মুখে প্রদত্ত বাক্য, ও উপন্যাসের অন্ত্য অংশ হইতে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কি ছিল তাহাও সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাবোধচন্দ্র সেন মহাশয় প্রভাতবাবুরই নির্দেশ অনুসরণ করিয়া “রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার” এক অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের ছয়টি

ভাগ। তন্মধ্যে প্রথমটি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি ভাগেই লেখক রবীন্দ্রনাথের ধর্মের আদর্শ যে এক অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে বাক্যাবলী সংগ্রহ দ্বারা বিবৃত করিয়াছেন। ইহা লেখকের অন্ততম প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই যে তত্ত্বকথাটির অবতারণা করিয়াছেন তাহা এই—রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গী ও সাম্প্রদায়িক পরিবেশের মধ্যে বহিত হইলেও তাহার গতি কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন ব্রাহ্মধর্মের বাহিরে এক অসাম্প্রদায়িক ধর্মে। লেখকের ঋণ মনোভাবপ্রসূত এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্যই প্রথম ভাগটির অবতারণা এবং এই মনোগত ভাবেরই প্রেরণায় যে লেখক প্রবন্ধের অবশিষ্ট পাঁচটি ভাগে একাধিক লেখক কর্তৃক আলোচিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্পষ্ট ভাষায় প্রথমাবধি প্রচারিত বিষয়টির পুনরাবতারণা করিয়াছেন ইহা সুস্পষ্ট। প্রবোধবাবু লিখিতছেনঃ

সব মাহুঘেরই একটি জন্মগত ধর্ম থাকে। তার আধ্যাত্মিক বিকাশ স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির অস্থায়ী নয়, জন্মলব্ধ ধর্মেরই অস্থায়ী। সে ধর্ম আবার গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত... রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিক ধর্ম ব্রাহ্মধর্ম; আদি ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশে তার শিক্ষা দীক্ষা। কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সঙ্গীও গড়ির মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকবার মত মন নিয়ে তিনি জন্মান নি।... তার মুক্তিকামী চিত্তে যে দীর্ঘকাল সাম্প্রদায়িক সঙ্গীতের সীমায় বন্দী থাকতে পাবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। (ক) তার ব্রাহ্মধর্মের গতি কেটে বেরিয়ে আসার প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই “গোরা” উপন্যাসে (১৯১০)। (খ) এই প্রথের মূল কথাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ শেষেছে তার একবারে শেষ অধ্যায়ে গোরা'র দু-একটি উক্তি—(গ) “আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।... আমাকে আজ সেই দেবতার মত দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, ... যিনি কেবল হিন্দু দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।” দেখা যাচ্ছে ‘গোরা’ রচনার কালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মবোধকে বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গীত থেকে মুক্ত করে সর্বসম্প্রদায়ের উদার ও বিশ্বজনীন ভূমিকার উপরে স্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতকার জীপ্ৰভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য।—

“রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করলেও ব্রাহ্মসমাজের গতি ধীরে ধীরে কাটিয়া ফেলিতেছিলেন। (ঘ) তাহার কাছে স্বদেশিকতার উগ্রতা যেমন বার্ষ, ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিকাটা ধর্মও যেমন নিবর্ণক। গণ্ডিকাটাই তাঁর কাছে অসত্য এবং এই গণ্ডি ভাঙাই হইতেছে তাঁর জীবনের আদর্শ ও সাহিত্যের বাণী। গণ্ডি

\* বিশ্বভারতী পত্রিকা, জীবন-আবদান ১০৫২

† দ্বিতীয় রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড—“রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজস্ব”, পৃ. ৭; ১৮৪ পৃ.

‡ রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, “চার অধ্যায়” ৫৪৫ পৃ.

বতই মোহন নামে মানুষের কাছে আত্মক, দেশের নামে, ধর্মের নামে—কবির মনে তাহা সায় পায় না। তিনি সেই গণ্ডির মধ্যে বাস করিয়া এককালে তাহার জয়গান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন খাচা বতই সুন্দর হোক, আকাশ সুন্দরতর।... রবীন্দ্রনাথ গোরা সচরিতা ও পদেশ বাবুকে যেখানে বাতির করিয়া আনিলেন, তাহা মানুষের ধর্মের উদার ক্ষেত্র—সেখানে তাহারা হিন্দুও নহে, ব্রাহ্মও নহে, খৃষ্টানও নহে—তাহারা মানুষ।”

প্রবোধবাবুর মন্তব্যের প্রথম বাক্যটিই আপত্তিকরক মনে হয়; কেননা উহার অর্থ এই প্রকার দাঁড়ায়—মানুষের ‘জন্মলব্ধ ধর্ম’ যাদের বিশ্বাস স্থায়ী হয়, তাদের সেই বিশ্বাস ‘স্বাধীন বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী’ হইতে পারে না—এই প্রকার মন্তব্য কি সকলের পক্ষেই সাধারণ ভাবে খাটে? ইহার পর বিচার করা যাউক তাঁহার (ক) ও (খ) চিহ্নিত পূর্বেদ্বিত বাক্য দুটির। উচ্চাঙ্গ সাহিত্য-সমালোচনা দ্রুতির কষ্টিপাথরে এই প্রকার “সুস্পষ্ট প্রমাণ” যে মকি বা ভ্রান্তিমূলক বিবেচিত হয় তাহা সাহিত্যিক মাত্রেরই জানা আছে। বিশেষতঃ বর্তমানক্ষেত্রে লেখক যখন উপজ্ঞাসোক্ত বাক্যের ভিত্তিতে গঠিত তাঁহার মতের সমর্থনকল্পে কোনও বাহ্য প্রমাণ—ব্রাউলির মতে যাহা সাহিত্য সমালোচনা একটি ‘canon’, উপস্থিত করেন নাই তখন আমরা তাঁহার ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’-যুক্ত সিদ্ধান্তকে পূর্বকথিত স্বীয় মনোভাবপ্রসূত অনুমানমাত্র বলিব। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ অল্পমিতি পোষণ বিরল নহে; এ যাবৎ সেম্পায়রের সম্পর্কে এইরূপ বহু ভিত্তিহীন অনুমান করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা সাহিত্য-শিল্পের শুণু সৌন্দর্য্য-সম্বোধে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না, শিল্পীর ব্যক্তিগত মত সম্পর্কে তাহারা যে নিজস্ব মত পোষণ করেন তাহার সমর্থনে তাঁরা চান শিল্পীস্বষ্ট চরিত্রযুগে নিজ নিজ মতানুযায়ী কথা শুনিতে :

“Who challenge a poet to deliver a short statement of his doctrine or creed. To positive and rigid natures the roundness of the world is bewildering; and when they meet with anything that does not fit into their scheme, they do not “as a stranger give it welcome.” (Raleigh)

এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। গোরাবর মুখনিঃসৃত একটি কথা হইতেই প্রবোধবাবু তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় মনে করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু ‘গোরা’ উপজ্ঞাসের অন্ত্যস্ত চরিত্রের (বিশেষতঃ আদর্শ ব্রাহ্মচরিত্র পদেশবাবুর) যে সকল বাক্য তাঁহার অনুমানের বিপক্ষে যায় সেগুলি বর্জন করিয়াছেন। সকলেই এ কথা জানেন যে, শিল্পী যখন একটি চরিত্রকে ক্রমে ক্রমে তাহার বাক্য ও কার্য দ্বারা বিকশিত করিতে থাকেন, তখন তাহার

মুখে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত বাক্য দেন এবং এই সকল বাক্যের মধ্যে অনেক সময় আমরা শিল্পীর গভীর চিন্তা বা ইন্টুইশন লব্ধ সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু এই সকল সত্য শিল্পীর জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনার অভিজ্ঞতালব্ধ মনে করিলে ভুল করা হইবে :

“His brilliant general statements of truth are sudden divinations...sparks thrown out into the darkness from the luminous centre of his own self-knowledge. But if we attempt to argue backwards and to recreate his personal history from a study of his cosmic wisdom, we fall into a trap.

এই সমালোচনা-বাক্যের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথেরই একটি মন্তব্যে।—“সোনার তরী” কবিতার কল্পনাকাল প্রাণ ও রচনাকাল ফাঙ্কন, এ সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণেয় উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, “তুমি পল্লিক মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে চাও ত বিপন্ন হবে।” \* কোনও প্রকৃত শিল্পীর কাব্য, নাটক বা উপজ্ঞাস হইতে আমরা যদি স্বীয় ধারণার সমর্থনসূচক বাক্য সংগ্রহপূর্বক তাহার সহিত শিল্পীর জীবনের ঘটনার যোগস্থাপনের চেষ্টা করি তাহা হইলে অনিশ্চিত বা বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনায় পতিত হই। সাক্ষি তিন শতাব্দী পূর্বে সেক্সপীয়র যে সকল উজ্জ্বল তদীয় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রযুগে দিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সার্বজনীন সত্য হিসাবে, প্রবাদবাক্য রূপে শিক্ষিত-সমাজে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন *Hamlet* নাটকে জামলেট-এর মুখে প্রদত্ত “There are more things in heaven and earth...philosophy”—এই বাক্য হইতে কোনও সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তি কি এই সিদ্ধান্ত করিবেন যে নাট্যকার অস্বরূপ কোনও অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা নাটকটি রচনার পূর্বে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন? অথবা যখন *As you Like It* নাটকে নাট্যকার বৃদ্ধ ভৃত্য এন্ডামের মুখনিঃসৃত বাক্যে সকল বৃদ্ধ লোকের অভিজ্ঞতালব্ধ মন্যকথা শুনাইলেন—“unregarded age in corners thrown” যাহার মধ্যে এমন একটি “personal note” (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুর) আছে যাহা হইতে মনে হয় এ কথা কেবল ভুক্তভোগী বৃদ্ধ লোকই বলিতে পারেন—তখন ঐ বাক্য হইতে যদি কোনও পাঠক সিদ্ধান্ত করেন, নাট্যকার উক্ত বাক্য রচনার সময়ে বা তৎপূর্বে নিশ্চয়ই বৃদ্ধিকে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা কি মারাত্মক ভুল হইবে না, যেহেতু তাঁহার বয়স্কতন তখন ন্যূনাত্মক পর্যায়ে বৎসর মাত্র? এন্ডামের মুখে প্রদত্ত বাক্যের

\* ‘বচনাবলী’, তৃতীয় খণ্ড, ঐশ্বর্য পত্রিকা

পশ্চাতে নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল মনে করা শুধু যে গুরুতর ভ্রম তাহাই নহে, উহা দ্বারা শিল্পীর স্বজনীপ্রতিভা ও গভীর অন্তর্ভূতি-শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেখা হয়। সেইরূপ, গোরা, পবন, বরদাসুন্দরী ইত্যাদি চরিত্র সৃষ্টি এবং তাহাদের বাক্যের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা বস্তুমান ছিল মনে করা একই প্রকার ভুল অনুমান; অধিকন্তু ইহা দ্বারা রবীন্দ্রনাথের স্বজনী প্রতিভাকে ধ্বংস করিয়া দেখা হয়। কারণ, কবি গ্যার্ডিন-ওয়ার্ল্ড-এব ভাষায় :

"He (the poet) has acquired a greater readiness and power in expressing those thoughts and feelings which arise in him without immediate external excitement."

কঠিনক স্বেচ্ছস্পীচের সমালোচক এই প্রকার ভ্রান্ত পথ চালিত সমালোচনা পদ্ধতি করিয়া বলিয়াছেন,

"Hamlet, the perplexed and brooding Shakespeare? Prosperous, the calm and royal Shakespeare? It might seem so were Shakespeare less myriad-minded than Coleridge called him, but that Shakespeare, feeling in his own heart and brain the passions of his creatures, should have portrayed them is almost incredible."

রবীন্দ্রনাথও তদীয় উপগ্রাস "চার অধ্যায়" সম্পর্কে প্রবোধবাবুর মন্তব্যের অনুরূপ শিদ্ধান্তের ঠিক উক্ত প্রকার উত্তর নিবেদিত করিয়াছেন; কিন্তু কে বা তাহা মনোযোগের সহিত পড়েন, অথবা পড়িলেও, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনাকালে তৎপক্ষ অবহিত হইয়া সংযতভাবে চিন্তা করিয়া লেখনী চালনা করেন:—"ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রে সমর্পনের জন্ত এই সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করেন এ সকল মতের কোন কোনটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলক "এহ বাহা।" এ কথাটা মিথ্যা হলেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হলেও তাই।\* কোন মত প্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে তা হলেই সেটা হবে অপরাধ। যদি কোন অধ্যাপক কোন দিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে জামলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গী কবির নিজের, সেটা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হাস্যবৃদ্ধি হয় না। তার নাটকে কোথাও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব কোনও ইচ্ছিতে প্রকাশ পায় নি এমনতর অবিচ্ছিন্ন কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার দ্বারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না। তর্ক ও উপদেশ সাময়িক প্রবন্ধের উপকরণ।"† "গোরা", তথা অন্যান্য উপগ্রাস এবং নাট্যকাহির কোনও

চরিত্রসৃষ্টির মূলে শিল্পীর নিজ মত ব্যক্ত হয় এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না, যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, চরিত্রগুলি শিল্পীর জীবনের রচনাকালীন কোনও বিশিষ্ট মনোভাব বা মতকে একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের চিহ্ন দিয়া তাহাকে শিল্পী-জীবনের একটা 'ল্যান্ডমার্ক' করিয়া রাখিয়াছেন।\* এইরূপ মতপ্রকাশ দ্বারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়। আবার ইহা দ্বারা মনে শিল্পীর "নিজের ব্যক্তিত্ব কোনও ইচ্ছিতে প্রকাশ পায় নি" এ কথা যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না (উদ্ধৃত ও ইচ্ছিত্র জটিল), কোনও ইংরেজ সমালোচকও এ কথা বলেন নাই। কিন্তু সেই সংশয়ে তাহারাই ইহা বলেন যে সাময়িক মনোভাবের এই সম্ভাবনীয় ছায়াপাত শিল্পীর জীবন স্মৃতি হইতে অচিরেই মুছিয়া যায় ও গিয়াছে।

"But the generative moments between experience and his soul have passed away beyond recovery, as they were many of them lost to his own remembrance long before he died. What remains is the child of his passion, and the child is immortal." (Raleigh)

যাহারা মনে করেন "গোরা" রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের ছায়াপাত উপগ্রাসের স্থান বা চরিত্রবিশেষে হইয়া থাকিবে তাহাদের এই উদ্ধৃত বাক্যটি সম্বন্ধে অবহিত হইতে অন্তরোধ করা যাইতেছে। গোরা চরিত্র শিল্পীর "immortal child of passion", কিন্তু গোরা বাক্য শিল্পী-জীবনের কোনও অভিজ্ঞতার 'ল্যান্ডমার্ক' নহে।

২

এইবার আমার প্রবোধবাবুর প্রবন্ধের অন্ত্যস্ত বিষয়বস্তুর বিচারে আসিব। গোরা যে উক্তিটিতে "এই গ্রন্থের মূল কথাটি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে" বলিয়া প্রবন্ধ-লেখক মনে করেন ( 'গা চিহ্নিত "আমাকে আজ...তারতবর্ষেরই দেবতা") তাহা ঠিক গোরা মনোভাবেরই উপযুক্ত, এজন্য তাহার মুখে দেওয়া হইয়াছে;† কারণ গোরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে অ-হিন্দুর সমাজ বলিয়াই বুঝিয়াছে; সে জানিয়াছে ব্রাহ্মের দেবতা ও হিন্দুর দেবতা পৃথক, "ব্রাহ্মধর্ম একটা ধাপছাড়া ধর্ম"; সেইজন্য 'ব্রাহ্ম' শব্দকে 'হিন্দু' শব্দ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বলিয়া আসিয়াছেন; "গোরা" প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পরে তিনি ১৩১৯ সনে প্রকাশিত "আত্ম-

\* যেমন, "তার ব্রাহ্মধর্মের গণি কেটে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট প্রমাণের" সময় ১৯১০।

† "ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্র সমর্থনের জন্তে এই সব মত"—প্রবোধ ববু, 'গ্রন্থ পরিচয়'

\* "He wrote his plays."--Raleigh (Shakespeare)

† "ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্র সমর্থনের জন্তে এই সব মত"—প্রবোধ ববু, 'গ্রন্থ পরিচয়'

পরিচয়" প্রবন্ধেও তাহার বিষয়বস্তু লইয়া যে প্রতিবাদ হয় তাহার প্রত্যুত্তরে এ সম্পর্কে তাঁহার মত চূড়ান্ত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—“ব্রাহ্মসমাজকে আমি হিন্দু সমাজের ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি”; “হিন্দু ব্রাহ্মর চিন্তাই” ইত্যাদি বহু বাক্য আছে, উহাদের উদ্বৃতি নিম্নরোজন। সুতরাং গোরা-চরিত্রের উক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বায় মনোভাব-প্রকাশক হইতে পারে না; গোরা-এই উক্তির মধ্যে শিল্পীচরিত্রের গোরা-চরিত্রের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিভ্রান্তিকর মনোভাব শেষ সময়েও উঁকি দিতেছে, ‘বচারশীল পাঠক উহা ধরিতে পারিবে। এইজন্যই এই বৎসর পরে লিখিত জাতীয় সঙ্গীতে দেখি—“হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসীক, মুসলমান, খ্রীষ্টানী”—ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ নাই। তারপর, ‘মি। ভারতবর্ষেরই দেবতা’ উহাও গোরা-উপযুক্ত কথা, রবীন্দ্রনাথের হইতে পারে না। ব্রাহ্মের “সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ”; কিন্তু তাহার সাম্যমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও আজ পর্যন্ত সকলেই যে দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছেন তাহাকে ‘বিশ্বদেবতা’, ‘বিশ্বপতি’, ‘অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি’, ‘ঈশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং’ ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করিয়া থাকেন; আর প্রবোধবাবু ব্রাহ্মদের সংকীর্ণ গণ্ডির বহির্ভূত উদার বিশ্বজনীন ধর্মের বাক্তি গুলিলেন গোরা-র মুখে প্রদত্ত যে দেবতার নাম ‘তাহা হইল “ভারত বর্ষের দেবতা”; সুতরাং কি প্রমাণ হইল?—a part is greater than the whole or the Infinite!

এই প্রসঙ্গে প্রকৃত কথা এই যে, প্রবোধবাবু কতক উদ্ভূত প্রভাবাবু লিখিত সমালোচনায়ই আছে—“তাঁহার কাছে আদর্শিকতার উগ্রতা যেমন ব্যর্থ...” (‘দ’ চিত্রিত বাক্য)। গোরা-চরিত্রের এই ‘উগ্র আদর্শিকতা’র মোহ সত্যজনও কাটািয়া উঠিতে পারেন নাই—পারা সম্ভবও নয়, এখানে শিল্পীর চরিত্রাঙ্কনের স্বাভাবিকত (natural touch) দেখিতে হইবে। সুচরিত্রের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ গোরা-কে ‘তাঁহার হিন্দুজানীর গুচিভাঙ্গার অগলটি ভাঙিয়া দিয়’ হিন্দু ও ব্রাহ্মকে এক ভারতসম্মী জাতির অন্তর্গত বলিয়া ‘ভারত বর্ষের দেবতা’র চরণে মিলিত হইতে প্ররোচনা করিয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকে এক বিশ্বপিতার সন্তানরূপে দেখিবার মত সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি আজিও এই একান্ত সাক্ষাৎ ভিন্নানী দেশপ্রেমিকের ধোলে নাই। সে দৃষ্টি আছে আদর্শ ব্রাহ্ম-পরোপকার। এজন্য রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসখানির শেষ কথাটি এই ভাবে লিখিয়াছেন, “তখন গোরা সুচরিত্রকে লইয়া পরেশকে প্রণাম করিল”। এ প্রণাম শুধু দম্পতিরূপে মিলনাকাজক্ষীর গুরুজনের আশীর্ব্বাদলাভের জন্য

প্রণাম নয়; পরেশের উদার সার্বজনীন ধর্মভাবের নিকট অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির নতিস্বীকার। এই জন্যই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গোরা-চরিত্রের নাটকীয় ব্যর্থতা (dramatic foil) দেখাইয়া পরোপকার চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা উজ্জলতর রূপে ফুটাইয়াছেন। গোরা-র উল্লিখিত কথায় রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে বলিলে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিক আদর্শকেই থকা করা হইবে। দুই বৎসর পরে তিনি জাতীয় সঙ্গীত রচনাকালে অবশ্য “ভারত ভাগ্য বিধাতা” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতে এই প্রকার ব্যবহার সূচু; উহা ধর্মের আদর্শবোধক নয়। ইহার প্রমাণ, উক্ত সঙ্গীত রচনার এক মাস কালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ “ধর্মের নবযুগ” নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার শেষে নিজ মনের প্রকৃত ভাবপ্রকাশক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, “জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, মানবভাগ্যবিধাতা”!

এইবার আমরা প্রবোধবাবু লিখিত “ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডি কেটে দেখিয়ে আসার...” (‘ক’, গ্রন্থ), এবং প্রভাবাবু-র “ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিকাটা ধর্ম” (‘ব’, গ্রন্থ) এই দুই উক্তি-র বিষয়বস্তুর আশাচিনা করিব। “ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডি”টা কি ও কোথায় এবং কে বা কাহার কাটিল তাহা ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ও আশৈশব ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা এবং সংস্কারের (tradition) মধ্যে বদ্ধিত হইয়াও আমরা ও আমাদের অনেক বন্ধু বৃন্দেতে সক্ষম হই নাই এবং হন নাই। ইংরেজীতে অবশ্য একটি কথা আছে, “Only he can see best of the game”—হইতে পারে, এজন্যই প্রবোধবাবুর বাহির হইতে ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিকা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন এবং আমরা গণ্ডির ভিতরে আছি বলিয়া উহা দেখি না। যাহা হউক, অনেক অল্পসঙ্কানের পর প্রভাবাবু-র “রবীন্দ্র জীবনী” হইতে উক্ত বাক্যটির মূল খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথ তাহার ‘ধর্ম’ নামক গ্রন্থের ‘সম্প্রচার’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:

(৬) “ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণরূপে না উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে তাহারা ক্রমশঃ ধর্মকে জীবন হইতে দূরে চেলিয়া নিতে থাকে। (৮) তাহার ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। বিষয়ী নিজের জমীর সীমানা এই সহস্রাব্দ সহিত বাচাইতে চেষ্টা করে না, (৯) ধর্ম ব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডি-রক্ষাকেই তাহার ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। (১০) বিজ্ঞানের কোন মূল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহার প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে-তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডির সীমানায় ইচ্ছাক্রমে করিতেছে কিনা, যদি করে তবে ধর্ম গেল বলিয়া তাহার ভীত হইয়া উঠে। ধর্মকে তাহার সংসার হইতে

বহু দূরে স্থাপিত করে...সম্প্রদায়ের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে পঞ্চের জগৎ উৎসর্গ করা হয়। (১) (২) কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদেব ধর্ম রিলিজন নহে—তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—(৩) তাহা পলিটিক্স হইতে তিব্বত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নিষিদ্ধ, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোন বিশেষ অংশে তাহাকে প্রচীরবদ্ধ করিয়া মাছুষের আরাম অমোদ হইতে কাব্য কলা হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা রক্ষার চর্য্য সর্বদা পাতারা লাড়িয়া নাট।”—

‘ধর্মপ্রচার’ প্রবন্ধে এই উদ্ধৃতিতে হইতেই প্রভাবাবু কোনও অজ্ঞাত কারণে এক ভ্রান্তিপূর্ণ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ উক্ত মন্তব্যগুলি ব্রাহ্মধর্মকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন। কারণ তিনি উহার (১) চিহ্নিত অংশের ভাষ্য করিতে গিয়া বলিতেছেন, “রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম প্রতি মুহূর্তে মানবের জীবন প্রকাশ পায়। (২) ইহাই ছিল ভারতের আদর্শ, সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্মকে রিলিজন করিতে চান, জীবনের সঙ্গে নহে; সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবে এই প্রবন্ধে উক্ত সমাজকে আঘাত করিলেন”—ইহা একেবারে তর্কশাস্ত্রমত (১) চর্য্যপ্রদ একটি সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথ নব্যের বাক্যে রিলিজনকে যে সংজ্ঞা দিলেন (৩) “তাহা পলিটিক্স হইতে তিব্বত” ইত্যাদি, তাহা কি ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে প্রযোজ্য? রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বাজনাচরণ বসু, দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলি, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও অনেক অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্ম সকলেই পলিটিক্স, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি নানা জনহিতকর আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকিয়াও ব্রাহ্মধর্ম নির্ধারণ সহিত সাধন করিয়াছেন এবং জীবিকা অজ্ঞানের জন্য স্ব-স্ব ব্যবসয়ে লিপ্ত রহিয়াছেন। সুতরাং ইত্যাদি দৃষ্টান্ত হইতে কি প্রমাণ হয় যে “ব্রাহ্মসমাজ ধর্মকে রিলিজন করিতে চান” এবং “সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবে এই প্রবন্ধে উক্ত সমাজকে আঘাত করিলেন”? এই সংক্ষেপে বিচার্য্য, “ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে”—ইহা দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকেই ইঙ্গিত করিতেছেন বুলিতে হইবে কি, যেহেতু প্রভাবাবু তাহার ভাষ্যে এই প্রশ্নে বলিতেছেন: “ইহাই ছিল ভারতের আদর্শ, সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্মকে...” ইত্যাদি? বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুষ্টিমেয় লোক অব-

লম্বিত ব্রাহ্মধর্মকে কি কোন শিক্ষিত লোক পূর্বপ্রদর্শিত হইতে ‘ভারতবর্ষের এ আদর্শ’ বলিবেন? রবীন্দ্রনাথের পূর্বের বাক্যগুলি স্মরণ স্বরূপ পাঠ করিলে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না, তিনি ‘এ আদর্শ’ বলিতে ভারতবর্ষের কোন ধর্মাদর্শের কথা বলিতেছেন? বলিতেছেন, “বিজ্ঞানের কোন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে—উঠে” (‘জ’ চিহ্নিত অংশ প্রঃ)।

এই সকল মন্তব্য লিখিবার সময় (১৯০৪) রামমোহন-প্রবৃত্তি ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বৎসর মাত্র অতিক্রম করিয়াছে। উহার মধ্যে বিজ্ঞানের কোন কোন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মধর্ম কত বার যায় যায় হইয়াছে বা ব্রাহ্মধর্ম-ব্যবসায়ীরা ‘ধর্ম গেল বলিয়া ভীত হইয়া’ উঠিয়াছেন তাহা আমরা অত্যাধিক আবিষ্কার করিতে পারি নাই। হয়ত ভবিষ্যৎদৃষ্টিয়ের কোন সাময়িক প্রবন্ধ হইতে উহা বাহির করিবেন এবং “ব্রাহ্মসমাজ ধর্মকে রিলিজন করিতে চান” ইত্যাদি মন্তব্য প্রামাণ্য বলিয়া ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে ইহাও প্রমাণিত হইতে পারে যে, এ খাবৎ ব্রাহ্ম বঙ্গিয়া বিদিত আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল, ডঃ হীরালাল হালদার, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি দার্শনিকগণ যেহেতু জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভূত মূল্যবান আলোচনা লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত করিয়াছেন এবং ইত্যাদি “পাশ্চাত্য দর্শনলব্ধ আলোকে দেশীয় বেদান্তশাস্ত্রের সত্যতা দেখিতে পাইয়াছেন”—

— তাহার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গী গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রভাবাবু রবীন্দ্রনাথের ‘সঙ্গ’ গ্রন্থের স্থান-বিশেষ সম্পর্কে রবীন্দ্রমতের সমালোচনাকালে নিজেই বলিয়াছেন, “জ্ঞান নিত্য অগ্রসর হইতেছে; ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধ অবশ্যজ্ঞাবী। এই অবস্থায় হিন্দুধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে সাম্য রক্ষা করা কঠিন” (রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, তত্ত্ব-বোধিনী পর্ক, ২৬৬ পৃ.)। যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত হিন্দু ধর্মের বিরোধ অবশ্যজ্ঞাবী বুঝিয়া ২৬৬ পৃষ্ঠায় উহা লিখিয়া থাকেন, তবে ‘ধর্মপ্রচার’ প্রবন্ধে অনির্দিষ্ট ‘ধর্মব্যবসায়ী’দের সহিত ‘জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরোধের কথা (‘জ’ চিহ্নিত বাক্য দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া উহা ও তৎপরেবর্তী বাক্যগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজকে ‘আঘাত’ করিবার জন্য লিখিত—এ কথা ঐ পুস্তকেরই ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন কেন বলিবেন কি? ‘ধর্মপ্রচার’ প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করিবার মত যতগুলি বাক্য আছে তাহার অনেকগুলিই উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইল, কোনটিই ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে

\* রবীন্দ্র জীবনী; বিচিত্র গল্প-রচনা

। রবীন্দ্রনাথের ‘ধর্মপ্রচার’ প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯১০, ১২ই মার্চ (১৯০৪)

\* পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—‘ব্রহ্মতত্ত্ব’ নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১ম ভাগ (১৯০৬)



পারে না ; তথাপি কি বলিতে হইবে রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করিলেন ?

\* Yet Brutus says he was ambitious.  
And Brutus is an honourable man!

রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে সাধারণভাবে নানা সম্প্রদায়মণ্ডে পক্ষ ক্রুরপ বিকৃত রূপ ধারণ করে তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঠিক এই প্রকার বর্ণনা-সম্বলিত উপদেশ উহার দশ বঙ্গদূর পূর্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রদত্ত ও পরে প্রকাশিত হয় তখন তদ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করা হইয়াছিল ইহা ত কেহই প্রবোধন নাই ? তুলনা করুন—“অনেক সম্প্রদায়ের সংস্কার এই যে, ভাবের চরিতার্থ ই ধর্ম... যদি হৃদয় ভাবে গদগদ হয়, উচ্ছ্বাসে অধীর হয়, মাতৃস্ব নৃত্য করে ও গড়াগড়ি দেয়, তবে ই হারা সন্তুষ্ট হইয়া মনে করেন যে, ধর্মে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। এই ভাবুকতাপ্রধান ধর্মে এক প্রকার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতা উপন্ন করে...” (শিবনাথ ‘ধর্মজীবন’ : ‘ধর্ম কি ও ধর্মিক কে’) এবং—“অমৃতভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাবাবিস্তার একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যাস আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি কিন্তু তাহা একপ্রকার মস্তোহন মাত্র” (রবীন্দ্রনাথ : ‘ধর্মপ্রচার’)। আবার—“ধর্ম মানবজীবনের এক স্রবের বস্তু নহে, এক দিনের কাজ নহে। একজন দুই ঘণ্টাকাল কোন বিশেষ স্থানে বদ্ধ হইয়া কোন বিশেষ নাম জপ করিল সেইটুকু তাহার ধর্ম হইল, তৎপরে সে বিষয়কার্যে গেল, সেটুকু তাহার বিষয়কার্য, সেখানে ধর্মের কিছু নাই—একরূপ নহে। বরং এই কথা বলিলেই প্রকৃত সত্য বলা হয় যে, সর্বস্থানে ও সর্বাবস্থাতে জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছাযোগে ঈশ্বরের সহিত নিত্য-যুক্ত থাকিতে পারাই ধর্ম” (শিবনাথ, ঐ) এবং “আমাদের ধর্ম... রিলিজন নহে... ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন শাশ্বতের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য” (রবীন্দ্রনাথ, ‘ধর্মপ্রচার’)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আচার্য্য শিবনাথের উপদেশের ন্যায় একই ভাবপ্রকাশক রবীন্দ্রনাথের বাক্যগুলি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির দোহাই দিয়া “ব্রাহ্মসমাজ ধর্মকে রিলিজন করিতে চান” এইপ্রকার সিদ্ধান্ত-প্রচার রবীন্দ্রনাথের মতের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার।

এইবার আমরা ‘ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি’ ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ‘ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসা’ এই বাক্য দুইটির মূলে কোনও সত্য আছে কিনা—আলোচনা করিব। কোনও ধর্মের ‘গণ্ডি’র সৃষ্টি কে করে তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই

বলিয়াছেন, “ইহারা (ধর্মের উপলব্ধিহীন প্রচারকগণ) ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয় একটা সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে”, “ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে” (‘চ’ চিহ্নিত বাক্য) ;—এই দুই বাক্য দ্বারা যে কোন ধর্মব্যবসায়ীকেই যে ‘গণ্ডি’র সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা বলা হইতেছে ইহা সুস্পষ্ট, তবে বিশেষ করিয়া যে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে creed বা dogma প্রাধান্য আছে, বিদিনিষেধের প্রাবল্য আছে এবং যাহাদের ধর্মসাধকেরা এই সকলের উপর জোর দিয়া চলার জন্ম অন্য সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এগুলি না মানিলে পৃথক থাকিতে বাধ্য করেন তাঁহারাষ্ট লক্ষ্যীকৃত, ইহাও সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মধর্মের কোনও বিশিষ্ট dogma নাই যাহা উক্ত ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্যপালনীয়\* ; সুতরাং যিনি বা যাহারা ব্রাহ্মধর্মের কোনও প্রকার গণ্ডি সৃষ্টি করিবেন, উহা রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট বাক্যানুসারে তাঁহাদের ‘স্বরচিত গণ্ডি’ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ-রচিত ব্রাহ্মধর্মের কোন গণ্ডি ছিল না, হইতেও পারেনা ; ইহাই ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং (বা তদীয় পিতৃদেব) ব্রাহ্মধর্মের কোনও গণ্ডি রচনা করেন নাই, সুতরাং তাহা কাটিয়া বাহির হইবার প্রয়োজনও তাঁহার হয় নাই।

উহা গেল আমাদের কথ্য ; কিন্তু সাধারণ ভাবে উল্লিখিত ‘ধর্মের গণ্ডি’ ছাড়াও বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্মের তথাকথিত ‘গণ্ডি’ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিয়োদ্ধৃত অদ্বীয় বাক্যগুলি কি সমালোচকগণের চক্ষে পড়ে নাই বুঝিতে হইবে ?—“ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক হইতে আটপেঠে বাঁধিয়া পরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই... সাম্প্রদায়িক অতি নির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাহার মধ্যে এই একটি দৃষ্টান্ত আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই দৃষ্টান্তকে যদি অনির্দিষ্টতা বলিয়া নিষ্কাশ কর, তবে ইহাকে জাঁতায় ফেলিয়া পেয়ে—ইহাও জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেল”। (‘সংকল্প’, ‘ধর্মশিক্ষা’)—“আমাদের ধর্মের কোনো ‘ডগমা’ নেই শুনে তিনি (স্টেফোর্ড ব্রুক) ভারি খুশী হলেন, বললেন ‘তোমরা খুব বৈচে গেছ’” (‘শান্তিনিকেতন’, ২য় খণ্ড, ‘অগ্রসর হওয়ার আশ্রয়’)। “আমাদের ধর্ম” বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি ‘ব্রাহ্মধর্ম’ ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম বুঝাইয়াছেন ? ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ যে সর্বার্থ নয়, সার্বভৌমিক বা বিশ্বজনীন ইহা বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন, “চিরকালের

\* ব্রাহ্মধর্মের ‘বীজমন্ত্র’ বা মূল সত্য কয়েকটি ভিন্ন পরব্যৌ অংশে দৃষ্টব্য।



ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আত্মান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে...” (এ, ‘ব্রাহ্মসমাজের সার্বকতা’ সমস্ত প্রবন্ধটি পঠিতব্য)। কিন্তু প্রবোধবাবু তদীয় পাঠক বর্গকে বুঝাইবেনই “ব্রাহ্মধর্ম যেখানে সর্কারী রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাকে মানেন নি”। প্রবোধবাবু গবেষক, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম (ব্রাহ্মসমাজ নয়) বলিতে কি বুঝায় তাহা ভাল করিয়াই জানেন এবং ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্ব বা আদর্শ সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চা না করিয়াও নিজেকে (ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে) একজন বিশেষজ্ঞ মনে করিয়া উহাকে ‘সর্কারী’ বলিবার অধিকার তাঁর হয়ত আছে এরূপ মনে করিতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের সেই সর্কারীতা কোথায় তাহা দেখাইয়া দিলে ব্রাহ্মসমাজ তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিয়া উপরুত হইতেন। আপাততঃ রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত উক্তিগুলির পর এ সম্বন্ধে আমাদের বাক্যব্যয় করার প্রয়োজন নাই; বাহাদের ইচ্ছা হইবে তাহারা নীরবকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের লিখিত মত অগ্রাহ্য করিয়াই এক্ষণে ব্রাহ্মধর্মকে ‘সর্কারী’ বলিতে পারেন।

ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধ সমালোচকগণ হয়ত বলিবেন, “ইহা ত আদর্শের কথা, বা ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা, ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোক যে মতামতসারে, যে ভাবে চলেন তাহা দ্বারা ই আমরা ব্রাহ্মসমাজকে বিচার করিব”।—ইহারও সমুচিত উত্তর রবীন্দ্রনাথই দিয়াছেন, অন্যও দিয়াছেন :

“কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে কয়েক জন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব ইতিহাসের সামগ্রী।” (পূর্বনির্দেশ)।

আবার বলিতেছেন :

“যদি কখনও দেখিতে পাই ব্রাহ্ম সমাজে বিলাসিতার প্রচার ও ধনের পূজা অত্যন্ত বেশী চলিতেছে, যদি দেখি সেখানে শ্রমনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতেছে তবে একথা কখনই বলি না যে বাহারা ধনের উপাসক ও ধর্ম উদাসীন তাহারা ই প্রত্যন্ত ব্রাহ্ম, কারণ সৎপায়ে তাহারা ই অধিক, অতএব আমাকে অল্প নাম লইয়া অল্প আর একটা সমাজ স্থাপন করিতে হইবে। তখন এই কথাই আমরা বলি এবং ইহা বলাই সাড়ে যে, বাহারা সভ্যধর্ম বাক্যে ও ব্যবহারে পালন করিয়া থাকেন তাহারা ই যথার্থ আমাদের সমাজের লোক :—তাঁহাদের যদি কর্তৃত্ব না-ও থাকে, ভোটসংগা গণনার তাহারা যদি নগণ্য হন তথাপি তাঁহাদের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই সমাজের উদ্ধার হইবে।—“আত্মপরিচয়”

সংখ্যাগণনা দ্বারা যে ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত রূপ নিরূপণ করা অসম্ভবিক এ সম্পর্কে সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজের বিশিষ্ট নেতা ও দার্শনিক পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছেন\* :

“যে সকল মত এইরূপে (ব্রাহ্মধর্মের মূল সভ্য বলিয়া) গৃহীত হয় নাই, অথচ আনুমানিক গণনার দ্বারা হয় ত অধিকাংশ সভ্যের মত, সে মত কেবল অধিকাংশের মত বলিয়াই বিশেষ সম্মানের বস্তু নহে এবং তৎবিরুদ্ধ মত কেবল অপেক্ষাকৃত অল্পাংশের মত বলিয়া অসম্মানের বস্তু নয়। যে মত প্রকাশ্য রূপে বিচারিত, পরীক্ষিত, গৃহীত বা বাস্তব হয় নাই, যে মত হয়ত আজ আছে কাল থাকিবে না, যে মত আত্ম অধিকাংশের, কাল অধিকাংশের এবং পবন অল্পাংশের মত হইয়া দাঁড়াইতে পারে, সে মত অধিকাংশের হউক আর অল্পাংশেরই হউক, তাহাকে সমাজের মত মনে না করিয়া ব্যক্তিগত মত বলিয়াই মনে করা উচিত এবং এইরূপ মতবিরোধী ব্যক্তি উপবৃত্ত ও শ্রদ্ধের হট্টলে তাঁহার নিকট সমাজের বেনী, বক্তৃতাময়, প্রতিকার স্তম্ভ প্রভৃতি সমুদায়ই অব্যবহার্য থাকিবে।”† “উপনিষদে জ্ঞানান্তরবাদ আছে। জ্ঞানান্তরবাদ ইদানীন্তন অধিকাংশ ব্রাহ্মের মতবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মের মতবিরুদ্ধ হওয়া আর ব্রাহ্মধর্মবিরুদ্ধ হওয়া এক কথা নহে। ব্রাহ্মধর্ম বলেন, আত্মা অমর ও অনন্ত উন্নতিশীল। আত্মা অশরীরী হইয়া অমর হইবে কি শরীরান্তর গ্রহণ করিবে, এই বিষয়ের মতামত ব্রাহ্মধর্মের মূল সভ্যের অন্তর্গত নহে। জ্ঞানান্তরবাদ অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতির বিরোধী নহে, সুতরাং ইহা ব্রাহ্মধর্ম-বিরোধীও নহে। (এঃ রবীন্দ্রনাথের মত—“পঞ্চের-সংসার,” উপ-কোডেক্স)।”

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, নিষ্ঠাবান আমরণ ব্রাহ্মসমাজসেবী কোন কোন ব্রাহ্ম শরীরান্তরে পুনর্জন্ম সম্ভব বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তজ্জন্য ব্রাহ্মধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন বা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হন নাই।

\* “সভ্যতাঃ ব্রাহ্মধর্মের মূল সভ্যসমূহ—ঈশ্বরের একত্ব ও অনন্তত্ব, তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনা, আত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ, আত্মার অমরত্ব ও ‘হ্রমোন্নতি’, এই সমস্তই উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। অবাস্তব বিষয়ে উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম এবং আধুনিক ব্রাহ্মধর্মে প্রভেদ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অবাস্তব বিষয়ে সকল ধর্মেরই প্রাচীন ও আধুনিক আকারে প্রভেদ হয় এবং অবাস্তব বিষয়ে আধুনিক ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেও অনেক প্রভেদ আছে। অবাস্তব

\* “প্রবৃত্তি” : “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—ইহার মতবৈচিত্র্য ও ও উদারতা,” ১৩০৩

† কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও ব্রাহ্মদের সহিত সাক্ষাৎকার অবাস্তব বিষয়ে একমত না হইলেও রবীন্দ্রনাথ উক্ত সমাজমন্দিরে বক্তৃতা দান ও বেনী গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিয়াছেন (এঃ ‘রবীন্দ্র-জীবনী’ ২য় পৃষ্ঠা, ৩৪০ পৃ.)। তাঁহাকে উক্ত সমাজের Hon. memberও করা হয়।

প্রভেদে প্রাচীন ও আধুনিকের, পূর্ব-পুরুষ ও পর-পুরুষের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।...উপনিষদের যে সকল মত আধুনিক মতের বিরুদ্ধে ও আধুনিকগণের অস্বীকার, সেই সকল মত (ব্রাহ্মধর্মের) মূল সত্যসমূহের বিরুদ্ধ ও বিনাশক নহে” (ব্রহ্মতত্ত্ব; বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম—তত্ত্বভূষণ)।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দুই-এক জনের মত বা অধিকাংশের মত দ্বারা যে ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজের বিচার করা চলে না এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ উভয়েই একই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই এক-মতের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা এখানে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে প্রভাতবাবুর একটি টিপ্পনীর বিচার করিব। রবীন্দ্রনাথ ‘গোরা’ উপন্যাসের বরদাসন্দরীর কতকটা অতিরঞ্জিত\* চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, “পৃথিবীতে কোন জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোন জিনিসটা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই অভ্যাস গঠক হইয়া থাকেন।” উপন্যাসের এই চরিত্রবর্ণনের বাক্য ভিত্তি করিয়াই প্রভাত বাবু ‘গোরা’ সমালোচনাকালে লিখিলেন, “ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোন্টা ব্রাহ্ম, কোন্টা অব্রাহ্ম লইয়া যে খুঁতখুঁতানি দেখা যায়, তাহা কবির মতে উদারতার পরিচায়ক নহে।” বরদাসন্দরীর মতন, বা ‘গোরার’ হারাণবাবুর মতন ব্যক্তির অস্তিত্ব ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোন এক সময়ে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ছিল না, যে রূপ ‘গোরার’ চিত্রিত কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্র তৎকালে হিন্দু সমাজের মধ্যেও অসম্ভব ছিল না; কিন্তু প্রত্যেকেই দুইটি সমাজের অন্তর্গত এক এক রকম চরিত্রের টাইপ হইতে পারে, অথচ ইহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট চরিত্র। কেহই সমাজের প্রতিনিধিত্বান্বিত নয়। কিন্তু উপন্যাস-বর্ণিত একটি চরিত্রের বর্ণনাব্যাক্যের ভিত্তিতে সাধারণ ভাবে “ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোন্টা ব্রাহ্ম, কোন্টা অব্রাহ্ম তাহা লইয়া খুঁতখুঁতানি দেখা যায়”—এরূপ সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য মন্তব্য করা সমালোচনার বিকার। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পূর্বকালে শুনিয়াছি, দুই-এক

\* “কেবল সাহিত্য কেন, কোনও কলাবিজ্ঞাই প্রকৃতির যথাযথ অঙ্কন নহে। যেমনটি ঠিক, তেমন লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে...দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়া দেখানো আবশ্যক; সুতরাং এখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা” (রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনা)।

“Art begins where the artist departs from strict imitation of nature imposing upon her a rhythm of his own creation.”—Encyc. Britt.

প্রভাতবাবু নিজের বলিয়াছেন, “গোরার মধ্যে ব্রাহ্মদের বহুধা সম্ভব বিকৃত করিয়া বাক করিয়াছেন।”

জন ব্রাহ্ম দৈনন্দিক ‘হরি’ সম্বোধন করিতে আপত্তি করিতেন; কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তিগত গৌড়াময় স্থান সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মসমাজে কোনও কালে হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতির শাস্তিবাচনের অন্তে “হরি ওঁ” উচ্চারিত হয়; ‘হরি’ নামধুক্ত সচরাচর মন্দিরে গীত বহু ব্রাহ্মসঙ্গীতের গদনা নিম্প্রয়োজন। প্রভাতবাবুর এই প্রকার ভিত্তিহীন মন্তব্য\* অনুসরণ করিয়া প্রবোধবাবু ব্রাহ্মধর্মের সর্জনতা দেখিতে পাইয়াছেন ও পুনঃ পুনঃ উহা অসম্বোধে চক্কানিন্দে পাঠকবর্গের নিকট প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্মের সার্বভৌমিকত্ব ও জাতীয়ত্ব এই উভয় দিকই যে সত্য, এ কথা রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল ব্রাহ্মধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে ‘আত্মপরিচয়’ প্রবন্ধে ও ‘হিন্দু ব্রাহ্ম’ বিভক্তে ‘তত্ত্বকৌমুদী’ পত্রিকায় (১লা বৈশাখ, ১৩১৯) যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি সমালোচকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি; স্থান ভাবে উগার অরণ্যমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি— “(ব্রাহ্মসমাজ) বিশ্বের সামগ্রী নয় ত কী? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী ত কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মত শূন্য ছুটিয়া থাকে না; তাহা ত দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার ত বিশেষ নামরূপ আছে।” “যদি সকল প্রকার গণ্ডিকে, সকল প্রকার বিশিষ্টতাকে একেবারে অস্বীকার করাকেই সর্বজনীনতা বলে তবে সর্বজনীনতা বস্তুতই আকাশ কুসুম সম্বন্ধ নাই। তাইকে মানি না, কিন্তু ভ্রাতৃত্বকে মানি, এ কথাও যেমন তেমনি সর্বজনকে বিশেষ বলিয়া মানি না, একটা নিরীশেষ সর্বজনীনতা মানি, ইহাও সেইরূপ মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। প্রত্যেকের বিশিষ্টতা আছে...।” ইহার পর আচার্য্য ব্রহ্মেন্দ্রনাথ শীল লিখিত “Rammohan the Universal Man” নামক যে ভাষণ প্রকাশিত হয়

‡ প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথ “গোরার” ব্রাহ্মদের বহুধা সম্ভব বিকৃত করিয়া বাক করিয়াছেন,” বলিয়াও বরদাসন্দরী চরিত্রের ‘বিকৃত’ বর্ণনা সমগ্র ‘ব্রাহ্মসমাজের’ স্ববহু প্রতিচ্ছবিরূপক বাক্য ব্যবহার করিলেন কেন? ‘গোরা’ কি ব্রাহ্মসমাজের chr. nicle না creation of art? ১৩১০ সনে ‘সাহিত্য সমালোচনার’ ‘বাড়া-বাড়ির’ কারণ সমর্থন ও প্রদর্শন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ সনে ‘গোরা’ উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজের একটি প্রতিচ্ছবি বা কটোপ্রাক দিয়াছেন? উপন্যাসটিকে কোনও বুদ্ধিমান পাঠকের ব্রাহ্মসমাজের কটোপ্রাক মনে করিবার কারণ থাকিলে কি দুই বৎসর ধরিয়া (১৩১৪-১৬) ‘প্রবাসী’তে ছাপিবার জন্য ‘গোরার’ পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুর নিকট প্রেরণ করিতেন?

(১৯২৪) উহার 'The Ideal of Universal Religion' শীর্ষক অংশকে এ সম্পর্কে চরম উক্তি বলা যাইতে পারে। এই সকল মনীষী-লিখিত মত প্রকাশিত হইবার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে লিখিত রবীন্দ্র জীবনীর সমালোচনার প্রভাত-বাবুর নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের সুবাক্ত মতের ভিত্তিতেই ধর্মের সার্বভৌমিকত্ব বিষয়ের ব্যাখ্যা পাঠ করিবার আশা করিয়াছিলাম। তিনি “ধর্মের নবযুগ” প্রবন্ধের বিষয়সূচী মধ্যে লিখিয়াছেন, “ধর্ম বিশেষ হইয়াও সার্বজনীন হইতে পারে—হিন্দু ধর্মও বিশ্বজনীন ধর্ম”, ইহা রবীন্দ্র-মতের correct synopsis; কিন্তু “ব্রাহ্মধর্মের পণ্ডিত”র কথা বলিতে গিয়া যে নিজ ভাবাবেগানুযায়ী বলিলেন, “পাঁচা যতই সুন্দর হউক, আকাশ সুন্দরতর” (জট্টবা ‘খ’) ইহা রবীন্দ্রমত তথা সকল মতবিরোধী অনুসারশ্রুত ভাবের উক্তি—“কাল্পনিক আকাশ কুসুমের মত।” কবি-কল্পনার দিক দিয়া ইহা সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তত্ত্বের স্থানে কীকা; সার্বজনীন ধর্ম যেন শেখীর “Sylark”-এর মত সুন্দর আকাশে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ “unbodied joy” “drinking in illimitable sweetness”; কিন্তু এই পক্ষকে বাস্তব-রাজ্যের সামান্য ধর্ম করিতে হইলে তাহার, “পাঁচায়” না হইলেও, রক্ষণীয় রূপ স্থির ভূমিতে অবতরণ করা দরকার। নিবিশেষ সার্বজনীনতার প্রতিবাদে কথিত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “এই যে আমাদের ভাবাবেগ, এই যে আমাদের আইডিয়াল, কবন্ধের মতো ইহার যুগু নাই কেবল দৈহ আছে, ইহার বিশেষ নাই কেবল বিশ্ব আছে।” আচার্য্য শীলের ভাষণ একাঙ্গিক বার মুদ্রিত হইয়াছে, সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ভাষণ প্রদত্ত হইবার পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আচার্য্য শীলের মতামতরূপ ভাব অনেকাংশে ব্যক্ত হওয়ায় এবং বর্তমানে চম্পাপ্য বলিয়া উহা হইতে প্রামাণিক কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—“যে কোনও বস্তু হউক না কেন, তাহা আদর্শে সার্বভৌমিক কিন্তু প্রকাশে বিশেষ, জাতীয়। নতুবা প্রকাশ অসম্ভব। সার্বভৌমিক সার্বভৌমিক রূপেই প্রকাশিত হইতে পারে না।...জাতিসকল আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াই এক সাধারণ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের নিম্নে একত্রিত হইবে (জট্টবা আচার্য্য শীলের 'The Ideal of Universal Religion')। এই একত্ব আমাদের উদ্দেশ্য, প্রথম হইতেই আমরা তাহা পাইতে পারি না। সুতরাং যে পরিমাণে আদর্শ আয়ত্তীকৃত হইবে সেই পরিমাণে আমাদের একত্ব প্রস্ফুটিত হইবে।” (রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ, ব্রহ্মতত্ত্ব ৪র্থ ভাগ, ১৩০৬)। “জাতীয়তায় সার্বভৌমিকত্ব নষ্ট হয় না, জাতিগত সন্ধীর্ণতায়ই সার্বভৌমিকত্ব নষ্ট হয়”।

(তত্ত্বভূষণ) এতৎসম্পর্কে প্রবোধবাবু লিখিত বাক্য-বলীর প্রতিবাদ নিম্নপ্রয়োজন; উহাদের পশ্চাতে এ বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব প্রতীয়মান হয়। তাহার একটিমাত্র বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—“রবীন্দ্রনাথের উপাসিত ধর্মও এ সবার (আচার, পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার) বিরোধী। ঈশ্বরের বিশেষ নামহীনতাও উক্ত ধর্মের একটি লক্ষণ।” রবীন্দ্রনাথ ধর্মাত্মতানে “আচার, পদ্ধতি, আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী” কখনই ছিলেন না; রবীন্দ্রনাথের শেখোক্ত প্রবন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠযোগ্য। ঈশ্বরের নাম সম্পর্কে তিনি উপনিষদের “ব্রহ্ম” শব্দই সর্বাঙ্গপেক্ষা বেশী ব্যবহার করিয়াছেন; “অপ্রচলিত সংগ্রহ” ২য় খণ্ড মধ্যে “ব্রহ্ম মন্ত্র” “ওপনিষদ ব্রহ্ম” নামক প্রবন্ধদ্বয় ও ধর্মবিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না এই অনুমানের সমর্থনে প্রবোধবাবু কোনও বাহ্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই; তিনি যে ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্মই পালন করিয়া গিয়াছেন তাহার বাহ্য প্রমাণ আমরা দিব। (১) তিনি মহিষির দীক্ষার দিন ৭ই পৌষের অনুষ্ঠান চিরাচরিত ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বরাবর সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন [প্রবোধ বাবুর “আচার পদ্ধতি...” বাক্য অপ্রমাণিত হইল]; (২) ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মাত্মতান ‘মাথোৎসব’ যথারীতি শেষ বয়স পর্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছেন। (৩) “আত্মপরিচয়” প্রবন্ধ; “ধর্মশিক্ষা” ও “শান্তিনিকেতন” বাহাতে ব্রাহ্মধর্মের মূল মতাসমূহ ভিত্তি করিয়া ধর্মব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (৪) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনারারী সভাপদ শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

ব্রাহ্মধর্মের সন্ধীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে সমালোচকগণ অনেক কথাই বলিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ, “মতবৈশিষ্ট্য ও তাহার উদারতা” মন্ডকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাভাজন ও প্রভাতবাবুর পদম পূজনীয় আত্মীয় পরলোকগত তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের যেসকল বাক্য প্রভাত বাবুর পাঠ করিবার সুযোগ সম্ভবতঃ ঘটে নাই তাহার কয়েকটিমাত্র উদ্ধৃত করিব। এগুলি লিখিত হয় ১৬০৩ বঙ্গাব্দে, রবীন্দ্রনাথের “সঞ্চয়” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব বৎসর পূর্বে। উদারতা ও অস্তিত্ব বিষয়ে উভয়ের মত-সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মত: “বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র ও ধর্ম-প্রবর্তক ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদন করিতে পারেন...এরূপ বিশেষ দেশ, শাস্ত্র বা ধর্মপ্রবর্তক হইতে ব্রাহ্মধর্মের বিশেষত্ব ও জাতীয়তা উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মধর্ম সার্বভৌমিক হইলেও ইহা এদেশের জাতীয় ধর্ম...” “ব্রাহ্মধর্মের মূল মতাসমূহ—ঈশ্বরের একত্ব ও অনন্তত্ব, তাহার আধ্যাত্মিক উপাসনা, আত্মার

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ, আত্মার অমরত্ব ও ক্রমোন্নতি।” “ব্রাহ্মধর্ম এ দেশের পক্ষে নতুন ধর্ম নহে, ইহা উপনিষদাদি ব্রহ্মবাদ-প্রতিপাদক হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ধর্ম। ব্রাহ্মসমাজও হিন্দু-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র একটি সমাজ নহে, ইহা সুসংস্কৃত হিন্দু সমাজমাত্র।” (ইহার সহিত তুলনীয় পনের বৎসর পরে লিখিত “আত্মপরিচয়” প্রবন্ধ)। “কোন বিশেষ শাস্ত্র বা গুরুর উপর ব্রাহ্মধর্ম নির্ভর করে না; সত্যমাত্রই ব্রাহ্মধর্মের শাস্ত্র, সত্যের শিক্ষক মাত্রই ব্রাহ্মধর্মের গুরু।\* কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মের একমাত্র অধিকারী নহে, উপযুক্ত সাধনসম্পন্ন প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিই ব্রাহ্মধর্মের অধিকারী। ইহাই ব্রাহ্মধর্মের সাধারণত্ব ও সার্বভৌমিকত্ব” (“ব্রহ্মভক্ত” ১ম ভাগ)। প্রভাতবার পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদযোগ্য কয়েকটি কথা বলিয়াছেন; “রবীন্দ্র-নাথের ধর্মসাধনা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব...একজ্ঞ কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ থাকেন নাই—(পুরাতন ও নতুন শতাব্দী)। “রবীন্দ্রনাথ এমন কি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ মতবাদের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই” (ঐ); “শান্তিনিকেতনের” ধর্মতত্ত্বের সহিত সনাতনী ব্রাহ্মধর্মের মিল নাই” (১৮৮ পৃ)। ‘সনাতনী ব্রাহ্মধর্ম’ বলিয়া কোনও কথা হইতে পারে না; আমাদের পরিচিত কোন ব্রাহ্ম ইহার অর্থ বা উৎপত্তি বলিতে পারেন নাই; কারণ ব্রাহ্মধর্মের কোনও বাঁধন মতবাদ নাই। ব্রাহ্মধর্ম

কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী—তাঁহার রূপ প্রবাহমান রূপ” ইত্যাদি (ডঃ ‘ধর্মশিক্ষণ’)। “রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা তাঁহার নিজস্ব” হইবারই কথা। সাধনপথে অগ্রসর প্রত্যেক সাধকের ব্যক্তিগত সাধনপন্থা—তিনি যে ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, সামাজিক বা সমষ্টিগত ধর্মোন্মূর্ত্তান পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইবেই। এই সাধনপ্রণালীর বিশিষ্ট পথ সাধক নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের অভাব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অবলম্বন করেন। আমাদের পরিচিত অনেক হিন্দু সমাজ-ভুক্ত ভক্ত সাধক বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর পথে অগ্রসর হইতেছেন, তথাপি তাঁহারা হিন্দুই; অনেক ব্রাহ্ম সাধক ব্রাহ্মসমাজের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যাহ ব্যক্তিগত সাধনপ্রণালী অবলম্বনে সাধন করিয়াছেন, কিছু পরে প্রয়োজন হইলে সামাজিক উপাসনা করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ধর্মের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই এবং হইতে পারে না। কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত থাকিয়া পরে উক্ত সমাজ ত্যাগ করিলেন কি না তাহা তিনিই বলিতে পারেন, কারণ ব্রাহ্মধর্মের নিকট তাঁহার আধ্যাত্মজীবনের ধর্মবোধ ও তৎসম্মিত তাঁহার আত্মতত্ত্বস্বীকার করা বা না করার উপর তাহা নির্ভর করে; সেই ধর্মবোধ তাঁহার নিজস্ব, এ সম্বন্ধে অস্ত্রের মত প্রকাশ বলপূর্ব্বক করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সন্দেহ ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন,

“He never forgot that his own longing to consider the problems of his country and his religion on the grand scale had found its first fulfilment in his youthful membership of the S. B. Samaj. And he was so far from repudiating this membership, that he one day exclaimed—“It is for them to say whether I belong to them or not! Unless they have removed it, my name stands on their books to this day!”

—The Master as I saw Him, Ch. XVII.

\* ‘ধর্ম’ সম্পর্কে এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজে শুধু পুস্তকেই লিপিত থাকে নাই। একটি বিশেষ গুরুবন্দনা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধনের অঙ্গ হয়, উহা তিনি প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং তাহা তাঁহার নিষ্ঠাবান হিন্দুপিতার পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ ছিল—

সিদ্ধ: শাস্তো রামজয়ো মগ্নোবধন্ত সাধনে ।

আনন্দ মোহনো বহুত্রিঙ্গাপিত তম: স্তব: ।

রামকৃষ্ণ শক্তিসিদ্ধো মাতৃভাব সমধিত: ।

ইহার পর আছে—“প্রেমিকা ক্রান্তেস কব, তব্বদশী ধবি মাটিনো ...ইহারা সকলে আমার গুরু, ইহাদের স্মরণ করিয়া আমি ধর্ম-সাধনে মহাশক্তি লাভ করি।”—হেমলতা দেবী রচিত জীবনচরিত ২৮৯ পৃ.।

ব্রাহ্মসমাজের আরও একাধিক ব্রাহ্মসাধকের বিষয় জানি যাঁহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুর শিষ্য গ্রহণ করেন ও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজেই জীবন কাটান।

প্রকৃত ধর্ম বাহা তাঁহার সাধন ও তৎসম্পর্কিত ব্যাখ্যান অসাম্প্রদায়িক। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যে আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মধর্মেরই আদর্শ এবং তাঁহার বাণী যে আজ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মাজিতরুচি লোকের নিকট আদৃত ইহা মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণের কথা। কিন্তু তাঁহার বাণীর সহিত তদীয় জীবনের ঘটনা বা কার্যকে জড়িত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে অনেক স্থলে জীবনের অথবা সমাজের অপূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তাহা এই কল্যাণ-পন্থাসূত্রের পরিপন্থী। রবীন্দ্র-বাণীই রবীন্দ্র-দীপন।

## গ্রাম্য পূজারি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রাম-দেবতার সেবক সে ছিল—

রাধামাধবের পূজারী,  
ভক্তি, নিষ্ঠা, আশা-আকাঙ্ক্ষা  
তারি পদ দিল উজাড়ি' ।  
প্রাণ ভরি শুধু তাঁহারে সাজায়,  
বদন ভরিয়া তাঁরি গান গায়,  
নয়ন ভরিয় নেহারি সে রূপ  
জীবন দিল যে শুধারি' ।

২

কৃত্রিম তাহার গ্রামের গর্ভী—

তাহার নিকট জিজ্ঞাসন,  
তিল ও ভুলসী দিয়া সে ম'পেছে  
হরি-পদে তার দেহ মন ।  
ধন, মান, জয়, যশে বাঁতরাগ,  
শুধু দেবতার মাগে সে সোহাগ,  
পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হৃদয়—  
গণে না অভাব অনটন ।

৩

দেবের শ্রেষ্ঠ পূজারীরূপে

ডাক দিয়াছেন মহারাজ,  
পাবে শত ভরি স্বর্ণের হার  
শুধী পূজারীরা হবে আজ  
রাজসভা গেছে ভক্তিতে ভরি',  
এসেছে সকলে কত আশা করি'  
গ্রাম্য-পূজারী দেখিতে এসেছে  
অনাহুত তবু নাহি লাজ

৪

দেখ রাজহুয় সম সমারোহ

পূজ্য-পূজার সে আসর,  
যুগ্মধর্মের কি বিনীত বেশ—  
দীনতা এত কি মনোহর ।  
অবর্ণনীয় সে সভার শোভা,  
সমাগত জন-গণ-মনোলোভা,  
ভ্রমিছেন হাসি পাণ্ডব-সখা

৫

রত্নের হার গলে—ফিরিছেন  
পূজারীর হল গৃহে সব ।  
করিছে তাঁদের জয়ধ্বনি যে  
লক্ষ লোকের কলরব ।  
অনিমন্ত্রিত পূজারীকে হায়,  
দেখ নাকো কেহ, কিছু না শুণায় ।  
পরের সুযশে পরমানন্দ  
নিজে সে করিছে অজুতব ।

৬

শ্রীকৃষ্ণ তাহে সহসা হেরিয়া  
ভূজবন্ধনে বাঁধি' হায়,  
কহেন—বন্ধু কখন এসেছ ?  
কোথায় চলেছ অবলায় ?  
পূজারী ফাঁপর—সবের না বচন,  
চাহে মুখপানে, বারে ছনয়ন,  
বলে, “হেন দ্বীনে হে মহামতিম !  
বন্ধু বলা কি শোভা পায় ?”

৭

গোপনে শুধান হৃদয়কেশ তাঁরে  
‘কই শত ভরি হেমহার ?  
ইন্দ্রপ্রস্থ জানে নাকো বুঝি  
সখা পরিচয় হে তোমার ?  
এসো লয়ে যাই নৃপতির কাছে ।’  
দ্বিজ কয় ‘তাতে কিবা লাভ আছে ?  
পরশমণির হার লভিয়াছি  
বাকি কি রহিল পেতে আর ?

৮

বাঁহারে পাইলে সব পাণ্ডা হয়  
পেয়েছি তাঁহার পরশন,  
বাঁহারে দেখিলে সব দেখা হয়  
পেয়েছি তাহার দরশন,  
আলিঙ্গনের বুকজোড়া হার,  
সকল দৈন্ত ঘুচালো আমার,  
অমৃতময় করেছ আমারে  
আর কিছু নাহি প্রয়োজন ।



# ডেয়ার

স্বরবীন্দ্রনাথ রায়

নদীতে যখন বান আসে অতকিৎবেই আসে। কোথাও কিছু নাই, সহসা কোথা হইতে রাশি রাশি জল আসিয়া এই কুল ভাসাইয়া একেবারে তছনছ করিয়া যায়—জল সরিয়া গেলে শীর্ণতোয়া, শাস্ত নদীটির পানে চাহিয়া লোকে ভাবে ইহার এত তেজ।

কিত্তীশ তাহাই ভাবিতেছিল, কিন্তু তাহার দেশ নাই। শনিবার আপিস-ফেরত আড়াই গজ লংকুণ গ্রীর জন্তু কিনিবে; তাহারই কাপড় দেখিতেছিল, সহসা একটি প্রৌঢ়ার সহিত দুইটি তরুণী আসিয়া দোকানে দাঁড়াইল।

কীৰ্ণাকী প্রৌঢ়ার দুই হাতে মোটা শাঁখা, সীমস্তে চণ্ডা সিঁচুর, তরুণীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ঈষৎ দীর্ঘ, বর্ণ গোর, আচরণ এবং পরিচ্ছদ সংযত। কনিষ্ঠা ছায়া, বয়স আঠার-উনিশ, দেহভঙ্গী ও বেশ-বাস তাহার বয়সের মতই উচ্ছত এবং বিশৃঙ্খল,—সাদী পরিয়াছে পশ্চিমাদের মত ডান কাঁধ চাকিয়া।

কনিষ্ঠা হাসিতে হাসিতে দোকানে ঢুকিয়াছিল, কিত্তীশের দিকে বারেক তির্যক দৃষ্টি হানিয়া, হান্তসংবরণ করিয়া মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু হাসির সে লহর তখনও তাহার স্মৃতিম দেহ বেষ্টন করিয়া কিরিতেছে।

তাহার স্বপ্ন বেশ ও চপল ভঙ্গী দেখিয়া কিত্তীশের ক্র সামান্ত কুঞ্চিত হইল। জ্যেষ্ঠা বোধ হয় সে ইজিত বুঝিয়াছিল, তাড়াতাড়ি বসনপ্রাপ্ত টানিয়া আরও কণ্ঠসংলগ্ন করিল। কিন্তু কনিষ্ঠার ঔদ্ধত্য তাহার কোন প্রভাব লক্ষিত হইল না।

কিত্তীশ হাম দিয়া কাপড়ের টুকরা হাতে তুলিয়া

লইয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গানির জন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। ততক্ষণে তরুণীদ্বয় প্রৌঢ়ার সহিত অপর ফুটপাতে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার কালে (কিত্তীশের মনোভাব বুঝিয়াই বোধ হয়) তরুণী আরও তীব্র একটি ক্রকুটি করিয়া গেল। এই পান্ডা-শাসনে কিত্তীশ সত্যই আহত হইল। অশ্রমনস্কভাবে হোকান ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাদের শাসন করিবার কি কেহই নাই? ইহাদের জন্তই বিদেশে বাঙালীর হর্নাম বটিয়াছে; পশ্চিমাদের মত কাপড় পরিলে স্থানীয় লোকের মনে যে অশ্রদ্ধা জাগিবে তাহা ভাবিয়া কিত্তীশ রীতিমত রুষ্ট হইল। সুরোগ পাইলে সে তরুণীটিকে মুখের উপর ছুঁচার কথা শুনাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু এমন সামান্ত ছুতায় যে সাহস পাওয়া যায় না!

অশ্রমনস্কভাবে কিত্তীশও যে কখন অপর ফুটপাতে চলিয়া আসিয়াছে বুঝিতে পারে নাই। সহসা তাহার খেয়াল হইল তরুণী দুইটি সামনের দোকানেই দাঁড়াইয়া আছে। অপ্রতিভ হইয়া ক্রমাল কিনিবার ছলে সেও দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, সুরোগ উপস্থিত হইলে সে তাহার সম্ভাবনার করিতে কুষ্ঠাবোধ করিবে না, বাঙালী হিসাবে তাহার সেটুকু অধিকার আছে বৈকি। কি ভাবিয়া তরুণী অকস্মাৎ তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন বলিতেছে—রণং দেহি।

অজ্ঞাত আশঙ্কায় সহসা কিত্তীশের বুকখানা কেমন তোলাপাড় করিয়া উঠিল, যে সঙ্কল লইয়া আসিয়াছিল, মুখে তাহার উপযুক্ত ভাষা জোগাইল না। বাধ্য হইয়া কিত্তীশকে

দুইখানি রুমাল কিনিতে হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে সরিয়াও  
যাইতে পারিল না।

ইতিমধ্যে প্রৌঢ়া মেয়েদের লইয়া দোকানের ভিতর গিয়া  
চুকিলেন। ক্ষিতীশ উর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল,—  
'তাহার দৃষ্টি দরকার টাকানো সাড়ীগুলির দিকে।

সহসা দোকানের ভৃত্য উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ  
কি চাই বাবু, ভতরে আসুন না?



কি ভাবিয়া তরুণী স্বকস্মাৎ তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মুখ দেখিয়া মনে হইল  
যেন বলিতেছে—রণং দেতি

ক্ষিতীশের ভিতরে বাইবার কোনই উদ্দেশ্য ছিল না,  
কিন্তু ভ্রাতার সম্বোধনে সকলে এমন সন্ধিক্ষণে তাহার  
দিকে চাহিল যে কেবল আত্মসম্মান রক্ষার জন্তই তাহাকে  
ভিতরে চুকিতে হইল।

তরুণী দুইটি কোরা সাড়ী ও সম্ভার 'চিকেন' দেখিতে-  
ছিল, ক্ষিতীশকে চুকিতে দেখিয়া তাহার দিকে তির্যক দৃষ্টি  
হানিয়া আবার কাপড়ে মন দিল। কনিষ্ঠার দৃষ্টি যেন  
একেবারে মর্ষভেদী।

দোকানী বলিতেছে, বাংলা মিলের সাড়ী ছাড়া কি  
আপনাদের পছন্দ হবে?—দেখুন কেমন পাড়, কি সুন্দর

কনিষ্ঠা প্রৌঢ়ার আগেই বলিয়া ফেলিল, কিন্তু বাংলার  
বলেই ত আর আড়াই টাকা বেশী দেব না।

তবে বোম্বে-ই নিন, এর পাড় আরও ভাল, এই  
দেখুন।—দোকানী খরিদাদের মন বুঝিয়া কথা ঘুরাইল।

তরুণীর কথাগুলি যেন ক্ষিতীশকে কশাঘাত করিল।  
সে হয় ত এই সুযোগে কিছু বলিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু  
মুখরাকে ঘাঁটাইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। বলিল,

আমায় তাহের শাড়ী দেখাও ত,  
ধনখালি, শক্তিপুরী যা হয়।

দোকানী তাহার সামনে একরাশ  
সাড়ী রাখিয়া দেন, সে একখানি করিয়া  
সাড়ী তুলিয়া, খুলিয়া, ঘুরাইয়া-দিকাইয়া  
দেখিতে লাগিল।

ক্ষিতীশ অনেকগুলি সাড়ী বাছিয়া  
একটি ফিরোজা রঙের সাড়ী হাতে  
তুলিয়াছে, এমন সময় কনিষ্ঠার সহিত  
সহসা তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল।

ক্ষিতীশ তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল,  
কেনন হবে বলুন ত?...তত্ত্ব পাঠাতে  
আছে কিনা—

কনিষ্ঠা যেন শুনে নাই এভাবে  
প্রথমে মুখ ঘুরাইয়া লইল, কিন্তু  
পরক্ষণেই মুখখানি লাস্ত্রময় করিয়া তুলিয়া  
উত্তর দিল, বেশ ত রং নিন না।

সহসা তরুণীর দৃষ্টি যেন উজ্জ্বল হইয়া  
উঠিল; কাপের কাপড়ে হেঁচকা টান  
মারিয়া সে এবার সোজা হইয়া বসিল।

বিজয়িনীর সে আকর্ষণে ভীকু বজ্রাঞ্চল যেন আরও নীচে  
সরিয়া গেল।

কত্থার কথায় চকিত হইয়া প্রৌঢ়া ঘাড় ফিরাইলেন, তার  
পর পুরু চশমার ভিতর দিয়া ক্ষিতীশের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া  
গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, মেয়ে সুন্দর হয় ত এটা নাও  
বাবা।

প্রৌঢ়া একখানি জাম রঙের ডুব-সাড়ী তুলিয়া ক্ষিতীশের  
হাতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণী মুহু প্রতিবাদ জানাইল,  
মায় বেমন পছন্দ।

ক্ষিতীশ বিপদে পড়িল।

যাহার জন্ত সে সাড়ীখানি লইতেছে সে মোটেই সুন্দরী



নয়, অথচ সকলের সামনে সে কথা স্বীকার করিতেও বাধিল। নিতান্ত দৃষ্টিকটুতা এড়াইবার জন্যই সে 'ডুবে' খানি কিনিল, কিন্তু মনের গোপনে কোথায় একটি কাঁটা বিঁধিতে লাগিল।

সে একবার তরুণীর দিকে চাহিল, কিন্তু সেখানেও আর আগের দৃষ্টি খুঁজিয়া পাইল না। হয়ত বা সে আহত হইয়াছে এবং মনে মনে তাহার অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কথাই চিন্তা করিতেছে। ক্ষিতিশ ব্যাগ খুলিয়া খানিক কি ভাবিয়া লইল, তার পর যেই সে ব্যাগ উন্মোচন করিয়া মাড়ে উনিশ টাকা শুনিয়া দিল, অমনি তাহার মনে বিবেকের প্রতিক্রিয়া আসিল।

সে নিবাহিত, দুইটি সন্তানের পিতা। সে, তাহার পক্ষে একরূপ চপলতা নিতান্তই অশোভন। তা ছাড়া মাসের মাফা-মাফি, আর্থিক অনটন আছেই।

ক্ষিতিশ সাড়ীখানি বগলে ঢাপিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত বাহির হইয়া আসিল, তরুণীর দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

বাড়ীর পথে সে যথাসম্ভব মন হালুকা করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু যে পরিমাণে সে মনকে প্রবোধ দিল, ততটা রুতকাষা হইতে পারিল না।

বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহার মন আরও দমিয়া গেল। দেখিল, কপালে পাড়ের ফিতা বাঁধিয়া স্ত্রী শুইয়া আছে, জরের উত্তাপে চোখ-মুখ রক্তাভ। পাশেই রুগ্ন সন্তান।

তথাপি বিবেকাহত মনকে সাঁঝনা দিবার জন্য সে অরুণার পাশে বসিয়া কতক্ষণ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। তাহার পর এক সময়ে সাড়ীখানি তাহার সামনে গরিয়া বলিল কেমন হয়েছে বল ত ?

অরুণা সাড়ী দেখিয়া খুশী হইয়াছে মনে হইল না। উদাস ভাবে একবার সেদিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, খোকার বালি এনেছ ?

ক্ষিতিশের উপর যেন একটি চাবুক আশিয়া পড়িল। অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বড় ভুল হয়ে গেছে, আবার গিয়ে এনে দিছি।

এখন থাক। আগে জল খেয়ে নাও গে। এই টানা-

টানির মধ্যে সাড়ী কেনার কিশ্বরকার ছিল ?—জরের বেগে অরুণা হাঁপাইতেছে।

ক্ষিতিশ তাও বুঝাইবার চেষ্টা করে, তোমায় তো ভাল কিছুই দিতে পারি না, ভাবলুম...

তাই বলে বুড়ো মাগী ঐ জামরঙের ডুরে পরব ? তুমিও কি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছ। অরুণার কণ্ঠে মুহূর্ত্তির স্বাক্ষর।

সে তিরস্কার তাহার প্রাপ্য। কাজেই সে আর কোন প্রতিবাদ নী করিয়া খাটের রেলিঙের সঙ্গে সাড়ীখানি বুলাইয়া হাত-মুখ দুইতে ভিতরে ঢপিয়া গেল।



সেই মুহূর্ত্তে অরুণার একজোড়া কঁকটিকুটিল চক্ষু লেগয়া তাহার

দেহ যেন হিম হইয়া গেল

দান্নাশ্রমে আগিয়াছে, দেখিল মা মৃগভাব করিয়া গড়গড় করিতেছেন।

ব্যাপান কি মা, এই অসময়ে দান্না ?

আতান্তর আর কারো বলে, বোয়ের মেসো এসেছেন। ত্রিবেণীতে স্নান করতে গেছেন, ফিরলেই যোগাতে হবে ত ? বৌ ত তিন দিন অস্তর কাত হয়েই আছেন।

ক্ষিতিশ কোন কথা বলিল না। নীরবে আহার সারিয়া অরুণার কাছে ফিরিয়া যাউতেছে এমন সময় তাহার মেসোখন্ডর হাতে ভিজা কাপড়ের বড় পুঁটুলি লইয়া ঢুকিলেন।

ক্ষিতিশের দশ বৎসর বিবাহ হইয়াছে। মেসোখন্ডর মাঝে মাঝে সরকারী কাজে দিল্লী হইতে এলাহাবাদে আসিতেন,

কাজেই সে তাঁহাকে চিনিত, কিন্তু তাঁহার আর কাহাকেও সে এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।

ক্ষিতীশ হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়াছে, মাসীমা ছুই মেয়েকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহাদের মুখে বিশ্বয়ের চিহ্ন।

আমাদের জামাই গো, ক্ষিতীশ।—মেসোমশায় পরিচয় করাইলেন।

মাসীমা তাঁহাকেও বিস্মিত করিয়া জানাইলেন—আ কপাল, একসঙ্গে বসে এখুনি যে দোকানে কাপড় কিনলাম।

পরিস্থিতি বুঝিয়া ক্ষিতীশ হতবাক ; ছুই শ্রালিকা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

ক্ষিতীশ এবার তাঁহাদের লইয়া তাড়াতাড়ি অরুণার ঘরে ঢুকিল। মাসীমা অরুণার পাশে বসিয়া কহিলেন, কেমন আছিস মা ? বড় বিব্রত করলাম তোদের...এঃ, গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

কনিষ্ঠা শ্রালিকার নাম লতা। সহসা খাটে ঝুলানো শাড়ীর উপর নজর পড়িতেই সে হাসিয়া উঠিল—কি জামাই-বাবু কাকে তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন ? শাড়ীটা ত দিব্যি দিম্বির খাটে ঝুলছে।

মুহূ কণ্ঠে ক্ষিতীশও এবার রসিকতা করিল—কেন, তোমারও ত বিয়ে হচ্ছে শুনলাম, তোমাকেই দেব।

ঈসু।—বলিয়া লতা শেষ বারের মত বিজয়ের হাসি হাসিল, নয়নে আবার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি।

মাসীমা উঠিয়া ভিতরে গিয়াছেন। দুর্লভ রত্নকে ঘরের

মধ্যে পাইয়া এবং তাহার চটুল চাহনি দেখিয়া সহসা ক্ষিতীশ যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে এবার আরও কিছু রসিকতা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অরুণার একঝোড়া ভ্রূকটিকুটিল চক্ষু দেখিয়া তাহার দেহ যেন হিম হইয়া গেল।

অরুণার রূপ ছিল না, কিন্তু দেহলাবণ্য ছিল, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যও ছিল, এমন কম মেয়েরই পাকে। কিন্তু গত বৎসরে ছেলেটি হইবার পর হইতে তাহার যে কি হইল, সে যেন দিন দিন শয্যায়া মিশিয়া যাইতেছে। তাহার নিজের দেহের হাল দেখিয়া এখন তাহারই কান্না আসে, আর সেই সঙ্গে আসে স্বামীর আচরণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি।

নারী নারীকে বিশ্বাস করে না, আর সবচেয়ে কম করে নিজের স্বামীকে।

তাই আজ ক্ষিতীশের বিহ্বলতা দেখিয়া তাহার দোষ-ক্ষুর চক্ষু যেন বলিতে চাহিল, আমারও এক দিন ছিল, সেদিন আমিও তোমার হৃদয় হরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এত শীঘ্র আমার ভুলিবে ?

আহত বিবেক তখন ক্ষিতীশের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে। সহসা তাহার রাগ গিয়া পড়িল লতার উপর, যেন দোষ তাহারই।

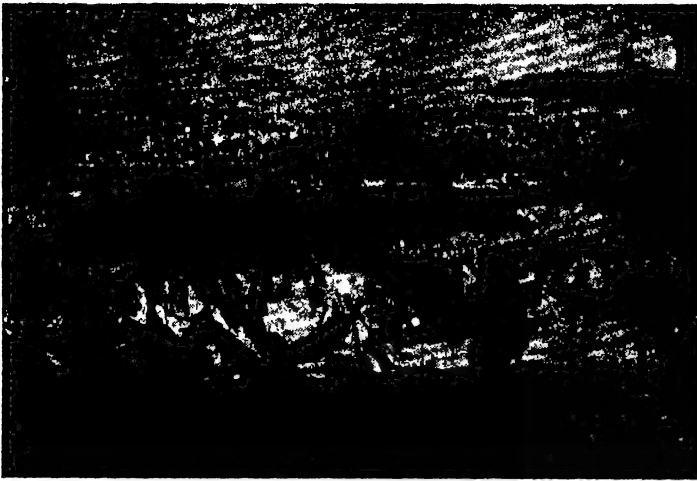
তুমি অমন করে কাপড় পরেছ কেন ? ওতেও কি কোন বাহাহুরি আছে।

লতা তাড়াতাড়ি দেহের উজ্জত অংশে আঁচল টানিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষিতীশের মনে তখন তাঁঁটার টান।







কুন্ডমেনার একটি দৃশ্য, এলাহাবাদ

বন ও অরণ্য—এই দশ প্রকার সন্ন্যাস-নাম ধারণ করেন বলিয়া ‘দশনামী সন্ন্যাসী’ রূপে খ্যাত। (খ) শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ত্রাণগেতর সাধুগণ ‘অদম্ভী’—অর্থাৎ, ইহার দণ্ড ধারণ করেন না। উভয় প্রকার সন্ন্যাসীই গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন।

অদম্ভী সাধুগণ অনেক প্রকার। ইহার ‘পঞ্চায়তী অখাড়া’ নামেও পরিচিত। সাধুগণের সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীকে ‘অখাড়া’ বলে। অদম্ভী সাধুগণের সাতটি মুখ্য অখাড়া, যথা—(অ) মহানির্বাহী, (আ) নিরঞ্জনী, (ই) জুনা (ভৈরব), (ঈ) অটল, (উ) আবাহন, (ঊ) আনন্দ ও (ঋ) অগ্নি। তন্মধ্যে মহানির্বাহী ও নিরঞ্জনী সম্পত্তি এবং সংগঠন বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।

মণ্ডলেশ্বর—সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অখাড়া ব্যতীত ‘মণ্ডলেশ্বর’ প্রথাও আছে। যাহারা এক একটি মণ্ডলী গঠনপূর্বক ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ‘মণ্ডলেশ্বর’ নামে খ্যাত হন। এক এক মণ্ডলেশ্বরের অধীনে দুই শত পর্যন্ত সাধু থাকেন। মণ্ডলেশ্বরগণের সর্বপ্রধানকে ‘মহামণ্ডলেশ্বর’ বলে। মহামণ্ডলেশ্বর মণ্ডলেশ্বরগণকে নিযুক্ত করেন।

জমাত—আট জন মহন্ত ও আট জন কারবারী এবং তাহাদের সহিত পর্যটক বহু সন্ন্যাসী লইয়া যে দল গঠিত হয়, তাহাকে ‘জমাত’ বা ‘পঞ্চ’ বলা হয়। এই পঞ্চের সহিত প্রায় আট শত সন্ন্যাসী এবং ইহার প্রশাসন পরিষৎ (Governing Body) থাকেন। প্রত্যেক স্থানে আট জন ‘ধানাপতি’ থাকেন। জমাত বা পঞ্চই উক্ত ধানাপতি ও সম্পাদক নিয়োগ করেন। সগরবংশধরসকল কপিলই ইহাদের ইষ্টদেব। ইহার মায়াবাদী।

(অ) মহানির্বাহী পঞ্চায়তী অখাড়া—

প্রয়াগে দ্বারাগঞ্জে ইহাদের প্রধান কার্যালয়। ইহার শাখা—হরিদ্বার, কন্থল, নাসিক, বেরার, বরোদা, উদয়পুর, ওঙ্কারেশ্বর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। এই অখাড়ায় সম্পাদকের পদই সর্বোচ্চ। ইনি সকল প্রকার কার্য নির্বাহ করেন। ইহার নাগা-শৈব ও ভট্টাচার্য করেন।

(আ) নিরঞ্জনী পঞ্চায়তী অখাড়া—

এই অখাড়ার বিধানও পূর্বোক্ত মহানির্বাহী অখাড়ার ত্রায় এবং ইহাদের মধ্যে সম্পাদকের পদই সর্বোচ্চ পদ। সম্পাদক অখাড়াধারাই নিযুক্ত হন।

প্রয়াগের ‘মোরীগেটে’ ইহাদের অখাড়া আছে। অষ্টান্ত প্রধান শাখা—কাশী-শিবালয়ঘাট, হরিদ্বার, ওঙ্কারেশ্বর, বরোদা, নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহাদের উপাঙ্গ—কান্তিক। ইহারও নাগা-শৈব ও ভট্টাচার্যী।

নির্বাহী ও নিরঞ্জনী অখাড়ায় পরম্পর গুরুশিষ্য বা সতীর্থ ভ্রাতৃসম্বন্ধ নাই। যে-কোন গুরুর নিকট হইতে যে-কোনরূপ দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেবল অখাড়ার নিয়মকানুন মানিয়া চলিলেই একত্রে বাস করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকুলোদ্ভূত ব্যক্তি নির্বাহী ও নিরঞ্জনী অখাড়ার সদস্য হইতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক বলই ইহাদের প্রধান যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হয়। এই অখাড়ায় প্রবেশের পূর্বে ইষ্টদেবের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সদস্ত হইতে হয়। তৎপরে ‘ব্রহ্মচারী’, তৎপর ‘নাগা’ অর্থাৎ ‘নয়’ বা ‘দিগম্বর’ পদ ক্রমে ক্রমে লাভ হয়। প্রায় বার বৎসর গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া ব্রহ্মচারী গুরুসেবা করেন; তৎপরে ‘নাগা’-পদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক কুস্তপর্বের সময় ব্রহ্মচারীকে নাগার দীক্ষায় দীক্ষিত করা হয়।

(ই) পঞ্চায়তী-অখাড়া জুনা—ইহাদের প্রধান স্থান কাশী। হরিদ্বার ও ওঙ্কারেশ্বরে ইহাদের শাখা আছে। মহানির্বাহী পঞ্চায়তী অখাড়ার অধিকাংশ রীতিনীতি ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহার দত্তাজেয়ের উপাসক।

(ঈ) পঞ্চায়তী অখাড়া অটল—ইহাদেরও প্রধান স্থান কাশী। ইহার গণেশের উপাসনা করেন।

(উ) পঞ্চায়তী অখাড়া আবাহন—ইহাদের প্রধান কেন্দ্র

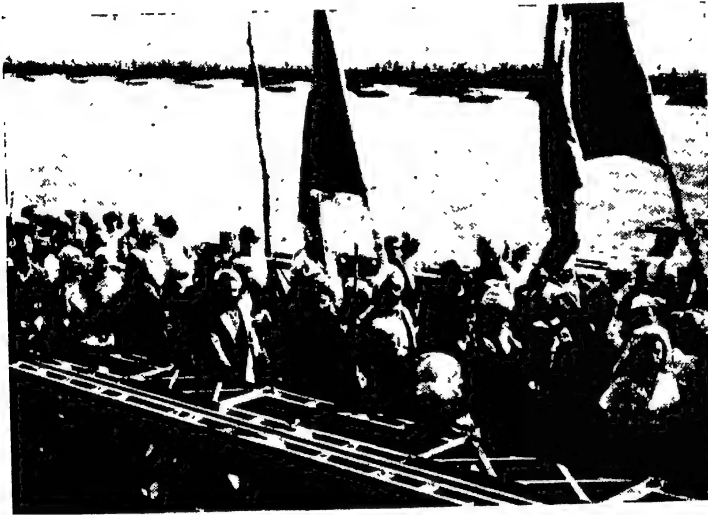
কাশী দশাশ্বমেধবাট। ইহারাও গণেশের উপাসক।

(উ) পঞ্চায়তী অখাড়া আনন্দ—ইহাদের প্রধান কেন্দ্র কাশীতে ‘পঞ্চকোশী কপিলধারা’ নামক স্থানে অবস্থিত। ইহারা সূর্যের উপাসনা করেন।

(খ) পঞ্চায়তী অখাড়া অগ্নি—এই অখাড়ায় দশনামী নাগা-সন্ন্যাসীদিগের ব্রহ্মচারিগণ থাকেন। ইহাদের মূল স্থান কাশী। এই অখাড়ায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ সম্মিলিত হইতে পারে না। ব্রহ্মচারিগণ গায়ত্রীর



প্রয়াগে সরস্বতীর তীরে পাণ্ডাগণের ছাড়া ও স্নানাবিগণ



সাধুগণের শোভাযাত্রা গঙ্গায় পশ্চিম পারে বাইতেছে

গণ এবং রামানুজ-শাখার রামানন্দ-স্বামী ও মতবিশেষে বিষ্ণুস্বামী-শাখার বল্লাভাচার্যের অধস্তন বৈষ্ণবগণ উক্ত চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—(১) অখাড়া ও (২) ঝালসা। এই দুই শ্রেণী সাধু-সম্প্রদায়ে ‘বৈরাগী’ বলা হয়। এই প্রকার বৈরাগী-সাধুর তিন অখাড়া আছে, যাহা অনী—অর্থাৎ সেনা নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম ও সাধু-সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্ত ইহারা সেনারূপে রহিয়াছেন। জনশ্রুতি এই যে, লক্ষ্মণগিরি ও ভৈরবগিরি নামক দুই জন সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর

উপাসনা করেন। ইহাদের কোন মণ্ডলেশ্বর নাই; কেবল কার্ধনির্বাহের জন্ত অধিকারী থাকে।

দশনামী নাগা-সন্ন্যাসীদের উক্ত সাত অখাড়া আছে। ইহাদের ইষ্টদেব পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সকলেই মায়াবাদী। কথিত আছে, মুঘল-সম্রাট আহম্মদ শাহের শাসনকালে রাজেন্দ্রগিরি (অভ্যুদয়কাল ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) সন্ন্যাসিগণের অখাড়ার পতন করেন এবং সৈনিক-সন্ন্যাসীদল গঠন করেন।

(২) বৈষ্ণব—বিষ্ণুর উপাসকমণ্ডলী ‘বৈষ্ণব-সম্প্রদায়’ নামে খ্যাত এবং সাধারণতঃ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলিয়া কথিত। শ্রীরামানুজ, মধ্য, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন-

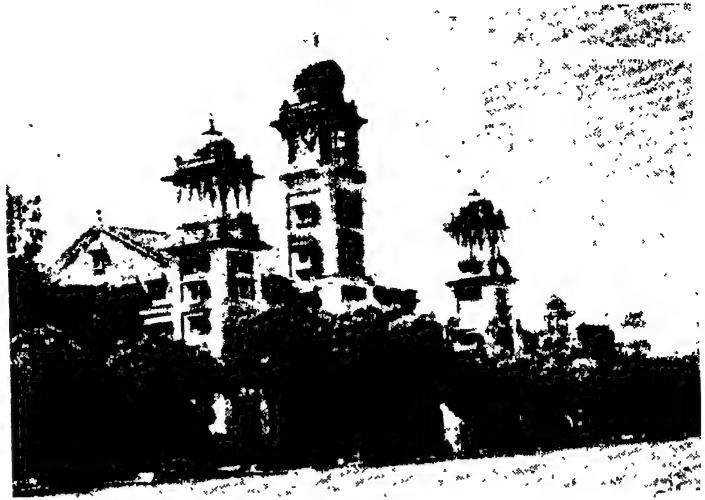
উপদ্রব এবং তদানীন্তন মুসলমান শাসকগণ হিন্দুগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার ও পীড়ন আরম্ভ করিলে রামানন্দীশাখার বালানন্দজী রাজস্থানের জয়পুর-নরেশের সমস্ত সেনাকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উক্ত উপদ্রব দমন করিবার জন্ত এক বিরাট সেনাদল গঠন করেন। এই সাধু-সেনাবাহিনী প্রধানতঃ তিনটি—(ক) নির্বাণী অনী, (খ) নির্ঘোহী অনী ও (গ) দিগম্বর অনী; এতদ্ব্যতীত আরও চারিটি—মহানিবাণী, সন্তোষী, ষাকী ও নিরালম্বী। এই সাতটি অখাড়াই বালানন্দজী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অখাড়ার সাধুগণ অখাড়ময়, নাগা, অতীত ইত্যাদি নামে খ্যাত। ইহারা সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন।

প্রত্যেক অখড়ার ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নযুক্ত পতাকা আছে। প্রধান তিনটি এই ভাবে গঠিত হইয়াছে :

(ক) নির্দালী অর্থাৎ অখড়ার—খাকী অখড়া, নিবালখী অখড়া, চাঁটাখরী অখড়া, বলভজী অখড়া, হরিবাসী নির্দালী, হরিবাসী খাকী প্রভৃতি সকলেই সম্মিলিত হয়।

(খ) নিমোহী অর্থাৎ অখড়ার—বাড়ির অখড়া, মালবাসী অখড়া, হরিবাসী, সন্তোদী ও হরবাসী মহানিলালী আদি সম্মিলিত হইয়া থাকে।

(গ) দিগম্বর-অর্থাৎ অখড়ার—গ্রাম-দিগম্বর ও গ্রাম-দিগম্বর সম্মিলিত হয়।



প্রধান বিধানশাল

ইহাদের নাম, যথা—(১) চারি সম্প্রদায়ের [(ক) মঙ্গল সম্প্রদায়, (খ) নিকাল সম্প্রদায়, (গ) বিকুসুমী সম্প্রদায়, (ঘ) রামানন্দী সম্প্রদায়]] খালসা, (২) ডাকোর খালসা, (৩) ডাঙিয়া খালসা, (৪) ত্যাগী খালসা, (৫) নন্দরাম দাসের খালসা, (৬) মহাত্ম্যগী খালসা ও (৭) সন্তসি খালসা।

গ্রামাঙ্কুশাখার রামানন্দী-সম্প্রদায়েই উক্ত অখড়া ও খালসা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ রামানন্দীশাখার বালানন্দজী বর্তমান আকারে কুস্তমেলার প্রবর্তন করায় রামানন্দীশাখার বৈকবগণ কুস্তমেলার অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। নির্দালী সম্প্রদায়ের বৈরাগী সাধুগণও ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় কুস্তমেলার যোগদান করিতেছেন। মঙ্গল-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয়প্রদানকারী গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এই মেলায় যোগদান করিলেও পুরোপুরি গোড়ীয় বৈকবগণ মুমুকু সাধুসম্প্রদায়ের পঞ্চায়তী মেলায় যোগদান করেন না।

(৩) উদাসীন-সম্প্রদায়—বিধর্মীদের অত্যাচার হইতে হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার জন্য নানকের পুত্র শ্রীচন্দ্রজী (জন্ম ১৫৫১ বিক্রমসংবৎ = ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) এই সম্প্রদায় সংগঠন করেন। ঠট্টা নগর, বারহট, জীনগর (কাশ্মীর), কনহার ও পেশাবর—এই পাঁচটি স্থানে পূর্বে ইহাদের প্রধান আবাস-স্থল ছিল। পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায়ের নির্বাণ শ্রীপ্রীতম-দাসজী ১৮৪৪ বিক্রম সংবতে (= ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রয়াগে সকল উদাসীন-সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া 'পঞ্চায়তী উদাসীন অখড়া' স্থাপন করেন। প্রয়াগের কীটগঞ্জ 'পঞ্চায়তী অখড়া বড়া উদাসীন' নামক অখড়াই ইহাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান। এতদ্ব্যতীত ভট্টনৌ (বেনারস), কনখল (সাহাবাগপুর), সাহেবগঞ্জ, মুলতানগঞ্জ (ভাগলপুর), অসুরগঞ্জ



শ্রীব্রজপতি, এলাহাবাদ

এই তিন প্রকার অখড়া ব্যতীত অতিরিক্ত সাধুগণ খালসার সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকেন। খালসার সাত প্রকার চিহ্নের দ্বারা প্রত্যেকের পথক পথক মোহজ আছে।

(মুন্ডের), প্রতাপটাঙা (মজঃকরপুর), গোপীগঞ্জ (বারাণসী), বালিয়া, বৃন্দাবন, সুখারস (পাতিয়ালা), কুরুক্ষেত্র, উজ্জয়িনী, ত্র্যম্বক, নির্বাণ অখাড়া (দক্ষিণ হায়দরাবাদ), লাল তালাব (গুন্টর), শিবকাঞ্চী, রামপুরি (নেপাল), দয়ালপুর (পঞ্জাব), শমীলা (হরদোই) প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে। ইঁহার নিরাকারবাদী ও চরমে নিবিশেষবাদী পঞ্চোপাসক।

এই উদাসীন সম্প্রদায়ের বিধান দুই প্রকার—(১) স্বতন্ত্র মঠ—ইহাতে গুরুপদম্প্রদায়ের যোগ্য শিষ্য মোহন্ত হন। (২) অখাড়া—ইহাতে ভেটিদ্বারা মোহন্ত নিগাচিত হয়। চার জন প্রধান মোহন্ত ও প্রায় এক শত জন সাধুর 'জমাত' ভারতের সমগ্র ভ্রমণ করিয়া স্ব সম্প্রদায়ের মঠ-পরিদর্শন, মোহন্ত-স্থাপন, স্ব-সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রচার, ভীষণ ভ্রমণ ও কুস্তপনে সদাত্মত্বাদির পরিচালনা করেন।

উদাসীন পঞ্চায়তী নয়া অখাড়া—১৯০২ সংবতে উদাসীন সঙ্ঘত সাহেবজীর সময় ইঁহার অন্তর্গত সম্প্রদায় উদাসীন বড়া অখাড়া হইতে পৃথক হইয়া প্রয়াগের ঘৃষ্টিগঞ্জে নয়া অখাড়া স্থাপন করেন। হবিদ্বার, গয়া, কানৌ, কুরুক্ষেত্র, উজ্জয়িনী, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানেও ইঁহাদের শাখা বর্তমান। ইহাতে কেবল সঙ্ঘত সাহেবের অন্তর্গত ব্যক্তিগণই সম্মিলিত হন।

নিম্নলিখিত পঞ্চায়তী অখাড়া—হঃ শিখ-সম্প্রদায়ের দশম গুরু গোবিন্দসিংহের প্রতিষ্ঠিত উদাসিগণের অখাড়া। উক্ত সম্প্রদায়ের সাধু মহতাবসিংহের শিষ্য পাতিয়ালা-নরেশ ঐয় গুরুর মত প্রচারার্থ এই নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের প্রায় সকল সাধুর একত্রিত করিয়া ১৯১৮ সংবতে (= ১৮৬১ খ্রিঃ) হরিদ্বারের কন্থলে প্রধান অখাড়া স্থাপন করেন। কানৌ, প্রয়াগ, ত্র্যম্বক, উজ্জয়িনী, ধর্মীকেশ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও ইঁহাদের প্রতিষ্ঠান আছে।

(৪) যোগী বা নাথ-সম্প্রদায়—ইঁহারা হঠযোগ সাধন করেন। মৎস্যোক্তনাথ ও গোরক্ষনাথ এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। উষড় ও দর্শনীভেদে নাথ সম্প্রদায় দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। দর্শনী নাথ-সম্প্রদায় কানকট নামে পরিচিত। ইঁহাদের প্রধান গাদী (বর্তমানে পাকিস্থানের মধ্যে) বেঙ্গল জিলায় টালা নামক স্থানে অবস্থিত। ভারতবর্ষে গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথের মন্দির এবং নেপালে মৎস্যোক্তনাথের মন্দির নাথ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। রোহতক জেলার অবোহর নামক স্থানে ইঁহাদের একটি সম্প্রতিষ্ঠান মঠ আছে।

এতদ্ব্যতীত এই ধর্মের প্রয়াগে পূর্ণকুস্তমেলার বিভিন্ন শ্রেণীর দণ্ডী ও বিভিন্ন জাতীয় সাধুর সমাবেশ হইয়াছিল।



হিমালয় হইতে পঞ্জাব অবতরণ

উত্তরপ্রদেশস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও নীতিধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহও তাঁহাদের মত এবং শিক্ষাদি প্রচারার্থ কুস্তমেলার উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বিভিন্ন প্রকার সাধু-সম্প্রদায়ের কথ' শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে বর্ণিত আছে। চৈতন্যদেব প্রয়াগ রূপকে বলিয়াছিলেন :

দক: সিদ্ধিকঙ্ক-বিজয়িতা মতধর্ম সমাধি  
রক্ষানন্দা ধর্মরূপি চমৎকারয়েন ভাবতঃ।  
যাবৎ প্রজ্ঞা মদরিপ বধীকার-সিদ্ধিবোধীনা  
গকোদ্যাতকরণবর্জিতাতিহাস ন পম্যতি ॥\*

শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণ বিষয়ে সিদ্ধ ঔষধি-স্বরূপ দাস্যাদি প্রেমশব্দে লেশমাত্রও বে-পরিস্রু চিত্তপথের পথিক না হয়, সেই পর্যন্তই সমুদ্রিশালিনী অগ্নিমাধি সিদ্ধিসমূহের উৎকর্ষ, সত্য, শৌচ, দানতপস্যাগাদি বাহার সাধন সেইরূপ সত্যধর্ম-যুক্ত সমাপি এবং নিবিশেষ ব্রহ্মাণ্ডভবজনিত মহা-আনন্দও সাধকের চিন্তের চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

\* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২৭

১. অগ্নিশিখাধর নাটক ১২



# শহরপত্তনের মূল নীতি

## শ্রীকালীচরণ ঘোষ

আজ কয়েক মাস ধরিয়া এক কথা চলিয়াছে, “কল্যাণী, কল্যাণী, কল্যাণী”। বলা বাহুল্য, শেষের দিকে কংগ্রেসের অধিবেশন ও প্রদর্শনী উপলক্ষ্য করিয়া প্রতিনিয়ত কল্যাণীর কথা উঠিয়াছে। কিন্তু তাহারও কিছুকাল পূর্ব হইতে রাজ্য-সরকারের প্রচারের ফলে লোকে কল্যাণী শহরের নামের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কল্যাণী একটি নূতন “শহর” বা উপশহর হইবে বলিয়া বিবিধ প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। কয়েকটি বড় শহর আর অধিক লোকের ভার বহনে অক্ষম, বাংলার অজস্র গ্রাম আর লোক ধরিয়া রাখিতে পারে না। শহরের অভিমুখে লোক চলিতে আরম্ভ করিয়া নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতেই কল্যাণী-জাতীয় শহরের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতেছে।

পল্লী আর শহর, আর নূতন নাম শহরতলী বলিলে লোকের মনে প্রত্যেকটির রূপের একটি ছবি জাগিয়া উঠে। গ্রাম বলিতে একটি ক্ষুদ্র স্থান, সরকারী খাতাপত্রে স্বনামে পরিচিত এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি কুটার, হয়ত মাঝে মাঝে কয়েকটি পাকা কোঠা (বাড়ী) বা ‘দালান’ের অধিকারে গঠিত। এই সকল গ্রাম সরকারী নথিপত্রে নির্দিষ্ট সীমানা দ্বারা বেষ্টিত এবং সাধারণতঃ আয়তনে অর্ধ হইতে দেড় বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। গ্রামবাসীর সংখ্যার কোনও স্থিরতা নাই, সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণী বা ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা অনূর্দ্ধ পাঁচ শত, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঁচ শত হইতে দুই হাজার, তৃতীয় শ্রেণীতে দুই হইতে পাঁচ হাজার এবং তদুর্দ্ধে পাঁচ হাজারের অধিক। এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলে ইহাকে নগর-পর্য্যায়ে উন্নীত করা যাইতে পারে।

চলতি কথায় বলা যায়—গ্রামের বিড়াল জড়লে প্রবেশ করিলে বনবিড়াল আখ্যা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে। যাহারা দিন আনে দিন খায়, মাঝে মাঝে যাহাদের ভাগ্যে অনাহার জুটিয়া থাকে, তাহারা দরিদ্র। যাহাদের সংসার চলিয়া শত মুজার সংস্থান থাকে, তাহারা গরীব গৃহস্থ; শত মুজা সহস্রে পরিণত হইলে সচ্ছল অবস্থা; সহস্র লক্ষে পৌঁছিলে লক্ষপতি, ক্রোড়পতি ধনী, “রাজা” বলিয়া পরিচিত হয়। গ্রাম-সম্বন্ধে সেইরূপ—একটা অবস্থা মনে করিলে নিতান্ত ভুল হয় না। তবে লোকসংখ্যা ছাড়াও নগর বা

লোকসংখ্যা ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত সকল অঞ্চলই শহর নামে পরিচয়লাভ করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি না থাকিলেও যাহা “শহর” তাহার লোকসংখ্যা ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার—প্রতি বর্গমাইলে অন্ততঃ এক হাজার লোকের বসতি। ঐরূপ স্থানে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা শাসনবিভাগীয় গুরুত্ব এবং অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ কৃষি ভিন্ন অপর উপায়ে উপজীবিকা অর্জন করিতে বাধ্য হইলে শহর বা “টাউন” বলা হয়। “মহানগরী” বলিতে গেলে উপরন্তু লক্ষাধিক বসতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলার পাঁচ শত অধিবাসীর গ্রাম ও গ্রামবাসীর সংখ্যা ভ্রাস পাইতেছে এবং বসতিযুক্ত গ্রামের সংখ্যাও বিশেষ কমিতেছে, উপরন্তু নূতন শহর গড়াইয়া উঠিতেছে অথবা কল্যাণীর ন্যায় শহরসৃষ্টির বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। ১৯০১ হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় বসতিপূর্ণ গ্রামের সংখ্যায় বিশেষ অবনতি লক্ষিত হইয়া থাকে। ১৯০১ সনে ৪৩,৩৯০, দশ বৎসর বাদে ১৯১১ সনে তাহা ৪১,০২৫ হয়। প্রতি দশ বৎসর অন্তর সময়ের হিসাবে ইহা যথাক্রমে, ৩৫,৬০৪; ৩৫,৬২৫; ৩৫,৬০৩ ও ৩৫,০৬৩ সংখ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ৫১৮টি পল্লী শহর বলিয়া পরিচিতির গৌরবলাভে সমর্থ হইয়াছে। তবে এ কথাও সত্য যে এখনও অনূর্দ্ধ পাঁচ শত লোকের বসতিযুক্ত গ্রামে বাংলার অধিকাংশ লোকই বাস করিতেছে। গ্রাম ও শহরের অধিবাসী-সংখ্যা বিচার করিলে দেখা যায় :

অধিবাসীসংখ্যা	শতকরা লোকের বাস
অনূর্দ্ধ ৫০০	২০'২৯
৫০০-১,০০০	১৯'৫৭
১,০০০-২,০০০	১৮'০২
২,০০০-৫,০০০	২৩'৬১
৫,০০০-১০,০০০	৩'৪৬
১০,০০০-২০,০০০	৩'০১
২০,০০০-৫০,০০০	৩'৮৩
৫০,০০০-১,০০,০০০	৩'৬৬
১,০০,০০০-তদুর্দ্ধ	১৪'৫৫

এই হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায় ৫,০০০—১,০০,০০০ পর্যন্ত অধিবাসী-সংখ্যা লইয়া যে সকল শহর আছে, একমাত্র ১,০০,০০০ ও তদুর্দ্ধ অধিবাসী-সংখ্যার শহরে তদপেক্ষা বেশী লোক বসতি স্থাপন করিয়াছে।

এই শহরের মোহ মানুষকে টানিতেছে। গ্রামের লোক অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া আছে; শহরে শিল্প, বাণিজ্য, বৃত্তি ও সেবাই প্রগতি উপভাবিকা। গ্রামবাসী অধিকমাত্রায় নির্ভর করে প্রকৃতির কৃপার উপর এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামের মধ্যেই উৎপাদনে রত থাকে। শহর চায় প্রকৃতিকে বশে আনিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশিষ্ট শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন করিয়া তাহা অন্তর্জাত বিক্রয়দ্বারা লব্ধ অর্থে নিজ অভাব দূর করিতে। গ্রামে যদি লোক একান্তবর্তী পরিবারে বাস করিয়া, ভগবানের উপর সমস্ত দায় চাপাইয়া কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতে চায় বা বাধ্যই হয়, শহর চাহিবে বিচারের কণ্ঠিপাথরে ফেলিয়া, জীবনের ঘটনা বিচার করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পত্নী, পুত্রকন্যা ও অন্তরঙ্গদের লইয়া বাস করিতে। গ্রামে জীবনের গতি মন্থর, সকল কাজের মধ্যে শিল্পপ্রীতি ও ভালমন্দ শিল্প-প্রতিভাকে রূপদানের চেষ্টা বিস্তারিত। শহর চায়—দ্রুতগতি এবং অর্থ-গণের জন্ত মুখর চঞ্চল জীবন। যাহা নাই তাহা লইয়া পল্লীর ক্ষোভ নাই, পাইলে তাহা উপভোগে আপত্তি নাই, অনাড়ম্বর জীবনে শাখ-আফ্রাদের আয়োজন ও সুযোগ কম। কিন্তু শহর চাহিবে বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, শহরবাসী বহুমুখী আনন্দ উপভোগের জন্ত সর্বদাই লালসায়িত। এখানে চাই দ্রুতগতি যানবাহন, সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ, মনোহারী দ্রব্যের সমাবেশ, আলোকমালায় সজ্জিত বিপণি, প্রশস্ত রাজপথ, “পাইপের কান মলিয়া জল,” আর দেয়ালে আঙ্গুল টিপিয়া বিজলীবাতি। শহরে আছে শিক্ষা, চিকিৎসা, নিত্যনূতন অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ, বহু সহিত পরিচয়, লোকচরিত্র পাঠ করিবার প্রচুর সুযোগ; আর সর্বোপরি আছে উপার্জনের উন্মুক্ত পথ। সং বা অসং উপায়ে অপরিমিত অর্থলাভ ও অপচয়ের যে অব্যাহত প্রান্তর পড়িয়া আছে তাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ভ্রম নিয়োগ করিলে স্রফলের আশা সর্বদাই বর্তমান।

পরিবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় শহরের পরিচয়লাভ সহজসাধ্য হইয়াছে; এখন পল্লীবাসীর মন চঞ্চল হইয়াছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে সন্তুচিত হইয়া আসার সংসার-যাত্রা নির্বাহ কর্তনতর হইতেছে। মানুষ শহরে আসিতে চায়, আর শহরে ক্রমে ভিড় হইয়া উঠিলে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হইয়া পড়া স্বাভাবিক। তাই আজ কল্যাণী শহরপত্তনে রাজ্যসরকারের এত প্রচেষ্টা। আরও নূতন শহর গড়িয়া উঠিতেছে, কোনটি উঠিবার পথেই বিলুপ্ত হইয়াছে। কত লোকের কত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, অর্থের অপচয় খটিয়া অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে।

ইচ্ছা করিলেই কি একটা শহর পত্তন করিয়া দেওয়া

যায়? ইহাতে সম্ভবিস্থক। উত্তর দেওয়ার বিপদ আছে। নগরের সুখভোগে অভিলষী পল্লীবাসীকে গ্রামে থাকিতে বলিলেই আর সে থাকিতে চায় না, সুতরাং প্রাণ বাহা চায়, দাবি যদি নিতান্ত উৎকট না হয়; তাহা পূরণ করিতে না পারিলে সে আর গ্রামে থাকিতে উৎসাহ পাইবে না। উপযুক্ত বাসস্থান বা বাসের উপযোগী জমি, পথঘাট, যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠাগার, স্বাস্থ্যকর-পরিবেশ, ডাক-ব্যবস্থা, আবর্জনা অপসারণের উপায়, রোগে চিকিৎসা, জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ, অবসরবিনোদনের যথারীতি ব্যবস্থা না থাকিলে গ্রামে আর মন স্থির থাকে না। কিন্তু এখানেও বড় প্রকমের একটা বিষয়ের অভাব রহিয়া গেল, তাহা দূর না হইলে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করা যাইবে না, সবই নিষ্কীর্ণ বলিয়া মনে হইবে।

কৈশোরে পড়িয়াছিলাম, যে স্থানে ধনী, প্রোক্রিয় বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী আর বৈদ্য নাই, “তত্র বাসং ন কারয়েৎ” অর্থাৎ তথায় বাস করিবে না। ধনী—দরদী ধনী হইলে গ্রামের অভাব অভিযোগ দূর করিবার পক্ষে উপযুক্ত লোকের অনুবিধা রহিল না, তাঁহারা দুঃসময়ে হৃদ্যে অর্থসাহায্য করিয়া গ্রামবাসীদের রক্ষা করিতে পারেন, গ্রামে আনন্দ-উচ্ছল জীবন, শারদীয়া (শার্দজনীন নয়) পূজা, অপরাপর “পালপার্বণ” তাঁহারা যথারীতি পালন করিবেন; শিক্ষালাভের অনুবিধা হইবে না—বিদ্যান ব্রাহ্মণশ্রেণী সে অভাব দূর করিবেন। নিরুপদ্রবে জীবনযাপনের সহায়তা করিবার জন্ত রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি বা রাজশক্তি সর্বদা জাগরুক থাকিবেন। গ্রামের ময়লা-আবর্জনা দূর করিবার সুযোগ করিয়া দিলেই নদীর কাজ শেষ হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ হিসাবে সে যুগে নদীই প্রগতি জীবিকা অর্জনের উপায় থাকায় লোকে বসতি-স্থাপনে চিন্তিত হইবে না, আর দেহ ধারণ করিয়া নীরোগ অবস্থায় চিরকাল থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং বৈদ্যেরও প্রয়োজন। ইহা বহুদিন আগেকার কথা, তখন মানুষ এত “সভ্য” হয় নাই, তাহার এত বিচিত্র “অভাব” ছিল না, কিন্তু লোক-বসতির পক্ষে যাহা অত্যাৱশ্যক মনে হইয়াছে, চাণক্য-পণ্ডিতের নাম দিয়া তাঁহার রচিত “শ্লোক” বলিয়া অপর কোনও পণ্ডিত তাহা প্রবচনের মধ্যে দাঁড় করাইয়াছেন।

কল্যাণী বা অপর শহর বাঁচিতে পারে, যদি তাহার প্রাণশক্তি অর্জনে সক্ষম হয়। সব সুখ থাকিলেও যদি মানুষ উপভাবিকার পথ খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে তাহাকে স্থানান্তরে গমন করিতেই হইবে। অপর সকল অভাব অর্থসাহায্যে সরকারী প্রচেষ্টায় দূর হইতে পারে, নগরসৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু নাগরিক যদি আত্মশক্তিতে

তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম না হন, ত শত সরকারী সাহায্য তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। কল্যাণী শহর গড়িতে মোট সাড়ে এগার কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা কত টাকায় দাঁড়াইবে সে কথা জানা নাই, দুই কোটি টাকা লইয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বর্তমান উন্নত ধরনের শহরের ব্যবহার্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হইতেছে, এমনকি ময়লা অপসারণের জন্য আধুনিকতম শহরের মত মাটির নীচে ড্রেন পাতিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের প্রাকৃতিক সুযোগ থাকিলে মানুষের চেষ্টায় সেই স্থান শহরে পরিণত হইতে পারে—অজ্ঞাত কালিমাটি সাক্ষি আজ চাঁটানগর হইয়াছে। কল্যাণীতে প্রস্তাবিত সকল সুখ-সুবিধা বিদ্যমান নাই, উপরন্তু অপরিচ্ছন্ন অঞ্চল বলিয়া পরিচিত—কাশীপুর, গার্ডেনরোড, কসবা, চাকুরিয়া ভাটপাড়া, খড়গপুর প্রভৃতি স্থান ক্রমেই বসতিপরিপূর্ণ হইয়া বড় শহরে পরিণত হইয়া উঠিতেছে। কেবল কলিকাতার সহিত যোগাযোগ সহজ বলিয়া নয়, এই সকল অঞ্চলে জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধা হইবে বলিয়া এইগুলি শহর হইতেছে। শহরপত্তনের সময় শিল্প ও শিল্পী নির্বাচন করাই অন্যতম প্রধান কর্তব্য এবং সম্ভব হইলে তৎসংলগ্ন অঞ্চলে জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় উদ্ভিজ্জ পণ্য-লাভের সুযোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যাহা মানুষের নিত্যব্যবহার্য তাহার অধিকাংশই যদি সরবরাহ করা সম্ভব হয় তবেই সেখানে লোকে স্বেচ্ছায় বাস করিবে। শিল্পে উপযোগী উদ্ভিজ্জ, খনিজ বা জীবজ কাঁচামালের সুযোগ থাকিলে স্বীয় বুদ্ধি ও প্রয়োজনবশে মানুষ উপজীবিকার পথ খুঁজিয়া বাহির করে।

বড় শিল্প স্থাপন করা সম্ভব কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞ বলিতে পারেন, কিন্তু যাহা নিত্যপ্রয়োজনীয়—কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছন্ন, চাল, তেল, লোহা, মাটির তৈজসপত্র ও অপর যাতুর তৈজসাদি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রথম হইতেই সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। জমিনির্বাচন ও বিক্রয় ব্যবস্থাই এ কাজের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। যে সকল দ্রব্যের বহুল ব্যবহারহেতু ছোট শিল্প পূর্বে প্রচলিত ছিল অথচ তাহার পরিবর্তে দ্রব্যাদি আসিয়া তাহা সরাইয়া দিয়াছে, শিল্প-নির্বাচনে এই নূতন অতিদ্রবিক অভাগনা জানাইতে হইবে। কাচ, এনামেল, পোসিলেন তৈজসাদি, টর্ক, টিপনোতাম (ধাতব), ধাতব কোটা ও অপর আহার, ঘরবাড়ী নির্মাণের ধাতব বড়া, কঙ্ক, ছিটকানি ইত্যাদি, এবং নূতনতর কৃষি সরঞ্জাম প্রস্তুতবিদগক অপরাপর শিল্পের সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ না দিলে কোনও নূতন উপজীবিকার পথ পাওয়া যাইবে না। এই সঙ্গে পরিমিত ব্যয়ে শিল্পের কাঁচামালের যোগান কত দূর হইতে নিয়মিত ভাবে চলে তাহাকেই তথ্য অল্প সম্বানের পথে সক্ষমপ্রধান স্থান দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। উৎপাদিত পণ্য কেন্দ্র হইতে কত দূরে বিক্রীত হইবে এবং অপরাপর অঞ্চল হইতে আগত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিনা, তাহাই বিচাষণ বিষয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ইট, কাচ, চণ, সিমেন্ট, বালি, পাইপ, লোহা, পাথর, পিচ চালিয়া ও পুঁতিয়া শহর নিমাণ সহজ, কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার জন্য যে সকল পারিপাশ্বিক অবস্থার একান্ত প্রয়োজন, তাহা না হইলে নবজাত শিল্প স্মৃতিকাগ্যেরই পঞ্চদ লাভ করিবে, ক্ষেপেই নাই।

## টাদের ব্যথা

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কন্ঠকার

চৈতালী-চাঁদ কি কথা জানায়

নবে পড়া ফলে ফলে,

মনের কামনা মনেতে শুকায়

বেদনায় ঢলে ঢলে।

গোধূলি লগনে কানে ভেসে আসে

ঝরানো পাতার বাণী

নিশি-ভোরে তার উষার আলোকে

নীবে যেও তা ভুলে।

জীবনের যত গোপন বাসনা

হৃদয়ে বেঁধেছে বাসা,

বেদনার ধূপে জ্বলে যায় দীর্বে

মিলনের যত আশা।

দ্বাপারের মাঝে থেকে না লুকায়

যাও যদি দূরে সরে

চাঁদ হয়ে তুমি ভাগিও ছিয়ায়

মেঘের ছায়ার ধূলে।

## কবির প্রেম

শ্রীঅম্বুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাল চেহারা নিয়ে আসে নি কেউপদ। অবশ্য আজ বয়েস হয়েছে। ঢাক পড়েছে মাথার, দুটো কান আর ঘাড়ের চার-পাশে গোটা খোঁচা কালো চুলের বিবলভার পাকাদেরই উঁকিছুঁকি বেশী। কপালে আর শুকনো গাল দুটোর অনেক ভাঁজ পড়েছে সময়ের আনাগোনার। ঠোঁটের আড়াল দেওয়া দাঁতগুলোতে আজ ভাঙ্গা-চোরাবের ভিড়ই বেশী। তবু এসব দেখে ও যে ঘোঁরনে সুশুকর ছিল, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভাল চেহারা নিয়ে আসে নি কেউপদ, কিন্তু ভাল মন নিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। আরও একটু কঠোর সমালোচক হলে বলা যেতে পারে, চেহারাটা ভয় পাওয়ার মতই; অন্ততঃ ছোট ছেসেমেরনের কাছ। কাঁটার মত চুঁচলো খাড়া খাড়া কাঁচা-পাকা গোঁফের উপরে নাকটাকে কে ধেন বেরাঙাভাবে চেপে দিয়েছে, বাতে বাড়তে না পারে। বৈটে মোটা শরীরটা বনমাত্রবের মত কালো বড় বড় লোমে ঢাকা। চেহারার সঙ্গে মিল করেছে কথা বলার স্বর ভঙ্গি আর চড়া মেজাজ।

কিন্তু ছেসেমেরনের এটী দল আর যা পাক না পাক, ভয় অন্ততঃ পায় না কেউপদকে। নইলে সকাল-সন্ধ্যা কেউপদের দোকান 'কৃষ্ণ ঠোসে' একগাদা ক্ষুদে পা আর ক্ষুদে চোপের ভিড় হবার ত কোনও কারণ নেই। বড় বড় কাঁচের জারে সারি সারি সাজানো নানা বঙের লেবেক্স ওদের একমাত্র আকর্ষণ। ছোট দুই-মি-জড়ানো নীল তারার দল সকাল-সন্ধ্যা ওপানকার পুরু কাঁচে ঠিকরে ঠিকরে কেবে। দু'চারটি ছেসেমের হাত বুলিয়ে দেয় কাঁচগুলোতে। তাবি, এদের লোলুপ চাওয়া কোন দিন যদি জারের মোটা কাঁচ ফাটরে দেয়?

'বেবো, বেবো সব। এখানে কি? গোট-আউট।'

দাঁত মুখ খিঁচানো এই ধরনের অসম্মানজনক ব্যাক্যাবাদই রোজ অভ্যর্থনা করে 'কৃষ্ণ ঠোসে'র অভিযাত্রী দলকে। ওরা পেছিয়ে যায় হুঁপা; কিন্তু একটু পবে আবার ডবল পা এগিয়ে আসাতে দেবি করে না। কাকুর হাতে একটা একটা ফুটো পরসা, কোথাও বড়-জোর একটা আনি। কিন্তু খালি হাতের নব্বই দলে রোজ ভারী।

'ডোবালো, ডোবালো, এরা আমার সর্কনাশ করল। বুঝলেন অম্বুপমবাবু, এরা আমার লাটে না উঠিয়ে ছাড়বে না। দোকান খুলে বসেছি হু' পরসা রোজগার করব বলে, বিলোবার জন্তে দান-হস্তর খুলে ত বসি নি। আপনিই বলুন?'—গজ গজ করে উঠে 'কৃষ্ণ ঠোসে'র কেউ হাজরা। কোকলা দাঁতগুলোর কঁক দিয়ে থুঁ ছিটকে আসে। কিন্তু তাই বলে বাচ্চাদের ভিড় কমে না।

বরং কমে আসে সারি সারি কাঁচের জারগুলোতে লেবু লেবেক্স আর রাংতা-মোড়া চকোলেটের ভিড়।

'লুটুক, লুটুক, কত আর লুটবে এরা, কি বলেন? লোটাংকে কেউ হাজরা ভয় খায় না। নইলে পাকিহানে ঘরবাড়ী, জমিজমা অত কিছু সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এখানে এসে বুড়ো বয়েসে লোকান খুলে বসতে হয়? দেশ বখন ছাড়তে হয়েছে দাদা, তখনই লোটার চূড়ান্ত হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণ ঠোসে'র কেউ হাজরার নরম মনটা বাইরের চেহারার রুক্ষ আবরণ মেনে এক এক সময় বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ।

'না না, খ্রিক্ট হতে হবে মশাই। ব্যবসা করতে বসেছি, ধম্মশালা খুলে বসি নি। ওসব দয়া করা ওণ্ট ডু। কেস কড়ি, মাং তেল। শহরে ত এত দোকান বহেছে, কোন্ শালা কত দান-ধম্ম করে শুনি? পেয়েছে কি এরা কেউ হাজরাকে?'

চেনে এরা কেউ হাজরাকে। ওই অসুন্দর রুক্ষ চেহারা, গিটগিটে স্বভাব আর নরম-গরম মেজাজের মুখোশে একটা বে শান্ত, সহজ, নরম মন লুকিয়ে আছে, জানে তা এই ঢেলেব দল। তাই ত ওরা এই দোকানেই ভিড় জমায়। সাঙস করে সহজ মনে ভাত পাতে, আনন্দার করে।

জানতে আমিও পারি। এ শহরে আসা আমার খুবই নতুন। এ পাড়াতেও তাই। দিনক'টাকে এখনও হাতের আঙ্গুলের মধ্যেই গোনা যায়। নতুন জায়গার অচেনা পরিবেশে আলাপ হ'ল সবার আগে কেউ হাজরার সঙ্গে, এই দোকানেই। প্রথম দিনের নতুন আলাপ মুখই শুধু করল না, রোজ এই দোকানে আড্ডা জমাবার একটা ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত ছড়িয়ে গেল।

'বুঝলেন দাদা, এরা কুঁড়ি। কুঁড়িদের বাচিড়ে বাগবাব ভায় নিতে হবে আজ আমার, আপনাব, সকলের। যার যেটুকু সামর্থ্য। বহুদিন বুঝি সবগুলোরই বাপ-মা আছে? ক্ষেপেচেন! কাকুর এটা আছে ত ওটা নেই, ওটা আছে ত এটা নেই। কাকুর আবার দুটোই নেই। হতভাগার দল মশাই। আর থাকবেই বা কোথেকে? পালাতে গিয়ে ছড়োছড়িতে কত বে কত দিকে ছিটকে পড়ল, আর কত বে কচাকচ কচু-কাটা হ'ল, তার কি কোনও হিসেব আছে? কিন্তু কুঁড়িগুলোকে ত বাঁচাতে হবে। যদি শুকিয়েই গেল, তা হলে ফুল হবে কারা? যদি না পেলো ভালবাসা, ঘেহ, মমতা, তবে কি আর এই কুঁড়িগুলো গোলাপ হয়ে ফুটবে মনে করেন? ঘণ্টা, ঘেঁটুহুল হবে। আপনি ত এজুকেটেড, লোক, আপনিই বলুন না?'

মুখ লুকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে ক্ষুদ্র দল। কেউ হাজরার দোকানে ওরই পাশে বসে লক্ষ্য করি। ওর কথা বলার বোঝা

৫, বিভিন্ন মুখভঙ্গী আর সেই সঙ্গে মোটা কালো দেহটাকে নানা ভাবে ধাক্কানো ঝাঁকানো কোঁচকের যথেষ্ট খোরাক জোগায়। কিন্তু আমি হাসিটাকে চেপে বাগারই চেষ্টা করি এই সব সঙ্গীন পরিস্থিতিগুলোতে।

একটা ফুটো পরস্যা বার করে এক দল লাড়ায়।

এক পরস্যা দিয়ে গোষ্ঠীগুরু তোরো লেবেকুস চুপবি? আমার বাড়ীর মজা পেয়েছিল? বেরো, বেরো। গেট-আউট। এক পরসার ক'টা লেবেকুস হয় জানিস? তিনটে তিনটে।

হান হান্সের তিনটে আঙ্গুল বড় করে ছড়িয়ে ওদের সারি সারি ছুঁ মিলব। চোখগুলোর সামনে ঘুরিয়ে দেয়।

যোগ হয় আর একটা পরস্যা। বড়জোর একটা আনা।

নিবি দা, হেনিই নে। হাকরা কবিস নে। এক আনার শাজার শ্রমটা গিনেচ চায়? বলি হোদের বাপ-ঠাকুরানা কখনও এক আনার কুড়ি-তিরিশটার বেশী বিনেছে শেবেগাস? বুঝলেন যমুপমবাবু, এই হাকরাগুলো মেলায় মচনচ না করে কিছুতেই ছাড়বে না।

নড়বড়ে দাতাগুলোর হাড়া ফাঁক দিয়ে ছিটকে পড়ে ধুঁ।

মন্দ লাগে না লোকানটা। মন্দ লাগে না সকাল-সন্ধ্যা এখানে সময় কাটানো। অনেক ঘা-খাওয়া জীবন কেটে হাজরার। অনেক-কিছুর অভিজ্ঞতা। তাই ভানট লাগে গল্প করতে। তার উপর দোকানের এই জীবন। এখানকারও এক বিচিত্র স্থান। এখানে শিশুদের এই ভিড়, ওদের কলহব, তুট মি আর দস্তিপনা আশ্চর্য-রকম নেশা খানে ভাল লাগার। আমার ভাগা ভাল, এই নতুন কারাগার গাত হাড়াহাড়ি আলাপ হয়ে গেল কেটে হাজরার মত একজন সত্যিকারের ভাষনাভূমির সঙ্গে। সত্যিকারের ভাল লোক সেই-ই, ছোটরা থাকে ভালবাসে। মানুষ ভাল কি খাপ খাটাই করবার কষ্টপাথর ওরাই নয় কি? লোকানের দিনের পর দিন কেনা-বেচায় একবেয়ে জীবনযাত্রায় যে ক্লান্তি আছে, তাকে ভরিয়েছে মাথুংগো শিশুদের এই মতোসব। কোন দোকানে কখনও ত চোপে পড়ে নি ছোট ছেলেমেয়েদের এত আনাগোনা, এমন অস্বস্তি আরও। এই কুড়িদের মাঝে নিজেদের হারিয়ে দিয়ে এক করা-কুঙ্গ রঙের চায় তরত শেব-জীবনের সব তাবাবার ভাসে বের্নাকে।

বলি, বেশ আছেন আপনি।

দেপেছেন দাদা! একে বলে বেশ থাক? দেখছেন ত নিজের চোপেই এই রাফসদের দল রোজ ছিঁড়ে থাকে আমার কেমন? লোকানটাকে লাটে না উঠিয়ে ওরা কি ক্ষান্ত হবে ভেবেছেন?

আপনাকে ভালবাসে ওরা, তাই আসে। আপনি ব্রেক করেন ওদের, তাই আসে। তাই আবদার করে।

দরকার নেই আমার মশাই ওসব ভালবাসা-টালবাসার।

দোকান খুলে বসেছি, আমার সম্পর্ক দাদা টাকার সঙ্গে। কেলে কড়ি, মাথো তেল। আপনি ত মশাই এজুকেটেড লোক, আপনিই বলুন না?

সায় দিই, সে ত ঠিক।

না না, এবার থেকে স্ট্রিক্ট হতে হবে। নইলে কুক টোসের পরমাণু আর কদিন ভেবেছেন? এখনই খাবি থাকে।

এবার আর আসবে কবে? কোন দিনই আসবে বলে মনে হয় না।

সময়ের-অসময়ে এখানে আড়ার আসব জমিয়ে, কেটে হাজরার এই শ্রমের, স্বচ্ছ জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র বেঁধে, ভিড় করা কুদে দস্তাদের হাসি-কান্না, নগড়া-মামামারি, আদর-আবদারের ভরা অনাবিল জীবনের নিতানুহন বৈচিত্র্যের অনাবাদিত পরশ নিতে নিতে এক দিন আবিষ্কার করলাম নতুন একজনকে। নতুন সে নয় কেটে হাজরার কাছে, নয় নতুন কুক টোসের মাঝনে ছড়ানো লাল গুলোর রাস্তায়। নতুন আমারই কাছে শুধু। রোজকার দেপা, রোজকার ভিড়-করা কুড়ির দলে সে নয়। কুড়ির বাশন সে ছাড়িয়ে এসেছে।

সায়রে, সায়। কি চাই?

সাদা সাজী। পরিষ্কার নয়। অনেক ভাঁজ পেয়েছে। মাথার খোকা খোকা কালো চুল এলোমেলো। অনেক ভাঁজ সেপানে।

গারে মাথার সাবান আছে কেঁচকাকা?

আছে বৈকি। কত রকমের আছে। সাবান নেই বলিস কি! তবে ত লোকান বন্ধ করে দিলেই হয়। কে মাথের রে, তুট বৃষ্টি?

না, ছোট মাসী।

তুট নাগিস না?

না।

‘জা।’ ভেঙে উঠল কেটে হাজরার ছোপ-লাগা নড়বড়ে দাতা-গুলো। তা কেন মাথবি? জমুক মরলা সারা গারে, তা হলেই যে মা তপ্পার মত রূপের ছিঁরি খুলবে। হতভাগা মেয়ে কোথাকার। গারে সাবান মাথলে শরীরটা পরিষ্কার হয় আর সেই সঙ্গে দংটাও যে কসাঁ হয়। একটুও যদি বড় থাকে মেয়েটার শরীরের ওপর। আপনি ত এজুকেটেড লোক অল্পমবাবু, আপনিই বলুন না?

মেয়েটাকে আজই প্রথম দেখা আমার। হ'পকের কেউ এখনও আলাপের বর্ণপরিচয়ও নামে নি। তা ছাড়া রোজকার ভিড়-করা কুড়িদের দলেও নয়। কুল বে ও। বোপা ছিপছিপে দেহের শ্রামলিমায়, এলোমেলো সাজ-পোশাকের উদাসীনতার ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে বোবনের তাজা ইসারা। বরসটা এখন ওর এমন পর্য্যায়, থাকে নীতিবোধের অভিধানে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে সাংঘাতিক। বয়েসের এই সীমান্ত আমিও পেরোয় নি। হুতবাং ওরই সবকিছু আমাকে উদ্বেগ করে এই বরণের প্রশ্ন অবশিষ্টই শুধু

আনল না, অপ্রস্তুতেও ফেলল বধেই। বত সহজে প্রস্তুটো এল, জবাবটা তত সহজে বেরুতে পাবল না, কিন্তু কেই হাজরার মত শাউ, সবল মানুষের এসব দিক ভাববার পেয়াল কোথায়? ওদের জাতই যে আলাদা।

কিন্তু দরকার হ'ল না জবাবটা দেবার। আমার সঙ্গে আলাপ জমবার পর থেকে সব ব্যাপারেই আমার মতামতের জল্পে প্রস্থ করা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে কেই হাজরার। আমি 'এজুকেটেড' বলেই হয়ত এই সম্মান। কিন্তু মতামত চাওয়াটা নেহাতই একটা সৌজন্য। কি মতামত দেব না দেব তা শুনবার জল্পে অপেক্ষার প্রয়োজন মনে করে না কেই হাজরা। করল না এর বেলাতেও। বেঁচে গেলাম ঠাঁক ছেড়ে।

'এই নে সাবান। এইটে তোর ভোট মাসীকে দিবি, আর এইটে তোর।'

ছ' রকমের ছোটো সাবান হাতড়ে বার করল কেই হাজরা।

'আমার কি হবে আবার? একটাই দাও।'

'হবে আবার কি? লোকে সাবান দিয়ে করে কি ঘোড়ার। ডম? মাগবি, গায়ে মাগবি। খুব ভাল সাবান যে। চমৎকার গন্ধ। পাচ্ছিস না?'

'হ'।' নরম কালো গোড়ের পাভলা কাপনে একটু সাধা আকাশ ঝিলিক দিয়ে গেল।

'এইটেই তোকে দিলাম। পাসা জিনিষ।'

'দাম কত কাকা?'

'ছ' আনা।'

দামটা শুনে ওর চেয়ে বেশী আমিই অবাক হলাম। এই কালকেও দেগেছি এই সাবান বার আনার বেচতে কেই হাজরাকে।

'বা বে, এত সস্তা!'

'এক আর অল্প দোকানদার পেয়েছিল যে খন্দের এলেই খ্যাচাং করে গলাটা কাটব! জায়া লাভের বেশী এক পাইও নেবে না কেই হাজরা, বুঝলি?'

বুঝল কতদূর সে কে জানে, কিন্তু লক্ষ্য করলাম পাশে মুখটা একটুপানি ফিরল; সাড়ীর আঁচলে উজ্জত হাসিটাকে লুকোবারই জল্পে।

'এখন কিন্তু দাম দিতে পারব না কেটকাকা। জমানো পয়সা আমার সব শেষ হয়ে গেছে।'

'শোন কথা, এখনুনি দিতে বলছে কে? এাকি আর অল্প দোকানদার পেয়েছিল, যে পয়সার জল্পে খন্দের পেছনে জোঁকের মত এঁটে থাকব? দিস, বশন হয়। আগে মেখে ত ঝাং, কি ভুবভুব গন্ধ! বলিস তখন কেই হাজরার পছন্দ কি রকম!'

চলে গেল মেয়েটা। মেয়ে নয়, ভোবের আকাশ এক টুকরো।

'বুঝলেন দাদা, ভারি ভাল মেয়ে।' বড় তেঁতুলগাছটার আড়ালে বিসর্গিল হেঁদে চকল পতিবেগ আড়াল না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থেকে, চোপ ফিরিয়ে আনল কেটপদ। 'যেমন মিষ্টি স্বভাব,

তেমনই মিষ্টি কথাবার্তা। আপনি ত মশাই এজুকেটেড লোক, দেখলেন এতকণ আপনিই বলুন? ভাল নয় মেয়েটা?'

'পারাপের কিছু অন্ততঃ এখন পেলাম না।' মতামতটা অনেক সাবধানতার সঙ্গে দিতে হ'ল।

'পাবেন কোথেকে শুনি? পেলেই হ'ল? পারাপদের সঙ্গে কেই হাজরা ভাব রাগতে যায় না।'

সেই প্রথম দেখলাম সীতাকে। দেখা নয়, বাসিত আবিষ্কার। কিন্তু এই দেখাই শেষ নয়। শ্রামজী মেয়ের যৌবন-জাগানো দেহের উচ্ছল চেটু নৃশুর বাজাল আরও অনেকবার কৃষ্ণ স্কোসের দোরগোড়ায়। \* ও এসে দাড়ালেই লক্ষ্য করি, কেমন যেন অস্বস্তির এলোমেলো ছোঁয়াচ লাগে কেই হাজরার বেঁটে মোটা শরীরটার। কারণে অকারণে চকলতার চেউ জাগে বার বার। কিন্তু এসব যে খুশী আর আনন্দেরই অসংযত প্রকাশ, তা বুঝতে দেরি লাগে না।

'খুব পয়সস্ত মেয়ে দাদা। দেখেন না, যেদিনই ও আসে, সেদিন বিক্রি কেমন হু হু করে বেড়ে যায়।'

'তাই বুঝি ওকে সব জিনিষে এত কন্সেশান দেন?' ভুলে ফেললাম প্রশ্নটা।

'কন্সেশান আবার কিসের মশাই? জায়া লাভের এক পাইও বেশী নোব না, কমও না! দোকান খুলে বসেছি দাদা, গলা কাটবার ব্যবস্থা ফেঁদে ত বসি নি। আর লোকসান দেবার জল্পেও দোকান খুলি নি। ফেলো কড়ি, মাগো তেল। আপনি ত এজুকেটেড লোক মশাই, আপনিই বলুন?'

মতামতটা দিয়েই দিলাম। 'সে ত একশ বার। কিন্তু এটো ত সেদিন বার আনার সাবানটার দাম বললেন ওকে মাত্র ছ' আনা।'

'বলব না? বার আনা দাম দিয়ে সাবান কেনবার সাধ্য কি ওর আছে? কিন্তু তাই-বলে কি সাবান মাগবে না? হো, পাউডার যাবে না? সেজে গুজে বেড়াবার এই ত সময়। ভাল দেখাবে, ভাল মানাবে। তা নইলে আর করবে কবে দাদা? বয়েস বাড়িয়ে গেলে? পয়সা নেই বলে কি সাধ-আছাদ করবে না? বাকি দশটা মেয়ের মত সেজে গুজে তেমে খেলে বেড়াতে ইচ্ছে করে না? আপনি তো এজুকেটেড লোক মশাই, আপনিই বলুন?'

বলবার বিশেষ কিছু ছিল না এর পর। শোনবার কানটাই পেতে দিলাম।

'কিন্তু সখ ওর আছে কিছুতে? মুখ ফুটে বলবে কখনো কিছু? হাত পাতবে? সে রকম মেয়েই ও নয়। তাই তো দিই। দান নয়, দয়াও নয়। দাম বা-হয় একটা কিছু বলতে হয় ভোলাবার জল্পে। নইলে কি নেবে ভেবেছেন? আর কম দামে না দিলে উপায় বা কি? কোথেকে দেবে দাম? আছে কি কিছু সঙ্গে? সবই তো সেখানে ছেড়ে ছুড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু তাই বলে কি সাধ-আছাদ করবে না? সেজে-গুজে সেমে-খেলে বেড়াবে না?'

খুবই ভালবাসেন আপনি ওকে, না ?

বাসব না ? ভালকে কে না ভালবাসে মশাই ! থাক না দু'চার দিন, আপনিও যদি ভাল না বেলে কেনেন তো কি বলেছি !

কথাটার কি ইসারা ছিল পুলক-জাগানো শিহরণের ? ঘোলা কি ছিল শুকনো বালুচরে হঠাৎ ছলকে পড়া একটু ঢেউয়ের ? নইলে কেন জড়িয়ে পড়বে এর পরের সব মুগ্ধতা একটা সাময়িক নীরবতার জালে ?

যোজ্ঞকার ভিড় জমানো কুড়ির মতো একটা ফুল। পাপড়ি খুলছে অনেকগুলো ভীকৃ অন্ধপ্রকাশে। ওদের মত সকাল সন্ধ্যা আসে না সে। বোজ ঘন ঘনও নেই তার আন্যপোনা। আবদার করে না, দস্তিপনাও করে না। কিন্তু আসে বেতুন, আসে বখন, তারি মৃন্ময় একটা মিষ্টি গন্ধ কৃষ্ণ টোসের দোরগোড়ার ছড়িয়ে পড়ে।

ভালই লাগে সীতাকে। শুধু ভালই লাগা। ভাল লাগার বেড়া পেদিয়ে আরো কিছু যে আসে নি, ভেতরটা হাতড়ে মনের কোণকে বোজ একবার পরীক্ষা করে নিই।

সীতা এলে খুশী হয় কেউ হাজরা। ওর আসার দিনগুলোর বাবধান অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠলে সাড়া পাই উৎকণ্ঠা ভড়ানো অস্থিরতার। কেউ হাজরার গোকানেই এই বিচিত্র জীবনের সঙ্গে এতগুলো দিন পরিচিত হবার পথ, অজানা তো আর কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু অজানা লাগতে থাকে নিভেই নিজে। কেউ হাজরার খুশী-অখুশীর সঙ্গে নিজের খুশী-অখুশীগুলোও কি করে কখন যে সন্তুর্পণ মিশে গেছে, জানতে পারলাম না। কিন্তু বুঝতে পারি বখন সীতা এসে লোকানের সামনে ঠাঁড়ালে ভাল লাগে আমারও। অর্শনের দীর্ঘতায় আমার মনটাও বখন হয়ে উঠে ব্যাকুল। তার পর ভাবি, এ তো শুধু ভাল লাগা। তার বেশী আর তো কিছু নয়। ভালকে ভাল তো লাগবেই।

মাঝে অনেক দিন এল না সীতা। কৃষ্ণ টোসের উঠানে অনেক দিন ফুটল না কোন ফুল। ওই মেয়ের দোকানে আন্যপোনার হিসেব রাগি না আমি। রাগবায় দরকারও নেই। সে সব রাগবে কেউ হাজরা। তবু এবার দেখা হবার বাবধানটা যে অস্বাভাবিক লম্বা হচ্ছে অনেকগুলি, এ জানতে হিসেব বা গবেষণার দরকার হয় না।

ক'দিন থেকেই উসখুস করছে কেউ হাজরা এই কারণেই। চশমাটা চোখে পরে মোটা খণ্ডার পেনসিলের দাগ টেনে কেনাকাটার হিসেব করতে করতে ডাকল এক দিন—অমুপমবাবু ?

বলুন।

অনেক দিন হ'ল মেয়েটা আসে নি, না ?

এই ধরণেরই একটা কিছুই আঁচ ছিল। বললাম, তাই তো মনে হচ্ছে।

মনে হওয়া-টওয়ার মধ্যে আমি নেই মশাই। আমি বাবসালাব মামর কাপড়ে-ভলমে হিসেব করে আমার কাজ। আচ্ছা কেন

আসছে না বলুন তো ? এতদিন গারের কখন তো হয় না। অমুখ-বিস্ময় করে নি তো, কি বলেন ?

এ প্রশ্নে সঙ্গ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। চিনি না ওকে, আলাপও হয় নি এখনো। জানি না ওর ইতিহাসও। ক'দিন দেখেছি শুধু দোকানের সামনে কিছুক্ষণ। তবু বললাম, না না, অমুখ করবে কেন ? হয়ত খুব কাজ পড়েছে বাড়ীতে।

কাজ ? তাই হবে ! কিন্তু কি এত কাজ মশাই ? পাটিয়ে পাটিয়ে কি মেয়ে ছেলতে চার মেয়েটাকে ওর মামা-মামী ? চলুন তো, খোজটা নিয়েই আসি। ভারি ভাল মেয়েটা মশাই, যেমনি মিষ্টি কথাবার্তা, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। চলুন।

একটু ইতস্ততঃ করলাম, আমি যাব ?

হ্যাঁ, এইতো কাছেই বাড়ী মশাই, হুটো গলি পেরুলেই।

আপনিই যান। আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?

এতে ঠিক-বেটিকের কি আছে মশাই ? ও এলে আমাদের ভাল লাগে, ওকে আমরা ভালবাসি, তাই খোজগবর নিতে যাচ্ছি আসে নি কেন অনেকদিন—এতে গুণগোলের কি আছে ? আপনি তো এজুকেটেই লোক, আপনিই বলুন ?

হয়ত কিছুই নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এক জাতের মানুষ আছে বাদেব মধ্যে সত্যকায়েব মানুষের সবকিছুই থাকে, শুধু থাকে না পৃথিবীকে অনুভব করবার শক্তি। নিজের মন দিয়ে পৃথিবীর মনকে তারা যাচাই করে ; কিন্তু গবর বাপে না পৃথিবী কত বদলে যাচ্ছে। এই দলেরই মানুষ কেউ হাজরা। আর এই জাতের মানুষদের বোঝানো যায় না, এতে ঠিক-বেটিকের কি আছে।

ঠিক এমন সময়েই হুটে উঠল হঠাৎ ফুল। এই অস্থির হাত থেকে আমায় রেচাই দেবার জেজই যেন।

কি রে কি ব্যাপার বল দিকি তোর ? আসিস না যে আজ-কাল ? আমরা যাচ্ছিলাম এখনুনি খোজ নিতে।

বড় মামীমা যে আসতে দেয় না কেউকাঁকা। বলে, 'এগন বড় হয়েছিস, বখন-তগন একা একা বাজার বাওয়া ঠিক নয়।'

'বড় হয়েছিস ত আমার কাছে ভয় কি আসতে ? আর বড় হয়েছিস ত একলা বেরুতে বেটিকটা কোণারটার গুনি ? কে কি করবে দেখি ত একবার ? দেব না গিটিয়ে লম্বা করে। কি বলেন অমুপমবাবু ?'

'নিশ্চয়ই।' একটু উৎসাহের সঙ্গেই সারটা বেরিয়ে এল।

'কিন্তু ভূই বড় হয়েছিস না হাতী। বড় হলেই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হয় জানি। তোর ত কিছুই হ'ল না।'

'কেন কাঁকা ?'

'আবার ভিজ্জস কবে কেন। দেখিস কোনদিন আরনার নিজেকে ? মাখার চুলগুলো সন্ধ্যাসীর জটার মত না করে ভাল ভাবে বাঁধতে পারিস না ? একটু ভাল সাজপোজ করতে ইচ্ছে করে না ? নিজেকে ভাল দেখাক, চাস না বুঝি ? বত বড় হচ্ছে, চেহারা হচ্ছে দেখ না ভুতের মত !'



তাকালাম সীতার দিকে। পাশে মুখ ফেরাল সে, আচমকা উঠলে ওঠা অবিরেচক হাসিটাকে চাপবার জন্তে। গলাটা আটকে গিয়ে থানিকটা কাসিই ছড়িয়ে পড়ল।

‘ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল বুঝি? লাগবে না ঠাণ্ডা? শরীরের ওপর অবশ্য করলে রোগভোগ একটা হবেই ত।’

সীতার জবাব এল, ‘সাজতে আমার ভাল লাগে না।’

‘ভাল লাগে না! তা কেন ভাল লাগবে! সাজলে যে ভাল দেখায়, ভাল মানায় হতভাগা মেয়ে। এই ত বয়েস সাজবার, এই ত সময় ঝা লাগাবার। নইলে সাজবি আর কবে ওনি? চুল পাকলে? বুড়ী হয়ে গেলে? শুনছেন ঋতুপমবাবু? আপনি ত এজুকেটেঙ লোক, আপনিই বলুন?’

প্রসঙ্গটা এমন পর্যায়ের যে আমার মত একজন অবিরাহিত যুবকের পক্ষে বিনা বিধায় কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সীতার ঘন কালো চোখ দুটোর চকল তারার আমার উপর একটুখানি ছোঁয়া বুলিয়ে গেল। মনে হ’ল ওপানেও যেন জিজ্ঞাসার ছায়া। তবু জবাব দিলাম না কোনকিছুই।

কি জবাব পেয়েছিল সীতা, জানি না। কিন্তু এর পর বগন আবার সে এসে, দেখি সেজেছে। রোজকার দেখা এলোমেলো অসংযত কালো চুলের গুচ্ছে এসেছে বাধনের চেষ্টা। চুলের অত বজা—ভট্টো বিহীন সাপের মত পিঠে ছোবল মারছে। ভোহাকাটা হাতেব সাড়ীটায় নতুন ধোপের গন্ধ। নরম কালো গাল দুটায় মাজাঘষার অনেক আঁচড়। একটু অবাক চোখেই তাকালাম।

কেউ হাজরা দোকানে নেই। কেনাকাটার কাজে বাজারে গেছে। দোকান সামলাবার ভার আপাততঃ আমারই উপর। কিন্তু হুল যে এই কঁকেই ফুটে উঠবে, তা কে জানে। কারও আনাগোনা বাধা পাতার হিসেব করা পথে চলতে পারে না। বিশেষ করে এ মেয়ের ত নয়ই। ওর এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বিব্রত করল আমার। কিন্তু খুশি যে মনকে কানায় কানায় হঠাৎ ভরিয়ে দেয় নি, এ মিথোচাই বা কতকণ লুকিয়ে রাখতে পারব?

‘কেউ কাকা, অ কেউ কাকা, কি করছ ভেতরে?’

জবাব দিতে হ’ল কেউ হাজরার বদলে আমাকেই। এত প্রথম কথা ওর সঙ্গে। ‘কেউলা নেই বাজারে গেছে।’

‘ও।’ কেবাম পথে পা বাড়াল সীতা সঙ্গে সঙ্গেই।

‘ইরে, কিছু কেনবার ছিল কি?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু কেউকাকা ত নেই।’

‘নাথাক, দোকানটা খোলা ত রয়েছে। আর দোকানের ভার এখন আমার ওপর। কেউলা কিরে এসে যদি শোনে যে তুমি এসেছিলে কিছু কেনবার জন্তে, আর কিছু না কিনেই চলে গেছ, তবে কি আমার আশ্ব রাখবে ভেবেছ?’

খামল সে, জো আছে?

নিশ্চয়ই। খুব ভাল কোমালিটির আছে। মাথলে চামড়া হ’দিনেই নরম তুলতুলে আয় মোলারেম হ’য়ে উঠবে। আর চকমক করবে শরীর। কে মাথবে, তুমি?

না, ছোট মাঝীমা।

তুমি মাথ না?

ওসব আমার ভাল লাগে না।

তোমার তো কিছুই ভাল লাগে না! কিন্তু ভাল না লাগলে ভাল হবে কি করে বল তো? সব ব্যাপারে অত উদাসীন হলে কি চলে? সাজতে যে হয় মাঝে মাঝে। সাজতে হয় এক এক সময়। দেখ না, পৃথিবীও তো সাজে কখনো কখনো। ভাল লাগে না বললেই তো ভালর শেষ হয়ে যায় না। কোন দিন বলবে ভাত খাব না, কেননা খেতেও আমার ভাল লাগে না।

কথাগুলো বলে অবাক লাগল নিজেই। এতখানি খুব হবার দরজা হুগাহুস কে যে দিল ভেবেই পেলাম না।

কেউকাকার সঙ্গে দিন-রাত্তির থেকে আপনায়ও দেখছি ওর রোগ লেগেছে!—কোটা হুলের পাগড়িতে ধরা পড়ল মাথা আকাশের মত এক বলক হাসি একটুখানির জন্তে।—দিন জোটা, বাট।

দিলাম। ওর জন্তেও দিলাম একটা। কেউ হাজরা থাকলে ঠিক যে রকমটি করত, তাই করলাম।

ভট্টো কেন একটাই চাট।

ওটা তোমার জন্তে।

বুধদ কটিল থানিকটা মিষ্টি হাসি। ‘ক’ত দাম?’

দাম কত, জানি। কিন্তু এ মেয়ের কাছে সব জিনিষেরই দাম আলাদা। যে দাম সকলের কাছে, তা ওর জন্তে নয়। এ সব কেউ হাজরার কাছেই শেখ। ‘তবু ইচ্ছে হ’ল বলি, ‘তোমাকে এমনই দিলাম।’ হঠাৎ এই দুঃসময়টাকে ঠিক সময়েই চেপে ধরল কিম্বিয়ে-পড়া বিবেক।

‘দাম ত কত জানি না। কেউদা এলে জেনে যেও। কিন্তু নিয়ে যাও তুমি। দেখ না মেয়ে, ভারি ভাল লাগবে।’

‘কিন্তু যদি খুব দামী হয়?’

‘না না, সম্ভাই হবে। ভর পেরো না।’

ভর পেল না। সম্ভা শুনে নির্ভরই হয়ত হ’ল। জোব শিশি হুটো হাতে নিয়ে এসোতে গিয়ে খামল আবার।

‘তখন যে অত বক্তা করলেন সাজা নিয়ে, আপনি নিশ্চয়ই আমার দিকে তাকান নি ভাল করে?’

‘এ কথা কেন?’

‘নইলে দেখতে পেতেন, আজ আমি সেজেছি। রোজ কেউ কাকা বক্ বক্ করে, আজ তাই জোব করেই সাজলাম।’

‘দেখেছি। ভালই করেছে।’

‘কিন্তু কৈ কেমন দেখাচ্ছে, একবারও ত বললেন না?’

কোন লাষণ-জড়ানো বোঁবন-ছোঁয়ানো মেয়ের এমন প্রশ্নের

উত্তরে কি জবাব দেওয়া যায়? 'বলতে পারা যায়, সন্দেহ। বলা যায়, দেখাচ্ছে তোমায় স্বাধীন মত। বনের মধ্যে নানা গাছের জঙ্গলে হঠাৎ উঁকি-দেওয়া স্থগমুখী মত। বলা যায় কত কিছু। আরও আবেগ দিয়ে, আরও কাব্য করে, বলা যায় অজস্র ভাষায়। অনেক কথায় স্তরের স্বার্থের ছড়িয়ে। রত্নী তুলির অনেক আবির্ভাব। কিন্তু বলতে পারলাম না কিছুই। হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেল ভাষা। সীতার ভীক চুটো কালো চোখের দিকে তাকিয়ে সময়টা দূরিয়ে গেল। ও চোখে খাচ কাভলের ছোপ দেখছি অনেক দিনের পর।

ভাল কি বেসে ফেলেছি এই মেয়েটাকে? প্রশ্ন কবি নিজেই নিজেকে। জবাবের জগে কান পেতে থাকি। শুনতে কিছুই পাই না। শুধু একটা অশুষ্ক স্তরের বৃন্দ এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহের আনাচে-কানাচে ছোট ছোট ডেউ তুলে। এই ভাল লাগা কি ভালবাসার নেমেছে ধীরে ধীরে আমার অভ্যাসে? এক চরকল মুহূর্তে পথ পেয়ে গেছে ওদের দল?

কেউ হাজার জীবনের পঙ্কজ বেলায় অনেকখানি ভাষণা জুড়ে রয়েছে এই কৃষ্ণ ষ্টোঁস। এগানকার এই ছোট্ট ঘরে, নানান জিনিষের অসাধারণ এলোমেলো সাজানোর মাঝে দোকানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হয় ত থাকে না, কিন্তু এখানে পদেরদের আনাগোনা যবেচাকেনায় এক বিচিত্র ভগ্ন পড়ে রয়েছে। আসে ছোট্ট চুট ছেলেমেয়েদের তরঙ্গ দল ঠিক হঠাৎ অঁর আঁবদার করতে। আসে বৃন্দাও। কাঁচাপাকা মাথার অড্ডা দিতে আসে। কথা হয় স্বপ্নচোপের, মরদ দেওয়া নেওয়ার। তরঙ্গের দল আসে। বাদ যায় না কুরেগাড়ীদেরও আনাগোনা। কার সঙ্গে ভাব নেই কেউ হাজার? কাকে সে চেনে না? যে যায় এ হস্তায়, কৃষ্ণ ষ্টোঁসের দেবগোড়ার একবার চুঁ নিয়ে যাবেই। এ শুধু দোকানই নয়, মিলনমন্দির—সব বয়সের, সব জাতের। কেউকাঁকা, কেউদা, কেউপদ। নানান ডাক সারা দিনে। এখানে আসবার পর থেকেই ওর এই দোকানের পৃথিবীতে আমার আসন পাকা হয়ে গেছে। সেই স্ত্রে অনেকের সঙ্গেই হয় চেনা-জানা।

এখানে নতুন পরিচয়ের নানা গুপের ভিড়ে ভাল লাগে আর একজনকে বিশেষ করে। সে বিজয়। 'বিজয় মাষ্টার! সবাই এ বলেই ডাকে। রোগা ছিপছিপে চেহারাটা। বেশী কথা বলে না, বেশী দেগাও দেয় না। মনে হয় ওকে বড্ড লাজুক। একটা মিষ্টি হাসির ছোঁয়া সব সময় মুখে লেগেই রয়েছে। ওর অল্প কথা বলা আর অল্প দেখা দেওয়ার ভেতরের কেমন একটা মাধুর্য আছে। তাই সঁবার থেকে আলাদা হয়েই আসন নিতে পেরেছে বিজয় মাষ্টার।

এক দিন কেউ হাজার ওর সামনেই জানাল, 'বৃন্দলেন অল্পমস বাবু, মাষ্টার আমাদের মন্ত কবি। কত কবিতা লেখে।'

'কি কবিতা? লেখক মন্ত কবিতার আর কিছু।'

'না না, ও কিছু নয়। কিছু নয়।' তাকাতাড়ি বলে উঠল বিজয় মাষ্টার। মুখে জড়িয়ে-থাকা হাসিটায় অস্বস্তি-জড়ানো লজ্জার ছায়া পড়ল।

'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। লেখে বৈকি। কত শুনিয়েছে আমার। আমার ত ভালই লাগে শুনতে। তবে আমার দাদা পড়াশুনো বেশী ত করি নি, কারো ভাল মন্ত বোঝবার ক্ষমতা কতটুকু বলুন? আপনি এজুকেটে সোক, আপনিই এসবের ঠিক বিচার করতে পারবেন। ওহে মাষ্টার, শুনিয়া না এক দিন আমাদের অল্পমস-বাবকে।'

এমনিতেই বিজয় মাষ্টার স্বল্পভাষী, তার উপর এত প্রশংসা। শুতরাং মনের অবস্থাটা কি বকম হয়েছে, অনুমান করতে পারছি।

'একটু-আধটু লিপি। আজেবাজে। ও কি আর শোনাবার মত নাকি! কেউদার তিলকে তাল করাটাই স্বভাব।'

'ফের দ্যান গ্যান স্তপ করেছ।' ধমকে উঠল কেউ হাজার। 'ওই ত তোমার এক বৃন্দাভ্যাস মাষ্টার।'

'কবিতা লেখার অভ্যাস ত ভাল গুণই মশাই। এতে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই। নিশ্চয়ই শোনাবেন এক দিন।'

এই একটা দিনই সেজেছিল সীতা। আর নয়। এর মধ্যে আরও বারকয়েক দোকানে হয়ে গেছে তার আনাগোনা। কিন্তু সেই এলোমেলো স্তর আববে। সেই অসাধারণী ডেউ। সেই উদাসীন ফোটা। যে মেয়ে সাজতে চায় না, যার ভাল লাগে না সাজতে—হঠাৎ তারই স্তর হবার সপ, হোক তা একটা দিনের ভজ্ঞ—একটা মুহূর্তের জঞ্জ—এ দৃশ্য দেখতে পাওরা হল ভৌতগ্য বৈকি! কিসের রং ধরেছিল এ মনে, কিসের আবেগ-করানো খুশী উৎসাহ দিয়েছিল প্রসাধনের, জানি না। জানি না ঐ কালো চুটো চোখের ভীক তারায় নেমেছিল কোন ইসারা কিনা। তবু কালো চুলের কপ জড়ায় হঠাৎ বিহীনীর আলিঙ্গন, কপালের মাঝখানে ছোট টিপের উঁকি, হঠাৎ কাভলের ছোপ কালো চোখের কানায় কানায়—এরা কিছুই কি বলে না?

হঠাৎ এক দিন বলে উঠল কেউ হাজার, 'বিয়ে করুন না আপনি সীতাকে, অল্পমসবাব।'

অমুরোধটা এমনিই অতক্তি আর অকস্মাৎ যে, ভাবতে আর অনুভব করতেই অনেকটা সময় চলে গেল। সত্যি বলতে কি, অমুরোধের ধারাটা যে এই পথ দিয়েই নামবে, কল্পনা করতে পারি নি।

'আপনি ইয়ং ম্যান, বিদ্যান, বুদ্ধিমান, সম্বলার, ভাল চাকরি করেন, উদার মন, স্বভাব-চরিত্র ভাল—আপনাদের মত ছেলেরা যদি এমন মেয়েকে নিয়ে ঘর না বাঁধে, তবে বাঁধবে কারা বলতে পারেন? বুড়োহাভাষা? মরচে-পড়া মন, বদমাইসরা? না মিনমিনে মেনিমুখোর দল?—তবু চূপ করেই থাকি। বলবার কিছু নেই বলে নয়; বলতে কিছু পারছি না বলেই। কেমন

এক অশ্রুজিহ্বা কুয়াশা চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে আমায়।  
জানি এ জড়তা বেদনার নয়, আনন্দের। আঘাতের নয়,  
পতনের। জানি এ বিষৃতা পিছনে খুশীই এনেছে, হুঃ নয়।  
তবু কুয়াশার কালো ধোঁয়া কাটিয়ে উঠতে পারছি কৈ ?

‘সত্যিই ভাল মেয়েটা। মিষ্টি স্বভাব, মিষ্টি মন, মিষ্টি হাসি—  
একটা মেয়ের মধ্যে আর কত চান মশাই ? এ মেয়ে যদি ভাল না  
হয়, তবে পৃথিবীতে ভাল মেয়ে একটাও নেই, এই সাক্ষ্য বলে  
দিলাম। আপনি তো দেখছেন দাদা, ওকে এদিন পরে, আপনিই  
বলুন ? অবিশ্রি বলতে পারেন গায়ের রং তুখে-জালতায় গোলা  
নয়। ‘অমন রং নিয়ে ক’টা মেয়ে জন্মায় দাদা শুনি একবার ?  
কিন্তু তাই বলে গোসাপকেই সবাই চাইবে, কৃষ্ণকলির দাম নেই  
কোন ? ‘আপনি তো এজুকেটেড লোক, আপনিই বলুন ?  
কৃষ্ণকলিকে ভালবাসার, ‘আরিক করার চোপ যদি আপনারদের  
মত ইয়মানদের না থাকে, তবে তাদের থাকবে বলতে পারেন ?  
বিয়ে যদি না করেন আপনি, মেয়েটা এক দিন দেখবেন কোন  
বড়োহাওয়া বা মাতাল জুয়াড়ীরা হাতে পড়ে ছুটুকটিয়ে মরছে।’

সে কি ?—নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই কেমন অস্বাভাবিক  
শোনাল। ‘না না, তা কেন হবে ?

‘কেন হবে না মশাই ? বাপ মা নেই আমার সরে পড়ে  
রয়েছে : এ বোকা কোনরকমে ঘাড় থেকে সরতে পারলেই তারা  
দেটে যায়। ‘না খুঁজবে ভাল পাত্র ? ‘তাহলে বেশী পরস্য প্রচ  
হবে না ? ‘আজকের দিনিয়ায় কে কার ভক্তো ভাবে মশাই ? ‘মা-  
বাপ তাইবোনেরাই কেউ কাউকে পোছে না, তা মামা তো চেদ  
দুয়ের সম্পর্ক। ‘আপনি তো এজুকেটেড লোক, আপনিই বলুন ?’

ভালবেসে ফেলছি সীতাকে। মনের মধ্যে অনেক হাতড়েও  
কিছু খুঁজে পাচ্ছি না স্বীকারের পথকে রূপে দেবার। সন্দরী নয়  
সীতা। গায়ের রঙে গোসাপ-পাপড়ির ছায়া নেই, নেই টানা  
চোপ, আঁকা ভূমি। গাঙুলে নেই আংটির ঝকমকানো তীরে,  
ককিতে আওরাজ জানে না নৃতন চিহ্নাইনের সোনার চুড়িগুলো।  
খাঁঝালো সেণ্টের পাগল-করা গন্ধ আশেপাশের হাওরাকে মাতাল  
করে তোলে না। এ মেয়ে কালো। কালোও যে এত কিছু ভাল  
নিয়ে থাকতে পারে, একে না দেখলে হয়ত জানতেই পারতাম না  
কোনদিন। সাধারণ সাদা সাদী দেহে জড়ানো। অনেক ভাঁজ  
গাওয়া, ময়লা। পিঠে লুটিয়ে-পড়া অক্লান্ত অলকগুচ্ছে কবরীর  
বন্ধন নেই। কিন্তু কালো চোপ ছুটোর স্নিগ্ধ ভাষায় আশ্চর্য মায়  
জাগানো রয়েছে। দেখানে তাকালেই পরশ লাগে প্রশান্তির।  
অবিস্তৃত বেশভূষা, উদাসীন সাজসজ্জায় ফুটে উঠছে স্বাভাবিক সৌন্দর্য।  
ফোটা ফুলের মত, উদার আকাশের অক্লান্ততার মত বা শান্ত, বা  
সরল, সহজ, বা ভাল লাগে—দেখতে ইচ্ছে করে পলকহারি চোপে,  
তাকির্বে থাকতে ইচ্ছে করে অনেকক্ষণ। ওখানে বোঁবনের ডেউয়ের  
স্বক হয়েছে ভাষা মাতামাতি। সাগরের ঢেউ নয়, নদীর ঢেউ নয়,  
নীল আকাশের ছায়াপড়া পদ্মপুকের। এখানে চোপ বলসে যায়

না, কে যেন নরম হাতের কোমল পরশ বুলিয়ে দিয়ে বার চোপে।  
নিষাভরণ জ্বাল মেয়ের এলোমেলো সাজ, এলোমেলো হাসি আর  
চকিত চাহনি, দিনের পর দিন আমার সবকিছু করে দিয়ে যায়  
এলোমেলো।

কিন্তু আমার সঙ্গে ওরা বিয়ে দেবেন কেন ? হঠাৎ এই  
জিজ্ঞাসাটা বেরিয়ে গেল মূণ থেকে। তবু খিখি আর সঙ্কোচে জড়ানো  
এই প্রশ্নটা অনেকক্ষণ থেকেই ঠোটের কাছে আনাগোনা করেছে  
বাইরে আসবার বার্ষ চেষ্টায়, তা স্বীকার করব কেমন করে ?

দেবে না মানে ? একশ বাব দেবে। রাজার বাব দেবে।  
ওদের বাপ দেবে। ওদের চৌদ্দপুরুষ দেবে। আপনি রাজী শে  
হোন এক বার, তার পর দেখি ওরা কেমন না দিয়ে পারে। দেখি  
তো কোন শালা আপত্তি করে ? দেবে না মানে ?

গোলাম এক দিন ওর আস্তানায়। ছোট্ট একটা ঘর। কিন্তু  
সেপানকার জীবন ছোট নয়। খাট রয়েছে দড়ির। জানলা ঘেঁষে  
টেবিল একটা। সেখানে থানকতক বই, কাঁচের ফুলদারীও একটা।  
ভোবের দেওয়া ফুল বিকেলে অনেকটা নেতিয়ে পড়েছে। একলা  
এখানে থাকে মাঠার। ছোট ঘরে বোজকার নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে  
থাকার জীবন এক জনের। সবটার রূপ অগোছালো, উদাসীন।  
তবু ভালই লাগল। যেমন ভাল লাগে এলোমেলো ওই মেয়েটাকে।

কবিতা শোনার সময় আর আপনার হয়ে উঠল না দেখছি,  
তাঁই নিজেই কাজ এলাম সময় করে।

আমার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে এখানে খুশী বা অবাক  
হওয়ার চেয়ে বিব্রত ভাবটাই বেশী করে চোপে পড়ল।

কৈ, শোনান।

আপনিও যেমন, কেঁটনার কথা সত্যি বলতে ভেবে নিয়েছেন ?  
একটু-আধটু লিপি নিজের পেয়ালে, তা কি শোনার বা  
শোনবার।

বেশ তো, আমিও শোনার পেয়ালেই গুনতে এসেছি, সমা-  
লোচনার মন নিয়ে আসি নি। এখানে তো ভাল পারাপের বিচার  
নেই।

সেদিন শোনার নি মাঠার। কিন্তু গুনলাম এক দিন এই  
ছোট ঘরে বসেই। ভালই লাগল। বিবট কিছু নয়। কবিতা-  
গুলো মহাকাব্যের পর্যায়ভুক্ত হুঃসাহসিক ভাবের স্পর্শও রাখে না।  
তবু বেশ স্বন্দর, সরল, শান্ত। এক সত্যিকারের স্বচ্ছ মনের দরুদে  
আর মমতার ভেজানো।

বললাম, বেশ ভালই তো হয়েছে।

লাজুক মাঠারের সব সময় হাসিখুশীতে ভরা মূণে লজ্জার ছায়া  
পড়ল। বললে, আপনি বিনয় করছেন। একটুও ভাল হয় নি।

ইচ্ছে করেই কোন জবাব না দিয়ে, সন্দেহটা ওয়ই উপর ছেড়ে  
দিলাম।

আচ্ছা, আপনি তো অনেক পড়াশুনো করেছেন, বাংলা ইংরেজী  
অনেক বড় বড় কবির ভাল ভাল কবিতা পড়েছেন, আপনার যখন

ভাল লেগেছে, তা হলে খুব খাপ খাইছে নি কি বলেন? একটু  
বাসে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা কাটবে এই প্রসঙ্গটা উঠে এল।

না। খুবই ছোট্ট জবাব দিলাম।

আচ্ছা, তা হলে কাগজের সম্পাদকেরা কেবল পাঠায় কেন?

কাগজে পাঠিয়েছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ। চার-পাঁচটা পাঠিয়েছিলাম। সব ক'টাই ফেরত  
এসেছে। আর পাঠাই না।

সবাইকার সবকিছুই ভাল লাগে কি?—বললাম।

আচ্ছা, কলকাতার কোন কাগজগুলোর সঙ্গে আপনার চেনা  
আছে কি? ছাপিয়ে দেবেন আমার হুঁচকটে পত্র?

চেনা নেই কারুর সঙ্গে ও জগতের। থাকলেও এ নিয়ে  
অন্যের-বিনয় আমাধারা হয়ে উঠত না। লিখে যান মন দিয়ে,  
আপনাকে যেতে হবে না, ওয়াই এক দিন আসবে এখানে।

সত্যি? বড় বড় কবিরের কাছে সম্পাদকেরা নিজের থেকেই  
আসে বুঝি?

নিশ্চয়ই।

চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকে লাজুক মাষ্টার।

মাষ্টার বিজয় লাজুক; কিন্তু কবি বিজয় লাজুক নয়। সেখানে  
অসংখ্য কথা সাজানো রয়েছে সুন্দর সুন্দর মত। ওরা সহজে গোলে  
না মূল, কিন্তু একবার মূল্য চলে ছড়িয়ে পড়ে আকুল বয়সখারার  
মত। মাষ্টারের সঙ্গে আলাপের নিবিড়তা এই সত্যটা জানিয়ে  
দিল। এই জানাই শেষ নয় ওখানকার সব জানার। হঠাৎ এক  
দিন আবিষ্কার করলাম আর এক জনকে। সে মাষ্টার নয়, কবিও  
নয়। সে তবু এক অপ্রত্যাশার-জড়ানো বিষয়-মেশানো আবিষ্কার।

‘আপনি আমার লেখার তারিফ করলেন। এখানে আর হুঁতন  
ওমু ভাল বলে আমার কবিতাকে। আপনি নাথার খি।’

কোঁতুহলী হয়েই শুধুলাম, ‘আর হুঁতন কে শুনি?’

‘কেন, কেউল আর সীতা।’

সীতা! ওই নামটা শোনবার ভেত্রে কান একেবারেই প্রস্তুত  
ছিল না। বিষয় ছড়িয়ে পড়ল চার-পাশে।

‘চেনেন না ওকে? দেখেন নি কোন দিন? কেউলার  
মোকানে আসে ত মাঝে মাঝে কিছু কেনবার চলে।’

হ্যাঁ বা না, বললাম না কিছুই।

‘ভারি ভাল মেয়ে। গায়ের রং কালো। তা হোক। কালো  
হলেই কি কেউ খাপ খাইছে? পৃথিবীর ভাল ভাল জিনিষের কত  
কিই ত কালো। নয় কি?’

‘তা বটে।’ সায় দিলাম।

‘ভারি ভাল মেয়ে। - যেমন মিষ্ট স্বভাব, তেমনই মিষ্ট হাসি  
আর কথা। দেখার এক দিন আপনাকে। আপনারও ভাল  
লাগবে।’

‘কোথায় দেখাবে?’

‘এই ঘরেই। এখানে ও প্রায়ই ত আসে। কাউকে বলবেন

না যেন তবে। বাড়ীর কেউ জানে না। লুকিয়ে আসে।’ পরের  
কথাগুলোতে মাষ্টারের স্বর আপনা থেকেই নীচ হয়ে এল।

‘ওকে তুমি ভালবাস মাষ্টার?’

এ প্রশ্নের জবাব হঠাৎ সহজে আসবার পথ খুঁজে পেত না,  
আমার সামনে আসেকার মত বসে থাকলে লাজুক মাষ্টার। এখন  
দেখা মাষ্টারের ভিন্ন এক সত্তা, কিন্তু এ বিজয় এখন অনেক উপরে,  
আকাশের কাছাকাছি।

‘ভালবাসা কিনা জানি না। তবে ভাল লাগে। খুব ভাল  
লাগে।’ একটু চুপ করে থেকে বললে মাষ্টার।

‘ওই ভাল লাগাকেই বলে ভালবাসা।’—জবাব দিলাম।

‘তাই কি?’

‘তাই।’ মুহূর্তসময়। তারপর প্রশ্ন করলাম, ‘এই সীতাই  
তোমার কবিতার ইনস্পিরেশন, কি বল?’

‘না না, তা নয়।’ একটা বস্তুম আভা মাষ্টারের হাসি-আঁকা  
মুখের শান্ত সরলতার ছড়িয়ে পড়ল। ‘তবে ওকে দেখলেই কেমন  
যেন হয়ে ওঠে মনটা। ওর কথা মনে পড়লেই কবিতার লাইন-  
গুলোতে আপনা থেকেই মিল এসে যায়। কিন্তু মজা কি জানেন,  
সীতা পত্রগুলো পড়ে আর হেসে মরে। আমি যেখানেই লুকিয়ে  
যাচ্ছি, ও ঠিক খুঁজে খুঁজে টেনে বার করবেই। আর চোঁচের  
চোঁচের পড়ে হেসে লুটোপুটি ধাবে।’

‘হাসে কেন?’

‘কি জানি!’

‘জিজ্ঞাস কর না কেন?’

‘ভারি ভাল লাগে ওর হাসি। তাই অস্বাভাবিক হয়ে হাসিই  
দেখি। জিজ্ঞাস করবার কথা মনেই থাকে না।’

ভালবাসে বিজয় মাষ্টার সীতাকে। আমার কাছে এ এক হঠাৎ  
আবিষ্কার। তবু এ সত্যি। লাজুক মাষ্টারের মনের গহন কোণে  
লুকিয়ে থাকা ভালবাসাকে খুঁজে পেলাম। এয় জগতে তৈরি ছিল  
না মন, প্রত্যাশার একটুও আভাসও পাই নি আগে। তবু অস্বাভাবিক  
করবার উপায় ত নেই ওদের এই ভাল লাগাকে।

সীতার কথার মূল্য হয়ে উঠে মাষ্টার কথার উদ্ধাম কল-  
কাকলিতে। ঘিণা আর সঙ্কোচের বাধ বজার মত ভেসে যায়।

‘জানেন ভারি একগুঁয়ে মেয়েটা। ভাল করে কিছুতেই সাজতে  
চায় না। আমি সেট, দো, পাউডার কত কি দিতে চাই, তা কি  
নিতে চায়? বলে কি জানেন, কি হবে সেজে? এই ত ভাল।  
বলে, বতাই রং মাখ, কালো কি কপনও ফর্সা হয়? ও সত্যি কথাই  
বলে। কিন্তু ও না লাজুক, ভগবানই ওকে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন।  
নইলে অত কালো চুলের ডেউ, অমন মিষ্ট হাসি, ওই মারা-  
বুনানো হুটো চোখ, বতাই লাজুক কেউ কি আনতে পারবে?’

‘জানেন সীতা নামটার সঙ্গে সব সময় হুঃখ জড়ানো থাকে।  
বাগানের সীতাকে মনে পড়লেই মনে পড়ে কান্নাকে। এ সীতাও  
তাই। এ মেয়েও হুঃখের। ওর কেউ নেই, কিছু নেই। তাই ত

## প্রয়াগে কুন্তগেলা



গঙ্গার চড়ায় যাত্রী-সমাবেশের ভিতর দিয়া পাণ্ডিত ঈশ্বরহরলাল নেহরুর ত্রিবেণী সঙ্গমভিমুখে গমন



সাপুগণের শোভাযাত্রা কর্তৃক গঙ্গার সেতু অতিক্রমণ



কুম্ভমেলার শোভাযাত্রায় হস্তীপৃষ্ঠে জটনৈক মোহন



শাখুগণের শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

এত ভাল লাগে। ওর জীবন কালকে নিয়ে বলেই ত এত সুন্দর  
সে হাসতে পারে। কাল্লাভেই ত মুক্তো বয়ে, হাসিতে ত নয়।  
তাই না ?

তুনে রাই চূপ করে। ভালই লাগে শুনতে।

এক দিন বললাম, 'সীতাকে তুমি বিয়ে কর মাঠার।'

'বিয়ে ?' মাঠারের চোখে ছায়া পড়ল এলোমেলো ডেউ।

'হ্যাঁ। ভালবাসাই ত বিয়ের ভিত্তি কবি।'

ভাল লাগল হরত কথাটা। কিছুকাল চূপ করে রইল মাঠার।  
তারপর প্রশ্ন ফুলল, 'কিন্তু ওর বাড়ীর লোকেরা যদি রাজী না হয় ?'  
কুক ট্রোসে বসে কেট হাজরাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম, তারই  
অবিকল প্রতিধ্বনি এ জিজ্ঞাসা। জবাব দিলাম, কিন্তু যে জবাব  
সেদিন শুনেছিলাম, তার পুনরাবৃত্তি করতে পারলাম না।

'কেন হবে না রাজী ?'

'ক্ষেপেছেন ? পাত্র হিসেবে ওদের কাছে আমি একটুও ভাল  
নই। গরীব মাঠার, ঘর-বাড়ী চালচুলো কিছু নেই। নিকে কি  
পাব, ওদের মেয়েকে কি খাওয়াব, তাই ভাববে ওরা।'

বললাম, 'এগুলো কারণ নয় মোটেই, এ তোমার দুর্বলতা  
মাঠার। ভালবাসতে নেমে ভয় পেতে নেই।'

'না না ভয় নয়। ভয় ত আমি পাই না।' হঠাৎ হৃৎ প্রতি-  
বাদ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এ কণ্ঠ কি সত্যিকারের ভালবাসার নয় ?

সেদিন জবাব দিই নি কেট হাজরার সেই প্রশ্নের। দিতে  
পারতাম। ছিল জবাব—একটাই জবাব। ছোট্ট একটা শব্দ।  
দিই নি। কেন, কে জানে। হরত ভয়, হরত লজ্জা, হরত  
সঙ্কোচ। কিংবা কিছুই নয় এসবের। ভাবতে থাকি আত্মগত  
হয়ে। তবু যে কারণই ইউক, এখন মনে হচ্ছে, ভালই  
করেছি জবাব সেদিন কিছুই না দিয়ে। দিলে আজ অমৃত্যুশেষ  
অন্ত থাকত না। অপরাধী হতে হ'ত এই লাজুক মাঠারের কাছে।  
তা সে অজ্ঞাতেই হোক। সত্যিই ভালবাসে সে আমার ভাললাগা  
ওই মেয়েটাকে। দোষ ওর নয়। দোষ নয় ওর ভালবাসার।  
ওই কুককলিকে জানে কবি, চেনে কবি আমার দেগবার, আমার  
চেনবার অনেক আগে থেকেই। এই ভালবাসার কোন সংশয়ের  
ছোঁয়াচ নেই। কোন স্বার্থপরতার দাগ নেই। নেই কোন  
নয়তা। এ সচ্ছন্দ, শাস্ত, অনাবিল। এক সুন্দর সরল চাওয়ার  
নির্ভর প্রকাশ। আমার ভালবাসা কি এত উঁচুতে উঠতে  
পারবে ?

অনেক দিনের পর আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমার গোলা  
জানলার ওরা ছড়িয়েছে আলোর ডেউ। হরতো চাঁদ রোজই  
উঠে এমনি করে, এমনিই আলো ছড়িয়ে বেড়ায় খুশীর  
পাগলামিতে। খেয়াল করবার অবসর হয় না। চাঁদের থোজই  
রাখি নি এতদিন। আজ অনেক দিনের পর ঘরে অন্ধকারে বসে  
একলা আবার চোখে পড়ল চাঁদ।

মাটির চাঁদকে তুলতেই হবে, আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে  
চেয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ দরজার ঠেলা পড়ল।

অমৃৎমবাবু আছেন নাকি ? চাপা গলা মাঠারের।

আমার ঘরে মাঠারের আগমন কতকটা স্বাভাবিক হবার কারণ  
বৈ কি। আলোর সূইচটা টেনে দিয়ে প্রদীপনার নামলাম।

এসো মাঠার, এসো, বল। পথ কি ?

পথর ভাঙাই। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাললাম দেখা  
করে বাই একটু আপনাব সঙ্গে।

বললাম, বেশ করেছে। কিন্তু নিছক দেখা করাটাট বে এভাবে  
দেখা দেওয়ার একমাত্র কারণ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ল না।

ঘর অন্ধকার করে বসেছিলেন, চাঁদের আলো উপভোগ  
করছিলেন বুঝি ?

জবাবে কিছু বলবার বদলে হাসলাম একটু।

তার পর মাঠার বেক্ষা শোনাবার জন্তে আমার ঘরে হঠাৎ  
এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আগমন করেছে, তাই শুনিয়ে ছিল এক  
কাঁকে। বেশী দেরি সইল না। খুশীর উপচে-ওঠা ডেউকে কতক্ষণ  
চেপে রাগতে পারে ?

জানেন, বলে ফেলেছি কাল সীতাকে, বলে ফেলেছি বিয়ের  
কথা।

কি জবাব পেলো ?

কিছুই বললে না।

রাগ করেছে বুঝি খুব ?

না না, রাগ তো নয়। চূপ করে রইল। 'বল দিকে মুখ  
ফিরিয়ে একটা বই টেনে ছবিগুলোর ওপর চোখ বুলোতে লাগল।  
লজ্জা পেয়েছে, কি বলেন ?

লজ্জাই তো পাবে কবি।

আমি তো তবে ঠিকই ধরেছি। মুখ ধুটে এমন প্রশ্নের জবাব  
কি মেয়েরা দিতে পারে ? কিন্তু জবাব দেয় হঠাৎ ওদের চূপ করে  
বাওয়া, মুখ ফিরিয়ে ও প্রশ্ন এড়িয়ে বাওয়া; নয় কি ?

সবই তো তুমি জান দৈগ্ধি মাঠার।

হাসি ছিটোনো মুগটা ওর হঠাৎ বস্ত্রম হয়ে উঠল।

জানেন, অল্পদিন আমার কবিতা পড়ে ও হাসে শুধু, কাল কিন্তু  
সব সময়ই গভীর হয়ে রইল। নতুন লেগা একটা পড়ে শোনলাম।  
শুনে গেল চূপ করে। জিজ্ঞেস করলাম, কেনন হয়েছে ? তাতে  
ধমকে উঠল, আমি তার কি জানি ! তার পর কি বললে জানেন ?  
কি ?

আপনার নাম করে বললে, আপনার কাছে যেতে। বললে,  
আপনি অনেক লেখাপড়া করেছেন, অনেক কিছু জানেন, কবিতার  
ভাল-খারাপের বিচার করার আপনিই যোগ্য লোক। আপনার  
ওপর ওর খুব শ্রদ্ধা। দেখলেন তো, সীতাকে আপনি না দেখলেও  
ও আপনাকে দেখেছে। কেটটার দোকানেই দেখে থাকবে হয়  
তো। আর জেনেছেও আপনার সবকিছু অনেককিছু।



এ কথাগুলো কিছুদিন আগে কানে এলে মন খুঁততে ঝলমলিয়ে উঠত। কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আজ আমার কাছে এই স্তম্ভবাদের মাঝে গুল্লরণের মেয়াদ। কালো নরম পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সাধা আকাশের ছোয়া-নেওয়া এই বর্ষণ আজ ছুরিয়ে গেছে আমার কাছে।

তাই বলতে পারলাম শুধু ছোট্ট সাদার, হবে।

কিন্তু লাজুক মাষ্টারের জড়তার সব বাঁধভাঙা প্রেমিক মন, উচ্ছলিত আনন্দ-বিহ্বলতার আমার মনের খোঁজ কি করে পাবে? 'খোঁজ নেবার সময়ই বা তার কৈ? কারই বা থাকে? এ অবস্থায় থাকত কি আমারই?

শুনবেন কবিতাটা?

শেনাও। শেনাবার মন নেই। তবু না বলতে পারলাম না।

পড়ে গেল মাষ্টার।

কেমন হয়েছে?

কিছুই কানে বাথ নি। যাবেও না জানতাম। বললাম, ভালই।

একটু বাদে একটা পল্ল ভুলল মাষ্টার, আচ্ছা অল্পমবাবু, একটা কথার জবাব দেবেন?

কি?

'বিয়েতে সবাই টাকাব দিকেই নেপে, মনের খোঁজ খুব কম লাকই নেয়, কেন বলতে পারেন? সত্যিকারের একটা ভাল মন ক'লাখ টাকা দিয়েও কেনা যায়? বলুন না?'

'নয়ই ত। 'তাই ত কবি, মালাবিনিময় সব বিয়েতেই হয়, মনের বিনিময় হয় খুবই কম।'

'এই আমি বলছি অল্পমবাবু, যার সঙ্গেই বিয়ে হোক সীতার, আমার মত ভালবাসতে কেউ পারবে না। কেউ না।'

এই কি সেই লাজুক মাষ্টার? ভীক কবি? এত জোরের সঙ্গে এতখানি আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে সে পেল? কে দিল তাকে এই সাহস, এমন উদাত্ত কণ্ঠে জানাতে ওর প্রেমের গভীরতা?

চাঁদকে ভুলে কবিরই দিকে তাকাই 'অবাক হয়ে। তবু চাঁদ ত প্রেমিকেরই।

কেউ হাজরার সেই প্রসঙ্গের জবাব দিলাম এতদিনের পর। সেই প্রসঙ্গ ও আর তোলে নি তার পর থেকে। চরিত ইচ্ছে করেই, হয়ত জবাব কিছুই না পেয়ে। আমিই টেনে আনলাম সেই মেয়ের প্রসঙ্গকে আবাদ।

'আপনার সেদিনের অহরোধ রাখতে পারলে খুঁতই হতাম, কিন্তু পারব না রাখতে।'

চশমাটা চোখে লাগিয়ে হিসেবের মোটা খাতায় যেতে ছিল কেউপদ, আমার কথার কোন সাড়া দিল না। ইচ্ছে করেই হয় ত। কানে যে যার নি, এ আমি মানতে রাজী নয়।

'বিয়ে করব না ওকে, তার কারণ এই নয়, যে ভাল লাগে না মেয়েটাকে বা ভালবাসি না। কারণ শুধু এইটুকুই, ও সত্যিকারের স্ত্রী হোক। ভালবাসি বলেই ওর ভাল চাই। 'সত্যিই-ও ভাল মেয়ে।'

'ভাল ত আমিও চাই মশাই।' খাতার হিসেব ছেড়ে কেউ হাজরার এবার সাড়া জাগল। 'তাই ত আপনাকে বলছি বিয়ে করতে। তা আপনি কি বলতে চান আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়েটা স্ত্রী হবে না?'

'হয়ত হবে। কিন্তু আমার চোখেও ভাল ছেলে ত আছে।'

'তা হয় ত আছে। কিন্তু ক'টা? তাদের পারই বা কোথায়, কোথায় খুঁজে বেড়াব ওদের? আছে বললেই ত আর হ'ল না। আছে যে তা ত জানে সকলেই দাদা। কিন্তু তাদের খুঁজবে কে? কে রাজী করাবে? আপনি ত এজুকেটেড লোক, আপনিই বলুন? বরাতজোরে আপনার মত একটা ছেলে চাতের কাছে পেয়ে গেছি তাই ধরে বসলাম।'

অভয় দিলাম। 'সে ভার আমার। আমি দেব খুঁজে। আমাকে যদি ভাল লেগে থাকে, আমার পছন্দের ওপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর করতে পারেন।'

এবার খুঁত হয়ে উঠল কেউপদ। অনেক দিনের পর ছোট-লাগা কোকলা দাঁতগুলোর আশেপাশে হাসি ছিটিয়ে উঠল।

'তা হলে ত কোন ভাবনাই নেই। আর আপনি দাদা অনেক পড়াশুনো করেছেন, অনেক ভাল ছেলের সঙ্গে আলাপসাদাপ আছে, আপনি এ কাজ ঠিকই পারবেন।'

ভাল লাগল না এই প্রথম কেউ হাজরার খুঁতকে। অবশ্য জানি দোষ ওর নয়, আমারই।

খোঁজবার দরকার ছিল না। কাছেই রয়েছে। আমার পছন্দ কমা পাত্রটির নাম ইচ্ছে করেই জানালাম না তখন কেউ হাজরাকে পরেই জানাব।

কিন্তু পরের দিনই ইয়াং কলকাতায় যেতে হ'ল আপিসে কাজে জরুরি ভাব পেয়ে। খুব সকালেই গাড়ী। এত তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত করতে হ'ল যে, কাউকে জানাবার সময় অবশি পাওয়া গেল না।

ভেবেছিলাম ওখানকার কাজ হুঁচাব দিনেই শেষ হবে। কিন্তু দিনের সংখ্যা কাজের অভাবনীর চাপে অনেক বেড়ে গেল। এং দেখি হবে কে জানত!

ফিরে আসতেই মাষ্টারের সঙ্গে দেখা। 'এই যে অল্পমবাবু কোথায় গিয়েছিলেন এদিন। আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি ত হররান হয়ে গেলাম।'

'কেন, কি হয়েছে? ব্যাপার কি?' আমাকে ওর এভাবে খোঁজার কথার কৌতূহলী হলাম নতুন খবরের আঁচ পেয়ে।

'ইয়ে, কবিতা লেপবার অর্ডার হয়েছে একটা। বিয়ের কবিতা খুব সুন্দর কাগজে লাল কালিতে ছাপবে, কত লোক পড়বে। যা-য

ত আর লিখলে চলবে না, ভাল করে শুদ্ধি লিখতে হবে। রাতে বিয়ের খুশী আর আনন্দ-উৎসবের উপবৃত্ত হয়। কি বলেন?’

‘সে ত নিশ্চয়ই।’

‘তাই খুঁজিলাম আপনাকে। একটু দেখে দেবার জন্তে। যাই হোক, চলে গেছে ছাপতে কলকাতায়। খুব খারাপ হয় নি। ছেপে এলে দেখবেন।’

‘এখনও তবু পরিষ্কার হ’ল না পুরো পবরটা। প্রশ্ন করলাম, ‘বিরোটা কার?’

‘ও হরি, তাও জানেন না বুনি? আর কি করেই বা জানবেন, আপনি ত এখানে ছিলেনই না ক’দিন। সীতার বিয়ে।’

‘হেসে শুধালাম, ‘তোমারই বিয়ে তা হলে, তাই বল। তুমিই বর, আর তুমিই কবিতা লিখছ তোমার বিয়েতে! বেশ মজা ত।’

‘না না, আমার সঙ্গে বিয়ে ত নয়।’ তাড়াহাড়ি জানিয়ে দিল মাষ্টার।

‘মানে?’ অবাক হয়ে তাকাতো হ’ল।

‘জনলাম ওরা নাকি খুব ভাল একটি ছেলে পেয়েছে।’ কৈফিয়তের স্বরে জানায় মাষ্টার।

‘তাতে কি?’

‘আমার প্রশ্নটার গলার সাধারণ স্বরের চেয়ে অনেকগানি কাঠিলের পংশ ছিল।’

‘না না, তাতে আর কি, তাতে কিছু নয়।’ কেমন বেন অসংযত হয়ে উঠল কবির এতক্ষণের স্বাভাবিকতা। ‘ভাল ছেলে পাক না। মেয়ের জন্তে ভাল ছেলে সকলেই ত খোজে। তবে সীতা কিন্তু রাজী হয় নি। ও মূল খুঁটে সাহস করে আমার নামই করেছিল। তা আমি জানি।’

‘আব তুমি? তুমি বুঝি বেইমানি করতে একটুও দেরি করলে না?’

‘না না, আমিও ত রাজী হই নি প্রথমে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন। তারপর এক দিন হঠাৎ ওর বড়মামা আমার ঘরে এসে হাজির। এসে বললে, ‘ছাপার অফরে কখনও দেখেছ নিজের কবিতা কবি?’ জানালাম, না। বললে, ‘দেখতে চাও?’—চাই বৈ কি, চাই, লাকিয়ে উঠলাম। জানাল, সীতার বিয়েতে কবিতা লেখ, খুব ভাল একটা। ছাপিয়ে দেব হাজার হাজার—ভাল কাগজে, ভাল কালিতে। কত লোকে পড়বে।’

‘ওই লোভেই ছেড়ে দিলে সীতাকে? ভুলে গেলে মুহুর্তে মেয়েটাকে? কুশ, ইন্ডিয়ট, ননসেন্স। তাহা ঠিকিয়েছে ওরা তোমার মাষ্টার।’

‘আঙনের চোখ নিয়ে তাকালাম ভুলে যাবার এই মমতাহীন ইতিহাসে। এত খারাপ কখনও কোন দিন লাগে নি মাষ্টারকে। ঘণার স্পন্দিত সমুদ্রে এভাবে কলুষ-স্নান করবার জন্তে কে ওকে ঠেলে দিল কেলে?’

‘না, ঠকায় নি। খাল্লা দেয় নি। সত্যিই। এই ত সেদিন

নিয়ে গেল কবিতাটা। ছাপাতেও গেছে কলকাতায়, জনলাম। দেখবেন, যখন বিয়ের রাতে বিলাবে।’

‘কি দেখব? কি দেখাবে তুমি? ও ত বিয়ের কবিতা নয়, ও তোমার অধঃপাতের কাহিনী। অথবা বিশ্বাসঘাতকতা আর বেইমানির গান। ওরা তোমার ঠকায় নি মাষ্টার, তুমিই ঠিকিয়েছ নিজেকে। ছাপার অফরে কি দাম আছে পৃথিবীতে? পয়সা থাকলেই বা খুশী ছাপানো যায়। আমার বললেই পাবতে, ছাপিয়ে দিতাম বিনা পয়সায় ওই রকম হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ! সামান্য ছেলেভুলানো লোভে বোকাদ মত ভুলে গেলে! নিজের কবিতা ছাপাব অফরে দেখতে পাবার খুশীতে এক কথায় ছেড়ে দিলে সবকিছু? মনে পড়ল না একবারও কি এত দিনের ভাল-লাগা মেয়েটার কথা? এত দিনের চাওয়া-পাওয়ার, হাসি-গানের স্মৃতি? তুমি বেইমানি করেছ মাষ্টার ভালবাসার সঙ্গে, জোচ্ছুরি করছ স্বপ্নের সঙ্গে। কয়েক লাইন ছাপার অফরের লোভে স্বচ্ছন্দে বেচে দিলে একটা মনকে!’

এ কি করে এসেছে মাষ্টার? শাস্ত, সরল, লাজুক, হাসি-ভরা-মুগ্ধ যে বিজয় মাষ্টারকে দেখে এসেছি এত দিন, দেখেছি বার মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসার অনাবিল ছবি—সেই কোমলতা, উদারতা হঠাৎ এমন কঠিন পাথর করে দিল কে? কালো মেয়ের নিঃপম কাক্সল-কালো রূপকে আমার ভাল-লাগা, লাজুক মাষ্টারের যে ভাল-বাসার কাছে হার মেনে নিয়েছিল বিনা প্রতিবাদে, শ্রদ্ধায় আর সহানুভূতিতে, কোথায় গেল সেই উদার আকাশ?

তাকালাম মাষ্টারের দিকে আবার অবাক বিশ্বাসে। কাঁপছে ও দারুণ অস্বস্তিতে। আমার এত উত্তেজনা কখনও দেখে নি। কখনও শোনে নি এমন কথার কশাঘাত। ক্ষোভে আর অশ্রুচোচনার সংযমের বাধ-ভাঙ্গা আমার এমন অস্বাভাবিক চেহারা ওর কাছে নুতন। তাই হয় ত।

কিন্তু আবার মনে পড়ল, মনে পড়ল মাষ্টারের কুঠার জড়সড় চেহারার দিকে তাকিয়ে, কালো চোখের ভাঁজ তারায় বিশ্বাসের ছায়া দেখে। ওরা ঠিক পথই ধরেছে, লোভ দোংয়েছে লোভীকে। লোভী লাজুক মাষ্টার নয়, নয় ওর সত্যিকারের ভালবাসা। ওর কবি-মনই লোভী। সেই কবিকেই ওরা দেখিয়েছে লোভ। ঠিক বার করেছে খুঁজে ঐ দুর্বলতাকে। ওদের আছে সংসারীর চোপ। যে চোপ এক চাওরাত্তই মাছুষ চিনতে পারে। যে চোপ সাংসারিক অভিজ্ঞতায় বিচারের ভুল বেশী করে না। তাই ভুল ওরা করে নি। ভুল করেছি আমিই।

কিন্তু লোভী কবিই কি একমাত্র বেঁচে থাকবে ওগানে?

ঘুম ভেঙে গেল ভোরে। ঘুম ভাঙল মিষ্টি স্বপ্নে। সানাই বাজছে। মনে পড়ে গেল আজ সীতার বিয়ে। সেই কুক্কলির বিয়ে। বিয়ে সেই অজুত মায়া-জড়ানো মেয়েটির—ভোয়ের ভেজা শিশিরের মতই যে অমলিন। জোক করে ভুলে-বাওয়া,

ভাল-লাগা মেয়েটার জঙ্গে অনেক দিনের পর মন আত্মকের ভেতরে  
ঠাং কেমন বেন করে উঠল, সানাইয়ের খুঁবে ভূপালির কান্নায়।

তারার ভেতরে রাতেই আকাশ। খুঁবের আনন্দ-উৎসবে মন  
সাজে নি বাড়ীটা। অনেক চকল ভিড় উজ্জল হয়ে উঠেছে।  
নিমগ্নিত হলেও নিলিঙ্গ, নিবাসক দর্শকের মত এক কোণে আত্ম-  
গোপন করে ছিলাম। বিয়ের অনেক খুঁবের ভরা আসরে পা  
দিয়েছি, পাত্রটিকেই দেখবার জঙ্গে শুধু।

দেখলাম। ভিড়ের পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলাম  
রাস্তায়। ফাঁকের কাছে ঠাং ধরে ফেলল মাষ্টার।

এই যে অল্পমমবাবু, কহকণ এসেছেন?

এই হ্যাঁ এলাম।

এরই মধ্যে চললেন?

হ্যাঁ, আর কি।

বা হে, 'বিয়ে' দেখবেন না? পাওয়া-দাওয়া করবেন না?

নাঃ।

না বললে কি চলে? তা কি করে হবে? সকলকে অত্যাধনা  
আর দেপাশুনা করবার ভাব যে আমার ওপর। সীতা তুললে  
ভয়ানক রাগ করবে। চলুন।

রাগ কেন করবে? কোঁতুল হ'ল।

বারে, ও অজ্ঞ অনেকবার আপনার সৌজ করেচে। আপনি  
কলকাতা থেকে কিরেছেন কিনা, আপনাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে  
কিনা। আমি বললাম, নেমন্তন্ন করা হয়েছে, আর উনি ঠিকই  
আসবেন। তার পর ও বলল তুমি ভর বড় আতিথ্য করে ঠিকমত।  
তিনি এখানকার নতুন লোক, কান্ডিকেই তো চেনেন না। ভর  
দিকে লক্ষ রেখো একটু। যাই বলুন, আপনাকে ও খুব শ্রদ্ধা করে।

লক্ষা ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই কি খুঁজে পেলেন না মাষ্টার?  
না খুঁজতে চাইল না?

বললাম, শরীরটা আমার ভাল নেই। তাই বেতে গছে।  
রাগ করতে মানা করে সীতাকে।

শরীর ভাল নেই? তবে তো থাকা ঠিক নয়।

ছাড়া পেয়ে এগোলাম।

অল্পমমবাবু। আবার ডাকল মাষ্টার।

দাঁড়াতে হ'ল। বিয়ের পনটা দেখেছেন?

হ্যাঁ। মিথ্যেই বললাম।

কৈ, আপনার হাতে দেখছি না তো?

ছিল তো এতক্ষণ। পকেটে রেখেছি বোধ হয়।

ও নিয়ে আর মাথা ঘামাল না মাষ্টার। 'কেমন হয়েছে?'

'ভালই।'

'আর বেশ চমৎকার ছেপেওছে, কি বলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সীতা আজ আমার কি বলেছে জানেন? বলেছে, তোমার  
খিয়ে কবি কবিতার সঙ্গেই হবে, মাষ্টারের সঙ্গে নয়। কেমন কেমন

বে কথা বলে মেয়েটা! আজ কিন্তু ও খুব সেজেছে। মাথায়  
ফুলের ভিড়, কপালে চন্দনের। চোখে কাজল টেনেছে। খুব  
জমজমাট একটা সাড়ী পরেছে। এত ভাল লাগছিল। আর আজ  
ও কি বলেছে জানেন?'

'কি?'

গলার স্বর অনেকটা পাদে নামিয়ে জানাল মাষ্টার, বলেছে,  
'এমন সেজেছি যে তোমাদের বিবাহ বৃদ্ধিমান অল্পমমবাবু ও দেখলে  
কাত।' তারি কাজল হয়েছে মেয়েটা! দেংহাই, এসব ওকে  
আবার বলবেন না! বেন।'

তাড়াতাড়ি পা চালালাম। আর দাঁড়ানো যায় না। আরও  
অনেককিছুই হয় ত থাকতে পারে মাষ্টারের, বলবার। শুনতে  
চাই না। চাই না। শোনা অস্বাভাবিক, শোনা পাপ। পাপ।  
বলেছে সীতা মাষ্টারকে, আমাকে নয়। মাষ্টারই শুদ্ধক, মনে  
রাখুক। আমার শোনার আর অধিকার নেই।

ইচ্ছে করে ঘুরেই ফিরলাম কৃষ্ণ ঠোসের সামনে দিয়ে। বিয়ে-  
বাড়ীতে দেখতে পেলাম না কেউ ছাত্রবাকে। হয় ত আসে নি।  
হয় ত লুকিয়ে এসেছে, লুকিয়েই পালিয়ে গেছে। হয় ত—

আলো জলছে কৃষ্ণ ঠোসে। এত রাতিরেও। ধমকে  
দাঁড়লাম। পা দুটো এগোবার স্বচ্ছন্দ গতি পাচ্ছে না। কলকাতা  
থেকে ফিরে আর দেখা করে নি কেউ ছাত্রবাবার সঙ্গে। মাষ্টারের  
এই বেইমানির ইতিহাস শোনবার পর থেকে সাহস হয় নি ওখানে  
মুগোমুগি দাঁড়াবার। মনে হয়েছে, এর জঙ্গে দায়ী একমাত্র আমিই।  
ভরসা আমিই দিয়েছিলাম কেউ ছাত্রবাকে। আশা দিয়েছিলাম।  
তাই অপরাধী হয়ে সেখানে বাবার মত মনের জোর খুঁজে পাচ্ছিলাম  
না কিছুতেই। 'ভুব' আশ্রয় এত কাছে এসেও, ফিরে যেতে পারলাম  
না। এগিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে।

'কে অল্পমমবাবু, আসুন।' মোটা পাতার হিসেবের পাতা  
থেকে চোপ তুলল কেউ ছাত্রবাবা পায়ের আওয়াজ শেয়ে।

'এখনও দোকান খুলে রেখেছেন যে?'

'শেষ হিসেবনিকেশ করে রাখছি। কাল থেকে কৃষ্ণ ঠোস  
বন্ধ।'

'সে কি!'' অবাধ হলাম।

'আমার পরমমম মেয়েই নেই, কার জঙ্গে খুলে রাখব বলতে  
পারেন? আর বিক্রিই বা হবে কি ঘোড়ার ডিম!'

দোকানে রোজ ভিড়-করা দণ্ডিলের কথা মনে করিয়ে দিলাম।  
বললাম, 'ওরা ত রয়েছে। এই কুঁড়িরা একদিন-না-একদিন বড়  
হবে। আপনার ছোট্ট উঠোন ফুলে ফুলে ভরে যাবে।'

'ক্ষেপেছেন, আর নয়! ওসব মায়া-টায়ার মধ্যে আমি  
নেই মশাই। আমার কি আর কাজকর্ম নেই বৃদ্ধা বয়েসে।  
যত সব বাজে কাজ।...তার পর, বিয়ে কেমন দেখলেন?'

'বিয়ে দেখি নি। আগেই চলে এসেছি।'

'কেমন পাওয়াল?'

‘খাই নি।’

কেউ হাজরা আবার মন দিল মোটা বাতায়।

• ‘বয় দেখলেন?’ হিসেব করার কঁকেই আবার প্রশ্ন ত’ল।

‘হ্যাঁ।’

‘কেমন লাগল?’

একটু ইতস্ততঃ করে জানালাম, ‘ভালই ত।’

‘ভাল না হাতী! এর চেয়ে ভাল কি হতে পারত না? ওদের খোজা আর কত ভাল হবে? আপনি ত মশাই ভাল ছেলে

দেব বলে কিছুই করলেন না। নিজেও এগিয়ে এলেন না। আপনি যদি মেয়েটাকে বিয়ে করতেন!’

চুপ করে বইলাম। এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারি। বলব কি চেঁচিয়ে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এক লাজুক শাষ্টার, এক ভীক প্রেমিক, এক লোভী কবি—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে, উদার আকাশের সরলতার সঙ্গে, সমস্ত পৃথিবীর ভালবাসার সঙ্গে! বলব কি চেঁচিয়ে, আমি নয়, এক হৃদয়হীন কবি নিষ্ঠুর হাতে উপড়েছে আধকোটা রক্ষকলির নরম পাপড়গুলো। বলব কি?

## উদ্বোধন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জাগো জাগো হে বধির ঈশ্বর আমার,—

অসহায় আর্ন্ত কণ্ঠে বিশ্বলোক ঢাকিছে তোমায় বারবার।

হায় প্রভু, তবু

তব মুক মুণ্ডে কত

কোনো দিন ফুটিবে না কথা?

জাগিবে না আঁখি মেলি’ ওগো তন্দ্রাতুর?

তবে কি সতাই তুমি অস্তিত্ববিহীন?

নিষ্করণ অন্ধ শক্তি তুমি কি গো চির উদাসীন

সংসারের দুঃখে স্থগে, বাধা-বেদনায়?

তুমি মোর শঠা বলে চিরদিন করেছি অচনা

ধূপদীপে, স্তবস্তোত্রে, বিকচ কুসুমে—

সে কি মোর ভ্রান্তি?—সে কি কল্লাবিলাস?

তুমি শঠা—স্বষ্ট আমি—

মিথ্যা এ কি মোহান্ধ সংস্কার

রয়েছি আকড়ি বৃকে স্থষ্টির প্রথম উষা হতে?

কে তোমারে প্রচারিল এ বিশ্বসংসারে?

কণ্ঠে কণ্ঠে কে বণ্টিল তব স্তবানাম

ছন্দোগীতে গাঁথি?

মন্দিরে মন্দিরে প্রভু, কে প্রথম পূজিল তোমায়?

জলে-হলে-অস্ত্রহীনে ভূধর-গহনে—

কার নেত্রে দিল ধরা বিজুতি তোমার অপরাধ?

হেরিয়া গগনপথে দীপ্ত ইন্দ্রশব্দ—

‘তব রক্ত ঘোষ বলি কে চিনিল তায়ে?’

বহিঁ জলে তব ভয়ে, স্থাঘ্য মের তাপ;

তব ভূতাসব নিত্য বহে প্রতজ্ঞন,

মৃত্যু আসে ধৈর্যে সলা ইজিতে তোমার,

উচ্চাসিত এ তুবন তোমারি প্রভায়—

কে প্রথম এষ্ট বাণী ঘোষিল ধরায়?

কল্লনার সপ্ত বর্ষে করিয়া বতন—

আমি তোমা গড়িয়াছি আপনার মনের মতন!

অপার মহিমা তব—সে যে হায়, আমারি স্বপ্নন—

অণু হতে অগীমান,—এই গর্জ মোর!

হে মর্ত্যতা মণীয়ান,

মতা যদি হও প্রভু, সক্ষমশক্তিমান—

পারো কি করিতে কতু জ্ঞান

‘আহ এষ্ট ধরিত্রীরে স্রবাস্ত্রুনাগপাশ হতে?’

যে ‘ব্রহ্মন উঠে ভেদি’ স্তব্ধ অভ্রতল

লক্ষ দণ্ড বকু হতে চির রাত্রিদিন—

পারো তাহা নিবারিতে?

ভগতের বত দুঃখভার—

নীদর সাক্ষীর মত দেপ যদি চাচি,—

পদ্যের লজ্জাও গিরি কোন মস্তবলে!

পারো কি নূতন করি পড়িবারে আর একবার—

জীর্ণ এ সংসার?

থাকো যদি—অস্তিত্বের দাও পরিচর

জীবনের সর্ব দিক হতে!—

অশরীরী আত্মাসম রহিও না বসি’

তিমির-স্তম্ভিত ধ্যানলোকে!

হায় স্বামী,

একবার এসো তুমি নাম

‘তব স্থপতি-ধাম হতে—

জঠর বস্ত্রপাক্ষিত মাটির ভগতে!

# নবাবী ও দেওয়ানী আমলে মুদ্রা

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ

নবাবীর শেষ আমলে এবং কোম্পানীর প্রথম আমলের যেসব মুদ্রা<sup>১</sup> বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব। সে সময়ে রূপার সিকা ঢাকার সর্বোচ্চ মান ছিল। দিল্লীর বাদশাহকে নজর পাঠাইবার জন্য এবং অজ্ঞাত ঢাকশালে নমুনা পাঠাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ ঢাকশালে অল্প পরিমাণে সিকা ঢাকা প্রথমতঃ তৈয়ার হইত। তাহার পর অজ্ঞাত ধনী, বণিক, মহাজন ইত্যাদি নবাব নাজিমের পরওয়ানা লইয়া রূপা বা পুরাতন টাকা দাখিল করিলে তাহা হইতে নূতন সিকা ঢাকা তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইত। অবশ্য বার বার চাহিদামত টাকা তৈয়ার করা হইত, তাহার নিমিত্ত রীতিমত ফিস বা দস্তখী দিতে হইত। ইত্যাদে মতঃ জগৎশেঠের কুঠীর ভগ্ন সর্বপ্রায়ে টাকা তৈয়ার হইত। কারণ কাহারাই নবাব-সরকারের বংশাধিকৃত কোষাধ্যক্ষ ও মহাজন, কাহাদের দস্তখীও অজ্ঞাত হইতে কম ছিল, শতকরা আট আনা। জগৎশেঠের কুঠীর অস্ত্রবাণিজ্য-ভণ্ডের ভার ও অজ্ঞাত ব্যবসায়ী হইতে অনেক কম ছিল। অপরাপর বিষয়েও সুযোগ-সুবিধা অনেক ছিল।

এ প্রসঙ্গে জগৎশেঠদের স্বত্বকে কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ তাহাদের সঙ্গে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মুঘল বাদশাহদের শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রত্যেক স্তরের সিপাহ সলার বা স্তবেদার যদিও দৃষ্টতঃ সেকোপরি ছিলেন, কিন্তু রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান, কাজুনগো, পোন্দার অথবা নিজামত বিভাগের কাজী-উল-কুজত (প্রধান কাজী), ওয়াকিনগার (সংবাদদাতা), ভরকরা (গোয়েন্দা) ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের প্রধান বাস্তবিক দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইতেন অথবা ইত্যাদের নিয়োগের সনদ দিল্লী হইতে মঞ্জুর করিয়া আনা হইতে হইত। ইত্যাদের প্রত্যেককে স্তবার বিভিন্ন স্থান হইতে স্ববিভাগীয় অধীন কক্ষচারিগণ কর্তৃক সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বাধীন ভাবে সরাসরি দিল্লী-দরবারের ঐ সব বিভাগীয় মহতীদের নিকট পাঠাইতে হইত। ক্ষমতার সমতা স্বার্থে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল না। দেওয়ানের প্রকৃতি হিসাব কাহুনগোদের মোহরযুক্ত করিতে হইত। কোন ভূমিদানী বিক্রয়ের কোবালাখ কাজীর ও কাহুনগোর শিল-মোহর যুক্ত হইত। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজের সন্ধিপত্রে কাহুনগোদের দস্তখত ও শিলমোহর যুক্ত ছিল, কারণ তাহারাই সমস্ত দলিল-পত্রের একাধারে মহাজেজ (Record-keeper) ও সত্যতা-যুক্ত করার কক্ষচারী (Registrar) ছিলেন। এইজন্য কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠদের বহালী সনদ দিল্লী হইতে আসিত। কোষাধ্যক্ষের তিনটি চাবি ছিল—একটি স্তবেদার, দ্বিতীয়টি দেওয়ান ও তৃতীয়টি কোষাধ্যক্ষ বা পোন্দারের জিম্মায় থাকিত। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় শক্তির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই শাসনপ্রণালীরও বিলোপ হইল।

জগৎশেঠ কোন বাস্তবিশেষের নাম নহে—রাজা, নবাব, মহা-রাজা ইত্যাদির জায় বাদশাহপ্রদত্ত উপাধি মাত্র। জৈন বণিক মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাবসা আরম্ভ করেন। ইহার অজ্ঞাত ভ্রাতার আশ্রয় বারানসী ইত্যাদি স্থানে গদীখাফাতে তিনি বাংলার রাজস্ব হস্তী করিয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট সহজেই পাঠাইতে পারিতেন। তিনি একবার এইরূপে এক হস্তীতে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠান। তাহাকে দিল্লীর সম্রাট 'শের' উপাধি দেন। মাণিকচাঁদের পর তাহার ভগ্নিপুত্র ফতেচাঁদ বাংলার রাজস্বের পোন্দার নিযুক্ত হন। তাহার সনদ সম্রাট ফারুকসাহাবের প্রদত্ত। এই সময় কাহাকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দেওয়া হয় ও বাংলার রাজস্বের পোন্দার নিযুক্ত করা হয়। পরে মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ১৭২৪ খ্রীঃ জগৎশেঠ উপাধি ও খেলাত ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, প্রধান মন্ত্রী তাজী আহমদ ও খালসার দায়দায়ান আলমচাঁদের পরামর্শ অনুসারে নবাব স্তজাউদ্দিন রাজকাযা নিকাশ করিতেন। তাহার সময় ফতেচাঁদ এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার রাজস্ব দিল্লীতে পাঠান। সত্যাক্ষরে লিখিত আছে :

"তাহাদের ধন-সম্পত্তি এত অধিক ছিল যে সেসকল ধনবান কোন মহাজন হিন্দুস্থান বা নাজিঘাতো দেখা যাইত না, অথবা সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কোন মহাজন বা বণিক ছিল না যাহা-দিগকে তাহাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তৎকালে সকল মহাজনই তাহাদের কাছে শূণ্য ছিল।...মহারাজার তাহাদের দুই কোটি আকট টাকা লুণ্ণ করিয়াছিল, তাহা তাহাদের কাছে দুই বোঝা খণ্ডের অতিরিক্ত কিছুই মনে হয় নাই। মহাজন ও অজ্ঞাত ব্যবসায়ীরা সকলেই অর্থের জন্য জগৎশেঠদের কুঠীতে উপস্থিত হইতেন। ইংরেজ, ফরাসী, আরমানী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণ শেঠদের নিকট টাকা কল্গ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা বাটী দিয়া বাংলার চলতি মুদ্রা সংগ্রহ করিতেন।"

১৭৪২ খ্রীঃ ঢাকার কুঠীয়ালের জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের ঢাকার গদী হইতে ঋণ লওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আবার ১৭৬০ খ্রীঃ ঢাকার কুঠীয়াল লিখিলেন যে কুঠীতে অর্থের নিতান্ত অভাব, কাজ চালাইতে হইলে জগৎশেঠের গদী হইতে ঋণ লইতে হইবে। কিন্তু তাহা দরকার হইল না—পরে দেখা যাইবে। সিরাজউদ্দৌলার সময় জগৎশেঠের নিকট ফরাসীদের পনের লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। ১৭৪৪ খ্রীঃ ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাহার জীবিতকালেই তাহার দুই পুত্র আনন্দচাঁদ ও দয়্যচাঁদের মৃত্যু হয়। সেইজন্য তাহাদের দুই জনের দুই পুত্র মহারাজা স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়া বান। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে বড়বয়ে

জগৎশেঠ মহাপট্টাদ প্রধান নেতা ছিলেন। ইংরেজের নিকট জগৎশেঠদের এত প্রতিপত্তি ছিল যে, মীরজাফর ১৭৫৮ খ্রীঃ ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কলিকাতায় গেলে তাঁহার সহিত জগৎশেঠও গিয়াছিলেন। ইংরেজের এই উপলক্ষে মোট ৮০,০০০ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে ১৮ হাজার আর্কট টাকা জগৎশেঠকে হিন্দু মতে সম্বন্ধনার্থ ব্যয় হয়। ১৭৬৩ খ্রীঃ বিফলমনোরণ হইয়া যখন মীরকাশিম বিহারেব দিকে চলিয়া যান, তখন মুন্সীর ইহাদিগকে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় ১৭৬৬ খ্রীঃ বাদশাহ শাহ আলম হইতে জগৎশেঠ খোশালচাঁদ ও মহারাজা উদয়চাঁদ উপাধি প্রাপ্ত হন। দেওয়ানী প্রাপ্তিকালে (১৭৬৫ খ্রীঃ) ক্লাইভের এক চিঠিতে নবাবের তিন মন্ত্রী উল্লেখ আছে। যথা—নবাব বেজা খাঁ, জগৎশেঠ ও হুসৈন। ১৭৬৫ খ্রীঃ জগৎশেঠ খোশালচাঁদকে কোম্পানীর সহকর্মী নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই জগৎশেঠদের পতন আরম্ভ হয়। ১৭৭২ খ্রীঃ পালসা মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। তৎপরে মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল বন্ধ হয়। মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে সিকা তৈয়ারের পর তাহার নমুনা ও ছাঁচ টাকা এবং পাটনার টাঁকশালে পাঠানো হইত। ইহার পরে এই সব টাঁকশালে সিকা টাকা তৈয়ার হইত। কলিকাতায় টাঁকশাল হইলে সেপানেও ছাঁচ এবং নমুনা পাঠানো হইত। সিকা টাকার বাদশাহের নাম, রাজত্বের বৎসর গোদিত থাকিত। সিকা টাকার দশ মাসা পরিমাণ রূপা থাকিত ও তৎসঙ্গে সামান্য পাদ থাকিত। সিকা টাকার ওজনই পণ্যের ওজনের মাপকাঠি ছিল। বিরাণী সিকার সেরে কোম্পানী মলকীদের নিকট হইতে লবণ কিনিত, আবার আণী সিকার ওজনে বিক্রয় করিত। বেশী ওজনের বলিয়াই চলিত কথায় “বিরাণী সিকা” প্রচলন হইয়াছে। সিলেট চূণের মাপ ছিল নবাই সিকায় সের।

সিকা টাকা ব্যতীত স্থানীয় টাকারও প্রচলন ছিল। চট্টগ্রাম, জিপুরা, ভুলুয়া (নোয়াপালি) ইত্যাদি অঞ্চলে দশ মাসা ও ঢাকাই টাকা চলিত। রাজত্বের হিসাবপত্রে, মেদিনীপুরে আল্লাসিকা নামে এক কাল্পনিক টাকার উল্লেখ দেখা যায়, ইহার মান সিকাটাকা হইতেও বেশী ছিল। ইহা ছাড়া নোকবাসিকার চলিত ছিল। কোচবিহার, বঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি (তখন বঙ্গপুর জেলাভুক্ত), গোয়ালপাড়া, রাঙ্গামাটি ও ভূটানের অধিকৃত এলাকায় কোচবিহারের নারায়ণী টাকার প্রচলন ছিল। কোচবিহারের টাঁকশালে প্রসিদ্ধ রাজা নরনারায়ণের আমলে এই টাকা প্রথম তৈয়াব হয়। রাজা নরনারায়ণ বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে আসামের বহু অংশ কোচবিহাররাজ্যভুক্ত ছিল। সেইজন্যই আসামের এই সব অঞ্চলে নারায়ণী টাকার প্রচলন ছিল। আবার, ভূটানে কোন টাঁকশাল না থাকিতে এবং ইহার বারিভাকেন্দ্র কোচবিহার ও বঙ্গপুর থাকায় ভূটিয়া নারায়ণী টাকা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইত। ভূটিয়া বা বাংলায় আসিয়া প্রথমতঃ পণ্যবিনিময় করিত। কেচবিহার হইতে পাদশাহ ও শুকনো মাছ এবং বঙ্গপুর হইতে লবণ,

তৈল, গুড় ইত্যাদি কিনিত, কিন্তু তাহাদের পণ্যের মধ্যে স্বর্ণ, কুম্ভারী, সাবর, বাদাম, কমলালেবু, চামর, ভূটিয়া ঘোড়া ইত্যাদি মূল্যবান বস্তু থাকিতে তাহাদের প্রাণ্য বেশী হইত। সেইজন্য মূল্য বাবদ তাহাদের নারায়ণী টাকা লইতে হইত। পুরাতন নারায়ণী টাকা পাইলে তাহারা তাহা কোচবিহারের টাঁকশালে দাখিল করিয়া নূতন নারায়ণী মুদ্রা তৈয়ার করাইয়া লইয়া দেশে ফিরিত, কারণ পুরাতন টাকা তাহাদের দেশে বা ভিক্রিতে চলিত না। ভূটানের দেবরাজ্যও কোচবিহারে রূপা পাঠাইয়া নারায়ণী টাকা তৈরি করাইতেন। বাংলার প্রচলিত সিকা, আর্কট টাকা কোচবিহারের টাঁকশালে নারায়ণী টাকায় রূপান্তরিত করার টাকাপ্রতি ওজনে দুই মাসা এবং এক মাসা পাদে মোট শতকরা ৩০ টাকা লাভ হইত। ইহার দশ হইতে পনের ভাগ বাছা বাবদ যে বাবদারী টাকা রূপান্তরিত করিবার জন্য আসিত তাহাকে দিতে হইত। বাকি অংশ টাঁকশালের কস্মচারী ও কোচবিহারের রাজার লাভ হইত। ১৭৭৩ খ্রীঃ সন্ধির পূর্বে কোচবিহারের টাঁকশাল বন্ধ করার প্রস্তাব হয়, কিন্তু এই সব কারণে টাঁকশাল বন্ধ করার প্রস্তাব সন্ধিপত্রে সন্নিবিষ্ট করা হয় না। ১৭৭৭ সালে কোচবিহারের টাঁকশাল বন্ধ হয়, কেবল দশহরার দিন টাঁকশালে এক হাজার নারায়ণী টাকা তৈয়ার করার অমুমতি দেওয়া হয়। ১৭৭৯ খ্রীঃ ভূটানের রাজা—কোচবিহারের টাঁকশাল বন্ধ করার বিশেষ অনুরোধের কারণ হইয়াছে বলিয়া জানান এবং এই টাঁকশাল পুনরায় স্থাপনের নিমিত্ত অমুরোধ করেন। তাহাকে দ্রুতপূর্বের শাসকগণের মজুত নারায়ণী টাকা দেওয়ার আদেশ হয়।

জিপুরার বোশনাবাদ পরগণা মূলরাজ্যভুক্ত হওয়ার পরে জিপুরার টাঁকশালে বোশনাবাদী টাকা বস্ত্রভাষীকার জ্ঞাপনার্থ মাত্র ২২১ টাকা তৈয়ার হইয়া তাহা নজর বাবদ দেওয়া হইত। এই টাকা চালু মুদ্রা ছিল না। দিনাজপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া ও রাক্ষসহল (শেবাস্ত অঞ্চলদ্বয় তৎকালে বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) জেলায় বিহারের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বাঙ্গ ছিল, সেইজন্য এই সব জেলায় পাটনাট বা আকিমাবাদী সিকার প্রচলন ছিল। বহু দিন হইতেই তাহাদের কুটি-মধ্যে টাঁকশাল বসাইবার অধিকার পাওয়ার জন্য কোম্পানীর চেষ্টা ছিল। ১৭৭৩ খ্রীঃ ডিসেম্বরগণ লিখিলেন—এ চেষ্টা অতি গোপনে করিতে হইবে, কারণ নবাবের নিকট পরশাস্ত করিলে তিনি জগৎশেঠের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, জগৎশেঠ বাতী হইবে না। টাকা তৈয়াবের যেসব গাভু আমদানী হয় তৎসমুদয়ই কেবলমাত্র জগৎশেঠগণ ক্রয় করিয়া থাকেন এবং তাহাতে তাহাদের বাণিজ্য লাভ হয়। এই প্রস্তাবে তাহাদের লাভের ব্যাঘাত হইবে, সেজন্য তাহাদের রাজী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের অজ্ঞাতসারে দিল্লী হইতে যদি অমুমতি পাওয়ার চেষ্টা করা যায় তবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। তবে জগৎশেঠ জানিতে পারিলে সেপানেও বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা, কারণ দিল্লীর দরবারেও

তাহাদের মধ্যে প্রভাব। ইহার পর সিংহজিউকোম্পানি সন ১৭৫৭ খ্রীঃ সন্ধিসূত্রে কোম্পানী টাকশাল করার অধিকার পায়। তারপর পলাশীর বিগ্রহ। ১৭৫৮ সনে কলিকাতার টাকশালে প্রথম টাকা তৈয়ার হয়। কলিকাতার কোম্পানী যে টাকশাল বসাইয়াছিল, তাহাতে কারেন্ট টাকা বলিয়া মুদ্রা তৈয়ার হইত। কিন্তু সে টাকার মান খুব কম ছিল। কারেন্ট টাকা চলিত না, কোম্পানীর হিসাবপত্রে ও কর্মচারীদের মাহিনার হিসাবে ব্যবহার হইত। ১৭৫৮ খ্রীঃ ডগলাস নামে এক বণিক প্রাণী বাবদ কলিকাতার টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, কলিকাতার টাকা লইলে তাহাকে শতকরা পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকা বাট্টা দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বাট্টাশিলা প্রকৃতি পার্হিত্য অঞ্চল হইতে রাজস্ব আসিত আদত টাকা। লিহট, কাছাড় ইত্যাদি অঞ্চলে কড়ি প্রচলন ছিল। কড়িই ছিল সর্বত্র প্রচলিত প্রাচীন ও সর্বনিম্ন মুদ্রা।

“কড়ি কটকা চিঁড়ে দই,

কড়ি বিনা বন্ধু কই।”—ভারতচন্দ্র

কড়ি হইতেই এক কড়ি চ'কড়ি ইত্যাদি নামের সৃষ্টি। লিহট হইতে বড় বড় পালোয়ার নৌকা বোকাই হইয়া কড়ি টাকার কোষাগারে আমদানী হইত।

এ সব গেল সুবেদারের এলাকার মুদ্রা। কিন্তু বাংলার তখন বহির্বাণিজ্যের বহুল প্রসার ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সুরাট বন্দর তখন পাবস্ত, আরব, মিশর, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশসমূহের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এই সুরাটের ইংরেজের কুঠী হইতে ১৬৬৪ খ্রীঃ ছত্রপতি শিবাজী এক কোটি টাকা আদায় করিয়াছিলেন। বাংলার ব্যবসায়ীরা দেশীয় জাহাজে ঐ বন্দরে বাংলার মসলিন, মলমল, পাগড়ির কাপড়, সোরা, বেশম ইত্যাদি চালান দিত। সেই জন্ত বোম্বাই টাকার আমদানী বাংলায় হইত। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের অমুমতি পাইয়া ইংরেজ কোম্পানী রাজার বৌদ্ধিকপ্রাপ্ত বোম্বাই বন্দরে টাকশাল বসাইয়া বোম্বাই টাকা তৈয়ার করিত। সুরাটী টাকাও বহু পূর্বে হইতেই বাংলার আমদানী হইত। চট্টগ্রামের বন্দোবস্তী কাগজে দেখা যায় যে, সুরা পাঁচ সময়েই সুরাটী টাকা সেখানে প্রচলিত ছিল। ইউরোপের কোন মুদ্রা বাংলায় চলিত না। ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমারগণ পরে পশ্চিম উপকূল হইতে পূর্ব উপকূলে বাবসা আরম্ভ করিল। তখন তাহারা দেশ হইতে রূপা ও রৌপ্যমুদ্রা আনিয়া মুর্শিদাবাদের টাকশালে সিকা টাকা তৈয়ার করাইয়া লইত, অথবা বাণিজ্যব্যপ-দেশে ভারতের পূর্ব বা পশ্চিম উপকূলের যে টাকা তাহাদের হাতে আসিত তাহা বাংলায় লইয়া আসিত। আর্কটের নবাবদের তৈয়ারী আর্কট টাকার মান উচ্চ ছিল, কারণ তাহাতে বোম্বের পরিমাণ বেশী ছিল। ক্রমে আর্কট ফরাসীদের হস্তগত হইল। তখন ফরাসীরা পণ্ডিতেরী টাকশালে টাকা তৈয়ার করাইয়া লইয়া ফরাসী আর্কট নামে বাংলায় চালাইত। পরে আর্কট বণন ইংরেজের অধিকৃত হইল তখন ইংরেজেরাও আর্কট হইতে টাকা

তৈয়ার করাইত। ফরাসী আর্কট বাংলার পূর্ব হইতেই প্রচলিত থাকায় ইংরেজদের তৈয়ারী আর্কটও ফরাসী আর্কট নামে চলিত। তবে এই আর্কট টাকার মান বাংলার সিকা টাকা হইতে অনেক কম ছিল। কোম্পানী সেইজন্ত আর্কট টাকার দানন ও ব্যবসা করিয়া বিশেষ লাভবান হইত। মরাতারা জগৎশেঠের কুঠী লুণ্ঠ করিয়া দুই কোটি আর্কট টাকা লইয়া যায়।

দাননী প্রথায় কুঞ্চল ও অভ্যাচারের উল্লেখ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নীলের যুগ পর্যন্ত যে দাননী প্রথা চালু ছিল, তাহা বাংলার সর্বনাশ করিয়াছে। দানন দিয়া চাষী বা ঠাতীকে নাগ-পাশে বদ্ধ করা হইত। পণ্যের যে মূল্য ধার্য্য করিয়া দানন দেওয়া হইত, পারিশ্রমিক ও আদত মূল্য হিসাবে তাহা নিতান্ত অপ্রচুর ছিল। বোটের মতে দানন লইতে অস্বীকার করার কোম্পানীর টাকার কুঠিয়ারা ব্যক্তিগত (ময়মনসিংহ) অঞ্চলের সাত শত ঠাতীর বৃদ্ধাঙ্গুর কাটিয়া দিয়াছিল, যেন আর ঠাত বুনিতে না পারে। বোট নিজেও তিন বৎসর কোম্পানীর চাকুরি করিয়া নগদই তাহার পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আবার, কোম্পানীর কুঠীতে দৈনিক মজুরের পারিশ্রমিকও নিতান্ত কম ছিল। বেশমের কুঠীতে বাতারা বেশম-সূতা জড়াইত তাহাদের মজুরী ছিল মাসিক আট আনা; মাত্র। এইরূপ অপ্রচুর মূল্য ও মজুরী এবং অল্প মানের টাকা দিয়া কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসারে প্রচুর লাভ করিত। অপর পক্ষে চাষী ও শিল্পীর আর্থিক অবস্থার ক্রমে ক্রমে অবনতি হইতে লাগিল। কিন্তু বিলাসিতাচীন মিঠাচারী বাঙালীর ভ্রম কোন পণ্য আমদানীর দরকার ছিল না। বাংলা হইতে রপ্তানী হইত বস্ত্র, পালা, সোরা, চাউল, চিনি, বেশম, আকিম ইত্যাদি; আর বাংলায় আমদানী হইত সোনা, রূপা, মদ (মেদিরা খীপ হইতে মদিরা), লম্ব, মশলা (বাটাভিয়া হইতে), বন্ধুক ইত্যাদি। এ সব পণ্যই আসিত, ধনী বিলাসীদের ভ্রম সামান্য পরিমাণে; মূল্যও কম। এইজন্ত বাণিজ্য-মান (Balance of Trade) সর্বদাই বাংলার অমুফুলে ছিল। দেখা যায়, বাতির হইতে কোন পণ্যের আমদানী মেদিনী-পুর্বের দরকার ছিল না। অথচ মেদিনীপুর্ব হইতে বহু প্রকার স্ত্রী বস্ত্র, বেশমী বস্ত্র ইংরেজ ও ফরাসী কুঠী হইতে রপ্তানী হইত। ইচ্ছা ছাড়া আন্তর্বাণিজ্যে মেদিনীপুর্ব হইতে বহু লক্ষ টাকার লবণ বাংলার বিভিন্ন বন্দরে এবং বাংলার বাহিরে পাটনা, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি স্থানে রপ্তানী হইত। টাকার একমাত্র কয়েক সহস্র টাকার লম্ব ভারতের পূর্ব উপকূল হইতে আমদানী হইত, তাহাও আবার বহু সহস্র টাকা মূল্যের শাঁপা তৈয়ার হইয়া বাংলা ও বাংলার বাহিরে রপ্তানী হইত। অথচ এক ইংরেজ কোম্পানীই এক কোটি টাকার মসলিন, মলমল, শিঙাণ-বস্ত্র ইত্যাদি রপ্তানী করিত।

এইজন্ত ক্রমে ফরাসী আর্কটে দেশ ছাইয়া গেল। অথচ বাংলার রাজস্ব ধার্য্য ছিল সিকা টাকার, তাহাও আবার সেই সনের



সিকা টাকার। তাহার উপর হুগিয়ান অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ খালসা কাছারীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নবাবী আমলের এক রাজস্ব-কাগজে হুগিয়ান শব্দকে ‘হুজিয়ান’ পড়িয়া আমি বড়ই সমস্তার পড়িয়াছিলাম। আমার হুজিয়ান পড়িবার কারণ ছিল, যে পরগণা সম্বন্ধে কাগজ তাহার পার্শ্ববর্তী পরগণাসমূহ হইতে রাজস্ব হিসাবে হুজী আদায় হইত। বাহী হউক ইহা অবাস্তব।

তখন ফলে এই দাঁড়াইল যে জমিদারকে খাজনা দিতে হইত ১০ ক্রা টাকার, আবার জমিদারকে তাহার প্রজারা দিত বিভিন্ন প্রকার টাকা। এই সব বিভিন্ন টাকার মান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি মুর্শিদাবাদের সিঁকা টাকার মান সর্বোচ্চ ছিল, কিন্তু তাহা নূতন সিঁকা, সিঁকার অর্থই নূতন তৈয়ারী। সিঁকা টাকা যত পুরাতন হইত, ততই তাহার মান বা মূল্য কমিয়া বাটত। কারণ প্রথমতঃ বতটা রূপা থাকে, ব্যবহারে ও চারিদিকে চাচিয়া ফেলার দরুন টাকার ওজন তাহা হইতে কম হইত, সঙ্গে সঙ্গে দামও কমিত। নবাব মীরকাশিম এষ্ট সমস্তার সমাধানের জন্য ধার্য রাজস্বের উপর বাট্টা ব্যবস্থা টাকাপ্রতি দেড় আনা চাপাইয়া দিলেন। ১৭৬০ সনে কোম্পানী মীরকাশিমের নিকট হইতে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী স্বত্ব পাইয়া এই সমস্তার সম্মুখীন হইল। কারণ এখন দেওয়ান পালা নয়, আদারের পালা। কোম্পানী বণিক, সূক্ষ্ম হিসাব জানে। তাহার মীরকাশিমের বাট্টা সহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আদায়ী টাকার উপর ভিন্ন ভিন্ন বাট্টার হার ধার্য করিয়া দিল। মেদিনীপুরে আদায়ী সিঁকার খাজনা ধার্য বলিয়া চলতি সিঁকার উপর শতকরা ছয় টাকা বাট্টার হার ধার্য হইল। অর্থাৎ, যেখানে একশত টাকা জমা ধার্য আছে সেখানে নূতন সিঁকা টাকা আদায় দিলেও ১০৬ টাকা দিতে হইত। টাকাই সিঁকার মান কড়াফাস্তি হিসাবে টাকা প্রতি ৭১ = ফাস্তি চলতি সিঁকা হইতে কম ধার্য হইল। নাবায়ী টাকার দাম টাকাপ্রতি ১৬ গুণ কম ধার্য করা হইল। আবার, বাট্টার নানা প্রকারের টাকা বাংলায় প্রচলিত হওয়ার তাহার ওজন ও খাদ অনুসারে মূল্য ধার্য করা হইল। যে সব টাকার এক পরমা হইতে এক আনা পরিমাণে খাদ থাকিত তাহাকে “বাজে রকম” বলা হইত। ইহাতে বাদামসী, লক্কী, আর্কট এবং অজ্ঞান প্রকার টাকা থাকিত। যেসব টাকার এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণ খাদ থাকিত বা ওজনে কম থাকিত তাহাকে “গড়শাল” বলা হইত। ইহাতে বোঝাই, পাটনাই, টাকাই, মুর্শিদাবাদী সিঁকা ফরাসী ও ইংরেজী আর্কট থাকিত। “পাঁচমেল” বলা হইত পাঁচ রকম টাকার মিশ্রণকে। ইহার মূল্য আর্কট হইতে শতকরা তিন টাকা বেশী ধার্য করা হইত। পোদ্দারেরা মুহার ওজন-খাদ পরীক্ষা করিয়া যে মূল্য-তালিকা প্রস্তুত করিত তাহাকে ‘পরবাই’ বলিত।

আর্কটের কোম্পানীর ধার্য বাট্টা ছিল শতকরা ১০/০, কিন্তু ইহা অজ্ঞান ছিল। কোম্পানী লাভের জন্য এইরূপ করিয়াছিল। এই টাকা কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা দ্বারা সর্বত্র চালু হইয়া

ছিল, তজ্জন চাহিদাও বেশী ছিল। চাহিদার উপরেই মান নির্ভর করে। জমিদারগণ যখন এই টাকা প্রকারের নিকট পাইয়া রাজস্ব দাখিল করিতে আসিতেন তখন সিঁকা বাট্টা বলিয়া ১০/০ আনা বেশী আদায় করা হইত। অথচ বাজারে ইহার বাট্টা ছিল শতকরা পাঁচ টাকা। দিনাজপুরের কালেক্টর লিখিলেন যে, কিস্তির সময় জমিদাররা আর্কট টাকার উপর ৫.৬ টাকা বাট্টা দিয়া সিঁকা টাকা সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু গোল বাধিল অন্য রূপে— দিনাজপুরের কালেক্টর বেশমকুঠীতে সিঁকা টাকা পাঠাইলে কুঠীওয়াল সিঁকা লইতে অস্বীকার করিলেন, কারণ তাহাকে কুঠীর হিসাবপত্রে একশত সিঁকা টাকা ১০১/০ আনা আর্কট টাকা রূপে জমা করিতে হইবে অথচ দাদনকালে ১০০ সিঁকা টাকা ভাঙ্গাইয়া তিনি মাত্র ১০৫ আর্কট টাকা পাইবেন। টাকার মান ধার্য করিলেও তাহা চাহিদা অনুসারে মূল্যসমতা হইবেই।

১১৭৬ সালে বাংলার কয়েকটি জেলায় অজ্ঞান হইল—বর্ধমান বর্ধমান বিভাগের (বিস্তৃত মেদিনীপুর জেলা বাদে) এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায়। ইহাই ছিয়াত্তরের মহন্তের অথবা মহাযুক্ত হুজিফ। অনেকে হয়ত মনে করিবেন গত পঞ্চাশের মহন্তের পর “মহাযুক্ত হুজিফ” একটা বুলি হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। দিনাজপুর, বরপুত্র, রাজসাহী হইতে মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় এবং ঢাকা (তখন ঢাকার অন্তর্গত বাঘরগঞ্জ) চট্টগ্রাম, বশোহর (তখন খুলনা বশোহরের অন্তর্গত), এমনকি সূর্য লিহট্ট হইতে কলিকাতায় বেলেঘাটার বহু চাউল আমদানী হইল। কিন্তু আমদানী করিল কাহাবা। কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী, দেওয়ান, গোমস্তা, এবং তাহাদের মজদুরী ও ধনী বেনিয়াগণ। তাহারা যে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিল তাহা জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাহিরে। এদিকে যেসব অঞ্চল হইতে চাউল আমদানী হইল সেখানেও অভাব দেখা গেল। সেসব অঞ্চলের লোকেরা কিন্তু অতিবিস্তৃত মূল্যেও চাউল পাইল না। যুদ্ধের সময় ‘সিঁকা’ করা চাউলের দ্বায় সরকারী পরওয়ানা লইয়া চাউল জোর করিয়া আনা হইল। কলে ডাক্তার বাংলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক কাহারও হিসাবে—যথা রাজমহলের (মালদহ তখন রাজমহলভুক্ত ছিল) কালেক্টরের হিসাবে, অর্ধেক লোক মরিল, কোম্পানীর ব্যবসা চলিবে কিসে? ইংরেজ আর বাগাই হউক বোকা নহে, চারি মাসের পঞ্চ বুরে থাকিয়াও কোম্পানীর ডিবেন্টুরা খবর পাইলেন ও কতক অনুমান করিলেন। ১৭৭০ সনেই তাহারা আলাদা ভাষায় লিখিলেন :

“We are not free from the apprehension that even amidst the distress to which a kingdom was reduced and the depopulation which was in prospect there may have been others in company's service or under its protection so far influenced by avarice as to monopolise the chief article of the support of the poor.”

সারার্থ :—

“আমরা এই আশঙ্কা হইতে মুক্ত নই যে এই যে দুর্দশা বাহাতে একটা রাজ্য ধ্বংস হইল এবং এই যে সম্মুখে লোকসংহেব আশঙ্কা তাহার মূলে কোম্পানীর কর্মচারী ও তাহাদের আলিঙ্গিত লোক আছে বাহারা দুর্লভের বশবর্তী হইয়া দরিদ্রের প্রাধন খাচ্চা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল।”

পরেও আবার ১৭৭২ সনে লিপিলেন যে, হুভিফের সময় এক-চেটিয়াকারী কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী ও গোমস্তা এবং অস্ত্রাভ্যর্থনগণ এত বেশী দরে বিক্রয় করিয়াছে যে তাহা দরিদ্রদের ক্রয়-শক্তির বাহিরে। তাহার পবর তাহারা পাইয়াছেন। এবার পুখানুপুখ তদন্তের হুকুম আসিল, কিন্তু যাহা সব যুগ হয় তাহাই হইল। অপরাধীরা তদন্ত খানাপা দিল। কেবলমাত্র পুণ্ডির দেওয়ান দেবীসিংহকে সম্রাটের দেওয়া হইল। বাহা হউক, এ প্রসঙ্গে ছিয়াতের মধ্যস্থতের বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণ অবাস্তব মনে করিবেন। পর বৎসর হইল পঞ্চাশ ফসল। ফসলের মূল্য একে-বারে কমিয়া গেল, কোন স্থানে বিপণ্ড কলাইয়ের দর হইল টাকার ৭৮ মণ, নুংক আর তাহা কাটিল না। মোট কথা, চাষীর হাতে টাকা আসিল না। রাজস্ব অনাদায়ের সম্ভাবনার জেলার জেলার চারি মাসের জগা অবশ্য রপ্তানীর আদেশ দেওয়া হইল।

দ্রিষ্টেরদের হুকুমে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যবসা বন্ধ হইল। তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার জগা দেওয়ানীপ্রাপ্তির পর ক্লাউড লবণ, তামাক ও সুপারির ক্ষতিবাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে সেট ব্যবসা সমর্পণ করিলেন। তাহাদের পোষণ করা চাই। যাহা লইয়া মীরকাশিমের সঙ্গে বিরোধ হইয়াছিল তাহা এবার কোম্পানীর কর্মচারীরা পাইল। কিন্তু প্রকৃত ব্যবসা এক, আর শোষণ অগ্ন। এ ব্যবসা টিকল না। মল্লিকদের নিকট হইতে যে দরে লবণ কেনা হইত সে দরে তাহাদের পারিশ্রমিক পোষাইত না, ফলে অনেক ব্যবসা ছাড়িয়া দিল। মেদিনীপুরের অনেকে টিভিয়ার মরাঠা এলাকার দানন লইয়া চলিয়া গেল। আবার যে চড়া দরে লবণ মতানদের নিকট বিক্রী করা হইত, তাহা জন-সাধারণের ক্রয়শক্তির বাহিরে। এক শত মণ লবণ ৮০ টাকার বিরাসী সিকার ওজন কিনিয়া ২০০ দরে বিক্রয় করিলে কি লাভ হয় তাহা হিসাব করিয়া দেখুন। চাউলের দর টাকার ৩৫ সের আর লবণের দাম টাকার ২০ সের। মরাঠা এলাকা হইতে চোয়াই লবণ সম্ভার আসিত, চোয়াবাজ্যে বিক্রয় হইত। কথার বলে “মুন ভাত”—তাহা ত যে প্রকারেই হয় জোটাতে হইবে।

তামাক বাঙালীর একমাত্র বাসন। এই সেদিনও তামাকের উপর ট্যাক্স বসাইতে গিয়া অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রীসভা টলমল হইয়াছিল। ঔপন্যাসিক খ্যাতকের পিতা ক্রীষ্ণ হইতে লিপিলেন—কোম্পানীর গোমস্তারা ব্যবসারীদের দ্বারা তামাক ফেলিয়া আসে, পরে গিয়া অধিক পরিমাণে তামাকের মূল্য দাবি করে, আবার বাজার হইতে চড়া দর দাবি করে। খাওয়ার পর পান খাওয়া

পূর্বজন্মের পুণ্যকল পান খেতে পাই।

লক্ষীছাড়া বাসিন্দা যার পানের কড়ি নাই।

সেই পানের সুপারির চড়া দাম হইল। জনসাধারণ এই সব নিত্যব্যবহার্য জিনিষ কিনিতে সর্ব্বশক্তি হইল। চোরাকারবার পুরানমে চলিল। জনসাধারণ যেমন অর্থশূন্য হইল, তেমন কোম্পানীর কারবারও গেল।

এদিকে ওলন্দাজ, করাসী, দিনেমারগণ তাহাদের ব্যবসা গুটাইতে লাগিল ইংরেজ কোম্পানী ব্যবসা একচেটিয়া করিতে। চীনে ওলন্দাজগণের আকিমের ব্যবসা—বাহা তাহাদের প্রায় এক-চেটিয়া ছিল, লোপ পাইল। অস্ত্রাভ্যর্থন বিদেশীর মারফত বাংলায় যে টাকা আসিত তাহা বন্ধ হইল। মীরকাশিমের নিকট হইতে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের জমিদারী স্বত্ব পাইয়াই কোম্পানী এই সব স্থানের আদারী রাজস্ব হইতে তাহাদের কুঠীতে ও আরজে ব্যবসায়ের মূলধনরূপে ব্যবহার করিত। ১৭৬১ সনে কার্ণাভার লইয়া চট্টগ্রামে পৌঁছিবাব সঙ্গে সঙ্গে ভেরেলটকে টাকার কুঠীতে দুই লক্ষ ও লক্ষীপুরের (নোয়াখালি জেলা) আরজে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাইবার আদেশ হইল। মেদিনীপুরের রেসিডেন্টই একাধারে ব্যবসায় ও জমিদারী রাজস্ব আদায়ের কার্য করিতেন। ব্যবসায়ের সমস্ত টাকা রাজস্ব হইতে জোগাইতে হইত। অতিরিক্ত টাকা গণ্ডখালী দিয়া নৌকাবোণে কর্ণাকাতার চালান হইত। বর্ধমানে কুঠী না থাকার বর্ধমানের রাজস্ব কর্ণাকাতার আসিত।

দেওয়ানী পাইবার পর কোম্পানীর আরও স্রবিধা হইল। এখন কোম্পানী “মাছের তেলে মাছ ভাজা” আরম্ভ করিল। বাংলার আর ব্যবসায়ের মূলধন হিসাবে সোনা, রূপা আমদানী না করিয়া বাংলার আদারী রাজস্ব হইতেই ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিল। বরং দক্ষিণাত্যের যুদ্ধবিধ্বস্তের টাকাও বাংলা হইতে বাইত। কর্ণেল কোডের সঙ্গে চারি হাজার মোহর ও বহু টাকা দক্ষিণাত্যের অভিযানে পাঠানো হইয়াছিল। আবার বোম্বাই সুরাট ইত্যাদি ব্যবসাকেন্দ্রেও বাংলা হইতে টাকা পাঠানো হইত। বাংলার মুদ্রা বাহিরে রপ্তানী হইয়া গেল। দেশীয় বণিকগণ সুরাট ইত্যাদি স্থানের ব্যবসায় গুটাইতে আরম্ভ করিল। পূর্বে একপ ছিল যে, মুর্শিদাবাদী ২৫ টাকা দিয়া সুরাট বন্দরে ১০০ টাকা পাইত। হুগুয়ান ভ লাগিতই না। ১৭৭২ সনের মধ্যে তাহাদের পুষ্টিম উপকূল-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল। সে সময়ে কোম্পানীর আড়াই লক্ষ টাকা সুরাটে পাঠাইবার দরকার হইল। কিন্তু তখন বণিকগণ বলিল—আমাদের এখন আর সুরাটের সঙ্গে ব্যবসা নাই। এখন কেবল হুগুয়ান কারবার হিসাবে মহাজনগণ—বধা জগৎশেঠের কুঠী ইত্যাদি হইতে টাকা পাঠানো যায়। তখন বাংলার মহাজনগণের সুরাটের মহাজনদের সঙ্গে কারবার ছিল না, হুগুয়ান করিতে হইলে মুর্শিদাবাদ হইতে বারানসীর মহাজনের নিকট হুগুয়ান কাটিতে হইত। বারানসীর মহাজন আবার বন্দেলখণ্ডের মহাজনের নিকট হুগুয়ান রিত। বন্দেলখণ্ড হইতে সুরাটে হুগুয়ান করিত। এইরূপে বারবার

হাণ্ড কাটিতে (re-drafting) অনেক ব্যয় হইত। তৎকালীন সর্দারজিহান নামের দেওয়ান মহামান্ন নবাব মহম্মদ বেজা খাঁ যোআব্বয় জন বহু জমি-মিনতি করিয়া মহাজনদিগকে শতকরা দুই টাকা বাট্টার টাকা পাঠাইতে পারিলেন। কিন্তু তাহার পর আর কেহ বেজা খাঁর অমুরোধেও হাণ্ড করিতে রাজী হইল না। (কোট-বিহারের টাঁকশাল বহু পূর্বেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল)। এদিকে মুর্শিদাবাদের, ঢাকার এবং পাটনায়ও টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কোম্পানীও নতুন টাকা বেশী তৈয়ার করিত না। নতুন টাকা তৈয়ার করা না করা তাহাদের আরম্ভে। পুরাতন টাকার মূল্য কম, তাহা দিয়া এবং আর্কট চুক্তি দিয়া ব্যবসা করা লাভজনক। ইংলণ্ডে বেশী কাপড় ও পরে বস্ত্রাদি পাঠানোও নিষিদ্ধ হইল। এমন কি মিসেস হেষ্টিংসের মণিমুক্তাগচিত বেশী গাউনও গুরুত্বাংশ আটক করিয়াছিল। ইহার পর এমন হইল যে, যে ক্ষেত্রে বাংলা হইতে ভাটাজলভি মাল রপ্তানী হইত সেখানে বাকদ তৈয়ারের জন্য সোরাভার (বালাষ্ট) হিসাবে বাংলা হইতে চালান হইত। সোরা কলিকাতা, মাদ্রাজ ইত্যাদি বন্দরে শুদামভর্তি করিয়া রাখা হইত। রপ্তানী মাল কম হইলেই সোরা বোঝাই হইত। তবে চাউলের মূল্য কেবোলা চাউলের হইতে অনেক কম হওয়ায় বহু পরিমাণ চাউল রপ্তানীর জন্য গোপন ছকুম আসিল। এইরূপে বাংলার ধনুকুল বাণিজ্য-মান নষ্ট হইল।

দেওয়ানী পাওয়ার পর ক্লাইভ বিভিন্ন সনের সিকা ঢাকার মূল্য ধাৰ্য্য করিলেন। বখা সাতসন সিকা ৩৩০০, ছয়সন সিকা ৯২ ৮, আটসন সিকা ৯২৮/০, ইহা হইতে পুরাতন টাকার সনায়ত সিকার দাম ধাৰ্য্য হইল ৯০ টাকা। পূর্বেই বলিয়াছি, সিকা ঢাকার তৈয়ারী হওয়ার বৎসর, (খাজা দিল্লীর বাদশাহের রাজত্বের বৎসর হিসাবে ধরা হইত) মুদ্রিত থাকিত। সনায়ত অর্থ বহু দিনের যেমন এখনও জরিপী বা সেটেলমেন্টের কসডায় “সনায়ত পতিত” বলিয়া জমির শ্রেণীবিভাগ করা হয়। বাট্টা ধাৰ্য্য করাতে চাষী, শিল্পীরা তাহাদের পণ্যের বা পরিশ্রমের মূল্য বাবদ কম মানের টাকা পাইত, কিন্তু জমিদারকে পাকনা দিবার সময় এই সব বাট্টার হারে বেশী পরিমাণ কম মূল্যের টাকা দিতে হইত। এইরূপে তাহারা অর্থহীন হইয়া ক্রমশঃ হীন হইল। কোম্পানী দেখিল দেশে রূপার অভাব, এবার ধনীদেব সঞ্চিত স্বর্ণের উপর দৃষ্টি পড়িল। ক্লাইভ হাউস অফ কমন্সে জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন, “জন-বহুলতায়, বিত্তহীনতা এবং অর্থসমৃদ্ধিতে লণ্ডন ও মুর্শিদাবাদ শহর সমতুল। কিন্তু শ্বেতক নগরে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের নিঃস্ব একরূপ ধন আছে বাহার তুল্য একজন ধনশালী ব্যক্তি লণ্ডনে নাই।”

এই সব ধন সাধারণতঃ সোনার রূপাভরিত হইয়া থাকিত। আমি আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে তিনি কোন এক স্বর্নবর্ণিকের বাড়ীর লোহার সিদ্ধকর্ত্তি একতাল সোনা দেখিয়াছিলেন, তাহা নাকি পূর্বপুরুষের সঞ্চিত, দারুণ অর্থসঞ্চিতে পড়িয়াও তাহা কেহ ব্যয় করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে বন্ধের ধনের উপর ইংরেজের দৃষ্টি পড়িল। কোম্পানী মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার টাঁকশালে মোহর তৈয়ারের আদেশ দিলেন। পূর্বে দিল্লীর বাদশাহের টাঁকশাল বাতীত অন্য কোন স্থানে মোহর তৈয়ার হইত না। মোহরের মান ধাৰ্য্য করা হইল সিকার বোল টাকী। স্থলীয় কোটে ব্যারিষ্টার খেটনীদের ফিস দেওয়া হইত বা ফিস বাবদ আদালতের খরচ ডিক্রী দেওয়া হইত স্বর্ণ-মোহরে। এখনও তাহা হাইকোর্টে চলতি আছে। সমসাময়িক চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, এই সময় আট সিকা টাকা এক পাউণ্ড বা সমতুল্যের তুল্য ছিল।

মোটামুটি হিসাবে এক তোলা সোনার দাম হয় এগার সিকা টাকা। আমরা দেখিয়াছি, ১৭৫৯ সনে এক তোলা সোনার দাম ছিল সাত টাকা, মোহর তৈয়ার করিয়া সোনার দাম বেঞ্চলেশন বলে বোল টাকা সিকা করা হইল। বেঞ্চলেশনে বলা হইল- যদি কেহ মোহর লইতে অস্বীকার করে তবে সে দণ্ডনীয় হইবে। ইহাতে ‘ডিভালুয়েশনে’র কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা অর্থনীতিবিদগণ বলিতে পারেন। ধনীরা সিকা ঢাকার অভাবে সঞ্চিত স্বর্ণ বাতির করিয়া আপাততঃ লাভবান হইলেন, যেমন গত যুদ্ধের সময় অভাবে বা লাভের আশায় সঞ্চিত স্বর্ণের বেশী দাম দেখিয়া অনেকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সিকা ঢাকার মান কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের ব্যবসায় ভিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গেল, কড়ি দিয়া আর বাতায় করা চলে না। সেই জন্য তাহার পরস, রূপার আবুলি সিকি, তখনকার টাঁকশাল তৈয়ার হইতে আরম্ভ হইল।

কোম্পানী প্রথমতঃ ১৭৭০ সনে কর্জ লইবার জন্য রপ্ত বাতির করিলেন প্রথমে ৪৫ লক্ষ টাকার। পরে এই বস্ত্র চলিতে লাগিল মেয়াদী হাণ্ডি এলেকার কালের ট্রেন্ডারী বিশেষ জায় ছিল।

বাংলার কারবারে জগৎশ্রেষ্ঠ সর্দারপ্রধান ছিলেন। ফক-চাদের মৃত্যুর পর তাঁহার নামেই কারবার চলিত। জগৎশ্রেষ্ঠেরা নবাবের কোষাধ্যক্ষ ও মহাজন ছিলেন। ফক-চাদের পৌত্র জগৎশ্রেষ্ঠ স্বরূপচাঁদ রুমুম-উ-নেজাবতের গাজাধী ছিলেন। তাঁহাদের কুটী প্রধান প্রধান স্থানে, বিশেষতঃ পাকনা-আদায়-কেন্দ্রে ও বন্দরে ছিল। রাজস্ব বিষয়ে ইহার বর্তমান ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের জায় কাধ্য করিতেন। সে সব স্থান হইতে হস্তী করিয়া মুর্শিদাবাদ খালসার রাজস্ব পাঠানো হইত। আবার দিল্লীর সম্রাটের প্রাপ্যও তাঁহারা হস্তী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইতেন। মারাঠাদের লুণ্ঠির পরও তাঁহারা এক কোটি টাকার একখানা দর্শনী হস্তী কাটিতে দিয়া করিতেন না। তাঁহাদের কেবল হস্তীর কারবার ছিল না, জমিদার-পণ রাজস্ব দিতে অক্ষম হইলে তাঁহারা কর্জ দিতেন। কোম্পানীও তাঁহাদের উপর হস্তী করিয়া তাঁহাদের বাণিজ্যক্ষেত্রে টাকা পাঠাইতেন। সৈন্ত ও কর্জদারীদের বেতন তাঁহাদের উপর বরাত দেওয়া হইত, পরে হিসাববিকাশ হইত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বরেন জগৎশ্রেষ্ঠের সঙ্গে হিসাববিকাশ হয় তখন দেখা যায় যে জগৎ-

শেষের ৫১ লক্ষ টাকা পাওনা - - তন্মধ্যে ৩৬ লক্ষ জমিদারদের ব্যবসার ২১ লক্ষ টাকা সৈয়দদের বেতন ব্যবসার ইংরেজ ও নবাবের নিকট। আবার নগদ টাকা দিবার জন্য জগৎশেঠের কুঠী হইতে “টিপ” লিখিয়া দেওয়া হইত। ইহা চেকের বা বর্তমান কালের নোটের স্তায়। ইহা দিলে যে-কোন মহাজন টাকা দিয়া দিতেন—জগৎশেঠের সন্মান ও প্রতিপত্তি এত বিস্তৃত ছিল। দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা, পূর্ণিয়ার, রাজসাহী ইত্যাদি সর্বস্থানেই ইহাদের কুঠী ছিল। ইহার বাতীত গণেশ দাস, রাজা হুজুরীমল, রাজা দয়াল-চাঁদ ইত্যাদির কুঠী হইতেও হুণী হইত। কলিকাতায় খালসা উঠিয়া আসিলে খালসার খাজাখীর কাজ রাজা হুজুরীমল, রাজা দয়াল-চাঁদের কুঠীতে হইত। ইংরেজ ইচ্ছামগকে জেনারেল ব্যাঙ্কার বলিত। বস্তুতঃ হুজুরীমল হেষ্টিংসের সঙ্গে অংশীদাররূপে ব্যবসা করিতেন। ঢাকার কুন্তেচাঁদের পৌত্র মহাতাপ রামের সঙ্গে ১৭৫২ সনে কোম্পানী কারবার করিতেন দেখা যায়। এই মহাতাপ রামই সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। চট্টগ্রামের রাজস্ব প্রথমতঃ নবাবের মুর্শিদাবাদে পাঠানো হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে বহু টাকা খরচ ও কম ওজনের বাতির চওয়ার খালসার হুকুম হইল যে, চট্টগ্রাম হইতে রাজস্ব ঢাকার পাঠাইয়া সেপান হইতে হুণী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে হইবে। চট্টগ্রাম হইতে পর্বতী কালে রূপচাঁদ রঘুনাথ দাসের কুঠীর মাফকত টাকা কলিকাতায় খালসায় পাঠানো হইত। রূপচাঁদের পিতা নিত্যানন্দ ঢাকার খাজাখী ছিলেন। লবণ-ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় কুঠী স্থাপন করেন। হিজলী আমিয়াও লবণের কারবার করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জগৎশেঠের কুঠীর কাজ অনেকটা বর্তমান কালের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্তায় ছিল। কোম্পানীও তাহাদের উপর হুণী কাটিতেন, যেমন কলিকাতায় টাকা দাখিল করিলে বিনা হুণীয়ানে রঙ্গপুরের কালেক্টরের উপর হুণী কাটিতেন। আবার কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা যে কারবার করিতেন তাহার মূলধন যোগাইত দেশীয় ধনীরা। যেমন হেষ্টিংসের বেনিয়ান ছিলেন কান্ডাবা। সকলেরই দেশী বেনিয়ান ছিল। বেনিয়ানরা কারবার করিয়া কোম্পানীর দৌলতে প্রসিদ্ধ ধনী হইয়াছিলেন। কিন্তু হস্তে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা এসেছে আসিতেন, বেনিয়ান ছাড়া কারবারের মূলধন যোগাইবে কে? জগৎশেঠের কুঠীর প্রতিপত্তি ও লাভ খরচ করার জন্য দেওয়ানীপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানী একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ইহার নাম হইল জেনারেল ব্যাঙ্ক—ইহার অংশীদার কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীগণ। এই ব্যাঙ্কের শাখা জেলায় জেলায় স্থাপন করা হয়। এই ব্যাঙ্কে কোম্পানীর আদারী রাজস্ব জমা হইত। এই ব্যাঙ্কে টাকশালে টাকা তৈয়ার করার, ছণ্ডি কাটার ইত্যাদি সুবিধা জগৎশেঠের স্তায় দেওয়া হইল। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত মূলধন কোথায়? মূলধন একমাত্র আদারী রাজস্ব, ইহা জমিদারদের কিস্তির টাকা ঢালাইয়া লইতে পারিত না। ফলে

জমিদাররা অল্প কুঠীতে বন্দোবস্ত করিতেন। কোন কোন কালেক্টর অল্প কুঠি মাফকত খালসাতে হুণী কাটিতেন। বড়ো হুকুম লাগিল, অল্প কুঠি হুণী গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু এত করিয়াও ব্যাঙ্ক টিকিল না। ১৭৭৬ সনে ব্যাঙ্ক বন্ধ হইল। জমিদারদের মাসিক কিস্তিতে রাজস্ব দিতে হইত, ইহা কেহই সংগ্রহ করিতে পারিতেন না, কারণ প্রজাদের নিকট হইতে শতের মতম অহুসারে টাকা আদায় হইত। সেইজন্য এই সব কুঠীর এত বিস্তৃত ব্যবসার ছিল। যে সব স্থানে এ সমুদ্রের কুঠী ছিল না, সে সকল স্থানে জমিদারদের অল্প ব্যবস্থা করিতে হইত। অনেক জমিদার এই জন্য মুর্শিদাবাদের খালসার রাজস্ব দিতেন, যদিও জমিদারী শুরুর অবস্থিত। ময়মনসিংহ ও ঢাকার রাজস্বদের তালুক আছে, বাহা মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত। ময়মনসিংহ জেলার বিশেষতঃ আলাপ-সিংহ, ময়মনসিংহ ও সেরপুর পরগণার জমিদারগণ সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে টাকা কর্তৃত্ব লইতেন। ইহার গৃহী-সন্ন্যাসী যেমন জাত বৈরাগী। ইহার ‘কাবুলীদের’ গায় জোর জুলুম করিয়া প্রাপ্য টাকা আদায় করিত। অনেক সময় পাতক জমিদারকে আটকাইয়া রাপিত, অথবা পুত্রকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া পিতৃশ্রমের জামিন-স্বরূপ আটকাইয়া রাপিত। কোন কোন সময় দলবলে জমিদারদের কাছারী চড়াও করিত। অনেক স্থলে জমিদারের কতক মহালের খাজনা আদায়ের ভার লইয়া প্রাপ্য আদায় করিয়া লইত। বকসারী বরকন্দাজেরাও কুশীদজীবী হইয়াছিল।

রঙ্গপুরের কালেক্টরীর পোদারওয়াও এক অভিনব উপায়ে মহাজনের কাজ করিত। এই প্রথা নাকি শরণাভীত কাল হইতে সেখানে প্রচলিত ছিল। কোন জমিদার রাজস্ব সম্পূর্ণ না দিতে পারিলে ইহাদের শরণাপন্ন হইতেন। ইহার কতক টাকা পাইয়া বাকী টাকা সুদসহ আদায়ের জন্য জমিদারের নামে একটি ‘পাঁট’ তৈয়ার করিত। তার পর কয়েকটা খলিয়ায় কিছু কিছু টাকা ভরিয়া খলিয়ার মুপ শীল-মোহর করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ দেয় ঢাকার একটা লেবেল লাগাইয়া রাপিত যেন সব টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। সেই অহুসারে জমিদারের বাকীয়াত রাজস্ব সব আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইত। তাহার পর জমিদার পাঁটের টাকা সুদসহ পরিশোধ করিলে সে টাকা ট্রেজারীতে রাপিয়া শীলমোহর করা খলিয়া বাতির করিয়া ফেলিত। শীলমোহর করা বলিয়া কাহারও খলিয়া দেখিবার নিয়ম ছিল না। পর্বতীকালে যখন এই প্রথা তুলিয়া দিয়া হিসাবনিকাশ করা হয়, তখন হিসাবনিকাশে বহু টাকার ঘাটতি দেখা গেল। কারণ শীল-মোহর করা খলিয়ার যে কেবল কম টাকা পাওয়া গেল তাহা নয়, যে টাকা পাওয়া গেল তাহার মধ্যে অধিকাংশই কম মূল্যের নানারূপী বা অনেক ভাল টাকা। পোদারদের মাতলরীর উপরেই বিনা মূলধনে এই লগ্নী কারবার চলিত। কয়েকজন খাজাখীকে জেলে দিয়া ইহার ব্যবস্থাপনা হইত।

দোপামুদ্রা এখন উঠিয়া গিয়াছে। অতএব তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রার সজ্জিত বর্তমান মুদ্রায় তুলনা করা এখানে অবাস্তব।

## ঔপাড়া

শ্রীধীরকুমার মিত্র

ঔপাড়া হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম; ইহা কলিকাতা হইতে সাতচল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রাম একলা সংস্কৃত-শিক্ষার অত্যন্ত প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এই গ্রামে কায়শাস্ত্র-শিক্ষার পন্থাটি চৌল ছিল বলিয়া জানা যায়।

ভাগীরথী ঔপাড়ার উত্তর ও পূর্ব সীমা বলিয়াকারে বেটন দিয়া আছে। ‘মহাপুরুষচরিতম’ নামক গ্রন্থে এই গ্রাম সম্বন্ধে যথোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে :

তন্মিন্ ওগলি পণ্ডিত বিষয়ে ঔপপন্নীতি নাম  
পন্নী রমা কুহুমদশনা নৃহৃদ্বর্কাদনী চ।  
গঙ্গা যন্তা ব্রজতলিলা হার-শোভাঃ বিধতে  
চিহ্না প্রদ্যাবিধি বসতিঃ বস্ত্রে বস্ত্র সুবৎ।



ঔপাড়ার স্বয়ং

অর্থাৎ, হুগলীতে ঔপপন্নী নামক পন্নী আছে; ইহা কুহুমদশনা ও নৃতন দূর্কাদশনা। ব্রজত-সলিলা ভাগীরথী তাহার হারের জায় বর্তমান। ব্রন্দাবনবাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবান ঈশ্বর এইখানে বসবাস করিতেছেন।

ঈশ্বর নবদ্বীপ হইতে ঔপাড়ার বাবধান মাত্র পনের মাইল; মধ্যে দেবালয়-শোভিত কালনা নামক প্রসিদ্ধ স্থানটি অবস্থিত। কালনা হইতে পূর্বদিকে দেরিলে ঔপাড়ার শ্রামল শশ-শোভিত রমণীয় ভূমি ভূ-স্বর্গ বলিয়া মনে হয়। এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দর্শকের হৃদয় উষ্মিত করে। ইহার উত্তরে গঙ্গার অপূর্ণ পাবে শান্তিপুর অবস্থিত।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রৈভোরিনামের মানচিত্রে ঔপাড়া গঙ্গার পূর্বদিকে ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় সম্ভবতঃ পরবর্তী কোন সময়ে এই স্থানটিও নবদ্বীপের জায় গঙ্গার পশ্চিম দিকে আসিয়াছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঈশ্বার চণ্ডীকাব্যেও এই গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন :

বাহ বাহ বলি ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া।

বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে ঔপাড়া।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-রচিত ‘গঙ্গাভিক্ষিতরঙ্গিনী’ কাব্যের মধ্যে ঔপাড়া সম্বন্ধে এই পঙ্ক্তিগুলি দেখিতে পাওয়া যায় :



শ্রীধীরকুমার মিত্রের বাসভাড়া

অধিকা পশ্চিম পাড়ে

শান্তিপুর পূর্ব ধারে

রাখিল দক্ষিণে ঔপাড়া;

উল্লাসে উলয় গতি

বটমূলে ভগবতী

চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের জন্ম এই স্থান পূর্বে প্রখ্যাত ছিল। এখানে-কার চোর-ডাকাত ও বাদবের উপহ্রবের কথাও চারিদিকে প্রচারিত ছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য দর্শন-শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের পুস্তক ‘বিদ্যোদ্যাদনুজ্ঞিনী’ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পূর্বে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণ ঔপাড়ার চতুষ্পাঠীগুলিতে অধ্যয়ন করিতে আসিত এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার তথন এই স্থানের বখেষ্ট সুনাম ছিল।

“ভ্রাম্যকল্পলতা”—প্রণেতা শোভাকবরবংশীর সিদ্ধ মহাপুরুষ ভক্ত-কবি মধুসূদন গুপ্তিপাড়ার জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিতসভার শিরোমণি গুপ্তিপাড়ানিবাসী ক্ষতিধর পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রতিভা ও বাকপটুতা তৎকালে বঙ্গসমাজে বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার বাকপটুতার নিদর্শন-স্বরূপ একটি ঘটনা ২৮শে অগ্রহায়ণ ১২২৫ সালের ‘সমাচার দর্শন’ পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

“মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—গুপ্তিপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মোঃ কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদ্যারি টাকা ও গাড়ি ও শাল প্রভৃতি ও ঘাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন



সেন-বংশের জোড়া শিবমন্দির, গুপ্তিপাড়া

তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদ্যারি পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে সঙ্কট দ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহারাজ আমি বিদ্যারি পাইলেও নাই না পাইলেও নাই। মহারাজও তাহার সহস্র করিলেন যে ভট্টাচার্য্যকে কহ যে বিদ্যারি না দেওয়া বাইতেছে। ইহাতে ঐ বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর গুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হুষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদ্যারি টাকা, ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।”

গুপ্তিপাড়ার টোলগুলি সম্বন্ধে বহু স্মৃতিতথ্য তথ্য ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের জাম্বাহরী মাসের *Calcutta Monthly Register* নামক কাগজে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণী হইতে সে যুগে নলীয়া, শান্তিপুত্র ও গুপ্তিপাড়া কিরূপ সংস্কৃতশিক্ষার কেন্দ্র ছিল তাহা জানা যায়। সেযুগে এক জন সাহেব নলীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে “হিন্দু অন্ত্রকোড” বলিয়া অভিহিত করেন।

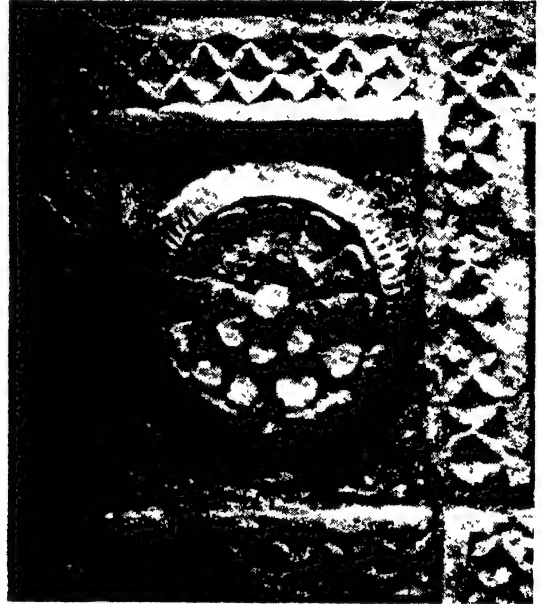
গুপ্তিপাড়ার সাধারণ ব্যক্তিও তৎকালে পণ্ডিতপন্থের সান্নিধ্যে থাকিয়া সঙ্গুণে বহু শাস্ত্রীয় সমস্তার সমাধান করিতে পারিত।

আজও গুপ্তিপাড়ার বালকগণ খেলার ছলে যে সকল প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করে তাহা এইরূপ :

- ১। “গুপ্তিপাড়ার বাটীর গুণে  
দেবের ভাবা হানুস জানে।”
- ২। “বিসর্গ ও অহুবার মুখে অবিরত  
আর্ককলার লম্বা-বোটা নেড়া মাথা যত”।

বঙ্গদেশে আর একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে ; তাহা এই “উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁধ ও হালিশহরের তেঁদড়”।

ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার *Travels of a Hindoo* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বানর-



গুপ্তিপাড়ার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে ইটের কারুকার্য

বানরী আনাইয়া অর্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদের বিবাহ দেন এবং তদুপলক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনাইয়া তাঁহাদিগকে ভূমিভোজনে আপ্যায়িত করেন।

গুপ্তিপাড়ার বহু দেবালয় আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্রের মন্দির ও শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির সর্বাঙ্গোৎকর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ‘জোড়া-বাংলা’ বা নিতাই-গোঁরের মন্দির এবং সেন-বংশের জোড়া শিবমন্দিরও বহু প্রাচীন।

শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্রের মন্দির ‘গুপ্তিপাড়ার মঠ’ বলিয়া খ্যাত। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীমৎ সত্যদেব সরস্বতী শান্তিপুত্রের এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়ী হইতে শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্রকে আনিয়া গুপ্তিপাড়ার নিকট কৃষ্ণবাটা নামক বিজন অরণ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিষ্য রাজা বিবেকরায় ঠাকুরের জন্ম বাবতীর সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান। যে স্থানটিতে শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্র বিদায় করেন—স্বভাব-সৌন্দর্য্যে



সেই স্থানটিকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয় এবং একত্ব উহা। “গুপ্ত-বৃন্দাবন” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের ছাৎ ঢালা-ঘরের ধরণে নিৰ্ম্মিত—সেই ঢালার উপরে আবার একটি ছোট থাক আছে; তদুপরি তিনটি কলসী স্থাপিত। মন্দিরের অভ্যন্তর চূড়াগুলি গন্ধার অপব পাবে অবস্থিত শাঙ্খপুং হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী গঙ্গানারায়ণ সরকার ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন। জৈরাধিকার মূর্তি পবে মোহান্ত রামানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

জৈবৃন্দাবনচন্দ্র সম্বন্ধে ‘পাট-পর্যটনে’ নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে :

বেলনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।  
বগনপাড়াবাসী জৈ রামাঙ্গি ঠাকুর।  
গোপতিপাড়াতে সত্যানন্দ\* সরস্বতী।  
বৃন্দাবনচন্দ্র দেবেন করিয়া পিরীতি।

গুপ্তিপাড়ার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঐষ্টব্য জৈরামচন্দ্রের মন্দির। এইরূপ কারুকার্যপটিত মন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই আছে। দিনাজপুরের কালুজীউর মন্দির ও বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবের মন্দিরের ভায় এই মন্দিরের গড়ন। জৈবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের উত্তরে গন্ধার দিকে এই মন্দির অবস্থিত এবং মন্দিরের মধ্যে জৈরামচন্দ্র, সীতাদেবী লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮২২ সনে এই মন্দির নিৰ্ম্মিত হয়।

এই মন্দির লাল ইট দিয়া নিৰ্ম্মিত এবং মন্দিরগাত্রে কারুকার্যপটিত ইটের মধ্যে বহু চিত্রাদি প্রাথিত আছে। বৃন্দাবনচন্দ্রের

মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারতের বিবিধ বিষয় ও মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলীর দৃষ্টান্তগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তদা যার, সেওড়াকুলির রাজা হরিশ্চন্দ্র বার অষ্টাদশ শতাব্দীতে জৈরামচন্দ্রের মন্দিরটি নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন।

জৈবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে আর একটি জোড়ামন্দির আছে। ইহা ‘জোড়-বাংলা’ বলিয়া কথিত। ইহার মধ্যে জৈগৌরাক্ষ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র ভারতে একমাত্র গুপ্তিপাড়া ব্যতীত দত্তীস্বামীদিগের সেবার মহাপ্রভুর পূজা আর কোথাও হয় না। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নিৰ্ম্মিত হয়।

এতদ্ব্যতীত সেন-পরিবারের জোড়ামন্দিরও গুপ্তিপাড়ার দেবালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এই মন্দির ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। রামধন সেন ইহার নিৰ্ম্মাতা।

\* বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতার নাম কোথাও সত্যানন্দ, কোথাও বা সত্যসেব বলিয়া উল্লিখিত আছে; কিন্তু জৈকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠাতার নাম সত্যসেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা উক্ত নামটি গ্রহণ করিয়াছি।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগ্নরাখদেবের বধবাত্মা গুপ্তিপাড়ার অন্যতম প্রধান পূর্ব : এইরূপ অভ্যাস বধ বাংলাদেশে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। একমাত্র পুরী ব্যতীত আর কোন বধ নাকি এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে না। বধবাত্মা উপলক্ষে এই স্থানে এক বৃহৎ মেলা হয়। তখন গুপ্তিপাড়া একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়। যেতারেও লং ‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রে এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ার বধবাত্মা উপলক্ষে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয় এবং উক্ত স্থানের মেলা দেখিতে বাইবার সময় একখানি নৌকা উল্টাইয়া বাওয়ার পরতাল্লিশ জন লোকের জীবননাশ হয়।

সম্প্রতি জৈকৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতিবক্ষার্থে এই স্থানে “জৈকৃষ্ণানন্দ



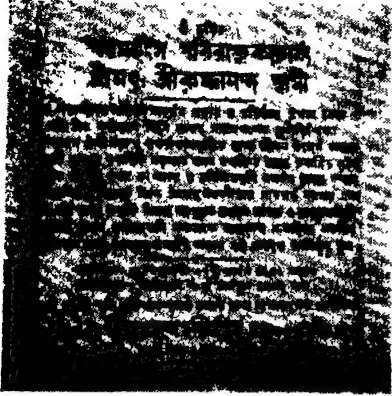
জৈরামচন্দ্রের মন্দিরে কারুকার্যপটিত ইটের উপর রামায়ণের একটি দৃশ্য।

হরিশম্ভির” নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। ১৩৫৭ সালের ৫ই মাঘ এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৩৫৭ সালের ৬ই ফাল্গুন ক্রাম্যপ্রসঙ্গ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই মন্দিরের দারোহাটন করেন। মন্দিরভাঙুরে জৈকৃষ্ণানন্দ স্বামীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি বক্ষিত হইয়াছে। এই মন্দিরে প্রত্যহ হরিনামসকীর্তন, শাঙ্খচুশীলন, নীতিশিক্ষা, চতুশাষ্টী প্রভৃতি স্বামীজীর প্রিয় বিষয়সমূহের দ্বারা বজার রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে স্বামীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ৭ মন্দিরগাত্রে প্রস্তরবলক প্রাথিত আছে।

অবিভার ধর্মবন্ধা ও প্রচারক জৈমং কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতিবক্ষার্থে হরিশম্ভির প্রতিষ্ঠা বিশেষ আনন্দের বিষয়। উক্ত হরিশম্ভিরে তাঁহার পূর্বজন্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পরবর্তীকালে সন্ন্যাসীসতীর্থ স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপ মহাশয়ের মূর্তি তাঁহার জন্মের পার্শ্বে বক্ষিত হইলে অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত। এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া চূরাল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; পবে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া তিনি জৈকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে সর্বতোভাবে সকল কার্যে সহায়তা



করেন এবং বেদান্তবিজ্ঞান, দেবী-জীবন, জীবনযজ্ঞ, সাধনশিক্ষা সোপান, শ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল লীলা, উপনিষদ পঞ্চক প্রভৃতি বহু ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বশবী হন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে।



শ্রীকামনন্দ হরিনামিরে প্রণীত প্রস্তর কলক

গুপ্তিপাড়ায় বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে পণ্ডিত শোভাকর, পণ্ডিত দেবীবর, পণ্ডিত বাণেশ্বর, পণ্ডিত রামধন বিদ্যালঙ্কার, পণ্ডিত মধুদেব প্রভৃতির নামও স্মরণীয়। সেকালে এবং একালেও বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নবাব সিংহাজীলাল সেনাপতি বেংহনলাল, স্মৃতিয্যাত মন্ত্রী রাজা মাণিকচন্দ্র, রাজা বিবেকেশ্বর



শ্রীকামনন্দ হরিনামিরের বাবীজীর প্রস্তরমূর্তি

রায়, প্রসিদ্ধ কবিগোরালা ভোলা ময়রা, ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, মহিলা-দার্শনিক ও বিদূষী হলকুমারী গুপ্তা, সঙ্গীতজ্ঞ সেন ও তণীর পুত্র স্বশীলচন্দ্র সেন, প্রভৃতি নব উল্লেখ করা বাইতে পারে।

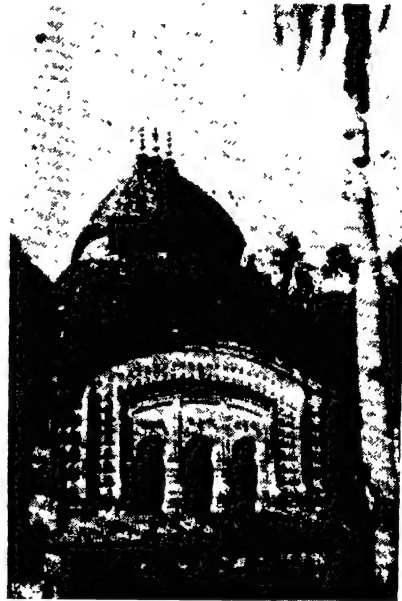
গোপাল ঠাকুর ও আশানন্দ ঢেঁকি এই স্থানে বিবাহ করেন বলিয়া প্রায়ই বাতায়াত করিতেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই স্থানের গৌরহরি মন্দিরের কল্যাণদুর্গামণি দেবীকে এবং শ্রাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বামনাচার্য ভট্টাচার্যের কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন।

‘তীর্থমঙ্গলে’ বিজয়রাম সেন লিখিয়াছেন :

“গুপ্তিপাড়ায় ব্রাহ্মণের কি করিব নীত।

মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত।”

বর্তমানে গুপ্তিপাড়ায় জীবিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রেমানন্দ কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বেভায়েণ্ড প্রেমানন্দ অনাধনাথ সেন এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের নামও উল্লেখযোগ্য।



সুন্দারবনচন্দ্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া

সার্কজনীন পূজা ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় প্রথম আরম্ভ হয় এবং এই স্থান হইতে ইহা ক্রমশঃ সার্কজ পরিব্যাপ্ত হয়। (The Friend of India, May 1820.)

গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারির তালিকায় লিখিত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

Guptipara—A large village in thana Balagar of the Hooghly subdivision, in the extreme north-east of the district, situated about 1½ miles west of the right bank of the Hooghly. The houses extend along a wide road for about a mile and half, and include some of modern fine buildings belonging to the Sen family.

Guptipara was a well-known place in the eighteenth century. “Guptipara” is shown in the map of Stavovinus (circa 1770 A.D.), but on the left bank of the river.

This, if correct, indicates an older site; for in the Bengali poems of the eighteenth century, the village is distinctly mentioned as being on the right bank.

The village is a mile to the east of Guptipara Station which is 22 miles from Bandel. The chief object of interest is a group of four temples at the eastern end of the village. Ranged round a quadrangle and enclosed within a rather high wall are four shrines known as the temples of Chaitanya Dev, Brindabanchandra, Ramchandra and Krishnachandra, all in the Bengal thatched hut model; the whole group being often called Brindabanchandra's Math.

(a) The oldest is that of Chaitanya Dev which faces east and has a door on the west; there three cusped arches on the east, but they have been walled up, leaving a small door. Reputed, according to local records, to have been built by Bisweswar Rai in the reign of Akbar, and therefore, apparently in the beginning of the 17th century, it is of a Jor-Bangla type with two iron rods to represent spires. It contains the images of Chaitanya and Nityananda.

(b) The shrine of Brindabanchandra, the biggest of the four, is a brick temple of the double thatched roof model. The entrance door and the inside of the sanctum are painted with figures of Krishna, Radha and Gopis, of trees, foliage, etc. In the sanctum are wooden images of Krishna, Radha, Garuda, Jagannath and Balaram.

(c) The temple of Ramchandra is made of red-coloured brick and has a curved roof; over the roof is a towerlike structure, to which access is had by a staircase. The front walls of the verandah and also, to some extent, of the sanctum, is covered with brick panels finely carved in the best style of Bengali art, with figures of gods and goddesses and scenes from epics. The temple is said to have been built by Hari-chandra Rai of Sheoraphuli at the end of the 18th century. It contains painted wooden images of Ramchandra, Lakshman (to the right) and Sita (to the left).

(d) Just opposite the Ramchandra temple, on the other side of the quadrangle, stands the fourth temple

of Krishnachandra, with small images of Krishna and Radha, said to have been built by Dandi Madhusudan in the time of Nawab Ali Vardi Khan.\*



চৌধুরী জা (নিভাই-গৌর মন্দির)

ভূমিপাড়ায় বহু প্রাসাদ আছে, তন্মধ্যে স্মরণীয় সেন ও 'চাঁচী বাগ্‌জের' কেশবরায় স্বর্গীয় শ্রীমাচরণ সেনের স্মরণ ভবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি গায়ে উচ্চ টংরেচী বিজালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও গ্রন্থাগার আছে। লোকসংখ্যা ১৫৫২ জন এবং পতকরা ২৬ জন লিখনপঠনক্ষম।

\* Census 1951, West Bengal, Hooghly (District Handbooks) by A Mitra.



## বাস্তব ও উদ্ভাস

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

শেষবেলায় নিজের বাড়ী এসে পৌঁছলাম। আমাদের তিন শরিকের বাড়ী। বছরতিনেক আগে মোট পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক বাস করতাম এ বাড়ীতে। আজ একমাত্র নীরদ কাকা আর তাঁর এক বিধবা মেয়ে এ বাড়ীতে বাস করেন। সদর আঙিনা দ্বীতিমত জলল হয়ে উঠেছে—বৈঠকখানার সিঁড়ির ঘাটলের ভিতর দিয়ে কয়েকটি ভাঁটকুলের গাছ দিবা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আঙিনায় হাতখানেক কবে উলুগড় গজিয়ে উঠে একেবারে দুঃখবোধ করে রেখেছে। অগত্যা সদর রাস্তা ছেড়ে অন্দরের দিক দিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলাম। নীরদ কাকা এক পাশে এক টুকরো জায়গা সাক্ষ করে একখানা ঘরে কোনক্রমে বাস করছেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বেন হাতে স্বর্গ পেলেন—বললেন, শৈলেন এসেছিল, বেশ কবেছিল। তার পর ঘটাপানেক ঘরে কত কথা। কত আন্তরিকতার সহর তাঁর কথা। নীরদ কাকার এ রূপটি কিন্তু জীবনে কোন দিন লক্ষ্য করি নি। কথা তিনি কম বলতেন—কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন না। বিবর-সম্পত্তির সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত স্বার্থপরের মত ব্যবহার করতেন যে, একবার অতিষ্ঠ হয়ে আমরা পৈতৃক ভিটা থেকে কিছুদূরে গিয়ে নতুন বাড়ী করব বলে মনে করেছিলাম। সেই নীরদ কাকা আজ এত বাচাল হলেন কেন করবে? শেষে বললেন, শৈলেন, তোরা আবার কিরে আর—দেশে রোজগারও হবে এখন প্রচুর—আশে-পাশের কোন গ্রামেই তো আর ডাক্তার নেই। তুই এলে আমাদের কত বল-ভরসা বল তো?

যে করদিন এখানে থাকি বাবার দোতলা টিনের ঘরখানিতেই থাকব স্থির করলাম। দুই বৎসর পরে প্রথম গিয়ে আমি ঘরের তালি খুললাম। একে একে সমস্তগুলো জানালা খুলে দিয়ে ঘরখানার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালাম। চেয়ে দেখি বাবার “অয়েল পেন্টিং” ছবিখানা ঠিক তেমনিই চাটানো আছে। বাবার ব্যবসার কোন জিনিষপত্র কোনদিন মা এ ঘর থেকে সরতে দেন নি। কত সাধের ঘরখানি বাবার! ভাল মিস্ত্রী দিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে ঘরখানি শেষ বয়সে তৈরি করেছিলেন। বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় ছবিখানা পেড়ে আনতে গিয়েছিলাম। মা নিষেধ করে বলেছিলেন—না শৈলেন ও ছবি তুই আনিস নে—তাঁর ঘরেই ঠাকৈ থাকতে দে, ভগবান রক্ষা করবেন।

আমি কোন প্রতিবাদ না করে সেদিন কিরে গিয়েছিলাম। বাবার ছবিখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলাম। দুই চোখের কোণে বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়িয়ে এল। মনে মনে বললাম, মা সেদিন ভুঁই এখন থেকে বাবার ছবিখানা সরতে দাও নি, আজ আমি এসেছি বাবার এত সাধের ঘরখানা বিক্রি হবে দিতে—

আর সেও তোমারই হুকুমে। যে ঘরখানা আমার মায় কাছে ছিল পবিত্র তীর্থের মত, সেই ঘর বিক্রি করে দিতে যে কত দুঃখে মা আমাকে আদেশ করেছিলেন—সে ত আমি বুঝি। আমার ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন—তুই বা শৈলেন, ঘরখানা বিক্রি করে আর। যে ঘর তুলতে হাজারচায়েক টাকা খরচ হয়েছিল, বেচে যদি হাজারখানেক টাকাও পাস ত তাই দিয়ে একটা ডিসপেন্সারী খুলে বসে পড়—এমনি করে গোনা নয়টি টাকা নিয়ে আর পয়ের দোরে তোকে খেটে মরতে হবে না। আমার বাচ্চারা যদি এমন করে শুকিয়ে মরে ত ঘর দিয়ে কি হবে। তাঁর ছবিখানা বন্ধ করে সঙ্গে আনিস। কথা বলতে বলতে মার হুঁচোখ বেয়ে বর বর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তবু বহু দিন পেয়ে-ছিলাম, মায় কথার কান দিই নি—অবশেষে আর সহ্য হ’ল না। আগে থাকতেই আমাদের এক বন্ধিষ্ণু মুসলমান প্রজা মক্কেল সেথকে পত্র দিয়েছিলাম—সে আমাকে পত্রপাঠ চলে আসতে লিখেছে।

অনেকক্ষণ এমনি চুপ করে বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাঠের সিঁড়ি ভেঙে হুদাম শব্দ করে কে বেন উপরে উঠে এল—চমক ভেঙে চেয়ে দেখি—রাডাপিসী। প্রণাম করতেই রাডাপিসী আমার চিবুক স্পর্শ করে আলীকাদ করলেন। আমার গায়ে মাথায় বায়ে বায়ে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন—ইস! একেবারে বোগা হয়ে গিয়েছিল শৈলেন—এমন কাঁচা সোনার বঙ তোর কালি হয়ে গিয়েছে।—আমি এবং আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে কিন্তু এ কথাটি আজও ধরা পড়ে নি। শরীর একটু ভাল বা মন্দ হওয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনোর অবস্থা আজ আর আমাদের কারও নেই—চোঁটে থাকটাই হ’ল যথেষ্ট। রাডাপিসী পুনরায় বলতে লাগলেন—হবে না—সে দেশে আছে কি? না আছে এক ফোঁটা হুঁশ, না পাওয়া যায় এক টুকরো মাছ। বনমালীর কাছে শুনলাম—তুই এসেছিল, শুনেই একেবারে ছুটে এসেছি। এবার দেশ ঠাণ্ডা হয়েছে—তোরা বাড়ী কিরে আর শৈলেন। একা তুই যদি বাড়ী ফিরে আসিস, আমি আর কোন ভয় করি নে।

রাডাপিসীর কোন কথার জবাব দেওয়া ত দুঃখের কথা—কমে কমে নিজেকে অত্যন্ত অসহায়—একান্ত অপরাধী মনে করছিলাম। রাডাপিসী চলে গেলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। দেশনিঃসারের পূর্বে যে গ্রামে হাজার হাজার হিন্দু ছিল—সেখানে আজ বড়জোর খুঁজলে জন পঞ্চাশেক লোক মিলবে। দিনের বেলায় নিজের নিজের বাড়ী-ঘরে যে যার কাজ করবে, রাতের বেলায় আমাদের পাড়ায় এসে সকলে রাজিবাস করে! মজা করবে ঘটায় মজা—যে-করজনের সঙ্গে দেখা হ’ল—কেপলাম কারও মুখে হাসি নেই—চোপে নেই জ্যোতি—একটা নিষ্প্রাণ দেহ

আর মন বেন কোনক্রমে এরা টেনে বেড়াচ্ছে। রাজাপিসীর কথায়—‘আমায় কাঁচা সোনার রঙ কালি হয়ে গিয়েছে’ এও যেমন সম্ভব—আবার বার গ্রাম ত্যাগ করে নি তাদেরও যে মানসিক মুক্তা হয়েছে—এও অস্বীকার করবার উপায় নেই। সমস্ত ব্যাপার এমনই একটা উৎকট দৈবাধীন হয়ে পড়েছে যে, এর প্রতিকার হয় ত আজ একান্ত ভাবে মানুষের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে। বার গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে তারা এবং বার গ্রামে রয়েছে—সকলেই বেন একটা আশা-ভরসাহীন নিষ্করণ দৈবের হাতে আপনাদের সমর্পণ করে দিয়ে চলেছে।

২

রাণে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ পরে তজ্জার ভাব এসেছিল। হঠাৎ ভেগে বিছানার উপরে উঠে বসলাম। মনে হ’ল এই মাত্র কে যেন আমার নাম ধরে বারে বারে ডাক দিয়ে গেল। ঘরের জানালা-খলা সব ছিল গোলা। পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা তিথি। জোয়ার আলো একেবারে ঘরপানির ভিতরে এসে পড়েছে। কিছুতেই আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে এসে দোতলার বারান্দায় দাঁড়লাম। আছন্নের মত কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ভিলাম—কখন ঘরে ঘরে নীচে নেমে এসেছিলাম কিছুই জানি না। নীচের তলার বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, বাইরের আড়িনা, পুণ্ড্র-পাড়ের নারকেল আর সুপারির বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঘাটের কাছে এসে দাঁড়লাম। প্রত্যেকটি তরলতা, আম, কাঁঠাল, আর নারকেল গাছ যেন আমাকে একান্ত পরিচিতের মত সম্মত স্বাগত জানাচ্ছিল। আমিও যেন এক অব্যক্ত ভাষায় তাদের সঙ্গে ভাববিনিময় করছিলাম—একেবারে সমস্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তাদেরই দলে মিশে গিয়েছিলাম। এবার আমার চমক ভাঙল। তাই ত এতক্ষণ ধরে নিশিতে পাওয়া মানুষের মত এই বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়লাম কেমন করে? কিন্তু মন আমার তখন এক বিচিত্র অহুত্বভিতে ভরে উঠেছে—দেহ ও মন আমার বেন স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে আকাশ-বাতাসে মিশে আমারই বাড়ীর সারাটা স্থানে একেবারে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি তরলতার পত্রস্পন্দনে যেন নিজের দেহে স্পন্দন অহুত্ব করছি। সে এক বিচিত্র অহুত্ব, ভাষার প্রকাশ করি এমন সাধা আজ আর নেই। নিস্তক প্রকৃতির সেই স্নেহময় রূপের মাঝে আমি আমাকে যেন একেবারে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছিলাম। স্থূল দেহের কোন অহুত্বই বেন আর ছিল না।

হঠাৎ কিছুদূরে কে যেন চীৎকার করে কেঁদে উঠল—নিস্তক প্রকৃতির একে যেন একটি তীক্ষ্ণধার ভীর এসে বিধল। আমি আবার আমার নিজের সত্তা ফিরে পেলাম। এত রাজে কে কাঁদে? শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। সামনের বাগানের চারপাশে ঘন আম কাঁঠালের বাগান—সেখানে চাষের আলো ভাল করে চুকতে পারে নি—সেই পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একট

উজ্জ্বল আলো এসে আমার মুখের উপরে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠলাম—কে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—তুমি কে? সন্দেহ হ’ল—তাকাতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—‘রাজাপিসী?’

রাজাপিসী বললেন—কে যে শৈলেন? ভূই এত রাজে?

আমি বললাম—কিন্তু আপনি এখানে কেন?

ততক্ষণে আরও এগিয়ে রাজাপিসীর একেবারে সামনে গিয়ে দাড়িয়েছি। চেয়ে দেখি রাজাপিসীর ডান হাতে পুরো পাঁচ হাত একপানা লাঠি আর বাঁ হাতে একটি উর্চ।

পুনরায় বললাম—এত রাজে আপনি কোথায় যাচ্ছেন পিসীমা।

তিনি বললেন—কোথাও ত যাচ্ছিনে বাবা। রোজ রাজেই আমি এমনি করে ঘুরে বেড়াই। জানিস ত রাজের বেলা যে বার কাজকর্ম সেরে আমাদের পাড়ায় এসে আশ্রয় নেয়—সকলের বা কিছু সম্বল তাও এখানে এনেই রেখেছে। এদিকে ভীষণ চোবের উপস্রব—রোজ রাজেই মানুষের সাড়া পাই। সারা রাত ত আমার অমনি ঘুম হয় না—তাই পাড়াটার ওপর দিয়ে বারে বারে ঘুরে বেড়াই।

—ভয় করে না আপনার?

—ভয়? না যে শৈলেন ভয় আমার কোন দিন করে না। আমার চোখের সামনে দশ-বারটা মানুষ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে দেখেছি—কিন্তু তবু আমি গ্রাম ছেড়ে যাই নি। বাবও না, যদি এখানেই মরব। কিন্তু এখানে আজ আর বাদের দেখছিস—তারা সবাই মরে রয়েছে—দেখ প্রাণ আছে কি নেই, এমনই অবস্থা।

গাছের পাতাটি পড়লে ওরা ভয় পায়।

সেই শব্দটি এগুনও মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল। আমি প্রশ্ন করলাম—ও কাঁদে কে।

পিসীমা দ্বান হেসে বললেন—কাঁদছে না যে গান গাচ্ছে।

—গান?

—“হাঁ যে, ও নটবর মণ্ডল—আর দেখবি আয়।”—বলে পিসীমা সঙ্গেহে আমার একপানা হাত নিজের মুঠোর ভেতরে ধরে ধরে অগ্রসর হয়ে চললেন। কিছুদূর গিয়ে দেখি কে একজন নটবর মণ্ডলের আঙ্গিনায় বসে গান গাইছে—

“ডাক পারি গো ডাক পারি

আমাদের চাদ গিয়েছে কোন বাড়ী”।

লোকটি নটবর। আমাদের দেখে সে একটুও ধামল না—ভেমন চীৎকার করেই চলল। পিসীমা বললেন—‘পাগল হয়ে গিয়েছে। দাক্ষার সময় ওর একমাত্র নাতিকে ও হারিয়ে ফেলেছে। রোজ রাজেই এমনি চীৎকার করে।’ আমি বললাম—‘গান কোথায় পিসীমা—ও যে কাঁদছে।’ পিসীমা জবাব দিলেন না—চেয়ে দেখি হ’চোখ বেয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছে—তিনি কাঁদছেন। কেবাব পথে পিসীমা একবার বলে উঠলেন—আমরা আর জমে সবাই

মিলে এমন কি মহাপাপ করেছিলাম শৈলেন, বার ফল এমন করেই ভুগতে হচ্ছে।” নিজের ঘরে ফিরে এসে সারাটা রাত্রি ধরে শুধু রাজাপিসীমার কথাই ভাবছিলাম। মানুষ চিনতে পারা কত শক্ত। এককালে এঁই রাজাপিসীকে আমরা ঘূরে ঘূরে রাখতাম। নিতান্ত খগড়াটে বলে গায়ের আবক্ষনার মত বাক্য মনে করতাম তাঁকেই আজ মাংস গ্রাহ্যের পূর্বম তিত্তিষণী বলে মনে হচ্ছে। বার বার রাজাপিসীমার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে লাগলাম।

৩

মফেজ সেপের অবস্থা এককালে ভাল ছিল না। সে আমাদের প্রজাও বসে, বরগাদারও বসে। বহুমান সে বেশ হুড়িয়ে নিয়েছে। চাষটি ছেলে—তিনি জন চাষবাসের কাজ করে। সবাই তেঁাটটি ফুলে কিছুদূর অবধি পড়েছিল—তারপর দুই-এক বাসর কমলপুত্রের মৌলবীর কাছে ঈশ্বর-স্বামী পড়ে মস্ত বড় মৌলবী হয়েছেন। মফেজ সেপ নয় শ’ গাঁটার টাকার আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—“এ পুত্রোপরি আমার টাকার ঘরের দাম ডাক্তারবাবু—তবে গাঁটের টাকার আমি মাপ চেয়ে নেলাম।”

আমি আর কথাটি না বলে টাকাগুলো পকেটে রাখলাম। তা এক হিসাবে আমি ঘর খারাপ পাঠি নি—চার হাজার নিকার ঘর বিক্রি করে তিন হাজার এক হাজার টাকা পেলাম। কত জন যে জলের দায়ে যথাসম্ভব বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছে। নয় শ’ গাঁটার টাকার মোট দুকপকেটে দুগুণ ফুলে উঠছিল।

দেশ ভাল। জমির বল আমার একটা নাম ছিল। দেশ ছেড়ে নানা গরিব গুরে বোখাও বসব স্থির করতেই হাতের টাকা ক্যাঁচি একেবারে নিশেষ হয়ে গেল। অবশেষে উপস্ফাস্তর না পেয়ে সামান্য বেতনে একটি গুণের কারখানায় কাজ নিযেছি। সারাটা দিন সেখানে পরিশ্রম করে কোনপ্রকারে ভাল-ভালের সংস্থানও হয় না। কলকাতার পাশে একটি উদ্যোগ-উপনিবেশে বাস করি। সেখানে ডাক্তারী করলে বেশ হুঁপুসা হতে পারে, কিন্তু আমার গুণ নেই—আসবাবপত্র নেই, কি নিয়ে বসব, ভাবলাম এইবার তখন একটু নিদের পায়ে পাড়াতে পারব।

মফেজ সেপের বাড়ী থেকে ফিরে দেখি, আমাদের আঙিনার সামনে সাত-আট জন লোক বসে রয়েছে। কাছে এসে বুঝলাম, এরা সকলেই রোগী—আমি বাড়ী এসেছি শুনে দেখাতে এসেছে। মনের ভেতর মোচড়ে দিয়ে উঠল। সে একদিন ছিল—প্রতিদিন এমনি দলে দলে রোগী এসে উপস্থিত হ’ত আমার “ডিসপেন্সারী” ঘরে। রোগী দেখা চিকিৎসকের পেশা—কিন্তু একটা কঠিন রোগী ভাল করে তুলতে পারলে যে কতখানি আনন্দ তা অপরে বুঝবে না। রোগী দেখে এক এক গুণ কাগজে গুণের ব্যবস্থা লিখে দিলাম। অল্প সকলে চলে গেলেও দেখি পাশের গ্রামের আবহুল সেপ আর জীনাথ মাংসা বসেই আছে। আর কি চায় ডিক্কাসা করতেই জীনাথ বদ বদ করে কেঁদে খেলে বলল—হাতে একটা পরসা নেই, কি দিয়ে গুণ কিনব!

আবহুল বলল—আপনি হাতে করে বা দেবেন তাতেই আমি ভাল হয়ে উঠব ডাক্তারবাবু। গুণ কেনবার সামর্থ্যের অভাবই যে এত বড় বিশ্বাসের কারণ তা বুঝতে অবস্থা আমার একটুও বিলম্ব হ’ল না। কিন্তু কি করব—আমি সম্পূর্ণ নিরপায়। অগত্যা কুর মনে তারা দুই জনও বিদায় নিল। প্রত্যেকটি রোগীই বারে বারে বলেছিল—আপনি আবার ফিরে আসুন ডাক্তারবাবু, আপনি গরীবের মা-বাপ—আমরা আর কার কাছে যাব।

উচ্ছে হচ্ছিল ভবিষ্যতের সমস্ত চিন্তা বিসম্মত দিয়ে খাবার গ্রাহ্যে ফিরে এসে এদের সেবার আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু এ সং চিন্তার বিলাস আমার বেশীক্ষণ রইল না—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমার জী-পুত্র, পারিবারবর্গের কথা। আমার বাড়ীঘরের মোত, গ্রামের মোত বড়, না যারা আমার অস্থিৎস্কর মত তারা বড়? দুকপকেট থেকে মফেজ সেপের দেওয়া টাকাগুলো বেব করে সম্ভরণে বিছানায় নীচে রেখে দিলাম।

৪

—বাবা তুমি খাচ্ছে বসে সেই ছাই রঙের চাদরখানা গায়ে ভড়িয়ে গড়গড়া ঢাকাছলেন—অতুর্নী আমাকে গঞ্জে ঘরপানা ভরতুণ করছিল। পাশে তাঁর অতি প্রিয় রামাছলনা পোলা পড়ে ছিল—এই কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি তখন পাঠ করছিলেন। কতক্ষণ পরে নলটি এক পাত্রে সরিয়ে রেখে পুনরায় পাঠ করতে লাগলেন। আমি অতুর্নদের মত এক পাশে চুপ করে বসে ছিলাম। মনে আমার সঙ্কোচের শেষ ছিল না—বাবাকে যেন বলতে হবে—“এই ঘরখানা মফেজ সেপের নিকট বেচে দিয়েছি।” কতক্ষণ পরে বাবা আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, “কি শৈল কিছু বলবি আমার?” আমি যেন কি বললাম। বাবা শুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। পরে ধীরে ধীরে বলে উঠলেন—“আমার এত সাধের ঘরপানা তুমি বেচে ফেলবি শৈল—আমি তা হলে থাকব কোথায় বলত?” দেগলাম তাঁর দুই চোপের কোণ বেয়ে জল ঝরছে।—ঘুম ভেঙে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে বিছানায় পড়ে রইলাম—আর ঘুম এল না। স্তিমিত হারিকেনের আলোটি বাড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ পরে বাবার ফটোখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সকালবেলাতেই মফেজ সেপ লোকজন নিয়ে ঘর ভাঙতে আসবে—সুতরাং বাবার ফটোখানা এবার নামিয়ে এনে, বন্ধ করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। পেরেক থেকে তারের ঝাঁধন খুলতে গিয়ে হঠাৎ হাত কসকে ফটোখানা কাঠের মেঝের উপরে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফটোখানা তুলে নিয়ে সম্ভরণে ভাঙা কাঠের টুকরোগুলো সরিয়ে ফেললাম, দেখি কাঠের টুকরোয় ফটোখানার অনেক জায়গা কেটে নষ্ট হয়ে গেছে। কেন যেন আমার হাত পা সমস্ত শরীর ধরধর করে কাঁপতে লাগল—মন একেবারে অবসন্ন হয়ে গেল।

ঘর বিক্রির কথা এ পর্যন্ত কাউকে জানাই নি। সকাল-বেলাতেই দশ-বার জন মজুর আর মিস্ত্রি নিয়ে মফেজ সেপ আর ছোট

ছেলে ঘর ভাঙতে এল। খবর পেয়ে নীরদ কাকা এসে বললেন, 'তুই আ হলে দাদার ঘরখানা বিক্রি করে দেবার জন্তেই এসেছিস? আমি ভেবেছিলাম আবার হয়ত তুই...' নীরদ কাকা কথা শেষ করতে পারলেন না—ঝর ঝর করে কেঁদে কেললেন।

মিস্ত্রিরা ঘরের চালে উঠে হাতুড়ি পিটিতে লাগল—টিনের চালের উপরে হাতুড়ির ঘা পড়ে সাঝাটা পাড়া একেবারে মুগরিত হয়ে উঠল। মনের ভিতরে কি যে অশান্তি হচ্ছিল আমার! মনে হচ্ছিল এখনই ছুটে গ্রাম ছেড়ে পালায়ে যাই। প্রত্যেকটি হাতুড়ির গা যেন আমার বুকের উপরে এসে পড়ছে! হঠাৎ রাঙাপিসী ছুটে এসে ডাকলেন, শৈলেন! আমি মুগ্ধ ভুলে হাব দিকে চাইতেও পারলাম না। তিনি চীৎকার করে বললেন, ও, তা হলে তুইও এই দলে। আমি ভেবেছিলাম, শৈলেন আমাদের গ্রামে ফিরে আসবে বুঝি। বাপের ঘর বিক্রি করতে এসেছ—নিজের রোজগারের ঢাকায় তা আর তোলা নয়—বাপের ঢাকায় তোলা ঘর। এ গায়েই কেউ আর আপনার নেই যে—সবাই শতর সবাই শতর। বলতে বলতে রাঙাপিসী তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। পাড়ার অনেকটাই এসে উকিঝুঁকি মারছিলেন। নিজের ষেঘের ষাধ এইবার ভেঙে গেল। স্বামী-পুত্রের শুষ্ক মুগ্ধ, অভাব-অনটন সমস্ত ভুলে গেলাম। ঘরের চালের মিস্ত্রিদের উদ্দেশ্য করে বললাম, চাল থেকে নেমে এস।

মফেজ সেগ জিজ্ঞাসা করল—কি হ'ল ডাক্তারবাবু। মফেজ সেগের হাতে 'হার সেই নয় শ' পঁচাত্তর টাকা ফেরত দিয়ে বললাম—আমার ঘর বিক্রি করা হ'ল না—অথবা কষ্ট দিলাম, মনে কিছু করে না।

মফেজ সেগ প্রশ্ন করল—কেন, বেচবেন না কেন? নাম ত আমি কম দিই না।

আমি বললাম, না সেজন্য নয়—পৈতৃক ভিটে থেকে আর কিছুই আমি বিক্রি করব না—হয়ত একদিন বাড়ীতেই আবার ফিরে আসতে পারি।

মফেজ সেগ বলল, ফিরে আসবেন নাকি—সে ত খুব ভাল কথা ডাক্তারবাবু। চাই নে আমার ঘর। আপনি আলি আমবা যে বাচে যাই।"

মফেজ সেগের ছোট ছেলটি কিন্তু বিরক্ত মুখে বলে উঠল—

বেচবেন না যদি তা হলি মিছেমিছি কেন হয়রানি করালেন বলেন ত?

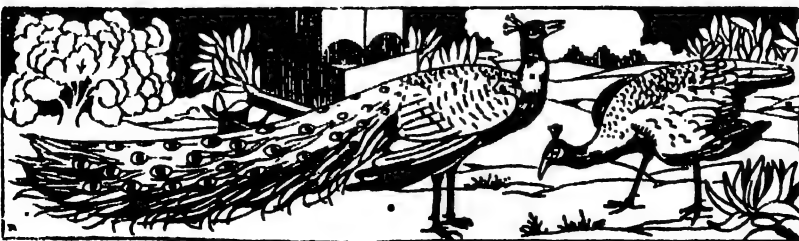
—সেটা সত্যি, আমার ভুল হয়েছে ভাই, সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

মফেজ সেগ বলল, তা হউক গে। তুমি চুপ কর মোকসেদ। কিন্তু মোকসেদ পুনরায় বললে, মিস্ত্রির রোজ, কামলার রোজ—সব-শুদ্ধ যে পনর ঘোলাটি টাকা লোকমান হ'ল—তা দেয় কেউ।

আমি পকেটে হাত দিয়ে পনরটি টাকা মোকসেদের হাতে দিয়ে বললাম—সেটাও আমিই দিচ্ছি। মফেজ সেগ সবাইকে নিয়ে বিদায় হয়ে গেল।

তিসের করে দেখলাম, পকেটে যা আছে তাতে কোন রকমে শেয়ালদা পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে। শুটকেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি গেলে কুষ্টিয়ার গহনার নৌকা ঘরতে পারব। পথে নেমে নিজের বাসার অভাব-অনটনের কথা বিশেষ করে মনকে চেপে ধরল। মনে মনে খুঁতছিলাম—কাল কলকাতা পৌঁছেই, কোন্ বন্ধুর কাছ থেকে অশুভ: গোটা কুড়ি টাকা ধার করতে পারব।

আজ বোধ হয় জয়ের মত এ গ্রাম ছেড়ে চললাম। আবার কোন দিন যে এখানে ফিরে আসব এ সম্ভাবনা হয় ত আর নাই। সম্ভানসম্ভতির ভবিষ্যৎ আছে—আরও কত প্রশ্ন আছে—এক প্রশ্ন শাপা-প্রশাপা মেলে শত প্রশ্নে গিয়ে দাড়ায়, স্মরণীয় আজ আমার জন্মভূমির উপর দিয়ে এই হয়ত আমার শেষ পরিভ্রম। বাধা-বেদনায় মন ভমে পাখর হয়ে গিয়েছে। মধুমতীর চরের উপরে এসে গেছি—আধ মাইলের উপর চর। সমস্তটা চর মটর আর খেসারি গাছে ভরে উঠেছে। তারই মাঝগান দিয়ে আলপথ। বারে বারে মটর গাছের শুদ্ধ ছপারে জড়িয়ে ধরে যেন বলছে—যেয়ো না, থাক। বাইকুলের গন্ধ ভেসে এসে সমস্ত প্রান্তরটি ভরে ফেলেছে। আজকের মত কোন ক্রমে পথ চলছিলাম। মাঠটুকু পার হয়ে একটা ছোট দয়ের নিকট এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ মনে পড়ল গত বৎসর দাক্ষার সময় ঠিক এই জায়গাটিতেই ঘটেছিল শোচনীয় দুর্ঘটনা। মনে মনে শিউরে উঠলাম। কাছেই গহনার নৌকা, সেখান থেকে বাজীদের কলরব ভেসে আসছিল। তাড়াতাড়ি নৌকায় চেপে বসলাম।



# বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাংলার ইতিহাসের চাত্রগণের নিকট সেন-বংশীয় স্মৃতিস্তম্ভ লক্ষণসেনের পুত্র রাজা বিশ্বরূপসেনের দুইখানি তাম্রশাসন সুপরিচিত। ইহার একখানি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নিকট-বর্তী কোন গ্রামে (কেহ কেহ বলেন, মধ্যপাড়া গ্রামে) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনটি বর্তমানে কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত আছে। প্রথমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় *Indian Historical Quarterly* পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে এই লিপির পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত পাঠ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ; অধিকন্তু তিনি শাসনের ভূমিদান সম্বন্ধীয় অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পরে পরলোকগত ননী গোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার *Inscriptions of Bengal* (vol. III) সংগ্রহে এই লিপিটি পুনঃসম্পাদন করেন। তাঁহার প্রকাশিত পাঠ অনেকটা নির্ভুল; তৎকর্তৃক সমগ্র শাসনের অন্তর্ভুক্তও প্রকাশ্য। কিন্তু দলিঙ্গের দুইখানি ভূমিদান সম্পর্কিত অংশের পাঠ এবং ব্যাখ্যাতে মজুমদার মহাশয়েরও অনেক ত্রুটি দেখা যায়। সুদীর্ঘ কালের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে সম্প্রতি আমি সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনের এই কঠিন অংশটি পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং তাহা শুদ্ধ বলিয়া মনে করি। কিন্তু উহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

বিশ্বরূপসেনের অপর একখানি তাম্রশাসন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার কোটালপাড়া পরগণার অন্তর্গত মদনপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। তাম্রপট্টখানি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু পরে উহা সেখান হইতে হারাইয়া যায়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিপিখানি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকাশিত পাঠ নির্ভুল হয় নাই; তিনি শাসনের যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও মূলানুগত নহে। ননী গোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিপিটি পুনঃসম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মূল শাসন এবং উহার যথাযথ প্রতিলিপির অভাবে তিনিও ইহার ভূমিদান অংশের নির্ভুল পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে পারেন নাই; বরং বলিয়াছেন যে, লিপিকরপ্রমাদের জন্য এই অংশের অনেক স্থানের পাঠ দুরূহ। এই অভিযোগ সত্য নহে। মদনপাড়া তাম্রশাসনখানি সম্প্রতি ঢাকা মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। কিছুকাল পূর্বে ঢাকা

মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমি ঐ লিপিখানি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই। তাহার ফলে মদনপাড়া শাসনেরও ভূমিদান অংশের শুদ্ধ পাঠ এবং ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই বিষয়টিও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। মদনপাড়া তাম্রশাসন পরীক্ষা করিয়া আমি বাংলার সেন-বংশীয় রাজগণের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি অভাবিতপূর্ব তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি; উহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে সেন-বংশের অপর একখানি তাম্রশাসনেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এই লিপিটিকে লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন বলা হইয়া থাকে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব জনৈক পণ্ডিতের সাহায্যে এই শাসনের পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রিন্সেপসিচ্চার প্রথম যুগে প্রকাশিত এই পাঠে ভ্রম প্রমাদেয় সংখ্যা অগণিত। মূল শাসনটি হারাইয়া গিয়াছে। জেমস প্রিন্সেপ শাসনের যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও সর্বদাংশে মূলানুগত নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, লিপির চন্দ্রাবলী ভূমিকায় এবং ভূমিদানার্থে যে দুই স্থানে ‘কেশব’ নামটি দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ উভয় স্থান হইতেই পূর্ববোধিত একটি নাম ঘষিয়া তুলিয়া উল্লিখিত তিনটি অক্ষর পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রিন্সেপ কল্পনা করিয়াছিলেন যে, কেশবের দ্ব্যর্থক ভ্রাতা মাধবের রাজত্বকালে শাসনটি উৎকীর্ণ হয়; অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাঁহার নামের স্থলে ‘কেশব’ লিখিত হইয়াছে। প্রিন্সেপ কর্তৃক প্রকাশিত ইদিলপুর শাসনের প্রতিলিপি যথাযথ না হইলেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহার অনেক স্থানেই পূর্ববোধিত অক্ষর ঘষিয়া তুলিয়া নূতন অক্ষর উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। মদনপাড়া শাসনে ঠিক অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া প্রথমে আমি অবাক হইয়াছিলাম। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মূল মদনপাড়া শাসন পরীক্ষা করিয়া সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রিন্সেপ-নিযুক্ত পণ্ডিত ইদিলপুর লিপিতে যাহা ‘কেশব’ পড়িয়াছেন তাহা ‘বিশ্বরূপ’ নামের ভ্রান্ত পাঠ মাত্র। কিন্তু পরবর্তী কালের লেখকেরা কেহই বসু মহাশয়ের এই মত গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, বসু মহাশয় ঐ মতের পক্ষে কোন অকাটা যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই;



এমন কি, তাঁহার প্রবন্ধে তাম্রপট্টখানির সম্যক পরিচয়ও পাওয়া যায় না। মূল ইদিলপুর ও মদনপাড়া লিপি এবং উদ্ধারের অবিকল প্রতিলিপির অভাবে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু যিনি মদনপাড়া শাসনের মূল কিংবা অবিকল প্রতিলিপি পরীক্ষার সুযোগ পাইবেন, তিনি যদি উহার সহিত ইদিলপুর শাসনের প্রিন্সিপ-প্রকাশিত প্রতিলিপির তুলনা করেন, তাহা হইলে দুইখানি শাসন যে একই নরপতি-প্রদত্ত সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকে সম্ভব বলিয়া মনে করি না।

সাহিত্য-পরিষদ, মদনপাড়া এবং ইদিলপুর শাসনের ছন্দোবদ্ধ ভূমিকাংশ মোটামুটি এক। এই অংশের নিম্নোক্ত তিনটি শ্লোক অত্যন্ত মূল্যবান :

১। পূৰ্বঃ জগৎকেশু ভূমিপতিনা সজ্জাত্য মুক্তিগ্রহঃ  
নুনঃ তেন হৃৎখিনি হৃৎখনীতীরে হরঃ প্রীতঃ।  
এতস্মাৎ কথমন্ত্যাপি বিপ্লবঃ বৈধব্যবদ্ধবতো  
বিখ্যাতপিতৃপালনো লিখিতবক্ষী বিশ্বরূপো নৃপঃ ॥

ইহা মদনপাড়া লিপির দশম এবং ইদিলপুর ও সাহিত্য পরিষদ শাসনদ্বয়ের একাদশ শ্লোক। ইহাতে লক্ষ্যসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

২। নিম্নোক্ত তিন শ্লোকটি মদনপাড়া শাসনে ত্রয়োদশ, ইদিলপুর লিপিতে চতুর্দশ এবং সাহিত্য-পরিষদ শাসনে পঞ্চদশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ লিপি-সম্পাদনকালে শ্লোকটির এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :

যাঃ নিখুয়া পবিত্রপানিরতবদধাঃ সতীনাঃ শিখা-  
ব্রহ্মণা কিমপি স্বরূপচরিতৈঃ কিংবা যরালঙ্কৃতম্।  
লক্ষ্মীভূষণপিতৃপালনো বিদগ্ধঃ যস্যাস্ত্যঃ সপ্তোত্তমঃ  
শ্রীমৎকট্টপদেবায় নমঃ শাস্ত্রী মাভূত্বিগৌচিতা ॥

এই শ্লোকে রাজা বিশ্বরূপসেনের মাতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মজুমদার মহাশয় শাস্ত্রীর “শ্রীমৎকট্টপদেবায় নমঃ” স্থলে “শ্রীমন্তাষ্টপদেবায় নমঃ” পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রীর মতে বিশ্বরূপ সেনের মাতার নাম কট্টপদেবী এবং মজুমদারের মতে তাষ্টপদেবী। তিন অক্ষরের এই নামটির তৃতীয় অক্ষর ‘ৎ’ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অপর দুইটি অক্ষর সম্বন্ধে শাস্ত্রী এবং মজুমদার উভয়ের মতই ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। ‘ৎ’ কোন সংযুক্ত বর্ণ হইতে পারে না, শাস্ত্রী নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি যাহা ‘ৎ’ পড়িয়াছেন, উহার আকার ণ-মাত্রা এবং আ-মাত্রায়ুক্ত ‘ত’-এর স্তায়। ণকারসদৃশ অংশটিকে তিনি ‘ট’ পড়িয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলে আকারসদৃশ অংশটি লইয়া সমস্ত অক্ষরটিকে ‘ৎটা’ পাঠ করা উচিত ছিল। মজুমদার মহাশয় ঐ ণ-মাত্রা এবং আ-মাত্রাসদৃশ অংশদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া

ষ-কলা পাঠ করিয়াছেন। ইহা ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে সমস্ত অক্ষরটিকে ‘ত্যা’ পড়া উচিত ছিল, ‘ত্যা’ নহে। কারণ অক্ষরটিতে ‘ত’-এর বিশ্বের কোনই চিহ্ন দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় এই অক্ষরটি ‘ত্যা’; সুতরাং বিশ্বরূপসেনের মাতার নামের প্রথম অক্ষর ‘অ’ এবং নামটি শ্লোকের পূর্ববর্তী ‘শ্রীমতী’ শব্দের সহিত সন্ধি-বদ্ধ। নামের দ্বিতীয় অক্ষরটির শাস্ত্রীদ্বারা পাঠ ‘ট্ট’ এবং মজুমদারদ্বারা পাঠ ‘ট’। লিপিটিতে বহুস্থানে ‘ট্ট’ এবং ‘ট’ ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩৮, ৪১, ৫০, ৫২, ৫৫ ও ৬০ সংখ্যক পংক্তিতে আট বার ‘ট্ট’ এবং ২৬, ৪৫, ৫২ ও ৬৫ সংখ্যক পংক্তিতে চার বার ‘ট’ এর ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু আলোচ্য অক্ষরটির সহিত ঐ সকল ‘ট্ট’ এবং ‘ট’ এর কিছু-মাত্রে সাদৃশ্য নাই। আমাদের বিবেচনায় এই অক্ষরটি ‘ধ্’ ব্যতীত অপর কিছু নহে এবং বিশ্বরূপসেনের মাতার প্রকৃত নাম ছিল ‘অধ্বগদেবী’।

আশ্চর্যের বিষয়, ইদিলপুর এবং মদনপাড়া শাসনে এই শ্লোকের স্বতন্ত্র পাঠ দেখা যায়। ইদিলপুর লিপিতে “ধ্বয়ঃ শ্রীমত্যাষ্টপদেবায় নমঃ” স্থলে “মহারাজ্ঞী শ্রীচন্দ্রাদেবী স্বস্ত” পাঠ করা হইয়াছে, যদিও আমাদের মনে হয়, ইহার শেষ চারিটি অক্ষরের বাঞ্ছনীয় পাঠ “দেবায় নমঃ”। এই স্থলে মদনপাড়া শাসনে পড়া হইয়াছে “মহারাজ্ঞী শ্রীতাড়া দেবি (অথবা, তাজাদেবি) তদস্ত”। স্পষ্টই বুঝা যায়, যে কবি মূলতঃ শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন তিনি ছন্দোভঙ্গ করিয়া “শ্রীচন্দ্রাদেবী স্বস্ত” কিংবা “শ্রীতাড়া দেবি (অথবা তাজা-দেবি) তদস্ত” লিখিতে যান নাই। বিশেষতঃ মদনপাড়া লিপিতে সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, পূর্ববোধিত তিন অক্ষরের একটি নাম বসিয়া তুলিয়া আলোচ্য নামের চারিটি অক্ষর (যাহা ‘তাড়া দেবি’ বা ‘তাজাদেবি’ পড়া হইয়াছে) পুনরুৎকর্ষ হইয়াছে। মূলতঃ এই লিপিতে যে তিন অক্ষরের নামটি উৎকর্ষ ছিল, ছন্দোবিশ্রাম অল্পস্বরে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর লঘু এবং তৃতীয় অক্ষরটি শুক্ল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, ঐ নামটির স্থলে পরবর্তী লিপিকারের “প্রাধ্বগদেবি স্বস্ত” (ইদিলপুর শাসনে “প্রাধ্বগ-দেবায় নমঃ”) লেখা উদ্দেশ্য ছিল, যদিও তিনি “তদস্ত”কে “স্বস্ত”রূপে পরিবর্তিত করিতে তুলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ছন্দোবক্ষা হয়, সাহিত্য-পরিষদ শাসনের পাঠের সহিত সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়। যে দুইটি অক্ষর ‘তাড়া’ বা ‘তাজা’ পাঠ করা হইয়াছে, পূর্বোৎকর্ষ অক্ষর দুইটি উত্তমরূপে বসিয়া না তুলিয়া ঐ দুইটি উৎকর্ষ করায় উহাদের আকার অস্বাভাবিক দেখা যায়। ইদিলপুর শাসনের অবস্থাও এই নামটির বিষয়ে মদনপাড়া লিপির স্তায়। আরও একটি কথা আছে।

‘দেবী’ স্থলে ‘দেবি’ অন্তর্ভুক্ত, যদিও অনেক সময়ে কবিগণকে ছন্দের অনুরোধে ত্রীলোকের নামের শেষে ‘দেবি’ লিখিতে দেখা যায়। মদনপাড়া লিপিতে যে কবি বিশ্বরূপসেনের মাতৃ-নামের শেষে ‘দেবি’ লিখিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই ছন্দোবিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এই শাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ভূমিদানাংশে পর পর কতকগুলি পংক্তি বমিয়া ভুলিয়া নূতন অক্ষর উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। যিনি ইহা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকটিতে কয়েকটি অক্ষর বমিয়া মহারাজার নামটি ছন্দোবিধানানুযায়ী সংযোজিত করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? সামান্য সামান্য বিষয়ে তাঁহার ত্রুটি খটিতে পারে; কিন্তু একটি নামের স্থলে অত্র একটি নাম বসাইতে গিয়া তিনি ছন্দোভঙ্গ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

৩। এতাতাং শশিপেরগিরিজাতামিব বভূব শক্তিমরঃ।

শ্রীবিষ্ণুরূপসেনঃ প্রতিভটুপালমকুটমণিঃ ॥

এই শ্লোকটি পূর্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্তী। উপরি-উদ্ধৃত পাঠ সাহিত্য-পরিষদ তান্ত্রশাসন হইতে গৃহীত। আশ্চর্য্যের বিষয়, মদনপাড়া লিপিতে “শ্রীবিষ্ণুরূপসেনঃ” স্থলে “শ্রীবিষ্ণুরূপসেনদেবঃ” লিখিয়া ছন্দের ব্যতিক্রম ঘটানো হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে “বিষ্ণুরূপ” এই চারিটি অক্ষর পূর্বোৎকীর্ণ হই অক্ষরের একটি নাম বমিয়া ভুলিয়া নূতন খোদিত দেখা যায়। হুই অক্ষরের এই মূল নামের দ্বিতীয় অক্ষরের উপর যে রেফচিহ্ন ছিল, তান্ত্রপটে এখনও উহা অবিকৃত রহিয়াছে। এই নামটি যে স্বর্ঘ্য, সর্ষ, দর্প, গর্ষ প্রভৃতির জ্ঞায় কিছু ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শাসনের ভূমিদানাংশে যে স্থলে ভূমিদাতা নৃপতির নাম পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানেও এই পূর্বোদ্ধৃত নামটি বমিয়া তৎস্থলে “বিষ্ণুরূপ” নাম পুনরুৎকীর্ণ দেখা যায়। চারিটি অক্ষর হুই অক্ষরের পরিসরে লিখিত হওয়ায় “বিষ্ণুরূপ” নামটি তান্ত্রপটে “বিস্বর” বলিয়া বাধ হয়। ইদিলপুর লিপিতে ইতাই যে ভ্রমবশতঃ “কেশব” পড়া হইয়াছিল, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রিন্সেপ কর্তৃক প্রকাশিত ঐ শাসনের প্রতিলিপি মূলানুগত না হইলেও উহাতে বাহা “কেশব” পড়া হইয়াছে, তাহার প্রথম অক্ষরে ‘ই’মাত্রা দেখা যায়। ভূমিদানাংশে নামটি “কিশ্বপ” বলিয়া বোধ হয়। অতাস্ত স্বল্পপরিসরে বাহা “বিষ্ণুরূপ” ছিল তাহাকে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করিতে গিয়া এই কল দাঁড়াইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, হুই অক্ষরে লিখিত যে নামটির স্থলে “বিষ্ণুরূপ” পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা স্বর্ঘ্য, সর্ষ, দর্প, গর্ষ প্রভৃতির জ্ঞায় একটা কিছু ছিল। শাসনের ভূমিদানাংশে

নামটির পূর্বে “শ্রীমৎ” সংযুক্ত আছে। এই অংশে রাজার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের নামের সহিত উক্ত শব্দটি সন্ধিবদ্ধ দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায়, মদনপাড়া লিপির মূল শাসনদাতার নামের প্রথম বর্ণ ‘ৎ’-এর সহিত সন্ধিতে ঘনবদ্ধ হইবার মত নহে। স্মৃতরাং নামটি স্বর্ঘ্যসেন বা সর্ষসেন হওয়া সম্ভব; কিন্তু দর্পসেন বা গর্ষসেন হওয়া সম্ভব নহে। শাসনের ভূমিকাংশ হইতে যে তিনটি শ্লোক উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি একযোগে পাঠ করিলে স্পষ্টই মনে হয়, দলিপের মূল দাতা ছিলেন রাজা বিশ্বরূপসেনের জ্যৈষ্ঠ পুত্র। মদনপাড়া লিপির ভূমিদানাংশে এই অনুমানের পক্ষে অকাটা প্রমাণ রহিয়াছে। কারণ এই অংশে অরিরাজ-নিঃশঙ্কশ্বর শ্রীমদল্লাসেনদেবের প্রপৌত্র অরিরাজমদনশঙ্কর শ্রীমল্লস্বর্গসেনদেবের পৌত্র অরিরাজবৃষভশঙ্কর শ্রীমদ্বিষ্ণুরূপসেনদেবের পুত্র অরিরাজ-নিঃশঙ্কশ্বর শ্রীমৎ \* \* \* সেনদেবের নামাদি হইতে কতকগুলি অক্ষর পরিবর্তিত করিয়া অরিরাজ বৃষভশঙ্কর শ্রীমদ্বিষ্ণুরূপসেনদেবের প্রপৌত্র অরিরাজ নিঃশঙ্কশ্বর শ্রীমদল্লাসেনদেবের পৌত্র অরিরাজমদনশঙ্কর শ্রীমল্লস্বর্গসেনদেবের পুত্র অরিরাজ-বৃষভশঙ্কর শ্রীমৎ বিষ্ণুরূপসেনদেব ইত্যাদি পুনর্লিখিত হইয়াছে। ইহার সুস্পষ্ট চিহ্ন তান্ত্রপটে বর্তমান। এই সকল পরিবর্তনবিষয়ক খুঁটিনাটির আলোচনায় সাধারণ পাঠকের দৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা। তাই আমরা মাত্র হুই-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। যেখানে এখন “শ্রীমল্লস্বর্গসেন” দেখা যায়, উহার “ল্লস্বর্গ” অক্ষরত্রয় একটি চার অক্ষরের নামের স্থানে পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছে। এই স্থানে পূর্বে “শ্রীমদ্বিষ্ণুরূপসেন” খোদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ একে ত বিষ্ণুরূপ ব্যতীত সেন-বংশে অপর কাহারও চারি অক্ষরের নাম দেখা যায় না; তদুপর ‘দ্বি’ বর্ণটির ‘ই’মাত্রাও চিহ্ন এখনও তান্ত্রপটে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আবার এখানে লঙ্গসেনকে “পরমসৌর” বলা হইয়াছে, যদিও তিনি “পরম বৈষ্ণব” ছিলেন এবং তৎপুত্র বিষ্ণুরূপসেনই সেনবংশের সর্বপ্রথম সৌর নরপতি। স্পষ্টই বুঝা যায়, বিষ্ণুরূপসেনের নামের স্থলে লঙ্গসেনের নাম পুনরুৎকীর্ণ করিবার পর পরবর্তী লিপিকার “পরম-সৌর”কে “পরমবৈষ্ণব” রূপান্তরিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, মদনপাড়া তান্ত্রশাসন অবশ্য এবং ইদিলপুর শাসন খুব সম্ভব মূলে বিষ্ণুরূপসেনের জ্যৈষ্ঠ পুত্রকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এই সেনবংশীয় নরপতির স্বর্ঘ্যসেন বা সর্ষসেন এইরূপ কোন একটা নাম ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিষ্ণুরূপসেনের পরবর্তী

কাঁলীন সাহিত্য-পরিষদ শাসনে কুমার স্বর্ধ্যসেনের নামোল্লেখ আছে এবং অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বরূপের পুত্র ছিলেন। সুতরাং বিশ্বরূপসেনের যে পুত্র মদনপাড়া ও ইদিলপুরশাসনের মূল দাতা, তাঁহার নাম স্বর্ধ্যসেন হওয়া খুবই সম্ভবপর।

অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মদনপাড়া-লিপি মূলতঃ স্বর্ধ্যসেনের দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু “দ্বিতীয়াকীর” কথাটির প্রথম চুইটি অক্ষরের স্থলে পরে “চতুর্দশ” পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছে, অথচ ‘রা’ অক্ষরটি অবিকৃত রহিয়াছে এবং ‘দ্ব’-এর ‘ই’মাত্রা ও ‘ত’-এর ‘ঈ’মাত্রার চিহ্নও সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, শাসনটি স্বর্ধ্যসেনের দ্বিতীয় রাজ্যসংবৎসরে প্রদত্ত এবং বিশ্বরূপ সেনের চতুর্দশ রাজ্যবর্ষে সংশোধিত হইয়াছিল। এই সংশোধনের কারণ আমি অন্তরে আলোচনা করিতেছি। এখানে সংক্ষেপে ইহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বর্ধ্যসেন জনৈক ব্রাহ্মণকে পিঞ্জোকাঙ্গাগ্রাম নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। উহার বার্ষিক আয় ছিল ৬৩২ পুরাণ বা চূর্ণী। কিন্তু পরে দেখা যায়, ঐ গ্রামের ১০২ পুরাণ আয়ের একটি অংশে কঙ্কপ-শঙ্করাশ্রমের নিষ্কর স্বস্থ রহিয়াছে। তাই ঐ অংশটি বাদ দিয়া উহার পরিবর্তে নারগুপ গ্রামের ১২৭ পুরাণ বার্ষিক আয়ের একটি অংশ শাসনগ্রন্থে ব্রাহ্মণকে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রয়োজন অঙ্গীভূত হয়। তদনুসারে পূর্ব্ববোধিত শাসনের কতকাংশ ঘষিয়া তুলিয়া কতকগুলি নতুন কথা পুনরুৎকীর্ণ করিতে হইয়াছিল।

বিশ্বরূপসেনের পুত্র স্বর্ধ্যসেন তদীয় পিতার রাজত্বের আরম্ভ এবং শেষের মধ্যবর্তী সময়ে কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বরূপকে নরপতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইদিলপুর শাসনের “রহনুপতিচরণৈঃ” স্বর্ধ্যসেন কর্তৃক জীবিত পিতার সমস্ত উল্লেখ স্মৃতিত করে। আবার,

বিশ্বরূপসেনের চতুর্দশ রাজ্যবর্ষের আশ্বিন মাসে মদনপাড়া লিপি হইতে স্বর্ধ্যসেনের নাম কাটিয়া তাঁহার পিতার নাম সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পরবর্তী, সাহিত্য-পরিষদ শাসনে বিশ্বরূপ কুমার স্বর্ধ্যসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, স্বর্ধ্যসেন পিতৃজ্যোতী হইয়া রাজ্যাধিকার করেন নাই। বোধ হয়, বিশ্বরূপসেন শত্রু-হস্তে বন্দী কিংবা হারারোগ্য রোগে অক্রান্ত হওয়ায় মন্ত্রিগণ তাঁহার সম্পর্কে নিরাশ হইয়া স্বর্ধ্যসেনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা কারামুক্ত বা রোগমুক্ত হইবার পরই স্বর্ধ্যসেন তাঁহাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন।

স্বর্ধ্যসেনের শাসনের ভূমিকাংশ বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন হইতে গৃহীত হইয়াছিল। তিনি কেবল উহাতে পিতার নামের স্থলে নিজ নাম এবং পিতামহীর নামের স্থলে মাতার নাম সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের শাসনে লক্ষণসেনের বর্ণনায় তাঁহার নিজের নামোল্লেখ থাকিতে স্বর্ধ্যসেনের পক্ষে এই পরিবর্তনসাধন কিছুই কঠিন হয় নাই। তবে ইহার ফলে বিশ্বরূপসেনের শাসনে উদ্ধৃত তৎপিতা লক্ষণসেনের বর্ণনামূলক কয়েকটি শ্লোক স্বর্ধ্যসেন নিজ পিতার বর্ণনায় ব্যবহার করিয়াছিলেন দেখা যায়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ইদিলপুর তাম্রশাসনও মূলতঃ স্বর্ধ্যসেন কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল; পরে বিশ্বরূপসেনের রাজত্বের দ্বিতীয় ভাগে ইহা সংশোধিত হয়। মূল শাসন এবং উহার অবিকল প্রতিলিপির অভাবে এই সংশোধন ও পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন। তবে প্রিন্সিপ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিলিপি হইতে মনে হয়, মূলে শাসনখানি মদনপাড়া তাম্রশাসনের গ্রন্থীতা বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে দান করা হইয়াছিল; পরে তাঁহার নাম কাটিয়া তৎস্থলে তদীয় ভ্রাতা দ্বন্দ্বর দেবশর্ম্মার নাম বসানো হয়।



# পরিবারের গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুর একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে বা উঠিয়া যাইতেছে। এককালে—শত বৎসর পূর্বে, প্রত্যেক হিন্দুই যৌধ পরিবারভুক্ত ছিলেন ও থাকিতে ভালবাসিতেন। এখন নানা কারণে—কতকটা আর্থিক অনটনের জন্ত, কতকটা আমি রোজগার করি, ভাল খাইব, ভাল পরিব, অপরকে তা সে আমার ভাই-ই হউক বা কাকা জেঠাই হউন, কেন আমার সমান ভাল খাইতে বা ভাল পরিবে দিব—এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের জন্ত। আবার কতকটা ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে। কতকটা আমি কলিকাতায় চাকুরী করি, আমার কাকা বিদেশে জব্বলপুরে চাকুরি করেন, দেশে অস্ত্রান্ত আত্মীয়-স্বজনেরা থাকেন এই মনোভাব বশতঃ—ঘটনার চাপে পড়িয়া যৌধ পরিবারপ্রথা লোপ পাইয়াছে বা পাইতে বসিয়াছে। মাতামহের মুখে প্রায়ই শুনিতাম, দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ীতে সকালে ৭২ খানি পাতা ও সন্ধ্যায় ৭২ খানি পাতা নিত্য পড়িত, ইহার উপর ‘এসো’ জন, ‘বসো’ জন থাকিত। ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছি যে, যখন কলিকাতায় প্রথম লোকগণনা হয় (অর্থাৎ ১৮৭২ সনে) তখন হাটখোলার দত্ত বাড়ীতে ৩৫০ জন লোক ছিল। দশ সের সন্দেশ জলখাবার খাইতে লাগিত। এখন এ সব কথা গল্পের সামিল।

এখন দেখা যাউক, বর্তমানে অবস্থা কিরূপ। গত আদমশুমারির সময়ে (ইং ১৯৫১ সনে) এ বিষয়ে কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সেন্সাসে বাড়ী আর “হাঁড়ি” সমার্থ-বোধক। একটি বাড়ীর যদি দুইটি পরিবার আলাদা আলাদা রান্না করেন, অর্থাৎ “তাঁহাদের হাঁড়ি যদি আলাদা হয়” তাহা হইলে তাঁহাদের দুইটি বাড়ী ধরা হয়। এক জন লোক যদি একলা বাঁধিয়া খান তাহা হইলে তাহাকেও একটি “বাড়ী” ধরা হয়। এইরূপে গড়ে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র লোকসংখ্যাকে সমগ্র বাড়ীর সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে

গড়ে বাড়ীপ্রতি কতজন লোক হইবে তাহার হিসাব পাওয়া যায়। ইং ১৯৫১ সনে এইরূপ বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যা হইতেছে ৪.৬০। পল্লী অঞ্চলে বাড়ী বা হাঁড়িপ্রতি জনসংখ্যা হইতেছে ৪.৭০ ; আর শহর অঞ্চলে হইতেছে ৪.৪০ জন। কলিকাতায় এইরূপ সংখ্যা হইতেছে ৪.২১ জন। কিন্তু এই সংখ্যা হইতে বুঝা যায় না যে, একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা কতটা কমিয়াছে বা লোপ পাইয়াছে। পূর্বতন সেন্সাসের গড়ের সহিত তুলনা করিলে দুইটি ভ্রম হইবে। এক—পূর্বতন সেন্সাসের বাড়ী বর্তমান সেন্সাসের বাড়ীর সহিত পুরাপুরি সমার্থবোধক নহে। দুই—কখনও লোকসংখ্যা কমিয়াছে আবার কখনও লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে এমতাবস্থায় বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যার সামান্ত তারতম্য হইতে কোনও সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। যেমন, বর্তমান জেলায় ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১, ও ১৯৪১-সনে বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪.৩ ; ৪.০ ; ৪.১ ও ৪.২ জন। ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ফলে ১৯২১ সনে বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যা কমিয়াছে। আবার জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির জন্ত ১৯৪১ সনে গড় বাড়িয়াছে।

একান্নবর্তী পরিবার ভাঙিবার প্রধান কারণ পরিবারস্থ জীলোকদের মধ্যে ঝগড়া বা মনোমালিন্য। পূর্বে শ্বশুর-শাশুড়ী, দাদাশ্বশুর-দাদিশাশুড়ী লইয়া একত্রে থাকা মেয়েদের পোরবের বিষয় ছিল। এখন কিন্তু মেয়েরা ননদ-জা লইয়া থাকিতে তাদৃশ ইচ্ছুক নহেন। সূতরাং এক বাড়ীতে বা এক হাঁড়িতে কয়জন বিবাহিত জীলোক আছেন তাহার সংখ্যা জানিতে পারিলে বুঝা যায় যে, একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা কতদূর টিকিয়া আছে।

এ বিষয়ে গত আদমশুমারির সময় পশ্চিমবঙ্গে একটি নমুনা-স্বরূপ Sample survey তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ছয়টি জেলার প্রত্যেক থানা হইতে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তথ্যগুলি জেলাওয়ারি সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়। যথা :

পরিবারের সংখ্যা—যেখানে বিবাহিত জীলোক আছেন

জেলা	বাড়ীর সংখ্যা	১ জন	২ জন	৩ জন	৪ জন	৫ জন	৫-এর অধিক
বীরভূম	২,৭৩৫	১৯১৫	৫৫০	১৮৫	৫৬	২১	৫
বাকুড়া	৪,৬৭২	৩,২৮০	৯৩২	৩৩৩	৯৭	২৭	১০
হাবড়া	৪,২০৭	৩,০৫৬	৭৩৯	২৮০	১০৫	২০	৭
চব্বিশ পরগণা	২,৭৪৫	৭,০৩১	১,৮৬১	৫২৯	২৪১	৬৭	১৬
মালদহ	৩,০২৫	২,১১৪	৫৯৪	২০৭	৭১	২২	১০
পঃ দিনাজপুর	২,৭১৪	১,৯৯৫	৫২০	১৪৯	৩৫	১০	৫
	২৭,১০৫	১৯,৩৯১	৫,১৯৯	১,৬৮৩	৬০৫	১৭৪	৫৩

এই তথ্যগুলিকে যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের একাদশবর্তী প্রথার ব্যাপকতার বা ইহার বিলুপ্তির পরিচায়ক বলিয়া ধাক্সা লই তাহা হইলে অশ্রয় হইবে না। তথ্যটিকে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা হাজারকরা ( ১০০০ ) হিসাবে সাজাইয়া দিলাম।

প্রতি ১,০০০ হাজার বাড়ীর মধ্যে যেখানে

বিবাহিত জীলোকের সংখ্যা

১ জন	২ জন	৩ জন	৪ জন	৫ জন	৫-এর অধিক
৭১৪	১৯২	৬২	২২	৬৪	২

এক পরিবারে ২ জন বিবাহিত জীলোক থাকে একাদশবর্তী পরিবারপ্রথা থাকার দরুনও হইতে পারে ( যেমন শান্তদী বো একত্রে আছেন বা বিবাহিতা নন্দ এখনও শুরুরবাড়ী বান নাই) কিম্বা একাদশবর্তী পরিবার ভাঙিয়া যাওয়া সত্ত্বেও আকস্মিক হইতে পারে ( যেমন চিকিৎসার জন্য দূর হইতে আগত আত্মীয় ইত্যাদি )। যেখানে ৩ বা ততোধিক বিবাহিত জীলোক একত্রে আছেন সেগুলিকে আমরা একাদশবর্তী পরিবার-প্রথার পরিচায়ক বলিয়া সহজেই ধরিয়া লইতে পারি। এমতে শতকরা ৯২টি পরিবার একাদশবর্তী পরিবার একথা কতকটা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আর যদি ২টি বিবাহিতা জীলোক যেখানে আছেন এইরূপ পরিবারের অর্ধেক একাদশবর্তী পরিবার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে একাদশবর্তী পরিবারের সংখ্যা শতকরা ১৮-৮-এ দাঁড়ায়।

এইবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের ( অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি বাদ দিয়া ) পরিবারের গঠন সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করিব। নমুনাস্বরূপ কিছু বিশেষ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। যথা :

	বাড়ীর সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	প্রতি ১,০০০ পুরুষ জীলোকের সংখ্যা	বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যা
পল্লী অঞ্চলে	৩,৬৫৮	২,৪৫২	২,০১৪	২৫৩	৫০৫
শহর ..	১,১৫৩	৩,৫২৭	৩,১৬৪	৮৭২	৫৮৬
মোট	৪,৮১১	১৩,০৫৬	১২,১৭৮	২৩৭	৫২৪

দেখা যায়, ষাঁহার মেনে বা অত্র প্রথাকেন না, পরিবারবর্গ লইয়া বাস করেন শহর অঞ্চলে এইরূপ পরিবারস্থ ব্যক্তির সংখ্যা পল্লী অঞ্চলের অপেক্ষা কিছু বেশী। কিন্তু গড় ধরিলে সবটা বুঝা যায় না—একত্র এইরূপ পরিবারের লোকসংখ্যার তারতম্য নিম্নে দেওয়া গেল। যথা :

শতকরা হিসাবে উপরোক্ত তথ্যগুলিকে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়। যথা :

মোট পরিবারের সংখ্যা ১০০ ( গড় জনসংখ্যা ব্রাকেটে দেওয়া হইল )

	ছোট	মাঝারি	বড়	খুব বড়
পল্লী অঞ্চলে	৩০.০ (২.৪)	৪৬.৯ (৪.৯)	১৭.৬ (১.৭)	৫.৫ (১২.১)
শহর	১২.১ (২.৭)	৫১.০ (৪.৯)	২০.০ (১.৮)	১০.০ (১২.৮)

শহর অঞ্চলে পরিবারস্থ ব্যক্তির সংখ্যা পল্লী-অঞ্চলের অপেক্ষা কিছু বেশী। কিন্তু এত সামান্য বেশী যে ইহা হইতে কোনওরূপ মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নহে। শহর অঞ্চলে বহু ধনীর বাস হেতু বড় বড় পরিবারের সংখ্যার অনুপাত বেশী। তেমনি ছোট পরিবারের অনুপাতও কম। বড়লোক চাকর-বাকর লইয়া বাস করেন, গরীব জী-পুত্র লইয়া কোনওরূপে দিন কাটায়।

বাড়ীর “কর্তা” পুরুষ কি জী সে সম্বন্ধেও তথ্যগুলি চিন্তার খোরাক জোগাইয়া দেয়। যথা :

	বাড়ীর কর্তা		প্রতি ১,০০০ বাড়ীতে	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ কর্তা	স্ত্রী কর্তা
পল্লী অঞ্চলে	৩,৪০৩	২৩৩	৯৩৬	৬৪
শহর ,,	১,১১৫	৪৮	৯৫৯	৪১

পল্লী অঞ্চলে জী-কর্তার সংখ্যাধিক্য হইতে বুঝা যায় যে, সেখানে যৌথ পরিবার-প্রথা শহর অপেক্ষা প্রবল। এক কথায় দেড়গুণ প্রবল বলিলে খুব অশ্রয় হইবে না।

এখন কাহাদের লইয়া পরিবার গঠিত? সাধারণতঃ আমি, আমার জী, ছেলেমেয়ে ও ভাইবোন লইয়া পরিবার গঠিত হয়। এইবার সংগৃহীত তথ্যগুলি নিম্নে

	কর্তার—	পুত্র	কন্যা	অত্র	অত্র
	জী	পুত্র	কন্যা	পুরুষ আত্মীয় জীলোক	আত্মীয়
পল্লী অঞ্চলে	২,২২২	৪,১০০	২,৮২৪	১,৮৪৪	৩,০০২
শহর ..	২৮৫	১,৪৩২	১,১৪৭	২৩১	২৩৭

পরিবারস্থ ব্যক্তির সংখ্যা

	ছোট		মাঝারি		বড়		খুব বড় পরিবার	
	৩ জন বা তার কম		৪ থেকে ৬ জন		৭ থেকে ৯ জন		১০ বা ততোধিক	
	পরিবারের সংখ্যা	লোক-সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লোক-সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লোক-সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লোক-সংখ্যা
পল্লী অঞ্চলে	১,০৯৯	২,৫২২	১,৭১৫	৮,৪৫৭	৬৪৩	৪,২৭৬	২০১	২,৪৪১
শহর ..	২২০	৫৮৭	৫৮৭	২,৮২৬	২৩২	১,৮২৩	১১৪	১,৪৫৫
মোট	১৩১৯	৩,১০৯	২,৩০২	১১,২৮৩	৮৭৫	৬,১০৯	৩১৫	৩,৮৯৬

উপরিউক্ত তথ্যগুলি তুলনামূলকভাবে বুবিবার স্তুবিধার  
জন্ত নিয়ে আমরা প্রতি ১০০ “কর্তার স্ত্রী” হিসাবে সাজাইয়া  
দিলাম। যথা :

কর্তা—

স্ত্রী	পুত্র	কন্যা	পুরুষ আত্মীয়	স্ত্রীলোক আত্মীয়
পল্লী অঞ্চলে	১০০	১৪০'৩	১৬'৬	৬৩'১
শহর	১০০	১৪৪'১	১১৬'৪	২৪'৫

পুত্র-কন্যার সংখ্যা সমান, তথাপি একই পরিবারভুক্ত  
একই ব্যক্তির পুত্র-কন্যার সংখ্যার তারতম্য কেন ? কন্যাদের  
বিবাহ হইয়া যায়, তাঁহারা নিজ নিজ স্বপুত্রবাড়ীতে চলিয়া  
যান ; এজন্য কন্যার সংখ্যা পুত্রদের অপেক্ষা ঢের কম।  
পল্লী-অঞ্চলে কন্যার বিবাহ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে হয়, লেখা-  
পড়ার সুযোগ কম। এজন্য পল্লী-অঞ্চলে কন্যার সংখ্যা শহর  
অঞ্চল অপেক্ষা কম। মেয়ে বিবাহের পর স্বামীগৃহে যায় বা  
লেখাপড়া শিখিবার জন্ত শহর অঞ্চলে যায়। পল্লী-অঞ্চলে  
পুরুষ আত্মীয়ের সংখ্যামত হেতু তাঁহাদের নিজ নিজ  
জীবিকার চেষ্টায় শহর বা অন্তরে গমন। শহর অঞ্চলে  
পুরুষ আত্মীয় ও স্ত্রীলোক আত্মীয়র বৈকল্য নিকট সংখ্যা-  
সাম্য দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় যে, উভয় পক্ষই বিবাহিত।  
এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করিবার পূর্বে পরিবারস্থ ব্যক্তি-  
বর্গের বিবাহিত অবিবাহিত প্রভৃতি সামাজিক অবস্থা কিরূপ  
তাহা বিচার করা আবশ্যিক। এ সম্বন্ধে পরিসংখ্যান নিয়ে  
দেওয়া হইল। যথা :

	অবিবাহিত		বিবাহিত	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
পল্লী অঞ্চলে	৪,৮৭৩	৩,৩০৮	৪,৩০১	৪,৪৫৮
শহর	১,২৮০	১,৩৭২	১,৫৪৭	১,৪২৮

হিন্দুদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা নাই। সুতরাং এই  
তাল্লাকীরা হিন্দু নহেন ধরিয়া লইতে পারি। যদি কেহ কেহ  
কোন হিন্দু আইনের ফাঁকে তাল্লাকের সুযোগ গ্রহণ করিয়া  
থাকেন তবে তাঁহারা এত “প্রগতিশীল” যে তাঁহাদের নামে  
মাত্র হিন্দু বলিয়া ধরিলে অস্তায় হইবে না। আর তাঁহারা  
সংখ্যায় খুব অল্প। এজন্য তাল্লাকীদের বাদ দিয়া আলোচনা  
করিলে আমাদের সিদ্ধান্তের কোনও গুরুতর পরিবর্তন  
আবশ্যক হইবে না। কিন্তু পরিসংখ্যানে তাল্লাকীদের  
বিদ্যমানতায় মনে হয় যে অনেকগুলি মুসলমান-পরিবারের  
তথ্য এই নমুনা বা sample-এর মধ্যে আছে। পশ্চিমবঙ্গে  
মুসলমানের অনুপাত শতকরা ১৯.৮ জন। বীরভূম, বাঁকুড়া,  
হাওড়া, ২৪ পরগণা, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে  
যথাক্রমে শতকরা ২৬.২ ; ৪.৪ ; ১৬.২ ; ২৫.৩ ; ৩৭.০ ও

৩০। সুতরাং এই নমুনার মধ্যে অনেকগুলি মুসলমান  
পরিবার আছে বলিয়া সম্ভব হয় বা হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

পক্ষান্তরে বিবাহের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মনে হয় ইলারা  
সকলেই বা অধিকাংশ হিন্দু। মুসলমানদের মধ্যে কেহ  
বড় একটা বিশেষ করিয়া বিবাহের বয়স থাকিলে বিবাহ  
থাকিতে চাহে না। এ বিষয়ে ঠাহারা বিশদ ভাবে জানিতে  
চাহেন তাঁহাদের টমসন সাহেব কৃত ১৯২১ সালের  
অঞ্চল বন্ডের সেক্সাস রিপোর্ট পাঠ করিতে অনুরোধ করি।  
মোট বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৫,৮৪৮ জন ; আর মোট  
বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫,৮৮৬ জন। বিবাহিত পুরুষ  
অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৫৮৮৬—৫৮৪৮=৩৮ জন  
বেশী। এই বেশী ৩৮ জন আকস্মিকও হইতে পারে।

বহু-বিবাহ প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলা যাইতে  
পারে। পল্লী-অঞ্চলে বিবাহিতা নারীর যে সংখ্যাধিক্য  
দৃষ্ট হয় তাহার কারণ অনেকের স্বামী অর্থোপার্জনের  
চেষ্টায় শহর অঞ্চলে থাকেন। শহর অঞ্চলে তদ্রূপ বিবাহিত  
পুরুষের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয় ; ইহার অর্থ অনেকে নানা  
কারণে স্ত্রী লইয়া সংসার করেন না বা অর্থাভাবে দেশ  
হইতে স্ত্রীকে আনিতে পারেন না।

অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীদের মোট সংখ্যার শতকরা  
হিসাব সাজাইলে দেখা যায় যে :

	পুরুষ	স্ত্রী
পল্লী অঞ্চলে	৫১.৫	৩৬.৭
শহর	৫৫.০	৪৩.৬

বিবাহ		তাল্লাকী ( Divorced )	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২৭৪	১,২২৭	১১	২১
৬২	৩৫৪	১	৩

ইহা হইতে মনে হয় যে শহর অঞ্চলে পল্লী-অঞ্চল অপেক্ষা  
স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই অধিকতর বয়সে বিবাহ করেন।  
পুরুষদের বেলায় পার্থক্য ৫৫.০-৫১.৫=৪.৫ জন ; স্ত্রী-  
লোকের বেলায় পার্থক্য ৪৩.৬-৩৬.৭=৬.৯ জন। ইহাতে  
মনে হয় শহর অঞ্চলে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স পুরুষদের  
তুলনায় বেশী বাড়িয়াছে। আমরা একথা বলিতেছি না যে,  
পুরুষ যদি গড়ে ৩০ বৎসরে বিবাহ করে তো স্ত্রীলোকেরা  
৩৫ বৎসরে বিবাহ করে। পুরুষদের বিবাহের বয়স যদি ২৪  
থেকে ৩০এ দাঁড়ায় অর্থাৎ ৬ বৎসর বাড়িয়া থাকে ;  
স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স ১৪ হইতে ২৪এ দাঁড়াইয়াছে  
অর্থাৎ ১০ বৎসর বাড়িয়াছে। উপরি-উক্ত তথ্য হইতে আমরা  
এই কথা বলিতেছি না। অল্প হিসাব হইতে এইরূপ আশঙ্ক  
করিতেছি।

এইবার আমরা বাড়ীর পরিবারবর্গের বয়সের হিসাব নিয়ে দিলাম। যথা :

	বাড়ির সংখ্যা	শিশু ১ বৎসরের কম	
		পুরুষ	স্ত্রী
পল্লী অঞ্চলে	৩,৬৫৮	১৮৮	১৭৭
শহর ,,	১১৫৩	৬২	৭৩

তুলনার সুবিধার জন্য উপরি-উক্ত তথ্যগুলি প্রতি ১০০০ বাড়ী হিসাবে নিয়ে দেওয়া গেল। যথা :

	শিশু	নাবালক	সাবালক	
	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
পল্লী অঞ্চলে	৫১°৪৮'৪	১২৬০'৮	১২২৮'৮	১২৭৩'২ ১১৮৬'২
শহর ,,	৫৪°৬'৬৩'৩	১৪৮০'৫	১৪০৪'১	১৫৮১'১ ১২৭২'৩

শহরে সাবালকের সংখ্যাধিক্যের কারণ শহরে রোজগারের

জন্ম অনেক আসেন। ১-২০ বৎসরের নাবালকদের মধ্যেও সংখ্যাধিক্যের কতকটা কারণ লেখাপড়ার সুবিধাও মেয়েদের

বিবাহের সুবিধা। পক্ষান্তরে সাবালিকা স্ত্রীলোকের অনুপাত সাবালক পুরুষদের তুলনায় কম। ইহার কতকটা কারণ স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স কম ; আর কতকটা পল্লী-অঞ্চলে বিধবাদের সংখ্যাধিক্য।

আমাদের সমাজ এখন দ্রুত পরিবর্তনের মুখে। পরিবারের সামাজিক গঠন, অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য সম্বলিত হওয়া প্রয়োজন।

## প্রবাহ

### শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল

এ প্রবাহ শাস্ত চকল  
অবিহল  
বয়ে চলে লহরে লহরে  
সুদূর সে আদি হ'তে—সুগে, সুগান্তরে !  
সুদূরের অনাগত, সর্ববিস্তৃত প্রলয়ের কূলে  
বয়ে চলে, লাগে, হান্তে চলে হলে হলে !  
এ আনন্দ-মল্লিকিনী ধারা  
বয়ে চলে—বাধাবদ্ধতায়—  
আদি কবি বাস্তবিক করুণার উঃস্রুণ হ'তে  
নিত্য—নবশ্রোতে !  
সে শ্রোতে, যমুনা কত রঙ্গে ভঙ্গে বহে যে উজান,  
মিলনে, বিরহে কত মান, অভিমান  
ভেসে যায়, যায় ভেসে জাতি, মান, কুল !  
কত কুল—  
শ্রোতে শ্রোতে ভেসে ভেসে যায় কত দেশে  
শোভা করি কত কেশে, বেশে !  
বেজবস্ত্রী, শিখা, বেবা, নির্বিকার্য তীরে  
কল্লোল গান্ধার গান গায় কিরে কিরে !  
প্রবাহ বহিয়া যায়  
জীবন-ধারায়—  
লোক হ'তে লোকাভীত কালে !  
যোগসূত্র স্মৃতিবালে

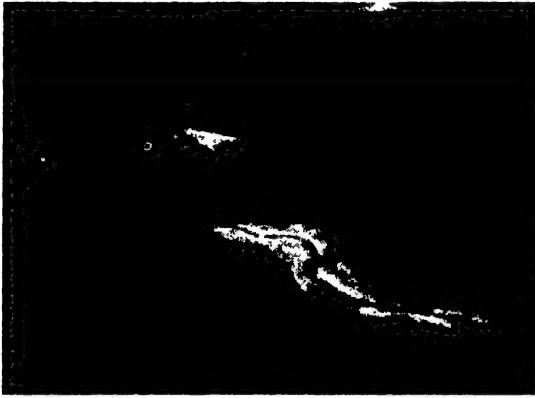
অভীত ও ভবিষ্যের চিন্তার ধারায়  
মিলনের স্বামী দিয়া যায় !  
বয়ে যায় সুরে সুরে বাঁশবীর সঙ্গীতের তানে  
প্রাণে প্রাণে  
জাপাইয়া আনন্দরাগিণী—  
প্রবাহ বহিয়া যায় দিবস-রাতিনী !  
পথ-রেখা হৃগ্ন বজ্র—  
চলে যায় দুটিপারে—দূর—কত দূর !  
কত কালবৈশাখীর ফড়ি—  
ঈশানের বজ্র কড় কড়  
চকিত চিহ্ন হানি  
পথে পথে দেয় চাতছানি !  
স্বাধনের কত কৃষ্ণ মেঘ—  
অবিশ্রান্ত ধারাতলে মত্ত করে তার গতিবেগ !  
রম্যের চেম জ্যোৎস্না, দীপ্ত ছায়াপথ  
অন্ধকারে আলো করে পথ !  
অগ্নিশিখা চাপি রাগি হিমালী সে হসন্তিকায়  
মজল-আরতি করে কুহেলি ধূপের ঘোঁড়ায় !  
বসন্ত, সাজায় তার হাট কুল নব পত্র, ফুলে—  
প্রবাহ বহিয়া যায়, মুক্তশ্রোতে যায় হলে হলে !  
জানি না এ প্রবাহের কোথা শেষ—কোথা কতদূর  
যোরা শুধু তীরে বসে তনি তার কল্লোল মধুর !



## মংপুতে

### ডক্টর শ্রীশ্রীর নন্দী

সেদিন ২৯শে আগষ্ট—সাত্কা মহলিস বসেছে দার্জিলিং শৈলের হাভলক-ভিলার। এই ছোট্ট পার্বত্য শহরের পণ্যমাণ্ড অনেকেই এসেছেন। এখানকার এজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমদিকান্ত গুপ্ত ঠিক আমার পাশেই সমাসীন। আগামী কাল মংপু বাবার জন্ত যে অভিযাত্রীদল তৈরি হচ্ছেন মনে মনে আজ ক’দিন থেকে, ইনি হলেন তার অধিনায়ক। সঙ্গে যাবেন আরও কয়েক জন।



পাহাড়ের উপর হুইতে বহু নিম্নস্ত শ্রেণীতিনীর দৃশ্য

সে সাতটা ভাল করে ঘুম হ’ল না। ভোর পাঁচটার সময় উঠে দার্জিলিঙের ঐ প্রচণ্ড শীতে হুগানাম ভপতে ভপতে স্নানটা ত কোন রকমে সেয়ে ফেললাম। তারপর চা-পান এবং দলের অজান্তেই আগমনের জন্ত প্রতীক্ষার পালা। আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা। বিহ্বাদামদীপ্ত আকাশ নয়—মন কালো করা গুমোট চাকা আকাশ। আব্রার জল নামল। দার্জিলিঙের বর্ষা—তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। সাবধানী মন বললে যে, এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে মংপুর বিপজ্জনক পথে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বসে বসে সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় দলের অজান্তে রথীরা এসে পড়লেন।

ঢা ঢা করে সাতটা বাজল। আমরা ছাতা ও বর্ষাতি আশ্রয় করে এসে ঘোটেই উঠলাম। গাড়ী ছাড়ল। আমাদের যাত্রা হ’ল সূর্য। মোটর ছুটল হু-হু শব্দে। ড্রাইভার নরবাগাহুরকে অনুময়ের সুরে বললাম, ‘দেখ বাবা, এই জল-বাদলের মধ্যে অত জোরে না-ই বা চালালে।’ নরবাগাহুর আমার অবস্থা দেখে নিরুত্তরে একটু হাসল। পিছন থেকে গর্জন উঠল, ‘ঠিক হ, ছিটো মামু পড়ছে।’ জনৈক সঙ্গী নেপালীতে হুকুম করেছেন, আর বন্ধে নেই। ঐ বাহাহুরপুত্র কি আর আমার কথা তনবে।

জলে ধোয়া চক্চকে পিচের রাস্তা। টায়ারগুলো গড়িয়ে চলেছে হু-হু শব্দে। নতুন গাড়ী—চলেছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। অদ্ভুত এই নেপালী ড্রাইভারগুলো। প্রায়ই এরা মদ পেয়ে গাড়ী চালায়। কিন্তু কৈ, তেমন দুর্ঘটনা ত ঘটে না। দার্জিলিং অঞ্চলের পার্বত্য পথে এদের মোটর চালনা-কৌশল বিশ্বরকর—বোধ হয় চোপ বেঁধে দিলেও এরা ঠিকমত গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।



হিত্তা নদী

এই বিশ্বাস আছে বলেই না এই বর্ষণমুগ্ন প্রভাবে নরবাগাহুরের চাতে প্রাণটিকে সপে দিতে পেরেছি। মনটিকে বিছিরে দিয়েছি অনন্তমুগ্নের ধরণীর অপূর্ণ রূপমাধুর্যের প্রতিটি কণার, তার অণুতে পরমাণুতে—নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছি সেই বসধারায়। রসো বৈ সঃ—সেই বসধরপেরই প্রকাশ বৃষ্টি ঘটেছে ব্যাপ্ত চরাচরে। সকালবেলার সূটি-ধোঁরা পাহাড়ী আলো মন্থরাবনের মাদকতা আনে। তন্ময় হয়ে দেখি। বৃক্ষময় প্রকৃতি ধারাবর্ষণকে প্রসঙ্গ মনে গ্রহণ করছে—সেখানে উৎসবের সমারোহ। সে শোভা স্বর্গীয়, সে নিসর্গ-সম্পদ অনির্কচনীয়। একে ব্যাখ্যা করা যায় না; এ হ’ল একান্ত ভাবে অহুভবের বস্তু।

আমরা শেষক রোডে এসে পড়েছি—এ পথটি একটু বিপজ্জনক। এখানেই কিছুদিন আগে রাজাপালের একান্ত-সচিবের গাড়ী নীচে নেমে গিয়েছিল—জখম হয়েছিলেন অনেকে। সে স্মৃতিটা তখনও তাজা আছে আমাদের মনে। গাড়ী চলেছে। কে একজন বললেন, ‘ও মশায়, চেয়ে দেখুন, এইখানেই রাজাপালের সেক্রেটারির গাড়ী নীচে নেমে গিয়েছিল।’ চকিত হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। পাহাড়ের গারে একটা মস্ত খাদ বিঘাট হা করে আছে—হাজার ফুটেরও বেশী গভীর। মাথাটা ঘুরে গেল, আমাদের ড্রাইভার

হুঁসিয়ার হয়ে চালাচ্ছে। পিছল পথ। রাস্তা এখানটার অত্যন্ত সরু। কোন বকমে একপাশা গাড়ী বেতে পারে। আমরা চলেছি অত্যন্ত-সম্পূর্ণে। সর্বনাশ। গাড়ীখানা ঢালু রাস্তা বেয়ে হু-হু করে নামছে—ত্রেক কবেছে ডাইভার। গাড়ী গড়িয়ে চলেছে—



তিস্তা ব্রিজ

ত্রেক কাজ করছে না। ডাইভারের হাত আর ঠীয়ারিং হুইল—এরাই এখন ভরসা। গাড়ী বিহ্বলগতিতে আরও খানিকটা নেমে গিয়ে থাকে পেল পাড়াই পাথরের দেয়ালে। ডাইভার অনন্তোপায় হয়ে ভইল ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছে পাগড়ের পায়ে। ভুল করে বাঁ দিকে হুইল ঘোরালেই এতগুলি প্রাণীর মোক্ষলাভ হয়ে যেত সে-দিন। একটা ঝাঁকানি—তারপর গাড়ী থামল। আমরা নেমে দেবি গাড়ীর মাডগার্ড, বনেট, এগুলো ছুবড়ে বিলী হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ার চুর্থটনার কারণ খুঁজতে গেলেন। আমি একটা পাথরের উপর বসে করুণ নেত্রে ভগবানের লীলাকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম তাঁর এই রক্ততাপবের মধ্যে। দর্শনশাস্ত্রের অগ্ররসে জারিত মন তখন গলতে শুরু করে দিচ্ছে—বাঁচবার ইচ্ছেটা হয়ে উঠছে প্রবল। সপ্ত স্বর্গের ওপার থেকে ব্রাউনিঙের কথাগুলো ভেসে এল যেন :

"Grow old along with me  
The best is yet to be"

মণিকান্ত বাবু ফিরে এলেন—চটকা ভেঙ্গে গেল। উঃস সন্ধান করে ফিরেছেন তিনি। অশিক্ষিত কুলির দল নাকি এঁটেল জাতীয় মাটি কেটে পিচের রাস্তার উপর বিছিয়ে দিয়েছিল। তার উপর বৃষ্টি পড়ার সেই মাটির আন্তর্য ভরাবহ ভাবে পিছল হয়ে উঠেছিল। তাই এই দুর্ঘটনা।

এখনও পরীক্ষার শেষ হয় নি। গাড়ী কাত হয়ে আছে। পাশের অঙ্গুরিসর নালা থেকে এখন তাকে ঠেলেঠেলে তুলতে হবে। আমার উপর হুকুম এল 'হাত লাগাও।' অগত্যা হাত লাগাতে হ'ল। তারপর আঁকর চলা। এ চলা পারে পারে এগিয়ে চলা নয়, বিহ্বলগতিতে গড়িয়ে চলা। এর একটা স্বাক্ষর আছে—

নেশা আছে। এগিয়ে চলায় নেশা লাগছে যেন, ঘোর লাগছে চোখে, তবু যেন নেশাটা জমছে না। কি জানি কিসের 'অভাব?' আমরা নামছি তিস্তা নদীর গর্ভে। তারপর আবার উঠতে হবে ৪৫০০ ফুট উচুতে। এবার ডাইভার হুঁসিয়ার। ঘণ্টায়কের

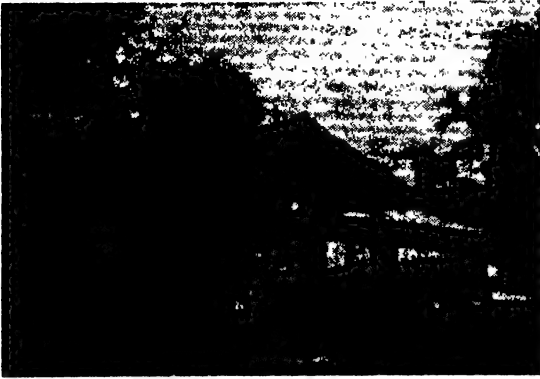


তিস্তা ব্রিজের উপর মণ্ডু অভিব্যক্তি দল

ভিতর তিস্তার ব্রিজের উপর এসে আমাদের গাড়ী থামল। কালিঙ্গ শহরের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার ব্রিগেব্রসাদ সেন এসেছেন মণিকান্ত-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। ওদিকের রাস্তা বৃষ্টি কতকগুলো ভেঙ্গে গেছে। আধ ঘণ্টা আগে দেখে গেছেন চকচকে রাস্তা, আধ-ঘণ্টা পরে এসে দেখলেন ধস নেমেছে। রাস্তা দুইভিত্তি হয়ে উঠেছে। তাই এই অঞ্চলের ইঞ্জিনীয়ার ভ্রমলোকদের অশেষ হুঁসি। গুনলাম সেন মহাশয় নাকি কোন একটা জরুরি ব্যাপার সম্বন্ধে পরামর্শ করায় জন্ম কালিঙ্গ থেকে নেমে এসেছেন ভোর পাঁচটার সময়। তারপর থেকে তার উৎকণ্ঠাব্যাকুল প্রতীক্ষা চলেছে। বাক, এতক্ষণে তার শেষ হ'ল। ওঁরা গাড়ীর আলোচনার মগ্ন হলেন আর আমরা তিস্তা ব্রিজের উপর গাড়ির নদীর শোভা দেখে নিলাম হুঁচোপ ভাবে। বিশিষ্ট তিস্তা আবার বোঁবন ফিরে পেয়েছে। নদীর মত নেচে চলেছে তার বিশিষ্ট জলের ধারা। পারে পারে এগিয়ে চলায় বাজছে কল কলধ্বনির নুপুর। ছবি তোলা হ'ল। নদীর ছবি, ব্রিজের ছবি, আর আমাদের কয়েকজনের ছবি। তার পর আবার বাজা। দাক্ষিণ্য থেকে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট নীচে নেমেছি, এবার আরোহণের পালা। ষ্টাটার গর্জনে উঠল আমরা তিস্তার পাশে পাশে চললাম জলের মধ্যে হুঁচোপ ঘুরিয়ে। পার্শ্বতা নদীর সে কি প্রাণময় উদ্গমন! সেদিকে তাকিয়ে মনপ্রাণ ভরে উঠল শক্তির ঐশ্বর্যে। শক্তিমত্ত প্রাণের সে কি হুঁকার গতি! কান পেতে গুনলাম তার সেই এগিয়ে চলার ছবস্ত রাগিনী :

আমি বাবো আমি বাবো কোথায় সে কোন দেশ,  
জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব করুণাগান,  
উষেণ অধীর হিরা সূর্য সন্মুখে গিয়া  
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান কবির শেষ।'

ভয় হরে আমি ঐ নদীর কলগান ওনেছি। বড় ভাল লেগেছে  
সেদিনের সেই পান শোনা। এমনটি আর তুনি নি।



রবীন্দ্র জনকলাপ কেন্দ্র, মংপু

গ্লুথ ঘুরে গেল। নদী তীরে গেল পাখরের আড়ালে।  
আমাদের বাস্পশকট উজ্জ্বল হয়ে ছুটে চলেছে। সবুজ পাখরে  
প্রাকৃতিক্যের রৌদ্রলাহ। তার একটা বিশেষ প্রাণমাতানো  
আকর্ষণ আছে। সেদিকে তাকিয়ে বসে আছি। গাছে গাছে  
ধূসর পাখর রসমর হয়েছে, প্রাণমর হয়েছে। সেখানে আলোছায়ায়  
ঝিকঝিক খেলা। ধূবি গাছের জল—নীচে কালো ছায়া, উপরে  
আলোর মাতামাতি। 'প্রায় মংপুর কুইনিং এলাকার এসে  
পড়েছি। 'হাওয়াটা একটু ঠেঁতো ঠেঁতো লাগছে যে তে।'—মস্তব্য  
করলেন এক জন। আর এক জন বললেন, 'তা লাগুক, গাঁয়ের  
ছেলে তুমি, ম্যালেরিয়ার ভিণ্ডো। এবার তোমার ম্যালেরিয়ার  
প্রাচু পালাবেন—মা তৈরী।' এই অভয় বাবী বিশেষ কলপ্রস্থ হ'ল  
না। বিপদ এল আর এক দিক থেকে। পথের বাঁক ঘুরে আমরা  
দেখি যে পথ জুড়ে একটা গাছ পড়ে আছে, আর একটা পাহাড়ী  
ঘেরে কুড়ল দিয়ে সেই গাছটাকে কাটছে। কি কাণ্ড! এখন  
মোটর বার কোন্ পথে? ভীয়ে এসে বৃষ্টি-বা তরী ভোবে। কিন্তু  
শেষ পর্যন্ত মুশকিল আসান হ'ল। ডাইভার নরবাহাদুরের আদেশে  
মেরেটি অবলীলাক্রমে গাছটি সরিয়ে ফেলল বাস্তার এক পাশে।  
ওটা মহীকচ না? চলেও নিতান্ত ছোট গাছ নয়। সমস্তলের চার-  
পাচ জন মরদের মেহনত লাগত ওটিকে সরাতে।

গাড়ী চলেছে পাহাড়ী পথ ধরে। নানান ধরণের গাছ—কুল  
কোটােনোরও বিরাট নেই। সে শোভা দেখার জন্ত কোন মানুষের  
চোখ সেখানে নেই—কোন মানুষের মনও সেখানে নেই তাদের  
'সুন্দর' বলতে। সঙ্গে বোটানির ছাত্র ছিল। তার কাছে নাম-  
গুলো শিখে নিলাম—অরোকেরিয়া, জ্যাবরোজী, ইপিকাক, চেবী,  
এজেলিয়া এবং আরও কত নাম এসেই পৌঁছোয়।

ঐশ্বর্যময় সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলাতে গিয়ে আমরা  
আতিথ্য গ্রহণ করলাম। ইনি পশ্চিমবঙ্গের ম্যালেরিয়ারতর

কুইনিং বিভাগের সর্কমর কর্তা। বড় বড় করেছিলেন উদ্ভিদলোক,  
ওর আতিথ্য ভোলবার নয়। গিয়ে ওনলাম ওর ছোট মেয়ে মীরা



মংপুর আমরা

জন্মদিন। - দলে আমাদের কবি ছিলেন। তাঁর নিকট গুরুকর্তার  
অমুরোধ আনালেন এসে—কবিতা রচনা করতে হবে। অমনি কবি  
মুখে মুখে কবিতা বানালেন। তার আরম্ভটা এইরূপ :

"মীরা,

ছন্দোমরী ছোট্ট মেয়ে তুমি,

নদীর জলে হারিয়ে যাওয়া শ্রামল তটভূমি।

তুবন ভরা ভালোবাসার মোহ

হুটি চোখে কাকল এক একে এলে।..." ইত্যাদি

কবি কবিতা রচনা করলেন, পুরস্কার মিলল ইত্যর জনের ভূমি-  
ভোজনে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখা। কবিগুরু সম্প্রপ্ত পাহাড়ী প্রায়  
মংপুর সেন-দম্পতির কল্যাণে সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে বইল।  
মংপুর সিকোনা-চাষের পরিচরটা ঢেকে গেছে এই মচন্তর পরিচরে।  
এখানে ওখানে সিকোনা গাছের ছাড়িয়ে নেওয়া ছাল শুকোচ্ছে।  
সেগুলো থেকে কুইনিং প্রস্তুত হয়। বস্ত্রপাতি সবই আছে সেখানে।  
কারখানা চলছে—দেশ থেকে ম্যালেরিয়ার দূর করার জন্ত তার  
অজীকার নিবন্ধন ধনিত হচ্ছে। ভাল লাগল মানুষের এই অক্লান্ত  
প্রয়াস—যোগকে জয় করবার এই দুর্লভ সাধনা। ওখান থেকে  
চললাম মংপুর জলসরবরাহের বন্দোবস্ত দেখতে। হুটি বড় বড়  
চৌবাচ্চাতে জল সংগৃহীত হচ্ছে পাহাড়ী বরণ থেকে। তাকে পবি-  
ক্ষত করা হয় নামমাত্র—তার পর সেই জল ব্যবহার করা হয়।  
আমায় দেখি পানীর জলের সেই চৌবাচ্চায় নেপালী ছেলেদের  
বথোজ সন্ধ্যাক্রীড়া। ওরা নাকি স্বাস্থ্যরক্ষার এ সব আইন-কাহন  
মানে না। ভগবানের দেওয়া স্বাস্থ্যসম্পদ ওদের এত বেশী যে  
আইনের বেড়া দিয়ে তাকে কুপণের ধনের মত সঞ্চয় করা ওদের  
ধাতে নেই।

সারা দিন দুপুর মংপুর পথে পথে। রবীন্দ্রনাথের পাদস্পর্শক  
মংপুর—সেই তীর্থে আমাদের পরিক্রমা চলল। ঘুরতে ঘুরতে এলাম

রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জনকল্যাণকল্পে—  
‘রবীন্দ্রজ্যোত্সবের সেতাবে’। কবির নানান টুকরো স্মৃতিতে  
সমুজ্জল এই ছোট আবাসগৃহে এসে থক হ’ল। কবির ব্যবহৃত  
শূন্য চৌকিখানি দেখে মনে পড়ে গেল ঠর শূন্য চৌকি কবিতাটির  
কথা। কর্তাদের বললাম ঐ কবিতাটি একটি বড় কাগজে স্তম্ভ  
করে লিখে কবির ব্যবহৃত ঐ চৌকিটির ওপর স্থাপনা করতে। ছোট  
ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করছে—নানা ধরণের খেলা। ‘শিশু  
তোলানাথের’ কবির স্পর্শপূত পুণ্যতীর্থে ছেলেরা খেলা করছে—বড়  
ভাল লাগল। বাইরে কবির আমলের বৃক্ষবহুরা আনমনে দাঁড়িয়ে  
দাঁড়িয়ে যেন বাড়ির একতারা বাজছে। মন উলস হরে বার।  
সবচেয়ে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বৃত্তকরে নিবেদন  
করি :

‘ত্রে মানব তোমার মন্দিরে  
দিনান্তে এসেছি আমি—’

তখন সান্ধ্য-গগনের প্রত্যন্তসীমায় হরত নিশীথের অভিলার স্তব্ধ  
হয়েছে। ধ্যানাশ্রিত আমি, মহাকবির বিরাট ব্যক্তিত্বের অশরীরী  
ছায়ার প্রচ্ছন্ন। বহুদের কোলাহলে ধ্যান ভাঙল। এখুনি নাকি  
বাত্মা করতে হবে—তারই ঘোষণা। এসে মোটরে উঠলাম। গাড়ী  
ছাড়ল। এবার ফেরার পালা।

গাড়ী নামছে। চোপখাধানো আলো পড়ছে পাহাড়ী পথ  
আর বনজঙ্গলকে আলোকিত করে। উল্গাতকণ্ঠে আবৃত্তি শুরু  
করলাম। বাধা পড়ল—আবৃত্তি খামাবার জন্ত নির্দেশ এল।  
তুনলাম যে মস্তব্যাকঠের কোলাহল তুনলে বস্ত্র জন্তদের আবির্ভাব  
হবে না। আমরা কথা না বললে ওরা দর্শন দিলেও দিতে পারে।  
অগত্যা চুপ করলাম। গাড়ী চলছে—বস্ত্রের সঙ্গীত-মুগ্ধরিত বনপথ  
আলোর বস্ত্রায় প্রাবিত। হঠাৎ দেখি একটা সাদা গরগোশ চলছে  
পাড়ীর সামনে সামনে। মোটরের হেডলাইটের আলো তার গায়ে  
পড়েছে। ওরা নাকি এইভাবে আলোর পথ ধরে চল। কি ভাগ্য!  
আমার শিকারী বহুরা সঙ্গে করে দু’একটি মারগাজ্ঞ আনেন নি  
—তাই সেদিন মাঝবের কুৎসিত লোভ আর আত্মপ্রকাশ

করতে পারল না। মিনিটকয়েক পরগোশটা চলল আমাদের আগে  
আগে, তারপরে পাখের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। আমরা ‘নিশেবে’  
একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম। আমাদের বস্ত্রা  
—যেন এমনটি ত আর দেখি নি। গাড়ী তখন নামছে তিস্তা নদীর  
গর্ভের দিকে। পথের দুধার বনজঙ্গলে সমাকীর্ণ। একটু পরেই  
এল একটা ছোট হরিণ—অভাবনীরের ‘কচিং কিরণে দীপ্ত।’  
আলোর পথ ধরে কিছুক্ষণ চলল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল মোটরের  
দিকে। বড় বড় চোখে আলো পড়ল—সবল বিশ্বাস জলে উঠল  
মোটরের ঝাঁকালো আলোয়। রণে ভঙ্গ দিল হরিণশিশু, পালিয়ে  
গেল জঙ্গলে। \*আবার দুর্গম পথে আমাদের নিঃশব্দ অভিযান।  
তখন তারায় তারায় নিদ্রাবিহীন গগনতলে আলোর মাতামাতি  
চলেছে। কয়েকজন আমরা শুধু অতস্ত্র সাক্ষী সেদিনের বহুৎসবের,  
প্রকৃতি ঘূমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ছবির বনভূমির চেতনা  
তজ্জ্বল। আমরা নিঃশব্দে চলছি, কারও মুখে কথা নেই।  
বাইরে বনবাণী নিকর; কার যেন আগমনের জন্ত প্রতীক্ষা করছে  
বনভূমি। একটা অশরীরী সত্য উপস্থিতি যেন অমুদ্রিত মূর্তি  
পাচ্ছি। নিস্তব্ধ গাছগুলো শির আন্দোলিত করছে, নিশির ডাক  
ইসারায় এসে পৌঁছেছে হিম হয়ে বাওয়া মনের মধ্যস্থলে। চেতনা  
ক্রমেই নিঃসাড় হয়ে পড়ছে। অসাড় হয়ে আসছে অমুদ্রিত-  
কেন্দ্রগুলো একটা অতীন্দ্রিয় সচেতনতার প্রভাবে। আর পাহলার  
মা—মুখ খুললাম। সবাই নড়ে চড়ে বসল। সকলেই যেন এটা  
চাচ্ছিল। সবাই কথা বলতে উৎসুক। কলরব উঠল। কোলাহল-  
চকিত করে তুলল স্বপ্নময় বনপথ। কিছুক্ষণ অকারণ পুলকে সবাই  
মুগ্ধ হয়ে উঠল। তারপর এল পানের পালা। ঈধারতরঙ্গে স্বয়-  
তরঙ্গ উচ্ছল হয়ে উঠল :

“হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে

হেমজিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।”

একটার পর একটা পান। স্বরের বজা বয়ে চলেছে। গাড়ীটাও  
হ হ করে ছুটে চলেছে। দার্জিলিং আর বেট্টী হয়ে নেই। মংপু  
ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ।\*

\* এই প্রবন্ধের ছবিগুলি শ্রীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রস্তুত

## বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আজি এলো মধুমাস। পলাশে, শিমূলে,  
পুষ্পিত কাকদনে আর সজিনার কুলে  
দিক হতে দিগন্তরে আসিল ফাঙ্কন।  
পুষ্পে পুষ্পে সারাবেলা শুনি শুনি শুনি  
স্বমুখিকায়। ভাসে দ্বিধা পবনে  
বাতাবী-কুলের গম্ব। বসন্তের বনে  
এলো শিক পঙ্খহীন সিঁহপার হতে  
আম্রবৃক্ষের লোভে। প্রত্যন্ত-হালোতে

নানা রঙ ডানা মেলি উড়ে প্রকাশিত।

পাবীন্দের কাকলির নাহিকো বিরতি।

কিশলয়ে কিশলয়ে প্রাণের স্পন্দন—

যে-প্রাণ যত্নের উর্দ্ধে আসে চিরন্তন।

হে বসন্ত! কবিও না বকিত আবারে।

প্রাণে তিথারী হয়ে এসেছি দ্বারে।

# বিজ্ঞানার্চাৰ্য্য ডাঃ মহেন্দ্ৰলাল সরকার

শ্রীনরেন্দ্ৰনাথ বসু

“সেই খন্ত নরকুলে, লোকে বাবে নাতি তুলে  
মনের মণিৰে নিত্য সেবে সৰ্বজন—”

অৰ্ধ শতাব্দী কাটিয়া গেল, ১৯০৪ অব্দের ২৩শে ফেব্রুৱাৰী—  
১৩১০ সালের ১১ই ফাল্গুন তাৰিখে স্বনামধন্য বিজ্ঞানার্চাৰ্য্য ডাক্তার  
মহেন্দ্ৰলাল সরকার এম-ডি, ডি-এল, সি-আই-ই, দেহত্যাগ করেন।  
কিন্তু আজিও বাংলায় সেই বয়েণা সন্মানের স্মৃতি জাতির অন্তরে  
অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। বৰ্ত্তমানে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে উপনীত  
হইয়া আমরা সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের অপূৰ্ণ প্রভাব উপলব্ধি  
কৰিতেছি। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাৰী মনীষী মহেন্দ্ৰলাল পঁচান্নী বৎসর পূৰ্বেই  
জ্ঞানৰসম কৰিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত এই অধঃ-  
পতিত দুঃখ ও দারিদ্র্যব্লিষ্ট ভারতের উন্নতির কোন আশা নাই।

ডাঃ মহেন্দ্ৰলাল সরকার ১৮৬১ অব্দের “ক্যালকাটা জাৰ্ণেল অফ  
মেডিসিন” নামক স্বসম্পাদিত পত্রিকায় ‘বিজ্ঞান-চৰ্চ্চায় একটি  
জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনাব আবশ্যকতা’ বিষয়ে এক সূচিস্থিত ও  
বুদ্ধিপূৰ্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি বহু শিক্ষিত দেশবাসীর  
দৃষ্ট আকর্ষণ করে। ইহার পর ছয় বৎসর ধৰিয়া অক্লান্ত চেষ্টার  
ফলস্বরূপ ডাঃ সরকার তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত “ভারতবর্ষীয়  
বিজ্ঞান-সভা” (Indian Association for the Cultiva-  
tion of Science) স্থাপনে কৃতকাৰ্য্য হন। তখন ইউরোপের  
সকল দেশেও এইরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় নাই। “বিজ্ঞান-  
সভা” স্থাপনার পর প্রায় আশী বৎসর অতীত হইয়া গেল। এখন  
এই প্রতিষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠাতার নাম বিজ্ঞান-জগতের সর্বত্র বিদিত।  
“ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা”র গবেষণাপাঠেই স্বীয় পরীক্ষালব্ধ সাক্ষ্যে  
বিজ্ঞানার্চাৰ্য্য স্যার সি. ভি. রমন এক-আর-এস সম্মান এবং নোবেল  
পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিই সমগ্র এনিয়ার মধ্যে প্রথম  
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক।

বৰ্ত্তমানে ডাঃ সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভাকে কলিকাতায়  
কেন্দ্রস্থল হইতে শহরতলি বাবরপুরে অতি বিকৃত ভূমিখণ্ডের উপর  
স্থাপিত নবনির্মিত এক বিরাট ভবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।  
দেশবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি.এসসি, ও  
অধ্যাপক সেখনাদ সাহা, এক-আর-এস, ইহার কর্ণধার এবং বহু কৃত-  
বিত্ত বৈজ্ঞানিক ও উৎসাহী ছাত্র বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাপাঠে  
কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

মহেন্দ্ৰলাল সরকার ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর তাৰিখে হাওড়া  
শহরের নর কোণ পশ্চিম পাঁচপাড়া গ্রামে কুবিজীৱী সঙ্গোপ  
কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতাপিতার প্রথম সন্তান। মাত্র  
পাঁচ বৎসর বয়সে মহেন্দ্ৰলালের পিতৃবিয়োগ হয় এবং নর বৎসর

বয়সে তাঁহার মাতাকেও হারাতে হয়। কলিকাতার নেবুতলায়  
মাতুলদেব আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি পল্লীৰ এক পাঠশালার শিক্ষাবৃত্ত  
করেন, পবে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভৰ্ত্তি হন। তখন ঐ স্কুল  
অবৈতনিক ছিল। মহেন্দ্ৰলাল ১৮৪৯ পর্য্যন্ত হেয়ার স্কুলের ছাত্র  
ছিলেন, তৎপরে জুনিয়ার বৃত্তি লাভ কৰিয়া ডিন্ধু কলেজে (পরে,  
প্রেসিডেন্সী কলেজ) প্রবেশ করেন। মহেন্দ্ৰলাল ডিন্ধু কলেজে  
অধ্যাপকদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সিনিয়র বৃত্তিও  
লাভ কৰিয়াছিলেন। কিন্তু কলিত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি একান্ত  
আগ্ৰহ হওয়ায় তিনি উক্ত কলেজ ত্যাগ কৰিয়া মেডিক্যাল কলেজে  
ভৰ্ত্তি হন।

মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশলাভের পর ১৮৫৫ অব্দে মহেন্দ্ৰলাল  
বিবাহ করেন। ১৮৬০ অব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র অন্তত্বলালের  
জন্ম হয়। মহেন্দ্ৰলাল ১৮৬০ সনে কৃতিত্বের সন্নিহিত এল-এম-এস  
পাস করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বহু পদক, পুরস্কার ও বৃত্তিলাভ  
কৰিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ডাঃ কেৱার জেদ করার, মহেন্দ্ৰলাল ১৮৬৩ সনে  
এম-ডি পরীক্ষা দেন এবং সাক্ষ্যমণ্ডিত হইয়া এম-ডি উপাধি লাভ  
করেন। ডাঃ মহেন্দ্ৰলাল সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠীয়  
এম-ডি। তাঁহার পূৰ্বে মাত্র আর একজন ঐ উক্ত উপাধি লাভ  
কৰিয়াছিলেন।

উক্ত বৎসরেই কলিকাতায় ‘ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসন’-  
এর বঙ্গ-শাখা স্থাপিত হয় এবং তাহার উদ্বোধন সভাতে ডাঃ  
সরকার হোমিওপ্যাথির নিন্দা কৰিয়া একটি বক্তৃতা করেন। তিনি  
প্রথমে এই শাখা-সভার সম্পাদক এবং তিন বৎসর পরে সহ-  
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

উদ্বোধন সভার হোমিওপ্যাথির বিশেষ অনুসারী এক জন  
বিশিষ্ট নাগরিক রাজেন্দ্ৰ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার  
মনে হইয়াছিল যে, যদি ডাঃ সরকারের মত পরিবৰ্ত্তন কৰাইতে  
পাৰা যায় তবে তাঁহার দ্বাৰাই এদেশে হোমিওপ্যাথির আদৰ-  
বৃদ্ধি সম্ভবপর হইবে। রাজেন্দ্ৰবাবুর সূচিন্তকৰ্মে কিন্তু কোন কল  
হইল না। ডাঃ সরকার রাজেন্দ্ৰবাবুকে বলিলেন, হোমিওপ্যাথি  
চিকিৎসার দ্বাৰা তিনি যে সকল রোগীকে আৰোগ্য কৰিয়াছেন,  
তাহা পথ্যপথ্যের কঠোর নিয়মের বলেই সকল হইয়া থাকিবে।

এই সময় কোন পত্রিকার পক্ষ হইতে এক জন বহু ডাঃ  
সরকারকে “বর্গান্স কিলোজৰ্মি অফ হোমিওপ্যাথি” নামক পুস্তক-  
খানির সমালোচনা কৰিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি সহজেই  
ইহাতে সম্মত হন। ডাঃ সরকার মনে কৰিয়াছিলেন, যে, এইবার  
তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রথার অস্বীকৃতি উল্লেখিত করার

একটা সুযোগ পাইলেন। কিন্তু পুস্তকখানি প্রথমবার পাঠ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হোমিওপ্যাথি প্রথা সৰ্ব্বদে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ না করিলে, উহার ঠিকমত সমালোচনা করা চলিবে না। তিনি রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের বাড়ী বাইরা তাঁহার চিকিৎসা-পদ্ধতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ডাঃ সরকার বুঝিলেন যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রথায় সত্য বহিরাছে এবং এলোপ্যাথি চিকিৎসকেয়া যে এতকাল ধরিয়া পূর্বোক্ত প্রথা অবলম্বনকারীদের একরূপ সমাজচ্যুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা একান্ত গঠিত কার্য।

মত পরিবর্তিত হওয়ার পর, ডাঃ সরকার 'ভেষজ সৰ্বদে 'চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা' শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার ফলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসক সমাজ হইতে তাঁহাকে সমাজ-চ্যুত হইতে হয়।

১৮৬৮ অব্দের জানুয়ারী মাস হইতে ডাঃ সরকার 'ক্যালকাটা জর্নাল অফ মেডিসিন' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইহার পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ সরকার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন সদস্য মনোনীত হন এবং তাঁহাকে 'ক্যাকাণ্ডি অফ আর্টসে' স্থান দেওয়া হয়। ইহার আট বৎসর পরে, ১৮৭৮ সনে সিনেটের বার্ষিক মিটিং-এ একটি প্রস্তাবের বলে তাঁহাকে 'ক্যাকাণ্ডি অফ মেডিসিনে'র সদস্য করা হয়। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসক সদস্যগণ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করেন। এই আপত্তির উত্তর দিয়া ডাঃ সরকার অতি বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে দুইপানি পত্র লিখেন তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ১৮৮৩ অব্দে ডাঃ সরকারকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

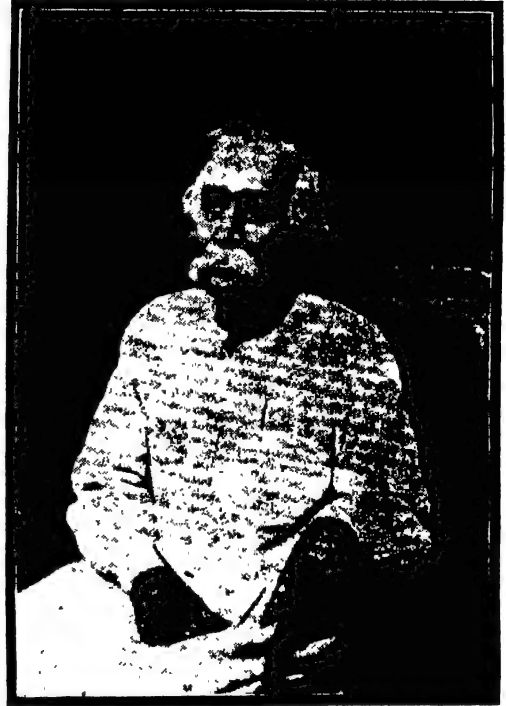
১৮৮৭, জানুয়ারীতে ডাঃ সরকার বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ সনে চতুর্থ বারের জন্ত পুনর্নির্বাচিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৮৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ সরকারকে কলিকাতার সেরিক নিযুক্ত করা হয়। সেরিক থাকাকালে তিনি যে ভেষজবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার দিনে একরূপ কমলাভূত ছিল। ডাঃ সরকার একজন রাজতন্ত্র প্রজা ও শাস্তি-সুখলায় সবিশেষ পক্ষপাতী হইলেও সেরিক হিসাবে ভারতের বড়লাট লর্ড ডাকরিনকে অভিনন্দন দিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বর্ধা ডাকতি ও হত্যাকাণ্ডের জন্তে কি তাঁকে অভিনন্দিত করতে হবে?' বর্ধাবৃত্ত জরকে তিনি ডাকতি ও হত্যাকাণ্ড বলিতে বিধা-বোধ করেন নাই।

ডাঃ সরকার ১৮৯৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনারারি ডি-এল উপাধি প্রাপ্ত হন।

চার বৎসরকাল (১৮৯৩-৯৭) ডাঃ সরকার 'ক্যাকাণ্ডি অফ আর্টস'-এর সভাপতি ছিলেন। দশ বৎসর ধরিয়া সিন্ডিকেটের

সদস্য থাকার সময় ভাইস-চ্যান্সেলরের অস্থগহিতিতে সাধারণতঃ তিনিই সভাপতিত্ব করিতেন। সে সময় প্রথম দেশীয় ভাইস-চ্যান্সেলর নিরোগের কথা উঠিলে অনেকেই আশা করেন যে, ডাঃ সরকারই উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে উক্ত পদ না দিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করেন।



ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

[হৃদয় চারি মাস পূর্বে স্মৃত কণ্টো হইতে

ডাঃ সরকার বহু বৎসর ধরিয়া 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এর কাউন্সিলের সদস্য এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সোসাইটির প্রতিনিধি হিসাবে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে একজন ট্রাষ্ট ছিলেন।

ডাঃ সরকার 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর ক্যান্টনমেন্ট অফ সারেল'-এর আজীবন সদস্য এবং 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি' ও 'ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি'র কনসাল্টিং সদস্য ছিলেন।

ডাঃ সরকার চার বার কঠিন অগ্নি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন শব-ব্যবচ্ছেদকালে প্রাপ্ত ক্রান্ত হইতে উৎপন্ন সেপটিক অগ্নি ছয় মাস-কাল ভুগিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করেন। দ্বিতীয় বার হৃদয় জেলার ডুবুদহ-বলাপঙ্কের স্ফাবিত একটি

এখানে অরোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া নিজেই অসুস্থ হইয়াছিলেন।

১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত ডাঃ সরকারের স্বাস্থ্য একরূপ ভালই ছিল। কিন্তু ঐ সময় সভ্যকৃত একটি দূর্ব্বীকণ বস্ত্র দ্বারা অনবরত নভঃস্থল পরিদর্শনে ব্যাপৃত থাকায় তিনি হাঁপানী (Asbhma) রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগ হইতে তিনি কখনও একেবারে মুক্তি পান নাই।

১৮৭৫ সনে পাণ্ডুরা একটি রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া তিনি ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হন। এবার তাঁহার রোগ এত প্রবল হয় যে, তাহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। তিন বৎসর কাল গরিয়া তিনি এই জরে ভুগিয়াছিলেন।

হুই বার ম্যালেরিয়া জরের তীব্র আক্রমণের ফলে এবং হাঁপানীর জন্ত ডাঃ সরকারকে আহাৰ্য্য ঔষধের মাত্রা বিশেষ ভাবে কমাইতে হইয়াছিল।

একজন বন্ধু বিশেষ অনুরোধে ১৮৯৬ সনের নভেম্বর মাসে ডাঃ সরকারকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিন্স কেরোসাহকে চিকিৎসা করার জন্ত টালিগঞ্জ বাইতে হয়। টালিগঞ্জ অঞ্চল সে সময় বিশেষ ভাবে ম্যালেরিয়া-হুই ছিল। চতুর্থ দিন সেখানে বাওয়ার পর তিনি আবার ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হন। এই শেষ বারের আক্রমণ হইতে তিনি আর কখনও একেবারে সুস্থীভাব করিতে পারেন নাই।

ডাঃ সরকার এম-ডি পাস করার পর তাঁহার কি ৪ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০ টাকা করেন। ১৮৭৪ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে উহা ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা এবং ১৮৯৭ অব্দে হাঁপানীতে আক্রান্ত হওয়ার পর ১৬ টাকা হইতে ৩২ টাকা করিয়াছিলেন। ১৯০১, আশ্বরাহী হইতে অসুস্থতাকেতু ডাঃ সরকার বাহিরে বাইরা রোগী দেখিতে অক্ষম হন। তখন হইতে রোগীরা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া ৫০ টাকা, এমন কি ১০০ টাকা পর্য্যন্ত কি দিয়া ব্যবস্থা লইতেন। সর্ব্বশেষে এত কি লইয়া ব্যবস্থা দেওয়াও তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

ডাঃ সরকারের ৭০ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার, তাঁহার ৭১ বর্ষে পদার্পণ (২রা নভেম্বর ১৯০৩) উপলক্ষে, রবিবার ৮ই নভেম্বর তারিখে

একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। তাঁহার পরিবারবর্গ এবং প্রিয় ছাত্রবৃন্দ বাংলা ও ইংরেজী কবিতা পাঠ করিয়া, উৎসবের জন্ত বিশেষ ভাবে রচিত গান গাহিয়া ডাঃ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সেদিন সকলে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন।

বিধির অমোঘ বিধান, উক্ত জন্মোৎসবের চারি মাসের মধ্যে, ১৯০৪ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ( ১১ই কান্তন ১৩১০ সাল ) মঙ্গল-বার প্রত্যুষে পুরুষসিংহ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নখর দেহত্যাগ করিয়া, অমৃত্যুশয্যায় শোকাগ্নিতে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া যান।

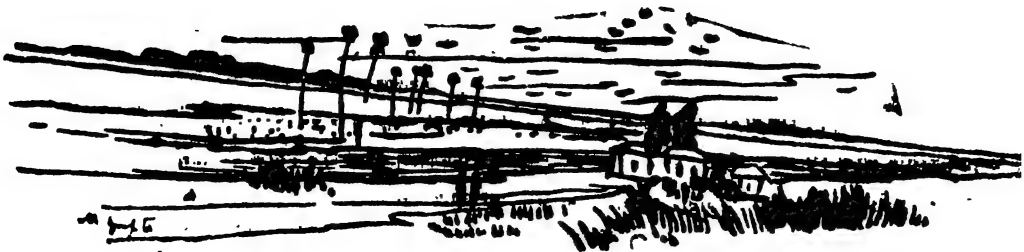
ডাঃ সরকারের মূর্ত্তি ছিল সৌম্য, কতকটা ভীমকান্ত। মুখ প্রতিভা ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক, তাহাতে অসাধারণত্বের ছাপ ছিল। দেখিলেই মনে হইত তিনি সাধারণ লোক নহেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী, তেজ ও সৌন্দর্য্য মেঘ ও রৌদ্রের স্তায় তাহার দেহজ্বলিতে বেন খেলিয়া বেড়াইত।

একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যসেবী চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ডাঃ মহেন্দ্রলালের মত খুব কমই দৃষ্ট হয়। বাইবেল ছিল তাঁহার প্রিয় পাঠ্য। সাহিত্য হিসাবে সেক্সপীয়ার হইতে কিপলিং পর্য্যন্ত সকলের লেখাই তিনি সাহিত্যিকের স্তায় অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। বাংলা সাহিত্যের ভাল নুতন বই বাহির হইলেই তিনি তাহা আনাইয়া পাঠ করিতেন।

ডাঃ সরকার ছিলেন নিষ্ঠাবান ও সত্যানুযায়ী। তিনি জানিতেন, ভগবান সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্য সকলের অপেক্ষা শক্তিশালী এবং সত্যেরই শেষ স্তর অবশ্যস্তাবী।

খ্রীষ্টীয়মতবাদ পরমহংসদেবের প্রসঙ্গে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম প্রায়ই শুনা যায়। এক সময় তিনি ভক্তদের গান শুনিয়া কোনরূপ উচ্চাস প্রকাশ না করায়, ভক্তগণ পরমহংসদেবকে বলেন—“ডাক্তারটি বড় কঠোর লোক, এমন পাবাণ-পলান গান ও উপদেশ শুনে চুপ করে থাকে।” ইহা শুনিয়া পরমহংসদেব উত্তর দিয়াছিলেন—“ডোবার হাতী নামলে জল তোলাপাড় করে। কিন্তু সাগরে হাতী নামলে সাগর জানতেই পারে না। ডাক্তারের জ্বরটা সাগরের মত বিশাল যে।”

এই অমূল্য বাণীর উপর আর কোনরূপ মন্তব্য অনাবশ্যক।





## প্রভাত-সূর্য্য

শ্রীরঞ্জিতকুমার সেন

বিহাবের আকাশে সূর্য্য উঠল।

গাড়ীটা এসে পৌঁছল অনেক দেরিতে। সুনলাম—হুঁ বটা পেট। প্রাটকরম ছাড়িয়ে কাঁচা ঘাসের বুকে পা দিয়ে একবার সূঁক কুম কপালে স্পর্শ করে উচ্চারণ করলাম, ‘ও অবাকুস্ম-সঙ্কাস—’

বরেন ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

পাশেই ট্রেনের সমরে চুকবার পেট। সোজা পথে ঘুরে না এসে ‘সট কাট’ করেছি আমরা ছোট একটা তারের বেড়া ভিঙিয়ে। সমর পেটের সামনেই প্রকাণ্ড একটা গোলাকৃতি কার্চের প্লান্ডের গারে মোটা মোটা লাল হরকে লেগা—‘কশন’, অর্থাৎ—সাবধান।

বরেন বলল, ‘পা চালা, বড্ড চা-তেঙা পেয়েছে।’

বললাম, ‘আর কত চালাব, এই কি কম?’

কিন্তু বেশী-কম বুঝবার মাহুয নয় বরেন। সমস্ত দেহটাকে নানাব্যবের পরিচ্ছদে আবৃত করে নিয়েছে সে। শীতের কুয়াশায় চাবদিক আচ্ছন্ন। মেঘের মত স্তরে স্তরে কুয়াশা জমে আছে কাছাকাছি ছোট ছোট পাহাড়গুলির গারে। চোখ কেয়ে না সে-দিকে তাকালে। কিন্তু বরেনের তাগিদটা একটু কড়া। শীতবস্ত্র বলতে মোজা ত দুয়ের কথা, সামান্য একটা মাকলারও সঙ্গে নিয়ে আসি নি। হয়ত একটু জড়তা-ই এসে থাকবে! অবস্থাটা আমার ঠিক বরেনের বিপরীত। কিন্তু সাধা রাত ট্রেনে যাত্রীদের অসম্ভব ভিড়ে শব্দের মত বেভাবে সঙ্কুচিত হয়ে ছিলাম, কাঁচা ঘাসের বুকে পা দিয়ে এতক্ষণে বেন আবার একটু জীবন কিয়ে পেয়েছি বলে মনে হ’ল। একটু একটু করে সূর্য্য উঠে যোনের টুকরো উড়িয়ে পড়ছে পাশে। চাবদিকে মাথা উঁচিয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়। যোদ পড়ে চিক্চিক করছে পাহাড়ের চূড়াগুলো। সত্যিই কি চোখ কিরতে চার?

শিশিরসিক্ত কাঁচা ঘাসের বুকে পারের দাগ কেটে কেটে এগিয়ে চললাম হুঁজনে।

শ্রাবপথে হঠাৎ একবার ধমকে ধাঁড়িয়ে পড়ল বরেন।—‘এই সেরেছে!’

—‘কেম, কি বাপার?’

পঞ্জীর পলায় বরেন বলল, ‘টর্কটা ট্রেনে কেল এসেছি।’

মনের উপর কেন বেন কথাটা বড় বেশী ধোঁপাত করল না। ‘কলসারি’, ‘স্টাট পয়ে সব সময় হটপুট করলে এই অবস্থাই হয়। হুঁজ কি, বড়লোক আছিল, পুষণো গেছে, এবারে আবার নতুন একটা হবে।’

স্টাট বুঝতে পারলাম—কথা তনে চটে গেছে বরেন। এসব সূর্য্যে রুহাশস্য তায় একেবারেই কম। ব্যবকরেক-তাকাল সে

প্রাটকরমের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে প্রাটকরম ছাড়িয়ে ট্রেন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শুধু ইঞ্জিনের একরাশ ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সূর্য্য উঠছে একটু একটু করে। পানিকরাদেই কুয়াশা কেটে যাবে। পরিষ্কার দিনের আলোর বিহাবের এই গুণ থুণ্ড কাঁকড় বিছানো মাটি একটু একটু করে গরম হয়ে উঠবে। এই সূর্য্য-তিলাইয়ার মত কত পথ ম্পর্ষিত হয়ে উঠবে বাইসিকেল, গো-শকট আর পণ্যজীবীদের অবিরাম পতিতে!

সুস্থ সূর্য্যতিলাইয়া একটু একটু করে জাগছে। নামটা কবে কে রেখেছিল, কি জানি! কার সূর্য্য কবে এপথে এসে হারিয়ে গেছে, কত তিলে তর্পণ হয়েছে একদিন এখানে—সে সব কথা বিশ্বস্তির অতলে তলিয়ে গেছে। আজ আর ইতিহাস, তার সাক্ষী দেয় না। সূর্য্যতিলাইয়ার ইতিহাস রচনা আজ হয়ত আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে!

যাত্রার উঠে পানিকটা ডান পাশে মোড় ঘুরতেই কলোনী পেলাম। বরেনের বোন বাণীর খণ্ডরবাড়ী এই দিকটাতেই। বাণীর বরের সঙ্গে প্রথম আলাপ আমার মেটিরবুকজে। শব্দর ঘোষ : মাখার সামনের দিকে কিছু টাক, পিছনের চুলগুলো অনেকটা আমার মতই খাড়া-খাড়া; কিন্তু লোকটি একেবারে সাদা-সিধে। চমৎকার হাসিখুশী মাহুযটি। এক বছরে ম্যাট্রিক দিয়ে এক বছরেই কলেজে ভর্তি হই আমরা। হুঁজনেই অখুনাতন পূর্ব-পাকিস্থানের উপকৃত মাহুয। মেটিরবুকজে বসেই এ সব কথা একদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল আমাদের মধ্যে।

বাসার চুকেই প্রথম সম্ভাষণে হাঁক দিয়ে উঠল বরেন, ‘খুব কড়া করে ডবলকাপ চা চাই আগে, তারপর কথা।’

পলায় আগরাজ শুনেই সন্তোষিত সকলে। একেবারে বাঘ-ভালুক পড়ে নি বাড়ীতে, রীতিমত চেনা-জানা মাহুযটা। আমি এই প্রথম এলেও বরেন এর আগে এসে গেছে এখানে বহুবার। ঠাট্টার সূত্র থেকে গাড়ীঘোর মাত্রা পর্বাত্ত তাল-লয় সবটুকু তার ঠিক আছে এখানে।

সুন্দর বাংলা প্যাটার্ন বাড়ী। ছাড়িয়েশালের উপরে টালির শেড। প্রশস্ত বারান্দা। ছোট একটা টেমিলের হুঁপাশে হুপানি চেয়ারে মুখোমুখি বসে ইতিমধ্যেই পড়ায় মন দিয়েছিল কিছু আর মিহ। শব্দরঘই ছোট ভাই জিতু; মিহ হচ্ছে ওদের ভাইব্বি, অর্থাৎ, বড় ভাই শিবদাসের মেজ মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন। আমাদের জানা ছিল যে, এত তোরে শব্দরের, ঘুম ভাঙবার নয় এবং ভাঙেও নি। কিন্তু ভাই বলে বাণীর বিবাহ,

নেই। সেই কোন সাত-সকালে উঠেই বড় আয়ের সঙ্গে একাধে-সেকাধে হাত চালাতে হ'ল তাকে।

বয়েনের আওয়াজ পেয়ে সমস্ত বাড়ীটা বেন অঙ্গক্ষেপের মধ্যেই মুগ্ধ হয়ে উঠল। জিতু আর মিহু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে অভি-বান্দন করল আমাদের। 'বাণী এসে বলল, 'এমন না জানিয়ে বখন চা-পিত্তেশ নিয়ে এসেছ, তখন ও-পাঠটা লোকান থেকে শেষ করে এলেই পারতে!'

—'বেমন তোদের জায়গা, তেমন ত লোকানপাট সব!' ঠাঠার ছিল অতি বড় সত্য কথাটা হঠাৎ গাঙ্গীধোব চালে চালিয়ে দিল বয়েন, 'চা দিতে না পারিস, কিছু আলা আর পয়স ফেলই এনে দে, নইলে ঠাণ্ডার এদিকে বে জমে বাবার অবস্থা!'

বাণী কিন্তু এবারে আর কোন প্রত্যুত্তর করল না। হঠাৎ চিপ করে আমাদের এক প্রণাম। বাধা দেব বে, তারও অবসরটুকু দিল না। বলল, 'মনে করেছেন, আপনাকে আমি চিনি না, তাই না? আপনি আমাদের কনকদা ত?'

কুর্খাৎ, কনক চাটুজে। সশরীরে উপস্থিত হয়েছি, অস্বীকার করবার উপায় নেই। বললাম, 'কিন্তু কনক ব্যক্তিটি বে আমি, তাই বা বুঝলে কি করে?'

—'ও আমরা বেশ বুঝতে পারি।' মুহু এক টুকরো হাসি খেলে গেল বাণীর হুই ঠোটে।—'ওনেছিলাম, বয়েনদায় সঙ্গে আপনিই আসবেন। এত বেশী আপনার নাম শুনেছি বে, ইচ্ছে হচ্ছিল আপনাকে দেখতে।'

বললাম, 'সেটাকে তবে বাস্তবে রূপ দিলেই ত পারতে। মাথা ওঁড়বার মত বখন সামান্য একটা ডেরা আছে কলকাতার, উত্তোপ করে গিরেই ত একবার উঠতে পারতে।'

হেসে বাণী বলল, 'বোনেরা আর বড়-একটা কে কোথায় যায়, দাদারাই চিরকাল বোনদের দেখতে আসে।'

—'তাই নাকি?' দেখলাম—বাণী বেশ সপ্রতিভ। যেবে বললাম, 'বাড়ীটাতে কে বেন নেই-নেই বলে মনে হচ্ছে?'

অবুঝ নয় বাণী, সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'বাই, ঠুকে তুলে দিই গে।'

কিন্তু গিরে আর তুলে দিতে হ'ল না। ইতিমধ্যে বয়েনই গিরে সে কাজ করে এসেছে। শব্দের সঙ্গে আপনি থেকে ভূমিতে এসে পৌঁছেছিলাম অনেক আগেই। চোখ বগুড়াতে বগুড়াতে উঠে এসে হঠাৎ আমার হুই কাঁধের উপর দিরে হুঁহাত প্রসারিত করে গদ গদ হয়ে উঠল শব্দর।—'এ আমার ভাবনার অতীত, ভেরী চিরায় ফুল, এ নাইস মর্নিং টু-ডে।'

বললাম, 'শব্দগুলো বাংলা করে বল। দেশ এখন ইংরেজ-শাসনযুক্ত। প্রাচেশিক ভাষার উপরেই আজকাল জোর পড়ছে বেশী। অজ্ঞাত: মহাকাব্যজ্ঞানার ব্যবহার ত সে বকমটাই মনে হয়!'

—'বাক্য:, একেই বলে সাহিত্যবসিক। কথার কি এঁটে উঠবার জো আছে।' বলে, টেবিলের উপরেই একটা পাশ ঘেঁষে ঘসে পড়ল শব্দর।

বললাম, 'বাড়ীর কর্তৃত্বপন্নতা দেখে ত মনে হচ্ছে বেলা একেবারে কম হয় নি! তা—হঠাৎ এই উপস্থিতি না সুইলে ঘুমটা আর কতক্ষণ হ'ত?'

লজ্জা গেল এবারে শব্দর।

পাশ থেকে মিহু বেন একবার কি বলতে গেল, কিন্তু শব্দরের তা কানে গেল বলে মনে হ'ল না। অনেকটা ফিলজকির ছাত্রের মত স্বভাব শব্দরের। মাকে মাকে কথার মাঝখানে খেঁচি হারিয়ে কলে, মাঝে মাঝে আবার বড় বেশী প্রগলভ হয়ে উঠে। অথচ ফিলজকির সামান্যতর ভূমিকার পৃষ্ঠার পর্য্যন্ত নজর পড়ে নি কোন দিন। কয়েটে মাইনুস আর বাজারে বিজনেস আছে বড় ভাই শিবদাসের, তারই দেখাশোনা তদারক করে। অণকাল খেমে বলল, 'হাতমুখ ধুয়ে ভাল হয়ে বসলে হ'ত না এবারে?'

প্রশ্নতই ছিলাম, অতএব অরাজী হবার কিছু নেই। মনে মনে ঠিকই জানতাম—বাকী কাজগুলো গুছিয়ে নেবার ভগ্ন বয়েনের একার গলাই এখানে যথেষ্ট।

অঙ্গক্ষেপের মধ্যেই টেবিলটা লুচির খালার আর চায়ের কাপে পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম এ বাড়ীর এই দ্রুত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে। ঠিক বেন ইলেকট্রিকে কাজ-গুলো হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই একটু আগেই বাণীর সঙ্গে চা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে বয়েনের।

অলক্ষ্যে থেকে বিনি এত কিছু ব্যবস্থা করতেন, তাঁকে দেখবার লোভটুকু কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছিলাম না। তিনি আর কেউ নন, বাণীরই বড় জা, শিবদাসের বউ শিবানী। বাণীর সম্পর্কে বয়েনও তাকে দ্বিধি বলেই ডাকে; অতএব বয়েনের বন্ধু হিসেবে আমিই বা নই কেন?

দেখা গেলাম তাঁর দুপুরে খেতে বসে। পরিপাটি করে অন্ন-বাঞ্ছনে বাটি সাজিয়ে এনে ভাতের থালা আসনের সামনে এগিয়ে ধরলেন শিবানী। পরিমাণ দেখে বললাম, 'এত কিছু ত কোন দিন খাবার অভাঙ্গ নেই দ্বিধি! জানেন ত, থাকি বাংলা-মুলুকে—কলকাতার রেশন-এরিয়র, থাওরা-মাওরা আপনা থেকেই করে গেছে। অবস্থাটাও এখন এমন ঠাঁড়িয়েছে বে, কিছুতেই আর হুঁমুর্চো বেশী খেতে পারি না। কিছু কিছু কামিয়ে না নিলে শেষ পর্য্যন্ত এঁটো পাতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ব'।

মুখের ঘোমটা কতকটা কপালের দিকে তুলে নিয়ে মুহু হাসলেন শিবানী। বললেন, 'আমরাও বাংলা দেশেরই মানুষ। বাঙালী সব অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এমন বেশী কিছু দ্বিধি নি বে, হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন।'

কথাটা সামান্যতিক। এ শুধু আমার কথা নয়, সমস্ত বাঙালীর কথা। অথচ বাঙালী নারীর এ অচল বিশ্বাসকে বে ভাববু, ভেমন শক্তি নেই। বাণী দেখলাম মুচকি হেসে অলক্ষ্যে কোথায় একদিকে চর্মে গেল। ততক্ষণ বয়েন প্রায় অর্ধেক ভাত শেষ করে এনেছে। থাওরা সম্পর্কে ও চিরকালই অনেকটা হুড়িফের দেখের লোক এ,

এ সব ব্যাপারে বাংলা বিহার উদ্ভিয়ার জ্ঞান নেই বরেনের। খেতেও পারে প্রচুর, খাটতেও পারে বখেটে। কয়েক বীয়ার কাজ, অর্গানাইজার হবার ইচ্ছে অনেক দিন থেকে। বলল, 'নে, বাজে না বকে এবারে আরম্ভ কর দিকি !'

বেন গাড়ী ফেল করব আর কি ! ষ্টেশন থেকে সকালে পা চালাবার মতই অবস্থা অনেকটা। পথ হলে তর্ক করা যেত, এখানে এই নতুন পরিবেশে সে তর্ক প্রথম আলোপের লক্ষ্যের স্বরূপ।

বাওয়া শেষ করে উঠলাম।

ঘড়িতে একেবারে কম বাজে নি। শীতের বেলা, পাহাড়ের তুষার গলানো কনকনে শীত। দেগতে দেখতে বেলা পড়ে আসবে। শব্বরের উৎসাহেই এক সময় জ্বরগাটা ঘুরে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে দেখা ভিন্ন বড় একটা কাজ ছিল না আর এ পথে। ঘুরে বেড়াতেই যে ঘর ছেড়েছি। পথে বেরিয়ে বরেনকে তাই এক সময় আবৃত্তি করে বলেছিলেন—

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,  
আমরা হ'জন চলতি হাওয়ার পথি।'

কিন্তু এইটুকুই তুল করেছিলাম যে, বরেন ঠিক চলতি হাওয়ার গাড়ী নয়, অনেকটা ঘরমুখো। বীয়াসংক্রান্ত কাজে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় বেন হঠাৎ কোন এক বামাস্থলীর প্রেমে পড়েছে, অথচ এমন মুখচোরা যে, মুখ ফুটে কিছু বলবে না ! মনের হুগুট রোমাল নিয়ে কেমন খিতিয়ে পড়েছে ইমানিং। ঠেলে চালালে তবে চলে। শব্বরের আত্মীয়তার হুগুট বুম্বীতিলাইয়ার পথের সঙ্গে বরেনের পরিচর আছে আগে থেকেই।

কিন্তু আমার নিজের দিক দিয়ে পরিচরটা এই প্রথম। চোখে পড়ল—রাষ্ট্রার এপাশে ওপাশে ছোট-বড় কাঁচা-পাকা বাড়ী। দেয়ালের পারে আর সাইনবোর্ডে কতগুলো সাংকেতিক অক্ষর জু জু করছে : এম এল ৩৬, ডি, এল ২২, এম এল ৮৪০০।

জিজ্ঞেস করলাম—'এগুলো কি ?'

হেসে শব্বর বলল, 'মাইকা লাইসেন্স নাচার আর ডিলার লাইসেন্স নাচার। এদের হাত দিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে সেল-বিজনেসে বার মাইকা।'

বেখলাম—রাশি রাশি অস্ত্রের স্তূপের পাহাড় জমে আছে এখানে ওখানে। তারই উপর দিয়ে হেঁটে বাচ্ছে লোকেরা, ছোট ছোট বিহারী ছেলেবা এসে খেলা করছে অস্ত্র দিয়ে পুতুল-ঘর বানিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এতে নষ্ট হয় না মাইকা ?'

ওনলাম—এগুলো মাইকার খোসামান্দ, পরিভাষ্য ঠাচ। ভালগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে প্যাকিঙে বার, বাজেগুলো এইভাবে খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়।

বড় তাই শিবদাস ছাড়া শব্বরের নিজেরও কিছুদিন আগে শিবদাস মাইকা মাইন ছিল কাজকাছি এক করেছে। কোন এক

আপকাস্ট্রির সঙ্গে তাপে বিজনেস ছিল, কিন্তু টিকল না ; আপকাস্ট্রি গ্রাস করে নিল সমস্ত বিজনেসটাকে। রাম্বপথে একটা সিগারেট ধরিয়ে শব্বর বলল, 'এই ভাবেই আমরা মার খাচ্ছি। টাকার জোরে আজ ওরা প্রায় সমস্ত বিজনেসই গ্রাস করছে। নিজেরা যে বোঁধভাবে কিছু করব, উপায় নেই ; প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙালীদের সরে পড়বার মতলব।'

বললাম, 'কেন, এখানে যারা বাঙালী আছেন, তাঁরা কি লোক সুরিধের নন নাকি ? প্রবাসী বাঙালী, মিলেমিশে বোঁধভাবে থাকারাই ত উচিত !'

শব্বর বেশ অকস্মাৎ একটা দুঃশব্দ-জগৎ থেকে নেমে এল এবারে। বলল, 'বোঁধ ভাবটা শুধু বাইরে থেকে মার খাবার ভয়ে, অর্ধের পথটা সবার ব্যক্তিগত।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে বাঙালী ক্লাব নেই কোন ?'

—'আছে বৈ কি ! চল, বাবার পথে দেখিয়ে নেব।'

বেখানে বাই, স্বভাতি স্বজনকেই আগে খুঁজি। শব্বরের কথায় তাই খানিকটা আশঙ্ক হলাম এবারে।

বুম্বীতিলাইয়ার লাল কাকরের পথ, কোথাও কোথাও পিচ বাধান সড়ক গলি। ধূলা জমে মাটি আর সুরকির রূপ নিয়েছে। মাথার উপরে সূর্য জলছে, কিন্তু তেমন তাপ নেই। শীতের বির-কিরে হাওয়ার সে তাপে বরং আরামবোধই করলাম।

খানিকটা এগিয়ে আসতেই প্রকাণ্ড একটা চকমেলান লাল বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়লাম। হাল-আমলের নতুন ক্যাসানের বাড়ী, পাতলা গাধুণীর উপর কোন কোন অংশে জাকরানী রঙের প্রলেপ। কচি আছে গৃহকর্তার। এমন বাড়ী দক্ষিণ কলকাতার কোন বিশেষ অঞ্চলেও কখনও চোখে পড়ে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন বড় অফিসার টকিসার কেউ থাকেন বুঝি এখানে ?'

ওনলাম—অফিসার নয়, বিহারের কোন্ এক ধনী মাইকা মার্কেটের কর্ত্তি এটা। বাবুদার ভোজরাজ। তাঁরই প্রাসাদ। দেখলাম—বাড়ীটা শুধু তার প্রাচীর-বেষ্টিত পরিবেশেই শেষ নয়, পূর্ব-দক্ষিণ মুখে প্রায় সিকি মাইল অবধি চলে গেছে তার সীমা। ডায়নামোর আগুয়াজ এসে কানে বিঁধছে, ইলেকট্রিকের তার চলে গেছে এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে, বোঁজকিয়নে মিটমিট করে জলছে বাল্বগুলো। অথচ সারা বুম্বীতিলাইরা রাজ্যের অন্ধকারে প্রেতাত্মার মত কাদে। আলোর জগতে দু'একটা কেরোসিন লাইটপোষ্টই বখেটে এখানে।

হঠাৎ প্রশ্ন করল শব্বর, 'কেমন লাগল ?'

বলতে বাচ্ছিলাম—'ভাল'। কিন্তু তার আগে স্বভোৎসাহিত কঠে বরেন হঠাৎ বলে উঠল, 'ভারতবর্ষে এ পরিবেশ এমন নতুন কিছু নয় যে, কেমন লাগবার প্রশ্ন আসছে।'

স্বাভাবিক কঠেই এবারে শব্বর বলল, 'পাশাপাশি আরও একটা চিত্র আছে, আর এক তারতম্য, বাবার আগে সেটাও বরং দেখে যাও।'

তবে কতখানিই কোঁচুল হ'ল। বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন ধরে যে ভারতবর্ষকে কলকাতার পাই, তা কলকাতার এক বণ্ড বীণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাকে এমন একটা পরিবেশে তার আপন বরুণে বড় করে পাবার লোভটা তাই কর কি। কিন্তু না পেলেই ভাল ছিল।

পাশেই ছ'একখানি বাড়ীর পরে একটা গম্বুজের মত বহুকালের নোনাবরা ছোট্ট একখানি ঘরের মধ্যে গিয়ে চঠাং প্রবেশ করল শব্দ। বলল, 'এগিয়ে এস।'

সংশরে দোল খাচ্ছি আর একটু একটু করে পা বাড়ান্ছি। ভিতরে যেতেই নজরে পড়ল—মৃত কঙ্কালের মত একটি লোক শুয়ে আছে ময়লা বিছানায়। তেল ফুটিয়ে এসেছে, বাতি নিভবার আর বড় দেরী নেই। মাঝে মাঝেই ককিয়ে উঠছে লোকটি, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছে না। জীবনীশক্তির অভাবে কঠিন নিশ্চয় হয়ে এসেছে। মাথার কাছে বুড়ী মত একটি মহিলা মানমুখে বসে ভগবানের নাম জপ করছেন। তাবলান—এক কি আমার এতক্ষণের বাস্তবতার ভাবতবর্ষ?

মুহুরুর দেহ-সলগ্ন হয়ে বসে মুহুরুর শব্দ জিজ্ঞেস করল, 'আজ ডাক্তার এসেছিল?'

জবাব দিলেন বুড়া, 'এসেছিল, কিন্তু কই, কিছু বলল না ত?'

সাম্মনা দিল শব্দ, 'ক্রমে ভালর দিকে যাচ্ছে, বলবে আবার কি?'

শব্দকে প্রায় মুখের কাছে টেনে নিয়ে মুহুরুরি বারকরেক কিস কিস করল, 'আমার বাবার দিন আর বড় বেশী চুয়ে নয়। বহু দিন আগে ছ'হাজার টাকার একটা ইন্স্যুরেন্স করেছিলেন, পলিসিটা পেইড-আপ হয়ে আছে। আমার অবর্তমানে মার কেন কোন কষ্ট না হয়, বেশি।'

'দেখ।'—বলে কিছুক্ষণের জন্ত মুখ ফুটিয়ে নিয়ে বসল শব্দ, তার পর কথাটাকে এক বকম চাপা দেবার জন্তই নতুন কথা পাড়ল : 'ভোর সঙ্গে আমাদের কনক চাটুজের পরিচর করিয়ে দিই অমির; বিশেষ সাহিত্যরসিক, লেখাটোবারও অভাস আছে কিছু-কিছু। আর বা পরিচর—তা ভুই ভাল হয়ে উঠে নিজেই কখনও ধীরে ধীরে পাবি।'

ছ'হাত কপালে ঠেকিয়ে একবার নমস্কার জানাতে জেঁট করল আমাকে অমির, কিন্তু পাবল না। অতিরিক্ত দুর্বলতার হাত হুখানি তার থু থু করে কাঁপছে। কিছু একটা বলে যে রোগীকে সাম্মনা দেব, এমন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। অচ গল্প-কাহিনীতে কোন নায়কের চরিত্র আঁকতে গেলে কত ভাষাই না কোটাই! ছ'চোখে আজ বা দেখলাম, সেই কি বড় কম কাহিনী। অচ কৈ, একটি কথাও ত মনে আসছে না।'

নীরবেই আবার এক সময় এসে পথে ঠাঁড়ালাম। আগে পরিচর পাই নি, এবারে শুনলাম—রোগীর পুরো নাম অমিরকান্তি ভট্টাচার্য। শব্দের দীর্ঘকালের বহু। কাটা কাপড় আর হোলিরাধীর

ছোটখাট একটা লোকস ছিল কলকাতায়। এখন ব্যবসায়ী প্রায় নষ্ট হয়েই রয়েছে। কি যোগে যে পেরেছে, এখানকার ডাক্তারবা পর্যায় ধরতে পারছে না। অচ পক্ষা ব্যর করে যে কলকাতায় এসে কোন বড় ডাক্তার দেখাবে, এমন সম্ভাবিত নেই।

শব্দ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলে?'

জবাব দিতে পারলাম না। বরেনও দেখলাম চুপ করেই গেল। অলক্ষ্যে মনটা শুধু কেমন একবার আতঁনাদ করে উঠল, হায় যে। হুর্ভাগা বাঙালী, কোথাও আজ আর সে নিজের অমুঠ নিয়ে ভিত্তোতে পারছে না। হুপুরে খেতে বসে শিরানী যে কত বড় দজের কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন, শুধু সেই কথাটা কিছুক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। কি স্ব-বাসে কি প্রবাসে বাঙালীর অমুঠ-চক্রের বিদূর্ণন আজ একই বকনের সর্গভ। একই বিবর্তন-ধারার বিবৃতির বেধা ছায়াপাত করে চলেছে তার জীবনে।

এগিয়ে চলেছি লাল কাঁকর আর পিচ্চালা গলি পথে। সূর্য্য ক্রমশঃ অস্ত্রাচলের পথে হেলে পড়ে পশ্চিম দিগন্ত ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে, আর তারই ধং এসে ঠিকবে পড়ছে পাহাড়গুলোর চূড়ার। সকালের রূপের সঙ্গে এ রূপের আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

সামনেই চোখে পড়ল কতকটা কাঁকা মাঠের মত বায়লা। শেষ প্রান্ত যেবে ছোট ছোট হুখানি টালির ঘর, আর তারই সামনে ছোট একখানি বাগান : শত বেলি, সহস্র বেলি আর বুঁই ও কনক চাপার ডালগুলোর সবে নতুন পাতা পাকিয়েছে।

বাড়ীটার সামনে এসেই হাঁক দিল শব্দ : 'বিনয়-দা বাড়ী আছেন?'

গৃহকর্ত্তা বিনয় ব্যক্তিটি বাড়ীতেই ছিলেন এবং অলক্ষণের মধ্যেই সবিনয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিলেন ভিতরে। হিতর অর্থে এক পাশে মাহুর পাতা একখানি চওড়া তক্তপোষ; ছ' তিন জন অলবরসী বাঙালী আগে থেকেই সিগারেটের ধোয়ার আর একতারার স্রবে আসর জমিয়ে আছেন; আর এক পাশে বান ছ-তিন কুশন-আঁটা চেয়ার ও একটা টেবিলে সামান কিছু বই ও ইন্-জারেল প্রসপেক্টাস। গৃহকর্ত্তা বিনয় লাহিড়ী কোন একটা মায়োরাড়ী কোম্পানীর অর্গানাইজিং এজেন্ট এখানে। খুব স্ক্রিটবাজ লোক, ববিশালের ওদিকে কোথায় বাড়ী। একতারা বাকিরে বাউল-তালিলালী পাইবার খুব সখ। শিখ্যও জুড়িয়েছেন ইতিমধ্যে কয়েকটি। এখানকার প্রবালী বাঙালী বারা, তাদের মধ্যে অধিকাংশ পন্ডিতদের অন্ধন তরুণেরাই এই 'বিনয়-বিভালয়ের' ছাত্র। বাহু অরুতে বিনয় লাহিড়ীর।

শব্দ একে একে সকলের সঙ্গে পরিচর করিয়ে দিলে পরে কান্ধে কাছে মুখ এসে অচুট কষ্টে করল, 'এই হচ্ছে আমাদের বাঙালী লাব। বিনয়-দার এই একতারার মধ্যেই আমাদের এখান-কার বাঙালী সম্প্রদায়ের জীবন বাধা পড়ে আছে। পর ত মুখিও একায়ে হাফেখড়ি দিয়ে যাও।'

বিনয়-দা ব্যক্তিটি দেখলাম বাস্তবিকই অচুত। আলাপ জমিয়ে

আপন করে নিতে সময় লাগে না। একেবারে পূর্ব জন্মের পরিচয় বেন, এই ভাবেই আলাপ করতে শুরু করে দিলেন। এসে অবধি বোর্ধ করি মনে মনে এমনি একটা বাঙালী পরিবেশই খুঁজছিলাম। পেরে আপ্যায়িত হলাম। বলতে হ'ল না যে, 'বিনয়-দা, একথানা হয়ে বাক।' তার আগেই একতায়ার তারে আওরাজ তুলে স্বয়ং ধরলেন তিনি—

'এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।

আমি ডুবি ডুবি মনে করি,

মরণভরে ডুবলাম না।

জলের নীচে প্রাণপণ,

তাতে আছে মধু কত,

কালো ভ্রমর জানে মধুর মধু,

অন্তে জানে না।—ডুব দিলাম না।'

বাংলার মর্মেয় বাউল। কথাগুলো বললাম, 'ওধু এই মুম্বী-তিলাইয়া নয়, বাংলার বাইরে এমনি করে আজ আপনাকেই দরকার বিনয়-দা। এমন করে বাঙালীকে বাংলার কথা শোনাতে সম্ভবতঃ প্রবাসে আপনার মত দরদী আর একটিও নেই।'

বিনয় লাহিড়ী গলে এবারে রীতিমত জল হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমাদের এই বাঙালী সজে কিছু দক্ষিণা দিয়ে যাবেন ত?'

কতকটা ইতস্ততঃ করে বললাম, 'তা দিলেই চ'ল, এতে আর আপত্তি কি আছে?'

কিন্তু পরে জানলাম—দক্ষিণাটা ক্লাবসংক্রান্ত কিছু নয়, ওটা বিনয় লাহিড়ীর একান্ত নিজস্ব। এই ভাবে বাউল, ভাটিয়ালী আর দেহতত্ত্ব গেরে জীবনের অনিশ্চয়তা প্রতিপন্ন করে ইন্সতারেসের প্রোপোজাল কর্ত্তে সই করিয়ে নেন তিনি। ব্যবসারে নেমে বিবয়-বুদ্ধিকে তিনি কাকুর পারে অঞ্জলি দিতে রাজি নন।

ঘরে ফিরে বরেনকে বললাম, 'বীমার কাজে নেমেছিল, অঞ্চ আঁচ'টা এখনও শিগলি নে। লাহিড়ীর কাছে থেকে হাতেকলমে কিছুকাল শিখে যা।'

তুনে একেবারে হো-ফো করে হেসে উঠল সকলে।

বাণী কাছেই ছিল, বলল, 'এখানে থাকলে দানারও দীক্ষা নিতে দেবী হ'ত না।'

বললাম, 'কেন, তোমার কর্ত্তাটি তবে ইতিমধ্যেই পাকা নাম লিখিয়ে বসেছে নাকি?'

চোখ দুটো ঈষৎ কপালে তুলে বাণী বলল, 'লিখিয়েছে মানে, ঐ ত ধ্যান জ্ঞান; একবেলাও ওখানে গিয়ে তাসপাশা না পিটিয়ে এলে পেটের ভাত হজর হয় না।'

বললাম, 'ও, তা হলে ওধুই তাসপাশা! আমি ভেবেছিলাম রাজ্যধিক্য কিছু।'

তুনে ঠোট দুটো উটে নিল বাণী, 'কিছু কিনা, তাই বা কুক করে বলি।'

দরজার পাশে ঝাঁকিয়ে কি একটা করছিল শব্দ, কথাটা কানে

বেতেই বলল, 'তবে সম্ভবতঃ পন্ডিতবৃত্তাটিকে একটি বেলাও আর বরদাশ করতে না তুমি।'

দাম্পত্য কলহের আশু একটা সূচনা। শব্দের কথা শুনে বাণী কতকটা গভীর হতে চেষ্টা করল এবারে। বলল, 'কেন, এই নির্দে কৌনদিন কিছু বলেছি তোমাকে? দিদি কতদিন কত রাত অবধি ভাত নিয়ে বসে থাকেন, তাতেও কি লজ্জা হয় না যে, বড় গলা করতে এসেছ?'

অবস্থা বেগতিক। বাধ্য হয়েই এবারে ছোটগলা করতে চ'ল শব্দকে।

বললাম, 'এ ব্যাপারে একমাত্র রায় দিতে পারেন দাঁদ। অতএব হৈসেল থেকে জজ সাহেবকে খবর দেওয়া ইউক।'

কিন্তু ডেকে আর আনতে হ'ল না, কাছেই ছিলেন শিবানী, এসে শব্দকে সম্মুখে আকর্ষণ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'বিচারের ক্ষেত্রে জজসাহেবও যে সব সময় স্থপট্ট হয়, এমন ইতিহাস সম্ভবতঃ খুঁজে পাওয়া বাবে না। অতএব এ ব্যাপারে কেস আমি ডিসমিসই করলাম।'

অমির ভট্টাচার্যের যোগপাণ্ডুর মুখখানি মন থেকে কখন যে মুছে গিয়েছিল, টের পাই নি। শিবানীর 'ডিসমিসাল নোটিশ' এবারে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

মিহু সম্ভবতঃ বসে বসে এতক্ষণ কি একটা এমব্রয়ডারী তুলছিল, এবারে চোপ তুলে বলল, 'পরোক্ষে তুমিই কিং হেরে গেলে মা-মণি।'

কিন্তু এ হারার বীণার যে কত স্থপ, তা সম্ভবতঃ মিহু বুঝতে পারল না। তা না পারলেও আমার উপর তার একটা ক্ষোভ ছিল। এসে অবধি মিহুকে নিয়ে বৈশীকণ কাটাতে পারি নি। সকালটা গেল পরিচয়ের প্রথম পাঠে। দুপুরে খাবার পয়ে মিহু একবার কাছে এসেছিল পানের বাটি নিয়ে। সেই বা সামান্য ছ'চাষটে কথা। এবারে সম্মুখে কাছে আকর্ষণ করে বললাম, 'আচ্ছা মিহু, বাংলা দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না তোমার? ধর এই কলকাতার কিংবা নিজেরেয় গ্রামে?'

কথা শুনে একটুও কিন্তু কোঁতুল প্রকাশ করল না মিহু। চোপ দুটো বার কয়েক পিটিপটি করে বলল, 'যেমন সব ঘটনা তুনেতে পাই, তাতে ত এখানেই বেশ আছি। এখানে অত সমস্তা নেই।'

—'কিন্তু তবু ত তোমার নিজের দেশ সেটা!'

—'হলে কি হবে! স্থপের চাইতে বাড়ি ভাল।' খেয়ে মিহু বলল, 'কোন হালান্না-ছন্ড নেই, ভিসা পাসপোর্টের কামেলা নেই, দিকি সহজ সরল জীবন এখানে। ক'দিন থাকলে দেখবেন, আপনারও আর চেড়ে যেতে ইচ্ছে হবে না এ বারপা।'

বললাম, 'ছিঃ ছিঃ, প্রবাসী বাঙালীরা চিরকাল প্রবাসে থেকে তুখু পাগলে পড়ে তাদের বাংলাকে দেখবে, দেখে সমস্ত হবেন, এই বা কোন্ নীতি মিহু?'

সম্ভবতঃ মিস্র এবারে মনে মনে কিছু একটা বড় জবাবেরই তরঙ্গনা করছিল, ইতিমধ্যে খাবারের আসনে ডাক পড়ার কথা খেয়ে গেল।

রায়ে শুধু শোবার আগে একবার প্রয়োজনীয় কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুনেছি, সারা বাড়ীতে তুমিই সকলের আগে ওঠে মিস্র! ছ'টার আগে ত নিশ্চয়ই! উঠেই আমাকে ডেকে দিও, কেমন?'

—'কেন, আপনাদের ঐ বিনয়-বিদ্যালয়ে কিছু কাংসন আছে নাকি?'

এসে অবধি যে কথাটার আদৌ জ্ঞানান দিই নি, এবারে সে কথাটা আর না বলে পারা গেল না; বললাম, 'না, সকালের ডাউন বসে মেলেই আবার আমাকে কলকাতার কিরতে হবে।'

তুনে মুখখানি যেন কেমন ক্যাকাশে হয়ে গেল মিস্রয়। অভিমানের কণ্ঠে বলল, 'এমনি করে একটা দিনের জন্তে তবে না এলেই পারতেন।'

বললাম, 'একটা দিনই কি কিছু কম! এর পর তুমি গেলে তবে আবার আসব।'

মিস্র এবারে নির্বাক। মুখ গভীর করে এক সময় কোথায় এক দিকে নীরবে উঠে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম—সারা বাড়ীটাতেই সেই গাড়ীর ঘোষণা ছাপ। বরেন কাছে থাকলে তাকে একবার শেখরকা করতে বলতাম, কিন্তু ডেকে ডেকেও কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না।

দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে শিবানী বললেন, 'লেখকেরা একটু খেলালী ধরনের হয় জানতাম, কিন্তু তাই বলে আপনার মত এমন পাগলামি কেউ কখনও করে? তখন রায় দিই নি, এবারে যদি তার প্ররোগ করে বলি, কালই যাওয়া হতে পারে না, তবে?'

বিনীত কণ্ঠে বললাম, 'তবে শুধু আমার উপর নয়, সংসারে এমন অনেক নিরীহ ব্যক্তি আছে, যাদের উপর একই সঙ্গে অবিচার করা হবে। বহু জনের সঙ্গে বহু ভাবে জড়িয়ে আছি, তা ছাড়া সময় এবং তাবিল দিয়ে এন্গেজমেন্টও রয়েছে অনেকের সঙ্গে, কথার খেলাপ হলে নিজেরই কিছু সম্মান রক্ষা পাবে? একটা দিনের এই যে আনন্দ লুটে নিয়ে গেলাম, এই কি কিছু কম?'

—'সারা দিনটা ত বাইরে বাইরেই কাটিয়ে এসেন, আনন্দ আর পেতে দিলেন কোথায়?' বলে শিবানী আর এক মিনিটও দাঁড়ালেন না, দরজার আড়ালেই এক সময় আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাণী এসে এক সময় নীরবে শশাঙ্গীটা তুলে দিয়ে গেল বিহানার চারপাশে। মুখের দিকে তাকিয়ে রান একবার হাসল, বলল, 'হান, কথা বলবেন না আমার সঙ্গে।'

সত্যিই এত বড় অপরাধের বুঝি ক্ষমা নেই কারুর কাছে! বললাম, 'কথা না বল, কিন্তু চিঠি দিও এবার থেকে, খুব বড় চিঠি।'

কি ভেবে হঠাৎ যেন মিনিট দু'তিনের জন্ত একবার আমার চোখের দিকে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়াল বাণী, তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনেই হ'ল না যে বাংলার চুর্কা-শীতল মাটিকে ছেড়ে ঘুর প্রান্তরে কোথাও এসে নোঙর করেছে। বাংলার স্ক্রামল প্রাণ আর বাংলার নারীর হৃদয়-নিউট্রানো স্নেহ খণ্ড খণ্ড তীর্থশীলার মত ছড়িয়ে আছে এই মুম্বীতলাইয়ার প্রকৃতিপুঞ্জ। ঐতিহাসিক তাই বুঝি যুগে যুগে বাংলার আপন সহোদরা বলে বার বার স্বাগত জানিয়েছে বিহারকে।

মিস্র না ডাকতেই ভোবে ভোবে ঘুম ভাঙল। আবার সেই 'জবাকুসুম সঙ্কাসং—' একটু একটু করে সূর্য উঠল মুম্বী-তলাইয়ার আকাশে, সূর্য উঠল বিহারের সপ্তদিগন্তে। একটা দিনের শুধু পরিবর্তন।...কত কাহিনীর উপরেই ত লেখনী সঞ্চালন করে চলেছি জীবনে। কিন্তু চিরদিনের এই আসা-যাওয়ার পথের পাশে পাশে যত অভিজাত্য, যত হুংস আর যত স্নেহ এই পোড়া হুঁচোপ মেলে হৃদয় দিয়ে অমূল্য করে গেলাম—তা কি সত্যিই কোন দিন ভাষার ফুটিয়ে তুলতে পারব?

সূর্যের আলোর ঘাসের বুকে শিরিষিকুণ্ডলি মুক্তার মত চক্চকু করছে।...

বরেনকে ওরা কিছুতেই ছুটি দিল না, জোর করে আটকে রেখে দিল।

শকর শুধু একবার ছোট করে বলল, 'আবার খুব তাড়াতাড়ি করে এস।'

বললাম, 'চেষ্টা করব।'

ষ্টেশনে এসে পৌঁছতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। চেয়ে দেখলাম—পাহাড়ের চূড়ার চূড়ার লাল সূর্যরশ্মি পড়ে উজ্জল রশ্মি মত জ্বলছে। বোকে ছেয়ে গেছে দিকপ্রান্তর।—অতর্কিতে হঠাৎ একবার কেন যেন মনে পড়ে গেল অমিরকান্তির কথা—অমিরকান্তি ভট্টাচার্য। তার ঐ বার্ষিক যোগসঙ্গীত জীবনে আজকের মত এই সূর্য ওঠা আবার নতুন করে সকল হবে ত?





# ‘শিক্ষা-সঙ্কট’ সম্পর্কে দু-চারটি কথা

শ্রীসেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কানুন বাসের ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের ‘শিক্ষা-সঙ্কট’ শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িলাম। আমি শিক্ষাবিদ নহি; সুতরাং যোগেশবাবুর প্রবন্ধের সকল বিষয় আলোচনা করিবার মত আমার বিদ্যা ও জ্ঞান নাই। তবে অতি সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, যোগেশবাবুর চিন্তাধারার সঙ্গে আমার মত সাধারণ বহু ব্যক্তির চিন্তাধারা প্রায় মিলিয়া যাইবে। যোগেশবাবু আমাদের অতীত শিক্ষাপ্রণালী কি ছিল ও ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রণালী কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সমরোপযোগী হইয়াছে; এবং আশা করি তাহার প্রবন্ধ শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বহু শিক্ষাবিদ, বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, বহু কমিটি, কমিশন প্রভৃতিও বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি দেখাইয়াছেন এবং ভবিষ্যতের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সুনির্দিষ্ট প্রণালীরও নির্দেশ দিয়াছেন। কমিটি-কমিশনের শেষ নাই; এখনও কমিটি-কমিশন বসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও বসিবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেশোপযোগী কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা হইল না। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হইয়াছে, আরও কত কি শিক্ষা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, অর্থের প্রাচুর্য হইতেছে; কিন্তু যোগেশবাবুর কথার বলিতে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই “Putting new wine into old bottle”-এর কাজই চলিতেছে।

বাহা ইউক, যোগেশবাবুর প্রবন্ধের শিরোনামের ‘সঙ্কট’ কথাটি ধামরা পল্লীগামবাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হাড়ে হাড়ে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি; হু’একটি উদাহরণ দিলেই আমাদের সঙ্কটের কথা বুঝা যাইবে। কৃষির প্রতি অমুদারী পল্লীবাসী একটি যুবককে বাড়গ্রাম ফরি কলেজে ‘আই-এসসি ইন এগ্রিকালচার’ অধ্যয়ন করিবার জন্য আমি উৎসাহিত করিয়াছিলাম। যুবকটি নিয়মধারিত সম্প্রদায়-ভুক্ত, আর্থিক অবস্থা অতি অসচ্ছল। তাহার অভিভাবকদের দত্তি কষ্টে যুবকটির কৃষি কলেজে অধ্যয়নের ব্যয় বহন করিতে হইত। তখন বাড়গ্রাম কৃষিকলেজে ‘বি-এসসি ইন এগ্রিকালচার’ অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। যুবকটির নিজের ও তাহার অভিভাবকদের এবং আমারও ধারণা ছিল যে, যুবকটি বাড়গ্রামেই বি-এসসি ইন এগ্রিকালচার অধ্যয়ন করিতে পারিবে। কিন্তু যুবকটি বখন আই-এসসি ইন এগ্রিকালচার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইল, তখন বাড়গ্রাম ফরিকলেজে বি-এসসি ইন এগ্রিকালচার অধ্যয়নের ব্যবস্থা আর ছিল না। ইহার পর যুবকটিকে যদি বি-এসসি ইন এগ্রিকালচার পড়িতে হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার উপকণ্ঠে টালিগঞ্জে কৃষিকলেজে পড়িতে হইবে। তাহাকে কলেজ-সলয় হোটেলে থাকিতেই হইবে। সে কাহারও

বাড়িতে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। তাহার শিক্ষা সম্পর্কে এইখানেই সঙ্কট উপস্থিত হইল। হোটেলে থাকিয়া কৃষিকলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য মাসিক প্রায় ৮০০ টাকা খরচ হইবে। তাহার অভিভাবকদের পক্ষে এত অধিক অর্থ সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব ছিল; বাড়গ্রামে বাহা খরচ হইত তাহার চতুর্গুণ খরচ হইবে টালিগঞ্জে। সুতরাং যুবকটিকে তাহার উচ্চতর কৃষিশিক্ষার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল। এবং সে বর্তমানে কলিকাতার এক আশ্রমের বাড়িতে অবস্থান করিয়া কোন কলেজে অর্থ বেতনে বি-কম পড়িতেছে; আর দিনে চাকুরী করিতেছে। অথচ উচ্চতর কৃষিশিক্ষার জন্য পল্লীগামবাসী দৈনন্দিন জীবনে কৃষির সহিত জড়িত যুবকগণকেই অধিকতর সুবিধাপ্রদান করা আবশ্যিক। পল্লীগামবাসী বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু যুবককে নিজ নিজ বৃত্তি সম্পর্কীয় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য এইরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং বৃত্তিজীবীসম্প্রদায়ভুক্ত যুবকগণকে ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর কিংবা আই-এ, আই-এসসি পরীক্ষার পর চাকুরীর জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়; বাহারা চাকুরী পায় তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে এবং বাহারা চাকুরী পায় না তাহারা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, নিজেদের বৃত্তিতে কিরিয়া যায় না। আমার বক্তব্য আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পল্লী অঞ্চলে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে কৃষির সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছাত্রগণের সংখ্যাই অধিক; কিন্তু বিদ্যালয়সমূহে তাহাদের বৃত্তির সহিত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। ইহার কলে তাহারা নিজেদের অভিভাবকগণের বৃত্তিকে অসম্মানজনক মনে করে এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর তাহারা নিজেদের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জনের পথ পরিত্যাগ করে। ইহার কলে তাহাদের অভিভাবকগণকে অতি জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। কৃষিকলেজে তাহারা তাহাদের ‘শিক্ষিত’ সম্মানসেব কোন সাহায্য পায় না, কৃষিও অবনতিপ্রাপ্ত হয়। পল্লীগামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার, বাহা সহিত কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। ইহা ছাড়া পল্লী অঞ্চলের এক-এক স্থানে এক-এক বৃত্তিজীবীর সংখ্যা অধিক। এই সংখ্যা অল্পসংখ্যে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃত্তিজীবী বৃত্তি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকাও দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি, আমার অঞ্চলে তত্ত্বাবধায়ক সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক; কিন্তু স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নত বয়স শিক্ষালাভের কোন সুযোগ নাই। হু’বের কথা আর কত বলি? গত চারি বৎসর আমার অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর অমুষ্ঠান হইতেছে; সরকারী শিক্ষা-বিভাগ এই প্রদর্শনীতে নানাবিধ শিক্ষাজাত দ্রব্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু উন্নত



তাঁদের সাহায্যে উন্নত বহনপ্রণালী হাতেকলমে দেখান না ;  
তাঁহাদিগকে বহু অভ্যস্ত করিয়াছি, কিন্তু কোন কল হয় নাই ।

ইহা বাতীত পল্লী অঞ্চলের বহু যুবকের এক-একটি বৃত্তির প্রতি  
জাতাবিক ঝোঁক থাকে । উদাহরণস্বরূপ একটি যুবকের কথা  
বলিতেছি : যুবকটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে ।  
চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় সে খুবই পটু ; তাহার চিত্রাঙ্কন দেখিয়া বহু  
শিল্পী আশ্চর্য্য হইয়াছেন এবং তাহাকে কলিকাতায় আট কুলে  
অধ্যয়ন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন । কিন্তু সে মার্টিন এণ্ড  
কোম্পানীর রেলের টিকিট কালেক্টারের পর পাইবার জন্য দরখাস্ত  
করিয়াছে, এমন কি সে দরখাস্তের সঙ্গে তাহার জ্ঞাতিত একখানি  
চিত্রও পাঠাইয়াছে । বলিতে পারি না, তাহার এই অঙ্কন-বিদ্যা  
টিকিট কালেক্টারের কাজে সাহায্য করিবে কিনা । নিজের অভিজ্ঞতা  
হইতে এইরূপ বহু উদাহরণ দিতে পারি । স্ত্রবোগ, স্ত্রবিধা,  
শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রধানতঃ অর্থের অভাবে এইরূপ কত যুবকের  
জাতাবিক প্রতিভা অন্ধুয়েই বিনষ্ট হইতেছে । জাতির পক্ষে এই  
অপচয় কম নহে ।

শিক্ষার সঙ্কট পদে পদে রহিয়াছে, অভিভাবকগণের অভিযোগের  
অন্ত নাই : বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন, পুস্তকের প্রাচুর্য্য ও মূল্য,  
প্রতি বৎসর পুস্তকের পরিবর্তন, খাতা পেন্সিলের প্রয়োজনীয়তা,  
শিক্ষাদানকাৰ্য্যে শিক্ষকগণের অবহেলা ও অশুপযুক্ততা, বিদ্যালয়ের  
ছাত্রগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি সম্বন্ধে কত রকম যে অভিযোগ  
আছে তাহা বলা যায় না । শিক্ষকগণের কর্মবিরতি আন্দোলন  
সম্পর্কে বহু অভিযোগও উদ্ঘাটিত হইয়াছে । এই সকল  
অভিযোগের মধ্যে অভিভাবকগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে বিশেষ  
কোন অভিযোগ শুনা যায় নাই । শিক্ষকগণের বেতন যে কম,  
তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে  
প্রাইভেট টিউশনের দ্বারা অর্থ উপার্জন না করিলে তাহাদের যে  
সংসার চলিতে পারে না, একথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন  
না । বহু অভিভাবকের অভিযোগ এই যে, শিক্ষকগণ প্রাইভেট  
টিউশনের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান  
কাৰ্য্যে তাহাদের মনোযোগ কম ; বিদ্যালয়ে তাঁহারা 'দিনগত  
পাপকর' করেন । জানি না, শরৎ ও পল্লী অঞ্চলের মোট শিক্ষক-  
গণের মধ্যে শতকরা কত জন প্রাইভেট টিউশনের সুযোগ ও  
সুবিধা পান ।

এই সকল অভিযোগের মধ্যে হয়ত কতকটা সত্য আছে ; কিন্তু  
শিক্ষকদের অর্থকষ্ট মোচন করিবার উপায় কি ? সরকার বলিবেন,  
তাঁহাদের তহবিলে এত অর্থ নাই যে শিক্ষকসম্প্রদায়ের বেতনের  
হাফ বর্ধিত করিয়া তাঁহাদের অর্থকষ্ট দূর করিতে পারেন ।  
অভিভাবকগণ বলিবেন আমরা হুঃখ-হৃদশাঘ্র চরম সীমার উপনীত  
হইয়াছি । ছাত্রদের বেতন বাড়াইয়া বর্ধিত হাফে শিক্ষকগণকে  
বেতন দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে  
ন । উভয় পক্ষের কথাই হয়ত ঠিক । এই প্রসঙ্গে অভিভাবক-

গণের উদ্দেশ্যে দুই-একটি কথা বলিতে চাই : সম্ভান-সম্মতিগণের  
প্রাসাঙ্গিকতার, চিকিৎসা প্রভৃতির ভারও যেমন সাধ্যমত বহন  
করিতে হইবে শিক্ষার ভারও তেমন বহন করিতে হইবে । মনে  
রাখিতে হইবে জাতির জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অল্পবয়সে  
অপেক্ষা কোন অংশে গোঁপন নহে । বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন  
মাথাপিছু চারি আনা বা আট আনা বাড়াইলেই অভিভাবকগণের  
মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইবে, কিন্তু ধান্দা, বস্ত্র এবং অগ্রগত  
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যে কত বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত  
অভিযোগ আছে, কিন্তু আন্দোলন নাই । অথচ ছাত্রগণের  
মাথাপিছু বেতনের হার চারি আনা বা আট আনা বাড়িলে শিক্ষক-  
গণের আর্থিক সম্বলতা কিছু বাড়িবে এবং তাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা-  
দানে অধিকতর মনোযোগ দিতে পারেন ।

এই প্রসঙ্গে আরও দুই-একটি কথা বলিব এবং তাহা নিজের  
অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি ; এই সম্পর্কে নিম্নেরও ত্রুটি  
আছে । এমন বহু মহাবিশ্ব পরিবর্তন দেখিয়াছি যে, স্ত্রী, পুত্র,  
কন্যা প্রভৃতি সিনেমায় বাইতেছেন, প্রসাধন দ্রব্যাদি ব্যবহার  
করিতেছেন, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, লোক-  
লৌকিকতারও বিরাম নাই, তৎসংস্রাসেরও কন্দু নাই । কিন্তু  
পুত্র-কন্যাস্থানের পুস্তক ক্রয় করিবার সময় অর্থের অভাব দেখা দেয়,  
এবং বাসের পর মাস পুত্র-কন্যাস্থান পুস্তকের অভাবে নিয়মিত  
পাঠাভ্যাস করিতে পারে না । এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে—যে  
ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহে চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিলাম, কিন্তু  
পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য এক জন গৃহশিক্ষক রাখিতে পারিলাম না ।  
আমাকে কেহ তুল বুঝিবেন না, আমার বক্তব্য হইতেছে, যে-সকল  
কাজকে আমরা অবশ্রম্যকরীয় বলিয়া মনে করি তাহা সম্পাদনের  
জন্য কষ্টে-সুখেও আমরা অর্থ সংগ্রহ করি ও ব্যয় করি । কিন্তু পুত্র-  
কন্যাস্থানের শিক্ষার বেলায় আমরা বীতিমত কাপণ্য করি । অনেক  
ক্ষেত্রেই সেই দিকে তত মনোযোগ দিই না । আমার এই মন্তব্য  
যে সকল ক্ষেত্রেই প্রবোদ্ধ তাহা নহে । স্ত্রতয়া শিক্ষার পথে  
বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন সঙ্কট আছে ।

এতদ্ব্যতীত খান ভানিতে শিবের গীত গাহিলাম । হয়ত অবশ্যের  
অনেক কথাই বলিয়াছি । আসল কথা হইতেছে, শিক্ষার জন্য  
সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে, অভিভাবকগণেরও সেইরূপ দায়িত্ব  
আছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকগণ পুত্র-কন্যাস্থানের শিক্ষার  
দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপরেই ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন ।

শিক্ষার মোড় ঘুরাইতেই হইবে । বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের  
জন্য পল্লী অঞ্চলেই বিভিন্ন উন্নত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে  
হইবে । সেই শিক্ষাব্যবস্থা এমন হইবে, বাহাতে পল্লী অঞ্চলের  
যুবকগণ সেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজ নিজ বৃত্তিতে কিরিয়া  
বাইতে পারে এবং তাহাকে উন্নত করিতে পারে । তবেই সমাজের  
স্থিতি হইবে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ একই সঙ্গে সাধিত  
হইবে । এই সম্বন্ধে যোগেশবাবুর বক্তব্য বিশেষ প্রশিধানযোগ্য ।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। পদী-অঙ্কলবাসী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত স্বকণ্ঠ কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে অধ্যয়নের জন্য আসিলে তাহারা এক নূতন পরিবেশের মধ্যে পতিত হয়। ক্রমশঃ নূতন পরিবেশের সুখ, সুবিধা,

স্বাস্থ্য তাহাদের আকর্ষণ করিয়া কেলে, গ্রামের পরিবেশে তাহারা আর কিরিয়া বাইতে চাহে না। শিক্ষা সম্পর্কে এই দিকেও দুই দেওয়া দরকার। ইহাও একটি সত্য।

## জৈন কবিদিগের উপরে মেঘদূতের প্রভাব

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ভারতীয় সর্বসম্প্রদায়ের কবি-মণ্ডলীর চিত্তের উপর কমবেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলতঃ মহাকবির মেঘদূত যে প্রকার প্রভাব সকল সহস্রয় ব্যক্তির মনের উপরে বিস্তার করেছে, এমন কি তাঁর রচিত অন্ত কোন গ্রন্থ তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে হয় না। মেঘদূতের প্রত্যেক শব্দ, পাদ, পাদার্থ প্রভৃতি অবলম্বনে শত শত গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে, মেঘদূতের রচনা-পদ্ধতিও দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত প্রভৃতি সর্বাধিক বিষয়কে অবলম্বনপূর্বক পরবর্তী ভারতীয় কবিগণ প্রয়োগ করেছেন, জৈন কবিগণও মেঘদূতের প্রভাবে হয়েছেন বিশেষ প্রভাবান্বিত। জিনসেন-বিরচিত পার্শ্বাত্মদয় বহু-তপাগচ্ছীয় চারিত্রসুন্দরগণি-বিরচিত শীলদূত (সংবৎ ১৪৮৪), খরতরগচ্ছীয়, কবি বিমল কৃতি-বিরচিত চন্দ্রদূত (সংবৎ ১৬৮১), মেঘবিজয়-বিরচিত মেঘদূতসমজ্ঞা, লেখ, চেতোদূত, নাথুরাম বিরচিত হংসপদাঙ্কদূত, নিত্যানন্দ-বিরচিত হনুমদূত প্রভৃতি জৈন কবি-বিরচিত দূতকাব্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আজ আমরা এই প্রবন্ধে অবশুত রামযোগি-বিরচিত সিদ্ধদূত কাব্য এবং মন্ত্রী শ্রীবিক্রম-প্রণীত শ্রীনেমিদূত কাব্য এই বিশিষ্ট জৈন দূত কাব্যদ্বয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি।

### ১। অবশুত-রামযোগি-বিরচিত সিদ্ধদূত কাব্য

এই দূত কাব্যখানি মেঘদূতের চতুর্থ চরণের সমস্তাপুতি-রূপে লিখিত, প্রতি স্লোকের প্রথমাদি তিন চরণ কবির স্বয়ং-কৃত আর চতুর্থ চরণ মেঘদূতের—ইহাই কাব্যশরীর। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় এরূপঃ—কোন এক যোগী যোগ-সিদ্ধির অন্ত রমণীয় পর্বতশ্রেণী বাস করছিলেন। তৎকালে আকাশে বহুদুটি তিনি দূরে এক শুভবর্ণ পুরুষকে দেখে ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্বক নিজ প্রিয়া 'বিদ্যা'র নিকট পাঠাতে মনস্থ করলেন। ঐ বিদ্যা হিমালয়ে মহাধোবের পুরীতে বাস করেন, তাই দূতরূপী সিদ্ধ-

পুরুষকে হিমালয়ে যেতে হবে—এটিই সংক্ষেপে প্রতিপাদ্য বিষয়।

যোগী বিদ্যালোভ কামনার এক সিদ্ধপুরুষকে মহাযোগী মহেশ্বরের কাছে পাঠাচ্ছেন, অতএব গ্রন্থখানি যে যোগবিষয়ক তা বলাই বাহুল্য। মেঘদূতকে শাস্ত্রসংপ্রদান যোগমার্গে পূর্ণভাবে পরিচালিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়; এ প্রচেষ্টায় আমাদের কবি কিন্তু পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

প্রায়োহ্যাস্ত্রং ভগতি বিরসং তেন কেবাং জনানাং

নাতান্ত্রং শ্রাদ্ধ তিস্থককং চেতসীবাশ্রয়িতুম্।

যেবাং বোধো বসতি হৃদয়েহুৎসাহং সংস্করণাং

তেষামেতন্ন ভবতি পৃথগ্ বস্তুতত্ত্বাযমেব। ১২৫।

ভাবার্থ এই যে, আধ্যাত্মিক ব্যাপার নীরস বলে কতকগুলি লোকের কাছে তা সুখকর হয় না, কিন্তু যাদের জ্ঞানোদয় হয়েছে, তাঁরা আর অধ্যাত্ম সাধনাকে (জাগতিক বিষয় হইতে) আলাদা মনে করেন না।

অতঃপর কবি এরূপ ব্যক্তিত্বপ্রায়ক (সম্বেশপ্রেরক, সম্বেশহারক ও সম্বেশপ্রাপক) কাব্যরচনাও যে বুদ্ধিজন্মমূলক তাও স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন :

যতো যোগী ন ভবতি পৃথক্ সোহপি সিদ্ধোহপি চাহং

বিভাংপ্যজ্ঞা ন ভবতি যথা বস্তুতো বাস্তবীয়া।

একং ব্রহ্ম স্মৃতি ভগতি ব্যাপকং বদ্যপীথং .

বুদ্ধিজাত্য্য পৃথগিবা সদা দৃষ্টতে কথ্যতে বা। ১২৬

দূতপ্রেরক যোগী আমি অন্বপদপ্রতিপাদ্য বস্তু হতে ভিন্ন নই, যে সিদ্ধকে আমি দূত করে পাঠাচ্ছি সেও আমি এবং যে বিদ্যার কাছে পাঠাচ্ছি তাও আমাত্তর নয়; সকলই এক ব্রহ্ম, বুদ্ধিজন্মে পৃথক বলে দৃষ্ট বা কথিত হয়।

মূল কাব্য সম্বন্ধে হু'এক কথায় বলতে গেলে এ বলতে হয় যে, যোগ-বিষয়ক বলে কাব্যখানি স্বভাবতঃই কঠিন হতে বাধ্য, তদুপরি পরকৃত কাব্যের অন্তর্ভবন তাও আবার মেঘদূতের মত অতি বিশিষ্ট কাব্যের। নিজ কাব্যের উপযোগী

করার ক্ষমতা কবি কোন কোন স্থলে মেঘদূতের অর্থাভার করনা করেছেন এবং এরূপ অর্থাভারীকরণ স্থলেই কবিতাগুলি একটু জটিল হয়ে পড়েছে। কোন কোন স্থলে আবার কাকু প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে বিধিবলক অর্থকে নিষেধবলক করা হয়েছে। যেমন—

যক্ষসীপাং লতিতবচনৈঃ প্রেমপিভীকৃতানাং

সদাঃ পুংসাং জয়হরণোদায়মায়াবিনীনাম্।

অন্তর্ভূত্যা বিষয়বিরহাদ্ভীকৃতভা কিং

“লোলাপাট্টদ্বিধি ন রমসে লোচনৈর্বিধিতোহসি। ২।৩০

অর্থাৎ, [ বাহু ] বিষয়শূন্য অন্তর্ভূত ষ্টি দ্বারা যে সময়ে তুমি মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করবে, তখন যদি মনুষ্যের জয়-হারিণী উদ্যম মায়াবিনী প্রেমময়ী যক্ষ রমণীগণের লোলাপাট্ট নেত্রপংক্তি দ্বারা আকৃষ্ট না হও তা হলে কি তুমি বঞ্চিত হবে? [ কখনই না ]। কালিদাসের সমস্ত ভাব অম্লকরণ করেও কবি স্থানে স্থানে কালিদাসের বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করেছেন। কালিদাস বলেছেন—লোলাপাট্ট লোচনের সহিত ক্রীড়া না করা আশ্চর্যকর। ছাড়া কিছুই নয়, কিন্তু যোগী বলেন যে, তা সাংসারিক অবস্থায় হলেও যোগাবস্থায় নয়।

“রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়” (২২)

সমস্যাটিকে প্রাণায়ামের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। কবি বলছেন, যেহেতু রিক্ততা লঘব উৎপাদন করে থাকে এবং পূর্ণতা গৌরবের নিধান হয়, তুমি প্রাণায়াম করার সময় কেবল রেচন করেই বিরত হবে না, পূরণও করো।

“জাতাশ্বাদো বিপুলজঘনাং কো বিহাভুঃ সমর্থঃ” (৪৬)

এর পূরণকল্পে বলা হয়েছে যে, হনুমান্ শুক প্রভৃতিই ধন্য, কারণ তাঁরা ঘোবনেও কামোদ্ভাস্তাদের হাবভাবে বিচলিত হন নি। অজ্ঞাতের সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া একান্তই ক্লেশকর; যেহেতু আশ্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপুলজঘনাকে পরিত্যাগ করা অসাধ্য। সিদ্ধপুরুষের গমনপথে বৈ সকল অসাধু ব্যক্তি থাকবে, মেঘদূতের শরভগণের জ্ঞান কবি তাঁদের ভিত্তিকার করতে উপদেশ দিচ্ছেন—

শ্রদ্ধাহীনা বিকলরক্তয়ো গর্বিণঃ ক্রুরতাবা

বিদ্যাভ্যাগে বিগতবিনয়া জ্ঞানতো নষ্টবৃত্তাঃ।

সংকরস্তো বদপি ভদপি বেদহা ভৎসয়েন্তান্

“কে বা ন শ্রুঃ পরিতপসঃ নিফলারক্তবৃত্তাঃ”। ৪৮।

উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত কয়টি থেকেই প্রমাণিত হবে যে, কবি বেশ নিপুণতার সঙ্গে, বেশ সফল ভাবেই, তাঁর আরও কার্য—সমস্তাপূর্তি রূপ দূতকাব্য নির্মাণ সমাধা করেছেন।

বলা বাহুল্য, যেহেতু আলোচ্য গ্রন্থ মেঘদূতের সমস্তাপূর্তি, সেজন্য উক্ত গ্রন্থ মন্ডাক্রান্তা হচ্ছেই লিখিত

হয়েছে। এ গ্রন্থে মেঘদূতের ১২৩টি কবিতা ছিল, এ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সর্বসময়ে ১৩৮টি শ্লোকে গ্রন্থ সমাপ্ত। এই ১৩৮টি শ্লোকের মধ্যে গ্রন্থরচনার কালসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু অতঃপর আরও দুইটি শ্লোক দেখা যায়। এর প্রথমটিতে এরূপ লিখিত আছে :

শ্রীবিজয়মার্কণ্ডেয়নিবন্ধকাল্যাণ

কালে গতেহয়িনরনাশুধিচন্দ্র (১৪২৩) সংখ্যে

বর্ষে বৃতে তপসি মাসি মিতৈকশেষে

শেষেণ শঙ্করচন্দ্রাভিত্য রামঃ (?) ॥

এর থেকে ১৪২৩ সংবৎ বা ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ গ্রন্থরচনার কাল প্রমাণিত হয়। সর্বশেষ চূর্ণকেও এরূপ লিখিত আছে—“সংবৎ ১৪২৩ বর্ষে মাঘবদি ১৪ (?) শুক্রে জাতমিদম্। পাণ্ডুলিপির কাল এরূপ লিখিত—সংবৎ ১৭০০ বর্ষে আশ্বিনি সুদী দশরহা (দশম্যাং) বৃথে লিখিতমিদম্ পণ্ডিত খেমজী-লিখিতম্।

## ২। মল্লিবর্ষ শ্রীবিজয়-প্রণীত শ্রীনেমিহূত

এ দূতকাব্যখানিও মেঘদূতের চতুর্থপাদের সমস্তাপূর্তি। এ গ্রন্থের কর্তা সাক্ষণপুত্র মল্লী শ্রীবিজয়। জৈনসম্প্রদায়ের দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের চরিত্রে অবলম্বনে এ গ্রন্থ লিখিত। নাম দেখে মনে হয় যেন নেমিকেই দূত করে পাঠান হয়েছে, বস্তুতঃ কিন্তু তা নয়, নেমিকে দূত করে পাঠান হয় নি, নেমির কাছেই অস্ত্র এক দূত পাঠান হয়েছিল।\*

কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় এরূপ—নেমিনাথ সমস্ত মূখ-ভোগ পরিত্যাগ করে এমনকি (স্বীয় পত্নীরূপে নির্দিষ্ট) রাজা উগ্রসেনের (কংসের পিতা) কন্যা রাজমতীকেও পর্বত পরিত্যাগ করে মোক্ষ কামনায় বৈবতক পর্বতের শিখরে যোগসাধনার ব্যাপৃত হয়েছিলেন। তখন তৎপত্নী রাজমতী এক ব্রাহ্মণকে দূত করে তাঁর কাছে পাঠান (১০৭) পরে নিজেই পিতার অনুমতি নিয়ে একজন সখীর সঙ্গে বৈবতকে

\* প্রকৃত অর্থের অনুবোধে নেমিহূত শব্দের যোগার্থ গ্রন্থপ করতে হবে—নেমির নিকট প্রেরিত দূত—নেমিহূত, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, লক্ষণাধারা গ্রন্থ বৃত্ততে হবে।

† ইতিবৃত্তাংশ এরূপ—কংসের পিতা বহুবল্লভের সমুদ্রবিজয় নামে এক ভ্রাতা ছিলেন, নেমি তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনের কন্যা রাজমতীর সঙ্গে নেমির বিবাহ স্থির করেন। নেমি অনিচ্ছাসম্বন্ধে অগত্যা স্বীকৃত হলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখলেন যে বরব্রাহ্মণের ভোজনীয় অন্ন শত শত হাগ বালি দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি দৃঢ়চিত্তে সমস্ত পরিত্যাগ করে বৈবতক পর্বতে তপস্যা আরম্ভ করেন।

গমন করেন। রাজীমতী নৈমিকে বৈবতকের উচ্চশৃঙ্গে  
ঢালিয়া দেখে অতিদুঃখে মাটিতে নুটিয়ে পড়েন :

সা.শোকাভাঃ ক্ষিতিকলমগাঃ ভ্রাম্য হঃখং হি নাৰীঃ

কঠোরপ্রণয়িনি জনে কিং পুনরুৎ সংস্বে ?০৥

তখন ঐ বৈবতক পর্বত স্বয়ং—

তাং হঃখাভাঃ শিশিরসলিলাসারসারৈঃ সসীর্ষৈ-

বাধাস্তেব স্মৃতিকুটজামোদমঞ্জালিনাদৈঃ ।

সাক্ষীমত্নিঃ পতিমমুগতাং তংপদভাসপূতঃ

ঐতঃ ঐতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥৪॥

পর্বতের স্বাগত সম্ভাষণে আশঙ্ক হয়ে রাজীমতী তখন  
তাকেই দূত করে নেগির কাছে পাঠালেন। অবশেষে নৈমি  
সহর হয়ে রাজীমতীকে নিজ যোগসহচরী করে মোক্ষ-  
স্থলের অধিকারিনী করেছিলেন। এটাই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

এই কাব্যে মোট ১২৬টি শ্লোক। গ্রন্থপরিচয়স্বক  
অন্তিম শ্লোক বাদে ১২৫টি সমস্যাপূর্তি। এর মধ্যে আবার  
প্রথম ছয়টি শ্লোক, ৮৮তম শ্লোক ও শেষের দুইটি মোট  
নয়টি কবির নিজ বাক্য; ৮৯তম শ্লোক হইতে ১২৩ শ্লোক  
পৰ্যন্ত ৩৫টি শ্লোক রাজীমতীর সখীর বাক্য। অবশিষ্ট ৮টি  
শ্লোক রাজীমতীর নিজ বাক্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে,  
উপসংহার শ্লোকসহ (যাহা সমস্যাপূর্তির অন্তর্গত নহে) মোট  
দশটি শ্লোক কবিবাক্য। উপসংহার শ্লোকটি এইরূপ :

সমুতার্হাঃ প্রবরকবিনা কালিদাসেন কাব্য-

দম্ভাঃ পাদং সুপদরচিতাদ্ মেঘদূতাদ্ গৃহীত্বা ।

ঐমল্লৈশ্চৈবচরিতবিশদং সাক্ষণস্যাক্ষর্যম্।

চক্রং কাব্যং বুধজনমনঃপ্রীত্যে বিক্রমাখ্যঃ ॥

এর থেকে কবির নাম বিক্রম এবং তিনি সাক্ষণের পুত্র  
এই পর্বন্ত অবগত হওয়া যায়। কবির কাল সম্বন্ধে কিছুই  
জানা যায় না। খৃঃ সম্ভবতঃ ইনি খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের মধ্য-  
ভাগে জীবিত ছিলেন।

সমালোচনা-প্রসঙ্গে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই  
যে, সমস্যাপূর্তির নাগপাশে আবদ্ধ থেকেও কবি বেক্রপ সহজ  
ভাবে ও সরল ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন তাতে তিনি  
উত্তম কবির পদ পাবার অধিকারী। পূর্বে দুটি সমস্যাপূর্তির  
উল্লেখ করেছি, তা থেকেই কবির রচনাশক্তির পরিচয়  
সুপ্রকট। আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ২৩ শ্লোকে  
রাজীমতী বলছেন তুমি এই পর্বতশৃঙ্গ ত্যাগ কর, নিজ রাজ্যে  
চল এবং সেখানে সুখসন্তোষ কর :

এতন্তুং ত্যজ শিখরিণঃ শৃঙ্গকীকরং

রাজ্যং প্রাজ্যং প্রণয়মবিলং পালয়নং বহুবর্গান্ ।

ব্যব্যে হর্ষো চিরমহুতং প্রাপ্য ভোগানবগুণান্

সোৎকর্ষানি প্রিয়সহচরীসম্ভাগাদিক্তানি ॥২৩॥

অতঃপৰি পৰিপ্রসঙ্গে বামন অবতার ভগবানের পুরীবর্ণন-  
প্রসঙ্গে বলছেন :

যত্র ভক্তান্ মনকতময়ান্ দেহলীঃ বিক্রমাখ্যং

প্রাসাদাং বিবিধমণিভির্মিষিতং বাসনত ।

তুমিঃ মুক্তাপ্রকরচিত্তমুজ্জ্বলাং চাপি দৃষ্ট।

“সংলক্ষ্যন্তে সলিলনিধয়স্তোরমাভাবশেষাঃ” ॥২৪॥

এর ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। একস্থানে রাজীমতীর সখী  
নৈমিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—সখী রাজীমতী পিতৃগৃহে  
একদিন রাত্রে হে স্বামিন্, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?—এ  
বলে সহসা জাগ্রত হলে আমরা তাঁকে বলেছিলাম, হে  
রসিকে, যে তোমাকে চোখ দিয়েও দেখলে না তাকে কি  
তুমি প্রিয়তম বলেই স্বরণ করছ ?

শাযোঃসঙ্গে নিশি পিতৃগৃহে প্রাপ্য নিদ্রাং পুরাসৌ

স্বং ক স্বামিন্ প্রজসি সহসেসতি ক্রবাণা প্রবদ্য।

উচ্যেৎস্বাভিনং ধনু নয়নেনাপি বেনেক্ষিতাসীঃ

“কচ্ছিত্তভূঃস্বয়সি রসিকে স্বং হি তন্তু প্রিয়েতি” ॥২৫॥

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। কবি  
মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের সমস্যাপূরণ করতে গিয়ে  
তাঁর কুমারসম্ভবের চমৎকারিঞ্চও স্বীকার করে নিয়েছেন  
স্বীয় রচনায়। ফলে তাঁর দূতকাব্যের নায়ক হিমালয়ের  
পরিবর্তে বৈবতকশৃঙ্গে যোগসাধনায় নিরত। তাঁর নায়িকা  
এক সখীর সঙ্গে গিয়ে নায়ককে অহুন্নয় করছেন এবং নিজে  
বাহা বলতে লজ্জাবোধ করেছেন, তা সখীমুখে বলেছেন—  
সমস্তই কুমারসম্ভবের সম্ভার। সর্বশেষে এই শ্লোক। এর  
দ্বারা “ক নীলকণ্ঠ ব্রহ্মসি” এই প্রসিদ্ধ বাক্য অনায়াসেই  
মনে পড়ে যায়। কবি বিক্রম কালিদাসের একান্ত ভক্ত  
ছিলেন, সম্বোধনাই। আর দুটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে  
এই প্রসঙ্গের উপসংহার করব। সখী বলেছেন যে, তুমি শীঘ্র  
নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে বহু বান্ধবের ও পিতামাতার  
আশা পূর্ণ কর; বর্ধাকালে বিদ্যাতের সঙ্গে মেঘের ভায়  
রাজীমতীর সহিত তোমার বেন জগৎকালও আর একরূপ বিরহ  
না হয়। (এখানে উপমার মাধ্যমে সমস্যা পূরণ করা  
হয়েছে)।

গদা শীঘ্রাঃ শপুসমতুলাং প্রাপ্য রাজ্যং ত্রিলোক্যং

কীৰ্ত্তিঃ শুভ্রাং বিতম্ভং স্তম্ভনাং পুরাশাং চ শিভ্রোঃ ।

রাজীমত্যা সহ নবঘনস্তেব বর্ধান্ত কুরে

“রা কুদেবঃ ক্ষণমপি চ তে বিদ্যতা বিপ্ররোগঃ” ॥২৬॥

অতঃপর উপসংহারে কবি বলেছেন—রাজীমতীর সখীর  
এই সকল বাক্য শ্রবণ করে নৈমি সহর হলেন এবং  
মোক্ষস্থ লাভ করাবার জন্য রাজীমতীকে নিজ সহচরী  
করলেন :

ভঙ্গ্যোক্তে বচনি সদয়ন্তাং সত্যৈকচিত্তাঃ  
সম্বোধনঃ স ভবিরতো রম্যমর্পদেশৈঃ ।  
চক্রে যোগান্নিজনসহচরীং যোগসৌখ্যাস্তিহতোঃ  
“কেবাং ন স্তানভিমতকলা প্রার্থনা হ্যন্তমেব” ॥১২৪॥

অতঃপর নেমি যোগসাধনা দ্বারা নিজেও যুক্ত হলেন এবং  
সম্ভারীজনোচিত অভীষ্ট ভোগ পরিত্যাগ করিয়ে রাজীমতীকে  
মোক্ষসুখের অধিকারিনী করলেন ।

শ্রীমান্ যোগাচলশিখরে কেবলজ্ঞানময়িন্  
নেমিদে বোবগনরগণৈঃ স্তুয়মানোহধিগম্য ।  
তামানন্ধ্য শিবপুত্রি পরিত্যজ্য সংসারভাজ্যং  
“ভোগানিষ্টানভিমতস্বখং ভোজয়ামাস শব্বৎ” ॥১২৫॥

( অস্তিমি শ্লোক দুটি অবশ্য মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায়  
ধরেন নাই ) । এর দ্বারা কবি যে কিরূপ নিপুণতার সহিত  
ঐর কাব্যরচনা কার্য সম্পন্ন করেছেন, তা পাঠকগণ অনায়াসে  
বুঝতে পারবেন ।

এই কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দূতকে উদ্দেশ্য  
করে কিছু না বলা । সমস্ত কথাই সন্দেশপ্রাপককে সন্ধ্যা  
করে বলা হয়েছে । এ কাব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে ছয় শত  
বৎসর পূর্বেও কালিদাসের মেঘদূতে ১২৬টি শ্লোক ছিল ।

জৈন সাহিত্যের উপরে মেঘদূতের অপূর্ব প্রভাবের আর  
একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—দূতকাব্যের আকারে জৈন কবিগণের  
চাতুর্য্যাস্য সময়ে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সন্দেশপ্রেরণ । এ  
সাহিত্য অতুলনীয় ও অতি বিশাল ।

জৈন ও বৌদ্ধসাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের অতি প্রাণবন্ত  
অঙ্গ । এ উভয় সাহিত্য বিশেষ করে মহাকবি কালিদাসের,  
আরও বিশেষতঃ—মেঘদূতের প্রভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত  
ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য, অধঃগার্গী ও অমৃত্য সাহিত্য  
মেঘদূতের প্রভাবে কীদৃশ প্রভাবিত, তা সহজে বর্ণনা কর  
চলে না । কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাব অপরিমিত  
অনন্তমেয় ।

## তাজ

### শ্রীকালীপদ ঘটক

চোখের জলে ডুবিয়ে দিয়ে  
একটি সুপের স্বপনস্মৃতি,  
আজকে তোমার দেখতে এলাম, তাজ !  
নীল বয়নার হ'কুল ছেপে  
উথলে উঠে প্রিয়ার শ্রীতি,  
বিচ্ছেদে বার হানছে বুকে বাজ ।

শেষ পাখরে দেউল গাঁথে  
হায় বিরহী শাহানশাহা,  
কি প্রেমপাখা রচিরা গেলে, কবি !  
হাজার হীরামতির বৃকে  
রূপ পেলো কি অরূপ বাজা,  
স্বপনভাঙা মরণবাজা ছবি !

তাজবেগমে দিয়েছে মাটি  
এ নাকি তারি কবরখানা,  
এ কথা খাটি সত্য কত নয় ।  
যে প্রেম রূপে দেয় নি ধরা  
জীবনে ধারে যায় নি জানা,  
সরণে হেথা তাতাখি পরিচয় ।

কামনা হেথা কুহুম হয়ে  
অর্থা যাচে প্রেমাপদে,  
খুঁজিয়া কিবে পবন-অতীতাকে ।  
অতম প্রেম পদ্মরাগে  
বিকশে হৃদি অমির হৃদে,  
মানস পটে ধ্যানের ছবি আঁকে ।

বাহারে শ্রমি আজিকে তাজ,  
বাখা বারিখি মখন করি'  
চেউ উঠে গো স্বপন-বয়নার ;  
তারি সে স্মৃতি তর্পণেতে  
করেক কোঁটা অক্ষবারি  
রাখিয়া পেছ তোমার আঙিনার ।

# হোলী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

বসন্তে, নবপত্রেশু বিকশিত হয়ে প্রকৃতির অপরূপ রূপের ছটায় ধিক্রী আলো করে তুলেছে, আর সেই রূপের নৈশা এসে লেগেছে মাতুষের মনে। নরনারী আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে। বসন্তের কিংকর ফুলের রঙের ছোঁপ লেগেছে সবার মনে, তাই রংধোলের আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠেছে নরনারী। ফাগুন এসেছে ফাগ নিয়ে, চারদিকে সুরু হয়েছে নাচগান আর রংধোলের ধুম। কত শতবর্ষ পূর্বে কুরুকানাইয়া বঙে বঙে রাঙিয়ে তুলেছিলেন তাঁর আদরিণী শ্রীরাধার অঙ্গ, ফাগধোলের আনন্দে মশগুল হয়েছিলেন গোপিনীদের নিয়ে, সুন্দরী তরুণী গোপবালাদের হাতে-লাস্তে, নৃত্য মুখরিত হয়েছিল নিকুঞ্জ, রঙের আবির্ভাব রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল বৃন্দাবন। আজ এত যুগযুগ ধরে সেই রংধোলের উৎসব চলেছে গৃহে গৃহে, হোলীর দিনে অযোধ্যা-বাসিনীরা গাইছে :

“ধুম মোটে বৃন্দাবন, যাহা হরি খেলত হোরী  
কেহিন হাত চিঠি লিখ ভেলো, কেহিন হাত সন্দেশ  
যাহা হরি খেলত হোরী।  
পদ্মি হাত চিঠি লিখ ভেলো, কাগন হাত সন্দেশ  
যাহা হরি খেলত হোরী  
কাঁড়ে তোরে বনবনা আর, কাঁড়ে কি পিচকারী ?  
কেশর খোরকে রং বনায়া, মোনে কি পিচকারী  
যাহা হরি খেলত হোরী।”

বৃন্দাবনে হরি হোলী খেলছেন। কার হাতে চিঠি লিখে পাঠাব, কার হাতে খবর পাঠাব। রাধা ব্যাকুল হয়ে বলছেন। সখী উত্তর দিচ্ছে—পাখীর হাতে চিঠি লিখে পাঠাও। কাকের মুখে খবর পাঠাও যেখানে হরি হোলী খেলছেন। তোমার রঙ কি দিয়ে তৈরি করেছ, পিচকারী কি দিয়ে বানিয়েছ ?

কুরুকানাইয়া,  
ভর পিচকারী সন্মুখ হারে ভিজ গরি রাধা পিরারী  
ভরি পিচকারী, তনপর মারি, ভিজ গরি গুল শাড়ী।  
হিলদিল কাগ-ডগর বিচ খেলো,  
উড়ত গুলাল, লাল ভাই বাদল, শোভা বরণ ন যায়।  
কাগুরা বিন যানে ন পাই হো  
করিহো কোন উপায়।  
হারা কুহন ঢোলী লেহ, আওল কি শাড়ী,  
যাহা হরি খেলত হোরী।”

কুরুকানাইয়া সোনার পিচকারী হাতে তুলে সামনে ছুঁড়ে মারলেন। রাধাপিরারী ভিজে গেলেন। আবার পিচকারী ভরে শরীরের উপর রঙ ছুঁড়ে রাধার সুন্দর শাড়ী

ভিজিয়ে দিলেন। রাস্তায় খুব ফাগের উৎসব চলেছে, গুলাল উড়ে উড়ে আকাশ লাল করে দিয়েছে। শোভা বর্ণনা করতে পারি না। রাধা বলছেন, “রঙ না খেলে ত যেতে পারব না, কি উপায় করি। আমার জন্ত সবুজ আর হলধে রঙের ঢেলী আর বেশমী অতি লাল শাড়ী নিয়ে এস, যেখানে হরি হোলী খেলছেন।”

এক নন্দলাল খেলে হোরী  
পহেলী হোরী অন্নন মে খেলে  
কিচর মার করে পোরী (নারী)  
দোসরী হোরী বাগিরানে খেলে  
বঠরন মার করে পোরী  
এক নন্দলাল খেলে হোরী।  
তিসরি হোলী কুরনপর খেলে  
পানি মার করে পোরী।  
চৌধি হোরী মহলিরানে  
রঙলাল করে পোরী।

“নন্দলাল হোলী খেলছেন, প্রথম হোলী উঠানে খেলে সব নারীদের কাঁদা-মাটি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় হোলী বাগিচাতে খেলছেন, আমের মুকুল নারীদের ছুঁড়ে মারছেন। তৃতীয় হোলী কুরার পাড়ে খেলে জল ছিটিয়ে নারীদের ভিজাচ্ছেন। চতুর্থ হোলী অন্দরমহলে খেলে রঙ দিয়ে নারীদের রাঙিয়ে দিচ্ছেন।”

আরি পিরাজী কি চোরি,  
লাল, মুখ সে খেলো না হোরী।  
যো গুন পার শাস হামারি, দেহে লাখন পারি  
লাল, মুখ সে খেলো না হোরী।  
যো গুন পার নন্দ হামারি,  
আপন। বিরপকে (ভাই) কহিএ ধার  
লাল, মুখ সে খেলো না হোলী।  
মব গুন পার খামী হামারি, ধরসে দেহে নিকাল  
লাল, মুখ সে খেলো না হোলী।  
হিন্দু ষটক, মোরি গাপর কোড়ে  
ধর বহিয়া বগ কোড়ি, লাল মুখ সে খেলো না হোরী।”

“আমার স্বামীকে না দেখিয়ে পালিয়ে এসেছি। লাল, তুমি আমার সঙ্গে হোলী খেল না, রাধা ক্রীকৃৎকে মিনতি করে বলছেন। আমার শাড়ী যদি গুনে তোমার সঙ্গে হোলী খেলছি তবে আমাকে লাখ গালি দেবে। যদি আমার নন্দ গুনে তবে তার ভাইকে বলে দেবে। আমার স্বামী বখন একথা শুনে তখন আমাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। লাল তুমি আমার সঙ্গে হোলী খেলতে এস

মা। কিন্তু লাল সেকথা না, তুমি আমার হু' হাত ধরে  
ক'ণিক মেয়ে আমার কলসী কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেছে।"

"বার দে পাগিরা, বোশমতগুয়ালে,

ভারী বড় শির সমরত নাহি

গহেরী বসনা, পাও পরজনিরা,

বোশমতগুয়ালে।

ছোড় ডগর, বানে দেও মোহন

ধর দারুণ বোরে, শান্ত ননকীয়া, বোশমতগুয়ালে।

একটা কাকে ওড়ে কালী কলিয়া

বাত করে যেইসা ছল চিকনিয়া

বোশমতগুয়ালে।

বার দে পাগিরা, বোশমতগুয়ালে,

হরদাস রসবস, ভই গোরালিন

তোমারি চরণকে ভই দাসী, যশোমতগুয়ালে।

( পরজনিরা—পায়ের অলঙ্কার, চিকনিয়া—গুণ্ডা, টাকা—দুপরসা )

রাধা বলছেন, ও যশোমতীনন্দন, আমাকে জল আনতে  
বেতে দাও। ভারী কলসী মাধায় রাখতে পারছি না, যমুনা  
গভীর, পায়ে পরজনিরা, রাস্তা ছেড়ে আমাকে চলতে দাও  
মোহন, ধরে আমার শান্তুড়ী ননক সবাই রাগ করে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার এই কাকুতিতে কান দিলেন না, তাঁর  
উৎপাত সমান ভাবেই চলল। তখন রাধা কপট রাগ করে  
বলছেন, যশোমতগুয়ালে, কাঁধে ত তোমার হু'পয়সার কালো  
কমল, আর কথাবার্তা আচরণ ঠিক গুণ্ডার মত।

শ্রীরাধিকার কৃত্রিম রাগেও যখন কোন ফল হ'ল না,  
তখন রাধা আত্মসমর্পণ করে বললেন, যশোমতগুয়ালে আগি  
গোরালিনী তোমার রূপেণে মুগ্ধ হয়ে গেছি, তোমার  
চরণের দাসী বনেছি। হে যশোমতীনন্দন, পথ ছেড়ে  
আমাকে জল আনতে যেতে দাও।"

বিজ্ঞানে কানাইরা হোলী মোচারে

ইতসে আওরখ হুন্দরী রাধিকা

উতনে কুমর কানাইরা

হিলমিল কাগ, বরসপর খেলে,

উড়ত লালপুলাল, লাল ভই বাহুল

শোভা বরণন ন বার।

রাধানে সৈন দিরা সখিরাণ কো,

রুণপুও উঠি থারি

হিললি হুং মুরলী পীতাধর,

শিরসে চুনর ওড়াইহি,

বিন্দী ভাল, নয়ন বীচাকাল

নখ বেশর পহে নাই।

কাঁহা পরে তোর নন্দ বাবাজী

কাঁহা যশোমত বারি ?

গুফত হুং মোড়, মোড়কে

কাঁহা গরি চতুরাই

নয়সে নারী বনাই

বিজ্ঞানে কানাইরা হোলী মোচাই।"

"ব্রজে কানাইরা হোলী খেলছেন, এমন সময় সূর্য  
রাধিকা এলেন এদিকে, আর ওদিকে কুমার কানাই  
চারদিকে কাগের উৎসব চলছে—রাভায় ঘাটে ময়দানে, লাং  
গুলাল উড়ে আকাশ লাল করে তুলেছে, বার শোভা বর্ণন  
করা যায় না। রাধা সখীদের নয়ন দিয়ে ঈশারা করলেন  
সখীরা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পীতাধর আর মুখে  
বীন্দী কেড়ে নিল। মাধায় নিজেকে পায়ের চুনরি খুঁচে  
বোমটা দিয়ে দিল। কপালে বিন্দী পরিয়ে দিল, আর দি  
নয়নে কাজল, নাকে বেশর পরিয়ে দিল। সখীরা হেঁচে  
ভেঙে পড়ে বলল, ও কানাইরা কোথায় তোমার নন্দ বাবাজী  
আর যশোমত মাঝি। শুকনো মুখ কিরিয়ে রাখছে কেন।  
তোমার চতুরালী কোথায় গেল? নরকে নারী বানিয়েছি  
ব্রজে কানাইরা হোলী খেলছেন।"

গিরা পরদেশ ন বাও, নয়নলোর জানাওরে

কুতন বোড়া, মোতিন লরি, চাবুক ছর ছর হারি,

গিরা পরদেশ ন বাও, নয়নলোর জানাওরে।

হুতনা কি হাতী, জরদে অনাড়ি

আজুল ছর ছর হারি

গিরা পরদেশ ন বাও .....

—সোরা পোরা বীহিরা, হারিশিলি চুড়িরা,

ছনদি সে বন্ধ লপাই

গিরা পরদেশ ন বাও .. ..

নাকচুনী নখ বেশর শোহে

বিন্দিকি ছব মেয়ারি

গিরা পরদেশ ন বাও, নয়নলোর জানাওরে।

হোলীখেলা সাধ হয়েছে, এখন বিচ্ছেদের পালা। আসন্ন  
বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় কাতরা রাধা মিনতি করে নয়নজলে  
জানাচ্ছেন প্রিয় পরদেশে যেও না, মোতির মালা-পরা তেজী  
বোড়াকে চাবুক দিয়ে দিয়ে হয়রাণ হয়েছি। মানে তোমার  
প্রেমে মুগ্ধ আমার মনকে শাসনে সংবত রাখতে পারছি না।  
আনাড়ী যাছত যেমন হাতীকে অজুশ দিয়ে মেরে মেরেও  
আপন বশে রাখতে পারে না, তেমনি আমিও আমার হৃদয়কে  
বশীভূত করতে পারছি না, হে প্রিয় তুমি আমাকে ছেড়ে  
পরদেশে যেও না। রাধার গৌরবর্ণ যদিও সর্ব্ব হুগু  
চুড়ি, হু'পাশে ছুই ছুরি শোভা পাচ্ছে, কপালে বিন্দি, আর  
নাকে চুনীর নখ আর বেশর। রাধার কি সূর্যের রূপ হুটে  
উঠেছে। সূর্যরী রাধা কাতরভাবে অহুন্নয় করছেন প্রিয়  
পরদেশে যেও না।

গ্রাম্য ঐওধী ভাবায় ঐরকম বহু সূর্যের গান আছে,  
হা থেকে আমরা সেকলে গ্রাম্য নারীদের মনোভাবের  
পরিচয় পাই। তারা যদিও অশিক্ষিত আনাড়ী ছিল ও  
তাদের গানগুলির ভিতর দিয়ে বড় সূর্যের সহজ কবিত্ব হু



উঠেছে। তাদের সাজসজ্জা, অলঙ্কারের প্রতি আসক্তি, তাদের হাঙ্গি-পরিহাস, প্রেম-বিবাহের উচ্ছাস তাদের প্রাণবন্ত সজীব হৃদয়ের পূরিচয় দেয়। তারা শ্রীরাধিকাকে উপলক্ষ্য করে নির্ভেদে বসিক মধুর হৃদয়ের ভাব ছুটিয়ে তুলেছে হোলীর

গানগুলির ভিতর দিয়ে। “পিয়া পরদেশ ন যাও, নয়নলোর আনাওয়ে”, এই সহজ সাধারণ একটি পঙ্ক্তিতেই চোখের সামনে স্মৃতিমতী হয়ে উঠে বিরহবিধুরা প্রেমিকা, যে সজল-নয়নে প্রিয়কে মিনতি জানাচ্ছে, “প্রিয় পরদেশ ন যাও।”

## নিঃস্ব

শ্রীসত্যব্রত রায় চৌধুরী.

পুরো দু’দিন উপোস থেকে অবশেষে সর্বশেষ অবলম্বন আইনের বই করণানির উপরই হাত দিতে হ’ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব করটা ধাপ সমন্বয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যখন সর্বশেষ পরীক্ষাটা অর্থাভাবে বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন বই বিক্রী করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? তাই বই কয়েকপাশি কাঁধে কলেজ কলেক্টরটের এ দোকান থেকে ও দোকান পর্যন্ত দর বাচাই করে ঘুরতে থাকে শুভেন্দু। তৈলহীন রুদ্ধ চুলগুলি বাতাসে উড়ে এসে কপালের উপর পড়ে। চশমার কাঁচে ঢাকা বড় বড় চোখ দুটো বেগুনীর স্নান, করুণ দেখায়। ফাঁড় গছীর মুখের কালচে রক্তের ছাপ। কপালের কাছ শিরাটা ফুলে উঠে যেন দপ দপ করে।

অবশেষে ন’টা টাকাই পাওয়া গেল। অধিকন্তু দোকানী একটু কুপা করেই যেন আরও আট আনা হাতে তুলে দিলে। মনে মনে ভুল্লোলকের সজ্জয়তার প্রশংসা করতে করতে শুভেন্দু পকাশ টাকার বইয়ের বিনিময়ে ন’টাকা মূল্যের নতুন কয়েকখানা নোট পকেটে পুরে গোলদীঘির দিকে এগোতে লাগল। আজ এই টাকা কয়টা না পেলে ইউনিভার্সিটির দরজা চিরদিনের মত তার কাছে রুদ্ধ হয়ে যেত। উপরন্তু কয়েক দিনের অবশ্রম্ভাবী উপবাস। পরও দিনই একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে। বাকী-পড়া চার মাসের বেতনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাসের না মিটিয়ে আর সে কলেজে ঢুকবে না এই প্রতিজ্ঞাই সে সেদিন করে এসেছে। মেসেও হ’মাসের বিল পড়ে আছে, কিছু না যেটালে সেখান থেকে উৎখাতের সম্ভাবনাও প্রচুর। শেব পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা বোধ হয় রক্ষা হ’ল—এই ভেবে একটা আশ্বপ্রসাদে সমস্ত উপবাসী মনটা ভরে উঠল শুভেন্দুর।

গরমের বেলা, বিকেল প্রায় চারটার কাছাকাছি। সমস্ত পথ ছুড়ে তপ্ত রোদের বলক। ট্রাম-বাসগুলো অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। থানিকদূর হুটপাথের উপর ঠাঁড়িরে থেকে ট্রামে উঠবে কি বাসে উঠবে ভাবতে শুভেন্দু এমন সময় হুটপাথের ওপারে চোখ পড়ল। ছোট্ট একটি ভেলভেটের ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে ট্রাম ঠাঁড়ে ঠাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। এতদূর স্মৃতিমতী অরুণতীও দেখতে পেরেছে শুভেন্দুকে।

হ্যাঁ, অরুণতীই বটে: চিনতে তুল হয় নি শুভেন্দু! তিন বছর আগেকার মতই তরী, তরুণী। চোখে শান্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুদ্ধি-দীপ্ত মুখ। গলার একছড়া মুক্তোর হার, হাতে সোনার ছুটি বালা, ঝাঁ হাতে বিটগরচ। পরিধানে সূর্য পাড়ের সালা সিলের শাড়ী। সালা আদির জামা। হাতে বেঁটে রঙীন ছাতা।

শুভেন্দু বাস্তবিকু পেরিয়ে আসতেই অরুণতী বললে, “কে, শুভেন্দু না?”

—“বোধ হয়। কেন, চিনতে কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?”

—“থানিকটা তাই বটে। সিদ্ধার্থকে গোঁতম বুকের রূপে দেখে চিনতে একটু বেগ পেতে হচ্ছে বৈকি?” বলে হাসতে লাগল অরুণতী।

—“সে থাক, অনেক দিন পর দেখা, আজ কেমন?”

—“ঠিক আগে যেমনটি ছিলাম, তেমনি ভাল। তুমি? তোমার খবর বল!”

—“আমিও বেশ ভাল।” একটু যেন জোয় দিয়েই বলল শুভেন্দু: “এবে হ্যাঁ, ভাল আর কোথায়? বাবা মারা গেলেন হ’ বছর আগে, কিন্তু বেধে গিয়েছিলেন প্রচুর ঋণ। দেয়ার দারে বাড়ী গাড়ী সব বিক্রী হয়ে গেছে। এখন নিজের উপর নির্ভর করেই পড়তে হচ্ছে ল’টা। থাকছি ভবানীপুরের একটা মেসে।”

অরুণতীর অন্তর্লক্ষ্য দৃষ্টিতে একটা সববেদনার আভাস হুটে উঠল। বললে, “ওর কিছু কিছু আমি আগেই শুনেছিলাম দিল্লীতে থাকতে।”

হালকা হেসে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, “এদিকে কোথায় এসে-ছিলে?”

—“এই ত এখানেই। দুটো বই কিনলাম। বোল্ডার জ’ ফ্রিক্টক আর প্রমোটাস’ অব নিউ ইন্ডিয়া। তুমি?”

—“একটু দরকার ছিল এদিকেই।”

থানিকদূর হ’জনেই চুপ। তথিপর হঠাৎ অরুণতী বলল, “কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। অবশ্য, তোমার খবর শেয়েছি কাগজে। এম-এতে প্রথম হয়েছে, সেক্ষেত্রে তোমার কন্সগ্রুইলেশন জানাচ্ছি শুভেন্দু।”

জ্ঞান হেসে শুভেন্দু বললে, “তোমার খবরও অবশ্য জেনেছি আমি। তবে একটু সেরিতে। বিরিতে বড় ব্যস্ত ছিলে বলেই বোধ হয় খবর দিতে পার নি। এম-এ পড়তে পড়তেই কলেজ ছেড়ে দিলে চলে গেলে।”

সলজ্জ হেসে অরুণ্ধতী বললে, “এত দিন ত বাংলার বাইরে যাইয়েই কাটিয়ে এলাম। এখানে এসেছি এই কয়েক মাস হ’ল। উনি এখানে বদলি হয়েছেন কি না? একদিন আমাদের বাসায় এস। আসবে ত?”

—“যাব। নিশ্চয়ই যাব। একদিন দেখে আসব তোমার সংসার।”

কথার স্তব টেনে অরুণ্ধতী বললে, “বাস্তব ঠাড়িয়ে ঠাড়িয়ে কথা বলার কোন মানেই হয় না। তুমি কি এখন ব্যস্ত শুভেন্দু?”

—“ব্যস্ত? না, ব্যস্ত কেন?”

—“তা হলে এস না কফি-চাউসেই গিয়ে না হয় একটু বস।”

যেচেই বসন বলল অরুণ্ধতী তখন ওর পরসার অন্ততঃ এক কাঃ কফি মিলবে, সঙ্গে নিশ্চয় কিছু খাবার। দু’দিন উপবাসের পর খুবই লোভনীয় আমন্ত্রণ। ভেবে দেখল শুভেন্দু। তারপর বলল, “বেশ, তাই চল।”

পথ চলতে চলতে অরুণ্ধতী বললে, “তুমি কিন্তু অনেক বদলেছ শুভেন্দু। আগেকার দিনের মত আর তোমার ঠাইল নেই। গাড়ী ছাড়া আগে তুমি কলেজে আসতে পারতে না, এখন তোমাকেও টামের জন্ত ঠাড়িয়ে থাকতে হয়। চেতায়ও সেই অবস্থা। মুণ্ডভর্তি খোঁচা খোঁচা লাড়ি। চশমাটা ভাঙা। চুল উকো-খুকো। তোমাকে দেখলে দার্শনিক বলে মনে হয় শুভেন্দু।”

বলে অরুণ্ধতী হাসলে।

শুভেন্দুও হাসল; বললে, “তখন ত আর এখনকার মত বাধাবরা হিসেব করা পড়া ছিল না। তবে তুমি কিন্তু ঠিক তেমনি আছ, অরুণ্ধতী। সেই কলেজে পড়া দিনগুলির মত। একটুও বদলে যাও নি কোথাও।”

সাবাদিনের অভুক্ত, অস্বাস্ত শুভেন্দু কাপসা দুটি মেলে সামনে গোলদীঘির দিকে তাকাল; তারপর বলল, “অবশ্য একদম আগের মত আছ, এ কথা বললে ঠিক হবে না। কারণ তখন ছিলে বিদ্যার্থিনী, এখন হয়েছ গৃহিণী। সব চেয়ে বড় আনন্দের মুহূর্তেই সব চেয়ে শ্লক্ষণের সূচনা হয়, তাই এখনকার সঙ্গে তোমার এখনকার রূপের কিছু পার্থক্য আছে বৈকি, অরুণ্ধতী।”

মুহূর্তে অরুণ্ধতীর মুখ রাঙা হ’ল, নিবিড় লজ্জার মাথাটা অবনত হ’ল। আন্তে আন্তে বললে, “এতদিন পরে তোমাকে ঠিক এমনভাবে দেখতে হবে এ সত্যিই কোনদিন ভাবতে পারি নি। এত আগের ছালা, হয়ে গেছে তুমি! এত পরিবর্তন হয়েছে তোমার চেতায়, বেশভূষায়! আশ্চর্য! তুমি আমার দিকে না তাকিয়ে থাকলে হয় ত চিনতেই পারতাম না তোমায়।”

—“এমনি হয় অরুণ্ধতী, আজ বেটাকে কল্পনারও ভাবতে পারছ না, কাল সেটাকেই বড় স্বাভাবিক বলে মনে হবে।”

আহতকণ্ঠে অরুণ্ধতী বললে, “সত্যি শুভো!”

শুভো! অনেকদিনের একটা পুরনো বাধা বেন শুভেন্দুর সমস্ত বুকটা জুড়ে মোচড় দিয়ে উঠল। অনেক দিনের পুরনো স্মৃতি বেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইল। অরুণ্ধতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ’ল, যে সময়ে জীবনের সবুজ পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে রূপালী জ্যোৎস্নায় ভরা উদ্দাম বাতাস জীবনটাকে উজ্জ্বল করে তুলত, এ বেন সে দিনেরই অরুণ্ধতী।

সে আজ থেকে ক’বছর আগেকার কথা। শুভেন্দু আর অরুণ্ধতী দু’জনেই তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেটা ছিল সেই সময়, যখন বাস্তবের উপর কল্পনায় তুলি বুলিয়েই সবাই জীবনকে দেখতে পার। সেই সময় উভয়ের মনে বিকশিত হয়েছিল অন্তর্লোকেব এক অপূর্ণ অন্তরঙ্গতা। সেটাই জীবনের সবচেয়ে মর্যাদাসিক মহাশব্দ। কিন্তু সে আজ শুধুমাত্র স্মৃতি।

কিন্তু তবুও কল্পনায় সেদিনের ছবিটা শুভেন্দুর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। চার বছর পূর্বে এমনি এক অপরাহ্নে কলেজ ছুটির পর গাড়ীতে করে যাচ্ছিল শুভেন্দু আর অরুণ্ধতী। তখন শরৎকাল, রূপালী রোম জরির চাদোরার মত সমস্ত মহানগরীকে জড়িয়ে ছিল।

বেড রোডের সামনে ষ্ট্রিয়ারটা ঠা দিকে ঘুরিয়ে শুভেন্দু বলে-ছিল, “আজ কিন্তু আমার শাসন না মানার পালা অরু। তোমার কোন মানা আজ আর শুনব না। আমার বতরুণ খুশী আমি গাড়ী চালাব। কিছুতেই তুমি বারণ করতে পারবে না।”

—“তা হবে না, শুভো। তোমাকে আমার ভয় করে। স্বাধীনতা পেলে সবকিছুতেই তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাও। আস্ত আবার তোমার মাথায় কি পেয়াল চেপেছে কে জানে?”

শুভেন্দু বললে, “বড় বড় কথা বলছ তুমি দিয়ে আজ আর তোমার সঙ্গে তর্ক করব না অরু। সত্যি, ভাবি ইচ্ছে করছে আজকে দু’জনে পাশাপাশি বসে বতরুণ খুশী পথ চলি। অনেকক্ষণ ধরে প্রাণ ভরে গল্প করি। তোমার সঙ্গে কথা বলা অবশ্য শেষ হবে না কোন দিনই। কারণ এই ধর, তুমি হলে বিটোফেনের একরূপ অমর-গীতি। এ জগতে বিটোফেনের কি শেষ হবে কোন দিন? বিটোফেন আর ঠায় বিনয় কাব্যগীতি, এ ছোটো ধারা চিরদিন পাশাপাশি চলবে যুগ-যুগান্তর ধরে।”

অরুণ্ধতী জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। শুধু বলল, “বিটোফেনের সঙ্গে ঠায় অমর প্রিয়ার কোন দিন মিলন হয় নি, শুভো।”

সঙ্কীর্ণ দুইতে একবার সেদিকে তাকাল শুভেন্দু। তারপর এবার হাতে ষ্ট্রিয়ার ধরে ব্যাকুল আগ্রহে অগ্র হাতের আকর্ষণে অরুণ্ধতীকে কাছে টেনে নিল। বলল, “প্রেমের শক্তি যতবার চেয়েও প্রবল

মক। মরণের ওপারেও তাদের ধারার ছেদ পড়বে না কোন-  
দিন।”

—“আঃ, ছাড়। তুমি এতও পাগলামি করতে পার। একটা  
এলিভেণ্ট ঘটাতে নাকি শেষকালে?”

গুভেন্দু ছাড়ল না। বললে, “অকু শোন। আমার সব কথা  
দাঙ্গকে তোমাকে শুনতেই হবে।”

—“শুনছি ত! ত’বছর ধরে তোমার মুখে শুধু বিঠোকে  
দার বিঠোকে শুনতে শুনতে আমার কান কালাপালা হয়ে গেল,  
ওভো।” পদ্মাত গালে কুস্তমের বড় ছড়িয়ে অরুণ্ডতী বলল।

—“শুনছ না, গাভী।” গুভেন্দু রাগ করে মুখ ফেবাল।

পানিকক্ষণ চুপ। তার পর গুভেন্দুর কাঁধে হাত রেখে ডোট  
রে অরুণ্ডতী দাকল, “ওভো!”

—“বল।”

—“চল না কোথাও বসি।”

—“ঈস! কি একটা বসবার জায়গা।”

মুহু হেসে অরুণ্ডতী বললে, “কেন, মাথার উপর অনন্ত নীল  
দাকশ, সবুজ ঘাসে ভরা এত বড় গড়ের মাঠ, সামনে ভিক্টোরিয়ার  
গাগানে রাশি রাশি কুলের বিছানা। নির্জনও খুব। এস না বসি  
কোথাও।”

• —“না। তোমাকে ত বলেছি অকু, আজ আমার শাসন ভাঙার  
গালা।”

—“বেশ ত, তবে চল আউটারামের ককি হাউসে।”

—“তা মন্দ নয়।” বললই আচমকা পথ ঘুরে ষিঙ্গ বেগে গাড়ী  
গালাতে লাগল গুভেন্দু। বললে, “মনে কর, এখন যদি একটা  
ঘণ্টনা হয় অকু। আমি যদি মরে যাউ। তোমার গায়ে অবশ্য  
খাঁচড়টিও লাগবে না। তা হলে কেমন হয়?”

অরুণ্ডতীর দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে মিটিমিটি হাসতে লাগল  
গুভেন্দু। অরুণ্ডতী কথা বললে না। মুণ ভার করে বাইরের দিকে  
চাকিয়ে রইল। এর পবে আর কিছু বলার কথা ভেবে পেলে না  
গুভেন্দু। অনেকক্ষণ পরে অরুণ্ডতীর নিকবকালো বিম্বনীটা ধা  
াতে জড়িয়ে গুভেন্দু বললে, “রাগ করলে?”

—“রাগ? বা-বে, রাগ করব কেন?”

—“তবে চুপ করে আছ?”

—“কি আর বলব, আমি ত আর তোমার মত বানিয়ে বানিয়ে  
করাশ কথা বলতে শিবি নি।”

—“ওঃ! তা হলে দেখছি সত্যিই ভীষণ রাগ কবেছ।” বলে  
হা হো করে হাসল।

আউটারাম ঘাটের বেট রেণ্টে মুখোমুখি বসে অরুণ্ডতী বললে,  
এখন কি করা যার?”

—“আমি কি জানি!”

—“তবু বলই না।” আবদারের সুরে অরুণ্ডতী বলল,  
আপ্নাততঃ গঙ্গার ঢেউ পোনা কিংবা জাতাজের মাছলগুলির একটা  
দুসার নেওয়া।”

সেখান থেকে যখন ওয়া বেড়িয়ে এল, তখন অরুণ্ডকার হয়ে  
এসেছে। গড়ের মাঠের উপর এখানে সেখানে ছড়ানো বটগাছের  
ছায়া বিলম্বিত হয়ে পড়েছে। দুখে চারিদিকে অসংখ্য আলোকের  
মালা। জনবিরল প্রান্তর। মাঝে মাঝে গঙ্গার উত্তলা হাওয়ার  
খাপটা ময়দানের বুকে। গুভেন্দু আর অরুণ্ডতী মাঠে বসল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে চঠাং গুভেন্দু বললে, “এভাবে আর  
ক’দিন কাটাতে, অকু?”

চঠাং যেন চমকে উঠল অরুণ্ডতী। বললে, “কেন? কি  
হয়েছে?”

—“তা কি জান না তুমি?”

—“লক্ষী ওভো, আর ক’টা দিন অপেক্ষা কর।”

—“কেন, অকু?” অরুণ্ডতীর হাতে হাত রেখে গুভেন্দু বললে,  
“আমাদের পরীক্ষাটা হয়ে যাক। আর তা ছাড়াও...”

—“তা ছাড়া আর কি অরুণ্ডতী?”

—“মা-বাবার মতামতটাও কি জেনে নেওয়া উচিত নয়,  
ওভো?”

—“তা উচিত বটে, কিন্তু ধর, তঁরা যদি অমত করেন!”

ব্যাকুল হয়ে অরুণ্ডতী বলল, “সেকথা এখন কেন, ওভো?”

—“তাও কি তুমি জান না, অকু? তুমি কি ভান না জগতে সব  
যাতনা সফল হয়, কিন্তু প্রিয়-বিবর্তের বহুধা একেবাবেই অসহনীয়।”

অরুণ্ডতী চুপ করে রইল। একটু অপেক্ষা করে গুভেন্দু বললে,  
“কেট মন্ত না দিলেও সবার অমতেই আমি তোমাকে চাই,  
অরুণ্ডতী।”

—“না, না, ছি, তা কেমন করে হয়! এ বড় বিলী, বড়  
অশোভন, ওভো।”

চঠাং উত্তপ্ত হয়ে গুভেন্দু বললে, “তা হলে তুমি কি করতে  
চাও অরুণ্ডতী?”

অরুণ্ডতী চুপ করে রইল। মুণ লুকাল হাঁটুতে।

—“ওঃ এই?” তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঠিগ করে গুভেন্দু তাকাল অরুণ্ডতীর  
দিকে। “সত্যি ত, তোমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সবার উপরে।  
তাদের মতামতের উপর তোমার মতামত, আমার ভালবাসার কোন  
দাম নেই। তাঁরা তোমায় স্নেহ করেন, তোমার ভাল চান।  
সন্তানের জন্ত বাপ-মায় এই স্নেহ খুব স্বাভাবিক জিনি। কিন্তু  
আমি! আমি তোমার কে? দিনের পর দিন তোমার জন্ত  
নিজেকে উন্মত্ত করে রেখেছি, স্বপ্ন গড়েছি, তার দাম কে নেবে,  
অরুণ্ডতী? তোমার মা-বাবার এক কথাতেই কি সব ভেসে যাবে?  
এতদিনের এত আকাঙ্ক্ষা সব বাষ্য হয়ে যাবে? এ কথা তোমায়  
আগে বলা উচিত ছিল অরুণ্ডতী।” চঠাং গুভেন্দু উঠে দাঁড়াল।  
“তবে কেন এতদিন প্রবঞ্চনা কবেছ আমার সঙ্গে? কেন খুলে  
বল নি তোমার মনোভাব? অরুণ্ডতী, আজ থেকেই তবে আমা-  
রের সব সম্পর্কেই শেষ হোক। সত্যি ত, কিসের জোরে সবার  
ওপরে ভান পেতে চাই? শুধু ভালবাসি, এই ত।”

অসহায়ভাবে শুভেন্দুর কান্নাটা আঁকড়ে ধরল অরুণ্ডতী, “ওতো, লক্ষীটি। রাগ করো না, বস।”

“না, না, কি দরকার অভিনয় করার? কেন আত্মপ্রবঞ্চনা কর? আমাকে ক’কি দাও?”

“শোন, শোন, শুভো।”

“না, এ ভাবে এ পরিবেশে তোমার সঙ্গে বসে থাকি অত্যন্ত অজ্ঞান, অত্যন্ত দৃষ্টিকটু অরুণ্ডতী। এ বড় অপোভন।”

“না, না, শুভো! শোন, তোমাকে গুনতেই হবে।” ব্যাকুল ভাবে শুভেন্দুর হাত দুটি ধরে বলল অরুণ্ডতী। “ছেলে-মানুষি করো না। ভেবে দেখ, শাস্ত হও, শাস্ত হ’য়ে ভেবে দেখ। আমাকে ভুল বোঝ না।”

ওরা বলল। আস্তে আস্তে শুভেন্দুর পাতলা চুলে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল অরুণ্ডতী, “আমি তোমারই। চির দিন আমি তোমারই থাকব।... স্বর্গগার মত তার গাল বেয়ে, বুক বেয়ে অশ্রু-কণা বয়ে পড়তে লাগল।...

কিন্তু সে আজ থেকে চার বছর আগেকার কথা। এ শুধু চার বছর আগেকার একটা কাহিনী। অতীতের একটা সামান্য দৃশ্য-বেগের কণিক উজ্জ্বল। এর সঙ্গে বর্তমানের কোনপ্রকার সম্পর্ক খুঁজে পাবে না শুভেন্দু।

ইণ্ডিয়া কফি হাউস। ধারাবাহিক প্লেটে ছুরি চালাতে চালাতে শুভেন্দু প্রসন্ন করলে, “পড়াগুনো ছেড়ে দিলে কেন অরুণ্ডতী? ও কাজটা না হয় সেবেই নিতে।”

কক্ষির কাপ থেকে মুখ তুলে অরুণ্ডতী বললে, “খুবই ইচ্ছে ছিল অজ্ঞাত: এম-এ পরীক্ষাটা দেবার। কিন্তু দশটা ঝামেলার আর হয়ে উঠল না। দু’দিন পর পরই ঠক এখানে ওখানে বদলি হতে হয়, তাই আর গুছিয়ে উঠতে পারলাম না।”

“ও।”

অনেকক্ষণ পর অরুণ্ডতী আবার বলে, “তোমার পরীক্ষা ত প্রায় এগিয়ে এল, শুভেন্দু। পরীক্ষা কোন দিন ধারাপ কর নি, এবারও নিশ্চয়ই করবে না। কি করবে এর পর?”

“কেন, আমার অবস্থার আর পাঁচ জনে বা করে তাই করব। ব্যবসা করতে চেষ্টা করব। বিয়ে করব, সংসারী হব।”

চোখ নামিয়ে ঠাট্টা করলে অরুণ্ডতী, “তোমার কথার কিন্তু রোম্যান্সের গন্ধ পাচ্ছি, শুভেন্দু। ভাবী বৌয়ের সঙ্গে দাও না এক-দিন আলোপ করিয়ে।”

ঠাং চমকে উঠল শুভেন্দু। এ বকম প্রশ্নের জন্তে যোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। কপে মুখ রেখে বানিকঞ্চণ কি বেন ভাবল শুভেন্দু। তার পর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথাই বলতে আরম্ভ করলে।

“ও, সে কথাটাই বুঝি এতক্ষণেও বলা হয় নি তোমার? অল্প-

পহার নাহি ছুরি শোন নি, না অরুণ্ডতী? পেল বছর এগোয়ার দিকে থেকে ইংরেজীতে অনাস’ নিয়ে বি-এতে প্রথম হয়েছো অল্প। ওই বাবা সেখানকারই প্রিন্সিপাল। তারি চমৎকার মেয়ে অল্পপরা। তার লেখা তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ। পড় নি? অপূর্ণ কবিতা লেখে অল্পপরা। ছোটবেলার শান্তিনিকেতনেই ছিল কিনা। কিন্তু আমার ছুঁতাপা অরুণ্ডতী। এখানে বা গরব, তাই করেক দিন হ’ল হাওয়া বদল করতে সিমলে গিয়েছে অল্প। এলে তাকে নিয়ে নিশ্চয়ই একদিন তোমাদের বাসায় বাব অরুণ্ডতী। সেখবে কি আশ্চর্য্য মেয়ে! তুমি দেখো, তার গান শুনে তুমি মুগ্ধ হবেই।”

একটু ঝামল শুভেন্দু; সেদল অরুণ্ডতীর চোখের পাতা দুটো ক্রমশ: ভারী হয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে তীব্র বেগনায় আত্মদমন করছে শুভেন্দুর কথাগুলো। শুভেন্দু খুদী হ’ল। উৎ-সাহিত হয়ে বলল, “তুমি এখানে ক’দিন আছ, অরুণ্ডতী? অল্পকে আসতে লিখে দেব এখানে? দেব?”

কমাল দিয়ে সানুগ্লাসের কাঁচটা মুছতে মুছতে অরুণ্ডতী বললে, “না না। কাজ কি মিছিমিছি বেচারীকে কষ্ট দিয়ে? সত্যি, বা গরব পড়েছে এখানে! ভাবছি আমিও দিনকতক ঘুরে আসব দাঙ্গিলিং থেকে।”

—“খুব ত ভাল কথা, অরুণ্ডতী। ক’দিন ভাল জায়গায় থাকলে ষাছোয়ও খুব উন্নতি হবে।” তারপর প্রসন্ন পরিবর্তন করে শুভেন্দু বললে, “আচ্ছা, বল ত ক’দিন পরে আমার আমার এই কফি হাউসে এলাম?”

কি বলতে বাচ্ছিল অরুণ্ডতী। কিন্তু এমন সময় বেরোয়া বিল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাগ বুলে হঠাৎ একটু অক্ষুট কণ্ঠেই উচ্চারণ করল অরুণ্ডতী, “মাই গড।”

—“কি, কি হ’ল?”

—“টাকা হারিয়েছি; নিশ্চয়ই কেলে এসেছি বইয়ের লোকানে।”

—“বাক।” হেসে বলল শুভেন্দু। “আগের অভ্যাসট এখনও তোমার দরেক্ট দেখতে পাচ্ছি। তবে আপে আমার টাকা কেলে আসতে, আজকাল নিজের টাকা কেলে এস। এই ব তফাৎ।” বলে পকেট থেকে টাকা বের করে বিল মিটিয়ে দিতে শুভেন্দু।

বাইরে এসে হুটপাথে দাঁড়িয়ে অরুণ্ডতী বললে, “তোমার কাছে চাইতে পারি তাই চাইছি, শুভো। আমার টাকা দাও ক’টা তা না হলে বড্ড অসুবিধে হবে বাড়ী কিরতে।”

—“ও: এই?” বলে হাসতে হাসতে পকেট হাতড়ে বা পেল সবই অরুণ্ডতীর হাতে তুলে দিল শুভেন্দু। একটা ট্যান্ডি জেবে উঠে পড়ল অরুণ্ডতী। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, “একদিন আমাদের বাসায় এস শুভো।”

শুভেন্দু হাত নেড়ে বললে, “বাব।” ট্যান্ডিটা চোখের আড়াল হতে হঠাৎ বনে পড়ল শুভেন্দুর—অরুণ্ডতী তার বাড়ীর ঠিকানা

দিয়ে বাদ নি। পকেট হাতড়ে দেখল সে একেবারে নিঃশব্দ। এবার থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত হেটেই যেতে হবে। রাস্তা শুভেন্দু সোভানী'র ঘেলিতে ভর দিয়ে ঠাণ্ডাল। একসঙ্গে জিলিপালের ও হোটেল মনেনজারের মুখটা মনে ভেসে উঠতেই মাথাটা বিম্বিত

করে উঠল। তাবল, থাকে জীবনের সবকিছু দিয়েও একদিন যনের কোণে আরও দেবার অকৃত্ত বাসনা। জেগে থাকত, তাকে আজ রাত্রি সামান্য ক'টা টাকা দিয়ে কেন এত নিঃশব্দ বোধ করছে সে?

## আমাদের নামরহস্য

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী। সেইজন্য আমরা “বাঙালী” নামে অভিহিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান নিবিশেষে সকলেই আমরা বাঙালী। বাঁহারা হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া ধর্মাস্তর গ্রহণপূর্বক অস্ত্র সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ বংশগত পদবী পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু বাঁহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না যে, তাঁহারা বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, মাজাজী বা অস্ত্র কোন প্রদেশের লোক। তাঁহাদের নামগুলি তাঁহাদের ধর্মের পরিচয় দেয়। কিন্তু তাঁহাদের জাতীয়তার (Nationality) পরিচয় পাওয়া যায় না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বাঙালী খ্রীষ্টান তাহা তাঁহার নাম শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বর্তমান রাজ্যপাল মাননীয় ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইলেও বাঙালী নাম বা বাঙালী আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে দেখিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তিনি বাঙালী নহেন। কি পরিচ্ছদে, কি নামে বা আচার-ব্যবহারে তিনি বোল-আনা বাঙালী। সেকালের খ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (K. M. Banerjee), কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন বোষ (গণিতজ্ঞ P. Ghosh), ডাক-বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হেমনাথ বোস ইহারা সকলেই খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু কেহই পিতৃদত্ত পুরাতন নাম পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করেন নাই। সেকালের বিখ্যাত ব্যাবিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) খ্রীষ্টান ছিলেন না। তিনি তাঁহার গৃহবীর সমাজ পরিবর্তন করিয়া Bonerjee হইয়াছিলেন। আমার জানা দুই-এক জন লোক আচার-ব্যবহারে বা পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ বাঙালী হিন্দু হইলেও ইংরেজী নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি। সেকালের লর্ডো-প্রবাসী রামগোপাল বিজ্ঞান

মহাশয়ের পৌত্র ভিক্টরনারায়ণ বিদ্যাস্ত। এই ভিক্টর-নারায়ণ খ্রীষ্টান নহেন। তিনি পুরা হিন্দু এবং লর্ডোয়ের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন।

বাঙালীর পদবী ইংরেজীতে লিখিবার সময় অনেকে একটু বিকৃত করিয়া ব্যবহার করেন। যেমন বাঁড়ুজ্যে Banerjee, চাট্টুজ্যে Chatterjee, মুখুজ্যে Mukherjee, দত্ত Dutt, বসু Vasu, সিংহ Sinha প্রভৃতি। বাঁহারা এইরূপ পদবী পরিবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের পুত্র বা পৌত্রগণের অনেকেই এইরূপ পরিবর্তিত উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামের বিখ্যাত জমিদারবংশীয় খ্যাতনামা ব্যাবিষ্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এসু. পি. সিন্হা হইয়াছিলেন। পরে ইনি লর্ড উপাধি পাইয়া লর্ড সিন্হা নামে পরিচিত হন। ইংরেজের আমলে বিহার বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হইলে এই লর্ড সিন্হাই বিহারের অস্ত্যন্তম গভর্ণর বা রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতবাসীকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা গভর্ণর করেন নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে একমাত্র লর্ড সিন্হাই ইংলণ্ডে লর্ডপ্রেরীভূক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে বা পরে কোন ভারতবাসী এই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইদানীং সিংহ উপাধিধারী অনেক লোক আপনাদিগকে সিন্হা উপাধিতে পরিচয় দিয়া থাকেন।

যে সকল বাঙালী হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন তাঁহারা ধর্মাস্তর গ্রহণের সময় পূর্ব নাম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া খাঁটি মুসলমানী নাম গ্রহণ করিতে তাঁহাদের বংশধরগণকে এখন বাঙালী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত “মোহনদী” নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক মোলানা আজম খাঁ যে বাঙালী ভ্রাতৃগণের বংশধর তাহা কেহ মনে করিতে পারেন

কি ? মোলানা সাহেবের প্রসিদ্ধাভিমান গাঙ্গুলী পদবীধারী  
বাঙালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই মোলানা সাহেব বঙ্গব্যবচ্ছেদের  
পর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পাকিস্থানে গিয়া বাস  
করিতেছেন। সেখানে গিয়া তিনি পূর্ব-পাকিস্থান মুসলিম  
লীগের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহার সহোদর কিন্তু  
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন।  
তাহার হিন্দু নাম হইয়াছে শশীভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। এইরূপ  
কত চাটুজ্জো, মুণ্ডুজ্জো, গাঙ্গুলী, সাজ্জাল, ভাড়ুড়ী, লাহিড়ী,  
চক্রবর্তী, আচার্য্য, ষাণ, বোস, মিত্র যে মুসলমান হইয়াছেন  
তাহার সংখ্যা নাই। মুসলমান সমাজে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যে  
সকল ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া মুসলমান সমাজের সংস্কার  
করিয়াছেন তাহাদের এক জনকে আমি দেখিয়াছি এবং  
তাহার সম্বন্ধে একটা কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিলে  
বোধ হয় অবাস্তব হইবে না। ঢাকানিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক  
মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনার নায়ক। আমি যখন  
“হিউদাদী”তে কাজ করিতাম তখন ইনি মধ্যে মধ্যে  
আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে আসিতেন। তাহার নাম  
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাহার নাম দীন  
মহম্মদ। আমি তাহাকে মুসলমানের বংশধর বলিয়াই মনে  
করিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে তাহার প্রকৃত পরিচয়  
ঘটনাক্রমে আমার গোচর হইল। একদিন জনাব দীন  
মহম্মদ আমাদের কার্যালয়ে আসিয়া বসিয়া আছেন, এমন  
সময় আমার পরিচিত এক জন ভদ্রলোক আমাদের  
কক্ষে প্রবেশপূর্বক তাহাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন,  
“নমস্কার গাঙ্গুলী সাহেব।” তখন দীন মহম্মদও বলিলেন,  
“নমস্কার, নমস্কার।”

ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি চুঁচুড়ায় সাহিত্যাচার্য্য  
অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাটীতে বসিয়া কথাবার্তা করিতে-  
ছিলাম। কথায় কথায় এই দীন মহম্মদের কথা উঠিল।  
দীন মহম্মদের নাম শুনিবামাত্র অক্ষয়বাবু বলিলেন, “যোগীন,  
তুমি দীন মহম্মদকে জান নাকি ?” আমি বলিলাম, “হ্যাঁ,  
তিনি আমার পরিচিত।” অক্ষয়বাবুর বৈঠকখানায় চুঁচুড়ার  
সুবিখ্যাত দীননাথ দর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি  
দীন মহম্মদের নাম শুনিয়াই বলিলেন, “ঢাকার সেই  
মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী ? আরে তাকে নিয়ে এক বার যে বড়  
মজা হয়েছিল।” কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে দীনবাবু  
বলিলেন, আমি যখন ঢাকাতে গভর্ণমেন্ট প্লাইডার বা উকীল-  
সরকার ছিলাম, তখন একদিন এই মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী—  
তখন আর মনোরঞ্জন নহে, দীন মহম্মদ একটা মোকদ্দমায়  
আমাকে উকীল নিযুক্ত করিবার জন্য আমার কাছে আসিয়া-  
ছিল। আমি তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলাম, “আমি

বিনা পারিশ্রমিকে তোমার মোকদ্দমা চালাইতে সম্মত  
আছি। কিন্তু তোমাকে দীন মহম্মদ নামের পরিবর্তে  
ইব্রাহিম নাম গ্রহণ করিতে হইবে।” আমার কথা শুনিয়া  
দীন মহম্মদ চলিয়া গেল। অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,  
“ইব্রাহিম নাম গ্রহণ করিতে বলিলে কেন ?” দীনবাবু  
বলিলেন, “ওর ইতিহাস যে আমি জানি। মনোরঞ্জন  
ব্রাহ্মণের ছেলে, কেশব সেনের সম্পর্কে আসিয়া পৈতা  
ফেলিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে  
শুনিলাম সে খ্রীষ্টান হইয়াছে এবং শেষে কোরাণ পড়িয়া  
মুসলমান হইয়াছিল। আমি তাই তাহার নাম ইব্রাহিম  
রাখিয়াছিলাম। ই অর্থাৎ ইজ, ব্রঃ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, হি  
অর্থাৎ হিন্দু, এবং ম অর্থাৎ মোসলেম। একাধারে এইরূপ  
চারটি ধর্মের সমাবেশ আর কোন নামে পাওয়া যায় কি ?”

কালসহকারে লোকের ক্রটির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে  
যেমন পরিচ্ছদের পরিবর্তন হয়, নামেরও সেই রকম পরিবর্তন  
হইয়া থাকে ইহা বলা অনাবশ্যক। এই নামের পরিবর্তন  
পুরুষ সমাজের স্থায় মহিলা সমাজেও ঘটয়া থাকে। বঙ্গদেশে  
ষট্টি মহাশয়দিগের নিকট যে সকল পাঞ্জি-পুঁথিতে বংশ-  
তালিকা আছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক  
নামের কোন অর্থ হয় না। ষট্টিকেরা প্রগনতঃ ব্রাহ্মণ, দ্বাগের  
বংশতালিকাই রাখিতেন। কল্যাণি অত্রাহ্মণ, রাজা বা  
ভূস্বামীর বংশতালিকাও তাহাদের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে।  
সাধারণতঃ আমাদের নাম তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে,  
ডাক নাম, মধ্যনাম ও পদবী। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
(বিভাগাগর), রামমোহন রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়  
প্রভৃতি নামের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ঐ সকল নামধারীর  
আত্মীয়স্বজন প্রদত্ত নাম। আর শেষ অংশ বংশগত পদবী  
অথবা শিক্ষাগুরু প্রদত্ত নাম। অনেক স্থলেই নামের মধ্য  
অংশের বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না। ঈশ্বরচন্দ্র  
বিভাগাগর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়,  
কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি নামের মধ্যাংশ ‘চন্দ্র’ ‘মোহন’ ‘নাথ’  
প্রভৃতিরও সার্থকতা কিছুই নাই। অতি অল্পসংখ্যক নামই  
আছে যাহার প্রথম অংশ হইতে দ্বিতীয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া  
কেবল প্রথম অংশ বজায় রাখিলে নামের বিশেষ কোন অর্থ  
হয় না। ‘ভূদেব’, ‘ভূপতি’, ‘ধরানাথ’, ‘ধরনীধর’ প্রভৃতি  
নাম প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ এক সঙ্গে জড়িত। অনেক  
ভূদেববাবুর নাম লেখেন ‘ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়’। সূ অর্থে  
পৃথিবী, দেব অর্থে দেবতা। সাধারণতঃ ভূদেব শব্দের অর্থ  
ব্রাহ্মণ। ভূদেববাবুর সময়ে শিক্ষা বিভাগে যে সকল রিপোর্ট  
বা বিবরণ প্রকাশিত হইত তাহাতে তাহার নাম সংক্ষেপে  
তিনি লিখিতেন B. D. M. অর্থাৎ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

নামের মধ্যভাগটা নির্বন্ধক বা অনাবদ্ধক বলিয়া অনেকে নামের ঐ মধ্যাংশটা ব্যবহার করিতেন না। 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আমার বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সাধারণতঃ 'সুরেশ সমাজপতি' নামে খ্যাত ছিলেন, যদিও তাঁহার নামের মধ্যাংশটা তাঁহার কাগজে লিখিত হইত। ডাঃ যুগেন্দ্রলাল মিত্র 'যুগেন মিত্র' নামেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যুগেন শব্দের কোন অর্থ হয় না। সিংহুর নাম যুগেন্দ্র। এইরূপ 'দেবেন', 'যোগেন', 'হীরেন' 'রমেন' প্রভৃতি নামের 'ঞ'-র পরিবর্তে কেবল 'ন' ব্যবহার করা সমীচীন নহে। কিন্তু সাধারণতঃ 'ঞ' ব্যবহৃত হয় না। তাহার পর 'নাথ', 'চন্দ্র' প্রভৃতি মধ্যনামের সহিত প্রথম নামের কোন সম্পর্ক নাই। 'দেবেন্দ্র' বলিলে দেবশ্রেষ্ঠ বুঝায়। 'ইন্দ্র' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। 'নাথ' শব্দও শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একই নামে 'ইন্দ্র' ও 'নাথ' ব্যবহারের পার্থক্য কি?

আমরা বাঙালী, সাধারণতঃ অল্পপ্রাস-ভক্ত। আমরা পুত্রকত্তার নাম রাখিবার সময় অল্পপ্রাসের দিকে দৃষ্টি রাধি। এমনকি, অনেক সময় অল্পপ্রাস বজায় রাখিবার জন্য অর্থহীন শব্দও আমাদের অঙ্কুরিত হয় না। আমার আত্মীয় ও পরিচিতগণের মধ্য হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার পাঁচ সহোদর ছিলাম। আমাদের নাম যথাক্রমে সত্যেন্দ্র-কুমার, দেবেন্দ্রকুমার, যোগেন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রকুমার এবং যুগেন্দ্রকুমার। আমার পুত্রগণের নাম যথাক্রমে বীরেন্দ্র-কুমার, বীরেন্দ্রকুমার, হীরেন্দ্রকুমার, নৃপেন্দ্রকুমার, মণীন্দ্র-কুমার, শৈলেন্দ্রকুমার, সুরেন্দ্রকুমার। পুরুষের জায় জীলোকের নামেও এইরূপ অল্পপ্রাসের বাছল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১২মি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। এই শ্রেণীতে নামের অর্থ ই বা কি পার্থক্যই বা কি?

আমরা সেকালে দেখিয়াছি বাঙালী মহিলাদের নাম চার-পাঁচটা অক্ষরযুক্ত হইত। সেকালে 'জগত্তারিণী' 'দয়াময়ী', 'মহামায়া', 'হরমোহিনী' প্রভৃতি নাম অনেক ছিল। সময়ের পরিবর্তনে আজকাল নাম সঙ্কুচিত হইয়াছে। আজকাল নীরা, ইরা, বীরা, মীরা, মায়া, শোভা, উষা, শম্ভা প্রভৃতি নামের ছড়াছড়ি। আমার অনেক সময় মনে হয় হয়ত আর কিছুদিন পরে বাঙালী মেয়েদের নাম এক অক্ষরে পরিণত হইবে। বন্ধিমবাবু তাহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। দেবী-চৌধুরাণীর নাম প্রমুখ। তাঁহার জননী তাঁহাকে ডাকিতে-ছেন,—"ও পি"। 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ শৈবালনীকে ডাকিতেছেন,—"শৈ"। সুতরাং মনে হয় আর কিছুদিন পরে বাঙালী সম্রাট বাঙালীদের নাম একাক্ষরে পরিণত হইবে।

আজকাল অনেক ইংরেজী নাম বাঙালী মেয়েদের দেখিতে পাই—'Opala', 'Happy', 'Dolly', 'Lucy', 'Dora', 'Baby', 'Mary' প্রভৃতি নাম বাঙালী মেয়েদের আছে। পুরুষদের নামে যাবনিক নামেরও অভাব নাই। 'জহরলাল', 'মতিলাল', 'চুনীলাল', 'ফকির' প্রভৃতি নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে আসে নাই। উহা আরবী, ফারসী হইতে আসিয়াছে। 'জহর' শব্দের অর্থ রক্ত। উহাতে 'লাল' শব্দ যোগ করিয়া বাঙালী নাম হইয়াছে 'জহরলাল' আর 'মল' শব্দ যোগ করিয়া হইয়াছে 'জহরমল' মারোয়াড়ীর নাম। এই সকল রক্তজাপক নীম অর্থাৎ হীরা, মতি, চুণী, পান্না প্রভৃতির ব্যবহার সুবর্ণবর্ণিক সমাজেই বোধ হয় সমধিক।

আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী অনেক সময় কাহারও নাম শুনিলে বুঝিতে পারি যে, সেই নামধারী ব্যক্তি পূর্ববঙ্গবাসী। সজনীকান্ত, চপলাকান্ত, প্রাণবল্লভ প্রভৃতি নাম পশ্চিমবঙ্গে বড় দেখিতে পাই না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় আসিয়া আমার এক মাতুলের পাটের ব্যবসায় কিছুদিন লিপ্ত ছিলাম। সে সময় এক ভদ্রলোক পাটের দালানী করিতেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রাম জেলায়। শুনিলাম তাঁহার নাম প্রাণনাথ সাহা। তাঁহার নিবাস নাগরপুর গ্রামে। তাঁহার নাম ও গ্রামের নাম শুনিয়া ভাবিলাম নাগরপুরের প্রাণনাথ। নামের সহিত বাসগ্রামের বেশ সামঞ্জস্য আছে।

নামে অল্পপ্রাস বা মধ্যনামের একতা কোন কোন পরিবারে পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ণ্টান্ত-স্বরূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাম করিতে পারা যায়। স্বরকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত 'নাথ' শব্দ ঐ পরিবারের মধ্যনামে ব্যবহৃত হইতেছে। স্বরকানাথের পর হইতে ঐ পরিবারের সকল পুরুষের নামে 'ঞ' আছে। ঐ পরিবারের আর একটা বিশেষত্ব দেখি যে, নামের ইংরেজী আত্মকর জ্যেষ্ঠ পুত্রক্রমে একই প্রকার। স্বরকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। মহাবীর তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্রীতীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্র-নাথ। ক্রীতীন্দ্রনাথের পুত্র ক্রমেন্দ্রনাথ এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। আরও কয় পুরুষ এইরূপ চলিবে তাহা অনুমান করা কঠিন। কারণ আজকের সমস্ত বন্ধুর জন্ম অবশেষে হয়ত অভিধানের সাহায্য লইতে হইবে।

আমাদের নামের সহিত উৎকলবাসীদের নামের বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে অনেক সময় উচ্চারণের পার্থক্য হেতু উহাদের নাম আমাদের নাম হইতে গুরুতর ভ্রান্তি ঘটা সম্ভব।



আমরা স্বরবর্ণ 'ঋ' অক্ষরকে উচ্চারণ করি 'রি'। আমরা উচ্চারণ করি 'ক্রিষ্ণাবন' উড়িয়ারা উচ্চারণ করেন 'ক্রম্ণাবন'। এই ক্রম্ণা ডাক নাম বক্রগদ্য হইয়া যায়। তবে উড়িয়ারদের পদবী আমাদের পদবীর সহিত এক নয়। বিহারবাসীদের নামের সহিত আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের নামের পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। আমাদের নাম তিন অংশে বিভক্ত, তৃতীয় অংশ পদবী; বিহারীদের বোধ হয় আমাদের মত বংশগত উপাধি প্রচলিত নাই। উহাদের অনেকের

নামই ছই ভাগে বিভক্ত। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারী, কিন্তু তাঁহার পদবী কি? আর একটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি। আজকাল আমাদের দেশে পার্শ্ব-সারথি নামটার একটু বাহুল্য দেখিতেছি। আমার পরিচিত চার জন বৃদ্ধ ভক্তলোকের পৌত্রের নাম শুনিলাম পার্শ্বসারথি। এই নামটা বাংলায় বড় ব্যবহার হইত না। যাত্রাজ অঞ্চলেই উহার ব্যবহার অধিক ছিল। সম্ভবতঃ যাত্রাজ হইতেই ঐ নামটা আমরা লইয়াছি।

## জীবন থামে না

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হাসপাতালের সিঁড়িতে ঠাড়াই। চঠাং ভাবি : একি !  
জীবনের সবটাই মেকি ?  
বহু দূর গ্রাম থেকে এসেছে বিধবা  
( আধবুড়ো জীর্ণ-শীর্ণ মলিন অথবা )  
—চারটে বাজার জন্ত সবাই অস্থির  
মা কিবা বাবা কিবা স্ত্রী বা স্বামীর  
জন্ত আকুল ব্যাকুল তারা ।  
কিছু নেই করবার—কুচক্রী মন্তরা  
ফিরে ফিরে আসে বেন  
হাসপাতালের সিঁড়িতে ঠাড়িয়ে ভাবি : কেন ?

এরা ত উধাও হতে পারে  
পল্লাসাগরের ঘাঁপে কিবা এক গানের নিবিড়ে  
বেগানে সবাই মিলে হাসে  
তাড়ি কিবা বৈদ্যাস্তিক কল্পনা-বিলাসে ।  
কেন তারা বঠ পায়, কেন তারা নিজেকে বেচে চায়  
সেই সব তঃপগুলি বাবা শুণ্ডু জরাসন্ধতার  
নিজেকেই ছিঁড়ে কুটে বারবার উচ্চতর হাসে  
—ছন্দ, নিবিড় বঙ, ভয়-ক্রাস কিবা ভালোবাসে ।

তুমি তো বোঝো নি তবু তোমাকেই আমি  
বলেছি, সেদিন ছিল মাঘের নবমী  
একপানি পরিপূর্ণ চাঁদ—প্রায় পরিপূর্ণ  
আমার সত্যকে দীর্ণ  
করেছিল। ঘাস আর শিশিরের জীর্ণ স্বচ্ছতার  
ঘে-সব মুহূর্তগুলি ফিরে এসে চলে চলে যায়—  
তখন ভেবেছি আমি এই পৃথিবীর  
একেধরী হয়ে আছি। সূর্যাস্ত আবার  
থেকে প্রান্তবায় পাণ্ডু রঙগুলি  
—গান আর গান আর গানের আব্বুলই  
আমাদের হৃদয়ের অনিবিড় বঙে  
স্পর্শ করবে খেত পোষ মাঘ হিমে ।  
তোমাকেই বলি তাই আমি  
জীবন থামে না, থামি আমি ।

## অসামান্য

### শ্রীনির্মলকান্তি নজুমদার

দেওঘর। কার্তিকের মাঝামাঝি। হাট করে কিম্বা শিবগজার খার দিয়ে। হঠাৎ চেনা মুখ দেখে ধমকে দাঁড়াই। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে প্রোটা জীলেকটি। জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি গোলাপীর মা?

একটা চোখ বড় করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েই সে বলে—আঁ, ছোড়দাদাবাবু! আপনি এখানে?

—দেওঘরের জলহাওয়া ভাল, তাই বেড়াতে এসেছি। তুমি ত ঠিক চিনেছ আমাকে।

—তা আর পারব না। আপনারা দেশের লোক, আপনার লোক। তার ওপর আবার মনিব। আপনাদের চিনতে কখনও ভুল করব না।

—তুমি এখানে কত দিন আছ?

—বছরসাতেক হবে। দেশে ম্যালেরিয়ার ভুগে ভুগে শরীর ভেঙে পড়ে। মামাত ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসি। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর শরীর ভাল হলে হাতিবাগানে এক বাবুর বাড়ী কাজে লাগি। হাতিবাগান বাজারে বোমা পড়ার পর বাবু সপরিবারে এখানে চলে আসেন। প্রায় বছরখানেক থেকে ফিরে বান কলকাতায়। আমি যাই নে। সেই থেকে বাবা বঙ্কি-নাথের চরণে পড়ে আছি। যেখানে লোকে আসে তীর্থ করতে সে জায়গা কি ছাড়তে আছে?

—না, মন যেখানে বসে সেখানে থাকাই ভাল। বেলা বাড়ছে। বোদের তেজ খুব। বাস্তব দাঁড়িয়ে কথা বলা কষ্টকর। আমাদের বাড়ী এক দিন যেরো। ভারী খুসী হয়েছি তোমাকে দেখে।

—কোথায় উঠেছেন আপনি?

—বিলাসীতে। বাড়ীর নাম ‘কৃষ্ণকালীধাম।’ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গেটওয়ারা বড় মোতলা বাড়ী।

দেওঘরে দশ বছর পরে গোলাপীর মায় সঙ্গে দেখা হবে কল্পনাও করতে পারি নি। গোলাপীর মা আমাদের গ্রামের জগন্নাথ ঘোষের বউ। সে একমাত্র কন্যা গোলাপীকে নিয়ে বিধবা হয়। গোলাপী মাঝা পেলে সে কয়েক মাস পাগলের মত হয়ে যায়। তার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাদের বাড়ী কাজ নেয় ও কিছুকাল আমার ভাইঝি শিউলিকে মাহুত করে। সংসার বড় মজার জায়গা। জনায়ণো হারিয়ে যায় যে পরিচিত মাহুত সে আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা দেয় অপরিচিত স্থানে। বাড়ী কিংবা জীকে বলি গোলাপীর মায় কথা।

হাটদিন বাদে হুপুর বেলা গোলাপীর মা আসে কৃষ্ণকালীধামে। ছেলেদের কাছে ডেকে মাখার হাত দিয়ে বলে—সোনার চাঁদ ছেলে। একটা বছর পঁয়ষাট হোক। বাপ-ঠাকুরদার মুখ উজ্জ্বল কর।

জগন্নাথ ঘোষ বাতায় দলে অভিনয় করত। দেবগ্রামের মাইনর স্কুলে পানিক দুব পড়েছিল। তার প্রভাবে গোলাপীর মায় কথা-বার্তাও হয়েছিল মার্জিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বেশ আসর জমিয়ে ফেলে। ছেলেমাছের মত নানা প্রশ্ন করে আমাকে গ্রাম সন্ধ্যা।

—ছোড়দাদাবাবু, হাটতলার সেই বটগাছটা এখনও আছে?

—না, আর বছর আধিনের ঝড়ে ওর শিকড়সহ উপড়ে কেলেছে।

—আহা, অত দিনের গাছটা আর নেই! শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী তলার মেলা বসে?

—কই আর বসে? বেচাকেনা নেই। লোকজন সব মরে-হেজে গিয়েছে। পুরনো উৎসবের প্রতি তেমন আকর্ষণও দোপ নে।

—আমাদের ছেলেবেলায় ব্রহ্মাণী তলার কত অনিন্দই না হয়েছিল। শিবের পূজন হয় ত?

—কি করে হবে? সন্ন্যাসী পাওয়া যায় না।

—ওমা সে কি কথা! সন্ন্যাসীর অভাবে পূজন হয় না। দেশের ত ভারী দুর্দশা দেখছি। হাটের ধবর কি? শিব-মন্দির তলা থেকে নব্বেন ঠাকুরের গোলাবাড়ী পর্যন্ত সারি সারি দোকান বসে?

—হাট একদম জমে না—প্রায় উঠে যাবার দাবিল। লোকে জিনিষ কিনে পরলা দেয় না। ধারে আর কত দিন চলে? অল্প গায়ের হাটুরেয়া রাগ করে আসা বন্ধ করেছে।

—ছি, ছি, লজ্জার কথা। অবস্থায় কুলোয় না বলে কি অর্থ্য করতে হবে? একেই বলে, ‘অভাবে স্বভাব নষ্ট।’ আচ্ছা, অগ্রহীপের বাবু! হাতী চড়ে আমাদের গায়ে বেড়াতে আসেন এখনও?

—গোলাপীর মা, সেদিন গিয়েছে। সে বাবুবাও নেই, সে হাতীও নেই। অগ্রহীপ এখন ঋংসের মূপে।

গোলাপীর মা চুপ করে থাকে। হয়ত কল্পনা করতে চেষ্টা করে দেশের পরিবর্তন। হয়ত তুলনা করে একাল ও সেকাল। হঠাৎ কি বেন তার মনে পড়ে। বলে, আসল কথাই আমার এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আমার যেমন ভোলা মন! ভীষ্মভি ধরার বরেন না হলে কি হবে, শোকে-তাপে সেই দশাই দাঁড়িয়েছে। আমার শিউলি কেমন আছে? তাকে পেয়েই ত আমি গোলাপীর শোক ভুলেছিলাম। ‘গোলাপীর মা’ বলতে পারত না, আমাদের ‘গো-মা’ বলে ডাকত।

—শিউলি যে বিয়ে।

—সেই একবস্তি মেয়ের বিয়ে! তা হবে বৈকি, অনেক কাল আমি যে দেশছাড়া। কত বড় হয়েছে, কেমন দেখতে হয়েছে—বজ্র দেখতে ইচ্ছে করে। বিয়ে হবে?

—অম্মাণ মাসের প্রথমেই।

—তা বেশ। বেঁচে থাক, সুখে থাক, হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর অক্ষয় হউক। তোমরা কবে বাছ?

—সামনের রবিবারের পরের রবিবার।

গোলাপীর মা নীরবে কি যেন ভাবে। তারপর আবার শুরু হয় প্রশ্নের পর প্রশ্ন। স্মৃতির জোয়ার বধন আসে তখন এমন ভাবেই কুলহারা হয় মানুষ।

—বিশস্তর ভট চাকি—বুড়ো কথক-ঠাকুর গো—তিনি এখনও বেঁচে আছেন?

—এই সেদিন মারা গিয়েছেন নকই বছর বয়সে।

—খুব গুণী লোক ছিলেন। গায়ে তাঁর জোড়া মেলা ভার। নিত্যদাস বাবাজীর আশুড়ার মছব কেমন হয়?

—মছব হয়—তবে বোষ্টমের নয়, শেরালের। নিত্যদাস দেহরক্ষা করেন আর আশুড়াও ভাঙে, এখন সেখানে সিঁদুর বন।

—বলেন কি! আশুড়ার চিহ্নই নেই! আমাদের সময় ও জায়গার আসর গমগম করত। নায়েব মশায়ের বাড়ি দুর্গাপুত্রার ভোজ কেমন চলছে?

—নায়েব মশাই কালীতে গঙ্গালাভ করেছেন। সে আজ পাঁচ বছরের কথা। ছেলেরা জমিদারী সেবেস্তায় চাকরি করে। বছর বছর পূজার সময় বাড়ি আসে কিন্তু কোন রকমে কাজ সেবে চলে যায়। ষাওয়ানো-দাওয়ানোর পাট উঠে গিয়েছে।

—গায়েব কোন স্থপতি ত নেই। কি নিয়ে আছেন আপনারা?

—আমরা গ্রামের বাস ভুলে দিয়েছি বললেই চলে। কৃষ্ণ-নগরে থাকি। আম-কাঁঠালের সময় মাস দুই কাটিয়ে আসি গায়ে। শীতকালেও হস্তাখানেরের জঙ্গ বাই। গেম্ভর গুড় আর চাঁচি পানের লোভ সামলাতে পারি নে। তা ছাড়া দেশের মাঝা কি সহজে কাটানো যায়?

—তাই কখনও যায়? আমারও মাঝে মাঝে মন কেমন করে। মাটির টান আর নাড়ীর টান একই রকমের। ঠাকুর-দেবতাকেও ভুলিয়ে দেয়। এক এক সময় প্রাণটা এমন ছটকট করে যে ইচ্ছে হয় হুঁচকার দিন ঘুরে আসি। কিন্তু গায়ে গিয়ে পরের বাড়ী উঠতে ভাল লাগে না। ঘরদোর কবে চুরমার হয়ে গিয়েছে—

বাপ-পিতামহের ভিটের শিদিম জলে না। সে কি চোখে দেখা যায়, না প্রাণে সর?

অক্লান্ত গোলাপীর মায় প্রশ্ন। অতীত ইতিহাসের টুকরো কথার মধ্যে সে যেন গুনতে পার বৈকুণ্ঠের বাসী। হারান দিনের হাতছানির আকর্ষণী শক্তি যে কতখানি তা মরমী ছাড়া আর কে বোঝে?

বেলা শেষ হয়ে আসে। সূর্য চলে পড়ে অস্তাচলে। নীল-কঠপুরের মুক্ত মাঠে ভ্রমণবিলাসীর ভিড়। পশ্চিম আকাশের রঙীন রক্তমঞ্চে মেঘশিশুদের 'মেকানো' খেলা। আমি বলি—গোলাপীর মা, আর দেখি করো না। অজকরে যেতে কষ্ট হবে। একটা চোখে ত দেখতে পাও না। আজকের মত এস।

ফিরবার দিন বিকেলে জিনিসপত্র গোছান হচ্ছে। গোলাপীর মা এসে হাজির। এক হাতে প্যাঁড়ার হাঁড়ি আর এক হাতে বৃন্দাবনী শাড়ি। অবাধ হয়ে স্নিগ্ধতা করি—গোলাপীর মা, ওসব কি?

—শিউলির বিয়েতে তার গো-মার আলীকাদ। আপনি নিয়ে গিয়ে তাকে দেখেন। আজ আর বসব না। আপনারা বাস্তু। বাস্তের গাড়ী থরতে হবে ত।

ছেলেদের চিবুক স্পর্শ করে গোলাপীর মা বলে, সোনামণির। আবার দেওঘরে বেড়াতে আসবে, কেমন?

চলছিল চোখে বিশায় নেয় গোলাপীর মা। আমার অন্তরে জাগে গভীর জঙ্ঘা। মহত প্রাণ যে কোথায় লুকিয়ে আছে কিছুই জানি নে আমার। সীমার মাঝে যেমন অসীমকে পাওয়া যায় তেমনি সাধারণের মাঝেই মেলে অসাধারণ।

বৃক্ষনগরে ফিরে আসি। শিউলির বিয়ে দাদার প্রথম কাজ। শহরসুন্দ লোকের নিমন্ত্রণ। বিয়ের রাজে দামী উপহারে ঘর ভরতি। সেদিকে লক্ষ্য নেই শিউলির। তার মন জুড়ে থাকে কীবের মিলি আর ছাণা শাড়ি। তার পাশে স্নান হয়ে আসে মূল্যবান বোতুলের চাকচিক্য। সে যে সবল প্রাণের স্নেহের দান। তাতে নেই সামাজিকতার বাধাবাধকতা, আভিজাত্যের অহঙ্কার গচাবের প্রচ্ছন্ন আয়োজন। তার কি ভুলনা আছে? গো-মার চোখের জলে দেওয়া জিনিস চোখের জলে গ্রহণ করে শিউলি।

চোখের জলে সামান্ত জিনিস অসামান্য হয়ে ওঠে।



# ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস—হায়দরাবাদ অধিবেশন

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এসসি

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪১শ অধিবেশন বসিয়াছিল ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এই কংগ্রেসের উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করেন। সভাস্থলে হায়দরাবাদের নিজাম, রাজপ্রমুখ, মন্ত্রিবর্গ, ভারতীয় এবং বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত নেতৃক দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারসমূহে মনোযোগসহকারে গবেষণাকার্য চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে উৎসাহিত করেন। তিনি বিজ্ঞানের স্বজনী-শক্তি ও জনসকারী শক্তির উল্লেখ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে কেবলমাত্র মানবকল্যাণের জন্যই গবেষণাকার্য চালাইবার অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, দেশের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ পরস্পর সহযোগিতা করিয়া কার্য করিলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ হইবে।

মূল সভাপতি ডক্টর সন্দরলাল হোরা তাঁর অভিভাষণে প্রথমতঃ বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিগণের অভিভাষণসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রধানতঃ জ্ঞান আনুষ্ঠানিক মুদ্রোপাধায়, জ্ঞান শি. সি. বায় এবং জ্ঞান এম. বিবেচনারায়ার অভিভাষণসমূহ হইতে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল মনীষীর নির্দেশসমূহ ব্যাখ্যা করেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মাধ্যমে তাঁহারা বিজ্ঞানের জনকল্যাণ-কামী প্রচেষ্টার উপরেই বেশী জোর দেন। তাঁর মতে মূল সভাপতির অভিভাষণের মধ্যে একটি জনকল্যাণকর নির্দেশ থাকি। অবশ্যই প্রয়োজন। ডক্টর হোরা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিবার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। তিনি সকল বৈজ্ঞানিকের জন্য এক জাতীয় চাকুরি ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন একরূপ মন্তব্য করেন। যখন দেশগঠনের জন্য বিজ্ঞানীদের উপর গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তখন জাতীয় সরকারের কর্তব্য সমস্ত বৈজ্ঞানিককেই সমান মর্যাদা প্রদান করা বাহ্যতে বৈজ্ঞানিকগণ নিবিষ্টমনে গবেষণাকার্য করিয়া বাইতে পারেন এবং অধিকতর উন্নতির জন্য স্থানভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করেন। তিনি বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের জন্য উন্নত ধরনের একটি ইনস্টিটিউট নিষ্পাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সেখানে লক্ষপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-দের কিছুকালের জন্য গবেষণা করিতে দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদের কোন রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে না। ডক্টর হোরা বৈজ্ঞানিক-গণের পরম বন্ধু মত তাঁহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, জাতীয় সরকারের তৎপ্রতি অবহিত হওয়া কর্তব্য। তিনি লক্ষপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সম্পূর্ণ অবসরগ্রহণকে জাতীয় মণ্ডল হিসাবে বর্ণনা করেন। তাঁহাদের অবসরগ্রহণের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচালনাধীন যুবকগণের গবেষণাকার্যও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। তাঁর মতে এই সমস্ত লক্ষপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বোঝা মূল্য দিয়া তাঁহাদিগকে অবৈতনিকভাবে একটি পেনসন দিয়া স্ব-ক-গবেষণাকার্যে ব্রতী রাখা দরকার।

মূল সভাপতির অভিভাষণের পর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কার্য আরম্ভ হইল। বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণের ভাষণ শেষ হইবার পর মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও সমালোচিত হইল।

রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর ভি. সুরেন্দ্রাশাস্ত্রী। তিনি মণীশুরের সেক্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। তিনি ভারতীয় রাসায়নিকদিগকে অধিকতর শঙ্খলার সহিত কথো নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ জানান। বহু বিশিষ্ট রাসায়নিক বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া আসা সত্ত্বেও যথাযথভাবে কথো নিযুক্ত হন না এবং ইহার জন্য রাসায়নিক বৃত্তির অপকৃষ্ণ ঘটতেছে। কলেজে ডক্টরির সময় যোগাভা বিচার না করায় তিনি শিক্ষার মান নিম্নাভিমুখী হওয়ার কারণস্বরূপ মনে করেন। রাসায়নিকগণের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আতঙ্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার ফলে যথেষ্টসংখ্যক লক্ষপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বৃত্তিরা পাওয়া যায় না। যথেষ্টসংখ্যক শিল্পের অভাবই ইহার মূল কারণ যদিও এদেশে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা মালের অভাব নাই। রাসায়নিক-গবেষণা ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ কাজ হইলেও ঐ সমস্ত গবেষণার মান অনেক সময় বেশ উচ্চশ্রেণীর হয় না। ইহার কারণ টিক প্রতিভার অভাব নহে। বিশেষজ্ঞের দ্বারা শিক্ষাদানের অভাবই হইল ইহার মূল কারণ।

তিনি খাদ্য-সমস্যার বিষয় স্পষ্টভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা যায়। আমাদের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ হারে বাড়িয়া বাইতেছে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রায় দ্বিগুণ হইবে। সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। সকল দিক বিচার করিতে গেলে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেষ্টা হওয়া একান্ত দরকার।

ডক্টর সুরেন্দ্রাশাস্ত্রী তাঁর মণীশুরস্থ ফুড-রিসার্চ-ইনস্টিটিউটের গবেষণা-লব্ধ ফলস্বরূপ ট্যাপিওকার খেতসার চাউল এবং গমের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে নির্দেশ দেন। ডক্টর ট্যাপিওকার সহিত তৈলবর্জিত বাদ্যচূর্ণ কিয়ৎপরিমাণে মিশাইয়া উহা হইতে একপ্রকার কৃত্রিম চাউল প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই চাউল রন্ধন করা সহজ এবং ইহার পুষ্টিমানও মন্দ নয়। অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ জাপানে এইরূপ চাউলের ব্যবহার দেখা যায়। ট্যাপিওকার খেতসার যখন চাউল হিসাবে ব্যবহার হইবে না তখন উহা হইতে বিতৃষ্ণ বৈজ্ঞানিক, উন্নত গুরুত্ব প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাঁহার মতে বেশী পরিমাণ ট্যাপিওকার চাষ করিয়া এই কৃত্রিম চাউল-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিলে দেশের খাদ্যসমস্যা বহুলাংশে মিটিয়া যাইবে। খেতসারজাতীয়

প্রাক্তর সহিত শরীরকর্ষ প্রয়োজনীয় হৃদ প্রভৃতি প্রাক্তর কথাও তিনি উল্লেখ করেন। দক্ষিণ জনসাধারণ বাদাম হইতে উৎপন্ন হৃদ ও দধি ব্যবহার করিতে পারেন। এ দেশে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন বাদাম উৎপন্ন হয় এবং প্রতি পাউণ্ডে আট পাউণ্ড হৃদ প্রস্তুত হইতে পারে। উক্ত স্বতন্ত্রকণ্যের গবেষণাগারে এই হৃদের সহিত অতিবিক্ত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন মিশ্রিত করিয়া ইহার পুষ্টিমান বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই হৃদ শীঘ্রই বাজারে সরবরাহ করিতে পারিবে আশা করা যায়। তিনি কয়েকটি পাণ্ডসংরক্ষণের কথা বলেন। বিভিন্ন ক্ষুদ্রে উৎপন্ন কলসমূহ কিয়ৎ পরিমাণে সংরক্ষণ করা বাইতে পারে। উপযুক্ত ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পাকা ফল, আলু, শাক-সব্জী, ডিম, আপেল, মাছ প্রভৃতি বহু নিত্যাব্যবহার্য খাদ্যসমূহ সংরক্ষণ করা সম্ভব হইবে। পরিশেষে ডক্টর স্বতন্ত্রকণ্য পাণ্ডসমগ্র্যর ভ্রূ ভবিষ্যতের উপর নির্ভর না করিয়া এখন হইতেই সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আশ্রয়নির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করিতে বলেন।

পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর পি. এস. গিল। বর্তমানে তিনি গুলমার্গ রিসার্চ অবজার্ভেটরীর ডিরেক্টর। তিনি মহাজাগতিক রশ্মিসমূহের উৎপত্তি এবং শক্তি সম্বন্ধে একটি সন্দেহ ভাষণ দান করেন। ডক্টর গিল বলেন, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এক শ্রেণীর তড়িৎকণাসমূহ পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলের উপর সর্কল এবং সর্কলে প্রতিঘাত হইয়া এই মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ সৃষ্টি করে। আজ পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত শক্তিশালী তড়িৎকণা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা বহু লক্ষ গুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন এই মহাজাগতিক রশ্মিকণাসমূহ। পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা এই সকল রশ্মিকণার অসুত। সমুদ্র-পাশস্থ বায়ুমণ্ডলে যে সকল মহাজাগতিক রশ্মি পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই এইরূপ শক্তিসম্পন্ন। ডক্টর গিল বলেন, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কীয় গবেষণার অনুকূলে এবং ইতিমধ্যে বহু মূল্যবান তথ্যসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর আর. এন. চৌধুরী। তিনি বর্তমানে কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টর। তিনি ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি প্রাণপ্রধান দেশগুলির রোগসমূহ এবং তাহাদের আবেগা-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ডক্টর চৌধুরী বলেন, বর্তমান শতাব্দীতে বহু আশ্চর্যজনক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং জ্বররোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ দারিদ্র্য বাইতেছে। ডি-ডি-টির আবিষ্কারের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বীজাণু-বহনকারী মশকসমূহ বহুলাংশে বিনষ্ট হইতেছে এবং তৎসহ রোগের বিস্তারও ঘটা কমিয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়া জরে কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ, কালাজরে এস্টিমিনি ঘটিত ঔষধ, কুষ্ঠ রোগে সালফোন এবং হাটকো-কাইলেইরয়ার ক্ষেত্রে 'চেট্রোন' আশ্চর্যজনক কল দান করিতেছে। ডক্টর চৌধুরী পুষ্টির অভাব এবং সরিষার তৈলে শিরাল-

কাটা, খনিজ তৈল প্রভৃতি দ্বারা ভেজালের দমন দেশের যে কতি হইতেছে তাহার বিবরণ বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, প্রায়শঃ রোগসমূহ বিজ্ঞানের জ্ঞান জলহাওয়া বতটা দারী তাহার চেয়ে দেশের সোকের অজ্ঞতা আরও বেশী দারী।

কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর বি. পি. পাল। তিনি বলেন ষাণ্ড হিসাবে চাউলেরই মত গমেরও আদর হওয়া উচিত। যদিও ভারতবর্ষে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে গমের চাষ হইয়া থাকে তথাপি একরপ্রতি গমের উৎপাদন-হার খুব কম। তিনি বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎপাদনহারবৃদ্ধি চেষ্টা করিতে বলেন। ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট যে বিখ্যাত 'পুসা গম' উৎপাদন করিতে পারিয়াছে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। তিনি গমের কয়েকটি রোগের নাম করেন এবং তাহাদের প্রতিকারের জ্ঞান চেষ্টা করিতে বলেন। তিনি একরপ শক্ত প্রাক্তর গম উৎপাদন করিতে বলেন বাহা স্বভাবতঃ রোগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে।

প্রাণীবিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বোম্বাইয়ের ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর ডি. ডি. বল। তিনি ভারতবর্ষে মংশ-চাষ সম্পর্কে গবেষণা-ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মংশ বিভাগগুলির মধ্যে অধিকতর সহ-যোগিতার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। ডক্টর বল মংশ-চাষের উন্নতির জন্ত অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বারাকপুরের জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর বি. সি. কুণ্ডু। তিনি উঁহার ভাষণে কয়েকটি উদ্ভিদজন্তুর উৎপত্তি এবং গঠন-প্রকৃতি বর্ণনা করেন এবং তত্ত্ব স্বায়িত্ব প্রদর্শিত বিচার করিতে গেলে তিসি ও পাটের তত্ত্বই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ডক্টর কুণ্ডু পাটের তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক মূল্যবান তথ্যের কথা বলেন।

এ বৎসর ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে অনেক গ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাসমূহে কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব গবেষণালব্ধ কলসমূহ অকপট ভাবে আলোচনা করেন। ডক্টর ই. বি. চেইন এন্টিবায়োটিকস সম্বন্ধে একটি জ্ঞান-গত বক্তৃতা করেন। ইউ.এস.এ'র প্রেসসর এ. এম. বেটম্যান পৃথিবীস্থ পল্লি সম্পদের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম, এসবেসটজ এবং টিন সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও যাবলরী নহে এবং ভারতবর্ষ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের প্রেসসর এক, সি, বাওডেন উদ্ভিদে ভাইরাস রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। একাডেমিসিয়ান ইংগেলহার্ড, একাডেমিসিয়ান নাজারোভ প্রমুখ রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণও বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার বিশাল অট্টালিকাসমূহ হায়দরাবাদ সহরের ক্রমোন্নতিরই পরিচায়ক। হায়দরাবাদস্থ গোল-কুণ্ডা-ভূগ, সালারজক মিউজিয়াম এবং চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহিত ইলোরা এবং অজন্তার বিখ্যাত ও বিশাল গুহাসমূহ বিজ্ঞানীদের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে বর্ধমানের কেবলমাত্র এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বলিলেই চলিবে না। ইহা জাতীয় সরকারকে প্রতি বৎসর গবেষণালব্ধ নূতন নূতন তথ্যসমূহ সরবরাহ করিতেছে। রাষ্ট্র এই সকল তথ্য গ্রহণ করিয়া দেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করুক ইহাই আমাদের কাম।

## ‘ক্ষয় রোগ কথা’

ত্রিনিদলকুমার বসু

আজকাল বিজ্ঞানের মহলে রোগ এবং চিকিৎসার বিষয়ে মতামতের মধ্যে প্রায় বৈপর্য্যিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ক্ষয়রোগ

বী ম্যালেরিয়ায় মৃত রোগের আশু কারণ অবগত করেক প্রকারেব বিশেষ ধরণের বীজাণু। পূর্বে চিকিৎসকগণ এই বীজাণুকে সহজে

এবং দ্রুত ধ্বংস করিয়া রোগীকে নিরাময় করিবার দিকেই বেশি ঝোঁক দিতেন। এখন যে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু চিকিৎসকগণের দৃষ্টি উত্তরোত্তর অল্প এক নূতন দিকে নিবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। রোগীর অথবা সাধারণ মানুষের শরীর নানা কারণে তরল হইয়া পড়ে। বীজাণু সর্বত্র থাকিলেও তাহার শরীর যদি ভাল থাকে, পাওয়া-পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাৱ প্রভৃতি যদি ভাল হয় তাহা হইলে মানুষের দেহে বীজাণুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এই দিকে নিবদ্ধ হওয়ার তাঁহার ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন যে, রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগের প্রতিরোধের বিষয়ে আমাদের বেশি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা উচিত।

বহুকাল পূর্বে লিখিত রামায়ণেও আমরা দেখিতে পাই, এক ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যু ঘটিলে সেই শিশুর পিতা রাজা রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া বলিলেন, রাজার পাশেই, অর্থাৎ সমাজদেহে কোনও পাপ উপস্থিত হওয়ার কারণে অকালমৃত্যু ঘটতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি রাজাকে দারী করিলেন। রাজা রামচন্দ্র অবশ্য খুঁজিয়া, বাহির করিলেন যে, শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের একাধিপত্যে হস্তক্ষেপ করার কলেই রাজ্যের শ্রবণ হ্রাস হইয়াছে।



এম.বি. প্রকাশক এও সন্স

প্রথমতঃ চিকিৎসকের আলোচনার দ্বারা ও দ্বিতীয়তঃ কুমারসহ  
১৬৭সি, ১৬৭সি/১ বহুবাভার ট্রিট কলিকতা (আমহার্ট ট্রিট ও  
বহুবাভার ট্রিটের সংযোগস্থলে) আমাদের পুরাতন স্টোরের বিপরীত দিকে

ফোন-৬৮৬৬ মার্চ ১৯৬৬  
১৬৭সি, ১৬৭সি/১ বহুবাভার ট্রিট কলিকতা : ফোন ৬৮৬৬

সে কথা থাক। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এ কথা দুঢ়কটে ঘোষণা করিতেছেন যে, রোগের জন্ত যেমন বীজাণু আংশিক ভাবে দায়ী, তেমনই যে পরিবেশের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবন-বান্ধা নির্বাহিত হয় তাহাকেও তদনুরূপ দায়ী বলিয়া ধরা যায়। অতএব রোগের চিকিৎসার যেমন প্রয়োজন, যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার বশে রোগীর পক্ষে বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছে সেগুলিরও প্রতিকার তেমনই বা ততোধিক প্রয়োজন।

বাংলা দেশে আজ যেরূপে যেরূপ ক্ষয়রোগ প্রায় মাদেরিয়ার মতই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল দায়িত্ব ও শিক্ষা বর্তমান, শুধু এইটুকু বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না। ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী বাংলা দেশের বক্ষ্যরোগ সঙ্কে বিশেষজ্ঞ। তিনি চিকিৎসার আধুনিকতম প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্ত যেমন প্রায় বিদেশে তীর্থ করিয়া থাকেন, তেমনই ভাবে বহুসংখ্যক দেশী দোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব তাঁহার উপরে গুরুত্ব থাকায় কোন কোন সামাজিক কারণে রোগের দ্রুত প্রসার ঘটতেছে সে সঙ্কেও বিচারশীল মন লইয়া সর্বদা অবতীত আছেন। উপরন্তু অধিকারী মহাশয় সাহিত্যা-লুপ্সা হওয়ার তিনি তাঁহার রসসমৃদ্ধ ভাষার দ্বারা বাঙালী সমাজের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করিবার প্রত্ন প্রচেষ্টা করিয়াছেন। ফলে আলোচ্য গ্রন্থখানি\* অতি সুপাঠ্য হইয়াছে।

বাংলা দেশের জীবন আত্ম নানাদিক দিয়া উদ্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলার জমির উপরে জনসংখ্যার চাপ সর্বাধিক। এদিকে কয়েক পুরুষ হইতে গ্রামের বৃদ্ধিমান ব্যক্তি পল্লী-জীবনের অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার আশার শহরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। গ্রামে এবং শহরে জন্ম-মৃত্যুর হার এমন ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, জাতির প্রাণশক্তি যেন নির্বাপনের পূর্বে দীপশিখার মত কখনও মশ করিয়া জলিয়া

উঠিতেছে, কখনও ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া প্রায় নির্বাপিত হইয়া আসিতেছে।

একথা অবশ্য সহজেই বলা চলে যে, 'সমাজের এবং রাষ্ট্রের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটলে তবেই বাঙালীর পক্ষে সুস্থ-সবল দেহ মন লইয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, অতএব মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে অত নজর না দিয়া কি ভাবে দ্রুত বিপ্লব সাধন করা যায় তাহাই আমাদের সকলের চেষ্টা হওয়া উচিত। কিন্তু ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী সে দায়িত্বকে চিকিৎসকের প্রধান দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি সাধারণ মানুষকে সামাজিক পরিবেশ এবং রোগের সম্পর্ক সঙ্কে শিক্ষিত করিবার প্রত্ন প্রচেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন বতই মৌলিক হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত সাধারণ নাগরিক যদি শিক্ষিত না হইয়া উঠে তাহা হইলে শুধু শাসনের দ্বারাই কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রণের সহায়তার বখাৰ সৃষ্টি হইবে ও মনবিশিষ্ট নাগরিক তৈরী করা সম্ভব নয়। অতএব বিজ্ঞানের শিক্ষা শুধু বিপ্লবের পথের অবস্থার জন্ত নয়, সকল সময়েই তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্যক্তি একান্তে এবং সমষ্টিগতভাবে সামাজিক পরিবেশকে পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইলে তখনই বিপ্লব মূল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়।

সেকথা আলোচনা করার প্রয়োজন এখন নাই। পুস্তক-খানির বক্তব্য লইয়াই আমাদের ভাবিতে হইবে। অধিকারী মহাশয় সূচনাতেই নিবেদন করিয়াছেন যে, বইখানি ঠিক প্রবন্ধ-কাব্যে লিখিত হয় নাই। তিনি কতকটা বৈঠকী গল্পের ভাষা ব্যবহার করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার বক্তব্যকে সুপরিষ্কৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিবার সময়ে বহু বাক্যের রচনারীতিতে আমরা চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। অনেকস্থলে মনে হয়, প্রত্যেক যেন কথা বলিতেছেন এবং সেই বলায় মধ্যেও ভাবগুলি ব্যাকরণের নিয়ম-মুখলা লঙ্ঘন করিয়া একটির পর একটি ভিড় করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ভাষার এইটুকু ক্রটি সঙ্কেও প্রত্যেকের বক্তব্য এত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিচার এমন স্বচ্ছ যে সেই সকল সামান্য ক্রটি অতিক্রম করিয়াও তাঁহার শিক্ষা অতি সহজে পাঠকের মনকে অধিকার করিয়া বসে। ইহা যে-কোন লেখকের পক্ষে অতিশয় গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তিনি পাঠকে যোগেয় চিকিৎসা এবং নিবৃত্তি, তাহার আশু কারণ এবং নিদান সঙ্কে ও সর্বোপরি বাংলা দেশে ক্ষয়রোগের বর্তমান ভয়াবহ পরিণাম সঙ্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। শহর ও গ্রামে আমরা জীবনধারণের জন্ত যে ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছি তাহারও সত্য রূপ তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার কতকটা আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আরজের মধ্যে, কতকটা আবার তাহার বাহিরে। আমাদের দেশে নারীজাতির প্রকৃত অবস্থা কি, কোন্ কোন্ কারণে মাতৃজাতির মধ্যে রোগের প্রসার সহজে

ক্ষয়রোগ কথ্য—পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপ-ক্রমিকা—ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী। নিউ গাইড, ১২ ক্লারাম বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৬০। দাম তিন টাকা।

## ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিন্থিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-ব্যাধি প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অস্বিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।০ আনি।  
ক্রিমিরোগের কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ  
২১ বি, গোবিন্দ আড্ডা রোড, কলিকাতা—২৭

কোব—আলিপুর ৪৪২৮





## মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে অসম্ভব সম্ভব • হোলো !



বিকেল বেলাটা একটু আরামে কাটাযে ভাবছি এমন সময় আপিসের পিওন এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির। এক অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করতে হবে—মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে। আমার স্বামী তাঁর আপিসের সাহেবকে আজ রাতে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের মতো করে খাওয়ানো মুন্সিফের কথা অথচ ভাল কিছু খাওয়াতেই হবে—স্বামীর মান বাঁচাতে। বড় ভাবনার পড়লাম। ঠিক এমন সময় ডাক পিওন দিয়ে গেল একটা বড় মোড়ক। তাতে ছিল আমারই অর্ডার দেওয়া চকচকে নতুন একটি ডালডা রন্ধন পুস্তক।



তাড়াতাড়ি কিছু ভালো খাবার রান্না করতেই হবে। আর যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেলাম বইখানাতে। তখনই কোমর বেঁধে রাখতে লেগে গেলাম—রান্না অবস্থা ডালডা বনস্পতি দিয়েই করলাম। তাড়াতাড়িতে হিমশিম খেয়ে গেলাম, কিন্তু তা সার্থক হ'য়েছিল। খাবার পরিবেশনের সময় আমার স্বামীর গলোমল্ল মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। আর খাওয়া শেষ করে ওঠবার সময় সাহেবের উচ্ছ্বিত প্রশংসা যদি শুনতেন! ডালডা বনস্পতি দিয়ে রান্না করলে খাবারের নিজস্ব স্বাদগুণ কুটে ওঠে ও সাধারণ খাবারও সুস্বাদু হয়। ভাতাভূজি, ফোলফাল থেকে আরম্ভ করে কালিরা-পোলাও ও মিষ্টির পর্যন্ত—সবই ডালডা বনস্পতি দিয়ে

চমৎকার রাখা চলে। অল্পকাল ডালডা বনস্পতিতে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' দেওয়া হয়।



বাজারের গোলা টিন থেকে পুটুরো রেহপদার্থ কেনা মানে বিপদ থেকে জানা—গোলা অবস্থায় খুব দানী রেহপদার্থেও ভেজাল দেওয়া ও তাতে খুলাবালি ও মাছি পড়া সম্ভব। আর তা খেয়ে আপনি অল্পে পড়তে পারেন।

স্বস্তা বজার রাখবার জন্য আমাদের যে বিশুদ্ধ রেহপদার্থের দরকার—ডালডা বনস্পতি তা আমাদের যোগ্য। সব সময়ই বাথরোথক শীলকবা টিনে ডালডা বনস্পতি কিনবেন। সকলের সুবিধার জন্য ডালডা বনস্পতি ১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়। আজই একটিন কিনে ফেলুন।

সচিহ্ন ডালডা রন্ধন পুস্তক বাংলা, হিন্দি, তামিল ও ইংরেজীতে পাওয়া যাচ্ছে। ৩০০ রকম পাকপ্রণালী, রান্নাঘরের খুঁটিনাটি বিষয় ও পুষ্টি সম্বন্ধীয় তথ্য ইত্যাদি এতে পাবেন।

মাম মাত্র ২ টাকা আর ডাক খরচ ১২ আনা।

আজই এই টিকানার লিখে আনিবে নিন :

দ্বি ডালডা  
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস  
পোঃ, বক্স ৩৫৩, বোম্বে-১



গাছ মার্কা টিন দেখে কিনবেন

HVM, 210-X52 F

# ডালডা বনস্পতি

রাখতে ভালো—খরচ কম

হয়, শিওরা অকালমৃত্যুর কবলে পতিত হয়, তারার কতগুলি অজ্ঞান বা কুসংস্কারগ্রস্ত, প্রহকার নিঃস্বয় অথচ সঙ্গত্বভূত্বসম্পন্ন মনোভাব লইয়া আমাদের সে বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। জগতের অপরাধের দেশে রাষ্ট্রের অধীনে শাস্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া এবং বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা কি আশ্চর্য উপায়ে শুধু শিশু এবং মাতৃ-জাতি নয়, সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যকে উন্নত করা সম্ভব হইয়াছে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ইহার জন্ত অর্থবলই যে প্রধানতঃ প্রয়োজন, এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ধনের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা প্রয়োজন হইল জ্ঞানের এবং তৎসহ সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ করিবার জন্ত পুঙ্খকায়ে।

ইহার পরে তিনি বাংলা দেশে ক্ষয়রোগের অল্পকুল অবস্থান্তর বিব্রেক্ষণকরে আমাদের খাজসমস্তা, বাসস্থানের অকুলের সমস্তা প্রভৃতি বিষয় একে একে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল বিব্রেক্ষণ পাঠ করিলে বুঝা যায়, কি ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেই না আমরা বাস করিতেছি।

সর্বশেষে ক্ষয়রোগ সম্পর্কে এবং চিকিৎসার পর রোগীর পুনর্-কাসন সম্বন্ধে অধিকারী মহাশয় স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে অতি

মূল্যবান কয়েকটি বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পুঙ্খক সমাপ্ত করিয়াছেন।

বইপানি জ্ঞানীর দ্বারা লিখিত এবং আমাদিগকে জ্ঞান বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রকাশিত। যে চিত্র বইপানি পড়িলে ক্রমশঃ আমাদের মনে ছুটিয়া উঠে তাহা একদিক দিয়া যেমন ভয়াবহ, অপরদিক দিয়া আবার তেমনই আশাপ্রদ। কেবলই মনে হয়, আমরা বাঙালীরা জীবনধারণের জন্ত, নিজের অজ্ঞানতা, আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তার সহায়তায় কি তামসিক অবস্থায় না সঞ্চিত করিয়াছি। ক্রিমিকীট যেমন নিজের চতুষ্পাশে নানাবিধ আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যেই মলিন জীবন যাপন করে, বাঙালী তেমনই বাস্তব-গত এবং সমষ্টিগত তামসিকতার গুণে প্রত্যেক মানুষের জীবনকে স্বল্পস্থায়ী, রোগাকীর্ণ করিয়া টানিয়া টানিয়া বাঁচিয়া আছে। অথচ অধিকারী মহাশয়ের পুস্তকে সকলের চেয়ে আশার কথা হইল এই যে, এ অবস্থা অনিবার্য নহে। পুঙ্খকায়ে একান্ত এবং সমষ্টিগত প্রয়োগের দ্বারা, বিজ্ঞানের যথার্থ ব্যবহৃত হইলে আমরা বর্তমানের সর্বগ্রামী তমোভাবকে বিতাড়িত করিতে পারি। বিজ্ঞান স্বীয় তত্ত্ব পরিবেশনের দ্বারা আমাদিগকে প্রয়োজনীয় শক্তি দিতে পারে। উপরন্তু অপরাধের দেশ এ পথে অগ্রসর হইয়া শারীরিক কল্যাণের মধ্যে সকলের জীবনকে সহজ ও সহজিৎস্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরাই বা পারিব না কেন?

বইপানির মধ্যে এই আশার স্তর, সর্বোপরি তমোভাবের পরিবর্তে একটি বলিষ্ঠ শাস্তিক ভাব আমাদের আকর্ষণ করে। যদি প্রত্যেক বাঙালী পাঠক এই গ্রন্থপানি পাঠ করিয়া তত্পর পরিবর্তে আশায় এবং শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন, পরিবেশকে পরিবর্তন করিবার সাহস তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে ভয় বা সঙ্কোচের পরিবর্তে তাহার সহিত সমবেতভাবে সংগ্রাম করিবার উচ্চমের দীপ-শিখা তাহার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হয় তবেই তিনি দস্ত হইবেন, লেখকের নিকটেও আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

# সুপ্রা কালি

দায়ী ফাউন্টেন পেনের জন্য

সুপ্রা কালি আজ ত্রুত জনপ্রিয় কেন?

সব বিদেশী দায়ী কালিকে সে হার মানিয়েছে, সল-এক্সট্রাক্ট ও তলানিমুক্ত ব'লে অব্যাহত তার প্রবাহ, বর্ণের স্থায়ী ওজ্জ্বল্য মনে আনে তৃপ্তির নিশ্চিত আশ্বাস। কালির রাসায়নিক গুণে প্রিয় কলমটি থাকে চিরনূতন।



## বঙ্গভারতী

দৈনিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা ১০০      সপ্তাহিক ৩  
রুচিবান, সংস্কৃতি-সম্পন্ন এবং বিচারশীল  
পাঠকগণের পক্ষে অপরিহার্য।

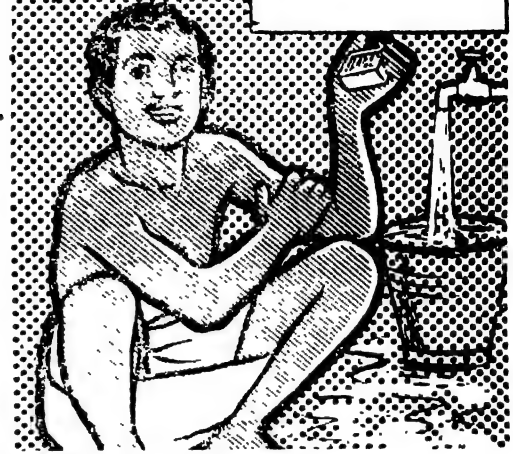
বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাম—কুলগাছিয়া; পোঃ—মহিষরেখা; জেলা—হাওড়া

ময়লার বীজাণু  
থেকে প্রতিদিনই  
আপনার অসু-  
খের সম্ভাবনা  
আছে



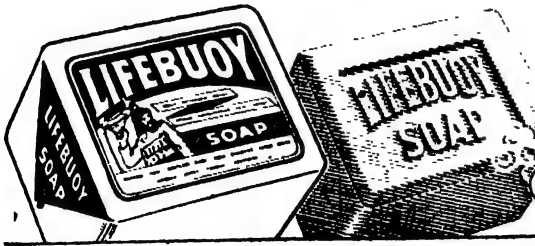
লাইফবয় মেখে  
এই সর্ব বীজাণু  
ধূয়ে ফেলে প্রতি-  
দিন নিজে কে  
রক্ষা করুন



# লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু  
থেকে আপনাকে রক্ষা করে

লাইফবয়ের  
“রক্ষাকারী  
ফেনা” আপনার  
স্বাস্থ্যকে  
নিরাপদে  
রাখে



# পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ঐতিহাসচন্দ্র  
দাশগুপ্ত, এম. এ., পি.এইচ.ডি.। কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয় কতক প্রকাশিত।  
মূল্য বার টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের বিবিধ ইতিহাস আলোচনায় প্রথম দিক এই  
আলোচনার অগ্রতম নায়ক পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কতক  
ইংরেজী ভাষায় রচিত এই সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাস ও ইহার বিভিন্ন দিক  
সম্পর্কে লিখিত নানা গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় এবং  
এগুলি পণ্ডিতসমাজে আদরলাভ করে। তাহার পর ক্রমশঃ অনেক নতুন  
উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে—অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে—অনেক  
অনেক নতুন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে  
ঐযুক্ত ব্রজমোহন সেন মহাশয়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ও ঐযুক্ত  
আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস' বিশেষ উল্লেখ-  
যোগ্য। দীর্ঘ দিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যের  
আর একখানি বড় ইতিহাস-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এখানি বাংলার  
লেখা। ইহাতে বাংলা সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—আদিযুগ  
বা হিন্দু-বৌদ্ধযুগ এবং মধ্যযুগ। গ্রন্থকারের মতে ডাক্তারগণ, চর্চাচর্চাবিশিষ্ট,  
দৌহাকোষ, খনার বচন, শৃঙ্গপুরণ, গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয়  
এবং ব্রতকথা আদিযুগের অন্তর্ভুক্ত। '১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত  
বিষ্মত' মধ্যযুগে লৌকিক সাহিত্য (মঙ্গলকাব্য), অশ্বমেধসাহিত্য,  
বৈষ্ণবসাহিত্য ও জনসাহিত্য বিকাশলাভ করে। এই যুগবিভাগের  
কল্পনার তথ্য গ্রন্থের অগ্রদূত আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মতামত  
অনুসরণ করা হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। গ্রন্থকার মূলতঃ প্রাচীন  
মতবাদের অনুবর্তন করিয়াছেন। তাই তিনি স্পষ্টভাবেই পীকার  
করিয়াছেন যে তিনি 'এই গ্রন্থরচনার উপাদান ও উদাহরণ সংগ্রহে প্রধানতঃ  
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থগুলির উপর অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য'  
হইয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে ২৩ গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং  
প্রসঙ্গক্রমে অনেক গ্রন্থ হইতে রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে অধিকাংশ  
ক্ষেত্রেই—বিশেষ করিয়া অপ্রকাশিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে নিদর্শনগুলির আকর  
বথানিয়মে উল্লিখিত না হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বড়ই অসুবিধায়  
পড়িতে হয়। পত্রাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা বাহ্যে

মাত্র। বর্ণাঙ্কিত ও ভাষার ক্রটি প্রমত্তমো বহুতর পরিলক্ষিত হয়। মোটের  
উপর, গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোঁরব যথোচিত রক্ষা করিতে পারিয়াছে  
মনে হয় না।

## ত্রিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

মন্দাকিনী—ঐরবি গুপ্ত, ঐঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিতেরী।

৮ বি ব্রজেন্দ্র ঘোষ লেন, কলিকাতা-১০। মূল্য তিন টাকা।

বইখানি বাগ্মিটি গাঠিকবিতার সমষ্টি। তরুণ কবি রবি গুপ্তের ইহা  
তৃতীয় বাল্যগ্রন্থ। ইহার মধ্যেই আরো দুইখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশ  
করিয়া লেখক যশোলাভ করিয়াছেন। ঐঅরবিন্দ আশ্রমের অধিবাসী  
বলিয়া তরুণ বয়সেই লেখক মরমী ভাবের প্রেরণা পাইয়াছেন। প্রথম কবিতা  
'মন্দাকিনী'।

অমরার মন্ত্র হতে মন্দাকিনী আসে বয়ে আসে

তরঙ্গ-উল্লাসে।

'উদয়', 'বঙ্গিরথ', 'তৃণা' প্রভৃতি কবিতার আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া  
উঠিয়াছে। 'নিহিত' কবিতায় তরুণ কবি বলিতেছেন,

হায় রজনী, তোমার বাণী যায় না কিছুই বোঝা।

আমার প্রাণে বাবল বাসা চিরদিনের গোঁজা।

'নেয়ে' কবিতায় পাই,

নিকমকালো চন্দ্রাতিপে

রাতের তারার জাশার সমুদ্র হ'ল;

পাণ্ডু-চাঁদের আভাস লাগে—

তরী বেয়ে কার ইশারায় চলে।

'আজান' আদিয়াছে,

আমি দেখিতেছি মহানু ভবির

সজ্জন-সরসী বহিরা তুর্গা,

জড়-জগতের অন্ধ-আধারে

নামিয়া ধ্বনিছে কিরণ-তুর্গা।

'ভবনী' কবিতায় আছে,

বিধ-বেদনার অত্র-বিসারিত তুচ্ছ-ভূবারিকা অচলে

স্রালোকে হেমময়ী জননী কল্যাণী শান্তি-সুখ-দীপ অনলে।



## অমৃততাঞ্জন

সর্বপ্রকার বেদনায় আণবিক বোমার ন্যায় কার্যকরী।

## দাদের মলম

চর্ম রোগে 'পরিমার্গ' শক্তির ন্যায় কার্যকরী।

অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭

স্থাপিত ১৯২৩



# দিনে দিনে আরও নির্মল, আরও লাবন্যময় ত্বক



**ক্যাডিল্মুড** রেঙ্সোনা কে  
আপনার জন্তে এই যাত্নটি  
ক'রতে দিন

রেঙ্সোনার ক্যাডিল্মুড ফেনা আপনার  
গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে  
ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন  
দিনে দিনে আপনার ত্বক আরও  
কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—  
আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।

## রেঙ্সোনা

**ক্যাডিল্মুড একমাত্র সাবান**

★ ত্বকপোষক ও কোমলতা প্রসূ কতকগুলি তৈলের  
বিশেষ সংমিশ্রণেব এক মালিকানী নাম

R.P. 117-50 BG

রেঙ্সোনা প্রোপাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

‘শ্রীঅরবিন্দ’ কবিতায় পাঠ,

জাগে এ ধরায় তির-আরাধা অমরার অরবিন্দ ।

‘নীল-বিরঙ্গ’ শ্রীঅরবিন্দে কবিতার অনুবাদ,

আমি দেব-বিশ্বম স্বর্ণ-নীলাকাশে

চিরস্বচ্ছ রাজি উদ্ভে মালিনের ।

বটখানিতে কবিতার সঙ্গে অনেকগুলি গানও আছে ।

হঠাৎ শুনি স্বপ্ন-সম

হোয়ার বাণী, নিরুপম ।

‘চকোর’ পাঠ,

হোয়ার নয়নে দেখিছি আমিও একটি আকাশ উজল হর,

স্বপ্ন-শিখায় পুচ্ছিত জাগে ।

অনেকগুলি কবিতাই ভার ও ভাষায় চম্ভর । তরুণ কবির চম্ভ ও শব্দের উপর আবিষ্ট আছে। “সম্বাদিনী”র অতুষ্টিময় কবিতাগুলি রসজ্ঞ পাঠকের অন্তরে সড়া জাগাইবে ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা

## ব্যাক অফ বাঁকুড়া লিমিটেড

সেটাল অফিস—৩৬নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

আদায়ীকৃত মূলধন—৫০০০০০ লক্ষ টাকার অধিক

ব্রাঞ্চ :—কলেজ হোয়ার, বাঁকুড়া ।

সেভিংস একাউন্টে শতকরা ২ হারে সুদ দেওয়া হয় ।

১ বৎসরের স্থায়ী আমানতে শতকরা ৩ হারে হিসাবে এবং

এক বৎসরের অধিক থাকিলে শতকরা ৪ হারে

সুদ দেওয়া হয় ।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে, এম. পি.

## পশ্চিমবঙ্গ জনগণের প্রতি নিবেদন—পশ্চিমবঙ্গ স্ব-

কার কর্তৃক প্রকাশিত । ২০ পৃষ্ঠা ।

দেশবিভাগের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গ নানা বিপর্দায় ভিতর দিয়া চলিয়াছে। সরকার গঠনের বৎসর যাবৎ এই রাজ্যের সর্বজনীন উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা করিয়া কার্যে আগ্রহের হইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় রাজ্যসরকারের দাব্যীয় জনকল্যাণ-প্রচেষ্টার বিবরণ সহজ ভাষায় সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থা, আর্থিক দুরবস্থা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, কল্যাণী নগরী, কৃষি ও দ্রব্য শিল্প, মাছের ব্যবসা, খাদ্য, ভূগর্ভস্থ জল, সেচ পরিকল্পনা, পশুচিকিৎসা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আইন পণ্যন, উচ্চশিক্ষা পুনর্গঠন, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রমিক-কল্যাণ, উপজাতি-কল্যাণ, মাদক-নিবারণ, কারা সংস্কার, পঞ্চাঙ্গিক পরিকল্পনা এবং সর্বশেষে ১৯৫২ সালের কর্মসূচী এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে। রুশদেশ, চীনদেশ কিংবা আমেরিকা সম্বন্ধে এদেশে যথেষ্ট প্রচার চলিতেছে। কিন্তু রাজ্যসরকার দেশবাসীর জন্য কি করিতেছেন সে সম্বন্ধে প্রচারকার্য খুব কমই হইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে একরূপ পুস্তকাদি বাণিজ্যিকভাবে প্রচার করিয়া একাধারে দেশের লোকের কৌতুহল-নিবৃত্তি ও সকলের মধ্যে নাগরিকের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার জন্য সরকারের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া সরকার একটি বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন।

পর্যাপ্ত দেবতা—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত । প্রাচী পকাশন,

১২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১ । মূল ১/- ।

এখানি “দি গ্রেট দ্যাট কেইলড” নামক ইংরেজী গল্পের বাংলা অনুবাদ। বিভিন্ন দেশের ছয় জন মনীষী—ইসরাইলি এক সময়ে নিজেরা কমিউনিষ্ট কিংবা কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন ইহাদের প্রত্যেক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারা হইয়াছেন লুই কিয়ার (আমেরিকান), টীফেন স্পেনডার (ইংরেজ), আন্দ্রে জ্যু (ফরাসী), ইগনাসিয়া মিলোন ইটালিয়ান), আর্থার কোয়েসলার (জার্মান) এবং রিচার্ড হাইট (আমেরিকান নিগ্রো)। পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের পর রুশদেশে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং তৎকর্তৃক মানবজাতিক নূতন আশার আলোক প্রদর্শন ও নব আশ্বাসের অনুপ্রেরণায় উদ্ভুদ্ধ করা বিংশ শতাব্দীর অঙ্গতম প্রধান ঘটনা। এই বিশ বৎসরের কিস্কির্দুকালের মধ্যে সোভিয়েটের আদর্শেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং উক্ত নূতন ধারণার সাজাজান্দে পরিণত হইয়াছে। সোভিয়েটের বর্তমান নীতি স্বাধীন চিন্তা ও মানুষের ব্যক্তি-বিকাশের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজ সমাজতন্ত্রী লড প্যাসফিল্ড বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সোভিয়েট অভ্যুত্থানকে মানবের নূতন সভ্যতার সূচনা বলিয়া অধিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যে এই নূতন সভ্যতার ফাটলগুলি এতই শূন্য হইয়াছে যে, ইহার বন্ধুতাও ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিধা পড়িয়াছেন। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ভয়াবহ সংগ্রামের কথা চিন্তা করিয়া আজ সমগ্রগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েটের তথাকথিত সাম্যবাদের আদর্শকে অক্ষতাবে অনুসরণ করিবার পূর্বে এই পুস্তক পাঠ করিলে তরুণদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ সমর-প্রযুক্তি-শিল্পের পরিণত হইতে চলিয়াছে ও মানবসভ্যতার বিনতির আশঙ্কার আজ বিশ্বের মনীষিগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কমিউনিজমের ‘অপর দিক’ সম্বন্ধে বাহ্যতে দেশের তরুণেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারে এমন একরূপ পুস্তকের বচল প্রচার কাম্য। কথা-সাহিত্যিক ভারাপক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

**টোল ও কোম্পানীর**

**দাদ ও কনডরের মলম**

**কিউটা-টোন** (সেরে বেদনা ও চর্মরোগের জন্য)

**নিম্ন মলম** (খোস পাচড়ে ও দুগ্ধকণীর জন্য)

**বহান গর** কলিকাতা-৩৫



## দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদাও স্বচ্ছকরে দেয়



“দেখছেন, আমার তোয়ালে কত সাদা? কেন জানেন তো—সানলাইটে কাচা হ’য়েছে ব’লে। দ্রুত-ফেনিল সানলাইটের ফেনা ময়লা নিংড়ে বার ক’রে দেয়। সানলাইট দিয়ে কাচলে আপনার কাপড়-চোপড় স্বচ্ছকরে সাদা হ’য়ে বার, তার কারণ সেগুলি স্বচ্ছকরে পরিষ্কার হয় ব’লে।”



“সাঁতারের পর শরীর ধোমন স্বচ্ছকরে বেশ হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। তেমনি সানলাইট সাবানে কাচার মতন আর কিছুতেই রঙিন কাপড়-চোপড় অত স্বচ্ছকরে হয় না। সানলাইটের সরের মতো ফেনা না আছড়ালেও ময়লা বের ক’রে দেয় আর সানলাইটে কাচা কাপড় টেকেও আরও বেশদিন।”



সানলাইট সাবান

কাপড় বাতায় • পরিশ্রম বাতায় • স্বচ্ছ বাতায়

221-X52 BG

গুরুত্বপূর্ণ



**মাটির পুতুল**—ঈশ্বরত পাল। নির্ভীক কাঁদালয়, বাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)। 'মূল্য ১/-'।

বইখানিতে দশটি কবিতা আছে : পদ্মা, মহরা, কালনাগিনী, গ্যালিক, ট্রাটের মোড়, কলকাস, শহীদ, কবির কামনা, চিঠি, প্রাণ, জুপিও।

গতানুগতিক নিরানন্দ কবিতার বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে 'পদ্মা'র।

"কে পদ্মা, আমারে সিক্ত করে আঁসতে আঁসতে

জীব করে ক্রৌবতার অনড় প্রাচীর।"

কবির দৃষ্টি এবং অনুভূতি আছে, কিন্তু ভাষা ও ছন্দ সর্বত্র কাব্যশ্রীমণ্ডিত হয় নি। স্থানে স্থানে ভাষার ভুলও রয়ে গিয়েছে।

**স্বাধীনতার সংকট**—ঈবীরেজ মজুমদার। 'অনুবাদক : ঈশলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞ ও ধোব, ১০ ভাষাচরণ দ্বিষ্ট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬০।

"অখিলভারত চর্যাসংগ্রহের সভাপতি বীরেন্দ্র মজুমদারের জন্ম হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই সেপ্টেম্বর গৌরকপুরে।" ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস ইন্ডিয়ান কলেজে পড়বার সময়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে থেকে খাদি-উৎপাদন ও গ্রাম-সংগঠনের শিক্ষা লাভ করেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে একাদিক পাকী-আক্রমণ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজসেবা সংক্ষেপে বর্ণনা করে তিনি অনেক বই লিখেছেন। এখানি তাঁর 'আজাদী কী পাতরী'র বঙ্গানুবাদ। আকারে বড় নয়, কিন্তু বইখানিতে অনেক ভাববার স্থান আছে। তাঁর বক্তব্য : "গান্ধীজী-বর্ণিত আর্থিক বিপ্লবকে যদি আমরা কার্ণে পরিণত করতে না পারি তবে ভারতে শুধু আমেরিকাই আবির্ভাব হবেনা, বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক অমিতবলশালী পেরতর কার্যেম হবে।" পুঞ্জিপতিদের হাতে যখন শিল্পীকরণের ভার দেব, তখন তারা তাদের পুরানো বন্ধু বিদেশী পুঞ্জিপতিদের সাথে পাঁচিড়া বাঁধবে।... কেদারী শিল্পবান্ধা যাদের হাতে পড়বে তাই তারা সিংহাসনের উপর প্রত্যাবিস্তার করবে। এই জগুট আমরা জনসাধারণের মন থেকে সোনার ভয়সা দূর করে শ্রমের ভরসায় তাদের নিজ জীবনগাত্র পরিচালন করার ক্ষমতা তৈরি করতে চাইছি। আমরা চাই, যাতে শাসনদণ্ডের উপর পড়ান বিস্তার করার ক্ষমতা পুঞ্জিপতিদের বদলে শ্রমিকদের হাতে যায়।"

**জীবনশিল্পী**—ঈশ্বরজিতকুমার নাগ। আগমনী প্রকাশনা-ভবন, ৮৫ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা-২। মূল্য ৪০।

জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি—এই চিন্তাগ্রোতে মনকে ছেড়ে দিয়ে লেখক তার পথপ্রদর্শক একে রাখে চেয়েছেন ২৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানিতে। প্রথম পৃষ্ঠাতেই চোখে পড়ল 'এসে পড়েছে', 'স্বিরমান জীবন'। লেখকের কল্পনা আছে, কিন্তু পাকশক্তিভা ভালভাবে আয়ত্ত হয় নি।

**জড়বাদ বনাম মানবজগৎ**—ঈশ্বরবান্দ্য কাগলী। আসান-সোল, রাহা লেন থেকে গল্পকার কতক প্রকাশিত। মূল্য ১/-।

পাশ্চাত্য জড়বাদ আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে অশান্তির পথে নিয়ে চলেছে, বর্তমান অবস্থা বিমোহন করে লোক তাই দেখিয়েছেন। ছোট বইখানিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে।

**সাথে গাহে পাখী**—ঈশ্বরজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশন, ৩ সাকাস রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য ১/-।

— লড়াই বাংলার গৌরব —

**আপড়পাড়া কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের**  
গভীর মার্ক।

শেকী ও ইজের স্নাতক অথচ সৌখীন ও টেকসই।

তাই বাংলা ও বাংলার বাহিরে বেখানেই বাঙালী  
সেখানেই এর আদর। পরীক্ষা প্রার্থীরা।

কারখানা—আপড়পাড়া, ২৪ পরগণা।

ব্লক—১০, আপার সার্বভূমার রোড, দিহলে, কুম নং ৩২,  
কলিকাতা-২ এবং টাঙ্গমারী ঘাট, হাওড়া টেশনের সম্মুখে।

## সামূল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আহ্বার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এক যে সঙ্গতি, সত্যতা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার হৃদয় পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে।

**নূতন বীমা**  
১৬, ৩৮, ৭১, ২১৮/-

মোট চলতি বীমা..... ৮৬,৭১,৮৫.৪০/-  
মোট সম্পত্তি..... ২২,৪৯,৮৩.৫৬/-  
বীমা ও বিবিন্ন অর্থ..... ১৯,৭৭,৭৬.২৮/-  
প্রিমিয়ামের আয়..... ৩,৯৪,২২.৩৭/-  
মারী শোধ (১৯৫২)..... ৮৮,৮২.২৭/-

হিন্দুস্থানের বীমাশ্রম বিরাগত  
সারবান ও গাভজনক।

**হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ**

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স, ৪নং সিম্পসন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩



“যেমন সাদা তেমন বিশুদ্ধ

এই লাক্স টয়লেট সাবান—

সুগন্ধি সরের মতো কেনা এর...”

নিরুপা রায়

বলেন



ভারতে  
প্রস্তুত

“বিশুদ্ধ, সাদা লাক্স টয়লেট সাবানই আমার ত্বকে  
খুব পরিষ্কার রাখে” নিরুপা রায় বলেন। “তার  
কারণ এই সাবানের প্রচুর সরের মতো কেনা  
গোমকুপের ভেতর পর্য্যন্ত যায়। আর, তাতে মুখের  
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে ও ত্বক্ পরিষ্কার স্ব-  
করে করে যায়। এই সাবান মাথলে গায়ের ওপর  
যে একটা সুগন্ধ থেকে যায় তা আমার বড়  
ভালো লাগে।”

“... তাই তো আমি ত্বকের লাভণোর জন্য লাক্স  
টয়লেট সাবান এত পছন্দ করি।”

উন্নয়ন সাহিত্যিক এবং সাবলীল ভাষা ও ছন্দে গুণে কবিতাগুলি মনকে মগ্ন করে। দুটি কাব্যগদ্য গদ্যরচনা ও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

**আলো-ছায়া**—ঈশ্বরীন্দ্রকুমার মিত্র। গ্রন্থালয়, ১৯০বি দ্রুগচরণ ডাক্তার রোড, তালুকদা, কলিকাতা। মূল্য ১০।

“কবিতার বৃক্ক নাহি থাকে,  
পশ্চাতে তাও বহি রাখে,  
তারকাখচিত নীল নভে  
তুমি মনোরমা।”

কাব্যলক্ষ্যকেও কবি বোঝায় এই রূপেই দেখতে ভালবাসেন। কবিতা-গুলিতে প্রবল আবেগ নেই, কোমল মাদুর্গ আছে। চ’এক জায়গায় সামান্ত ছন্দের ত্রুটি চোখে পড়ল।

### শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার লেখক (১ম খণ্ড)—ঈশ্বরীন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪।

যে সকল মনসী লেখককে বর্তমান সাহিত্যের পাঠক ভুলিতে বসিয়েছে অথবা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধসমাজ ও সাহিত্যিকগণিক কড়ক খাটানোর লেখা পঠিত ও আদৃত হয়, তাহাদের ও বর্তমানকালের সত্য সত্য দিকপাল সাহিত্যিকের কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, যথাঃ শিবনাথ শাস্ত্রী, হৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দত্ত, চরণসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ সায়র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উক্তাদের প্রত্যেকের লেখা, রচনামণী, বাগ্‌বৈদ্য,

চরিত্র-চিত্র, নিদর্শন-বর্ণন প্রভৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে ধারণ ও অনুবৃত্ত। বাঙ্গালচরিত্র ও রসসাহিত্যে, কথাসাহিত্যে ও প্রবন্ধগোবিন্দে, লিপিচর্চায় এবং লিখনতত্ত্বীয় ইত্যাদির প্রত্যেকের লেখাই স্ব স্ব মহিমায় সমৃদ্ধ ও দ্রুতমনি। আজিকার পাঠকগণ ইত্যাদের রচনা সম্বন্ধে অবহিত হইলে অনেককিছু শিখিতে পারিবেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক নতুন আলোকের সন্ধান পাইবেন। উল্লিখিত সত্য সত্যের রচনার বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের হৃদয় বিস্তার ও সমগ্র আলোচনা সাহিত্য-সম্বন্ধে ও রসপিপাসাগণের কোমল চরিত্রার্থ করিবে এবং ইত্যাদের লেখা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের তত্ত্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিনব আলোকসম্পাত পাঠকসমাজের সাহিত্যচেতনাকে প্রবুদ্ধ ও পরিভূত করিবে। আলোচ্য লেখকগণের প্রতিকৃতি এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

### শ্রীবিজয়েন্দ্রকুমার শীল

**নিয়ন্ত্রণী**—গুরুদাস। ঈশ্বরীন্দ্রকুমার দে। যোগদা সংস্করণী রোদাময়ী বিদ্যাপীঠ। লক্ষ্যপুত্র (মানভূমি)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০২। মূল্য ৪।  
এখান উপন্যাস। বর্তমানে আমাদের দেশে ছাত্রদের শিক্ষা-পদ্ধতি লইয়া এমন একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে যাহা আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলকে পর্য্যন্ত নাড়া দিয়াছে। পক্ষত শিক্ষা কিভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, ভাব এবং

# ফেথোডের মহাভূগরাজ তৈল

চুল উঠা বন্ধ করে  
মাথা ঠাণ্ডা রাখে



এই মার্কা দেখে কিনুন নকল থেকে সাবধান



শিক্ষকের মধ্যে বিরূপ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিলে প্রকৃত কল্যাণ সম্বন্ধিত হইতে পারে, কয়েকটি ছাত্র ও একটি আদর্শ শিক্ষক-চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাহা পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কিত নানা সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন। চাত্র-চরিত্রে চর্যলতা, চপলতা, ঈর্ষা, ঘেঁষ, কোমলতা, কঠোরতা সবকিছুই আছে, কিন্তু শান্তিমানের পরিবর্তে ভালবাসার শাসন ব্যাধি ক্রিয়ায় ইহাদের নৈতিক উন্নতিবিধান সম্ভব—তাহা বই ঘটনার মধ্য দিয়া দেখানো হইয়াছে এবং এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে লেখকের প্রয়াস একেবারে বাণ্য হয় নাই।

### শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ব্যবহারিক শব্দকোষ—কাজী আবদুল ওজ্জ্ব। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্টোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে আট টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৩০।

নামেই প্রকাশ, এ অভিধানখানি নিম্নত ব্যবহারযোগ্য। বাংলা ভাষায় অভিধান সংকলিত হইতেছে আজ কিপিদধিক দেড় শত বৎসর ধরিয়া। ইহা এই সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন ঐর্ষ্যশালিনী হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে যেমন বাণ্য বিভিন্ন অঙ্গুলে প্রচলিত শব্দসমূহের প্রয়োগের দিকেও ক্রমশঃ আন্মাদের দৃষ্টি ফিরিতেছে। প্রাচীন, এমন কি গত সোয়াশ দেড়শ বৎসরের পুস্তককার ব্যবহৃত বহু শব্দ এখন অচল। আবার বিস্তর শব্দের মানে ক্রমশঃ বদলাইয়া গিয়া নতুন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে। ভাষায় নতুন নতুন শব্দও প্রবেশ করিতেছে বিস্তর। অভিধানে নতুন-পুরাতন সকল শব্দ দ্রুত থাকে, ভাষার সম্পদ সম্বন্ধে সত্যত আমরা নজাগ হই। একারণ ভাষাদিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ইতিহাসে অভিধান একটি প্রবৃত্ত স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাংলা ভাষায় ছোট বড় অভিধান এযাবৎ সংকলিত হইয়াছে অনেক। রূপালি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা ভাষার দ্রুতগতিশীলতার সঙ্গে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। আলোচ্য অভিধানখানি এ অন্তর্য অনেকটা নিদ্রিত করিলে নিঃসম্পন্ন। অভিধান সংকলনে সঙ্কলয়িতা যেসব পুস্তককারের নিকট হইতে সহায়তা পাইয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন। তবে ইহার অভিধানখানির চুটকি বিশেষত্বের কথা তিনি 'নিবেদনে' উল্লেখ করিয়াছেন। এখানি ব্যবহারকালে এই বিশেষত্বগুলি প্রত্যেকেরই নজরে পড়িবে। সংকলয়িতা ঋণ শব্দের মানে বা প্রতিশব্দ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত শব্দের পরিমাণ ও পার্চান বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বা নতুন বাক্য সংযোগে দর্শাইয়াছেন। তাহার পূর্বেও বড় বড় অভিধানের এ দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সচরাচর ব্যবহারযোগ্য; অল্পপরিমিত অভিধানে ইহা অভিনব বটে। বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রবেশক এবং সাহিত্য-সেবী মাত্রের এখানি এজন্য বড়ই কাজের হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব, এই অভিধানখানিতে মুসলমান-সমাজে প্রচলিত অথচ বাংলা অভিধান সাধারণতঃ অচলিত শব্দসমূহও সংকলিত হইয়াছে। আমরা এই অভাব ইতিপূর্বে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি। এই অভাব নিরাকরণের প্রয়াস করিয়া সংকলয়িতা বাংলাভাষার ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। তাহার মতে "মুসলমান-সমাজের চিত্র বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সর্বের প্রয়োজনীয়তা সহজেই বুদ্ধি পাবে।" আমরা অভিধানখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সুন্দানীর চোখে পশ্চিম—শ্রীশৈকালি নন্দী। বেসল পাবলিশার্স, ১৫ বক্সি চার্টজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ১৭২। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

লেখিকা শিশু-শিক্ষণ বিভাগে অধ্যয়ন করার জন্য কিছুকাল পূর্বে বিলাত যান। সেখানে এক বৎসর ছিলেন। এই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন

উপলক্ষে তাহার ভ্রমণেরও সুযোগ ঘটে। এই পুস্তকখানিতে তিনি সুন্দানীর দৃষ্টিতে যেসব বিষয় দেখিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহারই কথা বর্ণনা করিয়া বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এখানে আলোচ্য কোন কোন বিষয় ইতিপূর্বেই প্রবাসীতে ও পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই লেখিকার অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এবং অভিজ্ঞতা পরিবেশন-কৌশল পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পুস্তকে কি কি বিষয় ক্রিয়ায় আলোচিত হইয়াছে তাহার আট শাওরা যাইলে বিদ্যমানের নামকরণ হইতে, যেমন—বিলাত দেশটা মাত্রিঃ বিলাতের পথেঘাটে, কাজ ৫ ছুটি, বিলাতের রাস্তায়, বিলাতের নতুন সমাজ, ছেলে কি করে 'মানুষ' হয়, ইংরেজ চানী পরিবার; আয়ারল্যান্ড—শাদা চোখে; প্যারিস; পঞ্চদশ-সপ্ত-হুইজারল্যান্ড; মস্কো জেনিস; ভিয়েনা—আন্তর্জাতিক শিশুশিক্ষা সম্মেলন প্রভৃতি।

নরনারীর সঙ্গে আলাপ-মন, তাদের দৈনন্দিন জীবনব্যাপনের রীতিপদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, পথেঘাটে নরনারীর চাল-চলনে, আর্থনিক ও প্রাচীন নানা বিষয়ে তাহাদের অন্তঃমনোভাব প্রকাশে যে নতুন সমাজের পরিচয় পাইয়াছেন, লেখিকা অতি সহজ ভাষায় সুনিপুণভাবে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাহানি হইলেও আয়ারল্যান্ড ও এখনও অর্থনৈতিক দিক হইতে কত পশ্চাৎপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত তাহার পরিচয় মিলে এই সম্পর্কীয় অধ্যায়ে। ইউরোপ মহাদেশে লেখিকা গিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপের মধ্যেও তাহার শীর্ষম নতুন জিনিষের আশ্রয় লইতে ক্ষান্ত হয় নাই। শিশু-শিক্ষণ বিভাগে অধ্যয়ন, এ সর্বের মধ্যেও, তিনি অধিকার তৎপর ছিলেন। ভিয়েনার আন্তর্জাতিক শিশুশিক্ষা সম্মেলনও

## বিদেশীর ওপর টেকা দিচ্ছে—

### কাজল কালি

কালি দিয়েও যে দেশের কালিমা ঘোচে, বিদেশী যুগে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে কাজল-কালি। আজ স্বদেশীর যুগে সেই কালি-ই যে বিদেশীর ওপর টেকা দিচ্ছে, এইটিই বিশেষ আনন্দের কথা।

শ্রীঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র

২৮।২।৫৪

প্রস্তুতকারক :—

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা)-১

অল্পতম বিক্রেতা—

কলেজ স্টো, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

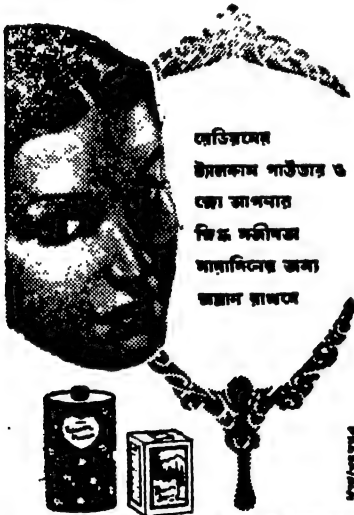
ল তাঁহার নিকট একটি বিশেষ আকর্ষণ। এখানকার বিবরণ অত্যন্ত নাজ চাইয়াছে। পুস্তকখানি বাংলাভাষীর নিকট আদরণীয় হইবে সন্দেহহ।

**মনাবী জীবন কথা** (১ম ও ২য় খণ্ড)—ঈশ্বরীন্দ্র রায়।  
রিফট বুক কোম্পানী, ২ গ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য  
প্রতিখণ্ড দুই টাকা।

প্রতি খণ্ডে দশ জন করিয়া কুড়ি জন বঙ্গমনীষীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে  
খণ্ডক আলোচনা করিয়াছেন আলোচনায় অভিনব এই যে, তিনি প্রত্যেকের  
ক্ষেপে দেখা করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রমুখ্যে যে জীবন-কথা এবং  
রিয়াছেন, তাহাষ্ট তত্ত্বভাবে পুস্তকদ্বয়ে তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।  
নবক দুই জনের—বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদত্ত ও ডঃ তরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের  
ক্ষেপে স্বয়ং সাফল্য কবিতা পারেন নাই। সাফল্যকালের নির্দিষ্ট দিনের

পূর্বকই তাঁহারা লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 'আত্ম-  
যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানবিধি, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য, বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদত্ত,  
হরিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রাজেশ্বর বসু, দ্বিতীন্দ্রনাথ  
সেন, তরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, গোপীনাথ কবিরাজ ও যোগেশচন্দ্র বাগ্‌চীর  
জীবন-কথা। তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে এই ক'টি জীবন-কথা আলোচনা  
করিয়াছেন : যদুনাথ সনক, ব. মহরদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, নন্দলাল বসু,  
রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, তরেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিতীন্দ্রনাথ  
মজুমদার, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

পুস্তক দুই খণ্ডে গ্রন্থকার নূতন ও পুরাতনের মিলন ঘটাইয়াছেন। প্রায়  
এক শতাব্দী যাবৎ বাংলাদেশে যে প্রাচীন ও নবীন বিচার চর্চা চলিতেছে  
তাঁহার একটি প্রদর পরিচয় মিলে এই জীবন-কথাগুলির মধ্যে। সংস্কৃত-  
সাহিত্যের অনুলীন যে কত সময়সাপেক্ষ ও আশ্রয়সাধ্য; তাহা এতদূরে হইতে  
আমাদের ধারণার মধ্যেই আসিবে না। কত বৎসর ধরিয়া কিরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে  
কাব্য, স্মৃতি, স্তায় দর্শনাদি অধ্যয়ন ও মনন করিয়া সে সমুদয়ে ব্যুৎপন্ন হইতে  
হয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতা-সংঘাতে ভারতবর্ষের বিকাশক্ষেত্রে  
যে বিপুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমরা কখনও স্বীকার  
না করিয়া পারিব না। গত শতাব্দীর রেনেসাঁসের যুগে আমাদের বিলুপ্তপ্রায়  
সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত এবং সর্কসাধারণের শিক্ষার অঙ্গ হইবার  
যোগ্য পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা-ব্যবস্থারও  
সংস্কার সাধিত হইয়াছে। দেশে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এমন কয়েক-  
জনের জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন যাহারা এই প্রাচীন পদ্ধতি  
অনুসরণপূর্বক প্রাচ্য-বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পার্ণিত্য অর্জন করিয়াছেন।  
আবার এমন কয়েকজনের জীবন-কথা উভয় খণ্ডেই আছে যাহারা প্রাচ্য ও  
পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যাই বিশেষ পারদর্য হইয়াছেন এবং তাহাদের অর্জিত  
জ্ঞান পোড়জনকে পরিবেশন করিতে নিয়ত রত রহিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে  
ইতিহাস এবং বিজ্ঞান-চর্চা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নূতন। এই দুইটি  
বিভাগেও বাঙালীজাতির বিশেষ গর্বের কারণ রহিয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ  
সরকার ইতিহাস-চর্চায় যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞান-  
সম্বন্ধে এবং বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় বিভিন্ন পন্থেক  
তাহাই অনুসরণ করিতেছেন। বিজ্ঞানক্ষেত্রে নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্রনাথ  
বসু এবং মেঘনাদ সাহা নাম আজ কে না জানেন? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র  
বসু এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞানানুশীলনে জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা  
যে স্বাভাবিক প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইহারা অনুসরণ করিয়া  
অগ্রগতি হইয়াছেন। হকীমাবু এইসব মনীষীর জীবন-কথা—বঙ্গ পরিসর  
হইলেও গোড়জনকে পুর্নাই। একটি বিশেষ হিতসাধন করিয়াছেন  
এবং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিপিনবিহারী গুপ্তের পুরাতন  
প্রসঙ্গের মত এই সকল মনীষীর নিকট হইতে জীবনদর্শন ও জীবন-  
সাধনার কথা আরও কিছু জানিয়া আমাদের পরিবেশন করুন এই কামনা



**রেডিয়াম স্নো ও  
ট্যালকাম পাউডার**

রেডিক্স ল্যাবরেটরী  
কলিকাতা-৬৬

ত্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

# চিবি ডি প্তি =

আমরা অতীৰ সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র ৫১০ সাড়ে বারো আনা সের দরে চিনি যাহাতে পাওয়া যায় সেজন্য স্থানে স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের সুব্যবস্থা হইতেছে। চিনি সরবরাহে কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিলে তৎপ্রতিকারার্থে যে কোনরূপ পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হইবে।

## সুগার ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

২নং দয়হাট্টা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

টেলি : ঠিকানা—“চিনিবিজি”

ফোন : ৩৩-১০১২



### সংস্কৃত মহাসম্মেলন

বিগত ১৭ই মাঘ হইতে ২৪শে মাঘ পর্যন্ত আটদিন ব্যাপিয়া চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ভবন-প্রাঙ্গণে ভগলী সংস্কৃত পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিপুল সমারোহে "সারস্বত সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৭ই মাঘ অপরাহ্নে তিন ঘটিকায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালী-পদ ভট্টাচার্য। ডক্টর শ্রীশ্রীতীর্থকুমার চট্টোপাধ্যায় এই দিন প্রধান অধিবেশনে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

১৮ই মাঘ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় পণ্ডিত শ্রীহরেন্দ্রনাথ তর্ক-তীর্থের সভাপতিত্বে জ্ঞানদর্শন সম্পর্কে শাস্ত্রালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য,

এম-এ। উক্ত দিবসের অন্ত্যাহ্নে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত শ্রীশ্রীতীর্থ জ্ঞানতীর্থ, এম-এ। ডক্টর শ্রীজ্ঞানকীর্ত্তন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, এম-এ, পি-এইচ-ডি একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯শে মাঘ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের সভাপতিত্বে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের সভায় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশ্রীতীর্থকুমার নন্দীর বক্তৃতা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত অজ্ঞান দিনের অন্ত্যাহ্নেও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশ-গ্রহণ করেন। ২৩শে তারিখে সংস্কৃত পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক অধ্যাপক শ্রীঅমিয়নাথ চক্রবর্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ-বিরচিত সংস্কৃত নাটক অভিনীত হয়। সভায় প্রতিদিনই অলাবনীয় লোক-সমাগম হইয়াছিল। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যালোচনামূলক এক্রপ বিরাট অনুষ্ঠান একটি অভিনব ঘটনা। সভার শেষ দিনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মহাত্মা ভূদেবের সাধনভূমি চুঁচুড়াতেই সরকার-প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক।

**ডায়াপেপসিন**

পরিপূর্ণভাবে  
স্বাদ্য  
হজম  
করিতে  
সাধ্য  
করে

**ইউনিয়ন ড্রাগ**  
কলিকতা

### প্রাক্তন সৈনিকদের সমবায় প্রতিষ্ঠান

প্রাক্তন সৈনিকদের আর্থিক উন্নতি এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে রিজিওনাল এম্প্রয়মেন্ট অফিসার, ক্যাপ্টেন এস. কে. মুখার্জী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রাক্তন সৈনিকদের লইয়া ১৯৫০ সনে 'বেঙ্গল এক্স সার্ভিসমেন্ বিকিউজিস এণ্ড সিটিজেন্স মাল্টিপারপাস' সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমবায়-সমিতি বর্তমানে কলিকাতা হইতে পরিত্রিশ মাইল দূরে (গ্রাম—পাথরঘাটা, পোঃ—চাকলা, জেলা—২৪ পরগণা) একটি সমবায় মৎস্ত-চাষ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতি আরও অজ্ঞান কুটীর-শিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। ইহাও বর্তমানে মৎস্তচাষ ও কৃষি-উন্নয়ন পারিকল্পনার দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন। বিগত মে মাসে সরকার কর্তৃক আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ক্যাপ্টেন মুখার্জী ও অজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের পরিকল্পনা দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। আশা করা যায়, দুই-এক বৎসরের মধ্যে বৃহৎ দুঃস্থ প্রাক্তন সৈনিক তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। সম্প্রতি রাজ্যপাল মহাশয়, বিখ্যেডিয়র গুরু কৃপাল সিং ও অজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি এই মৎস্তচাষ কেন্দ্র পরিদর্শন



## — সদ্যপ্রকাশিত নুতন ধরণের দুইটি বই —

প্রসিদ্ধ কথাস্রষ্টা আর্থার কোয়েটনারের

‘ডার্কনেস্ অফ টিউন’

নামক অল্পপম উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ

প্রসিদ্ধ কথাস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী ও শিল্পী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

লিখিত ও চিত্রিত

“মধ্যাহ্নে আঁধার”

“জঙ্গল”

ডিমাই ৫ সাইজে ২৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

শ্রীনীলিমা চক্রবর্তী কর্তৃক

অতীব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ভাষান্তরিত

মূল্য আড়াই টাকা।

সবল সুবিন্যস্ত ও প্রাণবন্ত ভাষায়

ডবল ক্রাউন ৫ সাইজে ১৮৪ পৃষ্ঠায়

চৌদ্দটি অধ্যায়ে সুসম্পূর্ণ

মূল্য চারি টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: প্রবাসী প্রেস—১২০১২, আগার সারকুলার রোড, কলিকাতা—২

এবং এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ—১৪, বকিম চাটজি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

### একাধারে চারিটি গুণ

একত্র সমাবেশ করেছে ক্যালকেমিকোর

### নিম্ন টুথপেস্ট

- ১) নিম্ন দাঁতনের সংক্রমণ-নিবারক, বিদ্যাপহারক, জীবাণুনাশক নানা গুণের সঙ্গে দাঁতের ও মাড়ীর পক্ষে উপকারী কয়েকটি আয়ুর্বেদীয় ভেদজ এবং আধুনিক দন্তবিজ্ঞানসম্মত দাঁতের হিতকর উপাদানও কিছু আছে।
- ২) দন্তকর (Caries) ও প্যারোন্টিয়া প্রতিরোধক আমাদের নবাবিষ্কৃত একটি বিশেষ রসায়ন এর মধ্যে আছে।
- ৩) প্রেসিপিটেড চক, ম্যাগকোর্ড ইত্যাদি বিস্তৃত উপাদান অবলম্বনে প্রস্তুত বলে, অম্লস্ফারী জীবাণু ধ্বংস হয় ও দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে।
- ৪) এর মধ্যে মুখের দুর্গন্ধ নাশক “ক্লোরোকিল” আছে।  
এই টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজার সময় যে প্রচুর ফেনা হয়, তা দাঁতের কীকে প্রবেশ করে এবং সমস্ত ময়লা ও খারাপ পরিষ্কার করে।

একাধারে এতগুলি গুণ আর কোনও টুথপেস্টে নেই।

বড়, সাধারণ এবং ছোট তিন রকম টিউবে পাওয়া যায়।



দি ক্যালকাটা  
কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২২

করিয়া বিশেষ সম্বোধন করিলেন। রাজ্যপাল মহাশয় প্রাক্তন সৈনিকদের এই কথাই বলেন যে, সরকার হুঃহুঃ সৈনিকদের সর্বদাই আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত যদি প্রাক্তন সৈনিকেরা নিজেরা উত্তমশীল হন ও এইরূপ সমবার-সমিতি গঠন করিয়া স্পেশ-উন্নয়ন কার্যে ত্রুটি হন। তিনি আশা করেন যে, এইরূপ আরও বিভিন্ন সমবার-সমিতি দেশে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

### শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর শতবার্ষিকী উৎসব

উত্তরপাড়ার সারদাত সন্ধ্যালনের উদ্যোগে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী উত্তরপাড়ার শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে অল্পকিছু সভার শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায় একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, “আমার পিতৃস্বস্তের স্বর্গত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় নিজমুখে শ্রীশ্রীমার করুণার কথা বাহা আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিতেছি। প্রথমে ললিতমোহনের একটু পরিচয় আবশ্যক, তিনি প্রসিদ্ধ কাগজবিক্রেতা মেসার্স জন ডিকিন্সন এণ্ড কোং লিঃ নামধেয় ইংরেজ আপিসের চিক সেলসম্যান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের গৃহী-শিষ্য কলিকাতা শ্রামপুতুরনিবাসী স্বর্গত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের আত্মকুল্যে ললিতবাবু ঐ পদ লাভ করিয়াছিলেন, কালীবাবু জন ডিকিন্সনকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা শ্রামপুতুরনিবাসী প্রাচীন ব্যক্তিমাঝেই জানেন।

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমা সঙ্কে নিজমুখে বাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ : ‘একবার ভয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন করিতে বাই। শ্রীশ্রীমা বহু সহকারে মধ্যাহ্ন-ভোজন করাষ্টয়া বিদায় দিবার কালে বলিলেন যে এ প্রচণ্ড রৌদ্রে কলিকাতায় ফিরিবার সময় মাঠ পার হইতে তোমার বড় কষ্ট হইবে। ললিতমোহন উত্তরে জানাইলেন মাতৃ-আশীর্বাদ আমার অক্ষয় কবচ। শ্রীশ্রীমা নীরবে সমস্ত চক্ষুতে চাটিয়া রহিলেন। একখানি চলমান রুক্ষবর্ণ মেঘ সারা পথটি ধরিয়া ললিতমোহনের মাথার আতপত্রের কাজ করিয়াছিল। এমন মায়ের অমোঘ আশীর্বাদ।’

এখন শ্রীশ্রীমার জীবন পর্যালোচনা করিয়া আমি যে শিক্ষালাভ করিয়াছি সে সঙ্কে দুই-চারিটি কথা বলিতেছি। চিকের আড়ালে অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপিণী শ্রীশ্রীমা বেক্ষেপে কথিয়া গিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধার হৃদয় ভরিয়া উঠে। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ষোড়শী পূজা দ্বারা মাতৃস্বস্তের সর্বজনীনতার আসনে সারদাদেবীকে

বেদপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, ষষ্ঠ্যগতের ইতিহাসে অল্প অল্প করিয়া ঘটনা।

### শ্রী চট্টোপাধ্যায়

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশক চট্টোপাধ্যায় ৬৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। নদীয়া জেলার পালপাড়া গ্রামে জন্ম আদি নিবাস ছিল। মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে তাঁহার পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি ছিল। সাবোর কৃষি কলেজে সাড়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর তিনি শ্রীখ ড্যানি স্ট্রিট, ডি. ওয়াল ডি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে রসায়ন-বিভাগে কাজ করেন; পরে কালকাটা ইলেকট্রিক সার্ভিস করপোরেশনের রসায়ন-বিভাগে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। এই স্থানে কাজ করিবার সময় একজন খেতাজ উপবিওয়ালার সহিত তাঁহার মতবৈধ হওয়ার তিনি উক্ত কার্য পরি-ত্যাগ করেন। ইহার পর হইতে তিনি আর কোন চাকুরি গ্রহণ করেন নাই।

প্রকাশবাবু নামজাদা লোক ছিলেন না; তিনি বাহা ভাল বুঝিতেন তাহা নীরবে করিয়া যাঁহা হইতেন। তাঁহার তাঁহার সংসারে আসিয়াছিলেন তাঁহার প্রথম পরিচয়েই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সৌজ্ঞেয় মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার আত্ম-সম্মানজ্ঞান খুব প্রখর ছিল। নীচতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কাহারও সহিত মতভেদ হইলেও তিনি তাহার প্রতি কোন বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন না। তিনি ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃ বন্ধু-বংশল ব্যক্তি খুবই বিরল। সকলের প্রতিই তিনি শ্রীতির ভাব পোষণ করিতেন। ঈশ্বরের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। ক্যান্সার রোগের অসহ্য বন্ত্রণায় যখন তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন তখনও তিনি বিচলিত হন নাই। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কহিয়াছেন এবং মৃত্যুর একদিন পূর্বে বন্ধুরা যখন তাঁহাকে দোখতে গিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের প্রতি তিনি আদর আপ্যায়নের কোন ক্রটি করেন নাই। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চার পৃষ্ঠাব্যাপী যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেই চিঠিতে বন্ধুর কথাই ছিল, নিজের কোন কথাই ছিল না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁহার নিপুণ চিকিৎসার কথা বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি চিকিৎসা করিতেন। বহু দরিদ্র রোগী তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।





